বিজ্ঞান ও ধর্ম – *সংঘাত নাকি সমন্বয়?*

সম্পাদনা: অভিজিৎ রায়

সূচিপত্র

ভূমিকা [ক্লিক করুন] ৭

প্রথম অধ্যায় : মহাবিশ্ব ও ঈশ্বর ১ ৮ [ক্লিক করুন]

- ঈশ্বরই কি সৃষ্টির আদি কারণ? : *অভিজিৎ রায়* ১৯ [ক্লিক করুন]
- বিজ্ঞান ও ধর্ম : *আলবার্ট আইনস্টাইন (দিগন্ত সরকার)* ২ ৬ [ক্লিক করুন]
- আইনস্টাইনের মহাজাগতিক ধর্ম ও অন্যান্য প্রসংগ : *রিচার্ড ডকিন্স (অজয় রায়)* ৩ ৪ [ক্লিক করুন]
- স্বাধীন ইচ্ছা, মন্দ ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব : *অপার্থিব* ৪৫ [ক্লিক করুন]
- বিজ্ঞানের ধর্ম ও ঈশ্বর প্রসঙ্গ : *অজয় রায়* ৪৯ [ক্লিক করুন]
- সংশয়ীদের ঈশ্বর : *আহমাদ মোস্তফা কামাল* ৮১ [ক্লিক করুন]
- মহাবিশ্ব ও ঈশ্বর : একটি দার্শনিক আলোচনা : *অভিজিৎ রায়* ৯৪ [ক্লিক করুন]

দ্বিতীয় অধ্যায় : পরিকল্পনা, ডিজাইন ও ঈশ্বর ১২০ [ক্লিক করুন]

- বিজ্ঞান কি ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছে? : *ভিক্টর স্টেঙ্গার (প্রদীপ দেব)* ১২১ [ক্লিক করুন]
- পরিকল্পিত মহাবিশ্ব? : *স্টিভেন ওয়েইনবার্গ (দিগন্ত সরকার)* ১ ২ ৮ [ক্লিক করুন]
- ঈশ্বরের অস্তিত্ব সৃষ্টির যুক্তি খন্ডন : *অপার্থিব* ১৩৭ [ক্লিক করুন]
- স্রষ্টা এবং ধর্ম যখন অসঙ্গতির : *সৈকত চৌধুরী* ১৪৩ [ক্লিক করুন]
- ব্যাড ডিজাইন : *অভিজিৎ রায়* ১৫১ [ক্লিক করুন]
- বাগানে গোপনে একজন মালী আসে অথবা আসে না *শোহেইল মতাহির চৌধুরী* ১৬০ [ক্লিক করুন]
- আমেরিকায় ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের নামে কি হচ্ছে? : *বন্যা আহমেদ ও অভিজিৎ রায়* ১৬২ [ক্লিক করুন]

তৃতীয় অধ্যায় : ধর্ম ও বিজ্ঞান - অনিবার্য সংঘাত নাকি সহাবস্থান? ১৯৫ [ক্লিক করুন]

- বিজ্ঞানমনস্ক ধারা, ধর্মাচ্ছন্ন স্রোত: *ইরতিশাদ আহমদ ১৯৬* [ক্লিক করুন]
- ধর্ম, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা: শহিদুল ইসলাম ২২০ [ক্লিক করুন]
- ধর্ম চেতনা ও ঈশ্বর বিশ্বাস: *ওয়াহিদ রেজা ২৩৬* [ক্লিক করুন]
- ধর্মবিশ্বাস, বিজ্ঞানবিশ্বাস ও এক চিল্‌তে ইতিহাস : *প্রদীপ দেব ২৫৪* [ক্লিক করুন]
- সৃষ্টিতত্ত্বের অসারতা বনাম বিবর্তনতত্ত্বের সাফল্য : *দিগন্ত সরকার ২৬৬* [ক্লিক করুন]
- ডারউইনিজমের আতংক : *ভিক্টর স্টেংগর (বন্যা আহমেদ) ২ ৮ ৯* [ক্লিক করুন]
- বিজ্ঞান ও ইসলাম - অন্তিম সংঘাত : *টড পিকক (তানবীরা তালুকদার) ২ ৯ ৫* [ক্লিক করুন]
- ধর্মীয় দাবী সম্বন্ধে যে কারণে আমি সংশয়বাদী : *পল কার্জ (জাহেদ আহমেদ ও অভিজিৎ রায়) ৩১৪*
- স্বতন্ত্র বলয় : *স্টিফেন জে গুল্ড (খান মুহাম্মদ) ৩২৫* [ক্লিক করুন]
- বিজ্ঞানের অংগনে যখন ধর্মের প্রবেশ : *রিচার্ড ডকিন্স (তানবীরা তালুকদার) ৩ ৪ ০* [ক্লিক করুন]
- বিজ্ঞান ও ধর্ম : সংঘাত নাকি সমন্বয় মার্ক্সবাদের দৃষ্টিতে : *শঙ্কর রায় ৩ ৪ ৭* [ক্লিক করুন]
- ধর্ম ও বিজ্ঞান: সংঘাত- সমন্বয়ের রণনীতি- রণকৌশল : *মোঃ জানে আলম ৩ ৫ ৬* [ক্লিক করুন]
- ধর্মের স্বরূপ এবং বিজ্ঞান : আবুল হোসেন খোকন ৩ ৬ ১ [ক্লিক করুন]
- ধর্ম নয়, বিজ্ঞান : *আকাশ মালিক ৩ ৬ ৬* [ক্লিক করুন]

চতুর্থ অধ্যায় : ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান ৩ ৭ ০ [ক্লিক করুন]

- বিজ্ঞানময় কিতাব : *অভিজিৎ রায় ৩ ৭ ১* [ক্লিক করুন]
- বিজ্ঞান, ধর্ম এবং অপবিজ্ঞান কোথায় টানব সীমারেখা? : *জাহেদ আহমদ ৩ ৮ ৯* [ক্লিক করুন]
- ধর্মে বিজ্ঞানঃ নিম গাছে আমের সন্ধান *নাস্তিকের ধর্মকথা ৪ ০ ০* [ক্লিক করুন]
- বিজ্ঞান, ধর্ম ও বিশ্বাস : *অপার্থিব ৪ ১ ১* [ক্লিক করুন]
- ইসলামী বিজ্ঞানের পৌরাণিক কাহিনী : *খান মুহাম্মদ ৪ ১ ৭* [ক্লিক করুন]
- ভগবদগীতায় বিজ্ঞান অন্বেষণ এবং অন্যান্য : *অনন্ত বিজয় ৪ ২ ৯* [ক্লিক করুন]

পঞ্চম অধ্যায় : ধর্ম, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ৪৫০ [ক্লিক করুন]

- নৈতিকতা কি শুধুই বেহেস্তে যাওয়ার পাসপোর্ট? : *অভিজিৎ রায় ৪৫১* [ক্লিক করুন]
- ধর্মই কি নৈতিকতার উৎস? : *অপার্থিব ৪ ৭ ৩* [ক্লিক করুন]
- হতবুদ্ধি, হতবাক! : *মীজান রহমান ৪ ৭ ৫* [ক্লিক করুন]
- আমাদের মূল্যবোধ কি ঈশ্বর হতে আগত? : *ভিক্টর স্টেংগর (মুন্সি কেফায়েতুল্লাহ) ৪ ৮ ৮* [ক্লিক করুন]
- বিবর্তনের দৃষ্টিতে নৈতিকতার উদ্ভব : *অপার্থিব ৫ ০ ০* [ক্লিক করুন]
- ' স্বার্থপর জিন' - এর আলোকে সহযোগিতা এবং আত্মত্যাগ : *দিগন্ত সরকার ৫ ০ ৬* [ক্লিক করুন]
- প্রসংগ নৈতিকতা : *পুরুজিত সাহা ৫ ১ ৬* [ক্লিক করুন]
- নাস্তিকতা নিয়ে কিছু ভুল ধারণা : *স্যাম হারিস (দিগন্ত সরকার) ৫ ১ ৯* [ক্লিক করুন]

ষষ্ঠ অধ্যায় : ধর্মের উৎস এবং অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ৫ ২ ৫ [ক্লিক করুন]

- ধর্মের উৎস সন্ধানে : *দিগন্ত সরকার ৫ ২ ৬* [ক্লিক করুন]
- ধর্মের উৎপত্তি : উত্তর পুরুষ ৫ ৩ ৯ [ক্লিক করুন]
- ধর্মের উপযোগিতা : *রিচার্ড ডকিন্স (জাহেদ আহমদ, বন্যা আহমেদ) ৫ ৪ ৬* [ক্লিক করুন]
- বিশ্বাস কি মানব মনে প্রোথিত? : *আশিক মাহমুদ রূপম ৫ ৫ ৬* [ক্লিক করুন]
- মানুষের উদ্ভব কি কোন স্বর্গীয় স্পর্শের ফসল? : *বন্যা আহমেদ ৫ ৬ ২* [ক্লিক করুন]
- বিবর্তনের দৃষ্টিতে জীবন : *অপার্থিব ৫ ৭ ২* [ক্লিক করুন]
- ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কি ফুরিয়ে গেছে? : *খান মুহাম্মদ ৫ ৮ ১* [ক্লিক করুন]
- ধর্মীয় চেতনার অস্তিত্ব : সামাজিক পরিচয়ের দৃষ্টিতে! : *বিপ্লব পাল ৫ ৯ ৩* [ক্লিক করুন]

সপ্তম অধ্যায় : অলৌকিকতার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ৬০৩ [ক্লিক করুন]

- পার্থিব জগতের অপার্থিবতা বিশ্লেষণ : *অনন্ত বিজয় ৬ ০ ৪* [ক্লিক করুন]
- আত্মা বলে সত্যই কি কিছু আছে? : *অভিজিৎ রায় ৬ ৩ ২* [ক্লিক করুন]
- প্রার্থনা কি কোন কাজে আসে? *ফরিদ আহমেদ ৬ ৬ ২* [ক্লিক করুন]
- মহাপ্লাবনের বাস্তবতা : *অনন্ত বিজয় ৬ ৭ ২* [ক্লিক করুন]
- যিশুর মৃত্যু রহস্য : *ওয়াহিদ রেজা ৬ ৮ ৪* [ক্লিক করুন]
- মানুষের পয়গম্বর হয়ে ওঠার সুলুক- সন্ধান : *দীক্ষক দ্রাবিড় ৭ ০ ২* [ক্লিক করুন]
- পরকালের পরাবাস্তবতা : *মাইকেল শারমার (ফরিদ আহমেদ) ৭ ১ ৯* [ক্লিক করুন]
- মিথ্যার বেসাতি : নীল আর্মস্ট্রং এর মুসলিম হয়ে ওঠার কল্পকাহিনী : *লাইটহাউজ ৭৩৭* [ক্লিক করুন]
- ডিম্বের সন্ধান এবং রাশেদ খালীফা ও তার ম্যাথমিটিকল মিরাকল: *নাস্তিকের ধর্মকথা ৭ ৪ ৩* [ক্লিক করুন]
- ওঁ গনেশায় নম! : *বিপ্লব পাল ৭ ৫ ০* [ক্লিক করুন]
- নাটের গুরু এরিক ফন দানিকেন : *স্বপন বিশ্বাস ৭ ৫ ৩* [ক্লিক করুন]
- অলৌকিক সংখ্যাতত্ত্ব : *নাস্তিকের ধর্ম কথ ৭৫৮* [ক্লিক করুন]
- কুরআনের সাংখ্যিক মাহাত্ম্য: ভিন্নমত *রায়হান আবীর ৭৬৫* [ক্লিক করুন]
- কোরানের মিরাকল ১৯ - এর উনিশ- বিশ *সৈকত চৌধুরী এবং অনন্ত বিজয় ৭ ৭ ৩* [ক্লিক করুন]

অষ্টম অধ্যায় : ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং মৌলবাদ ৭৯৭ [ক্লিক করুন]

- সেক্যুলারিজম মানে কি সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা? : *অভিজিৎ রায় ৭৯৮* [ক্লিক করুন]
- হাইপেশিয়া এক গণিতজ্ঞ নারীর বেদনাঘন উপাখ্যান : *অভিজিৎ রায় ৮০৪* [ক্লিক করুন]
- ব্রুনোর মৃত্যু এবং কিছু প্রশ্ন : *শহিদুল ইসলাম ৮১৪* [ক্লিক করুন]
- ইসলামের চিন্তার ইতিহাসে যারা সত্যের শহীদ : *নুরুজ্জামান মানিক ৮২৩* [ক্লিক করুন]
- ধর্ম সবকিছুকে বিষাক্ত করে তুলছে : *ক্রিস্টোফার হিচেনস (অগ্নি অধিরূঢ়) ৮৪৫* [ক্লিক করুন]
- ব্রুনো' র সমকালীন আরো যাদের হত্যা করা হয়েছিল : *নুরুজ্জামান মানিক ৮৫০* [ক্লিক করুন]
- মৌলবাদ : উৎস সন্ধান, ইতিবৃত্ত এবং সমকালীন প্রেক্ষিত : *রবিউল ইসলাম ৮৫৩* [ক্লিক করুন]
- মৌলবাদের জন্ম ও বিকাশ - রুখতে হবে কীভাবে : *মোঃ জানে আলম ৮৮৪* [ক্লিক করুন]

নবম অধ্যায় : ধর্ম ও নারী ৮৯৬ [ক্লিক করুন]

- পুরুষ রচিত 'ধর্মে' বিকলাংগ নারী : *নন্দিনী হোসেন ৮৯৭* [ক্লিক করুন]
- ' সনাতন ধর্মে' র দৃষ্টিতে নারী : *অনন্ত বিজয় ৯১০* [ক্লিক করুন]
- চিরকালীন মোল্লাতন্ত্র বনাম নারীর সমানাধিকার : *রবিউল ইসলাম ৯১৯* [ক্লিক করুন]
- নারীকে ক্ষমতাহীন করেছে একক ঈশ্বরের প্রবক্তারা : *দীক্ষক দ্রাবিড় ৯৪৪* [ক্লিক করুন]

দশম অধ্যায় : অন্যান্য ৯৫৪ [ক্লিক করুন]

- সৃষ্টিতত্ত্বের গালগপ্প বনাম বিবর্তনের শিক্ষা : *মেহুল কামদার (তানবীরা তালুকদার) ৯৫৫* [ক্লিক করুন]
- স্বজ্ঞা- সংঘাত ও সমন্বয়ের উর্ধ্বে : *দীপেন ভট্টাচার্য ৯৬১* [ক্লিক করুন]
- মানব প্রকৃতি কি জন্মগত নাকি পরিবেশগত? : *অপার্থিব ৯৭৪* [ক্লিক করুন]
- সমকামিতা (সমপ্রেম) কি প্রকৃতিবিরুদ্ধ? : *অভিজিৎ রায় ৯৮০* [ক্লিক করুন]
- সমকামিতা সম্পর্কিত কিছু ব্যক্তিগত মতামত : *স্নিগ্ধা আলী ৯৯৬* [ক্লিক করুন]
- জুলিয়েটের জন্য : *রিচার্ড ডকিন্স (অগ্নি অধিরূঢ়) ৯৯৮* [ক্লিক করুন]
- আত্মঘাতী কুসংস্কার : *প্রদীপ দেব ১০০৫* [ক্লিক করুন]
- মহাশূন্যে শিবলিংগ : *নৃপেন্দ্র নাথ সরকার ১০০৯* [ক্লিক করুন]
- সর্বগ্রাসী অপবাদ বনাম একজন আরজ আলী মাতুব্বর : *রণদীপম বসু ১০১৬* [ক্লিক করুন]
- আমার স্বর্গ এখানে : *মীজান রহমান ১০২৭* [ক্লিক করুন]

পরিশিষ্ট: তর্ক বিতর্ক ১০৩২ *[ক্লিক করুন]*

- ধর্ম ও বিজ্ঞানঃ কোথায় সংঘাত এবং কেন সমন্বয়ের প্রশ্ন? *সুরজিত মুখার্জী* ১০৩৩ *[ক্লিক করুন]*
  - একটি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া : *অভিজিৎ রায়* ১০৩৭ *[ক্লিক করুন]*
  - সংঘাত- সমন্বয় এর প্রশ্নঃ সাবজেকটিভ না অবজেকটিভ? *মোঃ জানে আলম* ১০৪২ *[ক্লিক করুন]*

- আস্তিকতা বনাম নাস্তিকতা : *মেজবাহউদ্দিন জওহের* ১০৪৬ *[ক্লিক করুন]*
  - আস্তিকতা বনাম নাস্তিকতার প্রত্যুত্তরে : *অভিজিৎ রায়* ১০৬২ *[ক্লিক করুন]*

উপসংহার ১০৭৭ *[ক্লিক করুন]*

ভূমিকা

ধর্ম এবং বিজ্ঞানের আদপেই কি কোন সমন্বয় হওয়া সম্ভব, নাকি এদের মধ্যে সতত বিরাজ করছে এক নিরন্তর সংঘাত? এ প্রশ্ন অনেক পুরোন। বিগত কয়েক বছরে বিজ্ঞান এবং ধর্মকে সমন্বয় করার বিভিন্ন প্রচেষ্টা এবং কৌশল লক্ষ্য করা গেছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সহ বাংলাদেশের অনেক মিডিয়ায়। শুধু সমন্বয়ের প্রচেষ্টাই নয় - সেই সাথে খুব কৌশলে বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞানও ছড়ানো হয়েছে, এমন কি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের প্রাচীন আয়াত আর শ্লোকের সাথে সমন্বিত করার চেষ্টা করা হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিস্কারকে - মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব, ডি.এন.এ, আপেক্ষিকতা, কৃষ্ণগহ্বর কিংবা কাল-প্রসারণ ইত্যাদি। কখনো বা চাঁদে আজান শুনে নীল আর্মস্ট্রং-এর মুসলিম হয়ে যাওয়ার কাহিনীও মিডিয়ায় জোরে সোরে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু, সত্যই কি প্রাচীণ ধর্মগ্রন্থগুলোতে আধুনিক বিজ্ঞানের অমনতর নিদর্শন রয়েছে? সত্যই নীল আর্মস্ট্রং চাঁদে নেমে আজান শুনেছিলেন? সত্যই কি স্রষ্টা প্রকৃতিতে তার অস্তিত্বের বিবিধ আলামত রেখে গিয়েছেন? সত্যই কি বিজ্ঞান ঈশ্বরকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছে? এ বইটিতে নির্মোহ এবং নিরপেক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক বাস্তবতাকে তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

প্রতিটি যুগে খুব ফলাও করে ধর্ম-বিজ্ঞানের সমন্বয় কিংবা সম্প্রীতির কথা বলা হলেও বিজ্ঞান এবং ধর্মের দ্বন্দ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত ইতিহাস কারো অজানা নয়। খ্রীষ্টজন্মের পাঁচশ বছর আগে পিথাগোরাস, এনাক্সু সিমন্ডের মত অনুসন্ধিৎসু দার্শনিকেরা জানিয়েছিলেন পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহমাত্র, সূর্যকে ঘিরে অন্য সকল গ্রহের মত পৃথিবীও ঘুরছে। ধর্মবিরোধী এই মতামত প্রকাশের জন্য এদের অনেককেই সে সময় সইতে হয়েছিল নির্যাতন। এই 'কুফরি' মতবাদকে দুই হাজার বছর পরে পুস্তকাকারে তুলে ধরেছিলেন পোল্যান্ডের নিকোলাস কোপার্নিকাস। বাইবেল বিরোধী এই সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব প্রচারের জন্য কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও আর ব্রুনোকে কিরকমভাবে অত্যাচারের স্টিমরোলার চালানো হয়েছিল সে এক ইতিহাস। ব্রুনোকে তো পুড়িয়েই মারলো ঈশ্বরের সুপুত্ররা। তারপরো কি সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘোরা ঠেকানো গেল?

শুধু ব্রুনোই নন, তার সমসাময়িক লুচিলিও ভানিনি, টমাস কিড, ফ্রান্সিস কেট, বার্থোলোমিউ লিগেট সহ অনেককেই ধর্মান্ধদের হাতে নিগৃহীত এবং নির্যাতিত হয়ে নিহত হতে হয়। খ্রীষ্টের জন্মের চারশ পঞ্চাশ বছর আগে এনাক্সোগোরাস বলেছিলেন চন্দ্রের নিজের কোন আলো নেই। সেই সঙ্গে সঠিক ভাবে অনুসন্ধান করেছিলেন চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি আর চন্দ্রগ্রহণের কারণ। এনাক্সোগোরাসের প্রতিটি আবিস্কারই ছিল ধর্মবাদীদের চোখে জঘন্য রকমের অসত্য। ঈশ্বর বিরোধিতা, ধর্ম বিরোধিতা আর অসত্য প্রচারের অপরাধে দীর্ঘ আর নিষ্ঠুর নির্যাতনের পর তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়। ষোড়শ শতকে সুইজারল্যান্ডের বেসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্র এবং ভেষজবিদ্যার অধ্যাপক ফিলিপ্রাস প্যারাসেলসাস ঘোষনা করলেন- মানুষের অসুস্থতার কারণ কোন পাপের ফল কিংবা অশুভ শক্তি নয়, রোগের কারণ হল জীবাণু। ওষুধ প্রয়োগে জীবাণু নাশ করতে পারলেই রোগ ভাল হয়ে যাবে। প্যারাসেলসাসের এই 'উদ্ভট' তত্ত্ব শুনে ধর্মের ধ্বজাধারীরা হা রে রে করে উঠলেন। সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক ধর্মবিরোধি মতবাদ প্রচারের জন্য প্যারাসেলসাসকে হাজির করা হয়েছিল 'বিচার' নামক এক প্রহসনের মুখোমুখি। ধর্মান্ধ বিচারকেরা ব্রুনোর মতই প্যারসেলসাসকে মৃত্যুদন্ডে

দন্ডিত করেছিলো। প্যারাসেলসাসকে সেদিন জীবন বাঁচাতে মাতৃভূমি ছেড়ে পালাতে হয়েছিলো। অত্যাচার আর নির্যাতন শুধু খ্রীষ্টানদের একচেটিয়া ভেবে নিলে ভুল হবে - আজকে মুসলিমরা ইবনে খালিদ, যিরহাম, আল দিমিস্কি, ওমর খৈয়াম, ইবনে সিনা, ইবনে বাজা, আল কিন্দী, আল রাজি কিংবা ইবনে রুশদের মত দার্শিনিকদের জন্য গর্ববোধ করে - কিন্তু সে সব দার্শনিকদের সবাই তাদের সময়ে বৈজ্ঞানিক সত্য কিংবা মুক্তমত প্রকাশের কারণে মৌলবাদীদের হাতে নিগৃহীত, নির্যাতিত কিংবা নিহত হয়েছিলেন।

আজকের দিনের পরিবর্তিত পরিবেশে বিজ্ঞানীদের উপর এত ঢালাওভাবে অত্যাচার করা কিংবা ডাইনী পোড়ানোর মত তাদের পুড়িয়ে মারা না গেলেও ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের দল সুযোগ পেলে এখনো বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঠেকাতে মুখিয়ে থাকে। যখনই বিজ্ঞানের কোন নতুন আবিস্কার তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত বিশ্বাসের বিপরীতে যায়, খোদ বিজ্ঞানকে ফেলে দিতে চায় আস্তাকুঁড়ে। তাতে আবশ্য লাভ হয় না কিছুই। অযথা গোলমাল বাধিয়ে নিজেরাই বরং সময় সময় হাস্যাস্পদ হন। অধিকাংশ ধার্মিকেরাই এখনো বিবর্তন তত্ত্বকে মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি কারণ ডারউইন প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবস্থান ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত সৃষ্টির কল্পকাহিনী গুলোর একশ আশি ডিগ্রী বিপরীতে। এখনো সুযোগ পেলেই ধর্মান্ধ মোল্লার দল প্রগতিশীল দার্শনিক, বিজ্ঞানী কিংবা সাহিত্যিকদেরকে 'মুরতাদ' আখ্যা দেয়, চাপাতি দিয়ে কোপায় কিংবা দেশ থেকে নির্বাসিত করে। এ তো গেল আমাদের মত দেশগুলোর অবস্থা। তথাকথিত 'উন্নত বিশ্বে' এখনো অশিক্ষিত আর অর্ধশিক্ষত পাদ্রী আর মোল্লারা উপযাজক সেজে বিজ্ঞানীদের পরামর্শ দিতে আসে বিজ্ঞানীদের কোন গবেষণা নৈতিক, আর কোনটা অনৈতিক; কিংবা দাবী তূলে বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে বিবর্তনের পাশাপাশি 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' কিংবা সৃষ্টিতত্ত্বের গালগপ্পগুলো অন্তর্ভুক্ত করার। কিন্তু এ ধরণের দাবী কতটুকু যৌক্তিক? এ বইটিতে সে দাবীগুলোকে সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন লেখকেরা।

বিজ্ঞান এবং ধর্মের সঙ্ঘাত এড়াতে সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমা কিছু চিন্তাবিদদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে 'স্বতন্ত্র বলয়' তত্ত্বের- ইংরেজীতে যাকে অভিহিত করা হয় 'ননওভারল্যাপিং ম্যাজেস্টেরিয়া' (Nonoverlapping Magisteria) নামে। বিখ্যাত বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী স্টিফেন জে গুল্ড ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত তার 'রকস অব এজেস' বইয়ে এমনি একটি মত দিয়েছিলেন এই বলে যে, বিজ্ঞান এবং ধর্মের অবস্থান সম্পূর্ণ দুটি আলাদা বলয়ে - যে বলয় দুটি একে অপরের সাথে থাকে অসম্পৃক্ত। এক বলয়ে থাকে বিজ্ঞান - যার কাজ হচ্ছে ভৌত বাস্তবতার আলোকে প্রাকৃতিক রহস্যাবলীর ব্যাখ্যা দেওয়া, আর অন্য বলয়ে অবস্থিত ধর্মের কাজ হচ্ছে নীতি নৈতিকতার চর্চা করা, এবং তার আলোকে সমাজ নির্মাণ করা। গুল্ড মনে করতেন, এভাবে দুই প্রবল প্রতাপশালী যোদ্ধাকে দুই বলয়ে আটকে রেখে সমূহ যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা যাবে। আমরা গুল্ডের 'স্বতন্ত্র বলয়' প্রবন্ধটি এ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করেছি। প্রবন্ধটি বাংলাদেশের পাঠকদের চিন্তাজগতে প্রভাব ফেলবে নিঃসন্দেহে।

বিজ্ঞান এবং ধর্মের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে স্টিফেন জে গুল্ডের প্রস্তাব খুব আকর্ষনীয় হিসেবে বিবেচ্য হলেও, সবাই যে এ প্রস্তাবকে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন তা নয়। যেমন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স

তার 'বিজ্ঞানের অংগনে যখন ধর্মের প্রবেশ' প্রবন্ধে গুল্ডের প্রস্তাবটিকে বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচনা করেছেন। আমরা ওই প্রবন্ধটিকেও এ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করেছি। অধ্যাপক ডকিন্স ছাড়াও মাইকেল শারমার, পল কার্জ এবং ভিক্টর স্টেঙ্গারের মত চিন্তাবিদ এবং বিজ্ঞানীরা মনে করেন গুল্ডের প্রস্তাবটির ভিতরেই রয়ে গেছে আসলে শুভঙ্করের ফাঁকি। এদের মতে, সত্যের প্রকৃতি কখনোই দুই বলয়ে বিভক্ত নয়। সামগ্রিকভাবে সত্যের সন্ধান করা যেতে পারে শুধুমাত্র একটি পদ্ধতিতেই - সেটা হল বৈজ্ঞানিক অণুসন্ধিৎসা। বৈজ্ঞানিক অণুসন্ধিৎসাকে 'ধর্মীয় বিশ্বাস' এর বলয়ে প্রবেশ করতে না দেওয়ার অর্থই হল জোর করে সাধারণ মানুষের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস, অপবিশ্বাস, কুসংস্কারের বাজার টিকিয়ে রাখা। বৈজ্ঞানিক অণুসন্ধিৎসার বলেই একটা সময় সম্ভব হয়েছে ভূকেন্দ্রিক সৌর-মডেলকে হটিয়ে সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার - তা সে যতই ধর্ম বিরোধী হোক না কেন; কিংবা হটানো সম্ভব হয়েছে মাত্র ছয় হাজার বছরের পৃথিবীর বয়সের বদ্ধমূল ধারণাকে। বিবর্তন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পর থেকে আত্মা দিয়ে জীবন-মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার সনাতন ধারণাও পালটে গেছে। প্রার্থনায় কাজ হয় কিনা অথবা ইএসপি, টেলিপ্যাথি, জন্মান্তর বলে কিছু আছে কিনা কিংবা তন্ত্র-মন্ত্রে কারো প্রাণ-হরণ করা সম্ভব কিনা এগুলো বিষয়ে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব। শরীরবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের নিরিখে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব ব্যক্তি বিশেষের মরণ-প্রান্তিক অভিজ্ঞতার কিংবা আধ্যাত্মিক এবং অপার্থিব অনুভূতির। এমনকি নীতি-নৈতিকতার ব্যাপার স্যাপার-যেগুলোকে ধর্মবাদীরা সবসময়ই নিজেদের পৈত্রিক সম্পত্তি বলে ভাবেন, সমাজ বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় সেগুলোর উৎস এবং ক্রমবিকাশও আজ নির্ধারণ করেছে বিজ্ঞান।

যে সমস্যাগুলোকে এক সময় বৈজ্ঞানিক গবেষণার বাইরে বলে মনে করা হত, মনে করা হত বিজ্ঞান সে সব প্রশ্নের উত্তর দানে অক্ষম, সেগুলোর অনেকগুলোই বিজ্ঞান আজ সমাধান করেছে কিংবা করতে চলেছে। সে সব প্রান্তিক সমস্যাগুলোর মধ্যে আছে মহাবিশ্বের উৎপত্তি, জীবনের উৎপত্তি ও বিকাশ, নৈতিকতার উৎস, ধর্মের উৎপত্তি, জীবন-মৃত্যুর ব্যাখ্যা, মানব প্রকৃতির রূপ - এ ধরণের নানা আকর্ষনীয় বিষয়। সব কিছুর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে এখনো পৌঁছুনো না গেলেও, বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, এবং প্রতিদিনই আমাদেরকে নতুন জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে চলেছেন নিরলসভাবে। তবে ধার্মিক এবং ধর্মবেত্তাদের অনেকেই আবার দুঃখিত এবং শঙ্কিত হয়েছেন; তারা এ সমস্ত প্রান্তিক বিষয়ে আজকের বিজ্ঞানীদের এহেন গবেষণাকে নিয়েছেন তাদের বলয়ে অযাচিত প্রবেশ কিংবা বিশ্বাসের উপর আগ্রাসন হিসেবে। তাদের অনেকেই আবার ঢালাওভাবে মন্তব্য করেছেন, 'বিজ্ঞান কখনোই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না'। কখনো নিষেধের কিংবা নীতি-নৈতিকতার প্রাচীর তুলে গবেষণা থেকে নিরস্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাতে করে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি থামানো যায়নি।

বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে পার্থক্য আছে, এটা তো অস্বীকার করার জো নেই। বিজ্ঞানের তথা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি হচ্ছে মুক্তমন (open mind) মুক্তান্বেষা (free inquiry), সংশয়ী মনোবৃত্তি (critical thinking), পরীক্ষা-নিরীক্ষা (experiment) এবং পদ্ধতিগতভাবে লব্ধ প্রাকৃতিক-জ্ঞান, যেটাকে ইংরেজীতে বলে - 'methodical naturalism'। বিজ্ঞান কোন অনুকল্পকেই বিনা প্রশ্নে মেনে নেয় না এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত ফলাফলগুলো, দেশ, কৃষ্টি কিংবা সংস্কৃতিভেদেও পরিবর্তিত হয় না। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ

কিংবা প্রাপ্ত অনুসিদ্ধান্তগুলো যে কোন দেশের গবেষণাগারে বসে পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব। বিজ্ঞান সে অর্থে সার্বজনীন। ধর্মও এক ধরণের সার্বজনীনতা দাবী করে, তবে তাদের 'সত্যতা' প্রায় সব ক্ষেত্রেই নির্ভর করে লোককথা, উপকথা, ঐশী বাণী, প্রত্যাদেশ, পবিত্র কিতাব গ্রন্থ, নবী-পয়গম্বর, সাধু সন্ত, ভিক্ষু কিংবা মোল্লাদের বচনের উপর। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু' - সকল ধর্মেরই মূল উপজীব্য। কিন্তু এ সব আপ্তবাক্য কিংবা ঐশী বচনের চেয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীদের কথাই আজ অনেক ক্ষেত্রে বেশী গ্রহণীয়। তাই মহাবিশ্বের জন্ম এবং পরিণতি নিয়ে একজন পোপ কিংবা বায়তুল মোকারমের খতিবের চেয়ে স্টিফেন হকিং কিংবা ওয়াইবার্গের মত বিজ্ঞানীদের মতামতই এ সময়ে সচেতন মানুষদের কাছে বেশী আকর্ষনীয়।

কিন্তু তারপরও সমাজে ধর্মের একটা বড় ভূমিকা আছে। ইসলাম ধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম প্রভৃতি ধর্মগুলো মানব ইতিহাসে অনেক বড় ধরণের প্রভাব বিস্তার করেছে। এ সমস্ত ধর্মের প্রেরিত পুরুষ, নবী রসুল আর ধর্মগুরুদের উৎসারিত বাণী, পবিত্র গ্রন্থগুলোর অনুপ্রেরণা, প্রত্যাদেশসমূহ এবং তাদের তৈরি আধ্যাত্মিকতা, রীতি-নীতি, কলা, কৃষ্টি, প্রার্থণা-গীত, সঙ্গীত -শ্যামা সঙ্গীত, কাওয়ালী, গজল, ভজন; কিংবা মন্দির, মসজিদ, প্যাগোডা, ক্যাথেড্রাল, নামাজ, রোজা, পূজা-পার্বন, বড়দিন, বুদ্ধ পূর্ণিমা, ঈদ কিংবা মহরম - এগুলো আমাদের সংস্কৃতির সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। সমাজ সভ্যতার বিন্যাসে , কিংবা ইতিহাসের পরিক্রমায় ধর্ম নিঃসন্দেহে একটি শক্তিশালী নিয়ামক। আর এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে, বাংলাদেশ তো বটেই, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই কোন না কোন ধর্মে বিশ্বাসী। কাজেই সমাজ এবং ইতিহাস বিশ্লেষণে ধর্মকে আলাদা করে গুরুত্ব দিতেই হবে। সমাজ গঠনে কি বিশ্বাসের একটা বড় ভূমিকা আছে? বিশ্বাস কি তবে মানব মনে প্রোথিত ছিল প্রথম থেকেই? কিংবা সমাজ বিবর্তনের ধারায় টিকে থাকার সংগ্রামে 'বিশ্বাস' ব্যাপারটা কোন বাড়তি উপযোগিতা তৈরি করেছিল? আবেগ দিয়ে নয়, বৈজ্ঞানিক ভাবেই এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা জরুরী। এ বইয়ে লেখকেরা আধুনিক গবেষণা এবং তথ্যের আলোকে সে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সচেষ্ট হয়েছেন।

এ বইয়ের ***প্রথম অধ্যায়ে*** মহাবিশ্বের উৎপত্তির পেছনে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা আছে কিনা এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। ঢালাওভাবে সবসময়ই মনে করা হয়েছে ঈশ্বরই হচ্ছে মহাবিশ্ব 'সৃষ্টির' পেছনে প্রথম কারণ। আমি আমার প্রথম প্রবন্ধে এই সজ্ঞাত ধারণাটি নিয়ে আলোচনা করেছি। এর পরের লেখাটি আলবার্ট আইনস্টাইনের। মিডিয়ায় খুব ফলাও করে আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানী কত বড় ধার্মিক ছিলেন তা প্রচার করা হয়। ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ে আইনস্টাইনের নিজের লেখা থেকেই (দিগন্ত সরকার অনুদিত) পাঠকেরা এর সত্যতা খুঁজে নিতে পারবেন। আইনস্টাইন খুব পরিস্কার করেই বলেছেন - 'মানুষের নৈতিকতার জন্য তো ধর্মের কোনো দরকারই নেই, দরকার মানবিকতা, সহমর্মিতা, শিক্ষা আর সামাজিকতার। মানুষ যদি পরকালের শাস্তির কথা ভেবে নৈতিক হয়, সেই নৈতিকতার মধ্যে মহত্ত্ব কোথায় থাকে?' সম্প্রতি আইনস্টাইনের একটি নতুন চিঠি নিলামে একশ সত্তর হাজার পাউন্ডে বিক্রি হয়েছে। সে চিঠিতে আইনস্টাইন ঈশ্বর বিশ্বাসকে 'বালখিল্য কুসংস্কার' (childish superstition) হিসবে অভিহিত করেছেন। দিগন্ত সেই চিঠিটির প্রয়োজনীয় অংশটুকু অনুবাদ করে এ বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস

নিয়েছেন। এ ছাড়াও এতে সংকলিত হয়েছে আইনস্টাইনের বিভিন্ন রচনা থেকে ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ে বেশ কিছু চিত্তাকর্ষক উদ্ধৃতি। এ অধ্যায়ের পরের লেখাটি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্সের। এ লেখাটিতে ঈশ্বর ও ধর্ম সম্বন্ধে আইনস্টাইনের মনোভাবকে আরো গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন ডকিন্স। প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের পুরোধা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. অজয় রায়। সম্মানিত পাঠকেরা এ প্রবন্ধ দুটি থেকে আইনস্টাইনের মনোজগৎ সম্বন্ধে নিজেরাই একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন। এর পরের প্রবন্ধটি মুক্তমনা সদস্য পদার্থবিদ অপার্থিবের। 'স্বাধীন ইচ্ছা, মন্দ ও ঈশ্বরের আস্তিত্ব' নামের প্রবন্ধটিতে অপার্থিব বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা আসলে পরস্পর-বিরোধী। মন্দের যুক্তি তথা 'আর্গুমেন্ট অব ইভিল'-এর নিরিখে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অপার্থিব প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন শক্তিশালী যুক্তিতে। এর পরের প্রবন্ধটি লিখেছেন ড. অজয় রায়। তিনি একজন অজ্ঞেয়বাদী পদার্থবিদের দৃষ্টিকোন থেকে ঈশ্বর এবং ধর্মকে বিশ্লেষণ করেছেন। এ অধ্যায়ের পরবর্তী প্রবন্ধটি এসেছে একজন সংশয়ীর দৃষ্টিকোন থেকে। আহমাদ মোস্তফা কামাল এ প্রবন্ধটিতে বলতে চেয়েছেন, লালন, ওমর খৈয়াম, মির্জা গালিব, হাফিজ, রুমি, রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন এঁরা কেউই আস্তিক ছিলেন না; আবার তারা যে নাস্তিক ছিলেন এমন কোনো প্রমাণও পাওয়া যায় না। জনাব কামালের মতে, এঁরা ছিলেন সংশয়ী। এ অধ্যায়ের শেষ প্রবন্ধটিতে আমি মহাবিশ্বের উৎপত্তি এবং ঈশ্বর নিয়ে একটি দার্শনিক আলোচনা করার প্রয়াস নিয়েছি।

বইয়ের ***দ্বিতীয় অধ্যায়ে*** পরিকল্পনা, ডিজাইন ও ঈশ্বর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারগুলো পশ্চিমা মিডিয়ায় ইদানিং নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে, বিশেষত, ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন বা সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প বাজারজাত হবার পর থেকেই। ধর্মবাদীদের অনেকে সূক্ষ সমন্বয়ের যুক্তি (Fine tuning argument) এবং নরত্ববাচক যুক্তি (Anthropic argument) প্রভৃতি যুক্তিমালা সাজিয়ে ঈশ্বরকে খুঁজবার চেষ্টা করছেন। সেই 'যুক্তি'গুলোর একটি চমৎকার জবাব দিয়েছেন প্রখ্যাত পদার্থবিদ অধ্যাপক ভিক্টর স্টেঙ্গর তার 'বিজ্ঞান কি ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছে?' প্রবন্ধের মাধ্যমে। প্রবন্ধটি আমাদের জন্য অনুবাদ করেছেন ড. প্রদীপ দেব। এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধটি নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়েইনবার্গের। তাঁর 'পরিকল্পিত মহাবিশ্ব?' প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন মহাবিশ্বের উৎপত্তির পেছনে কোন অপার্থিব সত্ত্বার পরিকল্পণা বা ডিজাইন জড়িত ছিল না। প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন দিগন্ত সরকার। এর পরের প্রবন্ধে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে সৃষ্টির যুক্তিকে খন্ডন করেছেন অপার্থিব। স্রষ্টা এবং ধর্ম যখন অসঙ্গতির - প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সৈকত চৌধুরী স্রষ্টা এবং ধর্ম বিশ্বাসে যুক্তির সংকটগুলোর কিছু নমুনা তুলে ধরেছেন। এর পরের লেখাটিতে আমি দেখিয়েছি যে, বিবর্তনের যেহেতু কাজ করে শুধুমাত্র বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর ভিত্তি করে দীর্ঘ সময় ধরে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে, তাই খুব যুক্তিসঙ্গত কারণেই প্রাণীদেহে অনেক ত্রুটিপূর্ণ অঙ্গপ্রতঙ্গ দেখা যায়, কোন সর্বজ্ঞ স্রষ্টার নিখুঁত ডিজাইনে কিংবা পরিকল্পনায় তৈরি হলে এমনটি ঘটতো না। 'বাগানে গোপনে একজন মালী আসে অথবা আসে না' প্রবন্ধে শোহেইল মতাহির চৌধুরী জন উইজডমের 'ধর্মের দর্শন' বইটি থেকে নেওয়া বিখ্যাত 'মালী'-র রূপকের সাহায্যে দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন যে, বিবদমান দুই পক্ষ মহাবিশ্ব সম্পর্কে কিংবা এর পেছনে কোন

ডিজাইনার থাকা বা না থাকা সম্বন্ধে তাদের মনের ভাবকে প্রকাশ করলেও সেটি যে জগৎ সম্পর্কে সত্য হবে তা হলফ করে বলা যাবে না। এই অধ্যায়ের শেষ লেখাটিতে বন্যা আহমেদ আর আমি আমেরিকায় ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের নামে কিভাবে ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার আর অবৈজ্ঞানিকতা উস্কে দেওয়া হচ্ছে, আর এগুলোর পেছনে কলকাঠি কারা নাড়ছেন- তার একটি বিস্তৃত বর্ণনা হাজির করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়টিতে বইয়ের কেন্দ্রীয় চিন্তার উপস্থাপন ঘটেছে। এ অধ্যায়টিতে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সঙ্ঘাত নিরন্তর চলতে থাকবে থাকবে নাকি থাকবে সহাবস্থান। প্রথম লেখাটিতে (বিজ্ঞানমনস্ক ধারা, ধর্মাচ্ছন্ন স্রোত) ড. ইরতিশাদ আহমেদ বলিষ্ঠভাবে দেখিয়েছেন ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যকার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব। তার মতে, বিজ্ঞান যেখানে নিত্য নতুন জ্ঞানের সন্ধান করে চলেছে ধর্ম তখন ভুল ধারণা, মিথ্যা গল্প-কাহিনী আর আজগুবি কল্পনার উপর নির্ভরশীল হয়ে রয়েছে। তিনি মনে করেন, শুধু বিজ্ঞান নয়- সংস্কৃতির বিকল্প হিসাবেও ধর্ম পশ্চাদপদ কারণ ধর্ম মানুষকে রুচিশীল হওয়ার কোন প্রেরণা যোগায়না; ধর্ম মুল্যবোধের উৎস হিসাবেও অপ্রয়োজনীয়, এবং ধর্ম এমন কি আধ্যাত্মিকতার বিকাশেও নিতান্তই অপ্রতুল এবং নিম্নমানের। এর পরে 'ধর্ম, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম অত্যন্ত পরিস্কার ভাবে দেখিয়েছেন যে, ধর্ম হচ্ছে ভাববাদের সর্বোচ্চ রূপ। সেখানে যুক্তির কোন স্থান নেই। যুক্তিহীন বিশ্বাসই হল ধর্মের প্রধান শক্তি। কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শন তা নয়। বিজ্ঞান নির্ভেজাল বস্তুতান্ত্রিক। ধর্মচেতনা ও ঈশ্বরবিশ্বাস নামক তৃতীয় প্রবন্ধে ড. ওয়াহিদ রেজা ধর্মচেতনা এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসের বিভিন্ন অযৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন - মানুষের ধর্মচেতনা ও ঈশ্বর বিশ্বাস আপাতঃ দৃষ্টিতে চকমকে সত্যের মতো মনে হলেও আসলে অবাস্তব ও অলীক। এর পরের প্রবন্ধ 'ধর্মবিশ্বাস, বিজ্ঞানবিশ্বাস ও এক চিল্‌তে ইতিহাস'-এ ড. প্রদীপ দেব ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যকার রক্তাক্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধের ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। 'সৃষ্টিতত্ত্বের অসারতা বনাম বিবর্তনতত্ত্বের সাফল্য' প্রবন্ধটিতে দিগন্ত সরকার দেখিয়েছেন কি ভাবে কিভাবে বিজ্ঞান সৃষ্টিতত্ত্বের গালগপ্পগুলোকে ধীরে ধীরে হটিয়ে দিচ্ছে। একটা সময় মানুষ সমতল পৃথিবীর ধারণায় নিমজ্জিত ছিল, তখন বিজ্ঞানীরাই মানুষকে তা থেকে মুক্ত করেছেন। এখন আর কেউ সমতল পৃথিবীর কল্পনায় বিভ্রান্ত হয় না। দিগন্ত আশা করেন অদূর ভবিষ্যতে ক্রমাগত প্রমাণ ও পরীক্ষার সাহায্যে বিবর্তনবাদও জনমানসে একই ভাবে স্থান করে নেবে। বন্যা আহমদে অনুদিত 'ডারউইনিজমের আতঙ্ক' প্রবন্ধটিতে অধ্যাপক ভিক্টর স্টেঙ্গর দেখিয়েছেন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত একটি বিষয় হওয়া সত্ত্বেও বিবর্তনবাদ কেন এখনো ধর্মান্ধদের মধ্যে 'আতংক' হিসেবে বিরাজ করছে। 'বিজ্ঞান ও ইসলাম - অন্তিম সংঘাত' প্রবন্ধটিতে টড পিকক দেখিয়েছেন আজকের ইসলামিক দুনিয়া সত্যিকার বিজ্ঞান চর্চার অভাবে কিভাবে ধীরে ধীরে আরো পেছনের দিকে চলে যাচ্ছে। প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন তানবীরা তালুকদার। এর পরের প্রবন্ধটিতে প্রখ্যাত মানবতাবাদী অধ্যাপক এবং সেক্যুলার হিউম্যানিজমের প্রতিষ্ঠাতা পল কার্জ বর্ণনা করেছেন কেন তিনি ধর্মীয় দাবী সম্বন্ধে সংশয়বাদী। পরের প্রবন্ধটি স্টিফেন জে গুল্ডের বহুল বিতর্কিত 'অসম্পৃক্ত স্বতন্ত্র বলয়', যা আমি এ লেখার প্রথমদিকে আলোচনা করেছি। প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন বাংলাদেশের ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির শিক্ষার্থী খান মুহাম্মদ। গুল্ডের প্রবন্ধটির সাথে একমত পোষণ না করে প্রবন্ধটির বিভিন্ন যুক্তি খন্ডন করেছেন অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স। ডকিন্সের প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন তানবীরা তালুকদার। এর পরের প্রবন্ধে শঙ্কর রায় মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করেছেন।

গণফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির গবেষণা, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিষয়ক সম্পাদক মোঃ জানে আলম দেখিয়েছেন, আধুনিক ধর্মবেত্তারা যতই প্রানান্তকর প্রয়াস পাক না কেন, বিজ্ঞান দিয়ে ধর্মকে প্রমাণ করা কিংবা বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে যৌক্তিক সমন্বয় সোনার পাথরবাটির মত অসম্ভব একটি প্রকল্প। কিন্তু তারপরও ধর্মকে তার অবস্থান ও আমজমগণের মানসে তার সুদৃঢ় শিকড়কে অস্বীকার করাও অসম্ভব একটি ধারণা বলে মনে করেন তিনি। তাই তিনি তার প্রবন্ধ 'ধর্ম ও বিজ্ঞান: সংঘাত-সমন্বয়ের রণনীতি-রণকৌশল' -এ তিনি সমূহ সঙ্ঘাত এড়াতে কিছু প্রায়োগিক রণনীতি ও রণকৌশলগত একটি প্রকল্পের প্রস্তাবনা উত্থাপন করেছেন। 'ধর্মের স্বরূপ এবং বিজ্ঞান' প্রবন্ধে আবুল হোসেন খোকন দেখিয়েছেন যে, ঢালাওভাবে যে মনে করা হয় ইসলাম ধর্ম আবির্ভাবের আগে জাহেলিয়া যুগে পৃথিবীর মানুষ ছিল পুরো অসভ্য-বর্বর এবং পশুতুল্য, আর ইসলাম এসে আমাদের সে অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছে, এটি একেবারেই মিথ্যা। তিনি আরো মনে করেন, এখানে ধর্ম-বিজ্ঞানের একে-অপরের সমন্বয়ের কিছু নেই। বরং আছে সংঘাত, এবং অনিবার্যভাবে আছে মিথ্যার ধবংস বা মৃত্যু। এ অধ্যায়ের 'ধর্ম নয় বিজ্ঞান' শীর্ষক শেষ প্রবন্ধে আকাশ মালিকও প্রায় একই অভিমত দিয়েছেন যে, ধর্ম নয়, বরং বিজ্ঞানের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে আমাদের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা; তাই ধর্ম এবং বিজ্ঞানের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা অর্থহীন।

চতুর্থ অধ্যায়ে এসেছে ধর্মগ্রন্থে আধুনিক বিজ্ঞান খুঁজে পাওয়ার বিষয়টি। 'বিজ্ঞানময় কিতাব' নামের প্রথম প্রবন্ধটিতে আমি দেখিয়েছি কিভাবে ইদানিং শতাব্দী প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোর বিভিন্ন আয়াত বা শ্লোককে বিভিন্ন চতুর অপব্যাখ্যার মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞান খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর পরের প্রবন্ধটিতে জাহেদ আহমেদ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে কি বোঝায় তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন এবং কোথায় বিজ্ঞান ধর্ম এবং অপবিজ্ঞানের সীমারেখা টানা যেতে পারে এ নিয়ে আলোকপাত করেছেন। প্রবন্ধটির শিরোনাম সংগত কারনেই - 'বিজ্ঞান, ধর্ম এবং অপবিজ্ঞান - কোথায় টানব সীমারেখা?'। এর পরের প্রবন্ধটিতে নাস্তিকের ধর্মকথা নামের লেখক দেখিয়েছেন ধর্মগ্রন্থে আধুনিক বিজ্ঞানের সন্ধান করা আসলে নিম গাছে আমের সন্ধান পাওয়ার মতই অবাস্তব এনং হাস্যকর। 'বিজ্ঞান, ধর্ম ও বিশ্বাস' প্রবন্ধটিতে অপার্থিব ধর্মবাদীরা যে বিজ্ঞানের সাথে ধর্মকে যুক্ত করে দাবী করেন যে, ধর্মের বিভিন্ন আয়াত ও শ্লোকগুলো পাঠ করেলে বিজ্ঞানকে পাওয়া যায় - এই দাবীর ভ্রান্তি নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। এর পরে 'ইসলামী বিজ্ঞানের পৌরাণিক কাহিনী' শীর্ষক প্রবন্ধে খান মুহাম্মদ দেখিয়েছেন ইসলামের প্রচীন পৌরাণিক কাহিনী গুলোকে কিভাবে নানা ধরণের অপব্যাখ্যা করে বৈজ্ঞানিকতার লেবাস পরানো হচ্ছে। এ অধ্যায়ের শেষ প্রবন্ধ 'ভগবদ্গীতায় বিজ্ঞান অন্বেষণ এবং অন্যান্য' -এ অনন্ত বিজয় দেখিয়েছেন কিভাবে হিন্দু মৌলবাদীরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মধ্যে অর্থহীন ভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের সন্ধান করে চলেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ কতটা ধর্ম থেকে উৎসারিত তা নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করা হয়েছে। নৈতিকতা ব্যাপারটিকে কেবল স্বর্গীয় ব্যাপার মনে করে ব্যাপারটার উপর এক ধরণের ঐশ্বরিক আবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এ ধরণের দাবী কতটা যৌক্তিক তা নিয়ে আমি প্রথম প্রবন্ধ - 'নৈতিকতা কি শুধুই

বেহেস্তে যাওয়ার পাসপোর্ট?' -এ আলোচনা করেছি। ধর্মই নৈতিকতার উৎস - এই সজ্ঞাত এবং বহুল প্রচলিত ধারণাটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন অপার্থিব তাঁর প্রবন্ধে। 'হতবুদ্ধি, হতবাক' প্রবন্ধে মীজান রহমান কোরান বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ইসলাম ধর্মের নৈতিকতা অনেক ক্ষেত্রে অমানবিক শুধু নয়, যুক্তি বুদ্ধিহীনও বটে। আমাদের মূল্যবোধ যে আসলে ঈশ্বর হতে আগত কিছু নয় - বরং সমাজ বিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবেই এটি মানব সমাজের ভিত্তি হিসেবে গড়ে উঠেছে - তা আলোচনায় এনেছেন অধ্যাপক ভিক্টর স্টেঙ্গর। প্রবন্ধটির অনুবাদ করেছেন মুন্সি কেফায়েতুল্লাহ। এই ধারনাটিকেই পরের প্রবন্ধ 'বিবর্তনের দৃষ্টিতে নৈতিকতার উদ্ভব'-এ আরো বিস্তৃত করেছেন অপার্থিব- ব্যাখ্যা করেছেন বিবর্তনের পটভূমিকায় নৈতিকতার উদ্ভব ও বিকাশকে। সম্পূরক আরেকটি প্রবন্ধে দিগন্ত সরকার রিচার্ড ডকিন্সের 'স্বার্থপর জিন' তত্ত্বের আলোকে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা এমনকি আত্মত্যাগের প্রবণতার উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করেছেন। এর পরের প্রবন্ধ 'প্রসংগ - নৈতিকতা'তে পুরুজিত সাহা নৈতিকতার কিছু দার্শনিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ অধ্যায়ের শেষ প্রবন্ধে নাস্তিকতা নিয়ে কিছু ভুল ধারণার অবসান ঘটাতে চেয়েছেন স্যাম হ্যারিস। প্রবন্ধটির অনুবাদ করেছেন দিগন্ত সরকার।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আধুনিক অথ্য ও তত্ত্বের আলোয় ধর্মের উৎস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধটি দিগন্ত সরকারের। এর পরের প্রবন্ধটি উত্তর পুরুষের। দুটো প্রবন্ধেই কিছু প্রাঞ্জল উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে কিভাবে বিভিন্ন মিথ কালের পরিক্রমায় ধর্ম হিসেবে বেড়ে উঠতে পারে। প্রথম প্রবন্ধটি জীববিজ্ঞান (দলগত নির্বাচন, মিম বিন্যাস প্রভৃতি) দৃষ্টিকোন থেকে, দ্বিতীয়টি সমাজবিবর্তনের দৃষ্টিকোন থেকে। 'ধর্মের উপযোগিতা' প্রবন্ধে অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স ব্যাখ্যা করেছেন ডারউইনীয় বিবর্তনের ধারায় ধর্মের ভূমিকা এবং অস্তিত্বের কারণ। এর পরের প্রবন্ধে আশিক মাহমুদ রূপম 'বিশ্বাস' ব্যাপারটা প্রথম থেকেই মানব মনে 'প্রোথিত' ছিল কিনা তা নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। তিনি প্রবন্ধটিতে বিশ্বাসে বিবর্তনের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করেছেন আধুনিক তথ্যের আলোকে। 'মানুষের উদ্ভব কি কোন স্বর্গীয় স্পর্শের ফসল?' নামের প্রবন্ধটিতে বন্যা আহমেদ দেখিয়েছেন, মানুষের বৈশিষ্ট্য প্রকৃতির অন্য প্রানীদের তুলনায় আপাত দৃষ্টিতে ভিন্ন মনে হলেও কোন স্বর্গীয় স্পর্শে এর উদ্ভব ঘটেনি, ঘটেছে বিবর্তনেরই ক্রমধারায়। এর পরের প্রবন্ধটিতে অপার্থিব বিবর্তনের দৃষ্টিতে জীবনকে ব্যাখ্যা করেছেন। পরবর্তী প্রবন্ধে খান মুহাম্মদ (শিক্ষানবিস) রবার্ট এইচ লোভির বিশ্লেষণ হাজির করে অভিমত দিয়েছেন যে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা প্রতিটি যুগেই ছিল, এখনো এর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায় নি। অধ্যায়ের শেষ প্রবন্ধটিতে সামাজিক পরিচয়ের দৃষ্টিতে ধর্মীয় চেতনার অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ড. বিপ্লব পাল ।

সপ্তম অধ্যায়ে আলৌকিক বলে কথিত বিভিন্ন ঘটনার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করেছেন লেখকেরা। প্রথম প্রবন্ধটিতে অনন্ত বিজয় দাশ ঈশ্বর দর্শন, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, টেলিপ্যাথি সহ বেশ কিছু অলৌকিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। এর পরের প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছি আত্মা দিয়ে জীবন-মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতাটি খুবই প্রাচীন এবং অবৈজ্ঞানিক। স্নায়ুবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান, জেনেটিক্স আর

বিবর্তনবিজ্ঞানের নতুন নতুন গবেষণা আত্মাকে আক্ষরিক ভাবেই রঙ্গমঞ্চ থেকে হটিয়ে দিয়েছে। 'প্রার্থনা কি কোন কাজে আসে?' প্রবন্ধটিতে ফরিদ আহমেদ ঐশ্বরিক শক্তির কাছে প্রার্থনার অন্তঃসারশূন্যতা তুলে ধরেছেন। 'মহাপ্লাবনের বাস্তবতা' প্রবন্ধটিতে অনন্ত বিজয় দাশ গানিতিক ভাবে হিসেব কষে এবং অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করে দেখিয়েছেন যে, নূহের আমলের মহাপ্লাবনের বর্ণনা কেবল উপকথা কিংবা অতিকথন ছাড়া আর কিছু নয়। পরের প্রবন্ধটিতে যিশুর মৃত্যু রহস্য উন্মোচন করেছেন ড. ওয়াহিদ রেজা। এর পরের প্রবন্ধে মানুষের পয়গম্বর হয়ে ওঠার সুলুক-সন্ধান করেছেন দীক্ষক দ্রাবিড়। 'পরকালের পরাবাস্তবতা' প্রবন্ধটিতে দীপক চোপড়া পরকালের অস্তিত্বের স্বপক্ষে যে সমস্ত 'প্রমাণ' হাজির করেছেন সাম্প্রতিক 'Life After Death: Burden of Proof' বইয়ে তা যুক্তিনিষ্ঠভাবে খন্ডন করেছেন মাইকেল শারমার । শারমারের প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন ফরিদ আহমেদ। আমরা ছোটবেলায় বাংলাদেশে শুনে শুনে বড় হয়েছিলাম নীল আর্মস্ট্রং নাকি চাঁদের মাটিতে নেমে আজান শুনে মুসলিম হয়ে গেছেন। এই বহুল প্রচলিত 'মিথ্যার বেসাতি'টিকে খন্ডন করেছেন লাইট হাউজ তার প্রবন্ধে। 'ডিম্বের সন্ধান এবং রাশেদ খালীফা ও তার ম্যাথমিটিকল মিরাকল অব কোরআন তত্ত্ব' - প্রবন্ধটিতে রাশাদ খালিফা কিভাবে কোরান টেম্পারিং করে তার বিখ্যাত '১৯ তত্ত্ব' হাজির করে কোরানের আলৈকিকতা দাবি করেছেন - তার মুখোশ উন্মোচন করেছেন নাস্তিকের ধর্ম কথা। এর পরের প্রবন্ধতে বিপ্লব পাল গনেশের দুধ খাওয়ার অলৌকিকতা খন্ডন করেছেন, যা বছর কয়েক আগে ভারতে হিন্দুদের মধ্যে গন-হিস্টেরিয়া তৈরী করেছিল। এর পরের প্রবন্ধটি এরিক ফন দানিকেনকে নিয়ে - যিনি বিগত শতকের আশি এবং নব্বই-এর দশকে খুবই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন - মহাজাগতিক প্রানীরা একসময় পৃথিবীতে এসে আমাদের মানব সভ্যতার পত্তন আর বিকাশ ঘটিয়েছিলো, আর তার নিদর্শন আমরা পাই পিরামিড থেকে শুরু করে কুতুব মিনার পর্যন্ত অনেক কিছুতে- তাকে নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন স্বপন বিশ্বাস। অধ্যায়ের শেষ প্রবন্ধটিতে 'অলৌকিক সংখ্যাতত্ত্ব' নিয়ে যাবতীয় ভাঁওতাবাজির স্বরূপ উদঘাটন করেছেন নাস্তিকের ধর্মকথা।

অষ্টম অধ্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং মৌলবাদের প্রসঙ্গ এসেছে। আমাদের উপমহাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেক্যুলারিজমকে ভুলভাবে সংজ্ঞায়িত করে 'সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা' হিসবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু সেক্যুলারিজমের মর্মার্থ সেটি নয়, বরং ধর্মকে রাষ্ট্রের কাজের সাথে জড়ানো যাবে না- এটাই যে সেক্যুলারিজমের মোদ্দা কথা, এবং সেটি যে কেউ স্পষ্ট করে বলেন না, তা ব্যাখ্যা করেছি। পরের কয়েকটি প্রবন্ধে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার ব্যাপারটি উঠে এসেছে। অতীতে (এবং এমনকি বর্তমানেও) বহু প্রখ্যাত বিজ্ঞানী কিংবা মুক্তমনা দার্শনিক ধর্মীয় কোপানলে নিগৃহীত এবং নির্যাতিত হয়েছিলেন (কিংবা এখনো হচ্ছেন)। তার কিছু নমুনা এই প্রবন্ধগুলোতে পেশ করা হয়েছে। হাইপেশিয়াকে নিয়ে প্রবন্ধটিতে আমি গণিতজ্ঞ হাইপেশিয়ার বেদনাঘন উপাখ্যান বর্ণনা করেছি - কিভাবে একসময় খ্রীষ্টিয় মৌলবাদিরা তার দেহ টুকরো টুকরো করে হত্যা করেছিলো। 'ব্রুনোর মৃত্যু এবং কিছু প্রশ্ন' -প্রবন্ধে ড. শহিদুল ইসলাম কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্ব সমর্থনের জন্য কিভাবে খ্রীষ্টিয় চার্চের পুরোধারা জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছিলো তার বর্ণনা হাজির করেছেন। তিনি আমাদের এও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ১৯৯২ সালে - গ্যালিলিওর মৃত্যুর চারশ বছর পরে চার্চ গ্যালিলিওর প্রতি চার্চ যে অমানবিক আচরণ করেছিলো তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

করে; কিন্তু ব্রুনোর প্রতি চার্চ অদ্যাবধি এমন কোন স্বীকারোক্তি প্রদান করেনি। বিজ্ঞানী আর দার্শনিকদের উপর অত্যাচারের ব্যাপারটা যে কেবল খ্রীষ্টানদের একচেটিয়া ছিলো না, বরং 'ইসলামের চিন্তার ইতিহাসে সত্যের শহীদ' যে কম নয়, তার বেশ কিছু নমুনা পেশ করেছেন নুরুজ্জামান মানিক তার প্রবন্ধে। ক্রিস্টোফার হিচেনস তাঁর প্রবন্ধে (অগ্নি অধিরূঢ় অনূদিত) দেখিয়েছেন ধর্ম জিনিসটা সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সব কিছুকে কিভাবে ধীরে ধীরে বিষাক্ত করে তুলছে। পরের প্রবন্ধে নুরুজ্জামান মানিক মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, ব্রুনো শুধু নয়, তার সমসাময়িক আরো অগনিত বিজ্ঞানী আর দার্শনিকদের উপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়েছিলো ধর্মের ধ্বজাধারীরা- আমরা যেন সেগুলো ভুলে না যাই। এর পরের প্রবন্ধ - 'মৌলবাদ : উৎস সন্ধান, ইতিবৃত্ত এবং সমকালীন প্রেক্ষিত' -এ রবিউল ইসলাম মৌলবাদের ইতিহাস আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং এ থেকে মুক্তির কিছু উপায়ও বাৎলে দিয়েছেন। মোঃ জানে আলম তার প্রবন্ধে মৌলবাদের জন্ম ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন, এবং কিভাবে একে রুখা যায় তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এ অধ্যায়ের সব শেষ প্রবন্ধটিতে আমি ধর্মানুভূতি এবং ধর্মের অসহিষ্ণুতার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছি।

নবম অধ্যায়ে ধর্ম ও নারীর প্রসঙ্গ এসেছে। প্রথম প্রবন্ধে নন্দিনী হোসেন বর্ণনা করেছেন কিভাবে পুরুষদের রচিত 'ধর্ম' নারীদের সামাজিকভাবে বিকলাংগ করে রাখে। বিভিন্ন ইসলামী কিতাব ঘেঁটে নন্দিনী দেখিয়েছেন, ধর্মের মধ্যে থেকে পুরুষের সমান অধিকার দাবি করাটা অনেকটা 'সোনার পাথরবাটি'র মতন। হিন্দু ধর্মেও যে মেয়েদের অবস্থা খুব একটা ভাল কিছু নয় তা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ আর পুরাণ ঘেটে দেখিয়েছেন অনন্ত বিজয় দাশ তার ''সনাতন ধর্মে'র দৃষ্টিতে নারী' প্রবন্ধে। অধ্যয়ের পরবর্তী প্রবন্ধ- 'চিরকালীন মোল্লাতন্ত্র বনাম নারীর সমানাধিকার' তে রবিউল ইসলাম দেখিয়েছেন কিভাবে মোল্লারা ধর্মকে ব্যাবহার করে নারীদের অবরুদ্ধ করে রাখে চিরকাল। অধ্যায়ের শেষ প্রবন্ধে দীক্ষক দ্রাবিড় মত প্রকাশ করেছেন যে, একটা সময় নারী পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানব সভ্যতার পত্তন ঘটিয়েছিলো, সেই নারীকে পরবর্তীতে ক্ষমতাহীন করেছে আসলে মনোথিইজম বা একক ঈশ্বরের প্রবক্তারা।

দশম অধ্যায়ে অন্যান্য প্রসংগ। 'সৃষ্টিতত্ত্বের গালগপ্প বনাম বিবর্তনের শিক্ষা' প্রবন্ধে মেহুল কামদার (অনুবাদ- তানবীরা তালুকদার) বর্ণনা করেছেন কি ভাবে ধর্মের বিভিন্ন গালগপ্পগুলো এমন ভাবে মানুষের মধ্যে জাঁকিয়ে বসেছে যে সেগুলো রীতিমত যুদ্ধ করে আমাদের তাড়াতে হচ্ছে। স্বজ্ঞা নিয়ে একটি সুন্দর লেখা লিখেছেন ড. দীপেন ভট্টাচার্য, তিনি দেখিয়েছেন এর অনেক কিছু সমাধানের জন্য ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান গবেষণার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে; তাঁর মতে এ এখনো সংঘাত- সমন্বয়ের উর্ধ্বে। মানব প্রকৃতি কি জন্মগত নাকি পরিবেশগত - এ নিয়ে সুগ্রন্থিত আলোচনা করেছেন অপার্থিব। সমকামিতা (সমপ্রেম) প্রকৃতিবিরুদ্ধ কোন ব্যাপার কিনা তা নিয়ে জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনা করেছি আমি। একই বিষয় নিয়ে সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে একটি সম্পূরক লেখা লিখেছেন স্নিগ্ধা আলী। রিচার্ড ডকিন্সের মেয়ে

জুলিয়েটের দশম জন্মদিন উপলক্ষে তার মেয়েকে লেখা ডকিন্সের লেখা চিঠির অনুবাদ করেছেন অগ্নি অধিরূঢ়। 'আত্মঘাতী কুসংস্কার' প্রবন্ধে ড. প্রদীপ দেব দেখিয়েছেন কিভাবে সমাজে জমে থাকা বিভিন্ন কুসংস্কারগুলো রীতিমত আত্মঘাতী হয়ে ওঠে। 'মহাশূন্যে শিবলিংগ' প্রবন্ধটিতে ড. নৃপেন্দ্র নাথ সরকার তার ছোটবেলাকার বিভিন্ন ঘটনা সাজিয়ে মানুষের মধ্যে জমে থাকা কুসংস্কারের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। 'সর্বগ্রাসী অপ-'বাদ' বনাম একজন আরজ আলী মাতুব্বর' প্রবন্ধে রণদীপম বসু কৃষক-দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর-এর জীবন দর্শন সহজ ভাষায় পাঠকদের জন্য তুলে ধরেছেন। বইটির সর্বশেষ প্রবন্ধ 'আমার স্বর্গ এখানে' তে ড. মীজান রহমান উল্লেখ করেছেন তিনি ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত কোন পতিতালয় সদৃশ কোন স্বর্গ চান না, বরং তিনি মনে করেন, আমাদের মত অধার্মিক মানবতাবাদীদের স্বর্গ এখানেই, এই মহামানবের সাগরকূলে - যেখানে মনুষ্যত্ব আছে, নারীর প্রতি সম্মান আছে, কুমারী কিশোরীর প্রতি আছে স্নেহের দৃষ্টি, সেখানেই আমাদের স্বর্গ। ইন্টারনেটের মুক্তমনা সাইটের জন্য লিখিত এ প্রবন্ধগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে আরো কিছু আকর্ষনীয় লেখা মূল বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে।

বইটি সংকলনের শেষ মুহূর্তে সুরজিত মুখার্জী বিজ্ঞান এবং ধর্মের সংঘাত কিংবা সমন্বয়ের প্রচেষ্টা অর্থহীন উল্লেখ করে মোঃ জানে আলমের একটি প্রবন্ধ (এ বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় দ্রঃ) খন্ডন করতে সচেষ্ট হন। এই প্রবন্ধটি মুক্তমনায় কিছু বিতর্কের জন্ম দেয়। প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমি নিজে একটি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি। মোঃ জানে আলমও সুরজিত বাবুকে একটি উত্তর দেন। আমরা সেগুলো এই বইয়ের পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করেছি। বছর খানেক আগে এক সময় জনাব মেসবাহউদ্দিন জওহের-এর সাথে আমার আস্তিকতা-নাস্তিকতা শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ বিতর্ক হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক মনে করায় সেই বিতর্কটিকেও আমরা বইয়ের পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

পরিশেষে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এ বইয়ের সকল লেখক আর শুভানুধ্যায়ীদের যারা শত ব্যস্ততার মধ্যেও বইটির জন্য লেখা দিয়েছেন এবং মূল্যবান উপদেশ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। আমরা আশা করব এ বইয়ের প্রবন্ধগুলো পাঠকের চেতনা জগতে সাড়া জাগাবে।

অভিজিৎ রায়
সম্পাদক, '**বিজ্ঞান ও ধর্ম** - সংঘাত নাকি সমন্বয়?'
জুলাই ২০০৮

প্রথম অধ্যায় : মহাবিশ্ব ও ঈশ্বর ১৮ *[ক্লিক করুন]*

- ঈশ্বরই কি সৃষ্টির আদি কারণ? : *অভিজিৎ রায় ১৯ [ক্লিক করুন]*
- বিজ্ঞান ও ধর্ম : *আলবার্ট আইনস্টাইন (দিগন্ত সরকার) ২৬ [ক্লিক করুন]*
- আইনস্টাইনের মহাজাগতিক ধর্ম ও অন্যান্য প্রসংগ : *রিচার্ড ডকিন্স (অজয় রায়) ৩৪*
- স্বাধীন ইচ্ছা, মন্দ ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব : *অপার্থিব ৪৫ [ক্লিক করুন]*
- বিজ্ঞানের ধর্ম ও ঈশ্বর প্রসঙ্গ : *অজয় রায় ৪৯ [ক্লিক করুন]*
- সংশয়ীদের ঈশ্বর : *আহমাদ মোস্তফা কামাল ৮১ [ক্লিক করুন]*
- মহাবিশ্ব ও ঈশ্বর : একটি দার্শনিক আলোচনা : *অভিজিৎ রায় ৯৪ [ক্লিক করুন]*

ঈশ্বরই কি সৃষ্টির আদি বা প্রথম কারণ?

অভিজিৎ রায়

বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর বিখ্যাত 'Why I am not a Christian' প্রবন্ধে প্রথম কারণ সম্বন্ধে বলেন:

> 'আমাদের আগেই বুঝে রাখা দরকার যে জগতের যা কিছু আমরা দেখতে পাই, সব কিছুর একটি কারণ আছে। এই কারণকে প্রশ্ন করতে করতে আপনি পেছনের দিকে এগিয়ে গিয়ে অবশ্যই প্রথম কারণের (First Cause) সম্মুখীন হবেন, এবং এই প্রথম কারণকেই স্বতঃসিদ্ধভাবে 'ঈশ্বর' হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।... আমিও বহুদনি ধরেই এটিকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলাম কিন্তু একদিন, যখন আমার বয়স আঠারো, আমি জন স্টুয়ার্ট মিলের আত্মজীবনী পড়ছিলাম, আর পড়তে গিয়েই সেখানে এই বাক্যটি গেলাম : 'আমার বাবা আমাকে প্রশ্ন করলেন- 'কে আমাকে তৈরি করেছে?' আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। কিন্তু এই প্রশ্নটি আমাকে আরও একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের দিকে ঠেলে দিল। যেটি হল- ঈশ্বরই যদি আমাকে তৈরি করে থাকেন, তবে ঈশ্বরকে তৈরি করেছে কে?' আমি এখনও মনে করি 'ঈশ্বরকে তৈরি করেছে কে?' এই সহজ সরল বাক্যটি প্রথম কারণ সম্পর্কিত যুক্তির দোষটি সেই প্রথম আমাকে দেখালো। যদি প্রতিটি জিনিসের একটি কারণ থাকে, তবে ঈশ্বরেরও কারণ থাকতে হবে। আবার যদি কারণ ছাড়াই কোন কিছু থাকতে পারে (যেমন ঈশ্বর), তবে এই যুক্তি ঈশ্বরের জগতের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য।'

'বিগ ব্যাং' তত্ত্বটি বৈজ্ঞানিক সমাজে গৃহীত হওয়ার পর পরই বিশ্বাসীদের মধ্যে নতুন করে 'প্রথম কারণ'টিকে প্রতিষ্ঠা করার নব উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেল। ১৯৫১ সালে Pope Pius XII পন্টিফিকাল একাডেমীর সভায় বলেই বসলেন-

> 'যদি সৃষ্টির শুরু থাকে, তবে অবশ্যই এই সৃষ্টির একজন স্রষ্টাও রয়েছে, আর সেই স্রষ্টাই হলেন ঈশ্বর।'

জ্যোর্তিবিজ্ঞানী এবং ধর্মযাজক জর্জ হেনরি লেমিত্রি (যিনি 'বিগ ব্যাং' প্রতিভাসের একজন অন্যতম প্রবক্তা) পোপকে সে সময় বিনয়ের সঙ্গে এ ধরনের যুক্তিকে 'অভ্রান্ত' হিসেবে প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ইদানিংকালে 'কালাম কসমলজিকাল আর্গুমেন্ট' (Kalam Cosmological Argument) নামে একটি দার্শনিক যুক্তিমালা সাধারণ বিশ্বাসীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত সুদর্শন দার্শনিক এবং পেশাদার বিতার্কিক উইলিয়াম লেন ক্রেইগ (William Lane Craig) ১৯৭৯ সালে লেখা The Kalam Cosmological Argument বইয়ের মাধ্যমে যুক্তির এই ধারাকে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেন। ধারাটিকে নিচের চারটি ধাপের সাহায্যে বর্ণনা করা যায় :

১। যার শুরু (উৎপত্তি) আছে, তার পেছনে একটি কারণ রয়েছে।

২। আমাদের আজকের এই মহাবিশ্বের একটি উৎপত্তি আছে।
৩। সুতরাং এই মহাবিশ্বের পেছনে একটি কারণ আছে।
৪। সেই কারণটিই হল 'ঈশ্বর'।

দার্শনিকেরা কালামের যুক্তিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন বিভিন্ন সময়েই*। এ বইয়েও কয়েকটি প্রবন্ধে 'আদি কারণের' যুক্তিগুলোর খন্ডন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে 'বাহুল্য বিধায়' সেগুলোর পুনরুল্লেখ করা হল না। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার উল্লেখ না করলেই নয়। সবকিছুর পেছনেই 'কারণ' আছে বলে পেছাতে পেছাতে বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের কাছে গিয়ে হঠাৎ করেই থেমে যান। এ সময় আর তারা যেন কোন কারণ খুঁজে পান না। মহাবিশ্বের জটিলতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য যদি ঈশ্বর নামক একটি সত্ত্বার আমদানি করতেই হয়, তবে সেই ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা করার জন্য একই যুক্তিতে আরেকটি 'ঈশ্বর'কে কারণ হিসেবে আমদানি করা উচিৎ। তারপর সেই 'ঈশ্বরের ঈশ্বর'-এর অস্তিত্ব ব্যাখ্যার জন্য লাগবে আরেকজন ঈশ্বর। এভাবে আমদানির খেলা চলতেই থাকবে একের পর এক, যা আমাদেরকে অসীমত্বের দিকে ঠেলে দেবে। এই ব্যাপারটি স্বাভাবিকভাবেই সকল বিশ্বাসীদের কাছে আপত্তিকর। তাই ধর্মবাদীরা নিজেরাই 'সবকিছুর পেছনেই কারণ আছে' এই স্বতঃসিদ্ধের ব্যতিক্রম হিসেবে ঈশ্বরকে কল্পনা করে থাকেন আর সোচ্চারে ঘোষণা করেন- 'ঈশ্বরের অস্তিত্বের পেছনে কোন কারণের প্রয়োজন নেই।' সমস্যা হল যে, এই ব্যতিক্রমটি কেন শুধু ঈশ্বরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে কেন নয়- এর কোন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা তারা দিতে পারেন না।

দর্শন ছেড়ে এবার বিজ্ঞানের দিকে চোখ ফেরানো যাক। 'যার শুরু আছে তার পেছনে কারণ থাকতেই হবে'- কালামের যুক্তিমালার প্রাথমিক ধাপটিকে বিজ্ঞানের জগতে অনেক আগেই খণ্ডন করা হয়েছে কারণবিহীন কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের উদাহরণ হাজির করে। আণবিক পরিবৃত্তি (Atomic Transition), আণবিক নিউক্লিয়াসের তেজষ্ক্রিয় অবক্ষয়ের (Radio active decay of nuclei) মতো কোয়ান্টাম ঘটনাসমূহ 'কারণবিহীন ঘটনা' হিসেবে ইতিমধ্যেই বৈজ্ঞানিক সমাজে স্বীকৃত। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্ব (uncertainty principle) অনুযায়ী সামান্য সময়ের জন্য শক্তি (যা $E = mc^2$ সূত্রের মাধ্যমে শক্তি ও ভরের সমতুল্যতা প্রকাশ করে) উৎপন্ন ও বিনাশ ঘটতে পারে- স্বতঃস্ফুর্তভাবে- কোন কারণ ছাড়াই। এগুলো সবগুলোই পরীক্ষিত সত্য। কাজেই উপরের উদাহরণগুলোই কালামের যুক্তিকে খণ্ডন করার জন্য যথেষ্ট।

আমি আমার লেখা 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী'† বইটিতে তথাকথিত শূন্য থেকে কিভাবে জড় কণিকা সৃষ্টি হয় তা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। এই ধারণাটিকে সম্প্রসারিত করে বহু বিজ্ঞানীই আজ মনে করেন এক কারণ বিহীন কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের (Quantum Flactuation) মধ্য দিয়ে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হতে পারে, যা পরবর্তীতে সৃষ্ট মহাবিশ্বকে স্ফীতির (Inflation) দিকে ঠেলে দিয়েছে, এবং

* উৎসাহী পাঠকেরা www.mukto-mona.com এবং www.infidels.org ওয়েব সাইট দুটি দেখতে পারেন।
† আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী (অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৫) -মূল বইয়ের সপ্তম অধ্যায় দেখুন।

আরো পরে পদার্থ আর কাঠামো তৈরির পথ সুগম করেছে[‡]। এগুলো কোন কল্পকাহিনী নয়। মহাবিশ্ব যে শূন্য থেকে উৎপন্ন হতে পারে প্রথম এ ধারণাটি ব্যক্ত করেছিলেন এডওয়ার্ড ট্রিয়ন ১৯৭৩ সালে 'নেচার' নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জার্নালে[§] । এর পর আশির দশকে স্ফীতি তত্ত্বের আবির্ভাবের পর থেকেই বহু বিজ্ঞানী প্রাথমিক কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশরে ধারণাকে স্ফীতি তত্ত্বের সাথে জুড়ে দিয়ে মডেল বা প্রতিরূপ নির্মাণ করেছেন। শূন্য থেকে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির ধারণা যদি অবৈজ্ঞানিক এবং ভ্রান্তই হত, তবে সেগুলো প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক সাময়িকী (Scientific Journal) গুলোতে কখনই প্রকাশিত হত না। মূলতঃ স্ফীতি-তত্ত্বকে সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে, এবং প্রায় সবগুলোতেই এই তত্ত্ব অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়েছে[**]। স্ফীতি তত্ত্ব গ্যালাক্সির ক্লাস্টারিং, এক্স রশ্মি এবং অবলোহিত তেজস্ক্রিয়তার বিন্যাস, মহাবিশ্বের প্রসারণের হার এবং এর বয়স, মহাবিশ্ব গঠনে এর উপাদান গুলোর প্রাচুর্য - সব কিছুই ব্যাখ্যা করতে পেরেছে নিখুঁত সৌন্দর্যে। আমি এর কারিগরী দিকগুলো এখানে আলোচনা করছি না, এগুলো নিয়ে বিস্তৃতভাবে গিয়ে মুক্তমনায় আগে একটা লেখা লিখেছিলাম '[স্ফীতি তত্ত্ব এবং মহাবিশ্বের উদ্ভব]' শিরোনামে[††]।

আসলে ইনফ্লেশন বা স্ফীতি নিয়ে আঁদ্রে লিন্ডে আর তার দলবলের সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে সত্যিকার অর্থেই সেই 'উত্তপ্ত বিগ ব্যাং' - যার মাধ্যমে পনর'শ কোটি বছর আগে এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এ মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, তাকে বিদায় জানানোর সময় এসে গিয়েছে। কারণ, সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, বিগ ব্যাং দিয়ে মহাবিশ্বের শুরু নয়, বরং মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে ইনফ্লেশন দিয়ে। অর্থাৎ, বিগব্যাং এর পরে ইনফ্লেশনের মাধ্যমে মহাবিশ্ব তৈরী (যা কিছুদিন আগেও সত্যি বলে ভাবা হত) হয়নি, বরং ইনফ্লেশনের ফলশ্রুতিতেই কিন্তু বিগব্যাং হয়েছে, তারপর সৃষ্ট হয়েছে আমাদের মহাবিশ্ব। তার কথায়[‡‡]:

> 'Inflation is not a part of big-bang theory as we thought 15 years ago. On the contrary, the big-bang is the part of inflationary model'

আরও মজার ব্যাপার হল, ওই ইনফ্লেশনের ফলে শুধু যে একবারই বিগব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ ঘটেছে তা কিন্তু নয়, এরকম বিগ ব্যাং কিন্তু হাজার হাজার, কোটি কোটি এমনকি অসীম-সংখ্যকবার ঘটতে পারে; তৈরী হতে পারে অসংখ্য 'পকেট মহাবিশ্ব'। আমরা সম্ভবতঃ এমনই একটি পকেট-মহাবিশ্বে অবস্থান করছি বাকিগুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত না হয়ে (এ ব্যাপারটিকে বলা হয় 'মাল্টিভার্স বা [অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা][§§]) । এই ধারণা

[§] E.P. Tryon, "Is the Universe a Vacuum Fluctuation?", Nature 246 (1973): 396-97.

[**] বিস্তারিত তথ্যের জন্য The Inflationary Universe: The Quest for a New Theory of Cosmic Origins, Alan H. Guth, Perseus Books Group (March 1, 1998) দেখুন।

†† একই লেখা একটু পরিবর্তিত আকারে মাসিক সায়েন্স ওয়ার্ল্ডের ডিসেম্বর সংখ্যায় (বর্ষ ৫, সংখ্যা ৬০, ডিসেম্বর ২০০৬) 'ইনফেশন থিওরি : স্ট্যান্ডার্ড বিগ ব্যাং মডেলের বিদায় কি তবে আসন্ন?' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল।

[‡‡] Self Reproducing Inflationary Universe, Andrei Linde, Scientific American, 1998

[§§] অনন্ত মহাবিশ্বের সন্ধানে, অভিজিৎ রায়, দৈনিক সমকাল, ১৫ জুলাই ২০০৬ ।

অনুযায়ী আমাদের মহাবিশ্ব যাকে এতদিন প্রকৃতির পুরো অংশ বলে ভেবে নেওয়া হত, আসলে হয়ত এটি এক বিশাল কোন "অমনিভার্স" (Omniverse)-এর খুব ক্ষুদ্র অংশবিশেষ ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের অবস্থাটা এতোদিন ছিল সেই বহুল প্রচলিত 'অন্ধের হস্তি দর্শন' গল্পের অন্ধ লোকটির মত - হাতীর কান ছুঁয়েই যে ভেবে নিয়েছিলো ওইটাই বুঝি হাতীর পুরো দেহটা! যাহোক, নীচের ছবিটি দেখলে লিন্ডের সাম্প্রতিক স্ফীতি তত্ত্বটি (যেটির নামকরণ করা হয়েছে Chaotic inflation) কি বলতে চাইছে এ সম্বন্ধে হয়ত কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে:

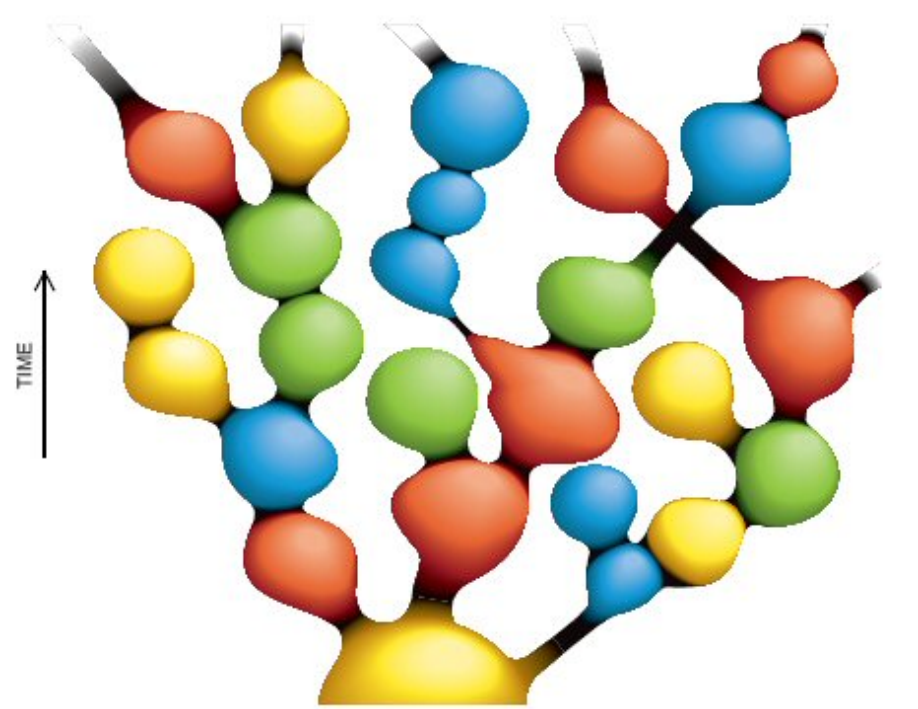

SELF-REPRODUCING COSMOS appears as an extended branching of inflationary bubbles. Changes in color represent "mutations" in the laws of physics from parent universes. The properties of space in each bubble do not depend on the time when the bubble formed. In this sense, the universe as a whole may be stationary, even though the interior of each bubble is described by the big bang theory.

ছবি: লিন্ডের সাম্প্রতিক তত্ত্ব বলছে কেওটিক ইনফ্লেশনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য সম্প্রসারিত বুদ্বুদ এবং প্রতিটি সম্প্রসারিত বদ্বুদই আবার জন্ম দিয়েছে এক একটি 'বিগ-ব্যাং'-এর। আর সেই এক একটি বিগ-ব্যাং পরিশেষে জন্ম দিয়েছে এক একটি পকেট মহাবিশ্বের। আমরা এ ধরনেরই একটি পকেট মহাবিশ্বে বাস করছি (ছবির উৎস - সায়েন্টিফিক আমেরিকান)।

দেখা যাচ্ছে, এ তত্ত্ব অনুযায়ী কেওটিক ইনফ্লেশনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য সম্প্রসারিত বুদ্বুদ (expanding Bubbles) এবং প্রতিটি সম্প্রসারিত বদ্বুদই আবার জন্ম দিয়েছে এক একটি 'বিগ-ব্যাং'-এর। আর সেই এক একটি বিগ-ব্যাং পরিশেষে জন্ম দিয়েছে এক একটি পকেট মহাবিশ্বের। আমরা এ ধরনেরই একটি পকেট মহাবিশ্বে বাস করছি। এতত্ত্ব আজ অনেকের মাঝেই তৈরী করেছে 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা'

এক সার্বজনীন দার্শনিক আবেদনের- এ মহাবিশ্ব যদি কোন দিন ধ্বংস হয়ে যায়ও, জীবনের মূল সত্ত্বা হয়ত টিকে থাকবে অন্য কোন মহাবিশ্বে, হয়ত অন্য কোন ভাবে, অন্য কোন পরিসরে ।

লিন্ডের মতে এ তত্ত্বের সমাধানটি এতটাই সরল যে, এর আগে এটি বিজ্ঞানীদের মাথায় কেন আসে নি তা ভেবে লিন্ডে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছেন। অ্যালেন গুথ, যাকে 'ইনফ্লেশন তত্ত্বের জনক' হিসেবে অভিহিত করা হয়, তিনি তার 'দ্য ইনফ্লেশনারী ইউনিভার্স' বইয়ে বিশ্বসৃষ্টিকে একটি 'আলটিমেট ফ্রি লাঞ্চ' হিসেবে অভিহিত করে বলেন,

> 'Most important of all, the Question of the Origin of the matter in the Universe is no longer thought to be beyond of science. … If inflation is correct, then the inflationary mechanism is responsible for creation of essentially all the matter and energy in the Universe. …After two thousand years of scientific research, it now seems likely that Lucretius (who said 'Nothing can be created from nothing') was wrong. Conceivably, *everything* can be created from nothing. And "everything" might include a lot more than what we can see. In the context of inflationary cosmology, it is fair to say that **Universe is the ultimate free lunch**!'

অনেক বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকেরাই মনে করেন, কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের ধারণার সাথে সমন্বিত করা ইনফ্লেশন বা স্ফীতি তত্ত্ব যখন একেবারে শূন্য থেকে বিশ্বসৃষ্টির একটি প্রাকৃতিক এবং যৌক্তিক সমাধান দিতে পারছে, তখন ঈশ্বর সম্ভবত একটি 'বাড়তি হাইপোথিসিস' ছাড়া আর কিছু নয়।

ইনফ্লেশন বা স্ফীতি তত্ত্ব ছাড়াও আরেকটি তত্ত্ব মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ইদানিং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পল স্টেইনহার্ট এবং নেইল টুরকের প্রস্তাবিত এই চক্রাকার মহাবিশ্ব বা 'সাইক্লিক মডেলে' তারা দেখিয়েছেন আমাদের মহাবিশ্বের কোন শুরু নেই, শেষ নেই। এ এক চলমান অনন্ত, অফুরন্ত মহাবিশ্ব (endless universe)। তাঁদের আঁকা এ ছবিতে 'বিগ ব্যাং' দিয়ে স্থান-কালের (space-time) শুরু নয়, বিগ ব্যাং-কে তারা দেখিয়েছেন কেবল একটি ঘটনা হিসেবে - যার উদ্ভব হয় স্ট্রিংতাত্তিকদের কথিত দুটো ব্রেনের সংঘর্ষের (collision of branes) ফলশ্রুতিতে। এবং কেবলমাত্র একবারই এই মহাবিস্ফোরণ ঘটবে বা ঘটেছে তাও নয়, বরং এ মহাবিশ্ব প্রাকৃতিক বিবর্তনের চক্রে চির চলমান। তারা গানিতিকভাবে দেখিয়েছেন, মহাবিশ্বের যাত্রাপথের প্রতিটি চক্রে বিগ ব্যাং উদ্ভব ঘটায় উত্তপ্ত পদার্থ এবং শক্তির। কালের পরিক্রমায় ক্রমশ শীতল হয়ে এর থেকে তৈরি হয় গ্যালাক্সি আর তারকারাজি, যা আমরা আজ চোখ মেললেই দেখতে পাই। আজ থেকে ট্রিলিয়ন বছর পরে আবারো বিগ ব্যাং ঘটবে এবং তৈরি করবে নতুন চক্রের। পল স্টেইনহার্ট এবং নেইল টুরক তাদের প্রস্তাবিত মডেলকে সাধারণ পাঠকেদের কাছে নিয়ে এসেছেন সম্প্রতি 'Endless Universe' বইয়ের মাধ্যমে[***]। নতুন এ তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের যেহেতু কোন 'শুরু'

[***] Endless Universe: Beyond the Big Bang -- Rewriting Cosmic History by Paul J. Steinhardt and Neil, Broadway; Reprint edition (June 3, 2008)

নেই, এর পেছনে কোন স্রষ্টা বসানোর চেষ্টা অর্থহীন। বিশ্বাসীদের অতি-প্রিয় কালামের যুক্তিমালা এ মডেলের জন্য একেবারেই প্রায়োগিক নয়।

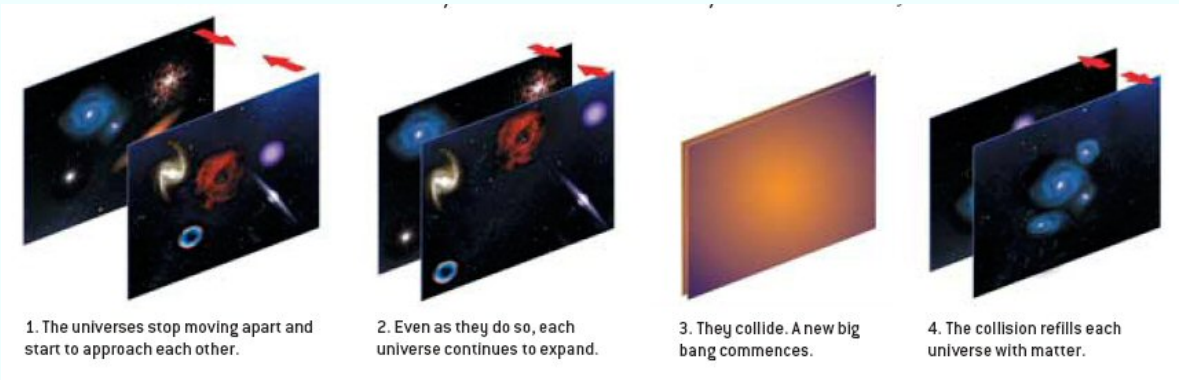

ছবি: পল স্টেইনহার্ট এবং নেইল টুরক তাদের প্রস্তাবিত এই চক্রাকার মহাবিশ্ব বা 'সাইক্লিক মডেলে' দেখিয়েছেন আমাদের মহাবিশ্বের কোন শুরু নেই, শেষ নেই, এবং পদার্থ এবং শক্তির উদ্ভব হয় দুটো ব্রেনের সংঘর্ষের ফলশ্রুতিতে, এবং এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে অনন্তকাল।

মহাবিশ্বের সত্যিকার প্রকৃতি বুঝবার জন্য হয়ত আমাদের ভবিষ্যতের কারিগরী জ্ঞানের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে, তবে এটুকু বলা যায় নিঃসন্দেহে যে, ইনফ্লেশনারী কিংবা সাইক্লিক - যে মহাবিশ্বই ভবিষ্যতে সঠিক প্রমাণিত হোক না কেন, এ দুটি তত্ত্বের কোন তত্ত্বই তাদের তত্ত্বকে সার্থকতা দেওয়ার জন্য কোন অলৌকিক সত্ত্বার উপর নির্ভর করছে না, মডেলগুলো নির্মান করা হয়েছে আমাদের জানা শোনা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম নীতি অনুসরণ করেই।

আরেকটি কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে এ ব্যাপারে। বিজ্ঞান কিন্তু কোন বিষয় সম্পর্কে পরম বা নিখুঁত জ্ঞান দিতে পারে না। আজকে আণবিক স্থানান্তর, নিউক্লিয়াসের তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ বা কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মত ঘটনার কারণ পাওয়া যাচ্ছে না- ভবিষ্যতে পাওয়া যেতেই পারে। কেউই সে সম্ভাবনাকে অস্বীকার করছে না। ভবিষ্যতে পাওয়া যেতে পারে মহাবিশ্ব সৃষ্টির 'আদি' কারণও। কিন্তু সেই কারণটি যে 'ঈশ্বরের মত মহাপরাক্রমশালী 'সত্ত্বা'ই হতে হবে, এটি ভেবে নেওয়ার কোন যৌক্তিক কারণ নেই, বরং কারণটি হতে পারে সম্পূর্ণভাবেই 'প্রাকৃতিক'। ওয়েস মরিসন তার 'Must the Beginning of the Universe Have a Porsonal Cause? A critical Examination of the Kalam's Cosmological Argument'-এ বলেন-

> 'সৃষ্টির সব কিছুর পেছনেই কারণ আছে- এ ব্যাপারটি ধ্রুব সত্য নয়। আর যদিও বা ইতিহাসের পরিক্রমায় কখনও বের হয়ে আসে যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে একটি 'আদি' কারণ রয়েছেই, তবুও একথা ভেবে নেওয়ার কারণ নেই যে, সেই আদি কারণটি ঈশ্বরের মত একটি 'ব্যক্তি সত্ত্বাই' হতে হবে।'

মুক্তমনা পদার্থবিদ ড. ভিক্টর স্টেংগরও একই ধরনের মত ব্যক্ত করে বলেন-

> 'ধরে নিলাম কালামের কথা অনুযায়ী মহাবিশ্বের একটি কারণ রয়েছেই, তো সেই কারণ কেন একটা স্রেফ প্রাকৃতিক কারণ হতে পারবে না? কাজেই দেখা যাচ্ছে - কালামের যুক্তিমালা প্রায়োগিক এবং তাত্ত্বিক - দু'দিক থেকেই ব্যর্থ হচ্ছে।'

ড. অভিজিৎ রায়, আমেরিকায় বসবাসরত গবেষক এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' ও 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। সাম্প্রতিক সম্পাদিত গ্রন্থ - 'স্বতন্ত্র ভাবনা'। ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com

বিজ্ঞান ও ধর্ম

আলবার্ট আইনস্টাইন
অনুবাদঃ দিগন্ত সরকার

মানুষের আধ্যাত্মিকতার ইতিহাস জানতে গেলে মনে রাখতে হবে যে আমরা মুলত আমাদের প্রয়োজনের বশেই কাজ করে এসেছি। আমাদের অগ্রগতির পেছনে দুটি মূল চালিকাশক্তি ছিল আমাদের অনুভূতি আর আকাঙ্খা। কিন্তু কোন অনুভূতি আর আকাঙ্খা মানুষকে ধর্মচিন্তার দিকে নিয়ে গেল? একটু চিন্তা করলেই বোঝা সম্ভব, যে আদিম মানুষের ভয়ই এই প্রাথমিক ধর্মচিন্তার মূলে - এই ভয় কখনও ক্ষুধার ভয়, কখনও আগ্রাসী জন্তুর ভয় আবার কখনও প্রকৃতির তাণ্ডবের ভয়। দুর্বল মানবচিত্তে এইসব কার্যকারণের পারস্পরিক কাকতালীয় যোগসূত্রের মাধ্যমে এক কাল্পনিক চরিত্রের উদ্ভব হয় - যার ইচ্ছা ও চিন্তার ওপরেই ভীতিকর এইসব ঘটনা পরিচালিত হয়। আর এই কাল্পনিক চরিত্রের বা চরিত্রগুলোর করুণা বা কৃপালাভের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট অসংখ্য যাগযজ্ঞ ও আচার-বিচার যুগ-যুগ ধরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে হস্তান্তরিত হতে হতে মূল ধর্মের আকার ধারণ করেছে। আমি এই ভীতিসর্বস্ব ধর্মের কথাই বলছি। এই ধর্মের উপজাত হিসাবে তৈরী হয়েছে এক পুরোহিত-শ্রেণী, যারা সাধারণ মানুষের সাথে এই কাল্পনিক ভীতিকর চরিত্রটির মেলবন্ধন ঘটিয়ে দেন। এই পুরোহিত শ্রেণী নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে শাসকশ্রেণীর সাথে আঁতাত গড়ে নিজ-নিজ স্বার্থসিদ্ধি করে গেছে।

ধর্মের উদ্ভবের পেছনে সামাজিক কারণও কম ছিল না। পরামর্শ, ভালবাসা আর সান্ত্বনা পাবার আশায়ও মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছে। এই ঈশ্বর আবার এক পরম-জ্ঞানী নীতিনিষ্ট ঈশ্বর, যিনি বিচার করেন - শাস্তি ও পুরস্কার দেন। ইনিই মৃতের আত্মাকে সংরক্ষণ করেন, বিশ্বাসীকে পদে পদে সাহায্য করেন, মানবজাতিকে পথ দেখান। এই ঈশ্বর এক নীতিনিষ্ট বিবেকবান ঈশ্বর।

ঈহুদীধর্মে এই ভীতিকর ধর্ম আর নৈতিকতা বা বিবেকের ধর্ম - এক থেকে অন্যে উত্তরণের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় - ওল্ড থেকে নিউ টেস্টামেন্টে। শুধু ঈহুদী ধর্মে নয়, যা কোনো ধর্মেই আদপে এই দুই শ্রেণীর বিশ্বাসের মিশ্রণ পাওয়া যায়। আর ভয়ের ধর্ম থেকে বিবেকের ধর্মে উত্তরণই মানুষের জীবনে একটা বড় পদক্ষেপ।

তবে এই দুই প্রকার ঈশ্বর-বিশ্বাসের মধ্যে একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় - ঈশ্বরের মধ্যে মানবিক গুণাবলী আরোপের প্রচেষ্টা। কিন্তু আমার বিশ্বাস তৃতীয় আরেক ধরণের ধর্মবিশ্বাস আছে যাতে ঈশ্বরের মানবীকরণ করা হয় নি। এই ধরণের মহাজাগতিক ধর্ম কাউকে ব্যাখ্যা করে বোঝানো কষ্টকর।

নিজের আকাঙ্খা বা বাসনার তুচ্ছতা অনুভব করতে শিখে আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশালতা আর শৃঙ্খলাবদ্ধতায় বিমোহিত হয়ে মানুষ সমগ্র মহাবিশ্বের অভিজ্ঞতা নিজের ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে চায়। স্কোপেনহাওয়ার

লেখা থেকে জানা যায় যে বৌদ্ধধর্মে এই ধরনের মহাজাগতিক একাত্মতার কথা বলা আছে। সর্বকালের সেরা ধর্মগুরুরা কিন্তু এই ধরণের ব্যক্তি-ঈশ্বর-বিহীন ও নিয়মকানুন-বিহীন মহাজাগতিক ধর্মের প্রচারই করে গেছেন। তাদের কেউ কেউ সমসাময়িকদের মধ্যে সাধুসন্ত হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছেন আর নাহলে নাস্তিক বলে পরিগণিত হয়েছেন। এদের মধ্যে যেমন আছেন গৌতম বুদ্ধ, তেমনই আছেন ডেমোক্রিটাস, স্পিনোজা আর ফ্রান্সিস অব আসিসি।

কিন্তু কি ভাবে এই মহাজাগতিক ধর্ম মানুষের মধ্যে প্রচার লাভ করতে পারে? এর মধ্যে তো কোনো ঈশ্বরবিশ্বাসে বালাই নেই, নেই কোনো নিয়মকানুন, আচার-আড়ম্বর। আমার ধারণা বিজ্ঞান আর চারুকলাই পারে একে মানুষের কাছে পৌছে দিতে।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে, ধর্ম আর বিজ্ঞানের আলোচনা এক ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে মনে হবে এরা যেন একে অপরের প্রতিদ্বন্দী। আর মনে হওয়াই স্বাভাবিক। যে ব্যক্তি কার্যকারণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা আর আস্থা রাখে, যে ওই কার্যকারণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখে সে কিছুতেই তার মধ্যে এক কাল্পনিক চরিত্রের অদৃশ্য হস্তক্ষেপের গল্প মেনে নিতে পারে না। এই ব্যক্তির কাছে কোনো ঈশ্বরের শাস্তি দেওয়া আর পুরস্কারের ধারণা পুরো গল্পকথার মত লাগবে। কারণ সে জানে সব মানুষই বাহ্যিক বা আন্তরিক প্রয়োজনের বশেই কাজ করে, সে কাজ আপাতদৃষ্টিতে আমাদের কাছে ভাল লাগুক বা না লাগুক। তাই এক পরম-জ্ঞানীর চোখে সে কখনই অপরাধী হতে পারে না। এই মতবাদ প্রসারের মূল ভিত্তি যুক্তি আর বিজ্ঞান, তাই অভিযোগ করা হয় যে বিজ্ঞান নাকি নৈতিকতার শত্রু। এই কারণেই ধর্মপ্রতিষ্ঠান যুগে যুগে বিজ্ঞানের সাথে লড়াইতে নেমেছে - যাতে তাদের ধর্মের অনুসারীরা তাদের ছেড়ে না চলে যায়। অথচ এই অভিযোগ অত্যন্ত হাস্যকর। মানুষের নৈতিকতার জন্য তো ধর্মের কোনো দরকারই নেই, দরকার মানবিকতা, সহমর্মিতা, শিক্ষা আর সামাজিকতার। মানুষ যদি পরকালের শাস্তির কথা ভেবে নৈতিক হয়, সেই নৈতিকতার মধ্যে মহত্ত্ব কোথায় থাকে?

বিজ্ঞানসাধনায় এই বিশ্বজগতের সাথে একাত্মতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। কেপলার বা নিউটন কত যুক্তি চিন্তা আর সাধনার মধ্যে দিয়ে মহাজাগতিক বস্তুর গতিবিধি সম্পর্কে সঠিক সূত্রে পৌঁছেছিলেন - তা এই মহাজাগতিক ধর্মের প্রভাব ব্যতিরেকে সম্ভব হত কি? যারা কিছু বিজ্ঞানের সূত্র পড়ে বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে ধারণা করেন যে এরা চারদিকের জগত সম্পর্কে সদা-সন্দিহান, অসামাজিক আর সর্বদা কিছু সূত্র আবিস্কারে মগ্ন থাকেন - তাদের পক্ষে কোনোভাবেই বোঝা সম্ভব হবে না একজন বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টার মর্ম। যারা নিজেরা এরূপ গবেষণায় নিজেরা সময় কাটিয়েছেন তারাই বুঝতে পারবেন যে সত্য উদ্ঘাটনের জন্য আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়ে বারবার বিফল হওয়া সত্ত্বেও কি এক অপার্থিব চালিকাশক্তি এই বিজ্ঞানীদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে গেছে। মহাজাগতিক ধর্মই এই শক্তি প্রদান করে - সূত্র আবিষ্কারের শক্তি, সত্য উদ্ঘাটনের শক্তি। আমার এক সমকালীন বিজ্ঞানী বলেছেন যে আজকের যুগে যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানীরাই একমাত্র ধার্মিক বলে নিজেকে দাবী করতে পারেন - আমার তো মনে হয় উনি ঠিকই বলেছেন।

[*লেখাটা আইনস্টাইনের ধর্ম ও বিজ্ঞান নিয়ে লেখা হাতে গোনা কয়েকটি লেখার মধ্যে একটি থেকে অনূদিত। লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩০ সালের ৯ই নভেম্বর, নিউ ইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিনে।*

আইডিয়াস অ্যান্ড ওপিনিয়ন্স আর দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাস আই সি ইট - এই দুটো বইতেও এই লেখাটা পরে প্রকাশিত হয়েছে]

***

আইনস্টাইনের নতুন চিঠি - একটা ব্যাপার উপরের লেখা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আইনস্টাইন অনেক কথাতেই ধর্ম বা ঈশ্বরের কথা উল্লেখ করলেও তিনি ধর্ম হিসাবে প্রচলিত বিশ্বাসকে মানতেন না। উনি বরং এক মহাজাগতিক ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন।

আইনস্টাইন যে প্রতিষ্ঠিত কোনো একেশ্বরবাদী ধর্মে বিশ্বাস করতেন না, সেকথা তিনি বহুবার বহু জায়গায় বলেছেন। তার আত্মজীবনীতেও অত্যন্ত স্পষ্ট করেই সেকথা জানিয়েছেন[1]। তাহলে এত বিতর্ক কেন? বিতর্ক এজন্য যে, আইনস্টাইন প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাস না করলেও তিনি ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে কিংবা লিখতে পছন্দ করতেন। প্রায়শঃই তাঁর লেখায় ঈশ্বরকে ব্যবহার করতেন রূপক হিসেবে। সেই সব রূপকাশ্রিত উপমাকে শিরোধার্য করে বিশ্বাসীরা বরাবরই আইনস্টাইনের ধর্ম নিয়ে জল ঘোলা করেছেন এতকাল। আইনস্টাইনের বর্ণিত এমনি একটি উপমা ছিল - 'science without religion is lame, religion without science is blind'। অর্থাৎ, 'ধর্মহীন বিজ্ঞান হলো খঞ্জ আর বিজ্ঞানহীন ধর্ম হলো অন্ধ'। ১৯৪১ সালে লেখা তার 'Science, Philosophy and Religion : A Symposium' প্রবন্ধে তিনি এ মন্তব্যটি করেছিলেন। তারপর যে কত মানুষ তার এই বক্তব্যটি ধরে তাকে একজন আস্তিকক-ধর্মভীরু বিজ্ঞানী বানাতে চেষ্টা করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এর মধ্যে ফিলিপ জি. ফ্রাঙ্ক থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক জীবনীকার ওয়াল্টার আইজ্যাকসন সহ অনেকেই আছেন। আইনস্টাইনের আরেকটি বিখ্যাত মন্তব্য ছিলো, 'God does not play dice [with the universe].'। অর্থাৎ, 'ঈশ্বর [মহাবিশ্ব নিয়ে] পাশা খেলেন না'। আইনস্টাইন এ বক্তব্যটি করেছিলেন ১৯২৬ সালে নীলস বোরের সাথে বিতর্কে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অসম্পূর্ণতাকে তুলে ধরতে এবং প্রাকৃতিক নিয়ম কানুন দ্বারা পরিচালিত সুষম এবং স্থিতিশীল মহাবিশ্বের মডেলকে তুলে ধরতে। অথচ বিশ্বাসীরা উপমার তাৎপর্য না বুঝে আইনস্টাইনের এ ধরণের বক্তব্যকে ঈশ্বারের অস্তিত্বের সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করতেন।

তবে আইনস্টাইনের একটি চিঠি এ বিষয়ে সমস্ত বিতর্কের ইতি টেনে দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। গত মে মাসে (২০০৮) এ চিঠিটি প্রায় রেকর্ড দামে নিলামে বিক্রি হল। এমনটা যে হবে তা কিন্তু সবাই আশা করেন নি। নিলাম আয়োজনকারী সংস্থা এর মূল্য অনুমান করেছিল মাত্র ছয় থেকে আট হাজার পাউন্ডের মধ্যে। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পেয়ে তাদের টনক নড়ে। শেষ অবধি নিলামে অংশগ্রহণকারী আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কথা মাথায় রেখে ১১টি টেলিফোন লাইনের ব্যবস্থা করতে হয়। চিঠিটির দাম ওঠে ১ লাখ সত্তর হাজার পাউন্ড আর সব খরচা মিলিয়ে নিলাম-বিজয়ী ক্রেতা ২ লাখ-এর কিছু বেশী পাউন্ড খরচা করেন এই চিঠিকে তার ব্যক্তিগত সংগ্রহে আনতে। এই মূল্য এর আগে তার স্ত্রীকে লেখা আইন্সটাইনের

[1] ড. শহিদুল ইসলাম দৈনিক সমকালে 'আইনস্টাইনের ধর্মবিশ্বাস' শিরোনামে একটি সুন্দর লেখা লিখেছেন।

৫৩টি চিঠির নিলামে ওঠা দামের চেয়ে কিছু কম হলেও এটিই তার এককভাবে বিক্রিত সর্বাধিক মূল্যের চিঠি।

কি ছিল সেই চিঠিতে? ১৯৫৪ সালে এরিক গাটকিন্ডকে লেখা এই ব্যক্তিগত চিঠির কিছু অংশে তার ধর্ম এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায়। গার্ডিয়ানের ওয়েবসাইটে পাওয়া গেল চিঠির কিছু অনূদিত অংশ। মূল চিঠিটি জার্মান ভাষায় লেখা ও তা থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন জোয়ান স্ট্যামবাগ। ধর্ম-বিজ্ঞান সংক্রান্ত অংশটুকু বাংলায় অনুবাদ করলাম নিচে -

> *"ঈশ্বর শব্দটি আমাকে মানুষের দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই মনে করায় না। বাইবেল আসলে অনেকগুলো সম্মানিত অথচ ছেলেভোলানো গল্পের একটা সংকলন ছাড়া কিছুই না। নতুন করে তার মানে অনুসন্ধান করে আমার এই ধারণায় পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। এইসব নতুন করে খুঁজে বের করা অনুবাদগুলোর সাথে মূল বক্তব্যের কোনো যোগসূত্রই নেই। আমার কাছে প্রচলিত অন্য সব ধর্মের মত ইহুদী ধর্মও এরকম কিছু শিশুসুলভ কুসংস্কারের সম্মিলিত রূপ। আমি নিজে ইহুদী হওয়া সত্ত্বেও বলতে পারি যে ইহুদীদের সাথে অন্য ধর্মের আরো দশজন মানুষের কোনো তফাৎ নেই। আমি মোটেও ইহুদী জনগোষ্ঠীকে ঈশ্বরের বাছাই করা কোনো গোষ্ঠী বলে মনে করি না।*
>
> *সাধারণভাবে আমি মানুষ হিসাবে আর ইহুদী হিসাবে আমার দুই আলাদা গর্বের স্তম্ভের মধ্যে যোগসাধন করতে যথেষ্ঠ যন্ত্রণাবোধ করি - কারণ এদের মধ্যে এক সুউচ্চ প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ হিসাবে আমি যেমন কার্যকারণ সূত্রের সন্ধানে সাধনা করি বলে গর্ববোধ করতে পারি, তেমনই ইহুদী হিসাবেও একেশ্বরবাদে বিশ্বাসের কারণে গর্ববোধ করতে পারি। স্পিনোজাই হয়ত প্রথম লক্ষ্য করেন প্রাচীরের একপাশে কার্যকারণ সূত্রের এই সীমাবদ্ধতা আদপে কার্যকারণের অস্তিত্বহীনতা ছাড়া আর কিছুই না। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে 'জীবন্ত' ধরে নেবার প্রচেষ্টা ঈশ্বরের মেরুকরণের মাধ্যমেও সৃষ্ট একেশ্বরবাদেও দূর করা যায় নি। এই দুই (কার্যকারণ আর ঈশ্বর) বিপরীতমুখী চিন্তাভাবনার মাঝে এক কৃত্রিম প্রাচীর দাঁড় করিয়ে আমরা নিজেদের বোকা বানাই অথচ আমাদের নৈতিকতাবোধও এর মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয় না।"*

***

ধর্ম ও বিজ্ঞান নিয়ে আইনস্টাইনের আরো কিছু প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি (আইনস্টাইনের বিবিধ রচনা থেকে সংকলিত) :

'আমার ধর্ম-প্রীতি নিয়ে যা শোনা যায় তার সবটাই মিথ্যে ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচারিত। আমি কোনো ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না এবং এটা আমি স্পষ্টভাবে বারবার জানিয়ে এসেছি। আমার মধ্যে ধর্মীয় ভাব বলতে শুধু আছে এই অসীম রহস্যময় মহাবিশ্বের বিশালতার প্রতি এক বিস্ময়'।

- Albert Einstein, in a letter March 24, 1954; from *Albert Einstein, the Human Side*, Helen Dukas and Banesh Hoffman, eds., Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1981, p 43

'আমি তো এমন ঈশ্বরের কথা ভাবতেই পারি না যে তার নিজের সৃষ্টিকে শাস্তি দেয়। যার উদ্দেশ্য বিধেয় আমাদের নিজেদের মত করে বানানো। সোজা কথায়, এরকম ঈশ্বর মানবচরিত্রের প্রতিফলন। আর মানুষ কি ভাবে মৃত্যুর পরেও বেঁচে ওঠে তাও কোনোভাবেই আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়, যদিও ভয় পেয়ে বা ধর্মীয় অহংবোধের বশবর্তী হয়ে দুর্বলচিত্ত মানুষ তা বিশ্বাস করে। আমি এই সর্বব্যাপী জীবনের আর সুবিশাল মহাবিশ্বের নিয়ে গবেষণা করতেই ভালবাসি। এই বিশাল প্রকৃতিরাজ্যে কার্যকারণের যে সামান্য বহিঃপ্রকাশ সামনে আসে, তা খুঁজে বের করাতেই আমার আনন্দ'।

- Albert Einstein, *The World as I See It*, Citadel Press, 1930

"কল্যাণময়, সর্বশক্তিমান ও নীতিবাগীশ এক ব্যক্তি-ঈশ্বরের ধারণা যে অসহায় মানুষকে সান্ত্বনা ও সহায়তার জন্যই দরকার ছিল, কারোর পক্ষেই তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। ধারণাটি সহজ সরল হওয়ায় মানুষের মনে সহজেই স্থানও করে নিয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে এই ধারণার দুর্বলতাও ছিল। ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে তা বারেবারে দেখা যায়। সহজ হিসাবে, যদি ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হন, তাহলে মানুষের সব কাজ, ইচ্ছা বা চিন্তা আদপে তারই কর্তৃত্বে। তাহলে, মানুষকে কি ভাবে তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী করা সম্ভব? ঈশ্বর মানুষের বিচার করে শাস্তি বা পুরষ্কার দিয়ে তাহলে তো নিজের কৃতকার্যেরই বিচার করছে। এর সাথে কিভাবে কল্যাণময় ও নীতিবাদী ঈশ্বরের ধারণাকে মেলানো যায়?

এক ব্যক্তি-ঈশ্বর সব প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে - এই ধারণাকে বৈজ্ঞানিকভাবে অসত্য প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই। কারণ এই ধারণাগুলো তখন এমন সব যুক্তির আশ্রয় নেবে যেসব বিষয় বিজ্ঞান তখনও আয়ত্তে আনতে পারে নি।

নৈতিকতার ভালর জন্যই ধর্মপ্রচারকদের উচিত এই ব্যক্তি-ঈশ্বরের ধারণা থেকে সরে আসা। এর অর্থ হল, যে শাস্তির ভয় আর পুরস্কারের লোভ এই ধর্মপ্রচারক সাধু-সন্তের এত ক্ষমতার উ□স, তা থেকে মানুষকে মুক্ত করতে হবে।"

- *Science, Philosophy and Religion*, A 1934 Symposium, published by the Conference on Science, Philosophy and Religion in Their Relation to the Democratic Way of Life, Inc., New York, 1941.

"ধর্মে যে সৌভ্রাতৃত্বের কথা বলা আছে, তা আদপে যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকদের কাঁধে কাঁধ মেলানোর বন্ধুত্ব, অর্কেস্ট্রায় সুরে সুর মেলানোর বন্ধুত্ব নয়।"

- Published in *Ideas and Opinions*, Crown Publishers, Inc., New York, 1954.

"আমি তো এমন ঈশ্বরের কথা ভাবতেই পারি না যে তার নিজের সৃষ্টিকে শাস্তি দেয়। যার উদ্দেশ্য বিধেয় আমাদের নিজেদের মত করে বানানো। সোজা কথায়, এরকম ঈশ্বর মানবচরিত্রের প্রতিফলন। আর মানুষ কি ভাবে মৃত্যুর পরেও বেঁচে ওঠে তাও কোনোভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয়, যদিও ভয় পেয়ে বা ধর্মের ইগোর বশবর্তী হয়ে দুর্বলচিত্ত মানুষ তাও বিশ্বাস করে ।"

- Albert Einstein, obituary in New York Times, 19 April 1955

"ব্যক্তি ঈশ্বরের ধারণা আমার কাছে একেবারেই ভিন দেশি, এবং ক্ষেত্রবিশেষে খুবই সরল।"

- Albert Einstein in a letter to Beatrice Frohlich, December 17, 1952; from *The Expanded Quotable Einstein*, p. 217.

"আমি একজন গভীরভাবে ধর্মনিষ্ঠ অবিশ্বাসী। এটিকে বলা যেতে পারে এক শ্রেণীর নতুন ধর্ম"।

- Albert Einstein in a letter to Hans Muehsam, March 30, 1954; from *The Expanded Quotable Einstein*, p. 217.

"ব্যক্তি ঈশ্বরের ধারনা আমার কাছে কল্পনার নরাত্বরোপ ছাড়া আর কিছু নয়, আর এটাকে আমি এত গরুত্ব সহকারে নিতে পারি না। আমি মানবীয় বৃত্তের বাইরে কোন উদ্দেশ্য এবং গন্তব্য কল্পণা করতে পারি না। আমার চিন্তাধারা অনেকটা স্পিনোজার দর্শনের কাছাকাছি- সৌন্দর্যের প্রতি যার ছিল প্রগাঢ় প্রশস্তিবোধ, আর শৃংখলার সরল যুক্তির উপর ছিল বিশ্বাস - একে আমরা আস্বাদন করতে পারি বিনম্র চিত্তে কিন্তু অসম্পূর্ণভাবে।"

- Albert Einstein, 1947, from Banesh Hoffmann, *Albert Einstein: Creator and Rebel*, New York: New American Library, 1972, p. 95.

"আমি বিশ্বাস করি না যে ঈশ্বর মহাবিশ্ব নিয়ে পাশা খেলেন।"

- Albert Einstein on Quantum Mechanics, published in *London Observer*, April 5, 1964

"কেন আপনি ভাবছেন যে 'ঈশ্বর ইংরেজদের শাস্তি দেবেন' -এই ধারণা আমি সমর্থন করব? আমার ঈশ্বর কিংবা ইংরেজ - এ দু'জনের কারও সাথেই কোন সম্পর্ক নেই। আমার শুধু খারাপ লাগে এ কথা ভেবে যে, ঈশ্বর তার অগনিত সন্তানদের ইচ্ছেমত শাস্তি দিতে পারেন তাদের নির্বুদ্ধিতার জন্য, অথচ যে সব নির্বুদ্ধিতার মূল কারণ আসলে ঈশ্বর নিজে - একটা অযুহাতেই তিনি তা থেকে মুক্তি পেতে পারেন, আর তা হল তার অনস্তিত্ব।

- Albert Einstein, letter to Edgar Meyer, a Swiss colleague, January 2, 1915, from *The Expanded Quotable Einstein*, p. 201.

"যতই মানব সভ্যতা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ততই আমি খুব নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছি যে, সত্যিকারের (মানবিক) ধর্মপরায়নতা কখনোই জীবন কিংবা মৃত্যুভয়ে ভীত থাকতে পারে না, অন্ধ বিশ্বাসে নিমজ্জিত থাকতে পারে না, বরং এটি যৌক্তিক জ্ঞানের পেছনে ধাবিত হবে।"

- *Science, Philosophy and Religion*, A 1934 Symposium, published by the Conference on Science, Philosophy and Religion in their Relation to the Democratic Way of Life, Inc., New York, 1941.

"আমি সে রকম ঈশ্বরের ধারনাকে মন থেকে মেনে নিতে পারি না যার ভিত্তি গড়ে উঠেছে মৃত্যু ভীতি থেকে কিংবা অন্ধবিশ্বাসের কাঁধে ভর করে"।

-Albert Einstein, from *Einstein: The life and Times*, p. 622.

"আমি স্পিনোজার ঈশ্বরে বিশ্বাসী যে ঈশ্বর মহাজাগতিক ছন্দে নিজেকে ধরা দেন, আর সেই ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস রাখতে পারি না যে মানুষের কৃতকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকেন।"

- Albert Einstein, following his wife's advice in responding to Rabbi Herbert Goldstein of the International Synagogue in New York, who had sent Einstein a cablegram bluntly demanding "Do you believe in God?"

"কিছু কিছু ক্যাথলিক সংস্থার আচার-আচরণ ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। সারা পৃথিবীতে যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত করতে চলেছে, সেই অবস্থায়ও তারা জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করে চলেছে।"

- Albert Einstein, letter, 1954

"আমি মানুষের অমরত্বে বিশ্বাসী নই। আমি মনে করি নৈতিকতা মানুষের জন্য ভাল কিন্তু এটা ব্যাখ্যা করার জন্য কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তির কল্পনা করার প্রয়োজন নেই।"

- Albert Einstein, letter to a Baptist Pastor, from *Albert Einstein: The Human Side,* edited by Helen Dukas and Banesh Hoffman, Princeton University Press

"বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তি হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মকানুনের সাহায্যে সবকিছুর ব্যাখ্যা দেয়া। কাজেই এটি কার্যকারণের সাথে যুক্ত। সে কারণে, একজন বৈজ্ঞানিক গবেষক বিশ্বাস করেন না যে প্রার্থনার মাধ্যমে কোন কিছু প্রভাবিত হয়, কিংবা কোন অলৌকিক সত্ত্বার ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কিছু ঘটে।"

- Albert Einstein in response to a child who had written him in 1936 and asked if scientists pray; from *Albert Einstein: The Human Side,* edited by Helen Dukas and Banesh Hoffman, Princeton University Press, p 32.

"মানুষের নৈতিকতার জন্য তো ধর্মের কোনো দরকারই নেই, দরকার মানবিকতা, সহমর্মিতা, শিক্ষা আর সামাজিকতার। মানুষ যদি পরকালের শাস্তির কথা ভেবে নৈতিক হয়, সেই নৈতিকতার মধ্যে মহত্ত্ব কোথায় থাকে?"

- Albert Einstein, *Religion and Science,* New York Times Magazine, 9 November 1930

আলবার্ট আইনস্টাইন (মার্চ ১৪, ১৮৭৯ - এপ্রিল ১৮, ১৯৫৫) জার্মানিতে জন্মগ্রহণকারী বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তিনি তার বিখ্যাত আপেক্ষিকতার তত্ত্ব এবং বিশেষত ভর-শক্তি সমতুল্যতার সূত্র আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত। তিনি ১৯২১ সালে আলোক-তড়িৎ ক্রিয়া সম্পর্কীত গবেষণার জন্য পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

দিগন্ত সরকার, পেশায় কম্পিউটার প্রকৌশলী, মূল আগ্রহ বিজ্ঞান-সংক্রান্ত লেখায়। অর্থনীতি, রাজনীতি বা অন্যান্য বিষয়েও লিখে থাকেন। মুক্তমনার নিবেদিতপ্রাণ সদস্য। বর্তমান নিবাস সিয়াটেল, আমেরিকা।
ইমেইল - diganta.sarkar@gmail.com

আইনস্টাইনের মহাজাগতিক ধর্ম ও অন্যান্য প্রসংগ

রিচার্ড ডকিন্স

অনুবাদ : অজয় রায়

একজন গভীরভাবে ধর্মনিষ্ঠ অবিশ্বাসী

"আমি ব্যক্তি ঈশ্বরের কল্পনা করতে চাইনা; আমরা আমাদের অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় যে মহাবিশ্বের গড়ন এখন পর্যন্ত সম্যক বুঝতে পেরেছি এতেই শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ে আমরা আপ্লুত।"

- আলবার্ট আইনস্টাইন। (১)

হৃদয় নিঃসৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি

একটি কিশোর সবুজ ঘাসের ওপর অধোমুখে শায়িত, ওর চিবুক দু'হাতের তালুর ওপর বিশ্রাম করছে। হঠাৎ করেই সে অভিভূত হয়ে পড়ল জটপাকানো কিশলয় আর শিকড়ের উচ্চকিত সচেতনতায়, কিম্বা ক্ষুদ্র জগতে বনের আবির্ভাবে, অথবা পিঁপড়া ও ঝিঁঝিঁ পোকার রূপান্তরিত এক জগতের আকস্মিক উপস্থিতিতে; এমন কি অভিভূত হয়ে উঠতে পারে, যদিও সে সময় অত বিশদ জানত না, কোটি কোটি ব্যাক্টেরিয়ার সমাহার ক্ষুদ্র জগতের স্বল্প পরিসরে নিশ্চূপ ও অদৃশ্যভাবে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠায়। অকস্মাৎ মনে হল, সবুজ ঘাসের চাদরের ক্ষুদ্র বনানীটি যেন ফুলে ফেঁপে উঠল এবং মহাবিশ্বের সাথে এক হয়ে মিশে গেল; আর বালকটি নিবিষ্ট মন নিয়ে এর গভীরে হল আত্মমগ্ন। এই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার সে ব্যাখ্যা দাঁড় করাল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে - একটি অলৌকিক ঘটনা রূপে। পরবর্তীকালে কিশোরটি পরিণত হল একজন পুরোপুরি পুরোহিতে। তিনি এঙ্গলিয়ান পুরোহিত হিসেবে দীক্ষিত হলেন, এবং হয়েছিলেন আমার বিদ্যালয়ের ধর্মগুরু ও আমার একজন প্রিয় শিক্ষক। তাঁকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম। তাঁর মত চমৎকার উদারপন্থী একজন পাদ্রী পেয়েছিলাম - এ আমার ভাগ্য; কাজেই আমাকে কেউ বলতে পারবে না যে সে সময় ধর্মের অমৃত আমাকে গলাধঃকরণ করানো হয়েছিল।

অন্য কোন মুহূর্তে এবং অন্য কোথাও, ঐ কিশোরটি হতে পারতাম আমি - নক্ষত্রখচিত কালো আকাশের নীচে - অভিভুত হচ্ছি কালপুরুষ, কাশ্যপেয় এবং সপ্তর্ষী প্রভৃতি তারাপুঞ্জের মোহনীয় দৃশ্যে, মোহিত হচ্ছি অশ্রসজল চোখে ছায়াপথের অশ্র"ত সঙ্গীতের মুর্চ্ছনায়, অথবা লাল জেসমিনের রাতের সুবাসে এবং আফ্রিকার উদ্যান থেকে ভেসে আসা উগ্র ঘ্রানযুক্ত ফুলের সৌরভে আমি বিমোহিত। প্রশ্ন হচ্ছে একই ধরনের অনুভূতি বা হৃদয়াবেগ আমার ধর্মগুরুকে ঠেলে নিয়ে গেল একদিকে, আর আমাকে ঠিক বিপরীতে, অন্যদিকে - কিন্তু কেন? উত্তরটি কিন্তু সহজ নয়। প্রকৃতি ও মহাবিশ্বের প্রতি আধা-মরমী সাড়াদান বিজ্ঞানী ও যুক্তিবাদীদের মধ্যে একটি সাধারণ ঘটনা। এর সাথে আধিভৌতিক বা অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের কোন সম্পর্ক নেই। আমার ধর্মগুরু, অন্তত শৈশবকালে, আমার মনে হয় ডারউনের 'দ্য অরিজিন অব স্পিসিজের' সমাপনী পঙক্তিগুলোর কথা জানতেন না (এবং আমিও না), সেই বিখ্যাত 'এনট্যাঙ্গল্ড ব্যাংক' অনুচ্ছেদটি, যার অভ্যন্তরে রয়েছে সেই অনুপম কথাগুচ্ছ :

> "যেখানে ঝোপঝাড়ের ওপর পাখীরা গাইছে, যেখানে বিচিত্র ধরনের পোকা-মাকড় ইতস্তত ঘুরছে-ফিরছে, আর যেখানে আর্দ্র মাটির নীচে কীট-কৃমিরা গুটিগুটি করে প্রবেশ করছে .. ।"

তিনি যদি এই কথাগুলো তখন জানতেন তাহলে তৎক্ষণাৎ এই কথাগুলোর সাথে একাত্ম হয়ে যেতেন, আর পরিণামে পাদ্রী না হয়ে, হয়ে উঠতে পারতেন একজন ডারউইনবাদী এবং বিশ্বাস করতেন, সবকিছুই 'উৎপন্ন হয়েছিল আমাদের চতুর্দিকে ক্রিয়াশীল নিয়মের ভেতর দিয়ে': (২)

পাঠগ্রহণ কালে আমাদের খেলা ছিল - তাঁকে ধর্মীয় পুস্তকের পৃষ্ঠা থেকে সরিয়ে এনে 'ফাইটার কমান্ডের' বা এ ধরনের কতিপয় রোমাঞ্চকর গল্পের দিকে টেনে আনা। তিনি রয়্যাল বিমান বাহিনীতে যুদ্ধকালীন কর্মে নিযুক্ত ছিলেন; এই হৃদ্যতা নিয়ে, এবং সঙ্গে ইংল্যান্ডের চার্চের প্রতি এখনও পোষণকরা কিছু ভালবাসা নিয়ে (অন্তত প্রতিযোগিতার সাথে তুলনা করে), আমি পরবর্তীকালে জন বেৎজেম্যানের কবিতা পড়েছিঃ আমাদের পাদ্রী একজন পুরানো বৈমানিক, তারা এখন নিষ্ঠুরভাবে তাঁর ডানাগুলো কর্তন করেছে, কিন্তু এখনও রেক্ট্রি উদ্যানের পতাকাবাহী দন্ডটি অনেক উচ্চতর বিষয়াভিমুখে দিক নির্দেশ করে .. .. .. ।

সুতরাং, প্রকৃতির যুদ্ধ থেকে, দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু থেকে আমাদের কল্পনায় অধিকাংশ সর্বোৎকৃষ্ট মূল্যবান বস্তুনিচয়, যেমন উচ্চতর জীব-জন্তুর উৎপত্তি, সরাসরি উপজাত হয়। জীবনের এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিতে মহত্ত আছে, যার সাথে জড়িয়ে আছে নানা প্রকৃতির ক্ষমতা, যা আদিতে কতিপয় রূপে বা এককে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করত; এবং যখন চিরন্তন অভিকর্ষের নিয়ম অনুযায়ী এই গ্রহটি চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকল, অতি সরল আরম্ভ থেকে অন্তহীন রূপে প্রাণের বিবর্তন ছিল চমৎকার ও বিস্ময়াপন্ন, এবং তা ক্রমাগত বিবর্তিত হচ্ছে।

'পেল ব্লু ডট' এ কার্ল সাগান লিখেছিলেন :

এটি কি রকম ব্যাপার হল যে, কোন ধর্মই বিজ্ঞানের প্রতি সামান্যতম দৃষ্টিপাত করে বলেনি, "এটি আমরা যা ভেবেছিলাম তার চাইতে ভাল। আমাদের পয়গম্বররা যা বলেছিলেন তার চাইতে মহাবিশ্ব কি অনেক বৃহৎ, মহত্তর, সূক্ষ্মতর, অধিকতর সুচারু?" পরিবর্তে তাঁরা বলেন, "না, না, না। আমার দেবতা এক ক্ষুদ্র দেবতা, এবং আমি চাইব তাকে সে ভাবেই রাখতে।"(৩) মহাবিশ্বের বিশালতার ওপর, যা ইতোমধ্যেই আধুনিক বিজ্ঞান দেখিয়ে দিয়েছে, যে ধর্ম, তা পুরাতনই হোক আর নতুনই হোক, অধিকতর গুরুত্ব দেবে সেই ধর্ম অবশিষ্ট শ্রদ্ধাকে আর্কর্ষণ করতে পারবে; এবং মনে হয় না যে প্রথাগত বিশ্বাস থেকে উৎক্ষরিত ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধাকে ধর্ম আর ধরে রাখতে পারবে।

কার্ল সাগানের বইগুলো তুরীয় বিস্ময়ের স্নায়ু-প্রান্তকে স্পর্শ করে - যে অপার বিস্ময়কে গত শতাব্দীগুলোতে ধর্ম এতদিন নিজের কুক্ষিগত করে রেখেছিল। আমার লেখা বইগুলোও সে একই আকাক্সক্ষাতেই লেখা। ফলে আমি অভিযোগ শুনতে পাই যে, আমি না কি গভীরভাবে ধর্মনিষ্ঠ। জনৈক আমেরিকান ছাত্র আমাকে লিখেছিল যে সে তার অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করেছিল যে আমার সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা আছে কি না। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন 'অবশ্যই'। 'তাঁর ইতিবাচক বিজ্ঞান ধর্মের সাথে সঙ্গতিহীন, কিন্তু তিনি প্রকৃতি ও মহাবিশ্বের চারপাশে মোমের পালিশ লাগিয়ে হর্ষোৎফুল্ল পরিবেশ সৃষ্টি করেন। আমার কাছে এটাই তো ধর্ম।'

কিন্তু ধর্ম কি সঠিক শব্দ ? নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থবিদ (এবং নাস্তিক) স্টিভেন ভাইনবার্গ তাঁর 'ড্রিম অব ফাইনাল থিওরি' গ্রন্থে অনেকের মতই এ বক্তব্য রেখেছিলেন ঃ

> অনেকে ঈশ্বর সম্পর্কে বেশ উদার, প্রশস্ত এবং নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন - ফলে এটি অসম্ভব নয় যে তারা যেখানে ঈশ্বরকে খুঁজবে সেখানেই তাঁর দেখা মিলবে। আমরা এমন কথাও বলতে শুনি - 'ঈশ্বরই হলেন চরম বা শেষ পরিণতি', কিম্বা 'ঈশ্বর হলেন প্রকৃতির সুন্দরতম প্রকাশ', অথবা 'ঈশ্বরই হলেন মহাবিশ্ব'। অবশ্যই, যে কোন শব্দের মত ঈশ্বর শব্দের ওপরও আমরা পছন্দ মত অর্থ আরোপ করতে পারি। আপনি যদি বলতে চান -'ঈশ্বরই শক্তি' অবশ্যই তা বলতে পারেন, এবং তাহলে আপনি একখন্ড কয়লাতেও তাঁর সন্ধান পাবেন।

ভাইনবার্গ অবশ্য সঠিক বলেছেন যে ঈশ্বর শব্দটি, যদি না এর অর্থ মানুষের কাছে অকেজো হয়ে পড়ে, জনগণ সাধারণত যে ভাবে বোঝে সেই অর্থেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত ঃ অর্থাৎ একজন আলৌকিক সৃষ্টিকর্তাকে চিহ্নিত করতে এবং যিনি আবার "আমাদের যথাযথ উপাস্য"।

অতিপ্রাকৃত ধর্ম থেকে আইনস্টানীয় ধর্মকে পৃথক করতে না পারার ব্যর্থতার কারণে অনেক দুর্ভাগ্যজনক সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। অনেক সময়, নানা প্রসঙ্গে আইনস্টাইন ঈশ্বর শব্দটি ব্যবহার করেছেন (এবং বলাবাহুল্য, তিনিই একমাত্র নাস্তিক বিজ্ঞানী নন, যিনি এ কাজ করেছেন), যার ফলে অনেক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। আর এটি করতে প্রয়াস পেয়েছেন অতিপ্রকৃতিবিদরা; এঁরা অতি উৎসাহে মহান চিন্তাবিদকে তাদের নিজেদের বলে দাবী করে এই ভ্রান্তি বিলাসে ইন্ধন জুগিয়েছেন। স্টিফেন হকিংয়ের 'কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'(৪) বইটির - "তাহলে ঈশ্বরের মনে কী আছে তা আমাদের জানা উচিত" - এই নাটকীয় (না কি দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত?) সমাপ্তি বাক্যটির গঠনশৈলী কুখ্যাতভাবে ত্রুটিপূর্ণ। এর ফলে ভুলক্রমে হলেও মানুষ বিশ্বাস করে যে, হকিং হলেন একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। 'দ্য সেক্রেড ডেপথ্ অব নেচার' এ কোষ জীববিজ্ঞানী উরসুলা গুডএনাফ যে সব উক্তি করেছেন তাতে তাঁকে মনে হতে পারে হকিং বা আইনস্টাইনের তুলনায় অধিকতর ধর্মনিষ্ঠ। তার লেখা থেকে গির্জা, মন্দির, মসজিদ ভালবাসেন এবং তাঁর পুস্তকের অসংখ্য অনুচ্ছেদ অপ্রাসঙ্গিকভাবে তুলে এনে অতিপ্রাকৃত ধর্মের পক্ষে গোলা বারুদ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এমন কি তিনি নিজে 'ধর্মপ্রাণ প্রকৃতিবাদী' (Religious Naturalist) হিসেবে আখ্যায়িত হতে ভালবাসেন। কিন্তু তবুও যত্নের সাথে তাঁর বইটি পড়লে সন্দেহাতীতভাবে প্রতীয়মান হবে যে, আমি যতটা কঠোর নাস্তিক, তিনিও, প্রকৃতপক্ষে ততটাই।

প্রকৃতিবাদী একটি অনিশ্চিতার্থক বা দ্ব্যর্থক শব্দ। আমার কাছে এটি আমার শৈশবের নায়ক হিউ লোফটিংয়ের ডক্টর দোলিটলকে ঐকান্তিকভাবে আবাহন করার মত (যিনি প্রসঙ্গক্রমে হলেন এমন ব্যক্তি যার রয়েছে তার চারপাশে এইচ এম এস বিগলের 'দার্শনিক' প্রকৃতিবাদীর স্পর্শ । অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকৃতিবাদী বলতে যা বোঝান হত আজও শব্দটি সে অর্থেই আমাদের কাছে বোধগম্য ঃ 'প্রাকৃতিক জগতের একজন শিক্ষার্থী'। গিলবার্ট হোয়াইট থেকে শুরু করে প্রকৃতিবাদীরা এই অর্থে অধিকাংশই ছিলেন পাদ্রী। আর ডারউইন নিজেও চেয়েছিলেন চার্চে যোগ দিতে - এই আশায় যে চার্চে তাঁর নিরুপদ্রব গ্রামীণ জীবনে ঝিঁঝিঁ পোকার প্রতি তাঁর প্রবল আসক্তি নিয়ে কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু দার্শনিকেরা 'প্রকৃতিবাদী'কে অনেক বেশী ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে

থাকেন - ঠিক 'অতিপ্রকৃতিবাদী'র বিপরীত অর্থে। জুলিয়ান বাজ্জিনি নাস্তিকতার(৫) প্রসঙ্গটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে ঃ

'অধিকাংশ নাস্তিকরা বিশ্বাস করেন যে যদিও মহাবিশ্ব একই প্রকার পদার্থে পরিপূর্ণ এবং তা হল ভৌত, তাহলেও এই ভৌত বস্তু থেকেই আসে মন, সৌন্দর্য, আবেগ, নৈতিক মূল্যবোধ .. .. এক কথায় জীবন প্রপঞ্চের সকল স্বরগ্রাম - যা মনুষ্য জীবনকে সমৃদ্ধ করে।'

মস্তিস্কের অভ্যন্তরে সংঘটিত ভৌত সত্তাদির অতি জটিল মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয় মানুষের চিন্তা ও আবেগ। একজন নাস্তিক ব্যক্তি এই অর্থে দার্শনিক প্রকৃতিবাদী যিনি মনে করেন প্রকৃতি ও পার্থিব জগতের বাইরে কিছু নেই, দৃশ্যমান মহাবিশ্বের অন্তরালে ওৎ পেতে থাকা অতিপ্রাকৃত সৃষ্টিশীল কোন বুদ্ধিমত্তার অস্তিত্ব নেই, দেহাতীত আত্মা নেই এবং নেই কোন অলৌকিকতা - ব্যত্যয় কেবল যে এমন কিছু প্রাকৃতিক প্রতিভাস রয়েছে যা আমরা এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারি নি। যদি এমন কোন অবোধ্য ঘটনা থাকে যা আমাদের কাছে এখনও ব্যখ্যাতীত, আমরা মনে করি অদূর ভবিষ্যতে এর রহস্য উন্মোচিত হবে, এবং তা প্রাকৃতিক ব্যখ্যার পরিম-ল থেকেই। আমরা যখন রংধনুর রহস্য ভেদ করি, এর অপার সৌন্দর্য - চমৎকারিত্ব কিন্তু বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় না।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হলেও, আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা কিন্তু মোটেও ধর্মবাদী নন যদি আপনি তাদের বিশ্বাসগুলোকে অভিনিবেশ সহকারে বিশ্লেষণ করে দেখেন। একথা নিঃসন্দেহে আইনস্টাইন ও হকিংয়ের ক্ষেত্রে সত্যি। বর্তমান 'এস্ট্রনমার রয়্যাল' ও 'রয়্যাল সোসাইটির' সভাপতি মার্টিন রিস বলেছিলেন যে তিনি চার্চে যান একজন 'অবিশ্বাসী এঙ্গলিকান' হিসেবে .. .. ট্রাইবটির প্রতি অনুগত্যতা বশত। তাঁর কোন ধর্মীয় বিশ্বাস নেই, তবে কবিত্বময় নৈসর্গবাদে অংশ নেন যা মহাবিশ্ব অন্য বিজ্ঞানীদের মধ্যেও জাগিয়ে তোলে, যাদের কথা আমি আগে উল্লেখ করেছি। সম্প্রতি টেলিভিশনে প্রচারিত কথপোকথনে প্রসঙ্গক্রমে ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ও ব্রিটিশ ইহুদিবাদের একজন নমস্য স্তম্ভ, আমার বন্ধু রবার্ট উইনস্টোনকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলাম এটি স্বীকার করাতে যে তাঁর ইহুদিবাদিতা হল এই প্রকৃতির এবং তিনি সত্যিই এমন কিছুতে বিশ্বাস করেন না যা অতিপ্রাকৃত। তিনি এটি প্রায় স্বীকার করে নিলেও, শেষ পর্যন্ত বেড়ার আড়ালে আশ্রয় নিলেন (সত্যের খাতিরে বলতে হয় যে তিনিই আমার সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন, এর উল্টোটা নয়)। আমি চেপে ধরলে তিনি বলেছিলেন যে ইহুদি ধর্ম তাঁকে শৃঙ্খলার মাধ্যমে জীবন গঠনে সাহায্য করেছিল এবং সুন্দর জীবন যাপন করাতে শিখেয়েছিল। হয়তো তা ঠিক; কিন্তু তা, অবশ্যই, অতিপ্রাকৃত কোন দাবীর মূল্যের ওপর সামান্যতম প্রভাবও রাখে না। অনেক নাস্তিক বুদ্ধিজীবী রয়েছেন যাঁরা গর্বের সাথে নিজেদের ইহুদি বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন এবং ইহুদি রীতি নীতি পালন করেন - সম্ভবত প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশত অথবা নিহত আত্মীয় স্বজনদের প্রতি আনুগত্যের কারণে; এ ছাড়াও কারণ হল হতবুদ্ধি ও সংশয়ী ইচ্ছায় নিজেকে সর্বেশ্বরবাদী ভক্তিমতের সাথে চিহ্নিত করা, যা আমরা অনেকেই এর মহান প্রবর্তকের সাথে অংশ নিতে চাই, তিনি আলবার্ট আইনস্টাইন। তারা হয়তো বিশ্বাস করে না, তবে ড্যানিয়েল ডেনেটের শব্দগুচ্ছ ধার করে বলা যায়, তারা 'বিশ্বাসের ওপর বিশ্বাস রাখে' (believe in belief)।

আইনস্টাইনের একটি বহুল উদ্ধৃত মন্তব্য হল 'ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান খঞ্জ, বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ।'(৬) কিন্তু আইনস্টাইন এও তো বলেছিলেন,

> আমার ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে আপনারা যা পড়েন তা অবশ্যই মিথ্যা, এটি এমন এক মিথ্যা যা ক্রমান্বয়ে পদ্ধতিগতভাবে পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। আমি কোন ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না এবং কখনও অস্বীকার করি নি বরং পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করেছি। আমার মধ্যে যদি এমন কোন কিছুকে ধর্মীয় বলে সনাক্ত করা যায় তা হল বিশ্বের গড়নের জন্য আমার অনাবিল প্রশংসা, যে বিশ্ব-গড়নকে আমাদের বিজ্ঞান এ পর্যন্ত উন্মোচিত করেছে। (২)

উক্ত বক্তব্য থেকে কি মনে হতে পারে যে, আইনস্টাইন স্ববিরোধিতা করেছিলেন ? তাঁর কথাগুলো কি উভয় পক্ষের সমর্থনে তুলে এনে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করা যায়? না। 'ধর্ম বা রিলিজিয়ন' শব্দটিকে আইনস্টাইন একেবারেই ভিন্ন বিছু কিছু অর্থে ব্যবহার করেছেন যা প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত 'ধর্ম' শব্দ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতিপ্রাকৃত বা আলৌকিক ধর্ম ও আইনস্টাইনীয় ধর্মের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে আমি যখন অগ্রসর হচ্ছি, মনে রাখবেন যে আমি কেবল অতিপ্রাকৃত দেবতার বিভ্রান্তি বা প্রবঞ্চনা নিয়ে কথা বলছি।

আইনস্টাইন থেকে আরও কতিপয় উদ্ধৃতি চয়ন করা যাক, যা থেকে তাঁর ধর্ম-প্রকৃতির কিছুটা সৌরভ পাওয়া যাবে:

আমি গভীরভাবেই ধর্মীয় অবিশ্বাসী (religious non believer)। এটিকে বলা যেতে পারে এক শ্রেণীর নতুন ধর্ম। আমি কখনও প্রকৃতির ওপর কোন উদ্দেশ্য আরোপ বা এর সাথে কোন লক্ষ্য যুক্ত করিনি। অথবা এমন কিছু আরোপ করতে চাই না যার ব্যাখ্যা হতে পারে 'নৃ-রূপকাশ্রিত' (anthropomorphic)। প্রকৃতির মধ্যে আমি যা দেখি তা হল এর চমকপ্রদ গড়ন - যার রহস্য আমরা খুব সামান্যই উন্মোচন করতে পেরেছি, এবং প্রকৃতির এই বিশাল বিস্ময় যে কোন চিন্তাক্ষম মানুষকে বিনয় ও নম্রতায় ভরিয়ে দেয়। এ হল এক সত্যিকার ধর্মীয় অনুভূতি যার সাথে অবশ্য মরমীবাদের (mysticism) কোন সম্পর্ক নেই।

ব্যক্তি ঈশ্বরের ধারণা আমার কাছে একেবারেই ভিনদেশী (alien) এবং এমন কি মনে হয় বেশ সরলও। আইনস্টাইনের মৃত্যুর পরে অধিক সংখ্যক ধর্মবাদীরা বোধ্য কারণেই তাঁকে নিজেদের বলে দাবী করতে থাকে। সমকালীন ধার্মিক সহকর্মীদের অনেকে অবশ্য তাঁকে দেখেছিলেন নিজেদের থেকে অনেক আলাদা করে, ভিন্ন দৃষ্টিতে। ১৯৪০ সালে আইনস্টাইন তাঁর সেই যে বিখ্যাত উক্তি - 'আমি **ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না**',(৭) এর সমর্থনে একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধ এবং এ ধরনের অনেক বক্তব্যে ধর্মীয় গোড়াদের কাছ থেকে আসা চিঠির ঝড় উঠেছিল সে সময়। এর মধ্যে অনেকগুলো তাঁর ইহুদি-উৎসকে পরোক্ষ কটাক্ষ করেও লেখা হয়েছিল। আইনস্টাইনের বক্তব্যের যে নির্যাস পরবর্তী অংশে তুলে ধরা হয়েছে তা ম্যাক্স জাম্মেরের লেখা 'আইনস্টাইন এন্ড রিলিজিয়ন' পুস্তকটি থেকে। (আমার ব্যবহৃত আইনস্টাইনের ধর্ম বিষয়ক উদ্ধৃতিগুলোর মূল উৎসও এই গ্রন্থটি)।

কানসাস শহরের রোম্যান ক্যাথোলিক বিশপ বলেছিলেন,

> 'এটা খুবই দুঃখজনক যে, যে ব্যাক্তি পুরাতন বাইবেল (Old Testament) বর্ণিত জাতি থেকে উদ্ভূত এবং ঐ ধর্মগ্রন্থ থেকে শিক্ষালাভ করেছেন, তিনি কিনা আজ সেই জাতির মহান ঐতিহ্যকে অস্বীকার করছেন।'

অন্য ক্যাথোলিক পাদ্রীরাও একই সুরে সুর মিলিয়ে বলছেন ঃ

"ব্যক্তি ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কোন ধরনের ঈশ্বর নেই। .. .. আইনস্টাইন জানেন না তিনি কী বলছেন। তিনি যা বলছেন সব ভ্রান্ত । কিছু ব্যক্তি, যেহেতু তাঁরা কোন বিশেষ ক্ষেত্রে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করেছেন, সে কারণে মনে করেন যে সব ব্যাপারেই মতামত ব্যক্ত করতে তাঁরা পারদর্শী।"

ধর্ম এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে যে কারও পক্ষে বিশেষজ্ঞ সাজার দাবী বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়া যায় না। যেমন, কোন এক পরী-বিশেষজ্ঞ এসে হুট করে পরীদের ডানার যথার্থ আকৃতি ও রং নিয়ে জ্ঞানদান করতে থাকলে ঐ পাদ্রী মহোদয়, নিশ্চয় বিনা বাক্যব্যয়ে তার কথা মেনে নেবেন না। তিনি ও বিশপ উভয়ই মনে করেন যে, যেহেতু আইনস্টাইনের ধর্মতত্ত্বের ওপর কোন প্রশিক্ষণ নেই, তাই তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ অনুধাবন করতে পারেন নি। কিন্তু এ কথা সত্য নয়, আইনস্টাইন ভালমতই জানতেন তিনি কী অস্বীকার করেছেন।

জনৈক যুক্তরাষ্ট্রীয় রোমান ক্যাথোলিক আইনজীবী, যিনি সমগ্র খ্রিশ্চিয়ান চার্চ সম্মেলনের পক্ষে কাজ করতেন, এক সময় আইনস্টাইনকে লিখেছিলেন ঃ

'আপনি এমন বন্তব্য রেখেছেন যাতে আমরা গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি, ... কারণ এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ঈশ্বরের ধারণাকে আপনি পরিহাস করেছেন। গত দশ বছরে কোন কিছু এমনভাবে হিসেব করে দেখা হয় নি যাতে জনগণ মনে করতে পারে যে জার্মানী থেকে ইহুদি বিতাড়নের পেছনে হিটলারের সামান্যতম যুক্তি থাকতে পারে, যা আপনার বক্তব্য করেছে। আপনার বাক স্বাধীনতা অবশ্যই আছে স্বীকার করে নিয়েও, আমি বলব আপনার (ঈশ্বর সম্বন্ধে) বক্তব্য যুক্তরাষ্ট্রে অশান্তির বৃহত্তম উৎস হিসেবে দেখা দিয়েছে।'

জনৈক নিয়র্কবাসী ইহুদি যাজক উক্তি করেছেন, "আইনস্টাইন অবশ্য প্রশ্নাতীতভাবে বড় মাপের বিজ্ঞানী, **কিন্তু** ধর্ম সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ইহুদি-ধর্ম থেকে একশত আশি ডিগ্রি' বিপরীতে অবস্থিত।" 'কিন্তু'? 'কিন্তু'? 'এবং' বলা হল না কেন?

নিউ জার্সিতে একটি ইতিহাস সোসাইটির সভাপতি চিঠি লিখেছিলেন যেখানে এত জঘন্যভাবে ধর্মীয় মনোভঙ্গির দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে যে এটি দু'বার পঠনযোগ্য ঃ

"আমরা আপনার বিদ্যামত্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ড. আইনস্টাইন। কিন্তু একটি জিনিষ রয়েছে যা আপনি শেখেন নি- ঈশ্বর হল একটি চৈতন্যময় সত্তা বা একটি চেতনা যাঁকে দূরবীক্ষণ বা অণুবীক্ষণ দিয়ে ধরা যায় না, ঠিক যেমন মগজকে বিশ্লেষণ করে মানুষের ধ্যান-ধারণাকে বা আবেগকে দেখা যায় না।(৮) "যেমনটি সবাই জানে ধর্মের ভিত্তি হল বিশ্বাস, জ্ঞান নয়। প্রতিটি চিন্তাক্ষম ব্যক্তি মাত্রই, সম্ভবত কোন না কোন সময় ধর্ম নিয়ে সন্দেহ-ভীতিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে। আমার নিজের বিশ্বাসও অনেকবার চির খেয়েছে। কিন্তু আমার অধ্যাত্মিক অপেরনের কথা কারও কাছে কখনও প্রকাশ করি নি দুটি কারণে ঃ (১) আমার ভয় হত যে এটি প্রকাশ করলে এমন কি সামান্য ইঙ্গিতও, আমার কোন কোন সহযোগীর জীবন ও আশার বিচলন ঘটাতে ও ক্ষতি সাধন করতে পারে; (২) কারণ আমি একজন লেখকের সাথে একমত, যিনি বলতেন, "যে কোন ব্যক্তির মধ্যে সঙ্কীর্ণ লক্ষণ থাকতে পারে যা কোন ব্যক্তির বিশ্বাসকে ধ্বংস করে দিতে পারে। " .. .. আমি আশা করি, ড. আইনস্টাইন, আপনার বক্তব্যকে ভুলভাবে উত্থাপন করা হয়েছে, এবং আপনি অচিরেই অধিকতর মধুর কথা আমেরিকান জনগণের বিশাল অংশকে শোনাবেন যারা আনন্দের সাথে আপনার মত প্রতিভাকে সম্মান জানাতে চায়।"

কি মারাত্মক ক্ষতিকর হৃদয় উন্মোচিত পত্র ! প্রতিটি বাক্যের সাথে যেন বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক ভিরুতা ঝরে ঝরে পড়ছে।

কম হেয় প্রতিপন্নকারী, কিন্তু অধিকতর মর্মন্তুদ হল ওকলাহোমায় অবস্থিত 'ক্যাভালরি তাবের্নাকল এসোসিয়েশনের' প্রতিষ্ঠাতার লেখা চিঠিটিঃ

> "প্রফেসর আইনস্টাইন, আমার বিশ্বাস আমেরিকার প্রতিটি খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী আপনাকে জবাব দেবে, -আমরা আমাদের ঈশ্বর এবং তাঁর পুত্র যিশু খ্রিস্টের ওপর থেকে আমাদের বিশ্বাস সরিয়ে নেব না, কিন্তু আপনি যদি এই জাতির জনগণের ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করেন তাহলে আমরা আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি আপনি যেখান থেকে এসেছেন সেখানে ফিরে যেতে। আমি ইস্রাইলের কল্যাণে আমার ক্ষমতায় যথাসাধ্য করেছি, এবং তখন আপনি এদেশে চলে এলেন, এবং সাথে আপনার ঈশ্বর নিন্দুক জিহ্বা নিসৃত একটি বাক্য; ইস্রাইলকে ভালবাসে এমন সব খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আমাদের দেশ থেকে ইহুদি বিদ্বেষ দমন করতে যা পারে সে তুলনায় ঐ ধর্মবিদ্বেষী বাক্যটি আপনার জনগণের স্বার্থের অনেক বেশী ক্ষতি করেছে। প্রফেসর আইনস্টাইন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী আপনাকে এখনই প্রত্যুত্তর দেবে, 'আপনার পাগলাটে ও ভ্রান্ত বিবর্তনবাদকে সাথে নিয়ে জার্মানীতে ফিরে যান, যেখান থেকে এসেছেন; অন্য বিকল্পটি হল যে জনগণ এদেশে আপনাকে অভিনন্দন জানিয়ে গ্রহণ করেছে ঠিক সেই সময় যখন আপনার নিজদেশ আপনাকে পালাতে বাধ্য করেছে সেই জনগণের বিশ্বাসকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন।"

তাঁর আস্তিক সমালোচকরা একটি বিষয়ে সঠিক যে আইনস্টাইন তাদের একজন নন। তাঁকে যে বলা হত 'তিনি একজন আস্তিক' তা তিনি বাববার দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করে এসেছেন। তবে কি তিনি ভলতেয়ার বা দাইদেরতের মত প্রত্যাদেশবিরোধী ঈশ্বরবাদী? অথবা স্পিনোজার মত সর্বেশ্বরবাদী - যাঁর দার্শনিক মতবাদের তিনি প্রশংসা করেছেন :

> আমি স্পিনোজার ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, বিরাজমান শৃঙ্খলাময় ঐকতানে যিনি নিজেকে মেলে ধরেছেন, এমন কোন ঈশ্বরে নয় যিনি নিজেকে মানুষের ভাগ্য কর্ম ও ভালমন্দের সাথে সম্পৃক্ত রাখেন।(৯)

ব্যবহৃত কয়েকটি পরিভাষার অর্থ নিয়ে দু'একটি কথা বলা যাক। একজন আস্তিক বা ঈশ্বরবাদী অতিপ্রাকৃত বুদ্ধিমত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, যিনি প্রথমেই মহাবিশ্ব সৃষ্টির আসল কাজটি সম্পন্ন করা ছাড়াও, এখনও আশে পাশেই আছেন তাঁর সৃষ্টির তদারকির জন্য এবং তাঁর আদি সৃষ্টির ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য। অনেক অস্তিক্যবাদী বিশ্বাস-পদ্ধতিতে দেবদেবীরা মনুষ্য বিষয়ে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকেন।(১০) তিনি (ঈশ্বর) ভক্তের প্রার্থনায় সাড়া দেন, পাপ ক্ষমা করেন বা এর জন্য শাস্তি দেন, আলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে জগতে হস্তক্ষেপ করতে ভালবাসেন, মন্দকাজ ও ভালকাজ নিয়ে মাথা ঘামান এবং তিনি জানেন কখন তা আমরা করব (এমন কি করার চিন্তা করলেও)। একজন প্রত্যাদেশ বিরোধী আস্তিক'ও (deist) অতিপ্রাকৃত বুদ্ধিমত্তায় বিশ্বাসী, কিন্তু তিনি এমন একটি সত্তা যিনি কেবল যে নিয়মাদি প্রথমদিকে সৃষ্ট মহাবিশ্ব পরিচালনা করে সেই সব তৈরীতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, অন্য কোন বিষয়ে নয়। প্রত্যাদেশ বিরোধী আস্তিকের ঈশ্বর এর পর থেকে আর কখনও হস্তক্ষেপ করেন নি, এবং মনুষ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে অবশ্যই তাঁর কোন আকর্ষণ নেই। সর্বেশ্ববাদীরা (pantheist) অতিপ্রাকৃত ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তবে তারা ঈশ্বর শব্দটি ব্যবহার করে প্রকৃতির নাতিপ্রাকৃত সমার্থক শব্দ রূপে; অথবা মহাবিশ্বকে বোঝাতে, কিংবা পরিপূর্ণ নিয়মাদি বোঝাতে, যে নিয়মাদির মাধ্যমে প্রকৃতির ক্রিয়াদি সম্পাদিত হয়। প্রত্যাদেশ বিরোধীরা কট্টর ঈশ্বরবাদীদের থেকে স্বতন্ত্র এই অর্থে যে তাদের ঈশ্বর প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন না, পাপ বা স্বীকারোক্তিতে কোন ঔৎসুক্য নেই, আমাদের মনের কথা পড়তে পারেন না, চমকপ্রদ আলৌকিকত্ব দেখিয়ে জাগতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। প্রত্যাদেশ বিরোধী ঈশ্বরবাদীরা সর্বেশ্বরবাদীদের থেকে এই হিসেবে স্বতন্ত্র যে তাদের ঈশ্বর এক একক, মহাবৈশ্বিক বুদ্ধিমত্তা - অন্যদিকে সর্বেশ্বরবাদীদের ঈশ্বর হলেন আলঙ্কারিক বা রূপক (metaphoric) - যেন মহাবিশ্বের নিয়মাবলীর জন্য চয়নকৃত কবিত্বময় প্রতিশব্দ। **সর্বেশ্বরবাদ হল প্রমত্ত নাস্তিকতার এক কাব্যময় প্রকাশ, আর প্রত্যাদেশ বিরোধী ঈশ্বরবাদ হল জল দিয়ে লঘুকৃত আস্তিকতা।**

এ কথা মনে করার যথেষ্ট যুক্তি আছে যে আইনস্টাইনবাদ বা আইনস্টাইনের নামে কথিত ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মতবাদ কোন ক্রমেই প্রত্যাদেশ বর্জিত আস্তিকতা নয়, এবং অবশ্যই বিশুদ্ধ আস্তিকতার প্রকাশও নয়। যে বাক্যাবলী বা উদ্ধৃতিসমূহ তাঁর ধর্ম-দৃষ্টিভঙ্গির নির্দেশক বলে ধরা হয় সেগুলো বিবেচনা করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ধরনের প্রায়শ উদ্ধৃত বাক্যাবলীর মধ্যে রয়েছে, যেমন ঃ 'ঈশ্বর সূক্ষ্মানুভূতিময় কিন্তু প্রতিশোধপরায়ণ নন', 'তিনি পাশা খেলেন না', 'মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে ঈশ্বরের কি কোন বিকল্প পছন্দ ছিল', . । (৩)

'ঈশ্বর পাশা খেলেন না' - এ বাক্যটির অনুবাদ হওয়া উচিত 'সকল বস্তুর অন্তরে ইতস্ততা (randomness) বিরাজ করে না'। 'মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে ঈশ্বরের কি কোন পছন্দ ছিল' - এ কথার অর্থ 'মহাবিশ্ব কি অন্য কোন প্রক্রিয়ায় বা পদ্ধতিতে শুরু হতে পারত?' আইনস্টাইন 'ঈশ্বর' শব্দটিকে বিশুদ্ধ রূপক ও কাব্যিক অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। স্টিফেন হকিংও, এবং অধিকাংশ পদার্থবিদই আইনস্টানীয় অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন, বিশেষ করে যে সব পদার্থবিদ ধর্মীয় অলঙ্কারিক ভাষার আশ্রয় নিতে ভালবাসেন। পল ডেভিসের রচিত 'ঈশ্বরের মন' (The Mind of God), আমার মনে হয়, আইনস্টানীয় সর্বেশ্বরবাদ ও এক ধরনের অস্পষ্ট প্রত্যাদেশ বর্জিত ঈশ্বরবাদের মধ্যবর্তী স্থানে ইতস্তত বিচরণ করে। এ কাজের জন্য অবশ্য পল ডেভিসকে টেম্পল্টন পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিল।(১১)

স্বয়ং আইনস্টাইন থেকে আর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমি আইনস্টানীয় ধর্ম নিয়ে আলোচনার উপসংহার টানতে চাই :

> "কোন কিছুর পশ্চাতে, যা অভিজ্ঞতা-উপলব্ধনীয়, তা অনুধাবন করতে হলে 'এমন কিছুর' অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় যা আমাদের অন্তর সম্যকভাবে বুঝে উঠতে পারে না এবং এর সৌন্দর্য ও গরিমা আমাদের কাছে উপনীত হয় অপ্রত্যক্ষভাবে এবং অতি দুর্বল প্রতিফলনের আকারে। এটি ধর্মপরায়ণতা। এই অর্থে আমি ধর্মপরায়ণ।"

এই অর্থে আমিও ধর্মপরায়ণ- শুধু সেই ব্যাক্যাংশটি সম্পর্কে যেখানে বলা হয়েছে , " আমাদের অন্তর সম্যকভাবে বুঝে উঠতে পারে না" সেটি সম্পর্কে আমি ভিন্ন মত পোষণ করি। এই বাক্যটির অর্থ কখনও হতে পারে না যে এই মুহূর্তে অবোধ্য কোন সত্তা "চিরকালের জন্যই অবোধ্য" হয়ে থাকবে। কিন্তু আমি কখনও 'ধার্মিক বা ধর্মপরায়ণ' এই অভিধায় চিহ্নিত হতে পছন্দ করি না, কারণ এটি লোকের কাছে ভুল অর্থবহন করবে। এটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর ও ভ্রান্ত অর্থবাহী কারণ জনগণের বৃহত্তর অংশের কাছেই 'ধর্মের' অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে 'অতিপ্রাকৃত' (supenatural)। কার্ল সাগান সুন্দরভাবে এটি উত্থাপন করেছেন,

> ".. .. যদি 'ঈশ্বর' শব্দ দিয়ে মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণকারী একগুচ্ছ পার্থিব নিয়ম'কে কেউ বুঝতে চান, তাহলে নিশ্চয় সে ধরনের ঈশ্বর রয়েছে। এ ধরনের ঈশ্বর ভাবাবেগের দিক থেকে কিন্তু একেবারেই অসন্তোষজনক .. .. অভিকর্ষ নিয়মের কাছে মাথা ঠেকিয়ে নামাজ, পুজো বা প্রার্থনা করার কোন অর্থ হয় না।"

কৌতুক উদ্রেক করলেও, সাগানের শেষ বক্তব্যটি কিন্তু আমেরিকার ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক রেভারেন্ড ডক্টর ফুলটন জে শীনের বক্তব্যে অনেকটাই কালিমালিপ্ত হয়ে গেছে। এই বক্তব্য ছিল আইসস্টানের ১৯৪০ খ্যাত 'ব্যক্তি ঈশ্বর বিরোধী' ধারণার ওপর ভয়ানক আক্রমণ চালনার অংশ বিশেষ। শীন বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে প্রস্তাব রেখেছেন এমন কেউ কি আছেন যিনি 'ছায়াপথের' জন্য প্রাণ বিসর্জনে প্রস্তুত? তিনি মনে ভেবেছিলেন যে তিনি আইনস্টাইনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে জোরালো নম্বর অর্জন করেছেন, নিজের মতের পক্ষে যতটা নয়। কারণ তিনি এর সাথে আরও সংযোজন করেছেন :

> "তাঁর (আইনস্টাইনের) মহাজাগতিক ধর্মের (cosmical religion) একটি মাত্র ত্রুটি রয়েছে : তিনি শব্দটিতে একটি অতিরিক্ত (ইংরেজী) অক্ষর বসিয়েছিলেন - অক্ষরটি হল 'এস' (s)।"

না, আইনস্টাইনের ধর্মে comical বা কৌতুকপ্রদ কিছু নেই। কিন্তু সে যাই হোক, পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে আমার অনুরোধ যে তাঁরা যেন তাদের 'প্রতীক বা রূপক' অর্থে ঈশ্বর শব্দটির ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। রূপকার্থে বা সর্বেশ্বরবাদী অর্থে ব্যবহৃত পদার্থবিদদের 'ঈশ্বর' বাইবেলের, পুরোহিত-পাদ্রি-মোল্লা-ইহুদি যাজকদের সর্ববিষয়ে হস্তক্ষেপ-ইচ্ছুক, অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়সী, অন্তর-পঠনক্ষম, পাপের শাস্তি বিধায়ক, প্রার্থনায় সাড়াদানকারী, এবং সাধারণের ভাষায় ব্যবহৃত ঈশ্বর থেকে আলোক-বর্ষ যোজন দূরে অবস্থিত। এই দুটি স্বতন্ত্র ধারণাকে এক করে ইচ্ছাকৃত সংশয় সৃষ্টির অপচেষ্টা আমার মতে, একটি উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্বাসঘাতকতা।

অনুবাদকের টীকা

১। রিচার্ড ডকিন্স পরিচিতি ঃ রিচার্ড ডকিন্স একজন খ্যাতনামা বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী, তাত্ত্বিক অভিব্যক্তিবাদী।

২। আইনস্টাইনের প্রাসঙ্গিক ইংরেজি উদ্ধৃতিটি হল ঃ I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it.

৩। এখানে আইনস্টাইনের বাংলায় উদ্ধৃতিগুলোর যথাক্রমিক ইংরেজী বাক্যগুলো হলঃ

God is subtle but he is not malicious
He does not play dice
Did God have a choice in creating the Universe ?

পাদটীকা

১) আইনস্টাইন কথিত বাক্যটির ইংরেজি হচ্ছে ঃ I don't try to imagine a personal God: It suffices to stand in awe at the structure of the world, insofar as it allows our inadequate senses to appreciate it. '

২) মূল ইংরেজী বাক্যটি ছিল all was `produced by laws acting around us'.

৩) মূল ইংরেজী বাক্যটি ছিল No, no, no! My god is a little god, and I want him to stay that way.

৪) A brief History of Time, Stephen Hawking, Bantam Press, London, 1988

৫) বইটির পুরো শিরোনাম ঃ Atheism: A Very Short Introduction to the meaning of an atheist's commitment to nautralism

৬) 'Science without religion is lame, religion without science is blind.'

৭) 'I do not believe in personal God.'

৮) ভারতীয় ব্রহ্মবাদীরাও বলেন যে পরম 'ব্রহ্ম' হলেন চৈতন্যময়, একমাত্র রিয়ালিটি। এই ব্রহ্মেরই প্রকাশ হল জড় জগৎ মহাবিশ্ব।

৯) প্রাসঙ্গিক ইংরেজি বাক্যটি ছিলঃ I believe in Spinoza's God who reveals himself in the ordinary harmony of what exists, not in a God who concerns himself with fates and actions of human beings।

১০) উদাহরণ: হিন্দু পৌরাণিক ধর্মে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ছাড়াও অনেক ছোটখাটো দেবদেবী (লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, কালী, কার্তিক, গণেশ, বিশ্বকর্মা ..) মানুষের জীবনের সাথে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে। ঠিক তেমনি ইসলামপূর্ব আরবে কাবার অসংখ্য দেবদেবী কোরাইশ ও অন্য আরব গোত্রের মানুষদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করত।

১১) টেম্পল্টন ফন্ডেশন (Templeton Foundation) থেকে প্রতিবছর পুরস্কার হিসেবে বিপুল অর্থ একজন বিজ্ঞানীকে প্রদান করা হয়। বিজ্ঞানীকে অবশ্য ধর্ম সম্পর্কে কিছ কিছু সুন্দর কথা বলতে হয়।

ড. রিচার্ড ডকিন্স, আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী বিজ্ঞানী, গবেষক এবং দার্শনিকদের অন্যতম। পেশায় বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। যুক্তিবাদী এবং সমাজসচেতন লেখালিখির কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে ড. রিচার্ড ডকিন্সের খ্যাতি আজ আক্ষরিক অর্থেই তুঙ্গস্পর্শী। 'ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার', 'সেলফিশ জিন', 'আনোয়েভিং দ্য রেইনবো', 'ক্লাইম্বিং মাউন্ট ইম্প্রোবেবল', 'ডেভিলস চ্যাপ্লেইন' এবং 'অ্যাঙ্গেসটর টেল' সহ অসংখ্য পাঠকনন্দিত জনপ্রিয় ধারার বিজ্ঞানভিত্তিক বইয়ের রচয়িতা। সম্প্রতি নিজ উদ্যোগে তৈরী করেছেন 'রিচার্ড ডকিন্স ফাউন্ডেশন'। তাঁর সর্বশেষ বই - 'দ্য গড ডিলুশন' এখন পর্যন্ত বিগত বাইশ সপ্তাহ ধরে নিউয়র্ক টাইমসের 'বেস্ট সেলার' তালিকায় রয়েছে।

ড. অজয় রায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপ, জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক, প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক। ইতিহাস পরিষদের অন্যতম সহ সভাপতি, শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের সভাপতি ও দক্ষিণ এশীয় মৌলবাদ ও সামপ্রদায়িকতা বিরোধী সংগঠনের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য।

স্বাধীন ইচ্ছা, মন্দ ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব - অপার্থিব জামান

ঈশ্বরে বিশ্বাসের পক্ষে একটা ক্ষতিকারক যুক্তি হল মন্দের (নৈতিক ও প্রাকৃতিক) যুক্তি (Argument from Evil) যা কিনা বলে যে, জগতে মন্দের উপস্থিতি ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করে, কারণ মন্দের উপস্থিতি পরম করুনাময়তার বিরোধী, আর সর্বকরুনাময়তা ঈশ্বরের একটি সংজ্ঞায়ক গুণ। ধর্মবাদীরা (Apologists) এই যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি দেন যে, মন্দ স্বাধীন ইচ্ছার অবশ্যম্ভাবী ফল। ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী করার ফলেই মন্দের উদ্ভব। মন্দ মানুষের নিজের সৃষ্ট, তার স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা। সংজ্ঞা অনুযায়ী ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, পরম করুনাময় এবং সর্বজ্ঞ। এখন সমস্যা হল ঈশ্বর যদি সর্বজ্ঞই হন তাহলে কেউ আগামীকাল কি করবে তা ঈশ্বরের আজই জানার কথা। কিন্তু তা হবে স্বাধীন ইচ্ছার পরিপন্থী, কারণ, আগামীকাল আমি কি করব সেটা ঈশ্বর বা অন্য যে কারো আজ জানা থাকার মানেই হচ্ছে আমার কাজটা পূর্বনির্ধারিত। কারণ, কেউ যদি আগামীকাল একটি কাজ করবে বলে প্রতিজ্ঞা করে, সেই কাজটা ঈশ্বরের জানা কাজটাই হতে হবে, অন্য কোন কাজ নয়। আমি শেষ মুহূর্তে মন পরিবর্তন করে অন্য কোন কাজ করতে পারিনা। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীন ইচ্ছা শেষ মুহূর্তে মন পরিবর্তন করার অধিকার দেয়ারই কথা । কাজেই স্বাধীন ইচ্ছা ও ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা পরস্পর বিরোধী। ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা স্বীকার করলে স্বাধীন ইচ্ছা অস্বীকার করতে হয়। সে ক্ষেত্রে আর একটা সমস্যা হল কেউ যদি কোন অপকর্ম করে তাহলে সেটা পূর্বনির্ধারিত, আমরা আগেই তা দেখেছি। কিন্তু কার দ্বারা পূর্বনির্ধারিত? নিশ্চয় ঈশ্বর। মানুষের অপকর্ম যদি ঈশ্বর নির্ধারিত হয় তাহলে ঈশ্বর সর্বকরুনাময় নন। আর যদি ঈশ্বর নির্ধারিত না হয় তাহলে অবশ্যই প্রকৃতি নির্ধারিত, সে ক্ষেত্রে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান কিনা সে প্রশ্ন ওঠে।

এবার ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে স্বাধীন ইচ্ছার যুক্তি (Free Will Defense) নিয়ে আলোচনা করা যাক। তার আগে আস্তিকতার বিরুদ্ধে মন্দের যুক্তির সারাংশ বর্ণনা দিয়ে রাখি:

মন্দের যুক্তি:

১। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বকরুনাময় এবং সর্বজ্ঞ (আস্তিকদের দাবী)

২। ঈশ্বর যেহেতু সর্বজ্ঞ, সেহেতু ভবিষ্যৎ মন্দ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।
৩। ঈশ্বর যেহেতু সর্বকরুনাময়, মন্দ নিবারণ ই তাঁর অভিপ্রায়
৪। ঈশ্বর যেহেতু সর্বশক্তিমান, মন্দ নিবারণ তাঁর পক্ষে সম্ভব
৫। ২,৩,৪ অনুযায়ী মন্দের উপস্থিতি ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করে
৬। পৃথিবীতে মন্দ আছে
৭। ৫ এবং ৬ অনুযায়ী ঈশ্বর (১ এর সংজ্ঞা অনুযায়ী) অনুপস্থিত

সংশয়বাদী ও নাস্তিকদের উপরোক্ত মন্দের যুক্তির বিপক্ষে আস্তিকরা স্বাধীন ইচ্ছার যুক্তি দেন, যার সারাংশ হল:

স্বাধীন ইচ্ছার যুক্তি:
১। ঈশ্বরের নিকট দুটো বিকল্প খোলা অছে : (ক) স্বাধীন ইচ্ছাপূর্ণ মানুষ সৃষ্টি করা
(খ) স্বাধীন ইচ্ছাবিহীন মানুষ সৃষ্টি করা
২। মন্দ কাজে সক্ষম স্বাধীন ইচ্ছাপূর্ণ মানুষ মন্দ কাজে অক্ষম স্বাধীন ইচ্ছাবিহীন মানুষের চেয়ে ও **শ্রেয়**।
৩। ঈশ্বর অবশ্যই যা **শ্রেয়** তাই করেন
৪। উপরের ২ এবং ৩ এর পরিপ্রেক্ষিতে মন্দ কাজে সক্ষম স্বাধীন ইচ্ছাপূর্ণ মানুষ সৃষ্টি ছাড়া ঈশ্বরের কোন বিকল্প নেই।

দুর্ভাগ্যবশত: উপরোক্ত স্বাধীন ইচ্ছার যুক্তির কয়েকটি ত্রুটি ধরা পড়ে। প্রথমত, স্বাধীন ইচ্ছার মাধ্যমে মন্দ কাজ করার সক্ষমতা, মন্দ কাজে ইচ্ছাহীন অক্ষমতার চেয়ে ভাল কিছু কিনা - এ ব্যাপারটি মোটেও বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। যারা মন্দ কাজের দ্বারা উপকৃত হয় শূধু তারাই এতে র্নিদ্বিধায় সম্মতি জানাতে পারে। মন্দের শিকার যারা (সংখ্যাগুরু) তারা কখনই এটা মানবেন না। আস্তিকদের আর একটি যুক্তি হল, স্বাধীন ইচ্ছা বিহীন মানুষ, যারা মন্দ কাজ করার বাসনা পূরণে অক্ষম, তারা রোবট সদৃশ।

আস্তিকদের এই যুক্তির বিপক্ষে প্রশ্ন করা যায় যে, স্রেফ ঈশ্বরের আদেশ বা ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে একজন স্বাধীন ইচ্ছাপূর্ণ মানুষ যদি অন্যায় থেকে বিরত থাকে তাহলে সেও কি একটা রোবট নয়?। অথচ সেরকম মানুষই ঈশ্বরের বা আস্তিকদের দৃষ্টিতে পূণ্যবাণ। কিন্তু মন্দ কাজে অক্ষম স্বাধীন ইচ্ছা বিহীন রোবট কি মন্দ কাজে সক্ষম স্বাধীন ইচ্ছা পূর্ণ রোবটের চেয়ে শ্রেয় (কম বিপদজনক) নয়? দ্বিতীয়ত উপরের ২ নং যুক্তিতে 'শ্রেয়' বলার অর্থ এই যে আস্তিকরা ঈশ্বরের মনের কথা যানেন। ঈশ্বর কোন ব্যাপারটাকে শ্রেয় মনে করেন তা মানুষের জানার কথা নয়। আস্তিকদের এটা বলা কার্যের পরে কারণ খোঁজার শামিল। মন্দ আছে বলেই তাদের এই যুক্তি। যদি এমন হত যে জগতে কোন মন্দ নেই তাহলে তারা যুক্তি দিতেন যে, ঈশ্বর যেহেতু পরম করুনাময়, তাই মন্দ বলে কিছু নেই!

আর এক আস্তিক দর্শন বলে যে, ভাল বা শুভ এর অর্থবহতার জন্যই মন্দ বা অশুভের প্রয়োযন। মন্দ বা অশুভ ব্যতিরেকে ভালো বা শুভ যেহেতু অর্থহীন, সেহেতু মন্দ বা অশুভ সম্পূর্ণ দূর করা ঈশ্বরের পক্ষেও অসম্ভব এবং যুক্তিহীন। তাহলে প্রশ্ন ওঠে ঈশ্বর কেন পূণ্য কাজের উপদেশ দেন ও পূণ্য কাজ না করলে শাস্তির ভয় দেখান? স্পষ্টত সবাই যদি শুধু পূণ্য কাজ করে তাহলে একই যুক্তিতে ভালো বা শুভ এর অর্থবহতা থাকেনা। কাজেই ঈশ্বরকে কিছু মন্দের নিশ্চয়তা বিধান করতেই হবে। আবার সেই মন্দের জন্য মানুষকেই ঈশ্বর শাস্তি দেবার বিধান দেন। কাজেই একটা অসঙ্গতি থেকেই যাচ্ছে। আস্তিকদের এই যুক্তির আর একটা বিপজ্জনক দিক হল, কেউ কোন অপকর্ম করলে এই বলে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারে যে, অপকর্মটা তার নিজের কারণে নয়, ঈশ্বরের কিছু মন্দের নিশ্চয়তা বিধানই তার অপকর্মের কারণ!

ভালর জন্য কিছু মন্দের প্রয়োজন আবশ্যকীয় হলে প্রশ্ন ওঠে স্বর্গে কেন অনাবিল সুখের প্রতিশ্রুতি? আর একটা প্রশ্ন ওঠে যে ভালর অর্থবহতার জন্য নিরপরাধ শিশু হত্যা, নারী ধর্ষণের মত মন্দের কি প্রয়োযন? আর তাছাড়া সেটা কি সর্বকরুনাময়তার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নয় কি? আর একটি ত্রুটি হল, স্বাধীন ইচ্ছা মানেই মন্দ করার সম্ভাবনা নিশ্চিত করা, আস্তিকদের এটা ধরে নেয়া। কিন্তু আসলে স্বাধীন ইচ্ছার অর্থ হল কয়েকটি বিকল্পের মধ্যে যে কোন একটা বেছে নেয়ার ক্ষমতা। কিন্তু বিকল্প মন্দই হতে হবে এমন কোন কথা নেই। স্বাধীন ইচ্ছা কয়েকটি ভালো বিকল্পের মধ্যে যে কোন একটা বেছে নেয়ার ক্ষমতাও তো হতে পারে। ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান, সর্বকরুনাময় ই হন তাহলে মন্দ বিকল্পগুলি অপসারণ করে শুধু ভালোগুলো রাখতে পারতেন না কি? চিন্তা করার বিষয়। কেউ যুক্তি দিতে পারেন যে মন্দ করার ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে বিকল্পের সংখ্যা সীমিত করলে স্বাধীন ইচ্ছাকেই খর্ব করা হয়। এর উত্তরে বলা যায় যে মন্দ করার ক্ষমতা থাকা সত্বেও তো অনেক কিছু করার ক্ষমতা মানুষের নেই, যেমন, উড়ে বেড়ান, যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে, বা নিজেকে অদৃশ্য করা। কাজেই মন্দ করার ক্ষমতা কেড়ে নিলে গুণগত কোন তফাৎ হবে না।

একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত যে স্বাধীন ইচ্ছার যুক্তির দ্বারা মন্দের সঙ্গে ঈশ্বরের গুনাবলির সামন্জস্য প্রমাণে আস্তিকদের চেষ্টায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিন্তু প্রমাণিত হয় না। যেমন আমি যদি যুক্তি দেই যে আমার একশ ফুট উচ্চতা লাফানর দাবীর সঙ্গে আমার ঘন্টায় একশ মাইল বেগে দৌড়ানর দাবীর কোন বিরোধ নেই, আমার এই যুক্তি সঠিক হলেও এটা প্রমাণিত হয় না যে আমি একশ ফুট উচ্চতা লাফ দিতে পারি বা ঘন্টায় একশ মাইল বেগে দৌড়াতে পারি।

আরেকটা বিবেচ্য বিষয় হল যে মানুষের মন্দ কাজ করার কারণ কিছুটা বংশাণু (gene) জনিত, আর কিছুটা পরিবেশ জনিত। যেহেতু এ দুটোর কোনটাই মানুষের আয়ত্তে নয়, সত্যিকার অর্থে মন্দ কাজের দায়িত্ত্ব ঈশ্বর মানুষের ঘাড়ে চাপাতে পারেন না নীতিগতভাবে।

এতক্ষণ আমরা নৈতিক মন্দের কথাই আলোচনা করেছি, যা মানুষ করতে পারে । কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত মন্দ? মানুষ কৃত মন্দ না হয় স্বাধীন ইচ্ছার যুক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়, যদিও তা ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিসের দ্বারা ব্যাখ্যা করবেন আস্তিকরা? প্রাকৃতিক দুযোগ জনিত মন্দ, ঈশ্বরের সর্বকরুনাময়তার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নয় কি? আস্তিকরা যুক্তি দেন, এটার দ্বারা ঈশ্বর মানুষকে পরীক্ষা করেন। প্রশ্ন ওঠে কোন মানুষকে? যারা বেঁচে রইল? কিন্তু যারা এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে মারা গেল তারা তো এর আগের কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বেঁচে ছিল।

পরীক্ষার কোন সুফল তো তারা পেলো না। আজ যারা বেঁচে রইল তাদের অনেকেই তো ভবিষ্যৎ এর কোন দুর্যোগে মারা যেতে পারে । এধরনের পরীক্ষার অর্থ কি তা হলে? আর এক দল আস্তিকরা বলেন, এগুলো হচ্ছে ঈশ্বরের এক গভীর লীলা খেলা। আমরা যা মন্দ বলে মনে করি তা আসলে ঈশ্বরের বৃহত্তর ভালরই অংশ। আমাদের অজ্ঞতার জন্যই আমরা তা বুঝতে পারিনা। যারা এই যুক্তি দেন প্রশ্ন ওঠে তারাই বা ঈশ্বরের এই গভীর বৃহত্তর কারণের কথা জানলেন কেমন করে? উপরন্তু এর প্রত্যুত্তরে এটাও তো ঘুরিয়ে বলা যায় যে আমরা যা ভাল মনে করছি সেটা আসলে ঈশ্বরের বৃহত্তর মন্দেরই অংশ। এই যুক্তি অন্যটার চেয়ে কোন অংশে কম অকাট্য নয়। মুশকিল হল এইরকম যুক্তি ঘটনা ঘটার পরে এর কারণ খোঁজা। যদি জগতে কোন মন্দ না থাকতো তাহলেও বলা যেত যে ঈশ্বর দয়ালু সেহেতু মন্দ নেই। কিন্তু মন্দ আছে বলে তারা যুক্তি দেয় যে মন্দ হচ্ছে ঈশ্বরের এক অজ্ঞাত কারণ জনিত ভালর অংশ। অর্থাৎ ফলাফল যাই হোক না কেন কার্যের সঙ্গে সঙ্গতি মিলিয়ে কারণ খোঁজা হচ্ছে। কাজেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হচ্ছি যে মন্দের অস্তিত্ব ও স্বাধীন ইচ্ছা ঈশ্বরের সর্বকরুনাময়তা, সর্বশক্তিমত্তা আর সর্বজ্ঞতার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।

English version of the article can be viewed at:

ON THE FREE WILL DEFENSE AGAINST ARGUMENT FROM EVIL

বিজ্ঞানের ধর্ম ও ঈশ্বর প্রসঙ্গ

অজয় রায়

> বিজ্ঞান বলতে আমরা কী বুঝি এ নিয়ে মতৈক্যে আসা কঠিন ব্যাপার নয়। বিজ্ঞান হল শতাব্দী-প্রাচীন একটি প্রচেষ্টা যা পদ্ধতিগত চিন্তার মাধ্যমে বিশ্বের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রপঞ্চসমূহকে যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণভাবে একটি সংস্থার মধ্যে একত্রিত করে। সাহসের সাথে বলতে হলে বলা যায় যে ধারণা-প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির ভেতর দিয়ে অস্তিত্বের উত্তরকালীন পুর্নগঠনের এটি একটি প্রয়াস।[১]
>
> – আলবার্ট আইনস্টাইন

বিজ্ঞান- ধর্ম-দর্শন নিয়ে একাডেমিক ও মুক্ত আলোচনা আমাদের সমাজে কখনও স্বস্তিপ্রদ ছিল না, আজও নেই বিশেষ করে বর্তমান বাংলাদেশের ধর্মান্ধ মৌলবাদী উগ্র পরিবেশে।

বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় 'ধর্ম' শব্দটির বিশালতা রয়েছে, রয়েছে বহুমাত্রিকতা। ইংরেজীতে প্রোপার্টি, কোয়ালিটি, ক্যারেক্টারিস্টিকস, এট্রিবিউটস প্রভৃতি শব্দের সাথে যুক্ত অর্থকেও আমরা অনেক সময় বাংলায় ধর্ম শব্দ দিয়ে প্রকাশ করি। যেমন আমরা বলি জড়ের ধর্ম 'জাড্য' (inertia), আলোর ধর্ম 'ঔজ্বল্য', অগ্নির ধর্ম 'দাহিকা' ইত্যাদি। সংস্কৃত সাহিত্যে বলা হয়েছে 'যা আমাকে ধারণ করে থাকে তাই আমার ধর্ম।' আবার ইংরেজী 'রিলিজিয়ন' শব্দটির বাংলাও আমরা ধর্ম করেছি, যদিও তা সঙ্কীর্ণ অর্থে। আমি ব্যাপক অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করেছি সঙ্কীর্ণ 'রিলিজিয়ন' অর্থে নয়।

এ দুটি শব্দের পার্থক্য বোঝাতে অধুনা অনেকে রিলিজিয়নের শব্দার্থ করেছেন 'উপাসনা ধর্ম'। অর্থাৎ ঈশ্বর উপাসনা, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সাথে জড়িয়ে থাকা মানুষের যে ক্রিয়াকাণ্ড তাকেই বলা হয়েছে মানুষের উপাসনা ধর্ম বা রিলিজিয়ন। এই অর্থে ইসলাম, খ্রীস্টিয়, হিন্দু এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে উপাসনা ধর্ম বা রিলিজিয়ন হিসেবে গণ্য করতে পারি। তবে রিলিজিয়ন' এর মূল ভিত্তি হল ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। কিন্তু রিলিজিয়ন বা উপাসনা-ধর্মই মানুষের একমাত্র ধর্ম নয়- এর বাইরেও মানুষের রয়েছে বৈচিত্রময় গুণাবলী বা ধর্ম, যাকে এক কথায় আমরা বলতে পারি 'মানব বা মনুষ্য ধর্ম', রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'অতি মানবীয়তা' (super humanism), রয়েছে কসমিক রিলিজিয়ন (cosmic religion) বা মহাজাগতিক ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথের মনুষ্য ধর্মের মূল সুরটি রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই ব্যক্ত করা যাক, যে কথাগুলো তিনি ১৯৩০ সাল থেকে অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতামালা হিসেবে এবং পরবর্তীকালে কোলকাতা (১৯৩৩) ও অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৩৩) প্রদান করেছিলেন ঃ

---

[1] A. Einstein, *Science, Philosophy and Religion*, a speech delivered in a symposium in 1940 (Published, New York, Harper, 1941); " It would not be difficult to come to an agreement as to what we understand by science. Science is the century-old endeavor to bring together by means of a systematic thought the perceptible phenomena of this world into as thoroughgoing an association as possible. To put it boldly, it is the attempt at the posterior reconstruction of existence by the process of conceptualization."

> "মানুষের এবটি দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবযাত্রা-নির্বাহে তার জ্ঞান, তার কর্ম. তার রচনাশক্তি একান্ত ব্যাপৃত। সেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়। কিন্তু, মানুষের আর-একটা দিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু সেই অমরতা। সেখানে বর্তমান কালের জন্য বস্তু সংগ্রহ করার চেয়ে অনিশ্চিত কালের উদ্দেশে আত্মত্যাগ করার মূল্য বেশি। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত-প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।" (পরিশিষ্ট-৩ দেখুন)

মানুষের এই বিরাটত্বকে, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বিশ্বমানবতা অনুসন্ধান করতে হবে মানুষের অন্তরে, বাউল কবিরা যেমন বলতেন, "মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।" নানা কবিতায় তাঁর 'তুমি' হলেন সেই অন্তরের মহামানব। নমুনা স্বরপ, গীতাঞ্জলি থেকে একটি কবিতার কয়েক ছত্র উল্লেখ করা যাক ঃ

আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে। (গীতাঞ্জলি)

কসমিক রিলিজিয়ন বা মহাজাগতিক ধর্ম সম্পর্কে দু-চার কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মহাজাগতিক ধর্ম বলতে আমরা কী বুঝি, এর উৎস কোথায় এবং ভিত্তিই বা কি? একটু বিশদে যাওয়া যাক। ধর্ম সম্পর্কে আইনস্টাইনের বিভিন্ন উক্তি ও লেখা বিশ্লেষন করে তাঁর ধর্ম-চিন্তাকে আখ্যা দেয়া হয়েছে 'কসমিক রিলিজিয়ন'। আইনস্টাইনের মত মহান বিজ্ঞানী থেকে সাধারণ বিজ্ঞানী যখন কোন চমকপ্রদ অবিষ্কার করেন তখন এক ধরনের বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন তাঁরা এবং এক বিশেষ ধরনের আনন্দে আপ্লুত হন, যাকে বলা যায় স্বর্গীয়। নিউটনের সনাতনী বিশ্বচিত্রে, অথবা লর্ড কেলভিনের তাপবলবিদ্যার দ্বিতীয় নিয়মের চমৎকারিত্বে, অথবা ম্যাক্সওয়েলের ক্ষেত্র সমীকরণের অসাধারন সরলতায়, কিংবা আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের অবিস্মরণীয় মনোহারিত্বে, স্রোডিংগারের তরঙ্গ সমীকরণের অনুপম সরল গড়নে ঐসব বরেণ্য বৈজ্ঞানিক থেকে বিজ্ঞান গবেষকরা যুগে যুগে বিস্ময়াভূত স্বর্গীয় আনন্দে আপ্লুত হয়েছেন; এই স্বর্গীয় আনন্দময় অনুভূতিকেই অনেক বিজ্ঞানী বলেছেন ধর্মানুভূতি। এই অর্থে প্রতিটি বিজ্ঞানীই ধর্মপ্রাণ। এই ধর্মানুভূতিকেই বিজ্ঞানীরা আখ্যা দিয়েছেন 'কসমিক রিলিজিয়ন' বা 'মহাজাগতিক ধর্ম'।

একথা কেউ অস্বীকার করেন না যে প্রতিটি বিজ্ঞানীর (এমন কি দার্শনিকও) স্ব-উদ্ভাবনী পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অনুসন্ধান করেন সত্যের মূলনীতি ও সৌন্দর্য যা থেকে গবেষক প্রতিষ্ঠা করেন সার্থক তত্ত্ব – অভিজ্ঞতার বোধে যা সত্যে পরিণত হয়। একজন তাত্ত্বিক পদার্থবিদের এই সত্যে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়াকে অনেকে বলেন 'কঠিন সত্য' (hard fact), আবার এই অভিজ্ঞতাকে কেউ আখ্যা দেন 'রহস্যময় অভিজ্ঞতা' (mysterious experience)। 'কঠিন সত্য'ই হোক আর 'রহস্যময় অভিজ্ঞতা'ই হোক – এই অনুভূতির প্রতিক্রিয়া এক এক জন বিজ্ঞানীয় এক এক ধরনের হতে পারে। আইনস্টাইন এই সত্যানুভূতিকেই বলেছেন 'কসমিক রিলিজিয়নের' ভিত্তি (.. .. this fact is the basis of cosmic religion)। এই ব্যক্তিগত প্রক্রিয়াকে 'কসমিক রিলিজিয়ন' বলা হলেও পদার্থাবদ্যার তথ্য ও নীতিমালা এর ইঙ্গিত বহন করে না; অবশ্যই ধারণা করা যেতে পারে যে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া - যা বিজ্ঞানীর মনে

সৃষ্ট হয়, বিজ্ঞানে তার সৃষ্টিশীল ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত। তাইতো আইনস্টাইন দৃঢ়তার সাথে বলতে পারেন যে, –

> " .. .. (this) knowledge, this feeling, is at the centre of true religiousness. In this sense, and in this sense only, I belong to the ranks of devoutly religious men. "

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আইনস্টাইনের কাছে "গাণিতিক পদার্থবিদ্যার সম্ভাবনার (possibility)" মধ্যে এই বিশ্বাস প্রায় ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন (identical)। আইনস্টাইনের মহাজাগিতিক ধর্ম হচ্ছে একটি অপার সৌন্দর্যময় ও ধারণাগতভাবে সরল প্রতীকী পদ্ধতির সম্ভবনায় বিশ্বাস – যা থেকে নিরীক্ষিত তথ্যসমূকে যৌক্তিভাবে (logically) বের করে আনা যায়। নিউটোনীয় পদার্থবিদ্যা সপ্তদশ শতকে মহাজাগতিক ধর্মকে প্রথম তুলে ধরেছিল সেই অর্থে - ঠিক যে অর্থে বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যা মহাজাগতিক ধর্মকে তুলে ধরেছে।

বিজ্ঞান শব্দের অর্থ

স্থান কাল পাত্র ভেদে একটি শব্দের অর্থ বদলে যায়। প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে বিজ্ঞান শব্দটির যে অর্থ ছিল আজ আর তা নেই। শব্দগত অর্থে বলা হয়ে থাকে বিজ্ঞান হল 'বিশেষ জ্ঞান' বা অনুপুঙ্খ জ্ঞান। এই বিশেষ জ্ঞান কি কোন বিশেষ বিষয়ের ওপর অথবা পরিপূর্ণ জ্ঞানের সামগ্রিকতাকে বোঝাবে তা অবশ্য শব্দগত অর্থ থেকে বোঝা যাবে না।

ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিকদের, বিশেষ করে শঙ্করাচার্যের হাতে পড়ে বেদান্তবাদীরা বিজ্ঞানকে 'ব্রহ্মজ্ঞানে' দাঁড় করিয়েছিলেন, আর বৌদ্ধাচার্যেরা বিজ্ঞানকে পরিণত করেছেন 'বিজ্ঞানবাদে' এবং 'শূন্যবাদে'।[২] একটু বিশদে যাওয়া যাক ঃ

ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিকেরা বিজ্ঞান বলতে বুঝাতে চেয়েছেন ঈশ্বরানুভুতি সম্পর্কে যে তত্ত্বজ্ঞান– বিশেষ জ্ঞান বা পরোক্ষ জ্ঞান তাই হল বিজ্ঞান। প্রাচীনেরা যে অর্থে বিজ্ঞান বুঝেচেন তা হল ভাববাদী চরম বা পরম জ্ঞানকে অর্থাৎ বেদান্তবাদীর দৃষ্টিতে তা হল 'ব্রহ্মজ্ঞান'। অন্যদিকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দৃষ্টিভঙ্গীতে যে বিজ্ঞান দর্শন গড়ে উঠেছে তার নাম 'বিজ্ঞানবাদ' যার সাথে বেদান্তবাদীর দেখার পার্থক্য রয়েছে। বিজ্ঞানবাদীদের মতে আমাদের কাছে যে দৃশ্যমান বস্তু তা মনাজগতের একটি ভাব মাত্র এর বাহ্যিক কোন অস্তিত্ব নেই। বৌদ্ধ ধর্মে মূলত চার শ্রেণীর দার্শনিক চিন্তা সনাক্ত করা যায়, এর মধ্যে দুটি হীনযান শাখার অন্তর্ভুক্ত অন্য দুটি মহাযান শাখার- এ দুটিকে বলা হয় বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ। হীনযানীদের দুটি শাখার প্রথমটিতে বলা হয়েছে 'বস্তুর প্রত্যক্ষ অস্তিত্ববোধই হল জ্ঞান', পরবর্তী ধাপে আর একটু এগিয়ে বলা হয়েছে যে 'ধারণার মধ্য দিয়ে সত্যের বোধ লাভ করা যায়'। এর ফলে ভাববাদের দিকে বৌদ্ধ দর্শন আরও এগিয়ে গিয়ে মন ও বস্তুর মধ্যে এক ধরনের কুয়াশা বা যবনিকার অন্তরাল সৃষ্টি হয়েছে, কিছুটা মিস্টিক বা রহস্যবাদেরও। অন্যদিকে মহাযানী দার্শনিকেরা এই পথে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন 'আমরা যে বস্তু সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করি তা হল ভাব থেকে উদ্ভূত একটি প্রতিলিপি (replica), যার পশ্চাতে বস্তুর কোন প্রকৃত বা বাহ্য অস্তিত্ব নেই, থাকতে পারে না। এটিই হল

[২] বস্তুজগতের কোন অস্তিত্ব নেই–বস্তু হল মনোজগতের সৃষ্ট প্রতিলিপি (replica) মাত্র। আর নাগার্জুন (১ম শতাব্দী) প্রবর্তিত শূন্যবাদের মর্মকথা হল বর্হিজগৎ ও মনোজগৎ কোনটিরই অস্তিত্ব নেই – সবই শূন্য (void)। নাগার্জুনের দর্শন চিন্তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় হিউম ও বার্গসোঁর চিন্তাধারায়।

বিজ্ঞান বাদীদের মূল কথা – আর সকল অভিজ্ঞাতাকে বলা হয়েছে 'মনের মধ্যে পরম্পরাক্রমে সজ্জিত ধারণা মাত্র'। এই দার্শনিক চিন্তাধারার পরবর্তী রূপ হল নাগার্জুনের সাপেক্ষবাদের ও অবচেতন সত্তার ধারণা যার ওপর ভিত্তি করে তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর দর্শন প্রক্রিয়া যাকে বলা হয়ে থাকে 'মাধ্যমিক বা মধ্যপথ'। এর অন্য নাম 'শূন্যবাদ'। এই দর্শনের মূল কথাগুলো হচ্ছে – 'মন ধারণায় বিশিষ্ট হয়, ফলে তখন থাকে কেবল কতকগুলো অসংহত ধারনা ও উপলব্ধি, কিন্তু এদের সম্বন্ধে কিছুই নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তাহলে আমরা পৌঁছে যাই এমন কিছুতে যাকে ধরা ছোঁয়া যায় না, এমন কিছু যা আমাদের সীমাবদ্ধ মনের অগম্য, আমরা প্রকাশ করতে পারি না, যার সংজ্ঞা দিতে পারি না। বড় জোর বলা যেতে পারে, এক প্রকারের সংবিৎ – বিজ্ঞান (কৌতুহলী পাঠকের জন্য এ নিয়ে আরও আলোচনা করা হয়েছে পরিশিষ্ট-১ এ) ।

আধুনিক বিজ্ঞান

আধুনক বিজ্ঞানের সূচনা বলা যায় গ্যালিলিওর (১৫৫৯-১৬৪২) হাত থেকে সপ্তদশ শতকে[৩] যা পূর্ণতা পায় নিউটনের (১৬৪২-১৭২৭) প্রতিভার স্পর্শে প্রিন্সিপিয়ার প্রকাশের (১৬৮৭) মধ্য দিয়ে। আধুনিক বিজ্ঞানের একটি সংজ্ঞা আইনস্টাইনের (১৮৭৯-১৯৫৫) উদ্ধৃত উক্তির মধ্য দিয়ে বলার চেষ্টা করেছি। এরও আগে ১৯ শতকের ইংরেজ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার (১৮২০-১৯০৩) বলেছিলেন 'বিজ্ঞান হল সুসংগঠিত জ্ঞান', আর উইলিয়াম হাজ্জিটির (Willium Haziiti: 1778-1830) ভাষায় বিজ্ঞান হচ্ছে 'কারণ'কে জানার তীব্র এষণা'। সরল কথায় বলা যায় আধুনিক বিজ্ঞান হল একটি প্রক্রিয়া যার মধ্যদিয়ে বিজ্ঞানীরা দৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কে সত্যে পৌঁছাতে চেষ্টা করে থাকেন। বর্হিজগৎ সম্পর্কিত যখন কোন ঘটনা ঘটে, এই ঘটনার স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য বিজ্ঞানীর প্রয়োজন অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ– এই পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের নিমিত্ত বিজ্ঞানীকে বুদ্ধিবৃত্তিক উপায় উদ্ভাবন করতে হয়, এমনকি পর্যবেক্ষণকে আরও সুক্ষ্ম পর্যায়ে নিয়ে যেতে তৈরী করতে হয় যন্ত্রব্যবস্থা। অবশ্যই এই সত্য বা জ্ঞান আপাত (relative), কারণ বিজ্ঞানে পরম (absolute) বলে কিছু নেই। বিজ্ঞানীর 'দেখা সত্য' এবং ধর্মবাদী বা দার্শনিকের দেখা সত্য এক নাও হতে পারে, এমন কি দার্শনিক যদি বস্তুবাদীও হন। বস্তুবাদী দার্শনিকের বস্তু বা বর্হিজগৎ বিজ্ঞানীর দেখা বর্হিজগৎ এক নয়। একটি সহজ উদাহরণ দেই, যেমন মার্কসবাদী বস্তুবাদীরা বলে থাকেন 'গতি হল জড়ের ধর্ম' – কথাটা এক অর্থে সত্য আবার এক অর্থে সত্য নয়। কারণ পরম গতি বলে কিছু নেই, গতি বিষয়টি আপেক্ষিক। যে দর্শকের কাছে বস্তুটি গতিময় বলে মনে হবে, বস্তুটির সাথে চলমান কোন দর্শকের কাছে মনে হবে সেটি স্থির।

বস্তুর যান্ত্রিক ধর্ম (mechanical property) হল তার জড়তা বা জাড্যগুণ (inertia)। বস্তুর এই জাড্যগুণের আর এক প্রকাশ হল তার ভর (mass)। বিজ্ঞানের সত্যানুসন্ধানের পথ একদিকে যেমন পরীক্ষণ নির্ভর, একই সাথে বুদ্ধিবৃত্তিকও। পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণকে বিজ্ঞানী যখন বুদ্ধিবৃত্তিক সংশ্লেষণের মধ্যদিয়ে একটি সাধারন সূত্র বা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁর অনুসৃত পথটিকে বলা হয় আরোহী (inductive) পদ্ধতি। এই তত্ত্ব থেকে তিনি যেমন সমকালীন ঘটনার ব্যখ্যা দিতে পারেন, তেমনি ভবিষ্যৎ ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কেও পূর্বাভাষ দিতে পারেন। অন্যদিকে বিজ্ঞানী তাঁর মনন মেধা সজ্ঞা-প্রজ্ঞার মাধ্যমে বর্হিজগৎ বা কোন স্থানিক ঘটনার বর্ণনার উদ্দেশ্যে কতকগুলো ধারণার মধ্য দিয়ে একটি মডেল নির্মাণ করেন এবং এর মাধ্যমে জাগতিক ঘটনাবলীর চমৎকার ব্যাখ্য দিতে সক্ষম হন, পরে ঘটতে পারে

[৩] গ্যালিলিও'র বিখ্যাত গ্রন্থ 'Dialogue' প্রকাশিত হয় ১৬৩২ সালে।

এমন ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষনে তা টিকলে মডেলটি তত্ত্বে উন্নীত হয়। এই পদ্ধতিকে সাধারণভাবে অবরোহী (deductive) বলে চিহ্নিত করা হয়। প্রথম পদ্ধতির উদাহরণ হিসেবে ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল উদ্ভাবিত তাড়িত চৌম্বক ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করতে পারি। ১৮৬৪ সালে তিনি বিদ্যুৎ, চুম্বকত্ব ও আলো সংশ্লিষ্ট নানা জানা তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে 'তাড়িত চৌম্বক ক্ষেত্র' নামে একটি একীভূত তত্ত্বে উপনীত হন, যার সার কথা মাত্র চারটি সাধারণ সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় পদ্ধতির চমৎকার উদাহরণ হল নিউটনের গতির নিয়ম ও অভিকর্ষ তত্ত্ব এবং আইনস্টাইনের বিশেষ ও সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব। বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় আইনস্টাইন মাত্র দুটি অনুমিতির আশ্রয় নিয়েছিলেন (ক) আলোর গতি সকল সময়ে সকল স্থানে, পর্যবেক্ষণ নির্বিশেষে ধ্রুব, আর (খ) পদার্থবিদ্যার সূত্রাবলীর বা নিয়মের রূপ সকল জাড্য প্রসঙ্গ কাঠামোয় (inertial frame of reference) অপরিবর্তিত থাকবে (invariant)। অন্যদিকে, চিরায়ত বলবিদ্যার বিশাল কাঠামোটি নিউটন কথিত মাত্র তিনটি গতির নিয়মের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সামান্য আভাস দেবার চেষ্টা করলাম মাত্র।

বিজ্ঞান সাধনার উদ্দেশ্য নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সামান্য মতভেদ রয়েছে। নির্ধারণবাদী (deterministic) বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে বিজ্ঞান সাধনার মূখ্য উদ্দেশ্য হল প্রকৃতিকে বোঝা, বর্হিজগৎ ও প্রকৃতির নিয়ম কানুন আবিষ্কার করে তার রহস্য ভেদ করা। আইনস্টাইন বলতেন, "পদার্থবিদ্যার চেষ্টা হল বাস্তবতার স্বরূপকে অনুধাবন করা, যে বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ ব্যতিরেকেই বিদ্যমান। এই অর্থেই ভ্যেত বাস্তবতার কথা বলা হয়ে থাকে। কোয়ান্টাম পূর্ব সময়ে পদার্থবিদ্যায় এটি কী ভাবে বুঝতে হবে তা নিয়ে কোন দ্বিধা ছিল না। নিউটনের তত্ত্বে স্থান ও কালে একটি জড় বিন্দু দিয়ে বাস্তবতা নির্ণীত হত; ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বে স্থান ও কালে একটি ক্ষেত্র দিয়ে।' অন্যদিকে অনিশ্চয়তাবাদী বিজ্ঞানীদের মত হল প্রকৃতির নিয়ম ও বিধি উদ্ঘাটন করা বিজ্ঞানীর কাজ নয়, বরং প্রকৃতি কী তার প্রকৃত চিত্র উপস্থাপন করাই বিজ্ঞানের কাজ। তাঁরা বলেন 'স্থুল জগৎ ও 'সূক্ষ্ম জগৎ' বা 'অব-পারমাণবিক জগৎ' নিয়ে বিভেদ রচনা করা নিরর্থক। 'কোয়ান্টাম জগৎ' বলে কিছু নেই। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার মাধ্যমে কোন বিজ্ঞানী কোন ভৌত প্রপঞ্চের কোয়ান্টাম বর্ণনা দিতে পারে মাত্র। এ প্রসঙ্গে আমরা অনিশ্চয়তাবাদী বিজ্ঞানীদের প্রবক্তা নীলস বোরের একটি উক্তি স্মরণ করতে পারি ঃ " 'প্রকৃতি কেমন তা আবিষ্কার করা ' – এটি পদার্থবিদের কাজ নয়; বরং প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা কী বলতে পারি এবং কী ভাবে বলতে পারি, – এটিই বিজ্ঞানের কাজ।" কিন্তু বিজ্ঞানের আসল বৈশিষ্ট্য হল জনকল্যাণে (অকল্যাণেও ?) এর প্রয়োগ-ধর্মিতা ও প্রযুক্তি। রকেট ও মিসাইল উৎক্ষেপন নিউটনের গতিবিদ্যার সফল প্রয়োগ, তাপ বলবিদ্যার ২য় সূত্রের সফল প্রযুক্তি হল তাপ-ইঞ্জিন, ভর-শক্তির সমতুল্যতা নীতি প্রয়োগে আণবিক চুল্লি বা এটম বোম্ব থেকে নিউক্লিয় শক্তির উদ্গীরণ, ব্যাক্টেরিয়া জনিত রোগ নিবারণে পেনিসিলিনসহ নানা এন্টিবায়োটিকের সফল ব্যবহার ... বিজ্ঞানের প্রয়োগ-ধর্মিতার কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। প্রয়োগ-ধর্মিতা না থাকলে বিজ্ঞান বিজ্ঞান হতো না।

বিজ্ঞানের অনুসন্ধান প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে এর কিছু কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। যেমন, বিজ্ঞান হল পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণে অভীক্ষন সাপেক্ষে যুক্তিবাদী বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা। এটিই হল বিজ্ঞানের মূল ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞান মনে করে পর্যবেক্ষণ অনপেক্ষ একটি বর্হিজগতের অস্তিত্ব আছে, যা কেবল আমাদের মনোজগতের সৃষ্ট কোন ভাবসমষ্টি নয়। আমরা প্রকৃতি বলতে যা বুঝি তা এই ভৌত জগতের প্রকাশ মাত্র।

বিজ্ঞানচর্চা কয়েকটি মৌলিক নীতির ওপর দণ্ডায়মান ।

(১) সরলতার নীতি ঃ কোন বৈশ্বিক ঘটনাকে যতদূর সম্ভব সরলতম তত্ত্ব বা নিয়মের মাধ্যমে ব্যখ্যা দেয়া সম্ভব ।

(২) সমতুল্যতার নীতি ঃ সমতুল্যতাও বিজ্ঞানের একটি ধর্ম - যেমন নিউটনের 'অভিকর্ষ ভর' এবং 'জাড্য ভর' সমতুল্য । আইনস্টাইন দেখিয়েছেন যে জড় ও শক্তি পরস্পরের সমতুল্য । এই সমতুল্যতারই বাস্তব প্রয়োগ পারমাণবিক চুল্লি ও অ্যাটম বোমা । আবার কোয়ণ্টাম জগতে কণা ও তরঙ্গ সমতুল্য । অর্থাৎ একটি ইলেকট্রন কণা মূলত কণিকা রূপে আমাদের কাছে সাধারণভাবে দৃশ্যমান হলেও অবস্থা বিশেষে জড়-তরঙ্গ রূপে আচরণ করতে পারে । চলমান ইলেকট্রন কণিকাসমষ্টি বিদ্যুৎ শক্তি রূপে দেখা দেয়- যার বাস্তব প্রয়োগ তো অহরহই দেখছি। আবার ঐ ইলেকট্রনসমষ্টিই কেলাসের মধ্যদিয়ে গমনকালে পরমাণুগুচ্ছের সাথে তরঙ্গরূপে মিথষ্ক্রিয়া ঘটিয়ে আলোর মতই ইলেকট্রন অপবর্তন প্রতিভাসের জন্ম দেয় । এই ইলেকট্রন তরঙ্গকেই ব্যবহার করে আমরা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে ক্ষুদ্র কণাকে বহুগুণ বর্দ্ধিত করে দৃশ্যমান করে তুলি, যা সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা দেয় না । আবার তরঙ্গ চরিত্রের আলোক রশ্মিই বস্তুকণা (ফোটন) রূপে দেখা দিয়ে আলোক-তড়িৎ প্রপঞ্চের (photoelectric effect) জন্ম দেয় । রশ্মি ও কণার সমতুল্যতার আর একটি নিদর্শন হল 'যুগ্ম কণিকার সৃজন' (pair production) এবং এর বিপরীত প্রক্রিয়া 'রশ্মির বিকাশ' । প্রথম প্রক্রিয়ায় রশ্মি থেকে কণিকা-প্রতিকণিকার (ইলেকট্রন-পজিট্রন) সৃষ্টি হয় ফলে রশ্মির বিনাশ ঘটে (annilation of radiation), আর দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় একটি কনিকা-যুগ্ম (ইলেকট্রন-পজিট্রন) মিলিত হয়ে তাড়িত-চৌম্বক তরঙ্গ, যেমন গামা রশ্মি, সৃষ্টি করে ।

(৩) একীভূত তত্ত্ব ঃ কতকগুলো ভৌত সত্তার সমতুল্যতা প্রতিষ্ঠার সম্প্রসারিত ও সার্বজনীন রূপই হল বিজ্ঞানীদের স্বপ্ন একীভূত তত্ত্বের ধারণা। এটিকে আমরা বলতে পারি বিজ্ঞানের, বিশেষ করে পদার্থবিদ্যার জ্ঞানতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি – যথাসম্ভব কম সংখ্যক প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমে জাগতিক ঘটনার ব্যখ্যা দেয়া । এর অগ্রপথিক ছিলেন মহামতি নিউটন যিনি অভিকর্ষ থেকে প্রাকৃতিক নানা ঘটনাকে বলবিদ্যার (মেকানিকসের) আওতায় নিয়ে এসেছিলেন, এমন কি আলো'কেও তিনি মেকানিকসের ধর্ম হিসেবে দেখাতে চেয়েছিলেন; অবশ্য এতে তিনি সফল হন নি । তাপের গতীয়তত্ত্ব ও তাপবলবিদ্যাও (thermodynamics) একীভূত হয়ে গেল। ইতোপূর্বেই বল হয়েছে যে, ক্লার্ক ম্যাকসওয়েল আলোক-বিদ্যুৎ-চুম্বকত্ব আপাতদৃষ্টিতে স্বতন্ত্র প্রপঞ্চসমূকে সমন্বয় ঘটিয়ে একটি সামগ্রিক একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের জন্ম দিয়েছিলেন ।

নিউটনের বিশ্বে 'স্থান ও কাল' হল দুটি স্বতন্ত্র পরম সত্তা । নিউটনীয় সীমাবদ্ধ আপেক্ষিক তত্ত্বানুযায়ী – 'সকল জাড্য প্রসঙ্গ কাঠামোয় বলবৈদ্যিক নিয়মাবলি একই রূপে দেখা দেয়'– যা পরম স্থানের ধারণাকে নস্যাৎ করে দেয় । কিন্তু সমস্যা রয়ে গেল নিউটনীয় বলবিদ্যার সাথে ম্যাক্সওয়েলের ক্ষেত্রতত্ত্বকে মেলান যাচ্ছিল না - দুটি শৃঙ্খলা স্বতন্ত্র পথে এগিয়ে চলল । ম্যক্সওয়েলের সমীকরণগুলো গ্যালিলীয় স্থানান্তরে অপরিবর্তিত থাকে না, যা বিজ্ঞানীদের বিচলিত করে তুলেছিল । এই আপাত বিরোধিতা থেকে পদার্থবিদ্যাকে মুক্ত করলেন আইনস্টাইন বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রস্তাবনা করে (১৯০৫) ।

বিশদে না গিয়েও বলা যায় যে আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব মেকানিকস ও তাড়িত-চৌম্বক ক্ষেত্রতত্ত্বের মধ্যে আপাত বিরোধ মিটিয়ে দু'এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করল- গ্যলিলিয় স্থনান্তরের পরিবর্তে আরও সার্বজনীন লরেঞ্জীয় স্থানান্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। নতুন ব্যবস্থায় নিউটনীয় বলবিদ্যা 'আপেক্ষিক তত্ত্বীয় বলবিদ্যা' (relativistic mechanics) নামে নতুন রূপ ধারন করল। বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এল যে আমাদের বর্হিজগৎ চর্তুমাত্রিক – তিনটি স্থানিক মাত্রার সাধে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত 'কাল'। স্থান ও কাল দুয়ে মিলে রচনা করল ইউক্লিডিয় চর্তুমাত্রিক স্থান-কাল সন্ততি (space time continuum)। দুটি ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান বা দুটি স্থানিক বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব ধ্রুব নয়, নির্ভর করবে জাড্য প্রসঙ্গ কাঠামোর আপেক্ষিক গতির ওপর। গতির সাপেক্ষে দূরত্ব সঙ্কুচিত (contraction) হয় আর কাল-ব্যবধান বর্ধিত (time dilation) হয়; কাল-ব্যবধানের প্রসঙ্গ-কাঠামোর নির্ভরতার কারণে দুটি দূরবর্তী ঘটনার কাল-'যুগপত্ততা' (simultaneity) আর রইল না। ফলে দূটি বস্তু কণিকার মধ্যে তাৎক্ষণিক দূর ক্রিয়া (action at a distance) বলেও কিছু থাকতে পারে না (যেমনটি নিউটন ভেবেছিলেন)।[৪] ভরবেগের সংরক্ষণ নীতি ও শক্তির সংরক্ষণ নীতি একত্রে একটি নীতিতে পরিণত হয়েছে।

পদার্থবিদদের আর একটি চেষ্টা তাঁদের সূত্রে ব্যবহৃত সমীকরণ সমূহে ধ্রুবকের সংখ্যা যত কম রাখা যায়। ফলে কেবল মাত্র মাত্রাহীন ধ্রুবকসমূহই স্থান পাবে পদার্থবিদ্যার মৌলিক সমীকরণসমূহে। এটিকে বলা যেতে পারে বিজ্ঞানের সরলীকরনের প্রকাশ। আইনস্টাইন এ প্রসঙ্গে উলেখ করেছেন ঃ

> আমি একটি উপপাদ্যের অবতারণা করতে চাই যা বর্তমানে কেবল প্রকৃতির 'সরলতা অর্থাৎ বোধগম্যতা'– এই বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত অন্য কিছুর ওপর নয় ঃ এ ধরনের স্বেচ্ছা আরোপিত কোন ধ্রুবক স্থান পাবে না; অর্থাৎ প্রকৃতি এমনভাবে গঠিত যে দৃঢ়ভাবে নির্ধারিত নিয়মসমূহ যৌক্তিভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, যে সব নিয়মে যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত ধ্রুবকসমূহই স্থান পাবে।[৫]

কিন্তু সমস্যা রয়েই গেল। নিইটনীয় 'জাড্য ভর' আর 'অভিকর্ষ ভর' কি সমতুল্য? চমৎকার একটি পরীক্ষায় দেখা গেল যে দুটি ভর অবিকল ও অভেদ। আর একটি মুস্কিল হল ম্যাক্সলীয় তত্ত্ব রশ্মির শক্তি-ধর্ম নিয়ে কিছু বলতে পারে না; এ ব্যাপারে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বও কোন সাহায্য করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে ম্যাকের প্রশ্ন ছিলঃ "এটি কি করে হয় যে জাড্য প্রসঙ্গ ব্যবস্থাসমূহ অন্য সকল স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার চাইতে অনন্য" – এর একটি সদুত্তর খুঁজে পাওয়া চাই। এ প্রসঙ্গে আইনস্টাইনের মন্তব্য ছিল ঃ "এই অবস্থা দৃষ্টে আমি নিশ্চিত হলাম যে বিশেষ আপেক্ষি তত্ত্বের কাঠামোয় অভিকর্ষ তত্ত্বের কোন সন্তোষজনক স্থান নেই।"[৬]

'জাড্য ভর' আর 'অভিকর্ষ ভরে'র সমতুল্যতা তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণিত ও সরলরৈখিক জাড্য কাঠামোয় বন্দী পদার্থবিদ্যাকে মুক্তি দিতে আইনস্টাইন সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করলেন

---

[৪] নিউনের মতে দূরবর্তী দুটি জড় কণিকার মধ্যে আকর্ষন তাৎক্ষণিক, এর জন্য সময়ের প্রয়োজন হয় না। একেই বলা হয় দূর ক্রিয়া।

[৫] 'I would like to state a theorem which at present can not be based upon anything more than upon a faith in the simplicity, i.e., intelligibility, of nature: there are no arbitrary constants of this kind; that is to say, nature is so constituted that it is possible logically to lay down such strongly determined constants occur, ..'

[৬] This convinced me that, within the frame of the special theory of relativity, there is no room for a satisfactory theory of gravitation. (Ref: *Autobiographical notes*, Albert Einstein: Philosopher – Scientist, editor Paul Arthur Schilpp, The Library of Living Philosophers, Inc, Evanston, Illinois, 1949).

(১৯১৫)। তিনি দেখালেন যে জাড্য ও অজাড্য (কোন জাড্য প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষে ত্বরিত প্রসঙ্গ কাঠামো) কাঠামো নির্বিশেষে পদার্থবিদ্যার নিয়মসমূহের রূপ (form) অপরিবর্তিত (invariant) থাকে। দেখা গেল যে কোন আপাত স্থির কাঠমোর সাপেক্ষে কোন 'ত্বরমান প্রসঙ্গ কাঠামোয়' অবস্থিত কণিকাকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে কণিকাটির ওপর যেন একটি বল ক্রিয়া করছে (এই বলকে বলা হয় ছদ্মবল)। এ থেকে আইনস্টাইন অবশেষে দেখালেন যে অভিকর্ষ আসলে কোন স্বতন্ত্র কোন ভৌত সত্ত্বা নয়। সাধারন আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে বেরিয়ে আসে যে স্থান-কাল ইউক্লিডিয় চর্তুমাত্রিক নয়, রাইমেনীয় চর্তুমাত্রিক বক্র-জ্যমিতিক সন্ততি – যা কি না বদ্ধহীন কিন্তু সসীম (boundless and finite)। এই নতুন স্থান-কাল আর নিষ্ক্রিয় নয়, জড়ের উপস্থিতিতে এর বক্রতার পরিবর্তন হয় যা অভিকর্ষ ক্ষেত্র রূপে দেখা দেয়। অভিকর্ষকে আর ভৌত প্রতিভাস নয়, স্থান-কালের জ্যমিতিক ধর্মের প্রকাশ।

পরবর্তী ধাপ ছিল তাড়িত চৌম্বক তত্ত্ব সহ সাধারণ ক্ষেত্রকে এর অধীনে আনার সর্বাত্মক চেষ্টা। বলাবাহুল্য আইনস্টাইনের পরবর্তীকালের নিরলস প্রায় একক প্রচেষ্টা সার্থক হয় নি। তিনি অভিকর্ষ ক্ষেত্র ও তাড়িত চৌম্বক ক্ষেত্রকে সাধারণ আপেক্ষিক তত্বের কাঠামোতে একীভূত করতে পারেন নি। যদিও, সমগ্র ক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য তিনি তাত্তিকভাবে চমৎকার চারটি ক্ষেত্র সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এই সমীকরণ চতুষ্টয় থেকে বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে আমরা সহজেই বিশুদ্ধ অভিকর্ষ ক্ষেত্রে উপনীত হতে পারি যা নিউটনের অভিকর্ষ তত্ত্বকে সার্বজনীনতা প্রদান করে। আমরা উপনীত হতে পারি সন্নিকর্ষের মধ্য দিয়ে বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বেও। এই সমীকরণগুলো সম্পর্কে আইনস্টাইনের নিজের বক্তব্য ছিল ঃ 'আমার বিশ্বাস যে এই সমীকরণগুচ্ছ রচনা করবে অভিকর্ষ সমীকরণসমূহের সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক সাধারনীকরণ। এদের ভৌত উপযোগিতা প্রমাণ করা সত্যিই হবে একটি দুঃসাধ্য সাধনা, কেবল মাত্র কিছু কিছু সন্নিকর্ষণ আনয়ন করা যথেষ্ট হবে না। তবে আসল প্রশ্ন হল ঃ এ সকল সমীকরণের সর্বত্র প্রযোজ্য নিয়মিত সমাধান কী হবে ? .. .. '

আইনস্টাইন সফল না হলেও প্রকৃতিতে বিদ্যমান অভিকর্ষ, তাড়িতচৌম্বক, দুর্বল নিউক্লিয় ও সবল নিউক্লিয় বলসমূহকে একীভূত করার সাধনা বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এগিয়ে চলছে, তবে খিন্ন পথে। ইতোমধ্যেই ষাটের দশকের শেষার্ধে গ্লাসো, সালাম ও ভাইনবার্গ তাড়িত চৌম্বক ও দুর্বল নিউক্লিয় বল দুটিকে একীভূত করেন (১৯৬৭); এই দুটি বলের একত্রিত নাম 'তাড়িত দুর্বল' (electro weak)। এ কাজের জন্য ১৯৭৯ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন তাঁরা। এখন চেষ্ট চলছে 'তাড়িত দুর্বল' ও 'সবল নিউক্লিয় বল' দুটির একত্রিকরণের নিরলস চেষ্টা 'মহান একীভূত তত্ত্বাবলী'র মাধ্যমে।[৭] ইতোমধ্যে তত্তীয়ভাবে তাড়িত দুর্বল ও সবল নিউক্লিয় বল দুটির একত্রিকরণ সম্ভব হয়েছে। অভিকর্ষকে 'মহান একীভূত তত্তের ' ভাঁজে আনার চেষ্টা চলছে আধুনিকতম সুপার স্ট্রিং তত্ত্ব ভিত্তিক ১০-মাত্রিক স্থান-কালের প্রেক্ষাপটে। এই সর্বব্যাপী তত্ত্বের নাম দেয়া হয়েছে 'সর্ববিষয়ের তত্ত্ব' (Theory of Everything: TOE) বা 'একীভূত সর্বাবষয়ের তত্ত্ব' (Unifued Theory of Everything: UTE)।

অসম্ভাব্যতার নীতি

পদার্থবিজ্ঞানে যেমন সমতুল্যতার নীতির প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তেমনি নীরবে এই বিজ্ঞানে কতকগুলো অসম্ভাব্যতার নীতি স্থান পেয়েছে। এই নীতিসমূহকে নিম্নভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে ঃ

[৭] তাত্ত্বিক ভাবে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলেও এখনও পরীক্ষিত হয় নি; এই মহান তত্ত্বের ইংরজী নাম ঃ Grand Unified Theories: GUTs.

- তাপ বলবিদ্য থেকে দেখান হয়েছে যে 'এমন কোন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা সম্ভব নয় যা দিয়ে চিরন্তন' গতি (perpetual motion i.e. perpetuum mobile) সৃষ্টি করা যায়।
- কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে পরম শূন্য তাপমাত্রা (0 K) অর্জন করা যাবে না।
- প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ নিখুঁত স্ফটিক পাওয়া যাবে না বা ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিমভাবে সম্পূর্ণ নিখুঁত স্ফটিক তৈরী করা যাবে না।
- কোন জড় বস্তুর গতিবেগ মহাশূন্যে আলোর গতিবেগকে অতিক্রম করতে পারে না।
- কোয়ন্টাম জগতে দুটি ক্যানোনিকাল রাশির একই সাথে একশত ভাগ নিশ্চয়তা নিয়ে পরিমাপন অসম্ভব (যেমন কোন কণিকার গতি ও অবস্থান)।
- একই সাথে কোন ভৌত সত্তা (যেমন আলো বা ইলেকট্রন) তার বিকিরণ ধর্ম ও জড় ধর্ম প্রকাশ করতে পারে না। প্রকৃতি তা করতে দেয় না।
- এমন কিছু সত্তা রয়েছে যার অস্তিত্ব জাড্য (বা অজাড্য) কাঠামোয় সম্পাদিত পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করা অসম্ভব। যেমন পরম গতি, স্থানকালের পরমতা (absoluteness), ক্লাসিকাল পদার্থবিদ কল্পিত ঈথর ইত্যাদি।

এ ধরণের আরও উদাহরণ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞানের জ্ঞানতত্ত্ব

বিজ্ঞানের সমস্যা হল প্রকৃতিক কোন ঘটনার ব্যখ্যায় কোন তত্ত্বের অবতারণা করতে হলে কোন পথে অগ্রসর হওয়া যায়। এই অনুচ্ছেদে আমরা বিজ্ঞানের ধ্যান-ধারনা ও পদ্ধতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলব, এবং বিজ্ঞানের দর্শনের প্রসঙ্গটিও আসবে।

প্রকৃতির কোন ঘটনার ব্যখ্যায় প্রস্তাবিত কোন তত্ত্বকে গ্রহণ বা অগ্রাহ্য করা প্রসঙ্গে প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি হল: তত্ত্বটি অবশ্যই অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যসমূকে অস্বীকার বা বিরোধিতা (contradiction) করবে না। বরং অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যাবলী তত্ত্বীয় ভিত্তির সুনিশ্চিতকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট।

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি অবশ্য বস্তুগত পর্যবেক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। বরং তা স্বয়ং তত্ত্বটির অঙ্গনের (premises) সাথে সম্পর্কিত – অর্থাৎ অঙ্গনটিতে "স্বভাবিকতা"(naturalness) বা "যৌক্তিক সরলতা"র (logical simplicity) রয়েছে কি না। এই দৃষ্টিভঙ্গিটির যথাযথ সূত্রায়ন কঠিন হলেও, স্মরণাতীত কাল থেকে তত্ত্বের নির্বাচনে এবং মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

এ সব কথা অবশ্য আমাদের কালের শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইনের চিন্তা ধারার অনেকটা প্রতিধ্বনি। আইনস্টাইন তত্ত্ব নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

> A theory is the more impressive the greater the simplicity of its premises is, the more different kinds of things it relates, and the more extended is its area of applicability.[৮]

[৮] *Autobiographical Notes*, Albert Einstein, *Albert Einstein: Philosopher-Scientist*, Editor: Paul Arthur Schilpp, The Library of Living Philosophers, Inc, Ecanston, Illinois, 1949

এ প্রসঙ্গে আমরা তাপবলবিদ্যার (thermodynamics) বিশাল ও ব্যাপক প্রযোগের কথা বলতে পারি ।

ম্যাক্স প্লাঙ্ক কর্তৃক বিকিরণের কোয়ন্টাম ধারণার (quantum concept of radiation) মধ্য দিয়ে 'কৃষ্ণকায় বিকিরণের' তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় দেখা গেল প্রকৃতিতে এমন অনেক ঘটনা রয়েছে সমকালীন পদার্থবিদ্যার আলোকে তার সমাধান দেয়া যায় না । কেবলমাত্র জ্ঞাত তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রকৃত নিয়মাবলী আাবিষ্কার করা সম্ভব নয়- এ কথা ভেবে আইনস্টাইন হতাশ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন ঃ

> The longer and more despairingly I tried, the more I came to the conviction that only the discovery of a universal formal principle could lead us to assured results. [৯]

তাপবলবিদ্যার ক্ষেত্রে এই সার্বজনীন নীতিটি ছিল যে 'প্রকৃতির নিয়ম সমূহ এমন যে, চিরন্তন গতি (perpetuum mobile) সৃষ্টি করা অসম্ভব' । প্লাঙ্কের বিকিরণ সূত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই সার্বজনীন নীতিটি হচ্ছে 'বিকিরণের রয়েছে কোয়ান্টাম চরিত্র' (quantum character) । বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় আইনস্টাইনের কাছে প্রতীয়মান হয়েছিল যে এই সার্বজনীন নীতিটি হচ্ছে প্রথমত মহাশন্যে 'আলোর দ্রুতি সকল জাড্য কাঠামোয় সমান এবং দ্বিতীয়ত লোরেঞ্জ স্থানান্তরের সাপেক্ষে পদার্থবিদ্যার নিয়মাবলী অপরিবর্তনীয় (invariant)' ।

অন্যদিকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা উদ্ভাবন কালে হাইসেনবর্গের কাছে 'অপর্যবেক্ষণযোগ্য ভৌত রাশি পদার্থবিদ্যার তত্ত্বের সূত্রায়নে স্থান পেলে তা হবে অসম্পূর্ণ' – এটি সাধারণ নীতি রূপে প্রতিভাত হয়েছিল । আবার তরঙ্গ বলবিদ্যার জনক স্রোডিংগারের কাছে কণিকার যে তরঙ্গ চরিত্র রয়েছে তাকে একটি স্থান ও কালের অপেক্ষক φ (r,t) রূপে প্রকাশ করা যায়– এটিই ছিল তার কাছে সাধারণ নীতি এবং এর ভিত্তিতেই তরঙ্গ-অপেক্ষকের জন্য একটি চমৎকার সমীকরণ দাঁড় করিয়েছিলেন ।

কিন্তু অযুত ডলার মূল্যের প্রশ্ন হল 'এই সার্বজনীন নীতি কী ভাবে পাওয়া যাবে ?' আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষণ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা সূচনায় সামান্য প্রাথমিক ধারণা াদতে পারে মাত্র, এর বেশী নয় । কোন ঘটনা বিশ্লেষণকারী নিয়মের আবিষ্কার করতে হলে বিজ্ঞানীকে ঘটনার সাথে সম্পর্কিত সার্বজনীন নীতিকে উদ্ভাবন করতে হবে । এই উদ্ভাবন কেবল পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতামূলক উপাত্ত (empiric datum) বিশ্লেষণ করে পাওয়া যাবে না; এটি আসবে বিজ্ঞানীর মুক্ত চিন্তার (free thinking) ফসল হিসেবে । অভিজ্ঞতামূলক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে আমরা বড়জোর ঘটনার ব্যাখ্যাদায়ী একটি (বা একাধিক) অভিজ্ঞতাধর্মী সূত্র (empirical formula) অবিষ্কার করতে পারি, প্রকৃতির রহস্যভেদকারী কোন তত্ত্ব উদ্ভাবন করতে পাবব না । প্ল্যাঙ্ক কর্তৃক ১৯০০ সালে প্রথমে অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতিতে (empirical method) কৃষ্ণকায়া বিকিরণের সূত্র প্রতিষ্ঠা এবং ১৯০৪ সালে বিশুদ্ধ তত্তীয়ভাবে একটি সার্বজনীন নীতিকে আশ্রয় করে বিকিরণের সূত্রের উদ্ভাবন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ । এই অনুমিতিটি ছিল, যা

[৯] ঐ, পৃষ্ঠা ৫৩

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ঃ 'কৃষ্ণকায় বস্তুটি (black body) রশ্মি শোষণকালে এবং নিঃসরণকালে তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গকে গুচ্ছাকারে (in quantum) শোষণ বা নিংসরণ করে থাকে।'

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক বলতেন যে বিজ্ঞানের দর্শনে দুটি পরস্পরবিরোধী ধারণা বর্তমান ঃ একটি হল অধিবিদ্যাগত (metaphysical) ও অন্যটি হল দৃষ্টবাদীসুলভ (positivistic)। আইনস্টাইনকে কিন্তু অধিবিদ্যার প্রবক্তা তো বলা যাবেই না, এমন কি তিনি প্রচলিত অর্থে দৃষ্টবাদী ছিলেন তাও প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

দৃষ্টবাদের আদি প্রবক্তা আগস্ট কোঁৎএ'র (August Comte: 1798-1867) মতে বৈজ্ঞানিক তথ্যই জ্ঞানের ভিত্তি ও সত্যে পৌঁছাবার পথ। পরবর্তীকালে পদার্থবিদ আর্নস্ট ম্যাকের হাতে আরও উন্নতি ও ব্যপকতা পায়। বিংশ শতাব্দীতে ভিয়েনাগোষ্ঠীর হাতে আধুনিক পদার্থবিদ্যার অভুতপূর্ব উন্নয়নের আলোকে এই দৃষ্টবাদ 'যৌক্তিক দৃষ্টবাদে' (logical postivism) পরিণত হয়েছিল। অনেকে আবার এই বিজ্ঞান-দর্শনকে 'যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদ' (logical empiricism) নামেও অভিহিত করে থাকেন। ১৮২৯ সালে কোঁৎএ লিখেছিলেন ঃ [১০]

> .. .. every positive theory has to be based on observations, it is on the other hand, also true that our mind needs a theory in order to make observations.

আর্নস্ট ম্যাক (Ernst Mach: 1838-1916) যে দৃষ্টবাদ গড়ে তোলেন তার সার কথা হল: বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী আসলে পরীক্ষণলব্ধ ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্তসার; জটিল উপাত্তসমূহকে মানবীয় বোধের উদ্দেশ্যে উপযোগী করে এসব (নিয়মাবলী) তৈরী করা হয়। অনেকে এ থেকে ভাবতে পারেন যে বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী মনের বাইরে স্থিত বাস্তবতার সাথে যতখানি না সম্পর্কিত তার চাইতে মনের সাথেই এদের সম্পৃক্ততা অনেক নিবিড়তর। তিনি বলতেন যে ভৌত বিজ্ঞানের লক্ষ্য হতে হবে পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলীকে সরলতম এবং যতদূর সম্ভব স্বল্প পরিসরে সংক্ষিপ্ত আকারে (Economical abstract expression) তুলে ধরা। স্বল্প ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের মন কী ভাবে প্রকৃতির বিশালতাকে ধারন করে উপস্থাপন করে – তা বোঝা বেশ শক্ত ব্যাপার– এর সামান্যই সে অনুভব করতে পারে। একজন বৈজ্ঞানিক কী ভাবে বিজ্ঞানের গবেষণায় ও তথ্য বিশ্লেষণে অগ্রসর হয় সে সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হল : [১১]

> In mentally separating a body (representing a physical reality) from the changeable environment in which it moves, what we really do is to extricate a group of sensations on which our thoughts are fastened and which is of relatively greater stability than the others, from the stream of all our sensations.

ম্যাক প্রত্যক্ষ বর্ণনা আর অপ্রত্যক্ষ বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। প্রথমটি সরাসরি অভিজ্ঞতালব্ধ উপাত্তের সাথে জড়িত; অন্যদিকে, শেষোক্ত বর্ণনায় পর্যবেক্ষণলব্ধ পদের কোন স্থান নেই এই বর্ণনা দেয়া হয় গাণিতিক পরিকল্পনার (mathematical scheme) সাথে তুলনা করে।

বিজ্ঞানকে অনেক সময়ই 'বিচার ও ভ্রান্তি'র (trial and error) মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। যেমন পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর তুলনা এবং সুবিন্যস্ত করতে এ ধরণের পদ্ধতি

[১০] Positive philosophy (A. Comte, *Cours de philosophie positive*, Premiere Lecon)
[১১] Ernst Mach, *The Principle of Comparison in Physics*, Popular Scientific Lectures, 1894

বিজ্ঞানীরা প্রয়োগ করেন। এই সুশৃঙ্খলকরণের ফলে বিমূর্ত ধারণা ও তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিধিগুলো বেরিয়ে আসে। ধারণাগুলো অর্থবহ তখনই হয়ে ওঠে যখন আমরা যে বস্তুর সাথে এ ধারণাগুলো যুক্ত সেই বস্তুটিকে নির্দেশ করতে পারি। [১২]

অনেকে বলে থাকেন যে আইনস্টাইনের বিজ্ঞানের গবেষণায় ম্যাকের চিন্তাধারা যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব উদ্ভাবন কালে কিন্তু আইনস্টাইন বুঝতে পেরেছিলেন যে ম্যাকের এই প্রত্যয় অতিসরলীকরণ। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বে পদার্থবিদ্যার সাধারণ বাক্যগুলো আসলে প্রতীকসমূহের মধ্যে (যেমন সাধারণ স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা, অভিকর্ষ বিভব ইত্যাদি .. ..) পারস্পরিক সম্পর্কাদির প্রকাশ, যা থেকে সিদ্ধান্ত টানা যায়, এবং সে সব সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে পর্যবেক্ষণীয় রাশিগুলো সম্পর্কিত বাক্যাদির মধ্যে স্থানান্তরযোগ্য । পর্যবেক্ষণ থেকে সাধারণ নীতিতে উত্তরণের যে সহজ রাস্তা ম্যাক দেখাতে চেয়েছেন, আইনস্টাইন কিন্তু তা সহজে মানতে রাজী নন। ১৯৩৩ সালে তিনি এ প্রসঙ্গে যে উক্তি করেছিলেন তা হল উনবিংশ শতাবদীর প্রকৃতিক দার্শনিকেরা মনে করতেন যে পদার্থবিদ্যার ধারণাগুলো ও স্বীকার্যসমূহকে (postulates) নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার (abstraction) মধ্যদিয়ে – অর্থাৎ যৌক্তক উপায়ে অভিজ্ঞতা থেকে বের করা যায় (deduce); এরা যৌক্তিক ধারনায় মনুষ্য মেধার মুক্ত উদ্ভাবন নয়। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন:

> A clear recognition of the erroneousness of this notion really only came with the general theory of relativity, .. . the fictitious character of the fundamental principles is perfectly evident from the fact that we can point to two essentially different principles, both of which correspond with experience to a large extent. ..

এই ভিত্তিগুলো হচ্ছে নিউটনের এবং আইনস্টাইনের অভিকর্ষ নীতি দুটি। আইনস্টাইন আরও বলেছেন যে এ থেকে প্রমাণিত হয় যে বলবিদ্যার মৌলিক ধারণাসমূহ ও স্বীকার্যসমূহ প্রাথমিক অভিজ্ঞতা থেকে যৌক্তিক আহরণের প্রতিটি প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। নিঃসন্দেহে বেশ কঠোর উক্তি। বিংশ শতাব্দীর আধুনিক বিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে পদার্থবিদ্যার সাধারণ নীতিসমূহ সূত্রায়িত হয়েছে এমন সব শব্দ ও প্রতীক ব্যবহার করে – যারা গাণিতিক ও যৌক্তিক উপাদানের দীর্ঘ শৃঙ্খলের দ্বারা পর্যবেক্ষনীয় ধারণাগুলোর সাথে সম্পর্কিত। আইনস্টাইন এর সাথে আরও যুক্ত করেছেন ঃ এ সব সাধারণ নীতিমালার কিছু ফল অবশ্য থাকতে হবে আর তা হল এ সব নীতিমালা পর্যবেক্ষনীয় ধারণাসমূহের মাধ্যমে সুত্রায়িত করা যাবে এবং যেগুলোকে অবশ্যই প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষন দ্বারা যাচাই করা যাবে। এই অর্থে আইনস্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গিকে দৃষ্টবাদী বলে, ব্যপকতর অর্থে, অনেকে অনুযোগ করতেই পারেন। তবে আইনস্টাইন, ম্যাকের বিপরীতে মনে করেন যে বিজ্ঞানের নিয়মাবলী ও পর্যবেক্ষণের মধ্যে পথটি হল দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর– মোটেই সহজ ও সরল নয়, যেমনটি ম্যাক বা তাঁর অনুসারীরা ভাবতেন। বরং নব্য যৌক্তিক দৃষ্টবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি আইনস্টাইনের কাছকাছি। এ্দেঁর মতে আধুনিক পদার্থবিদ্যায় নিয়মাবলীকে সরল ধারণার মধ্যদিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়; এই নীতিসমূহকে মনে করা হয় মুক্ত মানবীয় কল্পনা শক্তির (imagination) ফসল এবং এসব নীতিমালায় যে কোন "বিমূর্ত পদ" বা প্রতীক অন্তর্ভূক্ত হতে পারে, তবে এসব নীতি কোন ক্রমেই কল্পনার দ্বারা, সজ্ঞার (intution) মাধ্যমে, কিম্বা এমন কি যৌক্তিক সারল্য বা সৌন্দর্যের প্রতি আবেদন করে প্রমাণিত করা বা এর বৈধতা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

[১২] Physikalische Zeitschrift (XVII, 1916) 'এ প্রকাশিত আর্নস্ট ম্যাকের ওপর প্রকাশিত আইনস্টাইন লিখিত জীবনগাথা- এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

নীতিসমূহকে 'সত্য' বলে গণ্য করা হবে যদি যৌক্তিক সিদ্ধান্ধ দ্বারা পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত বক্তব্যগুলোকে আহরণ করা সম্ভব, যা প্রকৃত অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে। আইনস্টাইন বেশ দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে বিজ্ঞানের নীতিমালা অর্থাৎ পদার্থবিদ্যার তত্ত্বসমূহে এমন সব অস্ত্র মজুত থাকে যেগুলোর সাহায্যে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতাকে সযত্নে জরিপ করতে পারি। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে এসব অস্ত্র-কৌশল মানবীয় ধীশক্তিরই (human ingenuity) উদ্ভাবন। এ প্রসঙ্গে তিনি পূর্ণসংখ্যার উদাহরণ টেনে উক্তি করেছেন ঃ

> .. .. .. The series of integers is obviously an invention of human mind, a self created tool which simplifies the ordering of certain sensory experiences.[১৩]

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য পথ-পন্থা নিয়ে আমরা আইনস্টাইনের চিন্তাধারার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পরিশিষ্টে তুলে ধরলাম (পরিশিষ্ট-২ দেখুন)।

তবে চুম্বক কথাগুলো হচ্ছে ঃ-

১. প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল আমাদের অভিজ্ঞতাগুলোকে সমন্বিত করা এবং একটি যৌক্তিক পদ্ধতির মধ্যে নিয়ে আসা। যৌক্তিক দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হয় যে বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলো হলো "মনুষ্য মনের মুক্ত সৃজন"।[১৪] বিজ্ঞানীর মেধার 'মুক্ত উদ্ঘাটনের' ওপর গুরুত্ব দিলেও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ভূমিকার কথা তিনি ভুলে যা নি; একই সাথে পরপরই তিনি বলেছেন, " Experince may suggest the appropriate mathematical concepts, but they most certainly cannot be deduced from it." আরও বলেছেন যে, ' কোন গাণিতিক গড়নের ভৌত উপযোগিতার একমাত্র নির্ণায়ক এখনও অবশ্য অভিজ্ঞতা; কিন্তু সৃজনশীল নীতি রয়েছে গণিতের মধ্যেই। এজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে .. .. আমি সত্যি বলে মনে করি যে বিশুদ্ধ চিন্তার মধ্য দিয়েই আমরা বাস্তবতাকে সম্যকভাবে অনুধাবন করতে পারি, যা আমাদের প্রাচীনেরা কল্পনা করেছিলেন।'
২. তত্ত্বীয় পদার্থবদ্যার উদ্ভাবনী তত্ত্বের, মধ্য দিয়েই ভৌত বাস্তবতাকে বোধগম্য করে তোলা যায়। আইনস্টাইন বলেছিলেন যে জগৎ বোধ্য, আর এটি হল সবচাইতে অবাক করা কাণ্ড।[১৫]
৩. আইনস্টাইন ভৌত তত্ত্বের সরলতার ওপর জোর দিয়েছেন: nature is the realization of the simplest conceiving mathematical ideas। উদাহরণ স্বরূপ আমরা ম্যাক্সওয়েলের অনুপম সমীকরণসমূহের কথা অথবা আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের ক্ষেত্র-সমীকরণগুলোর চমৎকারিত্বের কথা উল্লেখ করতে পারি।
৪. তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার অগ্রগতির দিকে মনোযোগ দিলে দেখা যায় যে আমরা জ্ঞানের দুটি আপাত অ-পৃথকযোগ্য উপাংশের মুখোমুখী হয়েছি ঃ অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান এবং যুক্তিসিদ্ধ (rational) জ্ঞান। আইনস্টাইনের মতে, বিশুদ্ধ যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জগতের কোন জ্ঞান আহরণ করা যায় না। তিনি একটি চমৎকার উক্তি করেছেন ঃ "All knowledge of reality starts from experience and ends in it."

---

[১৩] Albert Einstein, *Remarks on Bertrand Russell's Theory of Knowledge*, (Paul A. Schilpps, *The Pgilosophy of Bertrand Russel*, 1944, p 287)

[১৪] Albert Einstein, `On Physical Reality' in *Franklin Institute, Journal*, 121, 1936.

[১৫] 'The most incomprehensible thing about the world is that it is comprehensible.', Albert Einstein, `On Physical Reality' in *Franklin Institute, Journal*, 121, 1936.

প্রশ্ন হল এমন কি কোন নীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যার সাথে সঙ্গতি রেখে ধারণাগুলোর সাথে সংবেদনগুলোর একটি সুসমন্বয়ী নির্বাচন সম্পাদন করা যেতে পারে। এডিংটনের মত বিষয়াশ্রিত দার্শনিক বিজ্ঞানী হয়তো বলতেন 'অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে', কিনতু আইনস্টাইনের উত্তর খুব সম্ভব হবে সুনির্দ্দিষ্ট 'না', কারণ আইনস্টান বারবার দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে 'ধারণা' নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞতা থেকে উদিত হয় না।

দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের এই যে বিশ্বাস যে বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাগুলে মনুষ্য কল্পনাপ্রসূত তা থেকে অনেকেই সিদ্ধান্ত টানতে পারেন যে, আমরা বিজ্ঞানের সুনির্দ্দিষ্ট মৌলিক নীতিমালায় (definitive basic principles) হয়তো কখনও পৌঁছাতে পারব না। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন যেমন পদার্থবিজ্ঞানী এবং 'যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদের' (logical empiricism) প্রধান প্রবক্তা হেনরী পয়ঁকার (Henri Poincare), যে পদার্থবিদ্যায় এ ধরনের কোন 'সঠিক ভিত্তি' কি থাকতে পারে? আইনস্টাইন কিন্তু এসব বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। হার্বার্ট স্পেনসার বক্তৃতায়, ১৯৩৩ সালে, তিনি মন্তব্য করেছেন ঃ

> If it is true that this axiomatic basis of theoretical physics cannot be extracted from experience but must be freely invented, can we ever hope to find the right way? Nay more, has this right way any existence outside our illusion.. .. I answer without hesitation that there is, in my opinion, a right way, and that we are capable of finding it. Our experience hitherto justifies us in believing that nature is the realization of the simplest conceiving mathematical ideas. I am convinced that we can discover by means of purely mathematical constructions the concepts and the laws connecting them with each other, which furnish the key to the understanding of natural phenomena. [16]

যেহেতু তত্ত্বীয় উপাংশটি অভিজ্ঞতা থেকে আহরণ করা যায় না, তাই তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা নিজস্ব কিছু অবদান প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক ধারণাতে রাখতে পারে। এর অর্থ হল বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে দৃষ্টবাদের কোন স্থান নেই কারন দৃষ্টবাদী তত্ত্বানুসারে সকল তত্ত্বীয় তাৎপর্য আমাদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। জ্ঞানতত্ত্বে এর একটি গুঢ় তাৎপর্য রয়েছে কারণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আমাদের বিজ্ঞানের বিষয় ও বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান দেয়, শুধু মাত্র বিষয়াশ্রিত গড়নের (subjective construct) জ্ঞান নয়। এই সিদ্ধান্ত থেকে যে অভিমত বেরিয়ে আসে তা হল বস্তুর স্ব-সত্তা'কে (thing in itself) বৈজ্ঞানিক পন্থায় জানা যায় এবং বৈজ্ঞানিক পন্থায় সেই বস্তুটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারি; যেমন একঝাঁক ইলেকট্রনের ওপর গবেষণাগারে নানা ধরনের পরক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারি – টিভিতে ছবি উৎপাদনে ব্যবহার করি, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে 'আলোক বীম' হিসেবে ব্যবহার করতে পারি, এবং দৈনন্দিন জীবনে ধাতব তারের ভেতর দিয়ে প্রবাহ সৃষ্টি করে বিদ্যুৎ শাক্তি উৎপাদন করি। সুতরাং বিজ্ঞান দাবী করতে পারে যে সে তত্ত্ববিদ্যাকে (ontology) ও জ্ঞানতত্ত্বকে (epistemology) প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মর্যাদায় পুর্নস্থাপন করেছে।

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের দৃষ্টিভঙ্গি

অন্যদিকে বর্হিবিশ্বের বোধগম্যতা নিয়ে প্ল্যাঙ্কের দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা ভিন্ন। আমরা বর্হিজগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, কিন্তু এর অনুসন্ধান করা সম্ভব নয়। পদার্থবিদ্যায় আমরা যে প্রতীকগুলো ব্যবহার করি তা বিশ্বচিত্রের উপাদান যা অনেকটাই স্বেচ্ছাক্রমে নির্বাচিত; বিশ্বচিত্রে পর্যবেক্ষণীয় রাশির স্থান নেই। পর্যবেক্ষণীয় রাশিগুলো অভিজ্ঞতার বিশ্বের অধিবাসী; এই অভিজ্ঞতা নির্ভর বিশ্বের পেছনে রয়েছে প্রকৃত

[১৬] Albert Einstein, *Herbert Spencer Lecture*, in *The World As I see It*, p 36, 1933

বা আসল জগৎ (real world) যা আমরা উপলব্ধি করতে পারি কেবল মাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। প্ল্যাঙ্ক এই 'প্রকৃত জগৎ'কে' মনে করেন 'পরম' (absolute) রূপে, আর এই পরমকেই তিনি পদার্থবিদ্যায় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন – শক্তির এবং এনট্রপি'র পরম মান দিয়ে (absolute value), এমন কি স্থান-কালের পরিমাপন বিষয়েও। প্ল্যাঙ্ক তাঁর আত্মকথায় বলেছেন ঃ

> .. .. In this it is of essential significance that the external world represents something independent of ourselves, something absolute that we are facing, and the search for the laws that hold for this absolute seem to me the most satisfying task for the life's work as a scientist.[১৭]

অভিজ্ঞতার জগৎ ও ধারনাগত জগতের মধ্যে যে ব্যবধান তার সেতুবন্ধনের চেষ্টা অনেকের কাছে মনে হতে পারে কান্টিয় সমাধানের মত। প্ল্যাঙ্ক যখন বলেন যে চিন্তন প্রক্রিয়ার নিয়মসমূহ ইন্দ্রিয়ানুভূত সংবেদনের পথের সাথে মিশে যায়, তখন মনে হয় তা কান্টের সজ্ঞার রূপরেখার ও বিশুদ্ধ বুদ্ধির মধ্যে সেতুবন্ধনের মত – যার ফলে বর্হিজগতের বোধগম্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। এই দুই জগতের মধ্যে আইনস্টাইনের সেতু বন্ধনের প্রয়াস কিছুটা ভিন্নতর– বিষয়টি তিনি ব্যক্তি বিজ্ঞানীর হাতেই ছেড়ে দিতে চান, তবে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে সেতু বন্ধনের যথাযোগ্য পথ খুঁজে অবশ্যই পাওয়া যায়। পথ অনুসন্ধানের যে ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন তা তার একটি উক্তির ভেতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন :

> .. without hesitation there is, in my opinion, a right way, and that we are capable of finding it. Our experience hitherto justifies us in believing that nature is the realization of the simplest conceivable mathematical ideas. I am convinced that we can discover by means of purely mathematical constructions the concepts and the laws connecting them with each other, which furnish the key to the understanding of natural phenomena.[১৮]

অনেকেই অভিযোগ করে থাকেন যে তিনি তাঁর বিজ্ঞানানুসন্ধানে 'বর্হিজগতের বাস্তবতা'কে প্ল্যাঙ্ক যে ভাবে বিবেচনায় এনেছেন সেভাবে আনেন নি। কিন্তু অভিযোগটি সত্য নয়। আইনস্টাইনের উদ্ধৃতি থেকেই তা স্পষ্ট ঃ

> The belief in an external world independent of the perceiving subject is the basis of all natural science. Since, however, sense perception only gives information of the external world or of the physical reality indirectly, we can only grasp the later by speculative means.[১৯]

প্ল্যাঙ্কের উক্তির সাথে এই উক্তির কোন গুণগত ভেদ আছে বলে মনে হয়না। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে আইনস্টাইনের পূর্বানুমতির গুরুত্বপূর্ণ দিক হল কোন ভৌত তত্ত্বের ভিত্তি নির্মাণের একটি

---

[১৭] M. Planck, *Wissenschaftliche Selbstbiographie*, Leipzig, 1948

[১৮] Albert Einstein, 'Clerk Maxwell's influence on the Evolution of the Idea of Physical Reality' in *The World as I see it* , New York, 1934, p 36

[১৯] ঐ, পৃ ৬০

আবশ্যিক শর্ত হওয়া চাই সরলতার নীতি আর এই ভিত্তি থেকে বেরিয়ে আসা পদার্থবিদ্যার যৌক্তিক তত্ত্বটিও ধারণ করবে সারল্য ধর্ম। আসল কথাটি হল একটি ভৌত তত্ত্বের জন্য এক জাতের গণিতকে নির্বাচন করতে হবে যা সামগ্রিকতার সাথে সঙ্গতি রেখে একটি সুসংহত অর্থাৎ সংসক্ত তত্ত্বকে সুন্দরভাবে বর্ণনা দানে সক্ষম। তবে বৈজ্ঞানিক কী ভাবে গবেষণা পদ্ধতি নির্বাচন করেন সে সম্পকে তাঁর শেষ কথা হল ঃ

> If you want to find out anything from the theoretical physicists about the methods they use, I advise you to stick closely to one principle: don't listen to their words, fix your attention on their deeds.[২০]

দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞানের জ্ঞানতাত্ত্বিক পদ্ধতির সাথে দর্শনের পদ্ধতির পার্থক্য রয়েছে – দার্শনিকের জ্ঞান মনোজগৎ নির্ভর, এবং জ্ঞানীর নিজস্ব ভূবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানতত্ত্ব একদিকে যেমন বিশুদ্ধ চিন্তার ফসল তেমনি অভিজ্ঞতা লব্ধ বাস্তব জগতের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। কাজেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কেবল ব্যক্তি জ্ঞানীর অধ্যাত্মীয় (subjective) বিষয় নয়, এই জ্ঞান অতি অবশ্যই মূলত বস্তুগত (objective) ।

ঐ যে আইনস্টাইন প্রায়শ বলতেন ' I hold it true that pure thought can grasp reality, as the ancient dreamed ' – এই উক্তির তাৎপর্য উপরের আলোচনায় নিশ্চয় খানিকটা প্রস্ফুট হয়েছে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষযটির তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করা যাক, সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রসঙ্গ টেনে। আমাদের ভৌত জগৎ একটি চতুর্মাত্রিক সন্ততি (স্থান-কাল) (four dimensional continuum) মাত্র, যা রিম্যান্নীয় বক্র জ্যামিতিক ধর্ম মেনে চলে, ইউক্লিডিয় জ্যামিতি নয়। এই সাধারণ তত্ত্ব থেকে বেরিয়ে আসে যে প্রকৃতির অভিকর্ষ ক্ষেত্র আসলে স্থান-কালের বক্রতার প্রকাশ। স্থান-কালের সাথে প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ অভিকর্ষের সম্পর্ক আইনস্টাইন কী ভাবে স্থাপন করলেন সে সম্পর্কে বলেছেন ঃ

> "If I assume a Riemannian metric in it (space-time) and ask what are the simplest laws which such a metric system can satisfy, I arrive at the relativistic theory of gravitation."

অনুরূপভাবে, মুক্তস্থানে একটি ভেক্টর ক্ষেত্রের উপস্থিতি অনুমান করে তিনি ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ সমূহে উপনীত হয়েছিলেন। স্থান-কাল কোন বিমূর্ত ধারণা নয়, অতি অবশ্য ভৌত বাস্তবতার সাথে সংযুক্ত। সুতরাং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানতত্ত্বে স্থান-কালের গড়ন হল জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক বস্তুরই গড়ন; স্থান-কালের রূপরেখা ভৌত প্রকৃতিতে অবস্থান করে, কোন জ্ঞানীর মস্তিষ্কে নয়।[২১] এ থেকেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি আইনস্টাইনের উক্তিটির তাৎপর্য। আর এখানেই নিহিত রয়েছে কান্টিয় জ্ঞানতত্ত্বের সাথে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানতত্ত্বের পার্থক্য, যিনি বলেন স্থান ও কাল দুটি স্বতন্ত্র সত্তা, উপরন্তু : space and time are

---

[২০] ঐ, পৃ ৩০

[২১] এ প্রসঙ্গে নর্থপ উক্তি করেছেন : .... 'Ultimate basis of space-time in the public, contingent, physical object of knowledge, rather than in the necessary constitution of the epistemological knower ..' (F.S.C Northrop, Einstein's Concept of Science in *Albert Einstein: Philosopher Scientist,* Ed. Paul Arthur Schilpp, The Library of Living Philosopher, Inc., Evaston, Illinois, 1949)

empirically real, but transcendtlly ideal ' । এবং স্থান ও কাল সম্পর্কে এই ধারণা মানব মনে পূর্ব থেকেই প্রোথিত (a priori) । এই অর্থে আইনস্টাইনসহ সকল বিজ্ঞানীই অকান্টবাদী ।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের তাত্ত্বিক উপাদানটি যে মনুষ্য মেধার 'মুক্ত উদ্ভাবন' এ কথটি উল্লেখ কালে আইনস্টাইন নিউটনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছিলেন যে, 'নিউটন, তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার ব্যাপক এবং কার্যকর পদ্ধতির স্রষ্টা হযেও, বিশ্বাস করতেন যে তাঁর পদ্ধতির মৌলিক ধারণাসমূহ এবং নিয়মাবলী অভিজ্ঞতা থেকে বের করে আনা যায় । সন্দেহ নেই এটিই হল তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি ' hypotheses non fingo (I feign no hypotheses).. .. 'র তাৎপর্য । ' আইনস্টাইন খেদের সাথে বলেছিলেন যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিউটোনীয় সিসটেমের অভূতপূর্ব সাফল্য স্বয়ং নিউটন ও সমকালীন বিজ্ঞানী ও দার্শনিককুলকে নিউটোনীয় পদ্ধতির ভিত্তির কল্পনিক চরিত্রকে বুঝতে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল । ্উপরন্তু সেকালের প্রাকৃত দার্শনিকেরা (natural phiosopher) বিশ্বাস করতেন যে পদার্থবিদ্যার মৌলিক ধারণাসমূহ ও স্বীকার্যসমূহ যৌক্তিক বিবেচনায় মনুষ্য মেধার 'মুক্ত উদ্ভাবন' হতে পারে না; বরং নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞকা থেকে আহরণ করা যেতে পারে ।

নিউটন তাঁর বৈজ্ঞানিক পন্থার যে পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর নীচের উক্তি থেকে বেরিয়ে আসে ঃ

> I have not as yet been able to discover the reason for these properties of gravity from phenomena, and I do not feign hypotheses. For whatever is not deduced from the phenomena must be called a hypothesis; and hypotheses, whether metaphysical or physical based occult qualities or mechanical, have no place in experimental philosophy. In this philosophy particular propositions are inferred from the phenomena, and afterwards rendered general by induction.[২২]

বোঝাই যাচ্ছে আাইনস্টাইনের বিপরীতে নিউটন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আরোহী পথ অনুসরণের পক্ষপাতী যার শুরুটা হবে প্রতিভাস থেকে, যদিও তিনি কিন্তু অবরোহী পদ্ধতিই প্রয়োগ করেছেন ।

অজ্ঞেয়বাদ, সংশয়বাদ এবং ঈশ্বর বিভ্রান্তি

এতক্ষণ বিজ্ঞানের ধর্ম নিয়ে যে আলোচনা করলাম তা বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ অঙ্গনে নিজেকে বন্দী রেখে । এ আলোচনা থেকে এটি প্রতীয়মান হয়েছে যে বিজ্ঞান গবেষণায় অলৌকিকতা, অধিবিদ্যা বা অধ্যাত্মবাদের এবং পরম সত্তার কোন স্থান নেই । কিন্তু শুধু বিজ্ঞান নিয়েই তো মনুষ্য জীবন নয় । এ জগতের বাইরে রয়েছ অধ্যাত্মবাদ, ঈশ্বরবাদ, ভাববাদ, অধিবিদ্যা ও ধর্মের জগৎ । এ জগতের সাথে বিজ্ঞানর জগতের মিথষ্ক্রিয়া ঘটা স্বাভবাবিক । ভাবলোকের বাসিন্দারা তারা; প্রতীচ্য বা প্রাচ্য যে দার্শনিক পথের অনুসারীই হন, তাদের সার কথাটি হল 'ভৌত বাস্তবতা বা বস্তু জগৎ বলে কিছু নেই, বস্তু জগৎ বলে যা প্রতীয়মান হয়, তা আসলে মনোজগতের সুষ্টি, সেখানেই তার অস্তিত্ব । নাগার্জুন তো আরও এক ধাপ এগিয়ে বললেন মনোজগৎ বলেও কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই । সব শূন্য । ঈশ্বরবাদী বা ধর্মবাদীরা, অন্যদিকে, এক ধরনের ইহজগতে বিশ্বাসী । এরা প্রায় সবাই ঈশ্বর নামের একটি পরম সত্তায় বিশ্বাসী,

[২২] Sir Isaac Newton, Philosophiae Naturalis Principia, 1687

যিনি সৃষ্টির অতীত, স্বয়ম্ভু , সর্বব্যাপী এবং সকল ক্ষমতার আধার ।[২৩] ইনি চরিত্রে ব্যক্তি ঈশ্বর, মানুষের ভাল মন্দের বিচারক, ভাল কাজে পুরস্কার ও মন্দ কাজে শাস্তি দেন । কিন্তু মুস্কিল হল এই সর্ব ক্ষমতা সম্পন্ন সৃষ্টি কর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে তাঁদের অনুসারীরা পারেন না । ভাববাদী ভুয়া দর্শনের যুক্তি, তাঁর অলৌকিত্ব, ধমক ভয় ভীতি এবং পরকালে পুরস্কারের লোভ দেখিযেও যখন ধর্মবাদীরা তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণে ব্যর্থ হলেন তখন তাঁরা একদল ছদ্মবেশী বৈজ্ঞানিকের আশ্রয় গ্রহণ করলেন । এই কেনা বিজ্ঞানীরা 'ইনন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' ও 'ফাইন টিউনিং' নামের অপবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের নামে ঈশ্বরের আস্তিত্ব প্রমাণে আদা জল খেয়ে মাঠে নামলেন । কিন্তু ধোপে টিকল না । এরা বিজ্ঞানের জগতে ঠাঁই পেল না । [২৪] এখন প্রশ্ন হল বৈজ্ঞানিকভাবে বা দার্শনিক কোন পদ্ধতিতে কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় ? ভাববাদী দর্শনে এ চেষ্টা নফল হয় নি, যদিও ভুরি ভুরি কথার ফুলঝরি ছেটান হয়েছে । একদল দার্শনিক বলে থাকেন আমরা যে ঈশ্বর সম্বন্ধে অনুভব করছি, বিশ্বাস করি বা না করি, এটিই ঈশ্বর-স্থিতির প্রমাণ । তাঁরা যুক্তি দেন যে কোন কিছুর অস্তিত্ব না থাকলে মানুষের চেতনায় বা মনে স্থান পেত না । কিন্তু এ ধরণের কথা দিয়ে বিজ্ঞানমনস্ক বা যুক্তিবাদী মানুষকে বোঝান শক্ত । এর বিপরীতে রয়েছেন, নিরীশ্বরবাদীরা ছাড়াও, অজ্ঞেয়বাদী ও সংশয়বাদীরা ।

অজ্ঞেয়বাদ কী - এ প্রশ্নের সূত্র ধরে বলা যায় বস্তুবাদী দর্শনে অজ্ঞেয়বাদ হল একটি দার্শনিক চিন্তা পদ্ধতি । এই দর্শন মতে, "বস্তুজাগতিক ঘটনার বাইরে কোন কিছু জানা যায় না, - অর্থাৎ প্রথম কারণ এবং অদৃশ্য জগৎ আমাদের কাছে অজানা (unknown) এবং আপাত দৃষ্টিতে অজ্ঞেয় (unnowable)" । এই মতবাদকে বলা হয়ে থাকে অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism) এবং এর অনুসারীরা হলেন অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) । ধর্মের দৃষ্টিকোন থেকে বলা যেতে পারে ঈশ্বর বা ইহজগতের বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন কিছুই জানা অসম্ভব - এ মতবাদকে বলা হয়ে থাকে অজ্ঞেয়বাদ । ঈশ্বর আছেন কি না, পরলোক ও স্বর্গ নরক আছে কিনা – এ ধরণের প্রশ্ন তোলা অবান্তর । সুতরাং আধিভৌতিক জগৎ সম্পর্কে আলোচনা নিরর্থক । কারণ এ সবই ভৌত বাস্তবতার কাঠামোর বাইরের । ঈশ্বর সম্পর্কে অজ্ঞেবাদীদের বক্তব্য জে জে রামানেস ভাষায় (G J Ramanes) চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে, যার সার কথা হল বর্তমানে বিদ্যমান সাক্ষ্যের আলোকে ঈশ্বর নামক সত্তা একটি অজ্ঞেয় সত্তা [২৫] ।

শুধু ঈশ্বর বা পারলৌকিক বিষয় নয়, এমন কি কোন পার্থিব ঘটনাও বিদ্যমান তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বুঝতে পারি না, যতক্ষণ না ঐ ঘটনা সম্পর্কে পর্যাপ্ত নতুন তথ্য অর্জিত হচ্ছে সেটি আমাদের কাছে অজানাই থেকে যাবে । বিজ্ঞান কোন কিছুকেই পরম সত্য বা পরম জ্ঞান বলে মনে করে না, বিনা প্রমাণে ও সাক্ষ্যে বিজ্ঞান কোন কিছুকে গ্রহণও করে না । নতুন নতুন তথ্য আহরণ-সংযোজন, সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ, তত্ত্ব পরিশোধন-মার্জিতকরণ – এ ভাবেই বিজ্ঞান অগ্রসর হয় নতুন জ্ঞানের প্রতিষ্ঠায় যুক্তি

---

[২৩] এখানে ঈশ্বর শব্দ দিয়ে শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মের ঈশ্বর ধারণাকে বোঝান হয় নি । এ শব্দ দিয়ে গড, আল্লঅহ্তালা এবং হিন্দু ধর্মের স্বগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ 'ঈশ্বর'কে বোঝান হয়েছে । এরা সবাই পরম ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ঈশ্বর (personal God) ।

[২৪] 'বুদ্ধিদীপ্ত নকসা ঃ যুক্তরাষ্ট্রে সৃষ্টিতত্ত্বের বিবর্তন' - অভিজিৎ রায় ও বন্যা আহমেদ, মুক্তান্বেষা, প্রথম বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃ ৫১, ২০০৮; 'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন নিয়ে কুটকাচালি' - অভিজিৎ রায়, স্বতন্ত্র ভাবনা (অজয় রায় সম্পাদিত), পৃ ১০৭, চারদিক, ঢাকা, ২০০৮; আরও দেখুন, আলো হাতে আঁধারের যাত্রী' – অভিজিৎ রায়, অঙ্কুর প্রকাশনা, পরিবর্ধিত ও সংশোধিত সংস্করণ, ২০০৬ ।

[২৫] By agnosticism, I understand a theory of things which abstains from either affirming or denouncing the existence of God; all it undertakes to affirm is that, upon existing evidence, the being God is unknowable. - G J Ramanes

বাদিতা ও মননশীলতাকে আশ্রয় করে। একে যদি কেই 'সংশয়বাদ' বলতে চান বলতে পারেন। সংশয়বাদিতা কি ? সংশংবাদের (skepticism) সাথে যুক্তির নিবিড় সম্পর্ক যেমন রয়েছে বিজ্ঞানের সাথে। তার আগে যুক্তিবাদ (rationalism) কী এ নিয়ে দু'চার কথা বলা যাক। আমার দৃষ্টিতে র‍্যাশনালিজম কোন বিশ্বাস বা ডকট্রিন নয়। এটি হল কারণ (reason), যুক্তি (logic) ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে সত্যে উপনীত হওয়ার বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি (system)। দর্শনে অবশ্য চিরায়ত যুক্তিবাদের আনুষ্ঠাণিক সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, যেমন ঃ

১. `The principle or practice of accepting reason as the only authority in determining one's opinion or course of action.'
২. In philosophy, the theory that the reason or intellect, is the true source of knowledge, rather than sensess.
৩. In theology, the doctrine that rejects that revelation and the supernatural, and makes reason the sole source of knowledge.

সুতরাং যুক্তিবাদের মূলে রয়েছে 'কারণ বা যুক্তি' (reason) ও বুদ্ধিমত্তা (intellect)। সংশয় ও জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধিৎসা (free inquiry) যুক্তিবাদিতার পশ্চাতে চালক শক্তি। সংশয় ব্যতিরেকে আপাত সত্য বা ঘটনাকে গ্রহণ না করার নীতিকেই বলা হয়েছে সংশয়বাদ এবং এর অনুসারীদের বলায় সংশয়বাদী (skepticist)। সংশয় ব্যতিরেকে কোন কিছু, যা আপাত দৃষ্টিতে যত দুর্বোধ্যই হোক, গ্রহণ করা জন্ম দেয় বিশ্বাসের। আর প্রশ্নাতীত বিশ্বাস ঠেলে দেয় অন্ধ মূঢ়তার দিকে। কোন ঘটনা সম্পর্কে, তা তথাকথিত দৈবই হোক বা পার্থিব হোক, 'জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন করা' রচনা করে বিশ্লেষণী পদ্ধতির ভিত্তি যা থেকে জন্ম নেয় যুক্তিবাদিতা।

ঈশ্বর বিশ্বাসের দিক থেকে মনুষ্য শ্রেণীকে দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যার এক প্রান্তে রয়েছে ব্যক্তি ঈশ্বরবাদীরা, অর্থাৎ আস্তিকেরা (theist) এবং অন্য প্রান্তে রয়েছে নাস্তিক বা নিরীশ্বরবাদীরা (atheist)। এর মাঝামাঝিতে অবস্থান করেন অজ্ঞেয়বাদী ও সংশয়বাদীরা। এ ছাড়াও রয়েছেন প্রত্যাদেশ বিরোধী ঈশ্বর বাদীরা (deist) - যারা অতিপ্রাকিত এক বুদ্ধিমত্ত সত্তায় বিশ্বাসী, তবে তিনি এমন এবটি সত্তা যিনি কেবল মহাবিশ্ব সৃষ্টি আর তার পরিচালন নীতি তৈরী করে দিয়ে নিশ্চুপ রয়েছেন, অন্য কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না; রয়েছে সর্বেশ্বরবাদীরা (pantheist), যারা অতিপ্রাকৃত ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, তবে প্রকৃতির 'নাতিপ্রাকৃত সমার্থক' শব্দ রূপে (super natural synonym) তাঁরা 'ঈশ্বর' শব্দটি অনেক সময় ব্যবহার করে থাকেন। এক কথায় বলা যায় 'সর্বেশ্বরবাদ হল 'প্রমত্ত নাস্তি কতার' এক কাব্যময় প্রকাশ, আর প্রত্যাদেশ বিরোধী ঈশ্বরবাদ হল জল দিয়ে তরলকৃত আস্তিকতা।'

ধর্মে অবিশ্বাসের প্রশ্নে অনেকেই, যেমন পল কার্জ, উগ্র নাস্তিকতার পরিবর্তে সংশয়বাদ শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। তিনি মনে করেন সংশয়বাদ শব্দটি 'অজ্ঞেয়বাদ ও নাস্তিকতাবাদের' চাইতে অনেক বেশী ব্যাপক এবং নির্মল। ঈশ্বরের ওপর আরোপিত নানা অতিন্দ্রীয় গুণাবলী ও তাঁর অস্তিত্বের পক্ষে ঈশ্বরবাদীরা যে সব তথ্য ও সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করেন তা সংশয়বাদীদের কাছে যথেষ্ট নয়। এ কারণে তারা বলতে পারেন যে বিদ্যমান প্রমাণের প্রেক্ষিতে ঈশ্বর একটি অজানা সত্তা এবং অজ্ঞেয়। এই অর্থে সংশয়বাদী অবশ্যই একজন অজ্ঞেয়বাদী, তবে তফাৎটা হল সংশয়বাদী আলোচনার দরজাটা বন্ধ করে দেন না। আরও নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হোক, তখন ভাবা যাবে।

যেহেতু বিদ্যমান তথ্য প্রমানের সাক্ষ্য অপ্রতুল সে ভিত্তিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে মানা যায় না। নে দৃষ্টিতে দেখলে সংশয়বাদীকে অবশ্যই নাস্তিক বলা যেতে পারে। এখন ঈশ্বর প্রমাণের দায়ভাগ বর্তায় আস্তিক্যবাদীদের ওপর। কিন্তু আমি যদি নিজেকে নিরীশ্বরবাদী বলে ঘোষণা করি তা প্রমাণের দায়িত্ব আমার ওপর বর্তায়। সে দিক থেকে পল কার্জের মতে সংশয়বাদী বলা অনেক নিরাপদ ও প্রাসঙ্গিক। [২৬] এতে প্রমাণিত হয় যে সংশয়বাদ অনুসন্ধান ও গবেষণার ওপর অনেক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

এখন দেখা যাক পদার্থবিদ্যা কি ইশ্বরের বা অন্য কোন অধিবিদ্যাগত বা অতিন্দ্রীয় সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণ দিতে পারে কি না। আমাদের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট য়ে, পদার্থবিজ্ঞান এদিক থেকে অজ্ঞেয়বাদের কাছাকাছি। আমরা ইতোপূর্বেই দেখিয়েছি যে পদার্থবিদ্যা অজ্ঞেয়বাদের মত কিছু অসম্ভভ্যতার নীতি প্রতিষ্ঠা করেছে। এর মধ্যে একটি হল যে কোন ভৌত কাঠামোয় সম্পাদিত ভৌত পরীক্ষণ দিয়ে ভৌত জগতের কোন 'পরম রাশি' নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ঈশ্বর ধারণা শুধু পরম সত্তা নয়, ধার্মিকেরা দাবী করেন যে এই সত্তা স্থানকালের সীমায় আবদ্ধ নয়, অর্থাৎ এর অস্তিত্ব এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে। আমাদের মহাবিশ্বের বাইরে অন্যকোন মহাবিশ্বের তিনি বাসিন্দা কিনা তা অবশ্য ধর্মবিদরা পরিষ্কার করে বলেন না। কোরানে আল্লহ্‌তালার অবস্থান সম্পর্কে একাধিক আয়াতে উল্লেখ আছে, যেমন সুরা এরাফে বলা হচ্ছে, "আল্লাহ্ তোমার প্রভু। তিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। পরে তিনি আরশে সমাসীণ হন। .. .. .. " (সুরা সরা এরাফ ৭/৫৪)। আসমান অর্থ আকাশ বা শূন্যস্থান – এখানে হয়তো মহাবিশ্বকে বোঝান হয়েছে। বাংলা একাডেমীর অভিধানে আরশ শব্দের অর্থ করা হয়েছে সর্বব্যাপী খোদার আসন, বেহেশতের উচ্চতম আসন ...। এই আসনের অবস্থান স্পষ্ট না হলেও তাঁর সৃষ্ট জগতের বাইরে যে অবস্থান তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর দ্বিতীয় অর্থটি ধরা হলে এই আসন আমাদের চেনা মহাবিশ্বের বাইরে বেহেশত নামক কল্পলোকে। সুতরাং আল্লহতালা আমাদের মহাবিশ্বের র‍্যামেনিয় জ্যামিতিক নিয়ম মেনে চলা বক্র স্থানকালের বাইরে। অতএব পদার্থবিদ্যার পরীক্ষনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাবে না, সুতরাং একজন পদার্থদিদের দৃষ্টিতে তিনি এক অজ্ঞেয় সত্তা।

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে বিজ্ঞানের জগতে কী ঈশ্বর বা অতিন্দ্রীয় কোন সত্তার অস্তিত্ব নেই? এর সহজ উত্তর, না নেই। তবে কোন বিজ্ঞানী ব্যক্তি জীবনে যে কোন ধর্মের অনুসারী হতে পারেন, ঈশ্বরকে পূজো বা আরাধনা করতে পারেন। অবার অনেক বিজ্ঞানী আছেন যারা নিরিশ্বরবাদী। বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। 'বিজ্ঞানীর ধর্ম' নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ ভবিষ্যতে লেখার ইচ্ছে আছে। প্রসঙ্গত শুধূ দু'চার কথা বলব।

অধিকাংশ বিজ্ঞানীই হয় প্রকৃতিবাদী, অজ্ঞেয়বাদী বা সংশয়বাদী। নিউটন বাববেলীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন, নিউটনের সমসাময়িক জার্মান গণিতজ্ঞ দার্শনিক গটফ্রেইড লেইবিনজ(Gottfried Leibniz)ও ছিলেন কট্টর রক্ষণশীল ধর্মবাদী। নিউটনের বলবিদ্যাকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি, একে উদ্দেশ্যবাদী নীতি (telelology) দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছিলেন। [২৭]

---

[২৬] 'কেন আমি সংশয়বাদী' - পল কার্জ, মুক্তান্বেষা, প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ ১২, জপনুয়ারী ২০০৮। ইংরেজী প্রবন্ধ ' Why I am Skeptic ' এর বঙ্গানুবাদ; অনুবাদ করেছেন জাহেদ আহমদ

[২৭] The doctrine that the existence of everything in nature can be explained in terms of purpose. এবং এই উদ্দেশ্য ঈশ্বর প্রণাদিত। Baruch Spinoza, *Tractatus Theologico-Politicus,* 1670; Short Treatise on God Man and His well being (English translation: A. Wolf), London, 1910

অন্যদিকে অস্টাদশ শতকের খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ ও পদার্থবিদ ল্যাপলাস ছিলেন ঈশ্বর সম্পর্কে উদাসীন, অনেকটা আইনস্টাইনের মতই। শুধু ধর্ম বিশ্বাসে নয় বিজ্ঞানের নীতির ব্যাপারেও তার সাথে আইনস্টাইনের নীতির বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ

> If men were restricted to collecting facts the sciences were only a sterile nomenclature and he would never have known the great laws of nature. It is in comparing the phenomenon with each other, in seeking to grasp their relationships, that he is led to discover these laws.[২৮]

এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাথে আইনস্টাইনের চিন্তার কি অদ্ভুত মিল।

এরও আগে সপ্তদশ শতাব্দীর ওলন্দাজ দার্শনিক-বিজ্ঞানী বারুচ স্পিনোজার (Baruch Spinoza) মতে ঈশ্বরের প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পন ও অচলা ভক্তিই (Obedience and piety) হল সকল ধর্মের মূল নীতি; ধর্মের বাকী সব কিছুই এ থেকে বেরিয়ে আসে। প্রচলিত অর্থে স্পিনোজা ধর্মবিশ্বাসী নন- তাঁর ধর্মবিশ্বাস অনেকটা সর্বেশ্বরবাদের (pantheism) অনুরূপ, প্রকৃতির মধ্যেই তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ খুঁজে পেতেন; সেই অর্থে তাঁর ঈশ্বর হলেন প্রকৃতি-ঈশর (Nature God)। এ কারণেই প্রকৃতিবাদী বিজ্ঞানী ও উদারমনা মানুষের তিনি প্রিয়পাত্র। জ্ঞানতত্ত্বের দৃষ্টিতে স্পিনোজা ছিলেন সম্পূর্ণরূপে দার্শনিক বা বিজ্ঞানী। নীচের উক্তি থেকেই তার প্রমাণ মেলে ঃ

> Philosophy has no end in view save with truth; faitk looks for nothing but obedience and piety. [২৯]

আইনস্টানীয় বিশ্বাসও স্পিনোজার বিশ্বাসের কাছাকাছি– আর এ কারণেই আইনস্টাইন উক্তি করেছিলেন যে তিনি এমন এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি যিনি মানুষের কাজকর্ম বা ভালমন্দ নিয়ে মাথা ঘামান না, কিন্তু প্রকৃতির ঐক্যতানের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন।[৩০]

এ কথা অবশ্য মেনে নিতে হবে যে, উনবিংশ শতাব্দীর খ্যতনামা বিজ্ঞানীদের মধ্যে অধিকংশই ছিলেন প্রচলিত অর্থে ধর্ম বিশ্বাসী – এই তালিকায় রয়েছেন খ্যাতনামা পরীক্ষণবিদ মাইকেল ফ্যারাডে, তাত্ত্বিক পদার্থদি ক্লাক ম্যাক্সওয়েল, ব্রিটিশ পদার্থবিদ উইলিয়াম উইলসন, জে জে থমসন (লর্ড কেলভিন), লর্ড রাদারফোর্ড প্রমুখ। সামপ্রতিক কালের কথায় আসা যাক। ১৯৯৮ সালে নেচার কর্তৃক চালিত একটি সমীক্ষার ফলাফলে দেখা গেল যুক্তরাষ্ট্রের অভিজাত বিজ্ঞানীদের মধ্যে (ন্যাশনাল একাডেমিক অব সায়েন্সের সদস্য) মাত্র ৭% ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাসী। ২০.৮ শতাংশ বিজ্ঞানী নিজেদের অজ্ঞেয়বাদী

---

[২৮] *Exposition du systeme du monde; Pierre-Simon Laplace*, http://www-history:mcs.st-andews.ac.uk/Biograhies/Laplace.html

[২৯] Baruch Spinoza, *Tractatus Theologico-Politicus*, 1670; Short Treatise on God Man and His well being (English translation: A. Wolf), London, 1910

[৩০] I believe in Spinoza's God who reveals himself in the ordinary harmony of what exists, not in a God who concerns himself with fates and actions of human beings.

(agnostic) বলে অভিহিত করেছেন। বাকীরা বিপুলভাবে নিরিশ্বরবাদী, অন্ততঃ বাইবেলীয় ঈশ্বরবাদের নিরিখে – অর্থাৎ ৭২.২ শতাংশ সরাসরি নাস্তিক বা ঈশ্বরে বিশ্বস করেন না। [৩১] এ ফলাফলে অবাক হবার কিছু নেই কারণ প্রকৃত বিজ্ঞান সাধকের এ ছারা গত্যন্তর নেই। বিরাশী বছর আগে ১৯১৬ সালে সকল শ্রেনীর বিজ্ঞানীদের (জীববিজ্ঞানী, পদার্থাবদ, গণিতজ্ঞ ..) ওপর চালিত সমীক্ষাতেও দেখা গিয়েছিল যে ব্যক্তি ঈশ্বর ভিত্তিক ঈশ্বরবাদে (theism) ঈশ্বরে বিশ্বাসীর সংখ্যা ছিল ৪০%। যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের উন্নতিতে এ সংখ্যা যে ক্রমশ হ্রাসমান তা ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালের সমীক্ষাগুলোতে ধরা পড়েছে। আমাদের কালে প্রখ্যাত কয়েকজন বিজ্ঞানী-দার্শনিকদের মধ্যে নাস্তিক্যবাদের প্রতিভূ হলেন রিচার্ড ডকিন্স - যিনি খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, সৃষ্টিশীল বিজ্ঞানী হতে হলে তাঁকে অবিশ্বাসী হতেই হবে, [৩২] ভিক্টর স্ট্রেংগার [৩৩], সংশয়াদের পল কার্জ এবং ব্যক্তি বাবইবেলীয় ঈশ্বর বিশ্বাসীদের মুখপাত্র হয়ে দাড়িয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র শাখার সরকারী 'হিউম্যান জেনোম প্রকল্পের' (Human Genome Project) খ্যাতনামা জীব বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস এস কলিন্স। [৩৪] সাথে পেয়েছেন বেশ ক'জন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আর্থার পিকক (Arthur Peacocke)।

কিন্তু ঈশ্বরবাদী কলিন্স নিজে ডারউইনিজমে বিশ্বাসী যখন তিনি বলেন – " Science reveals that the universe, our own planet, and the life itself are engaged in an evolutionary process. " এমন কি বিবর্তনের পক্ষে এমন কথাও বলেছেন, " .. .. in my view evolution might have been God's elegant plan for creatin humankind. .."। কলিন্সের মধ্যে ধর্ম ও বিজ্ঞানের বৈপরত্যের ঘটেছে অদ্ভুত এক সংমিশ্রণ। ধর্মবিশ্বাসী হয়েও যে সত্যিকার অর্থে নিষ্ঠাবান বিজ্ঞানী হওয়া যায় কলিন্স তাঁর দৃষ্টান্ত। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার দু'জন শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় শিক্ষকের কথা উল্লেখ করতে চাই- যাদের কাছে আমি পদার্থবিদ্যার পাঠ গ্রহণ করেছি। এদের মধ্যে একজন অধ্যাপক সুশীল চন্দ্র বিশ্বাস– যিনি ছিলেন একাধারে নিষ্ঠাবান গবেষক ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। তিনি সেই ত্রিশের দশকে রসায়ন পদার্থবিদ্যার গবেষণায় ছিলেন পথিকৃৎ, ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু নিয়মিত ধ্যান-ধারনা করতেন। অন্যজন আমার প্রিয় শিক্ষক নব্বই উর্দ্ধ অধ্যাপক ইন্নাস আলী, আমাদের দেশের সবচাইতে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত পদার্থবিদ, যার হাত ধরে গবেষণাগারে উচ্চতর গবেষণায় প্রবেশ করেছিলাম, কিন্তু একনিষ্ঠ কোরানিক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। নিজের জীবনের অর্জনকে দেখেছেন ঈশ্বরের মহিমাদীপ্ত প্রকাশ হিসেবে, যে অভিজ্ঞতার কথা তিনি প্রকাশ করেছিলেন "Revealing the Glory of God in my Life"।[৩৫] কলিন্সের মতই ধর্মবিশ্বাস তাদের বিজ্ঞান সাধানায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় নি। ভাবতে অবাক লাগে বৈ কি। বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস নিয়ে কোন অর্থবহ অনুশীলন হয়েছে বলে আমার জানা নেই, তবে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটি বিরাট সংখ্যক ঈশ্বর বিশ্বাসী। পরিচিত সহকর্মীদের মধ্যে অবশ্য বেশ য়েকজন রয়েছেন যাঁরা কোন ধরনের ঈশ্বরেই বিশ্বাস করেন না। এখানকার কিছু অপবিজ্ঞানী 'বিজ্ঞান ও ধর্মের ককটেল' বানিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোতে তা বল্গাহীনভাবে প্রচারিত হচ্ছে।

---

[৩১] E. J. Larson and L. Witham, 'Leading Scientists still reject God, *Nature*, **394**, 1998, 313

[৩২] Rnchard Dawkins, *The God Delusion*, Bantam Press, Lomdon, 2006

[৩৩] Victor J Strenger, *Has Science found God ?* ...., New York: Prometheus Books, 2003

[৩৪] Francis S. Collins, *The Language of God*, Free Press, New York, 2007

[৩৫] M. Innas Ali, *Revealing the Glory of God in my Life*, Asiatic Civil Military Press, Bangladesh, 1997

একটি গুরুতর প্রশ্নের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার এ প্রবন্ধটির ইতি টানতে চাই। মাস কয়েক আগে আমাদের দেশের খ্যাতনামা দার্শনিক শহীদ অধ্যাপক ড. গোবিন্দ দেবের বৈদান্তিক দর্শন নিয়ে আলোচনার জন্য প্রধান অতিথি হিসেবে আমাকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল। সমবেত দার্শনিক বন্ধু ও সহকর্মীদের কাছে আমি একটি প্রশ্ন রেখেছিলাম, "ধর্ম ও ধর্মশাস্ত্রোক্ত 'সত্যের' সাথে 'বৈজ্ঞানিক সত্যের' অমিল বা সংঘর্ষ (conflict) বাধলে তখন একজন দার্শনিক হিসেবে আপনার অবস্থান কোথায় হবে ? আপনি কি বৈজ্ঞানিক সত্যকে অস্বীকার করবেন ?"

বাইবেলীয় বা কোরানের ঈশ্বরবাদীদের কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে মুহূর্ত বিলম্ব হবে না, যেমন বাইবেলীয় ঈশ্বরবাদী হেনরি মোরিস দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা দিয়েছেন ঃ

When science and the Bible differ, science has obviously misinterpreted its data.[৩৬]

বেশ কয়েকমাস আগে কোন একটি ইন্টারনেট ফোরামে প্রকাশিত " Science and Quran " প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়ায় একাধিক পত্রলেখক মত প্রকাশ করেছেন যে কোরান ও বৈজ্ঞানিক সত্যের মধ্যে বিরোধ বাধলে তারা কোরানের মতকেই প্রধান্য দেবে, কারণ বিজ্ঞান শূন্য থেকে কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, অন্য দিকে আল্লাহাতালা সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন 'কোন কিছু না' (nothingness)। অজ্ঞানতার কথা বেশ দৃঢ়তার সাথে প্রচার করতে আমরা মোটেই দ্বিধাগ্রস্ত হই না।[৩৭] এই হল আমাদের বিজ্ঞান সাধানার পরিনতি।

০০০০ ০০০০ ০০০০

পরিশিষ্ট ১

অসঙ্গ ও নাগার্জুনের ভাববাদী দর্শন

ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিকেরা বিজ্ঞান বলতে বুঝাতে চেয়েছেন ঈশ্বরানুভুতি সম্পর্কে যে তত্ত্বজ্ঞান– বিশেষ জ্ঞান বা পরোক্ষ জ্ঞান তাই হল বিজ্ঞান। প্রাচীনেরা যে অর্থে বিজ্ঞান বুঝেচেন তা হল ভাববাদী চরম বা পরম জ্ঞানকে। বেদান্ত বাদীদের মতে এই জ্ঞান হল 'ব্রহ্মজ্ঞান'। অন্যদিকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দৃষ্টিভঙ্গীতে হাতে বিজ্ঞান দর্শন গড়ে উঠেছে তার নাম 'বিজ্ঞানবাদ' যার সাথে বেদান্তবাদীর দেখার পার্থক্য রয়েছে। বিজ্ঞানবাদীদের মতে আমাদের কাছে যে দৃশ্যমান বস্তু তা মনোজগতে সৃষ্ট একটি ভাব মাত্র এর বাহ্যিক কোন অস্তিত্ব নেই। হীনযানীদের দর্শন চিন্তায় বলা হয়েছে 'বস্তুর প্রত্যক্ষ অস্তিত্ববোধই হল জ্ঞান', পরবর্তী ধাপে আর একটু এগিয়ে বলা হয়েছে যে 'ধারণার মধ্য দিয়ে সত্যের বোধ লাভ করা যায়'। এর ফলে ভাববাদের দিকে বৌদ্ধ দর্শন আরও এগিয়ে গিয়ে মন ও বস্তুর মধ্যে এক ধরনের কুয়াশা বা যবনিকার অন্তরাল সৃষ্টি করেছে, কিছুটা মিস্টিক বা রহস্যবাদেরও। অন্যদিকে মহাযানী দার্শনিকেরা এই পথে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন 'আমরা যে বস্তু সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করি তা হল ভাব থেকে উদ্ভূত একটি প্রতিলিপি (replica), যার পশ্চাতে বস্তুর কোন প্রকৃত বা বাহ্য অস্তিত্ব নেই, থাকতে পারে না।' অন্যভাবে বলা হয়েছে, 'বাহ্য জগৎ বলে কিছু নেই, যা

---

[৩৬] H. R. Moris, *The Long War Against God,* New York: Master Books, 2000

[৩৭] শূন্য থেকে কী ভাবে প্রকৃতিতে জড়ের সৃষ্টি হয় তা জানতে হলে দেখুন, '*আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী*', পৃ ৯১ - ৯৬, অভিজিৎ রায়, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, পরিবর্ধিত ও নংশোধিত সংস্করণ, ২০০৬। এছারা দেখুন, " *Has Science Found God* ...., by Victor J Stenger, Prometheus Books, 2003 "

আছে তা মনোজগৎ মানুষের মস্তিষ্কে যার স্থিতি।' সকল অভিজ্ঞাতাকে বলা হয়েছে 'মনের মধ্যে পরম্পরাক্রমে সজ্জিত ধারণা মাত্র'। এই হল বিজ্ঞানবাদীদের মূল কথা।

বিজ্ঞানবাদের মূল প্রবক্তা অসঙ্গ হলেও এই দর্শনকে পরিপক্ক করে তুলেছেন বসুবন্ধু, শান্তরক্ষিত প্রমূখ। অসঙ্গের মতে আমাদের জ্ঞানের অবলম্বন বা উপাত্ত যদি বর্হিবস্তু থেকে আসে, তাহলে আমাদের মনে যে ছাপ পড়ে সেই ছাপটি (impression) ও বর্হিবস্তু এক হতে পারে না। এই ছাপটি তো বর্হিবস্তুর প্রতীক মাত্র। মনোজগতে সৃষ্ট এই ছাপ থেকে বাহ্যজগতের অস্তিত্বের কথা যে অমরা বলি তা শুধু কল্পনা। আর যদি সত্যি সত্যিই বর্হিজগতের অস্তিত্ব থাকে তা আমাদের জানবার উপায় নেই। যদি প্রশ্ন তোলা হয় যে আমাদের মনোজগতে যে ভাব বা ছাপের সৃষ্টি হয় তার পশ্চাতে কোন একটি হেতু)তো থাকা চাই, তার উত্তরে অসঙ্গবাদীরা বলে থাকেন বর্হিবস্তুই যে ঐ হেতু বা কারণ হতে হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাদের মতে বস্তু সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যে ধারণা বা কনসেপ্ট সৃষ্টি হয়ে থাকে তা আসলে কতকগুলি ভাবসমষ্টি। জিনিস মানে সংবেদনগুচ্ছ। চৈতন্য থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকতে পারে না, কারণ যা কিছুর উৎপত্তি হয় তা ক্ষণিক। অসঙ্গের মতে সারা বিশ্বই বুদ্ধিময়, আমাদের যা কিছু প্রয়োজন – ভাবের সঙ্গে, বর্হিবস্তুর অস্তিত্বেরও কোনও প্রয়োজন আমাদের হয় না। বস্তুর যে ধর্ম – দৈর্ঘ, প্রস্থ, স্বাদ, গন্ধ প্রভৃতি সমস্তই ব্যক্তি নির্ভর বা বিষয়ী-আশ্রিত। বিজ্ঞানবাদীরা আরও চরম কথা বলেন– 'চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ নক্ষত্র, পাহাড়, পর্বত প্রভৃতি তথাকথিত বাহ্যবস্তুগুলি আমাদের মানসিক অভিজ্ঞতা মাত্র। বর্হিবস্তু কেবল কথার কথা, আমাদের চারদিকে যে ঘটনা ঘটে সেগুলো শুধু আমাদের মনের সৃষ্টি। এক সুপ্রতিষ্ঠিত মানসিক শৃঙ্খলা থেকে সেগুলোর অভ্যুদয়। অসঙ্গের এসব ভাববাদী তত্ত্বকথা পরবর্তীকালে বার্কলে ও ফিকটের দর্শনেও এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

বসুবন্ধ বলেছেন যে, যেহেতু বর্হিবস্তুর মনের বাইরে কোন অস্তিত্ব নেই, তাই কনাদের মতানুসারে স্থুল বস্তু যে পরমাণু সমন্বয়ে গঠিত এ ধারণাও বিজ্ঞানবাদীদের দৃষ্টিতে বাতিল হয়ে যায় এবং পরমাণুরও কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। শান্তরক্ষিতের মতে পরমাণু এক আকাশকুসুম কল্পনা। বিজ্ঞানবাদের দৃষ্টিতে 'বিজ্ঞানের দুটি ক্রিয়া, একটি উপলব্ধি আর একটি ব্যাখ্যা'। এই উপলব্ধি ও ব্যখ্যার মধ্যদিয়ে অভিজ্ঞতার জ্ঞানও গড়ে ওঠে। জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে এই কথাটিই আমরা সঠিকভাবে জানি। সমগ্র বিশ্বই বিজ্ঞান বা বুদ্ধি – সকল বস্তুই বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত। চিন্তার বাইরে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই। চিন্তাই জ্ঞানের আদি ও জ্ঞানের শেষ।

বুদ্ধ বলতেন জড়জগতের যে দুঃখ-বেদনা, ক্লান্তি-বিষাদ, জড়া-মৃত্যু-অসুস্থতা– এ সবকে অতিক্রম করে মনের এক অনির্বচনীয় মুক্তির স্তরে উপনীত হওয়ারই অপর নাম 'নির্বাণ' বা মুক্তি। এ কোন ব্রহ্মজ্ঞানও নয়, পরমব্রহ্মে মিলিয়ে যাওয়াও নয়, ঈশ্বরপ্রাপ্তিও নয়। বিজ্ঞানবাদীরা নির্বাণের বিশদ ব্যখ্যা দিয়েছেন; তাদের মতে 'নির্বাণ' চার প্রকার। প্রত্যেক জীবের যে শুদ্ধ পবিত্র আদি রূপ তার নাম ধর্মকার, এই ধর্মকার এক ধরনের 'নির্বাণ'। সকল দুঃখ ও ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়েও যখন পর্যন্ত কিছুটা জড়ের বন্ধন থাকে তাকে উপাধিশেষ 'নির্বাণ' বলা হয়। অনুপাধিশেষ নির্বাণে জীবের সমস্ত শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে যায়। সকলের শেষ 'নির্বাণ' যখন আলোকপ্রাপ্ত হয়, বিশ্বের মঙ্গলই তার বিষয় হয় তখন 'নির্বাণ' তার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায়।

আর এই দার্শনিক চিন্তাধারার পরবর্তী রূপ হল প্রথম খ্রীস্টাব্দে বিকশিত বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগার্জুনের সাপেক্ষবাদের ও অবচেতন সত্তার ধারণা যার ওপর ভিত্তি করে তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর দর্শন পদ্ধতি যাকে বলা হয়ে থাকে 'মাধ্যমিক বা মধ্যপথ'। পরে তা শূন্যবাদ নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করে। এই দর্শনের মূল কথাগুলো হচ্ছে – 'মন ধারণায় বিশিষ্ট হয়, ফলে তখন থাকে কেবল কতকগুলো অসংহত ধারনা ও উপলব্ধি, কিন্তু এদের সম্বন্ধে কিছুই নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তাহলে আমরা পৌঁছে যাই এমন কিছুতে যাকে ধরা ছোঁয়া যায় না, এমন কিছু যা আমাদের সীমাবদ্ধ মনের অগম্য, আমরা প্রকাশ করতে পারি না, যার সংজ্ঞা দিতে পারি না। তাঁর যুক্তি প্রক্রিয়া এভাবে অগ্রসর হয় – বর্হিজগতের যদি অস্তিত্ব না থকে তাহলে মনোজগতের যে অস্তিত্ব আছে তারই বা প্রমাণ কোথায়? আমাদের মনের বাইরে বর্হিবস্তু যদি না থাকে তাহলে উপলব্ধির বাইরে আত্ম-চেতনাই যে আছে এমন মনে করার মতো কিছু নাই। দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, অনুভব, ইচ্ছাশক্তি .. .. ব্যতীত বিজ্ঞান বা বুদ্ধির কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। যদি বিষয় না থাকে তাহলে বিষয়ীও নেই। বিষয়গত সম্বন্ধ না থাকলে জগতও থাকে না। সুতরাং নাগার্জুনের মতে বর্হিজগৎ ও মনোজগৎ উভয়ই শূন্য (void)।

তাঁর যুক্তি মতে জগৎ বাস্তব হলে তার কখনও পরিবর্তন সম্ভব হতো না, আবার জগৎ যদি কেবল ভাবের সমষ্টি হয় তাহলেও তার উন্নতি ও প্রগতি অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু মূল বৌদ্ধ দর্শন মতে জগৎ প্রতিমুহূর্তেই পরিবর্তনশীল ভব-উন্মুখ – ডাই-ইলেক্টিক্যাল পথ ধরে। তিনি মনে করতেন যে জগতের সকল পদার্থ সৎও নয়, অসৎও নয়, সত ও অসৎ এই উভয় প্রকার নয়, পৃথকও নয়, অনাগমও নয়, অনির্গমও নয়। মাধ্যমিক সূত্রে বলা হয়েছে, "জিনিস ক্ষণিকও নয়, অনন্তও নয়, সমুৎপদও নয়, উচ্ছেদও নয়, অভিন্নও নয়, পৃথকও নয়, অনাগমও নয়, অনির্গমও নয়। ক্রমবিকাশের পদ্ধতিরূপে জগতের কোনও চরম বাস্তবতা নেই। বস্তু যদি বাহ্য হত তাহলে তার উদয় ও বিকাশ থাকত না। শকট যেমন কতকগুলো বাস্তব ধর্মের সমষ্টি, মানুষও তেমনি কতকগুলো বাস্তব ও মানসিক ধর্মের সমষ্টি। ধর্ম ছাড়াও শকট ও মানুষের প্রজ্ঞপ্তি [৩৮] আছে। এক অনন্ত ধারাবাহিক শ্রেণীতে এই ধর্ম কতকগুলো ক্ষণিক বা মুহূর্ত বিশেষ। চিন্তার কিছু বাহ্য হেতু থাকতে পারে তবে চিন্তার আসল হেতু হল পূর্ববর্তী চিন্তা। প্রদীপের শিখার স্থায়িত্বের প্রতি মুহূর্ত, তেল ও পলতের ওপর নির্ভর করলেও, আসলে তা শিখার পূর্বমুহূর্তের ধারাবাহিকতা। জগতে স্বয়ম্ভু বলে কিছু নেই। সবই অন্য কিছুর ওপর নির্ভরশীল। নাগার্জুন বলেছেন "ইহ প্রতীত্যসমুৎপদ শূন্যতম প্রচক্ষতে।" [৩৯] অর্থাৎ এই প্রতীত্য সমুৎপাদকেই শূন্যতা বলে। জন্ম নয়, মৃত্যু নয়, সত্তা নয়, বিলুপ্তি নয়, এক নয়, বহু নয়, আসা নাই, যাওয়া নাই – এই হচ্ছে শূন্যতা। ॥

নাগার্জুনের মতে বর্হিবস্তু অবোধ্য তাই বর্হিবস্তু অবাস্তব, বিজ্ঞানও অবোধ্য সেইজন্য বিজ্ঞানও অবাস্তব। এ জগৎ শুধু সম্বন্ধ। সম্বন্ধের জটিলতাকেই আমরা জগৎ বলি। এই সম্বন্ধগুলো দুর্বোধ্য। আমাদের সমগ্র অভিজ্ঞতার জগৎ শুধু আভাস – কতকগুলো দুর্বোধ্য সম্বন্ধের সমষ্টি। বস্তু ও চৈতন্য, দেশ ও কাল, কারণ ও কার্য, গতি ও স্থিতি সবই ভিত্তিহীন স্বপ্ন, এদের পেছনে কণামাত্র বাস্তবতা নেই। এই পণ্ডিতপ্রবরের মতে আলো ও অন্ধকার যেমন যুগপৎ থাকতে পারে না তেমনি অসংস্কৃত ও সংস্কৃত বস্তু একসাথে থাকতে পারে না। সংস্কৃত বস্তু অবাস্তব। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের ধারণা বুদ্ধির অগম্য। অতীত সন্দেহজনক, ভবিষ্যৎ অনির্দ্দিষ্ট। বর্তমানকেই কতকটা সত্য বলে মনে হয়। অতীত ও ভাবষ্যত না থাকলে বর্তমান অর্থহীন হয়ে পড়ে। যার আদি নাই, অন্ত নাই তার মধ্যদেশ থাকা কী ভাবে সম্ভব ? শুন্য থেকে চিন্তার আকার রূপে কালের উৎপত্তি। নাগার্জুনের এসব ভাববাদী তত্ত্বকথা আমদের কাণ্টের কথা মন করিয়ে দেয়।

আমরা বস্তুকে তার গুণ দিয়ে জানি। গুণের পূর্বে বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না, কারণ বস্তু তাহলে গুণহীন হয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন হল এই গুণগুলোর অস্তিত্ব কোথায় ? গুণহীন বস্তু যেমন অনুধেয় নয়, তেমনি বস্তুহীণ গুণের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। সেজন্য একবার বস্তু থেকে গুণে আবার গুণ থেকে বস্তুতে টানাপোড়েন করি অথচ বস্তু ও গুণ এক না পৃথক তা আমরা জানতে পারি না। বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ, কোমলত্ব, কঠিনত্ব প্রভৃতি গুণ বিষয়ী আশ্রিত। ইন্দ্রিয় আছে বলেই সেগুলোর অস্তিত্ব, চক্ষু ছাড়া বর্ণ, কর্ণ ছাড়া শব্দের অস্তিত্ব নেই। গুণের নিজের কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না, সমস্ত গুণই আভাস। কাজেই যে বস্তুকে আশ্রয় করে গুণের প্রকাশ তা বাস্তব হতে পারে না। মোদ্দা কথা দঁড়াচ্ছে বস্তু ও গুণ পরস্পর সম্পর্কিত কোনটিই সমগ্রভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় না। যার অস্তিত্ব আছে তা বস্তুও নয় গুণও নয়। যাতে গুণ আছে তাকে বস্তু বলে আমরা অভিজ্ঞতায় মেনে নিলেও আসলে বস্তু বলে কিছু নেই। এই হল নাগার্জুন দর্শন শূন্যবাদের সার কথা।

নাগার্জুন বলেছেন, "জ্ঞানের কোনও প্রকৃত ব্যখ্যা দেয়া যায় না। সংবেদনা থেকে যেমন ভাব আসে, তেমনি আবার ভাব থেকে সংবেদনার উৎপত্তি হতে পারে। দর্শনেন্দ্রিয় দেখে না, আবার যা দর্শনের ইন্দ্রিয় নয় তাও দেখে না, তাহলে কে ও কী দর্শন করে ? কাজেই দর্শক, দর্শন, এবং দর্শনীয় অচিন্ত্যনীয় ব্যপার হয়ে দঁড়াচ্ছে। উপলব্ধি ও উপলব্ধ পরস্পর অঙ্গাঙ্গী। নাগার্জুন আপেক্ষিতার ওপর জোর দিয়েছেন– যেমন বলতেন আকার ছাড়া যেমন কলসের অস্তিত্ব নেই, তেমনি কলস ছাড়া আকারের অস্তিত্ব অভাবনীয়। কাজেই সমস্ত জিনিসই আপেক্ষিক। তেমনি দ্রব্যের বা বস্তুর সকল ধর্ম আপেক্ষিক, চরম বা পরম বলে কিছু নেই।

শূন্যতা বোঝাতে নাগার্জুন প্রাণপাত করেছেন, তাও তা ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। বুদ্ধের চরম সত্যের প্রসঙ্গ টেনে তিনি শূন্য বোঝাতে গিয়ে বলতে চেয়েছেন যে, বুদ্ধের চরম যে সত্য তা শূন্য নয়, অশূন্য নয়, শূন্য অশূন্য

---

[৩৮] প্রজ্ঞপ্তি অর্থ হল বিজ্ঞাপন। বিশেষভাবে জ্ঞাতকরণ বা নিবেদন। এখানে বলা হচ্ছে যে স্বভাবিক ধর্ম ছাড়াও শকট বা মানুষের নিজেকে জাহির করার কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য গুণাবলী থাকতে পারে।

[৩৯] '*প্রতীত্যসমুৎপদ*' অর্থ হল 'কতকগুলি বস্তুকে অবলম্বন করিয়া তাহা হইতে অপর বস্তুর উৎপাদন বা উদ্ভব।'

উভয় নয়, শূন্য অশূন্য থেকে পৃথক নয়, সেই চরম সত্যকে চিহ্নিত করার জন্যই শূন্যতা বলা হয়। আবার অন্যত্র বলছেন 'শূন্যতা দ্বারা সবই সম্ভব হয়, শূন্যতা ব্যতীত কিছুই সম্ভব হয় না'। জগতের একমাত্র তত্ত্ব শূন্যতা। শূন্যতার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব নেই, তা দেখাও যায় না, উপলব্ধিও করা যায় না। নাগার্জুন শূন্যতা সম্পর্কে যে পরম জ্ঞান তাকেই নির্বাণ বলেছেন। শূন্যতার যে জ্ঞান তা হচ্ছে পরমার্থ বা পরম জ্ঞান। মাধ্যমিক কারিকাতে বল হয়েছে, 'বুদ্ধের ধর্মে দুটি সত্য আছে। একটি লৌকিক বুদ্ধি রূপ সংবৃতি আর একটি শূন্যরূপ পরম সত্য।' নাগার্জুনের উক্তিসমূহ বিশ্লেষন করলে দেখা যায় তিনি একটি গোলক ধাঁধায় পতিত হয়েছেন যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি। বেদান্তবাদীরাও তো প্রকারান্তারে একই কথা বলে থাকেন পরম ব্রহ্মই হল শ্বাশ্বত বা পরম জ্ঞান। জীব যখন এই জ্ঞান লাভ করে তখন তার মোক্ষলাভ হয়। কিন্তু এই ব্রহ্ম বোঝাতে বেদান্তবাদীর গলদঘর্ম হলেও সফল হন না। অবশেষে হাল ছেরে দিয়ে বলেন 'ব্রহ্ম কী তা উপলব্ধির বিষয়' জ্ঞান দ্বারা তাকে জানা যায় না।

নাগার্জুন শূন্যবাদে পৌঁছাতে যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন তা হল সংশ্লেষণ মূলক যুক্তি। তাই তিনি কেবল সম্পর্কই দেখেছেন, বস্তু দেখেন নি। কেবল প্রবাহ দেখেছেন, ঘটনা দেখেন নি। ফলে এই সংশেষণ মূলক যুক্তি তাকে টেনে নিয়ে গেছে অন্তহীন এক গোলক বৃত্তে। সেখানে তিনি উপনীত হয়েছেন অন্ধের মত। সংশেষণ ও বিশেষণ পদ্ধতি যদি আলাদা আলাদা ভাবে প্রয়োগ করা হয় তা প্রায় ক্ষেত্রেই একদেশদর্শী ও অন্ধ গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। নাগার্জুনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। এই একদেশদর্শী অন্ধ সংশেষণ যুক্তির পথ ধরে অগ্রসর হয়ে তিনি এক বিরাট গহ্বরে পতিত হয়েছেন। শুধুমাত্র সংশেষণ মূলক যুক্তির পথ ধরে অগ্রসর হতে গিয়ে তিনি বুদ্ধের মৌলিক ডাইলেকটিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছেন। বুদ্ধ স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'প্রত্যেক জিনিস সেই জিনিসও বটে অবার সেই জিনিস নয়ও বটে'। তিনি এই পথ পরিহার করে কেবল বস্তুর বাহ্যিক সম্বন্ধ দেখেছেন বস্তুর আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ দেখেন নি, ফলে বস্তুর আভ্যন্তরিক পরিবর্তন – জগতের ক্রমবিকাশ তার কাছে মিথ্যা মনে হয়েছে। নাগার্জুনের দর্শন আপেক্ষিকবাদ ও সন্দেহবাদের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। নাগার্জুনের দর্শন চিন্তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় হিউম ও বার্গসোঁর চিন্তাধারায়।

পরিশিষ্ট ২

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য-পথ নিয়ে আইনস্টাইনের চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত চিত্র ঃ

- সকল বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল আমাদের অভিজ্ঞতাগুলোকে সমন্বিত করা এবং একটি যৌক্তিক পদ্ধতির মধ্যে নিয়ে আসা। আমাদের ধারণাগুলোর যাথার্থ্য কেবল এরা আমাদের অভিজ্ঞতার জটিলতাকে সংক্ষেপে বিধৃত করে মাত্র, এর বাইরে এদের কোন বৈধতা নেই। বিজ্ঞানের বিষয়ে দার্শনিকদের অযথা হস্তক্ষেপকে আইনস্টাইন সমালোচনা করেছেন– তিনি মনে করেন তাঁরা বিজ্ঞান-চিন্তার অগ্রগতিতে অনেক সময়ই বাধার সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা অভিজ্ঞতাবাদের ক্ষেত্র থেকে কতিপয় মৌলিক ধারণাকে, যেগুলো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল, ঝেঁটিয়ে বিদায় করে পূর্ব নির্দ্দিষ্ট (a priori) নামক অবোধ্য এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন।

  যদি মনেও হয় যে, ভাবের বিশ্বকে (Universe of Ideas) যৌক্তিক পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতা থেকে নির্মাণ করা যায় না, কিন্তু এটি তো ঠিক যে এই বিশ্ব হল মনুষ্য মননের সৃষ্টি, যা ব্যতিরেকে বিজ্ঞানের কোন অস্তিত্ব থাকে না; কিন্তু তথাপি, 'ভাবময় বিশ্ব' আমাদের অভিজ্ঞতার প্রকৃতি থেকে ততটুকুই স্বাধীন, যতটা পরিধেয় বস্ত্র মানবদেহের আকার থেকে স্বাধীন। এটি বিশেষভাবে সত্য আমাদের স্থান ও কাল সম্পর্কিত ধারণার ব্যাপারে, যে দুটি সত্তাকে পদার্থবিদরা তথ্যের ভিত্তিতে পূর্ব নির্দ্দিষ্ট (a priori) রূপ সৌধের চূড়া থেকে নামিয়ে এনেছে তাদেরকে সঠিক প্রেক্ষিতে সুবিন্যস্ত করতে এবং এদেরকে কার্যাপোযোগী অবস্থায় (serviceable condition) দাঁড় করাতে।[৪০]
- যৌক্তিক দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হয় যে বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলো হলো "মনুষ্য মনের মুক্ত সৃজন"[৪১], তবে এদের অর্থ ও যথার্থতা দায়বদ্ধ হয়ে আছে ইন্দ্রিয়ানুভূত ছাপগুলোর সামগ্রিকতার কাছে – যার সাথে এরা

[৪০] কান্টের মতে স্থান ও কাল মানব মনে পূর্ব নির্দ্দিষ্ট সত্তা (*a priori concept*) রূপে প্রোথিত। কান্টীয় দর্শন অনুসারে ঃ ' Space and Time are Empirically Real. But Transcedentally Ideal. ' আইনস্টাইনের বক্তব্যের জন্য দেখা যেতে পারে : Albert Einstein, *The Meaning of Relativity*, Princeton Lecture, 1921

[৪১] Albert Einstein, `On Physical Reality' in *Franklin Institute, Journal*, 121, 1936

সুসমন্বিত এবং যার সাথে প্রত্যক্ষভাবে বা স্বজ্ঞাতভাবে সম্পর্কিত। একটি 'প্রকৃত বস্তুকে' তুলে ধরা যায় একমাত্র এই কারণে যে, এই ধারণাগুলোর এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলোর মধ্য দিয়ে অমরা হয়তো ইন্দ্রিয়ানুভুত 'সংবেদনগুলোর গোলকধাঁধার' (labyrinth of sense impressions) রহস্য নিরসনের পথ খুঁজে পেতে পারি। তাহলে আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা প্রসূত 'প্রাথমিক' ধারণা, মনুষ্য মেধা সৃজিত ধারণা এবং তাদের মধ্যে সম্পর্কস্থাপনকারী নিয়মসমূহ, যারা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তি নির্মাণ করে, একত্রে হল 'মুক্ত উদ্ভাবন'।
প্রশ্ন হল এমন কি কোন নীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যার সাথে সঙ্গতি রেখে ধারণাগুলোর সাথে সংবেদনগুলোর একটি সুসমন্বয়ী নির্বাচন সম্পাদন করা যেতে পারে। এডিংটনের মত বিয়য়াশ্রিত দার্শনিক বিজ্ঞানী হয়তো বলতেন 'অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে', কিনতু আইনস্টাইনের উত্তর খুব সম্ভব হবে সুনির্দ্দিষ্ট 'না', কারণ আইনস্টান বাববার দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে 'ধারণা' নিষ্কাশন প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞতা থেকে উদিত হয় না।

বিজ্ঞানীর মেধার 'মুক্ত উদ্ঘাটনের' ওপর গুরুত্ব দিলেও বৈজঞ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ভূমিকার কথা তিনি ভুলে যা নি; একই সাথে পরপরই তিনি বলেছেন, " Experince may suggest the appropriate mathematical concepts, but they most certainly cannot be deduced from it."

- আরও বলেছেন যে, ' কোন গাণিতিক গড়নের ভৌত উপযোগিতার একমাত্র নির্ণায়ক এখনও অবশ্য অভিজ্ঞতা; কিন্তু সৃজনশীল নীতি রয়েছে গণিতের মধ্যেই। এজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে .. .. আমি সত্যি বলে মনে করি যে বিশুদ্ধ চিন্তার মধ্য দিয়েই আমরা বাস্তবতাকে সম্যকভাবে অনুধাবন করতে পারি, যা আমাদের প্রাচীনেরা কল্পনা করেছিলেন।' (.. .. I hold it true that pure thought can grasp reality, as the ancient dreamed)। আইনস্টাইন কিন্তু বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বা শূন্যবাদী নাগার্জুনের মত বস্তু'কে কেবল মনোজগতের সৃষ্টি বলে মনে করতেন না, আমাদের পর্যবেক্ষণ নিরপেক্ষ ভৌতবাস্তবাতার অস্তিত্বই হল তার বিজ্ঞান সাধনার ভিত্তি, এবং এই ভৌত বাস্তবতা আমাদের ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে তার অস্তিত্বকে প্রকাশ করে– সেই ইন্দ্রিয়ানুভূত সংবেদন যতই আদিম বলে মনে হোক। এ কারণেই আইনস্টাইন কখনও পর্যবেক্ষণের গুরুত্বকে অস্বীকার করেন নি, এবং মনুষ্যমেধার সৃষ্ট তত্ত্বকে অবশ্যই পর্যবেক্ষণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। বিশেষ বা সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব যদি পরীক্ষার কষ্টিপাথরে না টিকত তাহলে আইনস্টাইনের সকল তত্ত্ব যতই সার্বজনীন, সুন্দর, বিমোহিত এবং মনুষ্যমেধার চমকপ্রদ উৎকর্ষতার নিদর্শন বলে প্রতিভাত হোক না কেন, অধিবৈদ্যিক দর্শনের কোলে আশ্রয় নিত, বিজ্ঞানে উন্নীত হত না। এ কারণেই তিনি বলতে পেরেছিলেন ঃ 'একটি গাণিতিক নির্মাণের ভৌত উপযেগিতার ক্ষেত্রে – অভিজ্ঞতা, অবশ্য এখন অবধি, একমাত্র নির্ণায়ক। কিন্তু সৃজনশীল নীতি গণিতেই অবস্থান করে।[৪২] এ প্রসঙ্গে আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে বিজ্ঞানীরা একটি সার্বজনীন নীতি গ্রহণ করেছেন তাহল বিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্য হল অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যগুলোর মধ্যে সমপর্ক প্রতিষ্ঠা করা যাতে কেবল বিদ্যমান জ্ঞাত ঘটনাবলীরই ব্যখ্যা দান নয়, এ থেকে ভবিষ্যত ঘটনারও নিশ্চয়তার সাথে আভাস দেওয়া সম্ভব। আমাদের অবশ্য ভুলে গেলে চলবে না যে বিজ্ঞান কেবল উপযোগী প্রকৌশল নয় বা ভবিষ্যতবক্তা নয়, এটি একটি যন্ত্রব্যবস্থাও বটে যার মাধ্যমে আমরা সুশৃঙ্খল, অবরোহী পদ্ধতিতে সূত্রায়িত, অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাইকৃত বাস্তবতার ধারণাগুলোকে অর্জন করতে পারি।
- তত্ত্বীয় পদার্থক্ষদ্যার অভাবনীয় সাফল্য দেখে কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, বিজ্ঞানীদের স্ব-উদ্ভাবনী পন্থা (heuristic method), অর্থাৎ গাণিতিক সারল্য ও সৌন্দর্য অনুসন্ধানের চেষ্টা, চমৎকার সার্থক তত্ত্বসমূহের উদ্ভাবন ঘটিয়েছে। এবং এই সব তত্ত্ব অভিজ্ঞতার আলোকে 'সত্য' হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ধরণের পন্থায় প্রাপ্ত সত্যকে অনেকেই বলেছেন 'কঠিন সত্য', আবার অনেকে অভিহিত করেছেন মূলত 'অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য' (empirical fact)। এ ধরণের আবেগময় প্রতিক্রিয়া নানা বৈচিত্রের হতে পারে, যেমন সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীর কাছে মনে হতে পারে এক ধরণের 'মরমী অভিজ্ঞতা' (mystic experience)। আইনস্টাইন বলেছিলেন যে জগৎ বোধ্য, আর এটি হল সবচাইতে অবাক করা কাণ্ড।[৪৩]

---

[৪২] Experience remains, of course, the sole criterion of the physical utility of a mathematical construction. But the creative principle resides in mathematics. *Ibid.*

[৪৩] 'The most incomprehensible thing about the world is that it is comprehensible.', Albert Einstein, `On Physical Reality' in *Franklin Institute, Journal*, 121, 1936

- তবে এটিও সত্য অনেক বিজ্ঞানীই উপরে যা বলা হল তার সাথে একমত নন। প্রকৃতিতে সরল নিয়মের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে পি. ডব্লিউ. ব্রিজম্যান (P. W. Bridgman) মত ব্যক্ত করেছেন যে এ ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছেঃ প্রথমত, সম্ভবত সরল নিয়মের অস্তিত্ব রয়েছে যা এখনও অনাবিষ্কৃত; অন্যটি হল যে প্রকৃতির সরল নিয়মের প্রতি রয়েছে পক্ষপাতিত্ব বা অনুরাগ। এ দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই, পার্থক্য কেবল উপস্থাপনা শৈলীতে। আমরা যখন 'সরল' বলি তখন বেঝাতে চেষ্টা করি আমাদের ধারণার মাধ্যমে সরল রূপে প্রতীয়মান হওয়া। বাস্তবিক অর্থে আমাদের ধারণাগুলো কিন্তু সুনির্দ্দিষ্ট ও স্পষ্ট নয়, বরং এরা ধোঁয়াশে এবং সঠিকভাবে প্রকৃতির সাথে খাপ খায় না। এতদ সত্তেও কিছু সীমিত পরিধিতে বেশ কিছু সরল নিয়ম দেখা যায় এটি সত্যিই আশ্চর্যজনক। [৪৪]
- অন্যদিকে আইনস্টাইন ভৌত তত্ত্বের সরলতা এবং তত্ত্বে ব্যবহৃত প্রতীক সমূহের চমৎকার সৌন্দর্যের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন, যার মধ্য দিয়ে ভৌত বাস্তবতা আমাদের কাছে ধরা দেয় (nature is the realization of the simplest conceiving mathematical ideas)। উদাহরণ স্বরূপ আমরা ম্যাক্সওয়েলের অনুপম সমীকরণসমূহের কথা অথবা আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্বের ক্ষেত্র-সমীকরণগুলোর চমৎকারিত্বের কথা উল্লেখ করতে পারি। এই সৌন্দর্য অনেক বিজ্ঞানীর মনে সঞ্চার করে প্রশংসা, অনেকের মনে শ্রদ্ধাময় ভক্তি; অন্যদিকে প্রকৃতিতে এত সরল নিয়মের অস্তিত্ব ব্রিজম্যানের কাছে উদয় হয় আশ্চর্যবোধ রূপে। দৃষ্টিভঙ্গির এই ভিন্নতা অবশ্য ভৌত জগৎ বা যৌক্তিক পদ্ধতি – য-দ্বারা বিশ্বকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বর্ণনা দেয়া হয়, সম্পর্কে ভিন্নদৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিতবাহী নয়। এই পার্থক্য ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।
- জ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত পদার্থবিজ্ঞানেরও বড় সমস্যা হল ইন্দ্রিয়ানুভুত অভিজ্ঞতাজাত জগৎ এবং ধারণা ও প্রতিজ্ঞার (propositions) মধ্যদিয়ে সৃষ্ট জগতের মধ্যে আপাত সমুদ্রসম ব্যবধানের মধ্যে কী ভাবে সেতুবন্ধ রচনা করা সম্ভব ? বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে দুটি উপাংশ রয়েছে – একটি হল দৃষ্টবাদ-সম্পৃক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আসা এবং সুনিদ্দিষ্টভাবে তাৎক্ষণিক, আর অন্যটি হল কল্পনার মধ্য দিয়ে ও তত্ত্বীয়ভাবে সৃষ্ট। শেষাক্ত জ্ঞানের চরিত্র অভিজ্ঞতা থেকে তাৎক্ষণিক জ্ঞান থেকে বেশ স্বতন্ত্র। তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার অগ্রগতির দিকে মনোযোগ দিলে, বিশেষ করে তত্ত্বের আধেয় এবং অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের সামগ্রিকতার মধ্যে সম্পর্কগুলোর ওপর দৃষ্টি নিবেশ করলে, দেখা যায় যে আমরা জ্ঞানের দুটি আপাত অ-পৃথকযোগ্য উপাংশের মুখোমুখী হয়েছি ঃ (ক). অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান এবং (খ). যুক্তিসিদ্ধ (rational) জ্ঞান। আইনস্টাইনের মতে, বিশুদ্ধ যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জগতের কোন জ্ঞান আহরণ করা যায় না। তিনি একটি চমৎকার উক্তি করেছেন ঃ All knowledge of reality starts from experience and ends in it.
- কেবলমাত্র বিশুদ্ধ য়ৌক্তিক উপায়ে অর্জিত প্রতিজ্ঞাসমূহ বাস্তবতার সাপেক্ষে সম্পূর্ণরূপে ফাঁপা। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে রয়েছে স্বীকার্যভিত্তিক নামাঙ্কিত, অবরোহী পদ্ধতিতে সূত্রায়িত উপাংশ এবং আরোহনের মাধ্যমে প্রদত্ত, সুচিহ্নিত, অভিজ্ঞতালব্ধ উপাংশ। এ প্রসঙ্গে আইনস্টাইন বলেছেন যে আমরা তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ হেতু (reason) বা বিচারবুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা আরোপ করেছি। পদ্ধতিটির গড়ন হল হেতু বা বিচারবুদ্ধির কাজ; অভিজ্ঞতাপ্রসূত উপাংশগুলো এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্কগুলো অবশ্যই তত্ত্বটির সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে তাদের প্রতিনিধিত্ব খুঁজে পাবে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে এভাবে অবরোহী পদ্ধতিতে সূত্রায়িত তাত্ত্বিক উপাংশটি হল 'মনুষ্য মেধার মুক্ত উদ্ভাবন'। যেহেতু তত্ত্বীয় উপাংশটি অভিজ্ঞতা থেকে সরসরি আহরণ করা যায় না, তাই তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা নিজস্ব কিছু অবদান প্রর্কতির ও বাস্তবতার বৈজ্ঞানিক ধারণাতে রাখতে পারে। এর অর্থ হল বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে দৃষ্টবাদের কোন স্থান নেই কারন দৃষ্টবাদী তত্ত্বানুসারে সকল তত্ত্বীয় তাৎপর্য আমাদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। জ্ঞানতত্ত্বে এর একটি গুঢ় তাৎপর্য রয়েছে কারণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আমাদের বিজ্ঞানের বিষয় ও বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান দেয়, শুধু মাত্র বিষয়াশ্রিত গড়নের (subjective construct) জ্ঞান নয় – যা নব্য কান্টবাদী জ্ঞানীদের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত। এই সিদ্ধান্ত থেকে যে অভিমত বেরিয়ে আসে তা হল বস্তুর স্ব-সত্তা'কে (thing in itself) বৈজ্ঞানিক পন্থায় জানা যায় এবং বৈজ্ঞানিক পন্থায় সেই বস্তুটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারি; যেমন একঝাক ইলেকট্রনের ওপর গবেষণাগারে নানা ধরনের পরক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারি –

[৪৪] ব্রিজম্যানের অভিমত সম্পর্কে বিস্তৃত জানার জন্য – P W Bridgman, *The Logic of Modern Physics*, 2nd Edition, New York, 1946, 201-3

টিভিতে ছবি উৎপাদনে ব্যবহার করি, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে 'আলোক বীম' হিসেবে ব্যবহার করতে পারি, এবং দৈনন্দিন জীবনে ধাতব তারের ভেতর দিয়ে প্রবাহ সৃষ্টি করে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করি। সুতরাং বিজ্ঞান দাবী করতে পারে যে সে তত্ত্ববিদ্যাকে (ontology) ও জ্ঞানতত্ত্বকে (epistemology) প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মর্যাদায় পুর্নস্থাপন করেছে।

- আইনস্টাইনের মতে আমাদের দৈনন্দিন চিন্তাপ্রসূত বর্হিজগতের ধারণাগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে ইন্দ্রিয়ানুভূত ছাপের (sense impression) ওপর; আর পদার্থবিদ্য অনুশীলন করে ইন্দ্রিয়ানুভূত অভিজ্ঞতাসমূহ নিয়ে এবং এদের মধ্যে "বোধদায়ী" (comprehending) সম্পর্কগুলো নিয়ে। বিজ্ঞানে এই সেতুবন্ধের চেষ্টা কী ভাবে করা হয় তা আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। কান্ট তার জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে কী ভাবে অভিজ্ঞতাপ্রসূত জগতের সাথে বুদ্ধিমত্তায় সৃষ্ট জগতের সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন 'অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবতা' (empirical realism) ও 'তুরীয় ভাববাদ' (transcendental idealism) নামক দুটি সত্তার (entity) মধ্য দিয়ে সে সম্পর্কে বিদগ্ধ জন অবগত আছেন। তাই আমি সে প্রসঙ্গে যাব না। কান্টের দর্শনে বলা হয়েছে যে প্রকৃতির নিয়ম হল প্রকৃতির অভিজ্ঞতার নিয়ম। তিনি মনে করেন যে চিন্তার নিয়ম ও চিন্তার সংশ্লেষী একত্বের নীতির মধ্যে ঐকতান বিদ্যমান। আমাদের বুদ্ধিবৃদ্ধিক কৌশলে রয়েছে সংজ্ঞা, স্থান ও কালের রূপরেখা এবং বিশুদ্ধ বোধগম্যতার নীতিমালা। দুটিই 'জ্ঞানের' উপাদান তবে তা অভিজ্ঞতাপ্রসুত বস্তুর মধ্যেই সীমিত, যদিও সবটাই অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত নয়। এ উপাদানগুলো পূর্ব নির্ধারিত (a priori); কিন্তু কান্টের 'পূর্ব নির্ধারিত' তো কালিক নয় যার সাথে পূর্ব অভিজ্ঞতার কোন সম্পর্ক রয়েছে – এটি হল যৌক্তিক অভিজ্ঞতা-অনপেক্ষ 'পূর্ব নির্ধারিত'। [৪৫]
- আইনস্টাইন লিখেছেন: " আমাদের 'ইন্দ্রিয়ানুভূত অভিজ্ঞতা' গুলোকে (sense experience) যে চিন্তনের মাধ্যমে সুশৃঙ্খলিত করা যায়– এটি সত্যিই বিস্ময়কর, কিন্তু তা কখনও বোঝা যাবে না।" [৪৬] এই প্রক্রিয়ায় কোন পূর্ব নির্দ্দিষ্ট কাঠামো (a priori framwwork) নেই, এমন কি ইন্দ্রিয়ানুভূত অভিজ্ঞতাগুলোকে সাথে ধারণাগুলোর বা তাদের পরস্পরের মধ্যে সমন্বয়ের কোন পরবর্তী (posteriori) কাঠামোও স্থাপন করা যায় না। ফলে আইনস্টাইনের চিন্তায় এগুলো 'কোন ভাবে সম্পর্কিত' অথবা 'ধারণাগত পদ্ধতির প্রতিজ্ঞাসমূহকে দৃঢ়ভাবে ইন্দ্রিয়ানুভূত অভিজ্ঞতাগুলোর সাথে যুক্ত থাকতে হবে – ইত্যাদি কথা অনেকটাই ধোঁয়াশে সুত্রায়নের মত মনে হতে পারে। তবে তাঁর মতে 'একটি পদ্ধতি' গড়ে তোলার জন্য কিছু বিধি স্থির করা প্রয়োজনীয়, যেমন কোন খেলা খেলতে হলে নিয়ম থাকতে হয়, যদিও নিয়মগুলো অনেকটা স্বেচ্ছাক্রমে স্থিরকৃত, তাহলেও এর মাধ্যমেই খেলাটি সম্ভব। অবশ্য বিধিগুলোর পরিবর্তন হতে পারে বাস্তব-পরিপ্রেক্ষিতে।

পরিশিষ্ট - ৩

রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম

আইনস্টাইনের সাথে ১৯৩০ সালে আলাপচারিতায় এই মনুষ্য ধর্ম প্রসঙ্গ এসেছে। আমরা যে মহাবিশ্ব দেখি তাকে রবীন্দ্রনাথ আখ্যা দিয়েছেন 'মানবীয় মহাবিশ্ব' কারণ মানুষের অসীম ব্যক্তিত্ব মহাবিশ্বকে অনুধাবন করতে পারে। একথার মধ্য দিয়েই কবিগুরুর 'মানুষের ধর্ম' এই অভিব্যক্তির মূল ভিতটি বের হয়ে এসেছে। মানুষ বলতে কবি কতগুলো স্বতন্ত্র ব্যক্তি মানুষের যোগফল নয়, একটি কঠিন পদার্থে জড় কণাগুলো যেমন তাদের মাঝে শূন্য স্থান (void) থাকা সত্তেও বিজ্ঞানের সূত্রে পরস্পর লেগে থেকে কঠিন পদার্থের রূপ নেয়, ঠিক অনুরূপভাবে স্বতন্ত্র মানব সত্তাগুলো পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলে মনুষ্য জগতের জীবন্ত ঐক্য - এই সত্তাই হল মানব বা মানব সত্তা। এই মানব সত্তা অর্থাৎ আমরা 'স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে মহাবিশ্বের সাথে যুক্ত হয়ে আছি - এটি হল মানবীয় মহাবিশ্ব।' একজন মানুষের দু॥খে অন্য মানুষ এগিয়ে আসে সে দুঃখ নিরাময়ে, কারণ 'সর্বমানবসত্তা পরস্পর যোগযুক্ত'। রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের ধর্মের দুটি দিক রয়েছে ঃ একটি হল তার জীব সত্তা অন্য যে কোন জীবের মতই তার রয়েছে জৈবিক সীমাবদ্ধতা- তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা রয়েছে, তার রয়েছে স্বার্থ

[৪৫] Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason* (tr. N K Smith), MacMillan, London, 1964
[৪৬] Albert Einstein, `On Physical Reality' in *Franklin Institute, Journal*, 121, 1936

পরায়নতা; রয়েছে ক্রোধ-হিংসা-কামনা-বাসনা প্রভৃতি ষড় রিপু; এই ক্ষুদ্র মানুষ নিজ স্বার্থ চরিতার্থের জন্য যে কোন অন্যায় কাজ এমন কি হত্যাকাণ্ডেও লিপ্ত হতে পারে। আবার এই মানুষই বিপন্ন মানুষকে রক্ষার জন্য নিজের জীবন দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। এই মানুষের মধ্যেই রয়েছে প্রেম প্রীতি, ভালবাসা পরার্থে জীবন বিলিয়ে দেবার মহান ব্রত, তার মধ্যে রয়েছে শিব-সুন্দর-মঙ্গলমের সাধনা। পরের হিতার্থে এই মানুষের রাজাই অকাতরে রাজ সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে ভিখিরীর জীবন বেছে নিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। মানুষের কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি অর্থাৎ ভালবাসা হল মনুষ্য ধর্মের প্রকাশ। জীব মানুষ শত্রুকে হত্যা করতে পিছপা হয় না, কিন্তু মহামানুষ বলে "শত্রুকে ক্ষমা করো।" গালে চড় খেলে অন্য গাল পেতে দাও, যিশুর এ কথা কেবল আপ্ত বাক্য নয়, মহৎ মানুষের ধর্ম। এসব গুণাবলীকে রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন 'মানুষের ধর্ম' [৪৭] - যে ধর্ম ব্যক্তি মানুষের সীমানা অতিক্রম করিয়ে মহত্তর মানুষে পরিণত করে। এই মানুষকেই রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন 'মহামানব, অতিমানব বা বিশ্বমানব।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন এই মানবতাবোধ নিজের মধ্যেই রয়েছে, এই মানবকে বাইরে খোঁজার প্রয়োজন নেই – আমাদের অন্তরেই তার বাস, তাকে উপলব্ধি করতে হবে। তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব, তবে আমাদের অন্তরেই তার অধিষ্ঠান, "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট'। মানুষের আর একটি বিশেষ ধর্ম হল সে স্বল্পে তুষ্ট নয়, নিজের গণ্ডীবদ্ধ জ্ঞান তাকে তৃপ্ত করে না– সে জানতে চায় মহাবিশ্বকে, ভূমাকে জানতে চায়। "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। মানুষ চায় অল্পে সুখ নেই বৃহতেই সুখ"।
কবিগুরর ভাষায় ...

> "মানুষের আত্মোপলব্ধি বাহির থেকে আন্তরের দিকে আপনিই গিয়েছে, যে অন্তরে দিকে তার বিশ্বজনীনতা, যেখানে বস্তুর বেড়া পেরিয়ে সে পৌচেছে বিশ্ব মানসলোকে – যে লোকে তার বাণী, তার শ্রী, তার মুক্তি। ... মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে। .... এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন দিকের নির্দেশ। যে দিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যে দিকে তার পূর্ণতা, যে দিকে ব্যক্তিগত সীমা সে ছাড়িয়ে চলেছে, যে দিকে বিশ্বমানব।"

ব্রহ্মজ্ঞান পিপাসু ছাত্রের উত্তরে উপনিষদের ঋষি বলেন, নিজের আত্মার মধ্যেই তার উপলব্ধি। 'আপনি কে ?' সেই আমি সোহহং। অর্থাৎ সীমাবদ্ধ মুনুষ্যজীবের মধ্যেই লুকিয়ে আছে 'মহামানব'। আইনস্টাইনের সাথে আলাপচারিতায় এই মহামানবের প্রসঙ্গে উক্তি করেছিলেন, "ব্যক্তি আমির অস্তিত্বে অতি ব্যক্তিক মানুষের (super personal man) ও বিশ্বজনীন শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধনাই আমার ধর্ম । এটিই ছিল আমার হিবার্ট বর্ক্তৃতার বিষয়, যাকে আমি অভিহিত করেছি "মানুষের ধর্ম "নামে। [৪৮]

এই মানুষ ব্যক্তিগত সংস্কার ছাড়িয়ে যেতে পারে তার জিজ্ঞাসা, তাতেই সে পৌছে যাবে বিশ্বগত জ্ঞানের বিশ্বে, প্রতিষ্ঠিত হবে বিজ্ঞান। তবে এই লুকিয়ে থাকা মনুষ্যই হল রবীন্দ্রনাথের কহু কবিতার 'তুমি'। রবীন্দ্রনাথ বলেন এই তুমি অন্তরেই বিরাজমান। "মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ, জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানূষকে পাই – অন্তরে বিকার ঘটলে সেই

---

[৪৭] 'মানুষের ধর্ম ' - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৩। এই পুস্তকের তিনটি প্রবন্ধ ১৯৩৩ সালে ১৬, ১৮ ও ২০ শে জানুয়ারীতে কবি 'কমলা বতৃতা' নামে পাঠ করেছিলেন। ঐ বছরেই ৮, ৯, ও ১০ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিষয়ে ইংরেজীতে বতৃতা দেন। ১৯৩৭ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালযের এক গ্রন্থমালায় ' Man ' নামে প্রকাশিত হয়। ইংরেজী ভাষার এই রচনা তিনটি মে মাসে ১৯৩৪ সালে ' The Viswa-Bharati News' এ, অগাস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ' Modern Review ' তে যথাক্রমে ' Man, Super Man ও I Am He ' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল।

[৪৮] ১৯৩০ সালে মে মাসের ১৯, ২১ ও ২৬ তারিখে অক্সফোর্ডে ম্যান্চেস্টার কলেজে হিবার্ট বতৃতায় ' The Religion of Man ' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথ তিনটি বতৃতা দিযেছিলেন ইংরেজীতে। ১৯৩১ সালে এগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। *The Religion of Man*, Rabindranath Tagore, 1931.

আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাই নে।" অনেক কবিতার মধ্যে একটি কবিতার কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করা যাক নমুনা স্বরূপ ঃ

প্রভূ, তোমা লাগি আঁখি জাগে।
দেখা নাই পাই
পথ চাই,
সেও মোর ভাল লাগে। (গীতাঞ্জলি)

অথবা,

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রধীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস –
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো, ধরায় আস। (গীতাঞ্জলি)

বাউল কবির

"আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে ।"

এই বাণী কবির ভাষায় পেল নতুন ব্যঞ্জনা। সেই বাউলই আবার বলছেন, সে মানুষ অন্তরের গভীরে – "তোরই ভিতর অতল সাগর।" এবং বলেছিল, "মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।" সেই অতিমানবের সন্ধানে কবি লিখেছেন অজস্র কবিতা, তারই সন্ধানে–

" ... মৃত্যুরে না কর শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তারি কাছে জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি।

কে সে জানি না। চিনি নাই তারে।
শুধূ এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে ... ..
জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি। ".

মানুষের ধর্ম হল,
"সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্ত, আবেরা হোন্ত, সুখী অত্তানং পরিহরন্ত। সব্বে সত্তা দুকখপমুঞ্চন্ত। সব্বে সত্তা মা যথালব্ধ-সম্পত্তিতো বিগচ্ছন্ত।"

ড. অজয় রায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক; বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক, প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক । মানবতাবাদী ও মানবাধিকার রক্ষায় সদা উচ্চকণ্ঠ এ বিজ্ঞানী চেতনা চিন্তায় প্রকৃতিবাদী ও সংশয়বাদী এবং মনেপ্রাণে সেক্যুলারিস্ট। ছাত্রাবস্থা থেকে ভাষা আনোদালনসহ সকল বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ এরই স্বাভাবিক পরিণতি। বিভিন্ন বিষয়ে লিখেছেন সহস্রাধিক প্রবন্ধ। সে তুলনায় পুস্তক লিখেছেন অনেক কম। তাঁর লেখা 'আদি বাঙালী' ও 'জড়ের সন্ধানে' শিরোনামে গ্রন্থ দুটি পাঠকপ্রিয়তায় ধন্য।

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ৫খন্ডে লেখা 'বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান কোষের' অন্যতম সম্পাদক ও লেখক। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানবাধিকার সংগঠনের সাথে যুক্ত। ইতিহাস পরিষদের অন্যতম সহ সভাপতি, শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের সভাপতি ও দক্ষিণ এশীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংগঠনের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য। ইমেইল: roya_k2003@yahoo.com

সংশয়ীদের ঈশ্বর

আহমাদ মোস্তফা কামাল

১

একজন তরুণ শিল্পীর কণ্ঠে লালনের ‘ক্ষম ক্ষম অপরাধ’ গানটি শুনতে শুনতে আমি যখন প্রায় মোহমুগ্ধ, তখন পাশে বসে থাকা আমার এক বন্ধু বললেন, এই গানটির মধ্যে তিনি মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিকতা খুঁজে পান। আমি নিজে ওটার মধ্যে সেরকম কিছু খুঁজে পাই না বলা বাহুল্য এ আমারই মুর্খতা, নিরেট মুর্খতা; কিন্তু তিনি কীভাবে খুঁজে পেলেন তা আমাকে ভাবিয়ে তুললো। নিজের মুর্খতার জন্য নিজেকে তিরস্কার করলাম, বিনয়ে নুইয়ে গিয়ে বন্ধুটিকে জিজ্ঞেস করলাম গানটির ঠিক কোথায় এবং কীভাবে তিনি মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিকতা খুঁজে পেলেন! আমার অজ্ঞতায় তিনি অবাক হলেন না, তবে নিতান্তই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, আমি যেন গানটি মনোযোগ দিয়ে আরেকবার শুনে দেখি। একবার নয়, বহুবার শুনেও কোনো লাভ হলো না, অর্থা মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিকতা আবিষ্কার করা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। মনে হলো মার্কসবাদ হয়তো আমি ঠিকমতো বুঝতেই পারি না, কিন্তু সেইসঙ্গে একটা প্রশ্ন মাথায় পাকাপাকিভাবে ঢুকে গেলো যা আমি অনেক চেষ্টায়ও খুঁজে পাচ্ছি না, আমার বন্ধুটি সহজেই সেটা পেলেন কীভাবে? আর কেনই-বা গানটিকে মার্কসবাদী নান্দনিকতা দিয়ে বিচার করতে গেলেন তিনি? সেটা না করলে এর রসাস্বাদনে কি কোনো ক্ষতি হয় তার? বলা নিস্প্রয়োজন যে, আমার বন্ধুটি গভীরভাবে মার্কসবাদে বিশ্বাস করেন এবং জীবন ও পৃথিবীর সবকিছুই মার্কসবাদের আওতায় এনে বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন, সেই অনুযায়ী গ্রহণ বর্জনও করে থাকেন। আর সেটাই আমার ভাবনার বিষয়। যারা একটি নির্দিষ্ট দর্শনে গভীরভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে থাকেন, তারা সেখান থেকে বেরুতে পারেন না কেন, কেনই-বা সবকিছুকে সেই দর্শনের আওতায় নিয়ে আসতে চান এবং মনে করেন যে, এর বাইরে অন্য কোনো কিছু নেই, অন্য কোনো ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও গ্রহণযোগ্য নয়? তাদের মানসগঠনটি এরকম বদ্ধ কেন?

গানের কথায় ফিরে আসি। যে শিল্পীর কথা বলছিলাম, তিনি বয়সে তরুণ হলেও তার কণ্ঠটি কারুকার্যময়, গলায় চমকার সুর আছে, কণ্ঠে দরদ আছে। সবচেয়ে বেশি আছে যে-জিনিসটি তার নাম মগ্নতা। এমন মগ্ন হয়ে গানটি গাইলেন তিনি যে, মনে হলো গান নয়, তিনি প্রার্থনা করছেন। আমরা যারা ওখানে ছিলাম সবাই-ই স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম, হয়ে উঠেছিলাম আদ্র-করুণ, এবং অস্বীকার করবো না খানিকটা ভাববাদী। আমার বন্ধুটির মতো আর কেউ মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিকতার কথা ভেবে সেরকমটি হয়েছিলেন কী না জানা হয় নি, তবে মনে হয়েছিলো একটি প্রার্থনা সংগীত (হ্যাঁ, লালনের ওই গানটিকে আমি প্রার্থনা সংগীতই বলবো) শুনলে আমরা সবাই এমন আদ্র-করুণ হয়ে উঠি কেন? আর কেনই-বা প্রতিটি মানুষেরই জীবনের কোনো-না-কোনো সময় প্রার্থনা করতে ইচ্ছে করে? তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে প্রার্থনাটা কার কাছে? প্রার্থনার

কথা বললে এই প্রশ্নটি আসবেই, আর প্রশ্নের পিছে পিছে অনিবার্যভাবে আসবে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ, তাঁর অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের প্রসঙ্গ, আস্তিকতা-নাস্তিকতার প্রসঙ্গ। এই লেখাটি সেইসব প্রসঙ্গ নিয়েই। নতুন কোনো বিষয় নয়, বলাই বাহুল্য। প্রচুর কথা হয়ে গেছে পৃথিবীতে, এ নিয়ে। নতুন কথাও খুব বেশি বলা যাবে না। তবু নিজের উপলব্ধির কথা বলে যেতে দোষ কী!

২

এখন, আমাদের সময়ে, কোনো 'আস্তিক' স্বীকার করতে লজ্জা পান যে, তিনি আস্তিক কারণ সেক্ষেত্রে তাকে প্রতিক্রিয়াশীল অভিধা পেতে হতে পারে। অন্যদিকে 'নাস্তিক'রা প্রকাশ্যে বলতে কিঞ্চি‌ ‘ভয়' পেলেও আড্ডায় বা ঘরোয়া পরিবেশে বেশ গর্ব করেই বলেন যে, তিনি নাস্তিক। অর্থা‌ নাস্তিকতা গৌরবের আর আস্তিকতা লজ্জার! কিন্তু অদ্ভুত শোনালেও সত্যি যে, এর একটি যদি নেতিবাচক হয় তবে একইভাবে অন্যটিও নেতিবাচক শব্দ। আমাদের এখানে একটি ধারণা প্রচলিত আছে এই দুটো শব্দ পরস্পরের বিপরীত অর্থ বহন করে। কিন্তু সত্য হচ্ছে এই যে, আস্তিকতার বিপরীত শব্দ নাস্তিকতা নয়, এই দুটো শব্দ দুটো বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করে। একটি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, অন্যটি ঈশ্বরের অনস্তিত্বে বিশ্বাস। যিনি অনস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তিনি আবার ঈশ্বরের পরিবর্তে প্রকৃতি বা এই ধরনের অন্য কোনোকিছুতে বিশ্বাস করেন। এই শব্দ দুটোর বিপরীত শব্দ হচ্ছে সংশয়। একজন সংশয়বাদীকে কি এর যে-কোনো একটি বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বা পক্ষে দাঁড় করানো যাবে? যে-কোনো এক পক্ষে দাঁড় করালে তার অন্য পক্ষে চলে যাবার সম্ভাবনাটিও পুরোমাত্রায় রয়ে যাবে। সংশয়বাদীদের নিয়ে না হয় একটু পরে বলি, তার আগে বরং আস্তিক-নাস্তিকদের নিয়েই কিছু চিন্তাভাবনা করা যাক।

প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের দেশে আস্তিকতা-নাস্তিকতার ধারণাটি খুবই অদ্ভুত। বিষয়টি আর ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্বে বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে নেই; দাঁড়িয়ে গেছে ধর্মে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর। অর্থা‌ যিনি ধর্মে বিশ্বাস করেন তিনি আস্তিক, যিনি করেন না তিনি নাস্তিক। এই কনসেপ্টটিকে পরিপূর্ণ বলা যায় না। ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ঈশ্বরের প্রতি যার বিশ্বাস নেই অথচ অন্য কোনো মহামহিম ক্ষমতাবান অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস আছে, আমাদের দেশে তাকে নিশ্চয়ই কেউ আস্তিক বলতে চাইবেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তো আস্তিকই। ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস আছে কি নেই সেটা তো কোনো প্রশ্নই নয়। অন্যদিকে ঈশ্বর সম্বন্ধে একেবারেই কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই অথচ ধর্ম-প্রণীত আচার আচরণ মহা সাড়ম্বরে পালন করেন এমন সব ব্যক্তিকে সবাই আস্তিক বলবেন, যদিও তার আস্তিক্য নিয়ে প্রশ্ন তোলার যথেষ্ট কারণ আছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ঈশ্বরে আস্থা নেই এমন লোককে আস্তিক বলা যায় কীভাবে? প্রচলিত দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে আস্তিক বলা যায় না বটে, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে ধর্ম মেনে চলা বা ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত মোটামুটি নিষ্ঠুর এবং ভয়ংকর একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করার পরিবর্তে একজন মানুষ তার নিজের মতো করে একজন ঈশ্বরের কল্পনা করতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে তাঁকে আস্তিক বললে খুব বেশি ভুল করা হবে না। এ প্রসঙ্গে আমরা লালনেরই আরেকটি গানের উদাহরণ দিতে পারি। পারে কে যাবি নবীর নৌকাতে আয় এই গানটির কয়েকটি পংক্তি এরকম :

নবী না মানে যারা

মওয়া ছেদ কাফের তারা

আখেরে হয়

এই পংক্তি শুনে যে কেউ মনে করবেন, লালন ইসলাম ধর্মে প্রচারিত মতেরই প্রতিধ্বনি করছেন। কিন্তু এর পরের বাক্যগুলো এরকম

যে মুর্শিদ সেই তো রাসুল ইহাতে নাই কোনো ভুল খোদাও সে হয়

এই পংক্তি অবশ্যই ইসলামের মূল তত্ত্ব বিরোধী। কারণ এখানে মুর্শিদ অর্থা একজন সাধারণ মানুষকে (হতে পারেন তিনি সাধক পুরুষ) প্রথমত রাসুলের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা হয়েছে (রাসুল নিজে কোনো সাধারণ পুরুষ নন, ইসলাম ধর্মমতে তিনি আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ মহামানব)। তবু শরীয়তপন্থী লোকেরা হয়তো এ কথাটি মেনে নিতে আপত্তি করবেন না, কারণ রসুলই বলেছেন আমি তোমাদেরই মতো সাধারণ মানুষ, পার্থক্য শুধু এই যে, আমার কাছে আল্লাহর অহি আসে তোমাদের কাছে আসে না (এটাকে অবশ্য তাঁর অপূর্ব বিনয়ের প্রকাশ বলেই মনে হয় আমার। কারণ যাঁর কাছে আল্লাহর অহি আসে তিনি সাধারণ মানুষ হন কীভাবে?)। কিন্তু লালন যখন বলেন খোদাও সে হয় তখন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের প্রতিবাদ স্বরূপ একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠার কথা। কারণ রসুল উপরোক্ত কথাটি বলেছিলেন যেন তার অনুসারীরা আল্লাহর সঙ্গে তাঁকে মিলিয়ে না ফেলেন এবং তাঁকেই আল্লাহ বলে ভাবার মতো ভুল না করেন। কিন্তু এখানে লালন তাই করেছেন। মুর্শিদ (সাধারণ মানুষ), রসুল (মহাপুরুষ) ও খোদা (সৃষ্টিকর্তা) কে তিনি মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে ফেলেছেন এবং পংক্তিটি পরিষ্কারভাবে এ কথাটিই বলতে চায় যে, মানুষ এবং খোদা একই রূপের দ্বিবিধ প্রকাশ অথবা মানুষের মধ্যেই খোদা বিরাজমান তাঁর আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। এই মত মূল ইসলাম সমর্থন করে না (যদিও এর সঙ্গে সুফিবাদ কথিত মতের বেশ মিল পাওয়া যায়)। প্রশ্ন হলো লালনের খোদা তাহলে কে, এই ধারণাই-বা তিনি কীভাবে এবং কোত্থেকে পেলেন?

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথাও বলা যায়। মানব-ইতিহাসের বিভিন্ন সময়কালে যতগুলো প্রতিভা প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ তাদের অন্যতম, আর রবীন্দ্রনাথের বহুমাত্রিক প্রতিভার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটেছে তাঁর গানে। কী কথায় কী সুরে তিনি এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। পৃথিবীতে এমন 'সংগীত প্রতিভা' আর দেখা যায় না। মানুষের জীবনের এমন কোনো অনুভূতি নেই যা তাঁর গানে ধরা পড়ে নি। আমার তো মনে হয় মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে মানিয়ে যাবার মতো একটা না একটা গান রবীন্দ্রনাথের আছে। কিন্তু তাঁর এই বহুবিচিত্র গানগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ প্রতিভার ছোঁয়া পেয়েছে তাঁর প্রার্থনা সংগীতগুলো। মানুষের সমর্পণ ও আতœনিবেদনের এমন অসামান্য আকুতি ও আর্তি অন্তত আমার জানামতে অন্য কোনোকিছুতে ধরা পড়ে নি। তো, তার একটি প্রার্থনা সংগীতের উদাহরণ দেই,

যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রয়ে গো কভু

দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর স্বামী ফিরিয়া যেওনা প্রভু।

রবীন্দ্রনাথের আস্তিকতা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলবেন না, জানি, কিন্তু এই গানের প্রভু কোন ধর্মগ্রন্থের? বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত কোনো ঈশ্বর তো তার অনুরাগীর এমন অন্যায় আব্দার রাখবেন বলে মনে হয় না, এমন প্রেমময় আহ্বানে তাকে পটানো যাবে না, উল্টো দ্বার বন্ধ দেখে তিনি রেগে যেতে পারেন। প্রভুর এমন কী দায় পড়েছে যে, বন্ধ দ্বার ভেঙে অনুরাগীর হৃদয়ে প্রবেশ করবেন?

শুধু কবিদের মধ্যেই নয়, বিজ্ঞানীদের মধ্যেও কখনো কখনো এমন অদ্ভুত ঈশ্বর বিশ্বাস দেখা যায়। মানব-ইতিহাসের আরেক বিস্ময়কর প্রতিভা আইনস্টাইন একবার অনিশ্চয়তা তত্ত্ব নিয়ে বিতর্কে (তিনি ঐ তত্ত্বের বিপক্ষে ছিলেন) যুক্তি দিয়ে সুবিধা করতে না পেরে দি গড ক্যান নট গ্যাম্বলিং বা ঈশ্বর জুয়া খেলতে পারেন না বলে অদ্ভুত এক অবৈজ্ঞানিক মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই মন্তব্যটি থেকেই তার মানসজগ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায় : ১. তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন এবং ২. এই ঈশ্বর কোনো ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ঈশ্বর নন। বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা যাক। আইনস্টাইন ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে ইহুদি ছিলেন। ধরা যাক তাঁর ঈশ্বর বিশ্বাস ইহুদি ধর্ম প্রভাবিত। সেক্ষেত্রে বলতেই হয়, যে-কোনো ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ঈশ্বর জুয়া খেলতে খুবই পছন্দ করেন এবং প্রায়শই জুয়া খেলে থাকেন। অর্থা কোনো নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা না করেই তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন, এবং যা ইচ্ছে তা-ই করার ক্ষমতাও তাঁর আছে। অতএব ঈশ্বরের জুয়া খেলতে পারেন না বলে তিনি যেমন তাঁর ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দিলেন (পারেন না শব্দটিই সীমাবদ্ধতার পরিচায়ক) অন্যদিকে ইঙ্গিত করলেন তাঁর ঈশ্বর অবশ্যই নিয়ম কানুন মেনে চলেন, বিজ্ঞানীদের কাজই সেই নিয়ম কানুনগুলো আবিষ্কার করা জুয়াড়িদের মতো কোনো অনিশ্চিত ব্যাপার স্যাপার নিয়ে কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবই নয়। এই কথাটি অনেক পরে স্টিফেন হকিংও বলেছেন। তাঁর মতে একজন ঈশ্বর যদি থেকেও থাকেন তাহলে তিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময়ই কিছু নিয়ম কানুন বেঁধে দিয়েছেন এবং এইসব নিয়ম কানুনে তিনি নতুন করে হস্তক্ষেপ করেন না, কোনো পরিবর্তন করেন না, সত্যি বলতে কি সেই ক্ষমতাই তার নেই। ধার্মিকরা তো বিশ্বাস করেন ঈশ্বরের ইচ্ছে ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না, অথচ হকিং বলছেন মহাবিশ্ব সৃষ্টি করার সময় নিয়ম কানুন বেঁধে দেয়ার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের কাজ শেষ হয়ে গেছে, এর পরে তাঁর আর কোনো ভূমিকা নেই। আইনস্টাইন বা হকিং-এর এই ঈশ্বরই বা কোন ঈশ্বর? কোনো ধর্মের সঙ্গে কি তা মেলে?

লালনের দয়াল/খোদা, রবীন্দ্রনাথের প্রভু কিংবা আইনস্টাইনের গড কোনো ধর্মগ্রন্থের ঈশ্বর নন, অথচ এঁরা প্রত্যেকে ঈশ্বরের মতো কোনো একজনকে কল্পনা করেছেন। এঁদেরকে কি আমরা আস্তিক বলবো? আস্তিক বলতে তো আমরা কোনো ধর্মাবলম্বীকে বোঝাই, অথচ প্রচলিত কোনো ধর্মে এঁদের আস্থা ছিলো না। সেক্ষেত্রে তাঁরা তো আস্তিকই থাকেন না, আবার নাস্তিকও তো বলা যাচ্ছে না, তাঁরা যে বিশ্বাস করেন! আমি এতক্ষণ ধরে তাঁদেরকে আস্তিকই বলেছি, কিন্তু এখন সম্ভবত বলা যায় এঁরা প্রত্যেকেই সংশয়ী। প্রচলিত

ঈশ্বর ধারণার প্রতি এঁদের সকলেরই সংশয় ছিলো বলে তাঁরা নতুন এমন একজন ঈশ্বরের প্রকল্প দাঁড় করিয়েছেন যেটা তাঁদের দার্শনিক প্রতীতির সঙ্গে মেলে।

৩

এই ঈশ্বরের স্বরূপটা কিরকম? এঁরা এই ঈশ্বরের ধারণাই-বা পান কোত্থেকে? কেউ হয়তো লালনের ওপর সুফিবাদের প্রভাব খুঁজে পাবেন, অথবা ভারতবর্ষের প্রেম ভক্তিবাদের এবং বৌদ্ধ সহজিয়াবাদের প্রভাবও খুঁজে দেখতে চাইবেন। রবীন্দ্রনাথের ওপর তো লালন, কবীর প্রমুখ মরমীদের প্রভাব প্রায় স্পষ্ট। কিন্তু যে প্রভাবই থাকুক না কেন, ধর্মগ্রন্থের ঈশ্বরের সঙ্গে যে তাঁদের ঈশ্বরের মিল প্রায় নেই একথা সবাই বোঝেন। এমন কি ইসলাম ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে সম্পর্কিত সুফিবাদের ঈশ্বরও ইসলামী ঈশ্বর নন! সুফিরা মনে করেন মানুষ হচ্ছে ঈশ্বরেরই একটি প্রকাশ মাত্র এবং মানুষ সাধনার মাধ্যমে নিজেকে এমন এক স্তরে উন্নীত করতে পারে যখন মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না, তাঁরা একই সত্ত্বায় পরিণত হন। এ প্রসঙ্গে মনসুর হেল্লাজের উদাহরণ টানা যেতে পারে। কথিত আছে তিনি সাধনার এমন এক উচ্চতর স্তরে আরোহন করেছিলেন যে, নিজেকে আল্লাহ থেকে পৃথক করতে না পেরে 'আমিই সত্য' (আনাল হক) বলে দাবি করেছিলেন। শরিয়তের দৃষ্টিতে গর্হিত এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে মনসুর হেল্লাজকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিলো (শরিয়তপন্থীদের মতে, নিজেকে বা অন্য কাউকে, এমনকি নবীকেও, আল্লাহর সঙ্গে তুলনা করা যাবে না, আল্লাহর শরীক বা অংশ হিসেবে বর্ণনা করা যাবে না। নিজেকে আল্লাহ হিসেবে দাবি করা তো ভয়াবহ অপরাধ। জ্ঞানত বা অজ্ঞানত আল্লাহর কোনো শরীক করা মৃত্যুদণ্ডের মতো শাস্তিযোগ্য অপরাধ)। তো, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর তাঁর রক্ত থেকেও আনাল হক ধ্বনি বেরিয়ে আসতে থাকে, অতঃপর তাঁর সারাশরীর কেটে টুকরো টুকরো করা হয়, কিন্তু প্রত্যেকটি টুকরো থেকে আনাল হক শব্দটি ধ্বনিত হতে থাকলে টুকরোগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়। কিন্তু মাংস-পোড়া ছাই থেকেও একই ধ্বনি নির্গত হতে থাকলে শরিয়তপন্থীরা ভয় পেয়ে ঐ ছাই সাগরে নিক্ষেপ করেন, এবং পরিণামে সাগরের পানি ফুলেফেঁপে উঠে আনাল হক ধ্বনিতে সমস্ত শহর ভাসিয়ে নিতে উদ্যত হয়। মনসুর হেল্লাজ নিজের এই পরিণতি আগে থেকেই জানতেন, (যিনি নিজেকেই খোদা বলে দাবি করেন, তিনি যে আগে থেকেই নিজের পরিণতি জেনে ফেলবেন সে আর বিস্ময়কর কী!) তাই তাঁর এক অনুসারীকে এরকম পরিস্থিতিতে কী করতে হবে সেটা আগেভাগেই বলে গিয়েছিলেন, ফলে সেবারের মতো শহরটি রক্ষা পায়।

যাহোক, সুফিবাদের এই আল্লাহর সঙ্গে মূল ইসলামের আল্লাহর ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। মূল ইসলামেরর কনসেপ্ট অনুযায়ী আল্লাহ একটি ইউনিক (একক/অদ্বিতীয়) সত্ত্বা, অন্য সবকিছু তাঁর সৃষ্টি। অর্থা সম্পর্কটা এখানে স্রষ্টা ও সৃষ্টির। আর সুফিবাদ বলছে আলাহ এবং তাঁর সৃষ্টজগতের মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই, কারণ আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন মাত্র। এই ধারণা এখন আর আমাদের কাছে বৈপ্লবিক বলে মনে হয় না, কিন্তু সুফিবাদের জন্মকালে এসব কথাবার্তা কী ভয়ানক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলো ভেবে দেখুন! ইসলামের পরিকাঠামোর মধ্যে থেকে, ইসলাম সৃষ্ট আল্লাহকে মেনে নিয়ে এবং নবীকে এবং ঈমানের অন্যান্য অনুষঙ্গগুলোকে স্বীকার করে নিয়েই তাঁরা আল্লাহর ভিন্নতর একটি রূপ দাঁড় করিয়েছিলেন।

এই যে প্রচলিত ধর্মমতসমূহের বাইরে গিয়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি নতুন ধারণা সৃষ্টি বা নিজের জন্যই ঈশ্বরের একটি রূপ তৈরি করেন মনীষীরা, তার কারণ কি? সঠিক কারণটি নির্ণয় করাটা খুবই দুরূহ; সম্ভাব্য কারণটি হয়তো এই যে, তারা অনুভব করেন নিজেকে সমর্পণের জন্য, নিবেদনের জন্য এমন একজনের অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন। কেমন একজন? প্রেমময়, দয়াময়, ক্ষমাশীল একজন। এমন একজন যিনি কথায় কথায় নরকের ভয় দেখান না, স্বর্গের লোভও দেখান না, শাস্তি দেবার জন্য উদ্যত হস্তে যিনি দাঁড়িয়ে থাকেন না, অনুরাগীর অপরাধকে তিনি দেখেন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে, যাঁর কাছে দাবি করা যায়, যাঁর ওপর অভিমান করা যায়, রাগ করা যায়, এমন কি তাঁর কোনো নিষ্ঠুরতার জন্য তাঁকে অভিযুক্তও করা যায়। প্রেম নিবেদনে যিনি আনন্দিত হন, অনুরাগীর সমর্পণ যাঁকে খুশি করে তোলে। প্রেমের মাত্রাটা বেশি হয়ে গেলে যিনি নিজের বিরাটত্ব ভুলে গিয়ে অনুরাগীর বন্ধ দুয়ার খুলে ঢুকে পড়েন, নিজেকে প্রকাশ করেন অনুরাগীর প্রেমের মধ্যে দিয়ে, প্রমাণ করেনÑ তিনি ভয়ংকর নন, বীভ□স নন, বিদ্বেষপরায়ণ নন, শাস্তিদাতা নন, ভীতিকর নন তিনি প্রেমময় এবং সুন্দরের পুজারী, সমর্পণ আর নিবেদনই তাঁর কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কিছু নয়।

৪

কিন্তু এমন একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব কেন স্বীকার করে নেন মনীষীরা? প্রচলিত কোনো ধর্মে যাঁদের আস্থা নেই, তাঁরা কেন এরকম একেকটি নতুন নতুন ঈশ্বর-ধারণার জন্ম দেন, তিনি না থাকলে তাঁদের এমন কি যায় আসে? এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া কঠিন, কারণ, উত্তর জানতে হলে এঁদের মনোজগ□টি বুঝতে হবে। একজন সৃষ্টিশীল মানুষের মনোজগ□ বোঝা সহজ কাজ নয়। লেখকের সাহিত্যকর্ম, শিল্পীর শিল্পকর্ম, বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ইত্যাদি দিয়ে সংশ্লিষ্টদের দার্শনিক উপলব্ধির জগ□টি খানিকটা বোঝা গেলেও মনোজগ□ বোঝা দুস্কর। এর কারণ দুটো। প্রথমত : সৃষ্টিশীল মানুষটি যতই প্রতিভাবান হন না কেন, তাঁর উপলব্ধির খুব কম অংশই তিনি শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করে যেতে পারেন অধিকাংশটুকুই রয়ে যায় অপ্রকাশিত অবস্থায়। প্রকাশ করার মতো সময়, উপযুক্ত ভাষা বা প্রকরণ খুঁজে পান না তাঁরা। কিন্তু এসবের চেয়ে সত্যি কথাটি হয়তো এই যে, সেই উপলব্ধিকে যথার্থভাবে প্রকাশ করতে পারাটাই এক অসম্ভব ব্যাপার। যে সুগভীর মগ্নতার ভেতর এঁদের কাছে সেই মহামহিম রূপটি ধরা দেয়, সচেতন হলেই তিনি হারিয়ে যান, কেবল রয়ে যায় তাঁর রেশটুকু। এখানে সেই মগ্নতার কথাটিও একটু বলা দরকার। মানব-ইতিহাসের যেসব মহামানবের সৃষ্টিকর্ম দেখে আমরা বিস্মিত ও অভিভূত হই, তার অধিকাংশই ওই মগ্নতা থেকে উ□সারিত। সাহিত্যশিল্পীর সাহিত্যকর্ম, বিজ্ঞানীর তত্ত্ব, সংগীতজ্ঞের কথা ও সুর এসবকিছুর মধ্যে যেগুলো কালজয়ী হয়, যুগ যুগ ধরে আমাদের আপ্লুত, বিমোহিত ও অভিভূত করে যায় সেগুলোর জন্ম যেন কোনো স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় হয় নি বলে মনে হয় আমাদের, যেন কোনো অজানা-অচেনা সূত্র থেকে সেগুলোর আবির্ভাব ঘটেছে। দু-একটি উদাহরণ দেয়া যাক। শহীদ সংগীতজ্ঞ আলতাফ মাহমুদের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি হচ্ছে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্র“য়ারি গানটি সুর করা। এই সুরটি যখন বেজে ওঠে তখন শ্রেণী-পেশা-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ কিছুক্ষণের জন্য হলেও থমকে দাঁড়ায়, তাদের মন একবারের জন্য হলেও কেঁদে ওঠে; এমনকি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস জানা না থাকলেও সুরটির কারুকার্য মানুষের মনকে এক অজানা বেদনাবোধে আক্রান্ত করে। আমার মনে হয় এদেশের মানুষের কাছে একুশে ফেব্র“য়ারি এমন

আদরণীয় হয়ে ওঠার পেছনে এই সুরটির একটি অত্যন্ত গভীর প্রভাব আছে। এর কারণ হয়তো এই যে, এই সুরের মধ্যে দিয়ে এই জাতির কান্না মূর্ত হয়ে উঠেছে, আর আলতাফ মাহমুদ হয়তো সেটিই করতে চেয়েছিলেন। বাঙালি জাতি স্মরণাতীত কাল থেকে নিপীড়িত, নির্যাতিত হয়ে এসেছে কিন্তু কোনোদিনই তেমন কোনো কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে নি। আর তা পারে নি বলেই এই নিরীহ জাতিটি এক সুগভীর বেদনায় নিমজ্জিত হয়েছে, কান্নায় গুমরে মরেছে আলতাফ মাহমুদ একটি সুরের মধ্যে দিয়ে সেই বেদনা দুঃখ কষ্ট কান্না এবং নিপীড়িত-নির্যাতিত হবার ইতিহাসকে মূর্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন, এবং বলাবাহুল্য, তিনি সফল হয়েছেন। এ যে কী বিশাল প্রতিভার পরিচয় দেয় তা ভাবা যায় না। এই গানটির কথা কিন্তু তেমন শক্তিশালী বা হৃদয়স্পর্শী নয়, সত্যি বলতে কি কথাগুলো যে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয় সেটা বোঝা যায় এই ঘটনা থেকে যে, আলতাফ মাহমুদ সুর করার আগে গানটি আবদুল লতিফের সুরে প্রায় এক যুগ ধরে গীত হয়েছে কিন্তু মানুষের মনে সেটি তেমন কোনো অভিঘাত তৈরি করতে পারে নি। বোঝা যায় আবদুল লতিফের সুরে আলতাফ মাহমুদ সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং তিনি নিজেই এটিতে সুর করার কথা ভেবেছিলেন। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই গানটি রচিত হবার এবং প্রথমবার সুর হয়ে যাবার পর তিনি নতুন সুর করতে এক যুগেরও বেশি সময় নেন। আগেই বলেছি, তিনি এমন এক সুর খুঁজছিলেন যা দিয়ে হাজার বছরের বাঙালির চেপে রাখা কান্নাটাকে মূর্ত করে তোলা যায় এবং তেমন একটি সুর সহসা পাওয়া যায় না তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়, সাধনা করতে হয় এক যুগ ধরে হয়তো তিনি সেটাই করছিলেন এবং অবশেষে কাঙ্ক্ষিত সুরটি তাকে ধরা দেয়। এই অসামান্য সুরটি তিনি পেয়েছিলেন কোথায় এ-কি তাঁর সচেতন সৃষ্টি নাকি গভীর কোনো মগ্নতার ফল যে মগ্নতা তাঁকে সুরটি উপহার দিয়েছিলো!

আরেকটি উদাহরণ দেয়া যায়। আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত স্পেশাল থিয়োরি অব রিলেটিভিটি প্রণয়ন করেন ১৯০৫ সালে যখন তাঁর বয়স মাত্র ২৩! এই তত্ত্ব মহাবিশ্ব সম্বন্ধে মানুষের প্রচলিত ধারণাগুলোকে আমূল বদলে দেয়। শুধু বিজ্ঞানেই নয়, এর প্রভাব পড়ে সাহিত্যে, দর্শনে, মনোবিজ্ঞানের আলোচনায়, সংস্কৃতিতে এমনকি অর্থনীতি এবং রাজনীতিতেও। মানব ইতিহাসে এমন যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আর আসে নি। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জায়গা এটি নয়, আমি শুধু দু-একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করবো। এই তত্ত্বের শুরুতেই তিনি দুটো স্বতঃসিদ্ধ (postulates) দেন। এর প্রথমটি আলোর বেগ সংক্রান্ত, যা পুরো উনিশ শতক জুড়ে চলতে থাকা ইথার সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক বিতর্কের অবসান ঘটায়। একটি মাত্র বাক্যে যে-যুবক একশো বছরের বিতর্কের অবসান ঘটান তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করাটাও সাহসের কাজ সে-সাহস আজ পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানকর্মী করে উঠতে পারেন নি। দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলোকে পৃথিবীর সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মুক্তি দিয়ে মহাবিশ্বের অসীম পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দেন। তিনি বলেন পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো পৃথিবীর মতোই মহাবিশ্বের সর্বত্র একইভাবে প্রযোজ্য হবে। এই দুটো স্বতঃসিদ্ধ তাঁর মূল কাজের কণামাত্র নয়, অথচ তিনি যদি কেবল এই দুটো কথা লিখেই মরে যেতেন তাহলেও বিজ্ঞানের জগ চিরকাল তাঁকে শ্রদ্ধাভারে স্মরণ করতো এমনই ছিলো এর গুরুত্ব। তাঁর মূল তত্ত্ব ছিলো অভূতপূর্ব সব ধারণার সমন্বয় যা মানুষের প্রচলিত ধারণাকে চিরকালের জন্য পাল্টে দেয়। এর মূল কথাটি হলো পরম বলে কোনোকিছু নেই, সবকিছুই আপেক্ষিক; কোনোকিছুকে বিচার করা যায় কেবল অন্য কোনোকিছুর সাপেক্ষে। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের মধ্যে থেকে গাণিতিক শৃঙ্খলা মেনে তিনি যে তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন তা ঝামেলা পাকালো দর্শনের আলোচনায়। সেখানেও চলে এলো আপেক্ষিকতা। সবকিছুই

আপেক্ষিক এ কথাটি যেন বেদবাক্যের মতো হয়ে উঠলো। এমনকি ঈশ্বরও। অর্থা ঈশ্বর কোনো পরম সত্ত্বা নন, পরম সত্যও নন। তিনিও আপেক্ষিকভাবে সত্য। বিশ্বাসীদের কাছে তিনি সত্য, অবিশ্বাসীদের কাছে মিথ্যা। আপেক্ষিকতত্ত্বের জন্য ঈশ্বরের এই পরিণতি দেখে আইনস্টাইন ব্যথিত হয়েছিলেন কী না জানি না, কিন্তু বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সমস্ত তত্ত্বই গিয়েছিলো ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ঈশ্বরচিন্তার বিরুদ্ধে। ১৯১৭ সালে জেনারেল থিয়োরি অব রিলেটিভিটি তত্ত্বে তিনি আলোর গতিপথ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে বলেছিলেন আলো সবসময় সরল রেখায় চলে না, কখনও কখনও বাঁকা পথও অনুসরণ করে। এটিও ছিলো একটি অবিশ্বাস্য, আশ্চর্য প্রস্তাব। কারণ, এর আগে পর্যন্ত মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে আলো কেবল মাত্র সরলরেখাতেই চলে। তাঁর কথা প্রথমে মেনে নেয়া হয় নি। পরে যখন পরীক্ষা করে তাঁর কথার সত্যতা পাওয়া গেলো তখন তিনি বলেছিলেন 'আলো যদি না বাঁকতো তাহলে ঈশ্বরের জন্য দুঃখ করা ছাড়া আমার কিছু করার ছিলো না, কারণ আমি জানতাম আলো বেঁকেই আসবে, তিনি না বাঁকালে আমি কী করবো!' অর্থা ঈশ্বরকে চলতে হবে আইনস্টাইনের নিয়ম মেনে! এ কেমন ঈশ্বর! আগেই বলেছি, আইনস্টাইনের সমস্ত তত্ত্বই ছিলো প্রচলিত ঈশ্বর ধারণার বিরুদ্ধে, অথচ তিনি নিজে ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন। এর মানে কী? তিনি কোন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন? এ কি তাঁর নিজের বানোনো ঈশ্বর? তাঁর কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় তাঁর ঈশ্বর বেশ নিয়মকানুন মেনে চলেন এবং কোন কোন নিয়ম তিনি মেনে চলেন বা চলবেন সেটা মানুষের পক্ষেই বলে দেয়া সম্ভব। অর্থা ঈশ্বরের কথা তিনি নিজে বলবেন না, বলবে মানুষ। তাহলে যেসব গ্রন্থকে ঐশ্বরিক বলে দাবি করা হয় সেসবের আর মর্যাদা রইলো কোথায়? রইলো না। আইনস্টাইন সেগুলোর তোয়াক্কাও করেন নি। তবু যে তিনি একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা করেছিলেন তার কারণ হয়তো এই যে, তাঁর সচেতন মন ও অভিব্যক্তি তাঁর তত্ত্বগুলোর জন্ম-প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে পারতো না। একজন অল্পবয়সী যুবক যেসব কথাবার্তা বলেছিলেন, কীভাবে তা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো সেটা বলা সত্যিই দুস্কর। বিজ্ঞানীরা আত্মভোলা হন, আইনস্টাইন সম্বন্ধেও এমন গল্প অনেক ছড়িয়ে আছ তার কারণ হয়তো এই যে, এক সুগভীর মগ্নতা তাঁদেরকে দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আর ওই মগ্নতা, সাধনা, ধ্যানই জন্ম দেয় ওরকম অভূতপূর্ব সব বৈজ্ঞানিক ধারণা, অসামান্য সুর, ব্যাখ্যাতীত সাহিত্য ইত্যাদির। মগ্ন থাকেন বলে এঁরা বিচ্ছিন্ন থাকেন দৈনন্দিন বাস্তবতা থেকে, তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাত্যহিকতা থেকে আর এই শিল্পীরা মনে করেন তাঁদের সৃষ্টিকর্মের জন্ম হয়েছে কোনো অজানা উ স থেকে, এসবের পেছনে যেন কারো হাত আছে। এসব যেন তাঁরা সৃষ্টি করেন না, তাঁদেরকে ধরা দেয় (এদেশের একজন অন্যতম প্রধান কথাসাহিত্যিক আমাকে একবার বলেছিলেন, নিজের লেখাগুলো পরে পড়তে গিয়ে মনে হয় লেখার সময় আমি যেন অন্য কারো করতলে ছিলাম, মনে হয় ওগুলো আমি লিখি নি, আমাকে দিয়ে অন্য কেউ লিখিয়ে নিয়েছে!)। যে উ স থেকে এসব আসে তাকেই তাঁরা দয়াল বলেন, প্রভু বলেন, গড বলেন প্রচলিত ঈশ্বরের সঙ্গে যাঁর মিল নেই বললেই চলে। এই ঈশ্বর তাঁদের নিজস্ব ঈশ্বর যিনি তাঁদেরকে সৃষ্টিকর্ম উপহার দেন, তাঁর সঙ্গে তাই সম্পর্কটি ভয়ের নয়, প্রেমের ও কৃতজ্ঞতার। আর এই প্রেম ও কৃতজ্ঞতা থেকেই জন্ম নেয় সমর্পণ। বিশ্বাসীরাই শুধু তাদের ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হন কথাটি ঠিক নয়, অবিশ্বাসী এবং সংশয়ীরাও জীবনের কোনো-না-কোনো সময়ে সমর্পিত হন কারো-না-কারো কাছে; হয়তো কোনো সুনির্দিষ্ট ঈশ্বরের কাছে নয়, তবু তিনি কোনো-না-কোনো অর্থে সমর্পিত ব্যক্তিটির চেয়ে অনেক বড়, মহান এবং দয়াময়। প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক বা সংশয়ীদের এই সমর্পণ অনেক বেশি তা পর্যপূর্ণ, কারণ তাদের কোনো সংজ্ঞায়িত

ঈশ্বর নেই। আমার তো মনে হয় বিশ্বাসীরা কোনোদিনই আপাদমস্তক সমর্পিত হতে পারেন না, তাদের ঈশ্বর ধারণা সুনির্দিষ্ট এবং সংজ্ঞায়িত বলেই ঈশ্বর সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার সময় তাদের নেই, তারা তাই ধর্মের কতগুলো আচার মেনেই সন্তুষ্ট থাকেন। ফলে তাদের নিয়মিত ধর্মচর্চা নিছক আচারসর্বস্বতায় পরিণত হয়।

৫

লালন, ওমর খৈয়াম, মির্জা গালিব, হাফিজ, রুমি, রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন এঁরা কেউই হয়তো প্রথম জীবনে প্রচলিত কোনো ধর্মে পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করেন নি; আবার তারা যে নাস্তিক ছিলেন এমন কোনো প্রমাণও পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে এঁরা ছিলেন সংশয়ী। নিজেদেরকে তাঁরা রেখেছিলেন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে। ফলে তাঁদের জীবনে যখন এক ধরনের সমর্পণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো নিজেদের মতো করে একজন ঈশ্বরের ধারণা তাঁরা তখন তৈরি করে নিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কথা বলা যাক :

প্রেমের হাতে ধরা দেব

তাই রয়েছি বসে

অনেক দেরি হয়ে গেল

দোষী অনেক দোষে।

বিধিবিধান-বাঁধন-ডোরে

ধরতে আসে, যাই যে সরেÑ

তার লাগি যা শাস্তি নেবার

নেব মনের তোষে

তাই রয়েছি বসে।

লোকে আমায় নিন্দা করে,

নিন্দা সে নয় মিছেÑ

সকল নিন্দা মাথায় ধরে

রব সবার নীচে।

শেষ হয়ে যে গেল বেলা

ভাঙল বেচা-কেনার মেলা

ডাকতে যারা এসেছিল

ফিরল তারা রোষে

প্রেমের হাতে ধরা দেব

তাই রয়েছি বসে।

বলাবাহুল্য এ হচ্ছে আচারসর্বস্ব ধর্মের প্রতি একটি সূক্ষ বিদ্রুপ। অন্যদিকে এই কবিতাটিকে সংশয়ীদের সমর্পণ সম্বন্ধে একটি চম□কার উপলব্ধির প্রকাশ বলেও ধরে নেয়া যায়। বিধিবিধান যখন তাদেরকে ধরতে আসে তখন তারা সরে যান, অনেক দোষে দোষী হন, অনেকভাবে নিন্দিত হন এসব তারা মেনেও নেন, তবু প্রেমের হাতে ধরা দেবার জন্যই বসে থাকেন। আরেকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন

একটি নমস্কারে, প্রভু,

একটি নমস্কারে

সকল দেহ লুটিয়ে পড়–ক

তোমার এ সংসারে।

হয়তো সংশয়ীদের সমর্পণ এমনই, তাঁরা যখন সমর্পিত হন তখন একবারে লুটিয়ে পড়েন, এমন গভীর তাদের সমর্পণ।

৬

এত কথার অবতারণা করতে হতো না যদি আমার বন্ধুটি লালনের ঐ গানটি নিয়ে ওরকম একটি মন্তব্য না করতেন। প্রিয় পাঠক, আমি আপনাদের সামনে গানটি তুলে ধরছি। আপনারাও একটু দেখুন এর মধ্যে মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিকতা খুঁজে পান কী না।

ক্ষম ক্ষম অপরাধ, দাসের পানে একবার চাও হে দয়াময়।

বড় সংকটে পড়িয়া দয়াল বারেবার ডাকি তোমায় ॥

তোমারই ক্ষমতায় আমি

যা কর তাই পার তুমি

রাখ মার সে নাম-নামি

তোমারি এ জগ□ময় ॥

পাপী অধম তরিতে সাঁই

তোমার পাবন নাম শুনতে পাই

সত্য মিথ্যা জানব হে সাঁই

তরাইতে আজ আমায় ॥

কসুর পেয়ে মার যারে

আবার দয়া হয় তাহারে

লালন বলে এ সংসারে

আমি কি তোর কেহই নয় ॥

আগেই বলেছি, আমি ব্যক্তিগতভাবে এই গানের মধ্যে কোনো দ্বান্দ্বিকতা খুঁজে পাই নি, পেয়েছি সমর্পণ, তুমুল সমর্পণ। দয়ালের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা। বড় সংকটে পড়েছেন তিনি সে তো বলছেন-ই, পড়ে দয়ালকে ডাকছেন তাঁর অজানা অপরাধ ক্ষমা করার জন্য। এই গানের মধ্যে আছে প্রেম, আছে ভালোবাসার দাবি আমি কি তোর কেহই নয় কিন্তু দ্বান্দ্বিকতা কোথায়? এমন অসামান্য এক সমর্পণের মধ্যে আমার বন্ধু তাহলে সেটা খুঁজে পান কেন? কেন গানটিকে একটি গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেন? এর কারণ নিহিত আছে আস্তিক ও নাস্তিকদের মানসলোকের মধ্যে। পৃথিবীর সবকিছুকে মার্কসবাদের আওতায় নিয়ে এসে ব্যাখ্যা

করার চেষ্টা আর সবকিছুকে ধর্মের আওতায় নিয়ে এসে ব্যাখ্যা করা একই ধরনের রোগ বলে মনে হয় আমার। এই দুই ধরনের মানুষই জীবন ও পৃথিবীর সবকিছুকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি ফ্রেম তৈরি করেন আর ওই ফ্রেমকেই তিনি স্ট্যান্ডার্ড বলে মনে করেন। পৃথিবীর সবকিছুকেই ওই ফ্রেমে বন্দী করে ফেলাটা তার একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়, একান্তই কোনো বিষয় যদি সেই ফ্রেমের মধ্যে না পড়ে তাহলে সেটাকে তীব্রকণ্ঠে অস্বীকার করেন। আস্তিকদের জন্য নাস্তিকতা আর নাস্তিকদের জন্য আস্তিকতা হচ্ছে ফ্রেমের বাইরের ব্যাপার ফ্রেমে ফেলে বিষয়টিকে তারা ব্যাখ্যা করতে পারেন না বলেই অস্বীকার করেন। অন্যদিকে সংশয়ীদের এমন কোনো সুনির্দিষ্ট ফ্রেম থাকে না, ফলে তারা যে কোনো বিষয়কেই স্বীকার বা অস্বীকার না করে বিবেচনায় নেন, সংশয় প্রকাশ করেন, বিষয়টির ভালো-মন্দ, ইতি ও নেতি খতিয়ে দেখেন আর এইদিক থেকে বিচার করলে মনে হয় সংশয়ীরা দার্শনিকভাবে অন্যান্যদের চেয়ে এগিয়ে আছেন। তাদের বিবেচনার আকাশটি অনেক বড়, তাদের ভাবনা-চিন্তার জগ্টি ফ্রেমবন্দী নয়, আর তাছাড়া কে না জানে আকাশকে কখনো ফ্রেমবন্দী করা যায় না!

৭

কিন্তু সংশয়ীদের নিয়ে একটি বড় সমস্যাও আছে। সেটি হচ্ছে দার্শনিকভাবে তাঁদের ওপর কোনো আস্থা রাখা যায় না। তাঁরা যে কখন কোন দলে যাবেন সে ব্যাপারে আগাম কিছুই বলা যায় না। আপনি আস্তিকদের ওপর আস্থা রাখতে পারেন, পারেন নাস্তিকদের ওপরেও কারণ তাদের সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস আছে। আপনি ধর্মপন্থিদের ওপর আস্থা রাখতে পারেন, পারেন মার্কসবাদীদের ওপরেও কারণ তাদের মনোজগতের প্যাটার্নটি আপনার মোটামুটিভাবে জানা। কিন্তু সংশয়ীরা কোনদিকে যাবে তা আপনি বুঝবেন কীভাবে? না, বোঝার উপায় নেই। অতএব আপনি যদি কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে চান তাহলে ভুলেও সংশয়বাদীদের কথা শুনতে যাবেন না। লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে সংশয়বাদী দর্শন এক বিরাট প্রতিবন্ধক। এ জন্যই বলেছি, আস্তিকদের শত্র“ নাস্তিকরা নয়, নাস্তিকদেরও শত্র“ নয় আস্তিকরা কারণ এরা পরস্পরের স্বরূপ জানে, এরা বড়জোর পরস্পর বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে শত্র“ হচ্ছে সংশয়ীরা, কারণ এঁদের স্বরূপ কেউ জানে না। এঁদের মোকাবেলা করতে হলে আপনাকে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট আকারের ফ্রেম তৈরি করতে হবে, সবকিছুকে সেই ফ্রেমে বন্দী করে বিচার করতে হবে এবং ফ্রেমের বাইরের সবকিছুকে নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলতে হবে, যদিও এরকম করলে আপনি হয়ে উঠবেন একজন ছাঁচে ঢালাই করা মানুষ তাতে ক্ষতি নেই যদি আপনার লক্ষ্যটি অর্জিত হয়।

সংশয়ীদের ওপর যদি আস্থা না-ই রাখা যায় তাহলে তাঁদের বিশাল আকাশ থেকে লাভটা কি হলো? তাঁরা তো সর্বদা পরিত্যাজ্য। না, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো লক্ষ্য অর্জন বা জাতীয় জীবনের কোনো লক্ষ্য অর্জনেও সংশয়ীরা তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারেন না, তাঁরা বরং পরিত্যাজ্যই, কিন্তু জীবন তো শুধু ব্যক্তিগত কিংবা জাতীয় জীবনের বৈষয়িক লক্ষ্য অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর মহত্তম কোনো দার্শনিক লক্ষ্যও থাকতে পারে। সেরকম কোনো মহত্তর উপলব্ধি অর্জন করতে হলে আপনাকে সংশয়ীই হতে হবে।

একটা উদাহরণ দেয়া যাক। আমাদের দেশে যারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করেন, কিংবা ইসলামী হুকুমত কায়েমের স্বপ্ন দেখেন এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করেন তারা বলতে পারেন না যে, এই লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেলে তাদের পরবর্তী করণীয় কাজটি কী হবে! চিন্তাটিকে আরেকটু বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে যাওয়া যাক। ধরা যাক, সারা বিশ্বই একদিন সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে রূপান্তরিত হলো বা সারাবিশ্বেই একদিন ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়ে গেলো, এরপর মানুষ কী করবে? ওরকম কোনো অবস্থা যদি সত্যি সত্যি তৈরি হয় তাহলে সেই পৃথিবী কি আর বসবাসযোগ্য থাকবে? পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ আল্লাহর ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কান্নাকাটি করছে, কিংবা পৃথিবী জুড়ে মানুষ একটি অভিযোগহীন জীবনযাপন করে যাচ্ছে এরকম পৃথিবী তো ভয়াবহ। ওরকম বৈচিত্র্যহীন পৃথিবীতে আত্মহত্যা করা ছাড়া মানুষের মুক্তির আর কোনো পথ খোলা থাকবে বলে তো মনে হয় না। মুশকিল হলো এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে কেউ-ই সহজে মুখ খুলতে চান না, বরং আগে তো সেই সমাজ অর্জিত হোক এরকম কথা বলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন। ইসলামপন্থিদের মধ্যে দার্শনিক খুঁজে পাওয়া আর এক সমুদ্র জলে একটি সুঁই খুঁজে পাওয়া একই কথা তাই তাদের কাছ থেকে এর সদুত্তর পাওয়ার আশা করাই বৃথা। কিন্তু বামপন্থি দার্শনিকরা কেন এটা নিয়ে কথা বলেন না? কেন তারা বলেন আগে তো সেই সমাজ অর্জিত হোক তারপর দেখা যাবে! কেন পরে দেখা যাবে? কেন এখনই বলা যাবে না? এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে না চাওয়া বা প্রশ্নটি এড়িয়ে যাবার কারণটি হয়তো এই যে, এই দার্শনিকরা জানেন ওরকম একটি সমাজ অর্জিত হওয়া পর্যন্তই কেবল মাত্র তাদের দর্শন ক্রিয়াশীল থাকতে পারে এরপর তার আর কোনো ভূমিকা থাকবে না। জেনেশুনেও কেন তারা অমন একটি অলঙ্ঘনীয় ফ্রেম তৈরি করেন বলা মুশকিল। ব্যক্তিগতভাবে আমি মার্কসবাদকে মানব-ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শন বলে মনে করি এবং এই দর্শন মানুষের জন্য যে ধরনের সমাজ কামনা করে সত্যি সত্যি যদি তা অর্জিত হয় তাহলে সেটা হবে এই দর্শনের বিরাট সাফল্য, এরপর এর মৃত্যু ঘটলেও কিছু যায় আসে না। তবে এমন একটি অসামান্য দর্শনের মৃত্যুর পরও সংশয়ীরা ক্রিয়াশীল থাকতে পারেন। সংশয়ীদের কৌতূহলের শেষ নেই, প্রশ্নেরও শেষ নেই আর তাই অনুসন্ধানেরও শেষ নেই। শেষ নেই বলেই সংশয়ীরা কোথাও দাঁড়ান না, অবিশ্রান্তভাবে এগিয়ে চলেন। ঈশ্বরবিহীন পৃথিবীতে তাঁরা নতুন ঈশ্বরের জন্ম দিতে পারেন হয়তো এভাবেই কোনো এক সুদূর অতীতে কোনো এক সংশয়ী মানব সমাজে ঈশ্বর ধারণার সূচনা করেছিলেন। একইভাবে ঈশ্বরময় পৃথিবীতে তাঁরা সংশয়ী প্রশ্ন করে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে পারেন। অর্থা কোনো অবস্থাই তাঁদের জন্য শেষ অবস্থা নয়। অন্য সব দর্শন যেখানে হেরে যায়, থেমে যায় সংশয়ীরা তখনও থাকেন চলমান। এই একটি জায়গায় সংশয়ীরা অন্য সবার থেকে শ্রেষ্ঠ।

আহমাদ মোস্তফা কামাল, বাংলাদেশে বসবাসরত লেখক। তাঁর গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধে কুশলী কলমে তুলে ধরেন সমাজের নানা বৈকল্য ও বিকার, অন্যায় ও অসঙ্গতি, অসুখ ও স্খলনের চিত্র। আগন্তুক, দ্বিতীয় মানুষ, আমরা একটি গল্পের জন্য অপেক্ষা করছি, সংশয়ীদের ঈশ্বর সহ বহু গ্রন্থের প্রণেতা।

মহাবিশ্ব এবং ঈশ্বর -একটি দার্শনিক আলোচনা

অভিজিৎ রায়

বছর ছয়েক আগের কথা। একবার একটি বাংলাদেশী ই-ফোরামে এক ভদ্রলোকের সাথে দর্শনগত কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আমি তখন সবেমাত্র ই-ফোরামগুলোতে লেখালিখি শুরু করেছি। ভদ্রলোক আমাকে তার জীবনের একটি ঘটনা গল্পচ্ছলে উল্লেখ করে বললেন,

> *গতকাল আমি আমার এক বন্ধুর বাসায় যাচ্ছিলাম, পার্টিতে। কিন্তু বেরুতে গিয়ে অযথাই আমার দেরী হয়ে গেল। কারণ বাড়ীর বাইরে পা দিয়েই দেখি প্রচন্ড বৃষ্টি। আমার বাড়ীর চারপাশটা বৃষ্টির পানি জমে এমনভাবে ভরাট হয়ে ছিল যে, বন্ধুর বাসায় যাওয়াটাই শেষ পর্যন্ত মুশকিল হয়ে দাঁড়ালো।*
>
> *এমন সময় আমর বড়র পাশের একট গাছ হঠাৎ করেই ভেঙে পড়ল আর তরপর জমে থাকা পানির উপর ভাসতে লাগল। ভাসতে ভাসতেই গাছের ডাল-পালা বিল্ডিং এর এখান ওখানে বাড়ি খেয়ে ভেঙে পড়ে যেতে লাগল আর শেষ পর্যন্ত যা ঘটল তা এককথায় অবিশ্বাস্য - চোখের সামনে দেখলাম বিশাল গাছটি একটা নৌকায় পরিণত হয়ে গেল। এই নৌকায় চেপেই আমি অবশেষে আমার বন্ধুর বাসায় পৌঁছুতে পারলাম। অবাক ব্যাপার, তাই না? নৌকাটি ছিল একদম নিঁখুত, গ্রাম বাংলার মাঝিরা যে নৌকাগুলোয় দাঁড় বায় - একদম সেই রকম। এমন একটা নৌকা নিজে থেকেই তৈরী হয়ে গিয়েছিল কোন মানুষের প্রচেষ্টা ছাড়াই- আমার চোখের সামনে!*
>
> *'যত সব ননসেন্স' - আপনি হয়ত ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠবেন—*
>
> *'কিভাবে একটা নৌকা কোন মানুষের প্রচেষ্টা ছাড়াই নিজে থেকে তৈরী হয়ে যেতে পারে?'*
>
> *'আপনার এভাবে নিজে নিজে নৌকা তৈরী হয়ে যাওয়ার কাহিনী শুনে মনে হচ্ছে কেউ একজন যেন দোয়াতের বোতল থেকে কালি নিয়ে ইচ্ছে মত দিস্তে দিস্তে কাগজে ছিটিয়ে দিল আর তা সুন্দর একটা অভিধানে পরিণত হয়ে গেল!'*
>
> *'কিভাবে নৌকার মত একটা জিনিস কোন পরিকল্পণা ছাড়া, কারো প্রচেষ্টা ছাড়া এমনি এমনি তৈরী হয়ে যেতে পারে?'*

তাহলে অভিজিৎ সাহেব, আমায় বলুন তো যেখান একটা সাধারণ নৌকাই কারা ইচ্ছ ছাড়া নিজে থেকে তৈরী হয়ে পানিতে ভেসে থাকতে পারে না, সেখানে কিভাবে আমাদের দেহের মত জটিল সিস্টেম হুট করে কোন কারণ ছাড়াই তৈরী হয়ে যেতে পারে?

কিংবা,

কিভাবে এই জটিল মহাবিশ্ব কারো উদ্দশ্য বা পরিকপণা ছাড়া এমনি এমনি তৈরী হয় যেতে পারে?'

খুবই যৌক্তিক প্রশ্ন। যেখানে একটি নৌকা নিজে থেকে তৈরী হয়ে পানিতে ভেসে থাকতে পারে না, সেখানে কিভাবে এই জটিল মহাবিশ্বকে 'সয়ম্ভু' বলে আমরা ভেবে নিতে পারি? কিভাবে ধারণা করতে পারি এই যে সুশৃঙ্খল বিশ্ব, প্রাণী-জগৎ, প্রকৃতি, গ্রহ-তারা এত সব কিছু নিজ থেকে সৃষ্ট হয়ে এমনি অবস্থায় এসে পৌঁছেছে কোন পরম পুরুষের হাতের ছোঁয়া ছাড়া? সৃষ্টিকর্তার ভূমিকা ছাড়া সৃষ্ট হয়েছে এ নয়নাভিরাম বিশ্ব? বললেই হল নাকি! মানব-মন সত্যই সায় দিতে চায় না এ ধরনের তথাকথিত 'অবাস্তব' অনুকল্পে। তাই আমাদের এই বিশ্বজগতের পেছনে সত্যিকারের 'পরম-পিতা'জাতীয় কেউ আছেন - এই স্বজ্ঞাত ধারণা তাড়িত করেছে, ভাবিত করেছে যুগে যুগে দার্শনিকদের। ৩৯০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে সক্রেটিস তার একটি লেখায় বলেছিলেন[1] –

> 'প্রাণময় সৃষ্টির মধ্যে এমন পূর্বকল্পিত চিহ্নের অস্তিত্ব সত্তেও আপনি কেমন করে সন্দেহ পোষণ করেন যে এরা পছন্দকৃত বা নকসাকৃত কার্যের ফসল নয় ?'

প্লেটোও ভেবেছেন যে, এই মহাবিশ্ব দেখে বোঝা যায় যে, এর পেছনে একজন নক্সাকার (Designer) রয়েছেন। তবে সবচাইতে সুন্দরভাবে এই ধারণাটি ব্যক্ত করেছেন উইলিয়াম প্যালি নামে এক ধর্মজাজক ১৮০২ সালে তার 'ন্যাচারাল থিওলজি' (Natural Theology) নামের একটি বইয়ে[2] :

> 'ধরা যাক জঙ্গলে চলতে চলতে এক ভদ্রলোক হঠাৎ একটি ঘড়ি কুড়িয়ে পেলেন। উনি কি ভেবে নেবেন যে ঘড়িটি নিজে থেকেই তৈরী হয়ে জঙ্গলে পড়ে ছিল, নাকি কেউ একজন ঘড়িটি তৈরী করেছিল?'

প্যালির এই আরগুমেন্টটি দর্শন শাস্ত্রে পরিচিত হয়েছে - সৃষ্টির যুক্তি বা 'আর্গুমেন্ট অব ডিজাইন' নামে। মহাবিশ্বের উৎপত্তির পেছনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত জোড়ালো যুক্তি হিসেবে বিগত সময়গুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি ঘড়ি যেমন নিজে থেকে সৃষ্ট হয়ে জঙ্গলে পড়ে থাকতে পারে না, ঠিক তেমনি এই মহাবিশ্বও নিজ থেকে সৃষ্ট হয়ে এমনি অবস্থায় চলে আসতে পারে না। ঘড়ি তৈরীর পেছনে যেমন

[1] 390 B.C., Xenophon, Gk. historian, quotes Socrates, "With such signs of forethought in the design of living creatures, can you doubt that they are the work of choice or design?"
[2] Natural Theology ; Evidences of the Existence and Attributes of the Deity. Collected from the Appearances of Nature, William Paley, Lincoln-Rembrandt Pub.; 12th edition (August 1, 1986)

ঘড়ির কারিগরের ভূমিকা আছে, তেমনি মহাবিশ্ব 'তৈরীর' পেছনেও ঈশ্বর জাতীয় কোন 'কারিগরের' হাত থাকতেই হবে; এই ধারণাটি একটা সময়ে আস্তিকদের মধ্যে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক যুক্তি হিসেবে বিবেচিত হত। এখনও বেশ কিছু বাংলাদেশী ফোরামেই এই যুক্তিটি ঈশ্বরের বিশ্বাসের সপক্ষে অত্যন্ত জোড়ালোভাবে ব্যবহৃত হয়।

তবে যারা 'নিরপেক্ষ' দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জ্ঞান বিজ্ঞান আর যুক্তিবাদের চর্চা করে যাচ্ছেন, তাদের কাছে কিন্তু প্যালির যুক্তির দুর্বলতা গুলো অনেক আগেই ধরা পড়েছে। আমি আমার 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' (অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৬) বইয়ে এ নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। পাঠকদের উদ্দেশ্যে এর কিছু তুলে ধরা হল -

১) ঘড়ির কারিগরের পিতা :

ঘড়ির যেমন ঘড়ির কারিগর থাকে, তেমনি প্রত্যেক কারিগরেরই থাকে পিতা। তাহলে মহাবিশ্বের কারিগর রূপী ঈশ্বরের পিতাটি কে? এই প্রশ্ন মনে আসাও স্বাভাবিক। আর সেই পিতার পিতাই বা কে ছিলেন, আর তার পিতা? - এমনি ভাবে প্রশ্নের ধারা চলতেই থাকবে। এই প্রশ্ন আমাদের ঠেলে দেবে অন্তহীন অসীমত্বের দিকে। বিশ্বাসীরা সাধারণতঃ এই ধরনের প্রশ্নের হাত থেকে রেহাই পেতে সোচ্চারে ঘোষনা করেন যে, ঈশ্বর সয়ম্ভু। তার কোন পিতা নেই, তার উদ্ভবের কোন কারণও নেই। তিনি অনাদি- অসীম। এখন এটি শুনলে অবিশ্বাসীরা/যুক্তিবাদীরা স্বভাবতই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে চাইবেন, 'ঈশ্বর যে সয়ম্ভু তা আপনি জানলেন কি করে? কে আপনাকে জানালো? কেউ জানিয়ে থাকলে তার জানাটিই যে সঠিক তারই বা প্রমাণ কি? আর যে যুক্তিতে ঈশ্বর সয়ম্ভু বলে ভাবছেন, সেই একই যুক্তিতে বিশ্বব্রমান্ডেরও সৃষ্টি স্রষ্টা ছাড়া এটি ভাবতে অসুবিধা কোথায়?' দর্শনশাস্ত্রে 'অক্কামের রেজর' (Occam's razor) নামে একটি সূত্র প্রচলিত আছে, যার নিরিখে বিশ্বাসীদের ঈশ্বরে বিশ্বাসটিকে সহজেই সমালোচনা করা যেতে পারে (প্রবন্ধের শেষে *টিকা দ্রষ্টব্য*)।

২) ঘড়ি বানায় ঘড়ির কারিগর, আর নৌকা বানায় নৌকার কারিগর :

আমি প্রবন্ধের শুরুতে বর্ণিত ঘটনাতে ফিরে যাই। বন্ধুর বাড়ীতে যাওয়ার পথে হঠাৎ করে একটি নৌকা দেখে উক্ত ভদ্রলোকের নৌকাটির পিছনে কারিগর থাকার কথা মনে হয়েছে। কিন্তু একটি নৌকা দেখে কি কারো মনে হতে পারে যে, একজন ঘড়ির কারিগর নৌকাটি বানিয়েছে? কখনই না। আমদের স্বভাবতই মনে আসে নৌকার কারিগরের কথা। তেমনি ভাবে আমাদের সমাজে আমরা দেখি- জুতা বানায় জুতার কারিগর, ঘড়ি বানায় ঘড়ির কারিগর, সোনার কাজ করে সোনার কারিগর (স্বর্ণকার)। একই কারিগর তো সবকিছু বানাচ্ছে না[3]। একই যুক্তিতে তাহলে আমাদের সৃষ্ট জীবনের জন্য দরকার একজন জীবনীকার, সূর্যের জন্য চাই

[3] হিন্দু শাস্ত্রে এধরণের কারিগরের একটি তালিকা রয়েছে- এদেরকে বলা হয় 'নবশাখ'; বাংলায় এ ৯ জাতি সম্পর্কে যে ছড়াটি প্রচলিত তা হল:

> 'তিলিমালী তাম্বুলী গোপনাপিত গোছালী
> কামার কুমার পুতুলী ইতি নবশাখাবলী।'

অন্যদিকে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে নবশাখ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> তার মাঝে মালাকার তাঁতি কর্ম্মকার।

'সূর্যকার' (সূর্যের কারিগর), চন্দ্রের জন্য একজন 'চন্দ্রাকার', আর বৃষ্টির জন্য চাই একজন 'বৃষ্টিকার', ইত্যাদি। কিন্তু ঘড়ির জন্য ঘড়ির কারিগরের উপমা নিয়ে শুরু করলেও বিশ্বাসীরা মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে প্রতিটি বস্তুর জন্য যুক্তিহীন ভাবে একজনমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কল্পণা করে থাকেন। এ ছাড়া আমাদের এ মহাবিশ্ব ছাড়াও যদি একাধিক মহাবিশ্ব থেকে থাকে[4], তাহলে একাধিক ঈশ্বর থাকতেই বা বাঁধা কোথায় ?

৩) শুন্য হতে ঘড়িঃ সাইবাবার ম্যাজিক?

ঘড়ি বা নৌকা বানানোর জন্য যে সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন তা কিন্তু প্রকৃতিতে বিদ্যমান। নৌকার ক্ষেত্রে কাঠ পাওয়া যায় গাছ কেটে। ঘড়ির ভিতরের কল কব্জাগুলো বানানো হয় লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি ধাতুথেকে। কিন্তু বলা হয়, সর্ব শক্তিমান ঈশ্বর এই মহাবিশ্বতৈরী করেছেন স্রেফ শুন্য হতে (ex Nihilo) । সুতরাং ঘড়ির কারিগরের সাথে মহাবিশ্বের কারিগরের মিল খোঁজার চেষ্টাটি ভুল।

৪)ভুল সাদৃশ্য :

ঘড়ির কারিগরের সাদৃশ্যটি আরেকটি কারণে ভুল তা হল, এখানে অবচেতন মনে ভেবে নেওয়া হচ্ছে যে, যেহেতু দুটি বস্তু একটি কমন বৈশিষ্ট্য বিনিময় করছে, অতএব, তাদের তৃতীয় একটি কমন বৈশিষ্ট বিদ্যমান থাকবে।

যেমন ধরা যাক নীচের উদাহরনটিঃ

১. ঘড়ির গঠন জটিল
২. ঘড়ির জন্য একজন কারিগর দরকার।
৩. মহাবিশ্বের গঠনও জটিল
৪. সুতরাং মহাবিশ্বের জন্য একজন কারিগর আবশ্যক।

শঙ্খকার কুম্ভকার আর কাংস্যকার।।
.. .. ..
সূত্রধর চিত্রকর আর স্বর্ণকার।
ব্রহ্মশাপে নিপতিত ওহে গুণাধার।।
(রেফারেন্স: আদি বাঙালী ঃ নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, অজয় রায়, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ ১৮৭)। হিন্দুধর্মে আবার একজন মহাকারিগরও রয়েছেন, তিনি বিশ্বকর্মা।

[4] একাধিক মহাবিশ্ব থাকার ব্যাপারটি কোন কল্পকাহিনী নয়। আমাদের মহাবিশ্ব যদি কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে স্থান-কালের শূন্যতার ভিতর দিয়ে আবির্ভূত হয়ে থাকে, তবে এই পুরো প্রক্রিয়াটি একাধিক বার ঘটতে পারে, এবং হয়ত বাস্তবে ঘটেছেও। একাধিক মহাবিশ্বের অস্তিত্বের ধারণাটি আসলে প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞানী ট্রিয়ন এবং লিন্ডের গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে। বলা হয়ে থাকে, সৃষ্টির উষা লগ্নে সম্প্রসারিত বুদ্বুদ (expanding bubbles) থেকে আমাদের মহাবিশ্বের মতই অসংখ্য মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে, যেগুলো একটা অপরটা থেকে সংস্পর্শহীন অবস্থায় দূরে সরে গিয়েছে। আমরা সেই সব অসংখ্য মহাবিশ্বেরই একটিতে অবস্থান করছি, অন্যগুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারেই জ্ঞাত না হয়ে। তবে একাধিক মহাবিশ্ব থাকার এই ধারণাটি সঠিক নাকি ভুল, এটি এ মুহূর্তে জানার উপায় নেই। কিন্তু কেউ যদি সজ্ঞাতভাবে ভেবে নেন, আমাদের এই মহাবিশ্ব ছাড়া আর কোন মহাবিশ্ব নেই, কিংবা তৈরী হওয়া সম্ভবপর নয়, তবে ট্রিয়ন এবং লিন্ডের গবেষণা থেকে আহুত সমাধানের ভুল ধরিয়ে দিয়ে নিজের সজ্ঞাত ধারণাটি প্রমানের দায়িত্ব থাকছে তার ঘারেই।

শেষ পদক্ষেপটি ভুল। কারণ, এটি এমন একটি উপসংহারের দিকে আমাদের নিয়ে গেছে যা বিচারের নীতি বা নির্নায়ক দ্বারা সমর্থিত নয়। উপরের যুক্তির ভুলটি নীচের আরেকটি উদাহরনের সাহায্যে আরো ভালভাবে পরিস্কার করা যায়ঃ

১. পাতার গঠন জটিল
২. পাতা গাছে জন্মায়।
৩. টাকার হিসাব (Money bills) এর গঠনও জটিল
৪.সুতরাং টাকা গাছে জন্মায় (এটি প্রবাদে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে নয়!)।

৫) অসঙ্গতি :

প্যালির আরগুমেন্টে ধরে নেওয়া হয়েছে ঘড়ির গঠন প্রকৃতিতে প্রাপ্ত পাথর, খনিজ বা পাহাড়-পর্বতের মত সহজ সরল ও বিশৃংখল নয়। তাই তার কারিগর লাগবে। আবার একই সাথে মহাবিশ্বের গঠন ধরে নেওয়া হয়েছে জটিল এবং সুশৃংখল ('সহজ সরল' প্রকৃতি এর একটি অংশ হওয়া সত্ত্বেও)। তাই এটি একটি অসম তুলনা।

৬) চক্রাকার যুক্তি :

'কে বানালো এমন নিখুঁত মহাবিশ্ব?' অথবা, 'বলুন তো, আমাদের তৈরী করেছে কে?'- প্রায়শঃই এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যূক্তিবাদীদের। কিন্তু যারা এ ধরনের প্রশ্ন করেন তারা বোঝেন না যে, এধরনের প্রশ্ন বিজ্ঞানের চোখে অর্থহীন প্রশ্ন। সঠিক প্রশ্নটি হবে 'এই সৃষ্টি রহস্যের প্রক্রিয়াটি কি?' বা 'আমাদের জীবন গঠনের মূল প্রিন্সিপালটি কি?' এবং বিজ্ঞান সর্বদাই এধরনের প্রশ্নের উত্তর খুজতে সচেষ্ট এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দিতে সক্ষম। বিজ্ঞান আজ পরিস্কারভাবেই জানে যে মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রক কোন 'ঈশ্বর' নামক কোন 'বড় বাবু' নন, বরং পদার্থবিজ্ঞানের কিছু সহজ সুত্রাবলী (Laws of Physics)। আসলে এ মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটছে তা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম মেনেই ঘটছে।

প্রাকৃতিক, অতিপ্রাকৃতিক কারো পক্ষেই পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মকে ডিঙ্গিয়ে কোন কিছু করা সম্ভব নয়। আমি আমার বই 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী'তে বলেছিলাম, আমাদের এ পর্যন্ত পাওয়া জ্ঞান থেকে বলা যায় 'ঈশ্বর' বলে কাউকে আভিহিত করতে চাইলে তা করা উচিত আসলে পদার্থবিজ্ঞানের প্রাণহীন সূত্রগুলিকে[5]।

[5] স্পিনোজা এবং আইনস্টাইন যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন তা হচ্ছে এই প্রাণহীন পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের ঈশ্বর, মহাবিশ্বের কারিগররূপী কোন ব্যক্তিসত্ত্বা নয়। এ প্রসঙ্গে কার্ল স্যাগান তার 'God Hypothesis' প্রবন্ধে লেখেন – 'Einstein was constantly interpreting what God would or what God wouldn't do. But by *God* they meant something not very deferent from the sum total of physical laws of the universe; that is gravitation plus grand unified field theories plus a few other things equaled God'.

প্যালির এই 'আর্গুমেন্ট অব ডিজাইন' পদার্থবিজ্ঞানের পাশাপাশি এক সময় উৎসাহের সাথে ব্যবহৃত হত জীববিজ্ঞানেও। প্রানীদেহের চোখ, কান প্রভৃতি অংগ প্রত্যংগ দৈবাৎ কোন বিক্ষিপ্ত প্রক্রিয়ায় নিজে থেকে তৈরি হয়ে যেতে পারে না বলে মনে করা হত। প্যালি নিজেও বলেছেন, কোন ধরনের পরিকল্পনাবিহীন ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমে হয়তো আঁচিল, আঁব, জরুল, তিল, ব্রণের মত জিনিসপত্র তৈরী হতে পারে, কিন্তু কোনভাবেই চোখ নয়। ডারউইনের 'বিবর্তনতত্ত্ব' রঙ্গমঞ্চে আসার আগ পর্যন্ত এ ধরণের যুক্তি খুব জোরালো যুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু ১৮৫৯ সালে ডারউইন-ওয়ালেস প্রস্তাবিত 'প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটা বিবর্তনতত্ত্ব' আক্ষরিক অর্থেই জীববিজ্ঞানে প্যালির 'ডিজাইন আর্গুমেন্টের' বিদায় ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। ডারউইন প্রমান করলেন চোখ বা এমনি ধরনের ধরণের জৈবিক উপাঙ্গের উদ্ভবের পেছনে ডিজাইন বা পরিকল্পনার মত ঐশ্বরিক 'উদ্দেশ্য' না খুঁজে প্রাকৃতিক নির্বাচন নামের প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে লাখ লাখ বছর ধরে ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা পরিবর্তনের ফলে চোখের মত অত্যন্ত জটিল অংগ-প্রত্যংগ গড়ে ওঠাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। একাধিক ধাপের এই ক্রমবর্ধমান নির্বাচনের মাধ্যমে যে ধাপে ধাপে যে জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্ভুত হতে পারে তা ইতোমধ্যেই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমানিত হয়েছে। পাঠকেরা এ নিয়ে বিস্তৃতভাবে জানতে চাইলে অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্সের 'The Blind Watchmaker' বইটি দেখতে পারেন। আমরা এখনও আমাদের চারপাশে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত বিভিন্ন ধাপের চোখের অস্তিত্ব দেখতে পাই, অনেক আদিম প্রাণীর মধ্যে এখনও বিভিন্ন রকমের এবং স্তরের আদি-চোখের অস্তিত্ব দেখা যায়। কিছু এককোষী জীবে একটা আলোক-সংবেদনশীল জায়গা আছে যা দিয়ে সে আলোর দিক সম্পর্কে খুব সামান্যই ধারণা করতে পারে, আবার কিছু কৃমির মধ্যে এই আলোক-সংবেদনশীল কোষগুলি একটি ছোট অবতল কাপের মধ্যে বসানো থাকে যা দিয়ে সে আরেকটু ভালোভাবে দিক নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। সমতলের উপর বসানো নামমাত্র আলোক সংবেদনশীলতা থেকে শুরু করে পিনহোল ক্যামেরার মত মেরুদন্ডী প্রাণীদের অত্যন্ত উন্নত চোখ পর্যন্ত সব ধাপের চোখই দেখা যায় আমাদের চারপাশে, এবং তা দিয়েই বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বন্যা আহমেদ তার 'বিবর্তনের পথ ধরে' বইয়ে (অবসর প্রকাশনা, ২০০৭) এ ধরণের অসংখ্য উদাহরণ হাজির করে প্যালির সৃষ্টিতত্ত্বের অসারতা দেখিয়েছেন। বস্তুতঃ ডারউইন আসার পর 'বলুন তো, আমাদের কে বানিয়েছে?' ধরনের অর্থহীন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের সময় ব্যয় করতে হয় না। কারণ, এ তত্ত্ব আমাদের দেখিইয়েছে যে, মানুষ কিংবা অন্যান্য প্রাণী কোন উপরওয়ালার নির্দেশনা ছাড়াই শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পদ্ধতির মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত সরল জীব থেকে ক্রমান্নয়ে উদ্ভুত হতে পারে। এ জন্যই দার্শনিক ডেনিয়েল ডেনেট বিবর্তনতত্ত্ব নামের 'বিপজ্জনক প্রস্তাব'টিকে 'ইউনিভার্সাল এসিড' বা রাজাম্ল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ইউনিভার্সাল এসিড যেমন তার বিধ্বংসী ক্ষমতায় সকল পদার্থকে পুড়িয়ে-গলিয়ে ছারখার করে দিতে পারে, তেমনি ডারউইনের বিবর্তনবাদী তত্ত্ব সমস্ত প্রথাগত ধর্মীয় ধ্যান ধারণা আর কুসংস্কারকে একেবারে দুর করে দিতে পারে[6]।

বিশ্বাসীদের তরফ থেকে করা 'কে আমাদের বানিয়েছে' এ ধরনের প্রশ্ন আরেকটি কারণে অর্থহীন তা হল, এখানে প্রচ্ছন্ন ভাবে উত্তরটি আগে থেকেই গ্রহন করে নেয়া হয়েছে -'কে আবার বানাবে - ঈশ্বর!'। এটি

[6] জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্যালির যুক্তির খন্ডন সম্বন্ধে আরো বিষদভাবে জানতে চাইলে এই বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত প্রবন্ধ 'আমেরিকায় ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের নামে কি হচ্ছে?' দেখুন ।

নিঃসন্দেহে একটি 'লোডেড কোশ্চেন'। অর্থাৎ ঈশ্বর আছে এটা ধরে নিয়েই এধরনের প্রশ্নকরে উত্তর খোঁজার চেষ্টা এক ধরনের চক্রাকার প্রচেষ্টা। মুক্তমনা সদস্য এবং পদার্থবিদ অপার্থিব জামান তার 'Who Created you?' পবন্ধে ব্যাপারটি খুব পরিস্কার ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন[7] :

> "আপনকে কে সৃষ্টি করেছে' এ ধরণের প্রশ্নের কোন অর্থ হয় না, কারণ প্রথমত প্রশ্নটির মধ্যেই এর উত্তর ধরে নেওয়া হয়েছে- যে একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছে। এবং যদি সৃষ্টিকর্তা থেকে থাকেন তাহলে প্রশ্নটির উত্তর এক ধরণের পুনরুক্তি (tautology) ছাড়া আর কিছু নয়; সৃষ্টিকর্তা আপনাকে সৃষ্টি করেছে। সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে প্রশ্নকারী সৃষ্টিকর্তার নাম জানার জন্য প্রশ্নটি করেন নি। সুতরাং এটি একটি অর্থহীন প্রশ্ন। আমি যে বলেছি যথার্থ প্রশ্ন হল জীবন সৃষ্টির কারণ এবং প্রক্রিয়াটি কী (কে নয়), যদি কোন কারণ থেকে থাকে। এবং উত্তর হল যা আমি উপরে দিয়েছি (যার সাথে অধিকাংশ নামকরা পদার্থবিদ ও জীববিজ্ঞানীরা একমত)।"

প্রাচীনকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান যখন সীমাবদ্ধ ছিল, তখন প্রাকৃতিক বিভিন্ন 'দৈব' ঘটনার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পেয়ে নানা ধরনের 'অতিপ্রাকৃতিক সত্ত্বার' কল্পনা করে নিয়েছে মানুষ। বনে হঠাৎ দাবানলে সমস্ত কিছু যখন পুড়ে ছাই হয়ে যেত, তখন ভয়ে পেয়ে মানুষ এর পেছনে 'অগ্নি দেবীর' কল্পনা করে নিয়েছে[8]। পুজো-অর্চ্চনা করে সেই দেবীকে তুষ্ট করতে চেয়েছে বারেবারেই ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার আশায়। বৃষ্টি কেন হয় এ ব্যাপারটিও এক সময় মানুষের জানা ছিল না। তাই ঝড়-বৃষ্টি নিয়ন্ত্রনের জন্য মুসলিমরা যেমনি 'মিকাইল ফেরেস্তার' কল্পনা করেছে হিন্দুরা করেছে 'দেবরাজ ইন্দ্রের' এবং 'বরুণের' কল্পনা। কিন্তু আজ স্কুলের ছোট ছেলেটিও জানে মিকাইল ফেরেস্তা বা ইন্দ্রের হাতের কারসাজিতে নয়, বৃষ্টি হয় পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে জলচক্র (Water Cycle) অনুসরন করে। কিভাবে জল বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায়, কিভাবে তা মেঘে পরিনত হয়, আর কিভাবে তা আবার বারিধারায় রূপান্তরিত হয়ে ফিরে আসে তা আজ প্রাইমারী স্কুলের বইগুলোতেই পাওয়া যায়। এই পৃথিবীটা কিভাবে শূন্যে ঝুলে থাকে তা একসময় মানুষের জানা ছিল না, রহস্য সমাধান করতে গিয়ে আমরা ধরিত্রী মাতাকে বসিয়েছি কখনও অদৃশ্য গরুর শিং এর উপর অথবা দৈত্যাকার কোন কচ্ছপের পিঠে[9] কিংবা মহাসর্প বাসুকীর ফণার উপর। কিন্তু আজকের স্কুলে পড়ুয়া ছাত্ররাও এটলাস-গরু-কচ্ছপ ছাড়াই স্রেফ নিউটনের মহাকর্ষ সুত্র খুব ভালভাবেই শুন্যপথে গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিচলন ব্যাখ্যা করতে পারে। মৃত্যুর ব্যাপারটি বুঝতে না পেরে মানুষ একসময় কল্পনা করেছে 'অদৃশ্য আত্মার'। কল্পনা করেছে যমদূত বা আজরাইলের মত কাল্পনিক চরিত্রের। কিন্তু বিজ্ঞান আজ আজরাইলের প্রাণহরনের গালগপ্প বা আত্মার অমরত্ব ছাড়াই প্রকৃতি জগতের নিয়ম-কানুন দিয়ে মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করতে পারছে। এ বিষয়ে আরো বিস্তৃতভাবে জানতে চাইলে, উৎসাহী পাঠকেরা আমার আর ফরিদ আহমেদের লেখা 'মহাবিশ্বে

---

[7] মুক্তমনা ওয়েব সাইট থেকে অপার্থিবের প্রবন্ধ 'Who Created you?' দ্রষ্টব্য।

[8] যেমন, আর্য নামে পরিচিত প্রাচীন কৌম জনগোষ্ঠী বেদে 'অগ্নি' দেবতার কল্পনা করেছিলেন।

[9] বার্টাণ্ড রাসেল সম্পর্কে একটি চমৎকার গল্প চালু আছে। তিনি একবার সৌর জগতে সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী সহ গ্রহরাজী কিভাবে শূন্যে ঝুলে থেকে সূর্যকে পরিভ্রমণ করছে এবং সূর্য কিভাবে আবার আমাদের ছায়াপথে ঘুরছে তা নিয়ে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বক্তৃতা শেষ হলে এক বৃদ্ধা উঠে দাড়িয়ে বলে উঠলেন, 'এতক্ষণ তুমি বলেছ- সব বাজে কথা। পৃথিবী আসলে সমতল, আর রয়েছে একটি বিরাট কচ্ছপের উপর।' রাসেল হেসে বৃদ্ধার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুরলেন, 'কচ্ছপটা তাহলে কার উপর দাঁড়িয়ে আছে ?' বৃদ্ধার জবাব, 'ছোকরা, তুমি খুব চালাক। তবে জেনে রেখ, কচ্ছপটার তলায় আরেকটা কচ্ছপ, আর ওইটার তলায় আরেকটা- এভাবে পরপর সবই কচ্ছপ রয়েছে। এ এক অনন্ত অনুক্রম!

প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' বইটি (অবসর প্রকাশনা, ২০০৭) পড়ে দেখতে পারেন। এ ছাড়া এই বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত 'আত্মা বলে সত্যই কি কিছু আছে?' দ্রষ্টব্য।

এটা ঠিক যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির আদি নিয়ামকগুলোর অনেক কিছুই এখনও অজানা, অনেক কিছুই এই মুহূর্তে ব্যাখ্যাতীত, কিন্তু তা বলে এ নয় যে তার পেছনে ঈশ্বর নামক কোন কাল্পনিক সত্ত্বাকে আমাদের মেনে নিতে হবে। আজকের বিজ্ঞানীদের কাছে যা অজানা ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীরা তার সমাধান নিয়ে আসবেন, এবং তা তারা সমাধান করবেন বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেই। এভাবেই প্রতিনিয়ত আমাদের জ্ঞান এগুচ্ছে। অনেকেই এ ব্যাপারটি বুজতে চান না। যখনই কোন রহস্য সমাধান করতে তারা ব্যর্থ হন, এর পেছনে ঈশ্বরের ভুমিকাকে কল্পনা করে নেন। যখনই আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে কোন ফাঁক ফোকর দেখতে পান, এর ভিতরে ঈশ্বরকে গুজে দিয়ে এর একটা সহজ সমাধান দিতে সচেষ্ট হন। এধরনের আর্গুমেন্টকে দর্শনের পরিভাষায় বলে 'God in gaps'। একটা উদাহরণ দেই। সৃষ্টির আদিতে অ্যামিনো এসিডের মত জটিল অনু কিভাবে তৈরী হল তার পুরো প্রক্রিয়াটি এখনো আমাদের অজানা। বিশ্বাসীরা স্বভাবতই এর পেছনে ঈশ্বরের হাত থাকার ব্যাপারটি নির্দ্বিধায় মেনে নেন। এটা অনেকটা প্রাচীনকালে বৃষ্টি কিভাবে হয় তা বুঝতে না পেরে এর পেছনে 'মিকাইল ফেরেস্তা'কে কল্পনা করে গোঁজামিল দেওয়ার মত ব্যাপার। আমরা জানি, যতই বিজ্ঞান এগুচ্ছে এই ধরনের ফাঁক ফোকর থেকে ঈশ্বরকে সরিয়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে তা ভরাট করবার চেষ্টা করছে। কারণ মানুষ জানে ঈশ্বর বা অন্য কাল্পনিক সত্ত্বাকে হাজির করে কোন কিছু ব্যাখ্যা করা আসলে অজ্ঞানতার সামিল। রাহুল সঙ্কৃত্যায়ন তার 'নতুন মানব সমাজ' গ্রন্থে ঈশ্বর প্রসঙ্গে বলেছেন[10] -

> 'অজ্ঞতার অপর নামই হল ঈশ্বর। মানুষ তার অজ্ঞতাকে সোজাসুজি স্বীকার করতে ভয় পায় তাই ঈশ্বর নামক একটি সম্ভ্রান্ত নাম খুঁজে বের করেছে। ঈশ্বর-বিশ্বাসের অপর কারণ মানুষের অসামর্থ্য এবং অসহায়তা।'

খুবই সত্যি কথা। 'ঈশ্বর কোন কিছু বানিয়েছেন' দাবী করা আসলে ঘুরিয়ে পেচিয়ে স্বীকার করে নেওয়া যে - 'আমি জানি না'। পাঠকদের অনেককেই হয়ত স্কুল জীবনে পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষায় 'আকাশ নীল কেন' বা 'রংধনু কিভাবে তৈরী হয়' - এধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা স্বভাবতই এ ধহরনের প্রশ্নের উত্তরে অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক কারণগুলোই ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কোন পরীক্ষার্থী যদি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে 'আকাশ নীল কারণ আল্লাহ আকাশকে নীল করে তৈরী করেছেন '- এ ধরনের উত্তর পরীক্ষার খাতায় লিখে আসে, তবে সে কত নম্বর আশা করতে পারে? স্রেফ শূন্য। পরীক্ষক ধরেই নেবেন যে 'আকাশ নীল কেন' এই প্রশ্নের উত্তর সেই পরীক্ষার্থী জানে না, তাই আবোল-তাবোল লিখছে। কাজেই মহাবিশ্ব কিভাবে সৃষ্টি হল তার উত্তরে কেউ ঝদি বলেন 'ঈশ্বর বানিয়েছেন' তবে তা হবে আসলে ওই পরীক্ষার্থীর উত্তরের মতই হাস্যকর এবং অজ্ঞতাসূচক। তাই দর্শনের পরিভাষায় এই ধরনের কুযুক্তিকে বলে 'Argument from ignorance' বা 'অজ্ঞতাপ্রসূত যূক্তি'।

[10] নতুন মানব সমাজ (প্রবন্ধ সংকলন), রাহল সাংকৃত্যায়ন, (অনবাদ: শম্ভুনাথ দাস), বুকস অ্যাণ্ড পিরিয়ডিকালস, কলকাতা, বাংলা ১৩৭৫, ১৯৬৮ পৃ: ২৮। মূল গ্রন্থটি ১৯৩৯ সালে জেলখানা থেকে 'তুমহারি ক্ষয়' নামে হিন্দীতে লেখা।

এবার দর্শন থেকে একটু বিজ্ঞানের জগতে পা রাখা যাক। আমরা জানি, আমাদের এই পরিচিত মহাবিশ্ব প্রায় ১৫০০ কোটি বছর আগে এক মহা-বিস্ফোরনের মাধ্যমে অসীম ঘনত্বের এক উত্তপ্ত পুঞ্জিভূত অবস্থা {যাকে পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় অদ্বৈত বিন্দু (Singularity point)} থেকে সৃষ্ট। দেশ কালের ধারণাও এসেছে এই বিগ-ব্যাং-এর পর মুহুর্ত থেকেই; কাজেই তার আগে কি ছিল - এই প্রশ্ন বিজ্ঞানের ভাষায় একেবারেই অর্থহীন, মূল ধারার অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা তাই ভাবতেন। তারা বলতেন, বিগ-ব্যাং-এর আগে কি ছিল এ প্রশ্নটি 'উত্তর মেরুর উত্তরে কি আছে?' বলার মতই শোনাবে। আসলে অর্থহীন এ কারণে যে, আমাদের পরিচিত পদার্থবিজ্ঞানের সুত্রগুলো দিয়ে ওই অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা দেখেছি নিউটনের সূত্রকে আলোর বেগের কাছাকাছি অবস্থায় এসে ভেঙে পড়তে। তেমনি আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্বসহ অন্যান্য যে সূত্রগুলো মহাবিশ্বের রহস্য উদঘাটনে আজ ব্যবহৃত হচ্ছে - সিংগুলারিটি বিন্দুতে গিয়ে সেগুলোও কিন্তু কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এ ব্যাপারটিকে খুব ভালভাবে ব্যাখ্যা করেছেন[11] –

> 'অদ্বৈততা হল এমন একটি জায়গা যেখানে এসে স্থান ও কালের সনাতনী ধারণাগুলি ভেঙে পড়ে, যেমন ভেঙে পড়ে পদার্থবিজ্ঞানের সকল জ্ঞাত নিয়ম। এর কারণ হল এসব নিয়ম সূত্রায়ন করা হয়েছিল সনাতনী স্থান-কালের পটভূমিতে। .. .. এই ভেঙেপড়াটি কিন্তু কেবল সঠিক তত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা প্রসূত নয়, বরং (অদ্বৈতার) ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগাম বলতে পারার আমাদের সামর্থ্যরে মৌলিক সীমাবদ্ধতার প্রতিনিধিত্ব করে এটি। এই সীমাবদ্ধতা সাধারণ কোয়ন্টাম মেকানিক্যাল অনিশ্চয়তা নীতি র্কতৃক আরোপিত সীমাবদ্ধতার সদৃশ এবং অতিরিক্ত।'

তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে, ঈশ্বর যদি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করে থাকেন তা করেছেন এক উদ্দেশ্যবিহীন এবং নিয়ম বিহীন অবস্থা (অদ্বৈত বিন্দু) থেকে। বিশ্বাসীরা সর্বদাই এই মহাবিশ্ব এবং মানবজাতির সৃষ্টির পেছনে এক মহাবুদ্ধিমান এক অজ্ঞাত সত্ত্বার 'সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য' এবং 'অভাবিত দিক নির্দেশনার' সন্ধান লাভ করেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর যদি কোন নির্দিষ্ট কারণে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেনই তবে তিনি তা উদ্দেশ্যবিহীন (purposeless) নিয়মবিহীন (lawless) এবং বিশৃংখল (chaotic) অবস্থার মধ্যে দিয়ে নিজের সৃষ্টিকে নিয়ে যাবেন কেন? তার সৃষ্টির প্রক্রিয়া তো হওয়া উচিৎ অনেক বাঙ্ময়, ব্যাপ্ত, উদ্দেশ্যমূলক এবং নিশ্চয়তাপ্রদানকারী। কিন্তু বাস্তবতাটি ঠিক উলটা। দার্শনিক কুয়েন্টিন স্মিথ (Quentin Smith) তাই তার 'Simplicity and Why the Universe Exists' প্রবন্ধে বলেন[12] –

> 'বলা হয়ে থাকে যে, ঈশ্বর ইচ্ছে করলেই বিশ্বসৃষ্টি মুহূর্তে অদ্বৈতবিন্দুতে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন, এবং ঠিক করে দিতে পারতেন যে, এটি বিগ-ব্যাং আকারে প্রচণ্ডভাবে বিস্ফোরিত হবে আর তার সাথে সম্পৃক্ত থাকবে থাকবে এমন সব নিয়মাবলী এবং জাগতিক শর্তাবলী, যা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত জীবনের বিকাশ ঘটাবে। কিন্তু এ ধরণের বক্তব্য অযৌক্তিক, কারণ এভাবে যদি মহাবিশ্ব আর পরবর্তীতে বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণ সৃষ্টি করা হয়, তাহলে সেটি করা হবে একটি অযৌক্তিক পন্থায়; এমন ধরণের অদ্বৈত বিন্দু সৃষ্টির

[11] Stephen Hawking, Breakdown of Predictability in Gravitational Collapse', *Physical Review* D 14, 2460 (1976).
[12] Quentin Smith, Simplicity and Why the Universe Exists, Philosophy 71 (1997): 125-32.

> পেছনে কোন যোউক্তিক ভিত্তি থাকতে পারে না। কারণ এ থেকে প্রত্যাশিত ফলাফল পেতে হলে বাইরে থেকে কাউকে তাৎক্ষণিকভাবে হস্তক্ষেপ করতে হবে।'

নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ স্টিফেন ওয়েইনবার্গের কথায়ও লক্ষ্য করা যায় একই সুর[13] :

> 'যে বিশ্ব একেবারে বিশৃঙ্খল, বিধিবিহীন, তেমন একটি বিশ্বকে কোন মুর্খের সৃষ্ট বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।'

আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিশ্বাসীদের অনেকেই ভেবে নেন যে সৃষ্টির আদিতে শুন্য থেকে মহাবিশ্বের উৎপত্তি স্রেফ অলৌকিক একটি ব্যাপার - এবং এই ব্যাপারটি কেবল 'ঈশ্বর' নামক একটি সত্ত্বার 'ভেল্কিবাজি' দিয়েই কেবল ব্যাখ্যা করা যায়। এমনভাবে ভাবার কারণও আছে। আমরা ছোটবেলায় পদার্থবিজ্ঞানের বইয়ে পড়েছি শুন্য থেকে কোন কিছু সৃষ্টি হতে পারে না। তাহলে - এই যে আমরা আজ চোখের সামনে পরিচিত পদার্থ আর শক্তির জগৎ দেখছি তার উদ্ভব কোথা থেকে ঘটল? কিভাবে শূন্য থেকে পদার্থের সৃষ্টি হল? কিভাবে তৈরী হল আমাদের এ বিশ্বজগৎ?

আসলে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হলে আমাদের স্কুলের পদার্থবিজ্ঞানের পাঠ চুকিয়ে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার পাঠ নিতে হবে। ব্যাপারটি সাধারণ পাঠকের জন্য বোঝা একটু জটিল। সহজ বাংলায় বললে বলতে হয়, 'শুন্য থেকে কোন পদার্থ তৈরী হয় না'- এ ধারণাটি চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানের জগতে হয়ত সত্য, তবে কোয়ান্টাম পদার্থের জগতে সত্য নয়। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা খুব ভালভাবেই দেখিয়েছে যে, অনিশ্চয়তা তত্ত্ব অনুসরন করে শুন্য থেকে পদার্থ ও শক্তি তৈরী হতে পারে। এই প্রক্রিয়াটাকে বলে 'ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশন' (vacuum fluctuation)।

'রহস্যময়' এই শূন্য শক্তি কিংবা ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটি গড়ে উঠেছে হাইজেনবার্গের বিখ্যাত অনিশ্চয়তা তত্ত্বের কাঁধে ভর করে। ১৯২৭ সালে জার্মান পদার্থবিদ ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ গানিতিকভাবে প্রমাণ করে দেখান যে, কোন বস্তুর অবস্থান এবং ভরবেগ যুগপৎ একসাথে নিশ্চিত ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বস্তুর অবস্থান ঠিক ঠাক মত মাপতে গেলে দেখা যাবে, ভরবেগের তথ্য যাচ্ছে হারিয়ে, আবার ভরবেগ চুলচেরা ভাবে পরিমাপ করতে গেলে বস্তুর অবস্থান অজানাই থেকে যাবে। কাজেই হাইজেনবার্গের এই সূত্র সত্যি হয়ে থাকলে, এমনকি পরম শূন্যেও একটি কণার 'ফ্লাকচুয়েশন' বজায় থাকার কথা, কারণ কণাটি নিশ্চল হয়ে যাওয়ার অর্থই হবে এর অবস্থান এবং ভরবেগ সম্বন্ধে আমাদেরকে নিশ্চিত তথ্য জানিয়ে দেওয়া, যা প্রকারন্তরে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্বের লংঘন।

বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং লেখক পল ডেভিস তার একটি বইয়ে উল্লেখ করেছেন[14],

---

[13] এ বইয়ের স্টিভেন ওয়েইনবার্গ-এর (দিগন্ত সরকার অনুদিত) 'পরিকল্পিত মহাবিশ্ব?' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

[14] *God and the New Physics*, Paul Davies, J.M. Dent & Sons, London, 1983, p 162

> "প্রাত্যহিক জগতে শক্তির পরিমান অপরিবর্তনীয়ভাবে স্থির; চিরায়ত পদার্থবিদ্যার প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর হল 'শক্তির নিত্যতা' নীতি (law of energy conservation)। কিন্তু কোয়ান্টাম আণুবীক্ষণিক জগতে শক্তি অনস্তিত্ব থেকে (nowhere) স্বতঃস্ফুর্থভাবে এবং অনিশ্চিতভাবে আবির্ভূত এবং অদৃশ্য হতে পারে।"

অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন যে, ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে শুন্য থেকে স্বতস্ফুর্তভাবে বিশ্বজগৎ তৈরী হওয়া কোন অসম্ভব বা অলৌকিক ব্যাপার নয়। এবং এভাবে বিশ্বজগৎ তৈরী হলে তা পদার্থবিজ্ঞানের কোন সূত্রকেই আসলে অস্বীকার করা হয় না। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসরণ করে শূন্য অবস্থা থেকে যে বিশ্বজগৎ তৈরী হতে পারে- এ ধারণাটি প্রথম ব্যক্ত করেছিলেন নিউইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটির এডয়ার্ড ট্রিয়ন (Edward Tryon), একটি বৈজ্ঞানিক জার্নালে ১৯৭৩ সালে[15]। তবে তারও আগে 'বিগ-ব্যাঙের জনক' গ্যামোর মাথাতেও ধারণাটি এসেছিল। গ্যামো তার 'My World line' গ্রন্থে ১৯৪০ সালে আইনস্টাইনের সাথে কথোপকথনের একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। গ্যামো খুব হাল্কা চালে সেদিন আইনস্টাইনকে বলেছিলেন[16], 'আমার এক ছাত্র সেদিন আপনার সমীকরন গুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখলো যে একটি নক্ষত্র কিন্তু স্রেফ শূন্য থেকে উদ্ভুত হতে পারে, কারণ আপনার সমীকরনে ঋণাত্মক মাধ্যাকর্ষন শক্তি ধণাত্মক ভর-শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়।' শুনে আইনসটাইন একটু থমকে দাড়ালেন। গ্যামো বললেন, 'আমরা ওই সময় দুজনে রাস্তা পার হচ্ছিলাম, আর এত গাড়ি ঘোড়ার ভীরে আমাদের কথা শেষ পর্যন্ত হারিয়ে গেল' ।

আমরা জানি পদার্থের ভর এবং শক্তি সম্পর্কিত হয় আইনসটাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E=mc^2$ দিয়ে। যদি পর্যাপ্ত শক্তি বিদ্যমান থাকে, ফোটন থেকে যে কোন সময় পদার্থ-প্রতি পদার্থ যুগল তৈরী হতে পারে। এর নাম 'যুগল উৎপাদন' (pair production) এবং এই ব্যাপারটিই মহাবিশ্বের ভর সৃষ্টির জন্য দায়ী।

ট্রিয়নের ধারণা অনুযায়ী আমাদের এই মহাবিশ্বের উদ্ভব হয়েছে শূন্যাবস্থা থেকে বড় সড় এক ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে। আসলে কোয়ান্টাম তত্ত্বানুযায়ী শূন্যতাকে আনেক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। শূন্যতা মানে আক্ষরিক অর্থে শূন্য নয়- পদার্থ বিজ্ঞানীদের মতে যে শূন্যদেশকে আপাতঃ দৃষ্টিতে শান্ত, সমাহিত মনে হচ্ছে, তার সূক্ষস্তরে সবসময়ই নানান প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে। এর মধ্যে নিহিত শক্তি থেকে পদার্থকণা স্বতঃস্ফুর্তভাবে তৈরী হচ্ছে, আবার তারা নিজেকে সেই শক্তিতে বিলীন করে দিচ্ছে। যেমন, শূন্যাবস্থা থেকে সামান্য সময়ের ঝলকানির মধ্যে ইলেকটন এবং পজিটন (কণিকা- প্রতিকণিকা যুগল) থেকে পদার্থ তৈরী হয়েই আবার তা শূন্যতায় মিলিয়ে যেতে পারে। পুরো ব্যাপারটার স্থায়ীত্বকাল মাত্র $১০^{-২১}$ সেকেন্ড। ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশন পঙ্খীরাজ ঘোড়ার মত কোন রূপকথার জীব নয়, নয় কোন গানিতিক বিমূর্ত মতবাদ; বিজ্ঞানীরা কিন্তু ব্যবহারিকভাবেই এর প্রমাণ পেয়েছেন। একটি প্রমাণ হচ্ছে 'ল্যাম্ব শিফট', যা

---

[15] *Is the Universe a Vacuum Fluctuation?*, E. P. Tryon, Nature 246(1973), 396-97

[16] George Gamow, *My World Line: My world line; an informal autobiography*, Viking, New York, reprinted 1970; Also see: Inflation for Beginners, John Gribbin, http://aether.lbl.gov/www/science/inflation-beginners.html

আহিত পরমাণুর মধ্যস্থিত দুটো স্তরে শক্তির তারতম্য প্রকাশ করে। তবে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের সবচেয়ে জোরদার প্রমাণ পাওয়া গেছে বিখ্যাত 'কাসিমিরের প্রভাব' থেকে [17]।

রিচার্ড মরিসের ভাষায়[18],

> 'আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে 'শূন্যতা' বলে আসলে কিছু নেই। এমনকি বিশুদ্ধ শুন্যস্থানেও প্রতিনিয়ত অসদ কণিকা বা ভার্চুয়াল পার্টিকেল যুগল ক্রমাগত উদ্ভুত হচ্ছে, আবার বিনাশ পাচ্ছে। এই সব কণিকার অস্তিত্ব কোন গানিতিক কল্পণা নয়। যদিও এদেরকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিন্তু এগুলোর কার্যকর প্রভাব খুবই স্পষ্ট এবং বাস্তব। এদের অস্তিত্বের অনুমিতির ভিত্তিতে যে সব ভবিষ্যদ্বানীতে উপনীত হওয়া গেছে, তা কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে খুব নিখুঁত ভাবেই প্রমাণিত হয়েছে।'

তবে ট্রিয়ন প্রথমে যে ভাবে ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করেছিলেন, তাতে বেশ কিছু সমস্যা ছিল। প্রথমতঃ এই প্রক্রিয়ায় ১৫০০ কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর উদ্ভবের সম্ভাবনাটি খুবই কম। আর দ্বিতীয়তঃ এই মহাবিশ্ব যদি শূন্যস্থান (empty space) থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন থেকে যায়- আদিতে সেই শূন্যস্থানই বা এলো কোথা থেকে (পাঠকদের এ প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত অনুযায়ী, মহাবিশ্ব স্থান-কালের বক্রতার প্রকাশ)। ১৯৮২ সালে আলেকজাণ্ডার ভিলেঙ্কিন (Alexander Vilenkin) এর একটি সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেন এভাবে[19] - মহাবিশ্ব সৃষ্ট হয়েছে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই 'শূন্য' থেকে - তবে এই শূন্যাবস্থা শুধু 'জড়হীন' শূন্যাবস্থা নয়, বরং সেইসাথে সময়শূন্যতা এবং স্থানশূন্যতাও বটে। ভিলেঙ্কিন কোয়ান্টাম টানেলিং এর ধারণাকে ট্রিয়নের তত্ত্বের সাথে জুড়ে দিয়ে বললেন, এ মহাবিশ্ব যাত্রা শুরু করেছে এক শূন্য জ্যামিতি (empty geometry) থেকে এবং কোয়ান্টাম টানেলিং এর মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে অশূন্য অবস্থায় (non-empty state) আর অবশেষে মহাস্ফীতির বা ইনফ্লেশনের মধ্য দিয়ে বেলুনের মত আকারে বেড়ে আজকের অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। এই মহাস্ফীতির ধারণাটিকে আশির দশকের শুরুতে আরো দৃঢ় গানিতিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করালেন সোভিয়েত বিজ্ঞানী আদ্রে লিন্ডে (Andre Linde) এবং আমেরিকার অ্যালেন গুথ (Alan Guth)[20]। ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে শূন্য অবস্থা থেকে কিভাবে আমাদের এ মহাবিশ্বের উদ্ভব আর বিস্তার ঘটতে পারে তা সাধারণ পাঠকদের জন্য সাধারণ ভাষায় তুলে ধরেছেন স্টিফেন হকিং তার বিখ্যাত 'দি ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' গ্রন্থে[21]:

> 'মহাবিশ্বে এই পরিমাণ জড়পদার্থ কেন রয়েছে তা মহাস্ফীতির ধারণা দিয়ে ব্যখ্যা করা যায়। মহাবিশ্বের যে সব অঞ্চল আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি সেখানে রয়েছে দশ মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন (অর্থাৎ ১ এর

[17] 'কাসিমির এফেকট' - ১৯৪৮ সালে ডাচ পদার্থবিদ হেনরিখ কাসিমিরের ভবিষ্যদ্বানী, যা পরবর্তীতে মার্কস স্প্যার্ণে, স্টিভ লেমোরাক্স প্রমুখ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়।

[18] Richard Morris, *The Edges of Science*, New York, Prentice Hall, 1990, p25

[19] Alexander Vilenkin, *Creation of Universe from Nothing*, Physics letters 117B (1982) 25-28

[20] বিস্তারিত ভাবে জানতে পড়ুন, Alan Guth, *The Inflationary Universe*, Basic Books, March 17, 1998

[21] Stephen W. Hawking, *A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes*, New York: Bantam, paper back ed. 1988, p. 136.

পিঠে আশিটি শূন্য = ১.০ x ১০^{৮০}) সংখ্যক জড়-কণিকা। কোত্থেকে এগুলো সব এলো? এর উত্তর হল কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী শক্তি থেকে কণিকা ও তার প্রতি-কণিকা এই যুগ্ম আকারে কণিকা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল এই শক্তি এল কোত্থেকে? এরও উত্তর হল মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ হল শূন্য। মহাবিশ্বে জড় সৃষ্টি হয়েছে ধনাত্মক শক্তি থেকে। অবশ্য জড়পদার্থ মহাকর্ষণের দ্বারা নিজেকে পরিপূর্ণভাবে আকর্ষণ করছে। দুটি বস্তুখণ্ড যখন কাছাকাছি থাকে তখন তাদের শক্তির পরিমাণ যখন তারা অনেক দূরে থাকে তা থেকে কম। এর কারণ হল এদেরকে পৃথক করতে হলে যে মহাকর্ষীয় বল দ্বারা তারা পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে সেই বলের বিরুদ্ধে আপনাকে শক্তি ব্যয় করতে হবে। তাই এক অর্থে মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের রয়েছে ঋণাত্মক শক্তি। এমন একটি মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে, যা মোটামুটি স্থানিক সুষম (approximately uniform in space), দেখান যেতে পারে যে এই ঋণাত্মক মহাকর্ষীয় শক্তি জড়ের প্রতিনিধিত্বকারী ধনাত্মক শক্তিকে নিখুঁতভাবে বিলুপ্ত করে দেয়। কাজেই মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ সব সময়ই শূন্য।'

স্ফীতি বা ইনফ্লেশন তত্ত্বের আবির্ভাবের পর আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান খুব পরিস্কারভাবেই আমাদের দেখিয়েছে মহাবিশ্বে মোট শক্তির পরিমাণ শূন্য; মহাবিশ্বের মোট গতিশক্তি এবং মাধ্যাকর্ষণের ঋণাত্মক শক্তি পরস্পরকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। এর মানে হচ্ছে মহাবিশ্ব 'সৃষ্টি'র জন্য বাইরে থেকে আলাদা কোন শক্তি আমদানী বা প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় নি। সহজ কথায়, ইনফ্লেশন ঘটাতে যদি শক্তির নীট ব্যয় যদি শূন্য হয়, তবে বাইরে থেকে কোন শক্তি আমদানী করার প্রয়োজন পড়ে না। অ্যালান গুথ এবং স্টেইনহার্ট নিউ ফিজিক্স জার্নালে (১৯৮৯) দেখিয়েছেন, ইনফ্লেশনের জন্য কোন তাপগতীয় কাজের দরকার পড়ে না। মুলতঃ ১৯৮১ সালের পর থেকে বহু তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী প্রাথমিক কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে মহাজাগতিক স্ফীতিকে সমন্বিত করে তাদের মডেল বা প্রতিরূপ নির্মাণ করেছেন। বহু বৈজ্ঞানিক জার্নালে সেগুলো প্রকাশিতও হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে[22]। সাধারণ পাঠকদের জন্য পেপারগুলো অতিরিক্ত প্রায়োগিক এবং জটিল মনে হতে পারেই, কিন্তু এখানে এই ব্যাপারটির উল্লেখ এ কারণেই করা হল, যাতে বুঝতে সুবিধা হয় যে, বহু বিখ্যাত পদার্থবিদই আজ স্রেফ শুন্যাবস্থা থেকে স্বতস্ফুর্তভাবে বিশ্বব্রহ্মান্ডের উৎপাত্তির সম্ভাব্যতার এই বৈজ্ঞানিক ধারণাটির উপর জোর নজর দিচ্ছেন, হাস্যকর বা 'ননসেন্স' ভেবে কেউ উড়িয়ে দিচ্ছেন না। ধারণাটি যদি স্রেফ 'ননসেন্স'ই হত, তবে বৈজ্ঞানিক জার্ণালগুলোতে এই ধারণার উপর আলোকপাত করা পেপারগুলো সাম্প্রতিক সময়ে কখনই প্রকাশিত হত না।

---

[22] উদাহরণ হিসেবে এখানে বোইজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশিত কিছু পেপারের উল্লেখ করা যেতে পারে :

David Atkatz and Heinz Pagels, "*Origin of universe as Quantum Tunneling effect*" Physical review D25 (1982): 2065-73;

S.W. Hawking and I.G.Moss "*Super cooled Phase Transitions in the very early Universe*", Physics letters B110(1982):35-38;

Alexander Vilenkin, "*Creation of Universe from Nothing*" Physics letters 117B (1982) 25-28,

Alexander Vilenkin, "*Quantum Origin of the Universe*" Nuclear Physics B252 (1985) 141-152,

Andre Linde, "*Quantum creation of the inflationary Universe*," Letter Al Nuovo Cimento 39(1984): 401-405

Victor Stenger, "*The Universe: the ultimate free lunch*", European Journal of Physics 11 (1990) 236-243.

etc.

ভিক্টর স্টেংগর পেশায় ইউনিভার্সিটি অব হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান' বিভাগের ইমারিটাস অধ্যাপক এবং কলারাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের সংযুক্ত অধ্যাপক। তিনি 'কলোরাডো সিটিজেন অব সায়েন্স' এরও প্রেসিডেন্ট আর নেশায় যুক্তিবাদী। তিনি আমাদের মুক্তমনা ফোরামের একজন সম্মানিত সদস্য। আমাদের এই বইটিতেও ভিক্টর স্টেংগরের বেশ কিছু চিন্তা জাগানো প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তিনি ২০০৩ সালে প্রকাশিত তার 'Has Science Found God? The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe' বইটির 'The Uncreated Universe' অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন পদার্থবিজ্ঞানের নিত্যতার সূত্র লংঘন না করেই কিভাবে শূন্য থেকে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হতে পারে; এবং এর মধ্যে 'অলৌকিকত্ব' কিছু নেই। তার ভাষায়-

> 'অন্য কথায়, মহাবিশ্ব "সৃষ্টিতে" বাইরে থেকে কোন শক্তির প্রয়োজন হয় নি। অধিকন্তু, এটি হল মহাস্ফীতি মহাবিশ্বতত্ত্বেরও একটি ভবিষ্যদ্বাণী, যা পর্যবেক্ষণ দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। সুতরাং আমরা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি, যদি শূন্য শক্তির একটি প্রাথমিক শূন্যতা (void) থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে তাহলে শক্তির নিত্যতার লংঘন হয় না।'

তিনি তাঁর অভিমতকে আরো বিস্তৃত করেছেন সম্প্রতি প্রকাশিত 'God: The Failed Hypothesis' বইয়ে[23]। বইটি এ বছরের নিউইয়র্ক টাইমস-এর বেস্ট সেলার। তিনি বইটির 'কসমিক এভিডেন্স' অধ্যায়ে দেখিয়েছেন যে, পদার্থের উৎপত্তি, মহাবিশ্বের উদ্ভব, পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের উৎপত্তি, মহাবিশ্বের শৃংখলা, মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কারণ – যে গুলোকে কিছুদিন আগেও মানুষের বুদ্ধির অগম্য অন্তিম রহস্যময় সমস্যা বলে ভাবা হত, দেওয়া হত অলৌকিক কিংবা ঐশ্বরিক প্রলেপ, সেগুলোকে আজ পদার্থবিজ্ঞানের জানা জ্ঞানের সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। মুক্তমনায় ড. স্টেংগরের 'কসমিক এভিডেন্স' অধ্যায়টির উপর ভিত্তি করে একটি প্রবন্ধ রাখা আছে; অনলাইনে প্রবন্ধটি পড়া যেতে পারে[24]।

শূন্য থেকে ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির সম্ভাবনা ছাড়াও আরো দুটো সম্ভাবনাও আধুনিক বিজ্ঞানে স্থান করে নিয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে পল স্টেইনহার্ট এবং নেইল টুরকের প্রস্তাবিত চক্রাকার বা 'সাইক্লিক' মডেল। স্ট্রিং তত্ত্বের দুই সমান্তরাল ব্রেনের ক্রমিক সংঘর্ষের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এ সাম্প্রতিক তত্ত্ব বলছে, মহাবিশ্বের কোন শুরু নেই, শেষ নেই। ট্রিলিয়ন বছরের ব্যপ্তিতে ঘটা ব্রেনের সংঘর্ষের ফলে উৎপন্ন হয় পদার্থ এবং শক্তির, যে ঘটনাকে আমরা বিগ ব্যাং নামে অভিহিত করি। বিগ ব্যাং যে একবারই ঘটেছে তা নয়, ট্রিলিয়ন বছর পর পর এ ধরনের বিগ ব্যাং ঘটতে থাকবে অন্তহীন চক্রের আবর্তে। তবে এ মুহূর্তে সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক তত্ত্ব হল, জুলিয়ান বার্বারের 'দ্য এন্ড অব টাইম'- এর মুল কথা হচ্ছে *সময়* বলে প্রকৃতপক্ষে কিছু নেই – এটি মস্তিস্কসঞ্জাত এক ধরনের প্রহেলিকা বা বিভ্রম। আর সে জন্যই বিগ 'ব্যাং-এর আগে কি ছিল' – এই সমস্যাকে এর আগে যৌক্তিকভাবে সমাধান করা যায় নি। যতবারই 'সময়'এর উৎসকে আমরা ধরতে গেছি – আঙ্গুলের ফাঁক গলে তা বেরিয়ে গেছে – মরুভূমির

[23] Victor J. Stenger, *God: The Failed Hypothesis: How Science Shows that God Does Not Exist*, Prometheus Books (2007)
[24] Victor Stenger, The Scientific Case Against A God Who Created The Universe, Mukto-Mona.

মরীচিকার মত। কারণ বার্বারের গবেষণা থেকে বেরিয়ে আসছে -সময় বলেই যে আসলে কিছু নেই! অ্যাডাম ফ্রাঙ্ক ডিস্কভার ম্যাগাজিনের মার্চ সংখ্যায় (২০০৮) মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানে প্রভাব বিস্তারকারী এ সময়কার তিনটি তত্ত্ব নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন[25]। এখন মহাবিশ্বের উদ্ভব এবং অস্তিত্বের পেছনে কোন্ তত্ত্বটি সঠিক, তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমাদের ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং কারিগরী অগ্রগতির দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে; তবে এটি ঠিক যে, এ তিনটি তত্ত্বের কোনটিই কোন আলৌকিক সত্ত্বার হস্তক্ষেপকে গোনায় এনে মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করছে না, বরং ব্যাখ্যা করছে পদার্থবিজ্ঞানের জানা জ্ঞানের সাহায্যেই। এ ছাড়াও প্রাকৃতিক উপায়ে মহাবিশ্বের উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করে তৈরি করা হয়ছে বহু গাণিতিক মডেলও[26]। 'মহাবিশ্ব কখনোই প্রাকৃতিক উপায়ে উদ্ভুত হতে পারে না, এর জন্য কোন অলৌকিক হস্তক্ষেপ লাগবেই' - এ বৈজ্ঞানিক মডেলগুলো এ সজ্ঞাত বিশ্বাস নির্ভর ধারনাকে নস্যাৎ করার জন্য এ মুহূর্তে যথেষ্ঠ।

মহাবিশ্বের উৎপত্তির পাশাপাশি শৃংখলা বা জটিলতা বৃদ্ধির বিষয়টিও আলোচনায় আনা দরকার। অনেকে কিছুদিন আগেও প্রকৃতিতে বিক্ষিপ্ত বা এলোমেলো অবস্থা থেকে শৃংখলায় উত্তোরনের বিষয়টিকে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের লংঘন বলে ভাবতেন। বিশেষত জীবকোষের বৃদ্ধি, বিকাশ এবং বিবর্তনের বিরুদ্ধে এটি অনেকের কাছেই খুব আকর্ষনীয় 'যুক্তি' হিসেবে বিবেচিত হত; তারা ভাবতেন একমাত্র 'ঐশ্বরিক কারণ' ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে একে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে আমরা দেখেছি তাদের এ অনুমান ভ্রান্ত। তাপগতিবিদ্যার তিনটি সুত্র আছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় সূত্রটি বলছে : 'তাপ কখনও নিজে থেকে শীতল বস্তু হতে গরম বস্তুতে যেতে পারে না।' সূত্রটিকে অনেক সময় এভাবেও বলা হয় : 'একটি বদ্ধ সিস্টেমে এনট্রপি কখনও কমতে পারে না।' এনট্রপি ব্যাপারটিকে অনেকসময় সাদামাটাভাবে বিশৃঙ্খলা বা disorder হিসেবে দেখানো হয়। এনট্রপি কমার অর্থ হচ্ছে সাদামাটা ভাবে বিশৃংখলা কমা। তাপগতিবিদ্যার ২য় সূত্র বলছে বদ্ধ সিস্টেমে এনট্রপি কমতে পারবে না, বাড়তে হবে।

বোঝা যাচ্ছে যে, তাপগতিবিদ্যার ২য় সূত্রটি যে ভাবে বলা হচ্ছে তা শুধু বদ্ধ সিস্টেমের জন্যই প্রযোজ্য। আমাদের বাসার ফ্রিজের উদাহরণটি হাজির করা যায়। আমরা সবাই জানি যে, ফ্রিজে তাপকে 'উল্টো দিকে' চালিত করা হয়, অর্থাৎ, গরম জিনিসকে ঠান্ডা করা হয় - ফলে সেখানে পানি জমে বরফ হতে পারে। বৈজ্ঞানিকভাবে এর অর্থ হচ্ছে রেফ্রিজেটরের ভিতরে এনট্রপি কমেছে। কিন্তু তাপকে এই 'উল্টো দিকে' চালিত করার জন্য রেফ্রিজেটরকে বাড়তি কিছু কাজ করতে হয়। কাজ করবার শক্তিটুকু ফ্রিজটি কোথা হতে পায়? রেফ্রিজেরটের পেছনে লাগানো মোটর আর কিছু জ্বালানী এই শক্তিটুকু সরবরাহ করে। কিন্তু এই শক্তিটুকু সরবরাহ করতে গিয়ে তারা ঘরের এনট্রপিকে বাড়িয়ে তোলে। এবারে খাতা কলম নিয়ে হিসেব কষলে দেখা যাবে পানিকে বরফ করে রেফ্রিজেটর তার ভেতরে এনট্রপি যত না কমিয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশী বাড়িয়ে তুলেছে ঘরের এনট্রপি। কাজেই যোগ-বিয়োগ শেষ হলে দেখা যাবে এনট্রপির নীট বৃদ্ধি

[25] Adam Frank, 3 Theories That Might Blow Up the Big Bang, Discover, March 25, 2008
[26] Victor J. Stenger, A Scenario For A Natural Origin Of Our Universe Using A Mathematical Model Based On Established Physics And Cosmology, Philo 9(2) দ্রষ্টব্য। অনলাইন লিঙ্ক : http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/Godless/Origin.pdf

ঘটেছে। কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি শুধুমাত্র ফ্রিজের ভিতরটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে পারে, এনট্রপি তো কমে গেছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে পুরো সিসটেম (ওপেন সিস্টেম) গোনায় ধরলে দেখবে যে, এনট্রপি আসলে কমেনি, বরং বেড়েছে।

বিবর্তনের ব্যাপারটাও তেমনি। সূর্য আমাদের এ পৃথিবীতে প্রতি নিয়ত শক্তির যোগান দিয়ে চলেছে। সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জীবদেহে কোষের বৃদ্ধি ঘটে, এবং কালের পরিক্রমায় বিবর্তনও ঘটে। শুধুমাত্র জীবদেহের দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হবে যে এনট্রপি কমেছে। কিন্তু ঠিকমত হিসেব-নিকেশ করলে তবেই বোঝা যবে যে, এই 'আপাতঃ এনট্রপি' কমাতে গিয়ে শক্তির যোগানটা পড়ছে অনেক বেশী। কাজেই এনট্রপির আসলে নীট বৃদ্ধিই ঘটছে।

সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থার উত্তরণকে যারা 'এনট্রপি কমার' অজুহাত তুলে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের লংঘন ভাবেন তারাও ভুল করেন। প্রকৃতিতে সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায় উত্তরণের উদাহরণের অভাব নেই। এমনকি জড়জগতেও এধরনের 'আপাতঃ এনট্রপি' কমার উদাহরণ রয়েছে বিস্তর। ঠান্ডায় জলীয়-বাষ্প জমে তুষার কণিকায় পরিণত হওয়া, লবনের মধ্যে কেলাস তৈরী, কিংবা পাথুরে জায়গায় পানির ঝাপটায় তৈরী হওয়া জটিল নকসার ক্যাথেড্রালের অস্তিত্ব এ পৃথিবীতে বিরল নয়। উদাহরণ আছে গ্যালাক্সি ফরমেশন, কিংবা স্পন্টেনিয়াস ম্যাগ্নেটিজমের। কোনটির ক্ষেত্রেই তাপগতির সূত্র ব্যহত হয়নি। কাজেই কালের পরিক্রমায় সরল জীব থেকে বিবর্তিত হয়ে জটিল জীবের অভ্যুদয় কোন অসম্ভব ঘটনা নয়, নয় তাপগতিবিদ্যার লংঘন। বন্যা আহমেদ তার 'বিবর্তনের পথ ধরে' বইয়ে এ ব্যাপারটা প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠকদের জন্য পরিস্কার করেছেন[27]। মুলতঃ বিগত শতকে হাবলের সেই যুগান্তকারী আবিস্কারের পর যখন থেকে আমরা জানতে পেরেছি মহাবিশ্ব প্রসারণশীল, তখন থেকে আমরা জানি - স্থানিক শৃঙ্খলা বৃদ্ধি (localized order) তাপগতিবিদ্যার কোন লঙ্ঘন নয়, কারণ পুরো মহাবিশ্বের এনট্রপি বৃদ্ধির নিরিখে সেই স্থানিক 'আপাতঃ এনট্রপি' কমা খুবই সম্ভব।

উপরের উদাহরণগুলো ধর্মবাদীদের জন্য নিঃসন্দেহে এক ধরণের সতর্কবাণী নিয়ে এসেছে। রহস্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য সহজ সমাধান হিসেবে যারা ঈশ্বররকে গুঁজে দিতেন, কিছুদিন পরে তারা নিজেরাই লজ্জিত হয়েছেন, কারণ দেখা গেছে অগ্রসর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে সে রহস্যকে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। প্যালির 'ডিজাইন আর্গুমেন্ট' থেকে শুরু করে 'এনট্রপি হ্রাসের' ভ্রান্তযুক্তিগুলো সে ব্যাপারটিই আমাদের কাছে পরিস্কার করে দেয়। এ ধরনের আরো কিছু উদাহরণ দেওয়া যায়।

এগারো শতকের ভারতীয় দার্শনিক উদয়ন আচার্য (Udayana) ঈশ্বর থাকার 'প্রমাণ' হিসবে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন। আমরা সেগুলো বিবেচনায় আনতে পারি। প্রথমতঃ উদয়নের মতে আমাদের চেনা জানা বস্তুজগতের সব কিছুর পেছনে একটা কারণ আছে। তার মতে কেউ না কেউ এই বস্তুজগত তৈরি করেছে।

[27] বন্যা আহমেদ, বিবর্তনের পথ ধরে, অবসর প্রকাশনা, ২০০৭, বইটির পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

সেই সত্ত্বাই ঈশ্বর[28]। এখন আধুনিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যার জ্ঞানের সাপেক্ষে আমরা জানি, সব কিছুর পেছনেই কারণ থাকার ব্যাপারটি কোন ধ্রুব সত্য নয়। এটোমিক ট্রান্সিশন, রেডিও এক্টিভ ডিকে, কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ করা যায়, যেগুলো 'কারণ বিহীন ঘটনা' হিসেবে স্বীকৃত। আর তাছাড়া, সব কিছুর পেছনে যদি কারণ থাকেই, তাহলে ঈশ্বরের পেছনে কেন কোন কারণ থাকবে না, সেটাও তো পরিস্কার করে বলা চাই।

ঈশ্বর থাকার দ্বিতীয় 'প্রমাণ' হিসবে তিনি যা বলতেন তা আজকের দিনে তেমন একটা শোনা যায় না। বিষয়টা একটু প্যাঁচালো। উদয়ন বলতেন, সব কিছুই তৈরি হয়েছে পরমাণু দিয়ে, এবং বিভিন্ন পরমাণু মিলে বড় বস্তু তৈরি করে। কিন্তু সেই বন্ধন নিজে নিজে তৈরি হতে পারে না, সেই বন্ধন তৈরি হয় সজ্ঞাত সত্ত্বার হস্তক্ষেপে। কিন্তু আজকের জ্ঞানের সাপেক্ষে আমরা জানি এটি মিথ্যা। আমরা জানি পরমানুর মিথস্ক্রিয়ার নানা সুত্রাবলী (laws of atomic interactions) রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠা পরমাণুর বন্ধনকে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করতে পারে। বিজ্ঞানের যে শাখায় বিষয়গুলো আলোচনা করা হয় তার নাম – 'রসায়ন' (chemistry)। রসায়নের নিয়মনীতি অনুসরণ করে কিভাবে বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বন্ধন তৈরি হয়, তা আজকের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও বলতে পারবে।

তার তৃতীয় 'প্রমাণ'টি ছিল পৃথিবীর শুন্যে ঝুলে থাকার সমাধান হিসবে। উদয়ন তখনকার জ্ঞানের সাপেক্ষে ভাবতে পারেননি কিভাবে আমাদের এই পৃথিবীটা শুন্যে ঝুলে আছে। তিনি মনে করতেন কেউ না কেউ নিশ্চয়ই পৃথিবীটাকে ধরে রেখেছে। তিনিই ঈশ্বর। আজ আমরা জানি, মাধ্যাকর্ষন সূত্র সহজেই পৃথিবীর এই শূন্যে ঝুলে থাকাকে ব্যাখ্যা করতে পারে; কোন অদৃশ্য সত্ত্বার দারস্থ হতে হয় না।

উদয়নের চতুর্থ 'প্রমাণ'টি ছিল মানব দক্ষতার অভিজ্ঞতা ভিত্তিক। এই 'প্রমাণ'টি অনেকটা আজকের দিনে এরিক ফন দানিকেনের 'প্রমাণের' মত। কেউ আমাদের না দেখিয়ে দিলে আমরা কিছু করতে পারতাম না। এই যে সভ্যতার অগ্রগতি – এটা এমনি এমনি ঘটে নি, কেউ না কেউ উপর থেকে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে, বলে দিয়েছে। কোন উপরওয়ালা ছাড়া মানব সভ্যতা এগোয়নি কিংবা এগুতে পারবে না এ ব্যাপারটা কে বলল? এটার বিরুদ্ধে এত যুক্তি দেওয়া যায় যে, আজকের দিনে এটা আদপে কোন যুক্তি নয় বলেই প্রতীয়মান হয়।

পঞ্চমতঃ উদয়ন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ গুলোকে ঐশ্বরিক ভাবতেন। তিনি মনে করতেন বেদ এক প্রমান্য ধর্মগ্রন্থ। কোন মানুষের পক্ষে বেদ লিখা সম্ভব নয়। কিন্তু আজকের দিনের জ্ঞানের সাপেক্ষে আমরা জানি, বেদ সেরকম কোন ঐশ্বরিক গ্রন্থ নয়, বরং সে সময়কার মুনি ঋষিদের চিন্তাভাবনার সংকলন বলা যেতে পারে। বেদের অনেক কিছুই আজকের জ্ঞানের সাপেক্ষে অবৈজ্ঞানিক, সেকেলে এমনকি অমানবিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। তারপর উদয়ন কিংবা তার মত কেউ বেদ কিংবা অন্য ধর্মগ্রন্থকে 'ঐশ্বরিক' ভাবতে পারেন, কিন্তু তাতে করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হচ্ছে না।

[28] উদয়নের এই প্রথম 'প্রমাণ'টি অনেকেটা পশ্চিমা বিশ্বে 'কালাম কসমোলজিকাল আর্গুমেন্টের' সমতুল্য, যেখানে ঈশ্বরকে 'আদি কারণ' হিসেবে দেখানো হয়েছে। কালামের যুক্তিমালার খন্ডন এই বইয়ের প্রথম প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

উদয়নের উদাহরণগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে, আগেকার দিনের চিন্তাশীল মানুষেরা বিভিন্ন যুক্তি সাজিয়ে ঈশ্বারের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু সফল যে হয়েছিলেন তা বলা যাবে না। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে ওই 'প্রমাণ'গুলো নিজে নিজেই অপাংকক্তেয় হয়ে গেছে।

এ ছাড়াও 'বিশ্বাসীদের থলিতে' ঈশ্বারের অস্তিত্বের স্বপক্ষে আরো অনেক কিম্ভুতকিমাকার 'প্রমাণ' আছে। এর অনেকগুলোই খুবই হাস্যকর এবং খেলো। যেমন, ইতালীর ক্যাথলিক পাদ্রী থমাস একুনিয়াস (Thomas Aquinas) ঈশ্বরের অস্তিত্বের 'প্রমাণ' হিসেবে বলতেন –

> "আমরা জানি এই পৃথিবীতে বিভিন্ন বস্তুর গুণ অবস্থা ভেদে ভিন্ন। যেমন, ভালোত্ব কিংবা উৎকর্ষতা ব্যাপারটা ডিগ্রি বা মাত্রার উপর নির্ভরশীল। আমরা ভালোত্ব এবং উৎকর্ষতাকে পরিমাপ করতে পারি এক পরম বা সর্বোচ্চ মানের সাপেক্ষে। মানুষের মধ্যে ভালো খারাপ দুইই আছে। কাজেই মানুষের মধ্যে ভালত্বের সর্বোচ্চাবস্থা (absoulute goodness) থাকতে পারে না। সুতরাং এমন কোথাও নিশ্চয় আছে যেখানে ভালোত্ব কিংবা উৎকর্ষতা থাকবে মানের সর্বোচ্চ স্কেলে। সেটাই ঈশ্বর"।

কিন্তু এটা কি কোন 'যুক্তি' নাকি? অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স তাঁর সাম্প্রতিক 'গড ডিলুশন'[29] বইয়ে এর জবাব দিয়ে বলেন,

গায়ের দুর্গন্ধও তো মানুষ ভেদে ভিন্ন হয়। তাহলে নিশ্চয় কোথাও এমন কেউ আছেন যিনি দুর্গন্ধের চুড়ান্ত। সেই পরম গন্ধমাধবই হচ্ছেন ঈশ্বর। কেমন শোনায় এখন?

অতি সম্প্রতি বিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে নতুন কিছু যুক্তির অবতারণা করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। এর মধ্যে সব চাইতে জনপ্রিয় মতবাদটি হল : 'বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্প' বা Intelligent Design Argument। এটি মূলতঃ প্যালির ডিজাইন যুক্তিরই বর্ধিত রূপ। মাইকেল বিহে, উইলিয়াম ডেম্বস্কি, জর্জ এলিস প্রমুখ এ তত্ত্বটির প্রবক্তা। এঁদের যুক্তি হল আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এমন কিছু পরিবর্ত্য রাশির (variables) সুক্ষ্ম সমন্বয়ের (Fine Tuning) মধ্য দিয়ে সৃষ্ট হয়েছে যে এই সমন্বয়ের একচুল হের ফের হলে আমাদের পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ হত না। এর অর্থ হল সৃষ্টির এক পর্যায়ে ঈশ্বর প্রাণ সৃষ্টি করবেন এই সুপ্ত ইচ্ছেটা মনে রেখে তিনি মহাবিশ্ব তৈরী করলেন, আর এ কারণেই আমাদের মহাবিশ্ব ঠিক যেমনটি আছে তেমন- এত নিখুঁত ও সুসংবদ্ধ। ব্যাপারটি নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। ধরা যাক মহাকর্ষণের কথা। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রে একটি ধ্রুবক স্বতঃভাবেই উদয় হয়- যাকে আমরা বলি মহাকর্ষ ধ্র"বক, G (Gravitational constant)। সেই সূত্র থেকে দেখা যায় যে দুটি বস্তুকণার মধ্যে আকর্ষণ বলের পরিমাণ নির্ধারিত হবে ঐ মহাধ্র"বকের সংখ্যাবাচক মান দ্বারা। যদি ধ্রুবকটির মান এখন যা আছে তা না হয়ে অন্যরকম হত তাহলে দুটি কণিকার মধ্যে আকর্ষণ বলের পরিমাণও বদলে যেত। সাদা চোখে ব্যাপারটি সামান্য মনে হতে পারে। আকর্ষণ বলের তারতম্য ঘটলে এমন কি এসে যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে এটি সামান্য নয়- এর একটি সুদূর প্রসারী প্রভাব পরবে আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর। তাঁরা বলেন যে ঐ মহাকর্ষ ধ্রুবকের বর্তমান মান আসলে আমাদের পরিচিত মহাবিশ্বের প্রকৃতি নির্ধারণ করেছে। ধ্রুবকটির মান অন্যরকম

[29] Richard Dawkins, The God Delusion, Houghton Mifflin, 1 edition (2006)

হলে তারকাদের মধ্যে হাইড্রোজেনের পরিমাণ কমে গিয়ে হিলিয়াম উৎপাদনের মাত্রাকে বদলে দিত। হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের পর্যাপ্ততা শুধু এই মহাকর্ষ ধ্রুবকের উপরই অবশ্য নয়, মহাকর্ষ ও দুর্বল নিউক্লিয় বলের মধ্যকার শক্তির ভারসাম্যের উপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল। যেমন, তাঁরা দেখিয়েছেন যে দুর্বল নিউক্লিয় বলের শক্তি যদি সামান্য একটু বেশি হত, এই মহাবিশ্ব পুরোটাই অর্থাৎ শতকরা একশ ভাগ হাইড্রোজেন পরমাণুতে পূর্ণ থাকত, কারণ ডিউটোরিয়াম (এটি হাইড্রোজেন পরমাণুর মামাতো ভাই, যাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে 'আইসোটোপ') হিলিয়ামে পরিণত হবার আগেই সমস্ত নিউট্রন নিঃশেষ হয়ে যেত। আবার এর উল্টোটি ঘটলে, অর্থাৎ দুর্বল নিউক্লিয় বলের শক্তিমত্তা আর একটু কম হলে সারা মহাবিশ্বে কেবল থাকত শতকরা একশ ভাগ হিলিয়াম। কারণ সে ক্ষেত্রে নিউট্রন নিঃশেষিত না হয়ে তা উৎপন্ন প্রটোনের সাথে যুক্ত হয়ে হাইড্রোজেন তৈরীতে বাঁধা দিত। কাজেই এ ধরণের দুই চরম অবস্থার যে কোন একটি ঘটলে মহাবিশ্বে কোন নক্ষত্ররাজী তৈরি হওয়ার মত অবস্থা কখন সৃষ্টি হত না, ঘটত না আমাদের এই মলয়শীতলা ধরণীতে 'কার্বন-ভিত্তিক' প্রাণের নান্দনিক বিকাশ। আবার, বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে ইলেকট্রনের ভর নিউট্রন ও প্রটোনের ভরের পার্থক্যের চেয়ে কিছুটা কম। তারা মনে করেন যে এর ফলে একটি মুক্ত নিউট্রন সহজেই প্রোটন, ইলেকট্রন ও প্রতি-নিউট্রিনোতে রূপান্তরিত হতে পেরেছে। যদি ইলেকট্রনের ভর সামান্য বেশি হত, নিউট্রন তাহলে সুস্থিত হয়ে যেত, আর সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপাদিত সকল প্রটোন ও ইলেকট্রন মিলে-মিশে নিউট্রনে পরিণত হত। এর ফলে যা ঘটত সেটি আমাদের জন্য খুব একটা সুখপ্রদ কিছু নয়। এমনতর পরিস্থিতিতে খুব কম পরিমাণ হাইড্রোজেন টিকে থাকত, আর তাহলে নক্ষত্রের জন্য পর্যাপ্ত জালানী অবশিষ্ট থাকত না। জন ডি. ব্যরো এবং ফ্রাঙ্ক জে. টিপলার এ ধরণের রহস্যময় নানা যোগাযোগ তুলে ধরে একটি বই লিখেছিলেন ১৯৮৬ সালে, নাম 'The Anthropic Cosmological Principle'। তাঁদের বক্তব্য হল, আমাদের মহাবিশ্বে গ্র্যাভিটেশনাল কিংবা অন্য মহাজাগতিক ধ্রুবকসমূহের মান এমন কেন, কিংবা মহাবিশ্বের চেহারাটাই বা এমন কেন হয়েছে এর উত্তর পেতে হলে অনুসন্ধান করতে হবে পৃথিবীতে প্রাণ এবং মানুষের আবির্ভাবের মধ্যে। প্রাণের বিকাশ ও সর্বোপরি বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের অভ্যুদয়ের জন্য এসব মৌলিক ধ্রুবকও পরিবর্ত্য রাশিগুলির মান ঠিক এমনই হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল, আর সেজন্যই ধ্রুবকগুলির মান এ রকম হয়েছে। হঠাৎ করে বা দৈবক্রমে এটি ঘটে নি, বরং এর পেছনে বিধাতা পুরুষের একটি সুস্পষ্ট ইচ্ছা নিহিত ছিল। মানুষের অভ্যুদয়কে কেন্দ্রে রেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম-নীতি-সূত্রসমুহের ব্যখ্যা করার এই প্রয়াসকে বলা হয় 'Anthropic Argument' বা 'নৃ-কেন্দ্রিক যুক্তি'।

এ ধরনের যুক্তিগুলো প্রথম দৃষ্টিতে বেশ আকর্ষণীয় মনে হলেও অনুসন্ধিৎসু চোখ দিয়ে দেখলে কিন্তু নানা দুর্বলতা বেরিয়ে আসে। প্রথমতঃ এ ক্ষেত্রে ধরেই নেয়া হয়েছে যে আমাদের পৃথিবীতে যে ভাবে কার্বন ভিত্তিক প্রাণের বিকাশ ঘটেছে সেভাবে ছাড়া অন্য কোনভাবে প্রাণের সৃষ্টি হতে পারে না। যেমন প্রায়শঃ বলা হয় যে পৃথিবীতে তাপ, চাপ সবকিছু যদি যথাযথ অনুপাতে না থাকত, তবে প্রাণের বিখাশ ঘটত না। এই যে পৃথিবীর কক্ষ-তল বিষুববৃত্তের তলের সাথে ২৩.৫ ডিগ্রী হেলে আছে, তার একচুল এদিক-ওদিক হলে তাপ ও চাপের অনুপাতের এমন তারতম্য দেখা দিত যে প্রাণের উন্মেষ একটি অসম্ভব ব্যাপারে পরিণত হত। কিন্তু অনেক বিজ্ঞানীই আছেন যাঁরা প্রাণের এ ধরনের সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞার সাথে একমত নন। এঁদের মতে 'আমরা এ ধরণের সর্বোত্তম' পরিবেশে উদ্ভুত হয়েছি বলেই আমরা ধরে নিয়েছি যে প্রাণের উৎপত্তির জন্য ঠিক এ ধরনের পরিবেশই লাগবে। অর্থাৎ বাতাসে সঠিক অনুপাতে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন বা কার্বন-ডাইঅক্সাইড

ইত্যাদির উপস্থিতি, আবহমণ্ডলের চাপ, তাপ ইত্যদি পরিবেশ নির্ধারক পরিবর্ত্য রাশিগুলির মান বর্তমানে যা আছে তা না থাকলে নাকি প্রাণের বিকাশ ঘটত না, ঘটবে না। এটি একটি সজ্ঞাত ধারণা- প্রমাণিত সত্য নয়। অক্সিজেনকে জীবন রক্ষার অন্যতম উপাদান বলে মনে করা হয়, কিন্তু মাটির নিচে এমন অনেক ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের জন্য অক্সিজেন শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, রীতিমত ক্ষতিকর। সমুদ্রেও গভীর তলদেশে, এমনকি কেরোসিন তেলের ভেতরের বৈরি পরিবেশেও প্রাণের বিকাশ ঘটেছে এমন প্রমাণ বিজ্ঞানীদের কাছে আছে যে ধরনের পরিবেশের সাথে আসলে আমাদের পরিচিত 'সর্বোত্তম পরিবেশের' কোন মিলই নেই। কাজেই সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, মহাজাগতিক ধ্র"বক আর পরিবর্ত্য রাশিগুলির মান অন্য রকম হলে মহাবিশ্বে প্রাণের অভ্যুদয় ঘটত না। খ্যাতনামা জ্যোতির্পদার্থবিদ ভিক্টর স্টেংগর তাঁর 'The Unconscious Quantum' বইটিতে দেখিয়েছেন যে মহাজাগতিক ধ্রুবক আর পরিবর্ত্য রাশিগুলির মান পরিবর্তন করে আমাদের মহাবিশ্বের মত আরও অসংখ্য মহাবিশ্ব তৈরি করা যায়, যেখানে প্রাণের উদ্ভবের মত পরিবেশের সৃষ্টি হতে পারে। এ জন্য 'ফাইন টিউনিংয়ের' কোন প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারটি বুঝানোর জন্য তিনি 'মাঙ্কি গড' নামে একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম লিখেছেন যার প্যারামিটারগুলো নির্বিচারে মান বসিয়ে সেই তথাকথিত 'Anthropic coincidence' ঘটানো যায় কোন ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই। 'মাঙ্কি গড' শুনতে খেলো শোনালেও এটি কোন ছেলেখেলা নয়, বরং রিচার্ড ক্যারিয়ারের[30] ভাষায়, একটি সিরিয়াস রিসার্চ প্রোডাক্ট', যা Philo জার্নালে বেশ গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়েছে[31]। আমি নিজেও ড. স্টেংগরের এই প্রোগ্রামটি তাঁর ওয়েবসাইট থেকে বহুবার ব্যবহার করেছি। কাজেই তিনি যখন বলেন, "বর্তমান জ্ঞানে এমন কোন ভিত্তি নেই যাতে সুক্ষ্ম সমন্বয়বাদীরা অনুমান করতে পারেন যে একমাত্র একটি সঙ্কীর্ণ, অসম্ভাব্য সীমার মধ্যে আবদ্ধ প্যারামিটার ছাড়া জীবন সৃষ্টি অসম্ভব" - তখন তাঁর এই বক্তব্যকে নস্যাৎ করা যায় না। এছাড়াও 'Physical Review' জার্নালে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে বিজ্ঞানী অ্যান্থনি অ্যাগুরি (Anthony Aguirre) স্বতন্ত্রভাবে দেখিয়েছেন মহাবিশ্বের ছয়টি প্যারামিটার বা পরিবর্ত্যরাশিগুলো বিভিন্নভাবে অদলবদল করে গ্রহ, তারা এবং পরিশেষে কোন একটি গ্রহে বুদ্ধিদীপ্ত জীবন গঠনের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব- কোন ধরনের 'Anthropic Argument' এর আমদানি ছাড়াই[32]।

'ফাইন টিউনিংয়ের' বক্তব্যের সমালোচনা করে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী স্টিভেন ভাইনবার্গ তাঁর 'পরিকল্পত মহাবিশ্ব' শিরনামে লেখা প্রবন্ধে বলেন[33]:

> 'কোন কোন পদার্থবিদ আছেন যারা বলেন প্রকৃতির কতিপয় ধ্রুবকের মানগুলোর এমন কিছু মানের সাথে খুব রহস্যময়ভাবে সুক্ষ্ম সমন্বয় ঘটেছে যেগুলো জীবন তৈরির সম্ভাব্যতা প্রদান করে। এভাবে একজন মানব দরদী সৃষ্টিকর্তাকে কল্পনা করে বিজ্ঞানের সব রহস্যের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। আমি এ ধরণের সুক্ষ্ম সমন্বয় ধারণায় মোটেও সন্তুষ্ট নই। '

[30] রিচার্ড ক্যারিয়ার- প্রখ্যাত যুক্তিবাদী, বিতার্কিক, secular web এর প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক, ইতিহাসবিদ।

[31] "Natural Explanations for the Anthropic Coincidences." *Philo* 3(2000): 50-67.

[32] Anthony Aguirre, "The Cold Big-Bang Cosmology as a Counter-example to Several Anthropic Arguments", Journal of Physical Rev, D64:083508, 2001.

[33] পূর্বোক্ত

তিনি কার্বন তৈরির পেছনে অ্যানথ্রোপিক যুক্তির চাইতে পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাখ্যাকেই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করেন। এছাড়া আদ্রে লিন্ডে, অ্যালেন গুথ প্রমুখের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানে ইনফ্লেশন বা স্ফীতিতত্ত্বের সাম্প্রতিক ফলাফলগুলোও তথাকথিত 'ফাইন টিউনিং' এর বিরুদ্ধে গেছে। এ নিয়ে বিস্তারিতভাবে জানতে এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত 'আমেরিকায় ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের নামে কি হচ্ছে?' প্রবন্ধটি পড়া যেতে পারে।

এই আপাত চমকদার বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পটি শুধু জ্যোতির্বিদ্যায় নয়, খুব উৎসাহের সাথে ইদানিং ব্যবহার হরা হচ্ছে জীববিজ্ঞানেও। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, জীববিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার'রা যে ভাবে যুক্তি সাজিয়ে থাকেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের ফাইন টিউনাররা দেন ঠিক উল্টো যুক্তি। জীববিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার'রা বলেন আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে এতটাই **অনুপযুক্ত** যে প্রাকৃতিক নিয়মে এখানে এমনি এমনি প্রাণের সৃষ্টি হতে পারে না। আবার জ্যোতির্বিজ্ঞানের ফাইন টিউনাররা ঠিক এর বিপরীত কথা বলেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রাণ-সৃষ্টির পক্ষে এতটাই **উপযুক্ত** যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রাকৃতিক নিয়মে কোনভাবেই সৃষ্ট হতে পারে না। একই সাথে দুই বিপরীত মেরুর কথা তো সত্য হতে পারে না। মাইকেল আইকেদা, বিল জেফ্রিস, ভিক্টর স্টেংগর, রিচার্ড ডকিন্সসহ অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে ফাইন টিউনিং বা অ্যানথ্রোপিক যুক্তিগুলি আসলে সেই পুরান 'গড ইন গ্যাপসের' যুক্তিবাদেরই নব্য সংস্করণ। যেখানে রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, কিংবা বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু বিষয় ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, সেখানেই ঈশ্বরকে টেনে আনা হচ্ছে। এভাবে মুক্তবুদ্ধি ও বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহিত না করে বরং অন্ধ বিশ্বাসের কাছে মানুষকে আত্মসমর্পণে উৎসাহী করা হচ্ছে। এ কারণেই রিচার্ড ডকিন্স তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেন[34]:

> সারল্য থেকে কিভাবে জটিলতার উদ্ভব ঘটে তার ব্যখ্যা বিজ্ঞান আমাদের কাছে হাজির করে। কিন্তু 'ঈশ্বরের অনুকল্প' কোন কিছুর জন্যেই গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারে না, কারণ আমরা যা কিছুর ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করি এই অনুকল্প তা স্বীকার করে নেয়।

বস্তুত অনেক বিজ্ঞানীই আজ মনে করেন যে, মহাবিশ্ব মোটেই আমাদের জন্য 'ফাইন-টিউন্ড' নয়, বরং আমরাই মহাবিশ্বে টিকে থাকার সংগ্রামে ধীরে ধীরে নিজেদেরকে ফাইন-টিউন্ড করে গড়ে নিয়েছি। অর্থাৎ সহজ কথায়- "মহাবিশ্ব মনুষ্যত্বের জন্য সুক্ষ্মভাবে সুসমন্বিত নয়, বরং মনুষ্যত্বই মহাবিশ্বের সাথে সুক্ষ্মভাবে সুসমন্বিত" । ব্যাপারটা হয়তো মিথ্যে নয়। আমাদের চোখের কথাই ধরা যাক। মানুষের চোখ বিবর্তিত হয়েছে এমনভাবে যে, এটি লাল থেকে বেগুনী পর্যন্ত সীমার তাড়িতচৌম্বক বর্ণালীতে কেবল সংবেদনশীল। এর কারণ হল আমাদের বায়ুমণ্ডল ভেদ করে এই সীমার আলোই বছরের পর বছর ধরে পৃথিবীতে এসে পৌঁছুছে। কাজেই সেই আবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে চোখের গড়ন সে ভাবেই বিবর্তিত হয়েছে। পুরো ব্যাপারটিকে আবার অন্য কেউ উল্টোভাবেও ব্যাখ্যা করতে চাইতে পারেন। যেমন তিনি বলতে পারেন যে ঈশ্বর আমাদের চোখকে লোল-বেগুনী সীমায় সংবেদনশীল করে তৈরি করবেন বলেই বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে

[34] A lecture by Richard Dawkins extracted from The Nullifidian (Dec 94), (http://www.simonyi.ox.ac.uk/dawkins/World of Dawkins-archive/ Dawkins/ Work/Articles/1994- 12religion.shtml

এই সংকীর্ণ পরিসরেরর (অর্থাৎ লাল থেকে বেগুনী) আলো আমাদের চোখে প্রবেশ করতে দেন। তাই আমাদের চোখ এরকম। কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যাকরণ কতটা যৌক্তিক? অনেকটা ঘোড়ার আগে গাড়ী জুরবার মতই শোনায়। এর পরও সুক্ষ্ম সমন্বয়কারীরা ঠিক এ ধরণের যুক্তি দিতেই পছন্দ করেন। মহাজাগতিক ধ্রুবকগুলি কেন এ ধরনের মান গ্রহণ করল এর বৈজ্ঞানিক ব্যখ্যা না খুঁজে- তা 'না হলে পরে পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি আর মানুষের আবির্ভাব ঘটত না' এ ধরণের যুক্তি উত্থাপন করে থাকেন।

প্রাণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি মুখ্য হয়, তবে বিগ-ব্যাংয়ের পর ঈশ্বর কেন ৭০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন এই পৃথিবী তৈরী করতে, আর তারপর আরও ৬০০ কোটি বছর কাটিয়েছিলেন পৃথিবীতে 'মানুষের অভ্যুদয়' ঘটাতে- এর কি কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা মেলে? পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাস-পরিক্রমায় আমরা তো আজ জানি যে মানুষ পুরো সময়ের মাত্র একশ' ভাগের এক ভাগের কম সময় ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করছে। তারপরও মানুষকে এত বড় করে তুলে ধরে মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার কি প্রয়োজন? এছাড়া প্রাণ কিংবা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি মুখ্য হয়, তবে বলতেই হয় মহান ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় সৃষ্টির চেয়ে অপচয়ই করেছেন বেশি। কোটি কোটি বছর পর পৃথিবী নামক সাধারণ একটি গ্রহে প্রাণ সৃষ্টি করতে গিয়ে অযথাই সারা মহাবিশ্ব জুড়ে তৈরি করেছেন হাজার হাজার, কোটি কোটি, ছোটবড় নানা গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহানুপুঞ্জ- যারা আক্ষরিক অর্থেই আমাদের সাহারা মরুভূমির চেয়েও বন্ধ্যা, উষর আর প্রাণহীন। শুধু কোটি কোটি প্রাণহীন আর নিস্তব্ধ গ্রহ, উপগ্রহ তৈরি করেই ঈশ্বর ক্ষান্ত হননি, তৈরি করেছেন অবারিত শূন্যতা, গুপ্ত পদার্থ এবং গুপ্ত শক্তি- যেগুলো নিষ্প্রাণ তো বটেই, প্রাণ সৃষ্টির কল্পিত মহান উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে নিতান্তই বেমানান। ঈশ্বরের সৃষ্টি যদি এত 'নিখুঁত'ই হবে তবে প্রশ্ন উঠতেই পারে, কেন এত অর্থহীন অপচয়?

আসলে 'ঈশ্বর নির্ধারিত মানবকেন্দ্রিক' সংস্কারের ভুত মনে হয় কারো কারো মাথা থেকে যাচ্ছে না। সেই টলেমীর সময় থেকেই আমরা তা দেখে আসছি। আমাদের এই ছোট্ট পৃথিবীটি কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া সাধারণ একটি গ্রহ মাত্র- এটি না সৌর জগতের না, না মহাবিশ্বের কেন্দ্র। আর এ সত্যটি গ্রহণ করতে আমাদের লেগেছে অনেক দিন। ভূকেন্দ্রিক মডেলের স্থানে কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিজ্ঞান সাধনাই যথেষ্ট ছিল না, এর জন্য কোপার্নিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিও প্রমুখ মুক্তচিন্তার মানুষকে সইতে হয়েছে নির্যাতন। একই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন চার্লস ডারউইন এবং আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জীবজগতের বিবর্তনের প্রস্তাব (১৮৫৯) উত্থাপন করলেন। বিবর্তনের ধারণা সাধারণ মানুষ এখনও মন থেকে মেনে নিতে পারে নি, কারণ এ তত্ত্ব গ্রহণ করলে 'ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত' বিশেষ সৃষ্টি মানুষের বিশিষ্টতা ক্ষুন্ন হয়। আর এ কারণেই মানুষ আজও নিজেকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ভেবে নিজেকে সৃষ্টির মধ্যমণি করে, পৃথিবীকে মহাবিশ্বের মাঝে বসিয়ে সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। ফাইন টিউনিং ও অ্যানথ্রোপিক যুক্তিগুলি এ জন্যই মানুষের কাছে এখনও এত আকর্ষণীয়।

সত্যি বলতে কি মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে 'ঈশ্বরের অস্তিত্বের' প্রয়োজন একটি বিশ্বাস-নির্ভর ধারণা মাত্র, এটিকে কোন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা তত্ত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ধর্মপ্রাণ মানুষের অন্তরের অনুভূতি ও বিশ্বাসই এর আসল ভিত্তি।

অনেক বিজ্ঞানীই ব্যক্তিগতভাবে ধর্মভীরু হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা এই বিশ্বাসকে ব্যক্তিগত পরিধিতেই সীমাবদ্ধ রাখেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাথে জড়িয়ে ফেলেন না। তাঁরা নিরাসক্তভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাফল্যজনক প্রয়োগের মধ্য দিয়েই মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটন করতে প্রয়াসী হয়েছেন, এবং বহু ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হচ্ছেন। এভাবেই ধাপে ধাপে বিজ্ঞানীরা এগুচ্ছেন। তার পরেও এটি স্বীকার করতে হয় যে আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে অনেক জায়গাতে এখনও 'ফাঁক' বা অপূর্ণতা রয়ে গেছে; অসমাধিত রয়ে গেছে অনেক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। যেমন, আমরা এখনও জানি না পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলি কিভাবে এক সময় তৈরী হল, আমরা এখনো বুঝে উঠতে পারিনি সৃষ্টির সূচনায় প্রকৃতি কেন প্রতি-কণিকার তুলনায় পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিল কণিকাদের প্রতি, কৃষ্ণ গহ্বরের কেন্দ্রেই বা কি রয়েছে, কেনই বা মহাবিশ্ব ত্বরিত হচ্ছে, আমাদের মহাবিশ্বের মত কি আরো অসংখ্য মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে? বিগ-ব্যাংয়ের পূর্বে স্থান বা কালের কি কোন ধারণা করা যায়? এ ধরণের নানা প্রশ্ন আমাদের মনকে নাড়া দেয়। আবার মহান একীভূত তত্ত্ব বা সার্বিক একীভূত তত্ত্বের স্বপক্ষে এখনও পরীক্ষণলব্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলেনি, স্থূলজগৎ ও আণুবীক্ষণিক জগৎ নির্বিশেষে আপেক্ষিক তত্ত্ব ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের সার্থক মেল-বন্ধন আমরা এখনও ঘটাতে পারিনি। এ ধরনের প্রান্তিক প্রশ্ন এবং সমস্যাগুলো হয়তো সাময়িকভাবে আমাদের চিন্তা-চেতনাকে অনন্ত প্রহেলিকার মধ্যে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু বিজ্ঞানীরা জানেন কি করে প্রহেলিকা কাটাতে হয়, কীভাবে মানুষকে আলোকিত করতে হয়। যুগ যুগ ধরে আমরা তাই দেখে এসেছি। সেজন্যই তাদেরকে আমি আমার বইয়ে আখ্যায়িত করেছি আলোর প্রদীপ হাতে চলা আঁধারের যাত্রী হিসেবে। বিজ্ঞানীদের এই নিবিড় সাধনায় ঈশ্বরের 'আলৌকিত্ব', কিংবা সাঁইবাবা অথবা সাঈদির মত ঐন্দ্রজালিক ব্যবসার কোন স্থান নেই, এমন কি বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত ঈশ্বর-বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের স্থানও এখানে গৌণ[35]। সত্যিকার বৈজ্ঞানিকের কাজ হল স্বমেধা উৎক্ষরিত তত্ত্ব, মডেল আর পরীক্ষণের ভিত্তিতে মহাবিশ্ব ও প্রকৃতির রহস্যকে অনুধাবন করে সত্যকে উদঘাটন করা।

আমি আমার 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' বইটি শেষ করেছিলাম একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করে। ঘটনাটি পড়েছিলাম বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদ মেঘনাদ সাহার 'হিন্দু ধর্ম-বেদ-বিজ্ঞান' সম্পর্কিত একটি চিত্তাকর্ষক বাদানুবাদ থেকে[36]। এ প্রবন্ধটিও আমি শেষ করছি সেই ঘটনাটির পুনরুল্লেখ করে। বর্ণিত ঘটনাটি এরকম:

---

[35] পৃথিবীর অধিকাংশ বিজ্ঞানী ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কিনা, এই প্রশ্নটি সাধারণ পাঠকদের কাছে সব সময়ই একটি কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় হিসেবে গণ্য হয়, যদিও এটা আমাদের মনে রাখতে হবে কারো ব্যক্তিগত বিশ্বাস অবিশ্বাসের ওপর কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যতা কখনই নির্ভর করে না, নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় লব্ধ প্রমাণের ওপর। যা হোক, ১৯৯৮ সালে করা একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সের (National Academy of Science) তালিকাভুক্ত খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের মধ্যে মাত্র ৭ শতাংশ বিজ্ঞানী ব্যক্তি-ঈশ্বরে (Personal God) বিশ্বাস করেন বাকি ৯৩ শতাংশের মধ্যে ৭২.২ শতাংশ সরাসরি নাস্তিক (Atheist) বা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হিসেবে নিজেদের অভিহিত করেছেন, এবং ২০.৮ ভাগ অজ্ঞেয়বাদী (Agnostic)। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Edward J. Larson and Larry Witham, Leading scientists still reject God, Nature, Vol. 394, No. 6691, p. 313, (1998). ;http://www.stephenjaygould.org/ctrl/news/file002.html

[36] আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম : অনিলবরণ রায়ের সমালোচনার উত্তর, মেঘনাদ সাহা, মেঘনাদ রচনা সংকলন (শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত), পৃষ্ঠা ১২৭-১৬৯, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলিকাতা, ১৯০৮ শকাব্দ (২য় সংস্করণ)।

বিখ্যাত গণিতজ্ঞ লাপ্লাস তার সুবিখ্যাত 'Mechanique Celeste' গ্রন্থে গ্রহসমূহের এবং চন্দ্রের গতির খুব সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, গতিতত্ত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ দিয়ে পর্যবেক্ষিত সকল গ্রহগতির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দান সম্ভব। তিনি যখন গ্রন্থটি নেপোলিয়নকে উৎসর্গ করার জন্য অনুমতি চাইতে গেলেন, তখন নেপোলিয়ন রহস্য করে বলেন:

> 'মসিঁয়ে লাপ্লাস, আপনি আপনার বইয়ে বেশ ভালভাবেই মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের চালচলন ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু আমি দেখলাম আপনি কোথাও ঈশ্বরের উল্লেখ করেন নি। আপনার মডেলে ঈশ্বরের স্থান কোথায়?'

লাপ্লাস উত্তরে বললেন:

> 'Monseigneur, je n'avais pas besoin de tel hypthese' অর্থাৎ- 'Sire, I have no need of that hypothesis.' (এই অনুকল্পের কোন প্রয়োজন আমার কাছে নেই)।

[প্রবন্ধটি 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' (অঙ্কুর প্রকাশনী)র সপ্তম অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে রচিত। ২০০৫ সালে প্রথম প্রকাশ এবং ২০০৬ সালে বইটির ২য় সংস্করণ প্রকাশের পর নতুন কিছু বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের সাপেক্ষে ঈষৎ পরিবর্তিত এবং বিবর্ধিত]

***

টিকাঃ

অক্কামের ক্ষুর

অক্কামের ক্ষুরকে দর্শন শাস্ত্রে অনেক সময় 'মিতব্যয়িতার নীতি' (Principle of Parsimony/Economy) কিংবা সরলতার নীতি (Principle of Simplicity) হিসেবে অভিহিত করা হয়। সংক্ষেপে এর মূল নীতিটি হল :

Pluralitas non est ponenda sine neccesitate (Plurality should not be posited without neccssity).

বাংলা করলে দাঁড়ায়-
'অনাবশ্যক বাহুল্য সর্বদাই বর্জনীয়'।

এই নীতি প্রয়োগ কিন্তু বিজ্ঞানে, ধর্মে, দর্শনে খুবই ব্যাপক। যেমন- বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'অক্কামের ক্ষুরের' প্রয়োগ হরহামেশাই লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞানীরা 'অক্কামের যে মূল নীতিটি অনুসরণ করেন তা হল- 'যদি দুটি বৈজ্ঞানিক মডেল একই রকম ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে, তবে অপেক্ষাকৃত সহজ মডেলটি সমাধান হিসেবে গ্রহণ কর।' যেমন, একটা সময় গ্রহদের অনিয়ত-গতিপ্রকৃতি জ্যোর্তিবিদদের কাছে বড় ধরনের তাত্ত্বিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। কেপলার এই সমস্যা সমাধান করতে আমাদের সামনে হাজির করেছিলেন তিনটি সূত্র। আর পরবর্তীতে একই সমস্যা সমাধানা করতে গিয়ে কেপলারের তিনটে নিয়মের বদলে নিউটন আমাদের দিলেন একটি মাত্র সূত্র- 'মহাকর্ষীয় ব্যস্তবর্গীয় নিয়ম' (nverse Law of Gravity) - যা দিয়ে গ্রহ উপগ্রহের চলাচলজনিত সমস্যাগুলোর একটা সহজ সমাধান পাওয়া গেল। দেখা গেল, এই নিয়ম থেকে কেপলারের নিয়মগুলো স্বতঃসিদ্ধভাবেই বেরিয়ে আসে। কাজেই যখন থেকে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রটিকে 'বৈজ্ঞানিক মডেল' হিসেবে গ্রহণ করা হল, কেপলারের বাকি সূত্রগুলো 'অনর্থক বাহুল্য' হিসেবে পরিত্যক্ত হল সঙ্গত কারণেই। এটিই অক্কামের সূত্রের একটি খুবই সার্থক প্রয়োগ।

অক্কামের ক্ষুরের আরেকটি সার্থক প্রয়োগ দেখা যায় ইথারের ক্ষেত্রে। উনবিংশ শতাব্দীর পদার্থ বিজ্ঞানীরা আলো চলাচলের জন্য মাধ্যম হিসেবে 'ইথার' নামক একটি অদৃশ্য, ঘর্ষণহীন, রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় এবং 'সর্বভূতে বিরাজমান' এক রহস্যময় পদার্থ কল্পনা করেছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল শব্দ চলাচলের জন্য যেমন মাধ্যমের প্রয়োজন, তেমনি আলো চলাচলের জন্যও একটি মাধ্যম থাকতেই হবে। তারা ধরে নিয়েছিলেন এই পুরো মহাবিশ্বটাই ডুবে রয়েছে ইথারের এক অথৈ মহাসমুদ্রে। আর এর ফলেই আলো অনেকটা শব্দের মতই তরঙ্গাকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ১৮৮০ সালে মাইকেলসন-মর্লির বিখ্যাত পরীক্ষা আর তারও পরে ১৯০৫ সালে আলবার্ট আইনস্টাইনের 'আপেক্ষিক তত্ত্ব' তাত্ত্বিকভাবে ঈথারের অস্তিত্বকে নস্যাৎ করে দিল। গন্ধহীন, স্পর্শহীন রহস্যময় 'ইথার' 'অহেতুক বাহুল্য' হিসেবে পরিত্যক্ত হল।

অক্কামের ক্ষুরের ব্যবহার দর্শনেই ব্যাপক। নাস্তিক্যবাদী দার্শনিকরা, অক্কামের ক্ষুরের প্রয়োগে যুক্তি দেখিয়ে থাকেন, ঈশ্বরের অনুমান নিতান্তই একটি অপ্রয়োজনীয় অনুকল্প। যেমন- নিম্নোক্ত দুটি হাইপোথিসিস বিবেচনায় আনা যাক।

- আমাদের সামনে এক জটিল মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে, যেটি প্রাকৃতিক নিয়মে (Natural Process) উদ্ভুত হয়েছে।
- আমাদের সামনে এক জটিল মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে, এবং একজন 'ঈশ্বর'ও রয়েছেন যিনি এই মহাবিশ্ব তৈরি করেছেন। এখানে 'ঈশ্বর' স্বভাবতই একটি পৃথক সত্ত্বা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

যদি এই দুইটি পথের মধ্যে একটিকে পছন্দ করতে হয়, তবে 'অক্কামের সূত্র' এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজটিকে সমাধান হিসেবে গ্রহণ করতে বলবে- অর্থাৎ প্রথম সমাধানটি এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

কেউ কেউ অবশ্য তৃতীয় একটি সমাধানকে অপেক্ষাকৃত সহজ হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন-

- আমাদের সামনে কোন জটিল মহাবিশ্বের অস্তিত্ব নেই- আসলে সবই মায়া আমাদের কল্পনা!

তবে এই তৃতীয় সমাধানটি আমাদের সলিপসিজমের (Solipsism) এর পথে নিয়ে যায় যা অধিকাংশ যুক্তিবাদীদের কাছে অগ্রহণযোগ্য।

'অক্কামের ক্ষুর' মধ্যযুগীয় দর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসেবে বিবেচিত হয়। 'অক্কামের ক্ষুর' নামক এই উদ্ভট পরিভাষাটি আসলে এসেছে ইংরেজ দার্শনিক উইলিয়াম অকহামের (William Ockham, ১২৮৫ -১৩৪৯) এর নাম থেকে। অকহাম নিজে যদিও এই সূত্রটির উদ্ভাবক ছিলেন না, তবে এই সূত্রটি তিনি প্রায়শই বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতেন বলে শোনা যায়। আর সেজন্যই তার নাম এই সূত্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে এখন জড়িয়ে রয়েছে। আমি অবশ্য জানি না যে, নাপিতের 'দাঁড়ি কামানোর ক্ষুরের' মত ভয়ঙ্কর একটা কিছুর আদলে তার নাম নিয়ে এই উদ্ভট পরিভাষা সৃষ্টির সাথে তিনি একমত হতেন কিনা, তবে তিনি চান বা না চান তার নামটি কিন্তু বিখ্যাত এই সূত্রের সাথে আজ ওতপ্রোতভাবেই জড়িয়ে রয়েছে।

রসিকজনেরা কিন্তু এই সূত্রটি নিয়ে নানা ধরনের রসিকতা করতেও ছাড়েননি। যেমন- কেউ কেউ এই সূত্রটিকে অভিহিত করেন 'Kiss' সূত্র (Keep it simple, stupid) হিসেবে। কেউবা এই সূত্রটির নির্যাসকে তুলে ধরেন এভাবে-

> 'যখন কোথাও ঘোড়ার ডাক শোন, তখন ঘোড়ার কথাই মাথায় রেখো, জেব্রা বা জিরাফের নয়'।

বিখ্যাত চিত্রকর ও বিজ্ঞানী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২ - ১৫১৯) ছিলেন অকহামের সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব। তিনিও তার মত করে একটি 'অক্কামের ক্ষুর' তৈরি করেছিলেন। তাঁর রচিত 'অক্কামের ক্ষুরটি' ছিল এ রকম-

> "Simplicity is the ultimate sophistication"

ড. অভিজিৎ রায়, আমেরিকায় বসবাসরত গবেষক এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' ও 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। সাম্প্রতিক সম্পাদিত গ্রন্থ - 'স্বতন্ত্র ভাবনা'। ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com

দ্বিতীয় অধ্যায় : পরিকল্পনা, ডিজাইন ও ঈশ্বর ১২০ *[ক্লিক করুন]*

- বিজ্ঞান কি ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছে? : *ভিক্টর স্টেঙ্গার (প্রদীপ দেব)* ১২১ *[ক্লিক করুন]*
- পরিকল্পিত মহাবিশ্ব? : *স্টিভেন ওয়েইনবার্গ (দিগন্ত সরকার)* ১২৮ *[ক্লিক করুন]*
- ঈশ্বরের অস্তিত্ব সৃষ্টির যুক্তি খন্ডন : *অপার্থিব* ১৩৭ *[ক্লিক করুন]*
- স্রষ্টা এবং ধর্ম যখন অসঙ্গতির : *সৈকত চৌধুরী* ১৪৩ *[ক্লিক করুন]*
- ব্যাড ডিজাইন : *অভিজিৎ রায়* ১৫১ *[ক্লিক করুন]*
- বাগানে গোপনে একজন মালী আসে অথবা আসে না: *শোহেইল মতাহির চৌধুরী* ১৬০*[ক্লিক করুন]*
- আমেরিকায় ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের নামে কি হচ্ছে? : *বন্যা আহমেদ ও অভিজিৎ রায়* ১৬২

বিজ্ঞান কি ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছে?

ভিক্টর স্টেঙ্গার

অনুবাদঃ প্রদীপ দেব

১৯৯২ সালে কস্‌মিক ব্যাকগ্রাউন্ড এক্সপ্লোরার (COBE)* স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলো যখন প্রথমবারের মত জনসমক্ষে প্রকাশিত হলো, এই মিশনের বিজ্ঞানী জর্জ স্মুট** মন্তব্য করলেন, "আপনি যদি ধার্মিক হয়ে থাকেন, এটা অনেকটা ঈশ্বরের মুখোমুখি হওয়ার মতো"। প্রচার মাধ্যমগুলো লুফে নিল এই মন্তব্য। একটা ট্যাবলয়েট পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় এ খবরের সাথে দেখা গেলো মহাবিশ্বের ঝাপসা আবহের মাঝে ভাসছে মধ্যযুগের শিল্পীদের আঁকা যীশুখ্রিস্টের মুখ।

১৯৯৮ সালে বার্কলের সেন্টার ফর থিওলজি এন্ড সায়েন্স-এ অনুষ্ঠিত "সায়েন্স এন্ড দি স্পিরিচুয়েল কোয়েস্ট" কনফারেন্সের রিপোর্ট প্রকাশ করতে গিয়ে নিউজউইক তাদের ২০ জুলাই সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে একেবারে ঘোষণাই দিয়ে দিল "বিজ্ঞান ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছে"।

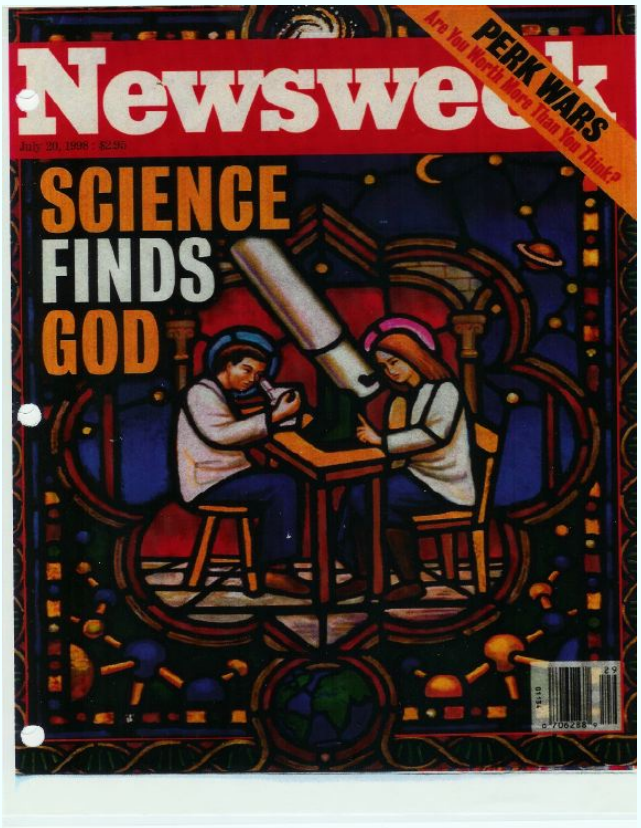

সেই কনফারেন্সে উপস্থিত কয়েক শ' বিজ্ঞানী ও থিওলজিয়ান আপাতদৃষ্টিতে সর্বসম্মতিক্রমে একমত হয়েছে যে বিজ্ঞান ও ধর্ম ক্রমশ একে অপরের সাথে মিলে যাচ্ছে। আর যে বিষয়ে বিজ্ঞান ও ধর্ম একে অপরের সাথে মিশে যাচ্ছে সে বিষয়টা হলো 'ঈশ্বর'। দক্ষিণ আফ্রিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও কোয়েকার (Quaker)*** জর্জ এলিস তাঁর বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করলেন এভাবে, "বিপুল পরিমাণ তথ্য ও উপাত্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সমর্থন করছে। এখন প্রশ্ন হলো আমরা কীভাবে এর মূল্যায়ন করবো"।

নিউজউইকের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, "আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমশ অগ্রগতির ফলে মনে হতে পারে যে ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের বিরোধ বাড়ছে এবং ধর্মের প্রতি মানুষের বিশ্বাস কমে যাচ্ছে"। কিন্তু যাই হোক, "ক্রমবর্ধমান সংখ্যক বিজ্ঞানী বলছেন, এসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত শক্ত করছে এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষেই ইঙ্গিত করছে"। প্রতিবেদনটি আরো জানাচ্ছে, "পদার্থবিজ্ঞানীরা এখন বুঝতে পারছেন যে মহাবিশ্ব একজন স্রষ্টার হাতেই বিশেষ ভাবে তৈরি হয়েছে প্রাণ ও চেতনার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে"। এ প্রতিবেদনে বিগ ব্যাং জ্যোতির্বিদ্যা, কোয়ান্টাম মেকানিক্স, ক্যায়োস থিওরি সব কিছুকেই বলা হচ্ছে "ঈশ্বরের এক একটি প্রবেশ পথ - যা দিয়ে ঢুকে ঈশ্বর এ পৃথিবীতে কাজ করেন"।

কিন্তু প্রতিবেদনে যতই বলা হোক "ক্রমবর্ধমান সংখ্যক" বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের সপক্ষে প্রমাণ খুঁজে পাচ্ছেন, কোন জরিপে কিন্তু সেরকম দেখা যাচ্ছে না। আমেরিকার ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্স এর সদস্যদের ওপর চালানো সাম্প্রতিক একটি জরিপে দেখা যাচ্ছে মাত্র ৭% সদস্য ব্যক্তিগত সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করেন। ১৯৩৩ সালে এ বিশ্বাসের হার ছিল ১৫% এবং ১৯১৪ সালে এ হার ছিল ২৯%। আর যাই হোক, বেশির ভাগ বিজ্ঞানী ধর্মীয় বিশ্বাসের দিকে ঝোঁকার চেয়ে ধর্ম-বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন এটাই সত্য।

দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানীদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে আমরা যা শুনছি তা বেশির ভাগ বিজ্ঞানীর কথা নয়, তা আসলে বিশেষ একটা গোষ্ঠীর অর্থপুষ্ট একটা ক্ষয়িষ্ণু সম্প্রদায়ের গলাবাজি। বার্কলেতে যে সম্মেলন হয়েছে তা একধরণের সংরক্ষণবাদী সম্মেলন যেখানে কিছু শিক্ষাবিদ তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা টিকিয়ে রাখতে চাচ্ছেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে। অন্যদিকে বিজ্ঞানীদের স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম চালিয়ে যাবার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করার কোন দরকারই হচ্ছে না।

সীমানা পেরোনোর চেষ্টা

বার্কলে মিটিং সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে নিউইয়র্ক টাইম্স এর বিজ্ঞান লেখক জর্জ জনসন বলেছেন, "মনে হচ্ছে সাম্প্রতিক কালে ধর্মবিশ্বাসীরা তাদের সীমা অতিক্রম করতে চাইছে অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি। তারা বৈজ্ঞানিক তথ্য ও উপাত্তকে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করতে চাইছে যেন তা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাসকে সমর্থন করে"।

ধর্মবিশ্বাসীদের বেশির ভাগের কাছেই ঈশ্বর বিহীন বিশ্বে জীবন ধারণ অর্থহীন। খুবই আন্তরিকতার সাথে তারা মনে করেন জীবন ধারণের জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন এবং তাই তারা ঈশ্বর বিহীন মহাবিশ্বের সম্ভাবনার ধারণা

বাতিল করে দেন। সে কারণে তাদের কাছে শুধুমাত্র কারো হাতে তৈরি মহাবিশ্বই সত্য। এবং তাই তারা মনে করেন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও উপাত্ত গুলোকে তাদের "সত্য"কেই সমর্থন করতে হবে, এর অন্যথা হওয়া চলবে না।

যাই হোক, আদর্শ বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের প্রধান শর্তই হচ্ছে যে সব কিছু নিয়েই প্রশ্ন করা যাবে। তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করার সময় যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, সে সব পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন তোলা যাবে। যে কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই কিছু না কিছু পূর্বধারণা বর্তমান থাকে। কিন্তু এই ধারণা গুলো সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়। যখন আরো শক্তিশালী ও সঠিক ধারণা পাওয়া যায় তখন পূর্বধারণা গুলো বদলে যায়। কিন্তু সংরক্ষণবাদীরা, তাদের বিশ্বাসে অনড় থেকে আদর্শ বিজ্ঞান চর্চার মূল বিষয়কে এড়িয়ে গিয়ে যখন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও উপাত্তকে ডিজাইনার ইউনিভার্স বা পরিকল্পিত মহাবিশ্বের ধারণার মধ্যেই চেপে রাখতে চাইছেন, তারা আসলে বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞানের চর্চা করছেন।

ধর্মবিশ্বাসীদের মতে বিগ ব্যাং তত্ত্ব "প্রমাণ" দিচ্ছে যে মহাবিশ্ব একটি নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক এরকম কথাই লেখা আছে বাইবেলের (ব্যাবিলনীয়) পাতায়। একদম শূন্য থেকে কোন কিছু সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং মহাবিশ্বেরও একজন সৃষ্টিকর্তা দরকার। কিন্তু এই সৃষ্টিকর্তাকে আসতে হচ্ছে একেবারে শূন্য থেকে। কারণ মহাবিশ্ব যে ধরণের "লজিক" মেনে চলে ঈশ্বর তার চেয়ে ভিন্ন ধরণের "লজিক" মেনে চলেন। এই বিশেষ ধরণের লজিকে ঈশ্বরের স্রষ্টা লাগে না। অবশ্য ঈশ্বরের জন্য স্রষ্টার দরকার কেন নেই, বা মহাবিশ্বও কেন ঈশ্বরের মত শূন্য থেকে সৃষ্ট হতে পারবে না সে সম্পর্কে থিওলজিয়ানরা পরিষ্কার করে কখনোই কিছু বলেন না।

ধর্ম-বিশ্বাসী সংরক্ষণবাদীরা বুঝতে পেরেছেন যে তাঁরা কিছুতেই প্রমাণ করতে পারবেন না যে ঈশ্বর আছেন। তাঁরা শুধু এটুকুই গভীর ভাবে বিশ্বাস করে থাকেন যে মহাবিশ্বের এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়মের সমন্বয় শুধুমাত্র ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইনের পক্ষেই রায় দেয়। কিন্তু তাদের জন্য দুঃখজনক হলেও সত্য যে বিজ্ঞান কোন ধরণের গভীর বিশ্বাসের প্রতিই কোন সহমর্মিতা দেখায় না, তা সে বিশ্বাস যতই আন্তরিক হোক না কেন। মহাবিশ্ব নিজের নিয়মেই চলছে চলবে। কে কী ভাবছে বা কী বিশ্বাস করছে তাতে মহাবিশ্বের কিছুই যায় আসে না। আমাদের টেলিস্কোপগুলো দিনের পর দিন একটা সত্যই প্রতিষ্ঠা করে চলেছে যে, পৃথিবী হলো বিশাল সাহারা মরুভূমির বুকে এক কণা বালির মত। এর বাইরে আর কিছু আমরা ভাবার ক্ষমতাও মানুষের নেই। আমাদের এই সত্য মেনে নেয়া উচিত এবং সেটা মেনে চলার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

অবিশ্বাসীরা বুঝতে পেরেছেন যে তারা ঈশ্বর যে নেই তা প্রমাণ করতে পারবেন না। তাঁরা শুধু এটুকুই বলতে পারেন যে ঈশ্বর বিহীন মহাবিশ্বের ধারণাই হলো সবচেয়ে সুবিধাজনক ও গ্রহণযোগ্য। সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য ও উপাত্ত এই ধারণার পক্ষেই রায় দেয়। কোন কারণ ছাড়াই বা কোন ধরণের পরিকল্পনা ছাড়াই হঠাৎ একেবারে শূন্য থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে এ ধারণা মেনে নিলে পদার্থবিদ্যার একটি সূত্রকেও অমান্য করা হয় না। মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ হিসেব করলে দাঁড়ায় শূন্য। সুতরাং "শূন্য" থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হতে গেলে অন্য কোন অলৌকিক শক্তির ভেলকিবাজির দরকার হয় না। অনুরূপ ভাবে মহাবিশ্বের নিয়মগুলো

তৈরি হবার জন্যেও কোন ধরণের অলৌকিকতার দরকার হয় নি। বস্তু জগতে স্বতস্ফূর্ত নিয়ম খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।

জীবন সুরে বাঁধা

সাম্প্রতিক বছর গুলোতে একটা ব্যাপার খুব মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। মনে করা হচ্ছে যে প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশের লক্ষ্যে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোকে "সূক্ষ্ম সুরে" (Fine Tuning) বেঁধে দিয়েছে কেউ। ধর্মবিশ্বাসীদের পাশাপাশি অনেক বিজ্ঞানীও এই ধারণায় বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। আসলে বিজ্ঞান ও ধর্ম বিষয়ে সম্প্রতি যত আলোচনা হচ্ছে তার মধ্যে এই সূক্ষ্ম সমন্বয়ের-এর প্রতি যতটা মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে সেরকম আর কোন কিছুর প্রতি হয়নি।

"সূক্ষ্ম সুর"ই বলুন কিংবা "সূক্ষ্ম সমন্বয়"ই বলুন - এ ধরনের প্রশ্নে যুক্তি তর্ক শুরু হয়েছে মূলত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সত্যের ভিত্তিতে, যেগুলোকে বলা হচ্ছে নৃকেন্দ্রিক সমাপতন বা "এনথ্রপিক কোইন্সিডেন্স"। আসলে তারা বলতে চায় যে মহাবিশ্ব এখন যেভাবে আছে, এর মৌলিক ধ্রুবক গুলির মান খুব সামান্য একটু এদিক ওদিক হলেই মহাবিশ্বে জীবন সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান, যেমন কার্বন, অক্সিজেন ইত্যাদির উৎপত্তি হতো না। প্রাণের উৎপত্তির পরিবেশই তখন সৃষ্টি হতে পারতো না।

"সূক্ষ্ম সমন্বয়"-এর ধ্বজাধারীরা মনে করেন যে শুধুমাত্র এক ধরণের প্রাণের বিকাশই সম্ভব। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম ও ধ্রুবক মেনে নিয়ে প্রচলিত প্রাণসত্ত্বার চেয়ে ভিন্ন ধরণের প্রাণের বিকাশও সম্ভব। যে ব্যাপারটা সবচেয়ে জরুরি তা হলো নক্ষত্রগুলোর পর্যাপ্ত সময় ধরে টিকে থাকা - যাতে প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলগুলো উৎপন্ন হতে পারে। এবং প্রাণের মত জটিল একটি নন-লিনিয়ার সিস্টেমের উদ্ভব ঘটতে পারে। আমি নিজে পদার্থবিজ্ঞানের অনেকগুলো ধ্রুবকের মান ইচ্ছামতো বহুগুণ বদলে দিয়ে সেই নতুন ধ্রুবক গুলো ব্যবহার করে একটি নতুন মহাবিশ্ব তৈরি করা সম্ভব কিনা দেখেছি। হিসেব কষে দেখেছি মহাবিশ্বের অবস্থা তখন কেমন হয়। প্রায় সব ধরণের ধ্রুবক বদলে দিয়েও মহাবিশ্ব গড়া সম্ভব, এবং তখনকার নক্ষত্রগুলোর আয়ু দেখা গেছে একশ কোটি বছরেরও বেশি। এ ধরণের সম্ভাব্য সব মহাবিশ্বেই প্রাণের উৎপত্তি সম্ভব।

সমীকরণের ঈশ্বর

সাম্প্রতিক সংলাপগুলোতে আরো এক ধরণের যুক্তির অবতারণা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের সমীকরণগুলো থেকে প্লেটোনিক মহাবিশ্বের আলামত পাওয়া যাচ্ছে, যে মহাবিশ্ব আমাদের পরিচিত মহাবিশ্বের চেয়ে আরো উন্নত।

খ্রিস্টান ধর্মতাত্ত্বিকদের সাম্প্রতিক চালচলন ও বিজ্ঞানের প্রতি তাদের একটা সমঝোতার মনোভাবের কারণে খ্রিস্টান ধর্ম এখন এমন একটি অবস্থানে চলে এসেছে যেখানে প্রাকৃতিক নিয়মের মাঝখান থেকেই ঈশ্বর খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে। অবশ্য এই ঈশ্বর খুঁজতে গিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মগুলো যে স্থান, কাল এবং বস্তুর

ধর্মের উপর নির্ভরশীল তা তারা মনেই রাখছেন না। আসলে, ঈশ্বরের ব্যাপারে আধুনিক কালের পশ্চিমা ধাচের থিওলজিক্যাল মনোভাব সিস্টিন চ্যাপেলের সিলিং-এ আঁকা সাদা দাড়িওয়ালা জিওভা/জিউস বা দেয়ালে আঁকা দাড়িছাড়া জেসাস/এপোলোর চেয়ে সম্ভবত প্লেটোনিক ধাঁচের ঈশ্বরের বেশি কাছাকাছি।

কিছু কিছু বিজ্ঞানী ও ধর্মতাত্ত্বিক সাম্প্রতিক কালে যে ব্যাপারে একমত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে তা হলো কোয়ার্ক, পরমাণু, পাথর, গাছপালা, গ্রহ-উপগ্রহ বা নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করে অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে পরম বাস্তবতার ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। আসলে পরম বাস্তবতা নিহিত আছে গাণিতিক বিশুদ্ধতা এবং পদার্থবিজ্ঞানের সমীকরণের মধ্যে। পরম ঈশ্বর তখন এসব সমীকরণ ও গাণিতিক বিশুদ্ধতার মধ্যে সহাবস্থান করেন যা সাধারণ মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। ঈশ্বরকে জানা সম্ভব আমাদের সামনে তাঁর শারীরিক উপস্থিতি দ্বারা নয়, বরং প্লেটোনিক বাস্তবতার মধ্য দিয়ে তাঁর উপস্থিতির মধ্য দিয়ে। আমাদের অস্তিত্ব আসলে "ঈশ্বরের মন"-এ।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে অতীতের যৌক্তিক মতপার্থক্যগুলোর বেশির ভাগই দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এসব তর্কবিতর্কে শুধুমাত্র যুক্তির খাতিরে যুক্তির ব্যবহার করা হয়, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার ওপর খুব একটা জোর দেয়া হয় না। তাই এসব তর্ক বিতর্কে বিজ্ঞানীরা মোটেও মনযোগ দেন নি, তা সে বিজ্ঞানী ঈশ্বরে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী যাই হোন না কেন। এখন সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীরা দাবী করছেন যে তাঁরা গতানুগতিক ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তি দেখাচ্ছেন না আর, বরং তাঁদের পর্যবেক্ষণ ও সমীকরণগুলোতে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাচ্ছেন।

পল ডেভিস যেমন বলেছেন, "আসল কথা হলো, এই যে মহাবিশ্ব সৃষ্টিশীল, এই যে বিশ্বের নিয়মনীতিগুলো এমন সব জটিল জটিল কাঠামো তৈরি করার জন্য উপযুক্ত, এসব থেকে একটা বিষয় মনে আসে এবং ক্রমশ তা একটি বোধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে - অন্য ভাবে বলা যায়, এই যে মহাবিশ্ব নিজের ভেতর একটা নিজস্ব সতর্কতার ব্যবস্থা করে নিয়েছে - এটাই আমার কাছে শক্তিশালী আলামত যে 'একটা কিছু আছে' এই সব কিছুর পেছনে। এই যে পরিকল্পনা বা ডিজাইন করে দেয়ার ধারণা - এটা আসলেই খুব গুরুত্বপূর্ণ"। খেয়াল করা দরকার যে পল ডেভিসের উক্তিতে "প্রমাণ (proof)" এর বদলে "আলামত (evidence)" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

তবুও, প্লেটোনিক ঈশ্বরের সাথে বাইবেলের ঈশ্বর বা অন্য কোন কাল্পনিক বা ব্যক্তিগত ঈশ্বরের কোন মিল নেই। এবং সমীকরণগুলোকে কোন ধরণের দেবতার প্রতিনিধিত্ব করতে হয় না। এটা সত্য যে প্লেটোনিক পদার্থবিজ্ঞানীরা কোয়ান্টাম ফিল্ড ও 'স্পেস-টাইম মেট্রিক টেনসর' কোয়ার্ক ও ইলেকট্রনের চেয়ে "বেশি বাস্তব" মনে করে। বিপরীতক্রমে বস্তুগত পদার্থবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে কোয়ার্ক ও ইলেকট্রন মেট্রিক টেনসর বা অন্য কোন ফিল্ডের চেয়ে বেশি বাস্তব। কারণ এগুলো মানুষের তৈরি। কিন্তু প্লেটোনিক বা বাস্তবিক দু'শিবিরেরই বেশির ভাগ বিজ্ঞানী দু'ধরণের সম্ভাবনার কোনটিকেই দেবতা মনে করছেন না। তাদের কোন পক্ষই মনে করেন না যে মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও প্রাণের উদ্ভবের জন্য একটি "অলৌকিক ভেলকিবাজী"র দরকার আছে।

গোঁজামিলের ঈশ্বর

গোঁজামিল দেয়ার জন্য এখনো ঈশ্বরের খোঁজ পড়ে। এতেই বোঝা যায় যে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সমঝোতা তৈরি হচ্ছে বলে যে দাবী করা হচ্ছে তা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ইতিহাসের দিকে তাকান। বিজ্ঞান সব সময় তার পর্যবেক্ষণ গুলো ব্যাখ্যা করেছে লৌকিক বা প্রাকৃতিক (অলৌকিক বা অপ্রাকৃত নয়) ধারণা বা মতবাদের মাধ্যমে। কিন্তু বিজ্ঞান যেখানে কোন ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারেনি বা চুপ করে থেকেছে ধর্ম সবসময়েই সেখানে অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা এনে হাজির করেছে গোঁজামিল দিয়ে ব্যাখ্যাবিহীন ফাঁকগুলো পূরণ করার জন্য। যে কোন ক্ষেত্রেই একটা ব্যাখ্যাই টিকে থেকেছে - তা হলো মানুষের পর্যবেক্ষণ।

প্রাচীন যুগের অরণ্যবাসী সাধুরা মনে করতেন যে পাহাড়ের চূড়া থেকে পাথর গড়িয়ে নিচে পড়ে যাবার কারণ হলো জ্বিন-পরীর কাজ। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ বলের ব্যাখ্যা আসার আগ পর্যন্ত এরকমই চলছিল। পুরোহিতরা মনে করতেন যে "ঈশ্বর" মানুষকে তাঁর নিজের আদলেই তৈরি করেছেন। কিন্তু ডারউইন এসে যখন বললেন যে মানুষ আসলে বিবর্তিত হয়েছে বানর প্রজাতির অনুরূপ থেকে তখন সব বদলে গেলো। এখন নতুন প্রজন্মের "ধার্মিক-বিজ্ঞানী" (সায়েন্টিস্ট-থিওলজিয়ান) এসে আবার তর্ক শুরু করেছে এই কারণে যে বিজ্ঞান এ ধারণার পুরোপুরি ব্যাখ্যা দিতে পারছে না এখনো। এবং তাই তারা বলতে পারছে যে, এখনো আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের জন্য জায়গা রয়ে গেছে। আমরা ব্যাখ্যা করে বলতে পারছি না যে কেন প্রকৃতির অনেক গুলো ধ্রুবকের মান এমন। তখন মনে হতে পারে যে ঈশ্বরই এমন ভাবে তৈরি করেছেন। আমরা "গণিতের অযৌক্তিক কার্যকারিতা" ব্যাখ্যা করতে পারছি না, তাই মনে হচ্ছে হয়তো ঈশ্বরই গণিত সৃষ্টি করেছেন।

হয়তো বা। কিন্তু এই আধুনিক গোঁজামিলের ঈশ্বর কি অরণ্যবাসী ফকির বা পুরোহিতদের ঈশ্বরের চেয়ে বেশি যৌক্তিক? বিজ্ঞান হয়তো একদিন এই ফাঁকগুলো পূরণ করে দেবে, এবং তা করবে ঈশ্বরকে ব্যবহার না করেই।

অনুবাদকের সংযোজনঃ

* Cosmic Background Explorer (COBE) স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন করা হয়েছিল ১৯৮৯ সালের ১৮ নভেম্বর। নাসার (NASA) গোডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টারে এই বিশেষ স্যাটেলাইটটি তৈরি করা হয়েছিল মহাবিশ্বের উৎপত্তির প্রথম দিকের সময়কার ইনফ্রারেড ও মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশান সনাক্ত করার উদ্দেশ্যে।

** ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার অধ্যাপক ডক্টর জর্জ এফ স্মুট ও নাসার সিনিয়র প্রজেক্ট সায়েন্টিস্ট ডক্টর জন ম্যাথের ২০০৬ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন কস্‌মিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশান সংক্রান্ত গবেষণার জন্য।

*** কোয়েকাররা শান্তিবাদী খ্রিস্টান ধর্মীয় সংগঠনের সদস্য যারা কোন প্রকার আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় আচার আচরণে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। তারা মনে করেন শান্তি রক্ষায় ধর্মের ভূমিকা অসীম।

ড. ভিক্টর স্টেঙ্গর, হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা বিভাগের এমিরিটাস অধ্যাপক, এবং কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সংযুক্ত অধ্যাপক। তিনি 'কলোরাডো সিটিজেন অব সায়েন্সের' প্রতিষ্ঠাতা এবং মুক্তমনার একজন সম্মানিত সদস্য। তিনি Not By Design: The Origin of the Universe, Physics and Psychics: The Search for a World Beyond the Senses, The Unconscious Quantum: Metaphysics in Modern Physics and Cosmology, Timeless Reality:Symmetry, Simplicity and Multiple Universes, Has ScienceFound God? : The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe. সহ অসংখ্য বইয়ের প্রণেতা। তার সাম্প্রতিক বই God: The Failed Hypothesis—How Science Shows That God Does Not Exist নিউইয়র্ক টাইম বেস্ট সেলার।

ড. প্রদীপ দেব অস্ট্রেলিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত। ইমেইল - Pradip.Deb@utas.edu.au. প্রকাশিত বইঃ অস্ট্রেলিয়ার পথে পথে (২০০৫), আলবুকারকি থেকে হলিউড (২০০৬), আইনস্টাইনের কাল (২০০৬)। তার এ লেখাটি অধ্যাপক ভিক্টর স্টেঙ্গরের 'হ্যাজ সায়েন্স ফাউন্ড গড?' প্রবন্ধের অনুবাদ।

পরিকল্পিত মহাবিশ্ব?

স্টিভেন ওয়েইনবার্গ

অনুবাদ : দিগন্ত সরকার

এই মহাবিশ্ব কি কারো পরিকল্পনা কিংবা হাতের নকশায় তৈরী বলে আমার মনে হয় কিনা – এ নিয়ে আমায় কিছু লিখতে বলা হয়েছে। কিন্তু নকশাকারী সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা না থাকলে এ নিয়ে কি ভাবে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা সম্ভব? যে কোনো মহাবিশ্বই সাদা চোখে কারো না কারো নকশা কিংবা পরিকল্পনায় তৈরী বলে মনে করা যেতে পারে। যদি সেই মহাবিশ্বে কোনো সূত্র না খাটে আর সেটা একেবারে বিক্ষিপ্ত আর এলোমেলো হয় – তাহলে সেটা হবে হয়ত কোনো মূর্খের তৈরী মহাবিশ্ব।

বরং যেটা নিয়ে কিছু আলোচনা চলতে পারে, সেটা হল আমাদের মহাবিশ্ব কি আমাদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে যেমন ভাবে বর্ণিত হয়েছে - সেরকম কোন ঈশ্বরের বা শক্তিমান কোনো ব্যক্তির সৃষ্টি? প্রশ্নটা আমাদের বুদ্ধির অগম্য নয় বলেই আমি মনে করি। আমাদের এই মহাপরিকল্পনাকারী পোপের বাসস্থান সিস্টাইন চ্যাপেলের ছাদের খোদাই করা ভাস্কর্যের মত না হলেও এক ধরনের ব্যক্তিত্বময়, বুদ্ধিদীপ্ত এবং সৃষ্ট জীবনের প্রতি, বিশেষত মানব জীবনের প্রতি করুণাময় হবেন বলে ভাবা যেতে পারে। আমি মনে করি আপনাদের অনেকেই এখানে নিখিল বিশ্বের এরকমের একজন নকশাকারীর চিরন্তন প্রতিমূর্তিতে আস্থাশীল নন। আপনার মানসপটে হয়ত রয়েছে আরো বিমূর্ত কিছু - প্রকৃতির সুষম এবং সামঞ্জস্যময় নিয়মের মধ্যে ব্যপ্ত এক মহাজাগতিক বিমূর্ত সত্ত্বা - অনেকেটা আইনস্টাইন যেমন কল্পণা করেছিলেন। আপনি অবশ্যই আপনার চিন্তার লাটাইকে এরকম অসীম নীলিমায় নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু সেরকম বিমূর্ত একটি ধারণাকে কেন "নকশাকারী' কিংবা 'ঈশ্বর' হিসেবে অভিহিত করতে হবে, তা আমার সত্যই বোধগম্য নয়।

যে কোনো জীবের কিছু অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখে মনে হয় এই সৃষ্টিকর্তা জীবনের ব্যাপারে বেশীই উৎসাহী। আগুন, বৃষ্টি বা ভূমিকম্পও কি সেই ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে? আজকের জগতে আমরা এসব প্রাকৃতিক শক্তির মূলে যে সূত্রগুলো কাজ করে তার অনেকটাই জেনে ফেলেছি। তাও, আরো পরম কিছু সূত্র আর আমাদের জানা সূত্রগুলোর ক্রিয়াকলাপের নিখুঁত পরিমাপ করে ভবিষ্যতবাণী করাও আমাদের পক্ষে এখনও সম্ভব নয়। আমরা জানি বৃষ্টি কি ভাবে হয়, কোন কোন প্রাকৃতিক শক্তি একে নিয়ন্ত্রণ করে – কিন্তু আজ থেকে ঠিক এক মাস পরে বৃষ্টি পড়বে কি না, সেটা আমরা সঠিক ভাবে বলতে পারি না। মানুষের মনও এরকমই কিছু দুর্বোধ্য সূত্রে চলে, যা আমরা কিছু কিছু জানি – কিন্তু সামগ্রিক ভাবে ভবিষ্যতবাণী করার মত অবস্থায় আসি নি।

এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা একটা বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত যে মূল প্রাকৃতিক সূত্রাবলীর কোনো ব্যতিক্রম হয় না – অন্যভাবে বললে, অলৌকিক কিছু ঘটে না। যা ঘটে তাকে কোনো না কোনো প্রাকৃতিক সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব – আজকে সে সূত্র না জানা থাকলে কালকে তা আবিষ্কৃত হবেই। সেখানে অধিকাংশ ধর্মই দাঁড়িয়ে আছে এই ধরণের কিছু অলৌকিকতার ওপর – যেমন মৃত যীশুর বেঁচে ওঠা বা কোনো

এক দেবদূতের মহম্মদের কাছে এসে উপদেশ পড়ে শোনানো – এ সবই বাস্তব বা লৌকিকতার ঊর্ধ্বে। এই সব অলৌকিক গল্পকথারা বিজ্ঞানের চোখে রূপকথার পরীর গল্পের মতই শোনায় – আর আমরা আজকের দিনে রূপকথায় বিশ্বাস রাখি না। আমরা এমন কি বুঝে গেছি যে মনুষ্যজাতি হাজার হাজার বছরের ক্রমবিবর্তনের ফসল – প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একটু একটু করে পরিবর্তিত হতে হতে এই অবস্থায় এসেছে।

এই অবস্থায় আমি পরম কিছু সূত্র ছাড়া আর কোথাও তো কোনো সৃষ্টিকর্তার নকশা থাকার সম্ভাবনা দেখতে পাই না – বাকি সবই তো প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরী। এই পরম সূত্রগুলোকে বলা যেতে পারে শেষ ও পরম সত্য – যার ওপর ভিত্তি করে সমগ্র প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক শক্তিগুলো পরিচালিত হয়। আমরা সেই সূত্রগুলো এখনো সঠিকভাবে জানি না বটে, কিন্তু এটুকু অনুধাবন করার মত জায়গায় পৌঁছেছি যে এর মধ্যে জীবন বা জীবের কোনো বিশেষ ভূমিকা নেই। রিচার্ড ফেইনম্যান বলেই গেছেন –

"এই সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মান্ড দেখে ও তার সূত্রগুলো বুঝে ওঠার পরে এটা মেনে নেওয়া খুবই শক্ত যে ঈশ্বর মহাবিশ্ব সৃষ্টিই করেছেন মানুষের ভাল-মন্দ বিচারের জন্য।"

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, কোয়ান্টাম মেকানিক্স যখন প্রথম বিজ্ঞানীমহলে আলোচিত হত, তখন অনেকেই মনে করেছিলেন যে এরই মাধ্যমে প্রাকৃতিক সূত্রে আবার মানুষের স্থান ফিরে এল – কারণ, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সূত্রগুলো অনেকটাই পর্যবেক্ষক নির্ভর। কিন্তু গত চল্লিশ বছরে হাফ এভারেট (Hugh Everett) থেকে শুরু করে তার পরবর্তী বিজ্ঞানীদের অনেকেই কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে আবার অন্য এক মাত্রা দান করেছেন – এখন তাই আর বিজ্ঞানীরা মানুষ-পর্যবেক্ষকের ধারণা নিয়ে কাজ করেন না, তারা পর্যবেক্ষককে আর দশটা প্রাকৃতিক বস্তুর মতই মনে করেন।

এটা পদার্থবিদ হিসাবে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে পরম-সূত্রে পৌঁছবার পরেও পদার্থবিদেরা মহাবিশ্বের সমস্ত কার্যকলাপের সঠিক ব্যাখ্যায় পৌঁছতে পারবেন না। কারণ তখন একটা নতুন প্রশ্ন উঠে আসবে বারবার – "কেন এই সূত্রই সব ব্যাখ্যা দিতে পারে – অন্য কোনো সূত্র যা পারে না?" কোয়ান্টাম মেকানিক্সের কথাই ধরা যাতে পারে কারণ এর সূত্রগুলো এখন মোটামুটি পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান দিয়ে প্রতিষ্ঠিত। খুব সম্ভবত এগুলোও পরম সূত্রেরই অংশ হিসাবে স্থান করে নেবে। কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্সে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রগুলোর মত কোনো নিশ্চিত ভবিতব্য বলে কিছু নেই – সব ফলাফলেরই কম হোক, বেশি হোক- কিছু না কিছু সম্ভাবনা থেকে যায়। সুতরাং বিজ্ঞানে কিছুটা রহস্যময়তা সব সময়ই হয়তো থেকেই যাবে – যাকে আরো নিখুঁত ভাবে ভবিতব্য আকারে প্রকাশ করাই সম্ভব হবে না। কিছু 'কেন' পরম সূত্র আবিষ্কারের পরও অজানা রয়ে যাবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখলে ধর্মভিত্তিক সব ব্যাখ্যারও একই সমস্যা। একটা মাত্রার পরে আর 'কেন'-র উত্তর মেলে না। যদি ঈশ্বরকে কোনোভাবে নির্দিষ্ট না করা যায় তার আচরণ দিয়ে তবে সেই ব্যাখ্যার তো কোনো মানেই দাঁড়ায় না – সেখানেও প্রশ্ন আসে কেন ঈশ্বরের আচরণ নির্দিষ্ট নয়? আর যদি মনে করা হয় ঈশ্বর মানুষকে ভালবাসেন, বা ঈর্ষাপরায়ণ বা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন – সেখানেও সেই একই প্রশ্ন ঘুরেফিরে আসে – কেন? ধর্মে বলা থাকতে পারে মহাবিশ্ব ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সেই ঈশ্বর মানুষকে ভালবাসেন, কিন্তু কোনোভাবেই জবাব দিতে পারে না যে কেন এমন ঘটে।

এই আলোচনা থেকে আমার মনে হয়েছে যে বিজ্ঞান এই সব 'কেন'র উত্তর কিছুটা হলেও দিতে পারে, ধর্ম তা-ও পারে না। বিজ্ঞানের সূত্রগুলো হয়ত বলতে পারে না যে কেন এগুলো একেবারে সম্পূর্ণ আলদা কেন হল না – কিন্তু সামান্য কিছুটা আলাদা কেন নয় তা সহজ অঙ্কের মাধ্যমেই বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব। যেমন কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে সামান্য কিছু পরিবর্তিত রূপে বিশ্লেষণ করলে কিংবা আপেক্ষিকতার সাথে সমন্বিত করতে চাইলে সমীকরণগুলো অবাস্তব, অসীম বা ঋণাত্বক সম্ভাবনার ফলাফল দেয়। একদম ঠিকঠাক ভাবে না সাজালে এই সূত্রগুলো কিছু অবাস্তব ভবিষ্যতবাণী করতে থাকে। অন্যদিকে ধর্মীয় ব্যাখ্যা সর্বদাই পরিবর্তনক্ষম – যুগে যুগে কতবার যে এদের ব্যাখ্যা পরিবর্তিত হয়েছে তার শেষ নেই – ভবিষ্যতেও হবে। ধর্মীয় ব্যাখ্যা অনুসারে কালকেই হয়ত পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরা বন্ধ করে দিতে পারে কোনো অদৃশ্য ঈশ্বরের ইচ্ছায় – বিজ্ঞানের তত্ত্ব মেনে তা পারে না।

অনেক পদার্থবিদের দাবীমতে আমাদের মহাবিশ্বের মহাজাগতিক ধ্রুবকগুলোর মান রহস্যময়ভাবে ঠিক এমনই (সূক্ষ-সমন্বয়), যাতে আমাদের মহাবিশ্বে প্রাণের সঞ্চার হওয়া সম্ভব। তাদের দেখলে মনে হয় যে যেন কোনো পরিকল্পনাকারী মানগুলো এমন ভাবেই সাজিয়েছেন যাতে পরবর্তীতে তিনি প্রাণের সঞ্চার করতে পারেন। আমি এই সূক্ষ-সমন্বয় তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। কার্বন নিউক্লিয়াসের বহুল প্রচারিত উদাহরণই বেঁছে নেই। বিশ্বসৃষ্টির প্রথম কয়েক মিনিটে সৃষ্ট মৌলগুলো ছিল হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম। এর মধ্যে কার্বন, নাইট্রোজেন বা অক্সিজেনের তখনো কোনো নামগন্ধই ছিল না। এই জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ভারী মৌলগুলো তৈরী হয়েছে প্রথম যুগের কিছু নক্ষত্রের মধ্যে, আর তারপরে তারার বিস্ফোরণের পরে ছড়িয়ে গেছে মহাবিশ্বে। এরকমই কিছু মৌল-সমৃদ্ধ অংশেই পরে সৌরজগত গঠিত হয়েছে।

এই হালকা মৌল থেকে ভারী মৌল তৈরী হবার প্রথম ধাপ হল তিনটি হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস মিলে একটা কার্বন পরমাণুর নিউক্লিয়াস গঠন। কিন্তু তিনটে হিলিয়াম পরমাণুকে জোড়া দেওয়া তো সহজ কাজ নয়। নক্ষত্রের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে তেজস্ক্রিয় কার্বন সংশ্লেষ হতে গেলে তার শক্তি মাত্রা হতে হবে তিনটে হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের শক্তি মাত্রার সমান - সাধারণের তুলনায় ৭ থেকে ৭.৭ মিলিয়ন ইলেক্ট্রিক-ভোল্ট (MeV)এর মধ্যে। একবার তেজস্ক্রিয় কার্বন গঠন হয়ে গেলে সেখান থেকে সহজেই তা তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাধ্যমে সাধারণ কার্বনে পরিণত হতে পারবে - যা আমাদের পৃথিবীতে আমরা পাই। কিন্তু সবই নির্ভর করে ওই তিনটে হিলিয়াম থেকে একটা তেজস্ক্রিয় কার্বন নিউক্লিয়াস গঠনের ওপর।

কার্বন নিউক্লিয়াস এমনই একটি তেজস্ক্রিয় অবস্থা আছে যাতে সে সাধারণের তুলনায় ৭.৬৫ MeV এনার্জি লেভেল-এ থাকে। এই মান মাত্র আরো এক শতাংশ (৭.৭০ - ৭.৬৫ = ০.০৫) বেশী হলে কিন্তু তারায় আর কার্বন সংশ্লেষ হত না। ঝট করে দেখলে মনে হবে যেন এই মান কার্বন পরমাণু তৈরী হবার জন্যই সাজানো। কিন্তু আরো গভীরে গেলে বোঝা যায় ব্যাপারটা মোটেও এমনকিছু সাজানো নয়। আমাদের দেখতে হবে ঠিক কেন সাধারণের তুলনায় ৭.৭ MeV উচ্চ এনার্জি লেভেল দরকার হয় তারায় কার্বন সংশ্লেষের জন্য। কারণ, দুটো ধাপে তেজস্ক্রিয় কার্বন সংশ্লেষ হয়। প্রথথম ধাপে, দুটো হিলিয়াম নিউক্লিয়াস একজোট হয়ে গঠন করে বেরিলিয়াম ৮ বলে একধরণের আইসোটোপ, যা পরের ধাপে আরেকটি হিলিয়াম পরমাণুকেও সাথে নিয়ে তেজস্ক্রিয় কার্বন গঠন করে। তাহলে এখন আমরা কার্বনকে আর তিনটি হিলিয়ামের সংযুক্তি না ভেবে একটি বেরিলিয়াম আর একটি হিলিয়ামের সংযুক্তির ফলে প্রস্তুত হয়েছে বলে মনে করতে পারি। সাধারণ অবস্থায়, একটি বেরিলিয়াম আর একটি হিলিয়ামের মিলিত এনার্জি লেভেল ৭.৪ MeV। তাহলে, আসল ফ্যাক্টর হল এই

অতিরিক্ত ০.৩ MeV শক্তি, যা নক্ষত্রের মত তাপমাত্রায় পাওয়া দুষ্কর। তাহলে আসল ফ্যাক্টর দাঁড়ায় এই ০.২৫ MeV অতিরিক্ত (৭.৬৫-৭.৪০=০.২৫) শক্তি, যা কিনা আরো ০.০৫ MeV বেশী হলেই তারায় কার্বন সংশ্লেষ দুরূহ হয়ে যেত। তাহলে ফ্যাক্টর হল এক শতাংশ নয়, প্রায় কুড়ি (০.০৫/০.২৫ = ২০%) শতাংশ - যা মোটেও মুখের কথা নয়। তাই কার্বন সংশ্লেষ নিয়ে সাজানো মানের দাবী বিতর্কিত।

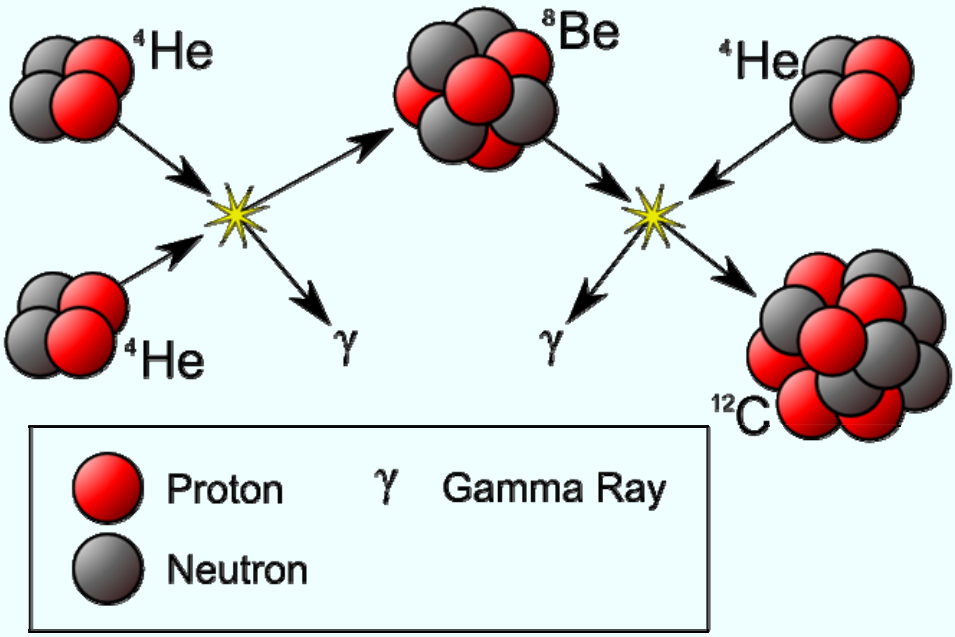

চিত্রঃ ত্রিপল আলফা বিক্রিয়ায় কার্বনের উদ্ভব

কিন্তু এমন একটা ধ্রুবক আছে যার মান একদম জীবন সৃষ্টির উপযোগী করেই সাজানো বলে মনে হয়। সেটা হল মহাজাগতিক ধ্রুবক বা কসমোলজিকাল কনস্ট্যান্ট - যা আসলে শূন্যস্থানের এনার্জজি-ডেনসিটি। এর মান এর মান ধনাত্বক বা ঋণাত্বক হতে পারে, বড়ো বা ছোট হতে পারে। যদি বড় ও ধনাত্বক হত তাহলে বিশ্বসৃষ্টির পরের মুহূর্ত থেকেই সব পদার্থকে একে অপরের থেকে দূরে সরিয়ে দিত, যার ফলে পদার্থ একত্র হবার কোনো সুযোগই পেত না, পরে তা থেকে নক্ষত্র, গ্রহ বা প্রাণ তৈরীও হত না। আবার যদি এর মান বড় ও ঋণাত্বক হত, তাহলেও মহাকর্ষকে প্রতিরোধ করার কোনো ক্ষমতাই তৈরী হত না, এবং মহাবিস্ফোরণে সৃষ্টির কিছুক্ষণের মধ্যেই তা আবার চুপসে একে অপরের ঘাড়ে এসে পড়ত - জীবন সৃষ্টি হবার পর্যাপ্ত সময়ই পেত না। পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে, আমাদের মহাবিশ্বের কসমোলজিকাল কনস্ট্যান্ট-এর মান যথেষ্ট কম, যার ফলে উপরোক্ত কোনো ঘটনাই ঘটে না। অথচ, প্রাথমিক সূত্র থেকে আমাদের ধারণা হয়েছিল যে এর মান যথেষ্ট বড় হওয়া সম্ভব।

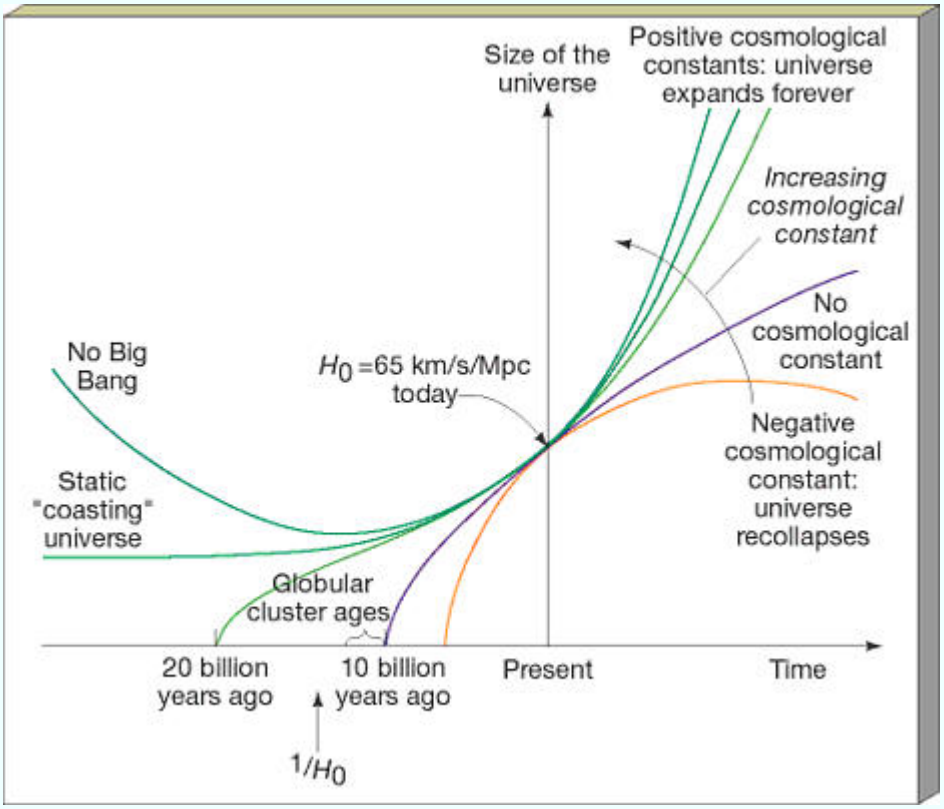

চিত্রঃ মহাজাগতিক ধ্রুবক বা কসমোলজিকাল কনস্ট্যান্ট কি আমাদের বেঁচে থাকার জন্য সূক্ষভাবে সমন্বিত?

এখনো আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে কেন কসমোলজিকাল কনস্ট্যান্ট-এর মান এত কম - কোনো সূত্র এখনো অবধি এর মান কম হবার ব্যাখ্যা দেয়নি। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় প্রকাশিত তথ্য থেকে কিছুটা অনুমান করা সম্ভব কেন আমাদের মহাবিশ্বে ধ্রুবকগুলোর মান এত নিখুঁতভাবে সজ্জিত। আন্দ্রেই লিন্ডের "ক্যাওটিক ইনফ্লেশন" তত্ত্ব অনুসারে আমরা যে গ্যালাক্সির সমষ্টিকে মহাবিশ্ব বলে জানি তা হয়ত আসল মহাবিশ্বের একটা অংশমাত্র আর যে মহাবিস্ফোরণে আমাদের দৃশ্যমান বিশ্ব তৈরী, সেরকম অসংখ্য বিগ-ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ এরকম বহু সংখ্যকক মহাবিশ্বে তৈরী করে চলেছে। আর প্রতিটি মহাবিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট অন্যান্য মহাবিশ্বের মহাজাগতিক ধ্রুবকগুলোর মান ভিন্ন ভিন্ন মানের।

এই অবস্থায় আমাদের বুঝতে অসবিধা হবার কথা নয় য, অসংখ্য মহাবিশ্বের মধ্যে আমরা সে মহাবিশ্বেই বাস করি সেটায় জীবনের উৎপত্তি হতে পেরেছে কারণ এর মহাজাগতিক ধ্রুবকগুলোর মান হয়তো জীবন গঠনের উপযোগী। আরো অনেক মহাবিস্ফোরণের ফলে উদ্ভুত অন্য মহাবিশ্বের মহাজাগতিক ধ্রুবকগুলোর মান হয়ত তেমন উপযোগী নয় - তাই সেখানে প্রাণের বিকাশও হয় নি। আমরা নাহয় বাসযোগ্য অংশে বসে আধ্যাত্মিকতার ঢেউয়ে ভেসে গিয়ে কল্পিত সৃষ্টিকর্তাকে প্রশ্ন করতে পারি যে কেন এখানে জীবন আছে, কিন্তু আরো হাজারটা মহাবিশ্বের কিংবা এই মহাবিশ্বের অধিকাংশ স্থানে এ ধরণের প্রশ্ন করার মত কেউ থাকবেও না। যদি এধরনের কোনো তত্ত্ব স্বীকৃতি পায়, তার পরেও মহাজাগতিক ধ্রুবকগুলো নিয়ে এই রকমের প্রশ্ন করার অর্থ হবে একটাই -

"ঈশ্বর আমাদের পৃথিবীতে স্থাপন না করে যদি শুক্র বা প্লুটোতে স্থাপন করতেন আমাদের কত না সমস্যাই হত। আমরা এখানে জল, মাটি, বাতাস আর অভিকর্ষের কল্যাণে কত ভালভাবে বেঁচে থাকতে পারছি। সৌরজগতে পৃথিবী ছাড়া আর কোনো জায়গায় কি আমরা এভাবে বাঁচতে পারতাম ?"

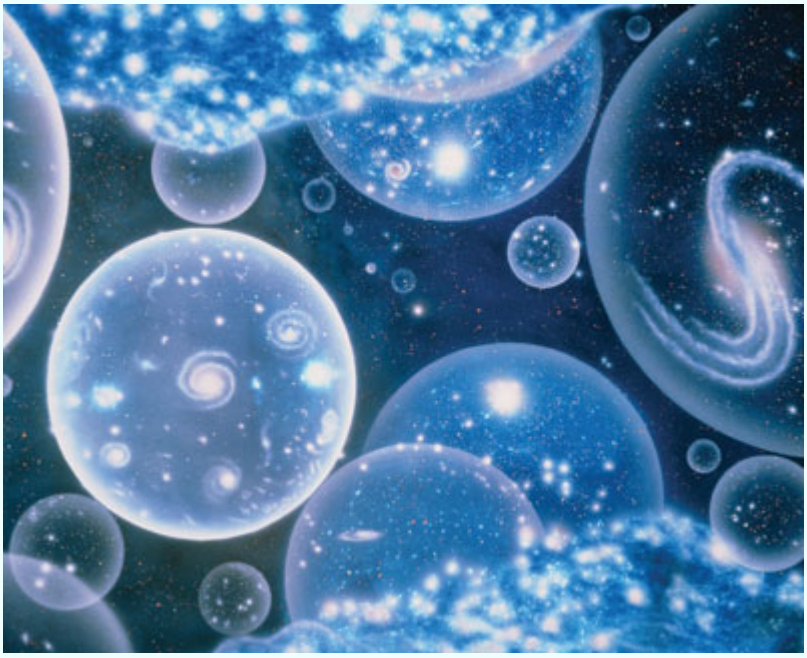

চিত্রঃ মাল্টিভার্স বা অনন্ত মহাবিশ্বের কল্পিত চিত্র

এই রকমের যুক্তিকে বলা হয় নৃ-কেন্দ্রিক বা এন্থ্রপিক। এর বক্তব্য এরকম, প্রকৃতির সূত্রগুলো আমাদের ঠিক ঠাক মত বেঁচে থাকার জন্যই অমন ভাবে তৈরি। আমরা যাতে বেঁচে থাকতে পারি - সে জন্যই সূত্রগুলো অমন- এছাড়া তাদের কাছে আর কোনো ব্যাখ্যা নেই। এ গুলো আমার চোখে একগাদি আধ্যাত্মিক জবর জং ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। অথচ উল্টোদিক থেকে ভাবলে, হাজারো মহাবিশ্বের ভীরে যে জায়গাটায় সূত্রগুলো এরকম, সেখানেই জীবন গঠিত হতে পেরেছে - আর সেজন্যই আমরা এখানে - সেরকম ভাবে বোধ হয় ভাবতে চাই না। আর অনন্ত মহাবিশ্বের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন মহাজাগতিক ধ্রুবক থাকলে সমগ্র মহাবিশ্বের বাসযোগ্য অংশেই আমরা কেন আছি এই প্রশ্ন করা আর সৌরজগতের প্লুটো বা নেপচুনে না থেকে কেন পৃথিবীতে আছি - একই ব্যাপার। কসমোলজিকাল কনস্ট্যান্ট -এর মান এত ক্ষুদ্র যে তা নক্ষত্র গঠনে কোনো বাধাদান করে না। কিন্তু আমরা সত্যি জানি না কেন এর মান এরকমই - এর মান অন্য কিছু হওয়া আদৌ সম্ভব ছিল কিনা। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, মাধ্যাকর্ষণের কোয়ান্টাম তত্ত্ব এই প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতে দিতে পারবে।

আরো অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যাশার চেয়ে জীবনটা আরো অনেকটা সহজ হলে একে না হয় ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে মেনে নেওয়া যেত। এখানে আনন্দ কিংবা সুখানুভূতির কথা ভাবলে মনে রাখতে হবে, মানুষের বা যেকোনো জীবের সাধারণ অনুভূতিগুলোর অনেক কিছুই কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের বৈশিষ্ট্যে স্থান করে নিয়েছে। কারণ বেঁচে থেকে নিজেদের জিন পরবর্তী প্রজন্মে বহন করে নিয়ে যাবার জন্য খাদ্যগ্রহণ বা প্রজনন করতেই

হয়। হয়ত এটা প্রত্যাশার বাইরে যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে অন্য কোনো গ্রহে একদল জীব সৃষ্টি হবে যারা আমাদের মত অবসর সময়ে জটিল বিজ্ঞান-চিন্তায় মগ্ন থাকবে। এক্ষেত্রে একদল খুব ভাগ্যবান কিছু ব্যক্তি সংকীর্ণ নমুনা থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেরা সৃষ্টিকর্তার নকশার কথা ভেবে বাহবা দিচ্ছে। একে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'সিলেকশন এফেক্ট'।

আমাদের মহাবিশ্ব অনেক অনেক বড়, হয়ত বা অসীম। এটাতে অবাক হবার কিছু নেই যে অধিকাংশ গ্রহেই কোনো প্রাণ নেই এবং যাদের মধ্যে আছে, তারাও হয়ত বেশীরভাগই অনুন্নত প্রকৃতির। খুবই অল্প ভগ্নাংশের জীবের হয়ত এই সৃষ্টিকর্তা সংক্রান্ত চিন্তা করার মত ক্ষমতা আছে। কোনো লটারি বিজেতাকে ইন্টারভিউ নিতে গেলে মনে হতে পারে যে কোনো বিশেষ দৈববলে সে এই লটারীটা পেয়েছে কিন্তু প্রশ্নকর্তার মনে রাখা উচিত যে আরো হাজার জন টিকিট কেটেও পুরস্কার জিততে পারে নি। তাই শুধু সাদামাটা প্রাকৃতিক নির্বাচনে আমরা যতটা উন্নত হতাম, তার চেয়ে সত্যিই আমরা বেশী উন্নত কিনা - এটা ভাবার পাশাপাশি এই পক্ষপাতের কথাও মনে রাখতে হবে যে আমরা নিজেরা কিন্তু নিজেদের সংকীর্ণ অভিজ্ঞতালব্ধ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমস্যার কথাটা ভাবছি।

এই প্রশ্নের উত্তর নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে। এর উত্তর পেতে পদার্থবিদ্যা আমাকে সাহায্য করবেনা। আমার জীবনে আমি খুবই সুখী, বোধহয় আমি মানবসমাজের সবথেকে সুখী ০.০১%এর মধ্যেই থাকব। তাও, আমি এক মা কে দেখেছি ক্যান্সারে মারা যেতে, বাবাকে অ্যালজাইমারসে ভুগে স্মৃতিশক্তি খোয়াতে আর অনেক তুতো ভাইবোনকে গনহত্যায় মারা যেতে। মঙ্গলময় ঈশ্বর তখন কোথায় লুকিয়ে ছিলেন কে জানে।

যারা সর্বশক্তিমান ও মঙ্গলময় ঈশ্বরে বিশ্বাসী তারা অনেক সময়েই এই দুঃখ-কষ্ট দেখে বিস্মিত হন। আবার অনেকসময়ে 'ফ্রি উইল'-এর কথা বলা হয়। মিল্টন তার প্যারাডাইস লস্ট-এ লিখেছেন :

"আমি তাদের বন্ধনহীন সৃষ্টি করেছি আর তারা তাই থাকবে যতদিন না তারা আমার দাসত্ব স্বীকার করে, নাহলে আমাকে তাদের প্রকৃতি পরিবর্তন করতে হবে আর আমার আগের আইন স্বাধীনতার নীতি পরিবর্তন করতে হবে - এভাবে তারা নিজেদের পতন ডেকে আনবে।"

আমার ভাইবোনেদের জার্মানদের হাতে মৃত্যু কি তাহলে জার্মানদের 'ফ্রি উইল'-এর প্রভাব? তাও অন্যের হাতে মৃত্যুর ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া যায়, ক্যান্সারে মৃত্যু কি টিউমারের ফ্রি উইলের ফল?

এইসব দুঃখদুর্দশা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের সাথে জড়িত কিনা সে নিয়ে আমি চিন্তিত নই, কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে সে ধরণের সৃষ্টিকর্তা কখনই মঙ্গলময় নন। অ্যাস্ক্যাইলাস বা ইউরিপিডিসের প্রাচীন গ্রীক নাটকে তারা

অনেককাল আগেই দেখিয়েছিলেন যে ঈশ্বর স্বার্থপর আর নিষ্ঠুর প্রকৃতির কিন্তু মানুষের কাছ থেকে ভাল ব্যবহারই আশা করেন। ওল্ড টেস্টামেন্টের ঈশ্বরও একইরকম ভাবে আমাদের নির্দেশ দেন অবিশ্বাসীদের মেরে ফেলতে, এমনকি তার নির্দেশে নিজের সন্তানকে বলি দিতে বলেন। খ্রীষ্টান আর ইসলাম ধর্মে ঈশ্বর আবার আমাদের সারাজীবনের জন্য পরিত্যাগ করবেন যদি আমরা তাদের ঠিকঠাক আরাধনা না করি। এটা কেমন ব্যবহার হল? আমি জানি হয়ত ঈশ্বরকে মানুষের মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না কিন্তু এখানে সমস্যা হল, যার অস্তিত্ব নিয়েই এত সংশয় তার মঙ্গলময় দিকটা তুলে ধরার জন্য আমরা তাহলে কোন্ মাপকাঠি ব্যবহার করতে পারি?

উইলিয়াম প্যালের এই 'আর্গুমেন্ট ফ্রম ডিজাইন' এখন আর মানুষের মাথায় সেরকম ভাবে নেই। ধর্মের সম্মান এখন নৈতিকতার উ্স হিসাবে। আমি এখন কষ্ট করে এই লেখাটা লিখছি কারণ আমি মনে করি নৈতিকতা প্রসঙ্গে ধর্মের অবদান মোটেও খুব একটা ভাল নয়। এখানে একটা বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যায়। একদিকে দেখলে ধর্মের জন্য মানবসভ্যতার ইতিহাসে কুসংস্কার, জিহাদ আর ক্রুসেডের মত ঘটনা ঘটেছে। আমাদের এই শতকেই একজন মুসলিম ধর্মান্ধ হত্যা করেছে সাদাতকে, ইহুদী ধর্মান্ধ হত্যা করেছে র্যাবিনকে আর হিন্দু ধর্মান্ধ হত্যা করেছে গান্ধীকে। হিটলারকে খ্রীষ্টান ধর্মান্ধ বলাটা হয়ত বাড়াবাড়ি হবে, কিন্তু এটাও ঠিক যে খ্রীষ্টীয় সংস্কৃতিতে যুগ-যুগান্তরের ইহুদীবিদ্বেষ না থাকলে হিটলার হয়ত ইহুদীনিধনে উদ্যত হতেন না। আবার অন্যদিকে দেখলে অনেক ধার্মিক ব্যক্তিই সমাজে মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। যেমন পদার্থবিদ ফ্রিম্যান ডাইসন তার ইম্যাজিনড ওয়ার্ল্ড বইতে লিখেছেন দাসপ্রথার বিরুদ্ধে ধর্মের কল্যাণময় সমর্থনের কথা।

আমি আমার ব্যক্তিগত কিছু মন্তব্য করব এই দাসপ্রথা নিয়ে। হয়ত কিছু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি সত্যিই দাসপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন - যেমন ইংল্যান্ডে উইলিয়াম উইলবারফোর্স বা আমেরিকায় উইলিয়াম এলেরি চ্যানিং। কিন্তু এটাও সত্যি যে আর অনেক ধর্মের মত খ্রীষ্টান ধর্মও কয়েক শতক ধরে দাসপ্রথাকে মেনে নিয়েই চলছিল। দাসপ্রথার উল্লেখ নিউ টেস্টামেন্টেও পাওয়া যায়। তাহলে উইলবারফোর্স বা চ্যানিং-এর ক্ষেত্রে আলাদাটা কি হয়েছিল? এরা তো কোনো দৈবাদেশ পেয়েছেন বলেও দাবী করেন নি, আবার কোনো নতুন পবিত্র গ্রন্থও আবিষ্কার হয় নি। বরং অষ্টাদশ শতকে যুক্তিবাদ এবং মানবতাবাদ প্রসারের সাথে সাথেই অনেকেই দাসপ্রথার বিরোধিতা শুরু করেন - যেমন অ্যাডাম স্মিথ বা জেরেমি বেন্থেম। সমারসেটের যে কেসের রায়ের সাথে সাথে ইংল্যান্ডে দাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘটে (যদিও উপনিবেশগুলিতে জারি ছিল) , সেই রায় যিনি দিয়েছিলেন, সেই ধর্মপ্রাণ লর্ড ম্যানফিল্ড কিন্তু তার রায়ে ধর্মের কথা একবারের জন্যও উল্লেখ করেননি। ধর্মীয় নৈতিকতা আমার মতে যুগের সাথে তাল মিলিয়েই চলে, বরং ধর্ম দ্বারা যুগ কমই প্রভাবিত হয়।

আমি তো বলব, ধর্ম বরং দাসপ্রথার স্বপক্ষেই বেশী কথা বলেছে। অনেকবারই ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি ব্যবহার হয়েছে দাসপ্রথাকে আদালতে সমর্থন জানাতে। মার্ক টোয়েন তার নিজের মা সম্পর্কে বলেন যে তিনি নাকি অসম্ভব দয়ালু ছিলেন কিন্তু সর্বদা দাসপ্রথা সমর্থন করে এসেছেন। কারণ, উনি সবসময় ধর্মীয় বাণীতে শুনে এসেছেন যে দাসপ্রথা ঈশ্বরের ইচ্ছায় চলে। ধর্ম থাকুক বা না থাকুক - সব সময়ই ভাল লোকে ভাল কাজ করবে আর খারাপ লোকে খারাপ কাজ করবে। কিন্তু ভাল লোককে দিয়ে খারাপ কাজ করানোতে ধর্মের জুড়ি নেই।

কদিন আগে একটা ই-মেল পেলাম আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স থেকে। তাতে একটা কনফারেন্সের কথা ছিল - যার বিষয়বস্তু হল ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যে গঠনমূলক আলোচনা। আমিও ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যে আলোচনা চাই কিন্তু 'গঠনমূলক' নয় । বিজ্ঞানের একটা বড় অবদান হল যে বিজ্ঞান বুদ্ধিমান মানুষকে অন্তত ধার্মিক হতে দেয় না। আমার মনে হয় না আমরা এ থেকে পিছিয়ে আসব।

স্টিভেন ওয়েইনবার্গ ১৯৭৯ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী। বর্তমানে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের (অস্টিন) অধ্যাপক। বিজ্ঞান লেখক এবং বর্তমান সময়ের অন্যতম আলোচিত দার্শনিক। *The First Three Minutes: A Modern View of the Origin of the Universe, Dreams of a Final Theory: The Search for the Fundamental Laws of Nature* সহ অনেক জনপ্রিয় বইয়ের লেখক। এই লেখাটা নিউ ইয়র্ক রিভিউ অব বুকস –এ প্রকাশিত হয়েছিল ২১শে অক্টোবর, ১৯৯৯ সালে। এ নিয়ে উনি কিছু আলোচনাও করেছিলেন ম্যাগাজিনের সাইটে।

দিগন্ত সরকার, আমেরিকায় বসবাসরত কম্পিউটার প্রকৌশলী এবং বিজ্ঞান লেখক। ইমেইল - diganta_sarkar@yahoo.com

ঈশ্বরের অস্তিত্ব - সৃষ্টির যুক্তির খন্ডন

(A REFUTATION OF THE DESIGN ARGUMENT FOR GOD)

- অপার্থিব জামান

E-mail: aparthib@yahoo.com

ঈশ্বরের অস্তিত্বের সমর্থনে একটা যুক্তির অবতারণা আস্তিকরা প্রায়েই করে থাকেন, যা সৃষ্টির যুক্তি বা Argument From Design নামে পরিচিত। এই যুক্তির সারমর্ম হল এই যে আমাদের এই বিশ্ব ও প্রকৃতি যে এত শৃঙ্খলাবদ্ধ, বিধিনিয়ন্ত্রিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, এমনটি পরিলক্ষিত হওয়ার একটাই ব্যাখ্যা যে এর পেছনে সচেতন কোন সত্বা আছেন। যেখানেই বিধি আছে সেখানে বিধানকর্তা থাকতে বাধ্য। যেখানে সৃষ্টি, সেখানে সৃষ্টিকর্তা থাকতে বাধ্য। এই রকম যুক্তি সর্বসাধারনের মনে সাধারণ চিন্তা হিসাবে আসাটা স্বাভাবিক। এটা একটা অতি পুরাতন ভাবনা ও যুক্তি। কিন্তু সাধারণ চিন্তায় যা আসে তা যে সর্বদাই ধ্রুব সত্য হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। পরে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় আসব। ইদানিং বিজ্ঞানের কিছু নতুন ধারণা ও প্রজ্ঞাকে কাজে লাগিয়ে সৃষ্টির যুক্তির একটা নতুন সংস্করণের অবতারণা করা হয়েছে। এটাকে বলা হয় বুদ্ধিমান সৃষ্টির যুক্তি বা Intelligent Design Argument । বিজ্ঞানের এই নতুন প্রজ্ঞা হল, প্রাণের অস্তিত্বের জন্য যে বেশ কতকগুলো সূক্ষ্ম সমন্বয়ের (Fine Tuning) প্রয়োজন, তার সবটাই ঘটতে দেখা যায় বাস্তবে। যেমন মহাকর্ষ বা তড়িৎচুম্বকীয় বলের সামান্যতম তারতম্য হলে গ্রহ নক্ষত্র তথা প্রাণের সৃষ্টি হতে পারতনা। অঙ্গার (কার্বন) এর একটা বিশেষ শক্তির স্তর না থাকলেও প্রাণের সৃষ্টি হতে পারতনা, ইত্যাদি। পদার্থবিজ্ঞানের কয়কটি মৌলিক ধ্রুবকের (Fundamental Constants) মানের সূক্ষ্ম সমন্বয় না ঘটলে প্রাণের বিকাশ ঘটতে পারতনা। প্রাণ সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় এইরকম সূক্ষ্ম সমন্বয় বাস্তবিকই ঘটতে দেখা যায়, যা ঘটার কোন আপাত কারণ নেই। এটা কাকতালীয় হওয়ার সম্ভাবনাও অতি ক্ষুদ্র (অন্তত তাই মনে করা হয়। আসলেই ক্ষুদ্র কিনা সেটা তর্কসাপেক্ষ, পরে বিশদ আলোচনায় যাব) । তাই একমাত্র প্রাণ সৃষ্টির জন্যে কোন সচেতন সত্বার বুদ্ধিমান অভিপ্রায়ের দ্বারাই এই সূক্ষ্ম সমন্বয় ঘটা সম্ভব। আর এই সচেতন সত্বাই ঈশ্বর। এটাই হল বুদ্ধিমান সৃষ্টির যুক্তি। এই যুক্তির অন্তর্নিহিত ত্রুটি নিয়ে পরে আলোচনায় আসব। আগেই বলে রাখি যে এই প্রবন্ধে 'সৃষ্টি' শব্দটি প্রধানত সচেতন সত্বার অভিপ্রায়যুক্ত নির্মাণ বা তৈরী অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শব্দটি শুধু নির্মাণ বা তৈরী অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ স্রষ্টার কোন স্বরূপ না ধরে নিয়েই। প্রসঙ্গ অনুযায়ে এটা পরিস্কার হয়ে যাবে কোন অর্থে 'সৃষ্টি' বলা হচ্ছে।

সৃষ্টির যুক্তির (সৃষ্টি থাকলেই সৃষ্টিকর্তা) একটা ত্রুটি হল, যে এটা কোন যুক্তি নয়, এটা দ্বিরুক্তি মাত্র। সৃষ্টি থাকা আর স্রষ্টা থাকা একই কথা। কাজেই সৃষ্টি আছে অতএব সৃষ্টিকর্তা আছেন, এই যুক্তি হল যা প্রমাণসাপেক্ষ্য (অর্থাৎ স্রষ্টা আছেন) তাকে ধরে নিয়ে সেটাই প্রমাণ করার একটা চক্রাকার চেষ্টা। কোন বস্তুর অস্তিত্ব সচেতন সত্বার অভিপ্রায়মূলক কর্ম বা প্রাকৃতিক নিয়মের ফল - এই দুই এর দ্বারাই সম্ভব। সৃষ্টির যুক্তি একটি প্রকৃত যুক্তি হলে, আমাদের কাছে যা সৃষ্ট বা Designed বলে মনে হয়, তা যে আসলেই সৃষ্ট (সচেতন সত্বার দ্বারা) সেটাই প্রমাণ করত । কিন্তু সৃষ্টির যুক্তি তা করেনা। সৃষ্টির যুক্তির এই সহজ অথচ সূক্ষ্ম ত্রুটি অনেকের কাছেই ধরা পড়েনা। তার কারণ মনে মনে অনেকেই স্রষ্টা আছেন এটা একটা স্বতসিদ্ধের মতই ধরে নেন। অনেকটা স্বজ্ঞাত (Intuitive) ভাবেই। কিন্তু যুক্তিশাস্ত্রে স্বজ্ঞাত ধারনার স্থান নেই। কারণ স্বজ্ঞাত ধারনা কোন কোন ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে। ইতিহাসে এর বহু নজীর আছে। যেমন পৃথিবী সমতল, বা সূর্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, এই ধারনাগুলো একসময় খুবই জনপ্রিয় ছিল। যুক্তিশাস্ত্রে শুধু অভ্রান্ত যুক্তি ও প্রমাণ বা সাক্ষ্যই (Logic and Evidence) গ্রহণযোগ্য। যুক্তি হতে হবে হেত্বাভাস (Fallacy)মুক্ত। যুক্তির অভ্রান্ততা নিশ্চিত করার প্রণালী যুক্তিশাস্ত্রেই আছে। এবং প্রমাণ বা সাক্ষ্যের (Evidence) অভ্রান্ততা যাচাই এর জন্য চাই পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের (Test and Observation) মাধ্যমে সার্বজনীন মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা।

আস্তিকদের সৃষ্টির যুক্তির আরেকটা ত্রুটিপূর্ণ দিক আছে যেমন :

১। বিশ্বের শৃঙ্খলা বা বিধিনির্দিষ্টতার কারণ হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা।
২। ঈশ্বর নিজে অসৃষ্ট, আবশ্যকীয় ভাবে অস্তিমান (existing necessarily) এবং সদা বিরাজমান (অনন্ত অতীত থেকে অনন্ত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত) এই দাবী করা।

উপরোক্ত ২ নং অনুযায়ী ঈশ্বর এর অস্তিত্ব বিশ্বে শৃঙ্খলা বা বিধিনির্দিষ্টতা থাকা বা না থাকার ওপর নির্ভর করেনা, কারণ ঈশ্বর সদা বিরাজমান । কাজেই ১ নং এর ত্রুটি এবং ২ নং এর সঙ্গে এর অসঙ্গতি এখানেই ধরা পড়ে। তাছাড়া বিশ্বের সবকিছু সৃষ্ট পরিলক্ষিত হওয়াটাও মানুষের মনের একটা পক্ষপাতদুষ্ট ধারণা। এর কারণ আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা আর আমাদের চিরপরিচিত পারিপার্শ্বিকতা। যেমন একটা ঘড়ি দেখলে আমরা তৎক্ষনাৎ সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে এটি মানুষ সৃষ্ট, কারণ আমরা পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে অনুরূপ আর একটি ঘড়ি মানুষের দ্বারাই তৈরী হয়েছিল। অথবা ঘড়িটির ভেতরের স্প্রিং বা চাকা দেখেও অনুমান করা যায় যে এটি মানুষের তৈরী, কারণ পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানা আছে যে স্প্রিং বা চাকা মানুষের তৈরী। কাজেই সৃষ্টির যুক্তি একটা অভিজ্ঞতা ও প্রসঙ্গ ভিত্তিক ধারনা থেকে উদ্ভুত। কাজেই যা কিছুই সৃষ্ট বলে প্রতিভাত হয় তাই সচেতন কোন স্রষ্টার ইচ্ছাপূর্বক ক্রিয়ার ফল, এই যুক্তিটা হল পরিচিত অভিজ্ঞতা থেকে আরোহী যুক্তির (Inductive Logic) মাধ্যমে উপনীত এক সিদ্ধান্ত। আরোহী যুক্তির অভ্রান্ততা সকল ক্ষেত্রে নিশ্চিত করা যায় না।

জগতের যাবতীয় বস্তু ও প্রপঞ্চ (Phenomenon) কে আমরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। প্রথম শ্রেণীর বস্তু হল যা কিছু মানুষ সৃষ্ট (বিশেষ করে কোন উদ্দেশ্যের কারণে) বলে প্রতীয়মান হয় (একই রকম বস্তু মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হওয়ার পূর্ব অভিজ্ঞতার দরুন), যেমন ঘড়ি, গাড়ী ইত্যাদি, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বস্তু হল যা কিছুই অক্রমিক (Random) ,সম্ভাবনাশ্রয়ী (probabilistic) বা প্রকৃতিজনিত, এক কথায় অসৃষ্ট, অর্থাৎ মানুষের দ্বারা সৃষ্ট নয় এমন বস্তু সমূহ, যেমন পাথরের টুকরো, মেঘ, রংধনু ইত্যাদি। কিছু বস্তু আছে যা আস্তিকরা সৃষ্ট বলে গণ্য করে আর নাস্তিক ও যুক্তিবাদীরা অসৃষ্ট (অক্রমিক বা প্রকৃতিজনিত) হিসাবে গণ্য করে, যেমন পশুপ্রাণী, মানুষ। এই নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনায় যাব। কাজেই আমাদের এই মানষিক মানচিত্র অনুযায়ী জগত সৃষ্ট ও অক্রমিক এই দুই শ্রেণীর বস্তু ও প্রপঞ্চ সমন্বয় গঠিত, যার সাহায্যে আমরা আরোহনের (Induction) মাধ্যমে যাদৃচ্ছিক (arbitrary) যে কোন বস্তু সৃষ্ট না অক্রমিক, এই বিচার করতে পারি। কিন্তু এই আরোহী সামান্যীকরণ (Inductive Generalization) সমগ্র বিশ্বের মত চূড়ান্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা অর্থবহ হতে পারেনা। কারণ আমরা একটা বিশ্বকেই জানি। একই রকম অনেক বিশ্বের নজীর আমদের জানা নেই যাতে করে আমরা আরোহনের মাধ্যমে *আমাদের এই* পরিচিত বিশ্ব যে সৃষ্ট, সেই বিচার করতে পারি, কারণ আমাদের বিশ্বের স্বরূপ *অন্য* কোন বিশ্ব যে কোন স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্ট এমনটি আমাদের জানা নেই। তাই আমাদের এই বিশ্ব যে কোনও স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্ট, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিভিত্তিক নয়, বরং বিশ্বাস ভিত্তিক। তাছাড়া আমাদের বিশ্বে সৃষ্ট ও অক্রমিক, এই দুই শ্রেণীর বস্তুই আছে। সৃষ্ট জগতে অক্রমিক অর্থাৎ অসৃষ্ট বস্তু থাকলে সঠিক অর্থে এটা বলা ভুল হবে যে জগতটা সৃষ্ট। এবারে আসি মানুষ ও প্রাণী (অর্থাৎ প্রাণ) স্রষ্টা সৃষ্ট না প্রকৃতি সৃষ্ট সেই প্রশ্নে। প্রাণী বা প্রাণ কে আস্তিকরা সৃষ্ট বস্তু বা প্রপঞ্চ বলে গণ্য করার কারণ হল যে পাথর বা মেঘে কোন অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বা অর্থ দেখা যায়না, যেমনটি প্রাণ বা প্রাণীতে দেখা যায়। আস্তিকরা উদ্দেশ্যহীন বা অর্থহীন বস্তূ প্রকৃতি সৃষ্ট বলে যেমন গণ্য করেন, তদ্রূপ উদ্দেশ্য বা অর্থ পূর্ণ বস্তুকে সচেতন সত্বার সৃষ্ট বলে গণ্য করেন। কিন্তু এইরকম চিন্তা বা যুক্তি ভ্রমশূন্য নয়। কোন বস্তু বা প্রপঞ্চ সচেতন স্রষ্টার সিসৃক্ষার কারণে সৃষ্ট আর কোনটি প্রকৃতির নিয়মে বা অক্রমিক ভাবে সৃষ্ট এই সিদ্ধান্তটা মূলত অধ্যাত্মীয় (Subjective). সোজা কথায় মনের ব্যাপার। কোন বস্তুর মধ্যে অভিপ্রায়ের আভাস দেখলে আমরা সেই বস্তু স্রষ্টার সৃষ্ট বলে মনে করি এবং আভাস না দেখলে মনে করি প্রকৃতির সৃষ্ট। কিন্তু এটা কি ভ্রমশূন্য ? কিছু উদাহরণেই এর উত্তর মিলবে। একটা বিমূর্ত চিত্রই ধরা যাক। এটা যে কোন বিখ্যাত চিত্রকরের আঁকা সেটা আগে ভাগে জানা না থাকলে এটা মনেই হতে পারে যে চিত্রটা অনবধানতা বা দুর্ঘটনা বশত রং ছিটানর কারণে সৃষ্ট। কারণ এতে কোন অভিপ্রায়েয় আভাস পাওয়া যায়না। অপরদিকে এটাও সম্ভব যে কোন শিল্পীর অনবধানতাবশত রং ছিটানর কারণে অনভিপ্রেত সৃষ্ট ছবিও একজন নামী শিল্পীর যত্ন সহকারে অঙ্কিত চিত্র বলে মনে হতে পারে, যদি ছবিটির সৃষ্টির নেপথ্য কাহিনী জানা না থাকে ! নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী ওয়াইনবার্গ এই সত্যটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন :

> ‘যে বিশ্ব একেবারে বিশৃঙ্খল, বিধিবিহীন, তেমন একটি বিশ্বকেও কোন মূর্খের সৃষ্ট বলে মনে করা যেতে পারে ’

কাজেই ধারা বা নিয়মের (pattern or regularity) সাথে যেমন সচেতন স্রষ্টার অভিপ্রায়ের কোন আবশ্যিক যোগসূত্র নেই, তেমনি অক্রম (randomness) বা বিশৃঙ্খলার সাথে সচেতন স্রষ্টা বা স্রষ্টার অভিপ্রায় না থাকারও কোন আবশ্যিক যোগসূত্র নেই।

এটা জানা আছে যে প্রকৃতির নিয়মের (অর্থাৎ বিজ্ঞানের নিয়মের) পরিণতিতে দুই রকম বস্তু বা প্রপঞ্চের উৎপত্তি হতে পারে, যার একটা আমাদের কাছে অক্রমিক বা এলোমেলো মনে হয়, আর অন্যটা উদ্দেশ্যপূর্ণ, অর্থবহ ও তথ্যসমৃদ্ধ মনে হয়। প্রকৃতির নিয়মের ফলে কি ধরনের বস্তুর উৎপত্তি হবে তা নির্ভর করে প্রকৃতির নিয়ম কিভাবে এবং কত সময় ধরে কাজ করছে তার ওপর। যেমন মেঘ ও রংধনু দুটোই বিজ্ঞানের নিয়মের পরিণতিতে সৃষ্ট। এলোমেলো মেঘকে আমরা কখনই সচেতন সত্বার সৃষ্ট বলে মনে করিনা। রংধনু বা সুন্দর ফুলকে সচেতন সত্বার সৃষ্ট বলে আমরা কিছুটা মানতে পারি। আমাদের মনোরন্জনের জন্যই যেন রংধনুর সৃষ্টি, বা প্রেম বা কাব্যের সুবিধার্থেই ফুলের সৃষ্টি ইত্যাদি। অপরদিকে মানুষকে সচেতন সত্বার সৃষ্ট বলে অনেকে শুধু মনেই করেনা, সচেতন সত্বা ছাড়া সৃষ্টি সম্ভব নয় বলেও ঘোষণা দেয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এলোমেলো মেঘ থেকে সুন্দর রংধনু, তা থেকে প্রাণী পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান কোন গুন বা ধর্ম আছে যা আমাদের ধারনাকেও ক্রমে ক্রমে পাল্টাচ্ছে ব প্রভাবিত করছে। কি এই গুণ? জটিলতা তত্ত্বে (Complexity Theory) বা তথ্যবিজ্ঞানে (Information Theory) তথ্যের গভীরতা (Depth of Information) বলে একটা ধারনা আছে, যার সঠিক সংজ্ঞা এখানে দেয়া যাচ্ছেনা। এই সেই ধর্ম। প্রাণের তথ্যের গভীরতা সবচেয়ে বেশী। এই তথ্যের গভীরতার তারতম্যের জন্যই কোন বস্তুকে অসৃষ্ট, আবার কোনটিকে সৃষ্ট মনে হয়। মানুষের তথ্যের গভীরতা তার বংশাণু-সমষ্টি (Genome) তে নিহিত, যা আবার মানুষের জীবদ্দশায় মস্তিষ্কের বিকাশের (ঊর্দ্ধ মস্তিষ্কে বর্তনী বা Synaptic Circuits গঠনের মাধ্যমে) সঙ্গে বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে তথ্যের গভীরতার তারতম্য পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মেই ঘটে। প্রাণ সৃষ্টির মূলেও আছে পদার্থবিজ্ঞানের বিধি। কিন্তু রংধনুর মত প্রাণ এক ধাপে বা অল্প সময়ের ক্রিয়ায় সৃষ্ট নয়। প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে কোটি কোটি বছর ধরে ছোট ছোট ধাপে পদার্থবিজ্ঞানের বিধির প্রয়োগের দ্বারা, যা বিবর্তন নামে পরিচিত। বিবর্তন প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) ও পরিব্যক্তি (Mutation), এই দুই মৌলিক ক্রিয়ার দ্বারা ঘটে। বিবর্তনের দরুনই তথ্যের গভীরতা বাড়তে বাড়তে এক পর্যায় জড় বস্তু থেকে জৈব বস্তু (যেমন DNA অণু), ডি.এন.এ থেকে এককোষী প্রাণী, ক্রমে ক্রমে জটিলতর প্রাণী এবং এক পর্যায়ে মানুষ প্রাণীর মাঝে আত্মসচেতনতার (Self-Consciousness) উদ্ভব হয়।

কিন্তু এটা বলা ঠিক হবে না যে প্রাণ সৃষ্টির বিশদ ব্যাখ্যা জানা হয়ে গেছে। আবহাওয়া পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মেই নিয়ন্ত্রিত হয়, আর পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম ও আমাদের জানা। তবুও আবহাওয়ার পূর্বাভাস আমরা ভ্রমশূন্যতার সাথে (Accurately) করতে পারিনা। ছায়াপথ (Galaxy) ও পদার্থবিজ্ঞানের

নিয়মেই সৃষ্ট, কিন্তু ছায়াপথ গঠনের বিশদ ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা এখনও জানেন না। প্রাণ, আবহাওয়া, ছায়াপথ এ সবই হল বিশৃঙ্খল তন্ত্রের (Chaotic System) উদাহরণ। বিশৃঙ্খল তন্ত্রের আন্তর্নিহিত জটিলতার জন্যই পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম নিখুত ভাবে জানা থাকলেও এই তন্ত্রসমূহের বিস্তারিত জানা সম্ভব নয়।

কাজেই যদিও প্রাণ বা প্রাণী আমাদের নিকট এক আশ্চর্য্যজনক বলে মনে হয়, যার সৃষ্টি সাধারণ বোধশক্তিতে গভীর রহস্যাবৃত, যার কোন আপাত ব্যাখ্যা নেই বলে মনে হয়, কিন্তু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে প্রাণ সৃষ্টির একটা সম্ভাব্য এবং বিশ্বাসযোগ্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব। রহস্যটা প্রাণের সৃষ্টিতে নয়, বরং পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের উৎসের প্রশ্নে। কারণ দেখা যাচ্ছে সব বস্তু বা প্রপঞ্চের মূলে আছে পদার্থবিজ্ঞানের অমোঘ বিধি। প্রকৃত অর্থে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মই যাবতীয় সৃষ্টির স্রষ্টা। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র আসলো কোথা হতে? পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের স্রষ্টা কি বা কে? চূড়ান্ত রহস্য থেকেই যাচ্ছে। আস্তিকরা বলেন যে ঈশ্বরের কোন স্রষ্টার প্রয়োজন নেই, ঈশ্বর স্বয়ম্ভূ। সেই একই যুক্তিতে দাবী করা যায় যে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রেরও কোন স্রষ্টার প্রয়োজন নেই। এই দাবী ঈশ্বরের কোন স্রষ্টার প্রয়োজন নেই ঐ দাবীর চাইতে কোন অংশেই কম বিশ্বসযোগ্য নয়। কিন্তু প্রকৃত সত্য কোনটা সেটা এখনও যুক্তি তর্কের বাইরে।

এইবার আসি বুদ্ধিমান সৃষ্টির যুক্তিতে, যাতে বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম সমন্বয়ের ধারণা ব্যবহার করে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। প্রাণের সৃষ্টির জন্য কতকগুলো ধ্রুবকের সূক্ষ্ম সমন্বয় যেহেতু খুবই অসম্ভাব্য মনে হয়, সেহেতু বুদ্ধিমান স্রষ্টার অস্তিত্বের কথা বলা হয়। কিন্তু এই যুক্তিও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ত্রুটিপূর্ণ। এই ত্রুটির কারণ হল, পরিসংখ্যান সম্পর্কে অপর্যাপ্ত জ্ঞান এবং কার্য কারণের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা প্রসূত স্বজ্ঞাত ধারণার অপপ্রয়োগ। প্রথমোক্ত কারণের উদাহরণ দেয়া যাক। দশটা ছক্কার ঘুঁটি একই সাথে ফেললে ৬৫২৬৫৫৩২১৪ হয়ার সম্ভাবনা আর ৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬ হয়ার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ এক, আর এর যে কোন একটি হয়ার সম্ভাবনা অতি ক্ষুদ্র। এই সম্ভাবনার মান হল = (১/৬)X(১/৬)X(১/৬)X(১/৬)..... (১/৬ কে দশবার গুন করার ফল)। কিন্ত ৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬ হলে আমরা খুব আশ্চর্য্যান্বিত হই, আর এই ফলের সাথে কোন বড় পুরস্কার জড়িত হলেতো দৈব হস্তক্ষেপের আভাস খুঁজে পাই। আর ৬৫২৬৫৫৩২১৪ হলে এক মামুলী ব্যাপার মনে হয়, যদিও দুটোর ঘটার সম্ভাবনার মান সম্পূর্ণ এক। সম্ভাবনার একটা বৈশিষ্ট হল যে পরিসংখ্যানে সময় ও সংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পর্যাপ্ত সময় দিলে স্বল্প সম্ভাবনার কোন ঘটনাও ঘটতে বাধ্য। বা স্বল্প সম্ভাবনার একই রূপ অনেক ঘটনা একসাথে ঘটানোর চেষ্টা করলে, কোন একটা চেষ্টা সফল হতে বাধ্য। যেমন একজন মানুষ ১০টি ছক্কার ঘুঁটিকে যদি ৬X৬X৬X৬X৬X৬X৬X৬X৬X৬ বার ফেলে তাহলে ফলাফল একবার ৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬ (বা ১১১১১১১১১১) হতে বাধ্য। তেমনি ৬X৬X৬X৬X৬X৬X৬X৬X৬X৬ জন মানুষ যদি একই সাথে ১০টি ছক্কার ঘুঁটি ফেলে তাহলে একজনের ফল ৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬ হতে বাধ্য। পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টির ব্যাপারটিও অনেকটা তাই। মহাবিশ্বে কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র অছে। আমাদের জানামতে কেবল একটিতেই প্রাণ সৃষ্টর জন্য প্রয়োজনীয় সব শর্তাদি পূরণ হয়েছে। এটা অনেকটা ৬X৬X৬X৬X৬X৬X৬X৬X৬X৬ জন মানুষের

একই সাথে ১০টি ছক্কার ঘুঁটি ফেলার মত ব্যাপার। আমাদের পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি একজনের ফল ৬৬৬৬৬৬৬৬৬৬ হওয়ার মতই ঘটনা। এত সংখ্যক গ্রহ আছে যে একটাতে প্রাণের সৃষ্টি হতে বাধ্য। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের কয়কটি মৌলিক ধ্রুবকের মানের সূক্ষ্ম সমন্বয়ের ব্যাপারটা? যার জন্য প্রাণের সৃষ্টি আদৌ সম্ভব (পৃথিবী হোক বা অন্য কোন গ্রহেই হোক), তার কি ব্যাখ্যা? আমরা তো একটাই বিশ্ব আছে বলে জানি। তাই পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক ধ্রুবকগুলির মানের সূক্ষ্ম সমন্বয় অনেক সংখ্যক বিশ্বের অস্তিত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এখানে একটা সূক্ষ্ম ব্যাপার লক্ষ্য করার মত। সেটা হল, এটা মনে করা ঠিক নয় যে পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক ধ্রুবকগুলির প্রকৃত মানের পূর্বনির্ধারিত সম্ভাবনা (Apriori Probability) ধ্রুবকগুলির অন্য কোন মানের পূর্বনির্ধারিত সম্ভাবনা এক। অর্থাৎ ধ্রুবকগুলির সব মানই সমসম্ভব (equally probable) এটা ধরে নেয়ার কোন কারণ নেই। এটা নীতিগতভাবে সম্ভব যে পদার্থবিজ্ঞানের চূড়ান্ত বা ব্যাপক তত্ত্ব (Theory of Everything), যা এখনো আমাদের জানা নেই সেই তত্ত্ব ধ্রুবকগুলির এমন এক মান বেঁধে দেয়, যা এখনকার প্রকৃত মানের সমান। অর্থাৎ সূক্ষ্ম সমন্বয় যে পদার্থবিজ্ঞানের চূড়ান্ত তত্ত্বের অবশ্যম্ভাবী ফল সেটা উড়িয়ে দেয়া যায় না। সূক্ষ্ম সমন্বয়ের আর একটা ব্যাখ্যা হল, কোন কোন সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের বিশ্বই একমাত্র বিশ্ব নয়। আমাদের বিশ্বের সমান্তরাল অগুনতি অনেক বিশ্ব আছে। পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক ধ্রুবকগুলির মান বিভিন্ন বিশ্বে বিভিন্ন হতে পারে। শুধু একটি বিশ্বেই মানগুলি প্রাণ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম সমন্বয়ের মানের সমান, সেটাই আমাদের বিশ্ব। এটা অনেক গ্রহের মধ্যে পৃথিবীতেই প্রাণের সৃষ্টির মত ব্যাপার। মোটকথা বিশ্বাসের উপর নির্ভর না করে যুক্তি সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করলে বিশ্ব বা প্রাণের সৃষ্টির জন্য সচেতন সত্বার চেয়ে বৈজ্ঞানিক বা প্রাকৃতিক কারণই অধিক যুক্তিযুক্ত। বিজ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ দ্বারা ঈশ্বরের (সচেতন স্রষ্টার) অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। তবে বিশ্বাস টেনে আনলে সে আর এক কথা।

পড়ুন লেখকের অন্যান্য যুক্তিবাদী প্রবন্ধ ঃ

- ধর্মই কি নৈতিকতার উৎস?
- স্বাধীন ইচ্ছা, মন্দ ঈশ্বরের অস্তিত্ব

প্রবন্ধটি মুক্ত-মনায় প্রকাশিত এবং সংকলিত - মডারেটর, মুক্তমনা

স্রষ্টা এবং ধর্ম প্রসঙ্গ যখন অসঙ্গতির

সৈকত চৌধুরী

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ ধর্মবিশ্বাসকে ধারণ করে আসছে। তবে প্রথম দিকে তা ছিল অসংগঠিত; কিছু বিচ্ছিন্ন বিষয়ে বিশ্বাস ও তার আরাধনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কালক্রমে ধর্ম সংগঠিত হতে শুরু করে এবং জটিল আকার ধারণ করে। আধুনিক যুগে পৃথিবীতে অসংখ্য ধর্ম দেখা যায়। যেমন- ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন, শিখ, ইহুদি, বাহাই ইত্যাদি। আবার বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যার একটা বড় অংশই ধর্মহীন।

ধর্মীয় বিশ্বাস বনাম যুক্তি

ধর্মগুলোর প্রধান শর্ত ও একমাত্র অবলম্বন 'বিশ্বাস'। ধর্মগুলোকে কখনো যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব হয় না, যদিও প্রত্যেক ধর্ম নিজ নিজ ধর্মের অনুকূলে অনেক যুক্তির অবতারণা করে; তবে তা কখনও যথার্থ যুক্তি হয়ে ওঠেনি। ধর্মগুলোকে যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যায় না বলেই হয়ত তা ধর্ম, নইলে তা পরিণত হত বিজ্ঞানে। প্রতিটি ধর্মের ভিত্তি হল বিশ্বাস, যুক্তি নয়। ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কেউ কেউ যুক্তির আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু তা ধর্মের কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। তবে যুক্তির সাথে বিশ্বাসের সম্পর্ক ঠিক যেন পরস্পর বিপরীতমুখী; কেননা বিশ্বাসের প্রশ্ন তখনই আসে যখন তার সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে এবং যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ সম্ভব হয় না। যা যুক্তির সাহায্যে প্রতিপাদন সম্ভব, তাকে বিশ্বাস করার জন্য কেউ বলবে না। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বিজ্ঞানের কথা বলা যায়। বিজ্ঞান যুক্তি নির্ভর, তাই বিজ্ঞানের কোনো বিষয় বিশ্বাস করার জন্য কাউকে আহ্বান জানানো হয় না, যেমনটি ধর্ম করে সব সময়। বিশ্বাসের জন্য অপেক্ষা করতে পারে কেবল মিথ্যাই। আর সত্য সবসময়ই সত্য। বিশ্বাসের জন্য নেই তার অপেক্ষা। ধর্মগুলোর বিষয়ে আরেকটি কথা না বললেই নয়। কোন নির্দিষ্ট ধর্মের সকল মানুষ যদি ঠিক এ মুহূর্তে ঐ ধর্মকে অবিশ্বাস করে তবে, তাৎক্ষণিক তার বিলুপ্তি ঘটবে। তাহলে ধর্মগুলো কি শুধুমাত্র মানুষের বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল নয়? একমাত্র মানুষের বিশ্বাস ব্যতীত ধর্মের আলাদা কি কোনো অস্তিত্ব আছে?

স্রষ্টায় বিশ্বাস

স্রষ্টায় বিশ্বাস ধর্মগুলোর প্রধান ভিত্তি। তবে স্রষ্টা বিষয়টি একেক ধর্মে একেক রকম। তাঁর বৈশিষ্ট্যে রয়েছে নানা বৈচিত্র্য, এমনকি নামেও। হিন্দুরা স্রষ্টাকে বলেন ঈশ্বর কিংবা ভগবান, মুসলমানরা আল্লাহ, খ্রিস্টানরা গড, ইহুদিরা জেহোভা। বিশ্বাসীরা স্রষ্টাকে বলেন আদিকারণ (first cause)। তারা বলেন সব ঘটনার পেছনে যেহেতু কারণ আছে তাই এ মহাবিশ্ব এবং এর যাবতীয় ঘটনার পেছনে এমন একটি বিশেষ কারণ থাকতে হবে যার আর নিজের কোন কারণ নেই (Uncaused cause)। আর এই বিশেষ কারণকেই তারা অভিহিত

করেছেন ঈশ্বর হিসেবে। বিষয়টি নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। প্রথমেই মনে করি, আমরা স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানি না, আর এই বিশ্বজগৎ ছাড়াও আর কোন বিশ্বজগতের সাথে পরিচিত নই। আমাদের যাবতীয় ব্যাখ্যা বিবৃতি- সব কিছুই আমাদের দেখা শোনা এবং অভিজ্ঞতার ফসল। আর অনেক ক্ষেত্রেই পূর্বসংস্কার যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা দেয়। এখন সমস্যাটির গোঁড়ায় নজর দেয়া যাক। আমরা আমাদের প্রাত্যহিক ঘটনার দিকে নজর দিলে দেখতে পাই, সব কিছুর পেছনে একটা কারণ আছে। কারণ ছাড়া কিছুই হয় না। আবার সেই কারণের পেছনেও একটা কারণ আছে। এখন, আমরা আমাদের চিন্তার উৎস হিসেবে এ কথাটিকে নিতে পারি, 'সবকিছুর পেছনে একটা কারণ আছে'। এবার আমরা, কারণের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধরে নিতে পারি - 'সব কিছুর পেছনে একজন ঈশ্বর আছেন, তিনি সবকিছুর কারণ, তার আর কোনো কারণ নেই'। এবার আবার আমাদের চিন্তার উৎসের দিকে নজর দেয়া যাক- প্রথমেই আমরা ধরে নিয়েছি - 'সব কিছুর পেছনে একটি কারণ আছে' কিন্তু পরে আবার নিজেরাই বলছি - -'ঈশ্বরের পেছনে কোনো কারণ নেই' । এই দুটি সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক ও বিপরীতমুখী। আমরা যেহেতু প্রথমেই স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নিয়েছি - 'সবকিছুর পেছনে একটি কারণ আছে' তাই ঈশ্বরের পেছনে কোনো কারণ থাকবে না তা হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) বলেন, "If everything must have cause, then God must have a cause"। আমরা সহজ ভাষায় বলতে পারি, সবকিছুর পেছনে যদি একজন স্রষ্টা থাকতেই হয় তবে তিনি আল্লাহ বা ঈশ্বর যাই হোন না কেন, তার পেছনেও একজন স্রষ্টা থাকতেই হবে।

আদি কারণের বিষয়ে আরো কিছু কথা বলা যায়। বিশ্বাসীরা আসলে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলতে চান - 'ঈশ্বর ছাড়া সব কিছুর পেছনেই কারণ আছে'। কিভাবে বুঝব যে এটি স্বতঃসিদ্ধ? কথা হচ্ছে ঈশ্বরকে আমরা দেখিনি। আমরা চোখের সামনে যা দেখছি তা হল- আমাদের চারপাশের বিশ্বজগত। কারণ ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব যখন বিশ্বাসীরা স্বীকার করে নিয়েছেনই, তখন 'ঈশ্বর' পর্যন্ত যাওয়া কেন, বিশ্বজগতে এসেই বা আমরা থেমে যাই না কেন? এ দাবীটি আমাদের সামনে উত্থাপন করেছিলেন ডেভিড হিউম ১৯৪৭ সালে তার Dialogues Concerning Natural Religion রচনায়[1]:

> 'But if we stop, and go no farther, why go so far? Why not stop at the material world? ... By supposing it to contain the principle of its order within itself, we really assert it to be god; and the sooner we arrive at that Divine Being, so much the better. When you go one step beyond the mundane system, you only excite an inquisitive humor, which it is impossible ever to satisfy'.

ডেভিড হিউম যখন এ কথাগুলো বলেছিলেন, তখনো আধুনিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ফলাফলগুলো জানা যায় নি। আজ যখন আধুনিক কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ফলাফলগুলো আমাদের চোখের সামনে আসতে শুরু করেছি, তখন দেখছি আধুনিক বিজ্ঞানের বহু তত্ত্বেই শুন্য থেকে মহাবিশ্ব উৎপত্তির কথা বলা হচ্ছে। পাঠকেরা এ সংক্রান্ত বিষয়ে ধারনা লাভ করতে চাইলে অভিজিৎ রায়ের 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের

[1] David Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith (Indianapolis: Bobbs-Merril, 1947), pp. 161-62.

যাত্রী' বইটি[2] পড়ে দেখতে পারেন। এ বইয়ের শেষ অধ্যায়ে অভিজিৎ কোয়াণ্টাম দোদুল্যমানতা (quantum fluctuation) প্রক্রিয়ায় কিভাবে জড় কণিকা তৈরি হয়, তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তাঁর 'ব্রীফ হিস্ট্রি অব টাইম' গ্রন্থে স্ফীতিতত্ত্বের জনক এলেন গুথের উদ্ধৃতি দিয়ে মহাবিশ্বকে 'আল্টিমেট ফ্রি লাঞ্চ' বলে অভিহিত করেছেন। হিউম যে কথাটা অনেক আগে বলেছিলেন, আধুনিক কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা সেটিই আমাদের সামন তুলে ধরেছে - কোয়াণ্টাম দোদুল্যমানতা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভাবেই শুন্য থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হতে পারলে ঈশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার দরকার কি?

আদিকারণের বিষয়ে আরো কিছু সমস্যা আছে। ধার্মিকদের আদিকারণ যে এক ও অদ্বিতীয় তার যুক্তি কী? এমনও কি হতে পারে না, আসলে আদিকারণ একটি নয় একাধিক। এ প্রসঙ্গে ইসলামের একমাত্র ও স্পষ্ট বক্তব্য হল, 'আসমান ও জমীনে যদি আল্লাহ ব্যতীত একাধিক ইলাহ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।' (সূরা আম্বিয়া- ২২)

এবার আমরা যদি মানুষের দিকে তাকাই, তবে দেখতে পাই একাধিক মানুষ মিলে সাধারনত একজন থেকে অধিকতর ভাল ও সুন্দর কিছু তৈরি করতে পারে। বর্তমান যুগে অনেক কিছুই বহু মালিকানাধীন, যা নিয়ে দ্বন্ধ খুব কমই হয়। তাহলে স্রষ্টার ব্যাপারে তার ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? একজনের বেশি হলেই তারা কেন মধ্যযুগীয় রাজার মত একজনের ওপর আরেকজন প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করবেন অথবা পরস্পর পরস্পরের সৃষ্টি ধ্বংসে মেতে উঠবেন, তা বোধগম্য নয়। এছাড়া তারা একেকজন যদি নিজের মত করে একেকটি মহাবিশ্ব বা মাল্টিভার্স সৃষ্টি করেন তাতেই বা বাধা কে দিবে? আবার তারা সকলে মিলে সবার মতানুসারে একটি মহাবিশ্ব তৈরি করলেই বা সমস্যা কোথায়? এছাড়া তাদেরকে যে একটা কিছু তৈরি করতেই হবে এমনও তো নয়। এই মহাবিশ্ব তৈরির আগে ঈশ্বর কিছু না করেই যেমন অলস সময় কাটাচ্ছিলেন তেমনি ভাবেই কাটিয়ে দিতে পারতেন অনন্ত সময়। তাই একত্ববাদের যুক্তি কতটা গ্রহণযোগ্য তাও ভেবে দেখতে হবে। ইবনে ওয়ারাক তাঁর 'Why I am Not a Muslim' গ্রন্থে হাল্কা রসিকতা করে বলেন, পলিথিইজম থেকে মনোথিজমে আসতে যেমন বহু 'গড'কে ছেঁটে ফেলা হয়েছে, তেমনি কালের পরিক্রমায় মনোথিইজম থেকে এথিজমে উত্তোরণের জন্য বাকী একটি 'গড'কেও ভবিষ্যতে ছেঁটে ফেলা হবে।

উদ্দেশ্যবাদীরা বলে থাকেন, স্রষ্টা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। স্রষ্টার মানুষ তৈরির উদ্দেশ্য একেক ধর্মে একেক রকম। যেমন- ইসলাম ধর্মমতে,

'জিন ও মানুষ জাতিকে আমি কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি' (৫১: ৫৬)।

এখানে প্রশ্ন এসে যায়, স্রষ্টার তো কোন অভাববোধ থাকতে পারে না এবং ইবাদতেরও তার কোনো প্রয়োজন নেই। তাহলে কেন মানুষকে ইবাদত বা উপাসনা করার জন্য সৃষ্টি করলেন। বর্তমানে লব্ধ জ্ঞানে আমরা জানি মহাবিশ্বের তুলনায় আমাদের পৃথিবী একটি বিন্দুসম। আর এই পৃথিবীতে যে মানুষগুলো আছে তা

[2] অভিজিৎ রায়, 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' অংকুর প্রকাশনী, ২০০৫

নিশ্চয়ই স্রষ্টার জন্য বড় একটা ব্যাপার হতে পারে না। আধুনিক যুগের পূর্বে সামান্য কিছু মানুষ ব্যতীত সকল মানুষই ছিল নিরক্ষর। আধুনিক যুগেও এসে মানুষকে সে অবস্থা থেকে পরিত্রাণ করা যাচ্ছে না। সেই মানুষগুলোকে স্রষ্টা কেনই বা এত উচ্চাশার সাথে তৈরি করলেন।

মানুষের চেয়ে উন্নততর কোনো প্রাণী নেই বিধায় আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতা আঁচ করতে না পেরে নিজেদেরকে অত্যন্ত জ্ঞানী ও ক্ষমতাবান মনে করতে থাকি। তাই হয়ত কল্পনা করি যে, অসীম জ্ঞানী স্রষ্টা আমাদের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হবেন না কেন।

এখানে আরেকটি কথা এসে যায়, ধর্মগ্রন্থসমূহ মতে যে উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য কি পূরণ হয়েছে? আমরা ইসলামের ইতিহাসে দেখতে পাই কখনো মুসলমানদের সংখ্যা অমুসলিমদের চেয়ে বেশি হয় নাই। এছাড়া মানুষ সাধারণত ধর্মের দৃষ্টিতে যতটা না সৎকাজ করে তার তুলনায় পাপাচার হচ্ছে ঢের বেশি। আর দুর্ভিক্ষ, খরা, বন্যা, ভূমিকম্প কিংবা সুনামীতে হাজারে হাজার নারী, পুরুষ আর নিরপরাধ শিশু মারা যাচ্ছে। এবার কেউ হয়ত বলতে পারেন স্রষ্টা আমাদেরকে পৃথিবীতে পরীক্ষা করছেন। তাহলে বলব, পরীক্ষার ফল কি হল? তিনি কেন তুচ্ছ মানুষদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। এটা কি তার পবিত্রতার বরখেলাপ নয়? যেহেতু সকল ধর্ম মতেই স্রষ্টা একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাই আপত্তিটি কিছুটা পরিবর্তিত রূপে সকল ধর্মের ক্ষেত্রেই উত্থাপন করা যায়।

অনেকে আবার স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য মহাবিশ্বের শৃঙখলার দোহাই দেন। এ বিষয়ে নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ স্টিফেন ওয়াইনবার্গ বলেন, 'যে বিশ্ব একেবারে বিশৃঙ্খল, বিধিবিহীন, তেমন একটি বিশ্বকে কোনো মূর্খের সৃষ্ট বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।'

অনেকে এমনও বলেন, স্রষ্টাকে আপনি বুঝবেন না। স্রষ্টাকে যদি নাইবা বুঝি তবে তাকে বিশ্বাস করব কিভাবে? যেখানে একেক ধর্মে একেক ধরনের স্রষ্টা; এছাড়া তার অস্তিত্বের বিরোধিতা অনেকেই করেছেন। আর আমরা স্রষ্টাকে না বুঝলে তিনি যে উদ্দেশ্যে আমাদের সৃষ্টি করেছেন বলা হয়, তা পূর্ণ হবেই বা কিভাবে? অবশ্য স্রষ্টা বিষয়টি মানুষের যদি অবোধগম্য হয়, তবে তা নিয়ে মাথাব্যথার কোন কারণ নেই। কেননা তাহলে তিনি অবশ্যই মানুষকে তাঁর আরাধনা বা স্তুতির জন্য নয়, অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। এটি অতিবর্তী ঈশ্বরবাদীদের(Deist) বিশ্বাস। যদিও 'ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন' ঈশ্বরের পেছনে জোরালো কোনো যুক্তি নেই, তবে তা আমাদের ব্যক্তি ও সমাজজীবনে তেমন কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলে না, বিধায় তা মন্দ হয়ত বলা যায় না। আরেকটি কথা, আমরা সাধারণতঃ বলে থাকি স্রষ্টাই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমরা বেমালুম ভুলে যাই যে, আমরা নর ও নারীর (পিতা-মাতা) মাধ্যমে জৈবিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। আমাদের জন্ম সম্পূণই তাদের (পিতা-মাতা) ইচ্ছা কিংবা সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল ছিল।

বিভিন্ন ধর্মমতে স্রষ্টার বিভিন্ন গুণ রয়েছে। যেমন- তিনি খুশি হন, রাগ করেন, দেখেন, শোনেন, বুঝেন। বলা হয় তিনি নিরাকার। আবার তাঁর নূর বা জ্যোতি রয়েছে! এছাড়া স্রষ্টার দুটি গুণ অসীম দয়ালু ও

ন্যায়বিচারক পরস্পরবিরোধী। যিনি ন্যায়বিচারক, তিনি দয়ালু হন কিভাবে আর যিনি দয়ালু, তিনি ন্যায়বিচারক হন কিভাবে? এছাড়া তার বসবার জন্য রয়েছে সিংহাসন (আরশ); স্রষ্টাকে বলা হয় অসীম আবার তাকে কেন্দ্রীভূত করা হয় নির্দিষ্ট একটি জায়গায়। স্রষ্টাকে বলা হয় তিনি অসীম ক্ষমতাবান। তাহলে তিনি কি এমন কিছু তৈরি করতে পারবেন যা তিনি নিয়ন্ত্রণে অক্ষম। প্রশ্নটির উত্তর হ্যা বা না যেটিই হোক তা তার অক্ষমতা প্রকাশ করবে। অর্থাৎ অসীম ক্ষমতাবান বা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলতে কিছু নেই। এছাড়া স্রষ্টা বিষয়ে আরেকটি প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ, স্রষ্টার কি এমন কোন গুণ রয়েছে যা সীমিতভাবে মানুষের মধ্যে নেই? তা তো থাকার কথা ছিল, কিন্তু নেই। এতে বিষয়টি পরিস্কার যে, মানুষের পক্ষে স্রষ্টার ও তার গুণাবলির কল্পনা সম্ভব এবং মানুষ তা-ই করেছে।

বিভিন্ন ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব ও অন্যান্য কিছু প্রসঙ্গ

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম মতে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্বর্গ, পৃথিবী, জীবজগৎ ও বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং তারপর তিনি আদম (অ্যাডাম) ও হাওয়া (ইভ) নামক প্রথম মানব-মানবীকে মাটি থেকে তৈরি করে প্রাণ দেন। সৃষ্টিমূহুর্তে পৃথিবী ছিল আকারহীন ও শূণ্য এবং মহা অন্ধকারে নিমজ্জিত। বিশ্ব মহাপ্রলয়ের মাধ্যমে ধ্বংস হবে আর ঐ দিনই ঈশ্বর সকলের কৃতকর্মের বিচার করবেন।

বাইবেল গ্রন্থটি স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। শ্রদ্ধেয় ডাঃ ওয়াহিদ রেজা তাঁর 'ধর্মচেতনা ও ঈশ্বরবিশ্বাস' (এ বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে সংকলিত) প্রবন্ধে মানুষ সম্পর্কিত বাইবেলের ৬টি স্ববিরোধী উক্তি উল্লেখ করেছেন :

১। মানুষ সৃষ্টি হওয়ার আগে গাছ এলো (জেনেসিস ১: ১১-১২) মানুষ তৈরি হওয়ার পর গাছ সৃষ্টি হলো (জেনেসিস ১: ৭-৯)।
২। জন্তু জানোয়ারদের পরে মানুষ সৃষ্টি হলো (জেনেসিস ১: ২৫-২৬) জন্তু জানোয়ারদের আগে মানুষ সৃষ্টি হলো (জেনেসিস ২: ১৮-২০)
৩। আদম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার দিনই মরবে (জেনেসিস ২: ১৭) আদম ৯৩০ বছর বেঁচেছিল (জেনেসিস ৫: ৫)
৪। ঈশ্বর মানুষকে লোভ দেখান না (জেমস ১: ১৩) ঈশ্বর মানুষকে লোভ দেখান (জেনেসিস ২২ : ১/২ স্যামুয়েল ২৪ :১)
৫। কোন মানুষ ঈশ্বরকে দেখেনি বা দেখতে পারে না (জন ১ : ১৮/১ টিম ৬ : ১৬) অনেকের কাছেই তিনি দেখা দিয়েছেন (জেনেসিস ২৬ : ২/ এক্সোডাস ২৪ : ৯-১০, ৩৩ : ২২-২৩)
৬। কেউই ঈশ্বরের মুখদর্শন করার পর বেঁচে থাকতে পারে না (এক্সোডাস ৩৩ : ২০) জেকব ও মুসা দুজনেই ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখেছেন কিন্তু মরেন নি (জেনেসিস ৩২: ৩০, এক্সোডাস ৩৩ : ১১)

বাইবেল ও কোরানের মতে পৃথিবী স্থির। বাইবেলের এই ধারণার কারণে সৌরকেন্দ্রিক মতবাদের জন্য ব্রুনোকে পুড়িয়ে মেরেছিল খ্রিস্টান ধর্মপুরুষরা, গ্যালিলিওকে করেছিলো গৃহবন্দি। এবার কোরানে আসা যাক। কোরানের ভাষায়[3]-

[3] বঙ্গানুবাদ কোরান শরীফ মাও. ফজলুর রহমান মুন্সি।

'নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও জমিনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়।' (৩৫:৪১, তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন)
'ইহা তার নিদর্শনসমূহ-আসমান জমিন তারই হুকুমে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে।' (৩০:২৫)

সৃষ্টিসম্পর্কে কোরানের অন্যত্র বলা হয়েছে,

'আর তিনি এমন যে, সমস্ত আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, তখন আরশ[4] ছিল পানির উপরে।' (১১:৭)

'আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীকে পানি হতে সৃষ্টি করেছেন' (২৪:৪৫) আবার কিয়ামত সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সেদিন আটজন ফেরেশতা রবের আরশ বহন করবেন' (৬৯:১৭)

সূরা নিসার ১১ ও ১২ নং আয়াত মতে, মৃত ব্যক্তির মা, বাবা, দুই মেয়ে ও এক স্ত্রী থাকলে তার সম্পত্তির মা পাবে ১/৬, বাবা ১/৬, দুই মেয়ে ২/৩ ও স্ত্রী ১/৮ অংশ। তাহলে মোট অংশ দাঁড়ায় (১/৬+১/৬+২/৩+১/৮) = ২৭/২৪ অংশ, যা মূল পরিমাণের চেয়ে বেশি। পরে হজরত আলী তা সংশোধন করেন, যা ফরায়েজে আইনে 'আউল' নামে পরিচিত।

সূরা ফাতেহা (বিশেষত আয়াত চার থেকে সাত) আল্লাহর বাণী হয় কিভাবে? পুরো সূরাটি পড়লে সুরাটিকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা বলেই মনে হয়। সেখানে আল্লাহর কাছে সঠিক পথ দেখানোর আহবান জানানো হয়েছে। ইবনে ওয়ারাক তার 'Why I am Not a Muslim' গ্রন্থে এ নিয়ে বিস্তৃতভাবে লিখেছেন। আমি সুরা ফাতেহা সম্পর্কে ইবনে ওয়ারাকের বই থেকে একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিচ্ছি[5] -

'These words are clearly addressed to God, in the form of prayer. They are Muhammad's words of praise to God, asking God's help and guidance'

এছাড়া সূরা তওবা স্বতন্ত্র সূরা নাকি অন্য কোন সূরার বা সূরা আনফালের অংশ তা নিয়ে বিভেদ আছে। সূরা ফীল ও কোরাইশ এক সূরা নাকি পৃথক দুটি সূরা তা নিয়ে অনেক বিতর্ক ছিল। তাছাড়া কোরানের আয়াত, শব্দ, বর্ণ, সংখ্যা নিয়ে বিভেদ রয়েছে, তা অনেকেই খেয়াল করেন না।

এবার আসি হাদিসে। আবু যর গেফারি (রা.) একদিন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে সূর্যাস্তের সময় মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন আবু যর, সূর্য কোথায় অস্ত যায় জানো? আবু যর বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই ভাল জানেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, সূর্য চলতে চলতে আরশের নিচে পৌঁছে সেজদা করে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকেও এই সম্বন্ধে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যহ সূর্য আরশের নিচে পৌঁছে সেজদা এবং নতুন পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি লাভ করে নতুন পরিভ্রমণ শুরু করে[6]।

---

[4] আরশ শব্দের অর্থ রাজসিংহাসন; আল্লাহর আসন।

[5] Ibn Warraq, Why I Am Not a Muslim, Prometheus Books, 1995

[6] সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৪/৫৪/৪২১ দ্রঃ; তফসীর মাআরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা-১১৩৩

এখন প্রশ্ন হল পৃথিবীর এক জায়গায় সূর্যাস্ত হলে অন্য জায়গায় থাকবে দুপুর, আরেক জায়গায় থাকবে সূর্যোদয়। তাহলে যা বলা হল, তার ব্যাখ্যা কী?

বিশ্বসৃষ্টির আদিতে যে অবস্থা বিরাজ করছিল, হিন্দুধর্মের মনুসংহিতার ঋষি তা বর্ণনা করেছেন এভাবে, 'এই যে বিশ্বসংসার চোখের সামনে প্রত্যক্ষ তা ছিল গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত। এই অন্ধকার জগ ছিল আমাদের জ্ঞানের অতীত, কোনো লক্ষণের সাহায্যে এ সম্পর্কে অনুমানের কোনো উপায় ছিল না। এই জগ ছিল অজ্ঞেয়, যেন সর্বতোভাবে গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন। এই প্রলয়াবস্থার পর স্বয়ম্ভূ সূক্ষরূপী ভগবান পঞ্চমহাভূত প্রভৃতিতে ব্যক্ত করলেন- তিনি অমিততেজা, প্রলয়াবস্থার বিনাশক রূপেই যেন আবির্ভূত হলেন।' (মনুসংহিতা ১: ৬-৭)

সৃষ্টির আদিতে কী ছিল তা ঐতিরেয় উপনিষদে' বিবৃত হয়েছে- 'সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপেই বর্তমান ছিল; নিমেষাদি ক্রিয়াশীল অন্য কিছুই ছিল না। সেই আত্মা এই রূপ ঈক্ষন করিলেন- "আমি লোকসমূহ সৃজন করিব"।' (১:১:১)

বৃহদারণ্যক উপনিষদের মতে, 'পূর্বে কিছুই ছিল না, এই জগ ভোজনেচ্ছারূপ মৃত্যু দ্বারা আবৃত ছিল, কারণ বুভুক্ষাই মৃত্যু। 'আমি সমনস্ক হইব'- এইরূপ উদ্দেশ্যযুক্ত হইয়া ঐ মৃত্যু কার্যপর্যালোচনক্ষম মনের সৃষ্টি করলেন। তিনি আপনাকে পূজা করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি যখন অর্চনারত ছিলেন, তখন উদক (জল) উৎপন্ন হইল।' (১:২:১) 'জলই অর্ক। উক্ত স্থলে জলের উপরে সরের ন্যায় যাহা হইয়াছিল, উহা গাঢ় হইল; এবং উহা পৃথিবীতে পরিণত হইল। পৃথিবী সৃষ্টি হইলে শ্রান্ত ক্লান্ত সেই মৃত্যু থেকে তেজোরস নির্গত হইল; (ইনিই) অগ্নি অর্থাৎ বিরাট।' (১:২:২)

এ বর্ণনা থেকে এটাই উপলব্ধি হয় যে, হিন্দুধর্মের সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে বিজ্ঞানের কোনও সম্পর্ক নেই এবং তা আদিম কল্পনা বৈ কিছু নয়।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, যুক্তির সাথে বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব প্রকট এবং বিরাট। যুক্তির ওপর ভর করে বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে। আর বিশ্বাসের ওপর ভর করে ধর্মগ্রন্থগুলো। এখন আপনি কোনটি গ্রহণ করবেন?

আমরা এ কথা স্পষ্টভাবে মনে করি- ধারণ করি, আমাদেরকে অবশ্যই ধর্মগ্রন্থগুলো পড়তে হবে, যার যার নিজের ভাষায়, যুক্তি প্রয়োগ করে বুঝতে হবে ধর্মগ্রন্থে বাণীসমূহের মর্মার্থ। শুধু পুণ্যলাভের আশায় পবিত্র ভাষায় না বুঝে, পাঠ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। না বুঝে পাঠ করলে শুধুই অজ্ঞতাই বৃদ্ধি পায়, জ্ঞান বাড়ে না। আর এই অজ্ঞতা নামক দুর্বলতার সুবিধা নেয় আমাদের চারপাশের কিছু ভণ্ড মোল্লা-মৌলভি, পির-ফকির, ঠাকুর প্রমুখেরা। তাই আমাদের সমাজকে বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল করে তুলতে হলে, আসুন আমরা যুক্তির আশ্রয় নেই। ঝেড়ে ফেলি সকল অজ্ঞতা, কুসংস্কার আর পবিত্র বিশ্বাসের নামে অপবিশ্বাসগুলো। এর কোনো বিকল্প নেই।

সৈকত চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল-এর সদস্য। যুক্তি পত্রিকাটিতে নিয়মিতভাবে তার লেখা প্রকাশিত হয়।

ব্যাড ডিজাইন

অভিজিৎ রায়

সিঙ্গাপুরে থাকাকালীন সময়গুলোতে সপ্তাহান্তে একবার হলেও সেরাঙ্গুন যেতাম। সিঙ্গাপুরে বসবাসরত বাঙালীরা সবাই সেরাঙ্গুন জায়গটাকে চেনেন। বাঙালী খাবার দাবার খেতে, কিংবা বাংলা পত্র-পত্রিকা পড়তে চাইলে সেরাঙ্গুন ছাড়া কারো গতি নেই। শুধু খাবারের দোকান বা বাংলা পত্রিকাই বা বলি কেন, সেরাঙ্গুনে কি নেই! বাঙালী লুঙ্গি, গামছা কিংবা 'হালাল মাংস' থেকে শুরু করে মৌসুমীর ছবি সম্বলিত 'ফোন কার্ড', কিংবা বিপাশার ছবিওয়ালা 'লাক্স সাবান', তিব্বতী কদুর তেল সবই পাবেন সেখানে। আমার অবশ্য কদুর তেল কেনার শখ ছিল না কখনও। আমার ক্ষেত্রে যেটা হত আমার বাসার পাশে কেমেন্টির ফুড স্টলে রোজ রোজ চাইনিজ বা মালে খাবার খেতে খেতে একসময় অরুচি ধরে যেত। হঠাৎ করেই তখন একদিন ইচ্ছে হত ধনে পাতা আর টম্যাটো দিয়ে বাঙালী কায়দায় রান্না করা রুইমাছ দিয়ে ভাত খেতে। তখন এম.আর.টি (সিঙ্গাপুরের পাতাল রেলের নাম) চেপে সটান চলে যেতাম সেরাঙ্গুনে।

এমনি একদিন রবিবারের অলস দুপুরে ঘুম ভেঙে বিছানায় একটু গড়িয়ে নিচ্ছি। রোববার ছুটির দিন। ইউনিভার্সিটি যাওয়ার তাড়া নেই। বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না একদমই। এরকম উঠবো-উঠি করে গড়াগড়ি করতে করতেই সকাল পার করে দুপুরে করে ফেললাম। পেটে খিদে মোচর দিতে শুরু করায় গা ঝাড়া দিয়ে উঠতেই হল শেষ পর্যন্ত। ভাবলাম খেতে যখন হবেই সেরাঙ্গুনে গিয়েই খাওয়া যাক। চোখের সামনে ভেসে উঠল রুইমাছের ঝোল, বেগুন ভাজি, আলুভর্তা, ডাল। তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। হাতমুখ ধুয়েই বাইরে বেড়িয়ে পড়লাম, তারপর সোজা এম.আর.টি স্টেশনে। সেরাঙ্গুনে নেমে সেখানকার এক বাঙালী খাবারের দোকানে (মোহাম্মদীয়া রেস্টুরেন্ট) খেয়ে দেয়ে তন্নয়ে একটু ঢু মারার জন্য উঠে পড়লাম। তন্নয় হচ্ছে কাঁচা বাজারের দোকান। বাঙালীদের জন্য মাছ আর 'হালাল' মাংসের আরত। সাথে পুঁই শাক, ডাটা শাক আর কচুশাক, ঝিঙ্গা, বেগুন, লাউ সবই পাবেন। ভাবলাম এসেছি যখন বাজারটা সেরে যাই। কিন্তু ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। এক 'সুললিত' কণ্ঠের ওয়াজ-মাহফিলের আওয়াজ কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে। আমার তো আক্কেল গুরুম। এই ভর দুপুরে এখানে ওয়াজ করছে কে রে বাবা! গলাটা বাড়াতেই হল। দেখলাম তন্নয়ের পাশে নতুন গজিয়ে ওঠা ক্যাসেটের দোকান থেকে আসছে এই আওয়াজ। ক্যাসেটের দোকানে বাজবে গান-মান্না দে, সুমন কিংবা নচিকেতা না বাজুক, অন্ততঃ মমতাজের 'বুকটা ফাইট্যা যায়' তো বাজতে পারে! কিন্তু সব ছেড়ে ছুড়ে হেরে গলায় ওয়াজ কেন। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলাম এটা নাকি দেলোয়ার হোসেন-সাঈদীর ওয়াজের ক্যাসেট। ওটা শুনলে নাকি 'বালা মুসিবৎ' দূর হয়! এই ধর্মীয় জিকির তুলে 'বালা মুসিবৎ' দূর করার ব্যাপারটি ইদানিং সব জায়গাতেই বোধহয় ঢুকে গেছে। মনে আছে ছোটবেলায় ঢাকা থেকে দূর পাল্লার বাসে করে যখন চট্টগ্রাম যেতাম, তখন বাসের ড্রাইভার ক্যাসেট প্লেয়ারে চালিয়ে দিত হিন্দি ছবির গান। আর আমরা গানের তালে তালে পা ঠুকতাম - 'হাওয়া মে উড়তে যায়ে, মেরে লাল দোপাট্টা...'। কিন্তু নব্বই দশকের পর সেই বাসগুলোতেই যখন উঠতাম তখন সেখানে হিন্দি গানের বদলে শুনতে পেতাম ক্বারী হাবিবুল্লাহ বেলালীর কোরান তেলোয়াত (এখন বোধ হয় বাজতে থাকে সাঈদীর ওয়াজের ক্যাসেট, কে জানে!)। কেউ সেগুলো বন্ধ করার সাহসটুকু দেখাতে পারত না। খোদ্ সৃষ্টিকর্তার বাণী বলে কথা! শুধু এই দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়

বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ নির্মাণে আমরা কতটুকু এগুতে পেরেছি। যাহোক, সেদিন আমিও তন্ময়ের পাশে ওই ক্যাসেটের দোকানে দাঁড়িয়ে নিজের 'বা মুসিবৎ' দূর করার মানসেই বোধ হয় সাঈদীর ওয়াজের প্রতি মনোযোগী হলাম। ভদ্রলোক বয়ান করেন ভাল। বাংলাদেশের হতদরিদ্র লোকগুলো দূর-দূরান্ত থেকে কিসের আশায় তার বয়ান শুনতে পাগলের মত সাঈদীর ওয়াজে ছুটে যান, তা বোঝা যায়। মানুষের 'আবেগ আর দুর্বলতা' নিয়ে খেলতে পারেন বটে ভদ্রলোক। কখনও তার প্রিয় নবীজীর ওপর কাফেরদের অত্যাচারের ফিরিস্তি দিতে দিতে হাউ মাউ করে কাঁদতে থাকেন, আবার কখনও বা ইহুদি-নাসারাদের ওপর প্রতিশোধ স্পৃহায় অগ্নিশর্মা হন। নামাজ-রোজার ফজিলত থেকে শুরু করে নারীদের বেপর্দা চলাফেরার বিপদ-সবই আছে তার বয়ানে। এ পর্যন্ত সবই ঠিক ঠাক ছিল; বয়ান করতে করতে ভদ্রলোক 'সবজান্তা শমশেরের'-এর মতই দর্শন আর বিজ্ঞানের জগতেও ঢুকে পড়লেন। কাঁপা কাঁপা গলায় ফিরিস্তি দিতে থাকলেন আল্লাহতালার সৃষ্টি কত নিখুঁত, কত 'পারফেক্ট ডিজাইন'। কোথাও কোন খুঁত নেই! তারপরেও নাস্তিকেরা কন যে আল্লাহয় বিশ্বাস করে না! সাঈদী সাহেব খোদা-তালার সৃষ্টি যে কত নিখুঁত তা প্রমাণ করার জন্য বেছে নিলেন মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ 'চোখ'কে। আমি তো অবাক। ভাবলাম একবিংশ শতকের 'উইলিয়াম প্যালে'র আবির্ভার হল নাকি! মনোযোগ দিয়ে শুনলাম হুজুর কি বলেন। পাকা দার্শনিকের মত বলে চললেন, এমন নিখুঁত অঙ্গ নাকি কোথাও নেই। খোদাতালার অপূর্ব ডিজাইন। বিজ্ঞানীরা হাজার চেষ্টাতেও অমনতর চোখ কখনও তৈরি করতে পারেনি, পারবেও না ইত্যাদি।

আমি মনে মনে হাসলাম। বুঝলাম আধুনিক বিজ্ঞান কিছুই তার পড়া হয়নি, যদিও আইডি (ID বা Intelligent Design) বা 'বুদ্ধিমত্ত পরিকল্প/নকসা' নামধারী আধুনিক সৃষ্টিবাদীদের ভুল প্রচারণাকে গ্রহণ করেছেন বেশ ভালভাবেই। বিজ্ঞানীরা বলেন সাঈদীর মত লোকেরা চোখকে যতটুকু নিখুঁত ভাবেন, সেরকম মোটেই নয়। প্রাণীদেহে চোখের উদ্ভব একদিনে হয়নি, হয়েছে দীর্ঘকালের বিবর্তনের পথ ধরে। আর বিবর্তন বা প্রাকৃতিক নির্বাচন যেহেতু শুধুমাত্র বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর ভিত্তি করে দীর্ঘ সময় ধরে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হয়, তাই খুব যুক্তিসঙ্গত কারণেই প্রাণীদেহে অনেক ত্রটিপূর্ণ অঙ্গপ্রতঙ্গ দেখা যায়। মানুষের চোখও তার ব্যাতিক্রম নয়। মানুষের চোখের অক্ষিপটের ভিতরে একধরনের আলোগ্রাহী কোষ আছে যারা বাইরের আলো গ্রহণ করে এবং তারপর একগুচ্ছ অপটিক নার্ভের মাধ্যমে তাকে মস্তিষ্কে পৌঁছোনোর ব্যবস্থা করে, যার ফলে আমরা দেখতে পাই। মানুষের চোখ যদি কোন বুদ্ধিমান স্রষ্টার 'সর্বাঙ্গ সুন্দর ও নিখুঁত নকসা' (perfect design) হত তা হলে নিশ্চয়ই জালের মত করে ছড়িয়ে থাকা এই স্নায়ুগুলোকে আলোগ্রাহী কোষগুলোর সামনের দিকে বসানো থাকত না! কারণ এ ধরনের নকসায় অপটিক নার্ভের জালিতে বাধা পেয়ে আলোর একটা বড় অংশ ফিরে যায় আর আমরা এমনিতে যতখানি দেখতে পেতাম তার থেকে কম দেখতে পাই এবং এর ফলে আমাদের দৃষ্টির মান অনেক কমে যাবে! কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, বাস্তবেই আমাদের চোখ ওরকম। আমাদের অক্ষিপটের ঠিক সামনে এই স্নায়ুগুলো জালের মত ছড়ানো থাকে, শুধু তাই না, এই স্নায়ুগুলোকে যে রক্তনালীগুলো রক্ত সরবরাহ করে তারাও আমাদের অক্ষিপটের সামনেই বিস্তৃত থাকে, এর ফলে আলো বাধা পায় এবং আমাদের দৃষ্টিশক্তি কিছুটা হলেও কমে যায়। শুধু তাই নয়, স্নায়ুগুলোর এই অসুবিধাজনক অবস্থানের কারণে আমাদের চোখে আরেকটি বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ স্নায়বিক জালটি মস্তিষ্কে পৌঁছোনোর জন্য অক্ষিপটকে ফুটো করে তার ভিতর দিয়ে পথ করে নেয়। এর ফলে একটি অন্ধবিন্দুর (blind spot) সৃষ্টি হয়।

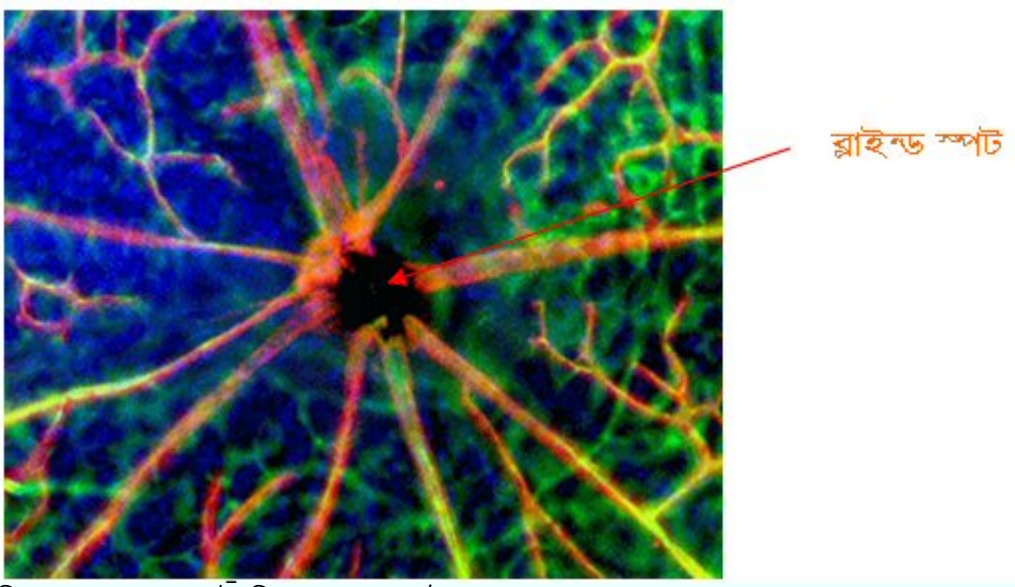

চিত্র : চোখের ভেতর তৈরি হওয়া অন্ধ স্পট

আমাদের প্রত্যেকের চোখেই এক মিলিমিটারের মত জায়গা জুড়ে এই অন্ধবিন্দুটি রয়েছে, আমরা আপাততভাবে বুঝতে না পারলেও ওই স্পটটিতে আসলে আমাদের দৃষ্টি সাদা হয়ে যায়। মানুষের চোখের আরও সমস্যা আছে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে দৃষ্টিশক্তি কমতে শুরু করে। দেখা দেয় দূরদৃষ্টি বা ক্ষীণদৃষ্টিসহ নানা ধরনের সমস্যার। এর কারণ হচ্ছে আমাদের কর্নিয়ার মধ্যে সংরক্ষিত তরল সময়ের সাথে সাথে তার স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলে। চুরন্ধ্র বা আইরিস এবং লেন্সের ফোকাস নিয়ন্ত্রণকারী মাংসপেশীগুলোর গতিশীলতা সময়ের সাথে সাথে অনেক কমে যায়; লেন্স ঝাপসা হয়ে আসে, রঙের ব্যতিচার ঘটে। শুধু তাই নয়, যে রেটিনা আমাদের চারপাশের ছবিগুলোকে আমাদের মস্তিষ্কে স্থানান্তরের জন্য দায়ী - অনেক সময় অতি সহজেই চোখের পেছন থেকে বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যার ফলে এমনকি অন্ধত্ব পর্যন্ত ঘটতে পারে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন সামান্য 'রি-ইঞ্জিনিয়ারিং' এবং 'রি-ডিজানিং' এই ব্যাড ডিজাইন থেকে মুক্তি দিতে পারে। নিচের ছবিতে প্রকৌশলবিদের দৃষ্টিকোণ থেকে চোখের ডিজাইন জনিত সমস্যার সমাধান দেখানো হয়েছে।

সাঈদী সাহেব যাই বলুন না কেন, অনেক প্রাণীর চোখই তথাকথিত 'সৃষ্টির সেরা জীব' মানুষের চোখের চেয়ে উন্নত। কুকুর, বিড়াল কিংবা ঈগলের দৃষ্টিশক্তি যে মানুষের চোখের চেয়ে বেশি তা সবাই জানে। মানুষ তো বলতে গেলে রাতকানা, কিন্তু অনেক প্রাণীই আছে রাতে খুব ভাল দেখতে পায়। আবার অনেক প্রাণীই আছে যাদের চোখে কোন অন্ধবিন্দু নেই। যেমন, স্কুইড বা অক্টোপাসের কথাই ধরা যাক। এদের মানুষের মতই একধরনের লেন্স এবং অক্ষিপটসহ চোখ থাকলেও অপটিক নার্ভগুলো অক্ষিপটের পিছনে অবস্থান করে এবং তার ফলে তাদের চোখে কোন অন্ধবিন্দুর সৃষ্টি হয়নি।

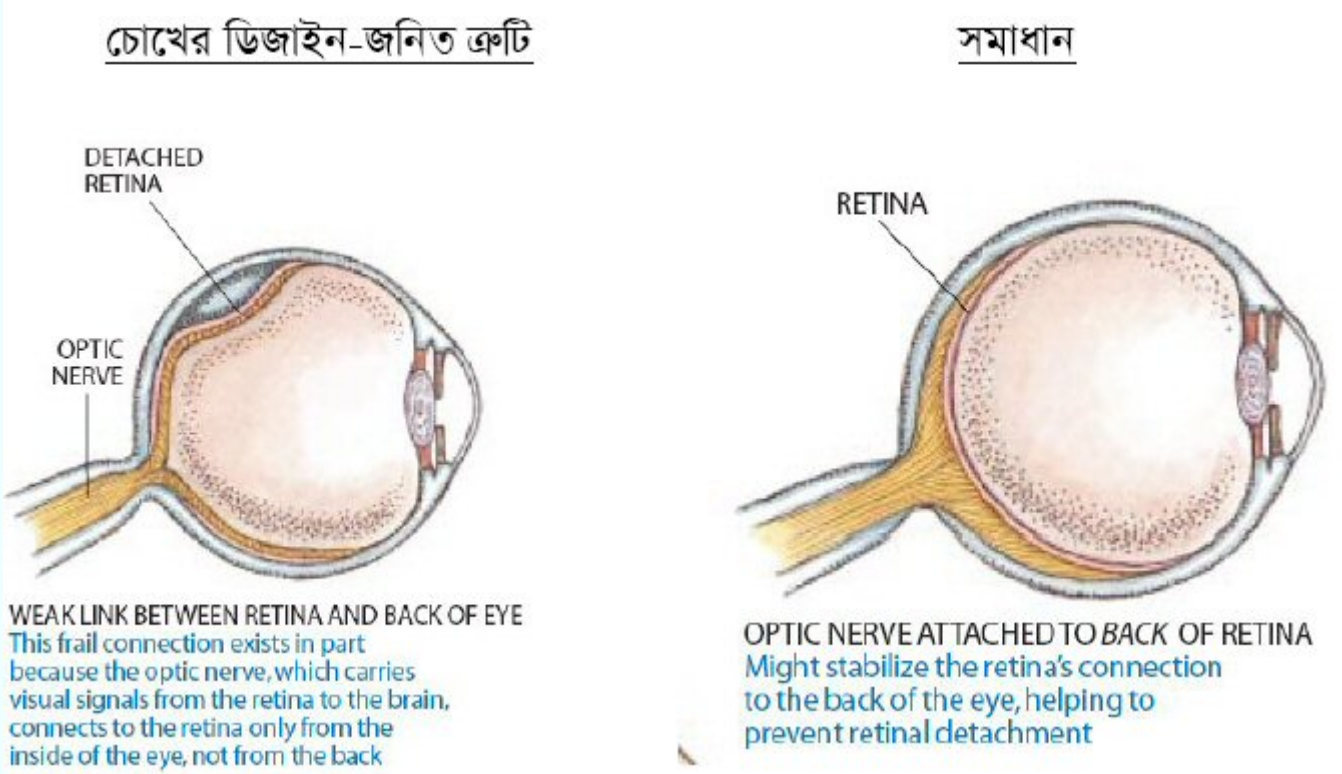

চিত্র : কোন সর্বজ্ঞ স্রষ্টার নিখুঁত সৃষ্টিতে নয়, বরং প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে চোখের উদ্ভব হওয়ায় আমাদের চোখে অনেক ধরনের 'ডিজাইন-জনিত' ত্রুটি রয়ে গেছে, যেগুলোর অনেকগুলোই ইঞ্জিনিয়ারের দৃষ্টিকোণ থেকে সুচারুভাবে 'রি-ডিজাইন' করে সমাধান করা সম্ভব।

আসলে বিবর্তন তত্ত্বের মাধ্যমে আমাদের চোখের এই সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটিকে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। বিবর্তন কাজ করে শুধুমাত্র ইতোমধ্যে তৈরি বা বিদ্যমান গঠনকে পরিবর্তন করার মাধ্যমে, সে নতুন করে কিছু সৃষ্টি বা বদল করতে পারে না। মানুষের মত মেরুদ-ী প্রাণীর চোখ সৃষ্টি হয়েছে মস্তিষ্কের বাইরের দিকের অংশকে পরিবর্তন করে যা অনেক আগেই সৃষ্টি হয়েছিলো, বহুকাল ধরে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের এই সংবেদনশীল কোষগুলো অক্ষিপটের আকার ধারণ করলেও মস্তিষ্কের পুরোনো মূল গঠনটি তো আর বদলে যেতে পারেনি, তার ফলে এই জালের মত ছড়িয়ে থাকা স্নায়ুগুলোও তাদের আগের অবস্থানেই রয়ে গেছে। কিন্তু অন্যদিকে স্কুইড জাতীয় প্রাণীর চোখ বিবর্তিত হয়েছে তাদের চামড়ার অংশ থেকে, মস্তিষ্কের অংশ থেকে নয়। এক্ষেত্রে ত্বকের স্নায়ুগুলো মস্তিষ্কের মত ঠিক বাইরের স্তরে না থেকে ভিতরের স্তরে সাজানো থাকে, আর এ কারণেই স্নায়ুগুলো মলাষ্কের চোখের অক্ষিপটের সামনে নয় বরং পিছনেই রয়ে গেছে। আমাদের চোখ যদি এভাবে লাখ লাখ বছর ধরে প্রাকৃতিভাবে বিবর্তিত না হয়ে কোন পূর্বপরিকল্পিত ডিজাইন থেকে তৈরি হত তাহলে হয়তো চোখের এত সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মাথা ঘামাতে হত না।

সাঈদী সাহেব যে বলেছেন বিজ্ঞানীরা কখনো চোখ তৈরি করতে পারবে না, এটিও স্ড়েরফ মিথ্যাচার। মানুষের চোখের চেয়ে শক্তিশালী 'চোখ' অনেক আগেই তৈরি করা হয়েছে। আসলে মানুষের চোখ অপটিক্যাল ইমেজিং

ডিভাইস হিসাবে খুবই দুর্বল -কেবল লাল থেকে বেগুণী বর্ণালীর সীমায় সংবেদনশীল। ফলে মানুষ বিকিরণ স্পেক্ট্রামের এক ক্ষুদ্র অংশ (৪০০-৭০০ ন্যানোমিটার*) মাত্র দেখতে পায় ($1\ nm = 10^{-9}m$)। বিজ্ঞানীদের তৈরি অবলোহিত টেলিস্কোপগুলো এর চাইতে অনেক বেশি পরিসরে সংবেদনশীল। ওগুলোর কথা না হয় বাদ দিন, বাজারে পাওয়া যে কোন সস্তা দামের ক্যামেরাও মানুষের চোখের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। আর যে বৈজ্ঞানিক ক্যামেরাগুলো জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতে ব্যবহৃত হচ্ছে (বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ কিংবা বর্ণালী বিশ্লেষণ ও উদ্ঘাটনে), সেগুলো মানুষের চোখের চেয়ে হাজারগুণ শক্তিশালী।

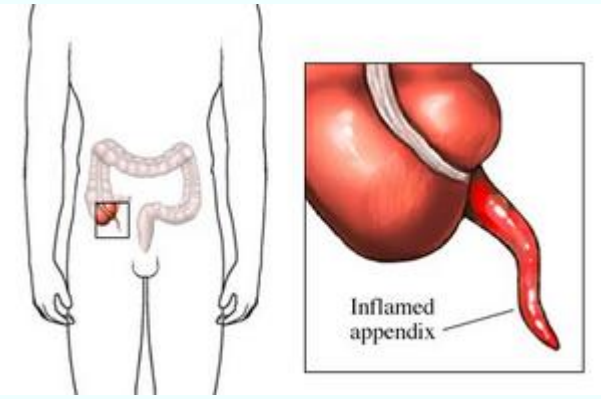

চিত্র: অ্যাপেন্ডিক্স দেহের কোনই কাজে লাগে না, বরং বর্তমানে অ্যাপেন্ডিসাইটিস রোগের বড় উ□সই হল এই অ্যাপেন্ডিক্স।

মানবদেহে এ ধরনের 'ত্রুটিপূর্ণ ডিজাইনের' অনেক প্রমাণ হাজির করা যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হল মানবদেহে থেকে যাওয়া বিলুপ্ত প্রায় অঙ্গের অস্তিত্ব¡। যেমন, আমাদের পরিপাকতন্ত্রের অ্যাপেন্ডিক্স কিংবা পুরুষের স্তনবৃন্ত। এগুলো তো দেহের কোন কাজে লাগে না, বরং বর্তমানে অ্যাপেন্ডিসাইটিস রোগের বড় উৎসই হল অ্যাপেন্ডিক্স নামের বাড়তি প্রত্যঙ্গটি। তা হলে এগুলো দেহে থাকার পেছনে কি ব্যাখ্যা? একজন সর্বজ্ঞ স্রষ্টা কিংবা বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পকের (ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনারের) সৃষ্টি এত বুদ্ধিহীন (আনইন্টেলিজেন্ট) হবে কেন যে ত্রুটিগুলো ছা-পোষা সাধারণ মানুষের চোখেও ধরা পড়ে? শুধু তো অ্যাপেন্ডিক্স নয়, আমাদের দেহে রয়ে গিয়েছে চোখের নিক্টিটেটিং ঝিল্লি, কান নাড়াবার কিছু পেশী, ছেদক, পেষক এবং আক্কেল দাঁত, মেরুদন্ডের একদম নিচে থেকে যাওয়া লেজের হাড়, সিকামসহ শতাধিক নিষ্ক্রিয়, অবান্তর এবং বিলুপ্ত অঙ্গাদি। কোন মহান 'সৃষ্টি তত্ত্ব' কিংবা 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' দিয়ে এগুলো ব্যাখ্যা করা যায় না। এ মুহূর্তে এগুলোকে সফলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে কেবল বিবর্তন তত্ত্ব। দেখা গেছে, এপেন্ডিক্স এবং সিকাম মানুষের কাজে না লাগলেও তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্য হজম করার জন্য অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। প্রাচীন নরবানর যেমন Australopithecus robustus তৃণসহ সেলুলোজ জাতীয় খাদ্য প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করত। এখনো শিম্পাঞ্জীরা মাংশাসী নয়। কিন্তু মানুষ খাদ্যাভাস বদল করে লতা পাতার পাশাপাশি একসময় মাংশাসী হয়ে পড়ায় দেহস্থিত এই অঙ্গটি ধীরে ধীরে একসময় অকেজো এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তাই এখন অ্যাপেন্ডিক্স এবং সিকাম আমাদের কাজে না লাগলেও রেখে দিয়ে

গেছে আমাদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় 'বিবর্তনের সাক্ষ্য'। এ ধরনের মন্দ নকসার দৃষ্টান্তগুলো বিবর্তন ছাড়া আর কোনভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় না।

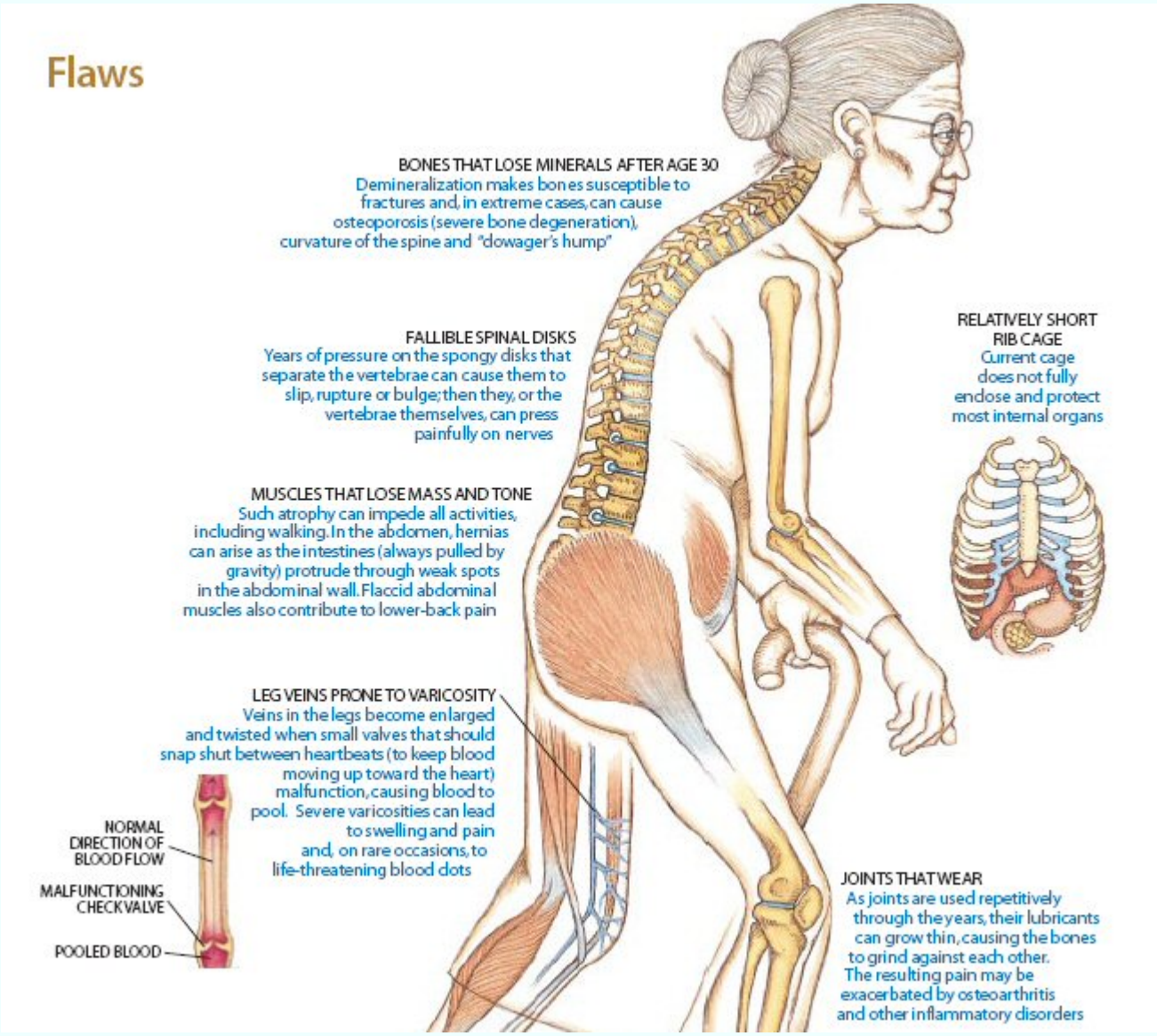

চিত্র: সায়েন্টিফিক আমেরিকানের ২০০১ সালের মার্চ সংখ্যায় মানবদেহের বিভিন্ন 'দুর্বল ডিজাইন' নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সায়েন্টিফিক আমেরিকানের ২০০১ সালের মার্চ সাংখ্যায় এস জে ওলশ্যাঙ্কি, ব্রুস কেয়ার্নস এবং রবার্ট এন বাটলার লিখিত 'If Humans were build to last' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সে প্রবন্ধে

লেখকত্রয় মানবদেহের বিভিন্ন 'ব্যাড ডিজাইন' নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। শুধু তাই নয়, একজন দক্ষ প্রকৌশলবিদের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা সে সমস্ত ডিজাইনজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোর সমাধান দিয়ে বলেছেন, 'এভাবে ত্রুটিগুলো সারিয়ে নিতে পারলে সবারই একশ বছরের বেশি দীর্ঘজীবন লাভ সম্ভব।'

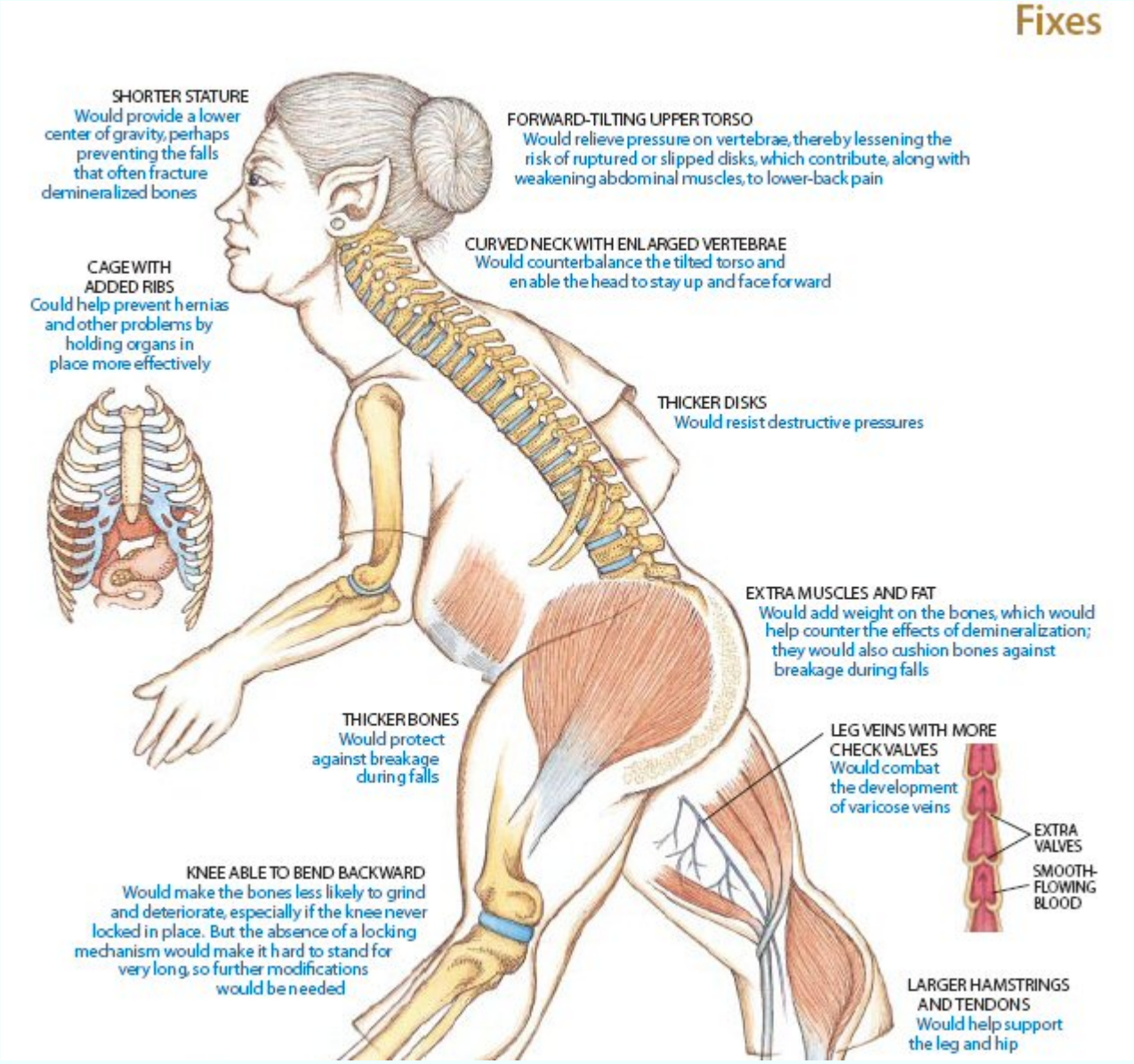

চিত্র: মানবদেহের বিভিন্ন 'দুর্বল ডিজাইন' দূর করে শতায়ুর অধিকারী কাঠামো বানানো সম্ভব (সায়েন্টিফিক আমেরিকান, ২০০১ সালের মার্চ সংখ্যার সৌজন্যে)।

প্রবন্ধটি থেকে কিছু উদাহরণ হাজির করার লোভ সামলাতে পারছি না। দেখা গেছে আমাদের দেহে ত্রিশ বছর গড়াতে না গড়াতেই হাড়ের ক্ষয় শুরু হয়ে যায়, যার ফলে হাড়ের ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পায়, একটা সময় অস্টিওপরোসিসের মত রোগের উদ্ভব হয়। আমাদের বক্ষপিঞ্জরের যে আকার তা দেহের সমস্ত অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট নয়। শুধু হাড় নয়, আমাদের দেহের মাংসপেশীও যথেষ্ট ক্ষয়প্রবণ। বয়সের

সাথে সাথে আমাদের পায়ের রগগুলোর বিস্তৃতি ঘটে যার ফলে প্রায়শই পায়ের শিরা ফুলে ওঠে। সন্ধিস্থল বা জয়েন্টগুলোতে থাকা লুব্রিকেন্ট পাতলা হয়ে সন্ধিস্থলের ক্ষয় ত্বরান্বিত করে। পুরুষের প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়ে প্রস্রাবের ব্যাঘাত ঘটায়।

ওলশ্যাঙ্কি, কেয়ার্নস এবং বাটলার প্রবন্ধটিতে দেখিয়েছেন ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো দূর করার পর 'পারফেক্ট ডিজাইনের' অধিকারী মানবদেহের চেহারা ঠিক কিরকম হতে পারে। এ ধরনের দেহে থাকবে বিরাট কান, তারসংযুক্ত চোখ, বাঁকানো কাঁধ, সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়া কবন্ধ, ক্ষুদ্রকায় বাহু এবং কাঠামো, সন্ধিস্থলের চারিদিকে অতিরিক্ত আস্তরণ বা প্যাডিং, অতিরিক্ত মাংসপেশী, পুরু স্পাইনাল ডিস্ক, রিভার্সড হাঁটুর জয়েন্ট ইত্যাদি। তিনি হয়ত আমাদের বর্তমান তথাকথিত 'সৌন্দর্যের স্ট্যান্ডার্ড' অনুযায়ী ভুবনমোহিনী প্রিয়দর্শিনী হিসেবে বিবেচিত হবেন না, কিন্তু শতায়ু হবার জন্য সঠিক কাঠামোর অধিকারী হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতেই পারেন।

মন্দ ও ত্রুটিপূর্ণ নকসার উদাহরণ আরো অনেক আছে। মহিলাদের জননতন্ত্র প্রাকৃতিকভাবে এমনভাবে বিবর্তিত হয়েছে যে অনেকসময়ই নিষিক্ত স্পার্ম ইউটেরাসের বদলে অবাঞ্ছিতভাবে ফ্যালোপিয়ান টিউব, সার্ভিক্স বা ওভারিতে গর্ভসঞ্চার ঘটায়। এ ব্যাপারটিকে বলে 'একটোপিক প্রেগন্যান্সি'। ওভারী এবং ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে অতিরিক্ত একটি গহবর থাকার ফলে এই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এটি মানবদেহে 'ব্যাড ডিজাইনের' চমৎকার একটি উদাহরণ। আগেকার দিনে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে শিশুসহ মায়ের জীবন সংশয় দেখা দিত । এখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আগে থেকেই গর্ভাপাত ঘটিয়ে মায়েদের জীবনহানীর আশঙ্কা অনেকটাই কাটিয়ে তোলা গেছে।

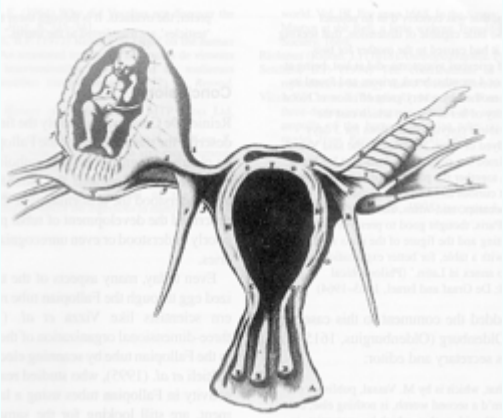

চিত্র: 'একটোপিক প্রেগন্যান্সি': মানবদেহের মন্দ নকসার আরেকটি উদাহরণ।

মানুষের ডি এন এ তে 'জাঙ্ক ডিএনএ' নামের একটি অপ্রয়োজনীয় অংশ আছে যা আমাদের আসলে কোন কাজেই লাগে না। ডিস্ট্রফিন জিনগুলো শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, সময় সময় মানবদেহে ক্ষতিকর মিউটেশন

ঘটায়। ডি এন এ'র বিশৃঙ্খলা 'হান্টিংটন ডিজিজের' এর মত বংশগত রোগের সৃষ্টি করে। আমাদের গলায় মুখ গহব্বর বা ফ্যারিংস এমনভাবে তৈরি যে একটু অসাবধান হলেই শ্বাস নালীতে খাবার আটকে আমরা 'চোক্' করি। এগুলো সবই প্রকৃতির মন্দ নকসার বা 'ব্যাড ডিজাইনের' উদাহরণ।

ব্যাড ডিজাইনের উদাহরণ শুধু জীববিজ্ঞানে নয়, জ্যোতির্বিদ্যাতেও দৃশ্যমান। বিশ্বাসীরা যদিও সব কিছুর পেছনেই 'মানব সৃষ্টির' সুমহান উদ্দেশ্য খোঁজার চেষ্টা করেন, তবে তাদের যুক্তি কোনভাবেই ধোপে টেকে না। প্রাণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি মুখ্য হয়, তবে মহাবিস্ফোরণের পর ঈশ্বর কেন ৭০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন এই পৃথিবী তৈরি করতে, আর তারপর আরো ৬০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন 'মানুষের উন্মেষ' ঘটাতে তার কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এটি নিঃসন্দেহেই মন্দ নকসায়নের বা ব্যাড ডিজাইনের উদাহরণ। পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাসের পরিক্রমায় আমরা আজ জানি, মানুষ তো পুরো সময়ের একশ ভাগের এক ভাগেরও কম সময় ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করছে। তারপরও মানুষকে এত বড় করে তুলে ধরে মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার কি প্রয়োজন? অথচ তথাকথিত মনুষ্যকেন্দ্রিক যুক্তির দাবিদারেরা তা করতেই আজ সচেষ্ট। আর তা ছাড়া প্রাণ কিংবা পরিশেষে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি মুখ্য হয়, তবে বলতেই হয় মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় সৃষ্টির চেয়ে অপচয়ই করেছেন বেশি। বিগ ব্যাং ঘটানোর কোটি কোটি বছর পর পৃথিবী নামক একটি সাধারণ গ্রহে প্রাণ সঞ্চার করতে গিয়ে অযথাই সারা মহাবিশ্ব জুড়ে তৈরি করেছেন হাজার হাজার, কোটি কোটি ছোট বড় নানা গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ - যারা আক্ষরিক অর্থেই আমাদের সাহারা মরুভূমির চেয়েও বন্ধ্যা, ঊষর আর প্রাণহীন। শুধু কোটি কোটি প্রাণহীন নিস্তব্ধ গ্রহ-উপগ্রহ তৈরি করেই ঈশ্বর ক্ষান্ত হননি, তৈরি করেছেন অবারিত শূন্যতা, গুপ্ত পদার্থ (Dark matter) এবং গুপ্ত শক্তি (Dark energy)-যেগুলো নিষ্প্রাণ তো বটেই, এমনকি প্রাণ সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে নিতান্তই বেমানান। আসলে এ ব্যাপারগুলোকেও বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার না করলে কোন সমাধানে পৌঁছুনো যাবে না। আমরা যতই নিজেদের সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে সান্ত¡না খোঁজার চেষ্টা করি না কেন, এই মহাবিশ্ব এবং এই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভবের পেছনে আসলে কোন ডিজাইন নেই, পরিকল্পনা নেই, নেই কোন বুদ্ধিদীপ্ত সত্তার সুমহান উদ্দেশ্য। প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির 'বিজ্ঞানের জন-ধীশক্তি বিষয়ক' বিভাগের অধ্যাপক ড. রিচার্ড ডকিন্স সেটিকেই স্পষ্ট করেছেন নিচের ক'টি অসাধারণ পঙক্তিমালায় (সায়েন্টিফিক আমেরিকান, নভেম্বর, ১৯৯৫:৮৫):

> 'আমাদের চারপাশের বিশ্বজগতে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলো দেখলেই বোঝা যায় এর মধ্যে কোন পরিকল্পনা নেই, উদ্দেশ্য নেই, নেই কোন শুভাশুভের অস্তিত্ব; আসলে অন্ধ, করুণাহীন উদাসীনতা ছাড়া এখানে আর কিছুই চোখে পড়ে না'।

ড. অভিজিৎ রায়, আমেরিকায় বসবাসরত গবেষক এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' ও 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। সাম্প্রতিক সম্পাদিত গ্রন্থ - 'স্বতন্ত্র ভাবনা'। ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com

বাগানে গোপনে একজন মালী আসে অথবা আসে না

শোহেইল মতাহির চৌধুরী

অনেকদিন ধরে অবহেলায় পড়েছিলো তাদের বাগান। বাগানের মালিক দুই বন্ধু বহুদিন পর খোঁজ নিতে এসে দেখলেন ছোট ছোট আগাছায় ভরে গেছে বাগানটি তবে আগাছাগুলোর মাঝে কিছু ফুলের গাছ হয়েছে যেগুলো ভারী সুন্দর। এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে বললো, "নিশ্চয়ই কোনো মালী এখানে আসে এবং এই ফুলগাছগুলোর পরিচর্যা করে"। এ বিষয়ে তারা খোঁজখবর করা শুরু করলো কিন্তু কোনো প্রতিবেশিই এমন খবর দিতে পারলো না যে তারা কাউকে এই বাগানে কখনও কাজ করতে দেখেছে। বন্ধুটি তখন তার মালী যে আসে সেই বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি দিলো, "যখন সব মানুষ ঘুমিয়ে যায় মালীটি নিশ্চয় তখন আসে। সেজন্যই কেউ তাকে দেখতে পায়না"। দ্বিতীয় জনের পাল্টা উত্তর, "না, কেউ না কেউ নিশ্চয়ই শব্দ শুনতে পেতো। তাছাড়া, কেউ যদি এই ফুলগাছগুলোর যত্ন নিতেই এখানে আসতো, তাহলে সে নিশ্চয়ই আগাছাগুলোও কেঁটে-ছেঁটে রাখতো"।

বাগান

দ্বিতীয় বন্ধু তার বিশ্বাসে অটল। সে বললো, " দেখো, কীভাবে এগুলো সাজানো। বুঝাই যাচ্ছে এখানে একটি সৌন্দর্যবোধ কাজ করছে এবং এর একটা উদ্দেশ্য আছে। সুতরাং আমি বিশ্বাস করি কেউ একজন আসে। হতে পারে এমন কেউ আসে যাকে নশ্বর চোখে দেখা যায় না। আমি বিশ্বাস করি, যত ভালোভাবে আমরা বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখবো ততো বেশি আমরা এই সত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবো যে কেউ একজন আসে"। তারপর তারা বাগানটিকে ভালোভাবে পরীক্ষা করা শুরুকরলো। কখনও কখনও তারা এমন কিছুর সংস্পর্শে আসলো যা ইঙ্গিত করে যে সত্যিই একজন মালী এই বাগানে আসে। কখনও কখনও তারা ঠিক বিপরীত কিছুর প্রমাণ পেলো। আবার কখনও তাদের এমনও মনে হলো যে, যে লোকটি বাগানে চুপিসারে আসে সে

ক্ষতি করার উদ্দেশ্যেই ঢোকে, সে দুষ্ট লোক। বাগানটিকে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা তো তারাই করলোই। তাছাড়াও একটি বাগানকে ফেলে রাখলে কি ঘটে তা জানার জন্য তারা গবেষণা করতে থাকলো।

এইসব পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে একজন যা জানতে পায় তা আরেকজন শিখে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর গবেষণার শেষে একজন বললো, "আমি এখনও বিশ্বাস করি একজন মালী আসে"। অন্যজন বললো "আমি বিশ্বাস করি না"। তাদের গবেষণায় বাগান সম্পর্কে তাদের পর্যবেক্ষণ একইরকম। কিন্তু তাদের সিদ্ধান্তগুলো ভিন্ন ভিন্ন। প্রাপ্ত তথ্যে উপাত্তে কোনো পার্থক্য ছিল না। এমন কি তারা যদি আরো বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতো তাতেও কোনো পার্থক্য তৈরি হতো না বলেই তারা মনে করে। কিংবা এবিষয়েও তাদের কোনো মতপার্থক্য নেই যে ফেলে রাখলে একটি বাগান দ্রুত অগোছালো ও জংলা হয়ে যায়।

এই পর্যায়ে, এই পতিত বাগান ও তার গাছপালা সম্পর্কে "একজন মালী আসে" বিষয়ক হাইপোথিসিসটি আর গবেষণার বিষয় থাকলো না। একজন হাইপোথিসিসটি মেনে নিচ্ছে এবং অন্যজন মেনে নিচ্ছে না। মজার বিষয় হলো দুজনের কেউই বাগানের ক্ষেত্রে এমন কিছু ঘটবে বলে আশা করছে না যা অন্যজন করছে। বাস্তব বিষয়গুলো সম্পর্কে দুজনের ধারণাই একরকম। তাহলে, দু'জনের মধ্যে পার্থক্যটা কী? একজন বলছে, "A gardener comes unseen and unheard. He is manifested only in his works with which we are all familiar".। অন্যজন বলছে, "No, there is no gardener"।

মালী সম্পর্কে তারা যে আলাদা আলাদা কথা বলছে তার উপর ভিত্তি করে বাগানটির সম্পর্কে তাদের অনুভূতি আলাদারকম হয়ে যাচ্ছে। একই তথ্য-উপাত্ত দিয়ে দু'জন দুইভাবে বিষয়টির ব্যাখ্যা দিচ্ছে। তাতে বাগানটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটা ভিন্ন চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। বাগানের অতীতটিও ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে এই ব্যাখ্যায়। তবে বাগানটির ভবিষ্যত সম্পর্কে তাদের আশা-আকাঙ্খা একইরকম মনে হচ্ছে। দু'জনই চায় আগাছামুক্ত সাজানো-গোছানো একটি বাগান।

উপরের "মালী"-র রূপকটি একটি বিখ্যাত রূপক। জন উইজডম তার ধর্মের দর্শন বইটির শুরু করেছিলেন এই গল্প দিয়ে। এই গল্পটির সারকথা হলো, বিবদমান দুই পক্ষ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় এমন তথ্য-উপাত্ত বিষয়ে আপত্তি তোলে না, এমনকি ভবিষ্যতে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কি পাওয়া যেতে পারে তা নিয়েও কোনো বিরোধে লিপ্ত হয় না। বরং একই ধরনের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে তারা ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়। উভয়পক্ষই পৃথিবী কিংবা মহাবিশ্ব সম্পর্কে (কিংবা এর পেছনে কোন ডিজাইনার থাকা বা না থাকা সম্বন্ধে) তাদের মনের ভাবকেই কথার মাধ্যমে প্রকাশ করছে। তবে কোনো বক্তব্যে ভাবের প্রকাশ ঘটলেই সেটি যে জগৎ সম্পর্কে সত্য কথা তা বলা যাবে না।

শোহেইল মতাহির চৌধুরী, ইন্টারনেটের বাংলা ব্লগে লিখে থাকেন। ইংল্যান্ডে গবেষণারত এ লেখক ফ্রি ল্যান্স অনুবাদক হিসেবেও কাজ করেছেন। লেখা প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশের অনেক পত্রিকাতেই। ইমেইল - ShohailMC@aol.com

আমেরিকায় ‘ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের’ নামে কি হচ্ছে?

বন্যা আহমেদ ও অভিজিৎ রায়

ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আবারও কোর্ট কাচারি পর্যন্তই গড়ালো, যদিও আমেরিকার জন্য সেটা নতুন কোন ব্যাপারই নয়। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ডোভার শহরের সরকারী স্কুল বোর্ড বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে বিবর্তনবাদের পাশাপাশি সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প বা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন (আইডি) পড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলে সেখানকার আভিভাবকেরা তার বিরুদ্ধে মামলা করতে বাধ্য হন। কোর্টের জজ *জন ই. জোন্স* বিস্তারিতভাবে আইডির প্রবক্তা এবং আইডির বিপক্ষে দাঁড়ানো প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানীদের বক্তব্য শোনার পর ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে রায় দিলেন - আদালতের সাক্ষী থেকে দেখা যাচ্ছে যে আইডি ধর্ম এবং সৃষ্টিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি মতবাদ, তাই সরকারী কোন স্কুলের পাঠ্যসুচীতে একে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তটি পরিষ্কারভাবে আমেরিকার সাংবিধানিক আইনকে (Establishment Clause, আমেরিকার সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর এই অংশটিতে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে, সরকার কোনভাবেই কোন ধর্মের পক্ষে বা তা প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে বা বিপক্ষে কোন আইন তৈরি করবে না) লংঘন করে। জজ সাহেব আরও বললেন, এই মামলা থেকে এও পরিষ্কারভাবে বোঝা গেছে যে, বিবর্তনবাদ একটি যথার্থ বিজ্ঞান এবং তা বৈজ্ঞানিক মহলে বহুলভাবে সমর্থিত, এই তত্ত্বের সাথে কোন আলৌকিক স্রষ্টা আদৌ আছে কি নেই তার কোন দ্বন্দ্ব নেই [১]।

কিন্তু জজ সাহেব বললে কি হবে, আজকে আমেরিকার অত্যন্ত রক্ষণশীল কিন্তু ক্ষমতাবান খ্রীষ্টান মৌলবাদী

ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন (আইডি) বলতে কি বুঝায়?

আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট ১৯৮৭ সালে এক ঐতিহাসিক রায়ে ‘ক্রিয়েশন সায়েন্স’ বা ধর্মীয় সৃষ্টিতত্তকে ‘অবৈজ্ঞানিক’ এবং ‘রিলিজিয়াস ডগমা’ হিসেবে চিহ্নিত করে দেওয়ার পর পরই সৃষ্টিবাদীরাও বুঝে গিয়েছিলেন যে সেই পুরনো সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়ে বোধ হয় আর জনসাধারণকে বোকা বানিয়ে রাখা যাবে না। ফলে বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য মূলতঃ তখন থেকেই তাদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো আরেকটু ‘সফিসটিকেটেড’ তত্ত্বের। সম্প্রতি তাদের পক্ষ থেকে নতুন কিছু যুক্তির অবতারণা করে নতুন মোড়কে ‘সেই একই পুরোন সৃষ্টিতত্ত্ব’কে হাজির করা হয়েছে, যার নাম হচ্ছে সৃষ্টির ‘বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প’ (Intelligent Design argument), বা সংক্ষেপে আইডি। মাইকেল বিহে, উইলিয়াম ডেম্বস্কি, ফিলিপ জনসন, জোনাথন ওয়েলসসহ প্রবক্তাদের সকলেই মোটা অঙ্কের অর্থপুষ্ট রক্ষণশীল খ্রীষ্টান সংগঠন *ডিস্‌কভারি ইন্সটিটিউটের* (Discovery Institute) সাথে যুক্ত। এঁদের যুক্তি হল, আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ড এবং সর্বোপরি জৈব জীবন এতই জটিল এবং অনন্যসাধারণ যে প্রাকৃতিক উপায়ে সেগুলো উদ্ভুত হতে পারে না, এবং এর পেছনে এক বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনাকারীর পরিকল্পনার ছাপ আছে। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা মহাবিশ্ব এবং পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির পিছনে খ্রীষ্টিয় ঈশ্বর জড়িত থাকবার ব্যাপারটা মুখ ফুটে সরাসরি না বললেও তাদের বিভিন্ন লেখালখিতে তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তারা বলেন, বৈজ্ঞানিক ডেটা বা উপাত্তগুলো শুধু প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় কিংবা উচিৎ ও নয়, এগুলোকে সঠিকভাবে বোঝা যাবে তখনই, যখন এক সৃজনশীল সজ্ঞাত সত্ত্বার (intelligent agent) সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের আলোকে এগুলোকে দেখার চেষ্টা এবং বিশ্লেষণ করা হবে। এই ‘আইডি’ ইদানিংকালে কারো কারো কাছে এতটাই গুরুত্ব পেয়েছে যে, তাঁরা অনেকেই এই তত্ত্বটিকে বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত করে (মুলতঃ ডারউইনীয় বিবর্তনের বিকল্প হিসেবে) স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে চান, এবং এ নিয়ে আমারিকায় আন্দোলনও শুরু করেছেন।

অংশ এবং সরকার তো তা বলছে না। এই তো সেদিনও তাদের প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ দিব্যি বলে দিলেন যে, স্কুলে আইডি এবং বিবর্তন দুটোই নাকি সমানভাবে পড়ানো উচিত। *সাইন্টিফিক আমেরিকান* জার্নালের অকটোবর, ২০০৬ সংখ্যার এক জরিপে দেখা যাচ্ছে যে, এদেশের রক্ষণশীল রিপাবলিকান

দলের ৬০%ই হচ্ছে সৃষ্টিতত্ত্ববাদী এবং মাত্র ১১% বিবর্তনবাদে আস্থা রাখে, আর ওদিকে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে ২৯% সৃষ্টিতত্ত্ববাদী এবং ৪৪% বিবর্তনবাদকে সঠিক বলে স্বীকার করে। উদারনৈতিক (liberal) প্রগতিশীল আমেরিকানদের মধ্যে ৬৩%, কিন্তু রক্ষণশীল অংশের মাত্র ৩৭% বির্বতনবাদকে মেনে নিয়েছে। বিজ্ঞানের সঠিকতা কি তবে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চেই নির্ধারিত হবে? কিন্তু অন্য কোন বৈজ্ঞানিক আবিস্কার যেমন বিদ্যুৎ, চুম্বকত্ব, টেলিস্কোপ থেকে শুরু করে মাধ্যাকর্ষণ, আপেক্ষিক তত্ত্ব কিংবা বিগ ব্যাং- কোনটিকে প্রতিষ্ঠিত করতেই কিন্তু রাজনৈতিক দলের কিংবা ধর্মীয় গোষ্ঠীর করুণা বা সম্মতির দরকার পড়েনি! সাম্প্রতিক একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে আমেরিকার জনগণের ৮২ শতাংশ সত্যিকারের স্বর্গে বিশ্বাস করে, এমনকি শতকরা ৫১ ভাগ ভুতে পর্যন্ত বিশ্বাস করে, আর সে তুলনায় বিবর্তনের মত বৈজ্ঞানিক একটি তত্ত্বে বিশ্বাস করে মাত্র শতকরা ২৮ ভাগ লোক [২]। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিনের নভেম্বর, ২০০৪ সংখ্যায় প্রকাশিত 'Was Darwin Wrong?' প্রবন্ধ থেকে দেখা যায় যে, ৪৫% আমেরিকান এখনও মনে করে যে, সৃষ্টিকর্তা গত ১০ হাজার বছরে কোন এক সময়ে মানুষকে এভাবেই বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানী ডগলাস ফুটুইমা তার 'Evolution' বইয়ে লিখেছেন যে, শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশী আমেরিকান এখনও মানুষের বিবর্তনে বিশ্বাস করে না, অথচ ওদিকে ইউরোপের বেশিরভাগ মানুষ বিবর্তনবাদকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছে। জ্ঞান বিজ্ঞানে এত অগ্রসর বলে কথিত আমেরিকানদের বিবর্তন সম্পর্কে আস্থার অবস্থা দেখে ইউরোপবাসীর অনেকেই নাকি বিস্মিত না হয়ে পারে না [৩]। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সামন্ততান্ত্রিক রক্ষণশীল চার্চ্চের সাথে বিজ্ঞানের দন্দ্ব, শিল্প বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, দু'টি বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্বব্যাপী উপনিবেশের অবসান ইত্যাদি থেকে পাওয়া শিক্ষার কারণেই হয়তো ইউরোপবাসীরা আজকে জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই অগ্রসর ভুমিকা নিতে সক্ষম হয়েছে। নিউ সাইন্টিস্ট মাগ্যজিনে বক্তব্য দিতে গিয়ে মিশিগান ইউনিভারসিটির শিক্ষক জন মিলার বলেন যে, (উন্নত দেশগুলোর মধ্যে) আমেরিকাই মনে হয় একমাত্র দেশ যেখানে বিবর্তনবাদ নিয়ে এই রক্ষণশীল ক্ষমতাশালী অংশ রাজনৈতিক খেলায় মেতেছে, পৃথিবীর বেশীরভাগ দেশেই এটা আর কোন ইস্যুই নয় [৪]। বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জেনেটিক্সসহ আধুনিক জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার নিত্য নতুন আবিষ্কারের ফলে যেখানে সারা পৃথিবীতে ক্রমশঃ মানুষের মধ্যে বিবর্তনের পক্ষে সমর্থন বাড়ছে সেখানে এই রাজনৈতিক খেলার শিকার হয়ে আমেরিকায় তা কমতির দিকে। খুবই আবাক লাগতে ভাবতে যে, আজকে যদি আমেরিকার সরকার এবং ক্ষমতাশালী অংশের এই অবস্থা হয় তাহলে প্রায় দু'শ বছর আগে এ দেশের প্রতিষ্ঠাতা রাজনীতিবিদেরা কি করে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করতে পেরেছিলো? এখন তো মনে হচ্ছে এদেশের পূর্বসুরীদের অগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গীর কারণেই হয়তো এখনও আমেরিকার স্কুল কলেজে বিজ্ঞান টিকে আছে! তাহলে কি আমরা বলব যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে আমেরিকা ক্রমাগতভাবে উদারনৈতিক অগ্রসরতা থেকে পিছিয়ে পড়ছে? হতেই পারে। তবে আরো একটা জিনিস এখান থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কোন দেশে বিজ্ঞানের বড় বড় আবিষ্কার ঘটলেই সেখানে বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গড়ে ওঠে না, বিজ্ঞানমনস্কতার জন্য চাই এমন এক সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সচেতন জনগোষ্ঠী যাদের মাধ্যমে রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে জনসাধারণের মাঝে জনপ্রিয় করে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হবে।

এতক্ষণ তো দেখলাম আমেরিকার মত উন্নত দেশে বিবর্তনবাদের কি অবস্থা। ইদানিং কালে শুধু তো আমরিকায়ই নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হারুন ইয়াহিয়াদের (তূর্কী দেশীয়) মত স্বঘোষিত 'বিজ্ঞানী'রাও আবার আইডি সমর্থন করতে শুরু করেছেন। তারা আইডির সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে নিজেদের সৃষ্টিতত্ত্ব মিলিয়ে বিবর্তনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছেন। আর ওদিকে আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কথা বোধ হয় আর না বলাই ভাল। দৈনিক সমকালে কালস্রোত বিভাগে এ বছর (২০০৬ সাল) মাসাধিক কাল ধরে

প্রকাশিত হচ্ছে হুমায়ুন রশীদের লেখা 'বাংলাদেশে কি বিবর্তন পড়ানো হচ্ছে?' নামের একটি সিরিজ। ওই সিরিজে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার যে করুণ ছবি ফুটে উঠেছে তা সত্যই ভয়াবহ। স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা তো বটেই, এমনকি জীববিজ্ঞানের স্বনামধন্য শিক্ষক শিক্ষিকারাও বিবর্তনকে ধর্মবিরোধী আজগুবি ধ্যান ধারণা বলে মনে করেন। তারা মনে করেন পরীক্ষা পাশের জন্য এসব 'হাবি জাবি' জিনিস পড়া যেতে পারে, কখনই ওগুলো সত্য বলে মেনে নেওয়া যাবে না! [৫]

বিবর্তনবাদ নিয়ে রক্ষণশীল মহলে এত হৈ চৈ কেনো?

বিবর্তনবিরোধীরা ডারউইনিজমকে শুধু প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হয়নি, সমস্ত 'শয়তানির চাবিকাঠি' হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছে। আমেরিকার রক্ষণশীল অংশের মদদপুষ্ট ডিস্‌কভারি ইন্সটিউটের পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং ইন্টেইলজেন্ট ডিজাইনের অন্যতম প্রবক্তা ফিলিপ জনসনের মতে, যেহেতু অবিশ্বাসীরা ডারউইনের মতানুসারে মনে করে মানুষ বানর থেকে উদ্ভুত হয়েছে, সেহেতু তারা যে কোন ধরনের 'নাফরমানি' করতে পারে - সমকামিতা, গর্ভপাত, পর্ণোগ্রাফি, তালাক, গণহত্যা সবকিছু [৬]! এমন একটা ভাব, ডারউইন আসার আগ পর্যন্ত সারা পৃথিবী যেন এগুলো থেকে একেবারেই মুক্ত ছিল! 'আনসারিং জেনেসিস' নামে একটা মৌলবাদী খ্রীষ্টান ওয়েবসাইট আছে, যারা এখনো মনে করে পৃথিবীর বয়স ছ'হাজার বছরের বেশী নয়। এ ওয়েবসাইটের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে কোন উপায়ে বিবর্তনকে ঠেকানো আর 'প্রমাণ করা' বিজ্ঞান যাই বলুক না কেন, বাইবেলে যা লেখা আছে তাই ঠিক[৭]। তারা খুব সুন্দর করে চার্ট বানিয়ে দেখিয়েছে বিবর্তন মানলে পাওয়া যাবে রেসিজম, ফ্যাসিজম, কমিউনিজম, নাজিজম আর জেনেসিস মানলে এ পৃথিবীতে থাকবে প্রেম ভালবাসা, স্নেহ, মায়া আর মমতা! ওদিকে হারুন ইয়াহিয়ার মত ব্যক্তিরা আবার দিব্যি বলে বেড়াচ্ছেন যে, বিবর্তনবাদ পশ্চিমা-আধিপত্যবাদী শক্তির দ্বারা সৃষ্ট একধরণের 'প্রতারণা' ছাড়া নাকি আর কিছুই নয়!

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে সব ছেড়ে ছুড়ে বিবর্তন তত্ত্বের উপর এই বিশেষ মহলটির এতো আক্রোশ কেন? বিজ্ঞানের তো আরো হাজারটা শাখা আছে, কই সেগুলো নিয়ে তো এমন 'উদ্দেশ্যমূলক' ভাবে বিতর্ক তৈরী করা হচ্ছে না? এমনকি জীববিজ্ঞানের ভিতরেও তো আছে কোষবিদ্যা, বংশগতিবিদ্যা, সাইটোজেনেটিক্স কিংবা আণবিক জীববিদ্যা ইত্যাদি। ওগুলো নিয়েও বিশেষ মহলটির কোন মাথাব্যথা নেই, বিতর্কও নেই। তাহলে নিশ্চয়ই ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের মধ্যে তারা এমন কিছু খুঁজে পেয়েছে যা তাদের গায়ে ভিষণ জ্বালা ধরানোর জন্য যথেষ্ট। কি সেটি? আসলে সত্যি বলতে কি, বিবর্তনতত্ত্ব সমস্ত পুরোন সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্যান ধারণা আর কুসংস্কারের বুকে তীব্র আঘাত হেনেছে। পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মের মূল ভিত্তি সৃষ্টিতত্ত্বকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলেছে বিবর্তনবাদ।

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই নিজের জন্ম রহস্য নিয়ে মানুষ বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করে এসেছে। যুগে যুগে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে তাই জন্ম হয়েছে নানা ধরণের ধর্মের এবং সৃষ্টিতত্ত্বের। তবে পশ্চিমা বিশ্বে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উইলিয়াম প্যালের কল্যাণে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে সৃষ্টির পরিকল্প যুক্তি (Design argument) প্রবলভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। ডারউইনের বিবর্তনবাদী তত্ত্বই ১৮৫৯ সালে প্রথমবারের মতো একে শক্তিশালীভাবে চ্যালেঞ্জ করে ভুল প্রমাণিত করলো। বিবর্তনবাদ খুব পরিস্কার ভাবেই দেখিয়ে দিল যে, মানুষসহ বিভিন্ন প্রজাতির বিবর্তন এবং উদ্ভবের পেছনে কোন স্বর্গীয় কারণ খোঁজার দরকার নেই। অন্যান্য পশুপাখি, গাছপালা যে পদ্ধতিতে পৃথিবীতে এসেছে, মানুষ নামের 'দ্বিপদী প্রাণী'টিও ঠিক একই বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এ পৃথিবীতে এসেছে। অর্থাৎ জীববিজ্ঞানের

দৃষ্টিতে মানুষ আসলে প্রাণীজগতের অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়, তা সে নিজেকে যতই 'অনন্য সাধারণ' মনে করুক না কেন! দার্শনিক ডেনিয়েল ডেনেট এজন্যই বিবর্তনতত্ত্বকে 'ইউনিভার্সাল এসিড' (universal acid) বা রাজাম্ল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন[৮]। ইউনিভার্সাল এসিড যেমন তার বিধ্বংসী ক্ষমতায় সকল পদার্থকে পুড়িয়ে-গলিয়ে ছারখার করে দিতে পারে, তেমনি ডারউইনের বিবর্তনবাদী তত্ত্ব সমস্ত প্রথাগত সৃষ্টিতাত্ত্বিক ধ্যান ধারণা আর কুসংস্কারকে একেবারে দুর করে দিতে পারে। অধ্যাপক ডেনেট তার বিখ্যাত বইটিতে[৮] বিবর্তন তত্ত্বকে 'ডারউইনের বিপজ্জনক প্রস্তাব' (Darwin's dangerous idea) বলে উল্লেখ করেছেন। এটি 'বিপজ্জনক' কারণ এটি বলে যে, মানুষ এবং অন্যান্য জীব কোন সৃষ্টিকর্তার নির্দেশনা ছাড়াই শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পদ্ধতির মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত সরল প্রাণ থেকে ক্রমান্বয়ে উদ্ভুত হতে পারে। নিঃসন্দেহে এটি সৃষ্টিবাদীদের জন্য বিপদের কথা। অক্সফোর্ডের বিশপ স্যামুয়েল উইলবারফোর্স (Samuel Wilberforce), যিনি ডারউইনের বন্ধু বিজ্ঞানী হাক্সলির সাথে ঝগড়া-ঝাটির কারণে বিখ্যাত হয়ে আছেন (২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য), সঙ্গত কারণেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটা বিবর্তনকে অস্বীকার করেন এই বলে[৯]: 'প্রাকৃতিক নির্বাচন নামের তত্ত্বটি ঈশ্বরের বাণীর সাথে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এটি বরং ঈশ্বরের সৃষ্টির সাথে ঈশ্বরের প্রেরিত বাণীর বিরোধ ঘটায়।'

সে যাই হোক, চলুন এবার দেখা যাক আজকের রক্ষণশীল আমেরিকাবাসীদের কাছে 'হট্ কেক' ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্ত্বটি আসলে কি বলতে চাইছে, এই তত্ত্বটিকে জনপ্রিয় করে তোলার প্রচেষ্টার পিছনে আসলে কি উদ্দেশ্য কাজ করছে। এর মুলে যেতে হলে আমাদেরকে আইডি তত্ত্বের আস্তানা ডিস্কভারি ইনস্টিটিউটে একবার ঢুঁ মেরে আসতে হবে। ওখানে কারা কালকাঠি নাড়ছেন, কি বলছেন এবং কেন বলছেন তা একটু খতিয়ে দেখলেও বোধ হয় ডোভার শহরের জজ সাহেবের দেওয়া সাম্প্রতিক রায়ের অর্থ পরিস্কার হয়ে যাবে। কিন্তু আইডি প্রবক্তাদের জন্ম রহস্যটা ঠিকমত বুঝতে হলে আমাদেরকে আরেকটু দুরে যেতে হবে, চোখ রাখতে হবে সেই আঠারো শতকে, উইলিয়াম প্যালের কালে। সৃষ্টিতত্ত্বের ইতিহাসের বইটার সে সময়কার পাতাগুলো একটু ভালোমত উলটে পালটে দেখতে হবে কারণ তাদেরই উত্তরসুরি হিসেবে জন্ম হয়েছে এই নব্য আইডি প্রবক্তাদের!

উইলিয়াম প্যালে এবং তার পরিকল্পিত সৃষ্টির যুক্তি

উইলিয়াম প্যালে (১৭৪৩-১৮০৫)'র বিখ্যাত বই 'Natural Theology, or Evidence of Existence and Attributes of the Deity, collected from the Appearences of Nature' প্রকাশিত হয় ১৮০২ সালে। ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়েও প্যালে ভেবেছিলেন বিস্তর, কিন্তু নিজেই শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন 'বুদ্ধিদীপ্ত স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞান উপযুক্ত মাধ্যম নয়' [১০] ; এ ক্ষেত্রে প্যালের 'উপযুক্ত মাধ্যম' মনে হয়েছিল বরং জীববিজ্ঞানকে। আর পূর্ববর্তী অন্যান্য *ন্যাচারাল থিওলিজিয়ান*দের মতই প্যালেও জীবজগতকে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে জীবের অভিযোজনের ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্যালে লক্ষ্য করেছিলেন যে, প্রতিটি জীবদেহে নির্দিষ্ট কাজ করবার জন্য নির্দিষ্ট অংগ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, যা জীবটিকে একটি নির্দিষ্ট কোন পরিবেশে টিকে থাকতে সহায়তা করে। তিনি জটিল জীবদেহকে ঘড়ির কাঠামোর সাথে তুলনীয় মনে করেছিলেন, আর তার মধ্যেই দেখেছিলেন স্রষ্টার সুমহান পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য আর নিপুণ তুলির আঁচর। প্যালের ভাষাতেই [১১] :

'ধরা যাক ঝোপঝারের মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে হঠাৎ আমার পা একটা পাথরে লেগে

> গেল। আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, এই পাথরটা কোত্থেকে এলো? আমার মনে উত্তর আসবে- প্রকৃতির অন্য অনেক কিছুর মত পাথরটাও হয়ত সবসময়ই এখানে ছিল। ... ...কিন্তু ধরা যাক আমি পথ চলতে গিয়ে একটা ঘড়ি কুড়িয়ে পেলাম। এবার কিন্তু আমার কখনই মনে হবে না যে ঘড়িটিও সব সময়ই এখানে পড়ে ছিল।'

নিঃসন্দেহে ঘড়ির গঠন পাথরের মত সরল নয়। একটি ঘড়ি দেখলে বোঝা যায়- ঘড়ির ভিতরের বিভিন্ন ছোট ছোট অংশগুলো কোন এক কারিগর এমনভাবে তৈরী করেছেন যেন সেগুলো সঠিকভাবে সমন্বিত হয়ে কাঁটাগুলোকে ডায়ালের চারপাশে মাপমত ঘুরিয়ে ঠিক ঠাক মত সময়ের হিসেব রাখতে পারে। কাজেই পথে ঘড়ি কুড়িয়ে পেলে যে কেউ ভাবতে বাধ্য যে ওখানে আপনা আপনি ঘড়ির জন্ম হয়নি বরং এর পেছনে একজন কারিগর রয়েছেন যিনি অতি যত্ন করে একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঘড়িটি তৈরী করেছেন*। একই যুক্তিমালার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে প্যালে বেছে নিয়েছিলেন আমাদের জীবদেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংগ চোখকে। চোখ নামের এই অংগটিকে প্যালে ঘড়ির মতই এক ধরনের জটিল যন্ত্র হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন, কারণ তার মতে, ' ঘড়ির মতই এটি (চোখ) বহু ছোট-খাট গতিশীল কলকব্জা সমন্বিত এক ধরণের জটিল যন্ত্র হিসেবে আমাদের কাছে আবির্ভূত হয়, যেগুলোর প্রত্যেকটি একসাথে কাজ করে অংগটিকে কমর্ক্ষম করে তুলে।' [১২]।

চোখকে প্যালে অনেকটা জৈব-টেলিস্কোপ হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, ঘড়ি কিংবা টেলিস্কোপ তৈরী করার জন্য যেহেতু একজন কারিগর দরকার, চোখ 'সৃষ্টি করার জন্য'ও প্রয়োজন একজন অনুরূপ কোন কারিগরের। সেই কারিগর যে একজন 'ব্যক্তি ঈশ্বর' (Personal God)ই হতে হবে তা প্যালে খুব পরিস্কার করেই বলেন [১১] :

> 'কোন পরিকল্পনাকারী (Designer) ছাড়া কোন পরিকল্পনা (Design) হতে পারে না, যেমনি আবিস্কর্তা ছাড়া কোন আবিস্কার হতে পারে না।... ...পরিকল্পনার ছাপ এতোই প্রবল যে একে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। এই পরিকল্পনাকারীকে অবশ্যই একজন ব্যক্তি হতে হবে। সেই ব্যক্তিই হচ্ছেন ঈশ্বর।'

পরিকল্পনাবিহীনভাবে প্রাকৃতিক উপায়ে চোখের উৎপত্তির সম্ভাবনাকে এক্কেবারে উড়িয়ে দিয়ে প্যালে বলেছেন[১১] : 'মানবদেহে স্রেফ দৈবাৎ প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ কোন ধরনের পরিকল্পনা (Design) বিহীন ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমে হয়তো আঁচিল, আঁব, জরুল, তিল, ব্রণের মত জিনিসপত্র তৈরী হতে পারে

---

* প্যালের এই 'ঘড়ির কারিগরের যুক্তি' দর্শনশাস্ত্রে পরিচিত হয়ে আছে 'পরিকল্প যুক্তি' বা 'Argument from Design' হিসেবে। শুধু জীব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়, জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তথা মহাবিশ্বের উৎপত্তির পেছনে ঈশ্বর নামক 'কারিগরের' অস্তিত্বের পক্ষে অত্যন্ত জোড়ালো যুক্তি হিসেবে অনেককাল ধরে প্যালের এই যুক্তিমালা ব্যবহৃত হয়েছে। একটি ঘড়ি যেমন নিজে থেকে সৃষ্ট হয়ে পথে পড়ে থাকতে পারে না, ঠিক তেমনি মহাবিশ্বও নিজ থেকে সৃষ্ট হয়ে এমনি অবস্থায় চলে আসতে পারে না। ঘড়ি তৈরীর পেছনে যেমন ঘড়ির কারিগরের ভূমিকা আছে, তেমনি মহাবিশ্ব তৈরীর পেছনেও ঈশ্বর জাতীয় কোন কারিগরের হাত থাকতেই হবে, এই ধারণাটি এক সময় সৃষ্টিবাদীদের মধ্যে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক যুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হত। জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্যালের যুক্তমালা নিয়ে আলোচনা এবং খন্ডন এই প্রবন্ধের পরিসরের বাইরে। উৎসাহী পাঠকেরা এর জন্য এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের প্রবন্ধগুলো দেখতে পারেন।

কিন্তু কোনভাবেই চোখ নয়।' ... কোথাও কোন উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

ডারউইন নিঃসন্দেহে প্যালের উক্তিগুলো পড়েছিলেন এবং এর একটি যোগ্য জবাবও মনে মনে ঠিক করেছিলেন যা তিনি দিয়েছিলেন পরে তার 'প্রজাতির উদ্ভব' বইয়ের মাধ্যমে। ডারউইন প্রস্তাব করলেন জীবদেহকে কেবল ঘড়ির মত যন্ত্রের মত কিছু ভেবে বসে থাকলে চলবে না। জীবজগৎ যন্ত্র নয়; কাজেই যন্ত্র হিসেবে চিন্তা করা বাদ দিতে পারলে এর পেছনে আর কোন কোন ডিজাইন বা পরিকল্পনার মত 'উদ্দেশ্য' খোঁজার দরকার নেই। জীবজগতে চোখের উদ্ভব ও বিবর্তনের পেছনে ডারউইন প্রস্তাব করলেন এক 'অন্ধ কারিগরের', নাম প্রাকৃতিক নির্বাচন- যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লাখ লাখ বছর ধরে ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা পরিবর্তনের ফলে চোখের মত অত্যন্ত জটিল অংগ-প্রত্যংগ গড়ে ওঠা সম্ভব। এ প্রক্রিয়াটির নাম ক্রমবর্ধমান নির্বাচন (cumulative selection)। একাধিক ধাপের এই ক্রমবর্ধমান নির্বাচনের মাধ্যমে যে ধাপে ধাপে যে জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্ভুত হতে পারে তা ইতোমধ্যেই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমানিত হয়েছে [১৩]। শুধু তাই নয়, এ পদ্ধতিতে আংশিকভাবে চোখের উৎপত্তি ও বিকাশ যে সম্ভব এবং তা বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে যে একটি জীবের টিকে থাকার সম্ভাবনাকে অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলতে পারে তারও অজস্র উদাহরণ রয়েছে আমাদের চারপাশে। ডারউইন তার 'প্রজাতির উৎপত্তি' (১৮৫৯) বইয়ে বলেন [১৪] :

> 'চোখের আছে কিছু অনুকরণীয় উপকরণ, যা দিয়ে এটি বিভিন্ন দূরত্বের সাথে ফোকাস করতে পারে, বিভিন্ন মাত্রার আলো এর ভিতরে ঢুকতে দিতে পারে, এবং গোলাকার ও বর্ণীয় অপেরণকে সংশোধন করতে পারে, সেটি প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভুত হয়েছে মনে করা হয়ত অসম্ভব ব্যাপার বলেই মনে হতে পারে। তবুও যুক্তি আমাকে বলে যে, যদি অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ও সরল চোখ থেকে নিঁখুত ও জটিল চোখ পর্যন্ত অনেক কয়েকটি স্তর থেকে থাকে এবং প্রতিটি স্তর তার ধারকের জন্য উপকারী হয় বলে দেখানো যায়; আর যদি চোখগুলো সামান্য পরিমানেও পরিবর্তনশীল হয়, এবং বিভিন্নতাগুলো বংশানুসৃত হয় (যা অবশ্যই সম্ভব), আর যদি অঙ্গের বিভিন্নতাগুলো বা পরিবর্তনগুলো জীবনের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে প্রাণীর জন্য উপকারী বলে বিবেচিত হয়, তাহলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে নিখুঁত ও জটিল চোখের উদ্ভব যতই অবাস্তব শোনাক না কেন, না ঘটার কোন কারণ নেই।'

বিবর্তন বা প্রাকৃতিক নির্বাচন লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ধাপে ধাপে ঘটে। আজকে আমরা চোখের যে পূর্ণাংগ গঠন দেখে মুগ্ধ হই তা একদিনে তৈরি হয়নি, তা বহুকাল ধরে ক্রমান্বয়ে ঘটতে থাকা ছোট ছোট পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। ডারউইনের পরে গত দেড়শো বছরে আমরা চোখসহ বিভিন্ন অঙ্গের বিবর্তন সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানতে পেরেছি। বিবর্তনের ইতিহাসে, খুব সম্ভবত, বেশ কয়েকবারই আলাদা আলাদাভাবে চোখের বিকাশ ঘটেছে- কখনও মাকড়সা, কাঁকড়া, বিভিন্ন পোকার মত সন্ধিবদ্ধ (arthropod) প্রানীদের মধ্যে, আবার কখনও অক্টোপাস, শামুক, ঝিনুক জাতীয় মলাস্ক (Mollusk) প্রাণীদের মধ্যে এবং কখনও বা আমাদের মত মেরুদন্ডী (Vertebrates) প্রাণীদের মধ্যে। এই তিনটি গ্রুপের মধ্যেই আলাদা আলাদাভাবে চোখের সৃষ্টি এবং বিকাশ ঘটেছে - এই বিভিন্ন ধরনের চোখগুলো একেটা একেক রকম পদ্ধতিতে কাজ করলেও শেষ পর্যন্ত এরা সবাই চোখের ভুমিকাই পালন করে। খুব সম্ভবত আলোর প্রতি সংবেদনশীল একধরনের স্নায়বিক কোষ থেকে প্রথম চোখের বিকাশ শুরু

হয়। তারপর হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হতে হতে আজকে তারা এই রূপ গ্রহন করেছে। কতগুলো সংবেদনশীল কোষকে কাপের মত অবতলে যদি ঠিকমতভাবে সাজানো যায় তাহলে যে নতুন একটি আদি-চোখের উদ্ভব হয় তার পক্ষে আলোর দিক নির্ণয় করা সম্ভব হয়ে উঠে।

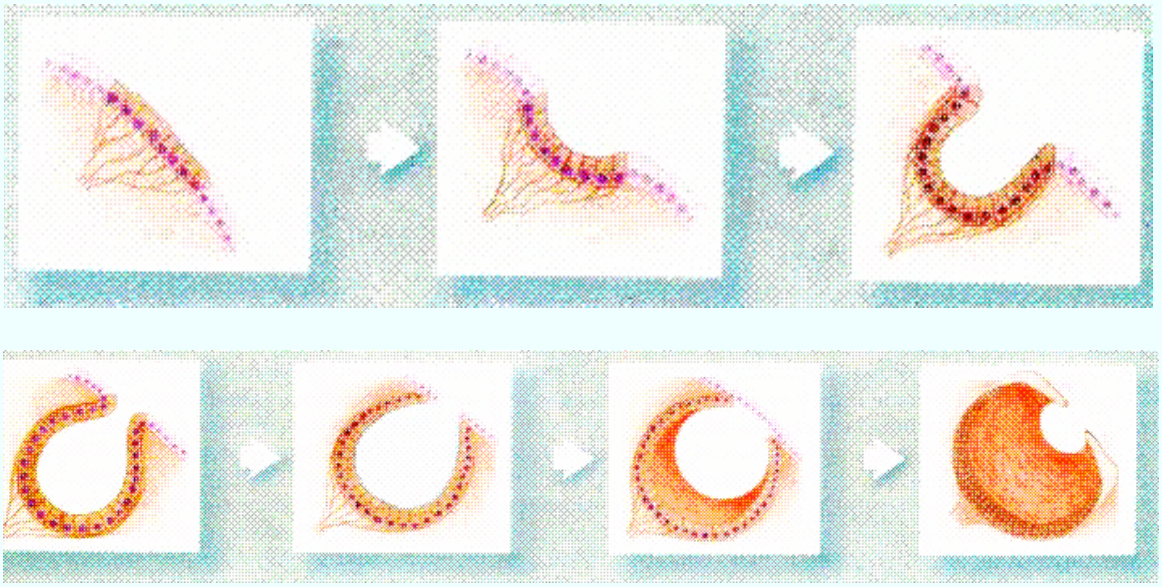

চিত্র ১০.১ : চোখের বিবর্তন : চোখের মত একটি জটিল প্রত্যঙ্গ সহজেই আলোর প্রতি সংবেদনশীল খুব সরল স্নায়বিক কোষ বিশিষ্ট 'আই-স্পট' থেকে বিভিন্ন ধাপে ধাপে পরিমিত ভিন্নতার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হতে পারে। যখনই এ ধরনের কোন পরিবর্তন - যা কিছুটা হলেও বাড়তি সুবিধা প্রদান করে, তা ধীরে ধীরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে জনপুঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে।
(সৌজন্য : http://www.millerandlevine.com/km/evol/lgd/index.html)

এখন যদি এই কাপটির ধারগুলোকে কোনভাবে বন্ধ করা যায় তাহলে আধুনিক pin-hole camera-এর মত চোখের উৎপত্তি ঘটবে। তারপর একসময় গতি নির্ধারণ করতে পারে এমন একটি অক্ষিপট (Retina) বা রং বুঝতে পারে কোনের (cone) মত এমন একটি অংশ বিকাশ লাভ করে তাহলে আরও উন্নত একটি চোখের সৃষ্টি হবে। এরপর যদি বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইরিস ডায়াফ্রামের (Iris diaphragm) উৎপত্তি ঘটে তাহলে চোখের ভিতরে কতখানি আলো ঢুকবে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। এরপর আস্তে আস্তে যদি লেন্সের (lens) উদ্ভব ঘটে তা তাকে আলোর সমন্বয় এবং ফোকাস করতে সহযোগিতা করবে আর এর ফলে চোখের উপযোগীতা আরও বাড়বে। এইভাবেই সময়ের সাথে সাথে মিউটেশনের মাধ্যমে চোখের ক্রমান্বয়িক পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা এখনও আমাদের চারপাশে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত বিভিন্ন ধাপের চোখের অস্তিত্ব দেখতে পাই, অনেক আদিম প্রাণীর মধ্যে এখনও বিভিন্ন রকমের এবং স্তরের আদি-চোখের অস্তিত্ব দেখা যায়। কিছু এককোষী জীবে একটা আলোক-সংবেদনশীল জায়গা আছে যা দিয়ে সে আলোর দিক সম্পর্কে খুব সামান্যই ধারণা করতে পারে, আবার কিছু কৃমির মধ্যে এই আলোক-সংবেদনশীল কোষগুলি একটি ছোট অবতল কাপের মধ্যে বসানো থাকে যা দিয়ে সে আরেকটু ভালোভাবে দিক নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। সমতলের উপর বসানো নামমাত্র আলোক সংবেদনশীলতা থেকে শুরু করে পিনহোল ক্যামেরার মত মেরুদন্ডী প্রাণীদের অত্যন্ত উন্নত চোখ পর্যন্ত সব ধাপের চোখই দেখা যায় আমাদের চারপাশে, এবং তা দিয়েই বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

ক)

খ)

গ)

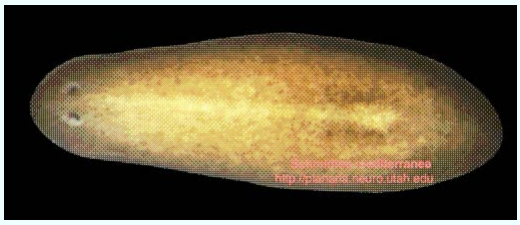

ঘ)

চ)

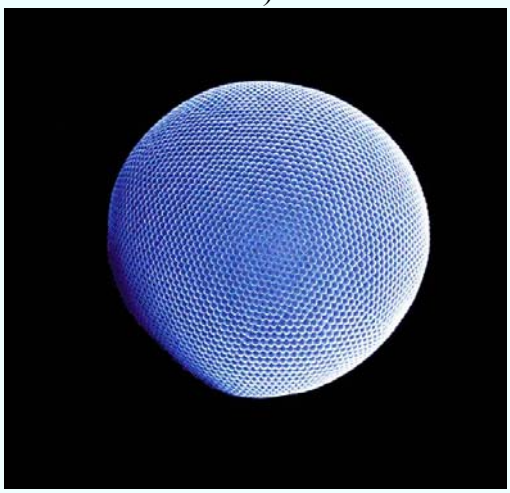

ঙ)

চিত্র ১০.২ : প্রকৃতিতে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের চোখ : ক) অন্ধ গুহা মাছ মেক্সিকান টেট্রা (Astyanax mexicanus); (খ) অন্ধ cave salamander: খুব সূক্ষভাবে লক্ষ্য করলে চামড়ার নীচে 'আদিম প্রকৃতির' চোখের অবস্থান বোঝা যাবে; (গ) আদিম নটিলাসের পিন-হোল ক্যামেরা সদৃশ চোখ; (ঘ) প্লানারিয়াম : কাপ 'আইস্পট' (ঙ) অ্যান্টার্কটিক ক্রিল (চ) মানুষের চোখ।

বিবর্তনবাদ : এক ইউনিভার্সাল এসিড

পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক ধ্যন ধারণার কোন কমতি নেই, কিন্তু খুব কম বৈজ্ঞানিক ধারণাই জনসাধারণের মানসপটে স্থায়ীভাবে বিপ্লব ঘটাতে পেরেছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক থমাস কুন (Thomas Kuhn) এ ধরনের যুগান্তকারী বিপ্লবাত্মক ধারণাকে 'প্যারাডিম শিফট্' (Paradigm Shift) নামে অভিহিত করতেন [১৫]। *প্যারাডিম শিফট্* কিন্তু হর-হামেশা ঘটে না। মানব সভ্যতার ইতিহাস তামা-তামা করে খুঁজলেও দু'একটির বেশি *প্যারাডিম শিফটের* উদাহরণ পাওয়া যাবে না। পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্ব ছিল একটি *প্যারাডিম শিফট্*, যা আমাদের চিরচেনা বিশ্বব্রহ্মান্ডের ছবিটাই দিয়েছিল আমূল বদলে। ঠিক একই ভাবে জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে *প্যারাডিম শিফটের* উদাহরণ হল বিবর্তনতত্ত্ব [১৬]। এই বিবর্তন তত্ত্বই আমাদের শিখিয়েছে যে, কোন প্রজাতিই চিরন্তন বা স্থির নয়, বরং আদিম এক কোষী প্রাণী থেকে শুরু করে এক প্রজাতি থেকে পরিবর্তিত হতে হতে আরেক প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে, আর মানুষ সহ পৃথিবীর সব প্রাণীই আসলে কোটি কোটি বছর ধরে তাদের পুর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হতে হতে এখানে এসে পৌঁছেছে। ডারউইন শুধু এ ধরনের একটি বিপ্লবাত্মক ধারণা প্রস্তাব করেই ক্ষান্ত হননি, বিবর্তনের এই প্রক্রিয়াটি (প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে) কিভাবে কাজ করে তার পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন সবিস্তারে [১৭], প্রথমবারের মত ১৮৫৯ সালে 'প্রজাতির উদ্ভব' বা 'অরিজিন অব স্পিশিজ' বইয়ে। খুব অবাক হতে হয় এই ভেবে, যে সময়টাতে সৃষ্টি রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে প্রায় সকল বিজ্ঞানী আর দার্শনিকই সবে ধন নীল-মনি ওই বাইবেলের জেনেসিস অধ্যায়ে মুখ থুবরে পড়ে ছিলেন আর বাইবেলীয় গণনায় ভেবে নিয়েছিলেন পৃথিবীর বয়স সর্বসাকুল্যে মাত্র ছ'হাজার বছর আর মানুষ হচ্ছে বিধাতার এক 'বিশেষ সৃষ্টি', সে সময়টাতে জন্ম নিয়েও ডারউইনের মাথা থেকে এমনি একটি যুগান্তকারী ধারণা বেরিয়ে এসেছিলো যা শুধু বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকেই তরান্বিত করেনি, সেই সাথে চাবুক হেনেছিলো আমাদের ঘারে সিন্দাবাদের ভুতের মত সওয়ার হওয়া সমস্ত ধর্মীয় সংস্কারের বুকে। দার্শনিক ডেনিয়েল ডেনেট এজন্যই বোধ হয় বলেছিলেন, 'আমাকে যদি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধারণাটির জন্য কাউকে পুরষ্কৃত করতে বলা হয়, আমি নিউটন, আইনস্টাইনদের কথা মনে রেখেও নির্দ্বিধায় ডারউইনকেই বেছে নেব।' [১৮] 'ডারউইনের বুলডগ' বলে কথিত বিজ্ঞানী টি এইচ হাক্সলি ডারউইনের 'প্রজাতির উদ্ভব' বইটিকে নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়ার' পর জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী 'মহাস্ত্র' হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন; আবার সেই সাথে আবার দুঃখও করেছিলেন এই ভেবে - 'এতোই নির্বোধ আমি যে এত সহজ ব্যাপারটা আগে আমার মাথায় আসেনি।' [১৯] বিজ্ঞানী আর্নেস্ট মায়ার বলেছেন, 'ডারউইনিয়ীয় বিপ্লব যে মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ধারণা - এটি যে কারো পক্ষে খন্ডন করা কঠিনই হবে।' [২০] স্টিফেন জে গুল্ড মনে করতেন তাবৎ পশ্চিমা বিশ্বের আধা ডজন বাছা বাছা তত্ত্বের মধ্যে ডারউইনের তত্ত্ব থাকবে শীর্ষস্থানে। [২১] আর অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স তো মনেই করেন যে, শুধু পৃথিবী নয় সমগ্র মহাবিশ্বে কোথাও প্রাণের বিকাশ ঘটলে তা হয়ত ডারউইনীয় পদ্ধতিতেই ঘটবে, কারণ ডারউইনীয় বিবর্তন সম্ভবতঃ একটি 'সার্বজনীন সত্য' (universal truth)।[২২] সমগ্র মহাবিশ্বের প্রেক্ষাপটে 'সার্বজনীন সত্য' কিনা তা এখনো প্রমাণিত না হলেও স্বীকার করে নিতেই হবে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব আর এর নান্দনিক বিকাশকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের চেয়ে ভাল কোন তত্ত্ব এ মুহূর্তে আমাদের হাতে নেই। আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে বলেছি পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব যেমন একটি সফল তত্ত্ব, জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডারউইনের তত্ত্ব তেমনি একটি অত্যন্ত সার্থক তত্ত্ব।

দার্শনিক ডেনিয়েল ডেনেট বিবর্তনতত্ত্বকে 'ইউনিভার্সাল এসিড' (universal acid) বা রাজাম্ল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন [৮]। ইউনিভার্সাল এসিড যেমন তার বিধ্বংসী ক্ষমতায় সকল পদার্থকে পুড়িয়ে-গলিয়ে ছারখার করে দিতে পারে, তেমনি ডারউইনের বিবর্তনবাদী তত্ত্ব সমস্ত প্রথাগত ধর্মীয় ধ্যান ধারণা আর কুসংস্কারকে একেবারে দুর করে দিতে পারে। অধ্যাপক ডেনেট তার বিখ্যাত বইটিতে [৮] বিবর্তন তত্ত্বকে 'ডারউইনের বিপজ্জনক প্রস্তাব' (Darwin's dangerous idea) বলে উল্লেখ করেছেন। এটি 'বিপজ্জনক' কারণ এটি বলে যে, মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী কোন উপরওয়ালার নির্দেশনা ছাড়াই শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পদ্ধতির মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত সরল জীব থেকে ক্রমান্বয়ে উদ্ভুত হতে পারে।

সৃষ্টিতত্ত্বের বিবর্তন

ভিক্টোরিয়ান যুগের শেষ নাগাদ ব্রিটেনসহ সারা ইউরোপের শিক্ষিত মহলেই ডারউইনীয় বিবর্তনবাদ

গ্রহনযোগ্য হয়ে ওঠে, বিজ্ঞানীদের মধ্যে তো বটেই, এমনকি চার্চের পাদ্রীদের মধ্যেও [১৬]। কিন্তু ইউরোপের অবস্থা যতখানি না ভাল হতে থাকল, আমেরিকার অবস্থা হতে লাগলো পাল্লা দিয়ে ততটাই খারাপ। তার কারণ, সেখানে বিবর্তনের ব্যাপারটি শিক্ষাঙ্গনে সীমাবদ্ধ থাকলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে তা কোনরকম সচেতনতা জাগাতে ব্যর্থ হয়। আর মানুষকে অসচেতন রাখতে পুরোমাত্রায় ইন্ধন যুগিয়ে চলে সেখানকার খ্রীষ্টিয় চার্চ এবং আমেরিকার রক্ষণশীল সরকারগুলো। ফলে দেখা গেল, জামানা পাল্টে গেলেও বেশিরভাগ আমেরিকানই বাইবেল বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বকেই 'শিরোধার্য' করে বসে আছেন[**]। সারা দুনিয়া জুড়ে শিক্ষাঙ্গনে যে নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে তার ছোঁয়া যেন আমেরিকানরা লাগাতেই চাইলেন না গায়ে। ধীরে ধীরে আমেরিকার প্রেস এবং মিডিয়ারও চোখেও বিবর্তন বনাম সৃষ্টিতত্ত্বের অলিখিত দ্বন্দ্বের ব্যাপারটা নজরে পড়ল এবং তাদের দৌলতেই ১৮৯০ সালের পর থেকে এই বিতর্ককে 'জনগণের মধ্যে' ছড়িয়ে দেওয়া শুরু হল। এখনও আমেরিকায় জনগণের মধ্যে বিবর্তন এবং সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে বিতর্কের কোন শেষ নেই। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, আমেরিকা পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রধান ধর্মপ্রাণ দেশ (ভারতের পরই)। অথচ ইউরোপে কিন্তু পরিস্থিতি একদমই অন্যরকম, সেখানে ইউরোপের বেশীরভাগ মানুষই আজকে বিবর্তনবাদকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে মেনে নিয়েছেন।

একটি জিনিস এখানে পরিস্কার করা দরকার। আমেরিকার সাধারণ মানুষ বা রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ বা প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যাই বিশ্বাস করুক না কেন আজকের দিনে জীববিজ্ঞানীদের সকলেই কিন্তু বিবর্তনবাদী। বিবর্তনবাদের স্বীকৃতি ছাড়া আজকে জীববিজ্ঞানের সব শাখাই অচল। কোন বৈজ্ঞানিক জার্নালেই বিবর্তনের মুল বিষয়টির সমালোচনা বা বিরোধিতা করা হয় না; সেখানে হয়তো বিবর্তনটা কিভাবে ঘটছে তার পদ্ধতি নিয়ে (যেমন ধীর গতিতে ঘটছে নাকি উল্লম্ফন ঘটছে) মতানৈক্য হতে পারে, বিতর্ক হতে পারে বিবর্তনের পদ্ধতি কি ফাইলেটিক (phyletic), স্যালটেশন (saltation) নাকি কোয়ান্টাম (quantum) এ নিয়ে; কিন্তু বিবর্তন যে ঘটছেই সে ব্যাপারে জীববিজ্ঞানী এবং প্রাণরসায়নবিদদের মধ্যে এখন কোনো সংশয়ই নেই।

প্রায় অর্ধ শতকেরও বেশী হতে চললো শিক্ষায়তনে (academia) বিবর্তন নিয়ে কোন বিতর্ক নেই, যা বিতর্ক সবই ওই রাজনৈতিক মহলে, আইন-আদালতে, মিডিয়া, স্কুল বোর্ডে কিংবা ইন্টারনেটের বিভিন্ন ফোরাম এবং ওয়েব সাইটে। বোঝা কষ্টকর নয় 'সীতার অগ্নিপরীক্ষার' মত ডারউইনীয় বিবর্তন তত্ত্বকে কেন বার বার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে, কেন টেনে হিঁচড়ে এমনকি আদালতের কাঠগড়াতেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বারবার; কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই ডারউইনবাদ অত্যন্ত সাফল্যের সাথেই বিপদকে সামাল দিতে পেরেছে। ইতিহাসের যে আইনী লড়াইগুলো বিগত শতাব্দীর আশির দশক পযর্ন্ত আমেরিকার জনগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছে সেগুলো হল : টেনিসির স্কোপস 'মাঙ্কি' ট্রায়াল (Scopes Trial, 1925), আরকানসাসের ভারসাম্যমূলক বিচারের ধারা (Arkansas Balanced Treatment Act, 1981), লুইজিয়ানার সৃষ্টিবাদী ধারা (The Louisiana Creationism Act, 1987)[২৩]। এর মধ্যে স্কোপসট্রায়ালের রায় বিবর্তনবাদীদের বিপক্ষে গেলেও এতে

** 'দ্য ক্রিয়েশনিস্টস' (১৯৯২) বইয়ের লেখক রোনাল্ড নাম্বারসের মতে প্রথম দিকে সৃষ্টিবাদ (creationism) শব্দটি 'বিবর্তন-বিরোধী' সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত না; কারণ, বিবর্তন বিরোধীদের সে সময় কোন সৃষ্টির কোন বিশেষ মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ঐকমত ছিল না। কিন্তু ১৯২০ সালের পর থেকে আমেরিকায় বাইবেলীয় সৃষ্টিতত্ত্ব বিবর্তন-বিরোধী মহলে বিবর্তনতত্ত্বের বিকল্প মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

তাদের 'নৈতিক বিজয়' অর্জিত হয়, আর বাকিগুলোর ক্ষেত্রে সৃষ্টিতাত্ত্বিকদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। লুজিয়ানার আইনী লড়াই তো একেবারে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। শেষপর্যন্ত আরকানসাস এবং লুজিয়ানা -দু জায়গার আদালতই তথাকথিত 'সৃষ্টিবিজ্ঞান' (Creation science)কে 'বিজ্ঞানের ছদ্মবেশধারী এক ধর্মীয় মতবাদ' (Religious dogma) হিসেবে আখ্যায়িত করে 'অসাংবিধানিক' হিসেবে বাতিল করে দেয়।

স্কোপস ট্রায়ালের কথা আলাদা করে বলতেই হয়। ১৯২৫ সালে জীববিজ্ঞানের শিক্ষক জন স্কোপসকে টেনেসীর ডেটন থেকে গ্রেফতার করা হয় স্কুলের ছাত্রদের 'বিবর্তন পড়ানোর অজুহাতে'। আজকের দিনের পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ব্যাপারটা শুনতে খুব অদ্ভুত শোনাবে, কিন্তু সেসময় সেটাই ছিল রূঢ় বাস্তবতা। মুলতঃ ১৮৯৫ সালে নাইজেরিয়ায় বাইবেল বিশ্বাসীদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়, যাকে 'নাইজেরিয়া বাইবেল কনফারেন্স' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকেই আমেরিকার 'মৌলবাদীরা' (fundamentalists) বিভিন্ন প্রদেশে 'বিবর্তন-বিরোধী আইন' বলবৎ করার জন্য সরকারের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে। সৃষ্টিবাদীদের দৌরাত্ম সেসময় এতোই বেশি ছিল যে টেনিসি, মিসিসিপি এবং আরকানসাসের মত প্রদেশগুলোতে স্কুল কলেজে বিবর্তন পড়ানোই ছিল অপরাধ। ওকলাহামার পাঠ্যপুস্তক থেকে বিবর্তন উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর ফ্লোরিডায় ডারউইনবাদকে 'ধ্বংসাত্মক' হিসেবে চিহ্নিত করে হেয় করা হয়েছিল[২৪]। এমন এক পরিস্থিতিতে ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা সৃষ্টি করবার লক্ষ্যে জন টি স্কোপস নামের টেনিসির এক হাইস্কুল শিক্ষক ছাত্রদের বিবর্তন পড়িয়ে সেখানকার বিবর্তন-বিরোধী আইনের বলি হবার সিদ্ধান্ত নিলেন। যথারীতি স্কোপসকে গ্রেফতার করা হল এবং আদালতের হাতে সোপর্দ করা হল। স্কোপসের পক্ষে লড়েছিলেন বিখ্যাত আইনবিদ ক্লেরেন্স ড্যারো (Clarence Darrow)। আর উল্টো পক্ষে ছিলেন তিন তিনবার (ব্যর্থ) প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী এবং তার্কিক উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান (Willium Jennings Bryan)। দুর্ভাগ্যক্রমে আদালত বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের সাক্ষ্য গ্রহণে অপারগতা দেখায়, যা চার্লস ড্যারোকে হতাশ করে দেয়। তারপরও চার্লস ড্যারোর জেরায় জর্জরিত হয়ে ব্রায়ান জেনিংস একটা সময় স্বীকার করতে বাধ্য হন যে পৃথিবীর বয়স বাইবেল বর্ণিত ৬০০০ বছরের ঢের বেশি [২৩]। পুরো কোর্ট পরিণত হয় যেন এক জলজ্যান্ত সার্কাসে।

যা হোক, শেষ পর্যন্ত স্কোপসকে বিবর্তন পড়িয়ে টেনেসির আইন ভাঙার অপরাধে (যা তিনি সত্যই করেছিলেন) একশ ডলার জরিমানা করা হয়। পরবর্তীতে অবশ্য স্কোপস আপিল করায় সে দন্ডও মওকুফ হয়ে যায়। কিন্তু এখানে পুরো ব্যাপারটিতে আসলে বিবর্তনবাদীদের নৈতিক বিজয় ঘটে। টেনিসির আদালত সারা আমেরিকাতেই এক ঠাট্টা তামাসার পাত্র হয়ে ওঠে। বিশেষ করে এইচ এল মেনকেন (H.L. Mencken) নামের এক পত্রিকার রিপোর্টার তার ক্ষুরধার লেখনীতে মৌলবাদী সৃষ্টিতাত্ত্বিকদের একেবারে তুলোধুনো করে ছাড়েন। দীর্ঘদিন ধরে মামলা মোকদ্দমার চাপ আর দেশ জুড়ে ঠাট্টা তামাসা সহ্য করতে না পেরে রায় প্রদানের দিন কয়েকের মধ্যেই ব্রায়ান জেনিংসের অকাল মৃত্যু ঘটে। ১৯৬০ সালে স্কোপস ট্রায়ালকে ভিত্তি করে স্ট্যানলি ক্রামারের (Stanley Kramer) নির্দেশনায় একটি বিখ্যাত চলচিত্র নির্মিত হয় -'Inherit the wind'। সেটিতে ড্যারোর ভূমিকায় আভিনয় করেন বিখ্যাত অভিনেতা স্পেনসার ট্রেসি (Spencer Tracy), ব্রায়ান জেনিংসের ভূমিকায় ছিলেন ফ্রেডরিক মার্চ (Fredric March), আর মেনকেনের ভুমিকায় ছিলেন জীন কেলি (Gene Kelley)। ছবিটি সে সময় দর্শকদের মধ্যে দারুন জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এবং এখন পর্যন্ত তা ইতিহাসের অন্যতম 'ক্লাসিক' ছবি হিসেবে বিবেচিত।

সৃষ্টিবাদীরা স্কোপস ট্রায়ালের পর থেকে নতুন উদ্যমে এবং নতুন ধারায় নিজেদের মতবাদ প্রচারে তৎপর হয়ে ওঠে। বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের কোন কিছুই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সাথে মিলছে না দেখে, ১৯৬১ সালে জন হুইটকম্ব (John Whitcomb) এবং হেনরী মরিস (Henry Moris) 'The Genesis Flood' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। লেখকেরা দাবী করেন যে সাদা চোখে যতই বেমানান লাগুক না কেন, বাইবেলের সৃষ্টি তত্ত্ব আসলে বিজ্ঞানের সাথে সংগতিপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক মহলে বইটি কোন গ্রহনযোগ্যতা না পেলেও ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা এই বইটির মধ্যে ডারউইনীয় বিবর্তনবাদকে ঠেকানোর অভিনব কিছু পন্থা খুঁজে পায়। ১৯৬৩ সালে হেনরী মরিস Creation Research Society (CRS) এবং সত্তর দশকের দিকে 'Institute of Creation Research' (ICR) প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের লক্ষ্য ছিল স্কুল কলেজগুলোতে এ নতুন সৃষ্টিতত্ত্বকে 'বৈজ্ঞানিকভাবে' পড়ানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করা। মরিস এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা পরিস্কার করেই বলেন [২৪] :

> 'আমরা যে চেষ্টাকে মহিমান্বিত করি তা হল প্রথমে এটি বোঝা যে ঈশ্বরের বাণী হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী; এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় ঈশ্বর পরিস্কার করেই বলতে সক্ষম, এবং যা বলেন তা সঠিকভাবেই নির্দেশ করেন। বাইবেলে ঠিক তাই রয়েছে, যা আমাদের মূলমন্ত্র। এটা আমরা মেনে নেই, আর তারপর বৈজ্ঞানিক উপাত্তগুলোকে সেই (বাইবেলীয়) কাঠামোর ভিতরে ফেলে ব্যাখ্যা করি।'

ICR এর ওয়েব সাইটেও লেখা আছে [২৫] :

> 'The Bible is the written word of God … To the student of nature this means that the account of origins in Genesis is a factual presentation of simple historical truth.'

এ ধরনের 'রিসার্চ' কতটা 'বৈজ্ঞানিক' তা নিয়ে সব সময়ই সংশয় তো থেকেছেই, তা হাসির ও খোরাক হয়েছে পুরোমাত্রায়। গবেষণা করার সময় বিজ্ঞানীরা খোলা মনে 'রিসার্চ করবেন' এটাই ধরে নেওয়া হয়। বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত নেন নিরপেক্ষভাবে করা পরীক্ষণের ফলাফলের ভিত্তিতে। কিন্তু বাইবেল বিশ্বাসী 'বিজ্ঞানীরা' তা করেন না। তারা বাইবেল যে 'অভ্রান্ত' সে সিদ্ধান্তেই সব সময় অটল থাকেন। আর আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্যের আলোকে বাইবেলকে 'পুনর্ব্যাখ্যা' করেন। যখন 'পুনর্ব্যাখ্যা' করতে পারেন না, কিংবা ধর্মগ্রন্থের সাথে তাদের সৃষ্টির গল্পগুলোর এতটাই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তখন তারা খোদ বিজ্ঞানের সাক্ষ্য-প্রমাণগুলোকেই প্রশ্নবিদ্ধ করতে থাকেন। নীচের কার্টুনটি দেখলেই বোঝা যাবে সৃষ্টিবাদীদের বিজ্ঞান 'Creation Sceince' কিভাবে কাজ করে। বলা বাহুল্য, কোন বৈজ্ঞানিক জার্নালে কখনই এই 'সৃষ্টি-বিজ্ঞানী'দের কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়নি। ডঃ ইউজিন স্কট (Eugenie Scott) এবং ডঃ হেনরী কোল (Henry Cole) একবার একটি সমীক্ষায় দেখিয়েছিলেন যে, এই সৃষ্টিবিজ্ঞানীরা আটষট্টিটি জার্নালে তাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল পাঠাতে পারতেন, কিন্তু নিজেরাই বুঝেছিলেন যে সেগুলো এতই নিম্নমানের যে পাঠানোর উপযুক্ত নয়, কিংবা যদিও বা কিছু পাঠিয়েছিলেন, সঙ্গত কারণেই সেগুলো প্রত্যাখ্যাতও হয়েছিলো [২৬]।

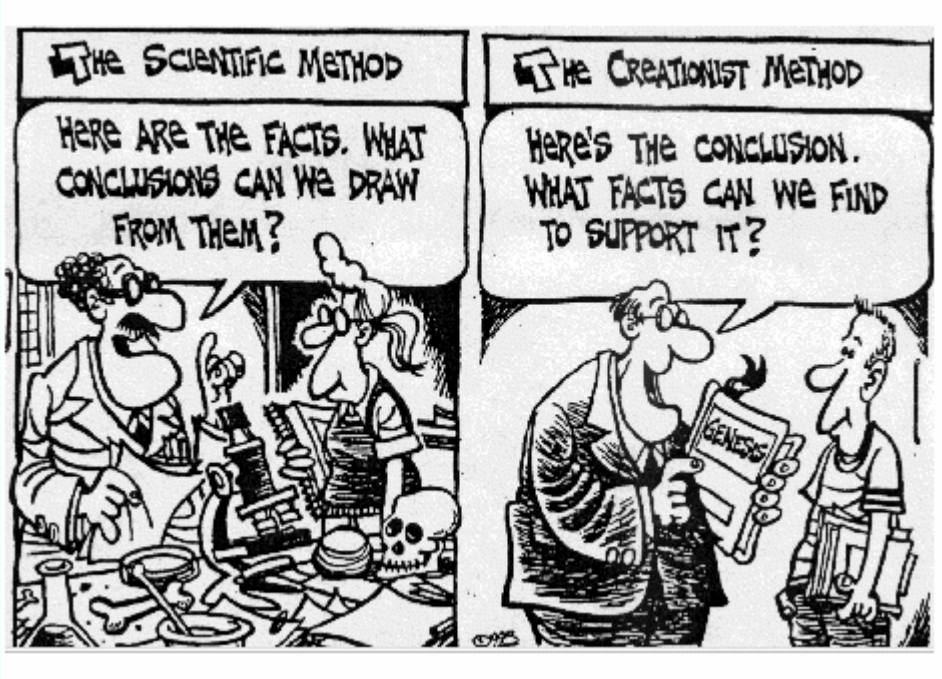

চিত্র ১০.৩ : কার্টুন : প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বনাম সৃষ্টি বিজ্ঞানের পদ্ধতি

মরিসের পাশাপাশি সৃষ্টিতত্ত্বের আরেক মহারথি ছিলেন দুয়েন গিশ (Duane Gish)। বায়োকেমিস্ট্রিতে ডক্টরেট করা এ ভদ্রলোক, অত্যন্ত দক্ষ তার্কিক। বিগত শতাব্দীর আশির দশকে এ ভদ্রলোক সারা আমেরিকার উপকূল জুড়ে ভ্রমণ করতেন আর বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানীদের সাথে মুখোমুখি বিতর্কে লিপ্ত হতেন। জীববিজ্ঞানীদের অধিকাংশই যেহেতু ল্যাব-রিসার্চ নিয়েই পড়ে থাকতেন, তাদের অনেকেই বাকপটু ছিলেন না, অনেকে প্রকাশ্য বিতর্কে অভ্যস্তও ছিলেন না। গিশ বেছে বেছে এ ধরনের জীববিজ্ঞানীদের নিজের সহজ শিকারে পরিণত করতেন। আর সাধারণ মানুষদের যেহেতু বিবর্তনের জটিল টেকনিকাল বিষয়গুলো নিয়ে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, সুযোগটি পুরোমাত্রায় ব্যবহার করতেন গিশ। প্রকাশ্য সভায় বিভিন্ন চটকদার বক্তব্য আউড়ে তিনি প্রতিপক্ষ জীববিজ্ঞানীদের ধরাশায়ী করার ভঙ্গী করে দর্শকদের 'বাহবা' কুড়াতেন। আর দর্শক সারির একটা বড় অংশই ছিল আবার চার্চগামী খ্রীষ্টান। তারা গিশের প্রতিটি বিতর্ক সভায় দলবল নিয়ে যোগদান করতেন আর গিশের প্রতিটি কথার পরই হাত তালির বন্যা বইয়ে দিতেন। ফলে প্রথম থেকেই তারা এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতেন যে, বিতর্ক শুরুর আগেই মনে হত গিশ বুঝি জয়ী হয়ে গিয়েছেন।

নিঃসন্দেহে এ সমস্ত চমকবাজীর প্রভাব আমেরিকায় পড়েছিল। অচিরেই রক্ষণশীলদের চাপে আর্কানসাস এবং লুজিয়ানায় বিবর্তনের পাশাপাশি সৃষ্টিতত্ত্বকেও পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য 'ভারসাম্যমুলক' আইন প্রবর্তন করা হল। এই আইনকে 'অসাংবিধানিক' হিসেবে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করলেন আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন (ACLU)। ফলে বিবর্তন-সৃষ্টিতত্ত্বের 'দ্বন্দ্ব' আবারও আদালতের কাঠগড়ায় উঠে এল। এবার আর্কানসাসের আদালত পরিণত হল 'সৃষ্টি বিজ্ঞানী'দের তামাসায়। সেখানে একেক 'সৃষ্টি বিজ্ঞানী' একেক ভাবে নিজেদের বিশ্বাস উপস্থাপন করতে থাকেন, যুক্তি এবং বুদ্ধির লেশ ছাড়াই। যেমন, ডালাসের ধর্মতাত্ত্বিক নর্মান গেইসলার (Norman Geisler) ঘোষনা করলেন - 'ঈশ্বরে অবিশ্বাস করেও ঈশ্বর যে আছে তাতে নিজের বিশ্বাস আনা সম্ভব।' তিনি আরো বললেন, আকাশে দেখা

ইউএফও বা উড়ন্ত চাকীগুলো নাকি শয়তানের চর! আরেক মৌলবাদী সৃষ্টিতাত্ত্বিক ও কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ হেনরী ভস (Henry Voss) কে তো ফিরিয়েই নেওয়া হল কারণ তিনি বিচার শুরুর ঠিক আগে শয়তানের আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন।

সৃষ্টি-বিজ্ঞানীদের অনেকেই আদালতে স্বীকার করলেন যে তারা গবেষণার নামে যা করছেন তা আসলে বিজ্ঞান নয়। লোমা লিন্ডা বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যারল্ড কফিন (Harold Coffin) বললেন, 'না, সৃষ্টি-বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষণযোগ্য নয়।' লোমা লিন্ডার আরেক 'বিজ্ঞানী' এরিয়েল রথ(Ariel Roth)কে যখন জিজ্ঞাসা করা হল সৃষ্টিবিজ্ঞান আসলেই বিজ্ঞান কিনা তিনি বললেন - 'যদি আপনি বিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করেন পরীক্ষণযোগ্যতা আর পূর্বাভাসযোগ্যতার নিরিখে, তবে আমার উত্তর, না!'। হ্যারল্ড কফিন (Harold Coffin) ক্যাম্বরিয়ান বিস্ফোরন, মধ্যবর্তী ফসিলের অভাব ইত্যাদি নানা অভিযোগে বিবর্তনকে অভিযুক্ত করলেন। কিন্তু কোঁসুলীর জেরার সামনে আসল গোমড় ফাঁস হয়ে গেল।

জেরার নমুনা :

> প্রঃ ১৯৫৫ সালে আপনার পি এইচ ডি-র পর তো কেবলমাত্র দুটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আছে স্ট্যান্ডার্ড সায়েন্টিফিক জার্নালে, না?
>
> উঃ হ্যাঁ, ঠিক।
>
> প্রঃ বলা হয় যে ক্যানাডার বার্জেস শেল (Burgess shale) তো ৫০০ মিলিয়ন বছরের বেশী পুরোন, কিন্তু আপনার তো ধারণা এটির বয়স মাত্র ৫০০০ বছর, তাই না?
>
> উঃ হ্যাঁ।
>
> প্রঃ বাইবেল না থাকলে তো পৃথিবী যে মিলিয়ন বছরের পুরোন তা মানতে আপনার কোন অসুবিধা ছিল না, তাই না?
>
> উঃ হ্যাঁ, যদি বাইবেল না থাকত।

দেখা গেল যে পাঁচজন বিজ্ঞানীকে সৃষ্টি-বিজ্ঞান সমর্থন করার জন্য আদালতে আনা হয়েছে তারা সবাই Creation Research Society (CRS)-এর সদস্য। তারা সকলেই একটি শপথনামায় সাক্ষর করেছিলেন এই মর্মে যে তারা বাইবেলের বাণীকে আক্ষরিক (literal interpretation) অর্থেই গ্রহণ করেন। CRS এর ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্গারেট হেলডার (Margatet Helder) আদালতে স্বীকার করলেন যে বিশেষ সৃষ্টিবাদের (special creation) পক্ষে কোন বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণ নেই।

ফেডারেল জজ উইলিয়াম ওভার্টনের সামনে আরকানসাসের ভারসাম্যমূলক বিচারের ধারাকে 'অসাংবিধানিক' হিসেবে ঘোষণা করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকলো না। তিনি ১৯৮২ সালের ৫ই জানুয়ারী বিচারের রায়ে ঘোষণা করলেন এই তথাকথিত 'সৃষ্টি বিজ্ঞান' আসলে 'সৃষ্টির বাইবেলীয় ভাষ্যকে সরকারী স্কুলের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার সুচতুর প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়।' এ ধরনের

প্রচেষ্টা আমেরিকার সংবিধানের প্রথম সংশোধনীকে লংঘন করে।

একইভাবে ১৯৮৫ সালে লুইজিয়ানাতেও ফেডারেল জজ অ্যাড্রিয়ান ডুপ্লান্টিয়ার (Adrian Duplantier) 'অসাংবিধানিক' আখ্যা দিয়ে তথাকথিত সৃষ্টিবিজ্ঞানকে বাতিল করে দেন। পরবর্তীতে আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট ১৯৮৭ সালের রায়ে সৃষ্টিতত্ত্বকে বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে 'ধর্মীয় প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর' অভিযোগে অভিযুক্ত করে স্কুল কলেজে এর অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয় [২৪]।

ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন : 'আধুনিক সৃষ্টিবাদ' এর জন্ম

আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট ১৯৮৭ সালে এক ঐতিহাসিক রায়ে ক্রিয়েশন সায়েন্সকে 'বৈজ্ঞানিক নয়' বরং 'রিলিজিয়াস ডগমা' হিসেবে চিহ্নিত করে দেওয়ার পর পরই সৃষ্টিবাদীরাও বুঝে গিয়েছিলেন যে এভাবে আর সচেতন জনসাধারণকে বোকা বানিয়ে রাখা যাবে না। তারা যখন দেখলো যে বিজ্ঞানীমহল কিছুতেই তাদের অবৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলোকে সমর্থন করছে না তখন তারা সত্যিকার অর্থেই মরিয়া হয়ে উঠল। গোপনে গোপনে জন্ম হল 'আধুনিক সৃষ্টিবাদের'। এই 'আধুনিক সৃষ্টিবাদী'রা তাদের পুর্বসূরীদের ভুল থেকে মূলতঃ তিনটি শিক্ষা নিলেনঃ

> প্রথমতঃ তারা বুঝেছিলেন কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশ্বাসকে (sectarian belief) বিজ্ঞান হিসেবে চালানো যাবে না, বরং সার্বজনীন সৃষ্টিকর্তার পক্ষেই 'সাক্ষ্য-প্রমাণ' হাজির করতে হবে।
>
> দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টিতত্ত্বের যে সমস্ত পূর্বতন দাবীগুলো হাস্যকর শোনায় এবং বৈজ্ঞানিক মহলে এবং সচেতন জনগণের মধ্যে ইতোমধ্যেই পরিত্যক্ত হয়েছে (যেমন বাইবেল কথিত পৃথিবীর বয়স- ছ'হাজার বছর) সেগুলো বাদ দিয়ে আধুনিক এবং বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি হাজির করা।
>
> তৃতীয়তঃ বিজ্ঞান যে কেবল 'প্রাকৃতিক নিয়ম দিকে জগৎকে ব্যাখ্যা করে' -এই মনোভাবকে 'গোঁড়ামীপূর্ণ' হিসেবে চিহ্নিত করে অপার্থিব অলৌকিক সত্ত্বাকে ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের আওতায় নিয়ে আসা।

মোদ্দা কথা হল বিবর্তনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য তাদের মূলতঃ দু'টো নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হলো: একদিকে তাদের প্রয়োজন হয়ে পড়লো আরেকটু 'সফিসটিকেটেড' তত্ত্বের আর অন্যদিকে অর্থ প্রতিপত্তি এবং রাজনৈতিক চালের জোড়ে সরকারী মাধ্যমগুলোতে আইডির পক্ষে সমর্থন জোগাড় করা। অর্থাৎ, সোজা পথে যদি স্কুল কলেজে তাদের সৃষ্টিতত্ত্ব ঢোকানো না যায় তাহলে বাঁকা পথে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি, বিশেষতঃ যখন ক্ষমতা এবং অর্থ কোনটারই তাদের অভাব নেই। আর তারই ফলাফল হচ্ছে আজকের এই সৃষ্টির 'বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প' (Intelligent Design argument), বা সংক্ষেপে আইডি।

তত্ত্ব হিসেবে 'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন' বা 'বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প'কে সাধারণ মানুষের সামনে হাজির করা হয় বিগত নব্বই এর দশকে। মাইকেল বিহে, উইলিয়াম ডেম্বস্কি, ফিলিপ জনসন, জোনাথন ওয়েলস প্রমুখ এ তত্ত্বটির প্রবক্তা এবং প্রচারক। প্রবক্তাদের সকলেই মোটা অঙ্কের অর্থপুষ্ট রক্ষণশীল খ্রীষ্টান সংগঠন *ডিস্কোভারি ইন্সটিটিউটের* (Discovery Institute) সাথে যুক্ত। এঁদের যুক্তি হল, আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ড এবং সর্বোপরি জৈব জীবন এতই জটিল এবং অনন্যসাধারণ যে প্রাকৃতিক উপায়ে সেগুলো উদ্ভুত হতে পারে না, এবং এর পেছনে এক বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনাকারীর পরিকল্পনার ছাপ আছে। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা মহাবিশ্ব এবং পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির পিছনে ঈশ্বর জড়িত থাকবার ব্যাপারটা মুখ ফুটে সরাসরি না বললেও সেদিকেই প্রায়শঃ ইঙ্গিত করে বলেন, বৈজ্ঞানিক ডেটাগুলো শুধু প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় কিংবা উচিৎ ও নয়, এগুলোকে সঠিকভাবে বোঝা যাবে তখনই, যখন এক সৃজনশীল সজ্ঞাত সত্ত্বার (intelligent agent) সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের আলোকে এগুলোকে দেখার চেষ্টা এবং বিশ্লেষণ করা হবে। প্রথম দিকে বৈজ্ঞানিক মহলে সুবিধা করতে না পারলেও বিজ্ঞান বিষয়ে অসচেতন রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিমন্ডলে এই 'আধুনিক সৃষ্টিবাদী'রা আক্ষরিক অর্থেই তর্ক-বিতর্কের টাইফুন ছুটিয়ে দিতে সমর্থ হয়। আর বরাবরের মত তো আমেরিকান সরকার আর মৌলবাদী খ্রীষ্টান চার্চ পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ার জন্য তো মুখিয়ে ছিলই। যেমন, ভিয়েনার রোমান ক্যাথলিক আর্চ বিশপ Christoph Schonborn 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' এর ৭ ই জুলাই, ২০০৫ সংখ্যায় পরিস্কার ঘোষণা করেন যে ক্যাথলিক চার্চ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটা বিবর্তনকে অস্বীকার করে। এর একমাস পরেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ একটি প্রেস কনফারেন্সে ঘোষণা করেন যে, তিনি স্কুল কলেজে বিবর্তন এবং 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' দুটোই পড়ানোর পক্ষে [২৭]।

তারা তাদের কৌশলের অংশ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষ জনগণের কাছে গিয়ে দাবী করে যে এই 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' তত্ত্বের সাথে আসলে ধর্মের কোনই সম্পর্ক নেই। এটি সম্পূর্ণ ভাবেই একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। যেমন, ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের অন্যতম প্রবক্তা এবং *ডিস্কোভারি ইন্সটিটিউটের* অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব উইলিয়াম ডেম্বস্কি তার 'The Design Revolution' (২০০৪) বইয়ে বলেন [২৮] :

> 'সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পটি কোন প্রোটেস্ট্যান্ট- খ্রীষ্টান সংক্রান্ত বিষয় না, এমনকি সাধারণ খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের ব্যাপারও নয় .... এটি এক অগ্রসর বৈজ্ঞানিক গবেষনামূলক কর্মসূচী। এ অনুকল্পের প্রবক্তারা এটার উৎকর্ষতা এবং ন্যায্যতা কোন ধরনের ধর্মীয় আবেদন হাজির না করেই বৈজ্ঞানিক মহলে উত্থাপন করতে সচেষ্ট।'

সেই ডেম্বস্কিই আবার খ্রীষ্টানদের সভাসমিতিতে গিয়ে তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষনা করে বলেন, তার লক্ষ্যই হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টকে বিজ্ঞানের জগতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। তিনি তার 'Intelligent Design: The Bridge Between Science and Theology' (১৯৯৯) বইয়ে সুস্পষ্ট ভাবেই লিখেছিলেন [২৮] :

> 'বিজ্ঞানের যে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি যীশু খ্রীষ্টকে দৃশ্যপট থেকে বিতারিত করে দিয়েছে সেগুলোকে মৌলিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে দেখতে হবে। যীশুকে বাদ দিয়ে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর গভীর ধারণা লাভ করা যায় না।'

অর্থাৎ, আইডির প্রবক্তারা ঠিক করেছেন তারা সাধারণ মানুষের মধ্যে গিয়ে 'রথও দেখবেন' আবার 'কলাও বেঁচবেন'। জনগণের সেক্যুলার অংশকে হাত করার লক্ষ্যে তারা ক্রমাগত প্রচার চালান যে তাদের

তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক, এর সাথে ধর্মের কোনই সম্পর্ক নেই, কিন্তু তাদের আসল গোমড় ফাঁস হয়ে যায় যখন তারা রক্ষণশীল মৌলবাদী সংগঠনের লোকজনের সাথে মিশতে গিয়ে বিশ্বাসের ঝাঁপি উপুর করে দেন!

ডিস্কোভারি ইন্সটিউটের আরেক কর্ণধর জোনাথন ওয়েলস 'Unification Church' এর আজীবন সদস্য। তিনি 'Moonie in-house journal' এ 'Darwinism : Why I went for a second PhD' শিরোনামের একটি প্রবন্ধে পরিস্কার করেই বলেন তার জীবনের একমাত্র ব্রতই হচ্ছে ডারউইনিজম ঠেকানো। তিনি লিখেছেন [২৯] :

> 'পিতার (চার্চের ফাদার Reverend Moon) উপদেশ, আমার শিক্ষা আর প্রার্থনা আমাকে এই মর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে যে আমি আমার পুরো জীবন ডারউইনিজম ধ্বংস করার কাজে নিয়োজিত করব, ঠিক যেমনিভাবে Unification Church এর অনেক সদস্য মার্ক্সিজম ধ্বংস করার কাজে উৎসর্গ করেছেন। যখন পিতা ১৯৭৮ সালে পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য আমাকে (আরো একডজন সেমিনারী গ্র্যাজুয়েট ছাত্রের সাথে) নির্বাচন করলেন, আমি সাথে সাথে এই সম্মুখ সমরে যোগদান করার সুযোগ লুফে নিলাম।'

বিজ্ঞান পড়লেই যে মানুষ 'বিজ্ঞানমনস্ক' হয় না জোনাথন ওয়েলসের উপরোক্ত উক্তিতেও তা আবারো প্রমাণিত হয়। অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স এ প্রসঙ্গে বলেন, 'This quotation alone casts doubt on any claims Wells might have had to be taken seriously as a disinterested seeker after truth-which would seem a fairly minimal qualification for PhD in science'। [৩০]
এই আধুনিক সৃষ্টিতাত্ত্বিকদের দুরভিসন্ধি জনসমক্ষে আরো একবার প্রকাশিত হয়ে যায় যখন হঠাৎ করেই ডিস্কোভারি ইন্সটিটিউটের এক 'গোপন দলিল' ১৯৯৯ সালে ইন্টারনেটে ফাঁস হয়ে যায়। দলিলটি 'ওয়েজ ডকুমেন্ট' (wedge document) নামে কুখ্যাত। দলিলটি http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/2437/wedge.html সাইটে এখনও রাখা আছে। দলিলটির ফাঁস হয়ে যাবার ব্যাপারটি এবং এর নির্ভরযোগ্যতা ডিস্কোভারি ইন্সটিটিউট নিজেই স্বীকার করেছিল [২৮]। দলিলটিতে লেখা আছে, 'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন'- এর পুরোধাদের প্রধানতম লক্ষ্যই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদকে শিক্ষা, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অঙ্গন থেকে হটিয়ে দিয়ে সব জায়গায় ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিষ্ঠিত করা আর যে প্রাকৃতিক এবং বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে বিজ্ঞানের সৌধ গড়ে উঠেছে তার মূলে কুঠারাঘাত করা। মজার ব্যাপারটা হচ্ছে, দলিলটিতে আরও বলা হয়েছে, তাদের মূল আক্রোশটা হচ্ছে বস্তুবাদের পুরোধা ডারউইন, মার্ক্স এবং ফ্রয়েডের উপর। তারা বিজ্ঞানের বিরোধীতা করতে যেয়ে এতই অন্ধ হয় গেছেন যে, ডারউইন, মার্ক্স এবং ফ্রয়েড সবার দর্শনকে একাকার করে ফেলেছেন, তাদের পার্থক্যগুলো বোঝারও ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। সে যাই হোক, আজকে অনেক আগ্রসর ধার্মিক এবং সৃষ্টিবাদী ব্যক্তিই বিবর্তনকে মেনে নিয়েছেন এই বলে যে তাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সাথে এর কোন দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু ফিলিপ জনসনসহ আইডি প্রবক্তারা এতটাই অন্ধ মৌলবাদী যে তাদের ধার্মিক বিবর্তনবাদীদের (যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, এবং বিবর্তনবাদকেও একটি বাস্তবতা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন) প্রতিও বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই [২৪]।

ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন প্রবক্তরা পূর্বতন সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে তাদের পার্থক্য করতে চাইলেও প্রতিবারই তাদের প্রচেষ্টা মাঠে মারা গেছে। এমনকি ডোভার কোর্টের মামলায় এটিও প্রকাশিত হয়ে পড়ে যে, Of Pandas and People নামের যে বইটি তারা ডোভার স্কুলের পাঠ্য পুস্তক হিসেবে নির্বাচন

করেছিলেন সেটির মূল লেখক Dean Kenyon এর কিছুদিন আগেই What is Creation Science? নামে একটি বইয়ের ভুমিকা লিখেছিলেন। বইয়ের দ্বিতীয় লেখক Percival Davis আবার বাইবেলীয় ছয় হাজার বছরের 'ইয়ং আর্থ' সমর্থন করে একটি বই লিখেছিলেন যার নাম - A Case for Creationism। তবে সবচেয়ে লজ্জাকর যে ব্যাপারটি প্রকাশিত হয়ে যায় তা হল, Of Pandas and People বইটি নিজেই একটি সৃষ্টিতাত্ত্বিক বই, যেটি ১৯৮৩ সালে 'Creation Biology' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৮৬ সালে একই বই বেরোয় 'Biology and Creation' নামে। Of Pandas and People বইটি আসলে 'Biology and Creation' এরই হুবহু কপি শুধু 'creation' শব্দটি সরিয়ে দিয়ে 'Intelligent design' শব্দটি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর 'Creator' এর জায়গায় 'Designer' বসানো হয়েছে।

নিঃসন্দেহে সচেতন মহলের কাছে আইডি প্রবক্তাদের এহেন 'লুকোচুরি খেলা' একদমই গ্রহনযোগ্যতা পায় নি। ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্ত্বের প্রবক্তারা তত্ত্বটিকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে চালাতে চাইলেও বৈজ্ঞানিক মহলে এটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে; শুধু তাই নয়, এটিকে 'উত্তম মোড়কে সৃষ্টিবাদ' (better-packaged creationism), 'সস্তা জ্যাকেটে সৃষ্টিবাদ' (creationism in a cheap tuxedo), লুকানো সৃষ্টিবাদ (stealth creationism) ইত্যাদি বিভিন্ন অভিধায় অভিষিক্ত করা হয় [৩১]।

আজকে আমেরিকাসহ সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা বিশেষ করে জীববিজ্ঞানীরা, বিজ্ঞানের এবং নিজেদের টিকে থাকার স্বার্থেই ব্যাপারটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছেন। বেশীর ভাগ জায়গায়ই আইডি সমর্থকদের পরাজয় ঘটলেও ছোট খাটো কিছু জায়গায় তারা দিব্যি ঢুকে পড়তে পেরেছে, ওহাইও এবং কানসাসের দু'টি ছোট স্কুল বোর্ড (যেখানে রক্ষনশীল রিপাবলিকান দলের সদস্য সংখ্যা বেশী) ইতোমধ্যেই তাদের জীববিজ্ঞানের পাঠ্যসুচীতে বিবর্তনবাদে সংশয় প্রকাশ করা উচিত বলে লাইন যোগ করে দিয়েছে। জর্জিয়ায় কব কাউন্টি স্কুল বোর্ড বিবর্তন একটি তত্ত্ব হলেও তা সত্য নয় বলে বইতে স্টিকার লাগিয়ে দেয়, পরে অবশ্য তারা তা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলো। জীববিজ্ঞানী ডঃ টিম বেড়া তার (Evolution and the Myth of Creationsim: a basic guide to the facts in the Evolution Debate) বইয়ের ভুমিকাতে লিখেছেন যে এতদিন বিজ্ঞানীরা সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের এইসব কর্মকান্ডকে অবহেলা করে এসেছে, শুধু গবেষণার কাজ করাকেই কর্তব্য মনে করেছে। কিন্তু আজকে আমেরিকায় এরা এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, এরা মানব সভ্যতার জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার মৌলিক অধিকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করেছে, বিজ্ঞানীদের জন্য আর চুপ করে বসে থাকা ঠিক হবে না। তাই আজকে আমেরিকাসহ পাশ্চাত্যের বড় বড় জীববিজ্ঞানীরা যেখানেই আইডি নিয়ে মামলা হচ্ছে সেখানেই ছুটে যাচ্ছেন সাক্ষ্য দিতে, মিডিয়ার বক্তব্য রাখছেন, বিজ্ঞান বিশেষতঃ বিবর্তনবাদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বই লিখছেন, ইন্টারনেটে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটগুলোতে বিস্তারিত লিখছেন এবং বিভিন্নভাবে এ বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।

ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইনের দেওয়া 'যুক্তি'গুলো

'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন' বা বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পের দুটি ভাষ্য পাওয়া যায়। একটি ভাষ্য পাওয়া যায় জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, যেটি বলে আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মান্ড এমন কিছু চলক বা ভ্যারিয়েবলের সূক্ষ্ম সমন্বয়ের (Fine Tuning) সাহায্যে তৈরী হয়েছে যে এর একচুল হের ফের হলে আর আমাদের এ পৃথিবীতে কখনই প্রাণ সৃষ্টি হত না। অর্থাৎ, পরবর্তীতে প্রাণ সৃষ্টি করবেন এই ইচ্ছাটি মাথায় রেখে ঈশ্বর

(কিংবা হয়ত অন্য কোন বুদ্ধিমান সত্ত্বা) বিশ্বব্রহ্মান্ড তৈরী করেছিলেন, আর সে জন্যই আমাদের মহাবিশ্বঠিক এরকম; এত নিখুঁত, এত সুসংবদ্ধ।

আর ওদিকে 'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন'এর জীববিজ্ঞানের ভাষ্যটি বলছে ঠিক তার উলটো কথা। জীববিজ্ঞানের আইডি প্রবক্তা 'ফাইন টিউনার'রা যে ভাবে যুক্তি সাজিয়ে থাকেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের 'ফাইন টিউনার'রা দেন ঠিক উলটো যুক্তি। জীববিজ্ঞানের আইডির প্রবক্তারা বলেন আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ড প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে এতটাই **অনুপযুক্ত** যে প্রাকৃতিক নিয়মে এখানে এমনি এমনি প্রাণ সৃষ্টি হতে পারে না। আবার জ্যোর্তিবিজ্ঞানের আইডি ওয়ালারা উলটো ভাবে বলেন, এই বিশ্বব্রহ্মান্ড প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে এতটাই **উপযুক্ত** যে এই বিশ্বব্রহ্মান্ড প্রাকৃতিক নিয়মে কোনভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। একসাথে দুই বিপরীতধর্মী কথা তো সত্য হতে পারে না। বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পের এই দুটি ভাষ্য নিয়েই তাহলে আলাদা আলাদা ভাবে আলোচনা করা যাক।

আমরা জীববিজ্ঞানের 'বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প'গুলোই বিবেচনায় আনব আগে। কারণ, দুনিয়া জুড়ে এদের প্রাবল্য আর জোয়ারই বেশী। তারাই ডারউইনীয় বিবর্তনবাদকে পাঠ্যপুস্তক থেকে হটিয়ে 'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন'কে তার স্থলাভিষিক্ত করতে চান। এ প্রসঙ্গে দার্শনিক ডেনিয়েল ডেনেট বলেন [২৭] :

> 'সৌভাগ্যক্রমে অযথা কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করার জন্য আজকের দিনে পদার্থবিদদের খুব বেশী প্রণোদনা নেই। কারণ পদার্থবিদদের আর সাধারণ মানুষদের কাছে গিয়ে গিয়ে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আর আপেক্ষিক তত্ত্ব বুঝানোর চেষ্টা করে সময় নষ্ট করতে হয় না কারণ ওগুলো ইতিমধ্যেই বৈজ্ঞানিক মহলে এবং তার বাইরে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে।
>
> কিন্তু বিবর্তনের ব্যাপারটা আলাদা। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনের মৌলিক ধারণাটি শুধু মাত্র চিন্তার উদ্রেগকারকই নয়, এটি অত্যন্ত শক্তিশালী 'ডিজাইন আর্গুমেন্ট'কে বাতিল করে দেয়, যেটি দীর্ঘদিন ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রধানতম যুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হত। সে জন্যই যত প্রণোদনা আজও দেখা যায় তার প্রায় সবই জীববিজ্ঞানীদের ঠেকানোর ক্ষেত্রে।'

আইডির জীববিজ্ঞানীরা সেই পুরোন চোখকে আবারো তাদের তত্ত্বের এক প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। আসলে 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন'-এর ব্যানারে, প্যালের সেই সৃষ্টতত্ত্বের যুক্তিই যে বিগত কয়েক দশকে আবার নতুন মোড়কে ফিরে এসেছে তা চোখ নিয়ে আইডি প্রবক্তাদের নতুন করে গজিয়ে ওঠা 'বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তি' গুলো আলোচনা করলেই বোঝা যাবে। আবারও চোখের গঠন নিয়ে তারা অনেক হৈ চৈ শুরু করছেন, তাদের মতে আমাদের চোখের গঠন এত জটিল, সুক্ষ্ম এবং নিখুঁত যে বুদ্ধিমান কোন স্রষ্টার ডিজাইন ছাড়া তা সৃষ্টিই হতে পারে না। ৫%, ১০%, সিকিভাগ বা অর্ধেক চোখ নাকি জীবের কোন কাজে আসতে পারে না। ডঃ রিচার্ড ডকিন্স, ডঃ ইউজিন স্কট, ডঃ জেরি কয়েন, ডঃ কেনেথ মিলার সহ অনেক বিজ্ঞানী ইতিমধ্যেই তাদের এই দাবিগুলোকে ভুল বলে প্রমাণিত করেছেন।

অনেকেই মনে করেন যে চোখের (কিংবা কান, পাখা, ফুসফুস ইত্যাদি) মত একটি গুরুত্বপুর্ণ অংশ ধীরে

ধীরে বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টি হতে পারে না, কারণ মধ্যবর্তী পর্যায়গুলো স্বতন্ত্রভাবে ঠিকমত কাজ করতে পারবে না, এবং তার ফলে তাদের কোন উপযোগিতাই থাকতে পারে না। তারা আসলে এখানে বিবর্তনের অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ দিকটিই বুঝতে পারেন না বা এড়িয়ে যেতে চান। আমরা আগেই দেখছি যে, জীবের কোন অংশকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের দৃষ্টিকোন থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে আসার জন্য পুর্ণাংগভাবে বিকাশিত হতে হয় না। অন্ধ হওয়ার থেকে আংশিক দৃষ্টিশক্তি থাকা অনেক ভালো। আমাদের মধ্যে অনেকেরই দৃষ্টিক্ষীণতার (myopia) বা দুরের বা কাছের দৃষ্টিহীনতার সমস্যা আছে, তার ফলে আমরা দুরে বা কাছে অস্পষ্ট দেখি। কিন্তু আমরা যদি আদিম কালের মত বন্য জীবন যাপন করতাম এই সীমাবদ্ধতাসহ চোখই আমাদেরকে অনেকখানি সুবিধা এনে দিতে পারতো। আমরা খাওয়া, আশ্রয়, সঙ্গী বা শিকারী পশুদের দেখতে পেতাম, তাদের নড়াচড়া বুঝতে পারতাম। যে জনসমষ্টির মধ্যে কোন দৃষ্টিশক্তিই নেই বা খুবই সীমিত দৃষ্টিশক্তি আছে তাদের জন্য চোখের উদ্ভব বা চোখের মত যে কোন অঙ্গের বিন্দুমাত্র উন্নতিই অনেক বাড়তি সুবিধা এনে দেবে। একেবারেই দর্শনশক্তি না থাকা মানে হচ্ছে সে পুরোপুরিই অন্ধ, এখন প্রাণীটির মধ্যে যদি অর্ধেক বা সিকিভাগ দৃষ্টিক্ষমতাও বিকাশ লাভ করে তাহলেই সে কিছু হলেও তার শিকারীর গতিবিধি দেখতে পাবে বা বুঝতে পারবে। চোখের এইটুকু আংশিক বিকাশই প্রাণীটির বেঁচে থাকা বা না থাকার মধ্যে বিশাল একটি ভুমিকা রাখতে পারে। একই যুক্তি খাটে পাখার ক্ষেত্রেও, আমরা চারপাশে আংশিক পাখাসহ প্রচুর প্রাণী দেখতে পাই। টিকটিকি, ব্যাঙ, শামুক জাতীয় গ্লাইড করে চলে এমন অনেক প্রাণীর মধ্যেও আংশিক পাখার মত অংশ দেখতে পাওয়া যায়। গাছে থাকে এমন অনেক প্রাণীর দুই জয়েন্টের মাঝখানে পাখার মত একধরনের চামড়ার অস্তিত্ব দেখা যায় যেটা আংশিকভাবে বিকশিত পাখা বৈ আর কিছু নয়। পাখাটি কত ছোট বা বড় তা এখানে ব্যাপার নয়, প্রাণীটি যদি কখনও গাছ থেকে পড়ে যায় তাহলে ওইটুকু পাখা ব্যবহার করেই সে তার জীবন বাঁচাতে পারবে যা কিনা তাকে টিকে থাকতে বাড়তি সুবিধা জোগাবে।

আইডি প্রবক্তাদের আরেকটি অতিপ্রিয় যুক্তি হচ্ছে চোখের নিখুঁত গঠন যা তাদের মতে কোন বুদ্ধিদীপ্ত সৃষ্টিকর্তার হস্তক্ষেপ ছাড়া সৃষ্টিই হতে পারে না। আর অন্যদিকে বিজ্ঞানীরা বলেন, বিবর্তন বা প্রাকৃতিক নির্বাচন যেহেতু শুধুমাত্র বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ সময় ধরে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হতে হতে আরও উন্নততর রূপে পরিণত হয়, তাই খুব যুক্তিসঙ্গত কারণেই প্রাণীর মধ্যে অনেক ত্রুটিপূর্ণ অংগপ্রত্যংগ দেখা যায়। এ প্রেক্ষিতে এখন দেখা যাক আইডি-ওয়ালারা যেমনটি দাবী করছেন, মানুষের চোখ আসলেই সেরকম ত্রুটিহীন বা নিখুঁত কিনা। চোখের অক্ষিপটের (Retina) ভিতরে একধরনের আলো-গ্রহনকারী (Photoreceptor or photo cells) কোষ আছে যারা বাইরের আলো গ্রহন করে এবং তারপর একগুচ্ছ দর্শন স্নায়ুর (Optic nerve or ganglion cells) মাধ্যমে তাকে মস্তিষ্কে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে, যার ফলে আমরা দেখতে পাই। কোন বুদ্ধিমান স্রষ্টা নিশ্চয়ই জালের মত করে ছড়িয়ে থাকা এই স্নায়ুগুলোকে আলো গ্রহনকারী কোষগুলোর সামনের দিকে বসিয়ে দেবেন না! কারণ তাহলে তো বেশ কিছু আলো বাধা পাবে, আমরা এই বাধাটুকু না থাকলে যতখানি দেখতে পেতাম তার থেকে কম দেখতে পাবো এবং এর ফলে আমাদের দৃষ্টির মান অনেক কমে যাবে! কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, বাস্তবেই আমাদের চোখ ওরকম। আমাদের অক্ষিপটের ঠিক সামনে এই স্নায়ুগুলো জালের মত ছড়ানো থাকে, শুধু তাই না, এই স্নায়ুগুলোকে যে রক্তনালীগুলো রক্ত সরবরাহ করে তারাও আমাদের অক্ষিপটের সামনেই বিস্তৃত থাকে, এর ফলে আলো বাধা পায় এবং আমাদের দৃষ্টশক্তি কিছুটা হলেও কমে যায়।

স্নায়ুগুলোর এই অসুবিধাজনক অবস্থানের কারনে আমাদের চোখে আরেকটি বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে ।

এই স্নায়বিক জালটি মস্তিষ্কে পৌছানোর জন্য অক্ষিপটকে ফুটো করে তার ভিতর দিয়ে পথ করে নেয়। এর ফলে একটি অন্ধবিন্দু (blind spot)-এর সৃষ্টি হয়। আমাদের প্রত্যেকের চোখেই এক মিলিমিটারের মত জায়গা জুড়ে এই অন্ধবিন্দুটি রয়েছে, আমরা আপাতভাবে বুঝতে না পারলেও ওই জায়গাটিতে আসলে আমাদের দৃষ্টি সাদা হয়ে যায়।

তাহলে কি চোখ সৃষ্টির সময় এই সীমাবদ্ধতাগুলো মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় খোলা ছিলো না? তাও তো ঠিক নয়! আমাদের সামনেই এরকম প্রাণীরও উদাহরণ তো রয়েছে যাদের স্নায়ুগুলো খুব নিখুঁতভাবে আলো-গ্রহনকারী কোষগুলোর পিছনে বসানো আছে! স্কুইড এবং অকটোপাসেরও আমাদের মতই একধরনের লেন্স-এবং-অক্ষিপটসহ চোখ আছে, যার প্রয়োজনীয় স্নায়ুগুলো অক্ষিপটের পিছনে অবস্থান করে এবং তার ফলে তাদের চোখে কোন অন্ধবিন্দু-এর সৃষ্টি হয়নি। আসলে বিবর্তন তত্ত্বের মাধ্যমে আমাদের চোখের এই সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটিকে কে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। বিবর্তন কাজ করে শুধুমাত্র ইতিমধ্যে তৈরী বা বিদ্যমান গঠনকে পরিবর্তন করার মাধ্যমে, সে নতুন করে কিছু সৃষ্টি বা বদল করতে পারে না। মেরদন্ডী প্রাণীর চোখ সৃষ্টি হয়েছে মস্তিষ্কের বাইরের দিকের অংশকে পরিবর্তন করে যা অনেক আগেই সৃষ্টি হয়েছিলো, বহুকাল ধরে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের এই অংশটি পরিবর্তিত হতে হতে আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা লাভ করেছে। মস্তিষ্কের এই সংবেদনশীল কোষগুলো অক্ষিপটের আকার ধারণ করলেও মস্তিষ্কের পুরোনো মূল গঠনটি তো আর বদলে যেতে পারেনি, তার ফলে এই জালের মত ছড়িয়ে থাকা স্নায়ুগুলোও তাদের আগের অবস্থানেই রয়ে গেছে। কিন্তু অন্যদিকে মলাঙ্ক (স্কুইড বা অকটোপাস) জাতীয় প্রাণীর চোখ বিবর্তিত হয়েছে তাদের চামড়ার অংশ থেকে, মস্তিষ্কের অংশ থেকে নয়। এক্ষেত্রে ত্বকের স্নায়ুগুলো মস্তিষ্কের মত ঠিক বাইরের স্তরে না থেকে ভিতরের স্তরে সাজানো থাকে, আর এ কারণেই স্নায়ুগুলো মলাঙ্কের চোখের অক্ষিপটের সামনে নয় বরং পিছনেই রয়ে গেছে। আমাদের চোখ যদি এভাবে লাখ লাখ বছর ধরে প্রাকৃতিকভাবে বিবর্তিত না হয়ে কোন পূর্বপরিকল্পিত ডিজাইন থেকে তৈরী হত তাহলে হয়তো চোখের এত সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিজ্ঞানীদেরও আর মাথা ঘামাতে হত না।

আণবিক জীববিজ্ঞানের কথা না উল্লেখ করলে চোখ নিয়ে আলোচনা তো সম্পূর্ণই হবে না। বিগত কয়েক দশকে জীববিজ্ঞানের এই শাখাটি রীতিমত বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে। জীববিজ্ঞানের মূল গবেষণা এখন চোখের মত 'বড় কাঠামো' থেকে সরে এসে তার কোষে এসে ঠেকেছে। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে পাওয়া ফলাফলগুলো রীতিমত বিস্ময়কর। দেখা গেছে, কীট-পতঙ্গের চোখের সাথে মানুষের চোখের কাঠামোগত যত বৈসাদৃশ্যই থাকুক না কেন, এরা একই ধরনের বংশানুসৃত দ্রব্য দিয়ে তৈরী। আলোর প্রতি সংবেদনশীল প্রোটিন Opsins এবং Pax6 নামে একটি প্রধান নিয়ামক জিন (master controll gene) খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা যা দিয়ে তারা ইঁদুর থেকে শুরু করে ফ্রুট ফ্লাই এবং ফ্রুট ফ্লাই থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত সকল প্রজাতির চোখের উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করতে পারেন[৩৫]। শুধু তাই নয় অন্ধ ড্রসোফিলার মধ্যে এ জিনটি প্রবেশ করিয়ে কৃত্রিমভাবে চোখের উদ্ভবও ঘটানো হয়েছে [৩৫, ৩৬]। এই জিনের আবিস্কার চোখের বিবর্তনের ধারাটিকে আরো স্পষ্ট ভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। এ কারণেই নেইল শ্যাঙ্কস তার 'গড দ্য ডেভিল এন্ড ডারউইন' বইয়ে উল্লেখ করেছেন - 'চোখের ব্যাপারটা বিবর্তনবাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠার বদলে বরং আজ বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ হিসেবেই বরং আবির্ভূত হয়েছে।' [১২]

লিহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়নবিদ ডঃ মাইকেল বিহে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের একজন অন্যতম

প্রবক্তা। তাঁর 'Darwins Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution' (১৯৯৬) বইটয়া নিঃসন্দেহে সাম্প্রতিক কালে ইনটেলিজেন্ট ডিজাইনের সমর্থনে সবচেয়ে শক্তিশালী বই। এ বইয়ে ডঃ বিহে হ্রাস-অযোগ্য জটিলতা (Irreducible complexity) নামে একটি নতুন শাব্দিক পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন, সরল অবস্থা হতে জটিল জীবজগতের সৃষ্টি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্টি হতে পারেনা। কিন্তু 'হ্রাস-অযোগ্য জটিলতা'- জিনিসটা কি? ডঃ বিহে তার বইয়ে ব্যাখ্যা করেছেন [৩২] :

> 'যে সমস্ত জৈব তন্ত্র (Biological system) নানা ধরনের, পর্যায়ক্রমিক, কিংবা সামান্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কোনভাবেই গঠিত হতে পারে না, তাদের আমি 'হ্রাস-অযোগ্য জটিল' (Irreducible complex) নামে অভিহিত করি। 'হ্রাস-অযোগ্য জটিলতা' আমার দেওয়া এক বর্ণাঢ্য শব্দমালা যার মাধ্যমে আমি পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় (interaction) অংশ নেওয়া একাধিক যন্ত্রাংশের একটি সিস্টেমকে বোঝাই - যার মধ্য থেকে একটি অংশ খুলে নিলেই সিস্টেমটি আর কাজ করবে না।'

বিহে পুরো ব্যাপারটি বোঝাতে মানুষের ডিজাইন করা ইঁদুর ধরার কলের (mouse trap) উদাহরণ হাজির করেছেন। এ সাধারণ যন্ত্রটির মধ্যে থাকে ১) কাঠের পাটতন, (২) ধাতব হাতড়ি যার সাহায্যে ইদুর মারা হয়, (৩) স্প্রিং যার শেষ মাথাটি হাতুড়ির সাথে আটকানো থাকে, (৪) একটি ফাঁদ যা স্প্রিংটিকে বিমুক্ত করে (৫) এবং একটি ধাতব দন্ড যা ফাঁদের সাথে যুক্ত থাকে এবং হাতুরীটিকে ধরে রাখে। বিহের যুক্তি হল শুধু প্ল্যাটফর্ম বা স্প্রিং এর সাহায্যে ইঁদুর ধরা যায় না। ইঁদুর তখনই কলে ধরা যাবে যখন পুরো সিস্টেমের সকল যন্ত্রাংশগুলো এক সাথে কাজ করবে। যে কোন একটি যন্ত্রাংশকে খুলে ফেললেই ইঁদুর ধরার কলের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই বিহের মতে, এটি একটি 'হ্রাস-অযোগ্য জটিল' সিস্টেমের ভাল উদাহরণ। ঠিক একইভাবে বিহে মনে করেন প্রকৃতিতে ব্যকটেরিয়ার ফ্ল্যাজেলামগুলো 'হ্রাস-অযোগ্য জটিল'। এ ফ্ল্যাজেলামগুলোর প্রান্তদেশে এক ধরনের জৈব-মোটর আছে যেগুলোকে ব্যাকটেরিয়ার কোষগুলো স্ব-প্রচালনের (self-propulsion) কাজে ব্যবহার করে। তার সাথে চাবুকের মত দেখতে এক রকমের প্রপেলারও আছে, যেগুলো ওই আনবিক মোটরের সাহায্যে ঘুরতে পারে। প্রোপেলারগুলো একটি 'ইউনিভার্সাল জয়েন্টের' মাধ্যমে মোটরের সাহায্যে লাগানো থাকে। মোটরটি আবার এক ধরনের প্রোটিনের মাধ্যমে জায়গামত রাখা থাকে, যেগুলো বিহের মতে স্ট্যাটরের ভূমিকা পালন করে। আরেক ধরনের প্রোটিন বুশিং পদার্থের ভূমিকা পালন করে যার ফলে চালক-স্তম্ভদন্ড (drive shaft)টি ব্যাকটেরিয়ার মেমব্রেনকে বিদ্ধ করতে পারে। বিহে বলেন, ব্যাকটেরিয়ার ফ্ল্যাজেলামকে ঠিকমত কর্মক্ষম রাখতে ডজনখানেক ভিন্ন ভিন্ন প্রোটিন সম্মিলিত ভাবে কাজ করে। যে কোন একটি প্রোটিনের অভাবে ফ্ল্যাজেলাম কাজ করবে না, এমন কি কোষ গুলোও ভেঙ্গে পড়বে।

জীববিজ্ঞানীরা বিহের সবগুলো যুক্তিকেই খন্ডন করেছেন। বিহের উদাহরণে বর্ণিত ওই ইদুঁর ধরার কলটির কথাই ধরুন। কলটি স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে খুলে এর ফাঁদ এবং ধাতব দন্ডটি সরিয়ে নিন। এবার আপনার হাতে যেটি থাকবে সেটি আর ইঁদুরের কল নয়; বরং অবশিষ্ট তিনটি যন্ত্রাংশ দিয়ে গঠিত মেশিনটিকে আপনি সহজেই টাই ক্লিপ কিংবা পেপার ক্লিপ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। এবারে স্প্রিংটিকে সরিয়ে নিন। এবারে আপনার হাতে থাকবে দুই-যন্ত্রাংশের এক চাবির চেইন। আবার প্রথমে সরিয়ে নেওয়া ফাঁদটিকে মাছ ধরার ছিপ হিসেবেও আপনি ব্যবহার করতে পারেন, ঠিক যেমনি ভাবে কাঠের পাটাতনটিকে ব্যবহার করতে পারেন 'পেপার-ওয়েট' হিসেবে। অর্থাৎ যে সিস্টেমটিকে এতক্ষণ

'হ্রাস-অযোগ্য জটিল' বলে ভাবা হচ্ছিল, তাকে আরো ছোট ছোট ভাগে ভেঙ্গে ফেলে অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় কাজে লাগানো যায়।

ব্যকটেরিয়ার ফ্ল্যাজেলাম গুলোর ক্ষেত্রে আসা যাক। বিহে যেমন ভেবেছিলেন কোন প্রোটিন সরিয়ে ফেললে ফ্ল্যাজেলাম আর কাজ করবে না, অর্থাৎ পুরো সিস্টেমটিই অকেজো হয়ে পড়বে, তা মোটেও সত্যি নয়। ব্রাউন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক কেনেথ মিলার পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন সরিয়ে ফেলার পরও ফ্ল্যাজেলামগুলো কাজ করেছে; বহু ব্যাকটেরিয়া এটিকে অন্য কোষের ভিতরে বিষ ঢেলে দেওয়ার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করতে পেরেছেন যে, ফ্ল্যাজেলামের বিভিন্ন অংশগুলোর আলাদা ভাবে ভিন্ন ভিন্ন কাজ থাকলেও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে তারা সুবিধা পেতে পারে। জীববিজ্ঞানে এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় যে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো এক সময় এক উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হলেও পরবর্তীতে অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে সরীসৃপের চোয়ালের হাড় থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর কানের উৎপত্তি। আজকে আমাদের কানের দিকে তাকালে ওটাকে 'হ্রাস-অযোগ্য জটিল' বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আদিতে তা ছিল না। এমন নয় যে, হঠাৎ করেই একদিন স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কজাবিহীন চোয়ালের হাড়গুলো ঠিক করল তারা কানের হাড়ে পরিণত হয়ে যাবে; বরং এর জন্য বিবর্তনের পথ ধরে ধীর পরিবর্তনের মাধ্যমে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়েই তারা আজকের রূপ ধারণ করেছে। কাজেই উৎপত্তির সামগ্রিক ইতিহাস না জেনে শুধুমাত্র চোখ, কান কিংবা ফ্ল্যাজেলামের দিকে তাকালে ওগুলোকে 'হ্রাস-অযোগ্য জটিল' বলে মনে হতে পারে বৈকি।

এ যুগের প্রথিতযশাঃ সংশয়বাদী, টেনিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মাসিমো পিগ্লিউসি তাঁর 'Design yes, intelligent no: a critique of intelligent design theory and neo-creationism' প্রবন্ধে বলেন, জীবজগতে হয়ত বেশ কিছু উদাহরণ থাকতে পারে যেগুলোকে জীববিজ্ঞানীরা বিবর্তন তত্ত্বের আলোকে এ মুহূর্তে ব্যাখ্যা করতে পারছেন না; কারণ জীববিজ্ঞানীদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য নেই। কাজেই এটি মূলতঃ অজ্ঞতা সূচক যুক্তি (Argument from ignorance), কখনই বিহের তথাকথিত Irreducible complexityর প্রমাণ নয়। আমরা এ প্রবন্ধে আগেই উলেখ করেছি যে, উইলিয়াম প্যালে যখন প্রথম আঠারো শতকে 'আর্গুমেনট অব ডিজাইন' বা সৃষ্টির অনুকল্পের অবতারণা করেছিলেন, তখন তিনি চোখের গঠন দেখে যার পর নাই বিস্মিত হয়েছিলেন। প্যালে ভেবেছিলেন চোখের মত একটি জটিল প্রত্যংগ কোন ভাবেই প্রাকৃতিক উপায়ে বিবর্তিত হতে পারে না। কিন্তু আজকের দিনের জীববিজ্ঞানীরা পর্যাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক নিয়মে চোখের বিবর্তনের ধাপগুলো সম্বন্ধে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছেন। ম্যাট ইয়ং তার 'Grand Designs and Facile Analogies: Exposing Behe's Mousetrap and Dembski's Arrow' প্রবন্ধে বলেন: 'আধা-চোখের যুক্তি গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না দেখে ডঃ বিহে এখন আধা ফ্ল্যাজেলামের যুক্তি হাজির করেছেন; আর একটা গালভরা নামও খুঁজে বের করেছেন -'ইরিডিউসিবল কম্পলেক্সিটি'। কিন্তু এটি ওই পুরোনো আধা চোখের যুক্তিই। আর গালভরা পরিভাষা বাদ দিলে এটি শেষ পর্যন্ত ওই অজ্ঞতাসূচক যুক্তি বা God in gaps।' [৩৩]

এবারে জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প' এর ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যাক[৩৪]। ধরা যাক মাধ্যাকর্ষণের কথা। নিউটন তার মাধ্যাকর্ষণ সূত্রে একটি ধ্রুবক ব্যবহার করেছিলেন যাকে আমরা বলি নিউটনীয় ধ্রুবক, বা গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট। নিউটন তার সেই বিখ্যাত সূত্রে দেখিয়েছিলেন, দুটো বস্তুর মধ্যে আকর্ষণবলের পরিমান ঠিক কতটা হবে সেটা নির্ণয়ে এই গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট নামের রাশিটি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি ওই ধ্রুবকটির মান এখন যা আছে তা না হয়ে অন্যরকম

হত আকর্ষণ বলের পরিমাণও যেত বদলে। সাদা চোখে মনে হবে যে ব্যাপারটা সামান্যই, আকর্ষণ বল বদলালেও বোধ হয় তেমন কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, ওই ধ্রুবকের মান আসলে আমাদের এই পরিচিত বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রকৃতি নির্ধারণ করছে। ওটার মান এখন যা আছে তা না হয়ে যদি অন্য ধরণের কিছু হত তা হলে এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডটাই হত অন্যরকম। ওই ধ্রুবকের মান ভিন্ন হলে তারাদের মধ্যে হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হয়ে হিলিয়াম উৎপাদনের মাত্রাকে দিত বদলে। হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের পর্যাপ্ততা শুধু এই গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট এর উপরই নয়, মহাকর্ষ এবং দুর্বল পারমাণবিক বলের মধ্যকার শক্তির ভারসাম্যের উপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল। যেমন, তাঁরা দেখিয়েছেন, দুর্বল পারমাণবিক বলের শক্তি যদি একটু বেশী হত, এই মহাবিশ্বে পুরোটাই মানে শতকরা একশ ভাগ হাইড্রোজেনে পূর্ণ থাকত, কারণ ডিউটেরিয়াম (এটি হাইড্রোজেনের একটি মাসতুত ভাই, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'আইসোটোপ') আর হিলিয়ামে পরিণত হবার আগেই সমস্ত নিউট্রন নিঃশেষ হয়ে যেত। আবার দুর্বল পারমানবিক বলের শক্তিমত্তা আরেকটু কম হলে সারা মহাবিশ্বে শতকরা একশ ভাগই হত হিলিয়াম। কারণ সে ক্ষেত্রে নিউট্রন নিঃশেষিত না হয়ে তা উৎপন্ন প্রটোনের সাথে যোগ দিয়ে হাইড্রোজেন তৈরীতে বাধা দিত। কাজেই এ দু' চরম অবস্থার যে কোন একটি সঠিক হলে মহাবিশ্বে কোন নক্ষত্ররাজি তৈরী হওয়ার মত অবস্থাই কখনও তৈরী হত না, ঘটত না আমাদের এই মলয়শীতলা ধরণীতে কার্বন-ভিত্তিক প্রাণের নান্দনিক বিকাশ। আবার,বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রনের ভর মাপতে গিয়ে দেখেছেন এই ভর নিউট্রন-প্রোটনের ভরের পার্থক্যের চেয়ে কিছুটা কম যার ফলে তারা মনে করেন, একটি মুক্ত-নিউট্রন সহজেই প্রোটন, ইলেকট্রন ও অ্যান্টি-নিউট্রিনোতে পরিনত হতে পেরেছে।

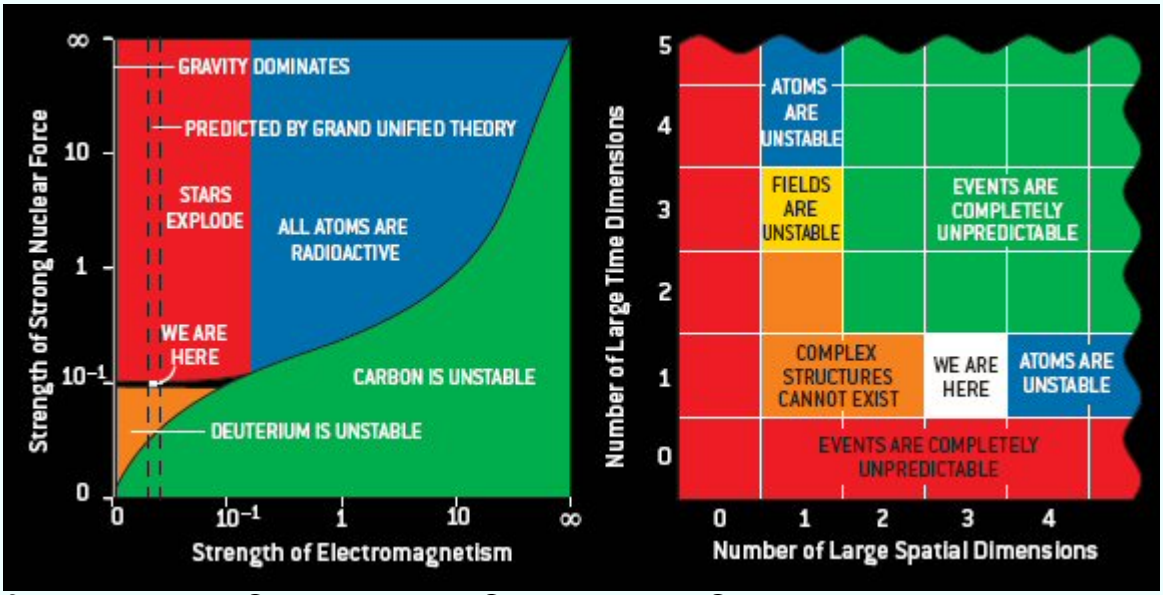

চিত্র ১০.৪ : অনেক বিজ্ঞানী বলেন মহাবিশ্বের খুব সীমিত পরিসরের মধ্যে জীবনের বিকাশ ঘটেছে; এমন কেন হয়েছে তার উত্তর পেতে হলে ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে পৃথিবীতে প্রাণ এবং মানুষের উপস্থিতির দিকে তাকিয়ে।

যদি ইলেকট্রনের ভর সামান্য বেশী হত, নিউট্রন তাহলে সুস্থিত হয়ে যেত, আর উৎপন্ন সমস্ত ইলেকট্রন আর প্রোটন সব একসাথে মিলে-মিশে নিউট্রনে পরিণত হয়ে যেত। এর ফলে যেটা ঘটত সেটা আমাদের জন্য খুব একটা সুখপ্রদ কিছু নয়। সে ক্ষেত্রে খুব কম পরিমানে হাইড্রোজেনই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকত আর তা হলে নক্ষত্রের জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানীই হয়ত খুঁজে পাওয়া যেত না।

জন ডি. ব্যরো এবং ফ্রাঙ্ক জে. টিপলার এ ধরনের নানা ধরনের রহস্যময় 'যোগাযোগ' তুলে ধরে একটি বই লিখেছেন ১৯৮৬ সালে, নাম- 'The Anthropic Cosmological Principle'। তাঁদের বক্তব্য হল, আমাদের মহাবিশ্বে গ্র্যাভিটেশনাল অথবা কসমলজিকাল ধ্রুবকগুলোর মান এমন কেন, কিংবা মহাবিশ্বের চেহারাটাই বা এমন কেন হয়েছে তার উত্তর পেতে হলে ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে পৃথিবীতে প্রাণ এবং মানুষের উপস্থিতির দিকে তাকিয়ে। পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির জন্য সর্বোপরি মানুষের আবির্ভাবের জন্য এই মৌলিক ধ্রুবক আর চলকগুলোর মান ঠিক এমনই হওয়া দরকার ছিল - সে জন্যই ওগুলো ওরকম। দৈবক্রমে ওগুলো ঘটে নি, ররং এর পেছনে এক বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বার (বিধাতার) একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। মানুষকে কেন্দ্রে রেখে বিশ্বব্রহ্মান্ডের নিয়ম-নীতিগুলোকে ব্যাখ্যা করবার এই যুক্তিকে বলা হয় 'অ্যানথ্রোপিক আর্গুমেন্ট' বা 'নরত্ববাচক যুক্তি'। গণিতবিদ এবং দার্শনিক ডঃ উইলিয়াম ডেম্বস্কি ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'Intelligent Design: The Bridge Between Science & Theology' বইয়ে তথ্য বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, আমাদের এই মহাবিশ্বের ভিতর যে ধরনের বিমূর্ত তথ্য লুকানো আছে তা কোন ভাবেই প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্ট হতে পারে না।

এধরনের যুক্তিগুলো প্রথম দৃষ্টিতে খুব আকর্ষণীয় দেখালেও, অনুসন্ধিৎসু সংশয়বাদী চোখ দিয়ে দেখলে কিন্তু নানা দুর্বলতা প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ ব্যারো এবং টিপালার যে যুক্তি দিয়েছেন সে ক্ষেত্রে এটি ধরেই নেওয়া হয়েছে আমাদের পৃথিবীতে যে ভাবে কার্বন ভিত্তিক প্রাণের বিকাশ ঘটেছে সেভাবে ছাড়া আর অন্য কোনভাবে প্রাণ সৃষ্ট হতে পারবে না। এই সজ্ঞাত ধারণাটি কখনই সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। যেমন, বিজ্ঞানীরা কিন্তু কার্বনের পাশাপাশি সিলিকন ভিত্তিক প্রাণের বিকাশকেও ইদানিং কালে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন। প্রকৃতিতে পাওয়া ডায়াটমগুলো (জীববিজ্ঞানের ভাষায় এগুলো এক ধরনের eukaryotic algae) এমনি একটি উদাহরণ। আবার আমরা প্রায়শঃই শুনি যে, আমাদের পৃথিবীতে তাপ, চাপ সবকিছু যদি সঠিক অনুপাতে না থাকত, তবে নাকি প্রাণের বিকাশ ঘটত না। এই যে পৃথিবীটা ২৩.৫ ডিগ্রীতে হেলে আছে, তার এক চুল এদিক ওদিক হলে তাপ আর চাপের এমন বৈষম্য তৈরী হত যে, প্রাণ সৃষ্টিই অসম্ভব একটি ব্যাপারে পরিণত হত। কিন্তু অনেকেই প্রাণের এই ধরনের 'সঙ্কীর্ণ' সংজ্ঞার সাথে একমত পোষণ করেন না। তারা বলেন, আমরা ওই ধরণের 'সর্বোত্তম' পরিবেশে বিকশিত হয়েছি বলে আমরা মনে করি প্রাণের উৎপত্তির জন্য ঠিক ওধরণের পরিবেশই লাগবে। যেমন, বাতাসে সঠিক অনুপাতে অক্সিজেন, চাপ, তাপ ইত্যাদি। এগুলো ঠিক ঠিক অনুপাতে না থাকলে নাকি জীবনের বিকাশ ঘটবে না। এটি একটি সজ্ঞাত ধারণা, প্রামাণিত সত্য নয়। অক্সিজেনকে জীবন বিকাশের অন্যতম উপাদান বলে মনে করা হয়, কিন্তু মাটির নীচে এমন অনেক ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের জন্য অক্সিজেন শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, রীতিমত ক্ষতিকর। ষাটের দশকে আমেরিকান জীববিজ্ঞানী টমাস ব্রক (Thomas Brock) এবং তার সহকর্মীরা ওয়াইওমিং এর ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের ১৬০ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার উষ্ণ প্রস্রবনে এক ধরনের সরলাকৃতির অণুজীব (Microbes) আবিষ্কার করেন [৩৭]। কোন বহুকোষী জীবই সাধারণতঃ এই তাপমাত্রায় টিকে থাকতে পারে না। সমুদ্রের গভীর তলদেশে এমনকি কেরসিন তেলের ভিতরের বৈরী পরিবেশেও প্রাণের বিকাশ ঘটেছে এমন প্রমাণ বিজ্ঞানীদের কাছে আছে - যে পরিবেশের সাথে আসলে আমাদের সংজ্ঞায়িত 'সর্বোত্তম পরিবেশের' কোনই মিল নেই। যে সমস্ত 'প্রাণ' এই ধরনের ভয়ংকর বৈরী পরিবেশে টিকে থাকতে পারে তাদেরকে বলা হয় চরমজীবী (Extremophile)। পৃথিবীতে বেশ কয়েক ডজন চরমজীবীর অস্তিত্ব রয়েছে।

কাজেই হলফ করে বলা যায় না যে, মহাজাগতিক ধ্রুবক আর চলকগুলোর মান অন্যরকম হলে এই মহাবিশ্বে প্রাণের বিকাশ ঘটত না। বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদ অধ্যাপক ভিকটর স্টেংগর তার 'The

Unconscious Quantum: Metaphysics in Modern Physics and Cosmology' বইয়ে দেখিয়েছেন চলক আর ধ্রুবকগুলোর মান পরিবর্তন করে আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ডের মতই অসংখ্য বিশ্বব্রহ্মান্ড তৈরী করা যায়, যেখানে প্রাণের উদ্ভবের মত পরিবেশ উদ্ভব ঘটতে পারে। এর জন্য কোন সূক্ষ্ম সমন্বয় বা 'ফাইন টিউনিং' এর কোন প্রয়োজন নেই। ডঃ স্টেংগর যখন বলেন, 'সূক্ষ্ম-সমন্বয়বাদীদের দাবীর এমন কোন ভিত্তি নেই যাতে তারা অনুমান করতে পারেন যে, একমাত্র একটি সঙ্কীর্ণ সীমা ছাড়া জীবন সৃষ্টি অসম্ভব'- তখন সেটিকে গুরুত্ব না দিয়ে আমাদের উপায় থাকে না। এছাড়াও 'Physical Review' জার্নালে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে অ্যান্থনি অ্যাগুরি (Anthony Aguirre) স্বতন্ত্রভাবে দেখিয়েছেন, মহাবিশ্বের ছয়টি প্যারামিটার বা পরিবর্ত্য রাশিগুলো বিভিন্নভাবে অদলবদল করে গ্রহ, তারা এবং পরিশেষে কোন একটি গ্রহে বুদ্ধিদীপ্ত জীবন গঠনের উপযোগী পরিবেশ তৈরী করা সম্ভব - কোন ধরনের 'Anthropic Argument'-এর আমদানী ছাড়াই [৩৮]।

ইনফ্লেশন বা স্ফীতি তত্ত্বের[৩৯] সাম্প্রতিক ফলাফলগুলোও তথাকথিত 'ফাইন-টিউনিং'-এর ধারণাগুলোকে প্রত্যাখান করছে। ইনফ্লেশন বা স্ফীতি তত্ত্ব নিয়ে প্রখ্যাত পদার্থবিদ আঁদ্রে লিন্ডে আর তার দলবলের সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল যদি সত্যি হয়ে থাকে, তা হলে আমাদের মহাবিশ্বের মতই বাস্তবে আরো মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে। একাধিক মহাবিশ্বের ধারণাটি কোন ঠাকুরমার ঝুলির রূপকথা নয়, নয় কোন স্টারট্রেক মুভি বা আসিমভের সায়েন্সফিকশন। অতি সংক্ষেপে অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণাটিকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যক্ত করা যায় এভাবে [৪০] :

> আমাদের মহাবিশ্ব যদি কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে স্থান-কালের শূন্যতার ভিতর দিয়ে আবির্ভূত হয়ে থাকে, তবে এই পুরো প্রক্রিয়াটি কিন্তু একাধিকবার ঘটতে পারে, এবং হয়ত বাস্তবে ঘটেছেও। এই একাধিক মহাবিশ্বের অস্তিত্বের ব্যাপারটি প্রাথমিকভাবে ট্রিয়ন, অ্যালেন গুথ, আর পরবর্তীতে মূলতঃ আদ্রে লিন্ডের গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে। বলা হয়ে থাকে সৃষ্টির উষালগ্নে ইনফ্লেশনের মাধ্যমে প্রসারণশীল বুদ্বুদ (Expanding Bubbles) থেকে আমাদের মহাবিশ্বের মতই অসংখ্য মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে, যেগুলো একটা অপরটা থেকে সংস্পর্শবিহীন অবস্থায় দূরে সরে গেছে। এ ধরনের অসংখ্য মহাবিশ্বের একটিতেই হয়ত আমরা অবস্থান করছি অন্য গুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারেই জ্ঞাত না হয়ে।

মাল্টিভার্স বা অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা কিন্ত শেলের মতই আঘাত করেছে 'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন'-এর প্রবক্তাদের বুকে। কারণ, সাদা মাঠা কথায় এ তত্ত্ব বলছে যে, হাজারো-লক্ষ-কোটি মহাবিশ্বের ভীরে আমাদের মহাবিশ্বও একটি। স্রেফ সম্ভাবনার নিরিখেই এমন একটি মহাবিশ্বে চলকগুলোর মান এমনিতেই এত সূক্ষভাবে সমন্বিত হতে পারে, অন্যগুলোতে হয়ত হয়নি। আমাদের মহাবিশ্বের চলকগুলো আকস্মিকভাবে এই রূপে সমন্বিত হতে পেরেছে বলেই এতে প্রাণের উন্মেষ ঘটেছে; এতে এত আশ্চর্য হবার কিছু নেই! কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েল সোসাইটি রিসার্চ প্রফেসর মার্টিন রীস সেটিই খুব চমৎকারভাবে একটি উপমার মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন [১২] :

> 'অসংখ্য মহাবিশ্বের ভীরে আমাদের মহাবিশ্বও একটি। অন্য মহাবিশ্বে বিজ্ঞানের সূত্র আর চলকগুলো হয়ত একেবারেই অন্যরকম হবে।... কাজেই ঘড়ির কারিগরের সাদৃশ্য এখানে একেবারেই অচল। তার বদলে বরং আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ডকে অনেকটা পরিত্যক্ত সেকেন্ড

হ্যান্ড কাপড়ের দোকানের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। **দোকানের মজুদ যদি বিশাল হয় তবে দোকানের কোন একটি জামা আপনার গায়ে ঠিকমত লেগে গেলে আপনি নিশ্চয় তাতে বিস্মিত হবেন না!** ঠিক একইভাবে আমাদের মহাবিশ্ব যদি ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য মহাবিশ্বের একটি হয়ে থাকে, দোকানের একটি জামার মতই সূক্ষ-সমন্বয় দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

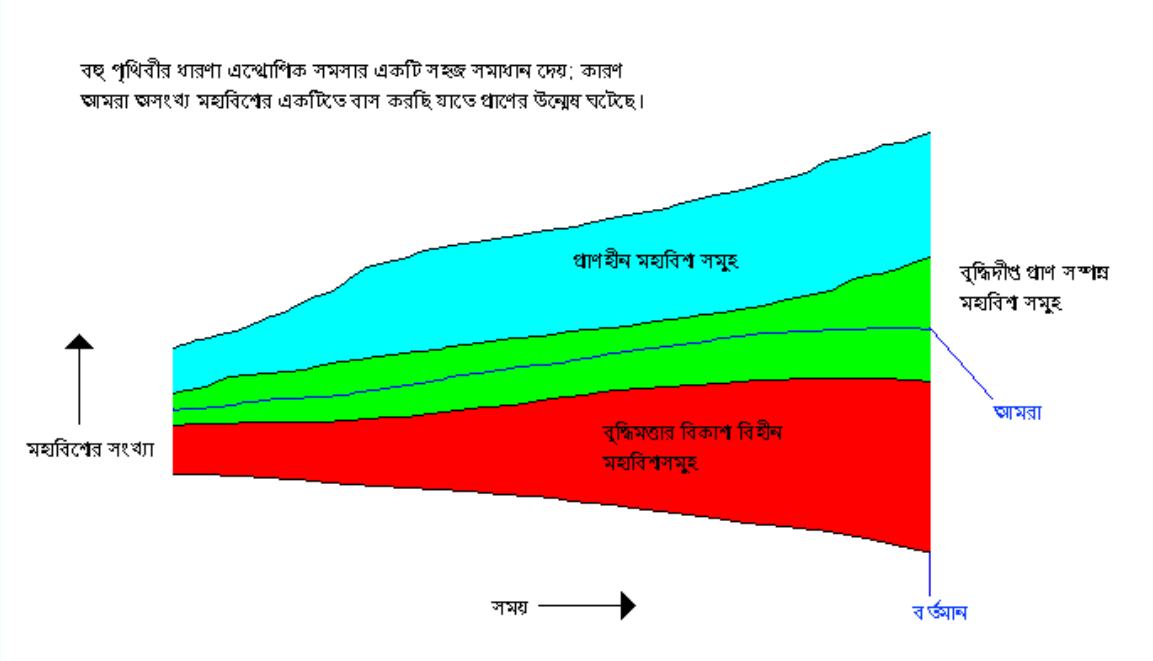

চিত্র ১০.৫ : মালটিভার্স হাইপোথিসিস অ্যান্থ্রোপিক এবং ফাইন-টিউনিং আর্গুমেন্টের একটি সহজ সমাধান দেয়।

'ফাইন টিউনিং' আর্গুমেন্টের এর সমালোচনা করেছেন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়েইনবার্গও। তিনি 'A Designer Universe?' প্রবন্ধে এ ধরনের যুক্তির সমালোচনা করে বলেন :

> 'কোন কোন পদার্থবিদ আছেন যারা বলেন প্রকৃতির কিছু ধ্রুবকের মানগুলোর এমন কিছু মানের সাথে খুব রহস্যময়ভাবে সূক্ষ-সমন্বয় (fine-tune) ঘটেছে যেগুলো জীবন গঠনের সম্ভাব্যতা প্রদান করে। এ ভাবে একজন মানব দরদী সৃষ্টিকর্তাকে কল্পণা করে বিজ্ঞানের সব রহস্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। আমি এই ধরনের সুক্ষ্ম-সমন্বয়ের ধারণায় মোটেও সন্তুষ্ট নই।'

মাইকেল আইকেদা, বিল জেফ্রিস, ভিকটর স্টেংগর, রিচার্ড ডকিন্স সহ অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন এই 'ফাইন টিউনিং' বা 'এনথ্রোপিক' আর্গুমেন্টগুলো সেই পুরোন 'গড ইন গ্যাপস' আর্গুমেন্টেরই নয়া সংস্করণ। যেখানে রহস্য পাওয়া যাচ্ছে, কিংবা আধুনিক বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, সেখানেই অতিপ্রাকৃতিক কোন কিছু আমদানী করে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হচ্ছে। এভাবে মুক্ত-বুদ্ধি এবং বিজ্ঞান চর্চাকে উৎসাহিত না করে বরং অন্ধ বিশ্বাসের কাছে প্রকারন্তরে নতি স্বীকারে আমাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে।

আসলে অনেক বিজ্ঞানীই আজ এই মতের সাথে পুরোপুরি আস্থাশীল যে, মহাবিশ্ব মোটেও আমাদের জন্য 'ফাইন টিউনড' নয়, বরং আমরাই এই বিশ্বব্রহ্মান্ডে টিকে থাকার সংগ্রামে ধীরে ধীরে নিজেদেরকে 'ফাইন টিউন্ড' করে গড়ে নিয়েছি। ব্যাপারটা হয়ত মিথ্যে নয়। আবারও আমাদের চোখের কথাই ধরা যাক। মানুষের চোখ বিবর্তিত হয়েছে এমনভাবে যে, এটি লাল থেকে বেগুনি পর্যন্ত -এই সীমার তড়িচ্চুম্বক বর্ণালিতেই কেবল সংবেদনশীল। এর কারণ হল, আমাদের বায়ুমন্ডল ভেদ করে এই সীমার আলোই বছরের পর বছর ধরে পৃথিবীতে এসে পৌঁছুচ্ছে। কাজেই সেই অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে আমাদের চোখও সেভাবেই বিবর্তিত হয়েছে। এখন এই পুরো ব্যাপারটিকে কেউ উলটোভাবেও ব্যাখ্যা করতে চাইতে পারেন। বলতে পারেন যে, কোন এক বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বা আমাদের চোখকে কে লাল থেকে বেগুনী আলোর সীমায় সংবেদনশীল করে গড়বেন বলেই বায়ুমন্ডলের মাধ্যমে তিনি সেই সীমার মধ্যবর্তী পরিসরের আলো আমাদের চোখে প্রবেশ করতে দেন। তাই আমাদের চোখ এরকম। কিন্তু এভাবে ব্যাখ্যা করাটা কতটা যৌক্তিক? অনেকটা ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেওয়ার মতনই শোনায়। তারপরও 'ফাইন টিউনার'রা ঠিক এভাবেই যুক্তি দিতে পছন্দ করেন। মহাজাগতিক ধ্রুবকগুলোর মান এরকম কেন, বৈজ্ঞানিকভাবে এটি না খুঁজে এর ব্যাখ্যা হিসেবে 'না হলে পরে পৃথিবীতে প্রাণের আর মানুষের আবির্ভাব ঘটত না' এই ধরণের যুক্তি হাজির করেন। প্রাণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি মূখ্য হয়, তবে মহাবিস্ফোরণের পর সৃষ্টিকর্তা কেন ৭০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন এই পৃথিবী তৈরী করতে, আর তারপর আরো ৬০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন 'মানবতার উন্মেষ' ঘটাতে তার কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। পৃথিবী উৎপত্তির ইতিহাসের পরিক্রমায় আমরা আজ জানি, মানুষ তো পুরো সময়ের একশ ভাগের এক ভাগেরও কম সময় ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করছে। তারপরও মানুষকে এত বড় করে তুলে ধরে মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার কি প্রয়োজন?

আসলে শতাব্দী-প্রাচীন 'মানবকেন্দ্রিক' সংস্কারের ভুত মনে হয় কারো কারো মাথা থেকে যাচ্ছেই না। সেই টলেমীর সময় থেকেই আমরা তা দেখে এসেছি। আমাদের এই পৃথিবীটা যে মহাকাশের কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের ভীড়ে হারিয়ে যাওয়া একটা নিতান্ত সাধারণ গ্রহ মাত্র, -এটি যে কোন কিছুরই কেন্দ্রে নয় - না সৌরজগতের, না এই বিশাল মহাবিশ্বের - এ সত্যটি গ্রহণ করতে মানুষের অনেকটা সময় লেগেছে। পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দিলে এর বিশিষ্টতা ক্ষুন্ন হয় এই ভয়েই বোধ হয় টলেমীর 'ভূ-কেন্দ্রিক' মডেল জনমানসে রাজত্ব করেছে প্রায় দু'হাজার বছর ধরে, আর ধর্ম বিরোধী সত্য উচ্চারণের জন্য কোপার্নিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিওদের সইতে হয়েছে নির্যাতন। একই দৃষ্টিভঙ্গি আমরা দেখেছি উনবিংশ শতাব্দীতে (১৮৫৯ সাল) যখন চার্লস ডারউইন এবং আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জীবজগতের বিবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। বিবর্তনের ধারণা সাধারণ মানুষ এখনও 'মন থেকে নিতে পারে নি' কারণ এই তত্ত্ব গ্রহণ করলে 'সৃষ্টির সেরা জীব' মানুষের বিশিষ্টতা ক্ষুন্ন হয়ে যায়! এই সংস্কারের ভুত এক-দু দিনে দূর হবার নয়। তাই রহস্য দেখলেই, জটিলতা দেখলেই মানুষ আজও নিজেকে সৃষ্টির কেন্দ্রে রেখে, পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্রে বসিয়ে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। 'ফাইন-টিউনিং' আর 'অ্যানথ্রোপিক' আর্গুমেন্টগুলো এজন্যই মানুষের কাছে এখনও এত আকর্ষণীয় বলে মনে হয়।

অধিকাংশ বিজ্ঞানীই আজ মনে করেন মহাবিশ্বের অস্তিত্বের পেছনে 'সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত' অনুকল্পটি (জীববিজ্ঞান এবং জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই) কিছু গোঁড়া খ্রীষ্টানদের ধর্মবিশ্বাস থেকে উদ্ভুত একটি বিশ্বাস-নির্ভর ধারণার চতুর অভিব্যক্তি মাত্র এবং এটি সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িতও নয় যে এটির

সত্যতা কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা কখনও নির্ণীত হওয়া সম্ভব। সেজন্যই এটি কখনও বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবী করতে পারে না। বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের সাফল্যজনক প্রয়োগেই মহাবিশ্বের রহস্য উদঘাটন করতে প্রয়াসী হয়েছেন, বহু ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হচ্ছেন। এভাবেই ধাপে ধাপে আমরা এগুচ্ছি। তার পরেও এটি অবশ্যই স্বীকার্য যে, আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক জায়গাতেই এখনও 'ফাঁক' রয়ে গেছে; রয়ে গেছে অনেক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। কিন্তু তার মানে এই নয় যে জটিল কিছু দেখলেই বিজ্ঞান তার পেছনে কোন সৃজনশীল সজ্ঞাত সত্ত্বাকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে এত সহজেই বৈধতা দিয়ে দেবে। সরল সিস্টেম থেকে জটিল সিস্টেমের বিকাশের উদাহরণ প্রকৃতিতে খুঁজলেই অনেক পাওয়া যাবে। ঠান্ডায় জলীয়-বাষ্প জমে তুষার কণিকায় পরিণত হওয়া, কিংবা বাতাস আর পানির ঝাপটায় পাথুরে জায়গায় তৈরী হওয়া জটিল নকসার ক্যাথেড্রালের অস্তিত্ব এ পৃথিবীতেই আছে। যখন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসে বিচিত্র নক্সার হিমবাহ, কিংবা এক পশলা বৃষ্টির পর পশ্চিমাকাশে উদয় হয় বর্ণিল রংধনুর, মুগ্ধ হয় আমাদের অনেকের মন, কিন্তু আমরা কেউ এগুলো তৈরী হওয়ার পেছনে আমরা কেউ সজ্ঞাত সত্ত্বার দাবী করি না। কারণ আমরা সবাই জানি ওগুলো সবই তৈরী হয় কোন সজ্ঞাত সত্ত্বার হস্তক্ষেপ ছাড়াই, পদার্থবিজ্ঞানের কতকগুলো প্রাণহীন নিয়মকে অনুসরণ করে। ক্যালস্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত এমিরিটাস অধ্যাপক মার্ক পেরাখ সম্প্রতি 'Unintelligent Design' নামে একটি বই লিখেছেন। বইটিতে তিনি উইলিয়াম ডেম্বস্কি, মাইকেল বিহে আর ফিলিপ জনসন সহ অন্যান্য আই.ডি প্রবক্তাদের সমস্ত যুক্তি খন্ডন করে উপসংহার টেনেছেন এই বলে যে, আই.ডি কখনই বিজ্ঞান নয়, বরং ছদ্মবেশী বিজ্ঞান, যাকে ইংরেজীতে আমরা বলি pseudoscience. ডঃ পেরাখ তার বইয়ে নিত্যদিনের বেশ কিছু সাধারণ উদাহরণ হাজির করে দেখিয়েছেন, জটিলতা মানেই বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ নয়, অনর্থক জটিলতা বরং প্রকারন্তরে বুদ্ধিহীনতাই প্রকাশ করে। তাঁর ভাষায়, 'কোন যন্ত্র তা সে মেকানিকালই হোক আর বায়োমেকানিকালই হোক, যদি অতিরিক্ত জটিল হয়, তা বরং বুদ্ধিহীন উৎসের দিকেই নির্দেশ করে' (আনইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন, মার্ক পেরাখ, ২০০৪, পৃষ্ঠা ১২৬)। কাজেই মহাবিশ্বের কিংবা জীবজগতের জটিলতাকে বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্পের প্রমাণ ভাবার কোন যৌক্তিকতা নেই।

আর তাছাড়া আই.ডির বিরুদ্ধে সবচাইতে বড় যুক্তি তো হাতের সামনেই রয়ে গেছে। আমাদের এই 'জটিল' মহাবিশ্বের অস্তিত্বকে ব্যখার জন্য যদি কোন বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বার সত্যই প্রয়োজন হয়, তবে ধরেই নেওয়া যেতে পারে সেই বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বাকে এই মহাবিশ্বের চেয়েও জটিল কিছু হতে হবে। তা হলে সেই জটিল বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বার অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করবার জন্য ওই একি যুক্তিতে আবার ততোধিক জটিল কোন সত্ত্বার আমদানী করতে হবে, এমনি ভাবে জটিলতর সত্ত্বার আমদানীর খেলা হয়ত চলতেই থাকবে একের পর এক। এ ধরনের যুক্তি তাই আমাদেরকে অনর্থক অসীমত্বের দিকে ঠেলে দেয়, যা বার্ট্রান্ড রাসেল এবং ডেভিড হিউমের মত দার্শনিকেরা অনেক আগেই অগ্রহণযোগ্য বলে বাতিল করে দিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত না আই.ডি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যুক্তি আর সংশয়বাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত আই.ডি প্রবক্তাদের ভাগ্যের শিকে ছিঁড়ছে না বলেই মনে হচ্ছে।

সৃষ্টিবাদীদের বিবর্তন: এর শেষ কোথায়?

আইডি-ওয়ালাদের চেয়ে বরং প্রগতিশীল অবস্থানে আছেন 'বিশ্বাসী বিবর্তনবাদী' (theistic evolutionist) দের দল। তাঁরা মনে করেন ঈশ্বর এক সময় পৃথিবীতে প্রাণের উন্মেষ ঘটালেও

পরবর্তীতে আর এতে হস্তক্ষেপ করেননি, বিবর্তনের মাধ্যমে প্রাণকে বিকশিত হতে দিয়েছেন। প্রয়াত পোপ জন পল ২ এ ধরনের বিশ্বাসী বিবর্তনবাদী ছিলেন যিনি বিবর্তনকে বাস্তবতা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। প্রতিটি যুগেই সৃষ্টিবাদীরা বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রাকে ঠেকানোর নানাভাবে চেষ্টা করে এসেছে। বিশেষতঃ যখনই ধর্মগ্রন্থের সাথে বিরোধ দেখেছে বিজ্ঞানের, বিজ্ঞানকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চেয়েছে আস্তাকুঁড়ে। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। বাইবেল-বিরোধী সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বকে সমর্থন করার জন্য গ্যালিলিও, ব্রুনোর মত বিজ্ঞানীকে করেছে নির্যাতন। তারপরও ঈশ্বর ও তার পুত্ররা সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘোরা থামাতে পারেননি। কোপার্নিকাসের তত্ত্ব এখন সৃষ্টিবাদীরা মেনে নিলেও বাইবেলের বাণীকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করে বিবর্তন ঠেকানোর প্রচেষ্টা এখনও কোন কোন মহলে লক্ষ্যনীয়। যেমন, 'ইয়ং আর্থ ক্রিয়েশনিস্ট'দের দল বাইবেলীয় ধারণায় বিশ্বাস করেন পৃথিবীর বয়স মাত্র ছ'হাজার বছর। বিগত কয়েক দশকে তাদের আস্ফালনও কিন্তু কমে এসেছে, কারণ আধুনিক রেডিও অ্যাকটিভ ডেটিং এর মাধ্যমে খুব নির্ভরযোগ্যভাবে পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করা গিয়েছে, যা বাইবেল বর্ণিত বয়সের চেয়ে অনেক অনেক বেশী। শুধু তাই নয়, মিলিয়ন বছর আগেকার ফসিলও আবিস্কৃত হয়েছে। বিজ্ঞানী ডগলাস ফুটুইমা 'সৃষ্টিবাদীদের বিবর্তনের' একটি ধারাবাহিক ছবি তার 'ইভলুশন' বইতে উল্লেখ করেছেন এভাবে:

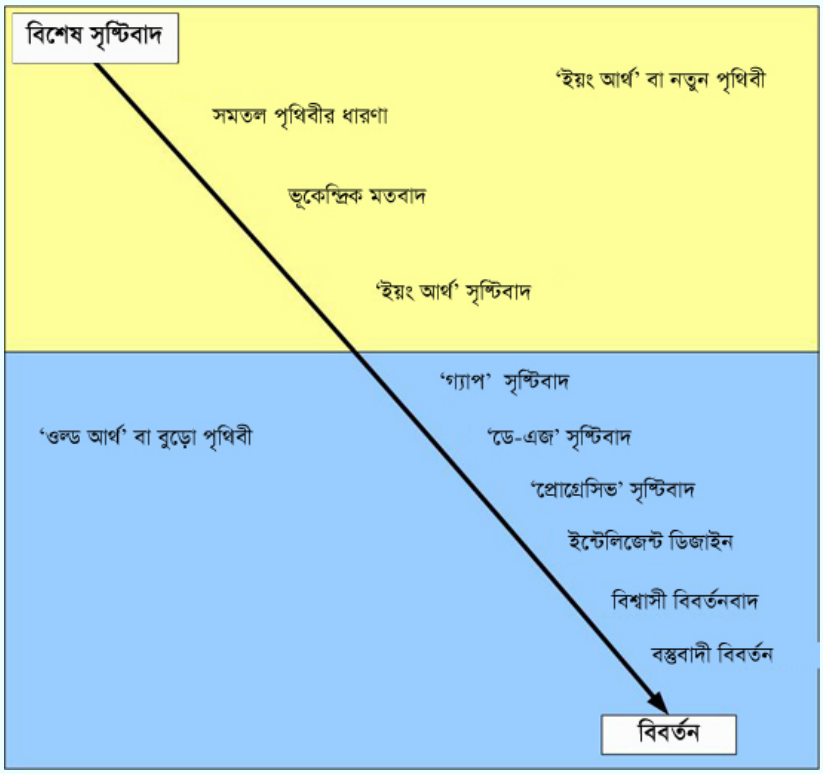

চিত্র : সৃষ্টিবাদীদের বিবর্তনের রূপরেখা (Ref. Evolutionary science, creationism and society, Doglas J. Futuyama, Evolution, Sinauer Associates Inc. p525)

বিজ্ঞানী ভিক্টর স্টেংগর এ প্রসঙ্গে খুব তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন :

> 'The species of religious thought called creationism continues to evolve by a process of natural selection. While, as National Center for Science Education executive director Eugenie Scott has pointed out, there has always been a continuum of creationist views from extreme to moderate, we can still identify a few dominant strains.'

আমরা মনে করি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই ধীরে ধীরে একটা সময় জৈব বিবর্তনকে একটি বাস্তবতা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন, এবং শেষমেষ বুঝবেন জড়জগৎ এবং জীবজগতের সবকিছুই প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপন্ন আর বিকশিত হয়েছে এবং এ সবই ঘটেছে বিবর্তনের ধারাবাহিকতায়, ঠিক যেভাবে কয়েক শো বছর লাগলেও শেষ পর্যন্ত সূর্যকেন্দ্রিক পৃথিবীর ধারণাটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো জনসাধারণের মধ্যে। জীববিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞান, জেনেটিক্স, আণবিক জীববিদ্যার কোন শাখাই বিবর্তনের কোন সাক্ষ্যের বিরোধিতা তো করছেই না, বরং যত দিন যাচ্ছে বিবর্তনের ধারাটি সবার কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। ফসিল ছাড়াও, জেনেটিক্স এবং আণবিক জীববিদ্যার মত নতুন শাখাগুলো যেভাবে বিবর্তনের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ একেবারে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে শুরু করেছে, এটি এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার মাত্র।

তথ্যসূত্র:

(১) Shermer M, 2006, Why Darwin Matters, Time Books, New York.
380

(২) Angier N, 2004, My God Problem, Free Inquiry magazine, vol 24, no. 5.

(৩) Futuyma DJ, 2005, Evolution, Sinauer Associates, INC, MA, USA, p.523.

(৪) Why doesn't America believe in evolution?, 2006, New Scientist magazine, August 2006issue, p 11.
http://www.newscientist.com/channel/being-human/mg19125653.700-why-doesnt-america-believe-in-evolution.html

(৫) রশীদ হু, জুলাই ১৫, ২০০৬, পরীক্ষায় পাশের জন্য পড়ি, কালস্রোত বিভাগ, দৈনিক সমকাল।

(৬) Stenger V, Do Our Values Come from God?, The Evidence Says No, http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/Godless/Values.htm

(৭) "We focus particularly on providing answers to questions surrounding the book of Genesis, as it is the most-attacked book of the Bible. We also desire to train others to develop a biblical worldview, and seek to expose the bankruptcy of evolutionary ideas, and its bedfellow, a "millions of years old" earth (and even older universe)." from 'Our message', Answer in Genesis, http://www.answersingenesis.org/

(৮) Dennett DC, 1995, Darwin's Dangerous Idea: Evolution and Meanings of Life, Penguin (UK), Simon and Schuster (USA).

(৯) White AD, 1993, A History of Warfare of Sceince with the theology in Christendom, Prometheus Books.

(১০) Rees M, 2001, Our Cosmic Habitat, Princeton University Press, p 163

(১১) Paley W, (1801) 1850, Natural Theology or Evidence of the Existence and Attributes of the Deity, Collected from the Appearances of Nature, American Tract Society.

(১২) Shanks N, 2004, God, the Devil and Darwin: A critique of Intelligent Design theory, Oxford University Press.

(১৩) বিস্তারিত তথ্যের জন্য Dawkins R, (1986) 1996, The Blind Watchmaker : Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe Without a Design, Norton Paperback এর 'Accumulating Small change' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।'

(১৪) Darwin C, (1859), 1999 The Origin of Species, Bantam Books, p 155.
(১৫) Kuhn T, 1970, The Structure of Scientific Revolutions, University Of Chicago Press, USA

(১৬) স্টেংগর ভি, ডারউইনিজমের আতংক, (অনুবাদ : বন্যা আহমেদ), জুন ২, ২০০৫, একুশ শতক বিভাগ, দৈনিক ভোরের কাগজ

(১৭) আজকের দিনের বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরা অবশ্য প্রজাতির উৎপত্তির পেছনে **প্রাকৃতিক নির্বাচনের পাশাপাশি** বিবর্তনের জন্য অন্য অনকে ফ্যাক্টর (যেমন জিন মিউটেশন, ক্রোমজম মিউটেশন, জেনেটিক রিকম্বিনেশন, জেনেটিক ড্রিফট এবং অন্তরণ বা আইসোলেশন) খুঁজে পেয়েছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(১৮) Dawkins R, Darwin and Darwinism, Mukto-Mona Darwin Day celebration, http://www.mukto-mona.com/Articles/dawkins/darwin_and_darwinism120206.htm

(১৯) Huxley TH, 1880, The Origin of Species (review), *Westminster Review*, vol 17, pp 541-570

(২০) Mayr E, 1988, Toward a New Philosophy of Biology, Cambridge, Mass, Harvard University press.

(২১) Gould SJ, 2002, The Structure of Evolutionary Theory, Belknap Press

(২২) Dawkins R, 2004, A Devil's Chaplain: Reflections on Hope, Lies, Science, and Love, Mariner Books; Reprint edition

(২৩) Berra TM, 1988, Evolution and Myth of Creationism, Stanford University Press, USA

(২৪) Stenger V, 2003, Has Science Found God? The Latest Results in the Search for the Purpose in the Universe, Prometheus Books, USA

(২৫) Creation Research Society [online], www.creationresearch.org

(২৬) Scott EC and Cole HP, 1985, The Elusive Basis of Creation 'Science', Quarterly Review of Biology, vol. 60, no. 1.

(২৭) Dennett DC, 2006, The Hoax of Intelligent Design and How It was Prepared, from Intelligent Thought: Science versus the Intelligent Design Movement, Brockman J (Editor), Vintage.

(২৮) Coyne JA, 2006, The Faith That Dare NOT Speak Its Name, from Intelligent Thought:

Science versus the Intelligent Design Movement, Brockman J (Editor), Vintage

(২৯) Wells J, Darwinism: Why I Went for a Second Ph.D, The Words of the Wells Family, Kansas Citizens for Science. Source: http://www.tparents.org/library/unification/talks/wells/DARWIN.htm

(৩০) Dawkins R, 2006, Intelligent Aliens, from Intelligent Thought: Science versus the Intelligent Design Movement, Brockman J (Editor), Vintage, pp 92.

(৩১) Perakh M, 2005, Intelligent Design Theory - A Quasi-Scientific Endeavor with a Religious Agenda, Mukto-Mona [online], www.mukto-mona.com

(৩২) Behe MJ, 1996, Darwin's Black Box : The Biochemical Challenge to Evolution, Free Press, USA.

(৩৩) Young M and Edis T [editors],(2004) 2006, Why Intelligent Design Fails: A Scientific Critique of the New Creationism, Rutgers University Press, London.

(৩৪) রায় অ, ২০০৫,আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রি, অঙ্কুর প্রকাশনী।

(৩৫) Halder G, Callaerts P, Gehring WJ, 1995, Induction of Ectopic Eyes by Targeted Expression of the eyeless Gene in Drosophila. Science, vol. 267, pp 1788-1792.

(৩৬) Gerhart J and Kirschner M, 1997, Embryos, and Evolution: Toward a Cellular and Developmental Understanding of Phenotypic Variation and Evolutionary Adaptability, Cells,

(৩৭) Brock TD, Life at High Temperature, History and Education, Inc, Yellowstone National Park, Wyoming.

(৩৮) Anthony A, 2001, The Cold Big-Bang Cosmology as a Counter-example to Several Anthropic Arguments, Journal of Physical Rev, D64:083508.

(৩৯) বিস্তারিত তথ্যের জন্য Alan H. Guth,1998, The Inflationary Universe: The Quest for a New Theory of Cosmic Origins, Perseus Books Group দেখুন|

(৪০) Linde A, 1998, Self Reproducing Inflationary Universe, Scientific American.

বন্যা আহমেদ, আমেরিকা প্রবাসী লেখক। পেশায় কম্পিউটার প্রকৌশলী। সর্বশেষ বই - 'বিবর্তনের পথ ধরে' (২০০৭)। তার বিভিন্ন প্রবন্ধ বাংলাদেশের সাপ্তাহিক ও দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। ইমেইল : bonna_ga@yahoo.com

ড. অভিজিৎ রায়, আমেরিকায় বসবাসরত গবেষক এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' ও 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। সাম্প্রতিক সম্পাদিত গ্রন্থ - 'স্বতন্ত্র ভাবনা'। ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com

তৃতীয় অধ্যায় : ধর্ম ও বিজ্ঞান - অনিবার্য সংঘাত নাকি সহাবস্থান? ১৯৫

...

- বিজ্ঞানমনস্ক ধারা, ধর্মাচ্ছন্ন স্রোত: *ইরতিশাদ আহমদ* ১৯৬ *[ক্লিক করুন]*
- ধর্ম, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা: শহিদুল ইসলাম ২২০ *[ক্লিক করুন]*
- ধর্ম চেতনা ও ঈশ্বর বিশ্বাস: *ওয়াহিদ রেজা* ২৩৬ *[ক্লিক করুন]*
- ধর্মবিশ্বাস, বিজ্ঞানবিশ্বাস ও এক চিল্‌তে ইতিহাস : *প্রদীপ দেব* ২৫৪ *[ক্লিক করুন]*
- সৃষ্টিতত্ত্বের অসারতা বনাম বিবর্তনতত্ত্বের সাফল্য : *দিগন্ত সরকার* ২৬৬ *[ক্লিক করুন]*
- ডারউইনিজমের আতংক : *ভিক্টর স্টেংগর (বন্যা আহমেদ)* ২৮৯ *[ক্লিক করুন]*
- বিজ্ঞান ও ইসলাম - অন্তিম সংঘাত : *টড পিকক (তানবীরা তালুকদার)* ২৯৫ *[ক্লিক করুন]*
- ধর্মীয় দাবী সম্বন্ধে যে কারণে আমি সংশয়বাদী : *পল কার্জ (জাহেদ আহমেদ ও অভিজিৎ রায়)* ৩১৪ *[ক্লিক করুন]*
- স্বতন্ত্র বলয় : *স্টিফেন জে গুল্ড (খান মুহাম্মদ)* ৩২৫ *[ক্লিক করুন]*
- বিজ্ঞানের অংগনে যখন ধর্মের প্রবেশ : *রিচার্ড ডকিন্স (তানবীরা তালুকদার)* ৩৪০ *[ক্লিক করুন]*
- বিজ্ঞান ও ধর্ম : সংঘাত নাকি সমন্বয় মার্ক্সবাদের দৃষ্টিতে : *শঙ্কর রায়* ৩৪৭ *[ক্লিক করুন]*
- ধর্ম ও বিজ্ঞান: সংঘাত- সমন্বয়ের রণনীতি- রণকৌশল : *মোঃ জানে আলম* ৩৫৬ *[ক্লিক করুন]*
- ধর্মের স্বরূপ এবং বিজ্ঞান : আবুল হোসেন খোকন ৩৬১ *[ক্লিক করুন]*
- ধর্ম নয়, বিজ্ঞান : *আকাশ মালিক* ৩৬৬ *[ক্লিক করুন]*

বিজ্ঞানমনস্ক ধারা ধর্মাচ্ছন্ন স্রোতে

ইরতিশাদ আহমদ

বিশ্বাস আর বিজ্ঞানের সহাবস্থান

একটা চাবি মাইরা দিছে ছাইড়া,
জনম ভইরা চলতে আছে

- আবদুর রহমান বয়াতী

বিজ্ঞানচর্চা বনাম বিজ্ঞানমনস্কতা

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কি দ্বিতীয় বছরে আমাদের রসায়নের একটা কোর্স নিতে হয়েছিল। কোর্সটা যিনি পড়াতেন, তিনিই ছিলেন পাঠ্য বইটার লেখক। বইয়ের ভূমিকায় শেষাংশে স্যার সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করে লিখেছিলেন, অণু-পরমাণু-ইলেক্ট্রন-নিউট্রন-প্রোটনের জটিল জগত সম্পর্কে তিনি যতই জেনেছেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার ক্ষমতার এবং বুদ্ধিমত্তার যে সীমা-পরিসীমা নেই তা উপলব্ধি করে ততই অভিভূত হয়েছেন। সৃষ্টির অপার রহস্য জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে যতই তার কাছে উন্মোচিত হয়েছে ততই তিনি মুগ্ধ হয়েছেন সৃষ্টিকর্তার বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে। তিনি বিজ্ঞানী ছিলেন, রসায়নশাস্ত্রে পন্ডিতও ছিলেন। কিন্তু এই ধারায় যারা চিন্তা করেন, বিজ্ঞানী হলেও কি তাদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক বলা যায়? যে বিজ্ঞানগ্রন্থটি তিনি রচনা করেছেন, যে বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ পদ্ধতির বর্ণনা তিনি নিজেই তার লেখা বইতে দিয়েছেন, তার তোয়াক্কা না করেই তিনি ধরে নিয়েছেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মান্ড এবং এর অন্তর্ভুক্ত সবকিছুর নিয়ামক আল্লাহতালা নামক একজন সৃষ্টিকর্তা। যে জ্ঞান তিনি বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে অর্জন করেছেন সেই জ্ঞানকে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের শুধু নয়, তার অপরিসীম বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন হিসেবে ধরে নিয়েছেন। তার এই ধারণার ভিত্তিতে আছে বিশ্বাস, কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নয়। এই স্ববিরোধিতার ব্যাখ্যা কি?

যদি রসায়নবিদ না হয়ে আমাদের শিক্ষক একজন অশিক্ষিত কৃষকও রয়ে যেতেন, তাহলেও খুব সম্ভবতঃ তিনি সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী একজন পরহেজগার বান্দা হয়েই থাকতেন। প্রতিদিন নিয়মমাফিক সকালে সূর্যোদয় এবং সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত দেখে দেখে রুজি-রোজগারের মালিক খোদাতালার দরবারে শুকরিয়া আদায় করতেন। গাছের ফল, ক্ষেতের ফসল আর নদীর জল-মাছ পেয়ে হয়তো গেয়ে উঠতেন, 'এই সুন্দর ফুল, এই সুন্দর ফল, মিঠা নদীর পানি, খোদা তোমার মেহেরবানী।' সবাই তো আর আরজ আলী মাতুব্বরের (১৯০০-১৯৮৫)[১] মতো প্রশ্ন তোলেন না, "আমি কে? খোদা কি

মনুষ্যভাবাপন্ন? কেন তাঁহাকে ধর্মযাজকগণ পার্থিব মানুষের ও তাদের কার্যকলাপের সাথে তুলনা করিয়া জনসাধারণকে বুঝ দেয়ার প্রয়াস পান?”

দেখা যাচ্ছে, সারাজীবনের বিজ্ঞান শিক্ষা এবং চর্চা আমাদের কেমিস্ট্রি স্যারকে তার আজন্মলালিত ধর্মবিশ্বাস থেকে মুক্তিতো দেয়ইনি, বরং আরো বেশী করে ধর্মের দিকে ঠেলে দিয়েছে। যদিও বিজ্ঞান প্রশ্ন না করে এবং সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে সদুত্তর না পেলে কোন কিছুই মেনে না নিতে শিক্ষা দেয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, একজন বিজ্ঞানচর্চাকারীর মনে বিজ্ঞান আর বিশ্বাসের এহেন সমন্বয় কিভাবে সম্ভব। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি দীর্ঘ দিন ধরে বটে, কিন্তু নিজের আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিশ্বাস আর বিজ্ঞানের সহাবস্থান দেখে দেখে অযৌক্তিক মনে হলেও একেই স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছি একসময়। মেনে নিয়েছি যে, বিজ্ঞানী হওয়া আর বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া এক কথা নয়। বিজ্ঞানচর্চা করে বিজ্ঞানী হওয়া যায়, কিন্তু মুক্তবুদ্ধির চর্চা না করলে বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া যায় না। তাই দেখি, বাংলার অধ্যাপক হয়েও একজন মুক্তবুদ্ধির চর্চা করে পরিণত হন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষে, আর একজন বিজ্ঞানী সারাজীবন বিজ্ঞানচর্চা করেও রয়ে যান ধর্মাচ্ছন্ন। ধর্ম টিকে থাকে বিশ্বাসে, বিজ্ঞান বিকশিত হয় সংশয়ে; ধর্মের ভিত্তি ঈমানে, আর বিজ্ঞানের মূল সাক্ষ্যপ্রমাণে।

আমেরিকায় আসার পরে এখানেও দেখেছি আপাতদৃষ্টিতে যাদেরকে আধুনিক, চিন্তা-চেতনায় অগ্রসর, উচ্চশিক্ষিত, কুসংস্কার-মুক্ত বলে মনে হচ্ছে সেই আমেরিকানদের মধ্যেও অনেকেই রয়েছে যারা আক্ষরিক অর্থেই আদম-হাওয়ার গালগল্পে বিশ্বাস করেন। ছয় হাজার বছর আগে ছয়দিনে ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন, বিনা প্রশ্নে এধরণের আজগুবি কথাকে পরম সত্যি বলে মানেন। এদের দৃষ্টিতে ঈশ্বর বা বিশ্বস্রষ্টা লম্বা দাড়িওয়ালা প্রৌঢ়বয়সের একজন পুরুষ।

এই ধরণের চিন্তার মূল হেত্বাভাস (ফ্যালাসি) হচ্ছে এই যে, সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী মানুষ নিজের অজান্তেই সৃষ্টিকর্তাকে মানুষের সীমাবদ্ধতার নিরীখে তুলনা করে। ধর্মবিশ্বাসের মূলে রয়েছে এই ধারণা যে, ভগবান বা আল্লাহ বা ঈশ্বর সব বিজ্ঞানীর সেরা বিজ্ঞানী, সব ইঞ্জিনীয়ারের সেরা ইঞ্জিনীয়ার, সব শিল্পীর সেরা শিল্পী, সব ভাস্করের সেরা ভাস্কর, সব গ্রন্থকারের সেরা গ্রন্থকার। মানুষের শ্রেষ্ঠ বিকাশ তার সৃষ্টিশীলতায় আর মননশীলতায়। তাই মাইকেলএঞ্জেলো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির সৃষ্টিশীলতায় আর আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথের মননশীলতায় আমরা হই বিস্ময়াভিভুত। বিজ্ঞানে, প্রকৌশলে, স্থাপত্যে প্রতিভার পরিচয় পেয়ে আমাদের চিত্ত হয় শ্রদ্ধায় অবনত।

এমন কি একজন ঘড়ির কারিগরও হয়ে যান আমাদের প্রশংসার পাত্র। সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসীরা ঘড়ির সাথে সৃষ্টির তুলনা করতে খুবই পছন্দ করেন। কারন ঘড়ির ডিজাইনার ঘড়ির মধ্যে স্বয়ংক্রিয় ভাবে চলার সামর্থ্য ঢুকিয়ে দেন, বা ‘চাবি মাইরা ছাইড়া দেন’ যা চলতে থাকে ‘জনমভর’। যা চলছে, তা কেউ না কেউ চালিয়ে দিয়েছেন, এই ধরণের চিন্তা করতেই আমরা বেশি অভ্যস্ত।

প্যালির ঘড়িতত্ত্ব

ঘড়িতত্ত্বের জনক হচ্ছেন উইলিয়াম প্যালি (১৭৪৩- ১৮০৫)[২] নামের একজন ধর্মযাজক। প্যালির *Natural Theology – or Evidences of the Existence and Attributes of the Deity Collected from the Appearances of Nature* প্রকাশিত হয় ১৮০২ সালে। প্যালি লিখেছেন,

> "আমরা যখন একটা ঘড়ির ভিতরটা ভালভাবে পরীক্ষা করি, আমাদের মনে ধারণা জন্মে যে, এর বিভিন্ন অংশগুলির একটার সাথে আরেকটাকে যুক্ত করা হয়েছে কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে মনে রেখে। এই অংশগুলিকে বানানো এবং লাগানো হয়েছে এমনভাবে যাতে এর মধ্যে গতির সঞ্চার হয়, এবং সেই গতিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে যাতে ঘড়িটা দিনের ঘণ্টানুযায়ী সময় নির্দেশ করতে পারে। যদি, এর বিভিন্ন অংশগুলি ভিন্ন আকারের হতো, অথবা যদি সেগুলো অন্যভাবে একটা আরেকটার সাথে যুক্ত থাকতো, তাহলে এই যন্ত্রটার মধ্যে কোন গতির সঞ্চার হতোনা, বা হলেও যে সময় নির্দেশ করার জন্য এটাকে বানানো হয়েছে ঘড়িটা তা করতে পারতো না ... আমরা অবধারিত ভাবেই ধরে নিতে পারি, ঘড়িটাকে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ বানিয়েছে, কোনও না কোন সময়ে, কোথাও না কোথাও, এক বা একাধিক নির্মাতা, এর নির্মান এবং ব্যবহার সম্পর্কে পূর্ব-পরিকল্পনা করেই এটাকে বানিয়েছে একটা বিশেষ কাজ করার জন্য, আর তা হচ্ছে সময় নির্দেশ করা"।

এই হচ্ছে প্যালির অকাট্য যুক্তি; ধোঁয়ার পেছনে যেমন থাকে আগুন, তেমনি প্রত্যেকটা ঘড়ির পেছনে আছে কারিগর, আর তেমনি এই বিশ্বব্রহ্মান্ডেরও আছে এক নির্মাতা! মজার ব্যাপার, প্যালি বইয়ের নামে 'এভিডেন্স' শব্দটা ব্যবহার করেছেন। কোন কিছুর সত্যতা দাবী করতে হলে যে, প্রমাণ হিসেবে সাক্ষ্য বা এভিডেন্স দরকার (বিজ্ঞানের নীতি অনুযায়ী) প্যালি প্রকারান্তরে তাই স্বীকার করছেন। যদিও সাক্ষ্যের (সৃষ্টি, পৃথিবী) সাথে প্রমাণের (স্রষ্টার অস্তিত্ব) সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্যালি লঙ্ঘন করেছেন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিয়ম - অনুমানের ভিত্তিতে কোন প্রমাণ গ্রহনযোগ্য হতে পারেনা, যতক্ষন না পর্যন্ত সেই অনুমানকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যাচ্ছে। প্যালির প্রাথমিক অনুমান (hypothesis) হচ্ছে, এই পৃথিবী 'ডিজাইন' করা হয়েছে। এই অনুমান যে ভ্রান্ত নয়, প্যালি তা প্রমাণের প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেননি। সঙ্গত কারনেই, এখন পর্যন্ত কারো পক্ষেই এটা প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি।

ইদানীংকালেও ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্ত্বের প্রবক্তারা এই ধরণের যুক্তিই দেন। এরা বলেন, বিশ্বব্রহ্মান্ড এতই জটিল যে, কোন উচ্চতর শক্তির ডিজাইন ছাড়া এর অস্তিত্ব অসম্ভব। তারা বলেন যে, জটিলতাইতো প্রমাণ করে উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী বুদ্ধিমান কোন ডিজাইনার এটা বানিয়েছেন। সাধারন চিন্তায় এই যুক্তির অসারতা চট্ করে ধরা পড়ে না। এর সুযোগেই এরা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনকে বিবর্তনতত্ত্বের পাশাপাশি বিকল্প তত্ত্ব হিসেবে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন অঙ্গরাজ্যে) স্কুল-কলেজে পড়ানোর দাবী

জানাচ্ছে। 'ইন্টেলিজেন্স', 'ডিজাইন', এবং 'জটিলতা' শব্দগুলির ভুল ব্যাখা এবং প্রয়োগের ওপরেই এই তত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে। কোন সাদা জিনিষ দেখে যদি কেউ বলে, "জিনিষটা এতই সাদা, এটা দুধ না হয়েই যায় না," আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়না এই বাক্যের বক্তার সাদা জিনিষ এবং দুধ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সীমিত। যারা মনে করেন, "জটিলতা মানেই ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন" তারাও জটিলতা এবং ডিজাইন সম্পর্কে তাদের সীমিত জ্ঞানেরই পরিচয় দেন।

রিচার্ড ডকিন্স[৩] তাঁর *The Blind Watchmaker*–এ প্যালির ধারনা সম্পর্কে লেখেন,

> "প্রকৃতিতে (বা Nature-এ) সব কিছুই পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মে চলে। যদি ঘড়ির কারিগর কাউকে বলতেই হয়, তবে তা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মাধীন অন্ধ সূত্রগুলি। সত্যিকারের ঘড়ি-নির্মাতার থাকতে হয় সম্মুখদৃষ্টি; ঘড়ির বিভিন্ন পার্টস, কল-কব্জা এবং তাদের মধ্যকার সংযোগক্রিয়া ঘড়ি-নির্মাতার ডিজাইন এবং পরিকল্পনার ফলশ্রুতি। ঘড়ি-নির্মাতা তার মনশ্চক্ষুতে দেখতে পান এই ঘড়ির ভবিষ্যত কার্যকারিতা ও উদ্দেশ্য । ডারউইন আবিষ্কৃত 'ন্যাচারাল সিলেকশন' বা প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়া অন্ধ এবং অচেতন। এই প্রক্রিয়া নিজে নিজেই চলে। আপাতদৃষ্টিতে জীবনের উদ্দেশ্য আছে মনে হলেও জীবনের অস্তিত্ব ব্যাখ্যাকারী প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার কোন উদ্দেশ্য নাই। এই প্রক্রিয়ার কোন মন নাই, মনশ্চক্ষু নাই। ভবিষ্যতের জন্য এর কোন পরিকল্পনা নাই, কোন অন্তর্দৃষ্টি নাই, নাই কোন সম্মুখদৃষ্টিও। আসলে এর কোন দৃষ্টিই নাই। প্রকৃতিতে 'ন্যাচারাল সিলেকশন'-এর ভুমিকা যদি ঘড়ি নির্মাতার মতোই হবে, তবে বলতে হয়, এ হচ্ছে এক অন্ধ ঘড়িনির্মাতা।"

মানুষের চিন্তাশক্তির সীমাবদ্ধতা

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জটিল ও 'পারফেক্ট' ডিজাইন

ডিজাইন যত জটিল হয়, ইঞ্জিনীয়ারিং-এর কলাকৌশল যতই সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার আওতার বাইরে হয়, এই শ্রদ্ধা আর প্রশংসার মাত্রা ততই বেশী হয়। আর তাই সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসীদের মতে, সবচেয়ে জটিলতম ঘড়ি, এই বিশ্বব্রহ্মান্ড যিনি বানিয়েছেন সব প্রশংসাতো তারই প্রাপ্য হওয়া উচিৎ। বিশ্বব্রহ্মান্ডের মতো বা প্রাণের মতো 'জটিল' 'সিস্টেম' ডিজাইন ছাড়া বানানো হয়েছে এবং এই সিস্টেমগুলি কোন 'পরিকল্পনা' ছাড়া 'নিয়মমাফিক' চলছে এটা মেনে নেওয়া অনেকের পক্ষেই কঠিন।

যুক্তিটা হচ্ছে এরকম - বিশ্বব্রহ্মান্ড নিশ্চয়ই বানানো হয়েছে, না বানালে আসলো কোত্থেকে? আর বানানো যখন হয়েছেই, কেউ না কেউ বানিয়েছেন, সেই কেউ না কেউই হচ্ছেন ভগবান। এই ধারণাই হচ্ছে তথাকথিত 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' তত্ত্বের ভিত্তিমূল।

'জটিল' 'সিস্টেম' 'পরিকল্পনা' 'নিয়মমাফিক' 'ইন্টেলিজেন্ট' 'ডিজাইন' এই শব্দগুলি আমরা অর্থাৎ মানুষেরাই উদ্ভাবন করেছি। এগুলো স্বর্গ থেকে কোন আসমানী কিতাবের মাধ্যমে আসেনি। আমাদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে যে জগৎ, তাকে আর সে জগতের মধ্যে যে কর্মকান্ড আমরা চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করছি, তাকে ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা এই শব্দগুলি উদ্ভাবন করেছি। অথচ আমরা আবার এই শব্দগুলিকেই ব্যবহার করছি যে জগৎ আমাদের কাছে এখনো অজানা, রহস্যময় তাকে ব্যাখ্যা করতে। ঘড়িকে তুলনা হিসেবে ব্যবহার করছি, যা আসলে ঘড়ির মতোই নয় তার সাথে। আর নিজেদের আবিষ্কৃত তুলনার অভিনবত্বে নিজেরাই হচ্ছি মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভুত। নিজেরাই নিজেদের মনের মাধুরী মিশিয়ে কল্পনার স্রষ্টা সৃষ্টি করেছি।

ডকিন্স ফ্যালাসিটার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে, "পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মাধীন এই পৃথিবীতে বিবর্তনের জটিল প্রক্রিয়া, এমন কি প্রাণের অস্তিত্বও, সত্যিই বিস্ময়কর – অথবা বলা উচিত আপাতঃ বিস্ময়কর; কারণ, বিস্ময় হচ্ছে এক ধরনের আবেগের বহিপ্রকাশ যা মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত, যে মস্তিষ্ক আবার সেই খোদ বিস্ময়কর প্রক্রিয়ারই ফলশ্রুতি"।[৪]

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'সীমার মাঝে অসীমের' সুর শুনছি, আবার নিজের মধ্যে সেই অসীমের 'মধুর প্রকাশের' আধ্যাত্মিক চেতনায় হচ্ছি উদ্ভাসিত। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন কবি ছিলেন, তাঁর কবিতার এই ছত্রটিতে তিনি শুধু যে এক আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অদ্ভুত সুন্দর প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাই নয়; আমাদের অর্থাৎ, মানুষের চিন্তার সীমাবদ্ধতাকেও (বলা নিষ্প্রয়োজন, তাঁর নিজের কাব্যভাবনা প্রকাশের সীমাবদ্ধতাকে নয়) ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর অননুকরণীয় রচনাশৈলী দিয়ে। আইনস্টাইনও এই ধরনের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা বলেছেন। বলেছেন যে, যে কোন চিন্তাশীল মানুষ 'সৃষ্টি'র বিরাটত্বে অভিভূত এবং মুগ্ধ হতে বাধ্য। তিনি একে এক ধরনের 'রিলিজিয়াস' অনুভূতির সাথে তুলনা করেছেন। ডকিন্স এই প্রসঙ্গে বলছেন, আইনস্টাইন 'রিলিজিয়াস' বলতে ধার্মিকতা বোঝান নি, খুব সম্ভবত আধ্যাত্মিকতা বুঝিয়েছেন। ডকিন্সের মতে আইনস্টাইন ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না।[৫]

কিন্তু জটিলতার অন্য ব্যখ্যাও আছে। বিশৃঙ্খলা তত্ত্ব (Chaos Theory) অনুসারে, জটিলতা বিশৃঙ্খলা থেকে উদ্ভুত হতে পারে; জটিলতার পিছনে কোন পরিকল্পনা নাও থাকতে পারে। আসলে, পরিকল্পনার অনুপস্থিতিতেই জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। নয় কি? কোন প্রক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রন না থাকলেই প্রক্রিয়াটা জটিল হয়ে পড়তে দেখা যায়। মনে রাখা দরকার, জটিল কথাটা এসেছে জট থেকে, জট পাকাতে কি ডিজাইন লাগে? বিশৃংখল এবং পরিকল্পনাহীন বিবর্তনই এই বিশ্বে জটিলতার কারণ; এই মতের পেছনে যুক্তি আছে।

বিশৃঙ্খলা তত্ত্বের অন্যতম উদ্ভাবক নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ ইলিয়া প্রিগোজিন, ইসাবেল স্টেঙ্গারস-এর সাথে লেখা তাঁর বই *Order Out of Chaos, Man's New Dialogue with Nature* – এ নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন।[৬] মোদ্দা কথা হলো, বিশ্বে; বেশির ভাগ সিস্টেমই উন্মুক্ত, আবদ্ধ নয়, (open systems, as opposed to closed systems); আর উন্মুক্ত সিস্টেমগুলি তাদের পরিবেশের সাথে প্রতিনিয়ত শক্তি, পদার্থ অথবা তথ্য আদান-প্রদান করছে। নিসন্দেহে, জৈবিক এবং সামাজিক সিস্টেমগুলি উন্মুক্ত, এবং তাই এগুলোকে যান্ত্রিকভাবে বুঝতে চেষ্টা করলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। উইলিয়াম প্যালি ঠিক এই ভুলটাই করেছিলেন, বিশ্বব্রহ্মান্ডকে ঘড়ির সাথে তুলনা করতে গিয়ে।

আবার এটাও মনে রাখার দরকার যে জটিল মানেই 'পারফেক্ট' নয়। ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্ত্বের প্রবক্তারা দাবী করেন যে, সৃষ্টি শুধু জটিলই নয়, 'পারফেক্ট'ও। অথচ, 'পারফেক্ট' বলতে আমরা কি বুঝি এ নিয়ে রয়েছে বিভ্রান্তি। সেদিন ইন্টারনেটে দেখলাম একজন প্রশ্ন রেখেছেন, খোদাতালা যদি আমাদের পারফেক্ট করেই সৃষ্টি করে থাকবেন, তবে আমরা খৎনা (প্রচলিত কথায় মুসলমানি) করাই কেন? প্রশ্নটা হাল্কা হতে পারে, তবে উড়িয়ে দেবার মতো কি?

ত্রুটিপূর্ণ ডিজাইনের আর একটা উদাহরণ - আল্লাহতালা আমাদের এমন নিঁখুত এবং সুবিন্যস্ত পৃথিবী উপহার দিয়েছেন যে, 'লিপ ইয়ার' দিয়ে 'ঠিক' করার পরেও প্রচলিত গ্রেগরিয়ান ক্যালন্ডারে 'ভুলের' পরিমান প্রতিদিন প্রায় সাতাশ সেকেন্ডের মতো, অর্থাৎ প্রতি তিন হাজার দুইশত ছত্রিশ বছরে প্রায় একদিন করে। খারাপ ডিজাইনের আরো সব চিত্তাকর্ষক উদাহরণ আছে অভিজিৎ রায়ের চমৎকার লেখা "ব্যাড ডিজাইন" [৭]-এ, যা এ বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বিবর্তনতত্ত্ব বোঝার সমস্যা

বিবর্তন তত্ত্ব সহজে মেনে নেয়া আমাদের অনেকের পক্ষেই মুশকিল। রিচার্ড ডকিন্সের মতে এর কারণ হচ্ছে,

> "মনে হয়, মানুষের মস্তিষ্ক যেন ইচ্ছাকৃতভাবে ডিজাইন করা হয়েছে ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্বকে ভুল বোঝার জন্য - যেন এই তত্ত্বটাকে মেনে নিতে কষ্ট হয়। সৃষ্টিশীল ডিজাইনার হিসেবে আমাদের অর্থাৎ মানুষের বিরাট সাফল্যই আমাদের মস্তিষ্কে মনে হয় ডারউইনতত্ত্বের সহজাত বিরোধিতার জন্ম দিয়েছে। প্রকৌশল আর শিল্পকলার চমৎকার সব সৃষ্টি আমরা প্রতিনিয়তই দেখছি আমাদের চারপাশে। জটিল, বিস্ময়কর এবং অদ্ভুত সুন্দর এই সৃষ্টিগুলি পূর্বপরিকল্পিত মেধাবী চিন্তার অবধারিত ফলশ্রুতি। ডিজাইন ছাড়া জটিল কোন জিনিষের সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে, এমন ধারণাতে আমরা অভ্যস্ত নই। স্বাভাবিক এবং সহজাত বুদ্ধি-বিবেচনার বিপরীতে নিজেদের চিন্তার জগতে এক বিরাট উত্তরণ ঘটাতে না পারলে ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) আর ওয়ালেসের(১৮২৩-১৯১৩) [৮] পক্ষে কিছুতেই বলা সম্ভব

> হতো না যে, প্রাণের বিবর্তন প্রক্রিয়াকে বোঝার বিকল্প এক পথ আছে; এবং একবার ভালোভাবে বুঝতে পারলে এই পথটাকেই অধিক যুক্তিসঙ্গত মনে হতে বাধ্য। চিন্তার এই উত্তরণ এতই ব্যাপক যে, অনেকেই এখন পর্যন্ত তা ঘটাতে পারেননি নিজেদের মনে"।[৯]

সীমাবদ্ধ চিন্তাশক্তির ফলেই মানুষের মনে সৃষ্টিকর্তার অবয়ব তৈরী হয়েছে একজন ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনারের ইমেজে। ফ্যালাসিটা হচ্ছে মানুষের চিন্তাশক্তির সীমাবদ্ধতাই এই ধরণের চিন্তার বা কল্পনার উৎস। বিশ্বব্রহ্মান্ড বা প্রাণ আমাদের অনেকের কাছে এক বিস্ময়কর মেশিন বা ইঞ্জিন বিশেষ। এজন্যই কল্পিত সৃষ্টিকর্তাকে আমরা মানুষের আদলে চিন্তা করি, মানুষের গুনাবলীর চূড়ান্ত রূপগুলি তাঁর উপর আরোপ করি। শুধু কি গুনাবলীই, আমরা মানুষের দোষ-ত্রুটির চরম প্রকাশও এই কল্পিত সৃষ্টিকর্তার চরিত্রে দেখতে চাই। বলেও থাকি, মানুষের জন্য যা পাপ দেবতাদের বেলায় তাই লীলাখেলা। আমরা ঈশ্বরকে মানুষের মতোই ক্ষমতালোভী রিপুতাড়িত একজন প্রভূ হিসেবে কল্পনা করি। তার মধ্যে দেখতে পাই মানবীয় গুনাবলীর চরমতম বিকাশ, আর দানবীয় রিপুপরায়নতার চূড়ান্ত প্রকাশ। এই প্রভূ পরম করুনাময়, কিন্তু আবার নিয়ন্ত্রন করতে পছন্দ করেন; দারুন নিরাসক্ত, জাগতিক সব চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে, কিন্তু আবার স্তুতি-প্রশংসা পেলে ভীষন খুশী হন; মহাপরাক্রমশালী অত্যাচারী রাজা-মহারাজাদের মতো আনুগত্য দাবী করেন এবং না পেলে কঠোর শাস্তি দেন। এই প্রভু মানুষের মতোই তোষামদে তুষ্ট হন, অবাধ্যতায় হন রুষ্ট।

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ ধর্মীয় চিন্তা-চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে এমনি সব পরস্পর-বিরোধী ধারণায়, কুসংস্কারে এবং আজগুবি কল্প-কাহিনীতে বিশ্বাসী ছিল। এখনো অনেকেই আছেন সেরকম। মানুষের চিন্তার সীমাবদ্ধতার জন্যই একসময়ে পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য বৃত্তাকারে ঘুরছে ভাবা হতো। এবং বলা হতো এটাই ধর্মের কথা। কিন্তু বিজ্ঞান যখন বললো যে, না ব্যাপারটা আসলে উল্টো, পৃথিবীই ঘুরছে সূর্যের চারপাশে। শুরু হয়ে গেল সংঘাত। পৃথিবী, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র নিয়ে বিজ্ঞান যখনই নতুন কোন ধারণার কথা বলেছে, যখনই নতুন কোন ব্যাখ্যা দিয়েছে, ধর্মবাদীরা তখনই তেড়ে-মেরে ছুটে এসেছে। অথচ বিজ্ঞানের কাজ সত্যের অনুসন্ধান আর তাই বিজ্ঞানের চালিকা শক্তি হচ্ছে অনুসন্ধিৎসা। ধর্মকে চ্যালেঞ্জ করা বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু মিথ্যা ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই, বিজ্ঞানের এক একটি আবিষ্কারে ধর্ম নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। ধর্মান্ধদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় ঘোরতর প্রতিক্রিয়ার।

অনিবার্য সংঘাত

বিজ্ঞানের উন্মেষ ঘটে ধর্মশাসিত সমাজের মধ্য থেকে। বিজ্ঞান মাথা তুলে দাঁড়ায় ধর্মের কোলেই। নিকোলাই কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) [১০] ছিলেন একজন ক্যথলিক ধর্মযাজক। তার লেখা *On the Revolutions of the Heavenly Bodies*-এ প্রথম (১৫৪৩) শোনা যায় সূর্যই বিশ্বব্রহ্মান্ডের কেন্দ্রে এবং পৃথিবী তার চারপাশে ঘুরছে। (যদিও

সূর্যকেন্দ্রিক ধারণার কথা শোনা গিয়েছিল আরো আগে, গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস, এরিস্টারখাস প্রমুখের ধারণায়।) চার্চের সমর্থনপুষ্ট টলেমীয় পৃথিবীকেন্দ্রিক ধারণাকে এই প্রথম বিজ্ঞান সরাসরি প্রশ্নবিদ্ধ করে তুললো। কোপার্নিকাসের ধারণাও পুরোপুরি সঠিক ছিল না, তিনি ভেবেছিলেন এই ঘূর্ণনের গতিপথ বৃত্তাকার। মজার ব্যাপার হচ্ছে কোপার্নিকাস তার গ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন পোপকে। সেটা করেও বোধ হয় ছাড় পেতেন না তিনি। পৃথিবীকে এবং তার ভেতরে বসবাসকারী সৃষ্টির সেরা মানব সম্প্রয়দায়কে বিশ্বের কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত করার মহা অপরাধে তাকে হয়তো শাস্তি পেতেই হতো। যদি না বইটি যে বছর প্রকাশিত হয় সে বছরেই তিনি মারা যেতেন। কথিত আছে, যেদিন বইটা তাঁর হাতে আসে সেদিনই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। সে যুগে রাষ্ট্রের বদলে চার্চ ছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার উৎসস্থল। তাই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে চার্চের মধ্যেই চলতো জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কিংবা চিন্তাভাবনা। কোপার্নিকাসের মত একজন ধর্মযাজকের অবসরে বিজ্ঞানচর্চা তাই সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে মোটেও অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না।

মানুষের ইতিহাসে ধর্মের এবং ধর্মভিত্তিক আচার-আচরন ও চিন্তা-ভাবনার উদ্ভব হয়েছে অনেক আগে, কমপক্ষে কয়েক হাজার বছর আগে। তুলনামুলক হিসাবে বিজ্ঞান মাত্র সেদিনকার ঘটনা, বিজ্ঞানের বয়স বড়জোর চার থেকে পাঁচশ বছর। বিজ্ঞানের অনুপস্থিতিতে সব প্রশ্নের উত্তর, সব সমস্যার সমাধান ধর্মেই খোঁজা হতো। আগেকার দিনে ধর্মই ছিল বিজ্ঞানের বিকল্প। শুধু বৈজ্ঞানিক নয়, সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সব কিছুর বিধি-বিধান আইন-কানুনের উৎস ছিল ধর্ম। এখনও, এই যুগেও ধর্মাচ্ছন্ন ও ধর্মান্ধ মানুষেরা মনে করেন তাই হওয়া উচিত। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্রম-অগ্রগতি সমস্যায় ফেলে দিয়েছে ধর্মানুসারীদের। বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হয়েছে, ধর্ম ততই প্রতিক্রিয়াশীল ভুমিকা নিয়েছে। এই ভুমিকা এক এক যুগে এক এক রকমের, আগে ছিল মারমুখী সংঘাতের এখন অনেকটা সমন্বয়ের, সহাবস্থানের। বিজ্ঞানের সাথে যুদ্ধ ঘোষনা করে আর যে পার পাওয়া যাচ্ছে না এবং যাবেও না, ধর্মের প্রবক্তারা তা মোটামুটি বুঝে নিয়েছেন। তাই সরাসরি সংঘাতের কথা আর নয়, বরং আজকাল তাদের মুখেই সমন্বয়ের কথা শোনা যায়। লক্ষ্যণীয় যে, সত্যিকারের বিজ্ঞানমনস্ক যারা, তাদের এই ধর্ম আর বিজ্ঞানের সমন্বয় নিয়ে মাথাব্যথা নাই। আগ্রহটা সবসময়ই দেখা যায় আসছে ধর্মওয়ালাদের দিক থেকে।

সংঘাত, সহাবস্থান, সমন্বয়–ধর্মভিত্তিক চিন্তাধারার ক্রমপশ্চাদপসরন

> *মানুষ ঈশ্বর শব্দটাকে অত সহজে বাদ দিতে পারে না, যত সহজে ঈশ্বরের ধারণাটাকে বাতিল করে দিতে পারে।* – বার্ট্রান্ড রাসেল। [১১]

সমন্বয় কেন?

বার্ট্রান্ড রাসেলের (১৮৭২-১৯৭০) 'ধর্ম ও বিজ্ঞানের' (*Religion and Science*) যে সংস্করনটা আমার হাতে আছে, তাতে উপক্রমণিকা (introduction) লিখেছেন বিজ্ঞান-দর্শনের প্রখ্যাত এবং বিতর্কিত পন্ডিত গবেষক মাইকেল রিউস।[১২] এই উপক্রমণিকায় মাইকেল রিউস লিখেছেন, ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যে সংঘাত-সমন্বয়ের চারটি রূপ দেখা যায়।

এক – যুদ্ধংদেহী, বিরোধমুলক। যখন ধর্মবাদীরা মনে করেন, বিজ্ঞানের আবিষ্কার মিথ্যা। ধর্মান্ধদের এই দলে ফেলা যায়। এরা ছয় হাজার বছর আগে ছয় দিনে এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল বিশ্বাস করেন, আদম-হাওয়ার গল্প, নুহের প্লাবন এসব গল্পকাহিনী সত্যি বলে মানেন। এরা বিশ্বাস করতে পারেন না যে আর্মস্ট্রংরা চাঁদে গিয়েছিলেন। আমেরিকায় এরাই হচ্ছেন 'ক্রিয়েশন' তত্ত্বের অনুসারী।

দুই – পার্থক্যতায় বিশ্বাসী, সহাবস্থানমুলক। এরা মনে করেন যে, ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যে সংঘাতের কোন কারণ নাই। কারণ দুটো সম্পূর্ন আলাদা জিনিষ। এদের কাজ-কারবার সম্পূর্ন ভিন্ন ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে। ধর্মে যেসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, বিজ্ঞানে তা পাওয়া যাবেনা, আর বিজ্ঞানের গবেষণায় ধর্মীয় প্রশ্নের মীমাংসা হবেনা। এদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত, এমনকি বিজ্ঞানীরাও আছেন। এরা 'বিশ্বাসে মিলে হরি, তর্কে বহুদূর' এই নীতির প্রবক্তা এবং সহজে বিজ্ঞানমনস্কদের সাথে তর্কে লিপ্ত হন না। এরা মনে করেন, বিজ্ঞানে পাওয়া যায় 'কিভাবে হয়' (how) প্রশ্নের উত্তর, আর ধর্মে 'কেন হয়' (why) প্রশ্নের। এরা আদম-হাওয়ার গল্প সত্যি কি মিথ্যা এই তর্কে যান না, কিন্তু এই গল্পের অন্তর্নিহিত শিক্ষায়, আমাদের কি করা উচিৎ এবং কেন করা উচিৎ তাতে বিশ্বাস করেন। এরা মনে করেন আমাদের স্রষ্টার প্রতি অনুগত থাকা উচিৎ এবং স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি দায়িত্বশীল থাকা উচিৎ। এদের অনেকেই ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্ত্বে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন।

তিন – সংলাপে বিশ্বাসী, সমন্বয়মূলক। এরা মনে করেন ধর্ম আর বিজ্ঞানের বিষয় ভিন্ন হলেও দু'এর মধ্যে সংযোগ আছে এবং কিছু কিছু ব্যাপার ধর্ম আর বিজ্ঞান দুটোরই আওতায় পড়ে। তাই এ দু'এর মধ্যে সমন্বয় আবশ্যক। এরা ধর্মকে যুক্তির সাহায্যে গ্রহনযোগ্য করে তোলার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। এদের অনেকেই বাইবেলীয় আজগুবি গল্পগুলির সবকটিকে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি বলে মনে করেন না; নিরন্তর চেষ্টা করেন এই গল্পগুলির পেছনের রূপকার্থ আবিষ্কার করতে এবং তা অবিশ্বাসীদের বোঝাতে। এরা একদিকে বিবর্তনতত্ত্ব স্বীকার করে নেন, অন্যদিকে একজোড়া আদি মানব-মানবীর ধারণায়ও বিশ্বাস করেন। স্বভাবতই স্ববিরোধী, চেপে ধরলে এরা দ্বিতীয় গ্রুপের ধর্মাচ্ছন্নদের মতই বলে বসেন, বিজ্ঞান কি পেরেছে ঈশ্বর নাই তা প্রমাণ করতে? কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব প্রমাণ করার দায়িত্ব যে যুক্তিশাস্ত্রের নিয়মানুসারে বিজ্ঞানের ওপর বর্তায় না, এরা তা বোঝেন না। এদের বিশ্বাস বিজ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, ধর্মই পারে সেখানে পথ দেখাতে।

চার – সম্মিলনে বিশ্বাসী, অভিন্নতামূলক, সম্পৃক্ততাবাদী। এই ধারায় যারা চিন্তা করেন তারা মনে করেন, ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যে আসলে কোন দ্বন্দ নাই। বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণে এবং সাক্ষ্যপ্রমাণে ধর্মীয় মতবাদের সঠিকতাই প্রমাণিত হয়। এদের ধারনা ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যকার পার্থক্য কৃত্রিম। এরাও বিবর্তনতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পুরোপুরিই মানেন, কিন্তু এটাও মনে করেন যে, বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঈশ্বরই মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীবে পরিনত করেছেন। কিন্তু কেন করেছেন এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে এরা ব্যর্থ হন।

বলা দরকার, মাইকেল রিউস একজন সমন্বয়পন্থী, যদিও নিজেকে নাস্তিক বলে দাবী করেন। বিবর্তনতত্ত্ব পুরোপুরি মেনে নিয়েও খৃষ্টান হিসেবে জীবন যাপন করা যায় বলে তিনি মনে করেন। [১৩] তাই তিনি কোথায়ও বলেন নি, যারা কোন না কোন ভাবে ধর্মাচ্ছন্ন শুধুমাত্র তারাই এই উপরোক্ত চার গ্রুপের কোন একটিতে পড়েন। তিনি বার্ট্রান্ড রাসেলকে সংঘাতপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এটা বোঝা দরকার যে, মাইকেল রিউসরা সব বিজ্ঞানমনস্ক মানুষকেই সংঘাতপন্থী মনে করেন। আসল ব্যাপারটা হলো এই যে, সত্যিকারের বিজ্ঞানমনস্ক কোন ব্যক্তিই সমন্বয়পন্থী কিংবা সহাবস্থানপন্থী হতে পারেন না। এবং সে কারণে তারা সংঘাতপন্থীও নন। বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় ধর্ম বা ধর্মীয় মতবাদ প্রাসঙ্গিক কিংবা প্রয়োজনীয় নয়। এ প্রসঙ্গে ফরাসী গণিতজ্ঞ ও জোতির্বিদ পিয়ের-সাইমন ল্যাপলাসের (১৭৪৯-১৮২৭) কথা প্রণিধানযোগ্য। জোতির্বিদ্যার ওপরে ল্যাপলাসের লেখা বইটা দেখে নেপোলিয়ন নাকি বলেছিলেন, "আপনার লেখা বইটা খুবই ভালো, কিন্তু ঈশ্বরের কোন উল্লেখ দেখছিনা কেন?' ল্যাপলাস নির্বিকারে উত্তর দিয়েছিলেন, "স্যার, আমার ওই অনুমানটার (hypothesis) কোন প্রয়োজন ছিল না"।

(মাইকেল রিউসের মতে, ডারউইন নাকি প্যালি-বর্নিত ডিজাইন খুঁজতে গিয়ে বিবর্তনতত্ত্ব আবিষ্কার করে বসেন। মাইকেল রিউস আরো মনে করেন যে, ডিজাইনতত্ত্ব ছাড়া নাকি বিবর্তনতত্তের আবিষ্কার সম্ভব হতো না। বিবর্তনবাদীদের এইজন্য নাকি প্যালির ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্ত্বের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ। অদ্ভুত যুক্তি বটে! রাজতন্ত্রের হাত থেকে ভারতের মুক্তির জন্য এবং ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতবাসীকে যেন বলা হচ্ছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে!)

ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যে সংঘাত-সমন্বয়ের এই চার অবস্থানের বর্ণনা দেয়ার পর খুবই চতুরতার সাথে রিউস এই উপক্রমণিকাতেই লিখেছেন যে, তিনি বলছেন না এই চারটির মধ্যে কোনটি সঠিক এবং কোনগুলি বেঠিক। তিনি রাসেলের বইয়ের পাঠকদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন এই বলে যে এই সিদ্ধান্ত "আপনাদের পাঠকদের"। আবার এও বলছেন যে, রাসেলের এই বইটিতে বিজ্ঞানমনস্করা (তাঁর মতে, বিজ্ঞানবাদী সংঘাতপন্থীরা) পাবেন তাদের অবস্থানের পক্ষে খুবই পরিষ্কার এবং জোরালো যুক্তি। রিউস সমন্বয়পন্থীদেরও (মানে, ধর্মাচ্ছন্নদেরও) বলছেন এই বইটি পড়তে, বিপক্ষের যুক্তি সম্পর্কে জানার জন্য, "নিজের অবস্থানের বিপক্ষে সবচেয়ে ধারালো যুক্তি যদি শুনতে চান, পড়ুন এই বইটি, বিজ্ঞানের পক্ষে এবং ধর্মের বিরুদ্ধে এমন যুক্তিপূর্ন আলোচনা আর কোথায়ও পাবেন না;

তবে সাবধান, আপনার মত পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে"। রাসেলের 'রিলিজিয়ন এন্ড সায়েন্স'-এর যে কোন পাঠকই মানবেন, রিউসের আশংকা অমুলক নয়।

রিউসের ব্যক্তিগত মতামত যাই হোক না কেন, এটা ঠিক যে, পৃথিবীতে ধর্মাচ্ছন্ন মানুষের সংখ্যাই বেশী এবং তারা রিউস-বর্ণিত চার গ্রুপের কোন একটিতে পড়েন।

প্রথম দলের (ধর্মাচ্ছন্ন সংঘাতবাদী) প্রভাব প্রধানত অশিক্ষিত মানুষের ওপর। কিন্ত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দলে অনেক শিক্ষিত লোকজন আছেন। আমরা এঁদেরকেই দেখি প্রতিদিন আমাদের চারপাশে। বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরের জন্য এরা এই যুগে আর ধর্মের দ্বারস্থ হন না। কিন্তু নৈতিকতা আর মূল্যবোধের শিক্ষার জন্য ধর্মের ওপর নির্ভর করেন।

ধর্মের পিছু হটা

বিজ্ঞানের উন্মেষকালে ধর্মের পরাক্রম ছিল প্রবল। কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব তাই ছিল বিপ্লবাত্মক। ধর্মবাদীদের মধ্যে শুরু হলো ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার। বলা হলো, সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীকে এত জটিল করে বানাননি; বিশ্বব্রহ্মান্ডের সবকিছুই নিখুঁত এবং সুবিন্যস্ত; ঈশ্বর পৃথিবীকে এই মহাবিশ্বের কেন্দ্রে বসিয়ে দিয়েছেন কারণ পৃথিবী হচ্ছে মানুষের বাসভূমি; সৃষ্টিকর্তা সবকিছু মানুষের প্রয়োজনেই সৃষ্টি করেছেন। (ধর্মবাদীদের স্ববিরোধিতা এখানে লক্ষ্যনীয়; এরা আগে জটিলতাকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন, পরে জটিলতাকেই 'ডিজাইনের প্রমাণ' বলে দাবী করেছেন।)

পোপকে উৎসর্গ করার পরেও কোপার্নিকাসের বইয়ের প্রকাশক ওসিয়ান্দরের স্বস্তি ছিলনা। তিনি (সম্ভবত কোপার্নিকাসের অমতে) বইয়ের ভুমিকায় লিখে দেন, এই গ্রন্থে বর্ণিত পৃথিবীর গতি-তত্ত্বটি একটি অনুমান বিশেষ, একে প্রমাণিত সত্য হিসেবে দাবী করা হচ্ছেনা। [১৪] কোপার্নিকাস ও তার প্রকাশককে কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছিল ধর্মীয় অনুশাসনের (স্যাঙ্কশন) ভয়ে। পরে রেনি ডেকার্টে (১৫৯৬-১৬৫০) কোপার্নিকাসের তত্তের প্রতি মৃদু সমর্থন জানিয়েছিলেন, তাও ভয়ে ভয়ে। জিওদার্নো ব্রুনোকে (১৫৪৮-১৬০০) ক্যাথলিক চার্চের আদেশে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল ১৬০০ সালে। গ্যালিলিও গ্যালিলিকে (১৫৬৪-১৬৪২) শাস্তিভোগ করতে হয়েছিল আমরণ।

কিন্তু বিজ্ঞানের জয়যাত্রা থেমে থাকেনি। থেমে যাননি নিউটন, ডারউইন, এবং আইনস্টাইন। তাঁরা এবং তাঁদের সহযাত্রীরা বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সত্য অনুসন্ধানের একমাত্র পন্থা হিসেবে। ধর্ম ক্রমাগত হয়েছে কোণঠাসা, ধর্মবাদীদের ক্রমশ পিছাতে হয়েছে, সংশোধন (এডজাস্ট) করতে হয়েছে নিজেদের অবস্থান। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্মের দাপটে বিজ্ঞানের অবস্থান ছিল আত্মরক্ষামুলক, আর আজ ধর্মবাদীরাই বিচলিত, বিজ্ঞান ধর্মের পরিসীমায় নাক গলাচ্ছে বলে চিন্তিত। আগে বলা হতো, ধর্মের কোন আওতা বা বলয় নাই, ধর্ম সর্বব্যাপী। আর আজ সমন্বয়বাদীদের মুখে শোনা যায় 'স্বতন্ত্র বলয়ে'র কথা।

স্টিফেন জে গুল্ডের "স্বতন্ত্র বলয়" বা Nonoverlapping Magisteria তত্ত্ব [১৫] যা NOMA নামে খ্যাতি পেয়েছে, তার মূল কথা হচ্ছে বিজ্ঞান-সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর ধর্ম দিতে পারে না, তাই ধর্মের উচিৎ বিজ্ঞানের আওতার বাইরে থাকা; একই যুক্তিতে বিজ্ঞানেরও উচিৎ নয়, ধর্মের বলয়ে নাক গলানো। দুই বিবদমান পক্ষকে সংঘাত থেকে বিরত রাখার যেন এক প্রাণান্তকর চেষ্টা! গুল্ডের মতে এটাই হচ্ছে সম্মানজনক পন্থা; তাঁর ভাষায় শুধু কূটনৈতিক নয়, নৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিবেচনায়ও।

রিচার্ড ডকিন্স স্বতন্ত্র বলয় তত্ত্বের (Nonoverlapping Magisteria) বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি দিয়েছেন।[১৬] ডকিন্স সব ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিজ্ঞানের আওতার বাইরে রাখার চেষ্টাকে অসৎ মনোবৃত্তির পরিচায়ক মনে করেছেন। তাঁর ভাষায়, ধর্মে যে সমস্ত অলৌকিক গল্প-কাহিনী দিয়ে সাধারণ মানুষকে বোকা বানানো হয়, সেই গল্পগুলির মধ্যে ব্যবহার করা হয় বিজ্ঞানের উপকরণ; আর বিজ্ঞান যখন এই সব গাঁজাখুরি গল্প-কাহিনীর সত্যতা এবং সম্ভাব্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তখনই বলা হয়, বিজ্ঞান ধর্মে নাক গলাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে স্বতন্ত্র বলয়ের প্রবক্তাদের মনে হয় শান্তিকামী, কিন্তু মিথ্যাকে মেনে নিয়ে যে শান্তি, তা কাম্য হওয়া উচিৎ নয়। দূর্ভাগ্যের ব্যাপার, অনেক নাস্তিক বিজ্ঞানীও শুধুমাত্র সমন্বয়ের খাতিরে ধর্মবাদীদের সাথে আপোষ করতে প্রস্তুত। স্টিফেন গুল্ড এবং মাইকেল রিউস হচ্ছেন এই দলের বিজ্ঞানী। স্বতন্ত্র বলয় বা Nonoverlapping Magisteria হচ্ছে তাঁদের এই ধরনের মানসিকতারই ফলশ্রুতি। এঁরা বিজ্ঞানী হলেও বিভ্রান্তির শিকার এবং বিপজ্জনক ভাবে ধর্মাচ্ছন্ন। তানবীরা তালুকদার ডকিন্সের প্রবন্ধটার বাংলা অনুবাদ করেছেন 'মুক্তমনা'য়[১৭] । লেখাটি এ বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উৎসাহী পাঠকেরা পড়ে দেখতে পারেন।

বিজ্ঞানমনস্ক মানুষেরা বিজ্ঞানকে কখনোই ধর্ম বানাতে চাননা, কিন্তু সমন্বয়পন্থী ধর্মাচ্ছন্নরা ধর্মকে সবসময়েই বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাই ধর্ম আর বিজ্ঞানের দ্বন্দ নিয়ে বিজ্ঞানমনস্করা খুব একটা বিচলিত নন, বরং ধর্মাচ্ছন্নদেরই এ নিয়ে বেশী হইচই করতে দেখা যায়। এই দু'এর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজনও ধর্মের প্রবক্তারাই অনুভব করেন বেশী। ধর্মবাদীরাই ধর্মকে বিজ্ঞানের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, বিজ্ঞানমনস্করা নয়। রাসেলের ভাষায়, "বিজ্ঞানমনস্ক মানুষেরা মানে না, গুরুত্বপূর্ণ কিংবা কর্তৃত্বসম্পন্ন কেউ বলেছে বলেই কোন কিছু মেনে নিতে হবে – বরং ঠিক উল্টোটা, সাক্ষ্যপ্রমাণ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে যা জানা যায় শুধুমাত্র তাকেই তারা সত্য বলে মেনে নেয়। এই 'নতুন' পদ্ধতির অভুতপূর্ব সাফল্য – তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয়বিধ – ধর্মবাদীদের বাধ্য করে ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে"।[১৮]

সে যুগে ধর্ম বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে বাধা ছিল, আজকাল তা আর সেরকম ভাবে নাই। এখন ধর্মবাদীরা ভীত বিজ্ঞান ধর্মের বিকাশে না বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞানকে তাই ধর্মের বলয় থেকে দূরে রাখার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এটা নিসন্দেহে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত অগ্রযাত্রার, আর ধর্মের ক্রমপশ্চাদপসরনের নিদর্শন। সংঘাত ধর্মবাদীরাই সৃষ্টি করেছে, বিজ্ঞান নয়। সমন্বয়ও ধর্মবাদীদেরই মস্তিষ্কপ্রসুত, বিজ্ঞানের প্রয়োজন নাই সমন্বয়ের।

ধর্ম যেখানে প্রতিনিয়তই অবস্থান পরিবর্তন করছে বিজ্ঞানকে জায়গা করে দিতে, বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা সেখানে অপ্রতিরোধ্য, অপ্রতিহত। বিজ্ঞানের কাজই হচ্ছে সত্যের সন্ধানে এগিয়ে যাওয়া, নিত্যই নতুন জ্ঞানের পেছনে ছোটা।

বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, ধর্মের অপ্রয়োজনীয়তা

ধর্ম্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত, মার্জ্জিত লোকের ধর্ম্ম

- মোতাহার হোসেন চৌধুরী[১৯]

ধর্মের প্রভাব

ন্যায়-অন্যায়ের সংজ্ঞা আর ধর্ম-নির্দেশিত পাপ-পূণ্যের ধারণার মধ্যে ধর্মাচ্ছন্নরা কোন পার্থক্য খুঁজে পান না। বিবেক-বুদ্ধির চেয়ে ধর্মের অনুশাসনের ওপরেই এদের আস্থা বেশী। এদের অনেকেই মনে করেন, বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ এবং আবিষ্কার সত্যি হলেও ধর্মের প্রয়োজন আছে। আছে কি? একটু পরে এই প্রশ্নটা নিয়ে আবার আলোচনায় আসবো। এখন শুধু বলে রাখি, ধর্ম শুধু বিজ্ঞানের প্রতিপক্ষ হিসেবেই ব্যর্থ নয়, মানুষের নৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটাতেও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ।

ধর্মীয় আচার-আচরণ ও ধ্যান-ধারণার অসারতা নিয়ে যত কথাই বলা হোকনা কেন, প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে ধর্ম আছে আমাদের চারপাশে, এবং আছে ব্যাপকভাবেই। সমাজে ধর্মের সর্বব্যাপী প্রভাবকে অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। ধর্মাচ্ছন্ন মানুষের সংখ্যা বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের চেয়ে ঢের বেশী। এদের অনেকের কাছেই ধর্মের এবং সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কথায় কথায় 'ইনশাল্লা,' 'গড উইলিং,' 'সবই হরির ইচ্ছা' শুনতে আমরা অভ্যস্ত। পৃথিবীর আপামর মানুষের খাদ্যসমস্যার সমাধান না হলেও নিত্য-নতুন মসজিদ-মন্দির-গীর্জা-সিনাগগ-টেম্পল তৈরীর কমতি নাই। চ্যারিটির টাকাপয়সার সিংহভাগ ব্যয়িত হয় এসবের পেছনেই। স্কুল-কলেজ-হাসপাতালে নয়, মসজিদ-মাদ্রাসা-দরগাতেই মানুষ দান-খয়রাত করতে পছন্দ করে বেশী। সাপ্তাহিক 'টাইম' ম্যাগাজিনের একটা প্রতিবেদনে জানা যায় আমেরিকায় পরলোকে এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসীদের সংখ্যা মোটেও কমেনি, যদিও অনেকেই জানেনা তারা আসলে কিসে বিশ্বাস করে।[২০]

এখনো শোনা যায় দায়িত্বশীল মানুষের মুখ থেকে, 'আল্লা আমাদের পরীক্ষা করছেন,' 'আল্লার মাল আল্লায় নিয়েছেন' ধরণের কথাবার্তা। মহাত্মা গান্ধীও এলাহাবাদ ভুমিকম্পের (১৯৩৪) পরে বলেছিলেন ঈশ্বর আমাদের শাস্তি দিচ্ছেন। [২১]

ধর্মের নামে ১৯৪৭-এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনহানির মধ্য দিয়ে ভারত বিভক্ত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আবারও ১৯৭১-এ আরো কয়েক লক্ষ মানুষের জীবনদানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ধর্মের নামেই আজো মধ্যপ্রাচ্যে

(প্যালেস্টাইনে, ইরাকে) চলছে অন্যায় জবরদখল, সন্ত্রাসের তান্ডব, মানুষ হত্যার উৎসব। পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্মীয় ভাবধারার উদ্ভব থেকে আজ পর্যন্ত অশান্তি, হানাহানি, খুনোখুনির মূল কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ম। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে একে সঙ্গবদ্ধ পাগলামী (collective madness) ছাড়া আর কি বলা যায়?

আহমদ শরীফ, আরজ আলী মাতুব্বরদের সংখ্যা হাতে গোনা যায়; ধর্মাচ্ছন্ন মানুষের ভীড়ে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষেরা জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে অন্ধকার আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো দেদীপ্যমান, কিন্তু তাদের সংখ্যা এখনও তেমন বেশী নয়।

বিজ্ঞানের আওতা

এখনো অনেক কিছুই রয়ে গেছে আমাদের অজানা, সৃষ্টি-রহস্যের অনেক কিছুই এখনো রয়ে গেছে আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু যতটুকুই জেনেছি, তার সবই বিজ্ঞানের মাধ্যমে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর পর্যবেক্ষণের ফলে। রাসেল বলেছেন, "জ্ঞান যতটুকুই অর্জন করা যায়, অর্জন করতে হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে; আর বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করতে পারে না, মানুষের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়"।[২২]

ধর্মবাদীদের মুখে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়, 'নৈতিকতা, মুল্যবোধ, ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান (এথিক্স) বিজ্ঞান দিতে পারেনা। তাই ধর্মের প্রয়োজন আছে'। যেন ধর্মই আমাদেরকে চুরি-চামারি, খুন-খারাবি, অত্যাচার-ব্যাভিচার এবং যাবতীয় অন্যায় কাজ করা থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা তো বলে অন্য কথা। যে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ধর্মভীরু, সে দেশে দুর্নীতির ব্যপকতা; আর যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশির ভাগ মানুষ সৃষ্টকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, সে দেশে ধর্মবিরোধী অবাধ যৌন-অনাচার, ধর্মীয় অনুশাসন যে খুব একটা কার্যকর নয় তাই প্রমাণ করে। আমেরিকায় ইদানীংকালে খোদ ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের মধ্যে যৌন-অনাচারের প্রাদূর্ভাব এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ধর্মের মতো বিজ্ঞানে সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যাওয়াটাই বোকামি। আসলে বিজ্ঞানমনস্করা তা করেও না। কারণ, বিজ্ঞান ধর্মের মতো দুনিয়ার সব প্রশ্নের উদ্ভট, মনগড়া উত্তর দেয় না। ধর্মবাদীরাই বিজ্ঞানকে ধর্মের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাড় করিয়ে দিয়ে বলে, বিজ্ঞান মূল্যবোধ, নৈতিকতা, 'এথিক্স', ন্যায়-অন্যায় সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনা। 'তাই বিজ্ঞানকে মেনে নিলেও ধর্মকে বাদ দেয়া যায় না; ধর্ম মানুষকে নীতিবোধ, মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়, বিজ্ঞান কি দিতে পারে?', ধর্মাচ্ছন্নরা বলবে। কিন্তু একথা না বুঝে যে বিজ্ঞানের কাজ মানুষকে নীতিবোধ, মূল্যবোধ, ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান দেয়া নয়, শুধু এবং শুধুমাত্র সত্যের অনুসন্ধান করা।

বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বিজ্ঞানের সংজ্ঞার মধ্যেই নিহিত। বিজ্ঞান সাক্ষ্য-প্রমান ছাড়া কোনকিছুকেই সত্য বলে মেনে নিতে পারেনা। বিজ্ঞান কোন আদর্শ, মতবাদ, কিংবা বিশ্বাসব্যবস্থা (belief-system বা creed) নয়। ন্যায়-অন্যায়ের সংজ্ঞা, পাপ-পূণ্যের

পার্থক্য বিজ্ঞানে পাওয়ার কথা নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কি মানুষের ন্যায়-অন্যায়, নীতিবোধ, মূল্যবোধ নিয়ে চিন্তা করার কোন দরকারই নাই? অবশ্যই আছে, তবে তা বিজ্ঞানের আওতায় আসেনা।

বিজ্ঞানের কাজ নয় মানুষকে বলা, "সদা সত্য কথা বলিবে"। কিন্তু সত্য বলাটা যে, মানুষের জন্য স্বাভাবিক, মিথ্যাটা যে সহজাত নয়, বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণে তা প্রমাণিত হতে পারে। অপরাধপ্রবনতা কোন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বংশানুক্রমে পাওয়া জন্মগত স্বভাব কি না, কিংবা সমকামিতা পরিবেশ-প্রতিবেশ উদ্ভুত আচরণজনিত কুঅভ্যাসের ফল কি না, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তার নিস্পত্তি হতে পারে। [২৩]

পক্ষে-বিপক্ষে বিজ্ঞানীরা (সত্যিকারের সত্যান্বেষী এবং ধান্দাবাজ, দুই ধরনেরই) এ নিয়ে তর্কে মেতে উঠতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞান বলে না, বলতে পারেনা, "সমকামিতা বিজ্ঞানসম্মত আচরণ নয়, তাই অনুচিত" কিংবা "চুরি-ডাকাতি করাটা বিজ্ঞানের নীতিবিরুদ্ধ"।

ধর্মাচ্ছন্ন গোষ্ঠীগুলি বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণকে (ক্ষেত্রবিশেষে পর্যবেক্ষণের অপব্যাখ্যাকে) নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য সবসময়ই সচেষ্ট। যখনই বিজ্ঞানের রায় তাদের অবস্থানের পক্ষে যায়, তখন তারা বিজ্ঞানের সেই পর্যবেক্ষণের পক্ষে জোর প্রচারণা চালান। যখন যায়না, তখন বলেন বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ, অপর্যাপ্ত। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে, সমকামীদের মধ্যে 'এইডস' রোগে আক্রান্তদের সংখ্যা বেশি এই পরিসংখ্যানকে ব্যবহার করে ধর্মবাদীরা দাবী করে থাকে যে, ধর্মীয় অনুশাসন না মেনে চললে ঈশ্বর এইভাবেই পাপীদের শাস্তি দেন। 'এইডস' রোগী ছাড়া অন্য পাপীরা কেন তাদের জীবদ্দশায় শাস্তি পাবে না এবং কেন মৃত্যুর পরে তাদের অনন্তকাল ধরে নরকের আগুনে পুড়তে হবে, এই প্রশ্নের কোন গ্রহণযোগ্য উত্তর এই ধর্মবাদীদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। আবার যখন, বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ফলাফলে প্রমাণিত হয় যে, প্রার্থনা কোন কাজেই আসে না, তখন এরা বলেন প্রার্থনা বিজ্ঞানের আওতাধীন বিষয় নয়, কিংবা বিজ্ঞান সবসময় নির্ভুল নয়।[২৪] ফরিদ আহমেদের মুক্তমনায় প্রকাশিত "প্রার্থনা কি কোন কাজে আসে?" (এই বইয়ের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) প্রবন্ধে প্রার্থনার অকার্যকারিতা সম্পর্কে একটা তথ্যনির্ভর আলোচনা আছে।[২৫]

বিজ্ঞান আদর্শের ভিত্তি হতে পারেনা। মুল্যবোধ, ন্যায়-অন্যায়, সুন্দর-অসুন্দরের তুলনা বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। ধর্মের প্রবক্তারা, সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসীরা, ধর্মকে বিজ্ঞানের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেন, বিকল্প হিসেবে দেখেন। যে সব প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানের দেয়ার কথা, সে সবও দিয়ে দেয়ার প্রয়াস পান, এমনকি আজগুবি হলেও। আর যে সব প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানে পাওয়ার কথা নয়, যেমন মূল্যবোধ, আদর্শ, ন্যায়-অন্যায়-সংক্রান্ত তা বিজ্ঞান দিতে পারেনা বলে অযথা বিজ্ঞানকে অকার্যকর বলে দাবী করে বসেন। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, এ ধরণের তর্কে স্বার্থান্বেষীরা বিজ্ঞানকে, বলা উচিৎ কিছু অসৎ বিজ্ঞানীকে, নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করতে পারেন এবং করেছেনও। যেমন,

একবার শুনেছিলাম, এক মিশরীয় কম্পিউটার প্রোগ্রামার কম্পিউটারকে দিয়ে 'প্রমাণ' করিয়েছেন যে, কোরান কোন মানুষের দ্বারা লিখিত হতে পারে না। বলা বাহুল্য প্রোগ্রামটা তিনি নিজেই লিখেছিলেন। এতে করে কোরান যে আসমানি কিতাব তা প্রমাণিত হয় নি, বরং কম্পিউটার বিজ্ঞানের জগতে প্রচলিত 'গারবেজ ইন, গারবেজ আউট' কথাটার আরেকটা ভাল উদাহরণ পাওয়া গিয়েছিল।

বিজ্ঞানের অর্জনকে ধর্মের পক্ষে কাজে লাগানোর এই ধরনের বালখিল্য উদাহরণ প্রচুর দেখা যায়, এ নিয়ে বিচলিত হওয়ার তেমন কোন কারণ দেখি না। তবে এর চেয়েও বিজ্ঞানের অনেক বেশি বিপজ্জনক ব্যবহার সম্ভব। বার্ট্রান্ড রাসেল বিজ্ঞানকে শুধু মারণাস্ত্র আর যুদ্ধাস্ত্র তৈরির জন্যই দায়ী করেন নি, তিনি পৃথিবীতে সেই সময়ের (১৯৩৫) অর্থনৈতিক অবস্থার নৈরাজ্যের জন্যও বিজ্ঞানকে প্রকারান্তরে দায়ী মনে করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপূর্ব সময়ে রাশিয়ায় কম্যুনিজম আর জার্মানিতে নাৎসীবাদের অভ্যুদয়ে রাসেল খুবই বিচলিত হয়েছিলেন এবং বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা পরোক্ষভাবে হলেও এ অবস্থার সৃষ্টি করেছে বলে মনে করতেন। তাঁর লেখা "রিলিজিয়ন এন্ড সায়েন্স"-এ এই আশংকা ব্যক্ত করেছেন যে, এই যুগে বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জ আর ধর্ম বা চার্চ থেকে আসবেনা, আসবে আধিপত্যবাদী সরকারগুলো থেকে। এবং এরা ধর্মকে নয়, বরং বিজ্ঞানকেই ব্যবহার করতে চাইবে তাদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য। সুযোগ বুঝে এরা নিজেদের সেক্যুলার বলেও দাবী করবে, এবং বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ খুঁজবে। প্রথমেই বলি হবে বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা (intellectual freedom)। বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার ওপরেই নির্ভর করে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, আর এখানেই রাসেলের আশংকা।[২৬] এই আশংকা মোটেও অবাস্তব নয় এবং তখনকার (১৯৩৫) তুলনায় এই যুগে মনে হয় তা আরো বেশি, যদিও ভিন্ন মাত্রার এবং ভিন্ন চরিত্রের। প্রসঙ্গটা এই রচনার মূল বিষয়বস্তুর বাইরে বলে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নাই তবে রাসেলের মতো আমিও মত প্রকাশের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য সোচ্চার হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি । বিশেষ করে, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদের এ ব্যপারে সচেতন থাকা উচিৎ।

ধর্ম কি প্রয়োজনীয়?

প্রথমে দেখা যাক বার্ট্রান্ড রাসেল এ সম্পর্কে কি বলেছেন। ১৯৩৫ এ যখন রাসেলের বিখ্যাত "রিলিজিয়ন এন্ড সায়েন্স" প্রকাশিত হয় তখন সমাজে ধর্মের দাপট ছিল নিসন্দেহে আজকের তুলনায় অনেক বেশি। (১৯৫০এ রাসেলের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার অন্যতম কারন এই বইটা।) যদিও ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্ব ইতোমধ্যে ধর্মের ভিত্তিমূলে জোরেশোরে নাড়া লাগিয়েছে।

রাসেলের মতে, ক্রিড (Creed, যাকে আমি বলছি 'বিশ্বাসব্যবস্থা') হচ্ছে ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যকার সংঘাতের বুদ্ধিবৃত্তিক উৎস। অনেক ধর্মাচ্ছন্ন মানুষ নিজেদের ব্যক্তিগত নীতিবোধ আর মূল্যবোধ আহরণ করেন এই বিশ্বাসব্যবস্থা থেকে। আর এই জন্যই তারা

ধর্মকে মনে করেন অপরিহার্য। ব্যাপারটা রাসেল সুন্দর করে বুঝিয়েছেন 'খুন করা কেন খারাপ কাজ' এই প্রশ্নের অবতারণা করে; নীচের অংশটা রাসেলের এই সম্পর্কিত লেখার ভাবানুবাদ।[২৭]

> ধরা যাক এক বেয়াড়া সংশয়বাদী এক পুরোহিতকে প্রশ্ন করে বসলো, "আচ্ছা বলতো, খুন করলে কি হবে? আমি কেন খুন করবো না?" বলা যেতে পারতো, "তাহলে তোমার ফাঁসি হবে"। কিন্তু ফাঁসি কেন হবে তার পেছনে তেমন জোরালো নৈতিক বা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নাই, আর ফাঁসি যে হবেই (ধরা যাক, পুলিশের দূর্নীতিপরায়নতা বা অযোগ্যতার কারণে) তারও কোন নিশ্চয়তা নাই। তাই পুরোহিতের পক্ষে খুব সহজ উত্তর হবে, "ধর্মে নিষেধ, মানুষ হত্যা মহাপাপ, পরকালে শাস্তি অবধারিত"। তর্কের খাতিরে মেনে নেয়া যায় এতে কাজ হতেও পারে এবং সেই বেয়াড়া মানুষটা খুন করা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখবে পরকালে শাস্তির ভয়ে । কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ধর্ম মানলে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে তাও, এবং এই ধরনের আরও অনেক মিথ্যা ও আজগুবি কথা, মেনে নিতে হয়, আর না মানলে ওই বেয়াড়া মানুষটাকে খুন করা থেকে নিবৃত্ত রাখা যাবে না এই ধরনের একটা আশংকার সৃষ্টি হয়।

রাসেলের মতে ধর্ম যে আজো টিকে আছে তার একটা বড় কারণ এই ধরনের আশংকা। কিন্তু খুন করা যে অন্যায়, অনৈতিক কাজ, এই মূল্যবোধ কি ধর্মীয় শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল? হার্ভাডের অধ্যাপক মার্ক হউজারের (Marc Hauser) মতে নীতিবোধ বিশ্বজনীন বা 'ইউনিভার্সাল'। মানব সভ্যতায় ভাষার উদ্ভবের মতো নীতিবোধেরও উদ্ভব ঘটেছে। সব ভাষার ব্যাকরণের মধ্যে (সংস্কৃতিভেদে তারতম্য থাকলেও সব ভাষার অন্তর্নিহিত কাঠামোর গভীরে) আছে বিশ্বজনীনতা, ঠিক তেমনি নীতিবোধের মধ্যেও একই ধরনের বিশ্বজনীনতা দেখা যায়। এর মধ্যে ধর্মের কোন প্রভাব আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না, কোন বিশেষ ধর্মের তো নয়ই।[২৮] জীবজগতের বিবর্তনের মতো মানুষের মনোজগতেও বিবর্তনের প্রক্রিয়া কাজ করে। অপার্থিব জামান তাঁর "ধর্মই কি নৈতিকতার উৎস?" (এ বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় দেখুন) প্রবন্ধে এর ওপরে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন।[২৯] উপসংহারে বলেছেন, নৈতিক আচরণ হচ্ছে ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর ক্রমবিবর্তমান বৈশিষ্ট্য।

দেখা যাচ্ছে বিবেকবোধ, নীতিবোধ, মূল্যবোধ, বিচারবোধ, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা, এসবের উৎস ধর্ম নয়। ধর্মপরায়ন না হয়েও বিবেকবান মানুষ হওয়া যায়। নরকের ভয়ে পাপকার্য্য থেকে বিরত থাকার, আর স্বর্গের লোভে পূণ্যকাজ করার মধ্যে যে সত্যিকারের মূল্যবোধের এবং নীতিবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না, তা কি বুঝিয়ে বলার দরকার আছে? তাহলে ধর্মের প্রয়োজন কোথায়?

কিন্তু ধর্মের অনুপস্থিতিতে, ডকিন্সের স্বভাবজাত ভাষায়, মানুষের মগজে ঈশ্বর-সাইজের যে গর্তটির (গ্যাপ) সৃষ্টি হবে তাকে ভরাট করা হবে কি দিয়ে? ডকিন্স এর উত্তর দিয়েছেন

- বলেছেন বিজ্ঞান দিয়ে, প্রতিনিয়ত সত্যানুসন্ধান যার কাজ। ডকিন্সের আশা এর মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে নতুন এক পৃথিবী - মিথ্যা নয়, সত্যের ভিত্তিতে।(৩০)

আমি বলবো, শুধু বিজ্ঞান দিয়ে নয়, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদের দিয়ে গড়ে উঠবে যে কালচার বা সংস্কৃতি তাই দিয়ে। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর ভাষায়, "চূড়ান্ত বিচারে সংস্কৃতি হচ্ছে রুচি। ওই রুচিতে ভালো-মন্দের বোধ আছে, আছে আকাঙ্ক্ষা, সৃষ্টির স্পৃহা। রুচিকে সূক্ষ্ম বলা হয়, কিন্তু রুচিতেই সংস্কৃতি ধরা পড়ে; অভিব্যক্ত হয় নিজস্বতা ও মৌলিকত্ব। এই রুচিটা সমষ্টিগত, ব্যক্তি যার অংশীদার"।(৩১)

যে সংস্কৃতির কথা এখানে বলা হচ্ছে তার ভিত্তি ধর্ম, জাতীয়তা, রাষ্ট্র বা অঞ্চল নয়, তার ভিত্তি হচ্ছে বিজ্ঞানমনস্কতা। মোতাহার হোসেন চৌধুরী এই সংস্কৃতির কথাই ভেবেছেন ধর্মের বিকল্প হিসেবে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনও এই বিশ্বজনীন কালচারের প্রয়োজনীয়তার কথা লিখেছেন তাঁর 'আইডেন্টিটি এন্ড ভায়োলেন্স' (*Identity and Violence*) বইয়ে।(৩২) অমর্ত্য সেন সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার ওপরেও গুরুত্ব দিয়েছেন, অনেকটা বার্ট্রান্ড রাসেলের 'বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা'র মতো করে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, আর বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা নতুন সত্য আবিস্কারের জন্য জরুরী। আর নতুন সত্য আবিস্কার করাইতো বিজ্ঞানের কাজ। রাসেলের কথা, "নতুন সত্য প্রায়শই অস্বস্তিকর, বিশেষত ক্ষমতাধরদের কাছে; কিন্তু নিষ্ঠুরতা এবং বর্বরতার কদর্য ইতিহাস সত্বেও, আমাদের বুদ্ধিসম্পন্ন, যদিও দূর্বিনীত, মানবপ্রজাতির এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন"।(৩৩)

শেষের কথা

ধর্ম বিজ্ঞান হিসাবে ব্যর্থ কারণ ধর্ম ভুল ধারণা, মিথ্যা গল্প-কাহিনী আর আজগুবি কল্পনার উপর নির্ভরশীল, সংস্কৃতির বিকল্প হিসাবে পশ্চাদপদ কারণ ধর্ম মানুষকে রুচিশীল হওয়ার প্রেরণা যোগায়না; ধর্ম মুল্যবোধের উৎস হিসাবে অপ্রয়োজনীয়, কারণ মূল্যবোধ ধর্মের চোখে পুরস্কার-তিরস্কারের অর্থহীন এবং অনৈতিক মাপকাঠিতে বিচার্য; এবং ধর্ম এমন কি আধ্যাত্মিকতার বিকাশেও নিতান্তই অপ্রতুল এবং নিম্নমানের।

ধর্মকে বাদ দিয়েই গড়ে তুলতে হবে জীবনমুখী সংস্কৃতি, যার মূলে থাকবে সুরুচি - সমষ্টিগত এবং ব্যক্তিগত। সংস্কৃতিই হবে ব্যক্তিক এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ, মূল্যবোধ আর নীতিবোধের ধারক ও বাহক। সম্মিলিত সচেতনতা (collective consciousness)-র উৎস হবে কালচার, ধর্ম নয়। রুচিশীল সংস্কৃতিতে আধ্যাত্মিকতা হবে সত্যিকারের উপভোগের বিষয়, বিকৃত অতিপ্রাকৃতিক (Supernatural) চিন্তা-চেতনার উৎস না হয়ে। মানুষ আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ও প্রকাশ উপভোগ করবে, সংগীতের মূর্ছনায়, কবিতার কাব্যময়তায়, ধর্মের অন্ধ চোরাগলিতে নয় । সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি খুঁজবে সাহিত্যে, শিল্পকলায়। রুচির উৎকর্ষতা দেবে উন্নত সংস্কৃতি, আর উন্নত সংস্কৃতি গড়বে উন্নত সমাজ।

মিথ্যা আর আজগুবি গল্প-কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে উন্নত ন্যায়ভিত্তিক সমাজ যে গড়ে তোলা যায় না, তা তো আর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে না। ধর্মভিত্তিক সমাজ বা রাষ্ট্র মানুষকে অন্যায়-অনাচার থেকে মুক্তি দিয়েছে, মানবসভ্যতার ইতিহাসে তা দেখা যায় না। বরঞ্চ যুগে যুগে ধর্মকেই দেখা গেছে, অন্যায়-অনাচার, নিপীড়ন-নির্যাতনের কাজে খুবই কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে।

তাই, ধর্মাচ্ছন্ন অন্ধকারে উন্নত সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞানমনস্ক আলোকিত মানুষ চাই আরো, আরো অনেক। ধর্মের নামে সঙ্গবদ্ধ পাগলামী (collective madness) নয়, চাই কালচারের চর্চার ফলে ঋদ্ধ সম্মিলিত সচেতনতা (collective consciousness)।

ধর্মাচ্ছন্ন স্রোতে বিজ্ঞানমনস্ক ধারাটি ক্ষীণ হলেও উজ্জ্বলতায় ভাস্বর। একদিন ধর্মাচ্ছন্নতাকে ছাপিয়ে এই বিরুদ্ধ ধারাটিই পরিণত হবে প্রবল স্রোতে, বিজ্ঞানের ইতিহাস তাই বলে।

তথ্যনির্দেশ

(১) আরজ আলী মাতুব্বর, *রচনাসমগ্র*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ১৯৯৪।

(২) উইলিয়াম প্যালির *Natural Theology – or Evidences of the Existence and Attributes of the Deity Collected from the Appearances of Nature* থেকে। Translation of:

". . . when we come to inspect the watch, we perceive. . . that its several parts are framed and put together for a purpose, e.g. that they are so formed and adjusted as to produce motion, and that motion so regulated as to point out the hour of the day; that if the different parts had been differently shaped from what they are, or placed after any other manner or in any other order than that in which they are placed, either no motion at all would have been carried on in the machine, or none which would have answered the use that is now served by it. . . . the inference we think is inevitable, that the watch must have had a maker -- that there must have existed, at some time and at some place or other, an artificer or artificers who formed it for the purpose which we find it actually to answer, who comprehended its construction and designed its use."

Available: **http://www.ucmp.berkeley.edu/history/paley.html**

(৩) রিচার্ড ডকিন্স, (Richard Dawkins)*The Blind Watchmaker*, W. W. Norton & Company, Inc. New York, 1987, p. 5. Translation of:

"All appearances to the contrary, the only watchmaker in nature is the blind forces of physics, albeit deployed in a very special way. A true watchmaker has foresight: he designs his cogs and springs, and plans their interconnections, with a future purpose in this mind's eye. Natural selection, the blind, unconscious, automatic process which Darwin discovered, and which we now know is the explanation for the existence and apparently purposeful form of all life, has no purpose in mind. It has

no mind and no mind's eye. It does not plan for the future. It has no vision, no foresight, no sight at all. If it can be said to play the role of watchmaker in nature, it is the *blind* watchmaker."

(৪) রিচার্ড ডকিন্স, (Richard Dawkins), *The God Delusion*, Transworld Publishers, London, 2006, p. 366. Translation of:

"The evolution of complex life, indeed its very existence in a universe obeying physical laws, is wonderfully surprising – or would be but for the fact that surprise is an emotion that can exist only in a brain which is the product of that very surprising process."

(৫) রিচার্ড ডকিন্স, (Richard Dawkins), *The God Delusion*, Transworld Publishers, London, 2006, p. 15. Einstein as quoted:

"I am a deeply religious nonbeliever. This is a somewhat new kind of religion. I have never imputed to Nature a purpose or a goal, or anything that could be understood as anthropomorphic. What I see in Nature is a magnificent structure that we can comprehend only very imperfectly, and that must fill a thinking person with a feeling of humility. This is a genuinely religious feeling that has nothing to do with mysticism. The idea of a personal God is quite alien to me and seems even naïve."

(৬) ইলিয়া প্রিগোজিন ও ইসাবেল স্টেঙ্গারস, (Ilya Prigogine and Isabelle Stengers) *Order Out of Chaos, Man's New Dialogue with Nature,* Bantam Books, New York, 1984. Brief paraphrase of:

"While some parts of the universe may operate like machines, these are closed systems, and closed systems, at best, form only a small part of the physical universe. Most phenomena of interest to us are, in fact, *open systems, exchanging energy or matter* (and one might add, information) with their environment. Surely biological and social systems are open, which means that the attempt to understand them in mechanistic terms is doomed to failure." Available: **http://www.talkorigins.org/faqs/faq-meritt/complexity.html#chaos**

(৭) অভিজিৎ রায়, *"ব্যাড ডিজাইন"*, মুক্তমনা। Available: **http://www.mukto-Mona.com/Special_Event_/Darwin_day/2007/avi_bad_design.pdf**

(৮) আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস (১৮২৩-১৯১৩), আলাদাভাবে বিবর্তনতত্ত্বের আবিস্কারে অবদান রাখার জন্য ডারউইনের সাথে সাথে ওয়ালেসকেও কৃতিত্বের দাবীদার মনে করা হয়।

"Alfred Russel Wallace - Darwin began formulating his theory of natural selection in the late 1830s but he went on working quietly on it for twenty years. He wanted to amass a wealth of evidence before publicly presenting his idea. During those years he corresponded briefly with Wallace, who was exploring the wildlife of South America and Asia. Wallace supplied Darwin with birds for his studies and decided to seek Darwin's help in publishing his own ideas on evolution. He sent Darwin his theory in 1858, which, to Darwin's shock, nearly replicated Darwin's own." Available:

http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/_0/history_14

(৯) রিচার্ড ডকিন্স, (Richard Dawkins)*The Blind Watchmaker*, W. W. Norton & Company, Inc. New York, 1987, (Preface). Translation of:

"It is almost as if the human brain were specifically designed to misunderstand Darwinism, and to find it hard to believe. .... our brains seem predisposed to resist Darwinism stems from our great success as creative designers. Our world is dominated by feats of engineering and works of art. We are entirely accustomed to the idea that complex elegance is an indicator of premeditated, crafted design. .... It took a very large leap of the imagination for Darwin and Wallace to see that, contrary to all intuition, there is another way and, once you have understood it, a far more plausible way, for complex "design" to arise out of primeval simplicity. A leap of imagination so large that, to this day, many people seem still unwilling to make it."

(১০) বার্ট্রান্ড রাসেল, (Bertrand Russell), *Religion and Science*, Oxford University Press, Oxford and New York, 1997, p. 21.

(১১) বার্ট্রান্ড রাসেল, (Bertrand Russell), *Religion and Science*, Oxford University Press, Oxford and New York, 1997, p. 215. Translation of:

"People are more unwilling to give up the word "God" than to give up the idea for which the word has hitherto stood."

(১২) মাইকেল রিউস, (Michael Ruse), Introduction to *Religion and Science*, by Bertrand Russell, Oxford University Press, Oxford and New York, 1997.

(১৩) মাইকেল রিউসের ওয়েবসাইট

Available: **http://www.fsu.edu/~philo/new%20site/staff/ruse.htm**

(১৪) বার্ট্রান্ড রাসেল, (Bertrand Russell), *Religion and Science*, Oxford University Press, Oxford and New York, 1997, p. 22.

(১৫) স্টিফেন গুল্ড, (Stephen J. Gould), *Nonoverlapping Magisteria*, The Unofficial Stephen Jay Gould Archive. Brief paraphrase of:

"I believe, with all my heart, in a respectful, even loving concordat between our magisteria—the NOMA solution. NOMA represents a principled position on moral and intellectua] grounds, not a mere diplomatic stance. NOMA also cuts both ways. If religion can no longer dictate the nature of factual conclusions properly under the magisterium of science, then scientists cannot claim higher insight into moral truth from any superior knowledge of the world's empirical constitution. This mutual humility has important practical consequences in a world of such diverse passions."

Available: **http://www.stephenjaygould.org/library/gould_noma.html**

(১৬) রিচার্ড ডকিন্স, (Richard Dawkins), "When Religion Steps on Science's Turf The Alleged Separation Between the Two Is Not So Tidy", Council for Secular Humanism. Brief paraphrase of:

"There is something dishonestly self-serving in the tactic of claiming that all religious beliefs are outside the domain of science. On the one hand, miracle stories and the promise of life after death are used to impress simple people, win converts, and swell congregations. It is precisely their scientific power that gives these stories their popular appeal. But at the same time it is considered below the belt to subject the same stories to the ordinary rigors of scientific criticism: these are religious matters and therefore outside the domain of science. But you cannot have it both ways. At least, religious theorists and apologists should not be allowed to get away with having it both ways. Unfortunately all too many of us, including nonreligious people, are unaccountably ready to let them."

Available: **http://www.secularhumanism.org/library/fi/dawkins_18_2.html**

(১৭) তানবীরা তালুকদার, "*বিজ্ঞানের অঙ্গনে যখন ধর্মের প্রবেশঃ দুটো যৌক্তিক পার্থক্য কি এত সহজ?*" মুক্তমনা। Available: **http://www.mukto-mona.com/Articles/talukder/dhormo_pobeshDawkins.htm**

(১৮) বার্ট্রান্ড রাসেল, (Bertrand Russell), *Religion and Science*, Oxford University Press, Oxford and New York, 1997, p. 16. Translation of:

"The men of science did not ask that propositions should be believed because some important authority had said they were true; on the contrary, they appealed to the evidence of the senses, and maintained only such doctrines as they believed to be based upon facts which were patent to all who chose to make the necessary observations. The new method achieved such immense successes, both theoretical and practical, that theology was gradually forced to accommodate itself to science."

(১৯) মোতাহার হোসেন চৌধুরী, *সংস্কৃতি কথা*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯৯।

(২০) Jackson Dykman, "The Marketplace of Faith," *Time*, March 10, 2008, p. 41.

(২১) Available: **http://rrkelkar.wordpress.com/2007/07/28/gods-role-in-natural-disasters/**

(২২) বার্ট্রান্ড রাসেল, (Bertrand Russell), *Religion and Science*, Oxford University Press, Oxford and New York, 1997, p. 243. Translation of:

"Whatever knowledge is attainable, must be attained by scientific methods; and what science cannot discover, mankind cannot know."

(২৩) অপবিজ্ঞানের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে এই বইটার কথা, *The Bell Curve -Intelligence and Class Structure in American Life* - Herrnstein & Murray, New

York: The Free Press, 1994। আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গদের বুদ্ধি কেন শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে কম এবং কেন তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবনতা বেশি তার ফিরিস্তি দেয়া হয়েছে এই বইটাতে পরিসংখ্যান বিদ্যার (অপ)ব্যাবহার করে। ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, কারণটা 'জেনেটিক'।

(২৪) রিচার্ড ডকিন্স, (Richard Dawkins),"The Great Prayer Experiment," *The God Delusion*, Transworld Publishers, London, 2006, p. 61.

(২৫) ফরিদ আহমেদ, "*প্রার্থনা কি কোন কাজে আসে?*" মুক্তমনা।

Available: **http://www.mukto-mona.com/Articles/farid_ahmed/prayer.pdf**

(২৬) বার্ট্রান্ড রাসেল, (Bertrand Russell), *Religion and Science*, Oxford University Press, Oxford and New York, 1997, p. 251.

(২৭) বার্ট্রান্ড রাসেল, (Bertrand Russell), *Religion and Science*, Oxford University Press, Oxford and New York, 1997, p. 10-11.

(২৮) মার্ক হউজার, (Marc Hauser), *Marc Hauser Discusses Moral Grammar*,

Available: **http://formsmostbeautiful.blogspot.com/2008/04/marc-hauser-discusses-moral-grammar.html**, and

Marc Hauser and Peter Singer, *Morality without Religion*, www.secularhumanism.org, Dec. 2005-Jan. 2006,

Available:
http://www.centerforinquiry.net/uploads/attachments/HauserSinger.pdf

(২৯) অপার্থিব জামান, "*ধর্মই কি নৈতিকতার উৎস?*" মুক্তমনা।

Available: **http://www.mukto-mona.com/Articles/aparthib/noitikota_aparthib.pdf**

(৩০) রিচার্ড ডকিন্স, (Richard Dawkins), *The God Delusion*, Transworld Publishers, London, 2006, p. 361.

(৩১) সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, "রাজনীতি থাকবে সামনে, শক্তি থাকবে সংস্কৃতিতে,"

সমাজচিত্র, *দৈনিক সমকাল*, ২৪শে এপ্রিল, ২০০৮।

(৩২) অমর্ত্য সেন, (Amartya Sen), *Identity and Violence,* W. W. Norton & Company, Inc., 2006, New York, p. 112.

(৩৩) বার্ট্রান্ড রাসেল, (Bertrand Russell), *Religion and Science*, Oxford University Press, Oxford and New York, 1997, p. 252. Translation of:

"New truth is often uncomfortable, especially to the holders of power; nevertheless, amid the long record of cruelty and bigotry, it is most important achievement of our intelligent but wayward species."

ড. ইরতিশাদ আহমদ ফ্লোরিডা ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্সট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক এবং চ্যায়ারপার্সন। তিনি *জার্নাল অব ম্যানেজমেন্ট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং* এর সম্পাদক। মুক্তমনার নিবেদিতপ্রাণ সদস্য। ইমেইল : ahmadi@fiu.edu

ধর্ম, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা

শহিদুল ইসলাম

সূচনাবক্তব্য

১.

শিরোনামে 'বিজ্ঞান' শব্দটি দুবার ব্যবহার করা হয়েছে। তদুপরি আমি একজন বিজ্ঞানের ছাত্র। তাই এরূপ ধারণার জন্ম নেওয়া অসম্ভব নয় যে আজকের লেখাটি বিজ্ঞান বিষয়ক। মোটেই তা নয়। আজকের লেখার মধ্যে বিজ্ঞান নাই। আছে মূলত দর্শন, সেইসঙ্গে ইতিহাস। দর্শন ও ইতিহাসে কোনরকম ট্রেনিং না থাকা একজন বিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে বিষয়টা যে কতটা বিপজ্জনক, তা পাঠকেরা হয়ত উপলব্ধি করতে পারবেন। বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে ১৭৮৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোনস কোলকাতায় এতদঅঞ্চলের ইতিহাস গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত এটি একটি ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্র। সাধারণভাবে ইতিহাস সম্পর্কে আমরা যা বুঝি, তা নিয়ে কাজ করা খুব একটা কষ্টকর মনে হয় না। কিন্তু 'ইতিহাসের দর্শন'-এর কথা উঠলে থমকে দাঁড়াতে হয়। তখন আর বিষয়টা অত সহজ-সরল থাকে না। ইতিহাসের সঙ্গে তখন সমাজ-সংগঠন, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, রাজনীতি সব একাকার হয়ে কাজটি কঠিনতর করে তোলে। ঠিক আজকের বিষয়টিও তেমনি জটিলতর। আমার পক্ষে এই শিরোনামের পক্ষে কতটা সুবিচার করা সম্ভব, সে সন্দেহ মাথায় রেখেই কিছু কথা আজকের এই পন্ডিত মহলে বলার চেষ্টা করবো। তাই প্রথমেই একজন বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও এই অসীম ধৃষ্টতার জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

২.

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ত্রিশ বছরে বিজ্ঞানের জগতে এক বিরাট বিপ্লব ঘটে গেছে। T.S. Kuhn এর ভাষায় এই ত্রিশ বছরে এক নতুন 'প্যারাডাইমের' জন্ম হয়েছে।[১] বিজ্ঞানের অধিবিদ্যক রূপটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং বিজ্ঞান একটি চঞ্চল, সদা-পরিবর্তনশীল একটি কর্মকান্ডে পরিণত হয়েছে। সেই বিপ্লব "led to the ideas of science as being in constant flux."[২] এমনি একটি সদা-পরিবর্তনশীল, যা অনবরত রূপ বদলায় সেরকম একটি প্রপঞ্চের সংজ্ঞা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। তাই বিশ-শতকের দু'জন দিকপাল বিজ্ঞানের ইতিহাস রচয়িতা জর্জ সার্টন[৩] এবং জে. ডি. বার্নাল[৪] কেউই বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা করেননি। সার্টন বলছেন "It (seience) began whenever and whatever men tried to solve the innumerable problems of life."[৫] জন্ম থেকেই মানুষ হাজারটা সমস্যায় জর্জরিত। তার মধ্যে প্রধান যে অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্কট তা বোধহয় ভুল নয়। মানুষ নিজেই যদি না বাঁচে তাহলে আর কি থাকে! তাই মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের মধ্য থেকেই বিজ্ঞানের উদ্ভব। কাজেই সে চেষ্টা না করাই ভাল। তবে আমার মনে হয় মূল লেখায় ঢোকার আগে সামান্য ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখা অপ্রয়োজনীয় হবে না। বিজ্ঞানের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের মধ্যে যেমন বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে তেমনি বিজ্ঞানমনস্কতার বা তার বিরোধী মনোভাবের একটি রূপরেখাও সে আলোচনায় উঠে আসবে বলেই আমার মনে হয়।

৩.

২০০৭ সালের কোন এক সময়ে বাংলাদেশের কোন এক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল 'বিজ্ঞানের দর্শন'-এর ওপর একটি বক্তৃতা দেবার জন্য। সেদিন আমার সঙ্গে আর মাত্র একজন বক্তা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অণুষদের প্রবীণতম অধ্যাপকদের একজন। তিনি সেদিন যা বললেন তা আমাকে হতবাক করেনি। কারণ সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের কোন এক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদে শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা আমাকে বলে দেয় আমাদের দেশের তথাকথিত বিজ্ঞান-শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্রগুলি এ ধরনের পন্ডিতের দ্বারা পরিপূর্ণ। তিনি বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিহীন কোরানের আয়াতের উল্লেখ করেন এবং এই বলে শেষ করেন যে, "আমার মন আছে বলেই পৃথিবীতে বস্তুরাশির অস্তিত্ব আছে।" সামনে দর্শন বিভাগের ছাত্র শিক্ষকরা চুপ করে তাঁর বক্তব্য শুনছিলেন। আমার বক্তৃতার এক পর্যায়ে সেদিন শ্রোতাদের যে প্রশ্ন করেছিলাম আজ আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে সেই প্রশ্নটি উত্থাপন করে এই অংশের কথা শুরু করি। আমি সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম "আপনারা কি বিশ্বাস করেন যে আমি আছি বলেই আপনারা আছেন? আমার অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের সঙ্গে আপনাদের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব সম্পর্কিত? আমি না থাকলে আপনাদের কোন অস্তিত্ব থাকবে না?" উপস্থিত সবাই সেদিন একবাক্যে বলে উঠেছিলেন "না।" অর্থাৎ আমার অস্তিত্বের সাথে তাদের অস্তিত্বের কোন সম্পর্ক নাই। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এবং তার অভ্যন্তরে যাবতীয় বস্তুরাশি 'আমি' নিরপেক্ষ। অর্থাৎ বস্তুরাশির অস্তিত্ব মানব-নিরপেক্ষ। এটাই বিজ্ঞানের প্রথম ও প্রধান দর্শন। সে কথায় পরে আসি। মানুষ যখন থেকে চিন্তা করতে শিখেছে, তখন থেকেই এই প্রশ্নটিকে ঘিরে বিজ্ঞজনেরা চিন্তাভাবনা করতে শুরু করেছেন। সেইসঙ্গে আরো যেসব প্রশ্ন মানুষকে ভাবিয়েছে তাহল 'বস্তুরাশির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি?' 'জ্ঞান কি?' 'জ্ঞানের উৎস কি?' 'জ্ঞান ও সত্য কি এক?' 'সব জ্ঞানই কি সত্যি?' 'সব সত্যি কি জ্ঞান?' 'মনের কি কোন আলাদা সত্তা আছে?' 'বস্তু বা মনের সম্পর্কই বা কি?' 'বস্তু মনকে নিয়ন্ত্রণ করে নাকি মন বস্তুকে?' এমনি সব প্রশ্নে বিজ্ঞজনেরা প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল 'মন'কে প্রাধান্য দেন। সেই অধ্যাপকের মত মনে করেন 'মন আছে বলেই বস্তুরাশির অস্তিত্ব আছে।' দর্শনের জগতে এরা ভাববাদী বলে পরিচিত। অন্য দলের মতে 'বস্তু'ই প্রধান। বলেন 'বস্তুই মন বা বিশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে।' দর্শনে এরা 'বস্তুবাদী' বলে পরিচিত।

৪.

সভ্যতার সূচনালগ্ন কিংবা তারও আগে থেকে সমগ্র বিশ্ব ছিল এক 'ধর্মীয় বিশ্বছবি'র অধীন। তখন মানুষের বস্তুজ্ঞান ছিল নিম্ন পর্যায়ে। প্রকৃতিতে যা কিছু ঘটত তার পিছনে কোন এক অতিপ্রাকৃত শক্তিকে খুঁজে ফিরত সেদিনের বিজ্ঞজনেরা। সর্বপ্রাণবাদী ধর্মে প্রকৃতির প্রত্যেকটি ঘটনার পিছনে এক বা একাধিক দেবদেবীর উপস্থিতি কল্পনা করত সেদিনের মানুষ। সূর্য ছিল ফোয়েবাসের রথ। সেই রথে চড়ে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে বেড়াত। দেবতা জিউস বা থোরের শক্তিশালী অস্ত্র ছিল মেঘগর্জন ও বিদ্যুত-ঝলকানি। বরুন ছিল বৃষ্টির দেবতা। এদের তুষ্ট করে মানভঞ্জন করাই ছিল সেদিনের ধর্মবেত্তাদের প্রধান কর্ম। 'অনস্তিত্ব' দেবদেবীর অস্তিত্ব তাদের কাছে ছিল সন্দেহের অতীত। সেইসব অস্তিত্বহীন দেবদেবীর অস্তিত্ব তাদের কাছে ছিল অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যির চেয়েও সত্যি। একান্তভাবে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল মানবজাতির জন্য সেটাই ছিল যৌক্তিক বিশ্বাস-অবিশ্বাস।[৬] ও সেই সব প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণকারী দেবদেবীদের তুষ্ট করার জন্য সৃষ্টি হয় নানাধরণের ম্যাজিক, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং ধর্মীয় মতবাদ। তাই বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই ম্যাজিক, জ্যোতিষশাস্ত্র, ধর্ম ও দর্শনের কথা এসে যায়। বিজ্ঞানকে বুঝতে হলে সমাজ পরিবর্তনে এসব অনুষজ্ঞগুলির উৎপত্তি ও বিনাশের আলোচনা অপরিহার্য।

৫.

সাত/আট হাজার বছর আগে কৃষির আবিষ্কার ও বন্যপশুর গৃহপালন সমাজে এক গুণগত পরিবর্তন ঘটায়। এক নতুন প্যারাডাইম মানুষের চিন্তাভাবনা, সমাজ-সংগঠন, সবকিছুর এক বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটায়। সে আবিষ্কার মানবজাতির এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী আবিষ্কার। মানুষের শিকারী ভবঘুরে জীবনের অবসান ঘটে। আবাদী জমিকে কেন্দ্র করে মানুষ এক জায়গায় স্থিত হয়। মানুষের জীবনযাত্রায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনে। যাযাবর জীবনের বহু দেবদেবীভিত্তিক হোমারের বিশ্বছবি নতুন সমাজ বাস্তবতায় অনুকূল মনে হয় না। প্রয়োজন দেখা দেয় কেন্দ্রীভূত এক সমাজ ব্যবস্থার বিশ্বছবি। দু/তিনশ বছর কৃষি-ভিত্তিক স্থায়ী সমাজে বসবাস করার ফলে মানুষের মন থেকে শিকারী যাযাবর জীবনের ছবি ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে। নতুন সমাজ কাঠামো মানুষের চিন্তার জগতে এক নতুন দর্শনের জন্ম দেয় যা কিনা শিকারী জীবনের দর্শন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। জমির পরিচর্যা, পশুপালন, ফসলবোনা, ফসলতোলা ইত্যাদি কাজই হয়ে ওঠে মানুষের জীবনের প্রথম দায়িত্ব। নতুন সমাজ কাঠামো মানুষের মনে স্বতঃসিদ্ধ এক সমাজ কাঠামো হিসেবে স্থান করে নেয়। সেইসঙ্গে চিন্তার জগতেও আসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

৫/৬ খ্রিঃ পূর্বাব্দে উপরিউক্ত প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যা নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হন বেশ ক'জন ধর্মপ্রচারক। আশ্চর্যের বিষয় সেইসব আদি ধর্ম প্রচারকবৃন্দ কেউ ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে দাবি করেনি কিংবা ঈশ্বরের বাণী বহন করে এনেছেন এমন দাবি করতে সাহস পাননি। বরং তাদের বলা যায় পরবর্তী দার্শনিক নামধারী পন্ডিতজনের পূর্বসূরী। তাঁদের কাছে যুক্তিই ছিল মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। তাই তাঁরা মানুষের 'যুক্তিবোধের' কাছে আবেদন জানান। তারা পুরনো গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের ধর্মমতগুলিকে আক্রমণ করেন। চীনে লাউ-সে এবং কনফিউসিয়াস ষষ্ঠ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে যৌক্তিক নৈতিকতা শিক্ষা দেবার জন্য – তাওইজম ও কনফিউসিয়ানিজম ধর্ম প্রচার করেন। প্রায় একই সঙ্গে ভারতবর্ষে গৌতমবুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্মের বর্ণভেদ প্রথার বিরূদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং মানব জাতিকে তার জন্ম-মৃত্যুর পূর্বনির্ধারিত বর্ণভেদের অচলায়তনের দেয়াল ভেঙ্গে মুক্ত করেন এবং কাজের ওপরই যে মানুষের সামাজিক অবস্থান নির্ণীত হয় সে শিক্ষা দেন। নৈতিক-গুণাবলীই ছিল তার প্রথম ও প্রধান শিক্ষা। ওদিকে ইরানের পুরনো ধর্ম থেকে বহু-ঈশ্বরবাদ, অসূর-পূজা, ম্যাজিক ও আচার পরায়ণতার দূর করার জন্য আবির্ভূত হন জরথুস্ত্র। তিনি শিক্ষা দেন পুরনো যুগের গোষ্ঠি-ঈশ্বরগণ ছিল অশুভ শক্তি। তিনি সার্থক ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নরবলী দেবার প্রথার সমালোচনা করেন এবং দাবি করেন একজন ঈশ্বরের ওপর সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। তিনি স্বর্গ-নরকের ধারণার সৃষ্টি করেন। কেন্দ্রীভূত এক সমাজ বাস্তবতায় তারও আগে অবতীর্ণ হয় একেশ্বরবাদী পুরোন বাইবেল। নতুন হিব্রু পয়গম্বর আমোস, হোসিয়া, ইসা বহু-ঈশ্বরবাদ, মূর্তিপূজা এবং ম্যাজিক ইত্যাদিকে আক্রমণ করেন।[৭]

৬.

একই শতকে গ্রিসের আমোনিয়ায় জন্ম নেন 'প্রাকৃতিক দর্শনের' (বিজ্ঞান) জনক বলে খ্যাত থেলিস (৬২৪-৫৪০ খ্রিঃ পূঃ)। বিজ্ঞানের ইতিহাসে থেলিস একটি মাইল ফলক। অনেকে তার আগের সময়কে 'প্রাকবৈজ্ঞানিক যুগ' বলে বিবেচনা করেন। যদিও সে যুগে মানুষ অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে। যেমন আগুন, কৃষি, পশুপালন, তামা-লোহা-নিষ্কাশন পদ্ধতি এবং ব্রঞ্জ তৈরির কলাকৌশল, এলকোহল, পাকা চামড়া, চাকা, নৌকা, ক্যালেন্ডার এমনি আরো অনেক কিছু। কিন্তু তবুও থেলিসকেই বিজ্ঞানের জনক হিসেবে মেনে নেবার কারণ কি? কারণ তিনি সমস্ত 'বস্তুরাশি'র মধ্যে একটি ঐক্যের সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছিলেন এবং সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে পৃথিবীর সমস্ত 'বস্তুরাশি' একটি মাত্র বস্তু থেকে তৈরি এবং সে বস্তুটি পানি। এরপর শুরু হয়ে যায় খোজাখুঁজির পালা। কেউ বলেন

পানি, কেউ বাতাস, কেউ মাটি, কেউ বা আগুন। কেউ এই চারটিকে মৌলিক বস্তু বলে মেনে নেন। যেমন এরিস্টটল। প্রায় তিন/চারশ বছর এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক অব্যাহত থাকে। এই তিনশ বছরে অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন প্যারাডাইমের জন্ম হয়। আর একটি মৌলিক বিপ্লব। কৃষি সভ্যতার-অবশ্যসম্ভাবী-ফল হিসেবে ক্রীতদাস প্রথার উন্মেষ ঘটতে থাকে। সে ক্রীতদাস-নির্ভর সমাজের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য দর্শনের জন্ম হয়। যুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে উপরিউক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজে দর্শন। সেইসঙ্গে ক্রীতদাস প্রথার যৌক্তিকতা। বিশ্বাস-নির্ভর ধর্মের সঙ্গে যুক্তি নির্ভর দর্শনের এক সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ডেমোক্রিটাসের প্রকৃতি দর্শনের বিরুদ্ধে প্লেটোর অবস্থানের কথা সর্বজনবিদিত। এ্যারিস্টটলও মনে করতেন সক্রেটিস-পূর্ব প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা কেবল প্রকৃতি নিয়েই ভাবতেন – তাদের মধ্যে কোন ঈশ্বর ভাবনা ছিলনা।

৫ম-৬ষ্ঠ খ্রিঃ পূর্বাব্দে কলোফোনে জন্মগ্রহণ করেন জেনোফেন। তাঁর সম্বন্ধে না বললে বিজ্ঞানের কথা অসমাপ্ত থেকে যায়। কারণ তিনিই ছিলেন "one of the first critics of anthropomorphism and mythology." সেই সময় তিনি যে চিন্তা করেছিলেন, ভাবলে আজ অবাক হতে হয়। তিনি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে মানুষই তার নিজের চেহারার মত করে ঈশ্বর সৃষ্টি করে। আরো বলেন যে অন্য কোন পশু-প্রাণীর যদি ঈশ্বর থাকত তাহলে তাদের ঈশ্বরের চেহারা তাদের মতই হত।[৮] যা হোক সেই ধারাবাহিকতায় লিউসিপ্পাস (৫০০–৪০০) ও ডেমোক্রিটাস (৪৬০–৩৭০) এটমের প্রস্তাব করেন। কোন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া তাঁরা কেবল যুক্তির সাহায্যে এটমের অস্তিত্ব কল্পনা করেছিলেন। বস্তুর সর্বকনিষ্ঠ অংশ, এখনকার ভাষায় বলা যায় 'মৌলিক-কণিকা' যা ভাঙ্গা যায়না। তারপর প্রায় আড়াই হাজার বছর অভঙ্গুর এটম বিজ্ঞানীদের মস্তিষ্ক দখল করেছিল। ১৮৯৭ সালে J. J. Thomson ইলেক্ট্রন আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রমাণ করলেন এটম অভঙ্গুর কিংবা বস্তুর সর্বকনিষ্ঠ অংশ নয়। বরং আরো ক্ষুদ্রতর কণিকার দ্বারা গঠিত একটি পদার্থ।

আগেই 'ভাববাদ' ও 'বস্তুবাদের' কথা বলেছি। ধর্ম হচ্ছে ভাববাদের সর্বোচ্চ রূপ। সেখানে যুক্তির কোন স্থান নেই। যুক্তিহীন বিশ্বাসই হল ধর্মের প্রধান শক্তি। কিন্তু দর্শন তা নয়। 'মন' 'সত্তা' আগে না 'বস্তু' আগে তা দর্শনের অন্যতম প্রধান অনুসন্ধানের বিষয়। যুক্তির সাহায্যে দার্শনিকগণ তাঁদের নিজেদের দার্শনিক তত্ত্ব নির্মান করেন। ধর্মে 'ভাববাদী' কিংবা 'বস্তুবাদী' এমন কোন বিভক্তি নাই। ধর্ম নির্ভেজাল ভাববাদী। তাই প্রথম কয়েকশ বছর দর্শনের সঙ্গে ধর্মের চলেছিল এক নিরবচ্ছিন্ন লড়াই। সে লড়াই-এর প্রথম শহীদ সক্রেটিস। হাজার হাজার যুক্তিবাদী মানুষ ধর্ম-বিশ্বাসের যুপতলে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। ধর্ম ও প্লেটোবাদের (যুক্তিবাদ) মধ্যে সুরহা করার জন্য জন্ম হয় 'নিও-প্লেটোবাদী' দর্শন। সেন্ট অগাস্টিন সেই দর্শনের প্রথম সার্থক রূপকার। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে যুক্তির সমন্বয় করতে গিয়ে ক্ষতি হল যুক্তিবাদের। ৫২৯ খ্রিস্টাব্দে প্লেটোর 'একাডেমী' বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সেইসঙ্গে 'বেনেডিক্টাইন' আদেশের মাধ্যমে প্রথম 'মঠ' প্রতিষ্ঠা হয়। এভাবে ৫২৯ সালে গ্রিক-দর্শনের ওপর খ্রিস্টীয় চার্চের ভারী-ঢাকনা চাপা দেওয়া হয়। শুরু হয় মধ্যযুগের অন্ধকারময় খ্রিস্টীয় চার্চের একাধিপত্য। শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ সমাজের যাবতীয় কিছুর ওপর মঠ সমূহের একক কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। মধ্যযুগ থেকে এভাবে বিজ্ঞান তিরোহিত হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের আলো নিবু নিবু জ্বলতেই থাকে। কারণ মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। তার জন্য বস্তু নিয়ে নাড়াচাড়ার কখনও শেষ হয়না।

৭.

কিন্তু বিজ্ঞান নির্ভেজাল বস্তুতান্ত্রিক। বস্তুহীন বিজ্ঞান কল্পনাতীত। বিজ্ঞানেও ভাববাদী ও বস্তুবাদী এমন কোন বিভাজন নাই। বিজ্ঞান একশভাগ বস্তুবাদী। আমরা দেখেছি গ্রিক সভ্যতার শুরুটা ভালই ছিল। থেলিস, লিউসিপ্পাস, ডেমোক্রিটাস, এ্যানাক্সোগোরাস,

এ্যানাক্সিমিনস, জেনোফেন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দার্শনিকের হাতে বিজ্ঞানের আদি রূপের উন্মেষ ঘটতে থাকে। তাঁদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু আধিভৌতিক কোন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নয়, তাদের আগ্রহের প্রধান জায়গা প্রকৃতি অর্থাৎ বস্তু। যুক্তির মাধ্যমে প্রকৃতির অদৃশ্য রহস্য উদঘাটনে তাঁরা যত্নবান হন এবং অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন। রোদ-বৃষ্টি-জল-ঝড়-ভূমিকম্প-অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর কারণ তাঁরা প্রকৃতির মাঝেই খোঁজেন। হিপোক্রেটিস (৪৬০–৩৭৭ খ্রিঃ পূঃ) গ্রিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরু ও পাশ্চত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক। তাই তাঁরা সবাই 'প্রকৃতি দার্শনিক'। তাদের সে অনুসন্ধানের প্রধান অস্ত্র ছিল যুক্তি এবং সে যুক্তির প্রয়োগ দেখে আইনস্টাইন বিস্মিত হয়েছিলেন।

আগেই বলেছি শুরু থেকেই বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির এক অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম শুরু হয়। কিন্তু বিজ্ঞান যত শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে, বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে বিরোধ ততই হ্রাস পেতে থাকে এবং এক সময় বিশ্বাস ও যুক্তি তাদের বিরোধ মিটিয়ে নেয় এবং বস্তুবাদী বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতা শুরু করে। মধ্যযুগের শুরুতে আমরা সেন্ট অগাস্টিনের কথা জেনেছি। ইটালির রেনেসা শুরুর সমান্য আগে সামন্তবাদী ইউরোপের সমাজে ও অর্থনীতিতে যখন পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, আরবি ও ফারসি ভাষায় প্রাচীন গ্রিক বিজ্ঞান যখন পুনরাবিষ্কার হতে শুরু হয়েছে, মধ্যযুগের অন্ধকারের মধ্য থেকে প্লেটো, এরিস্টটল ও টলেমীর নাম যখন আলোয় উঠে আসছে, ঠিক তখন মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় দার্শনিক সেন্ট টমাস এ্যাকুইনাস (১২২৫-৭৪ খ্রি) এরিস্টটলের বিজ্ঞানের সঙ্গে খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের সমন্বয় সাধনে ব্রতী হন এবং নিও-এরিস্টটলবাদের জন্ম দেন। কিন্তু তাঁর আগে বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ইবনে রুশদ (১১২৬–১১৯৮ খ্রিঃ) এরিস্টটলের দার্শনিক মতবাদ সমর্থন করেন এবং গোড়া ধর্মীয় পন্ডিত ইমাম গাজ্জালির কোপানলে পড়েন। এরিস্টটল বিশ্বাস করতেন বিশ্ব ও বস্তুজগৎ নিত্য ও শাশ্বত – অনাদিকাল থেকেই বিদ্যমান। আত্মা ও দেহ একই বস্তু। তাই দেহের মৃত্যুর সাথে সাথে আত্মারও মৃত্যু ঘটে। এমত কেতাবি ধর্ম-বিরোধী। রুশদ বস্তুর নিত্যতা ও ব্যক্তিগত আত্মার নশ্বরতার কথা প্রচার করেন। বলেন বস্তু নিত্য এবং সৃষ্টিবাদ সর্বৈব মিথ্যা। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মান্ড কতকগুলি সুসংবদ্ধ নীতি ও নিয়মের দ্বারা পরিচালিত। এতে কেবল মুসলিম ধর্মবেত্তারা নন, খ্রিস্টীয় ধর্মযাজরাও ইবনে রুশদের ওপর দারুন ক্ষেপে গেলেন। ১২১০ খ্রিস্টাব্দে রুশদ-চর্চা নিষিদ্ধ হয়। ১২৩১ সালে পোপের নির্দেশে রুশদের বই পড়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।[৯] সেন্ট টমাস এ্যাকুইনাস নিজেও ইবনে রুশদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন এবং ভিন্ন পথে এরিস্টটলের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে তাঁর 'স্কলাসটিসিজম' দর্শনের ভিত স্থাপন করেন। এভাবে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন শেষমেশ বিজ্ঞানেরই ক্ষতি করে। 'স্কলাসটিসিজম' বিজ্ঞান চর্চার পথ অবরুদ্ধ করে দেয়।

অনেকে মনে করেন ১৫৪৩ সালে কপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বব্রহ্মান্ড আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু। কেউ কেউ মনে করেন ১৫১৭ সালে চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাই ইউরোপে আধুনিকতার জন্ম দেয়। এভাবে কোন ব্যক্তি বিশেষের আবিষ্কার বা কৃতিত্ব বড় করে দেখার চাইতে সমাজের ও অর্থনীতির সামগ্রিক রূপান্তরের কথা স্মরণ করা বিজ্ঞানসম্মত। একথা মিথ্যা নয় যে নিজে একজন যাজক হয়েও কপারনিকাস শুধু এরিস্টটল ও টলেমির বিজ্ঞানকেই মিথ্যা প্রমাণ করলেন তা নয়, তিনি বাইবেলের একটি গল্পকেও মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করেন। বিজ্ঞানের জগতে এটা আর একটি নতুন প্যারাডাইম বা বিপ্লব। কিন্তু সমাজে অর্থনীতির পরিবর্তনও দ্রুত ঘটছিল। পুঁজিবাদ ক্রমশ সামন্তবাদকে সরিয়ে দিচ্ছিল। সেই পুঁজিবাদই আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। প্রগতিশীল সেই পুঁজিবাদ সম্প্রসারণের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের মিলন ঘটে। তাই রেনেসাঁর পর ইউরোপের সমাজে, বিশেষ করে ইংল্যান্ডের সমাজে পরিবর্তনের জোয়ার আসে। এক নতুন প্যারাডাইমের সৃষ্টি হয়। রেনেসাঁ, ধর্মসংস্কার ও শিল্পবিপ্লবের পথ পাড়ি দিয়ে পুঁজিবাদের স্থিত হতে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় লেগে যায়। সামন্তবাদী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নানা ধরনের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদকে তার যৌক্তিক জায়গায় পৌছাতে হয়।

সেইসঙ্গে ১৬২০ সালে ফ্রান্সিস বেকনের 'নোভাম অর্গানাম' স্কলাসটিসিজমের ওপর বড় রকমের আঘাত হানে। বেকন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নির্ভর আরোহী পদ্ধতির প্রস্তাব করেন এবং আধুনিক বিজ্ঞানের পথ সুপ্রশস্ত করেন। সেই পথ ধরে ১৭ শতকের শেষে নিউটনের আবির্ভাব। আর এক নতুন প্যারডাইম। প্রায় দু'শ বছর রাজত্ব করার পর নিউটনের বলবিদ্যার সীমাবদ্ধতা প্রমাণ করেন বিশ শতকের প্রথমেই আলবার্ট আইনস্টাইন। নতুন এক বিশ্বছবির জন্ম দেন তিনি। বিশ শতকের প্রথম ত্রিশ বছরে পদার্থবিজ্ঞানে যে বিপ্লব ঘটে তা এতদিনে 'normal' বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। আইনস্টাইনের বিশ্বছবি প্রমাণ করে যে বিজ্ঞানে শেষ বলে কিছু নাই। যা আছে তাহল আপেক্ষিকতা।

তাই আইনস্টাইনের বড় ভক্ত ও বড় সমালোচক কার্ল পপার বিশ শতকের মাঝামাঝি আর এক নতুন বিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে হাজির হন। তিনি বেকনের আরোহী পদ্ধতিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে অধিবিদ্যা ও অপবিজ্ঞানের পার্থক্য করার জন্য 'খন্ডনযোগ্যতা' (Falsibiality) নামে একটি ইন্টারেস্টিং বিজ্ঞানের দর্শনের জন্ম দেন।

৮.

মধ্যযুগের শুরুতে সেন্ট অগাস্টিনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ না হলেও শেষপাদে সেন্ট টমাস এ্যকুইনাসের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তিনি বিজ্ঞানের অগ্রগতি স্তব্ধ করতে পারেননি ঠিকই কিন্তু গতি কিছুটা হলেও শ্লথ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। একদিকে পুঁজিবাদ ও মধ্যপন্থী বুর্জোয়া শ্রেণীর উত্থান, অন্যদিকে একের পর এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার; সেইসঙ্গে মার্টিন লুথারের ধর্ম সংস্কার আন্দোলন। এই তিনের আক্রমণে ইউরোপের সমাজ ক্ষতবিক্ষত। ব্রুনোকে হত্যা করে, গ্যালিলিওকে সারাজীবন কারাদন্ড দিয়েও বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ঠেকানো যায়নি।

আমরা দেখেছি শুরুতে বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির এক অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। কিন্তু বিজ্ঞান যত শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে, বিশ্বাস ও যুক্তি তাদের বিরোধ মিটিয়ে একত্রে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। তাদের সে মিলিত শক্তি বিজ্ঞানীদের ওপর কেবল অত্যাচারই করেনি, তারা নানা তত্ত্বের অবতারণা করে বিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষের মনে ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করতে সচেষ্ট হয়। বিজ্ঞানের পথ কন্টকাকীর্ণ করে তোলার চেষ্টা করে। ফলে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা সাময়িক হলেও কখনও কখনও মন্থর হয়ে গেছে। কখনও মনে হয়েছে বিজ্ঞানের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। কারণ বিজ্ঞানের মৃত্যু মানেই মানুষের মৃত্যু। বরং ধর্ম ও দর্শনের সে মিলিত শক্তি ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞানের কাছে হার মানে। বিজ্ঞানের শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দির পর বিজ্ঞানকে আর পিছন দিকে তাকাতে হয়নি। প্রমাণ হয়েছে অভিজ্ঞতানির্ভর প্রাযুক্তিক ও যুক্তিবাদী বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা অপ্রতিরোধ্য। ধর্মীয় বিশ্বাস ও ভাববাদী দর্শনের সামনে আজ সে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। পুঁজিবাদের উত্থান, কপারনিকাসের আবিষ্কার, মার্টিন লুথারের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন ও আধুনিক বিজ্ঞানের 'প্রফেট' ফ্রান্সিস বেকনের আরোহী পদ্ধতি আধুনিক সভ্যতার দ্বারোদঘাটন করে। মানুষ নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিনের ধর্মীয় ও ভাববাদী দর্শনের দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে মানুষ ক্রমশঃ আত্মবিশ্বসী হয়ে ওঠে। মুক্তবুদ্ধির অবদমন, চিন্তার দাসত্বের বিরুদ্ধে আধুনিক বিজ্ঞান হয়ে ওঠে এক শক্তিশালী হাতিয়ার। সর্বজনীন শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়, খাদ্য-স্বাস্থ্য-বাসস্থান মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। মানুষ তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে ভাস্বর হয়ে ওঠে। ধর্ম ও ভাববাদী দর্শনের শৃঙ্খল-মোচন করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে আধুনিক বিজ্ঞান। বিজ্ঞান আজ এক স্বাধীন, সার্বভৌম সত্তায় পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞানের সে জগৎ আজ লক্ষ-কোটি মানুষের কর্মসংস্থান করছে। বিজ্ঞানের সামনে আজ আর কোন প্রতিপক্ষই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

ওদিকে যে লুথার ক্যাথলিক ধর্মের প্রতিক্রিয়ার দুর্গে আঘাত করে আপেক্ষিক প্রগতিশীল প্রটেস্টান্ট ধর্ম প্রবর্তন করেন, তিনিই আবার কপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। ১৫৪৬ সালে মৃত্যুর আগে তিনি কপারনিকাসকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন। প্রটেস্টান্টরা হত্যা করে সার্ভেটাসকে আর ব্রুনোকে হত্যা করে ক্যাথলিকবৃন্দ। প্রমাণ হয় ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পরস্পর শত্রু হলেও বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে তারা উভয়েই ছিল খড়গহস্ত। অতঃপর নানা নিপীড়ন ও অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয়েও আধুনিক বিজ্ঞান কেপলার, ব্রাহে, গ্যালিলিও-র হাত ধরে নিউটনে এস শিখর স্পর্শ করে। বিজ্ঞানের জগৎ আজ স্বমহিমায় উজ্জ্বল। বিজ্ঞানই আজকের পৃথিবী। তাই আজ নানা ধর্ম ও নানাবিধ বস্তুবিধ্বংসী-ভাববাদী দর্শন বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এখন তারা পরস্পরের শত্রু নয় – পরিপূরক। কারণ আজকের পুঁজিবাদী বিশ্বে তাদের স্বার্থ অভিন্ন।

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা' শীর্ষক আলোচনার পূর্বে সামান্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটির প্রয়োজন ছিল। আমি এখানে নিজের কথা বলিনি। বলার যোগ্যতাও আমার নাই। এসব বিষয়ে যাঁরা গভীর গবেষণা করেছেন, তাদের বই পড়ে, তাদেরই কথা বলেছি। এই অংশটি শেষ করে এনেছি। ইউরোপে বিজ্ঞানের উত্থানের কারণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন,

"ধর্মশাস্ত্রের প্রতি সেখানকার মনুষত্বের ঐকান্তিক যে নির্ভর ছিল, সেটা ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে এল। একদিন সেখানে মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রের প্রায় সমস্তটাই ধর্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অন্তর্গত না হোক, অন্তত শাসনগত ছিল। লড়াই করতে করতে অবশেষে সেই অধিকারের কর্তৃত্বভার তার হাত থেকে স্খলিত হয়েছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে যেখানে শাস্ত্রবাক্যের বিরোধ, সেখানে শাস্ত্র আজ পরাভূত; বিজ্ঞান আজ আপন স্বতন্ত্র বেদীতে একেশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত। ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি মানুষের অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয় বৈজ্ঞানিক যুক্তিপদ্ধতির অনুগত হয়ে ধর্মশাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। বিশ্বের সমস্ত জ্ঞাতব্য ও মন্তব্য বিষয়ে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রবণতা আজ বৈজ্ঞানিক। অপ্তবাক্যের মোহ তার কেটে গেছে।"[১০]

বিংশ শতাব্দীর একজন প্রথম সারির শিক্ষার দার্শনিক Stella Van Petten Henderson-এর মুখেও একই কথা শুনি,

"While Science was growing in the estimation of man, philosophy and even religion were losing its prestige."[১১]

আধুনিক বিশ্বে ধর্মের অবস্থানের ওপর এক বিশাল গবেষণা করেছেন Steve Bruce. সে বই এর তৃতীয় অনুচ্ছেদের শিরোনাম হল 'The Erosion of the Supernatural'. তিনি বলছেন, "the modern urban industrial society of Western Europe, North America and Australia are considerably less religious than the formations that preceded them."[১২]

বিজ্ঞান যখন বিশ্বব্রহ্মান্ডে মানুষের উদ্ভব ও ভূমিকা বিষয়ক আলোচনায় নিমগ্ন হয়, তখন ধর্ম ও দর্শন তাদের পূর্বের গুরুত্ব হারায়। একথা যেমন সঠিক, তেমনি একথাও সঠিক যে ধর্ম ও দর্শন তাদের জমি কখনই বিজ্ঞানের কাছে পুরোপুরি ছেড়ে দেয়নি। তাই আজকের এই বৈজ্ঞানিক পৃথিবীতে চরম অবৈজ্ঞানিক ধর্ম ও দর্শন তার হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পেতে চাইছে। আর সে চাওয়ার পিছনে বড় শক্তি হিসেবে কাজ করছে মরচে ধরা প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া-পৃথিবীর মোড়ল উন্নত বিশ্ব। তাই বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনের ঐতিহাসিক লড়াই আজও তার যৌক্তিক পরিনতিতে পৌছেনি। পৌছাতে পারছে না।

এ পর্যন্ত বিজ্ঞানের সার্বভৌম সাম্রাজ্য বিস্তারে ও প্রতিষ্ঠানে যে'কটি নাম স্মরণীয় তাঁরা হলেন উষালগ্নে থেলিস ও ডেমোক্রিটাস, মধ্যযুগে কপারনিকাস, আধুনিক যুগে গ্যালিলিও, নিউটন, বেকন, ডারউইন ও আইনস্টাইন। থেলিস ও ডেমোক্রিটাস বিজ্ঞানের লাট্টুটা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন – ধর্মীয় বিশ্বছবির মধ্যে বাস করে বস্তুবাদী দর্শনের জন্ম দেন। ধর্মীয়-ভাববাদী বিশ্বছবির মধ্যে বাস করে যাজক

কপারনিকাস ধর্মীয় ও ভাববাদী দর্শনের কফিনে প্রথম পেরেকটি ঠোকেন। আর বেকন-গ্যালিলিও-নিউটন-ডারউইন-আইনস্টাইনদের হাত ধরে বিজ্ঞান আজ সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত বস্তুবাদী দর্শনের এক বৈজ্ঞানিক বিশ্বছবি উপহার দিয়েছেন। তাই এই সূচনা বক্তব্য বোধহয় এভাবে শেষ করা যায় যে অতিতে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার্থে ধর্ম ও দর্শন এক ধনাত্মক ভূমিকা পালন করেছিল, সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন থাকার অবকাশ নাই। সে স্থানটি আজ বিজ্ঞানের দখলে। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মের পর মানুষের বস্তুজ্ঞান ক্রমশ এমন এক স্তরে পৌছেছে, যার কোন ব্যাখ্যা করা ধর্ম ও ভাববাদী দর্শনের পক্ষে সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের কোন শাখায় উচ্চতর জ্ঞানার্জন ছাড়া ধর্ম ও ভাববাদী দর্শনের পক্ষে আজকের বস্তুজ্ঞানের ত্রিসীমানায় পৌছানো সম্ভব নয়। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা আমাদের এই শিক্ষা দেয়।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা

১.

বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানমনস্কতার পার্থক্য আকাশ-পাতাল। বিজ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক কিন্তু বিজ্ঞানমনস্কতা প্রচন্ডভাবে ব্যক্তিক। বস্তুকে নিয়েই বিজ্ঞানের কারবার। বস্তুর কোন ধর্ম নাই, বর্ণ নাই, জাত-পাত-লিঙ্গ-ভাষা-সংস্কৃতি নাই। তাই বিজ্ঞানেরও কোন ধর্ম নাই, বর্ণ নাই, জাত-পাত-লিঙ্গ-ভাষা-সংস্কৃতি নাই। বিজ্ঞান বস্তুকে কেবল বস্তু হিসেবেই দেখে। তার অভ্যন্তরীণ সংগঠন আবিষ্কারে যত্নবান হয়। প্রকৃতি ও বিশ্বব্রহ্মান্ডের অন্তর্নিহিত নিয়মাবলী খুঁজে বার করতে চায় – তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি তা নির্ণয় করতে চায়। আর মানুষ হল বিজ্ঞানের কারবারি। মানুষের ধর্ম আছে, বর্ণ আছে, জাত-পাত-লিঙ্গ-ভাষা-সংস্কৃতি আছে। এসব নিয়ে মানুষ গর্ব অনুভব করে। মানুষ সচরাচর এইসব গুণাবলী বা বৈশিষ্টের উর্ধে উঠতে পারে না। এইসব গুণাবলী বা বৈশিষ্ট নিয়েই মানুষ বিজ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত হয়। বস্তু মানব নিরপেক্ষ। একজন বহিরাগতের মত মানুষ সেই বস্তুচর্চায় নিয়োজিত হয়। সেই তৎপরতার নামই বিজ্ঞান। কিন্তু বিজ্ঞান-চর্চা বা বস্তু-চর্চায় নিয়োজিত হবার সময় মানুষ সচরাচর তার নিজস্ব গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের প্রতি অনুগত থাকে। থাকতে ভালবাসে। কিন্তু এতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলে কোন পার্থক্য সূচিত হয়না। যেমন ধরুন, একজন মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান, ইহুদী কিংবা বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বসী মানুষ যদি একটি মৌলিক কণিকা আবিষ্কার করেন, তাহলে ঐ মৌলিক কণিকাটি আবিষ্কারকের ধর্ম গ্রহণ করে না। কিন্তু আমরা মানুষ জন্মসূত্রে একটি ধর্ম লাভ করি। আমরা বলতে পারি না যে ঐ মৌলিক কণিকাটি মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, ইহুদী বা বৌদ্ধ। একজন একশভাগ মুসলিম আব্দুস সালাম ও একজন একশ ভাগ নাস্তিক স্টিভেন ওয়াইনবার্গ একত্রে ১৯৭৯ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন একই আবিষ্কারের জন্য। এ সম্পর্কে সালাম বলেন,

"it made no basic difference to our work whether I was an 'avowed believer' and Weinberg an 'avowed atheist'. We were both 'geographically and ideologically' remote from each other. When we conceived the same theory of physics of unifying the weak and the electromagnetic forces."[১]

তাই তিনি কোন ধর্মীয় আদর্শায়িত বা সাম্প্রদায়িক বিজ্ঞানে বিশ্বাস করেন না। সাম্প্রদায়িক বিজ্ঞানের ধারণা গুঁড়িয়ে দিয়ে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন,

"There is only one universal science; its problems and modalities are international and there is no such science as Islamic science just as there is no Hindu science, no Jewish science, no Confucian science, no Christian science."[২]

এই কথাটিই আরো জোরের সঙ্গে বলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন,

"Scientific results are entirely independent from religion or moral consideration. Those individuals to whom we owe the great creative achievements of science were all of them imbued with the truly religious conviction that this universe of ours is something perfect and susceptible to the rational striving for knowledge."[৩]

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তব্যের কথা মনে পড়ল। ১৩২৬ সালে তিনি লিখেছিলেন, "যুক্তির নিয়ম সকল দেশেই সমান, যে-সকল পদার্থ প্রমাণের বিষয় তাহাদিগকে প্রমাণ করিবার প্রণালী সর্বত্র এক। ভারতবর্ষের ইতিহাসের তথ্যবিচার এক নিয়মে হইবে আর ইংলন্ডের অন্য নিয়মে হইবে ইহা হইতেই পারে না, বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও তাহার ফল দেশভেদে বিভিন্ন হইবে ইহাও অসম্ভব। অতএব বুদ্ধিবৃত্তিমূলক যে শিক্ষা য়ুরোপ পৃথিবীকে দিতেছে তাহা সর্বত্র এক হইবেই।"[৪]

বিজ্ঞানের বড় বড় আবিষ্কারের জন্য আজ যাঁরা স্মরণীয় ও বরণীয় তাঁরা প্রায় সবাই কোন না কোন ধর্মে বিশ্বাস করতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মান্ড নিখুঁত এবং যেকোন যুক্তিবাদ বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বিশ্বব্রহ্মান্ড সম্পর্কে এ সত্যে ফাটল ধরাতে পারে। তাই বিজ্ঞানের সূচনালগ্ন থেকেই ধর্ম ও ভাববাদী দর্শন প্রকৃতি নিয়ে গবেষণাকে সুনজরে দেখেনি। কারণ প্রকৃতির গূঢ় রহস্য আবিষ্কৃত হলে ধর্ম ও ভাববাদী দর্শনের অনেক গোমড় ফাঁস হয়ে যাবে। তাই প্লেটো-এরিস্টটল প্রাক-সক্রেটিক প্রকৃতি-দার্শনিকদের আক্রমন করেছিলেন। মানুষের বস্তুজ্ঞান যত নিম্ন পর্যায়ে থাকবে ধর্ম ও ভাববাদী দর্শনের প্রভাব ততই বাড়ে। কথাটি যে সত্য, তা কি প্রমাণ হয়নি? গ্যলিলিওর ওপর যে অবিচার করেছিল তখনকার পোপ, তার জন্য বিংশ শতাব্দীতে এসে পোপ ক্ষমা প্রার্থনা করেনি? ব্রুনোর বইগুলোর ওপর পোপ যে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন, তা আজও প্রত্যাহার করা হয়নি।

সেই স্মরণীয় ও বরণীয়দের কোন ধর্মে বিশ্বাসী হবার কারণে তাঁদের আবিষ্কার ব্যর্থ হয়ে যায়নি। সবাই তো আইনস্টাইনের মত ত্যাদড় ছেলে নয়। ইহুদী মা-বাবার সন্তান হয়েও যিনি মাত্র ১২ বছর বয়সে ধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারান এবং বলেন যে বাইবেলে বর্ণিত সব গল্পই সত্য নয়। মধ্যযুগে বা আধুনিক যুগের সূচনালগ্নেও তিনি যদি একথা বলতেন, তাহলে নির্ঘাত তাঁকে বিচারের সম্মুখীন হতে হত। আইনস্টাইন আস্তিক ছিলেন না নাস্তিক ছিলেন পাঠকই তার বিচার করবেন। বাইবেলের সব গল্প যে সত্যি নয়, তিনি শুধু একথা বলেই ক্ষান্ত হননি। আরো বলেছেন, "বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কোন অতিপ্রাকৃত শক্তি বা ঈশ্বরের কোন ভূমিকা নাই।" তিনি আত্মার কোন স্বাধীন সত্তায় বিশ্বাস করতেন না। বিশ্বাস করতেন না মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে। পুরস্কার হিসেবে স্বর্গ এবং শাস্তিস্বরূপ নরকেও বিশ্বাস করতেন না। তাঁকে কি বিশ্বসী বলা যায়? যাক বা না-যাক, তাতে কিছুই যায়-আসে না। তিনি আস্তিক হন কিংবা নাস্তিক, তিনি যা আবিষ্কার করে গেছেন তা বিংশ শতাব্দীতে এক নতুন বিশ্বছবির জন্ম দিয়ে গেছে, যা আজও তেমন কোনো প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হয়নি। আপেক্ষিক তত্ত্ব বা $E=mc^2$ আজও সত্য। তিনি যা আবিষ্কার করে গেছেন তা আইনস্টাইন নিরপেক্ষ। আইনস্টাইনের ধর্ম ও নৈতিকতা যাই হোক না কেন, তাঁর আবিষ্কার মানুষের চিন্তার জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। সে আবিষ্কার তার বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিরপেক্ষ। তাঁর বিশ্বাস যাই হোক না কেন, তাঁর আবিষ্কারের আগে কোন সাম্প্রদায়িক বিশেষণ জুড়ে দেয়া যাবে না।

২.

এবার আমরা আর একজনের কথা বলি, যিনি মধ্যযুগীয় ধর্মীয়-এরিস্টটলীয়-টলেমীয় বিশ্বব্রহ্মান্ডের কাফনে প্রথম পেরেক ঠুকেছিলেন। সূচনাবক্তব্যে তাঁর কথা এসেছে। তিনি কিন্তু একজন সাচ্চা ক্যাথলিক-ধর্ম যাজক। কাজেই তাঁর ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলা

যাবেনা। তিনি হলেন কপারনিকাস। ভয়ে ভয়ে তিনি সত্য প্রকাশ করে গেছেন, তা কি মিথ্যা হয়ে গেছে? ধর্মগ্রন্থ বলছে, সেরা দার্শনিক ও বিজ্ঞানী এরিস্টটল বলছেন, টলেমী বলছেন, পৃথিবীই সৌরজগতের কেন্দ্র। সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। তাঁদের কথা অবিশ্বাস করার ক্ষমতা কার আছে? পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ হাজার বছর ধরে তা বিশ্বাস করে এসেছে। পৃথিবীর সব মানুষ হাজার হাজার বছর যা বিশ্বাস করে আসে, তাই যে সত্য হয়ে যায় না, কপারনিকাস সেটাই প্রমাণ করলেন। বিজ্ঞানের সত্যাসত্য নির্ণয়ে গণতন্ত্র খাটে না। একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সত্য না মিথ্যা, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভোটে তা নির্ণীত হয় না। কপারনিকাস মরে বেঁচেছিলেন। তাঁর সত্যটি মেনে এবং প্রচার করতে গিয়ে জিওর্দানো ব্রুনোকে সর্বশক্তিমান পোপের সামনে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। বিচারে তাঁর মৃত্যুদন্ড হয়েছিল। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে খোলা আকাশের নিচে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। কপারনিকাসের আবিষ্কারকে আজও কেউ ভ্রান্ত প্রমাণ করতে পারেনি। বরং বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এ সত্যকে আরো জাজ্জ্বল্যমান করে তুলেছে। এভাবে বিজ্ঞানের সত্য প্রমাণ করতে গিয়ে গ্যালিলিওকে অত্যাচারিত হতে হয়েছিল। পৃথিবীর অপর গোলার্ধে দেশ আছে, মানুষ আছে, এ সত্য উচ্চারণ করে পোপের বিচারে প্রাণ দিয়েছিলেন সেকো দাস্কোলিকে। কারন পৃথিবী যে গোল এবং অপর গোলার্ধে যে মানুষ থাকতে পারে, এরকম বিশ্বাস ছিল ধর্ম বিরোধী। পৃথিবীর অপর পিঠে যে দেশ আছে, সেখানে মানুষ আছে, আছে প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার, একথা বোঝাতে কলম্বাস দশ বছর পর্তুগাল, স্পেন, ইংলন্ড ও ফ্রান্সের রাজ-দরবারে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বিশেষজ্ঞগণ তাঁর প্রস্তাব নাকচ করে দেন। শেষে স্পেনের রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রানী ইসাবেলা তাঁর যুক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং সব রকমের সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৪১২ সালে কলম্বাস আমেরিকায় গিয়ে পৌছান। ইউরোপের মানুষের কাছে তার আগে আমেরিকা, সেদেশের মানুষ ও সম্পদ অজানা ছিল। ধর্মযাজক ও ভাববাদী পন্ডিতদের অজ্ঞানতার জন্য দাস্কোলিকে জীবন দিতে হয়েছিল।

৩.

এটা প্রমাণ হল আশা করি যে ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাস বিজ্ঞান গবেষণার ফলাফলের ওপর কোন প্রভাব ফেলে না। বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তা কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে বস্তু মানব নিরপেক্ষ। এই বিশ্বাস বিজ্ঞানমনস্কতার একটি প্রধান স্তম্ভ। মাত্র সেদিন ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে সেসময়ের প্রখ্যাত পদার্থবিদ আর্নেস্ট মাখের 'Mechanics' বইখানি প্রকাশিত হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলতে তিনি কি বুঝতেন তা স্পষ্ট ভাষায় সে বইতে লিখেছেন, "All natural science can only picture and represent complexes of those elements which are ordinarily call sensation."[৫] বিজ্ঞানের দর্শনের জগতে মাখ ছিলেন একজন বিখ্যাত দৃষ্টবাদী-positivist. তবে পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে তিনি যে কাজটি করেছিলেন তাহল তিনি নিউটনের দু'শ বছরের পুরনো বলবিদ্যার ত্রুটিগুলো শনাক্ত করেছিলেন। আইনস্টাইনকে তা দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং তিনি জীবনের ৪২টি বছর মাখের দৃষ্টবাদী দর্শনের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন ছিলেন। মাখের বস্তু বিধ্বংসী দৃষ্টবাদ থেকে নিস্কৃতি পেতে তাকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

কিন্তু ১৯০৮ সালে ভি. আই. লেনিন মাখের সেই দৃষ্টবাদী দর্শন কতটা বিজ্ঞান বিরোধী ও ভাববাদী তা প্রমাণ করেন তার বিশ্বখ্যাত 'Materialism and Empirio-Criticism' বইতে।[৬] তিনি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, "Did Nature Exist Prior To Man?" সূচনা বক্তব্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের সেই প্রবীণ অধ্যাপকের কথা স্মরণ করুন। লেনিন লিখেছিলেন, "Natural Science positively asserts that the earth once existed in such a state that no man or any other creature existed or could have existed on it. Organic matter is a later phenomenon, the fruit of long evolution."[৭] কট্টর মার্ক্সবাদ বিরোধী বিংশ শতাব্দীর

অন্যতম প্রধান বিজ্ঞানের দার্শনিক কার্ল পপারের মুখেই এর উত্তরটা শোনা যাক। তিনি ১৯৮২-৮৩ সালে প্রকাশিত 'Quantum Theory and the Schism in Physics' বই এর ভূমিকায় লিখছেন, "যে ভৌত-বিশ্বে আমরা বাস করি তার বাস্তবিকতা – আমাদের অস্তিত্ব ছাড়াও এটি বিশ্বের অস্তিত্ব আছে এইমর্মে বাস্তবতা; আমাদের প্রকৃষ্টতম অনুকল্প অনুসারে আমরা যতদূর জানি – জীবনের অস্তিত্বের পূর্বেই বিশ্বের অস্তিত্ব ছিল, আমাদের সবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পরও, এবং অব্যাহতভাবেই, এর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে – এইমর্মে বাস্তবতা।"[৮] ১৯৭৭ সালে স্টিভেন ওয়াইনবার্গ বিষয়টি আরো সুন্দর ভাবে বুঝিয়েছিলেন। তিনি বলছেন যখন 'বিগ-ব্যাং' বিস্ফরণ ঘটে, তার ১/১০০ সেকেন্ডের মধ্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা ছিল একশ হাজার মিলিয়ন ($১০^{১১}$) ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। সেই তাপমাত্রায় আমাদের চেনা বস্তু জগতের কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব ছিল না। সেই তাপমাত্রায় কেবল ইলেকট্রন, পজিট্রন, নিউট্রিনোস ও ফোটন অর্থাৎ আলোর অস্তিত্ব ছিল।[৯] তিনি আরো লিখছেন, "Much later, after a few hundred thousand years, it would become cool enough for electrons to join with nuclei to form atoms of hydrogen and helium."[১০] আধুনিক বিজ্ঞানের 'পয়গম্বর' বেকন দৃষ্টবাদী। মাখও দৃষ্টিবাদী। মাখের দৃষ্টবাদ যদি বস্তুবিধ্বংসী এবং ভাববাদী হয়, তাহলে বেকনের দৃষ্টবাদ নয় কেন? আসলে আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় বিজয়ের প্রতি যদি আমাদের আস্থা থাকে তাহলে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। জর্জ সার্টন বলেছেন, "জ্ঞানের আপেক্ষিকতার ধারণার প্রতি মানুষের বিশ্বাস স্থাপনই হল বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় বিজয়।"[১১] তাহলে বোঝা যায় মাখের দৃষ্টবাদ কেন অবৈজ্ঞানিক আর সপ্তদশ শতাব্দীর বেকনের দৃষ্টবাদ কেন বিজ্ঞানের বন্ধ দরজা খুলে দিল। বেকনের সময় বিজ্ঞানের দরজা রুদ্ধ করা হয়েছিল। ধর্মীয় ও এরিস্টলীয় বিজ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত 'স্কলাসটিসিজম' বিজ্ঞানের অগ্রসর হওয়ার সব পথ বন্ধ করে রেখেছিল। বেকনের দৃষ্টবাদ ও আরোহী পদ্ধতি সে দরজা খুলে বিজ্ঞানকে এগিয়ে যাবার পথ করে দিয়েছিল। আপনারা পুঁজিবাদের কথাই ধরতে পারেন। সূচনালগ্নে পুঁজিবাদ ছিল একটি প্রগতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামো। সামন্ততন্ত্রের অমানবিকতা ধ্বংস করে পৃথিবীতে এক নতুন বিশ্বছবি স্থাপন করেছিল। কালের গতিতে আজ তা প্রতিক্রিয়ার দূর্গে পরিণত হয়েছে।

৪.

এবারে আমরা বিজ্ঞানমনস্কতার দিকে দৃষ্টি দেব। বিজ্ঞানমনস্কতার সংজ্ঞা নির্ণয় খুবই জটিল বিষয়। আমি নিজে বিষয়টি যেভাবে বুঝি, ঠিক সেভাবে ভাষায় প্রকাশ আমার কাছে অসম্ভব মনে হয়। এটা ভাষার সীমাবদ্ধতা, নাকি আমার সীমাবদ্ধতা, আমি ঠিক বুঝতে পারি না। বিজ্ঞানমনস্কতা মনের বিষয় – মানুষের বিশ্বাস অবিশ্বাসের ব্যাপার। তাই বিজ্ঞানমনস্কতা বলতে এক একজন এক একরকম বুঝবে, এটাই স্বাভাবিক। মনের সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক নিয়েই যত ঝঞ্ঝাট। জ্ঞানতত্ত্বের শুরু থেকে পন্ডিত, দার্শনিকগণ এ নিয়ে ভাবছেন। বিভিন্ন তত্ত্ব নির্মাণ করছেন। বিজ্ঞানমনস্কতার প্রশ্নটি তাই জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভবে যুক্ত। জ্ঞানের উৎস কি? এটি দর্শনের মৌলিক প্রশ্ন। মানুষ কি জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে? প্লেটো (৪২৮/৪২৭-৩৪৭ খ্রিঃ পূঃ) তাই মনে করতেন। নাকি জন্মের পর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করে? অভিজ্ঞতাবাদের প্রধান বক্তা জন লক (১৬৩২-১৭০৪ খ্রিঃ) তাই মনে করতেন। আবারও বলি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে দার্শনিকরা দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ভাববাদী ও বস্তুবাদী। বিজ্ঞান যেহেতু বস্তুবাদী তাই আমরা অনায়াসে ভাববাদী জ্ঞানতত্ত্বকে আমাদের হিসেবের বাইরে রাখতে পারি। বস্তুবাদের মধ্যেই আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখবো।

৫.

পৃথিবীর সমাজ-সভ্যতা-জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধর্ম-দর্শন সবই ক্রমবিকাশের অধীন-আপেক্ষিক। বিংশ শতাব্দীর আগে একথা আমরা উচ্চারণ করতে পারতাম না। আমার এ বক্তব্য বিংশ শতাব্দীর নতুন প্যারডাইমের ফসল। বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানে মহাবিপ্লবের ফলে আমাদের দৃষ্টি আজ পরমাণুর অভ্যন্তরের জটিল গঠন প্রণালী উন্মোচন করেছে। উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের RNA-DNAতে গিয়ে ঠেকেছে। বিশ্বব্রহ্মান্ডের বৃহৎ পরিসরে আমাদের দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে লিউসিপ্পাস ও ডেমোক্রিটাস এটমের প্রস্তাব করলেও ১৯০৫ সালের আগে তা আবিষ্কার হয়নি। তাই আজকের বিজ্ঞানমনস্কতা পরমাণু ঘিরেই আবর্তিত হয়। তেমনি ১৮৫৯ সালে ডারউইনের 'Origin of Species' বইটি প্রকাশের পর বিজ্ঞানমনস্কতার জগতে এক বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়, যেমন হয়েছিল কপারনিকাসের পর।

তেমনি ১৯৫৭ সালে মহাকাশ বিজয়ের লক্ষ্যে উৎক্ষেপিত প্রথম স্পুটনিক আমাদের চিন্তার জগতে আর এক বিপ্লব সাধন করে। তাই মানুষের বিশ্বাস-নিরপেক্ষ বিজ্ঞানচর্চার ফলাফল বিজ্ঞানমনস্কতার ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রভাব রাখে। বিজ্ঞান চর্চা বিজ্ঞানীর বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিরপেক্ষ হলেও, তার আবিষ্কারগুলি বিজ্ঞানমনস্কতার সীমানা নির্ধারক। সাধারণত যেসব বিশ্বাসে বিশ্বাস স্থাপন করলে কিংবা যেসব বিশ্বাসে অবিশ্বাস স্থাপন করলে একজনকে বিজ্ঞানমনস্ক বলা যায়, সেসব বিশ্বাস-অবিশ্বাসগুলি কিন্তু পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনে বিশ্বাস স্থাপন করা বিজ্ঞানমনস্কতার একটি প্রধান লক্ষণ।

বিগত আড়াই হাজার বছরের বিজ্ঞানের ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতা পিছনে রেখে আজ যেসব বিশ্বাস-অবিশ্বস আমাদের কাছে শাশ্বত মনে হয়, প্রাচীন ও মধ্যযুগে একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কাছে তা আশা করা ইতিহাস সম্মত নয়। তবুও সেই প্রাচীন ও মধ্যযুগে যারা প্রকৃতিবাদী বা বস্তুবাদী বলে প্রতিপক্ষ সমাজপতিদের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন, তাঁরাই ছিলেন সে সময়ের বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি। সেযুগে তাঁরাই ছিলেন প্রগতিবাদী। এ্যানাক্সোগোরাসের (৫০০-৪২৮ খ্রিঃ পূঃ) বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহীতার অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছিল। এথেন্স থেকে তিনি পালিয়ে বাঁচেন।[১২] তাঁদের বিজ্ঞানমস্কতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা গেলেও একথা তো মিথ্যা নয় যে বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী দর্শনের ক্রমবিকাশের মহাসড়কে তাঁরা চিরস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন। থেলিস, এ্যানাক্সিমেন্ডার, এ্যানাক্সিমিনস, এ্যানাক্সেগোরাস, জেনোফেন প্রমুখ যাঁদের হাতে গ্রিক দর্শন ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়েছিল, তারা সবাই ছিলেন বস্তুবাদী। তখনকার ধর্মীয় বিশ্বছবির মধ্যে বাস করেও তাঁরা ইহজাগতিক ঘটনাবলীর মধ্যেই ইহজাগতিক/প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন অনুসন্ধানে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন, এটা কম বড় কথা নয়। পরবর্তী গ্রিক দার্শনিকদের অনেকেই এঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে মহাজ্ঞানী প্লেটো এরিস্টটল দু'জনই আছেন। প্লেটো প্রকৃতিবাদী বিশেষ করে ডেমোক্রিটাসের সমস্ত লেখা পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন।

৬.

সমাজ পরিবর্তনের সেই যুগসন্ধিক্ষণে যখন পারিবারিক 'ক্রীতদাসপ্রথা' একটি সুনির্দিষ্ট মূল অর্থনৈতিক কাঠামোয় রূপান্তরিত হচ্ছে, সেই সময় ধর্মের সাথে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সংঘর্ষ তুঙ্গে ওঠে। জয় হয় ক্রীতদাসপ্রথার পক্ষের দার্শনিকগণের, প্লেটো, এরিস্টটল প্রমুখের। কিন্তু সে সংঘর্ষ থেমে যায়নি। পরে এপিকিউরাস, লুক্রেশিয়াস প্রমুখ প্রকৃতি বিজ্ঞানী ধর্মীয় দর্শনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান। আবার ক্রীতদাস অর্থনীতির ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যখন সামন্তবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্ম হচ্ছে তখনও সমগ্র পৃথিবী সংঘর্ষময় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে সংঘর্ষ মূলত ধর্মের সাথে ধর্মের এবং যুক্তির সাথে বিশ্বাসের। সামন্তবাদী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট হল এই

যে, তা অনেকটা বন্ধ্যা। তখন জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার তেমন একটা প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু তের/চোদ্দ শতকে পুঁজিবাদের আগমন বার্তা আর একটি নতুন প্যারাডাইমের জন্ম দেয়; এক নতুন সংঘর্ষের পূর্ব লক্ষণ। প্রগতিশীল ও অগ্রসরমান পুঁজিবাদ সামন্তবাদকে ধ্বংস করার সাথে সাথে বিজ্ঞানের রুদ্ধ দরজা উন্মোচন করে। এবারে সংঘর্ষ বাধে ধর্ম ও ভাববাদী দর্শনের সঙ্গে বস্তুবাদী দর্শন ও তার সর্বোচ্চ রূপ বিজ্ঞানের। সে সংঘর্ষে অশেষ অত্যাচার-নির্যাতনের শেষে বিজ্ঞানেরই জয় হয়। কিন্তু তার আগের দীর্ঘ প্রায় এক হাজার বছরের সামন্তবাদী সংস্কৃতিতে অভিসিক্ত মনে বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সহজে প্রবেশ করতে চায় না। কিন্তু বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব বিজয়রথ এগিয়ে চলে। নতুন নতুন আবিষ্কারে পুরনো পৃথিবীর আদল পাল্টে যায়। মানুষের মনে তা নানা ধরেনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঝড় তোলে একথা ঠিক কিন্তু মানুষের মনটি বিজ্ঞানমনস্কতার জারক রসে ভিজতে অনেক সময় লেগেছে। এমন কি আজও একশ ভাগ বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

আবারও রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হই। ১৩২৮ সালে লেখা তাঁর 'শিক্ষার মেলা' প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, "পূর্বদেশে আমরা যে সময়ে রোগ হলে ভূতের ওঝা ডাকছি, দৈন্য হলে গ্রহশান্তির জন্য দৈবজ্ঞের দ্বারে দৌড়ছি, বসন্তমারীকে ঠেকিয়ে রাখবার ভার দিচ্ছি শীতলাদেবীর 'পরে, আর শত্রুকে মারবার জন্যে মরণ উচাটন মন্ত্র আওরাতে বসেছি, ঠিক সেই সময় পশ্চিম মহাদেশে ভলটেয়ারকে একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'শুনেছি নাকি মন্ত্রগুণে পালকে পাল ভেড়া মেরে দেয়া যায়, সে কি সত্যি?' ভলটেয়ার জবাব দিয়েছিলেন, 'নিশ্চয়ই মেরে ফেলা যায়, কিন্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে সেঁকো বিষ থাকা চাই।' য়ুরোপের কোনো কোণে-কানাচে জাদুমন্ত্রের পরে বিশ্বাস কিছুমাত্র নেই এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে সেঁকো বিষটার প্রতি বিশ্বাস সেখানে প্রায় সর্ববাদিসম্মত।"[১৩] আইনস্টাইনের কথায় 'scientific results' যদি সত্যিই 'entirely independent' হয় 'from religious or moral consideration', তাহলে আমাদের দেশের একজন সফল ডাক্তার একটি অপারেশন করার আগে যে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়েন, তার কোন প্রভাব কি অপারেশনের ওপর পড়ে? অপারেশনের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা কোনমতেই কি নামাজ পড়ার ওপর চাপানো যাবে?

ফ্রান্সিস বেকন 'নোভাম অর্গানম'-এর ৩৮ সিদ্ধান্তে বলছেন "ইতিমধ্যে যে সব বিশ্বাস ও মিথ্যা ধারণা মানুষের উপলব্ধির জায়গাগুলি দখল করেছে এবং মনের মধ্যে দৃঢ় আসন গেড়েছে, মানুষের মনে সত্য প্রবেশের পথে সেগুলো কেবল মহা অন্তরায় হয়ে রয়েছে তাই নয়, সত্য প্রবেশ করলেও বিজ্ঞানের সাথে তা মিশে যেতে পারে না।"[১৪] বেকন এরকম চারটি 'Idol' বা বিশ্বাস চিহ্নিত করেছিলেন। ৪৬ সিদ্ধান্তে তিনি একটি গল্প বলেন। সেই গল্পের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতার একটি সংজ্ঞা দাঁড় করানো যায়। গল্পটি এরকম। 'জাহাজ ডুবির পর কিছু যাত্রী নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল এবং ঈশ্বরের কাছে শপথের তাদের একটি অঙ্কিত চিত্র মন্দিরের দেয়ালে টাঙ্গানো ছিল। সেই ছবিটিকে দেখিয়ে জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হল যে এরপরও কি ঈশ্বরের ক্ষমতা সম্পর্কে তার কোন সন্দেহ আছে? লোকটি উত্তরে চমৎকার জবাব দিয়েছিলেন! বলেছিলেন, "ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার পরও যারা মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের ছবি কই?"[১৫]

৭.

রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধে যেসব কুসংস্কার ও বিজ্ঞান-চেতনা-বিরোধী ঘটনাবলীর বিরুদ্ধে লিখেছিলেন, ৮৮ বৎসর পর তা আমাদের মাঝ থেকে আজও বিলুপ্ত হয়নি। বরং ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও বিজ্ঞান-বিরোধিতা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চাপে আজ তা শাখা, প্রশাখায় বিস্তৃত

হয়েছে। পীর-আওলিয়াদের কেরামতির প্রতি এদেশের উচ্চশিক্ষিতের যে বিশ্বাস, তা মধ্যযুগের ইউরোপের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাই লুই পাস্তুর নিজে অত্যন্ত ধর্মভীরু হওয়া সত্ত্বেও তিনি ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের মিলনের চেষ্টার বিরোধিতা করে লিখেছিলেন, "কেবল বিপথগামী মনই বিজ্ঞানের জগতে ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটাতে চেষ্টা করেন। তাঁরা আরো বেশী বিপথগামী যাঁরা উল্টোটি করেন অর্থাৎ ধর্মের জগতে বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা করেন। কারণ তারা বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে বেশি শ্রদ্ধা করেন।"[১৬]

একজন ব্যক্তি, একজন বিজ্ঞানী যদি বিজ্ঞানমনস্ক না হয় তাহলে সমাজের ও রাষ্ট্রের তেমন কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু একটি সমাজ, একটি রাষ্ট্র কিংবা একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ যদি বিজ্ঞানমনস্ক না হয়; না হয় যুক্তিবাদী, তাহলে সেই সমাজ, রাষ্ট্র বা ধর্ম সম্প্রদায়ের সমূহ বিপদ অনিবার্য। এ বিষয়ে দুটি কথা বলে শেষ করবো। ৮ম, ৯ম ও ১০ম শতকে মুসলমানদের বিজ্ঞান-তৎপরতার কথা আমরা আজও গর্বভরে উচ্চারণ করি। তারপর কেন আমরা হারিয়ে গেলাম, সেকথা মুসলিম আলেম সম্প্রদায় খুব কমই আলোচনা করেন। তাঁরা কেবল অতিতের তিনশ বছরের স্বপ্ন দেখেন। প্রফেসর আবদুস সালাম, বিশ শতকের একমাত্র মুসলিম নোবেল-বিজয়ী বিজ্ঞানী এ নিয়ে প্রচুর ভেবেছেন এবং লিখেছেন। তেমনি একটা লেখা 'Islam and Science' ১৯৮৪ সালে লিখেছিলেন,

"Of the major civilizations on this planet, science is the weakest in the Islamic Commonwealth. Unfortunately, some of us Muslims believe that while technology is basically neutral, and that its excess can be tempered through the adherence to the moral precepts of Islam, science - on the contrary – is value-loaded. It is believed that modern science must lead to 'rationalism', and eventually apostasy; that scientifically trained men among us will 'deny' the metaphysical presumptions of our culture."[১৭]

মুসলমানদের ভয় বিজ্ঞান পড়লে তাদের মধ্যে যুক্তিবাদের প্রসার ঘটবে, একসময় তারা ধর্ম ত্যাগ করতে পারে, আমাদের ধর্মের আধিভৌতিক সিদ্ধান্তগুলি অস্বীকার করতে পারে। সালাম সেদিন যা বলেছিলেন তা মিথ্যা নয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৮৩ সালে কুয়েতে অনুষ্ঠিত ইসলামি বিজ্ঞান সম্মেলনে। আরব ভূমির ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা সেখানে ইসলামি বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পথে বাধাগুলি শনাক্ত ও তা দূর করার জন্য মিলিত হয়েছিলেন। কিন্তু আলোচনা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে একটি প্রশ্নকে ঘিরে, 'Is Science Islamic?' The Saudis held that pure science tend to produce 'Mu'tazilite tendencies' potentially subversive of belief. Science is profane because it is secular; as such – it goes against Islamic beliefs."[১৮] মুতাজিলা সম্প্রদায়ের প্রতি সাচ্চা মুসলমানদের ক্ষোভ এখনও নিরসন হয়নি। বিজ্ঞানে যা কিছু অবদান ঐ তিনশ বছরে তার সবটাই মুতাজিলা সম্প্রদায়ের মানুষের। ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ সবাই মুতাজিলা ছিলেন - যুক্তিবাদী। সেদিন যুক্তিবাদকে টুটি চেপে হ্যা করার পরিণতি মুসলমানরা আজও ভোগ করছে। সালামের কথা দিয়েই লেখাটি শেষ করি। তিনি বলেছেন,

"religious orthodoxy and the spirit of intolerance are two of the major factors responsible for killing the once flourishing enterprise of science in Islam."[১৯]

তথ্যনির্দেশনা

সূচনাবক্তব্য

১. Thomas S. Kuhn, 'The Structure of Scientific Revolutions', The University of Chicago Press, 2nd Edition, 1970, USA.

২. Semyon Mikulinsky, History of Natural Science As A Science: Present State and Theoretical Problems 'Soviet Studies in the History of Science', USSR Academy of Science Moscow, 1977, p.8

৩. George Sarton, 'History of Science : Ancient Science Through The Golden Age of Greece', Harvard University Press, Cambridge, 1959.

৪. J. D. Bernal, 'Science in History', 4 Volumes, Penguin Books, 1969

৫. George Sarton, প্রাগুক্ত, p. 3.

৬. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য প্রচুর বই আছে। তার মধ্যে – a. Emile Durkheim এর 'The Elementary Forms of The Religious Life', The Freepress New York, 1965; b. Sir James Frazer এর 'The Golden Bough : A History of Myth and Religion', Chancellor Press, 1994, Great Britain; c. V. Gordon Child এর 'Man Makes Himself', Walts & co., 39, Parker Street, London, WC2, 1965 ও 'What Happened in History', Penguin Books 1937; d. Lewis Henry Morgan, 'Ancient Society : Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization', First-published in 1877, Macmilan & co. London; e. F. Engles, 'The Origin of the Family, Private Property and the State (1884), Collected Work of Marxs & Engles, Progress Publishers, Moscow; f. A.S. Bogomolov, History of Ancient Philosophy, Progress Publishers, Moscow, 1985.

৭. এই আংশের জন্য দেখুন Gordon Child এর 'What Happened in History'র অনুচ্ছেদ X, Government, Religion and Science in the Iron Age, পৃষ্ঠা 204 – 229.

৮. M. Rosenthal and P. Yudin, 'A Dictionary of Philosophy', Progress publisher, Moscow, 1967, p. 485.

৯. সমরেন্দ্রনাথ সেন, 'বিজ্ঞানের ইতিহাস', শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা, জনুয়ারী ১৯৯৪ পৃ: ২২৭-২২৯.

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ', রবীন্দ্ররচনাবলী – ১৪, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৪০৪

১১. Stella Van Patten Henderson, 'Introduction to Philosophy of Education', The University of Chicago Press, Chicago & London, 1947, p. 9

১২. Steve Bruce, 'Religion in the Modern World: from Cathedrals to Cults', Oxford University Press, Oxford & New York, 1996, p. 25

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা

১. Pervez Hoodbhoy, 'Islam and Science: Religious Orthodoxy and The Battle for Rationality', Zed Book Ltd, London and New Jersey, 1991, Forward by Mohammed Abdul Salam, X

২. ঐ, পৃষ্ঠা Forward IX

৩. Albert Einstein, 'Religion and Science: Irreconcilable? In Ideas and Opinions', Rupa Co., 20th impression 2005, p. 52

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কলাবিদ্যা', রবীন্দ্ররচনাবলী, পঞ্চদশখন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০০, পৃষ্ঠা ৮৭১

৫. V. I. Lenin, 'Collected Works vol-14, Materialism and Empirio-Criticism, Progress Publishers, Moscow, 1972, p. 53

৬. ঐ

৭. ঐ, পৃষ্ঠা – ৭৫

৮. কার্ল পপার : নির্বাচিত দার্শনিক রচনা – প্রথম খন্ড, ভাষান্তর : আমিনুল ইসলাম ভুইয়া, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০০৭, কার্ল পপার : ক্ষান্তিহীন অন্বেষী, পৃ. ছাব্বিশ.

৯. Steven Weinberg, 'The First Three Minutes: A Modern View of the Origin of Universe', Flemingo, 1993, p. 14-15

১০. ঐ, পৃষ্ঠা – ১৭

১১. শহিদুল ইসলাম, 'বিজ্ঞানের দর্শন (প্রথম খন্ড)', শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, ২০০৫, পৃষ্ঠা ২০৩

১২. M. Rosenthal and P. Yudin, 'A Dictionary of Philosophy', Progress Publishers, Moscow, 1967, p. 19

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষার মেলা', রচনাবলী চতুর্দ্দশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃ. ৩৮৯

১৪. শহিদুল ইসলাম, 'বিজ্ঞানের দর্শন (দ্বিতীয় খন্ড)', শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, ২০০৭, পৃ. ৩৫

১৫. ঐ, পৃ. ৩৮

১৬. ঐ, 'বিজ্ঞানের দর্শন (১ম খন্ড), শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, ২০০৫, পৃ. ২৩৯

১৭. 'Ideals and Realities : Selected Essays of Abdus Salam', Editor : C. H. Lai, World Scientic Publishing Co. Pvt. Ltd., Singapore, 1987, p. 183

১৮. Pervez Hoodbhoy, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

১৯. ঐ, পৃ. Forward p. IX

ড. শহিদুল ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। সর্বাধিক আলোচিত প্রকাশিত গ্রন্থ : *বিজ্ঞানের দর্শন*, দুই খণ্ড, শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, ঢাকা। প্রবন্ধটি ২৮ জুন ২০০৯, রবিবার, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশে 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা' শিরোনামে পঠিত।

ধর্ম চেতনা ও ঈশ্বর-বিশ্বাস
ওয়াহিদ রেজা

১

আদিম বা আদম মানব মানব গোষ্ঠীর প্রারম্ভিক যুগে পৃথিবীতে না ছিল কোনো ঈশ্বর, না ছিলো কোনো ধর্মের অস্তিত্ব। মানুষের মন থেকেই ধর্মের জন্ম, ঈশ্বর নামক অদৃশ্য অলীক ব্যক্তিটির গর্ভপাত। তারপরও মানুষ তার অ-মানুষ স্তর থেকে মানুষের অবস্থায় বিবর্তিত হওয়ার কালে কেন বা কি করে ধার্মিক হয়ে উঠলো এবং আজ পর্যন্তই বা কেন ধর্মবিশ্বাসকে আগলে রেখেছে, কোন নিয়মে বা কোন প্রয়োজনে মানুষ তার আদিম জীবনের স্থুল ধর্মীয় ধারণাকে পরবর্তী যুগে উচ্চতর মার্জিত রেূপ দান করেছে এ প্রশ্নের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত উত্তরটিতে যে কথাগুলো উঠে আসে, তা হলো সম্প্রদায়ের আধিপত্য বিস্তার ও ধর্মীয় চেতনার ধোঁয়ার অস্পষ্টতায় ক্ষমতার লিপ্সা । অর্থাৎ প্রভুত্ব। ধর্মীয় মৌলবাদের রাজত্ব। অরাজকতা। মানবতার অবমূল্যায়ন। মানুষের স্বাধিকার হরণের একচ্ছত্র শোষণ।

আজ ঐতিহাসিকভাবে এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত কোনো ধর্মই রক্তপাতহীন প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। সব ধর্মেরই প্রাতিষ্ঠানিকতার পবিত্র হাতে লেগে রয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তের দাগ। ধর্ম তার এই তথাকথিত অগ্রগতির সঙ্গে নিজের যথার্থতা নিরূপণের জন্য অতীয়ন্দ্রিয় সত্তার সমর্থন ব্যতীত ধর্ম স্বপ্নের অর্থহীন শিল্পকলায় বা একটি সুন্দর মায়ায় পর্যবসিত হয়। বিস্তৃত বিশ্বজগতের অন্তর্নিহিত সত্তার সঙ্গে রয়েছে ধর্মবোধের চিরবৈরিতা। আজ বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী দর্শনের ক্রমউৎকর্ষকালে মানুষের মৌলিক মেধা, মনন ও জ্ঞান চর্চা যখন প্রতি পদে পদে সকল রকম কুসংস্কার ও অন্ধত্বের কালো পর্দা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বিশ্বমানবতার সার্বজনীন ঊষার আলোমুখি ধাবমান তখন ধর্মের অন্তঃসার শূণ্যতা ও ধর্মবোধের অযথার্থতা যে আগামী একদিন প্রমাণিত হবেই এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। তখন ধ্বংস হয়ে যাবে ধর্মের ভীতিকর অলীক ঈশ্বরতত্ত্ব। ধুলায় মিলিয়ে যাবে ধর্মীয় লোভ ও বিভীষিকার তথাকথিত স্বর্গ-নরকের পরলৌকিক বাগাড়ম্বর।

মানুষের জ্ঞান বিকাশের প্রাথমিক স্থরটি ছিল ভয়, সংশয়, দ্বিধা, দ্বন্দ্বের অধ্যায়। প্রাকৃতিক বিবর্তন, আলোড়ন, দুর্যোগ ইত্যাদি এ সবের মূল কারণ। তৎকালীন সময় অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগে এ সমস্ত প্রাকৃতিক কার্যবিধির যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা-হীনতারই একমাত্র কারণ, অবলম্বন বা ধারণাই মানব মস্তিষ্ককে বাধ্য করেছে অতীন্দ্রিয় বা অলৌকিক নামক ভুয়া সংশয়ের কাছে আত্মসমর্পণে। যার ধারাবাহিক অনিবার্য ফলশ্রুতি হলো ধর্মচেতনা। আর এই ধর্মচেতনাই হয়ে দাঁড়িয়েছে পরবর্তী উন্নত মানুষের মৌলিক উন্নতির প্রধান অন্তরায়। পুরাকালে এই মতের সমর্থক ছিলেন এপিকিউরীয় দার্শনিকগণ এবং ল্যাটিন কবি ল্যুক্রেটিয়াস। তাঁরা ধর্মবিশ্বাসকে কুসংস্কারের যমজভাই বিবেচনা করতেন। পেট্রোনিয়াসের বিখ্যাত একটি পংক্তিতে এই মতের সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যায়। Primus in orbe deos facit timor (প্রাথমিকভাবে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য ভয়

থেকে এসেছে)। আধুনিককালে হিউম ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের উৎস হিসেবে ভয়ের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি আরো একটি কথা যোগ করে দিয়েছেন- ঈশ্বরের প্রতি ভয়, তাঁর সদিচ্ছা লাভের রূপ পরিগ্রহ করে। আধুনিককালে অনেক বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী, যেমন রিবট এই 'ভীতির মতবাদ'কে সমর্থন করেন। আদিম অবস্থায় ধর্মে ভয়ের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একটি রহস্যময় শক্তিতে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মচেতনা। ধর্মীয় মনোভাব হলো অধিকতর শক্তিশালী কোনো অদৃশ্য ব্যক্তির নিকট আত্মসমর্পণ। একেশ্বরবাদী ধর্ম বিশ্বব্রহ্মান্ডের অনন্ত শক্তিকে একজন ব্যক্তি হিশেবে চিন্তা করে। আর সেই অদৃশ্য ব্যক্তিটিই হলেন ঈশ্বর বা আল্লাহ। এটি অবশ্য উন্নত ধর্মচেতনার আধুনিক পরিণতি। প্রাথমিক স্তরে আদি টোটেম ছিলো তার প্রতীক। রবার্টসন স্মিথ এই মত দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেন। তাঁর বহু পরিচিত একটি অনুচ্ছেদ এখানে উদ্ধৃত হলো, 'আদিম মানুষেরা অসংখ্য বিপদের দ্বারা নিজেদের পরিবেষ্টিত বলে মনে করতো, সঠিকভাবে তারা বিপদটা কি জানতো না; কিন্তু অদৃশ্য কোনো ব্যক্তির রহস্যময় শক্তিই যে বিপদের (প্রাকৃতিক দুর্যোগ) কারণ এমন একটা উপলব্ধি বা ধারণা তাদের মধ্যে জন্ম লাভ করে। এবং এই উপলব্ধি থেকে তারা বুঝতে শেখে যে সেই অদৃশ্য ব্যক্তি মানুষের চেয়েও অধিকতর শক্তিশালী ' (W. R. Smith, The Religion of Semites, P. 55)। মূলত এই প্রাচীন উপলব্ধি বা ধারণা থেকেই ঈশ্বর ও ধর্মচেতনার আদি অঙ্কুরের বিকাশ। ধর্মবোধের আদি অবস্থা থেকে আধুনিক ধর্মচেতনা ভয়-ভীতি প্রদর্শনের ভূমিকা যে লুপ্ত হয়ে যায়নি তার পরিষ্কার দৃষ্টান্ত হলো বাইবেল ও কোরান। ওল্ড টেষ্টামেন্টের জনপ্রিয় নীতি হচ্ছে, 'প্রভুর প্রতি ভয়ই হলো জ্ঞানলাভের সূচনা' (eg Ps. exi.10. Prov. ix. 10) এবং নিউটেষ্টামেন্টে মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এই বলে, 'ঈশ্বরকে স্বীকার করে নিয়ে উপাসনা করো কিন্তু ঈশ্বর হিসেবে তাঁকে ভয় ও শ্রদ্ধা করো' (Heb. xxii-28, Moffe- এর অনুবাদ)। ভয় + শ্রদ্ধা? না মনোবিজ্ঞান আজ এ কথাটি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ভয় থেকে কখনো প্রকৃত শ্রদ্ধাবোধ জন্মাতে পারে না। তবে বাইবেলের চেয়ে কোরান ভয় প্রদর্শনে অত্যধিক তীক্ষ্ন ও শাণিত। কোরানের আল্লাহ চক্ষু রাঙিয়ে পাতায় পাতায় ভয়-ভীতির তর্জনী উঁচিয়ে রেখেছেন মানুষের প্রতি! তিনি একদিকে নিজেকে পরম দয়ালু ও অন্যদিকে চরম নিষ্ঠুর দাবি করেন। কিন্তু প্রকৃত দয়ালু যে কখনো নিষ্ঠুর হতে পারেন না এর বিশদ ব্যাখ্যার কী কোনো প্রয়োজন আছে?

ধর্মচেতনার সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্কের চেয়ে অন্ধ আবেগ, অনুভূতির সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠতর এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এর পেছনের মূল ভিত্তিটি হলো- বিশ্বাস। আর বিশ্বাস হচ্ছে প্রশ্নহীন, যুক্তিহীন, বুদ্ধিবিবেচনাহীন একটি বিষয়। জগৎ যেভাবে দৃশ্যমান ঠিক সেই ভাবে ধর্মীয় চেতনা জগতকে গ্রহণ করে না। ধর্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে একটি অফুরন্ত, অপার্থিব শক্তির অস্তিত্ব অনুমান করে। অতীন্দ্রিয় জগতের প্রতি ধর্মের যতোটা আস্থা রয়েছে পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতি ততোটা নেই (এটা প্রমাণ করতে বেশি দূর দৌড়ুনোর প্রয়োজন নেই, আজকের ধর্মীয় মৌলবাদী রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর কথাবার্তা, কার্যকলাপ লক্ষ করলেই এর সত্যতা পাওয়া যাবে)। ধর্ম বিশ্বাস করতে শেখায় সেই অতীন্দ্রিয় অপার্থিব জগৎ যা মানুষের সকল প্রত্যাশা পূরণ করতে সমর্থ। এটা সম্পূর্ণই একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস। আর এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে অবলম্বন করেই জগতে বিচরণ করছে অধিকাংশ মানুষ। এবং এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে পুঁজি করেই ধর্মীয় ব্যাখ্যাকারগণ যুগ যুগ ধরে মানুষকে ধর্মচেতনার আজগুবি অতীন্দ্রিয় জগতের লোভ প্রদর্শন করে বিপথগামী করেছে, অর্থাৎ মানুষের মৌলিক

বিকাশ ও মানবতার স্বতঃস্ফুর্ত বহিঃপ্রকাশকে রুদ্ধ করে রেখেছে, কল্পনাপ্রবণ এই সব চিন্তাবিদদের অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ আরোহমূলক ধর্মীয় ব্যাখ্যাকে অকারণ বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভন্ডামি বলা যেতে পারে। প্লেটোর সম্পর্কে জুবার্ট যেমন অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তার অনুকরণে ম্যাথু আর্নল্ড শেলির সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছিলেন এই বলে যে, 'এক সুন্দর কিন্তু নিষ্ফল দেবদূত। সে তার দ্যুতিময় পাখা মহাশূন্যে বৃথাই আন্দোলন করেছিলো'। বাক্যটি একটু ওলট পালট করে আমরা কল্পনাপ্রবণ ধর্মীয় ভাববাদী ও পান্ডাদের সম্পর্কেও প্রয়োগ করতে পারি। তারাও তাদের পাখা (ধর্ম প্রতিষ্ঠা পাবার আগেই) মেলে দিয়েছিলেন কল্পনারাজ্যের মহাশূন্যে। সেখানে কোনো বায়ুমন্ডল নেই। যদিও থাকে তা এতোই লঘু যে কেউ তাতে পাখা উড়ে যেতে পারে না। এই কল্পনার সঙ্গে ঐতিহাসিক রূঢ় বাস্তবতার কোনো মিল নেই।

কোঁতে তাঁর 'Religion of Humanity' গ্রন্থে বলেছেন, 'ধর্ম হলো মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত একটি কৃত্রিম সৃষ্টি'। কিন্তু এই কৃত্রিমতা যে ক্রমান্বয়ে মানুষের মেধায় ও মননে বায়বীয় এক অকৃত্রিমতার রূপ লাভ করেছে এ কথা অস্বীকার করা যাবে না। ধর্ম তাই এক ধরনের অতীন্দ্রিয় বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রতিটি ধার্মিকের কাছে। আর ধার্মিক মাত্রই বিশ্বাসী। আর বিশ্বাস মাত্রই প্রশ্ন-যুক্তি-আকাংক্ষাহীন বিষয়। বিজ্ঞান বুদ্ধিভিত্তিক। বিজ্ঞান প্রশ্ন-যুক্তি-কৌতহল-আকাংক্ষার সমন্বয়। কিন্তু ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় বুদ্ধির ভূমিকা গৌণ। প্রশ্ন-যুক্তি নিষিদ্ধ। ধর্মের সঙ্গে বুদ্ধি অপেক্ষা কাল্পনিক অনুভূতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। ধর্ম অপার্থিব শক্তিতে বিশ্বাসী। সে অপার্থিব শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করে। এবং বুদ্ধিনিরপেক্ষ অনুভূতির সাহায্যে ধর্ম পরম সত্তাকে উপলব্ধি করতে চায়। এর কোনোটিই বিজ্ঞানের কাজ নয়। এর কোনোটিই বিজ্ঞান সমর্থন করে না। তাই ধর্মকে এখন অবশ্যই বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী দর্শনের আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

'মানুষের ইতিহাস হলো প্রকৃতপক্ষে ধর্মের ইতিহাস'-মানব সভ্যতার মূলের দিক থেকে বিচার করলে ম্যাক্সমূলারের এই উক্তিতে খুব একটা অতিশয়োক্তি নেই। কারণ এমন কোনো আদিম মানব গোষ্ঠী বা সমাজ ছিলো না যেখানে অজ্ঞতা থেকে ধর্মের ধারণা প্রথম সৃষ্টি লাভ করে নি। অবশ্য আজকের সুসংগঠিত, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতের সঙ্গে আদিম ধর্মমতের পার্থক্য ছিলো অনেক। ধর্মের প্রথম উৎপত্তিও ক্রমবিকাশের প্রশ্নটি ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। আর তারপরই ধর্মের স্বরূপ ও কার্যাবলী পর্যবেক্ষন করা সম্ভব। কিন্তু এ ধরনের একটি সীমিত রচনায় তার বিশদ আলোচনা অসম্ভব। এখানে কেবল মানুষের প্রাচীন ধর্মবোধ থেকে বর্তমান ধর্মবোধের উন্নত অবস্থা লাভের একটি সংক্ষিপ্তসার টানা যেতে পারে যা কোনোভাবেই পূর্ণাঙ্গ নয় –

> 'ধর্ম একটি অত্যন্ত জটিল বিষয়। একে কোনো একটি মাত্র সামাজিক রীতির বৃদ্ধি বা বিস্তৃতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। যতোই আদিম রূপের হোক না কেন কোনো উপাসনা কোনো একটি মাত্র চিন্তার বা একটি মাত্র আবেগের প্রকাশ বলা যায় না। বরং ধর্ম হলো (মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তনশীল ধারার বহু বহু পূর্বের) অনেকগুলো জটিল ও শক্তিশালী চিন্তার সৃষ্টি' (M. Jastrow, The Study of Religion, P. 185)।

মানুষের মনেই ধর্মের জন্ম। জ্ঞানের ঊষালগ্নে মানুষের জীবনের উপর ব্যাখ্যাহীন প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। এই শক্তির অস্তিত্ব অনুমানের ফলে মানুষের মনে যে আবেগ জন্মেছিলো তার থেকেই ধর্মচেতনার উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন যুগের মতো আজকের স্বঘোষিত উন্নত ধর্মগুলোও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে মানুষের বিশ্বাসের প্রশ্রয়ে অলীক জগতের হাতছানি দেয়; ঈশ্বর, দেব দেবী, জীন, ফেরেশতা, স্বর্গ, নরকের গপ্পো শোনায়, আত্মা অমরত্বের লোভ দেখিয়ে উর্বর মানব মস্তিষ্কের বিকলাঙ্গতা ঘটায়। সালোমন রেইনখ ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'আমি এইভাবে ধর্মের সংজ্ঞা দিতে চাই- আমাদের কর্মদক্ষতার স্বাধীন প্রকাশকে বাধাদান করে যে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তার সমষ্টিকেই ধর্ম বলে' (Salomon Reinach Orepheus [E. Tr. 109] p.3)। এ কথা অনস্বীকার্য যে অযৌক্তিক বিধি-নিষেধ প্রগতির পরিপন্থী। খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলাম ধর্ম উভয়ই প্রগতীর পরিপন্থী। তারপরও এদুটি ধর্মের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ আজ এতোটা স্ফীত কেন? এর জবাব খুঁজতে যাবার আগে ধর্মের ইতিহাস একটা নিরবিচ্ছিন্ন প্রগতির ইতিহাস এরকম অনুমান করা থেকে বিরত থাকতে হবে, পরিবর্তে শোষণ, প্রভুত্ব, ক্ষমতালোলুপতার ধারাবাহিক ইতিহাসের কথাটি মাথায় রাখতে হবে। কারণ অনেক পুনরাবৃত্তি, অবক্ষয়, অসভ্যতা ও কুসংস্কারের জটিল আবর্তনের কাহিনী রয়েছে ধর্মের ইতিহাসে। যুগে যুগে প্রগতি যখন এক জায়গায় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে অন্যত্র তখন সে পরিবর্তনের পথে বিকশিত হয়ে নতুন পথ আবিস্কার করে নিয়েছে। ঐতিহাসিক ভাবে চিহ্নিত ধর্মের আদিম যুগের *ফেটিশবাদ* কোনোভাবেই প্রগতি নয়। এটা প্রত্যাবর্তন বা পশ্চাৎগতির নিদর্শন। Fetish কথাটি এসেছে পর্তুগীজ Feitico শব্দ থেকে। Feitico শব্দের অর্থ হলো মুগ্ধ হওয়া বা বিস্মিত হওয়া। আবার Feitico শব্দ এসেছে ল্যাটিন Factitius শব্দ থেকে। Factitius শব্দের অর্থ হচ্ছে কৃত্রিম। অবশ্য মধ্যযুগে ল্যাটিন এই শব্দটির অর্থ ছিলো - ঐন্দ্রজালিক। পশ্চিম আফ্রিকার আদিবাসীদের উপাস্য-বস্তুকে উল্লেখ করার জন্য পঞ্চদশ শতকের পর্তুগীজ নাবিকেরা এই শব্দটি ব্যবহার করতো। ফেটিশ একটি জড় পদার্থ। আত্মা বা রহস্যময় শক্তির এটি আবাসস্থল। অন্তত কিছু সময়ের জন্য এই বস্তুটির উপর আত্মা ভর করে বলে বিশ্বাস করা হতো। সেই জন্য জড় বস্তুটিকে উপাসনা করা হতো এবং সৌভাগ্য লাভের চেষ্টা হতো। প্রাকৃতিক বস্তু হিশেবে ফেটিশের নিজস্ব কোনো মূল্য ছিলো না। যে আত্মা তাতে বসবাস করে বা এসে অবস্থান করে সেই আত্মার গুণে মূল্যায়ন হতো ফেটিশের। হয়তো কোনো অদ্ভুত-দর্শন প্রাকৃতিক জিনিস, যেমন অস্বাভাবিক একটা পাথর কিংবা লাঠি, অথবা হাড় বা নখ প্রথম মানুষের মনযোগ আকর্ষণ করতো। তারা ভাবতো হয়তো এখানে অপার্থিব কোনো শক্তি থাকতে পারে। এই ভাবনা থেকে তারা উপাসনা করতে শুরু করে।

ফেটিশের কাছে উৎসর্গ ও প্রার্থনা করা হতো। কিন্তু যদি দেখা যেতো তাতে কোনো লাভ হচ্ছে না তখন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আকাংখিত বস্তুটি চাওয়া হতো। তাতেও না পাওয়া গেলে আদেশ করা হতো। কিন্তু তারপরও যদি আকাংখিত বস্তুটি পাওয়া না যেতো তখন শুরু হতো গালাগালি। এমন কি চাবুকও মারা হতো ফেটিশকে। কিন্তু যদি তাও ব্যর্থ হতো তখন ধরে নেয়া হতো জিনিসটিকে ছেড়ে আত্মা চলে গেছে। প্রয়োগবাদের আদিমতম রূপটি সম্ভবত এখানে প্রকাশ পেয়েছে। একটি ফেটিশ থেকে যতক্ষন কাজ পাওয়া যায় ততক্ষন সে পবিত্র। নইলে দাও আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে। অবশ্য এর ফলে ফেটিশকদের সমাপ্তি ঘটছে না। একটা ফেটিশ গেলে নতুন আরেকটা বস্তুকে ফেটিশ হিশেবে গ্রহণ করা হতো। স্পষ্টতঃ ফেটিশবাদ অত্যন্ত

অনুন্নত মানের ধর্ম। ফেটিশ একটি ব্যক্তিগত দেবতা। অসভ্যরা নিজেদের নির্দেশে তাকে কাজ করতে বাধ্য করতো। এই ধারণা ব্যক্তিগত এবং খামখেয়ালী চিন্তার এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

এবার আরো একটি ধর্মীয় মানের অধোগতির বিষয় বলা যেতে পারে। ফেটিশবাদের মতো বহু আত্মা উপাসনাবাদও (Polydoemonism) ধর্মীয় মানের আধোগতির নিদর্শন। সমগ্র চরাচর অসংখ্য আত্মায় পরিব্যাপ্ত। মানুষ প্রতি মুহূর্তে নিজেদের সুবিধা বা অসুবিধার জন্য তাদের উপস্থিতি বুঝতে পারে। স্বপ্ন থেকে যে এই ধারণার উৎপত্তি হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আদিম মানুষের কাছে স্বপ্নের অভিজ্ঞতা জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতার মতোই বাস্তব ছিলো। তারা আত্মাকে নিজেদের অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট প্রতিরূপ বলে ভাবতো। ঘুমের সময় আত্মা দেহ ছেড়ে ঘুরে বেড়ায় আবার জেগে উঠার আগে দেহে ফিরে আসে- এই ভাবে তারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতো। স্বপ্ন এবং মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য হলো স্বপ্নে আত্মা ফিরে আসে কিন্তু মৃত্যু হলে আত্মা আর দেহে ফিরে আসে না অথবা বলা যেতে পারে আত্মা দেহে না ফিরে এলে মৃত্যু হয়। আদিম মানুষ নিজেদের আত্মার মতো তার চারপাশের জীব ও জড় সব কিছুর মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করতো।

ফেটিশ শ্রেণীকে বাদ দিয়ে জগতের এই অসংখ্য আত্মাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত- নদী, পর্বত, সমুদ্র, গাছ, পাথর, পাখি, সাপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক জিনিসের আত্মার কল্পনা। এসবের নির্বাচিত আত্মাগুলোকে আদিম মানুষেরা নিজেদের চেয়ে শক্তিশালী মনে করতো। অন্তত এদের অনিস্ট করার ক্ষমতা যে বেশি সেটা তারা বিশ্বাস করতো। দ্বিতীয় শ্রেনীর আত্মা হলো মৃত মানুষের আত্মা। মৃত্যুর পর আত্মা বেঁচে থাকে এরকম এরকম অলীক ধারণা যে আদি মানুষদের মধ্যে ছিলো (আজও অনেকের মধ্যেই আছে) তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মৃত্যুর ফলে আত্মার ভালো বা মন্দ করার ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় বলে তারা বিশ্বাস করতো। পূর্বপুরুষদের উপাসনা সকল অসভ্য সমাজে প্রভূত বিস্তৃতি লাভ করেছিলো। তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছে বিশাল প্রাকৃতিক (সৌর কেন্দ্রিক) বস্তুগুলোর আত্মাকে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্তিকরণ। যেমন আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি একসময় মানুষের উপাস্য হয়ে উঠেছিলো। মানুষের ধারণা যখন কিছুটা উন্নত হয়েছিলো তখন তাদের মনযোগ গেলো এই বিশাল প্রাকৃতিক জিনিসগুলো সম্পর্কে। এন্ড্রু ল্যাঙ্গে তাঁর Making of Religion গ্রন্থে বলেছেন,

> ‘সর্বপ্রাণবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অসভ্য মানুষেরা বিশ্বব্রহ্মান্ডে অসংখ্য আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করলেও তারা সংজ্ঞার সাহায্যে একজন পিতার বা সবকিছুর স্রষ্টার কল্পনা করতো। তিনি আদি। অন্যান্য সাধারণ আত্মা অপেক্ষা তাঁর স্থান উর্ধ্বে। সেই আত্মার এতোদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, অসভ্যদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টধর্মালম্বীদের মতোই একেশ্বরবাদী ছিলো। তাদেরও একজন পরমেশ্বর ছিলেন’ (Andrew Lange ; The Making of Religion, P. 167)।

একথা হয়তো সত্য যে সমস্ত কিছুর অস্পষ্ট পশ্চাৎপটে একজন পরমেশ্বরের ধারণা অসভ্যদের মধ্যে একেবারে অপরিচিত ছিলো না। সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী আদিম মানুষ অনুভব করতো যে শত্রুভাবাপন্ন অসংখ্য আত্মার দয়ার উপর নির্ভর করে তাদের বাঁচতে হয়। তাই তারা সেই আত্মাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতো।

আত্মার সংখ্যা যতো বেড়ে যেতো তাদের সম্পর্কে ভয়ও ততো বাড়তো। এভাবেই ধর্মে ভয়ের ভূমিকা প্রাধান্য পেয়েছে। অসভ্য মানুষের ধর্মে ভয়ই প্রধান এবং ত্রুটি অসংখ্য।

এদের এই সব অজস্র ত্রুটি এবং স্থূলতা, ছেলেমানুষী এবং অজ্ঞতা থাকার পরও বলা যায় সভ্য মানুষের আত্মার ধারণা অসভ্যদের আত্মার ধারণারই সংস্কৃত রূপ। ই বি টাইলর তাঁর Primitive Culture গ্রন্থের প্রথম খন্ড শেষ করেছেন এই কথা বলে –

> 'আত্মা সম্পর্কিত মতবাদ (সর্বপ্রাণবাদ) ধর্মের দার্শনিক পদ্ধতির একটি প্রধান অংশ। বর্বরদের ফেটিশ উপাসনা এবং সুসভ্য খ্রীষ্টানদের উপাসনার মধ্যে মানসিক সংযোগের যে অবিচ্ছিন্ন ধারাটি রয়েছে তা এই মতবাদের ফলেই সম্ভব হয়েছে। যে বিভেদ বিশ্বের সকল বৃহৎ ধর্মমতগুলোকে পৃথক করে রেখেছে সেই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সুগভীর পার্থক্যের তুলনায় সর্বপ্রাণবাদ এবং জড়বাদের পার্থক্য অনেক বাহ্যিক।'

গোষ্ঠীর রীতি-নীতির প্রতি আনুগত্য থেকে নৈতিক চেতনা বিকশিত হয়েছে। মূলত টোটেমবাদ থেকে এর ধারাবাহিকতা শুরু গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য থেকে যেমন প্রশ্রয় পেয়েছে রক্ষণশীলতা, তেমনি আত্মিক বিশ্বাসের একটি পরিবেশও সৃষ্টি হয়েছে। অনেক সময় কোনো সাধারণ শত্রুর ভয়ে ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলো একত্রিত হতো। আবার কখনো কোনো শক্তিশালী গোষ্ঠী দুর্বলতর গোষ্ঠীগুলোকে জয় করে একটি বৃহৎ জনসমষ্ঠীতে পরিণত হতো। তার ফলে মানুষের মানসিক দিগন্তের বিস্তৃতি ঘটে এবং তার জীবনবোধ হয় গভীরতর। সামাজিক সংগঠনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনায়ও বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। সে সময় থেকেই বহু আত্মাবাদ বহু ঈশ্বরবাদে রূপান্তরিত হয়। আগে যে বহু আত্মা উপাসনা হতো সেই আত্মাগুলোকে কোনোমতে দেবতা বলা যায় না। তাদের কোনো ইতিহাস ছিলো না, ব্যক্তিগত চরিত্র ছিলো না, এমন কি একটা নামও ছিলো না। প্রাকৃতিক সেই আত্মাগুলোই ক্রমশ আধুনিকরণে মনুষ্য গুণসম্পন্ন হয়ে উঠলো। কল্পনা করা হলো, মানুষের মতো তাঁদেরও ভালোলাগা মন্দলাগা রয়েছে, আবেগ উচ্ছ্বাস আছে, তাঁদের আহ্বান করা যায়, এবং তাঁদের একটি নামও রয়েছে। এর অর্থ এই ধরা যাবে না যে, এরপর নদী, গাছ, আগুন, মেঘ, আকাশ প্রভৃতিতে যে সব আত্মা বসবাস করতো তাদের ধারণা শেষ হয়ে গেলো। বরং পূর্বে যে সব স্বর্গীয় দেবতাদের পুঁজো করা হতো না তারাই এসে আত্মার স্থান দখল করে বসলো। প্রকৃত ঘটনাটা কিন্তু অন্য রকম। নতুন কোনো স্বর্গীয় ঈশ্বর তখনো হাজির হয়নি। তাঁর উপস্থিতির আগেই ওইসব প্রাকৃতিক আত্মাগুলো ক্রমশ দেবত্বের মর্যাদা পেতে থাকে। কল্পনা শুরু হয় দেবতারা স্বর্গবাসী। তারপরও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আদিম সম্পর্কটি একেবারে মুছে গেলো না। অবশ্য ধীরে ধীরে দেবতার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক কমে আসতে লাগলো। দেবতারা ক্রমশ নৈতিক ও মানবিক গুণসম্পন্ন হয়ে উঠলেন। তারা একেকজন প্রধান হয়ে উঠলেন রাষ্ট্র ও ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন বিভাগে। যেমন যুদ্ধের দেবতা, ভালোবাসার দেবতা, কৃষি, শিল্প ও সৌভাগ্যের, ঝড়-ঝ3ার আলাদা আলাদা করে দেবতা কল্পিত হলো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বৈদিক 'অগ্নি' আগুনের দেবতা, পারস্যের 'আহুরা' আলোর দেবতা, ব্যাবিলনের 'মার্দুক' এবং মিশরের 'রা' হলেন সূর্যদেবতা, গ্রীসের 'জিউস' এবং ল্যাটিন 'জুপিটার' স্বর্গের দেবতা, জার্মানের 'ওডিন' এবং বৈদিক 'ইন্দ্র'

ঝড়ের দেবতা। এই সব ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বুনিয়াদের উপর আশ্রয় করে ধর্মীয় কল্পনার জাল বুনে দেবতাদের ব্যক্তিত্বের রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক আত্মায় মানবত্ব আরোপ করার ফলেই যে সকল দেবতার সৃষ্টি হয়েছে এই ধারণা ঠিক নয়। মানুষের ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতির মধ্য থেকে এবং উৎসর্গ ও প্রার্থনার দ্বারাও অনেক দেবতার সৃষ্টি হয়েছে। এই ধরনের জাতীয় দেবতার মধ্যে আছেন, যেমন ভারতীয় ব্রহ্মা, মিশরের ওশিরিস, গ্রীসের অ্যাপোলো, ল্যাটিন মার্স, বৈদিক বরুন ও বিষ্ণু, হিব্রু জিহোভা প্রভৃতি। একবার যখন এঁদের ব্যক্তিগত গুন আরোপ করা হলো তখনই তাঁদের মরজগতের উর্ধ্বে, একটা অর্ধেক বাস্তব ও অর্ধেক আত্মিক জগতে স্থাপন করার মানসিক প্রবণতা দেখা দিলো। সেই জগতে দেব-দেবীদের নিয়ে একটি সমাজ কল্পনা করা হলো। আসলে ধর্ম বুদ্ধিধর্মী হওয়ার আগে থেকেই কল্পনা ও আবেগ প্রধান। ধর্ম হলো একরকমের অনুভূতি এবং সেই সঙ্গে চিন্তা ও ইচ্ছার সংমিশ্রণ। যথেচ্ছ কল্পনা অপরিণত চিন্তার প্রকাশ।

জাতীয়ভাবে ধর্ম-বিকাশের ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ গতিভঙ্গি রয়েছে। প্রথমটি দেবতাদের উপর নৈতিক গুন আরোপ অন্যটি একেশ্বরবাদ অভিমুখি যাত্রা। দেবতাদের উপর নৈতিক গুনারোপের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বস্তুর আত্মা সম্পর্কিত ব্যাপারটি বাদ দিতে হবে। কারণ এর কোনো নৈতিক আলোচনা হতে পারে না। কিন্তু যখন আত্মার ধারণা প্রাকৃতিক বস্তুর আওতা ছাড়িয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উর্ধ্বে মোটামুটি একটি অতীন্দ্রিয় জগতে স্থাপিত হলো এবং আত্মাকে মনুষ্যরূপে কল্পনা করা হলো, অন্তত আত্মাকে মনুষ্যগুনসম্পন্ন বলে মনে করা হলো, আর তখুনি প্রশস্ত হয়ে গেলো দেবতাদের মঙ্গলময় ও ন্যায়বান বলে ধারণা করার পথ। এরপর ক্রমশ দেবতারা মানুষের আদর্শ এবং নৈতিক অভিভাবক হয়ে উঠলেন। ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলো তিনি সৎকে পুরুষ্কৃত করেন এবং অসৎকে শাস্তি দেন। তারপর থেকে দেবতাদের নৈতিক জগতের ধারক ও বাহকরূপে কল্পনা করা হতে থাকে। হফডিং বলেছেন,

> ‘প্রাকৃত ধর্ম থেকে নৈতিক ধর্মে উত্তরণকে ধর্মের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হিশেবে যে গণ্য করা হয়তো তা যথার্থ। বহু ঈশ্বরবাদী ধারণার একেশ্বরবাদে পরিবর্তিত হওয়ার ঘটনা অপেক্ষা এই পরিবর্তন অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ’ (H. Hoffding, The Philosophy of Religion, 1906, p. 326)।

এভাবে দেবতাদের নৈতিক গুনারোপ করার কালে এক একজন দেবতা এক একটি গুনের প্রতীক হয়ে উঠেন। বিভিন্ন জাতির কাহিনীতেই এর উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন - ইন্দ্র (বেদ), মার্স (ল্যাটিন), থব (টিউটানিক) প্রভৃতি দেবতারা হয়ে উঠলেন বিশেষ করে সৌন্দর্যের প্রতীক বরুণ (বেদ) ও ওশিরিস (মিশরীয়) হলেন ন্যায় বিচারের দেবতা। পল্লস এ্যাথেনী (গ্রীক) প্রজ্ঞার দেবী, হেসিটা (গ্রীক) সতীত্ব ও গাহর্স্থ্য আদর্শের দেবী, জরথুস্ত্র ধর্মের প্রধান দেবতা আহুরা মাজদা হলেন অমঙ্গলের শত্রু এবং বিশ্বে নৈতিকতার

পরিচালক। খ্রীষ্টপূর্ব ধর্মে ও টেস্টামেন্টেই দেবতাদের সম্পর্কে নৈতিক ধারণা সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছেছিলো।

একেশ্বরবাদে অগ্রগতির ক্ষেত্রে জাতীয় ধর্মে কালক্রমে অনেক দেবতার মধ্যে কোনো একটি দেবতাকে বেশি করে প্রশংসা করার একটি প্রবণতা দেখা যায়। মানুষের সামাজিক জীবনের উপমার সাহায্যে দেবতাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হতো। পৃথিবীর সমাজে একজন রাজা থাকেন, অতএব দেবতাদের সমাজে একজন রাজা থাকা স্বাভাবিক। এরপর আর অন্য দেবতাদের সমান ক্ষমতাসম্পন্ন থাকা সম্ভব হয় না। স্বর্গে একজন প্রধান দেবতার নেতৃত্বে অন্যান্য দেবতাদের প্রাধান্য অনুসারে ক্রমপর্যায়ে সাজানো হলো। উদাহরণস্বরেূপ বলা যায়, গ্রীকের লোকেরা বিশ্বাস করতো- দেবতাদের এবং সকল মানুষের পিতা হলেন জিউস। রোমানদের মতে জুপিটার হলেন প্রধান। ব্যাবিলনে মার্দুক, আসিরিয়ায় অসুর এবং প্রাচীন চৈনিকধর্মে তায়েন (স্বর্গ) এবং সাংতি (দেবতাদের প্রধান) কে প্রধান বলে মনে করা হতো। পৃথিবীর সব জায়গায়, সকল জাতীয় ধর্মে দেবতাদের একটি রাজ্য কল্পনা করার প্রবণতা দেখা যায়। এই ধরনের বিশ্বাসকে দেবতাদের রাজতন্ত্রবাদ বলা যেতে পারে। ম্যাক্সমুলার যাকে একদেব প্রাধান্যবাদ বলেছেন তার মধ্যেও এই এক দেবতার প্রাধান্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।

অন্য আরো একভাবে বহুর ধারণা 'একে' বিলীন হয়ে গিয়েছিলো। চিন্তনের সহায়তায় সকল দেবতাকে এক ঈশ্বরের বহুরেূপে প্রকাশ বলে সিদ্ধান্ত করার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বহু দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করেও একেশ্বরের ধারণা যে লাভ করা সম্ভব তার প্রমাণ প্রাচীন মিশর। প্রাচীন মিশরে সূর্যদেবতাকে সকল দেবতার আত্মারূপে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন - 'আমিই স্বর্গ ও মর্ত্যের স্রষ্টা, ... আমিই সকল দেবতার প্রাণ ..... আমিই সকালের চেপেরা (chepera), দুপুরের রা (Ra) এবং সন্ধ্যার ৎমু (Tmu)।' ভারতেও অনেক বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে এই প্রবনতা নিদর্শন পাওয়া যায়। তার মধ্যে বহু পরিচিত মন্ত্রটি হলো, 'ওগো অগ্নি, তুমি যখন জন্মগ্রহণ করো তখন বরুণ, যখন নিহত হও তখন মিত্র, তুমিই সকল দেবতা।' তিনি এক। মুনিরাই তাঁকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। পরবর্তীকালে উপনিষদের কালে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ব্রহ্মা বা পরমসত্তা এক। পার্থিব জগতের এই বহুত্বের ধারণা ভ্রমজ্ঞান বা মায়া। বহুর মধ্য দিয়ে 'এক' নিজেকে প্রকাশ করেছে। বহু দেবতার ধারণা ও অন্যান্য সব কিছুর মতো এক সত্তার ধারণায় রেূপান্তরিত হয়েছে। ভারতবর্ষে এই একশ্বরবাদ ব্যবহারিক প্রয়োজনে বহু ঈশ্বরের উপাসনা স্বীকার করে নিয়েছে। গ্রীসে এই প্রবণতার বিকাশ হয়েছিলো প্রধানত : জেনোফেনিস, পারমেনিডিস এবং স্টয়িক দার্শনিকদের প্রভাবে। গ্রীসে মানবরূপী বহু ঈশ্বরের ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জেনোফেনিস এক পরম ঐক্যের ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন। ইন্দ্রিয়জ কল্পনার দ্বারা সেই 'এক' কে কখনো জানা সম্ভব নয়। সর্বেশ্বরবাদীদের মতো স্টয়িক দার্শনিকগণও ঈশ্বরকে ব্রহ্মান্ডের আত্মা হিশেবে এবং বিশ্বচরাচরে অন্তর্বর্তী কারণ হিশেবে কল্পনা করেছিলেন।

ধর্মের একেশ্বরবাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল ইস্রায়েলে। পৌত্তলিক ধর্মগুলোতে অতি অল্প সংখ্যক ভাববাদীর অন্তর্দৃষ্টিতে একেশ্বরবাদী ধারণা কখনো কখনো পেয়েছে, কিন্তু কখনোই এটি জনগণের ধর্ম হয়ে উঠতে

পারেনি। পারস্যের জরথুস্ত্র একেশ্বরবাদের কাছাকাছি এসেছিলেন, কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে সব দেবতাদের নির্বাসিত করেছিলেন, জেন্দ আভেস্তায় তাঁর উত্তরাধিকারীরা সেই সব দেবতাদের পূনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইস্রায়েলের সূচনায়ও প্রকৃত অর্থে একেশ্বরবাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সেখানে জাতীয় জীবনের সূচনায় কেবল শিক্ষক এবং নেতারাই জিহোভা-কে একমাত্র দেবতা বলে স্বীকার করতেন কিন্তু অন্যান্য জাতীয় দেবতাদের অস্তিত্বকে তখনো অস্বীকার করা হয় নি। যেমন মোয়াবাইট জাতির দেবতা ছিলেন ক্যামোস, অ্যামোনাইট-দের দেবতার নাম ছিলো মোলক, জিদোনীয়-দের দেবতা ছিলেন বাল। তথাপি জিহোভাই ছিলেন প্রধান বা একমাত্র দেবতা, যে দেবতাকে ইস্রায়েলের মানুষ উপাসনা করতো। জিহোভা ছিলেন তাদের একমাত্র ধর্মীয় আকর্ষণ। ধর্মীয় যা কিছু অভিজ্ঞতা বা যা কিছু আদর্শ তারা লাভ করতো, সব কিছুই পেতো জিহোভার কাছ থেকে। অন্য দেবতাদের উপাসনা রাজদ্রোহ হিশেবে গণ্য হতো। তার মানে এই নয় যে, সমস্ত লোক অন্য দেবতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করতো। কিন্তু তারপরও তাদের কাছে জিহোভাই ছিলেন ইস্রায়েলের একমাত্র দেবতা। একে ঠিক একেশ্বরবাদ বলা যায় না। বরং একে দেবতা উপাসনা বলা যেতে পারে। অ্যামোসের সময় থেকে ইস্রায়েলের জননায়কদের মধ্যে উপলব্ধি হতে শুরু করে যে জিহোভার ঐশ্বরিক এবং নৈতিক রাজত্ব এতোদূর বিস্তৃত যে, তাঁকে কেবল ইস্রায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সঙ্গত নয়। তাঁর রাজত্ব রয়েছে সমগ্র বিশ্বজুড়ে। অন্য কোনো দেবতাদের স্থান আর সেখানে নেই। এই জিহোভারই পরিবর্তিতরূপ ইসলামের আল্লাহ্।

হঠাৎ করে ধর্মের বিশ্বজনীনতা প্রাপ্তি ঘটে নি। এর পেছনে ছিলো যথেষ্ট প্রস্তুতি। কিছু কিছু জাতীয় ধর্মে তৎকালীন সময় এই ধরনের প্রবণতা দেখা দিয়েছিলো। গ্রীস ও রোমান জগতে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতাব্দী থেকে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত যে রহস্যময় ধর্ম বিস্তৃতি লাভ করেছিলো তার মধ্যে বিশ্বজনীনতার লক্ষণ ছিলো সুস্পষ্ট। ইস্রায়েলে খ্রীষ্টপূর্ব অস্টম শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত ভাববাদীগণ বিশ্বজনীন ধর্মের শিক্ষা দিয়েছিলেন। রোমান এবং গ্রীসে জাতীয় দেবতাদের উপাসনা করা হতো প্রাচীন পদ্ধতিতে। ইস্রায়েলে এ্যামোস, ইশা (ীসাাড) এবং দ্বিতীয় ইশার শিক্ষায় জাতীয় ধর্মানুষ্ঠান অপেক্ষা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অন্তরের বিশ্বাস বড় হয়ে উঠেছিলো। জেরোমিয়া (ঝরেমোিড) যখন ঘোষনা করেছিলেন, ঈশ্বর তাঁর শিষ্যদের নিয়ে 'নতুন ধর্মশালা' গড়ে তুলতে বলছেন, তখনই ধর্মের ইতিহাসে 'আদর্শের বৃহত্তম এবং নবতম মূল্যায়ন' হয়েছিলো বলা যায়। 'আমি আমার আইন তাদের অন্তঃকরণে স্থাপন করবো, এবং তা তাদের হৃেদয়ে লিপিবদ্ধ করে দেবো' (ঝরে. ষষষি ৩১-৩৪)।

ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্ক যদি আন্তরিকতা ও নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে যারাই সেই শর্ত পালন করবে তাদে স্কলের জন্য ধর্মের দুয়ার থাকবে উন্মুক্ত। জেরোমিয়া অবশ্য ঠিক এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত করেন নি। কারণ তখনো তাঁর চিন্তা ইস্রায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। তবে তাঁর 'নতুন ধর্মশালা'র ধারণার মধ্যে এরকম সিদ্ধান্তের একটি প্রচ্ছন্নতা ছিলো। একই সঙ্গে ইস্রায়েলে আরো একটি ধারণার সৃষ্টি হয়েছিলো যে, জিহোভা কেবল ইস্রায়েলের নন, তিনি সমগ্র বিশ্বের একমাত্র ঈশ্বর। এই বিশ্বাসকে একেশ্বরবাদ বলা যেতে পারে। তিনি সমগ্র ইস্রায়েলের মানুষের যেমন বিচার করবেন তেমনি আরব, মিশর, ব্যাবিলনের মানুষেরও বিচার করবেন। পরবর্তীকালে ইহুদীরা ধর্মীয় এই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্পূর্ণরৈেপে ত্যাগ করায়

জুডাবাদ ক্রমশ একটি সংকীর্ণ বিশেষ মতবাদে প্রত্যাবর্তন করে। এইভাবে ইস্রায়েলের ধর্ম বিশ্বজনীন খ্রীষ্টধর্মের বুনিয়াদ গড়ে দিলেও নিজে জাতীয় ধর্ম থেকে যায়। তবে একথা সত্যি যে, সমস্ত শ্রেণী ও জাতির বাধা ভেঙে সকল মানুষকে পরিত্রাণের প্রথম পথ দেখিয়েছিলো বৌদ্ধধর্ম। যেমন খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাব হয়েছিলো জুডাবাদ থেকে, তেমনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং সংস্কার সাধন করে উৎপত্তি হয়েছিলো বৌদ্ধ ধর্মের। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এক স্বতন্ত্র শ্রেনীর ধর্ম। এই ধর্মে আছে অত্যন্ত শ্রমসিদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কৃচ্ছতাসাধন এবং সর্বেশ্বরবাদী দূর কল্পনা।

বৌদ্ধ ধর্ম ধর্মীয় ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। লক্ষনীয় বিষয় হলো এই ধর্মে পাপ থেকে পরিত্রানের কথা চিন্তা করা হয় নি। দুঃখ কষ্টের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের কথা বলা হয়েছে মাত্র। যখন সকল আবেগ ও আকাংক্ষা, এমন কি বাঁচার আকাংক্ষাও লোপ পাবে, তখনই মানুষ নির্বাণ লাভ করতে পারবে। নির্বাণ হলো সম্পূর্ণ নিস্পৃহ এক শান্তির অবস্থা। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আত্মা সম্পর্কিত অনেক ধারণাকে গৌতম বুদ্ধ অস্বীকার করেছেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে আত্মা দ্রব্য হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু বুদ্ধদেব তাও স্বীকার করেন নি। তাঁর মাত্র তথাকথিত আত্মা মায়া মাত্র। মানুষ কতগুলো কামনা-বাসনার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ যা করে তার মধ্যে দিয়েই তার মনুষ্যত্বের প্রকাশ ঘটে। কর্ম যোগই প্রকৃত সত্য। নীতিগতভাবে বুদ্ধ হয়ত নাস্তিক ছিলেন না, কিন্তু তিনি দেবতাদের অস্বীকার করেছেন। ব্রাহ্মণ্য দর্শনের ব্রহ্ম সম্পর্কে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিলো না। মানুষকে ভবচক্র থেকে মুক্ত করার কোনো সাহায্য দেবতারা করতে পারেন না। কারণ দেবতা মানেই তথাকথিত একটি কল্পিত বিষয়। বুদ্ধ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন,

> ''মুক্তির জন্য মানুষকে নিজেরই চেষ্টা করতে হবে। কোনো দৈব সাহায্য সে পাবে না। প্রার্থনা একটা অন্তঃসার শূন্য ব্যাপার। উপাসনা নিরর্থক।''

বৌদ্ধ ধর্মকে অনেকেই ধর্ম বলে স্বীকার করতে রাজী নন। কারণ এই ধর্মে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান নেই। মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে দেবতাদের কোনো ভূমিকা নেই। বুদ্ধদেব স্বয়ং তাঁর শিষ্যদের উপাসনা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছেন। অথচ যে মতবাদ তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন ধর্ম হিসেবে বৌদ্ধ ধর্ম বর্তমানে সেই মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কালানুক্রমিকভাবে খ্রীষ্টধর্ম হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বজনীন ধর্ম। মূল থেকেই এ ধর্মটি পুরোপুরি মিথ্যাশ্রয়ী (অবশ্য মিথ্যার অবলম্বন ছাড়া কোনো ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার্য নয়)। একটি কুমারী মাতার গর্ভে 'অলৌকিক' জন্মকে কেন্দ্র করে, সমস্ত সাধারণ ঘটনার অসাধারণ রূপায়নের নাম হচ্ছে- খ্রীষ্ট ধর্ম। সেন্ট পল এর মতো ধুরন্ধর, মিথ্যেবাদী, বজ্জাত লোকের আবির্ভাব না ঘটলে খ্রীষ্টধর্মের বিশ্বজনীনতার প্রশ্ন ছিলো অবান্তর। অত্যন্ত মিথ্যেবাদী, চতুর, দুধর্ষ, গুন্ডাপ্রকৃতির লোক ছিলেন পল। যীশু নিজে কোনো ধর্ম দিয়ে যাননি, এবং সবচেয়ে মজার ঘটনা হচ্ছে ক্রুশেও মৃত্যু ঘটে নি তাঁর। আজ ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে এ কথা প্রমাণিত সত্য। এমনকি ৪: ১৫৭ বচনে কোরানও এ কথা স্বীকার করে যে, ক্রুশে যীশুর মৃত্যু হয়নি। তারপরও উক্ত ধর্মের অধিকাংশ মানুষ একথা বিশ্বাস করে আবেগাপ্লুত হল যে, যীশু সশরীরে স্বর্গে চলে গেছেন এবং অদ্যাবধি

তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণে অবস্থান করছেন এবং বিশ্ব ধ্বংস প্রাপ্তির সময়, অর্থাৎ কেয়ামতের পূর্বে আবার তিনি সশরীরে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবেন। ইসলামী দর্শনে এমন একটি গাঁজাখুরি মতবাদের প্রশ্রয় লাভ ঘটেছে প্রারম্ভিককালে ইসলামে ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টানদের অন্ধ-কুবিশ্বাস থেকে। এ ব্যাপারে আমার যীশু সম্পর্কিত গবেষণামূলক (''যীশু শুয়ে আছেন ভারতে'' গ্রন্থটি পড়া যেতে পারে, এ ছাড়া এ বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত 'যীশুর মৃত্যু- একটি রহস্য' দ্রঃ) গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে খ্রীষ্টান ধর্মের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্যও রয়েছে।

তরবারির যে অমানবিক রক্তপাতে ইসলাম প্রথম সমাজের অশিক্ষিত, দুর্বল, নিম্নশ্রেনীর মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিলো তারচেয়ে ও নির্দয় ও বীভৎস কায়দায় প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হয়েছে ভন্ড পলের সৃষ্ট খ্রীষ্ট ধর্মের পান্ডারা। তাঁরা ক্রুশে মৃত্যু না হওয়ার পর আতঙ্কজনক, পলায়মান যীশুর কাল্পনিক গল্প প্রচার করে, জোর-জবরদস্তি আইন করে, তৎকালীন সমাজের বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদের সমাজে একঘরে করে, তাঁদের বইপত্র, পান্ডুলিপি পুড়িয়ে, যীশুর 'হোলি স্পিরিট' এর ভুয়া ধুঁয়া তুলে 'খ্রীষ্টধর্মের দর্শন' প্রতিষ্ঠা করেছে। এর প্রায় ছয়শ বছর পর একই কায়দায় ইসলামের আবির্ভাব। অত্যন্ত ধৈর্যহীন, অসহিষ্ণু এই ধর্ম হলো তরুণতম বিশ্বজনীন ধর্ম। অন্য দুটি বিশ্বজনীন ধর্ম অপেক্ষা ইসলাম প্রকৃতিতে অনেক কম সার্বজনীন। যুগের পর যুগ ধরে এই ধর্ম মূল সীমেটিক এবং এমনকি আরবীয় চরিত্র পালন করে এসেছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করার মতো স্বচ্ছতা, প্রসারতা এই ধর্মের নেই। ইসলাম অত্যন্ত গোঁড়া ধর্ম। স্থবির ধর্ম। আরবীয় স্টাইলের বাইরে এর কোনো নড়াচড়া নেই। কোনো রকম পরিবর্তন এই ধর্মে স্বীকৃত নয়। এমন কি আচার অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটিগুলিও অপরিবর্তনযোগ্য। নতুনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের যে সুযোগ খ্রীষ্টধর্মে রয়েছে, ইসলামে তা নেই।

কোরানের একটি জের-জবর-নক্তাও ইসলাম পরিবর্তনের অনুমোদন করে না। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলমানেরা আজ যে কোরানকে একেবারে অপরিবর্তিত ঐশ্বরিক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করে, প্রথম দিকে, গ্রন্থনকালে এর ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকরের সময় কোরানের প্রথম লিপিবদ্ধ পান্ডুলিপিগুলো তৃতীয় খলিফা ওসমানের সময় আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। প্রথম অবস্থায় কোরানের সাত প্রকারের সংস্করণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো। এগুলো ছিলো প্রথম দুটি মদীনায়, তৃতীয়টি মক্কায়, চতুর্থটি কুফা নগরে, পঞ্চমটি বসরায়, ষষ্ঠটি সিরিয়ায় এবং সপ্তমটি এমন কদর্য ছিলো যে, সেটাকে সামান্য সংস্করণ হিসেবে লিপিকারগণ সেটির স্থানের নামই উল্লেখ করেন নি। সেই সাতটি লিপিবদ্ধ কোরানে এমন অনেক বিষয়াদি ছিলো 'যা পাঠে মানুষ বিপথগামী হইবে' এই বিবেচনায় সেগুলোকে পুড়িয়ে নষ্ট করে নতুনভাবে সংকলিত করা হয় 'ঐশীগ্রন্থ' নামক আজকের কোরানকে। এরকম রুক্ষ কথা শুনে অনেক মুসলমানই অতৃপ্ত হতে পারেন, কিন্তু পারেন না ঐতিহাসিক সত্যকে হাওয়ায় মিলিয়ে দিতে। গোঁড়া ইসলামপন্থীরা এতোই অসহিষ্ণু ও ধর্মান্ধ যে এরা সুস্থিরভাবে ধর্মীয় কোনো ব্যাপারকেই বিবেচনায় নিতে অক্ষমতা প্রকাশ করে, অথচ নিজেরা ইসলামী বিধি-বিধান, নিয়মকানুন একজনও সঠিক, সুষ্ঠভাবে পালন করে না, কিন্তু নিজেদেরকে 'মুসলমান' বলে আত্মপরিচয় দিতে তৃপ্তি বোধ করে।

৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মোহম্মদের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুকালে কোরান গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ ছিলো না। তাঁর মৃত্যুর পরের বছরই ওমরের পরামর্শে প্রথম খলিফা আবু বকর কোরান গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার জন্য জনৈক যায়েদ ইবন্ সাবেতকে প্রধান করে ১০ জনের একটি কমিটি গঠন করেন। এ ব্যাপারে ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন তাঁর অনূদিত কোরানের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন,

> ....'জয়দ নামক জনৈক মদীনাবাসী পন্ডিত উৎসাহের সহিত এই সংগ্রহকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া বহু পরিশ্রমে নানা স্থান হইতে খর্জুর-পত্রে লিখিত, শ্বেত প্রস্তরে খোদিত এবং মানুষের বক্ষে চিত্রিত আয়াত সকল সংগ্রহ করেন। এই সংগ্রহীত বচন সকল প্রথমত আমীর আবু বকরের নিকট ছিল, পরে তাঁহার মৃত্যুকালে হফ্সা নাম্নী হযরতের পত্নীর নিকটে গচ্ছিত থাকে। নেতৃবর ওমর ফারুক যাবজ্জীবন এই গ্রন্থকেই মান্য করিয়া চলিয়া ছিলেন। তাঁরা মৃত্যুর পর আমীর ওসমানের সময় নানা স্থানে ইহার প্রতিলিপি বিস্তৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে সমস্ত পরস্পর এতো বিভিন্নরূপে লিখিত হইয়াছিল যে, তাহার জন্য মোসলমান মন্ডলীর মধ্যে ভয়ানক বিবাদ আরম্ভ হইল। ইহাতে ওসমান পুনরায় সেই জয়াদের দ্বারা কোরান সংগ্রহ করিয়া তাহাই সমস্ত মুসলমানকে মান্য করিতে বাধ্য করেন। তিনি এই নূতন গ্রন্থের বহু খন্ড প্রতিলিপি করাইয়া সমস্ত প্রধান নগরে প্রেরণ পূর্বক পূর্বলিখিত সমস্ত কোরআন অগ্নিতে দগ্ধ করাইয়া ফেলেন' (ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন অনূদিত 'কোরআন শরীফ' এর ২য় সংস্করণের ভূমিকা, পৃঃ ১১-১২, হরফ প্রকাশনী, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা)।

এ বিষয়টি সম্প্রতি বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত মোহম্মদ মতিওর রহমানের 'ঐতিহাসিক অভিধান' গ্রন্থে উল্লেখিত আছে।

আবু বকর থেকে ওসমান পর্যন্ত কোরানের প্রথম পর্বে লিখিত সংস্করণগুলোর সময়কাল ছিল ১৯ বছর। ৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে ওসমান আবু বকরের সময়কার যায়েদ কর্তৃক কোরানের প্রথম লিপিবদ্ধ সংস্করণগুলো পুড়িয়ে ফেলেন। এবং পরবর্তিতে ওসমান সেই যায়েদ ইবনে সাবেতকেই আবার নতুন করে কোরানকে লিপিবদ্ধ করার কাজে মনোনীত করেন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গিরিশ চন্দ্র তাঁর ভূমিকাতে ১২ পৃষ্ঠার টিকায় কোরান সংগ্রহকারী বলে 'জয়দ' নামের যার কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি তাঁকেই মোহম্মদের মৃত্যুর ক্রীতদাস-পরে ধর্মপুত্র যায়েদ বিবেচনা করেছেন, এ তথ্য সঠিক নয়। কারণ মোহম্মদের মৃত্যুর তিন বৎসর আগে তাঁর ধর্মপুত্র যায়েদ সিরিয়ার সন্নিকটে রোমান-শাসক শোহারাবিলের সৈন্যদের হাতে নিহত হন, এবং যায়েদের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী জয়নবকে মোহম্মদ বিবাহ করেন। অতএব কোরান লিপিবদ্ধ কাজে নেতৃত্বদানকারী যায়েদ এবং মোহম্মদের ধর্মপুত্র যায়েদ কিভাবে একই ব্যক্তি হন?

ইসলাম ধর্মে আরবের মুসলমান এবং ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য আলোচিত ধর্মমতগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ইসলাম ধর্মে বিশেষ কোনো অভিনবত্ব দেখা যায় না। ইসলাম ধর্ম হলো জুডাবাদের (ইহুদীদের) বিশেষ কয়েকটি দিক, এবং অধঃপতিত খ্রীষ্টধর্মের (খ্রীষ্টানদের)

কিছু ভ্রান্ত জ্ঞানের সংমিশ্রণ। খ্রীষ্ট ধর্মের ঈশ্বরের ধারণার থেকে ইসলামের ধারণা যে শ্রেষ্ঠ এবং ইসলাম ধর্মেই বৌদ্ধিক এবং সামাজিক প্রগতি যে অধিকতর হয়েছে এটিকে প্রতিপন্ন করার জন্যে জ্ঞান অপেক্ষা, বল ও ক্ষমতার প্রয়োগ করতে হয়েছে বেশি। আজ থেকে প্রায় ছয়শত বছর আগে ইবন বতুতা তাঁর 'রেহলা' গ্রন্থে লিখেছেন, ...

> 'যে দিন থেকে আরবরা তলোয়ার হাতে নিয়েছে, সে দিন থেকেই অন্য জাতিরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ শুরু করেছে।'

এই ধর্মের আল্লাহ্ সম্পূর্ণরূপে অতিবর্তী। একজন প্রাচ্য দেশীয় এক নায়ককে খুব বড় করে দেখলে যেমন হয় ইসলাম ধর্মের আল্লাহ্ তেমনি স্বেচ্ছাচারী, দায়িত্বজ্ঞানহীন, এবং স্বৈরশাসকরূপী প্রভু। কথায় কথায় চোখ রাঙানো হচ্ছে তাঁর বড় কাজ। তিনি স্বর্গের সুলতান। কিন্তু তাঁকে দেখাও যায় না, বোঝাও যায় না, অথচ মানুষ তাঁর দান, একান্তরূপে তাঁর সম্পত্তি! এবং বিশ্বের সকল কিছু তাঁর ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত! ইসলামের আল্লাহর গুনের মধ্যে কোনো প্রেম বা পবিত্রতার স্থান নেই, আছে কেবল ধমক আর হুমকি, সঙ্গে পরকাল বিষয়ক ইন্দ্রিয় সুখ-ভাগের লোভনীয় ইঙ্গিত। আগাগোড়াই ইসলাম প্রগতি-পরিপন্থী।

২

'ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন' এই তত্ত্বটির মধ্যে রয়েছে ধর্মের সবচেয়ে বড় ফাঁকি। আদমের উৎপত্তি কাল থেকে বাইবেলের হিসেব অনুযায়ী আব্রাহাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন আদমের ১৯৪৮ বছর পর। এবং আব্রাহামের জন্ম থেকে যীশুর আবির্ভাব ঘটেছিলো ১৮৫২ বছর পর। অর্থাৎ আদম থেকে যীশুর সময়ের ব্যবধান ৩৮০০ বছর। বাইবেলে বিশ্বসৃষ্টির সময়কাল যেমন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি পৃথিবীতে কবে মানুষের আবির্ভাব হয়েছিলো তাও নির্দিষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। আজকের ২০০৮ সনকে ভিত্তি হিসেবে হিসেবে ধরে নিলে ওই হিসেব অনুসারে দেখা যায় আজ থেকে মাত্র ছয় হাজার বছর আগে (যীশুর জন্মের ৩/৪ বছর পর থেকে খ্রীষ্টীয় সন গণনা শুর হয়, সেই হিসেবে) বিশ্বসৃষ্টির সূচনা ঘটেছিলো। আর মানুষ সৃষ্টি হয়েছিলো, অর্থাৎ প্রথম মানব আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে- এর মাত্র দিন কয়েক পরেই। বাইবেলের এই সৃষ্টিতত্ত্বকে ইসলাম সমর্থন করে। কিন্তু এই সৃষ্টিতত্ত্ব আজ বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত মিথ্যে।

এখন থেকে প্রায় ২৫০০০ বছর আগে বিশুদ্ধ আধুনিক মানুষ ক্রোম্যাগনন্ মানুষ বা হোমস্যাপিয়েন্স -এর উদ্ভব। তার আগে পর্যন্ত বহু হাজার বছর ধরে নিয়ানডার্থাল মানুষ পৃথিবীর নানা প্রান্তে টিকে ছিলো। তারা ছিলো শিকারী, গুহায় বসবাস করতো। পরিবার গঠনের প্রাথমিক প্রয়াস তাদের মধ্যেই লক্ষ করা গেছে। তাদের মস্তিষ্ক আধুনিক মানুষের মতো উন্নত ও জটিল না হলেও পূরববর্তী যে কোনো মানব প্রজাতির চেয়ে বিকশিত ছিলো। এবং এর সাহায্যে তারা দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য নানা কিছুর মতো, জীবনের রহস্য ও মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা অথবা এ ব্যাপারে চিন্তা করতে পারার প্রচেষ্টায় তারা সফল হতে পেরেছিলো বলেই মনে হয়। কারণ মাটি খুড়ে তাদের কবরের গুহা ও গহ্বর থেকে এমন প্রমাণ পাওয়া

গেছে যা থেকে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে, মৃত্যুর পরেও যাতে মৃত ব্যক্তির কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য দৈনন্দিন প্রয়োজনের কিছু দ্রব্যাদি শবের সঙ্গে রেখে দেওয়ার পদ্ধতি তারা অনুসরণ করতো। মৃত শরীরকে নষ্ট না করে বা অবহেলায় ফেলে না রেখে কবর দেওয়ার ব্যাপারটিও ছিলো অভিনব ও যুগান্তরকারী একটি আবিষ্কার। আর এভাবেই মৃত্যু পরবর্তী 'প্রাণ' বা প্রাণের কারণ হিসেবে 'আত্মা' জাতীয় কোনো একটি কিছুর সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা যে তারা ধীরে ধীরে শুরু করেছিলো তা বোঝা যায়।

মানুষের লিখিত ইতিহাসের বয়স মাত্র ৫০০০ বছর। ৭/৮ হাজার ধরে সে ধাতু ব্যবহার করেছে। তার আগে লক্ষ লক্ষ বছর আদিম মানুষ পাথরই ব্যবহার করতো, তখন তাদের ধর্মচেতনাও ছিলো অনুরেপভাবে আদিম। কিন্তু ধর্মের প্রাথমিক উপাদান ৪০/৫০ হাজার বছর আগে নিয়ানডার্থাল মানুষের চেতনাতেই উদ্ভাসিত হয়। সম্ভবত তারাই প্রথমে আত্মা, অলৌকিক শক্তি, অতীন্দ্রিয় শক্তি ইত্যাদি ধারণার ভিত্তি সৃষ্টি করে। আত্মার আদিম ধারণাই হাজার হাজার বছর পল্লবিত হয়েছে ওই আদিম মানুষের মনে। আর সেটাই বহু সহস্র যুগ নিয়ানডার্থাল থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণীর বংশ পরম্পরার ধারাবাহিকতায় ক্রম বিবর্তনের ফলে এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিকর্তা, তথা প্রাণের সৃষ্টিকর্তা ও সমস্ত আত্মার উৎস-স্বরূপ এক পরমশক্তি বা পরমেশ্বরের ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীতে ধর্মগুলোর সৃষ্টি হয়েছে বড় জোর বিগত ২ থেকে ৪ হাজার বছরের মধ্যে। এখনো অব্দি পাওয়া বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে এটি জানা গেছে, মানুষের মনে ধর্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিলো এখনকার মানুষের পূর্বসূরী নিয়ানডার্থাল ,মানুষের আমলে - যারা পৃথিবীতে ছিলো এখন থেকে আড়াই লক্ষ থেকে ৪০/ ৫০ হাজার বছর আগে Mousterian Period: Pleistocene epoch -এর একটি অংশ। তখন শাসক শাসিত শ্রেণীবিভাগ ছিলো না। মানুষ নিছক তার অনুসন্ধিৎসার ফলে, অজ্ঞতা ও অসহয়াতার কারণে তার 'উন্নত' কল্পনাশক্তির সাহায্যে তথাকথিত আদি ধর্মের সৃষ্টি করেছে। তখনকার পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এটি ছিলো একটি উন্নতর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। ধর্মকে শাসক শ্রেণীর অপব্যবহারের কাজ, যা ঐতিহাসিক প্রকৃয়ায় সৃষ্টি হয়েছে, সেটা অনেক অনেক পরের ব্যাপার। নিয়ানডার্থাল মানুষের আগের স্তর অর্থাৎ পিথেকানথ্রোপাস বা সিনানথ্রোপাস-দের মধ্যে ধর্মাচরণের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি। তখনকার মানুষের মস্তিষ্ক তথা চিন্তা করার ক্ষমতা এতোটা উন্নত ছিলো না, যার সাহায্যে ধর্ম ও অতিপ্রাকৃতিক শক্তি জাতীয় উন্নতর চিন্তা করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতো। মানুষকে তখন স্থুল জৈবিক প্রয়োজনেই প্রকৃতির প্রতিকুল অবস্থা ও জীবজন্তুদের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়েছে। নিতান্তই ব্যবহারিক প্রয়োজনে তাদের চেতনা ব্যতিব্যস্ত ছিলো। প্রাণ ও প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু হাজার হাজার বছরের অস্তিত্বের মাধ্যমে তাদের মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে, জীবনযাত্রা রেপান্তরিত হয়েছে, পথ পরিষ্কার হয়েছে নিয়ানডার্থাল সৃষ্টির। ধর্ম আলোচনার প্রসঙ্গে নিয়ানডার্থাল মানুষের আগেরকার ঐ অবস্থাকে বিজ্ঞানীরা বলে প্রাকধর্মীয় অবস্থা। এরপর উদ্ভব হয় নিয়ানডার্থাল মানুষদের, পৃথিবীতে তখন চতুর্থ হিমযুগ চলছে। ১৮৫৬ সালে জার্মানির ডুসেলডর্ফের কাছে নিয়ান্ডার উপত্যকায় পাওয়া গেলো এই ধরণের ভিন্নতর ও উন্নতর মানুষের অসম্পূর্ণ কঙ্কাল। তার আগে জিব্রাল্টারেও অবশ্য এ ধরনের একটি কঙ্কাল পাওয়া যায়। পরে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, ইতালী, স্পেন, রাশিয়া, পোল্যান্ড, ক্রিমিয়া, এশিয়া মাইনর, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, ইরাক, উত্তর আরবের মরুভূমি অঞ্চল, উত্তর আফ্রিকা, চীন ইত্যাদি বহু অঞ্চলে, এ ধরনের মানুষের কঙ্কাল, কবর ও অন্যান্য নানা নিদর্শন পাওয়া গেছে।

ক্রোম্যাগনন্ মানুষের মতো বুদ্ধিমান মানুষের অস্তিত্বের পর্যাপ্ত ও সঠিক প্রমান বিজ্ঞানের হাতে এখন মজুত আছে। আজ এ সব তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের কাল ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত গল্প-কথার প্রথম আদম সৃষ্টির সময়কালের চেয়েও অনেক-অনেক বেশী প্রাচীন। মজার ব্যাপার হলো এই মানুষ সম্পর্কে বাইবেলেই রয়েছে উল্টোপাল্টা, স্ববিরোধী কথাবার্তা। অস্ট্রেলিয়ার 'রু্যাশনালিষ্ট এসোসিয়েশন অব নিউ সাউথ ওয়েলস' বাইবেল থেকে এমন পরস্পর বিরোধী বহু উদাহরণ প্রকাশ করেছেন। এখানে কেবল মাত্র মানুষ সম্পর্কিত বাইবেলের ৬টি স্ববিরোধী উক্তি উল্লেখ করা হলো :-

(১) মানুষ সৃষ্টি হওয়ার আগে গাছ এলো (জেনেসিস ১: ১১-১২), মানুষ তৈরি হওয়ার পর গাছ সৃষ্টি হলো (জেনেসিস ১: ৭-৯)।

(২) জন্তু জানোয়ারদের পরে মানুষ সৃষ্টি হলো (জেনেসিস ১: ২৫-২৬), জন্তু জানোয়ারদের আগে মানুষ সৃষ্টি হলো (জেনেসিস ২: ১৮-২০)।

(৩) আদম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার দিনই মরবে (জেনেসিস ২: ১৭), আদম ৯৩০ বছর বেঁচে ছিলো (জেনেসিস ৫: ৫)।

(৪) ঈশ্বর মানুষকে লোভ দেখান না (জেমস ১: ১৩), ঈশ্বর মানুষকে লোভ দেখান (জেনেসিস ২২: ১/২, স্যামুয়েল ২৪: ১)।

(৫) কোনো মানুষ ঈশ্বরকে দেখননি বা দেখতে পারেন না (জন ১: ১৮/১, টিম ৬: ১৬), অনেকের কাছেই তিনি দেখা দিয়েছেন (জেনেসিস ২৬:২, এক্সোডাস ২৪: ৯-১০, ৩৩: ২২-২৩)।

(৬) কেউই ঈশ্বরের মুখ দর্শন করার পর বেঁচে থাকতে পারে না (এক্সোডাস ৩৩: ২০), জেকব ও মুসা দু'জনেই ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখেছেন কিন্তু মরেন নি (জেনেসিস ৩২ : ৩০, এক্সোডাস ৩৩: ১১)।

বাইবেলের আরো যে বিখ্যাত অপবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটি মিথ্যে প্রতিপন্ন হয়েছে তা হলো পৃথিবী সম্পর্কিত তত্ত্ব। বাইবেল ও কোরানের ভাষ্য অনুযায়ী পৃথিবী স্থির। কিন্তু এখন আমরা নিশ্চিত, পৃথিবী স্থির নয়। সে ঘুরছে। আজ থেকে চারশ বছর আগে খ্রীষ্টধর্মের পান্ডা-পুরুতগণ ব্রুনোকে ক্রুশে বেঁধে জীবনত পুড়িয়ে মেরেছিলেন কেবলমাত্র এই অপরাধের জন্য যে, তিনি এরিস্টটলের তত্ত্বকে অস্বীকার করে কোপার্নিকাসের গ্রন্থের মতবাদকে সমর্থন করে বলেছিলেন, সূর্য স্থির নয়, এই পৃথিবীটাই ঘুরছে সূর্যের চারপাশে। এটা ছিলো বাইবেলে বর্ণিত পৃথিবীতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত বা বিরোধী মতবাদ।

এখানে এ বিষয়ে একটি কথা বলে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী যে, কোপার্নিকাসেরও দু'হাজার বছর আগে মানব সভ্যতার কিছু কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত ছিলো যে, পৃথিবী বৃত্তাকার, সে একটি গ্রহ এবং ঘূর্ণায়মান। আয়োনীয় সভ্যতার কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে

তিনটি সুপষ্ট স্থরে ভাগ করা চলে - আয়োনীয়, এথেনীয় ও হেলেনীয় যুগ। এ তিনের মধ্যে বিজ্ঞান ও বস্তুবাদের চরম উৎকর্ষের দাবি রাখে আয়োনীয় সভ্যতা। আয়োনীয় যুগ খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। আয়োনীয় সভ্যতাতেই প্রথম ঘটেছিলো বস্তুবাদের উন্মেষ। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ট শতাব্দীতে আয়োনীয়ার মাইলেটাস ছিলো গ্রীক জগতের বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র এবং সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানে এ সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব বিয়াকশ ঘটে। যাকে অনেক ভাববাদী ঐতিহাসিকগণ অলৌকিক বলে অভিহিত করেন। কিন্তু গভীর ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে আয়োনীয়ার যে প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিলো তা অলৌকিক কিছু তো নয়ই, আকস্মিকও নয়। গ্রীক সভ্যতা ছিলো পূর্বাগামী প্রাচ্য সভ্যতার অনুবৃত্তি। গ্রীক বৈজ্ঞানিক তৎপরতার ভিত্তিভূমি দীর্ঘকাল ধরে রচিত হয়েছিলো মিশর ও ব্যাবিলনিয়ার। ভৌগলিকভাবেও মাইলেটাস ছিলো প্রাচীন সভ্যতাগুলোর নিকটবর্তী। মিশরের সাথে জলপথে এবং ব্যাবিলনের সঙ্গে স্থলপথে এর যোগাযোগ ছিলো। বস্তুতঃ গ্রীক পন্ডিত ও দার্শনিকগণ যে প্রাচ্য সভ্যতার কেন্দ্রগুলো ভ্রমণ করতেন তা নিশ্চিত ধারণা করার সঙ্গত কারণ আছে। আর এই আয়োনীয়াতেই তিনশ' বছর আগে হোমার যে ধর্মীয় সংস্কারহীন মুক্ত চিন্তাধারার সৃষ্টি করেছিলেন, তা আয়োনীয় বিজ্ঞানের উৎপত্তি ভাবগত পটভূমি হিসেবে কাজ করেছিলো। আয়োনীয়াতে যে বিজ্ঞান ভূমিষ্ট হয়েছিলো, সে বিজ্ঞান হলো, অধ্যাপক বেঞ্জামিন ফ্যারিংটনের ভাষায় - 'একটি বিজ্ঞানমনস্ক নবীন জাতির স্বাভাবিক কর্মতৎপরতা, একটি বলিষ্ঠ মানবতাবোধ এবং একটা বিশ্বজনীন সংস্কৃতির মিলিত ফল। ' আয়োনীয় যুগ বিজ্ঞান ও দর্শনের ইতিহাসে মানুষের এক গৌরবময় অধ্যায়। আয়োনীয় দর্শন ছিলো বস্তুবাদী দর্শন।

কিন্তু আয়োনীয়দের এই বিজ্ঞানচর্চার মুক্ত পরিবেশ স্থায়ী হয়নি। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আয়োনীয় সভ্যতার বিলুপ্ত ঘটে। পারসিক আক্রমণে আয়োনীয়ায় রাজনৈতিক ও সামাজিক গোলোযোগ দেখা দেয়। এর ফলে সেখানকার বৈজ্ঞানিক দার্শনিক পন্ডিতগণ বাস্তুহারা হয়ে পড়েন। মানব সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় সবচেয়ে উজ্জ্বল সভ্যতা আয়োনীয়া হয়ে পড়ে মৃত!

জ্যোতির্বিজ্ঞানে আয়োনীয়রা ২৬০০ বছর আগেই এমন উন্নতি সাধন করেছিলো যা আজ ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। আজ আমরা মানুষেরা পৃথিবী নামক শ্যামল গ্রহে বসে চাঁদ এবং মঙ্গলকে বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা করছি, যে স্বপ্ন দেখছি, সেই মানুষেরা তাদের জ্ঞানের সংগ্রাম শুরু করেছিলো লক্ষ বছর আগে। তারপরও তথাকথিত ঈশ্বর, দেবতাদের প্রভাবকে এড়িয়ে, একটি সাধারণ নিয়মের মাধ্যমে পদার্থ ও বিশ্বকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা প্রথম হয়েছিলো আয়োনীয়াতে - থেলিস, অ্যানাক্সিম্যান্ডার, অ্যানাক্সিমেনিস, হিরাক্লিটাস, পিথাগোরাস, ডেমোক্রিটাস, এমপিডক্লাস, অ্যানাক্সেগোরাসের মতো বিজ্ঞানীদের হাতে। তাঁরা বলেছিলেন, সবকিছু পরমানু দিয়ে তৈরি, মানব প্রজাতি বা অন্যান্য প্রাণীদের উদ্ভব ঘটেছে খুবই সরল অবস্থা থেকে, এ কোনো ঈশ্বর বা দেবতাদের কারসাজি নয়, পৃথিবী শুধুই একটি গ্রহ যা সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে আর নক্ষত্রেরা অনেক দূরে। তারাই ছিলেন কৃষকের, নাবিকের, তাঁতীদের সন্তান। এঁদের হাতে ছাব্বিশশো বছর আগে বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছিলো। তারপরেও তাদের ধ্বংস হয়ে যেতে

হয়েছে কোনো ধারাবাহিকতা না রেখে। এর শত বছর পরে অনেকটা একইভাবে, তবে আরো সুসংগঠিত চিন্তা আর কসমোপলিটন স্বপ্ন নিয়ে জেগে উঠেছিলো ভূমধ্যসাগরের তীরে আলেক্সান্দ্রিয়া। তাঁরা পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করেছিলেন, স্টীম ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেছিলেন। এখানে কাজ করেছিলেন ইরাটোস্থেনিস, ইউক্লীড, আর্কিমিডিস, অ্যারিস্টোকার্স, হাইপেশিয়ার মতো মহাকালের প্রতিভারা। এখানেই গড়ে উঠেছিলো বিশ্বের সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার। কিন্তু তাদেরকেও ধ্বংস হয়ে যেতে হয়েছিলো রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উন্মাদনার করাল গ্রাসে কোনো ধারাবাহিকতা না রেখে। পর্যায়ক্রমে রোমান, খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মের বর্বরা তাদের ধর্মীয় উন্মাদনায় পুড়িয়ে দিয়েছে আলেক্সান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের হাতে লেখা পাঁচ লক্ষাধিক বই। এর ফলে নেমে এসেছিলো মধ্যযুগীয় অন্ধকার, আমরা পিছিয়ে গিয়েছিলাম দেড় হাজার বছর। আলেক্সান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারে ব্যাবিলনের এক ধর্মযাজকের লেখা একটি গ্রন্থে ওল্ড টেষ্টামেন্টে উল্লেখিত সময়পুঞ্জির চেয়ে শতগুন পুরাতন সময়ের ইতিহাস ছিলো - প্রায় ৪ লক্ষ ৩২ হাজার পূর্বের। কী লেখা ছিলো সেই গ্রন্থে? এই প্রশ্নের উত্তরকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদের বর্বর পান্ডা-পুরুতগণ। তারপর অনেক অনেক যুগ পেরিয়ে এসে কোপার্নিকাস, কেপলার, গ্যালিলিওর মতো পন্ডিতদের অনেক কিছুই পুনঃআবিষ্কার করতে হয়েছিলো।

কোপার্নিকাসের পুনঃআবিষ্কারকেই ব্রুনো সাহসীকতার সঙ্গে প্রচার করেছিলেন, নিকোলাস কোপার্নিকাস নিজে যা প্রচার করতে পারেন নি ধর্মীয় গুন্ডাদের ভয়ে। আর সেটাই করেছিলেন বিজ্ঞানের নির্ভুল সত্য প্রচারের নির্ভীক সৈনিক এবং প্রথম শহীদ জিওর্দানো ব্রুনো। এটাই ছিলো তাঁর অপরাধ। এ জন্যই তাঁকে ধর্মীয় উন্মাদরা ইতালীর পিয়ম্বো নগরে দীর্ঘ আট বছর বন্দি করে রেখেছিলেন এমন একটি ঘরে যার ছাদ ছিলো সীসে দিয়ে তৈরি। গরমের সময় ঘরটি হয়ে উঠতো প্রায় অগ্নিময় আর শীতকালে বরফের মতো হিমশীতল। বিচারের সময় ব্রুনো ধর্মযাজকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'শাস্তির কথা শুনে আমি যতোটা ভয় পেয়েছি তারচেয়েও অনেক বেশি ভয় পেয়েছো তোমরা'। ১৬ জন প্রধান ধর্মযাজক তাঁর মৃত্যুদন্ড রায়ের ঘোষনায় বলেন, 'পবিত্র গীর্জার আদেশে পাপী ব্যক্তির একবিন্দু রক্তও নষ্ট না করে প্রাণদন্ড কার্যকর করতে হবে'। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে রোমে ব্রুনোর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয় তাঁকে ক্রুশে বেঁধে, প্রকাশ্য দিবালোকে, অগ্নিদগ্ধ করে।

ব্রুনো কোপার্নিকাসের চিন্তাকে আরো প্রসারিত করেছিলেন। ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, কতগুলো গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, পৃথিবীও সেই গ্রহগুলোর একটা। আরো অনেক গ্রহ আবিষ্কৃত হবে এটাই সৌরজগৎ। দূরের নক্ষত্রগুলোও এক একটি সূর্যের মতো, তাদেরও অনেকেরই আছে গ্রহ কিংবা গ্রহমন্ডলী। শুধু পৃথিবীই নয়, সূর্য ঘুরছে তার আপন মেরুতে। এই বিশ্ব অসীম। এর কেন্দ্রে বা প্রান্তে কিছু আছে এ কথা বলা অর্থহীন। পৃথিবী যে স্থির নয়, সে যে ঘুরছে, এ কথা আজ বৈজ্ঞনিকভাবে প্রমাণিত সত্য। ব্রুনোর মতবাদই বিজ্ঞানে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। মিথ্যে হয়ে গেছে বাইবেলের বয়ান। এতো গেলো ইসলাম পূর্ব বাইবেলের মিথ্যাচার। কিন্তু ইসলাম, মাত্র ১৪০০ বছরের নির্ভুল, আধুনিক ধর্ম? সে বাইবেলের একই ভুলকে কী করে প্রশ্রয় দেয়? ইসলামের আল্লাহ যদি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সর্বজ্ঞানের জ্ঞানীই হন তাহলে তিনি কী করে বাইবেলের

মিথ্যে বর্ণনাকে সমর্থন করতে পারেন? কোরানের ২৭:৬১ ও ৩০:২৫ পঙক্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, পৃথিবী স্থির।

১৯৯০ সালে কলকাতার মল্লিক ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত জৈনক মুহম্মদ নুরুল ইসলাম তাঁর 'পৃথিবী নয় সূর্য ঘোরে' নামক গ্রন্থে কোরানের ১১টি সুরার ১২টি পঙক্তি দ্বারা জোরজবরদস্তি প্রমাণ করতে চেয়েছেন- পৃথিবী অনড়, স্থির। তাঁর মতে পৃথিবী যদি সত্যি সত্যি ঘুরতো তাহলে আমরা সমস্ত জীবজন্তু উড়ে উড়ে ছিটকে পড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতাম, আর গাছপালা-দালান-কোঠা পাহাড়-পর্বত সব ভেঙ্গেচুড়ে তছনছ হয়ে যেতো! তাঁর এই অপবৈজ্ঞানিক ধারণাকে আজ কোনো বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। একে ধর্মীয় অন্ধত্বের উন্মাদনা ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। এ সমস্ত উন্মাদদের গাঁজাখুরি অপব্যাখ্যা এবং বাইবেল, কোরানের পৃথিবীর অনড়তত্ত্বকে মিথ্যে প্রমাণিত করে আমাদের শ্যামল পৃথিবী নামক গ্রহটি ঘুরেই চলছে সেকেন্ডে সূর্যের চারিদিকে ১৬ মাইল বেগে। আর সূর্য অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহকে নিয়ে ছুটে চলছে আন্তঃনাক্ষত্রিক শূণ্যতার মধ্য দিয়ে সেকেন্ডে ৪২ মাইল গতিতে। এবং এইভাবে পুরো মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিকে একবার ঘুরে আসছে ২৫ কোটি বছরে। কি স্বপ্নের মতো এই বিজ্ঞান, অথচ বাস্তব এবং সত্য। আর কি চকমকে সত্যের মতো মানুষের ধর্মচেতনা ও ঈশ্বর বিশ্বাস, যা আসলেই অবাস্তব ও অলীক।

ডাঃ ওয়াহিদ রেজা বাঙলাদেশের প্রখ্যাত কবি ও কথাসাহিত্যিক। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী।

ধর্মবিশ্বাস, বিজ্ঞানবিশ্বাস ও এক চিল্‌তে ইতিহাস

প্রদীপ দেব

১

- এই বিশ্বব্রহ্মান্ড গাছপালা মানুষ পশুপাখি নদীর স্রোত গানের সুর সব সব কিছু সৃষ্টি করেছেন আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান ঈশ্বর। তাইতো কবি বলেছেন, সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি, খোদা তোমার মেহেরবানী।

- ঈশ্বরই যদি সবকিছু সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করলেন কে?

- ঈশ্বরই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। আগে তিনি নিজেকে বানিয়েছেন, তারপর অন্যান্য সবকিছু। একটার পর একটা ।

- ব্যাপারটা বুঝলাম না, সৃষ্টি না হয়ে সৃষ্টিকর্তা হলেন কীভাবে? তিনি কি সবসময়েই ছিলেন, মানে সবকিছু সৃষ্টির আগে থেকেই?

- হ্যাঁ, তাই তো বলছি।

- বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টির আগে তিনি কোথায় থাকতেন? কী করছিলেন?

- তিনি নরক বানাচ্ছিলেন - তোদের মত নাস্তিকদের থাকার ব্যবস্থা করতে করতে। যত্তসব। দুপাতা বিজ্ঞান পড়েই মনে করছিস সবকিছু জেনে বসে আছিস! আরে ব্যাটা - বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।

এরকম অন্তঃসার শূন্য তর্কবিতর্কের সাথে আমরা সবাই পরিচিত। উপাসনা ধর্ম সম্পর্কে কোন প্রশ্নে অবিশ্বাসের ছায়া দেখলেই উপাসনা ধর্মে বিশ্বাসীরা খুব রেগে যান। বিশ্বাসের মতো তাঁদের রাগটাও অযৌক্তিক। বিশ্বাসের ভিত্তি শক্ত না হলে রাগ দেখানোই আত্মরক্ষার সহজ উপায়। রাগ দেখানোর পদ্ধতিটি অবশ্য একেক জনের কাছে একেক রকম, ক্ষমতা ও সুযোগ ভেদে তা সম্পর্কচ্ছেদ থেকে শিরচ্ছেদ পর্যন্ত হতে পারে।

২

ধর্মবিশ্বাসের সাথে বিজ্ঞানবিশ্বাসের কোন মিল নেই। উপাসনা ধর্মের পুরোটাই বিশ্বাস নির্ভর। কোন ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা বা কার্যকারণের সাথে তার সম্পর্ক অতি সামান্য। ধর্মবিশ্বাসের বেশির ভাগই আরোপিত এবং জন্মসূত্রে পাওয়া। মানুষ যে পরিবারে জন্মায় - ভালো লাগুক না লাগুক - পারিবারিক ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য তাকে বাধ্য করা হয়। সেক্ষেত্রে যাচাই বাছাই করার কোন সুযোগই থাকে না। পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর ভিন্নতার কারণে ধর্মবিশ্বাসেরও পার্থক্য দেখা দেয়। সে কারণেই দেখা যায় মিশরের মুসলমান আর বাংলাদেশের মুসলমানের ধর্মবিশ্বাস হুবহু এক নয়। সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণেও ধর্মবিশ্বাসে ভিন্নতা দেখা দেয়। সউদি আরবের শেখ আর সুদানের দরিদ্র মুসলমানের ধর্ম এক হলেও ধর্মবিশ্বাস ভিন্ন। শুধু তাই নয়, সমস্ত পরিকাঠামো এক থাকার পরেও মানুষে মানুষে ধর্মবিশ্বাসে ভিন্নতা দেখা দিতে পারে।

ধর্মবিশ্বাস পরীক্ষা করে দেখার কোন উপায় নেই। ধর্মগ্রন্থে যা লেখা আছে, যেভাবে লেখা আছে তাকেই পরম সত্য বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয় ধর্মপালনকারীদের। যখন সাধারণ চোখেই দেখা যায় যে ধর্মগ্রন্থে যা লেখা আছে তার সাথে বাস্তবের কোন মিল নেই - তখন নানারকম খোঁড়া যুক্তি ধার করে ধর্মগ্রন্থের লেখাগুলোর অন্যরকম একটা ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা হয়। তাইতো ধর্মবিশ্বাসীদের বিশ্বাস করতে হয় যে যীশুখ্রিস্টের কোন বায়োলজিক্যাল ফাদার নেই। যীশুকে ঈশ্বরের সন্তান বলা হয়ে থাকে, কিন্তু যে জৈব প্রক্রিয়ায় প্রাণীর জন্ম হয় - সেরকম কোন প্রক্রিয়া মাতা মেরি ও ঈশ্বরের মধ্যে ঘটেছে বলে বাইবেলে পরিষ্কার করে কিছু বলা নেই। এক্ষেত্রে নানারকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

ধর্মবিশ্বাস কথাটি যতটা প্রচলিত - বিজ্ঞানবিশ্বাস সে তুলনায় কম। কারণ বিজ্ঞানে শুধুমাত্র বিশ্বাস দিয়ে কিছু প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান পরীক্ষামূলক প্রমাণ ও কার্যকারণের ওপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানে একটা তত্ত্বের সাথে অন্য তত্ত্বের মিল থাকতে হয়। বিজ্ঞান ভাষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে ভিন্ন হয় না। যদি হয় তারও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ম্যাগনেটিক প্রোপার্টিজ বদলে যেতে পারে। তা ধনী দরিদ্র সাদা কালো যে কোন মানুষের পক্ষেই পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব। কিন্তু একটি ইঁদুর যেমন মাধ্যাকর্ষণ এড়াতে পারে না - তেমনি ভ্যাটিকানের পোপের পক্ষেও মাধ্যাকর্ষণ এড়ানো সম্ভব নয়। বিজ্ঞানে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা অবশ্যই জানেন যে মাধ্যাকর্ষণ বল সাধারণ অবস্থায় সব সময়েই কাজ করছে। ওটা নানাভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলেই তাতে বিশ্বাস রাখা যায়। কিন্তু যদি কেউ দাবী করেন যে তিনি কোন প্রকার প্রতারণার সাহায্য না নিয়ে

অলৌকিক উপায়ে মাধ্যাকর্ষণ এড়িয়ে শূন্যে ভেসে থাকতে পারেন - তাতে বিশ্বাস রাখা যায় না। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসীদের সকলেই কোন না কোন ক্ষেত্রে অলৌকিকতায় বিশ্বাস করেন। বিজ্ঞানে অলৌকিক বলে কিছু নেই।

বিজ্ঞানের যে সব তত্ত্ব এখনো প্রমাণিত হয়নি - সেখানে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ কাজ করতে পারে। যেমন স্ট্রিং থিওরি - এখনো প্রমাণিত হয়নি। সেখানে তাই এখনো মতদ্বৈততা কাজ করছে। নিউক্লিয়ার থিওরিতে বিভিন্ন মডেলে মতভিন্নতা আছে। কিন্তু সেসব আছে মূল সত্য বের করে আনার উদ্দেশ্যেই। সত্য উদ্ঘাটনের জন্য ভিন্ন মতাবলম্বীরাও একসাথে কাজ করে যায় বিজ্ঞানে। ভুল মতবাদ থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের ভুল স্বীকার করে নেন। স্টিফেন হকিং আর রজার পেনরোজের মধ্যে অনেক বছর ধরে বিতর্ক চলেছে ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন নিয়ে। শেষপর্যন্ত দেখা গেছে হকিং এর একটি ধারণা ভুল ছিলো। এ ভুল স্বীকার করে নিতে হকিং এর একটুও অসুবিধা হয়নি। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসে এরকম হয়না। সেখানে অহংবোধ বড়বেশি। আর সে কারণেই ধর্মে ধর্মে বিভাজন এত বেশি। বিভাজনের কারণে হানাহানি অনেক বেশি।

বিজ্ঞানবিশ্বাসের সাথে ধর্মবিশ্বাসের আরেকটি প্রধান পার্থক্য হলো ধর্মবিশ্বাস একটা পর্যায়ে বড়বেশি হিংস্র। ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়তো করুণা করা হয়, কিন্তু সম্মান করা হয় না ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে। পৃথিবীতে ধর্মীয় হানাহানির কারণে যত মানুষ মারা গেছে - আর কোন কিছুতে সেরকম হয়নি। আর বিজ্ঞানবিশ্বাসীরা বিশ্বাসের ভিন্নতার কারণে কখনো হিংস্র হয়ে ওঠেনি। অনেকে পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানকে দায়ী করতে পছন্দ করেন। কিন্তু যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে বোমা তৈরি করা হচ্ছে - সে একই পারমাণবিক তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর মানুষের দৈনন্দিন জ্বালানির চাহিদা মেটানো হচ্ছে, ক্যান্সারের চিকিৎসা করা হচ্ছে। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানের দোষ প্রচার করা হয় রাজনৈতিক স্বার্থে।

রাজনীতি দিয়ে বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি চেষ্টা পৃথিবীর সব দেশেই হয়। সেটা হয় ধর্মবিশ্বাসের দোহাই দিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থে। যেমন স্টেমসেল রিসার্চের ক্ষেত্রে আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশও অনেক ধরণের বিধিনিষেধ আরোপ করে বসে আছে। ফলে যে গবেষণা থেমে আছে তা নয়। কিন্তু যে গতিতে চলতে পারতো সে গতিতে তা চলছে পারছে না। বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে সবসময়েই পেছনে টেনে ধরে রেখেছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এবং এ সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণ হিসেবে সবসময়েই দেখা যায় এক ধরণের ধর্মবিশ্বাস কাজ করেছে। একটু পেছনের দিকের ইতিহাস খুঁজে দেখলেই দেখা যাবে - বিজ্ঞানকে কোন সময়েই সহজে মেনে নেয়নি ধর্মবিশ্বাসীরা।

৩

যে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রতি ধর্মবিশ্বাসীদের দৃষ্টিভংগিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রাথমিক ভাবে কী আবিষ্কৃত হলো তা না জেনেই বলে দেয়া হয় যে এটা ধর্মবিরুদ্ধ, শয়তানের কারসাজী, এটাতে খোদা নারাজ হবেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং সবাই প্রযুক্তিটি ব্যবহার করতে থাকে তখন ধর্মবিশ্বাসীরা হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলে যে এসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সবকিছুই ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে। ধর্মগ্রন্থের পাতায় পাতায় বিজ্ঞান। হুঁ হুঁ বাবা, ঐশ্বরিক গ্রন্থ হলো সকল বিজ্ঞানের উৎস!! আর তৃতীয় পর্যায় শুরু হয় না-জায়েজ বিজ্ঞানকে ধর্ম-প্রচারে কাজে লাগানো। একটা উদাহরণ দিই - মাইক্রোফোন আবিষ্কারের পর ওটা ব্যবহার করে আজান দেয়াকে না-জায়েজ বলা হতো। (চট্টগ্রাম শহরের একটি মসজিদে মাইক ব্যবহারকে কেন্দ্র করে এই সেদিনও মুসল্লীদের মধ্যে মারপিট হয়েছে।) আর এখন? বাংলাদেশের প্রতিটি শহরের হাজারো মসজিদের মাইক কী দৈনিক কী পরিমাণ শব্দ দূষণ করে তা যদি কেউ গবেষণা করে প্রকাশ করে - তার জীবন সংশয় দেখা দিতে পারে। কম্পিউটারে ভাগ্যগণনায় আজকাল দারুণ লাভ হয়।

মানব সভ্যতার ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায় একদম শুরুতে ধর্ম ও বিজ্ঞানে খুব একটা বিরোধ ছিলো না। কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। উপাসনা ধর্ম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে অনেক পরে। সৃষ্টিকর্তার ধারণাও তৈরি হয়েছে আরো অনেক পরে। বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের বিরোধের স্বরূপটা এক পলক দেখার জন্য আমাদের একটু পেছন দিকে যেতে হবে। ইতিহাসের দিকে। অবশ্য প্রচলিত ইতিহাস আর বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রচলিত ইতিহাস মূলত রাজনৈতিক ইতিহাস। রাজা বা শাসনকর্তার ইচ্ছামতো এ ইতিহাস রচিত হয়, বিকৃত হয়, সত্যি ঘটনা মুছে ফেলা হয় বা সাজানো ঘটনার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়। তবে মিথ্যার একটি বড় দুর্বলতা হলো এটা সবকিছুর সাথে সমন্বিত অবস্থায় বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। সামান্য সমন্বয়হীনতার লেজ যখন বেরিয়ে পড়ে - সে লেজ ধরে টান দিলেই মিথ্যার আবরণ খসে পড়ে একসময়। সত্য ইতিহাস সেভাবেই বেরিয়ে আসে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ইতিহাস লেখা হয় প্রকৃতিতে। একটি ফসিল কত বছরের পুরনো, বা এক খন্ড মাটি কী কী সভ্যতা ছুঁয়ে এসেছে তা বৈজ্ঞানিক উপায়েই নির্ণীত হয়। সেরকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই আজ জানা যায় - পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে - কত বছর আগে।

৪

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় পাওয়া নানারকম তথ্যপ্রমাণ থেকে দেখা যায় আধুনিক মানুষ বা হোমো সেপিয়ান্‌স এর আগের প্রজাতি হোমো ইরেক্‌টাসের সময় থেকেই পৃথিবীতে প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ত্রিশ লক্ষ বছর থেকে দশ লক্ষ বছর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে হোমো ইরেক্‌টাসের উদ্ভব ঘটেছিলো। চীনের বেইজিং এর কাছে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক গুহায় পাওয়া নিদর্শন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় - আজ থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে হোমো ইরেক্‌টাসরা প্রাকৃতিক আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার প্রযুক্তি অর্জন করেছিলো। আগুন যে সকল প্রযুক্তির একটি প্রধান উৎস তা পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছে। আগুন জ্বালানো, আগুনকে প্রয়োজন মত কাজে লাগানো এবং প্রয়োজন শেষে আগুন নেভানোর পদ্ধতি মানুষের আয়ত্ত্বে আসার সাথে সাথে সভ্যতার বিরাট একটি ধাপ অতিক্রান্ত হলো। আগুনের শক্তিকে আবিষ্কার করতে গিয়ে মানুষ দেখেছে আগুনের বিধ্বংসী ক্ষমতাও। সেসব থেকে আগুনের প্রতি ভয়ও তৈরি হয়েছে। ভয় থেকে মানুষ আগুনকে দেবতা জ্ঞান করতে শুরু করেছে। সনাতন যুগের সব ধর্মেই আগুন এর ভূমিকা বিশাল।

প্রকৃতিতে বাতাসের শক্তি দেখেছে মানুষ, দেখেছে ঘূর্ণিঝড়। তারপর যখন কৃষিকাজ শুরু করেছে মানুষ - আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে - দেখেছে মাটি থেকে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হচ্ছে, সব কিছু মাটিতে মিশে যাচ্ছে এক সময়। পরবর্তীতে গ্রিক দার্শনিকরা যখন পদার্থের মূল উপাদান নির্ধারণ করতে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে - তখন প্রাথমিক যুগ থেকে বয়ে আসা এ ধারণা কাজে লেগেছে। তাদের মনে হয়েছে - আগুন, পানি, মাটি আর বাতাসই হলো মূল উপাদান। প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখতে দেখতে মানুষ প্রকৃতিকে ভয় করতে শিখেছে - এবং সে ভয়কে জয় করার জন্য সংগ্রাম করতে শিখেছে। দেখেছে প্রত্যেক কাজের পেছনে কারো না কারো হাত রয়েছে। প্রকৃতির অদৃশ্য হাতকে ঈশ্বর জ্ঞান করতে শিখেছে।

ঈশ্বরের ধারণা তৈরি হবার পর মানুষের পর্যবেক্ষণে নতুন একটি ধারা তৈরি হলো। সমাজবদ্ধ ভাবে বাস করার জন্য সামাজিক নিয়ম কানুন তৈরি হলো। শুরু হলো সামাজিক শ্রেণীবিভাগ। নিজেদের মধ্যেই টিকে থাকার সংগ্রামে শারীরিক শক্তির সাথে বুদ্ধিমত্তাও যুক্ত হলো। যাঁরা বুড়ো হয়ে শারীরিক শক্তিতে পিছিয়ে পড়লেন - তাঁরা সমাজে নিজেদের আসন ঠিক রাখার জন্য শুরু করলেন ধর্মব্যাখ্যা। পরবর্তীতে এদের নিয়েই একটা শ্রেণী তৈরি হলো। সামাজিক ধর্মগুরু বা পুরোহিত শ্রেণী। এ পেশায় টিকে থাকার জন্য তাদের দরকার হলো গভীর প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ।

সূর্যোদয় সূর্যাস্ত জোয়ার ভাটা ঋতু পরিবর্তন জলবায়ুর পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে এসবের পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হলো। এদের হাত ধরেই ক্যালেন্ডার তৈরি হলো আজ থেকে প্রায় ২৮০০ বছর আগে। প্রতিষ্ঠিত হলো সময়ের হিসেব - বছর, মাস, দিন, ঘন্টা, মিনিট, সেকেন্ড। সংখ্যার ব্যবহার শুরু হলো। সংখ্যা লেখার চিহ্নও তৈরি হলো। শুরু হলো পৃথিবী কেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণা। যেহেতু এদের ব্যাখ্যার ভুল ধরার কেউ নেই- কোথাও কোন বিরোধ ঘটলো না। এদের এবং এদের উত্তরাধিকারীদের হাতেই রয়ে গেলো সামাজিক ক্ষমতা। আরো পরে যখন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো - রাজত্ব পরিচালনার ব্যাপার এলো - তখনো এই পুরোহিত শ্রেণীর দাপট ঠিকই থাকলো। কারণ রাজারা দেখলো পুরোহিতদের কাজে লাগাতে পারলে রাজত্ব করা সহজ হয়। কারণ যে মানুষ রাজাকে ভয় পায় না সেও প্রকৃতির অজানা রহস্যকে ভয় পায়। ততোদিনে এ প্রকৃতির নাম হয়ে গেছে ঈশ্বর। কিন্তু রাজাদের মন যুগিয়ে চলতে গিয়ে পুরোহিত শ্রেণীর সততায় কিছুটা ভন্ডামীও ঢুকে পড়েছে। নিজেদের অজান্তেই তারা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে ও তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নিজেদের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করতে চাইলেন না। ফলে স্বাধীন গবেষক ও রাষ্ট্রক্ষমতার কাছাকাছি গবেষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হতে শুরু করলো। আস্তে আস্তে আলাদা হতে শুরু করলো বিজ্ঞান ও ধর্মবিশ্বাস। পরবর্তীতে যখন পৃথিবী কেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণা ভুল প্রমাণিত হতে শুরু করলো পুরোহিতরা ভাবলো এতে তাদের আসন টলে যাবে। তাই তারা সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণার বিরোধীতা করলো। রাষ্ট্র পুরোহিতদের সমর্থন করলো। সে কথায় আসছি আর একটু পরের দিকে।

৫

টেক্সাসের হিউস্টন থেকে প্রকাশিত "এ ব্রিফ ইলাস্ট্রেটেড গাইড টু আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইসলাম"[1] নামে একটি বই আমার হাতে এসেছে। সেখানে বলার চেষ্টা করা হচ্ছে যে বিজ্ঞানের সাথে কোরাণের কোন বিরোধ নেই। বিজ্ঞান যা কিছু আবিষ্কার করছে - তা কোরাণ থেকেই ধার করা। মানব ভ্রূণের দুটো তুলনা আছে এই বইতে। একটি তুলনা হলো জোঁকের সাথে, অন্যটি হলো দাঁতে চিবানো চুইংগামের সাথে। এগুলো দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে কোরাণে মানুষের জন্ম কীভাবে হয় তার সঠিক বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কোরাণে উল্লেখ আছে আলাখ্ ও মুদ্‌ঘাহ্‌র কথা। আলাখ্ মানে হতে পারে জোঁক, ঝুলন্ত বস্তু বা জমাট রক্ত। আর মুদ্‌ঘাহ্ মানে চিবানো বস্তু। মানব ভ্রূণের ছবির সাথে জোঁক ও চিবানো চুইংগামের ছবির তুলনা করা হয়েছ আমাদের বোঝাতে যে কোরাণ সবজান্তা!

সে যাই হোক, মানুষের শরীর সম্পর্কে প্রত্যেক ধর্মই খুব স্পর্শকাতর। সকল ধর্মই শরীরকে খুব গুরুত্ব দেয়। এতই গুরুত্ব দেয় যে ধর্মের এ বাড়াবাড়ির কারণে প্রথম দিকে মানুষের শরীর নিয়ে কোন গবেষণা করাই সম্ভব ছিলো না। মৃত মানুষের শরীর ব্যবচ্ছেদ করে দেখা ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ভাবে নিষেধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের দেহের প্রথম ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছিলো আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে। গ্রিক ডাক্তার আল্কমেইয়ন গোপনে মানুষের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে শিরা ও ধমনীর পার্থক্য খুঁজে পান। আর শরীরের বিভিন্ন অংগপ্রত্যংগের মধ্যে স্নায়বিক সংযোগের ধারণাও আল্কমেইয়নই দেন। কিন্তু পরবর্তী ছয় শ বছর ধরে মানুষের এনাটমি নিয়ে আর কোন গবেষণা করা যায়নি ধর্মগুরুদের বাধার কারণে।

খ্রিস্টান ধর্মের উত্থান ঘটার পর এ অবস্থার আরো অবনতি ঘটলো। খ্রিস্টান ধর্মগুরুরা প্রচার করতে লাগলো যে মানুষের শরীর ঈশ্বর প্রদত্ত আত্মা রাখার একটি খাঁচা ছাড়া আর কিছু নয়। এবং সে খাঁচা খুলে দেখার অধিকার মানুষের নেই। সেসময় ১২৯ সালে ক্লডিয়াস গ্যালেনের জন্ম। তুরস্কের একটি ধনী পরিবারে জন্ম নেয়ার কারণে গ্যালেনের পক্ষে মানুষের শরীর পর্যবেক্ষণ করার কিছুটা সুযোগ হয়েছিলো। চিকিৎসাবিদ্যা শেখার জন্য গ্যালেন রোমে গিয়ে রোমান গ্ল্যাডিয়েটরদের রক্তাক্ত দেহ পর্যবেক্ষণ করলেন অনেকদিন ধরে। হৃদপিন্ডের কাজ, শিরা ও ধমনীর কাজ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করলেন তিনি। কিন্তু মানুষ তখনো বিশ্বাস করে যে আত্মা থাকে শরীরের ভেতর। গ্ল্যাডিয়েটররা আহত হয়ে মারা যাবার সময় গ্যালেন দেখলেন যে তাজা টকটকে ঘনলাল রক্ত বেরিয়ে আসছে শরীর থেকে। গ্যালেন ভাবলেন এর নাম জীবন। মারা যাবার সময় এভাবেই জীবন বেরিয়ে যায়। আর বেঁচে থাকলে ধমনী ও শিরা দিয়ে রক্তের সাথে জীবন প্রবাহিত হয়। গ্যালেনের অনেক ধারণা পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হলেও তারজন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে আরো তেরশ বছর। গ্যালেন এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। তাঁর এ বিশ্বাসের কারণে তাঁর পর্যবেক্ষণও ছিলো কিছুটা ঈশ্বর কেন্দ্রিক।

বিজ্ঞানের অন্যান্য কিছু শাখা যখন ডানা মেলতে শুরু করেছে - তখনো মানুষের শরীরের রহস্য জানার জন্য কোন গবেষণাই করা যাচ্ছে না ধর্মগুরুদের নিষেধের কারণে। ক্লসিয়াস গ্যালেনের পর্যবেক্ষণকেই সত্য হিসেবে ধরে নিয়ে চললো ১৪৯০ সাল পর্যন্ত। ধর্মগুরুদের প্রবল আপত্তির মুখেও ইতালির পাদুয়াতে এনাটমিক্যাল থিয়েটার তৈরি হলো। এখানে এনাটমি নিয়ে কাজ করলেন লিওনার্দো দা ভিনচি, এন্ড্রিয়াস ভেসিলাস প্রমুখ। মানুষের শরীরের ওপর ধর্মের বাধা নিষেধ কিছুটা কমে এলেও একেবারে থেমে নেই। এখনো মানুষের শরীর নিয়ে নতুন গবেষণায় ধর্ম একটি প্রধান বাধা।

জন্মনিয়ন্ত্রণকে অনেক ধর্মেই ধর্মবিরুদ্ধ কাজ বলে ধরে প্রচার করা হয়। গোঁড়া ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা কোন ধরণের জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহার করাকে ধর্মবিরুদ্ধ মনে করে। ১৯৫৬ সালে জন্মবিরতিকরণ পিল উদ্ভাবনের পর ধর্মগুরুরা ক্ষেপে গেলেন। কিন্তু তাতে খুব একটা কাজ হয়নি। মেয়েদের জীবন অনেকভাবেই বদলে গেলো এরপর থেকে। সন্তানজন্মসংক্রান্ত নানারকম রোগের হাত থেকে বাঁচতে আরম্ভ করলেন মেয়েরা। কিন্তু কিছু কিছু ধর্মবিশ্বাস এখনো বিজ্ঞানের এ অবদানকে স্বীকার করে না।

গর্ভপাতকে ধর্ম প্রবল ভাবে বাধা দিয়ে আসছে। খুব দরকার না হলে শখের বশে কেউ গর্ভপাত করে না। কিন্তু কিছু কিছু ধর্মবিশ্বাসী মনে করেন - এটা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ। তাঁরা আবার এটাও বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করার ক্ষমতা কারো নেই। তাহলে গর্ভপাত যেহেতু হচ্ছে তা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয় কীভাবে! কিন্তু যুক্তির কথা তো ধর্ম শোনে না। টেস্টটিউব বেবিকেও ধর্মবিশ্বাসীরা ধর্মবিরুদ্ধ কাজ মনে করেন। সে একই রকম অন্ধকারাচ্ছন্ন মানসিকতার কারণে স্টেমসেল রিসার্চ বাধাগ্রস্ত। অথচ সে গবেষণা থেকে মানুষ মুক্তি পেতে পারে আল্‌ঝেইমারের মত মারাত্মক ডি-এন-এ ঘটিত রোগ থেকে।

৬

বিবর্তনবাদকে কিছু কিছু ধর্মবিশ্বাসী মোটেই স্বীকার করেন না। ১৮৫৯ সালে ডারউইনের 'দি অরিজিন অব স্পেসিস' প্রকাশিত হবার পর পৃথিবীর ধর্মাকাশে একটি ঝড় বয়ে গেলো। সে ঝড় এখনো থামেনি। ধর্মবিশ্বাসীরা মানতেই চাচ্ছেন না যে মানুষ সরাসরি ঈশ্বরের হাতে কাদামাটি থেকে তৈরি নয়। আদম বা হাওয়ার কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি বৈজ্ঞানিক গবেষণায়। মানুষ এসেছে অনেক অনেক বছরের প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। নানারকম আগ্রাসী বিতর্ক শুরু হয়ে গেলো, যা এখনো চলছে বিশ্বজুড়ে। এ প্রসংগে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন বন্যা আহমেদের "বিবর্তনের পথ ধরে" [2] । এখানে একটা জিনিস লক্ষ্যণীয় যে বিবর্তনের বিরুদ্ধে নানারকম ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রচার করা হচ্ছে। একই সাথে অনেক গুলো মতবাদ তো সত্য হতে পারে না। তা ছাড়া চোখের সামনে যে বিবর্তন ঘটছে - তা চোখে দেখার পরেও ধর্মের দোহাই দিয়ে তা না মানার গোঁ ধরে থাকলে তাতে কার কী উপকার হবে বোধগম্য নয়।

ধর্মবিশ্বাসীরা বিবর্তনবাদকে পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে না পেরে - প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে এখন। ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন নামে একধরণের ছদ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গেলানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে ঈশ্বর ছাড়া এরকম অপূর্ব বুদ্ধিবৃত্তিক নির্বাচন আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যোগ্যতমকে খুঁজে নেয়ার দায়িত্ব ঈশ্বর নিজের হাতেই রেখে দিয়েছেন। ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন বা আইডি তত্ত্ব মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ ক্ষমতায় আসার পর। সহজেই বোঝা যায় যে এটা একটা সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক চাল। আমি বেশ কয়েকজন গোঁড়া খ্রিস্টান বাইবেল বোদ্ধাকে জিজ্ঞেস করে দেখেছি - বাইবেলে আইডি সম্পর্কে কী লেখা আছে বা আদৌ কিছু আছে কিনা। ঈশ্বরই সব কিছু ডিজাইন করেছেন জাতীয় এলোমেলো কিছু কথাবার্তা ছাড়া সুনির্দিষ্ট কিছু তাঁরা জানাতে পারেন নি। আসলে তত্ত্বটা খুব বৈজ্ঞানিক করতে গিয়ে সহজপাচ্য করতে পারেনি। এ প্রসংগে অভিজিৎ রায়ের একটি চমৎকার প্রবন্ধ আছে মুক্তমনায়, "আই ডি নিয়ে কূটকচালী" । আরো একটি চমৎকার বই এর নাম এখানে করা যায়। তা হলো রবিন উইলিয়াম্‌স এর "আনইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন, হোয়াই গড ইজন্‌ট এজ স্মার্ট এজ শি থিঙ্কস শি ইজ" [3]।

বিবর্তন প্রশ্নেই ধর্মবিশ্বাসীদের সাথে অনেকদিন থেকেই বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব চলছে পৃথিবীর সৃষ্টি ও বয়স নিয়ে। বাইবেলের পক্ষ নিয়ে একপক্ষ বলছে পৃথিবীর বয়স মাত্র ছয় হাজার বছর। অন্যদিকে বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ অনুসন্ধান, গবেষণা ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে হিসেব করে দেখিয়েছেন যে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে কমপক্ষে সাড়ে চার শ কোটি বছর আগে। বাইবেলে বলা আছে বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টি হয়েছে মাত্র ছয়দিনে। ১৬৪২ সালে ব্রিটিশ মন্ত্রী ও বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ জন লাইটফুট "অবজারভেশন্‌স অন জেনেসিস" নামে ২০ পৃষ্ঠার একটি বই লেখেন। সেখানে তিনি লেখেন যে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ৩৯২৮ সালের ১২ সেপ্টেম্বর। আর মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে এর পাঁচদিন পর, ১৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল নয়টায়। ডক্টর লাইটফুট উচচশিক্ষিত মানুষ, কিছুদিন পর ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এর পর ১৬৫০ সালে এংলিকান বিশপ জেম্‌স উশার ওল্‌ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা অ দেবতাদের বয়স হিসেব করে ঘোষণা করলেন, পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে যীশুখ্রিস্টের জন্মের ৪০০৪ বছর আগে, অক্টোবর মাসের ২৬ তারিখ রবিবার সকাল নয়টায়। সময়টি কোন্‌ দেশের স্থানীয় সময় তা জানা যায় নি। এঁদের এসমস্ত দাবীর সাথে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণের কোন মিল নেই। বৈজ্ঞানিক হিসেবে দেখা যাচ্ছে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে প্রায় সাড়ে চার শ কোটি বছর আগে। যেহেতু ধর্মগ্রন্থগুলো এসব বৈজ্ঞানিক তথ্য এখনো গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেনি, ধর্মবিশ্বাসীরা এখনো বিশ্বাস করে পৃথিবীর বয়স মাত্র চার হাজার বছর। আর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ গুলো ঈশ্বরই ওভাবে রেখে দিয়েছেন মানুষের

জ্ঞানের সীমানা দেখার জন্য। কারণ তিনি মানুষের জ্ঞান পরীক্ষা করে দেখতে খুব পছন্দ করেন। এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলছে এখনো, হয়তো চলবে অনেকদিন। তবে একসময় দেখা যাবে নতুন করে লেখা হচ্ছে বাইবেলের জেনেসিস - সেখানে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রবেশ করানো হবে, এবং আবারো প্রচার করা হবে যা সব লেখা আছে বাইবেলে!!

৭

পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরছে - এ সত্য কখনোই মেনে নিতে চায়নি ধর্মবিশ্বাসীরা। কারণ মানুষকে ক্ষমতার কেন্দ্রে দেখতে ভালোবাসে সবাই। আর মানুষের পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরবে আর সবকিছু - পৃথিবী স্থির থাকবে - এরকমই বিশ্বাস ছিলো তখন। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ সালে গ্রিক দার্শনিক হিপার্‌কাস ধারণা দেন যে বিশ্বব্রহ্মান্ডের কেন্দ্রে আছে পৃথিবী। এর প্রায় আড়াইশ বছর পর টলেমি হিপার্‌কাসের তত্ত্ব সমর্থন করে নানারকম যুক্তি দেন। তাঁর একটি যুক্তি ছিলো, যেহেতু পৃথিবীতে মানুষ বাস করে - সেহেতু সবকিছু পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই ঘুরবে। চার্চের খুব ভালো লাগলো টলেমির কথা। ভালো লাগাই কাল হলো - মহাকাশ গবেষণা ভুল পথে এগোতে থাকলো পরবর্তী প্রায় সাড়ে তের শ বছর ধরে।

১৫০৭ সালে পোলান্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাস দেখলেন টলেমির গাণিতিক যুক্তিগুলো প্রচুর ভুলে ভরা। কোপার্নিকাস হিসেব করে দেখালেন যে পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। চার্চের রোষানলে পড়ার ভয়ে তিনি অনেক বছর এসব গবেষণা প্রকাশ করেননি। শেষে ১৫৪৩ সালে তিনি এ তথ্য প্রকাশ করেন "অন দি রিভিলিউশান অব দি হেভেনলি বডিজ" বইতে। তিনি জানতেন যে বইটি প্রকাশিত হলে চার্চের নেতারা ক্ষেপে যাবেন। বুদ্ধি করে কিছুটা ঘুষ দেয়ার মতোই তিনি বইটি উৎসর্গ করলেন পোপ তৃতীয় জন পল্‌কে। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হলো না। চার্চের নেতারা কোপার্নিকাসের বইগুলো পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দিলেন। তবুও ভালো যে কোপারনিকাস্‌কেই পুড়িয়ে মারার আদেশ দেয়া হয়নি। পরে গ্যালিলিও যখন এ নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন - ক্যাথলিক চার্চ আদেশ দিলো কাজ বন্ধ করতে। গ্যালিলিওকে হুমকি দেয়া হলো যেন তিনি পৃথিবীর ঘূর্ণন সম্পর্কে আর একটি কথাও না বলেন। কিন্তু সহজে থেমে থাকার পাত্র গ্যালিলিও নন। তিনি একটি বই লিখলেন এবং তাতে পোপের বিরুদ্ধেও লিখলেন অনেক কিছু। ক্ষেপে গেলেন পোপ। গ্যালিলিওর সামাজিক প্রতিষ্ঠার কারণে তাঁকে হত্যা করলে জনমত চার্চের বিরুদ্ধে যেতে পারে ভেবে গ্যালিলিওকে গৃহবন্দী করা হলো। দীর্ঘদিন বন্দী অবস্থার মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে গ্যালিলিও

একসময় বাধ্য হয়ে ঘোষণা করেন যে, তিনি ভুল বলেছেন। কিন্তু সংগে সংগে এটাও বলেন যে, পৃথিবীর ঘূর্ণন কিন্তু পোপের কথামতো থেমে যাবে না। থেমে যায়নি। এতবছর পরে ভ্যাটিকানের পোপ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে গ্যালিলিওর প্রতি অবিচার করা হয়েছিলো সেদিন। ১৬০০ সালে নুহ্'র প্লাবন কখনোই হয়নি বলার অপরাধে ব্রুনোকে রোমের রাস্তায় প্রকাশ্যে পুড়িয়ে মেরেছে ইউনাইটেড চার্চের যাজকেরা। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অ মতামতের কাছে ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছিলো চার্চ। তখন চার্চের শক্তি সংহত করার উদ্দ্যেশ্যেই ব্রুনোর মতো মানুষকে খুন করা হলো। ভিন্ন মতের বিরুদ্ধে ধর্মবিশ্বাসীদের এ হলো স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

৮

শুধুমাত্র ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করলেই যে চার্চ ক্ষেপে যেতো তা নয়। মেয়েদের প্রতি বৈষম্যমুলক আচরণ কোন ধরণের কারণ ছাড়াই ঘটেছে তখন। মিশরের হাইপাশিয়া ছিলেন ৩৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৪১৫ সাল পর্যন্ত একমাত্র মেয়ে যিনি সমতল জ্যামিতিতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তিনি টলেমির পৃথিবী কেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণাকেও স্বীকার করতেন। কিন্তু তারপরও তাঁকে প্রকাশ্যে হত্যা করেছে। রাস্তা থেকে টেনে চার্চের ভেতর নিয়ে গিয়ে হিংস্রভাবে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে তাকে। তারপর রাস্তার উপর পুড়িয়ে মেরেছে তথাকথিত প্রেমের অবতার যীশুখ্রিস্টের মতাদর্শে বিশ্বাসীরা। পরবর্তী এক হাজার বছরে আর একজন মহিলাও বিজ্ঞান চর্চায় এগিয়ে আসতে পারেন নি।

৯

বিজ্ঞান ও ধর্মের ইতিহাস অনেক দ্বন্দ্বে ভরা। অনেক সময় নিজেদের ব্যক্তিগত ঘৃণার বহিঃপ্রকাশও ঘটায় অনেকে। যেমন প্রথম জীবনে আইনস্টাইনকেও ইহুদি পরিবারে জন্ম নেয়ার কারণে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। তাঁর গবেষণাকে জার্মানিতে ইহুদিদের বিজ্ঞান নামে প্রচার করা হয়েছে। এখনো অনেক দেশে শুধুমাত্র ধর্মীয় সংখ্যালঘু শ্রেণীর প্রতিনিধি হবার কারণে বৈষম্যের শিকার হতে হয় বিজ্ঞানীদের। বিজ্ঞানের কথা বললে তা যদি ধর্মের বিরুদ্ধে যায় - তা ব্যক্তিগত মত বলে প্রচার করা হয়। কিন্তু সুখের কথা হলো - বিজ্ঞানকে অস্বীকার করলেই তা মিথ্যা হয়ে যায় না।

বর্তমানে সব ধর্মবিশ্বাসীরাই প্রমাণ করতে চাচ্ছে তাদের ধর্ম বিজ্ঞান সম্মত - তাতে বিজ্ঞানের শক্তিকেই স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে। কারণ বিজ্ঞান চলবে বৈজ্ঞানিক ধর্মের ভিত্তিতে, কিন্তু বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অচিরেই অচল হয়ে যাবে।

---

[1] Ibrahim, IA. A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam. Houston: Darussalam. 1997.

[2] বিবর্তনের পথ ধরে; বন্যা আহমেদ; ফেব্রুয়ারি ২০০৭; অবসর, ঢাকা;

[3] Williams, R. Unintelligent Design Why God Isn't As Smart As She Thinks She Is. New South Wales, Australia: Allen & Unwin. 2006.

ড. প্রদীপ দেব অস্ট্রেলিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত। ইমেইল - Pradip.Deb@utas.edu.au. প্রকাশিত বইঃ অস্ট্রেলিয়ার পথে পথে (২০০৫), আলবুকারকি থেকে হলিউড (২০০৬), আইনস্টাইনের কাল (২০০৬)।

সৃষ্টিতত্ত্বের অসারতা বনাম বিবর্তনতত্ত্বের সাফল্য :

কিভাবে বিজ্ঞান সৃষ্টিতত্ত্বের গালগপ্পগুলোকে ধীরে ধীরে হটিয়ে দিল

দিগন্ত সরকার

সব জাগতিক বা মহাজাগতিক বস্তুর মত পৃথিবীরও একটা ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস ক্রমপরিবর্তনের ইতিহাস - যুগে যুগে নতুন আকারে বিকাশের ইতিহাস। এই পরিবর্তনের কোনো শেষ নেই, আজও তা ঘটে চলেছে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যদি পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখা যায়, তাহলে দেখা যাবে এই ইতিহাসের শুরু আজ থেকে প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে। এক মহাজাগতিক বিস্ফোরণে ছিটকে আসা এক জ্বলন্ত প্রস্তরখন্ড রূপে আমাদের পৃথিবী অগণিত মহাজাগতিক তারকার মধ্যে একটির চারদিকে ঘুরতে শুরু করে। সেই তারকা হল সূর্য। তারপরে আরো একশো কোটি বছর এগিয়ে গেলে দেখা যাবে পৃথিবী অনেক শীতল হয়েছে, যদিও বায়ুমন্ডল বিষাক্ত গ্যাসে ভর্তি, প্রাণী বা উদ্ভিদ কোনোটিরই দেখা নেই। তারই মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে আজকের সকল প্রাণীর পূর্বপুরুষ - কিছু অতি সরল ব্যাকটেরিয়া জাতীয় জীব। এই জীবেরা জড় পদার্থের থেকে সামান্যই আলাদা - এরা নিজেদের প্রতিরূপ বানাতে সক্ষম ও বহির্প্রকৃতি থেকে শক্তি সংগ্রহ করে জীবের গঠন উপাদান প্রোটিন সংশ্লেষ করতে পারে।

পরিবর্তনের ইতিহাস আর বিবর্তনবাদ

কিন্তু প্রশ্নের কি আর শেষ হয়? কয়েকশো কোটি বছরে কিভাবে সাধারণ ব্যাকটেরিয়া থেকে আমগাছ, হাতি বা তিমিমাছের মত আলাদা প্রাণী তৈরী হল? কেন সরল প্রাণী সরল রয়ে গেল না? পৃথিবীতে এত জীব বৈচিত্র্যের কারণ কি? কেন পৃথিবীতে যত প্রজাতি বাস করেছে তাদের নব্বই শতাংশই আজ বিলুপ্ত? কেন কিছু কিছু জীব তাদের কোটি কোটি বছর আগের রূপেই বর্তমান, অথচ তাদের সমসাময়িক বাকি জীবেরা পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ ধারণ করেছে? কিভাবে প্রাপ্ত ফসিল থেকে জানা যায় যে মানবজাতির আদি পুরুষ বানর জাতীয় প্রাণী?

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় বিবর্তনের তত্ত্বে। বিজ্ঞানের ভাষায়, জীবসমষ্টির বংশানুক্রমিক পরিবর্তনকেই বলা হয় বিবর্তন। জিন (Gene) হল বংশগতির একক, যা জীবের বৈশিষ্ট্যকে এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে বহন করে। জিনের পরিবর্তনের মাধ্যমেই বিবর্তন ঘটে। তবে সামগ্রিক অর্থে, বিবর্তন সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য - সংস্কৃতি, ভাষা, গান-বাজনা বা স্থাপত্য পরিকল্পনা - সবকিছুই সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হয়, এগুলো তো চোখের সামনেই ঘটছে। আর বিজ্ঞানের নিরিখে বিবর্তন বর্তমান জীববিজ্ঞানের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শাখা - যার কাজ হল এই পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক গুলো উন্মোচন করে প্রাকৃতিক নিয়মনীতি অনুধাবন করা।

কিন্তু কিভাবে আমরা জানতে পারলাম যে জীবসমষ্টির মধ্যে এভাবে পরিবর্তন ঘটে? কিভাবে বোঝা যায় যে কয়েকশ কোটি বছর ধরে জীব বিবর্তিত হয়েই আজকের রূপ ধারণ করেছে এবং এখনও পরিবর্তিত হয়ে চলেছে? কেন আমরা মনে করি এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল এবং কোনো দৈবপ্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়?

এর উত্তর হল প্রমাণ। গত দুই শতক ধরে মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। সেই সমস্ত তথ্যপ্রমাণের সম্মিলিত তাত্ত্বিক রূপ হিসাবে সামনে এসেছে বিবর্তন তত্ত্ব। দেড় শতক আগে প্রথম প্রস্তাবিত হওয়ার পরে, আজ অবধি এই প্রস্তাবের সমর্থনে প্রমাণ এসেছে প্রস্তর স্তরে পাওয়া ফসিল আকারে, এসেছে জীবের শারীরিক গঠন-সামঞ্জস্যের মধ্যে দিয়ে, এসেছে জিন ও DNA আবিষ্কারের মাধ্যমে। তাই আজকের বিজ্ঞানীমহলে বিবর্তনবাদ, মহাকর্ষের মতই সুপ্রতিষ্ঠিত একটি তত্ত্ব।

প্রাচীন পৃথিবীর লোকগাঁথায় সৃষ্টিতত্ত্ব

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত যে মানবসভ্যতায় একটা বড় সময় ধরে মানুষ জানতই না যে জীব আদৌ পরিবর্তিত হয়। তাদের চোখে পৃথিবী ও জীবজগৎ ছিল স্থিতিশীল এবং অপরিবর্তনীয়। তারা মনে করতেন সৃষ্টির আদি থেকে সমস্ত জীবপ্রজাতি অপরিবর্তিত আকারে বিদ্যমান। এর ফলে তাদের সৃষ্টিরহস্য ব্যাখ্যায় সাহায্য নিতে হত কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তির বা কোনো অলীক কল্পনার, যার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। একারণেই পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্যতায় সৃষ্টির একেকরকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এদের অধিকাংশই ঈশ্বর প্রভাবিত সৃষ্টি-প্রক্রিয়া।

ইরাকে গড়ে ওঠা প্রাচীন ব্যাবিলনের লোকেরা মনে করত যে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতকে। সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার প্রারম্ভে পৃথিবীতে শুধু জল ছিল, আর তাতে এক মিষ্টি জলের দেবতা (আপ্সু) আর এক নোনা জলের দেবী (তিয়ামাত) থাকতেন।বজ্রবিদ্যুতের দেবতা (মারদুক) তিয়ামাতকে মেরে তার শরীরের দুই অংশ নিয়ে স্বর্গ-নরক তৈরী করে।

মধ্য আমেরিকার মায়া সভ্যতার সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় একাধিক দেবদেবীর ভূমিকা ছিল। তাদের মতে, পৃথিবী হল জলে ভাসমান একটি বৃহৎ কুমীরের পৃষ্ঠে অবস্থিত। স্বর্গ ও নরকের একাধিক স্তরের মধ্যে আছে সংযোগরক্ষাকারী একটি বিশাল বৃক্ষ, যা প্রকৃতপক্ষে রাজার প্রতিমূর্তি। সমগ্র পৃথিবী ৫০০ বছরের আবর্তে ধ্বংস ও সৃষ্টি হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার ইনকাদেরও একইরকম চক্রাবর্তে ধ্বংস-সৃষ্টির ধারণা ছিল। তাদের মতে মৃতরা কোনো অতিপ্রাকৃতিক জগতের বাসিন্দা, তাই তারা মৃত শরীরকে মমি বানিয়ে সংরক্ষণ করত।

প্রাচীন মিশরে মনে করা হত যে সৃষ্টির আদিতে সমগ্র জগৎ জলপূর্ণ ছিল, তাতে সূর্যদেব রা সর্বপ্রথম উদিত হন। দেবরাজ রা-এর দুই সন্তান হল বায়ুমন্ডল যা এক তৃতীয় সন্তানের ওপর অবস্থিত। এই তৃতীয় সন্তান হল পৃথিবী। আকাশ হল তার চতুর্থ সন্তান।

আফ্রিকায় মাসাই উপজাতির মতে সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বর একটি বৃক্ষকে চিরে তিন খন্ড করেন। প্রথম খন্ড থেকে একটি লাঠি দেন মাসাইদের পিতৃপুরুষকে পশুপালনের জন্য, একটি লাঙল দেন কিকয়ু পিতৃপুরুষকে চাষ করার জন্য আর একটি তীরধনুক দেন কাম্বাকে শিকার করার জন্য।

প্রাচীন গ্রীকদের ধারণায় বিশৃঙ্খল অন্ধকার শূন্যতা থেকে পৃথিবী, তারা আর পাতাল তৈরি হয়। পরে প্রমিথিউস পশুদের থেকে উন্নততর এক প্রাণীরূপে মানবজাতির সৃষ্টি করেন।

প্রাচীন ভারতীয় সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে প্রজাপতি ব্রহ্মা দেব-দেবী এবং পরবর্তীকালে মানুষকে সৃষ্টি করেন।

তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় সৃষ্টিতত্ত্ব হল আব্রাহামিক ধর্মগুলোর (ইহুদী, খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্ম) সৃষ্টি প্রক্রিয়া। এই মত অনুসারে, কয়েক হাজার বছর আগে ঈশ্বর ছয়দিনে স্বর্গ, নরক, পৃথিবী, মানুষ আর পশুদের সৃষ্টি করেন। এই মত অনুসারে, প্রথম পুরুষ আদম আর প্রথম নারী ইভ, ইডেন উদ্যানে আর সব প্রাণীদের সাথে সহাবস্থান করতেন। এক ধূর্ত সাপের (শয়তানরূপী) পরামর্শে ইভ নিষিদ্ধ ফল আদমকে খাওয়ালে শাস্তিস্বরূপ ঈশ্বর তাদের পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তাদের দুই ছেলে হয় - কেন আর আবেল। মানবজাতি এই আদম ও ইভের বংশধর। পরবর্তীকালে, পৃথিবীকে পাপমুক্ত করার জন্য ঈশ্বর পৃথিবী-ব্যাপী বন্যা সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের কৃপায় নোয়া (নূহ) তার নৌকয় সমস্ত প্রজাতির একজোড়া প্রাণী নিয়ে বেঁচে থাকে। সেই বেঁচে থাকা প্রাণীদের থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান সব প্রাণীর। ইসলাম ধর্ম অনুসারে, আদম ছিলেন মানবজাতির প্রথম প্রথম নবী বা দৈবজ্ঞ। ঈশ্বর-সৃষ্ট এই পৃথিবী সার্বিকভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ, এবং এর সবকিছুই নিখুঁতভাবে পরিকল্পিত। এই শৃঙ্খলার মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতীয়মান।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে লোকগাঁথা

আজকের বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ধর্মগ্রন্থে বা লোকগাঁথার এই সৃষ্টিতত্ত্ব স্বীকৃত নয়। কারণ খুবই সাধারণ - এদের স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। যেকোনো তত্ত্ব বা ধারণার সত্যতা যাচাই করার সবচেয়ে সহজ পন্থা হল ধারণাটির স্বপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করা এবং পরীক্ষার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ করেই মানুষ আজ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণে এনেছে, অনুধাবন করেছে প্রকৃতির নীতিমালা।

বিজ্ঞান কেবলমাত্র বাস্তব সত্যকেই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে পারে, মানুষের মন পরিবর্তন করতে পারে না। আমাদের বিবর্তনের ইতিহাস সেরকমই এক বাস্তব সত্য, যা বিজ্ঞানের চোখে প্রমাণিত। কিন্তু মানুষের মনে রয়ে গেছে সেই প্রাচীন লোকগাঁথার রেশ। তাই ধার্মিক মানুষেরা ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত সবকিছুই প্রশ্নাতীত সত্য বলে মেনে নেন - ধরে নেন এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মানুষ সহ সকল প্রাণের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা।

কিভাবে বিজ্ঞান সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে এই লোকগাঁথাগুলোর মধ্যে সত্যতা নেই? কেন মনে করে এগুলো মানুষের জ্ঞান ও প্রমাণের অভাবের ফলে তৈরি কিছু অলীক গল্প? দেখা যাক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এদের ত্রুটি কোথায়।

মাত্র সাত দিনে মহাবিশ্ব?

সাতটি আক্ষরিক দিনে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে বলে এখন বিজ্ঞানীরা দূরে থাক, সাধারণ শিক্ষিত মানুষও মনে করেন না। কিন্তু এই মতাবলম্বীরা সবসময়েই মত পরিবর্তন করে চলেন। একটা সময় এই ধর্মবাদীরা ধর্মগ্রন্থের সবকিছু আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করতেন। কিন্তু যখন থেকে তারা বুঝলেন যে বিজ্ঞানের দেখানো সময়ের সাথে তাদর ধর্মগ্রন্থের বেঁধে দেওয়া 'সাত দিন'-এর বিস্তর ফাঁরাক, তারা নিরূপায় হয়ে নিজেদের মত করে ঐ সাতদিনকে সাজালেন। আপাতত, তাদের ব্যাখ্যা অনুসারে সাতটি দিন আসলে সাতটি যুগ, যাতে ধাপে ধাপে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু বিগ ব্যাংগ কে যদি সৃষ্টির আদি ধরে নেওয়া যায়, তাহলে মহাবিশ্বের শুরু ১৫ বিলিয়ন বছর আগে। আর পৃথিবী তৈরী হয় সাড়ে ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে। এই ১০ বিলিয়ন বছর যদি প্রথম দুটি দিন (তৃতীয় দিনে ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেন) হয়, তবে পরবর্তী সাড়ে চার বিলিয়ন বছর কিভাবে পরবর্তী চার দিন হয়?

এই মতাবলম্বীরা আবার নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে আসেন, বলেন দিনের দৈর্ঘ্য যে সুষম হতেই হবে তার তো কোনো মানে নেই। আপাতদৃষ্টিতে এই যুক্তি যথেষ্ট আপত্তিকর মনে হলেও এর ফলেও কিন্তু সাত দিনে সৃষ্টির কোনো কিনারা হয়না। বরং আরো বড় কিছু ত্রুটি সামনে চলে আসে।

ঈশ্বর পৃথিবী তৃতীয় দিনে সৃষ্টি করলেও তখনও চন্দ্র-সূর্য কিছুই নেই, অথচ পৃথিবীতে উদ্ভিদ বর্তমান। চতুর্থ দিনে তিনি চন্দ্র-সূর্য-তারা গঠন করেন ও আকাশ আলোকিত করেন। বাস্তবে, অধিকাংশ তারাই বয়সে পৃথিবীর চেয়ে বড়। তাই পৃথিবী গঠিত হবার পরে আকাশে তারার আবির্ভাব ঘটেছে, এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া,

সূর্যের অনুপস্থিতিতে উদ্ভিদের বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাই, শুধু সৃষ্টির সময়ে নয়, সৃষ্টির ক্রমেও এই সৃষ্টিতত্ত্ব অবৈজ্ঞানিক।

পৃথিবীব্যাপী বন্যা কবে?

যদিও প্রায় সব লোকগাঁথায় প্রবল বন্যায় জীবজগৎ ধ্বংসের কথা লেখা আছে, বাস্তবে, এখনও পর্যন্ত কোনো পৃথিবীব্যাপী বন্যার ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানীদের মতে কিছু প্রবল স্থানীয় বন্যাই লোকগাঁথায় এরকম ধারণার উৎস। যদি পৃথিবীব্যাপী একবারও বন্যা হয়ে থাকত, তাহলে সেই বন্যার বর্ণনায় সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে একটা সাযুজ্য লক্ষ্য করা উচিত। বাস্তবে তার বিপরীতই দেখা যায়।

জাহাজে প্রাণীদের স্থান সংকুলান হল কিভাবে?

প্রাচীন ভারতে মৎসপুরাণে, সুমেরীয় ও হিব্রু (আব্রাহামিক) উপকথায় বলা আছে একটি বিশাল জাহাজে পৃথিবীর বর্তমান সব প্রজাতির যুগল নিয়ে বন্যা থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে রাখার কথা। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে এত অসংখ্য প্রজাতি আছে তাদের সবাইকে একই জাহাজে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়। সহজ হিসাব করে দেখানো যায়, এরকম জাহাজটির ধারণক্ষমতা হতে হবে কমপক্ষে ১০ মিলিয়ন কেজি। একটা জাহাজ কতটা বড় ও মজবুত হলে এত ওজন নিতে পারবে? আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে কি সেই উন্নত টেকনলজি মানুষের কাছে ছিল?

শুধু তাই নয়, সব জীবকে একত্র করাও কি সহজ কাজ? পৃথিবীর সমস্ত প্রজাতির যুগল-নমুনা সংগ্রহ করতে কয়েকশ বছর লেগে যাওয়ার কথা। যদি উল্টোটাও ধরা যায়, সব প্রজাতিরা নিজেরাই জাহাজে এসেছিল, তাহলেও অনুমানে বিশেষ উন্নতি হয় না। শ্বেত-ভালুক আর হাতি একই পরিবেশে বেঁচে থাকবে এটা সম্ভব নয়, তাই একই জাহাজে একই পরিবেশে তাদের প্রাণধারণ করা প্রশ্নাতীত। খাদ্যসমস্যার কথাও ভেবে দেখার মত। বিভিন্ন প্রজাতির বিভিন্ন খাদ্যাভ্যাস - সকলকে সন্তুষ্ট করতে গেলে প্রচুর পরিমাণে এবং বিভিন্ন ধরণের খাবার দরকার।

আসলে যারা অনেক বছর আগে এই ধর্মগ্রন্থগুলো লিখেছিলেন তাদের কোনো ধারণাই ছিল না যে পৃথিবীটা সত্যি কতটা বড় ও কত বৈচিত্র্যময়। তাদের জীবনে তারা যে কয়েকটি জীবপ্রজাতির সম্মুখীন হতেন, সেগুলো হয়ত একটা প্রমাণ আকারের জাহাজে স্থান করে নিতে পারত। কিন্তু ভবিষ্যতে মানুষের যত জ্ঞানের পরিধি বেড়েছে, ততই মানুষ এইসব ধারণাকে প্রশ্ন করতে শিখেছে। আজকের জগতে এই লোকগাঁথাগুলোর ইতিহাসের পাতায় ছাড়া স্থান নেই।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব

স্বাভাবিকভাবেই এইসব ত্রুটি থাকার কারণে অনুসন্ধিৎসু মানুষের কাছে ধর্মীয় ব্যাখ্যা জনপ্রিয়তা কমে চলেছিল। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে নৌ-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি ও পৃথিবী সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণার স্বচ্ছতার কারণে এরকম অনেক অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি প্রমাণের খোঁজে বিশ্বের নানা প্রান্তে গিয়ে হাজির হলেন। এরকমই একজন ছিলেন চার্লস ডারউইন। তিনি পাঁচ বছর ধরে বিগল নামক একটি জাহাজে চড়ে বিশ্বের নানাপ্রান্তে ঘুরে জীববৈচিত্র্যের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। তারও কুড়ি বছর পরে, ১৮৫৯ সালে, তিনি '*অরিজিন অব স্পিসিস*' নামক একটি বইতে (Origin of Species) তার পর্যবেক্ষণ ও সংগৃহীত তথ্য সহ একটি মূল তত্ত্বের আকারে প্রকাশ করেন। এই তত্ত্ব ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব নামে খ্যাত। বর্তমানে এটি হল বিবর্তনবাদের সর্বজনস্বীকৃত মতবাদ।

প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব অনুসারে, একই প্রজাতির জীবগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা হয়। আর প্রতিযোগিতায় যোগ্যতমই বেঁচে থেকে বংশবিস্তার করার সুযোগ পায়। জীবের যে বৈশিষ্ট্য তাকে এই প্রতিযোগিতায় সুবিধা প্রদান করে, সেই বৈশিষ্ট্য ক্রমাগত নির্বাচিত হওয়ার ফলে জীবগোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহে পরিণত হয়।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের পর্যায়গুলো হল -

- জীবের প্রজননের মাধ্যমে অপত্যের সৃষ্টি হয়।
- একই জীবের অপত্যের মধ্যে জন্মগত প্রকরণ (variation) বা বৈশিষ্ট্য-পার্থক্য থাকে।
- জীবের যে বৈশিষ্ট্য তাকে প্রকৃতিতে মানিয়ে নিতে, বেঁচে থাকতে এবং প্রজননে (Reproduction) সাহায্য করে, সেই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী জীবের বংশবিস্তারের সম্ভাবনাও বাড়ে।
- এর ফলে পরবর্তী প্রজন্মে আরো বেশী-সংখ্যক জীবের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যাবে।
- এই বৈশিষ্ট্যগুলো জীবের মধ্যে একত্রিত হতে থাকবে।
- ক্রমাগত পরিবর্তনের মাধ্যমে, কালানুক্রমে জীবগোষ্ঠীর সামগ্রিক ভাবে নতুন শ্রেনীর জীবগোষ্ঠীতে পরিণত হবে।
- আঞ্চলিকভাবে বিচ্ছিন্ন একাধিক জীবগোষ্ঠী নিজ-নিজ পরিবেশ অনুসারে বিবর্তিত হয়ে একাধিক জীবে পরিণত হবে।
- এভাবেই, পরিবেশগত বৈচিত্র্যের জন্য পৃথক জীবগোষ্ঠীর বিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবীতে জীব-বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে।

ক্রমপুঞ্জিত প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে জটিল থেকে জটিলতর বৈশিষ্ট্য জীবের মধ্যে প্রকাশ পায়। সেকারণে, রিচার্ড ডকিন্স তার দ্য ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার (The Blind Watchmaker) বইতে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে অন্ধ পরিকল্পনাকারী আখ্যা দিয়েছেন।

সাম্প্রতিককালে আমেরিকান দার্শনিক ড্যানিয়েল ডেনেট ডারউইনের তত্ত্বকে 'সর্বজনীন অ্যাসিড' বলে বর্ণনা করেছেন, কারণ সব প্রাচীন ধর্মমতের মূল ধারণামূলে এটি আঘাত করে।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কি ভুল হতে পারে না?

নিশ্চয়ই পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচন বা বিবর্তনের তত্ত্বের স্বপক্ষে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে যে অপরিসীম প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে, কোনো নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে তাকে সেই সমস্ত প্রমাণ সহ নতুন প্রমাণগুলোর সার্থক ব্যাখ্যা দিতে হবে। আধুনিক জীববিজ্ঞানে বিবর্তনবাদ ছাড়া কোনো জটিল বিষয়ের সমাধান সম্ভব নয়। তাই এটা বললে অত্যুক্তি হয় না যে বিবর্তন ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না।

সৃষ্টিতত্ত্ব বা সৃষ্টিবাদ

বিবর্তনের স্বপক্ষে এত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বহু মানুষ আজও এতে বিশ্বাসী নন। তার কারণ, বিবর্তনে বর্ণিত সৃষ্টিপদ্ধতি তাদের নিজ-নিজ ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই শ্রেণীর মানুষ সাধারণত খুবই ধার্মিক এবং বিবর্তনবাদ নিয়ে সঠিক জ্ঞান এদের নেই। এদের স্বীকৃত অধিকাংশ মতের বিজ্ঞানে কোনো স্থান নেই। যেমন ধরা যাক, আমেরিকায় অধিকাংশ ধার্মিক মানুষের মতে পৃথিবীর বয়স মাত্র ছয় থেকে দশ হাজার বছর। এই মত মেনে নিলে বিবর্তন তো দূরে থাক, আধুনিক ভূতত্ত্ববিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ধারণাগুলোও পরিবর্তন করতে হবে। ভূতাত্ত্বিকরা (Geologists) মনে করেন ভূত্বক বা প্লেট (tectonic plate) সদা তার নিচের স্তরের ওপর ভাসমান এবং একটি নির্দিষ্ট গতিতে চলমান। তার ফলে কোটি কোটি বছর ধরে মহাদেশ ও মহাসাগরের মানচিত্র পরিবর্তিত হচ্ছে, জেগে উঠেছে নতুন পর্বত। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে ক্ষয়ের ফলে পর্বত থেকে তৈরি হয় মালভূমি, তৈরি হয় গিরিখাত। অপরপক্ষে ধার্মিকরা মনে করেন এসবই সৃষ্টির পর থেকে বছরের পর বছর ধরে অপরিবর্তিত আকারে বিদ্যমান।

এই ধর্মকেন্দ্রিক মতবাদগুলোকেই সম্মিলিতভাবে নাম দেওয়া হয়েছে সৃষ্টিতত্ত্ব বা সৃষ্টিবাদ। এই মতবাদের চর্চা হয় বিভিন্ন সংগঠনে - যেমন সান দিয়েগোতে স্থিত '*ইন্সটিটিউট ফর ক্রিয়েশন রিসার্চ*' (Institute for Creation Research) বা সংলগ্ন মিউজিয়াম যাতে ঈশ্বরের বিভিন্ন 'সৃষ্টি' প্রদর্শিত হয়। এদের পক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয়, তাই এদের মূল লক্ষ্য হল বিবর্তনবাদের মধ্যে ফাঁক খুঁজে বের করা, যাতে বিবর্তনবাদ আর সর্বজনগ্রাহ্য না হয়। কিন্তু বাস্তবে এরা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টি ছাড়া কিছুই করে না।

এই শ্রেণীর বক্তারা জানেন যে বিজ্ঞনীরা বিবর্তনের স্বপক্ষে এত প্রমাণের সম্মুখীন হন, এবং তাদের এই বিষয়ে ধারণাও এত বিস্তৃত যে তাদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে প্রত্যয় আনা সম্ভব নয়। তাই তাদের তত্ত্বের লক্ষ্য হল সাধারণ মানুষ, যারা ধার্মিক মতবাদগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে আহরণ করে। পৃথিবীতে যেহেতু বহু মানুষ আজো প্রকৃত শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, তাদের মনের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রোথিত করে উত্তেজনা সৃষ্টি করাই এদের উদ্দেশ্য।

এক নজরে এবার দেখে নেওয়া যাক বিভিন্ন সৃষ্টিতত্ত্বগুলো। এদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে জনপ্রিয়।

তত্ত্ব	মানুষ সম্পর্কে	প্রজাতি সম্পর্কে	পৃথিবী সম্পর্কে	মহাবিশ্ব সম্পর্কে
নবীন পৃথিবী	সরাসরি ঈশ্বর সৃষ্ট	সরাসরি ঈশ্বর সৃষ্ট	সরাসরি ঈশ্বর সৃষ্ট, বয়স ১০০০০ বছরের কম	সরাসরি ঈশ্বর সৃষ্ট, বয়স ১০০০০ বছরের কম
প্রবীণ পৃথিবী	সরাসরি ঈশ্বর সৃষ্ট	সরাসরি ঈশ্বর সৃষ্ট	বিজ্ঞানসম্মত বয়স, পৃথিবীব্যাপী বন্যার পরে পুনর্গঠিত	বিজ্ঞানসম্মত বয়স
উন্নতিশীল সৃষ্টিতত্ত্ব	সরাসরি ঈশ্বর সৃষ্ট	সরাসরি ঈশ্বর সৃষ্ট কিছু জীব এবং তারপর বিবর্তন, কিন্তু একই জীব থেকে সকল প্রজাতির উদ্ভবে বিশ্বাসী নয়	বিজ্ঞানসম্মত বয়স	বিজ্ঞানসম্মত বয়স
সুপরিকল্পিত সৃষ্টিতত্ত্ব	মতবাদ জানা যায়না	কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রভাব - যেমন হ্রাস-অযোগ্য জটিল জীব-বৈশিষ্ট্য	মতবাদ জানা যায়না (এ সম্বন্ধে কোন অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট এখনও নেই)	মতবাদ জানা যায়না
বিশ্বাসী বিবর্তনবাদ	আদিম মানব থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে	একই জীব থেকে ক্রমাগত বিবর্তনের মাধ্যমে	বিজ্ঞানসম্মত বয়স	বিজ্ঞানসম্মত বয়স

নবীন পৃথিবী সৃষ্টিতত্ত্ব (Young Earth Creationism)

এই তত্ত্বের প্রবক্তারা মনে করেন ঈশ্বর স্বয়ং পৃথিবী এবং সকল প্রজাতির সৃষ্টিকর্তা। তাদের মতে জেনেসিস বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রায় দশ হাজার বছর আগে মহাবিশ্ব সহ পৃথিবীর সৃষ্টি। সমীক্ষামতে, আমেরিকার ৪৭% বাসিন্দা এই তত্ত্বে সহমত। সম্প্রতি সিন্সিনাটিতে এরা একটি বিশাল মিউজিয়ামের উদ্বোধন করেছে যাতে ঈশ্বরের বিভিন্ন

সৃষ্টিকে তুলে ধরা হয়েছে। খ্রীষ্টধর্ম ছাড়াও ইসলাম এবং ইহুদী ধর্মাবলম্বীরাও অনেকে এই বক্তব্যের সমর্থন জানায়।

প্রবীণ পৃথিবী সৃষ্টিতত্ত্ব (Old Earth Creationism)

এই তত্ত্বের প্রবক্তারাও মনে করেন ঈশ্বর স্বয়ং পৃথিবী এবং সকল প্রজাতির সৃষ্টিকর্তা - তবে জেনেসিসের কয়েকটি অংশের অন্যরকম ব্যাখ্যার ফলে তাদের পৃথিবীর বিজ্ঞানসম্মত বয়স মেনে নিতে আপত্তি নেই। তারা বলেন স্বর্গ-মর্ত্য-নরক সৃষ্টির পরে অনেককাল সেখানে হয়ত কিছুই ছিলনা, মাত্র দশ হাজার বছর আগে ঈশ্বর সেখানে প্রাণ ও প্রজাতির সৃষ্টি করেন।

উন্নতিশীল সৃষ্টিতত্ত্ব (Progressive Creationism)

এই মতের প্রবক্তারা মনে করেন বাইবেলে (বা কোরাণে) বর্ণিত সৃষ্টি-প্রক্রিয়া পার্থিব ছয়দিনে সম্পূর্ণ হয়নি। ঈশ্বরের কাছে একদিনের অর্থ একেকটি যুগ। তবে এরাও বিবর্তনবাদ অস্বীকার করেন, এবং মনে করেন পৃথিবীর ইতিহাসে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে (যেমন মানবজাতির উৎপত্তি) ঈশ্বর সরাসরি সৃষ্টি-প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছেন।

বিশ্বাসী বিবর্তনবাদ (Theistic Evolutionism)

এই মতের প্রবক্তারা মনে করেন বিবর্তন হল ঈশ্বর প্রভাবিত একটি উপায় মাত্র, যার মাধ্যমে পৃথিবীতে একাধিক জীব-প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছে। তারা মনে করেন জেনেসিস আক্ষরিক অর্থে ধ্রুব সত্য নয়, রূপকার্থে বর্ণিত। এটি হল ক্যাথলিক চার্চের অফিসিয়াল মতবাদ। এই মতে, পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি এবং পরবর্তী বিবর্তন দৈববিধি দ্বারা পরিচালিত।

অন্যান্য ধর্মে সৃষ্টিতত্ত্ব

হিন্দু সংগঠন ইস্কনের প্রধান স্বামী প্রভুপদ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনের তত্ত্বে বিরোধী। '*লাইফ কামস আফটার লাইফ*' বইতে তিনি এই বিবর্তনবাদের সমালোচনা করেছেন।

বাইবেলের মত কোরাণে বর্ণিত উপায়ে জীব ও বিশ্ব সৃষ্টির বিরোধিতা করে বলে মুসলিম সমাজেও সৃষ্টিতত্ত্ব জনপ্রিয় হচ্ছে। আমেরিকায় এই মতবাদের মূল প্রবক্তা হারুন ইয়াহিয়া ও তার সংগঠন বি.এ.ভি। তুরস্কে এর প্রধান প্রচারক ফেতুল্লা গুলেন। এছাড়া মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াতেও এই মত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সাধারণভাবে এদের প্রচারিত বক্তব্য সুপরিকল্পিত সৃষ্টিতত্ত্ব বা নবীন পৃথিবী সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে মেলে।

সুপরিকল্পিত সৃষ্টিতত্ত্ব (Intelligent Design)

ক্রমাগত প্রমাণের বিরুদ্ধে ধর্মীয় চেতনায় আঘাতের ফলে পূর্ববর্ণিত প্রায় সব সৃষ্টিতত্ত্বই এখন ম্রীয়মান। তাই, তাদের স্থান দখল করেছে একদল নতুন সৃষ্টিবাদী 'বিজ্ঞানী' - যাদের মূল মতবাদ হল 'সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প' বা সুপরিকল্পিত সৃষ্টিতত্ত্ব।

এই তত্ত্বের দাবী হল - "মহাবিশ্ব ও জীবজগতের কিছু বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র কোনো বুদ্ধিমান সত্ত্বার পরিকল্পিত হস্তক্ষেপের মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা যায়।" বক্তব্যের স্বপক্ষে তাদের প্রমাণ হল কিছু বিচ্ছিন্ন জীববৈশিষ্ট্য, যা, তত্ত্বমতে হ্রাস-অযোগ্য জটিলতা। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন ঘটলে সরল অঙ্গ ক্রমাগত নির্বাচনের মাধ্যমে জটিল ও শক্তিশালী হবে। প্রকৃতিতে একই সাথে অঙ্গের সরল এবং জটিল রূপ পাওয়া যাবে। বিহে তার বই '*ডারউইন্স ব্ল্যাক বক্স*'-এ এরকম হ্রাস-অযোগ্য জটিলতার কিছু উদাহরণ দিয়েছেন।

এই ধরণের সৃষ্টিতাত্ত্বিকেরা আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সত্য যাচাই করার কথা বললেও তারাও প্রকৃতপক্ষে ছদ্ম-ধার্মিক ধারণা গুলোকেই বিজ্ঞান বলে উপস্থাপন করার চেষ্টা চালিয়ে যান।

বিবর্তন-সৃষ্টিতত্ত্ব বিবাদ

প্রকৃত বিজ্ঞানীরা স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ধারণা বা তত্ত্ব গঠন করে তার স্বপক্ষে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেন, নিয়মিত পরীক্ষার ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সেই তত্ত্বের সত্যতা যাচাই করেন। তাদের তত্ত্বের দাবীও কখনো একতরফা হতে পারে না, সমসাময়িক আরো বিজ্ঞানীরা তা পর্যালোচনা করে তার ভুলত্রুটি নিরীক্ষণ করেন। সংশোধিত আকারে তত্ত্বটি বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃত হয়।

অপরপক্ষে সৃষ্টিতাত্ত্বিকেরা, নিজেদের বিজ্ঞানী বলে দাবী জানালেও তারা এইধরণের প্রক্রিয়া মেনে চলেন না। তারা ধরে নেন যে সকলের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। প্রমাণ অনুসন্ধান করেন কিভাবে মানুষ ও ডাইনোসর একই পথে হেঁটেছিল, কেউ বা নোয়ার জাহাজের ধ্বংসাবশেষ খুঁজতে ব্যস্ত। আসলে তারা সাধারণ মানুষের মনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করতে চান যাতে তারা মনে করতে থাকে বিবর্তনবাদ হল একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মাত্র যার স্বপক্ষে খুব বেশি প্রমাণ নেই। অদূর ভবিষ্যতে বিবর্তনবাদ বিজ্ঞান থেকে বিতাড়িত হবে।

মানুষ ও ডাইনোসর কি একই পথে হেঁটেছিল?

কিছুকাল আগে সৃষ্টিতাত্ত্বিকেরা দাবী জানিয়েছিলেন যে মানুষ আর ডাইনোসর একই সাথে বসবাস করত। প্রমাণ হিসাবে যে শিলাস্তরে ডাইনোসরের পায়ের ছাপ আছে, সেই একই শিলাস্তরে তারা মানুষের পায়ের ছাপ দেখিয়েছিলেন।

ডাইনোসরের পায়ের ছাপ সত্যি হলেও পরে দেখা গেল মানুষের পায়ের ছাপ মানুষেরই হাতে তৈরী। তিরিশের দশকে ঐ অঞ্চলে পায়ের ছাপ মাটিতে বসানো একটা জনপ্রিয় উৎসবের অঙ্গ ছিল। এ থেকেই বোঝা যায় সৃষ্টিতাত্ত্বিকেরা কিভাবে তাদের 'প্রমাণ' খুঁজে বেড়ান।

সৃষ্টিতাত্ত্বিকেরা বিবর্তনবাদে বিশ্বাস না করার কারণ হিসাবে এই মতবাদের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা ও প্রমাণের অনুপস্থিতির কথা তুলে ধরেন। এইরকম কয়েকটি অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করা হল।

ভুল ধারণা- এক : বিবর্তন একটি অনুকল্প (Hypothesis) বা তত্ত্ব (Theory) যা প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অনুকল্প হল এমন একটি প্রস্তাব, সরাসরি পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষার মাধ্যমে যার সত্যতা যাচাই করা সম্ভব নয়। সাধারণভাবে, তত্ত্ব হল মতবাদ যা ভবিষ্যতে প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একটি তত্ত্ব হল এমন একটি মত যা -

- অনেকগুলো ধারণাকে একত্রিত করে
- কোনো প্রাকৃতিক ঘটনাকে সফলভাবে ব্যাখ্যা করে
- যার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই
- উপর্যুপরি বিভিন্ন ধারা থেকে প্রাপ্ত প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত

এই মতামত অনুসারে, বিবর্তনবাদ ও প্রাকৃতিক নির্বাচন মহাকর্ষ তত্ত্বের মতই আরো একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব - কোনোরকম অনুমানভিত্তিক নয়। আপেল মাটিতে পড়বে কিনা, বা পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে কিনা - এগুলো যেমন কোনো অনুমান নয়, বিবর্তনও সেরকম।

তা সত্ত্বেও যারা বলেন - "তবুও নিশ্চিত হওয়া যায়না" - তারা আসলে দার্শনিক আপেক্ষিকতার ফাঁদে পা দেন। আমরা কখনই সর্বজ্ঞ হতে পারব না, তাই চূড়ান্ত সত্য বলে বিজ্ঞানে কিছু নেই। কিন্তু, তা সত্ত্বেও সত্য বলে বিজ্ঞান তাকেই মেনে নেয় যার স্বপক্ষে জোরালো সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে।শুধু তাই নয়, তত্ত্বটিকে ঠিক বলে ধরে নিলে যে অনুসিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তারও প্রমাণ দরকার। সর্বোপরি, তত্ত্বটির ভবিষ্যতবাচ্যতা থাকতে হবে। বিজ্ঞানে

কোনো তত্ত্ব একদিনে সত্য বলে প্রমাণিত হয় না। বিবর্তনতত্ত্ব গত ১৫০ বছর ধরে বিভিন্ন শাখায় নিজ স্বপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করে এসেছে - তবেই তা বিজ্ঞান-স্বীকৃত তত্ত্ব হয়ে উঠেছে।

যেকোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করার জন্য তার বিরুদ্ধে কিছু নিশ্চিত প্রমাণ দরকার হয়। বিজ্ঞানী হালডেনের মতে, প্রিক্যাম্ব্রিয়ান যুগে যদি খরগোশের জীবাশ্ম পাওয়া যায়, তবে বিবর্তন তত্ত্ব তৎক্ষণাৎ ভুল বলে প্রমাণিত হবে। এধরনের কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণও এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে নেই।

বিজ্ঞানীমহলে বিবর্তনবাদের স্বীকৃতি সর্বজনীন। ১৯৯১ গ্যালপ পোল অনুসারে, আমেরিকায় বিজ্ঞানীদের মধ্যে ৫% সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করেন। কিন্তু এদের মধ্যে কম্পিউটার বা মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার-রাও সামিল। শুধু জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে ১৯৯৫ সালে হওয়া সমীক্ষায় ৪,৮০,০০০ জনের মধ্যে মাত্র ৭০০ জন সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী পাওয়া গেছে। ন্যাশনাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স, (একটি সংগঠন ৭২ জন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী যার সদস্য) বিবর্তনের স্বপক্ষে একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করেছেন। বর্তমানে এই সমর্থন আরো বাড়ছে।

ভুল ধারণা- দুই : বিবর্তন একটি এলোপাথারি (Random) প্রক্রিয়া

কিছু এলোপাথারি প্রক্রিয়া বিবর্তনকে প্রভাবিত করলেও, সামগ্রিক ভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচন কখনোই random নয়। প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বে বিবর্তনের মূল নিয়ন্ত্রক হল প্রকৃতি ও পরিবেশ - প্রকৃতি যাকে নির্বাচন করে, সেই বংশবিস্তারের সুযোগ পায়। সেকারণে অভিপ্রয়াণ বা স্থান-পরিবর্তনের ফলে জীবগোষ্ঠীর বিবর্তন ঘটেছে। নতুন স্থানে নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে যে বৈশিষ্ট্যগুলো বেশী কাজে এসেছে, সেগুলোই পরে প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে পরিগণিত হয়েছে - যার ফলে মূল জীবগোষ্ঠীর থেকে এরা আলাদা প্রজাতিরূপে গণ্য হয়েছে।

বিবর্তনের অন্যতম অঙ্গ হল রূপান্তর বা মিউটেশন (Mutation)। এটি একটি র‍্যান্ডম প্রক্রিয়া। আসলে, জননের এক ধাপে DNA সজ্জা ভেঙ্গে গিয়ে এক জটিল প্রক্রিয়ায় তার প্রতিরূপ তৈরী হয়। প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন না হলে প্রতিরূপে যে ত্রুটি দেখা যায়, তাই মিউটেশনের কারণ। সমালোচকদের মতে মিউটেশনের ফলে সাধারণত বিকলাঙ্গ জীব উৎপন্ন হলেও তা বিবর্তনে কিভাবে ভূমিকা নিতে পারে। আসলে, অনেকধরণের মিউটেশন ঘটতে পারে - কিছু উপকারী, কিছু অপকারী। যেমন ধরা যাক, প্রথম যে দ্বিপদ (bipedal) ও সোজা হয়ে দাঁড়ানো মানুষ মিউটেশনের ফলে তৈরী হয়েছিল, গাছে বসবাসরত তার সমসাময়িক প্রজাতির তুলনায় তার হয়ত অসুবিধাই হত। পরবর্তীকালে, প্রকৃতিতে তার এই রূপান্তরিত বৈশিষ্ট্য তাকে বেশী ভালভাবে মানিয়ে নিতে সাহায্য করেছে।

শুধু তাই নয়, প্রথম জড় থেকে জীবের সৃষ্টিও র‍্যান্ডম প্রক্রিয়া নয়। রাসায়নিক ধর্মের জন্যই অনু-পরমাণু নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করে। কার্বন পরমাণুর মধ্যে এরকম নিজেদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে বিভিন্ন আনবিক কাঠামো (Molecular structure) গঠনের ক্ষমতা আছে। প্রতিরূপ গঠনে সক্ষম একটি গঠন তৈরি হলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকৃতিতে আরো বেশীসংখ্যায় একই কাঠামো পাওয়া যাবে। প্রকৃতিতে এই ধর্ম কার্বন পরমাণুর বেশী করে আছে, তাই এটা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নয় যে প্রাণিদেহের মূল উপাদান কার্বন, এবং শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতিরূপকও (DNA) কার্বন দিয়েই তৈরি।

এই বিষয়ে মনে পড়ে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়েইনবার্গের একটি তুলনার কথা। তিনি বলেন যে কেউ একজন লটারী জিতলে এরকম মনে করাটা ভুল যে কোনো দৈবপ্রভাবে সে লটারী জিতেছে। কারণ তার পাশাপাশি অসংখ্য মানুষ আছে যারা লটারীর টিকিট কেটেছিল, কিন্তু কিছুই জিততে পারেনি। সুতরাং ভাগ্যক্রমে 'জেতা' মানেই যে দৈবপ্রভাবে জেতা - এরকম ধারণা ভ্রান্ত। সেরকমই, পৃথিবীতে যেমন প্রাণের বিকাশ হয়েছে, তেমনই উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে পর্যবেক্ষণে আসা মহাবিশ্বের কোথাও হয়ত সেরকম বুদ্ধিমান প্রাণের সৃষ্টি হয়নি। তার কারণ পৃথিবীর মত অনুকূল পরিবেশ হয়ত কোথাও পাওয়া যায়নি।

জীবন প্রথমে কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল

সৃষ্টিতাত্ত্বিকদের প্রায় সবাই মনে করেন প্রথম জীবন কোনো দৈবপ্রভাবেই শুরু হয়েছিল। তাদের দাবী, সেই কারণেই বিজ্ঞানীরা শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আজও পরীক্ষাগারে কৃত্রিম প্রাণ সৃষ্টি করতে পারেন নি, বা প্রাণ সৃষ্টির পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে পারেননি।

বাস্তবে, প্রথম জীবন সৃষ্টির পরে সাড়ে তিনশো কোটি বছর পেরিয়ে গেছে, পৃথিবীর পরিবেশেও অজস্র পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে তাই জড় থেকে জীবের উৎপত্তি পরীক্ষাগারে করে দেখানো সম্ভব হয় নি।

এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার পূর্বে জেনে নেওয়া দরকার জীবনের সংজ্ঞা কি ভাবে দেওয়া হয়। অনেক জটিল সংজ্ঞার পরিবর্তে আমরা মনে করতে পারি দুটি মূল বৈশিষ্ট্যের কথা -

- বহির্প্রকৃতি থেকে শক্তি আহরণের ক্ষমতা
- নিজের প্রতিরূপ গঠনের ক্ষমতা

বর্তমানে অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতে প্রাথমিক জীবিত সত্ত্বাগুলো কোনো আবরণে আচ্ছাদিত কিছু প্রতিরূপ গঠনে সক্ষন প্রোটিন অনু ছিল - তা থেকেই কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের পথ ধরে আজকের বিভিন্ন জীবপ্রজাতির সৃষ্টি।

এবিষয়ে প্রথম আলোকপাত ঘটে স্ট্যানলি-মিলারের বিখ্যার পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় দেখা যায়, মিথেন, অ্যামোনিয়া আর জলীয় বাষ্পের মিশ্রণে বিদ্যুতচমকের মত তড়িৎ-প্রবাহ ঘটালে অ্যামিনো অ্যাসিড ও শর্করা জাতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। আর এই দুটি উপাদানই জীবের অন্যতম গঠনমূলক উপাদান। আদি পৃথিবীতে যেহেতু পরীক্ষায় ব্যবহৃত উপাদানগুলোর কোনো অভাব ছিল না, এবং উদ্ভূত উপাদানের কোনো গ্রাহক ছিল না, তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে এই অ্যামিনো অ্যাসিড ও শর্করা রাসায়নিক মিশ্র-তরলের (Chemical Soup) আকারে পৃথিবীতে অবস্থান করত। আরেকটি পরীক্ষায় দেখানো গেছে যে একই পরিবেশে এই উপাদানগুলো নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে সক্ষম। খুবসম্ভব এই ধরণের শৃঙ্খলাবদ্ধ যৌগই রাসায়নিক মিশ্রণের মধ্যে প্রথম জীবনের ছাঁচ তৈরি করেছিল।

সাম্প্রতিককালে আরো কিছু পরীক্ষায় দেখানো গেছে যে এই শৃঙ্খলাবদ্ধ অ্যামিনো অ্যাসিড (short chains of RNA) কোনো উৎসেচকের অনুপস্থিতিতেও প্রতিরূপ গঠনে সক্ষম। সঠিক মাত্রায় ফ্যাটি অ্যাসিডের উপস্থিতিতে RNA -এর মত শৃঙ্খলাবদ্ধ অ্যামিনো অ্যাসিডের স্বতঃ সমাবেশ ঘটে। ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে আবরক সৃষ্টি হয়, আর তার মধ্যে থাকে RNA অনু - একরকম RNA ভাইরাস বলা যেতে পারে একে।

সুতরাং পদ্ধতিগত মতপার্থক্য থাকলেও বিজ্ঞানীমহলে এটা এখন স্বীকৃত যে জড় থেকেই প্রথম জীবনের সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হয় অজৈবজনি (Abiogenesis)। অজৈবজনির আরো কয়েকটি মতবাদ আছে যা আমি বিস্তৃত আকারে আলোচনা করলাম না।

সম্ভাব্যতা

সৃষ্টিতাত্ত্বিকদের একটি অন্যতম ধারণা হল প্রথম প্রাণ সৃষ্টির সম্ভাব্যতা খুবই কম। এ বিষয়ে তারা দেখান যে একটি প্রোটিন অনু সংশ্লেষ হবার সম্ভাবনা ১ এর পরে ১১৩টি শূন্যের সংখ্যার মধ্যে একভাগ। তাদের একইরকম দাবী একটি পূর্ণ কোষ গঠনের ক্ষেত্রেও।

বিজ্ঞানীদের মতে জৈবরসায়ন কোনো সম্ভাবনা মেনে চলেনা, যেমন চলে না কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়াও। উপযুক্ত পরিবেশে, সে যত কম সময়ের জন্যই হোক না কেন, উপাদানগুলো বিক্রিয়া করবেই। তাছাড়া, এই হিসাবগুলো ধাপে ধাপে কিভাবে প্রাণ সৃষ্টি হচ্ছে তা হিসাব করেনা, সরাসরি কিভাবে শূন্য থেকে কয়েকটি পৃথক ঘটনার মাধ্যমে সৃষ্টির সম্ভাব্যতা হিসাব করে। বাস্তবে, একেকটি উপাদান তৈরী হবার অনেক লক্ষ বছর পরেও পরিবেশ পরিবর্তিত হলে পরের ধাপের উপাদান তৈরি হয়ে থাকতে পারে। যেমন, অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরির অনেক বছর পরে প্রোটিন তৈরির মত উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলে তা সংশ্লেষিত হয়েছে। টক-অরিজিনের (http://talkoriginis.org) পাতায় বৈজ্ঞানিক মাসগ্রেভ এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

সবশেষে, প্রাণ গঠনের সম্ভাবনা সত্যিই খুব কম বলেই তো দৃশ্যমান পৃথিবীতে এই একটিমাত্র গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে, তাই না?

তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র (Second Law of Thermodynamics)

তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে, পদার্থের অন্যতম প্রবণতা হল বেশী বিশৃঙ্খল অবস্থার দিকে যাওয়া - যাকে তাপগতিবিদ্যার ভাষায় বলে 'ইনক্রিস ইন এনট্রপি' (Increase in Entropy)। সমালোচকদের মতে, বিবর্তনের

মাধ্যমে সরল থেকে জটিল প্রাণীতে বিবর্তিত হবার অর্থ হল ক্রমাগত সুশৃঙ্খল অবস্থার দিকে যাওয়া - যা তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের পরিপন্থী।

এই সমালোচনার দুই ভাবে উত্তর দেওয়া যায়। তাত্ত্বিক ভাবে বলতে গেলে, এই সূত্র কেবলমাত্র বদ্ধ (Closed) সিস্টেমের জন্যই কার্যকর। কিন্তু পৃথিবী বা জীবজগৎ কেউই বদ্ধ সিস্টেমের বাসিন্দা নয়, সূর্যের থেকে প্রতিনিয়ত শক্তি এসে পৌঁছয় - বিকিরিত হয়ে যায় কিছু শক্তি। তাই এই সূত্র জীবজগতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

শুধু তাই নয়, এই সমালোচনায় বিবর্তনকে একটি একমুখী প্রক্রিয়া বলে ধরা হয়েছে। বাস্তব কিন্তু তার বিপরীত। উদাহরণস্বরূপ, একধরণের মাছ যারা জলের তলায় গুহায় বাস করে। এই মাছেরা মূলত অন্ধ, যদিও তার পূর্বজরা যথেষ্ট জটিল চোখের অধিকারী ছিল। কিন্তু, অন্ধকার গুহায় চোখের উপস্থিতি কোনো সুবিধা দেয়না বলে নির্বাচনের ফলে এখন প্রজাতিগত ভাবে এরা অন্ধ হয়ে গেছে।

বিবর্তন বহুমুখী হলেও প্রকৃতি সবসময় তাকেই নির্বাচন করেছে যার খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা বেশী। তাই, সাধারণত জটিল থেকে সরল প্রাণীতে বিবর্তিত হলেও সে নির্বাচিত না হওয়ায় বংশবিস্তার করতে পারেনি।

ক্যাম্ব্রিয়ান স্ফীতি (Cambrian Explosion)

আজ থেকে ৫৪০ মিলিয়ন বছর আগে, ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে খুব দ্রুত সরল থেকে জটিল জীবের উৎপত্তি ঘটে। ফসিল রেকর্ড অনুসারে এইসময়ে অসংখ্য বহুকোষী জীবের উদ্ভব ঘটে, যেমন - কোরাল, মোলাস্ক (শামুক জাতীয়), অ্যানথ্রপড(সামুদ্রিক আরশোলা)।

পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হয় ৩.৫ বিলিয়ন বছর আগে। তার এত বছর পরে কিভাবে হটাৎ করে পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার হল - এই বিষয়ে সমালোচকেরা প্রশ্ন তোলেন। সৃষ্টিতাত্ত্বিকরা মনে করেন, কোনো দৈব প্রভাব ছাড়া এই ঘটনা ঘটা সম্ভব নয়। তারা এমনকি এও দাবী করেন যে পৃথিবীর সব বিশিষ্ট প্রজাতি এই সময়েই আবির্ভূত হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা দুভাবে এই ক্যাম্ব্রিয়ান স্ফীতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রথমত, ৫৪০ মিলিয়ন বছরেরও পুরোনো জীবাশ্ম পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। তার মধ্যে থেকে অনেক বহুকোষী জীবাশ্মগুলো থেকে প্রমাণিত হচ্ছে তারাই ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের জটিল জীবগুলোর পূর্বপুরুষ।

দ্বিতীয়ত, ফসিল রেকর্ডে কোথাও সরলতর জীবের উৎপত্তি জটিলতর জীবের আগে ঘটেছে বলে পাওয়া যায়নি। শুধু তাই নয়, সমসাময়িক পরিবেশের সাথে উপযোগী করে তোলার জন্য যা বিবর্তন প্রয়োজন সবই জীবাশ্মের মধ্যে দেখা গেছে।

তাত্ত্বিকভাবে, এই ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায় বিরামযুক্ত বিবর্তনের (Punctuated Equilibrium) তত্ত্বের সাহায্যে। স্টেফান গাল্ডের এই তত্ত্ব অনুসারে বিবর্তন একটি বিরামযুক্ত প্রক্রিয়া, এর ফলে পৃথিবীতে দীর্ঘদিনের স্থিতিশীলতার পরে স্বল্প সময়ে দ্রুত বিবর্তনের ঘটনা দেখা গেছে। পরিবেশের আকস্মিক পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর মূল

কারণ। ক্যাম্ব্রিয়ান স্ফীতির মূল চালিকাশক্তি ছিল বাতাসে অতিরিক্ত অক্সিজেন, যা জীবের বিকাশের অনুকূল। আজও কম অক্সিজেনযুক্ত পরিবেশে বেঁচে থাকা প্রজাতির সংখ্যা খুবই কম।

অপরিবর্তনশীল জীবদেহ

সমালোচকদের মতে কাঁকড়া বা আরশোলার মত প্রাণী বহু বছর ধরে অপরিবর্তনশীল রয়ে গেছে, যা বিবর্তন তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়না।

বিজ্ঞানীরা তাত্ত্বিক ভাবে বা উদাহরণের সাহায্যে এর উত্তর দিয়ে থাকেন। প্রথমত, পারিপার্শ্বিক পরিবেশের পরিবর্তন না হলে বা জীবের দেহে পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মত ক্ষমতা বিদ্যমান থাকলে জীব প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তিত হবে না, কারণ এক জীব অন্য জীবের তুলনায় বেশী সুবিধা পাবে না। পৃথিবীতে এরকম অনেক অংশে পরিবেশ বহু কোটি বছর ধরে একইরকম রয়েছে, সেই অংশে বসবাসরত জীবগোষ্ঠীর মধ্যে তাই পরিবর্তনও দেখা যায় না।

দ্বিতীয়ত, বিবর্তনের মাধ্যমে জীবের সব বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটবে তার তো কোনো মানে নেই, দেহের বাহ্যিক পরিবর্তন না হলেও আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে থাকতেই পারে। আরশোলা বা কাঁকড়াও বিবর্তিত হয়েছে, যদিও বাহ্যিকভাবে তার কোনো পরিবর্তন হয় নি। আরশোলার ৪০০০ প্রজাতি তৈরি হয়েছে বিবর্তনের মাধ্যমে। কাঁকড়ারও ইমিউন সিস্টেম (Immune system) আদি কাঁকড়ার একই সিস্টেমের থেকে যথেষ্টই আলাদা।

অন্তর্বর্তী জীবাশ্ম (Transitional Fossil)

পর্যাপ্ত সংখ্যক অন্তর্বর্তী জীবাশ্মের অভাব বিবর্তনের বিরুদ্ধে সমালোচকদের অন্যতম অভিযোগ। এই অভিযোগের মূলে আছে অন্তর্বর্তী জীব বা জীবাশ্ম সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা। সৃষ্টিতাত্ত্বিকরা দাবি করেন, কোনো প্রধান জীববৈশিষ্ট্যই অর্ধপূর্ণ অবস্থায় প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, দুটি প্রজাতির মধ্যবর্তী জীবের অস্তিত্বও খুবই কম।

বাস্তবে, বিবর্তনে আমরা সবাই অন্তর্বর্তী - নিজের বৈশিষ্ট্য কমবেশি পরের প্রজন্ম কে দিয়ে চলব। সত্যিকারের এক প্রাণী থেকে আরেক প্রাণীকে আলাদা করার কোনো পদ্ধতি জানা নেই। সাধারণভাবে এক প্রজাতি আরেক প্রজাতির সাথে প্রজনন করেনা, এই ভিত্তিতে বিজ্ঞানে প্রজাতিভেদ তৈরি করা হয়। আমাদের ধারণায় বিভিন্ন জীবের মধ্যে পার্থক্য এত প্রকট, যে আমরা এরা একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত বলে ধারণাই করতে পারিনা। তাই, এই শ্রেণীবিভাগ মানুষের আরোপিত, প্রকৃতি একে মেনে চলে না। আর্কিওপ্টেরিক্সকে উড়তে দেখলে আমরা মনে করে নিই যে তা পাখির আরেক প্রজাতি, কিন্তু আসলে তার যে সরীসৃপের মত শারীরিক বৈশিষ্ট্য আছে, তা বিশ্লেষণ না করলে বোঝা যায় না।

এ সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা অসংখ্য অন্তর্বর্তী জীবাশ্ম পেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ীর বিবর্তনের পথে ১৬ ধরনের স্বীকৃত অন্তর্বর্তী জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। পৃথিবীতে যত জীব বিচরণ করে গেছে, তাদের খুব অল্পসংখ্যকেরই জীবাশ্ম পাওয়া সম্ভব, কারণ জীবাশ্ম ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশে (যেমন অগ্ন্যুৎপাতের ফলে প্রাপ্ত লাভাস্তরে) গঠিত হয়। তার মধ্যেও এতধরণের জীবাশ্মের আবিষ্কার নির্দ্বিধায় বিবর্তনের ভিত্তিকেই সুদৃঢ় করেছে।

বয়স নির্ধারণ পদ্ধতি ও পৃথিবীর বয়স

বিজ্ঞানে কার্বন ডেটিং (Carbon Dating) পদ্ধতি অতিপ্রাচীন বস্তুর বয়স নির্ধারণের স্বীকৃত পদ্ধতি। কার্বনের আইসোটোপের (Isotope) তেজস্ক্রিয়-ক্ষয়ের (Radioactive decay) হার সুষম ধরে নিলে তার অর্ধজীবনকাল (Half-life) ৫৭৩০ বছর হয়। জীবিতাবস্থা জীব পরিবেশের সাথে কার্বন বিনিময় করে। মৃত্যুর পরে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ শুধু ক্ষয়িত হয়, আর সেই ক্ষয়ের হার সুষম। তাই, বস্তুতে তেজস্ক্রিয় কার্বনের অনুপাত থেকে তার বয়স নির্ধারণ করা যায়। একইভাবে ইউরেনিয়াম-লেড অনুপাত থেকেও বয়স নির্ধারণ সম্ভব। এই পদ্ধতি অনুসারে পৃথিবীর বয়স ৪.৫ বিলিয়ন বছর এবং এটাই বিজ্ঞানীমহলে স্বীকৃত।

সৃষ্টিতাত্ত্বিকদের মতে তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের সুষম হার একটি অনুমান মাত্র। এই হার প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনকালে অনেক বেশী ছিল। তারা এই মতের স্বপক্ষে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর পরীক্ষার কথাও বলেন।

সৃষ্টিতাত্ত্বিকদের এই দাবীর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়না। উপরন্তু, বিজ্ঞানীরাই ইউরেনিয়াম-থোরিয়াম অনুপাত থেকেও পরীক্ষা করেও একই বয়স বের করে প্রমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন। সূর্যের ভর-ঔজ্জ্বল্যের তুলনা থেকেও বোঝা গেছে যে সৌরজগতের বয়স তেজস্ক্রিয় বয়সের কাছাকাছি।

আনবিক ঘড়ি

সাম্প্রতিককালে জীববিজ্ঞানের আরো একটি পদ্ধতি সময় বা বয়স নির্ধারণে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এর নাম আনবিক ডেটিং বা মলেকুলার ডেটিং পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে, দুটি বিভিন্ন প্রজাতির DNA সজ্জায় কতগুলো নিরপেক্ষ রূপান্তর পার্থক্য আছে তা নির্ণয় করা হয়। যেহেতু এ ধরণের রূপান্তর সাধারণত সম হারে ঘটে থাকে, তাই দুটি প্রজাতির মধ্যে এই পার্থক্য থেকে তারা প্রজাতিগত ভাবে কতদিন আগে আলাদা হয়ে গেছে তা জানা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে নির্ণীত মানুষ ও শিম্পাঞ্জীর শেষ পূর্বপুরুষের বয়স, প্রাপ্ত ফসিলের কার্বন ডেটিং-এর মাধ্যমে পাওয়া বয়সের খুব কাছাকাছি। এ থেকে আবারও দেখা যায় বিজ্ঞানের একাধিক ও সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি শাখা থেকেও বিবর্তনের স্বপক্ষে একই প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে।

হ্রাস-অযোগ্য জটিল জীববৈশিষ্ট্য (Irreducible Complexity)

মাইকেল বিহে, তার ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত বই '*ডারউইন্স ব্ল্যাকবক্স*'(Darwin's Black Box)-এ দাবী করেন যে জীবজগতে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলোর সরলীকরণ সম্ভব নয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলো কিছু সাধারণ অঙ্গের সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযুক্তির ফলে কার্যকরী, যাদের যে কোনো একটিকে তাদের মধ্যে থেকে সরিয়ে নিলে তার কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায়। তার এই দাবির পরোক্ষ ইঙ্গিত হল, কোনো দৈব প্রভাব ছাড়া শুধুমাত্র বিবর্তনের মাধ্যমে এধরণের বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠা সম্ভব নয়।

উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন ব্যাক্টেরিয়ার ফ্ল্যাজেলা (flagella), একটি শুঁড়ের মত অঙ্গ, যা ব্যাক্টেরিয়াকে তরলের মধ্যে চলাফেরা করতে সাহায্য করে। তার দাবিমতে, ফ্ল্যাজেলা মূলত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত - একটি রোটর, একটি মোটর এবং একটি প্যাডল - আর এই সম্পূর্ণ সিস্টেমটির সরলীকরণ সম্ভব নয়।

কিন্তু একটু গভীরে দেখলে বোঝা যায় ফ্ল্যাজেলার তিনটি অংশই নিজেরা কিছু প্রোটিন দিয়ে তৈরী। আর ফ্ল্যাজেলার প্রধান ৪২টি প্রোটিন উপাদানের মধ্যে ৪০টিই অন্যান্য ফ্ল্যাজেলাহীন ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যেও উপস্থিত। তাই, ফ্ল্যাজেলাকে খুব সহজেই বিভিন্ন প্রোটিনের সংযুক্তির ফলে উদ্ভূত অঙ্গ বলে মনে করা যায়।

ফ্ল্যাজেলা আসলে যথেষ্ট জটিল একটি অঙ্গ, প্রকৃতিতে ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যে এর পূর্ববর্তী সরলতর অঙ্গ দেখা যায় - তার নাম টাইপ থ্রী সিক্রেসন সিস্টেম (Type III Secretion System)। এটি একটি সরু টিউবের মত অঙ্গ, যা ব্যাক্টেরিয়াকে প্রোটিন বা আয়ন বিনিময়ে সাহায্য করে।

বিবর্তনের দৃষ্টিতে দেখলে, ফ্ল্যাজেলার বিবর্তনের ধাপগুলো খুব সহজেই চিহ্নিত করা যায়। ব্যাক্টেরিয়ার যেকোনো প্রবর্ধক তাকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ওপর বেশি নিয়ন্ত্রণ রাখতে সাহায্য করবে, প্রবর্ধকের আন্দোলন বেশি খাদ্যসংগ্রহে সাহায্য করবে। প্রবর্ধকের সাথে রোটর ও মোটর যুক্ত হলে তা সাঁতার কাটার উপযোগী হয়। আর প্রাকৃতিক নির্বাচন অনুসারে, বেশী সুবিধার কারণে বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবের বেশী হারে বংশবৃদ্ধি ঘটবে।

বিহের হ্রাস-অযোগ্য জটিলতা তত্ত্বমতে, রোটর ও মোটর ছাড়া প্রকৃতিতে ফ্ল্যাজেলা-জাতীয় অঙ্গ কার্যকর হবেনা। কিন্তু জীবাণুরা বিহের কথা শুনে চলতে অভ্যস্ত নয়। তাই একধরণের অ্যামিবা (Raphidiophrys pallida) শুধু সিলিকা-নির্মিত প্রবর্ধক ব্যবহার করে চলাফেরা করতে বা শিকার করতে পারদর্শী হয়ে উঠেছে - ঠিক যেমনটা বিবর্তন তত্ত্ব অনুসারে হওয়া উচিত।

একইভাবে, বিহের আরো কয়েকটি জটিলতার উদাহরণও (ইমিউনিটি, রক্ত-জমাট বাঁধার পদ্ধতি) বিজ্ঞানীরা অসার প্রমাণিত করেছেন। কেন মিলার, তার ২০০০ সালে প্রকাশিত বই '*ফাইন্ডিং ডারউইন্স গড*' বইতে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

সর্বজনীন জেনেটিক কোড

সৃষ্টিতাত্ত্বিকদের একটি বড় অংশের ধারণা পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য এত সরল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হতে পারেনা। বাস্তবে, পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত জীব আবিষ্কৃত হয়েছে, সরল বা জটিল, সকলেই কোষযুক্ত। এককোষী বা বহুকোষী সব প্রাণীর কোষই নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় কোষে প্রোটিন উৎপাদন করে ও বংশগতি বহন করে। কোষে অবস্থিত ক্রোমোজোম গঠিত হয় DNA অনুর শৃঙ্খলা দিয়ে। জেনেটিক কোড হল একদল নিয়ম যা মেনে জীবকোষ এই DNA বা RNA শৃঙ্খলায় আবদ্ধ সংকেতকে প্রোটিন গঠনের সময় ব্যবহার করে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রতিটি প্রোটিনের মূল উপাদান অ্যামিনো অ্যাসিড যে নীতি মেনে DNA শৃঙ্খলা থেকে গঠিত হয়, তাকেই জেনেটিক কোড বলে। এই কোড সকল জীবদেহে একই ভাবে কাজ করে। জীবকোষ গঠনের একাধিক সম্ভাব্য পদ্ধতির মধ্যে এই একমাত্র পদ্ধতিই কেন সারা পৃথিবীতে সর্বজনীন? কেন বিভিন্ন জীব বিভিন্ন উপায়ে কোষে প্রোটিন উৎপাদন করে না? কারণ হল আমরা সবাই একই পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত। আদি পৃথিবীর পরিবেশ ও উপাদান সমূহ এই প্রক্রিয়ার পক্ষে উপযুক্ত ছিল, তাই অন্য সবকিছু বিবর্তিত হলেও এই একটিমাত্র পদ্ধতিই সকল জীবদেহে স্থান করে নিয়েছে। আর প্রজনেনের মাধ্যমে এক জীব থেকে আরেক জীবে তা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সকল জীব তৈরি করে থাকলে তাদের মধ্যে গঠনগত বৈচিত্র্যের এত অভাব হত কি?

সুপরিকল্পিত সৃষ্টিতত্ত্ব না পরিকল্পনার অভাব?

সৃষ্টিতাত্ত্বিকরা অনেকসময়েই যুক্তি দিয়ে থাকেন যে সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর না হলে এত নিখুঁতভাবে এত জটিল থেকে জটিলতর জীবদেহ গঠিত হত না। শুধু তাই নয়, ঈশ্বর সকলকে নিজ নিজ পরিবেশে বেঁচে থাকার মত উপযোগী করে গড়ে তুলেছেন, এবং তাদের প্রতিটি অঙ্গ কোনো না কোনো ভাবে কার্যকর।

কিন্তু এই নিখুঁত গঠন কতটা নিখুঁত? মানুষের শারীরিক গঠন পর্যবেক্ষণ করলে বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় অঙ্গের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যেমন অ্যাপেন্ডিক্স। এই অঙ্গগুলো কোনো কাজে আসেনা, অথচ সব মানুষের শরীরেই উপস্থিত। উপরন্তু, ক্ষেত্রবিশেষে অসুবিধার সৃষ্টি করে। নিখুঁত গঠন হলে যে এরকম কোনো অঙ্গের কোনো অস্তিত্ব থাকত না মানবদেহে, তা বলাই বাহুল্য।

সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী যে ভ্রূণাবস্থায় সরল থেকে জটিল প্রাণীর আকারে পরিবর্তিত হয় সেটা কিভাবে নিখুঁত হতে পারে? সাময়িকভাবে মাছের মত কানকো বা বানরের মত লেজ থাকে মানবভ্রূণের - কিন্তু এর কার্যকারিতা কোথায়? উত্তরটা স্বাভাবিক, বিবর্তনের পথে ঐ সব প্রাণী মানুষের পূর্বপুরুষ, তাদের বৈশিষ্ট্য মানুষ ভ্রূণাবস্থায় বহন করে। কিন্তু নিখুঁত পরিকল্পনার তত্ত্বে এর কোনো ব্যাখ্যা নেই।

মানুষের বিবর্তন সম্পর্কিত কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণা -

* মানুষ যদি বানরের উত্তরপুরুষ হয় তাহলে কোটি বছরে বানর গুলো কেনো কিছুটা মানুষের মত হলনা?

সহজ উত্তর, আমরা গাছে যে বানর ঝুলে থাকতে দেখি, সেই বানর থেকে আমাদের সৃষ্টি নয়। আমরা শুধু একই পূর্বপুরুষ থেকে তৈরি। আজকের গরিলা, ওরাং ওটাং বা শিম্পাঞ্জী সবাই আনথ্রপয়েড থেকে বিবর্তিত হয়ে তৈরি হয়েছে - এরা সবাই আধুনিক একেকটি প্রজাতি। সহজ কথায়, আজ থেকে ১২ মিলিয়ন বছর আগে কোনো বানর ছিল না, তবে যারা ছিল তাদের সাথে বানরের সাদৃশ্যই বেশি। তাদের মধ্যে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দল থেকে গরিলা, শিম্পাঞ্জী বা মানুষ তৈরি হয়েছে। এই দলগুলো ছড়িয়ে গিয়ে এক এক অঞ্চলে চলে যাওয়ায় একদলের পরিবর্তন আরেকদলের মধ্যে প্রভাব ফেলেনি - কোনো জিন বিনিময় হয়নি। জীববিজ্ঞানের ভাষায় একই প্রজাতির এরকম দুটি গোষ্ঠীকরণকে বলা হয় জনন-নিরপেক্ষতা (Reproductive Isolation)। আর এক এক অঞ্চলে পরিবেশ একেকরকম হওয়ায় তাদের বিবর্তনও একেকরকম ভাবে হয়েছে।

* মানুষ আর শিম্পাঞ্জীর ৯৫-৯৯% জিনগত মিল আছে, মাত্র ১-৫% মানুষ আর শিম্পাঞ্জীর মধ্যে এতটা পার্থক্য কেন করে?

জিন আমাদের জন্মাবস্থা নিয়ন্ত্রন করতে পারে, কিন্তু পরবর্তীতে আমরা কিভাবে চলব সেটা আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের ওপর নির্ভর করে। মানব-সভ্যতার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এক প্রজন্মে অর্জিত জ্ঞান আর সম্পদের ওপর পরের প্রজন্ম কাজ শুরু করে - এটাই মানুষকে অন্যের থেকে আলাদা করেছে। এই ১-৫% জিন-পার্থক্য মানুষের মস্তিষ্কের অতিরিক্ত বিকাশে সাহায্য করেছে যা আমাদের পুরুষানুক্রমে জ্ঞান বহন করতে সাহায্য করেছে। ভাল করে ভেবে দেখলে, আমাদের জ্ঞানের অধিকাংশই পুরুষানুক্রমে পাওয়া মানবসমাজের দান, ঠিক না? সেকারণেই আমাদের সভ্য সমাজে আমরা যেভাবে বাস করি, আফ্রিকায় জঙ্গলে আদিবাসীরা তার তুলনায় আলাদা ভাবে জীবনযাপন করে, কারণ তারা পুরুষানুক্রমে অন্য ধরণের জ্ঞান আহরণ করে। আফ্রিকায় জঙ্গলে আদিবাসীদের তুলনায় আমাদের যতটা পার্থক্য, তাদের সাথে শিম্পাঞ্জীদের মধ্যেও সেরকমই পার্থক্য আছে।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপাতদৃষ্টিতে বিবর্তন 'বলে মনে হয়'

সবথেকে ভিত্তিহীন যুক্তিগুলোর মধ্যে একটা হল ঈশ্বর এমনভাবেই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যাতে আমাদের মনে হয় পৃথিবী অনেক পুরোনো এবং জীবজগৎ বিবর্তিত হয়েছে। এই শ্রেণীর মানুষ আসলে দুই নৌকায় পা রেখে চলার একটা শেষ চেষ্টা করেন। এদের সম্পর্কে বক্তব্য রাখাও অসম্ভব।

বিকল্পের অভাবজনিত সৃষ্টিকর্তা

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটা বিষয় সুস্পষ্ট হয়, যে সৃষ্টিতাত্ত্বিকরা সৃষ্টিকর্তার পরিবর্তে বিজ্ঞানের আবিষ্কারে ফাঁক খুঁজে বের করতেই ব্যস্ত। যুক্তিটা এরকম, যদি সমসাময়িক বিজ্ঞানের সাহায্যে বিষয়টির ব্যাখ্যা না করা যায়, তার মানে ধরে নিতেই হবে যে তা সৃষ্টিকর্তার অবদান ছাড়া কিছুই নয়। এর আদর্শ উদাহরণ হল সৃষ্টিতাত্ত্বিক দার্শনিক উইলিয়াম ডেম্বস্কির 'ডিজাইন ফিল্টার'। এই তত্ত্ব মতে, প্রথমত যেকোনো জটিল বস্তু বা প্রাকৃতিক বিষয়কে প্রথমে প্রাকৃতিক সূত্রগুলো দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে। যদি সম্ভব না হয়, তাহলে দেখতে হবে বিষয়টি ঘটনাচক্রে ঘটে থাকতে পারে কিনা। যদি সে সম্ভাবনাও কম হয়, তাহলে ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে বিষয়টির পেছনে কোনো বুদ্ধিমান শক্তির গূঢ় পরিকল্পনা কাজ করছে।

এরকম তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক কোনো ভিত্তি নেই। যেসমস্ত বিষয়ের কোনো ব্যাখ্যা নেই, বা প্রচলিত ব্যাখ্যায় যথেষ্ট ত্রুটি আছে, বিজ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক বা প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দিয়েই সেই ফাঁকগুলো পূরণ করে মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট করা - যাতে প্রকৃতিকে মানুষ আরো বেশী করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই আজকের মানুষের ধারণা কালকে পরিবর্তন হতেই পারে। যদি কোনো বুদ্ধিমান শক্তির উপস্থিতি ধরেই নেওয়া হয়, তাহলে সেই বিষয়ে অনুসন্ধিৎসার অভাব দেখা যেতে পারে। আর এই অনুমানের সাহায্যে কি মূল ব্যাখ্যায় পৌঁছনো যাবে? কোনোভাবেই না।

অকামস রেজর

অনুমানের কথা বলতে চলে আসে অকামস রেজরের কথা। চতুর্দশ শতকের ইংরেজ তর্কশাস্ত্রবিদ উইলিয়াম অব অকাম। তার বক্তব্য ছিল যেকোনো প্রাকৃতিক বিষয়ের ব্যাখ্যা ন্যূনতম সংখ্যক অনুমানের ভিত্তিতে দেওয়া উচিত। অন্যভাবে বললে -

"সরলতম (ন্যূনতম সংখ্যক অনুমানের ভিত্তিতে) সমাধানই সর্বোত্তম সমাধান।"

এই তত্ত্ব বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্বের ওপর প্রয়োগ করা যেতে পারে, কারণ এরা দুটি প্রতিযোগী তত্ত্ব, যারা একই প্রাকৃতিক বিষয়ের ব্যাখ্যা দেয়। বিবর্তনবাদের ক্ষেত্রে কোনো অনুমানই করতে হয়না, কারণ এই তত্ত্ব প্রাকৃতিক

বিষয়কে দৃশ্যমান প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব দিয়ে ব্যাখ্যা করে। অন্যদিকে সৃষ্টিতত্ত্ব শুরুতেই অদৃশ্য মহাশক্তিমানের অস্তিত্ব অনুমান করে নেয়। সুতরাং, সহজেই বোধগম্য যে বিজ্ঞানে বিবর্তনবাদই স্বীকৃত হবে।

সত্যের সন্ধানে বিজ্ঞান

বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্বের পার্থক্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডগলাস ফুতুয়ামা বলেছেন -

"সৃষ্টিতাত্ত্বিকদের কিছু কিছু দাবী বিজ্ঞানীরা ভুল বলে প্রমাণ করতে পারেন, যেমন - পৃথিবীব্যাপী বন্যা বা পৃথিবীর সৃষ্টি আজ থেকে দশ হাজার বছর আগে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা কখনই পরীক্ষা করে দেখাতে পারেন না যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে, এবং তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। কারণ সেই সৃষ্টির কোনো নির্দিষ্ট বিন্যাস নেই যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে সৃষ্টি কিরকম হবে। তাই, সৃষ্টিতাত্ত্বিকদের মূল দাবী - সবই কোনো অতিপ্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা সৃষ্ট - এর কোনো পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এই বক্তব্য সুপরিকল্পিত সৃষ্টিতত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, এবং এই তত্ত্বও বিজ্ঞানের পরিধিতে আসে না।"

বিজ্ঞান ও সৃষ্টিতত্ত্বের মূল পার্থক্য হল পদ্ধতিগত। বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত সত্যের সন্ধান করে, আর অপরদিকে সৃষ্টিতত্ত্ব বিভিন্ন ধর্মীয় লোকগাঁথা, উপকথাগুলোকে "ধ্রুব সত্য" ভেবে নিয়ে তার স্বপক্ষে প্রমাণ সন্ধান করে। প্রকৃত বিজ্ঞানীরা নিজেদেরকে নিউটনের "জ্ঞানের বালুকাবেলায় ছোট নুঁড়ি কুরানোর" মত সত্যসন্ধানী মনে করে আর প্রমাণের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় আর সৃষ্টিতত্ত্বের ধারকেরা ইতিমধ্যেই (ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে) সত্য পেয়ে যাওয়া "সবজান্তা শমশের" ভেবে নিয়ে সেই সত্যের নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করেন।

বিজ্ঞানের এই পদ্ধতি সময়-পরীক্ষিত, সত্য সন্ধানে এর তুলনা নেই। কোনো সময়ে মানুষ সমতল পৃথিবীর উপলব্ধিতে নিমজ্জিত ছিল, তখন বিজ্ঞানীরাই মানুষকে তা থেকে মুক্ত করেছেন। এখন আর কেউ সমতল পৃথিবীর কল্পনায় বিভ্রান্ত হয় না। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ক্রমাগত প্রমাণ ও পরীক্ষার সাহায্যে বিবর্তনবাদও জনমানসে একই ভাবে স্থান করে নেবে।

সূত্র -

1. http://www.talkorigins.org

2. 'The Science of Evolution and the Myth of Creationism' by Ardea Skybreak

3. www.mukto-mona.com

4. Various Internet Resources

দিগন্ত সরকার, পেশায় কম্পিউটার প্রকৌশলী, মূল আগ্রহ বিজ্ঞান-সংক্রান্ত লেখায়। অর্থনীতি, রাজনীতি বা অন্যান্য বিষয়েও লিখে থাকেন। মুক্তমনার নিবেদিতপ্রাণ সদস্য। বর্তমান নিবাস সিয়াটেল, আমেরিকা।
ইমেইল - diganta.sarkar@gmail.com

একজন পদার্থবিদের দৃষ্টিতে বিবর্তনবাদ

ডারউইনিজমের আতঙ্ক

মুলঃ ড. ভিকটর স্টেংগার, আনুবাদঃ বন্যা আহমেদ

[বিজ্ঞানী ভিকটর স্টেংগার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিভাগের এমিরিটাস অধ্যাপক এবং কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের সংযুক্ত অধ্যাপক। তিনি 'কলোরাডো সিটিজেন অব সায়েন্স' এর প্রতিষ্ঠাতা এবং মুক্ত-মনার একজন সম্মানিত সদস্য। ড. স্টেংগর Timeless Reality, The unconscious Quantum, Physics and Psychics, and Not by design সহ অনেক সুলিখিত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধের প্রনেতা। নীচের প্রবন্ধটি অধ্যাপক স্টেংগারের অনুমতিক্রমে তার সর্বশেষ বই 'Has Science Found God? The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe' এর একটি অধ্যায় থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। অনুবাদটি দৈনিক সংবাদ আর ভোরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে।]

'আমাদের চারপাশে র বিশ্বজগতে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলো দেখলেই বোঝা যায় এর মধ্যে কোন পরিকল্পনা নেই, উদ্দেশ্য নেই, নেই কোন অশুভ কিংবা শুভের অস্তিত্ব; আসলে অন্ধ, করুনাহীন উদাসীনতা ছাড়া এখানে আর কিছুই চোখে পড়ে না'

- রিচার্ড ডকিন্স, (জীববিজ্ঞানী এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির Public Understanding of Science বিভাগের অধ্যাপক)।

সরলতার বিপদ:

বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় ধারণা হচ্ছে যে, যুগে যুগে বিজ্ঞান তার পুরনো তত্ত্বগুলোকে আবর্জনার স্তুপে ছুড়ে ফেলে দিয়ে নতুন তত্ত্বকে সাদরে গ্রহন করে নেয় এবং এভাবে ক্রমাগতভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। পদার্থবিদ এবং চিন্তাবিদ থমাস কূন, তার বহুলপাঠ্য 'The structure of Scientific Revolution' বইয়ে প্রথম এই ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তার বদৌলতেই আজকে এই 'paradigm shift' কথাটি আমাদের নিত্যদিনের শব্দভান্ডারের অংশ হয়ে গেছে। 'বিজ্ঞান আকস্মিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে থাকে' - এই ধারণাটি আসলে একধরনের অতিরঞ্জন বৈ আর কিছু নয়। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত পদার্থবিদ স্টিভেন ওয়েনবার্গ এর মতে, বিজ্ঞানের ইতিহাস খুঁজলে

থমাস কূনের বলা এই ব্যাপক 'Paradigm Shift' এর উদাহরণ খুবই কম দেখা যায়। সত্যি কথা বলতে কি, বিজ্ঞানের বেশীর ভাগ পরিবর্তনই ক্রমান্বয়িকভাবে আস্তে আস্তে ঘটে এবং নতুন তত্ত্ব আবিস্কারের পরেও অনেকদিন ধরে পুরনো তত্ত্বগুলো ব্যবহৃত হতে থাকে, নতুন আবিস্কারগুলো পুরনোগুলোকে হটিয়ে বিদায় করে না দিয়ে বরং নিজেরাই নতুন পরিসরে ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ দেখা যায়, যদিও প্রায় এক শতাব্দী আগেই কোয়ান্টাম বিপ্লব নিউটনিয় তত্ত্বকে আপাতঃভাবে 'ভুল' বলে প্রমান করেছিলো, পদার্থবিদ্যা পাঠ্যক্রমের বেশিরভাগ জুড়েই এখনও চিরায়ত নিউটনিয় মতবাদই আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে । ওয়েনবার্গ এর মতে এমনকি তাঁর সহকর্মী থমাস কূনও, হাভার্ড এ তাঁর ছাত্রদেরকে ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যাই শিক্ষা দিতেন। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা চিরায়ত ক্ষেত্রকে (classical domain) কেন্দ্র করে কাজ করে এবং পারমানবিক, আন্তঃপারমানবিক এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেও এর অনন্য কার্যকরীতা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু নিউটনীয় বলবিদ্যা যে সময় বিকশিত হয়েছিল সে সময় কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রমাণ করার মত কোন উপাত্ত বিজ্ঞানীদের হাতে ছিল না।

তবে গত পাঁচ শতাব্দীতে অন্তত পক্ষে দুটি বৈজ্ঞানিক আবিস্কারকে বড় paradigm shift হিসাবে চিহ্নিত করা যায় ; (১) ষোড়শ শতাব্দীতে কোপার্নিকাসের আবিস্কৃত তত্ত্ব- পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে এবং (২) উনবিংশ শতাব্দীতে (১৮৫৯ সাল) চার্লস ডারউইন এবং এ্যলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস এর প্রস্তাবিত প্রকল্প - প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural Selection) মাধ্যমে জীবজগতের বিবর্তন। এই দুটি আবিস্কার শুধু যে মানুষের চিন্তাধারাকে এক নতুন স্তরে উন্নীত করতে সাহায্য করেছিল তাই নয় তারা তখনকার প্রাচীন এবং গভীরভাবে সুরক্ষিত চিন্তাপদ্ধতিকে সরিয়ে দিয়ে পুরানো ধারণাগুলোর উপরও আধিপত্যও বিস্তার করে নিয়েছিল। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, তত্ত্ব দুটোই পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর প্রাচীন চিন্তাগুলোকে অত্যন্ত প্রবলভাবে আঘাত করেছিলো - যেগুলোকে মানুষ এতদিন ধরে সৃষ্টিকর্তার অভ্রান্ত বাণী হিসেবে বিশ্বাস করতো। এই দুই তত্ত্বকেই সেই সময়ে খ্রীস্টান ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি এক প্রাণঘাতী ভীতি হিশেবে গণ্য করা হয়েছিল।

এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আধুনিক বিবর্তনবাদ তত্ত্ব ডারউইনের প্রস্তাবিত প্রাথমিক ধারণার পরে , বিশেষ করে মৌলিক ডি.এন.এ কে কেন্দ্র করে আনবিক কার্যপ্রণালী আবিস্কৃত হওয়ার পর থেকে, অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আবার কারও কারও মতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের বাইরেও অন্যান্য প্রাকৃতিক পদ্ধতিও বিবর্তনে ভুমিকা রাখে। আমি এখানে 'ডারউইনিজম' বলতে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পদ্ধতি এবং প্রাকৃতিক নিয়মের (natural process of chance and natural law) সমন্বয়ে ঘটা জৈবিক বিবর্তনকেই বুঝাচ্ছি।

ষোড়শ শতাব্দীতে রোমান চার্চ গ্যলিলিওকে কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব, যাকে গ্যালেলিও শুধুমাত্র একটি গণিত শাস্ত্রীয় মডেলই নয় বরং 'বাস্তব সত্য' হিসেবে তুলে ধরেছিলেন, তা অস্বীকার করতে বাধ্য করিয়েছিল। খ্রীস্টান ধর্মগ্রন্থে অত্যন্ত পরিস্কারভাবেই উল্লেখ আছে যে, পৃথিবী সৌরজগতের অনড় কেন্দ্র। chron. ১৬.৩০ তে উল্লেখ আছে, 'হ্যা পৃথিবী শক্তভাবে দাড়িয়ে আছে, কখনই নড়বে না...'। Ps ১০৪:৫ দৃঢ়তার সাথে বলে, 'তিনি পৃথিবীকে তার ভিত্তির উপর স্থাপন করেছেন, যাতে কোন দিনও একে নাড়নো না যায়।...' একই রকম আরও অনেক উক্তি দেখা যায় যেমন: Ps.৯৩:১ এবং ৯৬:১০ এ। তা সত্ত্বেও প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যেই কোপারনিকাসের সৌর-তত্ত্বের বিরুদ্ধে ঈশ্বরে বিশ্বাসীদের সংগ্রাম ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। মূলতঃ কোপারনিকাসের তত্ত্বের পক্ষে জোড়ালো সাক্ষী প্রমাণগুলোএমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করলো যে, ধর্মকে হয় একসময় বাস্তব সত্য গ্রহণ করে নিতে হত না হয় ধ্বংস হয়ে যেতে হত। শেষ পর্যন্ত

বলতে গেলে, একধরনের প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্য দিয়েই ধর্মকে মেনে নিতে হয় যে পৃথিবী আসলেই সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। এর ফলে গোড়া ধার্মিকেরাও এটা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয় যে বাইবেলে লেখা সব কিছুকে সবসময় আক্ষরিক অর্থে মেনে নেওয়া যাবে না। এখান থেকেই ধর্মবাদী(Apologistic)দের পক্ষ থেকে নতুন জ্ঞানের সাথে তাল মিলিয়ে বাইবেলকে পুনর্ব্যখ্যার প্রয়াস শুরু হয়, তা বাইবেল-বিবৃত আক্ষরিক বাণীর সাথে সাদা চোখে যতই অসঙ্গতিপুর্ণ মনে হোক না কেন।

উনবিংশ শতাব্দী আসতে আসতে ইউরোপে চার্চের ক্ষমতা ভীষণভাবে কমে আসে, এবং সে কারণেই ডারউইনকে গ্যালিলিওর মত দুঃখজনক পরিনতির স্বীকার হতে হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ডারউইনকে তাঁর বর্ণিল জীবনের শেষে নিউটনের পাশে ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবিতে সমাহিত করা হয়। তারপরও, চিন্তাবিদ ড্যনিয়েল ডেনেট ডারউইনের মতবাদটির নাম দিয়েছেন 'ডারউইনের বিপজ্জনক প্রস্তাব'; এটি 'বিপজ্জনক' কারণ এটি বলে যে, মানুষ এবং অন্যান্য প্রানি, কোন উপরওয়ালার নির্দেশনা ছাড়াই, শুধমাত্র প্রাকৃতিক পদ্ধতির মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত সরল প্রাণের থেকে ক্রমান্বয়ে উৎপত্তি লাভ করেছে; আর সে কারণেই ডারউইনের এই তত্ত্বটি সেসময়ে খুব কম জায়গায়ই সাদরে গৃহীত হয়েছিল। আজও ডারউইনের এই বিপজ্জনক তত্ত্বটি বিজ্ঞান এবং অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

বিবর্তন তত্ত্বের বৈজ্ঞানিকতা :

সর্বসাধারণের মধ্যে বিবর্তনবাদ আসলেই বৈজ্ঞানিক কিনা এ নিয়েই বিতর্ক থাকলেও বৈজ্ঞানিক জার্নালগুলোতে আদৌ এমন কোন তর্ক-বিতর্কের নজীর পাওয়া যায় না, সেখানে বিতর্কযুদ্ধ চলে বিবর্তনবাদের পুঙ্খানুপুঙ্খতা নিয়ে, কখনই মতবাদটির মৌলিক ব্যাপারগুলো নিয়ে নয়। ডারউইনের সময়কাল থেকে এখন পর্যন্ত বিবর্তনবাদের সপক্ষে পরীক্ষা লব্ধ সাক্ষ্য প্রমাণের সংখ্যা হাজারগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাণের উৎপত্তি এবং গঠনের ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদ এতখানিই কার্যকরী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে যে একে এখন জীববিদ্যা এবং চিকিৎসাবিদ্যার ভিত্তি হিসেবে গন্য করা হয়।

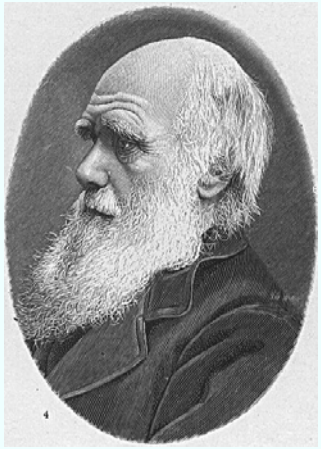

চার্লস ডারউইন (১৮০৯-৮২)

ডারউইন যা জানতেন তার চেয়ে আমরা এখন অনেক অনেক বেশী জানি, এবং আজকে আমরা এই অগ্রসর জ্ঞানের আলোকে বিবর্তনবাদের মূল তত্ত্বের আমূল সত্যতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা এখন জীন তত্ত্বের মূল বিষয়বস্তু এবং তাতে ডি.এন.এ কি ভূমিকা পালন করে তা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বুঝতে পেরেছি। এই সকল আবিস্কারই বিবর্তনবাদের মূল মতবাদকে আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেছে। আজকে আমরা জিনের ভিতরেই বিভিন্ন প্রাণের মধ্যে বিদ্যমান নিবিড় সম্পর্ক এবং তাদের সাধারণ উৎপত্তির ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারি।

আমি যখন এই বইটি লিখছিলাম তখনই মানুষের জিনোম প্রজেকটের ফলাফল প্রকাশিত হয়। এখন পর্যন্ত যত প্রাণীর জিনোম পরীক্ষা করা হয়েছে তাদের মধ্যে পাওয়া পরিচিত ডি.এন.এ র অনুক্রমগুলো অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে, সকল জীব একই উৎস থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে- ঠিক যেমনটি ডারউইন বলেছিলেন। ল্যাবরেটরিতে ব্যকটেরিয়া, ফ্রুট ফ্লাই, এবং অন্যান্য প্রাণীর বিবর্তন আমারা চোখের সামানেই দেখেছি। চিকিৎসাবিদ্যার গবেষণায় বিবর্তন একটি অপরিহার্য অংগ হিসেবে বিবেচিত হয়। আজকে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে বিবর্তনবাদ তত্ত্ব থেকে পাওয়া জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা ইতিমধ্যেই হাজার হাজার মানুষের জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি।

কোন কার্যক্রম বৈজ্ঞানিক কিনা তা বিচারের মানদন্ড নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু নিচের আলোচনা থেকে দেখা যাবে, বিবর্তনবাদ যে বিজ্ঞান' তা নিয়ে কোন সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়। এখানে অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণ (emperical observation) নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং পরীক্ষণযোগ্য এমন ভবিষদ্বানী (testable predictions) করা হয় যা ইতিমধ্যেই বৈজ্ঞানিক মহলে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। বিশেষ করে, ডারউইন এবং ওয়ালেসের প্রস্তাবিত বিবর্তন তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকলে তা খুব সহজেই ভুল প্রমানিত হয়ে যেত।

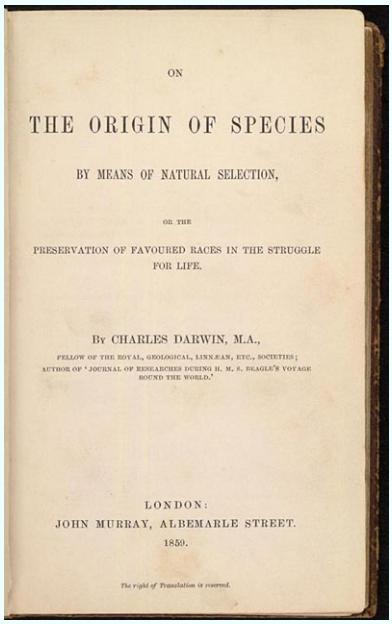
ON

THE ORIGIN OF SPECIES

BY MEANS OF NATURAL SELECTION,

OR THE

PRESERVATION OF FAVOURED RACES IN THE STRUGGLE FOR LIFE.

BY CHARLES DARWIN, M.A.,

FELLOW OF THE ROYAL, GEOLOGICAL, LINNÆAN, ETC., SOCIETIES;
AUTHOR OF 'JOURNAL OF RESEARCHES DURING H. M. S. BEAGLE'S VOYAGE ROUND THE WORLD.'

LONDON:
JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET.
1859.

The right of Translation is reserved.

The Origin of Species
by Means of Natural Selection
by Charles Darwin

ডারউইন এবং ওয়ালেসের সময়, বেশীর ভাগ মানুষ বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী বিশ্বাস করতো যে, ৬ হাজার বছর আগে পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছিলো। ঠিক এই সময়েই ভূতত্ত্ববিদরা প্রমাণ পেতে শুরু করেন যে পৃথিবীর বয়স আসলে তার থেকে অনেক বেশী এবং এই নতুন তথ্যটি ডারউইনকে এতই আলোড়িত করেছিলো যে তিনি বিগেলের সমুদ্রযাত্রার সময় চার্লস লিয়েলের লেখা 'ভূতত্ত্বের মূলনীতি' বইটি সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। 'On the Origin of the Species by means of Natural Selection' বইটির প্রথম সংস্করণে ডারউইন, ভূতত্ত্ব থেকে পাওয়া জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে, সাধারণ একটি অনুমান করেন যে পৃথিবীর বয়স আসলে কয়েক'শ কোটি বছর। সেখান থেকেই তিনি দেখান, প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটা এবং তার মাধ্যমে বহু প্রজাতির জীব সৃষ্টি হওয়ার জন্য যে লম্বা সময়ের দরকার তা আমাদের এই পৃথিবীর আছে।

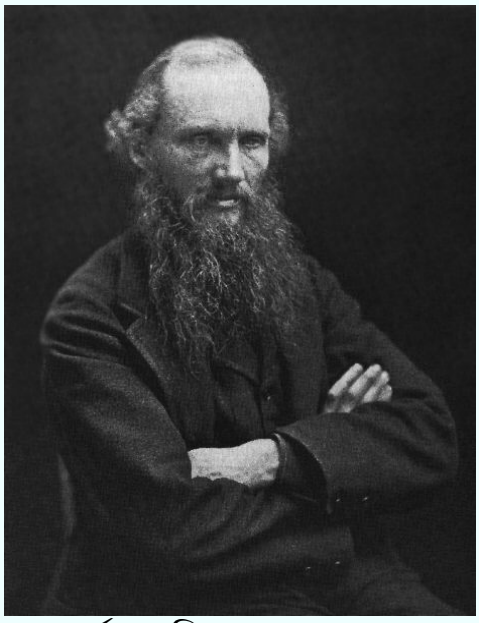

লর্ড কেলভিন (১৮২৪-১৯০৭)

বিখ্যাত পদার্থবিদ উইলিয়াম থমসন (যিনি পরে লর্ড কেলভিন উপাধিতে ভূষিত হন) এই আনুমানের বিরোধিতা করে বলেন যে পৃথিবীর বয়স আসলে ডারউইন যা বলেছেন তার থেকে অনেক কম। থমসন থার্মো-ডাইনামিকসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন, তিনিই প্রথম থার্মো-ডাইনামিকসের দ্বিতীয় সুত্র এবং চরম তাপমাত্রা স্কেল আবিষ্কার করেন। থমসনের সময় বিজ্ঞানীরা সৌর রশ্মির বিকিরণে অবদান রাখতে পারে এমন শক্তির উৎস হিসেবে শুধুমাত্র রাসায়নিক শক্তি এবং মাধ্যাকর্ষণের কথাই জানতেন। থমসন দুইটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আলাদা আলাদাভাবে সূর্যের বয়স নির্ধারণ করে দেখান, মাধ্যাকর্ষণ বল ব্যবহার করলে সূর্যের বয়স সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায় এবং সেটাও কিনা হচ্ছে মাত্র কয়েক'শ লক্ষ বছর। থারমো-ডাইনামিকসের সুত্র ব্যবহার করে কেলভিন এটাও প্রমাণ করেন যে, এমনকি মাত্র কয়েক লক্ষ বছর আগেও পৃথিবীর তাপমাত্রা এতই বেশী ছিল যে সেখানে কোনরকম প্রাণের উৎপত্তি ঘটা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

ডারউইনের সময়কালে বিজ্ঞানীরা পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে যা জানতেন তা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন তত্ত্বের সঠিকতা সম্পর্কে বড় ধরণের সন্দেহের জন্ম দেয়। ডারউইন বিবর্তনবাদ তত্ত্বের আরেক আবিষ্কারক ওয়ালেসকে লেখা এক চিঠিতে উল্লেখ করেন, 'বেশ কিছুদিন ধরেই, পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে থমসনের দৃষ্টিভংগী আমার সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে।' থমসনের সিদ্ধান্ত যদি সঠিক হত তাহলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনতত্ত্ব তখনি ভুল প্রমানিত হয়ে যেত। কিন্তু বলা বাহুল্য, এ প্রসঙ্গে থমসনের সিদ্ধান্তই আসলে ভুল ছিল এবং সে কারণেই ডারউইনের তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণ যায়নি। কিন্তু থমসনকেও এখানে ঠিক দোষ দেওয়া যায় না, কারণ, তিনি সেই সময়ের জানা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য ব্যবহার করেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তারপর, বিংশ শতাব্দীতে নতুন আরেকটি শক্তির উৎস হিসেবে পারমানবিক শক্তি আবিষ্কৃত হওয়ার পর দেখা গেল যে এটি রাসায়নিক বা মাধ্যাকর্ষন শক্তির তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী। এর ফলে সূর্যের বয়স নিখুঁতভাবে হিসেব করার জন্য অধিকতর নির্ভরযোগ্য একটি পরিমাপক খুঁজে পাওয়া গেল। আরো দেখা গেল যে, থমসন পৃথিবী ঠান্ডা হয়ে আসার ক্ষেত্রে সময়ের হারের যে হিসেব করেছিলেন তা সম্পুর্ণই ভুল কারণ পৃথিবী প্রাকৃতিক পারমানবিক তেজস্ক্রিয়তার মাধ্যমে তাঁর পূর্ববর্তী অনুমানের চেয়ে অনেক বেশী তাপ উৎপাদন করে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির মধ্যে বিজ্ঞানীরা বেশ ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেন যে পারমানবিক বিক্রিয়ার মাধ্যমেই সূর্যের ভিতরকার তাপের সৃষ্টি হয় । এই শতাব্দির শেষ নাগাদ সূর্য হতে প্রাপ্ত নিউট্রিনো পর্যবেক্ষণ করার (এমন একটি পরীক্ষায় আমি নিজেও অংশগ্রহণ করেছিলাম) মাধ্যমে সূর্যের শক্তির উৎস হিসেবে পারমানবিক শক্তির যথার্থতা আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় এবং সূর্যের সম্ভাব্য বয়সও হিসেব করে বের করা হয় প্রায় একশ কোটি বছর। এর আগেই রেডিওঅ্যাকটিভ ডেটিং এর মাধ্যমে প্রমানিত হয়েছে যে পৃথিবীর বয়স আসলেই কয়েক শ কোটি বছর, এবং প্রত্নতত্ত্ববিদরাও প্রায় কাছাকাছি সময়কালের

মধ্যেই পৃথিবীতে প্রাণের খোঁজ পেয়েছেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, বিবর্তনবাদ অন্য যে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মতই একটি বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ, এবং বিজ্ঞান কাজ করে উন্মুক্ত সীমায়, কাজেই কেউ দিব্যি দিয়ে বলতে পারে না ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের কোথায় কি পরিবর্তন করতে হবে। তবে এই মুহূর্তে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বর্ণিত বিবরতনবাদতত্ত্বকে ভবিষ্যতে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হবে (অন্ততপক্ষে একটি ব্যাপক পরিসরে) বললে, ভবিষ্যতে পৃথিবী আবার সমতল প্রমাণিত হবে বলার মতই শোনাবে।

বিজ্ঞান ও ইসলাম : অন্তিম সংঘাত

মূল : টড পিকক
অনুবাদ : তানবীরা তালুকদার

১

এই পুরো পৃথিবী জুড়েই মানুষের মধ্যে ভাষা এবং সংস্কৃতির অনেক বিভিন্নতা রয়েছে, এই ভিন্নতার মধ্যেই বিজ্ঞান তার নিজস্ব ভাষা ও গতি দিয়ে গোটা বিশ্বজুড়ে কম বেশী তার শক্ত শিকড় গড়ে নিয়েছে। শুধুমাত্র বেশ কয়েকটি ইসলামিক রাষ্ট্র ছাড়া, যেখানে কোরানের আইন আজোও রাজত্ব করছে। আজ আমি ধর্ম আর বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বের সেরকম একটি গল্পই বলবো।

কায়রো, মিশর : 'ইসলাম আর বিজ্ঞানের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই' - উচ্চস্বরে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন **জাগলুল এল নাগার**। কায়রো শহরের উপকণ্ঠে একটি সমৃদ্ধশালী জায়গায় জাগলুল এল নাগরের সাথে তার নিজস্ব আবাসস্থল ভিলা ইন মাদির, কফিরুমে বসে কথা হচ্ছিল- 'বিজ্ঞান হলো অনুসন্ধান। অজানা কে জানা। আর ইসলাম জ্ঞান অন্বেষনকে প্রেরণা দেয়। জ্ঞান অন্বেষনকে প্রার্থনা করার সমান মনে করা হয়।'

কায়রো শহরের উপকন্ঠ

তিনি ব্যাখ্যা করে অমাকে বুঝাতে চাইছিলেন, যেটাকে লোকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে, আসলে প্রকৃতপক্ষে সেটা 'ইসলামিক পদ্ধতি'। এই পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানই মুসলিম সভ্যতা থেকে আসা। নবী মুহম্মদ (সাঃ) ও বলে গেছেন দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান আহরণ করো। কোরাণের সর্বপ্রথম বানীটি হল - ইকরা অর্থাৎ- 'পড়ো'। তোমাকে তোমার সৃষ্টিকর্তা সর্ম্পকে জানতে হবে, ধ্যান করো, বিশ্লেষন করো, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করো।

ডঃ এল নাগার - মিশরের মূল ধারার পত্রিকার প্রবন্ধকার; খুব পরিচিত একজন টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব। পেশায় একজন ভূতত্ত্ববিদ যাকে অনেক মিশরীয় এবং তার সহকর্মী বিজ্ঞানীরাও সমাজের **নেতৃ**স্থানীয় হিসেবে বেশ সম্মান করেন। একজন বিশেষজ্ঞ যিনি পৃথিবীর জৈব ভূ-স্তর বিন্যাস - কিভাবে জীবন্ত প্রাণীসত্ত্বার দ্বারা পৃথিবীর ভূ-স্তর তৈরী হয়েছে এধরনের চমকপ্রদক বিষয় নিয়ে কাজ করছেন, এল নাগার লন্ডনের ভূতত্ত্ব বিভাগের একজন সদস্য, তার লেখা প্রবন্ধ সেখানে প্রকাশ ও বিশ্বব্যাপী সেটাকে প্রচার ও পরিবেশন করা হয়। কিন্তু তিনি একজন গোড়া ইসলামী মৌলবাদী, এমন একজন বিজ্ঞানী যিনি এই পৃথিবীকে কোরানের দৃষ্টি দিয়ে ব্যাখা করে থাকেন।

জাগলুল এল নাগার

গোটা আরব বিশ্বে ধর্ম একটি প্রচন্ড শক্তিশালী মাধ্যম, আরব বিশ্ব ছাড়া বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও ধর্মের এতো ব্যাপকতা নেই। যেকোন ধরনের অঘটনের পরেই মিশরের ধনী, গরীব সবাই সেটাকে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছে বলে সাধারণত ব্যাখা করে থাকেন। ১৯৬০ সালে সরকার সমাজতন্ত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে দেশে যে বিশৃঙ্খলা ডেকে আনেন, গামাল আবদুল নাসেরের দ্বারা আরব সমাজের জাতীয়তাবাদের পতন, ১৯৬৭ সালে ইস্রাইলের সাথে যুদ্ধে হেরে যাওয়া, দারিদ্র্য, সরকারের অযোগ্যতা, এ ধরনের সমস্ত কিছুই তারা এভাবে ধর্মীয় ভাবালুতার মাধয়মে ব্যাখা করে থাকেন।

আমি সরাসরি কায়রোর ইতিহাসের বর্ণাঢ্য গতিশীলতা থেকে শুরু করে বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য দুটোই প্রত্যক্ষ করেছি। বিশ মিলিয়ন লোকের একটি শহর কায়রো যেখানে পুরো মিশরের লোক সংখ্যার প্রায় চার ভাগের এক ভাগ বসবাস করে। আবাসিক এলাকা, পুরনো দিনের প্রায় ভেঙ্গে পড়া সুন্দর স্থাপত্য, এবং প্রায় ভেঙ্গে পড়া এসব বাড়ি ও ধ্বংস স্তুপের ছাদের মধ্যে বসবাস করা লোকজন কারণ এসব ভগ্নাংশ

সরিয়ে নেয়ার মতো লোকবলও তাদের সরকারের নেই। শহরের মধ্যে উন্মুক্ত নাচ - গান, জুয়ার আসর সহ বিলাস বহুল হোটেল, মিনার এমনকি পিজা হাট ও আছে। কায়রো শহরের এ্যামেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় তাহরির স্কোয়ার থেকে সামান্য একটু দূরেই অবস্থিত, যাতায়তের জন্য সেখানে একটি বড় চত্বর আছে, পথচারীরা সেখানে ভয়ানক বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে মেরামতরত পুরনো ভাঙ্গা গাড়ি পার হয়ে আসা যাওয়া করেন। দিনের পুরোটা সময়ই পুরুষেরা শহরের চায়ের দোকানে বসে হুক্কা সেবন করে, এই পরিবেশে যদি কোন নারীকে দেখা যায়, তিনি অবশ্যই একজন বিদেশিনী। বেশীর ভাগ মিশরীয় রমনীরা নেকাব পরিধান করে থাকেন, দিনের নির্ধারিত সময়ে যখন মুয়াজ্জিন আজান দেন, মুসলমানদেরকে প্রার্থনার জন্য ডাকেন, পুরুষেরা এসে শহরের মসজিদকে ভরিয়ে তুলেন।

বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে ইসলাম সমাজেরও যথেষ্ঠ অবদান আছে। বিরাট একটি সময় ধরে কায়রো আরবীতে 'আল কাহিরা' যে শব্দের মানে বাংলাতে 'বিজেতা' ইসলাম সমাজকে শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে বহু দিক থেকেই ইসলাম গোড়া খ্রীষ্টানদের থেকে অনেক বেশী সহিষ্ণু। যেমন, বাইবেল ওয়ালারা যে পৃথিবীর বয়স মাত্র ছয় হাজার বছর বলে নাচানাচি করে, এ ধরনের জিনিস কিন্তু ইসলামে নেই। কিংবা ক্লোনের গবেষণা নিয়েও কোন ঝামেলা নেই এবং এটি বেশ সমাদৃত; যদিও বর্তমান সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা মিশরে খুবই কমে গেছে। আর এই অনগ্রসরতার জন্য কে দায়ী?

কিন্তু এল নাগার তাদের এ অনগ্রসরতার জন্য ইসলামকে দায়ী করেন না। তাঁর মতে 'এর জন্য ইসলাম নয় বরং আমেরিকা আর বৃটেনই সমস্ত নষ্টের হোতা।'

পাশ্চাত্যের লোকদের এভাবে আক্রমণ করে কথা বলা এল নাগার এর একটি সাধারণ বিষয়। 'দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে তারা প্রায়ই স্যুট - টাই পড়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়' - বলছিলেন এল নাগার (যদিও সে সময়ে তিনি নিজেও ফিকে সবুজ রঙ্গের কেতাদুরস্ত স্যুট পড়া ছিলেন)। তিনি তাঁর পাশ্চাত্যের সহকর্মীদের জন্য করুণা অনুভব করেন, যারা নিজ নিজ পেশায় একেজন বিশেজ্ঞ হয়ে উঠছেন, কিন্তু নিজেদের আত্মাকে অনবরত অস্বীকার করে চলেছেন। তিনি কঠোর ভাষায় সমকামীতাকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য পশ্চিমা বিশ্বকে সমালোচনা করেন। পরিতাপের সুরে তিনি বলেন, পশ্চিমা বিশ্ব মানুষকে পশুর চেয়েও নীচের স্তরে নামিয়ে আনছে, 'একজন বিজ্ঞানী হিসেবে আমি দেখছি যত বিপদ আপদ সব পশ্চিম দিক থেকেই অসছে, পুর্ব দিক থেকে নয়'।

কোরান ও বিজ্ঞানের উপর লেখা তার তিনটি ছোট ছোট বই আমাকে উপহার দিলেন। এর মধ্যে একটি বই হলো *কোরানের দৃষ্টিতে পাহাড়ের ভৌগলিক গঠন*, *সুন্নাহ একটি মহামূল্যবান সম্পদ - বৈজ্ঞানিক*

দৃষ্টিতে, আর *কোরানের একটি অনুবাদ কপি*, যেখানে প্রথম পৃষ্ঠায় তার স্বাক্ষর ছিল যদিও অনুবাদক হিসেবে কোথাও তার নাম ছিল না।

সুন্নাহ একটি মহামূল্যবান সম্পদ বইটিতে এল নাগার নিজের মতো করে কোরানের পবিত্র বানী, হাদিস - মুহম্মদের বানী, সুন্নাহ ও প্রচলিত রীতি নীতিকে ব্যাখা করেছেন। এল নাগারের মতে কোরানে এক হাজারেরও বেশী বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উপর ইঙ্গিত দেয়া আছে, এবং সেই ঈশারা আছে মুহম্মদের অনেক বাণীতেও; যদিও সরাসরি কোথাও কোন বিষয়ের বৈজ্ঞানিক কোন ব্যাখা বা প্রমাণ নেই। তার পরিবর্তে আছে কতগুল ইঙ্গিত আর ঈশারা। এল নাগারের মতে, এই ইঙ্গিতগুলোর মাধ্যমে মানুষকে চিন্তা করার আর কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না মানুষ তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারে। কোরাণ আর বিজ্ঞানের সর্ম্পকের উদাহরণ টানার একটি খুব সাধারণ কৌশল হলো, কিভাবে কোরাণে আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত আভাস দেয়া ছিল, কোন আধুনিক যন্ত্রপাতি বা কৌশল জানা ছাড়াই আধনিক বিজ্ঞানের কঠিন কঠিন ব্যাপারগুলো কত আগেই কোরাণের বাণীতে অনুধাবন করা হয়েছিল - এ ধরনের 'যুক্তি' দেয়া। এল নাগার তার এই বইটিতে পবিত্র গ্রন্থের বাণী উল্লেখ করেছেন, 'সূর্য এবং চন্দ্র প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ কক্ষপথে ভ্রমণ করছে'। আল্লাহর প্রেরিত বাহক সৌরজগত ও পৃথিবী নিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক ও পরিমিত এমন সমস্ত কথা বলে গেছেন, তাও সেই সময়ে যখন পৃথিবীকে লোকে চ্যাপ্টা ও অনড় ভাবতো। মুহম্মদ যে সত্যদর্শী ছিলেন এটা অবশ্যই তার একটা প্রমাণ।

২

সব জায়গায় তিনি নবীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, নবী বলেছিলেন সাতটি পৃথিবীর কথা। ভূতত্ববিদদের কথা উল্লেখ করে এল নাগার দাবী করেন পৃথিবী সাতটি স্তরে বিভক্ত। অন্য এক জায়গায় নবী বলেছিলেন মানুষের শরীরে তিনশ ষাটটি জোড়া আছে, ইসলামিক গবেষকরা বলে থাকেন চিকিৎসা বিজ্ঞান এই সংখ্যাকে সমর্থন করে। এ ধরনের সূক্ষ জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ চিন্তাশক্তি তাদের মতে শুধু আল্লাহ তালাই দিতে পারেন।

সমালোচকরা অবশ্য বলে থাকেন, ইসলামিক গবেষকরা প্রায়ই একে অন্যের ভুল-ভাল কথাকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন, চতুর্দিকে একটি বিভ্রম তৈরী করেন যেনো এ তথ্যগুলো বিশাল কোন গবেষণা থেকে পাওয়া। মানুষের শরীরে তিনশ ষাটটি জোড়ার কথা চিকিৎসা বিজ্ঞান মোটেই সমর্থন করে না, এ সংখ্যা ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন থাকে, আর যেটার সাধারণ গড় হলো তিনশ সাতটি। আধুনিক ভূততবিদরা পৃথিবীর আবরনকে সাতটি নয়, বরং পনরটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন যার অপর নাম হলো প্লেট টেকটনিক ।

এল নাগার এমনকি ২০০৫ সালে সংগঠিত ভয়াবহ ভূমিকম্প এবং এর দ্বারা সৃষ্ট সুনামীতে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুতেও আল্লাহার মহানুভবতা দেখতে পান। প্লেট টেকটনিক আর বিশ্বব্যাপী বাড়তি উষ্ণতা এর জন্য দায়ী। পশ্চিমা বিশ্বের পাপের অপরাধে আল্লাহ নাকি তাঁর তীব্র ক্রোধ প্রকাশ করেছেন। কেনো তাহলে আল্লাহ লস এঞ্জেলস কিংবা ফ্লোরিডার তীর ছেড়ে দক্ষিন পূর্ব এশিয়াকে শাস্তি দিতে গেলেন? এল নাগার জবাব দিলেন, আঘাত প্রাপ্ত স্থানটি পশ্চিমা পর্যটকদের অনেক অনৈতিক কুকীর্তির মাশুল দিয়েছে।

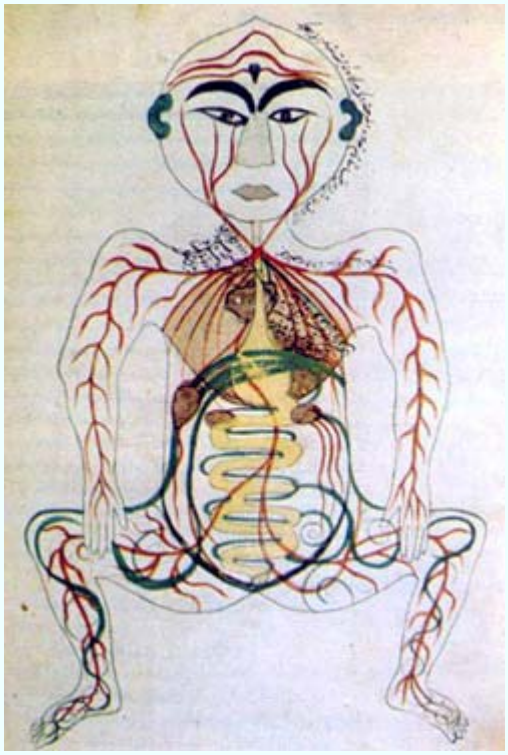

এগার'শ শতাব্দীর একটি প্রতিকৃতি

(মাজলিশ লাইব্রেরী, তেহরান এ সতেরশ শতাব্দী এ ডি, মানসুর বিন মুহম্মদ আহমাদ-এর আকা একটি পার্শিয়ান চিত্রাঙ্ক)

জনাব এল নাগার এর জনপ্রিয়তা ও প্রভাব এতোটাই যে - আরবের স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে হরদম তাঁর উপস্থিতি দেখা যায়, যার দ্বারা তিনি অতি সহজে লাখ লাখ দর্শক শ্রোতার কাছে চলে যান। জ্ঞান - বিজ্ঞানের ধারক কায়রোর আল আহরামে অবস্থিত রাজনীতি ও কৌশলবিদ্যা অধ্যয়নের স্থান এর রাজনৈতিক গবেষক **গোলাম সোলতানের** সাথে যদিও তার সম্পর্ক ততোটা উষ্ণ নয়।

সোলতান আমাকে বলছিলেন, জীবন যাপনের ব্যাপারে ধর্মীয় ব্যাখাগুলোকে বিজ্ঞান দিয়ে সারাক্ষণ 'প্রমাণ' করার এই যে প্রবণতা তাদের মধ্যে, সেটা প্রকৃত পক্ষেই অসৎ। নর্দান ইউনির্ভাসিটি থেকে ডক্টরেট করা সোলতান, তীব্র তামাকের গন্ধে ভরা তার ছোট্ট অফিসে বসে কাজ করেন, তার অফিসের ডেস্ক আর মেঝেতে পত্রিকা আর সাময়িকী গাদা করে রাখা। তিনি বলেন, 'এদের পদ্ধতি ঠিক নয়'। সোলতান বলেন, ইসলামিক বিজ্ঞানীরা কাজ শুরুই করেন উপসংহার মাথায় রেখে (কোরাণ বলে মানুষের শরীরে তিনশ ষাটটি জোড়া আছে) আর তারপর এটিকে সত্যি প্রমাণ করার জন্য সর্বোপরি চেষ্টা চালান। এ ক্ষেত্রে তাদের পছন্দমতো উত্তরে পৌছবার জন্য তারা মানুষের শরীরের সে সমস্ত জোড়া গুলোকেও জোড়া হিসেবে দেখাবেন, যেগুলোকে একজন মেডিকেল-ডাক্তার মোটেই জোড়া হিসবে গন্য করেন না। তাদের দেখলে মনে হয় তাঁরা ভুত-ভবিষ্যতের সবকিছুই জেনে বসে আছেন, কিভাবে পৃথিবী তৈরী হলো, কে পৃথিবী তৈরী করলেন -সব কিছু, আর তাদের এসব ব্যাখা করার বদলে শুধু প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রন করা প্রয়োজন। সোলতান আরো বললেন, যেকোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চালিকা শক্তি হওয়া উচিৎ শুধু সত্যের অনুসন্ধান করা, এবং বলা বাহুল্য সত্যে পৌছুনোর দরজা কিন্তু এখনো খোলা রয়েছে।

যে সকল গবেষকরা ইসলামপন্থীদের মতামতের বা 'গবেষণা'র সাথে একমত পোষণ করতে পারেন না তারা সাধারণতঃ বিষয়গুলো এড়িয়ে যান। কারণ এ সমন্ধে উচ্চবাচ্য করলে তাদেরকে হয়তো কর্তৃপক্ষের রোষানলে পড়তে হবে। সুতরাং বির্তক এড়িয়ে যাওয়াটাই অনেকে বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন। অন্য কথায় বলতে গেলে, আপনি য়দি বিজ্ঞানী হন এবং চরমপন্থী ইসলামিক ভাবনা সম্পন্ন না হন, তবে শুধুমাত্র নিজের কাজে মনোনিবেশ করাই ভালো। যে সকল বিজ্ঞানী কোরানিক-বিজ্ঞানকে সমর্থন করেন না, তারা ইচ্ছে করেই নিজেদেরকে 'লো-প্রোফাইলে' রাখেন। এ প্রসঙ্গে আমি সোলতানের কাছে কিছু উদাহরণ চাইলাম কিন্তু তিনি এড়িয়ে গেলেন, কিছুতেই ব্যাখা করতে চাইলেন না।

কোন বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি র ব্যাপারটা এখানে কোনদিনই প্রাধান্য পায় নি। ১৭৯৮ থেকে ১৮০১ সাল পর্যন্ত মিশরে যখন নেপোলিয়ন বোনাপার্তের দখলদারীত্ব চলছিল, তখন ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম মিশরে পদার্পন করেন। ইউরোপীয়ান বিজ্ঞানীদের আগমনে মিশরীয়দের প্রথম টনক নড়ে যে কতোটা তারা বিজ্ঞানে পিছিয়ে আছেন। এই কষ্টের অনুভূতি তাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রেরণা এনে দেয় যা অনেকদিন টিকে ছিল। দীর্ঘ দেড়শটি বছর এ জাগরণ বিদ্যমান ছিল, কায়রোর উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য তখন বিশ্বব্যাপী কায়রো শহরকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হতো। মেধাবী ছাত্রদের আসা এবং যাওয়া দুটোই সমানতালে চলত। যেভাবে মিশরীয় গবেষকরা গবেষণার কাজে পশ্চিমা বিশ্বে আসতেন ঠিক সেভাবেই এ্যামেরিকা, ইউরোপ থেকেও গবেষকদের মিশরে আসা যাওয়া লেগে থাকতো।

এরপর ১৯৫২ সালে রাজা (প্রথম) ফারুকের বিরুদ্ধে গামাল আবদেল নাসেরের নেতৃত্বে অভূথথান ঘটে। নাসের ছিলেন আরব বিশ্বের প্রথম আধুনিক নেতা যিনি পুরো আরব সমাজের মুখপাত্র ছিলেন। তার কাছে

জাতীয়তাবাদের মানে ছিল সমস্ত আরব সমাজকে একত্রিত করা - শুধু মিশরীয়দের নয়। তাঁর এই নীতিই এ্যামেরিকা আর ইউরোপের প্রতি সমগ্র আরব বিশ্বের বিরূপতাকে উস্কে দেয়। সোলতান বললেন, নাসেরের সময় থেকেই আরব বিশ্বের জাতীয়তাবোধ উজ্জীবিত হয় এবং পশ্চিমাদের সন্দেহের চোখে দেখাও শুরু হয়ে যায়।

সোলতানের চোখে সবকিছুর ঢালাও ইসলামীকরণ এবং সরকারী নীতি - এই দ্বৈতপ্রকল্পই বিজ্ঞান চর্চার দিকে জনগণকে অমনোযোগী এবং নিরুৎসাহিত করে তুলেছে। তিনি বলেন, আমরা একটা ক্রান্তিকালীন সময়ের মাঝে এখন আছি, এবং আমার মনে হয় হয়তো আমাদের এই দুঃসময়ের মাঝে অনেক দিন কাটাতে হবে।

এখনও মিশরের সাধারণ লোকজন আর শাসকরা সমাজে ধর্মকে শক্ত করে আকড়ে ধরে রেখেছে। গ্যালিলিও আর কোর্পানিকাসের সময়ে ইউরোপে যেমন বিজ্ঞানকে, ধর্ম যাজকরা তদের বিরাজমান শক্তির প্রতি হুমকি মনে করতো, এখন মিশরেও অনেকটা সেরকমই অবস্থা। এখন মুক্ত চিন্তার দরজা সেখানে প্রায় বন্ধ বললেই চলে। কারণ হিসেবে সোলতান উল্লেখ করলেন, ১৯৫০ সাল থেকেই কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন পশ্চিমা শিক্ষক আসছেন না আর দেশের ভিতরের নৈরাজ্যজনক শাসন পরিস্থিতির সাথে যারা একাত্মতা প্রকাশ করতে পারেনি তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কিংবা তারা নিজেরাই ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যাল্যয় ছেড়ে চলে গেছেন দূরে।

আমি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে প্রবেশ করলাম জনাব **ওয়াহিদ বাদায়ই** এর সাথে পুর্বনির্ধারিত সাক্ষাতের জন্য, ওয়াহিদ বাদায়ই রসায়ন বিভাগের একজন অধ্যাপক যিনি ১৯৬৭ সাল থেকে সেখানে শিক্ষকতা করছেন। আমরা যখন তার কক্ষে বসে কথা বলছিলাম, আমাদের আলাপচারিতার মাঝেই, তার ছাত্র এবং ছাত্রীরা আসা যাওয়া করছিল। ছাত্রীদের সবারই মাথা ঢাকা ছিল, তরুন সমাজের মধ্যেও রয়েছে ধর্মের কঠিন নিয়ম-কানুন মেনে চলার প্রবণতা। তিনি নিজে একটি ল্যাবটেরীর সাদা কোট পড়া ছিলেন আর তার ল্যাবটরীর চর্তুদিকের দেয়ালে ও কর্কবোর্ডের মাঝে কোরানের বিভিন্ন বানী টানানো ছিল। ১৯৮০ সালের দিকে যখন জার্মানীর সিমেনস কোম্পানীতে কাজ করতেন জনার বাদায়ই, তখনই তিনি সৌর শক্তির রুপান্তর এর উপর ডি -লিট অর্জন করেন, কিন্তু তিনি নিজেকে জনাব এল নাগার এর মতো ইসলামিক বৈজ্ঞানিক বলতে রাজী নন। তিনি একজন ধর্মপ্রাণ বৈজ্ঞানিক যিনি মনে করেন বিজ্ঞান আর ধর্ম দুটি আলাদা ব্যাপার, তাদের অবস্থান দুটি ভিন্ন বলয়ে।

কিন্তু ডারউইনিজম বা জীববিজ্ঞানের বিবর্তনবাদ নিয়ে তাহলে কি বলবেন? আমি প্রশ্ন করলাম তাকে (মিশরের স্কুলে বিবর্তনবাদ পড়ানো হয় যদিও সৌদি আরব এবং সুদানের স্কুলে বিবর্তনবাদ নিষিদ্ধ)। জবাবে বাদায়ই বললেন যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আদমের সৃষ্টি কি বানর থেকে হয়েছিল,

তাহলে আমি বলব না। মানুষ বানর থেকে আসেনি। যদি আমি ধর্মপ্রাণ হই, আমি যদি ইসলামকে বিশ্বাস করি তাহলে আমাকে ইসলামের সবগুলো তত্বই মানতে হবে। আর এই তত্বগুলোর একটি হলো মানুষের আবির্ভাব হয়েছে আদম আর ইভ থেকে। আমি একজন বৈজ্ঞানিক, আমাকে এটা বিশ্বাস করতেই হবে।

কিন্তু একজন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে কি এটি শুধুমাত্র একটা গল্প নয়? আমি তাকে প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম। তিনি জবাব দিলেন, আমি যদি একটি প্রবন্ধ লিখি আদম আর ইভের গল্প শুধুমাত্রই একটি গল্প, সত্যি কিছু নয় তাহলে সেটা কেউ গ্রহন করবে না যতক্ষন না আমি সেটা প্রমান করতে পারব।

'কোন ব্যক্তিই প্রমান ছাড়া যা ইচ্ছে লিখতে পারেন না, কিন্তু আমাদের কাছে সত্যি প্রমান আছে যে আদমই এই সৃষ্টির সর্বপ্রথম মানব ছিলেন সে গল্পটি সঠিক।'

কি প্রমান?

তিনি বিস্ফোরিত নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এটা কোরানে লেখা আছে।

৩

তিউনিস, তিউনিসিয়া ঃ কায়রোর ভারী কুয়াশাচ্ছন্ন বাক্যালাপের পর, তিউনিস সমুদ্রের নোনা বাতাস আর খোলা প্রান্তর ছিল এক রকমের মুক্তি। ভূমধ্যসাগরের তীরে নোঙ্গর করে আছে যেনো তিউনিসিয়ার রাজধানী, পাহাড়ের উদার প্রান্ত আর শহরতলী ঢাকা রয়েছে তাল গাছের ছায়াতে, বাগানগুলোতে মন কাড়া বোগেনভিলার ঝাড়। যে শহরটাতে আমি উঠলাম সেটাকে বলে সিদি বো। এখানের চারপাশে ভীষনভাবে ইটালী বা দক্ষিন ফ্রান্সের মতো প্রাচীন যুগের ছোয়া ঘিরে আছে। প্রকৃতপক্ষে সিসিলীর থেকে মাত্র ৮০ কি,মি, দূরে তিউনিস ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিকভাবেও এর নিকটবর্তী। অনেকেই বলেন, ইউরোপের পাশে ভূমধ্যসাগর আরব থেকে বেশ দূরে আর সেখানকার লোকেরা প্রকৃত এরাবীয়ান নন। আমি এয়ারপোর্টে আসার সময় আমার মিশরীয় দোভাষী বলেছিলেন, তারা আসলে ফ্রেঞ্চ। তিনি খুব একটা ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এটি বলেননি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সরকারী কর্মকর্তা বললেন আমরা ধর্মীয় উগ্রতাকে আর এই উগ্র মানসিকতাকে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর কাজের জায়গা থেকে সাফল্যের সাথে দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছি। ইসলামী চরমপন্থী ঘেরা সাগরের পাশের একটি ছোট্ট দ্বীপে এক কোটি জনগণের দেশ তিউনিসিয়া। চরমপন্থীরা ধর্মের সাথে সমস্ত কিছুর সংঘাত কমিয়ে আনতে চায়, এমনকি বিজ্ঞানেরও। কিন্তু ইসলাম আর বিজ্ঞানের মাঝে সংঘাত অনিবার্য।

তিউনিসিয়া ফ্রান্সের অধীনে ছিল যারা ১৯৫২ সালে স্বাধীনতা পায়, আরব প্রতিবেশীদের মতো তাদেরও মানবাধিকার লংঘনের কথা শোনা যায়, এদেশের প্রেসিডেন্ট আর তার পরিবার দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত। ফ্রীডম হাউজ নামের একটি অলাভজনক সংস্থা বাক স্বাধীনতার দিক থেকে এই দেশটিকে ১৯৫ এর মধ্যে ১৭৯ এর সূচক দিয়েছে। মার্চ মাসে একজন ভিন্নমতালম্বীকে সাড়ে তিন বছরের জন্য জেল এর শাস্তি দেয়া হয় (যিনি এরমধ্যে দুবছর বিচারের অপেক্ষায় জেলে কাটিয়ে দিয়েছেন), তার অপরাধ তিনি স্বাধীনতার জন্য উচ্চস্বরে লড়াই করেছিলেন। যদিও মিশরীয়দের থেকে তারা বেশ আলাদা, মিশরীয়রা সারাক্ষন অনবরত তাদের বাক স্বাধীনতার জন্য খোলামেলাভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকেন, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে তিউনিসদের অনেক কিছুতেই আমি বেশ ইতিবাচক প্রবনতা দেখেছি। বর্তমান সরকারের প্রতি তাদের প্রগাঢ় বিশ্বস্ততার একটি বড় কারণ হলো তারা বিশ্বাস করেন তাদের প্রেসিডেন্টের যে প্রতিদ্বন্দ্বী তিনি একজন ইসলামী চরমপন্থী হতে পারেন। এই সরকারকে সর্মথন করার আরো একটি বড় কারণ আছে অনেকের মধ্যে, অন্যান্য আরব দেশের তুলনায় শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ সাধারণ মানুষের যে মৌলিক অধিকারগুলো আছে, সেগুলো সবার কাছে খুব ভালোভাবে পৌছে গেছে।

যদিও রীতিমাফিক তিউনিসিয়া একটি মুসলিম দেশ, কিন্তু তারা সক্রিয় ভাবে অন্যান্য আরব দেশের থেকে মসজিদ ও তার বাইরের সমাজের দূরত্ব বজায় রাখে। ব্যক্তি মালিকানাধীন কাজে দাড়ি, নেকাব নিষিদ্ধ। রাস্তায় চুল ঢাকা অনেক তরুনী দেখা যায় কিন্তু এটাও আবার অস্বাভাবিক না যে সে মেয়েকেই আবার দেখা যাবে জীনস পড়ে, শুধুমাত্র ধর্মের কারণে ব্যবহার করা নেকাবকে যতদূর সম্ভব আধুনিক ঢঙ্গে পড়ে হেটে যাচ্ছে। স্কুলের পাঠ্যসূচীতে বিভিন্ন ধর্ম এবং ধর্মীয় বিশ্বাস সর্ম্পকে আলোচনাও বেশ কম। মিশরের মতো সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামিক বিজ্ঞান পড়ানো হয় না। ইসলামোলজি আর ইসলামি চরমপন্থীদেরকে সেখানে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখা হয়।

মিশরের থেকে সর্ম্পূন বিপরীত অবস্থা, যেখানে আমি সবচেয়ে বেশী আধুনিক ও পশ্চিমা মনোভাব সম্পন্ন বিজ্ঞানীদের সাথে কথা বলেছি যারা কথোপকথনের এক পর্যায়ে নিজেদেরকে ভালো মুসলমান হিসেবে দাবী করেন। তিউনিসিয়ার যেসব বৈজ্ঞানিকদের সাথে আমি কথা বলেছি তাদের ধর্ম সর্ম্পকে ব্যক্তিগত মতামত আমার কাছে খুব বেশী প্রাসঙ্গিকও নয়। আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল কিভাবে বিজ্ঞানকে, রাজনীতির মতো আশে পাশের সাধারণ সমস্যার সাথে জড়িয়ে দেয়ার একটা প্রবনতা আছে। তিউনিসিয়ার দ্বিতীয় বৃহতম শহর সাফাক্স এর বায়োটেকনোলজি সেন্টার এর বায়োপ্রসেস ল্যাব এর হেড **সামি সায়াদী** এক দশকেরও বেশী সময় ধরে গবেষনা চালাচ্ছেন কিভাবে জলপাই এর বজ্য অংশকে আবার নতুন করে তেল বানানোর কাজে ব্যবহার করা যায়। জলপাই সবসময়ই আরবের গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানী দ্রব্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল তখন থেকেই যখন আরবে স্বর্নযুগ বিরাজ করতো, আর এখনও এটি সৌভাগ্যের চিহ্ন হিসেবে সমস্ত আরবে স্বীকৃত, আর সায়াদীর অর্জনতো জলপাইকে সোনায় রুপান্তর করার মতোই ঘটনা।

সায়াদী'র ভাবনা অনেকটা সেরকমই যেরকমের দর্শন তিউনিসিয়ার ক্ষমতাশীনরা চান, আর সম্প্রতি এটা সব জায়গায় উপলব্ধিও করা হচ্ছে যে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি প্রত্যেক জাতির অগ্রগতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। ২০০৫ সালে বিভিন্ন গবেষনার বিষয়কে কেন্দ্র করে ১৩৯টি গবেষনাগার আছে সারা দেশ জুড়ে, যেখানে ১৯৯৯ সালে ছিল মাত্র ৫৫টা। সরকার সক্রিয়ভাবে এই অগ্রগতিকে সহযোগিতা দিচ্ছে।

সামি সায়াদী: তিউনিসিয়ার সাফাক্স ল্যাবে বিকল্প শক্তি নিয়ে গবেষণা করেন

তিউনিস শহরের দক্ষিন পাশে মাত্র নব্বুই মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত বওরজ - কেডরিয়া সায়ন্স এন্ড টেকনোলজী পার্ক, একটি চত্বর যেখানে শিক্ষার সুবিধা, শিল্পের সুবিধা, উদ্ভাবন ও উন্নয়নের সুবিধা ছাড়াও ব্যবসায়ীদেরকে এগিয়ে নিয়ে আসার একটি অভূতপূর্ব মিলনকেন্দ্র। এই পার্কটির কাজ শেষ হতে আরো বহু বছর লাগবে, যদিও সেখানে এখন কিছু ভবন আছে যেখানে পদার্থ, ভূতত্ব এধরনের বিষয়ের কিছু গবেষনা বিভাগ চালু হয়েছে, আর তারা এধরনের যন্ত্রপাতি দিয়ে সেখানে গবেষনা চালাচ্ছে যেগুলো পশ্চিমা দেশে হাই স্কুলেও ব্যবহারের উপযোগী নয়। তারা বিজ্ঞানের প্রতি অসীম ভালোবাসা আর আগ্রহের কারণে বিভিন্ন প্রজেক্ট চালিয়ে যাচ্ছেন।

পরিস্থিতি হয়ত শীগগীরই পরিবর্তন হবে। বুভুক্ষের মতো এরা লাভজনক আবিস্কারের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেসব উৎপাদনমুখী শিল্প গবেষনাগারের বাস্তব উপযোগীতা আছে, তিউনিসিয়ার সরকার তাদেরকে চার বছরের চুক্তিপত্র দিচ্ছেন। বওরজ - কেডরিয়া গবেষনাগারের প্রবীন গবেষকরা মাসে ১১০০ মার্কিন ডলার বেতন পান (এখানে যারা বসবাস করেন তাদের জীবন ধারণের জন্য মাঝারি ধরনের বেতন), কিন্তু নতুন কর্মসূচীর আওতায় যে একটি মূল ভালো আবিস্কার দিবেন তিনি রয়ালিটির অর্ধেক পাবেন।

৪

এরপরও, তিউনিসায়ার বিজ্ঞানের প্রতি সর্মথনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেসব প্রকল্পের উদ্দেশ্য থাকে শুধুমাত্র জ্ঞান অন্বেষণ, সেসব প্রকল্পকে কোন ধরনের সহায়তা দেয়া হয় না। বৈজ্ঞানিক গবেষনা, প্রযুক্তি ও সার্মথ্য উন্নয়ন মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রী তাইব হাদরী, যিনি ২০০৪ সাল থেকে এই মন্ত্রনালয়টি তৈরী হওয়া অব্দি ক্যাবিনেটের পদে আছেন বলছিলেন, প্রত্যেকে শুধু মৌলিক গবেষণা করতে চায়। আমি একজন

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গণিতবিদ এবং আমিও মৌলিক গবেষনা করতে চাই। কিন্তু সেটা হবে আমাদের পরের ধাপ। কিন্তু এখন আমাদের ব্যবসার জন্য প্রযুক্তির দরকার বেশী।

চিকিৎসক ও প্রজননবিদ (geneticist) হাবিবা বোওহামেদ চাবৌনি একাধারে তিউনিস বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞান শাখার একজন গবেষক, শিক্ষিকা ও রাজধানীর কেন্দ্রে অবস্থিত চার্লস নিকোলস হাসপাতালের একজন কর্মরত চিকিৎসক। তাঁর সাথে কথা বলে আমার মনে হলো বিজ্ঞানের যাত্রা এখানেও সনাতনপন্থীদের টানা হ্যাচরা থেকে সর্ম্পূন মুক্ত নয়। তিনি ২০০৬ সালে বিজ্ঞানে নারীদের অবদানের জন্য দেয়া পুরস্কার ' **L'Oréal-UNESCO'** এর বিজয়িনী। তিনি বংশানুক্রমিক ব্যাধি নিবৃত্ত করার গবেষনার জন্য এ পুরস্কার লাভ করেন। পাচজন নারীকে ১০০,০০০ হাজার মার্কিন ডলার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল। এই পাচজনের প্রত্যেকেই তাদের স্ব স্ব মহাদেশকে উপস্থাপন করছিলেন। যখন তিনি তার কর্মস্থলে আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানান, তখন তিনি ল্যাবটরীর একটি সাদা গাউন পরা ছিলেন। যে টেস্ট টিউবগুলো রোগীদের আটকে পড়া ডি,এন,এ গুলোকে আলাদা করতে জোর গতিতে ঘুরে যাচ্ছিলো, যেগুলো তিনি পরে পরীক্ষা করবেন।

চাবৌনি ১৯৭০ দশকের মধ্যভাগে তার কর্মজীবনের প্রথমদিকের কথা বলছিলেন, যখন অনেক বাচ্চাকেই তিনি বিকলাঙ্গতার শিকার হতে দেখেছিলেন। তিনি বলছিলেন, এটা খুবই দুঃখজনক, আমি দু, তিন, চার ভাইবোন এরোগে আক্রান্ত এমন পরিবারও দেখেছি। আমি এই সমস্যার প্রতিকার করতে চাচ্ছিলাম, কি করে এর থেকে পরিত্রান পাওয়া যায়, সে চেষ্টা করতে চাচ্ছিলাম। সে সময় জেনেটিক্স নিয়ে কাজ করার কোন সুযোগ এখানে ছিল না, প্রায় দু দশক ধরে সরকারী কর্মকর্তাদেরকে প্রভাবিত করার কঠিন প্রচেষ্টা চালিয়ে তিনি এ সুযোগ তৈরী করেন। আমরা ভালো পরিবেশ ও কাজ করার সুযোগ চাচ্ছিলাম। তারাও অনুধাবন করলেন আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতনামা চিকিৎসা জার্নালগুলো আমাদের লেখা প্রকাশ করছে। আমার মনে হয় অবশেষে নীতি নির্ধারকরা উন্নত গবেষনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

তিউনিসিয়ার জেনেটিক্স-চিকিৎসক গোষ্ঠীতে ১০০ জনের মতো চিকিৎসক ও প্রযুক্তিবিদ আছেন যারা সমস্ত আরব দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশী গবেষণাপত্র প্রকাশ করে থাকেন। হাস্যেজ্জল মুখে চৌবানি

বলছিলেন, 'আমাদেরকে PubMed -এ স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং আমরা মিশর থেকে এগিয়ে আছি। পরিমান দিয়ে নয় কারণ মনে রাখবেন আমরা তুলনায় আকারে তাদের মাত্র এক দশমাংশ।'

গত তিরিশ বছর ধরে চৌবানি দেখছেন, একসময় যারা তার কথার প্রতিবাদ করতেন এখন তারা কিভাবে তার কথার অনুসারী হতে শুরু করেছেন। একটা সময়ে প্রজনন এর উপর কোন উপদেশ নেয়া কিংবা এ সমন্ধে কোন চিকিৎসা নিতে আসাকে সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ গন্য করা হতো। কিন্তু এটা এখন সামাজিকভাবে অনেক বেশী গ্রহন যোগ্য এবং যে সমস্ত বিষয়গুলোকে আগে একদম সাদা চোখে অবহেলা করা হতো বা কখনও কোন গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হতো না, যেমন অটিজম আক্রান্ত শিশু, যেটা অনেকের মধ্যেই চিহ্নিত করা যায়, এগুলো নিয়ে এখন প্রায়ই খোলামেলা আলোচনা হচ্ছে।

এগুলো নিয়ে চৌবানি এখনও প্রায়ই লক্ষ্য করেন কিভাবে তার উপদেশ রোগীদের চিরন্তন বিশ্বাসের অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। অন্যান্য আরব ও মুসলমান দেশের মতো, তিউনিসিয়াতেও জন্মগত ব্যাধির প্রকোপ অনেক বেশী, তারমধ্যে বৃক্কীয় ও রক্ত সমন্ধীয় জটিলতাও অন্তর্ভুক্ত, এর কারণ হিসেবে নিকট-আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিবাহকে তিনি আবিস্কার করেন।

এখানে এবং আরব বিশ্বের সমস্ত জায়গায়, রক্ত সর্ম্পকের ভাইবোনদের মধ্যে বিয়ে এমনকি আপন চাচাতো ভাইবোনদের মধ্যেও বিয়ে করা এটি একটি সাধারণ প্রথা । তিনি বলছিলেন যদিও অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছেএটি এখন কমছে। এটার মানে, ইতোমধ্যেই তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের একই রকম অসংখ্য জীনের অংশীদার।

অন্যন্যক্ষেত্রে, বিশুদ্ধ গবেষণাকে পরিপূর্ণ সহায়তা দেয়া হয় না। প্রজনন চিকিৎসা শাস্ত্রে এমনকি ব্যবহারিকভাবে প্রযোজ্য জ্ঞানও ইসলামিক প্রথার সাথে বির্তকের জালে জড়িয়ে যেতে পারে। চৌবানি বলছিলেন, অস্বাভাবিকতা পরীক্ষার জন্য রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা কোন কঠিন কাজ নয়, সেটা শুধুই অনুসন্ধান। কিন্তু যখন পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে ক্লিনিকে রোগীদেরকে প্রজনন সমন্ধে উপদেশ দিতে যাই সেখানেই সমস্যার শুরু হয়। সেখানে এমন লোকও থাকে যারা বাচ্চা নেয়া বন্ধ করা কিংবা কাছের স্বজনদের মধ্যে বিয়ে না করার উপদেশ মেনে নিতে পারে না।

আজকাল জন্মপূর্ব পরিস্থিতি যাচাই এবং প্রজনন পরীক্ষা অনেক বিশদভাবে সমাজে গ্রহণযোগ্যে এবং আজকাল মায়েদের জীবন রক্ষার্থে ডাক্তাররা গর্ভনাশের ব্যবস্থা করে দেন। ইসলামিক আইন চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণে ১২০ দিন পর্যন্ত ভ্রুনের গর্ভ নষ্ট করার অনুমতি দেয় (যেখানে মায়ের জীবন ঝুকির সম্মুখীন); বলা হয় হয় সে সময়কাল পর্যন্ত ভ্রুনের আত্মা থাকে না, নইলে সে গর্ভ নষ্ট নরহত্যার সমান

অপরাধ। চৌবানির জন্য প্রধান সমস্যা হলো মত পরিবর্তন করানো। তিনি বললেন, 'তারা যুক্তি খুজতে থাকে কিভাবে আমাকে ভুল প্রমানিত করা যায়'। তারা অন্য ডাক্তারের কাছে যায়। অবশেষে তারা গতানুগতিকভাবে আমাদের উপদেশই মানেন, কিন্তু এটা অনেক কঠিন কারণ আমি তাদেরকে খারাপ সংবাদ দিচ্ছি যেটা তাদের চিরাচরিত বিশ্বাসের বিপক্ষে যেতে পারে।

মোহাম্মেদ হাদ্দাদ, তিউনিসের ডি লা মানোওবা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ইসলামিক বিশেষজ্ঞ, অনেক ছোট ছোট আকস্মিক আঘাতের কথা উল্লেখ করলেন যেগুলো সাধারণ মানুষের মনকে বৈজ্ঞানিক সুবিধার প্রতি বিমুখ করে তুলতে পারে। উদাহরনস্বরূপ, সম্প্রতি একজন শেখ ঘোষণা দিয়েছেন তিনি কোরানের আলোকে এইডস এর ঔষধ খুঁজে পেয়েছেন। তিনি ইয়েমেনের বাসিন্দা কিন্তু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তিনি আমাদের নসিহত করেন, এবং এগুলো এখন বড় ব্যবসা। হাদ্দাস বলছিলেন, সমস্যা হল, সাধারণ লোক তাদের কথা শুনছে। এ সমস্ত ব্যায়ারপ স্যাপার চলতে দিলে অনেক লোক মারা যাবেন।

আম্মান, জর্দান ঃ কোরানে বলা আছে 'পড়ো' কিন্তু কোথাও এটা বলা হয়নি যে কোরানকে পড়ো। ১৯৭০ সালে জর্দানের সবচেয়ে বড়ো গবেষনা কেন্দ্র 'দি রয়্যাল সায়ন্টিফিক সোসাইটির' একজন প্রতিষ্ঠাতা জনাব প্রিন্স আল হাসান বিন তালাল বলছিলেন, বলা আছে শুধু পড়ো। হাসান সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ছিলেন যতদিন না তার ভাই রাজা হুসেন তাকে উপেক্ষা করে নিজের ছেলে আবদুল্লাহকে সিংহাসনে বসিয়েছেন। ষার্টোধ্ব যুবরাজ যিনি উচ্চমানসম্পন্ন আরবী ও অক্সফোর্ড ইংরেজীতে কথা বলেন এবং বাইবেলের হিব্রু পড়েছেন তিনি জর্দানে যে সমস্ত ভুল ভ্রান্তি হচ্ছে তার একটি পুর্ন তালিকা দিতে পারেন। পশ্চিমা সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলো থেকে যে সমস্ত সাহায্যের প্রস্তাব আসে, সে সমস্ত সমস্যার কারণগুলোকে চিহ্নিত পর্যন্ত করা হয় না বরং সেগুলোকে ঠিকমতো না পড়াই একটি প্রথা হয়ে দাড়িয়েছে। তিনি নিজে খুবই পড়ুয়া একজন, আমাদের চল্লিশ মিনিটের উপরের সাক্ষাতের সময়ের মধ্যেই তিনি কিরকেগার্দ, কারেন আর্মস্টঙ্গের এ হিষ্টোরী ওফ গড এবং ১৯৩৯ সালে তার স্ত্রীর আত্মীয় সাউদ হাসানের লিখিত হোয়াট প্রাইস টলারেনস এর কথা উল্লেখ করেন।

৫

তিনি অকপটে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীদেরকে 'সমাজের আবর্জনা' হিসেবে অভিহিত করছিলেন আর প্রশ্ন করছিলেন তাদের বৈধতা সম্পর্কে যারা পৃথিবীকে নবীর সময়ের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। তিনি প্রশ্ন করছিলেন আমরা কি 'ইসলাম' নিয়ে নাকি 'ইসলামিজম' নিয়ে কথা বলছি, তিনি ধর্ম আর নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা চরমপন্থী সুযোগ সন্ধানীদের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে কথা বলছিলেন। ইসলামী চরমপন্থীদের দ্বারা যে বিপদের সৃষ্টি তার ভয় শুধু খ্রীষ্টানদের নয়, খোদ মুসলমানদেরই আছে। আরব - ইস্রায়েল সমস্যা আসলে প্রকৃত কারণ নয়, প্রকৃত কারণ হলো উগ্র ইসলামিজমের উথথান।

প্রিন্স হাসান বিশ্বাস করেন, দেশের ভবিষ্যত স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করার জন্য ধর্মকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানকে অনুসরণ করা উচিৎ এবং তিনি ব্যক্তিগত লক্ষ্য হিসবে গত প্রায় চল্লিশ বছরের বেশী সময় ধরে দেশের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাকে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। যে সমস্ত প্রকল্পের দ্বারা আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে তিনি সেগুলোকে পর্যবেক্ষণ করেন, এরমধ্যে ইস্রায়েলও অর্ন্তভুক্ত, যদিও এই দেশগুলোর মধ্যে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্পর্ক ততোটা উষ্ণ নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই বিতর্কিত।

তিনি উল্লেখ করলেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপের এখন কাজ চলছে। রয়্যাল সায়েন্টিফিক সোসাইটির একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হলো Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation বা TREC। এটি একটি বহুজাতিক উদ্যোগ - যেটি বাতাস, পানি, ভূ-গর্ভস্থ তাপ ও সৌরশক্তি র মত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ওমান থেকে আইসল্যান্ড পর্যন্ত বিকল্পশক্তির চাহিদা মেটাবে। এ উদ্যোগ যদি সফল হয়, তাহলে এই প্রচেষ্টার সুফল অনুধাবন করতে দশকের পর দশক কেটে যাবে। যেমন মুসা নেবো পাহাড়ের সামনে দাড়িয়ে ছিলেন (যদিও পৌরনিক কাহিনীতে পাহাড়ের অবস্থান সমন্ধে বলা হয়েছে আম্মান থেকে ২০ মিনিটের দূরত্বের কথা যাহা ডাহা মিথ্যা) সমগ্রকে দেখবেন বলে, ষাট বছর বয়স্ক যুবরাজ নিজেও জানেন বৈজ্ঞানিকভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ দেশ দেখে যাওয়া হয়তো তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

'দৃষ্টিভঙ্গী' তিনি বললেন, 'এটি কোন পৃথক বিষয় নয়, এটি একটি সামগ্রিক ব্যাপার'।

আমাকে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় দুর্দৈব হলো, মেধার ঘাটতি, তিনি স্বীকার করলেন। সমস্ত আরবের সব শিক্ষিত মেধাবীরা মহামারীর মতো দেশের বাইরে চলে যাচ্ছেন জীবন যাপনের জন্য, আর যে সব ছাত্ররা বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়তে যান, তাদের অর্ধেকের বেশী কখনও দেশে ফেরেন না। হাসান বললেন, এ্যামেরিকার নাসার অর্ধেকেরও বেশী কর্মজীবি মধ্যপ্রাচ্যের বাসিন্দা।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে জর্দানে মিশরের তুলনায় মেধার অভাব অনেক বেশী দৃষ্টিগোচর হয় কারণ এখানে সম্পদের পরিমান একদম নিম্ন সীমানায় চলে এসেছে। ইসলামী উগ্রপন্থীরা প্রায় ৭০০,০০০ এর ও বেশী ইরাকী উদ্বাস্তুদেরকে জর্দানে আশ্রয় দিয়েছে। ছয় মিলিয়ন লোকের দেশ জর্দানের জন্য এটি খুব বড় একটি বোঝা। এই সংখ্যার ভয়াবহতা তখনই উপলব্ধি করা যাবে, যখন কেউ কল্পনা করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চার বছরের মতো সময় নিয়ে সেখানে মাত্র ৩৫ মিলিয়ন লোককে ঢুকতে দেয়।

জনসংখ্যার আধিক্য সেখানে মুদ্রাস্ফীতি তৈরী করেছে, ভাড়া এবং সম্পত্তির মূল্য এখন সেখানে আকাশ ছোয়া, আর গ্রামগুলো অগোছালো। মিশর, তিউনিয়া এবং সিরিয়ার মতো (এ ব্যাপারে ইস্রায়েলের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে) জর্দানের কোন উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ নেই, শুধুমাত্র কিছুটা তেল আর পরিস্কার পানি ছাড়া। বাস্তবে, জর্দানের বেশীর ভাগ নদীর পানিই অন্য নদীতে প্রবাহমান, নদীর পানি আর আরব সমুদ্রে যায় না, এমনকি আরব সাগর দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রটিতে নতুন করে প্রাণ আনার অনেক পরিকল্পনাই রয়েছে কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য চাই আঞ্চলিক সহযোগিতা, যেখানে ইস্রায়েল আর প্যালেষ্টাইনের অংশ গ্রহনের ব্যাপার রয়েছে। সেই সাথে চাই পশ্চিমা সাহায্য।

জর্দানে অর্থনৈতিক সম্পদেরও অভাব রয়েছে, এখানকার পরিস্থিতি তেল সমৃদ্ধ আরব উপকূলের দেশ গুলো থেকে ভিন্ন যেখানে রকমের জ্ঞান - বিজ্ঞান দ্রব্য মুল্যের মত বিকি-কিনি করা যায়, দরকার হলে বাইরে থাকে আমদানী করার সার্মথ্য ও তাদের আছে। তারচেয়েও বড়ো হলো, বিপদের আশঙ্কা, ২০০৫ সালে সন্ত্রাসীরা আম্মানের তিনটি হোটেলে বোমা ফেলেছে, এবং আল কায়েদা একজন এ্যামেরিকান ডিপ্লোম্যাটকে হত্যা করার কথা স্বীকারও করেছে, এ সমস্ত কিছুই জর্দানীয়ান অর্থনীতির উপর মারাত্বক প্রভাব ফেলেছে যার কারণে জর্দানের একমাত্র উল্লেখযোগ্য আয়ের উৎস পর্যটন, পর্যটক কমে গিয়ে তাদের রাজস্ব আয় ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

মজার কথা হলো জর্দান, ইরাক এবং আরো একটি কঠিন জায়গার মধ্যে আটকে আছে। তবে এ মূহুর্তে এদেশটি আরবের মানবাধিকার উন্নয়নের অনেক সমস্যা যা আঞ্চলিক বুদ্ধিজীবিদের অসম চিন্তার কারণে ভুক্তভোগী বলে রিপোর্টে দোষারোপ করা হচ্ছে তার একটি মূর্ত প্রতীক। তাদের মধ্যে স্বাধীনতার অভাব আছে এবং এদের অকেজো, প্রভুত্বপরায়ন সরকার যাদের নিরাপত্তাবাহিনীর কাছে সীমাহীন ক্ষমতা দেয়া আছে, যদি পদস্থ কাউকে কেউ চেনে সেটা তার মেধাকে অতিক্রম করে পদোন্নতিতে সাহায্য করে, এবং এই অঞ্চলের গবেষকদের পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত ক্ষীন যোগাযোগ। শিক্ষার সুযোগ এখানে নিতান্তই সীমিত, বিশেষ করে মেয়ে এবং মহিলাদের জন্য। এসব কিছুর মানেই হলো, তুমি যদি একজন মেধাবী বিজ্ঞানী হও, একটা বড় সম্ভাবনা থেকেই যায় যে তুমি একসময় জর্দান ছেড়ে চলে যাবে।

'বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য চাই স্থিতিশীলতা, গনতন্ত্র আর মত প্রকাশের স্বাধীনতা ' বলছিলেন সিনেটর **আদনান বাদরান** যখন আমরা তার অফিসে বসে টার্কিস চা পান করছিলাম, যিনি মিশিগানের ষ্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে আনবিক জীব বিজ্ঞানের উপর ডি - লিট অর্জন করেছেন।

'মুক্তচিন্তা চর্চার জন্য, অনুসন্ধিৎসু হবার জন্য মানুষের একটা উপযুক্ত পরিবেশ চাই। সেটা যদি না থাকে কখনই তুমি মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনাগুলোকে মুক্ত করার সুযোগ পাবে না। আরব অঞ্চলগুলোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপারে এটি খুবই অন্ধকারাচ্ছন্ন, নিরাশাময় একটি গল্প'।

তিনি পনেরশ শতাব্দীতে আরম্ভ হওয়া দিশাহীন প্রথাকে এর জন্য দোষারোপ করলেন। আস্তে আস্তে শিক্ষার মান নীচু করে, অন্ধবিশ্বাসের বিস্তার শুরু হলো। আমরা বড় মনের ছিলাম, ইসলামও উদার ছিল, একটি প্রচন্ড বিশ্বাসী সংলাপ। এটি ছিল সহনশীল, অন্য সভ্যতার সাথে সহজেই মিশে যেতে পারতো। এরপরেই আমরা অন্ধবিশ্বাসী হতে শুরু করলাম। তিনি বললেন, ‘ যখনই তুমি গোড়া, তখনই তুমি একটি গন্ডীতে আবদ্ধ ’। যদি তুমি গন্ডীর বাইরে পা রাখ, তুমি একটি প্রান্তে এসে উপস্থিত হও - এবং তখন তুমি মুক্ত, তুমি তখন সুযোগ পেলে পশ্চিমে চলে যাও।

এবং সেটাই বাদরান করেছেন, বিশ বছর ধরে তিনি ফ্রান্সে আর যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন, এখানে তিনি ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর জন্য গবেষনা করে চারটি পেটেন্ট অর্জন করেছেন। তার কাজ হলো কলার পেকে যাওয়া বন্ধ করা, যার অর্থনৈতিক গুরুত্ব অসামান্য, বিলিয়ন ডলারের সাশ্রয় হয় এর মাধ্যমে, সম্ভাবনা, কারণ এই জন্যই কোম্পানীগুলো পুরো পৃথিবী জুড়ে তাদের উৎপাদিত খাদ্যশস্য সরবরাহ করার অনুমতি পায়, পচন ছাড়া।

এরপরও বাদরান জর্দানে তার নিজের ভূমিতে ফিরে গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ করেন, এমনকি তিনি আম্মানে অবস্থিত ফিলাডেফিয়া ইউনিভার্সিটিতে প্রেসিডন্টসীর মর্যাদাও ভোগ করেন ১৯৮৭ সালে, তিনিই ছিলেন জর্দানের উচ্চতর পরিষদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল, যাকে পরে রাজা দ্বিতীয় আবদুল্লাহ সিনেটর হিসেবে মনোনীত করেন। তারপর ২০০৫ সালে রাজা তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসবে নিয়োগ করেন, তিনিই ছিলেন প্রথম বৈজ্ঞানিক যিনি প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা লাভ করেছিলেন। রাজা যিনি সান্ধহুর্স্টের রাজকীয় মিলিটারী একাডেমীতে পড়াশোনা করেছেন, যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, এবং ওয়াশিংটন ডিসির জর্জটাউন ইউনিভার্সিটিতেও পড়াশোনা করেছিলেন, তিনি বাদরানকে শুধু আরব সমাজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন?

বাদরান বললেন, আমি সমস্ত কায়েমী স্বার্থ বিনষ্ট করে দিতে চেয়েছিলাম, স্বজনপ্রীতি থেকে পরিত্রান পেতে, আমি জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলাম। বাদরানের সময়ে সেখানকার পরিস্থিতি খুবই নাজুক ছিল, যাইহোক, একজন সাংবাদিক আমাকে জানালেন, বাদরান একজন খুবই উচুদরের শিক্ষিত, বৈজ্ঞানিক কিন্তু রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি ব্যর্থ।

৬

২০০৫ সালের নভেম্বরে যখন আত্মঘাতী বোমা হামলা কারীরা আম্মানের তিনটি হোটেলকে তাদের হামলার নিশানা বানালো সেই সাথে **বাদরানের** পরিকল্পনা নিয়ে সামনে অগ্রসর হবার রাস্তাও বন্ধ হয়ে

গেলো। তখন সরকারের সমস্ত মনোযোগ গিয়ে পড়ল দেশের আভ্যন্তরীন উন্নতিকে ছেড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাদরানেরও পরিবর্তন হলো। এখানে প্রধানমন্ত্রীকে রাজার পছন্দমতো কাজ করতে হয় এবং অনেকেই বলেন, এতে জর্দানের নিরাপত্তা বাহিনীর মৌন সম্মতিও লাগে। এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে বাদরানকে চাকুরী থেকে বাদ দিয়ে তার পুরনো জায়গায় সিনাটেতে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া হলো (তার চিন্তাভাবনা সে সময় অতিমাত্রায় 'আদর্শবাদী' হিসেবে দেখা হয়েছিল)।

বাদরানের পরে আমি জর্দানের সবচেয়ে বেশী প্রাণবন্ত এবং আশাবাদী বৈজ্ঞানিক চিন্তার ব্যক্তিকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পেয়েছি। আম্মানের ইউনেস্কোর প্রধান কার্যালয়ে, নোংরা ও অপ্রশস্থ একটি ঘরে পদার্থবিদ **হামেদ তারাউনেহ** এর সাময়িক কর্মস্থল, সেখানে দাড়িয়ে আমি সাথে তার কথা বলছিলাম। নিরবিচ্ছিন ধূমপায়ী লম্বা - চওড়া কাধের সৌম্য দর্শনের তারাউনেহর ঠোঁটে সব সময় একটি

আন্তরিকতার হাসি ঝুলে থাকে, বহু বছর আগে তিনি তার পিএইচডি এর জন্য সুইডেনে এ পাড়ি দেন, আমাদের এই সাক্ষাতের কিছু দিন আগেই মাত্র তিনি জর্দানে পদার্পন করেছেন। তিনি SESAME (Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East) এর জন্য প্রকৌশলী এবং প্রযুক্তিবিদদের সমন্বিত করার একটি প্রকল্প নিয়ে ব্যস্ত। এটি একটি আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন গবেষনাগার যেখানে পদার্থ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, ঔষধ এবং প্রত্নতত্ত্ব সমন্ধে গবেষণা করার অনেক সুযোগ ও যন্ত্রপাতি আছে। মুসলিম বিশ্বে এই প্রথম এমন বহুমুখী সুযোগ সম্পন্ন গবেষনাগার তৈরী হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মকে আলোকিত করার জন্য।

জর্ডানের SESAME ফ্যাকালটি

রাজা দ্বিতীয় আবদুল্লাহ SESAME এর জন্য জমি এবং প্রতিষ্ঠানটি চলার জন্য প্রায় দশ মিলিয়ন ডলারের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করাতে জর্দানকেই SESAME এর মনোনীত করা হয়েছিল। এই প্রকল্পটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের চিরাচরিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার প্রথা পুনরুদ্ধারের জন্য তৈরী করা সুইটজারল্যান্ড এর উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পর্দাথ বিজ্ঞানের গবেষণাগার CERN এর আদলে বানানো। আশা করা যায় ২০০৯ সালে যখন SESAME পুরোপুরি চালু হবে, এই বছরের জুনের মধ্যে আম্মানের নিকটে আল-বালকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের সব সুযোগও চলে আসবে, গবেষকরা ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ করবেন পুরো সপ্তাহ জুড়ে - লম্বা অধিবেশনে। ইউরোপীয়ান আদলের মতো SESAME এর একটা অংশও আশে পাশের সব উজ্জল প্রতিভাবানদেরকে নিয়ে কাজ করতে চায়, নইলে যারা বিদেশ থেকে দেশে ফিরবে তাদের জন্য সম্ভাবনাময় ও আর্কষনীয় সুযোগ সৃষ্টি করবে যা পরবর্তী তরুন প্রজন্মকে বিজ্ঞানের প্রতি উৎসাহী ও আগ্রহী করে তুলবে।

তারাউনেহ আশা করছেন অচীরেই SESAME জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিনত হবে বিশেষ করে সেসব সদস্যদের জন্য যারা বাৎসরিক ব্যয় ভার বহন করছেন, একটি দল যার মধ্যে আছে বাহরাইন, মিশর, পাকিস্তান, তূর্কী ও প্যালেষ্টাইন এর সরকার জড়িত আছে, এবং ইস্রায়েল, যেটি একমাত্র দেশ যাদের একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ রয়েছে, তথাপি তারা তথাপি তারা আমাদের থেকে জনবিচ্ছিন্ন। তারাউনেহ বললেন, 'আমরা বিজ্ঞানী'। 'আমরা রাজনীতির তোয়াক্কা করি না, আমাদের এখন সুযোগ হয়েছে জ্ঞান - বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করার এবং সবার মঙ্গলের স্বার্থে জ্ঞানের আলো জ্বালার। আরম্ভটা খুবই চমৎকার। এটি একটি বহুজাতিক পরিবেশ, যেটার প্রচন্ড অভাব ছিল আমাদের। এখন আমরা একে অপরকে বিজ্ঞানী হিসবে, মানুষ হিসেবে জানতে পারব।

আমি তাদের নিয়েও চিন্তা করি- সেই সব মহাবিজ্ঞানীরা যারা জর্দান পরিত্যাগ করে চলে গেছেন কিংবা জর্দানকে সম্ভাবনাহীন বলে উল্লেখ করেছেন, তাদের সম্পর্কে।

'আমি যদি বার্কেলে চলে যাই তাহলে কি আমি বেশী আয় করব'? তারাউনেহ জিজ্ঞেস করলেন? হ্যা, অবশ্যই, কিন্তু আমি এ জায়গার। আমি আরবের, আমি মুসলমান। এখানেই আমি থাকতে চাই। আর কেনই আমরা নিজেরা আমাদের নিজস্ব কিছু তৈরী করতে পারব না? আগামী পাচ বছরে অন্যরা দেখবে এটা কতো ফলপ্রসু হয়েছে। এবং এটা বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীদের কৌতুহল মেটানোর জায়াগা এবং বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি তৈরীর সেতু হিসেবে কাজ করবে। বিজ্ঞানের পথেই দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব। এটি পৃথিবীর মানুষের উন্নতি এবং অগ্রগতির সোপান।

তারাউনেহ এর আগ্রহ এবং উৎসাহের জন্য SESAME এর সাফল্য অনিবার্য। কিন্তু রাজার সাহায্য আর প্রকল্পটির আর্ন্তজাতিক চরিত্র এটিকে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির সাফল্য থেকে অনেক বড় করে তুলেছে।

এটি ঠিক সেই ধরনের একটি আঞ্চলিক প্রকল্প যেটিকে সেই এলাকার লোকজন বিশেষ পছন্দ করে, যুবরাজ হাসান বলছিলেন আরব বিশ্বের শান্তি ও অগ্রগতির জন্য এটিই আসল রোড ম্যাপ। যন্ত্র এবং কল্পনার একটি সংমিশ্রন যেহেতু, দ্রুত ও জোর গতিতে বৈজ্ঞানিক জগতের দিকে রশ্মি ফেলছে, হয়তো এটি সবার প্রার্নারই ফসল।

টড পিকক, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, লেখক এবং ফটোগ্রাফার। তার 'বিজ্ঞান ও ইসলাম : অন্তিম সংঘাত' - প্রবন্ধটি ২০০৭ সালের জুন মাসে ডিস্কভার ম্যাগাজিনে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন হিসেবে প্রকাশিত হয়।

তানবীরা তালুকদার, লেখক এবং নৃত্যশিল্পী। নেদারল্যান্ডস-এ বসবাসরত মুক্তমনার কো মডারেটর। অনেকদিন ধরেই ইন্টারনেট-এ লিখছেন। বেশ কিছু প্রবন্ধ দেশের দৈনিক পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছে। ইমেইল - tanbira.talukder@gmail.com

কেন আমি সংশয়বাদী?

পল কার্জ

অনুবাদ - জাহেদ আহমদ এবং অভিজিৎ রায়

ধর্মে অবিশ্বাসীরা সম্প্রতি তাঁদের আদর্শগত অবস্থান তুলে ধরার প্রকৃত পন্থা নিয়ে বিতর্ক করেছেন। কোন কোন বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক (যেমনঃ রিচার্ড ডকিন্স, ডেনিয়েল ডেনেট প্রমুখেরা) সাম্প্রতিক কালে 'ব্রাইট' বা 'মেধাদীপ্ত' শব্দটি ব্যবহারের প্রতি সহানুভূতিশীলতা দেখিয়েছেন। তাঁরা ভেবেছেন, এটি একটি বুদ্ধিদীপ্ত ধারণা এই অর্থে যে- 'ব্রাইট' শব্দটি এই ক্ষেত্রে প্রচলিত শব্দাবলীর (যেমন- নাস্তিকতা) সাথে সংশ্লিষ্ট অতীতের অনেক নেতিবাচক প্রচার ও ধারণার অবসান ঘটাতে সহায়ক হবে। অনেকে এটাকে দার্শনিক অবস্থানগত দিক থেকে এক আকর্ষনীয় উত্তোরণ হিসবে দেখেছেন। পক্ষান্তরে, এই ধারণার বিরোধীদের বক্তব্য হচ্ছে, এর মধ্য দিয়ে একধরণের উন্নাসিকতা কাজ করছে- কারণ নিজেদের ঢোল নিজেরাই পিটিয়ে আমরা নিজেদেরকে ব্রাইট বা মেধাদীপ্ত বলছি আর ইঙ্গিত করছি যে, আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষের সবাই বুদ্ধিহীন কিংবা মেধাশূণ্য। সন্দেহ নেই, 'নাস্তিকতা' বিশেষ্যটি অনেকের মনে নিরুৎসাহের জন্ম দেয়, তাঁরা এটাকে একটা অতি নেতিবাচক বা কট্টর মতবাদ বলে মনে করেন। অন্যরা এ ক্ষেত্রে 'অজ্ঞেয়বাদ'-এ আশ্রয় নেয়াকে সুবিধাজনক মনে করেন; তাঁরা বলেন, ঈশ্বর প্রশ্নে তাঁদের অবস্থান সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। ফলে কোন কোন সময় বিশ্বাসকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে ও একটি কৌশলজনক পন্থা হিসেবে বিবেচিত হয়।

ধর্মে অবিশ্বাস বিষয়টি তুলে ধরার জন্য আমি এখানে আরেকটি শব্দ উপস্থাপন করতে চাই যা আমার চোখে অধিকতর বেশি সংগতিপূর্ণ। কেউ শুধু এ ভাবে বলতে পারেন যে 'আমি একজন সংশয়বাদী'। দর্শনের জগতে এটি একটি সনাতনী (ক্লাসিক্যাল) ধারা, তথাপি আমি জোর দিয়ে বলব, এটি আজ ও প্রাসংগিক কেননা ধর্মীয় দাবি সমূহ সম্পর্কে আজ অবধি অনেক মানুষই সংশয়ী।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সংশয়বাদের প্রচুর প্রচলন রয়েছে। সংশয়বাদীরা কোন একটা তত্ত্ব বা অনুকল্পকে সন্দেহের চোখে দেখেন যতক্ষন পর্যন্ত না সেটি পর্যাপ্ত প্রমাণের সাহায্যে যাচাই করার মত পর্যায়ে পড়ছে। ধর্ম বিষয়ক সংশয়বাদীর ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। ধর্ম কেন্দ্রিক সংশয়বাদীরা গোঁড়া নন, ধর্মীয় দাবিসমূহকে তাঁরা আগে থেকেই প্রত্যাখান করেন না; কেবলমাত্র পর্যাপ্ত প্রমাণ ছাড়া ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাপারটি গ্রহণ করতে তাঁরা অপারগ।

এক্ষেত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে পর্যাপ্ত যুক্তি-প্রমাণ বা 'বার্ডেন অব প্রুফ' সরবরাহ ও উপস্থাপণ করার দায়িত্ব কিন্তু বিশ্বাসীর উপরেই বর্তায়। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু' কিংবা 'কেবলমাত্র বিশ্বাসের খাতিরে বিশ্বাস' কিংবা 'প্রত্যেকের রয়েছে বিশ্বাসের অধিকার' - প্রভৃতি দাবী এ ক্ষেত্রে প্রমাণ ও যুক্তির নিরিখে একেবারেই অগ্রহনযোগ্য ও বেমানান, কেননা তাহলে প্রত্যেকের খেয়ালখুশী মত বিশ্বাসকে আমাদের গণ্য করতে হবে। সে জন্যই একজন সংশয়বাদী কোন একটি অনুকল্প বা বিশ্বাস কে গ্রহণ করার আগে সেটির স্বপক্ষে প্রমাণ এবং যুক্তির অবতারনা চান। সংশয়বাদী অনুসন্ধানীরা (skeptical Inquirer) সর্বদাই নতুন যুক্তি ও তত্ত্বের আলোকে তাঁদের বিশ্বাস পরিবর্তন করতে প্রস্তুত থাকেন। কোন প্রকার কর্তৃত্ব, প্রথা, ঐতিহ্য, অতীন্দ্রিয়বাদ, অলৌকিকত্ব বা ঐশী বাণীর দাবীকে তাঁরা গ্রহণ করেন না। হাতের কাছে পর্যাপ্ত প্রমাণ অনুপস্থিত- এমন সব প্রশ্নের মীমাংশায় সংশয়বাদী অনুসন্ধানীরা তাঁদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মুলতবি রাখার পক্ষপাতী। সংশয়বাদীরা এই ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থেই অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) কেননা, তাঁদের কাছে প্রশ্নটি এখনো পুরোপুরি অমীমাংশিত এবং বিতর্কের জন্য সদা উন্মুক্ত। এখানে তাঁরা অবিশ্বাসী এই অর্থে, প্রশ্নটির চূড়ান্ত সমাধানকল্পে বিশ্বাসীরা যে সব ব্যাখ্যা হাজির করেন সেগুলিকে তাঁরা অপর্যাপ্ত প্রমাণ ও অগ্রহনযোগ্য তত্ত্ব হিসেবে দেখে থাকেন। সেজন্যই যে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বকে তাঁরা অতিমাত্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার বলে মনে করেন। একজন সংশয়বাদীকে এই অর্থে অবিশ্বাসী বা নাস্তিক বলা যেতে পারে। আমার ধারণা, বিষয়টিকে আর ও প্রাসংগিক করে তুলে ধরা যায় এই বক্তব্যের মাধ্যমে : এহেন ব্যক্তি ধর্মীয় দাবী সম্পর্কে একজন সংশয়বাদী।

দর্শন ও বিজ্ঞানের একটি সুসংহত ধারা হিসেবে সংশয়বাদ সর্বদাই খোলা মনে ধর্মীয় ব্যাপার স্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করেছে এবং সংশয়বাদ মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারে - সেখানে ঈশ্বর বিশ্বাসের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভিত্তি খুবই নগণ্য । পাইরো, ক্রেটিলাস, সেক্সটাস এম্পিরিটাস এবং কার্নিয়াডিস প্রমুখ প্রাচীন দার্শ নিকেরা অপার্থিব (মেটাফিজিক্যাল) ধর্মীয় দাবী সমূহকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন। দেকার্ত, বেকন, ল্যকে, বার্কলি, হিউম এবং কান্ট প্রমুখ আধুনিক দার্শনিকদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগি গড়ে ওঠার পেছনে ক্লাসিক্যাল সংশয়বাদের রয়েছে ব্যাপক ভূমিকা। তাঁদের অনেকের কাছে 'ঈশ্বর বিতর্ক' ছিল একটা হেঁয়ালির বিষয়; অতিপ্রাকৃতিক বিষয়াদির প্রত্যাখানের মধ্য দিয়েই হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের যাত্রা যেমনটি আমরা দেখি গ্যালিলিও, অন্যান্য বিজ্ঞানী এবং পরবর্তীকালের মনীষী যেমন- ফ্রয়েড ও মার্ক্স, রাসেল ও দ্যুয়ে, সাঁর্ত্রে ও হ্যাগার, পোপার ও হুক, ক্রিক ও ওয়াটসন এবং ব্যঞ্জ ও উইলসন-প্রমুখদের ক্ষেত্রে।

'ধর্মীয় দাবী সম্পর্কে আমি একজন সংশয়বাদী'- এ অবস্থানটি 'আমি একজন নাস্তিক'- অবস্থানের চাইতে বেশি প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি কেননা প্রথম বক্তব্যটি অনুসন্ধানের গুরুত্ব তুলে ধরে। অনুসন্ধানের ধারণাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ গঠনমূলক উপাদান রয়েছে যেহেতু অনুসন্ধান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায়, মহাবিশ্বে আমাদের আমাদের অবস্থান ও নিয়ত বেড়ে চলা মানব জ্ঞান সম্পর্কে আমাদের উত্তরোত্তর সচেতন করে তোলে। যে সব কারণে অনেক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক ধর্ম বিশ্বাসীদের দাবীকে সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখেন, সেগুলির কয়েকটি আমি নীচে তুলে ধরব চেষ্টা করব। প্রাথমিকভাবে আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব

অতিপ্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব- বিশেষভাবে এক ঈশ্বর কেন্দ্রিক ধর্ম সমূহের নির্দেশনা মূলক নীতিজ্ঞান তত্ত্ব, আত্মার অমরত্ব এবং স্বর্গ-নরক ইত্যাদি ধারণাবলীর মধ্যে। সীমিত পরিসরের কথা মাথায় রেখে ঈশ্বরের ধারণাকে খন্ডন করে যে আলোচনা আমি করেছি তা বিশাল ব্যাপ্তির সামান্য একটি খন্ডাংশ মাত্র বলে মনে হতে পারে।

শুরুতেই মনে রাখা দরকার সংশয়বাদী অনুসন্ধানীরা নীচের বিষয়গুলিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। যথাক্রমে-

একঃ ঈশ্বর বিরাজমান;

দুইঃ ঈশ্বর একটি ব্যক্তি সত্ত্বা;

তিনঃ আমাদের চূড়ান্ত নীতিজ্ঞানের উ□স হচ্ছেন ঈশ্বর;

চারঃ ঈশ্বরে বিশ্বাস অসীম মুক্তির সন্ধান দিবে; এবং

পাঁচঃ ঈশ্বরে বিশ্বাস ব্যতিত একজন মানুষের পক্ষে ভাল হওয়া সম্ভব নয়।

পাঠক-পাঠিকাদের আবার ও স্মরণ করিয়ে দেই, এগুলো প্রমাণের দায়িত্ব কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব দাবী উত্থাপনকারীর ওপরই বর্তায়। ঈশ্বর বিশ্বাসের স্বপক্ষে তাঁরা যদি পর্যাপ্ত প্রমাণ উপস্থাপন করতে অপারগ হন, তাহলে আমার অবশ্যই অধিকার আছে একজন সংশয়বাদী হিসেবে বিপরীত অবস্থান নেয়ার।

কী কারণে সংশয়বাদীরা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সন্দেহের চোখে দেখেন?

প্রথমত, সংশয়বাদী অনুসন্ধানীরা ঈশ্বরের প্রচলিত বৈশিষ্ট্যসমূহকে (যেমন- 'অতিপ্রাকৃতিক', 'সর্বশক্তিমান', 'পরম করুণাময়', 'সর্বত্র বিরাজমান' ইত্যাদি গুণাবলি) সুসংহত, যৌক্তিকভাবে বোধগম্য কিংবা অর্থবোধক বলে মনে করেন না। মানুষের বোধশক্তির বাইরের (যেমনটি ধর্মবাদিরা দাবী করে থাকেন) কোন অতিপ্রাকৃত সত্ত্বার অস্তিত্বের দাবী আমাদের পার্থিব যুক্তিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আমরা কি ভাবে একটি অসংজ্ঞায়িত সত্ত্বার অস্তিত্বের দাবী করতে করতে পারি যদি আমরা না জানি- ঠিক কোন্ অর্থে সেই সত্ত্বার অস্তিত্বের কথা বলা হচ্ছে? কি ভাবে এমন একজন ঈশ্বর আমাদের বোধগম্য হবেন যিনি সময় ও মহাশূণ্যের বাইরে এবং

যাঁর চরম মর্মার্থ বোঝা আমাদের সাধ্যের অতীত? ধার্মিকেরা একজন অজানা-অচেনা এক্স (X)-এর অস্তিত্বের দাবী জানাচ্ছেন। যদি তার মর্মবস্তু বোধশক্তির বাইরে হয়, তাহলে তিনি ফাঁপা একটি কাল্পনিক বিমূর্তন ছাড়া আর কিছু নাও হতে পারেন। সে জন্য ধর্মের ক্ষেত্রে সংশয়বাদীরা শব্দার্থ বিদ্যার দৃষ্টিকোন থেকে ঈশ্বর বর্ণনাকে আপত্তিজনক মনে করেন কারণ- এটি অবোধগম্য এবং এতে স্পষ্ট কোন বিষয়বস্তু থাকে অনুপস্থিত।

প্রায় সময় এই অজ্ঞেয় সত্তাটির পক্ষে দাবী উত্থাপন কারীরা এই যুক্তি দেখান যে ঈশ্বর হচ্ছেন সব কিছুর আদি কারণ। সে ক্ষেত্রে আমরা সহজেই দাবী উত্থাপন কারীর কাছে জানতে চাইব, 'ঈশ্বর নামক সত্তাটির পেছেনের কারণটি তাহলে কি?' ঈশ্বর স্বয়ম্ভূ কিংবা ঈশ্বরের পিছনে কোন কারণ নেই- এমন বক্তব্য আমাদেরকে অজ্ঞতার আর ও এক ধাপ পিছনে নিয়ে যায়। ভৌত মহাবিশ্বের বাইরে বিচরণ করার মানে হচ্ছে বিশ্বাসের পাখায় ভর করে যে কোন একটি উত্তর ধরে নেয়া। একই বিচারে অনেকে ধরে নেন, মহাবিশ্বের কারিগরিত্বের পেছনে রয়েছে বিশেষ ইন্টালিজেন্ট ডিজাইন (আই.ডি)। এমন ধরণের দাবীও ব্যাখ্যা দিতে পারে না আমাদের দ্বন্দ্ব, বাঁচার সংগ্রাম, ট্র্যাজেডি এবং দুঃখ-কষ্ট-বেদনার মত ব্যাপারগুলোকে। নিয়মানুবর্তীতা এবং শৃংখলা মানেই ডিজাইন বা কারিগরিত্বের উপস্থিতি নয়। ডিজাইন বিষয়ক বিতর্ক আমাদের এরিস্টটলের নিয়তিবাদকে স্মরণ করিয়ে দেয় -প্রকৃতিতে নিহিত রয়েছে উদ্দেশ্য বা সমাপ্তি। কিন্তু প্রকৃতিতে সে রকম উদ্দেশ্যের কোন প্রমাণ আমরা পাই না। আর মহাবিশ্বে কখনো কোন পরিকল্পনা বা ডিজাইনের ছাপ আছে মনে হলেও (মনে হওয়া মানেই পরিকল্পিত কিংবা নক্সাকৃত নয়) এটি এমন কোন কারিগর বা ডিজাইনারের অস্তিত্ব প্রমাণ করবে না যাঁর অস্তিত্ব বিষয়ে আমাদের হাতে খুব সামান্যই 'প্রমাণ' রয়েছে।

বিবর্তন তত্ত্ব অনেক বলিষ্ঠভাবে প্রজাতির উৎপত্তিকে ব্যাখ্যা করতে পারে। সময়ের সাথে সাথে প্রজাতির পরিবর্তনকে ডিজাইন বা পরিকল্পনার চেয়ে বরং আকস্মিক মিউটেশন, প্রভেদমূলক প্রজনন, প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং অভিজোজনের সাহায্যে অনেক ভালভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তারচেয়েও বড় কথা হল, দেহের বিভিন্ন বিলুপ্তপ্রায় অংগাদি যেমন, অ্যাপেন্ডিক্স, মেরুদন্ডের নীচে রয়ে যাওয়া লেজের হাড়, কিংবা পুরুষের স্তনবৃন্ত - এগুলোর অস্তিত্ব কোন নিখুঁত পরিকল্পনা বা ডিজাইন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের আরেক ধরনের ভাষ্য হচ্ছে তথাকথিত সূক্ষ-সমন্নয়ের যুক্তি (ফাইন টিউনিং আর্গুমেণ্ট)। এর প্রবক্তারা মনে করেন, প্রকৃতির ভৌত চলকগুলোর সূক্ষ সমন্নয়ের মাধ্যমে এমনভাবে এই বিশ্বব্রহ্মান্ড তৈরি করা হয়েছে যে এখানে জীবনোপযোগী পরিবেশ গঠন সম্ভব হয়েছে। এবং তারা মনে করেন এর পেছনে পরিকল্পনাকারী হিসেবে প্রচ্ছন্ন আছেন ঈশ্বর। কিন্তু এ যুক্তিও খুব শক্তিশালী বা পর্যাপ্ত কিছু নয়। প্রথমতঃ ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায় লক্ষ লক্ষ প্রজাতি টিকে থাকার সংগ্রামে হেরে গিয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কাজেই প্রকৃতির তথাকথিত'সূক্ষ-সমন্বয়' তাদের জন্য কোন কাজেই আসেনি। দ্বিতীয়তঃ অসংখ্য মানুষও বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে বলি হয়ে যেমন বিভিন্ন রোগে কিংবা দুর্যোগে মারা গিয়েছে। ২০০৪ সালে ভারত মহাসাগরের তলদেশে ভূসঞ্চরণের কারণে ধেয়ে আসা সুনামীতে লক্ষ লক্ষ নিষ্পাপ নর-নারী আর শিশু মারা গেছে। এ উদাহরণগুলো খুব কমই প্রকৃতির সূক্ষসমন্বয়ের দিকে ইংগিত করে, বরং নির্দ্বিধায় বলা যায়, কোন সূক্ষ-সমন্বয়ক এ ভুলভ্রান্তিগুলো দূর করায় সচেষ্ট হলে এই ব্যাপক প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব ছিল।

একই সাথে বলা যায়, সবচেয়ে বড় সমস্যাটি ত রয়েই গেছে - অশুভের সমস্যা (argument of evil)। যদি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ এবং পরমকরুণাময় ঈশ্বর এই মহাবিশ্ব বিনির্মাণ করে থাকেন, তবে অশুভের (evil) উপস্থিতি কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? স্বভাবতঃই ভয়াবহ বন্যা কিংবা প্লেগে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্য কোনভাবেই মানুষকে দায়ী করা চলেনা। এটাকে একভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় - যদি ঈশ্বর নিজেই এক অপকারী বা ক্ষতিকর সত্তা হয়ে থাকেন। কারণ 'সর্বজ্ঞ' ঈশ্বরের জানার কথা যে এ ধরণের ভয়াবহ বিপর্যয় তার প্রিয় সৃষ্টিকে আঘাত হানতে যাচ্ছে, কিন্তু তা ঠেকানোর কোন ব্যবস্থা নেননি। কিংবা হয়ত নিতে পারেন নি, সেক্ষেত্রে তিনি এক অসহায় নপুংসক ঈশ্বর বৈ কিছু নন। এটাও প্রকারন্তরে প্রমাণ করে যে স্রষ্টা বুদ্ধিহীন (unintelligent) এবং ত্রুটিপূর্ণ (faulty) পরিকল্পক।

ধর্মবাদীদের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, ঈশ্বর কখনো সখনো কিছু মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে (দেখা দিয়ে কিংবা ঐশ্বরিক বাণী পাঠিয়ে) ধন্য করেছেন। কিন্তু এই প্রকাশ কখনই নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের সামনে বস্তুনিষ্ঠভাবে আসেনি। ঈশ্বরের দক্ষিনা বিলানো হয়েছে গোপনে গোপনে, কিছু 'নির্বাচিত' পয়গম্বরের মাঝে, যাদের দাবী সংশয়মুক্তভাবে যাঁচাই করা যায়নি। ধর্মগ্রন্থগুলো ঘাটলে ঈশ্বরের নানা রকমের অলৌকিক কীর্তি কাহিনীর বিবরণ পাওয়া যায়, যেগুলো আসলে কখনোই সংশয়ের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বরং তথাকথিত অলৌকিক কাহিনীর পেছনের প্রাকৃতিক কারণকে খুঁজে পেতে আমাদের সাহায্য করে।

বাইবেল, কোরান, বেদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থগুলো অজস্র ভুলে ভর্তি, পরস্পরবিরোধী কথাবার্তায় পরিপূর্ণ। ওই গ্রন্থগুলি আসলে প্রাচীণকালের মানুষদের হাতে রচিত, যা সে সময়কার চিন্তাভাবনাকে তুলে ধরেছে। সেগুলো ত ঈশ্বরের বানী নয়ই বরং বিভিন্ন জাতি আর গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গল্প আর লোকগাঁথাগুলোর সংকলন বলা যেতে পারে; কাজেই সে বাণীগুলো কখনোই সকল কালের জন্য, সকল সমাজের জন্য কিংবা সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্ট ইতিহাসকেও সঠিকভাবে বর্ণনা করেনি। মোসেস, আব্রাহাম বা জোসেফের অনেককিছুই ইতিহাসনির্ভর নয়। নিউটেস্টামেন্টের রচয়িতাদের মধ্যে কেউই যে যীশুকে স্বচক্ষে দেখেনি তা গবেষণায় ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। চারটি গসপেল চাক্ষুষ সাক্ষীর ভিত্তিতে রচিত হয়নি, বরং নানা লোককথা এবং জনশ্রুতির ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে। যীশুর কুমারী মাতার গর্ভে আলৌকিক জন্ম, তাঁর আলৌকিক চিকিৎসায় রোগ সারানো এবং মৃত্যুর পর তার পুনরুত্থান নিয়েও তর্ক বিতর্ক এবং পরস্পরবিরোধিতার শেষ নেই। ঠিক একই ভাবে মুসলিমরা যেরকম দাবী করেন, আল্লাহর ওহী একেবারে অপরিবর্তিতভাবে মানুষের কাছে এসে পৌঁছিয়েছে, সেটিও ঠিক নয়। ইতিহাস ঘাটলে কোরানের অনেকগুলো ভাষ্য পাওয়া যায়, কাজেই এটাও বাইবেলের মত নানা বৈচিত্রময় লোককথার সংকলন বৈ কিছু নয়। তেমনিভাবে, যে হাদিসগুলো মুহম্মদের বানী হিসেবে তার সাহাবাদের

মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে দাবী করা হয়, সেগুলোও ইতিহাসভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা যায়নি।

কেউ কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কারণ তারা মনে করেন ঈশ্বর তাদের ব্যক্তি জীবনে হস্তক্ষেপ করেছেন, এর ফলে তারা জীবনের এক নতুন উপলব্ধি খুঁজে পেয়েছেন। এগুলো ব্যক্তিবিশেষের মনোজগতের আত্মগত অভিজ্ঞতা, কোনভাবেই কোন আপার্থিব সত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ নয়। ঈশ্বর দর্শন, গায়েবী আওয়াজ শোনা ইত্যকার ব্যক্তিবিশেষের মানসিক অবস্থাকে মনোবিজ্ঞানের সাহায্যেই খুব ভালভাবে ব্যাখ্যা কর যায়, কোন স্বর্গীয় হস্তক্ষেপের কাছে নতজানু না হয়েই।

দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর কি একজন ব্যক্তি? তাঁর কি মানব সদৃশ আকার আছে? তিনি কি মোসেস, আব্রাহাম, যীশু, মুহম্মদ কিংবা অন্যান্য পয়গম্বরদের কাছে কোন উপলব্ধিযোগ্য কোন রূপ ধারণ করে যোগাযোগ করেছিলেন?

আবারো বলতে হয়, এ ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য চাক্ষুষ সাক্ষীর অভাব রয়েছে। বরং রটনাবিদদের নিরন্তর রটনা আর বিশ্বাসনির্ভর প্রচারণাকেই প্রশ্নাতীতভাবে সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। প্রাচীন পুঁথিপত্র এবং গ্রন্থগুলোতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের যে 'প্রমাণ' পাওয়া যায় সেগুলো সবগুলোই ভ্রান্তিময়, সাহিত্যবোধহীন, প্রাগৈতিহাসিক (কু)দর্শনের প্রভাবযুক্ত এবং সর্বোপরি নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হবার যোগ্য নয়। ঐগুলোর অনেকগুলিই প্রাচীন কবিদের দৈব বন্দনা দিয়ে যত না প্রভাবিত, কিন্তু ততটাই প্রত্নতাত্ত্বিক দিক দিয়ে অন্তঃসারশুন্য, আর নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক গবেষণায় অনুত্তীর্ণ। শুধু তাই নয়, এদের অনেকগুলোই আবার বৈধতা আর প্রামানিকতার দাবীর সাপেক্ষে পরষ্পরবিরোধী।

প্রাচীন বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি-সদৃশ ঈশ্বরের সপক্ষে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। এই নরত্বরূপী ঈশ্বর আসলে প্রাচীন মানুষের উর্বর মস্তিস্কের চিন্তাভাবনার ফসল, সে জন্যই ঈশ্বর মানব আশা-আকাঙ্খার সাথে সংগতি রেখে রূপ নিয়েছেন ব্যক্তি-ঈশ্বরে। সে জন্যই গ্রীক যোদ্ধা এবং লেখক জেনোফোন (Xenophon) বলেন, 'সিংহদের যদি কোন ঈশ্বর থাকত, তবে তা হত সিংহের বৈশিষ্ট্যসপম্পন্ন'। মানব ঈশ্বর তাই হয়েছে মানব সদৃশ - আর তা মানুষের আশা আকাংখা আর কল্পনাকে বাস্তবতা দিতে গিয়েই।

তৃতীয়তঃ, মানবিক নৈতিকতাগুলো সব ঈশ্বরপ্রদত্ত- এই ধারণা কিন্তু খুবই সন্দেহজনক। ওই তথাকথিত 'পবিত্র' বাণীগুলো 'নাজিল' হওয়ার সময়কার তদানিন্তন সমাজ-সাংস্কৃতিক অবস্থাকেই কেবল তুলে ধরছে, এর

বেশি কিছু নয়। যেমন ওল্ড টেস্টামেন্টে ব্যভিচারী, ধর্মবিরোধী, অবাধ্য, জারজ, ডাইনী এবং সমকামীদের শায়েস্তা করার জন্য পাথর ছুঁড়ে হত্যা করার বিধান আছে। এটি সম্মিলিত অপরাধের উপর হুমকি দেয়: আছে জেহোভার তরফ থেকে তার সন্তানের অবিশ্বাসী সন্তানদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা। এতে পিতৃতন্ত্রের সাফাই গাওয়া হয়েছে, এবং নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব স্থাপন করা হয়েছে। দাসত্বকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে এমনকি গণহত্যাকেও ঈশ্বরের নামে জায়েজ করা হয়েছে। নিউ টেস্টামেন্টে বলা হয়েছে, 'সিজারের জন্য সবকিছু দিয়ে দাও, কারণ সবকিছুই সিজারের জন্য'; এটি দাবী করে স্ত্রী তার স্বামীর কর্তৃত্বাধীন থাকবে। এটি ফেইথ হিলিং, ঝার ফুঁক, তন্ত্র-মন্ত্র এবং অলৌকিকত্বকে গ্রহণযোগ্যতা দেয়। এতে 'স্বাধীনতা'র চাইতে বরং 'বাধ্যতা'র জয়গান গাওয়া হয়েছে, 'সাহসিকতা'র চেয়ে সাফাই গাওয়া হয়েছে 'কাপুরুষতা'র, 'আত্মনিয়ন্ত্রণ'-এর বদলে বরং প্রশংসা করা হয়েছে 'ভীরুতা'র। কোরান কোন ভিন্নমতকে প্রশ্রয় দেয় না, চিন্তার স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে, খর্ব করে অবিশ্বাসী হবার প্রয়াসকে। এটি মুহম্মদের উপর 'নাজিল' হওয়া গ্রন্থটির মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পন দাবী করে। এটি রাষ্ট্র এবং ধর্ম পৃথকীকরণ প্রচেষ্টাকে বাতিল করে দিয়ে বরং মোল্লা এবং ইমামদের শারিয়া আইন প্রবর্তনে ইন্ধন যোগায়।

ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে নানাপদের বিপরীতমুখি এবং পরষ্পরবিরোধী খেলা খেলতে ভক্তবান্দাদের জুড়ি নেই। তারা কখনো ধর্মযুদ্ধে অংশ নিয়েছে, কখনো আবার যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে; কখনো দাসত্বের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, কখনো বা বিরুদ্ধে, কখনো মৃত্যুদন্ডের পক্ষে কথা বলেছে, কখনো বা এর বিরুদ্ধে, কেউ রক্ষণশীলতার সাফাই গান ত কেউ গান সংস্কারের। কখনো রাজার স্বর্গীয় অধিকারের উপর, দাসত্বের উপর, কখনো বা পিতৃতন্ত্রের উপর আস্থা রেখেছে তো কখনো করেছে এগুলোর বিরোধিতা, কখনো নারীমুক্তির পক্ষে থেকেছে ত কখনো দাঁড়িয়েছে এর বিরুদ্ধে। কখনো জন্মনিয়ন্ত্রণ, ইচ্ছামৃত্যু, গর্ভপাতের অধিকারকে সমর্থন দিয়েছে তো কখনো দেখিয়েছে বৈরিতা, কখনো যৌন এবং লৈংগিক সাম্যের প্রতি আস্থাশীল থেকেছে ত কখনো পোষণ করেছে অনাস্থা।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় সত্যিকারের ধর্মানুরাগীরা খুব কমই ব্যক্তিস্বাধীনতা কিংবা স্বাধীকারের প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। তারা মানবতাকে পায়ে দলে বরং ঈশ্বরের বানীকেই শিরোধার্য করেছে, যুক্তি ত্যাগ করে বরণ করেছে বিশ্বাসকে, সংশয়ের পথ ছেড়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছে অন্ধত্বের পদতলে। বহু সময়ই মানবীয় বুদ্ধি ও শক্তির উপর আস্থা না রেখে মত্ত থেকেছে অদৃশ্য ঈশ্বরের কাছে অর্থহীন স্তব-স্তুতি আর নিস্ফল প্রার্থনায়। কিন্তু সেগুলোতে কাজ কিছু হয়েছে?

'কাতর সে আহ্বান লুটি গ্রহে গ্রহে
ফিরিয়া কি আসে নাই, ধরায় আগ্রহে?'

সংশয়ীরা তাই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন 'কোন আরাধ্য দেবতা নয়, মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য-বিধাতা'। সনাতন ধর্মগুলো শুধু অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপরই শুধু আগ্রাসণ চালায়নি, সেই সাথে লড়াই বাধিয়ে রেখেছে নিজ ধর্মেরই বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে (ক্যাথলিক বনাম প্রোটেস্ট্যান্ট, শিয়া বনাম সুন্নী ইত্যাদি)। ধর্ম নাকি পৃথিবীতে এসেছে কল্যাণের জন্য, কিন্তু মারামারি, হত্যা, রক্তপাত, নিষ্ঠুরতা আর অব্যক্ত বিভীষিকা দিয়ে পবিত্র মতবাদগুলোকে জায়েজ না করলে তার যেন শান্তি হয় না। একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী ব্যক্তি সবসময়ই মানব উন্নয়নের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বাধ সেধেছে দাসত্ব বিমোচনে, নারী মুক্তিতে, বৃহন্নলা এবং সমকামীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কিংবা গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার রক্ষায়।

আজকের যুগের কিছু উদার ধর্মবাদীরা মৌলবাদকে পরিত্যাগ করেছে মানছি, কিন্তু তার পেছনে ক্রমিক অবদান রয়েছে আধুনিক গণতন্ত্র এবং মানবিক গুণাবলীর, যা তাদের আগ্রাসণকে দমিয়ে কিছুটা হলেও পরমতসহিষ্ণু করে তুলেছে। তারপরও পুরোপুরি মানুষ করতে পারেনি। কারণ ধর্মবাদীরা শেষ পর্যন্ত মোক্ষ খুঁজে পায় পার্থিব সমাজ ছেড়ে ওই ইসলাম, হিন্দু, জুডাইজম কিংবা খ্রিষ্টান ধর্মের কানাগোলিতেই।

চতুর্থত, আমাদের বলতে বাধ্য করা হয় যে, ঈশ্বরে যারা বিশ্বাস করেন তারা কি দাবী অনুযায়ী (আত্মার) অমরত্ব এবং নির্বান লাভ করবেন?

প্রথম আপত্তিটি হল, এই অমরত্ব বা নির্বানপ্রাপ্তির ব্যাপারটা পুরোপুরি গোষ্ঠিকেন্দ্রিক। হিব্রু বাইবেল অমরত্ব বা নির্বানের ব্যাপারে গুটিকয় নির্বাচিত ব্যক্তিকেই শুধু প্রতিশ্রুতি দেয়। নিউ টেস্টামেন্ট শুধু তাদেরই পুরস্কৃত করে যাদের যীশু খ্রিষ্টের উপর আস্থা আছে। কোরানের দৃষ্টিতে বেহেস্ত নসিব হয় শুধু তাদেরই যারা আল্লাহ এবং তাঁর প্রেরিত নবী মুহম্মদের উপর বিশ্বাস করে।

সাধারণভাবে এই প্রতিশ্রুতিগুলো সার্বজনীন নয়, বরং ধর্মযাজক, পুরুত আর মোল্লাদের দ্বারা ব্যাখ্যাকৃত বিশেষ পথে চললেই মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটবে বলে জোর গলায় প্রচার চালান হয়। ধর্মীয় আইনকে বৈধতা দিতে ধর্মযুদ্ধের নামে কত যে রক্তপাত ঘটেছে তার ত ইয়ত্বা নেই। মারামারি হয়েছে প্রোটেস্টেন্টদের মধ্যে, রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে এবং প্রাচ্যের বিশ্বাসগুলোর মধ্যেও। রক্তপাত ঘটেছে মুহম্মদ এবং কোরানের আইন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে, কিংবা ওল্ড টেস্টামেন্টকে উর্ধ্বে তুলতে গিয়ে।

দ্বিতীয় আপত্তিটি হল, আত্মার অমরত্বের কথা বলা হচ্ছে বটে, কিন্তু আত্মার অস্তিত্বটাই তো বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত নয়। তার চেয়েও অসার হচ্ছে মৃত্যুর পর সেই আত্মা দেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে আলাদা সত্ত্বা হিসেবে বিচরণ করার ব্যাপারটি। বিজ্ঞান আমাদের বলছে 'মন' কিংবা 'সজ্ঞা' ব্যাপারটি মস্তিস্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের কাজকর্মের সম্মিলিত অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। মৃত্যুর সাথে সাথে দেহের মৃত্যু ঘটে, বিনাশ ঘটে ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্বের। কাজেই, কোন লোকের আত্মা চিরদিন কিংবা স্বর্গে গিয়ে বেঁচে থাকবে - এগুলো কোন বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে সমর্থিত নয়, শুধু কতকগুলো অন্ধ আবেগি বিশ্বাসই সার।

একইভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, বিশ্বাসীরা এখন পর্যন্ত আমাদের আগে বিগত হওয়া কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কারো আত্মাকে মর্তে ডেকে এনে এদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে দিতে পারেন নি। তথাকথিত আত্মার সাথে যে কোন ধরনের যোগাযোগের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। জ্বিন-ভুত দেখার ব্যাপারগুলোও কোন নির্ভরযোগ্য প্রত্যক্ষদর্শী দ্বারা সমর্থিত নয়।

মরণ-প্রান্তিক অভিজ্ঞতাগুলো (নিয়ার ডেথ এক্সপেরিয়েন্স) কেবল রিপোর্ট করেছে সে সমস্ত ঘটনাগুলোরই যেগুলোতে কেউ মৃত্যু প্রক্রিয়াটির কয়েকটি ধাপের মধ্য দিয়ে গেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর মারা যায়নি। বলা বাহুল্য, আমরা এমন কোন কেস পাইনি যেখানে কোন ব্যক্তি চিকি□সাবিজ্ঞানের মাপকাঠি অনুযায়ী সত্য সত্যই মারা গেছেন, চলে গেছেন এ পার্থিব জগ□ ছেড়ে, তারপর আবার ফিরে এসেছেন আমাদের কাছে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে। সে হিসেবে মরণ-প্রান্তিক অভিজ্ঞতাগুলোকে ব্যক্তি বিশেষের আত্মগত (subjective) কিছু অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে এগুলোকে প্রাকৃতিক, মনস্তাত্বিক এবং শরীরবৃত্তিয় কারণের সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা যায়।

পঞ্চমতঃ, আস্তিকরা বলে বেড়ান যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস করা ছাড়া কেউ ভাল হতে পারে না।

ঈশ্বর এবং প্রত্যাদেশে সংশয়ী হওয়া মানে নেতিবাচক বা ধ্বংসাত্মক কিছু নয়, নয় মুল্যবোধের অবক্ষয়। হাজারো উদাহরণ হাজির করে অসংখ্যবারই দেখানো হয়েছে যে, সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া এবং স□ভাবে জীবন যাপন করা সম্ভব কোন ধর্ম না মেনেই। একজন ব্যক্তি নৈতিকগুণাবলীর চর্চা করতে পারে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য পোষণ করা ছাড়াই। কাজেই কোন অপার্থিব সত্তায় বিশ্বাস ছাড়াই কেউ স□, পরপোকারি, সহানুভূতিশীল কিংবা মহ□ হওয়া কোন 'সোনার পাথর বাটি' নয়। পারিপার্শ্বিক জগতের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকার পাশাপাশি নিজস্ব উন্নয়নের জন্য চিন্তা করাও এক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক। ইহজাগতিকতা কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ গুণাবলির চর্চা সে হিসেবে যুক্তি এবং সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হতে হবে, দেখতে হবে যেন নৈতিকতার বিকাশ সাধারণ মানুষদের একটি সাধারণসূত্রে গ্রন্থিত করে। আমাদের নীতি এবং মুল্যবোধ আমাদের পার্থিব অভিজ্ঞতার কষ্ঠিপাথরে ঝালিয়ে নিতে হবে বারে বারে। মানবতাবাদী হিসেবে

পরিচিত সংশয়বাদীরা সব সময়ই ভালভাবে এ পার্থিব জীবন উপভোগ করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। তারা জীবনকে দেখে নান্দনিক সৃষ্টিশীলতার এক অনুপম ক্ষেত্র হিসেবে, অন্তহীনভাবে খোঁজ করে যায় সুখ এবং সমৃদ্ধির, আনন্দ উচ্ছ্বাসে ভরিয়ে তুলে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে। তারা জীবনের শোক দুঃখ কষ্টকে স্বাভাবিক ব্যাপার মেনে নিয়ে প্রশান্ত চিত্তে বরণের আহ্বান জানায়, দাবী করে সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলার। জীবন অনিন্দ্যসুন্দর করে তুলতে আমাদের নিজেদেরকেই প্রচেষ্টা চালাতে হবে, কোন বহিস্তঃ সত্তার কাছে স্বীয় বিবেক বিকিয়ে না দিয়ে।

যদিও নীতি এবং মূল্যবোধের ব্যাপারগুলো অনেকাংশেই হয়ত সামাজিক চাহিদার নিরিখে আপেক্ষিক হিসেবে গন্য হবে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সেগুলো একেবারেই আত্মগত। বরং অনেকক্ষেত্রেই তা বস্তুগত (objective),এবং ক্রমিক সংঘর্ষ এবং সমালোচনার নিরিখে পরিবর্তনশীল। সংশয়বাদ এবং মানবতাবাদকে সংযুক্ত করে এ এক নতুন যুগের সূচনা যা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রকৃতিকে প্রাকৃতিক ভাবে ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। কাজেই ধর্মের ব্যাপারে সংশয়ী ব্যক্তি মানবিকতা বোধে উদ্বেলিত হয়েই নৈতিকতার চর্চা করেন এবং জীবন সাজাতে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেন। সে রকম একজন ব্যক্তি কেবল নিজের কথাই ভাবেন না বরং অন্যদের চাহিদাকেও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন।

এ প্রবন্ধের সারমর্ম করলে বলতে হয়, একজন মুক্ত অন্বেষক ঈশ্বরে বিশ্বাস করার মত যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ পাননি বলেই তিনি সংশয়ী। তার সংশয় রয়েছে ব্যক্তি-ঈশ্বরের অস্তিত্বে, সংশয় রয়েছে প্রত্যাদেশে, সংশয় রয়েছে নৈতিকতার চর্চাকে ঢালাওভাবে ঐশ্বরিক মোড়কে পুরতে, সংশয় রয়েছে ঈশ্বরের দেখানো পথে আত্মার নির্বানে, কিংবা ভালমানুষ হতে গেলে ঈশ্বরে বিশ্বাসকে বাধ্যতামূলক হিসেবে দেখতে। অপরদিকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ভিত্তিক সংশয়বাদ মহাবিশ্বকে প্রাকৃতিকভাবেই ব্যাখ্যা করার এক উপযোগী ক্ষেত্র তৈরি করে। শুধু তাই নয়, নৈতিকতার চর্চায় এটি ইহজাগতিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ উপাদান যোগ করে। যখন এধরনের মুক্তান্বেষককে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কিনা জানতে চেয়ে, তিনি উত্তর দেন- 'না, আমি করি না, আমি এ ব্যাপারে সংশয়ী', আর সে সাথে এও বলে দেন, 'মানুষের জন্য ভাল কিছু করায় আমি নিবেদিত'।

পল কার্জ, আন্তর্জাতিক অংগনে সমাদৃত বিরাশি বছর বয়স্ক সেক্যুলার হিউম্যানিস্ট দার্শ নিক ও লেখক; স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্ক, বাফেলো-র দর্শনের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং ফ্রি ইঙ্কয়ারি (Free Inquiry) ম্যাগাজিনের প্রধান সম্পাদক। তাঁর প্রতিষ্ঠিত অনেক গুলো বিজ্ঞান ও মানবতাবাদী প্রতিষ্ঠানের একটি হচ্ছে সেন্টার ফর ইঙ্কয়ারি ট্র্যান্সন্যাশনাল। ওয়েবসাইটঃ www.secularhumanism.org

জাহেদ আহমদ, বায়োটেকনোলজিতে মাস্টার্স। মুক্তমনা হিউম্যানিস্ট ফোরামের কো-মডারেটর এবং সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য। ই-মেইলঃ worldcitizen73@yahoo.com

ড. অভিজিৎ রায়, আমেরিকায় বসবাসরত গবেষক এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' ও 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। সাম্প্রতিক সম্পাদিত গ্রন্থ - 'স্বতন্ত্র ভাবনা'। ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com

স্বতন্ত্র বলয়

স্টিফেন জে গুল্ড

অনুবাদক: খান মুহাম্মদ (শিক্ষানবিস)

সামঞ্জস্যহীন স্থানগুলো কখনও কখনও ব্যতিক্রমী সব গল্পের ইন্ধন যোগায়। ১৯৮৪ সালের প্রথম দিকে আমি ভ্যাটিকানে কয়েক রাত কাটিয়েছিলাম। আমাকে থাকতে দেয়া হয়েছিল এমন এক হোটেলে যা মূলত পর্যটনশীল ধর্মপ্রচারকদের জন্য নির্মিত। সেখানে প্রতিটি বাথরুমে ইচ্ছাকৃতভাবে বিডেট (বিশেষ ধরণের জলশৌচের পাত্র) এর ব্যবস্থা করা ছিল। প্রাতঃরাশে প্রতিদিনই দেয়া হত আলুবোখারার জ্যাম। প্রতিদিন এই এক জ্যাম খেতে খেতে বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। বুঝতেই পারছিলাম না, প্রাতঃরাশের ঝুড়িতে এই এক ধরণের আলুবোখারা ছাড়া অন্য কিছু দিলে কি হয়, যেমন একটু স্ট্রবেরিও তো দিতে পারে। এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে তুলনামূলক সংস্কৃতির অসংখ্য বিষয় থেকে এমন একটির সাথে আমার সম্যক পরিচয় ঘটে গেলো যা জীবনকে অনেক আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। আমাদের বিজ্ঞানী গ্রুপটা রোমে গিয়েছিলো "পন্টিফিশিয়াল একাডেমি অফ সাইন্সেস" কর্তৃক স্পন্সরকৃত একটি সম্মেলনে যোগ দিতে। সম্মেলনের বিষয় ছিল "নিউক্লিয়ার উইন্টার"। হোটেলে আমাদের সাথে ছিল ফরাসি এবং ইতালীয় ধর্মপ্রচারকদের একটা দল যাদের সবাই আবার পেশাদার বিজ্ঞানী।

দুপুরের খাবারের সময় ধর্মপ্রচারকেরা আমাকে তাদের টেবিলে ডেকে নিয়ে যায় এমন একটি সমস্যা সম্বন্ধে বলার জন্য যা তাদেরকে বিশেষ ঝামেলায় ফেলে দিচ্ছে। তারা জানতে চাচ্ছিলেন "বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব" বিষয়ে আমেরিকায় কি ধরণের কথাবার্তা চলছে? একজন জিজ্ঞেস করলেন: "বিবর্তন কি আসলেই আমাদের জন্য ঝামেলার কারণ? যদি হয়েই থাকে তবে সেই ঝামেলাটা কি রকম? আমি সবসময় শিক্ষা দিয়ে এসেছি যে, ক্যাথলিক বিশ্বাস এবং বিবর্তনের মধ্যে কোন নীতিগত বিরোধের অস্তিত্ব নেই। আর বিবর্তনের প্রমাণগুলো সবই খুব সন্তোষজনক এবং অভিভূত করে দেয়ার মত। আমি কি কিছু ভুল বললাম?"

এরপর প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে ফরাসি, ইতালীয় আর ইংরেজির পাঁচমিশালীতে বেশ প্রাঞ্জল কথোপকথন চললো। আমার সাধারণ উত্তরটি সব ধর্মপ্রচারকদেকেই পুনরায় আশ্বস্ত করলো। আমার উত্তরটি হল: বিবর্তন কোন বুদ্ধিবৃত্তিক ঝামেলার জন্ম দেয়নি; কোন নতুন তর্কও সৃষ্টি করেনি। আমেরিকার সমাজ-সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাদের নিজেদের মত করেই সৃষ্টিতত্ত্ব বেড়ে উঠেছে। সেখানে একসময়ের সব দলছুটেরা মিলে প্রোটেস্ট্যান্ট মৌলবাদের এমন একটি আন্দোলন গড়ে তুলেছে যাতে বিশ্বাস করা হয়, বাইবেলের প্রতিটি শব্দ আক্ষরিক অর্থেও নির্ভুল। তাদের এই দাবীর সুস্পষ্ট কোন অর্থ আমার জানা নেই। কথা শেষে আমরা সবাই আশ্বস্ত হলাম যে,

বিবর্তন সম্পূর্ণ সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে এর সহাবস্থানও নিশ্চিত হয়েছে। সবাই আশ্বস্ত হলেও আমার বিস্ময়ের ঘোর কেটে যাচ্ছিলো এই ভেবে যে, ইহুদি অজ্ঞেয়বাদী হিসেবে ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারকদেরকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে কত ব্যতিক্রমী ভূমিকাই না পালন করলাম।

একই ধরণের আরেকটি গল্প বলি: আমাকে হরহামেশাই একটি প্রশ্ন করা হয়, হার্ভার্ডের ছাত্রদের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়টি কখনও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠেছে কি-না। উত্তরে আমি বলি, সুদীর্ঘ ৩০ বছরের শিক্ষকতা জীবনে কেবল একবারই এ ধরণের ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এক অতি মনোযোগী ও নিয়মনিষ্ঠ নতুন ছাত্র এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "আমি একজন নিবেদিতপ্রাণ খ্রিস্টান এবং বিবর্তনবাদ নিয়েও আমার কোন সন্দেহ নেই। কারণ বিবর্তন খুব চমৎকার একটি বিষয় যার সপক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু আমার ইভানজেলিক্যালে ধর্মান্তরিত রুমমেট বলে, আমি একইসাথে বিবর্তনবাদী এবং খ্রিস্টান হতে পারি না। তাহলে এবার বলুন, কারও পক্ষে কি ঈশ্বর এবং বির্তনবাদ উভয়টিতেই একসাথে বিশ্বাস রাখা সম্ভব?" সে সময়ও আমি নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক দায়িত্ব পালন করেছিলাম, আমি তাকে পুনরায় আশ্বস্ত করেছিলাম যে, বিবর্তন সম্পূর্ণ সত্যি এবং খ্রিস্টান ধর্মের সাথে এর সহাবস্থান সম্ভব। আমি এই অবস্থানে খুব দৃঢ়, যদিও জানি একজন ইহুদি অজ্ঞেয়বাদীর পক্ষে এটা বেশ বেমানান।

এই গল্প দুটিতেই একটি মুখ্য বিষয় উঠে এসেছে। বিষয়টা হল বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব। ধর্মে বিশ্বাসীরা নিজেরাই এই বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব নামটি দিয়েছে। সাধারণ যুক্তিবাদী বা বিজ্ঞানী সমাজে এটি কখনই স্বীকৃতি পায় না, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশাল প্রভাব বিস্তার করে। এই সৃষ্টিতত্ত্বের ভাষ্য হচ্ছে: বাইবেলের প্রতিটি শব্দ সত্য, সমগ্র জীবকূলকে পার্থিব ৬ দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে, পৃথিবীর জন্ম মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে এবং সর্বোপরী বিবর্তনবাদ মিথ্যা। গল্পগুলো পড়ে অনেকেই হয়তো বুঝতে পেরেছেন- সৃষ্টিতত্ত্ব বিজ্ঞানকে ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয় না, কারণ এ ধরণের কোন যুদ্ধের অস্তিত্বই নেই। সৃষ্টিতত্ত্ব জীববিজ্ঞানের প্রকৃতি বা জীবনের ইতিহাস বিষয়ে কোন সমাধানহীন বুদ্ধিবৃত্তিক ইস্যুর জন্ম দেয় না। সৃষ্টিতত্ত্ব খুবই সংকীর্ণ ও স্থানীয় একটি আন্দোলন। পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই এটি শক্তিশালী এবং তার মধ্যেও কেবল প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের অনুসারী কিছু সেক্টরেই এর প্রভাব বেশী। এই প্রোটেস্ট্যান্টরা মনে করে, বাইবেল যেভাবে আছে সেভাবেই পড়তে হবে, এর আক্ষরিক অর্থই ধরতে হবে।

আমি এখানে বলতে চাই, কারও ইচ্ছা হলে গোঁড়া প্রোটেস্ট্যান্ট কোন ধর্মপ্রচারক রেখে বিজ্ঞানের পরিবর্তে সৃষ্টিতত্ত্বের মাধ্যমে জীববিজ্ঞান শিক্ষা করতে পারে। গোঁড়া ইহুদি হলে কোন মৌলবাদী রাব্বি রেখে তার নিজস্ব ইয়েশিভায় বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব চর্চা চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু বাইবেল সাহিত্যের ভিত্তিতে নির্মিত এ ধরণের সৃষ্টিতত্ত্ব কিন্তু ক্যাথলিক বা ইহুদিদের কাছে অর্থহীন। কারণ মূলধারার ইহুদি বা ক্যাথলিক ধর্মে বাইবেলের আক্ষরিক অর্থ করা হয় না। তারা মনে করে, বাইবেলের সব কথাই রূপক এবং উপমানির্ভর। যেকোন উঁচুমানের সাহিত্যেই কিন্তু উপমা এবং রূপক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ক্যাথলিক ও ইহুদিরা মনে করে বাইবেলের

কথাগুলোকে সঠিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে, আক্ষরিকভাবে নয়। দেখা যাচ্ছে, কেবল প্রোটেস্ট্যান্টরাই আক্ষরিক অর্থ করে। তাও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে সবাই না, গুটিকয়েক মৌলবাদী শ্রেণী।

গল্প এবং ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমি নিজের যে অবস্থান তুলে ধরলাম, পশ্চিমা বিজ্ঞান এবং বড় সবগুলো পশ্চিমা ধর্মের অবস্থানই এখন এরকম। প্রাচ্যের ধর্ম সম্বন্ধে খুব বেশী জানি না বিধায় কিছু বলছি না। তবে আমার মনে হয়, সেখানেও এটি গুরুত্ব পাবে। বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সংঘাত তখনই হ্রাস পাবে যখন হ্রাস পাবে এদের ভিন্ন ধরণের ক্ষেত্রদ্বয়ের মধ্যে অধিক্রমণ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্র হবে মহাবিশ্বের গঠন ও বিবর্তনের পরীক্ষণনির্ভর ব্যাখ্যা আর ধর্মের ক্ষেত্র হবে মানুষের প্রকৃত নৈতিক মূল্যবোধ এবং জীবনের আধ্যাত্মিক অর্থের সন্ধান। এই ক্ষেত্র দুটি একেবারে পৃথক করে ফেললেই আর সংঘাত থাকে না। মানুষের জীবনে সামগ্রিক প্রজ্ঞা অর্জন করতে হলে এই দুটি ক্ষেত্রেই অত্যধিক মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। কারণ এক মহান পুস্তক আমাদের জানিয়েছে, সত্যই আমাদেরকে মুক্তি দিতে পারে এবং ন্যায়-নীতি, দয়া ও বিনয় শিখলেই আমরা প্রতিবেশের সবার সাথে মিলে শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারি।

এই আদর্শ অবস্থানের প্রেক্ষিতে পোপ জন পল ২ এর বলা একটি কথা শুনে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। ১৯৯৬ সালের ২২শে অক্টোবর পন্টিফিশিয়াল অ্যাকাডেমি অফ সাইন্সেসকে (যে একাডেমি আমার ভ্যাটিকান সফরের ব্যায়ভার বহন করেছিল) উদ্দেশ্য করে তিনি কথাটি বলেছিলেন। তার কথায়: "সত্য কখনও সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না।" পোপ বিবর্তনের প্রমাণগুলোকে সমর্থন করেছিলেন এবং একই সাথে বিবর্তনবাদী তত্ত্বের সাথে ক্যাথলিকদের সহাবস্থানকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। বিশ্বের সব বড় বড় সংবাদপত্রের হেডলাইন হিসেবে পোপের এই কথা ছাপা হয়েছিল। যেমন ২৫শে অক্টোবরে নিউ ইয়র্ক টাইম্সের হেডলাইন ছিল:

'Pope Bolsters Church's Support for Scientific View of Evolution.'

আমি অবশ্যই "স্বল্প খবরের দিন" বিষয়টা মানি। হয়তোবা হেডলাইনে দেয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কোন খবর ছিল না সেদিন। পোপ এই কথা না বললে ঐদিন টাইম্স "রস ডোলের উপদেশ গ্রহণে রস পেরোর অস্বীকৃতি এবং তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পরিত্যাগ" ছাড়া অন্য কোন খবর হেডলাইন করতে পারতো না। তারপরও কেবল পোপের এই কথাটার প্রতি সকল স্তরের সব মানুষের এতো আকর্ষণ দেখে বিস্মিত না হয়ে পারিনি। ক্যাথলিক চার্চ কখনই বিবর্তনের বিরোধিতা করেনি এবং বিরোধিতা করার মত কারণও উপস্থিত হয়নি। পোপই বা কেন এমন একটা কথা বললেন? আর এই কথা শুনে বিশ্বের সব বড় বড় পত্রিকা এটাকেই কেন হেডলাইন করে ফেললো?

প্রথমে আমি এর একটি কারণই ভাবতে পারছিলাম, সব সংবাদিকরাই হয়তো বিজ্ঞান ও ধর্মের সম্পর্কটা ভুল বুঝেছে এবং এ কারণেই পোপের একটি সাধারণ কথাকে ওয়ারেন্টিবিহীন মন্তব্যের মত ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু

শীঘ্রই আমার এ ভুল ধারণা ভেঙে যায়। সম্ভবত পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই মনে করে, বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে যুদ্ধ চলছে এবং বিবর্তন নিশ্চয়ই খ্রিস্টান ধর্মের মর্মমূলে আঘাত করে। সে হিসেবে চার্চ যদি কখনও বিবর্তনের বর্তমান অবস্থাকে মেনে নেয় তাহলে সেটাই তো প্রধান খবর হওয়ার কথা। আধুনিক কালে এমনটি ঘটলেও অতীতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময়েই এটা ঘটেনি। সে সময় ঘটলে হয়তো খবরটা আরও ছড়িয়ে পড়তো। যেমন ধরুন, ১৬৪০ সালে পোপ আর্বান ৩ তার সবচেয়ে বিখ্যাত ঘরবন্দিকে মুক্তি দিয়ে বলছেন, "মহামান্য গ্যালিলিও, আপনিই ঠিক। সূর্যই কেন্দ্রে আছে।" ভেবে দেখুন কেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠতো এই খবরটা।

পরে আমি আবিষ্কার করলাম, বিবর্তন বিষয়ে চার্চের সন্তোষের এই খবরটা সব পত্রিকায় হেডলাইন হয়ে যাবার কারণ নন-ক্যাথলিক ইংরেজিভাষী সাংবাদিকদের ভুল বোঝা নয়। ভ্যাটিকান নিজেই এই উক্তিটিকে প্রধান সংবাদ বিজ্ঞপ্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছিল। আর এই প্রধান বিজ্ঞপ্তিটি ইতালীয় সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। যেমন, রক্ষণশীল ইল জিওর্নাল পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল: "পোপ বললেন বানর থেকে আমাদের উৎপত্তি হতেও পারে"।

স্পষ্টতই আমি প্রথমে ভুল বুঝেছিলাম এবং পরে সত্য আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছিলাম। কিন্তু, পোপের উক্তিতে এর থেকেও বেশী কোন আবেদন ছিল, কি হতে পারে সেটি? ক্যাথলিক চার্চ সম্পর্কে আমি যা বলেছি তা আরেকবার চিন্তা করে দেখলেই এই আবেদনটা পরিষ্কার হয়ে যায়। ক্যাথলিক চার্চ সব সময়ই বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে মূল্যায়ন করে, বিজ্ঞানকে ধর্মের জন্য হুমকি মনে করে না। ক্যাথলিক বিশ্বাসীদের কাছে বিজ্ঞানের গুরুত্ব আছে, এমনকি ক্যাথলিক নীতিতেও বিবর্তনের বৈধতাকে গ্রহণ করে নেয়া হয়েছে। তারা বিবর্তনকে বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা এবং এর সাথে ক্যাথলিক বিশ্বাসের সহাবস্থানকে সমর্থন করে।

টিপ ও'নেইলের নির্বাচনী এলাকার সাবেক অধিবাসী হিসেবে আমি জানি যে, "সব রাজনীতিই স্থানীয়"[*]। সুতরাং ভ্যাটিকানেরও নিশ্চয়ই বিবর্তন এবং বিজ্ঞান বিষয়ে একটি অভ্যন্তরীন সিদ্ধান্ত আছে যা আমার কাছে অনেকটাই অস্বচ্ছ। একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তিতে বিবর্তনের পক্ষ নেয়ায় আরও অস্বচ্ছ হয়ে উঠেছে সেটা। আসলে আমি জানতাম, গুরুত্বপূর্ণ একটা অন্তমিল খুঁজে পাচ্ছি না। এ কারণে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। ঠিক তখনই বুদ্ধিবৃত্তির একটা মুখ্য নীতি মনে পড়ে গেল: বিভ্রান্তিতে পড়লে একেবারে প্রাথমিক নথিপত্রগুলো পড়তে ভাল লাগে, অর্থাৎ এই বিভ্রান্তি বিষয়ক পাঠটা অশেষ কাজে দেয়। আমার মার্কিন অভিজ্ঞতার একটা বড় অংশ থেকে এই সরল ও মুখ্য নীতিটা উধাও হয়ে গিয়েছিল।

[*] Tip O'Neil was the Speaker of the US House of Representatives during the late eighties who famously said, "All politics is local."

মুখ্য নথিপত্র বলতে আমি পোপ পায়াস ১২ (যাকে আমি খুব একটা পছন্দ করতাম না) এর একটা উক্তিকে বুঝাচ্ছি। ১৯৫০ সালে করা এই উক্তির বিষয়টি হিউম্যানি জেনেরিস নামে পরিচিত। এই উক্তির ধাক্কাটা পুরো বিপরীতমুখী, পায়াস ১২ বলেছিলেন: মানব দেহের বিবর্তন বিষয়ে বিজ্ঞান যা কিছু বের করছে তা ক্যাথলিকরা ততক্ষণই বিশ্বাস করতে পারবে যতক্ষণ তারা এটাও বিশ্বাস করবে যে, এই বিবর্তন ধারার কোন এক পর্যায়ে ঈশ্বর সৃষ্ট জীবের মধ্যে আত্মা ফুঁকে দিয়েছেন। আমি জানতাম, এই উক্তি কোন সমস্যাই না। কারণ, আত্মা বিষয়ে আমি যা-ই বিশ্বাস করি না কেন বিজ্ঞানের পক্ষে তার এক বর্ণও ব্যাখ্যা করা সম্ভব না। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী এবং ভিন্ন এই ধর্মীয় ইস্যুতে ধর্মতত্ত্বের অবস্থান বিজ্ঞানের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে না। অন্য কথায়, পোপ পায়াস ১২ ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের সম্পর্কহীন অবস্থানকে সম্মান দেখিয়েছেন। এ কারণেই আমি হিউম্যানি জেনেরিসের পক্ষে যদিও জেনেরিসের পুরো লেখাটা আমি কখনই পড়ে দেখিনি। এই যুগে অবশ্য জেনেরিসের বিষয়টা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনে খুব একটা উপযোগী না।

এ সম্পর্কিত সব ধরণের লেখা খুঁজে পাই ইন্টারনেটে। ইন্টারনেটে পোপের উপস্থিতির কোন অভাব নাই। তবে আমার ইন্টারনেট দক্ষতার যথেষ্ট অভাব আছে। তাই কম্পিউটার বিষয়ে জানলেওয়ালা এক সহযোগীর সাহায্য নিলাম নেট থেকে তথ্যগুলো বের করে আনার জন্য। নেট থেকে নামিয়ে পোপ পায়াসের হিউম্যানি জেনেরিস বিষয়ক সবকিছু পড়লাম, সেই সাথে ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে পোপ জন পলের ঘোষণাটাও পড়লাম। এত কিছু পড়ার পর বুঝতে পারলাম, পোপ আর্বানের এই উক্তিটা এত নতুন ও আকর্ষণীয় মনে হয়েছে কেন। সেই সাথে বুঝতে পারলাম, বিজ্ঞান এবং ধর্মের জগতে বসবাসকারী আমার সব বিবর্তনবাদী বন্ধুদেরকে এই উক্তিটা কত আশা দেখাতে পারে।

হিউম্যানি জেনেরিসের লেখাটার মূল বিষয় ছিল চার্চের ম্যাজিস্টারিয়া তথা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষাক্ষেত্র। ম্যাজিস্টারিয়া শব্দটি কিন্তু ম্যাজেস্টি (ক্ষমতা) থেকে আসেনি। ম্যাজিস্টার লাতিন শব্দ যার অর্থ শিক্ষক। তাই ম্যাজিস্টারিয়ার অর্থ শিক্ষা। আমি মনে করি, এই প্রবন্ধের কেন্দ্রীয় ধারণাটি তুলে ধরার জন্য ম্যাজিস্টারিয়া শব্দটি ব্যবহার করা যায়। বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে তথাকথিত যুদ্ধের সমাধানকল্পেও এই শব্দের উপযোগিতা আছে। বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে কোন সংঘাত থাকার কথা না, কারণ এ দু'টির শিক্ষা কর্তৃপক্ষ (ম্যাজিস্টারিয়াম) বা শিক্ষাক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা এবং এই শিক্ষাক্ষেত্র দুটি একে অন্যকে অধিক্রমণ করে না। এই মৌলিক ধারণাটির নাম আমি দিতে চাই 'Nonoverlapping magisteria" (NOMA)' তথা 'স্বতন্ত্র বলয়'।

বিজ্ঞান যৌক্তিক মহাবিশ্ব নিয়ে পরীক্ষণমূলক কাজ করে: মহাবিশ্ব কি দিয়ে গঠিত (বাস্তবতা) এবং এটি কেন এরকম আচরণ করে (তত্ত্ব) তা দেখাই তার কাজ। অন্যদিকে ধর্ম নৈতিক মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার অর্থ নিয়ে কাজ করে। গতানুগতিক ভাষায় বলতে গেলে, আমরা প্রস্তর যুগ খুঁজে বের করি আর ধর্ম যুগের প্রস্তরকে নিজের মধ্যে ধরে রাখে; আমরা স্বর্গ কিভাবে কাজ করে তা নিয়ে গবেষণা করতে পারি আর ধর্ম নির্ধারণ করে কিভাবে স্বর্গে যাওয়া যায়।

ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যে সমঝোতাটা একেবারে স্বচ্ছ হয়ে যাবে যদি দুই অনধিক্রমণীয় বলয়ের মধ্যে একটি চূড়ান্ত নো ম্যান্স ল্যান্ড থাকে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এরা অধিক্রমণ তো করেই এমনকি একে অপরের বিরুদ্ধে লেগে ম্যাসাকার করে ফেলে। এ কারণে তাদের সীমান্ত বরাবর অবিশ্বাস্য জটিল সব উপায়ে গুঁতোগুতি চলতে থাকে। আমাদের অনেক প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তরের বিভিন্ন অংশ খুঁজে বের করার জন্য উভয়ের দারস্থ হতে হয়। আর কোন উত্তরটি কোন অংশ থেকে খুঁজব তা নির্ধারণ করাও বেশ জটিল এবং কঠিন। এক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের নাম করা যায় যেগুলো বিবর্তন এবং নৈতিকতা উভয় ক্ষেত্রের সাথেই সম্পর্কিত: বিবর্তন যেহেতু আমাদেরকে অতি উন্নত পর্যায়ের চেতন সম্পন্ন একমাত্র পার্থিব সৃষ্টি করে তুলেছে, সেহেতু অন্যান্য প্রজাতির সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্বগুলো কি? অন্যান্য জীবের সাথে আমাদের বংশানুক্রমিক বন্ধন মানব জীবনের কী অর্থকে নির্দেশ করে?

পায়াস ১২ এর হিউম্যানি জেনেরিস খুবই প্রথাগত একটি দলিল। আর এই দলিল উপস্থাপন করেছেন এমন এক রক্ষণশীল ব্যক্তি যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে উদ্ভূত বিভিন্ন "বাদ" এবং তার সাথে হতাশাবাদের চাপে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। এর সাথে তাকে "হলোকাস্ট" এর ভস্ম থেকে মানবতার শিষ্টাচারকে আবার জাগিয়ে তোলার জন্য সংগ্রামের বার্তা বহন করতে হয়েছিল। এ বিষয়ে পোপলিখিত পত্রের উপ-শিরোনাম ছিল "এমন কিছু মিথ্যা মতামত সম্পর্কে যেগুলো ক্যাথলিক মতাদর্শের ভিত্তিকে খাটো করে"। এই পত্র শুরু হয়েছিল আত্মরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে বলা কিছু কথা দিয়ে:

> ‘নৈতিক এবং ধর্মীয় বিষয়ে মানুষের মতানৈক্য এবং ভুলের কারণে সব যুগেই ভাল মানুষদেরকে কষ্ট পেতে হয়েছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশী কষ্ট পেতে হয়েছে চার্চের সত্যবাদী এবং ন্যায়নিষ্ঠ সন্তানদের। বিশেষতঃ আজকে যখন আমরা দেখি, খ্রিস্টান সংস্কৃতির নীতিগুলোকে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করা হচ্ছে।’

পায়াস চার্চের বহিঃস্থ শত্রুদেরকে আক্রমণ করে এখানে কিছু কথা বলেছেন। এই শত্রুদের মধ্যে আছে সর্বেশ্বরবাদ, অস্তিত্ববাদ, দ্বান্দ্বিকতামূলক বস্তুবাদ, ঐতিহাসিকতাবাদ এবং সবচেয়ে বড় শত্রু সাম্যবাদ। এরপর তিনি দুঃখের সাথে বলেছেন, চার্চের মধ্যে অবস্থানকারী কিছু বিজ্ঞ ব্যক্তি এক ভয়ানক আপেক্ষিকতাবাদের কবলে পড়েছেন- "এটি একটি ধর্মতাত্ত্বিক শান্তিবাদ এবং সমতাবাদ, যেখানে সকল দৃষ্টিভঙ্গিই সঠিক হয়ে উঠে"। তারা এর কবলে পরেছেন এই ভেবে যে, এর মাধ্যমে এমন ব্যক্তিদেরকে একীভূত করা যাবে যারা স্থির কোন বিশ্বাস গ্রহণ করেনি, যারা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে কিন্তু নির্দিষ্টভাবে ক্যাথলিক শিক্ষাক্ষেত্রকে মেনে নিতে চায় না।

কি সব অনিষ্টকর অভিনবত্বের জন্ম হল যারা অবতীর্ণ এবং প্রতিষ্ঠিত এক আইনকে এভাবে থমকে দিতে চায়! এ কোন পথে চলেছে পৃথিবী? একজন রক্ষণশীলের রক্ষণশীল কথাবর্তা হিসেবেই শোকাহত পায়াস বলে গেছেন:

> ‘এ ধরণের অভিনবত্বগুলো ইতোমধ্যেই ধর্মতত্ত্বের সকল শাখায় তাদের মারণ ফলাফলের প্রদর্শনী ঘটিয়েছে। অনেকে প্রশ্ন তোলে, ফেরেশতাদের ব্যক্তি সত্তা আছে কি-না এবং পদার্থ এবং আত্মার মধ্যে আসলেই কোন পার্থক্য আছে কি-না। অনেকে এমনটি পর্যন্ত বলে, আন্তঃপ্রমাণীকরণের (Transubstantiation) নীতিকে এমনভাবে সংশোধন করা উচিত যাতে পবিত্র ইউক্যারিস্টে খ্রিস্টের বাস্তব অস্তিত্বকে এক ধরণের প্রতিকী বিষয়ে নামিয়ে আনা যায়। বস্তু বিষয়ক কিছু সুপ্রাচীন দার্শনিক ধারণার উপর ভিত্তি করে এই আন্তঃপ্রমাণীকরণ নীতিমালার জন্ম হয়েছিল।’

পায়াস প্রথমে বিবর্তনের উল্লেখ করেছিলেন একটি অতিরঞ্জনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশের জন্য। এই অতিরঞ্জনের উদ্ভব ঘটেছিল কিছু অভিশপ্ত মতবাদের হিংসুক সমর্থকদের মাধ্যমে:

> ‘অনেকে ঠিকমতো কিছু না ভেবেই গোঁড়ার মত বলে যায়, বিবর্তনের মাধ্যমে নাকি সবকিছু উৎপত্তির ব্যাখ্যা দেয়া যায়। সাম্যবাদীরা এই মতবাদকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নেয় কারণ তারা জানতো, নির্দিষ্ট ঈশ্বরের ধারণা থেকে যখন সব মানুষ মুক্ত হয়ে যাবে, তখন তারা নিজেদের দ্বান্দ্বিকতামূলক বস্তুবাদ আরও প্রচার করতে পারবে এবং এর বিরোধীতাকে দমন করতে পারবে।’

বিবর্তন বিষয়ে পায়াসের চূড়ান্ত বক্তব্যটি এসেছে পত্রের একেবারে শেষ দিকে, ৩৫ থেকে ৩৭তম অনুচ্ছেদের মধ্যে। এখানে তিনি "নোমা" (NOMA) এর প্রমিত মডেলটি সর্বান্তকরণে মেনে নেন এবং স্বীকার করেন, বিবর্তন এমনই কঠিন এক ভূমিতে অবস্থান করছে যেখানে একে অপরের প্রবল বিরোধিতা করতে থাকে। "এখন সেই বিশেষ প্রশ্নগুলো সম্পর্কে আমাদেরই কথা বলতে হবে, যে প্রশ্নগুলো ইতিবাচক বিজ্ঞানের অংশ হলেও খ্রিস্টান বিশ্বাসের সত্যের সাথে কম-বেশী নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।" [মজার ব্যাপার হচ্ছে এই অনুচ্ছেদগুলোতে পায়াস বিবর্তনকে সরাসরি সম্বোধন করেননি, বরং "পলিজেনিজ্‌ম" নামের এক মতবাদকে অমূলক প্রমাণ করার জন্য সব বলেছেন। এই মতবাদে মানুষের পূর্বপুরুষ বিভিন্ন পিতা-মাতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে করা হয়। পায়াসের মতে এই মতবাদ কোনভাবেই মূল পাপের নীতির সাথে খাপ খায় না। "মূল পাপ বলতে আদম-হাওয়ার করা পাপকে বোঝায় যা বংশানুক্রমে সব মানুষের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে।" এক্ষেত্রে পায়াস হয়তো নোমার শর্ত

ভঙ্গ করেছেন। কিন্তু আমি এর বিচার করতে পারি না, কারণ আমি ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্বের খুটিনাটি জানি না এবং এ ধরণের কথাকে কোন প্রতীকি অর্থে গ্রহণ করতে হবে তাও জানি না। পায়াস যদি বলে থাকেন যে, মানুষের জন্ম আদি জীবগোষ্ঠী থেকে হয়েছে, এ ধরণের নীতি চর্চা করার কোন অধিকার আমাদের নেই কারণ তা একক আদিপুরুষ থেকে মানব জন্মের মতবাদের সাথে খাপ খায় না এবং তা মূল পাপ বিষয়ক নীতির বিরোধিতা করে, তাহলে আমি তাকে লাইনচ্যুত বলব। কারণ তিনি এর মাধ্যমে বিজ্ঞানের শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত একটি বিষয়ে ধর্মীয় শিক্ষাক্ষেত্রের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন।]

এর পরই পায়াস সেই চির পরিচিত কথাগুলো লিখেছেন যা ক্যাথলিকদেরকে একই সাথে বিবর্তন ও সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করার অনুমতি প্রদান করে। মানব দেহের বিবর্তন বিজ্ঞানের শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত একটি প্রামাণ্য বিষয় আর সৃষ্টিতত্ত্বের আত্মা বিষয়ক ধারণা ধর্মীয় শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত। এ প্রসঙ্গে পায়াসের কথাগুলো এরকম:

> মানববিজ্ঞান এবং পবিত্র ধর্মতত্ত্বের বর্তমান অবস্থানে দাড়িয়ে চার্চের শিক্ষক কর্তৃপক্ষ ততক্ষণ পর্যন্ত বিবর্তনের মাধ্যমে গবেষণা এবং আলোচনা করতে বাধা দেন না, যতক্ষণ এটা কেবলই মানুষের দেহের প্রাক-অস্তিত্বের কথা বলে। আগের কোন জীবিত বস্তু থেকে মানব দেহের উদ্ভব ঘটতেই পারে। কিন্তু এই বিবর্তনে আস্থা রাখার পাশাপাশি ক্যাথলিক বিশ্বাসীদের অবশ্যই মানতে হবে, আত্মাগুলো স্রষ্টা তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্টি করেছিলেন।

এই অংশ পর্যন্ত আমি হিউম্যানি জেনেরিসে অবাক হওয়ার মত কিছু পাইনি এবং এর মাধ্যমে এমন কিছুও ঘটেনি যা পোপ জন পলের সাম্প্রতিক অভিনব মন্তব্যের ঘোর কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু বিস্তারিত পড়ার পর আমি বুঝতে পারলাম, পোপ পায়াস বিবর্তন সম্পর্কে আরও বেশী বলেছেন, যার অধিকাংশই কোন উক্তির মধ্যে আগে পাইনি। আর পায়াসের এই কথাগুলো পোপ পলের উক্তিকে আরও চমৎকার করে তুলেছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পায়াস জোড় করেই বলেছেন, বিবর্তন নীতিগত দিক থেকে খুব সঙ্গত, যদিও তত্ত্ব হিসেবে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি এবং এটা সম্পূর্ণ ভুলও হতে পারে। এগুলো জেনে সবার মনে বদ্ধমূল ধারণার জন্ম হয় যে, পায়াস মিথ্যা নির্ণয়ের জন্য গভীরভাবে অনুসন্ধান করছেন। শেষ উক্তিটির সাথে সাথে পায়াস আরও কিছু কথা বলেছেন যা আমাদেরকে সঠিকভাবে বিবর্তন অধ্যয়নের জন্য বলে:

> এই অধ্যয়ন এমনভাবে করতে হবে যেন বিবর্তনের পক্ষে এবং বিপক্ষের সকল মতামতের কারণগুলো সমান গুরুত্বের সাথে বিচার করা হয়। কিন্তু অনেকে রুক্ষভাবে আলোচনার এই উদার নীতির লঙ্ঘন করেন এবং পূর্বে অস্তিত্বশীল কোন সত্তা বা জীবন্ত বস্তু থেকে মানুষের

> উৎপত্তি ঘটেছে এই তত্ত্বকে অকাট্য সত্য বলে মনে করেন। তারা মনে করেন এখন পর্যন্ত মানুষ যা কিছু আকিষ্কার করেছে এবং এই আবিষ্কারের বিষয়গুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করে যে উত্তরগুলো পাওয়া গেছে তা সম্পূর্ণ অলঙ্ঘনীয়। তাদের ভাবটা এমন যেন, স্বর্গীয় বার্তার উৎস থেকে এ সম্বন্ধে কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ এই প্রশ্নে স্বর্গীয় বার্তাই সর্বপ্রধান সংশোধন ও সচেতনতার কথা বলে।

এক কথায় বলা যায়, পায়াস একটি শর্ত সাপেক্ষে নোমা গ্রহণ করে নিয়েছেন। শর্তটি হল, ক্যাথলিকরা ততক্ষণ পর্যন্তই কেবল মানব দেহের উৎপত্তির কারণ হিসেবে বিবর্তনকে গ্রহণ করতে পারে যতক্ষণ তারা বিশ্বাস করবে যে, এই বিবর্তনের কোন এক পর্যায়ে ঈশ্বর আত্মা ফুঁকে দিয়েছেন। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় স্বর্গীয় হাত আছে। কিন্তু পায়াস মাঝেমাঝেই বৈজ্ঞানিক ধারণা হিসেবে বিবর্তনের মর্যাদা বিষয়ে বিজ্ঞানীদেরকে পিতৃসুলভ উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: বিবর্তন এখনও সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি এবং এ নিয়ে গবেষণা করতে হলে তোমাদেরকে অতিমাত্রায় সতর্ক হতে হবে। কারণ এটি আমার শিক্ষাক্ষেত্রের ঠিক সীমান্তরেখায় দাড়িয়ে অনেকগুলো ঝামেলাপূর্ণ ইস্যুর সৃষ্টি করে। পায়াসের এই বক্তব্যকে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়: এক, অন্য শিক্ষাক্ষেত্রের কারও পক্ষ থেকে উদ্ভূত ভিত্তিহীন উপদ্রব; দুই, বাইরের একজন বুদ্ধিমান ও সচেতন ব্যক্তির বন্ধুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি। ইতিবাচক ও শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি হিসেবে দুই শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে আপোস করার তাগিদে আমি সানন্দে দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সব দেখতে রাজি আছি।

যে কোন দিক দিয়ে চিন্তা করলেই দেখা যায় পায়াসের করা এই দ্বিতীয় (বিবর্তন অপ্রমাণিত এবং বিপজ্জনক) মন্তব্যটি জন পলের করা সাম্প্রতিক মন্তব্যের অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্বকে খুব সুন্দরভাবে সংজ্ঞায়িত করে। ক্যাথলিকরা ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপে বিশ্বাস করলেই কেবল বিবর্তনকে গ্রহণ করে নিতে পারে, পায়াসের করা এই প্রথম মন্তব্যটি কিন্তু পলের সাম্প্রতিক মন্তব্যকে খুব একটা সংজ্ঞায়িত করতে পারে না।

জন পল তার কথা শুরু করেছেন ১৯৫০ সালে পায়াসের পত্রের কথা উল্লেখ করেই। তিনি প্রথমে সানন্দে নোমা নীতিকে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং বলেছেন, এখানে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য নতুন কিছুই নেই। আগে চার্চ যা বলত এখনও তাই বলছে:

> আমার পূর্বসুরী পায়াস ১২ তার হিউম্যানি জেনেরিসে (১৯৫০) ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছেন, বিবর্তন এবং মানুষ ও তার বৃত্তি সংক্রান্ত বিশ্বাসের নীতির মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

নোমার শক্তিকে সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য জন পল একটি বড় ধরণের সমস্যা এবং তার সাথে একটি দ্বিতীয় সমাধানের উল্লেখ করেন: বিজ্ঞান বলে মানুষের বিবর্তন অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে হয়েছে আর ক্যাথলিকদের বিশ্বাস হল, কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে ঈশ্বর স্বর্গীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আত্মা ফুঁকে দিয়েছেন; বিজ্ঞানের দাবী এবং ক্যাথলিকদের এই বিশ্বাসের মধ্যে আমরা কিভাবে সমন্বয় সাধন করবো:

> 'মানুষের কথা চিন্তা করলে আমরা একটি অস্তিত্বগত পার্থক্যের সন্ধান পাই, অনেকে একে অস্তিত্বগত লম্ফ নামেও আখ্যায়িত করতে পারেন। অর্থাৎ মানুষের অস্তিত্বে বড় রকমের উত্থান রয়েছে। এক্ষেত্রে একজন তো বলতে পারেন, এ ধরণের অস্তিত্বগত বিচ্ছিন্নতা কি মানুষের ভৌত অবিচ্ছিন্নতার বিরোধিতা করে না? বিবর্তনের মূল ধারণায় কিন্তু এই ভৌত অবিচ্ছিন্নতার কথাই বলা হয়। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে পদ্ধতি বহু বার ব্যবহার করা হয়েছে তার দ্বারা দুটো ভিন্নধর্মী মতামতকে এক করা সম্ভব হয়, যাদের এক হওয়াকে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয়। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষন বর্ননা এবং পরিমাপের মাধ্যমে জীবনের বিভিন্ন দিক স্পষ্ট করে ব্যাখা করে এবং সময়ের সাথে সাথে আরো নির্ভুল ভাবে একে জীবনের সাথে যুক্ত করে। আধ্যাত্মিক সাধনার বিশেষ মূহুর্তকে এভাবে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষন করা যায় না, তথাপি এটা একটা গবেষনামূলক স্তরের আবিস্কার -যা মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত অনেক নির্দিষ্ট মূল্যবান জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত করে'।

জন পলের বক্তব্যের অভিনবত্ব এবং সংবাদগত গুরুত্ব নিহিত আছে পায়াসের করা অতি বিরল দ্বিতীয় মন্তব্যের মধ্যে। পায়াস বলেছিলেন, বিবর্তনের ধারণা নীতির মাধ্যমে পাওয়া যায়, একে ধর্মের সাথে সমন্বিত করা যায়, কিন্তু বিবর্তনবাদও মিথ্যা হতে পারে কারণ এর পক্ষে দেয়া প্রমাণগুলোর কোনোটাই খুব বেশী জোড়ালো নয়। এ প্রসঙ্গে জন পল বলে দিয়েছেন, পায়াস যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তুপের সমীক্ষা করছিলেন সেই সময়ের পর প্রায় অর্ধ শতাব্দী পেরিয়ে গেছে, নতুন একটি সহস্রাব্দের উন্মেষ ঘটেছে। এই পর্যায়ে এসে এমন সব উপাত্ত পাওয়া গেছে এবং আগের তত্ত্বগুলোকে এমনভাবে নতুন করে তোলা হয়েছে যে বর্তমানে আর কেউই বিবর্তন বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। শুভাকাঙ্ক্ষা আছে এমন যে কাউকেই এখন বিবর্তন মেনে নিতে হয়। জন পলের কথাগুলো ছিল এরকম:

পায়াস ১২ তার বক্তব্যে আরও বলেছিলেন, এই মতবাদটিকে (বিবর্তন) নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করে নেয়া ঠিক হবে না, কারণ এর কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আজ, সেই পোপলিখিত পত্রের প্রকাশনার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর, এমন সব নতুন জ্ঞান অর্জিত হয়েছে যে বিবর্তনবাদের পক্ষে একাধিক প্রকল্প প্রস্তাব করা সম্ভব হয়েছে। এটি বিশেষভাবে ভাবার বিষয় যে, গবেষকদের কাছে দিন দিন এই তত্ত্বটি অধিক গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে। জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ কিছু আবিষ্কারের কারণেই এই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্ররোচণা বা পক্ষপাতিত্ব নয়, স্বাধীনভাবে করা বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলোই বিবর্তনবাদের গুরুত্বকে প্রকট করে তুলছে।

উপসংহারে পায়াস এটাই বলেছিলেন যে, বিবর্তন কেবল একটি রীতিসিদ্ধ প্রকল্প; আপাত পরীক্ষার মাধ্যমে একে সমর্থন যোগানো হয়েছে এবং ব্যাপক পরীক্ষার মাধ্যমে এটি মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে। এর প্রায় ৫০ বছর পরে জন পল আবার নোমা নীতির মাধ্যমে বিবর্তনবাদের রীতিসিদ্ধতার কথা বলেছেন। এটা কোন বিশেষ সংবাদ নয়, খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনি বলেছেন, বর্তমান উপাত্ত এবং তত্ত্বের মাধ্যমে বিবর্তনবাদ প্রমাণিত হয়েছে। একনিষ্ঠ খ্রিস্টানদেরকেও এখন বিবর্তনবাদ গ্রহণ করে নিতে হবে, সম্ভাব্য সত্য হিসেবে নয় বরং প্রমাণিত সত্য হিসেবে। এক কথায় বলা যায় ক্যাথলিকদের দাপ্তরিক দৃষ্টিভঙ্গি এক সময় ছিল, "এটা সত্য না, কিন্তু প্রয়োজন হলে আমরা তা গ্রহণ করে নিতে পারি"। কিন্তু জন পলের কথার পর সে দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে দাড়িয়েছে, "এটা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে; আমরা সব সময়ই প্রকৃতির সত্যতাকে বরণ করে নেই, এবং এর থেকে ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করি।" আমি নিজে বিজ্ঞানের শিক্ষাক্ষেত্রকে প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু এর পাশাপাশি আমাদের জটিল জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের শিক্ষাক্ষেত্রের প্রধান নেতার এ ধরণের সমর্থনকে স্বাগত জানাই। এবং আমি রাজা সলোমনের প্রজ্ঞাময় কথাটি আবার বলতে চাই: "তৃষ্ণার্ত গলায় শীতল পানি যেমন লাগে, দূরদেশ থেকে আসা শুভ সংবাদও তেমন লাগে।" (প্রবাদ- ২৫:২৫)

ধর্মের মধ্যে যেমন পরস্পর বিরোধী মতের লোক আছে বিজ্ঞানেও তেমনটি আছে। আমার বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক সহকর্মী আছেন যারা ধর্ম আর বিজ্ঞানের প্রতি 'স্বতন্ত্র বলয়ের' প্রস্তাবনা দেখে হতাশ হয়েছেন। এদের মধ্যে অনেকেই আবার তাদের লেখনীর মাধ্যমে সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। আমার মত অজ্ঞেয়বাদী বিজ্ঞানী যারা পোপের সাম্প্রতিক মন্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছে তাদেরকে উদ্দেশ্যে করে আমার এই সহকর্মী বিজ্ঞানীরা বলেন: "আরে ভাই সৎ হোন; আপনি তো জানেন ধর্ম খুব বেশী ঘোলাটে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং সেকেলে। আপনারা এ ধরণের স্বাগত বার্তা জানাচ্ছেন কেবল এই ভেবে যে ধর্ম খুব শক্তিশালী এবং আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার পক্ষে অর্থ ও গণসমর্থন আমাদের জন্য এরকম কূটনৈতিক চালসম্পন্নই হওয়া উচিত।" আমি মনে করি না বিজ্ঞানীদের মাঝে এমন দৃষ্টিভঙ্গি খুব সাধারণ, কিন্তু এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে হতাশ করে। এ কারণেই এই প্রবন্ধ শেষ করার আগে আমি ধর্ম বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত কিছু কথা জানাতে চাই। এই কথাগুলো চিন্তাশীল বিজ্ঞানীদের মধ্যকার ঐক্যমতের প্রামাণিক সাক্ষ্য হিসেবে কাজ করবে। চিন্তাশীল বলতে আমি তাদেরকে বুঝিয়েছি যারা নোমা নীতিকে সেভাবেই সমর্থন করেন যেভাবে পোপ করেছেন।

প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব বা অনুশীলনের কথা বললে আমি কোনক্রমেই ধার্মিক বা বিশ্বাসী নই। কিন্তু ধর্মের প্রতি আমার ব্যাপক শ্রদ্ধা আছে এবং এই বিষয়টি আমাকে সবসময়ই বিস্মিত করেছে। বিবর্তন, জীবাশ্মবিজ্ঞান এবং বেসবলের মত কয়েকটি বিষয় বাদ দিলে ধর্ম ছাড়া আর কোন কিছুই আমাকে এতোটা বিস্মিত করতে পারেনি। এই বিস্ময় অনেকাংশেই নির্ভর করেছে ধর্মের ঐতিহাসিক হেঁয়ালির উপর। পশ্চিমা সভ্যতার ইতিহাস জুড়ে সুসংবদ্ধ ধর্ম একই সাথে সবচেয়ে অবর্ণনীয় ভীতি এবং সবচেয়ে হৃদয়বিদারক মানবীয় বিশুদ্ধতাকে লালন করেছে। মানুষের ভিতরের এই ভাল বিষয়গুলো ব্যক্তিগত শত শত ভীতির মুখেও অটল ছিল। (আমি বিশ্বাস

করি ধর্মের সাথে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির বিরোধের সূত্র ধরেই যত অনিষ্ট ঘটেছে। ইনকুইজিশন থেকে ইকুইডেশন পর্যন্ত পুরোটা জুড়েই ক্যাথলিক চার্চ মানবীয় ভয়-ভীতির একটা অংশের যোগান দিয়েছে- কিন্তু এর কারণ কেবল এই যে, পশ্চিমা ইতিহাসের একটা বিশাল অংশ জুড়ে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির প্রভাব বিদ্যমান ছিল। আমার এই বিশ্বাসী লোকেরা আরও অনেক আগে অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেন্টের যুগেও অনেক নৃশংসতার কারণ হয়েছিল, কিন্তু সে সময় যুক্তিবাদীদের দ্বারা সংঘটিত নৃশংসতাও প্রায় সমান ছিল।

আমি শ্রদ্ধার সাথে মনেপ্রাণে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যে (NOMA সমাধান) বিশ্বাস করি। নোমা শুধুমাত্র একটি কূটনৈতিক চাল নয়, বরং এটি আমাদের নৈতিকতা এবং বুদ্ধিমত্তার প্রধান অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে। নোমা সমাধানের পথকেও দুই ভাগে ভাগ করে। ধর্ম যদি বিজ্ঞানের শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত প্রকৃতির বাস্তবিক চেতনার ব্যাখ্যায় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারে, তাহলে বিজ্ঞানীরাও পৃথিবীর পরীক্ষণমূলক সংবিধানের উচ্চতর জ্ঞানের আলোকে তাদের নৈতিক সত্যের অন্তর্দৃষ্টি আছে বলে দাবী করতে পারে না। যে পৃথিবীতে বিভিন্নমুখী এতো অনুরাগ সেখানে এ ধরণের পারস্পরিক দীনতার গুরুত্ব অনেক।

ধর্ম অনেকের কাছে এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যেকোন ধরণের আয়েশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য ধর্মতত্ত্বের দারস্থ হয়। উদাহরণস্বরুপ আমি ব্যক্তিগতভাবে সন্দেহ করতে পারি, পোপ স্বর্গীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে যে আত্মার কথা বলেছেন তা আমাদের ভয় কিছুটা দূর করার জন্যই। বিবর্তন যেখানে সকল সৃষ্টিকে সমান মনে করে সেখানে পোপ এই ধারণা প্রদানের মাধ্যমে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস টিকিয়ে রাখলেন। কিন্তু, আমি এটাও মানি যে আত্মা এমন একটি জিনিস যা বিজ্ঞানের শিক্ষাক্ষেত্রের বাইরে। আমার বিশ্ব আত্মাকে প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত করতে পারে না, কিন্তু আত্মা নিয়ে ইতং বিতং আমার শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য কোন হুমকিও নয়। যদিও আমি আত্মা সম্পর্কে ক্যাথলিক বিশ্বাসকে পুরোপুরি মানি না তথাপি, আমি অবশ্যই তাদের রূপকাত্মক মূল্যবোধকে সম্মান করি। কারণ এই মূল্যবোধ নৈতিক আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং মানুষের সুপ্তশক্তি সম্বন্ধে আমাদের যে অগাধ বিশ্বাস আছে তাকেও স্বীকৃতি দেয়। চেতনার বিবর্তন আমাদের উপর যত শিষ্টাচার, যত্নশীলতা এবং নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামের চেতনা আরোপ করেছে তার সবই আমাদের এই সুপ্তশক্তির অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃতির বাস্তবতা সম্বন্ধনীয় কোন জ্ঞান থেকে নয় বরং নৈতিক অবস্থান থেকে আমি প্রকৃতি বিষয়ক "কোল্ড বাথ" তত্ত্বের পক্ষে কথা বলছি। এই তত্ত্ব বলে, প্রকৃতি সত্যিকার অর্থেই নিষ্ঠুর এবং অভিন্ন হতে পারে। আমাদের নৈতিক ডিসকোর্সের সাথে এর কোন সমঝোতা নেই, কারণ প্রকৃতি আমাদের শান্তির নীড় হবার জন্য গঠিত হয়নি, প্রকৃতি জানতো না যে আমরা আসছি এবং রূপকার্থে বললে বলতে হয় সে আমাদের পরোয়াই করে না। আমরা তো সর্বশেষ ভূতাত্ত্বিক মাইক্রো সেকেন্ডে অনেকটা অনধিকার চর্চাকারীর মতো আবির্ভূত হয়েছি। আমি এ ধরণের অবস্থানকে মুক্তি দানকারী মনে করি, এই অবস্থান কোন মতেই বন্ধন সৃষ্টিকারী হতে পারে না, কারণ এটা গ্রহণ করলে আমরা নৈতিক ডিসকোর্স গ্রহণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারি। এই স্বাধীনতাটাই

সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মত করে কথাটাকে এভাবে বলা যায়, প্রকৃতির বাস্তবতা থেকে পরোক্ষভাবে নৈতিক সত্য উদ্‌ঘাটন করা যেতে পারে, এ ধরণের ভ্রান্তি থেকে দূরে থাকাই কাম্য।

কিন্তু এটাও সত্য যে এই অবস্থান অনেককেই ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে। প্রকৃতির ব্যাপক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি তাদের কাছে অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য ঠেকে। তারা বিবর্তনের সকল ঘটনাকে সত্য মেনে নেয়, এবং এ থেকেই মানব জন্মের নিগূঢ় অর্থ সন্ধানের চেষ্টা চালায়। এর সাথে কখনও কখনও ধর্মের শিক্ষাক্ষেত্র যুক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৯৬ সালের ৩রা এপ্রিল যে ব্যক্তি জন পলের বক্তব্যে ব্যথিত হয়ে নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সে লিখেছিলেন তার কষ্টকেও আমি এখানে হেলা করতে চাই না। তিনি লিখেছিলেন:

> পোপ জন পলের বিবর্তন মেনে নেয়ার ঘটনায় আমার দ্বিধান্বিত হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছে। ভালোবাসা এবং আলোকের অধিকারী এক ঈশ্বরের সৃষ্ট বিশ্বে সকল ধরণের ব্যথা আর কষ্টের সমস্যা নিয়ে বেঁচে থাকা খুব কষ্টকর, যদিও সে একজন সৃষ্টিতত্ত্ববাদী হয়। কিন্তু সৃষ্টতত্ত্বে বিশ্বাসীরা অত্যন্ত এইটুকু বলতে পারে, স্রষ্টার হাতে যে মূল সৃষ্টির সূচনা ঘটেছিল তা সম্পূর্ণ মহৎ, শান্তিপূর্ণ, নির্দোষ এবং ভদ্র ছিল। কিন্তু বিবর্তনকে কেন্দ্র করে এমন কোন কথা বলা সম্ভব কি? বিবর্তনের কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব দিয়েও এমনটি বলা সম্ভব না। এই বিবর্তনের মূলে রয়ে গেছে কষ্ট-বেদনা, হৃদয়বিদারক নিষ্ঠুরতা এবং সন্ত্রাস। বিবর্তনের যন্ত্র শিকারী পশুর ধারালো দাঁত হয়ে মরণ ভয়ে চিৎকার করতে থাকা শিকারের জীবন্ত মাংসের উপর আপতিত হয়। বিবর্তনই যদি সত্য হয় তাহলে আমি বলব, আমার বিশ্বাস এর থেকে অনেক রুক্ষ সমুদ্রে পাল তুলতে পারে।

আমি এই লোকের যুক্তিকে মানি না, কিন্তু এটা মানি যে, তার সাথে খুব ভাল বিতর্কে জড়িয়ে পড়া যায়। আমি "কোল্ড বাথ" তত্ত্বকে একটু অন্যভাবে বলতে পারি বা এতে একটু পরিবর্তন আনতে পারি। তাহলে সে হয়ত প্রকৃতিতে বংশগতির আধ্যাত্মিক অর্থ করতে আরও উৎসাহিত হবে। যদিও এ ধরণের উৎসাহের অর্থ অনেকটা অনচ্ছ। কিন্তু, এর মাধ্যমে আমরা উভয়েই জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হতে পারি এবং এই নিগূঢ় উত্তরবিহীন প্রশ্নগুলো আরও ভালভাবে বোঝার শিক্ষা নিতে পারি। আমার বিশ্বাস, এখানেই নোমা তথা বিজ্ঞান এবং ধর্মের সম্পর্কহীন পৃথক শিক্ষাক্ষেত্র তত্ত্বের গভীর প্রয়োজনীয়তা এবং শক্তি নিহিত আছে। নোমা বিজ্ঞান ও ধর্মের পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীল ডিসকোর্সের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করে এবং এদের উভয়কে অনুমতি প্রদান করে। এই ডিসকোর্স উভয় শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ক্রমাগত ইনপুট নিয়ে প্রজ্ঞার একমাত্র চূড়ান্ত গন্তব্যের পানে ধাবিত হয়। মানুষ যদি আসলেই বিশেষ কিছু হয় তাহলে তার এই বিশেষত্ব নিয়ে তাকেই ভাবতে হবে এবং কথা বলতে হবে। পোপ জন পল ২ নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হয়ে বলবেন যে, তার শিক্ষাক্ষেত্র সর্বদাই এই বিভাজন মেনে এসেছে। সেই শিক্ষাক্ষেত্র যে বলে, "in principio, erat verbum" অর্থাৎ "সবকিছুর শুরুতে ছিল বিশ্ব"।

লেখার বাইরের কথা

এই প্রবন্ধের শুরুতে ভ্যাটিকানের যে মিটিংয়ের কথা বলা হয়েছে তার সংগঠক এবং অন্যতম অংশগ্রহণকারী ছিলেন কার্ল সেগান। তিনি আমার সাথে ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন এবং দুটি প্রধান অথচ বিপরীত ক্ষেত্র তথা বিজ্ঞান ও ধর্মের এ ধরণের বিশ্বস্ত সহযোগিতাভিত্তিক বিভাজনকে স্বাগত জানিয়েছেন। কার্ল আমার নিকটতম বন্ধুদেরও একজন। যেদিন এই প্রবন্ধের প্রুফ দেখছিলাম সেদিনই তার অসময়ে মৃত্যুর খবর আমার কাছে পৌছায়। আমি তখন কেবল গান্ধীর মৃত্যুতে নেহেরুর কথাগুলো মনে করতে পেরেছিলাম: "আলো বিদায় নিয়েছে এবং অন্ধকার আবার রাজত্ব কায়েম করেছে।" কিন্তু কার্ল ৬৩ বছরের ছোট্ট জীবনে যা করেছে তা মনে হতেই আমি ভিন্ন কিছু ভাবা শুরু করলাম। আমি ভাবতে লাগলাম আরও অল্প বয়সে মৃত্যুবরণকারী সঙ্গীতজ্ঞ হেনরি পার্সেলের মৃত্যুতে জন ড্রাইডেনের লেখা বুলিগুলো: "He long ere this had tuned the jarring spheres, and left no hell below."

রোমে কার্ল সেগানের সাথে যে দিনগুলো কাটিয়েছিলাম সেগুলো ছিল আমাদের বন্ধুত্বের সর্বোত্তম দিন। সেই চিরন্তন শহরের আনাচে কানাচে দুজনে ঘুরে বেড়াতাম আর বিস্মিত হতাম; এর অভিভূত করে দেয়ার মত স্থাপত্য এবং ইতিহাস আর... খাদ্যের (!) কল্যানে। কার্লের বিস্ময়টাই ছিল বিস্ময়কর। কারণ সে এমন এক দেশ দেখে অভিভূত হয়েছিল যে দেশে তখনও জনপ্রিয় বিজ্ঞানের সর্বকালের সেরা টিভি সিরিজ "কসমস" সম্প্রচার করা হয়নি।

আমি এই প্রবন্ধটি তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি। আমার মতো কার্লও আত্মার অনস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিল। আমাদের এই ধারণা ভুল, কেবল একটি কারণেই আমি এটা ভাবতে চাই না। কারণটি হল, আত্মা থাকলেই কেবল আমরা দুজনে মহাবিশ্বের অনন্ত পরিসরে বন্ধুর মত বিচরণ করতে পারি, আর ব্যক্তিগতভাবে আমি তার মত একটি চমৎকার আত্মার সাথে কথা বলতে পারি।

পরিশিষ্ট

ইভানজেলিক্যাল - প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে একটি বিশেষ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি।

নিউক্লিয়ার উইন্টার - ব্যাপক নিউক্লীয় যুদ্ধের কারণে পৃথিবী শীতল হয়ে যেতে পারে, এই অবস্থা।

পন্টিফিশিয়াল একাডেমি অফ সাইন্সেস - পোপ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান উন্নয়ন সংস্থা।

প্রোটেস্ট্যান্ট - পোপকে মানে না। বাইবেলকে আক্ষরিক অর্থে সত্য মানে এবং এটিকে সত্যের একমাত্র উৎস বলে।

ক্যাথলিক - পোপকে মান্য করে। খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে পরিবর্তনে বিশ্বাসী।

ইয়েশিভা - ইহুদি ধর্মগ্রন্থ শিক্ষার স্থান।

রাব্বি - ইহুদি ধর্মপ্রচারক।

টিপ ও'নেইল - যুক্তরাষ্ট্রের হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টিটিভের স্পিকার।

ইউক্যারিস্ট - খ্রিস্টের শেষ প্রাতঃরাশকে নির্দেশ করে।

ট্রানসাবস্ট্যানসিয়েশন (আন্তঃপ্রমাণীকরণ) - ইউক্যারিস্টে রুটি এবং মদের সাবস্ট্যান্স খ্রিস্টের দেহ এবং রক্তে পরিণত হয়েছিল, এই বিশ্বাস।

পলিজেনিজ্‌ম - মানুষের উৎপত্তি বিভিন্ন প্রজাতি থেকে বংশানুক্রমে হয়েছে, একটি মাত্র পূর্বপুরুষ থেকে (মনোজেনিজ্‌ম) নয়। ধর্ম ও বিবর্তন উভয় ক্ষেত্রেই এই বিশ্বাস আছে।

ইনকুইজিশন - রোমান ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃক ধর্মদ্রোহী এবং রাষ্ট্রদ্রোহীদের কঠোর শাস্তি দেয়ার পদ্ধতি।

অধ্যাপক স্টিফেন জে গুল্ড (১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ - ২০শে মে, ২০০২), একজন মার্কিন জীবাশ্মবিদ, বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদ। তিনি তার প্রজন্মের অন্যতম জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক হিসেবেও সমাদৃত হয়েছিলেন। গুল্ড তার কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা এবং নিউ ইয়র্কের অ্যামেরিকান মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্টরিতে কাজ করে। স্টিফেন জে গুল্ডের "Nonoverlapping Magisteria" লেখাটি Natural History 106 (March 1997): 16-22 এ প্রকাশিত।

খান মুহাম্মদ, বাংলাদেশের ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি'র শিক্ষার্থী। 'শিক্ষানবিস' নামে ইন্টারনেটে ব্লগ লিখে থাকেন। ইমেইল - hermitage17@yahoo.com

বিজ্ঞানের অংগনে যখন ধর্মের প্রবেশ

দুটোর যৌক্তিক পার্থক্য কি এতো সহজ?

রির্চাড ডকিন্স

অনুবাদক: তানবীরা তালুকদার

এক ধরনের কাপুরষোচিত বোধশক্তিজনিত মানসিক শিথিলতা কিংবা আপোষকামিতার কথা বাদ দিলে বিচারশক্তিসম্পন্ন যুক্তিবাদী লোকদের সিদ্ধান্তগুলো বরং যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিরুদ্ধেই যায় (এখানে সাম্প্রতিক যুগের Scientology(1) অথবা Moonies(2) -এগুলোর কথা বিচার্য্য নয়)। স্টিফেন জে গুল্ড তার প্রাকৃতিক ইতিহাস কলামে পোপের বিবর্তনবাদ এর প্রতি আচরণ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা প্রবলভাবে তার আপোষকামী মনোভাবকেই প্রকাশ করে -

> "বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে কোন সংঘাত নেই, সঠিক শিক্ষার অভাবে সেসব ক্ষেত্রে সহজেই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আমি বিশ্বাস করি, আমার সমস্ত অন্তকরন দিয়ে, একটি সম্মানজনক, একটি ভালোবাসাময় চুক্তি (আমি এটাকেই গুরুত্ব দেই) ...।"

যহোক, কি সেই দুটো সহজ দৃষ্টিতে পার্থক্যময় ক্ষেত্র, যাকে গুল্ড 'অসম্পৃক্ত স্বতন্ত্র বলয়' (Nonoverlapping Magisteria, সংক্ষেপে NOMA) নামে অভিহিত করেছেন - আর ধারনা করেছেন এদুটোকে আমাদের সমান উষ্ণভাবে সম্মান আর ভালোবাসা দিয়ে বুকে ধারণ করে রাখতে হবে? গুল্ড আরো বলেছেন, 'বিজ্ঞানের জ্ঞান শুধু ভৌত বাস্তবতার আলোকে প্রায়োগিক বিশ্বকে ধারণ করে। আর ধর্মের জ্ঞান মানুষের নৈতিক চিন্তা আর মূল্যবোধের ধারনাকে প্রসারিত করে।' কিন্তু সত্যই কি তাই?

নৈতিকতা কারা ধারণ করে ?

আসলে ব্যপারটা কি এতোই সরল? কিছুক্ষনের মধ্যেই আমি সে আলোচনায় যাবো যেখানে আসলে পোপ বিবর্তনবাদ বলতে কি বুঝিয়েছেন তার ভিত্তি তুলে ধরব এবং এরপর তার চার্চের অন্যসব স্বীকৃতির ব্যাপারেও কিছু কথা বলব। দেখবো আসলেই এগুলো এতো পরিস্কারভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাখা দেয় কি না। প্রথমেই সংক্ষিপ্ত আকারে ধর্মের সেই দাবী নিয়ে আলোচনা কারা যাক- যেখানে বলা হয় ধর্ম বিশেষ দক্ষ ভাবে আমাদের নৈতিকতা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে। এ ধারনাটি অনেক সময় অনেক অবিশ্বাসী লোকও সাদরে গ্রহন করেন, ধারনা করা হয়

সভ্যতার সাথে সাথে "মাথা নুয়ে" তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সর্বোচ্চ যুক্তিকে স্বীকার করে নেয়া - সে যতো দুর্বল যুক্তিই হোক না কেন।

প্রশ্ন হলো, "কোনটি ভুল এবং কোনটি ঠিক?" এটি একটি সত্যিকারের কঠিন প্রশ্ন যেটার উত্তর বিজ্ঞান হয়ত দিতে পারে না। নৈতিকতার অবয়ব দিয়ে কিংবা পূর্ববর্তী নৈতিক বিশ্বাস দিয়ে, গুরুত্বপূর্ন এবং কঠিন সব লৌকিক নৈতিক দর্শনের নিয়মানুবর্তিতা দিয়ে একজনকে হয়তো চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, বিজ্ঞান এবং যৌক্তিক কারনের সাহায্যে এর সাথে জড়ানো সংশ্লিষ্ট গোপন বিশ্বাসকে, অলক্ষ্যনীয় সামঞ্জস্যহীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যায়। কিন্তু চুড়ান্ত নৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তি মানুষের অন্য কোন জায়গা থেকে আসা উচিৎ, অনুমান করা যায় যুক্তি-তর্কের উর্ধ্বের কোন দৃঢ় প্রত্যয় থেকে। বিশ্বাসীদের দাবী অনুযায়ী এটা হয়ত আসে ধর্মের মাধ্যমে- মানে ঈশ্বর, ধর্মগুরু, সনাতন ঐতিহ্য, এবং একটি ঐশী বইয়ের মাধ্যমে এই নৈতিকতার টনিক বিতরন করা হয় - মানবজতির হেদায়েতের উদ্দেশ্যে।

দূর্ভাগ্যজনকভাবে, যে আশাটা ধর্ম দিতে পারে সেটা উষর প্রস্তরখন্ড ছাড়া কিছু নয়, সেখানে থেকে উৎপন্ন হওয়া বালির ভিত্তি সম নৈতিকতাগুলো একেবারেই নিস্ফলা। সত্যি বলতে কি- প্রাত্যহিক জীবনে কোন সভ্য মানুষই ধর্মগ্রন্থকে নৈতিকতার চূড়ান্ত বাহন হিসেবে পালন করে না। বরং আমরা নিজেদের পছন্দনীয় শ্লোক বা আয়াত ধর্মগ্রন্থ থেকে বেছে নেই (যেমন, 'ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই', 'প্রতিবেশীর প্রতি ভাল ব্যবহার কর' -এধরনের হিতোপদেশ সমূহ), এবং সানন্দে অশোভন অংশটুকু বাদ দিয়ে দেই (যেমন বেগানা নারীকে বেত্রাঘাত, বা তাদের ব্যাভিচারের জন্য পাথর ছুড়ে হত্যা, স্বধর্মত্যাগীদের মুরতাদ আখ্যা দিয়ে হত্যার আইন চালু করা, প্রতিপক্ষের বংশধরদেরকে শাস্তি দেয়া ইত্যাদি)। পুরনো বাইবেলের যে সৃষ্টিকর্তা তিনি নিজেই এক নির্মম, প্রতিহিংসাপরায়ন, নিজের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী, নারী পুরুষের মধ্যে অযৌক্তিক বৈষম্য সৃষ্টিকারী এবং ভয়ংকর রক্তপিপাসু এক চরিত্র, আজকের সমাজে কোন ব্যাক্তি তাকে আর্দশ চরিত্র বলে মেনে নেবে না। হ্যা, অবশ্যই আমাদের আজকের সভ্যতার অর্জনের আলোকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের রীতিনীতিকে বিচার করা খুবই অনুচিত । আর সেটাই আমার "আসল" কথা! স্পষ্টতই, আমাদের কাছে নৈতিকতার কিছু চূড়ান্ত বিকল্প উৎস আছে, যা আমাদের সুবিধামতো ধর্মগ্রন্থকে পদদলিত করে হলেও সামনে এগিয়ে যায়।

সেই বিকল্প উৎসটিকে মনে হয় খুবই উদার মতের শালীন ধারার এবং প্রাকৃতিক ন্যায় বিচারক যা ইতিহাসের সময়ের সাথে পরিবর্তন হয়, যখন যেই ধর্ম প্রচারক থাকে তার প্রভাবনুসারে নিয়মিত পরিবর্তন হতে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি, তা খুব কঠিন কিছু না। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনে, এমনকি আমাদের মধ্যে যারা খুব ধার্মিক তারাও এটাকে ধর্মগ্রন্থের চেয়ে বেশী মূল্য দিয়ে থাকি। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা সবাই কম বেশী ধর্মগ্রন্থকে অবহেলা করে থাকি, সে সমস্ত বানীগুলোকেই উদ্বৃত্ত করা হয় যেগুলো আমাদের উদার মানসিকতাকে ধারন করে আর যেগুলো করে না সেগুলোকে সযত্নে সজ্ঞানে এড়িয়ে যাওয়া হয়। আর যেখান থেকেই সেই উদারতা আসুক না কেনো, এটা আমাদের সবার জন্যই গ্রহনযোগ্য সে আমরা ধার্মিক হই কিংবা না হই।

অনুরূপভাবে, যীশু খ্রীষ্ট কিংবা গৌতম বুদ্ধের মতো মহান সব ধর্ম শিক্ষকরা, তাদের নিজেদের চারিত্রিক ভালো গুন দ্বারা আমাদেরকে অনুপ্রানিত করেন, তাদের ব্যাক্তিগত চরিত্রের দৃঢ়তা ও নৈতিকতাকে গ্রহন করার জন্য। কিন্তু আমরা আবার সেই ভালো কয়েকজন ধার্মিক নেতার মধ্যে থেকেই বাছাই এবং পছন্দের কাজটা করছি, জিম জোন্স অথবা চার্লস ম্যানসন এর মতো পাজী ধার্মিক নেতাদের বাদ দিয়ে। কিন্তু আমরা আর্দশ হিসবে জওহারলাল নেহরু কিংবা নেলসন ম্যান্ডেলার মতো নীতিবান নেতাদেরও তো গ্রহন করতে পারি। প্রথাগতভাবে, যেহেতু যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে তাই ভালো কি মন্দ সে বিচার না করে, আমরা আমাদের নৈতিকতা আর শালীনতার বিচার এবং প্রকৃতি থেকে আহরিত জ্ঞান দিয়ে নিজেরা সিদ্ধান্ত নেই কোনটা গ্রহন করব আর কোনটা বর্জন করব।

বিজ্ঞানের অংগনে ধর্ম

আমরা নৈতিকতার মূল্য নিয়ে আলোচনা করতে করতে মূল বিষয় থেকে দূরে সরে এসেছি। এখন আমি আমার মূল আলোচনা বিবর্তনবাদে ফিরে যাবো দেখব পোপ আমাদের প্রত্যাশানুযায়ী বিজ্ঞান-মনস্কতার ঝান্ডা উর্ধ্বে তুলে ধরতে পেরেছেন কিনা। “Pontifical Academy of Sciences” কে তার বিবর্তনবাদের উপর দেয়া বানীটি শুরুই হয়েছে নেতিবাচকভাবে দুমুখো ভাবধারার কথা দিয়ে যার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বিতীয় জন পলের আগের উক্তির সাথে মিল রাখা। আরো সন্দেহজনক হলো বারোতম পিয়াসের একটি উক্তির অন্তর্ভুক্তি -যিনি অন্যান্যদের তুলনায় বিবর্তনবাদের প্রতি খুবই বিরূপ। এখন পোপ এলেন আরো কঠিন কাজ করতে, বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমানের সাথে “ঐশী প্রত্যাদেশের” মিলন ঘটাতে।

ধর্মগ্রন্থে বলা হয়, মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছে এবং তার অবয়ব থেকে ... যদি মানুষ পুর্ববর্তী কোন জীবন থেকে তৈরী হয়ে থাকে তাহলে তার ঐশ্বরিক আত্মা সাথে সাথে সৃষ্টিকর্তা তৈরী করে দেন..... তারফলে তারা মনে করে জীবন্ত প্রানীর সব শক্তির আবির্ভাব হয় আত্মা থেকে, আর বিবর্তনবাদ শেখাচ্ছে পুরো উল্টোটা - আত্মা ছাড়াই কিভাবে প্রাণের বিকাশ আর বিবর্তন হতে পারে - নাকি নিছক দৃষ্টি আকর্ষন করার মত ব্যাপার কেবল এটা, মানুষের সৃষ্টির সাথে সম্পূর্ন সামঞ্জস্যহীন ..... এ দ্বিমুখী দন্দ্বে আমরা মানুষেরা নিজেরা অস্তিত্বের প্রশ্নে মনস্তাত্বিক একটা বিভ্রমের মধ্যে পড়ে যাই, যেটাকে অস্তিত্বের বিষয়ে একটা বিরাট ফাকও বলা যেতে পারে।

এ ব্যাপারে পোপকে একটা বাহবা দিতে হয় যে তিনি তখন অনুধাবন করেছেন যে সম্পূর্ন দুই মেরুতে অবস্থিত দুটো বিপরীতধর্মী ব্যাপারকে তিনি জোর করে এক করতে চাইছেন - "যাহোক এ ধরনের অস্তিত্বর বিষয়ে অবস্থান না গ্রহন করাটাই কি বাস্তবে পদার্থ এবং রসায়নের জগতে বিবর্তন এর উপর গবেষনার মূল ধারা নয়?'

ভয়ের কিছু নেই। অস্পষ্টতা আর নানাপদের আগডুম বাগডুম মুক্তির উপায় বাৎলে দিচ্ছে:

> 'জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে পদ্ধতি বহু বার ব্যবহার করা হয়েছে তার দ্বারা দুটো ভিন্নধর্মী মতামতকে এক করা সম্ভব হয়, যাদের এক হওয়াকে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয়। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষন বর্ননা এবং পরিমাপের মাধ্যমে জীবনের বিভিন্ন দিক স্পষ্ট করে ব্যাখা করে এবং সময়ের সাথে সাথে আরো নির্ভুল ভাবে একে জীবনের সাথে যুক্ত করে। আধ্যাত্মিক সাধনার বিশেষ মূহুর্তকে এভাবে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষন করা যায় না, তথাপি এটা একটা গবেষনামূলক স্তরের আবিস্কার -যা মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত অনেক নিদির্ষ্ট মূল্যবান জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত করে।'

সোজা ভাষায় বলতে গেলে, বিবর্তনবাদের নিদির্ষ্ট একটা লক্ষ্যে পৌছার একটা সময় এলো যখন সৃষ্টিকর্তা মানুষের আত্মাকে পূর্ববর্তী প্রানীর বংশের মধ্যে অন্তর্গত এবং সঞ্চারিত করলেন। (কখন? দশ লক্ষ বছর আগে? বিশ লক্ষ বছর আগে? *Homo erectus* আর জ্ঞান সম্পন্ন *Homo sapiens* মানুষের মধ্য? নাকি *Homo sapiens* মানুষ আর *H. sapiens sapiens* - মানুষের মধ্যে?) হঠাৎ করে আত্মা সঞ্চারনের অবশ্যই দরকার আছে, নইলে তো মানবজাতির জন্য অতি প্রয়োজনীয় ধর্মের ভিত্তিই ধ্বসে পড়ে। তুমি আহারের জন্য প্রানী হত্যা করতে পারো, কিন্তু ভ্রুন হত্যা কিংবা দুরারোগ্য ব্যাধীতে আক্রান্ত মানুষের যন্ত্রনাহীন মৃত্যু তাদের দৃষ্টিতে অযৌক্তিক জীব হত্যা, কারন -এক্ষেত্রে মহামূল্যবান 'মানব জীবনের' প্রশ্ন জড়িত।

ক্যাথলিজমের জাল কেবল নৈতিক বিবেচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ভাবলে ভুল হবে। ক্যাথলিক ধর্মানুসারীরা বিশ্বাস করে আধুনিক সভ্য *Homo sapiens* মানুষের সাথে অন্য সমস্ত 'ইতর প্রানী জগতের' একটি বিরাট বিভেদ আছে। আর বিজ্ঞানের চোখে এই বিভেদ একেবারেই ভ্রান্ত। বলা নিষ্প্রয়োজন, আজকের যুগে আকস্মিক ভাবে কোন ধরনের অমর আত্মার মাধ্যমে প্রানের বিকাশের কথা বিবর্তনবাদের কাছে বৈজ্ঞানিক ভাবে অগ্রহনযোগ্য।

আরো সাধারনভাবে বলতে গেলে, এটা বলা খুবই অযৌক্তিক, যেমন গুল্ডস এবং অন্যান্যরা বলে থাকেন, যে 'ধর্ম নিজেই বিজ্ঞানের অংগন থেকে দূরে অবস্থান করে, এবং শুধু নৈতিকতা আর মূল্যবোধের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে।' ঈশ্বার নামকএকটি অলৌকিক সত্ত্বা দ্বারা সৃষ্ট এবং তার দ্বারা বিরাজিত মহাবিশ্ব, প্রকৃতগতভাবে এবং গুনগতভাবে ঈশ্বরবিহীন মহাবিশ্ব থেকে আলাদা হওয়ারই কথা। আর সেই বিভেদটিই হলো অপরিহরনীয় বৈজ্ঞানিক পার্থক্য। ধার্মিকেরা যে সত্ত্বার অস্তিত্বের দাবী করে, তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাদের বৈজ্ঞানিক দাবীকেই উপস্থাপন করতে চায়।

প্রধান প্রধান রোমান ক্যাথলিক চার্চগুলোর বেশীর ভাগই এই ধরনের দাবীর প্রতি আস্থাশীল। বিনা ঔরসে কুমারীর মাতার সন্তান প্রসব, কুমারী মেরীর সশরীরে স্বর্গপ্রবেশ, সমাধি থেকে যীশূর পুনরুত্থান, মৃত্যুর পরে আমাদের আত্মার জবাবদিহিতা, -এগুলো ভুল হোক, ঠিক হোক - যথার্থ বৈজ্ঞানিক দাবী। হয় যীশূর একজন সত্য সত্যই বাবা ছিলেন নতুবা নয়। যথার্থ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমেই এর জবাব মিলতে পারে। এটা কোন "নৈতিকতা" কিংবা "মূল্যবোধের" প্রশ্ন নয়, এটা হলো বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা তথা সত্যান্বেষী মননের প্রশ্ন। আমাদের কাছে এটার জবাব দেয়ার মতো সাক্ষ্যপ্রমান হয়তো নেই কিন্তু এটি যে একটি বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন -এতে তো কোন সন্দেহ নেই। তবে বিজ্ঞান যদি অদূর ভবিষ্যতে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মতো কোন প্রমান খুঁজে পায়, আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন, ভ্যাটিকান সেটিকে উচ্চারনও করতে দেবে না।

যখন মাতা মেরী মারা যান, হয় তখন তার দেহ বিনষ্ট হয়ে গেছে, নতুবা তার দেহ এই পৃথিবী থেকে স্বসরীরে স্বর্গে তুলে নেয়া হয়েছে। আনুষ্ঠানিক দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত রোমান ক্যাথলিক চার্চ এর অনুমান, সম্প্রতি ১৯৫০ সালে তারা অধ্যাদেশ জারি করেছেন, যেখানে তারা বলেছেন স্বর্গ জিনিসটার সত্যিকারের 'ভৌগলিক অস্তিত্ব' বাস্তবিকই আছে, নইলে একজন রমনীর শরীর কিভাবে সেখানে গেলো? আমি একথা এখানে বলছি না যে, কুমারী মাতাকে নিয়ে অনুমিত এই মতবাদ আসলেই মিথ্যা, (যদিও আমি বিশ্বাস করি এটি অবশ্যই মিথ্যাই হতে হবে)। আমি শুধু এই যুক্তিই খন্ডন করতে চাচ্ছি যে, যারা বলেন এ ধরণের দাবী বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বাইরে রাখতে হবে। বরং, এই কুমারীর এই গল্পটি সত্য কিনা তা বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে নির্ণয় করা যেতে পারে - এটি তাই পরীক্ষণযোগ্য একটি বৈজ্ঞানিক তত্ব। আমাদের শারীরিক ভাবে মৃত্যু হলে আমাদের আত্মার জবাবদিহি করতে হবে কিনা কিংবা সেই সাথে ফেরেশতাদের দ্বারা বিচারপর্বের গল্প, স্পষ্টতই মাদার মেরীর সাথে যুক্ত হওয়ার অলৌকিক গল্পসমূহ, এবং এধরনের অন্যান্য সব গল্পসমূহ-এর ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে।

প্রায়শই খুব অসৎ মতবাদ অবলম্বন করে বলা হয় যে কোন ধর্মীয় দাবীই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বাইরে। অন্যদিকে এরাই আবার অতি প্রাকৃতিক রং-বেরং-এর গল্প সমূহ, এবং মৃত্যুর পরের জীবনের কথা বলে সাধারন মানুষদেরকে অভিভূত করার চেষ্টা থাকেন, নিজের দল ভারী করে গোপন উপায়ে জেতার চেষ্টা, কিংবা উপসনালয় বৃদ্ধির চেষ্টা থাকেন। এটাই তাদের বৈজ্ঞানিক শক্তি যা তাদেরকে এ সমস্ত গল্পকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে উপস্থাপন করার সার্মথ্য দেয়। এবং একই সময়ে সে সব বিষয়ের যৌক্তিক ব্যাখ্যা, বৈজ্ঞানিক গবেষনা কিংবা নুন্যতম সমালোচনাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয় - 'এগুলো ধর্মের বিষয়, বিজ্ঞানের এখান থেকে দূরে থাকা উচিৎ।' কিন্তু তুমি গাছেরটাও খাবে - তলারটাও কুড়োবে - এ তো হতে পারে না। অন্তত ধর্মের তাত্বিক আর আত্মপক্ষ সর্মথনকারী্দের এই দুমুখো নীতিকে আমাদের কখনোই প্রশ্রয় দেওয়া উচিৎ না। দূভার্গ্যবশতঃ তারপরো, আমাদের মধ্যে অনেকেই, এমনকি যারা ধর্মে বিশ্বাস রাখেন না তারাও অম্লান বদনে তাদেরকে একাজ গুলো অহরহই করতে দেই।

আমার মতে, সনাতন কট্টর মৌলবাদীদের বিপক্ষে পোপকে দলে টেনে আত্মপ্রসাদ লাভের একটা প্রচেষ্টা। এতে অবশ্য খুশী হবার মত কারণ আছে - যারা ক্যাথলিক ধর্মের প্রবক্তা যেমন মাইকেল বিহেদের পায়ের তলা থেকে আস্তে আস্তে মাটি সরে যাচ্ছে। তারপরেও যদি আমাকে বলা হয় সত্যিকারের সনাতন ঈশ্বর-বিশ্বাসী, ধর্মগ্রন্থ মেনে চলা সৎ ধার্মিক আর অন্যদিকে কপট, দুমুখোস্বভাবের, গোঁজামিল দেওয়া বক-ধার্মিকদের মাঝ থেকে কাউকে গ্রহণ করতে, আমি জানি আমাকে কোনটা গ্রহন করতে হবে।

তথ্যসূত্র (অনুবাদকের সংযোজন)

1. এল. রন। হার্ভাড Sceintelogy এর প্রবক্তা। ১৯৫০ সাল থেকেই তিনি এ নিয়ে কাজ শুরু করেন যা তিনি ১৯৫২ সালে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। ১৯৫৩ সালে তার এ মতবাদকে তিনি ধর্মের নাম এবং রূপ দেন। ১৯৬০ সালে তিনি Sceintelogy কে এই বলে সংঙ্গায়িত করেন, এ ধর্মনীতির মূল হলো, বিশ্বাস, আচরন আর ঐতিহাসিক পটভূমি আর ধর্মনীতি শব্দটি নিজেই নিজেকে প্রতিফলিত করে। Sceintelogy চার্চ এর অনুসারীরা এ ধর্ম সর্ম্পকে বলেন, "সত্যের শিক্ষা হলো এ ধর্মের মূল কথা"। মূল শব্দটি নিজেই ল্যাটিন শব্দ ***scientia*** এর জোড়া যার মানে হলো "জ্ঞান, দক্ষতা" অর্থ্যাৎ এর মূল ক্রিয়াপদ হলো জানা।

2. সান মুংগ মুন Moonies ধর্মের প্রবক্তা। ইউনিফিকেশন কমিউনিটি চার্চ থেকে ১৯৭০ সালে এ ধর্মের যাত্রা শুরু। এ ধর্মালম্বীরা নিজেদেরকে চাদের সন্তান মনে করেন। ১৯৭৪ সালে মেডিসন স্কয়ার গার্ডেন চার্চের এক সমাবেশের মধ্য দিয়ে এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এ ধর্মালম্বীদের সাধনার তিনটি স্তর থাকে, Moonies থেকে সাধনার মাধ্যমে **SUNNIES।** এবং **SUNNIES** এর সাধনা থেকে পাওয়া শক্তি ও ভক্তি তাকে KINGIES এর বা সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাবে, যা সাধনাকে পরিপূর্ন করবে।

ড. রিচার্ড ডকিন্স, আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী বিজ্ঞানী, গবেষক এবং দার্শনিকদের অন্যতম। পেশায় বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। যুক্তিবাদী এবং সমাজসচেতন লেখালিখির কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে ড. রিচার্ড ডকিন্সের খ্যাতি আজ আক্ষরিক অর্থেই তুঙ্গস্পর্শী। 'ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার', 'সেলফিশ জিন', 'আনোয়েভিং দ্য রেইনবো', 'ক্লাইম্বিং মাউন্ট ইম্প্রোবেবল', 'ডেভিলস চ্যাপ্লেইন' এবং 'অ্যাঙ্গেসটর টেল' সহ অসংখ্য পাঠকনন্দিত জনপ্রিয় ধারার বিজ্ঞানভিত্তিক বইয়ের রচয়িতা। সম্প্রতি নিজ উদ্যোগে তৈরী করেছেন 'রিচার্ড ডকিন্স ফাউন্ডেশন'। তাঁর সর্বশেষ বই - 'দ্য গড ডিলুশন' এখন পর্যন্ত বিগত বাইশ সপ্তাহ ধরে নিউয়র্ক টাইমসের 'বেস্ট সেলার' তালিকায় রয়েছে।

তানবীরা তালুকদার, লেখক এবং নৃত্যশিল্পী। নেদারল্যান্ডস-এ বসবাসরত মুক্তমনার কো মডারেটর। অনেকদিন ধরেই ইন্টারনেট-এ লিখছেন। বেশ কিছু প্রবন্ধ দেশের দৈনিক পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছে। ইমেইল - tanbira.talukder@gmail.com

বিজ্ঞান ও ধর্ম : সংঘাত নাকি সমন্বয় - মার্ক্সবাদের দৃষ্টিতে (জন্মশতবর্ষে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্মরণে)

শঙ্কর রায়

কার্ল মার্কসের মৃত্যুশতবর্ষে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি গবেষণা-সন্দর্ভ 'সাম থটস ওন মার্কস অ্যান্ড রিলিজ্যন' (নয়া দিললীতে 'মার্কস, মার্কসিজম অ্যান্ড ইন্ডিয়া' সেমিনারে, ২২-২৪ এপ্রিল, ১৯৮৩-এ পঠিত) বিজ্ঞান ও ধর্মকে মার্কসবাদের দৃষ্টিকোন থেকে বিচারে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। পঁচিশ বছর পরে তার পুর্নপাঠ বর্তমান দুনিয়ার দার্শনিক সংকটে এই প্রতিবেদকের কাছে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। সেজন্য এই সংক্ষিপ্ত রচনাটি হীরেন্দ্রনাথকে নিবেদিত করছি।

মার্কস ধর্ম সম্পর্কে বিশদভাবে লেখেন নি, যদিও অল্প পরিসরে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছিলেন। এই স্বল্পতার জন্যে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ধারণা বিকৃত ও অপব্যাখ্যা করা হয়। তিনি আস্তিকদের কখনো সেই অর্থে বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গ করেন নি। তাঁর কন্ট্রিব্যুশ্যন টু দি ক্রিটিক অফ হেগেল'স ফিলজফি অফ রাইট-প্রবন্ধে লিখেছিলেন- 'ধর্ম-নিপীড়িত প্রাণীর দীর্ঘশ্বাস, আত্মাহীন আত্মার মত হৃদয়হীন পৃথিবীর হৃদয়। জনগণের আফিম'[১]। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, ধর্ম মানুষের সৃষ্টি, ধর্ম মানুষ গড়ে নি। ধর্ম মানুষের সচেতনা, আত্ন-উপলব্ধি, কিন্তু এ উপলব্ধি বিশ্বচেতনাকে উল্টো করে দ্যাখে। ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এই উল্টো বা ভ্রান্ত উপলব্ধি নিরসনের জন্যে। তিনি ধর্মের তথা ধর্মগুরুদের আধিপত্যের (কখনো সখনো প্রাক-সামন্তবাদী নিপীড়ন) সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব বা দূষণ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। জনগণের প্রকৃত সুখীজীবন কায়েম না হলে ধর্মভীরু মানুষের কুসংস্কার বা মায়া (অর্থাৎ ধর্মেই সুখ) থেকে মুক্ত হবেনা[২]।

প্রচ্ছন্ন পরিহাস তাঁর ঐ প্রবন্ধে ছিলনা, তা মোটেই নয়। 'স্বর্গের সমালোচনা পরিণত হয় পাথিব সমালোচনায়, ধমতত্ত্বের সমালোচনা রাজনীতির সমালোচনায়'। হীরেন্দ্রনাথের মতে মার্কস এ নিয়ে সময় নষ্ট করেন নি, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন। ডি বি ম্যাক্কাওনের (দি ক্লাসিক্যাল মাকসিস্ট ক্রিটিকস অফ রিলিজ্যন-মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, কাউটসকি- গ্রন্থের রচয়িতা) একই মত। অর্থাৎ মার্কস ধর্ম সম্পর্কে কোনো বিশদ তত্ত্বায়ন করে যাননি। কিন্তু মার্কসবাদ তো কোনো আপ্ত বাক্য নয়। মার্কস রেখে গেছেন মার্কসীয় তথা হেগেলীয় বিচার পদ্ধতি (হেগেলের সমালোচনা করলেও আজীবন তিনি নিজেকে হেগেলের শিষ্য মনে করতেন), যা আমাদের মার্কসীয় দৃষ্টিতে ধর্ম-বিচারের প্রধান আয়ুধ। সে কারণেই প্রয়োজন হলে 'ক্রিটিক্যাল মার্কসিজম'-এর আশ্রয়ও নিতে কুণ্ঠিত হওয়া যাবেনা[৩]। ডেভিড ক্যট-এর মতে মার্কস ধর্মকে গীর্জার বা ধর্মযাজকদের চোখ দিয়ে দেখার

---

[1] কার্ল মার্ক্সের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিটি ছিলো –'Religious distress is at the same time the expression of real distress and the protest against real distress. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, just as it is the spirit of a spiritless situation. It is the opium of the people'.

[2] The abolition of religion as the illusory happiness of the people is required for their real happiness. The demand to give up the illusion about its condition is the demand to give up the conditions which needs illusions" (Karl Marx: Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right).

[3] লেলিন গোর্কিকে লিখেছেন, "On the question of God, the Godlike and everything connected with it, there is a contradiction in your position…it is clearly reactionary and reactionary. Like the Christian socialists (the worst variety of 'socialism', and its worst distortion, you make use of a method which despite your best

বিরোধিতা করেছিলেন। সেজন্যে তিনি ক্রিশ্চিয়ান মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, যেমন ভেনেজুয়েলার বিপ্লবী প্রেসিডেন্ট উগো শ্যাভেজ যিশু খৃষ্টের মানবধর্মের কথা প্রায়শ উল্লেখ করেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস ধর্মকে জর্মন দর্শনের সমালোচনার ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন, অনুসরণ করেছেন তাঁদের পূর্বসূরীদের (যথা ডেভিড ফ্রেডরিক স্ট্রস ও ব্রুণো বয়ার)। 'মানুষকে জন্তুদের থেকে পৃথক করা যায় চেতনাবোধ ও ধর্ম দিয়ে, এ কথা মেনে নিয়েও বলেছেন যে তার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে আধিভৌতিক, রাজনৈতিক, বিচারব্যবস্থাগত ও নৈতিক চেতনা - আর এর সবটাই পরিচালনা করে ধর্মগত ও ধর্মতত্বগত ব্যবস্থাপনা (মার্কস -এঙ্গেলস : ফয়েরবাখ: অপজিস্যন অফ দি মেটেরিয়ালিস্ট অ্যান্ড আইডিয়ালিস্ট আউটলুকস , প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, ১৯৭৬, পৃ ২৩-২৫)। এঙ্গেলস নিজে অন্যভাবে ধর্মের বিকাশ ব্যাখ্যা করেছেন, কেন ধর্মকে মার্কস আফিম বলেছিলেন তার পরোক্ষ ব্যাখ্যা মেলে[4]।

লেনিনও ধর্ম সম্পর্কে রচনায় কখনো যান্ত্রিকতা বা গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেননি। কিন্তু তিনি ধর্ম ও ধর্মযাজকদের প্রতিক্রিয়ার বিপজ্জনক সম্ভাবনা সম্পর্কে শ্রমজীবিদের সচেতন থাকতে বলতেন।রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-র খসড়া কর্মসূচির ধর্ম সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে নির্দিষ্ট করে বলেছিলেন - 'পার্টির উদ্দেশ্য নিপীড়নকারী শ্রেণীর সঙ্গে সংগঠিত ধর্ম-প্রচারের সংযোগ ছিন্ন করা এবং শ্রমজীবি জনগনকে ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে প্রকৃত মুক্ত করা। তার জন্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও ধর্ম-বিরোধী প্রচার করা। তবু দেখতে হবে যাতে আস্তিকদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত না লাগে, নচেৎ ধর্মান্ধতা বেড়ে যাবে।' (লেনিন-সংগৃহীত রচনাবলী, খন্ড ২৯,পৃ ১৩৪)।

লেনিন ও বলশেভিকদের বিরুদ্ধে তখন চার্চ ও জারের যুগলবন্দী এবং ধর্মের বিরুদ্ধে মতাদর্শগতভাবে অনড় অবস্থান অনিবার্য ছিল, তবু তিনি বুঝতে ভুল করেননি যে সাধারণ ধর্মভীরু মানুষরা নিপীড়িত শ্রেণীভুক্ত। অবশ্য তিনি আস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগতভাবে সংগ্রামের কতর্ব্য থেকে কখনো সরে যাননি। গোর্কিকে লেখা কয়েকটি চিঠিতে তা পরিষফূট । গোর্কি প্রচলিত আস্তিক্যবাদের ব্যাখ্যায় লিখেছিলেন, 'ঈশ্বর উপজাতি ও মানবসমাজ-উদ্ভুত বহু ধারণার জটিল সমন্বয়, যা সামাজিক অনুভূতি জাগায় ও সংগঠিত করে, যার উদ্দেশ্য ব্যক্তি ও সমাজের যোগসূত্র স্থাপন ও জৈবিক ব্যক্তিসত্তাকে বেঁধে ফেলা'। লেনিন এর বিরোধিতা করে বললেন, এটা বগনানভীয় ভাববাদী ধারণা এ সময় ঈশ্বর প্রতিক্রিয়ার যৌক্তিকতা। বন্ধু গোর্কিকে রেয়াৎ না করে বললেন ঐ ধারণা প্রতিক্রিয়াশীল, কারণ ঈশ্বরীয়

---

intention) repeats the hocus-pocus of the priests: you eliminate from the idea of God everything about it that is historical and drawn from real life (filth, prejudices, sacrificed ignorance and degradation, on the one hand, serfdom,monarchy, on the other), and instead of the reality of history and life there is substituted in the idea of God a gentle petty-bourgeois phrase(God= 'ideas which awaken and organize social feelings') – Lenin Coll Works, Vol 35, pp 127-28)

[4] এঙ্গেলস ধর্মের আরেকটি সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে -: "the fantastic refection in man's minds of those external forces which control the daily life, a reflection in which the terrestrial forces assume the form of supernatutal forces. In the beginning of history it was the forces of nature which were the first so reflected and which in course of further evolution underwent the most manifold and varied personifications among the various peoples… But it is long before, side by side with the forces of nature, social forces begin to be active – forces which confront man as equally alien and at first inexplicable, dominating him with the same apparent natural necessity as the forces of nature themselves."

ধারণা মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়, 'সামাজিক অনুভূতি'কে ভোঁতা করে, সজীবকে মৃতবৎ করে দাসত্বের দিকে ঠেলে দেয়।

কিন্তু লেনিন ধর্ম-প্রসঙ্গে শ্রমিকশ্রেণির দৃষ্টিকোন কি হওয়া উচিত, সে নিয়ে আত্যন্তিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মার্কসবাদ যেহেতু বস্তুবাদ-ভিত্তিক, তিনি বলেছিলেন, ধর্মের প্রশ্নে শ্রমিকশ্রেণিকে নিরন্তর শুধু বিরোধিতা করলেই হবেনা,শত্রুবৎ আচরণ করতে হবে(সং রচ, খণ্ড ১৫ পৃ ৪০৩-৪)। তিনি এরফুর্ট কর্মসুচির (১৮৯১) কথা (সোশ্যাল ডেমক্র্যাসীর রাজনৈতিক কৌশল প্রসঙ্গে) বলেছিলেন, কিন্তু সেখানে বলা হয়েছিল ,'রিলিজ্যন ইজ আ প্রাইভেট ম্যাটার', ধর্মাচরণের আদ্যন্ত বৈর, তা বলা হয়নি। ঐ লেখায় (বক্তৃতা) লেনিন নিজেই তা উদ্ধত করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চশ্রেণী-নিয়ন্ত্রিত ধর্ম-ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করে বলেছিলেন, 'পুরোহিত-তন্ত্র স্বভাবতই নিষ্ঠুর ও নিষ্করুণ', যার জন্য হিন্দু সমাজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সেজন্যে তিনি লিখেছিলেন, 'ব্রামহনজাতির কতর্ব্য - ভারতের অন্যান্য জাতির উদ্ধারের চেষ্টা করা।---- তিনি যদি শুধু টাকার চেষ্টায় ঘরিয়া বেড়ান, তাঁহাকে যথার্থ ব্রামহন বলা যায়না' (পুরোহিত ও অধিকার)। বণবিভাগের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, 'উহা জাতির উন্নতির প্রতিবন্ধক' (বৈসাদৃশ্য দূর কর)। তথাচ বিবেকানন্দ ব্রামহন্য আধিপত্যের পক্ষে ছিলেন। মনু সংহিতা উৎকলিত করে (ব্রামহমো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।/ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে) যুক্তি খাড়া করলেন যে তাঁদের কাছে আছে 'ধর্মের ভাণ্ডার'। স্বামীজি তো ধর্মবিরোধী (বিশেষত হিন্দু ধর্ম) ছিলেননা, এবং ব্রামহন্য আধিপত্যের পক্ষেও, তা না হলে তিনি যে প্রশ্ন প্রকাশ্যে রাখতেন, তা হল যে অন্যান্য বর্ণের মানুষেরা ঐ ভাণ্ডার-বন্চিত হল কেন?

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সমপাদক অর্ধেন্দু ভূষণ বর্ধন ১৯৯১ সালে (তখন তিনি সাধারণ সমপাদক হননি) পার্টির অধুনা-লুপ্ত মাসিক পত্রিকা 'পার্টি লাইফ' এ একটি প্রবন্ধে - মাকসজিম,রিলিজ্যন ,হিন্দুত্ব -ভারতীয় উপমহাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক দৃষ্টিতে ধর্মের বিতর্ক তুলে ধরেন। বৌদ্ধধর্ম ও স্যাখ্য দর্শনে যে যুক্তিবাদ ও নাস্তিকতার স্বীকৃতি আছে তা পশ্চিমী পন্ডিতেরা (মার্কসবাদী তাত্বিকরাও) চর্চা করেননি। বর্ধন লেখেন যে, বৌদ্ধধর্ম কোনো ঐশ্বরীয় ডক্ট্রিন, সর্বশক্তিমান বা সর্বপ্রজ্ঞাবান ঈশ্বর প্রভৃতি ধারনার কথা বলেননি। কারণ গৌতম বুদ্ধ আধিভৌতিক কিছু মানতেন না। আমি মনে করি ঐ প্রবন্ধটি ব্যালা, উরদু, হিন্দী, তামিল, মালয়ালি ইত্যাদি ভাষায় অনূদিত ও বহুল-প্রচারিত হওয়া উচিত, ধর্মানধদের (আমি মৌলবাদী শব্দটি এদের প্রতি প্রযোজ্য নয় মনে করি, কারণ ফান্ডামেন্টাল ফান্ডামেন্টালিজম শব্দটি বিজ্ঞানেই প্রয়োগ করা উচিত) এভাবেই বিতর্কে নামতে বাধ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে বলছি যে 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর', এই ধারণার সম্ভবত কোনো শাস্ত্রীয় ভিত্তি নেই । উপনিষদে আছে, 'প্রশ্নেন পরিপ্রশ্নেন'[৫]

বর্ধন যথার্থ লিখছিলেন যে, কমিউনিস্টরা ধর্ম থেকে বিরত থাকবে, কিন্তু যখন তা সামাজিক রূপ নেয় - যেমন, দুর্গাপূজা, ঈদ, ক্রিসমাস - সেখানে মিলন-অনুষ্ঠান বা মোলাকাতে তাঁরা অংশ নিতেই পারেন[৬]।

---

[5] "Question, Counnter-question"

[6] বর্ধন লিখেছেন, : "Marxists recognize that they must respect the individual's religious belief. We seek no conflict between us and true devotees of all faiths. We respect the right to their beliefs ….
What about Marx's aphorism that ' religion is the opium of the people?' I have indicated that the aphorism torn from its contect is interpreted one-sidedly.

এখানে লেনিনের কথা তিনি অন্ধভাবে না মেনে ঠিকই করেছেন। তাতে তিনি মোটেই অমার্কসবাদী হয়ে জাননি। কারণ মার্কসবাদ কোন পয়গম্বরের আপ্তবাক্য নয়, কর্মের নির্দেশ।

শেষত, বিজ্ঞানীকে কি নাস্তিক হতেই হবে? এ নিয়ে তর্কের মীমাংসা হয়নি। আমাদের ছাত্রজীবনে (সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র হবার সুবাদে) পেয়েছি ফাদার গোরে বা ফাদার ওয়েরস্ট্র্যাটিনের মত বিজ্ঞানীকে। তাঁদের বিজ্ঞান-মানস কোথাও ধর্মীয় দায়বদ্ধতায় ক্ষুন্ন হয়েছিল কি? নিশ্চয়ই না। তবু এ নিয়ে বিতর্ক চলুক। অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কিংবদন্তীপ্রতিম সংগঠক ও সাধারণ সমপাদক (১৯৩৩-৪৮) পূরণচাঁদ যোশী বলতেন সৃজনশীলতা জারিত হয় 'ক্ল্যাশেস অফ আইডিয়াজ' থেকে। এই 'ক্ল্যাশেস অব আইডিয়াজ' এর প্রেক্ষাপট তাই রুদ্ধ করে দেওয়া উচিৎ নয়, আকাংক্ষিত নয় অন্যের মুখ চেপে ধরা। বলপ্রয়োগ কোন প্রগতিশীল সিস্টেম গড়ে তুলার চাবিকাঠি নয়। বল প্রয়োগে চেতনার মুক্তি ঘটে না। আসলে ভুল যুক্তির মানুষেরও তাদের মতামত প্রকাশ করার অধিকার দেওয়া উচিৎ। চিন্তা করার সাহস, প্রশ্ন করার সাহস বিতর্কের মাধ্যমে ভুল যুক্তিকে পরাস্ত করে এগিয়ে যাবার প্রেরণা কিন্তু সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরই অংগ। অন্ধ আনুগত্যের মধ্যে দিয়ে, প্রশ্নহীন আনুগত্যের মধ্য দিয়ে কোন সিস্টেমই দীর্ঘদিন জোর করে টিকিয়ে রাখা যায় না, তা যতই 'সাম্যবাদী' কিংবা 'জনকল্যানমুলক' বলে প্রচারিত হোক না কেন, আর আমরা তা পৃথিবীর ইতিহাস বিশ্লেষণ করে জেনেছি। ভাবমূর্তি পূজায় আপ্লুত হয়ে অন্ধ স্তাবকতা নয়, বরং প্রতিটি দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচার, বঞ্চনা কিংবা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং সর্বোপরি সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ - সংঘাত আর নির্মাণের মাধ্যমেই সভ্যতা এগিয়ে যাক সুস্থ সংস্কৃতির দিকে।

শঙ্কর রায়, সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক ভাস্যকার। মুক্তমনায় নিয়মিত লিখে থাকেন। ইমেইল - sankarray62@rediffmail.com

সম্পাদকের নোট : কার্ল মার্ক্স উনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী দার্শনিক, রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ এবং সমাজ বিশেষজ্ঞ। শ্রেণীহীন শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়েছিল একসময় বিশ্বের বহু মুক্তিকামী মানুষকে। ধর্ম ও বিজ্ঞান নিয়ে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সুস্থ আলোচনা আজো তাই প্রাসঙ্গিক। সে হিসেবে এ প্রবন্ধটি বইয়ে আলাদা উপযোগ তৈরী করবে নিঃসন্দেহে।

তারপরও কিছু জিনিস আমাদের সবসময়ই মাথায় রাখতে হবে। মার্ক্সের প্রতিটি কথাই কিন্তু অভ্রান্ত নয়। এক সময় তার তত্ত্বের অনুরাগীরা কিন্তু সেভাবেই মার্ক্সকে দেখতেন। তারা ভাবতেন, এই মতবাদ এমন এক 'সত্যের' উপর প্রতিষ্ঠিত যা থেকে পদস্খলন কখনোই সম্ভব নয়। ঢালাওভাবে তার সমস্ত বানীকে 'বৈজ্ঞানিক' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিলো। কিন্তু রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপ এবং পরবর্তীতে সারা বিশ্বজুরে কমিউনিস্ট বিশ্বের পতনের পর সে সমস্ত বাণীর অভ্রান্ততা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবী জুরে পুঁজিবাদ বা ধণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রের উত্তরোণের যে 'আমূল ভবিষ্যদ্বানী' মার্ক্স করেছিলেন, আজকের বিশ্বের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে মনে হয় পৃথিবীর গতি-প্রকৃতি সেভাবে যায়নি। মার্ক্স মনে করেছিলেন যে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায়

শ্রমিক শ্রেনী বুঝি কেবল শোষণ আর বঞ্চনার শিকার হবে এবং এর ফলে শ্রমিক শ্রেনীর পিঠ 'দেওয়ালে ঠেকে যাওয়ায়' তারা ধণতান্ত্রিক সিস্টেমের পতন ত্বরান্বিত করবে। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু জায়গায় সফলতা এলেও ধনতন্ত্রের পতন হয়নি, বরং বলা যায় ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদি ব্যবস্থা নিজস্ব সিস্টেমের দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে বিবর্তিত হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বের 'ওয়েল ফেয়ার স্টেট' গুলো শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে অনেক বেশী মনোযোগী। ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের মাধ্যমে শ্রমিকেরা নিজের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারছে অনেক ভালভাবে এই পুঁজিবাদী সমাজেই। তারা কিন্তু বিপ্লবের পথে যাচ্ছে না। পুঁজিবাদী শোষণের কারণে 'দেয়ালে পিঠ' ঠেকে গেলে যদি বিপ্লব হয়ে যেত, তাহলে বিগত ত্রিশের দশকে সারা দুনিয়া জুরে অর্থনৈতিক মন্দার দুঃসময়ে কেন কোন বিপ্লব হল না সে ব্যাপারটি মোটেই বোধগম্য নয়। এরকম উদাহরণ আছে বহু।

মার্ক্স আরো মনে করেছিলেন পুঁজিবাদী সমাজে 'ক্লাস পোলারাইজেশন' তীব্র থেকে তীব্রতর হবে এবং শোষণ -শোষিতের (মার্ক্সের ভাষায় বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েত) মধ্যে শ্রেনীবৈষম্য তীব্রতর হবে। কিন্তু আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় য়ামরা দেখছি, নানান ধরণের সমস্যার শিকার হয়েও সমাজের একটি নির্দিষ্ট শ্রেনীর ক্রয় ক্ষমতা ও দৈনন্দিন জীবনের মান উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে এবং সর্বোপরি মালিক এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে মধ্যবর্তী শ্রেণীভুক্ত মানুষের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত আধুনিক বিশ্বের সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু সনাতন শ্রমিক এবং কাঁচামালের সংজ্ঞাই পালটে দিয়েছে। এপ্রসঙ্গে কলকাতার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজতাত্ত্বিক ড রামকৃষ্ণ মুখার্জির বক্তব্য প্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। তিনি মনে করেন, ধণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিশীলিত রূপ গ্রহণ করার ফলে শ্রমশক্তির এক উল্লেখযোগ্য অংশ কায়িক শ্রম দানের পরিবর্তে বুদ্ধিজনিত শ্রমদান (মেন্টাল লেবার) করছে এবং তারাই মধ্যবিত্তসূলভ জীবন জাপন করছে। প্রতিবছরই তৃতীয় বিশ্বের দেশ থেকে এইচ ওয়ান ভিসায় আমেরিকায় আসছে আজার হাজার 'মেন্টাল লেবারের' দল, যারা তৈরি করেছে এক দৃশ্যমান বলিষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেনী। বলা বাহুল্য, এই মধ্যবিত্ত শ্রেনীর বুদ্ধিমত্তা ও মানসিকতা আপামোর জনগণের কাছে সাধারণ মানদন্ড হিসেবে পরিগণিত হয়েছে এবং সমাজে তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হবার মধ্য দিয়ে তাদের স্বার্থ অনুযায়ী সামাজিক কাঠামো পরিবর্তিত হয়েছে। মার্ক্সের সনাতন ধারণায় সমগ্র উ্পাদিকা শক্তিকে কেবলমাত্র কায়িক শ্রমদানকারী শ্রমিকের মাধ্যমে মূল্যায়ন করেছিলেন - যা আজকের দুনিইয়ার সাপেক্ষে অনেকটাই বাতিলযোগ্য।

এ ছাড়া মনে রাখতে হবে, শুধু শ্রেনীগত কিংবা অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব নয়, আজকের দুনিয়ার জটিল সমাজে আরো নানা ধরণের দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত (যেমন, জাতিগত, লৈঙ্গিক, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক কিংবা ধর্মীয়) রয়েছে যা পৃথিবীর গতিপথ নির্ধারণে অনেক সময়ই নিয়ামক ভুমিকা পালন করেছে - মার্ক্স সেগুলো তেমন গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেননি, শুধু 'ক্লাস কনফ্লিক্ট'কেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কাজেই আজকের দিনে মার্ক্সের ব্যাখ্যা কতটুকু বৈজ্ঞানিক তা নির্মোহ বিশ্লেষণের দাবী রাখে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভারতে শ্রেণীবিভাগের তাৎপর্য' শীর্ষক লেখায় মন্তব্য করেছিলেন, 'শ্রেণী ছাড়াও আসলে অসাম্যের অনেক উৎস আছে; অসুবিধা আর বৈষম্যের সমস্ত কিছু কেবলমাত্র শ্রেনী দ্বারাই নির্ধারিত হবে - এই ধারণা ত্যাগ করতে হবে'। বিজ্ঞানের দার্শনিক কার্ল পপার (১৯০২-১৯৯৪) তার 'ফলসেফায়াবিলিটি' বা 'ভুল প্রমাণেয়তা' তত্ত্বের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, মার্ক্সিজম এক ধরনের ছদ্মবিজ্ঞান (pseudoscience)। পপারের ভাষায় -

> 'বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব ততক্ষণই থাকবে যতক্ষণ তত্ত্বগুলোকে কঠিন প্রায়োগিক পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে চালানো হবে। যখন কোন তত্ত্বকে পরীক্ষণের চেয়ে বরং সুরক্ষিত করে রাখার চেষ্টা করা হয়, তখন বুঝতে হবে এর মধ্যে গলদ রয়েছে'।

মার্ক্সের তত্ত্বের বিরুদ্ধে এটি একটি গুরুতর অভিযোগ সবসময়ই। যখন মার্ক্সের অনুরাগীরা দেখলেন পৃথিবীর গতি-প্রকৃতি মার্ক্সের দেখানো পথে যাচ্ছে না, তখন তাদের দরকার ছিল এই তত্ত্বকে বাতিল করে নতুন তত্ত্বের খোঁজ করা। তা না করে তারা পুরোন তত্ত্বকেই তারা আঁকড়ে ধরে রইলেন, এবং তত্ত্বকে জোড়া তালি দিয়ে একধরণের যথার্থতা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। পপারের মতে এ ধরণের কর্মকান্ড বিজ্ঞানমনস্কতার পরিপন্থি। সত্যি বলতে কি, এ ধরনের মনোভাবই তৈরি করে অন্ধ স্তাবকের এবং একটি তত্ত্বকে ঠেলে দেয় বিজ্ঞান থেকে অপবিজ্ঞানের দিকে। কার্ল পপার ছাড়াও মার্ক্সের 'লেবার থিওরী অব ভ্যালু'র সমালোচনা রয়েছে একাডেমিয়ায়। আধুনিক অর্থনীতিতে তার তত্ত্বকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে 'মার্জিনাল ইউটিলিটি' তত্ত্ব দিয়ে। এছাড়া উইলিয়াম স্ট্যানলি জেভোন, কার্ল মেঞ্জার কিংবা বোম ব্যাওয়ার্কের সমালোচনাগুলো পড়া যেতে পারে।

লুইস ফুয়ের, বার্ট্রান্ড রাসেল, গিবন প্রমুখ দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী, এবং ঐতিহাসিকেরা সময় সময় দেখিয়েছেন মার্ক্সের তত্ত্বের সাথে বিজ্ঞানের চেয়ে ধর্মের সাযুজ্যই বেশী। যে ভাবে কমিউনিজম সাম্যবাদের স্বপ্ন দেখিয়েছিল তা ধর্মগ্রন্থগুলোতে বর্ণিত ঈশ্বর কর্তৃক পরকালে স্বর্গের স্বপ্নময় আবেদনের কথা মনে করিয়ে দেয়। ধার্মিকরা যেমন কোরান, বেদ, বাইবেল, হাদিস প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের মধ্যে মহাসত্য খুঁজে পান, এবং মুহম্মদ, যীশু এবং অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদের বানীকে শিরোধার্য করে রাখেন, এবং তাদের দেখানো পথেই নিজেদের চালিত করতে চান- ঠিক সেভাবেই কমিউনিস্টরা অনেকটা মার্ক্স, লেলিন, স্ট্যালিন, ট্রটস্কি, মাও এবং তাদের লেখা লাল বইগুলোকে দেখতেন। ধর্মের অনুসারীরা যেভাবে নিজ নিজ ধর্ম প্রতিষ্ঠার নামে ঢালাওভাবে বিধর্মীদের উপর অত্যাচার করেছে, ঠিক তেমনি কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা এবং বিপ্লবেরর নামেও লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, গুলাগে প্রেরণ করা হয়েছে অনেক প্রগতিশীল মানুষকে, 'শ্রেনীশত্রু' কিংবা 'পুঁজিবাদের দালালের' তকমা এঁটে নির্যাতন করা হয়েছে কিংবা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সাহিত্যিক এবং রাজনীতিবিদদের নির্যাতন, নির্বাসন, কারাগারে নিক্ষেপ, শ্রমশিবিরে প্রেরণ, মস্তিস্ক ধোলাই ইত্যাদি সেই মধ্যযূগীয় ধর্মের কৃষ্ণ ইতিহাস ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। 'কাফের নিধন', কিংবা 'নির্যবন করো সকল ভুবনের' মত 'বুর্জোয়াদের খতম কর' ধ্বনি দিয়ে শ্রেনীহীন সমাজ গড়বার প্রেরণা ছিলো কমিউনিজমের অপরিহার্য শ্লোগান। ক্রুসেড, জ্বিহাদ ধর্মযুদ্ধের মতই ছিলো তাদের এই শ্রেনীসংগ্রামের লড়াই। গণহত্যার গবেষক রুমেলের মতে সোভিয়েত রাশিয়া প্রায় ছয় কোটি লোককে কমিউনিজমের নামে হত্যা এবং নির্যাতন করা হয়েছিলো, চীনে ১৯৪৯ সাল থেকে 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' সময় পর্যন্ত দশ লক্ষ লোক নিহত হয়েছিল। কম্বোডিয়ায় পলপটের সৈন্যবাহিনীর হাতে চার বছরে নিহত হয় প্রায় বিশ লক্ষ লোক। রুমেলের সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা যেতে পারে সহজেই কিন্তু তারপরও বলা যায়, একটি 'বৈজ্ঞানিক' সমাজব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য ঢালাওভাবে এত মানুষের প্রাণহানী কেন ঘটাতে হবে সে প্রশ্ন উত্থাপন মোটেই অসমীচীন নয়। আসলে 'কমিউনিজম নিজেই

একটি ধর্ম' কিনা ঢালাওভাবে এ বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় এর মধ্যে ধর্মের উপাদান রয়ে গেছে - প্রচ্ছন্নভাবেই।

আরো কিছু নমুনা পেশ করা যাক। মার্ক্সিজমের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেলিন উপংহার টেনেছিলেন এই বলে যে, সাম্রাজ্যবাদ বা 'ইম্পেরিয়ালিজম' হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজের উপঢৌকন। পুজিবাদী বিশ্ব যে সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি করে না তা নয়, বহুলাংশেই করে কিন্তু, কথা হচ্ছে, মার্ক্সীয় ধারণায় যেমন মনে করা হয়েছে 'স্যোশালিস্ট' দেশ গুলো যেহেতু পুঁজিবাদ থেকে মুক্ত থাকবে, সে বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ থাকবে না। কিন্তু আমরা দেখেছি সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব পুঁজিবাদী বিশ্বের মতই সমান আগ্রাসী। হাঙ্গেরী (১৯৫৬), চেকোশ্লাভাকিয়া (১৯৬৮), আফগানিস্তান (১৯৭৯)-এর উপর রাশিয়ার আগ্রাসনের ইতিহাস কারো অজানা নয়, অজানা নয় তীব্বতের প্রতি চীনের মনোভাবও। কাজেই সাম্রাজ্যবাদ কেবল পুঁজিবাদী বিশ্বের একচেটিয়া ভাবলে ভুল হবে।

রাশিয়া একসময় জেনেটিক্সের গবেষণায় শীর্ষস্থানে ছিলো, অথচ স্ট্যালিনের আমলে রাশিয়ায় 'জেনেটিক্স' এর উপর গবেষণার লালবাতি কিভাবে জ্বলে গিয়েছিল আমরা তা সবাই আজ জানি। বাম ঘরণার অনেকেই একটা সময় জেনেটিক্স বা বংশগতিকে পাত্তা না দিয়ে কেবল পরিবেশ নির্ণয়বাদকে আদর্শ হিসেবে করতেন, কারণ তা তাদের 'সাম্যবাদের বাণী' প্রচারে সহায়তা করে। আর এ কারণেই মার্ক্স কিংবা তার পরবতী তাত্ত্বিক কমিউনিস্টরা তাদের অনেক বাণীতেই এটাই জোরের সাথে বলেছিলেন যে মানুষের সকল বৈশিষ্ট্যই পরিবেশের ফল, এর সাথে বংশের কোন যোগ নেই। লেলিন এবং তার সমসাময়িক নেতারা ভাবতেন, সাহিত্য, বিজ্ঞান সব কিছুই 'মার্ক্সিজমের ছাকুনি'র মধ্য দিয়ে যেতে হবে, নইলে পরিশুদ্ধ হবে না! যেমন লেলিনের মার্ক্সবাদী নির্দেশ ছিল –'Literature must become party literature... Down with non partisan literatures.' পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ায় স্ট্যালিন মার্ক্সসীয় মতবাদের সংগে সংগতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে বংশাণুবিদ্যাকে বিকৃত করতেও পিছপা হননি । এই উদ্দেশ্যে তিনি লাইসেঙ্কো নামক এক ঠগ বিজ্ঞানীকে নিয়োগ করেন। যখন ভাভিলভ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা লাইসেঙ্কোর তত্ত্বের ভুল ধরিয়ে দেন তখন স্ট্যালিন তাদেরকে গুলগে পাঠিয়ে দেন। তারপর তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। স্ট্যালিনএর প্রতিহিংসার স্বীকার হয়ে আরো প্রাণ হারান কার্পেচেঙ্কো, সালমোন লেভিট, ম্যাক্স লেভিন, ইস্রায়েল আগলের মত বিজ্ঞানী। শুধু লাইসেঙ্কো নয়, স্ট্যালিন জামানায় লেপিশিঙ্কায়া নামের আরেক ঠগ বিজ্ঞানীকে প্রমোট করা হয়েছিল - সেই 'পুঁজিবাদী' জেনেটিক্স সরাতে। আইনস্টাইন আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রদান করার পর, ব্যাপারটা 'মার্ক্সিজমের সাথে সংগতিপূর্ণ' মনে না করায় 'সোভিয়েত এন্সাইক্লোপিডিয়া' প্রকাশ করা হয় রিলেটিভিটিকে 'নস্যাৎ' করে। এর প্রতিবাদ করায় পদার্থিবিদ জর্জ গ্যামোকে পালাতে হয়েছিলো রাশিয়া ছেরে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আঁদ্রে শাখারভ এবং সলঝনিৎসনের কপালেও জুটেছিল স্ট্যালিনীয় জামানার অত্যাচার আর নির্যাতন । পাস্তারনাক 'ডক্টর জিভাগো' রচনা করে ১৯৫৭ সালে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন; স্ট্যালিন চাপ প্রয়োগ করে এই মহান কবিকে দিয়ে স্ট্যালিনের স্তুতি করাতে চেয়েছিলেন। পাস্তারনাক রাজী হননি। লাং-ক্যাম্পারে পাস্তারনাকের মৃত্যুর পর তার শেষকৃত্যে উপস্থিত লোকজনকে স্ট্যালিন সরকার গ্রেফতার করে। এর মধ্যে সিন্যভস্কি এবং দানিয়েলের মত চিন্তাশীল মানুষেরাও ছিলেন। এদেরকে বিনা বিচারে কারাদন্ড দেওয়া হয়। এই দৃষ্টান্তগুলো আসলে বহুল প্রচারিত 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' শ্লোগানের বিরুদ্ধেই যায় বলে মনে হয়।

'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' কথা বলা হলেও সত্যিকার বিজ্ঞানের সাথে সমাজতন্ত্রের মাত্রাগত পার্থক্যটুকু পরিস্কার না করলে অন্যায় হবে। যে কোন 'ইজম' আসলে বৈজ্ঞানিক সার্বজনীনতার অন্তরায়। একজন পদার্থবিদ কখনোই নিজেকে 'নিউটোনিস্ট' কিংবা 'আইনস্টাইনিস্ট' হিসেবে পরিচিত করেন না। কারণ নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র কিংবা আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্ব পদার্থবিজ্ঞানেরই অংশ। কাজেই আলাদা করে কারো 'আইনস্টাইনিজম' চর্চা করার কিছু নেই। একই কথা জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও খাটে। ডারউইনের বিবর্তনবাদ কিংবা মেন্ডেলের বংশগতির তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এগুলো জীববিজ্ঞানেরই অংশ। সে হিসেবে প্রতিটি জীববিজ্ঞানীই কিন্তু বিবর্তনবাদী। ল্যামার্কের মতবাদ ভুল প্রমাণিত হওয়ার ফলে সেটা জীববিজ্ঞানের অংশ হতে পারেনি, সেটা অপাংক্তেয় হয়ে আছে 'ল্যামার্কিজম' অভিধায় অভিসিক্ত হয়ে। কাজেই সোজা কথায় যে কোন ধরণের 'ইজম' বৈজ্ঞানিক ধারণার পরিপন্থি। অথচ মার্ক্সিজম বা কমিউনিজমে সব কিছু ছাপিয়ে 'ইজম'টাই যেন বড় হয়ে উঠে। একে তো সকল পদার্থবিজ্ঞানীই যেমন 'আইনস্টাইনিস্ট', সেরকম সকল অর্থনীতিবিদদের সবাই যে 'মার্ক্সিস্ট' তা কিন্তু বলা যাবে না। বহু বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ আছেন যারা মার্ক্সিজমকে ভ্রান্ত মনে করেন। কাজেই এটি বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসেবে সার্বজনীন তা বলা যাবে না। আবার একই মার্ক্সিস্টদের মধ্যেও আমরা দেখি শতভাগ। কেউ লেলিনিস্ট, কেউ স্ট্যালিনিস্ট, কেউ ট্রটস্কিস্ট, কেউ বা মাওইস্ট। সবাই যে যার মত নিজেদের আবার 'সত্যিকার মার্ক্সিস্ট' মনে করেন। বাংলাদেশে ভাসানী, ন্যাপ, সিপিবি, ওয়ার্কার্স পার্টি, সর্বহারা পার্টি, পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি - এরকম নানা নামের বৈধ, অবৈধ কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব রয়েছে। এদের অনেকেই একসময় সমাজতন্ত্র কায়েমের নামে ঘোট পাকিয়ে শ্রেণীশত্রু মেরেছেন, কখনো ড. হুমায়ুন কবিরের মত বরেণ্য বুদ্ধিজীবিকে হত্যা করেছেন, কখনো বা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে আখ্যায়িত করেছিলেন 'দুই কুকুরের লড়াই' বলে। এমনকি একাত্তরে কোন কোন গ্রুপ পৃথক সায়ত্বসাসিত 'সরকার' গঠণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্তও হয়েছিলেন বলে সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তারা এগুলো যখন করছিলেন, তারা মার্ক্সীয় দৃষ্টিভংগীর মাধ্যমেই এগুলো জায়েজ করতেন। পরে যখন তাদের এই সমস্ত গণবিরোধী কর্মকান্ড দিনের আলোয় উঠে এসেছে, তখন তারা সাফাই গেয়েছেন এই বলে - ' মার্ক্সের তত্ত্বে কোন ভুল নেই - এটা স্রেফ পার্টির লাইনগত ভুল'! অবশ্য সব কমিউনিস্টই যে এই 'খতমের লাইন'কে সঠিক মনে করতেন তা নয়, সিপিবির মত কিছু 'মডারেট কমিউনিস্ট' দলের কর্মীদের দেখেছি খতমের লাইনে না গিয়ে বরং গণতান্ত্রিক পথেই আন্দোলন করতেন। এখানেও ধর্মবাদীদের সাথে মিল লক্ষ্যনীয়। চরম্পন্থি ইসলামের অনুসারীরা বিন লাদেনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে 'জিহাদ' হিসেবে আখ্যায়িত করে কোরান হাদিসের আলোকে অনেকেই বৈধতা দেন, আবার অনেক 'মডারেট মুসলিমেরা' এ ধরণের চরমপন্থি কার্যকলাপকে দেখেন ঘৃণার চোখে - বলেন, এদের কর্মকান্ডের সাথে 'শান্তিপূর্ণ ইসলামের' কোনই সম্পর্ক নেই। ধর্মবাদীদের মতই কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যে চরমপন্থি, মডারেটপন্থি, মধ্যপন্থি সব ধরণের অনুসারীই আছেন। এজন্যই ড. ফজলুর রহমান তার 'ইসলাম' (১৯৬৬) গ্রন্থে বহু আগেই বলেছিলেন, 'ইসলাম স্বভাবে কমিউনিজমের মতই'। কথাটা ঘুরিয়ে বলেও সমানভাবেই প্রযোজ্য। আবার এর পাশাপাশি আমরা পেয়েছি 'ধর্মেও আছি জিরাফেও আছি' গোত্রের ঈদ, পুজো, মিলাদে অংশ নেওয়া এবং এগুলোতে বিশ্বাস করা মার্ক্সবাদী। জ্যোতিষীদের রত্নপাথর হাতে পরা, ভুত-ভবান-শয়তান, রাশিফল, উদৃষ্টে বিশ্বাসী মার্ক্সবাদীরাও সংখ্যায় বিরল নয়। এদের অনেকেই গণেশের দুধ খাওয়া নিয়ে সারা ভারতে গণহিস্টেরিয়ার সময় বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার পক্ষে না থেকে বরং গনেশের অলৌকিকতার সাফাই গেয়েছেন। এদেরই একাংশ মুসলিমদের

ভোটব্যাংক অক্ষুন্ন রাখতে তসলিমা নাসরীনের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। এগুলো সবই আবার তারা করেছেন মার্ক্সবাদের দোহাই দিয়ে - 'দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে' সমাজ বিশ্লেষণ করে। কাজেই, এদের তত্ত্ব এবং কর্মকান্ড আসলেই কতটুকু 'বৈজ্ঞানিক' তা সঠিক বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

এতদ সত্ত্বেও, মার্ক্সবাদের তাৎপর্য এখনো অনেকের কাছেই প্রাসংগিক। সনাতন মার্ক্সবাদের পরবর্তী মার্ক্সবাদীরা, যেমন - গ্রামস্কি, এলথুজার কিংবা দেরিদো যে সমস্ত পোস্ট মডার্নিস্ট ব্যাখ্যা হাজির করেছেন সেগূলো আমাদের জানা প্রয়োজন। এ ছাড়া ভুলে গেলে চলবে না যে, সমগ্র তৃতীয় বিশ্ব সহ লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত মানুষ মুক্তিসংগ্রামে সামিল, তাদের অনেকের কাছেই মার্ক্সবাদ এখনো আলোকবর্তিকা। সম্প্রতি নেপালে মাওবাদীরা যেভাবে দীর্ঘদিনের রাজতন্ত্রকে উতখাৎ করেছে তা অনেক মার্ক্সিস্টকেই উদ্দীপ্ত করেছে। আমি শঙ্কর রায়কে এই প্রাসঙ্গিক লেখার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

ধর্ম ও বিজ্ঞান: সংঘাত-সমন্বয়ের রণনীতি-রণকৌশল

মোঃ জানে আলম

ধর্ম ও বিজ্ঞানের স্বরূপ

মূলগতভাবে ধর্ম একটি তাত্ত্বিক বিষয়। জগত ও জীবন সৃষ্টি সম্পর্কে কিছু তাত্ত্বিক ধারণা এবং সে তত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে কিছু আচার-আচারণ-উপাসনা ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নিয়েই ধর্ম। ধর্মীয় তাত্ত্বিকতার ভিত্তি হল বিশ্বাস এবং একমাত্র বিশ্বাস। বিজ্ঞানও প্রথমত একটি তাত্ত্বিক বিষয়। তবে সে তত্ত্বের ভিত্তি বিশ্বাস নয়। বিজ্ঞানের যে তত্ত্ব, তা গড়ে ওঠে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে। ধর্মে প্রথমে বিশ্বাস, অতঃপর বিশ্বাসের আলোকে জগত ও জীবনকে ব্যাখ্যার চেষ্টা এবং তাকে প্রমাণের প্রয়াস যা একটি অসম্ভব প্রকল্পও বটে। পক্ষান্তরে বিজ্ঞানে আগে পর্যবেক্ষণ, ধারণা ও পরীক্ষণ এর মাধ্যমে চুড়ান্ত প্রমাণ, অতঃপর তত্ত্বের নির্মাণ। প্রয়োগের মাধ্যমে প্রমাণ করা ব্যতীত কোন তত্ত্বের স্থান বিজ্ঞানে নেই। পক্ষান্তরে ধর্মীয় তত্ত্বের প্রয়োগ ও প্রমাণের কোন সুযোগ নেই। ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষ কিছু ধর্মীয় উপাসনা-আচার আচরণ-আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে এবং এ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নীতি-নৈতিকতা নিয়ন্ত্রন করে নারী-পুরুষ এর সম্পর্ক, নারীর অধিকারের মাত্রা, নারী স্বাধীনতা, বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক ইত্যাদি একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়, কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক জীবনাচরণ ধর্মীয় নৈতিকতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে, যে সবের আবার মূল লক্ষ্য হল পরকাল এবং পরলৌকিক মোক্ষলাভ। এর বাইরে ধর্মের আর কোন ইহজাগতিক ভূমিকা নেই। যদিও গোঁড়া ধর্মপন্থীরা তাদের ধর্মের মৌলিক বিধি-বিধানকে সমাজ ও রাষ্ট্রে অবিকলভাবে প্রয়োগ করতে চায়। তারা রাষ্ট্রের ও সমাজের সকল দিগনির্দেশনার জন্য ধর্মের আদিম ধারণা বা বিধি-বিধানকে অনুসরণ করে। মুসলিম মৌলবাদীরা সমাজ ও রাষ্ট্রের তাবৎ সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের পবিত্র ধর্ম-গ্রন্থ কুরআন ও সুন্নাহের উপর নির্ভর করতে চায়। কুরআন যেহেতু ঐশীগ্রন্থ এবং হযরত মুহাম্মদ(দঃ) আল্লাহের প্রেরিত পুরুষ, সেহেতু কুরআন ও সুন্নাহের (নবীর জীবনাচরণ) বাহিরে কোন দিগনির্দেশনা মুসলমানেরা মানতে নারাজ। ইহুদী মৌলবাদীরা তোরাহ্ এর আক্ষরিক ব্যাখ্যার বাইরে বিন্দু-বিসর্গ যেতে প্রস্তুত নয়। খৃষ্টান মৌলবাদীরা প্রায় সকল প্রশ্নে বাইবেলের শিক্ষা অভ্রান্ত বলে দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে। এ লক্ষ্যে তারা দেশে দেশে সশস্ত্র সংগ্রাম করছে, নিতান্ত সন্ত্রাসী কায়দায়। বিজ্ঞানের তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রযুক্তি আধুনিক মানুষের ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় জীবনকে আজ নিযন্ত্রণ করছে। আজ বিশ্ব মানবগোষ্ঠীর জীবনের হেন ক্ষেত্র নেই যেখানে প্রযুক্তি প্রবেশ করেনি। মজার ব্যাপার হল, এ প্রযুক্তি ব্যবহারে ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ ভেদে কোন বৈষম্য নেই, নেই কোন অনীহা। আধুনিক যুগে এমন কোন গোঁড়া ধর্মবেত্তা পাওয়া যাবে না, যিনি বিজ্ঞানের আবিস্কার নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার থেকে নিজেকে বিরত রেখেছেন। তাই বিজ্ঞান সর্বজনীন এবং ধর্মনিরপেক্ষ। ইসলামী বিজ্ঞান, খৃষ্ট্রীয় বিজ্ঞান, হিন্দু বিজ্ঞান, বৌদ্ধিক বিজ্ঞান কিংবা ইহুদী বিজ্ঞান বলে কোন বিজ্ঞান হতে পারেনা। কিন্তু পৃথিবীতে বিদ্যমান কোন ধর্মই সর্বজনীন নয়। বরং কোন এক ধর্মের বিশ্বাস অন্য ধর্মের বিশ্বাসকে নাকচ করে দেয় অর্থাৎ বিশ্বাসের দিক থেকেও তারা পরস্পর বিরোধী। এখানেও মজার ব্যাপার হল, বিশ্বাস যার একমাত্র ভিত্তি, সে আবার অন্যের বিশ্বাসকে নাকচ করার চেষ্টা করে যুক্তি দিয়ে। পৃথিবীতে ধর্মের সংখ্যা সহস্রাধিক। কোন ধর্মই তার শ্রেষ্ঠত্ব এবং খাটিত্বের দাবী পরিহার করেনি। বলা বাহুল্য পরস্পর বিরোধী সকল ধর্ম সত্য হতে পারেনা। ধর্ম ও বিজ্ঞানের এ বিরোধ বা দ্বন্দ্ব সহজাত। বিজ্ঞান ও ধর্মের উৎপত্তির ইতিহাসে এর বীজ নিহিত।

সমাজতত্ত্ব ও দর্শনের ছাত্র মাত্রেই জানেন, সামাজিক সত্ত্বা, সামাজিক চেতনার নির্ধারক। অর্থাৎ বিদ্যমান সামাজিক সত্ত্বার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে সামাজিক চেতনা। সমাজ-সভ্যতার ক্রম বিকাশের ধারা সম্পর্কে যাদের ন্যুনতম জ্ঞান আছে, তারা জানেন মধ্যযুগীয় সমাজ বাস্তবতায় যখন উৎপাদন-সম্পর্ক ছিল সামন্তবাদী ভূ-স্বামী ও ভূমি দাস, তখন মানুষ প্রকৃতির উপর ছিল নিতান্ত অসহায়। অবিকশিত উৎপাদিকা শক্তির ফলে খেয়ালী প্রকৃতির কাছে মানুষের অসহায়ত্বের কারণে মানুষ অলৌকিক শক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে নানা বালা মুসিবত থেকে মুসকিল আসান হওয়ার উপায় অনুসন্ধান করতে গিয়েই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণকারী কোন পরম শক্তির আশ্রয় প্রার্থণা, অতঃপর পরমাত্মায় বিশ্বাস স্থাপন করে। এ বিশ্বাস থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। এভাবে মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী যুগে ধর্ম মূল সামাজিক চেতনার স্থান দখল করে নেয়। কিন্তু লোহার আবিস্কার ও ব্যবহার, বিশেষভাবে জেম্স ওয়াটের বাস্পীয় ইঞ্জিন আবিস্কার উ্পাদিকা শক্তির বিকাশে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সাথে বিদ্যমান উ্পাদন সম্পর্কের দ্বন্দের ফলে সামন্তবাদী সমাজ ভাঙ্গার ঘন্টা বেঁজে ওঠে। সামন্তবাদী সমাজের গর্ভে জন্ম নেয় পুঁজিবাদী সমাজ। অন্ধ নিয়তি বিশ্বাসের বিপরীতে কাযর্-কারণ সম্পর্ক মানুষের চিন্তায় আসে। ধর্মীয় বিশ্বাসের বিপরীতে যুক্তি চিন্তা তথা বিজ্ঞান ক্রমানয়ে সামাজিক মূল চেতনার জায়গা দখল করতে থাকে। এভাবে বৈজ্ঞানিক চেতনার বিকাশের সাথে ধর্মীয় চেতনার বিলয় ঘটতে থাকে। ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিকাশ যেন ব্যাস্ত আনুপাতিকথ একটি বাড়লে অন্যটি কমবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, আজ একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের এ চরম উৎর্ষতার যুগেও ধর্ম এখনো কিভাবে দোর্দণ্ড প্রতাপে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিরাজ করছে? এ প্রশ্নের জবাবও আমাদের খুঁজতে হবে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার কারণের মধ্যে।

মানুষের চেতনার সামাজিক ভিত্তি

উপরোক্ত বিষয়ে দার্শনিক প্রত্যয় হল- সামাজিক সত্তার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সামাজিক চেতনা। সামাজিক সত্ত্বা হল একটি সমাজের সামগ্রিক আবহ, যার মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশকেও যোগ করা যায়। মানুষের ব্যক্তি চেতনার সমন্বিতরূপ হল একটি জনগোষ্ঠির সামাজিক চেতনা, যদিও ব্যক্তি চেতনা সবসময় সামাজিক চেতনার প্রতিনিধিত্ব করেনা। ব্যক্তি চেতনার প্রাথমিক ভিত্তি হল পারিবারিক আবহ। একটি শিশু জন্মের প্রাক্কালে যেমন তার আত্মজেরা শিশুর উপযোগী পরিধেয় বস্ত্র তৈরী করে রাখে, ঠিক তেমনি তার জন্মের পূর্বে তার পরিবারে তার জন্য বিশ্বাস-চেতনা-মূল্যবোধের একটি অদৃশ্য অবয়ব তৈরী হয়ে তাকে, জন্মের পর তৈরী পোশাকের মত ধীরে ধীরে নবজাতকও সে অবয়বে প্রবেশ করে। অতঃপর ক্রমে যখন এ শিশু আরো বেড়ে ওঠতে থাকে এবং সে ক্রমে পরিবারের গণ্ডি পেরিয়ে সামাজিক আঙ্গিনায় প্রবেশ করে, তখন মানুষের সঙ্গবদ্ধ আচার-আচরণ তার উপর প্রভাব ফেলে। পারিবারিক চেতনার অদৃশ্য অবয়বের মত যে সমাজের সে বাসিন্দা, সে সমাজও তার জন্য চিন্তা-চেতনা-মূল্যবোধের একটি অবয়ব আগাম তৈরী করে রাখে, তাকে পরিবর্তন নয়, তার মধ্যেই সে নিজেকে মানিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস একান্ত ব্যক্তি বিশ্বাস হলেও জন্ম লগ্ন থেকে প্রত্যেক ধর্ম ধর্মানুসারীদের গোষ্ঠীবদ্ধ আচার-আচরণের কারণে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এভাবে মানুষের চিন্তা চেতনা একটি সামাজিক সত্ত্বার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এখন আমরা যদি বিশ্বপ্রেক্ষিতে বিশ্ব মানব সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের দিকে তাকাই, তাহলে আমরা দেখব এ বিকাশ নানা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে সমসত্ত্ব নয়, বরং নিদারুন অসম। বিশ্বের কোন কোন দেশে সমাজ ব্যবস্থা এখনো মধ্যযুগে অবস্থান করছে শুধু চিন্তা চেতনাগত ভাবে নয়, উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও। ফলত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে পশ্চাদপদ, সেখানে মানুষের চিন্তা চেতনা ও পশ্চাদপদ হতে বাধ্য। বিজ্ঞানের আধুনিক প্রযুক্তি যদিও সে সকল সমাজে পৌছে গেছে উপছে পড়া তত্ত্বানুসারে, কিন্তু বিজ্ঞানের দর্শন সেখানে এখনো জায়গা করে নিতে পারেনি। নির্মম ফলশ্র“তিতে ঐ সকল পশ্চাদপদ সমাজ

এখনো মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনা-মূল্যবোধ এর জন্ম, বিকাশ ও লালনের উর্বর ক্ষেত্র হয়ে আছে। এখানে পাল্টা প্রশ্ন আসতে পারে, যে সকল দেশ, বিশেষভাবে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্মৃদ্ধ দেশগুলো, প্রযুক্তিগতভাবে তাদের দেশ ও সমাজকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছে, তথাপিও সে সকল দেশ এখনো ধর্মভিত্তিক দেশ হিসাবে কিভাবে টিকে আছে এবং ধর্মীয় চেতনা ও মূল্যবোধ কিভাবে তাদের সমাজের এখনো মূল চেতনার জায়গা দখল করে আছে?

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, ধর্ম একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক স্বয়ং রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এ প্রতিষ্ঠান তার তাত্ত্বিক ভিত্তিকে সুরক্ষার জন্য সর্বগ্রাসী প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে অনুক্ষণ। কারণ এ সকল রাষ্ট্র এখনো জনগণের রাষ্ট্র হয়ে ওঠতে পারেনি। বরং বিভিন্ন শেখ পরিবার দীর্ঘদিন যাবত তাদের মৌরসী তালুক হিসাবে এ সকল রাষ্ট্রের জনগণকে শাসন-শোষণ করে যাচ্ছে এবং সে ক্ষেত্রে তাদের অব্যর্থ হাতিয়ার হল ধর্ম। তাই বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার এ যুগে, পেট্রোডলারের বদৌলতে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সে সব দেশে পৌছলেও বিজ্ঞানের মূল যে দর্শন, তাকে সেখানে পৌছতে দেওয়া হচ্ছে না। রাষ্ট্রযন্ত্র সেখানে অতন্দ্র প্রহরীর মত পাহারা দিচ্ছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধকে। এর বিরুদ্ধে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় একটু রা করলে একেবারে শিরোচ্ছেদ। তাই সমাজের অবকাঠামো আধুনিক হলেও তার উপরিকাঠামো, প্রশাসন, বিচার, শিক্ষা ইত্যাদি রয়ে গেছে এখনো মধ্যযুগীয় এবং যতদিন তা ধরে রাখা যাবে, ততদিনই নিরাপদ ও নিরঙ্কুশ থাকবে শেখ পরিবারগুলোর স্বার্থ। তবে বলাবাহুল্য, এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলেও চিরস্থায়ী হবে না।

মানবগোষ্ঠীকে এগিয়ে যেতেই হবে

এ কথা আজ বলা বাহুল্য যে, বিশ্ব মানবগোষ্ঠী, তার সমাজ ও সভ্যতা, জন্মলগ্নের অবস্থায় দাঁড়িয়ে নেই। তার ক্রম বিকাশ মানব সভ্যতাকে বিকাশের এক অভাবনীয় পর্যায়ে উপনীত করেছে। মানুষের এ অগ্রযাত্রা অপ্রতিরোধ্য এবং তার গন্তব্য নিঃসীম। প্রকৃতিকে জয় করে মানুষের জীবনকে আরো সম্ভাবনাময়, সহজ ও সুখপ্রদ করতে হলে আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে। সেক্ষেত্রে বিশ্বপরিমণ্ডলের তুলনায় আমাদের মত পশ্চাদপদ দেশগুলোর এগিয়ে যাওয়ার তাগিদত অপরিহার্য। কারণ বিশ্ব প্রেক্ষিতে আমরা ইতোমধ্যেই অনেক পিছিয়ে আছি। আমাদের কাঙ্খিক্ষত অগ্র যাত্রার যে রথ, নিঃসন্দেহে তা তো ধর্ম নয়, বিজ্ঞান। কিন্তু নির্মম বাস্তবতা হল ধর্ম নামক বিষয়টি আমাদের মত পশ্চাদপদ দেশে তথা সমাজে শুধু নিরেট বাস্তবতা নয়, মানুষের জীবনাচরণের অন্যতম নিয়ন্তাও। এখানেই প্রশ্নটা আসে, তাহলে আমরা কিভাবে এগুবো। দুই রথে দু'পা রেখে এগুনো যেমন যাবে না, তেমনি ধর্মীয় রথে ওঠে মোক্ষলাভের পরম চিন্তায় যে বিশাল জনগোষ্ঠী আত্মনিমগ্ন হয়ে আছে, তাদের কিভাবে বিজ্ঞানের রথে সওয়ার করা যাবে? এ পথ কি সংঘর্ষের না সমন্বয়ের?

ধর্ম ও বিজ্ঞানঃ সংঘর্ষ না সমন্বয়?

আধুনিক ধর্মবেত্তারা যতই প্রানান্তকর প্রয়াস পাক না কেন, বিজ্ঞান দিয়ে ধর্মকে প্রমাণ করা কিংবা বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে যৌক্তিক সমন্বয় সোনার পাথরবাটির মত অসম্ভব একটি প্রকল্প। কারণ বিষয়গতভাবে দু'টির তাত্ত্বিক ভিত্তি সম্পূর্ণ বিপরীত এবং একটি অপরটিকে নাকচ করে। তথাপিও সমাজের সর্ববৃহৎ অংশের মধ্যে ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা-মূল্যবোধের উপস্থিতিকে অস্বীকার করা যায় না। বিজ্ঞানের আবিস্কার সকল প্রকার প্রযুক্তি ব্যবহারে আধুনিক ধর্মবেত্তাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি না থাকলেও এবং অবলীলাক্রমে কি পারিবারিক কি সামাজিক জীবনে তারা এ সকল প্রযুক্তির সুফল ভোগ করলেও বিজ্ঞানের দর্শন যখন তাদের হাজার বছরের লালিত বিশ্বাসে

আঘাত হানে, তখন তারা রে রে করে তেড়ে আসে। বিপন্ন করে তুলে সে দর্শনের আবিস্কর্তাকে। তাই বিজ্ঞানের এ উৎকর্ষতার বেদীমূলে অনেক বিজ্ঞানীকে আত্ম বলি দিতে হয়েছে যার ভুরি ভুরি নজির ইতিহাসে বিদ্যমান। তাহলে কি ধর্মের সাথে সমন্বয় করে এগুনোর প্রয়াস পেতে হবে? তা কিভাবে সম্ভব? বিজ্ঞান যে সত্য আবিস্কার করেছে তাকেত অস্বীকার করা যায়না। সমন্বয় করলেত দেয়া-নেওয়ার প্রশ্ন আসবে। এখানে দেওয়া নেওয়ার সুযোগ কোথায়?

রণনীতি ও রণকৌশলগত একটি প্রকল্পের প্রস্তাবনা

ধর্মকে বিজ্ঞানের সাথে সমন্বয় যেমন একটি অসম্ভব প্রকল্প, তেমনি তার অবস্থান ও আমজমগণের মানসে তার সুদৃঢ় শিকড়কে অস্বীকার করে জনগণের মানস পরিবর্তনের প্রয়াসও প্রায় অসম্ভব একটি ধারণা। তাই সমাজ তথা রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিতে হলে, যারা আদপেই সমাজকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে চান, তাদের কিছু রণকৌশল অবলম্বন করতে হবে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যটা (রণনীতি) স্থির করতে হবে দু'টি প্রেক্ষিত মাথায় রেখে,

এক) জ্ঞানগত দিক তথা দার্শনিক প্রেক্ষিত,

দুই) সমাজ ও রাষ্ট্র উন্নয়নমূলক প্রেক্ষিত.

জ্ঞানগত বা দার্শনিক প্রেক্ষিত

এখানে মূল প্রশ্নটা জ্ঞান ও দর্শনের। জ্ঞানগতভাবে সত্যের সাথে মিথ্যা, কিংবা ভুলের সাথে শুদ্ধের যেমন কোন সমন্বয় বা সমঝোতা চলেনা এবং এ জাতীয় প্রশ্নই বরং অবান্তর, ঠিক তেমনি ধর্ম তথা বিশ্বাসের সাথে বিজ্ঞানের সমন্বয় বা সমঝোতার কোন সুযোগ নেই। এখানে সাংঘর্ষিক হলেও বিজ্ঞানের চর্চা অব্যাহত থাকবে। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিস্কার বা অগ্রগতি যদি প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের ভীতে আঘাতের পর আঘাত হানে, কারো তথাকথিত ধর্মীয় অনুভূতিতে লাগে এবং কারো আজন্ম লালিত বিশ্বাসে ভীত উপড়েও ফেলে, তবুও বিজ্ঞানের আবিস্কারকে অস্বীকার করা কিংবা ধর্মের আলোকে তাকে জায়েজ করে নেওয়ার কোন সুযোগ নেই এবং তার প্রয়োজনও নেই। বরং তা করতে গেলে মানুষের চিন্তা সীমাবদ্ধ ও বুদ্ধি আড়ষ্ট হয়ে পড়বে। বিজ্ঞানের যে অভিযাত্রায় তাকে বাঁধাহীনভাবে চলতে দিতে হবে জ্ঞানের রাজ্যে। তার অগ্রগতির মাধ্যমে অজ্ঞনতার আধাঁর ধীরে ধীরে তিরোহিত হবে।

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত

আমরা পুর্বেও আলোচনা করেছি যে, বিজ্ঞানের এ চরম উৎকর্ষতার যুগেও পৃথিবীর সর্বাংশে আর্থ-সামাজিক বিকাশ সমভাবে ঘটেনি। একই ভাবে বিজ্ঞান ও জ্ঞানের বিকাশেও আছে মাত্রাগত তারতম্য। এখন জ্ঞানগত দিক থেকে আমরা যেমন বিজ্ঞান ও ধর্মের সাথে কোনরূপ সমন্বয় সমঝোতা ছাড়া এগুতে চাই, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে তা করতে গেলে এগুনোই যাবেনা। সমাজে বিদ্যমান সামাজিক চেতনা, তা যত পশ্চাৎপদ হউক না কেন, তাকে এক ধাক্কায় গুড়িয়ে দেওয়া যাবে না। বরং তা করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে প্রতিক্রিয়ায় নতুন

করে চাঙ্গা হবে ধর্মীয় বিশ্বাস। আবার সমাজের প্রত্যেক মানুষকে বৈজ্ঞানিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ বা সচেতন করে আমরা উন্নয়ন অগ্রগতির পথে এগুবো, সে ধারণাও অবাস্তব। এখানেই আসে ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের সমন্বয়ের প্রশ্নটি। তবে এ সমন্বয় অবশ্যই বিজ্ঞানের কোন সত্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে নয়, তা প্রকাশে "সহনীয় সীমারেখা" মেনে চলে। কথাটি একটু খোলাসা করি। বিজ্ঞানে এমন কিছু সত্য আছে বা আবিস্কৃত হবে, যা ধর্মের অস্থিত্বের উপর সরাসরি আঘাত হানবে। সে সকল সত্য প্রকাশে আমাদের যে কৌশল নিতে হবে, তাহলো যুক্তি-তর্ক, কার্য-কারণ চর্চা বা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমজনতাকে ক্রমান্বয়ে প্রস্তুত করে ধীরে ধীরে নব আবিস্কৃত সে সত্যকে তার সামনে তুলে ধরা, যাতে আজন্ম বিশ্বাস আচমকা ভেঙ্গে গেল বলে তাদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে না পড়ে। এ পদ্ধতিটাকে আমি ''সত্য প্রকাশের সহনীয় মাত্রা'' বলতে চাচ্ছি, যদিও আমার জানা নেই এ জাতীয় কোন প্রত্যয় আগে কেহ ব্যবহার করেছেন কিনা। আধুনিক ধর্ম-বেত্তারা তার বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার শেষ চেষ্টা হিসাবে যতই বিজ্ঞানের আলোকে ধর্মকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পাক না কেন, বিষয়টাকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনে আমাদের কেবল বৈজ্ঞানিক সত্যটাকে আমজনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে, যুক্তি-তর্ক ও কার্য-কারণ ব্যাখ্যা করে। ধর্মের বিরুদ্ধে সরাসরি কোন মন্তব্য করার প্রয়োজন নেই। তা আপনি-আচরি শুকিয়ে যাবে। কিন্ত এক্ষেত্রেও আমাদের অবিচল থাকতে হবে রণনীতিতে, অর্থাৎ আমাদের লক্ষ্যে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি আমজনগনকে বিজ্ঞানমনস্ক করার একটি সচেতন প্রয়াস চালাতে হবে বিরামহীনভাবে। তাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অগ্রগতির সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক চেতনার বিকাশের পথও হবে সুগম। এ পদ্ধতিতে অনুশীলনের ফলে এমন একটি সময় আসবে, তখন বিজ্ঞানের সাথে ধর্ম, যুক্তির সাথে বিশ্বাসের এবং কার্য-কারণের সাথে অলৌকিকত্বের সমন্বয়ের প্রশ্নটা অবান্তর হয়ে ওঠবে। তবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বা উদ্যোগ ছাড়া এ প্রয়াসকে সহজতর করবে। এ এক সাংস্কৃতিক লড়াই যাকে যুগপৎ অনেক ফ্রন্টে যুদ্ধ করে যেতে হবে। এর সহজ ও সংক্ষিপ্ত অন্য কোন বিকল্প নেই।

মোঃ জানে আলম, গবেষণা, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিষয়ক সম্পাদক, গণফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটি। ইমেইল- jalamadv@yahoo.com

ধর্মের স্বরূপ এবং বিজ্ঞান

আবুল হোসেন খোকন

মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষের সিংহভাগই মনে করেন ইসলাম ধর্ম আবির্ভাবের আগে পৃথিবীর মানুষ ছিল পুরো অসভ্য-বর্বর এবং পশুতুল্য। জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতার মতো কোন কিছুই তখন ছিল না তাদের মধ্যে। ইসলাম এসে অন্ধকার (ধর্মীয় পরিভাষায় যাকে বলা হয় আইয়ামে জাহেলিয়া) যুগ থেকে সবাইকে উদ্ধার করেছে এবং পৃথিবীতে শান্তি, সভ্যতা– ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু এটা যে কতোবড় ভুল এবং মিথ্যা ধারণা– তা কেবল ইতিহাস জানলেই ধরা য়ায়। ইতিহাসের প্রকৃত সত্য হলো ইসলাম কোন রকম অন্ধকার থেকেই মানুষকে উদ্ধার করেনি। বরং ইসলাম আসার আগেও যেমন পৃথিবীতে সভ্যতা, শিক্ষা, জ্ঞান-গরিমা, শান্তি ছিল; আবার তেমন ইসলাম আসার পরেও পৃথিবীতে অসভ্যতা, অশিক্ষা, বর্বরতা, অশান্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি সবই ছিল এবং আছে। অর্থাৎ আগেও পৃথিবীতে ভাল-মন্দ দুই-ই ছিল, পরেও তা আছে। ইসলাম এসে এখানে কোন পরিবর্তন আনেনি।

ইতিহাসে ফিরে যদি প্রশ্ন করা হয়, ইসলামের আবির্ভাব কখন? উত্তর পাওয়া যাবে যে, ইসলামের আবির্ভাব এখন থেকে ১ হাজার ৩শ' ৯৮ বছর আগে, ৬১০ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ এখন থেকে ১ হাজার ৪শ' ৩৮ বছর আগে (৫৭০ খ্রিস্টাব্দে) ইসলামের আবির্ভাবক হযরত মুহম্মদ জন্ম গ্রহণের ৪০ বছর পর (৬১০ খ্রিস্টাব্দে) নবুয়তপ্রাপ্ত হয়ে ইসলাম ধর্মের সূচনা ঘটান। মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন, এর পর থেকেই পৃথিবীতে সভ্যতা বা সু-সভ্যতা আসে। কিন্তু বাস্তব হলো, ইসলামের আবির্ভাব ঘটার আগেও রয়েছে ৪ হাজার ৬শ' ১০ বছরের সভ্যতার ইতিহাস। এই সু-দীর্ঘ সময়ের ইতিহাসে রয়েছে আজকের আধুনিক অবস্থার চেয়েও বিস্ময়কর সভ্যতা, জ্ঞানী-গুণি মানুষ, সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী, জীবন-যাপন ব্যবস্থাপনা, চিন্তা-ভাবনা, আবিস্কার, স্থাপত্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং আর্থ-সামাজিক জীবন ব্যবস্থা। সভ্যতার ক্ষেত্রে দেখতে পাবো ইসলামের আবির্ভাবের ৪ হাজার ৬শ' ১০ বছর আগে (৪ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে) প্রাচীন মিশর ও মেসোপটোমিয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে, ৪ হাজার ১০ বছর আগে (৩ হাজার ৪শ' খ্রিস্টপূর্বাব্দে) টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদী তীরে সুমেরীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে, ৩ হাজার ৬শ' ১০ বছর আগে (৩ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে) সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে, ৩ হাজার ৪শ' ৮০ বছর আগে (২ হাজার ৮শ' ৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) ট্রয়ে মানববসতি স্থাপিত হয়েছে, ১ হাজার ৬শ' ১০ বছর আগে (১ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে) জেরুজালেম নগরী প্রতিষ্ঠা হয়েছে, ১ হাজার ৪শ' ১০ বছর আগে (৮শ' খ্রিস্টপূর্বাব্দে) ফিলিসিয়াদের দ্বারা কার্থেজ নগরী প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, প্রায় দেড় হাজার বছর আগে (৪শ' ৪৭-৪শ' ৩৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) পার্থেনল নির্মাণ হয়েছে। আমরা যদি পৃথিবী বিখ্যাত অমর কীর্তির ইতিহাস খুঁজি তাহলেও দেখবো ইসলামের আবির্ভাবের ৩ হাজার ৬শ' ১০ বছর আগে (৩ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে) মিশরে পিরামিড নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে, ৩ হাজার ৩শ' ১০ বছর আগে (২ হাজার ৭শ' খ্রিস্টপূর্বাব্দে) গীর্জার বৃহত্তর পিরামিড নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে, ৩ হাজার ২শ' ১০ বছর আগে (২ হাজার ৬শ' খ্রিস্টপূর্বাব্দে) ফারাও থিউপসের জন্য সর্বোচ্চ পিরামিড তৈরি হয়েছে, ১ হাজার ৩শ' ৮৬ বছর আগে (৭শ' ৭৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) গ্রীসে প্রথম অলিম্পিকের সূচনা হয়েছে, ১ হাজার ৩শ' ৬৩ বছর আগে (৭শ' ৫৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে, ৮শ' ৩০ বছর আগে (২শ' ২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) চীনের মহাপ্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে, ১শ' ৭২ বছর আগে (৪শ' ৩৮ খ্রিস্টাব্দে) "জাস্টিয়ান কোড" আইন তৈরি হয়েছে, ৮০ বছর আগে (৫শ' ৩২ খ্রিস্টাব্দে) সেন্ট সোফিয়া গীর্জার নির্মাণ হয়েছে।

আমরা যদি বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী কিংবা দার্শনিকদের ব্যাপারে দেখি তাহলে পাবো– ইসলামের আবির্ভাবের ১ হাজার ৪শ' ৯৫ বছর আগে (৮শ' ৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) মহাকবি হোমার-এর জন্ম হয়েছে, ১ হাজার ২শ' ৫০ বছর আগে (৬শ' ১০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) গ্রীস দেশের আদি দার্শনিক থেলিস-এর জন্ম হয়েছে, আনাক্সিমান্দর-এর জন্ম হয়েছে, ইতালির

দার্শনিক পিথাগোরাস-এর জন্ম হয়েছে, ১ হাজার ২শ' ৩০ বছর আগে (৬শ' ২০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) গল্পকার ঈশপের জন্ম হয়েছে, ১ হাজার ১শ' ৭০ বছর আগে (৫শ' ৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) দার্শনিক জেনোফেন্স-এর জন্ম হয়েছে, ১ হাজার ১শ' ৬১ বছর আগে (৫শ ৫১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) চীনা দার্শনিক কনফুসিয়ানের জন্ম হয়েছে, ১ হাজার ১শ' ১৩ বছর আগে (৫শ' ৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) দার্শনিক হিরাক্লিটাস-এর জন্ম হয়েছে, ১ হাজার ১শ' ১০ বছর আগে (৫শ' খ্রিস্টপূর্বাব্দে)

প্রধান যুদ্ধ-বিগ্রহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুণ্ঠন, দেশ দখলের ঘটনা	
ইসলামের আবির্ভাবের আগে (সাড়ে ৪ হাজার বছরের চিত্র)	ইসলামের আবির্ভাবের পরে (১ হাজার বছরের চিত্র)
খ্রিস্টপূর্বাব্দে	খ্রিস্টাব্দে
o মিশরীয় সৈন্যদের যুদ্ধ অভিযান (২৮০০খ্রি:পূ:)	o মদিনায় মক্কাবাসীদের অবরোধ (৬২৭ খ্রিস্টাব্দ)
o আর্যদের আগমন (২৫০০)	o 'আল্লাহকে উপাস্য মানতে হবে' উল্লেখ করে সব দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে হযরত মুহম্মদের হুঁশিয়ারী-পত্র প্রেরণ (৬২৮)
o আর্যদের উত্তর ভারত দখল (১৯০০)	o হযরত মুহম্মদের মক্কা দখল (৬৩০)
o হিকসোদের দ্বারা মিশরের নীল অববাহিকা দখল, হিটাইটদের ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য দখল (১৮০০-১৭০০)	o হযরত আবুবকর কর্তৃক ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দমন অভিযান (৬৩২)
o মিশর থেকে হিকসোদের বিতাড়ন (১৫৮০)	o মুসলিম অভিযান চালিয়ে খ্রিস্টানদের কর্তৃত্বে থাকা প্যালেস্টাইন দখল (৬৩৪)
o গ্রীকদের ট্রয় অবরোধ (১১৮০)	o ইয়ারমুকের যুদ্ধ। মুসলিম অভিযান চালিয়ে সিরিয়া দখল (৬৩৬)
o টাইগ্রীস নদী তীরের আসিরীয় সাম্রাজ্যের পতন (৮০০)	o কাদেরিয়ার যুদ্ধ এবং মুসলিমদের দ্বারা পারস্য, মেসোপটোমিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিশর দখল (৬৩৮)
o আসিরীয়দের মিশর দখল (৭৯০)	o হযরত উমর কর্তৃক পারস্য ও খোরাসান দখল (৬৩৯)
o তিগনাথ পিলেসার কর্তৃক ব্যাবিলনীয়া দখল ও নব্য আসিরীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা (৭৪৫)	o মুসলিমদের দ্বারা আলেকজান্দ্রিয়া দখল (৬৪১)
o এসারডন কর্তৃক মিশরের হেবিস দখল (৬৮৩)	o আরবীয় মুসলিম বাহিনীর রোম সাম্রাজ্যে হামলা ও রোম বাহিনীকে পরাজিতকরণ (৬৪৩)
o আসিরীয় সাম্রাজ্যের পতন (৬১৬)	o রাইজানটাইন নৌবহরে মুসলিম হামলা ও পরাজিতকরণ (৬৫৫)
o ক্যালডিয়ানদের দ্বারা আসিরীয়া দখল ও দ্বিতীয় ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা (৬১২)	o কন্সট্যান্টিনোপলে আরবীয় মুসলিম বাহিনীর হামলা (৬৬৯)
o নেবুকাদনেজার কর্তৃক জেরুজালেম দখল (৬০৭)	o মুসলিম বাহিনীর সমরখন্দ দখল (৬৮৩)
o ম্যারাথন যুদ্ধে গ্রীকদের বিজয় (৮৯০)	o স্পেনে আরবীয় মুসলিম বাহিনীর হামলা ও দখল (৭১১)
o সাইরাস কর্তৃক পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা (৫৩৯)	o মুহম্মদ বিন কাশিমের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর সিন্ধু দখল (৭১২)
o পারস্য কর্তৃক ব্যাবিলন দখল (৫৩৮)	o ফ্রান্সে আরবীয় মুসলিম বাহিনীর হামলা (৭২০)
o পারসিকদের মিশর দখল (৫২৮)	o টরসের যুদ্ধ (৭৩২)
o ক্যাম্বেসিস কর্তৃক মিশর দখল (৫২৫)	o আরব সাম্রাজ্যে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলা (৮০৯)
o পারস্যরাজ জারেকসিস কর্তৃক গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান, এথেন্স দখল (৪৮০)	o আলফ্রেডের অভিযানে ডেনদের পরাজয় (৮৭৮)
o পেলোপেনিয়াস যুদ্ধ। স্পার্টা কর্তৃক এথেন্স দখল (৪৩১-৪০৪)	o ডেনমার্কের সুয়েইন কর্তৃক ইংল্যান্ড দখল (১০১৩)
o গলদের দ্বারা রোম নগরী দখল ও লুণ্ঠন (৩৯০)	o হ্যারল হেস্টিংসের যুদ্ধ (১০৬৬)
o ফিলিপ কর্তৃক গোটা গ্রীস দখল (৩৩৮)	o সেনজুক তুর্কীদের বাগদাদ দখল (১০৭১)
o আলেকজান্ডারের মিশর দখল (৩৩০)	o তুর্কীদের দ্বারা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের তীর্থস্থান দখল (১০৭৫)
o চন্দ্র মৌর্যের আক্রমনে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে গ্রীক বাহিনীর পরাজয়, সেনাপতি সেলুকাস বিতাড়িত (৩০৩)	o প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রুসেড (১০৯৯-১২৭০)
o দক্ষিণ ইতালি রোমের দখলে (২৭৫)	o কুর্দ নেতা গাজী সালাউদ্দিন কর্তৃক জেরুজালেম দখল (১১৮৭)
o রোম ও কার্থেজের মধ্যে যুদ্ধ (২৬৪)	o তৃতীয় ক্রুসেড (১১৮৯)
o মিলে-এর যুদ্ধে রোমের বিজয় (২৬০)	o ভারতের উত্তরাঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য ও শাসন প্রতিষ্ঠা (১১৯০)
o শিহ্-হেরা-টি কর্তৃক চীনের কর্তৃত্ব দখল (২৪৬)	o তারাইনের যুদ্ধ (১২৯২)
o রোম কর্তৃক স্পেন দখল (২১০-২০৬)	o চতুর্থ ক্রুসেড (১২০২)
o রোমান বাহিনীর সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধ (২০৪)	o চেঙ্গিস খানের পিকিং দখল (১২১৪)
o স্পেন রোমের দখলে (২০১)	o পঞ্চম ক্রুসেড (১২১৬)
o চীনে তাতারদের হামলা (১৬৬)	o মোঘলদের দ্বারা চীনের কিন সাম্রাজ্য দখল (১২৩৪)
o রোমানদের দ্বারা কার্থেজ ধ্বংস (১৪৬)	o ষষ্ঠ ক্রুসেড (১২৩৮)
o রোমে গৃহযুদ্ধ (৮৮)	o সপ্তম ক্রুসেড। মোঘলদের দ্বারা কিয়েভ ধ্বংস, রাশিয়া মোঘলদের করদরাজ্যে পরিণত (১২৪০)
o গ্রেট ব্রিটেনে জুলিয়াস সিজারের হামলা (৫৫)	o হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ দখল ও ধ্বংস (১২৫৮)
খ্রিস্টাব্দ বা খ্রিস্ট-পরবর্তী	o গ্রীকদের কন্সট্যান্টিনোপল পুনর্দখল (১২৬১)
o রোমান সম্রাট কুডিয়াসের ব্রিটেন অভিযান (৩০ খ্রিস্টাব্দ)	o অষ্টম ক্রুসেড (১২৭০)
o ফেউডিয়াসের ব্রিটেন দখল (৪৩)	o ডানিং যুদ্ধ (১২৯৭)
o সম্রাট টাইটাসের জেরুজালেম দখল ও ফিলিস্তিন থেকে ইহুদীদের বিতাড়ন (৭০)	o ফলকাকের যুদ্ধ (১২৯৮)
o রোমান সম্রাট টাজান কর্তৃক রোমানীয়া ও মেসোপটেমিয়াকে রোম-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্তকরণ (৯০)	o ব্যালকরাবার্নের যুদ্ধ (১৩১৩)
o গথ উপজাতিদের বিজয়, রোমান সম্রাট ডিসিউস নিহত (২৫১)	o ইংল্যান্ড-ফ্রান্স যুদ্ধ (১৩৩৭)
o রোমান সম্রাট থিওডোসিয়াস কর্তৃক গ্রীস ও ইতালি তেকে গথদের বিতাড়ন (৩৭৯)	o পরাটিয়ার্স যুদ্ধ (১৩৫৬)
o পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে বর্বরদের হামলা, ব্রিটেন থেকে রোমানদের বিদায় (৪০৭)	o ইংল্যান্ড-ফ্রান্স যুদ্ধ (১৩৬৯-১৩৭২)
	o স্কটদের দ্বারা ইংল্যান্ড দখল (১৩৮৫-৮৮)
	o নাইকোললিস যুদ্ধ (১৩৯৬)
	o তৈমুর লংয়ের ভারতবর্ষে হামলা ও দিল্লি লুট (১৩৯৮)
	o ইংল্যান্ড-ফ্রান্স যুদ্ধ (১৪১৫-২৯)

o স্পেন, পর্তুগাল, ইতালি, গল ও উত্তর আফ্রিকায় বর্বরদের একযোগে হামলা ((৪১০) o জ্যাভালদের দ্বারা রোম লুণ্ঠিত ((৪৫৫) o পশ্চিমাঞ্চলীয় রোম সাম্রাজ্যের পতন (৪৭৬) o জাস্টিয়ানের সেনাপতি বেলাসারিয়াস কর্তৃক রোম দখল (৫৩৬) o লম্বার্ডদের দ্বারা ইতালি দখল (৫৭৮) o রোমান সাম্রাজ্যের পতন (৬০০)	o অটোম্যান তুর্কীদের কন্সট্যান্টিনোপল দখল (১৪৫৩) o পানিপথের প্রথম যুদ্ধ। বাবরের দিল্লি দখল। সুলতান সুমাইয়ার হাঙ্গেরী দখল (১৫২৬) o সুলাইমান কর্তৃক ভিয়েনা অবরোধ (১৫২৯) o পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬) o হলদিঘাটের যুদ্ধ (১৫৭৪) o জুটপেলের যুদ্ধ (১৫৮৬) o ইংল্যান্ড-স্পেন যুদ্ধ (১৫৮৮)

দার্শনিক আনাক্সাগোরাস-এর জন্ম হয়েছে, ১ হাজার ৯৪ বছর আগে (৪শ' ৮৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) ট্র্যাজেডি রচনায় ইডিলাসের প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হোরোডেটাসের জন্ম হয়েছে, ১ হাজার ৭৯ বছর আগে (৪ শ' ৬৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে)

বিশ্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক সক্রেটিসের জন্ম হয়েছে, ১ হাজার ৭০ বছর আগে (৪শ' ৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হাইপোক্র্যাটস-এর জন্ম হয়েছে, দার্শনিক ডেক্রিটাসের জন্ম

হয়েছে, ১ হাজার ৬০ বছর আগে (৪শ' ৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) দার্শনিক এম্পিডোকলস-এর জন্ম হয়েছে, ১ হাজার ৪০ বছর আগে (৪শ' ৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) দার্শনিক লিউকিপ্পাসের জন্ম হয়েছে, ১ হাজার ৩৭ বছর আগে (৪শ' ২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) দার্শনিক প্লেটোর জন্ম হয়েছে, ৯শ' ৯৪ বছর আগে (৩শ' ৮৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) গ্রীস দার্শনিক এরিস্টটলের জন্ম হয়েছে, ৯শ' ৫০ বছর আগে (৩শ' ৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) মহা বিজ্ঞানী ইপিকুরাসের জন্ম হয়েছে, ৯শ' ১০ বছর আগে (৩শ' খ্রিস্টপূর্বাব্দে) মহাবিজ্ঞানী ইউক্লিডের জন্ম হয়েছে, ৮শ' ৯৭ বছর আগে (২শ' ৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের জন্ম হয়েছে, ৭শ' বছর আগে (১শ' খ্রিস্টপূর্বাব্দে) জুলিয়াস সিজারের জন্ম হয়েছে। এমনকি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ-এর জন্মের (৫৭০ খ্রিস্টাব্দ) ১ হাজার ১শ' ৬ বছর আগে (৫শ' ৩৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) জন্ম হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের, ৫শ' ৭৪ বছর আগে (৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) জন্ম হয়েছে খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রিস্টের। ঐতিহাসিক অনেক রাজনৈতিক ঘটনাও ঘটেছে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের আগে। যেমন ১ হাজার ১শ' ১৯ বছর আগে (৫শ' ৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে, ১ হাজার ৭১ বছর আগে (৪শ' ৬১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) এথেন্সে পেরিক্লিসের নেতৃত্বে এসেছে রাজনৈতিক স্বর্ণযুগ, ৬শ' ৮৩ বছর আগে (৭৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) স্পার্টাকাসে ঘটেছে ঐতিহাসিক দাস-বিদ্রোহ। সুতরাং কোনভাবেই বলার অবকাশ নেই ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের আগে, বা অন্য যে কোন ধর্মের আগে পৃথিবীতে সু-

প্রধান প্রধান ধর্ম এবং ধর্ম প্রবর্তনকারী		
সময়কাল	ধর্মগ্রন্থ	প্রবর্তনকারী
৮০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ (এখন থেকে ১০ হাজার বছর আগে)	ঋগ্বেদ (পরে বেদ)	ঋষিগণ
৬১৯৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ (এখন থেকে ৮ হাজার ২শ' ১ বছর আগে)	জেন্দ-আভেস্তা	জোরওয়াস্টার
৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ (এখন থেকে ৫ হাজার বছর আগে)	আমদুয়াত	-
১২৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ (এখন থেকে ৩ হাজার ২শ' ৯৩ বছর আগে)	বাইবেল (তৈরিত)	হযরত মুসা
১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ (এখন থেকে ৩ হাজার ৮ বছর আগে)	বাইবেল (জব্বুর)	হযরত দাউদ
৫১০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ (এখন থেকে ২ হাজার ৫শ' ১৮ বছর আগে)	বৌদ্ধ ধর্ম	গৌতম বুদ্ধ
২৬ খ্রিস্টাব্দ (এখন থেকে ১ হাজার ৯শ' ৮২ বছর আগে)	বাইবেল (ইঞ্জিল)	হযরত ইশা বা যীশুখ্রিস্ট
৬১০ খ্রিস্টাব্দ (এখন থেকে ১ হাজার ৩শ' ৯৮ বছর আগে)	কোরআন	হযরত মুহম্মদ

সভ্যতা ছিল না, সৃষ্টিশীলতা ছিল না, মানবতা ছিল না, আবিস্কার ছিল না, বিজ্ঞানী বা দার্শনিক ছিল না, শান্তি-শৃঙ্খলা ছিল না। বলা যাবে না মানুষ পুরো অসভ্য-বর্বর এবং পশুতুল্য ছিল। বলা যাবে না তাদের জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষা-দীক্ষা কোন কিছুই তখন ছিল না। বরং বলতে হবে তখন ছিল মহান এক উজ্জ্বল যুগ, যা অনেক দীর্ঘ ও সুবিশাল।

ধর্মের আবির্ভাব নিয়েও রয়েছে অনেক রাখ-ঢাক, লুকোচুরি। ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রথমে ঋষিরা কল্পনা দিয়ে ধর্মের প্রবর্তন ঘটিয়েছেন। তাদের থেকে এসেছে ঋগ্বেদ। পরে বেদ। তারপর ঋষিদের কল্পনাকে আরও খানিকটা যুগোপযোগী করে বা সংস্কার সাধন করে জোরওয়াস্টার কর্তৃক জেভ-আভেস্তা নামে ধর্মগ্রন্থের প্রবর্তন ঘটানো হয়েছে। তারপর আরও সংস্কার করে আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে আমদুয়াতের। এর উপর আরও সংস্কার সাধন করে আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে তৈরিত বাইবেলের। এরও সংস্কার সাধন করে আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে জব্বুর বাইবেলের। মাঝখানে আরও ভিন্নভাবে যুগযোপযোগী করে গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তন ঘটিয়েছেন বৌদ্ধ ধর্মের। এরপর আরও সংস্কার সাধন করে প্রবর্তন ঘটানো হয়েছে বাইবেল (ইঞ্জিল) নতুন নিয়মের। সবশেষে আরও খানিকটা সংস্কার সাধন করে প্রবর্তন ঘটানো হয়েছে কোরআর বা ইসলাম ধর্মের। যে কারণে প্রত্যেকটা ধর্মের সঙ্গেই প্রত্যেক ধর্মের মিল, বিশেষ করে আয়াত বা ধর্মবাক্যে মিল পাওয়া যায়। সর্বশেষ ধর্ম হিসেবে ইসলাম প্রবর্তনের সময় পুরনো ধর্মগ্রন্থগুলোর ভাল বাক্য বা বিষয়গুলো গ্রহণ করা হয়েছে, যুগোপযোগিতার কারণে আরবদের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না– এমন বিষয়গুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। এই ধর্ম প্রবর্তনকে সামনে রেখে প্রবর্তকের স্বার্থ-লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে কোরআনকে দীর্ঘ সময় ধরে নাজেল করার সুযোগে তৎকালীন আরব সমাজের আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তাল মেলাতে নানা বিষয় সংযুক্ত করা হয়েছে। যে কারণে অনেক বিষয়ই শেষপর্যন্ত স্ববিরোধী হয়ে পড়েছে এবং এক অবস্থানের সঙ্গে আরেক অবস্থানের সমন্বয়ের বড় রকমের অভাব তৈরি হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, তৎকালীন আরবের লোকেরা বা ধর্ম প্রবর্তক নিজেও পৃথিবী সম্পর্কে এতোই অজ্ঞ ছিলেন যে, ইসলামের আগে পৃথিবীর মানুষ 'আইয়ামে জাহেলিয়াত' যুগে ছিল বলে ভ্রান্ত ধারণা দেওয়া হয়েছে এবং সবচেয়ে অশিক্ষিত-অজ্ঞ আরবের লোকেরা তাই-ই বিশ্বাস করেছে। যা (ওই ভ্রান্ত ধারণা) আজও সব জায়গার মুসলমানদের বোঝানোর বা বিশ্বাস করানোর চেষ্টা হয়ে থাকে। আসলে পৃথিবী যে অন্ধকার যুগে ছিল না– তা ইতিহাসের পাতা উল্টালেই দেখা যায়।

সুতরাং একটা বিষয় পরিস্কার যে, ধর্মের প্রবর্তনই হয়েছিল কল্পনাকে ভর করে এবং সে ধর্ম আজও সেই কল্পনাতেই আছে। সে যে ধর্মই হোক না কেন। কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে যে কল্পনার স্থান নেই এবং কল্পনা যে প্রমাণহীন হতে বাধ্য– তা বলার অপেক্ষাই রাখে না। বিজ্ঞান প্রমাণনির্ভর, এবং প্রমাণ বা সত্যের উপর দাঁড়িয়েই বিজ্ঞানকে চলতে হয়। যা ধর্মের ব্যাপারে পুরো উল্টো, এবং সে কারণে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন সমন্বয় হতে পারে না। আর পৃথিবী এবং মানবসভ্যতার ইতিহাস হলো প্রমাণ নির্ভর, অর্থাৎ বিজ্ঞান নির্ভর। আর ধর্ম হলো কল্প-কাহিনী, সে কারণে তারপক্ষে প্রমাণের মুখোমুখী দাঁড়ানো সম্ভব নয়। সে জন্যই একে কল্পলোক দিয়ে অজ্ঞ মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা চালাতে হয়। একে জ্ঞান-সচেতনতা-সুশিক্ষা-ইতিহাসের সামনে শঙ্কিত, আতংকিত থাকতে হয়। ফলে ধর্ম সবসময়ই বিজ্ঞান বা জ্ঞানের প্রতিপক্ষ, শত্রু। কারণ এই বিজ্ঞানই যে ধর্মের নাশ বা যম। সুতরাং ধর্মের দারুণ ভয় বিজ্ঞানে।

বড় কথাটি হলো– মানুষ যতো জানবে ততো শিক্ষিত হবে, ততো বুঝবে, এবং ততো সত্য বা বস্তুতান্ত্রিক হবে। আর তা-হলেই ধর্মের জন্য মহাবিপদ। কারণ জানলে, শিক্ষিত হলে এবং বুঝলে– সত্যের জয়, বিজ্ঞানের জয়, বস্তুবাদের জয় হবে। আর পরাজয় বা বিলুপ্তি ঘটবে ভাববাদের, কল্পলোকের, তথা ধর্মের। সুতরাং সত্যই যেহেতু বিজ্ঞান, সেহেতু সত্যের প্রতিষ্ঠায় মিথ্যার ধবংস অনিবার্য। আর এ কারণেই ধর্ম বা ধর্মবাদীরা মৃত্যুভয়ে আতংকিত। এখানে আত্মরক্ষা পেতেই ধর্মবাদীদেরকে অবিরাম মরিয়া প্রচেষ্টা চালাতে হয়।

আরেকটা বিষয় হলো, ধর্মের জন্ম বা একে টিকিয়ে রাখার পেছনে বেশ কতগুলো কারণ রয়েছে। এ কারণের অন্যতম হলো– ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত স্বার্থরক্ষা করা, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এ গোষ্ঠীর লাভজনক বাণিজক্ষেত্র রচনা করা, ক্ষমতাবান হওয়া– সর্বপরি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে শোষণ-শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে মুষ্টিমেয় শোষকগোষ্ঠীর ব্যাপক স্বার্থরক্ষা করা। দেখা যাবে জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত এই কাজটিই নানা কৌশলে করে আসছে ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে কল্পিত পরলোক নামের এক লোভনীয় জায়গার লোভ দেখিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে শোষিত-শাসিত এবং লুণ্ঠন করতে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ পরিহার করে ধর্মকে তৈরি করতে হয় ভাববাদ বা কল্পলোকের ধারণা। ধর্ম এজন্যই ব্যবহার হয়ে এসেছে এবং আজও হচ্ছে। ঠিক এ কারণেই শোষকগোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদ এই ধর্মকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রণান্ত চেষ্টা করে থাকে। আর বিজ্ঞান সব সময়ই আর্থ-রাজ-সামাজিক সকল ক্ষেত্রে মানুষকে বস্তুবাদের ভিত্তিতে– তথা সত্যের উপর দাঁড় করিয়ে তাঁর স্বার্থরক্ষা করতে চায়। যেহেতু পৃথিবীতে মানুষ মূলত দুইভাগে বিভক্ত- শোষক ও শোষিত, আর যেহেতু শোষিত মানুষই সিংহভাগ– সেহেতু ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠী হিসেবে শোষকগোষ্ঠীর স্বীয়-স্বার্থরক্ষায় ধর্মকে ব্যবহার করতে হয় এবং এই ধর্মকে শোষিত মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে হয়। এ অবস্থায় সিংহভাগ মানুষের জন্য যেমন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োজন শোষণমুক্তি, তেমন সত্যের উপর দাঁড়াতে প্রয়োজন বিজ্ঞান। এ দুটো যতো পূরণ বা বিকশিত হবে, ধর্মের মৃত্যু ততো ঘনিয়ে আসবে। এখানে একে-অপরের সমন্বয়ের কিছু নেই। বরং আছে সংঘাত, এবং অনিবার্যভাবে আছে মিথ্যার ধবংস বা মৃত্যু।

- আবুল হোসেন খোকন : সাংবাদিক-লেখক ও মানবাধিকার কর্মী।

ধর্ম নয় বিজ্ঞান

আকাশ মালিক

মুসলমানের গৃহে জন্ম নেয়ার পর পৃথিবীর দিকে চোখ মেলে তাকানোর আগেই আজানের মাধ্যমে যে শব্দটি আমার কানে শুনিয়ে দেয়া হয়েছিল তা'হলো 'আল্লাহ্'। তারপর যখন শিশু থেকে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকলাম, আমাকে বলা হলো আল্লাহকে ঘিরে বেশকিছু ধর্মীয় অদৃশ্য ভয়ঙ্কর বস্তু ও কাহিনীর উপর বিশ্বাস করতে। আর কিশোর বয়সে জানতে পারলাম পৃথিবীতে দৃশ্যমান বস্তুর উপর বিস্ময়কর কাহিনী। অদৃশ্য ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে আল্লাহ, জ্বীন, পরী, শয়তান, ফেরেস্তা, তকদির, ভুত, প্রেত, আত্মা, বেহেস্ত, দোজখ, আরশ, কুরছি, পাপ, পুণ্য, ফুলছিরাতের পুল, মিজান পাল্লা, হাসরের মাঠ, এর কোনটাই অনুভব করা যায় না, শুনা যায় না, দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না। জাগতিক দৃশ্যমান বিস্ময়কর বস্তুর মধ্যে যেমন ভুকিম্প, রংধনু, কলেরা, বিজলী, বজ্রপাত, চাঁদের বুড়ীর সুতা, চন্দ্রগ্রহণ-সূর্য্যগ্রহন, এদের অনুভব করা যায়, শুনা যায়, দেখা যায় অথবা ছোঁয়া যায়। বড় হয়ে বিজ্ঞানের বই পড়ে জানতে পারলাম 'রংধনু' সাত পরীর আকাশ ভ্রমনের সাঁকো, 'কলেরা' এক জমদূতের নাম, 'বিজলী' আল্লাহ্র শয়তান মারার অস্ত্র, চৈতালী রাতে বিলের পাড়ে ভুতের আগুন সহ চাঁদের বুড়ীর সুতা কাটার কাহিনী, ভুকিম্পে মাটির নীচে ষাঁড়ের শিংয়ের কাহিনী, চন্দ্রগ্রহণ-সূর্য্যগ্রহণে টাকা-কড়ি দেনা-পাওনার কাহিনী, সন্ধ্যাকাশের রক্তিম মেঘ হাসান-হোসেনের রক্ত, এ সব গুলোই মিথ্যে। আমরা যেমন চাঁদের বুড়ীর সুতা কাটা বা রংধনুতে সাত পরীর আকাশ ভ্রমন দেখি নাই তেমনি নবী মুহাম্মদের (দঃ) চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করা, স্বশরীরে শপ্ত-আকাশ ভ্রমন করাও দেখি নাই। বিদ্যাঙ্গনে প্রবেশের আগ পর্যন্ত উভয় প্রকার বিশ্বাসে কোন খাদ ছিল না। সবই ছিল পরম সত্য। তাহলে নবী ইব্রাহীমের অগ্নিকুন্ডে ফুলের বাগান, পিতাবিহীন ঈসা নবীর জন্ম, আল্লাহ্র সাথে মুসা পয়গাম্বরের কথা বলা, মাছের পেটে ইউনুসের বেঁচে থাকা, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সুলাইমান নবীর উড়ে বেড়ানো, বেহেস্তে দুধের নদী, ডানাকাটা পরী, নরকের ভয়ঙ্কর আগুন, বিষাক্ত সাপ, এ সব কাহিনীর সত্যতার প্রমান কি? আমরা সেই সকল কাহিনীর সাক্ষী নই আর যারা তা রচনা করেছিলেন তাদেরকে দেখি নাই বলেই কি তা সত্য বলে মনে নেবো? আমাদের চক্ষুগোচরের জগত ও জীবন নিয়ে কোরআন ও হাদিস যা বলছে তা শুধু অযৌক্তিক অবৈজ্ঞানিকই নয় চরম ক্ষতিকর, অমানবিক এবং অনেক সময় হাস্যকরও বটে। দিনের দুপুর বেলা সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে মোহাম্মদ (দঃ) লক্ষ্য করলেন তাঁর নিজের ছায়া পায়ের নিকটে, আবার বিকেলের রোদে দাঁড়িয়ে দেখলেন ঐ ছায়া অনেক লম্বা হয়ে যায়। তাঁর এই অভিজ্ঞতা প্রকাশ করলেন কোরআনের সুরা ফুরকানে। *'আলাম তারা ইলা রাব্বিকা কাইফা মাদ্দাজিল্ল----------'।* 'তুমি কি দেখোনি কি ভাবে তোমার প্রভু ছায়া বিস্তার করেণ? তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। এরপর আমি সুর্য্যকে করেছি এর নির্দেশক'। (সুরা ফুরকান, আয়াত ৪৫)। বিষয়টা আরেকটু পরিস্কার করা হয়েছে পরের আয়াতে। *'ছুম্মা কাবাজনা-হু ইলাইনা কাবজান ইয়াসিরা'।* 'তারপর ধীরে ধীরে আমি একে টেনে নেই আমার নিজের দিকে'। (সুরা ফুরকান, আয়াত ৪৬)। আল্লাহ ছায়াকে টানেন, না সুর্য্যকে

টানেন? সুর্য্যতো কোথাও যায় না। আল্লাহ নিজে কোথায়. যে সুর্য্যকে টেনে নিজের দিকে নিয়ে যান? আজিকার দিনের দশ বৎসরের শিশুরাও এমন কথা শুনলে হাসতে হাসতে বগলের নীচে মুখ লুকোবে। এই সুরায় মোহাম্মদ (দঃ) আরো বল্লেন- *'আল্লাজি কালাকাছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদা--------'।* তিনিই এই মহাকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও এর মধ্যকার সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করে তারপর আরশে সমাসীন হলেন'। ((সুরা ফুরকান, আয়াত ৫৯)। মোহাম্মদ (দঃ) ছয় দিনের হিসেবটা কোথায় পেলেন? তার তৈরী ধর্ম ইসলামের সবটুকুই আদিপুস্তক তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাব থেকে ধার করা। ভ্রান্ত সব ধারণা এসেছে সেখান থেকেই। আদিপুস্তকে ছয় দিনে বিশ্ব সৃষ্টির কাহিনীতে বলা হয়েছে ঈশ্বর চন্দ্রকে রাতের বাতি ও সূর্য্যকে দিনের বাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছিলেন তৃতীয় দিনে যাতে জগতের মানুষ সময়, দিন, রাত্রী, মাস, বৎসর গণনা করতে পারে। তাহলে সূর্য্য বিহীন প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন গণনা হলো কি ভাবে? শুধু আদিপুস্তকেই চন্দ্রকে আলো বিকিরণকারী বাতি হিসেবে উল্লেখ করা হয় নাই কোরআনেও চন্দ্রকে বাতি বলা হয়েছে অর্থাৎ চন্দ্রের আলো আছে।

*'তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি সূর্য্যকে বানিয়েছেন উজ্জল আলোকময়, আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ **আলো বিতরণকারী** এবং অতঃপর নির্ধারিত করেছেন এর জন্য **মনজিল সমুহ**, যাতে করে তোমরা চিনতে পারো বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসেব'।* (সুরা ইউনুস আয়াত ৫)।

*It is He Who made the sun a shining thing and the moon as a **LIGHT** and measured out its (their) **stage**s, that you might know the number of years and the reckoning*. (www.quraanshareef.org)

*It is He Who made the sun to be a shining glory and the moon to be a **LIGHT** (of beauty), and measured out **stages** for her; that ye might know the number of years and the count (of time).* (Eusuf Ali)

বিজ্ঞানের আবিস্কারে অসহায় ধর্মবাদীরা উপরোল্লিখিত আয়াতের *'কামারা নুরান'* শব্দের অর্থ চন্দ্রে সূর্য্যের প্রতিফলিত আলো বলে চালিয়ে দিতে প্রয়াস পান। লক্ষণীয়, এখানে বিশেষ্য (*কামার* চন্দ্র) ও বিশেষন (*নুরান' আলো বিতরণকারী)* একই সাথে ব্যবহারিত হয়েছে। চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নেই বলেই বিজ্ঞান ক্ষান্ত হয় নি সারা বিশ্বের চোখের সামনে চাঁদে অবতরণ করে দেখে এসেছে সেখানে ধর্মের আলোও নেই সুতা কাটার বুড়িও নেই। এখন কেউ যদি মনে করেণ কোরআনতো সূর্য্যকে *সিরাজ* বাতি বলেছে চন্দ্রকে নয়, তাদের জন্যে একটি মন্দ খবর আছে। সুরা আহজাবের ৪৬ নং আয়াতে মুহাম্মদ (দঃ) সুর্য্যকে বলেছেন *'সিরাজাম মুনিরা'*। 'মুনিরা' শব্দ ব্যবহার হয়েছে সুর্য্য এবং চন্দ্র উভয়ের বর্ণনায়। অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য্য দুটোই বাতি, দুটোই আলো বিতরণকারী পার্থক্য শুধু একটির চেয়ে অপরটি বেশী উজ্জল। উল্লেখ্য 'নুর' থেকে 'নুরান' ও 'মুনিরা' শব্দের উৎপত্তি। এখনও কেউ যদি বলেন 'নুর' অর্থ প্রতিফলিত আলো তাহলে সমস্যাটা আরো ঘোরতর। কোরআন

বলছে- *'আল্লাহু নুরুস্‌ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ------'* । আল্লাহ আকাশ ও জমিনের বাতি। (সুরা নুর আয়াত ৩৫) **Allah is the Light of the heavens and the earth.** নুরের অর্থ যদি প্রতিফলিত আলো হয় তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, আল্লাহ কার প্রতিফলিত আলো?

মুহাম্মদ (দঃ) যদি জানতেন যে তাঁর জন্মের বহু পূর্বেই এ্যারিষ্টটল (৩৮৪-৩২২) বলে দিয়েছেন যে পৃথিবী গোলাকার, তাহলে প্রতিদিন এত কষ্ট করে সূর্য্যকে টেনে টেনে আল্লাহ্‌র বাড়ী পাঠাতেন না আর চন্দ্রকে মনজিলে মনজিলে থামাতেন না।

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

'চন্দ্রের জন্যে আমি নির্ধারিত করেছি বিভিন্ন মনজিল সমুহ। অবশেষে সে পুরাতন খেজুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়'। (সুরা ইয়াসিন আয়াত ৩৯)

And the moon, We have measured for it mansions (to traverse) till it returns like the old dried curved date stalk

পাহাড়ের ব্যাপারে কোরআন বলছে- *'তিনি পৃথিবীতে পাহাড় সৃষ্টি করেছেন যেন পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে হেলে-দুলে না পড়ে'।* (সুরা লোকমান আয়াত ১০)। নিউটনের মধ্যাকর্ষণ শক্তির কি আর প্রয়োজন আছে? অনুমান করা যায় মুহাম্মদের (দঃ) চোখে পৃথিবীর সাইজটা কত বড় ছিল যে পহাড় না থাকলে মানুষের ভারে তা কাৎ হয়ে যেতো? এটা পাগলের প্রলাপ না বৈজ্ঞানিক তথ্য।

কোরআনের সুরা কাহাফে (আয়াত ৮৩ থেকে ৯৩ পর্যন্ত) বর্ণীত জুলকারনাইন ও ইয়ুজুজ-মাজুজের কেচ্ছা আরব্য উপন্যাসকেও হার মানায়। বিজ্ঞান কোন দিন তা সমর্থন করবে না।

কোরআন বলছে পৃথিবী সমতল ও স্থীর হয়ে আছ, বিজ্ঞান বলছে পৃথিবী গোলাকার ও সব সময় ঘুরছে, কোরআন বলছে চাঁদ আলো বিতরণ করে, বিজ্ঞান বলছে চাঁদের নিজস্ব আলো নেই, কোরআন বলছে চাঁদ মনজিলে মনজিলে থামে, বিজ্ঞান বলছে চাঁদ কোথাও থামে না। পরকালের ভয়, ভীতি, লোভ, লালসা, শাস্তি, পুরস্কার, স্বর্গ ও নরকের আজগুবি সব কাহিনী আর অন্ধ বিশ্বাসের উপর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। এর কোন কিছুই বিজ্ঞান সমর্থন করে না, বিজ্ঞানের চলার পথে এদের কোন প্রয়োজন নেই। সম্পূর্ণ বিপরিতমুখী দুই আদর্শের দুই মতবাদের সমন্নয় আদৌ কি সম্ভব? আর সংঘাত, তা-তো ধর্মেরই মুলধন। ধর্ম যে দিন সংঘাত ও সন্ত্রাস ছেড়ে দেবে সে দিন থেকে ধর্ম আর ধর্মই থাকবে না। ধর্মগ্রন্থগুলো নিরপেক্ষভাবে খোলে দেখলেই তার স্পষ্ঠ প্রমান পাওয়া যায়।

মহাকাশমন্ডলী, জীবন ও জগত নিয়ে কাল্পানিক কথাগুলোর সত্যতা প্রমান করা তখনকার সময়ে হয়তো সম্ভব ছিল না কিন্তু এখন তা সম্ভব। ঠিক যেমন ছোট

বেলায় আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না ভুকিম্প, রংধনু, কলেরা, বিজলী, বজ্রপাত, চাঁদের বুড়ীর সুতা, চন্দ্রগ্রহণ-সূর্য্যগ্রহনের কাহিনী গুলোর সত্যতা প্রমান করা। বড় হয়ে স্কুলের পাঠ্যবই থেকে জানলাম রংধনু আমরাও তৈরী করতে পারি। পুকুর পাড়ে সুর্যের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে মুখ ভর্তি জল আকাশে ছোঁড়ে তার প্রমানও পেলাম। আমরা জানলাম সন্ধ্যাকাশের রক্তিম মেঘ হাসান-হোসেনের রক্ত নয় বরং সুর্য্যের আলো। এখন যদি মা বা দাদীকে বলি তোমাদের বর্ণীত কাহিনী সবটুকুই মিথ্যে। তাতে মায়ের মনে দুঃখ লাগবে বলে কি আমি তাকে সত্যটা বলবো না? মা যদি বলেন ঠিক আছে বাবা তোমারটাও সত্য আর আমাদেরটা ও সত্য কারণ এসব তোমার পূর্বপুরুষদের মুখের পবিত্র বাণী। আমি কোন্‌টা গ্রহন করবো? আমি মাকে শুধু দেখিয়ে দিলাম, মা নিজের চোখে দেখো জলকণিকায় সূর্য্যের কিরণই রংধনু। মাকে আমি দেখতে বলেছি বিশ্বাস করতে বলিনি। মা আমাকে দেখাতে পারেন নি বিশ্বাস করতে বলেছেন। ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্নয় তারাই চান যারা এই সত্য-মিথ্যার খিচুড়ী হজম করে শান্তনা পান। জীবন ও জগত নিয়ে পূর্বপুরুষদের ভ্রান্ত ধারণা মিথ্যে কাহিনী আমার নতুন প্রজন্মের জানার কোনই প্রয়োজন নেই। অনিশ্চয়তার সুতিকালয়েই বিশ্বাসের জন্ম। সত্যের ঘরে বিশ্বাসের উপস্থিতি যেমন হাস্যকর বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের সমন্নয় তেমনি অবাস্তব।

চতুর্থ অধ্যায় : ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান ৩৭০ *[ক্লিক করুন]*

- বিজ্ঞানময় কিতাব : *অভিজিৎ রায় ৩৭১ [ক্লিক করুন]*
- বিজ্ঞান, ধর্ম এবং অপবিজ্ঞান কোথায় টানব সীমারেখা?: *জাহেদ আহমদ ৩৮৯ [ক্লিক করুন]*
- ধর্মে বিজ্ঞানঃ নিম গাছে আমের সন্ধান *নাস্তিকের ধর্মকথা ৪০০ [ক্লিক করুন]*
- বিজ্ঞান, ধর্ম ও বিশ্বাস : *অপার্থিব ৪১১ [ক্লিক করুন]*
- ইসলামী বিজ্ঞানের পৌরাণিক কাহিনী : *খান মুহাম্মদ ৪১৭ [ক্লিক করুন]*
- ভগবদগীতায় বিজ্ঞান অন্বেষণ এবং অন্যান্য : *অনন্ত বিজয় ৪২৯ [ক্লিক করুন]*

বিজ্ঞানময় কিতাব

অভিজিৎ রায়

" মূর্খরা সব শোন, মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোন।" -নজরুল

১

এই প্রবন্ধটির সূচনা হয়েছিল একটি নির্দোষ ই-মেইলের জবাব দিতে গিয়ে। বছর সাতেক আগে আমি তখন সবে বাংলাদেশ থেকে পাড়ি জমিয়েছি বাইরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে । বিনা পয়সায় ইন্টারেনেট ব্যবহারের আমেজ সামলাতে সময় লাগছে। কুয়োর ব্যাঙ-কে কুয়ো থেকে তুলে সমুদ্রে ছেড়ে দিলে যেমন দশা হয় তেমনি দশা তখন আমার। কম্পিউটার নামের চার কোনা বাক্সের মাঝে জ্ঞানের অবারিত দুয়ার। আমি নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে পড়ে রইলাম সমুদ্র সিঞ্চনে । এমনি এক সময় সদ্য পরিচিত এক ভদ্রলোকের পাঠানো এক ই-মেইলে এক ওয়েব-সাইটের ঠিকানা পেলাম । ঠিকানাটা আসলে একটা অন-লাইন পত্রিকার। খুব যে আগ্রহ নিয়ে গেলাম তা নয়। কিন্তু গিয়ে অবাকই হলাম । পড়লাম বেশ কিছু লেখকের তথ্য-বহুল উঁচুমানের লেখা। অজানা অচেনা পত্রিকায় এমন যুক্তিবাদী ইহজাগতিক লেখা ? তাও আবার লিখছে কিছু সাহসী বাংগালীরা । সত্যিই অবাক করার মত ব্যাপার । পরবর্তীতে এদের অনেককে নিয়ে আমি 'মুক্তমনা' (www.mukto-mona.com) নামে একটি প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী আন্তর্জাল আলোচনাচক্র গড়ে তুলি। প্রবাসী বাঙ্গালীরা যারা আন্তর্জাল আলোচনাচক্র গুলি সম্বন্ধে একটু-আধটু খোঁজ খবর রাখেন, তারা সবাই একনামে মুক্তমনাকে চেনেন। কারণ অনেকেই মনে করেন যে, চলমান ধারার বিপরীতে সবময়ই মুক্তমনা ভিন্নকথা শোনায়। ধমার্ন্ধতা আর সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে অনেকের কাছেই মুক্তমনা আজ এক চলমান বহ্নিশিখা, ঘোর অমানিশায় পথ দেখানো এক আলোকবর্তিকা। গতবছর (২০০৭) সালে আন্তর্জালে মানবিকতা, মুক্তবুদ্ধি এবং বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের স্বীকৃতি স্বরূপ মুক্তমনাকে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মৃতি পদকে ভুষিত করেছে। মুক্তমনার ইতিহাস এক অনন্য ইতিহাস। এর কথা আপাতত: থাকুক। তবে এই প্রবন্ধে বেশ ক'টি জায়গায় মুক্তমনার প্রসংগ অনিবার্যভাবে এসে পড়বে বলেই এ প্রসংগটির অবতারণা।

বলছিলাম আসলে সেই অনলাইন পত্রিকাটির কথা। সে পত্রিকাটিতে সকলেই যে ধর্মের শিকল থেকে মুক্ত হয়ে প্রগতিশীল লেখা লিখতেন বা লিখছেন তা কিন্তু নয়। এক ভদ্রলোকের কথা খুব-ই মনে পড়ছে। এক পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক। উনি সবসময়ই একটি বিশেষ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব খুঁজতেন। এই ফ্যাশনটা ইদানিংকালে বাংলাদেশী শিক্ষিত মুসলমানদের ভেতরে প্রকট আকারে চোখে পড়ছে। বিশেষতঃ দুই বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলী এবং কেইথ মূরের 'অবিস্মরণীয়' অবদানের পর (ইদানিং সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে তুরস্কের হারুন ইয়াহিয়া নামের আরেক ছদ্ম-বিজ্ঞানী)। আজ তাঁরা ১৪০০ বছর আগের লেখা ধর্মগ্রন্থের মধ্যে 'বিগ ব্যাং' খুঁজে পান, মহাবিশ্বের প্রসারণ খুঁজে পান, মানব সৃষ্টির ক্রমবিকাশ খুঁজে পান, অণু-পরমাণু, ছায়াপথ, নক্ষত্ররাজি, শ্বেত বামন, কৃষ্ণগহ্বর, ভ্রুণ-তত্ত্ব, আপেক্ষিক

তত্ত্ব, সুপার স্ট্রিং তত্ত্ব, সবই অবলীলায় পেয়ে যান। তো সেই ভদ্রলোকও বুকাইলী-মূরের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে কোরাণ যে কত 'সুপার সায়েন্টিফিক' বই, তা প্রমাণের জন্যে পাতার পর পাতা লিখে যেতে থাকলেন। কাঁহাতক আর পারা যায়! আমি অবশেষে তাঁর একটি লেখার প্রতিবাদ করবার সিদ্ধান্ত নেই। বলি, 'কি দরকার আছে এই হাজার বছর আগেকার কতকগুলি সূরার মধ্যে বিগ ব্যাং এর তত্ত্ব অনুসন্ধান করার? বিগ ব্যাং সম্বন্ধে জানতে চাইলে অ্যাস্ট্রো ফিজিক্সের উপর গাদা গাদা বই বাজারে আছে; দেখুন না। ডিফারেনসিয়াল ইকুয়েশন সমাধানের জন্য তো আমাদের গণিতের বই-ই দেখতে হবে, কোরাণ-হাদিস চষে ফেললে কি এর সমাধান মিলবে?' এ যেন বারুদে আগুন লাগল। উনি এর পরদিন বিশাল মহাভারত আকারের মহাকাব্য লিখে বুঝিয়ে দিলেন ইসলাম এবং বিজ্ঞান বিষয়ে আমার জ্ঞান কত তুচ্ছ; কত নগণ্য, - কত অজ্ঞ, কত আহাম্মক আমি। এদিক-ওদিক-সেদিক থেকে দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত হাজির করে 'প্রমাণ' করে এক্কেবারে বুঝিয়ে পর্যন্ত দিলেন -দ্যাখ ব্যাটা - কোরাণে আধুনিক বিজ্ঞানের সবকিছুই আছে, কোরাণ কত 'বিজ্ঞানময়' কিতাব !

আমাকে লিখতেই হল। কি করব, আমার পিঠ যে তখন দেয়ালে ঠেকে গেছে। বললাম, একটু চোখ-কান খুলে যদি ধর্মগ্রন্থ গুলির ইতিহাসের দিকে তাকানো যায়, তাহলে বোঝা না যাওয়ার তো কথা নয় যে, সেই গ্রন্থগুলি লেখা হয়েছে বহু বছর আগে যখন মানুষের বিজ্ঞানের উপর দখল এবং জ্ঞান ছিল খুব ই সীমিত। এটা আশা করা খুব-ই বোকামি যে সেই সময়কার লেখা একটা বইয়ের মধ্যে বিগ-ব্যাং এর কথা থাকবে, সুপার স্ট্রিং এর কথা থাকবে, আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির কথা থাকবে। আধুনিক বিজ্ঞান নয়, ওই সমস্ত বইগুলিতে আসলে প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার চালচিত্রই ফুটে উঠেছে, তৎকালীন সমাজের মানুষের ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস , আশা আকাঙ্খার কথাই শুধু প্রকাশ পেয়েছে; এর এক চুলও বাড়তি কিছু নয়। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। কোরাণ যখন লিখিত হয়েছিল, তখনো গ্যালিলিও, ব্রুনো, কোপার্নিকাসের মত মনীষিরা এই ধরাধামে আসেন নি। তখনকার মানুষদের আসলে জানবার কথা নয় যে তাদের পরিচিত বাসভূমি - পৃথিবী নামক এই গ্রহটি যে সূর্য নামক নক্ষত্রের চারিদিকে ক্রমাগত পাক খেয়ে চলেছে। কি করেই বা বুঝবে ? জন্মের পর থেকেই তারা সাদা চোখে সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমে যেতে দেখেছে, আর রাত হলেই দেখেছে চাঁদ কে। এর পেছনে পদার্থবিজ্ঞানের কোন নিয়ম তারা কল্পনা করতে পারেনি, ভাবতো এগুলো বোধহয় ঈশ্বরের আইন। ঠিক সে কথাগুলিই কোরাণ-হাদিস-বেদ-বাইবেলে লেখা আছে। যেমন, ধরা যাক সূরা লুকমান (৩১:২৯) এর কথা। এখানে পরিষ্কার বলা আছে- "আল্লাহ ই রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিবর্তন করেন, তিনিই সূর্য এবং চন্দ্রকে নিয়মাধীন করেছেন; প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট পথে আবর্তন করে"। সূর্য আর চাঁদের এই ভ্রমনের কথা শুধু সূরা লুকমানে নয়, রয়েছে সুরা ইয়াসিন (৩৬:৩৮), সূরা যুমার (৩৯:৫), সূরা রা'দ (১৩:২), সূরা আম্বিয়া (২১:৩৩), সূরা বাক্বারা (২:২৫৮), সূরা কা'ফ (১৮:৮৬), সূরা ত্বোয়াহায় (২০:১৩০)। কিন্তু সারা কোরাণ তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও পৃথিবীর ঘূর্ণনের স্বপক্ষে একটি আয়াতও মিলবে না। আল্লাহর দৃষ্টিতে পৃথিবী স্থির, নিশ্চল। সূরা নামলে (২৭:৬১) পরিস্কার বলা আছে - 'কে দুনিয়াকে বসবাসের স্থান করেছেন আর তার মধ্যে নদীসমূহ সৃষ্টি করেছেন আর এটিকে (পৃথিবী) স্থির রাখবার জন্য পাহাড়-পবর্ত সৃজন করেছেন ... '। একই ভাবে সূরা রূম (৩০:২৫), ফাত্বির (৩৫:৪১), লূকমান (৩১:১০), বাক্বারা (২:২২), নাহল (১৬:১৫) পড়লেও সেই এক-ই ধারণা পাওয়া যায় যে কোরাণের দৃষ্টিতে পৃথিবী আসলে স্থির। আমি ভদ্রলোককে সবিনয়ে বলেছিলাম, তিনি যদি সত্যই মনে

করেন যে আধুনিক বিজ্ঞানের সকল তত্ত্ব ই কোরানে আছে, তাহলে শুধুমাত্র একটি আয়াত যদি কোরাণ থেকে দেখাতে পারেন যেখানে লেখা আছে 'পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে', অথবা নিদেন পক্ষে 'পৃথিবী ঘুরছে' - আমি তার সকল দাবী মেনে নেব। আরবীতে পৃথিবীকে বলে 'আরদ' আর ঘূর্ণন হছে 'ফালাক'। একটিমাত্র আয়াত আমি দেখতে চাই যেখানে 'আরদ' এবং 'ফালাক' পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে। উনি দেখাতে পারলেন না।

পারার কথাও নয়। কারণ কোরাণে এ ধরনের কোন আয়াত নেই। এর কারণটা আমি আগেই বলেছি। তখনকার যুগের মানুষেরা চিন্তা করে তো বের করতে পারেনি পৃথিবীর আহ্নিক আর বার্ষিক গতির কথা। টলেমীর পৃথিবী কেন্দ্রিক মতবাদকে মাথা থেকে সরিয়ে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদে মানুষের চিন্তা-ভাবনার উত্তোরণ ঘটেছে আসলে আরও অনেক বছর পরে। মুহম্মদের যুগে মানুষেরা এমনকি 'রাত্রিবেলা সূর্য কোথায় থাকে' - এই রহস্য ভেদ করতে গিয়ে 'গলদ-ঘর্ম' হয়ে উঠেছিল। তখনকার সময়ের মানুষেরা ভাবতো অনেক অনেক দূরে এমন একটি দেশ আছে যেখানে 'সূর্যদেব সত্য ই অস্ত যান'! চিন্তাশীল পাঠকেরা কোরাণের সেই বিখ্যাত সূরাটিতে চোখ বুলালেই বুঝবেন যেখানে জুলকারণাইনের উল্লেখ আছে-

> "অবশেষে যখন সে সূর্যাস্তের দেশে পৌছাঁলো, সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে ডুবতে দেখল এবং সেখানে দেখতে পেল এক জাতি। আমি বললাম, 'হে জুলকারণাইন, হয় এদের শাস্তি দাও, না হয় এদের সাথে ভাল ব্যবহার কর'।" (১৮:৮৬)

যারা কোরাণের মধ্যে অনবরত বিগ-ব্যাং, এবং সুপার স্ট্রিং তত্ত্বের খোঁজ করেন, তারা কি একবারের জন্যও ভাবেন না আল্লাহ কেমন করে এত বড় ভুল করলেন ! কিভাবে আল্লাহ ভাবলেন যে সূর্য সত্যই কোথাও না কোথাও অস্ত যায়? কোরাণ কি সত্যই 'মহা বিজ্ঞানময়' কিতাব নাকি ভ্রান্তি-বিলাস? অনেক পাঠকেরই হয়ত জানেন না যে মহানবী মুহম্মদকে শ্রেষ্টতম বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ ও দার্শনিক বলে অভিহিত করা হয়, তিনি 'রাতে সূর্য কোথায় থাকে' - এই রহস্যের কি হাস্যকর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন । এক সাহাবার (আবু যর) সাথে মতবিনিময় কালে মহানবী বলেছিলেন যে, রাত্রিকালে সূর্য থাকে খোদার আরশের নীচে। সারা রাত ধরে সূর্য নাকি খোদার আরশের নীচে থেকে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করে আর তারপর অনুমতি চায় ভোরবেলা উদয়ের (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৬/৬০/৩২৬-৩২৭, ৪/৫৪/৪২১)* ।

---

* ***Volume 4, Book 54, Number 421:***

Narrated Abu Dhar:

The Prophet asked me at sunset, "Do you know where the sun goes (at the time of sunset)?" I replied, "Allah and His Apostle know better." He said, "It goes (i.e. travels) till it prostrates Itself underneath the Throne and takes the permission to rise again, and it is permitted and then (a time will come when) it will be about to prostrate itself but its prostration will not be accepted, and it will ask permission to go on its course but it will not be permitted, but it will be ordered to return whence it has come and so it will rise in the west. And that is the interpretation of the Statement of Allah: "And the sun Runs its fixed course For a term (decreed). that is The Decree of (Allah) The Exalted in Might, The All-Knowing." (36.38)

যারা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলিকে বিজ্ঞানের মোড়কে পুরতে চান, তারা কি এই হাস্যকর আয়াতগুলির কথা জানেন না ? অবশ্যই জানেন। এবং জেনে শুনেই তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করেন। আর এখানেই আমার আপত্তি।

এখানে একটি কথা বলে নেয়া প্রয়োজন যে, আমি কোরাণের আলোচনায় স্থির এবং নিশ্চল পৃথিবীর উল্লেখ করেছি বলে কেউ যেন না ভেবে থাকেন যে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলি এই দোষ থেকে মুক্ত। বস্তুত বাইবেল এবং বেদেও আমরা ঠিক এক ই ধরনের নিশ্চল পৃথিবীর ছবি দেখতে পাই।

বাইবেল থেকে পাঠকদের সামনে পৃথিবীর স্থিরতার স্বপক্ষে কিছু প্রমাণ হাজির করছি-

> 'আর জগৎও অটল - তা বিচলিত হবে না' (ক্রনিকলস ১৬/৩০)
> 'জগৎ ও সুস্থির, তা নড়াচড়া করবে না।' (সাম ৯৩/১)
> 'তিনি পৃথিবীকে অনড় এবং অচল করেছেন' (সাম ৯৬/১০)
> 'তিনি পৃথিবীকে এর ভিত্তিমূলের উপর স্থাপন করেছেন, তা কখনো বিচলিত হবে না' (সাম ১০৪/৫)
> ইত্যাদি ।

একই ভাবে বেদেও রয়েছে -

Volume 6, Book 60, Number 326:

Narrated Abu Dharr:

Once I was with the Prophet in the mosque at the time of sunset. The Prophet said, "O Abu Dharr! Do you know where the sun sets?" I replied, "Allah and His Apostle know best." He said, "**It goes and prostrates underneath (Allah's) Throne**; and that is Allah's Statement:--

'And the sun runs on its fixed course for a term (decreed). And that is the decree of All-Mighty, the All-Knowing....' (36.38)

Volume 6, Book 60, Number 327:

Narrated Abu Dharr:

I asked the Prophet about the Statement of Allah:--

'And the sun runs on fixed course for a term (decreed), ' (36.38) He said, "**Its course is underneath "Allah's Throne**." (Prostration of Sun trees, stars. mentioned in Qur'an and Hadith does not mean like our prostration but it means that these objects are obedient to their Creator (Allah) and they obey for what they have been created for).

'ধ্রুবা দৌধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে।' (ঋগ্বেদ দশম মন্ডল, ১৭৩/৪)
অর্থাৎ, 'আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিশ্চল, এ সমস্ত পর্বতও নিশ্চল'।

ঋগ্বেদের আরেকটি শ্লোকে রয়েছে -

'সবিতা যৈন্ত্রঃ পৃথিবীমরন্মা-দগ্বন্তনে সবিতা দ্যামদৃং হত।' (ঋগ্বেদ দশম মন্ডল, ১৪৯/১)
অর্থাৎ, 'সবিতা নানা যন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীকে সুস্থির রেখেছেন - তিনি বিনা খুঁটিতে আকাশকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছেন।'

উপরের শ্লোকটি একটি বিশেষ কারণে আরো বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। এটি থেকে বোঝা যায়, বৈদিক যুগে মানুষেরা পৃথিবীকে তো স্থির ভাবতেন-ই, আকাশকে ভাবতেন পৃথিবীর ছাদ। তাঁরা ভাবতেন ঈশ্বরের অপার মহিমায় এই খুঁটিবিহীন ছাদ আমাদের মাথার উপরে ঝুলে রয়েছে। একই ধারণা আমরা কোরাণেও দেখতে পাই। সূরা লুকমানে (৩১:১০) আল্লাহর মহিমার বর্ণনা আছে এইভাবে-

'তিনিই খূঁটি ছাড়া আকাশকে ছাদ স্বরূপ ধরে রেখেছেন ...'

কিন্তু আজ এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগে আমরা জানি, আকাশ কখনই পৃথিবীর ছাদ নয়। সামগ্রিকভাবে আসলে আকাশ বলেই তো কিছু নেই। আকাশ হচ্ছে আমাদের দৃষ্টির প্রান্তসীমা। আমাদের পৃথিবীতে বায়ুমন্ডল থাকার কারণে আমাদের চোখে আকাশকে নীল দেখায়। চাঁদে বায়ুমন্ডল নেই, তাই চাঁদের আকাশ কালো। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, 'মহাবিজ্ঞানময়' কিতাবগুলোতে এ ধরনের কোন বিজ্ঞানভিত্তিক সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান তো আমরা পাই না। মানুষ কবে বড় হবে? ধর্মগ্রন্থগলো থেকে মুখ সরিয়ে কবে সত্যি সত্যিই একদিন বুঝতে শিখবে 'আকাশ' শব্দটার মানে? সুনীলের কবিতার 'একটা গাছ তলায় দাঁড়িয়ে' কবিতার কয়েকটি লাইন এ প্রসঙ্গে খুবই অর্থবহ -

' ... এতগুলো শতাব্দী গড়িয়ে গেল, মানুষ তবু ছেলেমানুষ রয়ে গেল
কিছুতেই বড় হতে চায় না
এখনো বুঝলো না 'আকাশ' শব্দটার মানে
চট্টগ্রাম বা বাঁকুড়া জেলার আকাশ নয়
মানুষ শব্দটাতে কোন কাঁটাতারের বেড়া নেই
ঈশ্বর নামে কোন বড় বাবু এই বিশ্ব সংসার চালাচ্ছেন না
ধর্মগুলো সব রূপকথা
যারা এই রূপকথায় বিভোর হয়ে থাকে

তারা প্রতিবেশীর উঠোনের ধুলোমাখা শিশুটির কান্না শুনতে পায় না
তারা গর্জন বিলাসী ... '

২

আমার নিবন্ধটি সেই অনলাইন পত্রিকাটি সহ অন্যান্য জায়গায় প্রকাশের পর বেশ কিছু প্রতিক্রিয়া হয়। আমার এক ধার্মিক বান্ধবী ই-মেইলে জানায়, "হতে পারে কোরাণে কোথাও বলা নাই যে 'পৃথিবী ঘুরছে'। কোরাণে তো কতকিছুই সোজাসুজি বলা নাই। যেমন, কোরানে তো এ কথাও বলা নাই যে 'পৃথিবী গোলাকার'। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে কোরাণের দৃষ্টিতে পৃথিবী সমতল ।"

উত্তরে আমি জানালাম, কোরাণের দৃষ্টিতে পৃথিবী সত্যই সমতল ! নিম্নোক্ত এই সূরাগুলি তার প্রমাণ -

' ... পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি (কার্পেটের মত) এবং ওতে পর্বত মালা সৃষ্টি করেছি ... '
(হিজ্বর ১৫:১৯)

'যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে (সমতল) শয্যা করেছেন এবং ওতে তোমাদের জন্য চলার পথ দিয়েছেন ...' (ত্বাহা ২০:৫৩, যুখরুখ ৪৩:১০)

' আমি বিস্তৃত করেছি (কার্পেটের মত) পৃথিবীকে এবং ওতে পর্বত মালা স্থাপন করেছি ... '
(ক্বাফ ৫০:৭)

'আমি ভূমিকে বিছিয়েছি, আর তা কত সুন্দর ভাবে বিছিয়েছি ... ' (ত্বর ৫২:৪৮)

'আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত ... ' (নূহ ৭১:১৯) ইত্যাদি।

উপরের আয়াতগুলি থেকে বোঝা যায়, পদার্থবিদরা যে ভাবে আজ গোলাকার পৃথিবীর ধারণা পোষণ করেন, কোরাণের পৃথিবী তার সাথে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমি এই প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত সূরা কাহাফ (১৮:৮৬) এর প্রতি আবারও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই যেখানে বলা আছে আল্লাহর এক বিশ্বস্ত বান্দা কাদামাটি পূর্ণ একটি নির্দিষ্ট স্থানে সূর্যকে ডুবতে দেখেছিলেন। একই সূরার ৯০ নং আয়াতে একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে সূর্যোদয়েরও বর্ণনা আছে। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে আল্লাহ কেন ভাবলেন যে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান দরকার ? এর মধ্য থেকে একটি সত্যই বেরিয়ে আসে, আর তা হল কোরাণের গ্রন্থাকার পৃথিবীকে গোলাকার ভাবেননি, ভেবেছেন সমতল।

নামাজ পড়ার নির্দিষ্ট সময়ের কথা মাথায় রাখলে পরিস্কার বোঝা যায় প্রাচীন কালে মানুষেরা সমতল পৃথিবীর ধারণা থেকে একদমই বেরুতে পারেন নি। আমাদের বাঙ্গালী কৃষক-দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর 'সত্যের সন্ধান' বইতে খুবই পরিস্কারভাবে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন। এই সুযোগে সেটা আবার একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। ইসলামী শাস্ত্রে প্রত্যেকদিন পাঁচবার নামাজ পরার বিধান আছে। এই পাঁচবারের জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ আছে, আবার কোন কোন সময়ে নামাজ পড়া আবার নিষিদ্ধ। যেমন, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত অথবা মধ্যাহ্নে নামাজ পড়ার কোন নিয়ম নেই। কিন্তু পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে আমরা জানি যে কোন স্থির মুহূর্তে বিভিন্ন দ্রাঘিমার উপর বিভিন্ন সময় দেখা দেয় এবং প্রতিমুহূর্তেই পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে নির্দিষ্ট উপাসনা চলতে থাকে। এর মানে কি? যেমন ধরা যাক, বরিশালে যখন সূর্যোদয় হচ্ছে, তখনও কলকাতায় সূর্য উঠেনি আর চট্টগ্রামে কিছুক্ষন আগেই সূর্য উঠে গেছে। কাজেই বরিশালে যখন ইসলামের দৃষ্টিতে নামাজ পড়া হারাম, তখন কলকাতা বা চট্টগ্রামে তা হারাম নয়। তা হলে নির্দিষ্ট সময়ে উপাসনা নিষিদ্ধ করার কোন মানে আছে? যুক্তিবাদী আরজ আলী 'সত্যের সন্ধানে' বইতে একটি মজার প্রশ্ন করেছেন। ধরা যাক একজন লোক বেলা দেড়টায় জোহরের নামাজ পড়ে বিমানে চড়ে মক্কায় যাত্রা করলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি দেখলেন যে ওখানে তখনও দুপুর হয়নি। ওখানে জোহরের ওয়াক্তের সময় হলে কি তার আরেকবার জোহরের নামাজ পড়তে হবে? আপাতঃ নিরীহ এই প্রশ্নটির মধ্যেই কিন্তু উত্তরটি লুকিয়ে আছে। আরজ আলী নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন-

> 'এক সময় পৃথিবীকে স্থির আর সমতল মনে করা হত। তাই পৃথিবীর সকল দেশে বা সকল জায়গায় একই রকম সময় সূচিত হবে, বোধহয় এইরকম ধারণা থেকে ওই সমস্ত নিয়ম-কানুন প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু এখন প্রমানিত হয়েছে যে, পৃথিবী গোল ও গতিশীল ।'

আসলে আধুনিক জীবন-যাত্রার সাথে তাল মেলাতে পুরোন ধর্মীয় কানুন মানতে গিয়ে দেখা দিচ্ছে নানা জটিলতা। ভবিষ্যতে এই জটিলতা আরও বাড়বে। যেমন, কোন নভোচারী অথবা কোন বিমান চালক ১০৪১.৬৭ মাইল বেগে পশ্চিম দিকে বিমান চালালে সূর্যকে সবসময়ই তার কাছে গতিহীন বলে মনে হবে। অর্থাৎ বিমান আরোহীদের কাছে সকাল, দুপুর আর সন্ধ্যা বলে কিছু থাকবে না- সূর্য যেন স্থিরভাবে একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই অবস্থায় বিমান আরোহীদের নামাজ-রোজার উপায় কি? ভবিষ্যতে মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি যদি বসতি গড়তে হয়, তবে দেখা দেবে আরও এক সমস্যা। সেখানে প্রায় ছয় মাস থাকে দিন আর ছয় মাস থাকে রাত। সেখানে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা রাখা আর দিনে পাঁচ বার নামাজ পড়া কি আদৌ সম্ভব? এটি বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে, প্রাচীনকালে মানুষের সমতল পৃথিবী ব্যাপারে ভুল ধারণার কারণেই আজকের দিনে নিয়ম পালনে এই জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

এ ধরণের তথ্যগত ভুল কিংবা প্রাচীণ অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার নিদর্শন কোরাণে আরো আছে। ভ্রান্ত 'সমতল' পৃথিবীর ধারণা কিংবা 'অনড়' পৃথিবীর ধারণাই কেবল নয়, কোরাণে আছে অদৃশ্য 'শয়তান জ্বীন' এর উপস্থিতির উল্লেখ (৬:১০০, ৬:১১২, ৬:১২৮, ৬:১৩০, ৭:৩৮, ১১:১১৯, ১৫:২৭ ইত্যাদি), যাদের কাজ হচ্ছে একজনের উপর উপর আরেকজন দাড়িয়ে 'Exalted Assembly' তৈরি করা (৩৭:০৮) আর

কানাকানি করে গোপন কথা শুনে ফেলা (৭২: ৮, ৩৭: ৬/১০) । এই অদৃশ্য শয়তান জ্বীনদের ভয় দেখানোর জন্য আল্লাহ আবার উল্কাপাত ঘটান (৭২: ৯, ৩৭:১০) বলে কোরাণে উল্লেখ করেছেন, সেজন্যই আমরা আকাশে উল্কাপাত ঘটতে দেখি। কিভাবে জুলকার্নাইন এক 'পঙ্কিল জলাশয়ে' সূর্যকে ডুবতে দেখেছেন, তার উল্লেখ যে কোরাণে আছে, তা তো এ প্রবন্ধে আগেই বলেছি। এ ধরণের ভুল আরো আছে। যেমন, বলা আছে স্পার্ম নাকি তৈরী হয় মেরুদন্ড এবং পাঁজরের মধ্যবর্তী জায়গা থেকে (৮৬:৬-৭); মাতা মেরী কে বর্ণনা করা হয়েছে অ্যারনের (মূসার বড় ভাই) বোন হিসেবে (১৯:২৮); ইত্যাদি। এগুলো সবই হাস্যকর রকমের ভ্রান্ত তথ্য। আর হাদিসের অবৈজ্ঞানিক আর হাস্যকর বানীগুলোর আর কথা বলতে গেলে তো মহাভারত হয়ে যাবে। কয়েকটা মজার উদাহরণ দেই। হাদিসে বলা হয়েছে যে, যখন কোন পুরুষের শুক্রাণু কোন মহিলার জরায়ুতে প্রবেশ করে, তখন আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত ফেরশতারা তার দ্বায়িত্ব নিয়ে নেয় (সহীহ বুখারী ১.৬.৩১৫, ৪.৫৪.৪৩০; সহীহ মুসলিম ৩৩.৬৩৯২ ইত্যাদি), মানুষের অঙ্গ-প্রত্যংগ গুলো 'ইসলামী পাপ বয়ে নিয়ে যায়' (সুনান নাসাই ১.১৪৯), এমনকি কোরান-হাদিস অনুযায়ী মানব অঙ্গগুলো নিজেরা নিজেরাই কথা পর্যন্ত বলতে পারে (কোরান, ৪১:২০, ৪১:২১, ৩৬:৬৫, ২৪:২৪) । তাও না হয় মানা গেল, কিন্তু হাদিসে উটের মুত্রকে যে রোগনাশকারী মহৌষধ হিসেবে বর্ণনা করে তা নিয়মিতভাবে পান করার পরামর্শ যে দেয়া হয়েছে, তা কি আমরা জানি? যেমন, সহীহ বুখারীর ভলিউম ৭, বই ৭১, হাদিস নং ৫৯০ দেখা যাক -

> আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত :
> কিছু লোকের মদীনার আবহাওয়া প্রতিকুল মনে হচ্ছিল। রাসুল (সাঃ) তাদেরকে নির্দেশ দিলেন উটের রাখালের সাথে বাস করতে এবং উটের দুধ ও মুত্র খেতে (ঔষধ হিসেবে)। তারা রাখালের সাথে থাকতে লাগল এবং উটের দুগ্ধ এবং মুত্র পান করতে লাগলো যতদিন পর্যন্ত না তারা সুস্থ হয়ে উঠে। এরপর তারা রাখালকে মেরে তার উট নিয়ে পালাতে লাগল। খবর পেয়ে রাসুল (সাঃ) তাদেরকে ধরে আনতে বললেন। তাদেরকে রাসুলের সামনে উপস্থাপন করার পর তিনি তাদের হাত পা কেটে এবং চোখে লৌহ তপ্ত শলাকা ঢুকিয়ে হত্যা করার আদেশ দিলেন।

উটের দুধের পাশাপাশি মূত্রপানের উপকারিতার কথা বলা আছে আরো অনেক হাদিসেই, এবং ইবনে ইসহাকের সিরাতেও[†]।

[†] যেমন, ১) *Narrated Anas:Some people from the tribe of 'Ukl came to the Prophet and embraced Islam. The climate of Medina did not suit them, so the Prophet ordered them to go to the (herd of milch) camels of charity and to drink, their* ***milk and urine*** *(as a medicine).* Sahih Bukhari 8:82:794

২) *Anas b. Malik reported that some people belonging (to the tribe) of 'Uraina came to Allah's Messenger (may peace be upon him) at Medina, but they found its climate uncongenial. So Allah's Messenger (may peace be upon him) said to them: If you so like, you may go to the camels of Sadaqa and drink their* ***milk and urine****. They did so and were all right.* Sahih Muslim 16:4130

৩) *"A tradtionalist told me from one who had told him from Muhammad b. Talha from Uthman v. Abdul-Rahman that in the raid of Muharib and B. Thalaba the apostle had captured a slave called Yasar, and he put him in charge of his milch-camels to shepherd them in the neighborhood of al-Jamma. Some men of Qays of Kubba of Bajila came to the apostle suffering from an epidemic and enlarged spleens, and the apostle told them that if they went to the milch camels and drank their* ***milk and their urine*** *they would*

পরস্পরবিরোধী বাণীও আছে ঢের। কোরানের কয়েকটি আয়াত থেকে পাওয়া যায়, এই মহাবিশ্ব তৈরি করতে আল্লাহ সময় নিয়েছেন ছয় দিন (৭:৫৪, ১০:৩, ১১:৭, ৫০:৩৮, ৫৭:৪ ইত্যাদি), কিন্তু ৪১:৯-১২ থেকে জানা যায়, তিনি পৃথিবী তৈরি করতে ২ দিন সময় নিয়েছিলেন, এর পর এর মধ্যে পাহাড়-পর্বত বসাতে আর অন্যান্য আনুষঙ্গিক ইমারত তৈরী করতে আরো চার দিন, সবশেষে সাত আসমান বানাতে সময় নিয়েছেন আরো দু-দিন। সব মিলিয়ে সময় লেগেছে মোট আট দিন। কাজেই কোরান অনুযায়ী আল্লাহ মহাবিশ্ব বানিয়েছেন কয় দিনে - ছয় দিনে নাকি আট দিনে? পরস্পরবিরোধিতার আরো কিছু নমুনা দেখি। সুরা ৭৯:২৭-৩০ অনুযায়ী আল্লাহ 'হেভেন' বানিয়েছিলেন আগে, তারপর বানিয়েছিলেন পৃথিবী, কিন্তু অন্য কিছু আয়াতে আল্লাহ বলেছেন একেবারে উলটো কথা - অর্থাৎ, আগে পৃথিবী, পরে হেভেন (২:২৯ এবং ৪১: ৯-১২ দ্রঃ)। কখনো বলা হয়েছে আল্লাহ সব কিছু ক্ষমা করে দেন (৪: ১১০, ৩৯: ১৫৩) কিন্তু আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, তিনি সব কিছু ক্ষমা করেন না (৪:৪৮, ৪:১১৬, ৪:১৩৭, ৪:১৬৮)। সুরা ৩: ৮৫ এবং ৫:৭২ অনুযায়ী ইসলাম ধর্মে যারা নিজেদের সমর্পন করেনি তারা সবাই দোজখে যাবে তা সে খ্রীষ্টান, ইহুদী, প্যাগান যেই হোক না কেন, কিন্তু আবার ২:৬২ এবং ৫:৬৯ অনুযায়ী, ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের সবাই দোজখে যাবে না। কখনো বলা হয়েছে মুহম্মদকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত আছেন একহাজার জন ফেরেস্তা (৮:৯-১০) কখনোবা বলেছেন এই সাহায্যকারী ফেরেস্তাদের সংখ্যা আসলে তিনহাজার (৩: ১২৪, ১২৬)। কখনো আল্লাহ বলেছেন তার একটি দিন পার্থিব এক হাজার বছরের সমান (২২:৪৭, ৩২:৫), কখনোবা বলেছেন, তার দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান (৭০:৪)। মানব সৃষ্টি নিয়েও আছে পরস্পর-বিরোধী তথ্য। আল্লাহ কোরাণে কখনো বলেছেন তিনি মানুষ বানিয়েছেন পানি থেকে (২৫: ৫৪, ২৪:৪৫), কখনোবা জমাট রক্ত বা 'ক্লট' থেকে (৯৬: ১-২), কখনোবা কাদামাটি থেকে (১৫:২৬, ৩২:৭, ৩৮:৭১, ৫৫:১৪) আবার কখনোবা 'ডাস্ট' বা ধূলা থেকে (৩০:২০, ৩৫:১১) ইত্যাদি। একই সাথে তো এত ধরণের পরস্পর-বিরোধী তথ্য সত্য হতে পারে না।

যা হোক, ইতিহাসের পাতাতে এবারে চোখ রাখা যাক। এগারো শতকের বিখ্যাত আরবীয় বিজ্ঞানী ইবন-আল হাইথাম ধারণা করেছিলেন যে পৃথিবী সমতল নয়, বরং গোলাকার। তার সমস্ত কাজ সে সময় ধর্মবিরোধী বলে বাজেয়াপ্ত করা হয়, আর তাঁর সমস্ত বইও পুড়িয়ে দেওয়া হয়[‡]। এই তো সেদিন - ১৯৯৩ সালে, সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ধর্মীয় ধ্বজাধারী ব্যক্তি শেখ আবদেল আজিজ ইবন বা'জ এই বলে একটি ফতোয়া জারি করেন -

---

recover, so off they went. From The Sirat Rasul Allah (The Life of The Prophet of God), by Ibn Ishaq pages 677- 678

[‡] T.J. de Boer তার History of Philosophy in Islam (1904) বইয়ে বলেছেন যে, পৃথিবীকে গোলাকার হিসবে বিবেচনা করে হাইথাম অপবিত্র নাস্তিকের প্রতীকে (unhappy symbol of impious Atheism) পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন, এবং তার কাজকর্ম জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। এছাড়া Bradley Steffens এর Ibn al-Haytham: First Scientist বইয়েও হাইথামের পান্ডুলিপি পোড়ানোর উল্লেখ পাওয়া যায়।

> 'এই পৃথিবী সমতল। যারা এই সত্যটা মানে না তারা সকলেই নাস্তিক, শাস্তিই তাদের কাম্য।'

কার্ল স্যাগানের 'The Demon-Haunted World' বইয়ে এই বিখ্যাত ফতোয়ার উল্লেখ পাওয়া যাবে[§]।

হিন্দু পূরাণগুলির অবস্থাও তথৈবচঃ। নরসিংহ পূরাণের ১৬৯ পৃষ্ঠায় সমতল পৃথিবীর পরিস্কার বর্ণনা আছে। তাই গুজরাটে বারোদায় 'জাম্বুদ্বিপা' নামের একটি প্রতিষ্ঠান এখনো বৈদিক সমতল পৃথিবীকে 'বৈজ্ঞানিকভাবে' প্রমান করার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯৯৯ সালের ১৫ ই সেপেটম্বর কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টিম মিলার দাবী করলেন যে, 'বাইবেল অনুযায়ী, পৃথিবীর চারটি প্রান্ত আছে।' এবং তিনি আরও দাবী করলেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন পৃথিবী আসলে হয় চতুর্ভুজ আকৃতির অথবা আয়তাকার। আসলে কোরাণ, বাইবেল আর বেদের মত ধর্মগ্রন্থে লেখা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কিছু মানুষ এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও মনে করে পৃথিবী গোলাকার নয়, সমতল। তারা 'আন্তর্জাতিক সমতল পৃথিবী সমিতি' (International Flat Earth Society[**]) এবং 'আন্তর্জাতিক চতুর্ভূজাকার পৃথিবী সমিতি' (The International Square Earth Society[††]) এ ধরনের হাস্যকর সমস্ত নামে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুলেছে যাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে পৃথিবীবাসীদের বোঝানো যে, বিজ্ঞান যাই বলুক না কেন, পৃথিবী কিন্তু সমতল!

আবারও ফিরে আসি বিজ্ঞানময় কিতাবের জগতে। ফিরে আসতেই হয় বারে বারে- বুকাইলী, হারুন ইয়াহিয়া আর মুর-দের কল্যাণে। সোজা হয়ে প্রশ্নটার মুখোমুখি দাঁড়াতেই হয় অবশেষে- 'সত্যই কি কোরাণ অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত আর মহা-বিজ্ঞানময় এক নিখুঁত ঐশী কিতাব?' বব ডিলানের বাংলা করে সুমন যেভাবে গেয়েছে, সেভাবেই বলি- 'প্রশ্নগুলো সহজ, আর উত্তরও তো জানা।' উত্তর হচ্ছে- মোটেই কোরাণ অলৌকিক কোন গ্রন্থ নয়। কোরাণে আসলে কোথাও বিগ-ব্যাং এর কথা নাই, রিলেটিভিটির কথা নাই, কৃষ্ণগহ্বরের কথা নাই, অণু-পরমাণুর কথাও নাই। বিগ-ব্যাং আর রিলেটিভিটির নামে যা দেখছি, তা হল আদিম সূরাগুলির 'আধুনিক' এবং 'চতুর' ব্যাখ্যা। নীচের উদাহরণ টি দেখা যাক-

> 'অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না, আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম' (আম্বিয়া ২১:৩০)

[§] যদিও ফতোয়াটি নিয়ে কিছুটা বিতর্ক আছে, কারণ শেখ আবদেল আজিজ ইবন বা'জ পরে ফতোয়া দেওয়ার ব্যাপারটি অস্বীকার করেন। কিন্তু এখনো অন্ততঃ তিনটি জায়গায় ফতোয়াটির উল্লেখ পাওয়া যায়- কার্ল স্যাগেনের ' The Demon-Haunted World' (১৯৯৬ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩২৫), অধ্যাপক পারভেজ হুদোভয়ের Islam and Science: Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality (পৃষ্ঠা ৪৯) এবং New York Times এর 1995 সালে প্রকাশিত Yousef M. Ibrahim এর প্রবন্ধ *Muslim Edicts take on New Force* (The New York Times, February 12, 1995)

[**] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন - The Flat-out Truth: The idea of a spinning globe is only a conspiracy of error that Moses, Columbus, and FDR all fought... http://www.lhup.edu/~dsimanek/fe-scidi.htm

[††] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন -The International Square Earth Society, http://pw1.netcom.com/~rogermw/square_earth.html

'মহাবিজ্ঞানময় কিতাব-বিশেষজ্ঞ' এর দল এই আয়াতটির মধ্যে বিগ-ব্যাং এর গন্ধ খুঁজে পান। কিন্তু আসলেই কি এর মধ্যে বিগ-ব্যাং এর কোন আলামত আছে? একটু যৌক্তিক মন নিয়ে আলোচনা করা যাক। এই আয়াত আর তার পরবর্তী আয়াতগুলের দিকে তাকানো যাক -

> 'আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম' (আম্বিয়া ২১:৩০)
>
> 'এবং আমি এ জন্য পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি, যেন তা সহ এটি না নড়ে।' (আম্বিয়া ২১:৩১)
>
> 'এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ' (আম্বিয়া ২১:৩২)
>
> 'আল্লাহই উর্ধ্ব দেশে স্তম্ভ ছাড়া আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন' (রা'দ ১৩:২)

এই আয়াতগুলি আমাদের আকাশ আর পৃথিবীর মধ্যকার সম্পর্কে আসলে খুব প্রাচীন আর অস্পষ্ট একটি ধারণা দেয়। আল্লাহ আকাশকে 'স্তম্ভ বিহীন' ছাদ হিসেবে স্থাপন করার পর পৃথিবীতে পর্বত মালা স্থাপন করলেন যাতে কিনা আমাদের এ পৃথিবী না নড়ে, ঠিক যেমনটি আমরা পাতলা কোন কাগজ বাতাসে উড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ওটাকে পেপার-ওয়েট দিয়ে চাপা দেই। আল্লাহ মানুষের মাথায় 'আকাশ ভেংগে পড়ার' হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কি করলেন? আকাশকে অদৃশ্য খুঁটির উপর বসিয়ে দিলেন। এগুলো কি করে বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলামত হয়? আর সবচেয়ে বড় কথা, 'আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম' - এই আয়াতটি যদি মহা-বিস্ফোরণের (বিগ-ব্যাং) এর প্রমান হয়, তবে কোথায় এখানে বিস্ফোরণের উল্লেখ? 'বিগ-ব্যাং' শব্দটি নিজেই এখানে তাৎপর্যবাহী। এই আয়াতের কোথায় রয়েছে সেই বিখ্যাত 'ব্যাং' (বিস্ফোরণ)-এর ইঙ্গিত?

উপরন্তু, পদার্থবিজ্ঞানে 'বিগ ব্যাং' স্থান-কাল অদ্বিতীয়ত্বের (space-time singularity) সাথে জড়িত, পদার্থের সাথে নয়। বিগ-ব্যাং এর প্রক্রিয়া যখন শুরু হয়েছিল তখন পৃথিবীর অস্তিত্বই ছিল না, পৃথিবীর জন্ম হয়েছে বিগ ব্যাং এর কোটি কোটি বছর পরে। উপরের আয়াতটি শুধু আকাশ ও পৃথিবী একসাথে 'মিশে থাকার' (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে যার কোন অর্থই হয় না) কথাই বলছে আর পরে বলছে উভয়কে 'পৃথক করে' (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে আবারও যার কোন অর্থ নেই) দেওয়ার কথা যা মূলতঃ 'হযবরল' ছাড়া আর কিছুই নয়, বিগ ব্যাং তো অনেক পরের কথা।

কাজেই কতগুলি অর্থহীন শব্দমালা -'আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম' কখনই বৈজ্ঞানিকভাবে 'বিগ ব্যাং'কে প্রকাশ করে না[‡‡]। কোয়ান্টাম পদার্থ-বিজ্ঞান থেকে আমরা জানি, মহাবিস্ফোরণ-মুহূর্তে প্রকৃতির চারটি বল- শক্তিশালী নিউক্লিয় বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল, তড়িৎ-চুম্বকীয় বল আর মধ্যাকর্ষণ বল 'একীভূত শক্তি' (super force) হিসেবে প্রকৃতিতে বিদ্যমান ছিল। উপরের আয়াটিতে কোথায় তার ইঙ্গিত? কিভাবে একজন ওই আয়াতটি থেকে হাবলের ধ্রুবক বের করতে পারবে? কি ভাবে মাপতে পারবে ডপলারের বিচ্যুতি? উত্তর নেই।

জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষনার দিকে খানিকটা চোখ বুলানো যাক। অ্যালেন গুথ এবং আঁদ্রে লিন্ডের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে পাওয়া ফলাফল থেকে জানা গিয়েছে, আমাদের মহাবিশ্ব যদি কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে স্থান-কালের শূন্যতার ভিতর দিয়ে আবির্ভূত হয়ে থাকে, তবে এ পুরো প্রক্রিয়াটি কিন্তু একাধিকবার ঘটতে পারে, এবং হয়তো বাস্তবে ঘটেছেও। ব্যাপারটিকে বলে মাল্টিভার্স বা অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা। এ ধারনায় মনে করা হয়, কেওটিক ইনফ্লেশনের মাধ্যমে সম্প্রসারিত বুদ্বুদ (Expanding Bubbles) থেকে আমাদের মহাবিশ্বের মতই অসংখ্য মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে, যেগুলো একটা অপরটা থেকে সংস্পর্শবিহীন অবস্থায় দূরে সরে গেছে। এ ধরনের অসংখ্য মহাবিশ্বের একটিতেই হয়ত আমরা অবস্থান করছি (পকেট মহাবিশ্ব) অন্য গুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারেই জ্ঞাত না হয়ে।

কাজেই, বিজ্ঞানের চোখে বিগব্যাংই শেষ কথা নয়। বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো বিগব্যাং-এর আগে কি ছিল তারও একটি সার্বিক উত্তর খুঁজতে সচেষ্ট হয়েছে। আসলে ইনফ্লেশন বা স্ফীতি নিয়ে আঁদ্রে লিন্ডে আর তার দলবলের সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে সত্যিকার অর্থেই সেই 'উত্তপ্ত বিগ ব্যাং' - যার মধ্য দিয়ে এ মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, তাকে বিদায় জানানোর সময় এসে গিয়েছে। কারণ, সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, বিগ ব্যাং দিয়ে মহাবিশ্বের শুরু নয়, বরং মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে ইনফ্লেশন দিয়ে। অর্থাৎ, বিগব্যাং এর পরে ইনফ্লেশনের মাধ্যমে মহাবিশ্ব তৈরী (যা কিছুদিন আগেও সত্যি বলে ভাবা হত) হয়নি, বরং ইনফ্লেশনের ফলশ্রুতিতেই কিন্তু বিগব্যাং হয়েছে, তারপর সৃষ্ট হয়েছে আমাদের মহাবিশ্ব । আঁদ্রে লিন্ডের কথায়[§§] :

> '১৫ বছর আগেও আমরা ভাবতাম ইনফ্লেশন হচ্ছে বিগব্যাং-এর অংশ। এখন দেখা যাচ্ছে বিগ ব্যাং-ই বরং ইনফ্লেশনারী মডেলের অংশবিশেষ।'

[‡‡] আসলে কোরানে কেন আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে থাকার কথা আছে তা সহজেই অনুমেয়। সে সময় প্যাগানসহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক গোত্রের উপকথা এবং লোককথাতেই আকাশ আর পৃথিবী মিশে থাকার আর হরেক রকমের দেব-দাবী দিয়ে পৃথক করার কথা বলা ছিল। যেমন মিশরের লোককথায় 'গেব' নামের এক দেবতা ছিলেন যিনি ছিলেন মৃত্তিকার দেবতা। এই গেবকে তার মা এবং বোন (আসমানের দেবী) থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ফলেই আকাশ আর পৃথিবী একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আবার, সুমেরীয় উপকথা গিলগামেশের কাহিনীতেও আসমানের দেবী 'অ্যান'কে মৃত্তিকার দেবতা 'কী' এর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার কথা বলা আছে। এ সমস্ত উপকথা থেকে প্যাগান রেফারেন্সগুলো বাদ দিলে যা রইবে, তা কোরাণেরই কাহিনী।

[§§] Self Reproducing Inflationary Universe, Andrei Linde, Scientific American, 1998

এখন কথা হচ্ছে, বিগব্যাং -এর মডেল কখনো ভুল প্রকাণিত হলে কিংবা পরিবর্তিত / পরিশোধিত হলে কি হবে? সাথে সাথে কি ধার্মিকেরাও বিগব্যাং-এর সাথে 'সঙ্গতিপূর্ণ' আয়াতকে বদলে ফেলবেন? তাহলে তখন 'আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল' -এই আপ্তবাক্যের কি হবে? এই ধরণের আশংকা থেকেই কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন বিশ্বাসী পদার্থবিজ্ঞানী আব্দুস সালাম জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের বিগ ব্যাং তত্ত্বকে কোরানের আয়াতের সাথে মিশাতে বারণ করতেন। তিনি বলতেন***,

> 'বিগব্যাং তত্ত্বের সাম্প্রতিক ভাষ্যটি বর্তমানে মহাবিশ্বের উৎপত্তির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করছে। কিন্তু আগামীকাল যদি এর চাইতেও কোন ভাল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহলে কি হবে? তাহলে কি নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তাল মেলাতে গিয়ে ধর্মগ্রন্থের আয়াত বদলে ফেলা হবে?'

খুবই যৌক্তিক শঙ্কা। ঠিক একই কারণে ১৯৫১ যখন Pope Pius XII বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের মিল খুঁজে পেলেন, তখন জ্যোর্তিবিজ্ঞানী এবং খ্রীষ্টান ধর্মযাজক জর্জ হেনরি লেমিত্রি (যিনি 'বিগ ব্যাং' প্রতিভাসের একজন অন্যতম প্রবক্তা) পোপকে বিনয়ের সঙ্গে এ ধরনের যুক্তিকে 'অভ্রান্ত' হিসেবে প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই পরামর্শ মানছে কে?

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ওই অনলাইন পত্রিকাটিতে অধ্যাপক ভদ্রলোকের সাথে বিতর্কের কারণে কোরাণ এবং কোরাণ-বিশেষজ্ঞদের কথা বারে বারে উঠে এসেছে বলে এমন ভাবার কোন কারণ নেই যে অন্যান্য ধর্মের 'কিতাব বিশেষজ্ঞের দল' এই অভিযোগ থেকে মুক্ত। এরা কেউই আসলে ধোয়া তুলসি-পাতা নয়; বরং, একই মূদ্রার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। কিছু হিন্দু ভাববাদী 'বৈজ্ঞানিক' আছেন, যারা মনে করেন মহাভারতে কৃষ্ণ অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছে তা আসলে বিগ-ব্যাং ছাড়া কিছু নয়। মৃণাল দাসগুপ্ত ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমীর বিখ্যাত বিজ্ঞানী। উনি দাবী করেন, আজ আধুনিক বিজ্ঞান যে সমস্ত নতুন তত্ত্ব ও তথ্য প্রতিদিনই আবিস্কার করছে, তার সবকিছুই নাকি প্রাচীনকালের মুণি ঋষিরা বের করে গেছেন। বেদে নাকি সে সমস্ত আবিস্কার 'খুবই পরিস্কারভাবে' লিপিবদ্ধ আছে। মিঃ দাসগুপ্তের ভাষায়, রবার্ট ওপেনহেইমারের মত বিজ্ঞানীও নাকি গীতার বিশ্বরূপ দর্শনে এতই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে ল্যাবরেটরীতে আণবিক শক্তির তেজ দেখে নাকি গীতা থেকে আবৃত্তি করেছিলেন-

'দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ ভাসস্তস মহাত্মনঃ'

বিজ্ঞান জানা কিছু শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবি আছেন যারা ভাবেন আধুনিক বিজ্ঞান আজ যা আবিস্কার করছে তা সবই হিন্দু পূরাণ গুলোতে লিপিবদ্ধ জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি। হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন তাদের মুখপত্র 'উদ্বোধন' এ বলা শুরু করেছে যে, কৃষ্ণ গহ্বর কিংবা সময় ধারণা নাকি মোটেই নতুন কিছু নয়। হিন্দুধর্ম নাকি অনেক আগেই এগুলো জানতে পেরেছিল। কিভাবে ? ওই যে বহুল প্রচারিত সেই আপ্তবাক্যে

*** Aparthib Zaman, Mixing Science with Religion, Mukto-Mona

-'ব্রহ্মার এক মুহূর্ত পৃথিবীর সহস্র বছরের সমান'। কিছু ধর্মবাদীর দৃষ্টিতে মহাভারতের কাল্পনিক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছিল আসলে এক 'পারমাণবিক যুদ্ধ' (Atomic War)। প্রশান্ত প্রামানিক নামে ভারতের এক 'জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক' তার 'ভারতীয় দর্শনে আধুনিক বিজ্ঞান' বইয়ে তার কল্পনার ফানুসকে মহেঞ্জোদাড়ো পর্যন্ত টেনে নিয়ে বলেছেন -'সম্ভবত দুর্যোধনেরই কোন মিত্র শক্তি পারমাণবিক যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে থাকবে মহেঞ্জোদাড়োতে' (পৃঃ ৬)। 'সবই ব্যাদে আছে' মার্কা এই সব বকচ্ছপ ভাববাদীরা অবলীলায় দাবী করে ফেলেন যে, নলজাতক শিশু (test tube baby) আর বিকল্প মা (surrogate mother) আধুনিক বিজ্ঞানের দান মনে করা হলেও তা হিন্দু সভ্যতার কাছে নাকি নতুন কিছু নয়। দ্রোণ-দ্রোনী, কৃপ-কৃপীর জন্মের পৌরাণিক কাহিনীগুলি তারই প্রমাণ। এমনকি কিছুদিন আগে উপসাগরীয় যুদ্ধে ব্যবহৃত স্কাড আর প্যাট্রিয়ট মিসাইল নাকি হিন্দু পুরাণে বর্ণিত 'বরুন বাণ' আর 'অগ্নিবাণ' বই কিছু নয়। তারা সব কিছুতেই এমনতর মিল পেয়ে যান। যেমনি ভাবে ভারতের 'দেশ' এর মত প্রগতিশীল পত্রিকায় ২২ এপ্রিল ১৯৯৫ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিজ্ঞান ও ভগবান' নিবন্ধের লেখক হৃষীকেশ সেন বেদান্তে বর্ণিত উর্ণনাভ বা মাকড়শার মধ্যে বিশ্বব্রহ্মান্ডের মডেলের মিল পেয়ে গেছেন।

খ্রীষ্টান সমাজেও এই ধরনের 'হাসজারু' প্রচেষ্টা বিরল নয় । বিজ্ঞানী - ফ্রাঙ্ক টিপলার - পদার্থবিজ্ঞানে অবদানের জন্য ইদানিং যত না বিখ্যাত, তার চেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছেন খ্রীষ্টধর্মকে 'বিজ্ঞান' বানানোর জন্য। ওমেগা পয়েন্ট নামে একটি তত্ত্ব দিয়েছেন টিপলার যা মহাসংকোচন (বিগ ক্রাঞ্চ)-এর সময় সিংগুলারিটির গানিতিক মডেলকে তুলে ধরে। এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু টিপলার মনে করেন এই ওমেগা পয়েন্টই হচ্ছে 'গড'। শুধু তাই নয়, যীশুর অলৌকিক জন্মকে (ভার্জিন বার্থ) তিনি বৈজ্ঞানিক বৈধতা দিতে চান যীশুকে বিরল xx male বানিয়ে, যীশুর পুনুরুত্থানকে ব্যারন এনিহিলেশন প্রক্রিয়ার সাথে তুলনা করেছেন, ইনকারনেশন বা অবতারকে বলেছেন বিপরীতমুখি ডিম্যাটারিলিজেশন পদ্ধতি, ইত্যাদি। এ সমস্ত রং-বেরং এর গালগপ্প নিয়েই নিয়েই তার সাম্প্রতিক বই The Physics of Christianity (2007)! বলা বাহুল্য মাইকেল শারমার, ভিক্টর স্টেংগর, লরেন্স ক্রাউস সহ অনেক বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকই টিপলারের যুক্তিকে খন্ডন করেছেন[†††], কিন্তু তাতে অবশ্য আধুনিক 'বিজ্ঞানময়' খ্রীষ্ট-ধর্মোন্মাদনা থেমে যায়নি, যাবেও না। ফ্রাঙ্ক টিপলারের অনেক আগে ১৯৭৫ সালে ফ্রিজোফ কাপরা একই মানসপটে লিখেছিলেন 'The Tao of Physics' - প্রাচ্যের তাওইজমের সাথে বিজ্ঞানকে জুড়ে দিয়ে। চীনের প্রাচীন দার্শনিকেরা ইন এবং য়্যান (yin and yang) নামে পরস্পরবিরোধী কিন্তু একইভূত সত্ত্বার কথা বলেছিলেন - মানুষের মনে ভাল-মন্দ মিলেমিশে থাকার প্রসঙ্গে। ফ্রিজোফ কাপরা সেই ইন এবং য়্যানকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলেন কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার জগতে - পদার্থের দ্বৈত সত্ত্বার (dual nature of matter) বর্ণনা হাজির করে - পদার্থ যেখানে কখনো কণা হিসেবে বিরাজ করে কখনো বা তরঙ্গ হিসেবে । আধুনিক পদার্থবিদ্যার শূন্যতার ধারনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন তাওইজমের 'চী' (ch'i or qi)-এর সাথে -

[†††] বিস্তারিত তথ্যের জন্য পাঠকেরা পড়ুন অধ্যাপক ভিক্টর স্টেংগরের 'In The Name Of The Omega Point Singularity' (Free Inquiry 27. No. 5 August/September 2007) ; এবং ডঃ লরেন্স ক্রাউসের 'More dangerous than nonsense' (New Scientist, 12 May 2007)।

> ‘যখন কেউ জানবে যে, মহাশুন্য ‘চী’ দিয়ে পরিপূর্ণ, তখনই কেবল সে অনুধাবণ করবে, শুন্যতা বলে আসলে কিছু নেই।‘

মুক্তমনার বিশিষ্ট সদস্য অপার্থিব জামান ধর্মগ্রন্থের মধ্যে ‘বিজ্ঞান খোঁজার’ এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে একটি নিবন্ধে লিখেছিলেন -

> ‘প্রায়শঃই ধর্মবাদীরা ধর্মগ্রন্থের একটি নির্দিষ্ট আয়াত বা শ্লোকের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান কে খুঁজে পান। এটি একটি হাস্যকর অপচেষ্টা। ওমনিভাবে খুঁজতে চাইলে যে কোন কিছুতেই বিজ্ঞান কে খুঁজে নেওয়া সম্ভব। যে কোন রাম-শ্যাম-যদু-মধু আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিস্কারের অনেক আগে কোন কারণে বলে থাকতে পারে -‘সব কিছুই আসলে আপেক্ষিক’। কিন্তু আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিস্কারের পর সেই সমস্ত রাম-শ্যাম-যদু-মধুরা যদি দাবী করে বসে এই বলে -‘হু ! আমি তো আইনস্টাইনের আগেই জানতাম আপেক্ষিক তত্ত্বের কথা’ তবে তা শুধু হাস্যকর ই নয়, যে সমস্ত নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানীরা তাদের শ্রমলব্ধ গবেষণার মাধ্যমে নিত্য-নতুন আবিস্কারে পৃথিবীবাসীকে উপকৃত করে চলেছেন, তাদের প্রতি চরম অবমাননাকরও বটে। সবাই জানে, আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিস্কারের জন্য আইনস্টাইনকে কখনই কোন ধর্মগ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়নি, বরং আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিস্কারের পর পর ই তা ধর্ম বাদীরা নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে জুড়ে দেওয়ার জন্য নানা জায়গায় মিল খুঁজে পেতে শুরু করলেন। বলা বাহুল্য, আধুনিক বিজ্ঞান যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দানে এখনও অক্ষম, সেই সমস্ত জায়গায় ধর্মবাদীরাও কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। যেমন, বিজ্ঞান এখনও নিশ্চিতভাবে জানে না যে আমাদের এই মহাবিশ্ব বদ্ধ, খোলা নাকি ফ্ল্যাট। তাই ধর্মবাদীদেরও কেউ তাদের ঐশী কিতাব থেকে আমাদের জন্য ভবিষ্যতবাণী করে কোন ধরনের আলোকপাত করতে পারছেন না। কিন্তু আমি নিশ্চত যে, বিজ্ঞানের কল্যাণে কখনও যদি এর উত্তর বেরিয়ে আসে, তবে সাথে সাথে ধর্মবাদীরা বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের কতকগুলি অস্পষ্ট আয়াত অথবা শ্লোক হাজির করে এর অতিপ্রাকৃততা দাবী করবেন। মূলতঃ প্রতিটি ক্ষেত্রেই (গোঁজা)মিলগুলি পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিক আবিস্কারগুলি প্রকাশ পাওয়ার পর, তার আগে নয়। এ কি স্রেফ ঘটনার কাকতালীয় সমাপতন?’

আমি অপার্থিবের মন্তব্যের সাথে সামগ্রিকভাবে একমত। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধর্মগ্রন্থে ‘আধুনিক বিজ্ঞানের’ সন্ধান পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিক আবিস্কারগুলো প্রকাশ পাওয়ার পর, তার আগে নয়। কারণ বিজ্ঞানের দায় পড়ে নি ধর্মগ্রন্থ থেকে সবক নিয়ে আলোর সন্ধান লাভ করতে, বরং ধর্মগুলোই জেনে গেছে, বিজ্ঞান ছাড়া তারা টিকে থাকতে পারবে না। কাজেই, নিত্য-নতুন বৈজ্ঞানিক আবিস্কারগুলোকে ধর্মগ্রন্থের সাথে জুরে দেবার জন্য ধর্মবাদীরা এখন মুখিয়ে থাকে। একটা সময় বাইবেল-বিরোধী সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব প্রকাশের জন্য কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, ব্রুনোর উপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়েছিল বাইবেল- ওয়ালারা, সেই তারাই এখন বাইবেলের নানা জায়গায় সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বের ‘আলামত’ পেয়ে যান। কোরানের ক্ষেত্রেও

একই ব্যাপার খাটে। কিছুদিন আগেও দেখতাম অনেকেই ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে রীতিমত জিহাদ শুরু করেছিলেন কোরানের আয়াতকে উদ্ধৃত করে, আজকে যখন বিবর্তনতত্ত্বের স্বপক্ষের প্রমাণগুলো এতই জোরালো হয়ে উঠেছে যে, সেগুলোকে আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না। তাই শুরু হয়েছে বিবর্তনবাদের স্বপক্ষে আয়াত খোঁজা। পেয়েও গেছেন কিছু কিছু। একটা ওয়েব সাইটে দেখলাম, ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে যে, কোরাণের ৪:১, ৭:১১, ১৫:২৮-২৯, ৭৬:১-২ প্রভৃতি আয়াতগুলো নাকি বিবর্তন তত্ত্বের 'সরাসরি' প্রমাণ। এ সমস্ত আয়াতে 'সৃষ্টি' বোঝাতে 'খালাকা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'গ্র্যাজুয়াল চেঞ্জ' - অতএব - 'ইহা ইভল্যুশন'। আমার অনুমান - আর কয়েক বছরের মধ্যে শুধু ইভ্যলুশন নয়, অচীরেই তারা মাল্টিভার্স, কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন, স্ট্রিং তত্ত্ব, প্যাঙ্গপারমিয়া, জেনেটিক কোড, মিউটেশন - এ ধরণের অনেক কিছুই তারা ধর্মগ্রন্থে পেয়ে যাবেন (কিছু কিছু হয়ত এর মধ্যেই পেয়েও গেছেন)। তবে এ ধরণের সমন্বয়ের জব্বর খেলা দেখিয়েছে হিন্দু ধর্মবাদীরাই। যখন বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকে ফ্রেডরিখ হয়েল, হারমান বন্দি আর জয়ন্ত নারলিকার মিলে স্থিতিশীল মহাবিশ্ব তত্ত্বের (Steady state theory) অবতারনা করেছিলেন, তখন তা ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের মধ্যে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, কারণ এটি বেদে বর্ণিত 'চির শাশ্বত' মহাবিশ্বের ধারণার সাথে মিলে যায়। কিন্তু মহাজাগতিক পটভুমি বিকিরণের (Cosmic background radiation) খোঁজ যখন বিজ্ঞানীরা পেলেন, তখন তা স্থিতিশীল মহাবিশ্বকে হটিয়ে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব বা বিগ ব্যাং-কে বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে দিল। হিন্দুত্ববাদীরাও সাথে সাথে ভোল পালটে 'চির শাশ্বত' মহাবিশ্ব বাদ দিয়ে 'অদ্বৈত ব্রহ্ম'-এর খোঁজ পেয়ে গেলেন। অর্থাৎ, মহাবিশ্বের সৃষ্টি থাকুক, না থাকুক, চিরশ্বাশ্বত হোক আর না হোক, স্থিতশীল হোক আর অস্থিতিশীলই হোক - সবই কিন্তু তাদের ধর্মগ্রন্থে আছে।

ধর্মবাদীদের গোঁজামিল দেওয়ার এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা (সঠিক ভাবে বললে বলা উচিত 'অপচেষ্টা') দেখে প্রবীর ঘোষ তার 'কেন আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না' বইতে খুবই মজার একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন -

> 'ধরা যাক, রাস্তার একটি মাতালকে এই বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের মডেল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। মাতালটি হয়ত রক্ত-চোখে প্রশ্নকারীর দিকে তাকিয়ে থেকে রাস্তা থেকে পড়ে থাকা মদের বোতলটি তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে গলায় মদ ঢালতে শুরু করল। তারপর অবশেষে শুন্য বোতলটি রাস্তায় ফেলে দিয়ে হেঁটে চলে গেল। পুরো ব্যাপারটিকে কিন্তু ইচ্ছে করলেই বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের সাথে গোঁজামিল দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায়। মদের বোতলটি যখন পূর্ণ ছিল, সেই অবস্থাটিকে আমাদের এখনকার প্রসারণশীল মহাবিশ্বের সাথে তুলনা করা যায়। মাতালটি গলায় মদ ঢেলে বোতল খালি করতে শুরু করল এই বোঝাতে যে, এক সময় বিশ্বের এই প্রসারণ থেমে যাবে আর শুরু হবে সংকোচন। শেষ পর্যন্ত মাতালটি শুন্য বোতল রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে এটাই বোঝাতে চাইছে যে মহাবিশ্ব সংকুচিত হতে হতে পূর্বের সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করে সিংগুলারিটি বিন্দুতে চলে আসবে।'

কী আদ্ভুত 'মহা-বিজ্ঞান ময়' নির্বুদ্ধিতা ! বাংলাদেশে বেশ ক'বছর ধরেই চলছে এই নির্বুদ্ধিতার খেলা, মাতাল সাজার আর মাতাল বানানোর নিরন্তর প্রক্রিয়া। এখানে 'জ্ঞানের কথা', 'লজ্জা' 'নারী'র মত

প্রগতিশীল বই অবলীলায় নিষিদ্ধ করা হয় মানুষের 'ধর্মানুভূতি' তে আঘাত লাগবার অজুহাতে, আরজ আলী মাতুব্বরের 'সত্যের সন্ধান' আর দেবী প্রসাদ চৌধুরীর 'যে গল্পের শেষ নেই' পড়ার অপরাধে মুক্তিযোদ্ধা ওহাবকে 'জুতোর মালা' পরিয়ে সারা গ্রাম ঘোরানো হয়, তসলিমাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়, মুক্ত বুদ্ধির চর্চা করার জন্য আহমেদ শরীফ-আলী আসগর-কবীর চৌধুরী দের 'মুরতাদ' ঘোষনা করা হয়, চাপাতির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হতে হয় মুক্তমনা অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদকে, আর অপরপক্ষে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামিক ফাউন্ডশন থেকে বের করা হয় 'Scientific Identification in Holy Quran' এর মত ছদ্ম-বিজ্ঞানময় গ্রন্থ। ভক্তি-রসের বান ডেকে অদৃষ্টবাদ আর অলৌকিকত্বের রমরমা বাজার তৈরী করতে চলছে বুকাইলী-মুর-দানিকেনদের বইয়ের ব্যাপক প্রচার আর প্রসার। বাংলাদেশের সারা বাজার এখন 'আল-কোরাণ এক মহা বিজ্ঞান', 'মহাকাশ ও কোরাণের চ্যালেঞ্জ', 'বিজ্ঞান না কোরাণ', 'বিজ্ঞান ও আল কোরাণ' জাতীয় ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক বই এ সয়লাব। এ বছর মুক্তমনা এবং শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের যৌথপ্রয়াসে প্রকাশিত 'স্বতন্ত্র ভাবনা' (চারদিক, ২০০৮) বইটির ভুমিকায় উদ্ধৃত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অজয় রায়ের একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি,

> 'জ্ঞানের একমাত্র উৎস যদি পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলি হয়, তাহলে সেই সমাজে নেমে আসবে বন্ধ্যাত্ব, সমাজ হবে জড় চেতনা-চিন্তায় আচ্ছন্ন, সৃষ্টিশীলতার স্থান দখল করবে কুসংস্কার, মূর্খতা, কুপমন্ডুকতা আর অজ্ঞানতা। আমাদের সমাজে দেখা যাচ্ছে কুসংস্কার আর প্রযুক্তিবিদ্যার ফসলকে আত্মস্থ করার পারস্পরিক সহাবস্থান। বিজ্ঞানের যুক্তি চাই না, চাই তার ফসল, পাশে থাক অন্ধবিশ্বাস আর ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পন। এই সমাজেই সম্ভব - ড্রয়িং রুমে রঙ্গিন টেলিভিশন সেট স্থাপন, এবং হিস্টিরিয়া-আক্রান্ত কন্যাকে পীরের চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রেরণ। এই সমাজেই সম্ভব- অনুরসায়নবিদদের রসায়ন চর্চার পাশাপাশি তথাকথিত পীরের পদচুম্বন।'

সত্যই তাই। অদ্ভুত উটের পিঠে সত্যি ই বুঝি চলেছে স্বদেশ। বিজ্ঞানের এই অগ্রগামীতার যুগে প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের বাঁধন ক্রমশঃ যখন শিথিল হয়ে পড়ছে, মানুষের মনে দেখা দিচ্ছে নানা ধরনের সংশয় আর প্রশ্ন, তখনই ধর্ম কেন্দ্রিক নিবর্তন মূলক শোষণ ব্যবস্থা বজায় রাখার মতলবে শুরু হয়েছে এক নতুন ধরনের নিরন্তর মগজ ধোলাই। আর তা হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের মোড়কে মুড়ে ধর্মকে পরিবেশন। কিছু মানুষ রসাল চাটনির মত তা খাচ্ছে ও বেশ। ধর্মের নেশায় বুঁদ হয়ে মানুষ ভাবতে শিখছে ১৪০০ বছর আগে লেখা 'বিজ্ঞান ময়' কিতাবে সত্যিই বুঝি মহা-বিস্ফোরণের কথা আছে, অথবা প্রাচীন কোন শ্লোকে আছে কাল প্রসারণের ইঙ্গিত। কে দেবে এই মোহান্ধ জাতিকে মুক্তি? ওমর খৈয়ামের একটি কবিতার কথা খুব মনে পড়ছে -

> যদি মাতালের শিক্ষাকেন্দ্র মাদ্রাসাগুলো
> এপিকিউরাস, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের দর্শন-শিক্ষালয় হত,
> যদি পীর দরবেশের আস্তানা ও মাজারগুলো
> গবেষণা প্রতিষ্ঠান হত,

যদি মানুষ ধর্মান্ধতার পরিবর্তে
নীতিজ্ঞানের চর্চা করত,
যদি উপাসনালয়গুলো সর্ববিদ্যাচর্চা-কেন্দ্র
হিসাবে গড়ে উঠত,
ধর্মতত্ত্বের চর্চার পরিবর্তে যদি গণিত বীজ-গণিতের
উন্নতি সাধন করত,
ধর্ম যা মানবজাতিকে বিভক্ত করে তা
'মানবতা'র দ্বারা প্রতিস্থাপিত হত,
পৃথিবী তাহলে বেহেস্তে পরিণত হত,
পরপারের বেহেস্ত বিদায় নিত,
প্রেম-প্রীতি মুক্তি-আনন্দে জগৎ পরিপূর্ণ হত নিঃসন্দেহে।

ওমর খৈয়াম বহু বছর আগে যে কথা বলেছিলেন, বাংলাদেশের জন্য সেকথা গুলো আজও কি নিদারুন সত্য! স্বতন্ত্র ভাবনায় ড. অজয় রায় যে ভাবে লিখেছিলেন, তার সাথে সুর মিলিয়ে আমাদেরও বলতে ইচ্ছে করে - ওমর তুমি আর একবার আস এই দেশে, কুসংসারে আচ্ছন্ন এই দেশে, ফতোয়াবাজদের এই দেশে আজ তোমার বড় প্রয়োজন।

***

(প্রবন্ধটি ৯ ই ডিসেম্বর ২০০২ সালে মুক্তমনা সহ বেশ কয়েকটি ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হয়। এর ইংরেজী সংস্করণটি infidels.org এর 'ইসলাম' বিভাগে রাখা আছে। 'বিজ্ঞান ও ধর্ম - সংঘাত নাকি সমন্বয়?'- মুক্তমনার প্রকাশিতব্য সংকলন-গ্রন্থের জন্য মে ২০, ২০০৮ এ সামান্য পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত)
শেষ আপডেট : মার্চ ২০১০

ড. অভিজিৎ রায়, আমেরিকায় বসবাসরত গবেষক এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' ও 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। সম্পাদনা করেছেন 'স্বতন্ত্র ভাবনা' নামের একটি সঙ্কলন। সাম্প্রতিক গ্রন্থ - 'সমকামিতা : একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান'। ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com

বিজ্ঞান, ধর্ম এবং অপবিজ্ঞান - কোথায় টানব সীমারেখা?

জাহেদ আহমদ

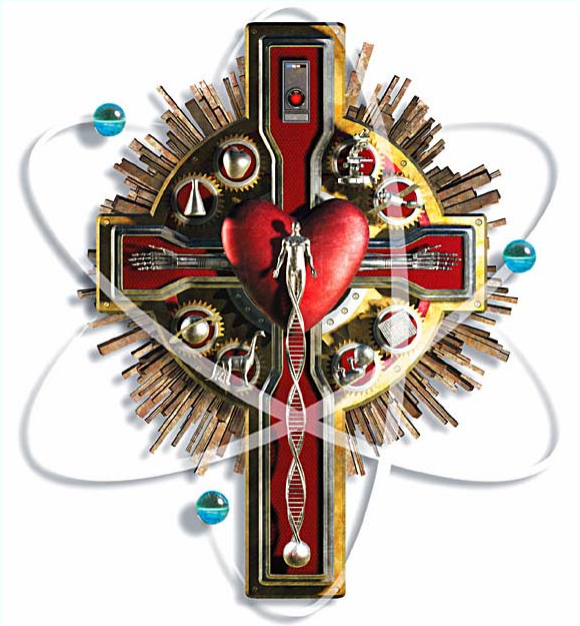

আমরা জানি বিজ্ঞানীরা সত্যের সন্ধান করে থাকেন, কিন্তু এ রকম দাবীতো আরো অনেকেই করতে পারেন যেমন- ধর্মতাত্ত্বিক, দার্শনিক, কিংবা কবি-সাহিত্যিকেরা। কেননা মহাবিশ্ব, পৃথিবী এবং এর তাবত রহস্যাদি কেবল বিজ্ঞানীদেরই নয়, বরং সকল কালের চিন্তাশীল মানুষদেরই কমবেশী ভাবিয়েছে। তাহলে প্রশ্ন আসেঃ একজন বিজ্ঞানীর চিন্তা এবং কাজের ধরণের সাথে একজন অবিজ্ঞানী চিন্তাশীল মানুষের চিন্তা ও কাজের তফাৎ কি? অন্য যে কোন সময়ের চাইতে বর্তমান সময়ে এই প্রশ্নটির উত্থাপন এবং এর যথাযথ বিশ্লেষণ বিশেষ জরুরী, কেননা বিজ্ঞানের সাথে ধর্মগ্রন্থের অদ্ভুত এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ মিলন ঘটানোর চেষ্টা চলছে বেশ কিছুদিন যাবত। হিন্দু-ইসলাম-খ্রিস্টান তিন ধর্মের কতিপয় স্বার্থান্বেসী অর্বাচীনেরা বিপুল যজ্ঞ সহকারে দিনের পর দিন এই অপকর্মটি চালিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের আবির্ভাব এবং সাধনার লক্ষ্য যেখানে সমগ্র মানবজাতি, সেখানে এই সব কূপমুন্ডুকেরা বিজ্ঞানের বিভাজন ঘটাচ্ছে 'বেদিক বিজ্ঞান,' 'ক্বোরাণিক বিজ্ঞান' এবং 'বাইবেলীয় বিজ্ঞান' ইত্যাদি নামে যা আসলে অপবিজ্ঞান (pseudoscience) বৈ আর কিছুই নয় (*কেন-* সে ব্যাখ্যায় পরে আসছি)। সাধারণ মানুষজনতো বটেই, এদের অপপ্রচারে অনেক শিক্ষিত মানুষজন ও বিভ্রান্ত হচ্ছেন। এর একটি (কিন্তু একমাত্র নয়) কারণ হচ্ছে-বিজ্ঞান বিশেষ করে একজন বিজ্ঞানীর কাজের ধরণ ও পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জ্ঞানের অভাব। তবে অনেককে দেখা যায় বিজ্ঞান বিষয়ে উঁচু ডিগ্রী থাকা সত্ত্বে ও আদম-হাওয়ার কাহিনী থেকে শুরু করে জ্বীণ-ভুতে ও পর্যন্ত বিশ্বাস করে থাকেন। এর কারণ কি? সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিজ্ঞান বিষয়ে একটা ডিগ্রি নেয়া আর বিজ্ঞানমনস্কতা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা দুটি জিনিস। একজন মানুষের মনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য কেবল একটা টেকনিক্যাল বিষয়ে সনদ (যতই উচ্চ পর্যায়ের হোক না কেন) যথেষ্ট হতে পারে না। দরকার সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, সমাজ বিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞান সম্পর্কে অন্তত ন্যূনতম ধারণা। কিন্তু আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সেই সুযোগ খুবই কম। বিজ্ঞানের ছাত্রদের একদিকে যেমন দেখা যায়- ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিদ্যা সম্পর্কে ভয়াবহভাবে অজ্ঞ; তেমনি কলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের কাছে বিজ্ঞান চিরকালই রয়ে যায় 'কেবল মাত্র মেধাবীদের' একটা বিষয়। যাঁরা ব্যতিক্রম, পুরোটাই তা নিজের চেষ্টায়। আর সে জন্যই বোধ করি, আরজ আলী মাতুব্বর, অধ্যাপক আহমদ শরীফ প্রমুখেরা বিজ্ঞানের কোন ডিগ্রী না নিয়ে ও চিন্তা-চেতনায় ছিলেন খাঁটি বিজ্ঞানমনস্ক আর ডঃ শমসের আলীর মত একজন মেধাবী বিজ্ঞানের ডক্টরেট সময় কাটাচ্ছেন ক্বোরাণের আয়াতের মধ্যে ডি-এন-এ অণুর গাঠনিক যোগসূত্র (?) বের করে। অপবিজ্ঞানের প্রসার ও জনপ্রিয়তার পেছনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে এই - বিজ্ঞান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে ও এটি যে আজকাল আমাদের জীবনকে অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণ করছে তা প্রায় সকলেই বুঝি। বিজ্ঞান ছাড়া আধুনিক সভ্যতা টিকে থাকতে পারবে না। আবার ধর্মের প্রভাব (ইতিবাচক-নীতিবাচক দুই অর্থে) ও মানুষের জীবনে অপরিসীম। তেল আর জলের মত বিজ্ঞান এবং ধর্ম দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয় হলে ও বেশিরভাগ মানুষ এ দুটোর কোনটিকেই ছাড়া জীবন কল্পনা করতে পারে না। কাজেই অসম্ভব হলে ও দুটোই সে আকঁড়ে ধরে থাকতে চায়। তাতে হয়তো কারো অসুবিধা থাকার কথা নয়। কিন্তু কেবল সস্তা জনপ্রিয়তা, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাস চরিতার্থ করার জন্য বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও প্রভাবের নিকট পরাভূত স্বীয় ধর্মের লোকজনের মিথ্যা মনোতুষ্টি যোগাতে যখন সরাসরি অপপ্রচার চালানো হয় যে, বেদ-বাইবেল-ক্বোরাণ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের মধ্যে স্বয়ং বিজ্ঞানের সকল আবিষ্কারের ইংগিত রয়েছে, তখন তা কেবল জঘন্য মিথ্যাচারই নয়, এটি একটি মারাত্নক অনৈতিক অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। কেননা এই সব দাবী দ্বারা সত্যিকারের বিজ্ঞানীদের বহু বছরের

সাধনাকে (অনেক সময় বিজ্ঞানের কোন একটি বিষয়ের আবিষ্কারক হিসেবে কেবল একজন বিজ্ঞানীর নাম আমরা জানলে ও প্রায় সময়ই দেখা যায় এর পেছনে রয়েছে পূর্বেকার সময়ের এক বা একাধিক বিজ্ঞানীর নিরন্তর শ্রম ও সাধনার ইতিহাস) অস্বীকার এবং খাটো করা হয় (আইনস্টাইন শুনলে কেমন বোধ করতেন যে তিনি ক্বোরাণ বা বাইবেলের মধ্যে আপেক্ষিক তত্ত্বের সূত্র খুঁজে পেয়েছেন!)। এ সব অপবিজ্ঞানের প্রবক্তারা যে আরেকটি মারাত্নক ক্ষতির কাজ করে তা হল- একজন মানুষের যুক্তি, পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণের চিন্তাশক্তিকে প্যারালাইজড্ করে দেয়।

বিজ্ঞানী যে ভাবে কাজ করেন/বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (scientific methodology)-র ধাপ সমূহঃ

বিজ্ঞান (science)-কে অপবিজ্ঞান বা pseudoscience থেকে আলাদা করতে হলে আমাদের একটু ধারণা থাকা দরকার একজন বিজ্ঞানী কি ভাবে কাজ করেন অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে। বিজ্ঞান হচ্ছে নিরন্তর সাধনা এবং অধ্যয়নের বিষয়; তবে বিজ্ঞানীর অধ্যয়ন, সাধনা ও শ্রমের সাথে সাধু-সন্নাসী-তান্ত্রিক-পীর-ফকিরের নির্জন 'আধ্যাত্নিক ধ্যান'-এর বিস্তর ফারাক রয়েছে। বিজ্ঞানীর গবেষণালদ্ধ ফলাফল তাই 'স্বপ্নে পাওয়া গাছ' জাতীয় কোন ব্যাপার নয়। এটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দিনের পর দিন গভীর অধ্যয়ন, সতর্ক পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, বিশ্লেষণ এবং অধ্যবসায়ের ফলে ঘটে থাকে; তারপর ও দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একজন বিজ্ঞানীকে একাধিকবার একই বিষয়ে পরীক্ষার পুনারাবৃত্তি করতে হয় যতক্ষন না পর্যন্ত কাংখিত মানের ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে।

নীচের চিত্রে একজন বিজ্ঞানীর কাজের পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলি দেখানো হল।

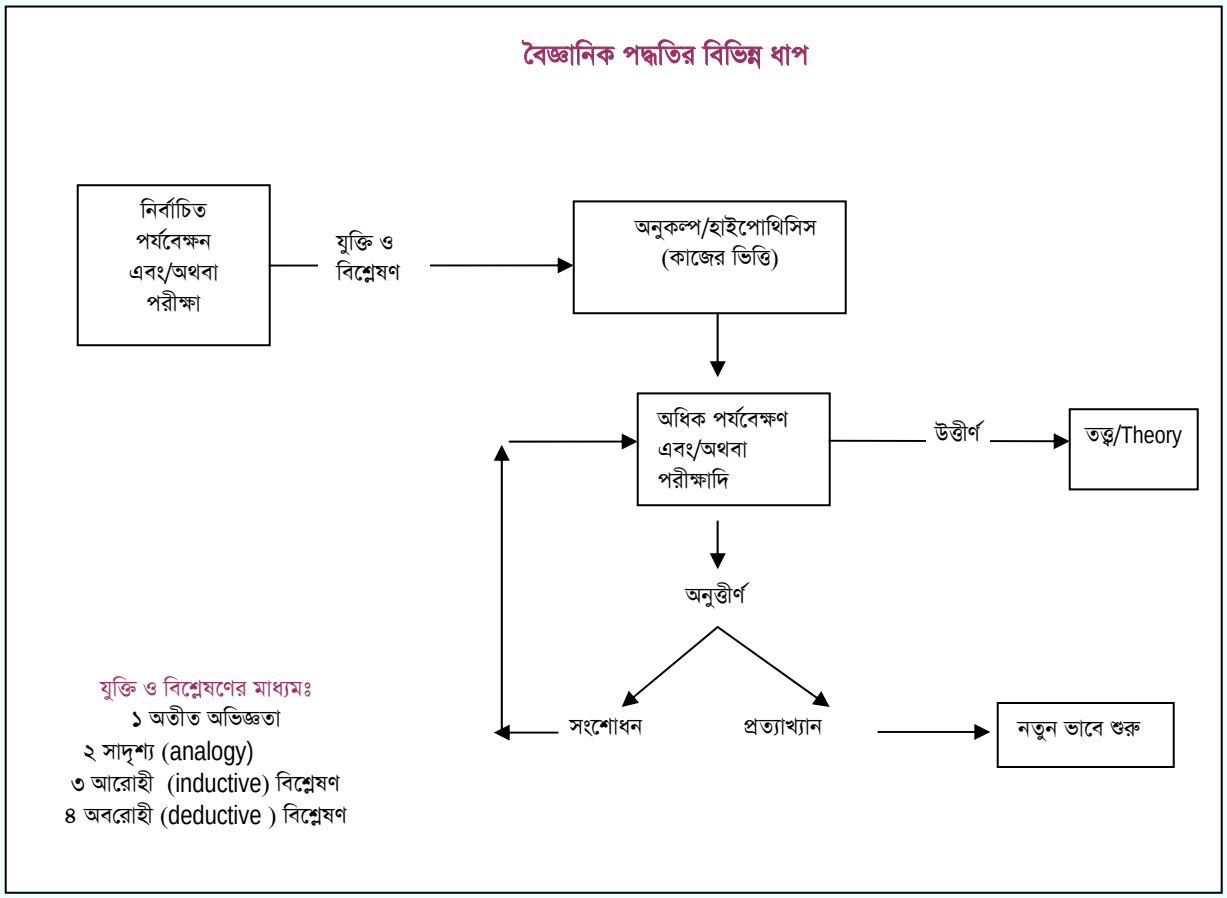

বিজ্ঞান (science) বনাম অপবিজ্ঞান (pseudoscience):

বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে আমরা মোটামোটি একটা ধারণা পেলাম। এবার দেখা যাক, অপবিজ্ঞান জিনিসটা আসলে কি? সহজ ভাষায়, ***বিজ্ঞানের মোড়কে ঢাকা কিন্তু আসলে বিজ্ঞান নয় এমন যে কোন তত্ত্ব, বক্তব্যকেই অপবিজ্ঞান বলা যায়।*** অপবিজ্ঞানের কয়েকটি উদাহরণ হচ্ছে- জ্যোতিষীশাস্ত্র (astrology) (আমি জ্যোতির্বিদ্যা বা astronomy এর কথা বলছি না, যা অবশ্যই বিজ্ঞান); ইন্টালিজেন্ট ডিজাইন (Inelligent Design); সৃষ্টিতত্ত্ব (Creationism); বিকল্প মেডিসিন যেমনঃ ম্যাগনেট থ্যারাপি, হোমিওপ্যাথি, আকুপাংচার, ডায়ানেটিক্স ইত্যাদি; টেলিপ্যাথি; ধর্মগ্রন্থসমূহ যেমনঃ বেদ-বাইবেল-ক্বোরাণ ইত্যাদিতে বিজ্ঞানের সূত্র লুকায়িত রয়েছে এমন সব দাবী। অর্থাৎ বিজ্ঞান আর অপবিজ্ঞান হচ্ছে অনেকটা আসল সোনা আর নকল সোনার মত ব্যাপার। এটা সত্য যে, *চকচক করিলেই সোনা হয় না* জেনে ও আমরা অনেক সময় নকল সোনাকে আসল সোনা মনে করে ভুল করি। সেজন্য খাঁটি সোনা ও নকল সোনার বৈশিষ্ট্য এবং তফাত জেনে রাখা ভাল। তবে স্থানাভাবে আলোচ্য প্রবন্ধে অনেক রকম অপবিজ্ঞানের মধ্যে আমি মূলত ধর্মীয় অপবিজ্ঞানের উপরই আলোকপাত করব। আশা করি পাঠক-পাঠিকারা তাতে অন্যান্য প্রকার অপবিজ্ঞান সম্পর্কে ও একটা ধারণা পাবেন। শুরুতেই দেখা যাক বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের আসলে কি কি পদ্ধতি ও বিশ্লেষণগত পার্থক্য রয়েছে-

প্রাচীন কালে মানুষেরা প্রাকৃতিক ব্যাপারসমূহ বিশেষত দূর্যোগ, খরা-বন্যা ইত্যাদির ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে সর্বদাই কোন না কোন অতি প্রাকৃতিক সত্ত্বা বা শক্তিকে টেনে নিয়ে আসত। এ যুগে ও বহু ধার্মিক মুসলিম-হিন্দু-খ্রিস্টানের কাছে সত্যের উৎস হিসেবে *ঐশী বাণী* বিজ্ঞানের মতই সত্য। **ধর্মের সংজ্ঞাতে বিবেচনায় আসে বহু বিজ্ঞানীদের এ রকম ধর্মীয় পরিচয় ও আছে। কিন্তু *প্রাকৃতিক জগৎ কি ভাবে কাজ করে,* এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে একজন বিজ্ঞানী কোন দৈবিক বা ঐশী বাণী** (divine revealation)**-র দ্বারস্থ হন না, কিংবা অতিপ্রাকৃতিক** (supernatural) **কোন ব্যাখ্যা দাঁড় করান না অর্থাৎ প্রাকৃতিক জগতের ব্যাখ্যা একজন বিজ্ঞানী প্রাকৃতিক ভাবেই খুঁজেন ।**

দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের অন্যতম একটি পার্থক্য হচ্ছে এর উন্মুক্ততা (openness)। ধর্মগ্রন্থের বাণীকে *অলংঘনীয় সত্য* হিসেবে গণ্য করা হয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে কোন তত্ত্বেরই রয়েছে একাধিক সংস্করণ (version)। নতুন পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ-প্রমাণ-যুক্তি ও বিশ্লেষণের কাছে বিজ্ঞানের পুরানো একটি তত্ত্ব হার মানতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠির বিশ্বাস, মতামত বা কর্তৃত্বের কোন মূল্য নেই। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থের বাণীকেই 'চরম ও পরম সত্য' (ultimate truth) বলে ধরে নেয়া হয়। যেমনঃ মুসলমানেরা ক্বোরাণকে *'সর্বকালের সকল মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বিধান'* বলে মনে করেন।

তৃতীয়তঃ একটি বিষয়ে নতুন কোন প্রশ্ন, সংশয়, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণকে বিজ্ঞান স্বাগত জানায়। এক অর্থে বলতে গেলে, এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই বিজ্ঞান এতদূর এগিয়েছে। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে সংশয়বাদের কোন স্থান নেই। ধর্মগ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী *সংশয়বাদী* বা *অবিশ্বাসীদের* জন্য পরকালে ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

নীচের চিত্রে বিজ্ঞান, ধর্ম এবং অপবিজ্ঞানের কতিপয় বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্যসমূহ দেখানো হল।

বিজ্ঞান (Science)	অপবিজ্ঞান (Pseudoscience)	ধর্ম (Religion)
সত্যের উৎসঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি	ধর্ম এবং বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যপূর্ণ (ad hoc) মিশ্রণ। প্রকৃতি সম্পর্কে অপ্রমাণিত, অপরীক্ষিত বা ভুল প্রমাণিত বক্তব্য কেবলমাত্র বিশ্বাসের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়।	সত্যের উৎসঃ 'ঐশী' বা 'দৈবিক বাণী'
সবক্ষেত্রে সমানঃ নিরপেক্ষ		সংস্কৃতি ও ব্যাখ্যার ধরণ অনুযায়ী তারতম্য ঘটেঃ নিরপেক্ষ নয়।
যে কেউ প্রশিক্ষণ দ্বারা চর্চ্চা করতে পারেন		'ঐশী'/'দৈবিক বাণী' কেবল নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ
সত্য শর্তসাপেক্ষ (provisional)		সত্য 'চূড়ান্ত' (ultimate)বলে গণ্য
প্রমাণাদিঃ পর্যবেক্ষন/পরীক্ষা		প্রমাণাদিঃ নেই। প্রয়োজন কেবল বিশ্বাস।
বিষয় বস্তুঃ প্রাকৃতিক জগৎ		বিষয় বস্তুঃ আধ্যাত্মিক জগৎ
বিঃদ্রঃ এগুলি একটি থেকে অন্যটি পুরোপুরি স্বতন্ত্র (mutually exclusive)। দুটি বিষয় মানব অস্তিত্বের পৃথক দুটি ক্ষেত্র নিয়ে চর্চ্চা করে।		

অপবিজ্ঞানের কি সুনির্দিষ্ট কোন প্যাটার্ণ বা বৈশিষ্ট্য আছে? কি ভাবে বিজ্ঞানকে অপবিজ্ঞান থেকে সনাক্ত করা যাবে সহজেই? বিভিন্ন ধরণের অপবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কয়েকটি সামঞ্জস্য চোখে পড়ার মত। যেমন-

❖ **টেস্টিমোনিয়ালস্** (testimonials) **-এর আধিক্যঃ** সুনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতির মূলনীতি যথাঃ পরীক্ষা, ফলাফল, তথ্য-উপাত্ত (data) বিশ্লেষণের পরিবর্তে অপবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে এক বা একাধিক সুপরিচিত বা খ্যাতনামা ব্যক্তির মৌখিক বা লিখিত প্রশংসাসূচক বাণীর (testimonials) ছড়াছড়ি দেখা যায়। একে বলা হয় Halo effect অর্থাৎ যখন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে অভিজ্ঞ বা সুপরিচিত একজন ব্যক্তি তাঁর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার বাইরের কোন একটি বিষয় সম্পর্কে একটি মনতব্য করেন, সাধারণ মানুষ তাতে সেই বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমানে প্রভাবিত হতে পারে। যেমনঃ আমেরিকান সাইকিক (আমাদের দেশের জ্যোতিষীর সমান) জন নিডনাগেল (John Niednagel) ব্রেইন টাইপিং (এক ধরণের অপবিজ্ঞান)কে এক ধরনের বিজ্ঞান বলে বাজারজাত করতে গিয়ে বিভিন্ন খ্যাতনামা এথলেট এবং কোচদের প্রশংসা সূচক মনতব্য ব্যবহার করেন। আমাদের দেশে ও এরশাদ সরকারের আমলে একবার দেখা গেল, সাঈদাবাদী হুজুর আবিষ্কৃত (!) জ্যোতি হিমেল পাউডারের বিজ্ঞাপণে স্বয়ং তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট (মওদুদ আহমদ)সহ অনেক মন্ত্রীবর্গের নাম। পরে জানা যায়, ব্যাংককের নিম্নমানের একধরণের পাউডারের সাথে কর্পূরের মিশ্রণে হুজুর হিমেল পাউডার বাজারজাত করেছিলেন। এরকম অনেক কবিরাজ, আধ্যাত্মিক পীর-ফকিরেরা পত্রিকার বিজ্ঞাপণে লোকজনের ভূঁয়া নাম-ছবি ও ঠিকানা ব্যবহার করে। আমেরিকান জ্যোতিষী জন নিগনাডেল ব্রেইন

টাইপিং এর প্রচারনায় বেশ কিছু খ্যাতনামা নিউরো-বিজ্ঞানীদের নাম ও ব্যবহার করেন তাঁদের অজান্তে। পরবর্তিতে ব্যাপারটি সম্পর্কে ওই সব বিজ্ঞানীরা জানতে পেরে তীব্র আপত্তি জানান। শেষ পর্যন্ত জন বিজ্ঞাপণ থেকে তাঁদের নাম সরাতে বাধ্য হন। ইন্টারনেটে একবার একটি ইসলামিক ওয়েবসাইটে দেখলাম ক্বোরাণে বিজ্ঞান আছে বলে সাফাই গাইতে গিয়ে আমেরিকান ভ্রুণতত্ত্বের একজন প্রফেসরের উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়েবসাইটে প্রফেসরের সাথে যোগাযোগের কোন ঠিকানা না পেয়ে শেষে ইন্টারনেট সার্চ করে আমি তাঁর কাছে আমার প্রশ্নসহ ই-মেইল পাঠালাম, কিন্তু কোন উত্তর পাইনি।

- **বৈজ্ঞানিক পরিভাষা** (scientific terminology) **এর অপব্যবহারঃ** অপবিজ্ঞান বিজ্ঞানের ভাষা ধার করে কথা বললে ও তা কখনোই বিজ্ঞান নয়। ডাক্তারের ভাষা নকল করে যে কেউ কথা বললেই তিনি ডাক্তার হয়ে যান না। ঠিক তেমনি, বিজ্ঞানীদের পরিভাষা (terminology) নকল করে কেউ একজন একটি অবৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কে মনতব্য করলেই সেটি বিজ্ঞান হয়ে যায় না। যেমনঃ অধিকাংশ অপবিজ্ঞানী ও ভূঁ য়া বিজ্ঞানী তাদের প্রচারণাতে *রিসার্চ বা গবেষণা* শব্দটির উল্লেখ করে থাকে। আমাদের যেটি জানতে হবে, রিসার্চ বা গবেষণা মানেই তা বৈজ্ঞানিক গবেষণা নয়, কেননা একটু আগে আমরা দেখেছি বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ণ রয়েছে। কাজেই অবৈজ্ঞানিক ভাবে কেউ বিশ বছর ধরে একটি ব্যাপার নিয়ে ভাবলে বা কাজ করলেই তা বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়ে ওঠে না। সে জন্যেই অপবিজ্ঞানের প্রচারকরা তাদের তথাকথিত আবিষ্কার, গবেষণা নিয়ে এত চেঁচামেচি করলে ও সেগুলি কোন *স্ট্যান্ডার্ড* সাইনস্ জার্ণালে প্রকাশ হয়েছে কি-না জিজ্ঞাসা করলে তা এড়িয়ে যায়।
- **অভিনব বিজ্ঞাপণীয় কায়দাঃ** অপবিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকেরা নিজেদের প্রচারে প্রায়শই পাঠক-দর্শক-শ্রোতাদের মনে এই ধারণা দেয়ার চেষ্টা করে যে, তারা বিশাল রকমের অভাবনীয় একটা ব্যাপার (breakthrough) ঘটিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আমরা জানি, একজন বিজ্ঞানী বড় কিছু একটা আবিষ্কার করলে সর্বপ্রথম সেটি সাইন্টিফিক গবেষণা জার্ণালে পাঠান। ইন্টারনেট, টিভি বা পত্রিকায় বিজ্ঞাপণ দিয়ে বিজ্ঞানীকে ঘোষণা দেয়ার দরকার হয় না তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে।
- ক্বোরণ-বাইবেলে বিগ ব্যাংগ (Big Bang) সহ অন্যান্য দাবীর ক্ষেত্রে একটা জিনিস লক্ষ করবেন। যখন একজন বিজ্ঞানী বিখ্যাত কোন একটি বিখ্যাত আবিষ্কার সম্পন্ন করে ফেলেন, কেবল তখনই (তার আগে নয়) অপবিজ্ঞানের প্রবক্তারা দাবী তুলে, এটি সম্পর্কে ক্বোরাণ-বাইবেল ইত্যাদিতে আগেই বলা হয়েছে; আবিষ্কারের এক মুহূর্ত আগ পর্যন্ত এসব অক্ষমরা কিন্তু নিজ নিজ ধর্ম গ্রন্থে সেই সব তথাকথিত লুক্বায়িত সূত্র সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়। যদি তা না হত, তাহলে এরা নিজেরা কেন বিগ ব্যাংগ তত্ত্ব আবিষ্কার করেনি? ক্বোরাণ-বাইবেল বহু শত বছর থেকে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করছে, তাহলে বিগ ব্যাংগ তত্ত্বের আবিষ্কারের জন্য কেন আমাদের বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল? এখানে অপবিজ্ঞানের প্রবক্তাদের সাথে পাক-ভারত উপমহাদেশীয় জ্যোতিষীদের বেশ মজার মিল রয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর বেশ কিছু জ্যোতিষী পত্রিকায় নিজেদের বিজ্ঞাপণে লিখতঃ ইনি সেই বিস্ময়কর মহাপুরুষ যিনি ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর তারিখ ও দিনক্ষণ আগেভাগেই নির্ভুলভাবে (?) বলে দিয়েছিলেন। যখন কেউ কেউ জানতে চাইলেন, ইন্দিরা গান্ধী জীবিত থাকাকালে কখন কোন পত্রিকায় বা সাক্ষাতকারে জ্যোতিষীটি এই ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন, কোন উত্তর পাওয়া গেল না। এরকম বাংলাদেশে ও একাধিক বার দেখা গিয়েছে।
- মোটামোটি সঠিক ভাবে বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা আবিষ্কারের বর্ণনার শেষে কিংবা পাশাপাশি বেছে বেছে হাজির করা হয় ক্বোরাণ-বাইবেলের এমন সব আয়াত বা বাণী যেগুলির সাথে বিজ্ঞানের স্পষ্ট কোন সামঞ্জস্য তো নেই, বরং এগুলির খুব সহজেই হতে পারে একাধিক ব্যাখ্যা। কিন্তু বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতির সাথে পরিচয় না থাকলে এসব সচিত্র, আকর্ষনীয় বর্ণনা এবং রেফারেনসের আধিক্যে ততোক্ষণে একজন সাধারণ পাঠক-পাঠিকা সহজেই কুপোকাত হয়ে যেতে পারেন।
- বড় বড় বিজ্ঞানীর এক বা একাধিক কোটেশনকে সম্পূর্ণ বিকৃত এবং ভূল অর্থে প্রয়োগ করা হয়। আইনস্টাইনের উদাহরণ টানা যাক। আমি আহতভাবে লক্ষ করেছি আইস্টাইনের ধর্মীয় এবং দার্শনিক বক্তব্য সম্পর্কে বেশির ভাগ মুসলমান/হিন্দু/খ্রীস্টানের জ্ঞান শুধু একটি উদ্ধৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধঃ "Science without religion is lame, religion without science is blind." অর্থাৎ 'ধর্ম ব্যতিত বিজ্ঞান খোঁড়া এবং বিজ্ঞান ব্যতিত ধর্ম অন্ধ।' কিন্তু আইনস্টাইন যে প্রচলিত ধর্মের কোনটিতেই (যদি ও বৌদ্ধ দর্শনের প্রতি তাঁর একটু আস্থা ছিল) বিশ্বাস করতেন না এবং তাঁর ঈশ্বর এবং ধর্মের ধারণা যে সরাসরি ক্বোরান-বাইবেলের ঈশ্বর ধারণার বিরোধী, সে সম্পর্কে খুব নগণ্য সংখক মানুষ অবহিত রয়েছেন। আসুন, আইনস্টাইনের নিজের মুখ থেকে শোনা যাক ধর্ম এবং ঈশ্বর বলতে আসলে তিনি কি বুঝিয়েছেন।

> *আমি ধর্মতত্ত্বে বর্ণিত এমন কোন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না যিনি ভালকে পুরস্কৃত করেন আর মন্দকে শাস্তি দেন।*
> "I do not believe in the God of theology who rewards good and punishes evil." [Albert Einstein, as quoted in a memoir by *Life* editory William Miller in *Life*, May 2, 1955]

> *আমি এ রকম সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব কল্পনা ও করতে পারি না যিনি তাঁর আপণ সৃষ্টিকে পুরস্কৃত এবং তিরস্কৃত করেন, যাঁর উদ্দেশ্য আমাদের নিজেদের উদ্দেশ্যের আদলে তৈরী; সংক্ষেপে তিনি এমন একজন ঈশ্বর যিনি দূর্বল ও নশ্বর মানুষেরই প্রতিচ্ছবি। আমি এ ও মনে করি না যে, শরীরের মৃত্যুর পরে মানুষ বেঁচে*

থাকে যদি ও দূর্বল চিত্তের লোকজনের মনে ভীতি কিংবা হাস্যস্পদ অহংবোধ থেকে এসব বিশ্বাস দানা বাঁধে।

"I cannot imagine a God who rewards and punishes the objects of his creation, whose purposes are modeled after our own -- a God, in short, who is but a reflection of human frailty. Neither can I believe that the individual survives the death of his body, although feeble souls harbor such thoughts through fear or ridiculous egotisms." [Albert Einstein, obituary in New York Times, 19 April 1955]

এবার অপবিজ্ঞানের কয়েকটি নমুনা এবং সেগুলির যথাযথ ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টি দেয়া যাকঃ

একঃ অনেক শিক্ষিত মুসলমান ও বিজ্ঞান সম্পর্কে নিজেদের দীনতার প্রকাশ ঘটান যখন তাঁদের কেউ কেউ মরিস বুকাইলি নামের সৌদী রাজপরিবারে চাকরী করা একজন খৃস্টান ডাক্তারের (কোন বিজ্ঞানী নয়) একটি বইকে বিজ্ঞান গবেষণার উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করেন। বইটির নামঃ 'Bible, Quran and Science' *(বাইবেল, ক্বোরাণ এবং বিজ্ঞান)।* উপরে অপবিজ্ঞানের যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা বললাম, সেগুলির বেশির ভাগই বইটির মধ্যে উপস্থিত অর্থাৎ বিজ্ঞানের কিছু বিষয়াদি বর্ণনার পাশাপাশি সেগুলিকে তুলনা করা হয়েছে বাইবেল এবং ক্বোরাণের কতিপয় অস্পষ্ট এবং সহজেই বিভ্রান্ত করা যায়- এরকম কিছু আয়াতের সাথে। বলা হয়েছে বাইবেল এবং ক্বোরাণের মধ্যে অনেক মিল থাকলে ও ক্বোরাণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সত্যিকারের বিজ্ঞান। কোনটি বিজ্ঞান আর কোনটি বিজ্ঞান নয়, তা কি একজন চিকিৎসক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন? মরিস বুকাইলির বিজ্ঞান গবেষক হিসেবে কি কোন গ্রহন যোগ্যতা আছে? উত্তর, না। আর ও মজার ব্যাপার- বাইবেল, ক্বোরাণ এবং বিজ্ঞানের এর মধ্যে ক্বোরাণকে চূড়ান্ত সত্য (?) বললে ও মরিস বুকাইলি নিজে কিন্তু মুসলমান হননি। হওয়ার অবশ্য দরকার ও নেই কারণ- জানা গেছে, ক্বোরাণকে আধুনিক পাঠক-পাঠিকার কাছে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে সৌদী শাসকরা বুকাইলিকে দায়িত্ব দিয়েছিল তিনি যেন একটি ইম্প্রেসিভ বই লিখে দেন। বিনিময়ে বুকাইলি পেয়েছেন বিরাট অঙ্কের পেট্রোডলার।

দুইঃ বাংলাদেশে ডঃ শমসের আলী *"Scientific Indications in The Holy Quran"* নামক বইটির তৃতীয় কভার পেজে ক্বোরাণের একটি আয়াত উল্লেখ করে তার সাথে বড় করে ডি-এন-এ অণুর ছবি জুড়ে দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, ক্বোরাণে ডি-এন-এ-র ব্যাপারে পর্যন্ত ইংগিত রয়েছে। আয়াতটি এ রকম-

এবং তোমাদের এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণিদের গঠন-প্রকৃতিতে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে সংবাদ (৪৫:৪)

দেখা যাক ব্যাপারটা আসলে সত্যি কি-না।

ডি-এন-এ অণুর পুরো নাম- ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক এসিড। একে বলা হয় 'জীবদেহের প্রধান অণু' (*The master molecule of life*)। কেউ কেউ আদর করে ডি-এন-এ-কে ডাকেন 'প্রচার মাধ্যমের প্রেয়সী' (*The darling of the media*)| যাঁরা বিজ্ঞানের ছাত্র/ছাত্রী নয়, তাঁরা ও জ্বীণ থেরাপি, ক্লোনিং, মানব জিনোম প্রকল্প (*Human Genome Project*) ইত্যাদি নাম শুনে থাকবেন। এ সবগুলি কাজ ও গবেষণার মূল টার্গেট বা অস্ত্র হচ্ছে ডি-এন-এ (যার সাথে *জিণের* পার্থক্য হচ্ছে- বিশাল দৈর্ঘ্যের একেকটি ডি-এন-এ অণুতে রয়েছে অনেকগুলি আলাদা আলাদা অংশ যা *জিণ* বলে পরিচিত)। এই ডি-এন-এ-র উপাদান ও গঠন আবিষ্কার করতে বিজ্ঞানীদের সময় লেগেছে প্রায় একশ' বছর। যদি ও ১৯৫৩ সালের জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক এর ডাবল-হেলিক্স মডেল ডি-এন-এ আবিষ্কারের ইতিহাসে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বায়োলজি বা মলিকুলার বায়োলজির যে কোন ছাত্র/গবেষক মাত্রই জানেন- পূর্ব্বর্তী বিজ্ঞানীদের গবেষণা এবং পর্যবেক্ষনের সূত্র ছাড়া ১৯৫৩ সালের যুগান্তকারী ঘটনাটি সম্ভব ছিল না। আমি নিচে ডি-এন-এ আবিষ্কারের ক্রোনোলজিকাল সালগুলো উল্লেখ করছি-(সূত্রঃ nature, *human genome issue*)

- ১৮৬৯ সাল - সর্বপ্রথম জীবকোষ থেকে ডি-এন-এ পৃথক করা হয়।
- ১৮৭৯ সাল - মাইটোসিস কোষ বিভাজন পর্যবেক্ষন করা হয়।
- ১৯০০ সাল - জোহান ম্যান্ডেলের মটরশুঁটি বিষয়ক গবেষণার সন্ধান লাভ।
- ১৯০২ সাল - বংশগতি (hereditary) বিষয়ে ক্রমোজোম তত্ত্বের ধারণার উদ্ভব।
- ১৯০৯ সাল - সর্বপ্রথম 'জিণ' শব্দটি চালু হয় (এটি ক্বোরাণে বর্ণিত কোন 'জীন' নয়- লেখক)।
- ১৯১১ সাল - ফ্রুট ফ্লাই *(Drosophila melanogaster)* নিয়ে গবেষণা ক্রমোজোম তত্ত্বের ধারণাকে শক্তিশালী করে।
- ১৯৪১ সাল - *এক জিণ-এক এনজাইম* তত্ত্বের ধারণা।
- ১৯৪৩ সাল - এক্সরে ডিফ্রেকশন (Xray diffraction) টেকনিকের প্রয়োগ করে ডি-এন-এ-র উপর গবেষণা করা হয়।
- ১৯৪৪ সাল - ডি-এন-এ ট্রানস্ফরমেশন (transformation) নীতির আবিষ্কার।
- ১৯৫২ সাল -জিণ যে আসলে ডি-এন-এ দিয়ে তৈরী, তা জানা যায়।

- ১৯৫৩ সাল -জেমস ওয়াটসন, ফ্রান্সিস ক্রিক এবং উইলকিনস ডাবল-হেলিক্স মডেল-এর মাধ্যমে ডি-এন-এ-র গঠন ও উপাদান ব্যাখ্যা করেন (সেসময় ওয়াটসনের বয়স ছিল মাত্র ২৩ বছর -লেখক)। ১৯৬৩ সালে সে জন্য তাঁদেরকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়।

এবার পাঠক-পাঠিকার কাছে আমার প্রশ্ন, উপরের আলোচনা থেকে কি মনে হয় ক্বোরাণের ওই আয়াত আসলে ডি-এন-এ অণুর গঠনের ব্যাপারেই ইংগিত প্রদান করে? এই মূর্খতার (নাকি, শঠতার) শেষ হবে কবে ?

তিনঃ ইসলামিক বা ক্বোরাণিক বিজ্ঞানের প্রবক্তাদের অনেকগুলো আজগুবি দাবীর মধ্যে একটি হল, আধুনিক ভ্রূণতত্ত্বের (embryology) সাথে নাকি ক্বোরাণের আয়াতের 'বিস্ময়কর' মিল (!) রয়েছে। দেখা যাক এই দাবীটি কতটা যৌক্তিক।

ক্বোরাণের আয়াত ৮৬:৬-৭ এ বলা আছে, শুক্রানু বা স্পার্ম মেরুদন্ড এবং বক্ষ পিঞ্জরের মাঝামাঝি স্থান থেকে উৎপন্ন হয় (সম্ভবত এখানে কিডনীর ইংগিত দেয়া হয়েছে); কিন্তু আমরা জানি তা মোটে ও সত্য নয়, কেননা শুক্রানূর উৎপত্তিস্থল হচ্ছে শুক্রাশয় (মিয়োসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায়)। ক্বোরাণের বহু জায়গায় বলা হয়েছে, *জমাট রক্ত থেকে মানুষের সৃষ্টি করা হয়েছে (২৩:১৪, ৭৫:৩৮, ৯৬:২);* যার সাথে বিজ্ঞানের অমিল ছাড়া কোন মিল নেই। 'জমাট রক্ত' প্রসংগ ঘুরে ফিরে বার বার কেন ক্বোরাণে আসল? এ রকম প্রশ্ন মনে আসতেই পারে। এর উত্তর খোঁজতে হলে আমাদের একটুখানি দৃষ্টি দিতে হবে মুহম্মদ পূর্ববর্তী সমাজ ও ইতিহাসের দিকে। মুহম্মদের জন্ম (৫৭০ খ্রিস্টাব্দ) এরিস্টটলের জন্মের (খ্রীস্টপূর্ব ৩৮৪) প্রায় একহাজার বছর পরে । দর্শন-সাহিত্য-বিজ্ঞান তখন ও (এমনকি পরে) এরিস্টটলের চিন্তা-চেতনার মধ্যেই আবর্তিত হচ্ছিল। স্বাভাবিক কারণেই এরিস্টটলীয় এ সব ধারণা কম বেশি মুহম্মদকে ও প্রভাবিত করেছিল । এ ক্ষেত্রে মুহম্মদের নিরক্ষরতা বড় কোন বাঁধা হওয়ার কথা নয়। যীশু, গৌতম বুদ্ধ ও নিরক্ষর ছিলেন। জমাটবাঁধা রক্ত (*আলাক্বা,* আরবীতে) থেকে জন্মের তত্ত্বটি এসেছে মূলতঃ গ্রীকদের কাছ থেকে। এরিস্টটলকে *জীব বিজ্ঞানের জনক* বলা হলে ও জীব সম্পর্কিত তাঁর অনেক তত্ত্বই কালক্রমে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। যেমন- মানব প্রজনন সম্পর্কে এরিস্টটল এই ভ্রান্ত ধারণাতে বিশ্বাস করতেন যে, যৌবনবতী মহিলার ঋতুস্রাব (menstrual blood) এর উপর পুরুষ বীর্যের ক্রিয়ার ফলেই মাতৃগর্ভে শিশুর জন্ম হয়ে থাকে। জমাট বাঁধা রক্ত থেকে জন্মের ক্বোরাণিক তত্ত্বে এরিস্টটলের এই ভ্রান্ত ধারণারই প্রতিফলণ ঘটেছে। সন্দেহ নেই, ক্বোরাণের এই ধারণাটি মারাত্মকভাবে ভুল। অথচ অনেক মুমিন এই সত্যকে মেনে নিবেন না কেবমমাত্র এই অন্ধ বিশ্বাসের কারণে- *ক্বোরাণ আল্লাহর বাণী, কাজেই ভুলত্রুটির উর্দ্ধে।* মূলতঃ ভ্রুনের পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তরে এমন কোন পর্যায় নেই, যেখানে ভ্রুনকে জমাট রক্তের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কেবলমাত্র একটি পর্যায়ে এই ভুলটি হতে পারে অর্থাৎ, ভ্রুনকে জমাট রক্ত সদৃশ মনে হতে পারে, যদি মিসকারেজ (miscarriage) বা প্রাকৃতিক উপায়ে গর্ভপাত ঘটে। তর্কের খাতিরে ও যদি মেনে নেই ভ্রুনটি জমাট রক্ত সদৃশ, তাহলে ও ভুলে যাওয়া চলবে না- এটি কেবল মৃত ভ্রুণের ক্ষেত্রে ঘটে অর্থাৎ, যেটির আর পূর্ণাংগ মানব শিশুতে রূপান্তরিত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই।

জমাট রক্ত আসলে কী, সে সম্পর্কে প্রাণ রসায়ণিক (biochemical) ব্যাখ্যাটা এখানে জেনে নেয়া ভাল। আঘাত বা দূর্ঘটনার ফলে রক্তক্ষরণ ঘটলে শরীরে স্বাভাবিক নিয়মেই ক্ষত বা আঘাতের স্থানে রক্ত জমাট বাঁধে। কৈশিক রক্তনালীর (capillary blood vessels) চাইতে বড় যে কোন রক্তনালী থেকে রক্তক্ষরণ ঘটলে জখম বা আঘাতের স্থানে রক্ত জমাট বাঁধে যাতে অতিরিক্ত ক্ষরণ না ঘটতে পারে। এ ক্ষেত্রে অনুচক্রিকা বা প্লেটলেট (তিন প্রকার রক্ত কোষের একটি) এর ভূমিকা সর্বপ্রধান এবং সর্বপ্রথম। যখন শরীরে কোথাও কোন জখম বা আঘাত ঘটে, স্বাভাবিক অনুচক্রিকাগুলি তখন সক্রিয় অনুচক্রিকায় রূপান্তরিত হয়। এ গুলির তখন আকৃতির পরিবর্তন ঘটে থাকে, এবং এরা আঠাঁলো হয়ে রক্তনালীর দেয়ালে জমা হয়ে প্লাগ (plug) তৈরী করে। এই সক্রিয় অনুচক্রিকাগুলি থেকে একই সময়ে রক্তপ্লাজমায় বিশেষ এক ধরণের রাসায়নিক পদার্থের নিঃসরণ ঘটে থাকে। অনেকগুলি জটিল প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে ফাইব্রিনোজেন তখন ফাইব্রিনে পরিণত হয়। ফ্রাইবিন হচ্ছে এক ধরণের অদ্রবণীয় প্রোটিন যা ফাইব্রিল নামক অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুতা জাতীয় বস্তুর সমন্বয়ে জটিল জালিকার সৃষ্টি করে। রক্ত কোষ এবং প্লাজমা (উভয়ের সমন্বয়েই রক্ত গঠিত) তখন ফাইব্রিলের এই জালে আটকা পড়ে গিয়ে ক্লট বা জমাট রক্তের সৃষ্টি করে।

চারঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy), **মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং ক্বোরাণঃ** গ্রহ-নক্ষত্র এবং জ্যোতিষ্কমন্ডলী সম্পর্কে 'মহাগ্রন্থ আল-ক্বোরাণের' ব্যাখ্যা একটু পর্যালোচনা করা যাক। ভ্রুণবিদ্যার মত এটি ও 'ক্বোরাণিক বিজ্ঞানী' এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক মুমিন বান্দাদের আরেকটি অতি প্রিয় বিষয়। সন্দেহ নেই, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) অনেক মুসলিম মনীষীদের মৌলিক গবেষণা এবং অধ্যয়নের নিকট প্রভূতভাবে ঋণী। উদাহরণস্বরূপ আল-সুফী, আল-বিরুণি, আল-জারকালি প্রমুখ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নাম করা যায়। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, এসব মনীষীরা ক্বোরাণ-এর সূত্র ধরে কিছুই আবিষ্কার করেননি। কেননা ক্লাসিক্যাল ইসলাম বা স্বর্ণ যুগে (The Golden Age of Islam) মুসলমান মনীষীরা যতটা না ছিলেন আচার-সর্বস্ব মুসলমান, তার চাইতে অধিক তাঁদের পরিচিত ছিল 'যুক্তিবাদী' মনীষী হিসেবে। এঁদের সম্পর্কে পাকিস্তানের বিখ্যাত নিউক্লিয়ার পদার্থ বিজ্ঞানী এবং কায়েদে-এ-আযম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পারভেজ হুদবাইয়ের মনতব্য প্রণিধানযোগ্যঃ

> '.....ইসলামের স্বর্ণ যুগে বিজ্ঞান অগ্রগতি লাভ করেছিল কারণ- ইসলামের অভ্যন্তরে তখন সক্রিয় ছিলেন মুতাজিলা নামধারী শক্তিশালী যুক্তিবাদী ঐতিহ্যের ধারক একদল চিন্তাবিদ। 'সবকিছুই পূর্ব-নির্ধারিত এবং আল্লাহর কাছে আত্ম-সমর্পন ব্যতিত মানুষের অন্য কোন উপায় নেই' --নিয়তীবাদীদের এ মতবাদের তীব্র বিরুদ্ধাচারন করে মুতাজিলারা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মুতাজিলারা যখন রাজনৈতিক ক্ষমতায় ছিলেন, জ্ঞান তখন সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে গোঁড়া ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম আল-গাজালির নেতৃত্বে ইসলামী রক্ষনশীলতার পুনাবির্ভাব ঘটে। আল-গাজালি যুক্তির স্থলে দৈব বাণী এবং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির স্থলে নিয়তিকে তুলে ধরেন। কার্য এবং ক্রিয়ার (cause and effect) সম্পর্ককে তিনি অস্বীকার করেন এই বলে যে, মানুষের ভবিষ্যত জানার শক্তি নেই, কেবল স্রষ্টিকর্তা এ বিষয়ে অবগত। গণিতশাস্ত্রকে আল-গাজালি 'ইসলাম বিরোধী' এবং 'মানব মনের জন্য ক্ষতিকারক' বলে মন্তব্য করেন। গোঁড়ামির জালে ইসলামের সমৃদ্ধি আটকা পড়ে যায়। মহামতি খলিফা আল-মামুন এবং হারুন-আল-রশিদ এর শাসনামলে রাজদরবারে মুসলিম, খ্রীস্টান এবং ইহুদী মনীষীরা একত্রিত হয়ে জ্ঞান -চর্চা এবং মত-বিনিময় করার যে প্রবনতা বহাল ছিল, তা পরবর্তীকালে চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। মুসলিম বিশ্বে সহিষু-তা, মেধা এবং বিজ্ঞানের মৃত্যু ঘটে। যুক্তিবাদী ধারার সর্বশেষ মুসলিম মনীষী হচ্ছেন চতুর্দশ শতাব্দীর আবদাল রাহমান ইবনে খালেদুন।'

লক্ষ করার মত একটি ব্যাপার হচ্ছে, ক্লাসিক্যাল ইসলাম যুগের অনেক মুসলমান মনীষীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-পর্যবেক্ষণ স্বয়ং ক্বোরাণের অনেক আয়াতকে 'অযৌক্তিক' এবং 'অবৈজ্ঞানিক' প্রমাণ করেছে। যেমনঃ ক্বোরাণের বর্ণনা অনুযায়ী, সূর্য অস্তমিত হয় একটি 'পঙ্কিল জলাশয়ে' বা muddy spring-এ (১৮:৮৬), তেমনি উদিত হয় একটি বিশেষ স্থান থেকে (১৮:৯০)। আমরা জানি, খালি চোখে সূর্য পুর্বাকাশে উদিত হয় এবং পশ্চিমাকাশে অস্ত যায় বলে মনে হলে ও বিজ্ঞানের বিচারে তা আসলে সত্য নয় কেননা, মহাশূন্যে অবস্থিত রয়েছে আমাদের সৌরজগতটি এবং সূর্য সেটির কেন্দ্র। পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে যেমন অবিরত ঘুরছে, ঠিক তেমনি এরা নিজেদের কক্ষ পথে হচ্ছে আবর্তিত অর্থাৎ, ঘূর্ণায়মান লাটিমের বেলায় যেমনটি হয়। প্রায় ২৪ ঘন্টায় পৃথিবী নিজস্ব কক্ষপথে একবার ঘুরে। এই কারণে সৌর জগতের কেন্দ্রে অবস্থিত সূর্যের সকল আলো একই সাথে এসে গোলাকার ও ঘূর্ণায়মান পৃথিবী গায়ে এসে পড়তে পারে না। যেখানে পড়ে, সেখানটায় হয় দিন; বাকী জায়গায় অন্ধকার বা রাত। কিন্তু ক্বোরাণে বর্ণিত গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কিত বক্তব্যের সাথে বিজ্ঞানের এসব তথ্যের কোন মিল নেই। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। গ্রীক ধারণার বশবর্তী হয়ে সে সময় প্রায় সকলে অজ্ঞতাবশত বিশ্বাস করতেন- পৃথিবীর আকার গোলাকৃতি নয়, বরং চ্যাপ্টা; এবং পৃথিবী হচ্ছে মহাবিশ্বের কেন্দ্র (একে বলা হয় এরিস্টটলের *ভূ-কেন্দ্রিক মহাবিশ্ব সম্পর্কিত* ***মতবাদ*** বা *geocentric theory of universe)*| তবে মুসলিম গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ আল-বিরুনি সে সময় ও (মৃত্যু ১০৪৮ সাল) বিশ্বাস করতেন যে , ঘূর্ণনশীল মহাবিশ্বের আকৃতি হচ্ছে গোল এবং মোটে ও চ্যাপ্টা নয়। বিজ্ঞানী বলতে হলে তাই আল-বিরুণিকে বলা উচিৎ, মুহম্মদকে নয়।

উপরের তথ্যগুলি দ্বারা এটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয় যে, ক্বোরাণ আসলে মানুষেরই তৈরী একটি গ্রন্থ। তা না হলে, সক্রেটিসের ভ্রান্ত মতবাদগুলি কি করে *সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ* আল-ক্বোরাণের পাতায় চলে আসল? ক্বোরাণে এরকম অবৈজ্ঞানিক এবং অসামঞ্জস্যে ভর্তি বর্ণনার আর ও অনেক উদাহরণ রয়েছে। ক্বোরাণের একটি আয়াত (২:২৯) অনুযায়ী, আল্লাহ প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বেহেস্ত বা স্বর্গ সৃষ্টিতে মনযোগ দিয়েছেন। আবার একই ক্বোরাণের অন্য স্থানে (৭৯:২৭-৩০)বলা হয়েছে, প্রথমে স্বর্গ বা বেহেস্ত তৈরীর কাজে আল্লাহ হাত দেন। অতঃপর দিন-রাত এবং সব শেষে পৃথিবী। আরেক জায়গায় বেহেস্ত এবং পৃথিবী তৈরীর মোট সময় সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ (নাকি, মুহম্মদ?) তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। যেমনঃ ক্বোরাণের কিছু কিছু আয়াত (৭:৫৪, ১০:৩, ২৫:২৯) অনুযায়ী আল্লাহ সর্বমোট ছয় দিনে বেহেস্ত ও পৃথিবী বানিয়েছেন; কিন্তু একই ক্বোরাণের ৪১:৯ আয়াত অনুযায়ী, আল্লাহ দুই দিনে পৃথিবী তৈরী করেছেন এবং সেখানে প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরীতে সময় লেগেছে আর ও চার দিন (আয়াত ৪১:১০) । সবশেষে বেহেস্ত তৈরীতে সময় লেগেছে আর ও দুই দিন (আয়াত ৪১:১২ অনুযায়ী) অর্থাৎ, এই হিসেব অনুযায়ী, বেহেস্ত ও পৃথিবী সৃষ্টিতে মোট ব্যয়িত সময় হচ্ছে (২+৪+২) বা, সর্বমোট ৮ দিন। তাহলে বেহেস্ত ও পৃথিবী সৃষ্টিতে সর্বমোট ব্যয়িত সময়ের ক্ষেত্রে মহাসত্য গ্রন্থ আল-ক্বোরাণের কোন বিবরণটি আসলে সত্য? ছয় (৬) দিন, নাকি আট (৮) দিন?

পাঁচঃ বিবর্তন তত্ত্ব, ক্বোরাণ এবং হারন ইয়াহিয়ার ইসলামিক সাইনস্ ঃ

গ্যালিলিওর পৃথিবী বিষয়ক ঘূর্ণন তত্ত্বের মতই ডারউইন-এর প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন তত্ত্ব (evolution by natural selection) শুরুতেই খৃস্টান ধর্মীয় যাজক, এর পৃষ্ঠপোষক এবং শিষ্যদের প্রচন্ডভাবে ক্ষেপিয়ে তুলে। ডারউইনের তত্ত্ব সম্পর্কে মিথ্যা বিভ্রান্তি ছড়ানো শুরু হয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৌশলে। অনেক খৃস্টান ও মুসলিম দেশ (আমাদের সময়ে অর্থাৎ ১৯৯২ সালে কলেজের ইন্টারমিডিয়েট লেভেল বায়োলজিতে বিবর্তন তত্ত্ব চালু থাকলে ও বর্তমানে তা বাংলাদেশে ও নিষিদ্ধ) এমনকি খোদ আমেরিকার কয়েকটি স্টেটের স্কুল-কলেজে এখন ও ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব নিষিদ্ধ এই (অপ)যুক্তিতে- এটি বাইবেল-ক্বোরাণে বর্ণিত ঈশ্বর ধারণার পক্ষে সরাসরি হুমকি স্বরূপ; কেননা বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী, ঈশ্বর মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম আদমকে সৃষ্টি করেন, অতঃপর আদমের বুকের পাঁজরের বাম অস্থি থেকে (!) হাওয়াকে সৃষ্টি করেন তাঁর সংগিনী হিসেবে। ক্বোরাণে ও রয়েছে এই বর্ণনার পুনরাবৃত্তি (২:৩০-৩৮)। কিন্তু ডারউনের বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী, পৃথিবীতে মানুষ হঠাৎ করে আসেনি; বরং আদি কোষী প্রাণি হিসেবে যাত্রা শুরু করে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে কোটি কোটি বছরে অল্প অল্প করে সাধিত পরিবর্তন, অভিযোজন তথা প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। পরিবর্তনের ধাপটি এ রকমঃ

আদি কোষীয় প্রাণি → বহুকোষী জীব → সামুদ্রিক জীব → ভূমির জীব → উভচর প্রাণি (এম্পিবিয়ান) →

রেপ্টাইলস (যেমনঃ ডায়নোসর) → স্তন্যপায়ী প্রাণি (উদাহরণ- মানুষ)

রেপ্টাইলস (যেমনঃ ডায়নোসর) → পাখি জাতীয় প্রাণি

অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ধাপে এসেছে মানুষ। কাল ক্রমে দেখা গেল ডারউইনের কথাই সঠিক। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, এ পর্যন্ত প্রাপ্ত এক কোষী প্রাণির জীবাশ্ম (fossil) রেকর্ডের মধ্যে সর্বাধিক পুরাতন জীবাশ্মের বয়স কম পক্ষে ৩.৫ বিলিয়ন বছর। খৃস্টান মোল্লা-পুরোহিতেরা যখন দেখল, ডারউইনের তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক গ্রহনযোগ্যতাকে এত সহজে নিশ্চিহ্ন করতে গেলে তাঁরা নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে, তখন তাঁদের কেউ কেউ ডারউইনের তত্ত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে টিকে থাকাটাই শ্রেয়তর মনে করল। ১৯৯৬ সালে পোপ জন পল II স্বয়ং ঘোষণা দিলেন, ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের সাথে বাইবেলের বর্ণনার কোনই বিরোধ নেই। আর ও মজার ব্যাপার, ২০০৫ সালে ভ্যাটিকান ডারউইনের পক্ষালম্বন করে এক ঘোষনায় ক্রিয়েসনিষ্ট (creationist) হিসেবে পরিচিত খৃস্টান মৌলবাদীদের (এরা বাইবেলের জেনেসিসের বর্ণনাকে একমাত্র সত্য এবং ডারউইনের তত্ত্বকে মিথ্যা বলে মনে করে) কড়া সমালোচনা করে এই বলে, ডারউইনের তত্ত্বের সাথে বাইবেলের বর্ণনা সামঞ্জস্যপূর্ণ; বাইবেলের বর্ণনাকে সরাসরি গ্রহণ না করে সেগুলিকে রূপক বা মেটাফরিক্যাল অর্থে গ্রহণ করা উচিত। তাতে অবশ্য বিবর্তন তত্ত্বের ওপর খৃস্টান-মুসলিম এবং অন্যান্য মৌলবাদী গোষ্ঠীর আক্রমণ কমেনি। তথাকথিত সৃষ্টিতত্ত্ব বিজ্ঞান (creation science), ইন্টালিজেন্ট ডিজাইন (intelligent design) ইত্যাদি চমকপ্রদ মোড়কে ধর্মীয় অপবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের নামে চালিয়ে দেয়ার নিরন্তর চেষ্টার আজ অবধি তাই কোন কমতি নেই।

গত কয়েক বছর থেকে আধুনিক শিক্ষিত অনেক ধর্মীয় মুসলমানদের মাঝে খৃস্টান ক্রিয়েসনিস্টদের অনুকরণে আবির্ভূত হয়েছেন হারণ ইয়াহিয়া (ছদ্ম)নামের একজন ইসলামিক ক্রিয়েসনিস্ট। তুরস্কের মুসলিম মৌলবাদী নেতা আদনান আক্তারের অধীন "Science Research Foundation" (*Bilim Arastirma Vakfi* - BAV) হচ্ছে হারুণ ইয়াহিয়ার নামে লিখিত তথাকথিত ইসলামিক সাইনস্ বিষয়ক সকল পুস্তক, ইন্টারনেট মেটেরিয়াল, লিফলেট, ভিডিও এবং কনফারেনস্ এর প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক। BAV-এর অর্থের উৎস সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান যদি ও দাবী করা হয় BAV চলে ডোনেশনের মাধ্যমে। বেশ আকর্ষনীয় ভংগিতে হারুণ ইয়াহিয়ার নামে লেখা এসব বই-পুস্তক-ভিডিও অত্যন্ত সুলভ মূল্যে তুরস্কের স্কুল-কলেজ এবং রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিক্রি ও বিতরণ করা হয়। ইংরেজী ছাড়া ও রাশিয়ান, পোলিশ, স্প্যানিশ, ইটালিয়ান, আরবিক সহ অন্যান্য ভাষায় ও এসব বই-পুস্তক অনুদিত হয়েছে এবং হচ্ছে। হারুণ ইয়াহিয়া গ্যাং-এর সৃষ্টি বিজ্ঞানের মূল টারগেট আংশিকভাবে পশ্চিমা ঘরানার দেশ তুরস্ক এবং পশ্চিমা দেশগুলিতে বেড়ে ওঠা মুসলিম ইমিগ্রান্ট এবং তাঁদের ছেলেমেয়েরা হলে ও বর্তমানে বিশ্বব্যাপী শিক্ষিত অনেক মুসলমানদের কাছে হারুণ ইয়াহিয়া একটা পরিচিত নাম। তবে খৃস্টান ক্রিয়েসনিষ্টদের সাথে হারুণ ইয়াহিয়ার ইসলামিক সাইনস্ বিষয়ক অপপ্রচারণার যে সব মিল, তা মোটে ও কিন্তু কোন এ্যাকসিডেন্টাল ব্যাপার নয়। নীচে দেখুনঃ

- হারণ ইয়াহিয়ার নামে প্রচারিত ক্বোরাণের পক্ষে বিবর্তন তত্ত্ব বিরোধী এসব ক্রিয়েসন সাইনস্-এর মুসলিম প্রবক্তাদের সাথে আমেরিকার খৃস্টান ক্রিয়েসনিষ্টদের প্রতিষ্ঠান Institute for Creation Research (ICR) এর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। এরা এক সাথে একাধিক কনফারেনস্ ও করেছে।
- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হারুণ ইয়াহিয়ার আর্গুমেন্টের সূত্র হচ্ছে বিবর্তন বিরোধী খৃস্টান মৌলবাদীদের আর্গুমেন্ট (creationism science, intelligent design দুটোই) থেকে ধার করা। হারুণ ইয়াহিয়া এগুলিকে কেবলমাত্র ইসলামিক লেবাস পরিয়ে চালিয়ে দেন। **লজ্জার বিষয় বৈকি যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পশ্চাতপদ মুসলমানরা অপবিজ্ঞানের কৌশল ও আজ পশ্চিমা বিশ্বের কাছ থেকে ধার করছে!**
- খৃস্টান মৌলবাদীদের মত হারুণ ইয়াহিয়ার অপবিজ্ঞানীয় প্রচারনায় ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদির অপর্যাপ্ত উপস্থাপন, অপ্রাসংগিক উদ্ধৃতি এবং অনির্ভরযোগ্য রেফারেনস্-এর আধিক্য দেখা যায়।

এ ছাড়া ও ইতিপূর্বে অপবিজ্ঞানের যে সব প্যাটার্নের কথা বলা হয়েছে, সে গুলির অনেকগুলি হারুণ ইয়াহিয়ার বক্তব্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শেষ কথা লেখার আগে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন রাখলাম, উত্তর জানালে খুবই বাধিত হব।

- ক্বোরাণে যদি বিজ্ঞানের ব্যাপারে এতই ইংগিত থেকে থাকত, তাহলে প্রশ্ন আসে- পৃথিবীর সমস্ত জনসংখ্যার প্রায় এক পঞ্চমাংশ মুসলমান হলে ও বর্তমানে সমস্ত পৃথিবীতে মুসলমান বিজ্ঞানীদের সংখ্যা কেন এক শতাংশের ও কম? কিংবা, কেন- পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম দেশে যত বিজ্ঞানী রয়েছে, অমুসলিম ইসরাইলের একা রয়েছে তার চাইতে দ্বিগুন সংখ্যক বিজ্ঞানী?
- ক্বোরাণ-বাইবেলকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রেফারেনস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এমন একটি স্ট্যান্ডার্ড সাইনস জার্ণাল (যেমনঃ Nature, Science, Cell) এর নাম কেউ বলতে পারবেন কি?
- ক্বোরাণ-বেদ-বাইবেলের বর্ণনার সাথে বিজ্ঞানের যে সব আবিষ্কার বা তত্ত্বের মিল আছে বলে দাবী করা হচ্ছে, কালক্রমে সেগুলি যদি ভুল প্রমাণিত হয় (বিজ্ঞানে এমনটি হরহামেশা হয়ে থাকে যেহেতু 'অলংঘনীয় সত্য' বলে বিজ্ঞানে কিছু নেই), তখন ক্বোরাণ-বেদ-বাইবেলের ঐসব বর্ণনা/আয়াতগুলি ও কি ভুল প্রমাণিত হবে, নাকি সেগুলির নতুন কোন ব্যাখ্যা হাজির করা হবে আমাদের সামনে?

শেষ কথাঃ

প্রশ্ন আসেঃ তাহলে বিজ্ঞানের সাথে কি ধর্মের *সহাবস্থান* কখনোই সম্ভব নয়, কেবল *সংঘাতই* একমাত্র উপায়? উত্তর হচ্ছে- সহাবস্থান হতে পারে কেবলমাত্র তখনই, বিজ্ঞান এবং ধর্ম এ দুটো যে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা বিষয় এই সত্য মেনে নিয়ে কিন্তু মিশ্রণ কখনোই সম্ভব নয়। অনেকে এ ও বলতে পারেন, বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সকলেই কি তাহলে নাস্তিক? উত্তরে বলব, না। বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের অনেকেই আস্তিক, কেউ কেউ নাস্তিক। কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসে না। একজন বিজ্ঞানীর ধার্মিক পরিচয় থাকতেই পারে, তাতে দোষের কিছু নেই। ধর্ম এবং ঈশ্বর বিষয়ে সকল বিজ্ঞানীকে যে আইনস্টাইনের দৃষ্টিভংগিকেই গ্রহণ করতে হবে, এমনটি ও এখানে বলা হচ্ছে না। কিন্তু একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান বিজ্ঞানী কখনোই দাবী করবেন না যে, ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বিজ্ঞান নিহিত। এই অপকর্মটি যাঁরা করে আসছেন তাঁরা প্রায় সকলেই করছেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় আত্ন-প্রচার অথবা/এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট (রাজনৈতিক সহ) কোন কারণে। কেননা মানব সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন, মানবতাকে ভালবাসেন- এমন ব্যক্তিমাত্রই জানেন, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীরা ভৌগলিক সীমারেখা তথা জাত-কাল-ধর্মের উর্দ্ধে; এরা সমস্ত মানবতার সম্পদ। আইনস্টাইনের জীবনকে সবচেয়ে বেশী যা প্রভাবিত করেছিল তা হচ্ছে: মমতা, সত্য এবং সৌন্দর্য। আর সত্য ও সুন্দরের পূজারী মানুষেরা এবং তাঁদের কর্ম কারো একচোটিয়া সম্পত্তি নয়, তাতে রয়েছে আমাদের সকলের সমান অধিকার। বিজ্ঞানকে ধর্মীয় লেবাস পরানোর অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তাই প্রতিটি বিবেকবান ও সচেতন বিশ্বনাগরিকের সোচ্চার হওয়া উচিৎ।

তথ্যসূত্রঃ

- Pazameta, Zoran. 1999. Scienece vs. Religion Teach the Difference, Resolve the Conflict. *Skeptical Inquirer* 23 (4):37-39
- Mayr, Ernst. 1999. The Concerns of Science. *Skeptical Inquirer* 23 (4):65
- Edis, Taner.World Designed by God. Science and Creationism in Contemporary Islam.

(www2.truman.edu/~edis/writings/articles/CFI-2001.pdf)

- Hoodbhoy, Pervez. 1992. *Islam and Science: Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality.* Zed Books.
- Science and Creationism: A view from the National Academy of Science (http://www.nap.edu/html/creationism/origin.html)
- http://www.creationtheory.org/HateMail/Kathrmann.shtml
- The Skeptic Dictionary (http://skepdic.com/creation.html)
- Sandbek, Terry. Brain Typing: The Pseudoscience of Cold Reading (http://www.americanboardofsportpsychology.org/Portals/24/BrainTypingSANDBEK.doc)
- (জাহেদ আহমদ) বিজ্ঞান, বিজ্ঞান মনস্কতা বনাম ক্বোরাণিক বিজ্ঞান. *যুক্তি*, ফেব্রুয়ারী ২০০৭

জাহেদ আহমদ, বায়োটেকনোলজিতে মাস্টার্স। মুক্তমনা হিউম্যানিস্ট ফোরামের কো-মডারেটর এবং সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য। ই-মেইলঃ worldcitizen73@yahoo.com

শুরু করছি একটি পৌরানিক কাহিনী দিয়ে, মহাভারতে এটি পাওয়া যাবে, ভাগবতেও এ কাহিনী আছে। দেবতাকূল সমুদ্র মন্থনের মাধ্যমে অমৃত আহরণ করে যখন তা পান করতে যাবে, সে সময় দানবদের মধ্য থেকে একজন, নাম রাহু, দেবতা সাজে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেবতাদের সাথে অমৃত পান আরম্ভ করে। কিন্তু দেবতা সূর্য এবং চন্দ্র হঠাৎই রাহুকে চিনতে পারায় তারা দেবতাদের জানিয়ে দেয় এবং দেবরাজ ইন্দ্র এককোপে রাহুর মস্তক ছিন্ন করে ফেলে। ঠিক সেই মুহুর্তে রাহু কর্তৃক পানকৃত অমৃত কেবল মস্তক হতে গলা পর্যন্ত এসেছিল বিধায় মস্তক পর্যন্ত অংশটুকু অমর হয়ে যায় এবং আকাশের একস্থানে অবস্থান করতে থাকে। সূর্য এবং চন্দ্রের কারণে ধরা পড়ে যাওয়ার কারণে তাদের প্রতি শুরু হয় ভীষণ শত্রুতা এবং যখনই তাদের সঞ্চারপথে রাহুর নাগালের মধ্যে আসে, তখনই রাহু সূর্য ও চন্দ্রকে গিলে খায়। যেহেতু রাহুর শুধু মস্তকই আছে, ফলে সে সূর্য-চন্দ্রকে হজম করতে পারে না বরং কিছুক্ষণের মধ্যেই তার কাটা গলা দিয়ে বের হয়ে পড়ে। যেসময়টুকু তার মুখের মধ্যে থাকে সে সময়েই হয় সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ।

বিভিন্ন জায়গার উপকথা, পুরাণ, প্রাচীণ গাঁথায় এরকম অসংখ্য কাহিনী আমরা পাই, যেখানে আমাদের চারপাশের প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এগুলো, পড়লে আমরা বুঝতে পারি- এককালে মানুষ কিকরে বিভিন্ন ঘটনার উত্তর কল্পনা করেছে। কিন্তু সমস্যা হয় তখনই যখন মানুষ এসব নানা কাহিনীকে স্ব স্ব ধর্মের মোড়কে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা আরম্ভ করে এবং তার একটা সার্বজনীন রূপ দেয়ার চেষ্টা করে। আর এই সার্বজনীন রূপ দিতে গিয়ে আজকের বিজ্ঞানের যুগে এসে, বিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার সাথে সেইসব পৌরানিক কাহিনীর একটা যোগসূত্র বের করে ফেলে অনেকেই। উপরের ঘটনাটির একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেখেছিলাম তেমনি একটি আলোচনায়। সেটি একটু শুনেনঃ

ভাগবতে আছে, "*রাহুর মস্তক অমৃতের স্পর্শ লাভ করিবার ফলে অমর হইয়াছিল। তাই ব্রহ্মা রাহুর মস্তককে একটি ছায়া গ্রহরূপে স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। রাহু যেহেতু চন্দ্র এবং সূর্যের চিরশত্রু, তাই অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্যের প্রতি ধাবিত হয়*"। (**ভাঃ ৮/৯/২৬**), কিংবা "*রাহু সূর্য এবং চন্দ্র উভয়ের প্রতিই বৈরীভাবাপন্ন এবং তাই সে প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে তাহাদের আচ্ছাদিত করতে চেষ্টা করে*"। (**ভাঃ ৫/২৪/২**)

এই আলোচনার পরেই সেখানে আনা হলো চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত বিজ্ঞানের আলোচনা এবং দুটিতে অদ্ভুতভাবে মিল দেখিয়ে দাবী করা হলো, রাহু হলো ছায়া যা চন্দ্রের উপরে পড়ে, সব পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রগ্রহণ হয় না- সব অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ হয় না, কেবল যখন রাহু বা ছায়া পড়ে তখনই এই গ্রহণ হয়। অতএব বিজ্ঞানের সমস্ত ব্যাখ্যা ভাগবতেই বিদ্যমান!

ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাঃ

এই যে, ধর্মের মধ্যে বিজ্ঞানকে খুঁজে বের করা- ধর্মের বিভিন্ন ঘটনা-ব্যাখ্যা-আলোচনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানো, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারকে ধর্মের প্রাচীণ গ্রন্থের মাঝে খুঁজে পাওয়া এসবের উদ্দেশ্য জানতে বেশী চিন্তা করতে হয় না। যে সময়ে ধর্মসমূহের উদ্ভব, সে সময়টি বা যুগটি মানুষ পার হয়ে এসেছে অনেক আগেই। একসময় কোপার্নিকাস-ব্রুনো-গ্যালিলিও-হাইপেশিয়াদের মেরে, লাইব্রেরী পুড়িয়ে, পেশী শক্তি দিয়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা সাময়িক স্তব্ধ করা গেলেও, মানুষকে পুরোপুরি আটকে রাখা সম্ভব হয়নি। এখন এই যুগে যখন মানুষের জ্ঞানজগতে বিচরণ হাজার বছর আগের কুসংস্কারকে অগ্রাহ্য করতে চায় বারেবারে। আর উল্টোদিকে প্রতিটি ধর্মই যে শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিয়ে এসেছিল, তা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। একে টিকিয়ে রাখতে তাই আজকের বিজ্ঞানের সাথে একটা ব্লেণ্ডিং যাকে বলে মিলে-মিশে জগা-খিচুরী বানানোটা হয়ে ওঠে অপরিহার্য। এভাবে ধর্মসমূহ হয়ে ওঠে বিজ্ঞানময়, ধর্মগ্রন্থ হয়ে ওঠে সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া!!

কিছু নমুনা দেখিঃ

কোরানঃ "অতঃপর আমি নিদর্শন দিতেছি। ওই সকল তারকার যাহারা পিছনে হটিয়া যায়।" - ৮১:১৫

বিজ্ঞানঃ অন্যান্য সকল দরবর্তী গ্যালাক্সী আমাদের এই মিলকীওয়ে গ্যালাক্সি থেকে সর্বদা দুরে সরে যাচ্ছে। ১৯২০ এর দশকে বৈজ্ঞানিক এডুইন হাবল দূরবর্তী গ্যালাক্সিসমূহের তারকার আলো পর্যবেক্ষন করে দেখতে পান- সেগুলি সর্বদা পশ্চাদপসরণ করছে।

কোরানঃ "আকাশমন্ডলীকে আমিই সৃষ্টি করিয়াছি শক্তিদ্বারা এবং নিশ্চই আমি উহাকে সম্প্রসারিত করিতেছি।"-৫১:৪৭

বিজ্ঞানঃ সকল দিকের সব দূরবর্তী গ্যালাক্সিই প্রতিনিয়ত আমাদের মিলকীওয়ে গ্যালাক্সী থেকে দুরে সরে যাচ্ছে। এর অর্থ দাড়ায়, মহাবিশ্ব সর্বদাই সম্পসারিত হচ্ছে।

কোরানঃ "কাফিরেরা কি দেখে না যে, এই আসমান যমীন সবকিছু মিলিত অবস্থায় ছিল, পরে আমি এইগুলিকে আলাদা আলাদা করিয়া দিয়াছি।"- ২১:৩০

বিজ্ঞানঃ মহাবিশ্ব বর্তমানে সম্প্রসারিত হচ্ছে, যার অর্থ দাড়ায়, আদিতে কোন এক সময় মহাবিশ্বের সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র তথা সমস্ত পদার্থ একত্রিত অবস্থায় ছিল, সম্ভবত কোন এক আদি বিস্ফোরণ থেকে এই সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছে। (বিগব্যাঙ)

কোরানঃ "ত□পর তিনি আসমানের প্রতি মন দিলেন, তখন উহা ধোঁয়া ছিল, পরে তিনি আসমান ও যমীনকে বলিলেন, 'আস, ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায়', তাহারা বলিল, 'আমরা একান্ত অনুগতভাবেই আসিলাম।'" - ৪১:১১

বিজ্ঞানঃ সৃষ্টির প্রারম্ভে মূলত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের মিশ্রিত ধোয়া উৎপন্ন হয়েছিল। কোন এক কারণে এই ধোয়া বিভক্ত হয়ে বিশাল আকৃতির সব ধোয়ার মেঘে রূপান্তরিত হয়েছিল। পরবর্তিতে এক একটি ধোয়ার মেঘ রূপান্তরিত হয়েছে এক একটি গ্যালাক্সিতে। ধোয়া থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এ মহাবিশ্ব সব গ্যালাক্সি তথা সম্পূর্ন মহাবিশ্ব।

কোরানঃ সূর্য তার নিজ অক্ষে ঘুরিতেছে। ইহা পরাক্রমশালী প্রভুর নির্ধারিত। আমি চন্দ্রকে যথাস্থানে বসিয়ে দিয়েছি এমনকি চন্দ্রটি শীর্ণ খেজুর পাতার মতো হয়ে যায়। সূর্য চন্দ্রকে ধরতে পারে না ও রাত্রিও দিনকে আতিক্রম করতে পারে না। তারা নিজ নিজ কক্ষ পথে চলতেছে। (৩৬: ৩৮, ৩৯, ৪০)

বিজ্ঞানঃ সূর্য তার নিজ অক্ষে ঘুরছে...স্থির ভাবে। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে ঘুরছে... বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল.. সবার কক্ষপথ আলাদা। সূর্য এদের মাঝখানে।

কোরানঃ হে জ্বিন ও মানবমণ্ডলী, যদি তোমরা প্রবেশ করিতে পার আসমান ও জমিনের এলাকায়, তাহা হইলে উহাতে প্রবেশ কর৷ তোমরা উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না মহাৰমতা ব্যতিরেকে। (৫৫:৩৩)

বিজ্ঞানঃ আবার মহাশূন্য বিজয়ের কথাও কোরআন শরীফের ৫৫নং সুরার ৩৩নং আয়াতে ইঙ্গিত দেয়া আছে৷ অর্থা[] আল্লাহ বলছেন, তোমরা মহাৰমতা অর্জন করেই কেবল উহাতে প্রবেশ করতে পারবে৷ বলাবাহুল্য, এই মহাৰমতা হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে মহাকর্ষের বাধা অতিক্রমকারী দ্রুতগামী প্রযুক্তি অর্জন৷ বিগত শতকের শেষ দিকে মানুষ এই প্রযুক্তি করায়ত্ত করে এবং সফলভাবে চাঁদে অবতরণ করে৷

একটু দেখলেই বুঝা যায় এরকম **বিজ্ঞানীকিকরণের** ক্ষেত্রে দুটি কাজ সচেতনভাবে করা হয়, দুধরণের বিচ্যুতি, বিজ্ঞানের কোন স্বীকৃত তথ্যক কোরানজাত করতে গিয়ে প্রথম বিচ্যুতি ঘটানো হয় অনুবাদে ও দ্বিতীয় বিচ্যুতিটি ঘটে ব্যাখ্যায়। যেমন,

অনুবাদগত বিচ্যুতিঃ উপরের নমুনা থেকে দেখি, ৮১:১৫ ও ১৬ এর অনুবাদ করাঝয়েছে এভাবে: "অতঃপর আমি নিদর্শন দিতেছি। ওই সকল তারকার যাহারা পিছনে হটিয়া যায়"। জহুরুল হকের অনুবাদে আমরা পাই, "আমি স্বাক্ষী মানছি গ্রহ-নক্ষত্রদের। যারা চলে থাকে, অদৃশ্য হয়ে যায়"। আরো তিনটি অনুবাদ দেখি:

"YUSUFALI: So verily I call to witness the planets - that recede, Go straight, or hide; PICKTHAL: Oh, but I call to witness the planets, The stars which rise and set, SHAKIR: But nay! I swear by the stars, That run their course (and) hide themselves,"

একইভাবে, ৫১:৪৭ এর অনুবাদ করা হয়েছে, "আকাশমন্ডলীকে আমিই সৃষ্টি করিয়াছি শক্তিদ্বারা এবং নিশ্চই আমি উহাকে সম্প্রসারিত করিতেছি"। জহুরুল হকের অনুবাদে এটি অনেকটা এমন : "আর মহাকাশমণ্ডল, আমরা তা নির্মাণ করেছি হাতে, আর আমরাই বিশালতার নির্মাতা"। ইংরেজী অনুবাদে পাই:

"YUSUFALI: With power and skill did We construct the Firmament: for it is We Who create the vastness of pace.
PICKTHAL: We have built the heaven with might, and We it is Who make the vast extent (thereof).
SHAKIR: And the heaven, We raised it high with power, and most surely We are the makers of things ample. "

এরপরে আসি সূর্য ও পৃথিবীর গতিসংক্রান্ত আয়াতের অনুবাদে। ৩৬:৩৮ এর অনুবাদে এখানে বলা হয়েছে, "সূর্য তার নিজ অক্ষে ঘুরিতেছে"। জহুরুল হকের অনুবাদ: "সূর্য তার গন্তব্যপথে বিচরণ করে"। এবং ইংরেজী অনুবাদে পাই:

"YUSUFALI: And the sun runs his course for a period determined for him:
PICKTHAL: And the sun runneth on unto a resting-place for him.
SHAKIR: And the sun runs on to a term appointed for it; "

এরকম আরো দেখানো যেতে পারে, আশা করি আপনার নিজেও কয়েকটি অনুবাদের সাথে মিলিয়ে দেখলেই বুঝবেন।

ব্যাখ্যাগত বিচ্যুতিঃ এখানে আরো মজা, কেননা সবচেয়ে বড় জোচ্চুরী ঘটে এখানেই। "গ্রহ-নক্ষত্ররা চলে ও অদৃশ্য হয়" (৮১:১৫) এই অনুবাদের বদলে "তারারা পিছু হটে" এই অনুবাদ ধরলেও যখন এর সাথে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি থেকে অন্য গ্যালাক্সিসমূহ দূরে সরে যাচ্ছে বিজ্ঞানী হাবলের এই আবিষ্কারের যোগসূত্র বের করা হয়, তখন হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারি না। আবার যখন "সূর্য চন্দ্রকে ধরতে পারে না ও রাত্রিও দিনকে আতিক্রম করতে পারে না। তারা নিজ নিজ কক্ষ পথে চলতেছে" (৩৬:৪০) এর ব্যাখ্যায় বলা হয় তারা মানে পৃথিবী, গ্রহ সমূহ নিজ নিজ অক্ষে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, তখন ব্যকরণ নতুন করে শিখতে ইচ্ছে করে। প্রশ্ন এসে খেলা করে, বিশেষ্যের পরে যে সর্বনাম বসে, সেই সর্বনাম কোন বিশেষ্যের স্থানে বসে! "আসমান যমীন সবকিছু মিলিত অবস্থায় ছিল, পরে আমি এইগুলিকে আলাদা আলাদা করিয়া দিয়াছি" (২১:৩০) এর ব্যাখ্যায় যখন বিগব্যাঙ থিওরি খুঁজে পাওয়া যায়, তখন মনে আসে এখন না থাক সৃষ্টির আদিতে নিশ্চয় আসমান বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নিশ্চয় ছিল। আরেকবার বিগব্যাঙ থিওরি খুঁজে দেখি শুরুতেই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল কি-না। "হে জ্বিন ও মানবমণ্ডলী, যদি তোমরা প্রবেশ করিতে পার আসমান ও জমিনের এলাকায়, তাহা হইলে উহাতে প্রবেশ কর" (৫৫:৩৩) এর ব্যাখ্যায় যখন বলা হয় মানুষের চন্দ্রে অভিযান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী কোরানেই করা হয়েছে, তখন আর হাসি চেপে রাখতে পারি না, মনে পড়ে যায়

সেই গল্পের কথা, যেখানে অর্ধশিক্ষিত এক গ্রাম্য যুবক বকলম গ্রামবাসীদের নিজের মত টেলিগ্রাম অনুবাদ করে শুনিয়েছিল!!

বিজ্ঞান বনাম কোরানঃ

মজা এখানেই শেষ নয়। আরেকটি মজার ব্যাপার হলো, এ ধরণের বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনায় আড়ালে আবডালে থেকে যায় কোরান- হাদীসের আরো কিছু সুরা, আয়াত, হাদীস। একইভাবে সেখানে ঘুণাক্ষরেও আনা হয় না বিজ্ঞানের অন্য কিছু স্বীকৃত আবিষ্কারের কথা। আর কোনক্রমেই যদিবা এসব কেউ নিয়েও আসে, সাথে সাথে ফতোয়াও হাজির হয়ে যায়ঃ "**এসব কোরান-হাদীস বুঝার সামর্থ্য আমাদের মত অর্বাচীনের নেই, কোন কোনটি আবার নাকি বিয়োণ্ড হিউম্যান ইমাজিনেশন**", কিংবা আক্রমণ চলে আসে বিজ্ঞানের উপরেই: "**বিজ্ঞান কি সব কিছু কখনো জানতে পারে?**" এই আক্রমণের সাথে সাথে অবশ্য কোরান ও বিজ্ঞানের যোগসূত্র বের করার হার কমা শুরু করে না।

যাহোক, এমন ফতোয়া আসবে ধরে নিয়েই আসুন কিছু কোরান-হাদীস পর্যালোচনা করিঃ

১৮: ৮৬: পরে যখন তিনি সূর্য অস্ত যাবার স্থানে পৌঁছলেন, তিনি এটিকে দেখতে পেলেন কালো জলাশয়ে অস্তগমন করছে, আর তার কাছে পেলেন এক অধিবাসী। আমরা বললাম- "হে যুলক্বারনাইন, তোমরা শাস্তি দিতে পার অথবা এদের সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার"।

১৮: ৯০: পরে যখন তিনি সূর্য উদয় হওয়ার জায়গায় পৌঁছলেন তখন তিনি এটিকে দেখতে পেলেন উদয় হচ্ছে এক অধিবাসীর উপরে যাদের জন্য আমরা এর থেকে কোন আবরণ বানাই নি।

এখানে কথক আল্লাহ যুলক্বারাইন সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলছেন, তিনি সূর্য উদয় স্থলে একবার গেলেন এবং আরেকবার গেলেন সূর্য অস্তের স্থানে। যেখানে গিয়ে যুলক্বারাইন দেখে সূর্যের কালো জলাশয়ে অস্ত যাওয়াও প্রত্যক্ষ করেন। এখান থেকে মনে প্রশ্ন আসে, তখন কি আরবের মানুষ জানতো না যে পৃথিবী গোলাকৃতির, কেননা, সমতল হলেই পৃথবীতে সূর্যের উদয় ও অস্ত যাওয়ার দুদিকে দুটি স্থানের প্রয়োজন পড়ে। (শানে নুযুল দ্রষ্টব্যঃ কাফিরেরা তাওরাত-ইঞ্জীলে উল্লেখিত আশ্চর্য মানুষ সম্পর্কে মুহম্মদ সা কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যে ব্যক্তি গোটা বিশ্ব ভ্রমণ করেছিলেন উভয় দিকে মানে পশ্চিমে ও পূর্বে)।

এরপরে আরো কটি সুরায় কিছু আয়াত দেখলে একই প্রশ্ন আবারো উকিঝুকি মারতে থাকে মনে:

২১: ৩১: আর পৃথিবীতে আমরা পাহাড় পর্বত স্থাপন করেছি, পাছে তাদের সঙ্গে এটি আন্দোলিত হয়; আর ওতে আমরা বানিয়েছি চওড়া পথঘাট যেন তারা স□পথ প্রাপ্ত হয়।

২১: ৩২: আর আমরা আকাশকে করেছি এক সুরক্ষিত ছাদ। কিন্তু তারা এর নিদর্শনাবলী থেকে বিমুখ থাকে।

১৫: ১৯: আর পৃথিবী- আমরা তাকে প্রসারিত করেছি, আর তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা, আর তাতে উ□পন্ন করেছি হরেক রকমের জিনিস সুপরিমিতভাবে।

৭৮: ৬, ৭: আমরা কি পৃথিবীটাকে পাতানো বিছানো রূপে বানাইনি? আর পাহাড় পর্বতকে খুঁটি রূপে? **২: ২২:** যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে ফরাশ (couch) বানিয়েছেন, আর আকাশকে চাঁদোয়া (canopy).....

৩১: ১০: তিনি মহাকাশমণ্ডলীকে সৃষ্টি করেছেন কোন খুঁটি ছাড়াই,- তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ; আর তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা পাছে এটি তোমাদের নিয়ে ঢলে পড়ে।

এসব যখন পড়ি, তখন আধুনিক বিজ্ঞান আকাশ সম্পর্কে কি বলে তা মনে আসলেই বিপদ। যখন মহাশূণ্যে নিয়ত গতিশীল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর বিচরণের দিকে তাকাই তখন কোরানের এই আকাশমণ্ডলী যাকে খুটি ছাড়াই আল্লাহ মানুষের ছাদ বা চাঁদোয়া হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, যার আবার ৭টি স্তরও বিদ্যমান, সম্পর্কে ধাধায় পড়ে যাই। আর, জমিন বা পৃথিবীকে পাতানো বিছানো হিসাবে তৈরী করে সেখানে পাহাড়-পর্বত দিয়েছেন, যার দরুন পৃথিবী হেলেও পড়ে না, নড়াচড়াও করতে পারে না। এ আল্লাহর অসীম দয়া নিসন্দেহে, কিন্তু এখন যখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, এত বড় বড় পর্বতমালা থাকার পরেও শুধু নড়াচড়া নয় প্রতি ২৪ ঘন্টায় এক ডিগবাজীর সাথে সাথে ৩৬৫ দিনে সূর্যের চারদিকে নেচে বেড়াচ্ছে এই পৃথিবী, তখন আল্লাহর জ্ঞানের পরিধি নিয়ে মন সন্দেহগ্রস্ত হয়ে উঠতে চায়!

এবারে নিচের আয়াত দেখিঃ

৩৬: ৪০: সূর্যের নিজের সাধ্য নেই চন্দ্রকে ধরার, রাতেরও নেই দিনকে অতিক্রম করার। আর সবকটিই কক্ষপথে ভাসছে।

এখানে সূর্য ও চন্দ্রের সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই বলে যখন ঘোষণা করা হয়, তখন হঠাতই মনে হয় সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথের কথা জানলে কি এই সংঘর্ষের কথা উঠতে পারে? মনে পড়ে এক বালকের কথা, যে অবাক হয়ে তার বাবাকে প্রশ্ন করে যে, আচ্ছা বাবা- একই আকাশে সূর্যও পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাচ্ছে, চন্দ্রও। তাহলে ওদের মধ্যে ঠোকাঠুকি হয় না কেন? বাবা বলতে পারেন, ভিন্ন কক্ষপথের কথা অথবা বলতে পারেন আল্লাহর কুদরতের কথা। আল্লাহ নিজে তো নিজের কুদরতের কথা ঘোষণা করবেনই।

সূর্য নিজ অক্ষে ঘুরছে দাবী করা হয়েছে যে আয়াতটি দিয়ে সেটি হলো ৩৬: ৩৮, সেটির PICKTHAL কর্তৃক অনুবাদ হচ্ছে: "And the sun runneth on unto a resting-place for him". এই রেস্টিং প্লেসের বিষয়টি আমরা এবার দেখি সহীহ বুখারী হাদীসেঃ

"*হযরত আবূ যর গিফারী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী করিম সা. আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আবূ যর, তুমি কি জান যে, অস্ত যাওয়ার পরে সূর্য কোথায় যায়?" আমি উত্তর করলাম, "আমি জানি না, একমাত্র আল্লাহর রাসুল সা. ই ভালো বলতে পারেন"। তখন তিনি বললেন, "অস্ত যাবার পরে সূর্য আল্লাহর আরশের নিচে অবস্থান করে এবং আবার পূর্বদিকে উদয় হওয়ার জন্য আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় থাকে। এমন দিন আসবে যখন সূর্য উদয়ের অনুমতি পাবে না এবং তখন পৃথিবীতে কেয়ামত নেমে আসবে*"। (**ভলিউম ৪, বুক ৫৪, হাদীস ৪২১**)

এবারে মুহম্মদ সা. ও তাঁর সমসাময়িক আরববাসীদের বিজ্ঞানের দৌড় সম্পর্কে ধারণা করা আমাদের জন্য কিছুটা সহজ হলো বিধায়। মুহম্মদ সাঃ এর বিজ্ঞান দৌড়ই বা বলি কেমনে, ওনাকে তো শিখিয়েছেন আল্লাহ স্বয়ং!!

এমনতো অসংখ্যই আছে। ভুরি ভুরি। কোনটা বাদে কোনটা লিখবো? জ্বিন, ফেরেশতা এসব আর রূপকথার দেও-দানবের কোন পার্থক্য নেই। তার উপরে নদীর দুভাগ হওয়া, বোরাকে করে সপ্ত আসমান পরিভ্রমণ, লাঠির সর্প হয়ে যাওয়া, হাতের ইশারায় চাদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া, হাতের স্পর্শে কুষ্ঠরোগ ভালো হয়ে যাওয়া প্রভৃতি ঘটনাকে চিত্তাকর্ষক পৌরাণিক কাহিনী বলা যেতে পারে, যেখানে বিজ্ঞান না টানাই হয়তো সবার জন্য মঙ্গলজনক।

যে লাউ সে-ই কদুঃ

এবারে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের সাথে বিজ্ঞানের সংযোগ দেখি:

ভাগবত ২/১৬/১৭: হে মাতঃ হে স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা! আমি পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি যে, কাল হইতেছে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি, প্রকৃতির সাম্য, অব্যক্ত অবস্থা বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে, যাঁহার থেকে সৃষ্টির শুরু হয়।

বিজ্ঞানঃ এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে প্রকৃতির সাম্য, অব্যক্ত অবস্থা বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি শুরু হয়। বিক্ষুব্ধ শব্দটির অর্থ বিস্ফোরণ। বিজ্ঞানীরা বলছেন, একটি বৃহ বিস্ফোরণের ফলে মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে। একে বিগব্যাঙ বলে।

ভাগবত ৩/২০/১৬: গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভী থেকে একটি সহস্র সূর্যের মতো উজ্জ্বল পদ্ম উদ্ভুত হয়েছিল। সেই পদ্মটি সমস্ত বদ্ধ জীবের অধিষ্ঠান স্বরূপ এবং প্রথম জীব সর্বশক্তিমান ব্রহ্মা সেই পদ্মটি থেকে আবির্ভুত হয়েছিলেন।

বিজ্ঞানঃ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বইটির মহাবিশ্বের উপত্তি এবং পরিণতি অধ্যায়ে (পৃ -১০০) আলোচনা করেছেন যে, মনে করা হয় বিস্ফোরণের সময় মহাবিশ্বের আয়তন ছিল শুণ্য, সুতরাং উত্তাপ ছিল অসীম। মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে তাপমাত্রা নেমে এসেছিল প্রায় এক হাজার কোটি ডিগ্রীতে। এ তাপ সূর্যের কেন্দ্রের তাপের চেয়ে প্রায় এক হাজার গুণ বেশী। ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে বিস্ফোরণের পর তাপমাত্রার পরিমাণ ১০০০ জ্বলন্ত সূর্যের তাপের সমান, যেটি বিজ্ঞানীরাও এখন আবিস্কার করেছেন।

স্কন্ধ পুরাণম ৩৮/৫৪: হে ভরত বংশাবতংস মেঘ সকল ধুম ও সমুদ্রের বাষ্প হইতে বৃষ্টি হয়। সেজন্য এরা জলপূর্ণ হলে নীল বর্ণ হয়ে থাকে এবং বর্ষণ করতে পারে।

ঋকবেদ ৭/৩৬/১: যজ্ঞের সদন হতে স্রোত্র প্রকৃষ্ট রুপে গমন করুক। সূর্য কিরণসমূহ দ্বারা বৃষ্টি সৃষ্টি করিয়াছেন।

বিজ্ঞানঃ আজকের বিজ্ঞানীরা বৃষ্টির কারণ হিসাবে যে পানিচক্রের কথা বলছেন, সেখানে এই সূর্যের তাপে প্রতিদিন সমুদ্র ও জলাশয়ের পানি বাষ্পীভুত হয়ে উপরে উঠে ঘনীভূত ও শীতলীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয়, যা ভারী হয়ে পরবর্তীতে বৃষ্টি হয়ে মাটিতে নেমে আসে। এটিই স্কন্ধ পুরাণ ও ঋকবেদের উপরের শ্লোকে বলা হয়েছে।

ভাগবত ২/৭/৩৭: কলিযুগে নাস্তিক অসুর স্বভাব মহাবিজ্ঞানীরা বৈদিক জ্ঞানে অত্যন্ত দক্ষ হয়ে মহাশূণ্য যানে চড়ে গগনমার্গে অদৃশ্যভাবে বিচরণ করবে....

বিজ্ঞানঃ এই শ্লোকে কলিযুগ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী করে বলা হয়েছে কলিযুগে বিজ্ঞানীরা বৈদিক জ্ঞান অর্জন করে বিমান বা মহাশূণ্যযান তৈরী করবে। কলিযুগ মানে বর্তমান যুগ। সুতরাং বলা যায় বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীরা যে বিমান তৈরী করেছেন, সে সম্পর্কে ভাগবতে লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছে। ভাগবতে বেশ কয়েক রকমের মহাশূণ্য যানের বর্ণনা আছে।

এমন অনেক নমুনা দেখানো যেতে পারে, বাইবেলের বিজ্ঞানিকীকরণ নিয়েও কিছু নমুনা দেয়া যেতে পারে। মুসলিম পাঠকের কাছে এখানকার আলোচনাগুলো হাস্যকর, অবৈজ্ঞানিক, অবান্তর, অযৌক্তিক খুব সহজেই মনে হতে পারে; কিন্তু আদতে কোরানের সাথে বিজ্ঞানের যোগসূত্র বের করার আলোচনার সাথে এই আলোচনাসমূহের কোন পার্থক্য নেই। যে লাউ সে-ই কদু, এখানেও হয়েছে অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগত বিচ্যুতি, আজকের বিজ্ঞান এসব কিচ্ছা-কাহিনীকে আর যাই হোক বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকার করে না। আরেকটি তুলনামূলক নমুনা দেখিয়ে এ পরিচ্ছেদের আলোচনা শেষ করছি।

কোরান ২৩:১৩,১৪: তারপর আমরা তাকে বানাই শুক্রকীট এক নিরাপদ অবস্থান স্থলে। তারপর শুক্রকীটকে বানাই একটি রক্তপিণ্ড, তারপর রক্তপিণ্ডকে বানাই একতাল মাংসের তাল, তারপরে মাংসের তালে আমরা সৃষ্টি করি হাড়গোড়, তারপর হাড়গোড়কে ঢেকে দেই মাংসপেশী দিয়ে, তারপরে আমরা তাকে সৃষ্টি করি অন্য এক সৃষ্টিতে। সেইজন্য আল্লাহরই অপার মহিমা, কত শ্রেষ্ঠ এই স্রষ্টা।

বিজ্ঞানঃ সেই কোন আমলে কোরানেই মাতৃগর্ভে ভ্রুণ সৃষ্টি ভ্রূণ থেকে ধীরে মানব শিশুর আকৃতি লাভের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে।

বায়ুপুরাণম ১৪/১৮, ১৯: গর্ভকালে শুক্র এবং শোনিত মিলিত হয়ে কলল আকার ধারণ করে। পরে কলল থেকে বুদবুদ আকার প্রাপ্ত হয়। চক্রের উপর মাটির পিণ্ড যেমন চক্রের ঘুর্ণন দ্বারা বিবর্তিত হয়ে ঘট, শরাদি বিভিন্ন নানাকার ধারণ করে, তদ্রূপ আত্মাও বায়ুদ্বারা পরিচালিত হয়ে কালবশে অস্থিযুক্ত বিবিধ মনঃসম্পন্ন মানুষরূপে উৎপন্ন করে।

ভাগবত ৩/৩১/২: সেই রেতকণা গর্ভে পতিত হলে, একরাত্রে শোনিতের সাথে মিশ্রিত হয়, পঞ্চ রাত্রিতে বুদ্বুদের আকার প্রাপ্ত হয় এবং ধীরে ধীরে তা মাংসপিণ্ডে বা অণ্ডে পরিণত হয়।

বিজ্ঞানঃ বৈদিক সাহিত্যে শুক্রাণুকে রেতকণা বা শুক্র, ডিম্বাণুকে শোনিত এবং জাইগোটকে কলল নামে অভিহিত করা হয়। আধুনিক বিজ্ঞান আজ অনুরূপ কথাই বলে।

উভয় আলোচনাই আধুনিক বিজ্ঞানকে টেনে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করলেও, আধুনিক ভ্রূণতত্ত্ব অনুসারে অবশ্য কোরান বা ভাগবত ও বায়ুপুরাণের এসব ব্যখ্যা সম্পূর্ণ ভুল প্রমানিত!!

১৪০০ বছর আগের এক নিরক্ষরের গল্পঃ

এই ধরণের বিজ্ঞান আলোচনার পরে সকলের উদ্দেশ্যে প্রায়শই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছুড়ে দেয়া হয়ঃ "আজ হতে ১৪০০ বছর আগে যে আরবে একজন নিরক্ষর মানুষ এই কথাগুলো কিভাবে ভাবতে পেরেছিলেন তা কি কখনো চিন্তা করেছেন? আজ বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করছে আজ হতে ১৪০০ বছর আগেই একজন মানুষ তা বললে তা কিভাবে তার মস্তিষ্ক প্রসূত হয়?" এভাবেই প্রমাণ হয়ে গেল কোরান মনুষ্য সৃষ্ট নয়, এটা ঐশী। এখানেই গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটলে ভালো হতো, কিন্তু যখন আমরা মানব ইতিহাসের কিছু দারুণ কিছু কর্মের সন্ধান পাই তখন বিস্ময়াভূত হয়ে যাই। সেই ১৪০০ বছরেরও আরো প্রায় ২ শতাধিক বছর পূর্বেই (কোপারনিকাসেরও সহস্র বছর পূর্বে) আর্যভট্ট (৪৭৬ খৃস্টাব্দ) বলেছেন, পৃথিবী গোলাকার, এটি নিজ অক্ষের চারদিকে ঘুরে এবং সাথে সাথে এটি সূর্যকেও প্রদক্ষিণ করে। ২ সহস্রাধিক বছর আগে (খৃষ্টের জন্মেরও ৩০০/ ৩৫০ বছর পূর্বে) এরিস্টোটল বলেছেন, বায়ুশূণ্য অবস্থায় বস্তু একই অবস্থানে থাকবে নতুবা সমগতিতে চিরকাল চলতে থাকবে। (এরিস্টোটল অবশ্য তার সিদ্ধান্তের পেছনে কোন প্রমাণ তো হাজির করতে পারেনই নি, বরং পরক্ষণেই তার সেই আবিস্কারকে অস্বীকার করেছেন এই ধারণা থেকে যে, বায়ুশূণ্য স্থান থাকতে পারে না, ফলে এটি অসম্ভব)। ভাস্করাচার্য (২), নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র প্রদানেরও ৫ শতাধিক বছর পূর্বে বলেছেন, পৃথবীতে বস্তুসমূহ পতিত হয় পৃথিবীর টানেই, এবং পৃথিবী, গ্রহসমূহ, জ্যোতিস্কসমূহ, চাঁদ ও সূর্য নিজ নিজ কক্ষে এই আকর্ষণের কারণেই অবস্থান করে। মুহম্মদের বহু আগে গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাস অনু, পরমানু, জড়তার সূত্র, জলচক্র, ভুমিকম্প, চুম্বকত্ব সহ আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক কিছুই সঠিক ভাবে অনুধাবণ এবং ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন।

এসব যখন দেখি তখন ভাবি, আল্লাহর পূর্বে মানুষই তো সঠিক জ্ঞান তো আমাদের দিতে পারলো। আর, আল্লাহ এমনভাবে পেচিয়ে পুচিয়ে যে জ্ঞান দিলেন, তাও দেখা যাচ্ছে অনেক জায়গায় ভুলে ভরা!! আফসোস তৈরী হয়, নিজ হাতে লেখার পরেও কেন আল্লাহ গোটা কোরানে একবারো সরাসরি উল্লেখ করতে পারলেন না যে, পৃথিবী গোলাকার, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।

সূত্রঃ

১। আল কুরআন- বাংলা অনুবাদ, ডঃ জহুরুল হক

২। Translation of quran(http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/)

৩। তাফসিরুল মারেফুল কোরআন (http://www.banglakitab.com/quran.htm)

৪। সৈয়দ কামরান মির্জা কর্তৃক প্রণীত Samples of Quranic Contradictions, Inconsistencies and Errors (http://www.faithfreedom.org/Articles/SKM/contradictions.htm)

৫। কোরআন বাইবেল বেদ ও বিজ্ঞান- ডাঃ সি এন সি বোস

৬। Richard Carrier, Predicting Modern Science: Epicurus vs. Mohammed, http://secweb.infidels.org/?kiosk=articles&id=362

নাস্তিকের ধর্মকথা, বাংলাদেশ থেকে লেখন। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে তিনি আন্তর্জালে লিখে থাকেন। nastikerdharmakatha.blogspot.com নামে নিজস্ব ব্লগ আছে তার। ইমেইল - nastikerdharmakatha@gmail.com

বিজ্ঞান, ধর্ম ও বিশ্বাস
অপার্থিব

প্রায়ই দেখা যায় ধর্মবাদীরা বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করে দাবি করেন–ধর্মের সূত্র ও শ্লোকগুলি পাঠ করলে তার ভেতরেই বিজ্ঞানকে পাওয়া যায়। এখানে ধর্মবাদী বলতে ধর্মে বিশ্বাসী বোঝানো হচ্ছে না, যারা ধর্মকে পরম সত্য বলে দাবি করেন এবং এই দাবির সমর্থনে নিজস্ব যুক্তি উদ্ভাবন করেন, তাদেরকেই বোঝানো হচ্ছে। তাদের দাবি অনুযায়ী বিজ্ঞানের সব আবিষ্কারের কৃতিত্ব ও মৌলিকতা ধর্মেরই প্রাপ্য। এই দাবি অবশ্যই ভ্রান্ত। কেউ যদি কোনো কিছুর মধ্যে বিজ্ঞান দেখতে বদ্ধপরিকর হন, তবে তিনি তাই দেখবেন। কোনো এক ব্যক্তি 'ক' একশ বছর আগে কথার ছলে কোনো প্রসঙ্গে বলেও থাকতে পারেন যে,—এ জগতের সবকিছুই আপেক্ষিক। তাই বলে কি আমরা দাবি করতে পারি 'ক' আইনস্টাইনের আগেই আপেক্ষিকতার তত্ত্ব জানতেন? এর জন্য কী তাঁকেই ('ক'-কে) মৌলিকতার কৃতিত্ব দেয়া উচিত? মানুষের বা ধর্মপুস্তকের কোনো অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে বা দ্ব্যর্থক বক্তব্য বা শ্লোককে যে যার ইচ্ছা মত সুবিধাজনক ব্যাখ্যা বা অর্থারোপ করে বিজ্ঞানের কোনো এক সূত্রের সঙ্গে জোর করে মেলাতেই পারেন। বিশেষ করে সূত্রটার সত্যিকার জটিল এবং নিখুঁত বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় ব্যক্ত না করে যদি তাকে অতিসরলীকৃতভাবে বলা হয়, তাহলে মিলের একটা আভাস বের করা কঠিন কাজ নয়। এটা বলা ভুল হবে না যে কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই, ধর্মীয় পুস্তকের কোনো বাণী বা সূত্রকে ভিত্তি করে বা তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ঘটেনি। তাই ধর্মকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেয়া বা ধর্মের উপর মৌলিকতা আরোপ করা একটা বড় ভুলই হবে। জগত ও প্রকৃতির অনেক প্রশ্নেরই উত্তর বিজ্ঞান খুঁজে পায়নি এখনও। কিন্তু তার কোনোটার উত্তর আবার ধর্মের সূত্রও দিতে পারেনি। বিজ্ঞান যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় তখন সহসা ওই উত্তরটা আবার ধর্মবাদীরা ধর্মপুস্তকের কোনো অস্পষ্ট শ্লোক বা আয়াতে অনায়াসে খুঁজে বের করতে পারবেন সন্দেহ নেই। দেখা যায় যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার (যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা প্রাপ্ত) অব্যবহিত পরেই ধর্মবাদিরা বিজ্ঞানের সেই সূত্রকে ধর্মপুস্তকের ভেতরে আবার আবিষ্কার করেন! এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি কখনো। ধর্মবাদীরাই বিজ্ঞানকে অনুসরণ করেন, উল্টোটা নয়। এটা কি শুধুই কাকতালীয় ব্যাপার? মনে হয় না। ধর্মে বিজ্ঞান খোঁজা বা বিজ্ঞানে ধর্ম খোঁজা একটা মহাভুল। এটা যে ভুল তা শুধু ধর্মে অবিশ্বাসী বা সংশয়বাদীরাই বলেন না, ধর্মে বিশ্বাসী প্রখ্যাত প্রয়াত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক আব্দুস সালামও এটা জোর দিয়ে বলেছিলেন। অনেকের বিজ্ঞানের 'মহাবিস্ফোরণ' বা বিগ-ব্যাং-এর তত্ত্বকে ধর্মের কোনো আয়াতের মাধ্যমে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টায় অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলতেন যে 'মহাবিস্ফোরণ' হল জগত সৃষ্টির একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। সময়ের সঙ্গে জগত সৃষ্টির ব্যাখ্যায় অন্য কোনো উন্নততর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও আমরা পেতে পারি, কারণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মাত্রই ক্রমাগত পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়। তিনি প্রশ্ন করতেন তখন সেই ধর্মবাদীরা কি ধর্মীয় শ্লোক বা আয়াতটির ব্যাখ্যাও সংশোধিত করবেন নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটির সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখার জন্য? বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করার বিপদ এভাবেই তুলে ধরেছিলেন অধ্যাপক সালাম। দুঃখের বিষয় অধ্যাপক সালামের চেয়ে অনেক নিচু সারির কিছু বিজ্ঞানী এখনও বিজ্ঞানকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, নানা প্রবন্ধ পুস্তক ও বক্তৃতার মাধ্যমে, যার অনেকটাই কুযুক্তিতে ভরা।

কুযুক্তি বা সুবিধাবাদী যুক্তির মাধ্যমে শুধু যে অস্পষ্ট ধর্মীয় শ্লোক বা আয়াতকেই বিজ্ঞানের সঙ্গে মেলানো যায় তাই নয়, অনেক প্রখ্যাত কবির কবিতায়, পুরাতন প্রবাদবাক্যে, একইভাবে চেষ্টা করলে বিজ্ঞানের সন্ধান মিলবে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করার চেষ্টায় ধর্মবাদীরা দুটো পন্থা অবলম্বন করেন। একদল ধর্মবাদীরা এটা মেনে নিয়েছেন যে বিজ্ঞানের সাফল্য, মর্যাদা, যথার্থতা অবিসংবাদিত। তাঁরা যুক্তি দেন যে বিজ্ঞান ধর্মের বাণীকেই সমর্থন করে। অর্থাৎ ধর্মের বাণী বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবার অনেক ধর্মবাদী আছেন যারা বিজ্ঞানকে খাটো করে দেখে এই যুক্তি দেন যে বিজ্ঞানের সব কিছুই ধর্মের বাণী যা বলে তারই সমর্থন। অর্থাৎ বিজ্ঞান ধর্মের বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (দুটোর সূক্ষ্ম তফাৎ লক্ষ্যনীয়)। দুটো যুক্তিরই ত্রুটি আছে। প্রথমোক্তের যুক্তি অনুযায়ী বিজ্ঞানকেই মুখ্য ধরে ধর্মকে বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থন/যাচাই করার চেষ্টা করা হচ্ছে। স্পষ্টই বিজ্ঞানের নিরিখে ধর্মকে যাচাই করার প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। কিন্তু এটা ধর্মবাদীদের জন্য স্ববিরোধিতারই সামিল। কারণ তাঁদের সংজ্ঞা অনুযায়ী ধর্মের স্থান সবার উপরে। দ্বিতীয়োক্তের ত্রুটি হল যে তাঁরা ধর্মকে মুখ্য ধরে বিজ্ঞানকে ধর্মের দ্বারা যাচাই করার চেষ্টা করেন, কিন্তু বিজ্ঞানকে ধর্মের দ্বারা যাচাই বা সত্য প্রমাণ করতে হলে বিজ্ঞানের ভাষায় ও বৈজ্ঞানিক শব্দাবলি ব্যবহার করেই করা সমীচিন, যা সূক্ষ্ম এবং দ্ব্যর্থহীন। কিন্তু ধর্মের বাণী বা শ্লোকগুলির ভাষা খুবই সাধারণ, অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থক, যা কোনো বৈজ্ঞানিক ধারণাবাহী শব্দ ব্যবহার করে না, তাই বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি পূরণ করতে পারে না। জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলি কোনো জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে সাধারণ পাঠকের জন্য সহজ ভাষায় ব্যক্ত করলে তার ভাষাতেও একটা ন্যূনতম বৈজ্ঞানিক ধারণা, শব্দাবলি ও স্পষ্টতা দেখা যায়, যা ধর্মের বাণী বা শ্লোকগুলিতে অবর্তমান।

এখন বিজ্ঞান ও ধর্মকে যুক্ত করার আর এক সমস্যাপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনায় আসি। এই যুক্ত করার প্রয়াস কম-বেশি সব ধর্মেই দেখা যায়। এমন অনেক বই বা প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দেয়া যায় যাতে বিজ্ঞানের দ্বারা বাইবেলের সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে; যেমন—"Genesis and the Big Bang: The Discovery of Harmony Between Modern Science and the Bible, Gerald L. Schroeder". কেউ তাওরাতকে বিজ্ঞানের আলোকে সত্য প্রমাণের চেষ্টা করেছেন, যেমন—" Thinking About Creation: Eternal Torah and Modern Physics, Andrew Goldfinger" আবার কেউবা বেদকে পদার্থবিজ্ঞানের আলোকে সত্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, যেমন 'Vedic Physics—Raja Ram Mohan Roy, Subhash Kak' এখানে উল্লেখ্য যে এই রাজা রামমোহন রায় (উল্লিখিত বইয়ের লেখকদ্বয়ের একজন) কিন্তু ইতিহাসের সেই প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব রাজা রামমোহন নন। যাহোক, এই সব প্রয়াসের মধ্যে এক আশ্চর্যজনক মিল দেখা যায়। সেই ধর্মীয় শ্লোকের অস্পষ্টতার সুযোগ নিয়ে দ্ব্যর্থক ভাষায় সুবিধাজনক ব্যাখ্যা দিয়ে মিল খোঁজার চেষ্টা। এই চেষ্টায় কোনো ধর্মই এমন কোনো বিশেষত্ব দেখাতে পারে না, যার জন্য অন্য সব প্রয়াস থেকে তাকে আলাদা কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে সর্বসম্মতক্রমে যুক্তিসঙ্গত বলে রায় দেয়া যায়। কারও কাছে 'ক' ধর্মের যুক্তি অধিক গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে, আবার কারো কাছে 'ঘ' ধর্মের। বিজ্ঞান ও ধর্মকে যুক্ত করার এই প্রয়াসের মূল কারণ যেহেতু একটি বিশেষ ধর্মের সত্যতা প্রমাণ করা, সেহেতু নিরপেক্ষ, যুক্তিনির্ভর কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে হয় সব ধর্মই সত্য প্রমাণিত হতে হবে অথবা সবই ভুল প্রমাণিত হবে। যেহেতু সব ধর্মই একই সাথে সত্য হতে পারে না (কারণ যে কোনো দুই ধর্মের মধ্যেই এক

বা একাধিক পরস্পর বিরোধী বাণী আছে), সেহেতু বিজ্ঞান ও ধর্মকে যুক্ত করার প্রয়াসকে সঠিক বিচার করলে সব ধর্মই ভুল এই সিদ্ধান্তে আসতে হয়। একটা উদাহরণ দেয়া যাক :— মালি দেশে ডোগান নামক এক সম্প্রদায় আছে, যাদের লোককথা অনুযায়ী আকাশে একটা তারা আছে, যে তারায় তাদের উদ্ধারকারী প্রভু বাস করেন। আধুনিক পর্যবেক্ষণ জ্যোতির্বিদ্যার অনেক আগেই তাদের লোককথায় তারাটির আকাশে অবস্থান, তার আবর্তনকাল সবই উল্লেখ করা ছিল। পরে পর্যবেক্ষণ জ্যোতির্বিদ্যার দ্বারা বাস্তবিকই আকাশের ঐ স্থানে, সঠিক আবর্তনকালের একটা তারা আবিস্কৃত হয় যার জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নাম Sirius–B বা Dog Star । ধর্মবাদিদের বিজ্ঞানের সত্যের দ্বারা ধর্মকে বিশ্বাসযোগ্য করাকে মেনে নিলে ডোগানদের ধর্মকে অবশ্যই সত্য বলে মেনে নিতে হবে। কিন্তু বিচার বিশ্লেষণের আলোকে কেউ ভাবতে পারেন যে, আসলেই ডোগানদের ধর্ম সত্য, তাদের প্রভু সত্যিই ঐ তারায় বাস করেন যিনি ঐ তারার সঠিক তথ্যটি তাদেরকে প্রদান করেছেন? না-কি এটা মনে করা যে, যেহেতু আমরা জানি যে প্রাচীনকালেও সুমেরিও, মিশরীয়, গ্রিক, ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা উন্নত ছিল, হয়ত এই তথ্য তাদের জানা ছিল। কোনো প্রকারে এই তথ্য কালের স্রোতে ভেসে গিয়ে কেবলমাত্র ডোগানদের কাছেই সংরক্ষিত হয়ে থাকে? বা অন্য কোনো সম্ভাবনা?

আসলে সমস্যা 'তৈরি' করার মূলে রয়েছে বিজ্ঞান ও ধর্মকে যুক্ত করার প্রয়াসের অন্তর্নিহিত আত্মনির্ভরতা (Subjectivity), কিন্তু যুক্তি ও বিজ্ঞানের ভাষা অবশ্যই বস্তুনির্ভর (Objective); কাজেই ধর্মের দ্বারা বিজ্ঞানকে যথার্থায়ন বা বৈধকরণ (Validation) বা বিজ্ঞানের দ্বারা ধর্মকে যথার্থায়ন করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এতক্ষণ ধর্ম ও বিজ্ঞানকে যুক্ত করার প্রয়াস নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার আসি কিছু ধর্মবাদিদের বিজ্ঞানকে ধর্মের বিপরীতে এনে তাকে খাটো করে দেখানোর বা ধর্ম যে বিজ্ঞানের চেয়ে কোনো অংশে কম-সত্য নয়, তা প্রমাণ করার প্রয়াসে। তাদের একটা যুক্তি হল যে বিজ্ঞানের সত্যের ভিত্তিও তো 'বিশ্বাস'। বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে পাওয়া বিজ্ঞানের সত্যকে 'সত্য' বলে যদি গ্রহণ করা যায়, তবে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে পাওয়া ধর্মীয় সত্যকে কেন 'সত্য' বলে গ্রহণ করা যাবে না? এই যুক্তির একটা সমস্যা হল যে শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে কোনো মতকে সত্য বলে দাবি করলেই যদি তাকে 'সত্য' বলে গ্রহণ করতে হয়, তাহলে সব ধর্মকেই 'সত্য' বলে মানতে হয়। আর শুধু ধর্ম কেন, পৃথিবীর সকল সম্প্রদায় বা উপজাতির বিশ্বাস ও কুসংস্কারভিত্তিক মত ও তথ্যকেও সত্য বলে মানতে হয়। তারা এটা বোঝেন না যে বিজ্ঞানের সত্য আর ধর্ম যাকে সত্য বলে দাবি করে, তার ভিতর এক বিরাট পার্থক্য আছে। বিজ্ঞানের সত্য যুক্তি আর প্রমাণের (Logic & Evidence) দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে এবং সর্বজনীনভাবে যাচাইকৃত; এবং যাচাইকরণের প্রণালীও বস্তুনির্ভর। বিজ্ঞানের সত্যকে 'সত্য' বলে গ্রহণ করার কারণ সেটাই, বিশ্বাসের জন্য নয়। কোনো ধর্মের দাবিকৃত 'সত্য'ই বস্তুনির্ভর যুক্তি আর প্রমাণের দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে এবং সর্বজনীনভাবে যাচাইকৃত হয়নি। কোনো এক বিশেষ ধর্মের সত্যের দাবিদার কেবল সেই ধর্মের অনুসারিরাই; এবং তাদের সত্যের যুক্তি আত্মনির্ভর। এই দাবি সত্য বলে গ্রহণ করার ন্যূনতম মাপকাঠিও পূরণ করে না। এটা সত্য যে অনেক বৈজ্ঞানিক সত্যেরই সূত্রপাত বিশ্বাস থেকেই। কিন্তু সে বিশ্বাস কোনো দৈবশক্তি বা মনুষ্য কর্তৃক প্রদত্ত কোনো বাণীর উপর ভিত্তি করে নয়, বরং বুদ্ধিমান অনুমান (যেমন অক্কামের ক্ষুর বা Occam's Razor নামক এক পরীক্ষিত দার্শনিক সূত্র), স্বজ্ঞা, সাধারণ জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ এর উপর নির্ভর করেই; এবং সেই অনুমান

কোনো বিশেষ ধর্ম বা সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত নয়। বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস আর অন্য সকল বিশ্বাসের মধ্যে আছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসকে 'প্রকল্প' (Hypothesis) বলা হয়। কিন্তু প্রকল্প বিশ্বাসভিত্তিক অনুমান হলেও সেই অনুমানকে আরো পরিশীলিত করে যুক্তি, প্রমাণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে একটা তত্ত্বে না আসা পর্যন্ত তাকে সত্য বলে দাবি করেন না বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানের সত্যের দাবিতে জবাবদিহিত্ব নিহিত আছে। বিজ্ঞানের 'সত্যে'র দাবিকে 'মিথ্যাকরণ' (Falsification) বা সংশোধন/পরিশীলন করা সম্ভব, যা অন্য কোনো 'সত্যে'র দাবির বেলায় প্রযোজ্য নয়, কারণ সেগুলি শর্তহীন; পরমভাবে সত্য বলে দাবি করা হয়, আর যেহেতু তা বস্তুনির্ভর যুক্তি প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নয়, সেহেতু তাদের দাবিতে 'মিথ্যাকরণে'র সম্ভাবনাকেও স্থান দেয়া হয় না।

উপরের আলোচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির (Scientific Method) আভাস উল্লেখ করা হয়েছে। 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' বলতে কি বোঝায় তার কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হল পর্যবেক্ষণের এক সুসংহত ব্যাখ্যা বের করা এবং এর দ্বারা প্রকৃতির কোনো সূত্র-বিধির উদ্ঘাটন করা। নিচে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বর্ণনা দেয়া হল, ক্রমিক অনুযায়ী :—

১। প্রথমে আসে পর্যবেক্ষণ বা অবেক্ষণ (Observation)
২। পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে এবং প্রতিসাম্য, সরলতা (Symmetry/Simplicity) প্রভৃতির ধারণা ও বিবেচনাকে বিধৃত করে কিছু সম্ভাব্য প্রকল্প (Hypothesis) প্রস্তাব করা।
৩। যুক্তি ও অদ্যাপিলব্ধ প্রজ্ঞা ও প্রমাণকে (Logic & Evidence) কাজে লাগিয়ে প্রকল্পকে একটা তত্ত্বে (Theory) উন্নীত করা।
৪। তত্ত্বের ভিত্তিতে কিছু ভবিষ্যৎবাণী করা (মানুষের ভাগ্য নয়, পর্যবেক্ষণের)।
৫। প্রকৃতি বা পরীক্ষাগারে লব্ধ পর্যবেক্ষণের দ্বারা ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা/ ভ্রান্ততা যাচাই করা।
৬। যদি ৫ নং ধাপে ভবিষ্য□বাণী ভ্রান্ত বলে প্রমাণ হয় তাহলে ২ নং ধাপে ফিরে গিয়ে বিকল্প কোনো প্রকল্প প্রস্তাব করে আবার ৩নং ধাপ থেকে শুরু করা এবং যতক্ষণ না ৫ নং ধাপে ভবিষ্য□বাণীর সত্যতা যাচাই না হয় এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করা।
৭। ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা অনেকবার যাচাই হলে তত্ত্বটিকে বৈজ্ঞানিক সূত্র বা বিধির (Scientific Law) পর্যায়ে উন্নীত করা।

এটা উল্লেখ্য যে বৈজ্ঞানিক সূত্রে উন্নীত হওয়ার পরেও যদি কখনো কোনো পর্যবেক্ষণ সূত্রের ভবিষ্যৎবাণীর বিরুদ্ধে যায় তাহলে সেই সূত্রকে পরিত্যাগ করে পুনরায় উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি নেয়া হয়। অনেক সময় নতুন কোন পর্যবেক্ষণকে ব্যাখ্যা করার জন্য সূত্রটিকে পরিত্যাগ না করে পরিবর্ধন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যার ফলে পূর্বের ও নতুন পর্যবেক্ষণ উভয়কেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এক্ষেত্রে সূত্রটির পূর্বের রূপকে ভুল বলা ঠিক হবে না, বরং তা এক সীমিত পর্যবেক্ষণ সমষ্টির মধ্যে প্রযোজ্য বলে ধরে নেয়া হবে। যেমন—আপেক্ষিকতার বিশেষ ও সাধারণ তত্ত্ব। 'আপেক্ষিকতার সাধারণতত্ত্ব' আবিষ্কারের জন্য আপেক্ষিকতার বিশেষতত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়নি, বরং তার কার্যক্ষেত্রের সীমা নির্ধারিত হয় মাত্র। এখন আসি বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু ভ্রান্তিমূলক উক্তি ও ধারণায় :

১। অনেক ধর্মবাদীরা কোন কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের মধ্যেই মতান্তরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে এই যুক্তি দেন যে, বিজ্ঞানীদের মধ্যেই যেখানে এত ভিন্নমত, সেখানে বিজ্ঞানের সত্যের দাবির কী বিশ্বাসযোগ্যতা আছে? তারা ধর্মীয় সত্যের দাবির ব্যাপারে ধর্মানুসারে 'ঐক্যমত'-এর কথা উল্লেখ করে ধর্মের সত্যের যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা করেন।

ধর্মবাদীদের উপরোক্ত যুক্তির দুটো ত্রুটি ধরা পড়ে। প্রথমত, ধর্মীয় সত্যের দাবির ব্যাপারে ধর্মানুসারে একমতের কারণ হল এই যে, ধর্মবিশ্বাসের মূল পূর্বশর্তই হল ধর্মের সত্যের দাবিকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করা এবং তার প্রতি ক্রমাগত অন্ধ-আনুগত্য প্রদর্শন করে যাওয়া। বস্তুনির্ভর বিচার বিশ্লেষণের কোনো স্থান নেই ধর্মবিশ্বাসে। যারা এই পূর্বশর্ত স্বাভাবিকভাবেই নেন, শুধু তারাই তো ধর্মানুসারী। কাজেই ধর্মের ব্যাপারে ধর্মানুসারীদের 'ঐক্যমত' দিয়ে ধর্মের যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা ভিত্তিহীন এবং ত্রুটিপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, কোনো বিশেষ তত্ত্বের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীমহলে মতান্তর থাকলে তাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রাপ্ত সত্যের ভুল বা যথার্থতার অভাব প্রমাণিত হয় না। কারণ বৈজ্ঞানিক মতান্তর সেই তত্ত্বের ক্ষেত্রেই ঘটে যেখানে এখনো পর্যন্ত পর্যবেক্ষণের অভাবে বা প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি সঠিক, সেটা সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পর্যবেক্ষণের দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হবার পরেই কেবল তা বৈজ্ঞানিক সত্যের মর্যাদা পায়। তত্ত্ব থেকে সত্যে উত্তীর্ণ হওয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরই এক অঙ্গ বা রেওয়াজ। বৈজ্ঞানিক মতান্তর বৈজ্ঞানিক সত্য আহরণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অনেক তত্ত্ব থাকলেই পর্যবেক্ষণের বাছাই-ক্রিয়ার মাধ্যমে সঠিক তত্ত্বটি, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সত্যটি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এটা বিজ্ঞানের শক্তি, দুর্বলতা নয়। তবে এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ভুল হলেও তা যুক্তিহীন, বিশ্বাসভিত্তিক নয়, ভুলের কারণ সাধারণতঃ কোনো ভ্রান্ত অনুমান, প্রকল্প বা উপাত্ত বা আরো সঠিক অর্থে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ২ নং ধাপে মতান্তরের জন্য (যে কারণেই হোক); ভুলই হোক বা সত্যই হোক, কোনো তত্ত্বে যুক্তিহীনতা থাকলে বা তা শুধু বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই প্রস্তাবিত হলে সেটি তত্ত্ব বলে গৃহীত বা গণ্যই হবে না।

২। ধর্মবাদীদের দ্বিতীয় এক ভ্রান্তিপূর্ণ উক্তি হল–বিজ্ঞানের সীমা আছে, সব কিছুর উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারে না। কোনো কোনো প্রশ্নের উত্তর ধর্মেই খুঁজতে হবে। এই উক্তির ত্রুটি হল বিশ্বাসকে জ্ঞান বা জানার (ঈড়মহরঃরড়হ) সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। 'বিশ্বাস' এক ব্যক্তিনির্ভর অনুভূতি, সেটাকে ব্যক্তিগতভাবে কেউ তার মনের কোনো প্রশ্নের উত্তর বা সত্যকে জানা বলতেই পারেন। কিন্তু সেই অনুভূতিভিত্তিক ব্যক্তিগত সত্যের উপলব্ধিকে কেউ যদি সত্য বলে বাহিরে প্রচার ও যাহির করতে চেষ্টা করেন, তখন অন্যকে তা সত্য বলে মেনে নিতে হলে সত্য যাচাইয়ের সব মাপকাঠিকে প্রয়োগ করতে হবে; এবং সেটা যদি বৈজ্ঞানিক সত্যের মতো সত্য যাচাইয়ের মাপকাঠির ধোপে না ঠেকে তাহলে সেটাকে সবার জন্য সত্য বলে মেনে নেয়ার কোনো যুক্তিকতা থাকে না, উপরন্তু যেহেতু দাবিদার ঐ সত্যটিকে নিজের ব্যক্তিগত গণ্ডির বাইরে এনে তাকে 'সত্য' বলে সবার সামনে পেশ করেছেন, সেহেতু দাবিকে যুক্তি-প্রমাণের আওতায় আনা এবং তা মাপকাঠিতে না টিকলে সেই দাবিকে যুক্তিহীন বলে দাবি করাটা মোটেই অযৌক্তিক হবে না। এটা বলাই বাহুল্য যে আজ

পর্যন্ত ধর্ম এমন কোনো সত্য দিতে পারেনি, যা কিনা যুক্তি প্রমাণের মাপকাঠিতে টিকতে পারে এবং যা বিজ্ঞানের দ্বারা আগেই জানা যায় নি।

৩। আরেক ভ্রান্ত উক্তি হল:—"বিজ্ঞান দাম্ভিকতাপূর্ণ, বিজ্ঞানীরা সবজান্তার ভান করেন..." ইত্যাদি। আসলে সত্য কিন্তু উল্টোটাই। বৈজ্ঞানিকেরাই সর্বদা ভুলের সম্ভাবনার জন্য সদাজাগ্রত থাকেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যেই বিনয় নিহিত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংশোধন বা পরিবর্ধনের স্থান সর্বদাই রাখা হয়। বড় বড় অনেক বৈজ্ঞানিকই অনেক ভুল করেছেন এবং প্রফুল্ল চিত্তে তা স্বীকারও করেছেন। যেমন, আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত সাধারণ মহাকর্ষ সমীকরণে একটি পদ অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন যা পরবর্তীতে তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল বলে উল্লেখ করেছিলেন। নোবেল বিজয়ী রসায়নবিদ লিনাস পলিঙ্গও ডি.এন.এ অণুর গঠনে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন, যা নোবেল বিজয়ী ওয়াটসন এবং ক্রিক সঠিকভাবে দিয়েছিলেন প্রায় একই সময়ে। বিজ্ঞানীরা নিজেকে অভ্রান্ত মনে করেন না এবং বৈজ্ঞানিক সত্যকেও বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীরা কখনোই পরম সত্যের মর্যাদা দেয় না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বৈজ্ঞানিক সত্যের চেয়ে অন্য কোনো সত্যের দাবি সমান বা বেশি বিশ্বাসযোগ্য। একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমেই ধাপে ধাপে প্রকৃত সত্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। সত্যকে জানার জন্য এরচেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য কোনো পথ বা সাধনী মানুষ প্রজাতির জানা নেই।

অপার্থিব : মুক্তমনার ফোরামের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অপার্থিব এর সাথে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা হিসেবে ও লেখক হিসেবে। পুরো নাম অপার্থিব জামান, তবে অপার্থিব নামেই লিখে থাকেন। বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য, যুক্তিবাদ অধিবিদ্যা তাঁর প্রিয় বিষয়। পদার্থবিদ্যার এই স্নাতক বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত। ইমেইল : aparthib@yahoo.com

ইসলামী বিজ্ঞানের পৌরাণিক কাহিনী

খান মুহাম্মদ

কুরআন বলে, পৃথিবী সমতল

প্রথম দিকে আমার বই পড়ার অভ্যাস খুব একটা ছিল না। ক্লাস এইটে হঠাৎ খুব ধার্মিক হয়ে গেলাম। আমার বই পড়াও তখন থেকে শুরু হল। বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের বই পড়া শুরু হয় তিন গোয়েন্দা বা সেবার অনুবাদ দিয়ে। আমাদের বাসায় ধর্মীয় বইয়ের জোয়ার ছিল বলেই বোধহয় আমার ক্ষেত্রে সেরকম হয়নি। যে কারণেই হোক, স্বীকার করছি, ইসলামের প্রতি আগ্রহ থেকেই আমার বইয়ের প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। একসময় সবচেয়ে বেশী মজা পেতাম তথাকথিত ইসলামী বিজ্ঞানের বইগুলো পড়ে। সেখানে কুরআন-হাদিসের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের আশ্চর্য সব সাদৃশ্যের ব্যাখ্যা দেয়া থাকতো। সাথে এটাও খেয়াল করতাম, অধিকাংশ ধার্মিকই বইগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ে না। কেবল জানে যে, এই নামে একটা বই আছে। এটাও মেনে নেয়, কুরআন সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। তারা মনে করে, ঐ বইগুলোতে কুরআনের বিজ্ঞানময়তার সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া আছে; যদিও ব্যাখ্যাটা সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই।

কিন্তু আমার খটকা লাগতে শুরু করলো। বুঝতে পারলাম, অধিকাংশ ব্যাখ্যাই একেবারে মনগড়া। তিলকে তাল বানানো। তবে সেটা আমার বিশ্বাসকে টলাতে পারল না। অন্তত কয়েকটি আয়াতের ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু, এর কারণ এখন বুঝি। কারণ, তখন সংশয় কি জিনিস তা জানতামই না, আর বিজ্ঞান কি জিনিস তা বুঝতামই না। আসলে মহা বিস্ফোরণ আর মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের বিষয়গুলো আমি ধর্মীয় বইয়েই প্রথম পড়েছিলাম। সেখান থেকেই আগ্রহের সূচনা। পরবর্তীতে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের বই থেকে এগুলো পড়তে লাগলাম। তখনই খটকাটা দৃঢ় হতে শুরু করলো। প্রকৃত বিজ্ঞানীদের এতো সূক্ষ্ম ও কষ্টসাধ্য আবিষ্কারগুলোর কত হাস্যকর ব্যাখ্যাই না অলৌকিকতার বিজ্ঞানীরা (তথাকথিত "ইসলামী বিজ্ঞানী"রা) বের করেছে। তখন মনকে প্রবোধ দিলাম এই বলে, কুরআন তো আর বিজ্ঞান গ্রন্থ না, কুরআন হল জীবন কিভাবে চালাতে হবে তারই নির্দেশনামূলক গ্রন্থ।

ভার্সিটিতে আসার পর ইন্টারনেটের সাথে পরিচয় হল। এখন আর বই লাগে না। ইন্টারনেটে লেখার অভাব নেই। কুরআনের জীবনাদর্শের অসারতাও এবার পরিষ্কার হতে শুরু করল। এক্ষেত্রে আমার পারিবারিক জীবনেরও প্রভাব ছিল। আমাদের বাসার পরিবেশকে গোঁড়া ইসলামী পরিবেশ বলা যায়। আমার ছোট বোনকে ক্লাস এইট থেকে বোরকা পরার জন্য চাপাচাপি করতে লাগলেন আমার বাবা-মা। বোরকা পরাতে তাদের খুব কষ্ট করতে হয়নি। একসময় যখন নেকাব পরানোর জন্য আব্বু-আম্মু উঠেপড়ে লাগল তখন আর সহ্য করতে পারলাম না। আমি স্পষ্ট করে বললাম, আমি নেকাবের সম্পূর্ণ বিপক্ষে। কেউ স্বেচ্ছায় পরলে পড়ুক, কিন্তু কোন চাপাচাপি করা যাবে না। এভাবেই ইসলামী জীবনাদর্শ ধীরে ধীরে ত্যাগ করতে শুরু করলাম।

এখন আমি স্বাধীন। তাই স্বাধীন মনে লিখতে বসেছি। আবার সেই কুরআন হাতে নিয়েছি, তবে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। আগে অজু করে নিতাম, এখন অজু ছাড়াই কুরআন হাতে নিয়েছি। আগে অন্ধ একটা বিশ্বাস সবকিছুকে দমিয়ে রাখত। কুরআনকেই শাশ্বত সত্য মনে করতাম, বিজ্ঞানের সাথে না মিললে মনে করতাম, ভবিষ্যতে সব ঠিক

হয়ে যাবে। এখন আর তা মনে করি না। আসলেই দেখতে চাই, কুরআন আল্লাহ্ প্রদত্ত নাকি সপ্তম শতকের মানব রচিত কোন সাধারণ গ্রন্থ।

আমি এই ইসলামী বিজ্ঞানের সবকিছু নিয়ে স্বাধীনভাবে লিখতে চাই। অভিজিৎ রায় তার "Does the Qur'an Have any scientific Miracles?"[১] প্রবন্ধে যে দশটি বিষয় নিয়ে লিখেছেন সেখান থেকেই একটি বেছে নিলাম। আমার লেখার উদ্দেশ্য সবাইকে বোঝানো যে, কুরআনে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়নি। কুরআনে অবৈজ্ঞানিক অনেক কিছুই আছে। সে সময়ে সাহিত্য হিসেবে তা যে মর্যাদাই পাক না কেন, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে কুরআনের কোন মূল্য নেই। কেউ অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে চাইলে করুক; কিন্তু কেউ যেন কখনও কুরআনের পক্ষে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে পার পেয়ে না যায়। আমরা চাই বিজ্ঞানমনস্ক উদার সমাজ গঠন করতে। লেখাগুলো সেই সমাজ নির্মাণের জন্যই।

এর জন্য প্রথমেই পৃথিবীর আকৃতি নিয়ে কুরআনে কি কি আয়াত আছে এবং সেগুলোতে কি বলা হয়েছে তা দেখে নেয়া প্রয়োজন। মুনিম সালিহ্'র "The Myth of Scientific Miracles in The Quran: A Logical Analysis"[২] প্রবন্ধে পৃথিবীর আকৃতি নিয়ে কুরআনের আয়াতগুলোর তালিকা পেয়েছি। অভিজিৎ রায়ের উপরে উল্লেখিত প্রবন্ধেও দুটি আয়াত পেয়েছি। দুটি আয়াত পেয়েছি জাকির নায়েকের বক্তৃতায়। সেগুলোই প্রথমে তুলে দিচ্ছি। মা'আরেফুল কুরআনের অনুবাদে আয়াতগুলো এরকম:

> **[২: ২২]** যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা (ফিরাশা) এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসেবে। অতএব, আল্লাহ্‌র সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুতঃ এসব তোমরা জান।
>
> **[১৩: ৩]** তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত (মাদ্দা) করেছেন এবং তাতে পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দু'দ প্রকার সৃষ্টি করে রেখেছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন। এতে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা করে।
>
> **[১৫: ১৯]** আমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত (মাদাদনা) করেছি এবং তার উপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি।
>
> **[১৮: ৪৭]** যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালনা করব এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর এবং মানুষকে একত্রিত করব অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না।
>
> **[১৮: ৮৬]** অবশেষে তিনি যখন সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছলেন; তখন তিনি সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখলেন। আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন।

[১৮: ৯০] অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌঁছলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্যে সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি।

[২০: ৫৩] তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে শয্যা (মাহ্দা) করেছেন এবং তাতে চলার পথ করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি।

[৩১: ২৯] তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন? তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত ভ্রমণ করে। তুমি কি আরও দেখ না যে, তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন?

[৩৯: ৫] তিনি আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে নিযুক্ত করেছেন প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

[৪৩: ১০] যিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন বিছানা (মাহ্দা) এবং তাতে তোমাদের জন্যে করেছেন পথ, যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পার।

[৫০: ৬-৭] তারা কি তাদের উপরস্থিত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি? তাতে কোন ছিদ্রও (ফুরুজ) নেই। আমি ভূমিকে বিস্তৃত (মাদাদনাহা) করেছি, তাতে পর্বতমালার ভার স্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ উদ্গত করেছি।

[৫১: ৪৮] আমরা ভূমিকে বিছিয়েছি (ফারাশনা)। এবং আমরা কতই না উত্তম সমতল রচনাকারী (আল-মাহিদুন)।

[৭১: ১৯] আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিছানা (বিসাতা)।

[৭৮: ৬] আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা (মিহাদা)।

[৭৯: ২৭-৩০] তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন? তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্যালোক প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীকে এর পর বিস্তৃত (দাহাহা) করেছেন। (ওয়াল আরদা বা'দা যালিকা দাহাহা)

[৮৮: ২০] এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল বিছানো (সুতিহাত) হয়েছে?

[৯১: ৫-৬] শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তাঁর। শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত (তাহাহা) করেছেন, তাঁর।

সাধারণ কাউকে এই আয়াতগুলো পড়তে দিলে তার বুঝতে কোন অসুবিধাই হবে না যে, কুরআনে পৃথিবীকে সমতল বলা হয়েছে। সমতলভাবে বিস্তৃত পৃথিবীর কথা বোঝানোর জন্য যত রকমের শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে তার প্রায় সবই কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দগুলো হচ্ছে ফিরাশা, মাদ্দা, মাদাদনা, মাহ্দা, মাদাদনাহা, ফারাশনা, আল-মাহিদুন, বিসাতা, মিহাদা, দাহাহা, সুতিহাত এবং তাহাহা। শব্দ অবশ্য এতোগুলো না। একই শব্দ বিভিন্ন পদে ব্যবহৃত হয়েছে। আমি হুবহুই লিখলাম। আল-মাহিদুন দিয়ে তো একেবারে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ আত্মপ্রশংসা করে বলছেন, আমরা কতই না উত্তম সমতল রচনাকারী। "শব্দার্থে আল-কুরআনুল মাজীদ" বইয়ে হুবহু এই অনুবাদই পেয়েছি।

কুরআনের সবচেয়ে বড় ত্রুটি ধরা পড়ে যুলকারনাইনের বিশ্ব ভ্রমণের বর্ণনাতে। এ ধরণের বিশ্ব ভ্রমণ আমরা পৌরাণিক কাহিনীতেও পাই। যুলকারনাইন সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছেছেন, অর্থাৎ সূর্য যেখানে অস্ত যায় সেখানে গিয়েছেন। সেখানে বসবাসকারী জাতিও দেখেছেন। আবার সূর্য যেখানে উদিত হয়ে সেখানেও গিয়েছেন। সেখানেও এক সম্প্রদায় বাস করতো। সূর্য তাদের খুব কাছে, আল্লাহ সূর্য থেকে তাদের রক্ষার জন্য কোন আড়ালও তৈরী করেননি। এখানে পৃথিবীকেন্দ্রিক খুব সংকীর্ণ এক বিশ্বের ধরণা ফুটে উঠেছে। সেই পৃথিবীও আবার সমতল। এই তলের এক পাশ থেকে সূর্য উদিত হয় এবং অন্য পাশে অস্ত যায়। সে হিসেবে পৃথিবীর প্রান্তও আছে। কারণ যুলকারনাইন উদয় এবং অস্তাচলের পর আর এগোননি। সেখানেই যেন পৃথিবীর শেষ।

কুরআনে এ ধরণের ব্যাখ্যা থাকাই স্বাভাবিক

কুরআনে এ ধরণের ব্যাখ্যা পেয়ে আমি মোটেই অবাক হয়নি। কারণ, কুরআন লেখা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর আগে সেই সপ্তম শতকে। তখন আরবে পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত ছিল কুরআনে তো তা-ই থাকবে। যেকোন সময়ের রচনা তো সে সময়ের চিন্তাধারারই প্রতিফলন।

মধ্যযুগে, পৃথিবী সমতল এরকম একটি ধারণা ছড়িয়ে পড়েছিল। এর মূল কারণ গ্রিক দর্শন এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অবনতি এবং খ্রিস্টান ধর্মের জাগরণ। খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকেই পিথাগোরাস বলেছিলেন, সকল জ্যোতিষ্ক গোলাকার। সে হিসেবে পৃথিবীও গোলাকার। তবে এরিস্টটল বলেছেন, লুসিপাস ও ডিমোক্রিটাসের মত প্রাক-সক্রেটীয় দার্শনিকরা সমতল পৃথিবীতে বিশ্বাস করতেন। ৩৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দেই এরিস্টটল গোলাকার পৃথিবীর পক্ষে পর্যবেক্ষণমূলক প্রমাণ দেন। তখন থেকে গ্রিক সভ্যতায় গোলাকার পৃথিবীর ধারণাই প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাবে এই ধারণা টিকতে পারেনি। লক্ষ্যণীয় যে, এই খ্রিস্ট ধর্মই এরিস্টটলের পৃথিবীকেন্দ্রিক ভুল মতবাদ প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য বিজ্ঞানীদের পুড়িয়ে মেরেছিল।

এরপরের যুগটা ছিল অন্ধকারের। ইসলামী ইতিহাসেও ইসলামের আবির্ভাবের আগের সময়টাকে “আইয়াম-ই-জাহিলিয়াত” বলা হয়। তখন আরবের সবাই মনে করতো, পৃথিবী সমতল। মুহাম্মাদ ইসলাম প্রচার শুরু করার পূর্বে আরব সমাজ নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছেন এবং সফরগুলোর মাধ্যমে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। এই সাধারণ বিষয়গুলো তিনি ভালভাবেই জানতেন।

ইসলামকে কেন্দ্র করে আরব সংঘটিত হয়। এর মাধ্যমে সেখানে একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক বিপ্লব ঘটে। ইসলাম হয়ত তাদেরকে সংঘটিত করেছে, কিন্তু জ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি কুরআনকে কেন্দ্র করে হয়নি। হয়েছে প্রাচীন

গ্রিক দর্শন ও বিজ্ঞান অধ্যয়নের মাধ্যমে। মধ্যযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের কেউই তথাকথিত ইসলামী বিজ্ঞানী ছিলেন না। তারা ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞান আলাদাভাবে অধ্যয়ন করেছেন। পৃথিবীর আকৃতি নিয়েই একটি উদাহরণ দেয়া যায়। গ্রিক দর্শন আরবিতে অনুবাদ করতে গিয়ে তারা জানতে পারেন যে, পৃথিবী গোলাকার। ৮৩০ সালে খালিফা আল-মামুন এক দল জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে বর্তমান সিরিয়ার দুটি শহরের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাপের কাজে নিযুক্ত করেন। তারা শহর দুটির দূরত্ব ও অক্ষাংশের পার্থক্য পরিমাপ করে পৃথিবীর পরিধি নিণয় করেন। পরিধির এই মান প্রায় নিখুঁত ছিল। কুরআনে পৃথিবীকে সমতল বলা হয়েছে না গোলাকার বলা হয়েছে এ নিয়ে সেই বিজ্ঞানীরা চিন্তাই করেননি। চিন্তা করলে নিশ্চয়ই কিছু বলে যেতেন।

কুরআনে পৃথিবীর আকৃতি নিয়ে প্রথম কথা বলেন ইবন তাইমিয়াহ্ যিনি বিজ্ঞানী ছিলেন না। তিনি "মাজমুল ফাতওয়া" গ্রন্থে বলেছিলেন, পৃথিবী গোলাকার এটা কুরআনে বলে দেয়া আছে। ইবন আব্বাসের হাদিসের সূত্র দিয়ে এই আয়াতের যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন, বর্তমানের ইসলামী বিজ্ঞানীরা সেটাকেই ফলাও করে প্রচার করেন। এই অসার ব্যাখ্যার কথা একটু পরে বলছি। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, কোন মুসলিম বিজ্ঞানী কুরআনের সাথে বিজ্ঞানকে মেশানোর চেষ্টা করেননি। কেবল ধর্মতত্ত্ববিদেরাই সে চেষ্টা করেছেন।[৩]

ইসলামী বিজ্ঞানীদের ঘোলাটে ব্যাখ্যা আর আমাদের পরিষ্কার ব্যাখ্যা

ইসলামী বিজ্ঞানীরা আবিষ্কারে খুব একটা পারদর্শী না হলেও উদ্ভাবনের বেলায় অতুলনীয়। কুরআনের খুব সাধারণ কোন আয়াত থেকে তারা অনেক কিছু **উদ্ভাবন** করেন। তাদের ব্যাখ্যা মোটেই বৈজ্ঞানিক না। কিন্তু ধর্মতত্ত্বে এ ধরণের ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। আমি যতদূর দেখেছি, ধর্মতত্ত্ব এমন একটা বিষয় যেখানে একই বিষয়র অনেক রকম ব্যাখ্যা দেয়া যায় এবং সবগুলোই খুব আধ্যাত্মিক (যৌক্তিক বলা যাবে না) মনে হয়। কুরআনের তাফসিরগুলো দেখলেই বোঝা যায়। ইসলামের মধ্যে এতো দল তৈরী হওয়ার অন্যতম কারণ একই বিষয়ের হরেক রকম ব্যাখ্যা। সবাই নিজের ব্যাখ্যাকে সঠিক মনে করে। কুরআনের আয়াতগুলো সুন্দর কিন্তু ভোঁতা। অনেক ফাঁক আছে। কিন্তু বিজ্ঞান এমন না। বিজ্ঞানের কিছু বিষয়েও মতভেদ আছে, কিন্তু মতভেদগুলো প্রমাণ করে, সে বিষয়ের সবকিছু এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পূর্ণতা পেলে তাতে কারও সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

ইসলামী বিজ্ঞানীরা কুরআনের মধ্যে বিজ্ঞান খোঁজেন। খুঁজে পেলে বলেন, কুরআন এক অলৌকিক গ্রন্থ। কুরআনে বিজ্ঞান আছে বলে তা অলৌকিক, অথচ বিজ্ঞানে আবার অলৌকিক বলে কিছু নেই। যাহোক এসব বিচারে তাদেরকে অলৌকিকের বিজ্ঞানীও বলতে ইচ্ছে হয়। কুরআনের তাফসিরকারীদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও তাদের ধর্মকথাগুলো বেশ ধারালো হয়। কিন্তু অলৌকিকের বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা অতিরিক্ত ভোঁতা যা পড়লে মাঝেমাঝে হাসি পায়। তাদের অপবিজ্ঞান চর্চা নিয়ে বিজ্ঞানীদের চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য চিন্তা করতে হচ্ছে। কুরআন ও বিজ্ঞানের সুসম্পর্ক দেখিয়ে গাদি গাদি বই বেরোচ্ছে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বিজ্ঞান সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানে না। তারা এগুলো পড়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে। এজন্যই তাদের ব্যাখ্যাগুলো খতিয়ে দেখার প্রয়োজন পড়ছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের "গবেষণা বিভাগ" থেকে "Scientific Indications in Holy Quran" নামে ৬৬৯ পৃষ্ঠার একটি বই বেরিয়েছে। এই বিভাগে এম আকবর আলী ও সাউথ-ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এম শমসের আলীর মত ব্যক্তি আছেন। তারা বিস্তৃতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে:

এ সকল আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল। অথচ ধারণাটি পৃথিবী গোলাকার-এ বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়। নিম্নোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এই আপাত বৈপরীত্যের মীমাংসা করা সম্ভব।

আমরা জানি একটি ক্ষেত্র যত বড় হবে তার তলের বক্রতা তত কম হবে। পৃথিবী একটি বিশাল ক্ষেত্র যার ব্যাস প্রায় ৬, ৪০০ কিলোমিটার। আর আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পৃথিবীপৃষ্ঠের খুব সামান্য একটা অংশ নিয়েই কাজ-কর্ম করে থাকি। এই অংশটুকুকে সকল ব্যবহারিক কাজে সমতল ধরে নেয়া যেতে পারে। এই স্বল্প অংশের বক্রতার পরিমাণ উপলব্ধি করার মত নয়। এমনকি, পৃথিবীপৃষ্ঠের এক মাইলের মত ঋদূরত্বও পৃথিবীর কেন্দ্রে এক ডিগ্রির ৭০ ভাগের এক ভাগের মত অতি সামান্য কোণ সৃষ্টি করে। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, এই ক্ষেত্রের তলকে সমতল বলা হয় যার ব্যাসার্ধ্য সীমাহীন, অনন্ত।

এটা আমার জীবনে পড়া সবচেয়ে ফালতু ব্যাখ্যাগুলোর একটি। কুরআনের আয়াতগুলো পড়লেই বোঝা যায়, সমতল পৃথিবীর কথা বলা হচ্ছে। এখানে আমরা এমন এক আল্লাহ্‌র সন্ধান পাই যার জ্ঞান এরিস্টটলের চেয়েও কম। যুলকারনাইনের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা পড়লে তা আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। সেজন্যই কি শমসের আলীরা ১৮ নং সূরার ৮৬ ও ৯০ নম্বর আয়াত দুটি এড়িয়ে গেলেন? পুরো বইয়ে এ আয়াত দুটির কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু ৯৩ ও ৯৪ নং আয়াত দুটি আছে। কারণ সেখানে ভুলের পরিমাণ কম। এক্ষেত্রে শমসের আলীরা রক্ষণাত্মক ভূমিকা নিয়েছেন, বিজ্ঞানকে আক্রমণ করেননি।

এবারে অন্য কথায় আসি। শমসের আলীরা বললেন, কুরআনে সত্যিই পৃথিবীকে সমতল বলা হয়েছে। কিন্তু জাকির নায়েক আবার অন্য কথা বলে বসলেন, তিনি উল্টো আক্রমণ করলেন। কারণ, attack is the best defense. অলৌকিকের বিজ্ঞানীরা যখন শমসের আলীদের (এটা অবশ্য তাদের মৌলিক না) ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে পারছিলেন না তখন, অতি জটিল আরবি ভাষার পুরাণ ঘেঁটে "দাহাহা" শব্দের নতুন অর্থ বের করা হল। কুরআনে অন্য সব শব্দের মতই দাহাহা শব্দটি "বিস্তৃত" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু তারা বললেন, দাহাহা শব্দের একটি মূল "দুহিয়া"। দুহিয়া অর্থ উট পাখির ডিম। তার মানে কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ পৃথিবীকে উট পাখির ডিমের মত বিস্তৃত করেছেন। এই সেদিন উদ্ভাবিত হল এটা। এ বিষয়ে জাকির নায়েকের ব্যাখ্যাটা এরকম:[৪]

কুরআনের যত স্থানে "বিস্তৃতি" বা "বিছানা" বা এ ধরণের সমার্থক শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোকে জাকির নায়েক পরে বলেছেন। আগে বলেছেন [৩১: ২৯] ও [৩৯: ৫] আয়াত দুটির কথা। তার ভাষায়:

রাত্রি দিবসে অন্তর্ভুক্ত হয়, আর দিবস রাত্রিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে অন্তর্ভুক্ত হওয়া অর্থ হল রাত্রি ধীরে ধীরে এবং ধারাবাহিকভাবে দিনে পরিবর্তিত হয় এবং ঠিক তার বিপরীতভাবে দিনও। পৃথিবী গোলাকার বলেই এ ধরণের ঘটনা সংঘটিত হতে পারে। পৃথিবী যদি সমত হতো, তাহলে রাত্রি থেকে দিনে এবং দিন থেকে রাত্রিতে হঠাৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতো।

জাকির নায়েক [৩৯: ৫] আয়াতের "ইউকাব্বিরু" শব্দের উল্লেখ করেছেন যার অর্থ আবৃত করা বা কুণ্ডলী করা বা গোলাকার কিছু জড়ানো। গোলাকার শব্দটি অবশ্য তার উদ্ভাবন।

এই ব্যাখ্যাও শমসের আলীদের সমতল পৃথিবী ব্যাখ্যার মত অসার। একটা প্রশ্নের মাধ্যমেই তা বোঝা যায়। ধরুন, আমি পৃথিবী সমতল না গোলাকার তার কিছু জানি না। এখন আমাকে কেউ প্রশ্ন করল, দিনের সব আলো নিভে গিয়ে কি হঠাৎ করেই রাত চলে আসে? আমি বলব, না তো। ধীরে ধীরে দিন রাতে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ দিনের আলো ধীরে ধীরে নিভে যায় এবং রাত ধীরে ধীরে নেমে আসে। এর মানে কি আমি বললাম, পৃথিবী গোলাকার? মোটেই না, আমি যা দেখি তাই বললাম। ঐ যুগের কোন কাফিরকে প্রশ্ন করলেও সে একই উত্তর দিত। কুরআনে অভিনব কিছু লেখা হয়নি।

তবে জাকির নায়েক এখানেই থেমে থাকেননি। এরপর তিনি বললেন [৭৯: ৩০] আয়াতটির কথা। তিনি দাবী করলেন, ইতোমধ্যে কুরআনে বলা হয়েছে যে, পৃথিবী গোলাকার। এরপর এই আয়াতে নাকি বলা হয়েছে, তা ডিমের মত দুই পাশে চাপা। এতোদিন পর্যন্ত সকল তাফসিরেই "দাহাহা" শব্দের অর্থ করা হয়েছে বিস্তৃত। কিন্তু এখন বলা হল, দাহাহার আরেক অর্থ নাকি উট পাখির ডিমের মত বিস্তৃত। এটা সত্যি হলেও কিছু প্রমাণ হয় না। কারণ দাহাহা ছাড়াও সমতল বা বিস্তৃতির অনেকগুলো প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা আমি উপরে উল্লেখ করেছি। তার যেকোন একটি সত্য হলেই হয়। কারণ, আল্লাহ্ একটি ভুলও করতে পারেন না। সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায়, কুরআনে সে সময়ের ধ্যান-ধারণা বলা হচ্ছে। তারপরও জাকির নায়েককে প্রশ্ন করা হল। তিনি চারটি পয়েন্টের মাধ্যমে বিস্তারিত উত্তর দিলেন:

১. পৃথিবীকে বিছানোর (কার্পেটের মত) কথা বলা হয়েছে। তার মানে পৃথিবীর কেন্দ্রভাগের চারদিকে ভূ-ত্বক বিছানো হয়েছে। কার্পেট তো গোলাকার জিনিসের উপরও বিছানো যেতে পারে।

> কথা হচ্ছে, কুরআনে ভূ-ত্বকের কোন কথাই নেই। সব স্থানে বলা হয়েছে গোটা পৃথিবীটাই বিছানা। বিছানা গোলাকার হয় তা অবশ্য আমি জানতাম না। নেক্কারজনকভাবে একের পর একেক মিথ্যা আরোপ করছেন তিনি।

২. ঐ কথাই। কার্পেট গোলাকার বস্তুর চারপাশেও বিছানো যেতে পারে।

> আসলে কার্পেট গোলাকার বস্তুর চারদিকে বিছানো যায় না। কার্পেট দিয়ে গোলাকার বস্তু মোড়ানো যায়। কুরআনের কি মারাত্মক শাব্দিক ভুল! অবশ্য সাহিত্য আর বিজ্ঞানকে মিশিয়ে ফেললে ঠিক আছে!

৩. অনেক স্থানে পৃথিবী বিস্তৃত করার কথা বলা হয়েছে। এর মানে পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

> বিস্তৃতিকে বানিয়েছেন সম্প্রসারণ। জাকির নায়েক বলছেন, সরাসরি সমতল তো আর বলা হয়নি। আমি জানি কেন বলা হয়নি। "পৃথিবী সমতল" এটা বৈজ্ঞানিক স্বীকার্যের মত। বিজ্ঞানীরা কোন কিছু প্রমাণ করলে সরাসরি বলে দেন। তারা যদি বের করতেন পৃথিবী সমতল তাহলে সরাসরি বলে দিতেন, পৃথিবী

সমতল। কুরআন কেন বিজ্ঞানের মত স্বীকার্য উল্লেখ করবে? তখন সবাই জানত, পৃথিবী সমতল। এটা বলার কোন প্রয়োজন পড়ে না। কুরআনে কেবল পৃথিবীর বিশালত্ব আর বিস্তৃতির বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশ করা হয়েছে। তাই বলি, "কুরআন বলেনি যে পৃথিবী সমতল, কিন্তু কুরআন একটি সমতল পৃথিবীর আকর্ষণীয় বর্ণনা দিয়েছে।"

৪. [৭৯: ৩০] আয়াতের মাধ্যমে নাকি সরাসরি বলে দেয়া হয়েছে, পৃথিবীকে আল্লাহ্ উটপাখির ডিমের মত করে তৈরী করেছেন। জাকির নায়েক এই আয়াতের অনুবাদ করেছেন:

"আমরা পৃথিবীকে উটপাখির ডিমের মত করে তৈরী করেছি"

"দাহাহা" সমাচার

জাকির নায়েকের অনুবাদ তো আমরা দেখলাম। এবার অন্যান্যদের অনুবাদগুলো দেখি:

মা'আরিফুল কুরআন - পৃথিবীকে এর পর বিস্তৃত (দাহাহা) করেছেন।

ইউসুফ আলি - And the earth, moreover, hath He extended (to a wide expanse);

পিকথাল - And after that He spread the earth,

আর্বারি - and the earth-after that He spread it out,

শাকির - And the earth, He expanded it after that.

সারওয়ার - After this, He spread out the earth,

হিলালি/খান - And after that He spread the earth;

মালিক - After that He spread out the earth,[30]

মাওলানা আলি - And the earth, He cast it after that.

ফ্রি মাইন্ড্‌স And the land after that He spread out.

ফেইথ ফ্রিডমের ওয়াবসাইটে এ নিয়ে একটি সুন্দর পোস্ট আছে। সেটাই হুবহু অনুবাদ করে দিচ্ছি:[৫]

কুরআন বিস্তৃতি, কার্পেট, বিছানা এবং এ ধরণের অন্যান্য শব্দের মাধ্যমে সমতল পৃথিবীর ধারণা তুলে ধরেছে। বর্তমানে অনেক মুসলিম apologist এটা অস্বীকার করার চেষ্টা করেন। তারা [৭৯: ৩০] আয়াতের "দাহাহা" শব্দের ভিত্তিতে এই অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

অনেক ইসলামবাদী "দাহাহা" শব্দের অর্থ করার চেষ্টা করেছেন, উট পাখির ডিম বা উট পাখির ডিমের মত আকৃতির। তারা বলেন, এই আয়াতে দাহাহা দ্বারা বিস্তৃত করা বোঝানো হয়নি (অন্য সব স্থানে কিন্তু বিস্তৃত করাই বোঝানো হয়েছে)। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে, গোলাকার তথা উট পাখির ডিমের মত করে তৈরী করা।

অনেকে দাবী করবেন, দাহাহা শব্দের মূল হল দুহিয়া যার অর্থ উট পাখির ডিম। এখানে দাহাহা'র সাথে উট পাখির ডিমের সম্পর্ক করা যায় না। আরবি অভিধান ঘাটলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তারপরও অনেকে ডিম নিয়ে পরে থাকতে চান। তাদের জন্য আরেকটি হতাশার কথা হল, পৃথিবীটা আসলে উট পাখির ডিমের মত না। জ্যামিতিতে উপগোলক দুই ধরণের হতে পারে: prolate (মেরু বরাবর প্রসারিত) এবং oblate (বিষুব বরাবর প্রসারিত)। সকল ডিমই প্রোলেট আকৃতির। অবলেট হল কমলালেবু। পৃথিবীটা অবলেট আকৃতির। কবে না জানি দাহাহা'র অর্থ হয়ে যায় "কমলালেবু"!

আরেকজন দাহাহা দিয়ে প্রাচীন আরবের একটি খেলার দিকে নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেন,

> *এই আয়াতের মূল শব্দ দাহাহা। আরবিতে "ইজা দাহাহা" নামে একটি বাগ্‌ধারা আছে যার অর্থ, "যখন সে ভূমির গর্তের উপর পাথরটি নিক্ষেপ করে"। এখানে "উযিয়াতুন" অর্থ গর্ত এবং "আল-মাদাহি" দ্বারা বোঝায়, একটি গোলাকার পাথর আছে যার উপর নির্ভর করে মাটিতে গর্ত করা হয়, এরপর গর্তে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে একটি খেলা চলে। তার মানে দাহাহা শব্দের সাথে গোলের একটা সম্পর্ক আছে। অনেকে বলেন উটপাখির ডিমের আরবি শব্দ যেখান থেকে এসেছে দাহাহা শব্দটিও সেখান থেকে এসেছে। পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, পৃথিবী গোলাকার না বরং এলিপসয়েড। আর উটপাখির ডিমও এলিপসয়েড। আরবিতে "সমতল" শব্দটির প্রতিশব্দ হচ্ছে "সাবি" এবং "আল-মুস্তাবি"। কুরআনের কোথাও পৃথিবীর বর্ণনায় এ শব্দ দুটি নেই। আছে ফারাশ, মাহ্‌দ, বাসাত, দাহাহা, তাহাহা, সুতিহাত ইত্যাদি যেগুলো বিস্তৃত হওয়াকে নির্দেশ করে।*

এখানে তিনি দাহাহার সাথে উযিয়াতুন ও আল-মাদাহি শব্দ দুটির তুলনার মাধ্যমে যে গোলাকারের দিকে ইঙ্গিত করলেন তা সত্য না। কারণ, আল-মাদাহি ও উযিয়াতুন শব্দ দুটি কেবল দ্বিমাত্রিকের ক্ষেত্র প্রযোজ্য। আল-মাদাহি বলতে আরব রুটির মত বৃত্তকে বোঝায়, অর্থাৎ চাকতির মত। উযিয়াতুনও বৃত্ত বোঝায়, গোলক না। তাছাড়া, দাহাহা'র একটি অর্থ নিক্ষেপ করা। তাহলে, উপরের বাগ্‌ধারায় নিক্ষেপ করার আরবি হবে দাহাহা। পাথর বা গর্তের সাথে তার কোন সম্পর্কই নেই। আর মানে উযিয়াতুন ও আল-মাদাহি'র সাথেও তার কোন তুলনা নেই।

এর আরেকটি প্রমাণ আছে। অনেক মুসলিমই ফেইথ ফ্রিডম সাইটে লেইন লেক্সিকনের একটি পোস্ট থেকে উযিয়াতুন ও আল-মাদাহি'র কথা তুলে নিয়েছেন। কিন্তু তারা দ্বিমাত্রিকতার কথা সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন।

আরজ আলী মাতুব্বরের "সত্যের সন্ধান"

"আমাদের বাঙালি কৃষক-দার্শনিক" আরজ আলী মাতুব্বর তার সত্যের সন্ধান বইয়ে কুরআনের অকেজো ধ্যান-ধারণা নিয়ে অনেক কিছু লিখেছেন। নামায আদায়ের সময় নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন। অভিজিৎ রায় সহ অনেকেই তাদের নিজ নিজ প্রবন্ধে এর উল্লেখ করেছেন। আমিও সংক্ষেপে উল্লেখ করছি:

কুরআন নামাযের জন্য সময় নির্দিষ্ট করেছে। নির্দিষ্ট সময় ছাড়া নামায আদায় করা যায় না। আবার কিছু সময়ে নামায আদায় নিষিদ্ধ। সূর্যাস্ত, সূর্যোদয়ের সময় নামায পড়া নিষেধ। এই নিয়মের কোন ধরণের ব্যতিক্রমের ইঙ্গিত কুরআনে নেই। কিন্তু সমস্যা হল, একই সময়ে পৃথিবীর এক স্থানে দুপুড় তো আরেক স্থানে মধ্য রাত হতে পারে। একই সময়ে হয়তো এক স্থানে সূর্য উঠছে এবং অন্য স্থানে এশার ওয়াক্ত চলছে। তার মানে একই সময়ে, এক স্থানে নামায পড়া সিদ্ধ কিন্তু অন্য স্থানে নিষিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে ইসলামে নামাযের সময় নির্দিষ্টকরণের ধারণাটি সে সময়ে প্রচলিত ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আরজ আলী মাতুব্বরের ভাষায়:

> *এক সময় পৃথিবীকে স্থির আর সমতল মনে করা হত। তাই পৃথিবীর সকল দেশে বা সকল জায়গায় একই রকম সময় সূচিত হবে, বোধহয় এইরকম ধারণা থেকে ওই সমস্ত নিয়ম-কানুন প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু এখন প্রমাণিত হয়েছে, পৃথিবী গোল ও গতিশীল।*

তিনি আরও উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন, ধারা যাক, এক লোক বাংলাদেশে ঠিক দেড়টায় জোহরের নামাজ পড়ে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে প্লেনে উঠলেন। ঘণ্টায় ৩০০০ মাইল বেগে সৌদি আরব গিয়ে দেখবেন এখনও দুপুড়ই হয়নি। তাকে কি আবার নামাজ আদায় করতে হবে? পৃথিবীর এমন অনেক স্থান আছে যেখানে দীর্ঘকাল দিন বা দীর্ঘকাল রাত থাকে। এমন স্থানও আছে যেখানে রাত হতে না হতেই আবার সূর্য উদিত হয়ে যায়। এশার নামাজ পড়ার সময় পাওয়া যায় না। যেখানে দীর্ঘকাল দিন বা রাত সেখানে ঘড়ি যদি নামাজ পড়াও যায়, রোযা কিভাবে রাখা হবে। সেখানে রমযান মাসকেই পৃথক করার উপায় নেই। দিনের সেহরি বা ইফতারের সময়ও পৃথক করার উপায় নেই।

এসব যুক্তিকে অনেকেই হেলা করেন। মুসলমানরা বলে, ইজমা-কিয়াসের মাধ্যমে এগুলোর সমাধান করা যায়। এজন্যই তো ইজমা-কিয়াসের দ্বার খোলা রাখা হয়েছে। কিন্তু আমি বলি, ইজমা-কিয়াস এজন্য আসেনি। কুরআন-হাদিস থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ্ কস্মিনকালেও ধারণা করতে পারেননি যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সময় নিয়ে এতো ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে। স্থানভেদে ইসলামের আইন এভাবে পরিবর্তন করতে হবে এটাও ভাবতে পারেননি। পৃথিবীর সব স্থানে একই সময় ভেবেই নিয়মগুলো স্থির করা হয়েছে। কুরআনের সব কিছু নির্দেশ করছে, পৃথিবী সমতল।

এবারে কেবল মরিস বুকাইলির কথা বাকি থাকে। বুকাইলিই এই অলৌকিকতার বিজ্ঞানকে উস্কে দিয়েছিলেন। তার 'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান' বইয়ের মতামত শমসের আলীদের মতই। অর্থাৎ তিনি মনে করেন, কুরআনে পৃথিবীকে সমতল বলা হয়েছে। কিন্তু, অপেক্ষাকৃত স্বল্প ক্ষেত্রের সাপেক্ষে।

একটা বিষয় নিয়ে অনেক কিছু লিখে ফেললাম। আমি আসলে সব কিছু পরিষ্কার করতে চাচ্ছিলাম। এজন্য পরিষ্কার বাংলায় "ছ্যাচরামি" পর্যন্ত করতে হয়েছে। এতোটা না করে আমি আমার বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে থাকলেও কাজের কয়েকটা জিনিস জানা হয়ে যেত। তারপরও এটাকে প্রয়োজন মনে করেছি। কারণ অন্য পক্ষ থেকে আমার কয়েক'শ গুণ "ছ্যাচরামি" করা হচ্ছে। কুরআনের আয়াতগুলোকে কানে ধরে বশ মানানো হচ্ছে। এমন সময়ে একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে আমাদের তো এমন কিছু লেখাই উচিত। কারণ আমরা চাই এমন একটি জাতি যার শিক্ষাব্যবস্থা হবে বিজ্ঞানকেন্দ্রিক। ছোটবেলায় পরবর্তী প্রজন্মের কাউকে যেন, ধমীয় সৃষ্টিতত্ত্ব পড়তে না হয় তা দেখা তো আমাদেরই দায়িত্ব। যতদিন বাবা-মা'রা ধর্মীয় অপজ্ঞানের কবল থেকে বেরিয়ে না আসবেন ততদিন ধর্মও টিকে থাকবে। বাবা-মা না পারি অন্তত শিক্ষাব্যবস্থা তো পরিবর্তন করতে পারি। এর একমাত্র উপায় হল, ধর্মীয় ধ্যান-ধারণাগুলোর অসারতা তুলে ধরা। আমি সেরকম কিছু অসারতা তুলে ধরলাম। কিছুটা হলেও দায়িত্ব পালন করলাম।

ধর্মে বিশ্বাস এখন পর্যন্ত খুবই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের শিক্ষিত মহলেও যে তা কতটা প্রকট, ভাবাই যায় না। কয়েকদিন আগে ভার্সিটির এক বন্ধুর সাথে কথা হচ্ছিল। আমি বললাম, কুরআন বলেছে পৃথিবী সমতল। সে বলল, কুরআন যদি সত্যি এ কথা বলে থাকে, তাহলে পৃথিবী অবশ্যই সমতল। প্রথমে বিস্মিত হয়ে গেলাম। দ্বিতীয় দফায় তার বিশ্বাসের প্রশংসা করলাম, তৃতীয় দফায় তাকে যুক্তি দেখালাম। তার বিশ্বাসের প্রশংসা আমি বেশিক্ষণ করতে পারিনি, কারণ সে প্রকৃত বিশ্বাসী না। শুধু সে না, আমার সহপাঠিদের অধিকাংশই প্রকৃত বিশ্বাসী না। প্রকৃত বিশ্বাসী হলে তারা দোযখের আগুনকেও বিশ্বাস করতো। আর দোযখের আগুনকে বিশ্বাস করলে তারা জীবনে অনৈসলামিক কিছুই করতে পারত না। অথচ আমার সহপাঠিরা ২৪ ঘণ্টা সময়ের প্রায় পুরোটাই অনৈসলামিক কাজ করে কাটায়। কুরআন তো বলেছে, তোমাকে ২৪ ঘণ্টাই ইবাদাত করতে হবে। তুমি যে কাজটি করছ তা ইসলাম অনুযায়ী করতে হবে। অথচ তারাও জানেও না, ইসলাম অনুযায়ী করা কাকে বলে? তাদের চেয়ে আমি বেশি জানি এবং একসময় বেশি পালন করতাম। তাহলে তাদের এই অন্ধ বিশ্বাসকে আমি কি বলতে পারি। হ্যা, আমি এই অন্ধ বিশ্বাসকে বংশীয় ধর্ম টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা বলতে পারি, অন্ধ প্রচেষ্টা, যুক্তিহীন প্রচেষ্টা। সংস্কার ধরে রাখার জন্যই সবকিছু। এই বিশ্বাস এক দিক থেকে ক্ষতিকর। কারণ তারা ধর্মের কিছু জানে না, কিন্তু ধর্ম নিয়ে আবেগীয় কিছু ঘটতে দেখলে জীবন দিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না। ভবিষ্যতে যে কি আছে জানি না।

এখন কেউ যদি পরিপূর্ণভাবে ইসলাম পালন করে এবং আমার ঐ বন্ধুটির মত অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করে তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি বলি, তুমি কুরআনে বিশ্বাস কর, যত ইচ্ছা কর। কুরআনে বিশ্বাস না করলে তো মুসলিমই হওয়া যাবে না। কিন্তু কুরআনের সাথে বিজ্ঞানকে মেলানোর চেষ্টা করো না। এই প্রচেষ্টা দেখেই আমার মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়েছে। পৃথিবীতে তো "ফ্ল্যাট আর্থ সোসাইটি" নামে একটা সমাজই আছে। অনেকে দাবী করেন, সৌদি গ্র্যান্ড মুফতি আবদুল্লাহ ইবন বাজ নাকি পৃথিবী সমতল বলে এক ফতোয়া জারি করেছিলেন। এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে দ্বিধা আছে বিধায় আমি বিস্তারিত লিখিনি। তারপরও বলি, বিশ্বাস করলে করেন, কিন্তু ধর্মের সাথে বিজ্ঞানকে মেলানোর চেষ্টা করবেন না। আর আধুনিক শিক্ষা যেহেতু বিজ্ঞানভিত্তিক তাই বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট সবকিছু আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ধর্ম নিয়ে আলাদা থাকুন।

তথ্যসূত্র

১. http://www.mukto-mona.com/Articles/avijit/Quran_miracle.htm

২. http://www.mukto-mona.com/Articles/mumin_salih/myth_scientific_quran.htm

৩. http://en.wikipedia.org/wiki/Flat_Earth

৪. জাকির নায়েকের লেকচার সিরিজ - ৫: কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান সামঞ্জস্যপূর্ণ নাকি অসামঞ্জস্যপূর্ণ

৫. http://www.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?t=23751

খান মুহাম্মদ, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির (আইইউটি) "তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল" বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। সচলায়তনে **শিক্ষানবিস** নামে লিখেন। ব্যক্তিগত ব্লগ - http://bigganpuri.wordpress.com/

ভগবদ্গীতায় বিজ্ঞান অন্বেষণ এবং অন্যান্য

অনন্ত বিজয় দাশ

দিনকয়েক আগে হঠাৎ করেই একটি পত্রিকা হাতে আসে; পত্রিকাটি দেখে প্রথমে এড়িয়ে যেতে চাইলেও প্রথম পাতার মধ্যখানে ঢাউস আকারে ছাপানো একটি খবরে অজানা কারণে চোখ আটকে যায়। তাই এবার আর এড়িয়ে না গিয়ে পড়তে বসলাম। খবরটি পড়ার পর আমার কী অনুভূতি হয়েছিল তা এখন আর উল্লেখ করলাম না, পাঠকদের অবগতির জন্য শুধু ঐ খবরটি হুবহু তুলে দিলাম :—

জটিল সমস্যা নিরসন করে শ্রীমদ্ভগবদগীতা—আলবার্ট আইনস্টাইন

আলবার্ট আইনস্টাইন কালজয়ী এক নাম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। বিজ্ঞান জগতে অনেক বিজ্ঞানীর অবদান সময়ের আবর্তে নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে হয়তো ধরে রাখতে পারে না তার বিস্ময়। হয়ে পড়ে কিছুটা ম্লান। কিন্তু বিজ্ঞান জগতে আইনস্টাইন এর অবদান স্বর্গেও পারিজাত সদৃশ। আইনস্টাইনের ভরশক্তি সমীকরণ $E = mc^2$ এবং আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিষ্কার এই পৃথিবী গ্রহে নয়; এমনকি ভিন্ন গ্রহে যদি কোন মানুষ বাস করে সেখানেও সৃষ্টি করবে একই বিস্ময়, একই কৌতূহল।

এখানে বিস্ময়ের ব্যাপার হল আইনস্টাইন ইহুদি বংশোদ্ভুত হয়েও নিয়মিত শ্রী শ্রী গীতা চর্চা করতেন। আরও বিস্ময় এবং মজার ব্যাপার হল যে নিয়মিত গীতা পাঠ এবং গীতা ধ্যানের ফসলই হল আইনস্টাইনের উক্ত দুটি যুগান্তরকারী আবিষ্কার।

ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজত্বের শেষ প্রহর। ব্রিটিশরা বুঝতে পেরেছিল ভারতবর্ষে তাদের রাজত্বের মেয়াদ শেষ। তাদেরকে সবকিছু গুটিয়ে অচিরেই ভারত ছেড়ে যেতে হবে। তারা চিন্তা করল যদি ভারত ছাড়তে হয়, তবে ভারত থেকে এমন এক অমূল্য সম্পদ তারা নিয়ে যাবে, যার আবেদন বিশ্বজনীন এবং কালজয়ী। বলা বাহুল্য এই কালজয়ী অমূল্য সম্পদ আর কিছুই নয়, তা হল ইংরেজিতে অনুবাদ করা শ্রী শ্রী গীতা। শ্রীমদ্ভগবদগীতার অনুবাদে প্রথম উদ্যোগী ভূমিকা নেন চার্লস উইলকিনস, যিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কেরানি হিসাবে এদেশে আসেন। উইলকিনস-এর প্রশংসনীয় উদ্যোগের সহায়তা করেন ভারতের বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস। এখন যদিও প্রায় পঞ্চাশোর্ধ বিদেশি ভাষায় গীতার বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। Theory of Relativity লিখে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আইনস্টাইন তখন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ের প্রধান। ভারতের কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক আপেক্ষিকতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনস্টাইনের সাথে দেখা করতে যান। বলা বাহুল্য, আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কারের পর পৃথিবীতে মাত্র গুটিকয়েক পদার্থবিজ্ঞানী তাহা বুঝতে পেরেছিলেন। আইনস্টাইন আসলেন এবং সকলকে বিস্ময়াভূত করে সংস্কৃতে প্রশ্ন করলেন—

কিংতে নাম? (তোমাদের নাম কি?)

কথম আগসি? (কোথা হতে এসেছ?)

সাক্ষাৎপ্রার্থী ভারতীয় অধ্যাপকবৃন্দের চক্ষুস্থির, হতবিহ্বল চিত্তে তারা উত্তর দিল :

We don't know how to speak in Sanskrit. (আমরা সংস্কৃতে কথা বলতে জানি না ।) Please speak with us in English. (অনুগ্রহপূর্বক আমাদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলুন ।)

আইনস্টাইন ঝড়ের বেগে ক্ষীপ্ত হয়ে বললেন, What! You say you are Indians. But you can not speak in Sanskrit. (কি! তোমরা বলছ তোমরা ভারতীয়, কিন্তু সংস্কৃত জান না ।)

উত্তরে ভারতীয়রা বলল, Sanskrit is a dead language in our country. It is used only in ancestral Functions. (সংস্কৃত হল আমাদের দেশের একটি প্রাণহীন ভাষা । কেবল শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে ইহা ব্যবহার করা হয় ।) আইনস্টাইন তেলে-বেগুনে জ্বলে রুদ্র মূর্তি ধারণ করলেন এবং বললেন, Who says Sanskrit is the dead language? It is the sole living language in the world. (কে বলে সংস্কৃত প্রাণহীন ভাষা? পৃথিবীতে একমাত্র জীবন্ত ভাষা হল সংস্কৃত ।)

তারপর আইনস্টাইনের বক্তব্য নিম্নরূপ :

"আমি ইংরেজিতে অনুবাদ করা গীতা পড়তে পড়তে অবাক হয়ে যাই, আত্মস্থ হয়ে পড়ি এবং এই আত্মস্থ অবস্থায় পদার্থবিজ্ঞানের অতি দুর্বোধ্য আপেক্ষিকতত্ত্ব আমার কাছে সূর্যের আলোর মত সহজ সরল হয়ে যায়, সকল জটিল তত্ত্ব হয়ে যায় সরল ।"

আইনস্টাইন আরও বলেন— "আমি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চাই না । সংস্কৃত অক্ষরে লেখা মূলগ্রন্থ পাঠের জন্য আমি নিজে সংস্কৃত বর্ণমালা, সংস্কৃত ব্যাকরণ আয়ত্ব করি । আমার উপলব্ধি হল, "অমৃতং মধুররং সম্যক, সংস্কৃতং হি ততোধিকম॥" যতদিন বিন্ধ্যহিমাচল পর্বত থাকবে দণ্ডায়মান, যতদিন গঙ্গা, কাবেরী, গোদাবরী রবে বহমান ততদিন সংস্কৃত থাকবে দীপ্তিমান ।" ভারতীয় পদার্থবিদরা লজ্জায় মাথা নত করে রইল । অনুধাবন করতে পারল ভারতীয় সংস্কৃত ভাষা এবং গীতা গ্রন্থ কত প্রভাবশালী এবং সমৃদ্ধ ।

যে পত্রিকা থেকে এই চটকদার খবরটি তুলে ধরলাম, সেটা ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক 'হরেকৃষ্ণ সমাচার' (১৪ বর্ষ॥ ৭ম সংখ্যা॥ এপ্রিল ২০০৬ ইং॥ চৈত্র ১৪১২ বৈশাখ ১৪১৩॥); আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ-ভাবনামৃত সংঘ (ইসকন)-এর মুখপত্র । মাসিক পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নাম উল্লেখ আছে আচার্যঃ শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ; এবং বর্তমান সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে লিখিত আছে শ্রী চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী'র নাম ।

কলেজে পড়ার সময় এক স্যার আমাদের প্রায়ই বকা দিয়ে বলতেন : "যারা গাধাকে ঘোড়া বলে, তারা গাধা চিনে না, ঘোড়াও চিনে না ।" আর পত্রিকাটির খবর পড়ার পর আমার মনে হল, যারা ধর্মকে (Religion) বিজ্ঞান বলে দাবি করেন, তারা বিজ্ঞান বোঝেন না, ধর্মও বোঝেন না । বোঝেন শুধু নিজেদের আখের গোছানো! লেখাটি পড়ে কয়েকটি প্রশ্ন তৎক্ষণাৎ মাথায় উদয় হয়—(১) এই লেখায় কোনো লেখকের নাম উল্লেখ নেই কেন? যদিও পত্রিকার বাকি সব লেখায় লেখকের নাম উল্লেখ আছে । (২) এই লেখার কোনো তথ্যসূত্র বা উৎস উল্লেখ নেই কেন? কিংবা কোথা হতে লেখক এই ধরনের অবিশ্বাস্য তথ্য পেলেন? (৩) যে কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন দাবি করা হচ্ছে, তাঁদের নামও লেখায় উল্লেখ নেই, কেন? (৪) কবে ঐ বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন? (৫) লেখক কী কৌশলে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সূত্র, ভারতীয়রা গীতা'র চর্চা করে বলে বুঝতে পেরেছিলেন; অথচ ওনার বক্তব্য মতে ভারতীয় পদার্থবিদরা সংস্কৃত ভাষা জানতেন না, এটা কি স্ববিরোধী হয়ে গেল না? (৬)

শ্রীমদ্ভগবদগীতা'কে লেখক কি বিজ্ঞানের কোনো বই (পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ইত্যাদি) হিসেবে ভাবছেন, না-কী একে তিনি শুধুই একটি 'ধর্মগ্রন্থ' (যেমন : তোরাহ, কোরান, বাইবেল, ত্রিপিটক) বলে ভাবছেন? না-কী ভাবছেন আবার এই দুটির 'হাঁস-জারু' মার্কা সন্নিবেশ বলে?

বিজ্ঞান আজ অস্বাভাবিক গতিতে অপ্রতিরুদ্ধ; আর আজকের আধুনিক যুগে ধর্মের বাণীগুলো কেমন যেন বোকা-বোকা ধরনের কথাবার্তা বলেই মনে হয়। বোঝাই যায়, এখন বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের মেল ঘটাতে না পারলে যে, পাবলিককে গেলানো যাবে না? আর পাবলিক না খেলে যে—স্বামীজি, বাবাজি, মাতাজিদের তল্পিতল্পা বেঁধে লাইটপোস্টের নিচে থালা হাতে বসে থাকতে হবে! তাই বোধহয় এরকম অক্লান্ত সাধু প্রচেষ্টা!

পাঠক, এই বিষয় নিয়ে লেখার কোনো ইচ্ছে ছিল না আমার; কিন্তু চারিদিকে ইসলামি মৌলবাদ নিয়ে ডামাডোলের ফাঁক দিয়ে কী করে হিন্দু মৌলবাদ বিস্তৃত হচ্ছে, এটা তুলে ধরার জন্যই লেখাটির অবতারণা। 'ইসকন' (International Society for Krishna Consciousness, ISKCON) দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দেশে বিশাল আঙ্গিকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, অপবৈজ্ঞানিক জ্ঞান, সময়ে-সময়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা তথ্য প্রচার করে আসছে। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি, ইসকন থেকে প্রকাশিত কয়েকটি বই আমার সদ্য পাঠের সুযোগ হয়েছে; বইগুলো পাঠ করে আমার তো চক্ষু চড়াকগাছ! আজকের যুগে বিজ্ঞানের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেও আধুনিক বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকদের অকথ্য-অশ্লীলভাষায় গালাগালি করা সম্ভব, তা ইসকনের গ্রন্থগুলি পাঠের আগে জানা ছিল না! ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য স্বামী প্রভুপাদ (১৮৯৬-১৯৭৭) ও তাঁর শিষ্যদের ভাষায়, বর্তমানকালের বিজ্ঞানের দর্শন হচ্ছে 'কূপমণ্ডুক দর্শন', বৈজ্ঞানিকেরা হচ্ছে মহামূর্খ, নির্বোধ, ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করা কতগুলি কুয়োর ব্যাঙ, বিকৃত মস্তিষ্কধারী, কুকুর, শূকর, উট, গাধার থেকে কোনো অংশে উন্নত নয়, তারা বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চাচ্ছে! ইসকনের গুরু ও শিষ্যদের মারাত্মক অভিযোগ : আধুনিক বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিকেরা কেন ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, ভগবানকে নিয়ে গবেষণা করেন না, আত্মার অস্তিত্ব মেনে নেন না, বেদ-গীতার বক্তব্যে আস্থা রাখেন না, বেদ-গীতাসহ অন্যান্য হিন্দুধর্মীয় পুস্তককে কেন বিজ্ঞানের গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন না? বাহ! মামা বাড়ির আবদার পেয়েছেন মনে হয়! বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সম্পর্কে ইসকনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমার বক্তব্যে যদি কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা সংশয় থাকে, তবে একটু কষ্ট করে হলেও ইসকন কর্তৃক প্রকাশিত জীবন আসে জীবন থেকে, কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান গ্রন্থ দুটি পাঠ করে নিবেন। একবার চোখ বুলালেই লক্ষ্য করবেন উক্ত গ্রন্থ দুটির পাতায় পাতায় একদিকে বিজ্ঞানের কী তীব্র বিরোধিতা, অপব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে আবার অন্যদিকে বিজ্ঞানের স্বীকৃতি পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা! কোথাও স্ববিরোধী বক্তব্য আবার কোথাওবা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-কার্যপ্রণালী সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানের অভাব! এখানে আলোচনার পরিসর সীমিত রাখার স্বার্থে মাত্র দুটি উদাহরণ তুলে ধরছি আমার বক্তব্যের সমর্থনে : জীবন আসে জীবন থেকে গ্রন্থের ১৪-১৫ পৃষ্ঠায় বিশ্বের সবচেয়ে দামি এবং মর্যাদাপূর্ণ নোবেল পুরস্কার সম্পর্কে কটাক্ষ করে বলা হয়েছে 'গর্দভের নোবেল পুরস্কার', নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানীরা নাকি বিকৃতমস্তিষ্কধারী, কুকুর, শূকর, গাধা আর নোবেল কমিটির সদস্যরা পশুর থেকে উন্নত নয়, এক নম্বরের মূর্খ! ইসকন গুরু প্রভুপাদ 'নোবেল পুরস্কার' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এভাবে, "একটি পশু আর একটি পশুর স্তব করছে, এতে কি কৃতিত্ব রয়েছে?..."! কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান গ্রন্থেও (পৃষ্ঠা ৫৬-৫৯) নোবেল পুরস্কার নিয়ে একই বক্তব্য রয়েছে : 'মূর্খদের জন্য নোবেল পুরস্কার'! অথচ সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ও মজার বিষয় হচ্ছে (নোবেল পুরস্কার নিয়ে এতো কুৎসিৎ গালাগালির পরেও) কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৮৭) শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁর বান্দারা লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে জোর দাবি জানিয়েছেন, 'ভগবানকে নোবেল পুরস্কার দিন'!! আঃ মরি! মরি! ভণ্ডামি আর স্ববিরোধিতার চমৎকার মেলবন্ধন! এবার চলুন জড়বস্তু সম্পর্কে বিশ্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী শ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁর বান্দার 'বিশেষ জ্ঞান' পাঠ করি : শ্রীল প্রভুপাদ বলেন (জীবন আসে জীবন থেকে, পৃষ্ঠা ৪), "সমস্ত জড় বস্তুই হচ্ছে পাঁচটি স্থূল পদার্থ (মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ) এবং তিনটি

সূক্ষ্ম পদার্থ (মন, বুদ্ধি এবং অহংকার)-এর সমন্বয়" । এরপর প্রভুপাদের যোগ্যশিষ্য করন্ধর বলেন, "বৈদিক জ্ঞান অনুসারে জড়শক্তির প্রথম প্রকাশ হচ্ছে অহংকার । তারপরে তা বুদ্ধিতে পর্যবসিত হয়, তারপরে মনে এবং তারপর আকাশ, বায়ু, আগুন, জল এবং মাটি এই স্থূল উপাদানগুলিতে রূপান্তরিত হয় । এই সবকটি মৌলিক উপাদান দিয়েই জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে... ।" পাগলের প্রলাপ দেখে কি বলবো বলুন? মৌলিক পদার্থের সংজ্ঞাই যারা জানে না, কোনগুলো মৌলিক পদার্থ, কোনগুলো নয়, তার নামই যারা জানে না, বস্তুর গঠন-ধর্ম নিয়ে যাদের সামান্য নবম-দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান-রসায়নবিজ্ঞানের জ্ঞানটুকু নেই, তাঁরা এসেছে নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানীকে সবক দিতে! হায়রে কপাল! একেই বলে বোধহয় কলিকাল! ওনাদের তো নোবেল প্রাইজ দেয়া উচিৎ! কী বলেন? মজার বিষয় তাঁরাও সেরকম দাবি করেছেন কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৮৯)! বিজ্ঞান নিয়ে ইসকনের এ অপকাণ্ড দেখে আমার কবি জীবনানন্দ দাশের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে : "অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ, যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা"!

ইসকনের কর্মকাণ্ড, স্ববিরোধী বিজ্ঞান-বিরোধিতা, অপব্যাখ্যা, ধর্মাশ্রয়ী ছদ্মবিজ্ঞানের অপতৎপরতা নিয়ে আলোচনা এখানে আর নয়; পরবর্তীতে স্বতন্ত্র আরেকটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা করা হবে । যা হোক, ইসকনের কয়েকজন স্থানীয় সদস্যের সাথে কথা বলে জানা গেছে, বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই (যেসব অঞ্চলে হিন্দু মন্দির রয়েছে) তাদের শাখা রয়েছে । তারা সেখানে ত্রৈমাসিক-মাসিক পত্রিকাসহ বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় বই-পুস্তক, ধর্মীয় ছবি-পোস্টার, লিফলেট, পূজার বিভিন্ন উপকরণ, প্রসাদ ইত্যাদি হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করেছে । এছাড়া নাম-সংকীর্তনের আড়ালে উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রচার তো চলছেই! দেশের অনেক অঞ্চলে আপাত 'নিরীহ' ধরনের ('সংখ্যালঘুদের ধর্মচর্চা করার স্বাধীনতা'র সুযোগে!) মন্দির তৈরি করে ভগবদ্গীতা থেকে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের বাণী প্রচার করা হচ্ছে! ধর্মের তথাকথিত শান্তির বাণী প্রচারের নামে আমাদের অল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত নিরীহ-নিরন্ন মানুষের 'অজ্ঞতা-অসহায়ত্ব'কে নিয়ে বেওসা হচ্ছে! কারণ এ বিষয়টি পাবলিক খায়ও ভালো! পাবলিককে খাওয়ানোর তাঁদের এ নিরন্তর অপচেষ্টার আসল উত্তর পাওয়া যায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাশিয়ার চিঠি গ্রন্থের ৭নং চিঠির কিছু উক্তির মধ্যে; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন : "এ পর্যন্ত দেখা গেছে, যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে । সে ধর্ম বিষকন্যার মত : আলিঙ্গন করে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ করে সে মারে । শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেননা তার মার আরামের মার ।" এই 'আরামের মার' দেওয়ার জন্য শুধু ইসকনই নয়, এ দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন, অনুকূল আশ্রম, লোকনাথ আশ্রম ইত্যাদি বিচিত্র নামধারী আশ্রম, কিংবা সাধকপুরুষ-মহাপুরুষের দল দীর্ঘদিন ধরে অপবৈজ্ঞানিক-বিজ্ঞানবিরোধী মৌলবাদী চিন্তা-ধ্যান-ধারণা কৌশলে লোক ঠকিয়ে বিক্রি করছে । এঁদের কাজ কারবার দেখে মনে হয় 'মিথ্যার বেসাতির' এক মহোৎসব চলছে এ দেশে । এসব দেখার কেউ নেই, কোনো প্রশ্ন করার কেউ নেই, বাধা দেয়ার কেউ নেই...!

শ্রীমদ্ভগবদগীতার অতীত অনুসন্ধান : এ প্রবন্ধের মূল বিষয় হচ্ছে ভগবদ্গীতা; সঠিকভাবে বলতে গীতায় বিজ্ঞান অন্বেষণ! অনেকদিন ধরেই হিন্দুত্ববাদীদের কাছ থেকে এরকম দাবি শুনে আসছি যে, গীতা হচ্ছে স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা সর্বজ্ঞানের আকর গ্রন্থ, বিজ্ঞানময় গ্রন্থ! আজকে সেই পবিত্র গীতাকে স্বল্প পরিসরে হলেও একটু বিশ্লেষণ করে হিন্দুত্ববাদীদের দাবির যথার্থতা যাচাইয়ের চেষ্টা করবো । গীতাকে নিয়ে আলোচনায় যাওয়ার আগে অবশ্যই সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গীতার অতীত ইতিহাস জানতে হবে । কারণ, ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনায় গেলে গীতাকে ভগবানের মুখঃনিসৃত বাণী ভেবে শুধু একের পর এক কথার ফুলঝুরিই সৃষ্টি হবে, গীতা রচনার সামাজিক প্রেক্ষাপট বুঝা যাবে না । আমার জানা মতে, বাঙলা ভাষায় হিন্দুধর্মের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ যেমন রামায়ণ, মহাভারতসহ ভগবদ্গীতা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানের আলোকে অত্যন্ত গবেষণাধর্মী দুটি গ্রন্থ (মহাকাব্য ও মৌলবাদ, সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা) রচনা করেছেন ভারতীয় বিদগ্ধ লেখক জয়ন্তানুজ

বন্দ্যোপাধ্যায়; স্বীকার করে নিচ্ছি, বাঙলাভাষায় এর থেকে বিশ্লেষণধর্মী ও মননশীল গ্রন্থ এখনো আমার নজরে আসেনি। ফলে এ প্রবন্ধে ভগবদ্গীতার অতীত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমার মূল উপজীব্যই জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ দুটি। আমি মনে করি, ভগবদ্গীতা (এমন কী রামায়ণ-মহাভারত) সম্পর্কে আরো বিস্তৃত পরিসরে সমাজবৈজ্ঞানিক দৃষ্টি থেকে জ্ঞান আহরণ করতে চাইলে উক্ত গ্রন্থ দুটি পাঠ একান্ত আবশ্যিক। এবার মূল আলোচনায় আসি, ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি প্রায় সব হিন্দু বাড়িতে শ্রীমদ্ভগবদগীতা অত্যন্ত যত্নসহকারে পবিত্রভাবে আলাদা করে তুলে রাখেন। যেমনটি কোরান, বাইবেলকে যত্নে রাখেন ইসলাম, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা। অনেক হিন্দু আছেন, সকালে গীতা পাঠ ছাড়া কোনো ধরনের খাদ্য পর্যন্ত গ্রহণ করেন না। গীতাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিসৃতঃ বাণী ভেবে পূণ্যলাভের জন্য যা যা করা দরকার, তার সবই তারা করেন। অন্ধবিশ্বাসী হিন্দুদের এই অন্ধ-আবেগকে পুঁজি করে বিচিত্র সব নামধারী শতশত 'মানসিক রোগী থেকে শুরু করে বুজরুক' বাবাজি-মাতাজি-ঠাকুরজি নিজেদের অন্ন-রুটির যোগান করছেন। স্বর্গলাভের মুলো ঝুলিয়ে নিরন্ন মানুষের মুখের আহার কেড়ে নিয়ে নিজেদের উদরপূর্তি করতে এঁরা এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেন না। সৌম্য দর্শন আর সেবাপরায়ণ মুখোশের আড়ালে কী বিভৎস লাম্পট্য আর ভণ্ডামি তাঁদের মধ্যে বিরাজ করছে, তা দেখলে শরীর রি রি করে উঠে!

শ্রীমদ্ভগবদগীতাকে অনেকে ভগবদ্গীতা আবার শুধু গীতাও বলে। বর্তমানে প্রচলিত মহাভারত পাঠ করলে দেখা যায়, গীতার রচনার প্রেক্ষাপট হচ্ছে এ রকম : কৌরব আর পাণ্ডবদের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন নিজের আত্মীয়স্বজনদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে বলে যুদ্ধ বিমুখ হয়ে পড়েন। অর্জুনকে যুদ্ধে নিয়োজিত করতে শ্রীকৃষ্ণ অনেক যুক্তি-তর্কের আশ্রয় নেন। এই ধরনের যুক্তি-তর্কে শ্রীকৃষ্ণ যা বলেন, তাই গীতার বিষয়বস্তু। গীতায় লক্ষ্য করা যায় যে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বিভিন্ন নামে ডাকছেন, যেমন—হৃষিকেশ, মধুসূদন, জনার্দন, বার্ষ্ণেয়, গোবিন্দ, অরিসূদন, কেশব ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন কিছু বলছেন, তখন বলা হচ্ছে 'শ্রীভগবান উবাচ'। এ কারণেই হয়তো গীতাকে ভগবদ্গীতা বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান দ্বারা যা গীত হযেছে। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে (১২৩টি অধ্যায়ের মধ্যে) ২৫-৪২ পরিচ্ছেদের ১৮টি অধ্যায়ে বর্তমানে প্রচলিত গীতা। এই আঠারোটি অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে সর্বমোট ৭০০টি শ্লোক। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে ভগবদ্গীতা আরম্ভ হবার পূর্বে ২৪টি এবং ভগবদ্গীতা শেষ হবার পরে আরো ৮১টি অধ্যায় রয়েছে। আপাত ধরে নেয়া যাক, মহাভারতের ভীষ্মপর্বেই সর্বপ্রথম গীতার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। আজকের এ প্রচলিত গীতাকে সর্বপ্রথম শঙ্করাচার্য-ই (৭৮৮-৮২০) মহাভারত থেকে বিছিন্ন এবং স্বাধীন-স্বতন্ত্র ধর্মগ্রন্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন; শঙ্করাচার্যের পূর্বে গীতা রচিত হবার পর মূলতঃ মহাভারতের সাথেই অঙ্গীভূত ছিল, তাই স্বতন্ত্র-স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্মগ্রন্থরূপে এর কোনো স্বীকৃতি ছিল না। পাঠক এখানে গীতাভাষ্যকার শঙ্করাচার্য সম্পর্কে একটি তথ্য আপনাদের জানিয়ে রাখি : (স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বাস মতে কৃষ্ণ পরবর্তী বিষ্ণুর অবতার!) শঙ্করাচার্য যখন নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে গীতাভাষ্য রচনা করেন, তখন তিনি উপক্রমণিকায় (ভূমিকা/মুখবন্ধ) যুক্তি হাজির করেন, "... গীতাশাস্ত্র সমস্ত বেদার্থের সারসংগ্রহ স্বরূপ, এবং এর অর্থ বোঝা অত্যন্ত কঠিন। এর অর্থ আবিষ্কার করবার উদ্দেশ্যে অনেকে এর পদ, পদার্থ, বাক্যার্থ এবং যুক্তি বিবৃত করলেও লোকে সেসব অত্যন্ত পরস্পরবিরোধী অনেক অর্থে গ্রহণ করে থাকে, এই উপলব্ধি থেকেই আমি এর বিবেকসম্মত অর্থ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে এর বিবরণ দিচ্ছি।" কিন্তু শঙ্করাচার্যের দাবি মতো পূর্ববর্তী কোনো গীতাভাষ্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি; আর ভুল-পরস্পরবিরোধী অর্থ বা ব্যাখ্যা তো অনেক পরের কথা! কিংবদন্তীতে এক সময় শঙ্করাচার্যের পূর্বে 'বৌধায়নের গীতাভাষ্যের' কথা শোনা যায়, কিন্তু এরকম কোনো গীতাভাষ্যের অস্তিত্ব বাস্তবে কখনো প্রমাণিত হয়নি। অতএব, শঙ্করাচার্যই যে সর্বপ্রথম মহাকাব্য মহাভারত থেকে গীতাকে আলাদা করে 'গীতাশাস্ত্র'রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন, গীতাবিশেষজ্ঞরা এই সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাহলে যে প্রশ্নটি দেখা দেয়, পল্লবিত মহাভারতে গীতা সংযুক্ত হবার এত কাল পরে কেন শঙ্করাচার্য মহাভারত থেকে গীতাকে আলাদা করে স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্মগ্রন্থরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন, আর নিজের দাবি

মত 'বিবেকসম্মত ভাষ্য' তৈরি করে তার মাধ্যমে 'ভগবান নির্দিষ্ট ধর্ম' প্রচার করলেন? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে, আমাদেরকে একটু অতীতে যেতে হবে। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, শঙ্করাচার্যের সময়কালে (নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে) কিংবা তারও আগে এ অঞ্চলের ব্রাহ্মণ্যধর্মের (বর্তমানের হিন্দু ধর্ম) সামনে বৌদ্ধধর্ম একটি বিশাল চ্যালেঞ্জরূপেই দেখা দিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কুৎসিৎ চাতুর্বর্ণ প্রথা-নিয়মনীতি, নারী ও শূদ্রদের প্রতি মনুবাদীদের নৃশংস ও বীভৎস আচরণে অতিষ্ঠ, সেকালে বৌদ্ধ-জৈনধর্মের উদার-মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের পরিচ্ছন্ন রীতিনীতি, বর্ণশ্রমের কঠোর বিরোধিতা, বস্তুবাদী জ্ঞানচর্চার প্রতি আকর্ষণ, গণমানুষকে বিপুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল। দলে-দলে শূদ্র-বৈশ্য ধর্মান্তরিত হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে লাগল। সমাজের নিপীড়িত শ্রমিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি উল্টোমুখ হওয়াতে সমাজের শোষকশ্রেণী ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সামনে মারাত্মক অস্তিত্বের সংকটরূপে দেখা দেয়। আবার গুপ্তযুগে এবং তার পরে হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরে বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং এই সমস্যার একটি সমন্বয়ধর্মী সমাধান প্রয়োজন ছিল। এতো গেল স্থানীয় সমস্যা, এছাড়া পঞ্চম শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত বিদেশী হুন আগ্রাসন উত্তর ভারতকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল; গুপ্ত ও পাল রাজারা শেষ পর্যন্ত হুন আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারলেও এরা বিশাল সংখ্যায় ভারতে বসতি স্থাপন করে রাজপুত জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের 'গুদের উপর বিষফোড়া' হিসেবে দেখা দেয়। এছাড়া সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে আরবেরা সিন্ধুদেশ দখল করে নিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সমাজের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সামনে মস্ত বড় বিপদ সংকেত হিসেবে আবির্ভূত হয়। তৎকালীন ভারতের ভিতর-বাহিরের এ অস্থিতিশীল অবস্থা ব্রাহ্মণ্যধর্মকে 'আত্ম-পরিচয়ের সংকটে' ঠেলে দেয়। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এ সংকটময় অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ দর্শন, মহাভারত থেকে গীতাকে আলাদা করে স্বতন্ত্র ধর্মগ্রন্থরূপে উপস্থাপন-প্রচার, ধর্মীয় ভক্তি-আন্দোলন—দুর্দশাগ্রস্থ বাস্তব পরিস্থিতিকে আড়াল করে একটি জাগতিক সমাধান সূত্র ও 'ঈশ্বরভক্তিতে মুক্তি'র অলীক প্রেরণা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছিল। আর এই মুক্তির মূল তাত্ত্বিক প্রেরণা আবার আসে ভগবদ্গীতা থেকে! এছাড়া আমরা দেখি, শঙ্করাচার্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক আদর্শকে শক্তিশালী করার জন্য, বদরী, দ্বারকা, পুরী এবং শৃঙ্গেরীতে হিন্দুধর্মের চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, শঙ্করাচার্যের পরম্পরা সৃষ্টি করেন, সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে পুনর্গঠিত করে হিন্দুধর্মকে এক সর্বভারতীয় সাংগঠনিক রূপ দান করেন। প্রধানত শঙ্করাচার্য এবং তাঁর অনুগামী ভক্তদের ধর্মীয় এবং সাংগঠনিক তৎপরতার ফলেই শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়, নির্বিশেষে হিন্দুধর্ম শক্তিশালী হয়ে ওঠে, আর দশম শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম কার্যত হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় (দ্রষ্টব্য : সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা, পৃষ্ঠা ২০)।

গীতার রচয়িতা কে তা অজানা; যেমন জানা যায় না প্রাচীন ভারতীয় অনেক লোকগাঁথা আর ধর্মীয় পুস্তক (বৌদ্ধ ধর্মের জাতক কাহিনী, উপনিষদ ইত্যাদি) রচয়িতার নাম। তবে গীতার অনেক ভাষ্যকার রয়েছেন; রয়েছে তাঁদের সম্পাদিত নানা ধরনের টীকা। বস্তুত টীকা ছাড়া গীতা বোঝা খুবই কঠিন। গীতার নানা ভাষ্যকার, যার-যার বিশ্বাসমতো গীতার ভাষ্য লিখেছেন, ফলে এঁদের টীকা পড়লে বিভিন্নজনের বিভিন্ন মতের চাপে একজন পাঠকের বিভ্রান্ত হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। গীতার ভাষ্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, শ্রীধরস্বামী মাধ্বাচার্য, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রমুখ। বিদেশি ভাষাতে গীতা অনুবাদের মধ্যে ১৭৮৫ সালে সর্বপ্রথম ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূমিকাসহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কেরানি চার্লস উইলকিন্স; এরপর ১৭৮৭ সালে নভিকভের রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। জার্মান পণ্ডিত শ্লেগেলের লাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮২৩ সালে। ১৮২৫ সালে ইউজেন বুর্নক ফরাসি ভাষায়, ১৮৫৮ সালে ডেমোট্রিয়ার গ্রিক ভাষায়, ১৮৬৯ সালে এফ. লরিনসারের জার্মান ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ সালে আবার এডউইন আরনলডের বিখ্যাত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৯০৪ সালে অ্যানি বেসান্ত গীতার থিওসফিক্যাল অনুবাদ প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি গীতার সমস্ত শব্দ ইচ্ছেমতো অনুবাদ করে গীতাকে একটি সর্বজনীনরূপ দানের চেষ্টা করেন; উদাহরণস্বরূপ স্বধর্ম অর্থ Duty, স্বভাব অর্থ Law, দেবতা অর্থ Shining One, সত্ত্ব রজ তম গুণের অর্থ

Harmony, Motion ও Inertia আর যক্ষ রক্ষ প্রভৃতি হচ্ছে হারিয়ে যাওয়া আটলান্টিস মহাদেশের বহুগুণসম্পন্ন দৈত্যাকার প্রাণী! আবার বারাণসীর যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় তান্ত্রিক দেহতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গীতার প্রতিটি শব্দের রূপক অর্থ দানের চেষ্টা করেন; লাহিড়ী মহাশয় নিজের গীতাভাষ্যে গঙ্গা শব্দের অর্থ করেন সুষুম্না, গাণ্ডীব অর্থ মেরুদণ্ড, পাঞ্চজন্য মানে অনাহত শব্দের পাঁচ রকম ধ্বনি, ভীষ্ম মানে ধর্মকর্ম করবার ভয়, পাণ্ডু অর্থ পৃথিবীর পঞ্চতথ্য, কুন্তী অর্থ কুণ্ডলিনী শক্তি, অর্জুন মানে জঠরাগ্নি, ভীম মানে প্রাণ বা শরীরের অভ্যন্তরের বায়ু, ইত্যাদি। সাথে-সাথে তিনি এও বলেন, সমস্ত ভগবদ্গীতা কুণ্ডলিনী শক্তির শূলাধার চক্র থেকে সহস্রার চক্রে উত্থানের রূপক মাত্র! এ বিষয়টি হয়তো অনেকে জানেন, ভারতবর্ষে বিট্রিশ শাসনামলে 'গীতার ধর্মযুদ্ধ ও কর্মযোগের তত্ত্বকে' হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও সশস্ত্র বিপ্লবের তাত্ত্বিক বুনিয়াদ হিসেবে ব্যবহারের প্রয়াস চালান বঙ্কিমচন্দ্র, মহাত্মা গান্ধী, বিবেকানন্দ, বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, বাল গঙ্গাধর তিলকসহ প্রমুখ (দ্রষ্টব্য : সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা, পৃষ্ঠা ২৪-২৭)। এজন্য বিট্রিশরা গীতাকে 'সন্ত্রাসে প্রেরণাদানকারী' গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করতো এবং গীতা বহন, পাঠের অভিযোগে নানাজনকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে গ্রেফতার করতো কোনো কারণ ছাড়াই। বর্তমান সময়ে অনেক হিন্দু বা নন-মুসলিমদের সাথে আলাপে দেখেছি, তারা ইসলামধর্ম ও কোরানশরিফ নিয়ে বেশ চিন্তিত এবং আতঙ্কিত! তাঁদের মতে, ইসলামি জেহাদিরা কোরানশরিফের কিছু 'উত্তেজক' আয়াত (যেমন, ২:১৯১-১৯৩, ২:২১৬, ৩:৮৫, ৯:৩৯, ৯:৭৩ ইত্যাদি) থেকে 'জেহাদ' সম্পর্কে আল্লাহতায়ালার সুনির্দিষ্ট নির্দেশ পেয়ে পৃথিবীটাকে 'দারুল-ইসলাম' বানানোর জন্য ননমুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, আত্মঘাতী বোমাহামলা করছে! পশ্চিমাদেশে কেউ কেউ একে নাম দিয়েছেন 'ইসলামফোবিয়া'! কোরানশরিফ সম্পর্কে বর্তমানকালের সনাতন হিন্দুধর্মাবলম্বীদের এহেন আচরণে মনে হয়, 'যত দোষ নন্দ ঘোষ'! তাঁদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থ (গীতা) একদম শান্তিবাদী, মানবতাবাদী, গণমানুষের কল্যাণকামী! অথচ ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগ পাঠ করলেই দেখা যায়, এর পাতায়-পাতায় শত্রুবিনাশের লক্ষ্যে 'ধর্মযুদ্ধ' চালিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ-উপদেশ (২:২১) : "যিনি আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ, অব্যয় বলে জানেন, হে পার্থ, সে পুরুষ কি প্রকারে কাহাকে হত্যা করেন বা করান? " তার মানে, আত্মা অবিনাশী বলে জানেন যিনি, তিনি মানুষ হত্যা করলেও হত্যাকারী হিসেবে দোষী সাবস্যস্ত হবেন না! বাহ! চমৎকার! পরের শ্লোকগুলিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'মানুষ হত্যা'র জন্য গোঁজামিল দিয়ে সুন্দর কিছু (কু)যুক্তি উপস্থাপন করেছেন (২:২২-৩১) : "মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর পরিগ্রহ করে। ... অতএব আত্মাকে এই প্রকার জানিয়া তোমার শোক করা উচিৎ নয়। ... যে জন্মে তাহার মরণ নিশ্চিৎ, যে মরে তাহার জন্ম নিশ্চিত; সুতরাং অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে তোমার শোক করা উচিৎ নয়। ... স্বধর্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার ভীত কম্পিত হওয়া উচিৎ নয়। ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয় আর কিছুই নেই।" এর পরের শ্লোকে ভগবান ঘোষণা করেন, "ধর্মযুদ্ধ না করলে স্বধর্ম ও কীর্তি ত্যাগ করিয়া তুমি পাপযুক্ত হইবে (২:৩৩), সকল লোকে তোমার অকীর্তি ঘোষণা করিবে, অকীর্তি অপেক্ষা মরণও শ্রেয় (২:৩৪)। আর ধর্মযুদ্ধে মারা গেলে স্বর্গে যাইবে, জয়লাভ করিলে পৃথিবী ভোগ করিবে ...! (২:৩৭) অতএব সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয় তুল্যজ্ঞান করে যুদ্ধের জন্য উদ্যুক্ত হও; এতে পাপভাগী হইবে না" (২:৩৮)। ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে নিজের বিশ্বরূপ প্রদর্শন করে, যুদ্ধের জন্য আবারো প্রণোদিত করতে থাকেন এভাবে (বিশ্বরূপ-দর্শনযোগ, ১১:৩৩-৩৪) : "তুমি যুদ্ধার্থে উত্থিত হও; শত্র জয় করিয়া যশঃ লাভ কর, নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ কর। হে অর্জুন, আমি ইহাদিগকে পূর্বেই নিহত করিয়াছি। তুমি এখন নিমিত্তমাত্র হও। ... যুদ্ধবীরগণকে আমি পূর্বেই নিহত করিয়াছি। এখন তুমি সেই হতগণকে নিহত কর; ভয় করিও না; রণে শত্রুগণকে নিশ্চয় জয় করিতে পারিবে, যুদ্ধ কর।" গীতার সর্বশেষ অধ্যায় মোক্ষযোগ-এ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানুষ হত্যার লাইসেন্স দিয়েছেন এভাবে (১৮:১৭) : 'আমি কর্তা'—এই ভাব নাই যার (নিরহংকার), যার বুদ্ধি, কার্যে লিপ্ত হয় না, তিনি সমস্ত লোককে হত্যা করলেও কাউকে হত্যা করেন না এবং তার ফলভাগী হন না।" এরপর কী আর

কিছু বলার থাকতে পারে? ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে নিশ্চয়ই গীতার এই শ্লোকের দোহাই দিয়ে নির্দ্বিধায় আইন-আদালত অবজ্ঞা করে যে কেউ (হিন্দুত্ববাদীরা) ভিন্নমতালম্বী-বিরুদ্ধবাদীকে ইচ্ছে মতন দমন করতে পারবে! কারো কিছু বলার থাকবে না!

এখন পাঠক, আপনারাই বলুন উত্তেজক-আক্রমণাত্মক নির্দেশাবলী কি কেবল কোরানশরিফেই আছে? শ্রীমদ্ভগবদগীতাতে নেই? কোরানশরিফে বর্ণিত জেহাদের সাথে গীতার ধর্মযুদ্ধের তফাৎ কোথায়? দুই পক্ষই নিজ-নিজ ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে নিজেদের মতের বিরুদ্ধ মানুষকে (বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী যেই হোক) হত্যা করে 'ধর্মযুদ্ধ' বলে চালিয়ে দিতে চান! একপক্ষ চায় দারুল-ইসলাম, এক পক্ষ চায় ভগবানের দুনিয়া! জানি, এ প্রবন্ধ পাঠ করে সনাতন হিন্দুধর্মালম্বীরা নয়-ছয় করে (যেমনটা ইদানীং মডারেট-মুসলিমরা করে থাকেন) গীতায় বর্ণিত 'ধর্মযুদ্ধের' যৌক্তিকতা (বাস্তব উপযোগিতা) দান কিংবা মিল থাক বা না-থাক ভিন্ন অর্থ (বা রূপক অর্থ) খোঁজার চেষ্টা করবেন; কিংবা চেষ্টা করবেন মহাভারতের বিশাল গল্পগুলি ফেঁদে ধর্মযুদ্ধের বক্তব্যকে তৎকালীন প্রেক্ষাপটের রচনা বলে চালিয়ে দিতে! কিন্তু নিরেট সত্য হচ্ছে এতে সাময়িক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোনো লাভই হয় না।

এবার গীতার ধর্মযুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা শেষে অন্য আলোচনায় যাই। গীতাকে অনেক ভাষ্যকাররা (শঙ্করাচার্য) হিন্দুদের আরেকটি ধর্মগ্রন্থ 'উপনিষদ' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে, উপনিষদ বেদান্ত বা বৈদিক সাহিত্যের শেষভাগের অন্তর্গত, ভগবদ্গীতা বুঝি সেই শ্রেণিরই একটি উপনিষদ। প্রকৃতপক্ষে বিশেষজ্ঞরা এবং অদ্বৈত অথবা বেদান্ত দর্শনের প্রবক্তারা গীতাকে উপনিষদ থেকে আলাদা করে দেখেন। তাহলে প্রশ্ন চলে আসে, গীতাকে কেন উপনিষদ বলা হয়? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর—গীতা প্রাচীন উপনিষদের অনেক পরবর্তীকালের রচনা হলেও অনেকের মতে এই গীতা উপনিষদের সার সংগ্রহ বিশেষ। পণ্ডিত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং মনে করেন ভগবদ্গীতার সঙ্গে অন্তত তেরোটি উপনিষদের কোনো না কোনো মিল রয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদের গুরু স্বামী বিবেকানন্দও এই মত সমর্থন করে বলেছেন—গীতা প্রাচীনতর উপনিষদগুলোর পরবর্তীকালের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য বিশেষ। তাঁর মতে—"The Geeta is a Commentary on the Upanishads… The Geeta takes the idea of the Upanishads and in (some) cases the very words. They are strung together with the idea of bringing out, in a compact, condensed and systematic from, the whole subject the Upanishads deal with." (দ্রষ্টব্য : সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা, পৃষ্ঠা ২৯-৩০)। আবার গীতার অনেক শ্লোক এবং বক্তব্যের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের বিশেষত 'ধম্মপদ' এবং 'সুত্তনিপাত'—এর অনেক অংশের সঙ্গে মিল রয়েছে; কিন্তু এসব গ্রন্থে কিংবা অন্য কোনো প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে গীতার কোনো উল্লেখ নেই। যদিও বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিব সঠিক বয়স নির্ধারণ করা কঠিন, তবু মনে করা হয় গ্রন্থগুলি বুদ্ধের সমকালে কিংবা তার অল্প কিছু কাল পরে, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর বেশ আগেই রচিত।

বর্তমানে প্রচলিত মহাভারত অনুযায়ী গীতা ভীষ্ম পর্বের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিক, পশ্চিমা পণ্ডিত গীতাকে আদি মহাভারতের অঙ্গ বলে মনে করেন না, বরং পরবর্তীকালের পল্লবিত মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত সংযোজন বলে মনে করেন। এঁদের মধ্যে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তিলক, ভাণ্ডাকর, রাধাকৃষ্ণণসহ প্রমুখ ভারতীয়, আর লাসেন, লরিনসার, গারবে, ভ্যান বুইটিনেন প্রমুখ পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ। ভগবদ্গীতা আদি মহাভারতে ছিল না, পরবর্তীকালে সংযোজন করা হয়েছে, এ সিদ্ধান্তের সপক্ষে তাঁদের কিছু যুক্তি সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা গ্রন্থ (পৃষ্ঠা ৩১-৩৩) থেকে নিচে তুলে ধরা হলো :—

(১) মহাভারতের উপক্রমণিকার সংক্ষিপ্তসারে অথবা আদিপর্বের প্রথমে দেয়া সংক্ষিপ্তসারে গীতার উল্লেখ তো দূরের কথা, কৃষ্ণ ও অর্জুনের মধ্যে কোনো কথোপকথনেরই উল্লেখ নেই। যদিও অনেক তুচ্ছ ঘটনার উল্লেখ

আছে। দুটি সংক্ষিপ্তসারই আদি মহাভারতে গীতা সংযোজিত হবার আগে রচিত হয়েছিল এবং পরে তা আর সংশোধন করা হয়নি, এ অনুমান যুক্তিসম্মত।

(২) উপরোক্ত দুটি সংক্ষিপ্তসারে, অথবা আদিপর্বের সুদীর্ঘ 'ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে' কোথাও 'কুরুক্ষেত্র' শব্দটিই নেই। মনে হয় একটি বড় জ্ঞাতিযুদ্ধের লোকগাঁথা মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধির কোন পর্যায়ে কুরুক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল।

(৩) জার্মান পণ্ডিত লাসেন এবং অ্যালব্রেখট্ ওয়েবার, ইংরেজ পণ্ডিত মনিয়ের উইলিয়ামস্‌সহ অনেক বিশেষজ্ঞ এই বিষয়ে একমত যে, পাণ্ডবেরা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক কবিকল্পনা মাত্র, এবং যে যুদ্ধের কথা প্রাথমিক পর্যায়ের মহাভারতে ছিল তা প্রকৃতপক্ষে কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ, কুরুপাণ্ডবের নয়। মহাভারতে পাণ্ডব পক্ষের অস্তিত্ব এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের মুখ্য ভূমিকা পরবর্তীকালের সংযোজন। বঙ্কিমচন্দ্র পাণ্ডবদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার না করলেও একথা মেনে নিয়েছেন যে, মহাভারতের যুদ্ধ প্রধানত কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ।

(৪) সাংখ্য দর্শন এবং যোগ দর্শনের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে গীতার রচনাকারের পরিচয় ছিল। অথচ এইসব দর্শন গড়ে উঠবার আগেই মূল মহাভারত রচিত হয়েছিল। অতএব গীতার পরবর্তীকালের রচনা এবং পল্লবিত মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত।

(৫) ভাষা ও রচনাশৈলীর বিচারে গীতা মূল মহাভারতের চেয়ে আরও বিবর্তিত, অতএব আধুনিক এবং প্রক্ষিপ্ত।

(৬) মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে হঠাৎই ভগবদ্‌গীতা আরম্ভ হচ্ছে এবং দীর্ঘকাল পরে শেষ হচ্ছে। যুদ্ধের ঘটনা প্রবাহ অকারণে থমকে দাড়িয়ে আছে। গীতা আরম্ভ হবার আগে দু'পক্ষের শংখনাদের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ প্রায় আরম্ভ হয়ে গেছে। আবার আঠারো পরিচ্ছেদের গীতা শেষ হওয়া মাত্রই যুদ্ধ আরম্ভ হচ্ছে। এত দীর্ঘ সময় কৃষ্ণ ও অর্জুন ছাড়া বর্ণিত লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা কি করছিলেন তার কোন ব্যাখ্যা নাই। প্রকৃতপক্ষে ঘটনা পরম্পরা, রচনা বিন্যাস, ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয় সংলাপ এবং সাহিত্যকতার বিচারে মহাভারতে গীতা সংক্রান্ত কিছু না থাকলেও কোন ক্ষতি ছিল না। এই সামঞ্জস্যহীনতা কোন মহাকবির কলমে সম্ভব নয় বলে মনে হয়। মহাভারতের অঙ্গ হিসেবে ভগবদ্‌গীতার এই সাহিত্যিক অসংগতিটির দিকটি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন—"...কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ থামিয়ে রেখে সমস্ত গীতাকে আবৃত্তি করা সাহিত্যের আদর্শ অনুসারে নিঃসন্দেহে অপরাধ। ...যখন কুরুক্ষেত্রের তুমুল যুদ্ধ আসন্ন তখন সমস্ত ভগবদ্‌গীতা অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতে পারে, ভারতবর্ষ ছাড়া এমন দেশ জগতে আর নাই।"

(৭) ভগবদ্‌গীতা শেষ হয়ে যাবার অনেক পরে নবম দিনে যুদ্ধের সময় অর্জুনের আচরণ এবং কৃষ্ণার্জুন সংলাপ গীতা প্রবচনের ঘটনার সঙ্গে সংগতিবিহীন...।

মহাভারতের উপক্রমণিকার (মুখবন্ধ) বক্তব্য অনুযায়ী, ব্যাসদেবের লেখা মহাভারতে প্রথমে মাত্র চব্বিশ হাজার শ্লোক ছিল, এবং তাতে কোন উপাখ্যান ভাগ ছিল না। এরপর ব্যাসদেব নাকি ষাট লক্ষ শ্লোকের এক বিরাট মহাভারত রচনা করেন। এর মধ্যে ত্রিশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, পনের লক্ষ শ্লোক পিতৃলোকে, আর চৌদ্দ লক্ষ গন্ধর্বলোকে চলে যায়! বাকি এক লক্ষ পৃথিবীতে রয়ে যায়। এই ধরনের 'ঠাকুরমার ঝুলির গল্প' বাদ দিলেও বোঝা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ের চব্বিশ হাজার শ্লোকের মহাভারত কালক্রমে বিভিন্ন মুনি-ঋষির হাত ধরেই পল্লবিত হতে হতে এক সময় এক লক্ষ শ্লোকের মহাভারত হয়ে উঠে। অবশ্য আরেকটি মত অনুযায়ী, প্রাথমিক পর্যায়ের

আট হাজার শ্লোকের 'জয়' নামক একটি কাব্য পরবর্তীকালের চব্বিশ হাজার শ্লোকের 'ভারত' নামে মহাকাব্যে পরিণত হয়, এবং আরও পরে এই মহাকাব্য এক লক্ষ শ্লোকের মহাভারতে পরিণত হয়। যা হোক, আমরা সে দিকে যাচ্ছি না। এ বিষয়টি হয়তো অনেকে জানেন, তৎকালীন সময়ে মানে খ্রিস্টপূর্ব সময়ে লেখ্যরীতি আবিষ্কারের পূর্বে এবং পরেও দীর্ঘদিন প্রচুর মানুষ বংশপরম্পরায় কোনো ছন্দোবদ্ধ কবিতা, লোককাহিনী, উপাখ্যান কণ্ঠে ধারণ (মুখস্ত) করে রাখতো। বিশ্বের বেশিরভাগ ধর্মগ্রন্থগুলোর ভাষ্য এভাবে মানে সুদীর্ঘকাল বংশপরম্পরাতেই কণ্ঠে ধারণ করা ছিল এবং পরবর্তীতে ক্ষমতাসীন রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় সময়ে-সময়ে লিখিতরূপ পেয়েছে। সাম্প্রতিককালের গবেষকরা এই বিষয়ে একমত যে, আমাদের মহাভারতের মূল কাহিনীও লোকমুখে মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী থেকে প্রচলিত থাকলেও আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেই প্রথম লিখিতরূপ নেয়। কিন্তু চারশ বছরের মৌখিক পরম্পরাতেই এর কলেবর অনেক বৃদ্ধি পায়। তারপর আনুমানিক খ্রিস্টাব্দ চতুর্থ শতক পর্যন্ত, এমনকি তারপরেও, মহাভারত আয়তনে অনেক বৃদ্ধি পায়। আর এভাবেই প্রায় বারোশ বছর ধরে অগণিত লেখকের হস্তক্ষেপে চব্বিশ হাজার শ্লোকের আদি মহাভারত প্রায় এক লক্ষ শ্লোকের মহাভারতে পরিণত হয়। (দ্রষ্টব্য : সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫)

গীতার রচনাকাল সম্পর্কে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ মনে করেন গীতা খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত। পশ্চিমবাঙলার বিদগ্ধ লেখক জয়ন্তানুজ বন্দোপাধ্যায় মনে করেন আদি গীতার রচনাকাল এরকম হলেও মহাভারতের অংশ হিসেবে বর্তমানে প্রচলিত গীতা আরও পরবর্তীকালের সংযোজন। স্বামী বিবেকানন্দ কৃষ্ণ ও যিশুর প্রচলিত জীবনকথা তথা ভগবদ্গীতা ও নিউ টেস্টামেন্টের মধ্যে অনেক মিলের কথা উল্লেখ করেছেন। রিচার্ড গার্বে মনে করেন যে, গীতা রচিত হয় খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক রাবার্ট মাইনর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ২৫০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ২৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভগবদ্গীতা রচিত হয়েছিল এবং ১৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল। যদিও তারপরেও মহাভারতের সঙ্গে সঙ্গে গীতার আরও পরিবর্তন হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মত অনুযায়ী মহাভারতের অঙ্গ হিসাবে গীতার জন্মলগ্নে নিঃসন্দেহে খ্রিস্ট পরবর্তীকালে। অধ্যাপক দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বির মতে, 'গীতা জালিয়াতির ফসল', গীতার রচনাকাল কোনোক্রমেই খ্রিস্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগের আগে হতে পারে না এবং তারপরেই কোনো সময়ে গীতা পল্লবিত মহাভারতে সংযোজিত হয়েছিল। একথাও মনে রাখা দরকার যে, অনেক গবেষক, ঐতিহাসিকের মতে গীতা কোনো একক লেখকের রচনা নয় এবং সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিকই; কারণ এতো দীর্ঘকাল (দুইশত, তিনশত বছর কিংবা আটশত বছরই হোক) ধরে নিশ্চয় একজন ব্যক্তির পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। বর্তমানে প্রচলিত গীতা বহুকাল ধরে অনেক লেখকের রচনা, পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনের ফসল। রাজারাম শাস্ত্রী ভাগবতের মতে গীতায় প্রথমে শুধু ষাটটি শ্লোক ছিল। পরবর্তীকালে ছয়টি পর্যায়ে ক্রমশ পল্লবিত হয়ে এটি বর্তমান সাতশ শ্লোকের গীতায় রচিত হয়। ফন হামবোলড্ নামে জার্মান গীতা বিশেষজ্ঞের মত হচ্ছে ভগবদ্গীতা প্রথমে একাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। বাকি সাত পরিচ্ছেদ পরবর্তীতে যোগ করা হয়েছে। অ্যালব্রেখট ওয়েবার, হলস্টারম্যান, হপকিসন্, জ্যাকবি প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই মতের সমর্থক। জি. এস. খইর নামে একজন ভারতীয় বিশেষজ্ঞ এই মত প্রকাশ করেন যে, বিভিন্ন পর্যায়ে তিনজন লেখক গীতার রচনা করেছেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার (যাকে অনেক গোঁড়া হিন্দু বলে দাবি করেন) মনে করেন ভগবদ্গীতা বেশ কয়েকজন বড় বড় কবি, দার্শনিক এবং ভক্তের রচনার ফসল। ১৯৮৬ সালে মৃত্যুর অল্পকাল আগে অধ্যাপক এ. এল. বেশম এক বক্তৃতামালায় বলেছেন ভগবদ্গীতা তিনটি পর্যায়ে তিনজন লেখক দ্বারা রচিত হয়েছিল্ প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম অধ্যায়ের ৪৭ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম ৩৮, এই ৮৫টি শ্লোক দিয়ে গীতা রচিত হয়েছিল। এখানে শুধু ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ করবার দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপরই গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে একজন বেদান্ত বাদী লেখক অদ্বৈতব্রহ্মের তত্ত্ব যোগ করে কলেবর অনেক বৃদ্ধি করেন। শেষ পর্যায়ে একজন বিষ্ণুভক্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী গীতায় বিষ্ণুর অবতারত্ব সংযোজন করেন, আর বাসুদেব কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত

করতে চেষ্টা করেন। আশ্বমেধিক পর্বের অনুগীতার সঙ্গে ভীষ্মপর্বের ভগবদ্গীতার তুলনা করে বেশম এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, অনুগীতা রচনার সময় ভগবদ্গীতায় বিষ্ণু অবতারের কোনো চিহ্ন ছিল না। উল্লেখ যে, বেশমের অনেক আগে এফ. ও. শ্রেডার নামে একজন জার্মান বিশেষজ্ঞ মূলতঃ একই মত প্রকাশ করেছিলেন। (দ্রষ্টব্য : সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা, পৃষ্ঠা ৩৬-৩৮)

গীতার সময়কাল নির্ধারণের জন্য উপরের এই বিস্তৃত আলোচনা থেকে আমরা ধরে নিতে পারি, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিস্টাব্দ চতুর্থ শতকের মধ্যে ভগবদ্গীতা পর্যায়ক্রমে রচিত, পরিবর্ধিত এবং মহাভারতে সংযুক্ত হয়েছিল। আর এই সময়টাই ছিল মহাভারতে ব্রাহ্মণ্য সংযোজনের যুগ।

গীতার শ্রীভগবান : গীতাকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ভগবানের মুখঃনিসৃত বাণী বলে সম্মান করে থাকেন, পূজা করে থাকেন। আর এই ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি বিষ্ণুর স্বয়ং অবতার, তিনি মহাকাল; তিনি সময়ে সময়ে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন! ভগবদ্গীতাতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও এমন দাবি করেছেন; দেখুন ৪:৭-৮, ১০:২১, ১১:২৪, ১১:৩০, ১১:৩২। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বিষ্ণু কে? পাঠক, শ্রীকৃষ্ণ কোনো ঐতিহাসিক পুরুষ কী-না বা আদৌ তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন কী-না, আমি সে দিকে যাচ্ছি না। (মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নিয়ে নানা সন্দেহ ও সংশয় রয়েছে। এ বিষয়ে আগ্রহীরা পড়তে পারেন : মহাকাব্য ও মৌলবাদ, পৃষ্ঠা ৬৮-১০৮) আমরা এখন দেখব, শ্রীকৃষ্ণ যদি সত্যিই জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তবুও তিনি 'বিষ্ণু' নামক ভগবানের অবতার হতে পারেন কী-না।

সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে আমরা জানি যে, প্রাচীনকালে মানুষের বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব ছিল। প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ যেমন ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাত-বন্যা, দাবানল কিংবা রাতের বেলা চন্দ্রের উদয়, দিনের বেলা সূর্য, জোয়ার-ভাটার খেলা, বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন ঋতুর চক্রাকারে আগমন ইত্যাদি মানুষকে বিপুল পরিমাণে বিস্মিত করতো; প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে 'জীবন' আছে, আস্তে আস্তে এই ধারণাও তাদের মধ্যে কাজ করে, সৃষ্টি করে প্রচণ্ড ভীতির; ফলে সূর্য, চন্দ্র, মেঘ, বিদ্যুৎ, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতিকে বিভিন্ন দেবদেবীরূপে কল্পনা করতো। তেমনিভাবে পৃথিবীতে অগ্নি, জল, মাটি পর্বত, নদী, বন প্রভৃতি অনেক প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যেই দেবদেবীর আধিষ্ঠান কল্পনা করতো; যেমন গ্রিক কিংবা রোমানদের প্রাচীন উপাখ্যান থেকে জানা যায়, তারা সমুদ্রের দেবতা হিসেবে নেপচুন, পৃথিবীর অভ্যন্তরের পাতালের দেবতা হিসেবে প্লুটো এবং আগ্নেগিরির দেবতা হিসেবে ভালকানকে পূজা করতো। মোট কথা হচ্ছে আদিম-অসহায় মানুষ প্রকৃতির এই রূপবৈচিত্র্য সম্পর্কে যৌক্তিক স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে না পেরে 'মানুষের থেকে শক্তিশালী' একাধিক দৈবশক্তির কাজকারবার বলেই ধরে নিত। আর এই দৈবশক্তিকে নিজেদের বশে রাখার উদ্দেশ্যে-তুষ্ট রাখার জন্য (কিংবা অজ্ঞতা, ভয়-ভীতি, কল্পনা থেকেও) প্রার্থনা-উপাসনার সৃষ্টি করে; সৃষ্টি করে বিভিন্ন দেবদেবীর, ঈশ্বরের অস্তিত্বের আর এভাবেই সৃষ্টি হয় ধর্মগুলোর। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিক গবেষণার দ্বারাই এমন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন আধুনিককালের গবেষকেরা। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা তো এখনো শিবলিঙ্গ হিসেবে পাথরকে, গঙ্গা নদীকে দেবী হিসেবে, রামায়ণের কাহিনী থেকে হনুমান বানরকে, কৃষ্ণের বাহন হিসেবে গরুকে, মনসাদেবীরূপে সাপকে পূজা করে! প্রাচীনকালের মানুষের উপাসনার রীতিনীতি আর বিশ্বাস এই আধুনিককালের হিন্দুদের মধ্যেও বর্তমান! যাহোক, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মানুষের কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর, শক্তিশালী, এবং সর্বব্যাপী সত্তা ছিল সূর্য, আর তার পরেই ছিল চন্দ্র। বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহকেও দেবতা জ্ঞান করা হতো। এর মধ্যে সূর্যের প্রখরতার জন্য তাকে পুরুষ দেবতা এবং চাঁদের স্নিগ্ধতার জন্য তাকে সাধারণত দেবী হিসেবে কল্পনা করা হতো (ব্যতিক্রম হচ্ছে আরবদেশে চাঁদকে পুরুষ দেবতা আর সূর্যকে নারীদেবতা হিসেবে গণ্য করা হত)। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, প্রাচীন মিশরে 'রা' এবং গ্রিসে 'এপোলো' নামে সূর্যকে শ্রেষ্ঠ দেবতা রূপে পুঁজো করা হতো।

ভারতবর্ষেও বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত সূর্যকেই প্রধান দেবতা রূপে কল্পনা করা হতো। প্রাচীনকালে গ্রিসে এবং ভারতের অভিজাত শ্রেণী রথে চড়ে যাতায়াত করতেন। তাই এসব দেশে কল্পনা করা হতো যে, আকাশে সূর্যদেবতাও রথে চড়ে যাতায়াত করেন, আর বিভিন্ন দেবতা তার রথের অশ্ব-সারথি ইত্যাদি। আধুনিক যুগেও ভারতে এরকম ধারণা প্রতিষ্ঠিত ছিল; কোণারকের সূর্যমন্দিরসহ ভারতবর্ষের অন্যান্য সূর্যমন্দির তার প্রমাণ। আবার মিশরীয়দের কাছে নীলনদ ছিল যাতায়াত-ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন। তাই তারা কল্পনা করতো দেবতাশ্রেষ্ঠ সূর্য আকাশ পথে নৌকায় করে যাতায়াত করেন আর বাকি দেবতারা সেই নৌকার মাঝি।

প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে সূর্য আর বিষ্ণুর মধ্যবর্তী সম্পর্ক নিয়ে আমি এবার কিছুটা সংক্ষিপ্তাকারে জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাকাব্য ও মৌলবাদ গ্রন্থ থেকে তুলে ধরছি। লেখক উক্ত গ্রন্থে বেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ, শুক্লযজুর্বেদ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত পুরাণ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ থেকে বিভিন্ন শ্লোক বা উদ্বৃতি তুলে ধরে স্থির সিদ্ধান্তরূপে দেখিয়ে দিয়েছেন, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে 'সূর্য'কেই দেবতাশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু হিসেবে গণ্য করা হতো। 'বিষ্ণু' শব্দের আক্ষরিক অর্থ (বিষ্ণু = বিস্তার + নু) যার বিস্তার বা ব্যাপ্তিই পরিচয়। পৃথিবী থেকে আপাতদৃষ্টিতে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের দিকে তাকালে মনে হয় সূর্যেরই আছে একমাত্র এই পরিচয়; অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রগুলো সূর্যের পাশে একদম ম্রিয়মাণ। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ২২ সূক্তের ১৬-১৭ ঋকে একই সঙ্গে অশ্বীদ্বয়, সবিতা এবং বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। এখানে দুটি ঋকে তিন পাদবিক্ষেপে বিষ্ণুর পৃথিবী পরিক্রমার কথা বলা হয়েছে। নিরুক্ত টীকাকার দূর্গাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন : "বিষ্ণুরাদিত্যঃ।... সমারোহণে উদয়গিরৌ ঊদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে। বিষ্ণু পদে মধ্যন্দিনেহন্তরীক্ষে। গয়শিরস্যস্তং গিরৌ ইতি ঔর্ণবাভ আচার্য্যো মন্যতে।" ভাবার্থ হচ্ছে, সূর্যই বিষ্ণু, তার উদয়কালীন, মধ্যাহ্নকালীন আর অন্তকালীন এই তিন পাদবিক্ষেপ। বিশেষত মধ্যদিনে অন্তরীক্ষে অবস্থিতিই সূর্যের বিষ্ণুত্ব। বিষ্ণুর এই তিন পাদে পৃথিবী পরিক্রমার কথা ঋগ্বেদের আরও কয়েকটি সূক্তে আছে; এগুলো হচ্ছে, ৯/১৫৪/১-৬, ১/১৫৫/৪-৬, ১০/৩৭/৮। এছাড়া ঐ ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের ১৫৫ সূক্তের ৫নং ঋকে বলা হয়েছে যে, "মানুষেরা বিষ্ণুর দুই পাদই অবলোকন করতে পারে এবং ধারণা করতে পারে। তৃতীয় পাদ মানুষেরা ধারণা করতে পারে না, এমনকি উড্ডীয়মান পাখিরাও প্রাপ্ত হইতে পারে না।" অর্থাৎ মধ্যাহ্নের সময় সূর্যকে নিরীক্ষণ করা মানুষের পক্ষে কঠিন এবং পাখীদের পক্ষেও তার কাছাকাছি যাওয়া অসম্ভব। একই সূক্তের পরবর্তী ৬নং ঋকে বলা হয়েছে যে, "বিষ্ণু চারটি নব্বই দিনকে চক্রের ন্যায় বৃত্তাকারে চালিত করেন।" এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে বৈদিক যুগে প্রচলিত চার ঋতুর নিয়ন্তা হিসেবে সূর্যের কথা এখানে বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের ১/১৫৪/৪-৬, ১/১৫৫/৪, ১০/৩৭নং সূক্তে বিষ্ণু এবং সূর্য উভয়কে জ্যোতির উৎস, অন্ন উৎপাদক, জগতের রক্ষাকর্তা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সূর্য, বিষ্ণু, সবিতা একই দেবতা, অশ্বীদ্বয় তাদের রথের ঘোড়া। আর ঊষা এবং রাত্রি এই দুই দেবী সূর্য এবং বিষ্ণুর গতি দ্বারাই সৃষ্ট। প্রাচীনকালে বড় বড় প্রাকৃতিক সত্তাগুলির বিভিন্ন নাম দেয়া হত; কিন্তু এসব বিভিন্ন নাম একই সত্তাকে নির্দেশ করতো। সূর্যের বিভিন্ন নাম সম্বন্ধে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৬৪নং সূক্তের ৪৬নং ঋকে বলা হয়েছে : "এই আদিত্যকে জ্ঞানীগণ ইন্দ্র, মিত্র ও বরুণ বলে থাকেন। ইনি স্বর্গীয়, পক্ষবিশিষ্ট এবং সুন্দর গমনশীল। ইনি এক হলেও বিপ্রগণ একে বহু নামে অগ্নি, যম ও মাতারিশ্বা বলে থাকেন।" মনে রাখা দরকার সূর্যের ত্রিপাদ বিক্ষেপের রূপক থেকেই সম্ভবত পরবর্তীকালে ত্রিপাদে বিশ্বভুবন অধিকার এবং বলি দমনের পৌরাণিক কাহিনী রচিত হয়েছিলো। ঋগ্বেদের ১০/১/১-৩ নং ঋকে স্পষ্ট বলা হয়েছে অগ্নি, সূর্য, বিষ্ণু একই দেবতা। দশম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম ঋকে অগ্নি এবং সূর্য অভিন্ন করে বলা হয়েছে "ভোর হতে না হতে বৃহৎ এবং সৌন্দর্যময় অগ্নি অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে আলোকজ্বল মূর্তি ধারণ করলেন এবং উজ্জ্বল রশ্মি দিয়ে সমস্ত বিশ্ব আলোকিত করলেন।" পরবর্তী ২য় ঋকে এই অগ্নিরূপী সূর্যকে 'আশ্চর্য বালক' বলে সম্বোধন করা হয়েছে; এবং এর পরবর্তী ৩য় ঋকে স্পষ্ট করে ঘোষণা করা হয়েছে যে, এই অগ্নিই বিষ্ণু, কারণ তিনি চারদিকে ব্যাপ্ত।

১০/৩/১-২নং ঋকে আবার একইভাবে সূর্যকে অগ্নিরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১০/৫/৭ নং ঋকে আবার বলা হয়েছে যে, অগ্নিই সূর্যরূপে ঊর্ধাকাশে অবস্থান করছে। সামবেদ সংহিতাতে (১৭/১/১/১৬২৫-২৬) বলা হয়েছে "হে বিষ্ণু ! এই যে তুমি বললে আমি বালরশ্মি দ্বারা পরিবেষ্টিত, এই কি তোমার একমাত্র রূপ? তুমি সংগ্রামের (আপাত ক্রুদ্ধ অবস্থায় মধ্যদিনে) অন্যরূপ ধারণ করে থাকি; আমাদের কাছে তোমার সেই অন্যরূপ প্রকাশিত কর। ... আমি অতি ক্ষুদ্র, আর তুমি অন্তরীক্ষে লোকের অতি দূরে নিবাসকারী। সেই মহান তোমাকে আমি স্তব করছি।" আবার সামবেদ সংহিতায় (১৮/২/৫/১৬৭০-৭৪) বলা হয়েছে, "বিষ্ণু এই চরাচর বিশ্ব পরিভ্রমণ করেন। এর পদ সুদৃঢ়রূপে অন্তরীক্ষে স্থাপিত। ইনি তিন প্রকারে পদক্ষেপ করেন। বিষ্ণু গোপা অন্তরীক্ষে অবস্থান করে তিন পাদের দ্বারা পৃথিবী পরিক্রমা করেন। এবং সকল ধর্মকে ধারণ করেন। ...যখন বিষ্ণু পৃথিবীর সর্বত্র পরিক্রমা করেন, তখন রশ্মিরূপে দেবগণ আমাদের জন্য পৃথিবীতে প্রবেশ করেন।" এছাড়াও শুক্লযজুর্বেদ সংহিতায় (যেমন ২/২৪-২৬, ৩/৬, ৪/২৯-৩০, ৫/১৪-১৫, ৫/৩৭, ৫৪১, ৯/৩১, ৭/১৬) প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সূর্য ও বিষ্ণুর অভিন্নতার তত্ত্ব বারবার উল্লেখিত হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪/১/১/১৫-১৬) বলা হয়েছে, "যজ্ঞের ফল বিষ্ণু প্রথম পেয়েছিলেন, তাই তিনি দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যিনি বিষ্ণু, তিনি যজ্ঞ, তিনিই আদিত্য।" (বিস্তারিত আলোচনার জন্য পড়ুন মৌলবাদ ও মহাকাব্য, পৃষ্ঠা ১২৯-১৩৩)

তাহলে বুঝা যাচ্ছে, সূর্য উপাসনা ছিল বৈদিক ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের মতো এদেশের তৎকালীন লোকেরা উপলব্ধি করেছিল যে, আকাশের সূর্যই আমাদের এ পৃথিবীতে আলোকের, প্রাণের এবং অন্নের উৎস। অতএব এই শক্তিমান সূর্যকেই ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা (পুরোহিত শ্রেণির লোক) শ্রেষ্ঠ দেবতা জ্ঞান করে যজ্ঞের মাধ্যমে নিরন্তর স্তুতি করতেন, বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য উপহার দিতেন, নিজেদের সামূহিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য তার কাছে প্রার্থনা জানাতেন। এবং পরবর্তীতে তাকে নিয়ে কাহিনী ফাঁদতেন। যার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়, রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি নামধারী কল্পিত ব্যক্তির উপর অবতারত্ব আরোপে। কিন্তু আমরা জানি, আমাদের এই সৌরজগতে সূর্য কতিপয় গ্যাসের সমন্বয়ে গঠিত একটি নক্ষত্র মাত্র। সূর্যের ভেতরের মূল রাসায়নিক উপাদানসমূহ হচ্ছে, হাইড্রোজেন-৯২.১%, হিলিয়াম-৭.৮%, অক্সিজেন-০.০৬১%, কার্বন-০.০৩০%, নাইট্রোজেন-০.০০৮৪%, নিয়ন-০.০০৭৬%, লৌহ-০.০০৩৭%, সিলিকন-০.০০৩১%, ম্যাগনেসিয়াম-০.০০২৪%, সালফার-০.০০১৫% এবং অন্যান্য-০.০০১৫%। সূর্যের মধ্যে প্রতি সেকেন্ডে ৬০০ মিলিয়ন টন হাইড্রোজেন গ্যাস, ৫৯৬ মিলিয়ন টন হিলিয়াম গ্যাসে রূপান্তরিত হচ্ছে আর বাকি ৪ মিলিয়ন টন শক্তিতে পরিণত হচ্ছে; যা আমরা আলো হিসেবে অবলোকন করে থাকি। সূর্যের ভিতরের এই বিপুল পরিমাণ শক্তির উদ্‌গিরণের ফলে সূর্যপৃষ্ঠের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৪০,০০০ ওয়াট আলোক নিঃসৃত হয়। যদিও এই মহাবিশ্বে সূর্যই একমাত্র বড় বা আলোক উজ্জ্বল নক্ষত্র নয়, সূর্যের থেকে হাজারগুণ বড় এবং আলোক উজ্জ্বল নক্ষত্র রয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই গ্যাসীয় পিণ্ডের একটি পদার্থ কি করে আমাদের এই পৃথিবীতে মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করতে পারে? যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ব্রাহ্মণ্যবাদের পক্ষে সাফাই গাইতে পারে? ভ্রান্ত জ্ঞানের ব্যাপ্তি কতটুকু পল্লবিত হলে এরকম কল্পনা করা সম্ভব? ধরে নিচ্ছি প্রাচীনকালের মানুষের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথাযথ বিকাশ হয়নি বলে তারা এই ধরনের ভ্রান্ত জ্ঞানের শিকার হয়েছিলেন, এ ক্ষেত্রে তাদের কোনো দোষ দেখছি না; হয়তো সেই সময় আমরাও এরকম ভ্রান্ত জ্ঞান চর্চার শিকার হতাম। কিন্তু আজকের এই বিংশ শতাব্দীতে এসেও বিপুল সংখ্যক হিন্দুধর্মাবলম্বীরা (এর মধ্যে ডিগ্রিধারী জ্ঞানীগুণী, রথীমহারথী রাজনৈতিক নেতাকর্মী, আমলা-কামলা থেকে শুরু করে রাস্তার ভিক্ষুক পর্যন্ত রয়েছেন) যখন কৃষ্ণকে বিষ্ণুর (সূর্যের) অবতার বলে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে দাবি করেন, মন্দিরে গিয়ে পূজা দেন, মথুরায় মসজিদ ভেঙ্গে কৃষ্ণের মন্দির বানানোর জন্য নিজের 'জান কোরবান' করতে ঘোষণা দেন, রাস্তায় গলা ফাটিয়ে অন্ধ-আবেগে মৌলবাদী স্লোগান দেন, তখন তাদেরকে কি বলা যায়?

গীতায় বিজ্ঞান : গীতায় বিজ্ঞানের অন্বেষণে যাওয়ার পূর্বে ইসকন কর্তৃক প্রকাশিত জীবন আসে জীবন থেকে গ্রন্থ থেকে স্বামী প্রভুপাদের কয়েকটি বাক্য (পৃষ্ঠা ২) আরেকবার পাঠ করে আসি (কারণটা এখন বলছি না, একটু পরেই বুঝতে পারবেন) : "একটা কুয়োতে একটা ব্যাঙ ছিল এবং তার এক বন্ধু এসে যখন তাকে প্রশান্ত মহাসাগরের কথা বলল, তখন সে তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করল, "ওঃ, এই প্রশান্ত মহাসাগরটি কি?" বন্ধু উত্তর দিল, "এটা একটি মহাসাগর—একটি প্রকাণ্ড বড় জলাশয়।" "কত বড়? এই রকম দুটো কুয়োর মতো?" তার বন্ধু উত্তর দিল, "না, না—তার থেকে অনেক বড়।" "কত বড়? এই রকম দশটা কুয়োর মতো? বিশটা কুয়োর মতো?" এইভাবে ব্যাঙ মশাই সমুদ্রের আয়তন সম্বন্ধে অনুমান করতে লাগলেন। কিন্তু এইভাবে কি কখনও প্রশান্ত মহাসাগরের বিশালতা উপলব্ধি করা যাবে? আমাদের ক্ষমতা, আমাদের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের অনুমানশক্তি অত্যন্ত সীমিত। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের সমস্ত অনুমানগুলি এই ব্যাঙ মশাইয়ের দর্শনের মতো।" আবার ঐ গ্রন্থের ৭নং পৃষ্ঠায়ও একই কথা বলা হয়েছে, কিন্তু আমি আর তাঁদের বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না। এবার চলুন গীতায় যাই। গীতা থেকে সামান্য কিছু শ্লোক উদ্বৃত করলে আশা করি আপনারাই অনেক কিছুই বুঝতে পারবেন! ইসকনসহ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দাবি মতো গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (বিষ্ণুর অবতার!) এই বিশ্ব-মহাবিশ্ব সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা; আমাদের মতো নাদান মনুষ্যজাতি থেকে শুরু করে সকল প্রাণী-উদ্ভিদ, জীব-জড় সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন, তিনি সবকিছুতেই আছেন, তিনি সর্বজ্ঞানী, তিনি লোকক্ষয়কারী অতি ভীষণ কাল...! থাক! থাক! আর না। ঈশ্বরের গুণাবলী নিয়ে এতো কথার দরকার নেই; আপনারা আমার থেকে নিশ্চয়ই আরো ভালো জানেন।

গীতার ভগবান মোক্ষযোগ অধ্যায়ে (১৮:৬১) বলেন : "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি/ভ্রাময়ন সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" অর্থ হচ্ছে, হে অর্জুন, ভগবান প্রাণীগণের হৃদয়ে বাস করে যন্ত্রারূঢ় পুতুলের মতো মায়া দ্বারা ভ্রমণ করান। বুঝলেন তো ভগবান প্রাণীগণের হৃদয়ে অবস্থান করেন? তা হৃৎপিণ্ড কি? কেনই-বা হৃৎপিণ্ডে অবস্থান করবেন? ওটা তো অনেকটা পাম্প মাত্র, যা সারা শরীরে রক্তপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। আধুনিককালে হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন সমস্যার কারণে ওপেন হার্ট সার্জারি-বাইপাস সার্জারি করা হয়, কিন্তু আত্ম-পরমাত্মা-ভগবানের অস্তিত্ব তো পাওয়া যায় না! থাকলেই না পাওয়া যাবে, কি বলেন? প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় ইসলাম ধর্মের একটি হাদিস আছে, ফেরেশতারা হযরত মুহম্মদের বক্ষবিদারণ করে হৃৎপিণ্ডের জমা রক্ত যা না-কী 'শয়তানি প্রণোদনার উৎস', তা পবিত্র পানি দ্বারা ধৌত করেছিলেন। এ ধারণাটি হাস্যকর। হৃৎপিণ্ড ধোয়ে-পরিষ্কার করে পাপ-চিন্তা দূর করা অসম্ভব; কারণ আমাদের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি (সেটা যতই ঈশ্বর লাভের চেষ্টায় বিভোর থাকুক কিংবা শয়তানি-কূটবুদ্ধি চালিত হোক) সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্ক; তাই প্রয়োজন মস্তিষ্ক ধৌত করা!! আসলে প্রাচীনকালে যখন চিকিৎসাবিজ্ঞান উন্নত ছিল না, তখন মানুষ ভাবতো হৃৎপিণ্ডই সবকিছু (কারণ আপাতদৃষ্টিতে সারা শরীরের মধ্যে একমাত্র হৃৎপিণ্ডেরই স্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করা যায়), যেমন ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে হৃৎপিণ্ড (ভুলভাবে আপেলের মতো) অঙ্কিত হয়ে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, গীতার সর্বজ্ঞানী শ্রীভগবান এ ভুলটি করলেন কিভাবে? স্বয়ং ভগবান কি জানতেন না, মস্তিষ্ক আর হৃৎপিণ্ডের কাজের পার্থক্য কী? এবার যাই গীতার কর্মযোগে (তৃতীয় অধ্যায়); সেখানে তিনি বলেন (৩:১৪) : "প্রাণীগণ অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়, যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি হয়, কর্ম হইতে যজ্ঞ হয়।" পাঠক 'যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি হয়', অংশটুকু মার্ক করুন। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, বৃষ্টি কিভাবে হয়? কিন্তু গীতার ভগবান তো দেখি দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণির বিজ্ঞান বইয়ের 'পানিচক্র' সম্পর্কেই জানেন না! তিনি আবার লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল, লোক সংহারে প্রবৃত্ত হয়েছেন! গীতার চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞানযোগে ভগবান অর্জুনকে বলেন (৪:৫), "তোমার এবং আমার বহু জন্ম হয়েছে; আমি সে সকল জানি, তুমি তা জান না।" আবার দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগে ভগবান বলেন (১০:৩), "তাঁর আদি নাই, জন্ম নাই, সর্বলোকের মহেশ্বর তিনি"। বক্তব্যটা কেমন যেন স্ববিরোধী হয়ে গেল মনে হচ্ছে? স্ববিরোধিতার আরো কিছু উদাহরণ দেই; গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে (মোক্ষযোগ, ১৮:৪০) বলেন, "ন তদস্তি

পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।/সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ॥" মানে হচ্ছে, পৃথিবীতে বা স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এমন কেউ নেই যে প্রকৃতিজ ত্রিগুণ থেকে মুক্ত হতে পারে। ত্রিগুণটা কি? (গীতার ভাষ্যে) ভগবানের মতে, ত্রিগুণ হচ্ছে সত্ত্ব, রজো, তম! কিন্তু গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগের ৪৫নং শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলেন, "বেদ ত্রিগুণাত্মক, তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও। অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত হও!" কিভাবে সম্ভব? আবার গীতার সন্নাসযোগের ১৫নং শ্লোকে শ্রী ভগবান বলেছেন, বিভু (ভগবান) কারো পাপ বা পূণ্য গ্রহণ করেন না। একই ধরনের বক্তব্য, বলা যায় আরো একটু সুন্দর করে, দয়া এবং উদারতার সাথে রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগে (৯:২৯) ভগবান বলেন, "সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।" বাঙলা হচ্ছে, আমি সর্বভূতের পক্ষেই সমান (সমদৃষ্টিসম্পন্ন)। আমার কোনো বিদ্বেষভাজন নেই, প্রিয়ও নেই। অথচ সপ্তম অধ্যায় জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগের ১৫নং শ্লোকে দেখা যায়, যারা ভগবানের ঈশ্বরত্বে, ধর্মমতে অবিশ্বাসী, তাদেরকে তিনি 'বিবেকশূন্য', 'নরাধম', 'পাপকর্মপরায়ণ' হিসেবে অভিহিত করেছেন! ভগবানের প্রচারিত ধর্মের প্রতি যাদের আস্থা নেই, তারা মৃত্যুময় সংসারে বারবার আবর্তিত হয় (৯:৩)! দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগে ভগবান বলেন (১৬:১৮-২০), "বল, দর্প, অহঙ্কার, ক্রোধের বশবর্তী বিদ্বেষকারী ব্যক্তিগণকে আমি অশুভ অসুর যোনিতে অজস্রবার নিক্ষেপ করে থাকি। মূঢ়েরা জন্মে-জন্মে অসুরযোনিপ্রাপ্ত হয় এবং আমাকে না পেয়ে আরো অধমগতিপ্রাপ্ত হয়" (মহাভারতের অনুশাসনপর্বের ১০২নং শ্লোকে অশাস্ত্রীয় কাজ করার ফলে অধমগতি লাভ করে তির্যকযোনিতে জন্মাবার কথা আছে)। দেখা যাচ্ছে, গীতার ভগবানও অন্য অনেক ধর্মের ঈশ্বরের মতো শুধুমাত্র নিজের ভক্তদের প্রতি দয়াশীল; কিন্তু নিরীশ্বরবাদী, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ভয়ানক নিষ্ঠুর! বরং মনে হয় গীতার ভগবান একটু বেশিই এগ্রেসিভ! কারণ আর কোনো ধর্মে এরকম নিরন্তর-জন্মজন্মান্তর ধরে নিরীশ্বরবাদীদের প্রতি, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শাস্তির বিধান (অসুরযোনিতে নিক্ষেপ) আছে কী-না আমার জানা নেই! যাহোক, বুঝি নারে ভাই, বিজ্ঞানময় কিতাবে ভগবান এমন স্ববিরোধী বক্তব্য দেন কিভাবে? আমরা তো জানি বিজ্ঞানের কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্বে পৌঁছুনোর আগে সংগৃহীত তথ্যগুলিতে যদি পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য থাকে, তবে সেই তথ্যগুলি তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দেওয়া হয়। বিজ্ঞাসম্মত বলে স্বীকার করা হয় না। অনেক প্রক্রিয়ার মধ্যে এটা বিজ্ঞানের একটা মানদণ্ড। ভগবানকে তো পাব না, তাই আজকের যুগের গীতাদরদী ধর্মবণিকদের অনুরোধ করছি, গীতাকে 'বিজ্ঞানময় কিতাব' প্রমাণ করতে হলে কষ্ট করে শ্লোকগুলির ঝটপট একটা ভিন্ন ব্যাখ্যা তৈরি করে ফেলুন, অথবা জোড়াতালি দিয়ে পাবলিককে বোঝানোর জন্য বক্তব্য তৈরি করে রাখুন!

গীতার বিভিন্ন শ্লোকে ভগবান আত্ম-পরমাত্মা (ঈশ্বর) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। বেশিরভাগ বর্ণনা পাওয়া যাবে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগে; সেখানে আত্মার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, চিরস্থায়ী, সর্বব্যপ্ত, সনাতন আবার সাথে-সাথে এও বলা হয়েছে, আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য ইত্যাদি; এমন কী আত্মা হিসেবে ভগবান নিজেকেই দাবি করেছেন (১০:২০)। প্রাচীনকালের চার্বাক দার্শনিকগণ আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সেই কবেই, বলেছেন দেহ ছাড়া আত্মা বলে স্বতন্ত্র কিছু নেই; ওগুলো জর্ফরীতুর্ফরী, ধূর্ত পণ্ডিতের বাক্যমাত্র! চার্বাকবাদীদের আত্মা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বা তাদের নিজস্ব দর্শন নিয়ে জানতে হলে পড়ুন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের লোকায়ত দর্শন বা ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে গ্রন্থটি। আজকে যুগে বিজ্ঞানও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না; আত্মা বা ভূত ঐ জাতীয় যা কিছু আধোভৌতিক দর্শনের দাবি করে কিছু মানুষ, তা বিজ্ঞানের ভাষায় দৃষ্টিবিভ্রম অথবা মানসিক রোগের লক্ষণ। আত্মার অনস্তিত্ব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে, প্রবীর ঘোষের অলৌকিক নয় লৌকিক গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে; আর আত্মা নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার জন্য পড়ুন অভিজিৎ রায়ের আত্মা নিয়ে ইতং বিতং প্রবন্ধটি। তাই আমি আর এ আলোচনাতে যাচ্ছি না।

গীতার একাদশ অধ্যায় বিশ্বরূপ-দর্শনযোগে ভগবান যখন শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর বিশ্বরূপ ধারণ করলেন (১১:২৩-৩১), ভগবানের আকাশস্পর্শী তেজোময় দীর্ঘ দন্তযুক্ত মুখমণ্ডল, উজ্জ্বল বিশাল চক্ষু, বহু বাহু, বিশাল ঊরুপদ-

উদর বিশিষ্ট উগ্রমূর্তি দেখে অর্জুন ভয় গেলেন, জানতে চাইলেন তিনি কে? উত্তরে ভগবান জানালেন (১১:৩২), "আমি লোকক্ষয়কারী মহাকাল, লোক সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি... ।" এতো কিছু বলার পরও আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, বিভূতিযোগে (দশম অধ্যায়) নিজের শ্রেষ্ঠত্ব তুলনা করতে গিয়ে ভগবান বললেন (১০:৩১), "তিনি মৎসদের মধ্যে মকর (কুমির), সমস্ত নদীর মধ্যে গঙ্গা!" গঙ্গা নদী কি খুব বিশাল নদী না-কী এ পৃথিবীতে? এর থেকে বড় নদী নাই? না-কী ভগবান সে সকল নদীর নাম জানতেন না? কিংবা গঙ্গার সাথে তুলনা করার অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে, হয়তোবা! এছাড়া দেখুন ভগবান নিজেকে মাছের মধ্যে কুমিরের সাথে তুলনা করছেন (ছি! ছি! হাতির সাথে পিঁপড়ার তুলনা কি যথার্থ!) । কুমির কি মাছ? কুমির হচ্ছে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী; সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীদের সাথে মাছের পার্থক্য জানতে হলে তো সর্বজ্ঞানী ভগবানকে এখন দেখি মাধ্যমিক শ্রেণীর জীববিজ্ঞান পাঠ করে আসতে হবে! আবার পানিতে কী কুমিরের থেকে বড় কোনো প্রাণী নাই, না ভগবান নিজেও জানেন না এ বিষয়টা । তিমি মাছের নাম কি শুনেছেন? ভগবানের বান্দারা জেনে রাখুন তিমি মাছ কিন্তু মাছ নয় । মনে হয়, গীতার রচিয়তারা তিমি মাছের নাম শুনেন নাই-দেখেন নাই, তাই ওদের ভগবানও শুনেন নাই-দেখেন নাই । মজার কথা হচ্ছে বিভূতিযোগে ভগবান নিজের সাথে ঋতু হিসেবে বসন্তের, মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ (১০:৩৫), পশুর মধ্যে সিংহ, পাখির মধ্যে গরুড় (এই পাখির নাম শুধু আমি হিন্দু ধর্মগ্রন্থেই পেয়েছি, বাস্তবে নিজের চোখে দেখা তো দূরের কথা, কোনো বইয়েও পড়ি নাই!) (১০:৩০), হাতির মধ্যে ঐরাবত, সাপের মধ্যে বাসুকি (গরুড় পাখির মত বাসুকি সাপের নামও শুধু হিন্দু ধর্মগ্রন্থে পেয়েছি, অন্য কোথাও না) (১০:২৭-২৮), মহাভারতে সত্যবাদী হিসেবে যুধিষ্ঠিরকে বাদ দিয়ে অর্জুনের (ধনঞ্জয়) সাথে তুলনা করেছেন, এমন কী ভগবান নিজের সাথে নিজের তুলনা করেছেন (১০:৩৭)!! হায়রে ভগবান! নিজের শ্রেষ্ঠত্ব-বিশালত্ব জাহির করতে গিয়ে এত নিচে নেমে আসতে হল! শেষমেশ হাতি, ঘোড়া, সাপ, পাখির সাথে তুলনা দিলেন? দশম অধ্যায়ের আরেকটি শ্লোক (১০:২১) দেখুন, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবে! ভগবান বলেন, "আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে কিরণশালী সূর্য, মরুতদের মধ্যে মরিচি, নক্ষত্রদের মধ্যে চন্দ্র ।" ইসকনের বক্তব্য শুনলে মনে হয়, ভগবদ্গীতা হচ্ছে সর্বজ্ঞানের আকর, বিজ্ঞানময় কিতাব! অথচ ভাবতে অবাক লাগে, ভগবান, মানে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা কি করে নক্ষত্র ও চন্দ্রের মধ্যে পার্থক্য জানেন না? চাঁদের কি নিজস্ব আলো আছে? না নেই, চাঁদ সূর্যের আলোয় আলোকিত, পৃথিবীর একটা উপগ্রহ মাত্র; আজকের যুগের বাচ্চা ছেলেও জানে এটা । পৃথিবী থেকে (আপাতদৃষ্টিতে) রাতের বেলা চাঁদের আলো দেখা যায় বলে কি সর্বজ্ঞানী ভগবান-সৃষ্টিকর্তা সেটাই ধরে নিয়ে বসে আছেন? (তাই তো মনে হয়, কারণ ১৫:১২নং শ্লোকে আবারো ভগবান সূর্য-চন্দ্র-অগ্নির তেজকে তার নিজেরই তেজ হিসেবে অভিহিত করেছেন!) সূর্য কি নক্ষত্র নয়? সূর্য একটা নক্ষত্র এবং সূর্যের থেকে হাজারগুণ বড় নক্ষত্রও আছে এ মহাবিশ্বে । বুঝি নারে ভাই, কোন বিজ্ঞান যে লুকিয়ে আছে এই গীতাতে, ভগবানই জানেন আর ভক্তকূলই জানেন! এরপরও ইসকনের গুরুজি প্রভুপাদ বড়-বড় সবক দেন, মহাশূন্যে অভিযান না-কী সময় ও অর্থের শিশুসুলভ অপচয়!! (দ্রষ্টব্য : জীবন আসে জীবন থেকে, পৃষ্ঠা ১০৬) এসব শুনলে বড্ড করুণা হয় ওদের নির্বুদ্ধিতার জন্য! ইসকনের মাসিক পত্রিকা হরেকৃষ্ণ সমাচারের ভাষ্য মতে, (নোবেল পুরস্কার নিয়ে যাদের এতো গাত্রদাহ!) সেই নোবেল বিজয়ী আইনস্টাইনের ভরশক্তি সমীকরণ ও আপেক্ষিকতার সূত্র গীতা পাঠের ফসল; তারা কি সুনির্দিষ্ট করে বলবেন গীতার কোন কোন শ্লোক পাঠ করে আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত ভরশক্তি সমীকরণ ও আপেক্ষিকতার সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন? পাঠক আপনারাই বলুন এবার, ইসকনের বই থেকে যে কুয়োর ব্যাঙের গল্প তুলে ধরেছিলাম, প্রকৃত কুয়োর ব্যাঙটা কে?

বেশ আগে কোথায় যেন শুনেছিলাম বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার পরমাণু বোমার বিস্ফোরণের তেজ দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গীতার একাদশ অধ্যায় (বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ, ১১:১২) থেকে শ্লোক আবৃত্তি করেছিলেন : "দিবি সূর্য্য সহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা ।/যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥" বাংলা করলে দাঁড়ায়, "যদি আকাশে সহস্র সূর্যের প্রভা যুগপৎ উদিত হয়, তাহলে সেই দীপ্তি বিশ্বরূপের প্রভাব কিঞ্চিৎ তুল্য হইতে পারে ।"

তো কি হল? যদিও আমি জানি না, ওপেনহাইমারের এ ঘটনা সত্য না মিথ্যে, না গুজব, তবে এ থেকে কি পরমাণু বোমার কোনো সূত্র আবিস্কৃত হয়ে গেল? কিংবা কোনো বৈশিষ্ট্য? কেউ কেউ বলেন, এখান থেকে না-কী বোঝা যায়, হিন্দু ধর্মচিন্তার মধ্যে নিহিত রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের নানা সিদ্ধান্ত! বললেই হল? যত্ত সব...! আবার কেহবা গীতায় বর্ণিত কৃষ্ণের বিশ্বরূপ ধারণ এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসীদের-ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের শাস্তি হিসেবে বারবার অসুরযোনিতে জন্ম দেবার হুঁশিয়ারির মধ্যে বিবর্তনবাদের প্রমাণ পেয়ে গেছেন! বিষ্ণুপুরাণ মতে একজন ব্যক্তি স্থাবর জন্ম বিশ লক্ষ যোনি, জলচর নয় লক্ষ যোনি, কুর্ম নয় লক্ষ, পাখি দশ লক্ষ, পশু ত্রিশ লক্ষ, বানর চার লক্ষ... এরকম মোট চুরাশি লক্ষ যোনিতে জন্মের পর মানুষ মনুষ্যযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে থাকে! আর পুরাণের এ বক্তব্যকেই আধুনিককালে বিবর্তনবাদের (এক কোষী থেকে বহুকোষী প্রাণীতে ক্রমবিকাশ) সাথে মিলিয়ে (মূলতঃ গোঁজামিল দিয়ে) হিন্দুধর্মগ্রন্থের 'বিজ্ঞানসম্মত' ব্যাখ্যা দেবার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন হিন্দুধর্মবণিকেরা (দ্রষ্টব্য : শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষের শ্রীকৃষ্ণ)! মজার বিষয় হচ্ছে, অধুনা সুডো-মডারেট হিন্দুরা ধর্মগ্রন্থকে বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণের চেষ্ট চালালেও আজকাল গীতা নিয়ে যাদের সবচেয়ে বেশি দৌড়ঝাঁপ, সেই ইসকন পার্টির কাছে বিবর্তনবাদের জনক চার্লস ডারউইন হচ্ছেন একজন মহামূর্খ, বিবর্তনবাদ হচ্ছে একটা ভ্রান্ত মতবাদ, এই মতবাদ যত অগ্রাহ্য করা যায়, ততই ভাল... (দ্রষ্টব্য : জীবন আসে জীবন থেকে, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৯)। এখন আমরা সাধারণ মানুষেরা কার কথা মানবো বলেন? তবে কেউ কোনো ধর্মগ্রন্থের কোনো বাণীর সাথে বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্বের সাথে আপাত মিল পেলেই ধর্মগ্রন্থের বক্তব্যকে একেবারে বিজ্ঞানসম্মত দাবি করলেই তো হয় না। প্রমাণ তো লাগবে; গীতাদরদীদের সেই প্রমাণ কোথায়? হিন্দু ধর্মগ্রন্থ গীতা বা পুরাণ পাঠ করলে দেখা যায়, কর্মফলের কারণে বিভিন্ন হীনযোনিতে জন্মগ্রহণের পর মনুষ্য জন্ম এবং পাপের ফলে পুনরায় হীনযোনিতে জন্মগ্রহণের যে ধারণা দেয়া হচ্ছে, তা অবশ্যই ব্যক্তি পর্যায়ে (দেখুন গীতার ৯:৩০-৩২, ১০:৩নং শ্লোক)। গীতার ভাষ্য থেকে ধরে নেওয়া যায়, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে পৃথকভাবে এ ধরনের কথিত অগ্রগতি বা অধমগতি উভয়েই ঘটতে পারে। কিন্তু বিবর্তনবাদ অনুসারে জৈববিবর্তন কোনো ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া নয়, বলা যায় এটি সামগ্রিকভাবে একটি প্রজাতির সমগ্র প্রাণীর বা সমগ্র জনগোষ্ঠীর পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বা ঘটনা। বির্বতনবাদ অনুসারে প্রজাতির পরিবর্তন প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বংশানুক্রমিক গুণাবলীকে বোঝায় (এখানে বিবর্তনবাদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই); কোনো পাপ-পূণ্যের কারণকে কিংবা কর্মফলকে বোঝায় না। বলা যায় বিবর্তনবাদের মূল ধারণা ও প্রক্রিয়ার সাথে গীতাসহ অন্যান্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থে উল্লেখিত জন্মান্তরবাদ, কর্মফল ইত্যাদি বক্তব্যের মূলগত দিক থেকে পরস্পর বিরোধিতা-বৈপরীত্য রয়েছে (যেমন বিবর্তনবাদ আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে)। তাই হিন্দু ধর্মগ্রন্থের কিছু শব্দের আপাত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে একে বিবর্তনবাদের (বা বিজ্ঞানের) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে দাবি করা, চরম মূর্খতা-শঠতার লক্ষণ (দ্রষ্টব্য : বিজ্ঞানের মৌলবাদী ব্যবহার, পৃষ্ঠা ১৮-১৯)। অতএব গীতার বিশ্বরূপ দর্শনের বর্ণনা, কিংবা শাস্তি হিসেবে আসুরিক যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মের হুঁশিয়ারি, এসবই সাহিত্যিক রূপক হিসেবে গ্রহণ করা যায়; বাস্তব ঘটনা বা বিজ্ঞান হিসেবে কখনো নয়। তাছাড়া এভাবে গোঁজামিল দিয়ে মিলাতে চাইলে তো যে কেউ শুধু ধর্মগ্রন্থ কেন, অনেক কবির যত্রতত্র কবিতা-গানের মধ্যেও বিজ্ঞানের সন্ধান পেয়ে যাবেন! যেমন ধরেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, "আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ/চুনি উঠল রাঙা হয়ে/আমি চোখ মেললুম আকাশে/জ্বলে উঠল আলো/পূবে পশ্চিমে/গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর"। এখন কবিগুরুর এই কবিতা থেকে কেউ যদি আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের চেতনাশক্তির দ্বারা সৃষ্ট অনুভূতি, আলোক তরঙ্গ, তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ ইত্যাদি পেয়ে যান, বা বিজ্ঞানের সাথে মিলিয়ে (আসলে গোঁজামিল দিয়ে) ব্যাখ্যা করতে বসেন, তবে তা 'পাগলের প্রলাপ' ছাড়া আর কি হতে পারে? আমি এখানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে দোষ দিচ্ছি না, আমার সে যোগ্যতাই নেই; আমি বলছি, কেউ যদি কবিতার লাইন, পংক্তি ইত্যাদির সাথে বিজ্ঞান মেলাতে চান, রূপক অর্থ করে হলেও বিজ্ঞানসুলভ ব্যাখ্যা দিতে চান, তবে সেটা অবশ্যই দোষের, সেটা বর্জনীয়। পাঠক, কাব্য ঢঙে সাজনো হেঁয়ালিপূর্ণ শ্লোকের অনুবাদে গোঁজামিল দিয়ে, চাতুর্যতার সাথে রূপক ব্যাখ্যা করে মিলাতে চাইলে আপনারাও এ রকম অসংখ্য কবির কবিতায় শুধু বিজ্ঞান নয়, জ্যোতিষী কিরো-নস্ত্রাদামুসকে হার মানিয়ে বিভিন্ন

ভবিষ্যৎ বাণীও পেয়ে যেতে পারেন! উদাহরণ দিলে হয়তো বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে; যেমন কবি জীবনানন্দ দাশের আট বছর আগের একদিন কবিতার প্রথম দুই লাইন দেখুন : "শোনা গেল লাশকাটা ঘরে/নিয়ে গেছে তারে..." । সবাই নিশ্চয়ই জানেন ১৯৫৪ সালের ১৪ অক্টোবর একটি ট্রাম দুর্ঘটনায় আহত হয়ে কবি জীবনানন্দ ২২ অক্টোবর মারা যান । এ লাইন দুটো থেকে কি ধরে নিব, কবি আগেই নিজের মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করে গেছেন? চাইলে গোঁজামিল দিয়ে কবি জীবনানন্দকে জ্যোতিষী জীবনানন্দ বানিয়ে দেয়া যাবে! সাথে আরো বলে রাখি আমাদের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের কবিতাতেও না-কী কবির শেষসময়ের অসুস্থতার খবর খুঁজে পেয়েছেন কেউ কেউ! যুক্তি হিসেবে তুলে ধরছেন কবির চক্রবাক কাব্যগ্রন্থের বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি কবিতার মধ্যের কিছু লাইন : "তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু, আর আমি জাগিব না,/কোলাহল করি' সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না ।/—নিশ্চল নিশ্চুপ/আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধুর ধূপ ।" আবিষ্কারকর্তাদের বলিহারি এ আবিষ্কার দেখে আমি নিজেই নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম তৎক্ষণাৎ!

গীতায় শ্রীভগবানের উবাচ : ভারতবর্ষে বৈদিকযুগের সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার শেণীতে বিভক্ত ছিল । সমাজের উপরতলার মানুষ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা আর নিচুতলার মানুষ বৈশ্য আর শূদ্ররা । সমাজ-কাঠামোর সকল সুযোগ-সুবিধা, শাসন-ক্ষমতা ভোগ করতো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় শোষক-গোষ্ঠী আর উদয়-অস্ত শ্রম দিয়ে সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থা, ভোগের যোগান টিকিয়ে রাখতো বৈশ্য-শূদ্ররা । 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই' ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের আঁতাত সম্পর্কে মনুসংহিতায় খুব সুন্দর করে বর্ণিত হয়েছে (৯:৩২২) : "ব্রাহ্মণহীন ক্ষত্রিয় উন্নতি লাভ করতে পারে না, আর ক্ষত্রিয়হীন ব্রাহ্মণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মিলিত হয়ে ইহলোকে ও পরলোকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ।" এই ইহলোকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মিলিত শাসনে বৈশ্য থেকে শূদ্রদের সামাজিক অবস্থান ছিল আরো করুণ! সঠিকভাবে বলতে গেলে, শুদ্র আর নারী (সে ব্রাহ্মণ কন্যা বা পত্নীই হোক আর শূদ্রাণী হোক), উভয়ের সামাজিক অবস্থান ছিল প্রায় এক সূতায় গাঁথা । অন্য একটি প্রবন্ধে (দেখুন সনাতন ধর্মের দৃষ্টিতে নারী) আমি হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ (মনুসংহিতা, মহাভারত, গীতা ইত্যাদি) থেকে প্রাচীন ভারতের নারীদের সামাজিক অবস্থান চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি; তাই গীতা নিয়ে এ আলোচনায় নারীর অবস্থানের বিষয়টি এখানে টানছি না । তবে সমাজের সবচেয়ে নিচুজাত হিসেবে পরিচিত শূদ্র সম্পর্কে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছি, কারণ যাদের পিঠে চড়েই পরগাছা আর্য শ্রেণী (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়) চিরকালই ভোগবিলাসে জীবন কাটিয়েছে, সেই পরগাছাদের রচিত কথিত ধর্মগ্রন্থগুলিতে শূদ্রদের কি অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছিল, তা অবশ্যই আলোচনার বিষয়; সাথে একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে, প্রাচীন ভারতের ঐ সময়ে তো আজকের মতো সংবিধান-আইন-কানুন ছিল না, ধর্মগ্রন্থের বাণীগুলোই (ঈশ্বরের বক্তব্য হিসেবে প্রচার করে) রাজার আইন হিসেবে, সামাজিক অনুশাসন হিসেবে ব্যবহৃত হত ।

বর্তমান হিন্দু আইনের উৎস মনুসংহিতা ও ভগবদ্গীতা পাঠ করলে দেখা যায়, দুটো গ্রন্থের শ্লোকগুলোতে প্রচুর মিল আছে; এবং এ কথা মনে রাখতে হবে (অবশ্য গীতা পাঠ করলে এমনিতেই বোঝা যায়), গীতার বেশিরভাগ বক্তব্যই সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক ও হেঁয়ালিপূর্ণ দার্শনিকরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে, মাঝে-মাঝে সর্বজনীন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে । কোনো ধর্মগোষ্ঠী, জনগোষ্ঠীর নাম উল্লেখ ছাড়াই সরাসরি আক্রমণ না করে পরোক্ষভাবে আক্রমণ করা হয়েছে; যেমন গীতার অনেক জায়গায় দেবতাদের প্রশংসা করা হয়েছে, অসুরদের তীব্র নিন্দা ও যুগযুগ ধরে প্রচণ্ড শাস্তি প্রদান করার কথা ঘোষিত হয়েছে । কিন্তু এই দেব কারা বা অসুর কারা সেটা গীতায় যথেষ্ট ব্যাখ্যা করা হয়নি (তবে গীতার নবম অধ্যায়ের বত্রিশ-তেত্রিশ নম্বর শ্লোক পাঠ করলে কিছুটা বুঝা যায়) । বরং ঋগ্বেদ, মনুসংহিতা, মহাভারতে দেবতা-অসুরদের রূপ উন্মোচন করা হয়েছে । তাই গীতার অনেক শ্লোকের সঠিক অর্থ উদ্ঘাটনের জন্য আমাদের অবশ্যই মনুসংহিতাসহ অন্যান্য কয়েকটি ধর্মগ্রন্থের দ্বারস্থ হতে হবে । মনুসংহিতার

দৃষ্টিতে সমাজের শ্রমজীবী মানুষ শূদ্ররা হচ্ছে ঊনমানুষ! আর ভগবদ্গীতায় লক্ষ্য করা যায় স্বয়ং ভগবান (?) মনুসংহিতার দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে তা 'ঈশ্বরের সৃষ্টি' বলে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা প্রদানের চেষ্টা করেন। হিন্দুসমাজের কুৎসিৎ চতুর্বর্ণপ্রথা সম্পর্কে জানতে এবং মনুসংহিতায় শূদ্রের অবস্থান পাঠ করতে বাঙলা ভাষায় বেশকিছু গবেষণামূলক গ্রন্থ রয়েছে, যেমন রামশরণ শর্মা রচিত প্রাচীন ভারতে শূদ্র, কঙ্কর সিংহের মনুসংহিতা এবং শূদ্র ইত্যাদি; আগ্রহীরা গ্রন্থগুলো পড়ে দেখতে পারেন। আমি সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদকৃত মনুসংহিতার কয়েকটি শ্লোক থেকে মনুসংহিতায় শূদ্রের অবস্থান নির্দেশের চেষ্টা করবো, সাথে আরো কয়েকটি ধর্মগ্রন্থেরও (প্রয়োজনানুসারে) উদ্বৃতি দেব : শূদ্রের সৃষ্টি সম্পর্কে মনুসংহিতা বলা হয়েছে, লোকবৃদ্ধির জন্য (স্রষ্টা) মুখ, বাহু, ঊরু ও পদ থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সৃষ্টি করলন (১:৩১); আর কিছু পরের শ্লোকে (১:৯২) আছে, ব্রহ্মার কাছে নাভির ঊর্দ্ধভাগ পবিত্রতর, এর মধ্যে মুখ পবিত্রতম! মহাভারতের অনুশাসনপর্বে (৩৫/১) বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ জন্মমাত্রই অন্য বর্ণের গুরু! ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরুষ সূক্তে বলা হয়েছে, সেই বিরাট পুরুষের ব্রাহ্মণ মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরু এবং শূদ্র পদ (১০/৯০/১২); মহাভারতের শান্তিপর্বের ৪৬নং শ্লোকে হুবুহু একই ভাষায় চতুর্বর্ণের কথা বলা হয়েছে। মনুসংহিতায় (১:৯১) ঈশ্বর কৃর্তক নির্দেশিত শূদ্রের একটি মাত্র কর্মের কথা বলা হয়েছে, সেটা হল বাকি তিন বর্ণের অসূয়াহীন সেবা! কিন্তু তিন বর্ণের কাজের মধ্যে ব্রাহ্মণের কাজ অধ্যাপনা-যাজন-যজন-দান-প্রতিগ্রহ, ক্ষত্রিয়ের কাজ লোকরক্ষা-দান-অধ্যয়ন-যজ্ঞ, বৈশ্যের কাজ পশুপালন-দান-অধ্যয়ন-কৃষি ইত্যাদি (১:৮৮-৯০)। মনুসংহিতার ২:৩১ শ্লোকে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণের নাম শুভসূচক, ক্ষত্রিয়ের নাম বলবাচক, বৈশ্যের নাম ধনবাচক আর শূদ্রের নাম হবে নিন্দাবাচক! ১০:৩১নং শ্লোকে বলা হয়েছে শূদ্র সক্ষম হলেও ধন সঞ্চয় করতে পারবে না! শূদ্রের দাসত্ব থেকে কোনো মুক্তি নেই, বরং সে ব্রাহ্মণের দাসত্বের জন্যই ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে (৮:৪১৩-৪১৪)! ৮:২৮১নং শ্লোকে আছে শূদ্র যদি কখনো ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাসনে বসে তবে শূদ্রের কটিদেশে গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে নির্বাসন দেয়া হবে! অপরাধী বিচারের ক্ষেত্রে ছিল চরম বৈষম্য, শূদ্র ব্রাহ্মণপত্নীগমন করলে শাস্তি ছিল মৃত্যু (৮:৩৩৬); পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ শূদ্রাণীকে বলৎকার করলেও শাস্তি ছিল অর্থদণ্ড মাত্র (৮:৩৮৫)। ব্রাহ্মণকে চোর বলে গালি দিলে শূদ্রের শাস্তি প্রাণদণ্ড, ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড (৮:৬৭-৬৮)! আসলে গোটা মনুসংহিতা জুড়েই রয়েছে শূদ্র নিষ্পেষণ, নিপীড়নের বাণী; ন্যূনতম মানবিক অধিকার স্বীকার করা হয়নি এ গ্রন্থে। তাই বলা যায় মনুসংহিতা হচ্ছে 'শূদ্র নিপীড়নসংহিতা'! পরিসর সীমিত রাখার জন্য মনুসংহিতা থেকে আর নয়। এবার আরো কিছু ধর্মগ্রন্থ থেকে শূদ্রের অবস্থান দেখা যাক : ঐতরেয় ব্রাহ্মণ মতে (৭/৩৫/৩), শূদ্রকে ইচ্ছা করলে উচ্চবর্ণীয়রা তাঁর বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে, বাধা দিলে হত্যা করার বিধান রয়েছে; যজ্ঞকালে শূদ্ররা নিষিদ্ধ ব্যক্তি বলে গণ্য হবে (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৩/১/১/৯); শূদ্রের পক্ষে বেদমন্ত্র পঠন তো দূরের কথা শ্রবণও নিষিদ্ধ (গৌতম ধর্মসূত্র, ১৬:১৯); শূদ্র যদি বিপন্ন হয়েও উচ্চবর্ণীয়দের সঙ্গে কথা বলেন, কিংবা তাঁর মুখের দিকে তাকান, তাহলে শাস্তি ছিল জীবন্ত পুড়িয়ে মারা (গৌতম ধর্মসূত্র, ২/২/৩/৩৩)। ব্রাহ্মণ যদি কোনো শূদ্রাণীকে বৈধভাবে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন, তাহলেও সেই মহিলার গর্ভজ সন্তান পিতৃসম্পত্তির অংশ পাবে না। শুধুমাত্র তার ভরণপোষণের খরচটুকু দেবে তার বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা, যারা উচ্চবর্ণীয় নারীর গর্ভজাত (গৌতম ধর্মসূত্র, ২৮:৩৭); কোনো দাস/শূদ্র তাঁর প্রভুর অন্যায় বা অনাচার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারবে না (কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ৩:১)।

সম্ভবত আর উদাহরণ অণ্বেষণ নিষ্প্রয়োজন! এই তালিকা ভাসমান 'সামাজিক' হিমশৈলের শীর্ষাংশ মাত্র! এ রকমের শতশত বিধান ঈশ্বরের বাণী হিসেবে প্রচার করে প্রাচীন ভারতের রাজন্যবর্গ আর পুরোহিত শ্রেণী সমাজ জীবনকে আষ্টেপ্রষ্ঠে বেঁধে রেখেছিলো; সমাজপতিরা নির্দ্বিধায় তথাকথিত ধর্মবিধানের দোহাই পেড়ে সমাজের বৃহত্তমসংখ্যক মানুষকে তাঁদের প্রাপ্য মানবিক অধিকার (মর্যাদা তো পরের কথা) থেকে বঞ্চিত করেছেন, লাঞ্ছিত করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই সকল অপহ্নবকের পক্ষে সাফাই গেয়ে, বর্ণভেদ প্রথার গুরুতর আর্থ-সামাজিক অসাম্যকে ঐশ্বরীয় সমর্থন দেবার উদ্দেশ্যে যখন গীতায় শ্রীভগবান (৪:১৩) বলে উঠেন, "চাতুর্বর্ণ্যয়ং ময়া সৃষ্টং

গুণকর্মবিভাগশঃ ।/তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥" । অর্থাৎ, গুণ অনুযায়ী কর্মের বিভাগ অনুসারে আমা দ্বারা চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি হয়েছে । আমাকে তার কর্তা এবং অব্যয় অকর্তা রূপে জানবে । মানেটা কি হল? শূদ্রদের জন্য এতো অন্যায় রীতিনীতি-নির্দেশ দয়ালু ভগবান নিজের সৃষ্টি বলে সাফাই গেলেন! অবশ্য ভগবান আগেই জানিয়ে দিয়েছেন (গীতা, ৪:১), গীতার তত্ত্ব তিনি না-কী আগেই সূর্যকে বলেছিলেন, সূর্য মনুকে, মনু স্বপুত্র ইক্ষাকুকে বলেছিলেন । যা হোক, ভগবান ভগবদ্গীতায় আরও বলেন (১৪:১৮), "ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।/ জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥" অর্থাৎ, সত্ত্বগুণের অধিকারীরা ঊর্ধ্বে যায়, রজঃগুণসম্পন্নরা মধ্যে অবস্থান করে, আর তমগুণসম্পন্ন লোকেরা জঘন্য বৃত্তিতে নিযুক্ত হয়ে অধোগামী হয় । কিন্তু ভগবানের দৃষ্টিতে সত্ত্বগুণের অধিকারী কারা, রজঃ বা তমোগুণসম্পন্ন কারা, সেটাতো আগে দেখতে হবে । এ বিষয়ে মনুসংহিতা থেকে দেখা যায়, সত্ত্বগুণজাত হচ্ছে ব্রহ্মা, বিশ্বস্রষ্টাগণ যজ্ঞকারী, ঋষি, দেবতা, বেদ তপস্বী, সন্নাসী, ব্রাহ্মণ প্রমুখ (মনুসংহিতা, ১২:৪৮-৫০); রাজা, ক্ষত্রিয়, যক্ষ, দেবগণের অনুগামী, অস্ত্রজীবী লোক প্রমুখ রজোগুণসম্পন্ন; আর হাতি, ঘোড়া, শূকর, শূদ্র, নিন্দিত ম্লেচ্ছ, সিংহ, বাঘ, ধর্মাচরণকারী, রাক্ষস, পিশাচ হচ্ছে তমোগুণজাত (১২:৪৩-৪৪) । তাহলে এ বিষয়ের সন্দেহের অবকাশ নেই, যে ভগবদ্গীতার ১৪তম অধ্যায়ের ১৮নং শ্লোকের এই উক্তির মাধ্যমে আর্যসমাজ এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রচলিত আর্থসামাজিক কাঠামোয় ব্রাহ্মণ্যদের উচ্চস্থান, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মধ্যস্থান আর শূদ্রের নিম্নস্থানের ইঙ্গিত করা হচ্ছে । দয়াময় ভগবান, যিনি সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করেন বলে দাবি করেন, অথচ তিনি গীতায় বলে উঠেন (১৭:১০) : "যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ ।/উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥"; বাঙলা করলে হয়, বহুদিনের পূর্বের বাসী, রসশূণ্য, দুর্গন্ধযুক্ত, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র খাদ্য তমোগুণ সম্পন্ন লোকের প্রিয় । হায়রে! সর্বজ্ঞ ভগবান কি জানেন না যে, এরকম খাবার তথাকথিত তামস প্রকৃতির শুদ্রলোকেরা ভালোবেসে খায় না! বাসী, নিরস, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র খাবার তারা দারিদ্রের পীড়নে খেতে বাধ্য হয় । বাসী-নিরস-উচ্ছিষ্ট খাবার কারো-ই বা খেতে ভালো লাগে? অথচ শ্রীভগবান নিকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণকেই শুদ্রদের স্বভাবজ তমগুণের লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন! সাধারণ চিন্তা থেকেই বোঝা যায়, তৎকালীন যুগের অমানবিক আর্থসামাজিক কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই কুখ্যাত চাতুর্বর্ণ প্রথাটি শ্রীভগবানের মুখ দিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা (ক্ষত্রিয়দের যোগসাজশে) বলিয়েছে; শ্রীভগবানের দোহাই দিয়ে, ধর্মীয় ভাবাবেগ তৈরি করে, দারিদ্র, ক্লিষ্ট, অনাহারী মানুষেরা (শূদ্ররা) যেন তাদের (ব্রাহ্মণ্যদের) ক্ষমতার প্রতি অফুরন্ত লিপ্সা মিটিয়ে চলে বিনা প্রশ্নে, বিনা বাঁধায় । এখানে একটি বিষয় ছোট করে বলে নেয়া যায়, পৃথিবীর অনেক দেশেই প্রাচীনকালে শ্রম বিভাজনের ভিত্তিতে এক ধরনের আদিম শ্রেণিবিভাগভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠেছিল । এই শ্রমবিভাজনভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার সবচেয়ে নির্যাতিত শ্রেণী সময়-সুযোগ পেলেই আর্থ-সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ বিদ্রোহ করেছে । এখান থেকেই শ্রমিকশ্রেণীর মানবমুক্তির বীজ বপিত হয়েছে; যেমন প্রাচীন চীন দেশে বারবার কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে, রাজশক্তি বা শোষকগোষ্ঠী বারবার প্রতিহিত হয়েছে । গ্রিক সাম্রাজ্যে, রোমান সাম্রাজ্যে বারবার দাস বিদ্রোহ হয়েছে । এমন কী ১৭৮৬-১৭৯৫ সাল ব্যাপী সংঘটিত ফরাসী বিপ্লব পৃথিবীর গণমানুষের চেতনায় মোড় ঘুড়িয়ে দিল । কিন্তু ভারতবর্ষে এরকম শ্রমিকশ্রেণীর জেগে উঠার নজির ইতিহাসে তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না (মৌর্যযুগের শেষের শূদ্রবিদ্রোহ বাদে) । কারণটা কি? কারণ হচ্ছে ধর্ম নামক আফিম । আমার জানা মতে পৃথিবীর আর কোনো দেশে এরকম শ্রেণীবিভাগের কাঠামোকে ধর্মীয় আবরণে বংশানুক্রমিক ও চিরস্থায়ী করার রীতি ছিল না কিংবা সম্ভবও হয়নি । ভারতবর্ষেই একমাত্র মনুসংহিতা-গীতা-উপনিষদ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে কর্মফল, জন্মান্তরবাদ, অবতারতত্ত্ব ইত্যাদির দোহাই দিয়ে নির্যাতিত শ্রমিকশ্রেণীসহ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ আমজনতাকে বেঁধে ফেলে ধর্ম নামক আফিমকে 'পৌরাণিক ঐতিহ্যে'র নামে গলাধঃকরণ করিয়ে গুটিকয়েক ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গোষ্ঠীর স্বার্থে দাস শ্রেণীতে পরিণত করাই ছিল শাস্ত্রকারদের মূল লক্ষ্য । ধর্মের নামে সামাজিক শোষণ আর নিপীড়নের এতো দীর্ঘস্থায়ীরূপ দেখে বলা যায়, তারা তাতে সফলকামও হয়েছিল!

এবার আলোচনাটুকু গুটিয়ে আনি; উপরের বিস্তারিত আলোচনা থেকে দেখা যায়, ভগবদ্গীতা ব্রাহ্মণ্য-ক্ষত্রিয়দের নিজস্ব কাঠামো, শাসন-শোষণ, চাতুর্বর্ণ প্রথা টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্যদের সুদীর্ঘ সময় ধরে সুকৌশলে রচিত। এটি কোনোভাবেই কোনো দেবতার মুখঃনিসৃত বাণী নয়; নয় কোনো অলৌকিক কিছু! স্বয়ং ভগবানের অস্তিত্বই যেখানে প্রশ্নবিদ্ধ। গীতা কোনো বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ নয়; নয় কোনো আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। হতে পারে, প্রাচীন সাহিত্য হিসেবে এর ঐতিহাসিক একটা মূল্য রয়েছে, কিন্তু স্পষ্ট করে বলা যায়, বর্তমানে গণমানুষের কল্যাণের জন্য-মুক্তির জন্য, বিজ্ঞান-দর্শন চর্চায়-প্রসারে, জ্ঞানের বিকাশে এর বিন্দুমাত্র কোনো ভূমিকা নেই।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

(১) শ্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাদিত), ১৯৯৭, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা।

(২) শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ গিরি মহারাজ (সম্পাদিত), ২০০৫, শ্রীগীতা, চন্ডিমুড়া, কুমিল্লা।

(৩) সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভূমিকা, অনুবাদ, টীকা), ২০০২, মনুসংহিতা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

(৪) জয়ন্তানুজ বন্ধোপাধ্যায়, ১৯৯৭ (প্রথম সংস্করণ ১৯৯৪), সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা।

(৫) শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, ২০০৪ (প্রথম সংস্করণ ১৯৮৩), জীবন আসে জীবন থেকে, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, পশ্চিমবঙ্গ।

(৬) শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, ২০০১, কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, পশ্চিমবঙ্গ।

(৭) জয়ন্তানুজ বন্ধোপাধ্যায়, ১৯৯৬ (প্রথম সংস্করণ ১৯৯০), মহাকাব্য ও মৌলবাদ, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা।

(৮) ড. আর. এম. দেবনাথ, ২০০৫ (প্রথম সংস্করণ ২০০১), সিন্ধু থেকে হিন্দু, রিডার্স ওয়েজ, ঢাকা।

(৯) ভবানীপ্রসাদ সাহু, ২০০১, ধর্মের উৎস সন্ধানে, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা।

(১০) পল্লব সেনগুপ্ত, ১৯৯৯, ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা : উৎসের সন্ধানে, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা।

(১১) মনিরুল ইসলাম, ২০০৮, বিজ্ঞানের মৌলবাদী ব্যবহার, ক্যাথার্সিস পাবলিশিং, ঢাকা।

(১২) আন্তর্জালিক ঠিকানা : http://www.iskcon.com/worldwide/centres/asia.html

(১৩) আন্তর্জালিক ঠিকানা : http://www.solarviews.com/eng/sun.html

(১৪) আন্তর্জালিক ঠিকানা : http://observe.arc.nasa.gov/nasa/exhibits/sun/sun_5.html

---

অনন্ত বিজয়, শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, এবং যুক্তি পত্রিকার সম্পাদক। মুক্তমনার একজন নিবেদিতপ্রাণ সদস্য। সংরক্ষনশীল সনাতন ধর্মের মিথ, কুসংস্কার এবং অনুদার সমাজ কাঠামোর একজন প্রবল সমালোচক। মানবতা এবং যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০৬ সালে মুক্তমনা এওয়ার্ড পেয়েছেন।

পঞ্চম অধ্যায় : ধর্ম, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ৪ ৫ ০ *[ক্লিক করুন]*

- নৈতিকতা কি শুধুই বেহেস্তে যাওয়ার পাসপোর্ট? : *অভিজিৎ রায় ৪৫১ [ক্লিক করুন]*
- ধর্মই কি নৈতিকতার উৎস? : *অপার্থিব ৪ ৭ ৩ [ক্লিক করুন]*
- হতবুদ্ধি, হতবাক! : *মীজান রহমান ৪ ৭ ৫ [ক্লিক করুন]*
- আমাদের মূল্যবোধ কি ঈশ্বর হতে আগত?: *ভিক্টর স্টেংগর (মুন্সি কেফায়েতুল্লাহ) ৪ ৮ ৮ [ক্লিক করুন]*
- বিবর্তনের দৃষ্টিতে নৈতিকতার উদ্ভব : *অপার্থিব ৫ ০ ০ [ক্লিক করুন]*
- ' স্বার্থপর জিন' - এর আলোকে সহযোগিতা এবং আত্মত্যাগ: *দিগন্ত সরকার ৫ ০ ৬ [ক্লিক করুন]*
- প্রসংগ নৈতিকতা : *পুরুজিত সাহা ৫ ১ ৬ [ক্লিক করুন]*
- নাস্তিকতা নিয়ে কিছু ভুল ধারণা : *স্যাম হারিস (দিগন্ত সরকার) ৫ ১ ৯ [ক্লিক করুন]*

নৈতিকতা কি শুধুই বেহেস্তে যাওয়ার পাসপোর্ট?

অভিজিৎ রায়

ছোটবেলায় এক ভদ্রলোকের বাসায় যেতাম। জ্ঞানী-গুনি কিন্তু রসিক মানুষ। পেশায় অধ্যাপক। আমার সাথে শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম আর বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খুব আগ্রহ ভরে আলোচনা করতেন। তাঁর বাড়ীর নাম ছিল - 'সংশয়'। আমি একদিন না পেরে জিজ্ঞাসাই করে ফেললাম - 'সংশয় কেন?' উনি উত্তরে হেসে বললেন-'অভি, সংশয়ই হচ্ছে সকল জ্ঞানের উৎস। মানুষ চোখ কান বন্ধ করে যে যা বলেছে তা বিশ্বাস না করে সংশয় প্রকাশ করেছে বলেই আমাদের সভ্যতা আজ এত দূর এগিয়েছে।' সত্যই তাই। ইতিহাসের দিকে তাকানো যাক। টলেমীর 'পৃথিবী-কেন্দ্রিক' মতবাদে কোপার্নিকাস আর গ্যালেলিওরা সংশয় প্রকাশ করতে পেরেছেন বলেই টলেমীর মতবাদ একসময় ভুল প্রমাণিত হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানীরা একসময় 'ইথার' নামক কাল্পনিক মাধ্যমটির অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বলেই পরবর্তীতে হাইগেনের তরঙ্গ-তত্ত্ব আর ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্বকে সরিয়ে আলোর প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে পদার্থ-বিজ্ঞানে জায়গা করে নিয়েছে প্লাঙ্ক, আইনস্টাইন আর ব্রগলীর তত্ত্বগুলো। হাটন আর লায়েলরা ৬০০০ বছরের পুরনো পৃথিবীর বয়সের বাইবেলের সংস্কারে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন বলেই মিথ্যা বিশ্বাসকে সরাতে পেরেছিলেন মানুষের মন থেকে। এভাবেই সভ্যতা এগোয়। অনেকেই তর্ক করতে এসে নিজের বিশ্বাসের পক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন না; তখন খুব ভক্তি গদ গদ চিত্তে তোতাপাখীর মত আউরাতে থাকেন বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে যাওয়া নিরক্ত বাক্যারলী - 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর' অথবা 'মানলে তাল গাছ আর না মানলে গাব গাছ'। এ যেন ডুবন্ত মানুষের শেষ খড়কুটো আঁকরে ধরে অনেকটা যুক্তিহীনভাবেই অন্ধ-বিশ্বাসের পক্ষে সাফাই গাওয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। কিন্তু যারা এধরনের বক্তব্য হাজির করেন তারা বোঝেন না যে, 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু' এ ধরনের ভাবনা নিয়ে বসে থাকলে আজও বোধ করি সূর্য পৃথিবীর চারিদিকেই ঘুরত। সভ্যতার অনিবার্য গতি আসলে বিশ্বাসের বিপরীতে, যুক্তির অভিমুখে; ক্যারেন আর্মস্ট্রং তার 'The Battle for God' বইয়ে যেটিকে একটু গুরুগম্ভীর ভাষায় বলেছেন - 'মিথোস্ থেকে লোগোস্ এর দিকে'। এ প্রসঙ্গে গৌতম বুদ্ধেরও একটি চমৎকার উক্তি রয়েছে- Doubt everything, and find your own light. গৌতম বুদ্ধের উক্তিটি যেন আধুনিক যুক্তিবাদীদের সংশয়ী দৃষ্টিভঙ্গীরই এক সংগঠিত রূপ- যেটি আসলে বলছে, কোন কিছুই বিনা প্রশ্নে মেনে নিও না! সেই একই সংশয়বাদী ভাবনার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই আধুনিক কালে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় :

> "বরং দ্বিমত হও, আস্থা রাখ দ্বিতীয় বিদ্যায়।
> বরং বিক্ষত হও প্রশ্নের পাথরে।
> বরং বুদ্ধির নখে শান দাও, প্রতিবাদ করো।
> অন্তত আর যাই করো, সমস্ত কথায়
> অনায়াসে সম্মতি দিও না।

কেননা, সমস্ত কথা যারা অনায়াসে মেনে নেয়,
তারা আর কিছুই করে না,
তারা আত্মবিনাশের পথ
পরিস্কার করে।"

সংশয়বাদ নিয়ে সামান্য কটি কথা খুব হাল্কাভাবে হলেও প্রথমেই সেরে নেওয়া হল একারণে যে, আজ আমরা সংশয়বাদী দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষন করব, ব্যবচ্ছেদ করে দেখ্‌ব আমাদের সমাজের একটি বহুল-প্রচলিত মিথকে, যেটি ছোটবেলা থেকেই আমাদের শিখিয়েছে, ধর্ম পালন করা ছাড়া কখনই ভালমানুষ হওয়া সম্ভব নয়, সম্ভব নয় সচ্চরিত্রের অধিকারী হওয়া।

ধর্ম ও নৈতিকতার জগাখিচুড়ি বনাম রূঢ় বস্তবতা :

প্রাচীনকাল থেকেই ঈশ্বরের প্রতি অগাধ আনুগত্য এবং ধর্ম বিশ্বাসকেই মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের একমাত্র অবলম্বণ বলে মনে করা হয়েছে। পাশ্চাত্য বিশ্বে গোড়া খ্রীষ্টধর্মের অনুসারীরা সংগঠিত হয়ে অনেক আগে থেকেই মগজ ধোলাই করতে শুরু করেছে এ কথা প্রচার করে যে, তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো আর তাদের ঈশ্বরই একমাত্র নৈতিকতা বিষয়ে শেষ কথা বলবার অধিকার রাখে। ধর্ম গ্রন্থগুলোতে যেভাবে পথ দেখানো হয়েছে, সেগুলো অন্ধভাবে অনুসরণ করাই হল নৈতিকতা । আমাদের দেশী সংস্কৃতি তো আবার এগুলোতে সবসময়ই আবার আরও একধাপ এগিয়ে। অনেক বাসায় দেখেছি সেই ছেলেবেলা থেকেই ছোট ছেলে মেয়েগুলোর মাথা বিগড়ে দিয়ে বাংলা শেখার আগেই বাসায় হুজুর রেখে আরবী পড়ানোর বন্দোবস্ত করানো হয়, নয়ত হরি-কীর্তন শেখানো হয় আর নৈতিক চরিত্র গঠনের মূলমন্ত্র হিসেবে তোতা পাখীর মত আউরানো হয় নিরক্ত বাক্যারলী - *'অ্যাই বাবু- এগুলো করে না - আল্লাহ কিন্তু গুনাহ দিবে'*। ছোটবেলা থেকেই এইভাবে নৈতিকতার সাথে ধর্মের খিচুড়ি একসাথে মিশিয়ে এমনভাবে ছেলে-পিলেদের খাওয়ানো হয় যে তারা বড় হয়েও আর ভাবতেই পারে না যে ধর্ম মানা ছাড়াও কারো পক্ষে ভাল মানুষ হওয়া সম্ভব। কিন্তু সত্যিই কি ধর্মের সাথে নৈতিক চরিত্র গঠনের কোন বাস্তব যোগাযোগ আছে? নামাজ, রোজা, হজ্জ্ব, জাকাত, কৃষ্ণলীলা, তবলিগ জামাত ইত্যাদির মাধ্যমে গণ মানুষের নৈতিকতা উন্নয়নের যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, সারা পৃথিবী জুরে ধর্মের নামে মারামারি, হানাহানি, হিংসা, শোষণ, নির্যাতন, দারিদ্র্য আর সন্ত্রাসের বিস্তার দেখে বোঝা যায় যে ঈশ্বরে বিশ্বাস আসলে কোন বিশাল অনুপ্রেরণা হয়ে মানুষের মধ্যে কখনই কাজ করেনি। কারণটা অতি পরিস্কার। ঈশ্বরে বিশ্বাসের মাধ্যমে মরালিটি বা নৈতিকতা অর্জনের চেষ্টা করা আসলে সোজা পথে ভাত না গিলে কানের চারিদিকে হাত ঘুরিয়ে ভাত খাওয়ার মতন। প্রত্যেক ধর্মই বলছে বিধাতা ভাল মানুষকে পুরষ্কৃত করেন আর পাপী-তাপী-নীতিহীনদের শাস্তি দেন। বোঝাই যায় পুরস্কারের লোভটাই এখানে মুখ্য। নৈতিকতা বাদ দিয়ে অন্য যে কোন উপায়ে আল্লাহকে তুষ্ট করে পুরষ্কার বগলদাবা করতে

পারলে কোন বান্দাই আর নৈতিকতা-ফৈতিকতার ধার ধারবে না। একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, রাম-নাম, হরিবোল, পাঁঠা বলি, কোরবানী, নামাজ, হজ্জ, কোরাণ তেলাওয়াত, পুজা, যজ্ঞ এই সমস্ত ব্যাপার-স্যাপারগুলোর মাধ্যমে মানুষ আসলে নৈতিকতার কোন ধার না ধেরে বিধাতার তুষ্টি লাভের প্রচেষ্টাতেই মত্ত। মানুষের প্রতি আর সমাজের প্রতি যাদের অবজ্ঞা আর প্রবঞ্চনা বেশী, তারাই কিন্তু বেশী-বেশী 'আল্লা-আল্লা' করে চ্যাঁচায়। হাজী সেলিমের মত পান্ডারই হজ্জ্ব করার প্রয়োজনটা পড়ে বেশী, এরশাদের মত লম্পটেরই 'আলহাজ্জ্ব' হওয়ার শখ হয় প্রবল। কারণ ধর্মেই রয়েছে সমস্ত আ-কাজ, কু-কাজ করেও পার পাবার ঢালাও ব্যবস্থা। মক্কা, জেরুজালেম, পুরী, বারাণসী, তিরুপতি, এসব পবিত্র স্থান দর্শনে রয়েছে জীবনের সব পাপ ধুয়ে গিয়ে পরকালে স্বর্গবাসী হওয়ার নিশ্চন্ত গ্যারান্টি। কোটি টাকার চোরাকারবারী তাই ধুম-ধাম করে পুজা-যজ্ঞ করে নয়ত শেষ বয়সে এলাকায় মন্দির গড়ে দেয় 'সমাজের ভালোর জন্য'।

উপরন্তু, যুক্তি আর বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজ সচেতন মানুষ আজ বুঝতে শিখেছে যে, ঈশ্বর এক অর্থহীন অলীক কল্পণা মাত্র। রাহুল সঙ্কৃত্যায়নের ভাষায়-'অজ্ঞানতার অপর নামই হল ঈশ্বর।' কাজেই অজ্ঞানতাকে পুঁজি করে ঈশ্বর নামক মিথ্যা-বিশ্বাসের মূলা ঝুলিয়ে মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের কাহিনী আজ অনেকের কাছেই 'শিশুতোষ ছড়া' ছাড়া আর কিছু নয়। বার্ট্রান্ড রাসেল তার Why I am not a Christian গ্রন্থে বলেন :

> ধর্ম সম্পর্কে দু ধরণের আপত্তি করা যায় -বৌদ্ধিক এবং নৈতিক। বৌদ্ধিক আপত্তি অনুসারে বলা যায় যে, কোন ধর্মকেই ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেওয়ার কোন যৌক্তিক কারণ নেই এবং নৈতিক আপত্তি অনুসারে বলা যায় ধর্মের উপদেশ গুলো এমন সময় থেকে উঠে এসেছিল যখন মানুষ বর্তমান যুগের থেকেও অনেক নিষ্ঠুর ছিল। ফলে দেখা যাচ্ছে এই উপদেশগুলি অমানবিকতাকে চিরন্তণ করবার জন্যই তৈরী। যদি এই চিরন্তন ব্যাপারটি গ্রহণে মানুষকে বাধ্য না করা হত, তবে মানুষের নৈতিক বিবেকবোধ বর্তমানে আরো অনেক উন্নত হত।

আমি একবার এক ওয়েব সাইটের জন্য ধর্ম এবং নৈতিকতার মধ্যকার বিভিন্ন অসঙ্গতি নিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম। লেখা শুরু করতে না করতেই এক ধার্মিক ভদ্রলোক সেখানে হুঙ্কার ছেড়ে বললেন,

> 'শ্রী অভিজিত রায়দের মত ব্যক্তি বর্গ যুগ যুগ ধরে এসেছে এবং ভূত হয়ে চলে গেছে। এদের সম্পর্কে কোরানে উল্লেখ রয়েছে যে, তারা অন্ধ ও বর্বর। এদের হৃদয়ে সীল মোহর এঁটে দেওয়া আছে। তারা কিছুই দেখতে পায়না এবং শুনতে পায়না। শুধু প্রাণীর মত হাম্বা হাম্বা রব তোলে।'

কোরাণে যদি সত্যই এমনটি বলা থাকে (এবং কোরানে সত্যই অবিশ্বাসীদের অন্ধ/বর্বর, এবং এদের হৃদয়ে যে সীলমোহর এঁটে দেওয়া আছে তা বলা আছে; দেখুন সুরা ২:৭, ৪:১৫৫, ৭:১০০, ৭:১০১, ৯:৯৩, ১৬:১০৮, ৩০:৫৯, ৪৫:২৩ ইত্যাদি) বলতেই হয় মহান সৃষ্টিকর্তার রুচিবোধ সত্যিই প্রশংসনীয়। কেবল ধর্ম মানি না বলেই ভদ্রলোক আমায় 'অন্ধ' ও 'বর্বর' বলেছেন, আর প্রমাণ স্বরূপ 'সাক্ষী গোপাল' মেনেছেন

তার চীর-আরাধ্য ওই ধর্মগ্রন্থকেই। শুধু যে কোরানেই অধার্মিকদের সম্বন্ধে এ ধরণের বিষেদগার করা হয়েছে তা ভাবলে ভুল হবে। শঙ্করাচার্য প্রমুখ দার্শনিকদের প্রাচীন কালের নাস্তিক্যবাদী চার্বাক দর্শনকে 'লোকায়াত' বা ইতর লোকের দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তুচ্ছ-আচ্ছিল্য করার প্রবণতাটির কথা এক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতেই পারে। এমনকি চার্বাক দর্শনের উৎপত্তি সম্বন্ধেও বলা হয় যে, মহাভারতের এক কুচরিত্র রাক্ষস চার্বাকের নাম থেকেই নাকি চার্বাক দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে। মহাভারতে আছে -চার্বাক ছিল দুর্যোধনের বন্ধু এক দুরাত্মা রাক্ষস। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়ের পর চার্বাক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করে যুধিষ্ঠিরকে জ্ঞাতিঘাতী হিসেবে ধিক্কার জানিয়ে আত্মঘাতী হতে প্ররোচিত করেছিল। কিন্তু উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা তাঁদের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় চার্বাকের চালাকি ধরে ফেলে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করেন। বোঝাই যায়, প্রাচীন ভাববাদীরা এই নাস্তিক্যবাদী দর্শনটির প্রতি সাধারণ মানুষের ঘৃণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এমন ঘৃণ্য চরিত্রের রাক্ষসের সাথে দর্শনটিকে জুড়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আরেকটি উদাহরণ দেখি।

মহাভারতের শান্তিপর্ব। এক ধণী বনিক রথে যাওয়ার সময় এক ব্রাহ্মণকে ধাক্কা মেরে দিল। ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ অপমানের জ্বালা ভুলতে আত্মহত্যা করার কথা চিন্তা করল। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের আত্মহত্যার মধ্যে সর্বনাশের সঙ্কেত দেখতে পেয়ে শিয়াল সেজে হাজির হলেন। ব্রাহ্মণকে তার পশু জীবনের নানা দুঃখ-দুর্দশার কথা বলে মানবজীবনের জয়গান গাইলেন। জানালেন অনেক জন্মের পূন্যের ফল সম্বল করে এই মানব জন্ম পাওয়া। এমন মহার্ঘতম এই মানবজীবন আর তায় আবার ব্রাহ্মণ! এমন জীবন পাওয়ার পরও কি কেউ আত্মহত্যা করে? কাজেই অভিমানে অত্মহত্যা করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। শিয়াল বলল, সে নিজেও আগের জন্মে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিল। কিন্তু সেই জন্মে সে চূড়ান্ত মূর্খের মত এক মহাপাতকের কাজ করেছিল বলেই আজ এই শিয়াল জন্ম। চূড়ান্ত মূর্খের মত কাজটি কি? এ বারেই কিন্তু বেরিয়ে এল নীতি কথা -

অহমাংস পন্ডিতকো হৈতুকো দেবনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যম্ অনুরক্তো নিরার্থিকাম্
হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সুংসৎসু হেতুমৎ।
আক্রোষ্টা চ অভিবক্তা চ ব্রাহ্মবাক্যেষু চ দ্বিজান্
নাস্তিকঃ সর্বশঙ্কী চ মূর্খঃ পন্ডিতমানিকঃ
ভাস্য ইয়ং ফলনিবৃত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ (শান্তিপর্ব ১৮০/৪৭-৪৯)

(অর্থাৎ, আমি ছিলাম এক বেদ সমালোচক পন্ডিত। নিরর্থক তর্কবিদ্যায় ছিলাম অনুরক্ত। বিচার সভায় ছিলাম তর্কবিদ্যার প্রবক্তা। যুক্তিবলে দ্বিজদের ব্রহ্মবিদ্যার বিরুদ্ধে আক্রোশ মেটাতাম। ছিলাম জিজ্ঞাসু মনের নাস্তিক, অর্থাৎ কিনা পন্ডিত্যাভিমানী মূর্খ। হে ব্রাহ্মণ, তারই ফলস্বরূপ আমার এই শিয়ালজন্ম।)

বোঝাই যায়, বৈদিক যুগেও যুক্তিবাদীদের সংশয়, অযাচিত প্রশ্ন আর অনর্থক তর্ক-বিতর্ক একটা 'ফ্যাকটর' হয়ে উঠেছিল। 'পন্ডিত্যাভিমানী মূর্খ' - এধরণের লেবেল এঁটে দিয়ে বেদ-সমালোচকদের প্রতিহত করার প্রচেষ্টা তারই ইঙ্গিত বহন করে। আজকেও কি এ দৃষ্টিভঙ্গীর খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে? যে ভদ্রলোকটি আমাকে ধর্মগ্রন্থের সমালোচনা করার জন্য 'অন্ধ' বা 'বর্বর' হিসেবে চিত্রিত করছেন, সে ধরনের লোকজনের কিন্তু আজো সমাজে অভাব নেই, নাস্তিক শুনলেই তারা খ্যাঁক করে উঠেন - 'ও তুমি নাস্তিক! তবে তো তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার! তোমার তো চরিত্র বলে কিছু নেই'। এরা আসলে নাস্তিকদের মানুষ বলেই মনে করেন না, ভাল-মানুষ ভাবা তো আনেক পরের কথা। কিন্তু, নাস্তিক মানেই কি অনৈতিক, চরিত্রহীন, লম্পট গোছের কিছু? এমনিভাবে ভাবার মোটেই কোন কারণ নেই। নাস্তিকরা আসলে নাকের সামনে থেকে ঈশ্বর নামক মুলাটি সরিয়ে বাস্তবসম্মত ভাবে 'মরালিটি' বা নৈতিকতা কে দেখবার পক্ষপাতি। ঈশ্বরের ভয়ে নয়, একটি সুন্দর এবং সুস্থ্য সমাজ গড়ে তুলবার প্রয়োজনেই মানুষের চুরি-দারি, লাম্পট্য, খুন, ধর্ষণ বিসর্জন দিয়ে সামাজিক মূল্যবোধগুলি গড়ে তোলা দরকার। নয়ত সমাজের ভিত্তি-মূলই যে একসময় ধ্বসে পড়বে! কাজেই অধার্মিকদের চোখে 'নৈতিকতা' বেহেস্তে যাওয়ার কোন পাসপোর্ট নয়, বরং নিতান্তই সামাজিক আবশ্যকতা। ধর্মান্ধরা যেহেতু সামাজিক-মূল্যবোধের এই বিষয়গুলো একেবারেই বুঝতে চান না, তাই তাদের মধ্যে যুদ্ধ, দাঙ্গা, জিহাদ, মারামারি লেগেই আছে। ১৯৭১ সালের কথাই ধরা যাক। সারা বাংলা হত-বিহ্বল হয়ে দেখেছে কিছু ধর্মান্ধ মানুষ ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে কি করে পশুর স্তরে নেমে যেতে পারে।

এক ভদ্রলোককে চিনতাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সাতে-পাঁচে নেই; সাদা চোখে দেখেলে নিতান্ত ভালমানুষ বলেই মনে হবে। কিন্তু ভুক্তভোগীরা জানেন যে একাত্তরে ভদ্রলোক এহেন দুষ্কর্ম নেই যে করেননি। সে সময় এমনকি তিনি ফতোয়া দিয়েছিলেন এই বলে যে, খান-সেনারা যদি কোন বাঙালী মেয়েকে ধর্ষণ করে তবে সেটি অন্যায় বলে বিবেচিত হবে না, বঙ্গনারীরা পাক-বাহিনীর জন্য 'মালে গনিমত', কারণ তারা ইসলামের জন্য লড়ছে। এমন নয় যে ভদ্রলোক অশিক্ষিত ছিলেন, অথবা ছিলেন বুদ্ধিহীন। বরং সৎ এবং হৃদয়বান হিসেবেই একটা সময় তার খ্যাতি ছিল; কিন্তু এই 'সজ্জন' ব্যক্তিও স্রেফ ধর্মের প্রতি ভালবাসায় অন্ধ হয়ে নেমে গেলেন পশুর স্তরে। উনি ভেবেছিলেন পাকিস্তান ভেঙ্গে গেলে ইসলাম হবে বিপন্ন। তাই ধর্ম বাঁচাতে যা যা করা দরকার সবই করেছেন। এমনকি খান সেনাদের সাথে পাল্লা দিয়ে তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগও আছে। ব্যাপারটি আনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও অতিমাত্রায় ধর্মপ্রবণদের জন্য এ ধরণের কাজ খুবই স্বাভাবিক। অনেক সময়ই মানবিকতার চেয়ে তাদের কাছে ধর্মবোধটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। এই ভদ্রলোকের কথা ভাবলেই নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ স্টিফেন ভাইনবার্গের বিখ্যাত উক্তিটি আমার মনে পড়ে যায় :

> 'ধর্ম মানবতার জন্য এক নির্মম পরিহাস। ধর্ম মানুক বা নাই মানুক, সবসময়ই এমন অবস্থা থাকবে যে ভাল মানুষেরা ভাল কাজ করছে, আর খারাপ মানুষেরা খারাপ কাজ করছে। কিন্তু ভাল মানুষকে দিয়ে খারাপ কাজ করানোর ক্ষেত্রে ধর্মের জুড়ি নেই।'

শুধু একাত্তর তো কেবল নয়, বছর কয়েক আগে গুজরাটে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দাঙ্গা, আর তারও আগে অযোদ্ধায় বাবরী মসজিদ ভেংগে শিবসেনাদের তান্ডব নৃত্য ধর্মের এই ভয়াবহ রূপটিকেই স্মরণ করে দেয়। আপরপক্ষে নাস্তিকদের যেহেতু এই অতি মানবিক সত্ত্বা-কেন্দ্রিক নৈতিকতায় কোন বিশ্বাস নেই, একজন নিষ্ঠাবান নাস্তিক সত্যিকার অর্থে গড়ে উঠতে পারেন একজন যথার্থ প্রথা-বিরোধী মানুষ হিসেবে। সুমন তুরহান নামে এক লেখক মাসিক দেশ পত্রিকার ৪ নভেম্বর ২০০২ সংখ্যায় 'নাস্তিকতার সংজ্ঞা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন - 'নাস্তিকদের অবিশ্বাস তাই শুধু অতিমানবিক সত্ত্বায় নয়, তার চেয়ে অনেক গভীরে, তিনি অবিশ্বাস করেন প্রথাগত সভ্যতার প্রায় সমস্ত অপবিশ্বাসে । সব কিছুই তারা যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখতে চান।' এর মধ্যে যে কিছুটা হলেও যে সত্যতা নেই তা নয়। তবে ভালমানুষ হোন, আর নাই হোন এটা কিন্তু ঠিক যে নাস্তিক বা অধার্মিকদের মধ্যে থেকে কখনোই আল-কায়েদা, তালিবান, হরকত-উল-জিদাদ, রাজাকার, আলবদর বা শিবসেনাদের মত সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক রূপ দেখা যায় না। যতদিন ধর্ম থাকবে, ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকবে ধর্মের সাম্প্রদায়িক এই সাংগঠনিক রূপটিও কিন্তু বজায় বজায় থাকবে পুরোমাত্রায়। কাজেই যতদিন মানুষের আনুগত্য ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে বিভক্ত হয়ে থাকবে ততদিন তা মানুষকে স্বাধীনভাবে আর বিজ্ঞানসম্মতভাবে নৈতিকতা ও মুল্যবোধ অর্জনে বাঁধা দিবেই। বেহেস্তের লোভে বা ঈশ্বরকে তুষ্ট করার জন্য নয়, মানুষকে ভালবেসে মানুষের জন্য কাজ করার প্রচেষ্টা যদি আন্তরিক হয়, তবেই গড়ে উঠবে সার্বজনীন মানবতাবাদ। সম্প্রতি এর প্রচেষ্টা শুরুও হয়েছে । ঈশ্বর কেন্দ্রিক মিথ্যার বেসাতি মন থেকে সরিয়ে শুধু মানুষের জন্য মানুষের কাজ করার বাসনা নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে জুড়ে নতুন শতকের আধুনিক মতবাদ হিসেবে এসেছে হিউম্যানিজম। এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে মনবতাবাদী সমিতি এবং যুক্তিবাদী সমিতি অফিস আদালতের ফর্মে বা বিয়ের রেজিস্ট্রেশনে 'হিন্দু', 'মুসলিম' এই শব্দ গুলির পাশাপাশি ধর্মের জায়গায় 'মনুষ্যত্ব' শব্দটি ব্যবহারের আইনি অধিকার আদায় করেছে । এ প্রসঙ্গে ভারতীয় যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষের একটি চমৎকার উক্তি তার অলৌকিক নয়, লৌকিক গ্রন্থ থেকে হুবহু তুলে দিচ্ছি –

> আগুনের ধর্ম যেমন দহন, ছুঁরির ধর্ম যেমন তীক্ষ্নতা তেমনি মানুষের ধর্ম হওয়া উচিত মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন। আর সে হিসেবে নামাজ না পড়েও বা শনি শীতলার পুজা না করেও আমরা যুক্তিবাদী নাস্তিকেরাই প্রকৃত ধার্মিক, কারণ আমরা মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ চাই।

ধর্মগ্রন্থগুলো কি সত্যই নৈতিকতার ধারক এবং বাহক ?

ইদানিং এক নতুন ধরনের প্রগতিবাদী (নাকি সুবিধাবাদী) আন্দোলন শুরু হয়েছে, যার মূলমন্ত্র হল ধর্ম নয় কেবল মৌলবাদকে আঘাত কর। অনেক মুক্ত-মনা যুক্তিবাদীদের অনেকেই দেখছি বুঝে হোক, না বুঝে হোক এ প্রচারনায় গা ভাসিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের মতই ইদানিং সোচ্চারে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়ছেন : 'শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও মৌলবাদ রুখব', যেন মৌলবাদ ব্যাপারটি হঠাৎ করেই আকাশ

থেকে আবির্ভুত হয়েছে মহীরূহ আকারে - কোন শিকর-বাকর ছাড়াই। যারা ধর্মকে শ্বাশত চিরন্তন আর জনকল্যানমমূলক বলে মনে করেন আর যত দোষ চাপাতে চান কেবল গোলাম আজম, আদভানী কিংবা 'মৌলবাদ' নামক নন্দঘোষটির ঘারে, তাদের প্রথমে খোদ 'মৌলবাদ' শব্দটিকেই বিশ্লেষণ করতে দেখতে বলি। 'মৌল' শব্দের অর্থ মূল থেকে আগত, বা 'মূল সম্বন্ধীয়'। আর 'বাদ' শব্দের অর্থ যে 'মত', 'তত্ত্ব' বা 'থিওরী', তা তো আমরা জানিই। তা হলে মৌলবাদ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি দাঁড়ালো? দাঁড়ালো - 'মূল থেকে আগত তত্ত্ব'। কোন্ মূল থেকে আগত তত্ত্ব? শেষ পর্যন্ত ওই ধর্মগ্রন্থের গোঁড়া মূলনীতিগুলো হতে আগত তত্ত্ব। কাজেই বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কিন্তু থলের বিড়াল ঠিকই বেড়িয়ে পড়ছে যে, ধর্মশাস্ত্রের মূলনীতিগুলোকে চরম সত্য বলে যারা মনে করেন, তারাই শেষ পর্যন্ত মৌলবাদী হন। মৌলবাদ শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ হল 'Fundamentalism'। এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অক্সফোর্ড ডিকশেনারীতে বলা হয়েছে - "Strict maintenance of traditional scriptural beliefs'; চ্যাম্বার্স ডিকশেনারী শব্দটি সম্পর্ককে বলছে "Belief in literal truth in Bible, against evolution etc.'। কাজেই ধর্মকে বাদ দিয়ে মৌলবাদ রুখবার চেষ্টা অনেকটা বিষবৃক্ষের গোড়ায় পানি ঢেলে তাকে বাঁচিয়ে রেখে আগায় কাঁচি চালানোর প্রচেষ্টা, নিছক ভন্ডামী। তসলিমা নাসরীন একবার একটি ইংরেজী সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন :

> আমি সাধারণভাবে মৌলবাদীদের আর সেই সাথে ধর্মের- দু-এরই সমালোচনা করেছিলাম। আমি আসলে ইসলামের সাথে ইসলামী মৌলবাদের কোন তফাৎ দেখি না। আমি মনে করি ধর্মই হছে মূল উ্স, যেটি থেকে মৌলবাদ নামক বিষাক্ত ডালপালাগুলো সময় সময় বিস্তার লাভ করে। যদি আমরা ধর্মকে অক্ষত রেখে দেই, কেবল মৌলবাদ নামক একটি ডালকে ছেঁটে ফেলতে সচেষ্ট হই, দেখা যাবে কিছু দিন পর মৌলবাদের আরেকটা শাখা অচীরেই বেড়ে উঠেছে। আমি খুব পরিস্কারভাবেই এটি বলছি কারণ, কিছু উদারপন্থী লোকজন আছেন যারা এ ধরনের প্রশ্নে ইসলামকে ডিফেন্ড করেন আর সমস্ত সমস্যার জন্য কেবল মৌলবাদীদের ঘারে দোষ চাপিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হন। কিন্তু ইসলাম নিজেই তো নারী-নির্যাতনকারী। ইসলাম নিজেই তো গণতন্ত্র সমর্থন করে না আর সমস্ত মানবিক অধিকার হরণ করে'।

আমার এক পরিচিতজন আছেন- সেক্যুলার এবং প্রগতিশীলতার দাবীদার। কিন্তু তসলিমার এই সাক্ষাৎকার পড়ে তার যেন পিত্তি জ্বলে গেল! তসলিমা 'শ্যালো', তসলিমা 'নির্বোধ', তসলিমা 'ইডিয়ট', কী নন তিনি! বুঝলাম, তসলিমার বড় অপরাধ তিনি ধর্ম আর মৌলবাদকে এক করে ফেলেছেন। কিন্তু তসলিমা ভুল বলছেন না ঠিক বলছেন সেটি বিশ্লেষণ করতে হলে নির্মোহ সংশয়বাদী দৃষ্টকোন থেকে ধর্মগ্রন্থগুলোর দিকে তাকানো দরকার। আসুন প্রিয় পাঠক, আমরা যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষন করে দেখি- ধর্মগ্রন্থ গুলোর সাথে মৌলবাদের সত্যই কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে কিনা, এবং ধর্মগ্রন্থ গুলো আদপেই *'নৈতিকতার ভান্ডার'* হিসেবে পরিচিত হবার যোগ্যতা রাখে কিনা!

ধর্মগ্রন্থগুলো আসলে কি বলছে? পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মমতগুলো সৃষ্টি হয়েছে বড় জোর বিগত ২-৪ হাজার বছরের মধ্যে। হিন্দু, ইসলাম কিংবা খ্রীষ্ট ধর্ম কোনটাই সে অর্থে চিরন্তন বা সনাতন নয়। কাজেই 'সনাতন

ধর্ম' নিছকই একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস। তবে সনাতন না হলেও ধর্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু কিন্তু হয়েছিলো বহু হাজার বছর আগে। বিরূপ প্রকৃতির নানা দুর্যোগ - দাবানল, প্লাবণ,বজ্রপাত প্রভৃতির ব্যাখ্যা খুঁজতে অসহায় হয়ে আর ওগুলোর হাত থেকে মুক্তি খুঁজতে মানুষ সৃষ্টি করেছিলো নানা দেবদেবীর; মৃত্যুকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা না করতে পেরে সৃষ্টি করেছিল অদৃশ্য আত্মার। যারা সমাজ বিজ্ঞান নিয়ে সামান্য পড়াশুনা করেছেন তারাই এগুলো জানেন। আর এখন পর্যন্ত জানা তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, মানুষের মধ্যে তথাকথিত 'ধর্মবিশ্বাসের' সৃষ্টি হয়েছিল নিয়ান্ডার্থাল মানুষের আমলে - যারা পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে এখন থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ বছর আগে। নিয়ানডার্থাল মানুষের আগে পিথেকানথ্রোপাস আর সিনানথ্রোপাসদের মধ্যে ধর্মাচরনের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। তবে নিয়ান্ডার্থাল মানুষের বিশ্বাস গুলো ছিল একেবারেই আদিম- আজকের দিনের প্রচলিত ধর্মমতগুলোর তুলনায় একেবারেই আলাদা। এখন থেকে ৪০-১৮ হাজার বছর আগে উচ্চতর পুর-প্রস্তর যুগে এসে আত্মা, পরমাত্মা, ধর্মীয় আচার আর যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত ব্যাপার-স্যাপারগুলো সুসংহত হয়। আজকের দিনের ধর্মবিশ্বাস গুলোর মধ্যে বৈদিক ধর্মের (হিন্দু ধর্মের পূর্বসুরী) উদ্ভব হয়েছিল আজ থেকে মাত্র ৩৫০০ বছর আগে, ইসলাম ধর্ম এসেছে ১৪০০ বছর আগে, খ্রীষ্টধর্ম ২০০০ বছর আগে, ইত্যাদি। একটা সময় সামাজিক প্রয়োজনে যে ধর্মীয় রীতি নিতি নিয়ম কানুন তৈরী হয়েছিল, আজ তার অনেকগুলিই কালের পরিক্রমায় স্থবির, পশ্চাৎপদ, নিবর্তনমূলক এবং অমানবিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ইতিহাস পরিক্রমায় দেখা যায় ফোনিকান, হিব্রু, ক্যানানাইট, মায়া, ইনকা, এস্টেক, ওলমেক্স, গ্রীক, রোমান কার্থাগিনিয়ান, টিউটন্, সেল্ট, ড্রুইড, গল, থাই, জাপানি, মাউরি, তাহিতিয়ান, হাওয়াই অধিবাসী - সবাই নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী দেদারসে শিশু, নারী, পুরুষ বলি দিয়েছে তাদের অদৃশ্য দেব-দেবীদের তুষ্ট করতে।

কিছু সভ্যতায় দেখা যায়, যখন কোন নতুন প্রাসাদ কিংবা ইমারত তৈরি করা হত, তার আগে সেই জায়গায় শিশুদের জীবন্ত কবর দেওয়া হত - এই ধারণা থেকে যে, এটি প্রাসদের ভিত্তি মজবুত করবে। অনেক আদিম সমাজেই বন্যা কিংবা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কুমারী উৎসর্গ করার বিধান ছিল; কেউ কেউ সদ্যজন্মলাভ করা শিশুদের হত্যা করত, এমনকি খেয়েও ফেলত। কোন কোন সংস্কৃতিতে কোন বিখ্যাত মানুষ মারা গেলে অন্য মহিলা এবং পুরুষদেরও তার সাথে জীবন্ত কবর দেওয়া হত, যাতে তারা পরকালে গিয়ে পুরুষটির কাজে আসতে পারে। ফিজিতে 'ভাকাতোকা' নামে এক ধরনের বিভৎস রীতি প্রচলিত ছিল যেখানে একজনের হাত-পা কেটে ফেলে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে সেই কর্তিত অংগগুলো খাওয়া হত। আফ্রিকার বহু জাতিতে হত্যার রীতি চালু আছে মৃত-পূর্বপুরুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্য। ভারতে সতীদাহের কথা তো জানাই। এগুলো সবই মানুষ করেছে ধর্মীয় রীতি-নীতিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে, অদৃশ্য ঈশ্বরকে তুষ্ট করতে গিয়ে। এধরনের 'ধর্মীয় হত্যা' সম্বন্ধে আরো বিস্তৃতভাবে জানবার জন্য ডেভিড নিগেলের 'Human Sacrifice: In History And Today' বইটি পড়া যেতে পারে।

এবার আসি প্রচলিত ধর্মগ্রন্থগুলোর প্রসঙ্গে। পবিত্র কোরাণের বেশ অনেকটা জুড়েই রয়েছে অনর্থক উত্তেজক নির্দেশাবলীর ছড়াছড়ি, যেগুলো 'মৌলবাদের সুতিকাগার' হিসেবে আজ কারো মনে হতেই পারে। যেমন :

কোরান মুমিন ভক্তদের শেখাচ্ছে যেখানেই অবিশ্বাসীদের পাওয়া যাক তাদের হত্যা করতে (২:১৯১, ৯:৫), তাদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হতে, কঠোর ব্যবহার করতে (৯:১২৩), আর যুদ্ধ করে যেতে (৮:৬৫)। কোরাণ শেখাচ্ছে বিধর্মীদের অপদস্ত করতে আর তাদের উপর জিজিয়া কর আরোপ করতে (৯:২৯)। কোরাণ অন্য সকল ধর্মের অনুসারীদের কাছ থেকে ধর্মীয় স্বাধীনতার নির্যাসটুকু কেড়ে নিয়ে সোচ্চারে ঘোষণা করছে যে ইসলামই হচ্ছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম (৩:৮৫)। এটি অবিশ্বাসীদের দোজখে নির্বাসিত করে (৫:১০), এবং 'অপবিত্র' বলে সম্বোধন করে (৯:২৮); মুসলিমদের ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আদেশ করে যত ক্ষণ পর্যন্ত না অন্য সকল ধর্মকে সরিয়ে ইসলামী রাজত্ব কায়েম হয় (২:১৯৩)। কোরাণ বলছে যে শুধু ইসলামে অবিশ্বাসের কারণেই একটি মানুষ দোজখের আগুনে পুড়বে আর তাকে সেখানে পান করতে হবে পুঁতি দুর্গন্ধ ময় পূঁজ (১৪:১৭)। এই 'পবিত্র' গ্রন্থটি অবিশ্বাসীদের হত্যা করতে অথবা তাদের হাত পা কেটে ফেলতে প্ররোচিত করছে, দেশ থেকে আপমান করে নির্বাসিত করতে বলছে আর ভয় দেখাচ্ছে এই বলে যে- 'তাদের জন্য পরকালে অপেক্ষা করছে ভয়ানক শাস্তি' (৫:৩৪)। আরও বলছে, 'যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে যাতে ওদের চামড়া আর পেটে যা আছে তা গলে যায়, আর ওদের পেটানোর জন্য থাকবে লোহার মুগুর' (২২:১৯)। কোরাণ ইহুদী এবং নাসারাদের সাথে বন্ধুত্বটুকু করতে পর্যন্ত নিষেধ করছে (৫:৫১), এমনকি নিজের পিতা বা ভাই যদি আবিশ্বাসী হয় তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখতে উদ্বুদ্ধ করছে (৯:২৩, ৩:২৮)। আল্লাহ তার কোরাণে পরিস্কার করেই বলছে - আল্লা-রসুলে যাদের বিশ্বাস নেই, তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড (৪৮:১৩)। ইসলামে অবিশ্বাস করে কেউ মারা গেলে কঠোর ভাবে উচ্চারিত হবে - 'ধর ওকে, গলায় বেড়ি পড়াও এবং নিক্ষেপ কর জাহান্নামে আর তাকে শৃংখলিত কর সত্তুর হাত দীর্ঘ এক শৃংখলে' (৬৯:৩০-৩৩)। মহানবী সবসময়ই আল্লাহর নামে যুদ্ধ করতে সবাইকে উৎসাহিত করেছেন সাফাই গেয়েছেন এই বলে - 'এটা আমাদের জন্য ভালই, এমনকি যদি আমাদের অপছন্দ হয় তবুও' (২:২১৬), তারপর উপদেশ দিয়েছেন - 'কাফেরদের গর্দানে আঘাত কর' আর তারপর তাদের উপর রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবার নির্দেশের পর বলেছেন অবশিষ্টদের ভালভাবে বেঁধে ফেলতে (৪৭:৪)। পরমকরুনাময় আল্লাহতালা এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন - 'কাফেরদের হৃদয়ে আমি গভীর ভীতির সঞ্চার করব' এবং বিশ্বাসীদের আদেশ করেছেন কাফেরদের কাঁধে আঘাত করতে আর হাতের সমস্ত আংগুলের ডগা ভেঙ্গে দিতে (৮:১২)

আল্লাহ জিহাদকে মুমিনদের জন্য 'আবশ্যিক' (mandatory) করেছেন আর সতর্ক করেছেন এই বলে -'তোমরা যদি সামনে না এগিয়ে আস (জিহাদের জন্য) তবে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে মর্মন্তুদ শাস্তি'(৯:৩৯)। আল্লাহ তার পেয়ারা নবীকে বলছেন, 'হে

নবী, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর আর কঠোর হও- কেননা, জাহান্নামের মত নিকৃষ্ট আবাস স্থলই হল তাদের পরিনাম' (৯:৭৩)।

এই হচ্ছে কোরাণ (হাদিস এবং অন্যান্য গ্রন্থগুলোর কথা না হয় বাদই থাকুক আপাততঃ)। অনেকেই দেখেছি নিজস্ব বিশ্বাসে আপ্লুত হয়ে কোরানকে নির্দ্বিধায় "The book of guidance' বলে মেনে নেন, আর ইসলামকে মনে করেন 'শান্তির ধর্ম'। যারা এমনটি ভাবেন, তারা কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে উপরের আয়াতগুলো কেউ যদি নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে আর সমাজে তার বাস্তব প্রয়োগ চায় তবে তারা কি ধরনের শান্তিএ পৃথিবীতে বয়ে আনবে? জ্বিহাদীদের কল্যাণে আজকের বিশ্বে 'ইসলামী সন্ত্রাসবাদ' (Islamic Terrorism) একটি প্রতিষ্ঠিত শব্দ। প্রতিদিন কাগজের পাতা খুললেই দেখা যায় এই জ্বিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ কিছু লোক বোমা মারছে মানুষ-জন, বাড়ী-ঘর, কারখানা, রাস্তাঘাট, যানবাহন, সিনেমা হল, সাংস্কৃতিক অঙ্গন বা সমুদ্র-সৈকতে। হাজার খানেক জ্বিহাদী সংগঠন যেমন - আল্ কায়দা, ইসলামিক জ্বিহাদ, হামাস, হরকত-উল-জিহাদ, হরকত-উল-মুজাহিদিন, জেইস-মুহম্মদ, জ্বিহাদ-এ-মুহম্মদ, তাহ-রিখ-এ-নিফাজ-সারিয়াত-এ-মুহম্মদ, আল-হিকমা, আল-বদর-মুজাহিদিন, জামায়ে ইসলামিয়া, হিজাব-এ-ইসলামিয়া আজ সারা পৃথিবী জুড়ে কায়েম করছে এক ত্রাসের রাজত্ব । ২০০৫ সালের ১৭ ই অগাস্ট সারা বাংলাদেশে একনাগারে ৬৩টি জেলায় একনাগারে বোমার মহড়া হয়ে গেল। মহড়ার প্রকোপ এমনই ব্যাপক ছিল যে অনেকেই ১৭ ই আগাষ্ট দিনটিকে এখন 'বাংলাদেশের ৯/১১' বলে অভিহিত করতে শুরু করেছেন। জঙ্গিবাদের সাথে বিশুদ্ধ ইসলামের সম্পর্ক কতটুকু তা বোঝা হয়ে গেছে বোমা মহড়ার স্থানগুলোতে পাওয়া তাদের ছাপানো লিফলেটগুলো থেকেই। সারা লিফলেট জুড়েই কোরাণ হাদিস থেকে নানা উদ্ধৃতি আর কাফের নাফরমানদের বিরুদ্ধে জ্বিহাদের ডাক। ফরহাদ মজহার আর বদরুদ্দিন উমরেরা পালের হাওয়া যতই অন্য দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করুক না কেন, বিশুদ্ধ ইসলামের সাথে জঙ্গিবাদের যে একটা সম্পর্ক রয়েছে, তা আর অস্বীকার করার জো নেই । সচেতন শান্তিকামী ধার্মিক মানুষদের আজ আত্মোপলব্ধির সময় এসেছে, সময় এসেছে সংশয়বাদী দৃষ্টিকোন থেকে প্রশ্ন করার - কেন এই জঙ্গি দলগুলো এত ইসলামিক? কেন তারা সন্ত্রাসী? কারা ধীরে ধীরে গড়ে তুলছে মোল্লা ওমর, বিন-লাদেন, মৌলানা মান্নান, গোলাম আজম, শাইখ আবদুর রহমান, মুফতি হান্নান আর বাংলাভাইদের? কে ইন্ধন যোগাচ্ছে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে? আজ অত্যন্ত পরিস্কারভাবে তাই বলার সময় এসেছে - এই 'পবিত্র' ধর্মগ্রন্থগুলো অনেকাংশেই মুসলিমদের ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের মূল উৎস। তবে সেই সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা দেশগুলোর সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং মধ্যপ্রাচ্যের প্রতি দীর্ঘদিনের বিদ্বেষমূলক পররাষ্ট্রনীতির কথাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না । জনবিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্র না পাওয়া কিংবা সাদ্দামের সাথে আল-কায়েদার কোন সম্পর্ক না খুঁজে পাওয়া কিংবা জৈব-যুদ্ধাস্ত্র না পাওয়া সত্ত্বেও নির্লজ্জ ভাবে ইরাকের উপর যে আগ্রাসন চালিয়েছে তা শুধু যে আমেরিকার চিরচেনা সাম্রাজ্যবাদী চেহারাটাকেই স্পষ্ট করে তুলেছে তা নয়, ইসলামী বিশ্ব এই আগ্রাসনকে যে কোন কারণেই হোক 'ইসলামের উপর আঘাত' হিসেবে নিয়েছে। সেজন্য রাজনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সে সমস্ত দেশেই ইসলামী আত্মঘাতী বোমা হামলার মাত্রাটা বেশী যে দেশের সরকার ইরাক যুদ্ধে বুশ-ব্লেয়ারকে নগ্নভাবে সমর্থন করেছে। প্যালেস্টাইনীদের বঞ্চিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলো যেভাবে দীর্ঘদিন ধরে

ইসরায়েলকে নগ্নভাবে সমর্থন করেছে তাও মুসলিম সমাজকে সংঘাতের পথে ঠেলে দিয়েছে। এই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আর প্রতিহিংসার ব্যাপারগুলো ভুলে গেলে কোন আলোচনাই কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না। আরেকটি ব্যাপার উল্লেখ করাও বোধ হয় এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রাষ্ট্রযন্ত্র কিভাবে ধর্ম ও মৌলবাদকে লালন করে, পালন করে আর সময় বিশেষে উস্কে দেয় তার একটি বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিজ্ঞানীরা স্টেম সেল নিয়ে গবেষণা করবে কি করবে না, কৃত্রিমভাবে সংযুক্ত জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র তুলে ফেলা হবে কি হবে না, স্কুলে বিবর্তনবাদ পড়ানো হবে কিনা, আর হলে কিভাবেই বা পড়াতে হবে, সব কিছুই সূক্ষভাবে নিয়ন্ত্রন করছে সরকার। বিজ্ঞানীদের গবেষণা আর কাজকর্ম নৈতিক না অনৈতিক - এ নিয়েও উপযাজক হয়ে জ্ঞানগর্ভ মত দিতে এগিয়ে আসছে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত অর্ধশিক্ষিত পাদ্রী আর যাজকেরা। যুদ্ধের আগে নবী-রসুলদের মতই 'ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর' শুনতে পাচ্ছে সে দেশের প্রেসিডেন্ট; মিডিয়া, বৃহৎ পত্রিকা গোষ্ঠি আর প্রকাশক নির্ধারণ করে দিচ্ছে কোন্ খবরে আমরা বিশ্বাস করব, আর কোন খবর চেপে যাওয়া হবে। আসলে 'মুক্ত বিশ্বের' কথা মুখে বলে এভাবেই নাগরিক রুচি, চাহিদা, চেতনা আর পুরো জীবনধারাকেই নিয়ন্ত্রন করতে চাইছে ধর্মান্ধ শাসককুল আর ধনকুবের গোষ্ঠি; সে অন্য এক ইতিহাস।

ধর্ম, মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনার একটা বড় সমস্যা হল অযাচিত 'স্টেরিওটাইপিং' এর ভয়। এ ধরণের আলোচনা শুরু হলেই আমি দেখেছি বিশ্বাসীদের অনেকেই ক্ষিপ্ত হয়ে বলতে থাকেন - শুধু গুটি কয়েক সন্ত্রাসীদের কারণে সামগ্রিক ভাবে ইসলামকে বা মুসলীমদের দায়ী করা কি ঠিক হচ্ছে ? একজন বিন লাদেন বা একজন মুফতি হান্নান কি ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে নাকি? না, সত্যই করে না। কাজেই আমিও বলি যে, পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম জনগোষ্ঠিকে কখনওই সন্ত্রাসী বলা উচিৎ নয়, যারা এ ধরনের 'স্টেরিওটাইপিং' করতে চান তাবা ভুল করেন। এটি একধরনের Racism । কেউ বা বলেন এটি এক ধরনের রোগ - 'ইসলামোফোবিয়া'! রোগ ই বলুন আর পশ্চিমা জাত্যাভিমানই বলুন (যাকে প্রয়াত এডোয়ার্ড সাইদ অভিহিত করেন 'ওরিয়ান্টালিজম' নামে), ৯/১১ এর পর পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসরত মুসলিমরা এ ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের স্বীকার হয়েছে বহু ক্ষেত্রেই - এ তো অস্বীকার করবার জো নেই। মুসলিম মানেই যে 'সন্ত্রাসী' নয় এটি বোঝার জন্য তো কোন দর্শন কপচানোর দরকার নেই, আমার-আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই তো যথেষ্ট হবার কথা। আমার নিজেরই অনেক মুসলিম বন্ধু-বান্ধব রয়েছে। তাদের কেউই তো সন্ত্রাসী নন। কেউই বিন লাদেন নন, কেউই নন মুফতি হান্নান। তারা আমার বিপদে আপদে খোঁজ-খবর নেন, বাসায় এসে গল্প-গুজব করেন, খাওয়া-দাওয়া করেন, এমন কি নামাজের সময় হলে এই কাফিরের বাসায় ‘পশ্চিম দিক কোনটা’ জানতে চেয়ে নামাজও পড়েন। এরা নিপাট ভাল মানুষ। তারা কোরানের কোন আয়াতে ভায়োলেন্সের কথা আছে তা সম্বন্ধে মোটেও ওয়াকিবহাল নন, সেটা নিয়ে আগ্রহীও নন- তারা আসলে 'Spiritual Islam' এর চর্চা করেন। বিপদটা কখনই এদের নিয়ে নয়। এরা সবাই শান্তি, ভালবাসা আর সহিষ্ণুতায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই মূল্যবোধগুলো তারা যতটা না ইসলাম থেকে পেয়েছেন, তার চেয়ে অনেক বেশী ছোট বেলা থেকেই সামাজিক শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কারণ কোনদিন কোরাণের বা ইসলামের চর্চা না করেও তো বহু মানুষ এই গুনাবলীগুলো বর্জিত নয়, এমন প্রমাণ ভুরি ভুরি হাজির করা যায়। কিন্তু এই 'Spiritual Islam' এর চর্চাকারী দলের বাইরেও একটা অংশ রয়েছে যারা

রীতিমত কোরাণের চর্চা করেন, চোখ-কান বন্ধ করে কোরানের সকল আদেশ-নির্দেশ মেনে চলেন আর কোরাণের আলোকে দেশ ও পৃথিবী গড়তে চান। বিপদটা এদের নিয়েই। কারণ কেউ যদি সামাজিক শিক্ষার বদলে কোরানের সকল আদেশ-নির্দেশ চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নেন তাহলে কি হবে ? নীচের আয়াতটায় চোখ বুলানো যাক -

> *Let not the believers Take for friends or helpers Unbelievers rather than believers: if any do that, in nothing will there be help from Allah (Q. 3:28)*

যারা কোরানের মধ্যে কখনও ভায়োলেন্সের টিকিটিও খুঁজে পান না, বরং পবিত্র কোরানের আলোকে জীবন সাজাতে চান, তারা নিজেরাই কি তাদের কোন হিন্দু, খ্রীস্টান বা অধার্মিক প্রতিবেশীদের প্রতি কোরাণে বর্ণিত উপরের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করেন? তারা কি সত্যই শুধুমাত্র অমুসলিম বলেই কারো বন্ধুত্ব প্রত্যাখান করেন? যদি তা না হয়, তবে বলতেই হয় যে তারা আসলে কোরাণের নির্দেশ অনুযায়ী চলছেন না। কিন্তু কোরাণ তো 'আল্লাহর কিতাব'। যদি কেউ যদি ভাসা ভাসা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোরানের চর্চা না করে কোরাণের সকল নির্দেশ আক্ষরিক ভাবেই মেনে চলার সিদ্ধান্ত নেন আর অবশেষে সাম্প্রদায়িক 'তালিবান' হিসেবে বেড়ে উঠেন, তবে দোষটা কার হবে?

আরেকটি আয়াত দেখি -

> *Fighting is prescribed for you, and ye dislike it. But it is possible that ye dislike a thing which is good for you (Q. 2:216)*

অথবা,

> *Then fight in Allah's cause - Thou art held responsible only for thyself - and rouse the believers. It may be that Allah will restrain the fury of the Unbelievers; for Allah is the strongest in might and in punishment (Q. 4:84).*

কোরাণের বর্ণিত নির্দেশ মত জ্বিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে তালিবানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইহুদী-নাসারাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য আফগানিস্তান চলে গিয়েছিলেন অনেকেই; কারণ ইহুদি-নাসারাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে তারা আল্লাহর নির্দেশ বলেই মেনে নিয়েছিলেন। তাদের যে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় তাও নয়। এমনি একজন ব্যক্তির উদাহরণ হচ্ছে John Phillip Walker Lindh (transformed as Abdul Hamid- বিখ্যাত 'আমেরিকান তালিবান'। দৈনিক প্রথম আলোর ১৮ ই অক্টোবর রিপোর্টে প্রকাশিত

হয়েছে সম্প্রতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হরকাতুল জিহাদের তত্ত্বাবধানে আশির দশকে বাংলাদেশ থেকে প্রায় তিন হাজার মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আফগানিস্তানে চলে গিয়েছিল । কোরাণের অমানবিক শিক্ষাই যে শেষ পর্যন্ত মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্রদের মধ্যে 'কাফিরদের' বিরুদ্ধে অযথা হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানোতে বহুলাংশে দায়ী, এটি অস্বীকার করার চেষ্টা স্রেফ আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়। এ স্পর্শকাতর বিষয়টি আলোচনা করতে গেলে সবসময়ই ঘুরে ফিরে ৯/১১'র ঘটনাটি সামনে চলে আসে। ৯/১১ এর ঘটনায় সারা পৃথিবী স্তম্ভিত হয়ে দেখেছিলো কি করে কিছু ধর্মোন্মাদ জ্বিহাদী সৈনিক উড়োজাহাজকে অস্ত্র বানিয়ে হাজার হাজার নিরপরাধ লোকের প্রাণহানি ঘটাতে পারে। যারা ইসলামের মধ্যে প্রতিনিয়ত শান্তি খোঁজেন, তারা বলবেন, এগুলো কতিপয় পথভ্রষ্ট দুষ্কৃতকারীদের কাজ - যার সাথে প্রকৃত ইসলামের সাথে কোনই সম্পর্ক নাই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই 'কতিপয় পথভ্রষ্ট দুষ্কৃতকারী'রা তো আর নিজেদের দুষ্কৃতকারী ভাবেনি। বরং ভেবেছে তারাই সাচ্চা মুসলিম, যারা কিনা আল্লাহর দেওয়া অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে। ৯/১১ ঘটার অনেক আগেই - ১১ই জানুয়ারী ১৯৯৯ এর নিউজ উইকের একটি সংখ্যায় ওসামা বিন লাদেনের একটা সাক্ষাতকার ছাপা হয়েছিল। সেই সাক্ষাতকারে লাদেন সাহেব পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন কেন তিনি সকল আমেরিকানদের মেরে ফেলাকে 'জায়েজ' মনে করেন। পাঠকদের উদ্দেশ্য কিছুঅংশ তুলে দেওয়া হল -

> QUESTION: "Why have you asked Muslims to target civilian Americans all over the world? Islam prohibits its followers from killing civilians in war?"
>
> BIN LADEN: "If the Israelis are killing small children in Palestine and the Americans are killing the innocent people in Iraq, and if the majority of the American people support their dissolute president, this means the American people are fighting us and we have the right to target them.
>
> QUESTION: "All Americans?"
>
> BIN LADEN "Muslim scholars have issued a fatwa [a religious order] against any American who pays taxes to his government. He is our target, because he is helping the American war machine against the Muslim nation.

হিন্দু ধর্মকে ইসলাম থেকে কোন অর্থেই ভাল বলবার জো নেই। যে জাতিভেদ প্রথার বিষ-বাষ্প প্রায় তিন হাজার বছর ধরে কুড়ে কুড়ে ভারতকে খাচ্ছে তার প্রধান রূপকার সয়ং ঈশ্বর। মনুসংহিতা থেকে আমরা

পাই- মানুষের সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর নিজের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য, আর পা থেকে শুদ্র সৃষ্টি করেছিলেন (১:৩১)। বিশ্বাসীরা জোর গলায় বলেন, ঈশ্বরের চোখে নাকি সবাই সমান! অথচ, ব্রাহ্মণদের মাথা থেকে আর শুদ্রদের পা থেকে তৈরী করার পেছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যটি কিন্তু বড় ই মহান! শুদ্র আর দলিত নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের প্রতি তাই 'ঈশ্বরের মাথা থেকে সৃষ্ট' উঁচু জাতের ব্রাহ্মণদের দুর্ব্যবহারের কথা সর্বজনবিদিত। সমস্ত বড়লোকের বাসায় এখনও দাস হিসেবে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের নিয়োগ দেয়া হয়। মনু বলেছেন- দাসত্বের কাজ নির্বাহ করার জন্যই বিধাতা শুদ্রদের সৃষ্টি করেছিলেন (৮:৪১৩)। এই সমস্ত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বাসার সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে চলে যাওয়ার পর গঙ্গা-জল ছিটিয়ে গৃহকে ‘পবিত্র’ করা হত (ক্ষেত্র বিশেষে এখনও হয়)। আর হবে নাই বা কেন ! তারা আবার মানুষ নাকি? তারা তো অচ্ছুৎ! শ্রী এম.সি.রাজার কথায়, 'আপনি বাড়ীতে কুকুর-বিড়ালের চাষ করতে পারেন, গো-মুত্র পান করতে পারেন, এমনকি পাপ দূর করার জন্য সারা গায়ে গোবর লেপতে পারেন, কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ছায়াটি পর্যন্ত আপনি মারাতে পারবেন না'! এই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের নৈতিকতা! এমন কি হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিতে শুদ্রদের উপার্জিত ধন সম্পত্তি তাদের ভোগের ও অধিকার নেই। সব উপার্জিত ধন দাস-মালিকেরাই গ্রহণ করবে -এই ছিল মনুর বিধান - 'ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিত স্বং ভর্ত্তৃহার্যধনো হি সঃ' (৮:৪১৬)। শুদ্ররা ছিল বঞ্চণার করুনতম নিদর্শন; তাদের না ছিল নাগরিক অধিকার, না ছিল ধর্মীয় বা অর্থনৈতিক অধিকার। শুদ্রদের যাতে অন্য তিন বর্ণ থেকে আলাদা করে চেনা যায় এবং শুদ্ররা যেন প্রতিটি মুহূর্তে মনে রাখে যে তিন বর্ণের মানুষের ক্রীতদাস হয়ে সেবা করবার জন্যই তাদের জন্ম। তিন বর্ণের মানুষদের থেকে শুদ্ররা যে ভিন্নতর জীব, মনুষ্যেতর জীব তা জানানোর জন্য প্রতি মাসে মাথার সব চুল কামিয়ে ফেলবার নির্দেশ দিয়েছেন মনু (৫:১৪০)। একজন শুদ্রকে বেদ পাঠ তো দূরের কথা, শ্রবনেরও অধিকার দেওয়া হয়নি। একজন শুদ্রকে তার উঁচু জাতে বিয়ে করবার অনুমতি পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এজন শুদ্র যদি ব্রাহ্মণের জন্য সংরক্ষিত আসনে বসে পড়ে, তবে তার বুকে গরম লোগার রডের ছ্যাকা দেবার অথবা পশ্চাৎদেশ কর্তন করে নেবার বিধান রয়েছে (৮: ২৮১)।

মনুর এসব বর্ণবাদী নীতির বাস্তব রূপায়ন আমরা দেখতে পাই রামায়ন ও মহাভারতে। বিশেষতঃ ধর্মশাস্ত্রীয় অনুশাসন যে শ্রেনী বৈষম্যের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হত এবং শূদ্রদের দমন-নিপীড়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত, তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ রামায়নের শম্বুকবধ কাহিনী। তপস্যা করার 'অপরাধে' রামচন্দ্র খÍগ দিয়ে শম্বুক নামক এক শূদ্র তাপসের শিরোচ্ছেদ করেন তার তথাকথিত রামরাজ্যে ।

প্রায় একই ধরনের ঘটনা আমরা দেখি মহাভারতে যখন নিষাদরাজ হিরন্যধনুর পুত্র একলব্য দ্রোনাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখতে এলে তাকে নীচ জাতি বলে প্রত্যাখ্যান করেন দ্রোণ। শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত একলব্যের শর নিক্ষেপের দক্ষতা নষ্ট করে ধনুর্বিদ্যায় দ্রোণের প্রিয় ছাত্র অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুন্ন রক্ষার অভিপ্রায়ে 'গুরু দক্ষিণা' হিসেবে একলব্যের বুড়ো আঙ্গুল কেটে নেন তিনি। এ ধরণের অনেক উপকরণ ছড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন মহাকাব্যগুলোতে।

আসলে এই সব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম আদিম মানুষের সাম্যের সমাজকাঠমোর ভিত উপড়ে ফেলে প্রতিষ্ঠা করেছিল অসাম্যের সমাজের, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের। ধর্মই তৈরী করেছিল হুজুর-মুজুর শ্রেনীর কৃত্রিম বিভাজনের, কিংবা হয়ত বলা যায় শোষক শ্রেণীই শ্রেনী বিভক্ত সমাজের ফায়দা পুরোপুরি লুটবার জন্য প্রথম থেকেই কাজে লাগিয়েছিল ধর্মকে; যে ভাবেই দেখি না কেন এর ফলে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সামাজিক আর অর্থনৈতিক শোষণের। এই শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবার জন্যই ব্রাহ্মণেরা প্রচার করেছিল - ধর্মগ্রন্থগুলো সয়ং ঈশ্বরের মুখ-নিসৃত। মানুষে মানুষে বিভেদ নাকি ঈশ্বর-নির্দেশিত! ঈশ্বরকে সাক্ষী মেনে রাজনৈতিকভাবে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত সুদুরপ্রসারী প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় উপমহাদেশের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলে।

ইসলামী জ্বিহাদী সৈনিকদের মতই ভারতে বিভেদের হাতিয়ার 'সনাতন ধর্ম' রক্ষায় আজ সচেষ্ট হয়েছে বিজেপি, রাষ্ট্রীয় সয়ং সেবক সংঘ, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, শিব-সেনা, বজরং দলের মত প্রতিক্রিয়াশীল দল গুলো। কয়েক দশক আগেও ভারতে নবহিন্দুত্বের তেমন কোন সংঠিত রূপ ছিল না । তবে অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর ধর্মান্ধতার কারণে ভারতের আপামোর জনসাধারণের কাছে সন্নাসী, গেরুয়া, জটা, দন্ড, রুদ্রাক্ষ, কমন্ডুলু এসব দীর্ঘকাল ধরে একটা বিমূঢ় সম্ভ্রম ভোগ করে এসেছে। ধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষের মোহের কথা ধুরন্ধর রাজনীতিবিদরা জানে। এই ধর্মীয় ভাবালুতা কে উস্কে দিতেই বোধহয় ১৯৯৮-৯০ সালে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় দুরদর্শনে ধর্মীয় অবয়বে প্রচারিত হল রামায়ন আর মহাভারত। সরকারী প্রচার মাধ্যমে এভাবে অন্ধ বিশ্বাসকে উৎসাহ দেবার ফলে ভারতে মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দুয়ার উন্মোচিত হল, রোপণ করা হল এক বিষ-বৃক্ষের চারা। দূরদর্শনের পর্দায় প্রথমবার রামায়ণ চলাকালে কল্পিত রাম জন্ম-ভূমি নিয়ে মৌলবাদী আন্দোলনের জোয়ার এবং পরবর্তীকালে ১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর উত্থান সেই প্রক্রিয়ারই অংশ। জয়ন্তানুজ বন্দোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে তার ‘মহাকাব্য ও মৌলবাদ’ বইয়ে বলেন:

> দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষে রামায়ন ও মহাভারতকে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহাকাব্যিক প্রতিফলন হিশেবে অথবা ভারতীয় তথা বিশ্বসাহিত্যের অমুল্য ধ্রুপদী সম্পদ হিশেবে গন্য না করে মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উপাদান হিশেবে ব্যবহার করার প্রবণতাই বেশী লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখানেই আমাদের গভীর লজ্জা। প্রথমে ১৯৮৮-৯০ সালে এবং আরও কয়েকবার সরকারী দুরদর্শনে রামায়ন ও মহাভারত যে অবয়ব ও প্রকাশভঙ্গিমায় সম্প্রচারিত হয়েছে, তা এই মৌলবাদী রাজনীতিতে ইন্ধন জুগিয়েছে বলেই মনে হয়। দুরদর্শনে সম্প্রচারিত রামায়নের কাহিনী প্রধানত তুলসীদাস রচিত রামচরিত মানস গ্রন্থকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে, বাল্মীকি রামায়নকে ভিত্তি করে নয়। তুলসী রামায়নের কাহিনী মধ্যযুগীয় ভক্তি আন্দোলনের ফলশ্রুতি এবং বৈষনব ভক্তি আন্দোলনের ফলশ্রুতি এবং বৈষনব ভক্তি সাহিত্যের অন্তর্গত। আদি বাল্মীকি রামায়নে বালকান্ড ও উত্তর কান্ড ছিল না। আর পরবর্তী কালে সংযোজিত এই দুই কান্ড এবং সনশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রক্ষিপ্ত কথা বাদ দিলে আদি বাল্মীকি রামায়নে রামের অবতারত্বের বিশেষ চিহ¡ পাওয়া যায় না। মহাকাব্য হিশেবেও রামায়নের সাহিত্যগুন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তুলসী রামায়নে বিষ্ণুকে শ্রেষ্ট দেবতা রামকে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। যা

> এমনকি বালকান্ড ও উত্তরকান্ড সহ পল্লবিত বাল্মীকি রামায়নেরও প্রধান বিষয়বস্তু নয়। দূরদর্শনে এভাবে রামায়নকে মহাকাব্য হিশেবে উপস্থিত না করে বিকৃতরূপে অবতারকাহিনী ও ধর্মগ্রন্থররূপেই জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। সরকারী প্রচারমাধ্যমে এভাবে অন্ধবিশ্বাসকে উ্সাহ দেওয়ার ফলে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সঞ্জীবিত হয়েছে, এ ধারণা যুক্তিসঙ্গত। দূরদর্শনের পর্দায় প্রথমবার রামায়ন চলাকালে রামজন্মভূমি নিয়ে মৌলবাদী আন্দোলনের জোয়ার এবং পরবর্তীকালে তার ব্যাপক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াই এর অকাট্য প্রমাণ।

বছরখানেক আগে গুজরাটে ঘটে যাওয়া স্মরণকালের মধ্যে সবচাইতে ভয়াবহ দাঙ্গা আমরা দেখেছি। ধর্মের মায়াজালে পড়ে সাধারণ মানুষ কী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে আর নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে - গুজরাটের সাম্প্রতিক দাঙ্গা তার প্রমাণ। তারপরেও কিন্তু ধর্মের সমালোচনা করলে মৌলবাদীদের সাথে সাথে অনেক প্রগতিপন্থিরাও একাটটা হয়ে বুক চিতিয়ে রুখে দাঁড়ান!

ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের পবিত্রগ্রন্থের দিকে তাকালে দেখা যায়, পুরো বাইবেলটিতেই ঈশ্বরের নামে খুন, রাহাজানি, ধর্ষনকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। কিছু উদাহরণ তো দেওয়া যেতেই পারে। যুদ্ধজয়ের পর অগনিত যুদ্ধবন্দিকে কব্জা করার পর মুসা (মোশি) নির্দেশ দিয়েছিলেন ঈশ্বরের আদেশ হিশেবে সমস্ত বন্দী পুরুষকে মেরে ফেলতে:

> এখন তোমরা এই সব ছেলেদের এবং যারা কুমারী নয় এমন সব স্ত্রী লোকদের মেরে ফেল; কিন্তু যারা কুমারী তাদের তোমরা নিজেদের জন্য বাঁচিয়ে রাখ' (গণনা পুস্তক, ৩১: ১৭-১৮)।

একটি হিসেবে দেখা যায়, মুসার নির্দেশে প্রায় ১০০,০০০ জন তরুন এবং প্রায় ৬৮,০০০ অসহায় নারীকে হত্যা করা হয়েছিল । এছাড়াও নিষ্ঠুর, আক্রমনাত্মক এবং অরাজক বিভিন্ন ভার্সসমূহের বিবরণ পাওয়া যায় যিশাইয় (২১: ৯), ১ বংশাবলী (২০:৩), গণনা পুস্তক (২৫: ৩-৪), বিচারকর্তৃগন (৮: ৭), গণনা পুস্তক (১৬: ৩২-৩৫), দ্বিতীয় বিবরণ (১২: ২৯-৩০), ২ বংশাবলী (১৪:৯, ১৪:১২), দ্বিতীয় বিবরণ (১১: ৪-৫), ১ শমূয়েল (৬:১৯), ডয়টারনোমি (১৩:৫-৬, ১৩:৮-৯, ১৩:১৫), ১ শমূয়েল (১৫:২-৩), ২ শমূয়েল (১২:৩১), যিশাইয় (১৩: ১৫-১৬), আদিপুস্তক (৯: ৫-৬) প্রভৃতি নানা জায়গায়।

বিশ্বাসী খ্রীষ্টানরা সাধারণতঃ বাইবেলে বর্ণিত এই ধরনের নিষ্ঠুরতা এবং অরাজগতাকে প্রত্যাখান করে বলার চেষ্টা করেন, এগুলো সব বাইবেলের পুরাতন নিয়মের (ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ) অধীন, যীশু খ্রীষ্টের আগমনের সাথে সাথেই আগের সমস্ত অরাজগতা নির্মূল হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এটি সত্য নয়। বাইবেলের নতুন নিয়মে যীশু খুব পরিস্কার করেই বলেছেন যে তিনি পূর্বতন ধর্মপ্রবর্তকদের নিয়মানুযায়ীই চালিত হবেন :

> এ কথা মনে কোর না, আমি মোশির আইন-কানুন আর নবীদের লেখা বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসি নি বরং পূর্ণ করতে এসেছি' (মথি, ৫: ১৭)।

খ্রীষ্ট ধর্মের অনুসারীরা যেভাবে যীশুকে শান্তি এবং প্রেমের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন, সত্যিকারের যীশু ঠিক কতটুকু প্রেমময় এ নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। যীশু খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন যে :

> 'আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি এই কথা মনে কোর না। আমি শান্তি দিতে আসি নাই, এসেছি তলোয়ারের আইন প্রতিষ্ঠা করতে। আমি এসেছি মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে দাঁড় করাতে; ছেলেকে বাবার বিরুদ্ধে, মেয়েকে মায়ের বিরুদ্ধে, বৌকে শাশুড়ীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি' (মথি, ১০: ৩৪-৩৫)।

ব্যভিচার করার জন্য শুধু ব্যভিচারিনী নন, তার শিশুসন্তানদের হত্যা করতেও কার্পন্য বোধ করেন না যীশু:

> 'সেইজন্য আমি তাকে বিছানায় ফেলে রাখব, আর যারা তার সঙ্গে ব্যভিচার করে তারা যদি ব্যভিচার থেকে মন না ফিরায় তবে তাদের ভীষণ কষ্টের মধ্যে ফেলব। তার ছেলেমেয়েদেরও আমি মেরে ফেলব '(প্রকাশিত বাক্য, ২: ২২-২৩)।

ধর্মের সমালোচনা কেন?

মানবতাবাদীরা আর যুক্তিবাদীরা কেন ধর্মগ্রন্থগুলোর সমালোচনা করেন? সমালোচনা করেন কারণ তা সমালোচনার যোগ্য, তাই। কোন কিছুই তো আসলে সমালোচনার উর্ধ্বে নয়- তা সে অর্থনীতি বা পদার্থবিজ্ঞানের নতুন কোন তত্ত্বই হোক, বা আল্লাহর 'মহান' বাণীই হোক। আসলে পুরো ধর্মবিশ্বাসই তো দাড়িয়ে আছে এক জলজ্যান্ত মিথ্যার উপর ভর করে। ধর্ম মানেই আজ কিছু অবৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনা, কুসংস্কার আর রীতি-নীতির সমাহার, যেগুলো কালের পরিক্রমায় উপযোগিতা হারিয়েছে। ধর্মের সমালোচনার আর একটি বড় কারণ হল, ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে বিরাজমান নিষ্ঠুরতা। ধর্মগ্রন্থগুলি তো আর গীতাঞ্জলি বা সঞ্চিতার মত নির্দোষ কাব্যসমগ্র নয় যে অবসর সময়ে শুয়ে শুয়ে কাব্য চর্চা করলাম আর তারপর আলমারীর তাকে তুলে রেখে দিলাম ! ধর্মগ্রন্থগুলিতে যা লেখা আছে তা ঈশ্বরের বাণী হিসেবে পালন করা হয় আর উৎসাহের সাথে সমাজে তার প্রয়োগ ঘটান হয়। হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে বর্ণিত সতীদাহর মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শুধুমাত্র ১৮১৫ সাল থেকে ১৮২৬ সালের মধ্যে সতীদাহের স্বীকার হয়েছে ৮১৩৫ জন জন নারী। এই তো সেদিনও - ১৯৮৭ সালে রূপ কানোয়ার নামে একটি মেয়েকে রাজস্থানে পুড়িয়ে মারা হল 'সতী মাতা কী জয়' ধ্বনি দিয়ে। সারা গ্রামের মানুষ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল - কেউ টু শব্দটি করল না। আর করবেই বা কেন? ধর্ম রক্ষা করে হবে না? মহাভারতের কথা শুনলে যেমন পূণ্য হয়, সতী পোড়ানো দেখলেও নাকি তেমনি। ধর্ম যে কি কিরকম নেশায় বুদ করে রাখে মানুষকে, তার জলজ্যান্ত প্রমান এই সতীদাহ। এ জন্যই বোধ হয় প্যাস্কাল বলেছেন - 'Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction.' খুবই সত্যি কথা। চিন্তা করুন ব্যাপারটা - জীবন্ত নারী মাংস জ্বলছে, ছটফট করছে, অনেক সময় বেঁধে রাখতে কষ্ট হচ্ছে, মাঝে মাঝে পালাতে চেষ্টা করছে - আফিম

জাতীয় জিনিস গিলিয়ে দিয়ে লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে আবার চিতায় তুলে দেওয়া হচ্ছে - কী চমৎকার মানবিকতা ! প্রায় প্রতিদিনই পত্র-পত্রিকায় পড়ছি যে, ইসলামী বিশ্বে সরিয়ার শিকার হয়ে প্রাণ হারাচ্ছে অসহায় সাফিয়া, আমিনারা। কোরাণের আয়াত উদ্ধৃত করে কাফিরদের বিরুদ্ধে রোজই যুদ্ধের হাঁক পাড়ছে বায়তুল মোকারমের 'বিখ্যাত' খতিব (অধুনা মৃত)। তবুও নেশায় বুদ হয়ে ধর্ম আর ধর্মগ্রন্থের মধ্যে 'শান্তি', 'প্রগতি' আর 'সহিষ্ণুতা' খুঁজে চলেছেন মডারেট ধর্মবাদীরা ।

তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই বেশ কিছু ভাল ভাল কথা আছে (এগুলো নিয়ে আমার বা কারোই আপত্তি করার কিছু নেই); এ গুলো নিয়েই ধার্মিকেরা গর্ববোধ করেন আর এ কথাগুলোকেই নৈতিকতার চাবিকাঠি বলে মনে করেন তারা। কিন্তু একটু সংশয়বাদী দৃষ্টিকোন থেকে দেখলেই বোঝা যাবে - ভালবাসা প্রেম এবং সহিষ্ণুতার বিভিন্ন উদাহরণ যে ধর্মগ্রন্থ এবং তার প্রচারকদের সাথে লেবেল হিসেবে লাগিয়ে দেওয়া হয়, সেগুলো কোনটাই ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থের জন্য মৌলিক নয়। যেমন, যীশুখ্রীষ্টের অনেক আগেই লেভিটিকাস (১৯:১৮) বলে গেছেন, 'নিজেকে যেমন ভালবাস, তেমনি ভালবাসবে তোমার প্রতিবেশীদের।' বাইবেল এবং কোরানে যে সহনশীলতার কথা বলা আছে, সেগুলোর অনেক আগেই (খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচশ বছর আগে) কনফুসিয়াস একইরকমভাবে বলেছিলেন - 'অন্যের প্রতি সেরকম ব্যবহার কোর না, যা তুমি নিজে পেতে চাও না'। আইসোক্রেটস খ্রীষ্টের জন্মের ৩৭৫ বছর আগে বলে গিয়েছিলেন, 'অন্যের যে কাজে তুমি রাগান্বিত বোধ কর, তেমন কিছু তুমি অন্যদের প্রতি কোর না'। এমনকি শত্রুদের ভালবাসতে বলার কথা তাওইজমে রয়েছে, কিংবা বুদ্ধের বাণীতে, সেও কিন্তু যীশু বা মুহম্মদের অনেক আগেই।

কাজেই নৈতিকতার যে উপকরণগুলোকে ধর্মানুসারীরা তাদের স্ব স্ব ধর্মের 'পৈত্রিক সম্পত্তি' বলে ভাবছেন, সেগুলো কোনটাই কিন্তু আসলে ধর্ম থেকে উদ্ভুত হয়নি, বরং বিকশিত হয়েছে সমাজবিবর্তনের অবশ্যাম্ভাবী ফল হিসেবে। সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে মানুষ কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যকে 'নৈতিক গুনাবলী' হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে; কারণ ও ভাবে গ্রহণ না করলে সমাজব্যবস্থা অচীরেই ধ্বসে পড়ত। বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক সলোমন অ্যাশ বলেন,

> 'আমরা এমন কোন সমাজের কথা জানি না, যেখানে সাহসিকতাকে হেয় করা হয়, আর ভীরুতাকে সম্মানিত করা হয়; কিংবা উদারতাকে পাপ হিশেবে দেখা হয় আর অকৃতজ্ঞতাকে দেখা হয় গুণ হিসেবে।'

এমন ধরনের সমাজের কথা আমরা জানিনা কারণ অমন সমাজ টিকে থাকতে পারে না। খুব সাদা চোখে দেখলেও, একটি সমাজে চুরি করা যে অন্যায়, এটি বুঝবার জন্য করার জন্য কোন স্বর্গীয় ওহি নাজিল হওয়ার দরকার পরে না। কারণ যে সমাজে চুরি করাকে না ঠেকিয়ে মহিমান্বিত করা হবে, সে সমাজের অস্তিত্ব লোপ পাবে অচীরেই। ঠিক একই ভাবে আমরা বুঝি, সত্যি কথা বলার বদলে যদি মিথ্যা বলাকে উৎসাহিত করা হয়, তবে মানুষে মানুষে যোগাযোগ রক্ষা করাই দূরূহ হয়ে পড়বে। এ ব্যাপারগুলো উপলব্ধির জন্য কোন ধর্মশিক্ষা লাগে না। আবার এমনও দেখা গেছে যে, শতাব্দীপ্রাচীন কোন চলমান ব্যবস্থার

পরিবর্তন মানুষ নিজে থেকেই করেছে পরিবর্তিত মূল্যবধের কষ্ঠিপাথরে মানবতাকে যাচাই করে, এবং অনেকক্ষেত্রেই ধর্ম কি বলছে না বলছে তার তোয়াক্কা না করেই। দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ এমনি একটি ঘটনা। বলা বাহুল্য, কোন ধর্মগ্রন্থেই দাসত্ব উচ্ছেদের আহবান জানানো হয় নি। বাইবেলের নতুন কিংবা পুরাতন নিয়ম, কিংবা কোরান, অথবা বেদ, উপনিষদ, মনুসংহিতা- কোথাওই দাসত্ব প্রথাকে নির্মুল করার কথা বলা হয়নি, বরং সংরক্ষিত করার কথাই বলা হয়েছে প্রকারন্তরে। কিন্তু মানুষ সমাজিক প্রয়োজনেই একটা সময় দাসত্ব উচ্ছেদ করেছে, যেমনিভাবে হিন্দু সমাজ করেছে সতীদাহ নির্মুল বা খ্রীষ্ট সমাজ করেছে ডাইনী পোড়ানো বন্ধ। সতীত্ব সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা, কিংবা সমকামিতা বা গর্ভপাতের অধিকার সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে সারা পৃথিবী জুড়ে এ কয় দশকে। এ পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর অনেকগুলোই ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত নয়।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি : Let the data decide আর কিছু প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান :

আজ আধুনিক রাষ্ট্রগুলির দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, আল্লাহর গুনার দোহাই দিয়ে মানুষ জনকে সৎ পথে পরিচালিত করার ব্যাপারটি কি নিদারুনভাবে ব্যর্থতায় পর্যবাসিত হয়েছে। আল্লাহ বা ঈশ্বরের গুনার ভয় দেখিয়েই যদি মানুষ-জনকে পাপ থেকে বিরত রাখা যেত, তা হলে আর রাষ্ট্রে পুলিশ-দারোগা, আইন-কানুন, কোর্ট-কাচারি কোন কিছুরই আর প্রয়োজন হত না। এক ইন্টারনেট ফোরামে একটা সময় রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং ধর্মের নৈতিকতা বিষয়ে লিখতে শুরু করেছিলাম; সাথে সাথেই এক ধার্মিক ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে বলতে শুরু করলেন - 'অভিজিৎ রায়ের মত নাস্তিক লোকজন রাষ্ট্রে আছেন বলেই পুলিশ দারোগার প্রয়োজন'। এধরনের উক্তিকে স্রেফ একজনমাত্র অজ্ঞ ধার্মিকের আস্ফালন বলে মনে করলে কিন্তু ভুল হবে। এ ধরনের ধ্যান ধারণা অনেকেই মনে মনে পোষণ করেন, তাদের বেশ বড় অংশই আবার সুশিক্ষিত। পাশ্চাত্য বিশ্বে ডিস্কোভারি ইন্সটিউটের পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং ইন্টেইলজেন্ট ডিজাইনের অন্যতম প্রবক্তা ফিলিপ জনসনের মতে, যেহেতু অবিশ্বাসীরা ডারউইনের মতানুসারে মনে করে মানুষ বানর থেকে উদ্ভুত হয়েছে, সেহেতু তারা যে কোন ধরনের 'নাফরমানি' করতে পারে - সমকামিতা, গর্ভপাত, পর্ণোগ্রাফি, তালাক, গনহত্যা সবকিছু । এমন একটা ভাব, ডারউইন আসার আগ পর্যন্ত সারা পৃথিবী যেন এগুলো থেকে একেবারেই মুক্ত ছিল!

একজন বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি হিসেবে ফিলিপ জনসনের এধরনের আবেগপ্রবণ আপ্তবাক্যারলীতে আমার বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই, বরং আমার আস্থা থাকবে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত ফলাফলে; বিজ্ঞানীরা যেটিকে বলেন, 'Let the data decide'। আমি ফিলিপ জনসনের সমর্থনে এমন কোন উপাত্ত বা ডেটা খুঁজে পাইনি যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের চাইতে বেশী অপরাধপ্রবণ; বরং কিছু পরিসংখ্যান একেবারেই উলটো সিদ্ধান্ত হাজির করছে। আমেরিকায় বিভিন্ন গবেষনায় দেখা গিয়েছে নাস্তিকদের চাইতে

পুনরুজ্জীবিত খ্রীষ্টানদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের হার বেশী; এও দেখা গিয়েছে যে, যে পরিবারের পরিবেশ ধর্মীয়গতভাবে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল সে সমস্ত পরিবারেই বরং শিশুদের উপর পরিবারের অন্য কোন সদস্যদের দ্বারা বেশী যৌণ নিপীড়ন হয় । ১৯৩৪ সালে আব্রাহাম ফ্রান্সব্লাউ তার গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন ধার্মিকতা এবং সততার মধ্যে বরং বৈরী সম্পর্কই বিদ্যমান। ১৯৫০ সালে মুরে রসের গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে যে, ধার্মিকদের তুলনায় নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদীরাই বরং সমাজ এবং মানুষের প্রতি সংবেদনশীল থাকেন, তাদের উন্নয়নের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। **ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি ১৯৮৮ সালে ভারতের জেলখানায় দাগী আসামীদের মধ্যে একটি জরিপ চালিয়েছিল। জরিপের যে ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল, তা ছিল অবাক করার মত। দেখা গিয়েছে, আসামীদের শতকরা ১০০ জনই ঈশ্বর এবং কোন না কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসী** । আমেরিকায়ও এরকম একটি জরিপ চালানো হয়েছিল ৫ ই মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে। সে জরিপে দেখা গেছে যে আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ (৮-১০%) ধর্মহীন হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা কম (মাত্র ০.২১%), সে তুলনায় ধার্মিকদের মধ্যে শতকরা হিসেবে অপরাধপ্রবণতা অনেক বেশী । আজ বাংলাদেশে জরিপ চালালেও ভারতের মতই ফলাফল পাওয়া যাবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, বেহেস্তের লোভ বা দোজখের ভয় কোনটাই কিন্তু অপরাধীদের অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারেনি। আল্লাহর গুনা কিংবা ঈশ্বরের ভয়েই যদি মানুষ পাপ থেকে, দুর্নীতি থেকে মুক্ত হতে পারত, তবে তো বাংলাদেশ এতদিনে বেহেস্তে পরিনত হত। কিন্তু বাংলাদেশের দিকে তাকালে আমরা আজ কী দেখছি? **বাংলাদেশে শতকরা ৯৯ জন লোকই আল্লা-খোদা আর পরকালে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও দুর্নীতিতে এই দেশটিই আজ পৃথিবীর শীর্ষে।** ধর্মে বিশ্বাস কিন্তু দেশবাসীকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে পারেনি। পারবেও না। যে দেশে সর্বোচ্চ পদ থেকে বইতে শুরু করে দুর্নীতির স্রোত, যে দেশে গোলাম ফারুক অভি, এরশাদ, ফালু, গোলাম আজম, নিজামী, হাজি সেলিম, জয়নাল হাজারীর মত হত্যাকারী, ধর্ষক, গুন্ডা, ছিনতাইকারী, ডাকাত রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকার দরুন শুধু রেহাই ই পায় না, বরং বুক চিতিয়ে ঘুরে বেরাবার ছাড়পত্র পায়, নেতা হবার সুযোগ পায়, সে দেশের মানুষ নামাজ পড়েও দুর্নীতি চালিয়ে যাবে; তারা রোজাও রাখবে, আবার ঘুষও খাবে। তাই হচ্ছে। এই তো ধর্মপ্রাণ, আল্লাহ-খোদায় বিশ্বাসী বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা। অপরদিকে সিঙ্গাপুরের দিকে তাকানো যাক। এ দেশটিতে অধিকাংশ লোকই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মপরিচয় থেকে মুক্ত। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অনেক চীনা ছাত্র-ছাত্রীকেই দেকেছি ধর্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তারা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে -'ফ্রি থিঙ্কার'। অথচ ধর্ম নয়, শধু আইনের শাসন আর সামাজিক মূল্যবোধগুলির চর্চা করে সিঙ্গাপুর আজ পৃথিবীর সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলির একটি। অধিকাংশ সিঙ্গাপুরবাসীরা আল্লা-খোদার নামও করেন না, নরকের ভয় অথবা বেহেস্তের লোভও তাদের নেই। কোন যাদুবলে তারা তাহলে দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকছে?

উপরের পরিসংখ্যান গুলো দেওয়ার উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা নয় যে, মানুষ নাস্তিক হলেই ভাল হবে কিংবা আস্তিক হলেই খারাপ হবে, বরং এটাই বোঝানো যে, ধর্ম কোনভাবেই নৈতিকতার 'মনোপলি ব্যবসা' দাবী

করতে পারে না। আসলে কোন বিশেষ ধর্মের আনুগত্যের উপর কিন্তু মানুষের নৈতিক চরিত্র-গঠন নির্ভর করে না, নির্ভর করে একটি দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট আর সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর। আসলে আধুনিক যুগের জীবন যাত্রার প্রেক্ষাপটে এ কথা বলা যায়, প্রাচীন কালের ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে নৈতিকতাকে বিশ্লেষণ করলে আর চলবে না, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে অনুসন্ধান এবং বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে।

প্রখ্যাত মনোবিদ, বিজ্ঞানের দার্শনিক এবং স্কেপটিক ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ মাইকেল শারমার তার The Science of Good & Evil: Why People Cheat, Gossip, Care, Share, and Follow the Golden Rule বইয়ে ব্যাখ্যা করেছেন সমাজ বিকাশের প্রয়োজনেই মানুষ কিছু নীতিকে প্রথম থেকে ‘গোêেন রুল’ হিসেবে গ্রহন করেছে :

> Do unto others, as you would have them do unto you.

কারণ এই নীতির অনুশীলন ছাড়া সমাজ ব্যবস্থা টিকে থাকবে না। মাইকেল শারমার তার গবেষনায় দেখিয়েছেন যে, মানব বিবর্তনের ধারাতেই পারষ্পরিক প্রতিযোগিতার পাশাপাশি আবার নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সহনশীলতা, উদারতা, স্বার্থত্যাগ, সহানুভূতি, সমবেদনা প্রভৃতি গুনাবলির চর্চা হয়েছে। সভ্যতার প্রতিনিয়ত সংঘাত ও সংঘর্ষেই গড়ে উঠেছে মানবীয় Provisional ethics, যা মানুষকে প্রকৃতিতে টিকে থাকতে সহায়তা করেছে।

নৈতিকতার ব্যাপারটি শুধু মানব সমাজেরই একচেটিয়া তা নয়, ছোট স্কেলে তথাকথিত অনেক 'ইতর প্রাণী' জগতের মধ্যেও কিন্তু এটি দেখা যায়। ভ্যাম্পায়ার বাদুরেরা নিজেদের মধ্যে খাদ্য ভাগাভাগি করে, বানর এবং গরিলারা তাদের দলের কোন সদস্য মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত থাকলে তাকে সহায়তা করর্ জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করে, এমনকি 'দশে মিলে' কাজ করে তার জন্য খাবার পর্যন্ত নিয়ে আসে। ডলফিনেরা অসুস্থ অপর সহযাত্রীকে ধাক্কা দিয়ে সৈকতের দিকে নিয়ে যায়, যার ফলে অসুস্থ ডলফিনটির পর্যাপ্ত আলো বাতাস পেতে সুবিধা হয়, তিমি মাছেরা তাদের দলের অপর কোন আহত তিমি মাছকে দ্রুত সারিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। হাতীরা তাদের পরিবারের অসুস্থ বা আহত সদস্যকে বাঁচানোর জন্য সবোর্চ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। এ ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

একটা সময় ধর্মীয় নৈতিক বিধানগুলোর একটা ইতিবাচক ভূমিকা ছিল হয়তো সমাজের উপর। নানা ধরনের ধর্মীয় বিধানই ছিল আইন, ওগুলোই ছিল সুনীতিবোধ গড়ে তোলার ভিত্তিভূমি। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগামীতার সাথে সাথে ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাচ্ছে, অনেক আগেই ফুরিয়েছে ধর্মপ্রবর্তকদের ভুমিকাও। আজ আধুনিক মননের অধিকারী মানুষের কাছে প্রাচীন উপাসনা ধর্মগুলো একেবারেই অপাংক্তেয় হয়ে উঠেছে। কেউই আজ বিশ্বাস করে না তন্ত্র-মন্ত্রে অসুখ সারে, কিংবা 'আল্লাহ মেঘ দে পানি দে' বলে চ্যাচালেই বৃষ্টি ঝরে। সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখতেও আজ ধর্মগুরু, নবী কিংবা পয়গম্বরদের 'মহান মিথ্যার' চেয়ে

ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ, আইনের শাসন আর সাংস্কৃতিক অগ্রগতি অনেক বলিষ্ঠ ভুমিকা রাখছে। ধর্মকেন্দ্রিক নৈতিকতার বিষয় গুলো অগ্রনী চিন্তার মানুষদের কাছে গুরুত্বহীন, তাদের মত ধর্মমুক্ত মানুষেরাই হয়ত আগামীর পরিবর্তিত বিশ্বে নির্ধারণ করবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের এক নতুন সংজ্ঞা।

ড. অভিজিৎ রায়, আমেরিকায় বসবাসরত গবেষক এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' ও 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। সাম্প্রতিক সম্পাদিত গ্রন্থ - 'স্বতন্ত্র ভাবনা'। ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com । উপরের লেখাটি 'স্বতন্ত্র ভাবনা' বইয়ে 'ধর্ম ও নৈতিকতা' শিরোনামে সংকলিত হয়েছে। এ ছাড়া 'যুক্তি' নামের পরিবর্তিত আকারে ছাপা হয়েছিলো।

ধর্মই কি নৈতিকতার উৎস?

- অপার্থিব জামান

E-mail: aparthib@yahoo.com

ধর্মে বিশ্বাসীরা একটা দাবী প্রায়ই করে থাকেন যে ন্যায় অন্যায় এর সংজ্ঞা কেবল ধর্ম বা অধ্যাত্মবাদের মাধ্যমেই দেয়া সম্ভব। ধর্মই নৈতিকতার উৎস। তাদের মতে যারা ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মে অবিশ্বাসী তাদের কোন স্থায়ী নৈতিক মূল্যবোধ থাকতে পারেনা। এখানে ধর্মবিশ্বাস বলতে সৃষ্টিকর্তা ও ধর্মীয় পুস্তকে বিশ্বাস বোঝান হচ্ছে। ধর্মবিশ্বাসীরা দাবি করে যে নৈতিকতা কখনই ধর্মে বিশ্বাস ছাড়া অর্জন ও বলবৎ করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে মানবতাবাদীরা বা যুক্তিবাদীরা কখনই দাবি করে না যে ধর্ম দ্বারা নৈতিকতা বলবৎ করা সম্ভব নয়। তারা শুধু এটাই বলে যে ধর্ম ছাড়াও নৈতিক চিন্তা বা আচার ব্যবহার এর অধিকারী হওয়া সম্ভব। নৈতিকতা ধর্ম প্রদত্ত নয়, বরং তা মানুষেরই সৃষ্ট প্রয়োজনের তাগিদে যার কিছুটা ধর্মে প্রতিফলিত হয় মাত্র, কারন ধর্মও মানুষেরই সৃষ্টি।
তারা আরও বলেন যে ধর্মে বিশ্বাস সত্তেও নৈতিকতার অভাব থাকতে পারে। এর প্রমাণ বাস্তবেই পাওয়া যায়। বিষয়টা গুছিয়ে বোঝান যাক নিম্নে :

১। একটা ব্যতিক্রমই কোন নিয়ম ভুল প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ঠ।
২। ধর্মবিশ্বাসীরা এটাকে একটা অমোঘ নিয়ম বলে দাবি করে যে নৈতিকতা কখনই ধর্মে বিশ্বাস ছাড়া ব্যক্তি বা সমাজে বলবৎ করা সম্ভব নয়।
৩। এমন অনেক ব্যক্তি বা সমাজ দেখা যায় যারা ইশ্বর ভিত্তিক ধর্মে বিশ্বাসী নয়, অথচ নৈতিকতাহীন ও নয়, যেমন বৌদ্ধ সমাজ, বা বিখ্যাত অনেক নাস্তিক মনীষী। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে উপরের ২ নং এর অমোঘ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। কাজেই নিয়মটি ভুল ।

গোড়াতেই একটা অবিসংবাদিত সত্য উল্লেখ করি। আর সেটি হল:

নীতিহীন নাস্তিকও যেমন আছে, তেমনি নীতিহীন আস্তিক ও আছে। আবার
নীতিবান আস্তিক ও যেমন আছে, তেমনি নীতিবান নাস্তিকও আছে।

নীতিহীন আস্তিক সম্পর্কে ধর্মবিশ্বাসীরা অবশ্য বলবেন যে, 'লোকটা যদি সত্যিই ধর্মে খাঁটি বিশ্বাসী হত তাহলে কখনই নীতিহীন হত না। নীতিহীনতা তার ধর্মে বিশ্বাসের অভাবের ই প্রমাণ'। এর উত্তরে বলা যায় যে লোকটি ধর্মে খাঁটি বিশ্বাসী কি না সেটা মুখ্য ব্যাপার নয়, মুখ্য ব্যাপার হচ্ছে যে সে 'নাস্তিক' নয়। আর আস্তিক হওয়া অর্থই ধর্মে বিশ্বাসী । নীতিহীন হয়ার কারনেই তাকে ধর্মে অবিশ্বাসী বলাটা হবে সুবিধাবাদী যুক্তি। কার্যের পরে কারণ খোঁজা।

অনেকে বলে থাকেন যে একমাত্র কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমেই সমাজে শান্তি ও নৈতিকতা বজায় রাখা যায়, যদি সবাই ধর্মীয় নীতিমালা মেনে চলে। এর প্রত্যুত্তরে এটাও বলা যায় যে লোকায়ত রাষ্ট্রীয় আইন কঠোর ভাবে বলবৎ করলে এবং সবাই তা মেনে চল্লেও সমাজ অপরাধ ও দুর্নীতি মুক্ত হতে পারে। কোন ধর্ম শাসিত রাষ্ট্র অপরাধ ও দুর্নীতি মুক্ত হলে এটা প্রমানিত হয় না যে জনগন ধর্মে গভীর বিশ্বাসের দরুন ই অপরাধ ও দুর্নীতি থেকে বিরত থাকছে। এটাই প্রমানিত হয় যে ধর্মীয় অনুশাসন কঠোর ভাবে বলবৎ করা হচ্ছে। অন্য কথায় বলা যায় যে আল্লা বা ইশ্বরের ভয়ে নয়, মানুষের (আইন প্রয়োগকারী) ভয়েই তারা অপরাধ ও দুর্নীতি থেকে বিরত থাকছে। যদি ধর্মীয় আইন প্রয়োগে কোন শৈথিল্য হয় বা আইন মেনে চলাটা স্বেচ্ছামূলক করে দেয়া হয় জনগনের বিবেকের উপর আস্থা রেখে তাহলে সমাজে দুর্নীতি আর অপরাধ মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠতে বাধ্য। ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা মানুষের অন্তরের অশুভ প্রবৃত্তি দূর করা যায়না। যায় শুধু তাকে চেপে রাখা। ধর্মীয় অনুশাসন বা বিশ্বাসের ওপর ভর করা নৈতিকতার ভিত্তি কখন ই দৃঢ় হতে পারে না। ধর্মীয় আইন বা বিশ্বাসে শৈথিল্য হলে নৈতিকতার ও অভাব দেখা দেয়। লোকায়ত আইনে শৈথিল্য হলেও নৈতিকতার অভাব দেখা দেয়। একই কথা সত্য লোকায়ত আইনের বেলায়। অর্থাৎ ধর্মীয় অনুশাসন বা বিশ্বাস নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় নীতিগতভাবে লোকায়ত শ্বাসনের চেয়ে অধিকতর কার্যকরী নয়। আসলে ন্যায় অন্যায় বা ভাল মন্দের ধারনা অর্থাৎ বিবেক মানুষের স্বজ্ঞাত (Intuitive) এক সহজাত প্রবৃত্তি। আর সব সহজাত প্রবৃত্তির মত এটাও বিবর্তনী মনোবিজ্ঞান (evolutionary psychology) এর নিয়মেই উদ্ভুত লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের পরিণতি হিসেবে। বিবর্তনী মনোবিজ্ঞান আবার বিবর্তনী জীববিদ্যার এক অঙ্গ। তাই মানুষের বিবেকের মূলেই আছে জীববিদ্যার অমোঘ নিয়ম, যা আবার চূড়ান্ত বিচারে পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক বিধিরই অভিপ্রকাশ।

বিবর্তনী জীববিদ্যার নিয়ম অনুযায়ী প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) সেই সব সহজাত প্রবৃত্তির বিকাশ ঘটায় যা প্রজাতির উদ্বর্তন ও বিস্তারে সহায়ক হয়। আর বিবর্তনী মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী মানুষের বিবেকের উৎপত্তি ও বিকাশ মানুষের মস্তিষ্কের বিবর্তনেরই অভিপ্রকাশ। জীববিদ্যার ভাষায় বলা যায় যে বিবেক হচ্ছে মধ্য মস্তিষ্কের (Limbic System) সৃষ্ট আদিম প্রবৃত্তির ওপর উর্ধ্ব মস্তিষ্কের কর্টেক্স নামক অঙ্গের নিবারক ক্রিয়ার অভিব্যক্তি। মনোবিজ্ঞান ও স্নায়ুবিজ্ঞানের অনেক পর্যবেক্ষণেই দেখা গেছে যে কর্টেক্স এর ক্ষতি হলে মানুষ তার বিচার বিবেক হারিয়ে ফেলতে পারে, যদিও সে অন্য সব কাজ কর্ম স্বাভাবিক ভাবেই চালিয়ে যায়। আধুনিক বিবর্তনী মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী মস্তিষ্কের বর্তমান বিবর্তন হচ্ছে জীন এবং সংস্কৃতির সহবিবর্তনের (Gene Culture Coevolution) এর কারণে।

যাহোক জটিলতায় না গিয়ে এটাই বলা যথেষ্ঠ যে মানুষ ও তার মস্তিক যদি জীববিদ্যার নিয়মে (বা আরো মৌলিক অর্থে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মে) উদ্ভূত ও বিবর্তিত হয়; তাহলে মানুষের বিবেকও সেই একই নিয়মেই উদ্ভূত ও বিবর্তিত, কারণ বিবেক মানুষ ও মস্তিষ্কের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিবেকের স্বজ্ঞাত ধারনা ধর্মের আগমনের অনেক আগে থেকেই বিরাজমান ছিল। তাই এটা বলা ভুল হবে যে বিবেক ধর্ম বা ইশ্বর প্রদত্ত। খ্রীষ্ঠান ও ইসলাম ধর্মের অনেক আগেই গ্রীকরা নৈতিকতা নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা করেছিল। কনফুসিয়াস ও বুদ্ধ ইশ্বর কে না টেনেই নৈতিকতা প্রচার করেছিলেন। তা ছাড়া এটা সহজেই বোঝা যায় যে নৈতিকতার উৎস যদি ইশ্বরেই নিহিত তাহলে মস্তিষ্কের জটিলতা ও বিবর্তন এবং বিচার বুদ্ধির পেছনে তার অবিসংবাদিত ভূমিকা নেহাত ই অনাবশ্যক ও বাড়তি হয়ে পড়ে। ভাল মন্দের বিচার কে ইশ্বর ভিত্তিক করা যে ভ্রান্তিপূর্ণ সেটা বোঝা যায় সহজেই। ধর্মবিশ্বাসীরা বলেন যে ইশ্বর যা নিষেধ করেন তাই মন্দ, আর যা আদেশ করেন তাই ভালো। তাহলে যদি প্রশ্ন করা হয় ইশ্বর কেন একটি কাজকে পাপ ঘোষনা করেন, যেমন, ধর্ষন, খুন ইত্যাদি? এর উত্তরে ধর্মবিশ্বাসিদের এটাই শুধু বলতে পারেন যে ইশ্বর যেহেতু পুণ্যের উৎস, তিনি কখন ই পাপ কাজকে অনুমোদন বা উৎসাহিত করতে পারেন না। অর্থাৎ নিজের অজ্ঞাতেই তারা স্বীকার করে নেন যে পাপ এর ধারণা স্বতন্ত্র, ইশ্বর নির্ভর নয়। কারণ পাপ বা মন্দের সংজ্ঞাই যদি হয় যে ইশ্বর যা নিষিদ্ধ বা নিরুৎসাহিত করেন, তাহলে ইশ্বর কখন ই পাপ কে অনুমোদন বা উৎসাহিত করতে পারেন না, এটা বলাটা অসার বাক্য বা দ্বিরুক্তিরই (tautology) সামিল। তাই ইশ্বর নির্ভর পাপ পুণ্যের সংজ্ঞা এক চক্রাকার সংজ্ঞা ।

এটা স্পষ্ট যে ধর্ম নরকের শাস্তি বা স্বর্গের পুরস্কারের কথা বলে সরল মনাদের জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক কার্যকরী নিবারক হিসাবে কাজ করে। কিন্তু আগেই বলেছি যে লোকায়ত সমাজের লোকায়ত আইন এর সুষ্ঠু প্রয়োগও কার্যকরী নিবারক হিসাবে কাজ করতে পারে। কোন ক্ষীণ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি জনসমক্ষে লুঠ বা ধর্ষণ না করার কারণ এই নয় যে ধর্মে তা নিষিদ্ধ, বরং তা না করার কারণ গ্রেপ্তার বা শাস্তির ভয়। আগেকার দিনে আইনের শাসন ছিলনা বা কার্যকরী রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের অভাবে প্রয়োগ হতনা বলেই ঐশ্বরিক বিধানের নামেই মানুষ অপরাধের নিবারক সৃষ্টি করেছিল। যদি ও এর ব্যতিক্রম ও আমরা দেখেছি, যেমন কনফুসিয়াসের সময়কার চীনে এবং বুদ্ধের বাণীতে। প্রাচীন ইংকা ও মায়া জনগন ও দৈব বাণীর ওপর নির্ভর না করেই এক নৈতিক সমাজের পত্তন করেছিল।

নৈতিকতা অনেকের কাছে একটা সহজাত গুণ, তারা ধর্ম বিশ্বাস বা বিধানের কারণে সৎকাজে লিপ্ত হন না । স্বর্গের পুরস্কারের লোভে বা নরকের শাস্তির ভয়ে ভালো কাজ করা বা মন্দ কাজ না করা আর বিবেকের কারণে ভালো কাজ করা বা মন্দ কাজ না করা সমান প্রশংসার যোগ্য হতে পারে না। নরকের ভীতির দ্বারা আনুগত্য আনা যায়, কিন্তু নৈতিক চেতনা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আগেই উল্লেখ করেছি যে পৃথিবীতে অনেক দেশ আছে যেখানে জনগনের এক বিরাট অংশ ইশ্বর বা ইশ্বরের প্রেরিত পুরুষ এ বিশ্বাস করেন না এবং সরকার ও লোকায়ত আইনের দ্বারা শাসিত, কিন্তু সেখানে নীতিহীনতা বা অপরাধ তেমন বেশী নেই। দূর প্রাচ্যের দেশ গুলোই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নৈতিক আচরন এবং চেতনা হচ্ছে ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর একটা ক্রমবিবর্তমান বৈশিষ্ট। এই বৈশিষ্ট বিভিন্ন মানুষের সমন্বয়ে গঠিত জনগোষ্ঠী, যেখানে পারস্পরিক মূল্যবোধ ও স্বার্থের সংঘাত অপরিহার্য, সেখানে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠিগত স্থিতিশীলতা আনয়নে সহায়তা করে। সুদীর্ঘ সময় ধরে পরীক্ষণ ও ভ্রমের মাধ্যমে এই ক্রমবিবর্তন ব্যক্তি ও সমাজকে অধিকতর শান্তি ও স্থিতিশীলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ধর্মের আগমন না হলেও মানব সমাজ নৈতিক আচরনমালার উদ্ভব করত প্রয়োযনের তাগিদেই, যেমনটি বেশ কিছু সমাজে দেখা যায় যার উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করেছি। মানুষ প্রমাণ করেছে যে তারা নিজেরাই নৈতিক আচরনমালা তৈরী করতে সক্ষম, ঐশ্বরিক প্রেরনা ছাড়াই, যার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ তাদের ভিন্ন স্বার্থ আর ইচ্ছার অন্বেষনে নিয়োযিত হতে পারে পরস্পরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত না হয়ে।

[Aparthib Zaman writes from USA. The article is kept in Mukto-mona web site]

হতবুদ্ধি, হতবাক !

মীজান রহমান

প্রশ্ন, প্রশ্ন, আর প্রশ্ন । এই যে এত প্রশ্ন ঝাঁক করে আসে মনে, এর উৎস কোথায় ? প্রশ্ন কি আল্লার ইচ্ছা, না শয়তানের ? শয়তানের ইচ্ছা কি আল্লার ইচ্ছা নয় ? তা যদি না হয় তাহলে এটা ধ্রুবসত্য হয় কেমন করে যে আল্লার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই ঘটে না সংসারে ? অথচ পবিত্র কোরাণে পরিষ্কার লেখা আছে ঃ

> "All things are from God." (4:78, Yusuf Ali)
> ["সকল বস্তুর উৎস আল্লা ।"]

আল্লাহই যদি সব বস্তুর উৎস হন, এবং আল্লাহর ইচ্ছাতেই যদি সব কিছু ঘটে, তাহলে পার্থিব যুক্তি অনুযায়ী শয়তানের ইচ্ছা এবং আমার তীক্ষ্ণ মৌলিক প্রশ্নগুলোও আল্লারই ইচ্ছা । এখানেই একটা বিরাট ধাক্কা খাই মনে । মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা ব্যতিরেকে যদি কিছুই ঘটবার উপায় না থাকে তাহলে দয়া করে আমাকে বলে দিন আমার পাপপুণ্যের সকল দায়ভার আমাকেই বহন করতে হবে কেন ।

উপরোক্ত আয়াতটির ঠিক পরপরই আছে ঃ

> "Whatever good (O Man!) happens to thee, is from God; but whatever evil happens to thee, is from thy (own) soul." (4:79, Yusuf Ali)
> ["(হে মানব), যা কিছু ভাল ঘটে তোমার জীবনে, সবই আল্লার দান ; যা কিছু মন্দ তা তোমারই আত্মানিঃসৃত ।"]

আমার ধাঁধাটা কোথায় বুঝতে পারছেন তো ? প্রথম আয়াতটির সঙ্গে দ্বিতীয়টিকে ঠিক মেলাতে পারছি না । এটা নিশ্চয়ই আমারই দোষ—আমার আত্মার কলুষনিঃসৃত দুষ্ট সংশয় । শয়তানের প্ররোচনাও হতে পারে । শয়তানই হোক আর যে'ই হোক, আমাকে কিন্তু বুঝিয়ে দিতে হবে সবকিছু যদি আল্লার কাছ থেকেই আসতে হয় তাহলে আমার মন্দটা তাঁর কাছ থেকে আসবে না কেন । আমার ভালটার কৃতিত্ব তাঁর, আর মন্দটার দায়িত্ব আমার, এটা কেমনতরো বিচার বলুন তো ।

পবিত্র কোরাণের আরেক জায়গায় আছে ঃ

> "As to those who reject Faith, it is the same to them whether thou warn them or do not warn them; they will not believe, God had set a seal on their hearts and on their hearings, and on their eyes is a veil; great is the penalty they incur." (2:6, Yusuf Ali).
> ("যারা বিশ্বাসের পথ বর্জন করে, তাদের সাবধান করা আর না করা একই কথা—তারা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না । আল্লাকরিম তাদের আত্মায় এবং কর্ণেন্দ্রিয়তে তালা মেরে রেখেছেন, তাদের চোখে পরিয়েছেন ঠুলি । তাদের জন্যে ঘোর শাস্তি অপেক্ষা করছে ।)"
> "God leaves in error whom He will and guides whom He pleases." (35:8, Dawood)
> ("আল্লা যাকে ইচ্ছা তাকে ভুলপথে ছেড়ে রাখেন, বা সৎপথে চালিত করেন ।")

প্রথমত, আমি বুঝি না মানুষের পক্ষে কিভাবে সম্ভব তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা, কারণ সবই তো তাঁর ইচ্ছা। দ্বিতীয়ত, অবিশ্বাসীর আত্মায় আর কানে তালা মেরে রাখা, তার চোখে ঠুলি পরিয়ে রাখা, তা'ও যদি পরমাত্মার ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়ে থাকে, তাহলে বেচারির তো মহাবিপদ। কোন্‌দিকে যাবে সে ? একদিকে 'অবিশ্বাস' যেহেতু সেটা একপ্রকার বস্তু সেহেতু আল্লার কাছ থেকেই পাওয়া, অন্যদিকে সেই অবিশ্বাসের শাস্তি থেকে পরিত্রাণের পথটাও তিনিই বন্ধ করে রেখেছেন (উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী)।

ছোটবেলায় শুনেছি যে আল্লাতা'লা মানবজাতির হেদায়েতের জন্যে মোটমাট ১ লক্ষ ৯০ হাজার পয়গম্বর পাঠিয়েছিলেন। এবং তাঁদের মধ্যে আমাদের পরম প্রিয় নবীকরিম হজরথ মোহম্মদ (দঃ) ছিলেন তাঁর সবচেয়ে পেয়ারা বান্দা, সকল নবীর সেরা নবী। এ-নিয়ে সেকালে কোন প্রশ্ন তুলবার অবকাশ ছিল না, কারণ একটা ধারণা আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করানো হয়েছিল জীবনের প্রত্যুষকালে যে ধর্মের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি হল ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস। যার ঈমান পাকা নয় সে ভাল মুসলমান নয়। আমার সেই কচি বয়সে 'ভাল মুসলমান' না হবার মত ভয়ঙ্কর জিনিস আর ছিল না। সুতরাং ঈমানের প্রতিটি শর্ত আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করার চেষ্টা করতাম। তাই যা শুনতাম ওস্তাদজীর মুখ থেকে, গুরুজনদের মুখ থেকে, তা'ই পরম শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করে নিতাম।

আমার মগজে সম্ভবত শয়তানের আনাগোনা শুরু হয়েছিল স্কুলে থাকাকালেই। যদিও স্কুলটা ছিল কেবল মুসলমানদের জন্য, শিক্ষকদের মধ্যে দু'চারজন স্বাধীনচেতা বেয়াড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন যাঁরা ধর্মকর্মের ব্যাপারে খানিক উদাসীনই ছিলেন বলা চলে। তাঁরা আমার কানে আধুনিকতা ও স্বাধীন চিন্তার মন্ত্রসুধা বর্ষণ করতে শুরু করলেন। ইউরোপীয় যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচয় ঘটালেন। প্রশ্ন ও সংশয়সম্বলিত অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞানার্জনের অগতানুগতিক সাধনাতে উদ্বুদ্ধ করলেন। যুক্তি ও প্রমাণ-পরীক্ষা ছাড়া কোনকিছুই অন্ধভাবে গ্রহণের যোগ্য নয়, এই দুঃসাহসী মনোভাবটি তখন থেকেই আমার মনে কাজ করতে শুরু করল। অচিরেই আমার মনে সাহস জন্মাল মহান সৃষ্টিকর্তাকে নিয়ে দুর্বিনীত প্রশ্ন তোলার। তিনি কে, কোথায়, কেন ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই যদি তাঁর সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে কি তিনি নিজেই নিজের স্রষ্টা ? পয়গম্বরদের ব্যাপারে যে-প্রশ্নটি পীড়া দিতে শুরু করল তা হল এই। প্রাচীন ইহুদী বিশ্বাস অনুযায়ী পৃথিবীর বয়স প্রায় ৬ হাজার বছর। আদম-হাওয়ার আগমনকাল যদি তা'ই হয়ে থাকে তাহলে সৃষ্টির প্রাতঃকালে নিশ্চয়ই ভূপৃষ্ঠের লোকসংখ্যা কয়েক লক্ষের বেশি ছিল না। তর্কের খাতিরে ধরা যাক ১ কোটি। ১ কোটি মানুষের জন্যে ১ লক্ষ ৯০ হাজার পয়গম্বর, একটু মাত্রাতিরিক্ত মনে হয় না ? গড়পড়তায় প্রতি পঞ্চাশ জনের জন্যে এক পয়গম্বর ! তার উপর পয়গম্বরদের অধিকাংশই ছিলেন মধ্যপ্রাচ্যের একটা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ যেখানে জলবায়ু আবহাওয়া এতই কঠোর যে লোকবসতি এমনিতেই খুব হালকা। মনে হয় সেখানে প্রতি বাড়ি বাড়ি না হলেও প্রতি পাড়ায় পাড়ায় একজন করে পয়গম্বর ছিলেন। তার সঙ্গে বর্তমান পৃথিবীর ছবিটা মেলানোর চেষ্টা করে আরো দিশেহারা হয়ে যড়ি। আজকের লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয়শ' কোটি। আজকের পৃথিবী অশান্তি আর অস্থিরতাময় পৃথিবী। শাসন শোষণ ও পেষণক্লিষ্ট পৃথিবী। আজকে আল্লার আরশ থেকে দু'চারজন মহৎ র্বক্তির আবির্ভাব ঘটলে মানবজাতির বড়ই উপকার হত। কিন্তু মহাপ্রভুর কি ইচ্ছা মনে তিনিই জানেন, আজকেই কোন পয়গম্বর নেই। চৌদ্দশ' বছর আগে মহানবী নিজেই সে-পথ বন্ধ করে গেছেন—আর নয়, আল্লাপাক আর পয়গম্বর পাঠাবেন না, তিনিই শেষ নবী। বিশ্বাসীরা তার যৌক্তিকতা দেখতে পাচ্ছেন অনায়াসে। আমি পারছি না। হয়ত তিনি আমার কানে তালা মেরে রেখেছেন, চোখে দিয়েছেন ঠুলি।

পয়গম্বর বিষয়ে আমার আরেকটি প্রশ্ন ঃ এতগুলো পয়গম্বরের মধ্যে আজ পর্যন্ত একজন মহিলা-নবীর নাম শুনিনি কেন ? মহিলারা নিশ্চয়ই আল্লারই সৃষ্টি, এবং তাদের প্রতি তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাব পুরুষদের যতই থাকুক করুণাময় আল্লাপাকেরও থাকবে তা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয় । তাই আমি অবাক হয়ে যাই যখন পবিত্র কোরাণেই পাই ঃ

> "Ask the unbelievers if it be true that God has daughters, while they themselves choose sons. Did We create the angels females?" (17|149, Dawood)
>
> "অবিশ্বাসীদের জিজ্ঞেস কর এটা কি সত্য হতে পারে যে তারা নিজেরা পছন্দ করে পুত্রসন্তান, আর আল্লার থাকবে কন্যা ? আমরা কি কখনোই নারী ফেরেশতা সৃষ্চি করেছিলাম ?"

কিম্বা ঃ

"The apostles We sent before you were but men whom We inspired." (21:7, Dawood).

"তোমার আগে যাঁরা আমাদের বার্তা বয়ে এনেছিলেন তাঁদের সবাই ছিলেন আমাদের বাণী ও প্রেরণাপ্রাপ্ত পুরুষ ।"

এ-দু'টি পংক্তির মর্মার্থ আমি এখনো বুঝি না । প্রশ্ন জাগে মনে, তাহলে কি পুরুষজাতির চিরকালীন নারীবিদ্বেষ প্রাকৃতিক নিয়মেরই অন্তর্গত, যার মৌল প্রেরণার উৎস দৈবশক্তির অন্তঃপুরে ?

কোরাণবর্ণিত ঐশীবাণীর মর্মকতা নিয়ে দু'চারটে প্রশ্ন তুলেছিলাম আমি বছরচারেক আগেকার লেখা একটি নিবন্ধে । নিবন্ধটির নাম ছিল 'আউট অব্ কন্‌টেক্সট' । একটা সাহসী অন্‌লাইন পত্রিকা (মুক্তমনা) ছাড়া আর কোথাও লেখাটি ছাপানো সম্ভব হয়নি—কোন সম্পাদক সাহস করেনি ছাপতে । এই যে সাহস না পাওয়া মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে পরীক্ষানিরীক্ষা দ্বারা প্রচলিত ধর্মের মম্য বোঝার চেষ্টা, এই যে প্রশ্নকারীর জবাব না দিয়ে তার কণ্ঠ রুদ্ধ করার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে আমাদের ধর্মকে ঘিরে, এ'ও এক নতুন প্রশ্নের সূচনা করেছে আমার মনে । প্রশ্নকে এত ভয় কেন ? কারণ ভয় থেকেই তো সৃষ্টি হয় ভয়ের অস্ত্র দিয়ে প্রশ্নের গলা টিপে ধরার প্রবৃত্তি । আমার নিবন্ধের শালীনতম প্রতিক্রিয়া একেছিল দু'চারজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কাছ থেকে । তাঁদের বক্তব্য, ধর্ম সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অপ্রচুর ও অগভীর ; আমার বিশ্বাসের খুঁটি দুর্বল ; আমার উদ্ধৃতিগুলো 'আউট অব্ কন্‌টেক্সট', ইত্যাদি । প্রতিক্রিয়াগুলোর সবক'টাই পূর্বপ্রত্যাশিত ছিল বলে কোনটাই আমাকে অবাক করেনি । যুগ যুগান্তর ধরে ধর্মের ধ্বজাধারীরা নিজেদের অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তিকে অক্ষত রাখবার চেষ্টায় এইরকম বাধার দেয়াল দাঁড় করিয়ে রেখেছেন । তাঁরা আমাকে বলেন যে আমি কোরাণ ভাল করে পড়িনি, যা পড়েছি তা'ও বুঝিনি বা ভুল বুঝেছি । আমি কোরাণ বিশেষজ্ঞ নই, সেটা আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু আমার সমালোচকদের একজনও আমার উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর একটিরও জবাব দেয়া দূরে থাক, দেবার চেষ্টাও করেননি । প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের রীতিটাই এমন যে ধর্মগ্রন্থের সত্যমিথ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলাটাই দণ্ডনীয় অপরাধ । সুতরাং কেউ যদি কোন উদ্ধত প্রশ্ন তোলে তাহলে একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হল কখন এবং কিভাবে সে দণ্ড কার্যকরী করা হবে । তাৎক্ষণিক মুণ্ডচ্ছেদ, না, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ?

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজে প্রাত্যহিক কোরাণপাঠ তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মসজিদবহুল শহর ঢাকাতে আজকাল পাখিদের কলরব ততটা শোনা যায় না যতটা শোনা যায় আজানের শব্দ আর কোরাণপাঠের সুমধুর সুর। বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও তারা বাংলাতে তেলোয়াত করে না কোরাণ, করে আরবিতে, কারণ তাতেই নাকি বেশি সোয়াব, তাতেই নাকি বেহেশ্‌তের ফেরেশ্‌তারা সাড়া দেয়। তার যদি আরবি বুঝত তাহলে কিছু বলার ছিল না, কিন্তু গুটিকয় পণ্ডিত ব্যক্তি ছাড়া কেউ একশব্দ আরবি বোঝে কিনা আমার সন্দেহ। শেখার প্রতি একটা কৌতূহল, সেটাও বেশি দেখিনি আমি। কৌতূহল জিনিসটাই যেন একটা নিষিদ্ধ বস্তু আমাদের ধর্মীয় কালচারে।

ব্যক্তিগতভাবে, আমি যে এক ভয়াবহ তম মানুষ সেটা নতশিরে মেনে নিচ্ছি। আমি চেষ্টা করিনি তা নয়। কোরাণ পড়বার চেষ্টা করেছি বটে, একবার নয়, দু'বার। প্রথমবার অন্য সবার মত, তোতাপাখি যেমন পড়ে, ছোটবেলায় বাধ্যবাধকতায়। তখনকার পড়া ছিল 'ভাল মুসলমান' হবার জেন্য, সোয়াব অর্জনের আশায়। দ্বিতীয়বার পড়েছি পরিণত বয়সে, ইংরেজিতে, বুঝবার জন্যে, শেখার জন্যে, জ্ঞানের আকর্ষণে। শিখতে গিয়ে, বুঝতে গিয়ে, অনেক প্রশ্ন জেগেছে আমার মনে, যেমন করে প্রশ্ন জাগে আমার অঙ্কশাস্ত্রে। সেই প্রশ্ন, সেই শিক্ষার দু'চারটে অংশ আমাকে কিঞ্চিৎ বিচলিত করেছে, বিস্মিত করেছে। তারই মীমাংসা খুঁজে বেড়াচ্ছি নানাদিকে, নানাপথে।

কোরাণের ভাষা নিয়ে সবসময়ই একটা প্রশ্ন ছিল আমার মনে ঃ ধর্মের মত একটি পবিত্র জিনিস, একটি ব্যক্তিগত জিনিস চর্চা করতে গিয়ে মাতৃভাষা ছেড়ে এমন একটি বিদেশী ভাষা কেন ব্যবহার করতে হয় আমাদের যার একটি বর্ণও কারো বোধগম্য নয় ? সে-প্রশ্নের সমাধান শেষ পর্যন্ত আমি কোরাণেই পেয়েছি—কোরাণে কোথাও লেখা নেই যে আরবি যাদের মাতৃভাষা নয় তাদেরও কোরাণ পড়তে হবে আরবিতে। কয়েকটা পংক্তি আমি উল্লেখ করছি এখানে।

১। "Each apostle We have sent has spoken only in the language of his own people, so that he might make his precepts clear to them." (14:1, Dawood)
("যেসব নবীকে আমরা মর্ত্যে পাঠিয়েছি ধর্মপ্রচারের জন্যে তারা সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মাতৃভাষাতেই কথা বলেছেন, যাতে করে সেই বাণীগুলো তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে।")

২। "We have revealed the Koran in the Arabic tongue so that you may grow in understanding." (12:1, Yusuf Ali)
("আমরা আরবি ভাষাতে কোরাণ নাজেল করেছি যাতে সেটা সবারই বোধগম্য হয়।")

৩। "Had We revealed the Koran in a foreign language they would have said, 'If only its verses were expounded! Why in a foreign tongue, and he an Arabian?'" (41:40, Dawood)
("আমরা যদি কোনও বিদেশী ভাষাতে কোরাণ নাজেল করতাম তাহলে ওরা বলত, 'এর ছত্রগুলো যদি বুঝবার উপায় থাকত কারো ! যেখানে ওরা সবাই আরবিতে কথা বলে সেখানে বিদেশী ভাষা কেন ?' ")

৪। "We have revealed the Koran in the Arabic tongue that you may understand its meaning." (43:1, Dawood)
("আমরা আরবিতে কোরাণ পাঠিয়েছি যাতে তোমরা সবাই বুঝতে পার।")

৫। "Thus have We revealed to you an Arabic Koran, that you may warn the mother-city (Mecca) and those who dwell around it; that you may forewarn them of the day which is sure to come." (42:5, Dawood)

("আমরা তোমার কাছে আরবি কোরাণ পাঠিয়েছি যাতে তুমি মক্কা এবং তার আশেপাশের জনগণকে সাবধান করে দিতে পার যে হাশরের দিন এক অনিবার্য বাস্তব যা থেকে কারুরই নিষ্কৃতি নাই ।")

এই পাঁচটি আয়াতের মধ্যে আমি তিনটি বাণী শুনতে পাই । এক, ধর্মশিক্ষা মাতৃভাষা ছাড়া আর কোন ভাষাতেই হওয়ার উচিত নয় । দুই, কোরাণ নাজেল হয়েছিল শুধুমাত্র আরবিভাষী আরবজাতির জন্যে । তিন, কোরাণ নাজেলের মূল উদ্দেশ্য ছিল সহজবোধ্য আরবি ভাষাতে মক্কা নগর ও তৎসংলগ্ন জনপদসমূহে আল্লার বাণী প্রচার করা ।

সুতরাং বাংলাদেশ সহ অন্যান্য মুসলিমপ্রধান দেশে যে আরবির প্রতি এত মোহ, আরবি ভাষাদে কোরাণপাঠের প্রতি এত যে অন্ধ আসক্তি তা সম্পূর্ণভাবে কোরাণের মূল আদর্শের পরিপন্থী । আজকে যে আরববহির্ভূত দেশসমূহে আরবির এত প্রভাব তার কারণ কোরাণে বর্ণিত আল্লার বাণী নয়, তার কারণ মধ্যযুগের ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদ । এটা আগাগোড়া রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্যেরই পরিচায়ক মাত্র ।

ভাষার ধাঁধাটা মোটামুটি মীমাংসা হয়ে গেলেও অন্যান্য ধাঁধা কিন্তু এখনো কাঁটার মত বিঁধে আছে মনে । যতই পড়ি কোরাণ ততই সৃষ্টি হয় নতুন নতুন প্রশ্ন । সৃষ্টি হয় নতুন নতুন বিস্ময়বিমূঢ়তা । এ কি করে সম্ভব ? এ কি করে হয় আল্লার বাণী ?

কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক ।

সৃষ্টিবাদ না বিবর্তনবাদ, বর্তমান জগতে এ নিয়ে মহাবিতর্ক । আধুনিক বিজ্ঞানের যুক্তিপ্রমাণের তোপে সৃষ্টিবাদীদের অনেক দাবিই টিকতে পারছে না বলে তাঁরা নতুন ভাষা আবিষ্কার করেছেন একই কথা বলার জন্যে ঃ Intelligent Design, বা বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনা । সে যাই হোক, কোরাণের ভাষা তো কেউ খণ্ডাতে পারবে না (খণ্ডাবার চেষ্টা করলেই তো মুণ্ডটা হারাতে হবে) ।

"... Yet your Lord is God, who in six days created the heavens and then ascended the throne, ordained all things." (10:1, Dawood)
("... অথচ তোমার প্রভুই (মহান) সৃষ্টিকর্তা, যিনি ছয় দিনের মধ্যে স্বর্গমর্ত্য সৃষ্টি করে আসন গ্রহণ করেছেন স্বর্গীয় সিংহাসনে, যেখান থেকে পরিচালনা করে চলেছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরন সকল কর্মকাণ্ড ।")

"It was He that gave the sun his brightness and the moon her light, ordaining her phases that you may compute the seasons and the years." (10:1, Dawood)
("তিনিই ছিলেন সেই মহাশক্তি যিনি সূর্যকে দিয়েছিলেন তার উজ্জ্বলতা, চন্দ্রকে তার আলো । চন্দ্রকলার হিসেব দিয়েই তো তোমরা হিসেব করতে পার বৎসর, বুঝতে পার ঋতুর গতি ।")

"It was He who created the heavens and the earth in all truth. On the day when He says: 'Be', it shall be, His word is the truth." (6:72, Dawood)
("এ এক অকাট্য সত্য যে স্বর্গমর্ত্য তাঁরই সৃষ্টি । যে মুহূর্তে তিনি বলবেন ঃ 'হও', তা হবে । তাঁর উচ্চারিত বাণীই সত্য ।")

"It was He who ordains life and death. If He decrees a thing, He need only say: 'Be', and it is." (40:66, Dawood)

("একমাত্র তিনিই জীবনমৃত্যুর মালিক। যখনই তিনি কোনকিছু সৃষ্টি করতে চান, তাঁকে শুধু বলতে হয় ঃ 'হও', তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।")

"Are the disbelievers unaware that the heavens and the earth were but one solid mass which We tore asunder, and that We made every living thing from water?" (21:25, Dawood)
("অবিশ্বাসীরা কি অবগত নয় যে একসময় স্বর্গ এবং মর্ত্যের আলাদা কোনও অস্তিত্ব ছিল না, তারা ছিল এক সংযুক্ত প্রস্তরখণ্ড যাকে আমরা ভেঙে টুকরো টুকরো করেছি ? তারা কি অবগত নয় যে সকল সজীব বস্তুকে আমার সৃষ্টি করেছি জলীয় উপাদান দিয়ে ?")

উপরোক্ত পাঁচটি আয়াতের মূল সুর একটিই—মহান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিরহস্য। অন্ধ বিশ্বাসীদের চোখে এর প্রতিটি শব্দ বর্ণে বর্ণে সত্য, কোনও বিতর্কেরই অবকাশ নেই কোথাও। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসের ভাগ্য থেকে হয়ত সৃষ্টিকর্তা নিজেই আমাকে বঞ্চিত করে রেখেছেন—সেই 'চোখের ঠুলি' আর 'কানের তালা' লাগানোর মত করে। তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তি অনুযায়ী সৃষ্টির জন্যে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাই যথেষ্ট, শ্রমের দরকার নেই। তিনি যা ইচ্ছা করবেন, তা বিনা বাক্যব্যয়ে, বিনা কালাতিপাতে, তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে যাবে। তাই যদি হয় তাহলে প্রথম পংক্তিতে কেন বলা হল যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে তাঁর ছয়দিন লেগে গেছে ? (ছয়দিন অবশ্য ছয়হাজার বছরও হতে পারে মানবিক মাপকাঠিতে, কোরাণেরই অন্য এক আয়াত অনুসারে)। ইহুদীদের তোরা এবং খ্রীষ্টানদের বাইবেল তো তার চেয়েও এককাঠি অগ্রসর হয়ে যায় ঃ সৃষ্টির ছয়দিনব্যাপী পরিশ্রমের পর মহাপ্রভু একদিন অবসর নিয়েছিলেন. যার সূত্র ধরে মানবজগতে প্রবর্তিত হয়েছিল সাব্বাথ বা বিশ্রামের দিন, ছুটির দিন। সে-অনুযায়ী ইহুদীরা শনিবারকে ধার্য করে নিলেন তাদের ছুটির দিন হিসেবে, আর খ্রীষ্টানরা নিলেন রবিবারকে। পশ্চিম জগতে এদু'টি দিনকে ছুটির দিন হিসেবে গ্রহণ করবার পেছনের কাহিনীটা এখানে। মুসলমানদের সৃষ্টিকর্তার হয়ত বিশ্রামের প্রয়োজন হয়নি, কিন্তু বিশেষ প্রার্থনা ও বন্দনার প্রয়োজন হয়েছিল, তাই সপ্তাহের বাকি দিনগুলোর মধ্যে তাঁরা বাছাই করে নিলেন পবিত্র শুক্রবারকে। মাঝে মাঝে মনে হয়, ভালই হল, ইসলামের পর আর কোন নবী পাঠানো হয়নি মানবজাতির জন্যে। তাহলে হয়ত সপ্তাহের বাকি দিনগুলোও একে একে দখল হয়ে যেত বিভিন্ন ধর্মের উপাসকদের দ্বারা—কেবল আল্লা আল্লা করা ছাড়া আর কোন কাজই থাকত না মনুষ্যজাতির!

দ্বিতীয় পংক্তিটি নিয়ে আমার সমস্যা হল যে চাঁদের চলাফেরাতে রদবদল হয় এবং বাৎসরিক সময়চক্র নির্ধারিত হয়, এই তথ্যটি। চান্দ্রমাস বা চান্দ্রবৎসরের প্রচলন এককালে ছিল কোন কোন দেশে, তা সত্য, কিন্তু চন্দ্রসূর্যের পারস্পরিক সম্পর্ক মধ্যযুগের বৈজ্ঞানিকদের কাছে যতই পরিষ্কর হতে শুরু করে ততই মানুষ চান্দ্রবৎসরকে বর্জন করে সৌরবৎসরের হিসেবে জীবন পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেয়। চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নেই, সূর্যের আলো দিয়েই সে আলোকিত, এই জ্ঞানটি দু'হাজার বছর আগেও মানুষের জানা ছিল। অথচ কোরাণের যে আয়াতটি উল্লেখ করা হল এখানে তাতে মনে হয় চন্দ্রের আলো কোনভাবেই সূর্যের ওপর নির্ভরশীল নয়। নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তা জানতেন কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা। তাহলে তথ্যের এই আপাত-অসামঞ্জস্য কেন ?

পঞ্চম পংক্তিটি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক বিশ্বাসীদের ভীষণ প্রিয়। তাঁরা মনে করেন, এই আয়াতটির মধ্যে নিহিত আছে বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত Big Bang-এর পূর্বাভাষ। তাই নাকি ? আমার 'তালামারা' মন সন্দিহান হয়ে ওঠে, 'ঠুলিলাগানো' চোখ কুঞ্চিত হয়ে আসে। 'একটি বিশাল কুণ্ডলিত

জড়বস্তুর তুমুল বিস্ফোরণ থেকে স্বর্গমর্ত্যের আবির্ভাব', তাই যদি হয়ে থাকে এই পংক্তির বক্তব্য তাহলে প্রশ্ন করতে হয় সেই 'জড়বস্তু'টি কি সৃষ্টির অংশ ছিল না ? সেটা কখন এবং কিভাবে গঠিত হল ? বিজ্ঞানমনস্ক বিশ্বাসীদের কাছে আমার প্রশ্ন ঃ Big Bang বলতে তাঁরা কি বস্তুর সংঘর্ষ বোঝেন ? আসলে Big Bang-এর সঙ্গে বস্তুর কোন সম্পর্ক নেই। ঐ মুহূর্তে বস্তু দূরে থাক, কাল ও স্থান, তা'ও ছিল না। সুতরাং সেই মহাপ্রলয়ের মুহূর্তটি ছিল কাল এবং স্থান সৃষ্টির (Time and Space) মুহূর্ত। অর্থাৎ 'অস্তিত্ব' শব্দটির প্রারম্ভিক সূচনা। কাল, স্থান এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বা আপেক্ষিকতার কোনও উল্লেখ আমি কোরাণের কোন ছত্রে খুঁজে পাইনি।

বর্তমানে বিশ্বের বহু-আলোচিত ও সর্বনিন্দিত 'ইসলামিক জঙ্গিবাদ', 'উগ্রবাদ' বা 'মৌলবাদ'-এর মোকাবেলা করতে গিয়ে ধর্মপ্রাণ ও শান্তিপ্রিয় মুসলমানরা ইসলামের শান্তি ও সহনশীলতার ভাবমূর্তিকে বড় করে প্রচার করার চেষ্টায় যে পংক্তিটি বারবার উল্লেখ করে থাকেন তা হল ঃ

> "You have your own religion, and I have mine." (109:6, Dawood)
> ("তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার।")

বাহ্, কি চমৎকার বাণী ! প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। অপর ধর্মাবলম্বীদের প্রতি এর চেয়ে বড় সম্মান আর কোন্ ধর্মে আছে ? কিন্তু মনটা চুপসে যায় যখন একই গ্রন্থের ভেতর দেখতে পাই ঃ

> "Believers, make war on the infidels who dwell around you. Deal with them firmly." (9:12, Dawood)
> ("বিশ্বাসীগণ, যেসব কাফের তোমার পরিপার্শ্বে বসবাস করে তাদের ওপর যুদ্ধ ঘোষণা কর। দৃঢ়মুষ্টি ব্যবহার কর তাদের সঙ্গে।")
> "When the sacred months are over slay the idolators wherever you find them. Arrest them, besiege them, and lie in ambush everywhere for them." (9:5, Dawood)
> ("পবিত্র মাসগুলি পার হয়ে গেলে মূর্তিপূজকদের যেখানে পাও সেখানেই তাদের সংহার কর। তাদের আটক কর, ঘেরাও কর, ফাঁদ পেতে থাক তাদের ধরার জন্যে।")

এ দু'টি পংক্তি পড়ে কি মনে হয় অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ইসলামের সহিষ্ণুতা সত্যি সত্যি আদর্শস্থানীয়?

অসহিষ্ণুতার উদাহরণ অজস্র। যেমন ঃ

> "Garments of fire have been prepared for the unbelievers. Scalding water shall be poured upon their heads, melting their skins and that which is in their bellies. They shall be lashed with rods of iron.
> Whenever, in their anguish, they try to escape from Hell, back they shall be dragged, and will he told : 'Taste the torment of the conflagration .' " (22:19, Dawood)
> ("অবিশ্বাসীদের জন্যে তৈরি করা হয়েছে আগুনের পরিধেয়। ফুটন্ত জল বর্ষণ করা হবে তাদের মাথার ওপর যাতে বিগলিত হবে তাদের চর্ম, বিগলিত হবে তাদের নাড়িভূঁড়ি। লৌহদণ্ড দিয়ে প্রহার করা হবে তাদের।

সেই অগ্নিদাহের যন্ত্রণায় যখনই তারা নরককুণ্ড থেকে পালাবার চেষ্টা করবে তখনই তাদের টেনেহিঁচড়ে ফিরিয়ে আনা হবে সেখানে। বলা হবে, 'এবার বুঝলে তো বাছা দাবালনের তাপ কেমন লাগে গায়ে।' ")

এ কি শান্তিপ্রিয় সহনশীলতার বাণী, না, প্রচণ্ড ক্রোধ, ঘৃণা আর প্রতিহিংসার হিংস্র নিনাদ ? এ কি কোনও করুণাময় বিশ্ববিধাতার ক্ষমাসুন্দর কৃপার ধ্বনি বলে মনে হয় আপনার কাছে ? মূর্তিপূজকরা পথভ্রান্ত হতে পারে, কিন্তু তারা কি এতটাই ঐশ্বরিক রোষ আর নিষ্ঠুরতার পাত্র ? বিশেষ করে যেখানে আল্লাতা'লা নিজেই বলছেন যে বিপথে যাওয়া বা সুপথে থাকা কোনটাই মানুষের নিজস্ব ইচ্ছায় ঘটে না, ঘটে তাঁরই ইচ্ছায় ? আমি কেমন করে সেই বিধাতৃর কাছে মাথা নত করি যে বিধাতৃর বর্ণিত উক্তিতে এত অসঙ্গতি, এত স্ববিরোধিতা ?

আরো শুনতে চান ? শুনুন তাহলে-

"We have bound their necks with chains of iron reaching up to their chins, so that they cannot bow their heads. We have put a barrier before them and a barrier behind them and cover them over, so that they cannot see." (36:7, Dawood)
("আমরা লোহার শেকল দিয়ে তাদের ঘাড় বেঁধে দিয়েছি থুতনি পর্যন্ত যাতে মাথা নোয়াতে না পারে। আমরা তাদের সামনে পেছনে দু'দিকেই প্রাকার সৃষ্টি করেছি, তারপর আচ্ছাদিত করেছি তাদের আপাদমস্তক, যাতে তাদের দৃষ্টিপথ রুদ্ধ হয়ে যায়।")

এই পংক্তিটি আমি সংগ্রহ করেছি সুরা 'ইয়াসিন' থেকে যা পুণ্যবান মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত উঁচুমানের সুরা, এবং যার নিয়মিত পঠন দ্বারা তারা অধিকতর পুণ্যার্জন করেন।

সহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে আমার শেষ উদ্ধৃতিটি হল ঃ

"You shall not pray for any of their dead, nor shall you attend their burial." (9:82, Dawood)
("তোমরা তাদের মৃতদের আত্মার শান্তিকামনা করবে না। তাদের শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে না।")

অর্থাৎ জীবিতাবস্থাতে ওদের ক্ষমা নেই শুধু নয়, মৃতাবস্থাতেও নেই। মৃতদেহের প্রতি যে বিশ্বাসমালাতে এত অসম্মান সে-বিশ্বাসকে সসম্মানে গ্রহণ করবার প্রবৃত্তি কি স্বাভাবিক ? সে-বিশ্বাসকে কি সহনশীল ও ক্ষমাশীল বিশ্বাস বলে মেনে নেওয়া সহজ ?

ছোটবেলায় বড় বড় আলেমদের মুখে শুনেছি, পবিত্র কোরাণ যে নিঃসন্দেহভাবে আল্লার বাণী এবং কোনও মরণশীল মানুষের পক্ষে এমন নিখুঁত রচনা সম্ভব নয় তার অন্যতম প্রমাণ হল কোরাণের ভাষা। এত নিপুণ ছন্দ, শব্দপ্রয়োগের এমন আশ্চর্য জাদুকরী শক্তি, এটা মানুষের সাধ্যাতীত। কোরাণ এক বিশাল মহাকাব্য, সব মহাকাব্যের সেরা মহাকাব্য। সব কবির সেরা কবি হলেন আল্লা স্বয়ং। ছোটবেলার অবোধ বিশ্বাসের আবহাওয়াতে এগুলো শুনতে খুব ভাল লাগত, যদিও আরবি বুঝি না বলে এর কাব্যিক গুণাগুণ বিচার করবার কোন উপায়ই ছিল না আমার, এখনো নেই। তবে কবিতা ও কবির প্রতি কোরাণের কি দৃষ্টিভঙ্গি তা যাচাই করবার সুযোগ এসেছে পরবর্তীকালে, ইংরেজি অনুবাদ পড়বার সময়।

তাতে আমার মনে হল, আল্লাপাক নিজে শ্রেষ্ঠ কবি হতে পারেন, কিন্তু কবিজাতিটাকে তিনি হয়ত খুব সুনজরে দেখেন না। দু'টি উদাহরণ দিই-

> "Poets are followed by erring men. Behold how aimlessly they rove in every valley, preaching what they never practice. Not so the true believers, who do good works and remember God with fervour and defend themselves only when wronged." (26:227, Dawood)
> ("কেবল পথভ্রান্ত লোকেরাই অনুসরণ করে কবিদের। খেয়াল করে দেখ কেমন উদ্দেশ্যবিহীনভাবে তারা পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, আর বুলি ছড়ায় যার একটি বর্ণও তারা নিজেরা পালন করে না। সত্যিকারের বিশ্বাসী যারা তারা কখনোই তা করবে না। তারা সবসময় সৎকর্মে লিপ্ত থাকে, আল্লাকে স্মরণ করে পরম ভক্তির সাথে এবং অন্যায় আচরণের সম্মুখীন হলেই আত্মরক্ষার জন্যে উদ্যত হয়, নইলে নয়।")

অথবা,

> "We have taught him (the Holy Prophet) no poetry, nor does it become of him to be a poet. This is but an admonition; an eloquent Koran to exhort the living and to pass judgment on the unbelievers." (36:69, Dawood)
> ("আমরা মোহম্মদকে (দঃ) কাব্য শেখাইনি। কাব্য করা তাঁকে মানায়ও না। কোরাণের যে সাবলীল ছান্দিক ভাষা তার উদ্দেশ্য জীবিত মানুষদের সুপথের নির্দেশদান ও পথহারা অবিশ্বাসীদের প্রতি সাবধানবাণী প্রচার করা।")

পবিত্র কোরাণে নারীর মর্যাদা কতখানি তা নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। আমি সেই বিতর্কে যেতে চাই না, কেবল কোরাণ থেকে দু'চারটে উদ্ধৃতি তুলে পাঠকের বিবেক-বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেব।

> "Men have authority over women because God has made the one superior to the other, and because they spend their wealth to maintain them. Good women are obedient ... As for those from whom you fear disobedience, admonish them, forsake them in beds apart, and beat them. Then if they obey you, take no further action against them." (4:34, Dawood)
> ("নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য স্বাভাবিক, কারণ একের চেয়ে অন্যের স্থান উর্ধ্বে, এবং নারীর ভরণপোষণের জন্যে পুরুষকে অর্থব্যয় করতে হয়। ভাল নারী বলতে বোঝায় বাধ্য নারী। ... যেসব নারী অবাধ্য হতে পারে বলে তুমি মনে কর তাদের তুমি ভর্ৎসনা কর, পৃথক শয্যাতে নির্বাসিত কর, এবং প্রহার কর। তারপর যদি তারা বাধ্যতায় ফিরে আসে, তাহলে আর কোনও ব্যবস্থা নিও না তাদের বিরুদ্ধে।")

এরপরও কি জোর দিয়ে বলা যায় যে ইসলামে নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা ? আমি বুঝি না, বুঝতে চাই।

> "Forbidden to you are your mothers, your daughters, your sisters, ... Also married women, except those whom you own as slaves." (4:24, Dawood)
> ("তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ হল তোমাদের মায়েরা, কন্যারা, বোনেরা ...। এবং নিষিদ্ধ বিবাহিত মহিলাগণ, কেবল তোমাদের ক্রীতদাসীরা ছাড়া।")

অর্থাৎ ক্রীতদাসী হলে তাদের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক অবশ্যই হতে পারে। তাহলে কি বলা যায় যে ক্রীতদাসীদের প্রতি নারীজাতির স্বাভাবিক সম্মান প্রদর্শনের কোনও প্রচেষ্টা ছিল পবিত্র কোরাণে ?

> "Not so the worshippers, who are steadfast in their prayer, who set aside a due portion of their wealth for the beggar and for the deprived; who truly believe in the Day of Reckoning, ..., who restrain their carnal desire (save with their wives and slave-girls, for those are lawful for them); transgressors are those who lust after other than these; ..." (70:22, Dawood)
> ("ব্যতিক্রম হল তারা যারা উপাসনায় নিষ্ঠাবান ; যারা তাদের অর্জিত সম্পদের একটা ন্যায্য অংশ পৃথক করে রাখে ভিক্ষুক ও অভাবীদের জন্যে ; যারা হাশরের দিনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ; যারা তাদের কামলিপ্সা সংবরণ করতে সক্ষম (শুধু তাদের বিবাহিত স্ত্রী ও ক্রীতদাসীগণ ছাড়া যারা আইনতই তাদের যৌনসঙ্গী হতে পারে) ; যারা তার বাইরে লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তারা লম্পট ;...")

দেড় হাজার বছর আগে আরব সমাজে যৌন ব্যভিচার ছিল প্রচণ্ডরকম সেটা জানি, দাসপ্রথাও ছিল তুমুল বিক্রমে, কিন্তু পবিত্র কোরাণে আল্লামালিক স্বয়ং তার সমর্থনে বাণী প্রেরণ করবেন সাত আসমানের ওপর থেকে, সেটা আমার কাছে কেমন অবিশ্বাস্য মনে হয়। অবশ্য আমার চোখে তো তিনিই ঠুলি পরিয়ে রেখেছেন !

কোরাণ পড়ার ফলে ইসলামের একটা সুন্দর দিক অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে আমার কাছে—সারল্য। এর নিরেট নিখাদ সারল্য। কোন জটিলতা নেই, কোন পণ্ডিতিপণা নেই, কোন সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে উচ্চমার্গের তর্কবিতর্ক নেই, নেই কোনও কুয়াশাঘেরা আবছা আধ্যাত্মিকতা। সত্যিকার অর্থেই সাধারণ মানুষের ধর্ম। নামাজ রোজা কর, সৎপথে চল, সরল জীবনযাপন কর, আল্লার আদেশ পালন কর, ঈমান ঠিক রাখ, ব্যস, তোমার আর কোন চিন্তা নেই। এজীবনে যত কষ্টই পাও তুমি, পরলোকে তোমার কোন ভয়-ভাবনা থাকবে না, হাশরের দিন আল্লাতা'লার পেয়ারা বান্দা হবে তুমিই। এইটুকু আমি মোটামুটি বুঝি। এইটুকু আমি বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে পারি।

কিন্তু। হ্যাঁ, এই কিন্তুগুলোই আমাকে যন্ত্রণা দেয়, ভাবায়, বিচলিত করে। এটা কেমন করে হয় ? ওটা কিভাবে আল্লার বাণী হতে পারে ? এর তাৎপর্য কি ? ওটার মর্ম আমাকে কে বোঝাবে ? ইত্যাদি। অন্ত হীন।

> "We have decked the lower heaven with constellations. They guard it against rebellious devils, so that they may not listen in to those on high. Meteors are hurled at them from every side; then, driven away, they are consigned to an eternal scourage. Eavesdroppers are pursued by fiery comets." (37:8, Dawood)
> ("স্বর্গলোকের নিচের তলাটি আমরা গ্রহনক্ষত্র দিয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছি যাতে করে দুরভিসন্ধিমূলক দুর্বৃত্তরা উর্ধ্বলোকের দিকে কান পেতে না থাকতে পারে। উল্কারা তাদের উত্যক্ত করতে থাকবে চারদিক থেকে, এবং বিতাড়িত হবার পর তাদের নির্বাসিত করা হবে এক অন্তহীন অভিশপ্ততায়। কানপাতা দুষ্কৃতিকারীদের ধাবিত করার কাজ অগ্নিবাহী ধূমকেতুদের।")

এর অর্থ কি ? স্বর্গলোক কি তাহলে গ্রহনক্ষত্রদের রাজ্য থেকেই শুরু হয় ? এর উপরতলা আর নিচের তলা বলতে কি বোঝায় ? উল্কাদের কাজ কি তাহলে উপরতলার বাসিন্দাদের সিকিউরিটি গার্ডের মত ? ধূমকেতুগুলোও তো দেখছি কেবল আজেবাজে মানুষগুলোকে ধাওয়া করে বেড়ায়। এগুলো কি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় আপনার কাছে ? জানি, কি বলবেন আপনি। আমার ঈমান নেই, আল্লাপাক

আমার আত্মা ও কানে তালা দিয়ে রেখেছেন, চোখে দিয়েছিন ঠুলি । তাই আমি কথাগুলোর ভাবার্থ বুঝতে পারছি না । কি করব বলুন । কোরাণে তো আল্লাতা'লা নিজেই বলছেন ঃ

> "Some of its verses are precise in meaning—they are the foundation of the Book—and others ambiguous. ... No one knows its meaning (the ambiguous parts) except God." (3:7, Dawood)
> ("এর কিছু কিছু ছত্র একেবারেই দ্ব্যর্থহীন, পরিষ্কার—এগুলোই হল এই গ্রন্থের স্তম্ভ । বাকিগুলো দ্ব্যর্থমূলক, অস্পষ্ট, যার অর্থ এক আল্লা ছাড়া কারো বোঝার সাধ্য নেই ।")

অর্থাৎ পবিত্র কোরাণের বেশির ভাগ ছত্রই জলের মত পরিষ্কার যা সকলেরই বোধগম্য । বাকিগুলো কারুরই বোধগম্য নয়, আল্লামালিক ছাড়া । সুতরাং দয়া করে এ-কথা বলবেন না যে কোরাণের কোন বাণী আমি না বুঝলেও আপনি বোঝেন ।

স্বর্গমর্ত্য প্রসঙ্গে আরো দু'টি উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

> "They shall dwell in the garden of eden, where rivers will roll at their feet. Reclining there upon soft couches, they shall be decked with bracelets of gold, and arrayed in garments of fine green silk and rich brocade : blissful their reward and happy their resting-place!" (18:30, Dawood)
> ("স্বর্গের উদ্যান হবে তাদের বসতিস্থান, যেখানে তাদের পায়ের নিচে দিয়ে বয়ে যাবে নদীর সলিলধারা । সেখানে, সুকোমল কেদারাতে সমাসীন হয়ে তারা সুসজ্জিত হবে উৎকৃষ্ট স্বর্ণালঙ্কারে, ভূষিত হবে মিহিন সবুজ রেশমি ভূষণ আর ঝলকভরা মখমল পরিধানে । জীবন হবে তাদের অনন্ত সুখের সায়র, চিরপ্রসন্ন হবে তাদের চিরবিশ্রাম ।)"

> "They shall recline on jewelled couches face to face, and there shall wait on them immortal youths with bowl and ewers and a cup of purest wine (that will neither pain their heads nor take away their reason); with fruits of their own choice and flesh of fowls that they relish. And theirs shall be the dark-eyed houris, chaste as virgin pearls : a guerdon for their deeds." (56:7, Dawood)
> ("তারা যখন মণিমুক্তখচিত আরামকেদারাতে হেলান দিয়ে সুখভাবনায় নিমগ্ন থাকবে তখন তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে চিরতরুণ যুবাদল । তারা সুদৃশ্য পাত্রে করে নিয়ে আসবে বিশুদ্ধতম মদিরা (যা তাদের মস্তিষ্কে আনবে না স্বস্তিহীনতা, বোধবুদ্ধিতে আনবে না বৈকল্য) । তাদের সকাশে আসবে তাদেরই পছন্দমাফিক সুস্বাদু ফল, তাদেরই শখের পাখির মাংস । তাদের আমোদপ্রমোদ আর ভোগবিলাসের জন্যে নিয়োজিত থাকবে কৃষ্ণনয়না স্বর্গীয় পরীগণ, কুমারী হীরকের মত অঘ্রাতা ও অস্পৃশ্যা পরী ।"

এরকম পংক্তি আরো কিছু আছে পবিত্র কোরাণে । এগুলো পড়ে আপনার কি মনে হয় জানি না, কিন্তু এগুলো আমাকে লজ্জায় ফেলেছে, বিব্রত ও বিমূঢ় করেছে । কেন ? ইহজগতে যেসব দ্রব্য বা আচার-আচরণ সাধ্বী মুসলমানদের জন্যে কঠোরভাবে বারণ, ঠিক সেই জিনিসগুলোরই লোভ দেখানো হয়েছে পরলোকে । পরলোক সত্যি সত্যি আছে কিনা তার কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ কেউ দাঁড় করাতে পারেনি এখনো, কিন্তু সেই কাল্পনিক বা বাস্তব পরলোকের বিলাসবহুল ও যৌনতা পূর্ণ জীবনের একটা স্থূলরকম রঙিন চিত্র দাঁড় করিয়ে মানবজাতিকে আদেশ করা হয়েছে বর্তমান জগতের আনন্দভোগ থেকে বিরত থাকার জন্যে । সত্যি কথা বলতে কি 'কৃষ্ণনয়না ও অঘ্রাতা কুমারী'র কথা শুনে আমার গা ঘিন ঘিন

করে। বারবার মনে হয় আমার নিষ্পাপ নিষ্কলুষ দৌহিত্রীটির কথা। মনে পড়ে প্রতিদিন স্কুলের পথে দেখা কৃষ্ণনয়না মেয়েগুলোর কথা। ইহজগতের সৎকর্মের পুরস্কার কি তাহলে পরপারের লাম্পট্যময় জীবন ? এ আমি কেমন করে বিশ্বাস করি বলুন তো ? এ-জীবনের প্রতি আমি কেমন করে আকৃষ্ট হব ? তবু মানা যাক, তর্কের খাতিরে মানা যাক যে, স্বর্গে গিয়ে পুণ্যবান পুরুষের গোপন যৌনক্ষুধা নিবৃত্ত হয়। কিন্তু পুণ্যবান মেয়েদের জন্যে কি ব্যবস্থা ? ওদের জন্যে কোনও পুরস্কারের কথা কি আল্লাপাক ভুলে গিয়েছিলেন ? তা কি করে হয় ? আল্লা আবার ভোলেন কি করে ? কিন্তু তাহলে কোরাণে তার উল্লেখ নেই কেন ?

সবশেষে আমি কয়েকটি আয়াত পেশ করব যেগুলো আমাকে অনেকদিন থেকেই অত্যন্ত বিচলিত ও হতবাক করে রেখেছে-

> "You (Muhammad) said to the man (adopted son Zayd) whom God and yourself have favoured : 'Keep your wife and have fear of God.' You sought to hide in your heart what God was to reveal (your intention to marry Zayd's wife). You were afraid of man, although it would have been more proper to fear God. And when Zayd divorced his wife, We gave her to you in marriage, so that it should become legitimate for true believers to wed the wives of their adopted sons if they divorced them. God's will must needs be done.
> No blame shall be attached to the Prophet for doing what is sanctioned for him by God." 33.37, 33.38, Dawood)
> ["যে লোকটা (মোহাম্মদের পালকপুত্র জাইয়িদ) তোমার এবং আল্লাতা'লা উভয়েরই প্রিয়পাত্র তাকে উদ্দেশ করে তুমি (মোহাম্মদ) বললে ঃ 'তোমার স্ত্রী তোমার কাছেই থাক। এবং আল্লাকে ভয় করো।' কিন্তু এই বলার মধ্য দিয়ে তোমার মনের ইচ্ছাটি (জাইয়িদের স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী হিসেবে পাওয়া) তুমি গোপন রাখবার চেষ্টা করেছিলে যা আল্লাতা'লা নিজেই প্রকাশ করতে যাচ্ছিলেন। তোমার মধ্যে লোকভয় আশ্রয় নিয়েছিল, যেখানে তোমার উচিত ছিল শুধু আল্লাকেই ভয় করা। তারপর যখন জাইয়িদ তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ফেলল, আমরা মেয়েটিকে তোমার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দিলাম। এতে করে তালাকের পর পালকপুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করার রীতিটি বৈধ করে দেওয়া হল। আল্লার ইচ্ছা অবশ্যই পালিত হবে সর্বপ্রকারে।
> আল্লা নিজে যা মন্‌জুর করে দিয়েছেন নবীর জন্যে তার জন্যে তাঁকে কোনভাবেই দোষারোপ করা চলবে না।"]

আমার জানামতে, পালকপুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা আরবসমাজে নিষিদ্ধ ছিল এবং নবীজী নিজেও সেই নিষেধের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু জাইয়িদের স্ত্রীর ব্যাপারে সব ওলটপালট হয়ে যাওয়াতেই এই আয়াতটিতে 'দোষারোপ'-এর প্রশ্নটি দাঁড়িয়ে গেল।

> "Prophet, We have made lawful for you the wives to whom you have granted dowries and the slave-girls whom God has given you as booty; the daughters of your paternal and maternal uncles and of your paternal and maternal aunts who fled with you; and any believing woman who gives herself to the Prophet and whom the Prophet wishes to take in marriage. This privilege is yours alone, being granted to no other believer." (33:50, Dawood)
> ("হে নবী, আমরা তোমার জন্যে বৈধ করেছি যথাযথ দীনমোহরপ্রাপ্ত স্ত্রীদের, আর বৈধ করেছি যুদ্ধক্ষেত্রে বিজিত ও আল্লাপ্রদত্ত দাসীদের ; বৈধ করেছি তোমার মামাতু চাচাতু ও খালাতু ফুফাতু বোনেদের ; বৈধ

করেছি সেইসব বিশ্বাসী রমণীদের যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের সমর্পণ করে দেয় নবীর কাছে, নবী নিজে যাদের জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, এবং যারা তোমার সঙ্গে দেশত্যাগ করেছিল। এই বিশেষ সুবিধাটুকু সংসারে আর কারো জন্যে নয়, শুধু তোমার জন্যই কবুল করা হয়েছে।")

বিশেষ সুবিধা ? মহানবীর কি এতই প্রয়োজন ছিল এরকম সুবিধার ? না ভাই, আমার এ-ধাঁধা জীবনেও কাটবে না।

সুরা আল্-তাহরিমে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে মৌলানা দাউদের অনূদিত কোরাণে (মৌলানা ইউসুফ আলীর অনুবাদেও)। কথিত আছে যে বিবি হাফ্সা (হজরতের অন্যতম স্ত্রী) একবার স্বামীকে একটি কপ্টিক দাসীর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন। তখন হজরত তাঁর সেই বিবিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ভবিষ্যতে আর কখনো এরকম দৃশ্য তাঁকে দেখতে হবে না। ঘটনাটি বিবি হাফ্সা বিবি আয়োশার কাছে ফাঁস করে দিয়েছিলেন। সেই সূত্র ধরেই আল্লার আরশ থেকে এই সুরাটি নাজেল হয়:

"Prophet, why do you prohibit that which God has made lawful for you, in seeking to please your wives? ... God has given you absolution from such oaths." (66:1, Dawood)
("হে নবী, যে জিনিস আল্লা নিজেই তোমার জন্যে বৈধ করে দিয়েছেন সে-জিনিসকে তুমি কেন স্ত্রীদের খুশি করার জন্যে অস্বীকার করতে চাও ? ... এধরনের প্রতিশ্রুতি থেকে আল্লাতা'লা তোমাকে পূর্ণ মুক্তি দান করেছেন।")

আমার আর কিছু বলবার নেই। পাঠকের বিচারবুদ্ধি আমার চেয়ে কম নয়।

ড. মীজান রহমান, কানাডার অটোয়ায় বসবাসরত গণিতের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। পঞ্চাশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষকতা করেছেন বেশ ক'বছর। বিশ্লেষনধর্মী প্রবন্ধকার হিসেবেও সুপরিচিত। প্রকাশিত গ্রন্থ সাতটি - তীর্থ আমার গ্রাম (১৯৯৪), লাল নদী (২০০১), অ্যালবাম (২০০২), প্রসঙ্গ নারী (২০০২), অনন্যা আমার দেশ (২০০৪), আনন্দ নিকেতন (২০০৬)। সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ 'দুর্যোগের পূর্বাভাস' (২০০৭)। ইমেইল - mrahman@math.carleton.ca

আমাদের মুল্যবোধ কি ঈশ্বর হতে আগত?

(Do our values come from God?)

মুন্সী কেফায়েতুল্লাহ

(মুল: ভিক্টর জে. ষ্টিঙ্গার)

ন্যায়ের সংজ্ঞা কী (What is Right)ঃ

মানুষ কীভাবে আচার আচরণ করবে তা নির্ধারণের ভার তার নিজের হাতে নেই, সে ভার গ্রহন করেছে সমাজে প্রচলিত ধর্মগুলি, বিশেষ করে খৃষ্টান ধর্ম। ধর্মের মোড়লরা মনে করে যে সমাজের বাকী লোকগুলো কীভাবে চলবে ফিরবে, কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায়- তা বিচার করার অধিকার একমাত্র তাদের, কারণ তাদের মতে ন্যায়বোধের উৎপত্তিস্থল হলো ঈশ্বরের মন (Mind of God)। সেই স্বগীয় কেন্দ্রের সাথে কমিউনিকেট করার জন্যে একমাত্র তাদেরই রয়েছে ডাইরেক্ট পাইপলাইন। সমাজের অনেক সেকুলার বিজ্ঞানীকেও বিনা প্রতিবাদে এই দাবী মেনে নিতে দেখা যায়। ষ্টেম সেল রিসার্চ কিংবা মরণাপন্ন রোগীর উপর হতে লাইফ সাপোর্ট যন্ত্রপাতি প্রত্যাহার সংক্রান্ত নৈতিক ইস্যুগুলি যখনই রাজনীতির অঙ্গনকে গরম করে তুলে, তখন ধর্মযাজকদের ডেকে আনা হয় তাদের জ্ঞানগর্ভ মতামত শোনার জন্যে। অথচ এসব ক্ষেত্রে কখনই কোন নিরীশ্বরবাদী, মুক্তমনা কিংবা মানবতাবাদীর মতামত নেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। বরং সুযোগ পেলেই তাদেরকে তুলোধুনা করা হয়ে থাকে।

নৈতিকতা সম্পর্কে ধর্মের কাছে সমাজের এই নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের গোড়ায় রয়েছে একটি যুগসঞ্চিত ধারণা- মানুষ মনে করে যে 'পরম মঙ্গল' (absolute good) এই মাটির পৃথিবীর বিষয় নয়, এর অরিজিন হচ্ছে স্বর্গ। অথচ পরম মঙ্গল জিনিষটির স্বরুপ বুঝতে পারলে তবেই কেবল এর প্রকৃত অরিজিন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। মঙ্গালের সাথে স্বগীয় নির্দেশ গুলিয়ে ফেললে বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়, অনেক ক্ষেত্রেই তা যুক্তিশাস্ত্র বা লজিক লঙ্ঘন করে। প্লেটোর ডায়লগে ইউথিফ্রু নামক এক তরুন ঠিক এরুপ একটি সমস্যায় পড়েছিল। সমস্যাটি ইউথিফ্রুর পিতাকে নিয়ে। নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত পিতাকে স্বহস্তে বধ করতে হবে ইউথিফ্রুকে, এ হচ্ছে ঈশ্বর তথা ধর্মের নির্দেশ। অথচ তার বিবেক বলছে জন্মদাতা পিতাকে সাপোর্ট করতে। স্বগীয় নির্দেশ নাকি বিবেকের তাড়না- কোন পথ বেছে নেবে ইউথিফ্রু? অবশেষে ঈশ্বরের ইচ্ছেকে পুর্ণ করতে পিতাকে হত্যা করবে বলে মনস্থির করল সে, কারণ তাতেই নাকি নিহিত আছে কল্যান। সক্রেটিস তাকে বললেন- দেবতার নির্দেশ পালনের চেয়েও মহত্তর কোন মঙ্গাল (higher good) আছে বলে যদি তোমার বিবেক বলে, সেক্ষেত্রে দেবতার নির্দেশ পালন করতে যাওয়া অন্যায়।

ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের অহরহ এরুপ উভয় সঙ্কটের মুখোমুখী হতে হয়। কাজটি ভাল তাই কাজটি করতে ঈশ্বর আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি ঈশ্বর নির্দেশ দিয়েছেন তাই কাজটি ভাল? (Does God will us to do certain acts because they are good or is an act good because God wills it?)। (যদি এমন হয় যে কাজটি ভাল তাই ঈশ্বর কাজটি করতে তাগিদ দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে ভাল আর ঈশ্বরনির্ভর থাকে না- ঈশ্বর বললেও কাজটি ভাল, না বললেও তাই)।

মনে করুন স্বয়ং ঈশ্বর আপনার সামনে আবির্ভুত হয়ে বললেন- তুমি তোমার একমাত্র পুত্রকে হত্যা করো, তাহলে আমি খুশী হবো (বাইবেল বর্ণিত আব্রাহাম ও ইসহাকের গল্পের অনুরুপ)। আপনি কি করবেন? আব্রাহামের মতো স্বীয় পুত্রকে বলি দিতে নিয়ে যাবেন, নাকি নিজ বিবেকের নির্দেশানুযায়ী আরও মহত্তর মঙ্গালের শরণ নিবেন (অর্থাৎ ঈশ্বরের নির্দেশকে অবজ্ঞা করবেন)?

ধার্মিকেরা যুক্তি দেবেন - যা ভাল নয় ঈশ্বর কখনও তেমন কিছু করতে বলবেন না। এই যুক্তিতে কিন্তু ধার্মিকেরা স্বীকার করে নিলেন যে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তা ঈশ্বর নির্ধারণ করেন না, ভালোত্ব ঈশ্বরনির্ভর নয় (good exists independent of God)। যদি একমাত্র ঈশ্বরই ভালোত্ব নির্ধারণের মালিক হতেন, তাহলে তিনি বলতেই পারেন যে পুত্রকে হত্যা করা তেমন মন্দ কিছু নয়।

ওল্ড টেষ্টামেন্টের ঈশ্বর প্রায়শই তার নামে নৃশংসতা করতে তার অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছেন। বাইবেলে বর্ণিত এরুপ কিছু বাণীর উদ্ধৃতি দেয়া হলো নিম্নে, - সানডে স্কুলের যাজকগণ কখনও এসব বাণী শ্রোতাদের সামনে মুখে আনেন না।
হযরত মুসা (আঃ) এক যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রচুর পরিমান যুদ্ধবন্দী করায়ত্ব করেছেন। ঈশ্বরের নির্দেশানুযায়ী সৈন্যরা ইতিপুর্বেই প্রতিটি পুরুষ বন্দীকে কতল করে ফেলেছে। বাদবাকী বন্দীদের প্রতি ঈশ্বরের নির্দেশ কীরুপ- মুসার মুখ থেকে তা জেনে নিন-

"অতএব এখন শিশুবন্দীদের মধ্য থেকে প্রতিটি ছেলে শিশুকে মেরে ফেল। মেয়েদের মধ্যে যারা ইতিমধ্যেই কোন পুরুষের শয্যাসংগিনী হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে হত্যা করো। তবে যে সব তরুনী এখনও পুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়নি (কুমারি), তাদেরকে তোমাদের (ব্যবহারের) জন্যে জীবিত রাখ"। (নাম্বারস- ৩১: ১৭-১৮ আরএসভি)।

আরেকবার হযরত মুসা (আঃ) করুনাময় ঈশ্বরের নির্দেশানুযায়ী হাজার তিনেক আদমসন্তানকে হত্যা করেন।

এবং তিনি তাদেরকে বললেন- "ঈসরাইলের প্রভু ঈশ্বরের এরুপ ইচ্ছা-'প্রতিটি লোককে তার পার্শ্ব দিয়ে কেটে ফেল, এবং ক্যাম্পের দরজায় দরজায় হানা দিয়ে প্রতিটি লোককে তার সংগীসহ হত্যা করো, প্রতিটি লোককে তার প্রতিবেশীসহ হত্যা করো'"। (এক্সোডাস-৩২-২৭ আরএসভি)।

আমি নিশ্চিত - অধিকাংশ খৃষ্টান পবিত্র গ্রন্থের উপরের বাণীগুলিকে নৈরাজ্যকর ঘটনা বলে উড়িয়ে দেবেন এবং বলবেন যে যীশুখৃষ্টের আগমনের পর উক্ত অবস্থার অবসান হয়েছে। তবে মুশকিল হয়েছে- নিউ টেষ্টামেন্টের অনেক জায়গায় দয়াল যীশু তার পুর্ববর্তী নবীদের নিয়মকানুন সম্পুর্ণ বৈধ হিসেবে বহাল রেখেছেন।

'ভেবো না যে আমি (পুর্ববর্তী) আইনসমুহ কিংবা নবীদের বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলি বাতিল করতে আসিনি, বরং পরিপুর্ণ করতে এসেছি' (ম্যাথিও-৫: ১৭, আরএসভি)।

খৃষ্টানরা তাদের পারিবারিক মুল্যবোধ নিয়ে গর্ব করে থাকে, ভূপৃষ্ঠকে শান্তির বাতাবরণে ঢেকে দেয়াই তাদের মিশন বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। কোন সন্দেহ নেই যে এসব লোকদের অধিকাংশই নিজ নিজ পরিবারের প্রতি অত্যন্ত দায়িত্বশীল এবং যে সমাজে তারা বাস করে সেই সমাজের নিষ্ঠাবান সদস্য। কিন্তু তারা ভুলে যান যে যীশুখৃষ্ট বলে গেছেনঃ

'ভেবো না যে আমি পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করতে এসেছি। আমি পৃথিবীতে শান্তি প্রেরণ করতে আসিনি, বরং তরবারী প্রেরণ করতে এসেছি। কারণ, আমি এসেছি যেন পুত্র তার পিতার বিরুদ্ধাচারণ করে, কন্যা মায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে, এবং পুত্রবধু শ্বাশুরির বিরুদ্ধাচারণ করে, এবং মানুষের শত্রু হয় তার নিজেরই পরিবারভুক্ত সদস্যগণ। যে ব্যাক্তি আমার চেয়ে তার নিজের বাপমাকে বেশী ভালবাসে, সে আমার দলভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত নয়; এবং যে ব্যাক্তি আমার চেয়ে তার নিজের পুত্রকন্যাদেরকে বেশী ভালবাসে সে আমার দলভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত নয়' (ম্যাথিও-১০:৩৪-৩৭ আরএসভি)।

তা'হলে কোত্থেকে এই ধারণার উৎপত্তি হলো যে যীশু ছিলেন 'প্রিন্স অব পিস' - শান্তির রাজকুমার?

এই শান্তির রাজকুমার যে ধর্ম প্রচার করে গেছেন, সেই খৃষ্টধর্মের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা কী দেখি? আমরা দেখতে পাই চার্চ কতৃক অনুমোদিত এবং স্বর্গকতৃক প্রণোদিত একগুচ্ছ মঙ্গল (divinely inspired good)-; প্রকৃতপ্রস্তাবে যা ভায়োলেন্স ও সন্ত্রাস ছাড়া আর কিছুই নয়। এই স্বগীয় অনুপ্রেরণা শুধু যে শাস্ত্রের পাতায় সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, যুগে যুগে তা বিশেষ বিশেষ মনোনীত জনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। পোপ ২য় আর্বান (১০৯৯ খ্রীঃ) ক্রুসেডের সময় মধ্যযুগীয় নাইটদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে কাফের (infidels) হত্যায় কোন পাপ নেই। এই কাফের বলতে শুধু যে পবিত্র ভুমিতে বসবাসরত মুসলমানদের বুঝায় তা নয়, সমস্ত অখৃষ্টান জনগোষ্ঠি এই কাফের শ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত। ক্যাথার ধর্মাবলম্বী একটি সম্প্রদায় দক্ষিন ফ্রান্সে বসবাস করতো। দুই ঈশ্বরে বিশ্বাসী এই ধর্ম মুলতঃ প্রাচীন জরুথ্রুষ্টীয় ধর্মের অনুরুপ। ত্রয়োদশ শতকের আলবিনো ক্রুসেডের মাধ্যমে এই সম্প্রদায়কে সমুলে ধ্বংস করা হয়। ১২০৯ খৃষ্টাব্দে বেজিয়া'র ক্যাথার নগরীর পতন ঘটে এবং বিপুল পরিমানে যুদ্ধবন্দী ক্রুসেডারদের করতলগত হয়। এই বন্দীদের মধ্যে কে বিশ্বাসী আর কে কাফের তা নির্ধারণ করতে সৈন্যরা মহামান্য পোপের উপদেশ চায়। তিনি বিধান দেন- "সব্বাইকে হত্যা করো। কে নিজের লোক ঈশ্বরই তা বেছে নেবেন"। প্রায় হাজার বিশেক বন্দীকে হত্যা করা হয়, অনেকের চোখ উপড়িয়ে ফেলা হয়, অনেকের দেহ ঘোড়ার পায়ে বেঁধে ঘোড়া চালিয়ে দলিতমথিত করা হয়, কাউকে বা টার্গেট প্র্যাক্টিসের শিকার বানানো হয়।

পুর্ববর্ণিত ইউথিফ্রু সঙ্কট সমাধানে যদি আমরা মেনে নিই যে ঈশ্বর যা বলেন তাই মঙ্গলজনক এবং ঈশ্বরের বাণী ধর্মশাস্ত্রগুলিতে এবং অন্যান্য পবিত্র উৎস্যগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে, সেক্ষেত্রে প্রতিটি শত্রু সৈন্য এবং সিভিলিয়ানকে হত্যা করা ইহুদী এবং খৃষ্টান ক্রুসেডারদের নৈতিক দায়িত্ব ছিল, ব্যতিক্রম শুধুমাত্র অক্ষতযোনী কুমারিবৃন্দ। ভোগের জন্যে এসব কুমারিদের বাঁচিয়ে রাখাও ক্রুসেডারদের নৈতিক দায়িত্ব।

ঐশ্বরিক মঙ্গালের পরিধি শুধুমাত্র এটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়! নৈতিক গাইড হিসেবে বাইবেলকে মেনে নিলে ইহুদি-খৃষ্টানদের আরও অনেক অবশ্য-করণীয় কাজ আছে। যেমন- যদি তাদের পরিবারের কোন সদস্য অন্য কোন ধর্ম গ্রহন করার চেষ্টা করে (ইসলামী পরিভাষায় যার নাম মুরতাদ), তাকে মেরে ফেলা অবশ্য করণীয় হয়ে দাড়ায়।

'যদি তোমার ভাই, তোমার মায়ের ছেলে, অথবা তোমার পুত্র, অথবা তোমার কন্যা, অথবা তোমার প্রিয় বন্ধুর স্ত্রী, অথবা তোমার বন্ধু যে তোমার নিজ প্রাণের মতোই প্রিয়, যদি তোমাকে এই বলে মন্ত্রণা দেয় যে- চলো আমরা অন্য দেবতার পুজো করি, যে দেবতাকে তুমি কিংবা তোমার পিতৃপুরুষরা কেউ জানে না, কিছু দেবতা যাদেরকে তোমার পার্শ্ববর্তী জাতিসমুহ পুজো করে, তোমার নিকটবর্তী কিংবা দুরবর্তী, পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত,- তুমি কিছুতেই তার অনুগত হবে না এবং তার কথা শুনবে না, তোমার চোখে তার জন্যে কোন দয়ামায়া থাকবে না, তুমি তাকে ছেড়ে দেবে না, তুমি তাকে লুকিয়ে রাখবে না-, কিন্তু তুমি অবশ্যই তাকে হত্যা করবে, তাকে হত্যা করতে তোমার হাতই সর্বাগ্রে প্রসারিত হবে, অতঃপর প্রসারিত হবে আর সকলের হাত। তুমি অবশ্যই তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে, কারণ সে তোমাকে তোমার প্রভু ঈশ্বরের কাছ থেকে দুরে সরিয়ে নিতে চেয়েছিল, যিনি তোমাদেরকে মিশরভুমি হতে বের করে এনেছিলেন, তোমাদেরকে দাসত্বের বন্ধন হতে মুক্ত করেছিলেন'। (ডিউটরনমি ১৩:৬-১১ আরএসভি)।

এবং তারা সপ্তাহের শেষ দিনে (সাবাথ ডে, আরবী-ইয়াওমুছ্ ছাবত) কর্মরত যে কোন লোককে হত্যা করতে নৈতিকভাবে বাধ্য।

‘সপ্তাহের ছয় দিন কাজের জন্যে বরাদ্দ রাখবে, কিন্তু সপ্তম দিনটি হবে সাবাথ ডে –সম্পুর্ণ বিশ্রামের দিন। সমস্ত পবিত্রতা শুধুমাত্র প্রভুর জন্যে, সপ্তম দিনে যদি কাউকে কাজ করতে দেখা যায় তবে তাকে অতি অবশ্য হত্যা করে ফেলতে হবে’ (এক্সোডাস–৩১:১৫ আরএসভি)।

কী মারাত্মক, একবার ভাবুন তো পাঠক! আমেরিকায় রবিবারদিন যে সব সুপার মার্কেট ও গ্যাস ষ্টেশন খোলা থাকে, ধর্মপ্রাণ খৃষ্টানরা প্রভুর নির্দেশ পালন করতে স্বয়ংক্রিয় মারনাস্ত্র দিয়ে সেখানে কর্মরত সব লোককে মেরে ফেলল! এমন স্বর্গীয় মঙ্গালের (ডিভাইন গুড) কথা ভাবা যায়!
কোন কোন ধর্মতত্ত্ববিদ যুক্তি দেখান, ঈশ্বরের এই সব ভয়ঙ্কর কার্য্যকলাপের পেছনে সুগুপ্ত রহস্যময় কারণ আছে যা আমাদের মতো নশ্বর জীবের প্রক্ষে হৃদয়ঙ্গাম করা অসম্ভব। এখন প্রশ্ন– আমাদের বিবেক সায় না দিলেও কি তা’হলে ঐসব ঐশ্বরিক নির্দেশ পালন করতেই হবে? যদি স্বয়ং ঈশ্বরও স্বর্গ হতে আমার সামনে হাজির হন এবং আমার ছেলেকে হত্যা না করলে আমি অভিশপ্ত হবো বলে ভয় দেখান, তবু আমি সে জঘন্য কাজ করবো না। পৃথিবীর অধিকাংশ বাপমা’ই আমার মতো আচরণ করবেন বলে আমার বিশ্বাস।

সঙ্গাতভাবেই অধিকাংশ ইহুদি এবং খৃষ্টান এসব ঐশ্বরিক নির্দেশকে জাষ্ট কাগুজে বিষয় বলে পাশ কাটিয়ে যান। এতে করে তারা কিন্তু ইউথিফ্রু সঙ্কটের গ্যাঁড়াকলে ফেসে যাচ্ছেন। ঈশ্বরের নির্দেশকে যদি ভালো বলে মেনে নেয়া না যায়, তবে ভালোর সংজ্ঞা কী?

বাইবেলের মতো কোরাণও কম রক্তপিপাসু নয়। অবিশ্বাসী বা কাফেরদের ভাগ্যে কী ভয়ঙ্কর পরিনতি অপেক্ষা করে আছে সে সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত রয়েছে কোরাণে। তবে শাস্তির ভার আল্লাহ–তায়ালা সাধারণতঃ নিজের হাতে রিজার্ভ রেখেছেন, বান্দার হাতে সোপর্দ করেননি।

‘নিশ্চয়ই, যারা আমার নির্দেশসমুহের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই আমি অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করবো; যখন তাদের চর্ম দগ্ধ হবে, তৎপরিবর্তে আমি তাদের চর্ম পরিবর্তিত করে দেবো যেন তারা শাস্তির আস্বাদ গ্রহন করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়’। (কোরাণ–৪:৫৬, অনুবাদ–প্রফেসর ডঃ মুজিবুর রহমান)।

যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাদেরকে কঠোরভাবে মোকাবিলা করতে হবে, অবশ্য অনুতাপের একটা সুযোগ রয়েছে ইসলামে।

‘যারা আল্লাহর সাথে ও তাঁর রাসুলের সাথে যুদ্ধ করে, আর ভুপৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শুলে চড়ানো হবে, অথবা এক দিকের হাত ও অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে অথবা দেশ হতে তাড়িয়ে দেয়া হবে; এটা তো ইহলোকে তাদের জন্যে ভীষণ অপমান, আর পরকালেও তাদের জন্যে রয়েছে ভীষণ শাস্তি। কিন্তু হ্যা, তোমরা তাদেরকে গ্রেফতার করার আগে যারা তওবা করে নেয়, তবে জেনে রাখ যে আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু’। (কোরাণ–৫:৩৩–৩৪, অনুবাদ–প্রফেসর ডঃ মুজিবুর রহমান)।

একথা সত্য, প্রতিটি ধর্মেই কিছুসংখ্যক ধর্মোন্মাদ ব্যক্তি রয়েছে যারা ধর্মগ্রন্থগুলিতে বর্ণিত প্রতিটি নির্দেশকে ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসেবে মান্য করে থাকে এবং অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করার চেষ্টা করে।

- ১৯৯৫ সালে ইগাল আমির নামক এক ব্যক্তি ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী আইজাক রবিনকে হত্যা করে। সে ছিল খুবই ধর্মপ্রাণ ইহুদি, কোর্টে দাড়িয়ে সে বলেছিল– “আমি যা কিছু করেছি, ঈশ্বরের জন্যে করেছি”।

- ফ্লোরিডা রাজ্যে গর্ভপাত বৈধ করার কারিগর ডঃ জন ব্রিটন ১৯৯৪ সালে পল হিলের হাতে নিহত হন। ২০০৩ সালে যখন হিলের প্রাণদন্ডাদেশ কর্য্যকর করা হয় তার আগ মুহূর্তে হিলের উক্তি– "আমি খুব সম্মানিত বোধ করছি যে তারা সম্ভবতঃ আমার কাজের জন্যে আমাকে মেরে ফেলতে যাচ্ছে। আমার বিশ্বাসে আমি খুবই সৎ, আমার আনুগত্যের জন্যে স্বর্গে অবশ্যই আমার জন্যে বিরাট পুরস্কার রয়েছে"।
- ১৯৯৮ সালে ফেব্রুয়ারীর ২৩ তারিখ ওসামা বিন লাদেন ঘোষণা করে– "আমরা– আল্লাহর ওয়াস্তে প্রতিটি মুসলমানকে আহ্বান জানাই– যে আল্লাহতে বিশ্বাস করে এবং তার নির্দেশ পালন করে পুরস্কৃত হওয়ার ইচ্ছে পোষণ করে– সে যেন আমেরিকানদের হত্যা করে এবং যখন যেখানে সুযোগ পায় আমেরিকান সম্পদ লুন্ঠন করে"।
- (বছর কয়েক আগে কিশোরগঞ্জের এক গ্রামে একটি ঘটনা দারুন আলোড়ন তুলেছিল। জনৈক মৌলানা সাহেব ঈদের নামাজ শেষে স্বহস্তে নিজ শিশু সন্তানকে কোরবানি দেন। পুলিশের জেরার জবাবে তিনি বলেছিলেন– হযরত ইবরাহিমের মতো তিনিও নাকি স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছিলেন এবং নামাজ শেষ করে ঘরে ফিরে আল্লাহু আকবর বলে স্বহস্তে ঘুমন্ত শিশুর গলায় ছুরি চালান। মারহাবা, মারহাবা। সংবাদটি তখন সবগুলি সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। তবে পরিতাপের বিষয় এই যে মৌলানা সাবের এত বড় ত্যাগ না আল্লাহপাকের দরবারে না সমাজের অঙ্গানে তেমন স্বীকৃতি পেয়েছিল। হুজুর চোখ খুলে দেখতে পান– স্বগীয় দুম্বা নিয়ে কোন ফেরেশতা স্বর্গ হতে নেমে আসেনি এবং তার ছেলের গলাটি সত্যি সত্যি দু'ফাক হয়ে গেছে ! বেরসিক ডাক্তাররা তাকে পায়গম্বরের সমগোত্রীয় বলে স্বীকার না করে সিজোফ্রেনিয়ার রোগী বলে শনাক্ত করেছিল। এক যাত্রায় পৃথক ফল, বড়োই আফশোষ)।

সৌভাগ্যের বিষয়, সম্প্রদায়গুলোতে এরূপ ধর্মোন্মাদের সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র। এর কারণ হয়তো এই যে ধর্মশাস্ত্রের ঠিক কোন জায়গাটিতে এসব ভয়ঙ্কর কর্মকান্ডের কথা লেখা আছে তা খুজে বের করা এবং তার মর্মোদ্ধার করা সাধারণের জন্যে ভীষণ কষ্টকর বৈকি।

কোনটা মঙ্গল– একজন ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তি কীভাবে তা নির্ধারণ করবেন তা'হলে? এমন দাবী নিশ্চয়ই কেউ করবেন না যে – কাজটি যে ভালো তা তারা স্বয়ং ঈশ্বরের মুখ থেকে শুনেছেন। তারা বড়জোর একথা বলতে পারেন – কোন রাব্বি, কোন পাদ্রী কিংবা কোন ইমাম বলেছে কথাগুলো। ঈশ্বরের এসব কাউন্সিলরবৃন্দ সাধারনতঃ ধর্মশাস্ত্র ঘেটে কিংবা নিজ ধর্মের মহাপুরুষ বা বিখ্যাত ব্যক্তিদের শিক্ষার উপর নির্ভর করে ভালোমন্দের বিধান দিয়ে থাকেন। তবে সব সময় শুধু শাস্ত্রের উপর নির্ভর করলে চলে না, বিশেষ বিশেষ সময়ে আশু করণীয় সম্পর্কে বিধান দিতে নিজের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা বা 'ইনার লাইটে'র শরণও নিতে হয় এসব হলি পুরুষদের। পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাব – এই ইনার লাইট ঈশ্বর হতে আগত এরূপ দাবী সম্পুর্ণ ভুল।

মহৎ আদর্শ (Noble Ideals)

একথা অনস্বীকার্য্য যে জুডিও–খৃষ্টান এবং ইসলাম ধর্মশাস্ত্রগুলিতে এমন বহু বিষয় রয়েছে যা মানব সমাজকে মহৎ আদর্শ শিক্ষা দেয়, অনেক সমাজ সেগুলিকে বিধিবদ্ধ আইন হিসেবে গ্রহন করেছে। তবে দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এসব মহৎ আদর্শগুলি অন্যান্য সমাজেও সমানভাবে বিদ্যমান থাকায় প্রমান হয় যে সভ্যতা সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারায় বহু যুগের চর্চা হিসেবে এসব নীতিসমুহ ক্রমান্বয়ে সমাজদেহে জন্মলাভ করেছে, কোন ঐশ্বরিক ধর্ম স্বর্গ হতে সেগুলিকে আনয়ন করেনি। সমাজে প্রচলিত এসব মহৎ আদর্শের উপর কোন বিশেষ ব্রান্ডের ঈশ্বরেরই কেবল একচেটিয়া দাবী রয়েছে– এমত মনে করার কোন কারণ নেই।

যে প্রাইমারী নিয়মটিকে অনুসরণ করে একজন লোক মোটামোটি নৈতিক ভাবে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে সেটি হচ্ছে "গোল্ডেন রুল"ঃ

"Do unto them as you would have them do unto you"-- অর্থাৎ "অপরের প্রতি সেই আচরণটিই করো যা তুমি নিজের প্রতি করতে পারতে। উল্টোভাবে বলা যায়- তুমি তোমার নিজের প্রতি যা পছন্দ করো না, অপরের প্রতি তা করতে যেয়ো না ।
(অত্যন্ত শাদামাটা একটি বক্তব্য, কিন্তু ব্যঞ্জনা কতোই না গভীর। আমি যেহেতু নিজে কারও দাস হতে পছন্দ করবো না, সুতরাং আমি কারও প্রভু হবো না; আমি যেহেতু নিজের স্ত্রীর সাথে অন্যের ব্যভিচার সহ্য করবো না, সুতরাং আমি অন্যের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করবো না; আমি যেহেতু চাইবো না যে কেউ আমাকে খুন করুক, সুতরাং আমি অন্যকে খুন করবো না.. ইত্যাদি ইত্যাদি।)

পশ্চিমের খৃষ্টান অধ্যুষিত সমাজে অধিকাংশ লোকের ধারণা- এটি যীশুখৃষ্টের শিক্ষা, মাউন্টের ভাষণের দিন যীশু এই বাণী বিলিয়েছিলেন। ধর্মপ্রচারকেরা ভালোভাবেই জানেন যে ধারণাটি সঠিক নয়, তবুও তারা বিশেষ কোন কারণে এই মিথ্যা ধারণা জিইয়ে রাখতে চান। স্বয়ং যীশু কখনও এরুপ দাবী করেননি। তিনি সেদিন যা বলেছিলেন, সুসমাচারের বর্ণনা অনুযায়ী তা নিম্নরূপ-!
"So, whatever you wish that men would do to you, do so to them; for this is the law of the prophets". (Mathew 7:12)।
"সুতরাং, লোকেরা তোমার প্রতি যেরুপ আচরণ করবে বলে তুমি প্রত্যাশা করো তাদের প্রতি তুমিও সেরুপ আচরণ করবে; কারণ এমনটিই নবীদের আইন"(ম্যাথিও ৭:১২)।
লেভিটিকাসে (১৯:১৮) বর্ণিত সেই বিখ্যাত উক্তি- "তোমার প্রতিবেশীকে ঠিক নিজের মতোই ভালবাসবে"- প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টজন্মের হাজার বছর আগেকার রচনা !

এর চেয়েও বড়ো কথা - গোল্ডেন রুল নিয়ে জুডিও-খৃষ্টানদের মাতামাতি অর্থহীন, কারণ এটি ছোট্ট কোন মরুচারী সম্প্রদায়ের একক সম্পত্তি নয়। নীচের রেফারেন্সগুলি পরখ করে দেখুন-

- দ্য ডকট্রিন অব দ্য মীন ১৩ (The Doctrine of the Mean 13)। যীশুর জন্মের ৫০০ বছর পুর্বে কনফুসিয়াস বলে গেছেন- "অন্যের কাছ থেকে যে আচরণ তুমি প্রত্যাশা করো না, অন্যের প্রতি সে আচরণ তুমি নিজে করো না"। (What you do not want others to do to you, do not do to others)।
- ইসোক্র্যাট্স্ (৩৭৫ খৃঃপুঃ)- "অন্যের যে কাজে তোমার মধ্যে ক্রোধের উদ্রেক করে, অন্যের প্রতি তুমি সেরুপ কাজ কখনও করো না"।
- মহাভারতের শিক্ষা (১৫০ খৃঃপুঃ)- "সকল ন্যায়পরণতার নির্য্যাস হচ্ছেঃ অন্যের প্রতি সেই আচরণ করো যে আচরণ তুমি অন্যের কাছ থেকে প্রত্যাশা করো।

মাউন্টের ভাষণের দিন শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে যীশু বলেছিলেন-
'Do not resist one who is evil. But if any one strikes you on the right cheek, turn to him the other also'- 'মন্দলোকের সাথে প্রতিরোধের পথে যেয়ো না। বরং কেউ যদি তোমার ডান চিবুকে আঘাত করে, অপর চিবুকটিও বাড়িয়ে দিও' (ম্যাথিও ৫:৩৯ আরএসভি)।

যীশু আরও বলে গেছেন-
'তোমরা শুনেছ- বলা হয়ে থাকে যে "তোমরা প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে এবং শত্রুকে ঘৃণা করবে"। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি- শত্রুকে ভালোবাসবে, যে তোমাকে যন্ত্রনা দেয় তার জন্যে প্রার্থনা করবে' (ম্যাথিও ৫:৪৩-৪৪, আরএসভি)।

উপরের নীতিবাক্যগুলি কেবলমাত্র খৃষ্টানদের একচেটিয়া বলে মনে করা হয়ে থাকে। তবে অনুরূপ সেন্টিমেন্ট অন্যান্য অখৃষ্টান সমাজেও প্রচলিত আছে- এই হয়েছে মুশকিল।

- যারা মঙ্গলাচরণ করে তাদের সাথে আমি মিশি, যারা মঙ্গলাচরণ করে না তাদের সাথেও আমি মিশি। এভাবেই মঙ্গল অর্জিত হয়। যারা সৎ তাদের সাথে আমি সদাচারণ করি, যারা অসৎ তাদের সাথেও আমি সদাচারণ করি। এভাবেই সততা অর্জিত হয়।
  ---তাও ধর্ম। তাও চে চিং ৪৯।
- ক্রোধকে ভালোবাসা দিয়ে জয় করো। অমঙ্গলকে মঙ্গল দিয়ে জয় করো। ....মিথ্যাকে সত্য দিয়ে জয় করো।
  ---বৌদ্ধ ধর্ম। ধর্মপদ ২২৩।
- যে মহৎ সে কখনও মন্দ দিয়ে মন্দের মোকাবিলা করে না; এ এমন এক সাধারণ নীতি যা প্রতিটি ব্যক্তির অনুসরণ করা উচিৎ; পুণ্যবানের গহনা হচ্ছে তার আচরণ। একজন ব্যক্তি- হোক সে দুষ্টপ্রকৃতির, কিংবা সদাচারী, কিংবা মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধী- তার ক্ষতি করা কখনই উচিৎ নয়। মহৎ প্রাণের যিনি অধিকারী, তিনি কখনও অকরুণ হতে পারেন না; তিনি এমনকি সেই দুরাচারের প্রতিও করুণা প্রদর্শন করেন- অপরের ক্ষতিতেই যে খুশী. নিষ্ঠুর কাজেই যার আনন্দ। এমন কে আছে যে যার মধ্যে দোষ নেই?
  ---মহাভারত, যুদ্ধ কান্ড ১১৫।

প্রকৃতপক্ষে নিউ টেষ্টামেন্টের কোথাও উল্লেখ্যযোগ্য তেমন কোন নৈতিক ধারণার সন্ধান মেলে না যা মৌলিক। বিশ শতকের গোড়ার দিকে ইতিহাসবিদ এবং পাদ্রী জোসেফ ম্যাকাবেথ যথার্থই বলেছেন: 'এমনসব ভাবাদর্শ যীশুখৃষ্টের উপর আরোপ করা হয় .... যেগুলি পুর্ব হতেই ওল্ড টেষ্টামেন্টে ছিল। যীশুর আবির্ভাবের বহু পুর্ব হতেই এসব নীতি ইহুদি গোত্রগুলিতে প্রচলিত ছিল, পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা -যেমন মিশরীয়, ব্যবিলনীয়, পারসিক, গ্রীক, হিন্দু ইত্যাদি সভ্যতায়ও এসব ভাবাদর্শ প্রচলিত ছিল'।

বাইবেলের মতো কোরাণেও অনেক নীতিকথা রয়েছে যা প্রশংসাযোগ্য। এসবের মধ্যে রয়েছে পিতামাতার প্রতি সদয় আচরণ করা, অসহায় পিতৃমাতৃহীনের সম্পত্তি আত্মসাৎ না করা, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ না খাওয়া, দরিদ্রকে সাহায্য করা, নেহায়েত প্রয়োজন ব্যতিরেকে শিশু হত্যা না করা ইত্যাদি। এগুলি অবশ্যই নৈতিক কাজ, তবে আবারও বলতে হয় এর একটাও ইসলামের মৌলিক অবদান নয়। পৃথিবীর প্রধান প্রধান একেশ্বরবাদী ধর্মগুলির শাস্ত্রবাক্য ও অনুশাসনে আমরা কমন কিছু আদর্শ দেখতে পাই যা যুগে যুগে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এসব আদর্শ ও মুল্যবোধ সমাজবিবর্তনের সাথে সাথে জন্মলাভ করেছে। মানুষ যতোই সভ্য হয়েছে, তার মাঝে র‍্যাশনাল চিন্তাশক্তির উন্মেষ ঘটেছে এবং কী করে আরও ভালোভাবে শৃঙ্খলার সাথে সামষ্টিক জীবন যাপন করা যায় তার উপায় হিসেবে এসব মুল্যবোধ সমাজজীবনে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ধর্মশাস্ত্রগুলিতে যেমন দাবী করা হয় যে মুল্যবোধ তথা আদর্শ স্বর্গ হতে নাজেল হয়েছে- স্বাক্ষ্যপ্রমানে তার সত্যতা মেলে না। স্বাক্ষ্যপ্রমান বরং স্বর্গের বাইরের কোন সোর্সকেই নির্দেশ করে।

নৈতিক আচরণ (Obsrving Moral Behavior)

মরালিটি বা নৈতিকতার উপর আলোচনা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন বিবেচনা করা হয়েছে এমনটি খুব কমই দেখা যায়। মানুষের আচরণ- তা সে ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে হোক কিংবা সামাজিক পর্য্যায়ে হোক- পর্য্যবেক্ষন করলে অনেকগুলি গুরুত্বপুর্ণ উপাত্ত সামনে চলে আসে। নৈতিকতা ও মুল্যবোধের উপর বৈজ্ঞানিক ষ্টাডি পরিচালনা করতে গেলে পর্য্যবেক্ষনজাত এসব উপাত্তসমুহকে ভিত্তি হিসেবে গননা করতে হবে। আমরা এখন মানব প্রজাতির এমন কিছু আচরণ নিয়ে আলোচনা করবো প্রতিনিয়তই যা আমরা আমাদের চারপাশে দেখতে পাই।

মানবজাতির অধিকাংশ সদস্যের মধ্যেই সাধারণ কিছু নৈতিক আচরণ প্রতক্ষ করা যায়, ব্যক্তিভেদে এর পরিমান কিছু কমবেশী হয়ে থাকে। যদিও আমরা বিধিবদ্ধ আইন শাসিত সমাজে বাস করি, তথাপি আমাদের অধিকাংশ আচরণই স্বতঃস্ফূর্ত, আইনের প্রতি চোখ রেখেই আমরা এমন আচরণ করি তা কিন্তু নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- দৈনন্দিন জীবনে আমরা অহরহই এমন অবস্থার সন্মুখীন হই যেখানে আমরা অতি সহজেই কাউকে প্রতারিত করতে পারি কিংবা কারও জিনিস চুরি করতে পারি। ধরা পড়ে শাস্তিভোগ করার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা না থাকলেও আমরা তা করি না। দৈনন্দিন জীবনে আমরা গোল্ডেন রুল অক্ষরে অক্ষরে পালন করি না, তবুও কারও ক্ষতি হোক এমন কাজ সাধারনতঃ আমরা করি না। যদি আমরা দেখি যে একজন মানুষ কিংবা একটি ইতর প্রাণী কষ্ট পাচ্ছে, আমরা কষ্ট অনুভব করি, অনেক সময় তার কষ্ট লাঘব করার সাধ্যমতো চেষ্টাও করে থাকি। রাস্তায় দুর্ঘটনা দেখলে আমরা গাড়ি থামাই, দুর্ঘটনাকবলিতদের সাহায্যে এগিয়ে যাই। কোন ক্রাইম ঘটতে দেখলে আমরা পুলিশকে খবর দিতে ছুটি। আমরা শিশুদের স্নেহ করি, বয়স্ক পিতামাতার যত্ন নেই, দুর্ভাগাদের প্রতি সহমর্মিতা পোষণ করি। আমরা স্বতঃপ্রনোদিতভাবে অনেক ঝুকিপুর্ণ কাজে আত্মনিয়োগ করি, দেশ ও কমুনিটির সুরক্ষার জন্যে সৈনিক হই, পুলিশ হই।

ধর্মীয় অনুশাসনের নির্দেশের জন্যেই আমরা এমন নৈতিক আচরণ করি বলে কেউ কেউ যুক্তি দিতে পারেন। **কিন্তু যারা প্রচলিত কোন ধর্মই পালন করেন না, তারা যে সম্পুর্ণ বিপরীত আচরণ করে থাকেন তারও তো কোন প্রমান নেই**। তারাও তো সেই একই ধরণের মরাল প্রিন্সিপল দ্বারা তাড়িত হয়ে একইরূপ আচরণ করে থাকেন! অর্থাৎ সমাজের অধিকাংশ লোক একসেট কমন মরাল প্রিন্সিপল বা সাধারণ নীতি দ্বারা পরিচালিত হন যা ধর্মনির্ভর নয়।
একথা সত্য -এই 'কমন সেট অব মরাল প্রিন্সিপল' বলতে সবগুলি মরাল প্রিন্সিপলকে বুঝায় না। কোন একটি নৈতিক ইস্যুতে সকলেই যে একই মত পোষণ করবেন তাও নয়। একই ধর্মীয় গোষ্ঠির সদস্যরাও কোন বিষয়ে প্রচন্ডভাবে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন জন একই শাস্ত্রীয় নির্দেশের বিভিন্নরূপ ব্যখ্যা দিয়ে নিজের নিজের মতকে জাষ্টিফাই করার চেষ্টা করেন।

উদাহরণস্বরূপ খৃষ্টান কমুনিটির কথা বিবেচনা করা যাক। হত্যা-ইস্যুতে বাইবেলের নির্দেশের সম্পুর্ণ বিপরীতধর্মী ব্যখ্যা প্রদান করেন বিভিন্ন গোষ্ঠি। ক্যাথলিক এবং গোড়া খৃষ্টানরা ভ্রুণহত্যা, মরন্নাপন্ন রোগীর উপর হতে লাইফ সাপোর্ট যন্ত্রপাতি প্রত্যাহার, ষ্টেম সেল রিসার্স ইত্যাদি কাজকে ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতি এবং এসব কাজের জন্যে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট প্রদান করার পক্ষপাতি। তাদের যুক্তির স্বপক্ষে তারা বাইবেলে বর্ণিত দাতের বদলে দাত, চোখের বদলে চোখ- এই দৃষ্টান্ত পেশ করেন। পক্ষান্তরে লিবারেল খৃষ্টানরা উপরোক্ত কাজের জন্যে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট প্রদানে রাজী নন, তারা উপরোক্ত কাজগুলিকে নিষিদ্ধ করারও পক্ষপাতি নন।
এ প্রসঙ্গো দার্শনিক থিওডোর শিকের মন্তব্য- ভ্রুণহত্যা বিতর্কের উভয় পক্ষই বিশ্বাস করে যে নরহত্যা অনৈতিক। যে ক্ষেত্রটিতে তাদের মতানৈক্য- তা হচ্ছে মানব-ভ্রুনের প্রকৃতি। মানবভ্রুণকে (fetus) কি একটি স্বয়ংসম্পুর্ণ অস্তিত্ব হিসেবে গন্য করা যায় যা নষ্ট করলে হত্যা করার মতো অনৈতিক কাজ সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করতে হবে? এক কথায় বলা যায়- নৈতিকতা নিয়ে এই মতদ্বৈধতা কোনটা ভাল কোনটা মন্দ সেজন্যে নয়, এই মতদ্বৈধতা রূঢ় বাস্তবতার একটি দিক নিয়ে।
কাকে হত্যা করা যাবে আর কাকে যাবে না- বাইবেলে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। একটি ভ্রুণ বা একগুচ্ছ ষ্টেম সেলকে হত্যা করতে বাইবেল পারমিশনও দেয়নি, নিষেধও করেনি। তবে শত্রুকে হত্যা করতে সে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে, বিশেষ করে যারা ইয়াহুর (Yahweh) পুজো করে না তাদেরকে।

ভালো সমাজ (The Good Society)

ইউরোপ বহুশতাব্দি ধরে স্বেচ্ছাচারী শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়ে এসেছে। শুধু ইউরোপ নয়, পৃথিবীর অন্যান্য ভুখন্ডের অবস্থাও কমবেশী একইরূপ ছিল। এইসব শাসকদের জীবনযাত্রা ছিল চরম অমিতব্যয়ী ও ভোগবিলাসপুর্ণ। পক্ষান্তরে প্রজাদের অবস্থান ছিল দারিদ্রের প্রান্তসীমায়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা ছিল শাসকের স্বেচ্ছাচারের অধীন। শাসকটি যতোই নিষ্ঠুর আর অযোগ্য হোন না কেন, রাজা হওয়ার স্বগীয় অধিকার রয়েছে বলে দাবী করতেন তিনি। ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকলে তিনি কীভাবে রাজসিংসাহনে আসীন থাকতে পারেন? একইভাবে ইসলামী জগতেও স্বেচ্ছাচারী শাসকরা ইসলামের নাম ব্যবহার করে অপ্রতিহত শাসন পরিচালনা করে এসেছে বহু শতাব্দি।

ইসলাম ও খৃষ্টান জগতের ইতিহাস বহুশত বছরব্যপী প্রভুত্ববাদী অপশাসকদের শাসনের ইতিহাস; ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের প্রতি এতটুকু ভ্রুক্ষেপ ছিল না এসব শাসকদের। 'এনলাইটেনমেন্ট' বা নবজাগরণ আন্দোলনের ফলে সমাজে যখন 'রিজন' বা যুক্তির প্রাধান্য শক্তিশালী হয়, তখন থেকে এসব অপশাসকদের ক্ষমতা লোপ পেতে থাকে।

আধুনিক আমেরিকায় একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে খৃষ্টীয় মতাদর্শকে ধারণ করে আমেরিকান জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আমেরিকার সংবিধানের কোথাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায় না। স্বাধীনতার ঘোষণপত্রে (ডিক্লারেশন অব ইন্ডেপেন্ডেন্স) 'সৃষ্টিকর্তা' শব্দটি আছে সত্য, তবে এই সৃষ্টিকর্তা খৃষ্টানদের গড নয়। তিনি টমাস জেফারসনের গড, এনলাইটেনমেন্টের গড। প্রাথমিক কালের প্রেসিডেন্টদের মধ্যে অধিকাংশই খুব একটা ভালো খৃষ্টান ছিলেন না। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং ন্যায়বিচারের প্রতি তাদের অঙ্গীকারের উৎস্য ছিল এনলাইটেনমেন্ট ফিলসফি, বাইবেলের পৌরানিক বাণীসমুহ নয়।
আধুনিক গণতন্ত্র ও বিচারব্যবস্থা যেসব নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত, বাইবেলের কোথাও আপনি সেগুলি খুজে পাবেন না। উদাহরণস্বরূপ, বাইবেল-স্বীকৃত দাসপ্রথা এরূপ একটি বিষয় যা আধুনিক মুক্ত সমাজের সাথে পুরোপুরি সঙ্গাতিবিহীন। ওল্ড টেষ্টামেন্ট শুধু যে দাসপ্রথাকে স্বীকৃতিই দেয় তা নয়, কীভাবে আপনি এই প্রথাকে দৈনন্দিন জীবনে হ্যান্ডল করবেন তার নিয়ম কানুনও পাবেন সেখানে।

'তুমি যখন একজন হিব্রু দাস ক্রয় করবে, সে তোমাকে ছয় বছর সেবা করবে। অতঃপর সপ্তম বর্ষে সে মুক্ত হয়ে যাবে, এর জন্যে তাকে কোন দাম পরিশোধ করতে হবে না' (এক্সোডাস ২১-২)।

'যদি তার প্রভু তার জন্যে একটি স্ত্রী বরাদ্দ করে এবং সে (স্ত্রী) ছেলে অথবা মেয়ে প্রসব করে, তবে সেই স্ত্রী এবং তার সন্তানাদির মালিক হবে প্রভু এবং তাকে (দাসকে) একা একাই চলে যেতে হবে। (এক্সোডাস ২১-৪)।

দাসপ্রথা বিলুপ্তিতে অবদান রাখার অনেক সুযোগ পেয়েছিলেন যীশু। কিন্তু তিনি তা করেননি, বরং স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। দাসপ্রথার স্বীকৃতিসুচক সেইন্ট পলের ভাষ্য:
'দাসেদের প্রতি নির্দেশ, তারা স্ব স্ব প্রভুর অনুগত হোক এবং সর্বপ্রযত্নে তার সন্তুষ্টি বিধান করুক'। (টাইটাস ২:৯)।

উনিশ শতকে যুক্তরাষ্ট্রে যখন দাসপ্রথা উচ্ছেদের আন্দোলন তুঙ্গে, তখন এই কুপ্রথা বহাল রাখার পক্ষে বহুলভাবে বাইবেলের দোহাই দেয়া হয়েছিল। ব্যাপ্টিষ্ট নেতা এবং প্রখ্যাত দাসমালিক রিচার্ড ফারম্যান (মৃ:-১৮২৫) দাসপ্রথার স্বপক্ষে বাইবেলীয় যুক্তিগুলি সন্নিবন্ধ করেন যার ফলশ্রুতিতে আমেরিকার বিখ্যাত গৃহযুদ্ধের সুচনা হয়। ক্যারোলিনা রাজ্যের ব্যাপ্টিষ্ট কনভেনশনের প্রেসিডেন্ট

হিসেবে ফারম্যান দক্ষিন ক্যারোলিনার গভর্নরকে লিখেছিলেন– "দাস রাখার অধিকার পবিত্র গ্রন্থগুলিতে সুস্পষ্টরুপে প্রতিষ্ঠিত, অনুশাসন ও উদাহরণ উভয়ভাবে"। দক্ষিন ক্যারোলিনার গ্রীনভিলে ১৮২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউনিভার্সিটিটির নামকরণ করা হয় রিচার্ড ফারম্যানের নামে– 'ফারম্যান ইউনিভার্সিটি'। উক্ত ইউনিভার্সিটির আর্কাইভে ফারম্যানের লেখা রক্ষিত আছে।

কনফেডারেসির প্রেসিডেন্ট জেফারসন ডেভিস দাবী করেছিলেন – শাস্ত্রনির্দেশের বাইরে তিনি কিছুই করেননি। তিনি বলেছিলেন– "সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ডিক্রিবলে দাসপ্রথা প্রতিষ্ঠিত। উভয় টেষ্টামেন্ট –, জেনেসিস থেকে রিভিলেশন–, সব শাস্ত্রেই দাসপ্রথার স্বীকৃতি রয়েছে"।

মহামান্য পোপসহ ক্যাথলিক চার্চের সকল ধর্মযাজকই দাসদাসী রাখতেন, এমনকি উনিশ শতকেও। মেরিল্যান্ডের জেসুইট পাদ্রীরা, ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার নানেরা দাস রাখতেন। ১৮৮৮ সালের পুর্ব পর্য্যন্ত চার্চ এই অমানবিক প্রথার নিন্দা করে কোন অফিসিয়াল বিবৃতি দেয়নি, প্রতিটি খৃষ্টান রাষ্ট্রে যখন উক্ত প্রথার বিলুপ্তি ঘটে, তার পরেই কেবল উক্ত সালে চার্চের পক্ষ থেকে ঘোষণা আসে। প্রখ্যাত ক্যাথলিক স্কলার জন টি নোনান জুনিয়রের মতে – চার্চ যীশু ও অন্যান্য নবীদের নৈতিক শিক্ষার মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন এনেছে একথা ঠিক নয়। তিনি আরও বলেন– দাসপ্রথা ও অন্যান্য উদাহরণের মাধ্যমে এটা প্রমানিত যে সময়ের সাথে সাথে চার্চের শিক্ষার পরিবর্তন ঘটে।

এখন কথা হলো, যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর অন্যত্র দাসপ্রথা বিলুপ্তির যে ক্যাম্পেইন শুরু হয় তার নেতৃত্বে ছিল খৃষ্টানরা। যেসব খৃষ্টান এই আন্দোলনে অংশগ্রহন করে, তারা নিশ্চয়ই তাদের ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশগুলিকে অনুসরণ করতে যায়নি, বরং অনুসরণ করেছিল অন্তর্নিহিত মহত্তর কোন নির্দেশকে, অনুভব করেছিল এক innate sense of higher good এর প্রেরণা। এতে কি প্রমানিত হয় না মানুষের ভ্যলুজ (মুল্যবোধ) কোন শাস্ত্রীয় ঈশ্বর থেকে উদ্ভুত নয়?

সর্বশেষে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো নারীনির্য্যাতন নিয়ে, ইতিহাসের প্রতি বাকে অন্তহীন নির্য্যাতনের শিকার মানব প্রজাতির এই গুরুত্বপুর্ণ অংশটি। সেইন্ট পল বলে গেছেন:
'বধুগণ, তোমরা স্বামীর প্রতি অনুগত হও, যেভাবে তোমরা পরম প্রভুর আনুগত্য করো। কারণ স্বামী হচ্ছে স্ত্রীর প্রভু, ঠিক যেভাবে যীশু চার্চের প্রভু এবং ত্রাণকর্তা'।

স্ত্রীজাতিকে মানবেতর প্রজাতি হিসেবে বিবেচনা করার মধ্যে যে বিবেকহীনতা ও অন্যায় লুক্কায়িত রয়েছে, তা অবশেষে অনুভব করতে শুরু করেছে পশ্চিমা সমাজ। ন্যায়–অন্যায় সম্পর্কে আমাদের ধারণা যে ধর্মীয় অনুশাসনের পথ ধরে বিবর্তিত হয় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে তা ধর্মীয় অনুশাসনের বিপ্রতীপ পথে বিবর্তিত হয়, এটি তার সাম্প্রতিকতম প্রমান।

ইনার সোর্সঃ
বর্তমানে অধিকাংশ ধর্মতত্ত্ববিদই স্বীকার করেন যে বাইবেল এবং কোরাণের প্রতিটি বাক্যকে অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে এমন নয়। তারা একথাও স্বীকার করে নিয়েছেন যে গ্রন্থগুলিতে অনেক বিষয় রয়েছে যা যুগের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ নয়। তবে তারা বলেন– গ্রন্থগুলিতে অনেক কিছু শেখারও আছে। আমি তাদের কথার দ্বিমত করবো না। এ লেখায় ইচ্ছে করেই আমি বেশ কিছু কুখ্যাত (notorious) আয়াতের উল্লেখ করেছি, তবে আমি নিজে সেগুলো তৈরী করিনি। আরও বহু অনুরুপ আয়াতের সাথে কাগজে কলমে রেকর্ড হয়ে আছে সেগুলি, যে কেউ ইচ্ছে করলেই তা নিজে নিজেই পাঠ করতে পারেন। আমি শুধু এটিই প্রমান করতে চেয়েছি যে সমাজের সবচেয়ে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিটিও কীভাবে শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বাইরে জীবনযাপন করছেন এবং প্ররম প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করছেন।

এটা অবিসংবাদিতভাবে প্রমানিত যে ইহুদি, খৃষ্টান, মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অধিকাংশ লোক শাস্ত্রবিধি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে না ; কোনটি ভাল কোনটি মন্দ তা তারা নিজেদের বিবেক দিয়ে ঠিক করে নেয় এবং তদানুযায়ী কাজ করে থাকে। ঈশ্বরের নির্দেশের নামে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনা করতে আজকাল আর কোন ইহুদি-খৃষ্টানকে দেখা যায় না। মুসলমানদের মধ্যেও খুব কম সংখ্যক লোককেই এই পথ অবলম্বন করতে দেখা যায়। হাতে গোণা গুটিকয়েক চরমপন্থী বাদে সংখ্যাগরিষ্ট ধর্মীয় নেতা এসব জঘন্য কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে বক্তব্য দিচ্ছেন এখন। এসব ধর্মীয় নেতা এবং তাদের অনুসারীরা এক্ষেত্রে শাস্ত্র নির্দেশের পরিবর্তে বরং নিজেদের অন্তর্নিহিত বিবেক-প্রনোদিত নৈতিকতাকেই উর্ধে তুলে ধরেন- অনেক ক্ষেত্রেই যা শাস্ত্রবিধানের সরাসরি পরিপন্থী।

মোদ্দা কথা হলো- কোন্ কাজটি নৈতিক আর কোনটি অনৈতিক ধর্মপ্রাণ লোকেদের অধিকাংশই তা নিজের বিবেক অনুযায়ী ঠিক করে নেয়। অথচ সেই একই কাজ যখন কোন নাস্তিক কিংবা হিউম্যানিষ্ট করে- ধর্মানুরাগীরা তাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করে। তার বিরুদ্ধে 'মরাল রিলেটিভিজম' অথবা 'মরাল সাবজেক্টিভিজম' এর অপবাদ আরোপ করে। বলে- নাস্তিকের আবার নৈতিকতা- 'নাস্তিকশাস্ত্রে সবই বৈধ'। মরাল রিলেটিভিজম হচ্ছে - একটিমাত্র মাপকাঠির উপর নির্ভর করে সব জিনিষের ভালোমন্দ নির্ধারণ না করে বরং প্রতিটি ইনডিভিজুয়াল ঘটনার আলোকে নৈতিকতার সঠিক এবং উপযুক্ত মানদণ্ডটি নির্ধারণ করা। তাই বলে হিউম্যানিষ্টরা খেয়ালখুশীমতো নৈতিকতার সংজ্ঞা পরিবর্তন করে তা কিন্তু নয়; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন হিউম্যানিষ্ট ও একজন ধর্মবিশ্বাসীর নৈতিক আচরণে কোন মৌলিক প্রভেদ দেখা যায় না। সাবজেক্টিভিজমের অর্থ হচ্ছে- প্রতিটি ব্যক্তির জন্যে এক সেট করে মরাল গাইডেন্স। বিশ্বাসীরা যেমন সাবজেক্টিভিজম অনুসরণ করে না, হিউম্যানিষ্টরাও তাই। ভালোমন্দের স্বরূপ নির্ণায়ক মৌলিক ধারণা প্রায় সব সমাজেই এক । নৃতত্ত্ববিদ সলোমন এ্যাশ যথার্থই বলেছেন- "মানব সমাজে কখনও রিলেটিভিজমের চর্চা হয়েছে- এর স্বপক্ষে কোন নৃতাত্ত্বিক প্রমান নেই । আমরা এমন কোন সমাজের কথা জানি না যেখানে সাহসিকতাকে ঘৃনা করা হয় এবং কাপুরুষতাকে সম্মানের চোখে দেখা হয়, যেখানে উদারতা পাপ বলে গন্য হয় এবং অকৃতজ্ঞতা পুন্য বলে গন্য হয়"। আজকালকার যুগে কেউ কি কল্পনা করতে পারে যে যুদ্ধে আটককৃত বন্দীদের মধ্য হতে কুমারীদের বাছাই করে নিজেদের লালসা পরিতৃপ্তির জন্যে রেখে দিয়ে বাদবাকী সব্বাইকে পাইকারীভাবে হত্যা করে ফেলা নৈতিক কাজ?

বাইবেলোক্ত ঈশ্বর এবং তার প্রধান প্রধান প্রেরিত পুরুষেরা যেসব নৃশংসতা প্রদর্শন করে গেছেন, বর্তমান যুগের অধিকাংশ ধর্মবিশ্বাসী সেগুলিকে শুধু যে প্রত্যাখ্যানই করে তা নয়, সেই সংগে অনেক নির্দোষ নির্দেশকেও অস্বীকার করে তারা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- যীশু খৃষ্টানদেরকে নির্জনে প্রার্থনা করতে অনুপ্রানিত করে গেছেন, কিন্তু কয়জন খৃষ্টান যীশুর সেই নির্দেশটি পালন করে থাকে- "এবং তোমরা যখন প্রার্থনা করবে, অবশ্যই মোনাফেকদের মতো করবে না। কারণ তারা সিনাগগ ও রাস্তার মোড়ে দাড়িয়ে (প্রকাশ্যে) প্রার্থনা করতে ভালবাসে, এমনভাবে যেন লোকেরা দেখতে পায়। বিশ্বাস করো, আমি তোমাদের বলছি- তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। কিন্তু তোমরা যখন প্রার্থনা করবে, ঘরের ভেতর যাও, দরজা বন্ধ করো এবং সেই পিতার কাছে প্রার্থনা করো যিনি গুপ্ত। এবং তোমাদের পিতা- যিনি গোপন জিনিসও দেখতে পান- অবশ্যই তোমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন" (ম্যাথিও-৬ঃ৫-৬, আরএসভি)।

যীশুর এই সুস্পষ্ট নির্দেশকে অমান্য করে খৃষ্টানরা সর্বত্রই বিরাট বিরাট পাবলিক শো'র মাধ্যমে এমনভাবে প্রার্থনা করে থাকে যেন তাদের ধর্মশীলতা জনসমক্ষে দৃশ্যমান হয়ে উঠে। সুপরিসর চার্চ, রাজনৈতিক সমাবেশ কিংবা স্কুলের ফ্ল্যাগের নীচে দাড়িয়ে সমবেতভাবে প্রার্থনাবাক্য আওড়ায় তারা। দেশের আদালত প্রকাশ্য প্রার্থনা-সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা দিলে আদালতের উপরও খেঁপে যায়

তারা। তাদের এই আচরণ স্পষ্টতই যীশুর নির্দেশের পরিপন্থী, সুতরাং ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে অবশ্যই নৈতিকতা বিরোধী। এই আচরণকে কীভাবে জাষ্টিফাই করবে ধর্মবিশ্বাসীরা? এই কাজের জাষ্টিফিকেশনের জন্যে অবশেষে বিবেক-তাড়িত নৈতিকতারই শরণ নিতে হবে তাদের, বলতে হবে- যীশু যাই বলুন, খোলা জায়গায় প্রার্থনা করার মধ্যে তেমন খারাপ কিছু নেই !

এবং কয়জন খৃষ্টান (তা তারা যে দলেই থাকুক না কেন) আছে যারা প্রভুর সেই মহান নির্দেশ- "লাভ ইউর এনিমি"- অনুসরণ করে হিটলার কিংবা ওসামা বিন লাদেনকে ভালবাসতে যাবে? আর যাবেই বা কেন?

মোট কথা হলো, অভিজ্ঞতালব্দ ঘটনাবলী প্রমান করে যে মানুষ এক ধরণের নৈতিক জীব ছাড়া আর কিছুই নয়; তাদের ভালোমন্দ সংক্রান্ত নৈতিক বোধ অনেক ক্ষেত্রেই মহান একেশ্বরবাদী ধর্মসমুহের নৈতিক শিক্ষার পরিপন্থী। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই এই সিদ্ধান্ত টানা যায় যে মানবমনে বিরাজমান নৈতিকতা-বোধের শিকড়টির মূল ধর্মের মধ্যে প্রোথিত নয়, এর উৎপত্তিস্থল অন্য কোথাও।

অভিজ্ঞতালব্দ নৈতিকতা (Empirical Morality)

যদি ধরে নেওয়া হয় যে কোন ঐশ্বরিক নির্দেশের ফলশ্রুতিতে মানুষের মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের জন্ম হয়নি, তাহলে প্রশ্ন- কোথা থেকে জন্ম নিল এই গুন? প্রকৃতপক্ষে মূল্যবোধের অরিজিন যে ঐশ্বরিক নয়- একান্তভাবেই প্রাকৃতিক (বায়োলজিক্যাল অরিজিন, কালচারাল অরিজিন এবং ইভোলিউশনারি অরিজিন), যথেষ্ট প্রমান রয়েছে তার। ডারউইন প্রজাতিসমুহে সহযোগীতা ও পরার্থবাদীতার উপকারীতা দেখতে পেয়েছিলেন। আধুনিক চিন্তাবিদগণ আরও নিবিড়ভাবে এই পর্য্যবেক্ষনের উপর কাজ করেছেন এবং দেখিয়েছেন- কীভাবে সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের পথ বেয়ে নৈতিকতাবোধ ক্রমান্বয়ে আমাদের মাঝে ধাপে ধাপে জন্মলাভ করেছে।
এমনকি নিম্নশ্রেণীর জীবের মধ্যেও কিছু কিছু নৈতিক আচরণ বা এর চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। ভ্যাম্পায়ার বাদুরেরা নিজেদের মধ্যে খাবার ভাগাভাগি করে খায়। বানরেরা দলবদ্ধভাবে খাদ্যান্বেষণ করে; দলের মধ্যে কোন বানর উত্তেজিত হয়ে পড়লে অন্য সদস্যরা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে। ডলফিনদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে অন্য ডলফিনরা তাকে উচু করে তুলে ধরে যেন রোগাক্রান্ত সাথীটি সহজে শ্বাস টানতে পারে। তিমিদের মধ্যে কেউ আহত হলে অন্যান্য সদস্যরা নিজেদের সমুহ ক্ষতির রিস্ক নিয়েও আহত সংগীর সাহায্যে এগিয়ে আসে। হাতি পরিবারে আহত সদস্যকে রক্ষা করতে পরিবারের অন্য সদস্যরা এগিয়ে আসে।
উপরের উদাহরণগুলি নৈতিকতার একেবারে প্রাথমিক দৃশ্যপট। এই আদিম বোধই মানুষের শারিরিক ও কালচারাল বিবর্তনের পথ বেয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহণ করেছে। এই সেই সোর্স -যেখান থেকে মানুষ ভালোমন্দ ন্যায়অন্যায় বোধগুলি লাভ করেছে।
এ বিষয়ে আমরা নিজেরাই নিজেদের শিক্ষক।
----সমাপ্ত---

বিবর্তনের দৃষ্টিতে নৈতিকতার উদ্ভব

অপার্থিব

নৈতিকতা যে মানব দেহের অন্তর্নিহিত কোন ভৌত বা বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ জনিত নয়, বরং তা দেহ বহির্ভুত বৈজ্ঞানিক কার্যকারণবিহীন কোন অদৃষ্য শক্তি দ্বারা সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত, এই ধারণা অনেকের মধ্যেই বদ্ধমূল। অনেক বিজ্ঞান সচেতন উদার বা মুক্তমনা মানুষও এই ধারণা পোষণ করে থাকেন । প্রেম,মমত্ববোধ, ও নৈতিকতার মত মানবিক গুণাবলীকে তাঁরা অত্যন্ত মহান ও ''স্বর্গীয়'' বলে মনে করেন, যা অচেতন,যান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক বিধিসমূহের দ্বারা ব্যাখ্যা করলে এই মহান গুণাবলীর অবমাননা করা হয় ও মানুষকে একটা যন্ত্রে পর্যবসিত করা হয়। কিন্তু একটু সতর্কতার সাথে চিন্তা করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে তাঁদের এই ধারণা আত্মার উপর তাঁদের অবচেতন বিশ্বাসেরই ইঙ্গিত বহন করে। কারণ মানুষের স্বভাব, অনুভুতি, আবেগ, মূল্যবোধ ইত্যাদির কারণেই আত্মার ধারণার সৃষ্টি, প্রাকৃতিক কারণ (অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ) এর দ্বারা মানুষ তার নিজের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে না পেরেই আত্মার ধারণার উদ্ভাবন করেছে অতীতে। মানুষ যন্ত্র নয় এটা জোর দিয়ে বলার অর্থই হোল আত্মায় বিশ্বাস। মানুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি হোল, কোন ঘটনার বা কার্যের প্রাকৃতিক কারণ বা ব্যাখ্যা খুঁজে না পেলে এক অপ্রাকৃতিক সত্বার অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করে এই অপ্রাকৃতিক সত্বার কারণেই যে ঘটনাটা ঘটছে এই ''ব্যাখ্যা'' দেয়া। কিন্তু দর্শন বা যুক্তিশাস্ত্রের ''ক খ'' যারা জানেন তাঁরা বা যুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন যে কেউই স্বীকার করবেন যে এটা কোন ব্যাখ্যাই নয়। বিবর্তন বিজ্ঞানের এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারাই এই মানবিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যগুলির (সঠিকভাবে বললে এই গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের উদ্ভবের) ব্যাখ্যা দেওয়া। নৈতিকতা ও অন্যান্য মানবিক মূল্যবোধের উৎসের ভিত্তি যে প্রাকৃতিক নিয়ম অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সূত্রই তার সমর্থনে এখন জোরাল সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক নিয়ম অর্থাৎ পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রই বিবর্তন প্রক্রিয়ার পেছনে কাজ করে আর তারই পরিণতিতে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জটিল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে, যা মানুষ সহ সব প্রজাতিকে বিবর্তনের নির্বাচন চাপের মুখে উদ্বর্তন ও বংশাণু সঞ্চালনে সহায়তা করে। এই সব জটিল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে জটিলটি হল মস্তিষ্ক। লক্ষকোটি øায়ূকোষ আর সংযোগ বর্তনীর দ্বারা গঠিত মস্তিষ্ক হল জটিল তন্ত্রের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মস্তিষ্ক একদিনে গড়ে উঠেনি। লক্ষ লক্ষ বছরে বিবর্তনের পরিণতিতে ক্রমাণ্বয়ে আজকের এই জটিল রূপ নিয়েছে মস্তিষ্ক। বিবর্তনের ধারাই হল ধাপে ধাপে সরল থেকে জটিলের দিকে অগ্রসর হয়া। অন্যান্য সব জটিল তন্ত্রের মত মস্তিষ্কও বিকাশমান ধর্ম প্রদর্শন করে। মস্তিষ্ক অতি জটিল হওয়ায় তার বিকাশমান ধর্ম ও অভিনব ও অনন্য। আবেগ, অনুভূতি, নৈতিকমূল্যবোধ ইত্যাদি সবই মস্তিষ্কের বিকাশমান ধর্ম । প্রাকৃতিক নির্বাচনের দরুন যে বিকাশমান ধর্ম গুলো উদ্বর্তন ও বংশাণু সঞ্চালনে সহায়ক সেগুলিই শুধু টিকে থাকে সময়ের বিবর্তনে। এই টিকে থাকাটা পারিসাংখ্যিক বা গড় অর্থে (সংখ্যা ও সময় উভয়ের ভিত্তিতেই)। মানুষ প্রজাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নৈতিক মূল্যবোধের তাড়না অনুভব করে। যারা করেনা তারা সংখ্যালঘু। তা নাহলে মানব প্রজাতি অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে যেত। এই তাড়না আসে বিবর্তনের প্রাকৃতিক কারণেই। কোন দৈব বা অতীন্দ্রীয় কারণে নয়।

নৈতিকতার উদ্ভব ও বিবর্তন হয় মস্তিষ্কের সাথে পরিবেশ ও অন্য মস্তিষ্কের মিথঁিয়ার দরুন মস্তিষ্কেরই বিবর্তনের মাধ্যমে, যার মাধ্যমে পুরো সভ্যতা বা সংস্কৃতির এরই সৃষ্টি। অনেকেই নৈতিকতার উৎস বলতে সভ্যতা বা সংস্কৃতিকেই চিহি¡ত করেন, যেন এখানেই তার শুরু বা মূল। সভ্যতা বা সংস্কৃতিকে তাঁরা এক মৌলিক সত্বা হিসেবে দেখেন। সভ্যতা বা সংস্কৃতি নিজেই যে (মস্তিষ্কের)বিবর্তনের ফল, যার এক প্রকাশ হল নৈতিকতা, সেটা তাঁরা উপলব্ধি করেন না। এই প্রসঙ্গে দার্শনিক ডোনাল্ড ক্যামেরন তাঁর লেখা ''জীবনের উদ্দেশ্য'' বই এর সংক্ষিপ্তসার অংশে বলেন :

> ''একটা বহুল প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে এই যে মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবে অর্থাৎ বংশাণুর বিবর্তনের মাধ্যমে লব্ধ মূল্যবোধগুলির বাড়তি আতিরিক্ত সব মূল্যবোধের সৃষ্টি হয় সংস্কৃতির এক বিকাশমান ধর্মের কারণে, আর এই সংস্কৃতিলব্ধ মূল্যবোধগুলি জন্মগতভাবে লব্ধ অধিকাংশ মূল্যবোধগুলির স্থান নিয়ে নেয় । কিন্তু এই ধারণার সমর্থনে কোন যুক্তি নেই। এই ধারণাকে আমাদের আর এক আত্মশ্লাঘার উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়, যার দরূন আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে অন্য প্রাণীর থেকে আমাদের পার্থক্যটা শুধু পরিমাণগত নয়, বরং গুণগতও। প্রাকৃতিক নির্বাচন কেমন করে জন্মগতভাবে লব্ধ মূল্যবোধের তথ্যটিকে মানুষের মস্তিষ্কে প্রোগ্র্যাম করে দেয় সেটা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু এটা বোঝা কষ্টকর যে এক মস্তিষ্ক থেকে অন্য মস্তিষ্কে সংক্রমিত তথ্য কি করে জন্মলব্ধ মুল্যবোধের অতিরিক্ত নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্যই আমরা সংস্কৃতির মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে নূতন মূল্যবোধ সঞ্চারিত করি। কিন্তু এই নূতন মূল্যবোধগুলি মস্তিষ্কেই সৃষ্ট, এক মস্তিষ্ক থেকে অন্য মস্তিষ্কে তথ্যের আদান প্রদানের মাধ্যমে সৃষ্ট নয়।''

অর্থাৎ ক্যামেরন বলতে চাইছেন যে মস্তিষ্ক করে সৃষ্টি, আর সংস্কৃতি করে সেই সৃষ্টিকে এক মস্তিষ্ক থেকে অন্য মস্তিষ্কে স্থানান্তর। বা ঘুরিয়ে বলা যায় যে এক মস্তিষ্ক থেকে অন্য মস্তিষ্কে মূল্যবোধের এই সংক্রমণকেই বলা হয় সংস্কৃতি। কাজেই বলা যায় যে নৈতিক মূল্যবোধের প্রবৃত্তি, যা কিনা মানুষের চিন্তা,অনুভূতি ও কর্মে উচিত অনুচিতের ধারণার জন্ম দেয় তা পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়মেরই পরিণতিতে বিবর্তনের দ্বারা মস্তিষ্কের মাধ্যমে সৃষ্ট । নৈতিকতার আসন্ন কারণ সংস্কৃতি বটে, তবে চূড়ান্ত কারণ পদার্থ বিজ্ঞানের বিধিসমূহ। এটাত এক সাধারণ যুক্তির কথা যে মানুষের মস্তিষ্ক(অর্থাৎ মন) যদি পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়ম্রের ফলে সৃষ্ট, তাহলে নৈতিকতা, যা আবার মস্তিস্কেই সৃষ্ট, সেটাও পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রেরই ফল। নৈতিকতা পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়মেই প্রচ্ছন্ন আছে(জটিল তন্ত্রের জন্য)। বিবর্তনের মাধ্যমে তা প্রকাশ প্রায় । নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যেও নৈতিকতার আভাস পাওয়া যায়। যেহেতু তাদের মস্তিষ্ক মানুষের মস্তিষ্কের মত অত জটিল নয়, তাই তাদের নৈতিকতাও অতটা উন্নত ও জটিল নয়। নৈতিকতার এই প্রকৃতিক নিয়মের দ্বারা সৃষ্টির কথা সমাজজীববিজ্ঞানী এড্ওয়ার্ড উইলসন বলেছেন তাঁর ''নৈতিকতার জীববৈজ্ঞানিক ভিত্তি'' নামক প্রবন্ধে। সেই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন যে উচিতের অনুভূতি জড়প্রক্রিয়ার একটি উৎপাদ কি ভাবে বিবর্তন নৈতিক প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে? এর ব্যাখ্যায় এড্ওয়ার্ড উইলসন তাঁর উপরে উল্লেখিত প্রবন্ধে লিখেছেন :

> ''ধরে নেই সহযোগিতা করা বা দলত্যাগ করার প্রবৃত্তি জন্মগত। কেউ বেশী সহযোগিতাপ্রবণ, অন্যেরা কম। এই ব্যাপারে নৈতিকতার প্রবণতা অন্যান্য সব মানসিক প্রবণতার মতই। যেসব প্রবৃত্তি জন্মগত বলে আমাদের জানা তার মধ্যে যেগুলি নৈতিক প্রবণতার সবচেয়ে কাছাকাছি সেগুলি হচ্ছে অন্যের কষ্টের প্রতি

সহমর্মিতা, শিশু ও তার পরিচর্যাকারীর মধ্যকার আসক্তির কতগুলি বিশেষ প্রক্রিয়া। নৈতিক প্রবণতার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তিযোগ্যতার সংগে যোগ করুন সহযোগিতাপ্রবণ মানুষের দীর্ঘায়ূ হওয়ার ও অধিকতর সন্ততি রেখে যাওয়ার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ। এই যুক্তিতে বিবর্তনের ঐতিহাসিক পথ ধরে এগুলে দেখা যাবে যে যেসকল বংশাণু মানুষকে সহযোগিতাপ্রবণ করে সেই বংশাণুগুলিই মানব প্রজাতিতে সামগ্রিকভাবে অধিকতর আধিপত্য বা প্রাধান্য বিস্তার করবে।

এই প্রক্রিয়া কয়েক হাজার প্রজন্ম ধরে পুনরাবৃত্ত হতে থাকলে তা অবশ্যম্ভাবীরূপে নৈতিক অনুভুতির সৃষ্টি করবে। কিছু মনোবিকারগ্রস্ত (যদি সেরকম কিছু থেকে থাকে) ছাড়া প্র্যত্যেক মানুষই বিভিন্নভাবে এই নৈতিক অনুভূতিকে প্রত্যক্ষ করে বিবেক, আত্মসম্মান, অনুশোচনা,সহমর্মিতা,লজ্জা, বিনয়, নৈতিক্তার প্রতি আঘাত ইত্যাদি রূপে। এই প্রক্রিয়া সাংস্কৃতিক বিবর্তনকে সেই সব প্রথার দিকে পক্ষপাতের সাথে পরিচালিত করে যেগুলো সার্বজনীন নৈতিক আচরণের সূত্র যেমন সম্মান, দেশপ্রেম,পরার্থতা,ন্যয়বিচার,সহমর্মিতা, করুণা ও প্রায়শ্চিত্যকে প্রকাশ করে।”

নৈতিকতার বিবর্তনের আরও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায় গণিতের এক শাখা ক্রীড়াতত্ত্বে। এর একটি সুপরিচিত উদাহরণ হল বন্দীর উভয়সংকট। নীচে সংক্ষেপে এর বিবরণ দেয়া হলঃ

দুই বন্দী, ক ও খ জেলের দুই পৃথক সেলে বন্দী হয়ে আছে। এদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের কোন উপায় নেই। অভিশংসক তাদের উভয়কেই একটা চুক্তির প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবটি হল -

১) যদি কেউ স্বীকার করে যে তারা উভয়ই অপরাধী, কিন্তু অপরজন তা অস্বীকার করে, তাহলে সে মুক্তি পাবে এবং অপরজন ৫ বছরের কারাদন্ড পাবে।

২) উভয়ই যদি অপরাধ অস্বীকার করে, তাহলে উভয় দু বছরের কারাদন্ড পাবে।

৩) উভয়ই যদি অপরাধ স্বীকার করে, তাহলে উভয় ৪ বছরের কারাদন্ড পাবে।

দেখা যাচ্ছে, কেউ যদি অপরাধ স্বীকার করে তাহলে সে হয় মুক্তি অর্থাৎ ০ বছরের কারাদন্ড পাবে (১ নং ক্ষেত্রে) নতুবা ৪ বছরের কারাদন্ড পাবে (৩ নং ক্ষেত্রে)। কেউ যদি অপরাধ অস্বীকার করে তাহলে হয় সে দু বছরের কারাদন্ড পাবে (২ নং ক্ষেত্রে) নতুবা ৫ বছরের কারাদন্ড পাবে (১ নং ক্ষেত্রে) । কাজেই প্রত্যেকের দৃষ্টিকোণ থেকে অস্বীকার ওরার চেয়ে স্বীকার করা অধিকতর পুরস্কার বয়ে নিয়ে আসবে (০ বা ৪ বছরের কারাদন্ড অবশ্যই ২ বা ৫ বছর কারাদন্ডের চেয়ে শ্রেয়)। এখন যদি উভয়ই যুক্তিবান ও স্বার্থপর হয় তাহলে উভয়ই অপরাধ স্বীকার করবে। কিন্তু পরিণামে তারা উভয়ই ৪ বছরের কারাদন্ড পাবে (৩ নং ক্ষেত্র), যা কিনা উভয়েরই অপরাধ অস্বীকার করার পরিণতির (২ নং ক্ষেত্র) চেয়েও খারাপ। কাজেই তাদের যুক্তিজ্ঞান ও স্বার্থপর চিন্তাপ্রসূত সিদ্ধান্ত পরিণামে তাদের নিজেদের যুক্তিকেই ভুল প্রমাণ করল! এই বন্দীর উভয়সংকটের উদাহরণ যদি অনেকবার পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং একই সাথে যদি তাদের নিজেদের মধ্যে যোগাযগের ব্যবস্থা করে দেয়া হয় তাহলে প্রথম

দিকে উভয়ই অপরাধ স্বীকার করবে বটে, কিন্তু শীঘ্রই তাদের মধ্যে পরীক্ষণ ও ভ্রমসংশোধনের এর মাধ্যমে পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করার এক প্রবণতার জন্ম হবে এবং তারা সহযোগিতার এক নৈতিক আচরণ সূত্র উদ্ভাবন করবে যা বলবে "তোমরা কখনই স্বীকার করিবে না"। অপরাধ চক্রের মধ্যেও এই সহযোগিতার সূত্র পরিলক্ষিত হয় যার দরুন তারা একে অপরকে ধরিয়ে দেয় না। বিবর্তন এভাবেই কাজ করে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে কাজ করে বিবর্তন আদিমকালের উপজাতি হতে আধুনিক মানুষের মধ্যে এক নৈতিক চেতনার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়েছে। এই নৈতিক চেতনা কোন অতীন্দ্রীয় শক্তির দ্বারা মস্তিষ্কে রোপিত হয় নি,এটা মস্তিষ্কের একটা হার্ডওয়্যার্ড প্রবৃত্তি । এই হার্ডওয়্যার্ড প্রবৃত্তি মানুষের একচেটিয়া নয়। আগেও উল্লেখ করেছি নিম্ন প্রাণীদের মাঝেও সরল নৈতিকতা পরিলক্ষিত হয়, যেমন নেকড়ে বাঘ গোত্রের মধ্যে। তাদের মধ্যে আনুগত্য, পুরস্কার, শাস্তি ইত্যাদি দেখা যায়। এক শ্রেণীর রক্তপায়ী বাদুড়দের মধ্যেও পরোপকারিতা দেখা যায়,যেখানে অসুস্থ বাদুড়কে প্রতিবেশী বাদুড় গরুর শরীর থেকে পান করা রক্ত দান করতে দেখা গেছে, কারণ প্রবৃত্তিগতভাবে দাতা বাদুড় জানে তারও একদিন প্রয়োজন হতে পারে এই সাহায্যের।

যে সকল প্রবৃত্তি উদ্বর্তনের সহায়ক বিবর্তনী জীববিজ্ঞানীরা সেগুলীকে উপযোজনীয় আর উদ্বর্তন পরিপন্থী প্রবৃত্তিকে প্রতি-উপযোজনীয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিছু প্রবৃত্তি উদ্বর্তনের সহায়কও নয় আবার উদ্বর্তন পরিপন্থীও নয়। এরা উদ্বর্তন নিরপেক্ষ বা উদাসীন। বিবর্তন (বিবর্তন মনোবিজ্ঞান সঠিক অর্থে) যে শুধু নৈতিক প্রবৃত্তির মত উপযোজনীয় প্রবৃত্তির উদ্ভবের ব্যাখ্যা দেয় তা নয়, অনৈতিক (যা উদ্বর্তন পরিপন্থী বা উদ্বর্তন নিরপেক্ষ হতে পারে) প্রবৃত্তি সৃষ্টির ব্যাখ্যাও দেয়। বাইবেলে যব নামক অধ্যায়ে যব কে ইশ্বরের কাছে এই ফরিয়াদ করতে দেখা যায় যে কেন তাকে ইশ্বর অসহণীয় দুর্দশার মধ্যে ফেলেছেন, সে তো কখনও কোন অপরাধ বা অন্যায় করেনি। এ কেমন বিচার ইশ্বরের, যব জানতে চায় ইশ্বরের কাছে। কিন্তু ইশ্বর যব এর এই প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর দেন নি। কিন্তু বিবর্তনী জীববিজ্ঞানের সৌজন্যে এখন এর ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব। এই লক্ষ্যে নীতিজ্ঞানের জীববৈজ্ঞানিক উৎস নামে অনেক বই ও গবেষণাপত্র লেখা হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন হল কেন মন্দ বা নীতিহীনতার সৃষ্টি? একটা উদাহরণের মাধ্যমে এটা বোঝার চেষ্টা করা যাক। একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল যে বিবর্তনও অনেকটা সাধারণ মানুষের মতই বুদ্ধি বা যুক্তিকে কাজে না লাগিয়ে পরখ ও ভুল ভ্রান্তির মাধ্যমে সবচেয়ে সহজে উদ্দেশ্য সাধন করতে চেষ্টা করে। স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত যে বিবর্তনের ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য হল উদ্বর্তন ও পরবর্তী প্রজন্মে বংশাণু হস্তান্তর করণ। কোন যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সক্রিয় যোদ্ধাদের সনাক্ত করে আলাদা করে ধ্বংস করা বেশ দুঃসাধ্য ব্যাপার। অনেক হিসাব নিকাশ, তথ্য সংগ্রহ ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। এর চেয়ে অনেক সহজে এ কাজ করা যায় নির্বিচারে সবাইকে ধ্বংস করে। তাতে শত্রু যোদ্ধাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত। যদিও এর ফলে অনেক নিরীহ বেসামরিক লোক নিহত হয়। কিন্তু যোদ্ধারা বেসামরিক লোক নিহত হওয়ার প্রতি উদাসীন, এতে তারা খুশীও নয়, দুঃখিত ও নয়। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল শত্রু যোদ্ধাদের ধ্বংস করা। ইরাকে মার্কিন বাহিনীর বোমাবর্ষণ এর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মূল লক্ষ্যকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মূল লক্ষ্য নয় যারা তাদেরও অনিবার্য্য ধ্বংসকে যুদ্ধের ভাষায় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াজনিত ক্ষতি বলা হয়। অনৈতিকতা বা নীতিহীনতা বিবর্তনের এক অনিবার্য্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াজনিত ক্ষতি। কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আবার ক্ষতি বা ধ্বংস নাও করতে পারে। বিবর্তনের ক্ষেত্রেও অনেকটা সেরকম ঘটে। বিবর্তনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল উদ্বর্তন ও বংশাণু সঞ্চারণ। এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রক্রিয়ার কিছু অপ্রত্যাশিত উপজাত উৎপন্ন হতে পারে। বিবর্তনের ভাষায় এগুলিকে স্প্যান্ড্রেল বলা হয়। ইমারতের ছাদের ধনুকাকৃতি খিলান তৈরীর সময় ত্রিকোণাকৃতি যে অপ্রয়োজনীয় অংশ অনিবার্য্যভাবে তৈরী হয়ে যায় তাকেই স্থাপত্যবিদ্যায় স্প্যান্ড্রেল বলা হয়।

বিবর্তনের এই অনৈতিক প্রবৃত্তির স্প্যান্ড্রেলের একটি উদাহরণ হল ধর্ষণ। এই প্রবৃত্তি যে এখনও টিকে আছে তার কারণ এটা উপজোযন-পরিপন্থী নয়। বিবর্তনের শক্তিসমূহের আমাদের মত নৈতিক চেতনা নেই, যদিও আমরা বিবর্তনেরই সৃষ্টি। বিবর্তন অন্ধ। সে শুধু জানে কিভাবে উদ্বর্তন ও বংশাণু সংরক্ষণ ও সঞ্চারণ করা যায় যে কোন উপায়ে। ধর্ষণ শুধু যে উপজোযন-পরিপন্থী নয় তাই নয়, বিবর্তনী মনোবিজ্ঞানীদের মতে বিবর্তনের আদিম পর্যায়ে উপজোযন সহায়কও হয়ত ছিল। বিবর্তনী মনোবিজ্ঞানী থর্নবুল আর নৃতত্ত্ববিদ পামার এর লেখা বই ''ধর্ষণের প্রাকৃতিক ইতিহাস'' এর মূল বক্তব্যই হল অতীতে ধর্ষণের এই উপজোযন সহায়তাকারী ভূমিকা। আর এই মূল বক্তব্যটি হল ধর্ষণ একটি বংশাণুগতভাবে সৃষ্ট বিবর্তনী কৌশল যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তিকে আছে এটা এক প্রকার যৌন নির্বাচন - একটা সফল প্রজনন কৌশল। স্বভাবতই থর্নবুল আর পামার ভুল বোঝাবুঝির স্বীকার হন তাঁরা যে ধর্ষণকে সমর্থন বা ক্ষমা করছেন এই অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে। কিন্তু তাঁরা এর কোনটাই করেন নি। করেছেন এটা ভাবলে তা হবে প্রাকৃতিক হেতুদোষের এক উদাহরণ। যে হেতুদোষের কারণে প্রকৃতিতে যাকিছুই ঘটতে দেখা যায় তাই ঘটা উচিত বলে মনে করা। আসলে তা নয়। ''হয়'' কে ''হওয়া উচিত'' এ উন্নীত করার কোন যৌক্তিকতা নেই। থর্নবুল আর পামার শুধু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছিলেন ধর্ষণের মত এক নিন্দনীয় আচরণ কিভাবে এখনও টিকে আছে তার বিবর্তনীয় ব্যাখ্যা দেয়ার। জীববিজ্ঞানী ম্যাট রিড্‌লীও তাঁর ''গুণের উৎস'' বইতে একই কথা বলেছেন - ধর্ষণ অতীতে বিবর্তনের জন্য উপযোজনীয় ছিল। তাই দেখা যাচ্ছে মন্দ প্রবৃত্তি গুলো বিবর্তনের এক অনিবার্য্য উপজাত সৃষ্ট হয়ে টিকে আছে। এরকম আর একটি মন্দ প্রবৃত্তি হল মিথ্যা কথন। পদার্থবিদ হাইন্‌য পেগেল্‌স তাঁর ''যুক্তির স্বপ'' বইয়ের ৩৩০ পৃষ্ঠায় এটা সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেনঃ

> ''জটিলতার নতুন বিজ্ঞান ও কম্পিউটার মডেলিং এর দ্বারা প্রাপ্ত জগৎ সম্পর্কে নতুন ধ্যান ধারণা আমদেরকে আমাদের মূল্যবোধ সম্পর্কে এমন কিছু শেখাতে পারে যা আমরা আগে কখনই জানতাম না। বিজ্ঞান নৈতিক বিরোধের সুরাহা না করতে পারে, কিন্তু ঐ বিরোধ নিয়ে যে বিতর্ক, বিজ্ঞান সেটাকে এক অভ্রান্ত অবয়ব বা কাঠামো দিতে পারে। একটা উদাহরণ নেয়া যাক যেমন মিথ্যা বলা। আমরা সত্যবলাকে একটা পুণ্য বলে গণ্য করি আর মিথ্যা বলাকে পাপ গণ্য করি। কিন্তু সবাই যদি সর্বদা সত্য কথা বলে, যার দরুন যে কাউকেই সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যায়, তাহলে কোন একজন মিথ্যা বললে তার বিপুলভাবে লাভবান হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু এই সম্ভাবনা সামাজিক স্থিতাবস্থা রক্ষার জন্য সহায়ক নয়। অপরদিকে যে সমাজে সবাই সর্বদা মিথ্যা বলে, সেই সমাজও বেশিদিন স্থিতাবস্থায় থাকতে পারে না এবং একসময় ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। সবচেয়ে স্থিতাবস্থার দশা হল যখন সবাই অধিকাংশ সময় সত্য বলে কিন্তু মাঝে মধ্যে মিথ্যা বলে, যা বাস্তব জগতে দেখা যায়। এক অর্থে বলা যায় যে আমাদের মধ্যে যারা মিথ্যাবাদী তারাই আমাদের বাকি সবাইকে সত্যবাদী ও সতর্ক থাকতে সহায়তা বা বাধ্য করে। মিথ্যাকথনের এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আমরা কেন মিথ্যা বলি সেটা বুঝতে আমাদের সাহায্য করতে পারে''

ক্রীড়াতত্ত্ব এইরকম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকে সমর্থন দেয়। মূলত তা সেই প্রাচীণ বিজ্ঞোক্তিকেই সমর্থন করে যা বলে, শুভ এর জন্যই মন্দের প্রয়োজন। আলোর জন্যই অন্ধকারের প্রয়োজন। সম্পূর্ণ মন্দহীন এক আদর্শ জগৎ অলীক কল্পনায় বিরাজমান, বাস্তবে এটা কখনই ঘটবেনা।

পরিশেষে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা যাক। অনৈতিকতা বা মন্দ থাকবেই বলার অর্থ এই নয় যে তাকে সমর্থন করা বা নৈতিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলা বা না পোষণ করা। অনেকে এটা ভাবতে পারেন যে ধর্মীয় বিধানের শাস্তির ভয় না থাকলে অর্থাৎ নৈতিকতার দৈব উৎসে বিশ্বাস না করলে নৈতিকতার উপর পরম কোন আস্থা বা বিশ্বাস আসতে পারে না। এর উত্তরে বলব বিবর্তন যেমন মন্দ বা অনৈতিকতার উপস্থিতি নিশ্চিত করে, তেমনি বিবর্তন এটাও নিশ্চিত করে যে অধিকাংশের মনে নৈতিক চেতনার শক্ত ভিত যেন গঠিত হয়। বিবর্তন এটাই নিশ্চিত করে যে গড়ে সমাজের অধিকাংশই যেন অপরাধ বিমুখ হয়, মানুষ প্রজাতির উদ্বর্তনের লক্ষ্যে। যাঁরা প্রচলিত ইশ্বরে বিশ্বাস করেন না অন্যান্যদের মত তাঁদের অধিকাংশেরও মনে নৈতিক চেতনার এক অনপনেয় প্রবৃত্তির সৃষ্টি হয়। পরলোকে শাস্তির ভয় কে যুক্তির বিচারে অমুলক জেনেও তাঁরা অপরাধ না করার এক জোরাল প্রবৃত্তি অনুভব করেন। অপরাধ করলে লাভবান হবার ও শাস্তি না পাওয়ার নিশ্চয়তা পেয়েও শত চেষ্টা করলেও তাঁরা অপরাধ করতে পারবেন না। এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাদের নিবৃত্ত করে। যুক্তি দিয়ে যেমন কোন খাবারের প্রতি অরুচি বা লোভকে পরিবর্তন করা যায় না তেমনি অপরাধ না করার বিবর্তনজনিত প্রবৃত্তিকেও যুক্তি তর্ক দ্বারা জয় করা যায়না। ধর্মে বিশ্বাসী অনেকে বলবেন ঈশ্বরে অবচেতন বিশ্বাসের জন্যই এমনটি হয়। অপরাধবিমুখ অবিশ্বাসী যুক্তিবাদী লোকটি সেটা জানে না। কিন্তু আসল ব্যাপারটি হল বিশ্বাসী লোকটিই নৈতিক মূল্যবোধ এর প্রবৃত্তির কোন প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা না জানায়, (হয়ত তাঁরা বিবর্তন ও পদার্থবিজ্ঞান পড়েন নি বা বোঝেন না বা এগুলোকে নাস্তিকের অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দেন) এক অপ্রাকৃতিক কারণ দ্বারা এর "ব্যাখ্যার" চেষ্টা করছেন । প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাসী না হয়েও যে কেউ নীতিবান হতে পারে নিছক প্রাকৃতিক কারণে সেটা তাঁদের অজানা ও সেহেতু অসম্ভব বলে মনে হয় তাঁদের।

অপার্থিব : মুক্তমনার ফোরামের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অপার্থিব এর সাথে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা হিসেবে ও লেখক হিসেবে। পুরো নাম অপার্থিব জামান, তবে অপার্থিব নামেই লিখে থাকেন। বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য, যুক্তিবাদ অধিবিদ্যা তাঁর প্রিয় বিষয়। পদার্থবিদ্যার এই স্নাতক বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত। ইমেইল : aparthib@yahoo.com

‘স্বার্থপর জিন’ -এর আলোকে সহযোগিতা এবং আত্মত্যাগ

দিগন্ত সরকার

স্বার্থপর জিন*

বাংলাভাষায় একটা কথা আছে - "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী"। আমার ধারণা ডারউইনের "যোগ্যতমের উদ্বর্তন" নিয়েও এরকমই কিছু ভয়ঙ্করী ভুল ধারণা রয়েছে - তাদের মধ্যে একটি হল আগ্রাসী মনোভাবের ব্যাখ্যা। খুব সহজ চিন্তাভাবনা করলে মনে হবে যে যদি যোগ্যতমই সবসময় নির্বাচিত হবে তাহলে সব জীবই তো চাইবে অন্যেকে মেরে ফেলতে আর নিজের বংশবিস্তার করতে। তাহলে সেই প্রাণীদেরই আমাদের এখন চারপাশে দেখতে পাওয়ার কথা যারা হিংস্র, শক্তিশালী ও আগ্রাসী। একটি জীবকে যদি জিনসমষ্টি নিয়ন্ত্রিত একটি স্বার্থপর যন্ত্র (যাকে আমরা বলব সজীব যন্ত্র) বলে মনে করা যায়, তবে সেই জিনগুলোই বেঁচে থাকার কথা, যারা প্রাণীদের মধ্যে এই আগ্রাসী নীতি অবলম্বনে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু বাস্তবে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম দেখি, কেন?

ব্যাপারটা একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা যাক। একটি সজীব যন্ত্রের কাছে বাকী জীব বা সজীব যন্ত্রেরা হল জল, কাঠ বা পাথরের মত প্রকৃতির আরো কিছু অংশমাত্র। প্রাকৃতিক নির্বাচন সেই জিনগুলোকেই নির্বাচিত করে যারা সজীব যন্ত্রকে তার পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির পক্ষে সবথেকে উপযোগী করে গড়ে তোলে। পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির মধ্যে অন্যান্য সজীব যন্ত্র বা জীবও অন্তর্ভুক্ত। ভিন্ন প্রজাতির জীবেরা একে অপরকে প্রভাবিত করে - খাদ্য-খাদক সম্পর্ক ছাড়াও পরাগরেণু বাহক প্রজাপতির মত উদাহরণও কম নেই। তবে একই প্রজাতির জীবেদের পারস্পরিক প্রভাব তুলনায় বেশী। কোনো এক জীবের কাছে বাকি সব জীব খাদ্যশৃঙ্খলে তার প্রতিযোগী আবার অর্ধেক (সাধারণভাবে) জীব তার সম্ভাব্য প্রজনন-সঙ্গী, বাকি অর্ধেকের সাথে প্রতিযোগিতা করেই তবে সে বংশবিস্তারে সক্ষম হবে। সাধারণ বিচারে, তাই জীবের পক্ষে তার প্রতিযোগীকে হত্যা করাটা (এবং খেয়ে ফেলাটা) খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। বাস্তবে কিন্তু তার উল্টোটাই বেশী করে চোখে পড়ে। শুধু তাই নয়, কনরাড লোরাঞ্জের 'অন অ্যাগ্রেসন' বই-এর মতে, নিজেদের মধ্যে এই মারামারিও জীবজগতে বিভিন্নভাবে হয়, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার ফলে পরাজিত পক্ষের প্রাণসংশয় হয় না। উন্নততর জীবজগতে, বিশেষত মানুষের মধ্যে আবার আগ্রাসনের পরিবর্তে পারস্পরিক সহযোগিতাই বেশী করে চোখে পড়ে। জীবজগতে হানাহানির পরিবর্তে এরকম সহযোগিতা কেন দেখা যায় যদি স্বার্থপর জিন-বিস্তার করাই জীবের লক্ষ্য হয়ে থাকে?

উত্তরটা প্রথমে একটা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাক। ধরা যাক মুক্তমনায় অপার্থিব আর বন্যা আমার প্রতিযোগী দুই সদস্য। এটা ভাবা খুবই স্বাভাবিক যে আমি এখন অপার্থিবের মুখোমুখী হলেই তাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হব। কিন্তু, এমন যদি হয় যে অপার্থিব আবার বন্যারও প্রতিযোগী, তাহলে অপার্থিবকে মারলে আদপে বন্যার সুবিধাই হয়ে যাবে। বরং, বন্যা আর অপার্থিবের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র হলেই আমার লাভ

---

* *স্বার্থপর জিন কথাটা রিচার্ড ডকিন্স প্রদত্ত The Selfish Gene এর বাংলা অনুবাদ। জীবের আচরণ কিভাবে বিবর্তনের পথে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে স্বার্থপর জিন দিয়ে - সে বিষয়েই বইটা। এই লেখটা মূলত বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় থেকে নেওয়া। ...*

বেশী। তাই, প্রতিযোগিতার জটিল ঘূর্ণাবর্তে প্রতিযোগীদের নির্বিচারে হত্যা করাটা নির্বাচিত হবার জন্য খুব একটা ভাল কৌশল নাও হতে পারে। চাষের ক্ষেতে অনেকসময়েই একটি কীটনাশক ব্যবহার করে কোনো একটি ক্ষতিকর কীট ধ্বংস করে তার প্রতিযোগী আরো ক্ষতিকর কীটের সুবিধা করে দেবার ঘটনা ঘটে - যার ফলাফল ক্ষতিকর। উদাহরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে, প্রতিযোগিতা বা লড়াইতে নামার আগে বা রণকৌশল নির্ধারণে সব সজীব যন্ত্রেরই সচেতন বা অবচেতন ভাবে লাভ-ক্ষতির হিসাব করতে হবে। আর এখানেই আসে হ্যামিলটনের "বিবর্তনগত স্থিতিশীল কৌশল"।

"বিবর্তনগত স্থিতিশীল কৌশল" হল এমন একটি কৌশল বা নীতি, যেকোনো জীবগোষ্ঠীর অধিকাংশ জীব তা অবলম্বন করলে অন্য কোনো কৌশল এসে তার স্থান দখল করতে পারবে না। পরিবর্তিত পরিবেশে কৌশল পরিবর্তন হতে পারে, প্রতি জীবের নিজে নির্বাচিত হবার কৌশল একই জীবগোষ্ঠীর অধিকাংশ জীবের কৌশলের ওপর সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। মূল কথা হল, একবার জীবগোষ্ঠীর অধিকাংশ জীব এই কৌশল অবলম্বন করা শুরু করলে এর বিরোধীদের প্রাকৃতিক নির্বাচনের সরাসরি বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে।

মেনার্ড স্মিথের কাল্পনিক উদাহরণ দিয়েই ব্যাখ্যা করা যাক। ধরা যাক, একটি জীবগোষ্ঠীর মধ্যে দুধরণের কৌশল অবলম্বনকারী জীব দেখা যায়। প্রথমটি আগ্রাসী নীতি, আরেকটি বিবাদ নীতি। আগ্রাসীরা সবসময় শেষ রক্তবিন্দু অবধি লড়াই করে, মৃতপ্রায় না হলে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে না। বিবাদীরা মারামারি না করে অন্য উপায়ে লড়াই করে, ঝগড়া করে, রক্তচক্ষু দেখায়, আক্রমণের ভাব করে কিন্তু রক্তপাত করেনা। এদের পার্থক্যটা অনেকটা অনেকটা ডিপ্লোম্যাট আর আর্মির পার্থক্যের মত। আগ্রাসীর সাথে বিবাদীর লড়াই হয়না, বিবাদী পালিয়ে যায়। কিন্তু দুই আগ্রাসীর লড়াইতে সর্বদা কোনো না কোনো একজন মারা যায় (বা গুরুতর আহত হয়)। প্রথমে, হিসাবের সুবিধার্থে ধরে নেওয়া যাক, কোনো জীবই জীবদ্দশায় তার কৌশল বদলায় না, এবং প্রতিযোগিতার শুরুতে একে অন্যের কৌশল জানে না। আমাদের এই মডেলের কাল্পনিক পয়েন্ট সিস্টেমে ধরা যাক, প্রতিযোগিতায় জিতলে ৫০ পয়েণ্ট, হারলে ০, সময় নষ্টের জন্য -১০, গুরুতর আহত হলে -১০০ পয়েন্ট - জিনের নির্বাচনের সম্ভাবনার সাথে মিল রেখেই এরকম পয়েন্ট সিস্টেম। এখানে মনে রাখতে হবে যে, আমরা লড়াইতে কে জিতবে তা নিয়ে আগ্রহী নই, তা নিয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। আমরা হিসাব করতে চাই যে এদের মধ্যে কোন কৌশলটি (বা এদের কোনো মিশ্রণ) স্থিতিশীল হতে পারে।

মনে করা যাক, জীবগোষ্ঠীর সব জীবই বিবাদী নীতি অবলম্বন করছে। তাহলে প্রতিটি প্রতিযোগিতায়, একজন জেতে (+৫০), একজন হারে (০) আর দুজনেই সময় নষ্ট করে (-১০**x**২ = -২০)। সমষ্টিগতভাবে লাভ হয় ৩০ পয়েন্ট, প্রত্যেকের ভাগে যায় ১৫ পয়েন্ট করে। এবার ধরা যাক একটা আগ্রাসী জীব এসে হাজির হল এই গোষ্ঠীতে। সে বিবাদীদের সহজেই লড়াইতে হারিয়ে দেবে, প্রতি যুদ্ধে +৫০ পয়েণ্ট হাসিল করবে। তার ফলে আগ্রাসন নিয়ন্ত্রক জিন খুব সহজেই জীবগোষ্ঠীতে বিস্তার লাভ করবে। এবার ধরি, যথেষ্ট সময় পরে, জীবগোষ্ঠীতে সবাই আগ্রাসী হয়ে গেছে। একইভাবে হিসাব করে দেখা যায়, দুটি আগ্রাসী জীবের লড়াইতে গড়ে -২৫ পয়েণ্ট পায় (জেতায় +৫০, সময় নষ্টে -১০**x**২ = -২০ আর গুরুতর আহত হওয়ায় -১০০)। একটি বিবাদী সেই দলে থাকলে সে সব লড়াইতে হারে, কিন্তু গড়ে সে ০ পয়েণ্ট পায়। ২৫ পয়েন্টের সুবিধা থাকায় সহজেই বিবাদ কৌশল নিয়ন্ত্রক জিন বিস্তার লাভ করবে।

এতদূর পর্যন্ত গল্পটা শুনে মনে হতে পারে যে জীবগোষ্ঠীতে সবসময় এই দুই কৌশলের জীবেদের মধ্যে একটা বাড়াকমা চলবে। আদপে, অংক কষে দেখানো যায় যে বিবাদী আর আগ্রাসী অনুপাত ৫:৭ অনুপাতে পৌঁছলে স্থিতিশীলতা লাভ করে। মানে, ওই অনুপাতে পৌঁছনর পরে প্রতিটি আগ্রাসী আর প্রতিটি বিবাদীর গড়পরতা লাভ-ক্ষতির হিসাব মিলে যায়। নির্বাচনে আর কেউই অন্যের তুলনায় সুবিধা পায় না। যদি কোনোভাবে আগ্রাসীর সংখ্যা এর চেয়ে বেড়ে যায়, তাহলে বিবাদীরা সুবিধা পেতে থাকে, যেভাবে আগ্রাসীদের দলে একটি বিবাদী সুবিধা পেত। একইভাবে দেখানো যায়, মানবসমাজে নারী-পুরুষের স্থিতিশীল অনুপাত ১:১।

মানবসমাজে অনুরূপ নীতি দেখা যায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, যা গেম থিয়োরী দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। কোনো ব্যবসায়ী একই দ্রব্য কমদামে বিক্রি শুরু করলে সে সাময়িকভাবে লাভ বাড়িয়ে ফেলতে পারে, কিন্তু তার প্রতিযোগিরাও সাথে সাথেই দাম কমিয়ে প্রত্যুত্তর দিলে তার আদপে লোকসানই হবে। তাই শেষমেষ নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া ছাড়া বাজারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে লাভ বাড়ানো সম্ভব নয়।

স্বার্থপর জিন ও স্থিতিশীল কৌশল

বিবাদী আর আগ্রাসী নীতি ছাড়াও অনেকরকম কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছেন স্মিথ আর প্রাইস। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রতি-আক্রমণের কৌশল। এই কৌশলে জীব প্রথমে বিবাদীর মত আচরণ করে, কিন্তু আক্রান্ত হলে প্রতি-আক্রমণও করে, বিবাদীদের মত পালিয়ে যায় না। এছাড়াও কোনো কোনো জীব শুরুতে আগ্রাসীদের মত ব্যবহার করে আক্রান্ত হলে পালিয়ে যেতে পারে - সেটাও একটা কৌশল। আর আছে শুরুতে পরীক্ষা করে যাচাই করে দেখে নেবার কৌশল। স্মিথ আর প্রাইস দেখিয়েছেন, এসবের মধ্যে প্রতি-আক্রমণের কৌশল বা টিট-ফর-ট্যাটই হল একমাত্র স্থিতিশীল কৌশল, অর্থাৎ, জীবগোষ্ঠীতে শুধু এই কৌশলই চালু থাকলে, বাকি কৌশল অবলম্বন করে জীবেরা অতিরিক্ত সুবিধা আদায় করে উঠতে পারেনা। শুরুতে পরীক্ষা করে নেবার কৌশলও প্রায় স্থিতিশীল, তবে এই কৌশল অবলম্বনকারী জীবগোষ্ঠীর মধ্যেও প্রতি-আক্রমণকারীরা সামান্য সুবিধায় থাকেন। উৎসাহী পাঠকেরা নিজেরা একই পয়েন্ট সিস্টেমে হিসাব করে দেখতে পারেন কোন ক্ষেত্রে কিভাবে কারা সুবিধাপ্রাপ্ত হয়। প্রকৃতিতে এই পয়েন্ট সিস্টেমের কিছু হেরফের হলেও মূলনীতি প্রায় একই থাকে। মেরু অঞ্চলের পাখীদের ক্ষেত্রে দিনের আলো যেটুকু সময় থাকে তা শিকার না করে নিজেদের মধ্যে মারামারি করলে সময় নষ্ট করার জন্য অনেক বেশী খেসারত দিতে হবে, তাই তাদের ক্ষেত্রে সময় নষ্ট করার পেনাল্টি -১০ এর জায়গায় -৩০ ভাবা যেতে পারে। তাই সাধারণ কিছু গাণিতিক হিসাবে সমগ্র প্রকৃতির হিসাবকে মাপতে গেলে অনেক সতর্কভাবে হিসাব করতে হবে।

এবার আসা যাক আরো একধরণের লড়াইতে - যাকে পরিভাষায় বলা যায় "পলায়নের লড়াই"(War of attrition)। এর মানে, যতক্ষণ না একজন পলায়ন করে, ততক্ষণ এই লড়াই চলে। প্রকৃতিতে এধরণের লড়াই বহুল প্রচলিত - সাধারণত খুব সহজে কাবু হয়না এরকম প্রজাতির (যেমন গণ্ডার) মধ্যে চলে। দুটো জীব একে অন্যের দিকে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী আর তর্জন-গর্জন করতে থাকে, যতক্ষণ না একজন 'রণক্ষেত্র' থেকে পালিয়ে যায়। জেতার জন্য শুধু অপরের থেকে বেশী সময় ব্যয় করতে হয়, সময়ই একমাত্র শক্তি এই

যুদ্ধে। এটা অনেকটা দুজনের মধ্যে নিলাম, যেখানে সময় হল কারেন্সীর সমতুল্য। উদাহরণ দেখতে হলে আমার মনে হয় কোনো জঙ্গলে যাবার দরকার নেই, মানবসমাজে এই পলায়নের লড়াই সর্বত্র চলে, বিশেষত বিশ্বাসের প্রশ্নে। অরকুটে বা অনেক ফোরামে (মুক্তমনাতেও) প্রায়ই দেখা যায় দুপক্ষ নিজের নিজের মতামত একতরফা বলে চলেছে। তারা উভয়েই আলাদা আলাদা মাপকাঠি দিয়ে অপরের মত ভুল আর নিজের মত ঠিক বলে দাবী জানাচ্ছে। লড়াই চলে ততক্ষণ, যতক্ষণ না একপক্ষ ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যায় বা ভাবে এই বিষয়ে আর সময় 'নষ্ট' করা ঠিক হবে না।

ধরা যাক সবাই যদি নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নেয় যে তারা একেকটি বিষয়ে সর্বাধিক এতগুলো পোস্ট দেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রেও কোনো চালাক ব্যক্তি নিয়ম ভেঙ্গে আরো একটা বেশী পোস্ট দিয়ে বাজিমাত করবে (বাস্তবে থাকলেও প্রকৃতির নিয়মে পোস্টের ঊর্দ্ধসীমা নেই)। তাই এই কৌশল ধোপে টিঁকবে না। আবার যে লড়াইতে হেরে যাচ্ছে, সে যদি আগে থেকেই হিসাব করে নিতে পারে যে সে হেরে যাবে, তাহলে সে ওই বিষয়ে কোনো পোস্টই করবেনা, সময়ের অপব্যবহার থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবে। সেক্ষেত্রে আবার যারা শুধু কয়েকটি পোস্ট দিয়ে বাজার 'যাচাই' করে নিতে চায় ক'জন তার সাথে থাকতে পারে, তারা সুবিধাপ্রাপ্ত হবে। কারণ তার সমমতে কয়েকটি পোস্ট আসা-মাত্রই সংখ্যালঘুরা আর বিরুদ্ধে পোস্ট দিয়ে সময় নষ্ট না করার কথা ভাববে। গল্প পড়ে আবার মনে হতে পারে যে কিছুদিন পড়ে অন্যেরা এই কৌশল ধরে ফেলবে আর তারা কয়েকটা বেশী পোস্ট অবধি ধৈর্য ধরবে। আবার আমরা ঘুরেফিরে সেই গল্পের শুরুতে হাজির। তাহলে স্থিতিশীলতা আসবে কি করে? গাণিতিক বা তার্কিকভাবে দেখানো যায় যে প্রতি ব্যক্তি তার নিজের নিজের মত করে লড়াইতে তার নিজের লাভ-ক্ষতির মূল্য যা ভাবে, সেই অনুপাতেই সময় ব্যয় করবে। অরকুটে বা ফোরামে যার বিশ্বাস দৃঢ়তর (অবশ্যবিশ্বাস দৃঢ়তর হলে তার কথাই সঠিক হবে এমন কোনো মানে নেই), সেই জেতে - কারণ তার কাছে জেতার 'মূল্য'ও বেশী। এটাই স্থিতিশীল কৌশল।

এ বিষয়ে কৌশলের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল প্রতিদ্বন্দীকে বুঝতে না দেওয়া যে সে কখন পলায়ন করতে চায়। অনেকসময়েই, ফোরাম ছেড়ে বেরিয়ে যাবার আগে একপক্ষের লেখার দৈর্ঘ্য ছোটো হতে থাকে, যুক্তির তীব্রতা কমতে থাকে - যা থেকে প্রতিদ্বন্দী বুঝে যায় যে এবার প্রতিপক্ষ হার-স্বীকার করতে চলেছে। হিসাবের থেকে সামান্য বেশী হলেও সে তখন সেই অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে লড়াইতে জেতার জন্য। তাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে যাদের পলায়ন আগে থেকেই বোঝা যায়, তারা সুবিধা পায় না। শেষ অবধি যারা একইভাবে লড়াই করতে পারে, তারাই নির্বাচিত হয়, তাই এই কৌশলই স্থিতিশীল।

এখন অবধি যা আলোচনা হয়েছে সব ক্ষেত্রেই ধরে নেওয়া হয়েছে লড়াইতে উভয়পক্ষ সমান বা প্রায় সমমাপের। বাস্তব প্রকৃতিতে কিন্তু তার উল্টোটাও প্রচুর দেখা যায়। মেনার্ড আর প্রাইস এই তত্ত্ব অসম লড়াই-এর ক্ষেত্রেও সফলভাবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন সেখানেও স্থিতিশীল কৌশলে পৌঁছন সম্ভব। তাদের হিসাবমত, অসাম্য প্রধানত তিনপ্রকারের -

১) আকার বা গঠনগত (বাঘ বনাম হরিণ)
২) যুদ্ধে প্রাপ্তি অনুসারে (তৃণভূমি নিয়ে মাংসাশী প্রাণী কেন লড়াই করবে?)

৩) অবস্থান নিয়ে ('হোম গ্রাউন্ড' বনাম 'অ্যাওয়ে গ্রাউন্ড')। এর মানে হল যুযুধান দুই পক্ষের এক পক্ষ আগে থেকেই সেখানকার বাসিন্দা আর অন্যপক্ষ অনুপ্রবেশকারী।

এবার দেখা যাক তৃতীয় প্রকারের অসাম্যের (হোম আর অ্যাওয়ে) সাপেক্ষে স্থিতিশীলতা কিভাবে আসতে পারে। সাধারণ হিসাবে বোঝা যায় যে "বাসিন্দা জেতে আর অনুপ্রবেশকারী পালায়" - এরকম কৌশল স্থিতিশীল। কারণ কোনো এক জীব যদি সর্বদা আক্রমণের কৌশল অবলম্বন করে, তাহলে সে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ভাল ফল করলেও বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে জড়িয়ে পড়ে অর্ধেক লড়াইতে আহত হবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে। অপরদিকে, জীবগোষ্ঠীর বাকি জীবেরা কোনো লড়াইতেই যাচ্ছেনা, কেউ না কেউ পালিয়েই যাচ্ছে। তাই তারা ওই আগ্রাসী জীবের তুলনায় সুবিধাপ্রাপ্ত হবে। একই ভাবে দেখা যেতে পারে "বাসিন্দা পালায় আর অনুপ্রবেশকারী জেতে" - এটাও একটা স্থিতিশীল কৌশল - যদিও প্রকৃতিতে এর উদাহরণ খুবই কম। কারণ, সাধারণত বাসিন্দারা নিজেদের অবস্থানগত সুবিধার কারণে সেই জায়গা সম্পর্কে বেশী ভাল ধারণা রাখে, যা তাদের লড়াইতে সাহায্য করে। স্মিথের মতে, এই দ্বিতীয়টি একরকম বিভ্রান্তিকর কৌশল। কারণ, এর ফলে, বাসিন্দ বলে আর কিছু থাকে না - যে অনুপ্রবেশ করে সেই অন্যেকে একরকম তাড়িয়ে দেয়। আর প্রথমটি প্রকৃতিতে সর্বত্র দেখা যায় - যাকে বলে আঞ্চলিক আচরণ (Territotorial behaviour)।

এই আঞ্চলিক আচরণের একটা ভাল নিদর্শন দেখা যায় নিকো টিনবার্জেন-এর পরীক্ষায়। তিনি একটি অ্যাকোরিয়ামের দুপাশে দুটো যুদ্ধবাজ মাছ ছেড়ে দিলেন। তারা দুপাশে দুটো বাসাও বানিয়ে ফেলল এবং নিজেদের বাসার প্রতিরক্ষাও করতে থাকল। এবার উনি দুটো টেস্ট-টিউবে মাছদুটোকে আলাদা করলেন। এবার তাদের পাশাপাশি আনলেই দেখা যায় তারা কাঁচের ওপারে থাকা প্রতিদ্বন্দীর সাথে মারামারি করতে উদ্যত হচ্ছে। মজার ব্যাপার হল, যদি টেস্ট-টিউব দুটোকে যদি একজনের বাসার কাছে বসিয়ে পাশাপাশি আনা যায় তাহলে দেখা যাবে যার বাসার কাছে সে মারমুখী, আর অপরজন পালাতে ব্যস্ত। বিবর্তনের পথে "বাসিন্দা জেতে আর অনুপ্রবেশকারী পালায়" - এই স্থিতিশীল কৌশল মাছগুলো আয়ত্ত করে ফেলেছে।

কিন্তু মেক্সিকোর সামাজিক মাকড়সা আচরণে ভিন্ন। কোনো মাকড়সা নিজের জালে বসে আক্রান্ত হলে সে পাথরের অপরদিকে চলে যায় ও সেখানকার মাকড়সাটাকে উৎখাত করে। এভাবে একে অপরকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গা দখল করা চলতে থাকে যতক্ষণ না কোনো এক মাকড়সা নতুন জায়গা পেয়ে যায়। এদের আচরণ দ্বিতীয় স্থিতিশীল কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে বিবর্তনের পথে "বাসিন্দা পালায় আর অনুপ্রবেশকারী জেতে" - এই স্থিতিশীল কৌশল মাকড়সারা নির্বাচনের মাধ্যমে আয়ত্ত করে ফেলেছে।

কিন্তু যদি যুযুধান প্রত্যেক পক্ষ আগের যুদ্ধের ফলাফল মনে রেখে চলে তাহলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায় - যুদ্ধের ফলে লোকসানও কম হয়। দেখা গেছে ঝিঁঝিঁপোকা পুরোনো লড়াইয়ের ফলাফল মনে রাখতে পারে। যে ঝিঁঝিঁপোকা আগে বেশ কয়েকটি লড়াইতে জিতেছে সে আগ্রাসী নীতিতে বিশ্বাসী হবে সেটা বলাই বাহুল্য। আর ডি আলেক্সান্ডার নামে এক বিজ্ঞানী ঝিঁঝিঁপোকার ঠিক এই বিশ্লেষণই করেছেন। প্রতিটি ঝিঁঝিঁপোকা তার সমাজে নিজের লড়াই করার ক্ষমতার হিসাব রাখে - মনে রাখে ক'জনকে সে হারাতে পারে

আর ক'জনকে সে পারেনা। এজন্যই একদল ঝিঁঝিঁপোকাকে একসাথে সমাজবদ্ধ করে রাখলে কিছুদিন পরে তার মধ্যে একটা শ্রেণীবিভেদ বা হায়ারার্কি আসতে বাধ্য। ওপরের শ্রেণীর পোকারা নিচের শ্রেণীর বিরুদ্ধে আগ্রাসী হবে আর নিচেররা সহজে পালিয়ে যাবে। এমনকি উচ্চশ্রেণীর লড়াই করার ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও সেই ঝিঁঝিঁপোকারা সহজে পার পেয়ে যায়, কারণ মনে রাখার এই কৌশল সামগ্রিকভাবে বিবর্তনগত ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। সাধারণভাবে এর ফলে দলের মধ্যে লড়াই অনেক কমে যায়, ঝিঁঝিঁপোকার সংখ্যাবৃদ্ধিও ত্বরান্বিত হয়। এই একই শ্রেণীবিভাগের আরো প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখা যায় বাঁদর আর মুরগীদের মধ্যে।

এতো গেল একই প্রজাতির মধ্যে লড়াইয়ের কথা, দুটো আলাদা প্রজাতির মধ্যে কিভাবে বিবর্তনগত ভারসাম্য আসে? আগেই বলে রাখা ভাল, আলাদা প্রজাতির মধ্যে বিবাদের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে অনেক কম, কারণ তাদের বেঁচে থাকার কৌশল অধিকাংশ সময়েই আলাদা। একই জায়গায় পিঁপড়ে আর সিংহ থাকলে তাদের কোনো সমস্যা নেই কারণ তারা আলাদা ধরণের খাবার খেয়ে বেঁচে থাকে। কিন্তু আবার হরিণ আর সিংহের ক্ষেত্রে ঘটনাটা অন্যরকম। সিংহ হরিণের মাংস খেতে চায় অথচ হরিণ বেঁচে থেকে বংশবিস্তার করতে চায়। এক্ষেত্রে হরিণের মাংস উভয়েরই জীবনধারণ কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ (Common resource) - তাই তা নিয়ে বিবাদ হবেই। তাহলে সিংহ আরেকটা সিংহের (বা এমনকি বাঘের) মাংস খাবার চেষ্টা করেনা কেন? এরও কারণের মূলে আছে বিবর্তনগত ভারসাম্য। এই মাংসাশী কৌশল ভারসাম্য রক্ষায় সফল হবে না - যদি এক সিংহ আরেকটিকে আক্রমণ করে তার মাংস খাবার চেষ্টা করে। এর ফলে প্রজাতির নিজেদের মধ্যে লড়াই আর তার ফলে প্রতিটি লড়াইতে প্রজাতির সামগ্রিক ক্ষমতা হ্রাস পাবে কারণ কেউ না কেউ লড়াইতে মারা যাবেই।

প্রকৃতিতে কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া দেখা যায় যে সাধারণভাবে দুই প্রজাতির বিবাদে একপক্ষ লড়াই না করেই পালিয়ে যায় কারণ দুই প্রজাতির মধ্যে সাধারণভাবে শক্তির সাম্য থাকে না। "আকারে শক্তিশালী হলে পালিয়ে যাও আর দুর্বল হলে আক্রমণ কর" - এরকম কৌশল বিবর্তনগত স্থিতিশীল। হরিণ আর সিংহ এভাবেই জঙ্গলে সাম্য রক্ষা করে - এক পক্ষ ক্রমাগত তাড়া করায় দক্ষ হয়ে ওঠে আর আরেকপক্ষ পালাতে। কোনো হরিণ যদি হঠাৎ করে সিংহের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায় তাহলে তার সাফল্যের সম্ভাবনা নেই, তাই সেই বৈশিষ্ট্যও প্রজাতিতে দেখা যায় না।

এভাবেই জিনের স্বার্থপরতা প্রকৃতিতে ভারসাম্য বজায় রাখে। যদি কোনো জিন এই কৌশলের বিরুদ্ধে যেতে চায়, তৎক্ষণাৎ তার বিস্তার সংক্ষেপিত হয়, কারণ জিনবাহক জীব প্রকৃতিতে লড়াইতে সাফল্য পায় না। আর, যারা মেনে চলে, তারা সহজেই বংশবিস্তার করে জিনের স্বার্থপরতার জাল বুনে চলে। কিন্তু প্রজাতি এই স্বার্থপর জিনের ফাঁদে পড়াই যে স্বার্থপর হয়ে উঠবে তেমন কিন্তু নয়, প্রজাতি বরং নিজের জিন বিস্তারের উদ্দেশ্যে আপাতদৃষ্টিতে হয়ে উঠবে আরো সমাজবদ্ধ আর সহমর্মি। তাই যোগ্যতমের জয়ের কৌশল নিজেদের মধ্যে হানাহানি নয়, তা লুকিয়ে আছে নিজেদের সহযোগিতার মধ্যেই।

স্বার্থপর জিন ও আত্মত্যাগ

শুধুমাত্র আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে থাকিলেই বিবর্তনে সুবিধা পাওয়া যায় - এটি যে ভ্রান্ত ধারণা তা আগের অংশে পরিস্কার করেছি। আগ্রাসী জীবেদের নিজেদের মধ্যে মারামারি করার প্রবণতা তাদের বিবর্তনগত ভারসাম্যে পৌঁছতে বাধা দেয়, যার ফলে সেই "আগ্রাসী জিন" স্থায়ী হতে পারে না। এবারে লিখছি দলবদ্ধ জীবদের নিয়ে। প্রকৃতিতে এইরকম দলবদ্ধ জীবের সংখ্যাই বেশী। পাখিরা জোট বেঁধে ওড়ে, মাছ দলে দলে সাঁতার কাটে, পোকামাকড় দলবেঁধে বাসা বানায় বা হায়েনারা দল বেঁধে শিকার করে। এখানে আলোচ্য মূল প্রশ্ন হল - এই দলবদ্ধ থাকার সহজাত প্রবণতা কিভাবে স্বার্থপর জিন তত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে? প্রতিটি জীব স্বার্থপর হলে কি তাদের দল গঠিত হতে পারে না? আরো বড় কথা সেই দল বা পরিবারের জন্য সহজাত আত্মত্যাগের কি ব্যাখ্যা হতে পারে? আর একই তত্ব দিয়ে জীব কিভাবে উপকারীর উপকার করতে শেখে তা নিয়েও আলোচনা করছি।

প্রথমেই নজর দেওয়া যায় দলবদ্ধ ভাবে থাকার স্বাভাবিক কিছু সুবিধার দিকে। একসাথে শিকার করায় হায়েনাদের শিকার পাবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। পেঙ্গুইনেরা নিজেদের মধ্যে জড়াজড়ি করে হাঁটে, যাতে এদের ঠান্ডা কম লাগে। একসাথে সাঁতার কাটলে সামনের মাছের তৈরী প্রবাহের মধ্যে শরীর ভাসিয়ে সাঁতার কাটাও সহজ হয়। আর V-আকৃতির জোট করে পাখিরা দূর-দূরান্তে পাড়ি দেয় একই প্রবাহ-জনিত সুবিধার কারণে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে হ্যামিল্টনের স্বার্থপর জোটের মডেলে কথা। ভুল বোঝার অবকাশ না রাখার জন্য বলে রাখা ভাল, এখানে স্বার্থপর জোট বলতে স্বার্থপর জীবের জোট বোঝানো হচ্ছে।

ডিসকভারি বা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে আমরা অনেকবারই দেখেছি বাঘের হরিণ শিকার করার দৃশ্য। মোটামুটি একটা সংক্ষিপ্ত জায়গার মধ্যে হরিণ দলবেঁধে চরে বেড়ায়। বাঘ যখন আক্রমণ করে, কাছাকাছি একটা হরিণকে বেছে নিয়ে তাড়া করে ধরে ফেলে। খুব স্বাভাবিকভাবেই বাঘের নজর থাকে দলের প্রান্তবর্তী হরিণগুলোর দিকে, যাদের ধরতে পারলে বাঘের শক্তিক্ষয় কম হবে। আর একই কারণে, হরিণদের দল গঠনের সময়ে সব হরিণই চাইবে যত পারা যায় দলে মাঝখানে থাকতে যাতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কমে যায়। ঘাস খাবার সময়ে হয়ত কিছুটা বিচ্ছিন্ন হবার দরকার পড়ে, কারণ মাঝের অংশে ঘাস দ্রুত কমে যায়। কিন্তু সাধারণভাবে চলাচল করার সময় হরিণেরা (ভাল দেখা যায় ভেড়াদের মধ্যে) যথাসম্ভব গা ঘেঁষাঘেঁষি করে চলতে থাকে। দূর থেকে দেখে এরা দলবদ্ধ বলে মনে হলেও এর পেছনে আছে প্রত্যেকের নিজ-নিজ স্বার্থপর উদ্দেশ্য - বিপদ-এলাকা কম করা আর প্রান্ত ছেড়ে মাঝের দিকে আসার প্রবণতা। এই ধরণের জোটকেই বলা যায় স্বার্থপর জোট - যেখানে সবাই নিজের স্বার্থের জন্যই জোট বেঁধে থাকে।

তবে, প্রকৃতিতে জোট-গঠন ছাড়াও সহমর্মিতার আরো অনেক উদাহরণ আছে যা এই মডেল দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। সবথেকে বড় সমস্যা হয় যেখানে জীব নিজের বিপদ এনেও দলকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। আপাতত সেরকম কয়েকটা উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। ছোটো অনেক পাখি আছে যারা বাজ বা ঈগলের মত শিকারী পাখি দেখলেই কিচিরমিচির শব্দ করে দলের বাকি পাখিদের সতর্ক করে দেয়। এর ফলে ওই পাখিটার বিপদ কিছুটা বেড়ে যায়, কারণ শিকারী তাকে সহজেই খুঁজে পেতে পারে। সে কিন্তু ইচ্ছা করলেই বিপদ বুঝে সটকে পড়তে পারে, কিন্তু সে তা না করে নিজেকে শিকারীর নিশানায় এনেও দলকে সাহায্য করছে - এই আত্মত্যাগের ব্যাখ্যা কি হতে পারে? এই ঘটনার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আগে একটা ব্যাপার বলে রাখা ভাল। পাখিদের এই এল্যার্ম কল নিয়ে বিশদ গবেষণা করে শব্দবিজ্ঞানী মার্লার দেখিয়েছেন এই ডাকগুলো এমনভাবে ডাকা হয় যাতে শিকারীরা কিছুতেই ডাক কোথা থেকে আসছে বুঝতে না পারে। স্বাভাবিকভাবে, কোনো এক সময়ে এই এল্যার্ম কল ঠিকঠাক না আসায় অনেক পাখি শিকার হয়েছে। তাই যাদের এল্যার্ম কল ঠিকঠাক, তারা বেঁচে থেকে বেশী বংশবৃদ্ধি করেছে। এল্যার্ম কল দেওয়ায় সুপটু করে তোলার জিনও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে স্বার্থপরের মত পাখিদের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে।

এবার আসা যাক আত্মত্যাগের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে। সাধারণভাবে দেখা যায় যে একই গোষ্ঠীতে জীবের "কিন" বা আত্মীয় থাকার সম্ভাবনা বেশী। আর আত্মীয়দের মধ্যে একই ধরনের জিন থাকার সম্ভাবনাও বেশী। তাই "কিন সিলেকশন" তত্ত্ব অনুসারে জীব নিজের স্বার্থপর জিনের "কপি" বাঁচানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুটো ভিন্ন প্রেক্ষাপটে দেখা যাক এল্যার্ম কলের গুরুত্ব।

একধরনের পাখি আছে যারা মাটিতে চরে বেড়ায়। শিকারী আক্রমণ করলে তাদের আত্মরক্ষার সহজ উপায় হল আশেপাশের ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে পড়া। ধরা যাক এরকমই একটি পাখির দলে একটি পাখি এক শিকারীকে আগেভাগে দেখে ফেলেছে। যেকোন মুহূর্তে এরপরে শিকারী আঘাত হানবে। এখন তার কাছে দুটো পথ খোলা আছে - প্রথমটি হল নিজের মত চুপচাপ ঝোপে লুকিয়ে পড়া, আরেকটা হল সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া। এখানে ভেবে দেখলে বোঝা যায়, পাখিটা যদি একা একা ঝোপে লুকিয়েও পড়ে, শিকারী আক্রমণ করলে গোটা দলই বিপদে পড়বে। শিকারী যদি দলবেঁধে আসে, তাহলে তো কথাই নেই। অন্যদিকে, শিকারী আঘাত হানার আগেই যদি সবাই মিলে লুকিয়ে পড়া যায়, তাহলেই বেঁচে যাওয়া যাবে। এধরনের পাখিরা তাই হিস-হিস শব্দে বাকিদের সতর্ক করে দেয়।

আরেক ধরনের পাখির কথা আসে, যারা আক্রান্ত হলে দলবেঁধে উড়ে পালিয়ে যায়। আগেরবারের মতই ভাবা যাক যে কোনো এক শ্যেনদৃষ্টি পাখি শিকারীকে আগে থেকেই দেখে ফেলেছে। এখন সে একা উড়ে যেতে পারে। কিন্তু শ্বাপদসংকুল পৃথিবীতে একা উড়ে গেলে তার বিপদের সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়া ছাড়া কমে না। শিকারী পাখিরা সাধারণত এরকম একা-হয়ে-যাওয়া পাখিদেরই আক্রমণ করে সহজ শিকার বানিয়ে ফেলে।

পড়ে যদি তার আবার দলে ফিরে আসার সম্ভাবনাও থাকে তাও সাময়িকভাবে তাকে একা হয়ে যেতে হবে। তাই এই অবস্থানে সবথেকে ভাল নীতি হল নিজেও উড়ে পালানো, আর সাথে আর সবাই যাতে পালায় সেজন্য কিচিরমিচির শব্দে তাদেরও সতর্ক করে তোলা। হ্যামিলটনের এই তত্ত্ব ঠিক হোক বা না হোক, পাখিদের মধ্যে এই আচরণ বারে বারে একই রকম ভাবে দেখা যায়।

বেঁচে থাকার পথে এই কৌশল খুবই দক্ষ। এই এল্যার্ম কল নিখুঁত না হবার কারণে যেমন অনেক পাখি শিকারে পরিণত হয়েছে, তেমনই এল্যার্ম কল না দেওয়ার কারণে অনেক দলও বিপদগ্রস্ত হয়েছে। সবে মিলে এল্যার্ম কল যারা ঠিকঠাক দিতে পেরেছে, সময়ের সাথে সাথে তাদের স্বার্থপর জিন বেশী হারে ছড়িয়ে পড়েছে। জীব নিজে স্বার্থপরের মত এল্যার্ম কল দিতে শিখেছে আর তা দেখে আমরা তাদের আত্মত্যাগের কথা ভেবে বিমোহিত হয়েছি।

ঘনিষ্ঠতা ও স্বার্থপর জিন

আরো জটিল কিছু উদাহরণের মাঝে ডুব দেওয়ার আগে চট করে একটা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা সেরে ফেলা যাক। জিন তো হল জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রক - একেকটি জিন একএকভাবে জীবের প্রকৃতি ও আচরণে প্রভাব আনে। কিন্তু, এই যে লেখার শিরোনামে "স্বার্থপর জিন" বলে একটা খটমটে তত্ত্বের নাম দেখা যাচ্ছে, সেটার মানে কি? সহজ করে বললে, যে জিন জীবগোষ্ঠীর মধ্যে নিজের উপস্থিতি বাড়িয়ে তুলতে সর্বদা সচেষ্ট, তাকেই বলা যায় "স্বার্থপর জিন"। রিচার্ড ডকিন্সের তত্ত্ব অনুসারে, যে জিন যত "স্বার্থপর" হবে - মানে নিজের উপস্থিতি বৃদ্ধিতে যত সচেষ্ট হবে, সেই জিনই জীবজগতে বেশী করে স্থান করে নেবে। কিন্তু জিনের তো নিজস্ব কোনো সচেতনতা নেই, তাহলে সে কিভাবে স্বার্থপর হতে পারে? সমাধানটাও সহজ। যে জিনের প্রভাবে জীব নিজের জিন বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হবে, সেই জিনই নির্বাচিত হবে - যেন, জিন চালকের আসনে বসে জীবকে নিয়ন্ত্রণ করে এমনভাবে চালাচ্ছে, যাতে সে জিনের আরো "কপি" তৈরীতে সাহায্য করে - নিজের "স্বার্থে" জীবকে চালনা করছে। "কপি" করার এক পদ্ধতি তো প্রজনন, কিন্তু আরো এক ভাবে জিনের স্বার্থপরতা প্রকাশ পায়। অন্য যে জীবের শরীরে একই জিন উপস্থিত আছে, জীবকে তার প্রতি পক্ষপাতিত্বে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু কিভাবে জানা সম্ভব কার দেহে কিসের জিন আছে? প্রকৃতিতে একটাই উপায় আছে এটা অনুমান করার - আত্মীয়তা। একদল নিকটাত্মীয়কে বাঁচানোর জন্য যদি কোনো জীব প্রাণ বিসর্জন দেয়, তাহলে তা হবে কোনো এক এরকম "স্বার্থপর জিন"-এর "প্ররোচনা" বা প্রভাবে - কারণ জীব নিজে মরে গেলেও তার জিনের "কপি" কিন্তু তার নিকটাত্মীয়দের দেহে সুরক্ষিত থাকার সম্ভাবনা খুবই বেশী। বিবর্তনের দৃষ্টিতে দেখলে, যে জিন জীবকে নিকটাত্মীয়দের সাথে ঘনিষ্ঠ করে তোলে বা তাকে নিকটাত্মীয়দের জন্য প্রাণ অবধি দিতে প্ররোচিত করে, সেই জিনের নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা বেশী - কারণ, জীবগোষ্ঠীতে এই জিনের "কপি" বেড়েই চলবে। ক্রমে, জীবের বৈশিষ্ট্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে এই ঘনিষ্ঠতা - জীবজগতে এর ব্যতিক্রম মেলা দুস্কর। এই একই কারণে জীবের বাবা-মায়ের পক্ষপাতিত্ব পেয়ে বড় হয়। বিজ্ঞানী ফিশার,

হ্যালডেন আর সর্বোপরি হ্যামিল্টনের প্রতিষ্ঠিত এই তত্ত্বই জনসমক্ষে এনেছেন রিচার্ড ডকিন্স তার "সেলফিশ জিন" বইতে।

হ্যামিল্টন আরো এক ধাপ এগিয়ে গাণিতিকভাবে হিসাব করার চেষ্টা করেছেন ঠিক কতটা নিকট আত্মীয় হলে তার জন্য জীব প্রাণ দিতেও প্রস্তুত থাকে। তার বক্তব্য হল - এক জীব অপর এক জীবের সাথে যতটা জিন শেয়ার করে, ততটাই তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু বাস্তবে কেউ জানে না কে কতটা জিন শেয়ার করে, তাই জীব শেয়ার করার সম্ভাবনার ওপর দিয়ে "হিসাব" করে। এই হিসাব মত, সন্তান বাবা-মায়ের ৫০% জিন শেয়ার করার সম্ভাবনা রাখে, তাই সন্তানের সাথে ঘনিষ্ঠতা ৫০% বলা যায়। একই ভাবে সন্তানদের নিজেদের মধ্যে জিন শেয়ার করার সম্ভাবনাও ৫০% - তাই তাদের মধ্যেও ঘনিষ্ঠতা সমান। কিন্তু তুতো ভাই-বোনেদের সাথে জিন শেয়ার করার সম্ভাবনা ১২.৫%, তাই এদের ঘনিষ্ঠতাও তুলনায় কম । এই ঘনিষ্ঠতার কারণটা খুবই সহজাত। স্বার্থপর জিন জীবকে বিবর্তনে এমন পথে নিয়ে চলে যাতে তার জিন-বিস্তারে সে উদ্যোগী হয়। যার সাথে সে বেশী জিন শেয়ার করবে, তার জিন-বিস্তার একরকম তার নিজের জিন-বিস্তারের সমতুল্য - যত ঘনিষ্ঠতা বাড়বে, তত বাড়বে নিজের জিন বিস্তারের সম্ভাবনা। এখন এ থেকে সহজেই অনুমেয় কিভাবে জীব তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হয় - নিজে মরে গেলেও তার জিন-বিস্তারের সম্ভাবনা মরে না। তাই এই পরোপকারী জিন বিস্তৃত হয় - জীবসমাজে স্থান করে নেয়।

এবার অনেকেই প্রশ্ন করবেন কেন অপত্যের তুলনায় বাবা-মায়ের আত্মবিসর্জন দেবার প্রবণতা বেশী দেখা যায় জীবজগতে? কারণ ব্যাখ্যা করা যায় অন্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। অপত্য জীবের বয়স কম বলে তার জিন সঞ্চারের সম্ভাবনাও বেশী বাবা-মায়ের তুলনায়। তাই অপত্যস্নেহের জিন ভারসাম্য রেখে জীবসমাজে স্থান পেয়ে গেছে। উদাহরণ হিসাবে ধরা যায় যে মনে করা যাক এক বাবার মধ্যে এই অপত্য-স্নেহের জিন আছে। তার চার বাচ্চাকে বাঁচাতে গিয়ে সে মারা গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই অপত্য-স্নেহের জিন তাদের বংশবিস্তারের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে, আর বাড়িয়ে তোলে জিনপুলে নিজের অস্তিত্ব। তাই এই অপত্য-স্নেহের জিন আসলে একটি স্বার্থপর জিন - জিনপুলে নিজের সংখ্যা বাড়াতে সদা-"সচেতন"। অন্যদিকে, স্বার্থপর জিন মোটেও জীবকে স্বার্থপর করে তোলে না, বরং ঘনিষ্ঠদের ক্ষেত্রে পরোপকারী করে তোলে।

দিগন্ত সরকার, পেশায় কম্পিউটার প্রকৌশলী, মূল আগ্রহ বিজ্ঞান-সংক্রান্ত লেখায়। অর্থনীতি, রাজনীতি বা অন্যান্য বিষয়েও লিখে থাকেন। মুক্তমনার নিবেদিতপ্রাণ সদস্য। বর্তমান নিবাস সিয়াটেল, আমেরিকা।
ইমেইল - diganta.sarkar@gmail.com

প্রসংগ - নৈতিকতা

পুরুজিত সাহা

সব বাক্যই কি সত্য বা মিথ্যা হয়? সব বাক্যের সত্য মিথ্যা কি একই ভাবে জানা যায়? নিচের বাক্যদুটি খেয়াল করুনঃ

১। প্রোটন ইলেকট্রনের চেয়ে ভারি।
২। প্রতিশ্রুতি ভংগ করা অনৈতিক।

প্রথমটা হয় সত্য নয় মিথ্যা, পরীক্ষা করে সত্যতা যাচাই করাও অসম্ভব কিছু না। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটার বেলায় সবার প্রতিক্রিয়া একরকম হয় না - কেউ বলে এটা ধ্রুবতারার মতোই সত্য, আবার কেউ বলে পরিস্থিতি নির্ভর।

এদের মাঝে এপিস্টেমোলজিক্যাল* পার্থক্য আছে নাকি নেই সেইটাই দর্শনের লাখ টাকার প্রশ্ন।আসলে লাখ টাকার ২টা প্রশ্ন। প্রথম বাক্যটির সত্য মিথ্যা মূল্যায়ন করা সম্ভব এবং সবাই মোটামুটি একমত যে বাক্যটি হয় সত্য নয় মিথ্যা ; একই সাথে সত্য আর মিথ্যা হওয়া সম্ভব নয় এবং সত্য মিথ্যা কোনটিই নয় এমনটাও হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয় বাক্যটির ক্ষেত্রে কি একই কথা বলা চলে?এবং যদি বলা চলে তাহলে কিসের ভিত্তিতে?

গত পরশু দেখা দ্য শেপ অফ থিংসের† একটা চরিত্রের (নায়িকা বললে রাজনৈতিক ভুল হবে, হেহে) মুখে ঠিক এই ধরনের একটা সংলাপ ছিল। নায়িকা তার আর্ট প্রজেক্টের জন্য এক মানুষ সাবজেক্ট বাছাই করে, তার প্রজেক্ট থাকে বাহ্যিক চেহারার সাথে মানুষের আচরণের সম্পর্ক দেখানো (এরা যে আর্ট প্রজেক্টের নামে কত কিছু করে!)। ঠিকই শেষ পর্যন্ত দেখা যায় আমাদের সাবজেক্ট, যে কিনা সিনেমার শুরুতে একই সাথে কুৎসিত এবং লাজুক, সেই সিনেমার শেষে এসে ক্যাম্পাস রোমিও - চেহারা, আচরণ দুটোতেই।

সিনেমার শেষ দৃশ্য ছিল তাদের দুজনের বোঝাপড়া। এভেলিন (শিল্পী) এর যুক্তি ছিল, আমরা সবাই নিজেদের বাস্তবতা তৈরি করি এবং তার উপরেই আমাদের নৈতিকতাকে বসাই। যদি সে শুরু থেকেই তার আর্ট প্রজেক্টের জন্যই এডামের সাথে ফ্লার্ট করে থাকে তাহলে সে তার বাস্তবতা অনুযায়ী কোন অন্যায় করে নি। যদিও এডামের বাস্তবতায় সেটা ভুল হতে পারে।অর্থাৎ এভেলিন মনে করে যে নৈতিকতা চিরন্তন কিছু না, ব্যক্তিনির্ভর।

---

* এপিস্টেমোলজি : দর্শনের একটা শাখা যেটা আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতি নিয়ে ভাবে - অর্থাৎ আমরা কী জানতে পারি এবং কোন ভাবে সেটাই এই শাখার আলোচ্য বিষয়।

† দ্য শেপ অফ থিংস সিনেমাটা খুবই ভাল। রাচেল ভাইৎস (দ্য মামি) আর পল রাড (ফ্রেন্ডস এর ফিবির শেষ বয়ফ্রেন্ড) দুজনেই অসাধারণ অভিনয় করেছে।

লেখাটার শুরুতে যে দুটা প্রশ্নের কথা তুলেছিলাম, তার তিন রকম জবাব নিয়ে এখনো ধুন্ধুমার লড়াই চলছে। একদল বলেন যে, নৈতিক বাক্যের সত্য মিথ্যা হয় না; এধরনের বাক্য শুধুমাত্র কোন কাজে আমাদের আপত্তি প্রকাশ করে। আরেকটু ভেঙ্গে বললে তারা বলতে চান যে "চুরি করা অন্যায়" আর "চুরি!!!" দুটো বাক্যই আমাদের একই তথ্য দেয় আর তা হচ্ছে বক্তা চুরি কাজটা পছন্দ করছেন না। অন্যায় শব্দটা একটা বিস্ময়বোধক চিহ্নের বেশি কোন অর্থ বহন করে না।

আরেকদল বলেন নৈতিক বাক্যের সত্য মিথ্যা হয় আর এ ধরনের সব বাক্যই মিথ্যা। এখানে ভুল বোঝার অবকাশ আছে, তাই বুঝিয়ে বলছি। এ দলের মতে, কেউ যখন বলে "চুরি করা অন্যায়" তখন বাক্যটার একটা উহ্য অংশ থাকে। পুরো বাক্যটা হবে, "চুরি করা চিরন্তনভাবে অন্যায়" এবং এই পুরো বাক্যটাকে তারা মিথ্যা বলে দাবি করেন[‡]।

তৃতীয় দলের মতে নৈতিক বাক্যের সত্য মিথ্যা হয় না এবং কিছু কিছু নৈতিক বাক্য সত্য। এদল বাকি দুই দলের যুক্তি খন্ডন করতে ওস্তাদ (নইলে তো তাঁদেরকেই বুঝাতে হবে কি করে নৈতিক বাক্য সত্য বা মিথ্যা হয়)। এঁরা মূলতঃ দেখান যে, যেসব যুক্তি ব্যবহার করে, নৈতিকতাকে খারিজ করে দেয়া হয় তা ব্যবহার করলে পুরো দর্শনকেই খারিজ করে দেয়া যায়।

জটিল সমস্যা!পাঠক (যদি এখনো কেউ থাকে), তুমি কোন দলে?

এখন বলে রাখা ভাল, এবারের ক্লাসটাতে ঢোকার আগে পর্যন্ত আমিও এভেলিনের মতোই ভাবতাম। বলা বাহুল্য ক্লাসে ঢোকার মিনিট দশেকের মাঝে নিজের ভুল বুঝতে পারি।

ঈশ্বর বলেছেন...

কিভাবে নৈতিক সিদ্ধান্তগুলো নিতে হয় এই বিষয়ে দার্শনিক মহলে তিনটা মতবাদ মোটামুটি জনপ্রিয় - কর্তব্যবাদ (Deontology), পরিণতিবাদ (Consequentialism) আর মহত্ববাদ (Virtue Ethics)। (আমজনতা অবশ্য বেশি বিশ্বাস করে কর্তব্যবাদে আর কাজ করে পরিণতিবাদ অনুযায়ী, হে হে।) প্রথমটার মূলনীতি হল, কিছু কিছু কাজ সব সময়েই খারাপ; পরিস্থিতি যাই হোক না কেন। (বাকি দুটো নিয়ে পরে একসময় লিখব, আশা করি।)

[‡] অনেকেই নৈতিকতা জিনিসটাকে পুরোপুরি পরিস্থিতি নির্ভর মনে করেন। যেমন, চুরি করা অন্যায়, কিন্তু রবিনহুডের মত চুরি করে সম্পদ দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দেয়াকে হয়ত অনেকেই অন্যায় ভাববেন না। 'মানুষ মারা অন্যায়' এ ব্যাপারটাও পরম কিছু নয়। যেমন, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু নিধন করা নৈতিকতার বরখেলাফ নয়। কিন্তু এদের নিয়ে সমস্যা হল, এই দলে থাকতে হলে ২টা অপশন -

১। সব নৈতিকতাকেই পরিস্থিতিনির্ভর বলতে হবে অথবা
২। খুব যত্ন করে নৈতিকতাকে ২ ভাগে ভাংতে হবে - একভাগ চিরন্তন আর আরেক ভাগ পরিস্থিতিনির্ভর।

প্রথম অপশনের দুর্বলতা হল, ধর্ষন বা শিশু নির্যাতনের মত অনৈতিক কাজগুলোকে পরিস্থিতিনির্ভর ভাবা কষ্টকর। অতএব মেনে নিতেই হয় সবকিছু আমরা পরিস্থিতিনির্ভর মনে করি না। দ্বিতীয় অপশনটাও ঝামেলার - চুরি করা আর ধর্ষন ভিন্ন মাত্রার অপরাধ, কিন্তু কেন?

বহুদিন ধরেই ধর্ম এই ভাল খারাপ নির্ধারণ করে দেবার দায়িত্ব পালন করে আসছে। আমরা এখন ধর্মের নৈতিক আইনগুলোতে এতটাই অভ্যস্ত যে ভাবতেও অবাক লাগে মাত্র দু হাজার বছর আগেও ধর্ম আর নৈতিকতা অনেকটাই ভিন্ন পরিমন্ডলের জিনিস ছিল। বস্তুতঃ সেন্ট পলের ধর্ম ছড়িয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত ধর্মের ভূমিকা ছিল অনেকটা জাগতিক, দেবতারা মানুষের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তেন, মানবীর সাথে প্রেমে পড়তেন, মোদ্দাকথায় মানবিক ভুলগুলো করতেন! এই ধরনের দেবতার একটা গালভারি নাম আছে - Anthropomorphic। ঈশ্বরের নৈতিক অবস্থান পারসী আর ইহুদীদের তৈরি যা ছড়িয়ে পড়ে রোমানদের হাত ধরে সারা বিশ্বে।

এই বিশাল পরিবর্তনের মাত্র তিন চারশ বছর আগেই কিন্তু প্লেটো ধর্ম ভিত্তিক নৈতিকতার সবচেয়ে বড় সমস্যাটা দেখিয়ে গেছেন। ইউথাইফ্রোতে সক্রেটিসের জবানে প্লেটো একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরলেন - দেবতারা কোন কাজ পছন্দ করেন বলে কাজটি ভাল নাকি কাজটি ভাল বলে দেবতারা পছন্দ করেন? যদি প্রথমটি সত্য হয় তাহলে নৈতিকতা ঈশ্বরের কেবল আরেকটা সৃষ্টি মাত্র, এর আর বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই।বস্তুতঃ, নৈতিকতা কারো খামখেয়ালী সৃষ্টি এটা আমাদের নৈতিক চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমজনতার পক্ষে এটা ভেবে নেয়া কষ্টকর যে ঈশ্বর চাইলে শিশু নির্যাতন বা ধর্ষণও মহত্তম কাজ হতে পারে। আর দ্বিতীয়টি সত্য হলে মেনে নিতে হয় যে নৈতিকতা ঈশ্বরের সৃষ্টি নয় এবং তার ফলে ঈশ্বর সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা - এই বিশ্বাসটাও ভেঙ্গে পড়ে।

নিঃসন্দেহে এই অবস্থানে যে কোন ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষই প্রথম পথটা নেবেন বলে ভেবে নিচ্ছেন। কিন্তু ফ্রেইলটি সিনেমাটা দেখলে তারা একটা হোঁচট খাবেন। বলে রাখি, এইটা ম্যাথু ম্যাককনারির বিরল ভাল সিনেমাগুলোর একটা। সিনেমাটাতে একটা বাবার উপর ঐশী বাণী নাজেল হয় - দুনিয়া থেকে সব মনস্টার নিকেশ করার। বাবা তার দুই ছোট ছেলে নিয়ে মনস্টারের খোঁজে বেরোয়, খুঁজেও পায় উদ্ভট সব উপায়ে। কিন্তু অবাক ব্যাপার হল এই সব মনস্টার দেখতে আপনার আমার মতই সাধারণ মানুষ, শুধু আমাদের মনস্টার শিকারী পরিবারটাই দেখতে পায় তাদের প্রকৃত রূপ ।

বলা বাহুল্য, পুরো ব্যাপারটাই বাবার মানসিক বিকার, অন্ততঃ যাদের ওপর ঈশ্বরের বাণী নাজেল হয় নি তারা তাই ভাববেন। কিন্তু যারা আগে ভেবে নিয়েছিলেন ঈশ্বরের ইচ্ছাই নৈতিকতা নির্ধারণ করে তারা কিন্তু সেই সিরিয়াল কিলার পরিবারের অবস্থানে একই কাজ করবেন। কারণ ঈশ্বর বলেছেন!

পুরুজিত সাহা, আমেরিকার ব্যাটন রুজ থেকে লিখে থাকেন। লেখালিখির প্রিয় বিষয় বিজ্ঞান ও দর্শন। ইমেইল - purujit.saha@gmail.com

নাস্তিকতার বিরুদ্ধে কিছু মিথ

স্যাম হারিস

অনুবাদঃ দিগন্ত সরকার

অনুবাদকের কথা: নাস্তিকতা আর আস্তিকতা নিয়ে বেশ কিছু লেখা পড়ছি। সেদিন স্যাম হ্যারিসের একটা লেখা খুব ভাল লাগল। সাহস করে লেখাটা অনুবাদ করতে বসেছি। তার আগে ছোট্ট একটু প্রস্তাবনা। অনেকেই নাস্তিকতাকে দেশের ও সমাজের পক্ষে সর্বনাশা বলে মনে করেন। তার অনেকগুলো কারণও তারা দর্শান। যেহেতু আমাদের সমাজে সামগ্রিকভাবে ধার্মিক লোকের প্রাধান্য সেহেতু এই যুক্তিগুলো খন্ডানোর মত লোকজনের যথেষ্ট অভাব বলে মনে করি। যার ফলে, নিত্যনতুন অভিযোগ শোনা যায় নাস্তিকদের বিরুদ্ধে। এই নাস্তিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোর অধিকাংশই এরকম - অমুকে নাস্তিক ছিল সে এই ওই করেছে, সুতরাং নাস্তিকেরা খারাপ। কিন্তু আরো দশজন নাস্তিক যদি উপকার করে থাকেন তাহলেও সে নিয়ে কোনো বিশেষ উচ্চবাচ্য নেই।

কিছুদিন আগেও এক ধর্মব্যবসায়ীর ভিডিওতে দেখলাম যে তিনি বলছেন নাস্তিকদের কোনো জীবনদর্শন থাকে না। যে জীবনদর্শন মানুষ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে আয়ত্ত করে, বা যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ধার্মিকেরা অর্জন করে থাকে - নাস্তিকেরা তাকে অপছন্দ করে। কিন্তু আমার বক্তব্য হল নাস্তিকেরাই প্রকৃত জীবন-দর্শন অর্জন করে থাকে। আস্তিকদের জীবন তো পরকালের জন্য প্রস্তুতি-মাত্র। তাহলে সে জীবনের মানে কি? যদি জীবন-দর্শনের মানে এই হয় যে নিজেকে পরলোকে ভাল অবস্থানের বা স্বর্গলাভের জন্য প্রস্তুত করা - তবে তাকে জীবন-দর্শন না বলে তো পরলোক দর্শনই বলা ভাল - তাই না? আর আধ্যাত্মিকতার সাথে ঈশ্বরে বিশ্বাস করার কোনো সম্পর্ক নেই। বুকভরা ভালবাসা, চমকে ওঠার আনন্দ, বিষাদভরা কান্না -এইসব আবেগও নাস্তিকদের আর দশটা মানুষের মতই থেকে থাকে। শুধু নাস্তিকেরা কোনো কাল্পনিক বা পূর্বপরিকল্পিত সর্বশক্তিমানের সাহায্য নেয় না সেই অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যার জন্য। তারা তাকে বাস্তবের সীমার মধ্যে রেখে পর্যবেক্ষণলব্ধ সূত্র থেকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করে। এটাই পার্থক্য। তাই অভিজ্ঞতায় কোনো ভেদাভেদ নেই, বিভেদ শুধু আছে ব্যাখ্যায়।

মানুষের বোধশক্তির বাইরেও যে কিছু আছে - তা নিয়েও নাস্তিক আস্তিক বিবাদ দেখি। অনেক সময়েই আস্তিক ঈশ্বর-পন্থীরা দাবী জানান যে যেহেতু আমরা অমুক-তমুক জানি না, তাই আমাদের প্রচলিত ধারণা মেনে চলতেই হবে যতদিন না ওগুলো আবিষ্কার হয়। বকলমে বক্তব্য হল ঈশ্বরের অস্তিত্ব ভুল প্রমাণ করার দায়িত্ব নাস্তিকদেরই। সেখানে নাস্তিকদের অবস্থান অনেক সহজবোধ্য - তারা যেটা জানেননা - সেটাকে জানিনা বলতেই অভ্যস্ত। পরীক্ষার দ্বারা যা প্রতিষ্ঠিত হয় না, তারা তাকে মেনে নেন না। অন্যভাবে বললে - যেকোনো বিষয়ে নাস্তিকদের তিনরকম অবস্থান সম্ভব - ঠিক, ভুল ও জানিনা। কিন্তু আস্তিকদের ক্ষেত্রে - ঠিক আর ভুল। কারণ তাদের ঠিক-ভুলের গন্ডীটা কেটে দিয়ে যায় ধর্ম।

আমার আত্মীয়স্বজনের অনেকেই বলেন নাস্তিকেরা ধর্মকে ও তার অবদানকে তুচ্ছজ্ঞান করে। এটা আরো একটা ভুল ধারণা। ধর্মকে তুচ্ছজ্ঞান করা আর ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করা একই ব্যাপার নয়। এটা সত্যি যে কোনো একটা বিশেষ ধর্মের সমস্ত কিছু নাস্তিকেরা মেনে চলে না, বরং নিজস্ব বিবেক বা চিন্তাই তাদের পরিচালিত করে। কিন্তু আমাদের সমাজে অনেক ভালো কাজের পেছনে যে ধর্মের বড় ভূমিকা আছে তাকে অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। আবার উল্টোদিকে ধার্মিকেরা তাদের ধর্মের প্রতিটি পঙতিকে সঠিক ও নির্ভুল বলে দাবী জানিয়ে প্রতিনিয়ত নতুন ব্যাখ্যা এনে তার সত্যতা প্রতিষ্ঠার যে ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে - নাস্তিকেরা তা থেকে বিরত থাকে।

প্রচলিত আরেকটি ভুল ধারণা হল নাস্তিকতার সাথে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। কথাটা আক্ষরিক অর্থে সত্যি হলেও বাস্তবে এর ব্যতিক্রম খুব কমই দেখা যায়। আমেরিকা ও ব্রিটেন - এই দুটি দেশই বর্তমানের আধুনিক বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সবথেকে বেশী সাহায্য করছে। আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের মধ্যে ভোটে ৯৩%-ই দাবী জানিয়েছেন যে

তারা নাস্তিক। যেখানে আমেরিকার জনসংখ্যার ৯০%ই আস্তিক। তাহলে, বিজ্ঞানী হওয়ার সাথে নাস্তিকতাবাদের সম্পর্ক খুবই গভীর - নব্বই শতাংশ আস্তিকের জনতা থেকে বিজ্ঞানীদের মধ্যে উলটো নব্বই শতাংশ নাস্তিক হওয়া এই দৃঢ় সম্পর্কেরই পরিসংখ্যান।

আমি ব্লগে সাধারণভাবে দেখে এসেছি অনেক ধার্মিকই নাস্তিক বলতেই হিটলার, স্ট্যালিন, মাও আর পল পটের মত দাম্ভিক ডিক্টেটরের কথাই বলে থাকেন। এখানে একটা ব্যাপার বলে রাখা ভাল, ব্যক্তির ব্যাপারে পরিসংখ্যান কখোনো সামগ্রিক পরিসংখ্যানের জায়গা নিতে পারে না। দক্ষিণ এশিয়ায় মহিলা রাষ্ট্রপ্রধানের সংখ্যা বিশ্বের অন্য জায়গার থেকে বেশী বলে দক্ষিণ এশিয়ার মেয়েরা অন্য জায়গার থেকে বেশী অগ্রসর - এটাও যেমন ভুল ধারণা, তেমনই কয়েকজন বিচ্ছিন্ন নাস্তিক ডিক্টেটরের আচরণ থেকে বাকি নাস্তিক বিজ্ঞানীদের মাপা যায় না। নিজ দেশ বা জাতির শ্রেষ্ঠত্বে অন্ধ অনেক ডিক্টেটর যেমন অন্য দেশ বা জাতির ওপর অত্যাচার চালিয়েছেন তেমনই নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ওপর অত্যাচারের নমুনাও ইতিহাসে কম কিছু নেই। তাই আলাদা করে নাস্তিকদের এ জন্য দায়ী করার কোনো কারণ দেখি না।

সবশেষে আসা যায় বিবেকের কথায়। এটা খুব প্রচলিত যে নাস্তিকেরা বিবেকদংশনে জর্জরিত হন না। কারণ নাস্তিকদের কাছে তাদের নৈতিকতার জন্য কোনো ভিত্তি নেই - আস্তিকদের কাছে ধর্মগ্রন্থ যেমন। এমন ভাব যেন - খুন, জখম বা ডাকাতির অভিযোগে যারা অভিযুক্ত হয় তারা অধিকাংশই নাস্তিক। নাস্তিকেরা যে অন্যায় করেন না তা নয়; কিন্তু বাস্তবে, তথাকথিত নাস্তিকদের যে অংশটি কোনো (লাল)বইকে ধর্মগ্রন্থ স্বরূপ গণ্য করে নিজ আদর্শ বা মত প্রতিষ্ঠা করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তারাই বরং অনৈতিক কাজ করে এসেছে। স্ট্যালিন কিংবা মাও নাস্তিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের বিরোধী লোকজনের উপর খুন, জখম, জেল- জুলুম করেননি, সেগুলো করেছিলেন কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার নামে। এদের কাজের জন্য নাস্তিকতাকে দায়ী করা সমীচিন নয়। বার্ট্রান্ড রাসেল, রিচার্ড ডকিন্স কিংবা স্টিফেন ওইনবার্গ - এদের মত ব্যক্তিত্বরাও নিজেদের 'নাস্তিক' হিসেবে পরিচিত করেন এবং নাস্তিকতা প্রচার করেন কোন রকম রাখডাক না রেখেই - কিন্তু কই তারা তো খুন রাহাজানি বা গনহত্যা করেননি কিংবা করছেন না। আস্তিকদের দাবীমত যদি ধর্মগ্রন্থই তাদের নৈতিকতার ভিত্তি হয় - তাহলে সময়ে সময়ে ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা পরিবর্তিত হয় কেন? কেনই বা সমস্ত ধর্মপরিচালিত সমাজেও দাসপ্রথা, জাতিভেদ আর লিঙ্গবৈষম্য জায়গা করে নেয়? নাস্তিকদের নৈতিকতার ভিত্তি মানুষের স্বতস্ফূর্ত বিবেক, যে পরিবেশে বড় হয় তার শিক্ষা আর জাতিগত চেতনা। তাই একই ধর্মের বিভিন্ন রূপ দেখা যায় বিভিন্ন অঞ্চলে। আমার নৈতিকতার একটা বড় ভিত্তি আছে আমাদের জিনে - তাই বিচ্ছন্নভাবে বা একাকী বেড়ে ওঠা মানুষও অনৈতিক না হতেই পারে - যতটা একজন তথাকথিত নৈতিক বা ধার্মিক মানুষ হতে পারে।

সামগ্রিকভাবে দেখলে ভাল আর খারাপ এই দুটো বিশেষণ নাস্তিক আর আস্তিকতার সাথে জুড়ে দেওয়াটা ঠিক নয়। ধর্মের অন্ধ সমর্থকেরা নিজের ধর্ম আর বিশ্বাস বাঁচিয়ে রাখতে সদা-সচেষ্ট বলে তারাই এই ভাল-খারাপ ধার্মিকতা দিয়ে বিচার করার স্কেলটা আবিষ্কার করেছেন। নাস্তিকেরা বেশী প্রশ্ন করে বলে দুর্নাম আছে। আমি নাহয় কয়েকটা প্রশ্নের উত্তরই দেবার চেষ্টা করলাম। আমার ব্যক্তিগত মতামতে মানুষকে বিচার করতে গেলে তার মানবিক গুণাবলীর দিকে তাকানোই ভাল - বিশ্বাস নিজস্ব। নাস্তিকদের ঈশ্বর-অবিশ্বাস যদি নতুন নতুন বিজ্ঞানের তত্ত্ব উদ্ভাবনে সাহায্য করে তাহলে ঈশ্বর অবিশ্বাস করে ক্ষতিটা কি হয়?

সাম্প্রতিক ভোটে আমেরিকায় অনেকবারই দেখা গেছে যে নাস্তিকতার সাথে কেমন একটা কলঙ্ক জড়িয়ে গেছে। নাস্তিকদের রাজনীতিতে তো আসাই উচিন নয় কারণ নিউসউইকের সার্ভেতে দেখা গেছে মাত্র ৩৭%

আমেরিকান একজন যোগ্য নাস্তিক প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে। কারণ, নাস্তিকদের একদল হতাশ, বিবেকহীন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিমুখ এবং মহাজাগতিক পরম শক্তির প্রমাণ বিরোধী মানুষের গোষ্ঠী বলেই মনে করা হয়েছে। এখনও আমেরিকার মাটিতে ৮৭% লোক "কোনোদিনও ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ কিংবা অবিশ্বাস করে নি", আর মাত্র ১০% মানুষ নিজেদের নাস্তিক বলে মনে করেছে। এরই মধ্যে আবার নাস্তিকেরা দুর্নামের ভাগিদার। এই দুর্নামের মিথগুলোকে আরো একবার পর্যালোচনা করে দেখা দরকার, কারণ প্রায়ই দেখা যায় সমাজের সবথেকে বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞানমনস্করাই নাস্তিক হয়ে থাকে।

১) নাস্তিকেরা মনে করে জীবন অর্থহীন

মজার কথা হল বরং ধার্মিকেরাই মনে করেন জীবন হল অর্থহীন আর কল্পনা করে নেন যে ইহজীবন শেষে পরলোকে গিয়ে তারা ইহজীবনের সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে তারা আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। বরং নাস্তিকেরাই স্থিরনিশ্চিত যে জীবন হল মূল্যবান। আর যেহেতু আমাদের ভালবাসার কিছুই চিরকাল থাকবে না, তাই তারা বিশ্বাস করেন যে এ জীবনে সব ভালবাসাই অর্থপূর্ণ।

২) মানবসভ্যতার ইতিহাসে সবথেকে বড় অপরাধগুলোর জন্য দায়ী হল নাস্তিকতা

আস্তিকেরা প্রায়ই দাবী করেন যে পল পট, স্ট্যালিন বা মাও সে তুং-এর হত্যালীলার কারণ তাদের নাস্তিকতা। ফ্যাসিজম আর কমিউনিসমের মূল সমস্যা তাদের ধর্ম-বিরোধিতা নয়, বরং তারা নিজেরাই একেকটা ধর্ম হয়ে উঠেছিল। এদের রাজত্ব তাই একরকমের অনমনীয় বিশ্বাসে চলেছে, আর প্রত্যেকের ব্যক্তিপূজায় বিশ্বাসী একদল মানুষের তাকে সমর্থন করেছে। এর সাথে বরং ধর্মে মহাপুরুষ-বন্দনার তুলনা করা যায়। আর এদের হাতে মারা গেছে যারা তাদের রাজনৈতিক শত্রু, জাতিগত ভাবে বিরোধী বা দেশের অন্ধ-উন্নতির পথে অন্তরায়। মানুষ যুক্তিবাদী হয়ে ওঠার কারণে কোনো সমাজই কোনোকালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

৩) নাস্তিকতা একটি অনমনীয় বিশ্বাস

আব্রাহামিক ধর্মগুলোর ধর্মগ্রন্থগুলোর দাবীমত সেগুলো কোনো না কোনো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের লেখা এবং তাতে মানুষের প্রয়োজনীয় সব তথ্যই দেওয়া আছে। আর তাদের মতে, যারা এই তথ্যের বিরোধিতা করে বা এই দাবী অযৌক্তিক বলে মনে করে তারাই হল নাস্তিক। তাই এই সংজ্ঞানুসারে কাউকে নাস্তিক হতে হলে তার নিজের বিশ্বাসে অনমনীয় না হয়ে শুধু যুক্তিবাদী হলেই চলে। ঐতিহাসিক স্টেফান হেনরী রবার্টস একবার এক আস্তিককে লক্ষ্য করে বলেছিলেন - *"আমার মনে হয় আমি আর তুমি দুজনেই নাস্তিক। তুমি যতগুলো ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আমি তার চেয়ে একটি কম ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। যখন তুমি বুঝে উঠতে পারবে যে তুমি কেন আর*

অন্যান্য (ধর্মের) সম্ভাব্য ঈশ্বরকে অস্বীকার করছ, তাহলেই তুমি বুঝতে পারবে কেন আমি তোমার (ধর্মের) ঈশ্বরকে অস্বীকার করছি"।

৪) নাস্তিকেরা বিশ্বাস করে মহাবিশ্বে সবকিছুই ভাগ্যক্রমে সৃষ্টি হয়েছে

এখন অবধি কেউই জানেন না ঠিক কি ভাবে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। আমরা স্থান-কালের সূচনা নিয়ে আদৌ আলোচনা করতে পারি কি না সে নিয়েও আমরা স্থিরনিশ্চিত নই। এই ভাগ্যক্রমে সৃষ্টির যুক্তিটা আসলে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের বিরুদ্ধে বারবার বলা হয়ে এসেছে। রিচার্ড ডকিন্স তার "দ্য গড ডিলিউশন" বইটিতে এই ভুল ধারণাগুলো খন্ডন করেছেন। যদিও আমরা এখনও জানি না আমাদের গ্রহের রসায়ন কিভাবে প্রাণের উদ্ভবে সাহায্য করেছিল, কিন্তু আমরা জেনে গেছি যে আমাদের এই জৈববৈচিত্র্য ভাগ্যক্রমে আসে নি। বিবর্তনের মূল স্তম্ভ হল হয়ত ভাগ্যক্রমে ঘটা কিছু মিউটেশন আর তার পরে প্রাকৃতিক নির্বাচন। ডারউইন এই প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের নামকরণ করেছিলেন কৃত্রিম নির্বাচনের সাথে এর সাদৃশ্য থেকে। কৃত্রিম নির্বাচনে পালিত পশুর ওপর এই নির্বাচন চালানো হয় - যার ফলে আরো ভাল উ্পাদনশীল পালিত পশু পাওয়া যায়। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ নন-র‍্যান্ডম এবং নির্দিষ্ট অভিমুখেই এগোয়।

৫) নাস্তিকতার সাথে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই

কিছু কিছু বিজ্ঞানীর মত বিজ্ঞানী হয়েও ধার্মিক হওয়া সম্ভব কিন্তু এটা মেনে নিতেই হবে বিজ্ঞানমনস্কতা ধর্ম থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। আমেরিকার জনগণের কথাই ধরা যাক। অধিকাংশ সার্ভেতেই দেখা গেছে যে প্রায় ৯০% জনগণই ঈশ্বর-বিশ্বাসী, আবার ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের ৯৩% বিজ্ঞানীই ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। বিজ্ঞানীরা তো সাধারণ জনগণেরই অংশ। এর মানে বিজ্ঞানচিন্তা তাদের নাস্তিকতার পথে নিয়ে গেছে।

৬) নাস্তিকেরা উগ্র

বিজ্ঞানীরা যখন কোনো বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন না, তখন তারা সেটা সরাসরি স্বীকার করে নেন। যা জানি না তাকে জানি বলে ভাব দেখানোটা বিজ্ঞানে অপরাধ বলেই মনে করা হয়। অথচ এটাই ধর্মের মূলভিত্তি। এটা খুবই বিপরীতধর্মী দাবী যে ধার্মিকেরা একাধারে নম্র ও মিতভাষী অথচ তারা মহাকাশবিদ্যা, জীববিদ্যা বা রসায়নের এমন জ্ঞানও রাখেন বলে দাবী জানান যা একজন বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীও রাখেন না। নাস্তিকেরা বিজ্ঞান থেকেই নিজেদের জ্ঞান আহরণ করেন। এটা কোনোমতেই উগ্রতা নয় - এটা একরকম সততা।

৭) নাস্তিকেরা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বিমুখ

নাস্তিকদের কেউ ভালবাসা, বিস্ময় বা মুহূর্তের আনন্দ থেকে বঞ্চিত রাখে না। শুধু নাস্তিকেরা সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোনো অবাস্তব বা অবৈজ্ঞানিক দাবী করে না। অনেক খ্রীষ্টান আছেন যারা বাইবেল পড়ে ও যীশুর কাছে প্রার্থনা করে আনন্দময় জীবনযাপন করছে। কিন্তু এতে কি প্রমাণিত হয়? এতে প্রমাণিত হয় কিছু কিছু কোড অব কনডাক্ট বা আচার-আচরণের নীতিমালা ও উপযুক্ত সুশৃঙ্খলতা মানুষের মনে প্রভাব ফেলে। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কি দাবী করা সম্ভব যে যীশুখ্রীষ্টই হলেন মানবজাতির একমাত্র রক্ষাকর্তা? সম্ভব নয় - কারণ সময়ে সময়ে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ এমনকি নাস্তিকেরাও এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

৮) নাস্তিকেরা মনে করে মানবজীবন আর মানুষের চিন্তার বাইরে কিছুই থাকতে পারে না

নাস্তিকেদের পক্ষে মানুষের চিন্তাভাবনার সীমাবদ্ধতা নিয়ে ধারণা করা আস্তিকদের তুলনায় সহজ। এটা সত্যি যে আমরা মহাবিশ্বের অনেককিছুই জানি না এবং তার সাথে এটাও সত্যি যে ধর্মগ্রন্থের পাতায় যে মত পাওয়া যায় তাও আমাদের ধারণার প্রতিফলন নয়। যেমন আমরা এখনো জানি না যে আমরা ছাড়া কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী মহাবিশ্বে আছে কি না। আর যদি থেকেও থাকে, প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের ধারণা আমাদের থেকে কয়েকগুণ বেশীও হতে পারে। নাস্তিকদের পক্ষে এরকম মেনে নেওয়া সম্ভব। আর সেই বুদ্ধিমান প্রাণীদের কাছে যে আমাদের ধর্মমগ্রন্থগুলো আরো অর্থহীন মনে হবে সেটাও নাস্তিকরা মেনে নেবেন। আসলে মহাবিশ্বের ব্যাপকতা আর রহস্যময়তা সম্পর্কে পৃথিবীর প্রচলিত ধর্মগুলো নিতান্তই সাধারণ ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে। পর্যবেক্ষণ ছাড়া সেই সব মেনে নেবার কোনো অর্থই হয় না।

৯) ধর্ম যে সমাজের উপকারে আসে, সেটা নাস্তিকেরা উপেক্ষা করেন

সমাজে ধর্মের উপকারী প্রভাব নিয়ে যারা আলোচনা করেন তাদের মনে রাখা উচিত যে শুধুমাত্র উপকারী প্রভাবের কারণে কোনো কিছুকে সত্যি বলে মেনে নেওয়া যায় না। এই একই কারণে সব সান্ত্বনাবাক্যই সত্যি নয় যদিও তা উপকারে আসে।

শুধু তাই নয়, ধর্মের উপকারী প্রভাবও প্রশ্নাতীত নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ম মানুষকে ঠিক পথে চলার জন্য ভুল ব্যাখ্যা দেয়, যেখানে সঠিক কারণ দেওয়া সম্ভব। কোনো গরিব বা দুঃস্থকে কি কারণে সাহায্য করা উচিত? তার সাথে সমব্যাথী বলে? না মহাবিশ্বের স্রষ্টা সাহায্যকারীকে পুরষ্কৃত করেন বলে?

১০) নাস্তিকতা বিবেক বা নীতির ধার ধারে না

কেউ যদি আগে থেকেই নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে খারাপ ধারণা না রাখে, তাহলে তার পক্ষে কোনো ধর্মগ্রন্থ থেকে সেই ধারণা পাওয়া সম্ভব না। কারণ ধর্মগ্রন্থে মানুষ ও ঈশ্বরের অসংখ্য নিষ্ঠুরতার নমুনা রয়েছে। আমাদের মানবিক গুণাবলী ধর্মগ্রন্থ পড়ে আসে না। আমাদের মানবিক গুণাবলী অনেকাংশেই আমাদের মস্তিষ্কে প্রোথিত থাকে আর তা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের সুখ-দুঃখের কারণ বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে।

গত কয়েক শতকে আমরা অনেক বিবেকবান হয়েছি কোনো ধর্মগ্রন্থ আলাদা করে আবিষ্কার না করেই। অধিকাংশ ধর্মগ্রন্থেই দাসপ্রথার উদাহরণ থাকলেও গত কয়েক শতকে আমরা তা আমাদের সমাজ থেকে নির্মূল করতে পেরেছি। ধর্মের যা যা ভাল দিক সবই আমাদের কাছে নীতিগতভাবে মূল্যবাণ কিন্তু তার মানে এই নয় যে তা কোনো মহাবিশ্বের স্রষ্টা আমাদের হাতে দিয়ে গেছেন।

স্যাম হারিস, আমেরিকান লেখক এবং দার্শনিক। *The End of Faith* (2004), *Letter to a Christian Nation* (2006) প্রমুখ গ্রন্থ প্রণেতা। উপরের লেখাটি লস এঞ্জেলেস টাইমস-এ ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।

দিগন্ত সরকার, পেশায় কম্পিউটার প্রকৌশলী, মূল আগ্রহ বিজ্ঞান-সংক্রান্ত লেখায়। অর্থনীতি, রাজনীতি বা অন্যান্য বিষয়েও লিখে থাকেন। মুক্তমনার নিবেদিতপ্রাণ সদস্য। বর্তমান নিবাস সিয়াটেল, আমেরিকা। ইমেইল - diganta.sarkar@gmail.com

ষষ্ঠ অধ্যায় : ধর্মের উৎস এবং অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ৫ ২ ৫ *[ক্লিক করুন]*

- ধর্মের উৎস সন্ধানে : *দিগন্ত সরকার ৫ ২ ৬ [ক্লিক করুন]*
- ধর্মের উৎপত্তি : উত্তর পুরুষ ৫ ৩ ৯ *[ক্লিক করুন]*
- ধর্মের উপযোগিতা : *রিচার্ড ডকিন্স (জাহেদ আহমদ, বন্যা আহমেদ) ৫ ৪ ৬ [ক্লিক করুন]*
- বিশ্বাস কি মানব মনে প্রোথিত? : *আশিক মাহমুদ রূপম ৫ ৫ ৬ [ক্লিক করুন]*
- মানুষের উদ্ভব কি কোন স্বর্গীয় স্পর্শের ফসল? : *বন্যা আহমেদ ৫৬২ [ক্লিক করুন]*
- বিবর্তনের দৃষ্টিতে জীবন : *অপার্থিব ৫ ৭ ২ [ক্লিক করুন]*
- ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কি ফুরিয়ে গেছে? : *খান মুহাম্মদ ৫ ৮ ১ [ক্লিক করুন]*
- ধর্মীয় চেতনার অস্তিত্ব : সামাজিক পরিচয়ের দৃষ্টিতে! : *বিপ্লব পাল ৫ ৯ ৩ [ক্লিক করুন]*

ধর্মের উৎস সন্ধানে*

দিগন্ত সরকার

ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য যে সময়, সম্পদ আর যন্ত্রণার মূল্য দিতে হয়, তাতে একজন বিবর্তনবাদী মনস্তত্ত্ববিদের ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে ধর্ম একটি অভিযোজিত বৈশিষ্ট্য। - মার্ক কোহেন

বিবর্তনের ভূমিকা

সব সমাজেই কেন ধর্মের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, সে বিষয়ে প্রত্যেকেরই সে সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা রয়েছে। কিন্তু আমি এই বিশ্লেষণ শুরু করতে চাই ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব থেকে।

যেহেতু আমরা সবাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে উদ্ভূত, আমাদের জানা দরকার প্রাকৃতিক নির্বাচন আমাদের ওপরে কিভাবে ধর্মীয় অনুভূতিকে নির্বাচন করেছিল। সাধারণভাবে, সেই ব্যক্তিই প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত হয় যে সময় আর সম্পদের সঠিক ব্যবহার করে। নাহলে তার প্রতিযোগী তার থেকে বেশি সুবিধা পেয়ে নির্বাচিত হবে। একজন বিবর্তনবাদীর কাছে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হল সময় আর সম্পদের অপব্যবহার। এক-একটি ধর্মস্থান বানাতে বছরের পর বছর লাগে। ধর্মে বিশ্বাসের কারণে শতশত মানুষের ওপর অত্যাচার হয়েছে। অন্ধবিশ্বাসীরা কত চাবুক খেয়েছে, কত রক্তপাত হয়েছে। তাহলে ধর্মের উপযোগিতা কোথায়?

প্রাকৃতিক নির্বাচনে, উপযোগিতা (merit) বলতে এমন কিছুকে বোঝায় যা সরাসরি ব্যক্তির জিন-প্রবাহের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু অন্যভাবে ভাবলে, যদি তা ব্যক্তির নিজের জিনের উপকার না করেও সেই প্রজাতির বা দলের সুবিধা করে, তাহলে? এটা হল প্রথম উপযোগিতা তত্ত্ব, যা দল নির্বাচন তত্ত্ব (Group Selection Theory) নামেও পরিচিত। এটি আমি পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব। দ্বিতীয় তত্ত্ব অনুসারে, ব্যক্তির জিন অন্য কোনো জীবের জিন দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন, ঠান্ডা সব মানুষেরই লাগে, যদিও তা থেকে মানুষের কোনো সুবিধা হয় না। অনেকক্ষেত্রেই জীবেরা এভাবে পরিবর্তিত হয় যাতে তারা কোনো পরজীবীকে সহজে বহন করতে বা পরবর্তী পোষকে প্রবাহিত করতে পারে। তৃতীয় তত্ত্ব অনুযায়ী, আমরা জিনের পরিবর্তে সাধারণ যেকোনো প্রতিলিপিকারকের কথা ভাবতে পারি। ধর্মমত নিজেরা একসাথে নিজেদের প্রতিলিপিকরণে দক্ষ - তাই আজ সব মানুষের মধ্যেই কমবেশী ধর্মবিশ্বাস বর্তমান। এই তত্ত্ব নিয়েও আমি পরে বিশদ আলোচনা করব।

অস্ট্রেলিয়া বা পাপুয়া নিউগিনির উপজাতিদের কথাই ভেবে দেখা যাক। তারা এমন প্রতিকূল পরিবেশে বাস করে, যেখানে কিছু বিষয়ে নিখুঁত বাস্তব জ্ঞান না থাকলে অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব - আর তাদের সে দক্ষতা আছে। অথচ, তারাই আবার তাদের এই জ্ঞানের সাথে ডাইনি-তত্ত্ব বা অতিপ্রাকৃতিক ব্যাখ্যা জুড়ে নিজেদের মধ্যেই ভীতি সৃষ্টি করেছে- নিজেদের অগ্রগতি রুদ্ধ করেছে। কিম স্টেরেলনি, এক দার্শনিক, পাপুয়া নিউগিনির উপজাতিদের এই বৈপরিত্য নিয়ে গবেষণা করছেন। তার বক্তব্য - কি করে মানুষ একাধারে এতটা বোকা আর বুদ্ধিমান হতে পারে, তা এদের দেখলে বোঝা যায়।

পৃথিবীতে সব মানুষের মধ্যেই এই অপব্যয়ী, সময়সাপেক্ষ, বিভেদকামী ধর্মীয় সংস্কার আছে, আছে তথ্য-বিরোধী, উৎপাদন-বিনাশী, ধর্মীয় কল্পনা। একটি বিশেষ প্রজাতির মধ্যে ধর্মের এই সার্বিক উপস্থিতি একমাত্র ডারউইনের তত্ত্ব দিয়েই বিশ্লেষণ সম্ভব। কিন্তু, মানব প্রজাতি কেন এই অভ্যাসে মেতে ওঠে যাতে তার জীবনসংশয় অবধি হতে পারে?

ধর্মবিশ্বাসের সুবিধা

ধর্ম যে মানসিক অবসাদ কমাতে সাহায্য করে তা নিয়ে বিশেষ একটা প্রমাণ পাওয়া যায়না। হয়ত কিছু ক্ষেত্রে এ তত্ত্ব খাটে, কিন্তু আমি অবাক হব যদি সামগ্রিক ভাবেও তা সত্যি হয়। এবিষয়ে জর্জ বার্নার্ড শ-এর উদ্ধৃতি মনে পড়ে - 'বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের চেয়ে বেশী শান্তিতে থাকে যেভাবে একজন মাতাল একজন ভদ্রলোকের চেয়ে বেশী শান্তিতে থাকে।'

ডাক্তার রোগীকে আস্বস্ত করেন বা সান্ত্বনা দেন - সাধারণ রোগব্যাধী ডাক্তারের আশ্বাসেই সেরে যায়। একে বৈজ্ঞানিক ভাবে বলা হয় 'প্লাসেবো (placebo) এফেক্ট'। নকল বড়ি বা অতি-তরলীকৃত হোমিওপ্যাথি ওষুধের প্রভাবও লক্ষ্য করা গেছে রোগীদের মধ্যে। মজার কথা, হোমিওপ্যাথির সুনামের একটা বড় কারণ হল, এর কোন প্রভাবই থাকে না - যেখানে প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে ক্ষতি হয়।

ধর্মও কি এরকমই এক 'প্লাসেবো' যা মানসিক অবসাদ দূর করে? উৎসাহীরা কিছু উদাহরণ নিয়ে উপস্থিত হলেও আমি সহজে তা মেনে নিতে প্রস্তুত নই। অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মীয় প্রভাব আমাদের চাপমুক্ত করার পরিবর্তে অযথা চাপ সৃষ্টি করে - পাপবোধ বা পুন্যের লোভ কি আমাদের পূর্বপুরুষদের ওপর অযথা চাপ সৃষ্টি করেনি? আমি একমত নই। সর্বত্র বিরাজমান ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপকতা বিশ্লেষণের জন্য সমমাপের তত্ত্ব প্রয়োজন।

এবিষয়ে বাকি তত্ত্বগুলো ডারউইনের বিশ্লেষনের সাথে ঠিক খাপ খায়না - যেমন : 'ধর্ম আমাদের অজানা সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা দেয়', 'ধর্ম সান্ত্বনা দেয়', ইত্যাদি। সান্ত্বনা-তত্ত্বের সঠিক বিশ্লেষণ করেছেন স্টিভেন পিঙ্কার, তার বই *'হাউ আওয়ার মাইন্ড ওয়ার্ক্স'* তে। বরফে আটকে পড়া মানুষ বা সিংহের মুখোমুখি মানুষ ধর্মীয় সান্ত্বনা থেকে কি বিশেষ সুবিধা পেতে পারে যাতে তার প্রাণ-বিনাশের সম্ভাবনা কমে? সহজ কথায়, ধর্মীয় সান্ত্বনা কি তাকে কোনোভাবে নির্বাচিত হতে সাহায্য করে? মনে হয় না।

বিবর্তনবাদীরা আপাত আর মূল কারণকে আলাদা করে দেখতে চান। নিউরোলজিস্টরা বলবেন মস্তিষ্কের কোনো অংশের অধিক সক্রিয়তা ধর্মবিশ্বাসের জন্ম দেয়। কিন্তু এটা আপাত কারণ - এ বিষয়ে আলোকপাত করছি না। যদি নিউরোলজিস্টরা বলেন এই ঈশ্বর-কেন্দ্রই ধর্মবিশ্বাসের অস্তিত্বের জন্য দায়ী, তাহলে বিবর্তনবাদীদের কাজ হবে খুঁজে বের করা কি কারণে এই ঈশ্বর-কেন্দ্র মানুষকে প্রাকৃতিক ভাবে সুবিধা দিয়েছিল যার ফলে এটি এখন মানব-প্রজাতির অবিচ্ছেদ্য অংগ।

'ধর্ম হল শাসকশ্রেনীর ক্ষমতা কুক্ষিগত করার যন্ত্র মাত্র' - এরকম রাজনৈতিক ব্যাখ্যাও বিবর্তনবাদীরা মেনে নেবেন না। এটা হয়ত ঠিক যে আমেরিকায় দাসেরা পরকালের কথা ভেবে তাদের ইহজীবনের ক্ষোভ প্রশমিত করত - যার ফলে তাদের মালিকপক্ষের সুবিধা হত। কিন্তু এই তত্ত্বের সাথে প্রাকৃতিক নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক নেই - সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্বের যা থাকা একান্ত দরকারী। ডারউইনের তত্ত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় কেন আমরা যন্ত্রণা অনুভব করি। যারা যন্ত্রণা অনুভব করে, তারা তা প্রশমিত করতে ব্যবস্থা নেয় - যারা অনুভব করেনা, তারা নেয় না। ফলে

তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও কমে যায় - সামান্য ক্ষত থেকেও তাদের মৃত্যু হতে পারে। তাহলে, নির্বাচনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঈশ্বর বাসনার ব্যাখ্যা কি?

দলগত নির্বাচন তত্ত্ব

এই তত্ত্ব অনুসারে, নির্বাচন কাজ করে প্রতিযোগী এক একটি দলের মধ্যেও। কেমব্রিজের আর্কিওলজিস্ট কলিন রেনফ্রু মনে করেন যে নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ আর আনুগত্যের কারণেই আব্রাহামিক ধর্মগুলি এত বিস্তার লাভ করেছে। আমেরিকান ডি এস উইলসন একি মতবাদ বিস্তৃত আকারে প্রকাশ করেছেন *'ডারউইনস ক্যাথিড্রাল'* বইতে।

একটা কাল্পনিক উদাহরণ দেখা যাক। কোনো এক উপজাতি হল যুদ্ধবাজ, যুদ্ধের দেবতায় বিশ্বাসী - মনে করে যুদ্ধে শহিদ হলে সরাসরি স্বর্গলাভ ঘটে। আরেক উপজাতির দেবতা শান্তিকামী, সহাবস্থানে বিশ্বাসী। এদের যুদ্ধ লাগলে স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধবাজ উপজাতি বেশী সুবিধায় থাকবে - তাদের সদস্যরা স্বর্গে যাবার জন্য যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত বলে। স্বাভাবিকভাবে, আস্তে আস্তে, এধরনের উপজাতি বড় হতে থাকবে, বেশী সম্পদের আধিকারী হবে, ছোট উপজাতি গুলোকে গ্রাস করবে। আনথ্রপলজিস্ট নাপোলিয়ন শাগন দেখিয়েছেন এরকম সত্যিই ঘটে - দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে বসবাসকারী উপজাতিদের মধ্যে।

দলগত নির্বাচন সম্পর্কে উইলসনের প্রত্যুত্তর

ডকিন্স তার লেখায় দলগত নির্বাচন (Group Selection) সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষণ করেননি বলে দাবী জানিয়েছেন এই তত্ত্বের মূল প্রবক্তা ডেভিড উইলসন (David Wilson)। তিনি একাধিক পরীক্ষালব্ধ ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

দলগত নির্বাচনের স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল বিজ্ঞানজগতে স্বীকৃত লিন মার্গুলিসের এন্ডোসিমবায়োটিক (Endosymbiotic) তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে, প্রোক্যারিওটিক (Prokaryotic) কোষ কয়েক মিলিয়ন বছর ধরে সম্মিলিত বিবর্তনের মাধ্যমে জটিলতর ইউক্যারিওটিক (Eukaryotic) কোষের জন্ম দিয়েছে। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত 'অরিজিন অব ইউক্যারিওটিক সেল' বইতে তিনি এর বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। আশির দশকে যখন প্রমাণিত হল যে মাইটোকন্ড্রিয়া আর ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে আবিষ্কৃত জেনেটিক বস্তু (Genetic Material) আসলে নিউক্লিয়াসে প্রাপ্ত জেনেটিক বস্তুর থেকে আলাদা, তখন এই তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হল। পরবর্তীকালে, হিউম্যান জিনোম প্রোজেক্টের সময়ে এই তত্ত্বের স্বপক্ষে আরো প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা যাকে আপাতদৃষ্টিতে একটি প্রাণী বলে মনে করছি সেটিও আসলে অনেকগুলি স্বতন্ত্র জীবের বিবর্তিত সহাবস্থানের ফলে সৃষ্ট। এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র জীবদের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতিযোগিতার চেয়ে দলগত সুবিধাই প্রাধান্য পেয়েছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনে সুবিধার জন্য অনেকগুলি জীবের এই সহাবস্থানকে দলগত নির্বাচন ছাড়া কি বা বলা যেতে পারে? তাই সবসময় ব্যক্তিগত পর্যায়ে নির্বাচনই শেষ কথা নয়, উপযুক্ত দলগঠনে সক্ষম হলে দলগত নির্বাচন ব্যক্তিগত পর্যায়ে নির্বাচনের পরিবর্তে প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে।

দলগত নির্বাচন তত্ত্ব আর মিম-তত্ত্ব (Meme Theory) একত্র করলে ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক

ধারণা করা সম্ভব। মনে করা যাক কোনো প্রজাতির সাংস্কৃতিক তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষমতা খুব বেশী। এখন তাদের একটি দলের মধ্যে যদি একটি নতুন তথ্য বা ধারণার উদ্ভব হয় সেটা সহজেই তাদের নিজেদের দলে ছড়িয়ে পড়বে। এবার সেই তথ্য বা ধারণা যদি তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা পরিবর্তন করে তাহলেই দলগত নির্বাচনের মাধ্যমে সংস্কৃতির পরিবর্তন সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, নবজাগরণের সময়ে পশ্চিমী দুনিয়ায় যে বিজ্ঞানচর্চার শুরু হয়েছিল তার ফলে তারা দলগতভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত হয়। তাই, তাদের সংস্কৃতির প্রভাব সারা বিশ্বে আজ দেখা যায়। কৃষিভিত্তিক সভ্যতার বিকাশের পরে মানুষের দলের আকার অনেক বেড়ে যায়, সমাজ গঠিত হয়, ধীরে ধীরে তৈরি হয় সামাজিক মনস্তত্ত্ব। আর এই সামাজিক মনস্তত্ত্ব পরে জন্ম দেয় ধর্মের।

পৃথিবীতে সব ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে গবেষণা করলে দেখা যায় সবারই উৎপত্তি হয়েছে সমাজের কিছু সমস্যা সমাধানের জন্য, কিছু নীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে। ধর্মে যে ধারণাগুলো আপাতদৃষ্টিতে বর্তমানযুগে অচল, তাই দেখা যায় সময়কালে কিছু সমস্যার সমাধান করেছে। তারা ধর্মবিশ্বাসীদের দল-গঠনে কিভাবে প্রভাবিত করে তার ওপর নির্ভর করে এই আপাত-অবাস্তব ধারণাগুলোর ব্যাখ্যা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, জৈনধর্মের অবাস্তব অহিংসতা নিজেদের মধ্যে সংগঠিত দল গঠনে সাহায্য করে।

তবে দলগত নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভব হলে প্রমাণিত হয় না যে ধর্ম খুব উপকারী বলে নির্বাচিত হয়েছে। এর প্রভাবেই মানুষ দল গঠন করে, যেমন অনেকগুলো জীব দল বেঁধে জটিল জীব গঠন করে। এখানে মানুষের এই দলগুলোকে একেকটি বিশাল জীবের সাথে তুলনা করা যায়। এরা একে অন্যের প্রতিযোগী, একে অন্যেকে 'শিকার' করে, প্রতিযোগিতার পেরে না উঠলে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এভাবেই উদ্ভব ঘটে সঙ্ঘবদ্ধ ধর্মের, একটি ধর্ম অন্যটির চেয়ে বেশী বিস্তার লাভ করে।

উৎস - http://www.skeptic.com/eskeptic/07-07-04.html

আমাদের মত যারা দলগত নির্বাচনকে গুরুত্ব দেন না, তারাও মনে করেন তাত্ত্বিকভাবে এটা ঘটা সম্ভব। কিন্তু যখন দলের মধ্যে ব্যক্তিমাত্রায় নির্বাচনের কথা ভাবা হয়, তখনই গোলমাল দেখা দেয়। সাধারণভাবে, ব্যক্তিমাত্রায় নির্বাচন আরও বেশি প্রবল হওয়ার কথা। আমাদের কাল্পনিক উপজাতিদের মধ্যে মনে করা যাক আত্মত্যাগী মৃত্যুভয়হীন যোদ্ধাদের পাশাপাশি কোনো এক স্বার্থপর যোদ্ধাও আছে। তাতে যুদ্ধে জয়ীপক্ষ লাভ করার সম্ভাবনা হয়ত একটু কমে, কিন্তু নিজের বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। বেঁচে বংশবিস্তার করার সম্ভাবনা বেশি বলে এধরনের ব্যক্তির জিন উপজাতিটির মধ্যে বেশী হারে ছড়িয়ে পড়বে। ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে যুদ্ধে আত্মত্যাগের সম্ভাবনাও কমে যাবে। এই সব ফ্যাক্টর মাথায় রেখে যদি কম্পিউটার সিমুলেশন করা যায় - তাহলে দেখানো খুবই সহজ যে দলের মধ্যে আত্মত্যাগীদের তুলনায় স্বার্থপরদের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা সবসময়েই বেশী।

ধর্ম কি অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় উপজাত?

যাই হোক, আমি এবার দলগত নির্বাচন ছেড়ে আমার নিজের মতবাদ নিয়েই আলোচনা করব। যে বৈজ্ঞানিকেরা ধর্মকে অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় উপজাত (By-product) বলে মনে করেন - আমি সেই দলে। ব্যাপারটা বিশদ ভাবে আলোচনা করার জন্য আমি প্রাণিজগতের একটা উদাহরণ দিতে পারি।

মথ মোমবাতির আলোয় ঝাঁপিয়ে পড়ে - ঘটনাক্রমে নয়, তারা নিজেদের মত করে আত্মহত্যা করে। কিন্তু এ যদি আত্মহত্যা হয়, তাহলে এ থেকে মথের কি সুবিধা হয়? না কি এটা মথের উপজাত প্রকৃতি যার মূলে অন্য সুবিধা লুকিয়ে আছে? বিশদ ব্যাখ্যা করা যাক। কৃত্রিম আলো তো কিছুদিন হলো পৃথিবীতে এসেছে - তার আগে রাতে চাঁদ-তারার আলোই আলোকিত হত। অসীম দূরত্বের আলোক-উৎস থেকে আসা সমান্তরাল রশ্মি সরলরেখায় পতংগকে চলতে সাহায্য করে। ধরা যাক কোনো পতংগের স্নায়ুতন্ত্র অনেকটা এভাবে তৈরী যাতে হয়ত তা সর্বদা আলোর সাপেক্ষে ৩০ ডিগ্রী কোণে চলতে পারে। পুঞ্জাক্ষি থাকায় এরকম নির্দিষ্ট কোণে আলোর উৎস রেখে চলাচল করা সহজ - কোনো একটি চক্ষুনালীতে আলোর উপস্থিতি থেকে কোণ নির্ধারণ করা যায় বলে। কিন্তু মোমবাতির আলোয় একই সূত্র প্রয়োগ করলে তারা শেষে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে বাতির আগুনে ঝাঁপ দিতে বাধ্য। মথের এই আত্মবিসর্জন-প্রকৃতি আপাতদৃষ্টিতে ক্ষতিকর হলেও মোমবাতির তুলনায় মথের জীবনে চাঁদ-তারার আলো পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী - তাই মোটের ওপর দিয়ে মথের এই প্রকৃতি মথের সুবিধাই করে দেয়।

এবার এই একই তত্ত্ব প্রয়োগ করে দেখানো যায় ধর্মবিশ্বাসের মত আবেগপূর্ণ যুক্তিবিরোধী মত, যার জন্য মানুষ এত সময় ও সম্পদ অপচয় করে, তাও মানুষের অন্য কোনো মনস্তত্ত্বিক প্রক্রিয়ার উপজাত। কি সেই মনস্তত্ত্ব, যা কিনা অন্য সময়ে কার্যকরী, কিন্তু একই সাথে মানুষকে অপচয়ী এক খেলায় মাতিয়ে তোলে?

আমার এই তত্ত্বের কেন্দ্রে আছে শিশু-মনস্তত্ত্ব। অন্য প্রজাতির তুলনায় মানুষের সুবিধা হল - একের পর এক মানবপ্রজন্ম জ্ঞানভান্ডারে নতুন জ্ঞান সংযোজন করে চলে, আর শিশুদের মাধ্যমে সেই জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মে প্রবেশ করে। শিশুরা নিজে থেকেও ছাদের ধারে না যেতে শিখতে পারে বা গভীর বনে একা একা না যেতে চাইতে পারে, কিন্তু যে শিশুরা বিনাপ্রশ্নে বড়দের কথা শুনে দ্রুত শিখে ফেলবে তাদের সুবিধা নিশ্চিত। মথদের মত শিশুদের এই বড়দের প্রতি অন্ধবিশ্বাস বা অনুকরণপ্রিয়তা ক্ষতিকর। কিন্তু একই মনস্তত্ত্ব তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। তাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে শিশু-মস্তিষ্ক এমনভাবে তৈরী হয় যাতে তারা সহজেই দলনেতা বা বড়দের কথা বিশ্বাস করে। শিশুরা যেহেতু বড়দের ভাল আর খারাপ পরামর্শের প্রভেদ জানেনা, তারা একই সাথে বিশ্বাস করে 'জলে পা ডোবাতে নেই, কুমীর থাকতে পারে', আর, 'পূর্ণিমার রাতে পাঁঠাবলি দিতে হয়' - যদিও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সময় আর পাঁঠার অপচয় ছাড়া লাভ কিছুই হয়না। এই শিশুই বড় হয়ে তার সন্তানকে একই শিক্ষাদান করে - কিছু ঠিক আর কিছু বেঠিক - আর সেও তা বহন করে চলে।

এই মডেল অনুসারে আমরা ধারণা করতে পারি ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি এলাকায় বিভিন্ন অযৌক্তিক ভিত্তিহীন বিশ্বাস বংশানুক্রমে প্রচলিত। কুসংস্কার বা অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান এভাবেই আঞ্চলিকভাবে উদ্ভূত - বংশানুক্রমে প্রবাহিত হওয়ার ফলে ভাষার মতই সময়ে সময়ে সামান্য আকারে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। একজায়গায় উৎপন্ন বিশ্বাস বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ধীরে ধীরে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে, কখনও বা আঞ্চলিক বিশ্বাসের সাথে মিশে গেছে।

ধর্মীয় নেতারা নিষ্পাপ শিশুদের এই দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত। তাই ধর্মযাজকেরা গর্ব করে বলেন - 'আমাকে প্রথম সাত বছরের জন্য একটি শিশুকে দিলে তাকে আমি সম্পূর্ণ মানুষ করে দিতে পারি'। সাম্প্রতিক কালে জেমস

ডবসন (*ফোকাস অন দ্য ফ্যামিলি* - খ্যাত) বলেছেন - 'শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থা যারা নিয়ন্ত্রণ করে, তারাই দেশের ভবিষ্যত নির্ধারণ করেন'।

ধর্মোপযোগী মানসিক কাঠামো

এবার, বিবর্তনবাদী মনস্তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিতে ধর্মকে পর্যালোচনা করা যাক। তাদের মতে মস্তিষ্ক কয়েকটি অংশ নিয়ে গঠিত, যাদের একেকটির কাজ একেক রকমের। কোনো অংশ যদি ভ্রাতৃত্ববোধ নিয়ন্ত্রণ করে তো আরেকটি সমবেদনা জাগিয়ে তোলে। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অংশ, দলগঠনের মানসিকতা আর নিজেদের দলের সদস্যকে অন্য দলের সদস্যের তুলনায় বেশী প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতার নিয়ন্ত্রণকারী অংশ - এদের প্রক্রিয়াগত ত্রুটির কারণে উপজাত প্রবৃত্তি হল ধর্মপরায়ণতা। এরা আসলে মানুষের ভাল বৈশিষ্ট্য হলেও কিছু ক্ষেত্রে এরা হিতে-বিপরীত করে, মথের আলোক-পরিচালিত দৃষ্টির মত।

পল ব্লুম, আমার মতই উপজাত-তত্ত্বে বিশ্বাসী আরেক মনস্তাত্ত্বিক, ধারণা করেন যে ধর্ম দ্বৈতবাদের (Dualist) উপজাত। দ্বৈতবাদে বিশ্বাসীরা মনে করেন শরীর ও মন দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্ত্বা - মন এক অপার্থিব সত্ত্বা। অপরদিকে, অদ্বৈতবাদীরা বিশ্বাস করেন মন শরীরেরই অংশ। দ্বৈতবাদীরা মনে করেন মন হল একরকম কায়াহীন আত্মা নিয়ে তৈরী, যা এক শরীর থেকে অন্য শরীরে প্রবেশ করতে পারে। অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মত আমিও দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী নই - কিন্তু আমারও সহজাত দ্বৈতবাদী প্রবৃত্তি আছে। ব্লুম দেখিয়েছেন, প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুরা দ্বৈতবাদে অনেক বেশী বিশ্বাসী - যা থেকে ধারণা করা যায় যে মস্তিষ্কের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রবণতা সহজাত। শুধু তাই নয়, শিশুরা সব ঘটনাকে কার্য-কারণ সূত্রে আবদ্ধ করতে চায় - যেমন, মেঘের কারণে বৃষ্টি বা সূর্যের কারণে আলো পাওয়া যায়। শিশুদের এই প্রবৃত্তিকে টেলিলজি (Telelogy) বলে।

সহজাত দ্বৈতবাদ আর টেলিলজির কারণে, সঠিক পরিবেশে প্রভাবে মানুষও ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে - যেভাবে মথেরা মোমবাতির আলোয় ঝাঁপ দেয়। দ্বৈতবাদ অনুসারে মানুষ ধারণা করে যে মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। আর টেলিলজির কারণে মনে করে যে সৃষ্টির কারণ হল কোনো অপরিসীম শক্তিধর ঈশ্বর। কিন্তু, উপজাত তত্ত্ব অনুসারে, মথের আলোক-পরিচালিত দৃষ্টির মত এই দ্বৈতবাদ আর টেলিলজিরও কিছু উপকারী দিক থাকা উচিত। দার্শনিক ড্যানিয়েল ডেনেটের প্রবণতাগত তত্ত্বে (Intentional Stance) আমরা সেই উপকারী দিক খুঁজে পাই।

প্রকৃতি, পারিপার্শ্বিক প্রাণিজগৎ ও পরিবেশের বিভিন্ন পরিস্থিতিকে বুঝতে ও অনুমান করতে আমরা যে অবস্থান গ্রহণ করি, তাকে ডেনেট তিনটি ভাগে ভাগ করেন - ভৌত অবস্থান, পরিকল্পিত অবস্থান ও প্রবণতাগত অবস্থান। ভৌত অবস্থানে (Physical Stance) মানুষ সবকিছু বিশ্লেষণ করে - যাচাই করে প্রতিটি অংশের কাজ আর কিভাবে তারা সংযুক্ত। কিন্তু এই অবস্থান যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। পরিকল্পিত অবস্থানে (Design Stance) বারবার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বস্তুর সম্পর্কে ধারণা করে - যেমন চাকা গড়ায় বা মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে। এটা একধরণের শর্টকাট, যা আমরাও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, ধরে নিই হৃৎপিন্ড পরিকল্পিত হয়েছে রক্ত পাম্প করার জন্য।

প্রবণতাগত অবস্থান হল আরো একটা শর্টকাট যা পরিকল্পিত অবস্থানের থেকেও কম সময়সাপেক্ষ। এই অবস্থানে প্রতিটি সত্ত্বাকে উদ্দেশ্যপ্রবণ বলে ধরা হয় - আর তাদের উদ্দেশ্য অনুমান করেই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সামনে পড়লে বাঘের উদ্দেশ্য অনুমান করতে দেরী হলেই সমস্যা। এই অবস্থায় বাঘ কি করে নখ বের করবে বা

ঝাঁপ দেবে তা ভাবতে গেলে বাঁচার সম্ভাবনা কমে যায়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে পরিকল্পিত অবস্থানের মতই এই অবস্থানও সমস্ত ধরণের বস্তু (প্রকৃতপক্ষে যার উদ্দেশ্য আছে, বা যার নেই) সম্পর্কেই নেওয়া সম্ভব।

এটা সহজবোধ্য যে প্রবণতাগত অবস্থানের সাথে বেঁচে থাকার সম্ভাবনার নিবিড় সম্পর্ক আছে। সামাজিক পরিস্থিতিতে এই অবস্থানের মূল্য আরও বেশী, সেখানে এমন কি অধিকতর মাত্রার প্রবণতাগত অবস্থানও লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় মাত্রার প্রবণতার উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে একজন পুরুষ বিশ্বাস করে যে আরেকটি নারী তাকে পছন্দ করে। চতুর্থ মাত্রায় বলা যায়, এক মহিলা ভাবছেন যে ওই ব্যক্তি জেনে গেছে যে সে চুরি করেছে। এভাবে আরো বেশী মাত্রার কথা ভাবা যেতে পারে - যেগুলো সামাজিক জীবনযাপনের জন্য জরুরী।

প্রবণতাগত অবস্থান মানুষের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয় বলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের মস্তিষ্কের বিন্যাসে তা জায়গা করে নিয়েছে। তাই আমরা সহজাত ভাবেই সব গুরুত্বপূর্ণ সত্ত্বারই উদ্দেশ্য বিশ্লেষনের চেষ্টা করি। এই অবস্থান মানুষের বন্ধু-শত্রু নির্বাচনে যেমন সাহায্য করে, তেমনই উপজাত হিসাবে প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যেও অভিপ্রায় আরোপ করতে প্রবুদ্ধ করে। এ জন্যই আদিবাসী বা আদিম মানুষেরা ঝড়, বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ভগবানের অভিপ্রায় সন্ধান করেছে। ব্লুমের মতে, শিশুদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশী লক্ষ্য করা যায়।

নৃতত্ত্ববিদ হেলেন ফিশারের মতে ধর্ম আমাদের ভালবাসা-প্রবণতার উপজাত। এই প্রবণতার নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা সবসময়েই বেশী। তার যুক্তিতে ভালবাসা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। প্রেমিকাকে প্রেমিক আর দশজন মহিলার চেয়ে শতগুণ সুন্দর বলে দাবী করে, যদিও বাস্তবে তা কোনোভাবেই ঠিক নয়। তাছাড়া, একসাথে বিভিন্ন খাবার পছন্দ করে, বিভিন্ন জামাকাপড় পরতে চায়, কিন্তু একজন সাধারণত একসাথে একাধিক ব্যক্তির প্রেমে পড়ে না। ফিশার দেখিয়েছেন প্রেমে পড়া মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষ রাসায়নিক ভারসাম্য বজায় রাখে। আর সেই অবস্থা নির্বাচিত হয়ে মানুষের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন বিবর্তনবাদী মনস্তাত্ত্বিকেরা। নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করা যায়। গুহাজীবনে যে শিশুদের বাবা-মায়েরা তাদের বড় করে তোলা অবধি নিজেদের বোঝাপড়া ও ভালবাসা বজায় রাখতে পেরেছিল, তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও বেশী ছিল - আর তার নিয়ন্ত্রক জিন নির্বাচিতদের মধ্যে বেশী করে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভালবাসার সাথে ধর্মপরায়ণতার সাদৃশ্য প্রচুর। উভয়েই কিছু স্বস্তি-সান্ত্বনা দেয়, বিপজ্জনক বিশ্বে লড়াই করে বাঁচার সাহস দেয়। তাই ভালবাসা-প্রবণতার উপজাত হিসাবে ধর্মপরায়ণতার সৃষ্টি - তা বিশ্বাসযোগ্য। মথের আলোক-পরিচালিত দৃষ্টির সাথে এখানে তুলনা চলে নারী-পুরুষের ভালবাসাকে, যা তাকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্ম দিয়ে নির্বাচিত হতে সাহায্য করে, আর আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার সাথে তুলনা চলে ধর্মপরায়ণতার, যা এক ক্ষতিকর উপজাত।

জীববিজ্ঞানী লুইস ওল্পার্টের মতে যেকোনো ধারণার সর্বজনীন-করণ হল একরকম গঠনমূলক অযৌক্তিকতা (Constructive Irrationality)। বিপদসংকুল গুহাজীবনে বা শিকারের সময় মানসিক পরিবর্তনশীলতা একটা ক্ষতিকর প্রবৃত্তি বলে গণ্য করা যেতে পারে। গঠনমূলক অযৌক্তিকতা এই পরিবর্তনশীলতার বিরুদ্ধে কাজ করে। সহজ কথায়, নতুন প্রমাণ সংগ্রহ করে নতুন যুক্তিতে ধারণা পরিবর্তন করার থেকে কখনও কখনও অযৌক্তিক ধারণা বয়ে চলা সহজ। ওল্পার্টের মতে ভালবাসা আর ধর্মপরায়ণতার সৃষ্টি এই গঠনমূলক অযৌক্তিকতার উপজাতরূপেই। একই ভাবে রবার্ট ট্রিভার বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মবঞ্চনার ব্যাখ্যা

দিয়েছেন। লিয়নেল টাইগার বলেছেন মানুষের এক প্রবৃত্তির কথা - মানুষ যা দেখতে চায়, তাই বেশী করে দেখে, যার সাথে আগে বঞ্চনার অভিজ্ঞতা আছে, তার কথা শুনলেই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ধর্ম এদেরও কমবেশী উপজাত।

আবার পুরনো মতামতে ফিরে যাওয়া যাক। নিষ্পাপ শিশুদের মনে প্রাপ্তবয়স্করা কিছু অযৌক্তিক 'ভাইরাস' প্রবেশ করিয়ে দেয়। কিন্তু কোনো 'ভাইরাস' কি অন্যের থেকে বেশী শক্তিশালী হতে পারে? কোনো 'ভাইরাস' কি মনে জায়গা করে নেওয়ার জন্য বিশেষভাবে দক্ষ? সত্যি কথা বলতে, 'ভাইরাস' গুলোর তুলনামূলক যোগ্যতার ওপর খুব একটা কিছু নির্ভর করে না। এখানে যোগ্যতা (merit) বলতে শুধু মনে জায়গা করে নেওয়া আর ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতাকেই বোঝানো হচ্ছে। এই 'ভাইরাস' গুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধাঁচে কোনো নির্বাচন কাজ করে কিনা সে বিষয়ে আমি আগ্রহী। কোনো ধারণার অন্যের তুলনায় বেশী আবেদন আছে কিনা বা মানব মনস্তত্ত্বের সাথে কোন ধারণা সুসঙ্গত - তা ভাবার বিষয় হতে পারে।

বিবর্তনের মডেলেও দেখা গেছে, নির্বাচন ছাড়াও পরিবর্তন সম্ভব। কোনো জিন যদি রূপান্তরিত হয়ে প্রায়-সমধর্মী আরেকটি জিনে পরিণত হয়, তাহলে তা নির্বাচনের সম্মুখীন হবেনা, কারণ জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে কোনো পরিবর্তন হবেনা। এভাবে বংশানুক্রমে পরিবর্তিত হয়ে রূপান্তরিত জিনটি জিন-পুল থেকে মূল জিনকেই সরিয়ে দিতে পারে। বাহ্যিক পরিবর্তন সামান্যই লক্ষ্য করা গেলেও এই প্রক্রিয়ায় মূল অন্তর্গঠনের পরিবর্তন হতে পারে। একে বলে জেনেটিক ড্রিফট (Genetic Drift)। আমাদের সংস্কৃতিতে এইরকম ড্রিফটের তুলনা পাওয়া যায়। ভাষা এই একই প্রক্রিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। মূল সংস্কৃত থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষা-উপভাষা সৃষ্টি হয়েছে। এদের কোনো একটির অন্যটির তুলনায় নির্বাচিত হওয়ার প্রশ্ন নেই, কিন্তু ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়ে একেকটি ভাষায় পরিনত হয়েছে। ধর্মমতগুলোও কোনোভাবে উৎপন্ন হয়ে একই ভাবে ড্রিফটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে - কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম না মেনেই। তাই ভাষার মত, ধর্মেও আঞ্চলিক বৈচিত্র্য দেখা যায়। একসাথে, নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে কিছু ধারণা বহুলভাবে প্রচারিত হয় - যেমন অবিনশ্বর আত্মার ধারণা বা স্বর্গ-নরকের ধারণা।

নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে একই ধর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরস্পরের পরিপূরকরূপে কাজ করে ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখে। প্রশ্ন হল, কিভাবে এত সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে ধর্ম বিন্যস্ত হল? কোনো 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের'(Intelligent Design) মাধ্যমে নাকি নির্বাচনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে? আমার মনে হয় উভয়েরই এতে কিছুটা ভূমিকা আছে। ধর্মীয় নেতারা সুচতুর ভাবে ধর্মের পরিকল্পনা করেছেন, যাতে তা সহজেই ছড়িয়ে পড়তে পারে। আবার, তারা পরিকল্পনা না করলেও সে বিশ্বাস হয়ত ভিন্নমতের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রচারিত হত।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের কিছু সুবিধাজনক প্রবৃত্তির উপজাত হিসাবে ধর্মপরায়ণতা উদ্ভূত হলেও, এই তত্ত্ব থেকে ধর্মকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করা যায়না। বিশদভাবে ধর্মকে ব্যাখ্যা করতে গেলে ধর্মমতগুলোর মধ্যে নির্বাচন সম্পর্কেও আলোচনা করতে হয়। ধর্ম কি তাহলে কিছু মিম(meme) দিয়ে গঠিত?

মিমবিন্যাস ও ধর্ম

'ধর্মে, সত্য বলতে সেই ধারণা বোঝায় যা বেশিদিন ধরে সমাজে টিঁকে আছে।' - অস্কার ওয়াইল্ড

প্রাকৃতিক নির্বাচন সাধারণভাবে সেই জিন গুলোকে নির্বাচন করে যা ব্যক্তির বেঁচে থাকার বা প্রজননের সক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। জিন এখানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে প্রতিলিপিকারক (Replicator) হিসাবে। কিন্তু, প্রাকৃতিক নির্বাচন যেকোনো প্রতিলিপিকারকের ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে। প্রতিলিপিকারক বলতে এখানে সেই সাংকেতিক তথ্যকে বোঝানো হচ্ছে যা নিজের হুবহু নকল করতে পারে, বা ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়ে পরিবর্তিত আরেক প্রতিলিপিকারক গঠন করতে পারে। প্রতিলিপিকারকের আদর্শ উদাহরণ হল জিন - যা DNA সজ্জার নিখুঁত প্রতিলিপি গঠন করতে সক্ষম। মিম-তত্ত্ব অনুসারে, মিমও এরকমই আরেক প্রতিলিপিকারক, যা আসলে সাংস্কৃতিক তথ্যের একক (Unit of Cultural Information)। হয়ত মিমেরা জিনের মত অত ভালো প্রতিলিপিকারক নয়, তবে মিম যত হুবহু নকল হবে, তত মিম-তত্ত্ব ভালভাবে কার্যকর হবে।

অনেকেরই মনে হতে পারে যে মিমের ক্ষেত্রে প্রতি প্রজন্মে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা এত বেশি, যে মিম-তত্ত্ব আদৌ কার্যকর হবেনা। প্রশ্ন আসে মিম কোথায় অবস্থান করে? শুধুমাত্র মানুষের মস্তিষ্কে? না প্রতিটি ই-মেল, এমনকি কাগজে লেখা কবিতাও কি মিম? আমার মতে মিমের প্রতিলিপি গঠনের ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ অবান্তর। মনে করুন একজন বৃদ্ধ কাঠমিস্ত্রী একজন তরুণ শিক্ষানবিশকে কাজ শেখাচ্ছেন। শিক্ষানবিশ কি তার সব সব কর্মপদ্ধতি হুবহু নকল করবেন? তা নয়, তিনি তার শিক্ষকের উদ্দেশ্য বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবেন, যাতে পরে তিনি সেটা পরে করতে পারেন। একট পেরেক পুঁতে ফেলতে হাতুড়ির কটা ঘা লাগে সেটা মাথায় না রেখে বুঝে নেবেন যে হাতুড়ি দিয়ে পেরেক পুঁতে ফেলতে হবে। একই পদ্ধতিতে প্রজন্মের পরে প্রজন্ম কাপড় সেলাই, ওরিগামি, মাটির কাজ সব কৌশলই নিখুঁতভাবে হস্তান্তর হতে থাকে।

সুসান ব্ল্যাকমোরের 'দ্য মিম মেশিন' বইয়ের ভূমিকায় আমি একটি উদাহরণ দিয়েছিলাম। আমি ছোটোবেলায় আমার বাবার কাছ থেকে একটি ওরিগামি (Origami) শিখেছিলাম। ওরিগামিটা বেশ শক্ত ছিল, তাতে ৩২ টা ধাপ ছিল। শেষে একটা সুন্দর অবয়ব পাওয়া যেত। এমনকি মাঝপথেও তিন-চার রকম অবয়ব তৈরী হত, ঢাকা দেওয়া বাক্স বা ছবির ফ্রেমের মত দেখতে। আমাদের বোর্ডিং স্কুলে মেট্রন এই ওরিগামি খেলা চালু করেছিলেন। খেলাটা কদিন চলেছিল, তারপরে আবার উধাও হয়ে গিয়েছিল। ছাব্বিশ বছর পরে আমি আবার সেই স্কুলে গিয়ে একই খেলা চালু করলাম, আবার খেলাটা কদিন চলে বন্ধ হয়ে গেল। এই ধরনের খেলা শুধুমাত্র মিম-প্রবাহের মাধ্যমেই চলতে থাকে, অবিকল একই দক্ষতায়। আমার বাবাদের সময়েও একই ভাবে খেলা শিখেছিলেন তিনি, আমার থেকে তিরিশ বছর আগে।

এবার একটা কাল্পনিক পরীক্ষার কথা ভাবা যাক। ২০০ জন ছাত্রকে ডেকে ২০টা লাইনে আলাদা করে দাঁড় করানো হল। এরা কেউই ওরিগামিটা আগে করেনি। এবার তাদের মধ্যে থেকে এক এক জনকে ডেকে তাদের ওরিগামিটা করে দেখানো হল, আর বলা হল পরেরজন কে একই ভাবে সেটা করে বোঝাতে। এভাবে পরের পর ছাত্রদের মধ্যে ওরিগামি হস্তান্তর চলতে থাকল ২০টা সমান্তরাল লাইনে, যেমন ভাবে প্রজন্মের পরে প্রজন্মে মিম হস্তান্তর হয়। শেষে ২০টা আলাদা ওরিগামি অবয়ব তৈরী। আমার ধারণা, এদের অধিকাংশই প্রথমটির মতই নিঁখুত হবে। হয়ত দুয়েকজন 'উইক লিংক' এর জন্য কিছু লাইনে করেকজনের পরে আর ঠিকঠাক ওরিগামি হবেনা। খুব অল্প ক্ষেত্রে ওরিগামির সামান্য রূপান্তর লক্ষ্য করা যেতে পারে। এরপরে ওই একই পরীক্ষা করা হল একটা আঁকা ছবি নিয়ে। এবার কিন্তু ২০টা লাইনে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি পাওয়া যাবে - প্রজন্মের হস্তান্তরের ফলে ওরিগামির নিঁখুত থেকে গেলেও ছবি আঁকা পরিবর্তিত হয়েছে।

কিন্তু তাহলে প্রশ্ন হল, ছবি আঁকা আর ওরিগামির মধ্যে পার্থক্য কোথায় যে একটা কৌশল (skill) নিঁখুতভাবে নকল করে ফেলা যাচ্ছে আর আরেকটা যাচ্ছে না? পার্থক্যটা পদ্ধতিগত। ওরিগামির কৌশলে প্রতিটি ধাপে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্দিষ্ট, প্রায়শই কাগজটাকে মাঝখানে ভাঁজ করতে বলা হয়। একজন একধাপে ভুল করলেও পরেরজনে সেটা ধরে ঠিক করে ফেলতে পারে। তাই, ধাপ গুলোকে 'ডিজিটাল'(digital) বলা যায়। কিন্তু ছবির ক্ষেত্রে ঘটনাটা আলাদা। একবার ছবিতে পরিবর্তন এলে সেই পরিবর্তন ঠিক করে ফেলা প্রায় অসম্ভব, এর মধ্যে স্ব-সংশোধন ক্ষমতা নেই। ছবি আঁকার কৌশল তাই 'এনালগ'(Analog)। তাতে বেশি পার্থক্য তৈরী হয়। শব্দ বা বাক্যও এরকম স্ব-সংশোধক্ষম (Self-normalizing), যদি সেটা ভাল করে বোঝা সম্ভব হয়। একই ভাবে দাঁড় করানো ছাত্রদের মাতৃভাষায় একটা সংক্ষিপ্ত বাক্য বলে দিলে তারা সেটা শেষ পর্যন্ত হুবহু নকল করতে পারবে, কিন্তু অজানা কোনো ভাষায় হলে পারবেনা, আঁকা ছবির মতই দশা হবে তার। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে সব মিম একই ভাবে নিজের প্রতিরূপ গঠন করতে পারেনা, কিছু মিম বেশি নিখুঁত ভাবে প্রবাহিত হয় অন্যেদের চেয়ে।

সুসান ব্ল্যাকমোরের *'দ্য মিম মেশিন'* বইয়ে মিম-তত্ত্ব নিয়ে তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি কল্পনা করেছেন সারা পৃথিবীজোড়া মস্তিষ্ক - আর মিমেরা নেমেছে মস্তিষ্কে স্থান দখলের লড়াইতে। জিন পুলের মতই মিম পুলেও সেই মিমই বেশি করে স্থান পায় যা ভাল প্রতিলিপি গঠনে সক্ষম। কোনো মিমের নিজস্ব আবেদন থাকার কারণে বা কোনো মিমের সাথে পুলে বিদ্যমান মিমগুলোর সহাবস্থানের ক্ষমতার কারণে মিমেরা মিম-পুলে স্থান পায়। দ্বিতীয় কারণ থেকে তৈরি হয় 'মেমেপ্লেক্স' (Memeplex) বা মিম-সমষ্টি, যারা একসাথে সহাবস্থান করে। এই মেমেপ্লেক্সর অনুরূপ জিনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। প্রতিটি জিনের সাথে জিন বাহকের এক বা একাধিক বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য জড়িত আছে। যে জিনের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য জিন বাহকের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বাহককে সাহায্য করে, সেই জিনই নির্বাচিত হয়। তার সাথে, যে জিন বাদবাকি জিনের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনা, সেও একই কারণে জিন-পুলে নির্বাচিত হবেনা। যেমন, নিরামিশাষী জিন-পুলে মাংসাশী জিন-পুলে নির্বাচিত হবেনা। মেমেপ্লেক্সও এভাবেই কাজ করে - সহাবস্থানক্ষম মিমদের নিয়ে। যে মিমগুলো নিজেরা মিম-পুলে স্থান পেতনা, তারাই হয়ত মিম-পুলে ভালভাবে স্থান করে নেয় অন্য মিমের উপস্থিতিতে।

এবার মিম-তত্ত্ব দিয়ে ধর্মকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। কিছু ধর্মীয় মত নিজস্ব আবেদনের মেমেপ্লেক্সে স্থান পায়, আর কিছু স্থান পায় কারণ তারা মেমেপ্লেক্সে বিপুলভাবে বর্তমান মিমগুলির সাথে খাপ খায়। আমি প্রথম গোষ্ঠীভুক্ত মিমদের একটা তালিকা বানাবার চেষ্টা করলাম :

- মৃত্যুর পরে জীবনলাভ সম্ভব।
- শহিদ হলে স্বর্গে গিয়ে ৭২ জন কুমারীর সান্নিধ্যলাভ হবে।
- নাস্তিক, ধর্মবিরোধী আর বিধর্মীদের মেরে ফেলা উচিত (অথবা, তাদের বা তাদের পরিবার একঘরে করে ফেলতে হবে)।
- ঈশ্বরে বিশ্বাস করা এক মহৎ গুণ। বিশ্বাসে কোনভাবে চিড় ধরলে তাকে আবার ঠিক করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হবে।
- বিশ্বাস (প্রমাণ ছাড়া) এক মহৎ গুণ। যত কম প্রমাণ সহ বিশ্বাস করা যায় ততই গভীর হয় বিশ্বাস। আর বিশ্বাসীরা পুরষ্কৃত হয়।
- যারা ধর্মবিশ্বাসী নয়, তাদেরও ধর্মীয় বিশ্বাসকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা উচিত।
- ধর্মে কিছু অদ্ভূত ঘটনা থাকে যা বোঝার চেষ্টা করা উচিত নয়। এদের বিশ্বাস করতে শেখা উচিত।
- শ্রুতিমধুর গান-বাজনা, সুন্দর চারুকলা বা শ্লোক - এরা সবই ধর্ম থেকে উদ্ভূত।

একেকটি ধর্মকে একেকটি মেমেপ্লেক্স বলে কল্পনা করা যেতে পারে। ইসলামকে যদি মাংসাশী মেমেপ্লেক্স বলা যায় তাহলে বৌদ্ধধর্মকে নিরামিশাষী মেমেপ্লেক্স ধরে নেওয়া যায়। একটি মেমেপ্লেক্সকে (ধর্ম) আরেকটির চেয়ে ভাল বলে ধরা যায় না। ধর্মীয় মিম গুলো একে অপরের উপস্থিতিতে বিকাশ লাভ করে ও সহজেই নিজস্ব মেমেপ্লেক্সের সাহায্যে মিম-পুলে স্থান পায়।

তাহলে এই মিম-তত্ত্বের সাথে পূর্ববর্ণিত জিনগত তত্ত্বের সংযোগ কিভাবে সাধন করা সম্ভব? প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্ক এমনভাবে গঠিত হয়েছে যাতে তা মিম-বোঝাই হয়ে থাকতে পারে। অনেকটা মনে করা যেতে পারে যেন মস্তিষ্ক হল একটা হার্ডওয়র প্ল্যাটফর্ম (Hardware Platform) আর অপারেটিং সিস্টেম (Operating system) নিয়ে গঠিত, যা আসলে জিন-কেন্দ্রিক প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভূত। আর মিম হল তার মধ্যে 'ইনস্টলড সফটওয়র' (Installed Software)। আমার ধারণা, প্রথমে মিমগুলো বিচ্ছিন্ন আকারে জনমানসে স্থান পেয়েছে নিজস্ব আবেদনের কারণে। এই অবস্থায় ধর্মীয় মিম গুলো মূলত ছিল মানসিক কাঠামোর উপজাত। পরে তাদের মধ্যে থেকে সহাবস্থানক্ষম মিমদের একত্র করে সংঘবদ্ধ (Organized) ধর্ম বা মেমেপ্লেক্স গঠিত হয়েছে। এভাবে জিন এবং মিম উভয়েই ধর্মের বিবর্তনে অংশগ্রহণ করেছে।

কার্গো কাল্টের কথা

কার্গো কাল্ট (Cargo Cult) হল প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ গুলিতে বর্তমান ধর্মবিশ্বাসগুলোর একটি সম্মিলিত নাম - যারা কার্গো-জাহাজ গুলোকে স্বর্গীয় দূতের পাঠানো সামগ্রী মনে করত। জাহাজের ইউরোপিয়ান নাবিকেরা কিভাবে রেডিও শোনে, কেন কোনো সারাইয়ের কাজ করতে হয়না, রাতে কি করে আলো জ্বালায় - এ সবই দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীরা অদ্ভুত বিস্ময়ে দেখত। ভানুয়াটুর (Vanuatu) তান্না (Tanna) দ্বীপে, কার্গোয় আসা আমেরিকান নাবিকদের এমনকি পূজো করা হত। আসলে উন্নত টেকনলোজির সাথে ম্যাজিকের বিশেষ একটা পার্থক্য নেই। তাই আদিবাসীরা সহজেই তাদের স্বর্গীয় দূত বলে মেনে নিত। তাদের ধর্মবিশ্বাসে পরবর্তীকালে এইসব 'ম্যাজিক'-এর ধারাও প্রবেশ করে, এমনকি নতুন ধর্মও তৈরী হয়।

তান্নায় এরকমই একটি কাল্ট এখনো আছে জন ফ্রামকে কেন্দ্র করে। সরকারি নথি অনুসারে জন ফ্রাম ১৯৪০ সালে দ্বীপে এসেছিলেন, যদিও নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারেনা যে এ নামে সত্যি কেউ ছিল। সে অনেকগুলো ভবিষ্যতবাণী করে গিয়েছিল - দ্বিতীয়বারে জাহাজভর্তি সামগ্রী আনবে ও সাদা আমেরিকানদের চিরকালের মত দ্বীপ থেকে বিতাড়িত করা হবে বলে। আরো ভয়ানক, সে বলে গিয়েছিল পরেরবারে আসার পরে আমেরিকানদের কারেন্সী তুলে দেওয়া হবে, তাই এর মধ্যে সবাই যেন তা শেষ করে ফেলে। ১৯৪১ সালে সেই আশায় আদিবাসীরা কাজ বন্ধ করে দিলো আর যা টাকাপয়সা ছিল তা দিয়ে জিনিসপত্র কিনতে থাকল। দ্বীপের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হল। কিছুদিন পরে যখন আমেরিকান সৈন্যরা জাহাজে করে পৌছল দ্বীপে, তারা মনে করল জন এসে গেছে। কোন এক নেতার বক্তব্য অনুসারে দ্বীপের মাঝে রানওয়ে বানানো হল যাতে আমেরিকার রাজা জন এসে নামতে পারে। বাঁশের হেডফোন, কন্ট্রোল টাওয়ার বানানো হল, যাতে জনের নামতে অসুবিধা না হয়।

ডেভিড অটেনবারো পঞ্চাশের দশকে সেখানে গিয়ে আবিস্কার করেন নাম্বাস নামে এক পুরোহিত এই নবগঠিত কাল্টের দায়িত্বে আছে - সে জনের সাথে নিয়মিত রেডিওতে যোগাযোগও রাখে। রেডিও থাকে জনের কাছে। অপরপ্রান্তে এক বৃদ্ধা, যার কোমরে বিদুতবাহী তার জড়ানো, মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন হয়ে অস্ফুটস্বরে কথা বলতে

থাকে - নাম্বাস সেটা বোঝে আর সবাইকে জানায়। ১৫ই ফেব্রুয়ারী জনের ফিরে আসার দিন হিসাবে চিহ্নিত, সেইদিন ধর্মীয় উৎসব পালন হয়। সব দেখে অটেনবারো তার বন্ধু স্যামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কেন এই আদিবাসীরা এত বছর ধরে অপেক্ষা করে চলেছে জনের পুনারগমনের জন্য - এতদিনে তো তাদের বোধোদয় হওয়ার কথা। স্যামের স্পষ্ট উত্তর - যদি আমরা ২০০০ বছর ধরে খ্রীষ্টের পুরাগমনের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে পারি, এদের উনিশ বছর কি খুব বেশি সময়?

মিম

মিম নিয়ে আমি আগেও লিখেছি, তাই মিমতত্ত্ব বুঝতে গেলে সেটা মুক্তমনা ওয়েব সাইট থেকে পড়ে দেখা যায়। তবে মিম-তত্ত্ব থেকে ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে আমি নিজেরও কিছু উদাহরণ দিলাম।

আমাদের সমাজে জাতিভেদপ্রথার মূলে আছে এরকমই বংশানুক্রমে মিম প্রবাহ। একেকটি জাতির মধ্যে একেকটি কৌশল-মিম যুগযুগান্ত ধরে অপরিবর্তিত অবস্থায় বাহিত হচ্ছে - কেউ সেই অনুযায়ী কামার, কুমোর, নাপিত, কসাই, পূজারী বা সোনার বনিক, এসব জাতি তৈরী হয়েছে। আজকে একটা গ্রামে এক কুমোর যা কৌশল ব্যবহার করে মাটির কলস বানায় তার সাথে তার ঠাকুর্দার কৌশলের কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং মিমের নকল হওয়ার ক্ষমতা সহজেই অনুমেয়।

ইসলামের সুফিবাদ দক্ষিণ এশিয়াতে জনপ্রিয় হওয়ার মূল কারণ এর মেমেপ্লেক্সটি আরব উপদ্বীপের ইসলামের সাথে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর মিম গুলোকেও স্থান দিয়েছিল। তাই বাস্তবে দেখা যায়, যত উত্তর ও পশ্চিম ভারতের দিকে যাওয়া যায় তত এদের ধর্মমতের সাথে পারসিক ও মধ্য এশিয়ার জনগোষ্ঠীর মতের মিলল পাওয়া যায়। আবার বাংলাদেশের ইসলামিক মত এদের তুলনায় ভিন্ন।

ভারতে কার্গো কাল্টের উদাহরণ কম নেই। কালীপূজোর আমদানি ঘটেছে এদেশে অনার্যদের হাত ধরেই। তারাও হয়ত পলিনেশিয়ার আদিবাসীদের মত প্রথমে আর্যদের মত করে পুজো করতেই ব্যস্ত ছিল। পরে সমাজ মিলে মিশে গেলেও অনার্যরা নিচুজাতি অস্পৃশ্য বলে গণ্য হয়েছে কিন্তু মিম-বিনিময়ের ফলে কিছু অনার্য ধর্মবিশ্বাস স্থান করে নিয়েছে আর্যপ্রধান মূল ভারতীয় মেমেপ্লেক্সে।

কিছুদিন আগে আরো একটা ভাল উদাহরণ পড়লাম। ওড়িশায় যেসব জায়গায় বৌদ্ধস্তুপ বা ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে, দেখা গেছে সেই অঞ্চলে বসবাসকারি আদিবাসীরা সেই ভগ্নাবশেষের মূর্তি নিয়ে পুজো শুরু করেছে। তাদের ধর্মমতে এ আরেক মিমের সংযোজন।

মেমেপ্লেক্সের সবচেয়ে ভালো উদাহরণ মনে হয় কনস্পিরেসি থিয়োরীতে পাওয়া যায়। প্রতিটি কনস্পিরেসি থিয়োরী এক একটি ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের প্রমাণ - এমনভাবে তৈরী যাতে তাকে চূড়ান্তভাবে ভুল প্রমাণ করা সম্ভব নয়, ঠিক যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণাও ভুল প্রমাণ করা যায়না।

ড্যানিয়েল ডেনেটর প্রবণতাগত তত্ত্বের নিদর্শন আমরা প্রতিনিয়ত পেয়ে থাকি। এখনো মার্কেটিং স্কিলের প্রধান স্তম্ভ হল অন্যের প্রবণতা আগে থেকে সঠিকভাবে অনুমান করা। এই দক্ষতার অভাবে আমাদের সমাজে যে কেউ

অসামাজিক আখ্যা পেতে পারে। আদিম মানুষের আদিম সমাজের মধ্যে তা যে আরো বেশি মাত্রায় ছিল, তা সহজেই অনুমেয় - কারণ সেই সমাজে অসামাজিক আখ্যা পাওয়া মৃত্যুদন্ডের সামিল।

** ধর্মের উৎস সন্ধানে প্রবন্ধটি রিচার্ড ডকিন্সের ঈশ্বর প্রবঞ্চনা (The God Delusion) বইয়ের The Roots of Religion অধ্যায় অবলম্বনে লিখিত।*

দিগন্ত সরকার, পেশায় কম্পিউটার প্রকৌশলী, মূল আগ্রহ বিজ্ঞান-সংক্রান্ত লেখায়। অর্থনীতি, রাজনীতি বা অন্যান্য বিষয়েও লিখে থাকেন। মুক্তমনার নিবেদিতপ্রাণ সদস্য। বর্তমান নিবাস সিয়াটেল, আমেরিকা। ইমেইল - diganta.sarkar@gmail.com

ধর্মের উৎপত্তি

উত্তর পুরুষ

পৃথিবীতে ধর্মের কি ভাবে শুরু কিংবা উৎপত্তি হয়েছিল তার ইতিহাস ও ব্যাখ্যা বিস্তর। এনিয়ে শত শত পুস্তক লিখা যাবে। কিন্তু মূল সত্যকে জানতে হলে থাকতে হবে গভীর ও তীক্ষ্ন অনুমান। জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন "ইমাজিনেশন ইজ মোওর ইমপোরটেন্ট দ্যান নলেজ"। কারণ আজ থেকে হাজার হাজার বৎসর আগে মানুষ যে প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাস করতো, সেই পরিবেশটাকে বুঝতে হবে অনুমানের কঠিন সত্য দিয়ে। তখন না ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, না ছিল নির্দিষ্ট কোন ভাষা, না ছিল উত্তম বাসগৃহ, না ছিল চলাফেরা করার মত উত্তম রাস্তা ঘাট। যা ছিল তা হলো গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে বসবাসের প্রয়োজনীয়তা, ছিল নিরাপত্তার চরম অভাব, আর ছিল খাদ্য অন্বেষনের জন্য শিকার ও চাষবাসের নানাবিধ প্রচেষ্টা। আধূনিক যুগের মানুষ পৃথিবীর ইতিহাস ও জাগতিক বহুমুখী শিক্ষা থেকে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারে "মানুষ জাতির অগ্রগতি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ" ঘটেছে শতাব্দি ও সহস্রাদির ধাপে ধাপে। তৎসঙ্গে মানুষের ভাষা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটেছে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর শতাব্দির চাকায়। এই সভ্যতার ক্রমবিকাশের জন্য কোন ঈশ্বর কিংবা মহাপ্রভু মাটির পৃথিবীতে নেমে এসে মানুষকে দিয়ে যাননি কোন অলৌকিক ক্ষমতা কিংবা কোন সংবিধান। মানুষ আদিম যুগ থেকে নিরাপত্তার কারণে ও বাঁচার তাগিদে নানাবিদ প্রচেষ্টা করেছে নিজ বুদ্ধিবলে। মানুষের এই প্রচেষ্টা ও বুদ্ধির প্রয়োগ আজ পর্যন্ত টিকে আছে অব্যাহত গতিতে। প্রতিকুল পরিবেশে আত্মরক্ষা, শিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য দূর্বলের উপর আক্রমণ, বুদ্ধির বলে নানাবিধ কৌশল দ্বারা অপরকে পরাজিত করা, ভাষার সুন্দর প্রয়োগ দ্বারা শান্তি, ঐক্য ও ভালবাসা স্থাপন করা, এসমস্ত মানুষ আয়ত্ত্ব করেছে নিজেদের বিবেক বুদ্ধির প্রয়োগ এবং তা থেকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার দ্বারা। আমরা যদি ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে নানা গবেষণা চালাই ও ইতিহাসের পাতা ওল্টাই তা হলে দেখতে পাবো ভয়, বুদ্ধি, স্বপ্ন, ভাষা, এবং কৌশল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ধর্মের উ্পত্তি হয়েছে। এর পেছনে ইশ্বরের কোন হাত নেই। মানুষ আদিম কাল থেকে নানাবিধ প্রাকৃতিক দূর্যোগের মুখোমুখি হত। যেমন, ঝড় তুফান, খরা, বন্যা, ভূমিকম্প, জলে ডুবা ইত্যাদি। এসব ছিল মানুষের জীবনের জন্য অত্যাধিক ভয়ের ব্যাপার। মানুষ ঐ সমস্ত দূর্যোগ থেকে আত্ম-রক্ষার জন্য কল্পিত পানির রাজাকে (বা দেবতাকে) খুশী করার জন্য পানিতে পূজো দেয়ার ব্যবস্থা করে। তাই জলের মধ্যে সুগন্ধিযুক্ত ফুল ছড়ানো, মিষ্টি ফল বিতরণ করা ছাড়াও উপঢৌকন হিসেবে নানাবিধ অলঙ্কার ও কাপড় চোপড় ইত্যাদি দেয়া হত। এসব ব্যবস্থাপনা শুরু হয় পরিবার ও গোষ্ঠীর ক'জন মিলে, নানাবিধ পরামর্শের পর। এভাবে বাতাস যখন প্রবল বেগে বইতে শুরু করে তখন আদিম মানুষ বাতাসকে ক্রোধান্বিত না হওয়ার জন্য নানা রকমের ছড়া কাটতে কাটতে বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সুগন্ধিফুল, শস্য দানা ইত্যাদি। সুর্য যখন উদয় হয় তখন সমস্ত আঁধার কেটে যায়। অন্তর থেকে দূর হয় বন্যপ্রাণীর আক্রমণের ভয়। শিকার, কাজকর্ম ও চলাফেরা করতে হয় সুবিধে। সুর্যের আলো দ্বারা হয় শীত নিবারণ। অতএব সুর্যটা খুব উপকারী সুতরাং সুর্যকে খুশী না করলে ওটা মাঝে মাঝে রাগ করে বসে। সব কিছু পুড়িয়ে দিতে চায় (খরা) আবার বৃষ্টির সময়ে সে গর্জন করে (বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত দ্বারা) নানা বিপত্তি ঘটায়। অতএব সুর্যটা ভীষণ শক্তিশালী ওকে খুশ রাখা খুবই জরুরী। সুর্যকে খুশি করলে অনেক শক্তি পাওয়া যাবে। এরকম মানষিক ধারণা থেকে সুর্যকে মানুষ নানা ভাবে পূজো দিতে শুরু করে। অনেক আদিম সম্প্রদায় আগুনকে সুর্যের

প্রতিনিধি মনে করে অগ্নিপূজা করতো। এভাবে ভয়ের কারণে আত্ম-রক্ষার তাগিদে শুরু হয়েছে প্রকৃতিপূজা বা ধর্মীয় আচরণ। তদ্রুপ নানা যুক্তি তর্কের মধ্যে শক্তিমান প্রাণী হিসেবে হাতি, সিংহ ও ঈগলকে, আবার উপকারী জন্তু হিসেব গরু ছাগল ও ভেড়াকে অনেক আদিম শ্রেণীর মানুষ পুজো দিতে আরম্ভ করে। কোন কোন সম্প্রদায় ধর্মীয় পুণ্যের জন্য এই নিরীহ প্রাণীগুলোর রক্ত মাংস দেব-দেবী কিংবা ইশ্বরের নামে উ□সর্গ করে। এভাবে বিভিন্ন রোগে মানুষ যখন আক্রান্ত হত তখন সে ভাবতো যে 'প্রকৃতি' বা যে 'প্রাণী' বেশী শক্তিশালী তার কাছে গিয়ে অনুনয় বিনয় করতে হবে, তার গুণ-কীর্তন গাইতে হবে। কোন কোন গোষ্ঠীপতিরা ভাবতো নদী বা পানি শক্তিশালী, কেউ ভাবতো আগুন, কেউ ভাবতো সুর্য, কেউ ভাবতো বাতাস। এভাবে একেক শক্তিকে নিজ নিজ বুদ্ধিমত্তার বলে দেয়া হত পূজো। কেউ পূজো দিতে গিয়ে গান, নাচ এবং ছড়া কাটার ও প্রবর্তন করে। আবার কোন কোন গোষ্ঠীর ভক্তরা পুজো দিতে গিয়ে চুপি চুপি ছড়া কাটতো, যাকে আমরা মন্ত্রপাঠ হিসেবে প্রাথমিক ভাবে ধরে নিতে পারি। তারা মনে করতো এতে শক্তির অধিকারী অদৃশ্য রাজা খুশী হয়ে তাদের মঙ্গল করবে বা বিপদ আপদ থেকে মুক্ত করবে। এসব করতে গিয়ে বিভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্ন ভাবে বসবাসকারী গোষ্ঠি গুলোর মধ্যে পুজোর (ওরশিপ রিচুয়েলের) আচার অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রকম ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। যদিও তাদের মৌলিক উদ্দেশ্য এক।

এভাবে সময়ের ধাপে ধাপে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা কওমের মধ্যে তুলনামূলক ভাবে কিছু কিছু বুদ্ধিমান লোকের আর্বিভাব হয়। তারা গোষ্ঠী বা কওমের মধ্যে নিজেকে নেতা বা অভিভাবক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এসব নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ ওরসিপ বা পূজো-প্রার্থণার দায়িত্ব একাই নিত। তারা মুরব্বী বা অভিভাবক হিসেবে নিজেদের কওমের মধ্যে নানাবিধ দাবী খাটাতো। নিজ বুদ্ধি বলে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদের অসুখ বিসুখ, জীন, ভূত ডাইনীদের নজর না লাগার জন্য নানাবিধ পথ্যাদি ও উপায় বা□লে দিত। জীবনের অভিজ্ঞতায় ঝড় বৃষ্টি খরা ইত্যাদির ইঙ্গিত ও কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী খয়রাত করে গোষ্ঠীর মধ্যে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে সম্মান পেতো। এছাড়া বিপদ আপদ না আসার জন্য নানাবিদ তন্ত্র মন্ত্র, পূজো প্রার্থণা এসব ছিল তাদের মৌলিক দায়িত্ব। কোন গোষ্ঠীর সাথে কোন ঝগড়া বিবাদ হলে তার মীমাংশা কিংবা জোর পূর্বক কোন কিছু দখল করতে হলে (যেমন পানির উ□স, ফসলের ভূমিসত্ত্ব ইত্যাদি) তার আদেশ নির্দেশ সবাই মেনে নিত নির্দ্বিধায়। এভাবে যুগ ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এরা হয়ে উঠলো এক শ্রেণীর অঘোষিত সমাজ সর্দার। কোন দেবতার দ্বারা সাহায্য লাভ কিংবা কোন অপশক্তির বিরুদ্ধে কখন কি ভাবে মোকাবেলা করতে হবে তার দায়ভাগ তাদের উপর গুরূ দায়িত্ব হিসেব অর্পিত হলো। বিনিময়ে সেই ব্যক্তি সমাজের নানাবিধ সুযোগ সুবিধাও হাতিয়ে নিতে থাকলো। অতএব বিভিন্ন দৈবশক্তি কিংবা ঐশী শক্তির একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে লোকটি সমাজে একক প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল। প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর একখানা মন্দির কিংবা দেবালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আর কোন বাধা থাকবেনা। কি কাজে পাপ, কি কাজে পুণ্য, কোন কাজ না হলে শক্তিমান দেবতা বিপদ দেবেন এবং কি কি কাজে তিনি খুশী হয়ে পুরস্কার দেবেন তার সব অনুশীলন এই দেবালয় থেকে শুরু হলো। এভাবে নিজ বুদ্ধি বলে শুরু হলো আরেকটি নিরব সাম্রাজ্যের জয় যাত্রা। কালক্রমে এই দেবালয়ের গুরূত্ব বাড়তে থাকে। এসব দেবালয়ে এখন কুমারী বালিকারা এসে সেবা শ্রম দেবে। যে নারী সন্তান পাচ্ছেনা সেও নির্দিষ্ট সময়ে এসে গুরূর পরামর্শ অনুযায়ী নানাবিধ সেবা ও শ্রম দেবে। এভাবে সমাজের মধ্যে বাড়তে থাকবে তাদের সেবা ও কাজকর্ম। তাদের কাজ কর্মের কোন কৈফিয়ত বা জবাবদিহিতা কাউকে দিতে হবেনা। দিতে পারবেনা কেউ কোন অভিযোগ। তারা কেবল অদৃশ্য ইশ্বর ও দেবতাদের কাছে নিজেদের ভুল ত্রুটির

কৈফিয়ত দেবে। যে লোকটি এখন এই দেবালয়ের সর্বেসর্বা, ভবিষ্যতে তার পুত্র, প্রপৌত্ররা হবে এর মালিক। যদি উপযুক্ত কেউ না থাকে তবে নিজ গোষ্ঠীর বা আত্মীয়ের মধ্য থেকে কেউ এসে ধরবে এর হাল। এখন কেউ যদি এসে লোকটিকে বলে "ওহে দয়ার ঠাকুর আমি তো ঠিক মত আরতি যোগে ফুল দিলাম, প্রণাম দিলাম, যজ্ঞ দিলাম তবু কেন আমার ক্ষেতে ফসল হলোনা?" লোকটি তখন চোখ বন্ধ করে বলে শোন গো মা, ফুলতো ঠিকই দিয়েছিলে কিন্তু ফুলটিতে কোন এক সময় ঋতুবতী মহিলার ¯পর্শে হয়েছে অপবিত্র, এ কারণে ফসল ভাল হয়নি। এভাবে নিজ বুদ্ধি বলে একটা ত্র"টি বের করে এরা মানুষদের বোকা বানিয়ে রাখে। কেউ হয়তো এসে বললো আপনি আপনার শক্তিমান গো দেবতাকে বলুন "কেন দশ মাস থেকে আমার গাভীটা ভাল দুধ দিচ্ছেনা?" আচ্ছা বাবা তার আগে বল দেখি তোমার পরিবারে কে কে আছে ? তোমার সংসার চলে কি ভাবে ? পরিবারের কে কি করে? এরকম মামুলী কয়েকটি প্রশ্নের পর পুরোহিত লোকটি বললো "তৃতীয়া নক্ষত্রের রাত্রিতে আমি স্পেশাল প্রার্থণা শেষে তোমার গাভী ও দুধের জবাব জেনে নেব।" লোকটি খুশী মনে চলে গেল। কয়দিন পর যখন লোকটি পুণরায় তার গাভীর দুধ সম্পর্কীত জবাবটি জানতে চাইলো তখন পুরোহিত হাসতে হাসতে জবাব দিলেন 'দেখ বাবা জীবিশ্বরের (জীব জানোয়ারের ইশ্বর) কত দয়া।' তুমি একে একে তিনটি মেয়ে যখন পেলে,তখন মন থেকে শুধূ ছেলে সন্তানের জন্য হাহাকার করেছিলে। দিয়েছিলে পুজো করেছিলে প্রার্থণা। সে কারণে ইশ্বর তোমার ভাগ্য থেকে দুধের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে বিনিময়ে ছেলে সন্তান করেছেন দান। কারণ তিনি জানেন দুধ অপেক্ষা তোমার ছেলে সন্তানের প্রয়োজন বেশী, সে কারণে তিনি তোমার প্রার্থণা কবুল করেছেন। পুরোহিতের কথা শুনে লোকটি খুশীতে বাগ বাগ হয়ে পরদিন নিয়ে এলো কিছু মূল্যবান উপঢৌকন। এভাবে বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন কওমের মধ্য থেকে বুদ্ধিমান লোকগুলো ধীরে ধীরে সমাজের মধ্যমণি হয়ে উঠলো। তারা এখন সাধারণ মানুষের সমর্থন পাওয়ার জন্য নানাবিধ চেষ্টার কৌশল চালিয়ে যেতে লাগলো। বিনিময়ে তারা কিছুই চাহেনা। তারা চাহে মানুষের আন্তরিক আশীর্বাদ ও কর্মের আন্তরিক সমর্থন। আর এই সমর্থনটা হচ্ছে তাদের সবচেয়ে বড় পূঁজি যা নিরাপ্তার জন্য এক বিশাল হাতিয়ার। এ উদ্দেশ্যে তারা শোষিত মানুষদের মুক্তির জন্য করেছে নানাবিধ প্রচেষ্টা। অত্যাচারী রাজাদের তারা ভয় দেখিয়েছে পরকালের। অপর দিকে শোষিত মানুষদেরকে বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঘটিয়েছে ঐক্য এবং ইশ্বরের দাবী হিসেবে নায্য পাওনার দাবী করেছে শাসকবর্গদের কাছে। এতে অনেক দাবী আদায় হয়েছে। আবার কোথাও তা নিয়ে বেঁধেছে যুদ্ধ। এসব যুদ্ধের ফলে অনেক শাসকদের জ্ঞানচক্ষু খুলেছে, তারা বুঝতে পেরেছে নির্যাতীতেরাও ধর্মের ডাকে ঐক্য স্থাপিত করে মানুষের অধিকার আদায় করতে জানে। যারা অতি মাত্রায় ধূর্ত তারা ধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে বিলাস বহুল জীবনকে ঘৃণা করেছে। যার ফলে তারা সাধারণ দাসদের ও শ্রমজীবি মানুষের স্তরে নেমে এসে একাত্ম হয়েছে। তাদের ভিতরের প্রচন্ড আকাঙ্খা ও সবুজনক্সা ছিল এরকম; একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে গেলে চিরজীবন তার নাম অক্ষুন্ন থাকবে। ইশ্বরের গুণকীর্তন করার সাথে সাথে তার যশ খ্যাতির গুণকীর্তন ও করা হবে নিঃসন্দেহে। ধর্মের সমর্থকরা তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করবে আজীবন। তার নিজের গোষ্ঠীর গৌরব উজ্জ্বল দিক ইতিহাসে অঙ্কিত হবে আর রক্ত পঙ্কিল দিক কালের গহব্বরে হারিয়ে যাবে। এভাবে গোষ্ঠী কর্তৃক স্বীকৃত কিংবা স্বঘোষিত ইশ্বরের প্রতিনিধিরা সময় বা কালের স্রোতে নিজেদেরকে সমাজসেবী হিসেবে করেছে প্রতিষ্ঠিত। এবং তা করেছে নিজ এলাকায়, নিজের সমাজে। যেখানে সামাজিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলায় ছিল ভরপুর। কিন্তু এই সমাজ সেবা করতে গিয়ে পৃথিবীর মানুষের মাথায় নানাবিধ নিয়ম ও আইন কানুন বাধ্যতামুলক ভাবে বেধে দেয়া একটি স্বেচ্চাচারীতা ছাড়া আর কিছু নয়। ইশ্বরের নামে নিজের মগজ থেকে

তৈরী করা আইন সব সমাজের জন্য সব যুগে কখন ও উপযোগী হতে পারেনা। এটা মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার উপরে পরাধীনতার একটি শৃঙ্খল। পৃথিবীর সবকিছু যেমন চলমান, সমাজ ও তেমনি চলমান। সমাজ কখনও স্থবির নয়। হাজার হাজার বছরের পুরানো সামাজিক অবস্থার সাথে বর্তমান সামাজিক অবস্থার মিল কখনও এক হয়না। তাই যদি হত তাহলে মানব সমাজে "সভ্যতার ক্রমবিকাশ" বলে যে শব্দটি আছে এবং ক্রমবিকাশের ধারায় আমরা বর্তমানে যে অবস্থানে পৌচেছি তা কখনও সম্ভব হতনা। সুতরাং ধর্ম সর্বরোগের মহৌষধ হিসেবে ধারণা দেয়া কিংবা 'কমপ্লিট কোড অফ লাইফ' আখ্যা দিয়ে মানুষকে "নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল" বুঝ দেয়া একটি ভুল ধারণা। তাই যদি হয় তাহলে গোটা পৃথিবীর মানুষ কি এত বোকা যে তারা এত আধূনিক শিক্ষা, এত গবেষণা, এত বিশ্ববিদ্যালয়, এত সমাজ তত্ত্ব, এত সংগঠন, এত আইন শাস্ত্র, এত কোর্ট-কাছারী নিয়ে বেহুদা ঘাটাঘাটি করছে ?

ধর্মের ইতিহাস থেকে জানা যায় পৃথিবীতে মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে বেশী ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত ভারতে এবং ইউরুপের গ্রীস ও ইতালীতে ধর্মের প্রবল প্রতাপ ছিল। মধ্য প্রাচ্যের প্রায় প্রতিটি গোত্রেই কেউ না কেউ সময়ের স্রোতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর কারণ এবং অনুসন্ধান হিসেবে যে সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা যায় তা হলো, 'কয়েক বৎসর পর পর পৃথিবীতে একজন ঈশ্বরের প্রতিনিধি আসবেন' এরকম একটি ধারণা মানুষের মনের মধ্যে সর্বদাই বিদ্যমান থাকতো'। দ্বিতীয়টি হলো 'মানুষের নিদ্রাজাত স্বপ্ন'। এর দু'টি ব্যাখ্যা আছে। প্রথমটি হলো সেই আদি যুগে মানুষ যখন স্বপ্নের মধ্যে নানাবিধ বিষয়বস্তু দেখতো তখন সে বিশ্বাস করতো ঘটনাটির মধ্যে সে নিজেই জড়িত। সে নিজেই বিভিন্ন যায়গায় ছিল। অথচ সজাগ হয়ে বুঝতে পারে সে তার গুহার মধ্যে অথবা কুড়ে ঘরে ঠিকই শুয়ে আছে। তাহলে সে বাইরে গেল ক্যামনে ? এত কিছু দেখলো ক্যামন করে ? বিষয়টি তৎকালীন আদিম মানুষদেরকে দারুন দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়। তারা তখন ভাবতে থাকে তাহলে মানুষের মধ্যে খুব সম্ভব দু'টি আত্মা আছে। একটি আত্মা রাত্রি বেলা ঘুমের মধ্যে যাওয়া আসা করে, ঘুরে বেড়ায়। আর অপর আত্মাটি সব সময়ে সঙ্গে থাকে। সব সময় যে আত্মাটি থাকে সেটি একবার বেরিয়ে গেলে আর ফেরত আসেনা। অর্থাৎ মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে অদৃশ্যে উদাও হয়ে যায়। মানুষের মৃত্যুকালীন সময়ে মুখ ও বুকের যে অবস্থা হয় এতে অতীতের মানুষ অনুমান করেছিল আত্মা জিনিসটি বুকের ভেতর থাকে। আর মৃত্যুর সময়ে সেটি মুখ দিয়ে অতি কষ্টের সাথে বের হয়। তৎকালে হার্ট বা হৃদযন্ত্রের কার্যক্রম সর্ম্পকে মানুষের উন্নত ধারণা ছিলনা। তৎকালীন আদিম সমাজের শুরু থেকে বুদ্ধিমান যাযক বা পুরোহিত সম্প্রদায় মানুষকে এই ধারণা দিয়ে আসছে যে আত্মার মৃত্যু হয়না। যে ধারণা আজো বহাল তবিয়তে ঠিকে আছে সারা পৃথিবীতে। অতএব যাযক বা পুরোহিত সম্প্রদায় নিজেদের (ঐশ্বরিক) প্রতিনিধিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য বলে বেড়ালো যে পৃথিবীতে তুমি যত কিছু গোপনে কিংবা অন্যায় ভাবে করে থাকো তা সকল দৈব শক্তির অধিকারী ইশ্বর বা ইশ্বরগণ জানেন। এবং মৃত্যুর পরে শাস্তি হিসেবে তা তোমার আত্মার উপর আরোপিত হবে। তারা উদাহরণ স্বরূপ স্বপ্নের মধ্যে নানাবিধ কষ্ট পাওয়ার কথা উল্লেখ করেন। কেউ কেউ সেই আত্মা থেকে আবার দেহ সৃষ্টি করে দেহের উপর শাস্তি আরোপ করা হবে বলে নিশ্চয়তা দেন। কেউ কেউ মৃত্যুর পর আত্মা থেকে পূর্ণজন্ম লাভ করে নিকৃষ্ট শ্রেণীর পশুতে পরিণত হবার কথা উল্লেখ করেন। কেউ কেউ বলেন সেই আত্মা ভূত প্রেত বা পিশাচ হিসেব পৃথিবীর অন্ধকারে ঘুরে বেড়াবে। ইসলাম ধর্মের হাদীসে বলা হয়েছে মৃত্যুর পর যখন মানুষকে কবরে রাখা হবে। তারপর আত্মীয় স্বজনগণ চল্লিশ কদম দুরে সরে আসার পর, কবরস্থানে দু'জন

অদৃশ্য ফেরেশতা এসে সেই মৃত মানুষের ভিতরে রূহ বা আত্মার সংযোজন ঘটাবেন। মৃত মানুষটি তখন জেগে উঠবে এবং ভয়ানক চিৎকার করবে। সেই চি□কার কেবল মাত্র কিছু পশু পক্ষী ছাড়া কেউ শুনবেনা। তারপর সেই মানুষটিকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে। সেই পাঁচটি প্রশ্নের জবাব যারা দিতে পারবে তারা শান্তির সাথে পূণরায় ঘুমিয়ে পড়বে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত। আর যারা সঠিক জবাব দিতে পারবেনা তাদের আজাব শুরু হয়ে যাবে। সেই আযাব (শাস্তি) হতে পারে আত্মার উপর কিংবা দেহের উপর। তবে অধিকাংশের মতামত হলো দেহের উপর। এই আজাবের কোন ক্রন্দন বা চি□কার কোন মানবজাতি শুনতে পাবেনা। এই গল্পের শেষে আমি একজন মৌলভী সাহেবকে হাস্যমুখে বলেছিলাম তাহলে ইসলাম ধর্ম আর্বিভাবের পুর্বে পৃথিবী থেকে যে কোটি কোটি মানুষ মারা গেল তারা কেউতো এই পাঁচটি প্রশ্ন সম্পর্কে কোন প্রস্তুতি নিয়ে মারা যায়নি। অতএব তারা নিশ্চয়ই ফেল করবে এবং তাদের অবস্থা তখন কি হবে? মৌলভী সাহেব তখন জবাব দিয়েছিলেন; যেহেতু ইসলাম ধর্ম তখন আসেনি সেজন্য সেই সময়কার ধর্ম অনুযায়ী তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। জানিনা পৃথিবীর ঈশ্বরের প্রতিনিধিগণ তাদের লোকদের সেই পাঁচটি প্রশ্ন ও জবাবের প্রস্তুতির কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন কিনা ।

'নিন্দ্রাজাত স্বপ্নের' দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটির প্রতি আমার বিশ্বাস, মধ্যপ্রাচ্যের লোকেরা প্রবল উষ্ণ আবহাওয়ার জন্য প্রচুর পরিমান খেজুর, আঙ্গুর, বেদানা ও এই জাতীয় ফলের রস পান ও ভক্ষণ করতেন। পান করতেন বকরী ও উটের দুধ।এতে নিদ্রা হত বড়ই গভীর ও স্বপ্নময়। তারা নানাবিধ স্বপ্ন দেখতেন। যেহেতু মধ্যপ্রাচ্যে সবুজ গাছ-গাছালি, সবুজ মাঠ প্রান্তর ও নদ নদীর বড় অভাব ছিল, অভাব ছিল পাখীর কল-কাকলী ও মেঘ বৃষ্টির। যে কারণে রাত্রি কালীন স্বপ্নের আমেজ ভোরবেলা তাদের মন থেকে হারিয়ে যেতনা। কারণ ওখানে সবুজ দৃশ্যাবলী ও নদ নদীর বদলে বিদ্যমান ছিল গনগনে সুর্যের তপ্ত আকাশ আর নীচে ছিল উত্তপ্ত মরুভূমির বালুরাশি। সুতরাং দিনের বেলাতে ও তারা বিগত রাত্রির স্বপ্নটি নিয়ে ভাববার অবকাশ পেতেন। এই স্বপ্ন কেন দেখলো ? স্বপ্নের রহস্য কি ? তা হলে নিশ্চয়ই কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে আভাসে ইঙ্গিতে কিছু বলতে চাইছে। এরকম শত শত প্রশ্ন তার মনকে ভাবিয়ে তুলতো। সে ভাবতো নিশ্চয়ই সেটা অদৃশ্য শক্তির সাথে তার অদৃশ্য আত্মার খেলা। অতএব সেই ব্যক্তিটি মানুষের ভাল মন্দ, বিপদ আপদ ইত্যাদি জাগতিক বিষয় আসয়ের সাথে স্বপ্নের কাল্পনিক অঙ্ক মিলাতে চেষ্টা করে। কিছু কিছু মিলে ও যায়। এতে তার সাহস এবং উ□সাহ উভয়ই বাড়তে থাকে। যার ফলে সে নিজে অদৃশ্য শক্তির প্রতিনিধি হতে যাচ্ছে বলে মনের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে এবং ত□কালীন প্রচলিত কিছু কিছু ঔষধ পত্রকে অনুকরণ করে রোগীদের সেবা ও পথ্য বা□লে দিতে থাকে নিজ বুদ্ধির জোরে। এতে কিছু কিছু কৃতকার্যতা আসে। তার সাথে পানি পড়া, ঝাড় ফুক, এটা ওটা মন্ত্র আওড়িয়ে মানুষের আস্থা অর্জনের জন্য নানাবিধ ফন্দি ফিকিরের চেষ্টাও চলতে থাকে অব্যাহত গতিতে। মাতৃভাষায় কথা বলার মধ্যে বিনয় ও বাকপটুতা তাদেরকে করে তুলে অতি আত্মবিশ্বাসী। ধীরে ধীরে দুর দূরান্ত থেকে মানুষ আসতে থাকে আরোগ্য লাভের আশায়, কেউ আসে চুরির উট বকরী ফিরে পাবার আশায়। সন্তানহীনা নারী আসে সন্তান পাবার কামনায়। কেউ আসে ভাল ফল ও শস্যতে বরকত হবার আশায়। কেউ কেউ আসে ঝগড়া বিবাদের একটা ফয়সালা করার জন্য মধ্যস্ততা হিসেবে ভূমিকা নেয়ার। কেউ কেউ আসে বুদ্ধি পরামর্শ নেয়ার প্রয়োজনীয়তায়। এভাবে লোকটি যখন জনপ্রিয় হতে শুরু করে তখন একদিন সুযোগ বুঝে নিজেকে অদৃশ্য শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে দেয়। শুরু হয় তার কথায় ও কাজে কৌশল প্রয়োগের নানাবিধ সুযোগ ও সতর্কতা। তখন নিজ কওমের বা

গোষ্ঠীর লোকেরা গর্বিত হয়। তাকে তখন সকল প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এভাবে ধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে একজন মানুষের গোড়া পত্তন হয় পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে। ইতিহাস আমাদের সাক্ষী দেয় হাজার হাজার কাল ও শতাব্দীর সিড়ি বেয়ে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধর্মের উ্পত্তি হয়েছে মানুষের ভয়, কৌতুহল ও আপন অস্তিত্বকে জানার প্রয়োজনে। ঈশ্বরের প্রয়োজনে নয়।

বিজ্ঞান ও ধর্ম সংঘাত নাকি সমন্বয় এর একটি সিদ্ধান্তে যাবার আগে আর ও কিছু কথা না বলে সিদ্ধান্তে যেতে পারছিনা । এ জন্য প্রিয় পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে সামান্য বিরক্ত করবো বলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। কথা হল পৃথিবীতে এত গবেষণাঘার, এত বিশ্ববিদ্যালয়, এত আবিষ্কার, এত আমূল পরিবর্তন সাধিত হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে আদম ও ইভ নামক দু'জন মানুষের স্বর্গ বিচ্যুতি থেকে পৃথিবীতে মানুষ ও ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। এতে এটাই প্রমাণিত হয় পৃথিবীর মানুষ এখনও বিজ্ঞানের দর্শন সম্বন্ধে অজ্ঞ। ইতিহাস ও বিজ্ঞানের আবিস্কারগুলোকে তারা মানুষের এক ধরণের কারসাজি হিসেবে বিশ্বাস করে। এই কারসাজি দ্বারা তারা বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদন করে মুনাফায় ধন-দৌলত আয়ত্ব করে। তারা আরও বিশ্বাস করে এসমস্ত তথ্য ও আবিষ্কারের সাথে ইশ্বরের কিংবা পরলৌকিকতার কোন সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞান মানুষকে পৃথিবীতে শোষণ, অত্যাচার ও যুদ্ধ বাধিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করে। বিজ্ঞান ইহ জগতে ভোগ-বিলাসের মদতদানকারী এক বিশাল দানব। কিন্তু বিজ্ঞানের এই বিশাল অবদান মানব সমাজের জন্য যে কি অপরিসীম আর্শীবাদ তারা এখনও বুঝতে চান না। ধর্মীয় গল্পগুলি বা অলৌকিক কেচ্ছা কাহিনীগুলো সব সময়েই যে অতিরঞ্জিত অর্থাৎ তিলকে তাল করা কিংবা মানুষকে বিশ্বাসী বানানোর জন্য খোঁড়া যুক্তির সমাবেশ তা তাদেরকে বুঝানো যায়না। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য বা তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য এসব গল্পের সৃষ্টি হতে পারে তা তাদের কিছুতেই বোধগম্য করানো যায়না। হাতের লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া, বিশাল তিমি মাছের পেটে বেঁচে থাকা, মৃত মানুষকে জীবিত করে তুলা, সাত আসমান ভ্রমন ইত্যাদি গল্প গুলোর সাথে বিজ্ঞানের যে ছাত্র বায়োলজী, ক্যামেষ্ট্রি ও ফিজিক্স পুঙ্খানুপুঙ্খু ভাবে বুঝতে পারে সেই ছাত্রটিও তার বিবেক থেকে কখনও এসব বিশ্বাস করতে পারেনা। এসবে বিশ্বাসী না হলে সমাজে এবং পরিবারে তার খাদ্য ও বাসস্থান মিলবেনা। একারণেই সে তা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। তা ছাড়া বাল্যকাল থেকে ধর্মীয় প্রভাবের কারণে সে মগজ ধুলাই এর শিকার। নিরপেক্ষ চিন্তা ভাবনা নিয়ে এসব ধর্মীয় গল্পের সমালোচনা লিখলে এটা "ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত" অপবাদ দিয়ে তারা সবাই মহা হুলস্তুল কান্ড ঘটাতে চান। ধর্মের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের চিন্তা ভাবনা সর্বদাই দূর্বল এবং পরনির্ভরশীল। তাদের নিজস্ব স্বাধীন যুক্তি সর্বদাই পাপের ভয়ে হয় মৃত নয়তো ম্রিয়মান। সেই যে হাজার হাজার বৎসর আগে ধর্মীয় অবতারগণ যা বলেছিলেন সেটাই তারা আচ্ছা করে গাঁট বেধে মনের মধ্যে পুতে রেখেছেন। স্ইে গাঁট তারা কখনও খুলে দেখতে চান না ঈমান নষ্ট হবার ভয়ে। ধর্মীয় কেতাবগুলোতে উল্লেখ আছে পৃথিবীর প্রথম মানুষ 'আদম' কে সৃষ্টি করার পূর্বে স্বয়ং বিধাতা তার ফেরেশতাগণের সাথে যুক্তি করেছিলেন পৃথিবীতে মানুষ পাঠানো হবে কি হবেনা ? তীক্ষ্ন বুদ্ধিতে বিষয়টি আলোচনা করলে দেখা যাবে ওখানে স্বয়ং আল্লাহ বা বিধাতা ফেরেশতাগণের মতামত নিয়ে 'গণতন্ত্রের' সুচনা করেছিলেন। অথচ পৃথিবীতে তারা গণতন্ত্র মানতে চান না। তারা ধর্মীয় কিতাবের একনায়কতন্ত্রী আইন কায়েম করতে চান। ধর্মীয় উক্তি বা হাদীসগুলোকে বিধাতার আইন হিসেবে মেনে নিয়ে মানুষের স্বাধীনতা ও মানুষের সময় এ দু'টো কে নির্মূল করতে অতিশয় উৎসাহী। নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে বলছি কোন দেশের গণতন্ত্রের অনুকরণ নয়, বরং যা একটি দেশের মানুষের জন্য কল্যাণকর তার উপর

জনগণের অধিকাংশের মতামতে বিল পাশ করে যদি আইন তৈরী হয় তবে সেটি ধর্মীয় আইনের চেয়ে উত্তম হবেনা কেন ? সেটি আমি পাঠক সমাজকে বিবেচনা করতে অনুরোধ করি। উপরোক্ত নিবন্ধের আলোচনা শেষে আমি এটা বলতে চাই বিজ্ঞান পরীক্ষা নিরীক্ষার যুক্তি প্রমাণে ও বাস্তববাদীতায় প্রতিষ্ঠিত। আর ধর্ম জীবন যুক্তির কল্পনা ও অদৃশ্যের বিশ্বাস নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম নগদ অপেক্ষা বাকীতে অধিক বিশ্বাসী । সুতরাং এ দু'য়ের সমন্বয় সাধন একটি কঠিন ব্যাপার, তবে নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে (এথিক্স) বিষয়টি আংশিক গ্রহণযোগ্য।

উত্তর পুরুষ, মুক্তমনার সদস্য এবং গবেষণাধর্মী লেখায় নিয়োযিত । বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ইমেইল - uttor.purush@gmail.com

ধর্মের উপযোগীতা

মুক্তমনা প্রকাশনী

www.mukto-mona.com

মূল প্রবন্ধঃ * ডঃ রিচার্ড ডকিনস (প্রফেসর, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি)
অনুবাদ*ঃ মুক্তমনা প্রকাশনীর পক্ষ থেকেঃ বন্যা আহমেদ, জাহেদ আহমদ, অভিজিৎ রায়

(ডঃ রিচার্ড ডকিনসের এই প্রবন্ধটি ইংরেজীতে সর্বপ্রথম *Free Inquiry* ম্যাগাজিনের ২৪নাম্বার ভল্যুমের ৫ নাম্বার ইস্যু তে 'What Use is Religion?' শিরনামে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকের অনুমতি সাপেক্ষে প্রবন্ধটি বাংলায় অনুবাদ করা হল। বাংলা অনুবাদের স্বত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে *মুক্তমনা (www.mukto-mona.com)* কর্তৃক সংরক্ষিত। *মুক্তমনা*র পুর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে এ রচনার সম্পূর্ণ, অথবা আংশিক প্রকাশ সম্পূর্ণ বেআইনী বলে গণ্য হবে। ধন্যবাদ।)

আমাদের চারপাশে ধর্মচর্চার নামে কি অপরিসীম অপচয়ই না করা হয় - একজন ডারউইনবিদ হিসেবে ধর্মের এই লাগামহীন অপব্যয়িতার দিকটি আমাকে ভাবিয়ে তোলে। প্রকৃতি অত্যন্ত মিতব্যয়ী, সে প্রতিটি মুহুর্তের, প্রতিটি পাই পয়সার হিসেব রাখে, নগন্য অপচয়কেও ছেড়ে দেয় না। কোন বন্য প্রাণী যদি তার স্বভাবগত কারণে অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত থাকে, প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) ঠিকই তার থেকে যোগ্যতর কোন প্রতিদ্বন্দীকে বেছে নেয় যে বংশবৃদ্ধি এবং টিকে থাকার কাজকেই বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রকৃতি অর্থহীন বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেয় না। যদিও এত স্পষ্টভাবে আমরা সবসময় তা দেখতে পাই না, প্রকৃতি কিন্তু তার এই নির্মম গতিতেই এগিয়ে চলে।

কিছু পাখী আছে যারা পিঁপড়ার বাসায় পাখা ডুবিয়ে দিয়ে স্নান (Anting) করে - দেখলে মনে হবে যেনো পিঁপড়েগুলোকে দিয়ে তারা তাদের পাখা আক্রমণ করাচ্ছে। হয়তো বা এর

পিছনে পাখা থেকে জীবানু ঝেড়ে ফেলার মত কোন স্বাস্থ্যগত কারণ রয়েছে: কিন্তু, এই ধরনের কাজের আদৌ কোন উপকারিতা আছে কিনা তা সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত নয়। তবে এই ধরনের অনিশ্চয়তা একজন ডারউইনবিদকে এসব কর্মকান্ডের পিছনে কোন ভালো কারণ থাকতেও পারে - তা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা থেকে বিরত করতে পারে না।

মানুষ নামের দ্বিপদী জীবরা ধর্মচর্চার পিছনে প্রচুর সময় ব্যয় করে, ব্যয় করে প্রচুর সম্পদও। মধ্যযুগে শত শত বছর ধরে অসংখ্য মানুষের শ্রমের বিনিময়ে চার্চগুলো নির্মিত হয়েছে। মধ্যযুগ এবং রেঁনেসার সময়কার অধিকাংশ মেধাই ব্যয়িত হয়েছে পবিত্র ধর্মীয় সংগীত এবং চিত্রকল্প রচনায়। খুবই কাছাকাছি আরেকটি ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের অপরাধে হাজার হাজার - এমনকি লক্ষ লক্ষ মানুষকে অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে, মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। ধর্মপ্রাণ মানুষেরা তাদের দেবতাদের জন্য প্রাণ দিয়েছে, হত্যা করেছে, উপবাস করেছে, চিরকুমারত্ব বরণ করেছে, এমনকি সমাজচ্যূতও হয়েছে।

বিভিন্ন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকা স্বত্তেও, পৃথিবীতে এমন কোন সমাজব্যবস্থা নেই যেখানে কোন না কোন ধরনের সময় এবং অর্থ অপচয়ী, বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী, বংশবৃদ্ধিরোধকারী ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখা যায় না। এই বিষয়টি ডারউইনবাদে বিশ্বাসী যে কারও জন্য একটা বড় রকমের ধাঁধার মত। আমরা যেভাবে পাখীদের অ্যন্টিং এর উদ্দেশ্যটা অনুমান করেছি, ধর্মও কি ডারউইনবাদীদের সামনে একই ধরনের চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করে না - যার অনুরূপ একটা যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেওয়া আজ খুবই প্রয়োজন? আমরা কেন প্রার্থনা করি, কেনই বা আমরা এত জাঁকজমকপূর্ণ ধর্মীয় আচার আচরন পালন করে আমাদের সারাটা জীবনই উৎসর্গ করে দেই?

ধর্মীয় আচরণ তখনি ডারউইনবাদের মাথাব্যথা হয়ে দাড়ায় যখন তা অদ্ভুত কোন ব্যতিক্রম না হয়ে বহুলভাবে স্বীকৃত একটি ব্যাপারে পরিনত হয়। আপাতদৃষ্টিতে, ধর্ম সার্বজনীন, এবং শুধুমাত্র বিভিন্ন সমাজে এর বিভিন্ন রূপ আছে বলেই সমস্যাটি আপনা-আপনি দূর হয়ে যাবে না। ভাষার মতই ধর্ম মূলত সার্বজনীন এবং অঞ্চলভেদে এই বিশ্বাসের তারতম্যও অত্যন্ত লক্ষ্যনীয়। এই প্রবন্ধের বেশীরভাগ পাঠকই স্বীকার করবেন যে আমাদের মধ্যে সবাই ধার্মিক নন। কিন্তু তারপরও ধর্ম মানব সমাজে সর্বজনস্বীকৃত: পোষাক পরিধানের কিংবা খাবার পরিবেশনের রীতির মতই প্রত্যেকটি সমাজে বিশেষ ধর্মীয় রীতিও প্রচলিত রয়েছে; এমনকি যারা ধর্মচর্চা করেন না, তারাও সেটাকে সামাজিক নিয়ম হিসেবেই মেনে চলেন। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, **আসলেই ধর্ম ঠিক কি কাজে লাগে?**

ধর্মীয় বিশ্বাস যে মানুষকে টেনশনজনিত (stress-related diseases) অসুখ থেকে মুক্তি দিতে পারে- এই ধারণারটির পিছনে তেমন কোন প্রমাণ খুজে পাওয়া যায় না। কিন্তু এটা

সত্যি হলেও আমাদের অবাক হওয়ার মত কিছু থাকবে না। ডাক্তারদের চিকিৎসার একটা লক্ষনীয় অংশই হচ্ছে স্বান্তনা এবং আশ্বাস প্রদান। আমার ডাক্তার মাথায় হাত বুলিয়ে চিকিৎসা করেন না, কিন্তু অনেক সময়ই মনে হয় যে তার স্টেথোস্কোপ পড়া বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার আশ্বাস বাণী শুনেই আমার ছোটখাটো অনেক অসুখ ভালো হয়ে গিয়েছে। রোগীর মন রক্ষার জন্য মিথ্যা ওষুধ দেওয়ার ব্যাপারটি (placebo effect) সবাই জানেন। অনেক সময় ওষুধীয় গুনাবলীহীন এইসব নকল বড়ি (dummy pills) খেয়েই দেখা যায় রোগীরা ভাল হয়ে যায়। সেই জন্যই নতুন ওষুধের ট্রায়ালের সময় প্ল্যাসিবো ব্যবহার করা হয়। প্ল্যাসিবোর মত হোমিয়প্যাথি ওষুধেও রোগ সেরে উঠতে দেখা যায়, অথচ হোমিওপ্যাথি ওষুধ তৈরী করার সময় এগুলোকে এতই পাতলা করে ফেলা হয় যে তাতে রোগ সারানোর কোন উপাদানই আর অবশিষ্ট থাকে না।

ধর্মও কি, প্ল্যাসিবোর মতই, মনের স্ট্রেস কমিয়ে মানুষের আয়ু বাড়িয়ে তোলে? হয়তো করে, কিন্তু তত্ত্বটিকে সংশয়বাদীদের সাথে পরীক্ষায় উপণীত হতে হবে যারা মনে করেন অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ম অশান্তি তো কমায়ই না বরং বাড়িয়ে তোলে। আমার মতে ধর্মের মত একটি বিশাল এবং সার্বজনীন একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করার জন্য এটি একটি অত্যন্ত দুর্বল তত্ত্ব। আমাদের পূর্বসুরীদের মনের অশান্তি কমিয়ে তাদেরকে দীর্ঘজীবি করার মাধ্যমে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিলো বলে আমি মনে করি না। এই ধরনের থিওরী ধর্মের মত এতো বড় একটি ব্যাপারকে ব্যখ্যা করার জন্য আদৌ যথেষ্ট নয়।

অন্যান্য তত্ত্বগুলো এ সম্পর্কিত ডারউইনীয় ব্যাখ্যা সম্পর্কে মোটেও ওয়াকিফহাল নয় বলে মনে হয়। উদাহরণ হিসেবে নীচের কথাগুলি বিবেচনা করা যাক। 'ধর্ম মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটায় এবং মহাবিশ্বে আমাদের অবস্থানের বিষয়টি তুলে ধরে', কিংবা 'ধর্ম সান্ত্বনাদায়ক। মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায় এবং ধর্ম আমাদের আশ্বস্থ করে আমরা অমর থাকবো।'এ সমস্ত কথায় মনস্তা তাত্ত্বিক সত্য থাকতে পারে, কিন্তু এ গুলি কখনোই ডার উইনীয় ব্যাখ্যা হতে পারে না। এ কথাটিই স্টিভেন পিংকার উল্লেখ করেছেন তার 'মন যে ভাবে কাজ করে' (How the Mind Works, Penguin, ১৯৯৭) বইতেঃ

> *'....এটি কেবল প্রশ্নের ই জন্ম দেয় যে মন কেন এমনভাবে বিকশিত হবে যেখানে তাকে স্পষ্ট মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে। বরফ শীতল পরিবেশে একজন মানুষ মনে মনে 'আমি উষ্ণতায় আছি' ভাবলেই আরাম পাবে না; তেমনি সিংহের মুখোমুখি একজন মানুষ সিংহকে খরগোস কল্পনা করলেই তার মনের সমস্ত ভীতি দূর হয়ে যাবে না।' (পৃষ্ঠা ৫৫৫)।*

মৃত্যু ভয় সম্পর্কিত ডারউইনীয় তত্ত্বের স্বরূপটি হওয়া উচিৎ এ রকমঃ ‘পরকালে বিশ্বাসের ব্যাপারটি গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে যখনই এটাকে পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়।’ এ বিষয়টি সত্য, কিংবা মিথ্যা হতে পারে। অথবা হতে পারে- এটি মানসিক চাপ এবং রোগীর মন রাখার জন্য মিথ্যা ঔষধ সম্পর্কিত আরেকটি তত্ত্ব- কিন্তু আমি সে বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যায় এখন যাচ্ছি না। আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে, একজন ডারউইনবিদের সবসময় এ রকম ভাবেই প্রশ্ন উত্থাপন করা উচিৎ।

কোন কোন মানুষ বিশ্বাসের সাথে একমত পোষণ করেন এবং কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করেন- এমন সব মনস্তাত্ত্বিক বক্তব্য কেবল মাত্র *তাৎক্ষণিক*, কোন *চূড়ান্ত* ব্যাখ্যা নয়। একজন ডারউইনবিদ হিসেবে আমি চূড়ান্ত প্রশ্নগুলির ব্যাপারেই আগ্রহী।

ডারউইনবিদদের কাছে *তাৎক্ষণিক* আর *চূড়ান্তের* পার্থক্যের ব্যাপারটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাৎক্ষ ণিক প্রশ্নগুলি আমাদেরকে শরীরবিদ্যা (physiology) আর মস্তিষ্ক-অংগ বিজ্ঞানের (neuroanatomy) দিকে ধাবিত করে। তাৎক্ষনিক উত্তরে ভুল কিছু নেই, এগুলি গুরুত্বপূর্ণ, এবং বৈজ্ঞানিক।

কিন্তু আমার কাছে আগ্রহের বিষয় হচ্ছে ডারউইনীয় চূড়ান্ত ব্যাখ্যার ব্যাপারটি। বিজ্ঞানীরা যদি কখনো মস্তিষ্কে ‘সৃষ্টিকর্তা কেন্দ্র’ নামক কোন কিছুর আদৌ সন্ধান পান, আমার মত ডারউইনবিদের কাছে তখন জিজ্ঞাসার বিষয় হবেঃ ‘সৃষ্টিকর্তা কেন্দ্র’ টি কেন বিকশিত হয়েছে। কেন আমাদের সেই সমস্ত পূর্ব পুরুষ যারা বংশগত নীতির (genetics) বদৌলতে ‘সৃষ্টিকর্তা কেন্দ্র’ পেয়েছে, তারা কেন টিকে থাকতে পেরেছে তাদের প্রতিপক্ষের তুলনায়, যাদের মস্তিষ্কে ‘সৃষ্টিকর্তা কেন্দ্র’ বিকশিত হয়নি? চূড়ান্ত ডারউইনীয় প্রশ্নগুলি কিন্তু মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের তাৎক্ষণিক প্রশ্নের তুলনায় বেশী ভাল, গভীর কিংবা বিজ্ঞানসম্মত নয়। তবুও আমি এখানে এই প্রশ্নগুলিই আলোচনা করছি।

কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, চূড়ান্ত ব্যাখ্যার বিষয়টি আসলে দলগত বাছাই তত্ত্বেরই (group selection theories) অন্য রূপ। দলগত নির্বাচন একটি বিতর্কিত ধারণা যেখানে বলা হয় ডারউইনীয় নির্বাচন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত দল থেকে বাছাই করে থাকে, আবার সাধারণ ডারউইনীয় তত্ত্ব অনুযায়ী দেখা যায় এটি গোষ্ঠির মধ্যকার ব্যক্তি পর্যায় থেকে বাছাই করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় - কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-তত্ত্ববিদ (anthropologist) কলিন রেনফ্রিউ ধারনা পোষণ করেন যে খ্রীস্টান ধর্ম টিকে থেকেছে এক ধরনের দল গত বাছাইয়ের মাধ্যমে কারণ তাঁরা নিজেদের মধ্যে বিশ্বস্ততা এবং ভ্রাতৃত্বশীল ভালবাসার বিষয়টি লালন করে। আমেরিকান বিবর্তনবাদী ডেভিড স্লওয়ানও একই রকমতত্ত্বে বিশ্বাসী।

দলগত বাছাই তত্ত্ব ধর্মের ক্ষেত্রেও যে কাজ করতে পারে সেটির একটি কাল্পনিক উদাহরণ দিচ্ছি। ধরা যাক- একটি উপজাতি অত্যন্ত পরাক্রমশালী যুদ্ধের দেবতা বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। পাশাপাশি আরেকটি উপজাতি শান্তি ও পরমসহিষ্ণুতার দেবতায় করে, কিংবা তাদের আদৌ কোন দেবতা বা ঈশ্বর নেই। প্রথম দলটি দ্বিতীয় দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। এ ক্ষেত্রে যে সব যোদ্ধারা বিশ্বাস করেছে যে যুদ্ধে 'শহীদ' হলে তারা সরাসরি স্বর্গে পৌঁছে যাবে, তারা বেশি সাহসিকতা ও মনোবলের সাথে যুদ্ধ করবে এবং নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হবে না। কাজেই এমন একটি উপজাতির আন্তঃগোত্রীয় বাছাইয়ে টিকে থাকার সম্ভাবনা অধিক; তারা তখন পরাজিত উপজাতির গবাদি পশু ছিনিয়ে নেবে, তাদের স্ত্রীলোকদের লুট করে উপপত্নীতে পরিনত করবে। এই রকম উপজাতি ক্রমান্বয়ে বংশবৃদ্ধি করতে থাকবে, একই বৈশিষ্ট সম্পন্ন নূতন জাতির জন্ম দেবে যারা সেই একই যুদ্ধবাজ দেবতা, বা ঈশ্বরে বিশ্বাসী। এখানে পাঠকের খেয়াল রাখা উচিৎ - **আমি যা বলছি সেটি কিন্তু 'যুদ্ধ বাজ ধর্ম টিকে থাকে' বলার চাইতে আলাদা। অবশ্যই সেটি টিকে থাকবে, কিন্তু এখানে আসল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে- গোত্র যারা যুদ্ধের দেবতায় বিশ্বাসী তারাই টিকে থাকে।**

দলগত বাছাই তত্ত্ব নিয়ে জোড়ালো রকমের আপত্তি রয়েছে। সেগুলি সব খন্ডানো এই প্রবন্ধের পরিধির বাইরে। গাণিতিক মডেল দেখিয়েছে - বিশেষ কিছু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দল গত বাছাই তত্ত্ব কাজ করতে পারে। বলাবাহুল্য, উপজাতির গোত্রের ক্ষেত্রে ধর্ম সেই বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কাজ করেছে। এটি একটি অত্যন্ত মজাদার তত্ত্ব কিন্তু এখানে আমি এ বিষয়ে বিষদ বর্ণনায় যাব না।

ধর্ম কি কোন সাম্প্রতিক ব্যাপার? আমাদের জীণ (বংশগতি উপাদানের একক) বেশির ভাগ প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ফেলার পর কি এর উদ্ভব হয়েছে? ধর্মের সর্বব্যাপিতা এই তত্ত্বের যে কোন সরলীকরনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তথাপি, এটির একটি

বড় দিক রয়েছে যেটি আমি এখানে তুলে ধরব। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে দলগত বাছাই বা নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে বৈশিষ্টগুলি স্থান করে নিয়েছিল সেটি প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম নয়। এর অন্যান্য উপকারিতা ছিল, এটি ঘটনাক্রমে আজকে আমাদের সামনে ধর্মীয় আচরণ হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে। ধর্মীয় আচার-আচ রণের ব্যাপারটি কেবল তখনি আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে, যখন আমরা প্রশ্নটিকে অন্যভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হব।

মুরগী এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হতে পারে। সবল মুরগীদের দুর্বল মুরগীকে ঠোকরানোর ব্যাপারটি ('pecking order')অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন। এই *'দলগত প্রভাবশালীতা' ('dominance hierarchy')*র ধারণাটি প্রথম মুরগীদের মধ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্রতিটি মুরগী শিখে নেয় কোনটিকে সে লড়াইয়ে হারাতে পারবে এবং কোনটি তাকে হারানোর ক্ষ মতা রাখে। যে দলে এই *'প্রভাবশালীতা'* সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে সেখানে প্রকাশ্য লড়াই দেখা যায় না বললেই চলে। এরকম গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত পাকাপোক্তভাবে আসন গাড়া মুরগীরা, ঘন ঘন দল বদল করা অন্যান্য দুর্বল মুরগীদের চাইতে বেশী ডিম পাড়ে। এ ব্যাপারটিতে *দলগত প্রভাবশালীতার* উদাহরণ দেখা যায়; কিন্তু এটি কোন আদর্শ ডারউইনবাদ নয়; কারণ, এটি একটি দলগত ব্যাপার। দলগত উৎপাদনশীলতার ব্যাপারটি হয়তো কৃষকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু অস্বাভাবিক কোন ব্যতিক্রম ছাড়া প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের ক্ষেত্রে এর কোন উপযোগিতা নেই বললেই চলে। *'দলগত প্রভাবশালীতা'* তত্ত্বটি টিকে থাকার সংগ্রামে কতটুকু মূল্যবান?'- একজন ডারউইন বিদের কাছে এ প্রশ্নের কোন গুরুত্ব নেই। এ ক্ষেত্রে সঠিক প্রশ্নটি হওয়া উচিত : 'ব্যক্তি পর্যায়ে শক্তিশালী মুরগীর বিরুদ্ধাচারণ করে টিকে থাকার সংগ্রামের মূল্য কত টুকু, কিংবা অপেক্ষাকৃত দুর্বল মুরগীদের থেকে আলাদা হয়ে না থাকার ক্ষতি তাকে কতটুকু পোষাতে হয়?' **ডার উইনবাদে প্রাসংগিক প্রশ্নগুলিকে এমনভাবে ব্যক্তি পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে সেখানে বংশগত বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা (genetic variations) দেখা যায়। এখানে আলাদা আলাদা ভাবে এক একটি মুরগীর মারমুখী প্রবণ তার বিষয় টি গুরুত্বপূর্ণ, কেন না প্রত্যকটি মুরগীর মধ্যে বংশগত বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা আছে। কিন্তু*দল গত প্রভাবশীলতার* ক্ষেত্রে বংশগত বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা (genetic variations) বিষয়টি আবান্তর, কেন না - দলের কোন জীণ (gene) নেই। তা আছে কেবল ব্যক্তি পর্যায়ে।**

উপরের উদাহরণ দিয়ে আমি এটাই বোঝাতে চাচ্ছি যে ধর্মও দলগত প্রভাবশীলতার মত একটি বিষয় হতে পারে। **'টিকে থাকার সংগ্রামে ধর্মের ভূমিকা কত টুকু?' এই প্রশ্নটিই হয়ত ভুল। আমার মতে সঠিক প্রশ্নটি হওয়া উচিত: 'ব্যক্তি পর্যায়ে মানুষের মধ্যে যে সব ব্যবহার বা মনস্তাত্ত্বিক আচরণ লক্ষ্য করা যায় - যে গুলিকে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আমরা ধর্ম বলি; টিকে থাকার সংগ্রামে এগুলির গুরুত্ব কত টুকু?' সঠিক উত্তর খোঁজার আগে আসলে প্রশ্নটিকে সঠিক ভাবে দাঁড় করানো খুবই জরুরী।** ডারউইনবিদদের মধ্যে যারা কেবল ধর্মের টিকে

থাকার কারণ খোঁজার মধ্যেই ব্যস্ত রয়েছেন, তারা আসলে ভুল প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। এর বদলে বরং আমাদের পূর্বপুরুষদের সময় থেকে চলে আসা এমন কিছু বিবর্তনশীল বিষয় নিয়ে ভাবা উচিৎ যেগুলো তাঁদের সময় ধর্ম হিসেবে বিবেচিত না হলেও পরবর্তীতে সভ্যতার পরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মীয় উপাদান হিসেবে খুঁটি গেড়ে বসেছে।

আমি এই প্রবন্ধে মুরগীদের ঠোকরানোর ধারা নিয়ে কিছু উদাহরণ হাজির করেছি। আসলে এ ব্যাপারটি আমার থিসিসের একেবারের মূল বিষয়; তাই একই বিষয়ে আরেকটি উদাহরণ দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না বলে পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। মথেরা যখন প্রজ্জ্বলিত আগুনের উপর ঝাপিয়ে পড়ে, এটাকে কেউ স্রেফ দুর্ঘটনা বলে মনে করেন না। দেখলে মনে হবে তারা যেন উড়তে উড়তে আগুনে আত্মাহুতি দিচ্ছে। এটাকে আমরা মথদের 'আত্মবিনাশী আচরণ' হিসেবে গন্য করতে পারি আর বিস্মিত হতে পারি এই ভেবে যে ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচন কিভাবে এমন একটি আত্মবিনাশী কাজকে সমর্থন করতে পারে! আমার কথা হচ্ছে এই সমস্যাটি থেকে একটা বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর আশা করার আগে প্রশ্নটিকে বরং ঘুরিয়ে নতুন করে লেখা উচিৎ। এটা মোটেও আত্মাহুতি নয়। আসলে অনভিপ্রেত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ফলাফল হিসেবেই আমরা এই আপাতঃ আত্মাহুতির ব্যাপারটি দেখে থাকি।

কৃত্রিম আলোগুলো আমাদের রাতের দৃশ্যপটে অতি সাম্প্রতিক সংযোজন। এর আগে রাতের আলো বলতে শুধু চাঁদ আর তারাদেরই বোঝাতো। আলোর এই উৎসগুলো প্রায় অসীম দূরত্বে থাকার কারণে এদের কাছ থেকে আলো এসে পৌঁছোয় সমান্তরাল পথে, ফলে তৈরী হয় এক আদর্শ দিকদর্শন যন্ত্র। আকাশের এই আলোক উৎসগুলোকে পতঙ্গেরা সরল পথে চলবার জন্য ব্যবহার করে থাকে। পতঙ্গদের স্নায়ুতন্ত্রগুলো একটি সরল নিয়ম অনুসরণ করে অভিযোজিত হয়েছে - *"এমন ভাবে পথ চল যেন, আলো এসে তোমার চোখে ৩০ ডিগ্রী কোনে আঘাত করে।"* যেহেতু পতঙ্গদের চোখগুলো যৌগিক (পুঞ্জাক্ষি), এই ব্যাপারটা একটা বিশেষ ধরনের ওমাটিডিয়ামের (পুঞ্জাক্ষির কেন্দ্রে এক ধরনের বিশেষ টিউব) জন্য খুবই সহায়ক।

কিন্তু এই আলোক দিকদর্শনযন্ত্রটি আলোর উৎসগুলোর অসীম দূরত্বে থাকার উপর খুব গভীর ভাবে নির্ভরশীল। যদি তা না থাকে, তবে আলোক রশ্মিগুলো সমান্তরাল রইবে না, বরং অনেকটা সাইকেলের চাকার স্পোকগুলোর মত বিভাজিত হয়ে যাবে। যে স্নায়ুতন্ত্র ওই ত্রিশ ডিগ্রীর সাধারণ নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, সেটি মথকে একটি লগারিদমিক সর্পিল পথে ঠেলে আগুনের শিখার উপর নিয়ে ফেলবে। শ'য়ে শ'য়ে মথ যখন প্রতিদিন চাঁদ বা তারা বা দুরের শহরের আলোর উপর নির্ভর করে নিখুতভাবে দিক নির্নয় করে চলতে থাকে তখন আমরা তা আর খেয়াল করি না। আমরা শুধু দেখি মথগুলো আগুনের দিকে ঝাপিয়ে পরছে, আর তা দেখে আমরা ভুল প্রশ্ন করে যেতে থাকি - 'কেন সব মথগুলো আত্মহুতি দিয়ে

চলেছে?'

এই শিক্ষাগুলোকে মানুষের ধর্মীয় ব্যবহারের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। অসংখ্য মানুষ, এমনকি কোন কোন জায়গায় শতকরা একশজন মানুষ, এমনসব বিশ্বাস পোষন করে যা শুধু বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণযোগ্য তথ্যেরই পরিপন্থি নয়, আরেকটি প্রতিদ্বন্দী ধর্মের সাথে তার বিরোধিতাও অত্যন্ত প্রকট। তারা শুধু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসই করে না, এর পিছনে প্রচুর সময় এবং প্রাচুর্য ব্যয় করে, জীবন দান করে, এমনকি হত্যাও করে। আমরা অনেকে তা দেখে বিস্মিত হই, ঠিক যেমন বিস্মিত হই মথের আত্মবলি দেওয়া দেখে। আমরা ভাবতে থাকি, 'কেন'? । কিন্তু আমার মতে আমরা এক্ষেত্রেও ভুল প্রশ্ন করছি।

হতে পারে, আজকে আমরা যে ধর্মীয় আচরনগুলো দেখি তা নিতান্তই কোন এক সময়ের মানুষের কোন এক মানসিক প্রবনতার দুর্ভাগ্যজনক অভিব্যক্তি, কিন্তু হয়তো সেই সময়ে এর কোন উপযোগিতা ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে এই মানসিক প্রয়োজনটি কি হতে পারে? এবিষয়ে আমি একটি প্রস্তাব দিতে চাই, কিন্তু প্রস্তাবটি দেওয়ার আগে পরিষ্কার করে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে এটি একটি উদাহরণ মাত্র। অমি মনে করি, এ বিষয়ে একটি বিশেষ কোন সিধান্তে পৌঁছানোর আগে আমাদের সঠিক প্রশ্নটি খুজে বের করা অনেক বেশী জরুরী।

আমার এই সুনির্দিষ্ট প্রকল্পটি হচ্ছে শিশুদের নিয়ে। অন্য যে কোন প্রজাতির চেয়ে আমরা, টিকে থাকার জন্য, পূর্ববর্তী প্রজন্মের অভিজ্ঞতার উপর অনেক বেশি নির্ভর করে থাকি। তত্ত্বগতভাবে, শিশুরা নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই শিখে নিতে পারে যে নদীতে কুমীর থাকলে সেখানে সাতার কাটতে হয় না। কিন্তু এটা ঠিক যে শিশুমস্তিষ্কে *'বড়রা যা বলে তা বিশ্বাস করো, পিতামাতার কথা শোন, মুরুব্বিরা যখন গুরু গম্ভিরভাবে কিছু বলে তা প্রশ্নকরা ছাড়াই মেনে চল'* - এইধরনের কিছু নিয়ম বাধা আছে বলে তা থেকে আমরা অনেক বাড়তি সুবিধাও পেয়ে থাকি।

ছোটবেলায় স্কুলের ধর্মযাজকের শিখানো সেই ভয়ংকর উপদেশেটির কথা আমি কখনই ভুলবোনা। এটাকে আসলে ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়েছে পরবর্তীকালে : সে সময়ে ধর্মযাজক যেভাবে চেয়েছিলেন আমার শিশু-মস্তিষ্ক সেভাবেই উপদেশটি গ্রহণ করেছিলো। একদল সৈন্যের রেল লাইনের পাশে কুচকাওয়াজ করার একটি গল্প বলেছিলেন আমাদের। একসময় তাদের নেতার দৃষ্টি অন্য কিছুতে আকর্ষিত হওয়ায় তিনি সৈন্যদেরকে থামার উপদেশ দিতে ভুলে যান। সৈন্যরা বিনাবাক্যে আদেশ মেনে নিতে এতই অভ্যস্থ ছিল যে তারা মার্চ করতে করতে চলমান ট্রেনের মুখে গিয়ে পড়ে। যদিও এখন আমি গল্পটি আর বিশ্বাস করি না, কিন্তু নয় বছর বয়সে ঠিকই বিশ্বাস করেছিলাম। যাজকটি চেয়েছিলেন আমরা যেন সৈন্যদের এই প্রশ্নাতীতভাবে আদেশ মেনে চলার রীতিকে, তা যত ই অযৌক্তিকই হোক না কেন, একটি আদর্শ হিসেবে মেনে নেই। এবং সত্যি কথা বলতে কি আমরা সে সময়ে

এটাকে একটা গুন বলেই মনে করতাম। আমি তখন আসলেই ভাবতাম দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে চলন্ত ট্রেনের মুখে পড়ার সৎসাহস কোনদিনও আমার হবে কিনা।

সুশিক্ষিত সৈন্যদের মত কম্পিউটারকেও যা বলা হয় তারা তাই করে থাকে। Programming Language এর মাধ্যমে তাদেরকে যা নির্দেশ দেওয়া হয় তারা আজ্ঞাবাহী গোলামের মতই তা পালন করতে থাকে। একদিকে কম্পিউটার আমাদের প্রয়োজনীয় অনেক কাজ করে দেয়, অন্যদিকে, এই আনুগত্যের অনিবার্য পরিনতি হিসেবে খারাপ নির্দেশাবলীকেও সে একইভাবে পালন করতে থাকে। কোনটি ভালো নির্দেশ আর কোনটি খারাপ নির্দেশ কম্পিউটার তা বুঝতে পারে না। সৈন্যদের মত তারাও শুধু নির্দেশ পালন করে যায়।

এই প্রশ্নাতীত বাধ্যতার ফলেই কম্পিউটার ভাইরাসের শিকারে পরিনত হয়। খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা একটি প্রোগ্রাম যখন কম্পিউটারকে তার ভিতরে লিপিবদ্ধ সব ঠিকানার তালিকা পাঠাতে নির্দেশ দেয় তখন সে তো তা পালন করেই, অন্য সব কম্পিউটার যাদেরকে সে এই প্রোগ্রামটি পাঠায় তারাও কাজটি একের পর এক অনুগতভাবে সম্পাদন করতে থাকে। এইভাবেই অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ভাইরাসগুলো ছড়িয়ে পড়ে। এমনভাবে কোন কম্পিউটার বানানো সম্ভব নয় যা আমাদের কাজের বেলায় অনুগত থাকবে কিন্তু ভাইরাসের সামনে দুর্বল হবে না।

আমার উপরের ব্যাখ্যা যদি বোধগম্য হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা ইতি মধ্যেই শিশুমস্তিষ্ক এবং ধর্মের মধ্যকার যোগসূত্রটি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) একটি শিশুর চিন্তাধারাকে এমনভাবেই তৈরি করে যাতে সে মা বাবা এবং গোত্রের মুরুব্বিদের কথা বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করে। এবং এই বিশেষ গুণটিই অবচেতনভাবে তাকে আবার মানসিক ভাইরাসের আক্রমনের শিকারে পরিনত করে। শিশুমস্তিষ্ক - ভালোভাবে বেচে থাকার পূর্ব শর্ত হিসেবে - বাবা মা এবং মুরুব্বিদের বিশ্বাস করতে বলে। এর অনিবার্য পরিনতি হিসেবেই 'বিশ্বাসকারীর' পক্ষে ভাল উপদেশ এবং খারাপ উপদেশের মধ্যে পার্থক্য করার কোন উপায় থাকে না। শিশুর পক্ষে বুঝে নেওয়া অসম্ভব যে *'নদীতে সাঁতার কেটো না, কুমীর খেয়ে ফেলবে'* একটি ভালো উপদেশ কিন্তু আবার *'পূর্ণিমার সময় ছাগল বলি না দিলে শস্যহানি ঘটবে'* একটি খারাপ উপদেশ। দুটি উপদেশই তার কাছে একইরকম ভাবে তাৎপর্যময়। দুটি উপদেশই এসেছে এমন এক বিশ্বাসী লোকের কাছ থেকে যাকে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করা শিরোধার্য।

পৃথিবী, মহাশূন্য, নৈতিকতা, এবং মানবপ্রকৃতি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। আবার যখন এই শিশুটিই বড় হয়ে ওঠে,তার নিজের ছেলেমেয়ে হয়, সে তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদেরকে আরও সুচারুভাবে এইসব শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করে।

এই মডেল অনুযায়ী, আমরা দেখতে পাই, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের ভিত্তিহীন বিশ্বাসের ধারা পুরষানুক্রমিকভাবে বিকশিত হতে থাকে। এই অযৌক্তিক বিশ্বাসগুলো হয় এলোপাতাড়িভাবে (randon drift) ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে অথবা ডারউইনীয় নির্বাচনের মত কোন এক গতিতে বিকশিত হতে থাকে, এবং অবশেষে আমরা যে রূপটি দেখতে পাই তা তার আদি রূপ থেকে বিবর্তিত হতে হতে আনেকখানি বদলে গেছে। একইভাবে ভাষাও পর্যাপ্ত সময় এবং ভৌগলিক ব্যবধানের কারণে তার মুল উৎস থেকে সরে যেতে যেতে লক্ষনীয়ভাবে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। একই জিনিষ দেখা যায় ধর্মের ক্ষেত্রেও, শিশুমস্তিষ্ককে সহজেই ছাঁচে ঢেলে বানানো যায় বলেই ধর্ম বংশ পরম্পরায় একজন থেকে আরেকজনের কাছে ক্রমাগতভাবে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে।

ডারউইনীয় নির্বাচন শিশুমস্তিষ্ককে এমনভাবেই তৈরী করে যাতে তারা মুরুব্বিদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করে; চিন্তাধারাকে এমনভাবেই সংগঠিত করে যেন বাচ্চারা একদিকে অনুকরন প্রবণ হতে, অন্যদিকে গুজব, রূপকথা এবং ধর্মে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্ত হয়। **বংশগতিক নির্বাচনই (genetic selection) আমাদের মস্তিষ্ককে এভাবে তৈরী করেছে এবং এখান থেকেই non genetic এক বংশগতনীতির উদ্ভব হয়েছে - যা থেকে হয়তো নতুন এক ধরনের মহামারী কিংবা non genetic (বংশগতনীতির অধীন নয় এরকম) এক ডারউইনীয় নির্বাচনের ভিত্তি তৈরী হবে। আমি মনে করি ধর্ম এমনি এক দলগত ঘটনা যাকে non genetic মহামারী এবং ডারউইনিয় নির্বাচনের সংমিশ্রন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়।** আমার এই প্রকল্প যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে ব্যক্তিগতভাবে মানুষের বেচে থাকার জন্য এমনকি তাদের জীনের জন্যও ধর্মের কোন ভুমিকা বা উপকারীতা নেই। এর যদি কোন উপকারীতা থেকেই থাকে তা মানুষের প্রয়োজনে নয়, তা শুধুই ধর্মের নিজের টিকে থাকার প্রয়োজনে।

* Richard Dawkins is the Charles Simonyi Professor of the Public Understanding Of Science at Oxford University. One of the most influential scientists of our times, Dawkins "climbs mental Everest," the *Times Educational Supplemental* has proclaimed. The author of bestsellers such as *The Selfish Gene* and The Blind Watchmaker, Dawkins has been called " one of the most incisive science writers alive"(New York times Book Review) .

পাঠকের মতামত পাঠনোর ঠিকানাঃ
mm_publication@yahoo.com,
mukto-mona@yahoogroups.com

বিশ্বাস কি মানব মনে প্রোথিত?

আশিক মাহমুদ রূপম

মানুষ স্বাভাবিকভাবে বিশ্বাস করে। অসংখ্য ধর্ম রয়েছে তার বিশ্বাসের জন্যে। অনেকগুলোই একটি আরেকটির বিপরীত ধারণা দেয়। কোনটি বলে নিরাকার একেশ্বরের কথা, কোনটি সাকার একেশ্বর, আর কোনটি বলে অজস্র ঈশ্বরের কথা। এমন আরো অসংখ্য বৈপরীত্য আছে তাদের মাঝে। কিন্তু ধর্মগুলোর নিজ নিজ বিশ্বাসীরা ধর্মগুলোকে সমান দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে। অসাধারণ মানুষের এই অদৃষ্টে বিশ্বাসের ক্ষমতা, সম্পূর্ণ বৈপরীত্যে বিশ্বাসের ক্ষমতা।

মানুষ যুক্তি আর বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে ধর্মের ধারণাগুলোকে প্রশ্ন করার ক্ষমতাও রাখে। যুক্তি বুদ্ধিতে ধারণ করা বস্তুবাদী পৃথিবীর ধারণার কাছে ধর্মের ধারণাগুলো কখনো কখনো কাল্পনিক, অলীক-অনর্থক হয়ে ওঠে তার কাছে। পৈত্রিক ধর্মকে ত্যাগ করে সে তখন। নিজেকে অবিশ্বাসী হিসেবে আবিষ্কার করে।

মস্তিষ্ক বিজ্ঞান বুঝলেও, প্রবৃত্তির সবটুকু হয়তো তা বোঝে না। তাই, সহজ হয় না এমন অবস্থায় স্থিত থাকা। অনুভূতির দুর্বল মুহূর্তে যুক্তিবুদ্ধি যখন দুর্বল হওয় ওঠে, মনের কোন কুঠুরিতে আবার স্থান করে নেয় নিজস্ব কোন পরিত্রাণকারী ঈশ্বর। মানসিক দুর্বলতা আর অসহায়ত্বকে যুক্তি দিয়ে যে প্রবোধ দেয়া যায় না, বিশ্বাস নিমিষেই সেখানে পরম স্বস্তি বুলিয়ে দেয়। পুনরায় অবিশ্বাসী হয়ে উঠতে যুক্তিবুদ্ধির অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় আবার। যেন বিশ্বাস করাটাই স্বাভাবিক। যেন মনের কোন কোণে রয়েছে বিশ্বাসের স্থায়ী আবাস।

তার মানে কি বিশ্বাস করাটাই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি? হয়তো তাই। অদৃষ্টে ও বিশ্বাসে মানুষ বেশ অভ্যস্ত। স্বাভাবিকভাবে মানুষকে একজন সৃষ্টিকর্তা, তার সৃষ্টি আর শাসনে বিশ্বাস করতে দেখা যায়, অপরটা, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাসও মানুষ করে, কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবে নয়। যথেষ্ট মস্তিষ্ক ক্ষয় করতে হয়। কিছু স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বাইরে যেতে হয়। যেন মস্তিষ্কে প্রোথিতই আছে মানুষ বিশ্বাস করবে।

'প্রোথিত আছে'- এমন শব্দগুচ্ছ ধর্মপ্রাণদের অত্যন্ত প্রিয়, স্বস্তিকর। আর অবিশ্বাসীদের জন্য প্রবল হতাশামূলক, সংশয়প্রদক। শুনে মনে হয়, যেন এক সুনিপুণ সৃষ্টিকর্তার দিকেই এই শব্দগুচ্ছ ইঙ্গিত করছে। আর কেনই বা নয়? এমন অতিমানবীয় সৃষ্টিশীলতার উল্লেখ করে কর্তাকে উহ্য রাখলে সন্দেহ না করেই বা হয় কিভাবে?

মানুষ কার্য-কারণের যুক্তিপাত করে। ঘটনা ঘটলে মানুষ তার ব্যাখ্যা জানতে উদগ্রীব হয়, যেমন 'হয়তো বিশ্বাস করা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা' উপলব্ধি করার পর মানুষ তার ব্যাখ্যা জানতে উদগ্রীব হবে। কিন্তু, সমকালীন যুক্তির গ-িতে সবকিছুর ব্যাখ্যা মানুষ সবসময় পায় না। কিছু ঘটনার ব্যাখ্যা জানতে তার বিজ্ঞান জানতে হয়, কখনো কখনো অপেক্ষা করতে হয় শতাব্দীকাল।

কিন্তু কার্য-কারণ যুক্তিপাতে মানুষ অধৈর্য, অস্থির। জোরালো যুক্তির পার্থিব ব্যাখ্যা পাওয়া না পর্যন্ত মানুষ বসে থাকে না। অজানা কারণের স্থান করে নেয় সর্বক্ষম কর্তা। মানুষের এই অধৈর্য অনুমানের বহু নমুনা পাওয়া যায় মানব সভ্যতার সমগ্র ইতিহাস জুড়ে। মানুষ জোরালো যুক্তির অপেক্ষা করে নি কখনো। তার বিনিময়ে তারা ভুল ও অলীকে নিমিষেই বিশ্বাসী হিসেবে ইতিহাসে নাম লিখেছে। কালের বিবর্তন, যুক্তি ও বিজ্ঞানের বিকাশ একসময় তাদের ভুল প্রমাণ করেছে, করেছে লজ্জিত।

আমরা ভুলের এই দুষ্টচক্রের ঝুঁকি না নিয়ে বরং ধৈর্য ধরি ও নিরাবেগ থাকি। আর যুক্তি, চিন্তার সমস্ত দুয়ার খুলে দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি বিশ্বাসের রসায়ন; বুঝতে চেষ্টা করি বিশ্বাস কি আসলেই প্রোথিত? কিভাবে মানুষ বিশ্বাসী হল?

মানুষ কি বিশ্বাসপ্রবণ?

গত শতকের ৪০ এর দশকে বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ফ্রিজ হেইদার ও ম্যারিয়্যান সিমেল গবেষণা করেন ক্রিয়া উপলব্ধি ও ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় মানুষের প্রকৃতির ওপর।[১] তারা কিছু ব্যক্তিকে একটি চলচ্চিত্র দেখান, যাতে কেবল কিছু জ্যামিতিক আকৃতি যেমন-ত্রিভুজ, বৃত্ত চলাচল করতে থাকে। প্রদর্শনের পরে প্রদর্শিত দৃশ্য বর্ণনা করতে বলা হলে তারা জ্যামিতিক নক্সার এই চলাচলের মাঝে 'পরিকল্পনা', 'অনুসরণ', 'পলায়ন', ইত্যাদি খুঁজে পান। জ্যামিতিক নক্সাগুলো বর্ণিত হয় সাঙ্কল্পিক বার্তা হিসেবে। ঘটনা ব্যাখ্যায় ঘটক কর্তা (এমন কি যেখানে কোন কর্তা নেই) অনুমানের প্রবণতা দেখা যায় মানুষের মাঝে প্রবল।

ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় অদৃশ্য কর্তায় মানুষের বিশ্বাসপ্রবণতা তাই কেবল ধারণাই নয়, এর গবেষণামূলক ভিত্তি বিদ্যমান। কিন্তু, কি কারণে মানুষ এই বিশ্বাসপ্রবণ হয়ে ওঠে? এরও কি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে, নাকি যুক্তির যথেষ্ট আশ্বাসের অভাবে আমাদেরকে আবার সেই অনুমানের চক্রে ফিরে যেতে হবে?

এ মুহূর্তে 'এ বিশ্বাস ঈশ্বরই দিয়ে দিয়েছেন আমাদের মাঝে' বলে আমরা ক্ষান্ত হতে পারি। কিন্তু, যুক্তি রহিত ধর্মাবেগ মনের দুর্বল মুহূর্তে অমোঘ আশ্রয় হয়ে যে সাহস জোগাতে হয়তো পারে, তার সিকি অংশও পারে না জ্ঞানপিপাসু মনের তৃষ্ণা মেটাতে।

বুঝতে হবে, আমাদের এই ধর্মীয় ব্যাখ্যার দ্বারস্থ না হওয়াটা আমাদের নিজস্ব ধর্মানুভূতিকে উপস্থাপন করে না। না করাটাই ভালো। আমরা হয়তো নিজেরা কেউ বিশ্বাসী, কেউ অবিশ্বাসী, কেউ বা নিশ্চিত। কিন্তু এ বিজ্ঞানালোচনায় ধর্মের দ্বারস্থ না হওয়ার জন্য এর কোনটি হওয়ারই প্রয়োজন নেই বা এর কোনটি হলেও

অসুবিধা নেই। মানুষের প্রয়োজন শুধু একটি বিজ্ঞানমনস্ক মুক্ত মন, তার ধর্ম বিশ্বাস যাই হোক। যুক্তি, জগতের রসায়ন বড় নিরাবেগ। এখানে আবেগী মানুষ সর্বদাই বিজ্ঞানের আনাড়ি ছাত্র, ইতিহাসের লজ্জিত অলীক-অনুমানকারী। আমরা তাই জ্ঞানের জিজ্ঞাসায় কেবল বিজ্ঞানেরই দ্বারস্থ হচ্ছি। আমাদের প্রশ্ন, মানুষের বিশ্বাসপ্রবণ হয়ে ওঠার পেছনে ব্যাখ্যা কি? আশার কথা, বিবর্তন তত্ত্বের সাহায্যে এর একটি জোরালো ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব।

বিশ্বাসে বিবর্তনের ভূমিকা

বিবর্তনের ব্যাখ্যায় যাবার আগে যে কথা সম্ভবত না বললেই নয় - তা হলো বিবর্তন তত্ত্ব ধর্মবাদীদের চোখে এক নম্বর শত্রুতে পরিণত হওয়া। সমকালের ধর্মীয় নেতাদের প্রায়শ দেখা যায় বিবর্তনের প্রতি তাদের বৈরীভাব প্রকাশ করতে। তারা মানতে চান না সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক এই তত্ত্বকে। বিবর্তন তত্ত্ব নিজে কিন্তু কখনোই ধর্মতত্ত্বে উৎসাহী ছিলো না। বিবর্তন ধর্ম বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংক্রান্ত বিজ্ঞান নয়। এ কেবল পরিবেশের সাথে জীবের অভিযোজনের মাধ্যমে প্রজন্ম পরম্পরায় তার প্রাপ্ত জৈব বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের কথা বলে। এই অভিযোজন প্রক্রিয়ায় জীবগোষ্ঠীর যেসব সদস্যের বেঁচে থাকার ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি হয়, তাদের প্রজননের সংখ্যা বেশি হবার সম্ভবনা থাকে এবং ঐ জীবকূলে তাদের জৈব বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য বেশি থাকে।

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক এই তত্ত্ব কি আসলেই ধর্মের শত্রুতে পরিণত হবার যোগ্য? বিবর্তন অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মতই ধর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। যুক্তরাষ্ট্রের কেস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত পদার্থবিদ লরেনস ক্রসও মনে করেন, বিবর্তনকে এভাবে শত্রু হিসেবে দেখা অহেতুক।[২] বিবর্তন কখন বলে নি এমনটি হতে পারে বা হতে পারে না যে, কোন সর্বক্ষমতাধারী ঈশ্বরই প্রকৃতিতে বিবর্তনের তত্ত্ব আরোপ করে দিয়েছেন। যার আলোচনা এখন বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না, তা নিয়ে বিজ্ঞান নিরাবেগ থাকবে, এমনটিই তো স্বাভাবিক।

ফিরে দেখি মানুষকে সভ্যতার প্রাথমিক পর্বে, যখন বাস করতো গুহায়। গুহার মুখে হঠাৎ যদি সে কোন শব্দ শুনতে পেতো, কি ভাবতো সে? কিছুই দেখা যায় নি এখনো, কিছুই জানা যাচ্ছে না - কি ওখানে। যদি ধরে নিতো কোন হিংস্র শিকারী জন্তু, তবে সে সময় পেতো সতর্ক ব্যবস্থা নেবার, অনুমান ভুল হলেও ক্ষতি নেই কোন। কিন্তু যদি ধরে নিতো কিছুই নেই ওখানে - কেবল বাতাসের নড়াচড়া, সত্যিই তা হলে তো ভালো; আর কোন হিংস্র জানোয়ার হলে এই অনুমান হয়ে উঠতো তার জীবনের জন্য মারাত্মক।

মানুষ কার্য-কারণের যুক্তিপাত করার ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাণী। এ ক্ষমতা তাকে ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। মানুষ প্রতিটি ঘটনা ব্যাখ্যা করতে চায়। গুহা মুখের শব্দ তাকে বিচলিত করে। কোন কর্তা, বিশেষ করে ক্ষতি করতে সক্ষম এমন কর্তার দ্বারা ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে, এমন অনুমান প্রায়শঃই তার জীবন বাঁচাতো। আর

ওখানে কিছু নেই ধরে নিয়ে তার খুব উপকার কখনোই হতো না, বরং ভুল অনুমান হয়ে থাকলে তা হতো জীবনবিনাশী। সেযুগে মানুষের জীবনযাপনের এমন প্রতিবেশ, প্রেক্ষাপট আর বিবর্তন মানুষকে সাহায্য করেছে তার মস্তিষ্কে এমন উপাদান গড়ে তোলার, যা ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় সহসাই ও প্রয়োজনে যুক্তির বাইরে গিয়ে (সম্ভবত অধিক শক্তিশালী ও অনিষ্টক্ষম) কোনো কর্তাকে অনুমান করতে সাহায্য করে। কার্য-কারণের যুক্তিপাতে মানুষকে অধৈর্য করে তো বটেই।

এভাবে ক্রিয়াকে যুক্তির বাইরে এসে ব্যাখ্যা করাটা অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের জন্য হয়েছে নিরাপদ ও স্বস্তিকর। সত্যি কথা বলতে, অজানা ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় সহসাই কর্তাকে নিয়ে আসাটা মানসিক স্থিতিশীলতার দিক থেকেই তার জন্য স্বাভাবিক পছন্দ হয়ে ওঠে এবং তা সম্ভবত অনেকাংশে আজও বিদ্যমান রয়ে গেছে।

জগৎ-সৃষ্টি, ন্যায়-অন্যায়, নীতিধর্মের জটিল দার্শনিক প্রশ্নের মুখে স্বাভাবিক কর্তা হিসেবেই এভাবে সম্ভবত ঈশ্বর ও তার প্রণীত বিভিন্ন অনুশাসনের আগমন। এমন বিশ্বাস সম্ভবত মানুষের ওই বিবর্তিত ও অভিযোজিত বৈশিষ্ট্যেরই প্রকাশ। একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করে নিলে জটিল সব দার্শনিক প্রশ্নের চটজলদি উত্তর পাওয়া যায়, স্বস্তিকর মানসিক অবস্থায় স্থিত হওয়া যায়। আর যুক্তি-বুদ্ধি-প্রমাণের মে ধ্য সীমাবদ্ধ থাকতে হলে চুপ করে বসে থাকতে হয় ও অপেক্ষা করতে হয় কালাতিকাল অনুমানবিহীন। এমনটা তো মানুষের বৈশিষ্ট্যে নেই।

ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় কর্তার সহসা অনুমানের বৈশিষ্ট্য কি করে মানুষকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী করে তোলে, তার আলোচনা বিজ্ঞানীরা করেন দু'টি ভিন্ন তত্ত্বে - একটি হলো অভিযোজন তত্ত্ব, অপরটি - উপজাত তত্ত্ব। অভিযোজনবাদীরা মনে করেন, গুহামানবের শ্বাপদসংকুল প্রতিবেশকে যেমন সরাসরি মানুষ অভিযোজন করেছিলো, তেমনি ঈশ্বরে বিশ্বাসও আদি মানুষের মানসিক ভারসাম্যের জন্য একটি অপরিহার্যতা ছিলো। জটিল দার্শনিক প্রশ্ন বা ব্যাখ্যাতীত প্রাকৃতিক ঘটনের সামনে অনুত্তর থাকা, বিপদ, অসুখ, দুঃখ দুর্ভোগে বিচলিত থাকার মতো অস্তিতিশীল মানসিক অবস্থার পরিত্রাণ হিসেবে ঈশ্বরে বিশ্বাস মানুষকে সরাসরি সাহায্য করেছে। আর এই বৈশিষ্ট্য মানুষ অভিযোজন করে নিয়ে নিজেকে আরও ভারসাম্যপূর্ণ করে তুলছে।

অপরদিকে উপজাত তাত্ত্বিকেরা মনে করেন, ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় কর্তা অনুমানের মানুষের যে অভিযোজিত বৈশিষ্ট্য, ঈশ্বরে বিশ্বাস তার কেবল উপজাত মাত্র। বিবর্তনের কালপরিক্রমায় ঈশ্বরে বিশ্বাস কখনো মানুষের জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদান ছিলো না, টিকে থাকতে তা মানুষকে অধিক সক্ষমও করে নি। মানুষের কর্তায় বিশ্বাস করে নেয়ার স্বাভাবিক প্রবণতার এ কেবল একটি প্রয়োগ উদাহরণ। বিশ্বাস করে নেয়ার যে উপাদান তৈরি হয়েছে মানুষের মাঝে, তারই বদৌলতে মানুষ অতিরিক্ত প্রয়োগ হিসেবে ঈশ্বর ও বিভিন্ন অদৃষ্টে বিশ্বাস করে।

অনেকটা যেন - ধনুকাকৃতির দু'টি খিলানের মাঝে স্থান করে নেয়া ইংরেজি 'ভি' আকৃতির স্প্যান্ড্রেলের মতো। বিবর্তনতত্ত্বগত জীববিজ্ঞানে স্প্যান্ড্রেলের ধারণাটি প্রথম আনয়ন করেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী

স্টিফেন ডে গুলড [৩]। তুলনাটা যেমন - খিলান হলো প্রতিবেশের সাথে অভিযোজনের মাধ্যমে তৈরি হওয়া মানুষের বিবর্তিত বৈশিষ্ট্য, অপরদিকে স্প্যান্ড্রেল মানুষের বিবর্তিত বৈশিষ্ট্যের জটিল বিন্যাসের মাঝে স্থান পেয়ে উৎপন্ন হওয়া একটি উপজাত। খিলান প্রয়োজনের নিমিত্তে তৈরি, স্প্যান্ড্রেল তৈরি নক্সার বাড়তি উপজাত হিসেবে, প্রয়োজনের তাগিদে নয়। কিন্তু দু'টি খিলানের মাঝে স্থান করে নেবার পর তা বাড়তি উপাদান হিসেবে দেখা দেয়, চিত্রের স্প্যান্ড্রেলটির মতো মানুষের শিল্প ও কল্পনাকে জায়গা দেবার মতো যথেষ্ট স্থান করে নেয়। এই দুই তত্ত্ব সংক্রান্ত সুপাঠ্য আলোচনা বিজ্ঞানলেখিকা রবিন হেনিগ করেছেন নিউ ইয়র্ক টাইম্সে তার প্রকাশিত প্রবন্ধ 'ডারউনস গড'-এ।

চিত্র: খিলান প্রয়োজনের নিমিত্তে তৈরি, স্প্যান্ড্রেল তৈরি নক্সার বাড়তি উপজাত হিসেবে, প্রয়োজনের তাগিদে নয়। উপরের চিত্রটি এইনার এইনারসন ভারান এর তোলা গনু মুক্ত দলিলে লাইসেন্সকৃত ছবি থেকে সম্পাদনা করা হয়েছে।

মানুষের বিশ্বাস করার ক্ষমতা ও বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাসের সাথে এর সম্পর্কের একটি সাযুজ্য পাওয়া যায় মানুষের কথা বলার ক্ষমতা আর সে ক্ষমতার সাথে বিভিন্ন ভাষার সম্পর্কের মাঝে। বিশ্বাসের ক্ষমতা যেমন মানব মস্তিষ্কে বিবর্তন দ্বারা প্রোথিত উপাদান, তেমনি কথা বলতে শেখার ক্ষমতাও মানব শিশু জন্ম থেকেই বহন করে। বিবর্তনের মাধ্যমে এর উৎপত্তি। মানুষের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হয়, কিন্তু সব মানুষ কথা বলার বা কোন ভাষা শিখে নেবার ক্ষমতা বহন করে। যেমনটি, মানুষের রয়েছে বিভিন্ন ধর্ম-বিশ্বাস, কিন্তু প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই তাদের নিজ নিজ ধর্মে সমান-প্রবলভাবে বিশ্বাসী। ধর্ম এমন কি পরিবর্তন পর্যন্ত হয়ে যায় ধর্মান্তরের মাধ্যমে। কিন্তু মনের গভীরে বিশ্বাসের যে আবাস, তা কখনো নিশ্চিহ্ন হয় না।

নিরাবেগ সমাপ্তি

এতক্ষণে এসে এই আবেগমুক্ত আলোচনা হয়তো একজন বিশ্বাসীর কাছে নিরানন্দ হয়ে উঠেছে। 'সম্ভবত বিশ্বাস মানবমনে প্রোথিত' বিশ্বাসীদের জন্য আপাত প্রলুব্ধকর এই প্রস্তাবনাকে এই আলোচনা যথেষ্ট সাদাসিধে করে ফেলেছে। কেননা আমরা আগেই মেনেছি, বিজ্ঞানালোচনায় আবেগমুক্ত থাকাটা জরুরি। যুক্তিবুদ্ধির বাইরে তাই কোন অতিরিক্ত প্রস্তাব বা দাবি উত্থাপন করা হয় নি এখানে, করার সুযোগও নেই। আরো যথাযথভাবে বলতে গেলে, এখানে কেবল এটুকুই প্রস্তাব করা হয়েছে - 'সম্ভবত বিশ্বাস মানবমনে প্রোথিত' এবং বিবর্তনে তার ব্যাখ্যা আছে। এমন নিরাবেগ সত্যানুসন্ধান একজন অবিশ্বাসীর কাছেও কষ্টকর হতে পারে। যেমনটা সম্ভবত একজন শান্তিবাদীর কাছে হতে পারে মেনে নেয়া যে - 'হিংস্রতাও মানবমনে প্রোথিত' এবং বিবর্তন এরও ব্যাখ্যা দিতে পারে।

এ আলোচনা কিছু সত্য উদঘাটনের পাশাপাশি কিছু প্রশ্নও রেখে যাচ্ছে। যেমন, আমরা কি তবে বিশ্বাস করতেই থাকবো কিংবা হিংস্রতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে, আমরা কি তবে আরও হিংস্র হয়ে উঠবো। তার উত্তর না হয় পরবর্তীতে কোন দার্শনিক আলোচনার মাধ্যমে আমরা বের করার চেষ্টা করবো। আপাতত আমরা বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ হিসেবে নিরাবেগ ব্যাখ্যাগুলোকে মুক্ত মনে গ্রহণ করি।

সত্য সন্ধানে আবেগের স্থান নেই। সত্য সন্ধানে তাই থাকতে হবে নিরাবেগ, থাকতে হবে মুক্ত। সংস্কারাচ্ছন্ন গন্ডিবদ্ধ মন নিয়ে গূঢ় জগতের জটিলতাকে ধারণ করা যাবে না।

তথ্যসূত্র:

১।http://members.westnet.com.au/emmas/2p/thesis/1.htm
২।http://www.economist.com/world/displaystory.cfm?story_id=9036706
৩। http://en.wikipedia/.org/wiki/Spandrel_(biology)

আশিক মাহমুদ রূপম, বিজ্ঞান লেখক। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের স্নাতক। একটি সফটওয়ার কোম্পানিতে গণিত বিশ্লেষক হিসেবে কর্মরত। ইমেইল : ashique.mahmood.rupam@gmail.com

মানুষের উদ্ভব কি কোন স্বর্গীয় স্পর্শের ফসল?

বন্যা আহমেদ

ধরুন, দেড় দুই লক্ষ বছর আগে কোনো এক বুদ্ধিমান মহাজাগতিক প্রাণী, আমাদের কল্পনার সেই 'উড়ন্ত সসারে' করে পৃথিবীতে পদার্পণ করল। সেই সময়ে আফ্রিকার এক কোণে ঘুরে বেড়ানো আমাদের আধুনিক মানুষের প্রজাতি *Homo sapiens* দের দেখে কী ভাবতো তারা? তারা কি বিবর্তনের পরিক্রমায় এই পৃথিবীতে আমাদের টিকে থাকা নিয়ে কোন বড়সড় বাজি ধরতে রাজি হত? তারা কি ভুলেও কল্পনা করতে পারতো যে এই প্রজাতিটিই খুব নিকট ভবিষ্যতে সারা পৃথিবীটাকে দখল করে নেবে? চারদিকের নির্মম প্রকৃতির সাথে টেক্কা দিয়ে টিকে থাকার জন্য কী আছে তাদের? প্রয়োজনীয় কিছুই নেই - থাবা নেই, ধারালো দাঁত নেই, শিং বা লোম কিছুই নেই, অত্যন্ত দুর্বল দেখতে অদ্ভুত এক দ্বিপদী প্রাণী! জানি, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর মতই শোনাচ্ছে, কিন্তু ব্যাপারটাকে ঠিক উড়িয়েও তো দেওয়া যায় না। এখন তাহলে প্রশ্ন করতে হয়, সে অবস্থা থেকে আমরা টিকে গেলাম কী করে?

শুধু টিকে গেছি বললেও তো ভুল বলা হবে - মাত্র দেড়-দুই লাখ বছরে ফুলে ফেপে সংখ্যা ছয়শো কোটি তো ছাড়িয়ে গেছিই, পৃথিবীব্যাপী প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করছি, ইদানীংকালে আবার পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে মহাবিশ্বের দিকেও দিয়েছি হাত বাড়িয়ে। কিন্তু কী করে সম্ভব হল সেটা? বৈচিত্র্যময় এই বিশাল প্রকৃতিতে আমরা কি আসলেই অনন্য? এর উত্তর তো সোজাসাপ্টা 'হ্যা' ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। মানুষ এই প্রকৃতিরই অংশ, অন্যান্য প্রাণীর মতই লাখ লাখ বছর ধরে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায়ই তার উৎপত্তি ঘটেছে। কিন্তু বিবর্তনের এই প্রক্রিয়াতেই মানুষের মধ্যে অনন্যসাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটেছে যা প্রকৃতিতে সেভাবে আগে কখনও ঘটেনি। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় যে কী ধরনের অভিনব এবং জটিল বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি ঘটতে পারে তারই সাক্ষ্য বহন করে চলেছি আমরা। বর্তমানে হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক স্টিভেন পিঙ্কার* এক সাক্ষাৎকারে মজা করে বলেছিলেন,

> 'হুট করে দেখলে মানুষের বিবর্তনকে তো অসাধারণ বলেই মনে হয়। যে পদ্ধতি থেকে শামুক, বট গাছ বা মাছের মতো জীবের জন্ম হয় তা থেকেই কী করে আবার চাঁদে পৌঁছে যাওয়া, মহাসমুদ্র পাড়ি দেওয়া বা ইন্টারনেটের জন্মদাতা এমন এক বুদ্ধিমান প্রাণীর উৎপত্তি ঘটতে পারে? **তাহলে কি কোন স্বর্গীয় স্পর্শ আমাদের মস্তিস্ককে বিশেষভাবে তৈরি করেছিল? মানুষের উদ্ভব কি কোন স্বর্গীয় স্পর্শের ফসল?** না, আমি তা মনে করি না, কারণ ডারউইন প্রদত্ত প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া দিয়েই মানুষের বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, এবং বিবর্তনের ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক কিংবা অলৌকিক ব্যাখ্যার চেয়ে অনেক বেশি যুক্তিগ্রাহ্য।'

---

* অধ্যাপক স্টিভেন পিঙ্কার, এমআইটি'র মস্তিস্ক এবং বৌদ্ধিক বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক, ভাষা, ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ এবং তার সাথে বিবর্তনবাদের সম্পর্ক, মানুষের মন, সচেতন জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবষণার জন্য বিখ্যাত। How the mind works সহ বেশ কিছু আলোচিত গ্রন্থের প্রণেতা।

মানুষের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে দু'টির কথা তো চোখ বন্ধ করেই বলা যায় : মানুষ একমাত্র প্রাণী যে দুই পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াতে শিখেছে, আর ওদিকে আবার খুব অসাধারণ রকমের বড় মস্তিস্কেরও বিবর্তন ঘটেছে যা অন্য কোন প্রাণীতে ঘটতে দেখা যায় নি। হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অত্যন্ত সুপরিচিত জীববিজ্ঞানী, এডওয়ার্ড উইলসনের গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০ লক্ষ বছর আগে থেকে শুরু করে আড়াই লাখ বছর আগে পর্যন্তও আমাদের মস্তিস্কের আকার প্রতি এক লাখ বছরে প্রায় এক চামচের সমান করে বেড়েছিলো [১] । বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ধীরগতিতে হলেও এখনও আমাদের মস্তিস্কের বিবর্ধন ঘটে চলেছে। আমাদের মস্তিস্কের যে অংশটি আমাদের বুদ্ধিমত্তার সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সেই সেরিব্রেল করটেক্স কে যদি টেনে ফ্ল্যাট করে বিছিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে যে তা চার পৃষ্ঠা জুড়ে জায়গা করে নিচ্ছে। আমাদের সবচেয়ে কাছের পূর্বসূরি শিম্পাঞ্জীদের সেরিব্রেল করটেক্স নেবে মাত্র এক পাতার সমান জায়গা, বানরেরটা নেবে একটি পোস্টকার্ডের সমান আর ইঁদুরের ক্ষেত্রে তা নেবে মাত্র একটা স্ট্যাম্পের সমান জায়গা [২]।

পার্থক্যটা চোখে পড়ার মতই, তাই হয়তো সাফল্যের পাল্লাটাও বেশ ভারী। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, উহু!, মস্তিস্কের আকারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও সেটাই বোধ হয় একমাত্র কারণ নয়! তাহলে তো আমাদের মত বড় মস্তিস্কের অধিকারী নিয়ান্ডারথাল প্রজাতির মানুষরাও একই রকম সাফল্য অর্জন করতে পারতো - তাদের মত প্রজাতির তো তাহলে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা নয়। একদিকে মস্তিস্কের বিকাশ, অন্যদিকে ঘটেছে ভাষার উৎপত্তি ও ব্যবহার, আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে ঘটেছে সাংস্কৃতিক বিবর্তন এবং বিকাশ ঘটেছে জটিল এক সামাজিক ব্যবস্থার। মানুষের বিবর্তনে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে যা হয়তো অন্য কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে সেভাবে প্রয়োজ্য নয়। এখানেই তো শেষ নয়, গত কয়েক লক্ষ বছরে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘটতে থাকা পরিবেশগত পরিবর্তনের ব্যাপারটাকেও তো এই সমীকরণ থেকে বাদ দিয়ে দিলে চলবে না। এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে টিকে থাকার জন্য মানুষ যত নতুন ভাবে অভিযোজিত হয়েছে বিবর্তনের নিয়মে ততই বিকশিত হয়েছে তার নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য।

আমরা জানি যে, এই মহাবিশ্ব প্রায় ১৪শ' কোটি বছর আগে সৃষ্টি হলেও আমাদের এই বুড়ো পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে প্রায় সাড়ে ৪শ' কোটি বছর আগে। এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, প্রাণের জন্ম হতে লেগে গিয়েছিলো আরও প্রায় একশো কোটি বছর। আর মানুষের উৎপত্তি? সে তো সে দিনকার কথা! আদিম এককোষী প্রাণ, ব্যাকটেরিয়া, বহুকোষী প্রাণী, অ্যালজি, অমেরুদণ্ডী প্রাণী, বিভিন্ন মেরুদন্ডী প্রাণীর উৎপত্তি, বিকাশ বা বিলুপ্তির ধাপ বেয়ে, বিবর্তনের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে মানুষের আদি পূর্বপুরুষদের উদ্ভব ঘটলো মাত্র ৫০-৬০ লাখ বছর আগে। সে সময়ে মানুষ এবং অন্যান্য বনমানুষের মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কিছু প্রজাতিরা পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াত শিখলেও তার থেকে আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষদের উদ্ভব ঘটতে লেগে গেছে আরও প্রায় ৩০ লক্ষ বছর। আর আমাদের নিজেদের প্রজাতি অর্থাৎ *Homo Sapiens* দের গল্পের শুরু তো সেদিন, মাত্র দেড় দুই লাখ বছর আগে। ভূতাত্ত্বিক নিয়মে হিসাব করলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের ব্যাপারটা এক্কেবারেই আনকোরা। কতটা আনকোরা, তা 'মহাজাগতিক ক্যালেন্ডারের' একটা সহজ এবং বোধগম্য উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি। এই ধরনের উদাহরণ প্রথম বোধ হয়

ব্যবহার করেছিলেন বিজ্ঞানী কার্ল স্যাগান। উদাহরণের ধরণটি আমার খুব প্রিয়। আমি এই আমার 'বিবর্তনের পথ ধরে' (অবসর প্রকাশনা, ২০০৭) বইয়ে বেশ কয়েকবার উল্লেখ করেছি। ধরুন, সাড়ে চারশো কোটি বছর ইতিহাসটাকে আমরা ১২ মাসের ক্যালেন্ডারে ফেলে প্রাণের বিকাশের সময়সীমাগুলো সম্পর্কে একটা আপেক্ষিক বা তুলনামুলক ধারণা পেতে চাই। সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা দাঁড়াবে অনেকটা এরকমঃ পৃথিবীর জন্ম প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছিলো বছরের প্রথম দিন বা পয়লা জানুয়ারীতে, আর ফেব্রুয়ারী বা মার্চে প্রথম উৎপত্তি ঘটলো ব্যকটেরিয়া বা নীলাভ শৈবাল জাতীয় প্রথম আদি প্রাণের। এই আদি জীবদের প্রতিপত্তি চলেছে বহুকাল ধরে। বছরের অর্ধেকেরও বেশী পেরিয়ে অক্টোবর মাস এসে গেছে বহুকোষী জীবের বিকাশ হতে হতে। জটিল ধরণের কোন প্রাণীর সন্ধান পেতে হলে আপনাকে কিন্তু সেই নভেম্বর মাসে এসে পৌঁছাতে হবে, যদিও তাদের রাজত্ব তখনও শুধুমাত্র পানিতেই সীমিত। নভেম্বরের শেষের দিকে প্রথমবারের মত পানিতে চোয়ালওয়ালা মাছ আর মাটিতে উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, আর ওদিকে পানি থেকে ডাঙ্গায় বিবর্তিত হওয়া প্রাণীগুলো পৃথিবীর মাটিতে রীতিমত জাঁকিয়ে বসেছে ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে। জুরাসিক পার্ক সিনেমায় দেখা সেই বড় বড় ডায়নোসরগুলোর আধিপত্য শুরু হলো এ মাসের মাঝামাঝি, কিন্তু ২৬ তারিখ আসতে না আসতেই তারা আবার চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেলো পৃথিবীর বুক থেকে। খেয়াল করে দেখুন যে বছর শেষ হতে আর মাত্র ৫ দিন বাকি, কিন্তু এখনও মানুষ নামক আমাদের এই বিশেষ প্রজাতিটির কোন নাম গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে না পৃথিবীর বুকে। ডিসেম্বরের ২৬ তারিখের দিকে অন্যান্য প্রাণীর বিবর্তন শুরু হয়ে গেলেও বানর জাতীয় প্রাণীর দেখা মিলছে ২৯ তারিখে আর নর বানরের উৎপত্তি ঘটতে দেখা যাচ্ছে ৩০ তারিখে। বছরের শেষ দিনে এসে উৎপত্তি ঘটলো শিম্পাঞ্জির আর আমাদের এই মানুষ প্রজাতির কথা যদি বলেন তাহলে তাদের দেখা মিললো বছর শেষের ঘন্টা বাজার মাত্র ২০ মিনিট আগে। আমরা এই আধুনিক মানুষেরা ইউরোপ অষ্ট্রেলিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছি এই তো মাত্র ৬ মিনিট আগে আর কৃষি কাজ করতে শিখেছি ঘড়িতে রাত বারোটা বাজার ১ মিনিট আগে [১৫]!

শুধু তো তাইই নয়, বিবর্তনের ধারায় যেমন অগুনতি জীবের উৎপত্তি ঘটেছে ঠিক তেমনি তাদের একটা বড় অংশ বিলুপ্তও হয়ে গেছে। একইভাবে আমরা ফসিল রেকর্ড থেকে দেখতে পাই যে, মানুষেরও বিভিন্ন প্রজাতির উৎপত্তি ঘটেছে, আবার আমাদের প্রজাতি ছাড়া বাকিরা বিলীন হয়ে গেছে ইতিহাসের পাতায়। বিবর্তনের ইতিহাসে অনিয়শ্চতার তো কোনো শেষ নেই, ডাইনোসরের মত অতিকায় প্রাণী বহুকাল ধরে পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করেও শেষপর্যন্ত হারিয়ে গেছে। সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে ভয়ঙ্কর কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মহাপরাক্রমশালী ডায়নোসরগুলো বিলুপ্ত হয়ে না গেলে সেই সময়ের অত্যন্ত নগন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলো হয়তো এত বিকশিত হতে পারতো না। অর্থাৎ, অন্যান্য প্রাণীর মতই আমাদের উদ্ভবও তো কোনো পূর্ব নির্ধারিত ব্যাপার নয়। প্রখ্যাত বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী এবং ফসিলবিদ স্টিফেন জে. গুলড তাই বলেছিলেন [৩],

> 'মানুষ আগে থেকে নির্ধারিত বিবর্তনের কোন ধারার শেষ ফসল নয় বরং মানুষ হচ্ছে আকস্মিকভাবে উদ্ভুত মহাজাগতিক এক অনুচিন্তার ফলাফল। বিশাল শাখা প্রশাখাসহ যে প্রাণবৃক্ষের বিবর্তন আমাদের এ পৃথিবীতে ঘটেছে মানুষ হচ্ছে তার একটা ছোট্টো শাখামাত্র। এরকম নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, এই গাছের বীজটাকে যদি আবার নতুন করে বপন করা হয় তাহলে এই শাখাটা আবার একই রকমভাবে একই জায়গায় জন্ম নেবে না।'

আমরা জানি যে, ষোড়শ শতাব্দীতে এসে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের ধারণাটা হাজার বছর ধরে টিকে থাকা মধ্যযুগীয় ধর্মীয় এবং সামাজিক স্থবিরতার ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপরও তো প্রায় কয়েকশ বছর লেগে গিয়েছিল সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে। আমরা জানি কিভাবে বহু বাঁধাবিঘ্ন পেরিয়ে জীববিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেরিয়ে এসেছিলো সেই 'প্রজাতির পৃথক পৃথক সৃষ্টি' এবং স্থির প্রজাতির মতবাদের ভ্রান্তি থেকে! প্রথমবারের মতো আমরা জানতে পেরেছিলাম আমাদের উৎপত্তি এবং বিকাশের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা। তারপর প্রায় দেড়শো বছর কেটে গেছে, বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক শাখাগুলো প্রতিদিনই আরও জোরালোভাবে এই বিবর্তন তত্ত্বের সঠিকতা প্রমাণ করে চলেছে, কিন্তু প্রাচীন চিন্তার অচলায়তন ভেঙে আমাদের সমাজে তা কিন্তু এখনও জায়গা করে নিতে পারেনি। পৃথিবীতে যে গুটিকয়েক তত্ত্ব সমস্ত পুরোনো ঘুণে ধরা রক্ষণশীল ভ্রান্ত চিন্তা ভাবনা ও প্রথাকে সমূলে আঘাত করেছে তার মধ্যে বিবর্তনবাদ অন্যতম। তাই তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধেরও মাত্রাটা যে একটু বাড়াবাড়ি রকমের বেশি হবে তা তো জানা কথাই। মানব সভ্যতার সমগ্র ইতিহাস জুড়েই আমরা এর পুনরাবৃত্তি দেখে এসেছি। অন্যান্য জীবের বিবর্তন নিয়ে কথা বললে যাও বা ঠিক আছে, কিন্তু মানুষের বিবর্তনের প্রসঙ্গ আসলেই আমাদের মাথায় যেনো আকাশ ভেঙে পড়ে। সেই ১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইন এবং অ্যালফ্রেড ওয়ালেস যখন প্রথম বিবর্তনের তত্ত্বটি প্রস্তাব করলেন তখন চার্চের বিশপের স্ত্রী মুখ থেকে যে আতঙ্কবাণী বের হয়ে এসেছিলো, তা যেনো আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। তিনি আর্তনাদ করে বলেছিলেন [৪],

> 'বনমানুষ থেকে আমাদের বিবর্তন ঘটেছে! আশা করি যেনো এটা সত্যি না হয়, আর যদি তা একান্তই সত্য হয়ে থাকে তবে চলো আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি সাধারণ মানুষ যেনো এটা কখনই জানতে না পারে!'

সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সত্যকে সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টা তো আর নতুন কিছুই নয়। এখনও বিশ্বব্যাপী সেই চেষ্টার যেন কোনো কমতি নেই!

ডারউইন প্রথমে তার 'প্রজাতির উৎপত্তি' বইটিতে মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে তেমন কিছুই বলেন নি (শুধু বলেছিলেন, 'Light will be thrown on the origin of man and his history'; সেই সময়ের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার এই নিশ্চুপতার কারণটা বোঝা তেমন কঠিনও নয়। ডারউইন যে সময়টিতে তার যুগান্তকারী বইটি প্রকাশ করেছিলেন, সে সময় ১৮৫৭ সালের দিকে জার্মানির ডুসেল নদীর উপত্যকায় নিয়েন্ডারথাল নামক জায়গায় বেশ কিছু আদিম মানুষের করোটি আবিস্কৃত হয়।

তখন জার্মানির প্রখ্যাত অধ্যাপক স্কাফ হাউসেন ফসিলগুলো পর্যবেক্ষণ করে প্রস্তাব করেন যে, এগুলো আসলে মানুষের কোনো বিলুপ্ত আদিম প্রজাতির হাড়গোড়। এদের নাম দেওয়া হয় নিয়েন্ডারথাল মানুষ [৫]। তখনকার শিক্ষিত সমাজ কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করেননি। ওদিকে ডারউইনের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং বিজ্ঞানী টি এইচ হাক্সলি সে সময়ই মানুষের বিবর্তনের বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং এপ বা বন মানুষের সাথে মানুষের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যগুলো তুলে ধরে ১৮৬৩ সালে 'Evidence as to Man's Place in Nature' নামক বইটি প্রকাশ করেন। এর পর ডারউইন যখন 'The Descent of man and selection with respect to

Sex' বইটি বের করেন ততদিনে মানুষের বিবর্তনের বিষয়টি বুদ্ধিজীবীমহলে মোটামুটিভাবে সুপরিচিত হয়ে গেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জার্মানি বিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেকেল তার বিখ্যাত 'সৃষ্টির ইতিহাস' বইয়ে লিখেছিলেন যে, বনমানুষ থেকে মানুষের বিবর্তন যদি সত্যিই ঘটে থাকে তবে মানুষও নয় আবার ঠিক বনমানুষও নয় এমন ধরণের মধ্যস্থিত ফসিল পাওয়া যাবে। তিনিই প্রথম বিবর্তনের মধ্যবর্তী অবস্থার এরকম ফসিলগুলোকে হারানো যোগসূত্র বা missing link বলে আখ্যায়িত করেন[৬]। তার কথাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে - গত একশো বছরে এমন অসংখ্য ফসিলের সন্ধান পাওয়া গেছে যা থেকে মানুষ এবং বনমানুষের মধ্যবর্তী অবস্থার বিবর্তনের ধাপগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শুধু তো তাইই নয়, এ থেকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন সময়ে আমাদের প্রজাতির মানুষ ছাড়াও আরও অন্যান্য প্রজাতির মানুষও বিচরণ করেছিলো, এমনকি অনেক সময় একাধিক প্রজাতির মানুষ একই সময়ে তাদের সম্মিলিত পদচারণায় মুখরিত করে তুলেছিলো আমাদের এই ধরনী। এই মুহূর্তে আমরা ছাড়া আর কোনো মানব প্রজাতির অস্তিত্ব না থাকলেও অতীতে ববভিন্ন প্রজাতির কুকুর বা বিড়ালের মত বিভিন্ন প্রজাতির মানুষও যে তা ছিলো তা নিয়ে কিন্তু দ্বিমত প্রকাশের কোনো অবকাশই আর নেই।

গত একশ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা মানুষ এবং এপের মধ্যবর্তী স্তরের যে সমস্ত ফসিল খুঁজে পেয়েছেন তা থেকে মানব বিবর্তনের একটা পরিস্কার চিত্র পাওয়া কিন্তু আর কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। এখন সমস্যাটা আর 'যথেষ্ট পরিমাণে ফসিল পাওয়া যাচ্ছে না' তা নয় বরং ঠিক তার উলটো। এত রকমের মানুষের পূর্বপুরুষের প্রজাতির এবং তাদের মধ্যবর্তী স্তরের ফসিল পাওয়া যাচ্ছে যে তাদেরকে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঠিক ঠাক মত শ্রেণীবিন্যাস করাটাই বিজ্ঞানীদের জন্য এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেকেলের মনোবাঞ্ছা যে এভাবে পূরণ হবে তা হয়তো তিনি নিজেও আশা করেননি। তার ওপরে আবার গত কয়েক দশকে ডেটিং পদ্ধতির যে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে তার ফলে ঠিকভাবে ফসিলের বয়স এবং প্রকৃতি নির্ধারণ করার ক্ষমতাও বেড়ে গেছে বহুগুণ।

এছাড়া মানুষ এবং এপের দৈহিক গঠনের তুলনামূলক বিচার থেকেও বহু তথ্য বেরিয়ে এসেছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের সাথে এপ বা বনমানুষের পার্থক্যগুলো যত বেশি না পরিমাণগত, তার চেয়ে অনেক বেশি গুণগত। মানুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রকমের ভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের আকার বিশেষত মস্তিস্কের আকার মানুষের অনেক বড়, বন মানুষের সাথে তাদের হাত এবং পায়ের আকারের অনুপাতেও পার্থক্য রয়েছে, গায়ের লোম পড়ে গেছে অনেকাংশেই, চামড়ার রঞ্জকবস্তু এবং বুড়ো আঙুল নাড়াবার ক্ষমতাও মানুষের অনেক বেশি। আগে মানুষের সাথে বনমানুষের পার্থক্যকে যত বড় বলে মনে করা হত আধুনিক গবেষণার ফলে তা ক্রমশঃ যেন কমে আসছে। অনেকেই এখনও ব্রিটিশ বিজ্ঞানী রিচার্ড ওয়েন (১৮০৪-১৮৯২) এর বলা কিছু ভুল তথ্যকে সত্য বলে মনে করে বসে আছেন । ওয়েন মনে করেছিলেন যে, তিনি মানুষ এবং বনমানুষের মধ্যে বিশাল এক পার্থক্য খুঁজে পেয়েছেন যা দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে মানুষ এবং বনমানুষ একই পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে আসেনি। তিনি বলেন মানুষের মস্তিস্কে হিপোক্যাম্পাস নামের একটি বাড়তি উপাঙ্গ রয়েছে যা কি না বনমানুষের মধ্যে নেই। কিন্তু ডারউইনের বন্ধু টি এইচ হাক্সলি তখনই তা ভুল প্রমাণ করেন, প্রকৃতপক্ষে মানুষ এবং এপ দুই গ্রুপের মস্তিষ্কের মধ্যে এই উপাংগটির অস্তিত্ব রয়েছে।

এতো গেলো একটা দিক, অন্যদিকে জেনেটিক্স এবং জিনোমিক্সের আধুনিক গবেষণা এবং পর্যালোচনাকে বাদ দিলে তো বিবর্তনের গল্প বলাই এখন আর সম্ভব নয়। গত দুই তিন দশকে বিজ্ঞানের এই শাখাটি বিবর্তনবাদ এবং মানুষের বিবর্তনের পক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী সব তথ্য এবং সাক্ষ্য হাজির করেছে যার সাথে অঙ্গস্থানবিদ্যা এবং ফসিলবিদ্যা থেকে আলাদা আলাদাভাবে পাওয়া তথ্যগুলো প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে। আর দুএক জায়গায় যেখানে অমিল বা সংশয় ধরা পড়ছে সেখানে বিজ্ঞানীরা সুযোগ পাচ্ছেন আরও নতুন নতুন গবেষণার মাধ্যমে ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার। বিজ্ঞানের তিনটি শাখা থেকে স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া এই সম্মিলিত তথ্যগুলো বিবর্তনবিদ্যাকে অত্যন্ত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। গত কয়েক দশকে আণবিক জীববিদ্যা, জেনেটিক্স, জিনোমিক্সের বিভিন্ন আবিস্কারগুলো প্রাণের বিবর্তন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে এক নতুন পর্যায়ে উত্তোরিত করেছে। চলুন খুব সংক্ষেপে দেখা যাক আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় আমাদের নিজেদের বিবর্তনের গল্পটা এখন কীরকম শোনাচ্ছে।

বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স তার Unweaving the Rainbow বইতে বলেছিলেন যে, ডিএনএ হচ্ছে 'মৃতের জেনেটিক বই'-আমাদের পূর্বপুরুষের ইতিহাসের রোজনামচা যেন তারা। বিবর্তনবিদ্যা বলে যে, জীবের শরীরের সবকিছুই তার পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। আর এদিকে ডিএনএ'র মধ্যে বিস্তারিতভাবে লেখা রয়েছে সেই কাহিনীর পূর্ণ ধারাবাহিক বিবরণী - কখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে, কোন পরিবেশে টিকে থাকার জন্য যুদ্ধ করেছে, প্রজননের ইতিহাস থেকে শুরু করে কোথায় কখন কোন মিউটেশন তাদের বিবর্তনের গতিকে নিয়ে গেছে নতুন দিগন্তে -সবকিছু লেখা আছে আমাদের ডিএনএ-র ভিতরে। প্রজননের মাধ্যমে পরের প্রজন্ম তৈরির ধারাবাহিকতা যদি ছিন্ন না হয় তাহলে ডিএনএ-এর ভিতরে লেখা তথ্যগুলো এক অণু থেকে আরেক অণুতে, এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। প্রতিটি জীব তার দেহকোষের ভিতরে হাজার লক্ষ এমনকি কোটি বছর ধরে এই ঐতিহাসিক তথ্য বয়ে বেড়াচ্ছে। আমরা মোটে গত কয়েক দশক ধরে আণবিক জীববিদ্যার প্রভূত অগ্রগতির ফলে সঠিকভাবে ডিএনএর ভিতরে লেখা এই তথ্যগুলো পড়তে এবং বুঝতে শুরু করেছি। ড. রিচার্ড ডকিন্স মনে করেন যে[৭] -

> পৃথিবীতে যদি একটাও ফসিলের অস্তিত্ব না থাকতো, বা কেউ যদি তাদেরকে কোন ম্যাজিক করে উড়িয়ে দিত, তাহলেও পৃথিবী জোড়া জীবের বিবর্তনের প্যাটার্ণ এবং তাদের জেনেটিক তথ্য থেকেই সম্পূর্ণ বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করা সম্ভব হতো।

কথাটা শুনতে অতিরঞ্জণ বা ঔদ্ধত্য বলে মনে হলেও, আজকে একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় দাঁড়িয়ে, আণবিক জীববিদ্যার সাম্প্রতিক আবিস্কারগুলোকে একটু মনযোগ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেই বোঝা যায় যে, কথাটা আদৌ মিথ্যা নয়।

মানুষের জিনোমের সিকোয়েন্সিং বা অনুক্রমের ঐতিহাসিক প্রথম খসড়াটি প্রকাশিত হয় ২০০১ সালের ফ্রেব্র"য়ারি মাসে। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা এই প্রজেক্টে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৩ সালে এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়[৮]। এর কিছুদিন পরেই, ২০০৫ সালে, আমাদের

বিবর্তনের ইতিহাসে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় শিম্পাঞ্জির জিনোমও পড়ে শেষ করা হয়[৮] (এদিকে আবার গত কয়েক বছরে ইঁদুর, মৌমাছি, ইস্টসহ বেশ কয়েকটি জীবের জিনোমের অনুক্রমও বের করা হয়েছে, ইন্টারনেটের ওয়েব সাইটগুলোতে এখন মানুষ এবং শিম্পাঞ্জিসহ বিভিন্ন জীবের জিনোমের অনুক্রমের বিস্তারিত তথ্য রাখা আছে[৯])। পৃথিবী জোড়া ৬৭ জন বিজ্ঞানী এই শিম্পাঞ্জি সিকোয়েন্সিং এ্যান্ড এ্যানালিসিস কনসোরটিয়ামে অংশগ্রহণ করেন, নেচার জার্নালের ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর ইস্যুতে মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির জিনোমের তুলনামুলক বিশ্লেষণের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হয়[১০]। ন্যাশনাল হিউম্যান জিনোম রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (NHGRI) এর ডিরেকটর ফ্রান্সিস কলিন্স এর মতে, এটি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস, শারীরিক গঠন, বিভিন্ন ধরনের অসুখ বিসুখের উৎপত্তি বুঝতে হলে বিবর্তনের ধারায় উদ্ভুত এবং অত্যন্ত কাছাকাছি সম্পর্কিত বিভিন্ন জীবের জিনোমের সাথে আমাদের জিনোমের তুলনামূলক ব্যাখ্যা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের জিনোমের পরীক্ষার সাথে ফসিল রেকর্ড এবং শারীরবিদ্যার তুলনামূলক ব্যাখ্যা থেকে বিজ্ঞানীরা আগে শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে যা ভেবেছিলেন তা প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে। এদের বর্তমান জিনোমের মধ্যে সাদৃশ্য প্রায় ৯৯% এবং তাদের প্রোটিনের গঠনও খুবই কাছাকাছি। ডিএনএ-র সন্নিবেশন এবং বিলুপ্তি হিসাব করলে এই সাদৃশ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৬%এ। প্রোটিনের স্তরে বিচার করলে দেখা যায় যে তাদের ২৯% জিন একই প্রোটিনের কোডিং এ নিয়োজিত। অর্থাৎ দুটো মানুষের ডিএনএ' তুলনা করলে যে পার্থক্য দেখা যাবে, একটা মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির মধ্যে সে পার্থক্যটা মাত্র ১০ গুণ বেশী, কিংবা ধরুন ইঁদুরের সাথে মানুষের যে পার্থক্য তার তুলনায় শিম্পাঞ্জির সাথে পার্থক্য ৬০গুণ কম[১১]! বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন যে, মানুষ এবং শিম্পাঞ্জিতে কিছু কিছু জিন অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর তুলনায় ক্রমাগতভাবে দ্রুতগতিতে বদলে যাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে শব্দ শোনা এবং বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় জিন, স্নায়ুতন্ত্রের সংকেত আদান-প্রদানের জিন, শুক্রাণু তেরির জিনসহ আরও কয়েকটি জিন। এদিকে আবার দেখা যাচ্ছে যে, বিবর্তনের ধারায় মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির ডিএনএ'তে ইঁদুর বা খরগোশের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে ক্ষতিকর মিউটেশন ঘটেছে। তার ফলে একদিকে যেমন তাদের অসুখের পরিমাণ বেড়েছে কিন্তু অন্যদিকে আবার তা তাদেরকে পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হতে বাড়তি সুবিধা করে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা মানুষের জিনোমের এই ধরনের মিউটেশনগুলো আরও খতিয়ে দেখছেন। শিম্পাঞ্জি, অন্যান্য প্রাইমেট বা অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর সাথে আমাদের মিলগুলো বোঝা যেমন দরকার ঠিক তেমনিভাবেই গুরুত্বপূর্ণ এদের সাথে আমাদের পার্থক্যগুলো সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারা। তাহলেই হয়তো আমরা বলতে পারবো কোন কোন পরিবর্তনগুলোর ফলে আমরা মানুষে বিবর্তিত হয়েছি, কিংবা ঠিক কোন কোন বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে আমরা তাদের থেকে বুদ্ধিমত্তায় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে এত আলাদা হয়ে গেছি। ইতোমধ্যেই আমরা এই ধরনের বিশ্লেষণ থেকে এমন কিছু কিছু তথ্য জানতে পেরেছি যা আমাদের স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে পারে। যেমন ধরুন, দেখা যাচ্ছে যে, শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের সাধারণ পূর্বসুরি থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর মানুষ Caspase-12 নামক জিনের কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে যার ফলেই সে এখন আলজাইমারস বা স্মৃতিভ্রংশ রোগে আক্রান্ত হয়। এখন আমরা যদি শিম্পাঞ্জির মধ্যে এই জিনের কাজগুলোকে ঠিকমতো বুঝতে পেরে আমাদের শরীরে মধ্যে তার প্রয়োগ ঘটাতে পারি তাহলে হয়তো এই মারাত্মক রোগটি থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি স্থায়ী ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিভিন্ন রোগের সাথে আমাদের

জেনেটিক গঠনের বিবর্তনের ইতিহাস যে কী ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তা এখন ধীরে ধীরে আমাদের সামনে পরিস্কার হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

গত শতাব্দীর প্রথম দিকে কিন্তু মানুষের তেমন কোন মধ্যবর্তী ফসিলের সন্ধান পাওয়া যায়নি, অনেকেই তখন মনে করতেন যে, মানুষ হয়তো অন্যান্য বনমানুষের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো প্রায় ৫ কোটি বছর আগে। তারপর ধীরে ধীরে যখন আরও অনেক ফসিল পাওয়া যেতে শুরু করলো, এদিকে আবার বিজ্ঞানীরা মানুষের সাথে ওরাং ওটাং, গরিলা, শিম্পাঞ্জির মিলগুলো আরও ভালো করে বুঝতে শুরু করলেন তখন মনে করা হল যে, হয়তো দেড় কোটি বছর আগে মানুষের বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিলো। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডিএনএর আবিস্কারের পর আমাদের সামনে আণবিক জীববিদ্যার গবেষণার দুয়ার খুলে যায়। সত্তরের দশকে মানুষ এবং অন্যান্য বনমানুষের প্রোটিনের এমাইনো এসিডের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে, বিবর্তনের যাত্রায় মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির আলাদা হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা ৫০ লক্ষ বছরের বেশি পুরোনো হতে পারে না। এদিকে আবার গত তিরিশ, চল্লিশ বছরে ফসিলবিদেরা আফ্রিকা থেকে মানুষের 'আধা' এবং 'সম্পূর্ণ' আদিপুরুষদের যে সব ফসিল খুঁজে পেয়েছেন তা থেকেও কিন্তু আমরা এখন একই ধরণের তথ্য পেতে শুরু করেছি। আর এদিকে আজকের জিনোমিক্সের অত্যাধুনিক গবেষণা থেকেও আমরা এ বিষয়ে অত্যন্ত জোরালো সাক্ষ্য পেতে শুরু করেছি। ২০০৬ সালের মে মাসে এমআইটি এবং হার্ভার্ড ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানীরা নেচার জার্নালে যে গবেষণাটি প্রকাশ করেন তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষ এবং শিম্পাঞ্জি তাদের সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো ৫৪ লক্ষ থেকে ৬৩ লক্ষ বছর আগে এবং তাদের আলাদা হয়ে যাওয়ার ইতিহাসটি বেশ জটিল [১২]। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, সম্পূর্ণভাবে আলাদা হয়ে যাওয়ার আগে এই দুই প্রজাতি বা উপপ্রজাতির মধ্যে বেশ লম্বা সময় ধরে প্রজনন ঘটেছিল যা আমাদের ক্রোমোজোম-এর মধ্যে গভীর ছাপ ফেলে গেছে। কে জানে, এ জন্যই হয়তো আমরা এত লম্বা সময় ধরে আফ্রিকাজুড়ে 'না-বনমানুষ-না-মানুষ' জাতীয় মধ্যবর্তী মানুষের বা মিসিং লিঙ্কের সন্ধান পাচ্ছি!

একটা মজার গল্প দিয়ে লেখাটা শেষ করা যাক। শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাং ওটাং সবার মধ্যে ক্রোমোসোমের সংখ্যা ৪৮, হঠাৎ করেই দেখা যাচ্ছে যে, একই হোমিনয়ডিয়া দলের সদস্য হওয়া স্বত্ত্বেও, মানুষের ক্রোমোসোমের সংখ্যা হয়ে গেছে ৪৬। বিবর্তনের তত্ত্বানুযায়ী এরা যদি পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে থাকে এবং অন্যদের সবার মধ্যে ৪৮ টি ক্রোমোসোমের অস্তিত্ব থাকে, তাহলে অবশ্য আমাদেরকে এখন প্রশ্ন করতে হবে, মানুষের জিনোম থেকে দু'টো ক্রোমোজোম কোথায় হারিয়ে গেল? বিবর্তন তত্ত্ব যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে তো একদিন হঠাৎ করে ক্রোমোজোম দু'টো হাওয়া হয়ে যেতে পারে না, তাদের কোনো না কোনো রকমের চিহ্ন থাকতেই হবে মানুষের জিনোমের মধ্যে। আর যদি এ ধরণের কোন নমুনা একেবারেই না পাওয়া যায় তাহলে তো বিবর্তনবাদের মুল বিষয়টি নিয়েই সন্দেহের অবকাশ থেকে যাচ্ছে। জীববিদরা প্রকল্প দিলেন যে, যেহেতু সব বনমানুষের মধ্যে এখনও ৪৮টা ক্রোমোজোম আছে কিন্তু এদের দলের মধ্যে শুধুমাত্র মানুষেরই দু'টো ক্রোমোজোম কম আছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, শেষ সাধারণ পুর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর বিবর্তনের পথে চলতে চলতে কোন এক সময়ে মানুষের প্রজাতির মধ্যে আদি দু'টো ক্রোমোজোম সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল, যা অন্যান্য বনমানুষের ক্ষেত্রে ঘটেনি। শেষ পর্যন্ত, এই তো কিছুদিন আগে, ২০০২ সালে বিজ্ঞানীরা দেখালেন যে, আসলে শিম্পাঞ্জিদের যে ১২ এবং ১৩ নম্বর ক্রোমোজোম (এখন তাদেরকে

2A এবং 2B বলে নামকরণ করা হয়েছে) রয়েছে সে দু'টো মানুষের মধ্যে মুখোমুখিভাবে সংযুক্ত হয়ে ক্রোমোজোম ২ তৈরি করেছে[১৩]। এই দু'টো ক্রোমোজোমের সংযুক্তির বিন্দুটির গঠন নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা থেকেও মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসের আরও অনক তথ্য বের হয়ে এসেছে, কিন্তু তা নিয়ে এখানে আর আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। আসলে এ ধরনের ক্ষেত্রগুলোতেই আমরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে বিবর্তনবাদের শক্তি এবং সঠিকতা বুঝতে পারি। কোন সঠিক তত্ত্ব থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বা পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয় যা অবৈজ্ঞানিক কোনো কিছুর উপর ভিত্তি করে দেওয়া সম্ভব নয়। যেমন ধরুন, মানুষের শরীরে কোনভাবেই এই হারিয়ে যাওয়া ক্রোমোজোমটির অস্তিত্ব খুঁজে না পাওয়া যেত তাহলে বিবর্তন তত্ত্বের সঠিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হতেন বিজ্ঞানীমহল।

এছাড়াও মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির জিনোম বিশ্লেষণ থেকে বিজ্ঞানীরা মানুষের মস্তিস্কের অত্যন্ত দ্রুত বিকাশের জন্য দায়ী জিনগুলো, তাদের বিকাশের সময়সীমা, বিভিন্ন ধরনের প্রোটিনের গঠন, বনমানুষদের মধ্যে ঘ্রাণশক্তির লোপ এবং সেই সাথে সাথে শক্তিশালী দৃষ্টিশক্তির বিকাশের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য পেতে শুরু করেছেন। এমআইটি এবং হার্ভার্ড ইউনির্ভারসিটির ব্রড ইনস্টিটিউটের সদস্য বিজ্ঞানী টি মিকেলসনের মতে, আগামী কয়েক বছরে আরও অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং প্রাইমেটের জিনোমের অনুক্রম বের করে ফেলা যাবে, সেখান থেকে খুব সহজেই মানুষের বিবর্তনের জন্য দায়ী বিশেষ ডিএনএর অনুক্রমগুলো বেড়িয়ে পড়বে। মানুষের বিবর্তনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো, যেমন ধরুন, দুই পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে পারা, মস্তিস্কের বিবর্ধন বা জটিল ভাষাগত দক্ষতার মতো বিবর্তনের বিশেষ ধাপগুলোতে কী ধরনের জেনেটিক পরিবর্তন কাজ করেছিল সেগুলো আবিস্কার করতে পারলে হয়তো আমরা মানুষের বিবর্তনের একটা সম্পূর্ণ রূপরেখা তৈরি করতে পারবো[১৪]। আবার অন্য দিকে এই জেনেটিক পরিবর্তনগুলো তাদেরকে টিকে থাকার জন্য কি বিশেষ ধরনের সুবিধা করে দিয়েছিল -এগুলো কি তাদের পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বাড়তি সুবিধা করে দিয়েছিল নাকি দ্রুত চলাচলে বা পারস্পরিক সংযোগ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল, নাকি সামাজিকভাবে দলবদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকার ক্ষমতা যুগিয়েছিল-এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে রয়েছে আমাদের উৎপত্তি এবং বিকাশের দীর্ঘ ইতিহাসের রহস্য। লেখাটি শেষ করা যায় এই বলে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রজাতির জীবসহ দ্বিপদী এই মানব প্রজাতিরও সেই আদি এক কোষী প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়ে এখানে এসে পৌছানোর জন্য কোন পরিকল্পনা বা ডিজাইন বা অতিপ্রাকৃত স্রষ্টার প্রয়োজন হয়নি, কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় উদ্ভব ঘটেছে তাদের। মানুষ যতই সে নিজেকে ঘিরে শ্রেষ্ঠত্বের মায়াজাল তৈরি করুক না কেনো, কিংবা যতই নিজের উদ্ভবকে কোন এক স্বর্গীয় স্পর্শের ফসল ভেবে চোখ বুজে আত্মপ্রসাদ লাভ করুক না কেন, সে আর সব প্রাণীর মত এই প্রকৃতিরই একটি অংশমাত্র।

তথ্যসূত্র :

1. DiChristine M, 2006, Becoming Human, Scientific American Science Magazne:Special Edition, p.1.
2. Calvin W. 2006, The Emergence of Intelligence, Scientific American:Special Edition, pp 85.
3. Gould, S, J: Understanding Evolution, PBS Website : (http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/08/1/l_081_06.html

4. Skybreak, A. 2006, The Science of Evolution and The Myth Of Creationism, Insight Press, Illinois, USA.
5 .আখতারুজ্জামান, ম, ১৯৯৮, বিবর্তনবাদ, বাংলা একাডেমি, পৃষ্ঠা ৩১৯।
6. আখতারুজ্জামন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩২২।
7. Dawkins R, 2004, The Ancestor's Tale, 2004. Houghton Mifflin Company, Boston, New York.
8. The Human Genome Project, http://genome.wellcome.ac.uk/node30075.html
9. New Genome Comparison Finds Chimps, Humans Very Similar At DNA Level, 2005, Science Daily Magazine. http://www.sciencedaily.com/releases/2005/09/050901074102.htm
10. Ibid
11. Ibid
12. Human and Chimp Genomes Reveal New Twist on Origin of Species, 2006, Science Daily Magazine. http://www.sciencedaily.com/releases/2006/05/060518075823.htm

13. Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium ,2005. "Initial sequence of the chimpanzee genome and comparison with the human genome". Nature *437: 69-87*
http://www.genome.gov/Pages/Research/DIR/Chimp_Analysis.pdf, Kenneth R. Miller, professor of biology at Brown University, delivered the keynote address at the University's 242nd Opening Convocation Tuesday, Sept. 6, 2005.
http://www.brown.edu/Administration/News_Bureau/2005-06/05- 013m.html, National Human Genome Reserach Institue4, 2005, 'Scientists Analyze Chromosomes 2',
http://www.genome.gov/1351462
14. New Genome Comparison Finds Chimps, Humans Very Similar At DNA Level,2005, Science Daily Magazine. http://www.sciencedaily.com/releases/2005/09/050901074102.htm
15. বন্যা আহমেদ, বিবর্তনের পথ ধরে, অবসর প্রকাশনা, ২০০৭

বন্যা আহমেদ, পেশায় কম্পিউটার প্রকৌশলী, গবেষক ও লেখক। ইতিহাস, দর্শন, সমকালীন রাজনীতি ও বিজ্ঞানের ইতিহাসে অপরিসীম কৌতুহল। আমেরিকায় বসবাসরত বন্যা আহমেদের বহু লেখা বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় পত্র-পত্রিকায় ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। অবসর প্রকাশনা থেকে বেরুনো বিবর্তনবিদ্যা সংক্রান্ত তার জনপ্রিয় গ্রন্থ - 'বিবর্তনের পথ ধরে' (২০০৭) পাঠকপ্রিয়তায় ধন্য। অনেকদিন ধরেই মুক্তমনার সাথে সংযুক্ত আছেন।

বিবর্তনের দৃষ্টিতে জীবন
অপার্থিব

বিবর্তনের আলোচনা ও বিতর্কের অনেকটাই ব্যয়িত হয় বিবর্তন আদৌ ঘটেছে কিনা তাই নিয়ে। বিবর্তনের পক্ষে যুক্তি ও প্রমাণ দিতে ও সৃষ্টিবাদীদের যুক্তি খন্ডন করতে অনেক সময়ই ব্যয় করেন বিবর্তন এর সমর্থকরা। কিন্তু অনেক বিবর্তন সমর্থকরাও বিবর্তনের প্রকৃত অর্থ ও তার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। এই প্রবন্ধে আমি তার উপরেই আলোকপাত করতে চাই। যদিও বিবর্তন এর ঘটনা এবং এর মূল কারণটি (অর্থাৎ পরিব্যক্তি ও প্রাকৃতিক নির্বাচন, Mutation and Natural Selection) এখন তর্কাতীত, এর খুঁটিনাটি এবং কি উপায়ে এটা ঘটে এর বিশদ ব্যাখ্যা (অর্থাৎ বিবর্তনের তত্ত্ব) নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। অবশ্য সেই তর্ক বিজ্ঞানভিত্তিক ও বিজ্ঞানীদের মধ্যেই সীমিত, কারণ তা বিজ্ঞানেরই একটা গবেষণার বিষয়। এই প্রবন্ধটি বিবর্তন ঘটার মৌলিক সত্যকে মেনে নিয়ে মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে এর গভীর অর্থ ও তাৎপর্য কি তা নিয়েই লেখা।

বিবর্তনের এই মৌলিক সত্যটির প্রকৃত অনুধাবন জীবনের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভংীর উপর প্রভাব ফেলতে বাধ্য। জীবনের অর্থ বা উদ্দেশ্য কি, কেন জীবনটা এমন ইত্যাদি প্রশ্ন ও তার উত্তর নিয়ে নতুন করে ভাবতে শেখায়। বিশেষ করে প্রেম, অনুভূতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সামাজিক আচারসমূহ এবং সামগ্রিকভাবে মানুষের স্বভাব নিয়ে তা আমাদের নতুন ভাবে বিচার করতে শেখাচ্ছে। মনোজীববিজ্ঞানের এক নতুন শাখা বৈবর্তনিক মনোবিজ্ঞান (Evolutionary Psychology) এই বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায়। এই শাখা বির্বতনের মাধ্যমে মানুষের স্বভাব ও আচরণ অর্থাৎ অনুভুতি, আবেগ, কর্মকান্ড ইত্যাদির ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করে।

বিবর্তনের মূল কথা হল মানুষ সহ প্রাণের সকল সমকালীন রূপই এক আদি সরল প্রাণরূপের কোটি কোটি বছরের ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত। এই ক্রমবিবর্তন সম্পূর্ণরূপে এক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। আর এই আদি সরল প্রাণরূপ পৃথিবীর প্রাক্‌জৈবিক আবহাওয়ায় জটিল অণুর রাসায়নিক ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত। জটিল অণুগুলি আবার সরল অণু ও পরমাণু থেকে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী সৃষ্ট। যে যদিও পূর্বে উল্লেখ করেছি যে বিবর্তনের মৌলিক প্রক্রিয়া হল পরিব্যক্তি ও প্রাকৃতিক নির্বাচন, যার আসন্ন উদ্দেশ্য হল প্রাণীর বংশাণুর উদ্বর্তন ও সন্ততি রক্ষা করা, আর বংশাণুর উদ্বর্তন ও সন্ততি রক্ষার ফলশ্রুতি হল মানুষ তথা জীবের সেই সব প্রলক্ষনই এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়- যেগুলি তার নিজের উদ্বর্তনের জন্য সহায়ক। কিন্তু পরিব্যক্তি ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মৌলিক কারণ হল পদার্থবিজ্ঞানের বিধিসমূহ। তাই এটা বলাই ঠিক হবে যে প্রাণ সৃষ্টির তথা বিবর্তনের মূলে রয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের বিধিসমূহ। যুক্তি ও প্রমাণ আমদেরকে এই সত্যটা মেনে নিতে বাধ্য করে। এটা অস্বীকার করার মানে হল জীবজন্তুর (বিশেষ করে মানুষ) পেছনে অদৃশ্য এক জীবনশক্তি বা 'লাইফ ফোর্স' বা 'ভাইটাল ফোর্স'-এর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা। মানুষের ক্ষেত্রে এই প্রাণশক্তিতে বিশ্বাস করবার লোভ সংবরন করা সাধারণ মানুষের জন্যে দুরূহ, কারণ মানুষের মন বা চেতনাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বা বিজ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যা করা বা ব্যাখ্যাকে সহজে গ্রহণ করা তাদের পক্ষে কষ্টকর। তাই অধিকাংশ মানুষই 'আত্মা' নামক এক অদৃশ্য প্রাণশক্তিতে বিশ্বাসী। এতে চট্ করে রহস্যের

সমাধান হয়ে যায় (বা সমাধানের অধ্যাস বা কল্পনাভ্রম সৃষ্টি হয়)। এমনকি মুক্তচিন্তার দাবীদার অনেক বিবর্তন সমর্থকদের কিছু আবেগময় বাক্যেও আত্মায় তাঁদের অবচেতন বিশ্বাসের আভাস পাওয়া যায়, যেমন স্বাধীন ইচ্ছার উপর জোর দেয়া, মানুষ যে যন্ত্র নয় এই কথাটা জোর দিয়ে বলা ইত্যাদি। অনেকে এই যুক্তিও দেন যে নৈতিকতা কখনও বিজ্ঞানের আওতায় পড়েনা বা বিজ্ঞানের দ্বারা নির্ধারণ করা যায়না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই উক্তিটি সত্য হলে জ্ঞানের যে কোন শাখার ক্ষেত্রেও এটা প্রজোয্য। কাজেই এটা কোন আপ্তবাক্য নয়। বরং বিবর্তনের আলোকে এটা বলা যায় যে মানুষ (ও তার মস্তিষ্ক) যেহেতু পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মে সৃষ্ট (বিবর্তনের মাধ্যমে) এবং নৈতিকতা বা মূল্যবোধ যেহেতু মানুষের মস্তিষ্কেই সৃষ্ট ও নিহিত, সেহেতু এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে নৈতিকতা বা মূল্যবোধও (পদার্থ)বিজ্ঞানের নিয়ম দ্বারা সৃষ্ট। একই যুক্তিতে আরও সাধারণভাবে বলা যায় যে মানবজীবনের সব দিকই, যেমন চেতনা, প্রেম, রাগ, ঈষা, র্অনুভুতি, ইত্যাদি সবই পদার্থবিজ্ঞানের আবশ্যকীয় পরিণতি হিসেবে বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট। এটা অস্বীকার করা মানেই অসংজ্ঞিত এক 'আত্মা' বা 'প্রাণশক্তির' ধারণাকে স্বীকৃতি দেয়া। তবে মানব জীবনের এই সব দিকগুলির ব্যাখ্যা করার জন্য সরাসরি পদার্থবিজ্ঞানের সরণাপন্ন হতে হয় না। বৈবর্তনিক মনোবিজ্ঞান বংশাণুর উদ্বর্তনের দ্বারাই মূলত এর ব্যাখ্যা দেয়। জীববিজ্ঞানী উইলিয়াম ক্লার্ক তাঁর "Are we hardwired?" (আমাদের আচরণ কি পূর্বনির্ধারিত?) নামক বইয়ের ১০ পৃঃ লিখেছেনঃ "চূড়ান্ত বিচারে সকল জীবের অস্তিত্বের সকল দিকই নিয়ন্ত্রিত হয় বংশাণুর দ্বারা, মানুষ এর কোন ব্যতিক্রম নয়।"

প্রাণ সৃষ্টির আদিকারণ হিসেবে পদার্থবিজ্ঞানকে সনাক্ত করায় কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন রসায়ন বা জীববিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে কেবল পদার্থবিজ্ঞানকে কেন বেছে নেওয়া? মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী অনেকেও এই মত পোষণ করেন যে জীববিজ্ঞানের ঘটনাগুলো পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের আওতায় পড়ে না। এটা প্রকারান্তরে জীব বা প্রাণের সৃষ্টীকে একটা অতিপ্রাকৃত ঘটনা বলে চালাবারই সামিল। কারণ প্রাকৃতিক ঘটনা বলতে আমরা বুঝি যা কিছুই প্রকৃতির নিয়মে অর্থাৎ পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মে ঘটে। অতিপ্রাকৃত বলতে সেই ঘটনাকেই বোঝান হয় যা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং তা লংঘন করে। পৃথিবীর সবকিছুই, তা জীব বা অজৈব পদার্থই হোক, মৌলিক পদার্থকণার (লেপ্টন বা হাল্কা কণা ও কোয়ার্ক) সমষ্টি। যেহেতু পদার্থের এই মৌলিক উপাদান সমূহ পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে চলে, সেহেতু বলাই বাহুল্য যে জড় ও জীব সব কিছুই, যা কিনা এই মৌলিক কণার দ্বারা গঠিত, তাও পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মেই চলবে। এখন পর্যন্ত জড় ও জীবের মধ্যে এমন কোন ধর্ম বা ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি যা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মকে লংঘন করে। জীবিত বা মৃত কোন প্রাণীর মধ্যেই এই জানা মৌলিক পদার্থকণা ছাড়া অন্য কোন উপাদান পাওয়া যায়নি।

জীবিত ও মৃত প্রাণীর পার্থক্য না বোঝার কারণে সাধারণ মানুষ আত্মার ধারণা উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু পার্থক্যটা মূলত ভৌত, জীবিত প্রাণী তাপগতীয় ভারসাম্যহীন অবস্থায় থাকে, আর মৃত প্রাণী সম্পূর্ণ তাপগতীয় সাম্যাবস্থায় বিরাজ করে। আরও অনেক ভৌত পার্থক্য আছে কিন্তু তা অণুজীববিজ্ঞানের বিষয়।

মানুষ কেবল পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মে সৃষ্ট নয়, এর পেছনে অন্য কোন কারণও আছে, এটা বলার মানে হল ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত সেই পুরান প্রাণশক্তিবাদ (vitalism) কে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস। তবে এটাও বলা হচ্ছে না যে পদার্থবিজ্ঞানের সব কিছুই জানা হয়ে গেছে, অজানা কিছুই নেই। পদার্থবিজ্ঞানের

দিগন্ত ক্রমপ্রসারমাণ। এই লেখায় পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম বলতে আমি জানা এবং অজানা দুটোই বোঝাব। কারণ আজকের অজানা আগামীকালের জানা।

পদার্থবিজ্ঞানকে মূল কারণ বলাতে কেউ কেউ এটাকে আমার ব্যক্তিগত মত হিসেবে নাকচ করতে পারেন। সেই কারণে এবং যেহেতু এই প্রবন্ধের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এই উপলব্ধিটি সেই কারণে আমি এটা নিয়ে আরও কিছু সময় ব্যয় করব কিছু নামকরা বিজ্ঞানীদের উদ্ধৃতি দিয়ে। যারা এটা নাকচ করেন তারা অবশ্যই বিজ্ঞানী নন। বিজ্ঞানীদের উদ্ধৃতি দেয়ার আগে একটা সহজ সত্যের উল্লেখ করা যাক। উঁচুমানের কোন জীববিজ্ঞানের বই খুললেই প্রথমেই পাওয়া যাবে রসায়নের কিছু প্রাথমিক পরিচিতি। আবার রসায়নের বই খুললে প্রথমেই পাওয়া যাবে পদার্থবিজ্ঞানের প্রাথমিক পরিচিতি। এতেই খানিকটা ইংগিত পাওয়া গেল, কোন উৎসে আমাদের পৌঁছুতে হবে। এখন কিছু বিজ্ঞানীদের এ ব্যাপারে কি মত সেটা জানা যাক। কেমব্রিজ বিশবিদ্যালয়ের ট্যানার সিরিজের তিনটি লেকচারে স্টিফেন হকিং শ্রোতাদের এটা স্মরণ করিয়ে দেন যে রসায়ন হল পদার্থবিজ্ঞানের লব্ধ ফল, আর জীববিজ্ঞান হল রসায়নের লব্ধ ফল, আর তাই মানুষের মন বা মস্তিষ্ক পদার্থবিজ্ঞানেরই পরিণতি। (এটার উল্লেখ পাওয়া যাবে "The Large, the Small and the Human Mind" নামক বইটিতে)। নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ওয়াটসন ১৯৮৫ সালে লন্ডনের সমকালীন শিল্পকলা ইনস্টিটিউটে এক বক্তৃতায় বলেন যে 'শেষ বিশ্লেষণে আছে শুধু পরমাণু, আর একটাই বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, অন্য সবকিছুই সামাজিক সৃষ্টি'। আরেক নোবেল বিজ্ঞানী ওয়াইনবার্গ বলেন যে ''বর্তমানে কোন জীববিজ্ঞানী-ই এটা আর মানবেননা যে জীববৈজ্ঞানিক আচরণের আরও মৌলিক স্তরের কোন ভিত্তি নেই। আর এই মৌলিক স্তরটি অবশ্যই পদার্থ এবং রসায়ন বিজ্ঞান । এর সাথে যুক্ত করতে হবে পৃথিবীর কোটি কোটি বছরের ইতিহাসের আপতিক ঘটনাসমূহ।'' এই উক্তিটির উল্লেখ পাওয়া যাবে ওয়াইনবার্গ এর 'Facing Up' নামক বইটির ২২-২৩ পৃষ্ঠায়। প্রখ্যাত বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিনস্ তাঁর ''অন্ধ ঘড়িনির্মাতা (The Biind Watchmaker) বইটিতে পাঠকদের একথাই স্মরণ করিয়ে দেন যে, যদিও বিবর্তনের ব্যাখ্যা পরিব্যক্তি ও প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা সম্ভব, কিন্তু বিবর্তনের একেবারে গোড়ার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ধাপে যেতে হলে আমাদের পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের দ্বারস্থ হতে হবে। আণবিক জীববিজ্ঞানী ফ্র্যাঙ্কলিন হ্যারল্ড তাঁর The Way of the Cell বইয়ের পৃ-৪ এ লিখেছেনঃ ''আমাদের এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ঠ কারণ আছে যে সব জীববৈজ্ঞানিক ঘটনারই, তা সে যত জটিলই হোক না কেন, চুড়ান্ত ভিত্তি হল অণুদের মধ্যকার রাসায়নিক ও ভৌত মিথস্ক্রিয়া।'' একই বইয়ের উপসংহারে তিনি বলেন যে ''এই বই লেখা হয়েছে এই স্বতঃবাক্যকে আশ্রয় করে যে জীবন একটি জড়প্রপঞ্চ যা রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে''। প্রয়াত পদার্থবিজ্ঞানী হাইনয্ পেগেলস্ তাঁর ''যুক্তির স্বপ্ন'' (Dreams of Reason) বইয়ের ৪৯ পৃঃ এ লিখেছেন ''জীববৈজ্ঞানিক তন্ত্রগুলি এক বিশেষ অতিজটিল কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল তন্ত্র যা সুসংজ্ঞিত সূত্র মেনে চলে।'' প্রাণীবিদ্ ও পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞান লেখক কলিন টাজ লন্ডনের ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার ২৫শে জানুয়ারী ১৯৯৮ সংখ্যার এক নিবন্ধে লিখেছিলেন যে ''পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক সূত্র ছাড়া জীববৈজ্ঞানিক সূত্র বলে কিছু নেই।'' মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ফ্রেড অ্যাডাম্স্ তাঁর "আমাদের অস্তিত্বের উৎসঃ কেমন করে মহাবিশ্বে প্রাণের উদ্ভব ঘটল" (Origin of Our Existence: How Life Emerged in our Universe) বইয়ে লিখেছেনঃ

পৃঃ ১৯১:
"সেই একই পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মই প্রাণ বিকাশের প্রথম প্ররোচণার যোগান দেয় যার পরিণতিতে জটিল প্রাণী যেমন মানুষের সৃষ্টি হয়।"

পৃঃ ১৯৩:
"যে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম দিয়ে গ্রহ নক্ষত্রের গতি সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করা যায় সেই একই পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মই সকল জীবিবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকেও নিয়ন্ত্রন করে"

ওই বইয়েরই শেষ প্রচ্ছদে মন্তব্য রেখেছেন বিজ্ঞানী ও নিউ ইয়র্কের হেডেন প্লানেটারিয়ামের পরিচালক নীল ডী গ্রাস এই বলেঃ

"জীববিজ্ঞানের নতুন দিগন্তের কথা আজকাল অহরহ শোনা যাছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মই যে প্রাণের সৃষ্টি ও বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে তা আমাদের মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেয়াকে আমি স্বাগত জানাই।"

পরিশেষে জীবিবিজ্ঞানী আর্নস্ট্ মেয়ার-এর একটা উক্তি দিয়ে এই বিষয়টি শেষ করিঃ

"সব জীববিজ্ঞানীই এ ব্যাপারে অবহিত আছেন যে আণবিক জীববিজ্ঞান নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে - জীবের সকল প্রক্রিয়াই রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব।"
(দ্রঃ The Growth of Biological Thought, 1981)

এটা পরিস্কার বলে দেয়া দরকার প্রাণের সৃষ্টি বা জীবনের সব কিছুই যে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম দ্বারা নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে গেছে তা নয়। কিন্তু সেজন্য প্রাণ সৃষ্টির আদিকারণ যে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম সে ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে বোঝান যাক। মাধ্যাকর্ষণের সূত্রের দ্বারা মহাকাশে পারস্পরিক মাধ্যাকর্ষনে আবদ্ধ দুটো বস্তুর (যেমন একটা তারা ও তার গ্রহ, বা একটা গ্রহ ও তার উপগ্রহ) কক্ষপথ যে উপবৃত্তাকার হবে সেটা আমরা নির্ভুলভাবে সমীকরণ দ্বারা নিরূপণ করতে পারি। কিন্তু দুটোর যায়গায় যদি তিনটি বস্তু পারস্পরিক মাধ্যাকর্ষনে আবদ্ধ হয় তাহলে মাধ্যাকর্ষণের সূত্রের দ্বারা ঐ তিনটি বস্তুর কোনটারই কক্ষপথ নির্ভুলভাবে গাণিতিক সমীকরণ দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এটা মাধ্যাকর্ষণের সূত্রের কোন সীমাবদ্ধতার কারণে নয়, বরং আমাদের গণনার পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার জন্য, যে সীমাবদ্ধতার জন্য কোন অসরলরৈখিক সূত্রের (যেমন মাধ্যাকর্ষণের সূত্র) গাণিতিক কোন সমাধান সম্ভব নয়। তাই বলে আমরা কি এটা বলব যে ঐ তিন গ্রহ-তারা সমষ্টির কক্ষপথের পরিলক্ষিত আকৃতি মাধ্যাকর্ষণের সূত্রের দ্বারা নির্ধারিত নয়?। অন্য কোন অজানা শক্তি বা বলের দ্বারা নির্ধারিত?। অবশ্যই নয়। এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কক্ষপথের পর্যবেক্ষিত আকৃতি মাধ্যাকর্ষণের সূত্রকে আবার লংঘনও করেনা। এর থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে সব ঘটনাই বিজ্ঞানের নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও কোন কোন ঘটনা সরাসরিভাবে এবং পুংখানুপুংখভাবে বিজ্ঞানের নিয়ম দ্বারা আহরণ করা যায়না। এরকম ঘটনার আরও একটি

উদাহরণ হল আবহাওয়া। আর চূড়ান্ত উদাহরণ হল মানুষ। এটা এখন পরিস্কার যে তিনটি খ-বস্তুর পারস্পরিক মাধ্যাকর্ষণ জনিত কক্ষপথই যদি বিজ্ঞানের নিয়ম দ্বারা সূক্ষ্মভাবে নিরূপণ করা যায়না সেখানে কোটি কোটি অণু পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত মানুষকে বিজ্ঞানের নিয়ম দ্বারা পুংখানুপুংখভাবে বর্ণনা করা কি করে সম্ভব?। মানুষের বেলায় ব্যাপারটা আরও জটিল, কারণ শুধু মাধ্যাকর্ষণের সূত্রই নয়, দুর্বল-তড়িৎ ও সবল এই দুই অসরলরৈখিক বলের সূত্রও কাজ করে মানুষের দেহের অণু পরমাণূতে। কিন্তু আবহাওয়ার মতই গড়ভাবে মানুষের স্বভাব আচরণকে ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব যেটা দেয় বৈবর্তনিক মনোবিজ্ঞান। বৈবর্তনিক জীববিজ্ঞান মুলত বংশাণুর উদ্বর্তন ও সন্ততি রক্ষার নীতির উপর নির্ভর করেই এই সবকিছুকে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করে।

আরেকটি ব্যাপার হল, জড় পদার্থ ও জীবের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। আমরা যে পার্থক্যটা দেখতে পাই তা জীবের আভ্যন্তরীণ অসংখ্য অণুপরমাণুর বিন্যাসের পার্থক্যের কারণে, বিজ্ঞানের নিয়মের কোন পার্থক্যের জন্য বা অন্য কোন নিয়মের কারণে নয়। মানুষের অনুভুতি বা মস্তিষ্কের যে কোন কর্মই বস্তুর বিকাশমান ধর্ম বা গুণের দরুন। বিকাশমান ধর্মের মূল কারণ হল বিজ্ঞানের সূত্রগুলির অসরলরৈখিকতা ও মিথস্ক্রিয়াযুক্ত বহু সংখ্যক কণার সমষ্টি। অবশ্য এর সঙ্গে আরও অনেক অনুকুল বাহ্যিক শর্তেরও শুভ সঙ্গম প্রয়োজন। একট সুন্দর তুষারের স্ফটিক আর একটা এবড়ো খেবড়ো পাথরের টুকরো উভয়ই পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মে সৃষ্ট। কিন্তু বিকাশমান ধর্ম ও বাহ্যিক শর্তের পার্থক্যের কারণে একটির মধ্যে আমরা সুন্দর এক প্রতিসাম্য ও কারুকার্য্য দেখতে পাই যা অন্যটায় থাকে অনুপস্থিত। বাহ্যিক শর্ত অল্প সময়ে এক কিস্তিতে পূরণ হতে পারে আবার ছোট ছোট কিস্তিতে অনেক সময়ে বিস্তৃত হতে পারে।

মানুষ সৃষ্টির বাহ্যিক শর্তপূরণ হল বিবর্তনের দ্বারা কোটি কোটি বছরের পুঞ্জীকৃত এক ঘটনা। এখানে ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিকাশমান ধর্ম নতুন এক বিজ্ঞানের শাখা যা জটিলতা বিজ্ঞান (Science of Complexity) নামে পরিচিত তার গবেষণার বিষয়। অতীতে যখন জটিলতার ঘটনা জানা ছিলনা তখন আনেকে লঘূকরণবাদকে (Reductionism) কে সমালোচনা করে সমষ্টিবাদ (Holism) প্রচার করে এই দাবী করতেন যে পুরোটা কখনই তার ক্ষুদ্রতম উপাদানের মাধ্যমে বিজ্ঞানের নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। আধুনিক জটিলতা বিজ্ঞানের আলোকে এই লঘূকরণবাদ বনাম সমষ্টিবাদ বিতর্ক অকেজো ও সেকেলে হয়ে গেছে। বিজ্ঞানে লঘূকরণবাদ বা সমষ্টিবাদ বলে কোন আলাদা ধারণা নেই।

উপরের দীর্ঘ ভূমিকার (যার প্রয়োজন ছিল বলে আমি মনে করি) পর এবার আসা যাক মূল আলোচ্য বিষয়ে, অর্থাৎ, বিবর্তনের তাৎপর্য এবং তা থেকে জীবনের ব্যাপারে কি উপলব্ধিতে আসা যায় সেটা নিয়ে। একটা তাৎখনিক উপলব্ধি হল ‘‘আমরা’’ বা ‘‘আমি’’ এই শব্দগুলি এক অলীক ধারণা মাত্র। এই শব্দগুলির দ্বারা সাধারণভাবে মানুষের দেহের বহির্ভূত কোন নিয়ামক শক্তির অস্তিত্বের ইংগিত করা হয় যার কোন ভিত্তি নেই বলে পূর্বেই যুক্তি দেখিয়েছি। সঠিক ভাবে বলতে হলে ‘‘আমি’’র দ্বারা বোঝানো উচিত ‘‘আমি’’ শব্দটির বক্তার মস্তিষ্ককে (আরও নির্ভুলভাবে বলতে হলে মস্তিষ্কের এক বিশেষ অংশের বর্তনীগুলিকে যাকে স্নায়ুবিজ্ঞানে বলে Synaptic Connections) যা বক্তাকে তার সকল কর্ম, উক্তি, আচরণ ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ/নির্ধারণ করে। প্রত্যেক মানুষের মস্তিষ্ক বা তার Synaptic Connections পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মেই

বিকাশমান ধর্মের মাধ্যমে ও ভিন্ন বাহ্যিক শর্তের কারণে সৃষ্ট। এই বাহ্যিক শর্তগুলি হল সেই বক্তার বংশাণু (Gene) এবং যে বাহ্য পরিবেশে সে বেড়ে উঠতে থাকে, যার সাথে সে সদা মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত । বংশাণু ও পরিবেশ দুটোই মস্তিষ্কের Synaptic Connectionsকে তার এককত্ব আরোপ করে। এক কথায় বলতে হলে একটা মানুষের ব্যক্তিত্ব, তার নিজস্বতা ও বৈশিষ্ট্য, সবই তার মস্তিষ্কের Synaptic Connections-এর জন্য। স্নায়ুবিজ্ঞানী জোসেফ লিডক্স তাঁর The Synaptic Self নামক বইতে এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধটিও লেখকের মস্তিষ্কের Synaptic Connections-এর কারণেই লিখিত হচ্ছে। এটা এক কঠিন সত্য। এর পেছনে কোন দেহ বহির্ভূত প্রাণশক্তি কাজ করছে না। হ্যাঁ এটা সত্য বটে যে মানুষের বংশাণু যে বংশাণবিক সূত্র অনুসরন করে, যা চূড়ান্ত বিচারে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মেরই বহিঃপ্রকাশ । ব্যাপারটিকে অনেকটা ক্যাসেটে বাজা গানের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যেমন একটি গানের কথা বা সুর গানের ক্যাসেট, গায়কের কণ্ঠ বা বাদ্যযন্ত্রের বহির্ভূত এক অস্তিত্বের ধারণা। কিন্ত এই তিনটির কোনটা ছাড়াই গান বা সুরটির সৃষ্টি বা অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়না। তেমনি এটাও বলা যায় যে বংশাণবিক সূত্রও বংশাণু (দেহের অংশ) ছাড়া অস্তিত্বশীল থাকতে পারে না। দেহ বহির্ভূত কোন প্রাণশক্তির কথা বলতেই যদি হয় তাহলে এই বংশাণবিক সূত্রকেই সেই মর্যাদা দেয়া ঠিক হবে।

উপরের আলোচনা থেকে আরেকটা তাৎপর্য বেরিয়ে আসে, সেটা হল যে "স্বাধীন ইচ্ছা"ও একটা অধ্যাস মাত্র। এর কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। কারণ প্রকৃত স্বাধীন ইচ্ছার অর্থ হল মানুষের এমন এক চালনী শক্তি যা দেহের ও পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের বহির্ভূত, এবং তা মানুষকে এমন ভাবেও চালাতে সক্ষম হবে যা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের বিরুদ্ধেও যেতে পারে। পাঠককে এটা "আত্মার" কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না কি? কাজেই পদার্থবিজ্ঞানের পরিণতিতে সৃষ্ট মানুষের প্রকৃত স্বাধীন ইচ্ছা থাকতে পারেনা। মানুষের সব কর্ম ও চিন্তা চুড়ান্ত বিচারে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একটা বাক্য আমরা প্রায়ই শুনতে পাই "আমরা কি করব না করব তা সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আমাদেরই হাতে। আমরা রোবট নই, আমাদের মন আছে, যা আমাদের ভাল মন্দ চিন্তা করার ক্ষমতা দিয়েছে" ইত্যাদি। বাক্যটির অসারতা এখন প্রতীয়মান হবার কথা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে স্বাধীন ইচ্ছা মস্তিষ্ককের বর্তনীতে সৃষ্ট একটি অনুভূতি মাত্র। হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল ওয়েগনার বলেন সচেতন স্বাধীন ইচ্ছায় বিশ্বাস কেবল একটি ভ্রান্তি বা ইল্যুশন এর বাস্তব কোন অস্তিত্ব নেই। তাঁর বই "ীললুসৈিন ঠে ছনৈসচৈিুস ঃলিল" এর মূল আলোচ্য বিষয় এটাই। আরেকজন বিবর্তনী মনোবিজ্ঞানী ভিক্টর জনস্টন তাঁর "Illusion of Conscious Will'" এর ১৮৮পৃষ্ঠায় বলেন যে, স্বাধীন ইচ্ছার সংজ্ঞার অর্থাৎ "যা চাই সেটা করার ক্ষমতা" এর "যা চাই"' অংশটি জীববৈজ্ঞানিকভাবে নির্ধারিত। কাজেই যখন কেউ বলে যে স্বাধীন ইচ্ছার অর্থ আমার যখন ইচ্ছা আমার মন পরিবর্তন করতে পারি, আসলে তার সেই 'ইচ্ছা' টাই "যা চাই" এর মত জীববৈজ্ঞানিকভাবে নির্ধারিত। তাই স্বাধীন ইচ্ছার প্রকৃত কোন অস্তিত্ব নেই। বংশাণু রক্ষা ও প্রসারণের জন্য বিবর্তন যে সকল ধর্ম মস্তিষ্কে সৃষ্টি করে স্বাধীন ইচ্ছার অনুভুতি তার একটি উদাহরণ, যেমনটি ভয়, ঈর্ষা, প্রেম ইত্যাদি। কোন একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার পর মস্তিষ্কে উক্ত সিদ্ধান্তটি স্বাধীন ইচ্ছাজনিত বলে অনুভূত হয় মাত্র, কিন্তু সিদ্ধান্তটির পশ্চাতে রয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের বিধি আর চারিপাশের অসংখ্য নির্ধারক উপাদান ও অতীতের তাবৎ ঘটনাসমূহের প্রভাব। কেউ কেউ কোয়ান্টাম তত্বের কথা বলে স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন। কারণ কোয়ান্টাম তত্বে সম্ভাব্যতা ও বিক্ষিপ্ততার (Randomness) কথা বলা হয়। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্বও পদার্থবিজ্ঞানেরই বিধি

এবং বিক্ষিপ্ততার জন্য কোন কর্ম বা চিন্তা স্বাধীন হয়ে যায়না, কারণ বিক্ষিপ্ততা সত্যিকার অর্থে সব কিছুর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। যদি মানুষের কর্ম তার "নিজের" দ্বারা নির্ধারিত হত তাহলে সেটা কার্য্য-কারণ নিয়মের আওতায় পড়ে যায়, কিন্তু বিক্ষিপ্ততা বা এলোমেলোতার সংজ্ঞাই হল কার্য্য-কারণ বহির্ভুত কোন ঘটনা।

বিবর্তনের আরেকটি তাৎপর্য হল নৈতিকতা বা মূল্যবোধের কোন পরম অর্থ নেই। এটাও বিবর্তনের (পদার্থবিজ্ঞানেরই) নিয়মে মানুষের মস্তিষ্কে সৃষ্ট, মূলত বংশাণু রক্ষণ ও বিস্তারের মৌলিক লক্ষ্যে। আমরা যখন জোর দিয়ে বলি "এটা উচিত, ওটা অনুচিত" ইত্যাদি, সেটা পদার্থবিজ্ঞানই আমাদের বলায় মস্তিষ্কের বর্তনীর মাধ্যমে। ভাল ও মন্দের ধারণা বিবর্তনের একট উৎপাদ। এর উৎপাদনের প্রক্রি-য়া হলঃ পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র-->বিবর্তনের সূত্র-->মস্তিষ্কের বর্তনী-->নৈতিকতা। তবে নৈতিকতা একটা পারিসাংখ্যিক ধারণা। একটা গোটা মানবগোষ্ঠির সকল মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ সমান হবেনা। কিন্তু গড় মূল্যবোধ এমন হতে হবে যা মানুষ প্রজাতিকে রক্ষা ও প্রসারে সহায়তা করবে। যখন এটা বলা হয় যে নৈতিকতা বা মূল্যবোধের কোন পরম অর্থ নেই তখন অনেকে এই বলে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন : "তবে কি আমরা যা খুশি তাই করব? জবাবদিহিত্ব না থাকলে কে আমাদের মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে?" ইত্যাদি। তারা এটা বোঝেন না যে যখন বলা হয় যে নৈতিকতা বা মূল্যবোধের কোন পরম অর্থ নেই, তখন এটাই বোঝান হয় যে নৈতিকতা বা মূল্যবোধ মানুয়ের বহির্ভূত কোন প্রাণশক্তি বা দৈব কোন শক্তির দ্বারা আরোপিত নয়, এটা বিবর্তনের দ্বারা সৃষ্ট, বিবর্তনেরই তাগিদে। কাজেই ধর্মে বিশ্বাস থাকুক না থাকুক, এটা কখনই ঘটবেনা যে সব মানুষই নীতিহীন হয়ে যাবে, কারণ তা বিবর্তনের পরিপন্থী, কারণ তা মানুষ প্রজাতির জন্য আত্মঘাতী হবে। বিবর্তনের নিয়মেই তা নিষিদ্ধ। বিবর্তনের কাজই হল প্রজাতির উদ্বর্তন নিশ্চিত করা। মানুষ তার মস্তিষ্কের দ্বারা নৈতকতা নিয়ে যা বলে (গড় অর্থে)তা বিবর্তনের নিয়ম্রের মুখপাত্র হয়েই বলে। নৈতিকতা যেহেতু বিবর্তনজনিত, সেহেতু কিছু কিছু মৌলিক নীতি ছাড়া স্থান ও কাল ভেদে তারও কিছু হেরফের হতে পারে।

উপরোক্ত মন্তব্য মানুষের অন্যান্য সহজাত প্রবৃত্তি যেমন ভয়, উৎকণ্ঠা, রাগ, ঈর্ষা, প্রেম তথা অনুভুতি বা আবেগের বর্ণালীর সকল অংশের ক্ষেত্রেই প্রজোয্য। কিন্তু যুক্তিবাদী চিন্তা? সেটাও কি বিবর্তনের নিয়মে সৃষ্ট? হ্যাঁ, কিন্তু একটু তফাত আছে। মানুষের (কিছু মানুষের বলা ঠিক হবে) কোন কোন প্রবৃত্তি সরাসরিভাবে বিবর্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৈরী হয়নি। এগুলো অন্য কোন প্রয়োজনীয় (বিবর্তনের অর্থে) প্রবৃত্তির আবশ্যকীয় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা উপজাত হিসাবে উদ্ভূত হয়। এগুলোকে বিবর্তনের স্প্যান্ড্রেল বলা হয়। এগুলি যদিও সরাসরিভাবে বিবর্তনের উদ্দেশ্য সাধন করে না কিন্তু এটা ছাড়া উদ্দেশ্য সাধনকারী প্রবৃত্তিগুলোর সৃষ্টিও সম্ভন নয়। ইমারত নির্মাণের সময় পিলার জোড়া লাগাবার পর কিছু বাড়তি অংশ বা ফাঁকা জায়গা অবধারিতভাবে তৈরী হয়ে যায় যা পিলারের বা দালানের সাম্যের জন্য অত্যাবশ্যকীয় নয় কিন্তু এটা এড়ানও সম্ভব নয়। মানুষ প্রজাতিতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার তাগিদেই বৈবর্তনিকভাবে যুক্তি ও অংকের প্রবৃত্তি সৃষ্ট হয় তার মস্তিষ্কে। বিবর্তনের জন্য যে যুক্তি ও গণিতের প্রয়োজন, আধুনিক মানুষ তার চেয়ে বাড়তি নেক বেশি সৃষ্টি করেছে, স্প্যান্ড্রেল-এর মত অবধারিতভাবেই। যুক্তিবাদ এই উপজাত বা স্প্যান্ড্রেল। যুক্তিবাদ বলতে আমরা বুঝি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যুক্তি ও প্রমাণের প্রাধান্য দেয়া। অনুরূপভাবে সৌন্দর্য্যবোধ ও শিল্পচর্চাও আদিম যুগে বিবর্তন জনিত প্রতিসাম্যবোধ বা প্রতিসাম্যপ্রীতি থেকে উদ্বূত এক স্প্যান্ড্রেল। আদিম

পরিবেশে পৃথিবীর সমতল ভূমিতে কিছু কিছু প্রতিসম জ্যামিতিক আকৃতির প্রতি আকর্ষণ মানুষকে এক উদ্বর্তনী মূল্য প্রদান করেছিল। সৌন্দর্য্যবোধের সৃষ্টির মূলেই ছিল এটি । বিবর্তনের হাওয়া এই স্প্যান্ড্রেলগুলিকেও ছুঁয়ে যায়। তাই সময়ের সাথে এটাও ক্রমশঃ জটিল ও উন্নততর হতে থাকে। তাই আমরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে পাই রবীন্দ্রনাথ বা মোত্জার্ট এর সুকুমার কলা বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্ট্রিংগ তত্ত্বের মত সূক্ষ্ম ও জটিল অভিব্যক্তি। আগেই বলেছি ভয়, উৎকণ্ঠা, রাগ ইত্যাদি বিবর্তনের প্রত্যক্ষ্য কারণে সৃষ্ট। এই প্রবৃত্তিগুলো মস্তিষ্কের এক বিশেষ অংশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর যুক্তিবাদী চিন্তা হয় আর এক অংশের দ্বারা। তাই যুক্তিবাদী চিন্তার সাথে ঐ প্রবৃত্তিলোর কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। একজন যুক্তিবাদী ব্যক্তিরও অন্ধকার রাতে একাকী গোরস্থানে হেঁটে যেতে ভয় করতে পারে। এই ভয় একটা অনুভুতি, কোন যুক্তি দ্বারা আহৃত কোন সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নয়। অনুরূপভাবে একজন নাস্তিকেরও জোরাল নৈতিক মূল্যবোধ থাকতে পারে বিবর্তনজাত সহজাত প্রবৃত্তির জন্য, ঐশিক শাস্তির ভয় বা যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে উপনীত সিদ্ধান্তের জন্য নয়। অনেক আস্তিকের মধ্যেও নৈতিক চেতনা দুর্বল হতে পারে সেই বিবর্তনের পারিসাংখ্যিকতার জন্য, যার ফলে কোন কোন মানুষের মধ্য এ সহজাত প্রবৃত্তির মাত্রা কম হয় গড়ের চেয়ে। এই গড় প্রবৃত্তি বিবর্তনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি সমাজের প্রত্যেকেই ১০০% ভাগ সৎ বা ১০০% অসৎ হয়ে যায় তাহলে তা হবে বৈবর্তনিক অস্থিতিশীলতার এক দশা। তাই এ দশা বেশীক্ষণ টিকতে পারে না। বিবর্তন মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তির এক পারিসাংখ্যিক বন্টন নিশ্চিত করে। এই পারিসাংখ্যিক বন্টনেরও স্থান কাল ভেদে চিছু হেরফের ঘটে। কিন্তু পরিশেষে একটা স্থিতিশীল বন্টনে তা স্থায়িত্ব লাভ করে, অনেকটা পরিসংখ্যানের গড়ে প্রত্যাবর্তনের এর ধারণার মত ব্যাপারটা। ভাল মন্দের এই অপরিহার্যতা পদার্থবিজ্ঞানের বিধির মধ্যেই অন্তর্নিহিত। এটা বিবর্তনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। মন্দের এই অপরিহার্য্যতা আস্তিকেরাও স্বজ্ঞাতভাবে বোঝেন ও মেনে নেন, যৌক্তকভাবে নয়। তাই মন্দকে তাঁরা ইশ্বরের লীলা খেলা হিসেবে ব্যাখ্যা দিয়ে নিজেকে বুঝিয়ে আশ্বস্ত করেন। কেউ কেউ সামাজিক ডারউইনবাদ এর পতনের কৃতিত্ব মানবতাবাদের বিজয়ের ওপর আরোপ করেন। কথাটা উপর-উপর অর্থে ঠিক হলেও, আসলে এই পতনটাও বিবর্তনের কারণেই। কারণ আগেই বলেছি বিবর্তন মানবগোষ্ঠিতে সমসত্বতা অনুমোদন করেনা। সামাজিক ডারউইনবাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধূ উন্নত মানের (বা এক বিশেষ শ্রেণীর) মানুষ নিয়ে এক সমাজ গঠন করা, যা বিবর্তন বিরোধী। কোন বিচ্ছিন্ন স্থানে সীমিত সময়ের জন্য সব প্রকার বিসরণ ও অপেরণই সম্ভব, কিন্তু গড়ে প্রত্যাবর্তনের দরুন তা চিরস্থায়ী, সর্বব্যাপী কোন অবস্থা হতে পারেনা। মন্দ ও ভালো উভয়েরই এক পারিসাংখ্যিক মিশ্রণ বৈবর্তনিক অর্থে অপরিহার্য বলে ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। অনেকে বলবেন তাহলে মন্দহীন এক আদর্শ সমাজের জন্য আবেগপূর্ণ ইছা, চেষ্টা বা সংগ্রাম করা, এ সবই কি নিষ্ফল, অর্থহীন? না, কারণ এই ইচ্ছা বা চেষ্টাও বিবর্তনের সৃষ্ট, কারণ এই ইচ্ছা ও চেষ্টার টানাপোড়েনের দ্বারাই বিবর্তন পারিসাংখ্যিক গড় নিশ্চিত করে। এই ইচ্ছা ও চেষ্টার জন্য নিজেকে বা অপরকে উদ্বুদ্ধ করা এসবই সেই বিবর্তনের কৌশলেরই প্রতিফলন। এ জন্যই ডারউইনবাদীরা, যারা বিবর্তনের এই সত্যকে বোঝেন, তারাও হাত পা গুটিয়ে নেই, তাদের অনেকেও আদর্শের জন্য সংগ্রাম করে যান। এটা তাদের (সবার নয় অবশ্য, সেই পারিসাংখ্যিক কারণেই) ভেতরের তাড়না, কিন্তু এই তাড়নাটা যে বিবর্তনের সৃষ্টি এটা বুঝেও এই তাড়নাকে তারা পরাস্ত করতে পারেন না। বিবর্তনের এক বিচিত্র সত্য।

মানুষের মহান আদর্শ, মনের ভাব ইত্যাদিকে পদার্থবিজ্ঞানেরই ফলশ্রুতি বলায় অনেকে এটা ভাবতে পারেন যে এর দ্বারা মানুষের সুকোমাল দিকের অবমাননা করা হচ্ছে। জীবনকে যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করায় জীবনের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য তাতে ক্ষুন্ন হচ্ছে। এর উত্তরে "সত্যই সুন্দর " এই পুরাতন প্রবচনের দ্বিরুক্তি না করে বলব, যারা বিজ্ঞানের এই ব্যাখ্যার চেষ্টায় লিপ্ত তাদের কেউই কিন্তু এটা মানবেননা। বরং এতে জীবনের এই রহস্যময় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কারণেই জীবন আরও সৌন্দর্যময় মনে হয় বলে তাঁরা মত দেবেন।

সবশেষে বিবর্তনের উপলব্ধির আরেকটি ফলশ্রুতি হল জীবনের পরম কোন অর্থ বা উদ্দেশ্য খোঁজার চেষ্টার নিষ্ফলতা। ধর্মে বিশ্বাসীরা জীবনের পরম উদ্দেশ্য বলবেন সৃষ্টিকর্তার সাথে মিলন ও পরপারের জন্য প্রস্তুতি ইত্যাদি। কেউ এই অর্থ খুঁজে পান পরোপকারের জন্য জীবন উৎসর্গ করে। আবার কেউ জীবনে সর্বোচ্চ আনন্দলাভকেই এর একমাত্র অর্থ মনে করেন। আবার কেউ জ্ঞান অর্জনেই জীবনের সার্থকতা খুজে পান। কিন্তু বিবর্তন বা পদার্থবিজ্ঞানে এই অর্থগুলির কোনটাই নিহিত নেই। বিবর্তন/পদার্থবিজ্ঞানের একটাই উদ্দেশ্য, যদি উদ্দেশ্য বলতেই হয়, সেটা হল বংশাণুকে পরবর্তী প্রজন্মে প্রেরণ করে তার অমরত্ব নিশ্চিত করা। অবশ্য অনেকেই জীবনের উদ্দেশ্য ও অর্থ সন্তানসন্ততিতে খুজে পান বটে। কিন্তু চূড়ান্ত উদ্দেশ্য কেউ বলতে পারেনা। কেন এই নিরন্তর বশাণু সংক্রমণ? কি এর শেষ পরিণতি? পদার্থবিজ্ঞান বা বিবর্তন কেন এই বংশাণু সংরক্ষণের কাজে নিরলস ভাবে নিয়োজিত? যদি বংশাণুর অমরত্ব নিশ্চিত করা ছাড়া আর কোন গূঢ় অর্থ থেকেই থাকে তা আমরা জানিনা। হয়ত পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলিতেই (জানা বা অজানা) এর গূঢ় অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে। কিন্তু কেনই বা পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রের উৎপত্তি, যার দরুন এই গোটা মহাবিশ্ব তথা বিবর্তনের সৃষ্টি? এই অজানা রহস্যটা হয়ত অজানাই থেকে যাবে, কিংবা হয়ত সমাধান আসবে ভবিষ্যতে। কিন্তু এই চিরস্থায়ী অজানাই আজ মানুয়ের এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা, খুঁড়োর কলের সেই সূতায় ঝুলান লোভনীয় খাবারের মত যেনো।

অপার্থিব : মুক্তমনার ফোরামের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অপার্থিব এর সাথে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা হিসেবে ও লেখক হিসেবে। পুরো নাম অপার্থিব জামান, তবে অপার্থিব নামেই লিখে থাকেন। বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য, যুক্তিবাদ অধিবিদ্যা তাঁর প্রিয় বিষয়। পদার্থবিদ্যার এই স্নাতক বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত। ইমেইল : aparthib@yahoo.com

ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কি ফুরিয়ে গেছে?

খান মুহাম্মদ (শিক্ষানবিস)

"ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি, চিকো"-র নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে সম্পাদিত "Magic, Witchcraft and Religion" বইয়ে ধর্ম ও অতিপ্রাকৃতের নৃবিজ্ঞান নিয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে রবার্ট এইচ লোভির (Robert H. Lowie) একটি প্রবন্ধ আছে যার নাম "Religion in Human Life"। এটা পড়ার পরই কিছু লেখার তাড়া অনুভব করলাম। এমন একটা সময়ে প্রবন্ধটি লেখা যখন ধর্মের নৃবিজ্ঞান কেবল প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেছিল এবং যখন সমাজের সাধারণ মানুষের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব এতো বেশি ছিল না। ১৯৬৩ সালকে অনেকটা এরকমই ধরে নেয়া যায়। সমসাময়িক নৃতাত্ত্বিক চিন্তাধারা এবং সময়ের পটভূমিতে লোভির প্রবন্ধটি নিয়ে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তবে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের আগে লোভির জীবন এবং প্রবন্ধটিতে তিনি ঠিক কি কি বলেছেন তা পরিষ্কার করে নিতে চাই।

রবার্ট লোভির জন্ম ১৮৮৩ সালে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে। জন্মের ১০ বছর পর সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সিটিতে চলে আসেন। তবে নিউ ইয়র্কের জার্মান পল্লীতে থাকার কারণে লোভিকে খুব ভিন্ন কোন সমাজের মাঝে পড়তে হয়নি। তার বাল্যকালের প্রতিবেশে ইহুদি চিন্তাধারার পাশাপাশি মুক্তচিন্তারও স্থান ছিল। এই প্রবন্ধেই লোভি বলেছেন, বাবা-মা ছোটকালে তাকে কোন ধমীয় শিক্ষা দেননি। তাই কোন নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি ছোটকাল থেকেই তার আগ্রহ গড়ে উঠেনি। ১৬ বছর বয়সে দর্শন নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন এবং লক্ষ্য করেন আর্নস্ট হেকেল সহ সমসাময়িক দর্শনের মূল ধারার দার্শনিকদের মনোভাব সব ধর্মের প্রতিই বিরূপ। বয়স ২৫ হওয়া পর্যন্ত দার্শনিকদের এই মনোভাব কেবল দেখেই গেছেন। এরই মধ্যে কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা শুরু করেন এবং নৃবিজ্ঞানে আগ্রহী হয়ে উঠেন। নৃবিজ্ঞানকেই ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নেন। বিভিন্ন বর্ণনামূলক গবেষণার মাধ্যমে নৃবিজ্ঞান সমৃদ্ধকরণে বিশেষ অবদান রাখেন।

রবার্ট লোভি ঠিক কি কারণে ধর্মে আগ্রহী হয়ে উঠলেন তা অনুমান করা যায়। খ্রিস্টান মিশনারিদের মানসিক দৃঢ়তা এবং বিশুদ্ধ জীবনযাপনই তাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল। এরপর যখন মাঠ পর্যায়ে গবেষণার জন্য অ্যারিজোনা আর মন্টানায় গেলেন এবং সেখানকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মের বিশাল প্রভাব লক্ষ্য করলেন তখনই বোধহয় আগ্রহটা পাকাপোক্ত হয়ে গেল। সমসাময়িক অনেক নৃবিজ্ঞানীর মত তিনিও মেনে নিলেন, মানুষের বাস্তব জীবনে ধর্মের প্রভাব এতো বেশি যে এ নিয়ে পরিপূর্ণ নৃতাত্ত্বিক গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। লোভি যে কেবল ধর্মের নৃবিজ্ঞান নিয়েই কাজ করেছেন তা নয়। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে গবেষণা করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনে ধর্মের প্রভাব তাকে বরাবরই বিস্মিত করছে। "Religion in Human Life" প্রবন্ধে সে দিকগুলোই ফুটে উঠেছে। প্রথমেই তিনি গবেষণার ধরণ বলে দিয়েছেন, অবশ্যই তা নৃতাত্ত্বিক। নৃতত্ত্বের মূলকথা হল, সবাইকে তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। অন্যদের বুঝতে না পারার মূল কারণ যে পক্ষপাতিত্ব তাকেই সমূলে উৎপাটন করে নৃবিজ্ঞান। লোভি এই কাজ আরও সহজে করতে পেরেছেন। কারণ ছোটবেলা থেকে তার মধ্যে কোন ধর্মীয় সংস্কার গড়ে উঠেনি। এ কারণে তার অসুবিধা না হয়ে বরং আরও সুবিধা

হয়েছে, তিনি সবকিছু নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সমর্থ হয়েছেন। লোভির দৃষ্টিভঙ্গির আরেকটি বড় দিক হল, তিনি স্বয়ং বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীদের পক্ষ নিয়েও কথা বলেননি, বিজ্ঞানী হয়েও বিজ্ঞানকে ধর্মের সমতলে নামিয়ে এনেছেন।

লোভি লক্ষ্য করলেন, আদিম পৃথিবীতে এমন কোন সভ্যতা বা সংস্কৃতি খুঁজে পাওয়া যায় না যাদের কোন ধর্মীয় ধারণা বা বিশ্বাস ছিল না। যেহেতু এটা সর্বব্যাপী ও সুপ্রতিষ্ঠিত সেহেতু এর কোন না কোন গুরুত্ব অবশ্যই থাকবে। এই গুরুত্বের কথা বুঝতে পারলেন আফ্রিকার আদিবাসী গোষ্ঠী থেকে শুরু করে খ্রিস্টান চার্চের ধর্মপ্রচারক সবার মধ্যে একটি সাধারণ চেতনার দিকে লক্ষ্য করে। চেতনাটি হল, "অন্যকে সাহায্য করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং নিজের চেয়ে অনেক বড় কোন সত্ত্বার প্রতি বিশ্বাস থেকে পাওয়া সাহস"। এভাবেই বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে তথ্য জোগাড় শুরু করলেন তিনি। সবকিছু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করলেন। তার কাছে এগুলো ছিল কেবল মানুষের বিশ্বাসের প্রতিফলন যা অবশ্যই বৈজ্ঞানিক গবেষণার দাবী রাখে। এর পাশাপাশি ধর্মবিরুদ্ধতার দিকেও চোখ পড়লো তার। সে সময় ধর্মের প্রতি পণ্ডিতদের তিন ধরণের মনোভাব ছিল। প্রথমত, ধর্ম এক ধরণের কর্তৃপক্ষ যা বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা হরণ করে; দুই, বাধা নিষেধের প্রতীক; তিন, জনগণের আফিম। ভলতেয়ারের বিখ্যাত উক্তি থেকে প্রথম মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়, "প্রথম দুষ্কৃতিকারীটি যখন প্রথম বোকাকে ঠকিয়েছিল তখন থেকেই ধর্মের সূচনা।" আর শেষ মনোভাব যে মার্ক্সবাদ থেকে এসেছে তা না বললেও চলে। মার্ক্সের মতে ধর্ম হল পুঁজিবাদের হাতিয়ার যা দিয়ে তারা শোষণ প্রক্রিয়া চালু রাখে।

স্পষ্টতই বোঝা গেল, ধর্ম বুদ্ধিজীবী মহলে কতটা ভিত্তিহীন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এটাও সত্য যে, সাধারণ মানুষের কাছে তা কখনই গুরুত্ব হারায়নি। এক সময় চার্চের গুরুত্ব মানুষের কাছে কমে গিয়েছিল, কিন্তু ধর্মের শক্তি তখনও পুঞ্জিভূত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেকেই ধর্মকে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন, মুক্তি ও নিরাপত্তার আশায়। এ থেকে বোঝা যায় ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা ভাব মূলত উন্নতি ও প্রতিপত্তি থেকে আসে। মানুষ প্রভাবশালী ও ধনী হয়ে গেলে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা তার কাছে ফুরিয়ে যায়, অন্তত সে তা-ই মনে করে। এই অবজ্ঞা ভাব অনেক বিস্তৃত হয়েছে, যা দুটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়: এক, ধর্মের প্রতি অনেকেই নিবেদিত কিন্তু এদের মধ্যে অধিকাংশই হতদরিদ্র; দুই, অন্যরা অর্থাৎ যারা স্বচ্ছল তারা ক্যাথলিক ধর্মকে পরোক্ষভাবে পালন করে, সন্তানকে ব্যাপ্টাইজ করলেও নিয়মিত ধর্ম পালন তাদের দ্বারা হয়ে উঠে না। প্রোটেস্ট্যান্ট সুইডেন বা ইভানজেলিক্যালদেরও অবস্থাও এমন। এভাবেই আধুনিক সভ্য জগৎ থেকে ধর্ম উধাও হতে বসেছে, আপাত দৃষ্টিতে অন্তত তা-ই মনে হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের মাঝে কাজ করতে গিয়ে লোভি লক্ষ্য করলেন, অ্যামেরিকার আদিবাসী অর্থাৎ ইন্ডিয়ানদের অনেক গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম এখনও বিশাল প্রভাব বিস্তার করে আছে, আদিম মানুষের জীবনে যেমন ছিল অনেকটা তেমনই।

নিউজিল্যান্ডের মাউরি গোষ্ঠীর লোকেরা যে কোন কাজের শুরুতেই ঐশীবাণী পড়ে নেয়, এমনকি একটি নৌকা বানাতে গেলেও বা বানানোর পর তা প্রথমবারের মত পানিতে ভাসাতে গেলেও। উত্তর ব্রাজিলের আপিনাই গোষ্ঠীর লোকেরা প্রতিদিন সূর্যের সম্মানে সমবেত ধর্মীয় সঙ্গীত গায়। এই উদাহরণগুলো লোভি পরোক্ষভাবে দিয়েছেন। নিজের গবেষণা ক্ষেত্র তথা ক্রো ও হোপি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় একাগ্রতা তাকে প্রত্যক্ষভাবেই বিস্মিত করেছে, অবশ্য এই দুই গোষ্ঠীর আচারানুষ্ঠানের মাহাত্ম তার কাছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ঠেকেছে।

হোপিরা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য অনেক সময় ব্যয় করে যা সময়ের অপচয় বলে মনে হতে পারে। হিসাব করে দেখা গেছে বছরের প্রতি তিন দিনে এক দিন তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে ব্যয় করে। কোন আচারানুষ্ঠান এক বার শুরু হলে তিন দিনের আগে থামতেই চায় না। সপ্তাহ বা মাস ব্যাপী অনুষ্ঠানও আছে। তাদের সবগুলো অনুষ্ঠানই বৃষ্টিকেন্দ্রিক। বিষয়টা খুব স্বাভাবিক। চাষের জমিতে সেচ দেয়ার মত কোন প্রযুক্তি না থাকায় কেবল বৃষ্টির উপরই তাদের নির্ভর করতে হয়। এজন্যই বৃষ্টি নিয়ে এতো বন্দনা। তাই হোপিদের উপাসনাকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়া যায় না। সাধারণ একজন ব্যক্তি সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করছে, বিষয়টা এমন নয়। এর সাথে জড়িয়ে আছে তাদের প্রাত্যহিক জীবন।

ক্রো ইন্ডিয়ানরাও ধর্মের প্রতি খুব একনিষ্ঠ। এই দুই গোষ্ঠীই ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান পালনে অনেক সময় ও শ্রম ব্যয় করে, হোপিরা বোধহয় একটু বেশি। কিন্তু এদের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। হোপিদের কাছে উপাসনার ভাবগত দিক খুব একটা প্রাধান্য পায় না। কিন্তু ক্রো-দের বসবাস ভাবের জগতে। ক্রোদের অতিপ্রাকৃতের সাথে মুখোমুখী যোগাযোগ লোভিকে সর্বাধিক বিস্মিত করেছিল। তারা হরহামেশাই এমন যোগাযোগ স্থাপন করে। তাই ক্রো এবং হোপি-দের মধ্যে যে পার্থক্য তাকে একটি প্রতিষ্ঠিত চার্চ ও সাধারণ ইভানজেলিজ্‌মের মধ্যে পার্থক্যের সদৃশ বলে চালিয়ে দেয়া যায়।

আদিবাসীদের এই ধর্ম পালন আমাদেরকে আদিম মানুষের কথাই মনে করিয়ে দেয়। আমরা বুঝতে পারি ধর্ম তাদের জীবনের কতটা অংশ জুড়ে ছিল। এটাই স্বাভাবিক, কারণ যারা ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদের এছাড়া কোন উপায় নেই। ক্রো জনগোষ্ঠীর লোকেরা এটাকে ঐশ্বরিক যোগাযোগের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। লোভি বলেন,

> ক্রোদের জীবনের প্রতিটি কাজ ধর্ম অনুযায়ী সম্পাদিত হয় বললে হয়তো অত্যুক্তি করা হবে, কিন্তু এটা সত্য যে তাদের জীবনের প্রতিটি হতাশা ও কষ্টের সাথে ব্যক্তিগত ঐশ্বরিক যোগাযোগ রূপে ধর্মের উপস্থিতি থাকে।

অর্থাৎ তাদের জীবনের যেখানেই হতাশা ও ব্যর্থতা সেখানেই ধর্ম। এই হতাশা ও ব্যর্থতাকে কিন্তু জীবনের অর্ধেক বলা যায়। তাহলে ধর্মকেও কি অর্ধেক বলতে হবে? না, ধর্ম তাদের জীবনে অর্ধেকেরও বেশি। তারা মনে করে, জীবনের সকল সফলতাই ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আসে। আর কেউ ব্যর্থ হলে ধরে নিতে হবে, তার কোন ঐশ্বরিক দূরদৃষ্টি নেই। এজন্য ব্যর্থ মানুষ মাত্রই সফল কারও কাছ থেকে কোন নিদর্শন নেয়। এই নিদর্শনের মাধ্যমে হয়তো কোন সফলতা আসে তার জীবনে। এভাবেই তার ঐশ্বরিক যোগাযোগের সূচনা ঘটে। ক্রো গোষ্ঠীর বৃদ্ধরা সবকিছু এভাবেই বর্ণনা করল লোভির কাছে। লোভির এক খ্রিস্টান বন্ধু তাকে এ সম্বন্ধে বলেছিল, "বৃদ্ধদের কাছ থেকে যখন এরকম কথা শোন তখন চোখ বন্ধ করে তোমাকে বিশ্বাস করে যেতে হবে।" আসলেই তো, এখানে সবকিছুই বিশ্বাসের। এর বাইরে কিছুই নেই। কিন্তু এভাবে বিশ্বাস করতে বেশ কষ্ট হয়। তাই বিশ্বাসের জন্য কিছু যুক্তি দেয়া ভাল। অতিলৌকিক ঘটনা ঘটা বা তা বর্ণনার সময় এই লোকেরা যে সচেতন ছিল তার পেছনে অন্তত ৪টি যুক্তি আছে।

১। একজন সাদা মানুষের কাছে তারা কেন মিথ্যা বলবে? কারণ তারা তো জানেই, তাদের গল্প যত অবিশ্বাস্য হবে সাদা মানুষেরা তা ততই কম বিশ্বাস করবে।

২। তারা যে ধরণের দৃষ্টি অর্জন করে তা শুধুমাত্র হেঁয়ালির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তারা এরকম ঐশ্বরিক যোগাযোগের জন্য দুর্গম পাহাড়ের উপর চলে যায়। সেখানে চারদিন অবস্থান করে, নিজেকে কষ্ট দেয়। এটা কোন পুরাণ নয়, কারণ লোভি নিজেই এরকম ঘটনা দেখেছেন। নিছক হেঁয়ালির উপর এটা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

৩। যদি ধরেও নেয়া যায় যে, সফলতা অর্জনের আশায় সে নিজেই নিজের মধ্যে একটা স্বপ্ন বা হেঁয়ালির জন্ম দিয়েছে; তারপরও কথা থেকে যায়। কারণ, সেক্ষেত্রে ফিরে আসার পর তার সফলতার সম্ভাবনা থাকতো না, প্রশংসিত হওয়ার বদলে সে নিজের সম্মান হারাতো।

৪। অতিপ্রাকৃতের কাছ থেকে কোন পুরস্কার পেয়ে অনেকেই সফলতা অর্জন করেছে। কিন্তু এর পাশাপাশি তাদের উপর নতুন বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছে। যোগাযোগের সময় ঈশ্বর তাদেরকে একটি নিষেধাজ্ঞা দেন। এটা মেনে না চললে সে আবার ব্যর্থ হবে। লোভি এক বৃদ্ধকে দেখেছেন যে এ কারণে ঐশ্বরিক যোগাযোগের পর দিন থেকে কখনও ঘোড়ায় চরেনি।

সুতরাং এরকম দৃষ্টি অর্জন হেলা করার মত না। এই আচারানুষ্ঠান ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে আর সমাজকে প্রভাবিত করে।

এবার বিশ্বের সাধারণ মানুষদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক যাদের পূর্বপুরুষরা এক সময় এমনই ছিল। এই সমাজেও ব্যক্তিগত চিন্তাধারা সমাজকে প্রভাবিত করে। আর এখানেও ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপাদান হল ধর্মীয় অনুপ্রেরণা। নিরাপত্তা ও নির্বাণের আশায় অধিকাংশ মানুষই ধর্মকে পুষে রাখে। কিন্তু তাদের ধর্মানুভূতির প্রকাশ আদিবাসীদের মত অতো স্পষ্ট হয় না। সে হিসেবে ধর্ম সমাজের অন্যতম ঐক্য আনয়নকারী হিসেবে কাজ করে। অবশ্যই ধর্ম সমাজ একাঙ্গীকরণের একমাত্র চালিকা শক্তি না। সঙ্গীত, শিল্প বা বিজ্ঞানও সে ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু কে পালন করবে তা নির্ভর করে ঐ সমাজের মানুষ কার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে তার উপর। এটা ধ্রুব সত্য যে, বিজ্ঞান, শিল্প বা সঙ্গীতের সাথে মিশে যেতে পারে এমন মানুষ সমাজে বেশি নেই। সমাজের অধিকাংশ মানুষই এখন পর্যন্ত ধর্মের সাথে একাত্মতা পোষণ করতে পারে। এ ধরণের সমাজে একাঙ্গীকরণের দায়িত্ব ধর্ম ছাড়া আর কে-ই বা পালন করবে। লোভি বলেন,

> সাধারণ মানুষের জন্য সমাজ একাঙ্গীকরণের চালিকা শক্তি হিসেবে এখনও ধর্মের বিকল্প নেই। এই ধ্রুব সত্যটি কেবল ধর্মের অস্তিত্বই ঘোষণা করে না, একই সাথে এর সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতাকে ফুটিয়ে তোলে।

এবার দেখা যাক ধর্মকে ঝেড়ে ফেলে সমাজ কতটা একীভূত হয়ে উঠতে পারে। এমন একটা সমাজের কল্পনা করতে হবে যেখানে ধর্মকে বিলুপ্ত করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন নাৎসি জার্মানিই এক্ষেত্রে সর্বোত্তম উদাহরণ। হিটলার খ্রিস্টান হওয়ার কারণে ইহুদি বিদ্বেষী ছিলেন না। কারণ সভ্য খ্রিস্টান কখনও ইহুদি নিধনকে স্বীকৃতি দিতে পারে না। তার এই চেতনার মূলে ছিল যুবক বয়স থেকে তিল তিল করে গড়ে উঠা চেতনা যা তাকে বলেছিল, ইহুদিরাই জার্মানদের সর্বশক্তিমান হয়ে উঠার পথে প্রধান অন্তরায়। আর জার্মানদের সর্বশক্তিমান হতে হবে এবং পুরো বিশ্বের নেতৃত্ব দেবে জার্মানরা এ ধরণের চেতনা হিটলার পেয়েছিলেন ইউজেনিক্স থেকে। তিনি মনে করতেন জার্মানদের চেয়ে সভ্য ও উন্নত আর কেউ নেই। এভাবেই হলোকাস্টের সূচনা। হলোকাস্ট অবশ্যই ধর্মবিরোধী। খ্রিস্টান চার্চ হলোকাস্ট বা হিটলারের কুশাসন মেনে নিতে পারেনি। হিটলার নিজের চিন্তাধারার বিরোধী কোন পক্ষকেই টিকিয়ে রাখতে চাননি যার মধ্যে ধর্মপ্রচারকরাও পড়তেন। সংগঠিত ধর্মকে উপড়ে ফেলে নিজের ইউজেনিক্স কেন্দ্রিক নাৎসিবাদকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তার লক্ষ্য। তিনি "ইয়ুথ গ্রপ" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যরা উদ্দেশ্য ছিল, এমন যুব সমাজ গড়ে তোলা যাদের মধ্যে প্রথাগত ধর্মের প্রতি আনুগত্য থাকবে না। কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নেও এ ধরণের ধর্মহীন শিক্ষা প্রচলিত ছিল। কোন গ্রামের মানুষকে ধর্ম পালন থেকে বিরত রাখার একটি মোক্ষম উপায় হল, সেখান থেকে একটি শিশুকে ছিনিয়ে নেয়া এবং তাদেরকে বলে দেয়া, কেউ যদি ধর্ম পালন করে বা কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে সাহায্য করে তাহলে শিশুটিকে মেরে ফেলা হবে। জার্মানির মত খ্রিস্টান রাষ্ট্রে হিটলার কিভাবে এই নীতি প্রয়োগ করেছিলেন তা বেশ দুর্বোধ্য। এভাবে সমাজ থেকে ধর্ম সরিয়ে নিলে কি হতে পারে তা লোভির ভাষায় বললে দাড়ায়:

> ধর্ম উধাও হওয়ার সাথে সাথে সমাজ থেকে নৈতিক মানদণ্ডও উধাও হয়ে যায়। সেই সমাজে যে কেবল ধর্ম থাকে না তা নয়, কোন সাধারণ বাধা সৃষ্টিকারী নীতিও থাকে না। কোন জাতি ধর্ম বাদ দিয়ে নৈতিকতা ধরে রাখতে পারবে কি-না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

হিটলার কতটা ধর্মবিরোধী ছিলেন তা নিয়ে বিস্তারিত চিন্তা করার অবকাশ আছে। কিন্তু এটা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নির্যাতিত, নিপীড়িত এবং যুদ্ধে বিধ্বস্ত সৈনিকরা ধর্মের দারস্থ হতে বাধ্য হত। জার্মানি-অস্ট্রিয়া-পোল্যান্ড অঞ্চলের খ্রিস্টান চার্চও হিটলারের নীতিকে মেনে নিতে পারেনি। "দ্য সাউন্ড অফ মিউজিক" সিনেমাতে চার্চের মাদার নাৎসি বাহিনীর হাত থেকে "মারিয়া ফন ট্র্যাপ" পরিবারকে পালাতে যেভাবে

সাহায্য করেছিলেন বাস্তবতা তেমনই ছিল কি-না জানি না, তবে সিনেমা তো বাস্তবতারই প্রতিফলন। নাৎসিদের ধর্মনাশ নিয়ে লোভি যা বলেছেন তা বাস্তবতার খুব কাছাকাছি।

রবার্ট লোভি এরপর ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘাত নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। গত ১০০ বছর ধরে এই সংঘাত ক্রমেই জোড়ালো হচ্ছে। তবে লোভি মনে করেন, এই সংঘাত মাত্র কয়েকটি বিষয় নিয়ে, বিজ্ঞানের সামগ্রিক শিক্ষার কথা চিন্তা করলে যা খুবই নগণ্য। তাই "স্বতন্ত্র বলয়" (এ বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় দ্রঃ) মেনে নিলেই বিষয়টা চুকে যায়। স্বতন্ত্র বলয়ে প্রথমে বলা হয়েছে ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে আলোচিত হবে, একে অন্যের পরিমণ্ডলে হস্তক্ষেপ করবে না। পাশাপাশি কে কোন ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করবে তাও বলে দিয়েছিলেন স্বতন্ত্র বলয়ের প্রবক্তা স্টিফেন জে গুল্ড। এই কাজটা না করলে সম্ভবত তিনি আরও কম সমালোচিত হতেন। কেবল স্বতন্ত্র বলয়ের বিষয়টি মেনে নিলেই সব সংঘাত চুকে যায়। আর কে কোন বলয়ে থাকবে তা সমাধান করাও কঠিন নয়। কারণ বলয় ইতোমধ্যে ঠিক হয়েই আছে। তাই বর্তমানে বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের সংঘর্ষ নৈতিকতার মানদণ্ড নিয়ে। তাই সব ঝেড়ে ফেলে এই একটি বিষয় দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। লোভির মতে, বিজ্ঞান কখনই নৈতিকতা ঠিক করে দিতে পারে না। নিজের মত করে কিছু বলার আগে লোভি কি বলেছেন তা-ই বলে নেয়া যাক।

লোভি প্রথমেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অস্থিতিশীলতার কথা বলেছেন। তার মতে বিজ্ঞানের সব তত্ত্বকেই অনুকল্প (হাইপোথিসিস) বলা যায়। কারণ সবগুলোই অপেক্ষাকৃত ভাল কোন অনুকল্প দিয়ে প্রতিস্থাপিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি মানুষের আরেকটি ভুল ধারণার উল্লেখ করেছেন। অনেকেই মনে করে, বিজ্ঞান সমাজ এবং অর্থনীতির ঊর্ধ্বে। কিন্তু লোভি বলেন, বিজ্ঞানীরা কোন আইভরি টাওয়ারে বাস করেন না, তারা এই সমাজেরই মানুষ, এই সমাজের অর্থনীতিই তাদের জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করে। তাই সমাজ ও বিজ্ঞানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক আছে। বিজ্ঞানীদেরও একটা সমাজ আছে যা অনেক সময় অপেক্ষাকৃত ভাল তত্ত্বের স্বীকৃতি দেয় না। যেমন উইলিয়াম হার্ভে যখন রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছিলেন তখন, বিজ্ঞানী মহল তাকে হাতুড়ে ডাক্তার আখ্যা দিয়েছিল। এর পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অনেক সময়ই ভুল ধারণা বিকশিত হয়ে উঠে, তবে অবশ্যই ভুল শোধরানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানই সবচেয়ে এক্সপার্ট। লোভির এই কথাগুলোকে বিজ্ঞানের জন্য খুব কট্টর বলে ধরে না নিলেও চলে। কারণ তিনি এগুলো বলেছেন বিজ্ঞানকে ধর্মের সমতলে নামিয়ে আনার জন্যই। মূল কথা বলেছেন এর ঠিক পরেই।

বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়েই বোধহয় ঠিক কথা বলছে, কিন্তু তারা যে ব্যক্তিদের নিয়ে বলছে বা যে সমস্যার সমাধান করছে সে ব্যক্তি ও সমস্যাগুলোই আসলে ভিন্ন। একটা উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হয়ে যাবে। কারও যদি ডায়াবেটিস থাকে তাহলে ধর্মের দারস্থ হয়ে কোন লাভ নেই। কিন্তু কেউ সাইকোসোমাটিক হলে আবার বিজ্ঞানের কাছে গিয়েও লাভ নেই। সাইকোসোমাটিক বলতে হতাশা থেকে উদ্ভূত একটি সমস্যাকে বোঝায়। লোভি তার এক ভাইয়ের উদাহরণ টেনে বুঝিয়ে দেন, কিভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস তাকে সুস্থ করে তুলেছিল। এ বিষয়ে তার শেষ কথা ছিল:

> সাধারণ মানুষ কেবল এমন একটি সমাধান চায় যা সত্যিকার অর্থেই কাজে দেবে। সেই সমাধান তৈরী করতে গিয়ে গণনায় কি পরিমাণ ভুল হয়েছে বা তা আদৌ কার্যকরী কি-না এ নিয়ে তারা বিন্দুমাত্রও মাথা ঘামায় না।

অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ম এমন একটি কার্যকরী সমাধান দিতে পারে।

এসব কারণেই লোভি স্পষ্ট করে বলে দেন, একজন সাধারণ মানুষ কখনই ধর্মের বদলে বিজ্ঞান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক ডোরিস লেসিং সত্যমুখী দর্শনের জয়গান গেয়েছেন। তার মতে,

> সত্যকে অর্জন না করে আজীবন তার জন্য সংগ্রাম করে যাওয়াই সর্বোত্তম।

কিন্তু লোভি মনে করেন, সাধারণ মানুষের কাছে লেসিংয়ের এই দর্শনের কোন গুরুত্ব নেই। তাই সাধারণ মানুষ সত্যকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়, তার জন্য সংগ্রাম করতে চায় না। সে এ ধরণের সত্যের কাছ থেকে শান্তি, নিরাপত্তা ও আয়েশ চায় যা বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে কখনই আসতে পারে না। কারণ বিজ্ঞান নিজেই প্রচণ্ড গতিশীল, প্রগতিশীল ও বিঘ্ন সৃষ্টিকারী। আর্নস্ট মাখ বিজ্ঞানের এই বৈশিষ্ট্যকে এভাবে তুলে ধরেছেন:

> বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ দর্শন হল বিশ্বের একটি অসম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বহন করে চলা এবং এই বয়ে চলাকে আপাত সম্পূর্ণ কিন্তু অপর্যাপ্ত বিশ্ব দৃষ্টির (ধর্ম) চেয়ে উত্তম বলে আখ্যায়িত করা।

বিজ্ঞানের প্রকৃত দর্শন এটাই। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই বিজ্ঞানী নন। তাই তাদের পক্ষে এই দর্শন মেনে চলা সম্ভব না। তাদের পক্ষে কি সম্ভব তার একটি সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায় গ্যোটের কবিতাতে:

> Wer Wissenschaft und kunst besitzt
> Hat auch Religion;
> Wer jene beiden nicht besitzt,
> Der habe Religion.
>
> যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈসর্গিক উদ্দেশ্যকে তাড়া করার কাজে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়েছে
> তার উৎসাহই তার ধর্ম হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু এই তাড়া করার কাজে জড়াতে না চাইলে
প্রথাগত ধর্মের উপর নির্ভর করে চলাই উত্তম।

এভাবে প্রবন্ধের শেষ প্রান্তে চলে আসেন লোভি। এ পর্যায়ে এসে তিনি নির্দ্বিধায় বলেন, বিজ্ঞান মানুষকে নিরাপত্তা দিতে পারে না। ধর্মের পক্ষেই কেবল চূড়ান্ত নিরাপত্তা দেয়া সম্ভব। সবশেষে বলেন:

যতদিন প্রকৃতির উপর যুক্তিযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ও মানুষের জৈব-মনোবৈজ্ঞানিক চালিকাশক্তির মধ্যে ব্যবধান থাকবে ততদিন বিশ্বাসেরও স্থান থাকবে। এই বিশ্বাস শুধু আয়েশই দেয় না সাথে নিরাপত্তা জোগায়; সম্ভাব্যতার বদলে নিশ্চয়তা প্রদান করে। তাই বলা যায়, ধর্ম ও বিজ্ঞান মানুষের জীবনে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের দুটি কাজ করে এবং এই দুয়ের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটতেই হবে এমন কোন কথা নেই।

এতটুকু জানার পর ধর্ম নিয়ে চূড়ান্ত কোন মন্তব্য করার চেষ্টা করা যেতে পারে। ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কি ফুরিয়ে গেছে?

এই উত্তর দেয়ার আগে জানতে হবে কার বা কিসের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হচ্ছে। যদি কোন মানুষের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয় তাহলে আমি প্রথমত গ্যোটের কবিতার সাথে একমত। অর্থাৎ যারা প্রথাগত ধর্মের বাইরে অন্য কিছুকে (বিজ্ঞান বা শিল্প-সাহিত্য) সমাজে বসবাসের জন্য তার চালিকাশক্তি হিসেবে খুঁজে পেয়েছে তার জন্য সেটাই সর্বোত্তম ধর্ম। কিন্তু যে সেটা খুঁজে পায়নি তার জন্য প্রথাগত ধর্ম মেনে চলাই উত্তম। কিন্তু, এই প্রথাগত ধর্মের কথা বললে তার মধ্যে গোঁড়ামিও এসে যায় যা অন্য ধর্মের সাথে বিরোধের সৃষ্টি করে। এই গোঁড়ামি এড়ানোর জন্য ডোরিস লেসিংয়ের মত আমিও বলব, সত্য বলে কোন কিছুকে ইচ্ছাকৃতভাবে মেনে নেয়ার চেয়ে বরং সত্যের অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া ভাল। কারণ সত্যানুসন্ধানী কোন ব্যক্তির পক্ষে গোঁড়া হওয়া সম্ভব নয়। সে, সমাজে স্থান করে নেয়া এবং শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যই কেবল ধর্ম পালন করবে।

এবার সমাজের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা যায়। রবার্ট লোভি তো বলেই দিয়েছেন, মানুষের জীবনে যেহেতু এখনও ধর্মের স্থান আছে সেহেতু সমাজেও এর প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু সেটা ১৯৬৩ সালের কথা। তখনও বিজ্ঞান এতো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। আর তখন বিজ্ঞান থেকে উদ্ভূত প্রযুক্তির ব্যবহারও ছিল সীমিত। গত ৪০ বছরে সমাজে বিজ্ঞানের প্রভাব ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে আর ধর্মের প্রভাব হ্রাস পেয়েছে। ধর্মের প্রভাব হ্রাসের আরেকটি কারণ শিল্প ও সাহিত্যের প্রভাব বৃদ্ধি। প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণেই শিল্পের এই প্রসার ঘটেছে যার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ চলচ্চিত্র। এই পরিস্থিতিতে কেউ কি বলতে পারে, সমাজ জীবনে ধর্মের কোন প্রয়োজন নেই।

এর উত্তর বিভিন্ন সমাজের জন্য বিভিন্ন রকম। কোন সমাজ ধর্মহীনতার দিকে এগোচ্ছে আর কোনটি এগোচ্ছে না তাও গবেষণার বিষয়। এই গবেষণার জন্য নৃবিজ্ঞানের বিকল্প নেই।

পরিশেষে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার কথা আসে। সেক্যুলারিজ্‌ম তথা ধর্মনিরপেক্ষতা বা ইহজাগতিকতা বিকশিত হওয়ার পর আমরা ধরেই নিতে পারি, রাষ্ট্রে ধর্মের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। সেক্যুলারিজ্‌ম অর্থই হল, রাষ্ট্র ধর্মহীন থাকবে এবং ব্যক্তি বা সমাজ ধার্মিক না ধর্মহীন তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তাই বলা যায়, এই যুগে রাষ্ট্র চালনার একমাত্র সমাধান সেক্যুলারিজ্‌ম।

সেক্যুলারিজ্‌ম মেনে নিয়ে তো ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিরাজমান প্রায় সব সমস্যার সমাধানই করা গেল। কিন্তু বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের সংঘাতের কি হবে? আগেই বলেছি, ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘাত সমাধানের প্রাথমিক উপায় "স্বতন্ত্র বলয়"। কিন্তু এই প্রাথমিক সমাধান বর্তমান যুগের সংশয়বাদী ও নাস্তিকদের মতের বিরুদ্ধে যায়। তাদের মতে, ধর্ম নৈতিকতার মানদণ্ড হতে পারে না। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের একমাত্র সংঘাত হল, বিজ্ঞান ধর্মকে নৈতিকতার মানদণ্ড হতে দেবে কি-না। এরও সমাধান আছে। তা হল নৈতিকতার অন্য কোন মানদণ্ড তৈরী করা এবং তার ভিত্তিতে সমাজকে গড়ে তোলা। সেই প্রক্রিয়া এখন পর্যন্ত ভালভাবে শুরু হয়নি। হলে তা দর্শন দিয়েই হবে। স্পিনোজার নীতিশাস্ত্র হয়তো আবার ফিরে আসবে। কিংবা সেই নীতিশাস্ত্রেরই কোন আধুনিক রূপ ধর্মের স্থান করে নেবে। তখন কি ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে? এটা আমি বলতে পারব না। বরং পাল্টা প্রশ্ন করতে পারব, ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কি ফুরিয়ে যাবার মত? আমরা এক সন্ধিক্ষণে দাড়িয়ে আছি। কারণ আমাদেরকে এমন একটি প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করতে হবে। আমি এখন পর্যন্ত এর জবাব খোঁজার চেষ্টা করিনি। তাই সরাসরি কোন উত্তর দিতে চাই না। অভিজিৎ রায়ের মত বলতে চাই, "Let the data decide"।

* সূত্রঃ Religion in Human Life - Robert H. Lowie; from "Magic Witchcraft and Religion", California State University, Chico.

সম্পাদকের নোট: বইটির সম্পাদক হিসেবে কিছু ব্যক্তিগত মতামত যোগ করা যাক। লেখাটি তথ্য সমৃদ্ধ। আমরা আজকে যে বিজ্ঞানের যুগে প্রবেশ করেছি সেখানে, ধর্ম-এর টিকে থাকার পেছনে 'শোষক শ্রেনীর হাতিয়ার' বা এ ধরণের রাজনৈতিক শ্লোগান না আউরে বরং এতদিন ধরে টিকে থাকার পেছনে কোন নৃতাত্ত্বিক কিংবা জীববৈজ্ঞানিক কারণ আছে কিনা তা খুজে দেখা দরকার। নৃবিজ্ঞানের আলোয় উপরের প্রবন্ধে তো আলোচনা করা হয়েছেই, সেই সাথে সামাজিক জীববিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলো জানাও এ মুহূর্তে জরুরী। বিবর্তনবাদের দৃষ্টিতে দেখলে সেটাই এই মুহূর্তে সর্বোত্তম বৈজ্ঞানিক পন্থা। এমন হতেই পারে 'বিশ্বাস' ব্যাপারটা মানব জাতির বেঁচে থাকার পেছনে হয়তো কোন বাড়তি উপাদান যোগ করেছিল একটা সময়। মানুষ তো আদিমকাল থেকে বহু সংঘাত, মারামারি এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আজ এই পর্যায়ে এসে পৌছেছে। একটা সময় সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করাটা ছিল মানব জাতির টিকে থাকার ক্ষেত্রে অনেক বড় ফ্যাক্টর। যে গোত্রে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিতে পারা গিয়েছিল যে যোদ্ধারা সাহসের সাথে যুদ্ধ করে মারা গেলে পরলোকে গিয়ে পাবে অফুরন্ত সুখ, সাচ্ছন্দ্য, হুর পরী উদ্ভিন্নযৌবনা চিরকুমারী অপ্সরা, (আর বেঁচে থাকলে তো আছেই সাহসী যোদ্ধার বিশাল সম্মান আর পুরস্কার) - তারা হয়ত অনেক সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছে এবং নিজেদের এই যুদ্ধাংদেহী জীন পরবর্তী প্রজন্মে বিস্তৃত করতে সহায়তা করেছে।

নিয়ে রিচার্ড ডকিন্সের একটি ভাল লেখা এ বইয়ে সন্নিবেশিত হয়েছে - 'ধর্মের উপযোগিতা' শিরোনামে। দিগন্ত সরকারও তার একটি লেখায় এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন - ধর্মের উৎস সন্ধানে। 'ধর্মের প্রয়োজনীয়তা কি ফুরিয়ে গেছে?' - লেখাটির পাশাপাশি এ দুটো লেখাও পড়ে দেখা যেতে পারে।

মানব সভ্যতাকে অনেকে শিশুদের মানসজগতের সাথে তুলনা করেন। শিশুদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই একটা সময় পর্যন্ত অভিভাবকদের সমস্ত কথা নির্দ্বিধায় মেনে চলতে হয়। ধরা যাক একটা শিশু চুলায় হাত দিতে গেল, ওমনি তার মা বলে উঠল - *চুলায় হাত দেয় না - ওটা গরম!* শিশুটা সেটা শুনে আর হাত দিল না, বরং সাথে সাথে হাত সরিয়ে নিলো। মার কথা শুনতে হবে - এই বিশ্বাস পরম্পরায় আমরা বহন করি - নইলে যে আমরা টিকে থাকতে পারবো না, পারতাম না। এখন কথা হচ্ছে - সেই ভাল মাই যখন অসংখ্য ভাল উপদেশের পাশাপাশি আবার কিছু মন্দ বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন উপদেশও দেয় - শনিবার ছাগল বলি না দিলে অমঙ্গল হবে, কিংবা রসগোল্লা খেয়ে অংক পরীক্ষা দিতে যেও না - গেলে গোল্লা পাবে জাতীয় - তখন শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না সেই মন্দ বিশ্বাসকে অন্য দশটা বিশ্বাস কিংবা উপদেশ থেকে আলাদা করার। সেই মন্দবিশ্বাসও বংশপরম্পরায় সে বহন করতে থাকে অবলীলায়। সব বিশ্বাস খারাপ নয়, কিন্তু অসংখ্য মন্দ বিশ্বাস হয়ত অনেক সময় জন্ম দেয় 'বিশ্বাসের ভাইরাসের'। এগুলো একটা সময় প্রগতিকে থামাতে চায়, সভ্যতাকে ধ্বংস করে। যেমন, ডাইনী পোড়ানো, সতীদাহ, মুরতাদদের হত্যা এগুলোর কথা বলা যায়। রিচার্ড ডকিন্স, ডেনিয়েল ডেনেট প্রমুখেরা পশ্চিমে এ নিয়ে অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ লিখছেন। অন্যান্য গবেষকদের মধ্যে আমেরিকান বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী জ্যারেড ডায়মন্ড আদিম সমাজে ধর্মকে একধরনের ডিলিনিয়েটর হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে, ধর্ম আদিম সমাজে সম্ভবত এক ধরণের কৌশল যা যোগাযোগ রক্ষা কিংবা পরিচয়ের সূত্র খোঁজার জন্য একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ক্রমে এর সাথে যুক্ত হয়েছে পৌরহিত্য, পরলৌকিকতা এবং আরাধ্য দেবতার সন্তুষ্টি কামনার উদ্দেশ্যে নানা আয়োজন, যা এখনও বিশ্বজুড়ে প্রচলিত ধর্মগুলোর মধ্যে টিকে আছে।

হিটলারকে যেভাবে এ প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে তার সাথে হয়ত অনেক পাঠকই একমত হবেন না। যদি ধরেও নেওয়া যায় লেখকের অনুমান সঠিক, তাহলেও এটি নিঃসন্দেহ যে, যুবক বয়েস থেকে হিটলারের মধ্যে গড়ে ওঠা ইহুদী-বিদ্বেষ কোন অলীক কল্পনাজাত বা নিজ-মস্তিষ্কপ্রসূত কিছু নয়। হিটলারের মধ্যে গড়ে উঠা ইহুদী-বিদ্বেষ নাস্তিক্যবাদের চেয়ে তদানীন্তন 'সভ্য' খ্রীষ্টান সমাজেরই অবদান। হিটলার নিজেই তার বই 'Mein Kampf' য়ে বলেছেন তার ইহুদি নিধনের কিংবা এ ধরনের যাবতীয় কাজকর্মের পেছনে অনুপ্রেবণা ছিল সয়ং ঈশ্বর -

> "Hence today I believe that I am acting in accordance with the will of the Almighty Creator: by defending myself against the Jew, I am fighting for the work of the Lord."

এ ধরণের বিশ্বাসের প্রচার হিটলার তার বিভিন্ন বক্তৃতায়ও করেছেন। হিটলারের একটি বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত করা যাক প্রাসঙ্গিক কিছু লাইন -

> "My feelings as a Christian points me to my Lord and Savior as a fighter. It points me to the man who once in loneliness, surrounded by a few followers, recognized these Jews for what they were and summoned men to fight against them and who, God's truth! was greatest not as a sufferer but as a fighter. In boundless love as a Christian and as a man I read through the passage which tells us how the Lord at last rose in His might and seized the scourge to drive out of the Temple the brood of vipers and adders. How terrific was His fight for the world against the Jewish poison. To-day, after two thousand years, with deepest emotion I recognize more

> profoundly than ever before the fact that it was for this that He had to shed His blood upon the Cross. As a Christian I have no duty to allow myself to be cheated, but I have the duty to be a fighter for truth and justice... And if there is anything which could demonstrate that we are acting rightly it is the distress that daily grows. For as a Christian I have also a duty to my own people.
>
> -Adolf Hitler, in a speech on 12 April 1922 (Norman H. Baynes, ed. *The Speeches of Adolf Hitler*, April 1922-August 1939, Vol. 1 of 2, pp. 19-20, Oxford University Press, 1942)

প্রোটেস্টেন্ট খ্রীষ্টান নেতা মার্টিন লুথারের ইহুদিদের প্রতি বিদ্বেষমূলক গ্রন্থ 'On the Jews and their Lies,'ও যে হিটলারকে দারুনভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল, তাও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। www.nobeliefs.com/hitler.htm - এই সাইটে হিটলারের খ্রীস্টিয় বিশ্বাস এবং অনুপ্রেরণা নিয়ে বেশ কিছু ভাল আলোচনা আছে।

খান মুহাম্মদের প্রবন্ধে 'সাধারণ মানুষের জন্য সমাজ একাঙ্গীকরণের চালিকা শক্তি হিসেবে এখনও ধর্মের বিকল্প নেই' বলে লেখক যে উপসংহার টানার চেষ্টা করেছেন তার সাথেও হয়ত অনেকেই একমত হবেন না না। একাঙ্গীকরণের ব্যাপারটা একই ধর্মের মানুষের জন্য হয়ত কিছুটা সত্যি, কিন্তু আলাদা ধর্মের মানুষের জন্য ততটাই মিথ্যা। পৃথিবীতে ধর্ম সব সময়ই ব্যবহৃত হয়েছে বিভেদের হাতিয়ার হিসেবে। এক ধর্মের অনুসারীদের সাথে অন্য ধর্মের রক্তাক্ত যুদ্ধের ইতিহাস সর্বজনবিদিত। এমনকি একই ধর্মের ভিতরেও ব্রাহ্মণ-শূদ্র আর জাত-পাতের সমস্যা, আশরাফ-আতরাফ, ক্যাথলিক-প্রোটেস্টান্ট কিংবা শিয়া-সুন্নী-কাদিয়ানী বিরোধ লেগেই আছে দিনভর। যতদিন ধর্ম থাকবে ততদিনই কিন্তু মানবতা জিনিসটা আলাদা আলাদা বিভিন্ন গোষ্ঠিতে বিভক্ত আকারেই থাকবে এটা অনেকেই মনে করেন।

'সাইকোসোমাটিক হলে আবার বিজ্ঞানের কাছে গিয়েও লাভ নেই' বলে প্রবন্ধে যে মন্তব্য করা হয়েছে তাও সঠিক নয়। সাইকোসোমাটিক রোগীদের নিয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণার অস্তিত্ব বিদ্যমান। বিজ্ঞান বরং বৈজ্ঞানিকভাবেই সাইকোসোমাটিকিসমের উৎস নির্ণয় করতে সক্ষম। বিজ্ঞানের কাছে এটা মন বা মস্তিষ্কের একটা অবস্থা - তাই হতাশা কাটিয়ে ওঠার জন্য মস্তিষ্ক বা মনোবৈজ্ঞানিকের পরামর্শ নেওয়া অন্যায় নয়।

ধর্ম উধাও হওয়ার সাথে সাথে সমাজ থেকে নৈতিকতার মানদণ্ডও উধাও হয়ে যাবে বলে যে ঢালাও মন্তব্য করা হয়েছে তাও প্রশ্নসাপেক্ষ। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং চীন সহ পৃথিবীতে অনেক জায়গায় ধর্ম এখন ক্রমবিলুপ্তির পথে, সেই সাথে কিন্তু মূল্যবোধ বা নৈতিকতা উধাও হয়ে যায় নি। নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের ব্যাপারগুলো মুলতঃ নির্ভর করে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট এবং সমাজ সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর। এ বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে যেগুলোতে পরিস্কার করা হয়েছে যে, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের ব্যাপারগুলো মোটেই ঈশ্বরপ্রদত্ত নয়, কিংবা ধর্ম থেকে উদ্ভুত নয়, বরং সমাজ বিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবেই এটি মানব সমাজের ভিত্তিমূল হিসেবে গড়ে উঠেছে। নৈতিকতার মোড়কে পোড়া ধর্ম তো মানব সভ্যতার পুরো সময়টা ধরেই ছিল, কিন্তু ইতিহাসের পাতাগুলো অনৈতিক যুদ্ধ, অত্যাচার, বিভৎষতায় ভরা - ধর্ম সেগুলোকে কখনই ঠেকাতে পারেনি, অনেক ক্ষেত্রেই বরং উসকে দিয়েছে।

এ প্রবন্ধে আলোচিত কারণগুলোর বাইরে ধর্মের টিকে থাকার পেছনে অন্যান্য কারণও আছে। রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মকে বিচার না করলে কোন ধর্মের বিশ্লষণই বোধ হয় পূর্ণ হতে পারে না। এ ধরণের বিশ্লেষণ ছাড়া ধর্মকে ব্যখ্যা করতে গেলে সরলীকরণের সম্ভাবনা থেকে যায় অনেকাংশেই। গত দশ হাজার বছরের মানব ইতিহাস এবং বিভিন্ন ধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস পড়লে এটা খুব সহজেই পরিস্কার হয়। মানব সভ্যতার বিভিন্ন ধাপে শুধু যে নতুন নতুন ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে তাইই নয়, ক্রমাগতভাবে তাদের রূপও বদলেছে বিভিন্ন কারণে। এ অসম্পূর্ণতার ব্যাপারটা মেনে নিয়েও বলতে হয় খান মুহাম্মদের প্রবন্ধটি সময়োপযোগী এবং আমাদের জন্য চিন্তাভাবনার যথার্থ খোরাক।

খান মুহাম্মদ, বাংলাদেশের ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি'র শিক্ষার্থী। 'শিক্ষানবিস' নামে ইন্টারনেটে ব্লগ লিখে থাকেন। ইমেইল - hermitage17@yahoo.com

ধর্মীয় চেতনার অস্তিত্ব : সামাজিক পরিচয়ের দৃষ্টিতে!

বিপ্লব পাল

[১]

প্রবাসী এই পিশীমার সাথে দেখা হয় নি অনেকদিন। বহুদিন বাদে দেখা-রাতভোর পুরানো দিনের শ্মৃতির পাটিসাপ্টা ভেজে আড্ডার মৌতাত। ছেলের গার্লফ্রেইন্ডরা বিয়ে করতে নারাজ-চিন্তায় ছিলেন। বংশরক্ষার তাগিদ। যাইহোক এখন মুখে চন্দ্রমুখী হাসি-ভাবী বৌ বিয়ের দিনক্ষন সবে ঠিক হয়েছে।

-বুঝলা বাবা, এমন মাইয়্যাযে ঠাকুর দিলেন ভাবতেই পারি নাই। ডাক্তার হইছে-কিন্তু বাসন্তী পূজা না দিয়া সে জলটাও খাই না। দূগগা দূগগা - -

ভাবী বৌমা আমেরিকায় ডাক্তার। কিন্তু বারোমাসে তেরোপার্বণে কন্যে! চারটিখানি কথা!

তেরোপার্বনে কন্যে কথাটা আমার অতীতের গার্লফ্রেন্ডদের জন্যে ব্যাবহার করতাম। জীবনে যেদুজন পি এইচডি ওয়ালা মেয়ের সাথে প্রেমকরেছি-ওরা ছিল এইরকম। কৃতবিদ্য-হালফ্যাশনে দুরস্ত-কিন্তু ব্যক্তিগত বিশ্বাসে অজপাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়েদের বেঞ্চে। সেখানে উত্তোরন?

নৈবচ!

ইউ টিউব খুলুন-হাজার হাজার ভিডীও- কোন 'বিজ্ঞানী' পরমেশ্বর তথা পরম আল্লায় বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছে! সেটা আপত্তিকর নয়-কিন্তু যখন দেখি এইসব ভিডিও দেখিয়ে ধর্মবিশ্বাসী তথা খোদার খাসিরা নিজেদের ধর্ম কত বৈজ্ঞানিক সেই প্রমাণে নেমেছেন। কোরাণে সবআছে (মানে ইঙ্গিত আছে), ব্যাদে সব আছে (মেঘনাদ সাহার উক্তি ধার করিলাম)। এই সব আছের দল না বোঝে ধর্ম না বিজ্ঞানের দর্শন। ব্যাপারটা এত হাস্যকর। ধর্ম মানে পরমসত্য তথা পরমপিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস। বিজ্ঞানে পরম সত্য বলে কিছু নেই-থাকতে পারে না-

সেটাই বিজ্ঞানের দর্শনের মুল ভিত্তি। বিজ্ঞান এবং ধর্মের অবস্থান একশো আশি ডিগ্রীতে।দর্শনশাস্ত্রের এই প্রাথমিক জ্ঞানটুকু পর্যন্ত এইসব বিজ্ঞানীদের নেই- অথচ কোরান আর বেদে বিগব্যাং, ভ্রুনতত্ত্ব ইত্যাদির এর সন্ধান পেয়েছে বলে এরা ড্যাং ড্যাং করে নাচছে! অধিকাংশ মুসসিম বিজ্ঞানী এবং প্রায় অর্ধেক ভারতীয় বিজ্ঞানীর ধর্মে অগাধ বিশ্বাস।

যদিও আমেরিকার ৯২% বিজ্ঞানী ধর্মে অবিশ্বাসী! আমেরিকান, ভারতীয় আর মুসলিমদের জন্য বিজ্ঞান আর ধর্ম কি আলাদা? কেন আমাদের উপমহাদেশের বিজ্ঞানীদের এই হাল? কেন এদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস প্রবল? আল-কায়দা কিন্তু বেশ উচ্চশিক্ষিতদের সংগঠন।

চাষী-শ্রমিক-খেটে খাওয়া মানুষ মৌলবাদি হয় না-হয় শিক্ষিত মানুষেরা। কেন?

এদিকে আমার বাবা, মা এবং স্ত্রী আমার ধর্মবিশ্বাস নিয়ে মুশকিলে। বেশ কিছুদিন আগের কথা। বাবার এক পুরানো বন্ধু বেড়াতে এসেছেন। নিপাট ভালো মানুষ। বয়সের ভারে ধর্মের পাল্লা ভারী। কথাপ্রসঙ্গে বললেন সংসার করতেছ, এবার ধর্মকম্মে মন দাও বাবাসকল।

আমি খুব হেসে ফেলেছিলাম। প্রায় প্রশ্ন করতে যাব-ছেলে মানুষ করার সাথে ধর্মের আদৌ কোন সম্পর্ক আছে কি না-বাবা বিপদ বুঝে ছেদ টানলেন। আমার স্ত্রী তার পরিবার, সহকর্মী, আত্মীয়স্বজনদের বলতে ভয় পান যে তার বর নাস্তিক। একবার এক খ্রীষ্টান সহকর্মিনীকে বলেছিলেন। উত্তরটা ছিল সহজ-তোমার বরের ওপর নিশ্চয় শয়তান ভর করেছে।

[২]

না- বহুদিন বাদে বাংলায় লিখতে বসেছি বলে আবোল তাবোল বকছি না। ধর্মের আদৌ কোন অস্তিত্বই নেই।যেটা আছে, সেটা হচ্ছে মানুষকে 'পরিচয়' বা আইডেন্টিটি দেবার জন্য একটা সামাজিক ট্রাডিশন। ধর্ম মানুষের মনে একটা কৃত্রিম আইডেন্টিটি ক্রাইসিস তৈরী করে।

মুসলমানরা মনে করে ইসলাম মহান-হিন্দুরা মনে করে তাদের ধর্ম ই সনাতন ধর্ম। কেন করে? ধর্মের ইতিহাস, ধর্মের পাতায় পাতায় অমানবিকতা!বর্বরতা? তাহলে কেন একজন তার হিন্দু বা মুসলিম পরিচয়ে গর্ববোধ করে? কেন ওবামা তার মুসলিম পরিচয় সম্পূর্ন অস্বীকার করতে চান?

বাস্তব সত্য এটাই-পেট চালানোর দায়ে কেও ইসলাম বা হিন্দুত্ব পালন করে না-অনুসরন করে তার জৈবিক ধর্ম। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পরে কেন ক্ষমতা দখলের জন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ দেখি আমরা? তার শিষ্যরা ইসলাম অনুসরণ করলে এমন ত হওয়ার কথা নয়! একজন মুসলমান বাবার সাথে হিন্দু বাবার পার্থক্যটা কি? সবাই চাই নিজেদের ছেলে মেয়েদের প্রতিষ্ঠিত দেখতে! একজন মুসলমান মা কি একজন হিন্দু মায়ের থেকে তার ছেলেকে কম ভালোবাসে? আমাদের ধর্ম একটাই-নিজেদের ছেলেপিলেদের মানুষ করা। পুজো, নামাজ, হজ এসবের সাথে ছেলেপুলে মানুষ করার কি সম্পর্ক?

আপনি বলবেন- তোমার ছেলেটা নৈতিকতা কোথা থেকে পাবে হে? আমার নিজের নৈতিকতা বিজ্ঞানপ্রসূত। অতদূর গিয়ে লাভ নেই-বাঘ,সিংহরা পুজা অর্চনা দেয় না বলেই জানি।

ওদের নৈতিকতা নেই?

দেশভাগের সময় হিন্দু মুসলমানরা যেভাবে একে অপরকে মেরেছে-বা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিসেনারা ইসলামের নামে বর্বরতার যে স্টীমরোলার বাংলাদেশের মানুষের ওপর চালিয়েছে-তা বাঘ বা সিংহ সমাজে কেও দেখেছে? মানুষ যে নিষ্ঠুরতার সাথে অন্য মানুষকে খুন করে, তার তুলনা সিংহজগতে পাবেন আপনি?

ধর্মের মতন নৈতিকতার ও কোন অস্তিত্ব নেই। আমি সততার পথে-কারণ, তা না হলে পেশাদারি জগতে বা সামাজিক জ়গতে আমার গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না। অসাধু ব্যাবসায়ীর কাছে কে যায়? ধরুন স্ত্রীকে ছেরে, অন্য মেয়ের পেছনে মন ছুক ছুক করে। কিন্তু পরকিয়াতে লিপ্ত হলে ফ্যামিলিতো লোপাট।

'আমি' বেঁচে আছি আমার ছেলের মধ্যে। পরকিয়াতে লিপ্ত হলে আমার জেনেটিক উত্তরাধিকারকে বাঁচাবো কিভাবে? নৈতিকতা বিবর্তনের পথে আসা সামাজিক আইন। বেঁচে থাকার জন্য-হ্যাঁ একদম জৈবিকযাপনের জন্য আমরা এগুলো অনুসরন করি। হিন্দুমুসলমানদের সবাই বাঁচার চেস্টা করছে-মোটেও ধর্মপালন করছে না। তা নাহলে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হয় না। ভারত নাকি ধর্মের দেশ-দুর্নীতি আবার এখানেই বেশি! বেঁচে থাকার তাগিদ থেকেই নৈতিকতার জন্ম-ধর্মগ্রন্থ পড়ে কেও নৈতিকতা শেখেও না-অনুসরন ও করে না। যেখানে জ়ীবণধারন কঠিন-কঠোর দারিদ্রে আধপেটা জীবনসংকুলান-সেখানেই নৈতিকতার স্থলন সর্বাধিক। অনেক মুসলিম বলেন কোরান অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে কঠোর।তাতে লাভটা

কি হল? ভারতে বা ইউরোপে, মুসলমানরা সবচেয়ে বেশী অপরাধী।দারিদ্রই এর কারণ। আগের শতকে অন্যতম ঘৃণিত নাম আদিল আমিন।উগান্ডার এই মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান প্রায় দুই মিলিয়ান লোক হত্যা করেছেন- কোরান মুকস্থ বলতে পারতেন। তা কোরাণের নৈতিকতা কি কাজে এল? ধর্মগ্রন্থের বাইরে ধর্মীয় নীতিমালার কোন বাস্তব অস্তিত্বই নেই। মানুষ যে নৈতিকতার অনুসারী তা কিছুটা সমাজ থেকে, পরিবার থেকে-আর অনেকটাই ঠেকে শেখা।

তাহলে ধর্মের রইলোটা কি? শুধু পরিচিতি? আইডেন্টিটি না আইডেন্টিটি ক্রাইসিস? মানুষের সোস্যাল আইডেন্টিটি কেন দরকার হয়? সামাজিক পরিচয় কি সত্যিই জরুরী?

আমার সোস্যাল আইডেন্টিটি কি? বাঙালি, ভারতীয়, হিন্দু, ইঞ্জিনিয়ার, ভারতীয় আমেরিকান, আমেরিকান বাঙ্গালী, বাঙাল, লেখক, সাংবাদিক অনেক কিছুই দেওয়া যায়। এদের সবারই কম্যুনিটি আছে। 'নাস্তিক' পরিচয়টা কিন্তু কোন আইডেন্টিটি দিচ্ছে না-তাই আমার স্ত্রী অন্যদের সামনে আমার নাস্তিক পরিচয় নিয়ে ইতস্থত বোধ করছেন। নাস্তিকদের একটা সমাজ, স্যোসাল সাপোর্ট সিস্টেম থাকলে এই গেরো হয় না। আমেরিকান বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই সমস্যা কম-কারন আমেরিকায় খুব সহজেই সমাজবিচ্ছিন্ন ভাবে বাঁচা যায়। ভারতীয় এবং মুসলমান বিজ্ঞানীদের সমস্যা হচ্ছে তাদের ধর্মীয় সমাজে থাকতে হয়। এদের নাস্তিক হিসাবে বাঁচা খুব মুশকিল।

এখানে সোস্যাল ইউটিলিটির একটা তত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানীরা আওড়াচ্ছেন। যে লোকটা নিজের মুসলমান পরিচয়ে গর্বিত-সে মোটেও আবেগে এমন করে না। কারন সেই গর্বিত মুসলমানটিই ক্রিস্টিয়ান নাম ধারন করে ইসলামের শত্রু আমেরিকায় চাকরী খোঁজে। সে যুক্তিবাদি। ইসলাম তাকে কিছু দিচ্ছে বলেই, সে মুসলমান হিসাবে গর্বিত। বাপ-ঠাকুর্দা শিখিয়েছে বলে সে গর্বিত এমন ভাবলে অতিসরলীকরন হবে। যে অতিউচ্চশিক্ষিত মেয়েটি বাসন্তীপূজা করে(পাঠক মাপ করবেন-আমার চারপাশের উচ্চশিক্ষিত মহিলারা সবাই এই গোত্রের-ব্যাতিক্রম দুর্লভ) জলপান করে-সমাজবিজ্ঞানের দৃস্টিতে সেও কিছু বস্তুবাদি লাভের আশায় এটা করছে।

কি সেই বস্তুবাদি লাভ?

আসলেই আমাদের জীবনটা সম্পূর্ন বাজার অর্থনীতির ক্রেতা বিক্রেতার সম্পর্ক। কিছু কেনাকাটা প্রকাশ্যে-টাকার বিনিময়ে-কিছু বেচাকেনা হয় অদৃশ্যে। অধচেতন মনে। সামাজিক জীবনযাপনের জন্য একজন বিক্রেতাকে, ক্রেতার কাছে গ্রহনযোগ্য হতে হবে। কেও মুসলমান

সমাজে বড় হয়ে চাইবে না-ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে তার বাবা-মা-স্ত্রী-আত্মীয়স্বজন-পাড়া প্রতিবেশী সবার বিরাগভাজন হতে। কথাটা হিন্দুদের ক্ষেত্রেও সত্যি। যতই উচ্চশিক্ষিত হৌক না কেন একজন ব্রতচারিণী চন্ডীস্বাদ্ধী মেয়ে, নাস্তিক মেয়ে অপেক্ষা পূত্রবধূ হিসাবে শতগুন গ্রহনযোগ্য বৃহত্তর সমাজের কাছে। ভাবী পূত্রবধু নাস্তিক শুনলে অনেক বাবা মা উলটে পড়বে। আর আমাদের অস্তিত্বের মূলেই আছে যৌণতা। "বধূ" হিসাবে নিজেদের গ্রহনযোগ্যতা বাড়াতেই এত ব্রতপালনের ধূম। আমরা সামাজিক পন্য-নিজেদের ধার্মিক হিসাবে 'জাহির' করলে কম্যুনিটির কাছে দাম বাড়ছে।

[৩]

সামাজিক পরিচয় তত্ত্বের হোতা হেনরি তাজফেল এবং জন টার্নার (১৯৭৯)। মানুষ কেন সাম্প্রদায়িক-তার ওপর গবেষনা করে এরা সিদ্ধান্তে এসেছিলেনঃ

-আমরা আত্মসন্মান অর্জনের জন্য নিজেদের একজন কম্যুনিটি ক্লাবমেম্বার ভাবতে ভালোবাসি। কম্যুনিটি হিন্দু, মুসলমান, ফুটবল ক্লাব, বাঙ্গালি, বাংলাদেশী, ভারতীয়-যা খুশি হতে পারে।

-আত্মসন্মান অর্জনের সহজপন্থা হচ্ছে-নিজেদের গ্রুপকে অন্যদের চেয়ে ভাল ভাবা। এবং সেই চিন্তাকে যুক্তিসম্মত করার সব সময় চেস্টা করা হয়। প্রতিটি হিন্দু বা মুসলমান সব সময় ভেবে যাচ্ছে তাদের ধর্ম এবং তাদের ধর্মের মানুষরা-অন্য ধর্ম এবং ধার্মিকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। মুসলিমরা মনে করে কোরাণ বিশুদ্ধ-বাইবেলে জল ঢুকেছে। আবার খ্রীষ্টানরা ভাবে আল্লা ধাপ্পাবাজি।

-অনেকে আবার বলার চেষ্টা করে হিন্দু বা ইসলামের মতন ধর্ম ইহজগতে নাই-এরা এক্সক্লুসিভ ক্লাবের মেম্বার হতে চাই। ইসলাম যা আছে তা অন্যধর্মে নাই-বা ইসলাম ই একমাত্র ১০০% আল্লাপ্রেরিত-বা বৈদিক সমাজ হচ্ছে আদর্শতম সমাজ-এমন শুনতে শুনতে কান পচে যাচ্ছে-বলার কিছু নেই। সবটাই নিজের আত্মসন্মান বাড়ানোর ভ্রান্ত প্রচেষ্টা। ধর্মের আদৌকোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই-সবটাই ধার্মিকের মনে আইডেন্টিটি ক্রাইসিস।

এটা সহজাত প্রবৃত্তি। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে নিজেদের আত্মসন্মান বাড়ানোর মিথ্যে

চেষ্টা। তবে আত্মসন্মান বাড়ানো বেঁচে থাকার জন্য জরুরী। সততা, দানধ্যানের মাধ্যমে আত্মসন্মান বাড়ানো নিশ্চয় সাধু প্রচেষ্টা। কিন্তু ধর্মের পাংচারড় টায়ারে পাম্প দিয়ে আত্মসন্মান বাড়ে না-বরং এইসব লোকেদের বুদ্ধি নিয়ে সংশয় জাগে।

[৪]

আমাদের একটা ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। যেমন ধরুন আমি অমুকের ছেলে বা বাবা। বা আমি পেশাদার প্রযুক্তিবিদ। আবার সামাজিক পরিচয় আছে-বাঙ্গালী, ভারতীয় ইত্যাদি। অন্যের সাথে আলাপচারিতায়, আমি আমার কোন পরিচয় তুলে আনবো-তা স্থান কাল, পাত্র নির্ভরশীল। চেন এবং লি (২০০৭) বলছেন-এই যে সিদ্ধান্তটা আমরা নিচ্ছি-অর্থাৎ আমি আমার হিন্দু বা মুসলিম পরিচয়টা কাজে লাগাবো কি না--তা পুরোটাই ব্যাবসায়িক এবং বাজার অর্থনীতি। অর্থাৎ যেখানে ভারতীয় বললে কাজ চলবে,সেখানে আমি ভারতীয়-যেখানে বাঙ্গালী বললে লাভ-সেখানে বাঙ্গালী। একজন বাংলাদেশী মুসলিমও তাসটা এই ভাবেই খেলেন-

যেখানে বাঙ্গালী পরিচয়ে লাভ বেশী সেখানে তিনি বাঙ্গালী-যেখানে মুসলিম পরিচয়ে লাভ বেশি সেখানে তিনি মুসলিম।

অনেক বাঙ্গালি মনে মনে জামাতি বা হিন্দুত্ববাদি। কিন্তু আলাপচারিতায় তা বলে না। কেন? সেই পরিচয়ের সংকট। উদার মন এবং মনন বাঙ্গালীর দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য। তারও একটা বাজারদর আছে। আমরা উদার এটা দেখাতে পারলে, আমাদের গ্রহনযোগ্যতা বাঙ্গালী সমাজে বাড়ে। গুজরাটে এটা হয় না। ওখানে আবার উগ্রহিন্দুত্বদের গ্রহনযোগ্যতা বেশী।

সৌদি আরবে আবার যেমন ধর্মীয় উদারতা ব্যাপারটার অস্তিত্বই নেই। এই আমেরিতাতেই দেখছি আমাদের বাঙ্গালী মেয়েরা খালি পিঠে নাইট ক্লাবে নাচছে -আবার সকালে বাসন্তীপুজ়াও চলছে-সবটাই সেই জৈবিক কারণে গ্রহনযোগত্যতার বাজার অর্থনীতি।হায়দ্রাবাদে বারে গিয়ে আমি দেখেছি অনেক মেয়ে বোরখা পড়ে ড্রিংক্স করতে এসেছে! বাইরে সে গ্রহনযোগ্যতার জন্যে মুসলিম পরিচয়টা রাখছে-ভেতরে সে রক্তমাংসের নারী।

[৫]

তাহলে মৌলবাদ আসছে কোথা থেকে?

এবার আমরা দেখি-কিভাবে আমাদের আচরন সামাজিক এই পরিচয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আইডেন্টিটি ক্রাইসিস থেকে বিজ্ঞানীরা (কোট এবং লেভিন) পাঁচ ধরনের ব্যাক্তিগত চরিত্র খুঁজে পেয়েছেন।

(১) সব কিছুতেই না! অনেকটা বাচ্চাদের মতন। আমি গরুর মাংস খাবো না-শুয়োরের মাংস খাবো না-এই করব না-ওই করবো না- শনিবারে নিরামিষ খাবো! তসলিমাকে মেরে ফেলব কারণ ধর্ম বলেছে! এই সব 'না' এর ভিত্তিতে, নিজের পরিচয় জাহির করা। এরা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা- সম্পূর্ন ভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল-এরাই মৌলবাদের বোরে-ফুটসোলজার। রাজনীতিতে এরা খুব মুল্যবান-কারন যেহেতু এরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নিতে পারে না- কোন ধর্মীয় গুরু বা অভিভাবক এদের হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। মৌলবাদি রাজনীতিতে তাই ধর্মগুরুদের অসাধারণ কদর । বিজেপি, বিএন পি, রিপাবলিকান পার্টী-সবাই এই খেলাটাই খেলে।

(২) ককটেল- স্থান কাল পাত্র ভেদে বদলায়! অনেকটা কচুরীপানার মতন। রাতে পিঠ খুলে আধুনিকা-সকালে পূজারীনি। রাতে হ্যাঁ-সকালে না। এরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে-আবার ড্রিকংস ও চলবে! একই সাথে আধুনিক/আধুনিকা এবং রক্ষনশীল হওয়ার চেষ্টা-কারন তাতে স্যোসাল ইউটিলিটি ভ্যালু বাড়ছে। ককটেল গ্রুপ। এরাই সংখ্যাগুরু।

(৩) অনুসন্ধানী-এরা অসন্তুষ্টিতে ভোগেন। যেমন নিরোদ সি চৌধুরী। নিজের সমাজের ত্রুটিটাই এদের সবথেকে বেশী চোখে পড়ে। যেসব মুসলমানরা ইসলামের কঠোর সমালোচনা করছেন তারাও এই প্রকৃতির। এদের সমস্যা হচ্ছে এরা সমালোচনা যতটা করেন-সমাধান সেই অনুপাতে বাতলান না। অসন্তুষ্টি ই এদের চালিকা শক্তি। তবে সামাজিক বিবর্তন এদের হাতধরেই আসে। এরাই পরিবর্তনের প্রতিভূ।

(৪)অভিভাবক- এরা ফাদার বা মাদার ফিগার টাইপের রোলপ্লে করতে চান। ইনারা সাধারনত চরিত্রবান হন-সমাজের অনেক উপকারও এরা করেন-স্বীকৃতির ও মোহ থাকে। আমরা তাদের দাদা বা ভাই বলি-কি হাঁসপাতালে বা ফাংশানে ওমুক ভাই বা তমুক দাদাই ভরসা। সমস্যাটা

হচ্ছে এরাও পরিবর্তনকে ভয় পান-যা চলছে তার মধ্যেই নিজেকে মহান করার প্রবণতা থাকে।

(৫)আত্মকেন্দ্রিক- এরা নিজেদের নিয়ে ভাবেন বেশী। সবসময় আত্মোন্নতির পথ খুঁজছেন। ক্যারিয়ারিস্ট। যে সমাজ তাকে আত্মউন্নতির পথ দেখাবে, তিনি সেই সমাজে থাকবেন। কর্পরেট ম্যানেজমেন্ট, সফল ব্যাবসায়িরা এই শ্রেণীর। এরা সুযোগ সন্ধানী -তাই পেটে টান না পড়লে প্রতিবাদ করেন না।

[৬]

এবার বোঝার চেষ্টা করা যাক কিভাবে মৌলবাদিরা ক্ষমতায় আসছে গণতন্ত্রের পথ ধরে। কোন সন্দেহ নেই ককটেল গ্রুপই বৃহত্তম-যেকোন গণতন্ত্রে। এরা মৌলবাদি নন। কিন্তু মৌলবাদকে প্রতিহত করার ক্ষমতাও এদের নেই। মৌলবাদিরা তলোয়ার নিয়ে নেমে গেলে এরা জ়ীহুজুর বনে যান। কচুরীপানার গতি শ্রোতের দিকে।যেকারনে প্রথম আলোর সম্পাদক মৌলবাদিদের পায়ে লুটিয়ে ক্ষমা চান। কারন তিনিও ককটেল শ্রেণীর। ফলে গণতন্ত্রের এই বৃহত্তম গ্রুপটি একই সাথে মৌলবাদি এবং বাজারের চাহিদার হাতে জিম্মি। বাকিরা মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘু। ধনতন্ত্রে অবশ্য আত্মকেন্দ্রিক লোকের সংখ্যা বেশী।সমাজতন্ত্রে অবিভাবকের সংখ্যা বেশী।

তবে ধনতন্ত্র একটা ব্যাপারে খুব সক্রিয়। মানুষের এই পরিচয়কে ধ্বংশ করার ব্যাপারে-যেটা খুব গুরুত্বপূর্ন।
ধনতন্ত্রে পরিচয়টা নেমে আসে ক্রেতা বিক্রেতায়-বাকি হিন্দু, মুসলমান, ভারতীয়, বাংলাদেশী সব ফালতু। আমেরিকায় বাংলাদেশী দোকানে ভারতীয় বাঙ্গালী হিন্দুদের বিশেষ খাতির-কেন?

কারন ক্রেতা হিসাবে তারা অনেকবেশী টাকার বাজার করে। ক্রেতার পরিচয়েই খাতির। যে ভাল কাজ করে, সেই একমাত্র দাম পায় আমেরিকায়।যে গরু যত দুধ দেয়-তার তত বেশী কদর। গরুর সামাজিক, পারিবারিক পরিচয়ে কি যায় আসে? ধণতন্ত্রে গরুর পরিচিতি তার দুধে। এইভাবেই পরিচয়বোধ আস্তে আস্তে লুপ্ত হচ্ছে আমেরিকায়। পথ অনেক দূর-তবে ব্যারাক ওবামার উত্থান অন্তত তাই বলে।

মুসলিম দেশগুলি এখনো সামন্ততান্ত্রিক-আরবদেশ গুলিতে অমুসলিমদের কোন নাগরকিত্ব ই নেই। ওখানে বেকারত্ব বাড়ছে-দেশের নেতারা দেখাচ্ছে আমেরিকা দায়ী। আমেরিকান নেতারাও এমনটাই চাইছে-তবেই না অস্ত্রবেচার সুবিধে!

অর্থাৎ রাজনীতিই চাইছে এই মৌলবাদি 'না' গোষ্টিকে টিকিয়ে রাখতে। ককটেল গোষ্টির ওপর ভরসা রাখা মুশকিল। মসনদ টেকে না। তাই চাই মৌলবাদি জনগন-যাতে রাজনীতির ব্যাবসাটা করা যায় আরামে। পায়ের ওপর পা তুলে। এতেব আমাদের সংস্কৃতির ওপর পাশ্চাত্যের আক্রমণ, ইরাকে আমেরিকার আক্রমন, ইত্যাদির ধুয়ো তুলে-ওদের ইসলামিক পরিচয়বোধ জাগ্রত করাও। ওদের মেয়েরা বেশ্যা-আমাদের মেয়েরা সতিসাবিত্রী বলে ঘৃণার চাকায় পাম্প দাও। রাষ্ট্র তাতে তাল মেলায়-এই ভাবেই গাঢ় হয় নিজেদের হিন্দুত্ব বা ইসলামের পরিচয়। কেও কি জানতে চাই-একজন হিন্দু বা মসুলিম মায়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? কেও চাই না।

সবাই চাই ধার্মিক নারী- ও মেয়েটা নাস্তিক? মানে অনেক পুরুষের সাথে শুতে চাই! ফলে পুরুষের স্যোস্যাল ইউটিলিটির ফাঁদে পড়ে মেয়েদের মাথায় ওঠে হিজাব-সিন্নি চড়ানোর ধুম।

রাষ্ট্র আর সমাজের পৃষ্টপোষকতায়, এই ভাবেই মৌলবাদের পালকি চলে। নিজেদের শবে কাঁধ দেয় মৌলবাদের ফেরিওয়ালা ধার্মিক উচ্চশিক্ষিত নারীবাহিনী। পুরুষ ধর্মে খুশী-কারণ নারীগর্ভের ওপর তার অধিকার নিশ্চিত করে 'ধর্ম'। নিজেদের জেনেটিক উত্তরাধিকার টেকানোর জন্য গৃহপালিত স্বামীরাও ঢেঁকুর তোলে-এই বেশ ভালো আছি! তারপর একদিন রাষ্ট্রযন্ত্র চলে যায় মৌলবাদিদের হাতে। দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। খাদ্যাভাব, শিক্ষাভাবে সন্তান প্রতিপালন হয় অসম্ভব। এটাই হয়েছে ইরাণে-ওখানে এখন ২২% বেকার। আর আহমেদঞ্জি আশকারা দিচ্ছেন আরো সন্তানের জন্ম দাও। তেহেরাণেও এখন তীব্রখাদ্যাভাব-কারণ খেমেইনির আমলে মৌলবাদীদের চাপে পড়ে ইরানে জনসংখ্যা বেড়েছে ৬% হারে! ৮০% খাদ্য আমদানী করতে হয়। এত তৈল সম্পদ, এত মেধা সম্পদ-অথচ দেশটা পড়ে আছে বেকারত্বের অন্ধকারে।

গত তিন দশকে খ্যাদ্যের প্রাচুর্য্যই মানুষকে ধর্মমুখী করেছে। পেটে আগুন জ্বললে কেও পরিচয়ের সংকটে ভোগে না-জৈবিকধর্মটা হারে হারে টের পায়। হিন্দু, ইসলাম ইত্যাদি পোষাকি ধর্ম তখন বিলাসিতা। পঞ্চাশের দশক থেকে সত্তরের দশকে বামপন্থার রমরমা উত্থানের পেছনে ছিল ক্ষুদা। বিশ্বব্যাপী সেই ক্ষিদে আবার প্রবলভাবে ফিরে আসছে-কায়রো, নাইজেরিয়া, ঢাকায় এখন খ্যাদ্যাভাব। খাবার পাওয়া গেলেও দাম অত্যাধিক বেশী। তেলের দামে, খাবারে দামে জীবণধারণ এখন আবার কঠিন হচ্ছে। আরো হবে। ২০১০ সালের মধ্যে খাবারের দাম বাড়বে

প্রায় চারগুন (২০০৫ সাল বেসিক)-তেল আর সারের বিল মেটাতে। আগামী দিনে বিজ্ঞানসম্মতভাবে রাষ্ট্রকে না চালালে, রাষ্ট্রবিপ্লব আসন্ন।

দেখা যাক। পেটের ক্ষিদে মানুষকে মৌলবাদ থেকে তার নিজস্ব জৈবিক ধর্মে ফিরিয়ে দেয় কি না। আমি আশাবাদি। সংকটই সমাধানের প্রথম পথ।

ড. বিপ্লব পাল, আমেরিকাতে বসবাসরত পদার্থবিদ, গবেষক এবং লেখক। এক সময় ভিন্নমতের মডারেটর ছিলেন, বর্তমানে www.fosaac.tv সম্পাদনার সাথে জড়িত।

সপ্তম অধ্যায় : অলৌকিকতার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ৬০৩ *[ক্লিক করুন]*

- পার্থিব জগতের অপার্থিবতা বিশ্লেষণ : *অনন্ত বিজয় ৬০৪ [ক্লিক করুন]*
- আত্মা বলে সত্যই কি কিছু আছে? : *অভিজিৎ রায় ৬৩২ [ক্লিক করুন]*
- প্রার্থনা কি কোন কাজে আসে? *ফরিদ আহমেদ ৬৬২ [ক্লিক করুন]*
- মহাপ্লাবনের বাস্তবতা : *অনন্ত বিজয় ৬৭২ [ক্লিক করুন]*
- যিশুর মৃত্যু রহস্য : *ওয়াহিদ রেজা ৬৮৪ [ক্লিক করুন]*
- মানুষের পয়গম্বর হয়ে ওঠার সুলুক- সন্ধান : *দীক্ষক দ্রাবিড় ৭০২ [ক্লিক করুন]*
- পরকালের পরাবাস্তবতা : *মাইকেল শারমার (ফরিদ আহমেদ) ৭১৯ [ক্লিক করুন]*
- মিথ্যার বেসাতি : নীল আর্মস্ট্রং এর মুসলিম হয়ে ওঠার কল্পকাহিনী : *লাইটহাউজ ৭৩৭*
- ডিম্বের সন্ধান এবং রাশেদ খালীফা ও তার ম্যাথমিটিকল মিরাকল : *নাস্তিকের ধর্মকথা ৭৪৩*
- ওঁ গনেশায় নম! : *বিপ্লব পাল ৭৫০ [ক্লিক করুন]*
- নাটের গুরু এরিক ফন দানিকেন : *স্বপন বিশ্বাস ৭৫৩ [ক্লিক করুন]*
- অলৌকিক সংখ্যাতত্ত্ব : *নাস্তিকের ধর্ম কথা ৭৫৮[ক্লিক করুন]*
- কুরআনের সাংখ্যিক মাহাত্ম্য: ভিন্নমত *রায়হান আবীর ৭৬৫ [ক্লিক করুন]*
- কোরানের মিরাকল ১৯ - এর উনিশ- বিশ *সৈকত চৌধুরী এবং অনন্ত বিজয় ৭৭৩ [ক্লিক করুন]*

পার্থিব জগতের অপার্থিবতা বিশ্লেষণ

অনন্ত বিজয়

পার্থিবজগতের জল, বায়ু, আহার্যের স্বাদ নিয়ে আমরা মানুষ, পশু-উদ্ভিদ সকলেই পার্থিব জগতে বেঁচে আছি। জগতের রূপ-রস-গন্ধ আমাদের মনকে ভরিয়ে তুলে, আনন্দ জোগায়। আমাদের ভালো-মন্দ-সুস্থতা-অসুস্থতা সবকিছুই এই পার্থিবজগতকে কেন্দ্র করে। যেমন ধরুন, দেখা সাক্ষাতের সময় প্রায়ই একে অপরকে জিজ্ঞেস করি, কেমন আছেন? প্রত্যুত্তর আসে—ভালো আছি অথবা ভালো নেই। এই ভালো থাকা বা না-থাকা সবই ইহজাগতিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে। আমরা সুখস্বপ্ন-কল্পনায় দেখি—জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, বিত্তশালী হওয়া, ব্যাপক পরিচিতি লাভ ইত্যাদি; এ সবই কিন্তু পার্থিবজগতে চাই। শোনা যায়, কেউবা স্বপ্নে স্বর্গ-নরক দেখেছেন। স্বর্গের অতিমনোমুগ্ধকর পানাহার, অবাধ স্বাধীনতা অথবা নরকের আগুনে দগ্ধ পাপী-তাপীর তীব্র কষ্টের রেশ কিন্তু এই ইহজগতে পেয়ে থাকি। আমরা কোথাও এমন কিছু কল্পনা করতে পারি না, যা ইহজগতে নেই; বোধ করি, কোনো না কোনোভাবে এই বস্তুজগতকে কেন্দ্র করে আমাদের যাবতীয় চিন্তার পরিধি। এরপরও অনেকে বলেন, অতিপ্রাকৃত শক্তি অথবা ঈশ্বর (গড, আল্লাহ, ইয়াহুয়া ইত্যাদি) কোনোভাবেই পার্থিবজগতের অধীন নয়। কিন্তু ঈশ্বরের যে সকল বৈশিষ্ট্য তাঁর অনুগতরা প্রকাশ করে থাকেন, যেমন—সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী, সর্বস্থানব্যাপী বিরাজমান ইত্যাদি, আসলে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় ওগুলো—যেমন শক্তিমত্তা এই বস্তুজগতেরই অধীন, প্রায়শ দেখি শক্তিমানদের প্রতি বেশিরভাগ মানুষ ভীতি-শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম বজায় রেখে চলে, গর্বভরে ঘোষণা করে, 'বীরভোগ্য বসুন্ধরা'; জ্ঞান অন্বেষণের স্পৃহা সকল মানুষেরই আছে, কিন্তু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বে সে সর্বজ্ঞানী হতে পারে না, আর স্থান-কাল-পাত্র তো বস্তুজগতের অধীন। এভাবে ঈশ্বরের সংজ্ঞায় ঈশ্বরকে ভাঙলে বুঝা যায় অতিপ্রাকৃতের শিরোমনি ঈশ্বর সামান্য তৃণসমমানুষের চিন্তার একটু বর্ধিতরূপ মাত্র। এজন্যই হয়তো পার্থিবজগতের জ্ঞানী-গুণী-বিজ্ঞানী-দার্শনিকেরা বলেন—অতিপ্রাকৃত-অপার্থিব-অলৌকিক বলতে কিছুই নেই; যা আছে, তা এই পার্থিবমানুষেরই কাল্পনিক সৃষ্টি। আরো বলেন—পার্থিবজগতে বিশ্বাসী কিংবা পার্থিবজগতে অবিশ্বাসী নির্বিশেষে পার্থিবজগতের সকল মানুষসহ—সকল প্রাণী, উদ্ভিদ, জড়, বিশ্ব-মহাবিশ্বের সবকিছুই পার্থিব প্রক্রিয়ায় উদ্ভুত। কিন্তু একমাত্র মনুষ্যপ্রজাতি বাদে অন্য কোনো প্রাণীর (উদ্ভিদসহ) ক্ষেত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়নি, পার্থিবজগতের প্রতি তার অবিশ্বাস; অপার্থিবের প্রতি আকাঙ্ক্ষা-বাসনা-লালসা। হয়তো এ বক্তব্য দেখে কেউ কেউ বলবেন—"মানুষ ব্যতীত অন্য কোনো প্রাণীর জ্ঞান এত উন্নত নয় যে ওরা অপার্থিবের সন্ধান পাবে; আমরাই মানুষেরা অপার্থিবের কল্যাণে একমাত্র *আশারাফুল মাকলুকাত!*" কিন্তু আমাদের দীর্ঘকালের কঠোর অধ্যাবসায়ে লব্ধ বিজ্ঞান ভিন্ন কথা বলে, বলে—পৃথিবীর যাবতীয় অপার্থিবতা আমাদের মধ্যেই বিরাজমান, সবকিছু পার্থিব কারণেই সৃষ্ট। এও বলে, পার্থিবতা সম্পর্কে সকলের ধারণা স্পষ্ট না থাকা এবং পার্থিবতা সম্পর্কে এখনো সবকিছু না জানার কারণে—ভয়ে, লোভে, লালসায়, ভণ্ডামিতে, সস্তা প্রচারের মোহে আবিষ্ট হয়ে পার্থিবতা ভুলে অপার্থিবতার জয়গান গেয়ে বেড়াই, তথাকথিত অলৌকিকতার পায়ে মাথা নত করে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করি, গুটিকয়েক শোষক-ভণ্ড-প্রতারক-প্রবঞ্চক-মানসিক রোগীদের (তথাকথিত) ঈশ্বরের প্রতিভূ বানিয়ে আমাদের একমাত্র পার্থিবজগৎ তাদের জন্য উৎসর্গ করে ফেলি। এতে মনুষ্যজীবনের ক্ষতি ভিন্ন লাভ মোটেই হয় না। যুগ যুগ ধরে রক্ত পানি করা শ্রমে উপার্জিত অর্থ অন্যায়-অসাম্য টিকিয়ে রেখে ভণ্ডের দলের লুটে নেয়া—চেয়ে-চেয়ে দেখা ছাড়া আমরা আর কিছুই করতে পারি না। আমাদের অপ্রাপ্তি-আর্তনাদ-ক্ষোভ-চোখেরপানি-হাহাকার—সবই অপার্থিবতার দেয়ালের নীচে চাপা পড়ে আছে; জনগণের সাম্যবাদের স্বপ্ন সুদূর আকাশে পাড়ি জমিয়েছে, ধরণীতে জনগণতন্ত্র শেকলবদ্ধ হতে চলছে অপার্থিবতার কারাগারে—এ বাস্তবতায় এই প্রবন্ধে দীর্ঘসময়

ধরে বহুল প্রচারিত বেশকিছু জনগুরুত্বপূর্ণ (!) তথাকথিত অপার্থিববিষয়সমূহকে নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করা হবে, সভ্যতা-ভব্যতার নামে এঁটে থাকা মুখোশ উন্মোচন করে কতিপয় অতিলৌকিকতার প্রতিভূদের কুৎসিৎ নগ্নরূপ উপস্থাপন করা হবে। আশা করি পাঠক, সত্য উদ্ধরণের এই সৎপ্রচেষ্টায় আপনারা সঙ্গে থাকবেন এবং এ সম্পর্কিত যেকোনো ভিন্নমত-মতবিরোধ-তথ্যের ঘাটতি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্দ্বিধায় জানাবেন।

(১) **ঈশ্বর দর্শন ও অলৌকিক অনুভূতি** :— পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বহু ধর্মীয় মহীয়সী মহাপুরুষ-নবী-সাধক-ঠাকুর-পীরবাবা-মৌলভির খবর পাওয়া যায়, যারা নিজ-নিজ ধর্মের ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। যেমন ইহুদিদের নবি হযরত মুসা সিনাইপর্বতে গিয়ে ঈশ্বরের সাথে দেখা করেছেন; ইসলাম ধর্মে হযরত মোহাম্মদ দীর্ঘ বিশ বছরের অধিক জিব্রাইল নামক অপ্রাকৃত সত্তার সাথে যোগাযোগ রেখে আল্লাহর কাছ থেকে কোরানের বাণী ধারণ করেছেন এবং একসময় বুরাক নামক আধা ঘোড়া-আধা পাখি পশুর পিঠে চড়ে বেহেশত-দোজখ প্রদক্ষিণ করে এসেছেন এমন কী স্বয়ং আল্লাহর সাথে কথোপকথন করেছেন; আর খ্রিস্ট ধর্মে হযরত যিশু স্বয়ং নিজেকে ঈশ্বরের পুত্ররূপে দাবি করেছেন। হিন্দুধর্মে তো এরকম অবতারবাদ বা দেবতাদর্শন কাহিনীর অভাব নেই, ঘরে ঘরে প্রায়ই এরকম কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়; কেউবা ঈশ্বরকে স্বপ্নে দেখেছেন, কেউ সামনা-সামনি দেখেছেন, কেউ ঈশ্বরের শব্দ শুনেছেন, কেউ ঈশ্বরের সাথে কথা বলেছেন, আলোচনা করেছেন, ধর্মপ্রচারের জন্য পরিকল্পনা করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের কালীমায়ের সাথে সাক্ষাৎ, লোকনাথের শিবের অবতার ইত্যাদি। প্রতিটি ধর্মেই এরকম কম বেশি মহাপুরুষের কাহিনী আছে, যারা স্বয়ং ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছেন অথবা দূত মারফত সময়-সময় বাণী পেয়েছেন। আবার এও শোনা যায়, কেউ কেউ নিজেকে ঈশ্বরের অবতার হিসেবে দাবি করেছেন, কারোবা শরীরে ঈশ্বর এসে ভর করেছেন (হিন্দুধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মে এরকম মজার-মজার 'অবতার' আবির্ভাবের গল্প বলতে গেলে শোনা যায় না)। সারা পৃথিবীতে এরকম অসংখ্য অতিপ্রাকৃত শক্তির সাক্ষাৎপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কৌশলি-আবেগময় সরল(?)বক্তব্য আমরা আমজনতা নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস করেছি যুগ যুগ ধরে, নিজেদের উজাড় করে দিয়ে মহাপুরুষের পদসেবা করেছি, প্রার্থনা করেছি রাতদিন এক করে[১], নিজেরা অন্ন গ্রহণ না করে পুণ্য লাভের আশায় গুরুর পাতে তুলে দিয়েছি, গুরুর আশির্বাদ লাভের আশায় ইহকাল-পরকাল সব এক করে দিয়েছি তবুও আমাদের, গুরুর সেবা করার তৃপ্তি মেটেনি। এ জনতার কাতারে মন্ত্রী থেকে ফকির, শিক্ষিত থেকে অশিক্ষিত, আমলা থেকে কামলা সক্কলেই আছেন। কিন্তু আফসোসের বিষয়, আমাদের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত অতিপ্রাকৃতশক্তি ঈশ্বর দর্শন, ঈশ্বরের সাথে কথোপকথন, ঈশ্বরের অবতার, অলৌকিক নানা অনুভূতি ইত্যাদির দাবিদারেরা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নিছকই একজন মানসিকরোগী। আর নয়তো ভণ্ড-প্রতারক মাত্র[২]। বিজ্ঞান, বিশেষ করে মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, এ ধরনের মানসিকরোগীদের ঠিকমতো চিকিৎসা হলে মানসিক ভ্রান্তি দূর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে; ফিরে আসতে পারেন সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, সুইজারল্যান্ডের মনোবিজ্ঞানী ডঃ ওয়াল্টার হেজ, আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী ডঃ জেমস্ ওল্ডস্, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের জে. ডেলগাজোসহ বিশ্বের আরো বহু মনোবিজ্ঞানী মানুষের মনে (চিন্তায়) ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরেরবাণী শোনার অনুভূতি সৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছেন, শুধু তাই না, তাঁরা দেখিয়েছেন বাহির থেকে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্নায়ুকোষে উত্তেজনা ও নিস্তেজ অবস্থার সৃষ্টি করে আধ্যাত্মিক অনুভূতিসহ প্রেম, ঘৃণা, ভয়, সাহসের অনুভূতি তৈরি করা সম্ভব। তবে যদি কেউ ইচ্ছাকৃত অভিনয়ের মাধ্যমে অপার্থিব অনুভূতি নিয়ে প্রতারণা করে থাকেন, তাহলে বিজ্ঞান কেন, কারো বাপেরও সাধ্য নেই—এদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। শুধু নিশ্চিত করতে পারে কারাদণ্ড।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি, বিজ্ঞানসম্মতভাবে ঈশ্বর দর্শন-অলৌকিক অনুভূতি সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে—মনোবিজ্ঞান (Psychology) এবং মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের বিচিত্র কর্মকাণ্ড সম্পর্কে।[৩] মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের একটি বিশেষ ধর্ম হলো গতিময়তা। সবার মস্তিষ্কের গতিময়তা সমান নয়, অর্থাৎ উত্তেজনা-নিস্তেজনায় দ্রুত সাবলীলভাবে মানিয়ে কাজ করার ক্ষমতা সমান নয়। কেন নয়? কারণ—এই মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিবেশের ওপর নির্ভর করে। সামাজিকীকরণের সময় যারা বিদ্যা-শিক্ষা-জ্ঞান সুস্থভাবে লাভ করেছে অর্থাৎ মূলত যারা চর্চা করার বেশি সুযোগ পেয়েছে—তাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের গতিময়তা বেশি, তারা যেকোন বিষয়ে চট্‌পট্‌ বুঝতে পারে, মানিয়ে নিতে পারে সহজেই। আর যাদের সামাজিকীকরণ ভাল হয়নি, পরিবেশের কারণে বিদ্যা-শিক্ষা-জ্ঞান আহরণ-চর্চা করার সুযোগ কম পেয়েছে তাদের স্নায়ুকোষের গতিময়তা কম বা দুর্বল হয়ে থাকে, তাদের যাচাই-বাছাই করার মানসিকতাও থাকে কম, তারা সহজেই আক্রান্ত হয় কুসংস্কারে, অপবিশ্বাসে কিংবা বিভিন্ন মানসিক রোগে। এ সমাজে বহুল প্রচলিত তথাকথিত বিভিন্ন অতিপ্রাকৃত/অলৌকিক ভ্রান্ত অনুভূতিকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় ইলিউশন (Illusion), হ্যালুশিনেইশন (Hallucination), ডিলিউশন (Delusion), প্যারানোইয়া (Paranoia) বলে থাকে; এবং ব্যক্তির ওপর জিন-ভূত-দৈত্য-দানো-পরী-রাক্ষস-খোক্ষস থেকে শুরু করে খোদ খোদা-আল্লাহ্‌-ভগবান-ঈশ্বর-ইয়াহুয়া ইত্যাদি সকল অতিপ্রাকৃত শক্তির অবতার কিংবা ভর মনোবিজ্ঞানের ভাষায় হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মানসিকঅসুখ। যেমন হিস্টিরিয়া (Hysteria), এপিলেপ্‌সি (Epilepsy), ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ (Maniac Depresive), স্কিটসোফ্রেনিয়া (Schizophrenia) ইত্যাদি।[৪] মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, অপার্থিব/অপ্রাকৃতঅনুভূতির কিংবা মানসিকরোগগুলোর পৃথক পৃথক উপসর্গ থাকলেও একজন ব্যক্তির মধ্যে পৃথক পৃথক উপসর্গগুলো একসাথে বিরাজ করতে পারে; এবং প্রায়ই একসাথে বিরাজ করেও।

এখন এ সকল ভ্রান্তঅনুভূতি এবং মানসিকরোগ নিয়ে ক্রমান্বয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক—বাস্তব জীবনে আমরা সবাই ইলিউশন বুঝলে বা না-বুঝলেও এর সাথে পরিচিত আছি। মনোবিজ্ঞান বলে, ইলিউশন বা ভ্রান্ত অনুভূতি হচ্ছে—"কোনো বস্তু প্রকৃতপক্ষে যা, তাকে সেইভাবে উপলব্ধি না করা।" যেমন—একটি গ্লাসে পানি নিয়ে সোজা চামচ ডুবিয়ে রাখলে, চামচটিকে আর সোজা দেখা যায় না, কিছুটা বাঁকা দেখায়। কারণ, এখানে পানি ও বাতাসের প্রতিসরাঙ্ক আলাদা হবার জন্য আমাদের দর্শনানুভূতি ভুল করেছে। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রোদেলা দুপুরে পিচ ঢালা রাস্তাকে ভেজা ভেজা মনে হয়, মরুভূমিতে মরীচিকা কিংবা রাতের অন্ধকারে দড়িকে সাপ ভাবার কথা সবাই জানি; এগুলো ভ্রান্ত দর্শনানুভূতির উদাহরণ। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়কে কেন্দ্র করে এ ধরনের ভ্রান্তিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা:— (১) দর্শনানুভূতির ভ্রম (Optical/Visual illusion), (২) শ্রবণানুভূতির ভ্রম (Auditory illusion), (৩) স্পর্শানুভূতির ভ্রম (Tactile illusion), (৪) ঘ্রাণানুভূতির ভ্রম (Olfactory illusion), (৫) স্বাদগ্রহণের বা জিহ্বানুভূতির ভ্রম (Taste illusion)। মনোবিজ্ঞানীরা সংক্ষেপে বলেন—ইলিউশন হলো প্রত্যক্ষণের ভুল। ইন্দ্রিয়গ্রাহী উদ্দীপকের প্রভাবে প্রত্যক্ষণ বা উপলব্ধি হয় বলে আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের যেকোনো একটির জন্যই ইলিউশন হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, এই ভুলের জন্য **আমাদের ইন্দ্রিয় কিন্তু দায়ী নয়, স্নায়ুসংকেত বিশ্লেষণে মস্তিষ্কের অক্ষমতাই এই ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।** শুধু মানসিক বা শারীরিক অসুস্থতদেরই ইলিউশন হয় না, সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষদেরও ইলিউশন হয়ে থাকে (পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিভ্রম ঘটলেও সচরাচর বেশি ঘটে থাকে দৃষ্টি ও শ্রবণজনিত ইলিউশন)। শ্রবণজনিত ইলিউশন হলো একটা শুনতে গিয়ে অন্য কিছু শোনা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘোরের মধ্যে থাকলে এরকম ঘটে থাকে। যেমন কারো আসার অপেক্ষাতে খুব উত্তেজিত হয়ে থাকলে হঠাৎ টেলিফোন কিংবা অন্য কিছুর শব্দকে মনে হয় কলিংবেলের শব্দ। আবার শরীরে হঠাৎ করে সুতোর স্পর্শ লাগলে অনেকে বিছে ভেবে লাফ দিয়ে ওঠেন,

স্পর্শানুভূতি ভ্রমের উদাহরণ। ভেজা সুপারি থেকে অনেক সময় খুব নোংরা গন্ধ আসে, এটাকে অনেকে নর্দমার ময়লা-আবর্জনার গন্ধ বলে ভুল করেন; যা ঘ্রাণানুভূতির ভ্রম। মিষ্টি খাওয়ার পর চা খেলে খুব তিক্ত স্বাদ লাগে, এটি স্বাদ গ্রহণের ভ্রম।—পাঠক এখানে ইলিউশন সম্পর্কিত খুব সাধারণ কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হল, আপনার চারপাশেই আরো হাজার-হাজার উদাহরণ পাবেন; শুধু একটু নজর দিলেই চলবে। বলা যায় ইলিউশন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণেই—গ্রামে-গঞ্জে-শহরে জিন-ভূত-প্রেত দেখার ভয়ঙ্কর সব কাহিনী এখনো প্রচুর শুনতে পাওয়া যায়; জন্মের পর থেকে শৈশব, শৈশব পেরিয়ে কৈশোর পর্যন্ত তথাকথিত অতিপ্রাকৃত শক্তি সম্পর্কে শুনতে শুনতে নিজের অজান্তে এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মে যায়, চিন্তার কুঠরিতে ভক্তি-ভয়ের সৃষ্টি হয়। ফলে হঠাৎ করে ইলিউশন হলে ঈশ্বরের দেখা পেয়েছেন, ভূতের দেখা পেয়েছেন বলে ভয় পান অথবা অন্য কোন অলৌকিক সত্তার বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলে মনে করেন। এদিকে হ্যালুশিনেইশন বা অলীক প্রত্যক্ষণ—কোন কিছুর বাস্তব অস্তিত্ব নেই, কিন্তু তাকে দেখতে পাওয়া/শুনতে পাওয়া/স্পর্শ পাওয়া/স্বাদ পাওয়া/ঘ্রাণ পাওয়ার অনুভূতিকে বলে থাকে। মনোবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখা আর জাগ্রত অবস্থায় অলীকপ্রত্যক্ষণ একই ধরনের শারীরবৃত্তিক ব্যাপার। আমরা যখন কোন কিছু প্রত্যক্ষণ করি, তখন ওই বস্তুর একটি ছাপ আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে রয়ে যায়। ফলে প্রয়োজন মত কল্পনার মধ্যে বস্তুটির প্রতিবিম্ব অবলোকন করতে পারি ঐ বস্তুর বাস্তব উপস্থিতি ছাড়াই; কিন্তু কল্পনার প্রতিবিম্বটি প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মত উজ্জ্বল হয় না। উপলব্ধিজনিত উত্তেজিত স্নায়ুকোষগুলোই আমাদের মস্তিষ্কে ধারণা ও কল্পনার উৎস। কোনো কারণে আমাদের চিন্তায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের স্বাভাবিক ধর্ম উত্তেজনা (excitation) ও নিস্তেজনা (inhibition)-তে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। অতিরিক্ত টেনশন বা দুশ্চিন্তার ফলে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের উত্তেজনা বিন্দুগুলো ধীরে-ধীরে নিস্তেজিত হবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে; তখন উত্তেজিত কোষগুলো অনড়ত্ব লাভ করে; এর দরুণ মস্তিষ্কে বাস্তবের বিকৃত ও অতিরঞ্জিত প্রতিফলন ঘটে। একে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় হ্যালুশিনেইশন বলে আর আমরা সাধারণেরা ঈশ্বর দেখেছি, ভূত দেখেছি বলে বিভ্রান্ত হই। পঞ্চেন্দ্রিয়ের ওপর ভিত্তি করে হ্যালুশিনেইশনকেও পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) দর্শনানুভূতির অলীকভ্রম (Optical/Visual Hallucination), (২) শ্রবণানুভূতির অলীকভ্রম (Auditory Hallucination), (৩) স্পর্শানুভূতির অলীকভ্রম (Tactile Hallucination), (৪) ঘ্রাণানুভূতির অলীকভ্রম (Olfactory Hallucination), (৫) স্বাদগ্রহণের বা জিহ্বানুভূতির অলীকভ্রম (Taste Hallucination)। সুস্থ মানুষেরও হ্যালুশিনেইশনের অভিজ্ঞতা হতে পারে। কিন্তু যদি এই অভিজ্ঞতা কারোর বারে বারে ঘটে থাকে, তবে তা মানসিক বিকারের লক্ষণ বলে সন্দেহ করতে হবে। এছাড়া মাদকদ্রব্য (আফিম, গাঁজা, চরস, অ্যামিটাল সোডিয়াম, ম্যান্ড্রেক্স, ধুতরা ইত্যাদি) সেবনের মাধ্যমেও অলীকবিভ্রম বা Hallucination ঘটতে পারে। এসকল মাদকদ্রব্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লাইসারজিক্ অ্যাসিড ডাইএথিল্যামাইড (সংক্ষেপে LSD)। এগুলোকে হ্যালুশিনোজেন্স (Hallucinogens) বা মানসিকবিভ্রমকারী ড্রাগ বলে। এসব ড্রাগে টেট্রাহাইড্রোক্যানাবিল (THC) নামে রাসায়নিক পদার্থ থাকে, এছাড়াও ক্যানাবিনল, ক্যানাবিডিয়ল (একত্রে ক্যানাবিনয়েডস বলে) থাকে। যখন এসব মাদকদ্রব্য শ্বাসের সঙ্গে অথবা ফুসফুস থেকে রক্তে শোষিত হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছায়, তখনই শুরু হয় এগুলোর কাজ। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের ভারতবর্ষে সাধু-সন্নাসীরা সোমরস-গাঁজা-ভাং-চরস ইত্যাদি উত্তেজক মাদক গ্রহণ করে ঈশ্বর দর্শন, ঈশ্বরের কথামৃত শোনা, তুরীয় আনন্দ ইত্যাদি অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লাভ করে আসছেন। প্রাচীন ঋকবেদে সোমরসের অনেক গুণগান করা হয়েছে এবং সেই বৈদিকযুগে যাগযজ্ঞের সময় মুনি-ঋষিরা সোমরস পান করতেন। তন্ত্রসাধনায় অত্যাবশ্যক পাঁচটি 'ম'—এর একটি হল মদ। যোগশাস্ত্রের প্রবক্তা পতঞ্জলি বলেছেন, "জন্মৌষধিমন্ত্রতপস্যামাধিয়ঃ সিদ্ধয়ঃ" (যোগসূত্র ১৪।১)—অর্থাৎ জন্মসূত্রে, বনৌষধির সাহায্যে, জাদুমন্ত্রোচ্চারণে, কঠোর সংযম পালনে বা মনঃসংযোগের দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয়, অর্থাৎ অতিপ্রকৃত শক্তি অর্জিত হয়। শুধু মাদকদ্রব্য গ্রহণ নয়, ডেলিরিয়াম

(Delirium) বা বিকারগ্রস্থ অবস্থায় যেমন প্রবল জ্বর, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, রক্তদূষণ, রিউম্যাটিক ফিভার, থাইরয়েড গ্রন্থির অত্যাধিক ক্ষরণ, অস্ত্রোপচারের পরে, মাথায় আঘাত লাগলে, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে বিশেষত টেমপোরাল লোব ও মধ্য-মস্তিষ্কে টিউমার, রক্তক্ষরণ ইত্যাদি কারণে অলীকদর্শন (আত্মা-ঈশ্বর-ভূত-প্রেত) হতে পারে। এছাড়া অপারেশনের আগে অ্যানাস্থিসিয়া প্রয়োগ করলে অনেকে মৃত্যুর আশঙ্কায় চরম ভীত হয়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে থাকেন, ফলে কেউকেউ চেতনা লোপ পাওয়ার আগে বা অর্ধচেতন অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন, ঈশ্বরের বাণী শোনেন। মেডিকেলের বিভিন্ন কেস হিস্ট্রি থেকে জানা যায় যাদের ভিটামিন বি-ওয়ান বা থায়ামিনের ঘাটতি থেকে বেরিবেরি রোগ হয় বা নিকোটিনিক অ্যাসিডের অভাবজনিত কারণে যে পেলেগ্রা রোগ হয় কিংবা যাদের প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত প্যারাথাইরক্সিন-এর মত কয়েকটি হরমোনের অভাব দেখা দেয়, তাদের মাঝে-মাঝে নানা অস্বাভাবিক প্রত্যক্ষের বিভ্রম বা হ্যালুশিনেইশন হয়ে থাকে।

ডিলিউশন হলো বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা; ইলিউশন ও হ্যালুশিনেইশনের সাথে ডিলিউশনের চরিত্রগত পার্থক্য আছে, কিন্তু কেউ কেউ এদের তিনটিকে একত্রে ব্যবহার করে থাকেন। **কোনো একজনকে দেখে ঈশ্বর মনে হওয়াকে ইলিউশন, কিছুই নেই অথচ সামনে ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়ার অনুভূতি হ্যালুশিনেইশন আর ঈশ্বর আছেন, তাকে অবশ্যই দেখতে পাওয়া যায়—এই অন্ধবিশ্বাস হলো ডিলিউশন।** ডিলিউশনের রোগী বিচার-বুদ্ধির ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তাদের ভ্রান্তবিশ্বাসে কোনো রকম যুক্তি-মুক্তচিন্তার ধার ধারে না। ডিলিউশন হওয়ার কারণ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত যতটুকু জানা যায়—'মস্তিষ্কের গতিময়তা কমে এলে উত্তেজিত স্নায়ুকোষগুলো অনড় অবস্থায় পৌঁছায়। উত্তেজনা ওই বিশেষ বিন্দুগুলোতে যেন অবস্থান-ধর্মঘট (Strike) পালন করতে শুরু করে। ফলে অনড় উত্তেজিতকোষগুলির আশেপাশের কোষগুলি মাত্রাধিক নিস্তেজিত হয়ে যায়। এই নিস্তেজনা যদি মস্তিষ্কের অনেকটা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে তখনই ভ্রান্তধারণা পাকাপাকি মস্তিষ্কে গেঁথে যেতে পারে। কারণ উত্তেজিত বিন্দুগুলোর উত্তেজনা প্রায় স্থায়িত্বের আকার নেয়; মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশ সুস্থ থাকায় যুক্তিবুদ্ধি সাধারণভাবে মস্তিষ্কে কাজ করে কিন্তু উত্তেজিত অংশে প্রভাব ফেলতে পারে না। ভ্রান্তধারণার সঙ্গে স্থায়ী শর্তাধীন পরাবর্ত[৫] গড়ে ওঠার ফলে রোগীর নিজের ধারণা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।' এ ধরনের রোগীর মধ্যে অনেকটা 'বিশ্বাসে মেলায় বস্তু...'-ই সার কথা। ডিলিউশন কয়েক রকমের রয়েছে, যেমন:— (১) ডিলিউশন অব রেফারেন্স বা আত্মপ্রাসঙ্গিক ভ্রান্তি (২) ডিলিউশন অব পারসিকিউশন বা নির্যাতনমূলক ভ্রান্তি (৩) ডিলিউশন অব ইনফ্লুয়েন্স বা প্রভাবিতকরণ ভ্রান্তি (৪) ডিলিউশন অব গ্র্যান্ডিয়ার বা বিরাটত্বের ভ্রান্তি। ডিলিউশন অব রেফান্সের রোগী মনে করেন, আশেপাশের সব কিছুই তাকে কেন্দ্র করে ঘটছে। চেনা অচেনা সবাই তার দিকেই নজর রাখছে, তাকে নিয়ে আলোচনা করছে, তার কথা ভেবেই চোখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, তাকে নিয়ে উপহাস করার জন্য হাসাহাসি করছে—এমন সব তুচ্ছ ও সাধারণ ঘটনাকে অতিরঞ্জিত ও বিকৃত করে তার নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ভাবেন। ডিলিউশন অব পারসিকিউশনের রোগীর ভ্রান্ত বিশ্বাস যে, সবাই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, তাকে ভয় দেখাতে চাচ্ছে, তার ক্ষতি করার পরিকল্পনা করছে। মস্তিষ্কের নিস্তেজিত স্নায়ুকোষগুলো এই সময় অতিস্ববিরোধী পর্ব বা Ultraparadoxical phase-এ আসে। এই অবস্থায় ইতিবাচক উদ্দীপনায় নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলোর বিকারগত অনড়ত্ব, তারপর অতিস্ববিরোধী এই দুটো ব্যাপার একসঙ্গে বা একটার পর একটা ঘটলে এই ডিলিউশনের উদ্ভব হয়। ডিলিউশন অব ইনফ্লুয়েন্স-এর রোগীরা মনে করেন, তাদের চিন্তা-অনুভূতি-কাজকর্ম বাইরের কোনো অদৃশ্য শক্তি/অলৌকিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে। তার নিজের ইচ্ছায় কোনো কিছু করছেন না। তারা মনে করেন, তারা অতিপ্রকৃত শক্তির প্রতিনিধি অথবা অবতার। ফলে তারা যা কিছুই করছেন, সবই ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃত শক্তির ইচ্ছাতেই করছেন। ডিলিউশন অব গ্র্যান্ডিয়ারের রোগীদের বিরাটত্বের ভ্রান্তির লক্ষণ দেখা যায়। এই

রোগীরা নিজেদের বিষয়ে উচ্চ ধারণা ও বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন; এরা মনে করেন স্বয়ং ঈশ্বর বা ঐ জাতীয় অতিপ্রাকৃত শক্তির সাথে তাদের যোগাযোগ হয়েছে, এবং অতিপ্রাকৃত শক্তি তাদের কথা শুনতে পাচ্ছে, তাদেরকে সমর্থন দিচ্ছে। বেশিরভাগ মহাপুরুষ বা অবতার নামধারীরা (রামকৃষ্ণ, লোকনাথ, যীশু, হযরত মোহাম্মদ, চৈতন্যদেব প্রমুখ) এই ডিলিউশনের শিকার। বিশেষ করে এখানে হিন্দুধর্মের মহাপুরুষ লোকনাথের নাম উল্লেখ করতে হয়; ভক্তদের কাছে তিনি ছিলেন শিবের অবতার, জীবিতকালে তাঁর শিষ্যদের প্রচণ্ড আত্মপ্রসিদ্ধি (কিংবা অহমিকা) নিয়ে বলতেন—"জলে-স্থলে-রণে-বনে-জঙ্গলে, যেখানেই বিপদে পড়িবে—আমাকে স্মরণ করিবে, আমিই তোমাদের রক্ষা করিব।" (বর্তমানকালের যেসকল ডাক্তার প্রাইভেট প্রেকটিস করেন, তাদের জন্য সুখবর, বাবা লোকলাথ আজ আর বেঁচে নেই, নয়তো—তিনি বেঁচে থাকলে প্রাইভেট ক্লিনিক, হাসপাতাল ইত্যাদি কতকিছুর ব্যবসা যে লাটে উটতো!) আবার মহাপুরুষদের মধ্যে কখনোবা ডিলিউশন অফ ইনফ্লুয়েন্স-এর উপসর্গ দেখা দিত। এ কথা বলার কারণ হচ্ছে, তাঁদের ধর্মপ্রচারের ইতিহাস দেখলে দেখা যায়, ধর্মপ্রচারের সময় প্রায়শ সোচ্চারে ঘোষণা দিতেন—"যা কিছুই করছেন স্বয়ং ঈশ্বরের নির্দেশেই করতেছেন।"[৬] বেশিরভাগ মহাপুরুষরাই গভীর প্রত্যয় নিয়ে বিশ্বাস করতেন—ধ্যান, উপাসনার মধ্য দিয়ে সমাধিস্থ অবস্থায় ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভব। ঈশ্বরদর্শনের তীব্র আকুতিতে তাঁরা কঠোর ইন্দ্রিয় সংযম ও কৃচ্ছ্রসাধন করতেন। এই কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, আর এ থেকেই ওনাদের 'ঈশ্বর' নামক হ্যালুশিনেইশন ঘটত[৭]। আবার কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে লোক-ঠকানোর জন্য, জনগণের কাছে নিজের ইমেজ বৃদ্ধির জন্য 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' খেলা চালিয়ে থাকেন, তবে আর বলার কিছু নেই। জানেনই তো ভণ্ডলোকের বেওসা করার জায়গা বা ফায়দা লোটার কায়দার অভাব নেই!

প্যারানোইয়া (Paranoia) হলো 'বদ্ধমূল ভ্রান্তিজনিত মস্তিষ্কবিকৃতি'। এই ধরনের রোগীর ভ্রান্ত ধারণা স্থায়ী ও অটল হয়। এটি ব্যক্তিত্বের রোগ। যদিও এর সাথে ডিলিউশনের বেশ মিল লক্ষ্য করা যায়। তবে তফাৎ হচ্ছে প্যারানোইয়া রোগীর মধ্যে ভ্রান্ত ধারণাটাই প্রধান, অন্য কোনো লক্ষণ বিশেষ কিছু থাকে না। ওনারা অন্ধ-ভ্রান্ত বিশ্বাসের বাইরে দৈনন্দিন জীবনে একদম স্বাভাবিক আচার-আচরণসহ যুক্তি-বুদ্ধি অনুসরণ করেন। তবে কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মসচেতন থাকেন। প্যারানোইয়া রোগীদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এঁরা নিজেদের ভ্রান্তবিশ্বাসের পেছনে খুব সুন্দর করে যুক্তি খাড়া করতে চেষ্টা করেন, অলীক ধারণাকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। যার ফলে আপাত দৃষ্টিতে এঁদের মানসিক রোগী বলেই মনে হয় না। যেমনটা করে থাকেন ডিলিউশন অফ ইনফ্লুয়েন্সের রোগীরা।

এখন ওই মানসিকঅসুখগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা যাক। হিস্টিরিয়া বা মূর্ছারোগ হচ্ছে একরকম নিউরোসিস্। এই রোগের কারণ হিসেবে ধরা হয়—অবদমিত মনের অবচেতন কামনা-বাসনা পরিতৃপ্তির চেষ্টা। সাধারণভাবে দেখা যায়—কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, অল্পশিক্ষিত, শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত, বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা বা যুক্তির সাথে পরিচিত হবার সুযোগ না পাওয়া ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে চিন্তার সহনশীলতা কম থাকে। এই শ্রেণির লোকেরা এক নাগাড়ে একই কথা শুনলে-ভাবলে-বললে, ওদের মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু কোষ বার বার উত্তেজিত হতে শুরু করে, আলোড়িত হতে থাকে। একসময় উত্তেজিত কোষগুলো অকেজো হয়ে অন্য কোষগুলোর কাছে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে মস্তিষ্কের কাজকর্মে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এসময় এরা আবেগে চেতনা হারিয়ে ফেলে বা অদ্ভুত আচরণ করতে শুরু করে। এই রোগের বিশেষ কিছু লক্ষণ হচ্ছে—এক রঙকে অন্য রঙ বলে মনে হওয়া, এক বস্তুর জায়গায় দুটি দেখা (Double Vision), সম্পূর্ণ স্পর্শহীনতা বা আংশিক স্পর্শহীনতা দেখা দেয়া, বস্তুর স্থান নির্ণয়ে ভুল করা, হাতের আঙুল বা জিবের মৃদু কম্পন, বাকশক্তি রোধ হয়ে যাওয়া, সর্বশরীরে খিচুনি বা মৃদু সঞ্চালন, ফিট বা মূর্ছা

যাওয়া। এই ধরনের একাধিক লক্ষণ হিস্টিরিয়া রোগীর মধ্যে মূর্ছা যাবার সময় দেখা দিতে পারে। আমরা যাদের প্রচলিত ভাষায় 'ঈশ্বরে ভর', 'জিন-ভূতে ভর' করেছে বলে ধারণা করি, তাদের সিংহভাগই মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত রোগী। এপিলেপ্সির রোগীরা এমনিতে ভালো থাকে তবে কিছুদিন পরপর তাদের মধ্যে এই রোগের আবির্ভাব ঘটে থাকে, তবে খুব কম সময়ের জন্যে রোগ-অবস্থা হয়ে থাকে, তারপরেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এই রোগ-অবস্থাকেই এপিলেপ্সির ফিট (Epileptic fit) বা খিঁচুনি বা তড়কাও বলা হয়। ফিট শুরু হবার সঙ্গেই রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় এবং সারা দেহের (চোখ, মুখ, বুক, পিঠ, পেট, হাত, পা) মাংশপেশীর প্রবল প্রক্ষেপ বা খিঁচুনি আরম্ভ হয়। ফিটের সময় দাঁতে দাঁত লেগে যেতে পারে এবং জিভে কামড় পড়তে পারে, মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়, কোনো কোনো সময় অসাড়ে প্রস্রাব হয়ে যায়। উল্লেখ করা যায় এপিলেপ্সির সাথে হিস্টিরিয়া রোগের কিছুটা পার্থক্য আছে, যেমন—এপিলেপ্সির ফিট সাধারণত ১ থেকে ২ মিনিট হয়, ফিটের সময় প্রথমে হাত-পা শক্ত হয়ে যায় এবং সারা শরীরে ঝাঁকুনি হতে থাকে, সবশেষে শরীর শিথিল হয়ে যায়, এই ফিটের সময় পুরোপুরি অজ্ঞান হয়ে যায়, প্রায় সময় ফিটের ঘটনাগুলি পর-পর ঘটে থাকে, ঘুমের মধ্যে অথবা জেগে থাকা অবস্থায় ফিট হতে পারে, এই রোগ স্ত্রী-পুরুষ অথবা যে কোনো বয়সের হতে পারে এবং মস্তিষ্কের শরীরভিত্তিক গোলযোগের ফলেই এই ফিট হয়। আর হিস্টিরিয়ার ফিট দীর্ঘস্থায়ী হয়, কোন নির্দিষ্ট সময়ে ফিট হয় না, প্রায় সময়ে এলোমেলো ভাবে হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে, তবে পুরো অজ্ঞান থাকে না, রোগী অনেক সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝতে পারে। ঘুমের মধ্যে বা একা থাকলে ফিট হয় না, লোকজনের সামনেই ফিট হয়। কিশোরী এবং যুবতীদের মধ্যে এ রোগ বেশি দেখা যায় এবং এই রোগে মস্তিষ্কে শরীরভিত্তিক গোলযোগ দেখা যায় না। ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ (Maniac Depresive) হচ্ছে—মানসিক অবসাদ জনিত অসুখ। এ রোগের বেশিরভাগ রোগীই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, শিক্ষা, সহনশীলতা, যুক্তি, মুক্তবুদ্ধির সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ না পাওয়া মানুষ। এরা পারিবারিক জীবনে অসুখী, দায়িত্বভারে জর্জরিত এবং এর দরুন মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্থ। অসুখের সময় এদের স্বাভাবিক চিন্তা-চেতনার ক্ষমতা কমে যায়, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গি (জোরে জোরে মাথা দোলানো, উচ্চস্বরে আবোল-তাবোল বলা, হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করা ইত্যাদি) করে। এ ধরনের অসুখ দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে। মাঝে মাঝে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেও পুনরায় আবার অসুখ ফিরে আসতে পারে।

আর স্কিটসোফ্রেনিয়া (কেউ কেউ একে সিজোফ্রেনিয়া বলে থাকেন) হচ্ছে প্রধানত চিন্তার রোগ (Disorder of thinking)। কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী লক্ষণগত কিছু মিল আছে এমন কয়েক ধরনের গুরুতর কঠিন মানসিক ব্যাধিকে একত্রে স্কিটসোফ্রেনিয়া বলে থাকেন। এখানে আগ্রহুদ্দীপক যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই রোগের শিকার হন আত্মস্থ ধরনের মস্তিষ্কের অধিকারীরা (যারা চিন্তা করতে ভালবাসেন)। তারা কোনো কিছু গভীরভাবে চিন্তা করতে গিয়ে সঠিকভাবে চিন্তার মূলে পৌঁছাতে না পারলে বা বুঝতে গিয়ে ঠিক মত বুঝতে না পারলে, অথবা কোনো সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে সমাধানের পথ না পেলে অতি আবেগপ্রবণতার দরুন সমস্যা থেকে নিজেকে বের করে আনতে না পারলে তাদের মস্তিষ্কের গতিময়তা কমে যায়। তারা আরো বেশি করে নিজেদের চিন্তার মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। ফলে মস্তিষ্কের চালককেন্দ্র (motor centre) এবং সংবেদনকেন্দ্র (sensory area) ধীরে ধীরে কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে থাকে, শ্লথ হতে থাকে, অনড় হতে থাকে। এর ফলে ঐ ব্যক্তিরা প্রথমে বাইরের কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে, তারপর নিজেদের পরিবারের আপনজন থেকে। একসময় নিজেদের সত্তা থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। তখন রোগীর চিন্তা (Thought), আবেগ (Affect), প্রত্যক্ষণ (Perception), ইচ্ছাশক্তি (Will), এবং আচার-আচরণে (Behaviour) ঐক্যহীন বা অসঙ্গতি ধরা পড়ে। রোগী স্নান, আহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, শরীরের যত্ন নেয়া, লাজ-লজ্জার দিকে দৃষ্টি দেয়া—ইত্যাদি ব্যাপারে

একেবারেই উদাসীন হয়ে যায়। স্কিটসোফ্রেনিয়া রোগীদের ইলিউশন, হ্যালুশিনেইশন, ডিলিউশন প্রায়ই ঘটে থাকে। তবে বেশি ঘটে থাকে ডিলিউশন এবং হ্যালুশিনেইশন (auditory hallucination)। যেসকল মুনি-ঋষি, মহাপুরুষ নামধারী স্কিটসোফ্রেনিয়া রোগী আছেন, তাঁরা ডিলিউশন অব ইনফ্লুয়েন্স এবং ডিলিউশন অব গ্র্যান্ডিয়ার-এ বেশি ভোগেন [৮]।

পাঠক, দীর্ঘ আলোচনার পর এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন—মহাপুরুষ, অবতার কখনোই শূণ্য থেকে সৃষ্টি হয় না। এঁদের গড়া হয়—শাসক-শোষক শ্রেণী, তল্পিবাহক বুদ্ধিজীবী, প্রচারমাধ্যম, ভণ্ড-বুজরুকের দল অবতার-মহাপুরুষদের কারিগর; আমরা সাধারণেরা তাঁদের প্ররোচনায় কী ভীষণ প্রতারিত হয়ে চলছি এতদিন! তাই তো ভারতের যুক্তিবাদী আন্দোলনের পুরোধা প্রবীর ঘোষ বলেন, "সকল মহাপুরুষ-অবতার এক একজন হয়তো মানসিক রোগী নয়তো ধান্ধাবাজ অভিনেতা।" এর থেকে বড় সত্য আর নেই।

(২) **অতীন্দ্রিয় অনুভূতি** : পার্থিবজগতের দ্বিতীয় অপার্থিব আলোচ্য বিষয় হচ্ছে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (Extra-Sensory Perception সংক্ষেপে E.S.P)। আমাদের চারপাশের সাধু-সন্ত-অবতার-অধাত্মবাদী-মহাপুরুষসহ বুজরুক-ভণ্ডের দল ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত অনুভূতির কথা বলে সুদূর অতীত থেকে বর্তমানে বেওসা করে আসছেন, অবাস্তব অলৌকিকত্বের স্বপক্ষে প্রচারণা চালিয়ে আসছেন। তাঁদের এ প্রচারণা অনেকসময় আমাদের মতো 'আধ-মরা'দের কাছে সত্য বলে মনে হয়; ধরাধামের ভিতরে-বাইরে অতিলৌকিকতার অস্তিত্ব রয়েছে বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি আর নবকলেবরধারী প্রচারকদের জগৎগুরু ভেবে মনপ্রাণ ঢেলে পূজা করি। পরামনোবিদ্যায় প্রচলিত আছে অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসমূহ হচ্ছে—(i) দূরচিন্তা (Telepathy) (ii) ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি (Precognition) (iii) অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি (Clairvoyance) এবং (iv) জড়পদার্থে মানসিক শক্তি (Psychokinesis বা Pk)।[৯] পাঠক, অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার আগে দেখে নিই এগুলো আসলে ঠিক কী। আমরা সবাই কম-বেশি দূরচিন্তার নাম শুনেছি এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইংরেজি Telepathy শব্দটিই ব্যবহার করে থাকি। সাধারণভাবে এটি হচ্ছে দূর থেকে অন্য একজনের মনের কথা বা চিন্তাকে জানতে পারার ক্ষমতা। ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি হচ্ছে ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা বলে দেয়ার ক্ষমতা, মানে আগামীকাল-পরশু অথবা আরো পরে কোনো নির্দিষ্ট দিন কী ঘটতে পারে—তা আগেভাগে বলতে পারার ক্ষমতাকেই ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি বোঝায়। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি হচ্ছে দূরের কোনো জিনিষ দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা। যেমন:—আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি ঠিক এই মুহূর্তে কি করছেন, তা বলতে পারার ক্ষমতাকেই বোঝায়। আর মনোগতিশক্তি বা জড়পদার্থে মানসিক শক্তি—কোন জড়বস্তুকে নিজের ইচ্ছেমত গতিশীল করা, অবস্থার পরিবর্তন করা অথবা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে কয়েকটি কথা বলে নিই। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান সবসময়ই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই কোন কিছু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে, বুঝে থাকে, গ্রহণ বা বর্জন করে থাকে। প্রযুক্তির প্রবল জোয়ারে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানদণ্ডগুলি সর্বজনীন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে দেখা যায়, ধর্মবাদিরা, অতিলৌকিকতার রক্ষককেরা নিজেদের ভণ্ডামোকে এখন বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রচার করতে চান, বিজ্ঞানের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাকে অলৌকিকতা দিয়ে পূর্ণ করতে চান। কারণ কেন যেন জনগণ বাসি অলৌকিকতাকে আগের মত খায় না। অলৌকিকতার সাথে বিজ্ঞানের কিছুটা মিশ্রণ থাকলে আম-পাবলিক চেটেপুটে খায়। তাই ধরাধামের বিধাতারা আজকে ধর্মের (অপার্থিবতার) সাথে বিজ্ঞানের খিচুরি পাকিয়ে জনগণের সামনে উপস্থাপন করে চলছেন অনবরত। আগেকার নির্ভেজাল 'যন্তর-মন্তর'-এর কার্যকারিতা ফুরিয়ে গেছে। যা হোক, ইদানীং এ অতিন্দ্রীয় অনুভূতি নামধারী কুসংস্কারকে বিজ্ঞানের মোড়কে হাজির করা হচ্ছে, নাম দেয়া হয়েছে পরামনোবিদ্যা।[১০] বিজ্ঞানের নাম ভাঙিয়ে অপবিজ্ঞানের চর্চার উদাহরণ তো

আর এ বিশ্বে কম নয়। এ উপমহাদেশের বহুল প্রচারিত ভয়ঙ্কর অপবিজ্ঞান জ্যোতিষিবিদ্যার মতোই পরামনোবিদ্যা একটি নতুন সংযোজন মাত্র।

এবার মূল আলোচনাতে আসি। (i) দূরচিন্তা, নাম শুনেই বোঝা যায় বিষয়টা কী। পরামনোবিদ্যার ঝাণ্ডাধারী বিজ্ঞানী-মহাপুরুষ-পুরুতদের দীর্ঘদিনের তুরুপের তাস হল এই দূরচিন্তা। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে,—আমরা যখন চিন্তা করি, তখন মস্তিষ্ক থেকে রেডিও তরঙ্গের মতো এক ধরনের তরঙ্গ প্রবাহিত হতে থাকে; দূরের কোনো লোকের পক্ষে তার মস্তিষ্কের সাহায্যে এই তরঙ্গকে ধরে প্রেরকের চিন্তার হদিস পাওয়া সম্ভব, যদিও কাজটা একটু কঠিন। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে, শব্দ বা আলোক তরঙ্গ নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক, গতি, মাত্রায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং আমরা প্রয়োজন মত সেগুলো মাপতে পারি (যেমন, শব্দের গতি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩৩২ মিটার আর আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল)। রেডিও-টেলিভিশন এই শব্দ-তরঙ্গ ও আলোক-তরঙ্গকে ধরে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করে এবং পুনরায় আমাদের সামনে দৃশ্য ও শব্দ হিসেবে উপস্থাপন করে। কিন্তু 'চিন্তা' যে তরঙ্গ, এবং অন্য আরেক ব্যক্তির মস্তিষ্ক "গ্রাহকযন্ত্র" হিসেবে কাজ করতে পারে তা শুধু কল্পনাতেই রয়ে গেছে, বাস্তবে প্রমাণিত হয়নি (পরামনোবিদ্যার ধারকেরা পর্যন্ত চিন্তা-তরঙ্গকে প্রমাণ করতে সক্ষম হননি)। তাই এই অস্তিত্বহীন চিন্তা-তরঙ্গকে ধরা এবং ভাব বুঝতে পারা নেহাতই অবাস্তব কল্পনা মাত্র। প্রাণির (বিশেষ করে মানুষের) মস্তিষ্কের একটি অংশ প্রিফ্রন্ট্যাল লোব (Prefrontal lobe), মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সাথে জটিল ও স্বাভাবিক যোগাযোগের মাধ্যমে, প্রাণির চিন্তা-বিচার-বুদ্ধি-মেধা ইত্যাদির বিকাশে কাজ করে থাকে এবং নিয়ন্ত্রণও করে থাকে। কিন্তু কোনো কারণে অপুষ্টি অথবা কোনো রোগের ফলে যদি এই অংশের অসম্পুর্ণ বিকাশ ঘটে, তবে প্রাণির মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ নাও হতে পারে, বিভিন্ন ধরনের মানসিক অস্বাভাবিকত্ব দেখা দিতে পারে। এই লোব থেকে চিন্তা কোনো ধরনের তরঙ্গ আকারে নির্গমন হচ্ছে—(এবং তাতে টেলিপ্যাথির কাজ হচ্ছে) বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত আবিষ্কার করেননি, বা এই ধরনের কোনো দাবিও করেননি। তাছাড়া এই ধরনের তরঙ্গের অস্তিত্ব এক প্রকারে অসম্ভবও। স্নায়ুবিজ্ঞান বলে—শব্দশক্তি বা আলোকশক্তির মতো চিন্তা কোনো শক্তি নয়, ভেসে বেড়াবার বস্তু নয়—স্নায়ুক্রিয়ারই একটি ফল মাত্র। এরপরও কিছু ব্যক্তি (বিশেষ করে পরামনোবিদরা) বিভিন্ন সময়ে টেলিপ্যথির সফল পরীক্ষা চালিয়েছেন বলে জোর গুজব রয়েছে। এ সকল গুজবের মধ্য থেকে একটি মাত্র উদাহরণ তুলে ধরছি এখানে— ১৯৫৯ সালের ২৫ জুলাই ড. জে বি রাইন দাবি করেন, তিনি টেলিপ্যাথির সাহায্য ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন 'ন্যাটিলাশ'-র খবর পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন। এবং তাঁর এ পরীক্ষার সাথে যুক্ত ছিলেন আমেরিকার বিমানবাহিনীর সদস্য উইলিয়াম বাওয়ার। পরীক্ষার সময় ন্যাটিলাশ ছিল না-কি ১২০০ মাইল দূরে জলের তলায়। ড. রাইনের এ বক্তব্যের সত্যতা যাচাই-বাছাইয়ে সময় নষ্ট না করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমগুলো পড়ি-মরি করে বাজাতে লাগল পরামনোবিদ্যার দিগ্বিজয়ের দামামা। সাধারণ মানুষ থেকে বুদ্ধিজীবি পর্যন্ত সকলেই এ স্টান্ট নিউজের কবলে পড়ে বিভ্রান্ত হতে লাগলেন। কিন্তু সত্য তো আর বেশি দিন চাপা থাকে না। ১৯৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের *দিস উইক* পত্রিকার তরফ থেকে যখন টেলিপ্যাথির ওপর রিপোর্ট ছাপাতে তথ্য সংগ্রহ করতে গেল, তখনি বেড়িয়ে এল "কেঁচো খুঁড়তে সাপ"। ন্যাটিলাশ সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন উইলিয়াম অ্যান্ডারসন পরিষ্কার করে জানান, ১৯৫৯ সালের ২৫ জুলাই ন্যাটিলাশ ছিল ডকে, কিছু সারাইয়ের কাজ চলছিল। আর আজ পর্যন্ত টেলিপ্যাথির কোনো পরীক্ষা ন্যাটিলাশে চালানো হয়নি। এরপর *দিস উইক* পত্রিকাটি যখন টেলিপ্যাথির সঙ্গে যুক্ত বলে কথিত মার্কিন বিমান বাহিনীর উইলিয়াম বাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করল, তিনিও জানালেন—টেলিপ্যাথির কোনো পরীক্ষার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন না এবং ৫৯ সালের ২৫ জুলাই তিনি ন্যাটিলাশে ছিলেন না, বরং ছিলেন বিমান বাহিনীর বিশ্ববিদ্যালয়ে। হায়রে দুনিয়া! চাপার জোর থাকলে যে, কত কিছুই করা সম্ভব, তারই নমুনা

এটি। টেলিপ্যাথি নিয়ে আরো প্রতারণামূলক খবর জানতে, আগ্রহীরা পড়ুন : প্রবীর ঘোষ, *অলৌকিক নয় লৌকিক* (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৪৯-১৭১। এবং ভবানী প্রসাদ সাহু, *ভূত ভগবান শয়তান বনাম ড. কোভুর*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১২১-১২৬।

(ii) প্রায় সব ধর্মের অবতার, জ্যোতিষী, মহাপুরুষ ইত্যাদি লোকেরা ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে বলে জাহির করে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করতে পারেনি যে ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি বলে কারো কোনো ক্ষমতা রয়েছে, বরং যারাই সাহস করে এই ক্ষমতার পরীক্ষা দিতে গেছে, তাদের বুজরুকি হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় কীভাবে এই বুজরুকের দল ভবিষ্যতের বক্তব্য বলে? আসলে বিষয়টি তেমন কিছুই না—পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী আর বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ করে কয়েক বছর পর কি ঘটতে পারে, তার একটা আভাস সবসময়ই পাওয়া যায় (বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিক, কলাম লেখকেরা এরকম প্রতিনিয়তই করে আসছেন); কোনো কোনো সময় এই আভাস বা অনুমান সম্ভাব্যতার নিয়মে (Law of Possibility) মিলে যায় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা মিলে না। পাঠক, আপনার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে তাকান, এরকম ঘটনা প্রচুর খোঁজে পাবেন। প্রায়শঃই দেখা যায়, ধর্মীয়গুরু যখন কোনো বিষয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রদান করেন এবং সেই বাণীটি ব্যর্থ হয় তখন আমরা ভুলে যাই, ধর্মীয়গুরুর ভুল হিসেবে স্বীকার করতে চাই না। কিন্তু কোনো কারণে যদি একবার ভবিষ্যদ্‌বাণীর কিঞ্চিৎ পরিমাণ মিলে যায়, তখন আমরা ঢাক-ঢোল নিয়ে বের হয়ে যাই গুরু-বন্দনা করতে করতে। অথচ নির্মোহ হয়ে হিসেব করলে দেখা যাবে, মহাপুরুষদের ভবিষ্যদ্‌বাণী (যা আপনি-আমি সক্কলেই কম-বেশি ধরি মাছ, না ছুঁই পানি—ধরনের বক্তব্য দিতে পারবো) বাস্তবে রূপান্তরিত হওয়ার পরিমাণ বা মিলে যাওয়ার সংখ্যা থেকে না-মিলে যাওয়ার সংখ্যা হাজার হাজার গুণ বেশি। তবে গুরুর প্রতি আমাদের অন্ধভক্তি-বিশ্বাস উবে গেলে, পাপে নিমজ্জিত হওয়া ও পরকালে নরক যাওয়ার ভয়ে না-মিলা ঘটনাগুলো কাউকে বলি না; চাপা দেই নিজের স্মৃতিভাণ্ডারে। এখানে প্রাসঙ্গিক যে, উপমহাদেশের যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ ড. আব্রাহাম থোম্মা কোভুর আমাদের জানিয়েছেন—একজন সফল (ধুরন্ধর) ধর্মগুরু/অবতার/পয়গম্বর/পিরবাবা হওয়ার জন্য কী কী গুণ/কৌশলের প্রয়োজন[১১]; —**প্রথমত**, প্রয়োজন কিছু অর্থহীন গালভরা বুলি উপযুক্ত দক্ষতার সঙ্গে ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে তোতাপাখির মত আউরে যাওয়ার ক্ষমতা—যেমন, আত্মমুক্তি, আত্মারশুদ্ধি, আত্মোপলব্ধি, ত্যাগ, তিতিক্ষা, পরমপ্রাপ্তি, দৈবশক্তি, অতীন্দ্রিয় মানস, কর্মযোগ, মোক্ষ, নির্বাণ ইত্যাদি। **দ্বিতীয়ত**, ম্যাজিসিয়ানসুলভ কয়েকটি লোক ঠকানো কৌশল আয়ত্ত করা; যেমন শূণ্যে হাত নেড়ে ফুল, সুগন্ধিযুক্ত ছাই, সন্দেশ বের করা, নিজের নাড়ী 'বন্ধ' করে দেওয়া, কারো পোশাকের ভিতরে কি আছে অথবা বাড়িতে কি ঘটেছে তা আচমকা বলে দিয়ে চমকে দেওয়া ইত্যাদি। পাশাপাশি এসবের সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত বা উদাস চাউনি, এলোমেলো পোশাক, পাগল-পাগল ভাব, কিছু অস্বাভাবিক আচরণ যেমন নিজের মল-মূত্র খেয়ে ফেলা বা এই ধরনের অস্বাভাবিক কোনো কিছু, আর কথাবার্তার মধ্যে যদি আকর্ষণীয় উপস্থাপনভঙ্গি থাকলে তো আর কথাই নেই! **তৃতীয়ত**, যা সবচেয়ে দরকারী তা হল কিছু প্রচারক দালাল। এরা ঐ ধর্মগুরু/অবতার/পয়গম্বরের মাহাত্ম সম্পর্কে নিজের ও অন্যদের (অর্ধসত্য-সম্পূর্ণ মিথ্যা) অভিজ্ঞতার কথা মুখে-মুখে, সংবাদপত্র-রেডিও-টেলিভিশন ইত্যাদি প্রচারযন্ত্রে, তাদের গল্প-কবিতা-উপন্যাস ইত্যাদি 'সাহিত্য-কীর্তির' মাধ্যমে রগরগে ভঙ্গিমায় প্রচার করবে। একাজ করার জন্য কখনো তাদের সাথে আর্থিক ভাগবাঁটোয়ারার চুক্তি করতে হবে অথবা কৌশলী আচরণে ওদের মধ্যেও সরল-নির্বোধ বিশ্বাস জন্মাতে হবে (অর্থাৎ পটাতে হবে)। **চতুর্থত**, প্রয়োজন বিপুল সংখ্যক সরল-বোকা-অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত-যুক্তিবুদ্ধিহীন-অসহায়-নির্বোধ ধর্মবিশ্বাসীর দল। যারা প্রণামী, নৈবদ্য ও সরল বিশ্বাস নিয়ে পয়গম্বর/অবতার/পিরবাবার ব্যবসাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলবে নির্দ্বিধায়। আমাদের চারপাশের গরীব দেশগুলিতে এরকম অসহায় লোকের তো অভাব নেই বরং ওদের সংখ্যাই বেশি। ড.

কোভুরের সাথে একমত পোষণ করে ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু আরেকটি কৌশলের কথা বলেছেন; তিনি বলেন—**পঞ্চমত**, অবতার/পয়গম্বর/পিরবাবার লোকঠকানো ধর্মব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত বিপুল পরিমাণ অর্থের কিয়দংশ স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল ইত্যাদি নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কাজে অথবা দুর্যোগ পীড়িত সাধারণ মানুষের ত্রাণকার্যে ব্যবহার করতে হবে। এতে করে বিপুল পরিমাণ সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের আস্থা, সম্মান, সহানুভূতি, সম্ভ্রম আদায় হয়; যা ঐ ধর্মব্যবসা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে অত্যাবশ্যকীয়। আশা করি পাঠকের চারপাশে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মিশনারি কাজকারবার দেখে উদাহরণের অভাব হবে না। আর আমাদের (বিশেষ করে বাঙালিদের মধ্যে) একটি মারাত্মক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গুজবে কান দেয়া[১২]; মূল ঘটনা কী, সেটা ভালোভাবে খোঁজ-খবর না করে "যাহা রটে তা কিছু কিছু বটে"—ধরে নিয়ে "চিলের পিছনে" ছুটতে থাকি। আমাদের এই ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত প্রপাগান্ডায় সম্পূর্ণ মিথ্যার বেসাতি দ্বারা তৈরি অলৌকিকতার প্রচার হয়, আর সাধারণ লোকে "বেশি লোক বলাবলি করছে দেখে"—বিশ্বাস করে, সত্যি বলে ধরে নেয়।

এখন আমরা দেখি, কী করে একজনের মুখ দেখে তার সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা যায়[১৩]; অনেক সময় তা প্রায় মিলেও যায়। এ কাজটি সবচেয়ে বেশি করে থাকেন ধর্মগুরু/জ্যোতিষি/পিরবাবা/পয়গম্বর ইত্যাদি কিসিমের লোকেরা। প্রথমেই স্পষ্ট করে বলে নিই,—ওঁদের এই বলার মধ্যে নেই কোনো অলীক ক্ষমতা, স্রেফ আছে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, মানুষকে যাচাই করার ক্ষমতা, আর উপস্থিত বুদ্ধি। তো এবার একজন ব্যক্তির চরিত্র বিশ্লেষণ করা যাক;—যার সম্পর্কে বলবেন, তার মধ্যে সর্বপ্রথম আপনার প্রতি আস্থা জন্মাতে হবে, এজন্য কিছু (প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক) ভালো ভালো কথা সুন্দর করে গুছিয়ে উপস্থাপন করতে হবে (কখনোই জটিল কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ শুরু করবেন না), পাশাপাশি কৌশলে ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা, কর্মক্ষেত্র, পরিবারের অবস্থা, বিবাহিত না অবিবাহিত, পছন্দনীয় বিষয়, শখ ইত্যাদি জেনে নিতে হবে (সবকিছু না জানলেও ক্ষতি নেই), পরিমিত মাত্রায় হাসতে হবে, ব্যক্তির মনযোগ আপনার প্রতি নিবদ্ধ করার জন্য এগুলো করতে হবে এবং ব্যক্তির চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হবে। ব্যক্তি যদি গড়-মধ্যবিত্ত ধরনের বলে মনে হয় (অর্থাৎ পোশাক, চেহারা, চুলের স্টাইল ইত্যাদি দেখে এরকমই লাগে), তবে তাকে এভাবে বলুন:— "আপনার মানুষ চেনার ক্ষমতা সহজাত, আপনি সবার জন্যই কিছু করতে চান বিশেষ করে আপনার পরিবারের জন্য; এবং আপনি সুযোগ মত করেনও, তবে এর বিনিময়ে তাঁদের কাছ থেকে আশানুরূপ কৃতজ্ঞতা-অভিনন্দন পান না এবং পাবেন না। কর্মক্ষেত্রেও আপনার একই অবস্থা; প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বারে বারে বঞ্চিত হচ্ছেন। আপনার বন্ধুদের মধ্যে শুভার্থী যেমন আছেন, তেমনি ঈর্ষাপরায়ণও কেউ কেউ আছেন। তাদের কাছ থেকে আপনাকে সাবধান থাকতে হবে। আপনি বহু অর্থ সমস্যাতে নানা সময়ে ভুগেছেন এবং শেষ পর্যন্ত উদ্ধারও পেয়েছেন। আপনার বিভিন্ন বিপদে প্রত্যাশিত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রত্যাশিত পরিমাণ সাহায্য পান নাই বরং অনেক সময় অপ্রত্যাশিত ব্যক্তিও আপনাকে সাহায্য করেছেন এবং আগামীতে করবেনও।" আমাদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—অন্যের মুখ থেকে প্রশংসা শুনলে আমরা খুশি হয়ে উঠি; এই প্রশংসার বিষয় সত্যি না হলেও কিছু যায় আসে না, আমাদের ক্ষেত্রে তা সত্যি বলে ধরে নিই। "সংসারের জন্য, কর্মক্ষেত্রের জন্য যতই করুন না কেন, যতটা সম্মান আপনার প্রাপ্য ততটা পাচ্ছেন না"—এই ধরনের কথাটা শুনতে নারী-পুরুষ সকলেই ভালোবাসে এবং সবসময় মনে করে সে প্রাপ্য সম্মানের কিছু কম পাচ্ছে কিংবা তার সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না ইত্যাদি। আর মধ্যবিত্ত রোজগারি ব্যক্তি যে নানা সময়ে আর্থিক সমস্যাতে পড়বেই এবং উৎক্রান্ত হবে, সেটা বলাই বাহুল্য। আমরা প্রত্যেকেই দেখেছি, বিপদে পড়লে অনেক সময় নিকট পরিচিত/কাছের বন্ধু পিছুটান দেয় এবং অর্ধপরিচিত ব্যক্তি বা বন্ধু এগিয়ে আসে। এটা সবার ক্ষেত্রে কম-বেশি ঘটে থাকে। শিক্ষিত, সুন্দরী নারী সম্পর্কে বলতে হলে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন—"আপনার কাছে অনেকেই প্রেম নিবেদন করেছেন এবং বেশিরভাগকে আপনার

যোগ্য বা পছন্দ হয়নি।" কিংবা একটু ঘুরিয়ে বলতে পারেন, "আপনার গুণমুগ্ধ পুরুষের সংখ্যা অনেক।" বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত, সুন্দরী-অর্ধসুন্দরী নারীর জীবনে একাধিক পুরুষের আবির্ভাব প্রায় ধ্রুবসত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরুষদের দেখেও এরকম প্রেমের কথা বলে দেয়া সম্ভব; সুদর্শন, স্মার্ট, বাকপটু কিংবা লোফার মার্কা ছেলেদের জীবনেও একাধিক নারী আসাটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

যাঁকে দেখে রাগী বলে অনুমান করবেন, তাঁর সম্পর্কে বলতে পারেন,—"আপনি সাধারণতঃ সহজ-সরল পথে চলতে ভালোবাসেন, কিন্তু প্রয়োজনে বাঁকা পথও ধরতে পারেন। আপনি রেগে গেলে সাংঘাতিক হয়ে ওঠেন কিন্তু কখনোই বুদ্ধির বিভ্রম ঘটে না।" দেখবেন যাঁর সম্পর্কে বলেছেন, খুশিতে তিনি একদম বাক-বাকম হয়ে যাবেন, তখন আপনি গুণমুগ্ধ শ্রোতার চোখে, শ্রোতার প্রচারে অন্যদের চোখেও হয়ে উঠবেন দারুণ ভবিষ্যদ্বক্তা। আসলে তোষামোদে সকলেই খুশি হয়, নিজের সম্বন্ধে ভালো কথা শুনলে মনের মধ্যে খুশির জোয়ার চলে আসে এবং না-মেলা কথাগুলো একদমই ভুলে যাই। আবার ব্যক্তি যদি ধনী হন (অর্থাৎ পোষাক-পরিচ্ছদ, চেহারা, গলায় চেন, হাতে আঙটি ইত্যাদি দেখে মনে হলে), তবে বলুন, "আপনার মানুষ চেনার ক্ষমতা অসাধারণ, আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ়চেতা। অনেকে আপনাকে ঈর্ষা করে এবং অনেকেই আপনাকে শ্রদ্ধা করে। অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন সহজেই। জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মোকাবেলা করেছেন, এমনিতে মানুষের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক আছে কিন্তু প্রয়োজনে রূঢ় হতেও জানেন। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব আছে, প্রায়ই বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় না, তবে নিত্য নতুন বন্ধুর আগমন হয়। ইত্যাদি।" ধনীব্যক্তি ব্যবসায়ী হলে (সবার জীবনেই কম-বেশি) তো লাভ-লোকসান আছেই অর্থাৎ ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবেলা করতেই হবে। এছাড়া ব্যবসায়ী ব্যক্তি কিংবা রাজনীতিবিদকে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করতেই হবে, এবং এক ধাপ উত্তরণের সঙ্গেই পুরানো অনেকেই বিদায় নেন। ধনীব্যক্তিকে অনেকে (বিশেষ করে গরীব আত্মীয়-স্বজনেরা) ভয় পেয়ে শ্রদ্ধা করে আর প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক ধনী ঈর্ষা করতেই পারে।

এভাবে মানুষের নানা শ্রেণিবন্যাসের ওপর নির্ভর করে এমনি কত কিছুই যে ঠিক-ঠাক বলে দেওয়া যায়, সে নিয়ে একটা মহাভারত রচনা করা যাবে। আমাদের আশেপাশের ভণ্ড-বুজরুক জ্যোতিষী/পির/মহাপুরুষ কথিত অলীক কারসাজি ব্যতিরেকে এরকমই মনুষ্যচরিত্র বুঝে বা আন্দাজ করে নানা বক্তব্য দিয়ে থাকে। যা অনেক ক্ষেত্রে মিলে যায়, অনেক ক্ষেত্রে যায় না। না মিললে বয়েই গেল। যাদের মেলে, প্রচার তো তারাই করে। অতএব "মা ভৈ"! কিন্তু আপনি যদি কোনো জ্যোতিষী/পির/মহাপুরুষকে কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেন নির্দিষ্ট করে উত্তর দিতে, যেমন—বিখ্যাত জীবিত অমুক ঠিক কোন্ দিন মারা যাবে, অমুকের সাথে কার বিয়ে হবে, কতটি সন্তান হবে, অমুকের ব্যাঙ্ক একাউন্টে ঠিক কতো টাকা আছে ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করেন (যদি ইনফরমার মারফত জানার সুযোগ না থাকে), তবে দেখবেন ঐ জ্যোতিষী/পির/মহাপুরুষ নির্ঘাত পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইবেন না; আর বেশি চাপাচাপি করলে চালাকি করে এমন ভাসাভাসা উত্তর দিবেন যে—মিলতেও পারে আবার নাও মিলতে পারে।

(iii) অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দাবিদারদের মতে, ক্লেয়ারভয়ান্স (Clairvoyance) শক্তির সাহায্যে বহু দূরের ঘটনা দেখা ও শোনা সম্ভব। প্রায়ই বিভিন্ন পির/মহাপুরুষেরা এমনটা দাবি করে থাকেন তাদের ভক্তদের কাছে। পাঠকের বোঝার সুবিধার জন্য প্রবীর ঘোষের বই[১৪] থেকে একটি ছোট্ট উদাহরণ তুলে ধরছি;—কলকাতার এক প্রবীণ সাংবাদিক এক বাঙালি তান্ত্রিকের পরম ভক্ত। ঐ সাংবাদিক বিদেশে একবার অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য কয়েকদিন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। ফিরে এসে ঐ সাংবাদিক

যখন তাঁর গুরুর কাছে ঘটনাটি বললেন, তিনি বললেন, "ওরে সে আমি দেখেছি। তোর ঘরে যে নার্স মেয়েটি ফুল রেখে যেত, সে বড় ভালোরে।" তান্ত্রিকবাবার ঐ এক কথাতেই বাজিমাৎ। সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণ সাংবাদিক বিশ্বাস করে ফেললেন, তান্ত্রিকবাবার নির্ঘাত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে। নয়তো গুরুজী বললেন কীভাবে, সাংবাদিকের কেবিনে রোজ নার্স ফুল রেখে যেত, সে বড় ভালো। আসলে ঐ সাংবাদিকের মধ্যে গুরুভক্তি এতোই প্রবল ছিল যে, গুরুর মুখ থেকে শোনার পর তাঁর মধ্যে আর যুক্তিবোধ কাজ করেনি। তিনি গুরুর কথাকেই পরমসত্য (Absolute truth) বলে ধরে নিলেন। কিন্তু আন্তর্জাতিকমান সম্পন্ন যে কোনো হাসপাতালের কেবিনের ফুলদানিতে ফুল থাকে, আর নার্সের কাজ তো রোগীদের সাথে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা করা—এটুকুই জানা থাকলেই যে এ ধরনের কথা বলা যায়, তা ঐ সাংবাদিকের মতো অন্ধবিশ্বাসীকে কে বোঝাবে? আবার ধরুন, আপনি বা আমি অন্য একজন ব্যক্তি সম্পর্কে মোটমুটি জানি, যেমন,—ঐ লোকটি কখন-কোথায় যাতায়াত করেন, রাতে কখন ঘুমাতে যান, কী ধরনের খাবার পছন্দ করেন, কী ধরনের পোষাক পড়তে ভালোবাসেন, কী ধরনের বই পড়েন, কখন পড়েন, কার-কার সাথে ভালো সম্পর্ক আছে, কার-কার সাথে খারাপ সম্পর্ক আছে, অবসর পেলে তিনি সাধারণত কী করেন, পরিবারে কে-কে আছে, তাঁরা কী করেন ইত্যাদি। তাহলে, আমরাও সময়-সুযোগমতো ঐ লোকটি সম্পর্কে এমন কিছু বলে দিতে পারবো, যা সত্যিই মিলে যাবে; অথবা উপস্থিত সময়ে আচরণ বিশ্লেষণ করেও কিছু-কিছু বলে দেয়া সম্ভব, যা মিলে যেতে পারে। আর ঐ লোকটির মধ্যে যদি অলৌকিকতার প্রতি গভীর বিশ্বাস থাকে, তবে তো তিনি নির্ঘাত ধরে নিবেন—আমাদের মধ্যে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি আছে! বন্ধু-বান্ধবের সাথে স্রেফ মশকারা করার জন্য (অলৌকিকতা প্রচারের জন্য নয়) এরকম খেলা আমরা সবাই কম-বেশি করেছি নানা সময়। দেখছি—সবচেয়ে ভালো হয়, খুব কাছের বন্ধুকে এরকম খেলা না দেখিয়ে (কারণ সেও আপনার সম্পর্কে কম-বেশি জানে, ফলে ঐ বন্ধুকে আর বিস্মিত করা যাবে না) একটু অল্প-অর্ধ পরিচিত লোক সম্পর্কে আগেই অন্য কারো (অন্য বন্ধু-বান্ধব) মারফত জেনে নিয়ে, ঐ অল্প-অর্ধ পরিচিতের সামনে হুট-হাট বলে দিলে তাঁর আর বিস্ময়ের সীমা থাকে না; তখন খেলাটা জমে ভালো।

আসলে ঐ টেলিপ্যাথিই বলেন, ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টিই বলেন আর অতীন্দ্রিয়দৃষ্টিই বলেন, এই সকল তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় যারা দেয় বা দাবি করে, তারা নিজেদের বুদ্ধিদীপ্ত অনুমান, বিশ্লেষণ এবং মাঝে মাঝে কিছু লৌকিক কৌশল প্রয়োগ করে বলে মাত্র—এগুলির কয়েকটি মিলেও যেতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটির মধ্যে বিন্দুমাত্র ঐশ্বরিক কোনো ক্ষমতা নেই। সত্যি কথা হচ্ছে, আমরা সাধারণ জনগণ "মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ-উপস্থিত বুদ্ধি খাটুনির কৌশল" জানি না বলেই, অন্যের মুখ থেকে নিজের সম্পর্কে দু-একটা বক্তব্য মিলে গেলে ধান্দায় পড়ে যাই। তা পাঠক, এই যে লৌকিক কৌশলের কথা বললাম সেটা কী; এটা হচ্ছে আশেপাশের ম্যাজিসিয়ানরা সচরাচর দর্শকদের জাদু দেখিয়ে তুষ্ট করার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করে থাকে, সেটাই। একটা উদাহরণ দেই,—প্রচলিত আছে, ইজারাইলি বিমান বাহিনীর সাবেক সদস্য, বর্তমানে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতারঝাণ্ডাধারী ইউরি গেলার এবং তাঁর গডফাদার ডক্টর আন্দ্রিজা পুহারিচ না-কি অনেক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে এসে সবাইকে তাজ্জব করে দিয়ে তাঁদের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির প্রমাণ দিয়ে গেছেন! শোনা যায় ইউরি গেলার সীল দিয়ে বন্ধ করা একটা মোটা খামের ভিতর রাখা ছবির বর্ণনা প্রতিবারই সঠিক দিয়েছেন। খামটিকে এমন পুরু করে রাখা হয়েছিল যাতে তীব্র আলোর সামনে খামটিকে ধরলেও ভিতরের ছবি ফুটে না ওঠে। চমকে যাওয়ার মতো বিষয়, কীভাবে সম্ভব। কিন্তু ম্যাজিসিয়ানদের কাছে ঐ বিষয়টি আসলে কিছুই না। গেলার যা করতেন তা হলো, দর্শকদের দৃষ্টির আড়ালে সীল করা খামটি ডুবিয়ে দিতেন অ্যাবসিলিউট অ্যালকোহল বা রিফাইন্ড স্পিরিটে। এতে সামান্য সময়ের জন্য খামটা স্বচ্ছ হয়ে যায়, এবং ভেতরের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দর্শকদের চোখের আড়ালে খামের ওপরে চোখ বুলিয়ে নিলেই হয় তখন। তারপর একটু সময় পর যখন ঐ অ্যাবসিলিউট অ্যালকোহল

বা রিফাইন্ড স্পিরিট উবে গিয়ে আবার অস্বচ্ছ হয়ে গেল তখন অলৌকিক কোনো কাজ করছি এমন একটা "ভাব" নিয়ে খামের ভিতরে রাখা ছবির বর্ণনা দিতেন। ব্যাস। আবার ইউরি গেলারের ম্যানেজার Yasha Katz গোপন খবর ফাঁস করে দিয়ে জানিয়েছেন, আগের পদ্ধতিটি ঠিক মতো ব্যবহার করা সম্ভব না হলে, এই Katz-ই কৌশলে গোপন খামগুলো খুলে তার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অনুষ্ঠানের আগেই গেলারকে জানিয়ে রাখতেন। এরপর অনুষ্ঠান শুরুর পর গেলার ভাব নিয়ে ছবির বর্ণনা দিতেন।

(iv) লোকমুখে প্রচলিত আছে, মানসিক বা চিন্তাশক্তির "অলৌকিক" ক্ষমতার মাধ্যমে কোনো জড়বস্তুকে স্থির কিংবা গতিশীল করা, কোনো ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করা বা কোনো বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন করা যায়। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেও রয়েছে এ নিয়ে নানা নিশান আর সাথে-সাথে বিভিন্ন মহাপুরুষ/পিরের জীবনীতেও জড়িয়ে রোমাঞ্চকর সব ঘটনার কথা। বিশেষ করে মানসিক শক্তি দিয়ে রেলগাড়ি আটকে দেয়ার 'গপ্পো' অনেকের কাছেই বোধহয় নতুন নয়। মনে আছে ছোটবেলায় ভারতের এক মহাপুরুষের জীবনী নিয়ে তৈরি এক বাংলা সিনেমাতেও এরকম ঘটনা দেখেছি। তখন বিষয়টি বিশ্বাসও করে ফেলেছিলাম। ভাবতাম, সাধু-সন্ন্যাসী-পিরদের নিশ্চয়ই এরকম নানা অলৌকিক ক্ষমতা আছে। বিশেষ করে, হিন্দুধর্মের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে এরকম প্রচুর সাধু-সন্ন্যাসীর বর্ণনা আছে, মানসিক শক্তির দ্বারা তাঁরা যখন খুশি-যেখানে খুশি চলে যেতে পারেন, যাকে খুশি ইচ্ছেমত শরীরের পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে পারতেন। যেমন—পদ্মপুরাণে আছে মুনি গৌতম একবার বাহির থেকে এসে দেখলেন, তাঁর স্ত্রী অহল্যা আর দেবরাজ ইন্দ্র ফষ্টিনষ্টি আর রমণে লিপ্ত। মুনি গৌতমের সহ্য হল না; তিনি অভিশাপ দিলেন, অহল্যা পাথর হয়ে গেল আর দেবরাজ ইন্দ্রের সর্বাঙ্গে হাজারটি ভগ (যোনি) উৎপন্ন হল! এজন্যই হয়তো হিন্দুরা ইন্দ্রকে "ভগবান" বলে থাকে!; আবার আরেক ধর্মাবলম্বিদের মধ্যে প্রচলিত আছে তাঁদের ধর্মের শেষ মহাপুরুষ একবার বিধর্মীর কাছে নিজের প্রচারিত ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য আঙুলের ইশারায় চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছিলেন! যাহোক—আধুনিককালে বিজ্ঞানের পরিচিত শক্তিগুলোর মধ্যে আছে বিদ্যুৎ শক্তি, চৌম্বক শক্তি, শব্দ শক্তি, আলোক শক্তি ইত্যাদি। এগুলোকে আমরা দৈনন্দিন ব্যবহারে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে আসছি। কিন্তু অদ্যাপি মানসিক শক্তি বা চিন্তা শক্তির খোঁজ বিজ্ঞানের জানা নেই; সহজ কথা হচ্ছে বিজ্ঞান এর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। অর্থাৎ বিজ্ঞানের অন্যান্য শক্তির মতো চিন্তাশক্তির মাধ্যমে আমরা বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালাতে পারব না, পারব না বৈদ্যুতিক ফ্যান চালাতে, পারবো না কোনো মোটরগাড়ি-সাইকেল থামাতে বা চালাতে, সম্ভব নয়—একটি চামচ বাঁকিয়ে দেয়া, একটি গাড়িকে শূন্যে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দেয়া ইত্যাদি। আগেই উল্লেখ করেছি, চিন্তা হলো প্রাণির মস্তিষ্কের স্নায়ুক্রিয়ার ফল। এবং এই স্নায়ুক্রিয়ার মাধ্যমে শুধুমাত্র স্বদেহেরই রক্তের চাপ বাড়তে পারে-কমতে পারে, মাথা গরম হতে পারে, হজমে গোলমাল হতে পারে, হাঁপানি বেড়ে যেতে পারে-কমতে পারে, দাঁতের ব্যথা, আলসার হতে পারে, ঘুম কম-বেশি হতে পারে, ক্ষুধামান্দ্য দেখা দিতে পারে ইত্যাদি। আর এগুলো হওয়ার কারণ হচ্ছে,—এ বিষয়গুলি সরাসরি আমাদের শরীরের অভ্যন্তরীণ স্নায়ুতন্ত্রের জটিল গঠন-ব্যাপ্তির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু কোনোভাবেই শরীরের বাইরে কোনো কিছুকেই চিন্তাশক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না; কারণ এটি শরীরের বাইরে প্রবাহিত হয় না। অধুনা বিভিন্নজনের সম্পর্কে শোনা যায়, তারা না-কি এই মানসিক বা চিন্তাশক্তি দিয়ে ধাতব চামচ বাঁকিয়ে দিয়েছেন, চলন্ত ট্রেন থামিয়ে দিয়েছেন, কেবল-কার থামিয়ে দিয়েছেন, লিফট থামিয়ে দিয়েছেন, চলন্ত স্টিমারও থামিয়ে দিয়েছেন। এগুলো করা হয়েছে মূলত আরো আট-দশটা ম্যাজিসিয়ানসুলভ কারসাজি দিয়ে; এর বেশি কিছু না। যেমন:—ভারতের বিখ্যাত জাদুসম্রাট পি সি সরকার একবার নারায়ণগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দ যাওয়ার জন্য স্টিমারে করে যাচ্ছিলেন। পথে স্টিমারের যাত্রীদের সস্তা বিনোদনের জন্য কিংবা তাজ্জব করার উদ্দেশ্যে মাঝনদীতে স্টিমার থামিয়ে দিলেন। দর্শকেরা দেখলো জাদুসম্রাট সরকার কুম্ভক যোগের মাধ্যমে মানসিকশক্তি প্রয়োগ করে স্টিমার থামিয়ে দিয়েছেন। জাদুকরের

এহেন অতীন্দ্রিয় কীর্তি দেখে চারিদিকে হৈচৈ পড়ে গেল, অবাক দর্শক ঘন হাতাহালি দিতে লাগল। কথা হচ্ছে অতীন্দ্রিয় কীর্তি-টর্তি কিছুই নয়, জাদুসম্রাটের ক্ষমতার চাবিকাঠি ছিল স্টিমারের সারেঙের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। যাত্রীদের সাথে মজা করার উদ্দেশ্যে জাদুকর আগেই স্টিমারের সারেঙদের সাথে আলাপ করে কৌশল ঠিক করে নিয়েছিলেন, তারপর তো সেই কৌশল অনুযায়ী কাজ। তাও তো ভালো, জাদুকরের এমন কাণ্ডকে যাত্রীরা শুধু সস্তা বিনোদন হিসেবে নিয়েছে, কোনো অলৌকিক মহাপুরুষের কীর্তি হিসেবে নেয়নি, নয়তো আরেকটি কুসংস্কারের চারা রুপিত হতো যাত্রীদের মনে। ঠিক এমনিভাবেই যাদের সম্পর্কে শোনা যায় ট্রেন আটিকে দিয়েছে মানসিকশক্তির প্রয়োগ করে, তারা এগুলো করে থাকেন আগে থেকে ড্রাইভার ও তার সাগরেদের সাথে চুক্তির মাধ্যমে। এতে দুপক্ষেরই লাভ। গুরুজির অলৌকিক কীর্তি প্রচারিত হলে তাঁর ভক্ত সংখ্যা বাড়বে, প্রণামী বাড়বে আর ড্রাইভার ও সাগরেদরা এই ফাঁকে গুরু কাছ থেকে দুপয়সা কামাতে পারবে। তেমনিভাবে বিখ্যাত (?) পরামনোবিদ ইউরি গেলারের "অতীন্দ্রিয় মানসিক বা চিন্তাশক্তি"-র মাধ্যমে লিফট, কেবল-কার থামিয়ে দেয়া, অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সাজিয়ে দর্শকদের সাথে নাটক করা হতো। আর গেলারের কুকীর্তিগুলি ইউরোপ-আমেরিকার পত্র-পত্রিকা, টিভি মিডিয়ার সাংবাদিকেরা অতীন্দ্রিয়তার নাম ভাঙিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে পরিবেশন করতো। তবে আমাদের জন্য সুখবর, সত্যানুসন্ধানী ম্যাজিসিয়ান জেমস র‍্যান্ডি "দি ম্যাজিক অব ইউরি গেলার" নামক একটি বই লিখে গেলারের হাটে হাড়ি ভেঙে দিয়েছেন। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে, ইউরি গেলার যেসব কাজ করে দেখাতেন এবং অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার পরিচয় হিসেবে জাহির করতেন, সেগুলি আসলে ছিল ম্যাজিসিয়ানসুলভ চাতুরী মাত্র; এবং এই বইয়ে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যা হোক, বাজার অর্থনীতির এ যুগে খবর যখন নেহাতই পণ্য, তখন মাঠের গরু যদি প্রচারের দৌলতে গাছে চড়ে বসে তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

পাঠক, এবার প্রবন্ধটি গুটিয়ে নেয়ার পালা; কী বুঝলেন। অতীন্দ্রিয়তা-অলৌকিকতা-অপার্থিবতা যা-ই বলি না কেন, তা সম্পূর্ণটাই সাজানো, কৃত্রিম, লোকদেখানো অভিনয় অথবা মানসিক ভারসাম্যহীনদের কাজকারবার। ক্ষমতাবানরাই নিজেদের কেদারা সুরক্ষিত রাখার স্বার্থে সময়ে-সময়ে আমাদের মস্তিষ্কে ঈশ্বর বিশ্বাস, ধর্ম, অতীন্দ্রিয়তার বাণী গেঁথে দেয়; এবং আপনার-আমার চারপাশের লোকেরাই সস্তাপ্রচারের মোহে, নিজেদের লাভের জন্য, শ্রেণিশোষণ টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই এ ভণ্ডামো-বুজরুকি কাজ করে আসছে যুগ-যুগ ধরে। এরাই সমাজের খ্যাতিমান, এলিট শ্রেণির সদস্য; চলনে-বলনে-ভোগে তারাই অগ্রগণ্য আর ত্যাগে পশ্চাদসারিতে। কিন্তু জানি, এটাই শেষ কথা নয়, শেষ কথা বলবে জনগণ। তবে তার আগে এ ভণ্ডদের দীর্ঘদিনের সেবাপরায়ণতার-পবিত্রতার-নৈতিকতার-পাপ-পুণ্যের-পারলৌকিকতার মুখোশ ছিঁড়ে ফেলতে হবে আপনাকে-আমাকে সব্বাইকে[১৫]।

তথ্যসূত্র :

(১) জন্মের পর থেকেই বুঝে না-বুঝে ঈশ্বরে-ধর্মে বিশ্বাসীরা রোজ কতবার যে হাতজোড় করে প্রার্থনা করে থাকেন, তার কোনো ইয়াত্তা নেই। সীমিতসাধ্যের সংকীর্ণতায় আকাশ-কুসুম সাধের বাহারি তালিকায় সাধারণ বিষয় থেকে কত যে অসাধারণ-অসম্ভব বিষয়াশয় এই প্রার্থনাতে উচ্চারিত হয়। অথচ এই বঙ্গদেশেরই সন্তান, অনেকের কাছে অখ্যাত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক, বিজ্ঞানচিন্তক অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা দ্বারা অনেককাল আগেই প্রার্থনার ফলাফল শূণ্য বলে প্রমাণিত করেছেন, তা আমরা ক'জনে খবর রাখি! জানা যায়, একবার এই জ্ঞানতাপস ছাত্রদের দ্বারা 'প্রার্থনা করার

প্রয়োজনীয়তা' নিয়ে জিজ্ঞাসিত হলে, উত্তর দেন—"কৃষিজীবী লোক পরিশ্রমের মাধ্যমে শষ্য লাভ করে; কিন্তু জগদীশ্বরের কাছে শুধুমাত্র প্রার্থনা দ্বারা কোন কৃষকের কস্মিনকালেও শষ্য লাভ হয় নাই।" পরবর্তীকালে তিনি একটি গাণিতিক সমীকরণ তৈরি করে, তাঁর দার্শনিক মন্তব্যের ভিত্তি জোরালো করেন। গাণিতিক সমীকরণটি হচ্ছে এরকম :—

পরিশ্রম = শষ্য

পরিশ্রম + প্রার্থনা = শষ্য

অতএব, প্রার্থনা = ০

অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মতভাবে বুঝা যায়, প্রার্থনা দ্বারা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না।

(২) টীকা : ধর্মগুরুদের ভণ্ড-প্রতারক বলায় অনেক দুর্বলহৃদয়ের ঈশ্বরবিশ্বাসী মনে চোট পেতে পারেন। দুঃখিত, আপনাদেরকে কারণ ছাড়া ইচ্ছেকৃত চোট দেয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই; কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এটাই বাস্তবতা। ধর্মের নাম, ঈশ্বরের নাম ইত্যাদি অলৌকিকতার নাম ভাঙিয়ে লোক ঠকানোর রীতি সারা পৃথিবীতেই রয়েছে, আর আমাদের ভারতীয় সভ্যতায় তো এই ইতিহাস অনেকে পুরনো। খ্রিস্টের জন্মের বেশ আগে, আজ থেকে প্রায় ২২০০ বছর আগে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের (৩২২- ২১৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) মন্ত্রী বিষ্ণুগুপ্ত বা কৌটিল্য (চাণক্য নামেও পরিচিত), তাঁর অর্থশাস্ত্রে এরকম বেশকিছু নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। এরকম একটি নির্দেশ—"কোন প্রসিদ্ধ পূণ্যস্থানে ভূমি ভেদপূর্বক দেবতা নির্গত হইয়াছেন এই ছলে সেখানে রাত্রিতে বা নির্জনে একটি দেবতার বেদী স্থাপন করিয়া ও এই উপলক্ষে উৎসবাদি ও মেলা বসাইয়া সেই স্থানে শ্রদ্ধালু লোকের প্রদত্ত ধন দেবতাধ্যক্ষ গোপনে রাজসমীপে অপর্ণ করিবেন। ...দেবতাধ্যক্ষ ইহাও প্রচার করিতে পারেন যে, উপবনে একটি বৃক্ষ অকালে পুস্প ও ফলযুক্ত হইয়াছে এবং ইহা হইতেই সেখানে দেবতার আগমন নিশ্চিত হইয়াছে। ...দেবতাধ্যক্ষ দুর্গের ও রাষ্ট্রের দেবতাগণের ধন যথাযথভাবে একস্থানে একত্রিত রাখিবেন এবং সেইভাবে রাজাকে আনিয়া দিবেন।..." (উৎস: কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র, পঞ্চম অধিকরণ, দ্বিতীয় অধ্যায়, নব্বইতম প্রকরণ।) ছি! ছি! কী বিভৎস! মানুষ ঠকানোর কী জব্বর অপকৌশল! একটা শব্দ হয়তো অনেকের মনে খটকা লাগতে পারে—শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যাবতীয় দায়িত্ব যার ওপর সর্বোচ্চ অর্পিত থাকে তিনি অধ্যক্ষ হিসেবেই পরিচিত; আবার একইরকম সেনাদের দেখা ও পরিচালনার দায়িত্ব যাঁর ওপর থাকে তাকে বলা হয় সেনাধ্যক্ষ। তাহলে 'দেবতাধ্যক্ষ' আবার কী? এটা কী এরকম যে—মন্দির, পুরোহিত, পণ্ডিতদের দেখাশুনোর দায়িত্ব, মন্দিরে ভণ্ডামি করে অর্জিত অর্থ-সোনাদানা ইত্যাদি রাজার কাছে নিয়ে আসার দায়িত্ব সে সময় যার ওপর থাকতো তাকে বলা দেবতাধ্যক্ষ! এরকম হলে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। এবার গ্রন্থনির্দেশ পেরিয়ে বাস্তবেতিহাসে আসি:—ভারতের সোমনাথ মন্দিরের নাম হয়তো অনেকের জানা আছে। পূর্ব আফগানিস্তানের ছোট্টরাজ্য গজনির সুলতান আমুর মামুদ একাদশ শতাব্দীতে ভারত আক্রমণ করতে এসে পৃথিবীবিখ্যাত এই মন্দিরটি লুণ্ঠন করেছিলেন এবং সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ভারতীয় হিন্দুদের অনেক হাঁ-হুতাশ! তবে আমাদের জন্য আসল কাহিনী অন্য জায়গায়। বিশাল এই মন্দিরটি বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে সেই সময়ই বিখ্যাত ছিল; এখানে ছিল প্রায় একহাজার ব্রাহ্মণ, শত শত নতর্কী ও গায়িকা এবং হাজার হাজার নর-নারীর বাসস্থান। চারিদিকে ছিল অতিসুন্দর কারুকার্য শোভিত নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল বিচিত্র বিবিধ রত্নখচিত ঝুলন্ত দীপাধার। সব থেকে আশ্চর্যজনক ছিল এই মন্দিরের শিবমূর্তি; বিগ্রহ কোন বেদীতে বসানো ছিল না—অবস্থান করত শূণ্যে, মন্দিরের ঠিক মধ্যখানে। তৎকালীন জনসাধারণের কাছে এ ছিল এক অত্যাশ্চর্যকর বিষয়, অনেকের কাছে অলৌকিক-অপার্থিব ব্যাপার-স্যাপার। তাই চাক্ষুস অপার্থিব ঘটনাকে দেখার জন্য এবং এ জীবনের সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে অক্ষয় স্বর্গ লাভের জন্য প্রতিদিনই ধনী-দরিদ্র-যোদ্ধা-কামার-কুমার-বৈদ্য শত-শত ভক্ত এ মন্দিরে আসতেন এবং নিজেদের প্রচণ্ড পরিশ্রমে

উপার্জিত অর্থ প্রণামী হিসেবে দেবতার পদতলে উজাড় করে ঢেলে দিত। দীর্ঘ বছর ধরে আস্তে আস্তে মন্দিরে জমে উঠেছিল বিশাল ঐশ্বর্য, যা তৎকালীন রাজার কাছে পাঠিয়েও শেষ হচ্ছিল না। সুলতান মামুদও এ মন্দিরের সৌন্দর্যে-রহস্যে অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি মন্দিরের সমস্ত ধনরত্ন লুণ্ঠনের পর দেবতার শূণ্যে ঝুলে থাকার কারণ জানতে উৎসুক হলেন। সুলতান তাঁর সঙ্গে আসা বিজ্ঞানী-ধাতুবিদ-বাস্তুকারদের দিয়ে মূর্তিটি পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিত হলেন, এটি লোহার তৈরি এবং মন্দিরের চারপাশে চুম্বক পাথর বসানো আছে, যার ফলে লোহার মূর্তিটি মাঝামাঝি একটা জায়গায় এনে ছেড়ে দিলে বিভিন প্রান্তের আকর্ষণে এই মূর্তিটি ভেসে থাকছে। এখানে মূর্তি কোন বিষয় নয়, যে কোন লোহা এইরকম মধ্যখানে এনে ছেড়ে দিলে, সেটিও শুণ্যে ভেসে থাকবে। অবশেষে সুলতানের নির্দেশে মন্দিরের দেয়ালে লাগানো পাথরগুলো খুলে ফেলতেই বের হয়ে এল চুম্বকপাথর বা ম্যাগনেটাইট। একপাশের চুম্বক পাথর সরে যেতেই দেবমূর্তিটিও শূণ্য থেকে পড়ে গেল মাটিতে। অলৌকিকতার দাবিদার দেবমূর্তির রহস্য উদঘাটিত হল; কৌটিল্যের সাক্ষাৎ উত্তরপুরুষ মন্দিরের পুরোহিত-দেবতাধ্যক্ষদের কারসাজিতে দীর্ঘকাল ধরেই কী কৌশলে লোক ঠকিয়ে বিপুল পরিমাণ সম্পদ লুটে নেয়া হয়েছিল সেসময়; এটা কী প্রতারণা নয়? হয়তো আমাদের জন্মের অনেককাল আগের কথা বলে অনেকে দাবি করতে পারেন অতীতে কী ঘটেছে সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়, বর্তমানে কী ধর্মের নামে কেউ প্রতারণা করতেছেন? উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ অবশ্যই করতেছেন। চোখ-কান খোলা রাখুন, আপনারা নিজেরাই ভূরি-ভূরি প্রতারক-বুজরুক ধর্মগুরুদের চিনতে পারবেন। আর যারা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চান, কষ্ট করে প্রবীর ঘোষের দুই খণ্ডে রচিত *যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা* (দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা) গ্রন্থদ্বয় পাঠ করে নিবেন। গ্রন্থদ্বয়ে আপনারা পাবেন বর্তমানকালের বিভিন্ন দেশের অসাধারণ কৌশলী বুজরুক-ভণ্ড ধর্মগুরুদের যুক্তিবাদীদের কাছে বে-আব্রু হওয়ার কাহিনী ও সাথে টাটকা প্রমাণ। এখানে বাংলাদেশী পাঠকদের অগ্রিম জানিয়ে রাখছি (যারা গ্রন্থদুটি পড়েননি), উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (পৃষ্ঠা ১১৯-১৩২) আছে—প্রবীর ঘোষ এবং তাঁর যুক্তিবাদিদের সাথে বাংলাদেশের বিশেষভাবে (কু)খ্যাত ঢাকার কোটি-কোটিপতি আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু আলহাজ্ব হুজুর দেওয়ান মোহাম্মদ সাইদুর রহমান চিশ্‌তি সাইদাবাদির (সংক্ষেপে হুজুর সাইদাবাদী) রোমাঞ্চকর লড়াই। হুজুর কলকাতায় গিয়ে দাবি করলেন, তিনি যন্তর-মন্তর করে কাঁচাডিমকে টোকা দিয়ে সেদ্ধডিম বানিয়ে ফেলেন এবং সেই ডিমের কুসুম খাইয়ে দিয়ে সন্তান ধারণে অক্ষম নারীকে সন্তানসম্ভাবা বানিয়ে দিতে পারেন! কিন্তু প্রবীর ঘোষের পাল্লায় পড়ে কোথায় তাঁর কেরামতি দেখাবেন, তা না—উল্টো মান-সম্মান খুঁইয়ে হুজুর পালিয়ে ঢাকা চলে আসলেন। এই পালিয়ে আসার পরও হুজুরের হুঁশ হলো না, পরবর্তীতে আরো দুবার গোপনে ভারত সফর করলেন। এরপর ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৯৭)-তে কলকাতাতে আমাদের হুজুর বুজরুকি, প্রতারণা ও ড্রাগ এন্ড ম্যাজিক রেমেডিজ এক্ট ভঙ্গ করার দায়ে গ্রেপ্তার হন কিন্তু বাংলাদেশী রাষ্ট্রনায়কদের দেনদরবারে (হুজুরের খাসবান্দা হিসেবে আমাদের এরশাদ থেকে বেগম খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনার নাম পর্যন্ত আছে!) ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশী বুজরুক ধর্মগুরুকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন।

(৩) রাজেশ দত্ত, *মনোবিজ্ঞানের আলোকে ঈশ্বর দর্শন*, র‍্যাডিকেল ইম্প্রেশন, কলকাতা।

(৪) প্রবীর ঘোষ, *অলৌকিক নয় লৌকিক* (১ম, ২য়, ৪র্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী, *মনের বিকার ও প্রতিকার*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা। অরুণকুমার রায়চৌধুরী, *অস্বাভাবিক মনস্তত্ব*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।

(৫) টীকা : প্রাণীর সব রকমের ক্রিয়াকলাপই পরাবর্তক্রিয়া বা Reflex। এটি দুধরনের; শারীরক্রিয়া ও মননক্রিয়া। পরাবর্ত সম্পর্কে বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ইভান পেত্রভিচ পাভলভ (১৮৪৯-১৯৩৬) বলেন :

"বহির্বাস্তবের ঘটনাবিশেষের সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংযোজন ব্যবস্থার ফলে গঠিত জীবদেহের নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়াকে পরাবর্ত বলে।" পাভলভ এখানে 'নির্দিষ্ট' শব্দটিতে বেশ জোর দিয়েছেন, কারণ তাঁর মতে—বহির্বাস্তবের বিশেষ উদ্দীপকটি যতবারই প্রয়োগ করা হোক না কেন, ততবারই একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে; অন্য কোন উদ্দীপকে সেই নির্দিষ্ট সাড়া জাগবে না। এই প্রতিক্রিয়া বা সাড়া স্নায়ুতন্ত্রের এক নির্দিষ্ট সংযোজন (কার্য-কারণ) ব্যবস্থার ফল। আর 'শর্তাধীন পরাবর্ত' হচ্ছে—যে সকল ক্রিয়া অস্থায়ী, প্রাণীবিশেষের জীবদ্দশায় বাইরের পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার প্রচেষ্টায় আয়ত্ত অর্থাৎ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ধরনের পরাবর্ত। একটা উদাহরণ দিই; কোনো ধরনের খাদ্যদ্রব্য মুখগহ্বরের সংস্পর্শে আনলে জিহ্বায় লালা নিঃসরিত হয়। শুকনো খাদ্যকে সিক্ত করা কিংবা কঠিন খাদ্যদ্রব্যকে লালায় সিক্ত করে নরম করা হয়, যাতে এই নরমখাদ্যদ্রব্য খাদ্যনালী দিয়ে সহজে পাকস্থলীতে গিয়ে পৌঁছতে পারে; এটা (লালা নিঃসরণ) প্রাণীর শারীরবৃত্তিমূলক ধর্ম বা শর্তহীন পরাবর্ত। আবার কোন খাদ্যের চেহারা-রঙ দেখার অথবা গন্ধ নাকে যাবার দরুন যে লালা নিঃসরণ হয়, তা শর্তাধীন পরাবর্ত। লালা নিঃসরণের মতো প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে মূলত রঙ, গন্ধ বা শব্দের কোন সম্পর্ক নেই। এই ধর্ম বা প্রতিক্রিয়া নিয়ে প্রাণী জন্মায় না, জীবদ্দশায় এটি অর্জিত হয়। শর্তাধীন পরাবর্তের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে পুরনো পরাবর্তের প্রয়োজন না থাকলে, আস্তে-আস্তে এটি ভেঙ্গে পড়ে; নতুন পরিবেশের সাথে অভিযোজনের মাধ্যমে নতুন শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে ওঠে। পরাবর্ত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহীরা পড়তে পারেন—পাভলভ ইনস্টিটিউট, কলকাতা থেকে ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত *পাভলভ পরিচিতি*, পৃষ্ঠা : ৮- ২০।

(৬) টীকা : বিভিন্ন ধর্মের মহাপুরুষদের ধর্মপ্রচারের বেশ মজার-মজার কাহিনী প্রচলিত আছে। এরকম কাহিনীগুলোর মধ্যে সামান্য কটি উল্লেখ করছি—হিন্দুধর্মের মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ শিবলিঙ্গ মনে করে নিজের পুরুষাঙ্গকে পুজো করতেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, উন্মাদ অবস্থায় লিঙ্গে মুক্তা পরিয়ে জীবন্ত লিঙ্গপুজা করতেন (উৎস: শ্রীম কথিত রামকৃষ্ণ কথামৃত, মূলপাঠ, চতুর্থভাগ, ১৫শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২১)! বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, তৈলঙ্গ স্বামী নিজের প্রস্রাব দিয়ে কালীর অর্চনা করতেন; প্রস্রাব করে কালীমূর্তির সারা শরীরে ছিটিয়ে দিতেন (উৎস: ভারতের সাধক, শঙ্করনাথ রায়, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০)! লোকনাথ ব্রহ্মচারী বলতেন, "আমার বিনাশ নাই, শ্রাদ্ধ নাই, আমি নিত্য পদার্থ। ...শতাধিক বৎসর পাহাড়পর্বত পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নি। আমি দেখেছি আমাকে। (উৎস: অলৌকিক লীলাপ্রসঙ্গ, নন্দলাল ভট্টাচার্য, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩)।"—হায়রে ধর্মাবতার! আপনাদের লীলা, বোঝা বড় ভার! ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ইসলাম ধর্মের ধর্মগ্রন্থ থেকে জানা যায়, নবি ইব্রাহিম (কারো কারো কাছে আব্রাহাম) একদা স্বপ্নে আল্লাহর কাছ থেকে প্রিয় বস্তু বিসর্জনের নির্দেশ পেলেন। তিনি ধরে নিলেন, প্রিয় বস্তু হচ্ছে নিজের সন্তান। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলছি, কোরবানির জন্য নির্ধারিত সন্তান নিয়ে ইসলামধর্মের সাথে ইহুদি, খ্রিস্টান ধর্মের একটু বিরোধ আছে। তৌরাত শরিফের জেনেসিস অধ্যায়ের ২২:১-১৯ থেকে জানা যায় আল্লাহতায়ালা কোরবানির জন্য নবি ইব্রাহিমের কাছে হযরত ইসহাককে মনোনীত করেছেন; আর কোরানশরিফে সরাসরি বলা নেই, কোরবানির জন্য মনোনীত সন্তানটি কে? (সুরা সাফফাত, ৩৭:১০২-১০৭), তবে অন্যান্য সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ইসলামিচিন্তাবিদরা বলেছেন, আল্লাহর কাছে কোরবানির জন্য মনোনীত সন্তান হচ্ছে হযরত ইসমাইল। আগ্রহীরা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পাঠ করতে পারেন, বেনজীন খান সম্পাদিত *পশু কোরবানি: একটি বিকল্প প্রস্তাব*, সংস্কার আন্দোলন, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৫২-১৬৪। যা হোক, এ বিষয়টি নিয়ে আপাতত বিতর্ক না করে বলা যায়, নবি ইব্রাহিম আল্লাহর প্রেমে এতোই অন্ধ হয়েছিলেন যে, স্বপ্নের বিষয়কে সত্য মনে করে, নিজের সন্তানকে পর্যন্ত কোরবানি করতে নিয়ে গিয়েছিলেন! আবার, ইসলামধর্মের শ্রেষ্ঠ ঐশীগ্রন্থ কোরানশরিফ না-কী

একসময় *লওহে মাহফুজে* সংরক্ষিত ছিল (৮৫:২২)। কিন্তু অবাক বিষয়, নবি হযরত মোহাম্মদের অনেক সামান্য ব্যক্তিগত ঘটনাও অপ্রাসঙ্গিকভাবে পবিত্র (?) কেতাবে ঠাঁই পেয়েছে; যেমন—চাচা আব্দুল উজ্জার সাথে ব্যক্তিগত রেষারেষি থেকে ঝগড়া হওয়ার কারণে একটি সুরা'ই (আল লাহাব, ১১১) নাজিল (?) হয়েছে, পোষ্যপুত্রের স্ত্রী জয়নবকে বিয়ে করার অনুমতিও আসে স্বয়ং আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে (সুরা আহজাব, ৩৩:৪, ৩৭)! নবি মোহাম্মদের একাধিক স্ত্রীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব নিরসনে আল্লাহ বাণী পাঠিয়ে দেন জিবারাইল মারফত (সুরা তাহরিম, ৬৬:৩-৫), বিবি আয়েশাকে নিয়ে একটি গুজবে সৃষ্ট কেলেঙ্কারী দূর করতে (সুরা নুর, ২৪:৪-৫) এগিয়ে এল জিবরাইল, সঙ্গে আবারো আল্লাহর বাণী! এখন, যদি কেউ ধারণা করেন—তৎকালীন সময়ে নবি হযরত মোহাম্মদ অনাকাঙ্ক্ষিত নানা ঘটনা থেকে মুক্তির জন্য, অথবা বিভিন্ন ঘটনার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির জন্য কৌশলে নিজের বক্তব্যকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বাণী বলে প্রচারিত করেছেন; তবে ঐ ব্যক্তির ধারণা যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে করেন কী?

(৭) টীকা : প্রতিটি ধর্মের মহাপুরুষ সম্পর্কে যতদূর জানা যায় তাঁরা সবাই নির্জনে বনে-জঙ্গলে কঠোর ইন্দ্রিয়সংযমের মাধ্যমে ধ্যানস্থ হতেন, নিজ-নিজ ঈশ্বরের উপাসনা করতেন। যেমন—রামকৃষ্ণ ছোটবেলায় গভীর জঙ্গলের কাছে শ্মশানঘাটে গিয়ে প্রায়ই একাকী কালীমায়ের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করতেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেই অকপটে স্বীকার করেছেন—ভগবৎ-প্রেমের জন্য তাঁর এ বাহ্যজ্ঞানহীনতা নয়, বরং মন্দিরে সাধকদের নানা নিয়ম, কঠোর ব্রতাদি পালন ইত্যাদি করতে করতে মাথায় গণ্ডগোল দেখা দেয়, মনোবৈকল্যের সৃষ্টি হয়েছে (উৎস: শিবনাথ শাস্ত্রী, *মহানপুরুষদের সান্নিধ্যে*, পৃষ্ঠা ১৫১-১৫২)। ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায়, নবি হযরত মোহাম্মদ তৎকালীন সময়ে লোকালয় থেকে অনেক দূরে হেরা পর্বতের গুহায় সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় আল্লাহর উপাসনা করতেন। বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে জনমানবশূণ্য পরিবেশে এরকম কঠোর ইন্দ্রিয়সংযমের মাধ্যমে দীর্ঘদিন অবস্থান করলে মস্তিষ্কের কার্যকলাপে বিকৃতি ঘটা স্বাভাবিক ব্যাপার।—এ আমার নিজস্ব কোন বক্তব্য নয়, মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষালব্ধ ঘোষণা। এখানে কানাডার প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ড. হেবের একটি গবেষণার কথা উল্লেখ করতে পারি। ড. হেব কয়েকজন সুস্থ যুবককে একটি ছোট ঘরের মধ্যে মাত্র ছত্রিশ ঘন্টা থেকে দশদিন পর্যন্ত ইন্দ্রিয়বোধ থেকে বঞ্চিত করে রাখার ব্যবস্থা করেন। পরীক্ষার জন্য ঘরটা অন্ধকার ও শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ছিল। ঘরের দেয়ালগুলো ছিলো নিরেট, শব্দরোধী—যাতে বাইরের কোনো আওয়াজ ভেতরে আসতে না পারে এবং ভেতরের আওয়াজ বাইরে না যেতে পারে। হাতে দস্তানা পরিয়ে ও কার্ডবোর্ডের টিউব লাগিয়ে স্পর্শানুভূতিকে অকেজো করা হয়েছিল। ছত্রিশ ঘন্টা পের না হতেই ঐ যুবকদের নানা রকম মানসিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়; নিঃশব্দতা, অন্ধকার, নিঃসঙ্গতা, ইন্দ্রিয়ের নিষ্ক্রিয়তা মস্তিষ্কের কোষগুলো সহ্য করতে পারল না। মস্তিষ্কের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে সকলের মধ্যেই ক্রমান্বয়ে 'হ্যালুসিনেইশন' ও 'ডিলিউশন' দেখা দেয়। আধুনিককালে মহাকাশ শারীরবৃত্তের গবেষণা থেকেও জানা গেছে, ইন্দ্রিয়জ সংবেদরহিত হলে মস্তিষ্কে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়; মস্তিষ্কের সুস্থ ও স্বাভাবিক কাজকর্মের জন্য ইন্দ্রিয়গুলোর সজাগ ও সক্রিয় থাকা খুব জরুরী (উৎস: রাজেশ দত্ত, *মনোবিজ্ঞানের আলোকে ঈশ্বর দর্শন*, র‍্যাডিকেল ইম্প্রেশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪)।

(৮) উপরের তিনটি মানসিকঅসুখ ও নানা কেসস্টাডি নিয়ে বেশ প্রাণবন্ত আলোচনা রয়েছে প্রবীর ঘোষের *অলৌকিক নয় লৌকিক* সিরিজ গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে।

(৯) প্রবীর ঘোষ, *অলৌকিক নয় লৌকিক* (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। ভবানী প্রসাদ সাহু, *ভূত ভগবান শয়তান বনাম ড. কোভুর*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা।

(১০) টীকা : "পরামনোবিদ্যা (Parapsychology)" নামটি অনেকের কাছেই পরিচিত। ইদানীং বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই এ নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে। তবে দুঃখের কথা হচ্ছে, এ লেখালেখির ফলে আসল সত্যটুকু জানার চেয়ে এ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বেশি। কেন বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে? কারণটা জানার আগে দেখে নিই এই বিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয়গুলি কী কী। মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, জাতিস্মর, মৃতব্যক্তির আত্মার সাথে যোগাযোগ (Planchette), ঠিকুজী-কোষ্ঠী, রাশিবিচার, ভবিষ্যদ্বাণী, ব্ল্যাকম্যাজিক ইত্যাদি। প্রচারের দৌলতে কূটকৌশলী ধর্মতত্ত্ববিদ-পরামনোবিদরা দাবি করে থাকেন মনোবিজ্ঞান যেরকম একটি বিজ্ঞান তেমনিই পরামনোবিদ্যা একটি বিজ্ঞান; কিন্তু নামের মিল থাকলেই তো দুটি বিষয় এক হয়ে যেতে পারে না। যেমনটা জ্যোতিষশাস্ত্র (astrology) দাবি করে আসছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের (astronomy) মত বিজ্ঞানের একটি শাখা, কিংবা অধুনা যেমন বাইবেলিয় সৃষ্টিতত্ত্বে ভরপুর "ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন" দাবি করছে জীববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এবং বিজ্ঞানসম্মত! তারা দাবি করলেই তো হল না, বিজ্ঞান চায় প্রমাণ। জ্যোতির্বিজ্ঞান যেমন তার শরীরে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা আবর্জনা (জ্যোতিষশাস্ত্র) ইতোমধ্যে ঝেড়ে ফেলেছে, মনোবিজ্ঞানও তেমনি দেহাতিরিক্ত আত্মা, মন ইত্যাদি অপার্থিব বিষয়কে ছেঁচে ফেলে দিয়েছে। এটি এখন বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের মত সম্পূর্ণরূপে পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণের ওপর নির্ভরশীল এবং জীবের আচরণসংক্রান্ত অভিজ্ঞনতামূলক বিজ্ঞান। তারপরও পরামনোবিদরা নিজেদের বক্তব্যকে বিজ্ঞানসমত বলে যে সকল প্রমাণ হাজির করেছেন, তার কোনোটিই এ পর্যন্ত ধোপে টিকেনি। অনেকের ভিতর এ প্রশ্ন আসবে, এ বিদ্যা যদি অবৈজ্ঞানিক হয়, তবে তারে নিয়ে এত মাতামাতি কেন? উত্তরটা এভাবে দেয়া যায়, এ পৃথিবীর মানুষের মধ্যে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার অনেককিছুই অবৈজ্ঞানিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন (যেমন—চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণের সময় খাবার গ্রহণ করা যাবে না, নষ্ট করে ফেলতে হবে, জিন-ভূত-পেত্নি-দৈত্য-আত্মা-ঈশ্বর-আল্লাহ-ভগবান ইত্যাদির অস্তিত্বে বিশ্বাস, তুক-তাক-বাণ মারা ইত্যাদি); কিন্তু এগুলো হাজার বছর ধরে টিকে আছে, শুধু টিকে আছে নয় বিপুল বিক্রমেই রাজত্ব করছে। পরামনোবিদ্যার অবস্থাও অনেকটা সেরকম। যাহোক, মূলত ১৯৭৪ সালের দিকেই এই ছদ্মবিজ্ঞানের (Pseduscience) খুব রমরমা অবস্থা শুরু হয়, কারণ ঐ সালে যুক্তরাষ্ট্রের "American Society for the advancement of Science"-এ পরামনোবিদ্যার সংস্থা বিশেষকে সভ্য হওয়ার অনুমতি দেয়। যেমনটা—(অনেকের হয়তো জানা আছে), ভারতের বিজেপি সরকার ২০০১-এ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউ জি সি) বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে "বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র"-কে বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করছে! মজার খবর হচ্ছে—পরামনোবিদ্যার পালে জোর হাওয়া থাকাকালিন সময়েই আমেরিকার নর্থ-ক্যারোলিনার ডিউক বিশ্ববিদ্যলয়ে ড. জে বি রাইন এবং তাঁর স্ত্রী লুইসা ই রাইন পরামনোবিদ্যা নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা (?) করেন ও পুস্তিকা প্রকাশ করেন, এবং একসময় ড. রাইন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরমনোবিদ্যা বিভাগের ডাইরেক্টর হন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ড. রাইনের কথিত গবেষণার ফলাফল যাচাই-বাছাই করতে গিয়ে তাঁর গবেষণা কাজের অবৈজ্ঞানিক দিকটি ধরা পড়ে যায়, তখন ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় বাধ্য হয়ে ড. রাইনের "গবেষণা" কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। এতেও দমে যান না ড. রাইন। তিনি, তাঁর স্ত্রী এবং আরেক ধাপ্পাবাজ ওয়াল্টার লেভি মিলে নর্থ ক্যারোলিনা স্টেটের ডারহাম-এ গঠন করেন Institute of Parapsychology। ওয়াল্টার লেভি হন প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর। ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে ওয়াল্টার লেভি পরামনোবিদ্যার সফল পরীক্ষা দিতে গিয়ে তাঁরই প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীদের হাতে ধরা পড়ে যান। এই প্রতিষ্ঠানে যারা, তিনজন উদ্যোক্তা (গ্রেট ধাপ্পাবাজ)-র চাপাবাজিতে মুগ্ধ হয়ে পরামনোবিদ্যায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং জড়িত হয়েছিল, তারাই পরবর্তীতে অতীন্দ্রিয় পরীক্ষার সফলতার পেছনে লৌকিক যান্ত্রিক কৌশল ও উদ্যোক্তাদের হাতসাফাই এর কারবার রয়েছে, প্রকাশ করে দেয়। এভাবে জনসমক্ষে নিজেদের ভণ্ডামো উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ায় ডাইরেক্টর ওয়াল্টার লেভি চূড়ান্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় মিস্টার ও মিসেস রাইনকে ফেলে রেখে পালিয়ে যান। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এঁদের এহেন কর্মকাণ্ড সর্বসাধারণের সামনে

বেআব্রু হওয়ার পরও সারা বিশ্বে পরামনোবিদ্যার চর্চা বন্ধ হয়নি। বরং সময়ে সময়ে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরো জানতে পড়ুন : প্রবীর ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৪-১৪৭। এবং ভবানী প্রসাদ সাহু, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৮-১২০।

(১১) ভবানী প্রসাদ সাহু, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৯-৫১।

(১২) টীকা : গুজব বাঙালিসমাজের মধ্যে বেশ পরিচিত এবং ভয়ঙ্কর একটি শব্দ (হুজুগ শব্দটিও প্রায় কাছাকাছি অর্থবোধক); 'হুজুগে-বাঙালি' বলে আমাদের একটি বদনামও রয়েছে সারা বিশ্বে। এটা অনেকটা সংক্রামক ব্যাধির মতো, একবার আক্রান্ত হলে এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া প্রায় অসম্ভব—যদি না গুজবগ্রস্তরা যুক্তিবোধ-বাস্তবনীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। চীনদেশি প্রবাদে আছে—"একটি গুজব একটি মাত্র কানে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু শতমুখে প্রচারিত হয়।" সাধারণভাবে গুজব বলতে আমরা বুঝে থাকি, "এক ধরনের অলীক বিবৃতি বা বক্তব্য, যা কখনো উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে, কখনো মানুষের প্রচারপ্রিয়তা অথবা রুদ্ধ আবেগের প্রকাশ সূত্র-ধরে, কার্যত এক ধরনের 'হয়ত-সত্য', 'প্রায়-সত্য' ইত্যাদি রসালো রঙে রাঙায়িত হয়ে শতমুখে বিচিত্র ও রোচক চেহারায় পরিণত হয়। এরই ফলে মূল ঘটনাটি প্রায়শই বিকৃত হয়ে পড়ে, এবং সৃষ্টি হয় এক ধরনের সামাজিক বিভ্রান্তি।" অস্বীকার করা যাবে না, গুজবের মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে খুব ছোট চেহারার সত্য লুকিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু শতকণ্ঠে প্রচারের ফলে বিষয়টি এত বেশি ফুলেফেঁপে ওঠে যে, তার মধ্যে সত্যটিকে খুঁজে পাওয়া কঠিন—খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মতো। গুজব সৃষ্টির বিভিন্ন কারণ রয়েছে, সমাজতাত্ত্বিকদের মতে—যুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব, দুর্ভিক্ষ বা মড়ক, আত্মপরিচিতির সংকট (Self-identity crisis) ইত্যাদি সামাজিক বিপর্যয়ের সময় বিবিধ গুজব সৃষ্টি হয়। এখানে ব্যক্তিগত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি; বেশ কিছুদিন আগে কোনো এক বন্ধের দিনে আমরা কয়েক বন্ধু আড্ডা দিচ্ছিলাম। আড্ডার বিষয় অনেক কিছু, রাজনীতি-অর্থনীতি, দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি। আস্তে আস্তে টের পেলাম আড্ডার বিষয় পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে,—মোড় নিল আধুনিককালে ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা, ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান ইত্যাদি। সবাই অনেক কিছু বলতে লাগলো। কেউ পক্ষে-কেউ বিপক্ষে। এরমধ্যে হঠাৎ করে একজন ক্ষেপে ওঠলো, গলার রগ ফুলিয়ে, মুখ লাল করে অতিদ্রুত কি-সব বলতে লাগলো। প্রথমে বুঝতে পারি নাই, দ্বিতীয়বার বলার পর বুঝলাম, মোটামুটি এরকম—"তোরা তো কিচ্ছু জানিস না, বেহুদা চিল্লাফাল্লা করে তোদেরও গুনাহ হইতেছে আর আমরাও এর ভাগীদার হইতেছি। আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা "নাসা"-র গবেষণাগারে পর্যন্ত আমাদের পবিত্র কিতাবটি (ইচ্ছা করেই পবিত্রকিতাবের নামোল্লেখ করলাম না) রাখা আছে। নাসার বিজ্ঞানীরা আমাদের এই ধর্মগ্রন্থ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই দিনরাত গবেষণা করতেছে। ওঁদের এই মহাকাশ গবেষণা বলিস আর প্রযুক্তিগত উন্নতির কথা বলিস, এগিয়ে যাওয়ার মূল কারণ—আমাদের এই ধর্মগ্রন্থ। আমাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে সব তথ্য নিয়ে ওরা এগুলো করতেছে!"—বন্ধুর আহাম্মকি কথা শুনে প্রথমে হাসবো না কাঁদবো ঠিক বুঝে পেলাম না। ঠিক একই ধরনের বক্তব্য অনেকদিন ধরেই একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিভিন্নজনের (স্বল্পশিক্ষিত থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষিত, মেডিকেল-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া থেকে শুরু করে মাদ্রাসা পড়ুয়া) কাছ থেকে শুনছি। কেউ কেউ আবার এর সাথে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের একটি অর্ধটুকরো বক্তব্য বড্ড বড়াই করে তুলে ধরে ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞানের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে চান! বন্ধুকে আমি এ সুযোগে ক্ষেপানোর জন্য বললাম, জব্বর খবর! এতো কিছু জেনেও তুমি বন্ধু মুখে আঙুল দিয়ে বসে আছো? মিস্‌টেক, ভেরি মিস্‌টেক! তা তোমাদের আমেল-কামেলরা কোথায়? এতোদিন ধরে কী করছেন? ইহুদি-নসারা সব অমূল্য জ্ঞান তোমাদের পবিত্র কিতাব থেকে লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে, আর তোমরা চেয়ে-চেয়ে দেখছো। শেইম! শেইম! অন্তত আমেল-কামেলদের তো উচিত পবিত্র ঐ কিতাব থেকে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান আগেভাগেই আমাদের বিজ্ঞানী-

গবেষকদের জানিয়ে দেয়া। তাহলে আমাদের মত গরিব দেশের আর ইহুদি-খ্রিস্টান পশ্চিমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না? আমার কথার জবাবে বন্ধুটি কিছু বলতে গিয়েও বললো না; মনে হলো রক্তবর্ণ চোখ দুটি দিয়ে ভস্ম করে দিতে চাইছে। অথবা আমার মত পাগলের সাথে কথা বলে বৃথা সময় নষ্ট, ভেবেই চুপ করে গেল। যা হোক, বিষয়টি নিয়ে আমি দীর্ঘদিন ভেবেছি, এক শ্রেণির মানুষের কাছে কেন "ধর্মগ্রন্থ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর"-হিসেবে ভূষিত হচ্ছে? আজ "বিজ্ঞানের অপ্রতিরোধ্য যাত্রায় ধর্মবাদিদের মধ্যে আত্মপরিচিতির (সঠিক করে বললে "ধর্মীয় পরিচিতি" হবে) সংকট সৃষ্টি করছে"—বলেই কী এই ধরনের ডাহা গুজব অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে পড়ছে? আমার কাছে মনে হয়েছে,—"যেমন করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ-আমেরিকার ক্রমবর্ধমান বুর্জোয়া উদারনীতিবাদ গ্রহণের (পাশাপাশি ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব) প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১৯-২০ সালে গঠিত World's Christian Fundamentals Association কিংবা National Federation of Fundamentalists ইত্যাদি নামের সংগঠনের মাধ্যমে খ্রিস্টান মৌলবাদী আন্দোলন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়, তৎকালীন ভারতেও ভি ডি সাভারকার, বাবুরাও সাভাকার, হেডগেওয়ার, গোলওয়ালকার প্রমুখের তীব্র হিন্দু মৌলবাদী হিসেবে আবির্ভাব ঘটে, স্বাধীনতার পর নকশালবাদী আন্দোলনের পরমুহূর্তেই সমগ্র ভারতবর্ষে মাতা সন্তোষী-সাঁইবাবা-সাঁইকৃষ্ণের মতো সাজানো দেবতার-ভণ্ডের বাজার সৃষ্টি করা হয়েছিল, ইজরাইল রাষ্ট্র গঠনের প্রতিক্রিয়ায় মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামি মৌলবাদের দ্রুত উন্মেষ ঘটে, আফগানিস্তানে সোভিয়েতবাহিনীর সাথে লড়াই করার জন্য আমেরিকা-পাকিস্তান-সৌদি আরবের প্রচেষ্টায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মুজাহিদীন সংগ্রহ করে ইসলামি মৌলবাদের প্রাতিষ্ঠানিক রূপকে শক্ত ভিত্তির মধ্যে দাঁড় করানো হয়েছিল, তেমনি হয়তো আজ নাইন-ইলেভেনের পরবর্তী ডামাডোলের ফলে আবারো কয়েকটি ধর্মীয় মৌলবাদ ভয়াবহ রকমে বিকাশের পথ পেয়ে গেছে, যার বিচ্ছুরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ধরনের আজগুবি সব গুজবে। সাথে সাথে আধুনিকবিজ্ঞানের নিত্যনূতন আবিষ্কার হয়তো "নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা নিয়ে" ধর্মবাদিদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে।" আমি নিশ্চিত নই, তবে অস্বীকারও করতে পারছি না। মূল আলোচনায় ফিরে যাই, আধুনিককালে কেউ কেউ 'গুজব'-কে চক্রান্ত তত্ত্ব (Conspiracy theory)-এর আলোকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁদের মতে—"চক্রান্ত তত্ত্বের মূল ভিত্তি হলো গুজব। চক্রান্তের সঙ্গে গুজবের একটি সংযোগ স্থাপিত না হলে চক্রান্ত এবং গুজব কোনোটিই সজীব বা সচল হওয়ার প্রাণ বা মাটি পায় না"। আমাদের বাংলাদেশ, পার্শ্ববর্তী ভারত, এবং তৃতীয়বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে রাজনীতি এবং ধর্ম নিয়ে সবচেয়ে বেশি চক্রান্ত করা হয় তাই এগুলিকে নিয়ে বেশি গুজবও তৈরি হয়; এবং এই গুজব প্রচারে মুখ্য ভূমিকা পালন করে সংবাদপত্রগুলো। ইউরোপ-আমেরিকায় সাধারণ জনগণের মধ্যে ধর্মের রেশ (পৃথিবীর অন্যান্য অংশের তুলনায়) একটু কমে যাওয়ার ফলে সেখানে কৌশলে বিজ্ঞানের নামে উদ্ভট ধর্মীয়গুজব ছড়ানো হয় অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে; যেমন—জার্মানির নাগরিক এরিক ফন দানিকেনের বিভ্রান্তকর "দেবতারা ভিনগ্রহের মানুষ" প্রকল্প, আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিমে প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত বারমুডা দ্বীপপুঞ্জ, পোর্টরিকো ও ফ্লোরিডাকে নিয়ে ত্রিভূজ কল্পনা করে বারমুডা ট্র্যাঙ্গল নাম দিয়ে চার্লস বার্লিজ কর্তৃক ১৯৭৪ সালে "দি বারমুডা ট্র্যাঙ্গল" নামের গ্রন্থে আধ-খাওয়া সত্যের মিশেল দ্বারা চাপাবাজিপূর্ণ প্রপাগান্ডা, উইলিয়াম আলবার্ট ডেম্বস্কি, মাইকেল বিহে, ফিলিপ জনসন, জোনাথন ওয়েলস প্রমুখের বিবর্তনবাদ বিরোধী বাইবেলিয় সৃষ্টিতত্ত্বের আলোকে "ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন" থিওরি ইত্যাদি। আলোচনার পরিসর সীমিত রাখার স্বার্থে আমরা এখানে ধর্মকেন্দ্রিক গুজবের কয়েকটি উদাহরণ টানবো :—(১) ১৯৬৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'অ্যাপেলো : ৮' উপগ্রহের চন্দ্রাভিযান এবং তার ফলস্বরূপ ১৯৬৯ সালে 'অ্যাপেলো : ১১'-র অভিযান সফল হয়। নীল আর্মস্ট্রঙ এবং এডুইন অলড্রিনের চন্দ্রে অবতরণ মহাকাশ-গবেষণা নিয়ে মানবসভ্যতা ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হিসেবে চিহ্নিত হয়। কিন্তু কতিপয় স্বার্থবাদী-ধর্মবাদী বুজরুক সংস্থা তাদের দীর্ঘমেয়াদী কার্যকলাপ চালু রাখার জন্য

মানুষের চন্দ্রাবতরণ একটি মিথ্যা ঘটনা—এই মর্মে প্রচার চালাতে থাকে। পশ্চিমাবিশ্বে খ্রিস্টান মৌলবাদিদের অর্থায়নে পরিচালিত 'আন্তর্জাতিক সমতল পৃথিবী সংগঠন'—এই প্রচার চালাতে থাকে। এই সংগঠনের সচিব স্যামুয়েল শেন্টন এবং চার্লস জনসন প্রচার করতে থাকেন চন্দ্রাবতরণের ঘটনা ঘটেছিল হলিউডের স্টুডিওতে; এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ঘটনা—যা চলচ্চিত্রের মতোই সাজানো। কয়েকদিন পর আরেকটি ভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন প্রচারণা শুরু করলো—নীল আর্মস্ট্রঙ চাঁদে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি সেখানে আজানের ধ্বনি শুনেছেন (চাঁদে যে বাতাস নেই, এরা মনে হয় জানে না!), তাঁদের ধর্মগ্রন্থের বর্ণনা মতো চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত দেখে এসেছেন—যার কারণে নীল আর্মস্ট্রঙ পৃথিবীতে ফিরে এসে ধর্মান্তরিত হয়েছেন! এ দুটি সংগঠনের বিজ্ঞানবিরোধী অপপ্রয়াস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানুষের চাঁদে গমনের ফলে তাঁদের ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত (দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা লোকঠকানো) সৃষ্টিতত্ত্ব এবং ঈশ্বর-পয়গম্বরের অলৌকিক ক্ষমতা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে, ফলে ভবিষ্যতে ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের মুলা দেখিয়ে ব্যবসা করা দুঃসাধ্য হয়ে যাবে। তাই ওরা চক্রান্ত করে নিজস্ব মতটি প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন মহাকাশ-গবেষণা সংস্থা,—তথা সমগ্র বিজ্ঞান গবেষণাকেই হেয় করতে চাইছে। (২) গত বছর (২০০৬) একুশে আগস্ট ভারতের মুম্বাই শহরের কাছাকাছি মাহিম সমুদ্রতীরের কাছে দরগার এক পিরবাবা প্রচার করলেন—আরব সাগরের জল আল্লাহ্‌র দয়ায় মিষ্টি ও পবিত্র হয়ে গেছে। এই গুজব ছড়িয়ে দেয়া মাত্র সারা শহরে খোদা-ভক্তির জোয়ার শুরু হয়ে গেল, মানুষ কথিত পবিত্র জল সংগ্রহের জন্য ভিড় করতে শুরু করলেন এবং জলপানও করতে লাগলেন। মুম্বাই মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক দূষণ সংক্রান্ত নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও প্রায় এক সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন ধর্মের ও বয়সের মানুষ ঐ সমুদ্রজল পান করতে লাগলেন। মূলত ঘটনা হলো দূষণের কারণে ঐ অঞ্চলের সমুদ্রজলে লবনের পরিমাণ অত্যাধিক কমে গিয়েছিল। এছাড়া মাহিম সমুদ্রতটটি মিঠি নদীর মোহনায়। এ সময়ে কোনো কারণে মিঠি নদীতে জলস্ফীতি হওয়ায় মিঠি নদীর মিষ্টিজল মাহিম অঞ্চলের সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, ফলে ঐ অঞ্চলের জলে লবনের পরিমাণ আরো উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পায়। কিন্তু গুজবের ফলে ঐ জল পবিত্র আখ্যা পেয়ে পানীয়ের উপযোগী হয়ে গেল! (৩) হিন্দুধর্মের পীঠস্থান হিসেবে স্বীকৃত ভারতবর্ষে বারোমাসই অবতার-মহাপুরুষদের রমরমা অবস্থা। দুয়েকদিন পরপরই ভারতের এখানে-সেখানে বাবাজী-মাতাজির আবির্ভাব ঘটে এবং মাশাল্লাহ্ ওনাদের নামগুলোও জব্বর : যেমন—আত্মাবাবা, পাইলটবাবা, লালবাবা, বালতিবাবা, ফ্লাইংবাবা, ডাববাবা, আদ্যামা, বড়িমা, ছোটিমা ইত্যাদি। এই নানা কিসিমের বাবাজী-মাতাজির মধ্যে এক সময় তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের সাঁইবাবা; সিল্কের গেরুয়া আলখাল্লায় ঢাকা, ঝাঁকড়া চুলওয়ালা এই লোক ভক্তদের কাছে সত্য সাঁইবাবা আর যুক্তিবাদিদের কাছে বুজরুক-শিরোমণি। প্রচারের জেটবিমানে চড়ে তিনি এবং তাঁর ভক্তবৃন্দ সারা ভারতেই একসময় প্রচণ্ড ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি করতে পেরেছিলেন, আর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন গুজব আর গুজব। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—দেবসম সাঁইবাবা শূণ্য থেকে অলৌকিক উপায়ে ঘড়ি-ছাই বা বিভূতি তৈরি করতে পারেন, সাঁইবাবার ছবি থেকে উজ্জ্বল জ্যোতি বের হয়, সুগন্ধিযুক্ত বিভূতিও পাওয়া যায় ইত্যাদি। মজার বিষয় হচ্ছে, খুবই সাধারণ কৌশল প্রয়োগ করে এগুলি অহরহ করে চলছেন আমাদের আশেপাশের ম্যাজিসিয়ানরা, কিন্তু তারা কখনোই এগুলিকে অলৌকিক বলে দাবি করেননি। বরং পাবলিককে আনন্দ দেবার সস্তা খোরাক হিসেবে কৌশলগুলো ব্যবহার করেন। এই যে শূণ্য থেকে ঘড়ি সৃষ্টি করা, এখানে মোটেও অলৌকিক কিছু নেই—অনেক আগে থেকেই হাত সাফাইয়ের মাধ্যমে রাস্তার রাম-শাম-যদু-মধু জাদুকর থেকে শুরু করে বিশ্ববিখ্যাত জাদুকর ডেভিড কপারফিল্ড পর্যন্ত অনেকেই অহরহ এ কাজটি করে আসছেন। শুধু ঘড়ি কেন, মিষ্টি-বল-পাখি-বাক্স-রুমাল ইত্যাদি জিনিষই তারা দর্শকদের সামনে কৌশলে নিয়ে আসেন। এ প্রক্রিয়াটিকে ম্যাজিকের ভাষায় বলে 'পামিং'। পামিং হল কিছু কৌশল, যার মাধ্যমে ছোটখাট কোনো জিনিষকে হাতের মধ্যে অথবা পোষাকের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রাখা হয়। তারপর একথা-সেকথা বলতে বলতে দর্শকের মনযোগ অন্যদিকে সরিয়ে চটজলদি জিনিষটাকে বের করে

নিয়ে আসা হয়। আর প্রচুর ছাই বের করতে চাইলে হাতের মধ্যে তো আর লুকিয়ে রাখা যাবে না, তখন ছাই ভর্তি ব্লাডার যুক্ত একটি সরু নল বগলের নীচ থেকে হাতের কব্জি পর্যন্ত বাধা থাকে। পোষাকের নীচে ঢাকা পড়ে যায় এই ব্লাডার ও নল। এরপর সময়-সুযোগ মতো ছাই সৃষ্টি করতে চাইলে শুধু ব্লাডারে একটু চাপ দিলেই হবে। ব্লাডার থেকে ছাই নল বেয়ে একদম হাতে চলে আসবে। কলকাতার বিখ্যাত জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র) একবার এরকম পামিং করে দেখিয়েছিলেন স্বয়ং সাঁইবাবাকে। ১৬-০৪-৭৮ তারিখের ইংরেজি সাপ্তাহিক *সানডে* থেকে জানা যায়, তিনি একবার পরিচয় বদল করে সাঁইবাবার সাথে একবার দেখা করতে যান এবং সাঁইবাবাও তখন চিনতে না পেরে, অন্যান্য নির্বোধ ভক্তের মতো একজন ভেবে ভেলকিবাজি দেখাতে লাগলেন। এক ফাঁকে পি. সি. সরকার সাঁইবাবার মতই শূণ্যে হাত নেড়ে একটি রসগোল্লা নিয়ে আসেন এবং সাঁইবাবার হাতে দেন। হঠাৎ এভাবে অপরিচিতের সামনে নিজের ভণ্ডামো উলঙ্গ হয়ে যাওয়ায় সাঁইবাবা আতঙ্কে চিৎকার করে স্থান ত্যাগ করেন। সাঁইবাবার ছবি থেকে যে জ্যোতি নির্গত হচ্ছে বলে গুজব বেরিয়েছে, তা আর কিচ্ছু না—ওটি ছিল infra-red photography। এই পদ্ধতিতে ছবি তুললে যে কোনো জীবিত প্রাণী বা উদ্ভিদের শরীর থেকে জ্যোতি নির্গত হচ্ছে বলে মনে হয়। এখানে আলাদাভাবে সাঁইবাবা বা গাধার কোনো তফাৎ নেই। ছবি থেকে সুগন্ধিযুক্ত বিভূতি পড়তে পারে দুভাবে :— (এক) আগে থেকেই কোনো ভক্ত অন্য ভক্তদের চোখে নিজেকে বড় করে তোলার জন্য সুগন্ধি মিশিয়ে বিভূতি সাঁইবাবার ছবির নীচে ছড়িয়ে দিতো অথবা (দুই) সাঁইবাবার ছবির কাঁচে ল্যাকটিক এসিড ক্রিস্টাল মাখিয়ে ঘষে দেয়া হতো। ল্যাকটিক এসিড ক্রিস্টাল বাতাসের সংস্পর্শে এলে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে বিভূতি বা ছাইয়ের মতো ঝরে পড়ে; কার ছবি সেটা বিষয় না। বোঝাই যাচ্ছে "সাঁইবাবা" প্রজেক্টে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ভেলকি দেখিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপরতলার লোকেরা সাঁইবাবার শিষ্য সংখ্যা বাড়াতে চেয়েছিল আর জনসাধারণের মধ্যে একটি উদ্ভট ধর্মীয় উন্মাদনা জিইয়ে রাখার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল। (৪) ১৯৯৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পাতায় খবরটা বের হয়—" ২১ সেপ্টেম্বর দিল্লির এক মন্দিরে দেবতা গণেশ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা নাকি ভক্তের হাত থেকে চামচে করে দুধ পান করেছেন"। খবরটা ছড়াতে যতটা না সময় লাগে, তার থেকে হাজার গুণ বেশি দ্রুত হুজুগে মেতে ওঠে ভারতের হিন্দু জনগণ। কাতারে কাতারে মানুষ দেবতাকে দুধ খাওয়াতে মেতে ওঠে যুক্তিতর্কের তোয়াক্কা না করে,—এক হিসেবে দেখা যায় শুধু দিল্লিতেই ঐ সময় ২৫ হাজার লিটার দুধ উবে গেছে দেবতার নামে! এরপর এই গুজবের রেশ দিল্লি ছাড়িয়ে মুম্বাই, কলকাতা পাড়ি দিয়ে নেপাল, সিকিম, বাংলাদেশে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যা বাড়িতে যে ঠাকুর আছেন, তাঁরা সক্কলেই চোঁ চোঁ করে দুধ পান করতে লাগলেন। ফলে দেখা গেল—দুদিনের মাথায় দুধের দাম হু হু করে বেড়ে সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেল। আর মন্দিরের বাইরের নর্দমা দিয়ে ভেসে যেতে লাগলো লিটার লিটার দুধ। হুজুগের স্রোতে ভেসে না গিয়ে রুখে দাঁড়ালেন এ অঞ্চলের যুক্তিবাদিরা। তাঁরা মানুষকে বোঝাতে লাগলেন : "তরলের একটা ধর্মই হচ্ছে ছড়িয়ে পড়া। পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে সারফেস টেনশন। উদাহরণ হিসেবে হাতেনাতে দেখালেন,—কেরোসিনের তেলটা সলতের নীচে থাকে। অথচ আলোটা তো তেল পুড়েই তৈরি হচ্ছে, সলতেটা তো এজন্য দাউদাউ করে জ্বলে শেষ হয়ে যাচ্ছে না। কারণ—কেরোসিনের তেল একটু একটু উপরে উঠে আসছে সলতে বেয়ে, আর এজন্যই দীর্ঘসময় ধরে আগুন জ্বলতে পারে। কিন্তু এখন যদি সলতেটা না জ্বালিয়ে, অনেকটা বাড়িয়ে নীচের দিকে নামিয়ে সলতেটা নীচু অন্য একটি কেরোসিনের পাত্রে রেখে দিলে কী হবে? তখন কেরোসিন তেলটা সলতে বেয়ে আস্তে আস্তে নীচে নেমে নীচের অন্য কেরোসিন পাত্রে গিয়ে জমা হবে। ঠিক ঐ ব্যাপারটি ঘটেছে গণেশকে দুধ খাওয়ানোর সময়। গণেশের শুঁড়ের গোড়ায় দুধ ভর্তি চামচ অল্প হেলিয়ে ধরায় দুধের ক্ষীণ ধারা সামান্য একটু উঠে ভুঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে।" কিন্তু এই ভুঁড়ি বেয়ে দুধ নেমে যাওয়া চট করে নজরে আসে না, কারণ—মন্দিরের দেবতার গলায় ফুলের মালা, নানা রঙের পোষাক পড়ানো থাকে। যারা বাসা-বাড়িতে দেবতার মূর্তিকে দুধ পান করিয়েছেন, তারা যদি

একটু কষ্ট করে মূর্তির পোষাকে অথবা শরীরে হাত দিতেন তবে টের পেতেন নেমে যাওয়া দুধের অস্তিত্ব। কিন্তু আফসোস! হুজুগ মানুষকে এতোই কাণ্ডজ্ঞান শূণ্য করে ফেলে তা অচিন্তনীয়। পাঠকের হয়তো মনে আছে গতবছরও একই হুজুগে মেতে ছিল ভারত-বাংলাদেশ-নেপাল-কানাডা-আমেরিকার হিন্দুরা। দশ বছর আগেকার ঘটনার সময় দেয়া বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার ধার এবারো ধারে নাই হুজুগে মানুষগুলো। তারা চায় নিত্যনতুন গুজব। যাহোক, এখন উপর্যুক্ত উদাহরণগুলোকে নেড়ে-চেড়ে দেখলে বুঝা যায়:— (এক) প্রত্যেকটি গুজব সৃষ্টির পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণ আছে, অথবা বলা যেতে পারে কোনো এক বা একাধিক উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখেই গুজবগুলি ছড়ানো হয়। যেমন : প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে গুজব ছড়ানোর পিছনে দুষ্কৃতকারীদের প্রধান উদ্দেশ্য অবাধ লুঠতরাজ করা। অপরদিকে ঈশ্বর বা ধর্ম নিয়ে গুজব সৃষ্টির পিছনে রয়েছে ধর্মগুরুর ক্ষমতা-প্রণামী বৃদ্ধি, ভোটের সময় রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে একটা ফ্যাক্টর হয়ে দেখা দেওয়া, শ্রেণিবৈষম্য টিকিয়ে রেখে এ যুগের "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়"-দের শাসন-শোষণ দীর্ঘস্থায়ী করা। (দুই) প্রকৃতির খেয়ালে যে অস্বাভাবিকত্ব দেখা যায়, তাকে অবলম্বন করে কিছু লোকের মধ্যে ব্যবসা ফেঁদে ধনসম্পত্তি বৃদ্ধির লিপ্সা কাজ করে। তাই প্রত্যেকটি গুজব তৈরির পিছনে অসৎ বুদ্ধিবাজদের চিন্তার উদ্ভাবনী শক্তিকে স্বীকার করতেই হয়; দেখা যায় এমনভাবে গুজব ছড়ানো হয় যা সচরাচর মানুষের সাধারণ ভাবনায় আসে না। (তিন) আপাত অস্বাভাবিক গুজবের পেছনে নিশ্চিত কারণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আপাত অপার্থিব-অলৌকিক ঘটনার পেছনে যুক্তিগ্রাহ্য-বিজ্ঞানসম্মত কারণ থাকে, যা পরে অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তাহলে আমরা বলতে পারি, হুজুগ দানা বাঁধতে সক্ষম হয় মানুষের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের উপর ভর করে। যেদিন থেকে বিজ্ঞানমনস্কতা আর যুক্তিবাদের আলোয় মানুষের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস কেটে যাবে সেদিন থেকে কোনো গণেশঠাকুর দুধ পান করবেন না, কেউ আর অলৌকিকতায় ভর করে ঊর্ধ্বলোকে গমন করতে পারবে না, আঙুলের ইশারায় চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারবে না, ঈশ্বর-ভূত-প্রেত কোনো ব্যক্তির ওপর ভর করবে না, কোনো অবতারও এ দুনিয়ায় জন্ম নিবে না কিংবা কোনো ধর্মগুরু আর অলৌকিকতাকে নিয়ে ব্যবসা করতে পারবে না। তখন পার্থিব এ জগতে কোনো অপার্থিবতার স্থান থাকবে না, পৃথিবী হবে শুধুই প্রকৃতির আর মানুষের।—বাংলাভাষায় গুজব বা হুজুগ সম্পর্কে একেবারে নৃতাত্ত্বিক আলোচনা জানতে হলে, আগ্রহীরা পড়তে পারেন: পশ্চিমবঙ্গ লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, "গুজব-হুজুগ ও লোকসংস্কৃতি"-বিশেষ সংখ্যা, ১৯বর্ষ ৪ সংখ্যা, ১৪১৩।

(১৩) প্রবীর ঘোষ এবং পিনাকী ঘোষ, *অলৌকিক নয় লৌকিক* (তৃতীয় খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৯৪-৩০২।

(১৪) প্রবীর ঘোষ, *অলৌকিক নয় লৌকিক* (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৭৪।

(১৫) টীকা : আমরা দেখেছি এ পৃথিবীতে সব সময়ই কিছু "ঘাড় বাঁকা" লোকের আবির্ভাব ঘটে যারা যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলে; এর জন্য জেলজুলুম-নির্যাতন-ভয়ভীতি কোনো কিছুরই পরোয়া করে না। এ জ্ঞানচিন্তক-সত্যানুসন্ধানী-মুক্তচিন্তকের উদাহরণ আমাদের চারপাশে কম নয়; সক্রেটিস, গৌতম বুদ্ধ, হাইপেশিয়া, ইবনে সিনা, ওমর খৈয়াম, ব্রুনো, গ্যালিলিও, ডারউইন, মার্ক্স, লেনিন, আরজ আলী, আহমদ শরীফ প্রমুখ। এঁদের কেউবা শোষিত মানুষের পক্ষে, সাম্যের সমাজ গঠনের জন্য নিজেকে আত্মনিবেদন করেছেন, কেউবা মানুষের প্রশ্ন করা-জিজ্ঞাসা-মুক্তচিন্তার অধিকার রক্ষায় নিজেকে আত্মোৎসর্গ করেছেন, কেউবা নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েও কাল্পনিক পৌরাণিক বাণীর কাছে বিজ্ঞানকে মাথা নত করতে দেননি। তাঁরা আমাদের নমস্য। কিন্তু এ সমাজ-

সভ্যতায় এখনো ভণ্ড-বুজরুক-মানসিক ভারসাম্যহীনদের জাহিলিয়া শেষ হয়নি, চলছে স্টিম রোলার কখনো প্রকাশ্যে, কখনো কৌশলে। তাই শাসকশ্রেণী আর তার পেটোয়া বাহিনী কর্তৃক সৃষ্ট অপার্থিবতা-অলৌকিকতার আফিমে আসক্ত জনগণের মোহমুক্তির জন্য এখনো কিছু সত্যসন্ধানী-যুক্তিবাদী স্রোতের বিপরীতে অবস্থান করছেন। এঁদেরই একজন আমাদের দেশের অতিপরিচিত জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ। বিজ্ঞানমনস্ক এই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরেই অলৌকিকতার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার প্রয়াসে নিবেদিত। তিনি প্রকাশ্যে (১৯৮৪-৮৫ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত দুটি সাক্ষাৎকার) চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, তিনি বেঁচে থাকা পর্যন্ত পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের যে কোনো ব্যক্তি যদি ভূত অথবা অন্য কোনো অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে, তবে তাকে দেয়া হবে এক লক্ষ বাংলাদেশি টাকা পুরস্কার। সস্তা জনপ্রিয়তার মোহে নয়, কিংবা জনগণের আবেগকে সুড়সুড়ি দেবার উদ্দেশ্যেও নয়, বরং এ চ্যালেঞ্জ প্রদানের একটাই উদ্দেশ্য, ভদ্রতা-অতিলৌকিকতার মুখোশ পড়ে যারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছে, তাদেরকে বেআব্রু করে সহজ সত্য জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা। শুধু আমাদের জুয়েল আইচ নন, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, অজ্ঞানতা দূর করে যুক্তিবাদী-বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ার কাজে নিয়োজিত। এ জন্য প্রয়োজন হলে চ্যালেঞ্জ জানানোর পাশাপশি প্রকাশ্যে তথাকথিত অলৌকিক দাবিদারদের কাজকারবার, লৌকিক কৌশল প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিচ্ছেন যাতে জনগণের ভুল ভাঙে, অন্ধবিশ্বাসকে নিজের মনন থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে পারে। আমার জানা মতে, সবচেয়ে প্রাচীন (১৮৮০ সালে ইংল্যান্ডে স্থাপিত) প্রতিষ্ঠান Society for Psychical Research এ পর্যন্ত বহু অলৌকিক ক্ষমতার নামে প্রতারণাকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। প্রতারকদেরকে করেছে নগ্ন। বর্তমান বিশ্বে পরিচিত গণিতবিদ ও ম্যাজিসিয়ান জেমস র‍্যান্ডি এবং তাঁর Committee for investigation of claims of the paranormal (CSICOP) নামক প্রতিষ্ঠানটি এক মিলিয়ন ডলার চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি অলৌকিকতাকে লৌকিক কৌশল ব্যতিরেকে দেখাতে পারে তবেই তাকে এ পুরস্কার দেয়া হবে। সারা বিশ্বে প্রায় পঞ্চাশটির অধিক শাখা-সংগঠন খুলে তথাকথিত অতিলৌকিক কর্মকাণ্ড, অবতারদের রহস্য অনুসন্ধান, প্রকাশ, অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়ে চলছে অবিরাম। এখানে আরেকজন যুক্তিবাদী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতেই হয়, যিনি আজীবন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে লড়াই করে গেছেন। শ্রীলংকার ড. আব্রাহাম টি. কোভুর (১৮৯৮-১৯৭৮)। ড. কোভুর মানুষের চেতনা মুক্তির জন্য, অন্ধবিশ্বাস থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিক সত্যকে গ্রহণ করতে পারবে—এই বোধ থেকে দীর্ঘদিনের অধ্যাবসায়ের দ্বারা দুটি বই "Begone Godmen" এবং "Gods, Demon & Spirits" রচনা করেছেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে রচিত এই দুই বইয়ে বহু আপাত অলৌকিক ঘটনা, অপ্রাকৃতিক-অতীন্দ্রিয়বাদের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, সাথে সাথে জনগণের স্বার্থবিরোধী ও শাসকশ্রেণির স্বার্থপুষ্টকারী বাবাজী-মাতাজীদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। ১৯৬৩ সালে সমস্ত পৃথিবীর সামনে ড. কোভুর অলৌকিকতা-অপার্থিবতার বিরুদ্ধে এক লক্ষ শ্রীলংকান রুপির চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেন। ড. কোভুর বলতেন, অবতার, সাধু, যোগী, সিদ্ধ পুরুষ, গুরু স্বামীজি ও অন্যান্য যারা দাবি করেন, আধ্যাত্মিক তপস্যা বা ঈশ্বরের আশীর্বাদে তারা অলৌকিক ক্ষমতা রপ্ত করেছেন তারা যদি যে কোনো একটি অলৌকিক কাজ কোনো কৌশল ব্যতিরেকে দেখাতে পারেন, তবে এ পুরস্কার জিততে পারবেন। অলৌকিক কাজগুলো হচ্ছে—খামে পোরা টাকার নাম্বার বলে দেয়া, টাকার নোটের হুবুহু আরেকটি তৈরি করা, যে জিনিষটি চাওয়া হবে তা শূণ্য থেকে নিয়ে আসা, মানসিক শক্তি বলে একটি কঠিন বস্তুকে বাঁকানো, টেলিপ্যাথির সাহায্যে আরেক জনের মনের খবর জেনে নেয়া, যোগবলে শূণ্যে ভেসে থাকা, এক স্থানে শরীর ত্যাগ করে অন্য স্থানে আবির্ভূত হওয়া, ছবি তোলা যায় এমন একটি ভূত বা আত্মা নিয়ে আসা ইত্যাদি। এখানে লক্ষণীয় যে, কোভুর তাঁর চ্যালেঞ্জে এমন সব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যা অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারেরা সচরাচর ঘোষণা করে থাকেন। এঁর মধ্যে কেউ কেউ কোভুরের চ্যালেঞ্জ সাহস করে গ্রহণ

করেছিলেন, কিন্তু শেষমেশ সবাই কোভুরের হাতে ধরা পড়ে মান-সম্মানসহ জামানতের টাকা পর্যন্তও খোয়েছেন। এবার আমরা যার কথা বলব, আমার মনে হয়, তাঁর সম্পর্কে বাংলাদেশের পাঠকদের সাথে নূতন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার দরকার নেই। তিনি এ উপমহাদেশের যুক্তিবাদী আন্দোলনের প্রবাদপুরুষ প্রবীর ঘোষ; অনেকের কাছে ভূতের পুলিশ। তাঁর ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি সম্পর্কে আমরা সবাই কম-বেশি জানি। প্রবীর ঘোষের লেখা অলৌকিক নয় লৌকিক, সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ, আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, প্রসঙ্গ সন্ত্রাস এবং ... প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলাদেশের বিজ্ঞানমনস্ক, সমাজসচেতন পাঠকের কাছে তুমুল জনপ্রিয়। অনেকেরই জানা আছে, প্রবীর ঘোষ তাঁর সমিতির মাধ্যমে জ্যোতিষ, ফেং শুই, রেইকি গ্রান্ডমাস্টার, অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের প্রতি বিশ লক্ষ ভারতীয় রুপির চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন। এই চ্যালেঞ্জ বলবৎ থাকবে প্রবীর ঘোষ জীবিত থাকা পর্যন্ত অথবা প্রথম অলৌকিক ক্ষমতাবান খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত। দুঃখের বিষয়, একজন অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারও নিজের অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দিতে পারেননি এখনো। জানা গেছে আজ পর্যন্ত প্রবীর ঘোষ এবং যুক্তিবাদী সমিতির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে পরাজিত হয়েছেন হাজারখানেক "অলৌকিক" বাবাজী-মাতাজী, বিধ্বস্ত-পলাতক জ্যোতিষীর সংখ্যা পৌনে দু'শ অতিক্রান্ত আর তাঁরা ভূতুরে বাড়ি বা ভূতের ভর ধরেছেন শ'খানেক। প্রবীর ঘোষ বলেন, "অনেকের কাছে চ্যালেঞ্জ শব্দটি অশোভন মনে হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য পর্যায় হল—চ্যালেঞ্জ। প্রচার ও বিজ্ঞাপনের দৌলতে যে গল্পের গরুগুলো গাছে চড়ে বসেছে, তাদের মাটিতে নামিয়ে এনে আবার ঘাস খাওয়ানোর জন্যই এই চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জ বাস্তব সত্যকে বড় বেশি স্পষ্ট করে তোলে। সাধারণ মানুষের কাছে আজকের জনপ্রিয় প্রশ্ন এটাই—চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেই দাবি প্রমাণ করা যায়, বাস্তবসত্যকে জানা যায়, সেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণে দ্বিধা থাকবে কেন?" তিনি আরো বলেন,—"আমি চাই, আমার এই চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে আরো কিছু মানুষ বুঝতে শিখুন, বিশ্বাস করতে শিখুন, অলৌকিক ক্ষমতাবান কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব এ বিশ্বে নেই। অলৌকিকতা যা আছে, তা শুধুই পত্র-পত্রিকা, ধর্মগ্রন্থ ও বইয়ের পাতায়।" প্রবীর ঘোষের যুক্তিবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ, নেপালসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানমনস্ক-সমাজ সচেতন মানুষেরা তাঁদের নিজ নিজ সাধ্যের মধ্যে যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন অপার্থিব ক্ষমতার দাবিদারদের প্রতি, হাতেনাতে তাদের ভণ্ডামো উন্মোচণ করে চলছেন, জনসাধারণদের শিখিয়ে দিচ্ছেন বুজরুক অপার্থিব ক্ষমতাবানদের লৌকিক কৌশলগুলো। বাংলাদেশে এখনো যে সকল বুজরুক অলৌকিক ক্ষমতার দাবি করছেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি—এতোই যখন আত্মবিশ্বাস নিজের ক্ষমতার প্রতি, তাহলে একটু কষ্ট করে প্রবীর ঘোষ প্রদত্ত চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করুন। চ্যালেঞ্জে জিততে পারলে, পাবেন আন্তর্জাতিক বিশাল খ্যাতিসহ বিশলক্ষ ভারতীয় রুপি, সাথে এ উপমহাদেশের অসংখ্য যুক্তিবাদী মানুষ, যারা আপনার খাসবান্দা হিসেবে আজীবন সেবা করে যাবে নির্দ্বিধায়। প্রবীর ঘোষের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা:– প্রবীর ঘোষ, ৭২/৮ দেবীনিবাস রোড, কলকাতা- ৭০০০৭৪। আর পাঠক, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, বুঝেন—যুক্তিবাদী-বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কাছে এ সমাজ-পরিবেশ অনুকূলে নয়; প্রতি পদে-পদে প্রথা-নীতি-নৈতিকতার নামে ভণ্ডামোর শিকল লাগানো। মৌলবাদী-ধর্মান্ধ-দালাল আর শাসকশ্রেণির "সুপারগ্লু" লাগানো সম্পর্কের ফলে কখনোই কাঙ্ক্ষিত সমাজ গঠন সম্ভব হবে না, যতক্ষণ না আপামর জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠবে। তাই সমাজসচেতন পাঠক, আপনার সহযোগিতার বড্ড প্রয়োজন, আগামীদিনের শ্রেণিহীন-শোষণহীন-ভণ্ডামোমুক্ত-প্রতারকমুক্ত সাম্যের সমাজ গঠনের জন্য। আমরা আপনার অপেক্ষায় আছি। আপনার হাতটি বাড়িয়ে দিন।

অনন্ত বিজয়, শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, এবং যুক্তি পত্রিকার সম্পাদক।

মুক্তমনার একজন নিবেদিতপ্রাণ সদস্য। সংরক্ষনশীল সনাতন ধর্মের মিথ, কুসংস্কার এবং অনুদার সমাজ কাঠামোর একজন প্রবল সমালোচক। মানবতা এবং যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০৬ সালে মুক্তমনা এওয়ার্ড পেয়েছেন।

আত্মা বলে সত্যই কি কিছু আছে?

(উৎসর্গ: গায়ক সঞ্জীব চৌধুরী - আত্মায় অবিশ্বাসী একজন পরিপূর্ণ ইহজাগতিক মানুষ)

অভিজিৎ রায়

আত্মার উৎস সন্ধানে :

আত্মার ধারণা অনেক পুরোন। যখন থেকে মানুষ নিজের অস্তিত্ব নিয়ে অনুসন্ধিৎসু হয়েছে, নিজের জীবন নিয়ে কিংবা মৃত্যু নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে, জীবন জগতের বিভিন্ন রহস্যে হয়েছে উদ্বেলিত, তার ক্রমিক পরিনতি হিসেবেই এক সময় মানব মনে আত্মার ধারণা উঠে এসেছে। আসলে জীবিত প্রাণ থেকে জড়জগৎকে পৃথক করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহজ সমাধান হিসেবে আত্মার ধারণা একটা সময় গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছিল বলে মনে করা হয়[১, ৪, ৫, ১৯]। আদিকাল থেকেই মানুষ ইট, কাঠ, পাথর যেমনি দেখেছে, ঠিক তেমনিভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে চারপাশের বর্ণাঢ্য জীবজগতকে। ইট, পাথর বা অন্যান্য জড় পদার্থের যে জীবনীশক্তি নেই, নেই কোন চিন্তা করার ক্ষমতা তা বুঝতে তার সময় লাগেনি। অবাক বিস্ময়ে সে ভেবেছে - তাহলে জীবগতের যে চিন্তা করার কিংবা চলে ফিরে বেড়াবার ক্ষমতাটি রয়েছে, তার জন্য নিশ্চয় বাইরে থেকে কোন আলাদা উপাদান যোগ করতে হয়েছে। আত্মা নামক অপার্থিব উপাদানটিই সে শুন্যস্থান তাদের জন্য পূরণ করেছে[১৪], তারা রাতারাতি পেয়ে গেছে জীবন-মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার খুব সহজ একটা সমাধান। এখন পর্যন্ত জানা তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, আত্মা দিয়ে জীবন মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার করার প্রচেষ্টা প্রথম শুরু হয়েছিলো সম্ভবতঃ নিয়ান্ডার্থাল মানুষের আমলে - যারা পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে এখন থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ বছর আগে[১৯]। নিয়ানডার্থাল মানুষের আগে পিথেকানথ্রোপাস আর সিনানথ্রোপাসদের মধ্যে এ ধরনের ধর্মাচরণের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। তবে নিয়ান্ডার্থাল মানুষের বিশ্বাসগুলো ছিল একেবারেই আদিম- আজকের দিনের প্রচলিত ধর্মমতগুলোর তুলনায় অনেক সরল। ইরাকের শানিদার নামের একটি গুহায় নিয়ান্ডার্থাল মানুষের বেশ কিছু ফসিল পাওয়া গেছে যা দেখে অনুমান করা যায় যে, নিয়ান্ডার্থালরা প্রিয়জন মারা গেলে তার আত্মার উদ্দেশ্যে ফুল নিবেদন করতো। এমনকি তারা মৃতদেহ কবর দেয়ার সময় এর সাথে পুষ্পরেণু, খাদ্যদ্রব্য, অস্ত্র সামগ্রী, শিয়ালের দাঁত এমনকি মাদুলীসহ সব কিছুই দিয়ে দিত যাতে পরপারে তাদের আত্মা শান্তিতে থাকতে পারে আর সঙ্গে আনা জিনিসগুলো ব্যবহার করতে পারে। অনেক গবেষক (যেমন নিলসন গেসছিটি, রবার্ট হার্টস প্রমুখ) মনে করেন, মৃতদেহ নিয়ে আদি মানুষের পারলৌকিক ধর্মাচরণের ফলশ্রুতিতেই মানব সমাজে ধীরে ধীরে আত্মার উদ্ভব ঘটেছে[১৬]।

আত্মা নিয়ে হরেক রকম গপ্প:

জীবন মৃত্যুর যোগসূত্র খুঁজতে গিয়ে আত্মাকে 'আবিস্কার' করলেও সেই আত্মা কি করে একটি জীবদেহে

প্রাণসঞ্চার করে কিংবা চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটায় তা নিয়ে প্রাচীন মানুষেরা একমত হতে পারেনি। ফলে জন্ম নিয়েছে নানা ধরনের গাল গপ্প, লোককথা আর উপকথার। পরবর্তীতে এর সাথে যোগ হয়েছে নানা ধরনের ধর্মীয় কাহিনীর। জন্ম হয়েছে আধ্যাত্মবাদ আর ভাববাদের, তারপর সেগুলো সময়ের সাথে সাথে আমাদের সংস্কৃতির সাথে মিলে মিশে এমনভাবে একাকার হয়ে গেছে যে আত্মা ছাড়া জীবন-মৃত্যুকে সংজ্ঞায়িত করাই অনেকের জন্য অসম্ভব ব্যাপার। আত্মা নিয়ে কিছু মজার কাহিনী এবারে শোনা যাক।

জাপানীরা বিশ্বাস করে একজন মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন তার ভেতরের আত্মা খুব ছোট পতঙ্গের আকার ধারণ করে তার হা করা মুখ দিয়ে শরীর থেকে বের হয়ে যায়। তারপর যখন ওই আত্মা নামক পোকাটি ঘুরে ফিরে আবার হামগুড়ি দিয়ে মুখ বেয়ে দেহের ভিতরে প্রবেশ করে তখনই ওই মানুষটি ঘুম থেকে জেগে উঠে[১, ৪]। মৃত্যুর ব্যাখ্যাও এক্ষেত্রে খুব সহজ। মুখ দিয়ে বেরিয়ে পোকাটি আর যদি কোন কারণে ফেলে আসা দেহে ঢুকতে বা ফিরতে না পারে, তবে লোকটির মৃত্যু হয়। অনেক সময় ঘুমন্ত মানুষের অস্বাভাবিক স্বপ্নদেখাকেও আত্মার অস্তিত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করতেন প্রাচীন মানুষেরা[১৫, ১৬]। তারা ভাবতেন, ঘুমিয়ে পড়লে মানুষের আত্মা 'স্বপ্নের দেশে' পাড়ি জমায়। আর তারপর স্বপ্নের দেশ থেকে আবার ঘুমন্ত মানুষের দেহে আত্মা ফেরত এলে মানুষটি ঘুম থেকে জেগে উঠে। আত্মা নিয়ে এধরনের নানা বিশ্বাস আর লোককথা ইউরোপ, এশিয়া আর আফ্রিকায় ছড়িয়ে ছিল।

আত্মার এক ধরণের প্রাগৈতিহাসিক ধারণা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী অ্যাবরোজিনসদের মধ্যে প্রচলিত ছিল[৭]। প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগে অ্যাবরোজিনসরা অস্ট্রেলিয়ার মূল ভুখন্ডে আসার পর অনেকদিন বাইরের জগতের সাথে বিচ্ছিন্ন ছিল। ফলে তাদের সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল চারপাশের পৃথিবী থেকে একটু ভিন্নভাবে। তাদের আত্মার ধারণাও ছিল বাইরের পৃথিবী থেকে ভিন্ন রকেমের। তাদের আত্মা ছিল যোদ্ধা প্রকৃতির। তীর-ধনুকের বদলে বুমেরাং ব্যবহার করত। কোন কোন অ্যাবরোজিন এও বিশ্বাস করত যে, তাদের গোত্রের নতুন সদস্যরা আত্মাদের পুনরায় ব্যবহার করতে পারত। ঠিক একইভাবে প্রায় বার হাজার বছর আগেকার আদিবাসী আমেরিকানদের মধ্যেও আত্মা নিয়ে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, যা প্রকারন্তরে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধ্যান ধারণার অভিযোজনকেই তুলে ধরে। আফ্রিকার কালোমানুষদের মতে সকল মানুষের আত্মার রং কালো রং-এর। আবার মালয়ের বহু মানুষের ধারণা, আত্মার রঙ রক্তের মতই লাল, আর আয়তনে ভুট্টার দানার মত। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অনেকের ধারণা আত্মা আসলে তরল। অস্ট্রেলিয়ার অনেকে আবার মনে করে আত্মা থাকে বুকের ভিতরে, হৃদয়ের গভীরে; আয়তনে অবশ্যই খুবই ছোট[২১]। কাজেই এটুকু বলা যায়, আত্মায় বিশ্বাসীরা নিজেরাই আত্মার সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞার ব্যাপারে একমত নন। আত্মা নিয়ে প্রচলিত পরস্পর-বিরোধী গাল-গপ্পগুলো সেই সাক্ষ্যই দেয়।

ইতিহাস ঘাটলে জানা যায়, হিব্রু, পারশিয়ান আর গ্রীকদের মধ্যে আত্মা নিয়ে বহুধরনের বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। প্রথম দিকে - অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব ছয় শতক পর্যন্ত তো বটেই- হিব্রু, ফোয়েনিকানস আর ব্যবলনীয়, গ্রীক এবং রোমাদের মধ্যে মৃত্যু-পরবর্তী আত্মার কোন স্বচ্ছ ধারণা গড়ে ওঠেনি[১, ৪]। তারা ভাবতেন মানুষের আত্মা একধরনের সজ্ঞাবিহীন ছায়া সদৃশ (shadowy entity) অসম্পূর্ণ সত্তা, পূর্ণাংগ কিছু নয়। গবেষক ব্রেমার আত্মা নিয়ে প্রাচীন ধারণাগুলো সম্বন্ধে বলেন, 'মোটের উপর আত্মাগুলো ছিল চেতনাবিহীন ছায়া ছায়া জিনিস, পূর্ণাংগ সত্তা তৈরি করার মত গুণাবলীর অভাব ছিল তাতে'[১৬]।

সম্ভবতঃ জরথ্রুস্ট্র ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যার আত্মা সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনা আধুনিক আধ্যাত্মবাদীদের দেওয়া আত্মার ধারণার অনেকটা কাছাকাছি। জরথ্রুস্ট্র ছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ বছর আগেকার একজন পারশিয়ান। তার মতানুযায়ী, প্রতিটি মানুষ তৈরি হয় দেহ এবং আত্মার সমন্বয়ে, এবং আত্মার কল্যানেই আমরা যুক্তি, বোধ, সচেতনতা এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চা করতে পারি। জরথ্রুস্ট্রবাদীদের মতে, প্রতিটি মানুষই নিজের ইচ্ছানুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ কর্ম করার অধিকারী, এবং সে অনুযায়ী, তার ভাল কাজ কিংবা মন্দকাজের উপর ভিত্তি করে তার আত্মাকে পুরষ্কৃত করা হবে কিংবা শাস্তি প্রদান করা হবে। জরথ্রুস্ট্রের দেওয়া আত্মার ধারণাই পরবর্তীকালে গ্রীক এথেনীয় দার্শনিকেরা এবং আরো পরে খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্ম তাদের দর্শনের অংগীভুত করে নেয়। খ্রীষ্টধর্মে আত্মার ধারণা গড়ে ওঠে সেন্ট অগাস্টিনের হাতে। জরথ্রুস্ট্রের মৃত্যুর প্রায় এক হাজার বছর পর অত্যন্ত প্রভাবশালী ধর্মবেত্তা সেন্ট অগাস্টিন খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তি হিসেবে একই ধরণের (মানুষ = দেহ + আত্মা) যুক্তির অবতারণা করেন। এই ধারণাই পরবর্তিতে অস্তিত্বের দৈত্বতা (dulaliy) হিসবে খ্রীষ্ট ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে। এর সাথে যোগ হয় পাপ-পূণ্য এবং পরকালে আত্মার স্বর্গবাস বা নরকবাসের হরেকরকেরম গালগপ্প। এগুলোই পরে ডালপালায় পল্লবিত হয়ে পরে ইসলাম ধর্মেও স্থান করে নেয়। সন্দেহ করা হয়, প্রাথমিকভাবে অগাস্টিন জরথ্রুস্ট্রবাদীদের কাছ থেকেই আত্মার ধারণা পেয়েছিলেন, কারণ খ্রীষ্টধর্মগ্রহন করার আগ পর্যন্ত নয় বছর অগাস্টিন ম্যানিকিন (Manchean) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের মধ্যে জরথ্রুস্ট্রবাদের প্রভাব বিদ্যমান ছিল পুরোমাত্রায়।

হিব্রু এবং গ্রীকদের মধ্যে প্রথম দিকে আত্মা নিয়ে কোন সংহত ধারণা ছিল না । এই অসংহত ধারণার প্রকাশ পাওয়া যায় হোমারের (খ্রীষ্টপূর্ব ৮৫০) রচনায় - *সাইকি* (Psyche) শব্দটির উল্লেখে। হোমারের বর্ণনানুযায়ী, কোন লোক মারা গেলে বা অচেতন হয়ে পরলে 'সাইকি' তার দেহ থেকে চলে যায়[১৬]। তবে সেই সাইকির সাথে আজকের দিনে প্রচলিত আত্মার ধারণার পার্থক্য অনেক। হোমারের সাইকি ছিল সজ্ঞাবিহীন ছায়া সদৃশ অসম্পূর্ণ সত্তা; এর আবেগ, অনুভূতি কিংবা চিন্তাশক্তি কিছুই ছিল না [১, ৪]। ছিল না পরকালে আত্মার পাপ-পূণ্যের হিসাব।

এর মাঝে গ্রীসের অয়োনীয় যুগের বিজ্ঞানীরা বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে জীবণ মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হন। ভাববাদের কচকচানি এড়িয়ে প্রথম যে গ্রীক দার্শনিক জীবনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হলেন, তাঁর নাম থেলিস (৬২৪-৫৪৭ খ্রী.পূ.)। থেলিসের বক্তব্য ছিল, বস্তু মাত্রই প্রাণের সুপ্ত আধার। উপযুক্ত পরিবেশে বস্তুর মধ্যে নিহিত প্রাণ আত্মপ্রকাশ করে[২০]। পরমাণু তত্ত্বের প্রবক্তা ডেমোক্রিটাস (৪৬০-৩৭০ খ্রী.পূ.) প্রাণের সাথে বস্তুর নৈকট্যকে আরো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। ডেমোক্রিটাস বলতেন, সমগ্র বস্তুজগৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণা দিয়ে গঠিত। তিনি সে কণিকাগুলোর নাম দিলেন অ্যাটম বা পরমাণু। তিনি শুধু সেখানেই থেমে থাকেননি, তার পরমাণু তত্ত্বকে নিয়ে গেছেন প্রাণের উৎপত্তির ব্যাখ্যাতেও। তিনি বলতেন, কাদা মাটি বা আবর্জনা থেকে যখন প্রাণের উদ্ভব হয় তখন অজৈব পদার্থের অনুগুলো সুনির্দিষ্টভাবে সজ্জিত হয়ে জীবনের ভিত্তিভুমি তৈরি করে। ডেমোক্রিটাসের প্রায় সমসাময়িক দার্শনিক লিউসেপ্পাসও (আনুমানিক ৫০০-৪৪০ খ্রী.পূ.) এধরণের বস্তুবাদী ধারণায় বিশ্বাস করতেন। তিনি বিজ্ঞানে তিনটি নতুন ধারণা চালু করেন -চরম শূন্যতা, চরম শূন্যতার মধ্য দিয়ে এটমের চলাফেরা এবং যান্ত্রিক প্রয়োজন। লিউসেপ্পাসই প্রথম

বিজ্ঞানে কার্যকারণ তত্ত্বের জন্ম দেন বলে কথিত আছে [২২]। অয়োনীয় যুগের দর্শনের বস্তুবাদীরূপটিকে পরবর্তীতে আরো উন্নয়ন ঘটান এপিকিউরাস এবং লুক্রেশিয়াস, এবং তা দর্শন ও নীতিশাস্ত্রকেও প্রভাবিত করে। গ্রীক পরমাণুবাদ পরবর্তীকালে বিজ্ঞানকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। যেমন, প্রথম আধুনিক পরমাণুবিদ গ্যাসেন্ডি তার পরমাণুবাদ তৈরির জন্য ঋণ স্বীকার করেছেন ডেমোক্রিটাস এবং এপিকিউরাসের কাছে। গ্রীক পরমানূবাদ প্রভাবিত করেছিল পরবর্তীতে পদার্থবিদ নিউটন এবং রসায়নবিদ জন ড্যাল্টনকেও তাদের নিজ নিজ পরমাণু তত্ত্ব নির্মাণে।

কাজেই গ্রীসের অয়োনীয় যুগে মেইনস্ট্রীম দার্শিনিকদের চিন্তা চেতনা ছিল অনেকটাই বস্তুবাদী। কিন্তু পরে পারস্য দেশের প্রভাবে আত্মা সংক্রান্ত সব আধ্যাতিক এবং ভাববাদী ধ্যান-ধারনা গ্রীকদের মধ্যে ঢুকে যায়। ভাববাদী দর্শনের তিন পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন সক্রেটিস, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল। এরা এথেন্সের সন্তান হলেও সে এথেন্স তখন অবক্ষয়ী এথেন্স। তারপরও পরবর্তী আড়াই হাজার বছর তাদের চিন্তা-চেতনা দিয়ে মানব সমাজ প্রভাবিত হয়েছিল। এদের ক্ষমতার কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, মানব ইতিহাসের প্রথম স্বাধীন নগরের বৈপ্লবিক মহত্ব থেকে তারা মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করার মত শক্তিধর হওয়া সত্ত্বেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে ক্ষমতাকে তারা প্রতিবিপ্লবের স্বার্থে ব্যবহার করতেন [২২]। তারা গণতন্ত্রের ভয়ে ভীত ছিলেন এবং গণতন্ত্রের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেন। অয়োনীয় যুগের দার্শনিকেরা পলে পলে বস্তুবাদের যে সৌধ গড়ে তুলেছিলেন, তা এই তিন ভাববাদী দার্শনিকদের আগ্রাসনে বিলুপ্ত হয়। বস্তুবাদকে সরিয়ে মূলতঃ রহস্যবাদী উপাদানকে হাজির করে তারা তাদের দর্শন গড়ে তুলেন। প্লেটোর বক্তব্য ছিল যে, প্রাণী বা উদ্ভিদ কেউ জীবিত নয়, কেবলমাত্র যখন আত্মা প্রাণী বা উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করে তখনই তাতে জীবনের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। প্লেটোর এ সমস্ত তত্ত্বকথাই পরবর্তীতে খ্রীস্টধর্মের বুদ্ধিবৃত্তিক সমর্থনের যোগান দেয়। প্লেটোর এই ভাববাদী তত্ত্ব অ্যারিস্টটলের দর্শনের রূপ নিয়ে পরবর্তীতে হাজারখানেক বছর রাজত্ব করে। এখন প্রায় সব ধর্মমতই দার্শনিক-যুগলের ভাববাদী ধারণার সাথে সঙ্গতি বিধান করে। আত্মা সংক্রান্ত কুসংসস্কার শেষপর্যন্ত মানব সমাজে ধীরে ধীরে জাঁকিয়ে বসে।

আত্মার অসারতা :

জীব কী আর জড় কী? বুঝব কি করে কে জীব আর কে জড়? জীবিতদের কি ভাবে সনাক্ত করা যায়? একটি মৃতদেহ আর একটি জীবিত দেহের মধ্যে পার্থক্যই বা কি? এ প্রশ্নগুলো দিয়ে আগেকার দিনের মানুষের অনুসন্ধিৎসু মন সবসময়ই আন্দোলিত হয়েছে পুরোমাত্রায়। কিন্তু এই প্রশ্নগুলোর কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পেয়ে তারা শেষপর্যন্ত কল্পনা করে নিয়েছে অদৃশ্য আত্মার [১৯]। ভেবেছে আত্মাই বুঝি জীবন ও মৃত্যুর যোগসূত্র। প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের ভাববাদী ধ্যানধারণাগুলো কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন ধর্মে জায়গা করে নেওয়ার পর জীবন-মৃত্যুর সংজ্ঞা ধর্মীয় মিথের আবরণে পাখা মেলতে শুরু করল। কল্পনার ফানুস উড়িয়ে মানুষ ভাবতে শুরু করল, ঈশ্বরের নির্দেশে আজরাইল বা যমদূত এসে প্রাণহরণ করলেই কেবল একটি মানুষ মারা যায়। আর তখন তার দেহস্থিত আত্মা পাড়ি জমায় পরলোকে। মৃত্যু নিয়ে মানুষের এ ধরনের ভাববাদী

চিন্তা জন্ম দিয়েছে আধ্যাত্মবাদের। আধ্যাত্মবাদ স্বতঃপ্রমাণ হিসেবেই ধরে নেয়-'আত্মা জন্মহীন, নিত্য, অক্ষয়। শরীর হত হলেও আত্মা হত হয় না।' মজার ব্যাপার হল, একদিকে যেমন আত্মাকে অমর অক্ষয় বলা হচ্ছে, জোর গলায় প্রচার করা হচ্ছে আত্মাকে কাটা যায় না, পোড়ানো যায় না, আবার সেই আত্মাকেই পাপের শাস্তিস্বরূপ নরকে ধারলো অস্ত্র দিয়ে কাটা, গরম তেলে পোড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ সবই আধ্যাত্মবাদের স্ববিরোধিতা। ধর্মগ্রন্থগুলি ঘাটলেই এ ধরনের স্ববিরোধিতার হাজারো দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। স্ববিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও আত্মার অস্তিত্ব দিয়ে জীবনকে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছে মানুষ। কারণ সে সময় বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ছিল সীমিত। মৃত্যুর সঠিক কারণ ছিল তাদের জানার বাইরে। সেজন্য অনেক ধর্মবাদীরাই 'আত্মা' কিংবা 'মন' কে জীবনের আধাররূপী বস্তু হিসেবে কল্পনা করেছেন। যেমন, ইসলামিক মিথ্ বলছে, আল্লাহ মানবজাতির সকল আত্মা একটি নির্দিষ্ট দিনে তৈরী করে বেহেস্তে একটি নির্দিষ্ট স্থানে (ইল্লিন) বন্দি করে রেখে দিয়েছেন। আল্লাহর ইচ্ছাতেই নতুন নতুন প্রাণ সঞ্চারের জন্য একেকটি আত্মাকে তুলে নিয়ে মর্তে পাঠানো হয়। আবার আচার্য শঙ্কর তার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলেছেন, 'মন হল আত্মার উপাধি স্বরূপ'। ওদিকে আবার সাংখ্যদর্শনের মতে - 'আত্মা চৈতন্যস্বরূপ' (সাংখ্যসুত্র ৫/৬৯)। জৈন দর্শনে বলা হয়েছে, 'চৈতন্যই জীবের লক্ষণ বা আত্মার ধর্ম।' (ষড়দর্শন সমুচ্চয়, পৃঃ ৫০) স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত ভাবতেন, 'চৈতন্য বা চেতনাই আত্মা।' (বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, পৃঃ ১৬২) স্বামী অভেদানন্দের মতে, 'আত্মা বা মন মস্তিস্ক বহির্ভুত পদার্থ, মস্তিষ্কজাত নয়।' (মরণের পারে, পৃঃ ৯৮)। গ্রীক দর্শনেও আমরা প্রায় একই রকম ভাববাদী দর্শনের ছায়া দেখতে পাই, যা আগের অংশে আমারা আলোচনা করেছি। অ্যারিস্টটলের পরবর্তী গ্রীক ও রোমান দার্শনিকেরা অ্যারিস্টটলীয় দর্শনকে প্রসারিত করে পরবর্তী যুগের চাহিদার উপযোগী করে তোলেন। খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতকে নয়া প্লেটোবাদীরা 'ঈশ্বর অজৈব বস্তুর মধ্যে জীবন সৃষ্টিকারী আত্মা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তাকে জীবন দান করেন' - এই মত প্রচার করতে শুরু করেন। নয়া প্লেটোবাদী প্লাটিনাসের মতে, 'জীবনদায়ী শক্তিই জীবনের মূল।' বস্তুতপক্ষে, জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'জীবনশক্তি' (life force) তত্ত্ব এখান থেকেই যাত্রা শুরু করে এবং জীবনের উৎপত্তি প্রসঙ্গে ভাববাদী দর্শনের ভিত্তিও জোরালো হয়। ধর্মবাদী চিন্তা, বৈজ্ঞানিক অনগ্রসরতা, কুসংস্কার, ভয় সব কিছু মিলে শিক্ষিত সমাজে এই ভাববাদী চিন্তাধারার দ্রুত প্রসার ঘটে।

বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি আর যুক্তির প্রসারের ফলে আজ কিন্তু আত্মা দিয়ে জীবন-মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলো মানুষের চোখে সহজেই ধরা পড়ছে। যদি জীবনকে 'আত্মার উপস্থিতি' আর মৃত্যুকে 'আত্মার দেহত্যাগ' দিয়েই ব্যাখ্যা করা হয়, তবে তো যে কোন জীবিত সত্ত্বারই - তা সে উদ্ভিদই হোক আর প্রাণীই হোক- আত্মা থাকা উচিৎ। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে একটি দেহে কি কেবল একটিমাত্র আত্মা থাকবে নাকি একাধিক? যেমন, বেশ কিছু উদ্ভিদ - গোলাপ, কলা, ঘাসফুল এমন কি হাইড্রা, কোরালের মত প্রাণীরাও কর্তন (Cut) ও অঙ্কুরোদগোমের (Bud) মাধ্যমে বিস্তৃত হয়। তাহলে কি সাথে সাথে আত্মাও কর্তিত হয়, নাকি একাধিক আত্মা সাথে সাথেই অঙ্কুরিত হয়? আবার মাঝে মধ্যেই দেখা যায় যে, পানিতে ডুবে যাওয়া, শ্বাসরুদ্ধ, মৃত বলে মনে হওয়া/ঘোষিত হওয়া অচেতন ব্যক্তির জ্ঞান চিকিৎসার মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয় - তখন কি দেহত্যাগী বৈরাগী আত্মাকেও সেই সাথে ডেকে ঘরে থুড়ি দেহে ফিরিয়ে আনা হয়? প্রজননকালে পিতৃদত্ত শুক্রানু আর মাতৃদত্ত ডিম্বানুর মিলনে শিশুর দেহকোষ তৈরী হয়। শুক্রানু আর ডিম্বানু জীবনের মূল, তাহলে নিশ্চয় তাদের আত্মাও আছে। এদের আত্মা কি তাদের

আভিভাবকদের আত্মা থেকে আলাদা? যদি তাই হয় তবে কিভাবে দুটি পৃথক আত্মা পরস্পর মিলিত হয়ে শিশুর দেহে একটি সম্পূর্ণ নতুন আত্মার জন্ম দিতে পারে? মানব মনের এ ধরনের অসংখ্য যৌক্তিক প্রশ্ন আত্মার অসারত্বকেই ধীরে ধীরে উন্মোচিত করেছে।

আত্মার সংজ্ঞাতেও আছে বিস্তর গোলমাল। কেউ আত্মার চেহারা বায়বীয় ভাবলেও (স্বামী অভেদানন্দের মরণের পারে দ্রঃ) কেউ আবার ভাবেন তরল (প্রশান্ত মহাসাগরের অধিবাসী); কেউ আত্মার রঙ লাল (মালয়ের অধিবাসী) ভাবলেও অন্য অনেকে ভাবেন কালো (আফ্রিকাবাসী এবং জাপানীদের অনেকের এ ধরণের বিশ্বাস রয়েছে)। বিদেহী আত্মার পুনর্জন্ম নিয়ে গোলমাল আরো বেশি। বিশ্বের প্রধান ধর্মমত হিসেবে হিন্দু, ইসলাম এবং খ্রীষ্ট ধর্মের কথা আলোচনা করা যাক। হিন্দুরা আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে; আবার অপরদিকে মুসলিম আর খ্রীষ্টানদের কাছে আত্মার পুনর্জন্ম বলে কিছু নেই। মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রত্যেকটি ধর্ম তাদের বিশ্বাসকেই অভ্রান্ত বলে মনে করে। এ প্রসঙ্গে প্রবীর ঘোষ তার 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থে বলেন [২১],

> 'একবার ভাবুন তো, আত্মার চেহারাটা কেমন, তাই নিয়েই বিশ্বের বিভিন্ন দেশবাসীর বিভিন্ন মত। অথচ স্বামী অভেদানন্দই এক জায়গায় বলেছেন, 'আমাদের মনে রাখা উচিৎ যে, সত্য কখনো দু'রকমের বা বিচিত্র রকমের হয় না, সত্য চিরকালই এক ও অখন্ড।'

বিবর্তনতত্ত্ব মানতে গেলে তো আত্মার অস্তিত্ব এবং পুনর্জন্মকে ভালমতই প্রশ্নবিদ্ধ করতে হয়। বিজ্ঞান আজ প্রমাণ করেছে জড় থেকেই জীবের উদ্ভব ঘটেছিল পৃথিবীর বিশেষ ভৌত অবস্থায় নানারকম রাসায়নিক বিক্রিয়ার জটিল সংশ্লেষের মধ্য দিয়ে আর তারপর বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছে জৈববিবর্তনের বন্ধুর পথে। এই প্রাণের উদ্ভব এবং পরে প্রজাতির উদ্ভবের পেছনে কোন মন বা আত্মার অস্তিত্ব ছিল না। প্রাণের উদ্ভবের পর কোটি কোটি বছর কেটে গেছে, আর আধুনিক মানুষ তো এল -এই সেদিন - মাত্র পচিশ থেকে ত্রিশ হাজার বছর আগে। তাহলে এখন প্রশ্ন হতে পারে ত্রিশ বছর আগে মানুষের আত্মারা কোথায় ছিল? জীবজন্তু কিংবা কীটপতঙ্গ হয়ে? কোন পাপে তাহলে আত্মারা কীটপতঙ্গ হল? পূর্বজন্মের কোন কর্মফলে এমনটি হল? পূর্বজন্ম পূর্বজন্ম করে পেছাতে থাকলে যে প্রাণীতে আত্মার প্রথম জন্মটি হয়েছিল সেটি কবে হয়েছিল? হলে নিশ্চয়ই এককোষী সরল প্রাণ হিসেবেই জন্ম নিয়েছিল। এককোষী প্রাণের জন্ম হয়েছিল কোন জন্মের কর্মফলে?

বিবর্তনের আধুনিক তত্ত্ব না জানা সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতের যুক্তিবাদী চার্বাকেরা সেই খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে তাদের সেসময়কার অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে আত্মার অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলেছিলেন। আত্মাকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়েই সম্ভবতঃ চার্বাকদের লড়াইটা শুরু হয়েছিল। আত্মাই যদি না থাকবে তবে কেন অযথা স্বর্গ নরকের কেচ্ছা-কাহিনীর আমদানী। আত্মা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করতে করতে শেষ পর্যন্ত ঠোঁট কাটা চার্বাকেরা ঈশ্বর-আত্মা-পরলোক-জাতিভেদ-জন্মান্তর সব কিছুকেই তারা নাকচ করে দেন। তারাই প্রথম বলেছিলেন বেদ 'অপৌরুষেয়' নয়, এটা একদল স্বার্থান্বেষী মানুষেরই রচিত। জনমানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া সেই সব স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণদের চার্বাকেরা ভন্ড, ধূর্ত, চোর, নিশাচর বলে অভিহিত করেছিলেন, তারা বাতিল করে দিয়েছিলেন আত্মার অস্তিত্ব, উন্মোচন করেছিলেন ধর্মের জুয়াচুরি এই বলে :

> ‘বেহেস্ত ও মোক্ষপ্রাপ্তি কি পরিত্রাণলাভ ফাঁকা অর্থহীন অসার বুলিমাত্র, উদরযন্ত্রে বিসর্পের কারণে সবেগে উৎক্ষিপ্ত দুর্গন্ধময় ঢেকুরমাত্র। এসব প্যাক প্যাক বা বাকচাতুরি নৈতিক অপরাধ, উন্মার্গ গমন, মানসিক ও দৈহিক ঔদার্যের ফলশ্রুতি -পরান্নভোজী বমনপ্রবণ ব্যক্তিদের অদম্য কুৎসিৎ বমনমাত্র, পেটুকদের এবং উন্মার্গগামীদের বিলাস-কল্পণা। পরজগতে যাওয়ার জন্য কোন আত্মার অস্তিত্ব নেই। বর্ণাশ্রমের নির্দিষ্ট মেকি নিয়ম-আচার আসলে কোন ফল উৎপন্ন করে না। বর্ণাশ্রমের শেষ পরিনামের কাহিনী সাধারণ মানুষকে ঠকাবার উদ্দেশ্যে ধর্মকে গাঁজাবার খামি বিশেষ।’

চার্বাকেরা বলতেন, চতুর পুরোহিতদের দাবী অনুযায়ী যদি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে বলিকৃত প্রাণী সরাসরি স্বর্গলাভ করে, তাহলে তারা নিজেদের পিতাকে এভাবে বলি দেয় না কেন? কেন তারা এভাবে তাদের পিতার স্বর্গপ্রাপ্তি নিশ্চিত করে না? :

যদি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে
বলি দিলে পশু যায় স্বর্গে
তবে পিতাকে পাঠতে স্বর্গে
ধরে বেঁধে বলি দাও যজ্ঞে।

চার্বাকেরা আরো বলতেন :

‘চৈতন্যরূপ আত্মার পাকযন্ত্র কোথা
তবে ত পিন্ডদান নেহাতই বৃথা।’

কিংবা

যদি শ্রাদ্ধকর্ম হয় মৃতের তৃপ্তের কারণ
তবে নেভা প্রদীপে দিলে তেল, উচিৎ জ্বলন।

আত্মা বা চৈতন্যকে চার্বাকেরা তাদের দর্শনে আলাদা কিছু নয় বরং দেহধর্ম বলে বর্ণনা করেছিলেন। এই ব্যাপারটা এখন আধুনিক বিজ্ঞানও সমর্থন করে। পানির সিক্ততার ব্যাপারটা চিন্তা করুন। এই সিক্ততা জিনিসটা আলাদা কিছু নয় - বরং পানির অনুরই স্বভাব ধর্ম। 'সিক্তাত্মা' নামে কোন অপার্থিব সত্ত্বা কিন্তু পানির মধ্যে সেঁদিয়ে গিয়ে তাতে সিক্ততা নামক ধর্মটির জাগরণ ঘটাচ্ছে না। বরং পানির অণুর অঙ্গসজ্জার কারণেই 'সিক্ত'তা নামের ব্যাপারটির অভ্যুদয় ঘটছে। চার্বাকেরা বলতেন, মানুষের চৈতন্য বা আত্মাও তাই। দেহের স্বভাব ধর্ম হিসেবেই আত্মা বা চৈতন্যের উদয় ঘটছে। কিভাবে এর অভ্যুদয় ঘটে? চার্বাকেরা একটি চমৎকার উপমা দিয়ে ব্যাপারটি বুঝিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আঙ্গুর এবং মদ তৈরির অন্যান্য উপাদানগুলোতে আলাদা করে কোন মদশক্তি নেই। কিন্তু সেই উপকরণগুলোই এক ধরণের বিশেষ প্রক্রিয়ায়র মাধ্যমে কোন পাত্রে মিলিত করার পরে এর একটি নতুন গুণ পাওয়া যাচ্ছে, যাকে আমরা বলছি মদ। আত্মা বা চৈতন্যও তেমনি। যিশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৬০০ বছর আগের বস্তুবাদী দার্শনিকেরা এভাবেই তাদের ভাষায় 'রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়' প্রাণের উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করেছিলেন, কোন রকমের আত্মার অনুকল্প ছাড়াই। তাদের এই বক্তব্যই পরবর্তীতে ভাববাদী দার্শনিকদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

আত্মা, মন এবং অমরত্ব : বিজ্ঞানের চোখে

ভাববাদীরা যাই বলুক না কেন স্কুলের পাঠ শেষ করা ছাত্রটিও আজ জানে, মন কোন 'বস্তু' নয়; বরং মানুষের মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের কাজ কর্মের ফল। চোখের কাজ যেমন দেখা, কানের কাজ যেমন শ্রবণ করা, পাকস্থলীর কাজ যেমন খাদ্য হজম করা, তেমনি মস্তিস্ক কোষের কাজ হল চিন্তা করা। তাই নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক তাঁর 'The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul' গ্রন্থে পরিস্কার করেই বলেন [২]: 'বিস্ময়কর অনুকল্পটি হল: আমার 'আমিত্ব', আমার উচ্ছ্বাস, বেদনা, স্মৃতি, আকাংখা, আমার সংবেদনশীলতা, আমার পরিচয় এবং আমার মুক্তবুদ্ধি এগুলো আসলে মস্তিস্কের স্নায়ুকোষ এবং তাদের আনুষঙ্গিক অণুগুলোর বিবিধ ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়।' মানুষ চিন্তা করতে পারে বলেই নিজের ব্যক্তিত্বকে নিজের মত করে সাজাতে পারে, সত্য-মিথ্যের মিশেল দিয়ে কল্পণা করতে পারে তার ভিতরে 'মন' বলে সত্যই কোন পদার্থ আছে, অথবা আছে অদৃশ্য কোন আত্মার আশরীরী উপস্থিতি। মৃত্যুর পর দেহ বিলীন হয়। বিলীন হয় দেহাংশ, মস্তিস্ক স্নায়ুকোষ। আসলে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের মৃত্যু মানেই কিন্তু 'মন' এর মৃত্যু, সেই সাথে মৃত্যু তথাকথিত আত্মার। অনেক সময় দেখা যায় দেহের অন্যান্য অংগ প্রত্যংগ ঠিকমত কর্মক্ষম আছে, কিন্তু মস্তিষ্কের কার্যকারিতা হারিয়ে গেছে। এ ধরনের অবস্থাকে বলে কোমা। মানুষের চেতনা তখন লুপ্ত হয়। মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা হারানোর ফলে জীবিত দেহ তখন অনেকটা জড়পদার্থের মতই আচরণ করে। তাহলে জীবন ও মৃত্যুর যোগসূত্রটি রক্ষা করছে কে? এ কি অশরীরী আত্মা, নাকি মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের সঠিক কর্মক্ষমতা?

এ পর্যায়ে বিখ্যাত ক্রিকেটার রমণ লাম্বার মৃত্যুর ঘটনাটি স্মরণ করা যাক। ১৯৯৮ সালের ২০ এ ফেব্রুয়ারী ঢাকা স্টেডিয়ামে (বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম) লীগের খেলা চলাকালীন সময় মেহেরাব হোসেন অপির একটি পুল শট

ফরওয়ার্ড শর্ট লেগে ফিল্ডিংরত লাম্বার মাথায় সজোরে আঘাত করে। প্রথমে মনে হয়েছিল তেমন কিছুই হয় নি। নিজেই হেঁটে প্যাভিলিয়নে ফিরলেন; কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ পরই জ্ঞান হারালেন তিনি। চিকিৎসকেরা তাকে ক্লিনিকে ভর্তি করলেন। পরদিন ২১ এ ফেব্রুয়ারী তাকে পিজি হাসপাতালের নিউরোসার্জারি বিভাগে ভর্তি করা হল। সেখানে তার অপারেশন হল, কিন্তু অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকেই যাচ্ছিল। পরদিন ২২ এ ফেব্রুয়ারী ডাক্তাররা ঘোষণা করলেন যে, মস্তিষ্ক তার কার্যকারিতা হারিয়েছে। হার্ট-লাং মেশিনের সাহায্যে কৃত্রিমভাবে হৃৎপিন্ড এবং ফুসফুসের কাজ চলছিল।

২৩ ফেব্রুয়ারী বিকেল সাড়ে তিনটায় তার আইরিশ স্ত্রী কিমের উপস্থিতিতে হার্ট লাং মেশিন বন্ধ করে দিলেন চিকিৎসকেরা। থেমে গেল লাম্বার হৃৎস্পন্দন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ডেথ সার্টিফিকেটে মৃত্যুর তারিখ কোনটি হওয়া উচিৎ? ২২ নাকি ২৩ ফেব্রুয়ারী? আর তার মৃত্যুক্ষণটি নির্ধারণ করলেন কারা? আজরাইল/যমদূত নাকি চিকিৎসারত ডাক্তারেরা?

এ ব্যাপারটি আরও ভালভাবে বুঝতে হলে মৃত্যু নিয়ে দু'চার কথা বলতেই হবে। জীবনের অনিবর্তনীয় পরিসমাপ্তিকে (Irreversible cessation of life) বলে মৃত্যু। কেন জীবের মৃত্যু হয়? কারণ মৃত্যুবরণের মাধ্যমে আমাদের জীবন তাপগতীয় স্থিতাবস্থা (thermodynamic equilibrium) প্রাপ্ত হয়। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র মানতে গেলে জীবনের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয় - নিবিষ্টচিত্তে এন্ট্রপি বাড়িয়ে চলা। আমাদের খাওয়া, দাওয়া, শয়ন, ভ্রমণ, মৈথুন, কিংবা রবিঠাকুরের কবিতা পাঠের আনন্দ - সব কিছুর পেছনেই থাকে মোটা দাগে কেবল একটি মাত্র উদ্দেশ্য - ফেইথফুলি এনট্রপি বাড়ানো - সেটা আমরা বুঝতে পারি আর নাই পারি! জন্মের পর থেকে সারা জীবন ধরে আমরা এনট্রপি বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রকৃতিতে তাপগতীয় অসাম্য তৈরি করি, আর শেষ মেষ পঞ্চত্ব প্রাপ্তির মাধ্যমে অন্যান্য জড় পদার্থের মত নিজেদের দেহকে তাপগতীয় স্থিতাবস্থায় নিয়ে আসি। কিন্তু কিভাবে এই স্থিতাবস্থার নির্দেশ আমরা বংশপরম্পরায় বহন করি? জীববিজ্ঞানের চোখে দেখলে, আমরা (উদ্ভিদ এবং প্রাণী) উত্তরাধিকার সূত্রে বিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের যারা যৌনসংযোগের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে প্রকৃতিতে টিকে রয়েছে তাদের থেকে মরণ জিন (Death Gene) প্রাপ্ত হয়েছি এবং বহন করে চলেছি। এই ধরনের জিন (মরণ জিন) তার পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পিত উপায়েই মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে চলেছে। যৌনজননের মাধ্যমে বংশবিস্তাররের ব্যাপারটিতে আমি এখানে গুরুত্ব দিচ্ছি। কারণ, যে সমস্ত প্রজাতি যৌনজননকে বংশবিস্তারের একটি মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে, তাদের 'মৃত্যু' নামক ব্যাপারটিকেও তার জীবগত বৈশিষ্ট হিসেবে গ্রহণ করে নিতে হয়েছে। দেখা গেছে স্তন্যপায়ী জীবের ক্ষেত্রে সেক্স-সেল বা যৌনকোষগুলোই (জীববিজ্ঞানীরা বলেন 'জার্মপ্লাজম') হচ্ছে একমাত্র কোষ যারা সরাসরি এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে নিজেদের জিন সঞ্চারিত করে টিকে থাকে। জীবনের এই অংশটি অমর। কিন্তু সে তুলনায় সোমাটিক সেল দিয়ে তৈরী দেহকোষগুলো হয় স্বল্পায়ুর। অনেকে এই ব্যাপারটির নামকরণ করেছেন 'প্রোগ্রামড্ ডেথ'। এ যেন অনেকটা বেহুলা-লক্ষিন্দর কিংবা বাবর-হুমায়ূনের মত ব্যাপার-স্যাপার - জননকোষের অমরত্বকে পূর্ণতা দিতে গিয়ে দেহকোষকে বরণ করে নিতে হয়েছে মৃত্যুভাগ্য। প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স হালকাচালে তার 'সেলফিশ জিন' বইয়ে বলেছেন, 'মৃত্যু'ও বোধহয় সিফিলিস বা গনোরিয়ার মত একধরনের 'সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ' যা আমরা বংশ পরম্পরায় সৃষ্টির শুরু থেকে বহন করে চলেছি! ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার মত সরল কোষী জীব

যারা যৌন জনন নয়, বরং কোষ বিভাজনের মাধ্যমে প্রকৃতিতে টিকে আছে তারা কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই অমর। এদের দেহ কোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বিভাজিত হয়, তার পর বিভাজিত অংশগুলিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় বিভাজিত হয়; কোন অংশই আসলে সেভাবে 'মৃত্যুবরণ' করে না।

আবার অধিকাংশ ক্যান্সার কোষই অমর, অন্ততঃ তাত্ত্বিকভাবে তো বটেই। একটি সাধারণ কোষকে জীবদ্দশায় মোটামুটি গোটা পঞ্চাশেক বার কালচার বা পুরুৎপাদন করা যায়। এই হাফ-সেঞ্চুরির সীমাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'হেফ্লিক লিমিট' (Hayflick Limit)। কখনো সখনো ক্যান্সারাক্রান্ত কোন কোন কোষে সংকীর্ণ টেলোমার থাকার কারণে এটি কোষস্থিত ডিএনএ'র মরণ জিনকে স্থায়ীভাবে 'সুইচ অফ' করিয়ে দেয় । এর ফলে এই কোষ তার আভ্যন্তরীন 'হেফ্লিক' লিমিটকে অতিক্রম করে যায়। তখন আক্ষরিকভাবেই অসংখ্যবার - মানে অসীম সংখ্যকবার সেই কোষকে কালচার করা সম্ভব। এই ব্যাপারটাই তাত্ত্বিকভাবে কোষটিকে প্রদান করে অমরত্ব। হেনরিয়েটা ল্যাকস নামে এক মহিলা ১৯৫২ সালে সার্ভিকাল ক্যান্সারে মারা যাওয়ার পর ডাক্তাররা ক্যান্সারাক্রান্ত দেহকোষটিকে সরিয়ে নিয়ে ল্যাবে রেখে দিয়েছিল। এই কোষের মরণজিন স্থায়ীভাবে 'সুইচ অফ' করা এবং কোষটি এখনো ল্যাবরেটরীর জারে বহাল তবিয়তে 'জীবিত' অবস্থায় আছে। প্রতিদিনই এই সেল থেকে কয়েশ বার করে সেল-কালচার করা হচ্ছে, এই কোষকে এখন 'হেলা কোষ' নামে অভিহিত করা হয়। যদি কোন দিন ভবিষ্যত- প্রযুক্তি আর জৈবমুল্যবোধ (bioethics) আমাদের সেই সুযোগ দেয়, তবে আমরা হয়ত হেলাকোষ ক্লোন করে হেনরিয়েটাকে আবার আমাদের পৃথিবীতে ফেরত আনতে পারব।

আবার ব্রাইন শ্রিম্প (brine shrimp), গোলকৃমি বা নেমাটোড, কিংবা টার্ডিগ্রেডের মত কিছু প্রাণি আছে যারা মৃত্যুকে লুকিয়ে রাখতে পারে, জীববিজ্ঞানের ভাষায় এ অবস্থাকে বলে 'ক্রিপ্টোবায়টিক স্টেট'। যেমন, ব্রাইন শ্রিম্পগুলো লবনাক্ত পানিতে সমানে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে, কিন্তু পানি যখন শুকিয়ে যায়, তখন তারা ডিম্বানু উৎপাদন, এমনকি নিজেদের দেহের বৃদ্ধি কিংবা মেটাবলিজম পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। শ্রিম্পগুলোকে দেখতে তখন মৃত মনে হলেও এরা আসলে মৃত নয় - বরং এদের এই মরণাপন্ন মধ্যেও জীবনের বীজ লুকানো থাকে। এই অবস্থাটিকেই বলে 'ক্রিপ্টোবায়টিক স্টেট'। আবার কখনো তারা পানি খুঁজে পেলে আবারো নতুন করে 'নবজীবন প্রাপ্ত' হয়। এদের অদ্ভুতুরে ব্যাপার স্যাপার অনেকটা ভাইরাসের মত। ভাইরাসের কথা আরেকবার চিন্তা করা যাক। ভাইরাস জীবণ ও জড়ের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করে। ভাইরাসকে কেউ জড় বলতে পারেন, আবার জীবিত বলতেও বাঁধা নেই। এমনিতে ভাইরাস 'মৃতবৎ', তবে তারা 'বেঁচে' ওঠে অন্য জীবিত কোষকে আশ্রয় করে। ভাইরাসে থাকে প্রোটিনবাহী নিউক্লিয়িক এসিড। এই নিউক্লিয়িক এসিডই ভাইরাসের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের আধার। উপযুক্ত পোষক দেহ পাওয়ার আগ পর্যন্ত তারা 'ক্রিপ্টোবায়টিক স্টেট'-এ জীবনকে লুকিয়ে রাখে। আর তারপর উপযুক্ত দেহ পেলে আবারো কোষ বিভাজনের মাধ্যমে অমরত্বের খেলা চালিয়ে যেতে থাকে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে 'মৃত্যু' ব্যাপারটি সব জীবের জন্যই অত্যাবশ্যকীয় নিয়ামক নয়। ভাইরাসের আনবিক সজ্জার মধ্যেই আসলে লুকিয়ে আছে অমরত্বের বীজ। এই অঙ্গসজ্জাই আসলে ডিএনএর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয় তারা কখন ঘাপটি মেরে 'ক্রিপ্টোবায়টিক স্টেট'-এ পড়ে থাকবে, আর কখন নবজীবনের ঝর্ণাধারায়

নিজেদের আলোকিত করবে। সে হিসেবে ভাইরাসেরা আক্ষরিক অর্থেই কিন্তু অমর - এরা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে না। তবে মানুষের নিজের প্রয়োজনে রাসায়নিক জীবাণুনাশক ঔষধপত্রাদির উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগে জীবাণুনাশের ব্যাপারটি এক্ষেত্রে আলাদা। ঔষধের প্রয়োগে আসলে এদের অংগসজ্জা ভেঙে দেওয়া হয়, যেন তারা আবার পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয়ে রোগ ছড়াতে না পারে। ঠিক একই রকম ভাবে অত্যধিক বিকিরণ শক্তি প্রয়োগ করেও ভাইরাসের এই দেহগত অঙ্গসজ্জা ভেঙে দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে এদের আনবিক গঠণ বিনষ্ট হবে এবং এদের জীবনের সুপ্ত আধার হারিয়ে যাবে। ফলে উপযুক্ত পরিবেশ পেলেও এরা আর পুনর্জীবনপ্রাপ্ত হবে না। যারা জীবন-মত্যুর ব্যাপারটিকে আরো ভালমত বিজ্ঞানের গভীরে গিয়ে বুঝতে চান তারা আনবিক জীববিজ্ঞানী উইলিয়াম সি ক্লার্কের লেখা '[Sex and the Origins of Death]' বইটি পড়তে পারেন [৬]। আমার আর ফরিদের লেখা '[মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে]' (অবসর প্রকাশনা, ২০০৭) বইটির প্রথম অধ্যায়েও বেশ কিছু আকর্ষনীয় উদাহরণ হাজির করে জীবন-মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। উৎসাহী পাঠিকেরা পড়ে নিতে পারেন ।

রমন লাম্বার মত মস্তিস্কের রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয়েছে সম্প্রতি দলছুট ব্যান্ডের গায়ক সঞ্জীব চৌধুরীরও। এই সুপ্রতিষ্ঠিত গায়কের ক্ষেত্রেও রক্তক্ষরণে মস্তিস্ক তার কার্যক্ষমতা হারিয়েছিল। তিনি চলে গিয়েছিলেন কোমায়। কোমায় একবার কেউ চলে গেলে তাকে পুনরায় জীবনে ফেরৎ আনা অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব ব্যাপার। কোমার স্থায়িত্ব সাধারণতঃ দুই থেকে চার সপ্তাহ থাকে। যারা চেতনা ফিরে পান, তারা সাধারণতঃ ২/১ দিনের মধ্যেই তা ফিরে পান। বাকীদের অনেকেই মারা যান, কিন্তু অনেকে কোমা থেকে উঠে আসেন বটে কিন্তু রয়ে যান অচেতন দশায় - যাকে মেডিকেলের ভাষায় বলে 'নিষ্ক্রিয় দশা' বা 'ভেজিটেটিভ স্টেট' (vegetative state)। ডাক্তার এবং রোগীর আত্মীয়স্বজনদের জন্য এ এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। কারণ রোগীর দেহটা বেঁচে থাকলেও মস্তিস্ক থাকে নিস্ক্রিয়। টেকনিকালি, এদের তখন মৃতও বলাও যায় না, কারণ শ্বাস-প্রশ্বাস সহ কিছু শারীরিক কাজ কর্ম চলতে থাকে স্বাভাবিক ভাবেই। মাসাধিককাল পর এ ধরনের রোগীরা পৌছে যান 'স্থায়ী নিষ্ক্রিয় দশা'য় (Persistent vegetative state)। যতই দিন পেরুতে থাকে রোগীর সচেতনতা আবারো ফিরে আসার সম্ভাবনা কমতে থাকে। অক্সিজেনের অভাবে মস্তিস্কের কোষগুলো ধীরে ধীরে মারা যেতে থাকে। ওই সময় কৃত্রিমভাবে তার দেহকে বাঁচিয়ে রাখা গেলেও তার চৈতন্য আর ফেরৎ আসে না। ১৯৯৪ সালে আমেরিকার মাল্টি সোসাইটি টাস্ক-ফোর্সের এগার জন গবেষকের একটি গবেষণা থেকে জানা যায়, স্থায়ী নিষ্ক্রিয় দশায় রোগী একবার পৌঁছে গেলে আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা চলে যায় শুন্যের কাছাকাছি[৩৮]। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পর ডাক্তারদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হয় রোগীর জীবন-প্রদীপ নির্বাপন করার, কারণ ততদিনে তাদের জানা হয়ে যায় যে, এ রোগী আর চৈতন্য ফিরে পাবে না। পাঠকদের নিশ্চয় ফ্লোরিডার টেরি শাইভোর ঘটনার কথা মনে আছে, যার খবর সারা আমেরিকা জুড়ে আলোড়ন তুলেছিল। ১৫ বছর ধরে 'স্থায়ী নিষ্ক্রিয় দশা'য় থাকার পর টেরি শাইভোর স্বামীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৫ সালে যখন ডাক্তাররা টেরির মুখ থেকে খাদ্যনালী খুলে দিয়ে তার 'দেহাবসান' ঘটানোর উদ্যোগ নিলেন, তখন তা আমেরিকার রাজণৈতিক মহলকে তোলপার করে তুলেছিল। রক্ষণশীলেরা ডাক্তারদের এ নাফরমানিকে দেখেছিলেন 'খোদার উপর খোদকারী'র দৃষ্টান্ত হিসেবে। কিন্তু ডাক্তারদের করণীয় ছিল না কিছুই। টেরি শাইভোর সিটি স্ক্যান এবং এমআরআই থেকে দেখা গিয়েছিল অক্সিজেনের অভাবে ব্রেন টিস্যুর অনেকটুকুই নষ্ট হয়ে গেছে। আদালতের রায়ও গিয়েছিল ডাক্তারদের অনুকূলেই।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ডাক্তারেরা কোন্ আলামতের ভিত্তিতে সিধান্ত নেন যে, রোগী স্থায়ীভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে নাকি চেতনা ফিরে পাবার আশা আছে? এটি নিঃসন্দেহ, ডাক্তার যদি বোঝেন যে, চেতনা ফিরে আসার সম্ভাবনা কিছুটা হলেও আছে, তাহলে কখনোই দেহবাসনের মাধ্যমে রোগীর মৃত্যু ত্বরান্বিত করবেন না। ডাক্তাররা আসলে সিদ্ধান্ত নেন 'ব্রেন ইমেজিং টেকনিক' নামে এক আধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে মস্তিস্ক পর্যবেক্ষণ করে - তারা দেখেন আহত মস্তিস্কে আদৌ কোন ধরণের বোধ শক্তি কিংবা চেতনার আলামত পাওয়া যাচ্ছে কিনা । অনেক সময় এই আলামত খুব সুপ্ত অবস্থায় থাকে - সহজে ধরা যায় না। এই অবস্থাকে বলা যেতে পারে - ন্যূনতম সচেতন অবস্থা বা 'মিনিমালি কনশাস স্টেট'। কাজেই ডাক্তারদেরকে খুব যত্ন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়, এবং তা দীর্ঘমেয়াদী। যেমন, এড্রিয়ান ওয়েনের নেতৃত্বে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষকের তত্ত্বাবধানে ২৩ বছরের এক তরুনী চিকিৎসারত অবস্থায় আছে। ভয়াবহ সরক দুর্ঘটনায় আক্রান্ত এ তরুনীর মস্তিস্ক বেশ ভালভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এক সপ্তাহ কোমায় থাকার পর চড়াই উৎরাই পেরিয়ে 'নিষ্ক্রিয় দশা'য় এসে ভীরলেন। সেই তরুনী এখন চোখের পাপড়ি মেলতে পারেন, কিন্তু বাইরের কোন নির্দেশ পালন করার নূন্যতম আলামত কখনোই দেখান নি। ডাক্তারেরা মেয়েটির মস্তিস্ক কি অবস্থায় আছে তা নিঃসন্দেহ হবার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা চালালেন। যেমন, রোগীর সামনে গিয়ে বললেন, 'কফির জন্য চিনি আর দুধ টেবিলে রাখা আছে, খাও'। এই মন্তব্যের কি প্রতিক্রিয়া রোগীর মাথায় পাওয়া যায় তা জানার জন্য fMRI স্ক্যান করে খুঁজে দেখলেন চিকিৎসকেরা। দেখলেন, ব্রেনের ভিতরে *টেম্পোলার গাইরি* নামের যে জায়গাটা আছে সেটা উদ্দীপ্ত হচ্ছে। মাথার এই জায়গাটা সুস্থ মানুষদের ক্ষেত্রে কথাবার্তা শোনা এবং বোঝার কাজে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এটুকু বোঝা গেল, হয়ত মেয়েটি সচেতন। কিন্তু চিকিৎসকেরা নিশ্চিত হতে পারলেন না। কারণ অনেক সময় গভীর ঘুমে থাকা মানুষের সামনেও এ ধরণের নির্দেশ দিলে তাদের মাথার এই জায়গাগুলো উদ্দীপ্ত হয়।

আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য ডাক্তারেরা ঠিক করলেন, রোগীকে দিয়ে টেনিস খেলাবেন। রোগীকে নির্দেশ দেওয়া হল - 'মনে কর তুমি টেনিস গ্রাউন্ডে আছ। আস এবার আমার সাথে টেনিস খেল দেখি!' নিঃসন্দেহে টেনিস খেলার প্রক্রিয়াটি এমনিতে বেশ জটিল। মাথার অনেকগুলো অংশের সমন্বিত সংযোগ করে তবে খেলাটা ঠিকমত খেলতে হয়। মাথার একটি অংশ আছে - *সাপ্লিমেন্টারি মোটর* এলাকা। এই এলাকাটা দেহের হাত-পা সহ অন্যান্য অংগ নিয়ন্ত্রণ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। দেখা গেল তরুনীর মোটর এলাকা অনবরত উদ্দীপ্ত হচ্ছে। টেনিস খেললে তাই হওয়ার কথা। আবার রোগীকে নির্দেশ দেওয়া হল - 'এবার মনে কর তুমি তোমার বাড়ীতে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাচ্ছ'। মস্তিস্ক স্ক্যান করে দেখা গেল এবারে মাথার *প্রিমোটর, প্যারিটাল* আর *প্যারাহিপোক্যাম্পাল* এলাকা উদ্দীপ্ত হচ্ছে। একজন সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রেও তাই হয়। বোঝা গেল মেয়েটি সম্ভবতঃ সচেতন অবস্থায় রয়েছে। ডাক্তারেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এ ধরণের রোগীর আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা একেবারে শূন্য নয়, বরং পাঁচ ভাগের এক ভাগ। মন্দ নয় সম্ভাবনা। আর সেজন্যই মেয়েটিকে কৃত্রিম উপায়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, এবং মেয়েটিও এভাবেই 'মিনিমালি কনশাস স্টেটে' রয়েছে- কখনো ডাক্তারের নির্দেশ মানছে, কখনো নয়।

অনেকদিন ধরে 'মিনিমালি কনশাস স্টেটে' থাকার পর আবার মোটামুটি সচেতন অবস্থায় ফিরবার উদাহরণ হচ্ছে আরকান্সাসের টেরি ওয়ালিসের ঘটনা। তিনিও এক ভয়ঙ্কর ধরনের সরক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ১৯৮৪

সালে চেতনা হারান এবং প্রায় ১৯ বছর ধরে ন্যূনতম সচেতন অবস্থা বা 'মিনিমালি কনশাস স্টেট'-এ ছিলেন। দীর্ঘদিন পর ২০০৩ সালে এসে টেরি ওয়ালিস কথা বলতে শুরু করেন। সেই সাথে হাত-পা নাড়ানোর ক্ষমতাও কিছুটা ফিরে পান। এখনো তিনি হাটতে চলতে পারেন না, এবং কারো না কারো সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে তাকে থাকতে হয়, কিন্তু তারপরও টেরি ওয়ালিসের উন্নতি লক্ষ্যনীয়। এথেকে বোঝা যায়, ন্যূনতম সচেতন অবস্থা বা 'মিনিমালি কনশাস স্টেট' থেকে আবার সচেতনতায় প্রত্যাবর্তন সম্ভব; কিন্তু 'স্থায়ী নিষ্ক্রিয় দশা' বা পার্মানেন্ট ভেজিটিটিভ স্টেট থেকে প্রত্যাবর্তন অনেকটা দূরাশাই বলতে হবে। নীচের ছবিটি দেখলে এ ব্যাপারটি হয়ত পাঠকদের জন্য আরো পরিস্কার হবে :

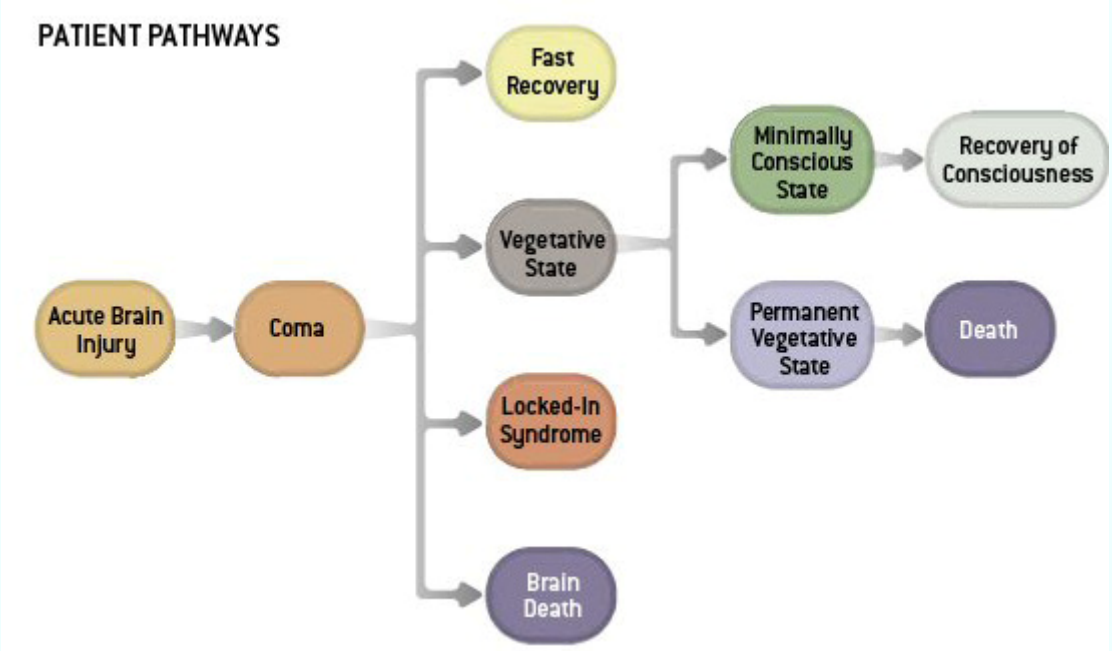

চিত্রঃ মস্তিস্কে আঘাত পেয়ে কোমায় চলে যাওয়া রোগীদের বিভিন্ন অবস্থা।

মৃত্যু নিয়ে আর কিছু কথা বলা যাক। আসলে মানুষের মত বহুকোষী উচ্চশ্রেনীর প্রাণীদের মৃত্যু দু' ধরনের। দেহের মৃত্যু (Clincal Death) এবং কোষীয় মৃত্যু (Cellular Death)। দেহের মৃত্যুর স্বল্প সময় পরেই কোষের মৃত্যু ঘটে। মানব দেহের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ রয়েছে - মস্তিস্ক, হৃৎপিন্ড, আর ফুসফুস। যে কোন একটির বা সবগুলোর কার্যকারিতা নষ্ট হলে মৃত্যু হতে পারে। যেমন, মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বন্ধ হলে কোমা হয়, রমণ লাম্বা কিংবা সঞ্জীব চৌধুরীর ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছে; হৃৎপিন্ডের কার্যকারিতা বন্ধ হওয়াকে বলে সিনকোপ, আর ফুসফুসের কার্যকারিতা বন্ধ হওয়াকে বলে আসফিক্সিয়া। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও কিন্তু 'মৃত্যু' ব্যাপারটার সংজ্ঞা দেওয়া এতোটা কঠিন ছিলো না। খুব সহজ সংজ্ঞা। হৃৎস্পন্দন থেমে যাওয়ার সাথে সাথেই কিংবা ফুসফুস তার হাপরের উঠানামা বন্ধ করে দেওয়ার সাথে সাথেই ব্যক্তির জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হত। কিন্তু ১৯৬৮ সালে হৃৎসংস্থাপন (Heart Transplant) প্রক্রিয়ার আবিস্কার

এবং এ সংক্রান্ত প্রযুক্তির উন্নয়নের পর মৃত্যুর এই সংজ্ঞা কিন্তু বদলে যায়। কিভাবে এখন হলফ করে সেই 'হৃদয়দাতা'কে মৃত বলা যাবে যখন চোখের সামনেই তার হৃদয় অন্যের দেহে স্পন্দিত হয়ে চলেছে? চিকিৎসা বিজ্ঞান পুরো ব্যাপারটিকে আরো জটিল করে ফেললো শ্বাসযন্ত্র বা রেস্পিরেটর আবিষ্কার করে- যেটি হৃৎপিন্ড আর ফুসফুসকে কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আধুনিক কোন কবি কিন্তু এখন মৃত্যু নিয়ে কবিতা লিখতেই পারেন এই বলে যে - 'হে হিমশীতল মৃত্যু - তুমি হচ্ছ রেস্পিরেটর সুইচের সহসা নির্বাপন!'

যত দিন যাচ্ছে ততই কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে জীবন আয়ু ত্বরান্বিত করার ব্যাপারটি খুব সাধারণ একটি বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে অনেক মৃত্যুপথ যাত্রী অসুস্থ রোগীর মৃত্যু নানাভাবে বিলম্বিত করা গেছে - কারো কারো জন্য কম সময়ের জন্য, আবার কারো জন্য দীর্ঘ সময়ের জন্য। যেমন ধরুন বার্নি ক্লার্ক নামের এক ডেনটিস্ট ভদ্রলোকের উদাহরণ, যিনি ১৯৮২ সালে নিজের রোগাক্রান্ত হৃৎপিন্ডের পরিবর্তে একটি যান্ত্রিক হৃদয় নিয়ে বেঁচে ছিলেন কয়েক মাস যাবৎ। আবার ১৯৮৪ সালে সদ্যজন্মলাভ করা শিশু ফে কে অতিরিক্ত ২০দিন বাঁচিয়ে রাখা গিয়েছিলো একটি বেবুনের হৃৎপিন্ড সংযোজন করে।

আশির দশকের প্রথম দিকে জেমি ফিস্কের 'জীবন প্রাপ্তি'র উদাহরণটি আরেকটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ হিসেবে উঠে আসতে পারে পাঠকদের কাছে। এগারো মাসের শিশু জেমি আর হয়ত বড়জোর একটা ঘন্টা বেঁচে থাকতে পারত-তার জন্মগত ত্রুটিপূর্ণ যকৃৎ নিয়ে। তার বাঁচবার একটিমাত্র ক্ষীণ সম্ভাবনা নির্ভর করছিল যদি কোন সুস্থ শিশুর যকৃৎ কোথাও পাওয়া যায় আর ওটি ঠিকমত জেমির দেহে সংস্থাপন করা সম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু এতো ছোট বাচ্চার জন্য কোথাওই কোন যকৃত পাওয়া যাচ্ছিলো না। যে সময়টাতে জেমি ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ছিলো আর মৃত্যুর থাবা হলুদ থেকে হলুদাভ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিলো সারা দেহে, ঠিক সে সময়টাতেই হাজার মাইল দূরে একটি ছোট্ট শহরে এক বিচ্ছিরি ধরণের সরক দূর্ঘটনায় পড়া দশ মাসের শিশু জেসি বেল্লোনকে হুড়াহুড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। যদিও মাথায় তীব্র আঘাতের ফলে জেসির মস্তিষ্ক আর কাজ করছিলো না, কিন্তু দেহের অন্যান্য অংগপ্রত্যংগগুলোকে কিন্তু রেস্পিরেটরের সাহায্যে ঠিকই কর্মক্ষম করে রাখা হয়েছিলো। জেসির বাবা রেডিওতে দিন কয়েক আগেই একটি যকৃতের জন্য জেমির অভিভাবকদের আর্তির কথা শুনেছিলেন। শোকগ্রস্ত পিতা এতো দুঃখের মাঝেও মানবিক কর্তব্যবোধকে অস্বীকার করেননি। তিনি পারমানেন্ট ভেজিটেশনে চলে যাওয়া নিজের মেয়ের অক্ষত যকৃৎটি জেমিকে দান করে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। জেসির রেস্পিরেটর বন্ধ করে দিয়ে তার যকৃৎ সংরক্ষিত করে মিনেসোটায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হল। জেমির বহু প্রতীক্ষিত অস্ত্রপ্রচার সফল হলো। এভাবেই জেসির আকস্মিক মৃত্যু সেদিন জেমি ফিস্ককে দান করল যেন এক নতুন জীবন। সেই ধার করা যকৃৎ নিয়ে পুনর্জ্জীবিত জেমি আজো বেঁচে আছে- পড়াশুনা করছে, দিব্যি হেসে খেলে বেড়িয়ে পার করে দিয়েছে জীবনের পচিশটি বছর!

এবার আসুন প্রিয় পাঠক - আপনাদের জিমি টন্টলিউজের ঘটনাটির সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। এক শুভ্র সকালে তরুণ জিমি লেক মিশিগানের উপর দিয়ে স্কেট করতে গিয়ে একস্তর পুরু বরফের আস্তরণ ভেদ করে হিমশীতল জলে তলিয়ে যায়। ও অবস্থাতেই ছিল সে অনেকক্ষণ। প্রায় আধাঘন্টা পরে পথচারীরা তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে। দেখে মনে হচ্ছিল জিমি মারাই গিয়েছে বুঝি, তার হৃৎস্পন্দন, নাড়ী, শ্বাসপ্রশ্বাস

কিছুই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নিয়ে গিয়ে সেবাশুশ্রূষার শুরু করার প্রায় একঘন্টা পরে ছেলেটির দেহে যেন জীবনের বৈশিষ্ট্য আবারো 'নতুন করে' ফিরে আসতে শুরু করলো। আসলে ঠান্ডা পানির তীব্র ঝাপ্টা জিমির দেহকে একেবারে অসাড় করে দিয়েছিলো। যদিও সাময়িক সময়ের জন্য হৃৎস্পন্দন এবং ফুসসুসও বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু তার অন্যান্য প্রয়োজনীয় অংগপ্রত্যংগগুলো কিন্তু একটি 'মিনিমাম লেভেলে' কাজ করে যাচ্ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই শক্তিটুকুই জিমির দেহে পুনরায় হৃৎস্পন্দন আর শ্বাসপ্রশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য ছিলো যথেষ্ট। চিকিৎসকরা একমত যে, বরফ শীতল ঠান্ডা পানি অনেকক্ষেত্রেই ক্লোরফর্মের মত অবচেতকের কাজ করে - অতিশীতল তাপমাত্রায় তখন দেহ চলে যায় 'হাইবারনেশন' বা শীতনিদ্রায় -ব্যাঙ, সাপ, বাদুর, কিছু মাছে যা হরহামেশাই ঘটতে দেখা যায় । দেখা গেছে এধরনের অবস্থায় দেহের বিপাকক্রিয়ার হার কমে যায়, এবং দেহের জন্য যতটুকু খাবার কিংবা অক্সিজেন সুস্থ অবস্থায় প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক কম শক্তি খরচ করে দেহকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। আর তাই এ ধরণের পরিস্থিতিতে দীর্ঘক্ষণ কাটিয়েও বেঁচে যাবার উদাহরণ কিন্তু জিমি একা নয়। লস ভেগাসের মুরে ব্রাউন আধাঘন্টা, উতাহ শহরে মিশেল ফাঙ্ক একঘন্ট্আর ক্যানাডার তের মাসের শিশু এরিকা নরডবাই দুই ঘন্টা ধরে বরফ-জলে ডুবে অচেতন হয়ে থাকবার পরও চিকিৎসকরা তাদের কিন্তু বাঁচাতে পেরেছেন। তবে সবচেয়ে অবাক করেছে জাপানের মিৎসুতাকা উছিকোশির ঘটনা। জাপানের রোকো পাহাড়ের তুষারাচ্ছন্ন পরিবেশে ২৪ দিন ধরে অবচেতন অবস্থায় পড়ে থাকার পরও কোব্ব সিটি জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পর তাকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে তোলা গেছে [১৭]।

এবারে আসি মৃত্যুক্ষণের আলোচনায়। রোগীর মৃত্যুর 'সঠিক' সময় নির্ধারণ করাটাও অনেকক্ষেত্রে অসুবিধাজনক, কারণ দেখা গেছে বিভিন্ন অংগপ্রত্যংগ দেহের মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে, যেমন মস্তিষ্ক ৫ মিনিট, হৃৎপিন্ড ১৫ মিনিট, কিডনী ৩০ মিনিট, কঙ্কাল পেশী - ৬ ঘন্টা। অংগ বেঁচে থাকার অর্থ হল তার কোষগুলো বেঁচে থাকা। কোষ বেঁচে থাকে তৎক্ষণই যতক্ষণ এর মধ্যে শক্তির যোগান থাকে। শক্তি উ□পন্ন হয় কোষের অভ্যন্তরস্থ মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে। মাইটোকন্ড্রিয়ার কার্যকারিতা ক্ষুন্ন হলে কোষেরও মৃত্যু হয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, মৃত্যু কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটি প্রক্রিয়া। দেহের মৃত্যু দিয়ে এর প্রক্রিয়া শুরু হয়, শরীরের শেষ কোষটির মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

আত্মা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

আত্মার ব্যাপারটা এতই কৌতুহলোদ্দীপক যে, সত্যই দেহাতীত কোন অস্তিত্ব আছে কিনা তা অনেকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচাই করে দেখতে চেয়েছেন। আর আত্মায় বিশ্বাসী গবেষকেরা আত্মার অস্তিত্ব প্রামাণের জন্য নানা ধরণের পরীক্ষা-নীরিক্ষার আয়োজন করেছেন। ১৯২১ সালে ডা: ডানকান ম্যাকডোগাল তাঁর বিখ্যাত "২১ গ্রাম পরীক্ষা" সম্পন্ন করেন[১৮]। তিনি দাবী করেন, এই পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি আত্মার ওজন নির্ণয় করতে পেরেছেন। তাঁর পরীক্ষা ছিল খুবই সহজ। তাঁর দাবী অনুযায়ী তিনি ছয় জন রোগীর মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন এবং মৃত্যুর ঠিক আগের এবং পরবর্তী মুহুর্তের দেহের ওজন মেপে দেখেন, ওজনের পার্থক্য ১১ গ্রাম থেকে ৪৩ গ্রামের মধ্যে (মিডিয়ায় যেমন আত্মার ওজন একদম মাপমত ২১ গ্রাম

বলে প্রচার করা হয়, হুবহু তা অবশ্য পাননি)। ঠিক একইভাবে তিনি ছয়টি কুকুরের মৃত্যু পর্যবেক্ষণ করেন, এবং একই ভাবে ওজন মেপে দেখেন ওজনের কোন পার্থক্য পাওয়া যাচ্ছে না। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন, মানুষেরই কেবল আত্মা আছে। কুকুর বিড়াল জাতীয় ইতর প্রাণীর আত্মা নেই। তাঁর এই পরীক্ষা মিডিয়ায় চমক সৃষ্টি করলেও বৈজ্ঞানিক মহলে অচীরেই পরিত্যক্ত হয়। কারণ ম্যাকডোগাল নিজে বা অন্য কেউই এই ২১ গ্রামের পরীক্ষা পুনর্বার সম্পন্ন করে সত্যাসত্য নির্ণয় করতে পারেন নি, যা বৈজ্ঞানিক মহলে গ্রহনযোগ্যতা পাওয়ার অন্যতম মাপকাঠি। শুধু পরীক্ষাটি পুনর্বার সম্পন্ন করা গেল না- এটিই কেবল নয়, পরীক্ষার উপাত্ত বা ডেটা নিয়েও ছিল সমস্যা। ম্যাকডোগাল নিজেই তার গবেষণাপত্রে স্বীকার করেছিলেন, তার গৃহীত ছয়টি উপাত্তের মধ্যে দুটোকে নিজেই বাতিল করে দিয়েছিলেন কোন "ভ্যালু" না থাকার কারণে। দুটো উপাত্তে দেখালেন যে ওতে ওজন "ড্রপ" করেছে, এবং পরবর্তীতে এই ওজন আরো কমে গেল (আত্মা বাবাজী বোধ হয় 'খ্যাপে খ্যাপে' দেহত্যাগ করছিল!), আরেকটি ডেটায় ওজন হ্রাস না ঘটে বরং বিপরীতটাই ঘটতে দেখা গিয়েছিল, পরে এর সাথে যুক্ত হয়েছিল অন্য কোন হ্রাসের ব্যাপার স্যাপার (এক্ষেত্রে বোধ হয় আত্মা বাবাজী সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না উনি কি দেহত্যাগ করবেন, নাকি করবেন না, নাকি দেহত্যাগ করে আবারও দেহে পুন:প্রবেশ করবেন, নাকি দেহকে চিরবিদায় জানাবেন!); শুধুমাত্র একটি উপাত্ত থেকে ওজন হ্রাসের ব্যাপারটা আঁচ করা গেল এবং জানা গেল এটি এক আউন্সের ৩/৪ ভাগ[২৩] । এই একটিমাত্র ডেটা থেকে আসা সিদ্ধান্ত ভিত্তিক কোন প্রবন্ধ গবেষণা সাময়িকীতে স্থান করতে পারা অত্যাশ্চর্য ব্যাপারই বলতে হবে।

ম্যাকডোগালের "গবেষণার" ফলাফল প্রকাশের পর পরই ড: অগাস্টাস পি ক্লার্ক নামের একজন ডাক্তার আমেরিকান মেডিসিন জার্নালে ম্যাকডোগালের কাজের সমালোচনা করে লেখেন যে, ম্যাকডোগাল এখানে খুব স্বাভাবিক আনুকল্পটির কথা বেমালুম ভুলে গেছেন : তা হচ্ছে এই ওজন হ্রাসের (যদি প্রকৃতই ঘটে থাকে) ব্যাপারটাকে বাষ্পীভবনের (evaporation) মাধ্যমে দেহের পানি ত্যাগ দিয়ে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। ব্যাপার হচ্ছে, মৃত্যু পরমুহুর্তে দেহের রক্তসঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায়, এবং ফুসফুসের মধ্যকার বাতাস আর রক্তকে আর ঠান্ডা করতে পারে না। ফলে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় আর দেহের লোমমকূপের মাধ্যমে পানি ইভাপোরেট করে বের হয়ে যাওয়ায় ওজন ঘাততি দেখা যেতে পারে। ড: অগাস্টাস পি ক্লার্কের এই ব্যাখা থেকে এটাও পরিস্কার হয় কেন কুকুরের ক্ষেত্রে কোন ওজন হ্রাসের ব্যাপার ঘটেনি। কারণ কুকুর মানুষের মত ঘামের মাধ্যমে দেহকে ঠান্ডা করে না। তারা করে 'প্যান্টিং' (panting)-এর মাধ্যমে।

আত্মা নিয়ে আরও অনেকেই বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, ব্রুস গ্রেসনের মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতার (near death experience, সংক্ষেপে NDE) পরীক্ষা। দেহবিচ্যুত আত্মার অস্তিত্বের সপক্ষে আকর্ষণীয় সব অভিজ্ঞতার (Out of Body Experience, সংক্ষেপে ODE) কথা ঢালাওভাবে অনেক মুমূর্ষু রোগী রোগমুক্তির পর বিভিন্ন মিডিয়ায় দাবী করে থাকেন । ব্যাপারগুলো কতটুকু সত্য তা পরীক্ষা করে সত্যাসত্য নির্ণয় করতে চাইলেন ব্রুস গ্রেসন। কিভাবে ব্রুস এ পরীক্ষাটি করলেন সেখানে যাওয়ার আগে এই মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতা বা এনডিই এবং দেহবিচ্যুত অভিজ্ঞতা বা ওডিই নিয়ে সাধারণ পাঠকদের জন্য কিছু কথা বলে নেয়া যাক। আমার খুব পরিচিতজনের অভিজ্ঞতার কথাই

বলি। বেশ কবছর আগের কথা। আমার জীবন সাথী বন্যা একবার গাড়িতে উঠতে গিয়ে গাড়ির দরজার সাথে মাথায় টক্কর লেগে খেল দরাম করে এক বারি। গাড়িতে উঠে বলতে লাগল তার সারা গা নাকি অবশ হয়ে যাচ্ছে। বিপদের কথা। তারাতারি তাকে হাসপাতালের ইমার্জেন্সি রুমে নিয়ে যাওয়া হল। চেতন - অচেতনের মাঝামাঝি কোন এক স্টেটে ছিল সে সময়টা (পরে বলেছিল সারাটা সময় নাকি তার মনে হচ্ছিল সে মারা যাচ্ছে, যদিও তার মনে হয়েছিল মৃত্যু ব্যাপারটা তেমন ভয়ানক কিছু না)। হয়ত কিছু সময়ের জন্য জ্ঞানও হারিয়ে থাকতে পারে সে। ভাগ্য ভাল, হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নেওয়ার পর ডাক্তারদের সেবা যত্নে কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে পায় সে। একটু পরে দিব্যি সুস্থ সবল হয়ে বাসায় ফিরে এল। কিন্তু হাসপাতালে ওই আধো জাগা আধো অচেতন অবস্থার মধ্যে এক বিরল অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেলে সে। এই অভিজ্ঞতার কথা সে এখনও সুযোগ পেলেই বলে বেড়ায়। সে দেখছিল (নাকি বলা উচিত 'অনুভব' করেছিল), সে নাকি দেহ বিযুক্ত হয়ে সারা কক্ষ জুরে ভেসে ভেসে বেরাচ্ছে। তার কোন ওজন নেই। হাল্কা পালকের মত হয়ে গেছে সে। ওভাবে ভেসে ভেসেই হাসপাতালে ডাক্তার-নার্সদের শঙ্কিত মুখগুলোও পরিস্কার দেখতে পাচ্ছিল সে। সারা ঘরের কোথায় কি আছে সবই দেখছিল উপর থেকে। টেবিলে রাখা পানির গ্লাস, বিছানার এলোমেলো চাদর, চিন্তিত লোকজনের মুখ, সবকিছু। সাইকোলজিস্টরা এ অবস্থাকেই বলেন 'আউট অব বডি এক্সপেরিয়েন্স'। বিশ্বাসীরা এগুলোতে আত্মার দেহবিচ্যুত অবস্থার অপার্থিব নিদর্শন খুজে পান। মুমূর্ষু বা মরণপ্রান্তিক অবস্থাতেই নাকি এ অভিজ্ঞতাগুলো বেশি দেখা যায়। রোগিদের অনেকে এসঅময় বিরাট বড় টানেলের শেষে আলো দেখা সহ নানা ধরণের আধি-ভৌতিক ব্যাপার স্যাপার প্রত্যক্ষ করেন। কেউ কেউ হাসপাতালের বিছানায় শায়িত চারিদিকে ডাক্তার-নার্স পরিবেষ্টিত নিজের মৃতদেহ পর্যন্ত দেখতে পান। ব্রুস গ্রেসন ঠিক করলেন এ অভিজ্ঞতার গল্পগুলো আসলেই সত্য, নাকি মুমুর্ষু অবস্থায় মনোবৈকল্য, তা একটি সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখবেন। তিনি তাঁর ল্যাপটপটি সাথে নিয়ে এলেন আর তাতে প্রোগ্রাম করে বিভিন্ন রঙ্গীন ছবি (যেমন, উড়োজাহাজ, নৌকা, প্রজাপতি, ফুল ইত্যাদি) বিক্ষিপ্তভাবে (রেন্ডমলি) ফুটিয়ে তুললেন। তারপর তিনি ল্যাপটপটিকে স্থাপন করলেন হাসপাতালের হার্টের অস্ত্রপ্রচার কক্ষের ছাদের কাছাকাছি কোথাও - এমন একটা জায়গায় যেখানে অস্ত্রপ্রচারের সময় রোগির দৃষ্টি পৌঁছয় না, কিন্তু দেহবিযুক্ত আত্মা হয়ে সারা কক্ষ জুরে ভেসে ভেসে বেড়ালে তা রোগির দেখতে পাওয়ার কথা। গ্রেসন এনডিই এবং ওডিই'র দাবীদার পঞ্চাশ জন রোগির ক্ষেত্রে পরীক্ষাটি চালনা করলেন, কিন্তু একজন রোগিও সঠিকভাবে ল্যাপটপের ছবিগুলোকে সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারেননি [১৮]। ঠিক একই ধরণের পরীক্ষা স্বতন্ত্রভাবে পরিচালনা করেছিলেন ডঃ জ্যান হোল্ডেন। তিনিও গ্রেসনের মতই নেগেটিভ ফলাফল পেলেন[২৬]।

আসলে তাই পাওয়ার কথা। যদি আত্মার মাধ্যমে তথাকথিত পরজগতের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হত তবে এই নব্য প্রযুক্তি বিজ্ঞানের জগতে ইতোমধ্যেই বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলত। আমাদের এত দিনের প্রচেষ্টায় বস্তুবাদি ধ্যান ধারণার যে বৈজ্ঞানিক বুনিয়াদ পলে পলে গড়ে উঠেছে তা অচীরেই ধ্বসে পড়ত, বদলে যেত বিবর্তনের মাধ্যমে প্রাণীজগতের এবং সর্বোপরি মানুষের উপত্তির সামগ্রিক ধ্যান ধারণা। মানব আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হলে রাতারাতি তা প্রকৃতিতে মানুষকে প্রদান করত এক অভূতপূর্ব বিশিষ্টতা। কিন্তু তা হয়নি। বরং বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সময়ের সকল আবিস্কার গেছে এই মানবকেন্দ্রিক ধারণার বিপরীতে। কোপার্নিকাস প্রমাণ করেছিলেন আমাদের আবাসভুমি পৃথিবী নামের গ্রহটি কোন বিশিষ্ট গ্রহ নয়, এটি না মহাবিশ্বের না এ

সৌরজগতের কেন্দ্র। বরং লক্ষ কোটি গ্রহ তারকার ভীরে হারিয়ে যাওয়া সামান্য গ্রহ বৈ এটি কিছু নয়। এ যেন ছিল সনাতন চিন্তাভাবনার পিঠে এক রূঢ় চাবুক। এতদিনকার প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্ব, রূপকথা, উপকথা আর ধর্মগ্রন্থের বাণীতে পৃথিবী যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল তা কোপার্নিকাসের এক চাবুকে যেন লন্ডভন্ড হয়ে গেল। তারপর ডারউইন এসে আরেক দফা চাবুক কষলেন। তিনি দেখালেন এ পৃথিবীর মত এর বাসিন্দা মানুষও কোন বিশেষ সৃষ্টি নয়, বরং অন্যান্য প্রাণিকূলের মতই দীর্ঘদিনের ক্রমবিবর্তনের ফল। এতদিন ধরে মানুষ নিজেকে সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে, নিজেকে ঈশ্বরের আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট ভেবে যে বিশ্বাসের পসরা সাজিয়ে এসেছিল, ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বে সেই বিশ্বাসের প্রাসাদোপম অট্টালিকা যেন তাসের ঘরের মতই ভেঙ্গে পড়ল। পরবর্তীতে আলেকজান্ডার ওপারিন, হাল্ডেন, ইউরে-মিলার, সিডনী ফক্সের ক্রমিক গবেষণা বিবর্তনকে নিয়ে গেল সূক্ষ রাসায়নিক স্তরে- যা অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থের উন্মেষকে (অজৈবজনি) বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে দিল। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক সমাজে অজৈবজনি এবং বিবর্তন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার পর থেকে মানুষ আত্মার অস্তিত্ব ছারাই জীবনের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে পারে। কৌতুহলী পাঠকেরা এ বিষয়ে আরো জানতে চাইলে বন্যা আহমেদের "বিবর্তনের পথ ধরে" (অবসর, ২০০৭)[৩৭] এবং আমার ও ফরিদ আহমেদের লেখা "মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে" (অবসর, ২০০৭)[১৯] বই দুটি পড়ে দেখতে পারেন।

কিন্তু তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে আত্মা যদি নাই থাকল, বিভিন্ন জনের মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতাগুলোকে (এনডিই এবং ওডিই) কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? ওই যে হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে যে দেখতে পায় তারা হাসপাতালের কক্ষ জুড়ে ভেসে ভেসে বেরাচ্ছে? এরা কি সবাই তবে মিথ্যে বলছে? না মোটেও তা নয়। আর তাছাড়া ওভাবে সবাইকে মিথ্যেবাদী বানাতে গেলে 'ঠগ বাছতে গা উজারের' দশা হবে। কারণ এ ধরণের ওডিই-অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবাণদের সংখ্যা এ পৃথিবীতে নেহাত কম তো নয়। দেহ থেকে বের হয়ে ভেসে ভেসে বেড়ানোই কেবল নয়, কেউ এ সময় টানেলের শেষপ্রান্তে উজ্জ্বল আলো দেখতে পায়, কেউ বা মৃত লোকজনের (যেমন সন্ত, যীশু খ্রীষ্ট, মুহম্মদ, ফেরেশতা, মৃত আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি) দেখা পায়। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে আমেরিকার শতকরা প্রায় ১৫-২০ ভাগ লোক মনে করে তাদের জীবনের কোন না কোন সময় ওডিই বা এনডিই -এর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এগুলোর কি ব্যাখ্যা?

এর ব্যখ্যা অবশ্যই আছে, এবং তা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানেই বেরিয়ে এসেছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন মস্তিস্ক আমাদের দেহের এক অতি জটিল অংগ। কি রকম জটিল একটু কল্পণা করা যাক। মস্তিস্কের জটিলতাকে অনেক সময় মহাবিশ্বের জটিলতার সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। কোটি কোটি গ্রহ -নক্ষত্র ছরিয়ে ছিটিয়ে থেকে আমাদের পরিচিত এই সুবিশাল এই মহাবিশ্বে তৈরি হয়েছে বিশাল বপুর সব সৌরজগত কিংবা ছায়াপথের। ঠিক একই রকমভাবে বলা যায়, আমাদের করোটির ভিতরে প্রায় দেড় কিলো ওজনের এই থকথকে ধুসর পদার্থটির মধ্যে গাদাগাদি করে লুকয়ে আছে প্রায় দশ হাজার কোটি নিউরন আর কোটি কোটি সায়ন্যাপসেস; আর সেইসাথ সেরিব্রাম, সেরিবেলাম, ডাইসেফেলন আর ব্রেইনস্টেমে বিভক্ত হয়ে তৈরি করেছে জটিলতম সব কাঠামোর। আমি যখন ২০০২ সালে আমার পিএইচডির কাজ শুরু করতে গিয়ে মস্তিষ্কের মডেলিং করছিলাম তখন ব্রেনের প্রায় তেতাল্লিশটি কাঠামো (প্রত্যংগ) সনাক্ত করে মডেলিং করেছিলাম। সেগুলোর ছিল বিদ্ঘুটে সমস্ত নাম - কর্পাস ক্যালোসাম, ফরনিক্স, হিপোক্যাম্পাস, হাইপোথ্যাল্যাস, ইনসুলা, গাইরাস, কডেট নিউক্লিয়াস, পুটামেন, থ্যালমাস, সবাস্ট্যানশিয়া নাইয়াগ্রা,

ভেন্ট্রিকুলাস ইত্যাদি [২৪]। আমাদের চিন্তাভাবনা, কর্মমান্ড, চাল চলন এবং প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা অনেকাংশেই মস্তিস্কের এই সমস্ত বিদ্গুটে নামধারী প্রত্যঙ্গগুলোর সঠিক কর্মকান্ডের এবং তাদের কাজের সমন্বয়ের উপর নির্ভরশীল। দেখা গেছে, মস্তিস্কের কোন অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হলে, কিংবা এর কাজকর্ম বাধাগ্রস্থ হলে নানারকমের অদ্ভুতুরে এবং অতীন্দ্রীয় অনুভূতি হতে পারে।

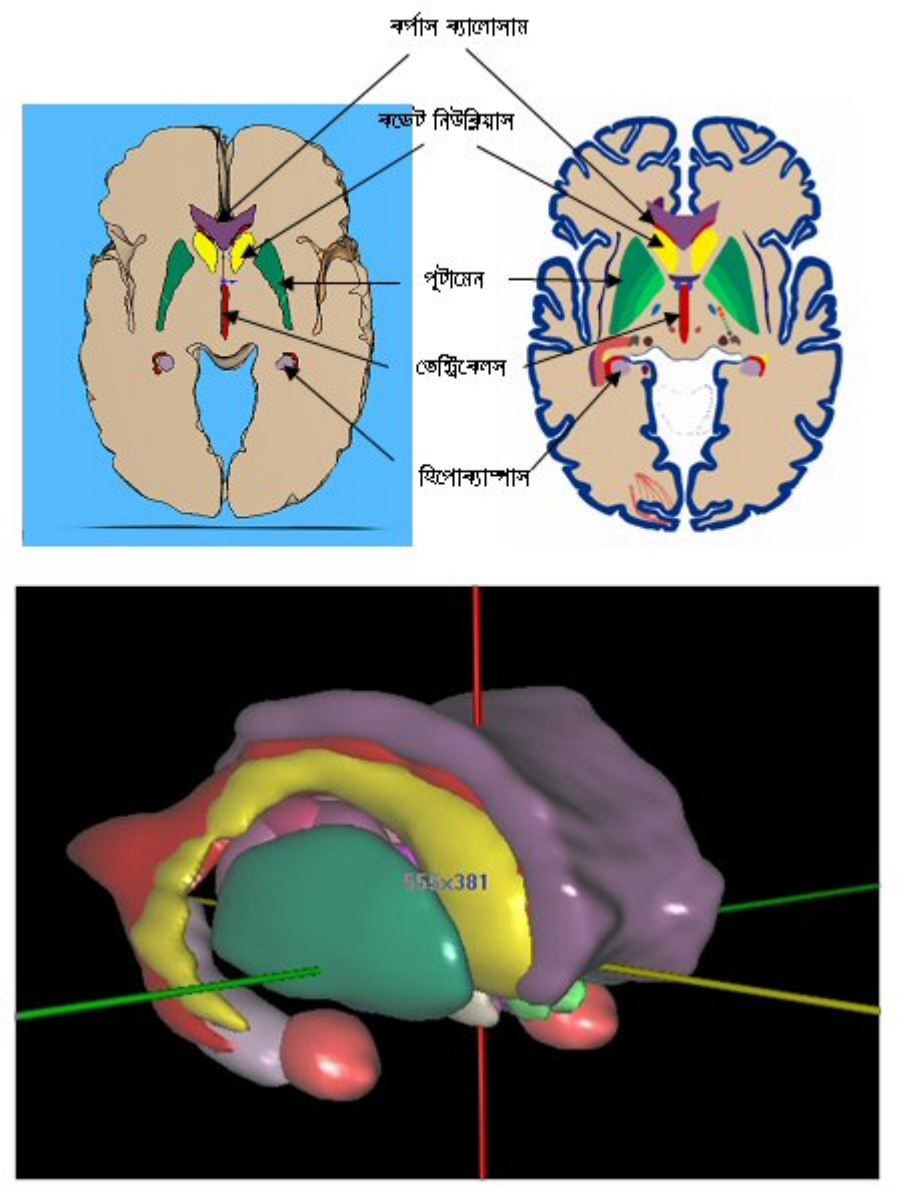

চিত্রঃ আমার পিএইচডির কাজের অংশ হিসেবে মানব মস্তিস্কের বিভিন্ন অংশ সনাক্ত করে ত্রি-মাত্রিক মডেলিং করতে হয়েছিল। আমি ৪৩ টি অংশ সঠিকভাবে সনাক্ত করে মডেলিং করেছিলাম [২৪]। উপরের ছবিতে আমার করা সেই মডেলিং-এর অংশবিশেষ দেখনো হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, আমাদের চিন্তাভাবনা, কর্মমান্ড, চাল চলন এবং প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা অনেকাংশেই মস্তিস্কের এই সমস্ত প্রত্যঙ্গগুলোর সঠিক কর্মকান্ডের এবং তাদের সমন্বয়ের উপর নির্ভরশীল।

যেমন, কর্পাস ক্যালোসাম নামের গুরুত্বপুর্ণ কাঠামোটি মস্তিস্কের বামদিক এবং ডানদিকের কাজের সমন্বয়

সাধন করে থাকে। আমরা সবাই জানি যে, আমাদের ব্রেন একটি হলেও এটি মুলতঃ ডান এবং বাম - এই দুই গোলার্ধে বিভক্ত। এই দুই গোলার্ধকে আক্ষরিক অর্থেই আটকে রাখে দুই গোলার্ধের ঠিক মাঝখানে 'কাবাব মে হাড্ডি' হয়ে বসে থাকা কর্পাস ক্যালোসাম নামের প্রত্যংগটি। কোন কারণে মাথার মাঝখানের এই অংশটি আঘাতপ্রাপ্ত হলে মাথার বামদিক এবং ডানদিকের সঠিক সমন্বয় ব্যাহত হয়। ফলে রোগীর দ্বৈতসত্ত্বার (Split Brain experience) উদ্ভব ঘটতে পারে।

ষাটের দশকে রজার স্পেরি, উইলসন এবং মাইকেল গ্যাজানিগার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বেরিয়ে আসে মজার মজার সব তথ্য। দেখা গেল এ ধরনের রোগীদের মাথার বামদিক একধরনের চিন্তা করছে তো ডানদিক করছে আরেক ধরণের চিন্তা [৯, ২৫]। মাথার দুই ভাগই আলাদা আলাদা ভাবে কনশাস বা চেতনাময়। মাথার বামঅংশ পেশাগত জীবনে ড্রাফটসম্যান হতে চায়, তো ডান অংশ হতে চায় রেসিং ড্রাইভার [২৫]! এখন যারা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তাদের কাছে সহজেই এ প্রশ্নটি উত্থাপন করা যায়, মস্তিস্ক-বিভক্ত দ্বৈতসত্ত্বাধারী রোগীদের দেহে কি তাহলে দুটি আত্মা বিরাজ করছে? বাড়তি আত্মাটি তাহলে দেহে কোত্থেকে গজালো? বোঝাই যাচ্ছে, আত্মার অস্তিত্ব দিয়ে এই ঘটনার ব্যাখ্যা মিলে না, এর ব্যাখ্যা সঠিকভাবে দিতে পারে 'দ্বিখন্ডিত মস্তিস্ক' এবং মাথার মাঝখানে থাকা কর্পাস ক্যালোসাম নামের গুরুত্বপূর্ন অংগের কাজকর্ম।

আবার বিজ্ঞানীরা এও দেখেছেন, হাইপোথ্যালমাস নামে মস্তিস্কের আরেকটি প্রত্যংগকে কৃত্রিমভাবে বৈদ্যুতিক ভাবে উদ্দীপ্ত করে (মূলতঃ মৃগীরোগ সারাতে এ প্রক্রিয়াটি ব্যবহৃত হত) দেহবিচ্যুত অবস্থার সৃষ্টি করা যায়, অন্ততঃ রোগীরা মানসিকভাবে মনে করে যে সে দেহ বিযুক্ত হয়ে ভেসে ভেসে বেরাচ্ছে। এ ধরণের অবস্থা সৃষ্টি হয় মস্তিস্কে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে (হাইপারকার্বিয়া) কিংবা কোন কারণে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে (হাইপক্সিয়া)। কিছু কিছু ড্রাগ যেমন, ক্যাটামিন, এলএসডি, সিলোকারপিন, মেসকালিন প্রভৃতির প্রভাবে নানাধরনের অপার্থিব অনুভূতির উদ্ভব হয় বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ সমস্ত ড্রাগের প্রতিক্রিয়া হিসেবে অচৈতন্যাবস্থা থেকে শুরু করে দেহ-বিযুক্ত অনুভূতি, আলোর ঝলকানি দেখা, পূর্জন্মের স্মৃতি রোমন্থন, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা সবকিছুই পাওয়া সম্ভব। আমি এক ভদ্রলোককে চিনতাম যিনি যীশুখ্রীষ্টকে দেখাবার এবং পাওয়ার জন্য এলএসডি সেবন করতেন। আমার আরেক বন্ধু প্রথমবারের মত গাঁজা খেয়ে এমন সমস্ত কান্ড কারখানা করা শুরু করেছিল যে মনে পড়লে এখনো হাসি পায়। হাড় কাঁপানো শীতের রাতে 'গরমে পুইড়া যাইতাছি', 'আমারে হাসপাতালে নিয়া যা' বলে হাউ মাউ কাঁদতে আর চ্যাচাতে লাগল। আমাদের তখন সদ্যকৈশোর উত্তীর্ণ বয়স, কলেজ পালিয়ে 'গাঁজা খেলে কেমন লাগে' - এই রহস্য উদ্ঘাটনে আমরা তখন ব্যস্ত। ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম সেরাতে। যদিও শেষটা বন্ধুটিকে হাসপাতালে নিতে হয়নি, কিন্তু পরদিন তার পাংশু মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝেছিলাম কি ধকলটাই গেছে তার উপর দিয়ে সারা রাত ধরে। সবাই মিলে চেপে ধরায় সে বলেছিল, 'সারা রাত ধরে আমি শুধু দেখছিলাম আমি একটা নিকষ কালো অন্ধকার টানেলের মধ্য দিয়ে হেটে চলেছি, আর সব কিছু আমার উপরে ভেঙ্গে পড়ছে'। গরম গরম বলে চ্যাচাচ্ছিলি কেন - এ প্রশ্ন করায় বলেছিল, তার নাকি মনে হয়েছিল টানেলের শেষেই দোজখের আগুন, সে আগুনে নাকি তাকে পুড়িয়ে ঝলসিয়ে কাবাব বানানো হবে! বলা বাহুল্য, এগুলো উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, মরণ-প্রান্তিক এবং দেহ-বিযুক্ত অনুভূতিগুলো আসলে

কিছুই নয়, আমাদের মস্তিস্কেরই স্নায়বিক উত্তেজনার ফসল। আর এজন্যই শ্মশানঘাটের কোন কোন সাধু-সন্নাসী কেন গাঁজা, চরস, ভাং খেয়ে 'মা কালীকে পেয়ে গেছি' ভেবে নাচাচাচি করে, তা বোঝা যায়।

এ প্রসংগে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সুসান ব্ল্যাকমোরের কথা বলা যেতে পারে। সুসান ব্ল্যাকমোর মরণ-প্রান্তিক অভিজ্ঞতা বিষয়ে বিশেশজ্ঞ একজন মনোবিজ্ঞানী, ইংল্যান্ডের ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। এক সময় টেলিপ্যাথি, ইএসপি, পরামনোবিদ্যায় বিশ্বাসী থাকলেও, আজ তিনি এ সমস্ত অলৌকিকতা, ধর্ম এবং পরজগত সম্বন্ধে সংশয়ী। সংশয়ী হয়েছেন নিজে বৈজ্ঞানিকভাবে এগুলোর অনুসন্ধান করেই। তিনি 'ডাইং টু লিভ', 'ইন সার্চ অব দ্য লাইট' এবং 'মীম মেশিন' সহ বহু বইয়ের প্রণেতা। তিনি তার 'ডাইং টু লিভ : নিয়ার ডেথ এক্সপেরিএন্স' (১৯৯৩) বইয়ে উল্লেখ করেছেন অক্সফোর্ডে অধ্যয়নকালীন সময়ে (সত্তুরের দশকে) তিন বন্ধুর সাথে মিলে মারিজুয়ানা সেবন করে কিভাবে একদিন তার 'আউট অব বডি' অভিজ্ঞতা হয়েছিল, কিভাবে তিনি টানলের মধ্যদিয়ে ভেসে ভেসে বেরিয়েছিলেন, অক্সফোর্ডের বিল্ডিঙ্গের বাইরে ভাসতে ভাসতে আটলান্টিক মহাসগর পাড়ি দিয়ে নিউইয়র্কে পৌছিয়েছিলেন, তারপর আবার নিজের দেহে ফিরে গিয়েছিলেন [৮]। তার এ অভুতপূর্ব অভিজ্ঞতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখা আছে The Archives of Scientists' Transcendent Experiences (TASTE) ওয়েবসাইটে। কিন্তু সুসান ব্ল্যাকমোর যা করেননি তা হল অন্যান্য ধর্মান্ধ ব্যক্তিবর্গের মত 'ধর্মীয় আধ্যাতিকতার অপার মহিমায়' আপ্লুত হয়ে যাওয়া, কিংবা এঘটনার পেছনে অকাট্য প্রমাণ হিসেবে স্রষ্টা, আত্মা কিংবা পরজগতের অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া। বরং তিনি যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে এনডিই এবং ওবিই-এর বৈজ্ঞানিক কারণ অণুসন্ধান করেছেন এবং উপসংহারে পৌছিয়েছেন যে, মরণ প্রান্তিক অভিজ্ঞতাগুলো কোন পরকালের অস্তিত্বের প্রমাণ নয়, বরং এগুলোকে ভালমত ব্যাখ্যা করা যায় স্নায়ু-রসায়ন (neurochemistry), শরীরবিজ্ঞান (physiology) এবং মনোবিজ্ঞান (psychology) থেকে আহৃত জ্ঞানের সাহায্যে[২৭]।

চিত্রঃ মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতার সময় অনেকেই টানেল বা সুরঙ্গ দেখে থাকেন।

কেন মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতাগুলোতে কেবলই টানেল বা সুরঙ্গ দেখা যায়? বিশ্বাসীরা বলেন, ওটি ইহজগত

আর পরজগতের সংযোগ পথ। টানেলের পেছনে আলোর দিগন্ত আসলে পরজগতের প্রতীকী রূপ। কিন্তু তাহলে অবধারিতভাবে প্রশ্নের উদয় হয় - কেন কেবলই সুরঙ্গ? কেন কখনো দরজা নয় কিংবা নয় কোন বেহেস্তী কপাট কিংবা নয় গ্রীক মিথোলজীর আত্মা পাড়াপাড়ের সেই 'রিভার স্ট্যায়ক্স'? এখানেই সামনে চলে আসে আধ্যাতিকতার সাথে বিজ্ঞানের বিরোধের প্রশ্নটি। বিজ্ঞানীরা বলেন, 'সুরঙ্গ দর্শন' আসলে মরনপ্রান্তিক কোন ব্যাপার নয়, নয় কোন অপার্থিব ইঙ্গিত। সেজন্যই মরনপ্রান্তিক অবস্থার বাইরেও মৃগীরোগ, মাইগ্রেনের ব্যাথার সময় অনেকে সুরঙ্গ দেখে পারেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, সুরঙ্গ দেখা যেতে পারে মস্তিস্ক যখন থাকে খুবই ক্লান্ত, শ্রান্ত, কিংবা কোন কাজে যখন চোখের উপর অত্যধিক চাপ পড়ে। আবার কখনো সুরঙ্গ দেখা যেতে পারে এলএসডি, সাইলোকিবিন কিংবা মেসকালিনের মত ড্রাগ-সেবনে। আসলে স্নায়ুজ-কল্লোল (neural noise) এবং অক্ষীয়-করটিকাল জরিপণের (retino-cortical mapping) সাহায্যে টানেলের মধ্য দিয়ে আঁধার থেকে আলোতে প্রবেশের আভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করা যায় [২৮]। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ুজীববিজ্ঞানী জ্যাক কোয়ান (Jack Cowan) ১৯৮২ সালে পুরো প্রক্রিয়াটিকে একটি বৈজ্ঞানিক জার্নালে গানিতিক মডেলের সাহায্যে ব্যাখা করেছেন [২৭]। তার মডেলের সাহায্যে কোয়ান দেখিয়েছেন, কর্টেক্সে ডোরা দাগ থাকলে তা আমাদের চোখে অনেকটা সর্পিল কুন্ডলী (spirals) আকারে রূপ নেবে। এগুলো আমরা ছোটবেলায় 'দৃষ্টি বিভ্রমের' (visual illusion) উদাহরণ হিসেবে দেখেছি। নীচে পাঠকদের জন্য এমনি একটি ছবি দেওয়া হল। ছবিটি দেখুন। বক্ররেখাগুলোকে সর্পিলাকার কুন্ডলী বলে বিভ্রম হবে। যদিও বাস্তবতা হল, বক্ররেখাগুলো একেকটি বৃত্ত।

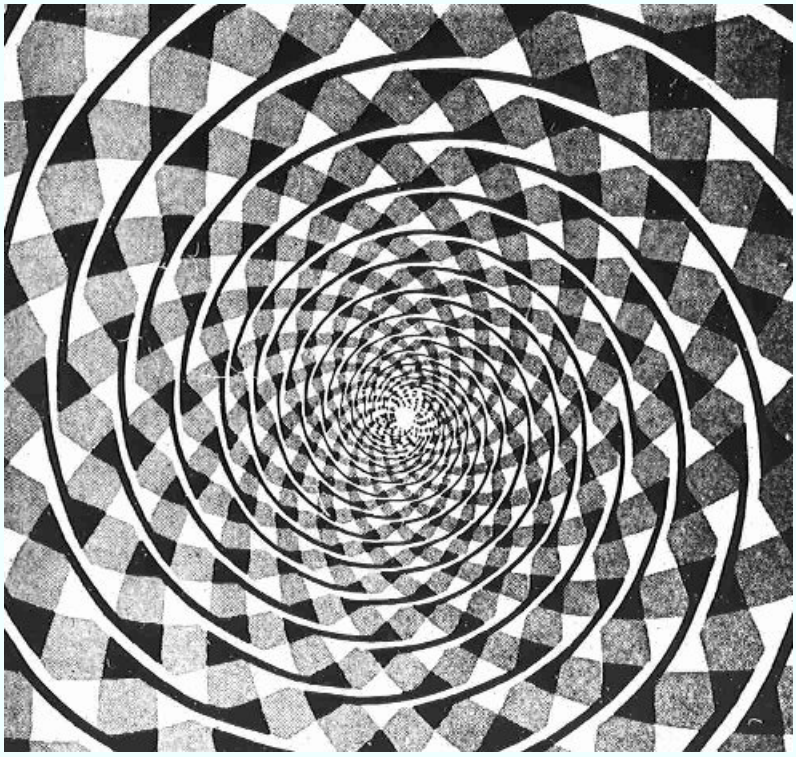

চিত্রঃ বক্ররেখাগুলোকে সর্পিলাকার কুন্ডলীর টানেল বলে বিভ্রম হচ্ছে। যদিও বাস্তবতা হল, বক্ররেখাগুলো একেকটি বৃত্ত। প্রমাণ হিসেবে ওগুলোর উপর আঙ্গুল ঘুরিয়ে দেখতে পারেন।

মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতা লাভের সময় প্রায় একই রকম বিভ্রম ঘটে মস্তিস্কের মধ্যেও। ড্রাগ সেবনের ফলে কিংবা অত্যদিক টেনশনে কিংবা অন্য কোন কারণে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে ভিজুয়াল কর্টেক্সের গতিপ্রকৃতি সততঃ বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে এ সময় ব্যক্তিরা নিজেদের অজান্তেই টানেল-সদৃশ প্যাটার্ণের দর্শন পেয়ে থাকেন। এটাই সুরঙ্গ-দর্শনের মূল কারণ। সুরঙ্গ দর্শনের এই স্নায়ুজ-কল্লোল এবং অক্ষীয়-করটিকাল জরিপণের গাণিতিক মডেলটির পরবর্তীতে আরো উন্নতি ঘটান পল ব্রেসলফ, সুসান ব্ল্যাকমোর এবং ট্রস্কিয়াঙ্কো এবং অন্যান্যরা [২৮, ২৯]।

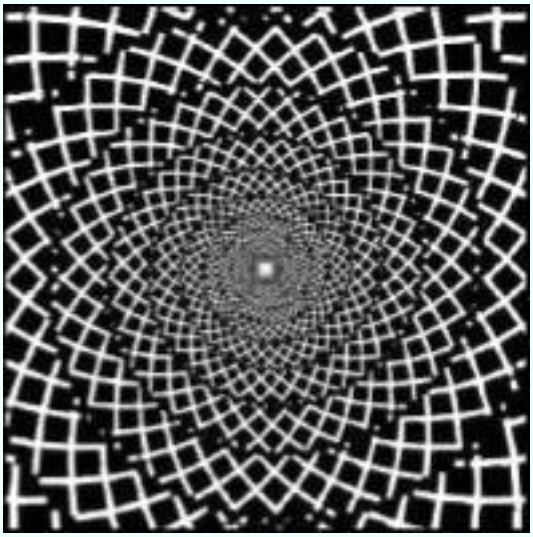

চিত্রঃ স্নায়ুজ-কল্লোল এবং অক্ষীয়-করটিকাল জরিপণের সাহায্যে সুরংগ দর্শনের আভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করা যায়।

কাজেই বোঝা যাচ্ছে সুরঙ্গ-দর্শনের মাঝে অলৌকিক বা অপার্থিব কোন ব্যাপার নেই, নেই কোন পারলৌকিক রহস্য, যা আছে তা একেবারে নিরস, নিখাঁদ বিজ্ঞান। বলা বাহুল্য, ফেলু মিত্তরের গোয়েন্দাগল্পের মত 'সুরঙ্গ-রহস্য' শেষ পর্যন্ত সমাধান করেছে বিজ্ঞানীরাই। শুধু রহস্য সমাধান নয়, গাণিতিক মডেল টডেল করাও সারা। শুধু তাই নয়, টানেলের পাশাপাশি কেন যীশুখ্রীষ্ট কিংবা মৃত-আত্মীয় স্বজনের দেখা যাচ্ছে তারও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, ব্যাপারটা হয়ত পুরোটাই সমাজ-সাংস্কৃতিক। যীশুখ্রীষ্টের দেখা পান তারাই, যারা দীর্ঘদিন খ্রীষ্টীয় জল-হাওয়ায় বড় হয়েছেন, বাবা মা, শিক্ষক, পাড়া-পড়শীদের কাছ থেকে 'খ্রীষ্টীয় সবক' পেয়েছেন। একজন হিন্দু কখনোই মরণ-প্রান্তিক অভিজ্ঞতায় খ্রীষ্টের দেখা পান না, তিনি পান বিষ্ণু, ইন্দ্র বা লক্ষীর দেখা, আর ভাগ্য খারাপ হলে 'যমদূতের'। আবার একজন মুসলিম হয়ত সেক্ষেত্রে দর্শন লাভ করেন আজরাইল ফেরেশতার। বোঝা যাচ্ছে, ধর্মীয় 'দিব্য দর্শন' কোন 'সার্জনীন সত্য' নয়, বরং, আজন্ম লালিত ধর্মানুগত্য আর নিজ নিজ সংস্কৃতির রকমফেরে ব্যক্তিবিশেষে পরিবর্তিত হয়। কাজেই, ঈশ্বর দর্শনই বলুন আর ধর্মীয় 'দিব্য দর্শন'-ই বলুন, এগুলোর উৎসও আসলে মানব মস্তিস্কই। দেখা গেছে মস্তিস্কের কোন কোন অংশকে উত্তেজিত করলে মানুষের পক্ষে ভুত, প্রেত,

ড্রাকুলা থেকে শুরু করে শয়তান, ফেরেশতা কিংবা ঈশ্বর দর্শন সব কিছুই সম্ভব। এ ব্যাপারটা আরো বিষদভাবে বুঝতে হলে আমাদের মস্তিস্কের একটি বিশেষ অংশ -'টেম্পোরাল লোব' সম্বন্ধে জানতে হবে।

টেম্পোরাল লোব : মস্তিস্কের 'গড স্পট'?

বিশ্বের তাবৎ বিজ্ঞানী আর গবেষকের দল অনেকদিন ধরেই সন্দেহ করছিলেন, ঈশ্বর দর্শন, দিব্যদর্শন, কিংবা ওহিপ্রাপ্তির মত ধর্মীয় অভিজ্ঞতাগুলো আসলে স্রেফ মস্তিস্কসঞ্জাত। সেই ১৮৯২ সালের আমেরিকার পাঠ্যপুস্তকগুলোতেও এপিলেপ্সির সাথে 'ধর্মীয় আবেগের' সাযুজ্য খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছিল। ব্যাপারটা আরো ভালমত বোঝা গেল বিগত শতকের মধ্যবর্তী সময়ে। ১৯৫০ সালের দিকে উইল্ডার পেনফিল্ড নামের এক নিউরোসার্জন মস্তিস্কে অস্ত্রপ্রচার করার সময় ব্রেনের মধ্যে ইলেকট্রোড ঢুকিয়ে মস্তিস্কের বিভিন্ন অংশকে বৈদ্যুতিকভাবে উদ্দীপ্ত করে রোগীদের কাছে এর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইতেন। যখন কোন রোগীর ক্ষেত্রে 'টেম্পোরাল লোব' (ছবিতে দেখুন)-এ ইলেক্ট্রোড ঢুকিয়ে উদ্দীপ্ত করতেন, তাদের অনেকে নানা ধরণের 'গায়েবী আওয়াজ' শুনতে পেতেন, যা অনেকেটা 'দিব্য দর্শনের' অনুরূপ [৩০]। এই ব্যাপারটা আরো পরিস্কার হল, ১৯৭৫ সালে যখন বস্টোন ভেটেরান্স এডমিনিস্ট্রেশন হাসপাতালের স্নায়ু-বিশেষজ্ঞ নরমান গেসচ উইন্ড-এর গবেষণায় প্রথম বারের মত এপিলেপ্সি বা মৃগীরোগের সাথে টেম্পোরাল লোবে বৈদ্যুতিক মিসফায়ারিং-এর একটা সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেল [৩১]। একই ক্রমধারায় ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ু বিশেষজ্ঞ ভিলায়ানুর এস রামাচান্দ্রণ তার গবেষণায় দেখালেন, টেম্পোরাল লোব এপিলেপ্সি রোগীদের ক্ষেত্রেই ঈশ্বর-দর্শন, ওহি-প্রাপ্তির মত ধর্মীয় অভিজ্ঞতার আস্বাদনের সম্ভাবনা বেশি [৩২]। এগুলো থেকে হয়ত অনুমান করা যায়, কেন আমাদের পরিচিত ধর্ম প্রবর্তকদের অনেকেই 'ওহি-প্রাপ্তির' আগে 'ঘন্টাধ্বনি শুনতে পেতেন', 'গায়েবী কণ্ঠস্বর শুনতে পেতেন' , তাদের 'কাপুনি দিয়ে জ্বর আসত' কিংবা তারা 'ঘন ঘন মুর্চ্ছা যেতেন'[৩৩]।

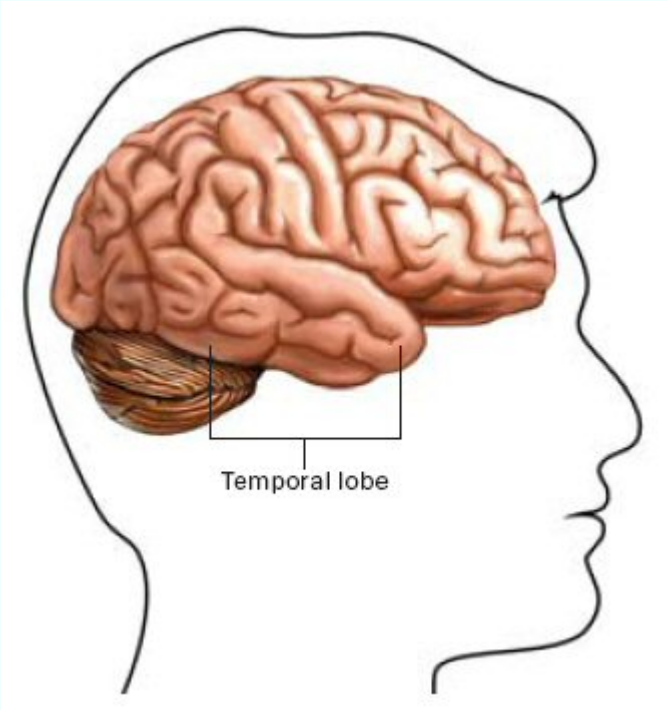

চিত্রঃ মস্তিস্কের টেম্পোরাল লোব : অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন মস্তিস্কের এই অংশটিই হয়ত ধর্মীয় প্রনোদনার মূল

উৎস। এই অংশটি নিয়ে গবেষণা করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতার সাথে এপিলেপ্সীর জোরালো সম্পর্কও পাওয়া গেছে।

এই ধরনের গবেষণা থেকে পাওয়া ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে ক্যানাডার লরেন্টিয়ান ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক মাইকেল পারসিঙ্গার আরো একধাপ সাহসী গবেষণায় হাত দিলেন। তিনি ভাবলেন, টেম্পোরাল লোবে বৈদ্যুতিক তারতম্য যদি ধর্মীয় প্রণোদনার উৎস হয়েই থাকে তবে, উল্টোভাবে - মস্তিস্কের এই গোদা অংশটিকে উদ্দীপ্ত করেও তো কৃত্রিমভাবে ধর্মীয় প্রনোদনার আবেশ আস্বাদন করা সম্ভব, তাই না? হ্যা, অন্ততঃ তাত্ত্বিকভাবে তো তা সম্ভব। ডঃ পারসিঙ্গার ঠিক তাই করলেন। তিনি টেম্পোরাল লোবকে কৃত্রিম্ভাবে উদ্দীপ্ত করে ধর্মীয় আবেশ পাওয়ার জন্য তৈরী করলেন তার বিখ্যাত 'গড হেলমেট'। এই হেলমেট মাথায় পরে বসে থাকলে নাকি 'রিলিজিয়াস এক্সপেরিয়েন্স' আহরণ করা সম্ভব। হেলমেট বানানোর পর অফিশিয়ালি প্রায় ছ'শ জনের উপরে হেলমেট পরিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়েছে। এদের প্রায় ৮০ শতাংশ বলেছেন, তাদের এক ধরণের অপার্থিব অনুভূতি হয়েছে [৩০]। তারা অনুভব করেছেন, কোন অশরীরী কেউ (কিংবা কোন স্পিরিট) তাদের উপর নজরদারি করেছে। অনেকের অভিজ্ঞতার লাটাই এর চেয়েও গজখানেক বেশি। যেমন, এক মহিলার হেলমেট পরার পর মনে হয়েছে তিনি তার মৃত মায়ের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। আরেক মহিলার কাছে এই অশরীরী অস্তিত্ব এতটাই প্রবল ছিল যে, পরীক্ষার শেষে যখন অশরীরী আত্মা হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল যে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। হেলমেট মাথায় পরার পর ব্রিটিশ সাংবাদিক আয়ান কটনের পুরো সময়টা নিজেকে তীব্বতী ভিক্ষু বলে বিভ্রম হয়েছিল। বিজ্ঞানী সুসান ব্ল্যাকমোরের অভিজ্ঞতাটাই বোধ হয় এক্ষেত্রে সবচেয়ে মজার। তিনি নিউ সায়েন্টিস্ট পত্রিকায় নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এভাবে [৩৪] -

> "আমার হঠাৎ মনে হল কেউ আমার পা ধরে টানছে, দুমড়ে মুচড়ে নষ্ট করে দিচ্ছে।, তারপর ধাক্কা মেরে আমাকে দেওয়ালে ফেলে দিল। পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত; কিন্তু ঘটনাটা ছিল দিনের আলোর মতই পরিস্কার। আমার প্রথমে প্রচন্ড রাগ হচ্ছিল, পরে রাগের স্থান ক্রমান্বয়ে দখল করে নিল ভীতি...।"

অধ্যাপক ব্ল্যাকমোর পরে বলেছিলেন [৩৫], 'পারসিঙ্গারের ল্যাবরেটরীতে আমার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এক কথায় অবিস্মরনীয়। পরে যদি বেরিয়ে আসে কোন প্ল্যাসিবো এফেক্টের কারনে আমি এগুলোর মধ্য দিয়ে গেছি -আমি তাহলে অবাকই হব।'

তবে সবার ক্ষেত্রেই যে 'গড হেলমেট' একই রকমভাবে কাজ করেছে তা কিন্তু নয়। একবার গড হেলমেটের কার্যকারীতা দেখানোর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্সকে। ডকিন্স বিবর্তনবাদে বিষেষজ্ঞ একজন বিজ্ঞানী, পাশাপাশি সব সময়ই ধর্ম, অলৌকিকতা প্রভৃতি বিষয়ে উ□সুক। ধর্মের একজন কঠোর সমালোচক তিনি। নিজেকে কখনোই 'নাস্তিক' হিসেবে পরিচিত করতে পরোয়া করেন না। ঈশ্বরে বিশ্বাস তার কাছে বিভ্রান্তি বা 'ডিলুশন', ধর্মের ব্যাপারটা তার কাছে 'ভাইরাস'। এহেন ব্যক্তিকে হেলমেট পরিয়ে তার মনের মধ্যে কোন ধরণের 'ধর্মীয় ফিলিংস' ঢোকানো যায় কিনা, এ নিয়ে অনেকেই খুব উৎসুক ছিলেন।

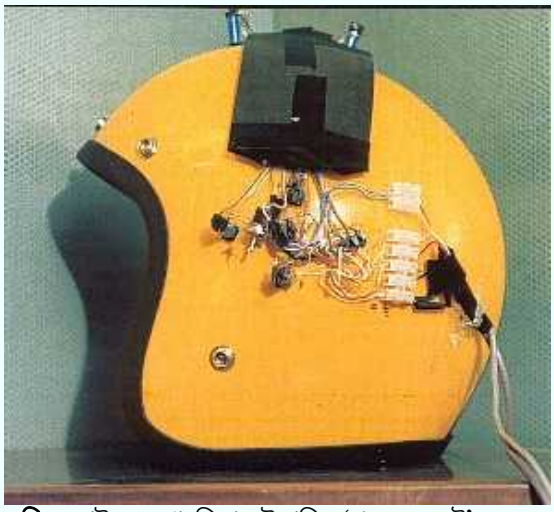

চিত্রঃ মাইকেল পারসিঙ্গার উদ্ভাবিত 'গড হেলমেট'।

রিচার্ড ডকিন্স খুব আগ্রহ ভরেই এই পরীক্ষায় 'গিনিপিগ' হতে রাজী হলেন ২০০৩ সালের । ডকিন্স পারসিঙ্গারের ল্যাবরেটরীতে এসে হেলমেট পরে চেম্বারে ঢুকলেন। যথা সময় বেরিয়েও আসলেন। এসে বিবিসির সাথে সাক্ষাৎকারে বললেন [৩৫], 'আমি খুবই হতাশ। খুব ইচ্ছে ছিল ঈশ্বর দর্শনের। কিন্তু চেম্বারে বসে মাথা ঝিম ঝিম করার ভাব ছাড়া আর তো কিছু পেলাম না বাপু!'

মনে হচ্ছে ডকিন্সের মত যুক্তিবাদী মাথা মৃগীরোগের জন্য উপযুক্ত নয়। এদের মত লোককে বোধ হয় সহজে গায়েবী আওয়াজ শোনানো, কিংবা দিব্য-দর্শন দেওয়া এত সহজ নয়। কাজেই, দুর্মুখেরা বলবেন, ডকিন্সের মত 'নিরেট-মস্তিস্ক' লোকেরা পয়গম্বর হবার উপযূক্ত নন! ধর্মবাদীরা কি আর সাধে বলে যে, নবুয়ত পেতে যোগ্যতা লাগে - হু!!

কিন্তু রিচার্ড ডকিন্সের উপর কাজ না করলেও এটাও ঠিক সুসান ব্ল্যাকমোর সহ অনেকের মধ্যেই তো করেছে, এবং করেছে খুব ভালভাবেই। তারা নিজেরাই তা স্বীকার করেছেন। আর পারসিঙ্গারের দাবী অনুযায়ী, তার উদ্ভাবিত এ প্রক্রিয়ায় যদি ৮০ শতাংশের বেশী লোকের অপার্থিব অনুভূতি হয়েই থাকে, তবে বলতেই হয় ঈশ্বরানুভূতির মত ব্যাপার স্যাপারগুলো হয়ত মস্তিস্কের বাইরে নয়। পারসিঙ্গারের ভাষায় [৩৪], 'ঈশ্বর মানুষের মস্তিস্ক তৈরি করেনি, বরং মানুষের মস্তিস্কই সৃষ্টি করেছে শক্তিমান ঈশ্বরের।'

শেষ কথা

আত্মা ব্যাপারটি মানুষের আদিমতম কল্পণা । এটি সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত নয় এবং আধুনিক বিজ্ঞানের চোখে অপার্থিব আত্মার কল্পণা ভ্রান্ত বিশ্বাস ছারা কিছু নয়। আমার এ প্রবন্ধে আমি খুব বিশদভাবে বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে আত্মা নামক ধারণাটিকে যাচাই করার চেষ্টা করেছি। এর থেকে যা বেরিয়ে এসেছে তা হল -

আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলোর সাথে আত্মা নামক ব্যাপারটি একেবারেই খাপ খায় না। সোজা সাপ্টা ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় - আত্মার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ বিজ্ঞান পায় নি। আর যত দিন যাচ্ছে, আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণের আশা ক্রমশঃ রূপান্তরিত হচ্ছে দূরাশায়। বস্তুতঃ স্নায়ুবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান, জেনেটিক্স আর বিবর্তনবিজ্ঞানের নতুন নতুন গবেষণা আত্মাকে আক্ষরিক ভাবেই রঙ্গমঞ্চ থেকে হটিয়ে দিয়েছে। আর সেজন্যই যুগল-সর্পিলের (ডিএনএ) রহস্যভেদকারী নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক বলেন [২], 'একজন আধুনিক স্নায়ু-জীববিজ্ঞানী মানুষের এবং অন্যান্য প্রানীর আচরণ ব্যাখ্যা করার জন্য আত্মা নামক ধর্মীয় ধারণার দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না'। ১৯২১ সালে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন একই ধারণা পোষণ করে বলেছিলেন, 'দেহবিহীন আত্মার ধারনা আমার কাছে একেবারেই অর্থহীন এবং অন্তঃসারশূন্য'।

কাজেই বিজ্ঞান মানতে হলে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হওয়ার কোন যুক্তিনিষ্ঠ কারণ নেই। প্রাচীনকালের মানুষেরা জন্ম-মৃত্যুর গূঢ় রহস্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে সমাধান করতে না পেরে আশ্রয় করেছিল 'আত্মা' নামক আধ্যাত্মিক ধারণার। বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণা সে সমস্ত পুরোণ এবং অসংজ্ঞায়িত ধ্যান ধারনাকে খন্ডন করে দিয়েছে। আত্মার অস্তিত্ব ছাড়াই বিজ্ঞানীরা আজ মানুষ সহ অন্যান্য প্রাণির আচরণ, আচার-ব্যবহার এবং নিজের 'আমিত্ব' (self) এবং সচেতনতাকে (consciousness) ব্যাখ্যা করতে পারছে। এমনকি খুঁজে পেয়েছে ধর্মীয় অপার্থিব অভিজ্ঞতার বিভিন্ন শরীরবৃত্তীয় উৎস। কাজেই ামার ব্যক্তিগত অভিমত হল- প্রাণের অস্তিত্বকে ব্যখ্যা করার জন্য আত্মা একটি অপ্রয়োজনীয় এবং পরিত্যক্ত ধারণা, যেমনি আলোর সঞ্চালনকে ব্যখ্যা করার জন্য পদার্থবিজ্ঞানীদের চোখে আজ ইথার একটি অপ্রয়োজনীয় এবং পরিত্যক্ত ধারণা। কিন্তু আত্মার সাথে ইথারের পার্থক্য হল - পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে ইথারকে হটানো সম্ভব হলেও আত্মাকে হটানো সম্ভব হয়নি, বরং আত্মা নামক পরিত্যক্ত ধারণাটিই আজো সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয়। অস্তিত্বহীন আত্মার শান্তির জন্য মানুষ তাই কত কিছুই না করে! আর সাধারণ অসচেতন মানুষকে সম্মোহিত রাখতে এই আগাছার চাষকে পুরোদমে জনপ্রিয় করে রেখেছে তাবৎ ধর্মীয় সংগঠনগুলো, স্বীয় ব্যবসায়িক স্বার্থেই। তবে, এমন একদিন নিশ্চয় আসবে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ জীবন-মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার জন্য আত্মার দারস্থ হবে না; আত্মার 'পারলৌকিক' শান্তির জন্য শ্রাদ্ধ-শান্তিতে কিংবা মিলাদ-মাহফিল বা চল্লিশায় অর্থ ব্যয় করবে না, মৃতদেহকে শ্মশান ঘাটে পুড়িয়ে বা মাটিচাপা দিয়ে মৃত দেহকে নষ্ট করবে না, বরং কর্ণিয়া, হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, যকৃত, অগ্ন্যাশয় প্রভৃতি অংগ-প্রত্যঙ্গগুলো যেগুলো মানুষের কাজে লাগে, সেগুলো মানবসেবায় দান করে দেবে (গবেষণা থেকে জানা গেছে, মানুষের একটিমাত্র মৃতদেহের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে ২২ জন অসুস্থ মানুষ উপকৃত হতে পারে)। এ ছাড়াও মেডিকেলের ছাত্রদের জন্য মৃতদেহ উন্মুক্ত করবে ব্যবহারিকভাবে শরীরবিদ্যাশিক্ষার দুয়ার। আরজ আলী মাতুব্বর তার মৃতদেহ মেডিকেল কলজে দান করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এক সময় অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন [৩৬],

> '...আমি আমার মৃতদেহটিকে বিশ্বাসীদের অবহেলার বস্তু ও কবরে গলিত পদার্থে পরিণত না করে, তা মানব কল্যাণে সোপর্দ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আমার মরদেহটির সাহায্যে মেডিক্যাল কলেজের শল্যবিদ্যা শিক্ষার্থীগন শল্যবিদ্যা আয়ত্ব করবে, আবার তাদের সাহায্যে রুগ্ন মানুষ রোগমুক্ত হয়ে শান্তিলাভ করবে। আর এসব প্রত্যক্ষ অনুভূতিই আমাকে

দিয়েছে মেডিকেলে শবদেহ দানের মাধ্যমে মানবকল্যাণের আনন্দলাভের প্রেরণা'

সে অনুপ্রেরনায় উজ্জীবিত হয়ে পরবর্তীতে মেডিকেলে নিজ মৃতদেহ দান করেছেন ড. আহমেদ শরীফ, ড. নরেন বিশ্বাস, ওয়াহিদুল হক প্রমুখ। সদ্য প্রয়াত ইহজাগতিক গায়ক সঞ্জীব চৌধুরী আমাদের এ তালিকায় নতুন এবং গর্বিত সংযোজন। সমাজ সচেতন ইহজাগতিক এ মানুষগুলোকে জানাই আমার প্রাণের প্রণতি।

অথ্যসূত্র :

1. Elbert, Jerome W, *Are Souls Real?* 2000, Prometheus Books.

2. Crick, Francis, *Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul*, 1995, Scribner.

3. Dennett, Daniel C., *Consciousness Explained*, 1992, Back Bay Books

4. Kurtz, Paul, *Science and Religion: Are They Compatible?*, 2003, Prometheus Books

5. Stenger, Victor J, *God: The Failed Hypothesis. How Science Shows that God Does Not Exist*, 2007, Prometheus Books.

6. Clark, William R, *Sex and the Origins of Death*, 1998, Oxford University Press, USA.

7. Swin, Tony, *A place for Strangers: Towards a history of Australian Aboriginal Being*, 1993, Cambridge University Press.

8. Blackmore, Susan, *Dying to Live: Near-Death Experiences*, 1993, Prometheus Books.

9. Blackmore, Susan, *Consciousness: A Very Short Introduction (Very Short Introductions) (Paperback)*, 2005, Oxford University Press.

10. Pinker, Steven, *How the Mind Works*, 1999, Penguin Books Ltd.

11. Brown, Warren S et. el, *Whatever Happened to the Soul? Scientific and Theological Portraits of Human Nature*, 1998, Augsburg Fortress Publishers.

12. Churchland, Patricia S., *Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind-Brain*, 1989 , The MIT Press

13. Churchland, Paul M, *The Engine of Reason, The Seat of the Soul: A Philosophical Journey into the Brain*, 1996, The MIT Press.

14. Zimmer, Carl, *Soul Made Flesh: The Discovery of the Brain—and How It Changed the World,* 2004, New York: Free Press.

15. Gora, God and Soul, Atheism: Questions and Answers, Atheist Center, Vijayawada.

16. Bremmer, Jan N., The Early Greek Concept of the Soul, Princeton University Press; Reissue edition, 1987.

17. Stone Alex, *Suspended Animation : Is Induced hibernation the key to surviving a trip to the ER?* Discover, May 2007.

18. Bosveld, Jane, Soul Search: Can science ever decipher the secrets of the human soul? Discover, June 2007

19. অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ, *মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে*, অবসর, ২০০৭।

20. অপরাজিত বসু, *প্রাণের রহস্য সন্ধানে বিজ্ঞান*, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৯৯।

21. প্রবীর ঘোষ, অলৌকিক নয়, লৌকিক (প্রথম ও পঞ্চম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩।

22. শহিদুল ইসলাম, বিজ্ঞানের দর্শন (প্রথম খন্ড), শিক্ষাবার্তা প্রকাশণা, ২০০৫।

23 Rationally speaking, Does the soul weigh 21 grams? March 08, 2007

24. Avijit Roy, *Construction of Physics-based brain atlas and its applications*, PhD thesis, NUS, 2007

25. Roger Penrose, *The Emperor's New Mind*, Oxford University Press, USA; New Paperback edition, 2002.

26. Robert Todd Carroll, *Near-death experience (NDE)*, Skeptic's Dictionary, Last updated 12/03/07, http://skepdic.com/nde.html

27. Susan Blackmore, *Near-Death Experiences: In or out of the body?* Skeptical Inquirer 1991, 16, 34-45.

28. S. J. Blackmore and T. S. Troscianko., The physiology of the tunnel. Journal of Near-Death Studies, 8:15-28, 1989.

29. Bressloff, Paul C., Jack D. Cowan, Martin Golubitsky, Peter J. Thomas, and Matthew C. Wiener. *What Geometric Visual Hallucinations Tell Us About the Visual Cortex*., *Neural Computation*. Vol. 14, No. 3, 473-491, 2002

30. John Horgan, The God Experiments : Five researchers take science where it's never gone before, Discover, December, 2006

31. David Biello, Searching for God in the Brain; Scientific American Mind, October/November 2007..

32. V. S. Ramachandran and Sandra Blakeslee, Phantoms in the Brain: Probing the Mysteries of the Human Mind, Harper Perennial, 1999.

33. দীক্ষক দ্রাবিড়, *মানুষের পয়গম্বর হয়ে ওঠার সুলুক-সন্ধান*, মুক্তান্বেষা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।

34. Robert Hercz, *The God Helmet*, Saturday Night Magazine, p 40-46, 2002

35. God helmet, wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/God_helmet

36. আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র, পাঠক সমাবেশ।

37. বন্যা আহমেদ, *বিবর্তনের পথ ধরে*, অবসর প্রকাশনা, ২০০৭

38. Steven Laureys, Eyes Open, Brain Shut; May 2007; Scientific American Magazine, May 2007.

ড. অভিজিৎ রায়, আমেরিকায় বসবাসরত গবেষক এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' ও 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। সাম্প্রতিক সম্পাদিত গ্রন্থ - 'স্বতন্ত্র ভাবনা'। ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com

প্রার্থনা কি কোন কাজে আসে?

ফরিদ আহমেদ

অনেকেরই স্বৈরাচারী এরশাদের সময়কার একটা বিশেষ ঘটনার কথা মনে থাকার কথা। সন তারিখ অবশ্য খুব ভাল করে মনে নেই আমার। তবে এইটুকু মনে আছে যে, বাংলাদেশে তখন বৈশাখ বা জৈষ্ঠ্যের ভয়াবহ দাবদাহ। খরায় পুড়ছে সারাদেশ। বৃষ্টির নাম নিশানাও নেই অনেকদিন ধরে। আল্লাহ প্রেমিক এরশাদ বেশ ঘটা করে একদিন ঢাক ঢোল পিটিয়ে জাতীয় ঈদগাহ ময়দানে ইসতিশকা নামাজ (বৃষ্টির জন্যে এই নামাজ পড়া হয়) পড়ার ঘোষনা দিল। নির্দিষ্ট দিনে সকালের দিকে অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে সেই নামাজ পড়াও হলো। আর কি আশ্চর্য! দুপুর গড়াতে না গড়াতেই কাল বৈশাখীর ঝড় হয়ে বৃষ্টি ঝাপিয়ে পড়লো ঢাকাসহ মোটামুটি প্রায় সারা দেশে। এরশাদ যে আল্লাহর খুব পেয়ারের বান্দা এবং খোদা যে মুমিন মুসলমানের ডাকে সাড়া দেন সে ব্যাপারে মানুষের আর কোন সন্দেহই রইলো না। দুর্মুখেরা অবশ্য বলে থাকেন যে আবহাওয়া অফিস থেকে ওইদিন বিকালে বৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনার পুর্বাভাস পেয়েই এরশাদ জনগণকে ইসতিশকার নামাজ পড়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। অনেকে হয়তো ভাবছেন বাংলাদেশের মত অশিক্ষিত এবং ধর্মভীরু মানুষের দেশে এটাইতো স্বাভাবিক। তাদের জন্য বলছি, এ ধরনের অন্ধবিশ্বাস শুধুমাত্র যে আমাদের মতো পশ্চাদপদ দেশেই রয়েছে তা কিন্তু নয়। এই সেদিন পোলিশ পার্লামেন্টে যখন সরকারী দলের পক্ষ থেকে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করার প্রস্তাব করা হয় তখনও পার্লামেন্টে বেশ হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, সত্যি সত্যিই বিশ জনেরও বেশী এমপি সংসদীয় চ্যাপেলে ঈশ্বরের কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেছিল। যারা এই ঘটনাকে কৌতুক হিসাবে নিয়ে বেশ মজা পাচ্ছেন তাদের জন্য তথ্য হচ্ছে পোলান্ড ক্যাথলিক দেশ এবং প্রয়াত পোপ দ্বিতীয় জন পল ক্যাথলিকদেরকে আহ্বান জানিয়েছিলেন 'তৃষ্ণার্ত ধরিত্রীকে বৃষ্টির সুশীতল পরশ দেওয়ার জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকট আকুল অনুরোধ করতে।'

স্বাস্থ্য, নিশ্চয়তা, নিরাপত্তা, ভাল রেজালট, চাকুরীর প্রমোশন, বিত্ত বা আরো বৃহৎ কোন লক্ষ্য যেমন বিশ্ব শান্তি ও মানব জাতির দুর্দশার অবসান ইত্যাদি হাজারো নানান বিষয়ে প্রতিদিন মানুষ সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করে থাকে। প্রার্থনা যে সবসময় ভাল কিছুর জন্যই করা হবে তা কিন্তু নয়। খারাপ উদ্দেশ্যেও প্রার্থনা করা হতে পারে, চলতি ভাষায় আমরা যাকে বলি 'বদ্ দোয়া'। কেউ কেউ দেখা যায় চুরি চোট্টামি, ডাকাতি, প্রতারনা, ধান্ধাবাজি বা ভয়ংকর প্রতিশোধের জন্যও 'ঈশ্বরের' হস্তক্ষেপ কামনা করে থাকে।

প্রার্থনা কি কাজ করে?

প্রশ্ন হচ্ছে এই সমস্ত অসংখ্য প্রার্থনা কি আদৌ কোন কাজে আসে বা কাজ করে? প্রার্থনা কি কোন ফলাফলে প্রভাব রাখতে পারে? কোন লোকের যখন কোন অসুখ হয়ে থাকে তখন তার পরিবারের লোকজন তার সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করতে পারে। এটাই স্বাভাবিক। রোগী সুস্থ হয়ে উঠলে পরিবারের লোকজন ভাবতে পারে যে প্রার্থনার কারণেই এই তার সুস্থতা। যদি কোন মহিলা অন্তঃসত্ত্বা হয়, সেক্ষেত্রে সে এবং তার স্বামী স্বাস্থ্যবান সন্তানের জন্য প্রার্থনা করতে পারে। এবং সত্যিই যদি স্বাস্থবান সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তখন ওই যুগল বিশ্বাস করতে পারে যে তাদের প্রার্থনার কারণেই এটা ঘটেছে। কোন এলাকার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া হারিকেন কারণে কোন বাড়ীর অধিবাসীরা তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করতে পারে। যদি ওই বাড়ী কোন কারণে হারিকেনে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তাহলে বাড়ীর বাসিন্দারা অনুমান করে নিতে পারে যে প্রার্থনাই তাদেরকে রক্ষা করেছে।

ঈহুদি, ক্রিশ্চিয়ান এবং মুসলিমদের সৃষ্টিকর্তার একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এই সৃষ্টিকর্তা তার ভক্তদের আকুল আবেদনে সাড়া দিয়ে মাঝে মাঝেই প্রাকৃতিক ঘটনা প্রবাহকে পরিবর্তন করে দেন। অবশ্য প্রতিদিন মিলিয়ন মিলিয়ন প্রার্থনা তার দরবারে জমা হয়ে অদ্যাবধি বিলিয়ন বিলিয়ন প্রার্থনার পাহাড় সৃষ্টি হলেও তেমন কোন যাচাইযোগ্য ইতিবাচক প্রমাণ পাওয়া যায়নি যা থেকে দাবী করা যেতে পারে যে সৃষ্টিকর্তা প্রার্থনায় কর্নপাত করে থাকেন।

প্রার্থনা বর্তমানে সারাবিশ্বে এক নয়া 'কুটির শিল্পে' পরিনত হয়েছে। প্রার্থনার ফলে রোগ নিরাময় হয় এই ভ্রান্ত ধারণার উপর অসংখ্য তথাকথিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল ছাপা হচ্ছে নামী দামী সব জার্নালে। গত পাঁচ-সাত বছরের মধ্যেই নিউ ইয়র্ক টাইমস প্রার্থনার ফলে অনেক জটিল রোগের রোগীদের নিরাময় হয়েছে এই বিষয়ের উপর কমপক্ষে আধ ডজন বইকে বেস্ট-সেলারের মর্যাদায় ভূষিত করেছে। নিউজ উইকের মত আরো অনেক ম্যাগাজিনের কভার স্টোরিও হয়েছে এই বিষয়কে নিয়ে। ডেটলাইন এনবিসি-র মত টেলিভিশনের কোন কোন প্রোগ্রামের পুরোটাই প্রার্থনাকে কেন্দ্র করে হয়েছে। বিশেষ করে চিকিৎসক ল্যারি ডোসি (Larry Dossey) তার Prayer is Good Medicine: How to Reap the Healing Benefits of Prayer এবং Healing Words: The Power of Prayer and Practice of Medicine এ প্রার্থনা যে রোগ নিরাময়ে দারুনভাবে কাজ করে তার 'বৈজ্ঞানিক প্রমাণ' আছে এই ধারণাকে বিশেষভাবে জনপ্রিয় করে তোলেন।

প্রার্থনার ফলে রোগ-নিরাময় হয় এমনতর দাবীর স্বপক্ষে যতই বৈজ্ঞানিক প্রমানের সাফাই গাওয়া হোক না কেন সেগুলো যে সব বুজরুকি সে বিষয়ে তেমন কোন সন্দেহ নাই। বুজরুকি যে নয় সেটা প্রমাণ করতে হলে প্রার্থনার প্রভাব সাথে সাথেই পরিমাপযোগ্য হওয়া উচিত। বিশেষ করে যেখানে প্রার্থনা করা হয় নির্দিষ্ট কোন বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে- যেমন রোগ থেকে আরোগ্য লাভ। অনেক জনপ্রিয় গ্রন্থ এবং প্রবন্ধে দাবী করা হয়েছে যে, প্রার্থনার ইতিবাচক নিরাময় মূল্য রয়েছে এবং তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমানিত।

প্রার্থনা থেকে রোগীরা কিছু মনস্তাত্বিক সুবিধা পেয়ে থাকে সে বিষয়টাকে হয়তো একেবারে অস্বীকার করা যাবে না। প্রার্থনার কারণে রোগীদের মধ্যে কিছুটা নিরুদ্বেগ ও স্বস্তিতে থাকা বা তাদের ব্লাড প্রেশার কমে যাওয়ার ঘটনা মাঝে মাঝে হয়তো দেখা যায়। যদিও এই সমস্ত এফেক্টগুলো খুবই তুচ্ছ এবং ধর্মীয় বা স্পিরিচুয়াল বিষয় থেকে আসে না এমন অন্যান্য প্রশমন ও স্বস্তিগুলোর খুব একটা পার্থক্যযোগ্যও নয়। প্রকৃতপক্ষে, আমরা দেখবো যে, কিছু ডাটা বরং এই ধারণাকেই পোক্ত করে যে, ওই ধরনের অহেতুক প্রার্থনা বরং রোগীদের জন্য ক্ষতিকর এবং খুব সম্ভবত তাদের উদ্বেগ বাড়িয়ে তোলে (STEP প্রজেক্ট দ্রষ্টব্য) । যে কোন ক্ষেত্রেই, প্রার্থনার স্বপক্ষে অসাধারণ প্রমাণকে বিবেচনায় নিতে গেলে গবেষণা কার্যকে হতে হবে অতি অবশ্যই 'নিরপেক্ষ' এবং 'অন্ধ', যেখানে রোগী বা গবেষক কেউই জানবে না কার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে।

প্রার্থনা খুব সম্ভবত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রও নয়। প্রথমতঃ বিজ্ঞান ভাববাদী নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব কঠোরভাবেই বস্তুবাদী। অথচ প্রার্থনার ব্যাপার-স্যাপারগুলো বস্তুবাদী নয়, বরং অনেক বেশী আধ্যাত্মিক। দ্বিতীয়তঃ প্রার্থনাকে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত দুরুহ। কিভাবে কাউকে প্রার্থনা করা থেকে বিরত রাখা যাবে বা কিভাবে নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে, রোগীর জন্য পৃথিবীর কোন প্রান্ত থেকে কেউ প্রার্থনা করছে না। যে কোন পর্যবেক্ষনযোগ্য বিষয়ই বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষাযোগ্য। প্রার্থনার পর্যবেক্ষনযোগ্য ফলাফল রয়েছে বলে ব্যাপকভাবে দাবী করা হয়। কাজেই প্রার্থনার ফলাফলকেও বৈজ্ঞানিক উপায়ে যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে সেটা সম্ভব নয়।

বার্ডের পরীক্ষা

প্রার্থনার স্বপক্ষে খুব সম্ভবত সবচেয়ে বেশি যে পরীক্ষাটি উল্লেখ্য করা হয় তা সম্পন্ন করেছিলেন কার্ডিওলজিষ্ট র‍্যান্ডলফ বার্ড (Randolph Byrd) স্যান ফ্রান্সিসকো জেনারেল মেডিক্যাল সেন্টারে। তার এক্সপেরিমেন্টে তিনি দাবী করেছিলেন যে, করোনারি পেশেন্টরা অজ্ঞাত এবং দূরবর্তী প্রার্থনা থেকে উপকৃত হয়েছে। অগাষ্ট ১৯৮২ থেকে জুলাই ১৯৮৩ এর মধ্যে তিনি ৩৯৩ জন রোগীর উপর তার গবেষণা কার্যক্রম চালান। তিনি এই গ্রুপকে দুইভাগে ভাগ করেন। ১৯২ জনকে প্রার্থনা করা হয়েছে গ্রুপে এবং ২০১ জনকে প্রার্থনা করা হয়নি এমন গ্রুপে রাখা হয়। তিনি উল্লেখ করেন যে, যে সমস্ত রোগীদের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে তাদের মধ্যে পালমোনারি এডেমা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা পাঁচ গুন কম।

প্রার্থনা সংক্রান্ত এই ধরনের তথাকথিত নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে, প্রার্থনা নিয়ে এই ধরনের নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা আদৌ সম্ভব নয়। মানুষকে প্রার্থনা পেয়েছে আর প্রার্থনা পায়নি এই ধরনের ভিন্ন দলে কখনো ভাগ করা যায় না। এর মূল কারণ হচ্ছে যে, আসলে কোনভাবেই জানা সম্ভব নয় যে কোন একজন ব্যক্তি কারো প্রার্থনা পায়নি। বার্ড যাদেরকে প্রার্থনা না পাওয়ার দলে ফেলে রেখেছেন তাদের মধ্যে কারো কারো জন্যে যে, তার দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয়রা প্রার্থনা করেনি তারই বা নিশ্চয়তা কি? বার্ড নিজেও অবশ্য এই সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন এবং স্বীকার করেছেন যে, এই গবেষণার জন্য 'বিশুদ্ধ' গ্রুপ পাওয়া যায়নি।

গ্যারি পি. পোজনার (Gary P. Posner) তার *Free Inquiry (1990)* ম্যাগাজিনে প্রকাশিত "God in the CCU?" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, বার্ডের সরবরাহকৃত সংখ্যাতাত্ত্বিক ফলাফলও খুব একটা শক্ত ভিত্তির উপর দাড়িয়ে নেই। উদাহরনস্বরুপ, প্রার্থনা গৃহীত গ্রুপের ১৩ জন রোগী (৭ শতাংশ) মারা যায়। অন্যদিকে নিয়ন্ত্রিত গ্রুপের রোগী মারা যায় ১৭ জন (৮.৫ শতাংশ)। এখানে দেখা যাচ্ছে যে,

দুই গ্রুপের মধ্যে মৃত্যুর হার প্রায় সমান। এমনকি ডোসিও স্বীকার করেছেন যে, বার্ডের পরীক্ষাকৃত দুই গ্রুপের মধ্যে এই পার্থক্য এবং অন্যান্য পার্থক্যসমূহ পরিসংখ্যানগতভাবে অ-তাৎপর্যপূর্ণ।

কলাম্বিয়া 'অতিলৌকিক' গবেষণা

২০০১ সালে *Journal of Reproductive Medicine* এ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল সেন্টার এর প্রকাশিত এক প্রবন্ধে দাবী করা হয় যে, বন্ধ্যা রমণীদের মধ্যে যাদের জন্য ক্রিশচিয়ান প্রার্থনা দলগুলো প্রার্থনা করেছে তাদের গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা যাদের জন্য প্রার্থনা করা হয়নি তাদের চেয়ে তিন গুন বেশি। এই গবেষণার ফলাফল জাতীয় গণমাধ্যম যেন লুফে নিল। এবিসি নিউজ এর মেডিক্যাল এডিটর টিমথি জনসন 'গুড মর্নিং আমেরিকা' নামক প্রভাতকালীন টক শো তে খুবই বিশ্বাসযোগ্যভাবে লাখ লাখ মানুষের কাছে এই 'বিস্ময়কর ফলাফল' জানিয়ে দিলেন। এখানে বলা খুব অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, সেই সময় টিমথি জনসন ওয়েষ্ট পিবডি, ম্যাসাচুসেটস এর এভাঞ্জেলিক্যাল কম্যুনিটি কভেন্যান্ট চার্চ এর মিনিস্টার ছিলেন। কাজেই তিনি যে এই গবেষণার ফলাফলকে নিয়ে উল্লসিত হবেন সেটা বলাই বাহুল্য।

এই গবেষণাটি প্রকৃতপক্ষে কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে পরিচালনা করা হয়নি বরং এটা করা হয়েছিল কোরিয়ার একটি ইনস্টিট্যুট এ। এর পরিচালক কোয়াং চা ছিলেন ওই গবেষণা পত্রের একজন সহ-লেখক। এই গবেষণার জন্য ২১৯ জন মহিলাকে র‍্যান্ডমলি দু'টো গ্রুপে ভাগ করা হয় এবং এর এক গ্রুপের জন্য প্রার্থনা করা হয় এবং অন্য গ্রুপের জন্য করা হয় না। আমেরিকা, ক্যানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার সংঘবদ্ধ প্রার্থনা গ্রুপগুলো রোগীদের জন্য প্রার্থনা পরিচালনা করে। গবেষকরা সব ডাটা সংগৃহীত হওয়া এবং পরীক্ষার ফলাফল না পাওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের মুখ বন্ধ করে রেখেছিলেন।

এই ফলাফলে দেখানো হয় যে, প্রার্থনা করা হয়েছে যে গ্রুপের জন্য তাদের গর্ভবতী হওয়ার হার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। অন্য দিকে প্রার্থনা করা হয়নি যে গ্রুপের জন্য তাদের হার মাত্র শতকরা ছাব্বিশ ভাগ।

খুব শীঘ্রই অবশ্য এই গবেষণার ফলাফলের যথার্থতা নিয়ে সন্দেহের ডালপালা গজিয়ে উঠতে থাকে। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার অবস্ট্রেটিকস এন্ড গাইনোকলোজীর ক্লিনিক্যাল প্রফেসর ব্রুস ফ্লাম (Bruce Flamm) এই গবেষণার বেশ কিছু ত্রুটি খুঁজে পান এবং একে 'জটপাকানো এবং বিভ্রান্তিকর' হিসাবে আখ্যায়িত করেন। এই গবেষণা যে জটিল এবং বিভ্রান্তিকর ছিল তার জ্বলন্ত উদাহরন হচ্ছে এরকম। প্রার্থনায় অংশ নেওয়া এক গ্রুপ সরাসরি রোগীদের জন্য প্রার্থনা করেছিল। দ্বিতীয় গ্রুপ শুধুমাত্র রোগীদের জন্যই প্রার্থনা করেনি বরং প্রথম প্রার্থনা গ্রুপের প্রার্থনা যাতে কার্যকর হয় সে জন্যও প্রার্থনা করেছিল। আর তৃতীয় গ্রুপের প্রার্থনা ছিল এই যে, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা বা আকাংখা যেন পরিপুর্ন হয়'।

এই বিভ্রান্তি অবশ্য তেমন বিশাল কিছু নয় এবং ফলো-আপ গবেষণায় তা হয়তো সংশোধনেরও সুযোগ ছিল। কিন্তু গবেষণায় জড়িতদের বিষয়ে যে সমস্ত তথ্য পরবর্তীতে বেরিয়ে আসে সেগুলোই বরং পুরো পরিস্থিকে আরো জটিল এবং বিভ্রান্তিকর করে তোলে।

এই প্রবন্ধের একজন লেখক ড্যানিয়েল পি. উইয়ার্থ (Daniel P. Wirth) ছিলেন একজন আইনজীবি যার কোন মেডিক্যাল ডিগ্রিই নেই। যদিও প্যারা-সাইকোলজীর উপর তার একট ডিগ্রি আছে এবং খুঁজে পেতে প্যারা-সাইকোলজী জার্নালসমূহে প্রার্থনার ফলে আরোগ্য লাভের উপর তার কিছু প্রবন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়। টাকা পয়সা সংক্রান্ত প্রতারণার দায়ে একবার জেলও খেটেছেন এই ভদ্রলোক।

গবেষণা প্রবন্ধের মূল লেখক ছিলেন সেই সময়কার কলাম্বিয়া ডিপার্টমেন্ট অব অবস্ট্রেটিকস এন্ড গাইনোকলজীর প্রধান রজারিও লোবো (Rogerio Lobo)। কিন্তু, প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর পরই তিনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোষনা করেন যে, এই গবেষণাটি যখন সম্পন্ন করা হয় তখন তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না। এমনকি গবেষণাটি সম্পন্ন হওয়ার বেশ কিছু দিন পর কোয়াং চা কর্তৃক অবহিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি এ বিষয়ে পুরোপুরি অজ্ঞ ছিলেন। এই প্রবন্ধ থেকে লোবো তার নাম প্রত্যাহার করে নেন এবং কোয়াং চা ও কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিদ্যমান সব সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। যদিও এই প্রবন্ধটি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করে নেয় নি এখন পর্যন্ত। এই নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এটা নিশ্চয়ই কলংক স্বরূপ।

এতো কেলেংকারীর পরেও ফেইথ হিলিং এর নির্লজ্জ প্রবক্তা ল্যারি ডোসিরা অবশ্য এই প্রবন্ধটিকে প্রার্থনার ঈপসিত ফল প্রদানের সক্ষমতার বৈজ্ঞানিক সমর্থক হিসেবে চালিয়ে যাচ্ছেন এখনো।

প্রার্থনা কি অতীতকে পাল্টে দিতে পারে?

২০০১ সালে *British Medical Journal* প্রকাশিত ডঃ লিওনার্ড লেইবোভিসি (Dr. Leonard Leibovici) একটি প্রবন্ধ নিয়ে ডোসি খুবই ইম্প্রেসড ছিলেন। সেই প্রবন্ধে উল্লেখ্য করা হয় যে, রোগীদের জন্য প্রার্থনা করলে তাদের হাসপাতালে থাকার সময় কমে যায় অর্থাৎ দ্রুত আরোগ্য লাভ করে। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এই গবেষণায় রোগীদের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে তারা হাসপাতাল থেকে চলে যাওয়ার পর। এর মানে এই গোত্রের 'গবেষক'দের দাবী অনুযায়ী, প্রার্থনা অতীতকেও প্রভাবিত করতে পারে।

ডিউক স্টাডি

> ডিউক স্টাডি থেকে জানা গিয়েছে প্রার্থনায় কোন কাজ হয় না।

ডিউক ইউনিভার্সিটির চিকিৎসকদের তিন বছর ধরে পরিচালিত ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে ফলদায়ক প্রার্থনার প্রভাব যাচাইয়ের জন্য আমেরিকার নয়টি হাসপাতালের ৭৪৮ জন রোগীর উপর গবেষণা চালানো হয়। লে এবং মোনাস্টিক ক্রিশ্চিয়ান, সুফি মুসলিম এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ সারা বিশ্বের বারোটি প্রার্থনা গ্রুপ এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রার্থনা ই-মেইলের মাধ্যমে জেরুজালেমেও পাঠানো হয়েছিল। করোনারি আর্টারি ওবস্ট্রাকসনের রুগীদের কম্প্যুটারের মাধ্যমে র‍্যান্ডমলি সিলেক্ট করা হয় এবং বারোটি প্রার্থনা গ্রুপের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গ্রুপগুলো রোগীদের সম্পুর্ন আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করে। এই ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ছিল দ্বৈত অন্ধ (Double blind)। হাসপাতালের স্টাফ বা রোগী কেউই জানতো না কার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে। *The Lancet* জার্নালে প্রকাশিত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, দুই গ্রুপের নিরাময়

হওয়া এবং স্বাস্থের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ, ডিউক স্টাডি বলছে, প্রার্থনায় কাজ হবার মত কোন প্রমাণ মেলেনি।

এখানে উল্লেখ্য যে, এই পরীক্ষা একদল 'বদ্ধমনা সংশয়বাদী বস্তুবাদী নাস্তিকদের' দ্বারা পরিচালিত হয় নি। বরং ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী একদল চিকিৎসক যারা ব্যক্তিগতভাবে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মেডিসিনের বিকল্পকে বেশি মূল্যবান মনে করেন তাদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল।

STEP প্রজেক্ট

স্টেপ প্রজেক্ট থেকে জানা গিয়েছে প্রার্থনায় তো কোন কাজ হয়ই না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রার্থনা বরং মানসিক উদ্বেগ বাড়িয়ে তোলে।

সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে চমকপ্রদ গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল হার্ভার্ডের প্রফেসর হার্বার্ট বেনসনের (Herbert Benson) নেতৃত্বে। দশ বছরব্যাপী চলা সুবিশাল এই প্রজেক্টের নাম ছিল STEP প্রজেক্ট (Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer)। হার্ভার্ড এবং মায়ো ক্লিনিক সহ ছয়টি মেডিক্যাল সেন্টার অংশ নিয়েছিল এই গবেষণায়। গবেষণার ফলাফল ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে *American Heart Journal* এ প্রকাশিত হয়। এই গবেষণায় ১৮০২ জন রোগীর উপর চালানো হয়। রোগীদের করোনারী বাইপাস গ্রাফট সার্জারী (CABG) হওয়ার আগের রাত থেকে শুরু করে পরবর্তী চৌদ্দ দিন ধরে প্রার্থনা করা হয়।

রোগীদেরকে 'র‍্যান্ডমলি' এবং 'ব্লাইন্ডলি' তিন দলে ভাগ করা হয়। ৬০৪ জন রোগী প্রার্থনা গ্রহন করে যাদেরকে আগেই জানানো হয়েছিল যে তাদের জন্য প্রার্থনা করা হতেও পারে, নাও পারে। প্রার্থনা পেতে পারে অথবা নাও পেতে পারে জানানোর পর প্রার্থনা পায়নি এমন রোগীর সংখ্যা ৫৯৭ জন। বাকী ৬০১ জনকে নিশিচিতভাবেই জানানো হয়েছিল যে তারা প্রার্থনা পেতে যাচ্ছে। কোন চিকিৎসকরাই জানতেন না যে প্রথম দুই দলের মধ্যে কোন রোগীরা প্রার্থনা পেতে যাচ্ছে। দু'টো ক্যাথলিক গ্রুপ এবং একটি প্রোটস্ট্যান্ট গ্রুপ প্রার্থনা পরিচালনা করেছিল। দেখাই যাচ্ছে, গবেষকরা কিছু ভাল চিন্তা-ভাবনা করার জন্য কোন নাস্তিক দলকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। তবে সে কথা আমরা বাদ দেই আপাততঃ।

প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায় যে, প্রার্থনা পাওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চিত দুই গ্রুপের মধ্যে যারা প্রার্থনা পেয়েছে তাদের ক্ষেত্রে শারীরিক অবস্থা খারাপ বা জটিল হয়েছে ৫২ শতাংশের (৩১৫/৬০৪) এবং যারা প্রার্থনা পায়নি তাদের হার শতকরা ৫১ (৩০৪/৫৯৭)। যারা প্রার্থনা পাবে বলে নিশ্চিত ছিল তাদের ক্ষেত্রে এই জটিলতার হার ৫৯ শতাংশ যা তিন গ্রুপের মধ্যেই সর্বাধিক। তিন গ্রুপের জন্যই প্রধান ঘটনাসমূহ এবং তিরিশ দিনের মধ্যে মৃত্যুর হার একই রকমের ছিল।

লেখকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, CABG থেকে জটিলতামুক্ত নিরাময়ে প্রার্থনার কোন কোন ভূমিকা নেই কিন্তু প্রার্থনা পাওয়া যাবে এই জানাটা রোগীদের কিছু জটিলতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। দ্বিতীয় ধরনের এই প্রভাব গবেষকদের বিস্ময়ের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তারা একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেন এই বলে, যে সমস্ত রোগী জেনেছে যে তাদের জন্য সংঘবদ্ধ প্রার্থনা করা হচ্ছে তারা খুব সম্ভবত ধরে নিয়েছে যে তারা এতই গুরুতর অসুস্থ যে তাদের জন্য প্রার্থনার প্রয়োজন। ফলে তাদের মধ্যে উদ্বেগের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে; ফলশ্রুতিতে ঘটেছে শারীরিক জটিলতা বৃদ্ধি। ভাগ্যিস গবেষণার এই অপ্রত্যাশিত ফলাফলের পর অবশ্য কেউ বলেনি যে, ঈশ্বর ইচ্ছাকৃতভাবেই গবেষকদের প্রত্যাশাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

এই গবেষণায় ক্যাথলিক যাজক ফাদার ডীন ম্যারেক (Father Dean Marek) সহ অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসীরা জড়িত ছিলেন। ফাদার ডীন ম্যারেক এই গবেষণার মায়ো ক্লিনিক অংশের প্রধান গবেষক ছিলেন। গবেষণার মূল অর্থের জগানদাতা ছিল The John Templeton Foundation, যারা চাচ্ছিল ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে বের করতে। কাজেই ইচ্ছাকৃতভাবে নেতিবাচক ফলাফল তৈরি করার জন্য কোন সংশয়বাদীকে দায়ী করার কোন সুযোগই এখানে নেই।

গভীরতর সমস্যা

বিশ্বাসযোগ্য ডাটার সম্পুর্ন অনুপস্থিতি ছাড়াও প্রার্থনা হাইপোথেসিসের আরো বড় সমস্যা রয়েছে। প্রার্থনা ধারণার ব্যাপক দার্শনিক এবং ধর্মতাত্ত্বিক জটিলতাও রয়েছে।

প্রার্থনা ও অসীমতা

বিশ্বাসীদের কাছে মঞ্জুর হওয়া প্রার্থনা এক ধরনের অলৌকিকতা হিসেবে বিবেচিত হয়। বিখ্যাত আমেরিকান মৌলবাদী ধর্মতাত্ত্বিক চার্লস হজের (Charles Hodge) এর মতে,

"A miracle, therefore, may be defined to be an event, in the external world, brought about by the immediate efficiency, or simple volition, of God."

সমস্যা হচ্ছে যে ওই ধরনের অলৌকিকতা ঘটাতে গেলে ঈশ্বরকে অসীমতার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হতে হয় এবং আমরা কখনোই জানতে পারবো না যে এই ধরনের কোন অসীম অস্তিত্বর দ্বারা আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে। বৈজ্ঞানিকভাবে এর সত্যতা যাচাই করা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

ঈশ্বরের অসীমতার বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে সর্বত্র বিদ্যমান অর্থাৎ মহাবিশ্বের সর্বত্রই ঈশ্বর একই সাথে একই সময়ে বিরাজমান। বলা হয় যে ঈশ্বর চিরন্তন, সর্ব ক্ষমতার অধিকারী এবং সর্ব-জ্ঞানী। তা সত্ত্বেও সসীম মানুষেরা কখনোই জানতে পারবে না যে এই ধরনের অসীম অস্তিত্বের অস্তিত্ব সম্পর্কে। মহাবিশ্বে সর্বত্র একই সময়ে বিদ্যমান কোন অস্তিত্বের উপস্থিতি জানতে হলে আমাদেরকেও মহাবিশ্বের সর্বত্র একই সময়ে বিদ্যমান থাকতে হবে। চিরন্তন কোন অস্তিত্বকে জানতে হলে আমাদেরকেও চিরন্তন হতে হবে। তথাকথিত কোন অনন্ত অসীম ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত কোন অহি দিয়ে এই সমস্যাকে উতরানো যাবে না।

কোন বিশেষ অস্তিত্বের কারণে ঘটমান কোন ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করার জন্য আমাদেরকে প্রথমেই জানতে হবে আদৌ সেই অস্তিত্বের অস্তিত্ব আছে কিনা। ধরা যাক, কেউ এ ধরনের উদ্ভট কথা বলল যে, 'আমি জানি যে আমার প্রার্থনা অদৃশ্য মঙ্গলবাসীদের দ্বারা মঞ্জুর হয়েছে, কিন্তু আমি জানি না সত্যি তাদের অস্তিত্ব রয়েছে কিনা।' এই উক্তির যৌক্তিকতা পুরোপুরি উদ্ভট এই কারণে যে এটা এমন একটা অস্তিত্বের কর্মকান্ডকে বর্ণনা করছে যার কোন অস্তিত্ব আছে বলেই জানা নেই।

একইভাবে, অসীম অস্তিত্ব কর্তৃক সংঘটিত যে কোন ঘটনা (মঞ্জুরকৃত প্রার্থনা বা যে কোন অসাধারণ অলৌকিক ঘটনা) জানার জন্যে আমাদের প্রথমেই জানা দরকার সেই অসীম অস্তিতের্ব অস্তিত্ব রয়েছে কিনা। যেহেতু আমরা কখনোই জানতে পারবো না যে অসীম কোন অস্তিত্ব যেমন ঈশ্বর, ভগবান বা আল্লাহর অস্তিত্ব রয়েছে। কাজেই, আমরা কখনোই জানতে পারবো না যে, যে সমস্ত ঘটনাসমূহ আমরা প্রত্যক্ষ করছি সেগুলো সেই অস্তিত্বে কারণেই ঘটছে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, অসীম ঈশ্বর যে প্রার্থনার জবাব দেন তা বৈজ্ঞানিকভাবে জানা যৌক্তিকভাবেই অসম্ভব।

অর্থহীন প্রার্থনা

যদি সত্যিই কোন সর্বজ্ঞ, অসীম দয়াময় এবং সর্ব-ক্ষমতাময় কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকে সেক্ষেত্রে প্রার্থনা পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয়। ধরা যাক, পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতিভাবান এবং দক্ষ চিকিৎসক হচ্ছেন আপনার বন্ধু। এই চিকিৎসকের আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে জ্ঞাত যে কোন ধরনের অসুস্থতাকে নিরাময় করার ক্ষমতা আছে। আরো ধরা যাক যে এই সুদক্ষ চিকিৎসক আপনার পরিবারেই বসবাস করে এবং আপনার পরিবারে ছয় মাস বয়সী একটি শিশু আছে।

এখন যদি এই অসাধারণ চিকিৎসকের উপস্থিতির সময়েই শিশুটি ভয়ানক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আপনি তার কাছ থেকে কি আশা করবেন? শিশুর যদি শ্বাসকষ্ট হয়, আপনি আশা করবেন যে চিকিৎসক তার কৌশল ব্যবহার করে তাকে আরাম দেবে, নিরাময় করে তুলবে। আপনি নিশ্চয়ই আশা করবেন না যে সে শিশুটিকে সাহায্য করার আগে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে আপনি তার নিরাময় ক্ষমতায় বিশ্বাস করেন কিনা। আপনি নিশ্চয়ই আশা করেন না যে শিশুকে সাহায্য করার আগে আপনার তার প্রতি কতটুকু বিশ্বাস আছে তা প্রদর্শন করার জন্য। আপনি যেটা আশা করবেন সেটা হচ্ছে এই অতি-চিকিৎসক শিশুটির শ্বাসকষ্ট দেখে অতি দ্রুত ব্যবস্থা নেবে।

আরো মনে করুন যে, এই চিকিৎসকের পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেরই শিশুদের ক্যান্সার হওয়ার আগেই তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে। নিঃসন্দেহে, আপনি প্রত্যাশা করবেন যে, যদি তার এই ক্ষমতা থেকে থাকে এবং যদি সে আমাদের সংজ্ঞায়িত 'ভাল মানুষ' হয় তবে সে তার ক্ষমতা ব্যবহার করবে। কিন্তু যদি এই চিকিৎসকের ক্ষমতা থেকে থাকে এবং তিনি যদি এর প্রয়োগ করে থাকেন তবে আপনি আশা করবেন যে পৃথিবীতে শিশুদের ক্যান্সার বলে কিছু থাকার কথা নয়। যদি তার সত্যিই এই ক্ষমতা থেকে থাকে তবে তার কারো অনুরোধের জন্য বসে না থেকে শিশুদের দুর্ভোগ প্রতিরোধে ঝাপিয়ে পড়া উচিত। আমরা একজন ভালমানুষ হিসাবে সেটাই তার কাছ থেকে আশা করবো।

একইভাবে, একজন অসীম দয়ালু ঈশ্বরও চান না তার সৃষ্ট কোন বান্দা দুর্ভোগ পোহাক। একজন সর্বজ্ঞ ঈশ্বর আগেই জানতে পারবেন যে কে দুর্ভোগ পোহাতে যাচ্ছে এবং একজন সর্ব-শক্তিমান ঈশ্বর দুর্ভোগ ঘটার আগেই তা প্রতিরোধ করবেন। কাজেই, যদি অসীম দয়ালু, সবজান্তা ও সর্বশক্তিমান কোন ঈশ্বর থেকেই থাকেন তবে প্রার্থনার যে কোন প্রয়োজনই নেই তা বলা বাহুল্য, বিশেষ করে অসুস্থতা বা অন্য যে কোন দুর্ভোগের জন্যতো একেবারেই নেই।

অন্য ঈশ্বরেরা

যদি কেউ ক্রিশ্চিয়ান ঈশ্বর বা মুসলিমদের আল্লাহ-র কাছে আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করে থাকে এবং সেই ব্যক্তি যদি কোন কারণে আরোগ্য লাভও করে থাকে তা হলেও প্রমাণ হয় না যে এই আরোগ্য সেই ঈশ্বরের জন্য হয়েছে। সব ধর্মই দাবী করে থাকে যে প্রার্থনার ফল পাওয়া যায়। উদাহরনস্বরুপ, ভগবত গিতায় শ্রীকৃষ্ণ দাবী করেছেন যে, যে ঈশ্বরকেই পুজো দেওয়া হোক না কেন প্রার্থনায় সাড়া দেন কেবল কৃষ্ণই। কাজেই, কোন প্রার্থনা মঞ্জুর হলেও বৈজ্ঞানিকভাবে দেখানো সম্ভব হবে না যে সেটা কেবলমাত্র কোন নির্দিষ্ট ঈশ্বরের কারণেই সম্ভব হয়েছে।

অতিপ্রাকৃতিক অজ্ঞতা

এমনকি আমরা যদি কোন অসাধারণ নিরাময় ঘটতে দেখি (কাটা পা পুনরায় আপনা আপনি তৈরি হয়ে গেছে) তারপরও আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হবো না যে এটা অতিপ্রাকৃতিক হস্তক্ষেপে ঘটেছে। কোন কিছু অতিপ্রাকৃত বলার অর্থ হচ্ছে সেটা প্রাকৃতিক নয়। কিন্তু কোন কিছু প্রাকৃতিক নয় বলতে গেলে একজনকে সত্যিকার অর্থেই সর্বজ্ঞ হতে হবে, কেননা এর অর্থ দাড়াচ্ছে যে, যে কোন একটি ঘটনার জন্য যে প্রাকৃতিক ফ্যাক্টরগুলো দায়ী হতে পারে তার সবগুলোকে আমরা জেনে গেছি এবং দাবী করছি যে সেই ফ্যাক্টরগুলোর কোনটাই ওই ঘটনার জন্য দায়ী নয়। কারোরই এ ধরনের সবজান্তা জ্ঞান নেই, কাজেই কারো পক্ষেই কোন বিষয়কে অ-প্রাকৃতিক বলারও কোন সুযোগ নেই। যে ঘটনার কারণ আমরা জানি না সেটাকে বড় জোর আমরা বলতে পারি অজ্ঞাত কারণ। অসীম সত্ত্বা বা ঈশ্বরকে খামোখা এর কৃতিত্ব দেওয়ার কোন মানে নেই।

ভক্তদের হৃদয় উজাড় করা প্রার্থনা আর আকুল হয়ে কান্নাকাটি সত্ত্বে দেখা যায় যে ঈশ্বর সব প্রার্থনায় সাড়া দেয় না। আরোগ্যের জন্য সর্বশক্তিমানের কাছে রাতদিন দোয়া দরুদ পড়ার পরেও দেখা গেছে যে সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে রোগী পটল তুলেছে। ঠিকমতো পড়াশোনা না করে মাজারে মাজারে বা মন্দিরে মন্দিরে ধর্ণা দিয়েও ফেল ঠেকাতে পারে না অনেক আদু ভাইয়েরা। আপাত দৃষ্টিতে কখনো কখনো মনে হয় যে প্রার্থনা বোধ হয় কাজ করছে। তবে বেশীরই ভাগ সময়েই যে তা কাজ করে না এটা নিশ্চিত। মানুষ যখন কোন পরিস্থিতিকে সামাল দিতে পারে না তখনি সে মূলত বাস্তবতা থেকে পালানোর শেষ চেষ্টা হিসাবে প্রার্থনার আশ্রয় নিয়ে থাকে। খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, আকাংখিত ইচ্ছাপূরনের যুক্তিসম্মত সম্ভাবনা যেখানে আছে সেখানেই শুধুমাত্র দাবী করা হয় যে, প্রার্থনা কাজ করে। আসলে হয়তো তা যুক্তিসংগত লৌকিকভাবেই ঘটেছে। অসম্ভব কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রার্থনা যে কাজ করে না তা বলাই বাহুল্য। এবং সে ধরনের কোন দাবী নিয়ে প্রার্থনার স্বপক্ষের লোকেরা এগিয়েও আসে না। কোন ব্যক্তির হাত বা পা যদি হাঙরের পেটে চলে যায় তবে কোন প্রার্থনাই আর সেই হাত বা পাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। কোন লোক যদি মারা যায় তবে পৃথিবীর কোন প্রার্থনাই আর তাকে ফিরিয়ে আনবে না। পুড়ে

ছাই হয়ে যাওয়া বাড়ীর কাঠামো আর ফিরে আসবে না কোন প্রার্থনাতেই। পারসিমনির নীতি (Principle of parsimony) বা অক্কামের ক্ষুর (Occam's Razor) যে কোন যৌক্তিক মননকেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেবে যে, এই বিশ্ব জগতে কোন কিছুর উপরেই প্রার্থনার কোন প্রভাব নেই। প্রার্থনা পুরোপুরি বাহুল্য ও অপ্রয়োজনীয়- কিছু লোকের জন্য একধরনের অলীক বিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়।

তথ্যসূত্র:

1. Victor Stenger, God: The Failed Hypothesis. How Science Shows That God Does Not Exist, Prometheus Books (January 25, 2007) http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/Godless/03Soul.pdf

2. Larry Dossey, Healing Words: The Power of Prayer and the Practice of Medicine (San Francisco: Harper, 1993)

3. Jeffrey P. Bishop and Vector J. Strenger, “Retroactive Prayer: Lots of History, Not Much Mystery, and No Science, “*British Medical Journal* 329 (2004): 1444-46.

4. Tomothy Johnson, “Praying for Pregnancy: Study say prayer helps women get pregnant,” ABC Television *Good Morning America* (October 4, 2001)

5. http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/Medicine/RetroPray.pdf

6. http://www.dimmaggio.org/Eye-Openers/prayer_does_not_work.htm

7. http://www.lava.net/~hcssc/prayer.html

ফরিদ আহমেদ, মুক্তমনার কো-মডারেটর, 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। ইমেইল - farid300@gmail.com

মহাপ্লাবনের বাস্তবতা : পৌরাণিক অতিকথন বনাম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

অনন্ত বিজয়

"পৃথিবীতে মনুষ্যজাতি সৃষ্টির পর মানুষ একসময় তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব 'ঈশ্বর-বন্দনা' ছেড়ে দিয়ে ঘোর পাপকর্মে নিমজ্জিত হয়েছিল; লোভ-হিংসা-বিদ্বেষ আর অপরাধ-প্রবণতার কারণে ভুলে গিয়েছিল মহান সৃষ্টিকর্তাকে। মনুষ্যজাতির এই অধঃপতন দেখে বিচলিত বোধ করলেন ঈশ্বর, ক্রুদ্ধ হলেন তাঁর সৃষ্টির ওপর। মনে-মনে সংকল্প আটলেন—এই পাপ এবং পাপী থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার জন্য ধ্বংস করে ফেলতে হবে সৃষ্টিজগৎ, নূতন করে ধরণীকে গড়ে তুলতে হবে। ধ্বংসের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিলেন প্লাবন, এক মহা-মহাপ্লাবন; যে প্লাবনের স্রোতে ভেসে গিয়েছিল দুনিয়ার সমস্ত পাপী, ধ্বংস হয়েছিল সকল পাপের বিষ, এমন কী আমাদের চিরচেনা-মায়াবী এই জীবজগতও। তবে সৃষ্টিকর্তা শুধু বাঁচালেন হযরত নুহ্* ও তাঁর পরিবার এবং সঙ্গী-সাথীদের। পরবর্তীতে তাঁদের মাধ্যমেই ঈশ্বর প্রাণের বিস্তার ঘটালেন পৃথিবীতে। আমরা, পৃথিবীর মানুষেরা আজ সেই হযরত নুহের বংশধর।"—সারসংক্ষিপ্ত করলে প্রায় এই ধরনের পৌরাণিক কাহিনীর অস্তিত্ব পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে, বিভিন্ন আঞ্চলিক লোকগাঁথা, বিভিন্ন পৌরাণিক উপাখ্যানে রয়েছে। লোকগাঁথা বা পৌরাণিক উপাখ্যানের বর্ণনাকে আমাদের মত সাধারণ মানুষেরা অবাস্তব কেচ্ছাকাহিনী বা শুধু গল্প হিসেবে মেনে নিলেও, ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত বর্ণনাকে 'সত্য' হিসেবেই বিশ্বাস করেন বেশিরভাগ মানুষ; আজন্ম লালিত তাদের পবিত্র 'বিশ্বাসের' কারণে 'কেচ্ছাকাহিনী' বলে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না। এটা সত্য যে, এই মহাপ্লাবনের কাহিনী দীর্ঘদিন আপামর সাধারণ মানুষের মনে (বিশেষ করে ইউরোপিয়ানদের মনে) 'সৃষ্টির প্রতি ঈশ্বরের লীলা বা প্রতিশোধ' হিসেবে বিরাজমান ছিল। যার ফলে নানা সময়ে প্রখ্যাত এই লোকগাঁথাটি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার (যেমন বিবর্তনবাদ) প্রমাণের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিবর্তনবাদের প্রবক্তা খোদ চার্লস ডারউইন থেকে শুরু করে ভূতত্ত্ববিদ চার্লস লায়েল, চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চিসহ আরো অনেকেই এই মহাপ্লাবনের বিপক্ষে নানা প্রমাণ হাজির করে মানুষের বিভ্রান্তি দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন। তারপরও পশ্চিমাদের পবিত্র বিশ্বাসের মিশেল দেয়া 'অর্ধসত্য আর অর্ধমিথ্যার কৃষ্ণগহ্বর' থেকে বেরিয়ে এসে 'পূর্ণসত্যে'র সন্ধান লাভ সহজ হয়নি; দীর্ঘ সময় পাড়ি দিতে হয়েছে। যাহোক, আমরা এ প্রবন্ধে পশ্চিমাদের জ্ঞান অন্বেষণের ইতিহাসে না ঢুকে, মহাপ্লাবনের সম্ভাবতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকব এবং মহাপ্লাবনের প্রেক্ষাপট বোঝানোর জন্য কিছু লোকগাঁথার কাহিনী উল্লেখপূর্বক প্রচলিত কয়েকটি ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য তুলে ধরব। তবে আগেই উল্লেখ করা ভালো, আজকের এই একবিংশ শতাব্দীতে 'মহাপ্লাবনের' সত্যতা নির্ণয়ে অনুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালানো সম্ভব না; আমাদের এই অক্ষমতা কিংবা রূঢ় বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে মহাপ্লাবনের পৌরাণিক কাহিনীকে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের জন্য অংকের আশ্রয় নিতে হবে। কী উত্তর বের হয়ে আসে, তা একটু পরেই দেখতে পাব।

হযরত নুহ (আঃ) ও মহাপ্লাবন সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত তথ্য

ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ 'বাইবেলে'র ওল্ড টেস্টামেন্টের (পুরাতন নিয়ম) অন্তর্গত তৌরাত শরিফে হযরত নুহ (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে : লামাকের একশো বিরাশি বছর বয়সে তাঁর একটি ছেলের জন্ম হল। তিনি

* হিব্রু উচ্চারণে নোয়া (Noa) এবং আরবি উচ্চারণে নুহ্ (Nuh)

বললেন, "আমাদের সব পরিশ্রমের মধ্যে, বিশেষ করে মাবুদ মাটিকে বদদোয়া দেবার পর তার উপর আমাদের যে পরিশ্রম করতে হয় তার মধ্যে এই ছেলেটিই আমাদের সান্ত্বনা দেবে।" এই বলে তিনি তাঁর ছেলের নাম দিলেন নুহ্। নুহের জন্মের পর লামাক আরো পাঁচশো পচানব্বই বছর বেঁচে ছিলেন। এর মধ্যে তাঁর আরো ছেলেমেয়ে হয়েছিল। মোট সাতশো সাতাত্তোর বছর বেঁচে থাকার পর লামাক ইন্তেকাল করলেন। (পয়দায়েশ/ Genesis, ৫:২৮-৩১)

মাবুদ দেখলেন দুনিয়াতে মানুষের নাফরমানি খুবই বেড়ে গেছে, আর তার দিলের সব চিন্তা-ভাবনা সব সময়ই কেবল খারাপির দিকে ঝুঁকে আছে। এতে মাবুদ অন্তরে ব্যথা পেলেন। তিনি দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন বলে দুঃখিত হয়ে বললেন, "আমার সৃষ্ট মানুষকে আমি দুনিয়ার উপর থেকে মুছে ফেলব; আর তার সঙ্গে সমস্ত জীবজন্তু, বুক-হাঁটা প্রাণী ও আকাশের পাখিও মুছে ফেলব। এইসব সৃষ্টি করেছি বলে আমার মনে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু নুহের উপরে মাবুদ সন্তুষ্ট রইলেন। (পয়দায়েশ, ৬:৫-৮)

এই হল নুহের জীবনের কথা। নুহ একজন সৎলোক ছিলেন। তাঁর সময়কার লোকদের মধ্যে তিনি ছিলেন খাঁটি। আল্লাহর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ-সম্বন্ধ ছিল। সাম, হাম, ইয়াফস নামে নুহের তিনটি ছেলে ছিল। সেই সময় আল্লাহর কাছে সারা দুনিয়াটাই গুনাহর দুর্গন্ধে এবং জোর-জুলুমে ভরে উঠেছিল। আল্লাহ দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, তা দুর্গন্ধময় হয়ে গেছে, কারণ দুনিয়ার মানুষের স্বভাবের পচন ধরেছে। (পয়দায়েশ, ৬:৯-১২)

এই অবস্থা দেখে আল্লাহ নুহকে বললেন, "গোটা মানুষজাতটাকেই আমি ধ্বংস করে ফেলব বলে ঠিক করেছি। মানুষের জন্যই দুনিয়া জোর-জুলুমে ভরে উঠেছে। মানুষের সঙ্গে দুনিয়ার সবকিছু আমি ধ্বংস করতে যাচ্ছি। তুমি গোফর কাঠ দিয়ে তোমার নিজের জন্য একটা জাহাজ তৈরি কর। তার মধ্যে কতগুলো কামরা থাকবে; আর সেই জাহাজের বাইরে এবং ভিতরে আলকাতরা দিয়ে লেপে দিবে। জাহাজটা তুমি এভাবে তৈরি করবে : সেটা লম্বায় হবে তিনশো হাত, চওড়ায় পঞ্চাশ হাত, আর উচ্চতায় হবে ত্রিশ হাত। জাহাজটার ছাদ থেকে নিচে এক হাত পর্যন্ত চারদিকে একটা খোলা জায়গা রাখবে আর দরজাটা হবে জাহাজের একপাশে। জাহাজটাতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় তলা থাকবে। আর দেখ, আমি দুনিয়াতে এমন একটা বন্যার সৃষ্টি করব, যাতে আসমানের নিচে যেসব প্রাণী শ্বাস-প্রশ্বাস নিয় বেঁচে আছে, তারা সব ধ্বংস হয়ে যায়। দুনিয়ার সমস্ত প্রাণীই তাতে মারা যাবে। (পয়দায়েশ, ৬:১৩-১৭)

"কিন্তু আমি তোমার জন্য আমার ব্যবস্থা স্থাপন করব। তুমি গিয়ে জাহাজে উঠবে আর তোমার সঙ্গে থাকবে তোমার ছেলেরা, তোমার স্ত্রী ও তোমাদের ছেলেদের স্ত্রীরা। তোমার সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তুমি প্রত্যেক জাতের প্রাণী থেকে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে এক-এক জোড়া জাহাজে তুলে নেবে। প্রত্যেক জাতের পাখি, জীবজন্তু ও বুকে-হাঁটা প্রাণী এক-এক জোড়া করে তোমার কাছে আসবে যাতে তুমি তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পার; আর তুমি সব রকমের খাবার জিনিস জোগাড় ও মজুদ করে রাখবে। সেগুলোই হবে তোমার এবং তোমাদের খাবার।" নুহ তা-ই করলেন। আল্লাহর হুকুম মত তিনি সবকিছুই করলেন। (পয়দায়েশ, ৬:১৮-২২)

এরপরে মাবুদ নুহকে আবার বললেন, "তুমি ও তোমার পরিবারের সবাই জাহাজে উঠবে। আমি দেখতে পাচ্ছি, এখনকার লোকদের মধ্যে কেবল তুমিই সৎ আছ। তুমি পাকপশুর প্রত্যেক জাতের মধ্য থেকে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে সাত জোড়া করে তোমার সঙ্গে নেবে, আর নাপাক পশুর মধ্য থেকেও স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে এক জোড়া করে নেবে। দুনিয়ার উপর তাদের বংশ বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তুমি তা করবে। আমি আর সাতদিন পরে দুনিয়ার উপরে বৃষ্টি পড়বার ব্যবস্থা করবো। তাতে চল্লিশদিন আর চল্লিশরাত ধরে বৃষ্টি পড়তে থাকবে। আমি ভূমিতে যেসব প্রাণী সৃষ্টি

করেছি তাদের প্রত্যেকটিকে দুনিয়ার উপর থেকে মুছে ফেলব।" মাবুদের হুকুম মতই নুহ সব কাজ করলেন। (পয়দায়েশ, ৭:১-৫)

মহাপ্লাবন সম্পর্কে তৌরাত শরিফে বর্ণিত আছে : দুনিয়াতে বন্যা শুরু হওয়ার সময় নুহের বয়স ছিল ছ'শো বছর। বন্যা থেকে রক্ষা পাবার জন্য নুহ, তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেরা এবং ছেলেদের স্ত্রীরা সেই জাহাজে গিয়ে উঠলেন। আল্লাহ নুহকে হুকুম দেবার সময় যা বলেছিলেন, সেইভাবে পাক ও নাপাক পশু, পাখি ও বুকে-হাঁটা প্রাণিরা স্ত্রী-পুরুষ মিলে জোড়ায় জোড়ায় সেই জাহাজে নুহের কাছে গিয়ে উঠল। সেই সাতদিন পার হয়ে গেলে পর দুনিয়াতে বন্যা হল। নুহের বয়স যখন ছ'শো বছর চলছিল, সেই বছরের দ্বিতীয় মাসের সতের দিনের দিন মাটির নিচের সমস্ত পানি হঠাৎ বের হয়ে আসতে লাগলো আর আকাশেও যেন ফাটল ধরলো। চল্লিশদিন আর চল্লিশরাত ধরে দুনিয়ার উপরে বৃষ্টি পড়তে থাকল। (পয়দায়েশ, ৭:৬-১২)

তারপর থেকে চল্লিশদিন ধরে দুনিয়াতে বন্যার পানি বেড়েই চলল। পানি বেড়ে যাওয়াতে জাহাজটা মাটি ছেড়ে উপরে ভেসে উঠল। পরে দুনিয়ার উপরে পানি আরো বেড়ে গেল এবং জাহাজটা পানির উপরে ভাসতে লাগল। দুনিয়ার উপরে পানি কেবল বেড়েই চলল; ফলে যেখানে যত বড় পাহাড় ছিল সব ডুবে গেল। সমস্ত পাহাড়-পর্বত ডুবিয়ে পানি আরো পনের হাত উপরে উঠে গেল। এর ফলে মাটির উপর ঘুরে বেড়ানো প্রাণী, পাখি, গৃহপালিত আর বন্য পশু, ঝাঁক বেঁধে চরে বেড়ানো ছোট ছোট প্রাণী এবং সমস্ত মানুষ মারা গেল। শুকনা মাটির উপর যেসব প্রাণী বাস করত, অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে যারা বেঁচে ছিল তারা সবাই মরে গেল। আল্লাহ এইভাবে ভূমির সমস্ত প্রাণী দুনিয়ার থেকে মুছে ফেললেন। তাতে মানুষ, পশু, বুকে-হাঁটা প্রাণী এবং আকাশের পাখি দুনিয়ার উপর থেকে মুছে গেল। কেবল নুহ এবং তাঁর সঙ্গে যারা জাহাজে ছিলেন, তারা বেঁচে রইলেন। দুনিয়া একশো পঞ্চাশ দিন পানিতে ডুবে রইল। (পয়দায়েশ, ৭:১৭-২৪)

জাহাজে নুহ এবং তাঁর সঙ্গে যেসব গৃহপালিত ও বন্যপশু ছিল আল্লাহ তাদের কথা ভুলে যাননি। তিনি দুনিয়ার উপরে বাতাস বহালেন, তাতে পানি কমতে লাগল। এর আগেই মাটির নিচের সমস্ত পানি বের হওয়া এবং আকাশের সব ফাটল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়াও থেমে গিয়েছিল। তাতে মাটির উপরকার পানি সরে যেতে থাকল, আর বন্যা শুরু হওয়ার একশো পঞ্চাশ দিন পর দেখা গেল পানি অনেক কমে গেছে। সপ্তম মাসের সতের দিনের দিন জাহাজটা আরারাতের পাহাড়শ্রেণির উপরে গিয়ে আটকে রইল। এরপরেও পানি কমে যেতে লাগল, আর দশম মাসের প্রথম দিনে পাহাড়শ্রেণির চূড়া দেখা দিল। (পয়দায়েশ, ৮:১-৫)

নুহের বয়স তখন ছ'শো একবছর চলছিল। সেই বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনেই মাটির উপর থেকে পানি সরে গিয়েছিল। তখন নুহ জাহাজের ছাদ খুলে ফেলে তাকিয়ে দেখলেন যে, মাটির উপরটা শুকাতে শুরু করেছে। দ্বিতীয় মাসের সাতাশ দিনের মধ্যে মাটি একেবাওে শুকিয়ে গেল। তখন আল্লাহ নুহকে বললেন, "তুমি তোমার স্ত্রীকে, তোমার ছেলেদের ও তাদের স্ত্রীদের নিয়ে জাহাজ থেকে বের হয়ে এস, আর সেই সঙ্গে সমস্ত পশু-পাখি এবং বুকে হাঁটা প্রাণী, অর্থাৎ যত জীবজন্তু আছে তাদের সকলকেই বের করে নিয়ে এসো। আমি চাই যেন দুনিয়াতে তাদের বংশ অনেক বেড়ে যায় এবং বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা দ্বারা তারা সংখ্যায় বেড়ে উঠে।" তখন নুহ, তাঁর স্ত্রীকে, তাঁর ছেলেদের ও তাদের স্ত্রীদের নিয়ে জাহাজ থেকে বের হয়ে আসলেন। তাঁদের সঙ্গে সব পশু-পাখি এবং বুকে-হাঁটা প্রাণী, অর্থাৎ মাটির উপরে ঘুরে বেড়ানো সমস্ত প্রাণী নিজের নিজের জাত অনুসারে বের হয়ে গেল। (পয়দায়েশ, ৮:১৩-১৯)

কোরান শরিফে হযরত নুহ্ (আঃ) এবং মহাপ্লাবণ সম্পর্কে বর্ণিত তথ্য : ইসলাম ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'কোরান শরিফে' হযরত নুহের নামে আটাশটি আয়াতসমৃদ্ধ 'সুরা নুহ্' নামের সুরা-ই (৭১ নম্বর) আছে; এই সুরাসহ আরো কয়েকটি সুরার বিভিন্ন আয়াতে হযরত নুহ্ এবং মহাপ্লাবনের কথা বলা হয়েছে, সময়ে সময়ে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে এই কাহিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে। তবে তৌরাত শরিফের মত এতো বিস্তৃত পরিসরে নুহের জাহাজের বর্ণনা কিংবা মহাপ্লাবনের ব্যাপারে (যেমন, জাহাজের উচ্চতা-আয়তন-ধারণ সংখ্যা, প্লাবন কতদিন ছিল ইত্যাদি) বক্তব্য দেয়া হয়নি; শুধু পবিত্র কোরান শরিফেই নয়, তৌরাত শরিফ ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ, পৌরাণিক উপাখ্যান কিংবা লোকগাঁথাতে এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি।

যা হোক, হযরত নুহ্ ও মহাপ্লাবন সম্পর্কিত কিছু আয়াত বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের 'কোরান শরিফ সরল বঙ্গানুবাদ' থেকে পাঠকের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরা হল (সাথে-সাথে পাঠকের সুবিধার্থে কয়েকটি আয়াতের ইংরেজিরূপ-ও দেয়া হল) : নিশ্চয়ই আমি নুহ্‌কে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম, আর সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র উপাসনা করো, তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোনো উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি। তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলেছিল, 'আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভুল করতে দেখছি। (সুরা আ'রাফ, ৭:৫৯-৬০)

সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোনো ভুল নেই, আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রসুল। (সুরা আ'রাফ, ৭:৬১)

আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি ও তোমাদেরকে সদুপদেশ দিচ্ছি, আর তোমরা যা জান না আমি তা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে জানি। (সুরা আ'রাফ, ৭:৬২)

তারপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে। তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করি, আর যারা আমার নিদর্শনাবলি প্রত্যাখান করেছিল তাদেরকে ডুবিয়ে দি। নিশ্চয় তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়। (সুরা আ'রাফ, ৭:৬৪)

তারপর আমি তার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠালাম, 'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুসারে জাহাজ তৈরি করো, তারপর যখন আমার আদেশ আসবে ও পৃথিবী প্লাবিত হবে তখন উঠিয়ে নিয়ো প্রত্যেক জীবের এক-এক জোড়া আর তোমার পরিবার-পরিজনকে, তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বসিদ্ধান্ত হয়েছে তাদেরকে বাদ দিয়ে। আর যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বোলো না, তাদেরকে ডোবানো হবে। (সুরা মুমিনুন, ২৩:২৭) So We inspired him (saying): "Construct the ship under Our Eyes and under Our Revelation (guidance). Then, when Our Command comes, and the oven gushes forth water, take on board of each kind two (male and female), and your family, except those thereof against whom the Word has already gone forth. And address Me not in favour of those who have done wrong. Verily, they are to be drowned. (Surah Al-Mu'minun, 23:27)

'... তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুসারে জাহাজ বানাও, আর যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বোলো না। তারা তো ডুববেই।' (সুরা হুদ, ১১:৩৭)

সে জাহাজ বানাতে লাগল, আর যখনই তার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা তার কাছ দিয়ে যেত তারা তাকে ঠাট্টা করত। সে বলত, 'তোমরা যদি আমাদেরকে ঠাট্টা কর আমরাও তোমাদেরকে ঠাট্টা করব যেমন তোমরা ঠাট্টা করছ। আর তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার ওপর অপমানকর শাস্তি আসবে, আর স্থায়ী শাস্তি কার জন্য অবশ্যম্ভাবী।' (সুরা হুদ, ১১:৩৮-৩৯)

অবশেষে আমার আদেশ এলে পৃথিবী প্লাবিত ঞল। আমি বললাম, 'এর ওপর প্রত্যেক জীবের এক-এক জোড়া উঠিয়ে নাও, যাতের বিরুদ্ধে আগেই স্থির করা হয়েছে তারা ছাড়া তোমার পরিবার-পরিজনকে ও যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকেও (উঠিয়ে নাও)।' তার সঙ্গে অল্প কয়েকজন বিশ্বাস করেছিল। (সুরা হুদ, ১১:৪০) (So it was) till then there came Our Command and the oven gushed forth (water like fountains from the earth). We said: "Embark therein, of each kind two (male and female), and your family, except him against whom the Word has already gone forth, and those who believe. And none believed with him, except a few." (Surah Hud, 11:44)

... পাহাড়প্রমাণ ঢেউয়ের মাঝে এ তাদেরকে নিয়ে বয়ে চলল। নুহ্ তার পুত্র যে আলাদা ছিল তাকে ডেকে বলল, 'হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে ওঠো আর অবিশ্বসীদের সাথে থেকো না।' (সুরা হুদ, ১১:৪২)

... এরপর বলা হল, 'হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি শুষে নাও! আর হে আকাশ! থামো।' এরপর বন্যা প্রশমিত হল ও কাজ শেষ হল। নৌকা জুদি পাহাড়ের ওপর থামল; আর বলা হল 'ধ্বংসই সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের পরিণাম।' (সুরা হুদ, ১১:৪৪) And it was said: "O earth! Swallow up your water, and O sky! Withhold (your rain)." And the water was diminished (made to subside) and the Decree (of Allâh) was fulfilled (i.e. the destruction of the people of Nûh (Noah). And it (the ship) rested on Mount Judi, and it was said: "Away with the people who are Zalimûn (polytheists and wrong-doing)!" (Surah Hud, 11:44)

... এরপর সুরা হুদের ৪৮ নং আয়াত পর্যন্ত হযরত নুহ্, মহাপ্লাবন সম্পর্কিত ঘটনার উল্লেখ আছে, কিন্তু আমরা আলোচনার পরিসর সীমিত রাখার স্বার্থে আর অগ্রসর হলাম না।

সনাতন হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত মহাপ্লাবন : হিন্দু ধর্মগ্রন্থ 'মৎসপুরাণ' এবং 'শতপথ ব্রাহ্মণ' (চারটি বেদের মধ্যে একটি হচ্ছে যজুর্বেদ, যা দুই ভাগে বিভক্ত—একটি হচ্ছে কৃষ্ণযজুর্বেদ বা তৈত্তরীয় সংহিতা অন্যটি শুক্লযজুর্বেদ; এই শুক্লযজুর্বেদ আবার দুই ভাগে বিভক্ত, একটি শতপথ ব্রাহ্মণ এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদ)-এ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দশটি অবতারের মধ্যে একটি অবতার হচ্ছে 'মৎস' বা মাছ অবতার (লক্ষ করার বিষয়, মৎসপুরাণ বা শতপথ ব্রাহ্মণেও মনুর নৌকা বা মহাপ্লাবন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা নেই; আছে কিছুটা ঠাকুরমার ঝুলির কাহিনী!)। উক্ত দুটি ধর্মগ্রন্থে মৎস অবতার আবির্ভাবের যে প্রেক্ষাপট বর্ণিত আছে, তা সংক্ষিপ্ত করে বললে—প্রথম মানব 'মনু' একবার এক জলাশয়ে হাত-পা ধৌত করতে গিয়ে ক্ষুদ্র একটি মাছ দেখতে পেলেন। ছোট ঐ মাছটি জলাশয়ের অন্যান্য রাক্ষুসে মাছ থেকে রক্ষা করার জন্য মনুর কাছে অনুরোধ জানালো। মনু তখন সেই মাছটিকে জলাশয় থেকে তুলে নিয়ে এসে 'নিরাপদ স্থান' হিসেবে জলভর্তি পাত্রে রেখে দিলেন। কয়েকদিনের মাথায় মাছটি আকারে বড় হয়ে গেল যে পাত্রে রাখা যাচ্ছে না; মনু তখন মাছটিকে একটি জলাশয়ে নিয়ে গেলেন। কিন্তু কিছুদিনের মাথায় মাছটি আরো বৃহৎ হয়ে গেল, জলাশয়েও আর স্থান সংকুলান হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে মনু মাছটিকে নিয়ে গেলেন পুকুরে, সেখান থেকে নদীতে। এরপরও মাছটি দিনদিন দীর্ঘ হতে লাগল, শেষমেশ স্থান সংকুলানের জন্য বাধ্য হয়ে নিয়ে যেতে হল সমুদ্রে। একদিন মনু সমুদ্রে গেলে, মাছটি নিজেকে ভগবান বিষ্ণুর অবতার পরিচয়

দিয়ে পাপ আর পঙ্কিলতায় ডুবে যাওয়া সমগ্র পৃথিবীতে মহাপ্লাবনের ব্যাপারে আগাম হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে দ্রুত একটি বৃহৎ নৌকা বানাতে নির্দেশ দিল; কারণ আসন্ন মহাপ্লাবনে পৃথিবীর সমস্ত জীবজন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে। মনু ফিরে এসে মাছটির কথামতো কাজ শুরু করে দিলেন। পরবর্তীতে ভগবান বিষ্ণুর ঘোষিত মহাপ্লাবন শুরু হলে সারা পৃথিবী তীব্র জলোচ্ছ্বাসে ডুবে যেতে লাগল; মনু ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা মাছের নির্দেশ মত নৌকায় গিয়ে উঠলো, আর মৎসরূপী বিষ্ণু তখন নৌকাটির গুণ টেনে নিয়ে বিরাট পাহাড়ের উপরে নিয়ে গেল। মহাপ্লাবনে সমস্ত পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হয়ে ভগবান বিষ্ণুর ইচ্ছা পূর্ণ হলে আস্তে আস্তে প্লাবনের পানি কমতে লাগল। বন্যার পানি কমে গেলে পৃথিবী পুনঃনির্মাণের জন্য মনু ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা পাহাড় থেকে ভূমিতে নেমে এল, এবং পুনরায় পৃথিবীতে বংশবিস্তারের মাধ্যমে মানব প্রজাতি টিকিয়ে রাখল।

আরো কিছু বিখ্যাত পৌরাণিক কাহিনী এবং লোকগাঁথা : আগেই উল্লেখ করা হয়েছে স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে চরিত্রের নামের ভিন্নতা আর কাহিনীর ছোট-খাট পরিবর্তন নিয়ে পৃথিবীর প্রায় সকল অঞ্চলেই এই প্লাবন বা মহাপ্লাবনের কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। পাঠকের আগ্রহ বিবেচনা করে এরকম পাঁচটি লোকগাঁথার কাহিনী সংক্ষিপ্তাকারে এখানে তুলে ধরা হল : (১) রোমান পৌরাণিক কাহিনীতে রয়েছে—দেবতাশিরোমনি জুপিটার একসময় প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হলেন মানুষের নাফরমানি আর শয়তানি দেখে; সিদ্ধান্ত নিলেন ধ্বংস করে দিবেন তাঁরই সৃষ্ট এই জীবজগতকে। প্রথমে ঠিক করলেন আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হবে পৃথিবীকে, কিন্তু পরে আবার সিদ্ধান্ত বদল করে নিলেন; মহাপ্লাবনের পানিতে ভাসিয়ে-ডুবিয়ে হত্যা করা হবে সৃষ্টিকে। এজন্য দেবতা নেপচুনের সাহায্য নিলেন দুনিয়ায় ভয়ানক ভূমিকম্প-বজ্রপাতের মাধ্যমে মহাপ্লাবনের জোয়ার সৃষ্টি করতে; দেবতাশিরোমনির নির্দেশ দেবতা নেপচুনের কাছে শিরোধার্য। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শুরু হল ভয়ানক মহাপ্লাবন, বিশাল-বিশাল স্রোতের টানে ভেসে যেতে লাগল সকল প্রাণ, ডুবে যেতে লাগল পৃথিবী। কিন্তু শেষমেশ ডুবলো না শুধু পানাস্‌সুস পাহাড়ের চূড়া। ভয়ঙ্কর ঐ প্লাবনের সময় নৌকা বানিয়ে স্রোতে ভেসে ভেসে পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নিয়েছিল প্রমিথিউয়াস পুত্র ডিউকেলিয়ন এবং তার স্ত্রী পাইহা। আগে থেকেই তাদের সততা, নিষ্ঠায় মুগ্ধ ঈশ্বর জুপিটার। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হলে দুনিয়া থেকে বন্যার পানি কমিয়ে দিলেন। ঈশ্বরের আশীর্বাদপ্রাপ্ত ডিউকেলিয়ন ও পাইহা একদিন পাহাড়ের চূড়া থেকে মাটিতে নেমে এলেন এবং দৈববাণী অনুসারে পৃথিবীতে পুনরায় বংশবিস্তার শুরু করলেন। (রোমান এই পৌরাণিক কাহিনীর সাথে গ্রিসের পৌরাণিক কাহিনীর লক্ষণীয় মিল রয়েছে, যেমন প্রমিথিউয়াস পুত্র ডিউকেলিয়ন এবং পাইহা নামের চরিত্র গ্রিককাহিনীতেও রয়েছে, আর রোমান ঈশ্বর জুপিটারের বদলে ওখানে রয়েছে জিউস... ইত্যাদি।) (২) সুমেরিয়ান গল্পগাঁথা থেকে জানা যায়, ঈশ্বর একসময় তাঁর সৃষ্টির প্রতি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে (মহান সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে যাওয়া ও আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত) মনুষ্যপ্রজাতিকে ধ্বংস করে দিতে মনস্থির করলেন; কিন্তু সৎ ও নিষ্ঠাবান রাজা জিউসুদ্রের প্রতি প্রীত হয়ে দেবতা এনলিল আগত বন্যার ব্যাপারে রাজাকে আগেই সতর্ক করে দিলেন এবং পরামর্শ দিলেন একটি বড়সড় জাহাজ বানানোর জন্য। রাজা জিউসুদ্র দেবতা এনলিলের পরামর্শ মতো কাজ শুরু করে দিলেন। একসময় এলো সেই ভয়ানক কালরাত্রি; চারিদিক থেকে শাঁ শাঁ করে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসা বাতাস আর সাত দিন-সাত রাত ধরে অবিরাম বৃষ্টিতে এ ধরণী ডুবে গেল। বন্যার সময় জিউসুদ্র এবং তার পরিবারের সদস্যরা সদ্য তৈরি করা জাহাজ উঠে ভেসে বেড়াতে লাগলেন একস্থান থেকে অন্য স্থানে। জাহাজে বসে রাজা জিউসুদ্র সূর্যদেবতা উতুর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন সূর্য উদয়ের জন্য, যাতে করে বৃষ্টি কমে গিয়ে বন্যার পানি নামতে শুরু করে। আস্তে আস্তে দেবতাদের ক্রোধ কমে এলে ধরণী থেকে বন্যার পানিও কমতে লাগল, আকাশে সূর্যের দেখাও মিলল। বন্যার পানি একদম কমে গেলে রাজা সবাইকে নিয়ে ভূমিতে নেমে এলেন, এবং দেবতাদ্বয় অনু ও এনলিলের সন্তুষ্টি কামনায় একটি ভেড়া ও ষাঁড় কোরবানি দিলেন (মহাপ্লাবনের পরে কোরবানি দেয়ার ঘটনাটি তৌরাত শরিফেও

উল্লেখ আছে, দেখুন : পয়দায়েশ, ৮:২০-২১)। (৩) আসামের লুসাই আদিবাসীদের লোকগাঁথায় রয়েছে, একবার জলের রাজা, যিনি আবার শয়তানদেবতা, নগাই-তি নামক এক অপূর্ব সুন্দরী নারীর প্রেমে পড়ে গেলেন। শয়তানদেবতা তাঁর চিত্তহরণকারী নারীর কাছে প্রেমে নিবেদন করতে গেলে, নগাই-তি তা প্রত্যাখান করে বসে এবং পালিয়ে যায়। সাধারণ এক নারীর দুঃসাহস দেখে দেবতা খুবই অপমানিতবোধ করলেন, ক্ষুব্ধ হলেন, রাগান্বিত হলেন! মানবীর সাথে প্রেমে প্রত্যাখাত হয়ে দেবতা নিজের কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন; প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তিনি মানবজাতিকে 'ফান-লু-বুক' পাহাড়ে ঘেরাও করে ফেললেন, হুমকি দিলেন—নগাই-তিকে না পেলে সকলকে তিনি পানিতে ডুবিয়ে মারবেন! শয়তানদেবতার হুমকিতে ভীত হয়ে জনগণ আশু বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য নগাই-তিকে জোর করে বন্যার পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। এরপরই দেবতার ক্রোধ কমে গেল এবং পাহাড়ের চারপাশ থেকে বন্যার পানি কমিয়ে দিলেন। (৪) চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ললোবাসীদের লোকগাঁথা থেকে জানা যায়, স্বর্গের পিতা সিজুসিহ্ একজন মৃতমানুষের রক্ত ও কিছু মাংস নিয়ে আসার জন্য পৃথিবীতে একবার দূত প্রেরণ করলেন। দূতটি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানুষের কাছে গিয়ে ব্যর্থ হল, কিন্তু একজন ব্যক্তি 'দুমু' শুধুমাত্র স্বর্গের পিতার কথা রক্ষা করলেন। পিতা পৃথিবীবাসীদের এই বেঈমানি দেখে খুবই দুঃখিত হলেন, সাথে-সাথে বাগান্বিতও হলেন। পৃথিবীবাসীকে উচিৎ শিক্ষা দেবার জন্য আকাশ হতে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগলেন। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে চারিদিকে মারাত্মক প্লাবনের সৃষ্টি হল। মানুষ, প্রাণী সকলেই বন্যার পানিতে ভেসে যেতে লাগল, ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু দুমু, তাঁর চার ছেলে, কয়েকটি বুনো হাঁস ও ভোঁদরসহ একটি বড়সড়-লম্বা গাছে আশ্রয় নিল এবং স্বর্গের পিতার করুণায় বেঁচে গেল। আজকে যারা সভ্য বা লেখাপড়া জানে, তারা দুমুর ঐ চার সন্তানের বংশধর; আর যারা অশিক্ষিত বা সভ্যতার আলো পায়নি, তারা কাঠ দ্বারা নির্মিত মূর্তির বংশধর, যেগুলিকে দুমু ও তাঁর সন্তানেরা ভয়াবহ মহাপ্লাবরের পর কুড়িয়ে পেয়ে মেরামত করেছিল। (৫) পূর্ব আফ্রিকার মাসাইদের আঞ্চলিক লোকগাঁথা থেকে জানা যায়, অনেককাল আগে মাসাইদের ওখানে টামবাইনোত নামে একজন সৎ-আদর্শবান ও ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বাস করতেন। তার স্ত্রীর নাম নাইপান্দে এবং তাদের তিন সন্তানের নাম ওশমো, বার্তিমোরা ও বারমাও। একদিন টামবাইনোতের ভাই লেঙ্গারনি মারা গেলে স্থানীয় প্রথানুসারে তিনি মৃত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করলেন। মৃত ভাইয়ের ঘরেও তিন সন্তান ছিল, ফলে ভাবীকে বিবাহের পর ঐ সন্তানগুলিও টামবাইনোতের সন্তান হয়ে যায়; অর্থাৎ নিজের তিন সন্তানসহ মোট ছয় সন্তানের পিতা হন টামবাইনোত। পৃথিবীতে সেসময় প্রচুর জনসংখ্যা ছিল; জনসংখ্যার ভারে পৃথিবী কম্পমান। কিন্তু জনসংখ্যা অধিক থাকলেও মানুষের মধ্যে ন্যায়-নিষ্ঠা-নীতি-ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি বলতে কিচ্ছু ছিল না। হত্যা-ধ্বংস-দুর্নীতি-লুণ্ঠন-রাহাজানি ইত্যাদি অপরাধ-প্রবণতায় পৃথিবী ছেয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বর মানুষের ঐ অধোগতি দেখে ব্যথিত হলেন, ক্ষুব্ধ হলেন; মনঃস্থির করলেন ধ্বংস করে ফেলবেন এই মনুষ্যপ্রজাতিকে, সাথে বাকি জীবজগতকেও, সবকিছু নূতন করে গড়ে তুলবেন আবার। কিন্তু ঈশ্বর টামবাইনোতের সততায় সন্তুষ্ট ছিলেন, তাকে নির্দেশ দিলেন কাঠ দিয়ে একটি জাহাজ তৈরি করতে, যেখানে আশ্রয় নেবে টামবাইনোত, তার দুই স্ত্রী, ছয় সন্তান, ছয় সন্তানের স্ত্রী, এবং কিছু নির্দিষ্ট প্রজাতির প্রাণী। টামবাইনোতের জাহাজ বানানো শেষ হলে, ঈশ্বর ভয়ঙ্কর বৃষ্টির আদেশ দিলেন। একটানা প্রচণ্ড বৃষ্টিতে চারিদিকে ভয়ানক বন্যা হয়ে হয়ে গেল; বন্যায় ডুবে যেতে লাগল বাকি সব মানুষ, পশু-পাখি ইত্যাদি আর টামবাইনোত তার পরিবার নিয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। এক সময় বৃষ্টি থেমে গেলে, টামবাইনোত তার সঙ্গে থাকা একটি পায়রা উড়িয়ে দিলেন। বেশকিছুক্ষণ পর পায়রাটি ক্লান্ত হয়ে ফিরে এল; টামবাইনোত বুঝতে পারলেন : পায়রাটি চারিদিকে কোথাও বসবার জন্য শুকনো স্থান না পেয়ে জাহাজে আবার ফিরে এসেছে। দিন কয়েক কেটে গেলে টামবাইনোত একটি শকুন উড়িয়ে দিলেন, তবে কৌশলে শকুনের পালকের সাথে একটি তীর আটকে দিলেন; যাতে শকুনটি কোথাও বসলে, তীরটি যেন ঐ স্থানে আটকে যায়। ঐ দিন সন্ধ্যার দিকে শকুনটি ফিরে এলেও পালকের সাথে আর তীর আটকে ছিল না। টামবাইনোত বুঝতে পারলেন শকুনটি কোনো নরম স্থানে বসেছিল, যেখানে তীরটি আটকে গেছে। আরো কিছুদিন পর বন্যার পানি একদম কমে গিয়ে মাটির

সমান হয়ে গেল। জাহাজটিও এক জায়গায় এসে আটকে গেল। তখন টামবাইনোত ও তার পরিবারের সদস্যরা ভূমিতে নেমে এসে আকাশে অপূর্ব সুন্দর রঙধনু দেখতে পেল। একে তারা ঈশ্বরের ক্রোধ প্রশমিত হওয়ার লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করল।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান : বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের অন্তর্গত তৌরাত শরিফে (জেনেসিস অধ্যায়ে) হযরত আদম থেকে হযরত ইব্রাহিমের বয়সের তালিকা সরাসরি দেয়া আছে। কিন্তু হযরত ইব্রাহিম থেকে যিশু খ্রিস্টের জন্ম অবধি এই সময়কালের সেরূপ কোনো তথ্য (জন্মলতিকা) সরাসরি দেয়া নেই। তবে প্রাচীন নানা ধর্মগ্রন্থ বিশ্লেষণ করে ১৬৫৪ সালে আয়ারল্যান্ডের ধর্মযাজক জেমস আসার (১৫৮১-১৬৫৬) 'অ্যানালাস অফ ওল্ড এন্ড নিউটেস্টামেন্ট' গ্রন্থে বাইবেলে উল্লিখিত আদম এবং তাঁর বংশধরদের জন্মলতিকা যোগ করে জানিয়েছিলেন— ঈশ্বর এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ৪০০৪ সালে, রবিবার সকাল নয় ঘটিকায়, অক্টোবরের ২৩ তারিখে; এর কিছুকাল পরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জন লাইটফুট (১৬০২-১৬৭৫) নতুন গণনা করে জানালেন, আদমের জন্ম সকাল নয় ঘটিকায়, সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখে, এবং সেটা খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার চার সালেই। আবার বাইবেলে বর্ণিত 'মহাপ্লাবন' খ্রিস্টপূর্ব ২৩৪৮ সালে হয়েছিল। এই দুই পণ্ডিতব্যক্তির সূক্ষ্ম দিনক্ষণের হিসাবকে বিশ্বের বেশিরভাগ ইহুদি এবং খ্রিস্টান সঠিক এবং এবং গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে থাকেন।

বাংলা একাডেমীর ঐতিহাসিক অভিধান (মোহাম্মদ মতিউর রহমান সংকলিত, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৩২৭) মতে, আদম পৃথিবীতে আসেন খ্রিস্টপূর্ব ৫৮০৯ সালে এবং মৃত্যুবরণ করেন খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৭৯ সালে। হযরত আদম থেকে হযরত নুহের বয়সের ব্যবধান ১০৫৬ বছর। হযরত নুহের বয়স যখন ছয়শত বছর, তখন মহাপ্লাবন ঘটেছিল; অর্থাৎ আদম জন্মের ১৬৫৬ বছর পর (খ্রিস্টপূর্ব ২৩৪৮ সালে) মহাপ্লাবন হয়েছিল। এরপর অতিক্রান্ত হয়েছে, ২৩৪৮ + ২০০৮ = ৪৩৫৬ বছর; আর একটি বারের জন্যেও মহাপ্লাবন হয়নি (মানে দুর্নীতি, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি অপরাধপ্রবণতা কমে গেছে, আর ঈশ্বরের প্রতি 'ঐকান্তিক বিশ্বাস' অটুট রয়েছে এখনও), কী অদ্ভুত!

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে এবং পৌরাণিক লোকগাঁথায় মহাপ্লাবনের কাহিনী বর্ণিত আছে, তা থেকে দুটি প্রশ্ন দেখা দেয় :
(১) মহাপ্লাবনের মাধ্যমে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতগুলিকে ডুবিয়ে দেওয়ার মত আদৌ এতো বৃষ্টি হওয়া কি সম্ভব?
(২) হযরত নুহের জাহাজে কি সত্যিই পৃথিবীর সকল প্রাণীর এক জোড়া করে জায়গা হওয়া সম্ভব ছিল?

এ দুটি প্রশ্নের উত্তর বের করার আগে পাঠকদের দুটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই : (ক) আমাদের এই প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থ তৌরাত শরিফকে বেছে নিয়েছি কারণ, তৌরাত শরিফের জেনেসিস অধ্যায়ে হযরত নুহের জীবনী, নুহের জাহাজের বর্ণনা, মহাপ্লাবন ইত্যাদি বিষয় যেরকম বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে, অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ বা পৌরাণিক লোকগাঁথাতে এরকম বর্ণনা নেই। স্পষ্ট করে বললে, ওগুলোতে যা আছে, তা খুবই ভাসা-ভাসা বা হালকা চালে লেখা; ফলে বাইবেল ব্যতিরেকে বাকি সকল ধর্মগ্রন্থের বাণী বা লোকগাঁথা থেকে 'তথ্য' নিয়ে মহাপ্লাবনের কাহিনীকে 'সত্য' প্রমাণ করা সম্ভব না (কারণ ওগুলোতে প্রচুর পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য রয়েছে, যেমন একটি ধর্মগ্রন্থে 'মহাপ্লাবন'কে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্থানীয় বন্যা বা প্লাবন হয়েছে বলে 'ইঙ্গিত' দিচ্ছে, আবার একই সাথে ঐ ধর্মগ্রন্থে সমস্ত পৃথিবী ডুবিয়ে দেয়া এবং প্রতিটি প্রজাতি থেকে এক জোড়া করে প্রাণী সংগ্রহের কথা বলা হচ্ছে!), কিংবা এ তথ্য সম্পর্কে সংশয়ী হয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালানোও সম্ভব না । (২) আমরা কোনোভাবেই স্থানীয় বন্যা বা প্লাবনকে অস্বীকার করছি না; বরং মনে করি, সেটি হবার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ প্রাচীনকালের সকল সভ্যতাই নদীর তীর ঘেষে গড়ে উঠেছে, উদাহরণ

হিসেবে বলা যায় নীলনদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা, সিন্ধুনদের তীরে সিন্ধু সভ্যতা, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর তীরে ব্যবিলনীয় সভ্যতা এবং হাল আমলে আমলে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে আমাদের ঢাকাই সভ্যতা। নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা তৈরি হলে, সহজেই ধারণা করা যায়, স্থানীয়ভাবে বন্যা হওয়া খুবই স্বাভাবিক বিষয়; এবং সে বন্যার সময় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা প্রাচীনকালের মানুষকে বেশ আকর্ষণ করেছে। এ আকর্ষণের প্রভাব গিয়ে পড়েছে ঐ অঞ্চলের মানুষের চিন্তা-চেতনায়; সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছে ধর্মগ্রন্থে, পৌরাণিক গল্পে, আঞ্চলিক লোকগাঁথায়।

এ বিষয়গুলো মাথা রেখেই আমরা আজকের এই প্রবন্ধে শুধুমাত্র 'কথন' এবং 'অতিকথন' (স্থানীয় প্লাবনকে কল্পনার ফানুস দিয়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে মহাপ্লাবন বানানো, সমগ্র পৃথিবীকে সেই মহাপ্লাবনে ডুবিয়ে দেয়া, এক জোড়া করে পৃথিবীর সমস্ত প্রজাতি সংগ্রহ করে নৌকায় রাখা ইত্যাদি)-এর মধ্যবর্তী দূরত্বে আলো ফেলতে চাচ্ছি। আশা করি, পাঠক নিশ্চয়ই বিষযটি বুঝতে পারছেন। তাই আর দেরি না করে, উপরের দুটি প্রশ্নের সমাধান অংকের মাধ্যমে দেওয়া যাক :

(১) মহাপ্লাবন হওয়া কি সম্ভব : আমাদের এই পৃথিবীর পরিধি হচ্ছে ৭,৯২৬ মাইল বা ১২,৭৫৬ কিলোমিটার; ব্যাসার্ধ হচ্ছে ৬,৩৭০ কিলোমিটার। পৃথিবীর আয়তন হচ্ছে প্রায় ১,০৮০ বিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার বা প্রায় ১,০৮২,৬৯৬,৯৩২,০০০ কিউবিক কিলোমিটার। এই বিশাল আয়তনের পৃথিবীকে ডুবিয়ে দেবার মত এত জল কোথা থেকে এল? আকাশ থেকে নিশ্চয়ই। তারপর সেই জল গেল কোথায়? সারা পৃথিবীর মাটিতে শুষে নেয়া সম্ভব নয় (বলা হয়ে থাকে, পৃথিবীর তিনভাগ জল আর একভাগ স্থল), আবার অন্য কোনো উপায়ে উবে যাওয়াও সম্ভব নয়। একমাত্র যে জায়গায় এই জল যেতে পারে, সেটা বায়ুমণ্ডল; অর্থাৎ এই জল বাস্প হয়ে যেতে পারে। তাহলে বায়ুমণ্ডলেই এখনো জলটা আছে? ধরে নিচ্ছি, যদি আকাশের সমস্ত বাস্প জমে জলবিন্দুতে রূপান্তরিত হয় ও পৃথিবীতে ঝরে পড়ে, তাহলে কী আবার আর একটি মহাপ্লাবন হয়ে সর্বোচ্চ পর্বতগুলিকেও ডুবিয়ে দেবে? মনে হয় না, আর কোনো মহাপ্লাবন হবে, কারণ ঈশ্বর যে নিষেধ করেছেন, আর কখনো বন্যা হয়ে সমস্ত প্রাণীজগতকে ধ্বংস করবে না (পয়দায়েশ, ৯.১৫)!

আবহবিদ্যার বই থেকে আমরা জানতে পারি, প্রতি বর্গমিটারের উপরে যে বায়ুমণ্ডল রয়েছে, তাতে গড়পড়তা ১৮ কিলোগ্রাম জলীয়বাস্প থাকতে পারে, এবং ২৫ কিলোগ্রামের বেশি থাকতে পারে না। বায়ুমণ্ডলের এই আদ্রতা ঘনীভূত হয়ে এক সঙ্গে যদি ঝরে পড়ে, তাহলে পৃথিবীতে জলের গভীরতা কতটুকু বৃদ্ধি পায়?

এক বর্গমিটার জায়গায় সবচেয়ে বেশি জল থাকতে পারে ২৫ কিলোগ্রাম বা ২৫,০০০ গ্রাম; এবং ২৫,০০০ গ্রাম জলের আয়তন হবে ২৫,০০০ ঘনসেন্টিমিটারের সমান। এই আয়তন হবে প্রতি ১ বর্গমিটার বা ১০০ × ১০০ = ১০,০০০ বর্গসেন্টিমিটার জায়গার উপরের স্তরে। এখন জলের আয়তনকে ভূমির ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করলেই জলস্তরের গভীরতা পরিমাপ করা যাবে, যেমন, ২৫,০০০ ÷ ১০,০০০ = ২.৫ সেন্টিমিটার; অর্থাৎ মহাপ্লাবনে সবচেয়ে বেশি জল জমা হলে, তা হতে পারে ২.৫ সেন্টিমিটার গভীর বা পৃথিবীর সবজায়গায় গড়ে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হলেও মাত্র ২.৫ সেন্টিমিটার জমতে পারে। আবার এইটুকু উচ্চতায় জল জমা সম্ভব হতে পারে তখনই, যদি মাটি এই জল শুষে না নেয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, হযরত নুহের ঐ কথিত মহাপ্লাবনে সত্যিই ২.৫ সেন্টিমিটার থেকে বেশি জল জমা সম্ভব নয়।

কিন্তু বহু জায়গায় বৃষ্টিপাত অনেক সময় ২.৫ সেন্টিমিটারকে ছাড়িয়ে যায়; কারণ সেসব ক্ষেত্রে জল বায়ুমণ্ডল থেকে সোজাসুজি শুধু সে জায়গায় পড়ে না, পাশাপাশি অন্যান্য জায়গা থেকেও বাতাস জল বয়ে আনে। কিন্তু তৌরাত শরিফের মতে (পয়দায়েশ, ৭:২০), মহাপ্লাবন একই সঙ্গে সারা পৃথিবীকে ডুবিয়ে দিয়েছিল জলের নিচে, সুতরাং তখন এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে বাতাসের মাধ্যমে জল আসা সম্ভব ছিল না।

হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, সারা পৃথিবী জুড়ে প্লাবন যদি হয়েও থাকে, তাহলেও জল ২.৫ সেন্টিমিটারের বেশি উঠতে পারেনি। কিন্তু আমাদের হিমালয় পর্বতের উচ্চতম শৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮.৮ কিলোমিটার বা ৮৮০০ মিটার উঁচু। তৌরাত শরিফসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ, আঞ্চলিক লোকগাঁথা এবং পৌরাণিক উপাখ্যানে বলা হয়েছে, মহাপ্লাবনের ফলে পৃথিবীর সমস্ত পাহাড়-পর্বত ডুবে গিয়েছিল। এখন একটু কষ্ট করে, হিসেব করলেই বুঝা যাবে মহাপ্লাবনের এই জলের গভীরতাকে কতগুণ বাড়িয়ে বলা হয়েছে?

৮.৮ কিলোমিটার বা ৮৮০,০০০ সেন্টিমিটারকে (জলস্তরের গভীরতা) ২.৫ সেন্টিমিটার দিয়ে ভাগ দিলে পাওয়া যায়, নাহ, খুব বেশি অতিরঞ্জন করা হয়নি, মাত্র ৩৫২,০০০ (তিন লক্ষ বাহান্ন হাজার) গুণ বাড়িয়ে বলা হয়েছিল! খুবই কম, তাই না?

যা হোক দেখা যাচ্ছে, কথিত ঐ 'প্লাবন' যদি হয়ে থাকেও, তাহলে ঠিক যাকে বৃষ্টি বলে, তা হয়নি; একটা ঝিরঝিরে বর্ষণ হয়েছে মাত্র। কেননা, চল্লিশদিন আর চল্লিশরাত বিরামহীন বৃষ্টির ফলে (পয়দায়েশ, ৭:১২) যদি মাত্র ২৫ মিলিমিটার (২.৫ সেন্টিমিটার) জল জমে, তাহলে দৈনিক বৃষ্টির পরিমাণ হবে ০.৬২৫ মিলিমিটার। আমাদের এখানে শরৎকালে যে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয় তাতেও ১০ মিলিমিটারের মত জল থাকে (প্রায় ২০ গুণ বেশি)!

(২) হযরত নুহের জাহাজ : দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ জাহাজে পৃথিবীর সকল প্রাণীর এক জোড়া করে কি জায়গা সম্ভব ছিল? তৌরাত শরিফ (পয়দায়েশ, ৬:১৫) মতে, জাহাজ ছিল তিনতলা, লম্বায় ৩০০ হাত, চওড়া ৫০ হাত আর উচ্চতা ৩০ হাত।

প্রাচীন পশ্চিম এশিয়ার লোকদের একহাত বলতে যে মাপ বোঝানো হত, তাকে দশমিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন করলে দাঁড়ায় প্রায় ৪৫ সেন্টিমিটার বা ০.৪৫ মিটার। তাহলে, জাহাজটি লম্বায় ছিল ৩০০ × ০.৪৫ = ১৩৫ মিটার লম্বা; আর ৫০ × ০.৪৫ = ২২.৫ মিটার চওড়া। তাহলে, প্রতিটি মেঝের মাপ ছিল ১৩৫ × ২২.৫ = ৩০৩৭.৫ বর্গমিটার এবং তিনতলা মিলিয়ে জাহাজে মোট জায়গা ছিল ৩ × ৩০৩৭.৫ = ৯১১২.৫ বর্গমিটার।

পৃথিবীতে শুধু প্রাণিই আছে দশ রকম Phylum-এর (উদ্ভিদের কথা না হয় বাদ দেয়া হল), যেমন—(১) Protozoa (২) Porifera (৩) Coelenterata (৪) Platyhelminthes (৫) Nemathelminthes (৬) Annelida (৭) Arthopoda (৮) Mollusca (৯) Echinodermata (১০) Chordata

এখন দশ রকম ফাইলাম থেকে আমরা শুধুমাত্র একটা ফাইলামকে বেছে নিচ্ছি, Chordata বা মেরুদণ্ডী প্রাণী। এই মেরুদণ্ডী প্রাণিদের আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন : (১) পাখি, (২) মাছ, (৩) সরীসৃপ (৪)

উভচর (৫) স্তন্যপায়ী। পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত আবিস্কৃত ১,৭৫০,০০০ প্রজাতির প্রাণী আছে; এবং ধারণা করা হয় অনাবিস্কৃত রয়েছে ১৪,০০০,০০০ প্রজাতির প্রাণী। নিচে কিছু প্রাণির প্রজাতি-সংখ্যা তুলে ধরা হল :

স্তন্যপায়ী	৩৫০০
পাখি	১৩০০০
উভচর	১৪০০
সরীসৃপ	৩৫০০
পতঙ্গ	৩৬০,০০০
অঙুরিমাল বা Annelid	১৬০০০

এখন দেখি, ঐ জাহাজে কেবল স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জন্যই জায়গা যথেষ্ট ছিল কি-না?

তৌরাত শরিফের বর্ণনা মতে (পয়দায়েশ, ৭:২৪), দুনিয়া ১৫০ দিন জলের নিচে ডুবে ছিল। তাহলে ঐ সময় স্তন্যপায়ীদের জন্যই কেবল জায়গার ব্যবস্থা করতে হয়নি, তাদের খাবারের জন্যও জায়গার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল; সাথে-সাথে হযরত নুহ, নুহের স্ত্রী, তাঁদের তিন সন্তান, তিন সন্তানের স্ত্রীদের জন্য জাযগাসহ তাঁদের খাবার-দাবার রাখতে হয়েছিল। জাহাজে প্রতি জোড়া স্তন্যপায়ীদের জন্য জায়গা ছিল, ৯১১২.৫ ÷ ৩৫০০ = ২.৬ বর্গমিটার।

নিঃসন্দেহে এই জায়গা পর্যাপ্ত নয়। নুহের পরিবারের জন্য জায়গার দরকার হয়েছিল, তাঁদের নিজেদের খাদ্যের দরকার ছিল, প্রাণিদের খাঁচাগুলোকে ফাঁক-ফাঁক করে রাখতে হয়েছিল (স্তন্যপায়ীদের মধ্যে তিমি, ডলফিন, হাতি, রাইনো, হিপ্পো, বাঘ, সিংহ, গরু, ছাগল, হাতি, জিরাফসহ বিশাল আকারের জীব-জন্তুরা রয়েছে), এসকল প্রাণিরও খাদ্যের দরকার ছিল। তৃণভোজ প্রাণিদের জন্য ঘাস-গাছ-গাছালি, মাংসাশি প্রাণিদের জন্য মাংসসহ খাদ্যেও স্টক কোথায় রাখা হবে? ছোট্ট একটা উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোয়ালা নামক লেজবিহীন ছোট ভালুকের মত প্রাণিটির রোজ এক কেজি করে ইউক্যালিপটাস (Eucalyptus) গাছের পাতা খায়, যা তার পুষ্টি ও পানির চাহিদা মিটিয়ে দেয়। ঐ জাহাজে তো শুধু স্তন্যপায়ী প্রাণিদেরই পর্যাপ্ত জায়গা হচ্ছে না, আবার অন্যান্য প্রাণিসহ ১৫০ দিন চলার মত তাদের খাদ্যের স্টক কোথায় রাখা হবে?

মোদ্দা কথা, ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত মহাপ্লাবনের বর্ণনাকে মিথ্যে প্রমাণ করে দিচ্ছে অংকের হিসাব; আসলে ওরকম কিছু ঘটাই অসম্ভব। যদি কিছু হয়ে থাকে তো, মনে হয় কোনো স্থানীয় বন্যা হতে পারে; বাকি বক্তব্যগুলি সব কল্পনা, বকওয়াস, অতিমাত্রায় অতিকথন ছাড়া আর কিছু নয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

(১) বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ২০০১, কিতাবুল মোকাদ্দস, ঢাকা।

(২) রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর, ২০০৭, কোরানশরিফ সরল বঙ্গানুবাদ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। এবং Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, & Dr. Muhammad Muhsin Khan. Interpretation of the Meaning of The Noble Quran. Download Facility provided by : www.road-to-heaven.com

(৩) সেন, নারায়ণ, ২০০৪, ডারউইন থেকে ডিএনএ এবং চারশো কোটি বছর, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩০। এবং আন্তর্জালিক (Internet) ঠিকানা : http://gpc.edu/~pgore/geology/geo102/age.htm
(৪) খান, বেনজীন, ২০০৩, দ্বন্দ্বে ও দ্বৈরথে, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৫৮।
(৫) ঘোষ, প্রবীর, ২০০৩, আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩০।
(৬) আন্তর্জালিক ঠিকানা : http://www.abarnett.demon.co.uk/atheism/noahs_ark.html
(৭) আন্তর্জালিক ঠিকানা : http://www.indianchild.com/animal_kingdom.htm
(৮) বিভিন্ন পৌরাণিক উপাখ্যানে মহাপ্লাবনের আরো কাহিনী জানতে আন্তর্জালে দেখুন : http://www.talkorigins.org/faqs/flood-myths.html

---

অনন্ত বিজয়, শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, এবং যুক্তি পত্রিকার সম্পাদক। মুক্তমনার একজন নিবেদিতপ্রাণ সদস্য। সংরক্ষনশীল সনাতন ধর্মের মিথ, কুসংস্কার এবং অনুদার সমাজ কাঠামোর একজন প্রবল সমালোচক। মানবতা এবং যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০৬ সালে মুক্তমনা এওয়ার্ড পেয়েছেন।

যিশুর মৃত্যু রহস্য

ওয়াহিদ রেজা

এমন ঢাকা কিছুই নেই যা প্রকাশ পাবে না,
এমন গুপ্ত কিছুই নেই যা জানা যাবে না।
-যিশু খ্রিস্ট

> 'জ্ঞানী কোথায়? শাস্ত্রবিদ কোথায়? এ যুগের বাদানুবাদকারী কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের (মানুষের) জ্ঞানকে মূর্খতায় পরিণত করেন নি? কারণ ঈশ্বরের জ্ঞানকে যখন নিজের জ্ঞান দ্বারা মানুষ জানতে পারেনি, তখন প্রচারের মূর্খতার মাধ্যমেই বিশ্বাসীদের উদ্ধার করতে ঈশ্বরের ইচ্ছা হলো। কেনোনা ইহুদিরা প্রমাণ চায় এবং গ্রিকরা জ্ঞানের অন্বেষণ করে আর আমরা ক্রুশে নিহত যিশুকে প্রচার করি।'...[১]

ঠিক এইভাবে, ধূর্ত সেন্ট পল-এর মিথ্যাচারিতার মধ্য দিয়ে প্রায় দু'হাজার বছর আগে প্যালেস্টাইনে শুরু হয়েছিলো খ্রিস্টধর্মের যাত্রা। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো, সত্যিকারভাবে ক্রুশে যিশুর মৃত্যু হয়নি। ক্রুশবিদ্ধাবস্থায় তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর নামে আজগুবি, গাঁজাখুরি বিভিন্ন গপ্পো ফেঁদে, জীবিত যিশুকে মৃত বানিয়ে, তাঁর মড়াকে খাড়া করে আকাশে উড়িয়ে দিয়েছেন চালিয়া খ্রিস্টপাণ্ডা-পুরুতগণ। একজন রক্তমাংশের মানুষকে ঈশ্বরের পুত্র বানিয়েছেন তারা। শুধু তাই নয়; ঈশ্বর এবং যিশু উভয়কে একত্রিত করে তারা বলে বেড়ান-'চিরশান্তিদাতা যিশু মানেই ঈশ্বর; ঈশ্বর মানেই যিশু-ক্রুশবিহীন-পরিত্রাণ নেই।' অথচ সেই ত্রাণকর্তা, চিরশান্তিদাতা যিশুই কিনা বাইবেলে বলেন [২],

> 'মনে করো না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি; না, শান্তি নয়, তরবারি দিতে এসেছি। আমি তো এসেছি ছেলেকে তার বাপের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে, মেয়েকে তার মায়ের বিরুদ্ধে, বউকে তার শাশুড়ীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে। মানুষের শত্রু হয়ে উঠবে তার নিজের ঘরেরই লোকেরা। যে নিজের বাবাকে বা মাকে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসে, সে আমার শিষ্য হবার যোগ্য নয়। আর যে নিজের ছেলেকে বা মেয়েকে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসে, সেও আমার শিষ্য হবার যোগ্য নয়।'

যিশুর মতো একজন শিক্ষিত, সরল, নির্বিরোধ, মানবিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ, যিনি তাঁর সময়কালে ইজরায়েলের সামাজিক অনাচার, অবিচার, শোষণের বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক অশান্তি, অস্থিরতার বিপক্ষে নিজের শান্ত স্বভাব সুলভ রীতিতে শান্তির বাণী প্রচারে ব্রতী ছিলেন, তিনি কেমন করে এ কথা বলতে পারেন যে, 'শান্তি নয়, অশান্তি, গোলযোগ আর মানুষে মানুষে শত্রুতা সৃষ্টির জন্যেই আমার আবির্ভাব।' এটা কোনো প্রফেটের বাণী হতে পারে না। আসলে বাইবেলের উপরোক্ত কথাগুলোই প্রমাণ করে গসপেল রচয়িতাগণ বা খ্রিস্টধর্মের পাণ্ডারা যে কতো বড়ো মিথ্যেবাদী ছিলো। আর যিশু যদি সত্যি সত্যি এই কথাগুলো বলে থাকেন-তাহলে কোনো মানুষেরই উচিত নয় বাইবেল, ক্রুশ ও যিশুকে শ্রদ্ধা করা বা প্রফেট হিশেবে তাঁকে বিবেচনায় রাখা।

বাইবেলে যিশুর চরিত্রে মিথ্যাচারিতার আরেকটি প্রমাণ হলো শিষ্যদের উদ্দেশ্যে যিশু তাঁর একই ভাষণে আরো বলেছেন [৩],

> 'আর যে কেউ নিজের ক্রুশ বহন করে আমার পেছনে পেছনে না আসে (বা আমাকে অনুসরণ না করে) সে আমার শিষ্য হবার যোগ্য নয়।'

বাইবেলের সবচে' বড়ো ভুল কথা এবং যোচ্চুরি হচ্ছে এটি। সমগ্র বাইবেল অর্থাৎ নিউ টেস্টামেন্ট এবং যিশুর বিক্ষিপ্ত জীবনী থেকে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যে রূপটি প্রতীয়মান হয় তাতে এ ধরণের মিথ্যে কথা তাঁর মুখ নিঃসৃত হওয়ার কোনো অবকাশ খুঁজে পাওয়া যায় না। আর যিশুর কোনো বক্তব্য থেকেই এটা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি তাঁর মিশন চলাকালীন সময় নিজের মৃত্যু বিষয়ে ক্রুশবিদ্ধ হওয়া বা ক্রুশে তাঁর মরবার কথা কখনো কোথাও পরিষ্কারভাবে তো নয়ই, এমনকি আভাসে ইঙ্গিতেও তা ব্যক্ত করেছেন। এখানে এ ব্যাপারটি খুবই লক্ষণীয় যে, যিশু যখন শিষ্যদের ক্রুশ বহনের কথা বলছেন বলে বাইবেলে উল্লেখ আছে তখন তিনি সদ্য ইজরায়েলে ফিরে নিজের নতুন অভিমত প্রচার করছেন কেবল। এবং বারোজন শিষ্য নির্বাচন করেছেন যারা প্রায় সকলেই অশিক্ষিত ও সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষ। অথচ ওই শিষ্যদের মাঝে তিনি তাঁর মতামত প্রচারের প্রথম পর্যায়েই তাঁর পেছনে পেছনে ক্রুশ বহনের আদেশ দিচ্ছেন! মজার ব্যাপার হলো, তিনি কখনোই তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে ক্রুশের উল্লেখ কোথাও করেননি। এমনকি বাইবেলে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কিত যে উহ্য ভবিষ্যবাণীগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেখানেও ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যিশুর জীবনাবসানের কোনোই উল্লেখ নেই। আজকের আধুনিক খ্রিস্টপাণ্ডা-পুরুতগণ এ বিষয়টি সম্পর্কে কী জবাব দেবেন? নিশ্চয় তারা বলবেন-এটি তাদের 'ঈশ্বরপুত্রের' পরবর্তীকালের সংগঠিতব্য অলংঘনীয় ভবিষ্যবাণী। না, এ জবাব সঠিক নয়। এ ধরণের উত্তর পুরোটাই যাজক-পাদ্রিদের বুজরুকি, মিথ্যেকে সত্য বানাবার কারসাজি। যিশু তাঁর পেছনে পেছনে ক্রুশ বহনের যে আদেশ দিচ্ছেন বা হুমকি প্রদর্শন করছেন তা কেবল এ সত্যই প্রমাণ করে যে, এটি হচ্ছে ক্রুশিয় ঘটনার পর যিশুর অন্তর্ধানের পরবর্তী কালের চতুর খ্রিস্টপাণ্ডাদের একটি ইতর ফতোয়া বিশেষ, কোনোভাবেই যিশুর মুখ নিঃসৃত বাণী নয়।

এরকম অজস্র প্রমাণ নিউ টেস্টামেন্টের গোটা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আসলে সেসব খ্রিস্ট প্রচারক বা গসপেল রচয়িতাদের জানা ছিলো যিশুর ক্রুশিয় ঘটনা এবং তারা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, খ্রিস্ট সম্বন্ধীয় তাদের সত্যমিথ্যার জগাখিচুড়ি রচনা তাকালীন ইহুদি সমাজের শোষিত, নিপীড়িত, দীন-দরিদ্র মৃতপ্রায় মানুষের মধ্যে কোরামিনের কাজ দেবে। আর সেই সময় যিশু সম্পর্কে অদ্ভুৎ অদ্ভুৎ সব গুজব, আজগুবি খবর, মিথ্যে প্রচার ও প্রপাগাণ্ডা, অলৌকিক গালগপ্পো ইজরায়েলের সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়ায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো। অস্বাভাবিকতা ও অলৌকিকতায় আকর্ষণ সাধারণ মানুষের প্রাচীনতম রোগ। আর এ রোগের রুগীর সংখ্যাই পৃথিবীতে অত্যাধিক। এদের পরিচালনা করেন একদল সুচতুর স্বার্থান্বেষী জ্ঞানপাপী। এ দলেরই অন্যতম খ্রিস্টপাণ্ডারা এই উপলব্ধি থেকে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাদের প্রচারে যদি ক্রুশিয় ঘটনার আগেই যিশুর মুখে ক্রুশ টানার ফতোয়া সেট্ করে দেওয়া যায় তাহলে তা মানুষের মনে বিশ্বাসযোগ্যতা পাবে এবং খ্রিস্টের প্রতি অধিক শ্রদ্ধা ভক্তি সঞ্চলনে সমর্থ হবে। অর্থাৎ সহজ সরল বিশ্বাসী জনগণ মালটা খাবে ভালো। এবং অস্বাভাবিক, অলৌকিক প্রিয় জনগণ তা ভালোভাবেই খেয়েছে। তাই নিউ

টেস্টামেন্টের গসপেলে যিশুর মুখে সুপরিকল্পিতভাবে ক্রুশ বহনের এই মিথ্যে ভাষণ প্রচার করেছেন রচয়িতাগণ। মনে রাখতে হবে, প্রচারে কোনো প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।

খ্রিস্টধর্মগ্রন্থ বলে প্রচলিত সমস্ত রচনাই যিশুর ক্রুশবিদ্ধ ঘটনার বহু বহু বছর পরে রচিত। যিশু নিজে কোনো গ্রন্থ রচনা করে যাননি। এমনকি কোনোটির তত্ত্বাবধায়কও তিনি ছিলেন না। অবশ্য সে সুযোগও পাননি তিনি। তাঁর মিশন বা প্রচারকাল ছিলো খুবই অল্প, বড়ো জোর দু' থেকে আড়াই বছর মাত্র। যিশুর জন্ম থেকে মৃত্যু এবং জীবনকালের গোটা অধ্যায় কেবল রহস্য-রহস্য আর রহস্যের মলাটে মোড়া। যিশু হচ্ছেন পৃথিবীর সবচে' রহস্যময় নায়ক বা মিস্ট্যারিয়াস হিরো। তাঁকে ধর্মীয় জগতের মেগাস্টারও বলা যেতে পারে। কারণ বিশ্বে কথিত যতো 'ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ' বা 'প্রফেট' ছিলেন তাঁদের মধ্যে যিশুর মতো রহস্যময়, জটিল, আকর্ষণীয়, কৌতূহলী পুরুষ দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। তাঁর মতো বিতর্কিত প্রফেটও কেউ নন। সকল ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষকেই একসময় মৃত্যুরস আস্বাদন করতে হয়েছে; যা প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে অলংঘনীয় বিধান, কেবল যিশুর ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই বিধান বহির্ভূত ব্যবস্থা! একমাত্র যিশুই নাকি মৃত্যুহীন, মৃত্যুঞ্জয় বা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত কাল্পনিক হরোর ছবির মতো মানুষ! যা এখনো সাধারণ মানুষের কাছে এক বিশাল প্রশ্নবোধক চিহ্ন। এ থেকে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল উঁকি দিতে পারে-

> 'তাহলে তিনি কোন্ ধাতুর মানুষ যে তাঁর মৃত্যু হতে পারে না এবং গত প্রায় দু'হাজার বছর ধরে আজো তিনি আকাশ দাবড়িয়ে বেড়াচ্ছেন? তবে কী তিনি রক্ত মাংশের বদলে অন্য কোনো পদার্থে প্রস্তুত?'

বিজ্ঞানের কথা বাদ দিলেও ধর্ম বা ইতিহাস এ ধরণের প্রশ্নকে অবান্তর জ্ঞান করে। তারা পরিষ্কার সাক্ষ্য দেয়- যিশু রক্তমাংশেরই মানুষ ছিলেন, আর পাঁচজনের মতো তাঁকেও খাওয়া-দাওয়া, প্রাকৃতিক কর্মাদি সম্পাদন করতে হতো। তাহলে তাঁকে নিয়ে আজো কেনো এতো কিংবদন্তি? কেনো এতো আজগুবি সব কেচ্ছাকাহিনীর প্রচলন? কারণ ধর্মীয় জগতে তিনিই একমাত্র পুরুষ যাঁর জন্ম, মৃত্যু এবং মাঝখানের সমস্ত ঘটনাবলী সুচতুর এক রহস্যের রঙিন পর্দায় আবৃত, যেনো যাদুর এক রেশমি রুমাল। আর এ রুমাল বা পর্দা এতো চিত্র-বিচিত্র, মনভোলানো যে, এর চোখ জুড়ানো গোলক ধাঁধায় মানুষ দু'হাজার বছর ধরে চক্কর খাচ্ছে কুলুর বলদের মতো! এবং চক্কর খেতে খেতে ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে আসল যিশু হাওয়া হয়ে গিয়ে ঘটেছে নকল যিশুর আবির্ভাব। আর এই নকল ড্যামিটাকে নিয়েই খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে চলছে যতোসব উদ্ভট, আজগুবি যাত্রা-থিয়েটার! বাইবেলের ভাষ্যানুযায়ী ক্রুশিয় ঘটনার পর অর্থাৎ তথাকথিত পুনরুত্থানের পরে যিশু হচ্ছেন এক যাদুময় পুরুষ। যে কিনা হঠাৎ হঠাৎ যেখানে সেখানে হাজির হতে পারেন, আবার টুপ করে অদৃশ্য হয়ে যাবার শক্তিও রাখেন। তাঁর হাড় মাংশ আছে, তিনি স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করেন অথচ দরোজা জানালা বন্ধ ঘরে ভৌতিকভাবে সশরীরে ঢুকে যেতে পারেন! একেবারে গাঁজাখুরি ছবির নায়কের মতো মানুষ। যা কিনা সাধারণ মানুষের মনে সুপার পাওয়ারের বিশ্বাস সৃষ্টিতে এক ইন্দ্রজালিক প্রভাবে বশীকরণের প্রচেষ্টা। অথচ রক্তমাংশের মানব যিশুর কবর রচনার কথা ভাবাটা তাদের কাছে মহাপাপের বিষয়! মানব সভ্যতার ধারাবাহিক অগ্রগতির সঙ্গে আজো অধিকাংশ মানুষের চিন্তা চেতনা যে ঘাস খাওয়া প্রাণীর মতোই নির্বুদ্ধিতার পর্যায়ে অবস্থান করছে তার বড়ো প্রমাণ এই হরোর টাইপের ভৌতিক যিশুর ধারণা এবং প্রতিচ্ছবি।

অন্যদিকে বেশির ভাগ মুসলমানও মনে করে-যিশু এখনো পর্যন্ত বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন! যদি প্রশ্ন করা হয়, 'সেটি কোথায়?' তাহলে উত্তর আসে, 'কোথায় আবার, আকাশে। আল্লাহ্ ডানপাশে বসে আছেন তিনি। হাদিসে আছে না।' এটি আরো বেশি অদ্ভুৎ শুধু নয় উদ্ভট বিশ্বাস। যা কেবল হাস্যকরই নয়, মানুষের চরমতম নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার উদাহরণ।

সকল ধর্মীয় পাণ্ডারা চিরদিন গোঁয়ারতুমি করে, আজগুবি মতবাদকে বহাল রাখার জন্যে রক্তপাত ঘটিয়েছে। রক্তপাত হচ্ছে ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রথম অধ্যায়। পৃথিবীর মানচিত্রে কোনো ধর্মই রক্তপাতহীন প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। এ রক্তপাত ধর্মের সূচনা লগ্ন থেকেই মগজঘোলাদের বংশানুক্রমিক ব্যাধি। কিন্তু সুখের কথা হলো, এই সংক্রামক ব্যাধিতে সমস্ত লোককে আক্রান্ত করতে তারা সফলতা লাভ করেনি। এই মগজঘোলারা তাদের ধর্মের তথাকথিত বিধানের নামে ধারাবাহিক শোষণ-নির্যাতন, ধমক-ঠমক, চোখ রাঙিয়ে এবং রক্তপাত ঘটিয়ে; অর্থা হাজারো অপকর্মের আশ্রয় নিয়েও মানুষের মৌলিক মেধা উত্তরণের গতি রোধে ব্যর্থ হয়েছে। আজ কোনো মুক্তমনের বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের পক্ষে এ আজগুবি ধারণা মেনে নেওয়া সম্ভব নয় যে, তারই মতো রক্তমাংশের কোনো আদম সন্তান হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকতে পারে, তাও আবার জমিনে নয়-আসমানে! অবশ্য বিজ্ঞানের নাম ভাঙিয়ে খাওয়া ধর্মবাদীদের সংখ্যাও নেহাত কম নয় যারা যিশুর আকাশে বেঁচে থাকার থিওরি পূর্ণ বিশ্বাসভরে বুকে আগলে আছে। তাদেরকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে উত্তর পাওয়া যায়, 'বিজ্ঞান ঠিকই আছে কিন্তু প্রফেট যিশুর ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম।' শিক্ষিত জ্ঞানপাপীদের এই আজগুবি ব্যতিক্রমের প্রশ্রয়ে, ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদের সাশ্রয়ে এবং খ্রিষ্টিয় পাণ্ডাপুরুতদের আশ্রয়ে যিশুর যে ড্যামিটা পৃথিবীর মানুষকে বোকা-বেআক্কেল বানিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে আকাশ দাবড়িয়ে বেড়াচ্ছে; তাকে এখন টেনে মাটিতে নামিয়ে আনার সময় হয়েছে। তাকে এখন আর হলিউড চলচিত্রের সুপারম্যানের মতো আকাশ দাবড়িয়ে বেড়াতে দেওয়া যায় না। তাহলে সেটা হবে বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিষ্কার প্রতারণা ও আজগুবি এক বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ, যা কোনো বিজ্ঞানমনস্ক সুস্থ সচেতন মানুষের কাজ নয়। বিতর্কিত যিনি এই রচনার নায়ক সেই যিশুই বাইবেলে স্বয়ং বলছেন, এমন ঢাকা কিছুই নেই যা প্রকাশ পাবে না, এমন গুপ্ত কিছুই নেই যা জানা যাবে না। অতএব তোমরা অন্ধকারে যা কিছু বলেছো, তা দিনের আলোতে শোনা যাবে, এবং অবরুদ্ধ ঘরে কানে কানে যা বলেছো, তা ছাদের উপর থেকে একদিন প্রচারিত হবে।[৪]

> আমি বিশ্বাসের দুর্গে আঘাত করেছি, কেননা
> বিশ্বাস হচ্ছে যুক্তির অভাব। যেসব বিশ্বাস উন্নতির
> আধুনিকতার প্রগতির সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তোলার
> পক্ষে বাধা, সেগুলোকে আঘাত করেছি। শাস্ত্রীয়
> আচার-আচরণ সবটাই কুসংস্কার...
>
> – আহমদ শরীফ

মুসলিম বিশ্বাস হচ্ছে, ইহুদিরা যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করতে পারেনি। তবে তাঁর মতো দেখতে অন্যজনকে ক্রুশে মারা হয়। এবং যিশুকে উপরে উঠিয়ে নেয়া হয়; তিনি এখন স্বর্গ অর্থা বেহেস্তে অবস্থান করছেন, ভিন্ন মতে চতুর্থ আসমানে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, অন্য কাউকে নয়, যিশুকেই ক্রুশবিদ্ধ করা

হয়েছিলো এবং তিনি সে নির্যাতনে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন। ক্রুশে তাঁর মৃত্যু হয়নি। চতুর্থ শতাব্দির প্রথম দিকে লিখিত অজস্র গসপেলের মধ্যে একটি গসপেলে পরিষ্কার উল্লেখ ছিলো-ক্রুশে যিশু মৃত্যুবরণ করেননি। অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন তিনি অর্থা মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন। তারপর একটি সমাধি-গুহায় তাঁর গোপন শিষ্যদের সেবা-শুশ্রুষায় সুস্থ হয়ে ছদ্মবেশে স্ত্রী মেরি মাগদালিনকে সঙ্গে নিয়ে প্যালেস্টাইন থেকে দামাস্কাসে পালিয়ে যান যিশু। সেটির নাম ছিলো 'নস্ট্রিক গসপেল।' সে গসপেলটি নব্য খ্রিস্টধর্মাবলম্বী রোমান সম্রাট কনস্ট্যান্টাইনের আদেশে ৩১৩ কি ৩১৪ যিশুসালে নষ্ট করে ফেলা হয়। অন্য একটি সুসমাচার 'গসপেল অব ফিলিপস্' এর ৬৩:৩১ বচনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যিশু ও মেরি মাগদালিনের সম্পর্কের কথা।

যাহোক, মুসলমানদের এখনো তাঁর আকাশ বা বেহেস্তে বেঁচে থাকার বিশ্বাসটি যে তাদের ধর্মীয় রীতি-বিরুদ্ধ একটি বিশ্বাস এ কথা তারা মানতে চায় না। ইসলাম পরিষ্কার বলে, কেয়ামত বা মহাধ্বংসলীলা ঘটার পরই প্রথমে প্রতিটি মানুষের ভালো-মন্দের বিচার হবে ঈশ্বরের আদালতে। এবং তারপরই উত্তমরা বেহেস্তে ও আধমরা দোযখে যাবে। সেই বিচারে কারোরই রেহাই নেই। আর সেই ঘটনার আগে কোনো জীবিত মানুষ স্বর্গ বা নরকে যেতে পারে না। এবং আকাশে বেঁচে থাকার ব্যাপারটি তো সম্পূর্ণ ভূয়া ও গাঁজাখুরি গপ্পো। আর যদি যিশুর মৃত্যু না-ই হয়ে থাকে (না হওয়ার প্রশ্ন তো ওঠেই না) তবে স্বশরীরে তাঁর স্বর্গে যাবার এবং এখনো সেখানে বেঁচে থাকার বিশ্বাস যে কতো বড়ো উদ্ভট ও আজগুবি বিশ্বাস এবং কোরানিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী তা মুসলমানরা বুঝতে চায় না। উল্টো তারা এই বিশ্বাসে মাতোয়ারা হয়ে আরো মনে করে, যিশু পৃথিবীর শেষলগ্নে আবার আবির্ভূত হবেন। তরোয়াল হাতে ক্রাইস্টবিরোধীদের হত্যা করবেন। সমস্ত শুকর মেরে ফেলবেন। সব ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন। বিধর্মীদের ওপর থেকে পোল-টাক্স তুলে নেবেন। এবং তারপর বিয়ে করবেন। কিন্তু কাকে বা ক'জনকে করবেন তার উল্লেখ নেই। তবে তাঁর অনেকগুলো ছেলেপুলে হবে এবং পঁয়তাল্লিশ বছর, ভিন্ন মতে চল্লিশ বছর তিনি ন্যায়বান রাজা হিশেবে বীরদর্পে রাজত্ব করবেন। আর তাঁর মৃত্যুর পর মদিনায় হযরত মুহম্মদের সমাধির কাছে আবু বকর ও ওমরের কবরের মাঝখানে তাঁকে সমাহিত করা হবে।[৫]

বুঝুন, কতোগুলো অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখনো যিশুর বাকি! দুই হাজার বছর আগে লোকটা যখন স্বর্গে গেছেন তখন দু'চাকার একটি সাইকেলও পৃথিবীতে ছিলো না। ছিলো না আধখানা বন্দুক, এমনকি একখানা পটকাও। আর এখন প্রায় বিদ্যুৎ বেগে ছুটে চলার মতো যান, বস্তুকে ছাই করে দেবার মতো লেজারগান, গোটা কয়েক বিশ্বধ্বংস করে ফেলার মতো পারমাণবিক অস্ত্র মানুষের হাতে মজুত। এ অবস্থায় ঢাল-তরোয়াল হাতে একজন দু'হাজার বছরের বুড়ো কেমন করে ক্রাইস্টবিরোধীদের হত্যা করবেন, পৃথিবীর সকল শুকর মারবেন আর সমস্ত ক্রুশ ভাঙবেন? একথা ভাবতে গেলে বোকা বনে বসে থাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই। মানুষের পৌরণিক অবাস্তব কল্পকাহিনী যে বর্তমানেও বাস্তবতার রূপ নিয়ে মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকতে পারে, যিশুর প্রত্যাবর্তন ও পরবর্তী মিশনের এ অন্ধবিশ্বাস তার বড়ো প্রমাণ।

আচ্ছা, যিশু ক্রাইস্টবিরোধীদের চিহ্নিত করবেন কীভাবে? কারো চোখেমুখে তো সে কথা লেখা নেই, থাকে না। আর তিনি অন্তর্যামীও নন। তাহলে গোটা বিশ্বব্যাপী এ হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করা তাঁর পক্ষে কী করে

সম্ভব? এবং বন-জঙ্গল দাবড়িয়ে শুকরের সঙ্গে দৌড়ে পেরে উঠবেন কী বৃদ্ধ যিশু? তবে 'ছুঃমন্তর-ফুমন্তর/সকল শুকর মর' এ জাতীয় মন্ত্রটন্ত্রের প্রভাবে যদি সমস্ত শুকর বধ করতে পারেন তাহলে অন্য কথা। রইলো ক্রুশ ধ্বংসের ব্যাপার। গির্জা-টির্জা, গোরস্থান-টোরস্থানের মেটালিক ক্রুশ না হয় ভাঙা গেলো। কিন্তু য়্যুরোপ আমেরিকায় ছেলেমেয়ে, নরনারীদের বুক-পাছা, হাতে-পায়ে যে কোটি কোটি ক্রুশ উল্কি করে আঁকা হয়েছে বা রয়েছে, সেসমস্তকে কোন্ পদ্ধতিতে ধ্বংস করবেন আমাদের থুড়থুড়ে যিশুদাদু? মাথায় খেলে না আমার। এখন কেউ যদি বলেন, 'আপনার তো মশায় বুদ্ধি-শুদ্ধি একদম নেই। যিশু কী সাধারণ লোক নাকি? তিনি হলেন প্রেরিত পুরুষ, পয়গম্বর। তিনি কিনা করতে পারেন। তিনি একসময় অন্ধকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন, মৃতকে জীবিত করেছেন, আহারকে বাহারি করে খাইয়েছেন। আরো কতো কিছু করেছেন। জানেন না এসব?'

জানি ভাই, জানি। ওসব আদ্দিকালের রদ্দি কেচ্ছাকাহিনী ভুলে যান। ওগুলো এখন বাতিল মাল। আর যিশু কোনোকালে ওসমস্ত কিছুই করেননি। কালক্ষেপে সেসব তিল শুধু তাল হয়ে জন্মেছে। যিশু যদি মৃতকে জীবিত করে থাকেন তাহলে সেই কৃতিত্বে তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় নন। মড়াকে খাড়া করার কথিত গল্পের নায়ক পৃথিবীতে অনেকেই ছিলেন। শুধুমাত্র ওসব দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে গেলে আলাদা একখানা বই লিখতে হবে আমাকে। হযরত মহম্মদের বেলায়ও এমন মৃতকে জীবিত করার গল্প আছে। শুনবেন? শুনুন–

> এক মহিলা হযরতের সঙ্গে হিজরত করতে মদিনায় গিয়েছিলেন। সেখানে তার একমাত্র পুত্র মারা যায়। ছেলেটির চাদর ঢাকা দেয়া লাশ হযরত মহম্মদের সামনেই ছিলো। মহিলা হযরতের পায়ের কাছে বসে কান্নাকাটি করে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করছিলেন, যেনো মৃত ছেলে জীবন ফিরে পায়। এর কিছুক্ষণ পর মৃত ছেলেটি সত্যি সত্যি হাত পা নাড়া দিয়ে মুখের চাদর সরিয়ে উঠে বসে। পরবর্তীকালে অনেক বছর নাকি সেই ছেলে জীবিত ছিলো।

এখন আমরা যুক্তিবাদীরা যদি জানতে চাই, হযরত মহম্মদ অন্যের একমাত্র মৃত পুত্রকে জীবিত করলেন অথচ তাঁর যদি সত্যি এমন অলৌকিক ক্ষমতা থাকতো তাহলে যখন তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র আবদুল্লাহ্ মারা যান তখন তাঁকে কেনো তিনি পুনর্জীবন দান করলেন না? এর উত্তরে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মৌলবাদী কোনো মাওলানা-মুন্সির জবাব আমাদের প্রয়োজন নেই। কারণ আমরা জানি এ গল্পটি ভুয়া। কোরআন বলে : মহম্মদের কোনো ক্ষমতা ছিলো না মৃতকে জীবিত করার। তিনি আর দশজনের মতোই রক্তমাংশের মানুষ ছিলেন (২১:৮/২৫:২০/৪১:৬)। তারপরও তাঁকে নিয়ে এরকম আজগুবি কাহিনী তৈরি হয়েছে। এরচে'ও আরো অদ্ভুৎ এক গল্প হযরত মহম্মদের সম্পর্কে আছে। তাহলো, উহুদের যুদ্ধে জনৈক আবদেল্লাহ্ নামে হযরতের এক অনুসারী মৃত্যুবরণ করেন। লোকটি তার পুত্র জাবিরের ওপর রেখে যান নিজের গোটা সংসারের দায়িত্ব ও ঋণের বোঝা। এ অবস্থায় মহম্মদ একদিন জাবিরের বাড়িতে দাওয়াত খেতে এলে জাবির তার একমাত্র উপার্জনের উৎস দুধেল মাদি ছাগলটা জবাই করে রান্না করেন। ব্যাপারটা জেনে হযরত সকল সঙ্গীদের নিয়ে খেতে বসে বললেন, 'তোমরা মাংশ খাবে কিন্তু কেউ হাড় চিবুবে না।' তারপর আহার শেষে মহম্মদ সেই হাড়গুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে তার উপর হাত রেখে দোয়া বা মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন্ত ছাগল তৈরি হয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।[৬]

এখন একে আপনি কী বলবেন? এরকম অসাধারণ ক্ষমতা যাঁর ছিলো তিনি তো চাইলে (যদ্দিন বেঁচে ছিলেন) তখনকার মৃত সমস্ত মানুষকেই বা তাঁর প্রিয়জনদের জীবিত করে তুলতে পারতেন। তাঁদের মৃত্যুতে তাঁর অশ্র"পাত করার কোনো কারণ ছিলো না। কোরান স্পষ্ট বলছে, মানুষ জানে না (মৃত্যুর পর) তাদের আবার কখন পুনরায় জীবিত করা হবে (২৭:৬৫)। আসলে এসমস্ত যে স্রেফ গাঁজাখুরি গল্প তা বোঝার জন্যে মস্ত পণ্ডিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আজকে ক্লাশ ফাইভের বাচ্চারাও এসবের অসারত্ব বুঝতে পারে, পারবে। এবার যিনি আমাকে যিশুর অলৌকিকত্বের বাহাদুরি করে প্রশ্ন তুলতে চান; উত্তরে আমি তার কাছে জানতে চাইবো- বলুন তো উপরোক্ত দৃষ্টান্তের পর যিশুর চে' হযরত মহম্মদের অলৌকিক ক্ষমতা কম কোথায়? আসলে এসব গালগপ্পোগুলো চিরদিন আপনাদের মতো অন্ধবিশ্বাসীরা তৈরি করেছে। যারা কোনোদিন সত্যের খোঁজখবর-যাচাই বাছাই না করে বিশ্বাসের মাত্রাতিরিক্ত পুলকে লোকমুখে শোনা ঝাল খেয়ে তিলকে তাল করেছে চিরদিন। কোনো প্রফেট মানব না অতিমানব-এ প্রশ্ন ওঠেই না। কারণ অতিমানব বলে পৃথিবীতে কেউ নেই। ছিলো না কোনোদিন। গল্প-কাহিনী-বায়োস্কোপে তাদের পাওয়া যায়, বাস্তবে নয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে একদল অতিউৎসাহী লোক এই অতিমানব কথাটি সৃষ্টি করেছে। এখনো করছে এবং করে। বেশিদূর যাওয়া লাগবে না, আপনার আশেপাশের মার্কামারা পীর-ফকির, সুফি সম্রাট, সুফি বাদশা ইত্যাদি স্বঘোষিত মালগুলোর দিকে তাকালে আপনিও হাটসেরা কোরবানীর তাগড়া গোরুর মতো আজকের তথাকথিত অতিমানবদের দেখতে পাবেন। তবে হ্যাঁ, এসমস্ত ভণ্ড, ধান্দাবাজ, নিকৃষ্ট লোকদের সঙ্গে যিশুর তুলনা চলে না। সত্যিকার অর্থে তিনি চমৎকার মানুষ ছিলেন। নির্বিরোধ, শিক্ষিত, নিরীহ, নির্লোভ সাধক পুরুষ। তাঁর প্রকৃত চরিত্রকে বিকৃত করে দিয়েছে খ্রিস্ট পাণ্ডারা। নিজেদের স্বার্থে। ক্ষমতার লিপ্সায়।

যিশুর স্বশরীরে স্বর্গে জীবিত থাকার থিওরি ইসলামি জগতে আরো যে একটি কারণে বিশ্বস্ততা লাভ করেছে তার পেছনে রয়েছে একটি হাদিস। যেটি হযরত মহম্মদের মি'রাজ বা উর্ধ্বলোকে গমন সম্পর্কিত। তিনি নাকি যখন দ্বিতীয়, ভিন্ন মতে চতুর্থ আকাশে পৌঁছান তখন সেখানে তিনি বেপ্টিস্টজন (যাঁকে গলা কেটে হত্যা করেছিলেন সম্রাট হেরোদ) ও যিশুকে দেখতে পেয়েছেন। কোরানিক দর্শনে কোনো জীবিত মানুষের সেখানে পৌঁছানোর বা বর্তমান থাকার কথা নয়। কেবল হাদিসের মাধ্যমেই ইসলামি দর্শনে এই গল্পটির অনুপ্রবেশ। আসলে প্রারম্ভিককালে যে সকল খ্রিস্টানরা ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলো তাদের কাছ থেকেই স্বশরীরে যিশুর স্বর্গলোকে গমনের থিওরি ইসলামি দর্শনে (হাদিসে) প্রবেশ করেছে। কোরানের ভাষ্য যদি সঠিক হয় তবে নিশ্চয় যিশু মৃত্যুবরণ করেছেন বলেই সেখানে তাঁর তথাকথিত উপস্থিতি সম্ভব হলে হতেও পারে। হাদিসের বয়ান ভুল।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে যে কথাটি বলা প্রয়োজন, কোরানের ৪:১৫৮ আয়াতে যিশুকে ঈশ্বরের কাছে তুলে নেয়ার যে উল্লেখ আছে তা কোনোভাবেই স্বশরীরে তুলে নেয়া বোঝায় না। আর একে অবশ্যই আক্ষরিক অর্থে বিবেচনা করা উচিত নয়। যারা এক্ষেত্রে সেটা করেন তারাই আবার অন্য বিষয়ে বলেন, কোরানের সব কথা আক্ষরিকভাবে নেয়া ঠিক না। অনেক রূপক-টুপক আছে ওসবে। তাহলে যিশুর বেলায় রূপক থাকবে না কেনো? এটা কী ধরণের গোঁয়ারতুমি? ঠিক এরকম আরো প্রায় অর্ধশত আয়াত কোরানে আছে যা মানুষের মরণোত্তর তুলে নেয়া বা ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাওয়া অর্থে ব্যক্ত। এবং একই অর্থে কোরানে অন্যত্র যিশুর

জবানিতে বলা হয়েছে-'তারপর আপনি (ঈশ্বর) যখন আমাকে তুলে নিলেন তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে জানতেন' (৫:১১৭)।

এই তুলে নেয়াকে যদি কেউ যিশুকে সশরীরে তুলে নেয়া বোঝেন তাহলে তা হবে কোরানিক দর্শনের পরিপন্থী। কারণ কোরানের ঈশ্বর স্পষ্ট ঘোষণা করছেন: প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে (৩:১৮৫)। এবং তারপরই তাঁর কাছে তুলে নেয়া বা ফিরে যাওয়া বোঝায়। একথাও কোরানে লেখা আছে হযরত মহম্মদকে উদ্দেশ্য করে যে, 'তুমি বলে দাও : তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত মৃত্যুদূত তোমাদের প্রাণ সংহার করবে, তারপর তোমাদেরকে তোমাদের ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে' (৩২:১১)। যিশু অতিমানব বা কোনো সুপারম্যান ছিলেন না। ধর্মীয় অনুশাসনে তিনি একজন কথিত প্রেরিত পুরুষ মাত্র। রক্তমাংশের স্বাভাবিক মানুষ। অন্যান্য কথিত প্রেরিতরা যেমন ছিলেন। জীবন থাকলে যেমন মরণ নিশ্চিত তেমনি যিশুও যথাসময়ে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন। এ বিষয়ে আলোচনায় আমরা পরে আসবো।

কোরানের সুরা ৩, আয়াত ১৪৪ এ বলা হয়েছে, 'মহম্মদ একজন প্রেরিত পুরুষ ভিন্ন কিছু ছিলেন না এবং অবশ্যই তাঁর পূর্বের সমস্ত প্রেরিত পুরুষরা মৃত্যুবরণ করেছেন।' এরপরও যিশুকে অদ্যাবধি জীবিত মনে করাটা বোকামি তো বটেই সঙ্গে কোরানের বাণীকে অবিশ্বাস করার মতো অপরাধ নয় কী?

জীবিত স্বর্গে তুলে নেয়া বা ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাওয়া যিশু সম্পর্কিত ধারণাটি যে সম্পূর্ণ একটি মিথ্যা ধর্মীয় দর্শন তা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। হাজার বছরের আকাশ দাবড়ানো রহস্যময় যিশু আজ মানুষের সুস্থ জ্ঞান ও মুক্তচিন্তার কাছে রহস্যহীনভাবে বন্দি। এতে তাঁর সম্মান কিছু খর্ব হয় না বরং বাস্তবতার মাটিতে তিনি সম্পূর্ণ নতুনভাবে সত্যিকারের কালজয়ী নায়ক হিশেবে চিহ্নিত হন। যার তুলনা পৃথিবীতে কেবল তিনিই স্বয়ং। আমাদের দেশে একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে; পরিবারের কোনো সন্তানের যদি অকালমৃত্যু হয় তখন তার স্বজনরা আফসোস করে বলে, 'আল্লাহ্র মাল আল্লাহ তুলে নিয়েছেন।' বাস্তবে কিন্তু সেই 'মালটিকে' মৃত্তিকাতেই কবরস্থ করা হয়। তাহলে আল্লাহ্ কী করে তুলে নিলেন? এই তুলে নেয়াটাকেই কোরানে বারবার বলা হয়েছে ফিরে যাওয়া, ফিরিয়ে নেওয়া বা প্রত্যাবর্তন।

* তাঁরই (আল্লাহর) কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। ১০:৪
* হযরত মহম্মদ বলছেন, 'তাঁরই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন।' ১৩:৩০/৩৬
* আল্লাহ্র দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে। ২৪:৪২
* আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। ২৯:৮
* তোমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাবে। ৩০:১১
* অবশেষে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। ৩১:১৪
* অবশেষে তোমাদের প্রভুর কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। ৩৯:৭
* আমরা অবশ্যই আমাদের প্রভুর কাছে ফিরে যাবো। ৪৩:১৪

এ সমস্ত কথার মানে কী স্বশরীরে ফিরে যাওয়া বা তুলে নেওয়া? ইসলামি দর্শনে এটা মৃত্যু পরবর্তী আত্মাটাত্মার ব্যাপার। যা নাকি অদৃশ্য, অবয়বহীন। এই মানদণ্ডে কেবল যিশু সম্পর্কিত আয়াতের ভিন্ন মানে করা কী কোরানের স্ববিরোধী বক্তব্য হয়ে দাঁড়ায় না? আর কোরানের কোথায় লেখা আছে যিশু পুনরায়

পৃথিবীতে ফিরে আসবেন? শুকর ও ক্রাইস্টবিরোধীদের হত্যা করবেন, খেয়ে না খেয়ে সমস্ত ক্রুশ ভাঙবেন; কোথায় লেখা আছে এসব কোরানে? এসমস্ত বাজে কথা এলো কোথা থেকে? উত্তর : এসেছে হাদিস থেকে। হাদিসের তরিতরকারিতে হলুদ-মরিচ-গরমমশলা মিশিয়ে ধান্দাবাজ আলখেল্লাধারীরা যা খুশি পরিবেশন করলে আজো তা নির্দ্বিধায় গিলতে হবে নাকি? তাদের এ সমস্ত আজেবাজে খাদ্য তারা মানুষকে হজম করাতে গিয়ে এখন নিজেরাই হয়ে উঠেছে কোরানের বড়ো শত্র“। তারা যাচ্ছেতাইভাবে ডরভয় দেখিয়ে শিশুকাল থেকেই আমাদের ছেলেমেয়েগুলোর মুক্তচিন্তা ও মৌলিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয়। এর কেবল একটা সামান্য দৃষ্টান্ত এখানে দেয়া যাক।

অধিকাংশ মুসলিম বিশ্বাস করে তার মৃত্যুপরবর্তী কবরস্থ হওয়ার কিছুক্ষণ পরে সে আবার কবরে জীবিত হয়ে উঠবে ফেরেশতা বা যুগল দেবদূতের আগমনে। এবং শুরু হবে তার উপর সওয়ালজবাব ও শাস্তি বা নিপীড়ন। কিন্তু কোরানের কোথাও এই জীবিত হয়ে ওঠা বা কবর আজাবের কথা লেখা নেই। বরং কবরে মৃতের জীবিত হয়ে ওঠার কথা কোরানিক ভাষ্যে সম্পূর্ণ বাতিল। সেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে: 'মৃতেরা জীবিত নয়, প্রাণহীন, নির্জীব, তারা জানে না যে কখন আবার জেগে উঠবে' (১৬:২১)। 'মানুষ জানে না তাদের আবার কখন পুনরায় জীবিত করা হবে' (২৭:৬৫)। অন্যত্র কখন মৃতকে জীবিত করা হবে তার নির্দিষ্ট সময় বা কাল বলে দেওয়া হয়েছে এইভাবে : 'এরপরে অবশ্যই তোমরা মরবে, তারপর কেয়ামতের দিন পুনরায় তোমাদের জীবিত করে উঠানো হবে' (২৩:১৫-১৬)। অথচ কাঠমোল্লারা হাদিসের দোহাই পেড়ে এর উল্টো কথাবার্তা বলে বেড়ায়। তাদের কাছে কোরানের চে' হাদিস বড়ো বিষয়, কোরান হলো তোতাপাখির মতো সুর করে আবৃত্তি করার পুস্তক!

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা নিশ্চয় অপ্রসঙ্গিক হবে না যে, অধিকাংশ মুসলমান কেবল নয়, মক্তব-মাদ্রাসার শতকরা ৯৫ জন মুন্সি-মাওলানা ধর্মশিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেন-কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬। এ সংখ্যাটি ছেলেবেলায় মায়ের বেত্রঘাতের ভয়ে সকালে পাড়ার মসজিদে ওস্তাদজির কাছে ধর্মশিক্ষা লাভ করতে গিয়ে আমিও শিখেছিলাম। তোতাপাখির বুলি শেখাবার মতো ওস্তাদজি আমাদের তাই শিখিয়েছিলেন, 'আশমানি কিতাব পবিত্র কোরানের আয়াত সংখ্যা হইল ৬৬৬৬টা, বুঝলি। মনে রাখ্বি সবসময়।' বহু বছর আমিও তাই মনে রেখেছি। কিন্তু পরিণত বয়েসে পৌঁছে দেখলাম ছেলেবেলায় ওস্তাদজির শেখানো শিক্ষা ভুয়া। ভুল। কোরানের প্রকৃত আয়াত সংখ্যা হচ্ছে, ৬২৩৬ টি। অথচ এখনো মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষকরা শুধু নন, ইসলামি পণ্ডিত হিশেবে পরিচিত কোরান অনুবাদকদের অনূদিত কোরানে উল্লিখিত আছে আয়াত সংখ্যা-৬৬৬৬!

দৃষ্টান্ত-১.

বেঙ্গলি ট্র্যান্সেশন অব দ্য হোলি কোরান বাই প্রিন্সিপাল আলী হায়দায় চৌধুরী। হাদিয়া : দশ টাকা মাত্র। ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কের সৌজন্যে প্রকাশিত। ডিসেম্বর ১৯৬৮। প্রকাশক : রুহুল আমিন নিজামী, ৩/১০ লিয়াকত এভিন্যু, ঢাকা-১। ঝিনুক পুস্তিকার এই অনুবাদে কোরানে ১১৩ বিসমিল্লাহ্ সহ আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে ৬৩৬৭ টি। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, একটি মুসলিম সম্প্রদায় 'বিসমিল্লাহ্' কে আয়াত হিশেবে বিবেচনা করে। তাহলে সেই হিশেবে ৬৩৬৭ থেকে ১১৩ বাদ দিলে দাঁড়ায় ৬২৫৪ আয়াত। এটিও

ভুল। কোরানের সর্বমোট ১১৪ সুরার মধ্যে একমাত্র সুরা 'তওবায়' বিস্মিল্লাহ্ পাঠ করা হয় না। বাকি প্রতিটি সুরার পূর্বে 'বিস্মিল্লাহ্' একবার করে পাঠ করা হলেও অন্য একটি সুরায় 'বিস্মিল্লাহ্' দুইবার পাঠ করা হয়। সুরাটির নাম - 'নামল', সুরাটির শুরুতে এবং ৩০ নং আয়াতে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ১১৪ সুরার মধ্যে 'তওবা'য় বিসমিল্লাহ্ উচ্চারিত না হলেও ১১৪ বারই কোরান পাঠের সময় বিস্মিল্লাহ্ উচ্চারিত হয়।

উল্লেখিত মুসলিম সম্প্রদায়টি ছাড়া শিয়া, সুন্নিসহ অন্য কোনো মুসলিম সম্প্রদায় 'বিসমিল্লাহ্'কে কোরানের আয়াত হিশেবে বিবেচনা করে না। তাই দেখা যাচ্ছে প্রিন্সিপাল চৌধুরীর অনূদিত কোরানে বিসমিল্লাহ্কে আয়াত হিশেবে বাদ দিলে ৬২৫৪ সংখ্যাটিও ভুল।

অধ্যক্ষ আলী হায়দার চৌধুরী অনূদিত কোরানের মধ্যে আরো একটি মজার ব্যাপার হলো, তিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকারে বিভিন্ন মনীষীর নামের তালিকায় প্রথমই উল্লেখ করেছেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের নাম, কিন্তু তিনি তাঁকে সম্বোধন করেছেন, 'গিরিশ বাবু' বলে। এবং ভাই গিরিশ, যিনি কোরানের প্রথম বঙ্গানুবাদক, হায়দার সাহেব বলেছেন-তিনি তাঁর অনুবাদে ভাই গিরিশের ভাষান্তরেরও সাহায্য নিয়েছেন। অথচ সুরা ৫ এর ১১৭ নং আয়াতে যিশু সম্পর্কে ভাই গিরিশ যে 'শব্দটি' ব্যবহার করেছেন, অধ্যক্ষ সাহেব সেটিকে পাশ কাটিয়ে বা বাদ দিয়ে লিখেছেন- 'তৎপর তুমি যখন আমাকে লইয়া গেলে...'(পৃষ্ঠ-১৪৯)। কোথায় লইয়া গেলো?
সম্মানিত পাঠক, আমি সেটাও জানাবো, একটু ধৈর্য ধরুন।

দৃষ্টান্ত-২.

খোশরোজ কিতাব মহল, ১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মার্চ ২০০০ সংস্করণ-আরবীয় বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও শানে নুযূলসহ 'কোরআন শরীফ' এর মূল আরবীয় বঙ্গানুবাদ করেছেন ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, পিএইচডি (লণ্ডন), এম.এ. (ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট), বি.এ.(অনার্স), ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট, মুমতাযুল ফুকাহা (ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট), অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতি ক্ষেত্রে ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট এমন ইসলামি তারকা পণ্ডিত লোকটিও তাঁর ভাষান্তরিত কোরানে আয়াত সংখ্যা উল্লেখ করেছেন ৬৬৬৬। কিন্তু তিনি যখন 'মতান্তর' শব্দটি ব্যবহার করে আয়াতের সংখ্যা ৬২৩৬ লেখন তখন আমাদের মস্তিষ্কে চুলকানো সংশয়ের উদ্রেক হয়-তিনি কতোটা সাচ্চা! এরকম আরো ডজন ডজন দৃষ্টান্ত আমাদের গোডাউনে মজুদ আছে।

যাহোক, কোরান আর হাদিস; এই দু'এ মিলেই ইসলামি দর্শন। হাদিস হলো নকল-নকল-হদ্দ নকলের এক সম্ভার। যে গ্রন্থটির জন্যে মুসলিম সম্প্রদায় মরিস বুকাইলিকে নিয়ে গর্ব করে; তাঁর সেই 'দ্য বাইবেল দ্য কোরান এ্যাণ্ড সাইন্স' গ্রন্থে মরিস হাদিসকে ভেজাল, দূষণীয়, যা ঘটে নাই তার উপস্থিতি সমৃদ্ধ বিষয় বলে ঘোষণা করেছেন। সোজা কথায় প্রায় বাতিলের পর্যায়ভুক্ত করেছেন তিনি হাদিসকে। শোনা যাক তাঁর বক্তব্য।

মরিস তাঁর গ্রন্থের শুরুতে ইন্ট্র্যাডাকশনে বলছেন, 'বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের গসপেলগুলোর সাথে তুলনা করা যেতে পারে এমন ধর্মগ্রন্থ মুসলমানদেরও আছে। তাহলো তাদের হাদিসগ্রন্থ। হাদিস হলো মহম্মদের

কথা ও কাজকর্মের বিবরণ সমৃদ্ধ গ্রন্থ। যিশুর কথা ও কাজের বিবরণ হিশেবে যেমন নিউ টেস্টামেন্ট, হাদিস সেরকমই ধর্মগ্রন্থ। যিশুর অন্তর্ধানের কয়েক দশক পরে যেমন নিউ টেস্টামেন্টের গসপেলগুলো রচিত হয়েছিলো তেমনি হাদিসও রচিত হয়েছে মহম্মদের মৃত্যুর কয়েক দশক পরে। হাদিস ও গসপেল উভয়ের মধ্যে রয়েছে অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনার লোকমুখের বিবরণ। আজ অনুসন্ধানে একথা প্রমাণিত যে, সঠিক গসপেল হিশেবে বিবেচিত সেসবের লেখকরা কেউ লিখিত ঘটনা বা বিবরণের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। এ গ্রন্থের শেষান্তে আলোচিত হাদিসের ব্যাপারেও এই সত্য প্রযোজ্য।'

চলুন এবার মরিস বুকাইলি তাঁর গ্রন্থের শেষান্তে হাদিস সম্পর্কে কী বলেছেন তা আমরা সংক্ষেপে পাঠ করি[৭] –

> 'হাদিস শব্দের অর্থ হলো বক্তব্য বা উচ্চারণ। তবে প্রচলিত অর্থে মহম্মদের কর্মজীবনের বিবরণকেই হাদিস নামে আখ্যায়িত করা হয়।... সম্প্রতি মদিনার ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. মহম্মদ মোহসিন খান সম্পাদিত আরবি/ইংরেজির একটি দ্বিভাষি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে (যার প্রথম সংস্করণ হয় পাকিস্তানের গুজরানভালা থেকে ১৯৭১ যিশুসালে)। সত্যতা ও বিশ্বস্ততার দিক থেকে বুখারির হাদিসের স্থান কোরানের পরেই। ইসলামিক ট্র্যাডিশন নামের একটি সংস্থা থেকে (১৯০৩-১৯১৪) হুদাস ও মারকাইসের একটি বুখারি হাদিসের ফরাসি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যারা আরবি ভাষা জানেন না তারা এ অনুদিত হাদিস পড়ে দেখতে পারেন। তবে হাদিসের বিভিন্ন ভাষান্তরের ব্যাপারে পাঠককে সচেতন থাকতে হবে। কারণ ফরাসিসহ য়্যুরোপের অন্যান্য ভাষায় অনুদিত হাদিসে অসঙ্গত বক্তব্য ভরে দেয়া হয়েছে। এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এগুলো আসলে অনুবাদ নয়, ব্যাখ্যা। এছাড়া কোনো কোনো অনুবাদে হাদিসের আসল বক্তব্যের রদবদল তো করা হয়েছেই, সে সঙ্গে হাদিসে যা নেই তাও জুড়ে দেয়া হয়েছে হাদিসের নামে।
>
> 'মূল বা উৎসের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, মুসলমানদের হাদিস আর খ্রিস্টানদের নিউ টেস্টামেন্টের ফোর গসপেলস্ প্রায় একই ধরনের ধর্মীয় গ্রন্থ। নিউ টেস্টামেন্ট ও হাদিস রচয়িতাদের কেউই বর্ণিত ঘটনা বা বিবরণের প্রত্যক্ষদর্শী নন। কেবল তাই নয়, উভয় ক্ষেত্রে এসব রচনায় বর্ণিত ঘটনা ও বক্তব্যগুলো বিচ্ছিন্নভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ার বহু পরে সেগুলো সংকলিত হয়েছে। বাইবেলের গসপেলগুলোর মতো হাদিসগ্রন্থের ব্যাপারেও একথা সত্যি যে, এসবে বর্ণিত বা লিপিবদ্ধ সবকিছুই বিশ্বাসযোগ্য, প্রামাণ্য বা একদম সঠিক একথা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত নয়। হাদিসের ব্যাপারে যারা বিশেষজ্ঞ তাঁদের কাছে খুব অল্প সংখ্যক হাদিসই সঠিক হাদিস হিশেবে অনুমোদন লাভ করতে পেরেছে। এ কারণে আল-মুয়াত্তা, সহি মুসলিম এবং সহি আল-বুখারি ছাড়া বাকি হাদিসগ্রন্থে দেখা যায় সঠিক বলে পরিচিত হাদিসের নামে এমন সব হাদিস রয়েছে যেগুলো হয় জাল, নয়তো বাতিল।
>
> 'সহি মুসলিমকে যদিও সঠিক হাদিসগ্রন্থ বলে মনে করা হয়, তথাপি আমি আমার এই গবেষণায় সবচে' প্রামাণ্য ও সঠিক বলে বিবেচিত আল-বুখারিকেই বেছে নিয়েছি। এ কাজ করতে গিয়ে একটা কথা আমি সব সময় মনে রেখেছি যে, অনেক লোকের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এসমস্ত হাদিসগ্রন্থ সংকলিত হয়েছে মানুষেরই হাতে। প্রথম এ সমস্ত চালু ছিলো লোকমুখে। এসবের কোনো কোনো বর্ণনা কমবেশি সঠিক। আর যেগুলো সঠিক নয় সেগুলোর জন্যে দায়ী তারাই-যাদের মাধ্যমে এসকল হাদিস চালু ছিলো। এছাড়া এমন সব হাদিসও রয়েছে, যেসব হাদিসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা অনেক। এবং সেসব হাদিসের সত্যতা ও সঠিকতা সন্দেহজনক।

> 'আমি আমার এ রচনায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে বিভিন্ন হাদিসের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছি। এর আগে কোরানের বিভিন্ন আয়াত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব-তথ্য যেভাবে ব্যবহার করেছি, এ ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে ফল, তা মুখে না বলে দৃষ্টান্তসহ তুলে ধরা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে- আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে কোরানে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী যেখানে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে সেখানে হাদিসে বর্ণিত একই বিষয়ের তথ্যাবলী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে সত্য বা প্রামাণ্য হিশেবে দাঁড়াতেই পারছে না।...
>
> 'এমনও দেখা গেছে, কোনো কোনো বাণীর ব্যাখ্যা হিশেবে হাদিসের কোনো কোনো বাণীকে গ্রহণ করা হয়েছে। এবং হাদিসের সেই ব্যাখ্যা টেনে ব্যাখ্যাকারী বা ইসলামি পণ্ডিতরা কোরানের বিভিন্ন বক্তব্যের যেসব আলোচনা বা ভাষ্য রচনা করেছেন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে সেসব একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। ... এসব আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তই নেয়া চলে যে, হাদিসগ্রন্থগুলোতে এমন হাদিসও আছে যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করা যায় না। আর এসব হাদিস আসলেই সঠিক কিনা এ সন্দেহ থেকেই যায়।
>
> 'এই যে, দু'ধরনের (ইসলামি) ধর্মগ্রন্থ-কোরান ও হাদিস, এদের উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, সে পার্থক্য বা অমিলের ওপরই সবচে' বেশি গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। কোরান এবং হাদিসের মধ্যে এই যে অস্বাভাবিক ব্যবধান এটা কেবল ভাষা বা সাহিত্য-মানের দিক থেকে নয়; এ ব্যবধান বিষয়-বস্তুর দিক থেকেও উল্লেখ করার মতো। আসলে কোরানের ভাষা ও বচনভঙ্গির সঙ্গে হাদিসের ভাষা-বচনভঙ্গির তুলনা তো দূরের কথা, তুলনার কথা চিন্তাই করা যায় না। সবচে' বড়ো কথা, এ দু'ধরনের ধর্মীয় গ্রন্থের রচনাগুলো যখন যুক্তি ও বিজ্ঞানের দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়, তখন উভয়ের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য ধরা পড়ে; তা লক্ষ করে যে কেউ বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারবেন না। ...
>
> 'সত্যি কথা বলতে কি, মাত্র অল্প কিছু হাদিসেই মহম্মদের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণার সঠিক প্রতিফলন হয়েছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। বাদবাকি হাদিসে যেসব চিন্তা-ভাবনা ও বর্ণনার উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো অবশ্যই সেই যুগে প্রচলিত (লোক কাহিনী) বা সাধারণ মানুষের কল্পনা ছাড়া আর কিছুই না।'

ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে একটা ছবি ছিলো ঘোড়ার শরীর, নারীর মাথা আর পিঠে তথাকথিত পরীর পাখা লাগানো এক অদ্ভুৎ প্রাণীর। সেটি ছিলো কাপড়ে রঙিন সূতোয় বোনা হস্তশিল্প। আমার মায়ের হাতের সুচিকর্ম। সেই ছবিটা ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঘরের দেয়ালে লাগিয়েছিলেন বাবা। পরে জানতে পারি ছবির প্রাণীটির নাম- বোরাক। এরই পিঠে চড়ে নাকি হযরত মহম্মদ মি'রাজ গিয়েছিলেন। এবং চোখের পলকে সংঘটিত হয়েছিলো সেই যাত্রা। কিন্তু প্রাণীটিকে বাস্তবে পৃথিবীর কেউ কখনো দেখেছে বলে কোনো প্রমাণ বা উল্লেখ কোথাও নেই। তারপরও ওই প্রাণীর অদ্ভুৎ অবয়বের চিত্র মানুষের হাতে কী করে এলো এ প্রশ্নের জবাব সেদিন খুঁজে পায়নি আমার কিশোর-মগজ। তবে মানুষের ধর্মীয় কল্পনা যে কি সৃষ্টিছাড়া হতে পারে তথাকথিত বোরাকের ছবি আমাকে তা বুঝতে সাহায্য করেছে নিঃসন্দেহে! সেই ছেলেবেলা থেকেই । এখানে বোরাকের কথা বলছি শুধু এই কারণে; যেহেতু তারই সাহায্যে মহম্মদ উর্ধ্বলোকে গিয়ে অন্যান্য প্রফেটদের সঙ্গে (যাঁরা সকলেই মৃত্যুবরণ করেছেন, অথচ এখনো জীবিত বলে মনে করা) যিশুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন বলে হাদিস ও তফসির আমাদের কৌতূহল উদ্দীপক গল্প শোনায়। অথচ আমরা ওপরের আলোচনায় দেখেছি-কোরান একেবারেই স্বীকার করে না কোনো জীবিত মানুষের স্বর্গলোকে যাবার কথা। তাহলে ওখানে মৃত প্রফেটদের সঙ্গে জীবিত যিশুর উপস্থিতি কী কোরানের ভাষ্যকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করে না? আর মহম্মদের

মি'রাজ গমনের কথা কোরানের যে তিন জায়গায়[৮] উহ্যভাবে উল্লেখ আছে সেখানে তো কেবল একজন দেবদূত ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে মহম্মদের দেখা হওয়ার কথার উল্লেখ নেই। তাহলে মুসলিম সম্প্রদায় প্রথম কোরানের বাণী বিশ্বাস করবে না হাদিসের গল্প, এ প্রশ্ন কী ওঠে না? আর হাদিস যে কী জিনিশ তাতো আমরা মরিস বুকাইলির মুখে শুনলামই। আর ওই পাখা দাবড়ানো বোরাকের মতো কোনো প্রাণীর পিঠে চড়ে চোখের পলকে সপ্তাকাশ ভ্রমণ আজ বৈজ্ঞানিক বিচারে বাতিল বলে প্রমাণিত। এবং আজকাল আর ওই তথাকথিত বোরাকের ছবি কারো ঘরে দেখাও যায় না। মানুষ যেমন আজ বুঝতে পেরেছে ওই ঘোড়া-নারী-পরীমার্কা কিম্ভুত প্রাণীটি আসলে মানুষেরই কল্পনার ফসল তেমনি আগামীতে তারা ক্রমশ আজো প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাসের বহু ফাঁকি বুঝতে পারবে; এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত বলছি, আরবিয় ভূখণ্ডে উদ্ভুত দু'টি ধর্মশাস্ত্রেই আছে-পৃথিবী স্থির। তার নড়নচড়ন নেই। এককালে মানুষ বিশ্বাসও করতো এ কথা। সে সময় যাঁরাই এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন তাঁরাই পড়েছেন ধর্মীয় কোপানলে। কিন্তু একথা কী আজ আর কেউ বিশ্বাস করে যে, পৃথিবী স্থির? করে না। কারণ আজ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত-পৃথিবী স্থির নয়, ঘূর্ণায়মান। সেকেণ্ডে ১৬ মাইল বেগে আমাদের এই গ্রহ সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। আর সূর্য অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহকে নিয়ে ছুটে চলেছে আন্তঃনাক্ষত্রিক শূন্যতার মধ্য দিয়ে সেকেণ্ডে ৪২ মাইল গতিতে। তর্কের খাতিরে বললে বলা যায়, তবু মি'রাজ গমনে মহম্মদের একটি অবলম্বন ছিলো, কিন্তু বিনা অবলম্বনে যিশু সশরীরে স্বর্গলোকে গেলেন কোন্ অদৃশ্য পাখায় ভর করে?

এমন অনেক কল্পনাপ্রসূত ধর্মীয় বিশ্বাস বা তথাকথিত সত্য অসত্যে প্রতিপন্ন হয়েছে। হচ্ছে এবং হবেও। মুশকিল হলো, বিজ্ঞানে যেমন যাচাই-বাছাই, পরিবর্তন-পরিবর্ধন আছে; ধর্মে তা অনুপস্থিত। সে হলো ঠ্যাঁটা-মুরুব্বি। একেবারে অকাট্য, অভ্রান্ত, অপরিবর্তীত সত্যের পরাকাষ্ঠা। যা কিনা মানুষের মৌলিক বিকাশ, প্রকাশ, মুক্তচিন্তা ও মননশীলতার প্রধান অন্তরায়। আমরা মুক্তচিন্তার মানুষরা যখন শাস্ত্রীয় কোনো অসামঞ্জসের প্রশ্ন তুলি তখুনি আমাদের মুরতাদ, কাফের, নাস্তিক ইত্যাদি বলে শোর তোলা হয়। অথচ ধর্মপরায়ণ, আস্তিক বলে পরিচিত অসৎ লোকগুলো যখন কোরানের নামে মানুষকে মিথ্যে কথা বলে, তখন কেউ তাদের কিচ্ছুটি বলে না। তাদের বিরুদ্ধে কোনো শোর তোলে না। আমরা ওপরের আলোচনায় দেখেছি কোরানের কোথাও যিশুকে সশরীরে উর্ধ্বলোকে তুলে নেয়ার কোনো উল্লেখ নেই। অথচ এদেশে ইসলামি চিন্তাবিদ হিসেবে পরিচিত খাজা মোজাম্মেল হক এনায়েতপুরী তাঁর 'অনির্বাণ শিখা' নামক রচনায় যিশু সম্পর্কে লিখেছেন [৯],

> 'কোরানের বাণী অনুযায়ী তিনি কাতলিত (Creucified) হননি' (এতোটুকুই মাত্র সঠিক, কিন্তু তারপর তিনি বলছেন) 'বরং সশরীরে উর্ধ্বলোকে গমন করেছেন এবং বেহেশ্তে অবস্থান করছেন এবং শেষ জামানায় তিনি পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন।'

এটি একটি ডাহা মিথ্যাচার তাও আবার কোরানের নাম ভাঙিয়ে, যে কোরান মুসলিমদের কাছে প্রশ্নাতীত পবিত্র ও বিশ্বস্ত গ্রন্থ। এনায়েতপুরী তাঁর এই মন্তব্যের কোরানিক প্রমাণ হাজির করুন, কোনো হাদিস-টাদিস আঁটা তপ্পিমারা আলখেল্লা হাজির করলে চলবে না, সুস্পষ্ট কোরানের বাণী চাই। চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি তাঁকে। নয়তো তাঁকে 'মস্ত কাফের' এবং 'কোরান বিকৃতকারী' হিশেবে চিহ্নিত করা হোক, সঙ্গে সঙ্গে এই দাবিও রাখছি।

আজকাল আবার কিছু অর্ধশিক্ষিত চালিয়াত বিজ্ঞানের নাম ভাঙিয়ে কোরানের ভাষ্য বিকৃত করে নিজেকে মুসলিম পণ্ডিত জাহির করতে চায়। এমনি এক আদমের নাম মুহাম্মদ সাইফুল হক সিরাজী। জনৈক এ লোকটা ১৫.১০.০১ দৈনিক যুগান্তরের 'ইসলাম ও জীবন' এর পাতায় দাম্ভিক উচ্চারণ 'বিজ্ঞানকে পথ দেখিয়েছে মিরাজ' নামক রচনায় সৃষ্টিছাড়া সব কথাবার্তা বলে মানুষকে বোকা বানাবার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হযরত মহম্মদ নাকি রক্তমাংশের মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন নূর অর্থাৎ আলোর তৈরি! তাই সিরাজী তাঁকে আলোর গতির সঙ্গে তুলনা করে তথাকথিত বোরাককে নভোযান বলে তার মধ্য দিয়ে হযরতকে সপ্তাকাশে পাঠিয়েছেন। এ বিষয়ের বিরুদ্ধে অনেক কিছুই লেখা যায় এবং তাঁর বক্তব্যকে তুলোধুনো করে বাতাসেও ওড়ানো যায়। কিন্তু সেটা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি না। তিনি কেবল বলুন, বোরাক নামক ওই নভোযানটি কোন্ দেশের কোন্ বৈজ্ঞানিক কারখানায় তৈরি হয়েছিলো? উত্তরে ঈশ্বর-টিশ্বরের দোহাই পাড়লে চলবে না। কারণ বিজ্ঞানের মদদ যখন তিনি নিয়েছেন তখন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই তাঁকে দিতে হবে। একেবারে বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা। তিনি যে এ বিষয়ে কতোটা মহাপণ্ডিত তা তাঁর রচনা পড়লেই বোঝা যায়। তিনি বলেছেন, 'মুহাম্মদের (সাঃ) নূরের অংশ থেকে সৃষ্ট আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। মহানবীর (সাঃ) নভোচারণ ছিল বোরাকের সাহায্যে, যার গতির সঙ্গে সবকিছু অতুলনীয়। অতএব, বোরাকের গতি ও মুহাম্মদের (সাঃ) নিজস্ব গতির সমন্বিত ফল Resulten motion আরও অনেক গুণ বেশি হবে।'

ওরে সব্বোনাশ! তাঁর এই অলীক পাগলামোর কোরানিক প্রমাণ দেয়ার আগে আরেকটুখানি দেখা যাক লোকটা আরো কী ধরনের প্রলাপ বকেছেন। অন্য এক জায়গায় তিনি বলছেন, 'বিরুদ্ধবাদীদের অন্যতম যুক্তি হচ্ছে, জড়দেহ লইয়া নভোলোকে পৌঁছা অসম্ভব। কিন্তু কথা হচ্ছে, মুহাম্মদ (সাঃ) মানব ছিলেন বলে যে তার দেহ আমাদের মতো জড় উপাদান বিশিষ্ট ছিল তা তো নাও হতে পারে। বুনিয়াদ এক হলেও প্রত্যেক বস্তুর প্রকাভেদ তো আছে। কয়লা থেকে হীরক প্রস্তুত হয় এবং উভয়ই পদার্থ, কিন্তু তাই বলে কয়লা ও হীরক কি একই বস্তু? ।

'তাছাড়া সব পদার্থের ধর্ম যে সর্বত্র একই রূপ থাকে তা নয়। কাচ একটি জড় পদার্থ। বাধা দেয়া জড় পদার্থের ধর্ম। আমাদের দেহ তা ভেদ করতে পারে না, কিন্তু কোন আলোকরশ্মিকে সে বাধা দিতে পারে না। সসম্মানে তার জন্য নিজের দেহের ভেতর দিয়ে পথ ছেড়ে দেয়। আবার অনেক অস্বচ্ছ পদার্থের ভেতর দিয়ে সাধারণ আলো প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু যদি তাদের ওপর X-Ray করা হয়, তবে সে তা ভেদ করে চলে যায়।

'অতএব বলা যায়, মুহাম্মদ (সাঃ) জড়ধর্মী ছিলেন না। পদার্থের যা সার নেই জ্যোতি বা নূর থেকে মুহাম্মদের (সাঃ) সৃষ্টি। ফলে স্থূল দেহ নিয়েও তার পক্ষে আকাশ ভ্রমণ সম্ভব হয়েছিলো।'

তিনি একবার বলেন নূর, একবার বলেন স্থূল দেহ! আচ্ছা, তর্কের খাতিরে না হয় মানা গেলো মহম্মদ স্থূল দেহধারী হলেও পদার্থের গুণগত ভিন্নতার মতো তাঁর গুণগত মান ছিলো নূর। কিন্তু বিজ্ঞানের পরীক্ষায় নূর বা

আলোর গতিতে কোনো স্থূল দেহধারী ছুটতে পারে না, তথাকথিত ওই মান বা গুণই ছুটতে পারে। সে বিচারেও মহম্মদের স্বশরীরে মি'রাজ গমন বাতিল হয়ে যায়।
এরপর তিনি উপায়ান্তর না দেখে হাদিস হাতড়িয়েছেন। যেখানে মহম্মদ বলছেন, 'সর্বপ্রথম আল্লাহপাক আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। ... আমি আল্লাহ্র নূর এবং সমুদয় বস্তু আমার নূর থেকে সৃষ্ট। সুতরাং বলা যায়, মুহাম্মদ (সাঃ) যেহেতু নূরের তৈরি আর নূরের কোন ওজন নেই, সেহেতু তার পক্ষে আকাশ ভ্রমণ অসম্ভব বিরুদ্ধবাদীদের এই যুক্তিও ধোপে টেকে না।'

হযরত মহম্মদ যদি ওজনহীন নূরেরই তৈরি হয়ে থাকেন তাহলে বোরাক বা সে নামের নভোযানের প্রয়োজনটা হলো কী কারণে? অন্যদিকে কোরান মহম্মদকে পরিষ্কার রক্তমাংশের মানুষ বলেই ঘোষণা করে-

* বলো : আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ (৪১:৬)
* আমি তাদেরকে (প্রফেটদের) এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা খাদ্যগ্রহণ করতো না এবং তারা (কেউ) অমরও ছিলো না (২১:৮)

অন্যত্র ২৮ সুরার ৮৬ আয়াতে বলা হচ্ছে : আর তুমি (মহম্মদ) এমনটা আশা করোনি যে, তোমার প্রতি এ গ্রন্থ (কোরান) অবতীর্ন হবে।' এখানে প্রশ্ন হলো, যে ব্যক্তি পৃথিবী বা নিখিল বিশ্ব সৃষ্টির আগেই নিজের সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তিনি নিজের কাছে সৃষ্টিকর্তার গ্রন্থ অবতীর্ণ করার বিষয়টা পূর্ব থেকে জানবেন না কেনো? যদি জানতেনই তাহলে কোরানে কী উপরোক্ত কথার বর্ণনা থাকতো? এবং কোরানের কোথাও উল্লেখ নেই, ঈশ্বর সর্বপ্রথম, আদমেরও আগে মহম্মদের নূর সৃষ্টি করেছেন।

আর সিরাজীর মতো ইসলামি অতিপণ্ডিতরা 'নিশ্চয় তোমাদের কাছে আল্লাহর নূর ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে' বলে মহম্মদকে উদ্দেশ্য করে কথায় কথায় কোরানের যে বাণীর উদ্বৃতি দেন, সে নূর বা আলো মানে ব্যক্তি মহম্মদকে বোঝায় না। আরবের তদানীন্তন অন্ধকার যুগে তাঁর আবির্ভাবকেই সম্ভবত বোঝানো হয়েছে। আমরা যেমন অশিক্ষাকে দূরীকরণ লক্ষে আজকাল বলি, 'আলোকিত মানুষ চাই।' এর মানে কী সত্যি সত্যি আলো বা নূরের মানুষ বুঝতে হবে? কোরানের সেই আয়াতটিও রূপক অর্থে এরকম উচ্চারণকেই বোঝায় (৩:৭)। আর নয়তো কোরানের শিক্ষাকে বলা হয়েছে নূর। বিজ্ঞানের থিওরি কপচে ওসব নূরটুরের কথা বলে কোনো মানবকে অতিমানব করে দেখাবার চেষ্টাকে মানুষ এখন স্রেফ পাগলামো হিশেবেই বিবেচনা করতে শিখেছে।

এ নিয়ে আলোচনা আর দীর্ঘ করা অর্থহীন। মি'রাজ বিষয়টি হযরত মহম্মদ জীবিত থাকাকালীন সময় থেকেই একটি বিতর্কিত বিষয়। ইতিহাসে একথা লেখা আছে। মহম্মদ যখন মি'রাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাক্ষাত লাভের কথা তাঁর ভক্ত-শিষ্যদের কাছে প্রচার করেন তখন তাঁর ভক্ত-শিষ্যদের একটি বিরাট দল এর বিরোধীতা পোষণ করে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একথা সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত কোরানের তফসিরে উল্লেখ আছে। সেখানে আরো বলা হয়েছে: হাফেয ইবনে-হাজার আসকালনী তাঁর 'ফতহুল-বারী' গ্রন্থে মহম্মদের ভক্ত-শিষ্যদের এ মতবিরোধের উল্লেখ করে এমন কিছু উক্তি উদ্বৃত করেছেন যা দিয়ে মি'রাজ বিষয়ের বিতর্ক ও বিরোধের মীমাংসা হতে পারে। তিনি আরো বলেছেন, কুরতুবীর

মতে এ ব্যাপারে কোনো মীমাংসায় না যেয়ে নিশ্চুপ থাকাই উত্তম। কেনোনা মি'রাজ বিষয়টির সঙ্গে কোনো বাস্তবতা জড়িত নয়; বরং এটা বিশ্বাসগত প্রশ্ন।[১০]
তাই তো প্রাচীন কবি বলে গেছেন, 'বিশ্বাসে মিলায় হরি তর্কে বহুদূর।' বিশ্বাসে কোনো যুক্তি নেই। আর যেখানে যুক্তি নেই সেখানে কথিত সত্য প্রশ্নবিদ্ধ। যেমন যিশুর স্বর্গগমন ও অদ্যাবধি তাঁর সেখানে বর্তমান থাকার বিষয়টি। ওটা নিছক বিশ্বাস। ধর্মীয় রঙিন বিশ্বাস। সত্য নয়। রূঢ়, কঠিন বাস্তব নয়। বিশ্বাস। স্রেফ বিশ্বাস। এবং এই বিশ্বাসের রঙিন দোলায় যিশুকে নিয়ে হাজার হাজার তথাকথিত অলৌকিক গপ্পের জন্ম হয়েছে। আজো হচ্ছে। তেমনি ঠিক একইভাবে হযরত মহম্মদকে নিয়েও আজো যে কোরানিক দর্শনের বাইরে অবাস্তব কেচ্ছাকাহিনীর জন্ম হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত তো উপরোক্ত আলোচনায় ব্যক্ত হয়েছে।

কোরানের ভাষ্যানুযায়ী প্রত্যেক মানুষের জীবনের একটি নির্দিষ্ট সময় বা কাল আছে, তা পূর্ণ হওয়ার পরই তার মৃত্যু হয়। এবং কেয়ামত বা শেষ বিচারের দিন তাকে আবার পুনর্জীবিত করা হবে। সেই আলোকে যিশু সম্পর্কে কোরানের সুস্পষ্ট কিছু আয়াত-

> * ঈশ্বর বলছেন, 'হে যিশু, অবশ্যই আমি তোমার কাল পূর্ণ করবো'... ৩:৫৫।
> * যিশু বলছেন, 'আমার প্রতি শান্তি-যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন আবার জীবিত হয়ে জেগে উঠবো' ১৯:৩৩।
> * ঈশ্বর বলছেন, 'মেরির পুত্র মসিহ একজন পয়গম্বর ছাড়া কিছু নয়। তার পূর্বে অনেক পয়গম্বর গত হয়েছে' ৫:৭৫।

একই সুরার ১১৭ নম্বর আয়াতটি সবচে' তাৎপর্যপূর্ণ যিশুর ক্ষেত্রে। এটিতেই সুস্পষ্টভাবে তাঁর মৃত্যুর কথা ব্যক্ত হয়েছে। এখানে যিশুর ভাষ্যে বলা হচ্ছে,

> '...আর আমি তাদের ব্যাপারে সাক্ষী ছিলাম যতোদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। তারপর যখন তুমি আমার দেহচ্যুত করলে তখন থেকে তুমিই তাদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আর তুমি সকল বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞাত।'

এখানে অত্যন্ত লক্ষণীয় শব্দটি হচ্ছে 'দেহচ্যুত'। এর অর্থ মনে হয় না খোলসা করে বলার কোনো প্রয়োজন আছে। আমার সংগ্রহের বিভিন্ন অনুবাদকের অনুদিত ১৭টি বাংলা কোরানের মাত্র একটি সংস্করণে উল্লেখ আছে এই 'দেহচ্যুত' শব্দটি। সেটি সর্বপ্রথম বাংলা অনুদিত কোরান। অনুবাদকÑ ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। অনুবাদের জন্যে ইসলামি চিন্তাবিদগণ তাঁকে 'ভাই' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তাঁর অনুবাদের বিপক্ষে আজো পর্যন্ত কোনো কোরান বিশেষজ্ঞ কোনো প্রশ্ন তোলেননি। ভাই গিরিশচন্দ্রের হুবুহু অনুবাদটি হচ্ছে,'... আমি তাহাদের মধ্যে যে পর্যন্ত ছিলাম তাহাদের সম্বন্ধে সাক্ষী ছিলাম; পরে যখন তুমি আমাকে দেহচ্যুত করিলে তখন তুমিই তাহাদিগের সম্বন্ধে রক্ষক ছিলে, এবং তুমি সর্ব বিষয়ে সাক্ষী।'[১১] উল্লেখ্য কোরানের ভাষ্যানুযায়ী একথাগুলো যিশু শেষবিচারের দিন ঈশ্বর সমীপে বলবেন।

কোরানের সুরা ৩ এর ৫৫ আয়াতে যিশুকে তুলে নেয়ার বিষয়ে যে 'মুতাওয়াফিফ' আরবি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা 'তাওয়াফফা' শব্দ থেকে উৎপন্ন। আরবিতে যদি বলা হয়-'তাওয়াফফাল্লাহু ওয়াহিদান' তার অর্থ হবে- আল্লাহ ওয়াহিদের আত্মাকে উঠিয়ে নিলেন; অর্থাৎ ঈশ্বর ওয়াহিদকে মৃত্যু দিলেন বুঝতে হবে। যেখানে 'ঈশ্বর' কর্তৃবাচক হন এবং 'মানুষ' হয় কর্মবাচক এবং 'তাওয়াফফা' হয় ক্রিয়া, সেখানে 'তাওয়াফফার' অর্থ আত্মা বা রুহুকে তুলে নেওয়া বা মৃত্যুদান করা ছাড়া অন্য কোনো অর্থ কখনো হয় না। সমস্ত আরবি সাহিত্য ঘেঁটে এই শব্দের অন্য অর্থে ব্যবহারের একটি প্রমাণও পাওয়া যাবে না। এ শব্দটি কোরানের বিভিন্ন জায়গায় মোট পঁচিশ বার ব্যবহৃত হয়েছে। তেইশটি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে মৃত্যুর সময় আত্মাকে নিয়ে যাওয়া অর্থে। কেবল মাত্র দু'টি জায়গায় (৬:৬০/৩৯:৪২) ঘুমের মধ্যে আত্মাকে নিয়ে যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং সেই দু'জায়গায় 'ঘুম' ও 'রাত্রি' শব্দ দু'টি ব্যবহারের ফলে 'তাওয়াফফা' বিশেষত্ব লাভ করেছে বলতে হবে। ইবনে আব্বাস 'মুতাওয়াফিফকার' অনুবাদ করেছেন 'মুমিতুকা' অর্থাৎ- আমি তোমাকে মৃত্যু দেবো (বুখারি-কিতাবুত্তফসির)। অথচ অন্যসব কোরান অনুবাদকরা কেউই শব্দ দু'টোর প্রকৃত অর্থ তাদের অনুবাদে ব্যবহার না করে-তুলে নেওয়া, উঠিয়ে নেওয়া, গ্রহণ করা ইত্যাদি সব শব্দ ব্যবহার করে রহস্যের ধুম্রজাল সৃষ্টি করে রেখেছেন যিশুর মৃত্যু বিষয়ে! একই স্থানে এম. পিকথলও তাঁর ইংরেজি অনুবাদে শব্দটি ব্যবহার করেছেন অন্যদের মতো; যার অর্থ তুলে নেয়াই বোঝায়।

কিন্তু অবাক করা সবচে' মজার ব্যাপার হলো, সৌদির বাংলা কোরানের তফসিরের কোথাও যিশুর মৃত্যুকে স্বীকার করা না হলেও সুরা ৫ এর ১১৭ আয়াতটি পরিষ্কার ভাষান্তর করা হয়েছে এভাবে (পৃঃ ৩৬৪)-

> 'অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন' ।

এই সেরেছে!! যিশুর অমরত্বের জারিজুরি সব ভেস্তে গেছে। এটা কী হলো? হাজার মিথ্যের পর্দা ফেলেও আসল সত্যকে ঢেকে রাখা গেলো না, সে ঠিক বেরিয়ে এলো। সম্ভবত এ জন্যেই যিশু বাইবেলে বলেছেন, 'এমন ঢাকা কিছুই নেই যা প্রকাশ পাবে না, এমন গুপ্ত কিছুই নেই যা জানা যাবে না।' এবং কোরানের ঈশ্বর বলছেন, 'আকাশে ও ভূমিতে এমন গোপন কোনো বিষয় নেই যা এই সুস্পষ্ট শাস্ত্রে না আছে' (২৭:৭৫)। এখন বাংলা 'লোকান্তরিত" শব্দের অর্থ কী 'পরলোকগত' বা 'মৃত' থেকে বদলে অন্য কিছু করা হবে যিশুকে বাঁচিয়ে রাখতে; তাঁর অমরত্বের জন্যে? কিন্তু তাও সম্ভব না। কারণ কোরানে ঈশ্বর মহম্মদকে বলছেন,

> 'আমি তোমার পূর্বে কোনো মানুষকে অমরত্ব দান করিনি; সুতরাং যদি তোমার মৃত্যু হয়, তবে কী তারা অনন্তকাল বেঁচে থাকবে' (২১:৩৪)?

এরপরও যিশুকে কেউ বাঁচিয়ে রাখতে চাইলে ওয়াদা ভঙ্গকারীর অভিযোগে ঈশ্বরকে কী আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় না?

তথ্য নির্দেশ :

১. বাইবেল, ১ কোরিন্থিয়ান্স ১:২০-২৩
২. মাথিউস ১০:৩৪-৩৮/লুক ১২:৫১, ১৪:২৬
৩. মাথিউস ১০:৩৯
৪. লুক ১২:২-৩/মাথিউস ১০:২৬
৫. বাইবেল, কোরান ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, সা'দ উল্লাহ্, সময় প্রকাশন, বাংলাবাজার, ঢাকা, ০২.২০০০। পৃঃ ১১৮।
৬. মিথ্যা বিনাশী হযরত ঈসা (আঃ), রফিকউল্লাহ্, মল্লিক ব্রাদার্স, কলেজ ষ্ট্রিট, কলকাতা ২০০১। পৃঃ ৫৯
৭. The Bible The Qur'an and Science, Maurice Bucaille, Translated from the French by Alastair D. Pannel Crescent Publishing Co, Delhi-110006, 1985, P.242-248
৮. কোরান ১৭:১/১৭:৬০/৫৩:১৩-১৮
৯. দৈনিক বাংলার বাণী ১৮.০৬.১৯৯৫
১০. পবিত্র কোরআনুল করীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসির), সৌদি বাদশাহ্ ফাহাদ ইবনে আবদুল আজীজ কর্তৃক সৌদি থেকে প্রকাশিত। পৃঃ ১৩০৬
১১. কোরআন শরীফ, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অনুবাদিত, হরফ প্রকাশনী, কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭, ১৮২৯ শক.। পৃঃ ১৩৭

ডাঃ ওয়াহিদ রেজা বাঙলাদেশের প্রখ্যাত কবি ও কথাসাহিত্যিক। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী।

মানুষের পয়গম্বর হয়ে ওঠার সুলুক-সন্ধান

দীক্ষক দ্রাবিড়

ভূমিকা

ক্ষমতাবান সম্রাটরা আদিকালে নিজেকে ঈশ্বরই দাবি করতেন। জগতে সকল ক্ষমতা যার, প্রশংসা যার একক অধিকার, সিংহাসনে বসে মানব উদ্ধারের ক্ষমতার কল্পিত আস্বাদ পাওয়ার ইচ্ছা সেই পরাক্রমশালী নৃপতির হতেই পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত পৃথিবীর অনেক জাতি-গোষ্ঠী-দেশে দেশে সম্রাট/রাজাধিরাজরাই ঈশ্বরের চরিত্রে অভিনয় করে গেছেন। নিরীহ প্রজা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে নিজেদের ধন-প্রাণ নিবেদন করেছে সেইসব ঈশ্বরদের পদতলে। কিন্তু মানুষের সাকার দেহ, মরণশীল জীবন, আর সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে ঈশ্বরের পদ দীর্ঘদিন ধরে রাখা যায় নি।

তবু বিচিত্র জাতি-গোষ্ঠীর জন-মানবের উপর ছড়ি ঘুরানোর ক্ষমতা নির্বিঘ্ন রাখতে ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া ছাড়পত্র ছাড়া চলে কি করে? সুতরাং মানবের ইতিহাসে ঈশ্বরে পুত্র বলে নিজেদের দাবি করা লোকের সংখ্যাও একাধিক। তবে বাঘের বাচ্চার মত ঈশ্বরের বাচ্চা হয়ে ওঠার জৈব প্রক্রিয়া নিয়ে জনমনে সন্দেহের তালমিশ্রি জমাট বাঁধতে থাকলে এ পদ্ধতি ততটা জনপ্রিয়তা পায়নি। তাই খুব বেশি ঈশ্বরের পুত্রকে পায়নি মানব সমাজ।

ক্ষমতার বিপরীত প্রান্তে ছিল নির্যাতিতরা। ক্ষমতাবান শুধু সিংহাসনে বসেই নিজেকে ঈশ্বর কল্পনা করবে আর নিপীড়িতরা হাড়-চামড়া-সার হয়ে কল্পনাশক্তি হারিয়ে ফেলবে তাতো হয় না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সাহস করে ঘুরে দাঁড়ায়। তাদের অবশ্য সিংহাসন নেই রোমান বা মিশরীয় সম্রাটের মত। তারা তাই সম্রাট-ঈশ্বরের বিপরীতে নতুন ঈশ্বর বানানোর কায়দা আবিষ্কার করে। তারা ঈশ্বরের আবাস বানায় শূন্যে। সে ঈশ্বর চোখে দেয়া যায় না, সে ঈশ্বর মানুষের শরীর ধারণ করেন না; তার সিংহাসন মর্ত্যে নয়, তিনি আছেন ঊর্ধ্বলোকে। তিনি শুধু পরাক্রমশালী অশ্বারোহী বাহিনীর নির্দেশদাতা নন, তার নির্দেশে সূর্য ওঠে, তারপর সন্ধ্যা হলে ডুবে গিয়ে আশ্রয় নেয় তার আসনের নিচে। তার আসন এমনই বিশাল, তার ক্ষমতা এমনই বিপুল।

ক্ষমতাবান-ধনাঢ্যদের কাছে পৃথিবীর বিলাসী জীবন বড়, আর বড় সিংহাসনে বসে থাকা প্রতাপশালী সম্রাট। সম্রাটের ক্ষমতায় যে রয়েছে তাদেরও অংশীদারিত্ব। নির্যাতিত-নিঃস্ব-দরিদ্র সহায় সমম্বলহীন মানুষের

পৃথিবীতো নরকবাসের সময়। তারা তাদের স্বর্গ বানায় শূন্যে, সর্বশ্রেষ্ঠত্বের ক্ষমতা আরোপ করে গড়ে তোলে তাদের মূর্তি। কিন্তু মূর্তি গড়ে তুললেই সে মূর্তি শুধু আমার বলে দাবি করা যায় না। ক্ষমতাশালী সম্রাট বরং আরো জোরে-শোরেই সে নতুন মূর্তি স্বত্ব দাবি করতে পারে। সম্রাট তো আর সর্বময়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পৃথিবীর ক্ষমতার সিংহাসনে বসেননি। বরং তিনিই তো নির্বাচিত পৃথিবীকে শাসন করার জন্য। ঈশ্বর যদি ভালই বাসেন তবে তিনি তার পছন্দের মানুষগুলোকে নিঃস্ব করে বানাবেন কেন? বরং ঈশ্বরের করুণাপ্রাপ্তরা তো ইহ ও পরালোকে সমান ঐশ্বর্যশীল হওয়ার কথা।

কে হে তুমি, নিঃস্ব দরিদ্র, বংশ-গোত্র-নাম পরিচয়হীন ধর্মপ্রচারক? কিসের বলে, কিসের ভিত্তিতে তুমি দাবি করো তোমার সাথে শূন্যের ঈশ্বরের যোগাযোগ? কেন তোমাকে ঈশ্বর নির্বাচিত করবেন? তুমি ক্যাডা?

"আমিই প্রেরিত পুরুষ। ঈশ্বরের কোনো পুত্র-কন্যা নেই। আমি পয়গম্বর। অবিশ্বাসীদের পথে ফেরাতে ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন।" স্বঘোষিত পয়গম্বর বের করেন ঈশ্বরের দেয়া পাথরের খন্ড। এই যে তাতে খোদাই করা ঈশ্বরের দশটি নির্দেশ। নিপীড়িত মানুষরা আশ্বাস পেয়েও যাচাই করে নেয়ঃ

"কিন্তু সম্রাটকে ছেড়ে তোমার ঈশ্বরকে যদি আমরা মেনে নেই তবে কি তিনি সম্রাটের অত্যাচার থেকে আমাদের বাঁচাবেন? সব সময় তোমার সাথে থাকবেন? তোমার ঈশ্বর আবার সম্রাটের দলে ভিড়ে যাবেন নাতো?"

পয়গম্বর কণ্ঠ তীব্র করেন যাতে তাকে সম্রাটের চেয়েও ক্ষমতাশালী মনে হয়। তিনি জানান, ঈশ্বর আমার সাথেই থাকবেন। তেমনই কথা হয়েছে। তার সাথে আমার প্রায়ই কথা হয়। তোমাদের কথাও আমি তাকে জানাতে পারি।

নিপীড়িত মানুষ আশান্বিত হয়। পয়গম্বর সম্রাট না হোক, ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র না হোক, শূন্যের ঈশ্বরের সাথে তার নিয়মিত কথা হয়। তিনি তার প্রশ্নের উত্তর দেন। "সম্রাটের শোষণ-শাসন থেকে বাঁচবার জন্য এই 'পয়গম্বর'ত্ব দাবি করা লোকটির ওপর আমরা ভরসা করতে পারি'। সমর্থকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। পয়গম্বর তাদের আশার কথা শোনান, আশ্বস্ত করেন। কিন্তু তারা প্রশ্ন তোলে, তুমি কি তোমার ঈশ্বরকে দেখেছ? পয়গম্বর এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। শূন্যের ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে তিনি জানান, ঈশ্বর আমাকে দেখা দিয়েছেন।

“ঈশ্বর আপনাকে দেখা দিয়েছেন! তাহলে সত্যি সত্যি আকাশে ঈশ্বর আছেন। তিনি আমাদের রক্ষা করবেন সম্রাটের অবিচার থেকে!”

“নিশ্চয়ই তিনি তা করবেন। তার সাথে আমার তেমনই কথা হয়েছে।”

যাদের কিছুই ছিল না, না ধন, না ক্ষমতা, না সাহস, না রুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা তারা অকস্মাৎ সব পাওয়ার খুশিতে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তাদের সাথে আছে শূন্যের ঈশ্বর। সে ঈশ্বরের পতাকা নিয়ে তারা খালি হাতে, নাঙা (নগ্ন) পায়ে, উদোম বুকে লড়াই করবে সম্রাট ঈশ্বরে বিরুদ্ধে। তাদের সাথে থাকবেন শূন্যের ঈশ্বর আর তার অদৃশ্য দেবদূতগণ।

পয়গম্বরের গাল-গল্পে বিশ্বাসী লোকদের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। কিন্তু আর সব সাধারণ মানুষের মত মানুষ পয়গম্বর তার শূন্যের ঈশ্বর আর দেবদূতের সাহায্য নিয়েও নিঃস্বদের নির্যাতনের সমাপ্তি ঘটাতে পারেন না। সুতরাং লক্ষ লক্ষ পয়গম্বর জন্মাতে থাকে আরবের ঊষর ভূমিতে। নিজেকে পয়গম্বর দাবি করা তখন তরুণ আরবদের হাল ফ্যাশন। আজকাল যেমন তরুণরা মডেল সাজে, নায়ক হয়, তখন যুবারা হতো পয়গম্বর (ব্যতিক্রম আছে একালের নায়কদের মধ্যে, নায়করাও কেউ কেউ পয়গম্বর হতে চান, যেমন হলিউডের টম ক্রুজ)।

কিন্তু পয়গম্বর হওয়ার তরিকা কেউ কাউকে জানান দেন না। না ঈশ্বর তার ঐশিগ্রন্থে না পয়গম্বর তার বাণী ও নির্দেশে, কোনভাবেই জানা যায় না, কী প্রকারে একজন মানুষ হয়ে উঠতে পারে পয়গম্বর, নবী, প্রেরিত পুরুষ। কি যোগ্যতায় সে পেয়ে যায় আকাশের ঈশ্বরের লেখা বইয়ের নতুন নতুন সংস্করণ?

কী প্রকারে মেষের রাখাল, গোয়াল-নন্দন শুধু নিজের উচ্চারণের জোরেই, শুধু নিজের সাক্ষ্যেই হয়ে যান পয়গম্বর। মানুষ থেকে পয়গম্বর হয়ে উঠার পদ্ধতিটা না জেনে পয়গম্বরকে ‘রূপকথার রূপকার’ বলা যায় না কিছুতেই। প্রশ্ন তাই, তরিকাটা কী?

আদিম সমাজে পয়গম্বর

আদিম সমাজগুলোতে নির্যাতিতদের কেউ একজন প্রতিবাদ করে উঠতো। তার জাতি-গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করতো, শোষকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে নতুন ধর্মের ডাক দিতো। সেই সাহসী মানুষ অস্বীকার করতো শাসকের ধর্মকে। নিজেকে সম্পর্কিত করে তুলতো ঈশ্বরের সাথে; হয় ঈশ্বর-পুত্র নয় পয়গম্বর হিসেবে দাবি করতো নিজেকে। পয়গম্বরদের ইতিহাসগুলোর সরলীকরণ করলে এই আমরা পাই। এ কথাগুলোই ভূমিকায় বর্ণনা করা হয়েছে। এই সরলীকরণে অনেকেই আপত্তি করবেন। কতটা ইতিহাস সিদ্ধ এ প্রস্তাবনা?

সমস্যা এই ইতিহাসেই। ইতিহাস কোথায় পাওয়া যায়? কে লিখবে ইতিহাস? ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ১৯৯১-তেই পাওয়া যায় নানা বিভ্রান্তিকর তথ্য। আর পৌরাণিক ইতিহাসের সত্যাসত্য নির্ধারণ করার উপায় কী? প্রধান প্রধান পয়গম্বরদের সত্যিকার ইতিহাস পাওয়া দুরূহ (ড্যান ব্রাউনের দ্য ভিঞ্চি বা জন ক্যামেরনের কফিন আবিষ্কারের কথা ভাবুন)। এসব ইতিহাস থেকে পয়গম্বরদের উত্থানকে বুঝতে গেলে সমস্যা দেখা দেয় অন্ততঃ তিন রকমের; ক) অনুসারীরাই মূলতঃ পয়গম্বরের জীবনেতিহাসের প্রথম বয়ানকারী। সুতরাং সেগুলো পক্ষপাতদুষ্ট, ফোলানো-ফাঁপানো, মিথিক্যাল। খ) অনগ্রসর জাতি-গোষ্ঠীর পক্ষে এসব ইতিহাস সংরক্ষণ করা সম্ভব ছিল না। সঠিক ঐতিহাসিক বয়ান পাওয়া যায় না, জবাব পাওয়া যায় না অনেক প্রশ্নের, একারণেই। গ) পরবর্তীকালে আসা অন্য কোনো ধর্মের ষাঁড়দের দ্বারা বা পরাক্রমশালী সম্রাটের বাহিনীর দক্ষযজ্ঞে ইতিহাসের অনেক চিহ্নই ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং পয়গম্বরদের প্রকৃত জীবনী এখন আমরা আর ঠিকঠাক জানতে পাই না।

সুতরাং মানুষের পয়গম্বর হওয়া বুঝতে এমন একজনকে বেছে নেয়া উচিত যার সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। পক্ষ-বিপক্ষের অনেকগুলো সূত্র থেকে তার তথ্য যাচাই করা যায় এরকম একজন পয়গম্বরকে এখানে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করতে চাই। কয়েকটি কারণে এই উদাহরণ আমাদেরকে পয়গম্বরত্ব লাভ সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা দেবে:

এই পয়গম্বর আধুনিককালের হলেও অনগ্রসর সমাজের সদস্য। বর্তমান সময়ের অনগ্রসর সমাজের মানুষের আচার-আচরণ থেকে আমরা সহজে সভ্যতার ঊষালগ্নের মানুষের সমাজব্যবস্থা একটা স্পষ্ট ধারণা পেতে পারি।

আধুনিক সময়ের বলে তার সম্পর্কে তথ্যের ঘাটতি নেই।

পয়গম্বর হিসেবে তিনি তার সমাজ-জাতিকে কাংক্ষিত মুক্তি এনে দিতে পারেননি। পয়গম্বর হিসেবে তার এই ব্যর্থতা পৃথিবীর প্রতিষ্ঠিত ২/৩টি ধর্ম বাদে বাকী বিপুল সংখ্যক ব্যর্থ পয়গম্বরদের সম্পর্কে অনুমান করতে সাহায্য করবে।

পয়গম্বরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আমাদের আলোচ্য এই পয়গম্বর জন্মেছিলেন উত্তর আমেরিকায়। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর দিকের কথা। ইউরোপ থেকে সাদা চামড়ার লোকেরা দলে দলে এসে তখন দখল করে নিচ্ছে উত্তর আমেরিকার বিস্তীর্ণ প্রান্তর। পয়গম্বরের জাতির জন্য নেমে এসেছে চরম দুর্দিন। তারা তখন বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত, দলাদলিতে লিপ্ত, কেউবা ইউরোপিয়ানদের দালালিতে রত। ইউরোপিয়ানদের আনা মদ ও সস্তা চাকচিক্যময় ভোগ্যপণ্যের মোহে পড়ে (রেড) ইন্ডিয়ান জাতির অনেকেই তখন বিভ্রান্ত। সাদা চামড়ার লুটেরাদের হাতে তখন তারা নির্যাতিত হচ্ছে, আটকা পড়ছে, হয়ে পড়ছে দাস। এসময় রেড ইন্ডিয়ানদের মাঝে একজন জেগে উঠলেন, তার নাম টেকুমসে। তিনি বললেন, "মহান ঈশ্বর হচ্ছেন আমার পিতা। এই মাটির পৃথিবী আমার মা"। তিনি বললেন, এই মাটি সমষ্টিগতভাবে সব রেড ইন্ডিয়ানদের সম্পত্তি। একক কোনো মালিক নেই এই মাটির। কেউ চাইলেই ব্যক্তিগতভাবে এর কোনো অংশ বিক্রি কররে পারে না। টেকুমসে'র এই ঘোষণা উপনিবেশকারীদের রাষ্ট্রদখলে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ালো। যুদ্ধ লাগলো সাদা চামড়ার ইউরোপিয়ানদের সাথে ভূমিপুত্রদের।

টেকুমসে' এখানে নির্যাতিত মানুষের নেতা, সাহসী যোদ্ধা। যদিও তিনি ঘোষণা দিয়েছেন পরম ঈশ্বরের তিনি পুত্র তবু তিনি পয়গম্বর ছিলেন না। তেমন দাবিও তিনি করেননি।

পয়গম্বর ছিলেন টেনসকাওয়াতাওয়া (তার নামের মানে, যিনি দরজা খুলে দেন, 'হি হু ওপেন্স দ্য ডোর'।) তিনি ছিলেন সাহসী যোদ্ধা টেকুমসে'র ছোট ভাই। টেনসকাওয়াতাওয়া (১৭৭৮-১৮৩৭) ছিলেন শাওনি নৃগোষ্ঠীর সদস্য। পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা অবশ্য তার চরিত্রে নানা কালি-ঝুলি মাখিয়েছেন। তাকে চিহ্নিত করেছেন ভন্ড, প্রতারক, মাতাল হিসেবে। তবে সব পয়গম্বরদের ক্ষেত্রেই এরকম মানহানির আর ষড়যন্ত্রের ঘটনা ঘটেছে। তার জীবনী পাঠ করলে মানুষ কীভাবে পয়গম্বর হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে আমরা একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাবো। এই পাঠ থেকে আমরা এও বুঝতে পারবো আদিকালে কেন গন্ডায় গন্ডায় জন্ম হতো পয়গম্বর আর আত্মার।

টেনসকাওয়াতাওয়ার মানুষ থেকে পয়গম্বর হয়ে ওঠাটা খুবই মিথিক্যাল। একবার কিছু লোক তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে। তারপর তিনি মারা গেছেন ভেবে তাকে ফেলে যায়। পরদিন চেতনা ফিরে পেয়ে টেনেসকাওয়াতাওয়া জানালেন যে, মৃত্যুর পর দেবদূতরা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বর তার হৃদপিন্ড খুলে পরিষ্কার করে তাকে আবার পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে নবীন পয়গম্বর তখন আহ্বান জানালেন রেড-ইন্ডিয়ান জাতির ঐক্যের। বললেন সাদারা হচ্ছে শয়তান, ওদের সমস্ত আচার-আচরণ শয়তানী, ওদের হুইস্কি শয়তানের পানীয়। যারা সাদাদের দলে গেছে তাদেরকে প্রায়শ্চিত্ত করে ফিরে আসার আহ্বান জানালেন তিনি। তারপর তিনি নিজেই গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে সে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে শুরু করলেন।

কিন্তু তার বেশিরভাগ জাতভাইরাই তাকে বিশ্বাস করলো না। তারা তাকে বিকৃত মস্তিষ্ক হিসেবে চিহ্নিত করল। তাকে মিথ্যাবাদী, পাগল ও অসৎ বলে গালাগালি করল। অবিশ্বাসীদেরকে পয়গম্বর তখন একটা যুদ্ধ করার লাঠি দেখিয়ে তা মাটি থেকে তুলতে বললেন। বিখ্যাত যোদ্ধা বড়ভাই টেকুমসে সেই লাঠি মাটি থেকে উঠাতে ব্যর্থ হলেন। তারপর একে একে গোত্রের সবাই যখন সেই লাঠি তুলতে ব্যর্থ হলো, তখন তারা মেনে নিলো টেনসকাওয়াতাওয়া ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ। পয়গম্বর তখন কানাডা থেকে শুরু করে মেক্সিকান উপসাগর পর্যন্ত উত্তর আমেরিকার বিরাট অঞ্চলে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রে বিভক্ত রেড-ইন্ডিয়ান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নির্দেশনা দিলেন। তাদেরকে জানালেন ঈশ্বরের পবিত্র আদেশ।

পয়গম্বর ও তার যোদ্ধা বড় ভাই মিলে ফোর্ট গ্রিনভিলে সাদাদের প্রভাবমুক্ত এক শহরের পত্তন করলেন। যার নাম হলো পরবর্তীতে 'প্রফেটস্ টাউন'। পয়গম্বরের নগর। তিনি তখন রেড-ইন্ডিয়ানদের বিভিন্ন রাজ্যে যাচ্ছেন, সেগুলোকে সাদাদের শয়তানীমুক্ত করছেন ঈশ্বরের নির্দেশ অনুযায়ী, আর দলে দলে রেড-ইন্ডিয়ানরা তার ধর্ম বরণ করে নিচ্ছে। ইন্ডিয়ানার গর্ভনর উইলিয়াম হ্যারিসন (পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট) পয়গম্বরের এই অগ্রযাত্রায় প্রমাদ গুণলেন। কারণ পয়গম্বর ইতোমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছেন ইন্ডিয়ানা, ইলিওনয়, মিশিগান ও উইসকনসিনে যে ভূমি কিনেছেন বলে গর্ভনর দাবি করছেন তা ধর্মবিরুদ্ধ।

গর্ভনর তখন দেশবাসীকে হুশিয়ার করে সংবাদ পাঠাতে শুরু করলেন যে, টেনসকাওয়াতাওয়া একজন জোচ্চোর, প্রতারক, একজন ভন্ড পয়গম্বর। ডেলওয়ারের অধিবাসীদের পরামর্শ দিলেন হ্যারিসন যে, টেনসকাওয়াতাওযা যদি সত্য পয়গম্বর হবেন, তবে কোথায় তার স্বর্গীয় ক্ষমতা।

"তাকে বলো যে, তার ক্ষমতা থাকলে সূর্যকে থামাতে, চাঁদের গতি পরিবর্তন করতে, নদীর স্রোতধারা বদলে দিতে, মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে তুলতে। তবেই না মানবো সে সত্যিকার পয়গম্বর।"

হ্যারিসনের এই চ্যালেঞ্জে দমে গেলেন না টেনসকাওয়াতাওয়া। তার ভাই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে নিষেধ করলেন তাকে। পয়গম্বর শুধু আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে বললেন, সদাপ্রভু তুমি তোমার ধর্মকে জয়ী করো। তোমার পয়গম্বরকে জয়ী করো। তারপর পয়গম্বর হ্যারিসনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। পয়গম্বর জানালেন ১৮০৬ সালের ৬ জুন তারিখে তিনি সূর্যকে গ্রিনভিলের আকাশে থামিয়ে দেবেন।

যার নির্দেশে সূর্য থেকে গেল আকাশে

পয়গম্বরের জানানো তারিখ ও সময়ে বিপুল সংখ্যক জনতা জড়ো হলো পয়গম্বরের ঐশি ক্ষমতা নিজ চোখে দেখতে। পয়গম্বরের ইশারায় সূর্য থেমে গেলো আকাশে। গ্রিনভিলের মানুষেরা দেখলো এক নাটকীয় সূর্যগ্রহণ। পয়গম্বরের সত্যতা নিয়ে রেড-ইন্ডিয়ানদের আর কারো মনেই কোনো সন্দেহ রইলো না। তার জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগলো, সাথে ধর্মানুসারীদের সংখ্যা। শুধু যুক্তরাষ্ট্রের সাদা বাসিন্দারা সন্দেহ প্রকাশ করে বললো, কোনোভাবে টেনসকাওয়াতাওয়া আগেভাগে জেনে গিয়েছিলেন সূর্যগ্রহণের কথা। তার এসবই ভন্ডামি। কিন্তু দলে দলে তীর্থযাত্রীরা আসতে শুরু করলো পয়গম্বরের গ্রামে। আর তিনি তার ঐশি ক্ষমতায় তাদের রোগ-শোক দূর করে দিতে থাকলেন মুর্হূতের মধ্যে।

ঈশ্বরের নির্দেশে পয়গম্বর তার জাতিকে আলো ও সত্যের পথ দেখান। সাদাদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধে তিনি ও তার বড়ভাই সাফল্যের সাথে নেতৃত্ব দেন। কিন্তু ১৮১৩-তে টেমসের যুদ্ধে যখন বড়ভাই টেকুমসে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হ্যারিসনের হাতে নিহত হলেন তখন মনোকষ্টে পয়গম্বর তার অনুসারীদের নিয়ে হিজরত করলেন কানাডায়।

অন্যদিকে হ্যারিসন ১৮৪০-এ নির্বাচিত হলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। কিন্তু তাতে কি? পয়গম্বরের অভিশাপ তো ছিলই। দায়িত্বগ্রহণের মাত্র একমাসের মধ্যে পরাক্রান্ত সেনাপ্রধানকে আক্রমণ করলো সামান্য ঠান্ডাজ্বর এবং তাতেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। তিনিই যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট যিনি ক্ষমতায় থাকতেই মারা যান। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। পয়গম্বরের অভিশাপ (!) বিশ বছর পর পর আমেরিকার প্রেসিডেন্টরা এভাবে ক্ষমতায় থাকতেই দেখলেন মৃত্যুর মুখ। ১৮৬০/১৮৮০/১৯০০/১৯২০/১৯৪০/১৯৬০ এই বছরগুলোতে নির্বাচিত হওয়া প্রেসিডেন্টরা গদিতে থাকতেই মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৮০-তে রোনাল্ড রিগ্যান যখন আততায়ীর গুলি খেয়েও বেঁচে গেলেন তখন যুক্তরাষ্ট্রবাসী হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলো এই বলে যে পয়গম্বরের অভিশাপ থেকে হয়তো মুক্তি পাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র!

প্রেসিডেন্ট হ্যারিসনের মৃত্যুর আগেই দেশে ফিরে এসেছিলেন পয়গম্বর। ১৮৩৭-এ তার তিরোধানের আগে তিনি বিশ্বাসীদের শুনিয়ে গেছেন ঈশ্বরের আশ্বাস বাণী।

"অবশ্যই একদিন পয়গম্বরের মাতৃভূমি মুক্ত হবে সাদাদের শোষণ-শাসন থেকে"। পয়গম্বরের তিরোধানের পর তার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আরো অনেকে নিজেদের ঐশি ক্ষমতার কথা দাবি করেছে। কিন্তু তারা কেউ জাতিকে মুক্তি এনে দিতে পারেননি, ঐক্যবদ্ধও করতে পারেননি।

পয়গম্বর ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন যে, তারপর এক মহিলা নবী আসবেন, কিন্তু তাকে হত্যা করা হবে। এবং একজন বালক নবী আসবেন এবং রেড-ইন্ডিয়ান জাতির উচিত সেই বালক নবীর কথা শোনা। তার অনেক ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য হয়েছে। তিনি বলেছিলেন হটকাগারা উপজাতি তাদের মুখের ভাষা লিখতে সক্ষম হবে। পরে তা সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, এমন একদিন আসবে যেদিন বৃক্ষ তার শেকড় থেকে মুক্ত হবে এবং পৃথিবী ভ্রমণ করবে। যেদিন তার জাতভাইরা দেখলো পাহাড়ের বৃক্ষকে মানুষ শেকড় থেকে আলাদা করছে এবং ট্রেনে বা জাহাজে করে নিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে সেদিন তারা বেদনায় অশ্রু ফেললো। তাদের পয়গম্বর কত প্রজন্ম আগে তাদেরকে এসব কথা আগাম জানিয়ে গিয়েছিলেন।

তাদের পয়গম্বরের বাকী কথাগুলোও সত্যে পরিণত হবে এই আশায় এখনও বুক বেঁধে আছে রেড-ইন্ডিয়ান জাতির বিশ্বাসীরা। এখনও তারা ছোঁয় না সাদাদের হুইস্কি, প্রেমে পড়ে না সাদা নারীর। ঘরে পোষে না সাদাদের আনা ইউরোপের কুকুর ও বেড়াল। এখনও তারা স্বপ্ন দেখে বালক নবীর। যে তাদের মাটিকে স্বাধীনতা এনে দেবে, মুক্ত করবে সাদা দস্যুদের হাত থেকে।

না-দেখা ঈশ্বরকে অস্তিত্ব দিয়েছেন পয়গম্বররা

মানুষের কখনও না-দেখা ঈশ্বরকে অস্তিত্ব দিয়েছেন পয়গম্বররা। তারা দাবি করেছেন বিশ্ব ব্রহ্মান্ড ঈশ্বরের সৃষ্টি - চাঁদ, সূর্য, পাহাড়, সাগর, বাতাস, রোগ-জীবাণু, এমনকি শয়তান ও ভূত-প্রেত- এবং যদিও সৃষ্টিগুলোকে আমরা দেখতে পাই, অনুভব করতে পারি, তবু ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে পয়গম্বর লাগে। মানুষ একা একা পারে না। মানুষের যুক্তি-বুদ্ধি পারে না, মানুষের বিজ্ঞান পারে না। কোনো কোনা মানুষ শুধু পয়গম্বর হয়ে ওঠে আর তাদের সাথে ঈশ্বরের দেখা হয়ে যায়, কথা হয়ে যায়। আমরা পয়গম্বরে আস্থা এনে পুরনো জপমালা বদলে বাজার থেকে কিনে আনি নতুন ধরনের তসবিহ।

ঈশ্বর তার অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে কতিপয় পয়গম্বর ছাড়া - কাউকে গ্রন্থসহ, কাউকে গ্রন্থছাড়া, বেশি কিছুই পৃথিবীতে পাঠাতে পারেন না। সেসব পয়গম্বররা, কুষ্ঠরোগীকে রোগমুক্ত করে দেওয়ার, চাঁদকে আঙুলের ইশারায় ভাগ করে দেয়ার, সূর্যকে মাঝ আকাশে থামিয়ে দেয়ার, সাগরের মাঝ বরাবর পথ করে হেঁটে যাওয়ার, দেবদূতের সঙ্গে ঊর্ধ্বাকাশে উড়াল দেয়ার, বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়ে ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রমাণ দেখান পৃথিবীতে। ঈশ্বর তার ক্ষমতার, তার অস্তিত্বের তেমন প্রমাণ দেখাতে পারেন ততটা যতটা পারেন পয়গম্বররা। ইতিহাস তো তাই বলে। কিছু অনুসারীরা হয়তো দেখে, তবে অধিকাংশ লোক না দেখেই, পয়গম্বরের ক্ষমতার বর্ণনা শুনে মুগ্ধ হয়ে তার ধর্মকে, তার ঈশ্বরকে, তার গ্রন্থকে বিশ্বাস করে। তারপর কবুল করা ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে পৃথিবী জুড়ে ভিন্নধর্মেও, বিধর্মীদের মু-ুপাত করে।

পয়গম্বর মুসা তার জাতিকে জানান যে, পাহাড়ে তার সাথে ঈশ্বরের কথা হয়; ঈশ্বর যদি তার সাথে কথা কইতে পারেন তবে অন্যের সাথে কইতে অসুবিধা কী? অতঃপর অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর বৃষ্টি-বাদলের রাতে ঈশ্বর নবী মুসাকে দেখা দেন - ঈশ্বর আগুনের তৈরি, তাই পাহাড় পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুন কি শুধু মুসাই দেখতে পেতেন সেই কালে, আর কেউ পেত না? তবে ঈশ্বর সেই কালেও আর কারও সামনে আসেন না। দুই খন্ড পাথর দেন তিনি নবী মুসাকে। সেই পাথর খ-ে ঈশ্বর নিজ হাতে লিখে দেন দশটি নির্দেশনামা। একটি পাথর ভেঙে যাওয়ার পর ঈশ্বর আবার নতুন করে মুসাকে আরেকটি পাথর দেন। সেসব গল্প আমরা শুনি। কিন্তু পাথর খন্ডগুলো আর পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাই না। ঈশ্বরের চাঁদ, ঈশ্বরের সূর্য তেমনই আছে, কিন্তু তার স্বহস্তলিপি, তার নির্দেশনামা লেখা পাথরখন্ড দু'টি পৃথিবী থেকে উধাও হয়ে যায়, কি বিস্ময়কর।

যেসব মানুষ এরকম পয়গম্বর হয়ে ওঠেন, তাঁরা ঈশ্বরের সাথে তাদের সোল এজেন্সির এমন সব গল্প-গাঁথা ছড়িয়েছেন, তা শুনে আমরা শিহরিত হই, কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারি না। ঈশ্বর কি তবে শুধু পয়গম্বরদের? কেন ঈশ্বর মানুষের কাছে আসতে পারেন না, জনে জনে নির্দেশ নামার পাথর বিলোতে পারেন না, দেশে দেশে পাহাড়ে পাহাড়ে এসে উঁকি দিয়ে যান না।

পয়গম্বরদের গাল-গল্পের সাথে এই যে আমাদের যুক্তি-বুদ্ধি মেলে না সে দোষ কার? ঈশ্বরের, নাকি মানুষ থেকে রূপান্তরিত পয়গম্বরের। যেহেতু ঈশ্বর আমাদের কাছে আসেন নি, যেহেতু পয়গম্বররাই বিভিন্ন দাবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, সেহেতু দায়ভার মানুষের পয়গম্বরদের ওপরই বর্তায়। তবু জরুরি প্রশ্নটাই পয়গম্বরদের করা হয় না:

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তবু মানুষের কাছে তার পরিচয় তুলে ধরতে কেন তার পয়গম্বর লাগে?

অ্যাবনর্মাল সাইকোলজি

পয়গম্বররা মানুষ। মানুষ ছাড়া অন্য কেউ মানুষের আকার-আকৃতির প্রাণীর জন্ম দিতে পারে, এর কোনো প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। পয়গম্বররা মানুষের গর্ভে ইম্পল্যান্ট করা ভিনগ্রহের কোনো প্রাণীর ভ্রুণ এমনটিও জানা যায়নি। সোজা কথায়, তারা অতি-অবশ্যই মানুষ, পুরুষের ঔরসে নারীর গর্ভে হওয়া রক্তমাংসের মানুষ। তাদের নামে কিছু অলৌকিক কাহিনী চালু আছে। যা মানুষরা করতে পারে না বলেই আমরা জানি। তবে তেমন গল্প আমরা সাম্প্রতিককালে উত্তরা-টঙ্গির বালক পীরের ক্ষেত্রেও শুনেছি। সাভারের মহিলা-পীরের ক্ষেত্রেও নানা অসম্ভব ঘটনা ঘটানোর গুজব চালু আছে। সেসব নেহায়েত গুজব, অনুসন্ধান করলেই বেরিয়ে পড়ে তার কোনো ভিত্তি-প্রমাণ নেই।

কিন্তু মানুষ থেকে পয়গম্বর হয়ে ওঠার পথে তারা নিজেরা এমন কিছু দেখার ও শোনার দাবি করেন যা তাদের চারপাশের মানুষ দেখতে ও শুনতে পায় না। যেমন আমরা মুসা নবীর কাছ থেকে শুনতে পাই যে তার মাথায় কেউ কথা বলে অবিরাম। কিন্তু আশে-পাশের কেউ সেসব কথা শুনতে পায় না। নবীদের কাছ থেকে আমরা জানি ভরাট আসরে জিব্রাইল এসে দাঁড়ায়, তাদেরকে ওহি দেয়, কিন্তু আসরের অন্য কেউ জিব্রাইলকে দেখতে পায় না তার দেখা ওহি'ও কেউ শুনতে পায়না। অশরীরি অস্তিত্বের সাথে পয়গম্বরদের যোগাযোগের, কথোপকথনের ও লেন-দেনের এমন কিছু অলৌকিক, অস্বাভাবিক ও অপ্রমাণযোগ্য গল্প আমরা শুনেছি। তারা এসব মিথ্যা করে বা বানিয়ে বলেছেন এমন মনে হয় না।

নবী পয়গম্বরদের বর্ণনায় বোঝা যায়, তারা যা বলেছেন তা তারা নিজেরা বিশ্বাস করেন ও অন্যদের বিশ্বাস করাও জরুরি বলে মনে করেন। এসব বিশ্বাসের ভিত্তিতে নতুন ধর্ম চালু হয়ে যায় এবং যারা এসবে বিশ্বাস করে না তারা অবিশ্বাসী বা বিধর্মী ঘোষিত হয়। পয়গম্বরদের এইসব মানব-অসম্ভব কার্যকলাপকে মনোবিজ্ঞান বা সাইকোলজির আলোকে অস্বাভাবিক বা অ্যাবনর্মাল মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মনে হয়[1] ।

পয়গম্বরদের মনের তিন ধরনের বিশেষ অবস্থা লক্ষণীয়। যা তাদেরকে মানুষ থেকে আলাদা করে তোলে: (ক) অনুপ্রেরণা: মানসিক উত্তেজনার এমন একটা স্তর যখন বাস্তব সমস্যা-অসুবিধাগুলো নিয়ন্ত্রণ মন অস্বীকার করে, (খ) এক্সট্যাসি বা উদভ্রান্তের মত উদ্বেলিত অবস্থা: যখন বাস্তব হিতাহিত জ্ঞান কিছুক্ষণের জন্য লোপ

[1] জার্নাল অব রিলিজিয়ন অ্যান্ড হেলথ ভ: ১৩, নং:৩ পৃষ্ঠা ১৯৪-২০০

পায়, (গ) দৃষ্টি ও শ্রবণ বিভ্রম: স্বপ্ন বা বিভ্রমের শিকার হয়ে নিজের কল্পনার মত দৃশ্য দেখতে পাওয়া ও কথা শুনতে পাওয়া।

ছোটবেলা থেকেই যে কোন সাধারণ মানুষকে শেখানো হয় পয়গম্বরদের মত আদর্শ মানুষ হতে। কিন্তু কী সেই উপায়? মন ও চিন্তার কোন স্তরে মানুষ হয়ে ওঠে পয়গম্বর। সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজাটা কঠিন, কিন্তু এর উত্তর জানাটা জরুরি।

এ পর্যায়ে প্রশ্ন হচ্ছে, মনের বিশেষ অবস্থার কারণেই কি একজন মানুষ অতি-মানুষ, মহা-মানুষ, বা পয়গম্বর হয়ে ওঠেন, অথবা হয়ে উঠেছেন বলে নিজের মনে বিশ্বাস করে?

নবী ইজিকিয়েল ও এপিলেপ্সি

বহু আগে থেকেই মনোবিজ্ঞানীরা কিছু পয়গম্বরদের অস্বাভাবিক আচরণ নিয়ে গবেষণা করছেন। এ বিষয়ে সবচে বেশি গবেষণা হয়েছে নবী ইজিকিয়েলকে নিয়ে। নবী ইজিকিয়েল প্রায় ২৬০০ বছর আগে বাইবেলের 'ইজিকিয়েলের বই' অংশটুকু লিখেছেন। সানডিয়েগোর ক্যালিফোর্নিয়া ইউনির্ভাসিটির নিউরো সাইন্সের অধ্যাপক এরিক আলটশুলার বলেছেন ইজিকিয়েল হচ্ছেন এপিলেপটিক রোগীর ক্লাসিক্যাল উদাহরণ[2]। বাইবেলে বর্ণিত উদাহরণ থেকেই অধ্যাপক এরিক জানাচ্ছেন, ইজিকিয়েল যে ঘন ঘন অজ্ঞান হয়ে পড়তেন বা তার কথা বলা বন্ধ হয়ে যেত, এগুলো হচ্ছে বিশেষ এক ধরনের (টেম্পোরাল লোব) এপিলেপ্সির (মৃগী রোগ) লক্ষণ। যারা এরকম ঘন ঘন মুর্চ্ছা যান, তারা সবসময় এরকম দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠা মানুষের মত আগে-পাশের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে নেতিবাচক কথা বলতে থাকেন।

ইজিকিয়েল নিজের মাথার ভেতর ঈশ্বরের নির্দেশ শুনে ডান পাশে কাত হয়ে শুয়েছিলেন ৩৯০ দিন তারপর পাশ ফিরে শুয়েছিলেন আরো ৪০ দিন, মানুষের বিষ্ঠা দিয়ে তার খাবার রান্না করেছিলেন, নিজের বাড়িতে গর্ত করে তার ভিতরে লুকিয়ে ছিলেন গজবের ভয়ে (ইজিয়েল, ৪:৯)। ধর্মবেত্তারা অবশ্য ইজিকিয়েলের এসব কর্মকান্ডকে সিম্বলিক ও ঈশ্বরের রহস্যময়তা বলে ব্যাখ্যা করার একটা চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু নিউরোটিক, নিউরোটিকই, সে নেপোলিয়নই হোক, জুলিয়াস সিজারই হোক আর নবী-পয়গম্বরই হোক।

নবী ইজিকিয়েলের মধ্যে এপিলেপ্সির রোগের অন্যান্য লক্ষণও দেখা গেছে। যেমন তিনি বাতিক গ্রস্তের মত লিখতেন শুধু লিখতেন। যাকে বলে হাইপারগ্রাফিয়া। তাছাড়া আগ্রাসী ধরনের ধার্মিক ছিলেন ইজিকিয়েল। ডিলিউশন, ধর্মের বিষয়ে আগ্রাসী মনোভাব ছাড়াও এই ধরনের মৃগী রোগের আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে ধর্মীয় আদেশ-নিষেধ বিষয়ক বক্তৃতাবাজি করা। ইজিকিয়েলের এই সবকিছুই ছিল বলে জানিয়েছেন প্রফেসর

[2] নিউ সাইন্টিস্ট, ১৭ নভেম্বর ২০০১

এরিক। নিউরোসাইন্সের এই তত্ত্ব প্রমাণের পর ইজিকেয়েলের বই পড়তে হবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তাহলে এসব ধর্মগ্রন্থ রচনার নতুন একটা অর্থ ধরা পড়বে।

ইজিকিয়েলের মত অনেক পয়গম্বরের ক্ষেত্রেই সাইকোটিক, এপিলেপটিক, সিজোফ্রেনিক, অথবা হিস্টেরিক এসব অভিযোগ উঠেছে। এ ধরনের নিউরোটিকের কাছ থেকে শোনা ধর্মকথার সারবত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন গবেষকরা। তাই মানুষ থেকে পয়গম্বর হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে সন্দেহের চোখেই দেখেন নিউরোসাইন্সের লোকজন। তাদের অনেকেরই মতামত ধর্ম মূলত: নিউরোসিস ও পলায়নপর মনোবৃত্তির ফসল[3]।

সাইকোলজির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হলে আমরা পয়গম্বরদের প্রফেসির রহস্যের একটা সমাধান পাই। তাদের অস্বাভাবিক সব দাবি আর অসম্ভব সব বিশ্বাস, অদ্ভুত সব শব্দ বা কণ্ঠ শোনা, অবিশ্বাস্য সব দৃশ্য দেখার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এ থেকে। সরাসরি পরীক্ষা করার মত নবী-পয়গম্বর হাতের কাছে এখন পাওয়া কঠিন। তবে মানসিক হাসপাতালের রোগীদের আচরণ থেকে যেটুকু বোঝা যায় তাতে সন্দেহ নেই সাইকোলজির ব্যাখ্যা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।

তবে কি পয়গম্বরত্ব একধরনের মানসিক ব্যাধি? শ্রুতি ও দৃষ্টি বিভ্রমের শিকার মানুষের বাস্তবতাবর্জিত কল্পনার প্রকাশ।

পয়গম্বররা কি সিজোফ্রেনিক?

নবী ইজিকিয়েলের অস্বাভাবিক সব কাজকর্মের কথা আগের পর্বে বলা হয়েছে। যা থেকে নিউরাসাইন্সের গবেষকরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে তিনি এপিলেপ্সিতে ভুগছিলেন। অন্যান্য নবীদের আচার-আচরণের বর্ণনা ও নিজের ঢোল-কীর্তন পড়ে অনুমান করা যায় যে আজকের পৃথিবীতে বাস করলে তাদেরকে আমরা মানসিক ব্যাধি হাসপাতালেই পাঠাতাম। এ বিষয়ে সাওনি পয়গম্বরের উদাহরণটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

পয়গম্বরদের কালে এসব মানসিক রোগের আবিষ্কার হয়নি। কিন্তু রোগটা ছিলো। অনেক জাতি-গোষ্ঠীতেই এরকম আচরণকে অশরীরি আত্মা ভর করা, আছর হওয়া হিসেবেই দেখতো। এখনও পৃথিবীর অনেক

[3] জার্নাল অব বাইবেল এন্ড রিলিজিয়ন, ভলিউম-২১, নং-৪, পৃষ্ঠা ২৪৪

পিছিয়ে পড়া জনপদে সিজোফ্রেনিক লোকদের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন লোক বলেই মানুষ মানে (বাংলাদেশেও উদাহরণের অভাব হবে না)।

পয়গম্বরদের আচার-আচরণ বা জীবন ইতিহাস আমরা ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থে পাই। তারা সিজোফ্রেনিক ছিলেন কি না বা থাকলে কতটা সিজোফ্রেনিক ছিলেন তা বোঝার জন্য আমাদের জানা দরকার সিজোফ্রেনিয়া অসুখটা কী?

একটা সাধারণ ধারণা আছে সিজোফ্রেনিয়া রোগে ভোগা লোকজনের দ্বৈত বা বিভক্ত (ডাবল বা স্প্লিট পার্সোনালিটি) রয়েছে। অর্থাৎ ভিন্ন সময়ে তাদের মধ্যে ভিন্ন ব্যক্তিত্ব দেখা যায়। তবে এ এখনও প্রমাণ-সাপেক্ষ বিষয়। অন্যদিকে, সিজোফ্রেনিয়ার মত মানসিক অবস্থাগুলোকে সাইকোসিস বলে। সাইকোসিস মানে হচ্ছে এতে আক্রান্ত হলে মানুষের বাস্তব-অবাস্তব জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায়। তবে ঐ ব্যক্তি যে সবসময় অবস্তাব কথাবার্তা বলবে বা আচরণ করবে এমন নয়, তার ঐ সাইকোসিস অল্প কিছু সময়ের জন্যও হতে পারে। বাকী সময় সে স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে।

একটি মানুষ সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত কি তা নিচের লক্ষণগুলো দেখে বোঝা যায়। সবার মধ্যেই একসাথে সব ক'টি লক্ষণ থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। আক্রান্ত হওয়ার মাত্রার উপর নির্ভর করবে কয়টি লক্ষণ বা লক্ষণের প্রাবল্য।

১: হ্যালুসিনেশন: একে বলা যায় ভুল দেখা। এ অবস্থায় মানুষটি যা দেখছে বলে ভাবছে তা আসলে ঠিক নয়। "সর, সর, আমার চোখের সামনে থেকে সর"-এ কথা রাস্তার পাগলদের বলতে আমরা দেখি। এই বলে আজো ওঝারা জিন্-ভূত তাড়ায়। এই কথা বলেই পয়গম্বররা শয়তান তাড়াতেন। আবার অনেকেই দৃষ্টি বিভ্রমে ঘুম থেকে ওঠে ভোর বেলা আকাশের সমান লম্বা দরবেশ দেখে, ফেরেশতা দেখে, বিভ্রান্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে সেই দৃশ্যবস্তুকে অনুসরণ করে হারিয়ে যায়।

২: কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া: সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত মানুষ সব সময় শুনতে পায় তাদের মাথার ভেতর কে যেন কথা বলছে। আমি একজনকে চিনি যে, প্রযুক্তি-পছন্দ করতো বলেই হয়তো, আক্রান্ত হওয়ার পর বলতো স্যাটেলাইটের সব টিভি চ্যানেলের কথা সে তার মাথার ভেতর শুনতে পায়। তবে অন্য মানুষরা এসব শব্দকে বাস্তব মানুষের, অশরীরি আত্মার, ফেরেশতার, বা ঈশ্বরের বলে মনে করে। একসাথে কয়েক ধরনের

কণ্ঠস্বর শোনে এরা। কোনো কণ্ঠস্বর থাকে শয়তানের, কোনোটা বা ঈশ্বরের, কোনোটা স্বর্গীয় পিতা বা নবীর। শয়তান মাথায় কুবুদ্ধি দেয়, বলে অমুককে হত্যা কর, তমুককে ধর্ষণ কর, ওর কান কেটে ফেল। আবার ঈশ্বর আশ্বাস দেন যে, তুমিই আমার প্রতিনিধি, নিশ্চয়ই সব মানুষ একদিন তোমার কথা শুনবে।

৩: ডিলিউশন: ভ্রান্ত বিশ্বাস। এরকম লোক মনে করে সে উত্তম কুমার - টালিউডের নায়ক, তার বিশাল ক্ষমতা আছে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার, সে ভবিষ্যতের নেতা-প্রেসিডেন্ট। এরকম ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকেই মানুষ ভাবে সে পয়গম্বর, ঈশ্বর তাকে বাছাই করেছেন পাপ থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করতে।

বিভিন্ন রকমের ডিলিউশনে মানুষ ভুগতে পারে। তবে এর মূল কথা হলো সে নিজেকে এমন একটা কিছু বলে বিশ্বাস করে যার সাথে বেশিরভাগ যুক্তি-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ একমত হয় না।

কিছু উদাহরণ: খ্রিস্টান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সেইন্ট পল বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি "ঈশ্বরের এক মিশনে আছেন" কারণ তিনি সেরকম এক 'দৃশ্য' দেখেছেন। বিটলসের গায়ক জর্জ হ্যারিসনকে চাকু মেরেছিলো যে আব্রাম, সেও ভাবতো, সে "ঈশ্বরের এক মিশনে আছে" [4]।

অস্কার পাওয়া মুভি "দি বিউটিফুল মাইন্ডে" রাসেল ক্রো অভিনয় করেছিলেন নোবেল জয়ী অধ্যাপক জন ন্যাশের ভূমিকায়। ন্যাশ সিজোফ্রেনিক ছিলেন। তিনি তার শিশুদেরকে পানিতে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিলেন কারণ তার ভাষায় ঈশ্বর সেটা করতে বলেছেন।

২০০৪-এ সুইডিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনা লিন্দকে ছুরি মেরেছিল যে যুবক সেও দাবি করেছে যে ঈশ্বর তাকে এই কাজের জন্য নির্বাচিত করেছে। তার নাম ছিল মিজালো। মিজালো কে আমরা এই দাবির জন্য সিজোফ্রেনিয়াক ভাববো কিন্তু একই রকম দাবি যখন পয়গম্বররা করছেন তখন তাদেরকে আমরা প্রেরিত পুরুষ জ্ঞান করেছি। কেন?

---

[4] অরেঞ্জ কাউন্টি রেজিস্টার, ৭/৫/০২, পৃষ্ঠা ১২১

সাইকিয়াট্রিক অ্যানথ্রোপলজিস্টরা নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠার বিষয় নিয়ে গবেষণা করে থাকেন। তারা বলছেন, একজন ব্যক্তি মানুষের হ্যালুসিনেশন বা ডিলিউশনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই চালু হয়েছে নতুন নতুন ধর্ম। অর্থাৎ পয়গম্বরদের মানসিক বৈকল্যের কারণে ভুল দেখা ও ভুল শোনার উপর দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন ধর্ম। তাদের এসব কথায় প্রথমেই বিশ্বাস করেছে তাদের পরিবারের সদস্যরা, বন্ধু-স্বজনরা, তারপর ধীরে ধীরে নানা অলৌকিকতার গাল-গল্পে সমর্থক-ভক্তদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ধর্মটি একসময় রূপ পেয়েছে বিরাট প্রতিষ্ঠানের (তবে সবার প্রচারিত ধর্মই বড় হয় না, সবাই পয়গম্বর হিসেবে সফলও হয় না, তারা তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তাদের জনপদ থেকে এবং মানসিক ব্যধিগ্রস্ত হিসেবেই মারা যায়)[5]।

ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও পয়গম্বর হয়ে ওঠার এই সাইকো-এ্যানালাইটিক্যাল ব্যাখ্যা আপনাকে এক কথায় মেনে নিতে হবে তা বলছি না। তবে টেম্পোরাল লোব, এপিলেপ্সি আর সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণগুলো পড়-ন, তারপর আপনার চেনা-জানা পয়গম্বরদের জীবনী গ্রন্থে আবার চোখ বুলান[6]। দেখুন ভুল দেখা, ভুল শোনর কত কথা রয়েছে পৃথিবীতে। তবে পয়গম্বরদের সবাই যে এপিলেপপ্সি বা সিজোফ্রেনিয়ার রোগি ছিলেন তা না। কেউ কেউ পয়গম্বর হয়েছিলেন ফ্যাশনে কিংবা বংশ পরম্পরায়, স্বীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য।

আরবে নবীদের জন্মহার হ্রাস বনাম পাপ-পূণ্যের হিসাব

প্রবন্ধের গোড়াতে বলেছি, আরবে নবী হওয়া ছিল ভীষণ ফ্যাশন। প্রতিবাদী তরুণ-যুবাদের বিদ্রোহের অংশ ছিল নবী হওয়া। নতুন ঈশ্বরের কাছে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে পুরাতন/প্রচলিত দেব-দেবীকে অস্বীকার আর রাজা-ঈশ্বরকে চ্যালেঞ্জ করা। কত নবী ছিলেন এরকম? মাওলানারা সুর করে বলেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার, ভিন্নমতে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার।

---

[5] Littlewood, R. (1984) The imitation of madness: the influence of psychopathology upon culture. Social Science and Medicine, 19, 705-715.

[6] নবী মুহাম্মদের অধিকাংশ জীবনীকার মত প্রকাশ করেছেন যে, তিনি ঈশ্বরের থেকে প্রত্যাদেশ লাভ করছিলেন স্বপ্নে কিংবা খিঁচুনির সময়। এপিলেপ্সির খিঁচুনি উঠলে মুহম্মদ (দঃ) ঘন্টাধ্বনি শুনতে পেতেন, এবং হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যেও ঘেমে উঠতেন (Martin Ling, op. cit, p.245)। যখন এ অবস্থা থেকে সুস্থ হয়ে উঠতেন, তিনি তার ওহী অন্যদের বয়ান করতেন। ইবনে সাদ-এর ভাস্য মতে মুহম্মদ ওহী নাজিলের সময় উদ্বিগ্ন থাকতেন এবং তার মনোসংযোগে বিগ্ন ঘটতো (Katib al Waqidi p. 37. *See also* *Bukhari 1: 1: 2*), কখনো বা মাটিতেও পড়ে আচ্ছন্ন যেতেন (*Bukhari 6, 60, 478*), কখনো বা তার ঘাড় এবং কাঁধ শক্ত হয়ে গিয়ে কাঁপুনি উঠত, আর তিনি তার স্ত্রীকে চাদর দিয়ে চাপা দিতে বলতেন (*Bukhari 6, 60, 478*, *Bukhari 9,78.111*)। মুহম্মদের অলীক শব্দ শোনা, অলীক বিভ্রম প্রভৃতি উপসর্গগুলো দেখে মনে হয় তিনি সম্ভবত এপিলেপ্সি কিংবা স্কিজোফ্রেনিয়াতে আক্রান্ত হতেন, যা বৈজ্ঞানিকভাবে বোঝার মত অবস্থা সে সময়ে ছিল না। ডঃ গুস্তাভ ওইল (Gustav Weil) মুহম্মদের এপিলেপ্সির উপসর্গগুলো নিয়ে তাঁর '*Mohammed, der Prophet*" (Stuttgart, 1843)-এ আলোচনা করেছেন, যেগুলোকে মুহম্মদের প্রতি বিষেদগার হিসেবে প্রতিপন্ন করে মুসলিম সমালোচকেরা বাতিল করে দিতে চান।

বাইবেলের হিসাব যদি ধরি, তবে হযরত আদম থেকে হযরত ঈসার জন্মের মধ্যে পার্থক্য ৪ হাজার বছরের। যেহেতু নবী মুহাম্মদের পর আর কাউকে নবী স্বীকৃতি দেয়া হয় না সেহেতু এই বিপুল সংখ্যার নবীদের জন্ম হয়েছিল এই ৪ হাজার বছরের মধ্যেই। আরো ৫৭০ বছর পর একজন। সুতরাং নবী ঈসা পর্যন্ত গড়ে বছরে ৩০ জনের উপরে নবী আরবের ধূলোতে লুটোপুটি করেছেন। অসম্ভব নয়।

অনেক নবীর বাবা, দাদা নবী ছিলেন। ছেলে, নাতিরাও নবী ছিলেন। দুই/তিন ভাই নবী ছিলেন এমনও হয়েছে। শ্বশুর-জামাই নবী ছিলেন এও দেখা যায়। অনেকটা বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান-মেম্বার পদে প্রতিযোগিতার সময়কার সংবাদপত্রের হেডলাইনের মতো: শ্বশুর ও জামাতা উভয়েই চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী। দু'জন দুই দল থেকে।

এসব নবীদের কেউ ভারতে বা চীনে জন্মান নি। রাশিয়ায় বা জাপানে জন্মান নি। অস্ট্রেলিয়ায় বা মেক্সিকোতে জন্মাননি। অন্তত: সেরকম কোনো উদাহরণ আমরা আরব অঞ্চলের ধর্মগ্রন্থগুলোতে পাই না। কিন্তু পরিস্থিতি এমন যে এখন খোদ আরবও নবী পাওয়ার রহমত থেকে বঞ্চিত। কেয়ামত পর্যন্ত নবী হওয়া বন্ধ।

নবীদের জন্মহার কমে যাওয়ার কারণ কী? পৃথিবীতে পাপ ও পাপীর সংখ্যা কমে যাওয়া? দুনিয়ার সব মানুষ ধর্মপ্রাণ হয়ে পড়া?

ভারতের কাউকে (যেমন রাম, কৃষ্ণ বা বুদ্ধ) নবী বানানোর চেষ্টা না করাই ভালো। ভারতে আসতেন অবতার। একা বিষ্ণুই মৎস্য কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি-এই দশরূপে ধরায় এসেছেন। মজার বিষয়, এসব অবতারদের কেউ আরবে হেদায়েত করতে জন্মাননি। এমন কি, ইংল্যান্ড, আফ্রিকা, আমেরিকাতেও তাদের জন্ম হয়নি। পথভ্রষ্ট মানব তখন কি শুধু ভারতেই ছিলো? হেদায়েত কি শুধু তাদেরই দরকার ছিল?

তারচেয়েও বড় প্রশ্ন হেদায়েত কি এখন দরকার করে না? এখন কেন আবাবিল পাখি আসে না বুশের আর্মি থেকে ইরাককে মুক্ত করতে? এখন যখন সমকামীরা গির্জায় গিয়ে বিয়ে করে সংসার শুরু করে তখন লুতের সময়কার মত অভিশাপ নেমে আসে না। নুহের বন্যা হওয়ার মত পাপাচার কি তখনকার চেয়ে এখনকার মানুষ কম করছে?

এখনও কেউ নবীত্ব দাবি করলে তাকে আমরা ভন্ড ভাবি কেন? কোন মাপকাঠিতে তাহলে আগের এরকম দাবিদাররা উৎরে যান?

দীক্ষক দ্রাবিড়, ইন্টারনেটের বাংলা ব্লগে লিখে থাকেন। তার কিছু প্রবন্ধ মুক্তান্বেষা সহ বাংলাদেশের অন্যান্য লিটল ম্যাগাজিনেও প্রকাশিত হয়েছে।

আশা জেগে রয় চিরন্তন

বিজ্ঞান, পরলোক এবং জীবনের অর্থ

মূল: মাইকেল শারমার
অনুবাদ: ফরিদ আহমেদ

আমি একবার একটা বাম্পার স্টিকার দেখেছিলাম। তাতে লেখা ছিল,

‘জঙ্গী অজ্ঞেয়বাদীঃ আমি জানি না, তবে আপনিও তা জানেন না’ (*Militant Agnostic: I Don’t Know and You Don’t Either*)।

পরকাল সম্পর্কে এটাই আমার অবস্থান। আমিও কিছু জানি না, আপনারাও কিছু জানেন না। আমরা যদি নিশ্চিতভাবে জানতাম যে পরলোক বলে কিছু আছে তাহলে মৃত্যুকে এত ভয় পেতাম না। প্রিয়জনের মৃত্যুতে এরকম বুকভাঙ্গা আর্তনাদে মাতম করতাম না আমরা। এমনকি এই বিষয়ে বিতর্ক করারও হয়তো প্রয়োজন পড়তো না।

যেহেতু কেউই নিশ্চিতভাবে জানি না যে মৃত্যুর পর কি ঘটে, সেহেতু আমরা বিষয়টাকে ধর্ম, সাহিত্য, কবিতা, বিজ্ঞান বা হাস্যরসের মত ভিন্ন ভিন্ন উপায় দিয়ে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করি। সদা উদ্বিগ্ন উডি এলেন এর বিকল্প সমাধান করেছিলেন এভাবেঃ ‘আমি যে মারা যেতে ভয় পাই তা কিন্তু না, তবে যখন মৃত্যু ঘটবে তখন আমি সেখানে থাকতে চাই না’। স্টিভেন রাইটও ভেবেছিলেন যে তিনি এর সমাধান বের করে ফেলেছেন এভাবেঃ ‘আমি চিরকাল বাঁচতে চাই। যত দূর সম্ভব, যত খানি সম্ভব’।

ঠাট্টা তামাশা আপাতত বাদ দেই। যেহেতু আমি একজন বিজ্ঞানী এবং এবং মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রয়েছে বলে দাবি করা হয় সেহেতু আসুন আমরা সেই সংশয়াচ্ছন্ন ভবিষ্যতের ডাটা বিশ্লেষণ করি এবং তা আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা কি ধরনের অর্থ বহন করে তাই বরং বিবেচনা করি।

একুশ গ্রামঃ আত্মার প্রকৃতি *

শারীরিক মৃত্যুর পর মানুষের কি টিকে থাকে বলে মনে করা হয়? এর উত্তর হচ্ছে আত্মা। পৃথিবীতে যত ধরনের ধর্ম বা আধ্যাত্মিক আন্দোলন আছে ঠিক তত ধরনেরই আত্মা সম্পর্কে ব্যাখ্যা চালু রয়েছে। সাধারণ বিশ্বাস হচ্ছে যে, আত্মা হচ্ছে সচেতন চিরন্তন বস্তু যা জীবিতের অনুপম নির্যাস এবং দৈহিক মৃত্যুর পরও তা টিকে থাকে'।

আত্মার প্রাচীন হিব্রু শব্দ হচ্ছে 'নেপেশ', বা 'জীবন' বা 'প্রাণশক্তি'। গ্রীক শব্দ হচ্ছে 'সাইকি', বা 'মন'। এবং ল্যাটিন শব্দ হচ্ছে 'এনিমা' বা 'অতিপ্রাকৃত সত্তা', বা 'শ্বাস-প্রশ্বাস'। শরীরে স্পন্দন আনা, প্রাণ চাঞ্চল্য আনা এবং জীবনীশক্তির মূল নির্যাস হচ্ছে আত্মা। এটা মোটেও আশ্চর্যজনক নয় যে প্রাকৃতিক জগত সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবের কারণে এই ধারণাসমূহ যখন প্রথম গড়ে উঠছিল, তখন প্রাচীন মানুষেরা মন, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং আত্মার মত সাময়িক রূপকের আশ্রয় নিয়েছিল । এই মুহূর্তে ছোট্ট যে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করছে, উত্তেজনায় লাফালাফি করছে বা আনন্দে লেজ নাড়াচ্ছে, ক্ষণকাল পরে সেই পরিণত হচ্ছে এক খণ্ড অনড় মাংসপিণ্ডে। আসলে কি ঘটছে সেই মুহূর্তে?

আসলে কি ঘটছে সেটা উদঘাটন করার জন্যে ১৯০৭ সালে ম্যাসাচুসেটস-এর চিকিৎসক ডানকান ম্যাকডোগাল ছয় জন রোগীর মারা যাওয়ার আগের এবং পরের ওজন নেন। তিনি মেডিকেল জার্নাল American Medicine এ জানান যে ওই সমস্ত ব্যক্তিদের মৃত্যুর আগের এবং পরের ওজনের পার্থক্য ২১ গ্রাম। যদিও তার ওজন পদ্ধতি ছিল খুবই স্থূল ধরনের এবং হেরফেরমূলক এবং কেউই তার ফলাফলের অনুরূপ ফলাফল পরবর্তীতে আর পায়নি, তা সত্ত্বেও আত্মার ওজন হিসাবে ছয় গ্রাম মোটামুটি কিংবদন্তির রূপ পেয়ে যায়। এই গবেষণার আসল তাৎপর্য হচ্ছে আত্মা এমন একটা জিনিষ যাকে পরিমাপ করা যায়। কিন্তু আসলেই কি তা সম্ভব?

বিজ্ঞানে আমরা আমাদের ধারণাগুলোকে নিখুঁতভাবে সংজ্ঞায়িত করি। আমি 'আত্মাকে' সংজ্ঞায়িত করি এভাবে, 'একজন ব্যক্তির মৌলিক গুণাবলীর প্রতিনিধিত্বকারী অনুপম তথ্যের প্যাটার্ন'। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী, আমরা মারা যাওয়ার পর আমাদের ব্যক্তিগত তথ্যের পাটার্নকে সংরক্ষণের কোন মাধ্যম না থাকলে আমাদের মৃত্যুর সাথে সাথে আত্মাও মৃত্যুবরণ করে। ডিএনএ দ্বারা সংকেতলিপিবদ্ধ প্রোটিন দিয়ে আমাদের দেহ গঠিত। কাজেই ডিএনএর বিখণ্ডায়নের সাথে সাথে আমাদের প্রোটিন প্যাটার্ন চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। মস্তিষ্কের মধ্যে বিরাজমান নিউরনের প্যাটার্নের মধ্যে আমাদের স্মৃতি এবং ব্যক্তিত্ব সংরক্ষিত থাকে। কাজেই যখন ওই নিউরনগুলো মারা যায় তখন তার সাথে সাথে আমাদের স্মৃতি এবং ব্যক্তিত্বও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। স্ট্রোক এবং আলযেইমার রোগের মতোই চরমভাবে স্মৃতিকে বিধ্বস্ত করে দেয়, তবে একেবারে পাকাপাকি এই যা।

* আত্মা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য এ বইয়ের 'আত্মা বলে সত্যই কি কিছু আছে?' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

যেহেতু মস্তিষ্ক নিজে কিছু উপলব্ধি করে না, সেহেতু এটা মানসিক কার্যকলাপকে ভিন্ন উৎসের উপর চাপিয়ে দেয়। অতিপ্রাকৃত অস্তিত্বসমূহ যেমন, ভূত-প্রেত, দেবদূত এবং ভিনগ্রহের প্রাণীদেরকে সত্যিকারের প্রাণী বলে বিবেচনা করা হয়। মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতাকে অন্তর্নিহিত কার্যকলাপ হিসাবে বিবেচনা না করে বহির্কার্যকলাপ হিসাবে ধারণা করা হয়। একইভাবে, তথ্যের স্নায়বীয় প্যাটার্ন, যা হচ্ছে আমাদের স্মৃতি এবং ব্যক্তিত্ব – আমাদের 'আমিত্ব', তাকে আত্মা হিসাবে ভাবা হয়। এই প্রেক্ষিতে, আত্মা হচ্ছে এক ধরনের বিভ্রম।

বিজ্ঞান কি আমাদের রক্ষা করতে পারে?

আমার বিভিন্ন গ্রন্থ এবং প্রবন্ধগুলোতে কীভাবে আমরা মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারি সে সম্পর্কে অনেক বৈজ্ঞানিক পরিস্থিতিকে আমি মূল্যায়ন করেছি। তবে এইখানে আমি ২০০৬ সালে লেখা দীপক চোপড়ার বই Life After Death: Burden of Proof এ পরলোকের অস্তিত্বের স্বপক্ষের প্রমাণাদির সর্বশেষ দাবি নিয়ে আলোচনা করবো। দীপক চোপড়ার মতে, ছয় ধরনের প্রমাণের প্রেক্ষিতেই তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছেন যে, আত্মা বাস্তব এবং চিরন্তন।

১. মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতা এবং চেতনার পরিবর্তিত অবস্থাঃ হাজার হাজার লোক আছে যাদেরকে হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে তারা দিব্যি বেঁচে বর্তে উঠেছে এবং পরলোকের কিছু অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছে। এই অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্যে আছে শরীর থেকে বের হয়ে ভেসে বেড়ানো, সুড়ঙ্গ বা সাদা আলোর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা, ভালবাসার লোকজন অথবা ঈশ্বর বা যীশুকে দর্শন কিংবা অন্যলোকের কোন স্বর্গীয় বর্ণনা ইত্যাদি। যদি এই রোগীদের মস্তিষ্ক মৃত হয়ে থাকে তবে তাদের সচেতন 'আমিত্ব', তাদের 'আত্মা' নিশ্চয়ই দেহের মৃত্যুর পরও বেঁচে ছিল।

২. ইএসপি এবং মনের প্রমাণঃ এখানে চোপড়া দূরদর্শন এবং টেলিপ্যাথির জন্য psi গবেষণার উপর নির্ভর করেছেন। এক্ষেত্রে গবেষণায় ব্যবহৃত ব্যক্তিদেরকে একা কোন রুমে আটকে রাখলেও তারা পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করা ছাড়াই অন্য কোন রুমে কি ঘটছে তা দেখতে পারে।

৩. কোয়ান্টাম সচেতনতাঃ কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জগতে দেখা গেছে, পারমানবিক কণাদের গতিবিধির উপর পরীক্ষা-নিরিক্ষা দূরবর্তী অঞ্চলে অনিশ্চিত প্রভাব তৈরি করে, আইনস্টাইন জাকে বলতেন - 'স্পুকি একশন এট এ ডিসটেন্স'। এক স্থানের কণার উপর পর্যবেক্ষণ তাৎক্ষনিকভাবেই অন্য কোন দূরবর্তী (তাত্ত্বিকভাবে বহু দূরের দুই গ্যালাক্সিতেও হতে পারে) স্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কণাকে প্রভাবিত করে। এটা আপাত দৃষ্টিতে আইনস্টাইনের আলোর গতির সর্বোচ্চ সীমার লঙ্ঘন বলেই মনে হয় । চোপড়া এর অর্থ করেছেন এভাবে যে, মহাবিশ্ব এক বিশাল কোয়ান্টাম ক্ষেত্র, যেখানে সব কিছুই (এবং সবাই) আন্তঃসম্পর্কযুক্ত এবং একে অন্যকে সরাসরি এবং তাৎক্ষনিকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। দীপক চোপড়াএবং অন্যেরা কীভাবে মস্তিষ্ক জৈব-রাসায়নিক সংকেতের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বস্তুজগতকে প্রতিনিধিত্ব করে তা ব্যাখ্যা করার জন্য

কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে প্রয়োগ করেছেন - 'কোয়ান্টাম সচেতনতার মাধ্যমে আমরা হয়তো জানতে পারবো মস্তিষ্ক কীভাবে যাকে আমরা স্বর্গ বলে জানি সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাল্পনিক জগতসমূহ তৈরি করে থাকে। যদি এই রহস্য মস্তিষ্কের রসায়নের মধ্যে না থেকে বরং সচেতনতার মধ্যে থাকে তবে পরলোক দূর কোন রহস্যময় জগত না হয়ে আমাদের বর্তমান জীবনেরই বর্ধিতাংশ হতে পারে।'

৪. আধ্যাত্মিক মাধ্যম এবং মৃতের সাথে কথোপকথনঃ দীপক আধ্যাত্মিক মাধ্যম এবং তাদের মৃত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগের আপাত প্রতীয়মান সক্ষমতার উপর করা গবেষণাসমূহের ব্যাপক পর্যালোচনা করেছেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্ত করেছেন যে তিনি নিজেও এরকম এক গবেষণায় অংশ নিয়েছিলেন। সেই পরীক্ষণে তিনি তার মৃত বাবার সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দীপকের বাবার সাম্প্রতিক মৃত্যুই তাকে এই ধরনের গবেষণা এবং এই বই লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে।

৫. প্রার্থনা এবং রোগ নিরাময় গবেষণাঃ চোপড়া ফলদায়ক দূরবর্তী প্রার্থনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। রোগীর সুস্থতার জন্য অনেক দূর থেকে অজানা ব্যক্তিরা প্রার্থনা করলে, প্রার্থনা না করা রোগীদের তুলনায় তারা অনেক দ্রুত আরোগ্য লাভ করে। এর মূল অর্থ হচ্ছে যে, চিন্তার মাধ্যমে দূর কোন কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কোন দেবতার হস্তক্ষেপেই হোক বা কোন মহাজাগতিক শক্তির কারণেই হোক না কেন এ ধরনের শক্তি প্রদর্শন করা সম্ভব। এর মাধ্যমেই আমরা বিশ্বজগৎ এবং এর অন্তর্ভুক্ত সব কিছুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হই।

৬. তথ্য ক্ষেত্র, মরফিক অনুরণন এবং বিশ্বজনীন জীবন শক্তিঃ চোপড়া দাবি করেছেন যে প্রকৃতি তথ্য ক্ষেত্রের মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ করে থাকে। তিনি এক্ষেত্রে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী রুপার্ট শেলড্রেক (Rupert Sheldrake) পরিচালিত গবেষণাসমূহের উল্লেখ করেছেন। রুপার্ট শেলড্রেক প্রমাণ হাজির করেছেন যে, কেউ যখন পিছন থেকে কারো দিকে তাকিয়ে থাকে তখন তারা তা উপলব্ধি করতে পারে। কুকুরেরা জানে কখন তাদের মনিবেরা বাড়িতে ফিরছে। দেখা গেছে শব্দজট (crossword puzzle) বেলা গড়িয়ে গেলে সমাধান করা সহজতর, কারণ তখন অনেক লোকই এর সমাধান করে ফেলেছ এবং সে সমস্ত তথ্য প্রকৃতিতে রয়ে গেছে। সব জীবিত সত্তাকে একে অন্যের সাথে সংযোগকারী 'মরফিক অনুরণন ক্ষেত্র' দিয়ে এবং আরো অনেক রহস্যময় অতিপ্রাকৃতিক বিষয়সমূহকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তারা বলেন, তথ্যকে সৃষ্টিও করা যায় না বা একে বিনাশও করা যায় না। কেবলমাত্র নতুন প্যাটার্নে পরিবর্তিত করা যায়। কাজেই এই সংজ্ঞা অনুযায়ী আমাদের 'আত্মা' হচ্ছে আসলে তথ্যের আধার যা জন্মের আগেও ছিল এবং মৃত্যুর পরেও তা বহাল তবিয়তে টিকে থাকবে অর্থাৎ আত্মা অবিনশ্বর।

দীপক চোপড়ার মতে এই ছয় ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ হাজার বছর আগে বৈদিক ভারতের হিন্দু ধর্মের প্রথম আধ্যাত্মিক নেতা মহাজ্ঞানী মুনি ঋষিরা বর্ণনা করে গেছেন। 'ঋষিরা বিশ্বাস করতেন যে জ্ঞান জ্ঞানীর কাছে

বহিস্থ কিছু নয় বরং তা তার চেতনার মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। কাজেই জীবন এবং মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনে তাদের কোন বহিরাগত ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই। আমাদের সত্ত্বার নির্যাস হচ্ছে soul (অন্তর্গত সত্ত্বা), যাকে ঋষিরা আত্মা বলতেন। Soul এবং আত্মা হচ্ছে অদৃশ্য স্বর্গীয় ঝলক যা রক্ত মাংসের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি নিয়ে আসে। অন্যদিকে বেদান্তের আত্মা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; আর এখানেই সবচেয়ে বড় পার্থক্যটা নিহিত। খ্রীস্টীয় soul-এর মতো আত্মা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসতে বা যেতে পারে না। মানুষ এবং স্বর্গীয়তার মধ্যে একধরনের ঐক্য রয়েছে'।

আমি স্বীকার করছি যে আমার পশ্চিমা বৈজ্ঞানিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি কারণে দীপক কি বলতে চাচ্ছে তা সঠিকভাবে বুঝতে দারুণভাবে অসুবিধা হচ্ছে (যা মাঝে মাঝে খুবই হতাশাজনক)। আমি নিশ্চিত যে, আমার কোন ভুল হলে দীপক তা শুধ্‌রে দেবে। আমি যা বুঝেছি তার সারাংশ এরকম। বিশ্বজগৎ হচ্ছে সময়হীন শক্তির এক দৈত্যাকার সচেতন তথ্য ক্ষেত্র যার অংশ আমরা সকলেই। জীবন এই অন্তহীন সচেতন ক্ষেত্র থেকে সাময়িকভাবে উদ্ভাবিত। তার মতে এই ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরকমঃ 'ক্ষেত্রটা পূর্নাঙ্গরূপে কাজ করে। দূরবর্তী ঘটনাসমূহের মধ্যে এটা তাৎক্ষনিকভাবে সংযোগ সাধন করে। এই ক্ষেত্র সব ঘটনাকেই স্মরণ রাখে। এর অবস্থান কাল এবং স্থানের উর্ধ্বে। এটা সৃষ্টি হয় সম্পূর্ণভাবেই এর নিজের মধ্যে এবং এর সৃষ্টি উদ্ভূত এবং সম্প্রসারিত হয় বিবর্তনীয় দিকে। এটি একটি সচেতন ক্ষেত্র'। চোপড়া বলেছেন যে সুপ্রাচীনকালে ঋষিরা যা আবিষ্কার করেছিলেন তা আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথে চমৎকারভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণঃ 'প্রতিটা ইলেকট্রন, প্রত্যেকটা চিন্তা, সময়ের একেকটা মুহূর্তের মধ্যে বিরাজমান ব্যবধানের কারণে প্রকৃতির প্রতিটি প্রপঞ্চের কাছে সচেতনতার ক্ষেত্র প্রাথমিক'। এই ব্যবধানই হচ্ছে রেফারেন্স বিন্দু, সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুর স্থবিরতা, যেখানে মহাবিশ্বের সকল ঘটনাসমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়।

চোপড়ার পরলোকের তত্ত্বে জীবন এবং মৃত্যু সচেতনতার দিকে বা সচেতনতা থেকে শুধুমাত্র ক্রান্তিকাল ছাড়া আর কিছুই নয়। ' আগের মুহূর্তকে অবসান করেই যেহেতু পরের মুহূর্তকে আসতে হয়, সেহেতু মৃত্যু ছাড়া কোন বর্তমান মুহুর্ত নেই'। কাজেই তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, 'আমরা অন্তহীনভাবে পূনর্নির্মিত মহাবিশ্বে বসবাস করি'। মৃত্যুকে ভয় করার কোন কারণ নেই কেননা 'আমি যা ধারণ করি তা মৃত্যু নয়, বরং আমি কি হতে পারি সেটাই মৃত্যু। আজ আমি নিজেকে দেখছি সময়ের শিশু হিসাবে, কিন্তু আমি হতে পারি অনন্ত সময়ের শিশু'। পরিশেষে চোপড়া উপসংহার টেনেছেন এভাবে যে, ' আমরা আমাদের পুরনো পরিচয় অভিজ্ঞতার 'আমিত্ব'-আত্মার পরিচয়ের কাছে ফেলে দিয়ে এক বিশ্ব থেকে আরেক বিশ্বে চলাচল করি এবং আমরা আমাদের পরবর্তী শরীরে সম্পূর্ণ নতুন এক অনুপম জীবনের উপাদানসমূহ জড়ো করি'।

বাস্তবতা যাচাইঃ বিজ্ঞান আসলে কি বলে

আসুন ফিরে আসা যাক বাস্তবতায়। প্রকৃত সত্য কিন্তু ভিন্ন রকম। গত পঁঞ্চাশ বছরে পৃথিবীতে আনুমানিক ১০৬ বিলিয়ন মানুষ জন্ম গ্রহণ করেছে। এখনকার জীবিত ছয় বিলিওন মানুষকে বাদ দিয়ে এর আগের একশ বিলিওনের সকলেই মারা গেছে এবং তাদের মধ্যে কেউই কখনো দুনিয়াতে ফিরে এসে আমাদের সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত করেনি যে পরলোক বলে কিছু আছে। এই উপাত্তসমূহ অমরত্বের প্রত্যাশা এবং

পরলোকের দাবিকে সেভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। তারপরও আসুন একটা একটা করে এগুলোকে পর্যালোচনা করা যাক।

মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতা এবং চেতনার পরিবর্তিত অবস্থা

পাঁচশ' বছর আগে ইনকুবি এবং সুকুবির রূপ নিয়ে অশুভ শক্তি তাদের শিকারদের বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় জ্বালাতন করেছে। দুইশ' বছর আগে ভূত এবং প্রেতরা সারারাত ধরে হয়রানি করেছে লোকজনকে। গত শতাব্দীতে ধূসর এবং সবুজ বর্ণের ভিনগ্রহের বাসিন্দারা মানুষদের তাদের বিছানা থেকে ধরে ধরে নিয়ে গেছে তাদের মহাকাশীয় গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার করার জন্য। আর এই যুগে এসে মানুষ মুখোমুখি হচ্ছে মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতার। মুখোমুখি হচ্ছে আত্মা বাবাজীর হরহামেশা শরীরের বাইরে চলে যাওয়া, শরীর থেকে আলাদা হয়ে ভেসে বেড়ানোর ছেলেমানুষি ইচ্ছার। ভেসে ভেসে আত্মা বাবাজী চলে যাচ্ছে কখনো আঙিনার বাইর।, কখনো বা শুধুমাত্র আঙিনা পার হয়েই সন্তুষ্ট থাকছে না। তা চলে যাচ্ছে একেবারে পৃথিবী ছেড়ে মহাশূন্যের অসীম অন্তহীনতায়।

কি ঘটছে এগুলো? এই সকল পরাবাস্তব প্রাণী এবং রহস্যময় প্রপঞ্চসমূহ কি বাস্তবতা নাকি সবটুকুই আমাদের মনের মাধুরী মেশানো কল্পনা? বিজ্ঞানের নতুন তথ্য প্রমাণ ধারণা দিচ্ছে যে এই বিষয়গুলো প্রকৃতপক্ষে মস্তিষ্কের কারসাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। স্নায়ুবিজ্ঞানী মাইকেল পারসিংগার (Miachael Persinger) তার ক্যানাডার সাডবেরিতে অবস্থিত লরেন্টিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে লোকজনদের Temoporal lobe এ চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের প্যাটার্ন তৈরি করে এর সবগুলো অভিজ্ঞতাই তাদেরকে দিতে পেরেছিলেন। আমি নিজেও এরকম এক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলাম এবং সেই সময় সামান্য হলেও আমার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

একইভাবে, ন্যাচার পত্রিকার ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০০২ সালের সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে যে, সুইস স্নায়ুবিজ্ঞানী ওলাফ ব্লাংকে (Olaf Blanke) এবং তার সহকর্মীরা আবিষ্কার করেছেন যে তারা তেতাল্লিশ বছর বয়স্ক এক মৃগী রোগিণীর টেমপোরাল লোবের সঠিক এঙ্গুলার জাইরাসে বৈদ্যুতিক উদ্দীপনার মাধ্যমে শরীর বিচ্যুত অভিজ্ঞতা (Out-of-body experience, সংক্ষেপে OBE)) আনতে সক্ষম হয়েছেন। প্রাথমিক স্বল্প উদ্দীপনায় ভদ্রমহিলা 'বিছানায় ডেবে যাচ্ছি' বা 'উঁচু থেকে পড়ে যাচ্ছি' ইত্যাদি অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। কিছুটা বেশি পরিমাণে উদ্দীপনার পরে 'নিজেকে বিছানায় শোয়া দেখতে পাচ্ছি, তবে শুধু আমার পা এবং নিচের অংশ দেখতে পাচ্ছি' বলেছেন। আরো অধিক উদ্দীপ্ত করার পর ভদ্রমহিলার তাৎক্ষণিক অনুভূতি হলো 'ওজনহীনতা' এবং 'দুই মিটার উঁচুতে সিলিং এর কাছাকাছি ভাসছি' এরকম।

২০০১ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ Why God Won't Go Away'তে একই ধরনের একটি গবেষণায় উল্লেখ করা হয় যে, গবেষক এন্ড্রু নিউবার্গ (Andrew Newberg) এবং গবেষক ইউজিনি দ্য আকুইলি (Eugene D'Aquili) দেখতে পেয়েছেন যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এবং ফ্রানসিসকান সন্ন্যাসিনীরা যখন ধ্যান করে তখন তাদের মস্তিষ্কের স্ক্যান Posterior superior parietal lobe এ বিস্ময়করভাবে স্বল্প কর্মচাঞ্চল্য প্রদর্শন করে। Posterior superior parietal lobe কে লেখকদ্বয় Orientation

Association Area (OAA) বলে উল্লেখ করেছেন, যার কাজ হচ্ছে শরীরকে বস্তুগত দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা দেওয়া (যে সকল লোকের এই অংশ বিনষ্ট হয়েছে তাদের কোথাও যাওয়ার রাস্তা খুঁজে পেতে বেশ বেগ পেতে হয়।)। যখন OAA উদ্দীপ্ত হয় এবং সঠিকভাবে কাজ করতে থাকে তখন সত্তা এবং অ-সত্তার মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য থাকে। গভীর ধ্যান বা প্রার্থনার সময় যখন OAA ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে তখন ওই পার্থক্য ঘুচে যেয়ে বাস্তবতা এবং কল্পনা, শরীর অনুভব এবং শরীর বিচ্ছিন্নতার অনুভবের মধ্যকার সীমারেখা ঝাঁপসা হয়ে উঠে। সম্ভবত একারণেই ভিক্ষুরা বিশ্বজগতের সাথে একাত্মতা অনুভব করে বা সন্ন্যাসিনীরা ঈশ্বরের উপস্থিতি টের পায়, কিংবা ভিনগ্রহবাসীদের দ্বারা অপহৃত ব্যক্তিরা বিছানা ছেড়ে উড়ে যেতে থাকে অন্য জগৎ থেকে আসা মূল নভোযানের দিকে।

কারো কারো ক্ষেত্রে কখনো কখনো বড় ধরনের শারীরিক বা মানসিক আঘাতের কারণেও ওই ধরনের অভিজ্ঞতার সূত্রপাত হতে পারে। Lancet এর ডিসেম্বর ২০০১ সংখ্যা একটি ডাচ গবেষণার কথা উল্লেখ করেছে যেখানে ৩৪৪ জন হৃদ্‌রোগী ক্লিনিক্যাল ডেথ অবস্থা থেকে বেঁচে ফিরে এসেছে। এদের মধ্যে বারো শতাংশ মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছে। মরণপ্রান্তিক সেই অভিজ্ঞতায় তারা তাদের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেসে বেড়িয়েছে এবং সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে আলোর দেখা পেয়েছে। কেউ কেউ আবার সেই সময় মৃত আত্মীয় স্বজনের সাথে টুকটাক সুখ দুঃখের কথা টথাও সেরে ফেলেছে বলে জানিয়েছে।

এই সব ঘটনার সাধারণ ব্যাখ্যা হচ্ছে যে, যেহেতু আমাদের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার উদ্দীপক বাইরে থেকে মস্তিষ্কে আসে, কাজেই যখন মস্তিষ্কের একটা অংশ মস্তিষ্কের ভিতরেই অস্বাভাবিকভাবে এই বিভ্রম তৈরি করে তখন মস্তিষ্কের অন্য অংশ বহিরাগত বিষয় হিসাবে সেগুলোকে চিহ্নিত করে। ফলে, অস্বাভাবিক বিষয়কে মনে করা হয় অতিপ্রাকৃতিক বিষয় বলে। বাস্তবে এটা কেবলমাত্র মস্তিষ্কের রসায়ন ছাড়া আর কিছুই নয়।

আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, NDE এবং OBE এর মধ্যে জৈব-রাসায়নিক সম্পর্ক রয়েছে। আমরা জানি যে আকাশে উড়ার হ্যালুসিনেশন এট্রোপাইন এবং অন্যান্য বিষাক্ত এলকোয়েডের কারণে ঘটে থাকে। এদের কিছু কিছুকে পাওয়া যায় ম্যানড্রেক এবং জিমসন আগাছার মধ্যে। ইউরোপিয়ান ডাকিনীরা এবং আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ান শ্যামানরা এগুলোকে যত্রতত্র ব্যবহার করতো। কেটামাইনস (Ketamines) এর মত অনুভূতিনাশকের কারণে খুব সহজেই OBE সংঘটন করানো সম্ভব। DMT (dimethyl-tryptamine) জগৎকে সম্প্রসারণশীল বা সংকুচিত হওয়ার অনুভূতির জন্ম দেয়। LSD দৃষ্টিভ্রম এবং শ্রবনভ্রম তৈরি করে অন্যান্য অনেক অনুভূতির মধ্যে বিশ্বজগতের সাথে একাত্মতার অনুভূতির জন্ম দেয়। ওই ধরনের কৃত্রিমভাবে তৈরি রাসায়নিক উপাদানের গ্রহণ উন্মুখ এলাকা থাকার অর্থই হচ্ছে মস্তিষ্কের স্বাভাবিকভাবে তৈরি রাসায়নিক উপাদান কিছু পরিস্থিতিতে (উদাহরণস্বরূপ, শারীরিক বা মানসিক ভয়ানক আঘাত বা দুর্ঘটনা) মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতার কোন একটি অথবা সকল অনুভূতিরই বিকাশ ঘটাতে পারে। কাজেই, আজরাইলকে মাথার কাছে দেখার চরম যন্ত্রণা থেকে লাগামহীন 'ভ্রমনের' রূপে মরণপ্রান্তিক এবং শরীর বিচ্ছিন্নতার অভিজ্ঞতা হতে পারে।

কেন ভিন্ন ভিন্ন লোক সুড়ঙ্গের মত একই ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে সেটা দেখানোর মাধ্যমে মনোবিজ্ঞানী এবং পরাবাস্তব গবেষক সুসান ব্লাকমোর (Susan Blackmore) হ্যালুসিনেশন

হাইপোথেসিসকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। রেটিনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য মস্তিষ্কের পিছনের দিকে অবস্থিত ভিস্যুয়াল কর্টেক্সে প্রক্রিয়াজাত করানো হয়। হ্যালুসেনিক ওষুধসমূহ এবং মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাব এই এলাকায় স্বাভাবিক স্নায়ু কোষের উৎক্ষেপণের হার এর সাথে ঝামেলা পাকাতে পারে। এটা যখন ঘটে তখন স্নায়বিক কার্যক্রমের 'ডোরাকাটা দাগ' (Stripes) ভিস্যুয়াল কর্টেক্সের দিকে অগ্রসর হয়। এটাকেই তখন মস্তিষ্ক কেন্দ্রীভূত বৃত্ত বা সর্পিল কুণ্ডলী রূপ বলে ধরে নেয়। এই সর্পিলাকার কুণ্ডলীলেই সুড়ঙ্গ হিসাবে হয়তো দেখা যায়। একইভাবে, দেহ বিচ্যুতির ক্ষেত্রে উপর থেকে ভাসমান অবস্থায় দেখার বিষয়টা প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া 'বিকেন্দ্রীকরণ' এর সম্প্রসারিত ধরন। নিজেকে সমুদ্র সৈকতে বসে থাকা বা পর্বত আরোহণ করা কল্পনা করা সাধারণত উপর থেকে নিচের জিনিষ দেখার মত।

মস্তিষ্ক এবং মন যে একই জিনিষ তা এই গবেষণা কর্মগুলোই প্রমাণ। সকল অভিজ্ঞতাই আসলে গৃহিত হয় মস্তিষ্কের মাধ্যমে। কর্টেক্স এর মত বৃহৎ এলাকা টেম্পোরাল লোবের মত ক্ষুদ্র এলাকার কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে। এই ক্ষুদ্র এলাকাগুলো আবার এঙ্গুলার গাইরাসের (Angular Gyrus) মত আরো ক্ষুদ্র এলাকাগুলোর স্নায়বিক ঘটনাসমূহের মধ্যে তুলনা করে। এই লঘুকরণ একক নিউরন পর্যায় পর্যন্ত চলতে থাকে। এই পর্যায়ে কোন ব্যক্তি পরিচিত কাউকে দেখতে পেলে তার মস্তিষ্কে 'দিদিমা নিউরন' নামে পরিচিত খুব নির্বাচিত কিছু নিউরনসমূহ চঞ্চল হয়ে উঠে। UCLA এর নিউরোসার্জন আইজাক ফ্রিড (Itzhak Fried) এর সহযোগিতায় ক্যালটেক এর স্নায়ু বিজ্ঞানী ক্রিস্টল কোচ (Christol Koch) এবং গ্যাব্রিয়েল ক্রেইম্যান (Gabriel Kreiman) গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকে বিল ক্লিন্টনের ছবি দেখানোর পর একটিমাত্র নিউরনকে চঞ্চল হতে দেখেছেন। 'মণিকা নিউরন' যে এর খুব কাছাকাছি সংযুক্ত হতে বাধ্য তা বলাই বাহুল্য।

চেতনার স্নায়বিক সম্পর্ক খোঁজার সূত্রপাত হয় এই মৌলিক পর্যায় থেকে। এবং তারপর স্নায়বিক সংযোগের এই সরলতর ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত চিন্তার জটিল সিস্টেমের বিকাশমান উপাদান খোঁজার জন্য আমরা সেখান থেকে ক্রমশ অগ্রসর হই। আমরা যা প্রত্যক্ষ করি সেটাকে দার্শনিকেরা বলে থাকেন কোয়ালিয়া (Qualia) বা স্নায়বীয় ঘটনাসমূহের সংযোগের কারণে উদ্ভূত চিন্তা এবং অনুভূতির মনোগত অবস্থা। তবে এটা ঠিক এক সময় না এক সময় বিজ্ঞানের নাছোড়বান্দা আচরনের কারণে সচেতনতার গূঢ় রহস্যও সমাধান হয়ে যাবে।

স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিকের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়াটাই অস্বাভাবি এবং অতিপ্রাকৃতের ভবিষ্যৎ। প্রকৃতপক্ষে, অস্বাভাবি এবং অতিপ্রাকৃত বলতে কিছু নেই। আছে শুধু স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক..... আর আছে শুধু কিছু রহস্য যা এখনো ব্যাখ্যা করা যায়নি এই যা।

ইএসপি এবং মনের প্রমাণ

একশ' বছরেরও বেশি সময় ধরে পিএসআই (psi) বা সাইকিক প্রপঞ্চের উপস্থিতি আছে বলে দাবি করা হচ্ছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চের মত সংগঠনগুলো গড়ে উঠেছিল psi গবেষণায় কঠোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য। সে কাজে সহায়তা দেওয়ার জন্য তাদের হাতে বিশ্ব মানের বৈজ্ঞানিকও ছিল। বিংশ শতাব্দীর বিশ শতকে জোসেফ রাইনের ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষণ থেকে

শুরু করে নব্বই এর দশকে করা ড্যারিল বেম এর কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার মত মাঝে মাঝেই সিরিয়াস একাডেমিক রিসার্চের সুবিধাও পেয়েছে psi।

উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে বেম এবং তার প্রাক্তন ইউনিভার্সিটি অব এডিনবার্গ প্যারাসাইকোলোজিস্ট সহকর্মী চার্লস হনর্টন তাদের প্রবন্ধ 'Does Psi Exist? Replicable Evidence for an Anomalous Process of Information Transfer' নামকরা রিভিউ জার্নাল Psychological Bulletin এ প্রকাশ করেন। চল্লিশটা প্রকাশিত প্রবন্ধের মেটা-এনালাইসিস (meta-analysis) করে লেখকদ্বয় উপসংহারে পৌঁছেছেন এভাবেঃ

Psi এর পক্ষে প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও (সাফল্যের হার ৩৫ শতাংশ, যেখানে ২৫ শতাংশ হার দৈবক্রমে হওয়াটা প্রত্যাশিত) বেম এবং হনর্টন হায় হতাশ করেছেন এই বলে যে, বেশিরভাগ একাডেমিক মনোবিজ্ঞানী তথ্য বা শক্তির ব্যতিক্রমী প্রক্রিয়ায় স্থানান্তর, যাকে psi বলা হয় (যেমন, টেলিপ্যাথি বা অন্য ধরনের ইন্দ্রিয়াতীত অনুধাবন, যা বর্তমানে জানা বস্তুগত এবং জৈবিক মেকানিজম অনুযায়ী অব্যাখ্যাত), তার অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না।

বিজ্ঞানীরা কেন psi গ্রহণ করেন নাই? বিজ্ঞানের জগতে ড্যারিল বেমের একনিষ্ঠ গবেষক বলে বিরাট সুনাম রয়েছে এবং তিনি psi গবেষণায় পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ সব ফলাফল প্রদর্শন করেছেন। নতুন তথ্য এবং প্রমাণ হাজির করলে বিজ্ঞানীদের কি তাদের পুরনো মনোভাব পাল্টানোর কথা না? তাহলে কেন সংশয়? সংশয়ের মূল কারণ হচ্ছে, কোন গবেষণার গ্রহণযোগ্যতার জন্য প্রতিরূপযোগ্য (Replicable) ডাটা এবং সামর্থময় (Viable) তত্ত্বের প্রয়োজন, যার দুটোই psi গবেষণায় অনুপস্থিত ছিল।

উপাত্ত: মেটা-এনালাইসিস এবং গ্যাঞ্জফেল্ড কৌশল দুটোই পরবর্তীতে ভয়ংকর তোপের মুখে পড়েছিল। ইউনিভার্সিটি অব অরিগনের রে হাইম্যান (Ray Hyman) বিভিন্ন গ্যাঞ্জফিল্ড পরীক্ষণে ব্যবহৃত পরীক্ষণ ক্রিয়াবিধির মধ্যে অসামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছেন (বেমের মেটা-এনালাইসিসে সেগুলোকে এমনভাবে একত্রিত করা হয়েছে যেন সেগুলো একই ক্রিয়াবিধি অনুসরণ করে।)। ওই রকম ভিন্নধর্মী ডাটা সেটের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পরিসংখ্যান পরীক্ষাও (Stouffer's Z) অনুপযোগী ছিল। তিনি টারগেট রান্ডমাইজেশন প্রক্রিয়াতেও (যে সিকোয়েন্সে ভিসুয়াল টারগেট রিসিভারে পাঠানো হয়।) খুঁত খুঁজে পান। যার কারণে লক্ষ্য নির্বাচন পক্ষপাতদুষ্ট হয়েছিলঃ 'গবেষণায় সব তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য এসেছিল টারগেটের দ্বিতীয় অথবা তার পরবর্তী উপস্থিতিতে। আমরা যদি প্রথম উপস্থিতির ক্ষেত্রে অনুমানকে পরীক্ষা করি তাহলে দেখতে পাবো যে ফলাফল দৈবর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ইউনিভার্সিটি অব হার্টফোর্ডশায়ারের রিচার্ড ওয়াইজম্যান (Richard Wiseman) তিরিশটারও বেশি গ্যাঞ্জফিল্ড পরীক্ষণ নিয়ে একটি মেটা-এনালাইসিস করেও psi এর কোন হদিস খুঁজে পাননি। ফলে তিনি উপসংহার টানেন এই বলে যে, psi ডেটা বা উপাত্ত প্রতিরূপযোগ্য নয়। বেম তার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ এরকম আরো দশটা গ্যাঞ্জফিল্ড গবেষণা আছে বলে পালটা দাবি করেন এবং সেগুলো নিয়ে আরো কাজ করে তা প্রকাশ করার পরিকল্পনা তার রয়েছে বলে জানান। আর এইভাবেই শুরু হয় ডেটা নিয়ে বিতর্ক যা ডেকে নিয়ে আসে আরো অনেক অনেক যুক্তিতর্ক।

তত্ত্বঃ ভবিষ্যতে যদি আরো তাৎপর্যপূর্ণ ডাটাও প্রকাশিত হয় তা হলেও psi এর ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা সন্দিহান আছেন বা ভবিষ্যতেও থাকবেন। এর পিছনের জোরালো কারণ হচ্ছে যে, psi কীভাবে কাজ করে সে বিষয়ে ব্যাখ্যামূলক কোন তত্ত্ব নেই। যতদিন পর্যন্ত না psi এর অনুগামীরা ব্যাখ্যা করতে পারবেন যে, কীভাবে প্রেরকের মস্তিষ্কে নিউরন কর্তৃক তৈরি করা চিন্তাসমূহ মগজের খুলি ভেদ করে গ্রহীতার মস্তিষ্কে পৌঁছবে ততদিন পর্যন্ত এই সংশয় থেকেই যাবে। এমনকি উপাত্ত যদি দেখায়ও যে psi এর উপস্থিতি আছে, যা ব্যাখ্যার প্রয়োজন (আমি নিশ্চিত যে তা নেই), তারপরও আমাদের কার্যকারণ সম্পর্কটা প্রয়োজন।

কোয়ান্টাম সচেতনতা

দীপক চোপড়া এবং অন্যেরা হয়তো পালটা যুক্তি দেবে যে, psi এর অকাট্য তত্ত্ব রয়েছে এবং তা হচ্ছে কোয়ান্টাম সচেতনতা। দারুণ জনপ্রিয় এবং একটা অদ্ভুত ধরনের নামের চলচ্চিত্র 'What the Bleep! Do We Know!?' তে কোয়ান্টাম সচেতনতা দেখানো হয়েছে। চাতুর্যপূর্ণ সম্পাদনার এই চলচ্চিত্রে অভিনেত্রী মার্লি ম্যাটলিন একজন স্বপ্নালু ফটোগ্রাফারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এই চরিত্রটি আপাত অর্থহীন মহাবিশ্বকে অর্থপূর্ণ করার চেষ্টা করছে। চলচ্চিত্রটির মূল বিষয় হচ্ছে সচেতনতা আর কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মাধ্যমে আমরা আমাদের নিজেদের বাস্তবতা তৈরি করি। ছবিটি যে সপ্তাহান্তে মুক্তি পেয়েছিল তার আগেই এর প্রযোজকের সাথে ওরিগনের পোর্টল্যান্ডে একটি টেলিভিশন শোতে আমার দেখা হয়েছিল। ফলে, প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার আগেই আমি ছবিটি দেখে ফেলেছিলাম। আমি কখনোই ভাবি নাই যে, সচেতনতা এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্সের উপর কোন চলচ্চিত্র সফল হতে পারে। কিন্ত আশ্চর্যজনকভাবে ছবিটা কয়েক মিলিওন ডলার আয় করে ফেলে এবং এর একধরনের একটা কাল্ট অনুসারীও তৈরি হয়ে যায়।

এই চলচ্চিত্রের অবতাররা হচ্ছেন গোঁড়া নিউ এজ পন্থী বিজ্ঞানীরা। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ক্যালটেক পদার্থবিদ মুরে গেল-ম্যানের (Murray Gell-Mann) ভাষায়, এদের তত্ত্বকথার ফুলঝুরি, 'কোয়ান্টাম বকবকানি' ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন ধরুন ইউনিভার্সিটি অব অরিগনের কোয়ান্টাম পদার্থিবিজ্ঞানী অমিত গোস্বামী বলেছেন যে, 'আমাদের চারপাশের বস্তুগত জগত সম্ভাব্য সচেতনতার নড়চড় ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি প্রতি পলে পলে আমার অভিজ্ঞতা বেছে নিচ্ছি। হাইজেনবার্গ বলেছেন পরমাণুসমূহ বস্তু নয়, বরং প্রবনতা'। ঠিক আছে অমিত। আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি। পারলে বিশ তলা বিল্ডিং এর উপর থেকে লাফিয়ে পড়ুন এবং ভূমির প্রবনতার মধ্য দিয়ে নিরাপদে অতিক্রম করে যাওয়ার অভিজ্ঞতা সচেতনভাবে বেছে নিন।

The Message of Water গ্রন্থের জাপানী লেখক গবেষক মাসুরা এমোটোর গবেষণা হচ্ছে কীভাবে মানুষের চিন্তা বরফের ক্রিস্টালের আকৃতি পরিবর্তন করে দেয় তা দেখানো। এক গ্লাস পানি তার চারপাশে 'ভালবাসা' শব্দ জড়িয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত বেশ কিছু ক্রিস্টালে পরিণত হয়ে যায়। আবার এলভিস প্রিসলির 'Heartbreak Hotel' বাজালে এক টুকরো ক্রিস্টাল ভেঙ্গে দুই টুকরায় পরিণত হয়। তাহলে কি এলভিসের 'Burnin' Love' বাজালে পানি ফুটতে শুরু করবে? তাইতো হওয়ার কথা, তাই না?

ছবিটারর সবচেয়ে দুর্বলতম অংশ হচ্ছে ৫৮ বছর বয়স্কা মহিলা J. Z. Knight শরীরের মধ্যে ভর করা ৩৫০০০ বছর বয়সী প্রেতাত্মা 'রামথা'র সাক্ষাৎকার। আমার ভাবনা হচ্ছে ৩৫০০০ বছর আগে কোন অঞ্চলের মানুষ ভারতীয় উচ্চারণে ইংরেজীতে কথা বলতো কে জানে। চলচ্চিত্রের অনেক প্রযোজক, লেখক এবং অভিনেতারা রামথার 'School of Enlightement' এর সদস্য। এই স্কুলে সপ্তাহান্তে নিউ এজ এর ধ্যান ধারণা শেখানো হয়।

কোয়ান্টাম জগতের অদ্ভুতুড়তার সাথে (যেমন, হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার সূত্র, যেখানে বলা হয়েছে যে যখনই কোন কণিকার অবস্থান সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়, তখনই তার গতি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এর উল্টোটাও হতে পারে যেখানে গতি নিশ্চিতভাবে জানা গেলে অবস্থান অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।) বৃহৎ জগতের রহস্যময়তার (যেমন সচেতনতা) সংযোগ সাধনের চেষ্টা নতুন কিছু নয়। এ দুটোর সর্বোত্তম সংযোগ ঘটিয়েছিলেন পদার্থবিজ্ঞানী রজার পেনরোজ এবং চিকিৎসক স্টুয়ার্ট হ্যামেরফ। যাদের কোয়ান্টাম তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক মহলে আলোর চেয়ে উত্তাপই বেশি পরিমাণে ছড়িয়েছিল।

আমাদের নিউরনের মাঝখানে কিছু ক্ষুদ্রাকৃতির ফাঁপা মাইক্রোটিউবুলেস আছে যেগুলো কাঠামোগত খুঁটি হিসাবে কাজ করে। ধারণা (এবং এটা শুধু ধারণাই, আর কিছু নয়) করা হয় যে, মাইক্রোটিউবুলেসের মধ্যে কোন কিছু হয়তো ওয়েভ ফাংশন পতনের একটা সূত্রপাত ঘটায়, যার ফলে পরমাণুগুলোর কোয়ান্টাম সমন্বয়ের সৃষ্টি হয়।। পরিণতিতে নিউরনসমূহের মাঝে সিনাপ্সে নিউরোট্রান্সমিটার নির্গমন হয় এবং এর ফলে তারা একসাথে একইভাবে বিকশিত হয়ে চিন্তা এবং সচেতনতা তৈরি করে। যেহেতু ওয়েভ ফাংশনের পতন কেবলমাত্র কোন পরমাণু 'পর্যবেক্ষিত' (কোন কিছু দিয়ে যে কোনভাবে প্রভাবিত হলে) হলেই ঘটতে পারে, সেহেতু এই ধারণার আরো একজন প্রস্তাবক স্নায়ুবিজ্ঞানী স্যার জন একলেস (John Eccles) বলেন যে, খুব সম্ভবত 'মন'ই হয়তো অণু থেকে পরমাণু, নিউরন, চিন্তা, সচেতনতার পৌণপুণিক চক্রের পর্যবেক্ষক।

বাস্তবে, সাব এটোমিক কোয়ান্টাম এফেক্ট এবং বৃহৎ আকারের ম্যাক্রো সিস্টেমের ব্যবধান এতো বেশি যে তাদের মধ্যে সংযোগ সাধন সম্ভবপর নয়। কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্টিকল পদার্থবিজ্ঞানী ভিক্টর স্টেংগার তার গ্রন্থ The Unconcious Quantum - এ দেখিয়েছেন যে একটি সিস্টেমকে কোয়ান্টাম মেকানিক্স হিসাবে বর্ণনা করতে হলে এর গড় m, গতি v এবং দূরত্ব d কে অবশ্যই প্লাঙ্কের (Planck) ধ্রুবক h এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। 'যদি mvd, h এর চেয়ে অনেক বেশি হয় তাহলেই কেবল সিস্টেমকে মেনে নেওয়া যেতে পারে'। স্টেংগার হিসাব করে দেখেছেন যে, সিন্যাপ্সের দূরত্বে নিউরাল ট্রান্সমিটার মলিকিউলস এর ভর এবং তাদের গতি প্রায় তিনগুন বেশি, যা কোয়ান্টাম প্রভাবকে কার্যকর করার জন্য খুব বেশি বড়। মাইক্রো-ম্যাক্রো সংযোগ বলে কিছু নেই। যখন তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করা হয় তখন সাব এটোমিক পার্টিকলগুলো হয়তো পরিবর্তিত হয়, কিন্তু চাঁদ ঠিকই চাঁদের

জায়গায় থেকে যায় তা সে কেউ তার দিকে তাকাক বা না তাকাক। কি যে ঘোড়ার আন্ডাটা হচ্ছে এখানে কে জানে?†

বিজ্ঞানের ইতিহাস মনের অন্তর্নিহিত কার্যাবলী ব্যাখ্যা করার অসংখ্য স্বাপ্নিক কিন্তু ব্যর্থ কর্মকাণ্ড দিয়ে ভর্তি। সকল মানসিক কার্যাবলীকে ঘূর্ণায়মান পরমাণু, যা মূলতঃ এগিয়ে যাচ্ছে চেতনার দিকে, তার কার্যাবলী হিসাবে ব্যাখ্যা করা থেকেই এই কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে প্রায় চারশ' বছর আগে ডেকার্ট (Descarte) এর বিখ্যাত উচ্চাকাঙ্খী প্রচেষ্টা থেকে। এই ধরনের কার্টেসিয়ান স্বপ্ন এক ধরনের নিশ্চয়তা প্রদান করে, কিন্তু খুব দ্রুত তা জীববিজ্ঞানের জটিলতার মুখোমুখি হয়ে ফিকে হয়ে যায়। আমাদের উচিত স্নায়বীয় পর্যায়ে এবং আরো উঁচুতে চেতনার খোঁজ করা যেখানে কার্যকারণ বিশ্লেষণ উত্থান এবং আত্ম-সংগঠনের মত নীতির দিকে দিক নির্দেশ করেছে।

সাইকিক মাধ্যমতা এবং মৃতের সাথে কথা বলা

দীপক চোপড়া একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করেছেন। সেই গবেষণায় তিনজন সাইকিক দাবি করছিল যে তারা পরলোকে চলে যাওয়া লোকজনের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। যদিও কোন সাইকিককেই বলা হয়নি যে দীপক সেখানে উপস্থিত ছিল, তা সত্ত্বেও দুইজন তাকে নাম ধরে সনাক্ত করে ফেলেছিল। দুইজন বলেছিল যে সে তার সদ্য মৃত বাবার সাথে যোগাযোগ করতে চায় এবং এর মধ্যে একজন তার ছেলেবেলার ডাক নামও কিভাবে যেন জানতো। দীপক এই অভিজ্ঞতাকে খাঁটি অভিজ্ঞতা বলে দাবি করেছেন। যদিও তিনি স্বীকার করেছেন যে, তার এ বিষয়ে মনে কিঞ্চিৎ খুঁতখুঁতানি ছিল। বিশেষ করে যেহেতু দীপকের মতে, 'পরলোক থেকে আসা আমার বাবা ততটুকুই জিনিষই জানতো যতটুকু আমি জানি, তার চেয়ে বেশি কিছু না'।

এই কিঞ্চিৎ খুঁতখুঁতানি বেশিরভাগ লোকের সন্দেহবাতিকতার চেয়েও বেশি সন্দেহবাদী, বিশেষ করে এমন একটি আবেগপ্রবন লেখায় যেখানে মৃত ভালবাসার জনদের সাথে সংযোগ সাধনের প্রতিশ্রুতি দেয়। সাইকিকেরা কীভাবে মৃতদের সাথে কথা বলে? আমি এ বিষয়ে অনেক লেখালেখি করেছি। তবে সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় এটা এমন একটা চালাকি যেখানে দুটো কৌশলের বিশেষ প্রয়োজন হয়।

† সম্প্রতি রজার পেনরোজ এবং স্টুয়ার্ট হ্যামারফ মনুষ্য-চেতনার একটি তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, মাইক্রো-টিউবলসসমূহের মধ্যে কোয়ান্টায়িত মহাকর্ষ থাকার ফলে দরুন যে মনুষ্য-চেতনার উদ্ভব ঘটে সেটা ধ্বংস হয় না। ভাববাদীরা স্বভাবতই এতে 'আত্মার নিত্যতা' খুঁজে পেয়েছেন। পেনরোজের অধিপদার্থবিদ্যার এ সব ব্যাখ্যা বিভিন্ন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। অধিকাংশ বিজ্ঞানীই এগুলো গ্রহণ করেননি। যেমন, পদার্থবিজ্ঞানী স্মোলিন বলেন, 'আমাদের মস্তিষ্কের আবাস তো আর পরমশূন্যের কাছাকাছি কোথাও নয়, এজন্য বিবর্তনের ফলশ্রুতিতে মস্তিষ্কের আচরণ কোয়ান্টায়িত হয়ে যাবে এমন প্রত্যাশা খুব একটা যৌক্তিক হতে পারে না'। আরেক পদার্থবিদ ম্যাক্স টেগমার্ক Physical Review পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধে হিসাব কষে দেখিয়েছেন যে, নিউরনের সক্রিয়ন ও উদ্দীপনের (firing and excitation) জন্য প্রয়োজনীয় সময় decoherence জন্য প্রয়োজনীয় সময় থেকে কমপক্ষে ১০,০০০,০০০,০০০ গুণ বেশী। অর্থাৎ, পেনরোজ মস্তিস্ককে 'কোয়ান্টাম কম্পিউটারের' সাথে যে তুলনা করেছিলেন সে অনুমানে ভুল ছিল। টেগমার্ক উপসংহার টেনেছেন এই বলে - মানুষের মস্তিস্ককে ক্লাসিকাল বা চিরায়ত ব্যবস্থা হিসেবে ধর উচিৎ, কোয়ান্টাম ব্যবস্থা নয়। শুধু বৈজ্ঞানিক জার্নালে নয়, ইন্টারনেটেও পেনরোজ-হ্যামারফের যুক্তির খন্ডন আছে - সম্পাদক।

১. কোল্ড রিডিং বা সবজান্তার ভান করাঃ এখানে আপনি আক্ষরিক অর্থেই কারো সম্পর্কে কিছু না জেনেই ভান করবেন যে তার সম্পর্কে সবকিছু জানেন। আপনি অনর্গল প্রশ্ন করবেন এবং অসংখ্য মন্তব্য করেন এবং দেখবেন যে কোনটা ঝড়ে বক মরের মতো লেগে যায়। 'আমি প অক্ষরের নাম পাচ্ছি। দয়া করে বলবেন কি কে এটা? উনি আমাকে লাল রঙের একটা কিছু দেখাচ্ছেন। কী সেটা, প্লিজ? এরকম করে চলবে আরো কিছুক্ষণ। বেশিরভাগ মন্তব্যই হবে ভুলভাল ধরনের। তাতে অবশ্য কোন সমস্যা নেই। B.F. Skinner তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচরণের উপর পরীক্ষায় যেমন দেখিয়েছেন যে, লোকজনের শুধু দরকার মাঝে মাঝে তাদেরকে বুঝ দেওয়া যে সত্যি সেখানে কিছু একটা আছে (স্লট মেশিনে জুয়াড়িদের আটকে রাখার জন্য মাঝে মাঝেই তাদেরকে জিততে দিতে হয়)। এই ভণ্ড সাইকিকদের জারিজুরি ফাঁস করার উপর আমার করা WABC নিউইয়র্কের একটি অনুষ্ঠানে সাইকিক যখন নামধাম, তারিখ, রঙ, রোগব্যাধি, অবস্থা, পরিস্থিতি, আত্মীয়স্বজন, স্মারকবস্তুসমূহ এবং অন্যান্য বিষয় দ্রুতগতিতে বলে যাচ্ছিল তখন আমরা প্রথম মিনিটেই প্রায় প্রতি সেকেন্ডে একটি করে মন্তব্য গুনতে সক্ষম হয়েছিলাম। সাইকিকরা এতো দ্রুত গতিতে কথা বলে যে আপনাকে টেপ থামিয়ে পিছনে যেয়ে দেখতে হবে যে আসলে কি বলা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানের সাইকিকের সাফল্যের হার ছিল দশ শতাংশের চেয়েও কম। আর ওই দশ শতাংশ সাফল্যের ব্যক্তিরা ছিল তারাই যারা মনে মনে সুতীব্রভাবে চাচ্ছিল যেন তারা তাদের মৃত প্রিয়জনের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

২. ওয়ার্ম রিডিং বা জ্ঞাত মনোবিজ্ঞানের নিয়মের প্রয়োগঃ ওয়ার্ম রিডিং সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনোবিজ্ঞানের জানা নীতিগুলোকে ব্যবহার করে। ব্রিটিশ মনোবিশারদ এবং যাদুকর ইয়ান রোল্যান্ড (Ian Rowland) এর সাইকিক অনুমান কীভাবে করতে হয় সে সম্পর্কে অন্তর্জ্ঞানসম্পন্ন এবং বিশ্বকোষিক গ্রন্থ The Full Facts Book of Cold Reading বেশিরভাগ বাড়িতেই পাওয়া যাবে এমন সব বস্তুসমূহকে যাতে করে নিশ্চিতভাবে কাউকে বিশ্বাস করানো যাবে যে তাদের মৃত প্রিয়জন কক্ষে উপস্থিত আছে সহ উচ্চ সাফল্য সম্ভাবনাসম্পন্ন অনুমানসমূহের তালিকা প্রদান করেছে। তালিকার বিষয়গুলো এরকমঃ এক বাক্স পুরাতন ফটো, তার মধ্যে কিছু এলবামে সাঁটা, কিছু এলবামের বাইরে; পুরনো ওষুধপত্র, মেয়াদ উত্তীর্ণ মেডিক্যাল সাপ্লাই, খেলনা, বই, শৈশবের কোন স্মৃতি চিহ্ন; পরিবারের মৃত কোন ব্যক্তির গয়নাগাটি; এক প্যাকেট তাস, যার মধ্যে একটা আবার খোয়া গেছে; নষ্ট হয়ে যাওয়া ইলেকট্রোনিক কলকব্জা; হারিয়ে যাওয়া মানানসই কলম বাদে নোট প্যাড বা মেসেজ বোর্ড; ফ্রিজের গায়ে লাগানো বা টেলিফোনের পাশে রাখা জীর্ণ নোট; কোন শখের বিষয়ের উপর লেখা বই, পুরনো ক্যালেন্ডার, আটকে যাওয়া বা ঠিকমত খোলে না এমন কোন ড্রয়ার; হারিয়ে যাওয়া চাবি; নষ্ট হয়ে যাওয়া ঘড়ি ইত্যাদি। অতিপ্রাকৃত কিছু আছে বলে যারা ধারণা দিতে বাধ্য তাদের কিছু সাধারণ বিচিত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঃ হাটুতে দাগ, বাড়ীর ঠিকানায় ২ সংখ্যার উপস্থিতি; শৈশবে পানিতে পড়া জাতীয় দুর্ঘটনা, কোনদিন পুরাতন না হওয়া কোন পোশাক; ওয়ালেট বা পার্সে প্রিয়জনের ছবি; ছেলেবেলায় চুল বড় রাখা হত, কিন্তু বড় হয়ে ছোট চুল রাখা; জোড়ার একটা হারিয়ে যাওয়া কানের দুল ইত্যাদি ইত্যাদি। জেমস ভ্যান প্রাগ, সিলভিয়া ব্রাউন,

রোজমেরি আলটিয়া এবং অন্যান্য মিডিয়াম যাদের উপর আমি ব্যাপক তদন্ত করেছি তারা সবাই মৃত্যুর কারণ হিসাবে বুক বা মস্তিষ্ক এলাকাকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষ। মৃত্যুর কারণ চিহ্নিত করার পর তারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় সেই মৃত্যু কি তরিত্ব গতিতে হয়েছে নাকি ধীর গতিতে হয়েছে সেদিকে। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে তারা মৃত্যুর অর্ধ ডজন প্রধান কারণকে বলে যেতে থাকে। 'সে বলছে যে তার বুকে ব্যথা ছিল'। যদি এক্ষেত্রে তারা ইতিবাচক সাড়া পায়, তাহলে তারা এগিয়ে যেতে থাকে। 'তার কি ক্যান্সার ছিল? কারণ আমি ধীরে ধীরে মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি'। যদি তারা হ্যাঁ সূচক উত্তর দেয়, তাহলে তারা সাথে সাথেই সাফল্যের কৃতিত্ব নিয়ে নেয়। যদি আত্মীয় স্বজনরা ইতস্তত করে তবে সেক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মৃত্যুর কারণ সরিয়ে নেয় হার্ট এটাকের দিকে। যদি মাথার কোন সমস্যার কারণে মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলে তারা স্ট্রোক অথবা আছাড় খেয়ে পড়ে যেয়ে বা গাড়ি দুর্ঘটনা মস্তিষ্কের আঘাতের কথা উল্লেখ করে।

আমি একদিন নিজেই টেলিভিশনের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সাইকিকের ভূমিকা পালন করেছিলাম এবং খুব সহজেই অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে আমি মৃতদের সাথে কথা বলছি। এটা অবশ্য খুবই সহজ কাজ। যে কেউই ইচ্ছা করলে মৃতদের সাথে কথা বলতে পারে। কঠিন কাজ হচ্ছে মৃতদেরকে পালটা কথা বলানো। সাইকিক মিডিয়ামরা চতুর কৌশল ব্যবহার করে বিভ্রম তৈরি করার মধ্য দিয়ে ধারণা দেয় যে মৃতরা আমাদের সাথে কথা বলছে। এবং যেহেতু যারা মিডিয়ামের কাছে সাহায্যের জন্য আসে তার আবেগগতভাবে ভঙ্গুর থাকে, সেহেতু তারা খুব সহজেই মিডিয়ামদের প্রভাববিস্তারকারী পদ্ধতির ফাঁদে পড়ে যায়।

প্রার্থনা এবং রোগ নিরাময় গবেষণা [‡]

২০০৬ সালের এপ্রিলে The American Heart Journal স্বাস্থ্য এবং রোগীর নিরাময়ের উপর ফলদায়ক প্রার্থনার প্রভাব নিয়ে এ পর্যন্ত করা সবচেয়ে বিস্তারিত গবেষণা প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞান এবং ধর্মবিষয়ক গবেষণায় উদ্দেশ্যমূলক সহায়তা প্রদানকারী বলে পরিচিত টেম্পলিটন ফাউন্ডেশন (Templeton Foundation) এর অর্থানুকূল্যে এবং 'প্রার্থনা ফলদায়ক' এই মতের প্রবক্তা হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল স্কুলের কার্ডিওলোজিষ্ট হার্বার্ট বেনসন এর নেতৃত্বে পরিচালিত এই গবেষণার ফলাফল বিজ্ঞান এবং ধর্মে উৎসাহী উভয়পক্ষের লোকেরাই লুফে নেয়। ছয়টি আমেরিকান হাসপাতালের ১৮০২ জন রোগীকে এলোপাতাড়িভাবে তিনটি দলে ভাগ করা হয়। প্রার্থনা পাওয়া ৬০৪ জনকে বলা হয়েছিল যে তারা প্রার্থনা পেতেও পারে অথবা নাও পেতে পারে। ৫৯৭ জন কোন প্রার্থনা পায়নি এবং তাদেরকেও বলা হয়েছিল যে তারা প্রার্থনা পেতেও পারে অথবা নাও পেতে পারে। প্রার্থনা পাওয়া ৬০১ জনকে বলা হয়েছিল যে তারা প্রার্থনা পাবে। সার্জারির আগের রাত থেকে প্রার্থনা করা শুরু হয় এবং তা চলতে থাকে প্রতিদিন ধরে পরবর্তী দুই সপ্তাহ। প্রার্থনাকারীদেরকে নিজেদের মত করেই প্রার্থনা করার সুযোগ

[‡] এ ছাড়া পাঠকেরা এ বইয়ের 'প্রার্থনা কি কোন কাজে আসে?' প্রবন্ধটি পড়তে পারেন।

দেওয়া হয়। তবে বলে দেওয়া হয় যে তারা যেন 'দ্রুত নিরাময় এবং কোন ধরনের জটিলতাহীন সাফল্যজনক সার্জারির' জন্য প্রার্থনা করে থাকেন।

এই গবেষণার ফলাফল ছিল দ্ব্যর্থহীন। কোন দলের মধ্যেই স্ট্যাটিসটিক্যালি সিগনিফিক্যান্ট কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। তার মানে হচ্ছে প্রার্থনা কোন কাজে আসেনি। শুধু যে কাজে আসেনি তা নয় বরং আরো বাজে দিক হচ্ছে যে, যে দলের রোগীরা জানতো যে তাদের জন্য প্রার্থনা করা হবে তাদের মধ্যে সামান্য কিছু পরিমাণে বেশি জটিলতা (যদিও স্ট্যাটিসটিক্যালি সিগনিফিক্যান্ট নয়) দেখা দিয়েছিল। একে বলে 'নোসেবো এফেক্ট' (Nocebo Effect)। কাজেই, মামলা খতম।

আগের অনেক গবেষণায় যেখানে প্রার্থনার ইতিবাচক ফলাফলের দাবি করা হয়েছিল, সেগুলোতে নিচেরগুলো সহ অসংখ্য পদ্ধতিগত ত্রুটি ছিলঃ

১. নিয়ন্ত্রণের অভাবঃ এই গবেষণাসমূহের অনেকগুলোই বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক মর্যাদা, বৈবাহিক অবস্থা, ধর্মনিষ্ঠার মাত্রা ইত্যাদি হস্তক্ষেপকারী চলককে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে সব ধর্মই বহুগামিতা, মদ্যপান ও মাদকদ্রব্যের ব্যবহার এবং ধূমপানের মত অস্বাস্থ্যকর আচরণকে নিষিদ্ধ করেছে। ওই চলকগুলোকে যখন নিয়ন্ত্রণ করা যায় তখন আর আগের মতো তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফল থাকে না। বয়স্ক মহিলাদের নিতম্বের সার্জারি থেকে নিরাময়ের এক গবেষণায় বয়স চলককে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। গির্জায় উপস্থিতির হারের সাথে রোগ নিরাময়ের সম্পর্কের অন্য এক গবেষণা একেবারেই ধর্তব্যের মধ্যে নেয়নি যে অসুস্থ লোকজনেরা গির্জায় সাধারণত কম যেয়ে থাকে। এর সাথে সম্পর্কযুক্ত আরো একটি গবেষণা ব্যায়ামের পরিমাণ চলককেও নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

২. ফলাফলের পার্থক্যঃ গোঁড়া খ্রীষ্টানদের দ্বারা প্রার্থনাকৃত কার্ডিয়াক পেশেন্টদের উপর করা এক বহুল প্রচারিত গবেষণায় ২৯ টি ফলাফল চলক পরিমাপ করা হয়। কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র ৬ টি চলকে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। একই ধরনের অন্যান্য গবেষণায় বিভিন্ন ফলাফল পরিমাপ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থপূর্ণ হতে হলে একই পরিমাপগুলোকে একই ধরনের অন্যান্য গবেষণাগুলোতেও তাৎপর্যপূর্ণ হতে হবে। কারণ অনেক ফলাফল যদি পরিমাপ করা হয় তবে এদের মধ্যে কিছু কিছু দৈবক্রমেই তাৎপর্যপূর্ণ সহ-সম্পর্ক দেখাতে পারে।

৩. ফাইল-ড্রয়ার সমস্যাঃ ধর্মনিষ্ঠা এবং মরণশীলতার উপর করা কয়েকটি গবেষণায় (ধার্মিক লোকেরা অধার্মিকদের চেয়ে বেশি দিন বাঁচে বলে মনে করা হয়) বেশ কিছু ধর্মীয় চলক ব্যবহার করা হয়েছে। তবে সুচতুরভাবে সেগুলোই প্রকাশ করা হয়েছে যেগুলো এই দুইয়ের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ সহ-সম্পর্ক রয়েছে বলে প্রমাণ করেছে। অন্য গবেষণায় একই চলকসমূহ ব্যবহার করে ভিন্ন সহ-সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেছে। এবং সেখানেও অবশ্য শুধুমাত্র তাৎপর্যপূর্ণগুলোই প্রকাশ করা হয়েছে। বাকীগুলোকে অ-তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফলের ড্রয়ারে ফেলে রাখা হয়েছে। যখন

সব সব চলককে একসাথে গাঁথা হয়, তখন দেখা যায় যে ধর্মনিষ্ঠার সাথে মরণশীলতার আসলে কোন সম্পর্ক নেই।

৪. কার্যকর সংজ্ঞাঃ প্রার্থনার প্রভাব নিয়ে যখন কোন পরীক্ষা করা হয় তখন মূলতঃ কি পর্যবেক্ষণ করা হয়? উদাহরণস্বরূপ, কোন ধরনের প্রার্থনা করা হয়? (খ্রীষ্টান, ইহুদী, মুসলমান, বৌদ্ধ, উইকান এবং শ্যামান প্রার্থনা কি একই?) কে বা কাকে প্রার্থনা করা হয়? (ঈশ্বর, যীশু এবং একটি বিশ্বজনীন জীবনী শক্তি কি সমপর্যায়ের?) প্রার্থনার কতক্ষণ ধরে এবং কতবার করা হবে? (দুইটা দশ মিনিটের প্রার্থনা কি বিশ মিনিটের একটা প্রার্থনার সমান?) কত জন লোক প্রার্থনা করছে এবং ধর্মে তাদের মর্যাদা কি জরুরী? (একজন পাদ্রীর প্রার্থনা কি দশজন উপাসনাকারীর প্রার্থনার সমান?) বেশিরভাগ প্রার্থনা গবেষণায় এই ধরনের কার্যকর সংজ্ঞার অভাব রয়েছে অথবা এই ধরনের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গবেষণায় কোন মিলই নেই।

৫। ধর্মতাত্ত্বিক জটিলতাঃ ঈশ্বর যদি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান্ হয় তাহলে তাকে স্মরণ করানো বা স্তুতিবাক্যে তুষ্ট করানোর কোন প্রয়োজনই নেই যে কারো নিরাময়ের প্রয়োজন। প্রার্থনা করার পরেও যে সকল রোগী মারা গেছে তাদেরই বা ব্যাখ্যা কি? বৈজ্ঞানিক প্রার্থনা ঈশ্বরকে স্বর্গীয় গবেষণাগারের ইঁদুরে পরিণত করেছে যা জন্ম দিয়েছে অপবিজ্ঞান এবং নিকৃষ্ট ধর্মের।

তথ্য ক্ষেত্র, মর্ফিক অনুরণন, এবং বিশ্বজনীন জীবনী শক্তি

আপনি কি কখনো খেয়াল করেছেন যে দিনের শেষে সংবাদপত্রের শব্দজট (crossword puzzle) খোলা অনেক সহজ? আমি কখনোই খেয়াল করি নাই। রুপার্ট শেলড্রেক এর মতে যেহেতু সকালের সম্মিলিত সাফল্য সাংস্কৃতিক মরফিক ক্ষেত্র দিয়ে রিজোনেট করে সে কারণেই এটা সম্ভবপর হয়। শেলড্রেকের মরফিক রিজোনান্স তত্ত্বে (মরফ বা 'তথ্যের ক্ষেত্র') একই ধরনের ক্ষেত্র স্পন্দন তোলে এবং বিশ্বজনীন শক্তির মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করে। সময়ের সাথে সাথে প্রত্যেক ধরনের প্রাণীই এক একটি বিশেষ ধরনের একমুখী সম্মিলিত স্মৃতিতে পরিণত হয়। শেলড্রেক তার ১৯৮১ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ 'A New Science of Life' এ লিখেছেন 'প্রকৃতির নিয়মতান্ত্রিকতা অভ্যাসগত। বস্তু বা বিষয়সমূহ যেমন আছে তেমনই আছে, কারণ তারা যেমন ছিল তেমনই আছে'। শেলড্রেক বলেছেন, মরফিক রিজোনান্স হচ্ছে 'অরগানিজম এবং প্রজাতির ভিতরকার সম্মিলিত স্মৃতির রহস্যময় টেলিপ্যাথি ধরনের আন্তঃসম্পর্কের ধারণা' এবং ভৌতিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হোমিং পিজিওন, কীভাবে কুকুর টের পায় মনিব বাড়ী ফিরেছে বা আড়াল থেকে কেউ তাকিয়ে থাকলে টের পেয়ে যাওয়া ইত্যাদি বিষয় ব্যাখ্যা করেছে। শেলড্রেক ব্যাখ্যা করেছেন যে, 'দৃষ্টির হয়তো দ্বিমুখী প্রক্রিয়া আছে, আলোর অন্তর্মুখী গমন এবং মানসিক প্রতিচ্ছবির বহির্মুখী নির্গমন'। শেলড্রেকের ওয়েবপেজ থেকে এক্সপেরিমেন্টাল প্রটোকল ডাউনলোড করে হাজার হাজার মানুষ পরীক্ষা করেছেন এবং সেই সব পরীক্ষা ইতিবাচক, রিপিটেবল, এবং উচ্চ তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফল প্রদান করেছে। যার অর্থ হচ্ছে, পিছন থেকে কেউ তাকালে সেটা যে বোঝা যায় সে বিষয়ে ব্যাপক বিস্তৃত অনুভূতিপ্রবণতা রয়েছে।

আসুন, এই দাবিকে ভালভাবে পরীক্ষা করা যাক। প্রথমতঃ কোন ওয়েবপেজ প্রটোকলের ভিত্তিতে অপরিচিত লোকদের মাধ্যমে কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সাধারণত ঘটে না। এক্ষেত্রে জানার কোন উপায়ই নেই যে ওই সমস্ত অপেশাদার লোকেরা ইন্টারভেনিং চলকসমূহ এবং পরীক্ষকের পক্ষপাতকে কীভাবে সামাল দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ মনোবিজ্ঞানীরা এই ধরনের বর্ণনাকে বিপরীত আত্ম-সন্তুষ্টি প্রভাব বলে বাতিল করে দেনঃ একজন লোক কেউ তাকে পিছন থেকে দেখছে ভেবে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে, ওই ঘাড় ঘোরানো যে লোক দেখছে বলে মনে করা হচ্ছে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, ফলশ্রুতিতে সেই লোক প্রথম ব্যক্তির দিকে তাকাবে। আর তাতেই প্রথম ব্যক্তি নিশ্চিত হবে যে তার দিকে কেউ তাকাচ্ছে সেই অনুভূতিটা আসলেই সত্যি। তৃতীয়তঃ ২০০০ সালে লন্ডনের মিডলসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জন কাউয়েল শেলড্রেকেরে প্রস্তাবিত পরীক্ষণ প্রটোকল ব্যবহার করে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি পরীক্ষা চালান। তিনি এই পরীক্ষার জন্য ১২ জন স্বেচ্ছাসেবককে ব্যবহার করেন যারা প্রত্যেকেই ১২ টা সিকোয়েন্সে ২০ বার তাকানো এবং না তাকানো পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। শেষ নয়টা সেশনে নির্ভুলতার ফিডব্যাক দেওয়া হয়। ফলাফল হচ্ছে, পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা তাদের দিকে কেউ তাকাচ্ছে কিনা তা সঠিকভাবে তখনই বলতে পেরেছিল যখন তাদেরকে নির্ভুলতার ফিডব্যাক দেওয়া হয়েছিল। কাউয়েলের মতে এর কারণ হচ্ছে, অংশগ্রহণকারীরা আসলে জেনে গিয়েছিল যে পরীক্ষার ট্রায়ালগুলির অনুক্রমে দৈবতা (Note: দৈবতা – randomness) ছিলনা। ইউনিভার্সিটি অব হার্টফোর্দসশায়ারের মনোবিজ্ঞানী রিচার্ড ওয়াইজম্যান শেলড্রেকের গবেষণার পুনরাবৃত্তি করার চেষ্টা করেন এবং দেখেন যে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরা যে হারে তাদের দিকে চোরা দৃষ্টিকে সনাক্ত করতে পারেন তার হার দৈব হারের চেয়ে খুব বেশি নয়। চতুর্থতঃ পরীক্ষকের পক্ষপাতিত্বের সমস্যাও রয়েছে। ইন্সটিটিউট অব নোয়েটিক সায়েন্সেস এর গবেষক ম্যারিলিন শ্লিজ (psi বিশ্বাসী) ওয়াইজম্যানের (psi অবিশ্বাসী) সাথে শেলড্রেকের গবেষণার অনুকরণ করেন এবং দেখেন যে, যেখানে শ্লিজের ফলাফল এসেছে পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ সেখানে ওয়াইজম্যানের ফলাফল হয়েছে পুরোপুরি দৈব।

শেলড্রেক বলেন যে, সংশয়বাদীরা মরফিক ফিল্ডের সুপ্ত ক্ষমতাকে অবহেলা করে, যেখানে বিশ্বাসীরা এই ক্ষমতাকে আরো বর্ধিত করে। ওয়াইজম্যানের ক্ষেত্রে শেলড্রেকের মন্তব্য হচ্ছে, 'সম্ভবত বিষয়টি সম্পর্কে তার নেতিবাচক প্রত্যাশা সচেতন বা অচেতনভাবে তার গবেষণায় প্রভাব ফেলেছে'।

হয়তো। কিন্তু কথা হচ্ছে কীভাবে আমরা নেতিবাচক psi এবং না-psi এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারি? কথায় আছে না, অদৃশ্য আর অস্তিত্বহীনকে যে একই রকম বলে মনে হয়।

মধ্য ভূমি

কথা হচ্ছে, তাহলে অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে কি? প্রকৃতিগতভাবে আমি বেশ আশাবাদী ধরনের মানুষ। কাজেই, আমি বর্তমান অবস্থায় সন্দেহগ্রস্থ ভবিষ্যতের অগ্নিশিখায় সংশয়বাদের ঠান্ডা পানি ঢেলে দিতে চাই না। তবে আমি সত্য হিসাবে কি আশা করি তার চেয়ে প্রকৃত সত্য কি তাকেই বেশি গুরুত্ব দেই। এবং সেভাবেই আমি বিষয়গুলোকে অনুধাবন করি।

আমি চোপড়া, বেম, গোস্বামী, শেলড্রেক এবং তাদের মতো আরো অনেককেই জানপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে চাই। সত্যি সত্যিই চাই। আমি স্কুলে থাকা অবস্থাতেই ধর্মকে পরিত্যাগ করেছি। কিন্তু মাঝে মাঝেই আমি আমার বিজ্ঞান এবং প্রকৃতির দিকে ধাবমান মনকে আমার প্রাক্তন এভানজেলিক অনুভূতিতে হাবুডুবু খেতে দেখি। এ কারণেই বলা যেতে পারে আমি সংশয়বাদী। এভানজেলিকরা যা দেয় সেটা হচ্ছে অনেকখানি ধর্মের মতোই। সব কিছুরই প্রত্যাশা দেয়, কিন্তু আসলে কিছুই দেয় না (শুধু আশা ছাড়া)। এবং পুরোটাই আসলে বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমি বিশেষ করে সংশয়াচ্ছন্ন হই তখনই যখন দেখি মানুষ বলাবলি করে যে 'বিশাল কিছু' আমাদের জীবদ্দশায় আমাদেরকে রক্ষা করবে এবং আমাদের গভীরতম আবেগগত চাহিদাকে পরিপূর্ণ করবে। এভানজেলিকরা কখনোই দাবি করে না যে পরবর্তী প্রজন্মেই যীশুর পুনরুত্থান ঘটতে যাচ্ছে (অথবা অন্যেরা পরিত্রাণ পেয়ে যাবে শুধু তারা ছাড়া।) একইভাবে 'ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী' মতের ধর্মনিরপেক্ষ প্রবক্তারা সাধারণত তাদের বরাদ্দ সময়সীমার মধ্যেই সভ্যতার ধ্বংস হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন (এবং অতি অবশ্যই সেই কেয়ামত থেকে সামান্য যে ক'জন রক্ষা পাবে তারাই হবে তার অংশ)। একইভাবে, ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষ ইউটোপিয়া উভয়েরই ভবিষ্যৎবক্তারা তাদের নিজেদেরকে বাছাই করা কতিপয় লোক ভাবেন এবং মনে করেন যে স্বর্গ তাদের একেবারে হাতের মুঠোয়।

স্বর্গ কোথায়? এখানেই স্বর্গ। বর্তমানই হচ্ছে আমাদের স্বর্গ। আমাদের মধ্যেই স্বর্গ আবার আমাদেরকে ছাড়াই স্বর্গ। আমাদের চিন্তা এবং কাজের মধ্যেই স্বর্গ নিহিত। আমাদের জীবন এবং ভালবাসাতেই সিক্ত স্বর্গ। আমাদের পরিবার এবং বন্ধুদের মধ্যেই স্বর্গ দীপ্তমান। আমাদের প্রত্যয়ের বলিষ্ঠতা এবং আত্মার বৈশিষ্ট্যতার মাঝেই বিরাজমান স্বর্গ।

জীবন চিরস্থায়ী না হলেও, আশা ঠিকই জেগে থাকে চিরন্তন।

ড. মাইকেল শারমার, আমেরিকার জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক, বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদ এবং The Skeptics Society-এর প্রতিষ্ঠাতা। Skeptic - ম্যাগাজিনের সম্পাদক।

ফরিদ আহমেদ, মুক্তমনার কো-মডারেটর, 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। ইমেইল - farid300@gmail.com

মিথ্যার বেসাতি :

নীল আর্মস্ট্রং-এর মুসলিম হয়ে ওঠার ইসলামী কল্পকাহিনী

লাইটহাউজ

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ শুক্রবার দৈনিক যুগান্তরের ইসলামী পাতায় একটি লেখা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যার লেখক হাবিবুর রহমান সরকার। লেখক মহানবীর চাঁদ দ্বিখন্ডিত করার কাহিনী বর্ণনা করতে যেয়ে এক পর্যায়ে দাবি করেছেন ১৯৬৯ সালে (হাবিবুর রহমান লিখেছেন ১৯৬৭ সালে) প্রথম চন্দ্রে অবতরনকারী নীল আর্মস্ট্রং চাঁদ দিখণ্ডিত হওয়ার ফাটল দেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন -

> মক্কায় থাকা অবস্থায় আবু জাহিলসহ অন্য কাফির মুশরিকরা নবী করিম (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, যদি আপনি আল্লাহর রাসূল হয়ে থাকেন তবে নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে চাঁদকে দিখণ্ডিত করে দেখান। রাসূল (সা.) বললেন, যদি এই মু'জিযা দেখাই তবে কি তোমরা ইসলাম গ্রহণ করবে? তারা বলল, হ্যাঁ আমরা ইসলাম গ্রহণ করব। রাসূল (সা.) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে স্বীয় পবিত্র আঙুল দ্বারা চাঁদ দিখণ্ডিত করলেন। অর্থা রাসূলের শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইশারা করতেই (পূর্ণিমার রাতে) চাঁদের একখণ্ড আবিকুবাইস পাহাড়ে আর অন্য একটি খণ্ড কাইকাআন পাহাড়ে পতিত হয়। আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী পরিমাণ সময় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় ছিল।
>
> এই দৃশ্য মক্কার কাফির মুশরিকরা স্বচক্ষে দেখেও ঈমান আনার পরিবর্তে বলল, 'মুহাম্মদ তোমার জাদু দেখি আসমানেও চলে।' (নাউজুবিল্লাহ) তাদের ধারণা ছিল জাদু যেহেতু জমিনে চলে এবং আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে কোন জাদু চলে না, তাই মহানবী (সা.)-কে অযোগ্য প্রমাণ করার জন্য এবং তাদের হাস্যরসের পাত্র বানাতে আলোচ্য ঘটনার উদ্ভব ঘটায়। কোরআনুল কারিমের সূরাতুল 'কামার' এর মধ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।
>
> এত বড় বিশাল চাঁদের দিখণ্ডিত হওয়ার অলৌকিক দৃশ্য দেখে তকালীন কাফির মুশরিকরা ঈমান গ্রহণ না করলেও আজ দেড় সহস্র বছর পর হলেও গত ১৯৬৭ সালে এক মার্কিন নভোচারী নিল আর্মস্ট্রং নভোযানে গিয়ে চাঁদ দিখণ্ডিত হওয়ার ফাটল দেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

১৯৬৭ না হয় ১৯৬৯ হল কিন্তু এখন প্রশ্ন হল নীল আর্মস্ট্রং কি সত্যিই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন? এর উত্তর অবশ্যই 'না', আর্মস্ট্রং-এর মুসলিম হবার কাহিনী সম্পূর্ণ একটি গুজব। মুসলিম ধর্মব্যবসায়ীদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন তাদের অন্তঃসারশূণ্য গর্বের নিকৃষ্টতম উদাহরণ এটি।

এই গুজবের ডালপালা ছড়াল যেভাবে

এই কাহিনীর দু'টি ভার্সন পাওয়া যায়।

প্রথম কাহিনী: আর্মস্ট্রং যখন চাঁদের মাটিতে হাটছিলেন তখন এক অচেনা ভাষায় অদ্ভুত সুরে তিনি কিছু শব্দমালা শুনতে পান। সেই শব্দমালা সেই সময় তার বোধগম্য হয়নি। পরবর্তীতে পৃথিবীতে ফেরার পর তিনি ইজিপ্টে যান এবং সেখানে আযানের ধ্বনি শোনেন। তিনি বলেন, "আমি যখন চাঁদে গিয়েছিলাম তখন এরকমই কিছু শুনতে পেয়েছিলাম"। তখন তার ইজিপ্সিয়ান বন্ধু এটিকে আযানের ধ্বনি নিশ্চিত করলে তিনি ত[illegible]ক্ষনা[illegible] ইসলাম গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় কাহিনী: আর্মস্টং যখন চাঁদের মাটিতে তথ্যানুসন্ধান করছিলেন তখন তিনি চাঁদের মাটিতে এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একটি লম্বা দীর্ঘ ফাটল দেখতে পান। এই ফাটলের সাথে তিনি তিনি মুহাম্মদের চাঁদ দ্বিখন্ডিত করার কাহিনীর যোগসূত্র খুঁজে পান। চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়ার কথা পবিত্র কোরাণের সূরা আল-ক্বামারে বর্ণিত হয়েছে এভাবে[1] -

> '... চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত জাদু|তারা মিথ্যারোপ করছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করছে। প্রত্যেক কাজ যথাসময়ে স্থিরীকৃত হয়। ...'

মুহাম্মদের চাঁদ দ্বিখন্ডিত করার কাহিনীর চাক্ষুস প্রমাণ পেয়ে আর্মস্ট্রং নাকি তড়িঘড়ি করে দেশে ফিরে এসে দেরি করেননি, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

এই গুজবের অসারতার পক্ষে কিছু প্রমাণ

প্রথম কাহিনীটি প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, চাঁদে যদি কেউ আজান দিয়েও থাকে তা স্বাভাবিকভাবে আর্মস্টং-এর শোনার কথা নয়, কারণ চাঁদে কোন বাতাস নেই। বাতাস নেই বলেই চাঁদের বুকে এস্ট্রোনটেরা একে অন্যের সাথে যোগাযোগের জন্য বেতার তরংগ ব্যবহার করেন। মাধ্যমবিহীন জায়গায় যে আজানের ধবনি স্বাভাবিক পন্থায় পৃথিবীর মত নভোচারীদের কানে এসে পৌঁছুবার কথা নয়, তা বোধ হয় ইসলামী চিন্তাবিদেরা বুঝে উঠতে পারেননি। তাই তারা ভেবেছেন, আজানের সুমধুর ধ্বনি যেভাবে বাতাসে ভেসে ভেসে আমাদের কানে পৌঁছয়, ঠিক সেভাবে চাঁদে নামার পর আর্মস্ট্রং-এর কানেও পৌঁছিয়েছিলো। বিজ্ঞান না জেনে বিকৃত করার ফল আর কি বেশি হবে!

আর দ্বিতীয় কাহিনীটি শুনে মনে হয়, যারা এই গল্পটি ছড়িয়েছিলেন, তাদের চঁদের আকার-আয়তন সম্বন্ধে কোন বাস্তব ধারণা নেই। প্রায় চল্লিশ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটারের ওই বিশাল জায়গার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনায় অবতরণ করে আর্মস্ট্রং এক্কেবারে চাঁদের ফাটলের মধ্যেই গিয়ে পড়লেন? নজরুলের লিচু চুরি কবিতাটির মত - *পড়বি তো পড় মালির ঘারে!* আর্মস্ট্রং সাহেব সম্ভবতঃ নজরুলের লিচু চুরি পড়েননি, তারপরও নভোযান নিয়ে যাত্রা করে

[1] এছাড়া, বিভিন্ন হাদিসে মুহম্মদ (দঃ) কর্তৃক চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায় এভাবে-

Narrated Anas bin Malik: "The people of Mecca asked Allah's Apostle to show them a miracle. So he showed them the moon split in two halves between which they saw the Hiram' mountain. (Translation of Sahih Bukhari, Merits of the Helpers in Madinah (Ansaar), Volume 5, Book 58, Number 208)"

Narrated 'Abdullah: "The moon was split (into two pieces) while we were with the Prophet in Mina. He said, "Be witnesses." Then a Piece of the moon went towards the mountain. (Translation of Sahih Bukhari, Merits of the Helpers in Madinah (Ansaar), Volume 5, Book 58, Number 209)" ইত্যাদি।

পড়বি তো পড় - ঠিক ঠিক গিয়ে পড়লেন চাঁদের ফাটায়! এ নিয়ে কিছু বলাটাই বোকামী। চাদের ভুমির ছবিগুলোর কোথাওই কিন্তু চাঁদকে সেরকম আগা-গোড়া বাংগি-ফাটা মনে হয়নি। এবার আমরা অথেন্টিক কিছু ডকুমেন্টের সাহায্যে দেখাবো চাঁদে আজান শুনে কিংবা ফাটল দেখে আর্মস্ট্রং-এর মুসলিম হবার কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা।

(১) নীচের বার্তাটি ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট হতে ইসলামিক বিশ্বের সকল দূতাবাসগুলোতে প্রেরিত হয়েছিল। মূল কপির ফটোকপি দেখা যাবে এখানে।

P 04085 0Z MAR 83 ZEX

FM SECSTATE WASHD C

TO ALL DIPLOMATIC AND CONSULAR POSTS PRIORITY

BI

UNCLAS STATE 056309

FOLLOWING REPEAT SENT ACTION ALL EAST ASIAN AND PACIFIC DIPLOMATIC POSTS DID MAR 02.

QUOTE: UNCLAS STATE 056309

E.O. 12356: N/A

TAGS: PREL, PGOV, US, ID

SUBJECT: ALLEGED CONVERSION OF ENIL ARMSTRONG TO ISLAM

REF: JAKARTA 3081 AND 2374 (NOT ..)

1. Former astronaut Neil Armstrong, now in private business, has been the subject of press reports in Egypt, Malaysia and Indonesia (and perhaps elsewhere) alleging his conversion to Islam during his landing on the moon in 1969. As a result of such reports, Armstrong has received communications from individuals and religious organizations, and a feeler from at least one government, about his possible participation in Islamic activities.

2. While stressing his strong desire not to offend anyone or show disrespect for any religion, Armstrong has advised department that **reports of his conversion**

to Islam are inaccurate.

3. If post receive queries on this matter, Armstrong requests that they politely but firmly inform querying party that **he has not converted to Islam and has no current plans or desire to travel overseas to participate in Islamic religious activities.**

(২) এশিয়ান রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক ফিল পার্শাল এর কাছে নীল আর্মস্ট্রং এর পক্ষে এডমিনিস্ট্রেটিভ এইড এর ভিভিয়ান হোয়াইট এর পাঠানো চিঠি।

NEIL A. ARMSTRONG

LEBANON, OHIO 45036

July 14, 1983

Mr. Phil Parshall

Director, Asian Research Center

International Christian

Fellowship 29524 Bobrich

Livonia, Michigan 48152

Dear Mr. Parshall:

Mr. Armstrong has asked me to reply to your letter and to thank you for the courtesy of your inquiry. **The reports of his conversion to Islam and of hearing the voice of Adzan on the moon and elsewhere are all untrue.**

Several publications in Malaysia, Indonesia and other countries have published these reports without verification. We apologize for any inconvenience that this incompetent journalism may have caused you.

Subsequently, Mr. Armstrong agreed to participate in a telephone interview, reiterating his reaction to these stories. I am enclosing copies of the United States State Department's communications prior to and after that interview.

Sincerely

Vivian White

Administrative Aide

(৩) জার্নাল এরাবিয়া, দ্য ইসলামিক ওয়ার্ল্ড রিভিউ, ইস্যু জুন ১৯৮৫/রমজান ১৪০৫, পৃষ্ঠা ৫ এ সম্পাদকের কাছে প্রেরিত এই চিঠিটি প্রকাশিত হয় -

A MUSLIM OVER THE MOON?

"Arabia" is by far the superior newsmagazine regarding what is going on in the Muslim world today. Your reporting is extremely thorough and seeks to be as objective as possible. Your willingness to criticize political policies as well as religious happenings in the Muslim world is refreshing. As an American I would feel your slant on the West is basically fair. It would be most helpful if you would dispel a misconception prevalent in almost all Muslim countries. From Morocco to the Philippines it is commonly believed that Neil Armstrong heard the Azan on the moon, converted to Islam and is now engaged in the full-time propagation of the Muslim faith.

The US State Department has issued a memo saying that the story about Armstrong's conversion was untrue. The memo said "While stressing his strong desire not to offend anyone or show disrespect for any religion, Armstrong has advised department that reports of his conversion to Islam are inaccurate." The memo further says, "if post receives queries on this matter, Armstrong requests that they politely but firmly inform querying party that **he has not converted to Islam** and has no current plans or desires to travel overseas to participate in Islamic religious activities."

N.B. The memo was sent to all our diplomatic and consular posts.

Dr Phil Parshall

Director, Asian Research Centre Manila, Philippines

(৪) ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর ৬ তারিখে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত "গ্লোবাল লিডারশিপ ফোরাম" এ নীল আর্মষ্ট্রং অংশগ্রহণ করেন। মালয়েশিয়ার সর্বাধিক প্রচারিত ইংরেজী দৈনিক "স্টার মালয়েশিয়া" তখন তার একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে যা প্রকাশিত হয় ৭ ই সেপ্টেম্বর তারিখে। সেই সাক্ষাৎকারের একটি বাক্য ছিল নিম্নরূপ:

> "Armstrong, 75, also denied he had heard the Muslim call to prayer on the moon and had converted to Islam".

শেষ কথা

এখন নিশ্চয়ই মনে প্রশ্ন উঠবে, যদি নীল আর্মস্টং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে থাকেন তবে কারা এ গুজব ছড়াল? তাদের উদ্দেশ্য কি? সম্ভবত একজন আমেরিকান কাফেরের চাঁদের পবিত্র ভূমিকে অপবিত্র করে দেওয়ার ক্ষত ঐসব ইসলামী ধর্মব্যবসায়ীরা ভুলতে পারেনি। তারই ক্ষতিপূরণ তারা করতে চাইছে নীল আর্মষ্ট্রং কে মুসলিম প্রতীয়মান করার মাধ্যমে। ধর্ম ব্যবসা চাঙ্গা রাখার জন্যই তাদের এই নির্লজ্জ দাবি "চাদেঁর বুকে প্রথম পা রেখেছে একজন মুসলমান"।

লাইটহাউজ/

তথ্যসূত্র :

(১) http://ourislamonline.tripod.com/neilstatementdeptt.htm

(২) http://www.wikiislam.com/wiki/Neil_Armstrong

(৩) http://www.answering-islam.org/Hoaxes/neil.html

(৪) http://www.thestar.com.my/news/story.asp?file=/2005/9/7/nation/11971532&sec=nation

---

লাইট হাউজ, ইন্টারনেটের বিভিন্ন বাংলা ফোরামে লিখে থাকেন। ইমেইল - lighthouse12321@yahoo.com

ডিম্বের সন্ধান এবং রাশেদ খালীফা ও তার ম্যাথমিটিকল মিরাকল অব কোরআন তত্ত্ব

নাস্তিকের ধর্মকথা

একঃ ডিম্বের সন্ধানে

আমার পূর্ববর্তী 'ধর্মে বিজ্ঞানঃ নিম গাছে আমের সন্ধান' প্রবন্ধে (এ বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় দ্রঃ) এক জায়গায় উল্লেখ করিয়াছিলাম, "*আফসোস তৈরী হয়, নিজ হাতে লেখার পরেও কেন আল্লাহ গোটা কোরানে একবারো সরাসরি উল্লেখ করতে পারলেন না যে, পৃথিবী গোলাকার*"

লেখাটি মুক্তমনায় প্রকাশিত হইবার পর, হঠাৎই সেইদিন একবিজ্ঞজনের আলোচনায় দেখিলাম তিনি সদর্পে ঘোষণা করিয়াছেন যে, "*মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন কোরআন মাজীদে পৃথিবীর 'গোলাকার' আকৃতি এরশাদ করিয়াছেন*"। আমার তো ভীমিড়ি খাইবার দশা, হায়! হায়! ইহা তিনি কি বলিতেছেন। চক্ষু রগড়াইয়া দেখিলাম আল্লাহ পাকের সেই বানী, "And we have made the earth egg shaped".[Al-Qur'an 79:30]

যাহার মানে দাঁড়াইতেছে পৃথবীকে আল্লাহ পাক ডিম্বাকৃতির করিয়া বানাইয়াছেন!

আমি দুইটি জিনিস বুঝিতে পারিলাম না –

- ডিম্বাকৃতি ব্যাপারটা 'গোলাকার' হইয়া গেল কেমন করিয়া,
- আর দুই- ছোট বেলায় বিজ্ঞানের বইয়ে পড়িয়াছিলাম – পৃথিবীর আকৃতি নাকি কমলালেবুর মত – উত্তর দক্ষিণে খানিকটা চাঁপা। কেহ তো আমাকে বলে নাই পৃথিবীর আকৃতি ডিম্বাকার। ডিমের তো জানি উত্তর দক্ষিণে ছূঁচালো।

তারপরো যাহা হোক, কাল বিলম্ব না করিয়া আমার সেই প্রবন্ধখানির জন্য নাকে খত দিবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা আরম্ভ করি। যদিও আমি কোরআন মাজীদের কয়েকখানি অনুবাদ আদ্যপান্ত পাঠ করিয়াই উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত জানাইয়াছিলাম, তথাপি বিশালাকায় কোরআন পাক পাঠকালে উক্ত আয়াত হয়তোবা কোন কুক্ষণে আমার দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া গিয়াছিল ইহা ভাবিয়া মনে বড়ই ক্লেশ অনুভব করিতেছিলাম।

তো, আমার সেই প্রবন্ধখানিতে আমার এই বক্তব্য তুলিয়া নিবার ও করজোরে ক্ষমা প্রার্থণার উদ্দেশ্যে যাইতেছিলাম। ইত্যবসরে কি মনে করিয়া জহুরুল হক সাহেবের অনুবাদখানি খুলিয়া দেখিলাম। **৭৯ নম্বর সুরা। সুরা আন নাযিয়াত। ৩০ নম্বর আয়াত।**

এবার আবারো ভীমড়ি খাইবার দশা। অনুবাদে ডিম্ব খুঁজিয়া পাইলাম না। অনুবাদে যাহা পাইলাম তাহা এইরূপঃ "*আর পৃথিবী-এর পরে তাকে প্রসারিত করেছেন*"। ভাবিবালাম, জহুরুল সাহেবের অনুবাদের উপর নির্ভর করা ঠিক হইবে না। অন্য অনুবাদের খবর লইতে হইবে। ঢুকিলাম যথার্থ অনুবাদ ওয়ালা ইসলামী সাইট কোরআনা শরীফ ডট অর্গে। সেইখানেও দেখি অনুবাদ করা হইয়াছে এইরূপে:

"পৃথিবীকে এরপরে তিনি বিস্তৃত করেছেন"

"And after that He spread the earth "

তথাপি মন ভরিলো না। ভাবিলাম, বিজ্ঞজন যেহেতু বলিয়াছেন সেহেতু নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও ডিম্ব পাওয়া যাইবেই যাইবে। তাই খুঁজিতে থাকিলাম। এবার আরেকটি সাইটে* খোঁজ লাগাইলাম। সেইখানেও দেখি :

YUSUFALI: "And the earth, moreover, hath He extended (to a wide expanse)"
PICKTHAL: "And after that He spread the earth"
SHAKIR: "And the earth, He expanded it after that"

কিছুখানি দমিয়া যাইলেও হতাশ হইলাম না, কেননা ইহার মধ্যেই ডিম্ব খুঁজিয়া পাইবার দুর্বার আকাঙ্খা আমার মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছে। প্রথমে ভাবিলাম, সেই বিজ্ঞজনের শরনাপন্ন হওয়াই বুদ্ধিমানের কর্ম হইবে। ওনাকে বিস্তারিত জানাইলে তিনি সদয় হইয়া আমাকে একখানি সাইটের লিংক (http://www.irf.net/irf/dtp/dawah_tech/t15/t15b/pg1.htm) দিলেন। খুশীমনে সেইখানে ঢুকিয়া দেখিলাম তাহা কোরআন শরীফের অনুবাদমূলক সাইট নহে, বরং কোরআনকে নিয়া বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবমূলক সাইট। সেইখানে অবশ্য ডিম্ব সংক্রান্ত একখানা আলোচনা পাইলাম। একই ধরণের আলোচনা পরবর্তীতে আরেক বিজ্ঞজনের একখানি আলোচনাতেও দেখিলাম যাহা মহাগুরু জাকির নায়েক সাহেবের আলোচনা হইতে অনুবাদকৃত। তাহাই এইখানে তুলিয়া দেওয়া সকলের জন্য সুবিধাজনক হইতে পারে:

ذَٰلِكَ دَحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ

"And we have made the earth egg shaped" [Al-Qur'an 79:30]
"এবং আমি পৃথিবীকে তৈরী করেছি ডিম্বাকৃতিতে।" (আল কুরআন - ৭৯ : ৩০)

* http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/079.qmt.html

এখানে লক্ষ্য করার মতো বিষয় : প্রদত্ত আয়াতে আরবী শব্দ **دَحَاهَا** (দাহাহা) মানে ডিম্বাকৃতি। ইহা বর্ধিত হওয়াকেও বুঝায়। **دَحَاهَا** (দাহাহা) শব্দটা এসেছে **"দুহিয়া"** থেকে যার অর্থ বিশেষভাবে অস্ট্রিচ পাখির ডিম যেটা geospherical সাইজের, ঠিক পৃথিবীর আকৃতির মতো"।

অবশেষে ডিম্বের সন্ধান পাইয়া কিছুখানি আস্বস্ত হইলেও একেবারে নির্ভার হইতে পারিলাম না। মাথায় প্রশ্ন আসিয়া বড়ই ক্লেশ তৈরী করিতে লাগিলো: **دَحَاهَا** অর্থ যদি ডিম্বাকৃতিই হইবে তবে কেনবা সকল অনুবাদে (এই পর্যন্ত ১১ জন কৃত অনুবাদ দেখিয়াছি, আরো দেখিতেছি..) বিস্তৃত, spread, extended, wide expanse প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইলো?

তাই ভাবিলাম এইবারে **دَحَاهَا** শব্দ খানি দেখা যাউক। যেইভাবা সেই কাজ। ড. ফজলুর রহমান সাহেবের বাংলা-আরবী অভিধানে দেখিলাম, বাংলা একাডেমির অভিধানেও দেখিলাম এবং সর্বশেষে নেটেও কয়েকখানা অনলাইন ডিকশনারি সাইটে দেখিলাম। সর্বত্রই পাইলাম এইরূপ অর্থ:
دَحَا অর্থ বিস্তৃত, spread, extended প্রভৃতি অর্থসমূহ। আর **هَا** অর্থ এই, এটি বা This। দুঃখের সহিত লক্ষ করিলাম যে, কোথাও কোন রূপ ডিম্ব পাওয়া যাইতেছে না। দুহিয়া শব্দটিও খোঁজার চেষ্টা করিলাম, উল্টোদিকে উটপাখির ডিম্ব, ডিম্ব, ডিম্বাকৃতি, উটপাখি প্রভৃতি শব্দসমূহের আরবী প্রতিশব্দও খুঁজিয়াও কোথাও **دَحَاهَا বা "দুহিয়া"** পাইলাম না। মন ভাঙিয়া যাইবার দশা যখন দেখিলাম ডিম্বের আরবী হইল **আল-বাইজা** (بيضة, بييصة, شخص متساهل)। দেখিলাম ডিম্বাকৃতির আরবী بيضاوي । দেখিলাম উটপাখির আরবী يحاول إجتناب الخطر برفض مواجهته نعامة, النعامة من ।[†]

ব্যর্থ মনোরথে হাল ছাড়িয়া দেওয়ার আগে শেষ চেষ্টা চালাইলাম। তাফসীর দেখিলাম। সমস্ত মুসলিম বিশ্বে শ্রদ্ধার পাত্র **Ibn Kathir** এর কোরআন তাফসীর (http://www.tafsir.com/default.asp?sid=79&tid=56986) দেখিতে লাগিলাম। যাহা পাইলাম তাহা এইরূপ:

"Then Allah says,
[دَحَـهَا وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ]
(**And after that He spread the earth**,) He explains this statement by the statement that follows it,
[أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَـهَا]

[†] (http://online.ectaco.co.uk/main.jsp;jsessionid=bc30ebf38e09352d3074?do=e-services-dictionaries-word_translate1&direction=1&status=translate&lang1=23&lang2=ar&source=egg)

(And brought forth therefrom its water and its pasture.) It already has been mentioned previously in Surat Ha Mim As-Sajdah that **the earth was created before the heaven was created, but it was only spread out after the creation of the heaven. This means that He brought out what was in it with a forceful action. This is the meaning of what was said by Ibn `Abbas and others, and it was the explanation preferred by Ibn Jarir**. In reference to the statement of Allah,

[وَالْجِبَالَ أَرْسَـهَا]

(And the mountains He has fixed firmly,) meaning, He settled them, made them firm, and established them in their places. And He is the Most Wise, the All-Knowing. He is Most Kind to His creation, Most Merciful. Allah then says,

[وَلأَنْعَـمِكُمْ مَتَـعاً لَّكُمْ]

(As provision and benefit for you and your cattle.) meaning, **He spread out the earth**, caused its springs to gush forth, brought forth its hidden benefits, caused its rivers to flow, and caused its vegetation, trees, and fruits to grow. **He also made its mountains firm so that it (the earth) would be calmly settled with its dwellers**, and He stabilized its dwelling places. All of this is a means of beneficial enjoyment for His creatures (mankind) providing them of what cattle they need, which they eat and ride upon. He has granted them these beneficial things for the period that they need them, in this worldly abode, until the end of time and the expiration of this life."

এইবারে ভাবিলাম, থাক আর কাজ নেই। **এত খুঁজিয়াও যেহেতু ডিম্বের খোঁজ মিলিতেছে না, তবে আমার বরাতে সম্ভবত ডিম্ব নাই। কিন্তু দুই দুই জন বিজ্ঞ মহাশয় এবং মহাগুরু জাকির নায়েকের কথাও বা অবিশ্বাস করি কেমনে? শেষে তাই ভাবিলাম, ওনারাও সম্ভবত বেঠিক কিছু বলেন নাই। আসলেই কোরআনে উক্ত আয়াতে ডিম্বের কথা বলা হইয়াছে। তবে তাহা হয়তোবা উটপাখির নহে, অশ্বের হইবার সম্ভাবনাই অত্যাধিক।**

দুইঃ রাশেদ খালীফা, ম্যাথমেটিকল মিরাকল অব কোরআন এবং কোরআন টেম্পারিং

গত কয়েকদিন ডিম্ব খুঁজতে খুঁজতে অবস্থা একেবারে কেরোসিন। শেষে তো হাল প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম।

কিন্তু পুরো ছাড়িনি।

তার ফলও পেলাম হাতেনাতে। অবশেষে ডিম্ব পেলাম। অশ্ব ডিম্ব নয়, একেবারে উটের ডিম্ব। এখান থেকেই دَحَاهَا অর্থ যে ডিম্বাকৃতির তা সকলে প্রথম জানতে পারে।

লিংকটি হচ্ছে সাবমিশন ডট অর্গের (http://www.submission.org/suras/sura79.html), আরবী থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন রাশেদ খলীফা। অনুবাদটি আগে দেখে নিই:

[79:30] He made the earth egg-shaped.

এবং শেষে স্পেশাল নোটও আছেঃ
79:30 The Arabic word "dahhaahaa" is derived from "Dahhyah" which means "egg".

অবশেষে ডিম্বের সন্ধান পেয়ে আমি তো যারপরনাই খুশী। এবং এই রাশেদ খলীফার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞবোধ করতে থাকি। সেই কৃতজ্ঞতাবোধের জায়গা থেকেই তাঁর প্রতি উৎসাহী হয়ে উঠি এবং ওনার সম্পর্কে খোঁজ খবর করা শুরু করে দেই।

রাশেদ খালীফাঃ

তিনি মূলত একজন বায়োকেমিস্ট ছিলেন। মিশরে জন্ম হলেও ১৯৫৯ সালে আমেরিকায় বায়োকেমিস্ট্রিতে পিএইচডি করতে যান এবং সেখানেই থেকে যান। তিনি ইউনাইটেড সাবমিটার ইন্টারন্যাশনাল (USI) নামে গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন, যারা নিজেদেরকে প্রকৃত ইসলামের অনুসারী বলে দাবী করতো। এই গ্রুপ কখনো ইসলাম শব্দ ব্যবহার করেনি, বদলে ব্যবহার করে সাবমিশন এবং মুসলিমের বদলে ব্যবহার করে সাবমিটার। (http://en.wikipedia.org/wiki/Rashad_Khalifa#Life)

ম্যাথমেটিকল মিরাকল অব কোরআন এর জনকঃ

রাশেদ খালীফা ১৯৭৪ সালে তার বিখ্যাত ম্যাথমেটিকল মিরাকল অব কোরআন প্রকাশ করেন। এই তত্ত্বের মূলে আছে একটি সংখ্যা ১৯। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এ আছে ১৯ টি অক্ষর, মোট সুরার সংখ্যা ১১৪ যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য, আয়াতের সংখ্যা ৬৩৪৬ যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য, মোট অক্ষর ১৬২১৪৬ যাও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। এমন আরো বিশাল একটি তালিকা তিনি বের করেন, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য বা কোন না কোন ভাবে ১৯ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত।

কোরআনের বাইরেও তিনি প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনার মধ্যেও তিনি ১৯ কে নিয়ে আসেন (যেমন হ্যালির ধুমকেতু ৭৬ বছর (১৯*৪) পর পর আবির্ভুত হয়)।

রাশেদ খালীফার মতে এই ১৯ এর ব্যাপারটি কোরআনের ৭৪ নম্বর সুরাতেই বিদ্যমান।

আল্লাহর ম্যাসেঞ্জারঃ

এরপরে তিনি নিজেকে আল্লাহর ম্যাসেঞ্জার হিসাবে দাবি করেন।
(http://islam.thetruecall.com/modules.php?name=News&file=article&sid=292)। তিনি কোরআনের ৩:৮১ কে নিজের মত করে অনুবাদ ও তাফসীর করে জানান যে, প্রোফেট বা রাসুল হলেন তারা যারা আল্লাহর ওহী প্রাপ্ত হন, এবং ম্যাসেঞ্জার হলো তিনি যিনি রাসুলের প্রতি নাযিলকৃত ওহীকে যথার্থতা প্রদান করবেন। তিনিই কোরআনকে তার প্রকৃত রূপে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন বিধায় তিনি সেই ম্যাসেঞ্জার।

কোরানের আরো দুটো সুরার আয়াতে জোর করে নিজের নাম বসিয়ে দিয়েছেন। প্রথমে নীচের লিঙ্ক থেকে ৮১: ২২ পড়ুন-
http://www.submission.org/suras/sura81.html

[81:22] Your friend (**Rashad**) is not crazy.

অথচ, ইউসুফ আলী, পিকথাল কিংবা শাকির – কারো অনুবাদেই ঐ আয়াতে রাশাদের নামের উল্লেখ নেই।

একই কাজ রাশাদ খলীফা করেছেন সুরা ৪২:২৪ এও -

[42:24] Are they saying, "He (**Rashad**) has fabricated lies about GOD!"? If GOD willed, He could have sealed your mind, but GOD erases the falsehood and affirms the truth with His words. He is fully aware of the innermost thoughts.

ইউসুফ আলী, পিকথাল কিংবা শাকির – কারো অনুবাদেই ঐ আয়াতে রাশাদের নামের উল্লেখ নেই, তা বলাই বাহুল্য।

এবারে আবার ম্যাথমেটিকল মিরাকল দিয়ে প্রমাণ করে দেন যে তিনিই সেই ম্যাসেঞ্জার। তিনি এই আবিষ্কার জানান ১৯৭৪ সালে। এই ১৯ এর অলৌকিকত্ব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে ৭৪ নম্বর সুরায়, তিনি এই আবিষ্কার করেন ১৯৭৪ সালে। এই বছরটি হলো হিজরী ১৪০৬। ১৪০৬ = ১৯*৭৪। অতএব, তিনিই আল্লাহর ম্যাসেঞ্জার। (http://www.submission.org/tampering.html)

কোরআনকে যথার্থতা প্রদানঃ

এই আর্টিকেলটি (http://www.submission.org/tampering.html) পড়লে মোটামুটি তার থিউরিটি বুঝা যাবে। তিনি বলেন, দুনিয়া জুড়ে যে দাবী করা হয় সর্বত্র কোরআন অবিকল একই- তা আসলে ঠক নয়। কোরআনের অনেকগুলো ভার্সন পৃথিবীতে ছিল এবং আছে যেগুলোর একটির সাথে আরেকটিতে ব্যবধান বিদ্যমান। মিশরীয় এডিশনে প্রাপ্ত দুনিয়ার প্রাচীণ Tashkent কোরানের সাথে মিলিয়ে দেখলেও বুঝা যায় এই ব্যবধান। আজকের মোটামুটি যে গোটা দুনিয়ায় মোটামুটি একই ধরণের আদর্শ কোরআন পাওয়া যায় তা ১৯২৪ সালে মিশরের কায়রোতে ছাপানো এবং পরবর্তীতে সৌদি বাদশা ফাহাদের ছাপানো।

তিনি এরপরে জানান, এসব কোরআনের বিভিন্ন কপিতে মনুষ্যকৃত ভুল থেকে গিয়েছে। এবং প্রকৃত কোরআন পাওয়া সম্ভব সেই ১৯ দিয়েই। এভাবে তিনি কোরআনকে পরিবর্তনে (তার মতে শুদ্ধ ও সঠিক কোরআন উদ্ধারে) নামেন ।

সেখানে ধরে ধরে বিভিন্ন শব্দের শেষে, মাঝে শুরুতে অক্ষর দেয়া, আয়াত বাড়ানো-কমানো প্রভৃতি কাজ সমূহ করেন- যার ভিত্তি ছিল ১৯ থিউরি।

কোরআন টেম্পারিং – খালীফা স্টাইল

রাশেদ খলিফার সবচেয়ে বড় অসাধুতা হল তার প্রানপ্রিয় ১৯ তত্ত্বকে স্বার্থকতা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহর কিতাব কোরআন টেম্পারিং-করতেও দ্বিধান্বিত হন নি। একটি উদাহরণ দেই। কোরানের 'আল তওবা' সুরাটিতে মোট ১২৯ টি আয়াত আছে। ইউসুফ আলী, পিকথাল এবং শাকির সবার অনুবাদ থেকেই এটি দেখা যায়। পাঠকেরা নীচের লিংক্টিতে গেলেই দেখতে পাবেন কোরানের উল্লিখিত সুরাটিতে আয়াত আছে ১২৯টি :

http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/009.qmt.html
আমি এখান থেকে ৯: ১২৮ এবং ৯: ১২৯ আয়াত দুটো উল্লেখ করছি –

009.128
YUSUFALI: Now hath come unto you a Messenger from amongst yourselves: it grieves him that ye should perish: ardently anxious is he over you: to the Believers is he most kind and merciful.
PICKTHAL: There hath come unto you a messenger, (one) of yourselves, unto whom aught that ye are overburdened is grievous, full of concern for you, for the believers full of pity, merciful.
SHAKIR: Certainly a Messenger has come to you from among yourselves; grievous to him is your falling into distress, excessively solicitous respecting you; to the believers (he is) compassionate,

009.129
YUSUFALI: But if they turn away, Say: "Allah sufficeth me: there is no god but He: On Him is my trust,- He the Lord of the Throne (of Glory) Supreme!"
PICKTHAL: Now, if they turn away (O Muhammad) say: Allah sufficeth me. There is no Allah save Him. In Him have I put my trust, and He is Lord of the Tremendous Throne.
SHAKIR: But if they turn back, say: Allah is sufficient for me, there is no god but He; on Him do I rely, and He is the Lord of mighty power.

এবার প্রিয় পাঠক রাশেদ খলীফার কোরাণে চোখ বুলান –
http://www.submission.org/suras/sura৯.htm

দেখবেন সেখানে ৯: ১২৮ এবং ৯: ১২৯ এর অস্তিত্বই নেই! পুরোপুরি গায়েব!!!!!

এই হচ্ছে রাশাদ খলিফার ম্যাথমেটিকল মিরাকল অব নাইন্টিন – কখনো তাঁর ইচ্ছেমত আয়াত গায়েব করে কখনো বা বাড়তি আয়াত বসিয়ে দিয়ে কোরানকে 'অলৌকিক' বানিয়েছেন তিনি।

প্রশ্নঃ
১। কোনটি ঠিক?
২। রাশেদ খালীফা যদি বেঠিক হন, তবে তার প্রচারিত থিউরি দিয়ে দুর্বল মুসলমানদের ইমান শক্ত-পোক্ত করার চেষ্টা কেমন?

নাস্তিকের ধর্মকথা, বাংলাদেশ থেকে লেখন। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে তিনি আন্তর্জালে লিখে থাকেন। nastikerdharmakatha.blogspot.com নামে নিজস্ব ব্লগ আছে তার। ইমেইল - nastikerdharmakatha@gmail.com

ওঁং গনেশায় নম!

বিপ্লব পাল

আমেরিকানরা বলে Rat God। ইদানিং আমেরিকায় ভারতীয় এইচ.ওয়ান.বি বিরোধী যত ওয়েব সাইট আছে, তাতে ভারতীয়দের ওরা বলে র‍্যাট গড ওরশিপিং ইন্ডিয়ান। এইসব ইঁদুর দেবতার ভক্তরা সফটওয়ার মার্কেটে আমেরিকানদের স্বভূমে রিফিউজি বানিয়েছে। ইঁদুরের যারা পুজো করে, তারা আবার সফটওয়ার করবে কি টাইপের ব্যাপার আর কি! র‍্যাট গড ওরশিপিং আমেরিকান স্ল্যাং এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সম্প্রতি।

ভারতে অধিকাংশ হিন্দু যেসব পূজো অর্চনা করে তার সবটাই প্যাগানিজম। আদিবাসি সংস্কৃতির ধারার সাথে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের ককটেল। 'গা' এর অর্থ হচ্ছে বুদ্ধি, 'না' মানে জ্ঞান। মানে হলো গিয়ে গনেশ হচ্ছে জ্ঞান এবং আক্কেল বুদ্ধির দেবতা (গনপতি, বিনায়ক ইত্যাদি নানা নামে হিন্দুরা এর পুজো করে)। তাহলেই বুঝুন গনেশের পুজো করে আম-ভক্তদের বিদ্যাবুদ্ধি এতোই বেড়েছে, তারা গনেশ দুধ খাচ্ছে ইত্যাদি জাতীয় বিশ্বাসে মগ্ন। বিজেপির কিছু শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব ডায়ালগ ঝাড়ছেন, এটা নাকি হিন্দুধর্মের প্রেষ্ঠত্ব প্রমানের জন্য 'কলিযুগে' বাবা গনেশের কীর্তি! ইন্টারনেটেও এই গনেশের দুধ খাওয়া নিয়ে অনেক সাইট আছে*। হিন্দুরা দাবী করেছেন তাদের ধর্মই সত্য ধর্ম (True religion), কারণ তাদের দেবতা দুধ খেয়ে নিয়ে জনগণের মাঝে অলৌকিকতার প্রমাণ দিয়েছে। অন্য ধর্মের উপাস্য দেবতারা কি এমন কীর্তি ঘটিয়ে দেখিয়েছে কখনো?

কীর্তিই বটে। গাছ কি করে মাটি থেকে জলটানে তারা সেটা জানলেই সবাই বুঝতে পারতো গনেশের শুঁড় কি ভাবে 'ক্যাপিলারি' একশনের মাধ্যমে জল বা দুধ টানছে। জল খুব শক্তিশালি পোলার অনু এবং অধিকাংশ সারফেসের সাথে বেশ জোরালো আকর্শনে আবদ্ধ। ফলে সরুক্যাপিলারি বেয়ে জল বা দুধের মতন জলীয় পদার্থ অনায়েসেই উঠতে পারে। এটা শুধু গনেশের দুশ খাওয়া কেন, স্ট্র দিয়ে পেপসি কোলা কাওয়ার সময়ও যে কেউ দেখতে পাবে। এছাড়া ম্যাস-হিস্টেরিয়ার ব্যাপার তো আছেই†। সে জন্য ভারতের মূর্তি দুধ খাওয়া শুরু করার কিছুদিন পর নাকি সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর ওপারে ক্যানাডার মন্দিরের মূর্তিগুলোও দুধ খাওয়া শুরু করে দিল! প্রবীর ঘোষ, স্যানাল এডমারাকু সহ ভারতীয় যুক্তিবাদীরা এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা তো তো আছেনই, জেমস রান্ডি সহ অনেকেই বৈজ্ঞানিকভাবে ধর্মবাদীদের যুক্তি খন্ডন করেছেন‡। যুক্তিবাদীদের কেউ কেউ নিজেরাই গনেশের মুর্তি বানিয়ে তাকে কোক, ফান্টা, হুইস্কি, বিয়ার, গোমূত্র সবই খাইয়ে ছেড়েছেন।

---

* উদাহরণ স্বরূপ www.milkmiracle.com সাইটে যাওয়া যেতে পারে।

† তথ্বের জন্য দেখুন, http://www.ibnlive.com/news/science-behind-milk-drinking-gods/19175-11.html

‡ James Randi, Milk-drinking statues, http://www.randi.org/hotline/1995/0027.html

অবশ্য বৈজ্ঞানিক সত্যিতে আর কি যায় আসে! গনেশ বাবাজীপন সেই ঋকবেদের সময় থেকে ভারতীয়দের বিদ্যাবুদ্ধি এতো উদ্ধার করেছেন আজো তারা ইঁদুর পুজো করছে। পশুপাখি-গাছপালা পুজো করা একদিয়ে ভালো, কারণ এতে পশুপাখি এবং প্রকৃতির প্রতি মানুষের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। সেটাই পাগ্যানিজমের উজ্জ্বল দিক। অন্যদিকে এমনতরো কুসংস্কারে আবদ্ধ সমাজ কি ভাবে সামনের দিকে এগোবে সেটাও চিন্তার বিষয়। আর অপচয়ের ব্যাপারটা ত আছেই। ভারতের মত হত-দরিদ্র রাষ্ট্রে যেখানে মানুষ দু-বেলা খেতে পায় না, সেখানে গামলা গামলা দুধ গণেশের শুঁড়ে তুলে দিয়ে কি অর্থহীন অপচয়! এ বিলাসিতা কি আমাদের সাজে? অবশ্য এখানে প্রশ্ন উঠতেই পারে, আমেরিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকই বিবর্তনে বিশ্বাস করে না-বাইবেলের ছহাজার বছর সৃষ্টিতত্ত্বেই তাদের মানসিক বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ। তাও আমেরিকা রাষ্ট্র হিসাবে বিদ্যা-বুদ্ধি এবং শক্তিতে পৃথিবীতে প্রথম। তাহলে এই ধাঁধার উত্তর কে দেবে?

সামাজিক বিবর্তনেই এর উত্তর মিলবে। আসলে সমাজের উত্তোরন না অবনমন তা অনেক কিছুর ওপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সমাজের উৎপাদন শক্তি। এটা অনেক কিছুর ওপর ভিত্তি করে বৃদ্ধি পায়-যেমন শিক্ষার মান এবং পরিকাঠামো, বাজার অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীলতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে উৎপাদন বৃদ্ধির সম্পর্ক , সম্পদ বন্টনের পদ্ধতি, সামরিক শক্তি দিয়ে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা ইত্যাদি। তাই অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তাধারা, আমাদের এই উৎপাদন কাঠামোয় কতটা ক্ষতি করে সেটা নির্নয় করা জরুরী। যেমন গুজরাট ভারতের মধ্যে সবথেকে বেশী হিন্দুত্ববাদি রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতির দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের থেকে অনেক এগিয়ে। নাস্তিক কম্যুনিউস্ট দেশগুলি থেকে কুসংস্কার আচ্ছন্ন আমেরিকা জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং জনকল্যানে অনেক বেশী অগ্রসর। কারণ গুজরাট বা আমেরিকা ধার্মিক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকলেও উন্নতির জন্য ধনতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করেছে- যার উৎপাদন শক্তি সমাজতন্ত্রের চেয়ে বেশী। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে আমরা লেলিনতান্ত্রিক অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কারে নিজেদের আবদ্ধ রেখেছি। অর্থাৎ গনেশের দুধ খাওয়া বা বিবর্তনে না বিশ্বাস করা একমাত্র কুসংস্কার নয়। রাজনৈতিক মতবাদে অন্ধ বিশ্বাসও কুসংস্কার বিশেষত সেটা যদি অবৈজ্ঞানিক হয়ে থাকে। পৃথিবীর অনেক কমিউনিস্ট রাষ্ট্রেই ভুল এবং অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিলো। সেজন্য আমরা দেখেছিলাম স্ট্যালিনের জামানায় জেনেটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এর বারোটা বাজিয়ে দিয়ে কিভাবে লাইসেঙ্কুজমের অন্ধবিশ্বাস প্রমোট করা হয়েছিল।

সুতরাং কুসংস্কার সর্বত্র। এই কুসংস্কার থেকে মুক্তি পেতে গেলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, সমাজের প্রতিটি চুক্তি নির্নয়ে, রাজনীতির প্রতিটি আনাচে কোনাচে বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তা আনতে হবে। পৃথবীতে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে সব থেকে কম জার্মানীতে। জার্মানী মৌলিক গবেষনা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষনায় আমেরিকার থেকে বেশ কিছু ক্ষেত্রে এগিয়ে, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য সেই সব গবেষনার ফল বাজারে খুব বেশী পৌঁছাচ্ছে না বা পৌঁছালেও সেটা সম্ভব হচ্ছে আমেরিকার কোম্পানীগুলির মাধ্যমে। অর্থাৎ শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা আনা যথেষ্ট নয়। এই empericism ছড়াতে হবে প্রতিটি ক্ষেত্রে।

জার্মানিতে স্কুলে ধর্মতত্ত্ব পড়ানো হয়। আমার এক বন্ধুপত্নী মাইকা জার্মানীতে ধর্মশিক্ষা এবং গণিতের শিক্ষিকা। আমি ওর কাছে জানতে চেয়েছিলাম জার্মানীতে ধর্মের নামে কি পড়ানো হয়। মোটামুটি যা বুঝেছি জার্মানীতে প্রবল বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া হয়। এটার প্রয়োজন বিতর্কিত। কিন্তু হিটলারের সোসাল ডারউইনিজম নিয়ে অমানবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য জার্মান সরকার এটা সিলেবাসে রেখেছে। তা সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রে জার্মানিতে একটা ভালো কাজ হয়েছে। সবাই স্কুলে ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করায়, এবং পাশাপাশি বিজ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ় থাকায়, ধর্মের ভূত জার্মান সমাজে সব থেকে কম। একটু চোখ খুললেই দেখা যাবে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে সব থেকে যারা ভালো কোরান পড়েছেন এবং বোঝেন, তারাই সব থেকে বেশী ইসলাম বিরোধী। কারণ ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করলেই, ধর্মের বুজরুকি সবার আগে বোঝা যায়। অবশ্য যদি বিজ্ঞানের শিক্ষাটা আগে থেকে ঠিক ঠাক থাকে। সুতরাং স্কুলে পরীক্ষানির্ভর বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর আরো বেশী জোর দিতে হবে।

ড. বিপ্লব পাল, আমেরিকাতে বসবাসরত পদার্থবিদ, গবেষক এবং লেখক। এক সময় ভিন্নমতের মডারেটর ছিলেন, বর্তমানে www.fosaac.tv সম্পাদনার সাথে জড়িত।

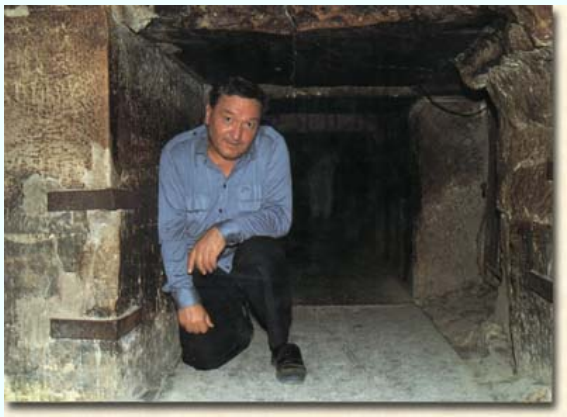

নাটের গুরু এরিক ফন দানিকেন

স্বপন বিশ্বাস

ষাটের শেষে ও সত্তুরের শুরুতে দানিকেনের 'দেবতত্ত্ব' নিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় বই বিক্রির মাতম শুরু হয়। দানিকেন তার Chariots of the Gods বইয়ে বলেন যে, মেক্সিকো থেকে চীন অবধি যত প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন মেলে, সেগুলো ভিন্ গ্রহের উন্নততর প্রাণীদের দ্বারা প্রভাবিত। দশ থেকে চল্লিশ হাজার বছর আগে ভিন্ গ্রহের প্রাণীরা পৃথিবীতে আসে, উন্নততর প্রযুক্তি দিয়ে পৃথিবীবাসীকে নানাবিধ স্থাপনা তৈরিতে সহায়তা করে। যে সকল পুরাকীর্তি ও তার ধ্বংসাবশেষ দেখে পৃথিবীবাসী আজও অভিভূত, সেগুলো মনুষ্যকীর্তি নয়, আরো উন্নত সভ্যতার প্রতিনিধিত্বকারী মহাশূন্যযানে চেপে আসা 'দেবতাদের' কীর্তি ওসব। দানিকেন এই 'দেবতত্ত্ব' টোপ এমনভাবে হাজির করেন যে, বিশ্বাসী বিশ্ববাসী সেটি গিলে ফেলে। মুড়ি মোয়ার মতো দানিকেনের বই বিক্রি হয়। শেষ পর্যন্ত তার বই বিক্রি সর্বসাকুল্যে ছয় কোটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। অপবৈজ্ঞানিক বই বিক্রির এমন মাতম স্মরণকালে আর কোনটি ঘটেছে বলে মনে পড়ে না। Chariots of the Gods অবলম্বনে আমেরিকায় একটি টিভি সিরিয়াল তৈরি হওয়ার পর তার খ্যাতি ও বই বিক্রি আরো তুঙ্গে ওঠে। মাছি মারা কেরাণী থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সর্বমহলে তার ভক্তের সংখ্যা বেড়ে যায়। মিডিয়া ও পাঠকের আশীর্বাদে শ্রী দানিকেন বনে যান, সমালোচকের ভাষায়, একজন prophet (profit?)। তার বই জনপ্রিয় হয়েছে কেন?

ফন দানিকেনের বই

দানিকেন বলেছেন "আমি হঠাৎ কোন অহি বা দৈববাণী শুনিনি, দেবতত্ত্ব আমার ধীর সাধনার প্রয়াস।" জানা গেছে Chariots of the Gods লেখার আগে দানিকেন পুরাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। ব্যক্তিগত কিছু অশান্তির মধ্যে থেকেও ছুটে গেছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। অবশেষে মেক্সিকোতে পেলেন তার দাবীর সমর্থনে কিছু নমুনা। মেক্সিকোর পালেঙ্ক নামক স্থানে একটি মন্দিরের বড় পাথরে খুঁজে পেলেন রকেটের মতো কিছু। ইউরেকা ইউরেকা!! অতি দ্রুত প্রস্তুত হলো Chariots of the Gods এর পান্ডুলিপি। কিন্তু কোন প্রকাশক ওটা প্রকাশ করতে চাইল না। প্রায় ২২ বার প্রত্যাখ্যাত হয়ে বেপরোয়া দানিকেন প্রভাবশালী জার্মান সাংবাদিক থমাস ফন র‍্যান্ডোর শরণাপন্ন

হন। র‍্যান্ডো তাকে উপদেশ দেন কোন কল্পবিজ্ঞান লেখকের সহায়তায় পান্ডুলিপিটি পুনর্বার লিখতে । ১৯৬৮ সালের দিকে দানিকেনের – Chariots of the Gods সহ আরও একটি বই প্রকাশিত হয় । কিছুকাল পরেই চন্দ্রবিজয় ঘটে । চন্দ্রবিজয়ে মানুষের উত্তেজনা ও বিকল্প বিজ্ঞানে মানুষের উৎসাহের ফলে দানিকেনের বই বিক্রির মাতম ঘটে । পরবর্তীতে দানিকেন আরো বই লিখেন; বিষয়বস্তু প্রায় কাছাকাছি । দেবতারা এসেছেন উড়ন্ত চাকীতে চড়ে, চারিদিকে তার নমুনা। ইস্টার দ্বীপের মূর্তি, পিরি রেই–এর মানচিত্র, পিরামিড, নাজকা লাইন, মঙ্গলের চাঁদ, দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণখনি সর্বত্রই দেবতার পদস্পর্শ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

পালেঙ্ক মন্দিরের বড় পাথরের ওপর খোদাই করা ছবিটি দেয়া হ'ল। রকেটের মতো কিছু বা তাতে মহাশূন্যচারী বসে আছে বলে মনে হচ্ছে না তো। দানিকেনের মনে হয়েছে। মায়া–লিপি বিশেষজ্ঞ আয়ান গ্রাহাম বলছেন, "নিশ্চিতভাবেই আমি ওটাকে মহাশূন্যচারী বলে মনে করার কোন কারণ দেখি না। আমি কোন অক্সিজেন টিউব দেখতে পাচ্ছি না। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আঁকা মায়া অবয়ব দেখতে পাচ্ছি মাত্র।" বইয়ের শুরুর দিকে দানিকেন একটি 'রকেট সমীকরণ' দাঁড় করিয়েছেন যা কোন সমীকরণই নয় কারণ ওখানে কোন '=' চিহ্ন নেই। এই উদ্ভট অসমীকরণে হর অংশে একটি স্থির সংখ্যা (যা কি না 'এক') দিয়ে গুণ করা হয়েছে। একজন স্কুলছাত্রও জানে যে 'এক' দিয়ে কোন সংখ্যাকে গুণ করলে ওই সংখ্যাটিই থেকে যায়। তাহলে দানিকেন ওটি আমদানি করলেন কেন? কি করে পৃথিবী ও চাঁদ এলো? পৃথিবী একটি উপগ্রহকে পাকরাও করলো । পৃথিবীর দিকে টেনে আনার সময় পৃথিবীর ঘূর্ণনের গতির কাছাকাছি এসে উপগ্রহটি চূর্ণবিচূর্ণ হয় ও চাঁদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় । প্রমাণ কোথায়? প্রমাণ রয়েছে তিয়াহিউয়ানাকোর প্রাচীন মন্দিরের 'গ্রেট আইডলের' চিহ্নাবলীতে । দানিকেনের ভাষ্য অনুযায়ী ২৭০০০ বছর আগে একটি উপগ্রহ বছরে পৃথিবীকে ৪২৫ বার চক্কর দিয়েছে; দানিকেনের বছর তখন ২৮৮ দিনে মাত্র । বছর ২৮৮ দিনে হওয়া মানে অতীতে, কেপলারের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী, পৃথিবী সূর্যের খুব কাছাকাছি ছিল – এমন একটা জায়গায় যেখানে বর্তমান শুক্র গ্রহের অবস্থান । এর মানে, দানিকেনের হিসেবে বরফ যুগে আমাদের এই পৃথিবী সূর্যের আরো দুই কোটি মাইল নিকটে ছিল? বহু প্রশ্ন । কিন্তু দানিকেনের তরফ থেকে কোন সদুত্তর মেলেনি । দানিকেনের দাবীর অধিকাংশই বাকচাতুরি ও স্রেফ প্রতারণা । একবার তিনি তার দাবীর সমর্থনে মৃৎপাত্রের কয়েকটি ছবি হাজির করে বলেন, ওগুলো পুরাতাত্ত্বিক খননের ফলে প্রাপ্ত। মৃৎপাত্রের গায়ে ফ্লাইং সসারের ছবি । একটি টেলিভিশন প্রোগ্রামের একদল অনুসন্ধানী ব্যাপারটি হাতে নেন ও প্রাচীন মৃৎপাত্রের নির্মাতাকেও খুঁজে পান ও দানিকেনকে চেপে ধরেন । জবাবে দানিকেন

বলেন, তার চাতুরির যাথার্থতা আছে কেননা কেউ কিছু বিশ্বাস করার আগে তা পরীক্ষা করে নেবে, ইত্যাদি ।

ভিন গ্রহের প্রাণীদের পৃথিবী দর্শন বিষয়ে দানিকেন একটি হাইপোথিসিস দাঁড় করাতেই পারেন। কেউ কেউ বলেন, hypotheses are a dime a dozen, মানে 'দশে বারো'। হাইপোথিসিস দাঁড় করানোটা বিজ্ঞান নয়, ওটা নিয়ে তুমি কি করছো ও অন্যেরা ওটাকে কিভাবে দেখছে – তা হচ্ছে বিজ্ঞানের কাছাকাছি। দানিকেন কখনো নিরবচ্ছিন্নভাবে কোন পরীক্ষা–নিরীক্ষা করেন নি। তিনি এও বলেন নি যে তার বই ফ্যান্টাসি অথবা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী। বরং সমালোচকদের এক হাত দেখিয়েছেন এই বলে, "বই লিখতে হিম্মত লাগে, পড়তে লাগে আরো হিম্মত।"

দানিকেনের বইয়ের জনপ্রিয়তার কারণ হিসেবে জন অমুহান্দ্রু লিখেছেন, "ফন দানিকেন, মনে হয়, নতুন ধর্মমত নিয়ে হাজির হয়েছেন।" তিনি যা বলছেন স্পষ্টতই লোকে তা শুনছে। কেন? আমাদের ধর্মীয় সংস্কৃতিতে "আমরা একাকী নই" ইস্যুটি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ মনেবৃত্তি। ঈশ্বর আত্মা দেবদূত সবাই অপর লোকের বাসিন্দা। বৈজ্ঞানিকরাও বহু প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিজ্ঞান গবেষণায় ক্রমাগত বিশেষায়ন হওয়ার প্রেক্ষিতে একপ্রকার গণবিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। আর মানব সমাজের বাইরে উন্নততর প্রাণী আছে – এই বিশ্বাসের উপর্যুপরি তাগিদ মানুষকে বিকল্প বিজ্ঞান বা রহস্যবাদের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

আমি মনে করি, বাইবেলসহ সকল ধর্মগ্রন্থকেই এই রাইখ সফলভাবে ব্যবহার করেছেন। বাল্যকালে বাইবেলের সঙ্গে যে বন্ধন তৈরি হয়েছিল, দেবতত্ত্বে তার প্রভাব পড়েছে। দানিকেন মনে করেন, বাইবেলে ফ্লাইং সসারের বহু উল্লেখ রয়েছে আর বাইবেলের দেবতা হলো ভিন গ্রহের প্রাণী। (ক্যাথলিক পোপের দরবার থেকে কোন উচ্চবাচ্য হয়েছে বলে শুনিনি আর হলেও তা বই বিক্রির অনুকূলে গেছে)। দানিকেন পুনর্বার আবিষ্কার করেছেন, ঋকবেদে বিমান ও ইঞ্জিলে পারমাণবিক চুলা। দানিকেন বহু অলৌকিক উপাদানের সংমিশ্রণ; এই গুণ বই জনপ্রিয় হওয়া ও বিক্রির সহায়ক।

বইয়ের ফন দানিকেন

দানিকেনের জন্ম ১৯৩৫ সালে সুইজারল্যান্ডের যফিংগেন শহরে । তার বাবা ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক । ছেলেকেও তিনি একজন আদর্শ ক্যাথলিক হিসেবে গড়ে তুলতে চাইবেন এতে আর অবাক হওয়ার কি আছে? দানিকেনকে ফ্রিবুর্গে একটি আবাসিক স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। স্কুলের গ্রেড খুব খারাপ হওয়ায় অল্প বয়সেই দানিকেন ওখানকার পাঠ চুকিয়ে হোটেলের ওয়েটার হিসেবে কাজ নেন। স্কুলে বয়স্কাউট থাকার

সময়ে তাকে একবার স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে হাজিরা দিতে হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ – সে স্কাউট ট্রেজারি থেকে টাকা চুরি করেছে। কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না। এই অভ্যেসটি পরবর্তীতে তার লেখক জীবনকেও প্রভাবিত করেছে।

দানিকেন আন্তর্জালে তার নিজস্ব ওয়েবসাইটে বলছেন, তিনি একটি পাঁচতারা হোটেলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছিলেন। ঠিক এই সময়েই তিনি তার প্রথম বইটি লেখার পরিকল্পনা করেন। হোটেল থেকে ৪ লক্ষ সুইস ফ্রাঙ্ক ধার নিয়ে মিশর, লেবানন, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা সফর করেন। প্রকাশিত হয় Chariots of the Gods । হোটেলে কাজ করার সময়েও প্রতারণা ও ছিঁচকে চুরির দায়ে তাকে জরিমানা দিতে হয়েছে। ১৯৬৭ সালে আন্তর্জাতিক পুলিশ তাকে ৭০০০ পাউন্ড ট্যাক্স ফাঁকির দায়ে গ্রেফতার করে। ম্যাজিস্ট্রেটের অনুসন্ধানে দেখা যায় যে দানিকেন ৩৫০০০০ পাউন্ড ঋণ নিয়ে বসে আছেন। জালিয়াতির দায়ে অভিযুক্ত হন এরিক ফন দানিকেন। বিচারকরা জানান, দানিকেন অসৎ ও তার দেবতত্ত্ব হচ্ছে ফালতু ব্যাপার। শ্রীঘরে যেতে হয় তাকে। অবশ্য জেলখানায় বসে বসে লিখেন Return of the Gods । সাড়ে তিন বছর শ্রীঘরে কাটিয়ে ১৯৭২–এর শেষে মুক্তি পাওয়ার পর সেই বইটি প্রকাশিত হয় এবং এটিও বেস্টসেলার হয় ।

১৯৭৭ সালে বিবিসির একটি প্রোগ্রামে দানিকেনের দেবতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত দেয়া হয় যে, ওটি অপবিজ্ঞান । সত্তুরের শেষ দিকে জনতার অঙ্গনে তার উপস্থিতি তেমন লক্ষ্য করা যায় না । ১৯৮২ সাল নাগাদ দানিকেনের দশম বই প্রকাশ করার জন্য কোন ইংলিশ বা আমেরিকান প্রকাশক খুঁজে পাওয়া যায়নি ।

গত ক'বছর ধরে কিছু টেলিভিশন প্রোগ্রামের বদান্যতায় দানিকেনের ভাবনা আবার জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে । তিনি একটি বিশাল থিম পার্ক নিয়ে কাজ করেছেন । থিম পার্কের নাম মিস্ট্রিস অব দ্যা ওয়ার্ল্ড। দানিকেনের ওয়েবসাইটে দেখা যাচ্ছে, তিনি রহস্য বিষয়ে অনেক গবেষণারও সমন্বয় করেছেন । যাই হোক না কেন মানুষের কল্পনাশক্তিকে চাবকে দিয়ে হৈ হৈ রৈ রৈ সৃষ্টিতে তার জুড়ি নেই ।

দানিকেনের চরিত্র ও সততা নিয়ে যেসব অভিযোগ আছে সেগুলো তার ওয়েবসাইটে উল্লেখ নেই । থাকারও কথা নয় । অপ্রিয় সত্য এড়িয়ে গেছেন । ওয়েবসাইটে যা বলা আছে তার সব অসত্যও নয় । ক'জন লেখক পৃথিবীতে আছেন যাদের বই ৩২টি ভাষায় অনুদিত হয়ে ৬ কোটিরও বেশী বিক্রি হয়েছে? দানিকেন বাকচতুর; চারটি ভাষায় কথা বলতে পারেন, ২৫টি দেশে ৩০০০ বক্তৃতা দিয়েছেন, তার মধ্যে ৫০০ টি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে; আমার জানামতে তিনি একবার কলিকাতায়ও এসেছিলেন । ওখানে তার আপ্যায়ন হয়েছিল অম্ল–মধুর । দানিকেন বহু লেখক সংঘের সদস্য । পাশ করে স্কুলের

চৌকাঠ পার হওয়া সম্ভব হয়নি কিন্তু বলিভিয়ার স্টেট ইউনিভার্সিটি এই পন্ডিতমন্য? ব্যাক্তিকে সম্মানীয় ডক্টরেট ডিগ্রী দিয়েছে । পৃথিবীতে এমন ঘটনা ঘটে চলেছে । স্কুলের চৌকাঠ না পেরিয়ে গৃহবধুর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ঘটনা কি বিরল? যে পন্ডিতের এত গুণ আমি কি তার চরিত্রে কালিমা লেপন করতে পারি? পারি । কারণ সে এক অপবৈজ্ঞানিক দেবতত্ত্ব হাজির করে বই লিখে বিশ্ব প্রতারণা করেছে । তার সত্য হচ্ছে আধা সত্য, সিকি কিংবা দু'আনী সত্য। তথাপি বিশ্বব্যাপী তার পাঠক আছে ভক্ত আছে । বই থেকে টাকা আসছে । আসছে টাকা থিম পার্ক থেকেও । লেখকের যেমন গালগল্প লেখার স্বাধীনতা আছে পাঠকদেরও তা পড়ার স্বাধীনতা আছে । ভদ্রলোক বা গুণীজনেরা দানিকেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন না। ফন দানিকেনকে বাতিল করে গোটা দুই বই লিখেছেন রোনাল্ড স্টরি। লেখকের অধিকার বিষয়ে রাষ্ট্রীয় আইনের নানা সীমাবদ্ধতা থাকে। এই সুযোগটিকে দানিকেন নির্লজ্জভাবে ব্যাবহার করে চলেছেন। বয়োবৃদ্ধ দানিকেন কোনরকম পিঠ বাঁচিয়ে সুকৌশলে এখনো মানুষের পকেট হাতিয়ে চলেছেন।

হারম্যান হেসে হার মেনেছে। দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি, দানিকেনের প্রতারণা সুইচ ব্যাংক চাকু চকলেট ও ঘড়ির মতো নিখুঁত।

অলৌকিক সংখ্যাতত্ত্ব ...

নাস্তিকের ধর্মকথা

এক

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বিশ্ব বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখে যুক্তরাষ্ট্রের উপর হামলার এক বিরল, কিন্তু মর্মান্তিক দৃশ্য । বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার টুইন টাওয়ারটি চোখের নিমিষে ধ্বসে পড়ে। গোটা দুনিয়া নাড়া খায়, তারপর থেকে বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পাল্টে যেতে থাকে- সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হয়- আর আমরা দেখতে পাই এই ঘোষনার মধ্য দিয়ে দুনিয়াজুড়ে এক সর্বগ্রাসী দানবের সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে। দানবটি হলো যুক্তরাষ্ট্র। দানব রাষ্ট্রপতি George W. Bush। George W. Bush এ মোট অক্ষর সংখ্যা হলো **১১**টি। **"১১"** সংখ্যাটি হলো দারুন অশুভ সংখ্যা। সমস্ত কিছুর মূলেই আছে এই **১১**।

এক নজরে তাহলে সেটাই দেখি:

- হামলার তারিখ: সেপ্টেম্বরের ১১
- হামলার তারিখ: ৯/১১ ==>> ৯+১+১=১১
- সেপ্টেম্বর ১১ হলো বছরের ২৫৪ তম দিন ==>> ২+৫+৪=১১
- সেপ্টেম্বের ১১ এর পরে বছর শেষ হতে আর ১১১ দিন বাকি ছিল
- টুইন টাওয়ার পাশাপাশি দাঁড়ানো- যা দেখতে ১১
- প্রথম বিমান যেটি আঘাত হানে সেটি ১১ নং ফ্লাইট
- American Airlines মানে AA। A হচ্ছে ইংলিশ বর্ণমালার প্রথম অক্ষর: মানে American Airlines>> AA>> ১১
- নিউইয়র্ক স্টেট হচ্ছে ইউনিয়নে যুক্ত হওয়া ১১ নাম্বার স্টেট।
- New York City - ১১ টি অক্ষর
- Afghanistan - ১১ টি অক্ষর
- The Pentagon - ১১ টি অক্ষর
- ফ্লাইট ১১ - ৯২ অন বোর্ড ->> ৯+২=১১
- ফ্লাইট ৭৭ - ৬৫ অন বোর্ড ->> ৭৭= ১১*৭ ->> ৬+৫=১১
- Air Force One ==>> ১১ অক্ষর
- Saudi Arabia =>> ১১ অক্ষর
- ww terrorism =>> ১১ অক্ষর
- ইউ এস স্টেট সেক্রেটারি Colin Powell ==>> ১১ অক্ষর
- নভেম্বর ১১ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের Remembrance day, নভেম্বর হলো ১১ তম মাস।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় আঘাত হানা বিমানের পাইলট Mohamed Atta ==>> ১১ অক্ষর

দুই

উপরের আলোচনা থেকে আমরা কি সিদ্ধান্তে আসতে পারি? একমাত্র সিদ্ধান্ত এটাই হতে পারে যে, ১১ একটি অলৌকিক সংখ্যা। এবং ১১ সেপ্টম্বরের ঘটনাটি একটি অলৌকিক ঘটনা।

বাইবেল ও বিভিন্ন প্রাচীণ মিথে শয়তানের চিহ্নের সাথে ১১ এর একটা যোগ পাওয়া যায়। নিউ টেস্টামেন্ট এ শয়তানের চিহ্ন ৬৬৬ যাও ১১ দ্বারা বিভাজ্য।

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে- এটি অবশ্যই শয়তানের কাজ। এই ১১ সেপ্টেম্বরেই শয়তান দুনিয়ায় নেমে এসেছে এবং তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে George W. Bush এর উপর ভর করার মাধ্যমে।

তিন

এক ও দুই নং অনুচ্ছেদের আলোচনাটি দেখে তো চমকেই উঠেছিলাম। dharmakatha এতেও দেখি ১১ টি অক্ষর। নিজের জীবনে তো দেখি আরো অনেক ১১ও আছে। খাইছে!! আমারেও কি শয়তানে পাইলো না-কি?

চার

আসেন এবার মজা বাদ দিয়ে একটু যৌক্তিক মন নিয়ে আলোচনা করা যাক...

অলৌকিক ১১ এর তত্ত্বটি সম্পূর্ণই বাজে, মেকি এবং উদ্দেশ্যমূলক। ৬৬৬ কে ১১ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় ৬০.৫৪৫৪৫৪.. মানে এটা ১১ দিয়ে বিভাজ্য নয়।

টুইন টাওয়ারের হামলার সাথে সনপর্কিত অসংখ্য বিষয় পাওয়া যাবে যার সাথে ১১ এর কোন সম্বন্ধ নেই:

- হামলার বছর ২০০১=> ২+০+০+১= ৩ (১১ নয়)

- বিমান গুলো আঘাত হানে সকাল ৯ টার দিকে (১১ টার দিকে নয়!!)।
- ৪ টি (১১টি নয়) বিমান হামলা করেছে।
- বিমানে লোকের সংখ্যা ২৬৬=> ২+৬+৬=১৪ (১১ নয়)
- একটি প্লেন এর নাম্বার ৭৬৭ => ৭+৬+৭=২০ (১১ নয়)
- আরেকটি প্লেন এর নাম্বার ৭৫৭ => ৭+৫+৭= ১৯ (১১ নয়)
- ৭৫৭ নং প্লেন এর ফুয়েল ক্যাপাসিটি ২০,০০০ গ্যালন (১১ হাজার গ্যালন নয়)
- ৭৫৭ নং প্লেন এর ডানার দৈর্ঘ ১২৪ ফুট =>১+২+৪ = ৭ (১১ নয়)
- ৭৫৭ নং প্লেন এর ডানার দৈর্ঘ ১৫৬ ফুট =>১+৫+৬ = ১২ (১১ নয়)
- একটি টাওয়ারের উচ্চতা ১৩৬২ ফুট=> ১+৩+৬+২ = ১২ (১১ নয়)
- অন্যটির উচ্চতা ১৩৬৮; ১+৩+৬+৮ = ১৮ (১১ নয়)
- অন্য ফ্লাইট গুলো হচ্ছে: UA ৯৩=> ৯+৩= ১২ (১১ নয়)
- UA ১৭৫=> ১+৭+৫= ১৩(১১ নয়)
- ফ্লাইট ১১ এর প্যাসেঞ্জার ছিল ৮১ জন=> ৮+১ = ৯ (১১ নয়)
- Boston =>> ৬ টি অক্ষর (১১ নয়)
- Massachusetts => ১৩ টি অক্ষর (১১ নয়)
- Pennsylvania => ১২ টি অক্ষড় (১১ নয়)
- Washington D.C. =>> ১২ টি অক্ষর (১১ নয়)
- Los Angeles =>> ১০ অক্ষর (১১ নয়)
- হাইজ্যাকারদের সংখ্যা ১৯ =>> ১+৯= ১০ (১১ নয়)
- Tony Balair => ১০ অক্ষর (১১ নয়)

একই ঘটনাকে অন্য সংখ্যা দিয়েও 'প্রমাণ' করা যাবে যে অন্য আরেকটি সংখ্যা অলৌকিক। যেমন ধরা যাক ২। ইচ্ছে করলেই একই পদ্ধতিতে '২' সংখ্যাটিকে 'অলৌকিক' বানো যেতে পারে। দেখুন -

- হামলার তারিখ: ১১/৯ =>> ১১-৯= ২
- হামলার তারিখ: সেপ্টেম্বর ১১ => ১+১=২
- হামলার বছর: ২০০১ => ২+ ০*০*১=২
- ১১ সেপ্টেম্বর হচ্ছে বছরের ২৫৪ তম দিন=> ২+৫+৪= ১১=> ১+১=২
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা => ২ টি টাওয়ার
- World Trade Center কে আঘাত হেনেছে ২ টি বিমান
- প্রতি বিমানে ২ টি ডানা আছে।
- প্রথম আঘাতকারী বিমানের ফ্লাইট নাম্বার ১১=> ১+১=২
- New York => ২ টি শব্দ
- The Pentagon => ২ টি শব্দ

  …….. ইত্যাদি।

পাঁচ

অনেক মুসলিম আছেন যারা অলৌকিক '১১' তত্ত্বের মতই অলৌকিক '১৯' তত্ত্বকে চোখ বুজে বিশ্বাস করেন। কোরআনের ম্যাথমেটিকল মিরাকল অব ১৯ তত্ত্বের প্রতি যারা বিস্মিত ও মুগ্ধ জন্য দেখানো যেতে পারে যে, ইসলাম এবং কোরআনে **অনেক কিছুই আছে যা ১৯ এর সাথে খাপ খায় না। যেমন :**

- কোরআনে পারা ৩০ যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য না
- কোরআনে রুকু ৫৫৮ টি, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়
- সিজদাহ ১৫ টি যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়
- মাক্কী সুরা ৮৬, মাদানী সুরা ২৬ টি- কোনটিই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়
- নোকতা ১,০৫,৬৮৪ টি যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়
- আল্লাহ শব্দটি সংখ্যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য ধরে নিলেও (আসলে না)- রাসুল, মুহাম্মদ সা, জীব্রাইল, মানুষ প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ আছে যার সংখ্যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়।

- বিসমিল্লায় ১৯ টি অক্ষর থাকলেও কলেমা তাইয়েব্যা (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...), কলেমা শাহাদাত, আউজুবিল্লাহ..., এমন অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ বাক্যের অক্ষর ১৯ টি নয়।
- সুরা ৯৬ এর অক্ষর সংখ্যা ৩০৪টি যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য হলেও সুরা ১, ২, ... এমনকি ১১০ বা অন্য সুরাগুলো অক্ষর সংখ্যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য না।
- ১১০ নং সুরায় শব্দের সংখ্যা ১৯ টি। বাকি সুরাগুলোর শব্দসংখ্যা ১৯ নয়।

  ..... ইত্যাদি।

অন্য যেকোন আরেকটি সংখ্যা দিয়েও তালিকা বের করে অলৌকিক তত্ত দেয়া যেতে পারে:

- আল্লাহ শব্দটিতে অক্ষর ৪ টি
- ৪ নং সুরায় আয়াত ১৭৬ => ৪*৪৪=১৭৬
- সুরা এখলাসের আয়াত সংখ্যা ৪
- সুরা এখলাসের প্রথম আয়াত যেখানে আল্লাহর একত্ব সম্বন্ধে ঘোষণা দেয়া হয়েছে (কুলহু আল্লাহু আহাদ)- প্রথম আয়াতটিতে শব্দ সংখ্যা ৪ টি।
- সুরা এখলাস ১১২ নং সুরা, যা ৪ দ্বারা বিভাজ্য => ১১২/৪=২৮=> ২+৮=১০=> ১+০=১ অর্থা আল্লাহ এক
- কোরআনে আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬, যা ৪ দ্বারা বিভাজ্য
- আসমানী কিতাবের সংখ্যা ৪ টি
- আসমানি কিতাব নাযিলকৃত রাসুল ৪ জন
- প্রধান ফেরেশতা ৪ জন

  ..... ইত্যাদি।

অতএব 'প্রমাণিত' হলো যে কোরআন অলৌকিক এবং এই ৪ সংখ্যাটি একটি অলৌকিক সংখ্যা। এই অলৌকিক ৪ এর তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন নাস্তিকের ধর্মকথা (যদিও তিনি রাশাদ খলীফার ন্যায় নিজেকে নবী দাবি করেননি...)। এখনো তত্ত্বটি খসড়া পর্যায়ে আছে। আরবী টেক্সট ওয়ার্ডে নেয়ার কাজ চলছে- সেটা

হয়ে গেলেই সুদীর্ঘ তালিকা নিয়ে তিনি অচিরেই জনসম্মুখে হাজির হবেন। ভদ্রলোক তার সমস্ত হিসাবাদি কম্পিউটারের ক্যালকুলেটর টুলটি ব্যবহার করে করেছেন- আগামিতে কম্পিউটারের আরো নানা বাহারি ব্যবহারে ৪ এর অলৌকিকতার তালিকাটিকে সম্পূর্ণ করে তোলা হবে। সুতরাং নিসন্দেহে বলা যায় এই ৪ এর তত্ত সম্পূর্ণ (১০০%) কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে পাওয়া।

এছাড়াও তিনি জানিয়েছেন- প্রকৃতিতেও অলৌকিক সংখ্যা ৪ এর উদাহরণ গণ্ডায় গণ্ডায় আছে। পরবর্তীতে এহেন তালিকাও তিনি হাজির করবেন, তবে এক্ষণে একটি উদাহরণ দিয়ে বর্তমান নিবন্ধটি শেষ করা যাক: **নুরানী পশু ছাগলের ঠ্যাং ৪টি।**

সহযোগী লিংক:

১। http://skepdic.com/lawofnumbers.html

২। http://www.snopes.com/rumors/elevens.asp

নাস্তিকের ধর্মকথা, বাংলাদেশ থেকে লেখন। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে তিনি আন্তর্জালে লিখে থাকেন। nastikerdharmakatha.blogspot.com নামে নিজস্ব ব্লগ আছে তার। ইমেইল - nastikerdharmakatha@gmail.com

কুরআনের সাংখ্যিক মাহাত্ম্যঃ- “ভিন্নমত”
রায়হান আবীর

১

আমি ধর্ম পালন না করলেও ধর্ম নিয়ে আমার আগ্রহ রয়েছে। তাই টিভিতে যখন আব্বু-আম্মু নিবিষ্ট মনে ডঃ জাকির নায়েকের বক্তৃতা শুনে তখন কাজ না থাকলে আমিও সোফায় যেয়ে বসি। বোঝার চেষ্টা করি তিনি কী বলতে চান। তেমনি ধর্ম নিয়ে লেখা বইও পড়ি। কয়েকবছর আগে বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আহমদ দিদাদ এর লেখা “কুরআন ও বিজ্ঞান” নামে একটা বই দেখলাম কাটাবনের মসজিদের নীচে মার্কেটটায়। কিনে নিয়ে আসলাম। সেই বইয়ে নানা ভাবে কুরআনকে স্বর্গীয় কিংবা আলৌকিক প্রমানের জন্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে মিল দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি ছিল, উনিশ সংখ্যা দ্বারা আল্লাহ যে কুরআনকে বেঁধে দিয়েছিলেন তার প্রমান। আল্লাহতায়ালা বাঁধলেও সর্বসমক্ষে এই মিরাকলের ব্যাপারটি প্রথম তুলে ধরেন ডক্টর রাশাদ খালিফা[১]।

পুরো ব্যাপারটি যে কোন মানুষকে আকৃষ্ট করবে। যিনি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী তিনি প্রমানটি দেখে তৃপ্তির ঢেকুর তুলবেন- জিনিসটা মাথায় রাখার চেষ্টা করবেন, ক্ষেত্র বিশেষে কোন সংশয়বাদীর সাথে তর্কে লিপ্ত হলে তলোয়ার হিসেবে ব্যবহার করবেন। আর যিনি অবিশ্বাসী তিনিও সামান্য দ্বন্দ্বে পড়ে যাবেন।

আপনারা যারা এই মিরাকল সম্পর্কে জানেন না- তারা উইকিতে[২] লেখা এই নিবন্ধটি পড়ে দেখতে পারেন:

> **কুরআনের সাংখ্যিক তাৎপর্য**
>
> কুরআন শরীফের পূর্বতন তাফসীরকারকগণ এই ঊনিশ সংখ্যা সম্পর্কে অনেক সুন্দর সুন্দর ধারণা করেছিলেন। কেউ বলেছিলেন এই ঊনিশ হচ্ছে দোযখ নিয়ন্ত্রনকারী ঊনিশ জন ফেরেশতা। এবং অনেকে ইসলামের ঊনিশটি প্রধান স্তম্ভ বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাফসির কারকগন এই বলে তাদের কথা শেষ করেছেন যে এই সম্পর্কে আল্লাহ্ তালাই ভাল জানেন। অর্থাৎ তারা ১৯ সংখ্যা দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। কারণ ইসলামের নবী এই ঊনিশ সংখ্যা সম্পর্কে আসল অবস্থা বর্ণনা করেননি। বলা হয়ে থাকে এই ঊনিশ সংখ্যাটির মাধ্যমে আল্লাহ তালা কুরআন শরীফের আসল রচয়িতা যে তিনি তা প্রকাশ করেছেন। কেননা যদি মুহাম্মদ নিজে কুরআন রচনা করতেন তাহলে তিনি এই ঊনিশ সংখ্যা দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে যেতেন। কুরআন নাযিল হওয়ার ধারাবাহীকতা থেকে আমরা দেখতে পাই সূরা মুদ্ দাসসির এর ৩০ নং আয়াতটি চতুর্থ বারের সময় মুহাম্মদ এর নিকট নাযিল হয়।

---

[১] Rashad Khalifa, http://en.wikipedia.org/wiki/Rashad_Khalifa

[২] কুরআনের সাংখ্যিক তাৎপর্য, বাংলা উইকিপেডিয়া, http://bn.wikipedia.org/wiki

" ইহার উপর আছে উনিশ "

সূরা মুদ্দাসসির এর ৩০ নং আয়াত নাযীল করে জিব্রাইল (আ) কিছুক্ষণ নীরব থাকেন এবং এই সুরার বাকী ১৪ টি আয়াত নাযিল না করে তিনি চলে যান সেই সুরা আল-আলাকে, যার ১ম ৫টি আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল করা হয়েছিল। সুরা আল-আলাকে বাকী ১৪টি আয়াত এই সময় নাযিল করা হয়, তাহলে প্রথমে নাযিল করা সুরাটিতে আয়াত সংখ্যা হল (৫+১৪=১৯) ।

সুরা আল-আলাকের যে ১ম যে ৫টি আয়াত নাযিল করা হয়েছিল গণনায় দেখা যাবে যে তার শব্দ সংখ্যা ১৯ ।
১৯ টি শব্দের অক্ষর গুলোর যোগফল ৭৬ যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য ।
সুরা আল-আলাক কুরআন শরীফের পিছন দিক দিয়ে ১৯ নং সুরা ।
কুরআন শরীফের মোট সুরা সংখ্যা ১১৪ যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য ।
কুরআন শরীফের ১ম বাক্য বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম যাতে মোট অক্ষর সংখ্যা ১৯ ।
"বিসমি" কুরআনে মোট ১৯ বার উল্লেখ করা আছে ।
পরবর্তি শব্দ "আল্লাহ" উল্লেখ আছে ২৬৮৯ বার যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য ।
পরের শব্দ "রাহমান" আছে ৫৭ বার যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য ।
পরের শব্দ "রাহীম" আছে মোট ১১৪ বার যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য ।

২

আসলেই কী কুরআনে সাংখ্যিক মাহাত্ম্য (মিরাকল অফ ১৯) বিদ্যমানঃ-

স্পষ্ট উত্তর হচ্ছে- না। ডক্টর খলিফা বেশকিছু ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন। এই লেখায় বেশকিছু উদাহরণ এবং গঠনমূলক আলোচনায় তা দেখানো হবে।

মূলত পৃথিবীর যেকোন বিষয়েই একটি গানিতিক মিরাকল বের করা সম্ভব (প্রবন্ধের নীচের অংশে উদাহরণ দ্রষ্টব্য)। সেটি গণিতবিদদের দ্বারা সমর্থিত না হলেও মানুষকে আনন্দ কিংবা ধাঁধায় ফেলার জন্য যথেষ্ট।

ধরুন একটি সমুদ্র সৈকত। আপনি একটি নিক্তি নিলেন- এবং সমুদ্র সৈকতের একটি একটি করে বালুর ওজন মাপা শুরু করলেন। যেসব বালুর ওজন হচ্ছে এক গ্রাম সেটিকে আপনি থলেতে ভরে রাখলেন। যেগুলো না সেগুলো ফেলে দিলেন। আরও ধরি আপনার হাতে অফুরন্ত সময় রয়েছে এবং এই অফুরন্ত সময় আপনি শুধু বালুর ওজন মাপবেন এবং এক গ্রামের ওজনের বালু আলাদা করবেন। তাহলে দীর্ঘসময় পর আপনি বেশ বড় একটি বালুর স্যাম্পল জোগাড় করতে পারবেন যাদের প্রত্যেকের ওজন এক গ্রাম করে। এখন যদি আপনি ঘোষণা দেন যে, এই সমুদ্র সৈকতটি একটি মিরাকল এবং এর প্রত্যেকটি বালু কণার ওজন এক গ্রাম তাহলে কী তা যুক্তি সংগত হবে? হবে না।

কারণ গণিত আমাদের বলে, এই সৈকতে প্রতিটি বালুকণার ওজন এক গ্রাম- এই শর্ত আরোপ করার আগে আপনাকে শতকরা কতভাগ বালুর ওজন এক গ্রাম তা নির্ণয় করতে হবে। যদি শতকরা মান ৯০-৯৯% হয় তাহলে আমরা সেই শর্ত সঠিক বলে ধরে নিতে পারি।

শতকরা= এক গ্রাম ওজন এমন বালুর সংখ্যা/ পরীক্ষণীয় মোট বালুর সংখ্যা (যে বালু আপনি ফেলে দিয়েছেন+ যে বালু আপনি রেখেছেন) x ১০০

আপনার পরীক্ষায় একবস্তা বালুর বিপরীতে কমপক্ষে এক হাজার বস্তা বালু আপনি বাদ দিয়েছেন (কারণ তাদের ওজন এক গ্রাম নয়)। সুতরাং আপনার শতকরা মান হবে খুব কম। অর্থাৎ মিরাকলটি সত্যি নয়।

ডক্টর খালিফা ঠিক এই কাজটি করেছেন। কিভাবে?

তিনি বলেছেন কুরআনকে আল্লাহ উনিশ দ্বারা আটকে দিয়েছেন। তিনি বেশ কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন,

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'-এ মোট বর্ণ ১৯।
সর্বপ্রথম নাযিলকৃত ৫টি আয়াতে (সূরা আলাক) মোট শব্দ সংখ্যা ১৯, তাতে মোট বর্ণ ৭৬ (যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য)।
সর্বপ্রথম নাযিলকৃত পূর্ণাংগ সুরার (সুরা আলাক) আয়াত সংখ্যা ১৯।
সর্বশেষ নাযিলকৃত সুরায় (সুরা নসর) শব্দ সংখ্যা ১৯।
সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াতে (সুরা নসর-১) অক্ষর সংখ্যা ১৯।
পুরো কুরআনে 'কুরআন' শব্দটি এসেছে ৫৭ বার (যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য)।
কুরআনের সর্বমোট সুরার সংখ্যা ১১৪ (যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য)।
কুরআনের সর্বমোট আয়াত সখ্যা ৬৩৪৬ (যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য)।

তাহলে ডক্টর খালিফার চালাকিটা কোথায় হল? বের করা খুব সহজ।

যেকোন বই থেকেই আপনি "বিশেষ কিছু অংশ"/অপশন বাছাই করতে পারেন। তারপর যেই যেই অপশন আপনার মিরাকল প্রমানে কাজে লাগবে তা রেখে (ধরুন সাত দ্বারা বিভাজ্য) বাকিগুলো ফেলে দিতে পারেন। কুরআনের ক্ষেত্রে যেমন, একটি শব্দের অক্ষর সংখ্যা, চ্যাপ্টারের সংখ্যা, নির্দিষ্ট একটি শব্দ সর্বোমোট কতবার ব্যবহৃত হয়েছে সেই সংখ্যা ইত্যাদি- ইত্যাদি গ্রহন করা হয়েছে। ঠিক তেমনি ভাবে আপনি চাইলে অন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা, বিজোড় সুরার সংখ্যা, জোড় চ্যাপ্টারের সংখ্যা, বিজোড় চ্যাপ্টারে অতটি অক্ষর রয়েছে- জোড়টিতে কতটি রয়েছে ইত্যাদি নিতে পারেন। অর্থাৎ আপনি মাথা খাটিয়ে অসীম সংখ্যক অপশন/"বিশেষ অংশ" বাছাই করতে পারেন। ডক্টর খালিফা তাই করেছেন। অসংখ্য অপশন থেকে তিনি উনিশ দ্বারা বিভাজ্য প্রমান করা যায় এমন অপশনগুলো গ্রহণ করেছেন- বাকিগুলো ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু কুরআনে যদি আসলেই উনিশের মিরাকল থেকে থাকে তাহলে তা সব কিছুতেই থাকবে- শুধু মাত্র কয়েকটি জিনিসে নয়।

তারপরও কথা থেকে যায়। উনি তো অনেক কিছুই মেলাতে সক্ষম হয়েছেন। সেগুলো কী আসলেই মিলেছে? সেগুলো কি আসলেই ঊনিশ দ্বারা বিভাজ্য? চলুন দেখি পরবর্তী আলোচনায়।

৩

এই অংশে, প্রমানিত শর্তগুলোও অনেক ক্ষেত্রে সঠিক নয় তা দেখানো হবে। সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবচ্ছেদের জন্য একটি নিয়েই আলোচনা করবো।

ডক্টর রাশেদ খলিফা বলেন,

> "The key to Muhammad's perpetual miracle is found in the very first verse of the Qur'an, `IN THE NAME OF GOD, MOST GRACIOUS, MOST MERCIFUL = BiSM ALLaH, AL-RaHMaN, AL-RaHIM…"

মুহাম্মদের বলে যাওয়া- কুরআন যে একটি মিরাকল তার সন্ধান লাভ করা যায়, কুরআনের সর্ব প্রথম আয়াতেই। IN THE NAME OF GOD, MOST GRACIOUS, MOST MERCIFUL = BiSM ALLaH, AL-RaHMaN, AL-RaHIM'… …

"এই প্রথম আয়াতের অক্ষর গণনা করে (ইংরেজীতে শুধু মাত্র বড় হাতের অক্ষর) আমরা দেখতে পাই যে, এখানে ঊনিশটি অক্ষর রয়েছে। এবং এতে যে শব্দগুলো রয়েছে সেগুলো প্রত্যেকটি ঊনিশের গুনিতক। যেমন প্রথম অক্ষর, 'ISM ঊনিশ বার; দ্বিতীয় শব্দ, ALLaH ২৬৯৮ বার, যা ১৯ এর গুনিতক (১৯ X ১৪২) ; তৃতীয় শব্দ , AL-RaHMaN আছে ৫৭ বার, (১৯ X ৩); সর্বশেষ শব্দ, AL-RaHIM আছে ১১৪ বার (১৯ X ৬)"

ডঃ খালিফা দাবী করেছেন, কুরআনের এই অলৌকিকত্বে মানুষের কোন হাত নেই। অথচ, "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" বাক্যে যে ১৯টি বর্ণ আছে, এই মৌলিক দাবীতেই মানুষের হাত আছে। আরবি বাক্যটিকে ইংরেজিতে প্রতিবর্ণীকরণ করার সময় আমরা যদি স্বরবর্ণ বাদ দেই, তাহলে বাক্যটি এরকম দাঁড়ায়: "BSM ALLH ALRHMN ALRHIM", উল্লেখ্য আরবীতে স্বরবর্ণগুলো লেখা হয় না, পড়ার সময় ধরে নেয়া হয়। এই প্রতিবর্ণীকৃত বাক্যে বর্ণের সংখ্যা ১৯। কিন্তু, আরবিতে "তাশদিদ" বলে একটি প্রতীক আছে, কোন বর্ণের উপর সে প্রতীক থাকলে তা দুই বার উচ্চারণ করতে হয়। "ALLAH" শব্দের দ্বিতীয় " L " এর উপর একটি তাশদিদ আছে। সেক্ষেত্রে এই লাম দুইবার উচ্চারণ করে এভাবে লেখা যেত (বা এভাবে লেখা উচিত): "ALLLAH"; আর বর্ণ সংখ্যা হয়ে যেত ২০টি।

তাশদিদ যুক্ত বর্ণ দুইবার ধরা হয়েছে নাকি একবার ধরা হয়েছে, সে বিষয়টি ডঃ খালিফা কোথাও স্পষ্ট করে বলেননি। এছাড়া যে স্বরবর্ণগুলো লেখা হয় না, কিন্তু পড়ার সময় ধরা হয় সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা বা বাদ দেয়ার ব্যাপারটাও তিনি স্পষ্ট করেননি।

পরবর্তী সমস্যা "BISM" শব্দ নিয়ে। এটি প্রকৃতপক্ষে দুটি শব্দের সমন্বয়: " Bi"-এক্ষেত্রে এই শব্দের অর্থ "মধ্যে" এবং " ISM" অর্থ "নাম"।

ডঃ খালিফা সবসময় আরবি বর্ণক্রম ব্যবহারের কথা বলেছেন। এই আরবি বর্ণক্রম ব্যবহার করে "ISM" শব্দটির অনুসন্ধান করা যেতে পারে। আবদুল বাকি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কুরআনের একটি নির্ঘণ্ট ঘেটে এই আশ্চর্যজনক তথ্য পাওয়া গেছে:

"BiSM" শব্দটি কুরআনের প্রথম আয়াতেই আছে। এই শব্দটি কুরআনের মাত্র তিনটি স্থানে উল্লেখিত হয়েছে: ১:১১, ১১:৪১ এবং ২৭:৩০।

কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে কেবল "ISM" শব্দটি কুরআনে মোট ১৯ বার উল্লেখিত হয়েছে।

কিন্তু তৃতীয় আরেকটি তালিকা আছে। "ISMuHu" শব্দের অর্থ "তার নাম"। এটি আরবিতে একটি অখণ্ড শব্দ হিসেবে লেখা হয়। কুরআনে এটি ৫ বার এসেছে।

সবগুলো ফলাফল যোগ করলে পাওয়া যায়: ৩ + ১৯ + ৫ = ২৭, স্পষ্টতই এখানে ১৯ এর সাংখ্যিক তাৎপর্য আর থাকছে না।

আমাদের সামনে আরও অনেকগুলো অনুমানের ব্যাপার আছে, যেগুলো সম্বন্ধে ডঃ খালিফা কোন ব্যাখ্যা দেননি। কোন বিবেচনায় তিনি তিনবার উল্লেখিত "BiSM" শব্দটি গণনা থেকে বাদ দিয়েছেন? যে শব্দ নিয়ে গবেষণা করছিলেন সেই শব্দটিই বাদ দেয়ার পিছনে কোন যুক্তিই দেখাননি। আর কেবল বিচ্ছিন্ন "ISM" শব্দ গণনার ব্যাপারেই বা তিনি কোন নীতি অনুসরণ করেছেন? সর্বনামযুক্ত বিশেষ্য " ISMuHu" কেই বা কেন বাদ দিলেন?

তাহলে কি এই তিন ধরণের শব্দের অর্থের মধ্যে কোন ব্যাখ্যা লুকিয়ে আছে? হয়ত বা, যেসব স্থানে এই শব্দগুলোর মাধ্যমে কেবল আল্লাহ্‌র নাম বোঝানো হয়েছে সেগুলোকেই ডঃ খালিফা গণনা করেছেন। কিন্তু নিম্নোক্ত দুটি আয়াতের দিকে লক্ষ্য করলে এই ধারণাও ভুল বলে প্রমাণিত হয়। সূরা মায়িদার ৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

"…but pronounce God's name (ISM ALLaH) over it…" এবং সূরা বাক্বারার ১১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

"And who is more unjust than he who forbids in places for the worship of God, that His name (ISMuHu) should be pronounced?"

মূল আরবি বা ইংরেজি অনুবাদ কোনটিতেই এই শব্দগুলোর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই, একটি ছাড়া: এখানে "God's name" সরাসরি বিধেয় এবং "His name" উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবি বর্ণক্রমেএই শব্দ দুটির লেখ্য রূপের ভিত্তিতেই কেবল দুটিকে ভিন্ন স্থানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আরও কথা আছে, কিসের ভিত্তিতেই বা ডঃ খালিফা এই শব্দগুলোর বহুবচন রূপগুলো বাদ দিলেন? এগুলোর বহুবচন কুরআনে আরও ১২ বার এসেছে। বিশেষত সূরা আ'রাফের ১৮০ নম্বর আয়াতের কথা উল্লেখ করা যায়, "The most beautiful names belong to God…"

বহুবচন বাদ দেয়ার কেবল একটি কারণই থাকতে পারে। সেটি হচ্ছে, বহুবচনগুলো গণনা করলে মোট সংখ্যাটি ১৯ না হয়ে ৩৯ হয়ে যায়।

উপরন্তু ALLAH শব্দটির ব্যবহারের ধরণের ব্যাপারেও সন্দেহ আছে। এই শব্দের সাথে যখন "Li" প্রসর্গ যুক্ত হয় তখন দুইয়ে মিলে " LiLaH "বা "LiLLah" শব্দের জন্ম দেয়। এখানে প্রসর্গটির অর্থ "প্রতি"। এই লিল্লাহ শব্দেও একটি লাম এর উপর তাশদিদ আছে। (উদাহরণ হিসেবে ২:২২ আয়াতটি দেখা যেতে পারে।) ব্যকরণ অনুসারে এই প্রসর্গযুক্ত শব্দটি ঠিক "BiSM" এর মত করেই ব্যবহৃত হয়। পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি ডঃ খালিফা এবার প্রসর্গযুক্ত শব্দগুলো বাদ দিয়ে কেবল মূল শব্দটিই গণনা করবেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। এবার ঠিকই "LiLaH" গুলো গণনা করেছেন, কারণ এগুলো গণনা না করলে মোট সংখ্যাটা ২৬৯৮ হত না এবং তা ১৯ দিয়েও বিভাজ্য হত না। এ ধরণের যাদৃচ্ছিক ব্যবহারের পেছনে কি আদৌ কোন যুক্তি আছে?

"ISM" এর সাথে "Bi" যুক্ত হয়ে যখন "BiSM" হয়েছে তখন ডঃ খালিফা সেটা বাদ দিয়েছেন, কিন্তু "ALLAH"-র সাথে "Li" যুক্ত হয়ে যখন "LiLaH" হয়েছে তখন তিনি সেগুলো ঠিকই গণনা করেছেন; কেবল ১৯ দিয়ে বিভাজ্য একটি সংখ্যায় পৌঁছানোর জন্য।

AL-RaHMaN শব্দের ক্ষেত্রে কোন দ্বিধা নেই। এটি কুরআনে ৫৭ (১৯ X ৩) বারই উল্লেখিত হয়েছে। লেখকও এমনটিই বলেছেন।

এবার AL-RaHIM শব্দের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। ডঃ খালিফা বলেছেন, এই শব্দ মোট ১১৪ (৬ X ১৯) বার এসেছে। কিন্তু আবদুল-বাকির নির্ঘণ্ট অনুসারে কুরআনে এই শব্দটি হুবহু এই রূপে মাত্র ৩৪ বার উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ এই ৩৪ স্থানেই শব্দের আগে "AL" নামক ডেফিনিট আর্টিক্লটি আছে। কিন্তু বাকি ৮১ স্থানে শব্দের আগে কোন ডেফিনিট আর্টিক্ল নেই। এখন আর্টিক্ল সহ এবং ছাড়া সবগুলোই যদি আমরা গণনা করি, তাহলে মোট সংখ্যাটি দাঁড়ায় ১১৫। এক বার এর বহুবচনও উল্লেখিত হয়েছে। তাহলে মোট ১১৬ হয়ে যাচ্ছে। ১১৫ এবং ১১৬, কোনটিই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়।

ডঃ খালিফার এই আবিষ্কারকে অনেকেই সম্পূর্ণ অনুমোদন দিয়েছেন। ডঃ Bèchir Torki এ নিয়ে রীতিমত ৪ পৃষ্ঠার এক বিশাল সারাংশ রচনা করেছেন। এই সবগুলো অনুমোদন পত্র বা সারাংশতেও উপরে উল্লেখিত চারটি মৌলিক অনুমিতির ব্যাপার সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

ডঃ খালিফা "ALLAH" শব্দে তাশদিদের কারণে দ্বিত্ব হয়ে যাওয়া লামগুলো গণনা থেকে বাদ দিয়েছেন, আবার অলিখিত স্বরবর্ণগুলোও বাদ দিয়েছেন।

তিনি "ISM" এর মোট সংখ্যা গণনা করতে গিয়ে "BiSM" শব্দটি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন, কিন্তু ওদিকে আবার "ALLaH" শব্দ গণনা করতে গিয়ে "LiLaH" অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এছাড়াও তিনি তার গণনা থেকে "ISMuHu" বাদ দিয়েছেন, যদিও ব্যকরণগত দিক দিয়ে এটি হুবহু "ISM" এর মতোই অর্থ বহন করে ।

এছাড়া তিনি "ISM" এবং "AL-RaHIM" শব্দের বহুবচন রূপগুলো বাদ দিয়েছেন ।

উপরন্তু তার " AL-RaHIM " শব্দের গণনা ভুল হয়েছে ।

সুতরাং মিরাকল প্রমানের জন্য খলিফা নিজের ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন- মিল করার জন্য । কিন্তু সে ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেন নি । তার অন্যান্য সিদ্বান্তগুলোও ভুলে ভরা । সেগুলোও আলাদা করে প্রমান করা সম্ভব ।

৪

এ ধরণের সংখ্যাতাত্ত্বিক খেলা বিজ্ঞানবহির্ভূতঃ-

সংখ্যা নিয়ে এ ধরণের ধাঁধাময় খেলা অনেক প্রাচীন । সেই পিথাগোরাসের আমল থেকেই মানুষ এসব করে আসছে । কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হওয়ার পর অনেক কিছুর মত এটাকেও বিজ্ঞানের অঙ্গন থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করা হয়েছে । এই অপবিজ্ঞানের নাম দেয়া হয়েছে Numerology তথা সংখ্যাতত্ত্ব[৩] । গণিত থেকে সংখ্যাতত্ত্ব সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে; যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে জ্যোতিষ শাস্ত্র আলাদা হয়েছে এবং রসায়ন থেকে আলকেমি আলাদা হয়েছে । সংখ্যাতত্ত্ব তাই একটি পরিপূর্ণ অপগণিত বা অপবিজ্ঞান । বিজ্ঞানের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অপব্যবহারকেই অপবিজ্ঞান বলা হয় ।

গাণিতিক মিরাকলের আরও উদাহরণঃ-

মূলত চাইলে কুরআনে সাত কিংবা অন্য যেকোন সংখ্যার মিরাকল বের করা সম্ভব । সম্ভব পৃথিবীর যেকোন কিছুতেই । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রে এমন একটি গাণিতিক ব্যাখ্যা বেশ জনপ্রিয় । বলা হয়ে থাকে- এই ঘোষণা পত্রের মাধ্যমে আমেরিকার ভবিষ্যতের সকল ঘটনা আগে থেকেই বলে দেওয়া সম্ভব । খুব রিসেন্টলি টুলের (Tool) একটা গানে (Lateralus) ফিবোনাক্কি সিরিজের সুন্দর প্রয়োগ আছে । সব রকম কবিতাতেই গণিতের খেলা দেখা যায়, সেই ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে । পিকাসোর ছবিতে পাওয়া যায় ত্রিমাত্রিক জ্যামিতির খেলা । গস বা অয়লারের মত গণিতবিদের জীবনী পড়লে মানুষের গাণিতিক ক্ষমতায় আপনার আরো আস্থা বাড়বে ।

আরেকটি উদাহরণ হতে পারে ইহুদিদের বিখ্যাত শেমহামেফোরাস[৪] । ইহুদি ধর্মবেত্তার সেই মধ্যযুগ থেকেই সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে মত্ত । সে সময়ই তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ তোরাহ-র দ্বিতীয় গ্রন্থ এক্সোডাস থেকে

[৩] Numerology, http://en.wikipedia.org/wiki/Numerology
[৪] Shemhamphorasch, http://en.wikipedia.org/wiki/Shemhamphorash

স্রষ্টার রহস্যময় নাম বের করেছিল। এক্সোডাসের ১৪:১৯-২১, এই তিনটি আয়াতের মাধ্যমে তারা স্রষ্টার ৭২টি নাম উদ্ভাবন করেছে। এই প্রতিটি আয়াতে ৭২টি করে বর্ণ আছে।

- প্রথমে প্রথম আয়াতটি ডান থেকে বামে লিখেছে
- তারপর দ্বিতীয় আয়াত বাম থেকে ডানে লিখেছে
- সবশেষে তৃতীয় আয়াত আবার ডান থেকে বামে লিখেছে
- এই লেখার কাজটি ১৮ কলাম ও ১২ সারিতে করা হয়েছে। ১৮ গুন ১২ = ৭২ গুন ৩
- এবার ১২ টি সারিকে ৩ সারি ৩ সারি করে ভাগ করেছে। মোট চারটি ভাগ হয়েছে যার প্রতিটিতে ১৮ কলাম ও ৩ সারি।
- প্রতি ভাগের একটি কলাম দ্বারা স্রষ্টার একটি তিন অক্ষরের নাম পাওয়া গেছে। এভাবে মোট ১৮ গুন ৪ = ৭২ টি তিন অক্ষরের নাম পাওয়া গেছে।
- চার ভাগের প্রতিটিতে আবার একটি বর্ণের সাথে মিলিয়েছে। এতে স্রষ্টার একটি চার অক্ষরের নাম পাওয়া গেছে।
- এই যে চার অক্ষরের নাম তার সঠিক উচ্চারণ জানার চেষ্টা করছে তারা। এ নিয়েই তারা সংখ্যাতত্ত্বের খেলা খেলছে, এখনও। এই শব্দকে ডিজিটে নিলে নাকি ২১৬ ডিজিটের একটা নাম পাওয়া আছে। ড্যারেন আরনফ্স্কির "পাই" সিনেমায় এই ২১৬ ডিজিটের সাথে পাই এর সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

৫

রাশাদ খলিফাকে দরকারী সাইজ মুমিন মোসলমানরা পরে ঠিকই করেছেন। তিনি যে ভন্ড হেন তেন অনেক অনেক কিছুই পরবর্তীতে তারা চিৎকার করে বলেছেন। আবার তারাই "কুরআনকে অন্যরকম কিছু একটা" প্রমাণের জন্য রাশাদ খলিফার এই মিরাকল নাইন্টিন ব্যবহার করছেন আজ অবদি। তা করুক। আমার মতো কেউ যেন এই মিরাকল নাইন্টিন দেখে কুরআনের গ্রন্থকে অলৌকিক না ভেবে বসেন- সে জন্যই এই লেখা।

লেখক বাংলাদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তড়িৎকৌশল নিয়ে পড়াশুনা করছেন।

কোরানের ‘মিরাকল ১৯’-এর উনিশ-বিশ!

সৈকত চৌধুরী এবং অনন্ত বিজয় দাশ

‘মিরাকল’ (miracle) বা অলৌকিকতা সম্পর্কে আমাদের দেশের প্রত্যেকেই কম-বেশি অবগত আছেন। মিরাকল বলতে তারা বুঝে থাকেন ধর্মের সাথে সম্পর্কিত বিষয়কে, যেমন স্রষ্টার অস্তিত্ব, স্রষ্টার কুদরতি শক্তি, স্রষ্টার যা ইচ্ছে তাই করার ক্ষমতা, স্বর্গ-নরকের ধারণা, আত্মার ধারণা, মৃত্যুর পরের পারলৌকিক জীবন, পুরুষ্কার অথবা শাস্তির ব্যবস্থা ইত্যাদি। ধর্মের বাইরে খুব সামান্য পরিসরে আরও কিছু মিরাকল প্রচলিত আছে, যেমন ভিনগ্রহের প্রাণী, ইউএফও, টেলিপ্যাথি, রেইকি, অতিন্দ্রীয় দৃষ্টি ইত্যাদি। তবে এ ধরনের মিরাকল পশ্চিমা বিশ্বে যে মাত্রায় প্রচলিত আছে আমাদের দেশে এখনো সেই রেশ পৌঁছায়নি। এর কারণ হতে পারে পশ্চিমা দেশগুলোর মতো আমাদের এখানে প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেনি। ভিনগ্রহের প্রাণী বা ইউএফও সম্পর্কে তথ্য প্রচারের সাথে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও উন্নত প্রযুক্তির সম্পর্কে আছে।

প্রতিটি ধর্মই মিরাকলে ভর্তি। কোনো ধর্মই তাদের নিজেদের লৌকিক দাবি করে না। আজকের এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু মুসলমানদের বহুল প্রচারিত একটি মিরাকলের ওপর আলোকপাত করা। তবে আলোচনাটিকে সহজবোধ্য ও ব্যাখ্যাসদৃশ করার জন্য আমরা কোরান এবং ইসলাম ধর্মের বাইরের আরো কিছু বিষয়কে ছুঁয়ে যাব।

বাংলাদেশ একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র এবং শিক্ষার মান যথেষ্ট নিম্নমুখী হওয়ায় এ দেশ মিরাকল বিকাশের একটি উর্বর ভূমি। এ দেশে ধর্ম এক শ্রেণীর মানুষের কাছে এতো বেশি অন্ধ-আনুগত্য-বিশ্বাসের বিষয় যে, ধর্ম ছাড়া তাদের পক্ষে এক মুহূর্ত নিঃশ্বাস নেওয়া সম্ভব নয়। ধর্মের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন অথচ ধর্মের নাম ভাঙিয়ে বা জড়িয়ে কোনো কিছু শোনানো হলে, সেটা তারা বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। জ্যোতিষী, পীরবাবার ব্যবসা এ কারণেই টিকে আছে। শহরাঞ্চলে কম থাকলেও গ্রামে-গঞ্জে ভূত-পেত্নী-পরী-বাণ মারা-জাদু করা-মারণ-উচাটন-পানি পড়া ইত্যাদিতে বিশ্বাস করার লোকের অভাব নেই। নব্বইয়ের দশকে ইরাকের কুয়েত দখলের পর যখন আমেরিকার সাথে ইরাকের যুদ্ধ চলছিল, ঐ সময় একদিন খবর ছড়ালো আকাশে সাদ্দামকে দেখা যাচ্ছে! কিছুক্ষণের মধ্যেই মানুষ একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল আকাশে সাদ্দামকে দেখার জন্য; রাস্তাঘাটে জ্যাম লেগে গেল, বাড়ির ছাদে লোকেলোকারণ্য। ইরাক-আমেরিকার ঐ যুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান যাই হোক, বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ প্রায় সবাই ইরাকের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। সাদ্দাম হোসেনের জনপ্রিয়তা তখন বাংলাদেশীদের কাছে তুঙ্গে। মানুষের ঐ দুর্বল অনুভূতিকে পুঁজি করে যে বা যারাই এই গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিল সাথে সাথেই এই খবর গণহিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত করে। মানুষের প্রতিদিনকার সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান এক নিমিষেই রহিত হয়ে যায়। শুরু হয় উন্মাদনা। পরবর্তীতে (ইরাকের পরাজয় যখন আসন্ন) এমন গুজবও ছড়িয়েছিল ফেরেশতারা সাদ্দাম বাহিনীকে সহায়তা করা জন্য দলে দলে আকাশ থেকে ইরাকের দিকে ছুটে যাচ্ছেন!

প্রতিটি মিরাকলই গুজবের সমষ্টি। কাল্পনিক। রহস্যমণ্ডিত অজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। মূল তথ্য বা ঘটনার বিকৃতি হয়ে থাকে নানা ভাবে। মিরাকলের প্রতি সাধারণ মানুষের পক্ষপাত থাকলেও বাস্তবতার কোনো ভিত্তি নেই। যুগে যুগে কিছু মিরাকলের পরিবর্তন হয়েছে। যেমন একটা সময় ছিল সূর্য ও চন্দ্রকে ‘জীবন্ত অলৌকিক সত্ত্বা’ ভেবে পূজা করা হতো। কিন্তু চাঁদের মাটিতে মানুষের পদার্পণের পর অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী কতিপয় মানুষের এই ‘অলৌকিক চন্দ্র-সূর্য’ বিশ্বাসে হোঁচট লেগেছে; বাধ্য হয়েছেন গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কিত পূর্বের বিশ্বাসে পরিবর্তন আনতে। মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের উৎসই হচ্ছে মিরাকল মেনে নেওয়া। বাংলা ভাষার একটি সাধারণ বাগ্‌ধারা হচ্ছে ‘তিলকে তাল করা’। কিন্তু মিরাকল বাস্তবতাকে শুধু ‘তাল’ করে না, কুমড়ো বানিয়ে ছাড়ে! বিখ্যাত স্কটিস দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) তাঁর ‘*An Inquiry Concerning Human Understanding*’ গ্রন্থে মিরাকল বা অলৌকিকতা বলতে বুঝিয়েছেন[১] : “A miracle is a transgression of a law of nature by a particular volition of the Deity, or by the interposition of some invisible agent” মানুষ কেন মিরাকল বিশ্বাস করে, তার কারণ বহুমাত্রিক। একটি কারণ হতে পারে, যতদিন মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্বে এবং ধর্মগ্রন্থের বাণীকে অপৌরষেয় বলে বিশ্বাস করবেন, ততদিন ‘মিরাকল’ ভাবনা মুলোর মত মানুষের মনে ঝুলে থাকবে।

বিজ্ঞান কি ‘মিরাকল’ বা অলৌকিক কোনো কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে? কিংবা বিজ্ঞান কি কোনো কিছুকে ‘মিরাকল’ বলে

---

[১] Hume, David. *An Inquiry Concerning Human Understanding,* Section X "Of Miracles," (1748), Bobbs-Merrill, Library of Liberal Arts edition. http://18th.eserver.org/hume-enquiry.html#10

ঘোষণা করতে পারে? মোটেই না। সহজ কথায় যা লৌকিক নয়, তাই অলৌকিক। 'মিরাকল' বলতে স্পষ্টই বোঝায় প্রাকৃতিক নিয়মের (Laws of Nature) পরিপন্থী কোনো কিছু। বিজ্ঞান সম্পূর্ণ লৌকিক, বস্তুবাদী। বিজ্ঞানের যে কোনও শাখায় গবেষণার প্রথম ধাপ হচ্ছে ঘটনা বা বিষয়গুলিকে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্লেষণ করা। এখানে 'লৌকিক' বিষয়টি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা মেথডের সাথে জড়িত। বিজ্ঞান মানে কেবল কিছু ঘটনা বা বিষয়কে (পৃথিবীর সাথে চন্দ্রের দূরত্ব, সূর্যের দূরত্ব, পৃথিবীর বয়স, মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর পার্থক্য, ইত্যাদি) জানা বা চিহ্নিত করা বোঝায় না; বিজ্ঞান স্পষ্টই বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির (Nature of Science) সাথে সম্পর্কিত; যথা বৈধ প্রমাণের বৈশিষ্ট্য (the criteria of valid evidence), অর্থবোধক গবেষণার নক্সা (the design of meaningful experiments), সম্ভাবনার সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ণয় (the weighing of possibilities), গবেষণার জন্য গৃহীত অনুকল্পগুলোর পরীক্ষণ (the testing of hypothesis), উপযোগী তত্ত্ব গঠন (the establishment of useful theories) ইত্যাদি যা এই পার্থিব জগতের কোনো নির্দিষ্ট ফেনোমেনা সম্পর্কে যথার্থ, নির্ভরযোগ্য এবং অর্থবোধক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করে। বিজ্ঞানই আমাদের সামনে উন্মোচন করেছে প্রাকৃতিক আইন বা নিয়মের রাশি। বিজ্ঞান ছাড়া এই প্রাকৃতিক আইন বোঝার চেষ্টা অবান্তর এবং ভ্রান্তও বটে। বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা করার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি (Method) রয়েছে, যেমন : অবরোহ (Deductive) পদ্ধতি, আরোহ (Inductive) পদ্ধতি, গবেষণার ফলাফলে অভিন্নতা (Replicability), মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ (Falsifiability) ইত্যাদি। বিজ্ঞানের এই প্রতিটি পদ্ধতিরই আবার কিছু মৌলিক নীতি (Principle) রয়েছে, যেমন : সংজ্ঞা নির্ধারণ, কার্য-কারণ সম্পর্ক (Cause and Effect relationship), গবেষণার জন্য সংগৃহীত ডেটা (Data) বা উপাত্তের মধ্যে স্ববিরোধিতা-আত্মবিরোধিতা না থাকা (Law of non self-contradiction), একই কারণ সব সময় একই ফল দেবে (Law of uniformity of nature), কারণগুলো অবশ্যই বোঝা যাবে ইত্যাদি। উল্লেখ্য, ধর্মগ্রন্থের বাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি মাত্র আয়াত বা শব্দগুচ্ছকে নিয়ে ডজন-ডজন ব্যাখ্যাকার ডজন-ডজন ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন, নিজস্ব ভিন্নমত ব্যক্ত করেন, ফলে একই আয়াতে বা শব্দগুচ্ছকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের পরস্পর-বিরোধী ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই পরস্পর-বিরোধী ব্যাখ্যা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে 'গড ইন দ্যা গ্যাপ্‌স' পূরণ করে কেউ কেউ উত্তর দেন, 'এর আসল অর্থ একমাত্র স্রষ্টাই জানেন, স্রষ্টাই সর্বজ্ঞ।'

কোনো একটি গবেষণার জন্য সংগৃহীত হাজার হাজার উপাত্তের মধ্যে যদি একটি উপাত্তের সাথে অন্যগুলোর আত্মবিরোধিতা থাকে, কোন একটি উপাত্ত যদি বিশ্লেষণের সময় ভুল প্রমাণিত হয়, কিংবা উপাত্তগুলো এমন যে মিথ্যাপ্রতিপন্নকরণ করার সুযোগ নেই তখন গোটা গবেষণাটাই খারিজ হয়ে যায়। 'রিসার্চ প্রবলেম' পরিবর্তন করতে হয়। আবার গবেষণার জন্য যে প্রবলেম (গবেষণার বিষয়) বেছে নেওয়া হল, সেই প্রবলেমের টার্মগুলো যদি এমন হয় 'কার্যকরী সংজ্ঞা' (Operational definition) নির্ধারণ-ই করা যাচ্ছে না বা ভাসাভাসা-অস্পষ্ট থাকে তবে 'গবেষণা' প্রথম ধাপেই বাতিল হয়ে যায়।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'লৌকিক' বলতে বুঝায় যে বিষয় বা ঘটনা বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি বা পদ্ধতির মৌলিক নীতিমালাকে অতিক্রম করে না এবং বিজ্ঞান তার পদ্ধতির মাধ্যমেই ঐ বিষয় বা ঘটনাকে বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা-উদ্ঘাটন করে থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যেহেতু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে খুব বেশি ওয়াকিবহাল নন, তাই তাদের কাছে যে বিষয় বা ঘটনা সাধারণের অসাধ্য, (কাল্পনিক বক্তব্য) পূর্বের চেনা জগতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তাই 'অলৌকিক' বলে বিশ্বাস করেন। যেমন নবী মুহাম্মদের মিরাজে গমন।

ইদানীং কিছু কৌশলী ধর্মবাদী তাঁদের ধর্মগ্রন্থকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের জন্য বিজ্ঞানের আশ্রয় নিচ্ছেন। বিজ্ঞানের সাথে ধর্মগ্রন্থের বাণী মেলানোর জন্য যত চালাকির দরকার হয়, সেগুলোর কোনোটাই বাদ রাখছেন না। কারণ বিজ্ঞান ইতিমধ্যে সাধারণ শিক্ষিত লোকের মনে এই আস্থা স্থাপন করতে পেরেছে যে, 'মানুষের কল্যাণেই বিজ্ঞান, অজানাকে জানার জন্য বিজ্ঞান ছাড়া কোনো উপায় নেই, বিজ্ঞান মানবীয় আবেগ নিরপেক্ষ, বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, যা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।' তাই ধর্মকে ভবিষ্যতের বাজারে টিকে থাকার জন্য বিজ্ঞানের কোলে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু ধর্মগ্রন্থের বাণী বা অলৌকিকতা আর বিজ্ঞানের কর্মপ্রক্রিয়া পরস্পর বিপরীতমুখী। একটার সাথে আরেকটার সমন্বয়ের কোনো সুযোগই নেই; সংঘাতের ইতিহাস তো খুবই পুরানো। তারপরও শেষ চেষ্টা হিসেবে অন্তহীন জাড়িজুড়ি করে যাচ্ছেন কতিপয় অসাধু ধর্মবাদী। উদাহরণ, রাশেদ খলিফার আবিস্কৃত কোরানের মিরাকল উনিশ।

আমাদের এই প্রবন্ধে আল-কোরানের কথিত 'উনিশ' মিরাকল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যথাস্থানে তথ্যসূত্র উল্লেখ করা আছে। পাঠকের কাছে বিনীত অনুরোধ, প্রবন্ধটির বক্তব্য, তথ্য, যুক্তি গ্রহণ বা বর্জনের আগে অবশ্যই নিজে যথাসম্ভব যাচাই করে নিবেন। খোলা মনে বিচার করবেন। শুধুমাত্র 'পূর্ববিশ্বাস বা আবেগের বশবর্তী হয়ে' বর্জন করা কিংবা 'বিরুদ্ধ মত' হিসেবে আমাদের বক্তব্যে আস্থা স্থাপন করা এই প্রবন্ধের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য নয়। জনমানসে যৌক্তিক চেতনা-বিজ্ঞানমনস্কতা বিকাশই উদ্দেশ্য।

(১) ইংরেজিতে 'Pareidolia' বলে একটি শব্দ প্রচলিত আছে, অর্থ হল : এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিষয় যা অস্পষ্ট (vague) ও এলোমেলো উদ্দীপনার (random stimulus) কারণে ভ্রান্ত অনুভূতি বা Illusion-এর সৃষ্টি করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহী উদ্দীপকের প্রভাবে প্রত্যক্ষণ বা উপলব্ধি হয় বলে আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের যে কোনো একটির জন্য ইলিউশন হতে পারে। তবে এই ইলিউশনের জন্য আমাদের ইন্দ্রিয় দায়ী নয়, স্নায়ুসংকেত বিশ্লেষণে মস্তিষ্কের অক্ষমতাই এই ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। মানব মনের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আমরা যা দেখি বা উপলব্ধি করি, তা তৎক্ষণাৎ (অনেক সময় অজান্তেই) আমাদের চেনা জগতের সাথে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করি-তুলনা করি। হঠাৎ করে নতুন কিছু দেখলে পূর্বের দেখা কোনো বিষয়ের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য খোঁজার চেষ্টা করি; যেমন দুটি বিন্দু পাশাপাশি বসিয়ে যদি এর নীচে অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি একটি ছোট রেখা টানা হয়, অনেকের কাছেই একে 'মানুষের মুখমণ্ডলের অবয়ব' বলে মনে হবে। অথচ এই চিত্রে মানুষের মুখমণ্ডলের সাথে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যের পরিমাণ অনেক বেশি। প্রায়শই মানুষ চিন্তায় বৈসাদৃশ্যের থেকে সাদৃশ্যের ওপর গুরুত্ব দেয়। তাই অস্পষ্ট এবং ভাসাভাসা কোনো কিছু দেখলে অনেক সময় পরিচিত কোন জিনিস বা বিষয়ের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়; যেমন মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় তুলোর মত টুকরো টুকরো ভেসে বেড়ানো মেঘমালায় বুঝি কারো মুখের প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে। কখনোবা চাঁদের গায়ে দেখা যায় কারও ছবি। আকাশে ইউএফও কিংবা মঙ্গল গ্রহে মানুষের মুখমণ্ডলের প্রতিকৃতি দেখা যাচ্ছে, এরকম প্রচুর বানোয়াট ছবি বাজারে রয়েছে। ২০০২ সালের ১৮ জুলাই ব্রাজিলের এক নাগরিক দাবি করলেন তার বাড়ির জানালার কাঁচে 'কুমারী মাতা' মেরির ছবি ফুটে ওঠেছে। বছর খানেক আগে কোন এক রাত্রিবেলা শুনা গেল হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা দাবি করছেন চাঁদের গায়ে 'শিবের অবতার' লোকনাথের ছবি দেখা যাচ্ছে। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে কী হৈচৈ! ২০০৬ সালের পহেলা জুন রব নাভাস নামের এক পাকিস্তানি মৎসজীবী এক ধরনের সামুদ্রিক মাছের (rabbit fish) পেটের মধ্যে আরবি অক্ষরে 'আল্লাহ' লেখা খুঁজে পেলেন। দুবাইয়ের বিখ্যাত মাছের বাজার Shindagha-এ পরবর্তীতে ঐ মাছটি প্রদর্শনীর জন্য নিয়ে আসা হয়।[২] এর আগে ২০০৪ সালের ২৪ মার্চ ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের হেবরন শহরে সহস্রাধিক মানুষ জটলা পাকিয়েছেন একটি সদ্য-ভূমিষ্ট মেষ শাবক দেখার জন্য। শাবকটির মালিক ইয়াহিয়া আতরাস দাবি করছেন, 'সদ্য ভূমিষ্ট মেষ শাবকটির গায়ের একদিকে আরবি হরফে 'আল্লাহ' লেখা এবং অন্যপাশে 'মুহাম্মদ' লেখা।'[৩] ২০০৭ সালের ১৩ অক্টোবর এ্যালেন স্টোন নামের এক ব্যক্তি তার বাড়ির পিছনের আঙিনাতে একটি পাথর কুড়িয়ে পেলেন, পাথরের অস্পষ্ট খাজের মধ্যে আঁকাবাঁকা রেখা রয়েছে।[৪] ভদ্রলোক দাবি করতে লাগলেন, এটা যীশুর প্রতিকৃতি! একই বছরের ১৫ অক্টোবর তারিখে ভ্যাটিকেন টিভি চ্যানেল দুটি ছবি পাশপাশি দেখিয়ে গুজব ছড়ালো : 'কবরের পাশে আগুন জ্বলছে; সেই আগুনের লেলিহান শিখা বাতাসের কারণে এঁকেবেঁকে গেছে। আগুনের শিখাটি পোপ দ্বিতীয় জন পলের আবছায়া প্রতিকৃতি বলে মনে হচ্ছে।'[৫] উপরের এই সবগুলো ঘটনাই Pareidolia উদাহরণ। মানুষের দুর্বল অনুভূতির স্থান বলে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে গুজব ছড়ায় বেশি, আর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগার অজুহাতে বেশিরভাগ সময় এই সব গুজবের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করতে দেওয়া হয় না। জন্মের পর থেকে শৈশব, শৈশব পেরিয়ে কৈশোর পর্যন্ত তথাকথিত অতিপ্রাকৃত শক্তি বা আল্লাহ-ভগবান-ঈশ্বরের কথা শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মে যায়, চিন্তার কুঠরিতে ভক্তি-ভয়ের সৃষ্টি হয়। তার ওপর রয়েছে ধর্মীয় উপাসনার রীতিকে অবুঝ মনের ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। ফলে শৈশবেই মানুষের মনে বা চিন্তায় ঈশ্বর-ভগবান-আল্লাহ সম্পর্কে এক ধরনের 'প্যারাডাইম' গড়ে ওঠে। অলৌকিক কোনো কিছুর অস্তিত্ব কম্মিনকালে না থাকলেও 'পরিস্থিতির শিকার' মানুষ বাধ্য হয় অলৌকিকতা দেখতে!

(২) Ernest Vincent Wright (১৮৭৩?-১৯৩৯) নামের একজন মার্কিন লেখক '*Gadsby: Champion of Youth*' (Wetzel Publishing Co., 1939) নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন। উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পঞ্চাশ হাজার একশত দশটি শব্দ দিয়ে গোটা উপন্যাস লেখা হলেও লেখক কোথাও একটি বারের জন্য ইংরেজি 'E' স্বরবর্ণটি ব্যবহার করেননি। অর্থাৎ ইংরেজিতে 'E' অক্ষর ব্যবহার করে যত শব্দ (he, she, they, them, theirs, her, herself, myself, himself, yourself, love, hate, etc.) আছে সেগুলো বাদ দিয়ে বাকি ২৫টি অক্ষর দিয়ে তৈরি শব্দ ব্যবহার করেছেন, বাক্য তৈরি করেছেন; অথচ এর ফলে ব্যাকরণগত ভুল, বাক্যের অসামঞ্জস্যতা, ভাব প্রকাশের দুর্বলতা বা ঘাটতি কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। নীচে '*Gadsby*' উপন্যাসটির প্রথম প্যারাগ্রাফ তুলে দেওয়া হল[৬] :

> "If youth, throughout all history, had a champion to stand up for it; to show a doubting world that a child can think; and, possibly, do it practically; you wouldn't constantly run across folks today

[২] http://www.newstatesman.com/Life/200606050009

[৩] আরো দেখুন : Ali Sina, *The Miracles of Allah*, http://www.faithfreedom.org/Articles/sina/miracles_of_allah.htm

[৪] The Skeptic's Dictionary, *pareidolia*, http://www.skepdic.com/pareidol.html

[৫] http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/worldnews.html?in_article_id=487764&in_page_id=1811

[৬] আগ্রহীরা এই ওয়েব সাইট থেকে পুরো উপন্যাসটি পাঠ করতে পারবেন : http://www.spinelessbooks.com/gadsby/index.html

> who claim that "a child don't know anything." A child's brain starts functioning at birth; and has, amongst its many infant convolutions, thousands of dormant atoms, into which God has put a mystic possibility for noticing an adult's act, and figuring out its purport."

লেখকের এই কৃতিত্ব আর দক্ষতার জন্য তিনি কিন্তু এর জন্য কোনো 'মিরাকল পাওয়ার'-এর বহিঃপ্রকাশ বলে দাবি করেননি। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, পরিশ্রম, সৃষ্টিশীলতার দ্বারা আপাতদৃষ্টিতে অনেক 'অসম্ভবকে'ই 'সম্ভবের গণ্ডি'তে আবদ্ধ করা সম্ভব।

(৩) গণিত নিয়ে যাদের অল্প-বিস্তর লেখাপড়া আছে তারা অবশ্যই 'ফিবোনাক্কি রাশিমালা' সম্পর্কে অবগত আছেন। এই রাশিমালা আমাদের সামনে প্রকৃতি মাতার অপার রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে দিচ্ছে ধীরে ধীরে। 'ফিবোনাক্কি রাশিমালা'র জন্মদাতা ইতালির নাগরিক Leonardo Pisano (১১৭৫-১২৫০) মৃত্যুর আগে একদা তাঁর তৈরি রাশিমালা নিয়ে জিজ্ঞাস্য হলে রহস্য করে বলেছিলেন, 'প্রকৃতির মূল রহস্য এই রাশিমালাতে আছে।'[৭] কি সেই রহস্য? সেটা জানার আগে এক ঝলক রাশিমালাটা দেখে নিই : আমাদের প্রচলিত ডেসিমেল পদ্ধতির রাশিমালা হচ্ছে ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯। এভাবে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। মৌলিক রাশিমালা হচ্ছে ১, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯ ইত্যাদি। আর ফিবোনাক্কি রাশিমালা হচ্ছে ০, ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ৫৫, ৮৯, ১৪৪, ২৩৩, ৩৭৭, ৬১০, ৯৮৭ ... ইত্যাদি। অর্থাৎ ফিবোনাক্কির রাশিমালাটা তৈরি হয়েছে প্রথম দুইটি রাশির যোগফল সমান পরবর্তী রাশি; ০ + ১ = ১, ১ + ১ = ২, ২ + ১ = ৩, ৩ + ২ = ৫, ৫ + ৩ = ৮, ৮ + ৫ = ১৩, ৮ + ১৩ = ২১ ইত্যাদি। এভাবে অদ্ভুত নিয়মে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে এই রাশিমালার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা যায়, যথা : এ রাশিমালার যে কোন চারটি সংখ্যা নেওয়া হলে প্রথম ও চতুর্থ সংখ্যার যোগফলের সাথে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার যোগফল বিয়োগ করা হলে ফলাফল অবশ্যই সবসময় ঐ চারটি সংখ্যার প্রথমটি হবে। ধরা যাক চারটি ফিবোনাক্কি রাশি ২, ৩ , ৫, ৮। প্রথম ও চতুর্থ সংখ্যার যোগফল (২ + ৮) ১০, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার যোগফল (৩ + ৫) ৮ বিয়োগ করলে বিয়োগফল হচ্ছে ২, যা কিনা আমাদের ধরে নেওয়া চারটি সংখ্যার প্রথম সংখ্যা। আমরা সাধারণত ডেসিমেল পদ্ধতিতে হিসেব করে এতো অভ্যস্ত যে, কোন কিছুর গণনায় ডেসিমেল সংখ্যা (০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯) দ্বারাই কোন কিছুর হিসেব করে থাকি; যেমন ঘড়ি দ্বারা সময় নির্ণয়, টাকা-পয়সার লেনদেন, বাজার-সদাই ইত্যাদি। কিন্তু বিস্ময়করভাবে প্রকৃতির নানা স্তরে ফিবোনাক্কি রাশিমালার ব্যাপক উপস্থিতি রয়েছে, যেমন : সূর্যমুখী ফুলের পাপড়ি বিন্যাসে, ক্যকটাস গাছের পুরুত্বে, পাইন গাছের মোচায় ফিবোনাক্কি রাশিমালার সংখ্যা পাওয়া যায়। শামুকের যে স্পাইরাল দেখা যায় সেখানেও ফিবোনাক্কির রাশিমালার উপস্থিতি রয়েছে। শীতের সময় আমাদের দেশে সুদূর সাইবেরিয়া হতে 'অতিথি পাখি' ঝাকে ঝাকে আসে। পাখিদের নিজেদের অঞ্চলে উষ্ণ আবহাওয়া দেখা দিলে স্থান পরিবর্তন করে তারা অন্য শৈত্য এলাকায় গমন করে। এই অতিথি পাখির ঝাক গণনা করে দেখা গেছে তাদের একেকটি ঝাকে ২১টি পাখি থাকে, ২২ বা ২৩টি পাখি থাকে না। মজার ব্যাপার ফিবোনাক্কি সিরিজে ২১ সংখ্যাটি রয়েছে, ২২ বা ২৩ সংখ্যা নেই। মৌমাছিদের জীবনযাত্রায়ও রয়েছে ফিবোনাক্কি রাশিমালার উপস্থিতি। মৌমাছিরা সাধারণত কলোনি করে থাকে। প্রতিটি কলোনিতে একটি পুরুষ মৌমাছির পিতা-মাতা ১ জন, দাদা-দাদী ২ জন, প্রপিতা-মাতা ৩ জন, প্রপিতা-মাতার পিতা-মাতা ৫ জন এবং এদের পিতা-মাতা ৮ জন। এভাবে ক্রমেই মৌমাছির বংশতালিকায় ফিবোনাক্কি রাশিমালার সংখ্যার খোঁজ পাওয়া যায়।

সুখের সংবাদ প্রকৃতির এতো বৈচিত্রময় স্থানে ফিবোনাক্কি রাশিমালার উপস্থিতি দেখা গেলেও এখন পর্যন্ত এই রাশিমালাকে এর জন্মদাতা ফিবোনাক্কি বা অন্য কেউ 'অলৌকিক রাশিমালা' বলে দাবি করেননি।

(৪) ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকায় ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী হামলার পর সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে '১১' সংখ্যাটি নিয়ে একটি অতিলৌকিক-আধোভৌতিক পটভূমি তৈরির চেষ্টা হয়েছিল। এ পটভূমির উদ্যোক্তা হিসেবে আছেন ইজরাইলের সাবেক গুপ্তচর, সাবেক জাদুকর এবং বর্তমানে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার সম্রাট হিসেবে (কু)খ্যাত ইউরি গ্যালার[৮]; তিনি ১১ই সেপ্টেম্বরের পরপরই সবাইকে (বিশেষ করে আমেরিকানদের) উপদেশ দান করেন প্রত্যেকেই যেন প্রতিদিন ১১ সেকেন্ড করে প্রয়োজন মত প্রার্থনা করেন।[৯] কারণ তাঁর মতে : '১১ হচ্ছে একটি রহস্যময় সংখ্যা, এর মধ্যে অপ্রাকৃত গোপন নানা তথ্য লুকানো রয়েছে এবং এ সংখ্যা দুনিয়ার পার্থিবতা এবং অপার্থিবতার সংযোগ সেতু।' ইউরি গ্যালার শুধু বক্তব্য দান করেই ক্ষান্ত হননি, ৯/১১-এ ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী হামলার সাথে '১১' সংখ্যাটির একটি সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। নীচে তাঁর আবিস্কৃত সম্পর্কটির উল্লেখযোগ্য অংশ তুলে ধরা

[৭] অনন্ত বিজয়, '*ফিবোনাক্কির গণিত রহস্য*', *সাপ্তাহিক দিবালোক*, ঈদসংখ্যা, ৮ ডিসেম্বর (রোববার), ২০০৮, বিয়ানীবাজার, সিলেট, পৃষ্ঠা ৩।
[৮] প্রবীর ঘোষ, *অলৌকিক নয় লৌকিক*, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১৭৬-১৯১।
[৯] Uri geller, *The 11:11 phenomenon*, http://www.uri-geller.com/articles/11.htm

হল[১০] :

- সন্ত্রাসী হামলার তারিখ ৯/১১ : ৯+১+১=১১।
- ১১ই সেপ্টেম্বর বছরের ২৫৪তম দিন : ২+৫+৪=১১।
- ১১ই সেপ্টেম্বর পর বছর শেষ হতে ১১১ দিন বাকি থাকে।
- ১১৯ হচ্ছে ইরাক/ইরানের রাষ্ট্রীয় কোড ১+১+৯=১১। রাষ্ট্রীয় কোডটি উল্টো করে গণনা করলে হামলার তারিখটি আবার সামনে চলে আসে। [উপরোক্ত তথ্য মিথ্যা। ইরানের রাষ্ট্রীয় কোড ৯৮ অর্থাৎ ৯+৮=১৭ এবং ইরাকের রাষ্ট্রীয় কোড ৯৬৪ অর্থাৎ ৯+৬+৪=১৯, সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় কোড ৯৬৬ অর্থাৎ ৯+৬+৬=২১]
- আক্রমণস্থল টুইন টাওয়ার দেখতে ইংরেজি ১১-এর মত।
- প্রথম আক্রমণকারী বিমান : 'ফ্লাইট-১১।' আমেরিকার এয়ারলাইন্সকে ইংরেজিতে সংক্ষেপে 'AA' বলা হয়। এই 'AA' ইংরেজি বর্ণমালার প্রথম বর্ণ, পাশাপাশি সাজালে ১১।
- ইংরেজি 'Afghanistan' শব্দটিতে ১১ অক্ষর রয়েছে।
- ইংরেজি 'New York City' শব্দটিতে ১১ অক্ষর রয়েছে। আমেরিকাতে 'New York' ১১তম রাজ্য। [নিউইয়র্কের সাথে 'City' শব্দ জুড়ে দিয়ে ১১টি অক্ষর গণনা করা হয়েছে, কিন্তু আফগানিস্তানের সাথে 'Country' শব্দ ধরা হয়নি।]
- ইংরেজি 'The Pentagon' শব্দটিতে ১১ অক্ষর রয়েছে।
- এছাড়া ইংরেজি 'George W. Bush', 'Bill Clinton', 'Saudi Arabia', 'Colin Powell' শব্দগুলিতে ১১ অক্ষর রয়েছে।

(৫) সংখ্যা দিয়ে বিন্যাস-সমাবেশ করে ধর্মগ্রন্থকে অলৌকিক দাবি করার অভ্যাস বেশ পুরানো। রুশ বংশদ্ভোত গণিতবিদ এবং খ্রিস্টান ধর্মতাত্ত্বিক ড. ইভান পেনিন (১৮৫৫-১৯৪২) একদা দাবি তুলেছিলেন বাইবেল 'ধর্মগ্রন্থটি ৭ সংখ্যা দ্বারা চমৎকারভাবে আবদ্ধ।'[১১] বাইবেলের (ওল্ড টেস্টামেন্ট) প্রথম আয়াত : 'In the beginning God created the heavens and the earth.' (সৃষ্টির শুরুতেই ঈশ্বর আসমান এবং জমিন সৃষ্টি করলেন)। (জেনেসিস, ১:১)। উক্ত আয়াতে হিব্রু ভাষায় ৭টি শব্দ আছে এবং ২৮টি অক্ষর আছে (৭×৪)। তিনটি বিশেষ্য (noun) রয়েছে যথা ঈশ্বর (God), আসমান (heavens), জমিন (earth)। হিব্রু ভাষায় যেহেতু কোনো সংখ্যা নেই, বর্ণগুলোর যোগফলই হচ্ছে সংখ্যা মান (numeric value)। তাই এই আয়াতের তিনটি বিশেষ্যের সংখ্যামান হচ্ছে ৭৭৭ (৭×১১১)। আয়াতটির ক্রিয়াপদ 'created'-এর সংখ্যা মান হচ্ছে ২০৩ (৭×২৯)। আয়াতটির Object হচ্ছে প্রথম তিনটি শব্দ 'In the beginning'; ১৪টি বর্ণ দিয়ে গঠিত (৭×২) এবং বাকি চারটি শব্দও (Subject) ১৪টি বর্ণে গঠিত। হিব্রু ভাষায় আয়াতটির চতুর্থ ও পঞ্চম শব্দদুটিও ৭টি বর্ণে গঠিত। ক্রিয়াপদ 'created'-এর প্রথম, মধ্যম এবং শেষ বর্ণের সংখ্যা মান ১৩৩ (৭×১৯)। আয়াতের সব কটি শব্দের প্রথম এবং শেষ বর্ণের সংখ্যা মান ১৩৯৩ (৭×১৯৯)। বাইবেলের মধ্যে লেখক হিসেবে ২১ জন ব্যক্তির নাম রয়েছে (৭×৩)। হিব্রু ভাষায় তাঁদের নামের সংখ্যা মান ৭ দ্বারা বিভাজ্য। এই ২১ জনের মধ্যে ৭ জনের নাম রয়েছে নিউ টেস্টামেন্টে, যথা : Moses, David, Isaiah, Jeremiah, Daniel, Hosea and Joel। এই ৭টি নামের সংখ্যা মান হল ১৫৫৪ (২২২×৭)। ডেভিড নামটি পাওয়া যায় ১১৩৪ বার (১৬২×৭)। বাইবেলে 'seven-fold' শব্দগুচ্ছটি (phrase) ৭ বার রয়েছে, '৭০' এসেছে ৫৬ বার (৭×৮), ঈশ্বর সৃষ্টির জন্য ৭ দিন সময় নিয়েছেন, ইজরায়েলিরা ৭ দিনে ৭ বার মার্চ করেছে জেরিকোর দিকে। শেষ গ্রন্থ 'প্রকাশিত কালাম' (Revelation)-এ রয়েছে ৭ জন পবিত্র আত্মা ৭টি তূর্য (trumpet) নিয়ে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তাছাড়া রয়েছে ৭টি স্বর্ণের বাতির স্ট্যান্ড, ৭টি চার্চ, ৭টি তারা, ৭জন রাজা, ৭টি পাহাড়।[১২] আবার Psalm 118 অধ্যায় সম্পর্কে দাবি করা হয়েছে, এটি বাইবেলের মাঝের অধ্যায়। Psalm 117 অধ্যায়টি সর্বকণিষ্ঠ এবং Psalm 119 অধ্যায়টি সবচেয়ে দীর্ঘ অধ্যায়। Psalm 118 অধ্যায়ের আগে ৫৯৪টি অধ্যায় রয়েছে এবং Psalm 118 অধ্যায় পরে আরো ৫৯৪টি অধ্যায় রয়েছে।[১৩]

স্বীকার করছি, আমরা এই প্রবন্ধের লেখক দুজনের কেউই হিব্রু ভাষা জানি না। তাই উপরোক্ত হিব্রু ভাষার দাবিগুলো যথার্থভাবে অনুসন্ধান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। খ্রিস্টানদের দাবিকৃত 'মিরাকল ৭' ভাষ্য তুলে দেওয়ার কারণ হল পাঠকের মনে কিছু প্রশ্নের সূত্রপাত ঘটানো, তাদের চিন্তার খোরাক যোগানো।

---

[১০] The Skeptic's Dictionary, *law of truly large numbers (coincidence)*, http://skepdic.com/lawofnumbers.html

[১১] Keith Newman, *Is God A Mathematician?*, http://www.wordworx.co.nz/panin.html

[১২] G. Nehls, *The Mysterious 19 in the Quran: A Critical Evaluation*, http://www.answering-islam.org/Nehls/Ask/number19.html

[১৩] http://www.greaterthings.com/Word-Number/CenterofBible/Psalm118.htm

এক নজরে রাশেদ খলিফা[১৪]

জন্ম : নভেম্বর ১৯, ১৯৩৫ (মিশর)
মৃত্যু : জানুয়ারি ৩১, ১৯৯০ (বয়স ৫৪)
জাতীয়তা : মিশরীয়-আমেরিকান
পেশা : জৈব-রসায়নবিদ
ধর্মীয় বিশ্বাস : ইসলাম, United Submitters International (USI)

জীবন-বৃত্তান্ত : রাশেদ খলিফা (Rashad Khalifa) কায়রোর এইন শামস্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ১৯৫৯ সালে আমেরিকাতে আসেন এবং ১৯৬৪ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ. ডি ডিগ্রি অর্জন করেন জৈব-রসায়নবিদ্যায়। ১৯৭৫-৭৬ সালে তিনি প্রায় বছর খানেক লিবিয়া সরকারের বিজ্ঞান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে রসায়নবিদ হিসেবে জাতিসংঘের অধীনে ভিয়েনাতে শিল্প উন্নয়ন সংস্থায় যোগ দেন এবং সেখান থেকে ১৯৮০ সালের দিকে সিনিয়র রসায়নবিদ হিসেবে আমেরিকার এরিজোনা রাজ্যের সরকারি রসায়ন বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় বিশটির মত বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছেন, নিজে কোরান অনুবাদ করেছেন ইংরেজিতে এবং ধর্মবিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সবচেয়ে আলোচিত গ্রন্থের নাম : '*The Computer Speaks: God's Message to the World*'। রাশেদ খলিফার লেখা গ্রন্থ, আর্টিকেল বা গবেষণা সম্পর্কিত আলোচনা পাওয়া যায় এই ঠিকানায় : International Community of Submitters (ICS), P.O. Box 43476, Tucson, AZ 85733 এবং ওয়েব সাইট http://www.submission.org।

রাশেদ খলিফা ইসলাম ধর্মে 'United Submitters International' নামে নতুন একটি ধর্মীয় গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন; তাঁর অনুসারীরা নিজেদের 'মুসলমান' হিসেবে পরিচয় দেবার পরিবর্তে 'Submitter' এবং ইসলাম শব্দের পরিবর্তে 'Submission' শব্দ ব্যবহার করেন। রাশেদ খলিফা ও তাঁর অনুসারীদের ধর্মীয় বিশ্বাস : (১) আল-কোরান'ই একমাত্র গ্রহণীয় ধর্মগ্রন্থ। তবে এটিও বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পায়নি। (২) নবী মুহাম্মদের সুন্নাহ পুরোপুরি বাতিল; ধর্মীয় বিশ্বাস বা প্রথা হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। (৩) যে হাদিসগুলো সুন্নাহর সাথে বিরোধপূর্ণ সেগুলোও বাতিল। (৪) রাশেদ খলিফা নবী মুহাম্মদের পরে ইসলাম ধর্মের একজন রসুল। (৫) তাঁরা নবী ইব্রাহিমের রীতি অনুসরণ করে প্রার্থনা করে থাকেন[১৫]; যদিও তেমন কোনো বিশ্বাসযোগ্য উৎস নেই যে নবী ইব্রাহিম কিভাবে প্রার্থনা করতেন।

রাশেদ নিজের ইংরেজি অনুবাদকৃত কোরানের 'সুরা ফুরকান', 'সুরা ইয়াসিন', 'সুরা শুরা' এবং 'সুরা তাক্‌ভির'-এর আয়াতে নিজের নাম ঢুকিয়ে তাঁর বক্তব্যের 'ধর্মীয় গ্রহণযোগ্যতা' আদায়ের চেষ্টা করেছেন। কোরানের আয়াতগুলি হচ্ছে : We have sent you (Rashad) as a deliverer of good news, as well as a warner. [25:56][16] Most assuredly, you (Rashad) are one of the messengers. [36:3][17] Are they saying, "He (Rashad) has fabricated lies about GOD!"? If GOD willed, He could have sealed your mind, but GOD erases the falsehood and affirms the truth with His words. He is fully aware of the innermost thoughts. [42:24][18] এবং Your friend (Rashad) is not crazy. [81:22][19]। অথচ ইউসুফ আলী, পিকথাল, শাকির-এর মত বিশ্বখ্যাত ইংরেজি অনুবাদক[২০] ও আমাদের দেশের বাংলা অনুবাদকের

[১৪] Rashad Khalifa : Biography; http://en.wikipedia.org/wiki/Rashad_Khalifa
[১৫] http://www.submission.org/salat-how.html
[১৬] http://www.submission.org/suras/sura25.html
[১৭] http://www.submission.org/suras/sura36.html
[১৮] http://www.submission.org/suras/sura42.html
[১৯] http://www.submission.org/suras/sura81.html
[২০] http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/quran/

কেউই এই আয়াতগুলিতে 'Rashad' শব্দটি ব্যবহার করেননি। তিনি দাবি করেন : "ইসলাম ধর্মের নবী মুহাম্মদ 'শেষ নবী' (last Prophet) হলেও শেষ রসুল (last messenger) ছিলেন না। কোরানের ৩৩ নং সুরা আহজাবের ৪০ নম্বর আয়াতে মুহাম্মদকে (সাঃ) শেষ নবী বলা হলেও শেষ রসুল বলা হয়নি। আল্লাহ ফেরেশতা এবং মানুষের মধ্যে থেকে রসুল মনোনীত করেন। (সুরা ২২, হজ, আয়াত ৭৫)।" এরপর নিজেকে 'রসুল' বলে দাবি করে কোরানের সুরা আল-ই-ইমরান-এর ৮১ নম্বর আয়াত উপস্থাপন করেন, যেখানে আল্লাহ ভবিষ্যতে একজন রসুল পাঠানোর ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। আর সুরা তওবার শেষের দুটি আয়াতকে (১২৮ ও ১২৯) 'মিথ্যে দাবি' করে তাঁর নিজের অনুবাদের কোরান থেকে বাদ দিয়ে দেন।

বলার অপেক্ষা রাখে না, রাশেদ খলিফার এসব দাবি-বক্তব্য সাধারণ মুসলমান থেকে শুরু করে কট্টরপন্থীদের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭৬ সালের প্রথম দিকে রাশেদ প্রথাগত মুসলমানদের সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছান।

১৯৬৯ সালের দিকে রাশেদ খলিফা কোরান শরিফের শব্দমালা, অক্ষর-বর্ণ ইত্যাদি বিশ্লেষণের জন্য একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরির প্রচেষ্টা শুরু করেন। ১৯৭৪ সালে ঘোষণা করেন : তিনি কোরানের ৭৪ নং সুরা মুদ্দাচ্ছির-এর ৩০ নং আয়াতে উল্লেখিত '১৯' থেকে এমন একটি গাণিতিক থিওরি আবিষ্কার করেছেন যা কোরানকে একদম 'অলৌকিক' মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে; যেমন তাঁর দাবি হচ্ছে : 'কোরানের সুরা সংখ্যা ১১৪, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য, কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬৩৪৬, যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য। কোরানে উল্লেখ করা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' শব্দের মধ্যে ১৯টি অক্ষর রয়েছে। কোরানের প্রথম ওহি ৯৬ নং সুরা আলাক-এ ১৯টি শব্দ রয়েছে, ঐ সুরা আলাকটি শেষের দিক থেকে গণনা করলে ১৯তম অবস্থানে রয়েছে; এবং সর্বশেষ ওহি (১১০) সুরা নাসর-এর প্রথম আয়াতে ১৯টি বর্ণ রয়েছে।' ইত্যাদি।[২১]

রাশেদ খলিফার এই দাবি প্রথম দিকে পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী মহলে তেমন কোনো প্রভাব ফেলেনি। ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা '*Scientific American*'-তে 'কোরানের কৌশলী পাঠ' বলে প্রথম মন্তব্য প্রদান করেন আমেরিকার বিখ্যাত গণিতবিদ-বিজ্ঞানী মার্টিন গার্ডনার (Martin Gardner)। মার্টিন গার্ডনার পরে আরও বিস্তারিতভাবে রাশেদ খলিফা এবং তাঁর কাজ সম্পর্কে মূল্যায়ণ করেন।[২২] তিন বছর পর ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে কানাডার 'Council on the Study of Religion' তাদের '*Quarterly Review*' পত্রিকায় রাশেদ খলিফা আবিষ্কার সম্পর্কে মন্তব্য করে : "an authenticating proof of the divine origin of the Quran."

১৯৭৩ সালের ২৪ জানুয়ারি প্রথম মিশরের '*Akher Sa'a*' ম্যাগাজিনে রাশেদ খলিফার গবেষণার খবর প্রথম প্রকাশ করে। একই পত্রিকায় নভেম্বর ২৮, ১৯৭৩ এবং ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৫ সালে ঐ গবেষণার আপডেট প্রকাশ করা হয়। এরপর সারা বিশ্বেই বিভিন্ন ভাষার পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বইয়ে রাশেদ খলিফা এবং তাঁর আবিষ্কারটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়।

১৯৭৯ সালের অক্টোবর মাসে 'ইসলাম ধর্মের রসুল' দাবিকারী রাশেদ খলিফার বিরুদ্ধে ১৬ বছরের এক মেয়েকে 'যৌন নির্যাতন-নিপীড়ণ-উত্যক্ত' করার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগকারিণীর দাবি, জাতিসংঘের একটি গবেষণা প্রজেক্টে কাজ করার সময় রাশেদ খলিফা তাঁর উপর 'যৌন নির্যাতন-নিপীড়ণ' চালিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে রাশেদ খলিফা আমেরিকার 'National Academy of Science'-এর বিরুদ্ধে ৩৮ মিলিয়ন ডলারের মামলা করেন 'Science and Creationism' নামক বিবর্তনবাদের ওপর গ্রন্থ প্রকাশের জন্য, যে গ্রন্থে বলা হয়েছে, "Evolution is a Godless process." পরবর্তীতে অবশ্য রাশেদ খলিফার এ মামলা কোর্টে টেকেনি।

[২১] http://www.submission.org/quran/app1.html

[২২] Martin Gardner, The numerology of Dr. Rashad Khalifa-Scientist, Skeptical Inquirer, Sept-Oct, 1997.

১৯৯০ সালের ৩১ জানুয়ারি আমেরিকার এরিজোনা রাজ্যের টুকসন মসজিদের ভিতর ৫৪ বছর বয়সী রাশেদ খলিফার মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাঁর সারা শরীরে ছুরি দিয়ে ২৯ বার জখম করা হয়েছিল এবং চেহারা এতই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে মুখমণ্ডল দেখে চেনাই যাচ্ছিল না। রাশেদের হত্যাকারী হিসেবে আমেরিকার 'জামাতুল ফুরকা' নামের একটি মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনের দিকে অভিযোগের আঙুল ওঠে।

কোরান সম্পর্কে রাশেদ খলিফার অভিমত হচ্ছে : "কোরান হলো আল্লাহর 'ফাইনাল টেস্টামেন্ট'। নবী মুহাম্মদের মৃত্যুর পর কোরানে মিথ্যা আয়াত ঢুকিয়ে বিকৃত করা হয়েছে, সময়ানুসারে কোরানের সুরা সাজানো হয়নি। খলিফা ওসমান কোরান সংকলনের জন্য যে কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন সাহাবিদের দিয়ে, তাঁরা ভুল করেছেন। হজরত আলী কোরান সংকলন কমিটির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু কোরানকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করা যায়নি। তারপর ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে মারওয়ান ইবনে আল হাকাম (মৃত্যু ৬৫ হিজরি/৬৮৪ খ্রিস্টাব্দ) হজরত ওমরের কন্যা হাফসার কাছে রক্ষিত নবী মুহাম্মদের নিজ হাতে লেখা 'প্রকৃত কোরান' ধ্বংস করে ফেলেন। আজকে সারা বিশ্বে মোটামুটি একই স্টান্ডার্ডের কোরান অনুসরণ করা হয়ে থাকে তা তৈরি হয়েছিল মিশরের কায়রোতে ১৯২৪ সালে। হজরত ওসমানের সময়কার সংকলিত কোরানের দুটি কপি পাওয়া গেছে উজবেকিস্তান (তাশখন্দ শহর) এবং তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহর থেকে; এগুলি থেকে দেখা গেছে এখানেও মনুষ্যকৃত ভুল রয়েছে। ১৯২৪ সালের মিশরীয় সংস্করণে তা শুদ্ধ করা হয়। এরপর সৌদি বাদশা ফাহাদ কোরানের আরেকটি সংস্করণ বের করেন। আজকে কোরানের সকল মাসহাফকে যে একই রকম বলে দাবি করা হয়, তা সত্য নয়। বিভিন্ন পার্থক্য নিয়ে পৃথক রকমের কোরানের অস্তিত্ব পৃথিবীতে ছিল।"[২৩] তাই বিকৃত হয়ে যাওয়া কোরানকে উদ্ধার করে মানুষের কাছে আল্লাহর প্রকৃত বাণী পৌঁছানোর জন্য নিজ উদ্যোগে রাশেদ কোরানের নতুন একটি অনুবাদ তৈরি করেন।

রাশেদ খলিফার কোরান সম্পর্কে এ ধরনের বক্তব্য, নতুন ধর্মমত তৈরি, নিজেকে রসুল বানানোর প্রচেষ্টা ইত্যাদি স্পষ্টই ইসলামের মূল বিশ্বাসের পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও উনিশ মিরাকল সম্পর্কে তাঁর উপস্থাপন ভঙ্গি চমৎকার। কোরানে মিরাকল রয়েছে বলে যে 'হিসাব' তিনি দেখিয়েছেন তা প্রথম দেখাতে মুসলমান-অমুসলমান অনেককেই বিভ্রান্ত করতে পারে। হুট করে এই মিরাকলের পিছনের কারিগরি বোঝা কারো কারো কাছে অসম্ভব। রাশেদ খলিফার কোরানের ১৯ মিরাকল নিয়ে বাংলা ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে, যেমন : মেজর কাজী জাহান মিয়া লিখিত '*আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ*' নামক দুই খণ্ডের বইয়ের প্রথম খণ্ডের প্রথম চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে এই ১৯ মিরাকল।[২৪] লেখকের উচ্চ প্রশংসা করে বইটির প্রথমেই একটি অভিমত দিয়েছেন *মাসিক মদীনা*'র সম্পাদক, বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেম মাওলানা মুহিউদ্দীন। ডাঃ খন্দকার আব্দুল মান্নান লিখিত '*কমপিউটার ও আল কুরআন*' নামক বইটিতে স্থান পেয়েছে ১৯-এর ম্যাজিক।[২৫] আল-কোরআন একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ কোরানের একটি বাংলা অনুবাদ করেছেন।[২৬] কোরানের বাংলা অনুবাদের প্রথমে তিনি রাশেদ খলিফার ১৯ ম্যাজিক হাজির করেছেন ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে। এছাড়া বিভিন্ন মফস্বল শহরের স্থানীয় পত্র-পত্রিকা, চটি বইয়ে এই ১৯ ম্যাজিকের গল্প বলা হয়েছে। আর বাংলাদেশের একটি মফস্বল শহরে বিজ্ঞান আন্দোলন করতে গিয়ে কতশত বার এই '১৯ ম্যাজিক' প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আজকের এই প্রবন্ধটিতে 'আল-কোরানের উনিশ ভোঁজাভাজি' নির্মোহ দৃষ্টিতে বিচার করা হবে, যুক্তিবাদী মন নিয়ে উদ্ঘাটন করা হবে রাশেদ খলিফা ঘোষিত 'কোরানের গ্রেট মিরাকল' ৭৪:৩০ নং আয়াতের যথার্থতা।

রহস্যের চাবিকাঠি : কোরানের ৭৪:৩০ নং আয়াত

দাবি : "সুরা আল-মুদাচ্ছির (৭৪) এর ৩০ নম্বর আয়াতে আল-কোরানে উনিশ সংখ্যার ফর্মুলার কথা বলা হয়েছে।"

---

[২৩] Submission.org, *Tampering With the Word of God*, Appendix 24, http://www.submission.org/tampering.html. And *Preserving and protecting the Quran*, http://www.submission.org/quran/protect.html.

[২৪] কাজী জাহান মিয়া, *আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ* (মহাকাশ পর্ব-১), প্রকাশক: নাহরীন পারভীন, রায়ের বাজার, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ-অক্টোবর, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১৭-২৯।

[২৫] ডাঃ খন্দকার আব্দুল মান্নান, *কমপিউটার ও আল কুরআন*, প্রকাশনায় : ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, মীরপুর, ঢাকা, পঞ্চম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০০৩।

[২৬] হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, *কোরআন শরীফ: সহজ সরল বাংলা অনুবাদ*, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, প্রথম প্রকাশ মার্চ, ২০০২।

৭৪:৩০ নম্বর আয়াত : "আ'লাইহা তিসআ'তা আ'শারা"—অর্থাৎ ইহার উপর উনিশ। এ বাক্যাংশে 'ইহার' বা 'তাহার' কথাটি রয়েছে। এখন 'ইহার' বা 'তাহার' দ্বারা কি বা কাকে বোঝানো হচ্ছে জানতে হলে অবশ্যই এর আগের-পরের বাক্যগুলোতে ফিরে যেতে হবে, বিবেচনায় আনতে হবে। মনে রাখতে হবে এ আয়াতটি বিচ্ছিন্নভাবে নাযিল হয়নি। আর বিচ্ছিন্নভাবে কোনো একটা আয়াতকে এভাবে উপস্থাপন করলে কি দাড়ায়, দেখা যাক : 'নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।' (১০৩:২)। এই আয়াতটি বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপন করলে এর অর্থ যা দাঁড়ায় তা অর্থহীন এবং ঐ সুরার মূলভাবের সাথে সাংঘর্ষিক। এবার এর আগের ও পরের আয়াত দেখি : 'শপথ যুগের, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে।' অর্থাৎ এখানে বোঝানো হচ্ছে সকল মানুষ নয় বরং যারা আল্লাহতে ঈমান আনেনি তারাই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত। এভাবে কোরানের আয়াতগুলোকে বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপন করলে তা অনেক ক্ষেত্রেই কোরানের মূলভাবের সাথে সাংঘর্ষিক, অবাস্তব, অর্থহীন, হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমরা যদি সুরা মুদাচ্ছিরের ৩০ নম্বর আয়াতটির অর্থ বুঝতে চাই তবে অবশ্যই এই আয়াতের আগের ও পরের আয়াত আমাদের বিবেচনায় আনতেই হবে।

আলোচনার সুবিধার্থে বিস্তারিতভাবে এখানে সুরা মুদ্দাচ্ছিরের ২৭-৩১নং আয়াত বিভিন্ন প্রসিদ্ধ অনুবাদকের অনুবাদ ও সেই সাথে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ তফসিরকারকদের তফসির তুলে ধরা হলো :

(১) আল-কোরানের বিখ্যাত ইংরেজি অনুবাদক ইউসুফ আলী, পিকথাল, শাকীর সুরা মুদ্দাচ্ছিরের ২৭-৩১নং আয়াত অনুবাদ করেছেন এভাবে :

074.027
YUSUFALI: And what will explain to thee what Hell-Fire is?

PICKTHAL: - Ah, what will convey unto thee what that burning is! –

SHAKIR: And what will make you realize what hell is?

074.028
YUSUFALI: Naught doth it permit to endure, and naught doth it leave alone!-

PICKTHAL: It leaveth naught; it spareth naught

SHAKIR: It leaves naught nor does it spare aught.

074.029
YUSUFALI: Darkening and changing the colour of man!

PICKTHAL: It shrivelleth the man.

SHAKIR: It scorches the mortal.

074.030
YUSUFALI: Over it are Nineteen.

PICKTHAL: Above it are nineteen.

SHAKIR: Over it are nineteen.

074.031
YUSUFALI: And We have set none but angels as Guardians of the Fire; and We have fixed their number only as a trial for Unbelievers,- in order that the People of the Book may arrive at certainty, and the Believers may increase in Faith,- and that no doubts may be left for the People of the Book and the Believers, and that those in whose hearts is a disease and the Unbelievers may say, "What symbol doth Allah intend by this?" Thus doth Allah leave to stray whom He pleaseth, and guide whom He pleaseth: and none can know the forces of thy Lord, except He and this is no other than a warning to mankind.

PICKTHAL: We have appointed only angels to be wardens of the Fire, and their number have We made to be a stumbling-block for those who disbelieve; that those to whom the Scripture hath been given may have certainty, and that believers may increase in faith; and that those to whom the Scripture hath been given and believers may not doubt; and that those in whose hearts there is disease, and disbelievers, may say: What meaneth Allah by this similitude? Thus Allah sendeth astray whom He will, and whom He will He guideth. None knoweth the hosts of thy Lord save Him. This is naught else than a Reminder unto mortals.

SHAKIR: And We have not made the wardens of the fire others than angels, and We have not made their number but as a trial for those who disbelieve, that those who have been given the book may be certain and those who believe may increase in faith, and those who have been given the book and the believers may not doubt, and that those in whose hearts is a disease and the unbelievers may say: What does Allah mean by this parable? Thus does Allah make err whom He pleases, and He guides whom He pleases, and none knows the hosts of your Lord but He Himself; and this is naught but a reminder to the mortals.

ইংরেজি অনুবাদকগণ স্পষ্টই বলেছেন সুরা মুদ্দাচ্ছিরে ৩০নং আয়াতটিতে শুধুমাত্র দোজখের উনিশজন ফেরেশতার সংখ্যার কথাই বলা হয়েছে, এর বেশি কিছু নয়।

(২) উপমহাদেশের বিশিষ্ট আলেম মাওলানা আশরাফ আলি থানভী কর্তৃক রচিত '*বয়ানুল কোরআন*'-এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদে রয়েছে[২৭]:

> "আপনি জানেন কি দোজখ কি বস্তু? (২৭) উহা (কাহাকেও উহাতে প্রবেশ করার পর অদগ্ধ) থাকিতে দিবে না—এবং (অনাগত কোনও কাফেরকে বাহিরে) ছাড়িবে না। (২৮) উহা (পোড়াইয়া) দেহের সৌষ্ঠব বিকৃত করিয়া দিবে। (২৯) উহার উপর উনিশজন ফেরেশতা (নিযুক্ত) থাকিবেন। (৩০) আর আমি দোজখের কর্মচারী কেবল ফেরেশ্‌তাদিগকেই নিযুক্ত করিয়াছি। আর আমি তাহাদের সংখ্যা এইরূপে রাখিয়াছি যাহা কাফেরদের বিভ্রান্তির উপকরণ হয়, (আর এই জন্য) যেন বিশ্বাস করে—কিতাবীগণ এবং ঈমানদারদের ঈমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। (৩১)।" (সুরা ৭৪, মুদ্দাচ্ছির, আয়াত ২৭-৩১)।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এই সুরা মুদ্দাচ্ছিরের ৩০ নং আয়াতের অনুবাদে উল্লেখ করাই আছে : 'উহার উপর উনিশজন ফেরেশতা (নিযুক্ত) থাকিবেন।' অর্থাৎ দোজখের বর্ণনার মধ্যে যে 'উনিশ' রয়েছে তা কোনো কোরানের অলৌকিক ফর্মুলা বা কোনো কোড নয় বরং দোজখের শাস্তি প্রদানকারী উনিশজন ফেরেশতার কথা বলা হচ্ছে, যা ৩১নং আয়াত পড়লেই বুঝা সম্ভব।

এবার এই আয়াতগুলির শানে নুজুল লক্ষ্য করি :

> "৩০নং আয়াতটি শ্রবণ করিয়া আবুল আসাদ নামক জনৈক শক্তিশালী কাফের বলিয়া উঠিল, হে কোরাইশ জাতি! তোমরা ইহাতে ভীত হইও না। আমি দশজন ফেরেশ্‌তাকে ডান বাহু দ্বারা এবং নয়জনকে বাম বাহু দ্বারা পরাজিত করিয়া দিব। অন্য রেওয়াতে আছে, এই আয়াতটি শুনিয়া আবু জাহাল বলিল, ভয় কিসের? ফেরেশ্‌তারা মাত্র উনিশজন। তোমরা সংখ্যায় অনেক রহিয়াছ। প্রতি দশজন মানুষও কি একজন ফেরেশ্‌তাকে হঠাইয়া দিতে পারিবে না? এই ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি নাজিল হয়। (দ্রষ্টব্য : *ছহীহ রহমানী বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ* (বয়ানুল কোরআনের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ), পৃষ্ঠা ৯৪২)।

শানে-নুজুল থেকে এটা পরিষ্কার যে রাশেদ খলিফা প্রদত্ত 'মিরাকল উনিশ' আয়াতটিতে দোজখের শাস্তি প্রদানকারী উনিশজন ফেরেশতার কথাই বলা হয়েছে এবং এটা বলার জন্যই এ আয়াতগুলো রচিত হয়েছে।

এখানে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, কোরানে যদি কোনও সংখ্যার ফর্মুলা (মিরাকল বা ম্যাজিক ইত্যাদি) থাকে তবে তা দোজখের মধ্যে বর্ণিত হবে কেন? এটা তো একটি সুসংবাদ, যা বেহেশতের বর্ণনাতে থাকাই স্বাভাবিক ছিল।

---

[২৭] হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) (মূল উর্দু), *ছহীহ রহমানী বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ* (বয়ানুল কোরআনের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ), হামিদিয়া লাইব্রেরী লিঃ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৯৪২।

(৩) আলহাজ্জ মাওলানা এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্সী '*বঙ্গানুবাদ কোরান শরীফ*'-এ সুরা মুদ্দাচ্ছির-এর ২৭-৩১ নম্বর আয়াতের অনুবাদ করেছেন এভাবে[২৮] :

> "(২৭) তুমি কি বুঝ?—এই ছাকার কি? (২৮) এমন আগুন—যা কিছুই বাকী রাখবে না, এবং ছাড়বেও না। (২৯) মানুষকে ঝলসে দেবে। (৩০) সেখানে উনিশ জন রয়েছে। (৩১) ফিরেশতাদের ছাড়া কাউকে জাহান্নামে মোতায়েন করিনি। আমি তাদের সংখ্যা স্থির করেছি-শুধু কাফিরদের পরীক্ষার জন্য!"

(৪) বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেম ও বহু গ্রন্থ-প্রণেতা মাওলানা মুহিউদ্দীন খান কর্তৃক অনূদিত '*তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন*'-এ সুরা মুদ্দাচ্ছিরের ২৭-৩১ নম্বর আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে[২৯] :

> "(২৭) আপনি কি বোঝলেন অগ্নি কি? (২৮) এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না। (২৯) মানুষকে দগ্ধ করবে। (৩০) এর উপর নিয়োজিত আছেন উনিশজন ফেরেশতা। (৩১) আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাই রেখেছি। আমি কাফেরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই তার এই সংখ্যা করেছি।"

এখানেও দেখা যাচ্ছে অনুবাদক স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন, এখানে 'উনিশ' দ্বারা কোনো ফর্মুলা নয় বরং উনিশজন ফেরেশতার কথা বলা হচ্ছে।

তফসীরকারক এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, "তফসীরবিদ মুকাতিল বলেন : এটা আবু জাহ্‌লের উক্তির জওয়াব। সে যখন কোরআনের এই বক্তব্য শুনল যে, জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক উনিশজন ফেরেশতা, তখন কোরায়শ যুবকদের সম্বোধন করে বলল : মুহাম্মদের সহচর তো মাত্র উনিশজন। অতএব, তার সম্পর্কে তোমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। সুদ্দী বলেন : উপরোক্ত মর্মে আয়াত নাজিল হলে পর জনৈক নগণ্য কোরায়শ কাফের বলে উঠল : হে কোরায়শ গোত্র, কোন চিন্তা নেই। এই উনিশ জনের জন্যে আমি একাই যথেষ্ট, আমি ডান বাহু দ্বারা দশজনকে এবং বাম বাহু দ্বারা নয় জনকে দূর করে দিয়ে উনিশের কিস্‌সা চুকিয়ে দেব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় : আহাম্মকের স্বর্গে বসবাসকারীরা জেনে রাখ, প্রথমতঃ ফেরেশতা একজনও তোমাদের সবার জন্য যথেষ্ট। এখানে যে উনিশ জনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সবাই প্রধান ও দায়িত্বশীল ফেরেশতা। তাদের প্রত্যেকের অধীনে কর্তব্য পালন ও কাফেরদেরকে আযাব দেয়ার জন্যে অসংখ্য ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন, যাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।" (দ্রষ্টব্য : *তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন*, পৃষ্ঠা ১৪২১)।

অর্থাৎ 'উনিশ' সংখ্যাটা যে ফেরেশতাদের সংখ্যা মাত্র তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

(৫) নাসিম উদ্দিন আহমদ কর্তৃক অনূদিত কোরান শরিফের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদে 'উনিশ'-এর ব্যাখ্যায় (পাদটীকায়) বলা হয়েছে[৩০] : 'জাহান্নামের উনিশ জন রক্ষক।'—'Nineteen guardians of the Fire.'

(৬) সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী-এর '*তাফহীমুল কুরআন*'-এ সুরা মুদ্দাচ্ছিরের ২৭-৩১ নম্বর আয়াত অনুবাদ করা হয়েছে[৩১] : "(২৭) আর তুমি কি জান, সেই দোযখটি কি? (২৮) উহা কাহাকে জীবিত রাখে না আবার মৃতাবস্থায়ও ছাড়িয়া দেয় না। (২৯) চামড়া ঝলসাইয়া দেয়। (৩০) উনিশজন কর্মচারী সেখানে নিয়োজিত। (৩১) আমরা উহা দোযখের এই কর্মচারী ফেরেশতাদিগকে বানাইয়াছি। আর তাহাদের সংখ্যাকে কাফিরদের জন্য একটা পরীক্ষা-মাধ্যম বানাইয়া দিয়াছি।"

---

[২৮] এ, কে, এম, ফজলুর রহমান মুন্সী, *বঙ্গানুবাদ কোরান শরীফ*, প্রকাশক: এ, কে,এম, শহিদুল হক, কুমিল্লা, অনুবাদ কাল ১৯৬২-৬৫, পৃষ্ঠা ৪৮০।

[২৯] হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহঃ), *তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন, পবিত্র কোরআনুল করীম* (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর) অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, খাদেমুল-হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, পৃষ্ঠা ১৪১৯, ১৪২১।

[৩০] অধ্যক্ষ নাসিম উদ্দিন আহমদ, *পবিত্র কোরআন* (পাদটীকাসহ বাংলা ও ইংরেজীতে অনুবাদ), রংপুর পাবলিকেশন্স লিঃ, ঢাকা, প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা ১৩০০।

[৩১] সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *তাফহীমুল কুরআন*, (অনুবাদ : মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম), ১৮শ খ-, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল: জুলাই ২০০৬, পৃষ্ঠা ১০৭, ১০৯।

তফসীরে বলা হয়েছে : "লোকেরা রাসূলে করীম (স)-এর মুখে শুনিতে পাইয়াছিল যে, দোযখের কর্মচারীর সংখ্যা হইবে মাত্র উনিশ জন। এই কথা শোনা মাত্রই তাহারা এই কথার উপর ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিতে শুরু করিয়া দিয়াছিল। এমনকি, এই কথা শুনিয়া তাহারা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল যে, একদিকে আমাদিগকে বলা হইতেছে যে, আদম (আ) হইতে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার যত মানুষ কুফরী ও নাফরমানী করিয়াছে তাহারা সকলেই দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে। আবার সেই সঙ্গেই আমাদিগকে বলা হইতেছে যে, এতবড় একটা বিশাল-বিরাট দোযখে এত অসংখ্য মানুষকে আযাব দেওয়ার কাজে মাত্র ১৯ জন কর্মচারী নিযুক্ত করা হইবে! এই কথায় কুরাইশ সরদাররা প্রচণ্ড অট্টহাস্যে ভাঙিয়া পড়িল। আবূ জেহেল বলিল : 'ভাই সব! তোমরা কি এতই দুর্বল ও অর্থব হইয়াছ যে, তোমরা দশ-দশ জন লোক মিলিয়াও দোযখের এক একজন কর্মচারী ও সিপাহীর মুকাবিলা করিতে পারিবে না?' বনু জুমাহ গোত্রের একজন পাহলোয়ান বলিয়াই ফেলিল : '১৭ জনের সহিত তো আমি একাকীই মুকাবিলা করিব, অবশিষ্ট দুই জনকে তোমরা কাবু করিয়া লইবে।' এই ধরনের অত্যন্ত হাস্যকর কথাবার্তার জওয়াবে এই বাক্যটি একটি মধ্যবর্তী কথা হিসাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।" (দ্রষ্টব্য : *তাফহীমুল কুরআন*, ১৮শ খ-, পৃষ্ঠা ১০৮)।

(৭) ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক কোরান শরিফের অনুবাদে সুরা মুদ্দাচ্ছির এর ২৭-৩১ নম্বর পর্যন্ত আয়াত অনুবাদ করা হয়েছে এ রকম[৩২] : "(২৭) তুমি কি জান সাকার কী? (২৮) উহা উহাদিগকে জীবিতাবস্থায় রাখিবে না ও মৃত অবস্থায় ছাড়িয়া দিবে না। (২৯) ইহা তো গাত্রচর্ম দগ্ধ করিবে। (৩০) সাকার-এর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে উনিশ জন প্রহরী। (৩১) আমি ফিরিশ্‌তাদিগকে করিয়াছি জাহান্নামের প্রহরী; কাফিরদিগের পরীক্ষা স্বরূপই আমি উহাদিগের এই সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছি।"

(৮) সাইয়েদ কুতুব শহীদ এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর '*তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*'-এ এই আয়াতগুলো প্রসঙ্গে বলা হয়েছে[৩৩] : "দোযখের প্রহরী থাকে 'উনিশ জন'। এই ফেরেশতারা ব্যক্তি না গোষ্ঠী, তা আমরা জানি না।" (পৃষ্ঠা ২৩৩)। "মোশরেকরা যে উনিশ জনকে নিয়ে বাকবিতণ্ডা শুরু করেছিল তার রহস্য নিয়েই আয়াতটি শুরু হয়েছে। বলা হয়েছে, 'আমি দোযখের দায়িত্বশীল হিসেবে ফেরেশতা ছাড়া আর কাউকে নিযুক্ত করিনি।" (পৃষ্ঠা ২৩৪)।

উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনা থেকে দেখলাম সকল ইসলামি চিন্তাবিদ, তফসীরকারকের মতানুসারে সুরা মুদ্দাচ্ছিরের ৩০ নম্বর আয়াতে বর্ণিত 'উনিশ' কোনো ফর্মুলা বা কোড নয়। বরং তা দ্ব্যার্থহীনভাবে দোজখের (সাকার) প্রহরী উনিশজন ফেরেশতার কথা বোঝাচ্ছে।

কোরানের সুরা সংখ্যা

দাবি : "কোরানের সুরা সংখ্যা ১১৪ যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য।"

বর্তমানে বহুল প্রচলিত কোরানের সুরা সংখ্যা ১১৪ হলেও অনেক ইসলামি চিন্তাবিদ খলিফা উসমানের 'কোরান সংকলন কমিটি' কর্তৃক প্রণীত কোরানের সুরা সংখ্যা নিয়ে দ্বিমত প্রকাশ করে আসছেন। তাঁরা সুরা ফালাক ও নাস কোরানের অংশ বলে মনে করেন না। তারা বলেন : "একটা কেশে কয়েকটি গ্রন্থি দিয়ে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (স.) ন্যায় মহারাসুলের দিব্য জ্ঞানের বিকার ঘটানো যদি লাবীদের ন্যায় একজন নগণ্য ইহুদির পক্ষে সম্ভবপর হয়, তাহলে জগতের অভিধান হতে 'অসম্ভব' কথাটা চিরকালের জন্য মুছে যাওয়া উচিৎ। কোরানের একটি আয়াতে এই মতের সমর্থন হচ্ছে-সুরা ফোরকানে বর্ণিত হয়েছে 'এবং অত্যাচারী (কাফের)গণ (মুসলমানদিগকে সম্বোধন করে) বলে, তোমরা তো একজন জাদু ও মায়াবিষ্ট লোকের অনুসরণ করছ মাত্র। দেখ, তারা তোমার সম্বন্ধে কিরূপ উপমার সৃষ্টি করেছে, এর ফলে তারা ভ্রষ্ট হয়ে গেল, সুতরাং তারা আর পথ পেতে সমর্থ হবে না।' (১ম রুকু) এই আয়াত হতে স্পষ্ট জানা যাচ্ছে যে, 'হজরতকে কেউ যে জাদু করেছে', আরবের কাফেরগণই এরূপ কথা বলত। এই আয়াতে ঐ প্রকার উক্তির কঠোর প্রতিবাদ করে ঐ মিথ্যাপ্রচারকদিগকে অত্যাচারী ও ভ্রষ্ট বলা হচ্ছে। কোরানে 'তা-হা' সুরায় হজরত মুসা এবং ফেরআওনের জাদুকরদিগের ঘটনা বর্ণনার পর বলা হয়েছে-জাদুকরগণ কুত্রাপি সফলতা লাভ করতে পারে না।"[৩৪]

অর্থাৎ হজরত মুহাম্মদকে জাদু করা হয়েছিল এবং এ জাদু থেকে মুক্তি লাভের উপায় হিসেবে সুরা ফালাক ও সুরা নাস নাজিল

[৩২] *আল-কুরআনুল করীম*, অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, প্রকাশকাল : অক্টোবর, ১৯৯৪ (অষ্টম মুদ্রণ), পৃষ্ঠা ৯৬৮।

[৩৩] সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, অনুবাদ : হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, ২১ তম খণ্ড, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ (৪র্থ সংস্করণ), পৃষ্ঠা ২৩৩-২৩৪।

[৩৪] সা'দ উল্লাহ, *ইসলামী দর্শন ও দার্শনিক*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, প্রকাশ ২০০০, পৃষ্ঠা ১৯৪।

হয়েছে, এমন ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। মাওলানা আকরাম খাঁ হজরত মোহাম্মদ (দ.)-এর ওপর জাদুর প্রভাব হওয়া সম্পর্কে বলছেন : "এই সুরা দুটিকে (ফালাক ও নাস) অবলম্বন করে বিভিন্ন প্রকারের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়ে গেছে। সাহাবী আব্দুল্লাহ এবন-মাছউদ এ সুরা দুটিকে কোরানের অংশ বলে স্বীকার করেননি। নিজের মুসাবিদায় সুরা দুটি লিপিবদ্ধ করেননি এবং সমস্ত সাহাবীর মতের ও স্পষ্ট হাদিসগুলোর বিরুদ্ধে আজীবন দৃঢ়ভাবে নিজের মত কায়েম রেখেছেন।" (দ্রষ্টব্য : *ইসলামী দর্শন ও দার্শনিক*, পৃষ্ঠা ১৯৪)। তাহলে সুরা ফালাক ও নাসকে সঙ্গত কারণেই বর্জন করে আমরা কোরানের সুরা সংখ্যা ১১২টি বলতে পারি।

সুরা 'ফাতিহা' কি কোরানের অংশ, এ নিয়ে অনেক মুসলমানের মধ্যে সংশয়-দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে। এ প্রসঙ্গে যুক্তি হচ্ছে, সুরা ফাতিহা পাঠে বুঝা যায় এটা আল্লাহর কথা নয়, এটা মানুষের কথা; আল্লাহ কখনো বলবেন না, 'আমাকে সরল পথ দেখাও' অথবা 'আমি শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।'

নবম সুরা 'তওবা' সম্পর্কে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রচিত *বয়ানুল কোরানে* রয়েছে : "এই সুরাটি ইহার পূর্ববর্তী সুরা সুরায়ে আনফালের অংশ হওয়ার এবং স্বতন্ত্র সুরা না হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, এই অনিশ্চয়তার দরুন ইহার প্রথমে বিসমিল্লাহ লেখা হয় নাই।" (দ্রষ্টব্য : *ছহীহ রহমানী বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ* (বয়ানুল কোরআনের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ), পৃষ্ঠা ৩০৩)। এ প্রসঙ্গে তফসীর *মাআরেফুল ক্বোরআন*-এ উল্লেখ আছে : "একটি সূরা সমাপ্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় সূরা শুরম্ন করার আগে 'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' নাযিল হত। এর থেকে বোঝা যেত যে, একটি সূরা শেষ হত, অতঃপর অপর সূরা শুরম্ন হল। কোরআন মজীদের সকল সূরার বেলায় এ নীতি বলবৎ থাকে। সূরা তওবা সর্বশেষ নাজিলকৃত সূরাগুলোর অন্যতম। কিন্তু সাধারণ নিয়ম মতে এর শুরম্নতে না বিসমিল্লাহ নাযিল হয়, না রসূলুলম্নাহ্ (সাঃ) তা লিখে নেয়ার জন্যে ওহী লেখকদের নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় হযরত (সাঃ)-এর ইন্তেকাল হয়। কোরআন সংগ্রাহক হযরত ওসমান গনী (রাঃ) স্বীয় শাসনামলে যখন কোরআনকে গ্রন্থের রূপ দেন, তখন দেখা যায়, অপরাপর সুরার বরখেলাফ সুরা তওবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' নেই। তাই সন্দেহ ঘনীভূত হয় যে, হয়তো এটি স্বতন্ত্র কোন সুরা নয় বরং অন্য কোন সুরার অংশ। এতে এ প্রশ্নের উদ্ভবও হয় যে, এমতাবস্থায় তা কোন সুরার অংশ হতে পারে? বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে একে সুরা আনফালের অংশ বলাই সংগত।" (দ্রষ্টব্য : *তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন*, পৃষ্ঠা ৫৫২)।

"সূরা তওবা স্বতন্ত্র সূরা না হয়ে সূরা আনফালের অংশ হওয়ার সম্ভাবনাটি এর শুরুতে বিসমিল্লাহ্ না লেখার কারণ, এ সম্ভাবনা থাকার ফলে এখানে বিসমিল্লাহ্ লেখা বৈধ নয়, যেমন বৈধ নয় কোন সুরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ লেখা।" (দ্রষ্টব্য : *তফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন*, পৃষ্ঠা ৫৫৩)।

তাহলে সুরা তওবা ও সুরা আনফাল একই সুরার অংশ না-কী দুটি ভিন্ন সুরা তা অমীমাংসিত।

সুরা ফীল ও সুরা কোরাইশ নিয়েও রয়েছে এরকম বির্তক। তফসীর *মাআরেফুল ক্বোরআন*-এর ১৪৭৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে : "এ ব্যাপারে সব তফসীরকারকই একমত যে, অর্থ ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই সূরা (কোরাইশ) সূরা-ফীলের সাথেই সম্পৃক্ত। সম্ভবতঃ এ কারণেই কোন কোন মাসহাফে এ দু'টিকে একই সূরারূপে লেখা হয়েছিল। উভয় সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ লিখিত ছিল না। কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ) যখন তাঁর খেলাফতকালে কোরআনের সব মাসহাফ একত্রিত করে একটি কপিতে সংযোজিত করান এবং সাহাবায়ে-কেরামের তাতে ইজমা হয়, তখন তাতে এ দু'টি সূরাকে স্বতন্ত্র দু'টি সূরারূপে সন্নিবেশিত করা হয় এবং উভয়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করা হয়। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর তৈরি এ কপিকে 'ইমাম' বলা হয়।" অর্থাৎ সুরা ফীল ও সুরা কোরাইশ একই সুরা না-কী দুটি ভিন্ন সুরা তা নিয়ে অনেক সন্দেহের অবকাশ আছে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, কোরানের সুরা সংখ্যা যেমন হতে পারে ১১৪টি, তেমনি তা হতে পারে ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২ বা ১১৩টি এবং সবগুলোর পক্ষেই দৃঢ় প্রমাণ রয়েছে; এবং এগুলো কোনোটাই (১১৪ ব্যতীত) ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। তাই যারা কোরানের সুরা সংখ্যা ১১৪টি বলেন এবং একে স্থির ধরে শুধুমাত্র ১৯ দিয়ে বিভাজ্যতার কারণে এর পিছনে অলৌকিকত্ব খুঁজেন তাদের এ ধরনের অপচেষ্টার অসৎ উদ্দেশ্য বুঝতে কারও আর বাকি থাকে না।

কোরানের আয়াত সংখ্যা

দাবি : "কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬৩৪৬, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য (১৯×৩৩৪=৬৩৪৬) এবং এ সংখ্যাটির অঙ্কগুলোর যোগফল ১৯ (৬+৩+৪+৬=১৯)।"

মিশরীয় বংশোদ্ভূত রাশেদ খলিফার আবিস্কৃত 'উনিশ সংখ্যার মোজেযা'র অনেক একনিষ্ঠ অনুরাগী বাংলাদেশে আছেন। তাঁরা কেউবা 'কোরানিক ১৯ সংখ্যার' মিরাকলে আপ্লুত হয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন কোরানিক মিরাকল প্রচারের জন্য, কেউবা ওপেন চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন কোরানকে 'অলৌকিক' দাবি করে। বাংলাদেশে এরকম একজন অনুরাগী হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ। তিনি নিজেও কোরান বাংলাতে অনুবাদ করেছেন। আমরা হিসেব করে দেখেছি তাঁর অনূদিত কোরানে আয়াত সংখ্যা ৬২৩৭; যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের অনূদিত কোরানের সরল বঙ্গানুবাদেও একই সংখ্যক আয়াত রয়েছে। ইউসুফ আলীর অনূদিত কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬২৩৯। মুনির উদ্দীন কি জানতেন রাশেদ খলিফা কোরানের নিজস্ব অনুবাদের নবম সুরা তওবা'তে শেষের দুটি আয়াত (১২৮ ও ১২৯) কেটে বাদ দিয়েছেন? কারণ (তাঁর মতে) : "উক্ত আয়াত দুটি মিথ্যা। সুরা তওবা মদিনাতে নাযিল হয়েছিল আর ঐ শেষের আয়াত দুটি অনেক আগে মক্কায় থাকতে বলা হয়েছিল। তাহলে এই আয়াত দুটি সুরা তওবার শেষে গেল কিভাবে? আবার এই আয়াতের সাক্ষী হিসেবে দুজনের কথা জানা যায়, যারা তেমন বিশ্বাসযোগ্য নন।"[৩৫] ইউসুফ আলী, পিকথাল, শাকীরসহ স্বনামধন্য কোরানের ইংরেজি অনুবাদক সুরার তওবা'র আয়াত সংখ্যা ১২৯ দিয়েছেন। তাদের অনূদিত আয়াত দুটি নীচে তুলে দেওয়া হলো[৩৬] :

009.128

YUSUFALI: Now hath come unto you a Messenger from amongst yourselves: it grieves him that ye should perish: ardently anxious is he over you: to the Believers is he most kind and merciful.

PICKTHAL: There hath come unto you a messenger, (one) of yourselves, unto whom aught that ye are overburdened is grievous, full of concern for you, for the believers full of pity, merciful.

SHAKIR: Certainly a Messenger has come to you from among yourselves; grievous to him is your falling into distress, excessively solicitous respecting you; to the believers (he is) compassionate,

009.129
YUSUFALI: But if they turn away, Say: "Allah sufficeth me: there is no god but He: On Him is my trust,- He the Lord of the Throne (of Glory) Supreme!"

PICKTHAL: Now, if they turn away (O Muhammad) say: Allah sufficeth me. There is no Allah save Him. In Him have I put my trust, and He is Lord of the Tremendous Throne.

SHAKIR: But if they turn back, say: Allah is sufficient for me, there is no god but He; on Him do I rely, and He is the Lord of mighty power.

রাশেদ খলিফার অনূদিত কোরানে নবম সুরা তওবা'র আয়াত সংখ্যা ১২৭টি।[৩৭] হাফেজ মুনির উদ্দীনের কোরানেও সুরা তওবার শেষের আয়াত দুটি আছে : "(১২৮) (হে মানুষ,) তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে এক রসূল এসেছে, তোমাদের কোনরকম কষ্ট ভোগ তার কাছে দুঃসহ, সে তোমাদের একান্ত কল্যাণকামী, ঈমানদারদের প্রতি সে হচ্ছে স্নেহপরায়ণ ও পরম দয়ালু। (১২৯) এরপরও যদি এরা (এমন কল্যাণকামী একজন রসূলের কাছ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তুমি (তাদের খোলাখুলি) বলে দাও, আল্লাহতায়ালাই আমার জন্যে যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই; (সমস্যায় সংকটে) আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি এবং তিনিই হচ্ছেন মহান আরশের একচ্ছত্র অধিপতি।"

রাশেদ খলিফা যে কোরানকে 'আল্লাহর বাণী' বলে দাবি করলেন এবং সেই কোরানই তাঁর মতে মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। তাই বিকৃতি থেকে উদ্ধারের জন্য দুটি আয়াত কেটে কমিয়ে নিজেই নতুন করে ইচ্ছে মত কোরান অনুবাদ করছেন। পনেরশত বছর পর এই ধরনের অভিযানের শুদ্ধতা-উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠতে পারে। তবে মূলে যে রহস্য লুকিয়ে রয়েছে তা হল এ রকম না হলে কোরানের অলৌকিকতা, '১৯ মিরাকল' দেখানো যাচ্ছে না।

[৩৫] http://www.submission.org/false-verses.html
[৩৬] http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/quran/
[৩৭] http://www.submission.org/suras/sura9.html

হাফেজ মুনির উদ্দীন কোরানে আয়াত সংখ্যার যে হিসাব দিয়েছেন, তা হলো : "হজরত আয়েশা (রা.)-এর মতে ৬৬৬৬, হজরত ওসমান (রা.)-এর মতে ৬২৫০, হজরত আলী (রা.)-এর মতে ৬২৩৬, হজরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে ৬২১৮, মক্কার গণনা মতে ৬২১২, বসরার গণনা মতে ৬২২৬, ইরাকের গণনা মতে ৬২১৪। ঐতিহাসিকদের মতে হজরত আয়েশার (রা.) গণনাই বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।" (দ্রষ্টব্য : *কোরআন শরীফ: সহজ সরল বাংলা অনুবাদ*, পৃষ্ঠা ১১)।

দেখা যাচ্ছে কোথাও (রাশেদ খলিফা প্রদত্ত) কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬৩৪৬ বলা হয় নাই।

এ. বি. এম. আব্দুল মান্নান মিয়া ও আহমদ আবুল কালাম কোরানের আয়াত সংখ্যার বিষয়ে যে অভিমত দিয়েছেন তা এরকম[৩৮] : "কোরানের আয়াত সংখ্যা ছয় হাজারের মত। শায়খ আদ-দানী (রা.) বলেছেন, মুসলিম উম্মাহ একমত যে কোরানের আয়াত সংখ্যা মোটামুটি ছয় হাজারের মত। তবে তাঁদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে এই ছয় হাজারের পরে কত সংখ্যা বেশি আছে তা নিয়ে। এ বিষয়ে ছয়টি মত পাওয়া যায় :

১. পূর্ণ ছয় হাজার; না বেশি, না কম।
২. ৬ হাজার ২শত ৪টি।
৩. ৬ হাজার ২শত ১৪টি।
৪. ৬ হাজার ২শত ১৯টি।
৫. ৬ হাজার ২শত ২৫টি।
৬. ৬ হাজার ২শত ৩৬টি।

এ বিষয়ে আরও কয়েকটি মত পাওয়া যায়। যথা—
৭. মুসনাদ দায়লামীর এক বর্ণনায় আছে কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬ হাজার ২শত ১৬টি।
৮. ইবনুদ দুরীস (রা.)-এর এক বর্ণনায় জানা যায় কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬ হাজার ৬শত।
৯. আমাদের দেশে ও অন্যান্য মুসলিম বিশ্বে বহুল প্রচলিত কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬ হাজার ৬শত ৬৬টি।

কোরানের আয়াত সংখ্যা নির্ণয়ে এ মতবিরোধ খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। একটি উদাহরণের মধ্য দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠবে। সুরা ফাতিহার আয়াত সংখ্যা সাধারণভাবে গণ্য করা হয় ৭টি। কিন্তু ইমাম হাসান (রা.)-এর মতে আয়াত সংখ্যা ৮টি। তিনি 'বিসমিল্লাহ'-কেও একটি আয়াত গণ্য করেছেন। আবার কারও কারও মতে সুরা ফাতিহার আয়াত সংখ্যা ৬টি। এ মতানুযায়ী ৬ ও ৭ আয়াতদ্বয় মিলে এক আয়াত এবং বিসমিল্লাহ আয়াত নয়। আবার কার কারও মতে সুরা ফাতিহার আয়াত সংখ্যা ৯টি।

তবে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত কোরানের প্রতিটি সুরার প্রারম্ভে প্রতিটি সুরার যে আয়াত সংখ্যা উল্লেখিত আছে তা এক সঙ্গে যোগ করা হলে মোট আয়াত সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২৩৬টি আর 'বিসমিল্লাহ'-কে প্রতিটি সুরার এক একটি আয়াত গণ্য করা হলে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২৩৬+১১৩ = ৬৩৪৯টি।"

পৃথিবীর এতো জ্ঞানী-গুণী ইসলামি পণ্ডিত থেকে শুরু করে আলেম-ওলামা-মাওলানা কেউই কোরানের আয়াত সংখ্যা ৬৩৪৬ বলেননি। যা রাশেদ খলিফা 'কোরানের মিরাকল' প্রমাণের জন্য উপস্থাপন করেছেন। আমরা কি বলতে পারি রাশেদ খলিফা সম্পূর্ণ স্বীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য অযৌক্তিকভাবে কোরানের আয়াত সংখ্যার মনগড়া হিসাব দাখিল করেছেন; যেমন করে তিনি নিজের অনূদিত কোরানের সুরা ফুরকানের ৫৬ নম্বর আয়াত, সুরা ইয়াসিনের ৩ নম্বর আয়াত, সুরা শুরা'র ২৪ নম্বর আয়াতে এবং সুরা তাক্‌ভির'র ২২ নম্বর আয়াতে ব্রাকেটে নিজের নাম 'রাশেদ' ঢুকিয়ে দিয়েছেন নিজেকে 'রসুল' হিসেবে প্রমাণের জন্য। দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন, বাংলাদেশে মেজর জাহান মিয়া, হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদের মত ইসলামি পণ্ডিতরা কি বহুল প্রচলিত কোরানের আয়াত সংখ্যার সাথে রাশেদ খলিফা কৃত কোরানের আয়াত সংখ্যার গরমিল বা আয়াত কেটে কমিয়ে দেওয়া সম্পর্কে অবগত ছিলেন না? অবগত থাকলে, তবে কেন এই ধরনের গরমিল নিয়ে 'কোরানের মিরাকল' প্রমাণের অপচেষ্টায় সামিল হলেন? আবার জানা না

[৩৮] এ. বি. এম. আব্দুল মান্নান মিয়া ও আহমদ আবুল কালাম, *উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা*, দ্বিতীয় পত্র, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৫, পৃষ্ঠা নম্বর ১৮-১৯।

থাকলে, কোনো ব্যক্তির 'মিরাকল থিওরি' নিয়ে নিজেই পূর্ণ তথ্য না জেনে কি কারণে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছেন? অর্থাৎ 'মিরাকল-ফেরিওয়ালা'র মত তাঁরাও এর দায়ভার এড়াতে পারেন না।

কোরানে 'বিসমিল্লাহ' ও তার বর্ণ সংখ্যা

দাবি : "কোরানে 'বিসমিল্লাহ' ১১৪ বার এসেছে যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হয়। এছাড়া 'বিসমিল্লাহ'-তে ১৯টি বর্ণ রয়েছে।"

বর্তমানে কোরানে যুক্ত জের-জবর-পেশ-তাশদীদ-মদ ইত্যাদি মুহাম্মদের কোরানে অস্তিত্ব ছিল না। হজরত ওসমান কর্তৃক সংকলিত-সম্পাদিত কোরানেও সমরূপ ব্যঞ্জনবর্ণকে আলাদা করে পাঠ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। স্বরবর্ণের ব্যবহার ছিল না। সকলেই জানেন, আরবি বর্ণমালায় ২৯টি বর্ণ রয়েছে; এর মধ্যে ২৬টি বর্ণ বর্তমানে ব্যঞ্জনবর্ণ রূপে গণনা করা হয় এবং বাকি তিনটি বর্ণ (আলিফ, ওয়াও, ইয়া) স্বরবর্ণ হিসেবে গণনা করা হয়। কিন্তু স্বরবর্ণ তিনটি প্রথমে ব্যঞ্জনবর্ণরূপেই ধরা হত; পরে 'আলিফ, ওয়াও, ইয়া' তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালেকের (মৃত ৭০৫) সময় গভর্নর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কোরানের পঠন-লিখনের এ সমস্যা দূর করার জন্য প্রথম ইরাকের বসরা নগরীর সুফি পণ্ডিত হাসানকে অনুরোধ করেন। হাসান জনৈক বসরাবাসী ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ামারকে নিয়োগ করেন। ইয়াহিয়াই প্রথমে সিরিয়ান ভাষায় ব্যবহৃত স্বরচিহ্ন এবং নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রচলিত ডট পদ্ধতির ব্যবহার আরবি বর্ণলিপিতে শুরু করেন; হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরবর্ণের পার্থক্য, যুক্ত-ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ, ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে যে সমরূপতা ছিল তার পার্থক্য ও শব্দ নির্ধারণ করেন। এরপর ধীরে ধীরে একটি বাক্যে শব্দের মধ্যে বিভক্তি, কমা, পূর্ণ ছেদ, সেমিকোলন, কোলন ইত্যাদি বিরামচিহ্ন ব্যবহার শুরু হয়। কিন্তু আরবি বর্ণলিপি বা লিখন পদ্ধতিতে এই নতুন জিনিস আমদানি সর্বজন কর্তৃক গৃহীত হয়নি। কট্টরপন্থীদের আপত্তি ছিল ঐসব ডট ও স্বরচিহ্ন পবিত্র কোরানের ওহি নয়, এগুলো বিধর্মীদের তৈরি। বিখ্যাত সুন্নি নেতা মালিক ইবনে আনাস (মৃত ৭৯৫) মসজিদে এই 'সংশোধিত কোরান' নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। স্থানীয় আলেম-ওলামা, বাদশাহ একমত হয়ে বললেন, পূর্বের 'চিহ্নহীন' কোরানই থাকুক যেমন সিনাগগে (ইহুদিদের উপাসনালয়) তোরাহ রয়েছে। ইহুদি থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান মনীষী হারুন ইবনে মুসা (মৃত ৮১৩) সর্বপ্রথম আরবি শব্দ ভাণ্ডার প্রস্তুত করেন। এরপর পুনরায় আব্বাসীয় খলিফা ইবনে মুজাহিদ (মৃত ৯৩৬) কোরানের পঠন পদ্ধতি, উচ্চারণ, বিরাম চিহ্ন ইত্যাদির ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত বলে স্বীকৃতি প্রদান করেন। কিন্তু এই গোলমেলে পরিস্থিতির এখনো পূর্ণ সমাধান হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তুরস্কের ইস্তাম্বুল ও মিশরের কায়রো থেকে প্রকাশিত কোরানের আবৃত্তি পদ্ধতি মোটামুটি সর্বজনসম্মত হলেও স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের পঠন পার্থক্য আগের মতোই রয়ে গেছে।[৩৯]

এবার মূল আলোচনায় যাই। 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' অর্থ 'পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।' স্পষ্টই এ কথাটি একজন মানুষ বলবে, আল্লাহ নয়; কারণ মুসলমানরা কোরানকে আল্লাহর বাণী বলে মনে করেন। তাই 'বিসমিল্লাহ' কোরানের অংশ হতে পারে না। অনেকে মনে করেন, 'বিসমিল্লাহ' কোরানের অংশ না হলেও হজরত মুহাম্মদ কোরান পাঠের আগে বা নির্দিষ্ট অংশ শুরু করার আগে 'বিসমিল্লাহ' বলতেন, যা সাহাবিরা অনুসরণ করতেন। ফলে এই 'বিসমিল্লাহ' শব্দটি কোরানের সাথে জড়িয়ে পড়ে। আর 'বিসমিল্লাহ'-এর অর্থ যেহেতু 'পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি', তাই এর দ্বারা বোঝা যায় কোরান পাঠ এখনো শুরু হয় নাই, 'বিসমিল্লাহ' এর পরই তা শুরু হতে যাচ্ছে।

তফসীর 'মাআরেফুল ক্বোরআন'-এ বলা হয়েছে : "'বিসমিল্লাহ' কোরান শরিফের সূরা নামলের একটি আয়াত বা অংশ। সূরা তওবা ব্যতীত প্রত্যেক সূরার প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' লেখা হয়। 'বিসমিল্লাহ' সূরা আল-ফাতিহার অংশ, না অন্যান্য সকল সূরারই অংশ, এতে ইমামগণ ভিন্নভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) বলেছেন, 'বিসমিল্লাহ' সুরা নামল ব্যতীত অন্য কোন সূরার অংশ নয়।" (পৃষ্ঠা ২)।

আমরা পূর্বের আলোচনা থেকে দেখেছি সুরার সংখ্যা ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩ বা ১১৪ এর মধ্যে যে কোনোটিকেই ধরে নেয়া যেতে পারে। সুরা 'তওবা' বাদে বাকি সুরার প্রারম্ভের 'বিসমিল্লাহ' বিবেচনায় আনলে এবং এর সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে সুরা নমলের ৩০ তম আয়াতে উল্লেখকৃত 'বিসমিল্লাহ'-কে যোগ করলে আমরা মোট 'বিসমিল্লাহ'র সংখ্যা যেমন পেতে পারি ১১৪টি, তেমনি ১১০, ১১১, ১১২ ও ১১৩টিও পেতে পারি, যাদের কোনোটিই (১১৪ বাদে) ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

[৩৯] Benjamin Walker, *Foundations of Islam: The Making of a World Faith*, Rupa & Co, New Delhi, 2004, Page 158-159.

তাই কোরানে 'বিসমিল্লাহ' ১১৪ বার আছে এবং একে স্থির বলে ধরে নিয়ে তার মাঝে 'মোজেযা' খোঁজা শুধু অযৌক্তিক নয়, হাস্যকরও বটে।

ইসলামি ভাষ্য মতে, 'কোরান আল্লাহর কাছ থেকে জিব্রাইল মারফত অথবা অন্য কোনো উপায়ে মৌখিকভাবে নাজিল হয়েছে, কোনো লিখিত দলিল আল্লাহর কাছ থেকে আসেনি।' তাই কোরানের কোনো একটি বাক্যে কতটি বর্ণ আছে তা হিসেব করতে হলে মৌখিকভাবে উচ্চারিত বর্ণগুলো হিসেবে আনতে হবে, উহ্য যেসব বর্ণ লেখার সময় আসে, সেগুলো হিসেবে আনা ঠিক হবে না। যাহোক, এভাবে হিসেব করলে 'বিসমিল্লাহ'র বর্ণ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩টি। যেসব বর্ণ (যেমন) দুবার উচ্চারিত হয়েছে (তাশদীদযুক্ত হরফ) সেগুলোকে দুবার গণনা করলে দাঁড়ায় ১৬টি। খাড়া জবর যা আলিফের প্রতিনিধিত্ব করে তা হিসেবে আনলে মোট বর্ণ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮টি।

এবার 'বিসমিল্লাহ'র লিখিত রূপটিও যদি বিবেচনায় আনা যায় তবে তাশদীদযুক্ত হরফ যেহেতু দুবার উচ্চারিত হয় তাই এগুলোকে দুইবার উল্লেখিত ধরলে 'বিসমিল্লাহ'র মোট বর্ণ সংখ্যা হয় ২২টি। সেই খাড়া জবরদ্বয় যা আলিফের প্রতিনিধিত্ব করে তা হিসেব করলে মোট বর্ণের সংখ্যা হয় ২৪টি (যেহেতু বিসমিল্লায় তাশদীদযুক্ত লামের পূর্বে একটি উহ্য লাম রয়েছে তাই তাশদীদযুক্ত লামকে একবার গণনা করলে হিসাবটি দাঁড়ায় যথাক্রমে ২১ ও ২৩); আর এক্ষেত্রে তাশদীদযুক্ত হরফগুলো একবার গণনা করলে দাঁড়ায় ২১টি। আর যদি আমরা তাশদীদযুক্ত হরফগুলোকে একবার গণনা করি আর খাড়া জবরকে বিবেচনায় না আনি এবং উচ্চারণে উহ্য বর্ণগুলোকেও হিসেবে আনি তবেই কেবল 'বিসমিল্লাহ'র মোট বর্ণ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯। তাই এ হিসেবকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার কিছুই নেই।

এখানে আরেকটি কথা গুরুত্বপূর্ণ, আরবি ভাষার বর্ণসংখ্যা গণনা পদ্ধতি ও লেখার পদ্ধতি নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে যার ফলে কোরানের বর্ণ সংখ্যার হিসাব সম্পর্কে কখনোই নিশ্চিত হওয়া যায় না। কোরান বিশেষজ্ঞরা কোরানের বর্ণ সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে খুবই দ্বিধাবিভক্ত।

রাশেদ খলিফা শুধু 'বিসমিল্লাহ'র বর্ণ সংখ্যার মধ্যে অলৌকিকতা খোঁজার চেষ্টা করেননি, 'বিসমিল্লাহ'র অন্তর্ভূক্ত শব্দগুলোর মধ্যে অলৌকিকতা খোঁজে পেয়েছেন। তিনি বলেন : "কোরানে 'ইসম' শব্দটি ১৯ বার, 'আল্লাহ' শব্দ ২৬৯৮ বার, 'আর রাহমান' শব্দ ৫৭ বার এবং 'আর রাহিম' ১১৪ বার রয়েছে যাদের সবগুলোই ১৯ দিয়ে বিভাজ্য।"

১৯৮৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার '*The Muslim Digest*' (জুলাই-অক্টোবর সংখ্যা) পত্রিকা রাশেদ খলিফার 'গাণিতিক চালাকি'কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে 'অনিষ্টকর উৎপথগামী' (sinister heretic) বলে মন্তব্য করেছে। তারা বলছেন : "রাশেদ খলিফার দাবি মতো কোরানে 'আল্লাহ' শব্দের সংখ্যা ২৬৯৮ নয়, এটি ২,৮১১ বার; আর-রাহমান ৫৭ বার নয় বরং এটি ১৬৯ বার এসেছে।" পূর্বেও ঐ পত্রিকা (জুলাই/আগস্ট, ১৯৮১ এবং মার্চ/এপ্রিল, ১৯৮২ সংখ্যা) রাশেদ খলিফার কোরান নিয়ে ভুলভাবে 'মিরাকল' উপস্থাপনের জন্য সমালোচনা করেছে।

কোরানে 'বিসম' শব্দটি ৩ বার, আলাদাভাবে 'ইসম' শব্দটি ১৯ বার এবং 'ইসমুহু' শব্দটি এসেছে ৫ বার। তাই 'ইসম' মোট ২৭ বার। বহুবচনরূপে 'ইসম' শব্দটি এসেছে ১২ বার; অর্থাৎ মোট ৩৯ বার 'ইসম' শব্দটি কোরানে এসেছে যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। 'বিসম' ও 'ইসমুহু'-এর সাথের 'ইসম' শব্দটি রাশেদ খলিফা তাঁর '১৯ মিরাকল'-এ হিসেব করেননি অথচ 'লিল্লাহ'-তে অন্তর্ভূক্ত 'আল্লাহ' শব্দটি হিসেব করেছেন। কিন্তু কেন? কারণ এটি না করলে তাঁর '১৯ মিরাকল'-এর মিরাকল আর থাকছে না। আবার 'আর রাহিম' শব্দটি কোরানে ১১৪ বার রয়েছে, সেটি সত্য নয়। 'আর রাহিম' কোরানে এসেছে মোট ১১৬ বার (একবার বহুবচনে) যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।[৪০]

কোরানের বর্ণ ও শব্দ সংখ্যা

দাবি : কোরানের সর্বমোট বর্ণসংখ্যা ৩২৯১৫৬, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য (১৯×১৭৩২৪=৩২৯১৫৬)।

[৪০] William Campbell, *A Numeric Miracle of the Number 19?*, http://answering-islam.org.uk/Campbell/s6c1.html

"সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবুদাল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-ও কোরআনের অক্ষর গণনা করেছেন বলে অনেকে মনে করেন। তাঁর গণনা মতে কোরআনের অক্ষর হচ্ছে ৩,২২,৬৭১। তাবেয়ীদের মাঝে মোজাহেদ (র.)-এর গণনা অনুযায়ী কোরআনের অক্ষর হচ্ছে ৩,২১,১২১। তবে সাধারণভাবে ৩,২০,২৬৭ সংখ্যাটিই বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।" (দ্রষ্টব্য : *কোরআন শরীফ: সহজ সরল বাংলা অনুবাদ*, পৃষ্ঠা ১১)। উল্লেখিত কোরানের তিনটি বর্ণ সংখ্যার কোনোটিই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। আর সাহাবায়ে কেরামরা কেউই রাশেদ খলিফা প্রদত্ত কোরানের বর্ণসংখ্যার হিসেব দেননি। এখন কোরানের বর্ণসংখ্যা নিয়ে কোন দাবিটি (রাশেদ খলিফার হিসেবকৃত বর্ণসংখ্যা ও হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদের উল্লেখিত সাহাবায়ে কেরামের বর্ণ সংখ্যা) সঠিক? বিচারের ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দেওয়া হল।

আবার হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রচিত *বয়ানুল কুরআন*-এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ-এ কোরানের সর্বমোট বর্ণসংখ্যা ৩২১২৫০ উল্লেখ করা হয়েছে। যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। (দ্রষ্টব্য : *ছহীহ্ রহমানী বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ*, পৃষ্ঠা ২১)।

আমাদের জানা মতে রাশেদ খলিফা যদিও কোরানের সর্বমোট শব্দ সংখ্যার মধ্যে কোনো অলৌকিকত্ব দাবি করেননি, কিন্তু প্রাসঙ্গিক বিধায় কোরানের শব্দ সংখ্যা ও বিভিন্ন অক্ষর সংখ্যা নিয়ে প্রখ্যাত ইসলামি বুজুর্গদের মতামত তুলে দেওয়া হল :

কোরানের শব্দ সংখ্যা

সাহাবায়ে কেরামরা তাদের যুগে কোরানের শব্দ সংখ্যাও নির্ণয় করেছিলেন। কিন্তু এ সম্পর্কে সরাসরি তাদের সাথে সম্পৃক্ত কোন রেওয়াত পাওয়া যায় না। যা কিছু আছে সবই পরবর্তীকালের। হুমায়দা আযরাজের গণনা অনুযায়ী কোরানের শব্দ সংখ্যা ৭৬,৪৩০, আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহর গণনা মোতাবেক ৭০৪৩৯, মোজাহেদের গণনা মোতাবেক ৭৬২৫০, তবে যে সংখ্যাটি সাধারণভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা হচ্ছে ৮৬৪৩০। (দ্রষ্টব্য : *কোরআন শরীফ: সহজ সরল বাংলা অনুবাদ*, পৃষ্ঠা ১১)। এখানের কোনটিই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

বয়ানুল কুরআন-এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ-এ কোরানের সর্বমোট শব্দসংখ্যা ৮৬,৪৩০ উল্লেখ করা হয়েছে। (দ্রষ্টব্য : *ছহীহ্ রহমানী বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ*, পৃষ্ঠা ২১)। যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

এ. বি. এম. আব্দুল মান্নান মিয়া ও আহমদ আবুল কালাম বলেন : কুরআনের শব্দ সংখ্যা কত সে বিষয়ে তিনটি মত পাওয়া যায়। যথা-

১. ৭৭৯৩৪ (সাত্তাতর হাজার নয়শত চৌত্রিশটি)
২. ৭৭৪৩৭ (সাত্তাতর হাজার চারশত সাঁইত্রিশটি)
৩. ৭৭২৭৭ (সাত্তাতর হাজার দু'শত সাত্তাতরটি)

কুরআনের হরফ সংখ্যাও এক কথায় নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে শায়খ ইবনুদ দুয়ীস (র)-এর এক বর্ণনায় জানা যায়, কুরআনের সর্বমোট হরফ সংখ্যা হচ্ছে ৩২৩৬৭১ (তিন লক্ষ তেইশ হাজার ছয়শত একাত্তরটি)। (দ্রষ্টব্য : *উচ্চ মাধ্যমিক ইসলাম শিক্ষা*, দ্বিতীয় পত্র, পৃষ্ঠা ১৯)। উল্লেখিত সংখ্যার কোনোটিই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

কোরানে বিভিন্ন অক্ষরের সংখ্যা

আরবি ভাষার ২৯টি বর্ণ দিয়ে কোরান রচিত। কোরানে উল্লেখিত এই ২৯টি অক্ষরের পরিসংখ্যান হাফেজ মুনির উদ্দীনের অনূদিত কোরান থেকে তুলে ধরা হল : আলিফ ৪৮৮৭২, বা ১১৪২৮, তা ১১৯৯, ছা ১২৭৬, জীম ৩২৭৩, হা ৯৭৩, খা ২৪১৬, দাল ৫৬০২, যাল ৪৬৭৭, রা ১১৭৯৩, যা ১৫৯০, সীন ৫৯৯১, শীন ২১১৫, ছোয়াদ ২০১২, দোয়াদ ১৩০৭, তোয়া ১২৭৭, যোয়া ৮৪২, আঈন ৯২২০, গাঈন ২২০৮, ফা ৮৪৯৯, ক্বাফ ৬৮১৩, কাফ ৯৫০০, লাম ২৪৩২, মীম ৩৬৫৩৫, নূন ৪০১৯০, ওয়াও ২৫৫৪৬, হা ১৯০৭০, লাম-আলিফ ৩৭৭০, ইয়া ৪৫৯১৯। (দ্রষ্টব্য : *কোরআন শরীফ: সহজ সরল বাংলা অনুবাদ*, পৃষ্ঠা ১১)। এখানে উল্লেখিত ২৯টি অক্ষরের মধ্যে কাফ ও লাম-এর সংখ্যা বাদে আর কোনটিই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

হযরত আশরাফ আলী থানভী'র *বয়ানুল কুরআন*-এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদে কোরানের ২৯টি অক্ষরের যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তা নীচে তুলে ধরা হল :

আলিফ ৪৮৮৭১, বা ১১৪২৮, তা ১১৯৯, ছা ১২৭৬, জীম ৩২৭২, হা ৯৭৩, খা ২৪১৬, দাল ৫৬৪২, যাল ৪১৯৭, রা ১১৭৯৩, যা ১৫৯০, সীন ৫৮৫১, শীন ৩২৫৩, সোয়াদ ২০১৩, দ্বোয়াদ ১৬০৭, ত্বোয়া ১২৭৪, যোয়া ৮৪২, আইন ১৪১০০, গাইন ২২০৮, ফা ৪৪৯৯, ক্বাফ ৬৮১৩, কাফ ৯৫২৩, লাম ৩৪১২, মীম ২৬৫৩৫, নূন ২৬৫৬০, ওয়াও ২৬৫৩৬, হা ১৯০৭০, লাম-আলিফ ৩৭২০, ইয়া ৩৫৯১৯। (দ্রষ্টব্য : *ছহীহ্ রহমানী বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ*, পৃষ্ঠা ২১)। এখানের কোনোটিই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

কোরানে 'আল্লাহ' শব্দটির সংখ্যা

দাবি : কোরানে 'আল্লাহ' শব্দটি ২৬৯৮ বার উল্লেখিত হয়েছে যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য (১৯×১৪২=২৬৯৮)। এছাড়া 'আল্লাহ' উল্লেখ আছে এমন আয়াতগুলোর আয়াত নম্বর যোগ করলে যোগফল হয় ১১৮১২৩, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য (১৯×৬২১৭=১১৮১২৩)।

আমরা জানি, রাশেদ খলিফা ৯ নম্বর সুরা তওবার শেষের দুটি আয়াত (১২৮ ও ১২৯) 'মিথ্যা' দাবি করে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। অথচ সুরা তওবার শেষ আয়াতে 'আল্লাহ' শব্দটি রয়েছে। সুতরাং হিসাবটির কি অবস্থা দাঁড়ালো তা সহজেই অনুমেয়।

সুরা আলাক

দাবি : প্রথম নাযিলকৃত সুরা আলাককের আয়াত সংখ্যা ১৯। কোরানের পেছন দিক থেকে গণনা করলে তার ক্রমিক নম্বর হয় ১৯। এছাড়া সুরাটির সর্বমোট আরবি বর্ণসংখ্যা ৩০৪ (১৯×১৬)। সুরাটির প্রথম পাঁচটি আয়াতে বর্ণসংখ্যা ৭৬ (১৯×৪) এবং শব্দ সংখ্যা ১৯টি।

সুরা নাস ও সুরা ফালাক নিয়ে মতানৈক্যের কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে ইসলামি পণ্ডিতদের গ্রন্থ থেকে, সে হিসেবে ৯৬ নম্বর সুরা আলাক কোরানের পেছনের দিক থেকে ১৯ নং সুরা নাও হতে পারে। আবার প্রশ্ন হচ্ছে, কেন পেছনের দিক থেকে গণনা করতে হবে? কেন সামনের দিক থেকে নয়? মিলে যায় বলে? পেছনের দিকটি কি কোনো বিশেষ কারণে আল্লাহর (কিংবা রাশেদ খলিফার) কাছে বেশি প্রিয়? সুরাটির সর্বমোট বর্ণসংখ্যা এবং প্রথম পাঁচটি আয়াতের বর্ণ সংখ্যা ও শব্দ সংখ্যা রাশেদ খলিফা ঠিক কিভাবে-কোন পদ্ধতিতে গণনা করেছেন, তা খুব পরিষ্কার নয়। রহস্যজনক ব্যাপার হচ্ছে সুরাটির সর্বমোট বর্ণসংখ্যা, প্রথম পাঁচটি আয়াতের বর্ণসংখ্যা ও শব্দ সংখ্যাকে ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য দাবি করলেও সবগুলো আয়াতের সর্বমোট শব্দ সংখ্যা ১৯ মিরাকলের বিবেচনায় আনেননি। কারণ এখানে ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্যতার দাবি করা যাচ্ছে না। আবার সুরা আলাকের আয়াত সংখ্যা ১৯টি ধরেছেন; অথচ রাশেদ খলিফার সাধের 'বিসমিল্লাহ'কে আয়াত হিসেবে ধরলে আয়াত সংখ্যা দাঁড়ায় ২০টি।

সুরা নাসর

দাবি : সুরা নাসর কোরানের সর্বশেষ নাযিলকৃত ওহি। সুরাটির প্রথম আয়াতে ১৯টি বর্ণ রয়েছে।

এ বিষয়ে বেশ কিছু ভিন্নমত রয়েছে, যেমন :

১. সুরা নাসর কোরানের সর্বশেষ ওহি বলে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

২. সুরাটি প্রথম আয়াতে আলিফের প্রতিনিধিত্বকারী খাড়া, যবর ও তাশদীদ রয়েছে যা বর্ণ গণনার সময় 'বিসমিল্লাহ'র মতো একই সমস্যার সৃষ্টি করে।

৩. সুরা নাসর যদি সর্বশেষ ওহি হয় তবে নিয়ম অনুযায়ী এই সুরার সর্বশেষ আয়াতটির বর্ণসংখ্যা বিবেচনায় নেওয়ার কথা। এছাড়া রাশেদ সুরাটির সর্বমোট বর্ণসংখ্যাও বিবেচনায় আনতে পারতেন। কিন্তু কেন তা করেননি, তা বুঝতে বুদ্ধিমান পাঠকের কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

৪. কোরানের সর্বশেষ সংযুক্ত সুরা 'সুরা নাস'-এ ধরনের বিভাজ্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না কেন?

হরুফে মুকাত্তাত

রাশেদ খলিফা হরুফে মুকাত্তাত বা কিছু সুরার প্রারম্ভে উল্লেখিত বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলোকে নিয়ে পূর্বের মতই অলৌকিকতার জাল বুনেছেন। এক্ষেত্রেও ১৯ সংখ্যা দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্যতার প্রমাণের জন্য রীতিমতো নিজের মনগড়া হিসাবের আশ্রয় নিয়েছেন। অহেতুক লেখাটির কলেবর না বাড়িয়ে উৎসাহী পাঠকদের অনুরোধ করবো রাশেদ খলিফা হরুফে মুকাত্তাতগুলো সম্পর্কিত যে হিসেব দিয়েছেন, তা নিজেরাই একটু যাচাই করে দেখুন, এর অন্তঃসারশূন্যতা সহজেই প্রতীয়মান হয়ে পড়বে। প্রথমেই একটি মজার বিষয় লক্ষ্য করবেন রাশেদ খলিফা ২৯টি সুরার প্রারম্ভে হরুফে মুকাত্তাত রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, অথচ ২৯ সংখ্যাটিই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

হরুফে মুকাত্তাতযুক্ত ২৯টি সুরার বেশিরভাগই মাদানি সুরা, যাকে (হরুফে মুকাত্তাত) সুরার মূল অংশ বলে ধরা হয় না। বলা হয়ে থাকে এগুলো যুক্ত হয়েছে সম্পাদনার সময়। অর্থহীন হরুফে মুকাত্তাতগুলোর মাহাত্ম্য অজানা, অর্থ সম্বন্ধে সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না এবং 'অতীন্দ্রিয় ও অবাস্তব' দাবি করে অযথাই রহস্যের জাল তৈরি করা হয়েছে। মুসলিম মনীষীরা হরুফে মুকাত্তাতের ব্যাখ্যা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত। ইবনে সিনা, সুয়ুতি, ইবনে খালেদুন, আল-জামাখশারি, আল-বাদাবী প্রমুখ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিত্বরা এ ব্যাপারে তাঁদের মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা সুয়ুতি বলেন : আল-কোরানের ১৯ নম্বর সুরা মরিয়মের প্রারম্ভে ব্যবহৃত 'কাফ্-হা-ইয়া-আইন-সা'দ' অক্ষরগুলো আল্লাহর পাঁচটি গুণাবলীকে প্রকাশ করছে; যেমন কাফ্ (ك) অক্ষরটি করিম (সদয়), হা (ه) অক্ষরটি হাদী (পথপ্রদর্শক), ইয়া ( ) অক্ষরটি হাকিম (বিজ্ঞ), আইন (ع) অক্ষরটি আলিম (জ্ঞানী), এবং সোয়াদ (ص) অক্ষরটি সাদিক (ন্যায়নিষ্ঠ) বোঝাচ্ছে। তদ্রুপ ৭ নম্বর সুরা আল-আ'রাফ-এর প্রারম্ভে ব্যবহৃত 'আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ' দ্বারা বোঝায় 'আনাল্লাহু রাহমানুস্ সামাদ' (আমি আল্লাহ, দয়ালু ও চিরঞ্জীব)। আল-বাদাবী একই ধরনের মত পোষণ করে বলেন : "১৩ নম্বর সুরা আর্ রা'দ-এর প্রারম্ভে ব্যবহৃত 'আলিফ-লাম-মীম-রা' অক্ষর দ্বারা 'আনাল্লাহু আলিমু ওয়ারা' (আমি আল্লাহ সবজান্তা, সর্বদ্রষ্টা) বুঝিয়েছে। পাশাপাশি ইউরোপিয় কোরান-বিশ্লেষক যেমন এলয়স স্প্রেঙ্গার, থিওডোর নলডেক, হার্সফিল্ড, ওটো লথ, হ্যান্স বুয়ের প্রমুখ ব্যক্তিরাও কোরানের হরুফে মুকাত্তাত সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেছেন। ইউরোপিয় কোরান-বিশ্লেষকদের মধ্যে হার্সফিল্ড (Hartwig Hirschfeld) হরুফে মুকাত্তাত সম্পর্কে বলেন[৪১] : "সোয়াদ (ص) অক্ষরটি নবী মুহাম্মদ পত্নী হাফসার জন্য, নূন (ن) অক্ষরটি হজরত ওসমানের জন্য, মীম (م) অক্ষরটি আল মুগিরা, ত্বোয়া (ط) অক্ষরটি (হজরত আয়েশার ছোট বোনের স্বামী) তালহা ইত্যাদি। এরা সকলেই নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন কোরান সংকলনের সাথে।" অর্থাৎ হার্সফিল্ডের মতানুসারে কোরান সংকলনের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা কোরানের বিভিন্ন সুরার প্রথমে নিজেদের নামকে সাংকেতিক চিহ্নরূপে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। (দ্রষ্টব্য : *Foundations of Islam: The Making of a World Faith*, page 155-156)।

আমরা রাশেদ খলিফার '১৯ মিরাকল'-এর কয়েকটি মূল দাবি সম্পর্কে জানতে পারলাম। এ ধরনের আরও বেশ কিছু দাবি তিনি উত্থাপন করেছেন যা শুধুই তাঁর কৌশলী ধূর্ততা উন্মোচন করে। রাশেদ খলিফার এ ধরনের দাবি সম্পর্কে আরো কিছু কথা বলা প্রয়োজন।

১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়

রাশেদ খলিফা কোরানের সাথে সম্পর্কিত যেসব সংখ্যা কৌশলে ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য বলে চালিয়ে দেওয়া যায় সেগুলোকেই শুধু বিবেচনায় এনেছেন। কিন্তু কোরানের সাথে সম্পর্কিত এমন অনেক কিছু আছে যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয় অথচ হতে পারতো। নীচে এরকম কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হলো :

১. কোরানের রুকু সংখ্যা ৫৪০টি, ৩০টি পারা, ৭টি মঞ্জিল রয়েছে, যার কোনোটিই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।
২. কোরানের প্রতিটি সুরার আয়াত (যথা সুরা বাকারার আয়াত সংখ্যা ২৮৬, সুরা আল-ই-ইমরানের আয়াত সংখ্যা ২০০ ইত্যাদি), শব্দ ও বর্ণ সংখ্যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হতে পারত।
৩. বলা হয় কোরান ২৩ বছর ধরে অবতীর্ণ হয়েছে। ২৩ সংখ্যাটি ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।
৪. হজরত মুহাম্মদ ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন। এই ৪০ সংখ্যাটি ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।

[৪১] Aurthur Jeffery, *The Mystic Letters of the Koran*, http://www.answering-islam.org/Books/Jeffery/mystic_letters.htm.

৫. কোরানের প্রতিটি আয়াতের শব্দ ও বর্ণ সংখ্যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য হতে পারত।
৬. কোরানের যে আয়াতে ১৯ ম্যাজিকের কথা বলা হচ্ছে, তা হল ৭৪ নম্বর সুরা মুদ্দাচ্ছিরের ৩০ নম্বর আয়াত। এই ৭৪ এবং ৩০ সংখ্যাদ্বয় ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।
৭. কোরানের প্রতিটি বর্ণের আলাদা আলাদা সুনির্দিষ্ট সংখ্যা থাকতে পারত, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য।
৮. কোরানের সুনির্দিষ্ট সুরা সংখ্যা, আয়াত সংখ্যা, শব্দ-বর্ণ সংখ্যা থাকতে পারত, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য।

এরকম প্রচুর উদাহরণ রয়েছে যা কোরান বা ইসলামের সাথে সম্পর্কিত সংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।[৪২] ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্যতা যদি কোরানের অলৌকিকতার প্রমাণ হতে পারে তবে ১৯ দ্বারা অবিভাজ্যতা লৌকিকতার প্রমাণ হবে না কেন?

নিঃশেষে বিভাজ্যতা

আমাদের প্রয়োজনের কারণেই কখনো কখনো নিঃশেষে বিভাজ্যতাকে আমরা অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি; ধরা যাক, আমাদের কাছে ১০টি আম আছে এবং আমরা সংখ্যায় মোট পাঁচ জন। তাহলে সহজেই আমাদের সবার মধ্যে সমান ভাগে আম ভাগ করে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু আম যদি ১১টি হয়, তবে আমাদের পাঁচ জনের কাছে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া কিছুটা জটিল হয়ে পড়বে। অর্থাৎ নিঃশেষে বিভাজ্যতার কারণে যে সুবিধা পেয়ে থাকি প্রয়োজন পূরণের জন্য তা আমাদের দুর্বলতার কারণে। অনেক ক্ষেত্রে আবার নিঃশেষে বিভাজ্যতার কোনো প্রয়োজন হয় না, যেমন পানীয়ের ক্ষেত্রে। পানীয়কে আমরা ইচ্ছেমত সমানভাগে ভাগ করতে পারি। আরেকটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, ক্রমিক যে কোনো ১৯টি সংখ্যার মধ্যে একটি সংখ্যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হবে। তাই নিঃশেষে বিভাজ্যতার সাথে অলৌকিকতার যে কোনো সম্পর্ক নেই তা বুঝতে গভীর চিন্তার প্রয়োজন নেই।

আবার নিঃশেষে বিভাজ্যতাকে যদি কেউ অলৌকিক বলে দাবি করেন তবে অবিভাজ্যতাকে কেন অলৌকিক বলা যাবে না? যেমন কেউ বললো, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের (অধ্যায় সংখ্যা, পৃষ্ঠা সংখ্যা, বাক্য সংখ্যা, বর্ণ সংখ্যা ইত্যাদি) কোনো কিছুই ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য নয়, তাই গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ একটি 'অলৌকিক কাব্যগ্রন্থ'। তখন অলৌকিক-অন্বেষণকারীরা কি জবাব দিবেন?

কেন ১৯?

কোরানে ৭ আসমানের কথা আছে, ৬ দিনে বিশ্ব সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে ইত্যাদি কিন্তু রাশেদ খলিফা কোরানে এত সংখ্যা থাকতে কেন ১৯ সংখ্যাটিকে বেছে নিলেন তার একটি জবাব তিনি নিজেই দিয়েছেন, যদিও তা মোটেও সন্তুষজনক নয়। যেসব কারণ তিনি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, তার বেশ কতকগুলো পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। রাশেদ খলিফা প্রদত্ত আরো কয়েকটি কারণ নিয়ে আলোচনা করা যাক[৪৩] :

১। ১৯ একটি মৌলিক সংখ্যা।
> তাতে কি? মৌলিক সংখ্যা তো প্রচুর আছে, যেমন ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ২৩ ... ইত্যাদি। আর কোরানেও তো ১৯ ছাড়া আরো কয়েকটি মৌলিক সংখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়, যেমন ৭।

২। ১ ও ৯ অঙ্কদ্বয় পৃথিবীর সব ভাষায় একই রকম। অর্থাৎ ১ ও ৯-এর লিখিতরূপ পৃথিবীর সব ভাষায় একই।
> অলৌকিকতা অন্বেষণের এ ধরনের উছিলা একমাত্র মূর্খতা আর নির্বুদ্ধিতার মহামিলনের ফলেই সম্ভব।

৩। ১০ + ৯ = ১৯
$১০^2 - ৯^2 = ১৯$

[৪২] Mumin Salih, *New Amazing Numerical Findings in the Quran*, http://www.news.faithfreedom.org/index.php?name=News&file=article&sid=1836.
[৪৩] http://www.submission.org/quran/app1-part2.html

> এটি যে কোনো পর্যায়ক্রমিক দুটি সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন :

$৩ + ২ = ৫$
$৩^2 - ২^2 = ৫$

$৫ + ৪ = ৯$
$৫^2 - ৪^2 = ৯$

$১৩ + ১২ = ২৫$
$১৩^2 - ১২^2 = ২৫$

এটিকে কারণ হিসেবে ধরলে, রাশেদ খলিফার ভণ্ডামীটা আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

৪। আমরা যেসব অঙ্ক গাণিতিক কাজে ব্যবহার করি, তার প্রথম সংখ্যা ১ এবং শেষটি ৯।

> গাণিতিক হিসাব-নিকাশ আমরা সাধারণত দশমিক পদ্ধতি বা দশভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করি। মানব ইতিহাসে সংখ্যার ব্যবহার শুরু হওয়ার পর থেকে দশভিত্তিক সংখ্যা গণনা সুবিধাজনক হওয়ায় (কেউ কেউ বলেন আমাদের হাতে দশটি আঙুল থাকায়) এই পদ্ধতি দীর্ঘদিন অনুসরণ করে আসছি; যেমন আমরা গণনার সময় ৯ এর পরই ১০ চলে যাই কিন্তু এর মধ্যে আরো কিছু সংখ্যা থাকতে পারতো অথবা কিছু সংখ্যা কম হতে পারতো। তাই দশমিক পদ্ধতির গণনায় (০ বাদ দেওয়ায়) প্রথম সংখ্যা ১ এবং শেষ সংখ্যা ৯ হওয়ার সুবাদে এখানে কি অলৌকিকত্ব পাওয়া গেল তা বোধগম্য নয়?

বর্তমানে শুধু দশমিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাও নয়। বিভিন্ন প্রয়োজনে আরো কিছু সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন :

বাইনারি পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে সংখ্যা হচ্ছে দুটি ০ ও ১। কম্পিউটারের যাবতীয় সব প্রোগাম এই বাইনারি মেথডে লেখা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতি ১৯ লেখা হয় ১০০১১।

অকটেট পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে যেসব অঙ্ক ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার প্রথমটি ০ ও শেষটি ৭। আর এ পদ্ধতিতে ১৯ লেখা হয় ২৩।

হেক্সাডেসিমেল পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে যেসব অঙ্ক ব্যবহৃত হয় তার প্রথমটি ০ ও শেষটি F। এ পদ্ধতিতে ১৯কে লেখা হয় ১৩।

তাই শুধুমাত্র ডেসিমেল বা দশমিক পদ্ধতিকে বিবেচনায় এনে ১৯-এর মধ্যে অলৌকিকত্ব খোঁজাকে অজ্ঞতার পরিচায়ক বলে ধরে নিতে হবে।

১৯ একটি ছোট সংখ্যা। ভালো করে খোঁজলে ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য অনেক কিছুরই (যেমন কারো জন্ম সাল, মৃত্যু সাল, জীবনের স্মরণীয় ঘটনার তারিখ, মাসিক আয়-ব্যয়, কিংবা কোনো বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা, অধ্যায় সংখ্যা, শব্দ ইত্যাদি) সংখ্যা পাওয়া যাবে। শুধু ১৯ কেন, এরকম যে কোনো ছোট সংখ্যা দ্বারা একই ধরনের অলৌকিকতার দাবি উত্থাপন করা সম্ভব।

সম্ভাবনা ও অলৌকিকতা

রাশেদ খলিফা কোরানের সাথে সম্পর্কিত কিছু সংখ্যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য বলে দাবি করে একেই কোরানের অলৌকিকতার পক্ষে প্রমাণ বলে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। '১৯ মিরাকল' বিষয়টি যদি সত্যি সত্যি ধর্মগ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থ যেমন গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ ইত্যাদি যে কোনোটির বেলায় ঘটত তবে কেউ কি ঐ গ্রন্থকে অলৌকিক বলে মেনে নেবেন? যদিও অনেক গ্রন্থে এই ধরনে ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে তবে কেউ তা গণনা করার চেষ্টা করবে না; কারণ এর মধ্যে অলৌকিকতা (মূলত সংখ্যা তত্ত্বের চমৎকার ব্যবহার) খুঁজে বের করলেও তা বাজারে চলবে না, ধর্মব্যবসাও হবে না।

সম্ভাবনা বিষয়ে একটি কথা বলা প্রয়োজন। একজন লেখকের লেখা কোনো একটি গ্রন্থ (নকল করা ছাড়া) হুবুহু আরেকজন লেখকের পক্ষে কাকতালীয়ভাবে লিখে ফেলা একদম অসম্ভব। শরৎ চন্দ্রের 'পথের দাবী', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে-বাইরে' বাংলা ভাষায় আর

কেউ লিখবেন না, এটাই স্বাভাবিক এবং এর অন্যথা অসম্ভব। এ জন্য এই গ্রন্থগুলি অলৌকিক হয়ে যায়নি। অর্থাৎ আমরা বলতে চাচ্ছি কোনো কিছুর অসম্ভাব্যতা এর অলৌকিকতার প্রমাণ হতে পারে না।

রাশেদ খলিফার দাবি যদি সত্যি হত

রাশেদ খলিফার দাবি মতো যদি কোরান সত্যিই ১৯ সংখ্যা দ্বারা আবদ্ধ থাকতো তবে এ সম্পর্কে দুটি কথা বলার অবকাশ থাকতো :

১। এটি সম্পূর্ণ কাকতালীয় (Coincidence)। এ রকম অনেক ঘটনা বাস্তবে ঘটে থাকে, যেমন ফিবোনাক্কি রাশিমালা। এ ধরনের ঘটনা যদি ধর্মগ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ বা অন্য বিষয়ে পাওয়া যায় তবে তা অলৌকিক বলে দাবি করা হয় না। তাছাড়া মৌলিক যে প্রশ্নটি উত্থাপিত করা যায় : কোনো গ্রন্থের বা কোনো বিষয়ের রচনাশৈলী (Style) কি ঐ বিষয়বস্তুর বৈধতা দিতে পারে? স্টাইল হচ্ছে কেমন করে-কিভাবে একটি বিষয়কে উপস্থাপন করা হবে, আর বিষয়বস্তু হচ্ছে কী উপস্থাপন করা হবে। উত্তরটা হচ্ছে না, স্টাইল বিষয়বস্তুর বৈধতা বা Validity দিতে পারে না; কারণ একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন স্টাইলে উপস্থাপন করা সম্ভব আর ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তু একই স্টাইলে বা রচনাশৈলী দ্বারা উপস্থাপন করা সম্ভব। স্টাইল ও বিষয়বস্তুর মধ্যে আন্তসম্পর্ক নেই। স্টাইল বা রচনাশৈলী বলতে বুঝি : কোন ভাষায় এটি উপস্থাপন করা হচ্ছে, গদ্যে না পদ্যে, এটি মৌখিক না লিখিত, হস্তলিখিত না প্রিন্ট করা, লেখার অক্ষর কত বড়, বাক্য কত বড়, অক্ষরের সংখ্যা কতটি, শব্দ-প্যারাগ্রাফ-লাইন কতটি, বিষয়টি কি শ্রুতিমধুর, সুন্দর, শব্দগুলো-বাক্যগুলোর মধ্যে অন্তমিল কিরকম, বাচনভঙ্গি কিরকম ইত্যাদি।[৪৪] রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে এ কথা বলার কারণ হচ্ছে, কোরানসহ যে কোনো ধর্মগ্রন্থকেই তার রচনাশৈলী দ্বারা অলৌকিক দাবি করার মধ্যে কোনো যৌক্তিকতা নেই।

২। এটি পূর্বপরিকল্পিত; যেমন আমেরিকান লেখক Ernest Vincent Wright-এর লেখা *Gadsby: Champion of Youth* উপন্যাসটি বা ইভান পেনিনের আবিষ্কার ওল্ডটেস্টামেন্টের অলৌকিক ৭ সংখ্যা। যেহেতু বাইবেলে বলা হয়েছে অনেক লেখক এই গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাই পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ৭ সংখ্যাটি সময়ে সময়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোরান সম্পর্কে যুক্তিবাদীরা বলেন : "হজরত মুহাম্মদ উম্মি বা নিরক্ষর ছিলেন না। বোখারির প্রচুর সহি হাদিস রয়েছে যা নবী মুহাম্মদকে লেখাপড়া জানা মানুষ হিসেবেই উপস্থাপন করে; যেমন সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ৭, বুক ৬২, নম্বর ৮৮; সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ১, বুক ৩, নম্বর ৬৫; সহি বোখারি শরিফ, ভলিউম ১, বুক ৩, নম্বর ১১৪। ঐ সময়ে (ষষ্ঠ শতাব্দী) আরবের কাব্য-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ চলছিল। মুহাম্মদ তাঁর সাথীদের নিয়ে কোরান রচনা করেছেন যা কোনো কঠিন কাজ নয়। কোরানকে অতুলনীয় গ্রন্থ বলা যায় না; বিষয়বস্তুর দিক দিয়েও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নয়। যদিও তাতে (কোরানে) প্রায়শই জোরপূর্বক অলৌকিকতা আরোপের প্রচেষ্টা চালানো হয়। বর্ণসংখ্যা ও বাক্যসংখ্যার সুনির্দিষ্ট সংখ্যার ভিত্তিতে অগণিত সাহিত্য রচিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 'চতুর্দশপদী কবিতা' (সনেট)।" অর্থাৎ হজরত মুহাম্মদ এবং তাঁর সহযোগীরা ১৯ সংখ্যার বিষয়টি মাথায় রেখেই কোরান রচনা করেছিলেন।

কোরান সম্পর্কে এ ধরনের বক্তব্যের জবাব রাশেদ খলিফার '১৯ মিরাকল' থেকে দেওয়া যায় না। কোরানকে অলৌকিক প্রমাণের রাশেদ খলিফার সংখ্যাভিত্তিক কৌশল সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

উপসংহার

দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা দেখলাম :

১) উনিশ নিয়ে কোরানের অলৌকিকত্ব প্রমাণের রাশেদ খলিফার দাবি অন্তঃসারশূন্য।
২) কোরানের সুরা আল-মুদাচ্ছির (৭৪) এর ৩০ নম্বর আয়াতে শুধুমাত্র দোজখের ফেরেশতাদের সংখ্যা বলা হয়েছে; কোনো অলৌকিক সংখ্যা (যেমনটা রাশেদ খলিফা দাবি করেছেন) বা অন্য কিছু বলা হয়নি।
৩) রাশেদ খলিফা কোরান শরিফে 'অলৌকিকত্বের উপস্থিতি' প্রমাণের জন্য কোরানের আয়াতে যেমন পরিবর্তন করেছেন, তেমনি আয়াত কেটে কমিয়ে দিয়েছেন, ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন।
৪) এই ধরনের কথিত 'মিরাকল' ধর্মগ্রন্থ কোরান ছাড়াও আরো অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে।
৫) (ইসলামি ভাষ্য মতেই) সম্পূর্ণ কোরান যেহেতু লিখিতরূপে নাযিল হয়নি, তাই এর লিখিতরূপের মধ্যে অলৌকিকতা

[৪৪] Hekmat, *The Miracle of 19*, http://www.faithfreedom.org/Articles/Hikmat10101.htm

খোঁজে পাওয়া উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং অপ্রাসঙ্গিকও বটে। একটি ভাষার লিখিতরূপ ভাষা বিশেষজ্ঞরা সময়ে-সময়ে গণমানুষের প্রয়োজনে নির্ধারণ করে থাকেন। পরিবর্তন-পরিবর্ধন-সংযোজন-বিয়োজন ঘটান। অর্থাৎ ভাষার লিখিতরূপ সম্পূর্ণ লৌকিক।

'মিরাকল' টাইটেল জুড়ে দিয়ে কোটি মানুষের দুর্বল আবেগ-অনুভূতির কেন্দ্র 'ধর্মগ্রন্থ' নিয়ে কত অসাধু ব্যবসা করা যায় তারই সামান্য উদাহরণ রাশেদ খলিফার এই '১৯ মিরাকল'। যুগে যুগে ধর্ম আর ধর্মগ্রন্থকে কেন্দ্র করে ধর্মব্যবসায়ী-প্রতারকচক্র এ ধরনের হুজুগ সৃষ্টি করে এসেছে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার তাগিদ থেকে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু অবাক লাগে যখন উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পর্যন্ত নিজেদের এতোদিনের অর্জিত কাণ্ডজ্ঞান-যুক্তিবোধ-শিক্ষাদীক্ষা সব কিছু রহিত করে গা ভাসিয়ে দেন হুজুগের তালে।

***

লেখক পরিচিতি : সৈকত চৌধুরী, *বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল*-এর সাথে যুক্ত। অনন্ত বিজয় দাশ, শিক্ষার্থী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট। সাধারণ সম্পাদক, *বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল*। সম্পাদনা : বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার ছোটকাগজ '*যুক্তি*'।

অষ্টম অধ্যায় : ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং মৌলবাদ ৭৯৭ *[ক্লিক করুন]*

- সেক্যুলারিজম মানে কি সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা? : *অভিজিৎ রায় ৭৯৮ [ক্লিক করুন]*
- হাইপেশিয়া এক গণিতজ্ঞ নারীর বেদনাঘন উপাখ্যান : *অভিজিৎ রায় ৮০৪ [ক্লিক করুন]*
- ব্রুনোর মৃত্যু এবং কিছু প্রশ্ন : *শহিদুল ইসলাম ৮১৪ [ক্লিক করুন]*
- ইসলামের চিন্তার ইতিহাসে যারা সত্যের শহীদ : *নুরুজ্জামান মানিক ৮২৩ [ক্লিক করুন]*
- ধর্ম সবকিছুকে বিষাক্ত করে তুলছে : *ক্রিস্টোফার হিচেনস (অগ্নি অধিরূঢ়) ৮৪৫ [ক্লিক করুন]*
- ব্রুনো' র সমকালীন আরো যাদের হত্যা করা হয়েছিল : *নুরুজ্জামান মানিক ৮৫০ [ক্লিক করুন]*
- মৌলবাদ : উৎস সন্ধান, ইতিবৃত্ত এবং সমকালীন প্রেক্ষিত : *রবিউল ইসলাম ৮৫৩ [ক্লিক করুন]*
- মৌলবাদের জন্ম ও বিকাশ - রুখতে হবে কীভাবে : *মোঃ জানে আলম ৮৮৪ [ক্লিক করুন]*

সেক্যুলারিজম মানে কি সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা?

অভিজিৎ রায়

আমার আগ্রহের কারনেই হোক, আর 'মুক্তমনা'র সাথে আমার দীর্ঘদিনের সংশ্লিষ্টতার কারণেই হোক বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে আমাকে লিখতে, আলোচনা করতে এবং বিতর্কে অংশ নিতে হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টিও মাঝে মধ্যে চলে আসে। বিতর্ক করতে গিয়ে অনেকের কাছ থেকেই যা শুনি তা হল, স্যেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দের মানে হচ্ছে সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা। এমনকি যারা ধর্ম মানেন না, এবং উদারপন্থী বলে কথিত তাদের অনেকেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে এভাবে দেখেন।

বিষয়টি আলোচনার দাবী রাখে। স্যেকুলার শব্দের মানে কি সত্যই সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা? অন্ততঃ রাষ্ট্রীয় ভাবে বাংলাদেশ কিংবা ভারতের মত দেশগুলোতে এখন তাই প্রচার করা হয়। বিভ্রান্তি সে কারণেই। আসলে কিন্তু 'সেক্যুলারিজম' শব্দটির অর্থ -'সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা' নয়, বরং এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে একটি মতবাদ, যা মনে করে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক রাখা উচিৎ। আমেরিকান হেরিটেজ ডিকশনারীতে secularism শব্দটির সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে এভাবে -

> The view that religious considerations should be excluded from civil affairs or public education

এ সংজ্ঞা থেকে বোঝা যাচ্ছে, ধর্মকে রাষ্ট্রের কাজের সাথে জড়ানো যাবে না- এটাই সেক্যুলারিজমের মোদ্দা কথা। ধর্ম অবশ্যই থাকতে পারে, তবে তা থাকবে জনগণের ব্যক্তিগত পরিমন্ডলে - 'প্রাইভেট' ব্যাপার হিসেবে; 'পাবলিক' ব্যাপার স্যাপারে তাকে জড়ানো যাবে না।

ভারত তার জন্মলগ্ন থেকেই 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করে এসেছে (যদিও ভারতের সংবিধানে 'অফিশিয়ালি' ধর্মনিরপেক্ষতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অনেক পরে)। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু সেক্যুলারিজমের প্রকৃত সংজ্ঞা অনুধাবণ করতে পেরেছিলেন অনেক ভালভাবে। তিনি রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী থেকে ধর্মকে পৃথক রাখাই সঙ্গত মনে করতেন, জাতীয় জীবনে সব ধর্মের প্রতি উদাসীন থাকাটাই তার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হত। তিনি বলতেন -

> 'ধর্ম বলতে যে ব্যাপার স্যাপারগুলোকে ভারতে কিংবা অন্যত্র বোঝানো হয়, তার ভয়াবহতা দেখে আমি শঙ্কিত এবং আমি সবসময়ই তা সোচ্চারে ঘোষণা করেছি। শুধু তাই নয়, আমার সবসময়ই মনে হয়েছে এ জঞ্জাল সাফ করে ফেলাই ভাল। প্রায় সব ক্ষেত্রেই ধর্ম দাঁড়ায় ধর্মান্ধতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা, মূঢ়তা, কুসংস্কার আর বিশেষ মহলের ইচ্ছার প্রতিভূ হিসেবে'।

নেহেরুর কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, ধর্মের অন্তর্নিহিত কাঠামোগত প্রতিক্রিয়াশীলতার কারনেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে, পার্থিব বিষয় আষয়ের সাথে সাথে জড়ানো যাবে না। নেহেরুর অনুপ্রেরণা আমেরিকার 'ফাউন্ডিং ফাদার'রা ছিল কিনা জানি না - যারা আমেরিকার সংবিধান তৈরির সময় প্রতিষ্ঠার সময় ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা রেখেছিলেন, খুব বলিষ্ঠ ভাবে* -

> "As **the Government of the United States of America is not, in any sense, founded on the Christian religion**; as it has in itself no character of enmity against the laws, religion, or tranquility, of Musselmen; and as the said States never have entered into any war or act of hostility against any Mehomitan nation, it is declared by the parties that no pretext arising from religious opinions shall ever produce an interruption of the harmony existing between the two countries." (ref. The Treaty of Tripoli, drafted in 1976 under George Washington, and signed by John Adams in 1976)

আসলে অভিধানে secular শব্দটির অর্থও করা হয়েছে এভাবে - 'Worldly rather than spiritual' । সেক্যুলারিজমের অন্যান্য প্রতিশব্দগুলো হল - worldly, temporal কিংবা profane। শবার্থগুলো খুব ভালভাবে খেয়াল করলে বোঝা যাবে, এর অবস্থান ধর্ম কিংবা আধ্যাতিকতার দিকে নয়, বরং এর একশ আশি ডিগ্রী বিপরীতে। সেজন্য, সেক্যুলারিজমের বাংলা প্রতিশব্দ অনেকে খুব সঠিকভাবেই করেন - 'ইহজাগতিকতা'।

অথচ সেই 'ইহজাগিতিক' ভারতেই রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন পঞ্চাশের দশকে ঘোষণা করলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয় বরং সর্ব ধর্মের সহাবস্থান, এবং তিনি Hindu view of life এর কল্পিত ভাববাদী পূর্ণতায় তিনি আস্থাবান। 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়' - এই শ্লোগানটি বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী দল আওয়ামিলীগও খুব জোরে সোরে বলার চেষ্টা করে। তবে এ শ্লোগানটির মধ্যেই রয়েছে এক ধরণের 'শুভঙ্করের ফাঁকি'। এ ফাঁকিটি চমৎকার ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তার 'ইহজাগিতিকতার প্রশ্ন' প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে আমার আর সাদ কামালীর যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত 'স্বতন্ত্র ভাবনা' (চারদিক, ২০০৮) বইয়ে-

> 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়, এই কথাটা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর পরই খুব জোরেসোরে বলা হচ্ছে। কথাটা সত্য বটে আবার মিথ্যাও বটে। সত্য এ দিক থেকে যে, রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা নাগরিকদের এ পরামর্শ দেয় না যে, তোমাদের ধর্মহীন হতে হবে; কিন্তু তা বলে এমন কথাও বলে না যে, রাষ্ট্র নিজেই সকল ধর্মের চর্চা করবে, কিংবা নাগরিকদের নিজ নিজ ধর্ম চর্চায় উৎসাহিত করবে। রাষ্ট্র বরঞ্চ বলবে ধর্মচর্চার ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিজের কোন আগ্রহ নেই, রাষ্ট্র নিজে একটি ধর্মহীন প্রতিষ্ঠান।, ধর্ম

* আমেরিকার ফাউন্ডিং ফাদারদের প্রধান ছিলেন যারা তাদের অনেকেই আসলে ধর্মহীন নাস্তিক ছিলেন বলে অনেকে দাবী করেন। ক্রিস্টোফার হিচেন্স তার 'Thomas Jefferson: Author of America' বইয়ে দাবী করেছেন যে, জেফারসন সম্ভবত নাস্তিকই ছিলেন, এমন কি তার সময়েও, এবং প্রবলভাবেই। রিচার্ড ডকিন্সও তার বইয়ে এমন ইঙ্গিত করেছেন। তবে নাস্তিক হোন বা না হোন আমারিকার ফাউন্ডিং ফাদারেরা যে সেক্যুলার ছিলেন, এটা তাদের বিভিন্ন লেখালিখি থেকে স্পষ্ট। পরবর্তীতে ফাউন্ডিং ফাদারদের আদর্শ থেকে আমেরিকার বিচ্যুতি প্রবলভাবে লক্ষ্যনীয়। আমেরিকার ডলারে লিখিত 'ইন গড উই ট্রাস্ট' এমন একটি ভন্ডামীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

> বিশ্বাস নাগরিকদের সম্পূর্ণ ব্যাক্তিগত ব্যাপার। রাষ্ট্রের ওই ধর্মহীনতাকেই কিছুটা নম্রভাবে বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষতা।'

খুবই দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আওয়ামিলীগ ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আউরে মুখে ফ্যানা তুলে ফেললেও তারা ধর্মনিরপেক্ষতার মূল সুরটি কখনোই অনুধাবন করতে পারে নি। তার প্রমাণ পাওয়া যায় আওয়ামিলীগের ওয়েব সাইট (http://www.albd.org/) দেখলেই। আওয়ামিলীগের ওয়েব সাইটে মাথার উপরে 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান' লেখা বানীটি তারই পরিচয় বহন করে। অথচ এক সময় আওয়ামিলীগই 'আওয়ামী মুসলিম লিগ' থেকে মুসলিম শব্দটি উঠিয়ে দেবার সাহস দেখাতে পেরেছিল কিংবা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রিয় মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। সে সময় রাষ্ট্রিয় মূলনীতিগুলো ছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। মুক্তিযুদ্ধের পরিপেক্ষিতে খুব স্বাভাবিক ছিল সে অংগীকার। কিন্তু এর জন্য যে বিশাল সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি প্রয়োজন তা তাদের নেতাদের ছিল না, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তো ছিলই না।

ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করলেও এর মুল ভাবটি তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে স্পষ্ট ছিল- এমন কোন নজির পাওয়া যায় নি। পাকিস্তানী কারাগার থেকে ঢাকায় ফিরে এসে রেসকোর্স ময়দানে বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান যে বক্তৃতা দেন তাতে তিনি বাংলাদেশকে 'দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র' হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন তা কম তাৎপর্যপূণ নয়। ওই বছরেরই সাতই জুন তারিখের বক্তৃতায় শেখ মুজিব ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যা বলেছেন তা হল -

> 'বাংলাদেশ হবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান মুসলমানের ধর্ম পালন করবে, হিন্দু হিন্দুর ধর্ম পালন করবে। খ্রীস্টান তার ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধও তার নিজের ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্মহীনতা নেই, ধর্মনিরপেক্ষতা আছে।'

এ বক্তৃতা থেকে মুজিবের 'সর্বধর্মের প্রতি সদ্ভাবের' সুর ধ্বনিত হলেও সেক্যুলারিজমের মুল সুরটি অনুধাবিত হয় নি। আর হয় নি বলেই, সে সময়কার সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদে 'ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার সুযোগ লোপ' করা হলেও, প্রবণতা দেখা দিল রাষ্ট্র কর্তৃক সকল ধর্মকে 'সমান মর্যাদাদানের'। তাই বেতারে, টেলিভিশনে, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে - সর্বত্র কুরান শরীফ, গীতা, বাইবেল আর ত্রিপিটক পাঠ করা হতে লাগলো এক সংগে। এ আসলে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, বরং ধর্ম আর শ্রদ্ধার মিশেল দেওয়া এক ধরণের জগাখিচুরি। সহজ ভাষায় বলা যেতে পারে 'ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতা'। যত দিন গেছে, ততই মুজিব এমনকি এই ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতা থেকেও দূরে সরে গেছেন। তার শাসনামলের প্রান্তে প্রতিটি ভাষণেই মুজিব 'আল্লাহ', 'বিসমিল্লাহ', 'ইনশাল্লাহ', 'তওবা' প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করতেন। এমনকি শেষদিকে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক প্রতীক 'জয় বাংলা'ও বাদ দিয়ে 'খোদা হাফেজ' প্রবর্তন করেন। শুধু তাই নয়, যে 'ইসলামিক একাডেমী' মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার আলবদরদের সাথে ঘনিষ্ঠতার কারণে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল, তারও পুনরুত্থান ঘটান মুজিব, এবং প্রতিষ্ঠানটিকে 'ফাউন্ডেশন'-এ উত্থিত করেন।

তাও কাগজে কলমে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সংবিধানে যাও বা চালু ছিল মুজিবের সময়, জিয়াউর রহমান এসে তা মূল শুদ্ধ উপড়ে ফেললেন। ধর্ম নিরপেক্ষতার উপরে কাঁচি চালিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হল 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' আর সমান বেগে মুলনীতি হিসেবে স্থাপিত হল - 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর আস্থা আর বিশ্বাস'কে। সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদ-এর উচ্ছেদ হয়ে গেল। ১২ নং অনুচ্ছেদের উচ্ছেদের ফলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করার সুযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল। এরশাদ সাহেব এসে তো ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্মই বানিয়ে দিলেন। এর পর থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা তো অচ্ছুৎ হয়েছেই, বরং পাল্লা দিয়ে শুরু হয়েছে ধর্মকে তোষণ করে চলার নীতি। বিগত জোট সরকারের আমলে ধর্মকে আর মৌলবাদকে তোষণ করার ফলশ্রুতি স্বরূপ কিভাবে বাংলা ভাইয়ের উত্থান হয়েছিল, কিভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর পরিকল্পিত ভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছিল, কিভাবে প্রতিটি জেলায়, সিনেমা হলে, মাজারে, উদীচির অনুষ্ঠানে বোমাবাজির মহড়া চালানো হয়েছিল তা আমরা সবাই দেখেছি।

জনগনকে ইহজাগতিকতায় উদ্বুদ্ধ করার কাজ অতীতের শাসকেরা করে নি, এখনকার শাসকেরাও করছেন না। 'মোহাম্মদ বিড়াল' নিয়ে আলপিন নাটক আর তার পরিসমাপ্তি বায়তুল মোকারমের খতিবের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনার মহড়া আমরা দেখেছি এ সরকারের আমলেই। এতদিন রাষ্ট্রীয় বিবাদ-বিপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সংসদভবন, বঙ্গভবন এগুলো ছিল উপযুক্ত এবং নির্বাচিত স্থান। আমাদের অতি বুদ্ধিমান রাষ্ট্রের কর্ণধরেরা সেটিকে সংসদভবনের বদলে বায়তুল মোকারমের বৈঠকখানায় নিয়ে উঠালেন। পরে দেখলাম, 'জাতীয় নারী উন্নয়ননীতি' বাস্তবায়নের পরিবর্তে অর্ধ শিক্ষিত, শিক্ষিত মোল্লাগোষ্ঠিকে তোষণ করে চলেছেন এখনকার শাসকেরা। এই ধরনের কাজের সুদূর-প্রসারী প্রভাব কি তারা ভেবে দেখেছেন? এ ব্যাপার-স্যাপারগুলো হয় শারিয়া-কেন্দ্রিক রাষ্ট্রে। বাংলাদেশ আসলে কোন পথে চলেছে এর গতি-প্রকৃতি দেকলেই কিন্তু বোঝা যায়।

ভারতের অবস্থাও যে খুব ভাল তা বলা যাবে না। সেখানেও সেক্যুলারিজমের মূল সুরটি আত্মস্থ করার পরিবর্তে চলছে ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতা জাহির করার মহড়া। এ প্রসঙ্গে প্রবীর ঘোষ তার 'সংস্কৃতি, সংঘর্ষ ও নির্মাণ' বইয়ে লিখেছেন -

> 'বিপুল প্রচারে সাধারণ মানুষ পরিচিত হয়েছে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দের সাথে। জেনেছে, ধর্মনিরপেক্ষতা কথার অর্থ হল - 'সব ধর্মের সমান অধিকার'। বিপুল সরকারী অর্থব্যায়ে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দের এই যে ব্যাখ্যা হাজির করা হচ্ছে এবং এরই সাথে সম্পর্কিতভাবে আমাদের দেশের মন্ত্রী, আমলা ও রাজনৈতিকেরা মন্দিরে মন্দিরে পুজো দিয়ে বেড়াচ্ছেন, গুরুদোয়ারায় নতজানু হচ্ছেন, মসজিদে গীর্জায় শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছেন। দেওয়ালী, ঈদ, বড়দিন ইত্যাদিতে রাষ্ট্রনায়কেরা বেতার, দুরদর্শন মারফৎ শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য দিলে আয়কর থেকে রেহাইয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।

সাধারণের ভাল লাগছে - 'সব ধর্মের সমান অধিকার' মেনে নিয়ে মন্ত্রী, আমলা, রাজনীতিকদের সমস্ত ধর্মের কাছে নতজানু হতে দেখে। উদার হৃদয়ের মানুষ হিসেবে নিজেদের ভাবতে ভাল লাগছে জনগনের - হুঁ হুঁ বাবা, আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ। এখানে সব ধর্মই সমান অধিকার ও শ্রদ্ধা পায় মন্ত্রী আমলাদের। মন্ত্রীরা এরই মাঝে জানিয়ে দেন সমস্ত ধর্মের সমান অধিকার বজায় রাখতে, দেশের 'ধর্মনিরপেক্ষতার মশাল' জ্বালিয়ে রাখতে হবে।

'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটিকে নিয়ে কী নিদারুনভাবে অপব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষের মগজ ধোলাই করা হচ্ছে ভাবা যায় না। 'নিরপেক্ষ' শব্দের অর্থ কোন পক্ষে নয়। 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দের অর্থ তাই 'কোন ধর্মের পক্ষে নয়' - অর্থাৎ, সমস্ত ধর্মের সংগে সম্পর্ক বর্জিত। secularism শব্দের আভিধানিক অর্থ - একটি মতবাদ - যা মনে করে রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষানীতি প্রভৃতি ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত থাকা উচিৎ।

কিন্তু এ কি! এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে আমরা কি দেখাচ্ছি? সেক্যুলার রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানেও এদেশে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। কোন প্রকল্পের উদ্বোধন বা শিলান্যাস করা হয় মন্ত্রোচ্চারণের প্রদীপ জ্বালিয়ে, পুষ্পার্ঘ নিবেদন করা হয় নারকোল ফাটিয়ে। রাজনীতির ব্যবসায়ীরা 'সেক্যুলারিজম'-এর নামে নানা ধর্মকে তোল্লাই দিয়ে সর্বধর্মের সমন্বয় ও সংহতির বাঁধা গৎই এতোদিন বাজিয়ে এসেছেন।'

কিন্তু এই ছদ্ম-নিরপেক্ষতা যে ভারতের কোন উপকারে আসেনি ইতিহাস তার প্রমাণ। জাতিভেদ প্রথা, ধর্মীয় সংঘাত আর দাঙ্গা সে স্বরূপটিই আমাদের সামনে তুলে ধরে। কিছুদিন আগে 'রাম জম্মভুমি'কে পুঁজি করে বাবড়ি মসজিদ ধ্বংস, অযোধ্যায় নির্বিচারে মুসলিমদের হত্যা, গুজরাটে দাঙ্গা আর তার ফলশ্রুতিতে ধর্মান্ধ বিজেপির উত্থান আমাদের কাছে ঐ ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ উৎকট ভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে। গুজরাট দাঙ্গার পর অধ্যাপক জয়ন্তী প্যাটেল তার India: Gujarat riots - communalization of state and civic society" প্রবন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, তা খুবই তাৎপর্যপুর্ণ -

> *"Our interpretation of secular as SARVADHARMA-SAMABHAV, protecting every religion and their diverse mode of belief structure, their separate social and civil code, varied customs, mores and faiths, and even education system is not conducive in building an integrated national society or human identity. Our identity is basically communal and has proved to be an obstruction in building a nation- state. It is clear that in interpreting the meaning of the word secular we have disregarded the spirit of the enlightenment and renaissance which was instrumental in building a modern state and the civic society in the west. It seems that we have to interpret the correct meaning of the word secular in our law enforcement.* ***The connotation of the word secular should mean negation of all religions*** *(SARVADHARMA-ABHAV)."'*

রেনেঁসার মানব মুক্তি প্রয়াস কিন্তু তখনকার সময়ের গীর্জাকেন্দ্রিক ধর্মের গোড়ামিকে উপেক্ষা করেই পরিচালিত হয়েছিল। সেক্যুলারিজম বলতে সেখানে সব ধর্মের সহাবস্থান বোঝানো হয় নি। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ ফ্রান্সকে ধর্মনিরপেক্ষ থাকার প্রেরণা যুগিয়েছে। আদি বসতি স্থাপনকারীদের ধর্মীয়ভাবে নিপিড়িত হবার

অভিজ্ঞতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে কোন বিশেষ ধর্মের পক্ষ নিতে দেয় নি। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের জীবনে মুক্তিযুদ্ধের মত এত বড় সড় ঘটনা ঘটলেও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত তাৎপর্য আমরা পয়ত্রিশ বছরেও অনুধাবন করতে পারলাম না। আমার প্রবন্ধটি শেষ করতে চাই স্বতন্ত্র ভাবনা বইটি থেকে অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহার একটি উদ্ধৃতি দিয়ে -

> "সেক্যুলারিজম বহু শতাব্দী ধরে (আমাদের উপমহাদেশে) যে ভাবে আচরিত এবং রূপান্তরিত হয়ে আসছে, 'ধর্মনিরপেক্ষতাকে'ই যদি তার ঠিক বঙ্গানুবাদ বলে ধরে নেই, তবে শুধুমাত্র সব ধর্মের সহাবস্থানেই তার অর্থ পুরোপুরি ধরা পড়ে না। এ কথা সত্য যে, ধর্মনিরপেক্ষতায় তার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়; ধর্ম থেকে চিন্তার মুক্তিতেই ধর্মনিরপেক্ষতা পূর্ণতা পায়।"

ধর্ম থেকে চিন্তার মুক্তি ব্যক্তিগত পর্যায়ে না হলেও, রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে অন্তত জরুরী ।

ড. অভিজিৎ রায়, আমেরিকায় বসবাসরত গবেষক এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' ও 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। সাম্প্রতিক সম্পাদিত গ্রন্থ - 'স্বতন্ত্র ভাবনা'। ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com

হাইপেশিয়া : এক বিস্মৃতপ্রায় গণিতজ্ঞ নারীর বেদনাঘন উপাখ্যান

অভিজিৎ রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভ্যতা সৃষ্টির পেছনে নারীর ভুমিকা একদমই স্বীকার করেননি। তিনি বলেন [১]:

> 'সাহিত্য কলায় বিজ্ঞানে দর্শনে ধর্মে বিধি ব্যবস্থায় মিলিয়ে আমরা যাকে সভ্যতা বলি সে হল পুরুষের সৃষ্টি।'

আবার ভলটেয়ার নারীর মননশীলতা, শক্তিমত্তা আর বুদ্ধিবৃত্তিকে স্বীকার করে নিলেও প্রবলভাবেই অস্বীকার করেন নারীর উদ্ভাবনী শক্তিকে। তিনি দাবী করেন [২]:

> 'ইতিহাসে জ্ঞানবতী নারী খুঁজলেই পাওয়া যাবে, এমনকি পাওয়া যবে নারী-যোদ্ধার অস্তিত্বও, কিন্তু কোথাও নারী উদ্ভাবক পাওয়া যাবে না।'

বলতেই হয় - রবিঠাকুর এবং ভলটেয়ার দুজনই ছিলেন ভ্রান্ত, অন্ততঃ ইতিহাস পর্যালোচনার এই ব্যাপারটিতে। ইতিহাস খুঁজলে নারী উদ্ভাবক তো পাওয়া যায়ই, পাওয়া যায় বিজ্ঞান আর প্রকৌশলবিদ্যায় নিবেদিতপ্রাণ অজস্র মহীয়সী নারীর অস্তিত্ব, যারা আমাদের সভ্যতার বিনির্মানে শুধু সহায়তাই করেননি, নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসেবে। এমনি এক বিস্মৃত-প্রায় বিদুষী বিজ্ঞানী এবং গনিতজ্ঞ ছিলেন হাইপেশিয়া (Hypatia) - জিওর্দানো ব্রুনোর [৩, ২১] মতই বিজ্ঞানের বেদীমূলে আত্মোৎসর্গীকৃত এক প্রাচীন দার্শনিক।

হাইপেশিয়া জন্মেছিলেন ৩৭০ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়াতে। গনিতজ্ঞ হিসেবে তার উত্থান যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি মর্মান্তিক তার তিরোধানের ইতিহাস। সম্ভবত: তিনিই ছিলেন গনিতে পর্যাপ্ত অবদান রাখা ইতিহাসের প্রথম নারী গনিতজ্ঞ; মার্গারেট অ্যালিক তাঁর 'Hypatia's Heritage' গ্রন্থে হাইপেশিয়াকে বর্ননা করেন 'মাদাম কুরীর পূর্ববর্তী সবচাইতে উল্লেখযোগ্য নারী বিজ্ঞানী' হিসেবে [৯]। তবে কেবল 'নারী গনিতজ্ঞের' বা 'নারী বিজ্ঞানীর' লেবাস পরিয়ে তাঁর মূল্যায়ন করা হবে স্রেফ বালখিল্যতার সামিল। সত্যিকথা বলতে কি, ইউক্লিডের পর আলেকজান্দ্রিয়াতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এত বড়

গনিতজ্ঞের জন্ম হয়নি [৪, ১০, ১১]। ইতিহাসবেত্তাদের মতে, হাইপেশিয়া ছিলেন মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারী ইতিহাসের শেষ 'প্যাগান সায়েন্টিস্ট'। অথচ খ্রীষ্টধর্মোন্মাদীদের রোষানলে পুড়ে (আক্ষরিক অর্থেই) এই রূপসী বিদুষীকে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে হয় মাত্র ৪৫ বছর বয়সে, ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে। হাইপেশিয়ার মৃত্যুর পর পশ্চিমা বিশ্বে গনিত, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান আর বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি সাধিত হয় নি- দীর্ঘদিন, কম করে হলেও প্রায় ১০০০ বছর [৫]। মূলতঃ হাইপেশিয়ার মৃত্যুই সূচনা করেছিল মানব ইতিহাসের এক ঘোর কৃষ্ণ অধ্যায়ের, যে সময়ে মুক্তবুদ্ধি, জ্ঞানচর্চ্চা, বিজ্ঞান-শিল্প-সাধনা তীব্রভাবে ব্যহত হয়। এ সময় জ্ঞানচর্চার বদলে চর্চা করা হয় ধর্মীয় আস্ফালন, কূপমুন্ডুকতা, অরাজকতা আর বর্বরতার। এ সময়টাতে পৃথিবী এগোয়নি এক বিন্দুও, বরং প্রগতির চাকাকে ঘোরানো হয়েছে উলটো দিকে। এই কলঙ্কময় সময়টিকে ইতিহাসবিদরা আখ্যায়িত করেন একটি বিশেষ নামে - 'অন্ধকার যুগ' বা Dark Age।

হাইপেশিয়ার বাবা থিওন নিজেও ছিলেন একজন বড় মাপের গনিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ এবং আলেকজান্দ্রিয়া মিউজিয়ামের পরিচালক। যে সময়টাতে মেয়েদের আক্ষরিক অর্থেই দেখা হত কেবল পুরুষের সম্পত্তি হিসেবে, কথিত আছে, সে সময়টিতেও থিওন তাঁর মেয়েকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন 'একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে' [৬]। পূর্ণাঙ্গ মানুষ তো হাইপেশিয়া হয়েছিলেনই, আর সেই সাথে ছিলেন অনিন্দ্য সুন্দরী, আর বিদুষী। এ যেন সত্যিকারের মনি-কাঞ্চন যোগ। তাঁকে বলা হত হত - 'Le souffle de Platon et le corps d'Aphrodite' - অর্থাৎ, 'পরমাসুন্দরী আফ্রোদিতির দেহে প্লেটোর আত্মা' যেন! স্বভাবতাই সুদর্শনা আর বিদুষী হাইপেশিয়াকে বিয়ে করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন অনেকেই, কিন্তু স্বাধীনচেতা হাইপেশিয়া তাদের প্রত্যেকের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, আর নিজেকে নিয়োজিত করেন বিজ্ঞানের নিবিড় সাধনায়। বেশ কিছুটা সময় দেশের বাইরেও কাটান তিনি, তারপর দেশে ফিরে এসে গ্রহণ করেন আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গনিতজ্ঞের পদ। অচিরেই তিনি নিজেকে পরিণত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম জনপ্রিয় শিক্ষক হিসেবে। তিনি পড়াতেন গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন আর মেকানিক্সের বিভিন্ন জটিল জটিল বিষয়গুলো। দূর দূরান্ত থেকে ছাত্ররা শহরে চলে আসতো তার বক্তৃতা শুনতে, আর আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের একটি বিশাল কক্ষে প্রতি সন্ধ্যায় সর্বসাধারণের জন্য হাইপেশিয়া বক্তৃতা দিতেন। পয়সা খরচ করে এ নারীর বক্তৃতা শুনতে হত তখন! সাধারণের জন্য দর্শনী ছিলো একটি মোহর [৪]। তবে সভায় যারা স্বচ্ছল ও স্থায়ী সদস্য, তারা আবার মাসিক বা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সম্মানী প্রদান করতেন। হাইপেশিয়া তাঁর বক্তৃতায় প্লেটো, অ্যারিস্টটলের দার্শনিক কাজকর্ম নিয়ে প্রচুর কথা বলতেন, তাদের পর্যালোচনা করতেন আর দূর দুরান্ত থেকে আসা লোকজন যেন সম্মোহিত হয়ে তার কথা শুনতো পিন পতন নিস্তব্ধতায় [৮]। তার অনুরাগী ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন খ্যাতনামা খ্রীষ্টান। তার মধ্যে একজন ছিলেন সাইরিনের সিনেসিয়াস (Synesius of Cyrene), যিনি পরবর্তীতে Ptolemasis এর বিশপ হন। হাইপেশিয়াকে হত্যার পর তার সমস্ত কাজ কর্মও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় খ্রীষ্টান মৌলবাদীদের হাতে। ইতিহাসবিদরা হাইপেশিয়ার কাজকর্মের যেটুকু জানতে পেরেছেন তার মধ্যে একটা বড় উৎসই হল এই সিনেসিয়াসের লেখা চিঠিপত্র। সেই চিঠিগুলোতে হাইপেশিয়ার প্রতি ব্যক্ত হয়েছে গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি আর ভালবাসা।

হাইপেশিয়ার মৌলিক কাজের মধ্যে রয়েছে দায়োফ্যান্তাস রচিত অ্যারিথমেটিকা পুস্তকের উপর ১৩ অধ্যায়ের একটি আলোচনা, যার বেশ খানিকটা অংশই পরবর্তীতে দায়োফ্যান্তাইন পান্ডুলিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয় [৬]। এছাড়া তিনি অ্যাপোলোনিয়াসের কৌণিক ছেদ পুস্তিকার উপর একটি আলোচনা লিখেন [৫], আর টলেমীর কাজের উপর আলোচনা লিপিবদ্ধ করেন Astronomical canon শিরোনামে [৪]। তিনি তার

বাবাকে জ্যামিতির কালজয়ী গ্রন্থ Euclid's element এর নতুন সংস্করণ তৈরীতেও সহায়তা করেছিলেন - যে সংস্করণটি আজও পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত হয় [৫]। হাইপেশিয়া আর তার বাবা যৌথভাবে টলেমীর Almagest এর উপরও কাজ করেন। তবে যে দুটি যন্ত্রের আবিস্কার হাইপেশিয়াকে 'উদ্ভাবক' হিসাবে মহিমান্বিত করেছে তার একটি হল অ্যাস্ট্রোলেব (Astrolabe) - যেটি ব্যবহৃত হত গ্রহ-নক্ষাত্রাদির দৈনন্দিন ঘূর্ণন গণনায়, আর মহাজাগতিক নানা সমস্যা সমাধানে; আর একটি হল হাইড্রোস্কোপ (Hydroscope) যা দিয়ে তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব মাপা যেত [৭]। এছাড়া তিনি পানির লেভেল মাপার জন্য একটি যন্ত্রও তৈরী করেছিলেন।

কিন্তু হাইপশিয়াকে মেরে ফেলা হল কেন? এটি বুঝতে হলে তৎকালীন মিশরীয় শাসনতন্ত্রের বিশেষতঃ টলেমী বংশের দিকে একটু চোখ মেলে তাকানো দরকার। ইতিহাসের বই ঘেটে পাওয়া যায়- টলেমী সোতার আর তার ছেলে টলেমী ফিলাডেফেলস থেকে আরম্ভ করে জনা পনের টলেমীয় বংশদ্ভুত রাজা তখন মিশর শাসন করেছিলো। তার মধ্যে সবচাইতে যিনি পরিচিত তাকে নিয়ে হলিউডে ছবি পর্যন্ত হয়েছে, সর্বশেষ শাসক সেই যে ভুবনমোহিনী ক্লিওপেট্রা। খ্রীষ্টপূর্ব ৩১ সালে ক্লিওপেট্রাকে হত্যা করা হয় আর ক্লিওপেট্রা ও রোম সম্রাট সিজারের ছেলে টলেমী সিজারিয়ান রাজা হন। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০ সালে তাঁকে হত্যার মাধ্যমে টলেমী বংশের সমাপ্তি ঘটে এবং মিশর রোম সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। তখন থেকে শুরু করে হাইপেশিয়ার সময় পর্যন্ত আলেকজান্দ্রিয়া রোমান শাসনের জাঁতাকলে ভয়াবহভাবে নিষ্পিষ্ট এক শহরে পরিণত হয় [৪]। দাসপ্রথার অভিঘাত ধ্রুপদী সভ্যতার প্রাণশক্তিকে একেবারে নিঃশেষিত করে ফেলেছিল। খ্রীষ্টিয় চার্চ তখন প্রাচীন প্যাগান মূল্যবোধ, প্রভাব আর সংস্কৃতিকে উপ্‌ড়ে ফেলে তার নবোত্থিত শক্তিকে সংহত করার চেষ্টা করছে পুরোমাত্রায়। হাইপেশিয়া দাঁড়িয়েছিলেন এই প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিগুলোর ঘুর্ণিকেন্দ্রে - বিদ্যমান সংঘর্ষের এক নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে। মার্গারেট এলিক তার *Women and Technology in Ancient Alexandria : Maria and Hypatia* প্রবন্ধে বলেন : 'Hypatia was a scholarly pagan and a woman, an espouser for Greek scientific rationalism and an influential political figure. This proved to be a dangerous combination.'। তার বিচক্ষণতা আর বিচার বুদ্ধি সমাজে এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিলো যে নগরপাল অরিস্টিস (Orestes) হাইপেশিয়ার মতামত না নিয়ে কোন কাজ করতেন না [৮]। এই সমৃদ্ধি আর স্বীকৃতিই বোধ হয় হাইপেশিয়ার কাল হল! 'তুচ্ছ নারী'র মেধা, মনন আর জ্ঞান অনেক সময়ই পরাক্রমশালী পুরুষতন্ত্রের কাছে নিতান্ত অসহনীয়। তার মধ্যে আবার সে নারী যদি হয় বিজ্ঞানমনস্ক মুক্ত-বুদ্ধির চর্চাকারী, রাজনীতি সচেতন এক স্বাধীনচেতা রমণী! আমেরিকান বিজ্ঞানী J.W.Draper স্পষ্ট করেই বলেন, 'হাইপেশিয়া ছিলেন ধর্মের বিপরীতে বিজ্ঞানের নিবিড় সমর্থক।' হাইপেশিয়াকে *ড্রাপার* দেখেছেন সেসময়কার ইউরোপীয় সভ্যতার বিদ্যমান দুটি ধারার সংঘর্ষে এক বিরোচিত নিয়ামক চরিত্র হিসেবে [১২]। দুটি ধারার একটি হচ্ছে মুক্ত বুদ্ধির চর্চা সমৃদ্ধ 'লিবারেল' ধারা আর একটি হল কট্টর-পন্থী ধর্মান্ধ 'পুরিতানিক' ধারা। হাইপেশিয়ার অনেক বক্তব্যই ছিলো গোঁড়ামী বিরোধী আর মুক্তবুদ্ধির প্রতি সমর্থনসূচক, যা নিঃসন্দেহে কট্টরপন্থিদের উষ্মার কারণ ঘটিয়েছিলো। হাইপেশিয়া তাঁর এক শিষ্যকে বাইবেল সম্পর্কে বলেছিলেন [৪] :

> 'আমি খ্রীষ্টান নই। কিন্তু বাইবেলের প্রাচীন ও নবীন দুটো খন্ডই আমি পড়েছি। আব্রাহাম ইয়াকুব ইউসুফ ধর্মই বল, আর যীশু খ্রীষ্টের ধর্মই বল, অহঙ্কার না করেও আমি বলতে পারি, ও দুটি মর্মই আমি উপলব্ধি করেছি। বিশ্বাসের কথা, ঈশ্বরের প্রেমের বাণী ও-দূটিতে আছে ঢের কিন্তু দার্শনিকের দৃষ্টিতে ওসব বালকসুলভ উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়। পরিণত বুদ্ধির জাতির জন্য থাকা উচিৎ যুক্তি-নির্ভর জ্ঞানভিত্তিক

ধর্ম একটা, যা ছিলো গ্রীকদের, যার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প নিয়ে আমি যথাসাধ্য কাজ করে যাচ্ছি আলেকজান্দ্রিয়ায় বসে।'

এ ধরনের স্বচ্ছ কথাবার্তা যে যুগে যুগে মৌলবাদীদের ক্ষিপ্ত করেছে তা বলাই বাহুল্য। এমনি একজন মৌলবাদী খ্রীষ্টান ছিলেন **সিরিল** (Cyril) যিনি ৪১২ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার আর্চ বিশপ বা পেট্রিয়ার্ক হয়েছিলেন। এই 'পেট্রিয়ার্ক' ব্যাপারটা হয়ত অনেকের কাছেই অপরিচিত। ছোটট একটু বয়ান করা যাক এ নিয়ে। পোপের পদ সৃষ্টির পূর্বে খ্রীষ্টানদের ধর্মগুরু ছিলেন তিনজন। তাদের একজন থাকতেন রোমে, একজন বাইজেন্টিয়ামে আর আরেকজন থাকতেন আলেকজান্দ্রিয়ায়। তাদেরকে বলা হত পেট্রিয়াক। আলেকজান্দ্রিয়ার এই পেট্রিয়ার্ক সিরিল হাইপেশিয়ার রাজনৈতিক দর্শনের জন্য, তার মুক্তবুদ্ধির চর্চার জন্য এবং সর্বোপরি নগরপাল অরিস্টিসের সাথে হাইপেশিয়ার সুসম্পর্কের কারণে তাঁকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। মুলতঃ এই আর্চ বিশপ সিরিল খ্রীষ্ট ধর্মের পথ প্রশস্ত করার জন্যই হাইপেশিয়াকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয় [৪]। এর পেছনে আরো একটি রাজনৈতিক দিকও ছিলো। সিরিলের সাথে অরিস্টিসের ছিলো ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। অরিস্টিসের প্রতি হাইপেশিয়ার প্রচ্ছন্ন সমর্থন সিরিলকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলে। খ্রীষ্টিয় অনুরাগীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে, আর্চ বিশপের সাথে অরিস্টিসের পুনর্মিলনে হাইপেশিয়াই হচ্ছেন প্রধান অন্তরায় [১৩]।

চার্লস কিংসলের উপন্যাস Hypatia and or the New Foes with an Old face (1853) থেকে জানা যায়, বিশপ সিরিল খ্রীষ্টান ধর্মানুরাগী তরুণদের হাইপেশিয়ার বক্তৃতা শুনতে যেতে নিরুৎসাহিত করতেন। তার ভয় হত যে, হাইপেশিয়ার প্রবল ব্যক্তিত্ব আর তীক্ষ্ণ যুক্তির কাছে খ্রীষ্ট ধর্মের দার্শনিক ভিত্তির দুর্বলতাটুকু প্রকাশিত হয়ে পড়বে। উপন্যাসে দেখা যায়, সিরিলের প্রিয় এক তরুণ খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী ফিলামন (Philammon) হাইপেশিয়ার সভায় যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে সিরিল হাইপশিয়াকে তাঁর সামনে তুলে ধরেন এভাবে : 'হাইপেশিয়া হচ্ছেন সাপের চেয়েও ধূর্ত আর সব ধরনের চালাকিতে ওস্তাদ আর যুক্তিতে পটু।' আর সিরিল ফিলামনকে এই বলে সাবধান করেন যে, 'তুমি যদি ওখানে যাও তবে নিজেকে ঠাট্টার পাত্র বলে মনে হবে, আর লজ্জায় তুমি পালিয়ে আসবে [১৪]।'

ফিলামনের মত সন্ন্যাসীদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিলো হাইপেশিয়ার বক্তৃতামঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে হাইপেশিয়ার সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণিত করা। তারা ভাবতেন তুচ্ছ নারী কী জানবে দর্শনের, বিজ্ঞানের? অথচ তাঁর অনুগামীদের কাছে হাইপেশিয়া ছিলেন মিনার্ভার মত জ্ঞানময়ী, জুনোর মত মর্যাদাময়ী আর আফ্রোদিতির মত সুন্দর। কিংসলের উপন্যাসে দেখা যায়, ফিলামন কিছুটা কৌতুহল আর আর অবজ্ঞা নিয়েই প্রথমে হাইপেশিয়ার বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন, মূল উদ্দেশ্যটি ছিল হাইপেশিয়াকে ভুল প্রমাণ করে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা। কিন্তু হাইপেশিয়ার ব্যক্তিত্ব, বাগ্মীতা আর জ্ঞানের আলোক-স্পর্শে ফিলামন আক্ষরিক অর্থেই সম্মোহিত হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত হাইপেশিয়ার একজন একান্ত অনুরাগীতে পরিণত হন। তাদের বন্ধুত্ব আর কিছুটা নৈসর্গিক প্রেমের মূর্চ্ছনা হাইপেশিয়ার মৃত্যুর শেষ দিনটি পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল [১২]।

তার প্রিয় খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের হাইপেশিয়া-মোহ সিরিলকে ক্রুদ্ধ নেকড়ের মতই উন্মত্ত করে তোলে। সিরিল হাইপেশিয়াকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিলেন। ৭১ এ বাঙালী বুদ্ধিজীবী হত্যার মতই সিরিল যেমনিভবে বেছে বেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নব্যতান্ত্রিক' নিও-প্লেটোনিস্টদের ধরে ধরে হত্যার মহোৎসবে মত্ত ছিলেন, এমনি এক দিন কর্মস্থলে যাওয়ার পথে হাইপেশিয়া মৌলবাদী আক্রোশের শিকার হলেন, অনেকটা আজকের দিনের হুমায়ুন আজাদের মতোই। তবে হাইপেশিয়ার ক্ষেত্রে বীভৎসতা ছিলো আরও ব্যাপক।

হাইপেশিয়া-হত্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায় পনের শতকে সক্রেটিস স্কলাসটিকাসের রচনা হতে [১৫]:

> 'পিটার নামের এক আক্রোশী ব্যক্তি অনেকদিন ধরেই তক্কে তক্কে ছিলো, শেষমেষ সে হাইপেশিয়াকে কোন এক জায়গা হতে ফিরবার পথে কব্জা করে ফেলে। সে তার দলবল নিয়ে হাইপেশিয়াকে তার ঘোড়ার গাড়ী থেকে টেনে হিঁচড়ে কেসারিয়াম (Caesarium) নামের একটি চার্চে নিয়ে যায়। সেখানে তারা হাইপেশিয়ার কাপড়-চোপড় খুলে একেবারে নগ্ন করে ফেলে, তারপর ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে তাঁর চামড়া চেঁছে ফেলে, তার শরীরের মাংস চিরে ফেলে, আর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত হাইপেশিয়ার উপর তাদের অকথ্য অত্যাচার চলতে থাকে। এখানেই শেষ নয়; মারা যাবার পর হাইপেশিয়ার মৃতদেহ টুকরো টুকরো করে সিনারন (Cinaron) নামের একটি জায়গায় জড় করা হয় আর তারপর পুড়িয়ে তা ছাই করে দেয়া হয়।'

হাইপেশিয়াকে হত্যা করা হয় ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে। হাইপেশিয়ার হত্যাকারীদের তালিকায় ছিলো মূলতঃ সিরিলের জেরুজালেমের চার্চের প্যারাবোলানস, মৌলবাদী সন্ন্যাসী, নিট্রিয়ান খ্রীষ্টীয় ধর্মবাদীরা [৫]। তবে সিরিল নিজ মুখে তার সাংগপাংগদের হাইপাশিয়াকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিনা তা অবশ্য বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। কিন্তু এটি অন্ততঃ নিঃসন্দেহ যে, সিরিল এমন এক ধরনের রাজনৈতিক বাতাবরণ তৈরী করতে সমর্থ হয়েছিলেন যা হাইপেশিয়া-হত্যায় ইন্ধন যুগিয়েছিলো। সিরিলকে পরবর্তীতে ধর্মীয় অধিকার বলে সেইন্ট বা সন্ত হিসেবে অভিসিক্ত করা হয়। ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধের উপযুক্ত ধর্মীয় 'শাস্তি'ই বটে!

যা হোক, অরিস্টিস এই নিষ্ঠুর হত্যাকান্ড সম্বন্ধে রিপোর্ট করেন এবং রোমকে এর তদন্ত পরিচালনা করতে অনুরোধ করেন। তারপর তিনি তার কর্মস্থল থেকে অব্যহতি নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে চিরতরে বিদায় নেন। আর ওদিকে তদন্তকাজ পদে পদে 'পর্যাপ্ত সাক্ষীর অভাবে' বাধাপ্রাপ্ত হয়, আর শেষপর্যন্ত সিরিল জল ঘোলা করতে এও জনসমক্ষে প্রচার করতে শুরু করেন যে, হাইপেশিয়া নাকি জীবিত আছেন এবং এথেন্সে বহাল তবিয়তে বাস করছেন [১৬]।

হাইপেশিয়ার হত্যাকান্ড আলেকজান্দ্রিয়া এবং পুরো রোমান সাম্রাজ্যে বৈজ্ঞানিক আর যুক্তিবাদী শিক্ষার বিদায় ঘন্টা বাজিয়ে দেয়। ইউরোপ পুরোপুরি প্রবেশ করে 'অন্ধকার যুগে'। এমনকি মৃত্যুর পরও হাইপেশিয়াকে রেহাই দেয়নি ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা। ৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে চার্চের পক্ষ থেকে হাইপেসিয়াকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করা হয় 'That woman had neither souls nor reasons' [৫]। গোঁড়া খ্রীষ্টধর্মের প্রসারের সাথে সাথে আলেকজান্দ্রিয়া নানা ধরনের ধর্মীয় সংস্থার (cult) ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে যায়, মুক্তবুদ্ধির চর্চা ব্যহত হয়; নানা ধরণের ধর্মীয় তুক-তাক, জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা, কুসংস্কার, অতীন্দ্রিয়তা আর আধ্যাত্মিকতা ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্থান দখল করে নেয়। ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়া আরবদের অধীনস্ত হয় আর সমস্ত গ্রন্থাগারটি পুনর্বার (জুলিয়াস সিজারের আগ্রাসনের পর) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় - এবারে অবশ্য বর্বর খ্রীষ্টিয় মৌলবাদীদের আরেক সহোদর ইসলামী মৌলবাদীদের হাতে [৫]। কথিত আছে আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের বই-পত্তর ধ্বংস করতে গিয়ে খলিফা ওমর নাকি বলেছিলেন -

> 'বইপত্রগুলো যদি কোরানের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয় তবে সেগুলো আমাদের দৃষ্টিতে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। কাজেই ওগুলোর ধ্বংস অনিবার্য; আর বই-পত্তরগুলোতে যদি কোরানের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোন কথাবার্তা আদৌ থেকেও থাকে তবে সেগুলো হবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত। কাজেই সে দিক দিয়েও ওগুলো ধ্বংস করা জায়েজ।'

অবশ্য অনেক গবেষক আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের উপর ইসলামের আগ্রাসনকে কেবল 'মিথ' বলেই মনে করেন [১৭]।

হাইপেশিয়াকে হত্যার পর তাকে যেন আক্ষরিক অর্থে ভুলেই গিয়েছিলো মর্তের বিস্মৃতিপরায়ন মানবজাতি। স্মৃতির পরতে পরতে পড়েছিলো ধুলোর পুরু স্তর। ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাকে হত্যার পর প্রায় তের'শ বছর ধরে সত্যিকার অর্থেই যেন নিশ্চুপ হয়ে পড়ে রয়েছিলো সবাই। অনেক অনেক বছর পরে - সেই ১৭২০ সালে জন টোলান্ড (John Toland) "Hypatia or the History of a most beautiful, most virtuous, most learned and in every way accomplished lady; who was torn to pieces by the clergy of Alexandria to gratify the pride, emulation and cruelty of the archbishop commonly but undeservedly titled St Cyril" নামের দীর্ঘ শিরোনাম বিশিষ্ট প্রবন্ধে হাইপেশিয়াকে স্মৃতির ছাইভস্ম হাত্‌রে আমাদের সামনে তুলে আনেন। তিনিই বিশ্ববিবেক কে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলেন এই বলে যে হাইপেশিয়ার মত অনিন্দ্যসুন্দর, বিজ্ঞ এবং নিষ্পাপ দার্শনিকের রক্তে হাত রঞ্জিত করার দায়ে সমস্ত পুরুষতন্ত্রের লজ্জিত হওয়া উচিৎ [১২]। হাইপেশিয়ার হত্যাকারী হিসেবে খ্রীষ্টিয় চার্চ আর তার তৎকালীন পুরোধা সিরিলকে অভিযুক্ত করে টোলান্ড ওই প্রবন্ধে স্পষ্ট করেই বলেন :

> 'সেইন্ট বা সন্ত নামধারী পুরুষতন্ত্রে দীক্ষিত এক বিশপ ছিলেন এই জঘন্য হত্যাকান্ডের মূল হোতা, আর তার শিষ্যরা ছিলেন তাদের গুরুর জিঘাংসা চরিতার্থ করার নিয়ামক।'

টোলেন্ডের হাত ধরে পৃথিবী যেন কুম্ভকর্ণের ঘুম থেকে জেগে উঠলো। যে ভলটেয়ার তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ইতিহাসে এর আগে কোন 'নারী উদ্ভাবক' পাননি, তিনিই হলেন এবার হাইপেশিয়া বন্দনায় উচ্ছসিত। তিনি Examen Important De Milord Bolingbroke Ou Le Tombeau Du Fanatisme (1736), বইয়ে বলেন :

> ''এই পাশবিক হত্যাকান্ড পরিচালিত হয় সিরিলের মাথা-মুড়োনো ভিক্ষু হিসেবে খ্যাত কতকগুলো 'ডালকুত্তা'র সহচর্যে, আর উগ্র, গোঁড়া ধর্মবাদীদের আস্ফালনে''।

ভলটেয়ার হাইপেশিয়ার অবদান উল্লেখ করেছিলেন তাঁর Dictionnaire Philosophique বইয়েও। তিনি সেখানে হাইপেশিয়াকে একজন সম্মানিত শিক্ষক এবং বিজ্ঞানী হিসেবে উল্লেখ করেন আর সিরিলকে হত্যার আভিযোগে সরাসরি অভিযুক্ত করে বলেন, 'সিরিল তাঁর খ্রীষ্টিয় আক্রোশ হাইপেশিয়ার উপর ঝেরে দিলেন।'। পরবর্তীতে হাইপেশিয়াকে নিয়ে এন্তার লিখেছেন এডওয়ার্ড গিবন (দ্য ডিক্লায়েন এন্ড ফল অব রোমান এম্পায়ার), দামাস্কিউয়াস (সুদা), হেনরি ফিল্ডিং (আ জার্নি ফ্রম দিস ওয়ার্ল্ড টু দ্য নেক্সট্), চার্লস লিকন্ট দ্য লিসল (Hypatie; Hypatie et Cyrille), মরিস বারস্ (Sous l'oeil des barbares), চার্লস কিংসলে (হাইপেশিয়া অর দ্য নিউ ফো'স উইথ এন ওল্ড ফেস্), জে ডবলিউ ড্রাপার (হিস্ট্রি অব ইন্টেলেকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট ইন ইউরোপ), বার্ট্রান্ড রাসেল (হিস্ট্রি অব ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি) সহ অনেকেই। ইতালিতে আঠারো শতকে হাইপেশিয়া 'আধুনিক সাহিত্য'-এর এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে উঠে আসে। দ্য স্যালুজো, কার্লো প্যাস্কাল, মারিও লুজি হাইপেশিয়াকে নিয়ে কবিতা, প্রবন্ধ আর নাটক রচনা করেন। জার্মান ভাষায় আর্নুলফ জিটল্‌ম্যানের ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাস 'হাইপেশিয়া' (১৯৮৯) দারুন জনপ্রিয়তা পায়। ক্যানাডাতেও প্রায় একই সময়ে আঁদ্রে ফেরেত্তি আর জ্য

মার্সেল হাইপেশিয়াকে নিয়ে দু দুটি দীর্ঘ উপন্যাস রচনা করেন। নারীবাদীরা হাইপেশিয়াকে ঘিরে রচনা করতে শুরু করেন নারীবাদী সাহিত্য। নারীবাদী কবি এবং ঔপন্যাসিক উর্সুলা মোলিনারো হাইপেশিয়াকে নিয়ে আশির দশকের শেষভাগে রচনা করেন একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ। আজ দু' দুটি বিখ্যাত গবেষনা-সাময়ীকীর (জার্নাল) নাম হাইপেশিয়ার নামানুসারে রাখা হয়েছে। একটি হল এথেন্স থেকে প্রকাশিত *'হাইপেশিয়া: ফেমিনিসট স্টাডিস'*; এবং অপরটি *'হাইপেশিয়া : এ জার্নাল অব ফেমিনিস্ট ফিলোসফি'*। হাইপেশিয়া উঠে এসেছে আজকের দিনের নারীবাদী চিত্রকর্ম এবং শিল্পকলাতেও - অত্যন্ত প্রবলভাবেই। ১৯৭৯ সালে হাইপেশিয়াকে নিয়ে নারীবাদী চিত্রকর জুডি শিকাগোর একটি স্থাপত্যকর্ম স্যান ফ্রান্সিস্কো মিউজিয়ামের 'আধুনিক চিত্রকলা'তে প্রদর্শিত হয় [১২]। সে তুলনায় বরং বাংলা সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং শিল্পকলায় হাইপেশিয়ার উল্লেখ নিতান্তই অপ্রতুল।

সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানে নারীরা অবদান রেখেছে বিপুল ভাবে। 'বিশ্বকবি' রবিঠাকুর সভ্যতার বিনির্মাণে নারীর কোন অবদান খুঁজে না পেলেও আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী, প্রত্নতাত্ত্বিক, এবং নৃতত্ত্ববিদদের মতে মানব সভ্যতার শুরুর প্রথমদিকে নারী-পুরুষের অবদান ছিলো প্রায় সমান সমান। অনুমান করা হয় আগুনের আবিস্কারক ছিলো নারী [৪]। যদি তা নাও হয়, এটি নিঃসন্দেহ যে নারীরাই প্রথম আগুন ও তাপ দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে খাদ্য-সংরক্ষণ করতে শিখেছে। নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব এমনকি প্রাচীনকালের পুরাণতত্ত্বগুলোও সাক্ষ্য দেয় যে, নারীরা প্রথম থেকেই খাদ্যসংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণের ভূমিকায় নিয়োযিত ছিলো [১৮]। কাজেই যৌক্তিকভাবেই এটি ধরে নেয়া হয় যে নারীরাই সেই ব্যবস্থাগুলোর উন্নতি সাধন করেছে। গবেষকরা এও স্বীকার করেন যে নারীরাই তৈরী করেছে হোর্টিকালচার বা উদ্যানবৃত্তির [১৯]। মানব সভ্যতার উষালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষাধিক বছর পার হয়ে গেছে, অথচ পুরো সময়কালের শতকরা নিরানব্বই ভাগ সময়ই মানুষ কাটিয়েছে সেই প্রাক-উদ্যানবৃত্তির সময়টিতে যখন পুরুষেরা শিকার এবং মৎসাহরণের সাথে যুক্ত ছিলো, আর মেয়েরা যুক্ত ছিলো গৃহস্থালীর নানা রকমের কাজ আর ফলমূল ও অন্যান্য খাবার-দাবার সংগ্রহ আর সংরক্ষণে। গবেষকরা বলছেন যে, সে সময় শিকারের মাধ্যমে পুরুষেরা যে পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করতো, তাতে মাত্র ২০ থেকে ৪০ ভাগ প্রয়োজন মিট্‌তো, বাকী ৬০ থেকে ৮০ ভাগ প্রয়োজনই মেটাতো আসলে নারীরা [১৮]। অর্থাৎ নারীরাই ছিল মুলতঃ খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার উদ্ভাবক এবং নিয়ন্ত্রক। প্রাচীন পুরাণ এবং মিথ্‌গুলোও এই মতকে সমর্থন করে। দেখা যায়, রুটি-রুজির সংস্থানকারী হিসেবে যাদের উপাস্য হিসেবে ভাবা হত তারা সবাই ছিলেন দেবী- অর্থাৎ নারী - আইসিস, সাইবেল, অ্যাগদিস্তিস, দিনদিমিন, ইশতার, আসতারতে, রিঅ্যা কিংবা লক্ষ্মী। প্রায় সব জাতির মধ্যেই যে আদিম রূপকথা প্রচলিত আছে তাতে দেখা যায় স্বর্গের কোন দেবী তার আদ্যাশক্তি বিতরণ করেছিলো এই মর্তের মানুষের মাঝে যার ফলে মানুষ শিখেছিল বীজ বুনতে, উদ্যান তৈরীতে আর কৃষিকাজের জন্য উপকরণ বানাতে। প্রকৃতিজগতেও 'বৈজ্ঞানিক নারীবাদের' সমর্থন রয়েছে। যে শিম্পাঞ্জিকূলের সাথে আমরা -গর্বিত মানুষরা- শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ সদৃশ জিন বিনিময় করি, তাদের সাথে তুলনা করেও দেখেছি যে, পুরুষ শিম্পাঞ্জীদের তুলনায় স্ত্রী-শিম্পাঞ্জীরা অনেক বেশী সময় ব্যয় করে ছোট ছোট হাতিয়ার আর যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজে। সেগুলো তারা ব্যবহার করে মাটি খোঁড়া আর খাবার সংগ্রহে [৭]।

সম্ভবতঃ মেসোপটেমিয়ার মুরিবেতের মেয়েরাই সর্বপ্রথম ভূমি-কর্ষণ করে বীজ বুনতে শিখেছিলো খ্রীষ্টের জন্মের ৮০০০ বছর আগে [১৮]। সে সময় প্যালেস্টাইনে মেয়েরা শিখেছিলো শস্যক্ষেত্র আর সবজি বাগানের পরিচর্যা করতে, আর তুরস্কে গম থেকে রুটি বানাতে। পরবর্তীকালে মৃৎপাত্র তৈরীর রাসায়নিক প্রক্রিয়া, সুতা কাটার বিদ্যা, তাঁতের প্রযুক্তি আর শণ ও তুলার রকমারি উদ্ভিদবিদ্যা শেখানোর কৃতিত্ব

শুধুমাত্র নারীদের। নারীরাই প্রথম চিকিৎসক, শিল্পী আর প্রকৌশলী [৪]। কাজেই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে নারীদের কর্মস্থল শুধু রন্ধনশালা আর শয়নকক্ষেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, নারীরা পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়ে উন্নয়ন ঘটিয়েছিলো সে সময়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির।

আজ তবে নারী বিজ্ঞানী, গবেষক, গণিতবিদ আর প্রযুক্তিবিদদের এত অপ্রতুলতা কেন পুরুষদের তুলনায়? এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। পুরুষের পাশাপাশি একদিন যে নারী পত্তন করেছিলো, বিস্তার ঘটিয়েছিলো প্রযুক্তি-নির্ভর সভ্যতার, আজ সে নারীর অধিকাংশই প্রযুক্তি আর সভ্যতা থেকে যোজন মাইল দূরে; পর্দা, প্রথা, বিশ্বাস-অপবিশ্বাস আর হাজারো পুরুষতান্ত্রিক নিয়মের ঘোরটপে বন্দি। এ তো নারী জাতির এক পরাজয়ই বটে। কখন তাহলে ঘটেছিলো নারী জাতির এই 'ঐতিহাসিক পরাজয়'? অনেক গবেষকই আজ দায়ী করেন কৃষিব্যবস্থাকে [২০]। তারা মনে করেন হোর্টিকালচার থেকে কৃষিব্যবস্থার উত্তোরণে সভ্যতা এগিয়েছে অনেক, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে দু'দুটি প্রগতিশীল মানবিক সত্ত্বাকে। কৃষিকাজের উদ্ভবের পর থেকেই নারীরা বন্দি হয়েছে গৃহে; মূলতঃ নিয়োযিত হয়েছে গৃহস্থালির পরিচর্যায় আর সন্তান লালন-পালনে, আর কৃষিব্যবস্থার ফলেই নিখুঁতভাবে তৈরী হয়েছে শ্রমবিভাজনের, পরবর্তীতে ব্যক্তিগত মালিকানার। আর এ ব্যবস্থার ক্রমোত্তরনেই নারী ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয় খাদ্যোৎপাদনের তথা প্রযুক্তির মূলস্রোতধারা থেকে। এঙ্গেলস তার 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্টরের উৎপত্তি' (১৮৮৪) নামের কালোত্তীর্ণ বইটিতে দেখিয়েছেন ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভবের সাথে সাথে একসময় সম্পদ বাড়তে থাকে, আর সেই সম্পদই শেষ পর্যন্ত শত্রু হয়ে দেখা দেয় নারীর। অরণ্যপর্ব থেকে মানুষ যখন পৌঁছোয় কৃষিপর্বে, তখন সম্পদশালী হয়ে ওঠে বিভিন্ন গোত্র। একসময় ওই সম্পদ অধিকারে চলে আসে গোত্রপতিদের; তারা হয়ে ওঠে সম্পদশালী, উদ্ভাবন ঘটে ব্যক্তিগত মালিকানার। সম্পদ যত বাড়তে থাকে পরিবারে নারীদের থেকে গুরুত্ব বাড়তে থাকে পুরুষদের, পুরুষ মাতৃধারার প্রথা ভেঙে সৃষ্টি করে পিতৃতন্ত্রের প্রথা, নারী পরিনত হয় পুরুষের সম্পত্তিতে।

ইতিহাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, আর চিকিৎসাবিজ্ঞানে নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু ইতিহাসবেত্তারাই মানব সভ্যতার ইতিহাস লিখতে গিয়ে তা বারবার এড়িয়ে গিয়েছেন। অটোমান স্ট্যানলি তার 'মাদারস এন্ড ডটারস অব ইনভেনশন' বইটিতে হাজারো দৃষ্টান্ত হাজির করে দেখিয়েছেন যে, পুরুষেরা যখন কোন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটিয়েছে তখন তা পুংখানুপুংখভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে, কিন্তু নারীরা যখন কোন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটিয়েছে তখন তা চলে গেছে বিস্মৃতির অন্তরালে। ইতিহাসবিদরা ঢালাওভাবে বলেছেন 'কে, কখন, কিভাবে এ প্রযুক্তি আবিস্কার করেছেন তা সঠিকভাবে বলা যায় না।' বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, মেয়েরা যে সমস্ত কাজকর্মে নিয়োজিত ছিল সেগুলোর ক্ষেত্রেই অমন ঢালাও 'স্টেরিওটাইপিং' করা হয়েছে। স্পিনিং হুইল বা চরকা এমনি একটি উদাহরণ। সম্ভবত নারীরাই এটির উদ্ভাবন ঘটিয়েছিলো চীন দেশে, কিন্তু আজ তার কোন লিপিবদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায় না, অথচ সেই চরকা যখন তের শতকের পর পশ্চিমা বিশ্বে প্রবেশ করে 'পুরুষের হাতে' উন্নত আর বিবর্ধিত হয়, তা তখন থেকেই যেন তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করার আগ্রহ শুরু হয়ে যায়।

তারপরও পুরুষতান্ত্রিক ইতিহাসের জাল ভেদ করে অনেক নারীই প্রতিটি যুগে আমাদের সামনে চলে এসেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হাইপেশিয়া, মাদাম কুরী, লরা বেসি, সোফিয়া কোভালেভস্কায়া, লিস মিন্টার প্রমুখ। এ কজন ছাড়াও আরও আছেন ক্যারলিন হারসেল, মেরী অ্যানী ল্যাভরশিয়ে এবং ডি.এন.এ এর উদ্ভাবক রোজালিন ফ্র্যাঙ্কলিন। এদের সবাই গবেষণাগারে পুরুষ

সহযোগীদের সাথে একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন; অথচ ওই সহযোগীরাই তাঁদের অবদানকে অনেক সময়ই অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছেন। ফ্র্যাঙ্কলিনের কথা তো বলাই যায় - ডি.এন.এর 'যুগল সর্পিলের' রহস্যভেদ করার পরও প্রাপ্য কৃতিত্ব থেকে তাঁকে ইচ্ছে করেই বঞ্চিত করা হয়েছে। জোসলিন বেল পালসার আবিস্কারের পরও নোবেল পুরস্কার পাননি, পেয়েছেন তাঁর পুরুষ সহযোগী অ্যান্থনী হিউয়িশ [২১]। আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব নিয়ে লিখিত যুগান্তকারী পেপারটিতে তার স্ত্রী মিলেভা আইনস্টাইনের অনেক অবদান থাকা সত্ত্বেও তা এড়িয়ে গেছেন [২২]। ভেরা রুবিন 'ডার্ক ম্যাটার' বা গুপ্ত পদার্থ আবিস্কারের পরও স্বীকৃতি পেতে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছে দীর্ঘ সময়। উনিশ শতকে ব্রিটেন এবং আমেরিকায় এমন আইনও করা হয়েছিলো, বিবাহিত নারীরা যদি কোন 'পেটেন্ট' উদ্ভাবন করে থাকেন, তা স্বামীর সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে [৭]। এ সব কিছুই পুরুষেরা ব্যবহার করেছে নারীর উদ্ভাবনী শক্তিকে অবদমিত আর ব্যহত করার কাজে। এটি নিঃসন্দেহ যে, নারীরা সভ্যতা-নির্মানের এক বড় অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও পুরুষশাসিত সমাজের সীমাবদ্ধতায় পথ হারিয়েছে বারে বারে। কিন্তু যে নামটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব নিয়ে উঠে এসেছে, যার মৃত্যুর সাথে জড়িয়ে আছে আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের ধ্বংস, আর মধ্যযুগীয় অন্ধকার যুগের সূচনা - তিনি হলেন হাইপেশিয়া। হাইপেশিয়া হত্যায় বিক্ষুব্ধ হয়ে চার্লস লিকন্ট দ্য লিসল এক সময় নিবেদন করেছিলেন আবেগময় পংক্তিমালা, আমার অক্ষম হাতের আনুবাদে তার অনেকটাই হয়ত নিরস শোনাবে :

> 'সে একা বেঁচে আছে, যেন শাশ্বত চিরন্তনী হয়ে
> মৃত্যু কেবল বিক্ষিপ্তই করতে পারে এই কম্পমান বিশ্বব্রহ্মান্ডকে
> কিন্তু আজো সৌন্দর্য তাঁর আগুন হয়ে জ্বলে
> আর তাঁর ভিতর পুনর্জন্ম ঘটে যেন সকলের
> এবং ধরিত্রী ভুলুন্ঠিত হয়ে পড়ে রয় তাঁর শুভ্র চরণ তলে।'

বার্ট্রান্ড রাসেল তার *হিস্ট্রি অব ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি* গ্রন্থে স্পষ্ট করেই বলেছেন, হাইপেশিয়াকে হত্যার মাধ্যমে আলেকজান্দ্রিয়ার খ্রীষ্টিয় মৌলবাদীরা নিশ্চিত করেছিল যেন আর কোন দার্শনিক ভবিষ্যতে তাদের এমনিভাবে না জ্বালায়। হাইপেশিয়ার বেদনাঘন উপাখ্যান মনে করিয়ে দেয় আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির বিদুষী নারী 'খনা'কে যার খ্যাতি ক্ষুব্ধ করে তুলেছিলো তদানিন্তন পুরুষতন্ত্রকে। শেষপর্যন্ত খনার জীহ্বা কেটে ফেলে পুরুষতন্ত্র একসময় পালন করেছিলো তাদের জয়ন্তী উৎসব। ঠিক তেমনিভাবে হাইপেশিয়াকে হত্যার মাধ্যমে পুরুষতন্ত্রের পুরোধা খ্রীষ্টিয় চার্চ আকাশে উড়াতে চেয়েছিলো তাদের বিজয় কেতন, যা প্রকারান্তরে সূচনা করে মানব-ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক ঘোর কৃষ্ণ অধ্যায়ের - অন্ধকার যুগ বা *ডার্ক এজ*-এর ।

তথ্যসুত্রঃ

১) *পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী* , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খন্ড, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ।
২) Women in Philosophical Dictionary, Voltaire, Vol. 10, Dumon Paris, 1764 (reprint 1901)
৩) *ব্রুনোর আত্মত্যাগ ও যুক্তিবাদ* - শহিদুল ইসলাম, মুক্ত-মনা; জিওর্দানো ব্রুনো স্মরণে সেমিনার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইন্সটিটিউট মিলনায়তন, ২৯ এপ্রিল ২০০৫।

৪) *মহাজাগতিক আলোয় ফিরে দেখা*, আসিফ, সময় প্রকাশন, ২০০৩।
৫) *Women and Technology in Ancient Alexandria : Maria and Hypatia*, Margaret Alic, Women's Studies Int. Quart., Vol.4, No. 3, 1981, pp 305-312.
৬) *Women, Technology and Innovation*, ed. Joan Rothschild, New York : Pergamon, 1982.
৭) *Mothers and Druthers of Invention: Notes for revised History of Technology*, Autumn Stanley, The Scarecrow Press, Inc. Metuchen, N.J., & London, 1993
৮) *Hypatia*, Joseph McCabe, Critic, Vol 43, pp 267-272.
৯) *Hypatia's Heritage*, Margaret Alic, Boston, 1986.
১০) *Humanisms and History of Mathematics*, A. W. Richeson, ed. G. W. Dunnington, National Mathematics Magazine, Vol. 15, 1940, pp 74-82.
১১) *Women of Mathematics*, R. Jacobacci, Arithmetic Teacher, Vol. 17.4, 1970, pp 316-324.
১২) *Hypatia of Alexandria*, Maria Dzielska, Translated by F. Lyra, Harvard University Press, England, 1995.
১৩) *Life of Hypatia*, Socrates Scholasticas, from his ecclesiastical History, Alexandra 2, Cosmology, Philosophy, Myths and culture, Ed. David Fideler, Phanes Press.
১৪) *Hypatia and or the New Foes with an Old face*, Charles Kingsley, Conkley, Chicago, 1853 (1906)
১৫) *The Murder of Hypatia*. Socrates Scholasticus. Fifth Century (1953). In: Freemantle, Ann ed. A Treasury of Early Christianity, pp. 379-380. Viking, New York.
১৬) *Women in Mathematics*. Lynn M. Osen. The MIT Press, Cambridge (1975).
১৭) *The Decline and Fall of Roman Empire, vol 1-3*, Edward Gibbon, Everyman's Library; Boxed ed (1993)
১৮) *Daughters of ISIS, Daughters of Demeter: When Women Sowed and Reaped*, Autumn Stanley, Women's Studies Int. Quart., Vol 4, No. 3, pp. 289-304 (1981).
১৯) *Female of the Species*, M. Kay Martin & Barbara Voorhies, New York: Columbia University Press, 1975.
২০) *The Worst Mistake in the History of the Human Race*, Jared Diamond, Discover Magazine, pp Pages 64-66, May 1987
২১) *আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী*, অভিজিৎ রায়, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৫।
২২) *আজি হতে শতবর্ষ আগে*, অভিজিৎ রায়, (মুক্তমনা) সাপ্তাহিক যায় যায় দিন, ১৫ মার্চ, ২০০৫

ড. অভিজিৎ রায়, আমেরিকায় বসবাসরত গবেষক এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' ও 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। সাম্প্রতিক সম্পাদিত গ্রন্থ - 'স্বতন্ত্র ভাবনা'। ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com

ব্রুনোর মৃত্যু এবং কিছু প্রশ্ন
শহিদুল ইসলাম

মানুষ কখনই কোনো প্রশ্ন বা ব্যাখ্যা ছাড়া জীবনকে মেনে নেয় নি। এটাই মানুষের স্বভাব। প্রাচীনকাল থেকেই, বিশেষ করে গ্রিক সভ্যতার শুরুর কাল থেকে, মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনাবলী নিয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে এসেছে। 'আমি কে', 'কোথা থেকে এসেছি', 'কোথায় চলেছি', 'বিশ্বব্রহ্মান্ড কে নিয়ন্ত্রণ করছে', 'বস্তুর প্রকৃত সত্তা কি?', 'জীবন মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য কি?', ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে এসেছে মানুষ সেই আদিকাল থেকেই। ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান যুগে যুগে এসব প্রশ্নের জুৎসই একটা উত্তর দেবার চেষ্টা করেছে। সেসব প্রশ্নের স্থান-কাল-ঐতিহাসিকতার সীমানায় আবদ্ধ ছিল। উত্তরও। মধ্যযুগের দার্শনিকরাও তাদের যুগের ভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত থেকেই এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চার্চের মৌলিক মতাদর্শগুলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা। নতুন কোনো চিন্তার অনুসন্ধান করা সে সময় ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। মধ্যযুগের এক হাজার বছর দর্শন ও বিজ্ঞান ধর্মতত্ত্বের ক্রীতদাস ছিল বললে ভুল বলা হয় না। মধ্য ও আধুনিক যুগের সীমানায় দাঁড়িয়ে জিওর্দানো ব্রুনো তাঁর সীমাহীন জ্ঞানানুশীলনের জন্য ক্যাথলিক ধর্ম আদালতের রায়ে আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

জিওর্দানো ব্রুনো সময়ের অনেক আগে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এমন একটা সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন যখন মধ্যযুগ শেষ হয়েও হয় নি, আবার আধুনিক যুগ শুরু হয়েও হয় নি। মধ্যযুগের ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং আধুনিক যুগের যুক্তিবাদ শুরুর সন্ধিক্ষণে তাঁর জন্ম হয়। ১৫৪৮ সালে ইতালির ভিসুভিয়াস পর্বতমালার অদূরে ছোট্ট একটি শহর নোলায় তার জন্ম। ইউরোপের দীর্ঘ অন্ধকার যুগের শেষে এই ইতালিতেই ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে রেনেসাঁর যাত্রা শুরু হয় এবং পরবর্তী দুশো বছর তা ইতালি এবং সমগ্র ইউরোপের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিক ও শিল্পকলায় অভূতপূর্ব জোয়ার নিয়ে আসে। সে রেনেসাঁর কথা উঠলে আমরা ভাবে গদগদ হয়ে পড়ি। রেনেসাঁ যখন উত্তুঙ্গে, তখন সেই রেনেসাঁর সূতিকাগার ইতালিতে জন্ম গ্রহণ ক'রে জিওর্দানো ব্রুনোকে শুধু জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার জন্য মাত্র ৫২ বছর বয়সে পরম ক্ষমতাশালী চার্চের এক ঘৃন্য বিচারের রায়ে জীবন্ত পুড়ে মরতে হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম বছরে তাঁর সে আত্মত্যাগ রেনেসাঁর সব অর্জনকে যেন ব্যঙ্গ করে। ১৫৫০ সালের পর রেনেসাঁ আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পেতে থাকে। রিফর্মেশন বিরোধী এক প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনে সমগ্র ইউরোপ তখন কাঁপছে। ব্রুনো সেই সময় তাঁর দর্শন ও বিজ্ঞান প্রচার করেছিলেন। তখন দর্শন ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটে নি। দর্শনচ্যুত বিজ্ঞান কিংবা বলা যায় বিজ্ঞানচ্যুত দর্শনের এক অন্ধকারময় সময়ে ব্রুনো তাঁর বিপ্লবী মতবাদ নিয়ে অবতীর্ণ হন।

ব্রুনো-হত্যা প্রমাণ করে যে তখনও সমাজের ওপর গীর্জার দাপট কমে নি। ধর্মনিরপেক্ষ শাসকের শক্তি তখনও তেমন বৃদ্ধি পায় নি। সামন্তবাদী অর্থনীতির ভাঙ্গন শুরু হলেও সমাজের ওপর তার সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ তখনও রীতিমত বহাল রয়েছে। পুঁজিবাদ কেবল উঁকিঝুঁকি মারছে। শিল্পবিপ্লব তখনও বহুদূরে। গীর্জার সঙ্গে রাজার ক্ষমতার দ্বন্দ তখনও নিরসন হয় নি। আর রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের দ্বন্দ্ব তখনও জমে ওঠে নি।

সময়ের সাথে সাথে শেষের দুই দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে ওঠে। বলা যায় সমগ্র মধ্যযুগ ধরেই গীর্জা ও সেক্যুলার শাসকের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলে আসছিল। পোপ ইনোসেন্ট III (১১৯৮-১২১৬)-র সময়ে চার্চ ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করে। কিন্তু তা অল্পকাল স্থায়ী হয়। তবে রাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বন্দ্ব গীর্জার পরাজয় ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। গীর্জা তার ক্ষমতা সংরক্ষণে মরিয়া হয়ে ওঠে। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত রোমান ক্যাথলিক চার্চ মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। ইহজাগতিকতা এবং প্রটেস্টান্ট ধর্মের বিস্তার রোধে মরিয়া হয়ে ওঠে। ১৫৪২ সালে খ্রিস্টীয় আদালত (Inquisition) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৫৬৪ সালে 'Council of Trent সর্বপ্রথম নিষিদ্ধ বই-এর তালিকা প্রকাশ করে। প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার শক্তি পরস্পর সহ অবস্থান করে। অকসফোর্ড, কেমব্রিজ, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিক্রিয়ার শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয়। ব্রুনোর ওপর যখন অত্যাচার-নির্যাতন চালানো হয়, সেই ষোড়শ শতাব্দীর শেষ নাগাদ পশ্চিম ইউরোপ কিছুটা হলেও মধ্যযুগীয় বিশ্বছবি থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। অধিকাংশ সাধারণ মানুষ মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনার মধ্যে নাক ডুবিয়ে থাকলেও মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তনের রেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশ্বাসের স্থানটি ক্রমশ গ্রহণ করতে থাকে যুক্তি। আবেগ, মিথ এবং অতিপ্রাকৃত কিছুর স্থান দখল করে যুক্তিবাদ। মানুষ তার নিজের ওপর আস্থা ফিরে পায়। নবোত্থিত বিজ্ঞানের প্রভাব অবহেলা করতে পারে না পশ্চিম ইউরোপ। সেইসঙ্গে ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপ এগিয়ে চলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি। বংশ পরিচয় নয়, মেধা, মনন ও পরিশ্রমের দ্বারা সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে সাধারণ ঘরের মানুষ। কোপারনিকাস, গ্যালিলিও ও নিউটনের নতুন বিশ্বছবি, ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় এরিস্টটলের মধ্যযুগীয় বিশ্বছবিটাকে। সেই নবোত্থিত বিজ্ঞানের অনুপ্রেরণায় দর্শন ধর্মতত্ত্বের শক্ত রশি ছিঁড়ে বের হয়ে আসতে সমর্থ হয়। অনেকেই অ-খ্রিষ্টান হয়ে পড়েন, অনেকে আবার ধর্ম বিরোধী। যুক্তিহীন বিশ্বাস নয়, অনুভূতিপ্রসূত যুক্তিই হয়ে ওঠে তাঁদের হাতের প্রধান হাতিয়ার। অভিজ্ঞতা ও যুক্তি দিয়েই তাঁরা ওপরের প্রশ্নগুলির সমাধান চান। কোন প্রাচীন বা ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব তাঁরা আর মানতে রাজী নন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার গুরুত্ব অনুভূত হতে থাকে। আল কেমিস্টরা হাতে কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ধারাই ব্যবহার করতো। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, বিজ্ঞান চেতনা বিরোধী। লক্ষ্য ভুল হলে যা হয়, তাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তবে তাঁদের সে অপচেষ্টার ফলে আধুনিক রসায়ন জন্মগ্রহণ করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সম্ভবত রোজার বেকন (১২১৪-১২৯২) সর্বপ্রথম যুক্তি ও হাতে কলমে পরীক্ষানিরীক্ষার ওপর জোর দেন এবং এরিস্টটলের অপবিজ্ঞানকে সাংঘাতিক ভাষায় আক্রমণ করেন। তিনি এরিস্টটলের সমস্ত বই পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। তিনিই প্রথম সামন্তবাদী অর্থনীতির ভাবাদর্শ ও জীবনাচরণের অমানবিকতার কথা বলেন। চারিত্রিক সঙ্গতি না থাকলেও তার দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিল বস্তুতান্ত্রিক। এরিস্টটলীয় ভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অধ্যাপনার পদ থেকে সরিয়ে দেয় এবং গীর্জা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাঁকে বন্দি করা হয়। জিওর্দানো ব্রুনোর হত্যার ২০ বছর পর ফ্রাসিস বেকন (১৫১৬-১৬২৫) তাঁর বিখ্যাত বই 'নোভাস অর্গানাম', প্রকাশ করেন। সেই বইতে তিনি স্কলাসটিসিজম নামের বিজ্ঞান বিরোধী দর্শনকে আক্রমণ করেন এবং আধুনিক আরোহী পদ্ধতির সাহায্যে বিজ্ঞানের বন্ধ দরজা খুলে দেন। ঐ বইতে বেকন পরিস্কার ভাষায় ধর্মের বিজ্ঞান বিরোধী চরিত্রের উল্লেখ করেন এবং ধর্ম-সংস্থার হাতে বিজ্ঞানীদের অত্যাচার-নির্যাতনের কথাও উল্লেখ করেন। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্যি যে মাত্র ২০ বছর আগে ক্যাথলিক চার্চ যে ব্রুনোকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিল, সেকথার কোনো উল্লেখ নেই সে গ্রন্থে।

একজন সৈনিক জিওভ্যানী ব্রুনোর ঘরে জন্মগ্রহণ করলেও সত্যি কথা বলতে কি ব্রুনোর কোনো পরিবার ছিল না, জন্মস্থান ছিলনা, রাষ্ট্র ছিল না, ধর্ম ছিল না। এই বিশাল পৃথিবীতে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ-একা। ভবঘুরের মত প্রাণ হাতে করে ইউরোপের দেশে দেশে তাঁকে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। তবুও আশ্চর্যের কথা এই যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে যাজক-ঐতিহ্যের দ্বারা নিপীড়িত নিঃসঙ্গ ব্রুনো তৎকালীন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির ওপর দাঁড়িয়ে একজন প্রকৃত দার্শনিকের মত পৃথিবীকে বিচার করতে বসেছিলেন। এটা আশ্চর্যের এই জন্য যে মাত্র বিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা এই ধরণের চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তাই বলছিলাম ব্রুনো তাঁর সময়ের অনেক আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যখন তার দর্শন শোনার কান তৈরি হয় নি। বিশ্বাস করার মন তো তৈরিই হয় নি।

আধুনিক অর্থে ব্রুনোই ছিলেন প্রথম সর্বপ্রাণবাদী। সর্বেশ্বরবাদ মনে করে পৃথিবীর সবকিছুর প্রাণ আছে। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। তাই ঈশ্বরকে খোঁজার জন্য কোন উপাসনালয়ের প্রয়োজন নাই। তিনি খ্রিষ্টিয় ধর্মতত্ত্ব সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছিলেন। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার বস্তুবাদ ও স্টয়িক মতবাদের পুনরুত্থান ঘটান। তার সঙ্গে অনন্ত অসীম বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রফেটিক ধারনা সংযুক্ত করেন।

তের বছর থেকে পরবর্তী দশ বছর তিনি নেপলসের সেন্ট ডোমিনিকান স্কুলে লেখাপড়া করেছিলেন। বিখ্যাত স্কুল সেটি। সেন্ট থমাস এ্যাকুইনাস ছিলেন ডোমিনিকান গোত্রের একজন মানুষ। তিনি সেই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ব্র"নো এ্যাকুইনাসের প্রভাব অস্বীকার করতে পারেন নি এবং কিছুকালের মধ্যে ব্রুনো একজন ডোমিনিকান ধর্মযাজক হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে তিনি জিওর্দানো নামটি গ্রহণ করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই স্কুলের সবাই তাঁর অসাধারণ মেধা ও স্মরণশক্তির পরিচয় পান। তিনি একজন স্পষ্টভাষী, মুক্তমনের মানুষ ছিলেন। কিন্তু বাক সংযম করতে জানতেন না। যা সত্যি মনে করতেন, অনায়াসে তা প্রকাশ করতে পিছপা হতেন না। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি নিজেকে বিপদের জালে জড়িয়ে ফেলেন। প্রমাণ হয়ে যায় যে এই বালক ডোমিনিকান সম্প্রদায়ের উপযুক্ত নন। সেকালে ছাত্রদের প্রশ্ন করার কোনো অধিকার ছিল না। শিক্ষক ছাত্রদের যা শেখান, ছাত্রদের সেটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হত। ছাত্র অবস্থায় যা তাকে শেখানো হতো, শিক্ষক হয়েও তার মধ্যে মুখ ডুবে থাকাই ছিল, সেকালের শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ। শিক্ষকরা ছিলেন পুরাতন জ্ঞানের সংরক্ষক। নতুনের প্রতি তাঁদের কোনো আগ্রহ ছিল না। ছাত্ররা ছিল তাঁদের শ্রোতা। শিক্ষকদের জ্ঞানের প্রশংসা করাই ছিল একজন ভাল ছাত্রের সদগুণ। নতুন কোনো কথা বলা, কোন রকম সন্দেহ প্রকাশ ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সৃজনশীলতা ছিল মহাপাপ। তারা পরিশ্রম করবে, পরীক্ষা দেবে এবং ফলের জন্য অপেক্ষা করবে। শিক্ষা ছিল এরকম একরৈখিক ব্যাপার। কিন্তু ব্রুনোর চরিত্রে সেরকম 'সদ্গুণ' ছিল না। নতুনের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল মজ্জাগত। মাঝে মধ্যে বেয়াড়া ধরনের প্রশ্ন করে শিক্ষকদের বেকায়দায় ফেলে দিতেন। তাই অচিরেই তিনি বিপদগ্রস্ত হলেন। প্রচলিত ধর্মকে তিনি যুক্তির অস্ত্র দিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করতেন। ফলে শিগগিরই তিনি ধর্ম আদালতের নজরে পড়েন। ১৫৭৬ সালে বিচার এড়াতে তিনি নেপলস ত্যাগ করে রোমে যান। সেখানেও নিস্তার নেই। বিচারের ভয়ে অতি সত্বর রোম ত্যাগ করেন। এই সময় তিনি ডোমিনিকান ধর্মমত পরিত্যাগ করেন। ১৫৭৯ সালে তিনি জেনেভায় যান। সেখানে কেলভিন একটি প্রটেস্টান্ট রিপাবলিক স্থাপন করেছিলেন। তিনি কেলভিন ধর্মমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু বেশীদিন তিনি তা ধরে থাকতে পারেন না। আবারও তিনি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। একটি প্রবন্ধে তিনি

জনৈক কেলভিনপন্থী দর্শনের অধ্যাপককে আক্রমন করেন এবং তাঁর একটি বক্তৃতায় ২০টি ভুল শনাক্ত করেন। ফলে তাঁকে কিছুদিন কারাভোগ করতে হয়। ভুল স্বীকার করে তিনি মুক্তি পান।

১৫৮১ সালে তিনি প্যারিসে পলায়ন করেন। সেখানে তখন ক্যাথলিক ও হুগোনটদের মধ্যে ধর্মীয় যুদ্ধ চলছে। তাঁর ধর্মবিশ্বাসের কারণে সেখানে তিনি শিক্ষকতার কোনো কাজ পেলেন না। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সেখানকার বিদ্বৎসমাজের সামনে বক্তৃতা দেন। প্রথম দিকে তিনি কিছু সহানুভূতিশীল বন্ধুও পেয়ে যান। তাঁর গুণপনা, বিশেষ করে তাঁর অসাধারণ স্মরণশক্তির কথা, রাজা তৃতীয় হেনরির কানে পৌঁছায়। ব্রুনোর নতুন দর্শনের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। ব্রুনো কি আসলেই জাদুকর নাকি মায়াবী কিছু, তা জানার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ব্রুনো তাঁর প্রখর স্মরণশক্তির জন্য যাদুকর বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রাজা তাকে ডেকে পাঠান। ব্রুনো তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হন যে ম্যাজিক নয়, তাঁর সিসটেম সুসংগঠিত জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অল্পকালের জন্য হলেও ব্র"নো ফ্রান্সের রাজার আশীর্বাদ লাভ করেন। ১৫৮৩-১৫৮৫ এই দুই বছর তিনি লন্ডনে ফরাসি রাষ্ট্রদূতের বাড়ীতে বাস করেন। এই সময় ১৫৮৪ সালে তাঁর দুখানা বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। The Ash Wednesday Supper এবং On the Infinity Universe and Worlds এ বই দুখানি তো বটেই, তাঁর প্রায় ২০ টি গ্রন্থের সবগুলোই ইটালি ভাষায় লেখা। প্রথম বইটিতে তিনি কোপারনিকাসের সূর্য কেন্দ্রিক সৌরজগতের সমর্থনে তার বক্তব্য তুলে ধরেন। দ্বিতীয় বইটিতে তিনি আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ডের মত আরও অসংখ্য বিশ্বব্রহ্মান্ডের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ তুলে ধরেন এবং বলেন তাদের প্রত্যেকটিতে মানুষের মত বুদ্ধিমান প্রাণীর বাস আছে। তাঁর এ মত সরাসরি বাইবেলের জেনেসিস পর্বের বিরোধী। তাই চার্চ তা মানতে রাজী ছিল না। ঐ বছর তাঁর আরও একখানা বই প্রকাশিত হয়। 'On Cause, Principle and Unity'। এই তিনখানা বইতে ব্রুনো তাঁর বিশ্বতত্ত্ব স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তা ছিল ধর্মীয় ও এরিস্টটলিয় বিশ্বতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। শেষ বইতে তিনি ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মত বলেন -

> "সমগ্র পৃথিবী ও তারকারাজির কোনো মৃত্যু নেই এবং তারা কখনও ভেঙ্গে পড়ে না। সুতরাং প্রকৃতির কোথাও কিছুর মৃত্যু অসম্ভব। সময় সময় তারা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্পূর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে তারা পুনর্গঠিত হয় মাত্র। ওপর ও নীচ বলে ধ্রুব কিছু নেই, যেমনটি এরিস্টটল শিক্ষা দিয়েছেন, মহাশূন্যে স্থায়ী আসন বলেও কিছু নেই। একটি বস্তুর অবস্থান অন্য আর একটি বস্তুর অবস্থানের সঙ্গে আপেক্ষিক। বিশ্বব্রহ্মান্ডের সর্বত্র বস্তু অবিরাম পরিবর্তনের অধীন এবং পরিদর্শক সবসময়ই বস্তুজগতের কেন্দ্রে অবস্থান করেন ।"

এভাবে ব্রুনো সে সময়ই গতির আপেক্ষিকতা তত্ত্বের আভাষ দেন।

কোপারনিকাস শুধু সৌর জগতের কেন্দ্রে পৃথিবীর জায়গায় সূর্যকে স্থাপন করে এক বিপ্লব সাধন করেছিলেন। কোপারনিকাস অনন্ত বিশ্বজগতের কথা ভাবেন নি, তাঁর ভাবনা ছিল সৌরজগৎকে ঘিরে। কিন্তু ব্রুনো কোপারানিকাসের কল্পিত সীমিত বিশ্বের মডেলটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং অসীম বিশ্বব্রহ্মান্ডের অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন, একাধিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণাও তিনি করেছিলেন। পরবর্তী বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ব্রুনোর কল্পনাকে সত্যি বলে প্রমাণ করে। হাজার হাজার বিশ্বব্রহ্মান্ডের অস্তিত্ব আজ আর অনুমানের ব্যাপার নয়। তাই জার্মান দার্শনিক আর্নেস্ট ক্যাসির বলেন,

> "ব্রুনোর সিদ্ধান্ত মানুষের স্বাধীনতার পথে প্রথম ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ। মানুষ কেবল আমাদের বিশ্বব্রহ্মান্ডের ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে রাজী নয়। ..... অনন্ত ও অসংখ্য বিশ্বব্রহ্মান্ডের ধারণা মানুষের যুক্তির সীমানাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। বরং তা মানুষের চিন্তার স্বাধীনতার জন্য এক বিরাট উদ্দীপক সিদ্ধান্ত।"
> (আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অভিজিৎ রায়, ২০০৬, পৃষ্ঠা ১৩৭)

এর কিছু আগে ১৫৮২ সালে তাঁর দুখানা বই প্রকাশিত হয়। Shadows of Idea এবং Art of Memory। এই বই দুখানাতে তিনি মানুষের ধারণা বা আদর্শকে সত্যের ছায়া বলে মনে করেন। একই বছরে তাঁর Brief Architecture of the Art of Lully নামে আরো একটি বই প্রকাশিত হয়। লুলি নামের প্রধান চরিত্রটি গীর্জার ধর্মমত মানুষের বিচার বুদ্ধি দিয়ে প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু ব্রুনো প্রমাণ করেন যে এই ধরণের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার কোনো অর্থ হয় না। খ্রিষ্টধর্মকে তিনি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলে দাবি করেন। তিনি মনে করেন যে ধর্ম সম্পূর্ণ দর্শন বিরোধী। খ্রিষ্টধর্ম অন্যসব ধর্মের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে ধর্মের ভিত্তি হল অন্ধ বিশ্বাস। তথাকথিত প্রত্যাদেশের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

তিনি যে অসীম বিশ্বব্রহ্মান্ডের প্রস্তাবনা করেন সেখানে ঈশ্বরের ধারণার কোনো জায়গা রাখেন নি। তিনি ধারণাই করতে পারতেন না যে ঈশ্বর এবং প্রকৃতির কোনো আলাদা সত্তা আছে এবং পৃথকভাবে তাঁরা অস্তিত্ববান। বাইবেলের জেনেসিস পর্ব, ক্যাথলিক চার্চ, এমন কি এরিস্টটল যে রকম ঈশ্বরের কল্পণা করেছিলো, সেটা ব্রুনো মানতে পারেন নি। তাঁর কাছে মেরীর কৌমার্য এবং যীশুর ক্রুসবিদ্ধের ব্যাপারটি অর্থহীন। তিনি বাইবেলকে অশিক্ষিতের জন্য একখানা বই ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেন নি। তিনি চার্চের শিক্ষাকে অনর্থক মনে করেন এবং মনে করেন যে তা মানুষের অজ্ঞতাকে উস্কে দেয়। ব্রুনো লেখেন "মানুষ যা কিছু সুনিশ্চিত এবং স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে মনে করে, সেগুলোকে যদি ব্যাপক আলোচনার আওতায় আনা যায়, তাহলে প্রমাণ হয়ে যায় যে সেগুলো কতটা অসঙ্গত এবং অযৌক্তিক"। তিনি 'Libertes philosophica' নামে একটি শব্দবন্ধের প্রচলন করেন যার অর্থ হল চিন্তার স্বাধীনতা, স্বপ্ন দেখার স্বাধীনতা এবং যদি ইচ্ছা কর দর্শন সৃষ্টির স্বাধীনতা। তার চতুর্থ বইয়ের নাম 'The Incantation of circe', সিরসির যাদু । সিরসি হচ্ছে হোমারের সেই যাদুকর যিনি মানুষকে পশুতে রূপান্তর করে এবং সেই পশুর সঙ্গে তাদেরই ভুলভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা করে। ব্রুনোর এই বইটা প্রমাণ করে যে তিনি ভাবানুষঙ্গ নিয়ে চিন্তা করতেন এবং ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ও তার পদ্ধতি নিয়ে অবিরাম প্রশ্ন উত্থাপন করতেন।

৩৪ বছর বয়সে ১৫৮২ সালে তিনি The Chandler নামে একটি নাটক লেখেন। নাটকের থিম এরকম: একজন মোমাবাতি প্রস্তুতকারক চর্বি ও তৈলজ পর্দাথ দিয়ে মোমবাতি তৈরী করে এবং সেগুলো বিক্রি করার সময় উচ্চস্বরে বলতেন,

> 'আমার তৈরী এই মোমবাতির দিকে তাকান। এটি আমি তৈরি করেছি। এর আলো আপনাদের কিছু বিশ্বাসের ছায়াকে দীপ্তিমান করে তুলবে। ..... আমি আমার বিশ্বাস আপনাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চাই না। সময়ই সবকিছু দেয় আবার সবকিছু কেড়ে নিয়ে যায়। সবকিছু পরিবর্তিত হয় কিন্তু কোনোকিছুই অস্তিত্বহীন হয়ে যায় না। ..... এই দর্শনের সাহায্যে আমার মনের শক্তি বৃদ্ধি পায়, আমার মন প্রসারিত হয়। তবে রাত যতই অন্ধকারাচ্ছনড়ব হোক, আমি দিনের জন্য অপেক্ষা করি এবং

যারা সারাদিন ঘোরতর পরিশ্রম করেন তারা রাতের জন্য অপেক্ষা করেন। সুতরাং আনন্দ করুন। সম্ভব হলে তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ থাকুন এবং ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা প্রদান করুন।' (John J Kessler Ph. D. Ch.E.).

ব্রুনো প্রায় এককভাবে কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে প্রচারাভিযান চালিয়ে যান। তখন প্রায় সবাই তার কথায় হাসাহাসি করতো-ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতো। কোপারনিকাসের তত্ত্ব তখন প্রায় কেউই বিশ্বাস করতো না কারণ তা এরিস্টটলের বিশ্বতত্ত্বের সঙ্গে মেলে না। ১৫৮২ থেকে ১৫৯২ সালের মধ্যে ইউরোপে এমন একজন শিক্ষক খুঁজে পাওয়া যেত না, যিনি সরাসরি ও খোলাখুলিভাবে কোপারনিকাসের বিশ্বতত্ত্বের পক্ষে কথা বলতেন। একমাত্র ব্রুনো ছাড়া। গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২) কখনও ব্রুনোর সঙ্গে দেখা করেন নি এবং তিনি তাঁর কোনো লেখায় ব্রুনোর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি। কেপলার (১৫৭১-১৬৩০) ও গ্যালিলিও উভয়েই ব্রুনোকে খুব একটা পছন্দ করতেন না।

ইংলন্ডের রানী এলিজাবেথের সঙ্গে তার একবার দেখা হয়েছিল। তিনি তার গুণকীর্তনে খুবই বাড়াবাড়ি করেছিলেন। রানীকে তিনি অপেরা গায়িকা, প্রোটেস্টান্ট শাসক, পূতপবিত্র, স্বর্গীয় ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেছিলেন এবং তাকে His Most Christian Majesty এবং পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রধান বলে সম্বোধন করেছিলেন। তাঁর এই উচ্ছাসময় উক্তি তাঁর বিচারের সময় তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল। তাঁকে একজন নাস্তিক এবং ধর্মদ্রোহী বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। রানী এলিজেবেথও ব্রুনো সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। তিনি তাকে একজন জংলি, বিপ্লবী, রাষ্ট্রদ্রোহী ও ভয়ঙ্কর মানুষ বলে মনে করতেন। আবার, ব্রুনো ইংরেজেদের কর্কষ মানুষ বলে মনে করতেন।

ইতোমধ্যে ধর্মসংস্কার আন্দোলনে প্রোটেস্টান্ট ধর্মের বিজয় সূচিত হয়েছে। ইংল্যান্ড তখন ক্যাথলিক ধর্ম ও রোমের বিরুদ্ধে সোচ্চার। ব্রুনো এতে আশাবাদী হয়ে ওঠেন। ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ইংলন্ডে যান। অনেক আশায় আবার বুক বেঁধে ব্রুনো অক্সফোর্ডে দর্শনের অধ্যাপক পদের জন্য দরখাস্ত করেন। কিন্তু অক্সফোর্ড তখনও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের মত নির্জীব এরস্টটলবাদের হাতে বন্দি। ব্রুনো সেখানে কোপারনিকাসের নতুন বিশ্বতত্ত্বের সমর্থনে বক্তৃতা প্রদান করেন। কিন্তু অক্সফোর্ডে তখন সাধারণভাবে কোপারনিকাসের সে তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে নি। সেখানে তখনও সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। সেইসঙ্গে তিনি এরিস্টটলের বিশ্বছবিটাকে উচ্চকণ্ঠে আক্রমণ করেন। ব্রুনো যেন ভীমরুলের চাকে আঘাত করলেন। তাঁর সেই বক্তৃতা তীব্র বাদানুবাদের সৃষ্টি করে। চৌর্যবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত হন তিনি এবং অক্সফোর্ড ছাড়তে বাধ্য হন। লন্ডনে এসে ফরাসী রাষ্ট্রদূতের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৫৮৫ সালের আগে তিনি আর প্যারিসে ফিরে আসেন নি। প্যারিসে এসে পুণরায় তিনি বিপদের মধ্যে পড়েন। কেমব্রাই কলেজে বক্তৃতায় তিনি এরস্টটলকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন এবং কোপারনিকাসের তত্ত্বের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ফলে স্রোতারা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তাকে কেবল ব্যঙ্গবিদ্রপ করেই তারা ক্ষান্ত হন নি, শারীরিকভাবেও লাঞ্ছিত করা হয়। দেশ ছেড়ে পালাতে তাঁকে বাধ্য করা হয়। তিনি পালান কিন্তু তিনি তার মতাদর্শ পরিত্যাগ করেন না। ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে ঘুরে বেড়ান। পাঁচ বছর তিনি মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের বিভিনড়ব দেশে ঘুরে বেড়ান। মাঝে মধ্যে মার্বুব, মেইনজ, উইটেনবার্গ,

প্রাগ, হেমেস্টেড, ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং জুরিখ প্রভৃতি স্থানে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করেন। এসব প্রোটেস্টান্ট দেশ। এর মধ্যে তিনি ল্যাটিন ভাষায় দর্শন, বিশ্বতত্ত্ব, পদার্থবিজ্ঞান, ম্যাজিক এবং স্মৃতিবিজ্ঞানের উপর বেশ কটি বই লেখেন।

যদি তিনি জার্মানিতে থাকতেন তাহলে হয়তো ভয়ের কিছু ছিল না। কিন্তু ১৫৯১ সালে ভেনিস থেকে তিনি এক রহস্যময় আমন্ত্রণ পান। জুয়ানে মোসেনিগো নামের এক যুবক স্মৃতিবিজ্ঞান শেখার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানান। ভেনিস তখন ইটালির একটি স্বাধীন প্রদেশ। তিনি ভেবেছিলেন রোমের প্রসারিত হাত হয়তো সেখানে পৌছাবে না। তিনি ভেনিসে গেলেন। তাঁর ছাত্র তখন তাকে সেখানকার ধর্ম আদালতের হাতে তুলে দিল। ব্রুনো ভেনিসের ধর্ম আদালতে বিচারের সম্মুখীন হলেন। তাঁর গুণধর ছাত্রটি তার বিরুদ্ধে অভিযোগের এক দীর্ঘতালিকা প্রদান করেন। অভিযোগের তালিকায় বলা হয়েছিল যে ব্রুনো হযরত মুসাকে একজন বড় যাদুকর হিসেবে বিবেচনা করতেন। তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে গল্প করেছিলেন, বাইবেলে যে কল্পকাহিনী ছাপানো আছে, তা গাঁজাখুরে গল্প ছাড়া কিছু নয়। যীশুও একজন যাদুকর ছিলেন এবং তিনি একজন জঘন্য ব্যক্তি। ব্রুনো নাকি বলতেন তিনি যিশুর চাইতেও ভাল ম্যাজিক দেখাতে পারেন। যিশুর পুনরুত্থান ও তার virgin birth নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করতেন। নরক বলে কিছু আছে বলে তিনি মনে করতেন না। তাই মৃত্যুর পর মানুষকে কোনো শাস্তি পেতে হবে না। ঈশ্বর বলে আলাদা কিছুর অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করতেন না। কারণ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর থাকলে এমন অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ পৃথিবীর সৃষ্টি হত না। প্রার্থনা, সংরিক্ষত স্মৃতিচিহ্ন, ছবি কোন কিছুই কোন উপকারে আসে না। যাজকরা সবাই গাধা। কোন ধর্মই তাকে খুশী করতে পারে না। মোসেনিগো তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ''তাহলে আপনি কোন ধর্ম বিশ্বাস করেন?'' উত্তরে এরিস্টটলের একটি উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, 'যা প্রত্যেকটি আইন ও প্রত্যেকটি বিশ্বাসের শত্রু', বলে উচ্চস্বরে হেসে উঠেছিলেন। ভেনিসের আদালতের সামনে নতজানু হয়ে তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন এবং তার এসমস্ত ধর্মতত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্ব অস্বীকার করেছিলেন। এর মধ্যে তিনি কোনে অন্যায় দেখেন নি। মৃত্যুকে তিনি পরিহার করত চেয়েছিলেন আরও কিছু কাজ করার সুযোগ পাওয়ার জন্য। তিনি তাঁর নতুন দর্শনের আলোকে র্ধমের একটি নতুন সম্প্রদায় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। মুক্ত হলে তিনি জার্মানি বা ইংলন্ডে চলে যেতেন এবং তার ধর্মমতের পক্ষে প্রচার চালাতেন। কিছু অনুসারী তৈরীর চেষ্টা চালাতেন। ব্রুনো ভেবেছিলেন তিনি মুক্তি পাবেন। কিন্তু রোমের উচ্চ আদালত সে সুযোগ তাকে দেয় নি। প্রধান ধর্ম বিচারক কার্ডিনাল সান্তাসেভেরিনা ব্রুনোকে রোমের ধর্ম আদালতে হস্তান্তর করার নির্দেশ দেয়। ভেনিস সরকার প্রথমে বাধা দিলেও ব্রুনোকে রোমের ধর্ম আদালতের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়।

১৫৯৩ সালের ২৭শে ফের্রুয়ারি তাকে রোমে আনা হয়। সাত বছর সেখানে তাঁকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। তাকে লেখাপড়ার কোন সরঞ্জাম দেয়া হয় নি। ব্র"নোর বিরুদ্ধে আটটি অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। সেগুলো যে কি, তা কোন দিনই জানা যাবে না। কারণ তার ফাইলটি লুকিয়ে রাখা হয়। পরে নেপোলিয়নের হাতে পড়ে তা ধ্বংস হয়। ১৫৯৯ সালে তাঁর বিচার শুরু হয়।

১৬০০ সালের ২৫শে জানুয়ারি পোপ ক্লিমেন্ট ৬ষ্ঠ তাঁকে ধর্মনিরপ্রেক্ষ শাসকের হাতে বিচারের ভার অর্পণ করেন। ব্রুনো এবারে কিন্তু ক্ষমা চান না। তিনি বলেন যে তিনি তার বক্তব্য প্রত্যাহার করবেন না। কারণ

তিনি এমন কিছু লেখেন নি বা বলেন নি যা প্রত্যাহারযোগ্য। ৮ই ফের্রুয়ারি বিচারের রায় পাঠ করা হয়। সে রায়ে ব্রুনোকে অনুতাপশুন্য, গোঁয়ার, দুর্দম, একগুঁয়ে এবং ধর্মহীন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাকে গীর্জা থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং যাজকীয় ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়। সেন্ট পিটার গীর্জার আঙ্গিনায় জনসম্মুখে তার বই আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং সেসব বইগুলিকে নিষিদ্ধ বইএর তালিকায় অন্তভুর্ক্ত করা হয়। তাঁর সে বইগুলো আজও নিষিদ্ধ বই এর তালিকায় রয়েছে। বিচারের রায় শুনে অকুতোভয় ব্রুনো বলেছিলন, "Perhaps you who pronounce my sentence are in greater fear than I who receive it."

১৬ ফের্রুয়ারি ব্র"নোকে Caupo dei Fiori তে আনা হয়। তাকে ক্লান্ত ও ভগড়বহৃদয় দেখাচ্ছিল। শেষ মুহূর্তেও চার্চ তাঁকে একা ছেড়ে দেয় নি, একদল যাজক তাকে ঘিরে থাকে এবং তাঁর বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকে। আগুন লাগাবার ঠিক আগ মুহূর্তে চুমু খাওয়ার জন্য তাকে একটি ক্রুশ দেয়া হয়। রাগে তিনি মুখ ঘুরিয়ে নেন। বলেন, ''আমি স্বইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করছি।'' তিনি মনে করেন চিতার আগুনের লেলিহান শিখার ওপর চেপে তার আত্মা স্বর্গে পৌঁছে যাবে। তাঁকে উলঙ্গ করে একটি খুঁটির সঙ্গে বাধা হল। তারপর আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সক্রেটিসের পর আর একজন পন্ডিতকে জ্ঞানচর্চার, ভিন্নমত পোষণ করার জন্য এবং কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বকে সমর্থন করার জন্য আত্মাহুতি দিতে হল।

ব্রুনোকে হত্যা করার দায় থেকে চার্চ কখনও নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। কোপারনিকাসের De revolutionbus (১৫৪৩) প্রকাশিত হওয়ায় ক্যাথলিক চার্চ ততটা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে নি। কারণ সম্ভবত এই যে তার সে তত্ত্ব কেবল জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও বিদ্বৎসমাজের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ব্র"নোর সমর্থনজ্ঞাপন এবং তার সে তত্ত্বের পক্ষে প্রচারাভিযান চালানোর পরই বইটি নিষিদ্ধ করা হয় ১৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে। বইটি প্রকাশের ৭৩ বছর পরে। আঠার শতক পর্যন্ত সে নিষেধাজ্ঞা বলব ছিল। কিন্তু জিওর্দানো র্রুনোর বইগুলি (প্রায় ২০টি) আজও ক্যাথলিক চার্চের নিষিদ্ধ বই-এর তালিকায় রয়েছে। ১৯৭৯ সালের ১০ নভেম্বর আইনস্টাইনের জন্মশতবার্ষিকীতে ধর্মযাজকীয় বিজ্ঞান একাডেমীর বিজ্ঞানীদের এক সমাবেশে পোপ ২য় জন পল যে মন্তব্য করেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য। বলেছিলেন,

> ''মাননীয় সভাপতি, আপনি আপনার ভাষণে সত্যিই বলেছেন যে গ্যালিলিও ও আইনস্টাইন একটি যুগকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে তোলে। গ্যালিলিওর বিশালত্ব সকলের জানা, আইনস্টাইনের বিশালতার মতই। কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি যাকে আজ আমরা সম্মানিত করছি কার্ডিনালদের কলেজের সামনে, বিপরীতে প্রথম ব্যক্তিটিকে সীমাহীন কষ্ট দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে চার্চের মানুষ ও সংগঠনের হাতে। আর এ সত্য আমরা চাপা দিতে পারি না।'' (আলো হাতে আঁধারের যাত্রী, অভিজিৎ রায়, পৃ ৩২)।

১৯৯২ সালের ৩১ অক্টোবর রোমান ক্যাথলিক চার্চ অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করেছেন যে কপারনিকাসোর তত্ত্ব সমর্থন করে গ্যালিলিও সঠিক কাজ করেছিলেন, ব্রুনোর প্রতি এ রকম কোনো স্বীকারোক্তি চার্চ আজ পর্যন্ত করে নি। (আলো হাতে আঁধারের যাত্রী, অভিজি রায়, পৃ ৩৩) বরং ব্রুনোর প্রতি ক্যাথলিক চার্চ যে এখনও অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তা এনসাইক্লোপোডিয়ার সর্বশেষ সংখ্যায় ব্রুনো সম্পর্কে মন্তব্যে প্রকাশ পায়। সেখানে ব্রুনোকে চপলমতি ও অস্থিতিশীল চরিত্রের অধিকারী একজন জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্রুনোর ধর্ম সম্পর্কে ধারণাগুলিকে ভ্রান্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেজন্য চার্চের রক্ষণশীল অঙ্গ

'ইনকুইজিশনে'র হাতে দীর্ঘদিন ধরে কারাবন্দী ও নির্যাতন ভোগ করার কথা বলা হলেও চার্চ কর্তৃপক্ষ যে তাকে জীবন্ত দগ্ধ করে হত্যা করে তার জন্য কোন অনুশোচনার অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় নি। (আলো হাতে আঁধারের যাত্রী, অভিজিৎ রায়, পৃ ৩৩)।

তাই আসুন ব্রুনোর হত্যাকাণ্ডের চারশ বছর পুর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশের এই ক্ষুদ্র স্মরণসভা থেকে আমরা আওয়াজ তুলি যে গ্যালিলিওর মত ব্রুনোর প্রতিও যে ক্যাথলিক চার্চ অমানবিক অপরাধ করেছিল আজ র্চাচকে তা স্বীকার করতে হবে এবং তার জন্য সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। সেই সঙ্গে তার সমস্ত বই এর উপর থেকে ধর্মীয় আদালতের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করত হবে।

সহায়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থসমূহ

১। Giordano Bruno (1548-1600): Christan Bartholmess - Internet.
২। John J. Kessler Ph.D, Ch.E: Giordano Bruno: The Forgotten Philosopher-Internet.
৩। অভিজিৎ রায়, ''আলো হাতে চলিয়াছে আধারের যাত্রী'', অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৫
৪। H. Butterfield: The Origins of Modern Science, 1300-1800, G Bell and Sons Ltd, London, 1968.
৫। শিশির কুমার ভট্টাচার্য, ''মানুষ ও মহাবিশ্ব,'' সময় প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০০৪।
৬। Edward McNall Burns, Philip Lee Ralph, Robert E. Lerner et. al. "World Civilization", Special Indian Edition, 1991.
৭। M. Rosenthal & P. Yudin, "A Dictionary of Philosophy", Progress Publishers, Moscow, 1967
৮। Jostein Gaarder, "Sophies World," Berkley Books, New York, 1996
৯। সরদার ফজলুল করিম, ''দর্শন কোষ,'' বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৩।

[প্রবন্ধটি শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চ আয়োজিত "ব্রুনোর আত্মত্যাগ" শীর্ষক সেমিনারে পঠিত হয়েছিলো।]

ড. শহিদুল ইসলাম, মুক্তমনের মানুষ ও সেক্যুলারিস্ট অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম প্রাবন্ধিক হিসেবে সুপরিচিত। শিক্ষা, বিজ্ঞান দর্শন তাঁর লেখার প্রিয় বিষয়। ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তির অধ্যাপক হিসেবে দীর্ঘদিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নব প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের তিনি ছিলেন প্রথম পরিচালক। সমাজ ও রাজনীতি সচেতন এই শিক্ষাবিদ শিক্ষা ও শিক্ষক সম্বন্ধীয় সমস্যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনের সাথে জড়িত। শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের অন্যতম সহ সভাপতি। দুটি খন্ডে সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থটির নাম 'বিজ্ঞানের দর্শন'। তাঁর অন্যান্য পরিচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: সাম্প্রদায়িকতা রাষ্ট্র রাজনীতি, জাতীয়তাবাদ : সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, প্রসঙ্গ : শিক্ষা, দেশভাগ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ইত্যাদি।

ইসলামের চিন্তার ইতিহাসে যারা সত্যের শহীদ

নুরুজ্জামান মানিক

ভুমিকা: আমার শ্রদ্ধেয় লেখক ও গবেষক ড. অভিজিৎ রায় এর আগ্রহ-উৎসাহ আর তাগিদে এই রচনার জন্ম । এটি মুক্তমনা, সাতরং এবং সচলায়তন বাংলা ওয়েবসাইটে সিরিজ আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং ঐ সময় যারা এই লেখাটি পড়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, মুল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন , মন্তব্য করেছেন (বিশেষত হাসান মো্রশেদ, মাহুবুব লীলেন , জামাল আবেদিন ভাস্কর, ফারুক ওয়াসিফ, তীরন্দাজ প্রমুখ) তাদের সকলেরই নামে উৎসর্গিত এই রচনা ।

অনেকে এ লেখায় ধর্ম অবমাননার গন্ধ পাবেন, পেতে পারেন ইসলাম বিদ্বেষের আলামতও। তবে এ রকম ভুলভাবে এ প্রবন্ধ পাঠ করলে বিপদ। ইসলামের ইতিহাস থেকে মন্দ ঘটনাগুলো দেখানো এই রচনার উদ্দেশ্য নয় , বরং বস্তুনিষ্ঠভাবে ইতিহাস তুলে ধরাই এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। সে জন্যই নির্যাতন এবং নিপীড়নের অজস্র দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের পাশাপাশি এ প্রবন্ধে বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে আধুনিক সভ্যতায় মুসলমানদের অবদানের কথা।

এই রচনার জন্য কালগত বিবেচনায় এসেছে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী যা মুসলিম জাতির ইতিহাসে স্বর্নযুগ হিসেবে বিবেচিত। এ সময় তাদের প্রতিভার বিভিন্নমুখী অগ্রগতি সাধিত হয় এবং নানামুখি চিন্তার বিকাশ ঘটে । কাদরিয়া , মুতাজিলা, আশারিয়া ইত্যাদি ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদ গড়ে এই সময়ে । এই সময়েই সুফিবাদ এবং মুসলিম জুরিসপ্রুডেন্স এর উত্ পত্তি ও বিকাশ ঘটে। দর্শন -বিজ্ঞান চর্চায় প্রভুত উন্নতি সাধন করে মুসলিম জ্ঞানীগণ। রাস্ত্রীয় আনুকুল্য বা পৃষ্ঠপোষকতায় (বিশেষত আব্বাসীয় খেলাফত) গড়ে উঠেছিল মুসলিম দর্শন ও বিজ্ঞান । আবার ঐ রাস্ত্রই বাঁধা হয়েছিল মাঝে মাঝে প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লাদের প্ররোচনায় । শেষ প্রতিক্রিয়াশীলদের জয় হয়েছিল এবং তাদের প্রভাবে মুসলিম জগতে জ্ঞানের আলো নিভে গিয়েছিল । মুসলিম দর্শন ও বিজ্ঞান ,সুফিবাদ এবং মুসলিম জুরিসপ্রুডেন্স এর বিকাশে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ছিল কাদরিয়া আর মুতাযিলা মতবাদের । তাই এই রচনার শুরুতেই আছে তাদের কথা । তার পর্যায়ক্রমে এসেছে দার্শনিক , ইমাম আর সুফিদের কথা ।

ধর্মদ্রোহিতার অভিযো্গ " বিরুদ্ধ/ভিন্নমতের অবলম্বীদের দমন এর জন্য "রাস্ট্র" , "শাসক ", "প্রতিষ্ঠান" ," সামন্তবাদী সমাজ্", এর সবচেয়ে প্রাচীন ও কার্যকর অস্ত্র । এরা তাদের স্বীয় রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার বা অপব্যবহার করেছে ।

মুসলিম জাতির ইতিহাসে প্রতিক্রিয়াশীলতা ছিল বৈকি তবে তা' তত মারাত্মক নয় যতটা ছিল তথাকথিত আধুনিক ইউরোপে । তথাকথিত ধর্মদ্রোহ /নাস্তিকতার অপরাধে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা সেখানে মামুলি ব্যপার ছিল । হাইপেশিয়া, গ্যালিলিও কিংবা ব্রুনোদের ভাগ্যে কি জুটেছিল তা আমরা সবাই জানি। ধর্মদ্রোহ /নাস্তিকতার দায়ে যাদের মুরগি জবাইয়ের মত হত্যা করা হয়েছে তারা সবাই নাস্তিক আসলেই ছিলেন এমন ভাবলে মারাত্মক গলতি হবার অবকাশ । ইউরোপে প্রথমে "খ্রীস্টধর্মী " হওয়াটাই ছিল "মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধ " এবং সে অপরাধে বহু খ্রীস্টধর্মীকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছে কিন্তু অভিযোগ ছিল "ধর্মদ্রোহ /নাস্তিকতা" আবার স্বয়ং খ্রীস্টধর্মীরাই যখন ক্ষমতায় আসল তখন তারাই ভিন্নমত অবলম্বীদের বিরুদ্ধে ফরমানের পর ফরমান এবং ১২৩৩ সালে গঠন করে "ইনকুইজিশন "। গোটা ইউরোপ জুড়ে শিকলের মত বিছানো হয়েছিল অসংখ্য ইনকুইজিশন । সে এক বিরাট ইতিহাস । সে সব নিয়ে এ বইয়ের অন্যান্য অনেক প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন বিজ্ঞ লেখকেরা। আমার লেখাটিকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে অধ্যায়ের অন্যান্য লেখাগুলোর সম্পুরক হিসেবে দেখবার অনুরোধ রইলো।

এখানে " মুসলিমদের সাথে ইহুদি বা খ্রীস্টধর্মীর বিরোধ নয় " আসেনি এমনকি স্রেফ " আস্তিকতা বনাম নাস্তিকতা" নয় , নয় " মুমেন বনাম কাফের " , দ্বন্দ্ব চিন্তাগত -দর্শনজাত আর " রাস্ট্রের ভুমিকা" তার ক্ষমতায় থাকার কায়েমি স্বার্থজাত । প্রগতিশীলতা বা প্রতিক্রিয়াশীলতা দিয়ে শুধু বিচার করলে চলবে না, এর ভিতরের রাজনীতিও বুঝতে হবে । খলিফা মুতাওয়াক্কিলের মদ্যপ হতে তার ঈমান বাধ সাধেনি কিন্তু মুতাজিলাদের কিংবা প্রথম আরব দার্শনিক আল কিন্দীকে মেনে নিতে বাধ সেধেছে । মুসলিম শাসকদের "ইমাম বুখারি বা ইমাম আবু হানিফা"র উপর নিযাতন যদি ইসলাম হয় আর তার কথা বলা যদি "ইসলামের ইতিহাসের মন্দ দিক " তুলে ধরা হয় তবে আমার কিছু বলার নেই । জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মুহম্মদ আজরফ এর মতে, আমরা "ইসলামের ইতিহাস " হিসেবে যা পড়ি সেগুলি "ইসলামের ইতিহাস" নয় বরং "মুসলিম শাসক বা রাজা বাদশদের ইতিহাস " ।

আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই , এ জাতীয় রচনা ত্রুটিমুক্ত হতে পারে না । প্রাসংগিক এমন অনেক চিন্তক /মনীষীর কথা বাদ পড়ে গেছে , যাদের কথা বললে এর মর্যাদা বৃদ্ধি পেত । আবার যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের প্রসংগে হয়ত কো্ন তথ্য বাদ পড়ে গেছে যার দরুন রচনার অংগহানি ঘটেছে । আমার এটাও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই , এ জাতীয় রচনা প্রনয়নে যে পরিমান ভাষা দখল , অধ্যয়ন ও গবেষনা দরকার তা আমার নেই । এই রচনায় বেশ কিছু পুস্তক ও আন্তর্জালিক সুত্র থেকে অকুণ্ঠচিত্তে সাহায্য নিয়েছি , অসংকোচে তাদের কথাও উদ্ধৃত করেছি ।

জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় আরবেরা প্রায় পাচশ বছর একচ্ছত্র আদিপত্ত বজায় রাখতে পেরেছিল, অন্ধকার ইউরোপে তারাই জালিয়েছিল আলোকবর্তিকা কিন্তু খোদ নিজেরাই চলে গেল আধারে । এই পরিবর্তনে যদি আমাদের আপত্তি না থাকে তবে

কোন কথা নেই কিন্তু আমরা যদি সেই স্বর্নযুগে সত্যি ফিরে যেতে চাই তবে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না "জ্ঞান চর্চার বিকল্প নেই "।

***

ক) স্বাধীন ইচ্ছা ও মুতাযিলা মতবাদ মতবাদের জন্য মৃত্যুদন্ডিত/ নির্যাতিতগণঃ

ইসলামের ইতিহাসে স্বাধীন ইচ্ছা মতবাদ (Free Will Thought) এর সাহসী প্রচারের প্রথম ব্যক্তি হচেছন **মা'বাদ ইবনে খালিদ আল জুহানি**। এই মতবাদ যখন ঘোষিত হয়, তখন ছিল উমাইয়া শাসনামলের প্রথম দিক।এই সময়টা ছিল অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক। উমাইয়াদের নেতৃত্বে দেশে তখন অত্যাচার ও নির্মম রক্তপাত চলছিল। স্বাধীনচেতা আরবগন এই অবস্থা সহ্য করতে না পেরে রাস্ট্রের নিকট নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাবি করলেনঃ

তোমরা কেন এই বর্বরোচিত কাজ কর?

এসব কি ইসলাম বিরোধী নয়?

তোমরা কি মুসলমান নও?

রাস্ট্রের উত্তর ছিল : "আমরা যা করি , তার জন্য আমরা দায়ী নই। আল্লাহই সব কিছু করেন। ভালমন্দ তারই ক্ষমতা। [1]

ইতিহাস রচয়িতারা উল্লেখ করেন, মা'বাদ ইবনে খালিদ আল জুহানি একদিন তার সাথী হযরত **ওয়াসিল ইবনে আতাকে** সাথে নিয়ে বিশিস্ট মুসলিম মনীষী **হযরত হাসান আল বাসরি** (রাঃ)এর নিকট আগমন করেন এবং বলেনঃ" হে আবু সাইদ ,যেসব শাসক মুসলমানদের রক্তপাত ঘটায় এবং বলে যে তাদের কৃতকর্ম আল্লাহ কতৃক সাধিত হয় ।" এ কথার প্রতিউত্তরে হাসান (রা।) জবাব দেন " আল্লাহর শত্রু ,তারা মিথ্যাবাদি।"[2] এরকম পরিস্থিতিতে মা'বাদ ইবনে খালিদ আল জুহানি বলেন, "মন্দ বা অসত্ কাজের জন্য মানুষ নিজেই দায়ী । এগুলো আল্লাহর উপর আরোপ করা উচিত নয় । " তার এই মত " কদর

মতবাদ" নামে পরিচিত। মা'বাদ ইবনে খালিদ আল জুহানি প্রকাশ্যে এই মতবাদ প্রচার করেন। এই কারণে উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের (৬৮৫-৭০৫) নির্দেশে হাজ্জাজ কর্তৃক তাকে হত্যা করা হয় ৬৯৯ সালে,মতান্তরে ৭০০ সালে। [3] মা'বাদ ইবনে খালিদ আল জুহানির পর দামেস্কের **গায়লান ইবনে মুসলিম** অনুরূপ মতবাদ প্রচার করেন। তিনি বলেনঃ " প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে মানুষকে সত্ কাজে অনুপ্রানিত করা এবং দুস্কর্ম থেকে বিরত থাকা।" তার এই প্রচার ছিল উমাইয়া শাসকদের স্বার্থ পরিপন্থী। [4] এই কারণে খলিফা ইবনে আবদুল আজিজের (৭১৭-৭২০ খ্রি) কাছে তাকে ধরে আনা হয়। সে জনসম্মুখে তার ভুল স্বীকার করে কিন্তু খালিফার মৃত্যুর পরে , সে আবার "স্বাধীন ইচছা মতবাদ" এর শিক্ষাদান শুরু করে। এর পরের খলিফা হিশাম ইবনে আবদুল মালিক(৭২৪-৭৪৩ খ্রি) তাকে গ্রেফতার করেন,বিচার করেন এবং হত্যা করেন।[5] এই মতবাদের অন্য একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন **আল জা'দ ইবনে দিরহাম**। যে স্বাধীন ইচছা মতবাদ কে কেবল সমর্থনই করেনি, বরং গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর দর্শন অনুযায়ী কোরআনের আয়াতের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহর গুনাবলীর বর্ণনা পুনঃঅনুবাদ করার চেস্টাও করেন। এই কারনে উমাইয়া গভর্নর তাকে বরখাস্ত করে তার শিক্ষকতা পেশা থেকে।[6] সে তখন কুফায় পালিয়ে যায়, যেখনে সে তার ধারণা ক্রমাগত উপাস্থাপিত করতে থাকে এবং অনুসারি জোগাড় করতে থাকে। উমাইয়া গভর্নর খালিদ ইবনে আবদুল্লাহ তাকে জনসম্মুখে ৭৩৬ সালে হত্যা করেন। কিন্তু তার প্রধান শিষ্য **জহম ইবনে সাফফাওয়ান** ,তিরমিজ এবং বলখে তার গুরুর মতবাদকে প্রচার করতে থাকে। উমাইয়া গভর্নর নাসের ইবনে সাইইয়ার তাকে ৭৪৩ সালে হত্যা করেন।[7]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য , স্বাধীন ইচ্ছা মতবাদের মা'বাদ আল জুহানী কে হত্যার মাধ্যমে তার দর্শন স্তব্ধ হয়ে যায়নি, বরং একই বছরে অর্থাৎ ৬৯৯ সালে (হি ৮০) দু'জন প্রখ্যাত মনীষী আভির্ভুত হন নতুন মতবাদ নিয়ে (**মুতাযিলা মতবাদ** বলে পরিচিত) । এই দু'জন হলেন ওয়াসিল বিন আতা ও আমর বিন ওবায়েদ । মুতাযিলাগন ছিলেন ইসলামের শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী সম্প্রদায় । তারা বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাকে জ্ঞানের যথার্থ উ□স মনে করতেন । স্বাধীন ইচছা ও ন্যায়পরায়নতা ছাড়াও তারা তাদের ব্যাখ্যায় আরো গুরুত্বপুর্ন ও সূক্ষ বক্তব্য সংযোজন করেন । খলীফা ইয়াজিদ ইবনে ওয়ালিদ প্রকাশ্যে মুতাযিলা মতবাদ সমর্থন করেন । ৭৪৯ সালে উমাইয়াদের পতনের পর তারা আব্বাসীয়দের উদার সমর্থন লাভ করে। খলিফা মনসুর ছিল আমরের বন্ধু ।

খলিফা আল মামুনের রাজসভায় তারা স্থান পান । তারা আল মামুন , আল মুতাসিম ও আল ওয়াতিক -এই তিন জন খলিফাকে প্রভাবিত করেছিলেন । তাই তাদের রাজত্বকালে রক্ষনশীল ধর্মবেত্তাদের উ্সাহিত করা হয়নি । কিন্তু খলিফা মুতাওয়াকিলের ক্ষমতায় আরোহনের সঙ্গে সঙ্গে মুতাযিলাদের দুর্দশা শুরু হয়। তারা 'ধর্ম বিরোধী' হিসেবে নিন্দিত হন এবং তাদের গ্রন্থাবলী আগুনে ভস্মীভুত করা হয় । উল্লেখ্য , মুতাযিলাদের সম্পর্কে আমরা যে সব তথ্য জানি, সেগুলি তাদের সমর্থকদের বরাতে নয়, সমালোচকদের মাধ্যমে ।[৪]

খ) নির্যাতিত দার্শনিকগণঃ

সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী হল মুসলিম জাতির ইতিহাসে স্বর্নযুগ । এ সময় তাদের প্রতিভার বিভিন্নমুখী অগ্রগতি সাধিত হয় । তারাই ছিলেন জ্ঞান বিজ্ঞান , দর্শন ও গবেষনার অগ্রদুত । তারা গ্রীক দর্শন আয়ত্ব করেন এবং বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করে ইউরোপের রেনেসার দ্বার উন্মুক্ত করেন। আধুনিক দর্শনের বিবর্তনের ইতিহাসে মুসলিম দার্শনিকদের অবদান অনস্বীকার্য । মধ্যযুগের টমাস একুইনাস , ডন স্কেটাস , দান্তে, রজার বেকন, ডেকার্ট , হিউম , স্পিনোজা'র ন্যায় দার্শনিকদের উপর তাদের প্রভাব প্রতিভাত হয়েছে । তবে , মুসলিম দর্শনের বিস্তারিত আলোচনা ও ইউরোপের রেঁনেসা তথা আধুনিক সভ্যতায় তার প্রভাব নিয়ে লেখা বর্তমান রচনার লক্ষ্য নয় ,বিধায় এখানেই ইতি । মুল প্রসঙ্গে যাবার আগে মোটাদাগে কয়েকটি কথা বলতেই হয় :

ক) রাস্ত্রীয় আনুকুল্য বা পৃষ্ঠপোষকতায় (বিশেষত আব্বাসীয় খেলাফত) গড়ে উঠেছিল মুসলিম দর্শন ও বিজ্ঞান ।

খ) সর্বকালের মত, মুসলিম দার্শনিকদের বুদ্ধিবাদী উদ্যোগ প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লাদের দ্বারা ঝুকিপুর্ন (!) ও ধর্ম বিরোধী (কুফুরী) হিসেবে বিবেচিত হয়েছে । ফলে, তারা প্রশংসা না পেয়ে বরং শিকার হয়েছেন নানা নিগ্রহ -নির্যাতনের ।

গ) মোল্লাদের প্ররোচনা , ষড়যন্ত্র ও প্রভাবে রাষ্ট্র বা সরকার "রাস্ট্রের শান্তি" বজায় রাখার নিমিত্তে কিংবা "জনগণের ধর্মানুভুতিতে আঘাত" দেওয়ার অজুহাতে তাদের উপর বিরূপ ব্যবহার করেছেন ।

ঘ) "মুতাজিলা" সম্প্রদায় ও "ইখওয়ানুস সাফা " প্রতিষ্ঠানের মারফত মুসলিম চিন্তাধারা বিকশিত হয় কিন্তু একথাও সত্য , মুক্তবুদ্ধি চর্চাকারী মুতাযিলাদের প্ররোচনায় খলীফা আল মামুন মৃত্যুদন্ডের ভয় দেখিয়ে মুতাযিলা মতবাদ গ্রহন করাতে প্রথম "মিহনা" (inqusition) স্থাপন করেন এবং তখনই মুতাযিলা সম্প্রদায়ের সমাধি রচিত হয়। আর সে জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয় "ইলমুল কালাম " যার প্রভাবে ইসলামে দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চা ব্যহত হয়। ইসলামে "ইলমুল কালাম " এর আদি নায়ক ছিলেন **ইমাম আবুল হাসান আল আশ আরী** আর একে পূর্ণতা দান করেন হুজ্জাতুল ইসলাম বলে খ্যাত **ইমাম আল গাজ্জালী** [9]। যুক্তিবাদিতা (Rationalism) ও ধর্মবাদিতার (Patristicism) দ্বন্দ্বে শেষোক্ত মতেরই জয় হয় । ইসলামের ইতিহাসে এর পরিনতি সম্পের্ক সৈয়দ আমীর আলী'র বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেছেন : "আবুল হাসান আল -আশআরি ও আহমদ আল গাজ্জালীর প্রভাবে যে প্রতিক্রিয়াশীল প্রগতিবিমুখ অবস্থার সৃষ্টি হয় , তার সঠিক বর্ণনা দেয়া অসম্ভব। আল বিরুনীর 'আল আসার উল বাকীয়া ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের পন্ডিত-সম্পাদক ডক্টর স্যাচাউ কয়েকটি কথায় বেশ সুন্দরভাবে বলেছেন যে ,' **আল -আশ আরী ও আল গাজ্জালী না জন্মালে , আরবরা কেবল গ্যালিলিও, কেপলার ও নিউটনদের জাতি হতো** ।' বিজ্ঞান ও দর্শনের বিরুদ্ধে প্ররোচনায় এবং ধর্মতত্ত্ব ও শরীয়ত ব্যতীত অন্য বিষয়ে জ্ঞানার্জন অপ্রয়োজনীয় এরূপ নির্দেশ দানে এ দু'জন মুসলিম মনীষী অন্য সকলের চেয়ে মারাত্বকভাবে মুসলিম জগতের প্রগতির পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন" ।[10]

ঙ) অতঃপর এই প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রভাবে মুসলিম জগতে জ্ঞানের আলো নিভে যায়। ১১৫০ সালে বাগদাদের খলীফা মুস্তানযিদের আদেশে ইবনে সিনার দার্শনিক রচনাবলী ও "ইখয়ানুস সাফা" রিসালাগুলো সংগ্রহ করে পুড়ে ফেলা হয় । ১১৯২ সালে প্রসিদ্ধ চিকিৎসাবিদ ও চিন্তক আল রুকন আল সালাম নাস্তিক হিসেবে নিন্দিত হন এবং তার সমস্ত রচনা প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলা হয়। আরব থেকে বিতাড়িত হলেও দর্শন - বিজ্ঞান তথা মুক্তবুদ্ধির চর্চা আরও কিছুকাল চলেছিল আন্দালুসীয় দার্শনিকদের হাতে

(যেমন, ইবনে বাজা, ইবনে রুশদ) কিন্তু সেখানেও প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রভাব যখন বেড়ে উঠল তখন আর সারা মুসলিম জাহানে মুখ্যত দর্শন ও মুক্তবুদ্ধির চর্চার আর কোন অস্তিত্ব রইল না । [11]

চ) এই দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রথম ও শেষ মহান মনীষী ছিলেন যথাক্রমে আল কিন্দী (৮০১-৮৭৩) ও ইবনে রুশদ (১১২৬-১১৯৮) ।

মোল্লাদের দ্বারা কিংবা তাদের প্ররোচনায় রাস্ট্র দ্বারা কিংবা রাজনৈতিক কারণে কিংবা স্রেফ ঈর্ষাবশত মুসলিম দার্শনিকদের ইসলামের নামে হত্যা ও নির্যাতনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেয়া হলঃ

- প্রথম আরব দার্শনিক **আল কিন্দি** (৮০১ মতান্তরে ৮০৩-৮৭৩ খ্রীঃ) ছিলেন দর্শন, গনিত, জ্যামিতি,জ্যৌতির্বিদ্যা, সঙ্গীত, পদার্থ, চক্ষুবিজ্ঞান,আবহাওয়াবিদ্যা,ভুগোল, চিকিত্্সাবিজ্ঞান, ফার্মেসী , রাস্ট্রবিজ্ঞান , মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী । দর্শনে নব্যপ্লেটোবাদ ও পিথাগোরীয়বাদ এর প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল এবং মুসলিম ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে সেকালের প্রগতিশীল মুতাজিলাবাদ এর প্রতি তার অনুরাগ ছিল। তার রচনাবলী/গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ২৬৫/২৭০ । দূর্ভাগ্যবশত , তার অল্পসংখ্যক গ্রন্থই বর্তমানে বিদ্যমান। আল কিন্দি অনুদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আরিস্ততলের "মেটাফিজিক্স ", টলেমীর ভুগোল এবং প্লোটিনাসের "এন্নিয়ার্ডস" উল্লেখ্যযোগ্য।[12] তার কিছু কিছু বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ক্রেমোনার জেরার্ড কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয়। তাতে করে আল কিন্দি'র রচনাবলী মধ্যযুগের ইউরোপীয় চিন্তাকে বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত করে। বারশতকের টমাস আকুইনাস পর্যন্ত ইউরোপের সমস্ত দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিকদের উপর আল কিন্দি'র মুলতত্ত (Basic Principles) এর একাধিপত্য ছিল । [13] সুনিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের জন্য তিনি দর্শনে গানিতিক পদ্বতির সমর্থন করেন। কিন্দি'র এই সুপারিশ আমাদের আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের জনক ডেকার্ট'র কথা মনে স্মরণ করিয়ে দেয়। আল কিন্দি'র জ্ঞানবিষয়ক মতবাদ হল- ইন্দ্রিয় (Senses) বা কল্পনার (Imagination) দ্বারা জ্ঞান পরিবাহিত হয়। কল্পনা হচ্ছে, ইন্দ্রিয় ওপ্রজ্ঞার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী শক্তি । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অধুনা কান্ট (১৮০৪) ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ্ন ও

প্রজ্ঞার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কল্পনাকে ভেবেছেন বলে ধারণা করা হয় কিন্তু বর্তমানে কান্ট এর ধারণাটি মৌলিকতার প্রশ্নের সম্মূখীন কারন এ বিষয়টি আমাদেরকে Lord Kames (1782) , Muratori (1750) এবং পরিশেষে এডিশন এ নিয়ে যায়। কিন্তু এ বিশেষ কৃতিত্ব বস্তত আল কিন্দি'র নিকট যায় যিনি কান্টের নয় শতাব্দী পুর্বে এ মতবাদের সুস্পস্ট রূপায়ন করেন।[14] শারীরিক আলোকবিজ্ঞানে গানিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ তার জন্য রজার বেকন এর প্রশংসার বানী নিয়ে আসে। উইটলো (Witelo) সহ ত্রয়োদশ শতাব্দির অন্যান্য চিন্তাবিদ তাদের স্বীয় মতাবাদের চিন্তা বিকাশের ক্ষেত্রে তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। [15] আল কিন্দি সংগিত বিষয়েও গানিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ করেন এবং সাতটি গ্রন্থ রচনা করেন ।[16] কারমারের মতে, সংগিত এর উপর তার রচনাবলী প্রায় দু'শতাব্দী ধরে পরবর্তি লেখকদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। [17] আল কিন্দি আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন, আল মুতাসিম ও আল ওয়াতিকের পৃষ্টপোষকতা লাভ করেন। তিনি বহু চেষ্টাকরে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। [18] কিছুকাল বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। খলিফা আল মুতাওয়াক্কিলের রাজত্বকালেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু তার দার্শনিক মতবাদ প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লা সমাজের মনপুত না হওয়ায় চাপের মুখে তাকে অধ্যাপনা থেকে অবসর নিতে হয় [19] ।মুহাম্মদ ও আহম্মদ নামক দু'জন ঈর্ষাপরায়ন ব্যক্তির কুৎসা রটনার প্রেক্ষিতে খলিফা মুতাওয়াক্কিল এর আদেশ মোতাবেক 'কুফর/ধর্মদ্রোহিতা' অভিযোগে আল কিন্দিকে বেত্রাঘাত দ্বারা শাস্তি দেয়া হয় এবং তার গ্রন্থাগারটি বাজেয়াপ্ত করা হয়।[20] খলিফা মুতামিদের আমলে তিনি পরলোকগমন করেন।

- যুক্তিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে আলকিন্দি'র সমগোত্রিয়দের সবাই ছিলেন কমবেশী সংশয়বাদী বা অজ্ঞাবাদি । এ সংশয়বাদীদেরই এক সুস্পষ্ট দৃস্তান্ত লক্ষ্য করা যায় আল কিন্দির বিশিষ্ট **শিষ্য আহমদ বিন আল তায়েব সারাখশি**'র চিন্তায় । সারখশি ছিলেন আব্বাসীয় খলিফা আল মুতামিদের গৃহশিক্ষক। ৮৯৯ খ্রীস্তাব্দে তিনি নিন্দিত ও মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হন। যতদুর জানা যায়, তিনি যুক্তিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব ও জ্যামিতিতে পারদর্শী ছিলেন।উল্লেখ্য, বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ পান্ডিত্যের জন্য সারাখাশি খলিফার সান্নিধ্য ও আনুকল্য লাভ করেছিলেন । কিন্তু (আল বিরুনীর মতে) তিনি

তার সংশয়কে শুধু খলিফার সাথে একান্ত আলাপেই সীমিত রাখেননি, প্রকাশ করেছিলেন তার বিভিন্ন গ্রন্থে । [21]

- আন্দালুসীয় দার্শনিকদের মধ্যে প্রথমেই যার নাম আসে তিনি হলেন আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া **ইবনে বাজা**। বলা হয়ে থাকে , দর্শনে মোলিক অবদান রাখতে পারতেন এমন দার্শনিক ইবনে বাজা ।সাহিত্য, গনিত, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন , চিকিৎসাশাস্ত্র ,সঙ্গিত প্রভৃতি বিষয়ে তার পান্ডিত্ত ছিল । 'হাই ইবনে ইয়াখযান ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা ইবনে তোফায়েল তাকে সানন্দে ওস্তাদ হিসেবে গ্রহন করেন এবং জ্ঞানলাভ করেন। ইবনে বাজা চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যামিতি, রসায়ন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান , জ্যোর্তিবিদ্যা, দর্শন এবং সঙ্গিত বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন । তিনি জ্যোর্তিবিদ্যায় টলেমির কোন কোন ধারণার সমালোচনা করেন এবং ইবনে তোফায়েল ও আল বিতরুজির জন্য পথ তৈরি করেন । উল্লেখ্য, বিতরুজীর টলেমির ভুকেন্দ্রিক মতবাদের সমালোচনা কোপার্নিকাসকে সুর্যকেন্দ্রিক মতবাদ প্রচার করতে উৎসাহিত করে । সঙ্গিতের উপর তার রচনা পাশ্চাত্যে বহু প্রশংসিত হয়[22] । তবে, দার্শনিক হিসেবেই পাশ্চাত্যে তার খ্যাতি বেশী । তিনি আরিস্ততলের ভাষ্য করেন এবং নিজেও কয়েকখানা মৌলিক দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'তদবির উল মুতাওয়াহহিদ ' গ্রন্থটি সর্বশ্রেষ্ঠ । হিব্রু ভাষায় এটির আজও অস্তিত্ব পাওয়া যায়। আল ফারাবীর থেকে এক ধাপ উর্দ্ধে উঠে তিনি মত প্রকাশ করেন "**খাটি দর্শনের সঙ্গে প্রত্যাদিষ্ট ধর্মের (ইসলামের) সামঞ্জস্য হতে পারে না।** " বলা বাহুল্য, তার এসব মতবাদ প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লাদের মাঝে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে । এ সময় তিনি মরক্কোর আল মোরাভিড এর দরবারে উযির হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। এখানে তাকে নাস্তিকতাবাদের[23] অভিযোগে বিষ প্রয়োগে হত্যা [24] করা হয় ।

- আধুনিক সভ্যতার অগ্রদুতদের আরিস্ততলের প্রতিভার সাথে পরিচিত করে ইউরোপীয় মানবতাকে অনুর্বর পান্ডিত্যাভিমান এবং ধর্মতত্ত্বের গোড়ামির পক্ষাঘাতদুষ্ট প্রভাব থেকে মুক্তি সংগ্রামে যিনি

অপরিমিত প্রেরনা ও উৎসাহ দিয়েছিলেন ,তিনি হলেন সুধীশ্রেষ্ট আবু আল ওয়ালিদ মোহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মোহাম্মদ **ইবনে রুশদ** [25] (১১২৬-১১৯৮) । তিনি দর্শন ,গনিত, আইনবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকি□সাবিদ্যা , ব্যাকরণ, ফেকাহ, যুক্তিবাদ প্রভৃতি বিষয়ে পন্ডিত ছিলেন । তার লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ষাটের বেশী । দর্শনের উপর রচিত গ্রন্থ প্রায় আটাশটি [26]। তার দর্শনের গ্রন্থসমুহকে তিন প্রকারে বিভক্ত করা যায় -ক) আরিস্ততলের ভাষ্য খ) পুর্ববর্তী দার্শনিকদের সমালোচনা (গ) স্বরচিত মৌলিক গ্রন্থাবলী । [27] ইবনে রুশদই সর্বপ্রথম আবিস্কার করেন , একবার কারো বসন্ত হলে , তার আর কখনো এ রোগ হবে না। তিনিই সর্বপ্রথম চোখের পর্দার গঠন গুরুত্ব ও তার ক্রিয়ার উপর বিশদ আলোচনা করেন। ইবনে রুশদ তার বন্ধু ইবনে তোফায়েল অনুরোধে আরিস্ততলের উপর ভাষ্য রচনা করেন । এ জন্য তিনি সত্যিকার অর্থে 'ভাষ্যকার '[28] শিরোনামে ভুষিত হন এবং মধ্য ইউরোপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন । দান্তে তার 'ডিভাইন কমেডি'(La divina commedia)তে তাকে ইউক্লিড, টলেমি, হিপোক্রিটাস, ইবনে সিনা (আভিসিনা)এবং গ্যালেন এর সাথে উল্লেখ করেছেন । বর্তমানে আরবীতে রচিত তার মেটাফিজিকার বৃহত ভাষ্য পাওয়া যায় , এটি বাওয়াজেস কর্তৃক সম্পাদিত। অবশ্য, ল্যাটিন বা হিব্রু অনবাদও পাওয়া যায়[29] । ইউরোপের দর্শন ইবনে রুশদের মাধ্যমে আরিস্ততল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। গিলসন যথার্থই বলেন :" আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মধ্যযুগীয় দর্শনের জনপ্রিয় ধারণা গঠনে এভারোজের

চেয়ে অধিকতর প্রভাববিশিষ্ট ব্যক্তি খুবই স্বল্পসংখ্যক ছিলেন-এটা এখন ঐতিহাসিক সত্যরূপে গৃহীত[30] ।" তার প্রধান পদ্ধতি আরিস্ততলীয় হলেও, তিনি বিভিন্ন উ□স থেকে গৃহিত ভাবের -প্রভাবের দ্বারা এ পদ্ধতি (জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হবার প্রনালী) কে নতুন রূপদান করেন। তিনটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে তার নিজস্ব দর্শন পরিব্যপ্ত হয়েছে, যথাঃ ফসল, কাশজ এবং তাহফুত গ্রন্থে । ইবনে রুশদের 'কুল্লিয়াত ' গ্রন্থটি চিকি□সাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপুর্ন গ্রন্থ । আইনবিজ্ঞানে তার ' বিদায়েত আল মুজতাহিদ' উল্লেখ্য । আমরা জানি, ইমাম আল গাজ্জালি 'দার্শনিকদের অসঙ্গতি' গ্রন্থে দার্শনিকদের তীব্রভাবে আক্রমন করেছেন এবং বিশটি অভিযোগে তাদেরকে অভিযুক্ত করেছেন[31] । ইবনে রুশদ প্রতিটি অভিযোগ খন্ডন করেন ।

এভাবে তিনি বিজ্ঞানের পথ সুগম করেন। ধর্ম রক্ষার্থে আল গাজ্জালি অনিচ্ছাকৃতভাবে বিজ্ঞানের পথ রুদ্ধ করেছেন । দুর্ভাগ্যক্রমে, মুসলিমগণ আল গাজ্জালিকে 'ইসলামের কর্তা ' (Authority of Islam) বলে অনুসরন করতে থাকে এবং ধীরে ধীরে বিজ্ঞান পাঠে অমনযোগী হয়ে উঠে । এমতাবস্থায় , ইবনে রুশদ বিজ্ঞান সমর্থনে এগিয়ে আসেন এবং মধ্য ইউরোপ তার প্রদত্ত বিজ্ঞানবিধি অনুসরণ করে চরম সফলতা অর্জন করে[32] । তিনি একইসাথে "ছদ্ম বিজ্ঞান" প্রত্যাখ্যান করেন। তার রাজনৈতিক দর্শন ছিল সব রকম মানবীয় অত্যাচার ও শোষনের বিরুধী । ইবনে রুশদ বিশ্বাস করতেন, নারীরা সর্ববিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ এবং তিনি তাদেরকে সমরক্ষত্র, সমাজে,রাস্ট্রে , জ্ঞানবিজ্ঞানে পুরুষের সমান অধিকার দানের পক্ষপাতি ছিলেন । তিনি আরবী , গ্রীক ও আফ্রিকার নারীযোদ্ধার বহু উদাহরণ দিয়েছেন; সংগিতে নারীর অসামান্য উৎকর্ষের উল্লেখ করেছেন এবং দাবী জানিয়েছেন যে, নারীকে যদি পুরুষের মতো সুযোগ দেয়া হয় ও সমান শিক্ষাদান করা হয় , তাহলে তারা স্বামীর মতো, ভ্রাতার মতো সমান দক্ষতা দেখাতে পারে ।[33] আল মোরাভিদ আল মোহাদ্দেস এর আমলে তিনি মারাকাশে বিতাড়িত (১১৪৭) হন । আবু ইয়াকুব যখন আমির হন, তখন তাকে রাজ চিকি□সক নিযুক্ত করেন । আবু ইয়াকুবের মৃত্যুর পর খলিফা আল মনসুরও ইবনে রুশদের সাহচর্যে কাটাতেন। তার খ্যাতি উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে । এই অধ্যায়ের ভুমিকাতেই বলা হয়েছে, আধুনিক সভ্যতায় আরবদের মৌলিক দান আছে । আর তা' হল 'সংশয়বাদ ' । ইউরোপে সংশয়বাদের প্রার্থমিক ইতিহাসে বেনামিতে প্রকাশিত 'তিন ভন্ড' (Tribus Impostorus) বেশ উচু স্থান দখল করেছিল । এতে মুসা, যীশুখ্রীষ্ট আর মোহাম্মদ (সাঃ)-এই তিনজনকে 'ভন্ড' বলা হয়েছিল। সেই কলঙ্কময় গ্রন্থের রচয়িতা বলে সন্দেহ করা হয় সম্রাট ফ্রেডারিক অথবা ইবনে রুশদকে [34]। এদিকে , প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লারা তাকে কাফির, নাস্তিক হিসেবে কু□সা রটানো শুরু করে , সাধারণ লোকও মোল্লাদের প্রচারে তাকে কপট /মুনাফিক ভেবে তার উপর ক্ষেপে উঠে । খলিফা অনন্যোপায় হয়ে তাকে কর্ডোভার লুসিনিতে নির্বাসন দেন । মোল্লারা এতটুকু সাফল্য অর্জন করে যে, তারা ইবনে রুশদকে শুধু নির্বাসন দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি , তার গ্রন্থগুলিকে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। দর্শন ও দার্শনিকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আইন জারি করা হয়[35] এবং আন্দালুস ও মারাকুশে সর্বত্র তা' প্রচার করা হয় । অবশ্য খলিফা তার ভুল বুঝতে পেরে ইবনে রুশদকে মারাকাশে ফিরিয়ে আনেন এবং পুর্বপদে বহাল করেন ।কিন্তু তার স্বাস্থ্য তখন ভেঙ্গে পড়েছে । মারাকুশে আসার কয়েক মাস পরেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন (১০ ডিসেম্বর ১১৯৮) ।

ইবনে রুশদ (রজার বেকনের মতে, যিনি প্রকৃতির দ্বার উদঘাটন করেছেন) কে চরম অপমান,নির্যাতন ও নির্বাসনের পরিনতি সম্পর্কে রেডিক্যাল হিউম্যানিষ্ট আন্দোলনের পুরোধা, লেনিন -স্টালিনের সহকর্মী কমরেড এম এন রায়ের বক্তব্য দিয়ে এই অধ্যায়ের ইতি টানছি -"তিনি এসেছিলেন ইসলামের সংস্কৃতির ইতিহাসের এক ঘোরতর সঙ্কটকালে। দ্বাদশ শতাব্দীতে উক্ত সংস্কৃতি উন্নতির চরমে পৌছেছিল আর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি প্রগতির পথ রোধ করার মতো ক্ষমতা অর্জন করেছিল । মুসলিম সংস্কৃতি যে ধবংসের পথে এগিয়ে গেল সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইলো না ।.....পাচশ বছর ধরে ইসলামের চিন্তাধারার যে অভুতপুর্ব উন্নতি হয়েছিল , তার প্রত্যক্ষ ফলাফলের মর্ম নিবন্ধ করতে গিয়ে ইবনে রুশদ যখন তার এই উগ্র বিপ্লবাত্বক মতবাদের কথা বললেন যে, বিচারবুদ্ধিই সত্যের একমাত্র উ্স তখন মোল্লাদের চাপে পড়ে কর্ডোভার সুলতান আল মনসুর ধর্মের কর্তৃত্বাভিমানে এই ধর্মবিরোধী মতামতের জন্য নরকাগ্নির ভয় দেখিয়ে বের করলেন রাজানুশাসন । ইসলাম যখন তার শ্রেষ্ঠ সম্পদকে অস্বীকার করলো তখনই শুরু হল তার অবনতি ।.....বহুশত বছরের স্বাধীন চিন্তার আবাসভূমি যে কর্ডোভার রাজসভা , সেখান থেকে ইবনে রুশদ হলেন বিতাড়িত । যুক্তিবাদ কে ধর্মদ্রোহিতা বলেই মনে করা হল ।.....কালক্রমে প্রতিক্রিয়ার জয় হল এমন নিরঙ্কুষভাবে যে ,গোড়া মুসলমানদের চোখে দর্শন হয়ে দাড়াল অধার্মিকতা ,অসাধুতা ও পাপাচারের সামিল । .....ইবনে রুশদ তার নিজের দেশবাসীর দ্বারা অস্বীকৃত হলেন বটে কিন্তু ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী যারা তারাই দিল তার মাথায় সম্মানের স্বর্ণমুকুট পরিয়ে । বিশ্বাস আর বুদ্ধির মধ্যে , অজ্ঞতা, স্বেচ্ছাচার আর স্বাধীন চিন্তার মধ্যে যে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ বাধল, দ্বাদশ থেকে পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে যা দিল ইউরোপকে টলিয়ে আর ক্যাথলিক চার্চের ভিতমুলকে কাপিয়ে ; তা' আরব দার্শনিকদের শিক্ষা থেকেই করেছিল অফুরন্ত প্রাণরস সংগ্রহ । চারশ' বছর ধরে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক চিন্তা জগতে প্রভাব বিস্তার করেছে ইবনে রুশদ আর রুশদবাদ [36]।

গ) নির্যাতিত যুগশ্রেষ্ঠ ইমামগণ :

প্রচলিত অর্থে যিনি নামাজে নেতৃত্ব দেন , তিনি ইমাম। কিন্তু এখানে "ইমাম" হিসেবে যাদের কথা বলা হবে, তারা এই অর্থে ইমাম ছিলেন না যেমন , ইমাম বুখারী (রঃ) , ইমাম মনসুর হাল্লাজ (রঃ)। আব্বাসীয় খেলাফতকালে প্রথমে "ইমাম" উপাধির প্রচলন হয়। ইসলামী আইনের স্কুল তথা সুন্নি মাজহাবের[37] প্রধানদের "ইমাম " হিসেবে অভিহিত করা হয় , যেমন ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম শাফী (রঃ), ইমাম মালিক (রঃ) , ইমাম হাম্বল (রঃ) প্রমুখ । শিয়া মজহাবে "ইমাম" বিশেষ অর্থ বহন করে। শিয়া মতানুসারে, আধ্যাতিক শক্তি ব্যতিরেকে কেউ ইমাম হতে পারে না এবং আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জামাতা হযরত আলী রাঃ এর উপর উত্তরাধিকার সুত্রে বর্তায় । আল্লাহর এই পবিত্র নূর লাভ করায় ইমাম একইসাথে নিষ্পাপ ও সমস্ত দোষের ঊর্দ্বে এবং এই নূর উত্তরাধিকার সুত্রে পিতা থেকে পুত্রে গড়ায় [38]।

গৌরচন্দ্রিকা দিলাম , এখানে যাদের কথা বলব, তাদেরকে আমরা যেন আমাদের পাড়া মহল্লার মসজিদের পেশ ইমাম বা নামজে নেতৃত্বদানকারীর সাথে গুলিয়ে না ফেলি ।

আজ সারা মুসলিম জাহান যে সকল মহান ইমামদের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে , যাদের ফতোয়া /আইন (সুন্নি/শিয়া মাজহাব) কিংবা যাদের সংকলিত হাদিসের উদ্ধৃতি (যেমন ,ইমাম বুখারী রঃ কৃত বুখারী শরীফ) ছাড়া আমাদের আলেম -ওলামা-মুফতি-মুহাদ্দেস-পীর মাশায়েখদের ওয়াজ সম্পন্ন হয় না , আসুন একটু দেখে নেই ,তাদের উপর কিরূপ আচরন করেছিল রাস্ট্র কিংবা আলেম সমাজ ।

আমাদের পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজাত মোবারক রয়েছে যে শহরে সেই মদীনার পথে দেখুন **ইমাম মালিক (রঃ)** এর হাত পা বেঁধে মারছে খলিফার সৈন্যরা ,মুচরে মুচরে শরীর থেকে তার হাত ভেঙ্গে ফেলেছে । এর পর চলে যান অন্দকার কারাগারে ,যেখানে **বন্দী ইমাম শাফি (রঃ) আর ইমাম হাম্বল (রঃ)** । দেখুন তাদের উপর কি নিষ্ঠুর অত্যাচার হচ্ছে । ঐ দেখুন , ইমাম নাসায়ী (রঃ) কে যেন খুন করে গেল।[39] আর ইমামুল আজম বলে খ্যাত, বিশিষ্ট তাবেয়ী , মুসলিম ব্যবহারশাস্ত্রের প্রবক্তা, স্বাধীন চিন্তা সমর্থক **ইমাম আবু হানিফা** কে কুফার কাযীর পদ গ্রহনে অস্বীকৃতির জন্য খলিফা আল মনসুর আদেশে

প্রকাশ্যে ১১ দিন ধরে প্রত্যহ ১০ ঘা মারার পর তাকে ছাড়া হয়।কিন্তু খলিফার দু:শাসন ও হত্যাকান্ডের সমালোচনা থেকে ইমাম সাহেবকে বিরত রাখা যায়নি । তাই, খলিফা ইমাম আবু হানিফাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং কারাগারেই বিষ প্রয়োগে তাকে হত্যা করান[40] । খলিফা আল মনসুর বিষ প্রয়োগে আরো হত্যা করেন রসায়ন শাস্ত্রের জনক জাবীর ইবনে হাইয়ান এর ওস্তাদ মশহুর আলেম **ইমাম জাফর সাদেক**(রঃ) কে[41] । খলিফা হারুনুর রশীদের আদেশে চার বছর জেলখানায় বন্দী থাকাকালীন সিন্দি ইবনে শাহিক বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন **ইমাম মুসা কাজেম** কে ৭৯৯সালে[42] । খলিফা আল মামুন বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন **ইমাম রেজা (রঃ)** কে ২৬ মে ৮১৮ সালে ইরানের তুস নগরে[43]।

বিশ্ববরেন্য মুহাদ্দেস, কোরআনের পরই সবচেয়ে বেশি পঠিত বিশুদ্ধ গ্রন্থ[44] আ ল জামেউস সহীহ (সহীহ বুখারী) এর সংকলক, যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে ইসমাইল **আল বুখারী** (৮০৯-৮৬৯) কে বৃদ্ধাবস্থায় ধর্মদ্রোহ (কুফুরী) এর অভিযোগে মোল্লাদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে (যে আন্দোলনের পেছনে স্বয়ং গভর্নরের হাত ছিল)আজীবন নির্বাসনদন্ড দেন বুখারার গভর্নর খালিদ ইবনে আহমদ জহলি [45] । ইমাম সাহেব বুখারা থেকে বহিস্কৃত হয়ে বয়কন্দ নামক স্থানে উপস্থিত হন কিন্তু সেখানেও তার বিরুদ্ধে অপপ্রাচার চলতে থাকে[46] ।তখন তিনি সমরখন্দবাসীদের আমন্ত্রনের প্রেক্ষিতে সমরখন্দের দিকে যাত্রা করেন । কিন্তু পথিমধ্যেই বখরতঙ্গ নামক নিভৃত পল্লীতে নিকট আত্নীয় গালীব ইবনে জিবারিলের গৃহে গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হন[47] । এমতাবস্থায় সমরখন্দবাসীদের পক্ষ থেকে উপর্যপুরি দরখাস্ত আসার প্রেক্ষিতে তিনি তথায় যাবার মনস্থ করেন ,কিন্তু পরে জানতে পারলেন বুখারায় তার বিরুদ্ধে ছড়ানো বিদ্বেষের অগ্নিশিখা সমরকন্দকেও গ্রাস করেছে[48] । ইমাম বুখারী দু'হাত তুলে প্রার্থনা করেলেন :"হে আল্লাহ! আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও-এ দুনিয়া আমার জন্য ছোট হয়ে গেছে [49]।" পরে সমরখন্দবাসীগণ তাদের ভুল বুঝতে পেরে ইমাম সাহেবকে তথায় নিয়ে যাবার ইচ্ছা করলে তিনি মোজা ও পাগড়ি পরিধান করে দু'ব্যক্তির কাধে ভর করে সওয়ারীর উপর আরোহনের জন্য অগ্রসর হন কিন্তু ১৫/২০ কদম অগ্রসর হয়েই বললেন :"আমাকে ছেড়ে দাও, আমার দূর্বলতা বেড়ে চলেছে "। কিছুক্ষন পরেই নিভে গেল ইমাম বুখারী (রঃ) এর প্রাণ প্রদিপ [50]। দিনটি ছিল ২৬৫ হিজরির ঈদুল ফিতরের পবিত্র দিন রোজ রোববার[51] ।

ঘ) নির্যাতিত সুফিগণ :

ইমাম মনসুর হাল্লাজ [52] সুফিবাদের[53] ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত মনীষী এবং "সর্বশ্রেষ্ঠ সুফি শহীদ"[54] বলে পরিচিত । সুফি পথপরিক্রমার চুরান্ত পর্যায়ে তিনি ঘোষনা করেন 'আনাল হক ' অর্থা 'আমি সত্য ' [55]। তিনি বলেন 'আমি সত্য, কেননা আমি সত্য কর্তৃক অসত্য বলে বিবেচত হইনি[56] ।' বস্তত, হাল্লাজ তন্মায়াবস্থায় 'আমিই সত্য' যখন উচ্চারন করেন, তখন এক বলিষ্ঠ ধর্মীয় অনুভুতি প্রকাশ করেন। এই অনুভুতির মধ্যে তিনি আল্লাহর সাথে একাত্ত্বতা অনুভব করেছেন[57] ।

যা হোক , তার এই উক্তি ধর্মবিরোধী (কুফুরী) বলেই বিবেচিত হল[58] প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লারা দাবী করলেন বিচারের । ৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহের অভিযোগ আনা হয় , সরকারী আইনজীবী তার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিলেন কিন্তু অন্য একজন আইনজীবী হাল্লাজের পক্ষ সমর্থন করেন এ যুক্তিতে যে, মরমী উক্তি কে প্রচলিত আইনের মানদন্ডে বিচার করা যায় না । ৯১৩ খ্রীস্টাব্দে তাকে গ্রেফতার করে বাগদাদের বিশেষ আদালতে হাজির করা হয় । উক্ত আদালতে তাকে ফাতেমীদের একজন কারামাতীয়া এজেন্ট সাব্যস্ত করে ৯ বছরের কারাদন্ড দেয়া হয়[59]। উজির হামিদের নির্দেশ ও মালিকী কাজি আবু উমার সমর্থিত একটি ফতোয়ার বলে ৭ মাস মামলা চলার পর মনসুরকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয় [60]। আনাল হক ('আমিই সত্য' বা আমিই খোদা) ঘোষনার পেছনে হাল্লাজের নিজস্ব ব্যাখ্যা বা দর্শন ছিল কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা কিংবা ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষ তার কোন বক্তব্য আমলে নেননি ,তারা তাকে হত্যা করেন বেত্রাঘাত, পীড়ন , অঙ্গচ্ছেদন, শিরোচ্ছেদন ও অগ্নিসংযোগে[61] ।

হাল্লাজের পর স্পেন দেশীয় বিখ্যাত সুফি দার্শনিক শায়খুল আকবর[62] মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী[63] (১১৬৫-১২৪৩ খ্রী) সুফী মতবাদকে পুর্নতত্ত্ব দর্শন সমন্বিত করে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন[64]। তার দার্শনিক মতবাদকে চার ভাগে ভাগ করা যায়-১) ওয়াহদাতুল ওজুদতত্ত্ব , ২) প্রজ্ঞাতত্ত্ব , ৩) জ্ঞানতত্ত্ব এবং ৪) ধর্মতত্ত্ব ।[65] ইবনুল আরাবীর 'ওয়াহদাতুল ওজুদ ' এ আশারীয়াদের সার্বিক দ্রব্য সম্পর্কীয় মতবাদ, হাল্লাজীয় দর্শন ও নব্য প্লেটোবাদীদের এক সত্তা সম্পর্কীয় মতবাদের সংমিশ্রন ঘটেছে । মুতাজিলা,

আশারিয়া, কারামাতিয়া, ইখায়ানুস সাফা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রভাবে তিনি প্রভাবিত।[66] মৃত্যুর ৫ বছর পুর্বে স্বপ্রস্ততকৃত গ্রন্থতালিকায় দেখা যায় ,ইবনুল আরাবীর গ্রন্থ সংখ্যা দু'শ উননব্বই এ উঠে । তারপর তিনি আরও কয়েকখানা গ্রন্থ লিখেছিলেন ।[67] তন্মধ্যে দেড়শত পান্ডুলিপি রক্ষিত আছে[68] । তার গ্রন্থাবলীর মধ্যে আল ফতুহাতুল মক্কীয়া সর্বশ্রেষ্ঠ । এটি বর্তমানে চারটি সুবৃহত্ খন্ডে ও পাচশত ষাটটি অধ্যায়ে বিভক্ত হয়ে প্রকাশিত হয় [69]। তার দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠগ্রন্থ 'ফুসুল উল হিকাম' । এটি ২৭ টি অধ্যায়ে লিখিত এবং প্রত্যেকটি অধ্যায় একজন নবীর নামের শিরোনামায় উল্লেখিত ।[70] এই গ্রন্থে সুফিবাদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে[71] ।

ইবনুল আরাবী ১২০২ খ্রষ্টাব্দে সংসার বিরাগী সুফী জীবন অবলম্বন করে জন্মভুমি স্পেন ত্যাগ করে হজব্রত পালন ও দেশভ্রমনে বের হন [72]। তবে , হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হলেও তিনি সরাসরি মক্কায় না গিয়ে মিশরে যান এবং সেখানে প্রায় বছরখানেক বাস করেন [73]। মিশরে তিনি তার নিজ সুফী দর্শন প্রচার করতে থাকেন । তার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র , মধুর ব্যবহার, পান্ডিত্যপুর্ণ কাব্য রচনা ও সুললোলিত বয়ানের ফলে অসংখ্য শিষ্য জোটে । কিন্তু শীঘ্রই প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লারা তার উপর খড়গহস্ত হয়ে উঠে । মোল্লাদের চাপে কায়রোর তৎকালীন শাসক প্রথমে তাকে কারারুদ্ধ করেন , পরে দেশ থেকে বহিস্কার করেন[74] ।

উপসংহার

আগেই বলেছি যে, সমগ্র ইউরোপ যখন অজ্ঞতা , কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতায় নিমজ্জিত ছিল সেই মধ্যযুগে আরব মনীষীরাই । মুক্তবুদ্ধি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের স্বাধীন চর্চা তথা এক বর্ণাঢ্য দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রচনা ক্রতে সক্ষম হয়েছিল এবং সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত জ্ঞানকান্ডের রাজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রেখেছিল । আবারও এটাও লক্ষনীয় যে,শুরুতেই প্রগতি আর প্রতিক্রিয়াশীলতার দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে এসেছে নানা ধর্মতাত্ত্বিক দার্শনিক ,মজহাব বা সুফিবাদ । দ্বাদশ শতাব্দীতে উক্ত সংস্কৃতি

উন্নতির চরমে পৌছেছিল আর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি প্রগতির পথ রোধ করার মতো ক্ষমতা অর্জন করেছিল আর ইবনে রুশদের পর থেকে মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি স্তব্ধ হয়ে যায় ।

এই অধপতনের কারণ -১) আল আশারী ও আল গাজ্জালীর সজ্ঞাবাদের জয় , ২) পরবর্তি শাসকদের জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চাও পৃষ্ঠপোষকতা দানে অনাগ্রহ । জ্ঞান ব্যক্তির বিলাস হতে পারে কিন্তু রাস্ট্রের জন্য অপরিহার্য - এই সত্য যতদিন পর্যন্ত জাগ্রত ছিল ততদিন পর্যন্ত আরব বা মুসলিম চিন্তা বিকশিত হয়েছে ; ৩) বিপ্লবাত্মক রাজনৈতিক পটপরিবতনে স্থায়ী দেশসমুহ ধংসের মুখে পতিত হয় , গনহত্যা সাধিত হয়, বই -পুস্তক-গ্রন্থাকার পুড়িয়ে ফেলা হয় , শিক্ষাঙ্গন বন্ধ করে দেয়া হয় , এমতাবস্থায় ধর্মপরায়নগণ মরমী সাধনায় নিয়োজিত হন । এই অবস্থা চলতে থাকে সতেরো শতক পর্যন্ত । অবশ্য এই অবক্ষয়ের যুগেও আবির্ভাব ঘটে ইবনে খালদুন এর মত মোলিক চিন্তাবিদের । তকলিদের বিরুদ্ধে সোচ্চার আওয়াজ উঠে ইমামা তাইমিয়ার কণ্ঠে (যার জীবনের সিংহভাগ কেটেছে কারাগারে এবং মৃত্যুও কারাগারে) । আরো যে সকল চিন্তাবিদ দ্বারা দার্শনিক ঐতিহ্যকে সজিব রাখা হয় তাদের মধ্যে কাতেবি, সিরোজি , হিলি , ইস্পাহানি, সিরাজি, জিলি, সরহিন্দি প্রমুখ । আঠারো শতকের মুসলিম চিন্তার ভুবনে সুচিত হয় এক নতুন উদ্যম । আরব -তুরস্ক -ভারত প্রভৃতি অঞ্চলে শুরু হয় মুক্তবুদ্ধি চর্চা ও অনুশীলন , রচিত হয় ধর্মতাত্ত্বিক সংস্কার আন্দোলনের । এই আন্দোলন সুনির্দিষ্ট রূপ ও বিকাশ লাভ করে মিশরের জামাল উদ্দিন আফগানী (১৮৩৯-৯৭) ও আবদুহ (১৮৪৯-১৯০৫) , উপমহাদেশে সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-৯৮), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) , আল্লামা ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮) ও মাওলানা আজাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) প্রমুখ আধুনিক ধর্মবেত্তা ও দার্শনিকের চিন্তায় । এই একই ধারা বাংলাদেশে বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪) ও আবুল হাশিম (১৯০৫-৭৪) প্রমুখ বরেন্য চিন্তাবিদের রচনায় ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য করা যেতে পারে ১৯২৬ সালের ১৭ই জানুয়ারী ঢাবি এলাকায় আত্মপ্রকাশিত আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজি আনোয়ারুল কাদির , আবুল ফজল প্রমুখের 'ঢাকা মুসলিম সমাজ 'কেন্দ্রিক 'বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলন' এর কথা যাদের মুখপাত্র 'শিখা'এর শ্লোগান ছিল 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ , বুদ্ধি যেখানে আরষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব '। এদের এক সভায় কবি নজরুল বলেছিলেন -

'বহুকাল পরে কাল রাত্রে আমার ঘুম হয়েছে । এতদিন আমি মনে করতাম আমি একাই কাফের , কিন্তু আজ দেখে আমি আশ্বস্ত হলুম যে , মৌ আনোয়ারুল কাদির প্রমুখ কতকগুলি গুনি ব্যক্তি দেখছি আস্ত কাফের । আমার দল বড় হয়েছে এর চেয়ে বড় সান্ত্বনা আমি চাইনা ।'

স্বাভাবিকভাবেই 'আস্ত কাফের'রা প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরোধিতার সম্মুখিন হয়েছেন । ১৯২৯ সালের ৮ ই জানুয়ারি আহসান মঞ্জিলে এক বিচার সভায় আবুল হুসেনকে 'স্বীকারোক্তিপত্র লিখতে বাধ্য ' করতে আমরা দেখেছি (ইনকুইজিশনের সামনে গ্যালিলিওর আত্মসমর্পন এর পুনারাবৃত্তি) ।

এই একুশ শতকে আমরা কতটা এগিয়েছি ? আমরা কতটা ভোগ করছি চিন্তার স্বাধীনতা ?আজ আমরা ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ, আল রাজী, ইবনে বাজা, ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ) প্রমুখের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি , গর্বিথই হই তাদের অবদানে কথা জেনে আবার একি সাথে আমরাই আজকের ওমর খৈয়াম কে চাপাতি দিয়ে কুপানোর জন্য প্রস্তুতি নেই । কাফের নাস্তিক নলে মুখে ফেনা তুলা হত যেই কবি নজরুল ইসলামের নামে আজ তিনিই আমাদের জাতীয় কবি 'মুসলমানদের গর্ব ' । এই বিপরিতধর্মী আচরন থেকে আমরা কি পারিনা বেরিয়ে আসতে ? যে ধর্মের আসমানি কিতাবের প্রথম আয়াত 'পড়', মহানবী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের বানী আছে 'প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন ফরজ ' কিংবা 'জ্ঞানার্জনে সুদূর চীন দেশে যাও' সেই ধর্মের অনুসারি হিসেবে আমরা জ্ঞান -বিজ্ঞান তথা মুক্তবুদ্ধি চর্চা ত্যাগ করে কতটা এগিয়েছি বা পিছিয়েছি সেই হিসাব মেলানোর সময় কি এখনো আসেনি ? আমরা হযরত উমর (রাঃ) এর খেলাফতের কথা কি ভুলে গেছি যখন খলিফার কাছে প্রকাশ্যে জবাব চাওয়া হত খুতবার সময় ? আত্ম সমালোচনা করতে আমরা কবে শিখব ? "সব দেশেই সব কালে নতুন চিন্ত শাসক এবং প্রচলিত ধর্মের রোষানলে পড়ে কারণ নতুন চিন্তা সব সময়ই শাসকদের জন্য হুমকি " এই প্রতিপাদ্যকে কি আমরা মিথ্যা প্রমান করতে পারিনা ?

টিকা ও তথ্যসংকেত:

1. Saeed Sheikh, Studies in Muslim Philosophy,1962, page-3)
2. মুসলিম দর্শন :চেতনা ও প্রবাহ,আবদুল হালিম,বাংলা একাডেমী ,ঢাকা,১৯৯৮,প-৫১)
3. Asqalaanee, Ahmed ibn 'Alee Ign Hajar al-,Tahdheeb at-Tahdheeb, Hyderabad, 1325-7,Vol 10, Page225 এবং মুসলিম ধর্মতত্ব ও দর্শন,আমিনুল ইসলাম ,১৪৯৯৫,বাংলা একাডেমী ,ঢাকা,প-৮২
4. আবদুল হালিম ,প্রাগুক্ত .
5. Sharrastanee,Muhammad ibn'abdul Kareem ash-,Al-Milal Wa'l-Nihal,Beirut,Darr-al-Marifah,2nd Edition,1975,Vol-1,Page 30.
6. Ibn al Hanbal,Ahmad, Ar-Radd 'alaa al-Jahmeeyah,Riyadh,Darr al Liwaa,1st Edition,1977,Page- 41-43
7. Sharrastanee, ibid,Page-46
8. আল মাসুদিঃ মুরজা আল দাহর, বারবিয়ার ডি মিনার্ড প্যারিস কর্তৃক সম্পাদিত ১৮৬১-৭৭, খন্ড ৬, পৃ ২২, শিবলী নুমানী : মাক্কালাত ই শিবলিমতেবা মারিফ ,আযমগর ,১৩৭৫/১৯৫৫, খন্ড ৫ ,পৃ১২ ,আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত ,পৃ৮৫ , ড রশিদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভুমিকা , পৃ৩০৭)
9. http://satrong.org/content/religion/Imam_Al_Gazzali_NM.pdf
10. Syed Ameer Ali, Spirit of Islam, Appendix III, London 1946.
11. আবদুল মওদুদ :মুসলিম মনীষা , ঢাকা ১৯৭০, প-১৬-১৭
12. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত , প-১২৬
13. আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, প-৪৩-৪৪
14. Sharif M M: Muslim Thought, Its Origin and Achievements, London, 1954, Page 79.
15. আবদুল হালিম ,প্রাগুক্ত , প-?
16. Sharif M M: A History of Muslim Philosophy, Vol 1, Wiesbaden, 1963 ,Page 428.
17. H. G. Farmer, A History of Arabian Music to the 13th Century ,London 1929.
18. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত , প-১২৬
19. আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, প-৪৩

20. Sharif M M: A History of Muslim Philosophy, ibid., Robert L. Arrington [ed.] *A Companion to the Philosophers* , Oxford, Blackwell ,2001, Peter J. King *One Hundred Philosophers* New York, Barron's ,2004

21. আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত , প-১৩৫

22. H. G. Farmer, ibid, Page 222.

23. কোন কোন মুসলিম জীবনীকার ইবনে বাজাকে নাস্তিক বলে অভিহিত করতে কুন্ঠিত হননি । দেখুন, ইবনে খাল্লিকান , ওয়াফাত আল ওয়াল , ওস্টেনফিলড সম্পাদিত , পটিনজেন , ১৮৩৫, খন্ড ২, পৃ ৩৭২ ।

24. Al-Qifti, A. (c.1172) Akhbar al-hukama' (Information about Wise People), ed. J.Lippert, Leipzig: Maktabat al-Mutanabbi, 1903. (Includes a section on Ibn Bajja's life and works.

25. ইবনে রুশদের জীবন ও রচনাবলীর জন্য দেখুন, রেনান,এভারোজ এট লা এভারোইজম , প্যারিস, ১৮৫২ ; এল এহওয়ালি, ইসলামিক ফিলসফি , কায়রো, ১৯৫৭ , হোয়ারলি , লাইফ এন্ড অব ইবনে রুশদ,আমেরিকান ইউনিভার্সিটি , কায়রো, ১৯৪৭; আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাস ইবনে রুশদ , কায়রো,১৯৫৩ ; বর্তমান লেখক কৃত ,আল্লামা বিজ্ঞানী ইবনে রুশদ, দৈনিক ইনকিলাব, ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯.

26. রাহুল সংস্কৃত্যায়ন , দর্শন -দিগদর্শন , প্রথম খন্ড , ছন্দা চট্টোপাধ্যায় অনুদিত , কলকাতা , পৃ১৮৮

27. ইসলামী বিশ্বকোষ , ১ম খন্ড, ইফাবা, পৃ ১৫০

28. বাওয়েজেসের মতামতও তাই.

29. আবদুল হালিম ,প্রাগুক্ত , পৃ১৬২-১৬৫

30. গিলসন , হিস্ট্রি অব খ্রিস্টান ফিলসফি ইন দি মিডল এজেস , নিউইয়র্ক ,১৯৫৪ , পৃ২১৯

31. http://satrong.org/content/religion/Imam_Al_Gazzali_NM.pdf

32. আবদুল হালিম , প্রাগুক্ত .

33. আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত,পৃ ১৫৯

34. ড. আবদুল কাদের, ইবনে রুশদের দর্শনের প্রভাব, ইফা পত্রিকা , জুলাই-ডিসে ১৯৭৭ ।

35. আল আনসারি কর্ত্রক উল্লেখিত রেনালের এভারেজ এট লা এভারোইজম রাবেয়দা,পৃ৪৩৯। আবদুল হালিম , প্রাগুক্ত . আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত,পৃ ১৫৯

36. এম এন রায়,ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান, শতদল প্রকাশনী,১৯৯০, পৃ ৫৯

37. http://www.satrong.org/content/religion/Majhaber_utpotti_o_krombikash_NM.pdf

38. সাদ'উল্লাহ , ইসলামে ভিন্নমত ও লড়াই , ঐতিহ্য , ২০০০ ; http://en.wikipedia.org/wiki/Imam

39. http://banglarislam.com/Articles/Sharia/amaderImamera.pdf

40. আবদুল মওদুদ , প্রাগুক্ত , ২৪

41. http://en.wikipedia.org/wiki/Jafar_al-Sadiq

42. http://en.wikipedia.org/wiki/Musa_al-Kazim

43. http://en.wikipedia.org/wiki/Ali_al-Raza#Death

44. আল্লমা আইনী ,কাশফুয যুনুন, ১ পৃ৪২৬

45. মুহম্মদ মুজীবুর রহমান ইমাম বুখারী ,ইফাবা,ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫, আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ৩৯; http://banglarislam.com/Articles/Sharia/amaderImamera.pdf

46. মুহম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত ,পৃ৩২

47. আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ৪০ এবং মুহম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত ,পৃ৩২

48. মুহম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত ,পৃ৩২

49. ড. কফিল উদ্দিন আহমেদ, হাদিস শাস্ত্রের অগ্রদূত ইমাম বোখারী (র:),দৈনিক ইত্তেফাক , ১১ এপ্রিল ২০০৮।

50. মুহম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত ,পৃ৩২

51. আবদুল মওদুদ, প্রাগুক্ত, পৃ৪০

52. হাল্লাজের জীবন দর্শন ও সুফী সাধনা সম্পর্কে জানতে দেখুন ,L. Massignon, The Passion of Hallaj 4 vol., tr. 1982; E. G. Browne. Literary History of Persia. Four volumes, 1998. ; Herbert Mason. Memoir of a Friend: Louis Massignon. Notre Dame 1983: University of Notre Dame Press.; Jan Rypka, History of Iranian Literature. Reidel Publishing Company. 1968 ;Nicholson R A: The Mystics of Islam , london 1963 , The idea of personality in sufism, london , 1964, Studies in Islmaic Mysticism ,Cambridge 1921, ফরিদউদ্দীন আত্তার , তাজকেরাতুল আওলিয়া (বঙ্গানুবাদ) প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড ,ঢাকা , ১৯৬৩ ।

53. http://www.satrong.org/content/religion/Sufism_NM.pdf

54. সাদ'উল্লাহ, প্রগুক্ত, পৃ১১৫

55. See notes no. 52

56. Dr A E Affifi , The Mystical phylosophy of Muhyid Din Ibnul Arabi, Sh Muhammad Ashraf, Kashmiri Bazar, Lahore, Pakistan (no date) ,1st edition , cambridge,1938, p15 quoted from Hallaz, Massignon p 62

57. Dr A E Affifi , ibid, p140

58. মো সোলায়মান আলী সরকার, ইবনুল আরাবী ও জালালউদ্দিন রুমি , বাংলা একাডেমি , ঢাকা, জুন ১৯৮৪ ,পৃ ৭
59. আমিনুল ইসলাম,প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৮
60. সাদ উল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৬
61. আমিনুল ইসলাম , প্রাগুক্ত, পৃ১৮৮
62. Nicholson R A, Ibid; Idries Shah, The Sufis, New York, 1964 P-137 .
63. http://satrong.org/content/religion/Ibnul_Arabi_NM.pdf
64. মোঃ সোলায়মান সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫
65. Dr A E Affifi, ibid.
66. মোঃ সোলায়মান সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ ৮
67. আবদুল মওদুদ , প্রগুক্ত , পৃ১৬৬
68. মোঃ সোলায়মান সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ৩০
69. S A Q Hussani , Ibn al Arabi, P 33 , Madras ,1931 ;Rom Landau , The Philosphy of Ibn Arabi, P31-121 , London 1959)
70. S A Q Hussani, ibid.
71. Nicholson R A, Ibid, P 149-161.
72. মোঃ সোলায়মান সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ 29
73. আবদুল মওদুদ , প্রগুক্ত , পৃ 164
74. মোঃ সোলায়মান সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ ২৯;আবদুল মওদুদ , প্রগুক্ত , পৃ১৬৫

নুরুজ্জামান মানিক : প্রাবন্ধিক , ফ্রীল্যান্স সাংবাদিক ও কলামিষ্ট । ১৯৯০'র দশকের শুরু থেকে বাংলাদেশের প্রথম শ্রেনীর জাতীয় দৈনিক (যথা ইত্তেফাক, জনকণ্ঠ,মুক্তকণ্ঠ , যুগান্তর,প্রথম আলো,সমকাল, আমার দেশ ইত্যাদি) সাপ্তাহিক ,পাক্ষিক ও মাসিক সাময়িকী সমুহে প্রবন্ধ-নিবন্ধ-প্রতিবেদন-ফিচার লিখছেন । প্রকাশিত রচনা পাঁচ শতাধিক । লেখার বিষয় বিচিত্র । উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ / কলাম দিয়ে যাত্রা শুরু । বিষয় সমসাময়িক রাজনীতি ও সমাজ । আগ্রহের ক্ষেত্র আমদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ । বিজ্ঞান বিষয়ক (বিজ্ঞান,তথ্য -প্রযুক্তি,মহাকাশ বিজ্ঞান -গবেষণা) প্রকাশিত রচনা শতাধিক। ইসলাম ,মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন বিষয়ে প্রকাশিত রচনা অর্ধশতাধিক । Email: manik061624@yahoo.com

ধর্ম সবকিছুকে বিষাক্ত করে তুলছে

ক্রিস্টোফার হিচেনস
অনুবাদ: অগ্নি অধিরূঢ়

১

ধর্মের বিরুদ্ধে চারটি পুরনো অভিযোগ আছে। প্রথমত: মানুষ ও মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে ধর্ম সম্পূর্ণ ভুল তথ্য দেয়। দ্বিতীয়ত: এটা ভুল ভাবে মনে করে যে আত্মার শান্তির জন্য শক্তি যোগায় কেবলমাত্র ধর্ম। তৃতীয়ত: ধর্ম যৌনতাকে অস্বাভাবিক ও বিপদজনকরূপে উপস্থাপন করে আর নারীদের হেয় হিসেবে প্রতিপন্ন করে। চতুর্থত: ধর্ম মনে করে নৈতিকতার ধারক আর বাহক কেবল ধর্ম।

আমার বালকোচিত কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হওয়ার আগেই আমি এই অভিযোগ চারটি আবিষ্কার করেছিলাম। শুধুমাত্র এই কারণে আমাকে ধর্মের প্রতি আক্রমণাত্মক বলা যেতে পারে-এমনটা আমি কোনমতেই মনে করি না। অবশ্য এর পাশাপাশি আমি আরও একটি সুস্পষ্ট অশ্লীল ঘটনা চিহ্নিত করতে পেরেছি। এটা হল 'কর্তৃপক্ষের (ঈশ্বেরের) দালালদের দ্বারা ধর্ম ব্যবহৃত হচ্ছে।' আমি নিশ্চিত যে, আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ আমার মত একইভাবে ধর্ম সম্পর্কে একই উপসংহার টেনেছে। আমি ডজনেরও বেশি দেশে শত শত জায়গায় এ ধরণের মানুষদের সাথে মিশেছি। এদের মধ্যে কেউ কেউ কখনও কোন কিছু বিশ্বাস করত না। আবার কেউ বা জটিল সব সমস্যায় পরে বিশ্বাসকে বিসর্জন দিয়েছে। তাদের কারও কারও জীবনে এমন মুহূর্ত আছে যেগুলো অশান্তির কালো পর্দায় ঢাকা ছিল। সেই সময়গুলোতে তারা মানসিকভাবে কিছুটা বিপর্যস্ত ছিল। আবার কারও কাছে তা কেয়ামতের আগাম বার্তা বহন করে এসেছিল। অবশ্য সমস্যা মিটে যাবার পর তাদের মানসিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। তারা এর ফলে নিজেদের নৈতিক পক্ষপাতকেও ভালভাবে চিনতে পেরেছে।

আমার নিজের এবং সহচিন্তকদের কাছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের নীতি আদতে কোন বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কোন কিছুতে আস্থা রাখা আমাদের মূল নীতি নয়। আমরা শুধু যে বিজ্ঞান ও কার্যকারণের উপর নির্ভর করি বা আস্থা রাখি তা নয়। কারণ এগুলো পর্যাপ্ত উপাদানের চাইতেও বেশি প্রয়োজনীয় বলে পরিগনিত। কিন্তু যা কিছু বিজ্ঞানের বিরোধীতা করে বা যথাযথ কারণকে এড়িয়ে চলে তাকে আমরা আসলে মন থেকে অস্বীকার করি। আমাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা সবাই একমত- আমরা মুক্তান্বেষা, মুক্তমনাকে শ্রদ্ধা করি, নিজস্ব গরজে নতুন চিন্তাকে স্বাগত জানাই। কিন্তু তাই বলে আমরা আমাদের আদর্শ নিয়ে কোন রকম গোঁড়ামী করি না।

বাধাগ্রস্থ বিবর্তন (punctuated evolution) এবং নব্য ডারউইনবাদ এর অপূর্ণ শূন্যস্থানগুলো বিষয়ে প্রফেসর রিচার্ড ডকিন্স এবং প্রফেসর স্টিফেন জে গুল্ড এর মতবিরোধ হওয়াটা আমাদের কাছে এক সুগভীর ব্যঞ্জনা বয়ে

। উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ ও যথাযথ কারণ পর্যালোচনাসাপেক্ষে আমরা আমাদের জ্ঞানকে ত্বরান্বিত করতে পারি, ঝগড়া-ঝাটি করে নয়। (রিচার্ড ডকিন্স এবং ড্যানিয়েল ডেনেট এর প্রতি আমার একটা নিজস্ব বিরক্তিআছে। তারা নাস্তিক বা অবিশ্বাসী শব্দটির পরিবর্তে বুদ্ধিদীপ্ত (Bright) শব্দটি ব্যবহারের প্রস্তাব করেছেন)। আমার মতে এর ফলে তারা নিজেদেরকে কিছুটা হলেও ছোট করেছেন। আমরা কেউ বিস্ময় এর প্রতি প্রলুব্ধতা, রহস্যময়তা এবং শক্তিমানের প্রতি ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা থেকে মুক্ত নই। আমাদের সঙ্গীত, শিল্পকলা, সাহিত্য আছে। আমরা এখন জানি যে, বিশেষ রকমের নীতিনৈতিকতার জন্য পৌরাণিক বইয়ের নীতিকাহিনীর চাইতে সেক্সপীয়র, টলস্টয়, শিলার, দস্তয়েভস্কি এবং জর্জ এলিয়ট এর দ্বারস্থ হওয়াটা ঢের বেশি আকর্ষনীয় এবং ভাল।

সাহিত্য ধর্মগ্রন্থ নয়। বরং তা মনকে পুষ্টি জোগায়। এর আর কোন উপমা খুঁজে পাচ্ছি না, তাই 'আত্মা'ই উল্লেখ করি - এ আত্মাকেও শান্তি দেয়। আমরা বেহেশত বা দোজখে বিশ্বাস করি না। কিন্তু কেউ বলতে পারবে না যে, আমরা ওই গাল-গপ্পে বিশ্বাস করিনা বলে আমরা বেশী অপরাধপ্রবণ (আসলে যদি কখনও সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তাহলে আমি নিশ্চিত এর উল্টোটাই প্রমাণিত হবে)। আমাদের জীবন এই একটাই - অবশ্য ভবিষ্যতে আমাদের সন্তান-সন্ততিদের মাধ্যমে বাঁচার ব্যাপারটি তো আছেই। আমরা সম্পূর্ণভাবে সুখী যে আমরা অবশ্যই আমাদের নিজেদের ইচ্ছে এবং অভিলাস অনুযায়ী পরিবেশ, পথ তৈরি করে তিনে সক্ষম। আমরাই আমাদের ভাগ্য-বিধাতা।

আমরা এটা অনুমান করতে পারি যে শেষ পর্যন্ত যা সম্ভব হবে তা হল মানুষ তাদের সংক্ষিপ্ত ও সংগ্রামী জীবনের মর্ম যখন বুঝতে পারবে তখন তারা পরস্পরের সাথে আরও ভাল ব্যবহার করবে। আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে, ধর্ম ছাড়াও নৈতিকভাবে শুদ্ধ জীবন যাপন সম্ভব।

২

ধর্ম অসংখ্য মানুষের কোন ভাল করে না, বরং বেশ্যার দালালের মতো নোংরা মনের ও গণহত্যাকারীর মতো অপরের প্রতি হিংস্র হতে শেখায়। কিন্তু আমাদের মত অধার্মিকদের জন্য কোন উপরওয়ালার প্রয়োজন নেই, নেই নিজের মনে জোর বাড়ানোর জন্য কোন কৃত্রিম 'ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের'। ফরাসী গণিতজ্ঞ ব্লেইজ প্যাস্কেল মনে হয় আমাদের মত লোকদের কথা স্মরণ করেই বলতেন - "আমাকে বানানোই হয়েছে অবিশ্বাস করার জন্য।" আমাদের প্রতিদিন অথবা প্রত্যেক সপ্তাহে অথবা কোন বিশেষ দিনে কোথাও জমায়েত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা নাস্তিকরা কোন মোল্লাগিরি সমর্থন করি না কিংবা নিজের মতবাদ পালনের জন্য পুলিশিগিরিও করি না। কোন প্রতিমা, চিত্র বা বস্তুকে (এমনকি তা যদি কোন বই হয় তাকেও) শ্রদ্ধাইয় গলে গলে পড়বার মত উপযুক্ত বলে মনে করি না। বরং তথাকথিত এই ভদ্রতাকে আমরা পরিত্যজ্য বলে বিবেচনা করি। আমরা মনে করি না যে, পৃথিবীর এক জায়গা আরেক জায়গা থেকে 'পবিত্রতর'। আমরা মনে করি হজ্জ্ব কিংবা তীর্থযাত্রা আসলে হাস্যকর লোকদেখানো কার্যক্রম ছাড়া কিছুই নয়। কোন পবিত্র দেয়াল, গুহা, পাথর বা দালানের নামে গণহত্যাকে আমরা কোনক্রমে মেনে নিতে পারি না। আমরা বরং লাইব্রেরীতে যেতে কিংবা বা আর্টগ্যালারি

দেখতে অথবা প্রিয় বন্ধুর সাথে লাঞ্চে গিয়ে হাস্য-রসিকতা কিংবা জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় সময় কাটাতে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। এইসব বইয়ের জগত বা সাংস্কৃতিক আলোচনাপূর্ণ লাঞ্চ বা গ্যালারি পরিদর্শনের অর্থ খুব স্পষ্ট। যদি আমাদের মধ্যে কিঞ্চিত ধর্মবিশ্বাস তৈরি হয়েও থাকে তবে তা এসেছে এই সাংস্কৃতিক জগত থেকে, কোন অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহা থেকে নয়। আমাদের প্রিয় চিত্রকর, সুরকার প্রমুখের সৃষ্টি আমাদের মনোজগতে পরিবর্তন ঘটিয়েছে। অগাস্টিন, একুইনাস, মাইমনিডস এবং নিউম্যান আমাদের চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে ঠিকি, কিন্তু এই প্রভাবশালী ধর্মবিদেররা আবার অনেক শয়তানি বচনও আউরেছেন। কখনও কখনও তা চলে গেছে বোকামীর পর্যায়েও। অসুখের কার্যকারণ, এই সৌরজগতে পৃথিবীর অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে তারা হাস্যকর এবং অবৈজ্ঞানিক নানা মন্তব্যও করেছেন। বর্তমান কাল পর্যন্ত তাদের মতবাদের টিকে না থাকা বা আগামীতেও তাদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি না হবার পিছনে এগুলোই সাধারন কারণ। কেন ভবিষ্যতে তাদের মত ধর্মগুরু বা পয়গম্বর আর পৃথিবীতে আসবে না সেটাও বোঝা কষ্টকর নয়।

ধর্ম ভাল ভাল কথা যা বলার অনেক আগেই বলে ফেলেছে। একালে নয়, তার সবচেয়ে মূল্যবান বাণী বা উদ্দীপনামূলক বক্তব্য দিয়েছে সেই শতাব্দী প্রাচীন অতীতকালে। এটা তো বটেই, এছাড়া কোন ভালোকাজে ধর্মের বাকরুদ্ধ করা হয়েছিল সেও অনেকদিন আগের কথা। এমন ঘটেছিল সাহসী ভিন্নমতাবলম্বী লুথারিয়ান গির্জার যাজক দিয়েত্রিচ বনহেফের (Dietrich Bonhoeffer) এর জীবনে। নাৎসীদের অপকর্মে সাহায্য না করার কারণে তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত কোন নবী বা ধর্মনেতার জীবনে এমন ঘটেনি। আমরা এমন কাউকে পাইনি যার বক্তব্যে পুনরুক্তি নেই। তারা সবসময় গতকালের কথার প্রতিধ্বনি তুলেছেন। কারও কারও ধর্ম সম্পর্কিত স্বীকারোক্তি পাসকেলকে উদ্ধৃত করতে গিয়ে নিজেদের সংকীর্ণ মনোভঙ্গিকে প্রকাশ করে ফেলেছে। যখন তাদেরর ওই প্রচারকার্য ভন্ডামো ও নিরানন্দে পর্যবসিত হয়, তখন তারা সি. এস. লুইস (C. S. Lewis) এর নামোল্লেখ না করে পারে না। দুই পদ্ধতির কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। এটা আসলে সবসময় ঘাড়ের উপর চেপে থাকা একধরনের অনিচ্ছুক মানসিক চাপ থেকে আসে। কত উদ্যম যে এই মানসিক চাপকে লালন করেছে তা বিশ্বাস করা কঠিন। প্রত্যেক সূর্যোদয়কে নিশ্চিত করতে আজটেকরা প্রত্যেক বিশেষ দিনে একজন মানুষের বুক চিরে ফেলত। একেশ্বরবাদীরা তাদের উপাস্যকে এর চেয়েও বেশি বিরক্ত করেছে। 'স্বর্গীয় পরিকল্পনার এক অংশ ব্যক্তি' -এমন মিথ্যাচার করার জন্য কত ভণ্ডামীই না করা হয়েছে। কিন্তু কোনটাই কাজে লাগে নি।

কারও পাপ সম্পর্কে সচেতন করার জন্য কি পরিমাণ অহংবোধ বিসর্জন দেয়া হয়েছে? কিছুই নয়। কতবার তারা লজ্জা পেয়েছে? কখনও নয়। আর এগুলোর সাথে তুলনা করে যদি জিজ্ঞাসা করি - বিজ্ঞানের নতুন উদ্ভাবনের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কতভাবে ধর্মকে মোচড়ানো হয়েছে? অকাজের অনুমান কতগুলো তৈরি করা হয়েছে? বিজ্ঞানের নতুন চিন্তার সাথে মানুষের নিজ হাতে তৈরি ফেরেশতার পবিত্র বাণীর মিলে যাবার জন্য ধর্মীয় সূত্রসমূহকে কত নতুনভাবে সাজানো হয়েছে? কত সাধু, কত অলৌকিক ঘটনা, কত ধর্মসভাই না ওইসব মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে আবার সময়ান্তরে সেগুলোকে বাতিল করতে ব্যবহার করা হয়েছে, তার ইয়ত্ত্বা নেই।

ঈশ্বর তার নিজের আদলে মানুষকে তৈরি করেনি। সহজ করে বললে বলা যায় যে, ঈশ্বর বা ধর্মের সংখ্যা অতিরিক্ত বেড়ে যাবার এটাই সহজ ব্যাখ্যা। বিশ্বাসগুলোর নিজেদের প্রতি ও নিজেদের মধ্যে যে পরস্পরবিরোধীতা তা সহোদর হত্যার মত একই দোষে দুষ্ট। আর এর ফলে সভ্যতার অগ্রগতিকে শুধু প্রতিহত করাই হয়েছে।

৩

ধর্মগুলোর সবচেয়ে পরিশীলিত সমালোচনাকেও ধর্মবাদীরা সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক বলে মনে হবে। ধর্মগুলো মানুষের তৈরী। হ্যাঁ, এটাই সবচেয়ে নরম নিন্দা। এমনকি যে মানুষের হাতে এটা তৈরি হয়েছে, সেই মানুষও কোন নবী, ত্রাণকর্তা অথবা গুরুর অনেক কথার সাথে একমত হবে না। তারপরও অন্তত: পরবর্তীকালের উদ্ভাবন এবং অগ্রগতির অর্থ তারা বলার আশাটুকু করতে পারে। এটা জানা কথা যে, তারা অর্থাৎ সাধারণ মানুষ কথা বলা শুরু করলেই ধর্ম বা ধর্মের দালালরা তাদের বাধা দেবে। তারপরও তারা দাবী করে যে তারা সব জানে। শুধুমাত্র বর্তমানকে জানা নয়, তারা ভুত-ভবিষ্যৎ, অতীত সবকিছু জানে। ঈশ্বর আছে - শুধু এটুকু জানাতেই তারা থামে না। তারা বলে যে, ঈশ্বর আমাদের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন: ঈশ্বর আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে, এই বিশ্বকে পরিচালনা করছে; এছাড়াও ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা করেন। আমরা কি খাব, কি পড়ব, এমনকি আমরা যৌনতাকে কোন দৃষ্টিতে দেখব ইত্যাদি সব কিছুই আসবে ঈশ্বরের কাছ থেকে। অন্যভাবে বললে বলা যায়, এ ধরণের বিস্তৃত এবং জটিল আলোচনায় আমরা খুব খুব স্বল্প বিষয়ে অনেক অনেক বেশি জানি। তারপরও মানুষকে আলোকিত করার প্রত্যাশা আমরা করি। যাবতীয় দলাদলির মধ্যে একটি বিষয়ে আমরা সবাই একই দলভুক্ত।

আমাদের চাহিদা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য ধর্মগুলোর মধ্যে রয়েছে এ বিষয়ে কারও কোন মতভেদ নেই। এ ধরণের বোকামো কিছুটা অহংকারের সাথে মিশ্রিত থাকে। এই ধরণের অহংকারকে ব্যবহার করে বিতর্ক থেকে বিশ্বাসকে বাদ দিতে হবে। যে ব্যক্তি নিজের ভাবনা সম্পর্কে স্থির প্রতিজ্ঞ এবং নিজের বিশ্বাসের স্বপক্ষে স্বর্গীয় অজুহাতকে ব্যবহার করেন, তিনি আসলে মানব প্রজাতির শৈশবাবস্থায় রয়ে গেছেন। আমরা দীর্ঘকাল আগেই সেই অবস্থাকে বিদায় জানিয়েছি। আর অন্য সব বিদায়লগ্নের মত এটাকেও দীর্ঘায়িত করতে চাই না।

ধর্মের সাথে বিতর্ক থেকে সবধরণের বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এটা সমাপ্তি নয় বরং এখান থেকেই শুরু করতে হবে। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, মানব প্রকৃতি নিয়ে সব ধরণের আলোচনা এই ধর্মের সাথে বিতর্ক দিয়েই শুরু করতে হবে। কারণ সুন্দর ভবিষ্যত অথবা সভ্য জীবনের জন্য যে বিতর্ক, তার সমাপ্তি থেকে নতুন করে শুরু করা যায় না। ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বরূপ বেশ স্পষ্ট। সামাজিক চাহিদা আর বিবর্তনের কারণেই মানুষের মধ্যে ধর্মবধ টিকে আছে একে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। মৃত্যুভয়, অনিশ্চয়তা, অজানা রহস্যর উর্ধে যতক্ষন না ওঠা যাচ্ছে, ধর্মের এজক ধরণের 'চাহিদা' কারো কারো মধ্যে থেকেই যাবে। তাই আজগুবি গপ্প-কাহিনীতে বিশ্বাস করে যারা শান্তি পেতে চায়, তাদের আমি বাধা দেই না। বলতে পারেন এটা আমার জন্য মহানুভবতা, যদিও আমি তা মনে করি না। কিন্তু ধর্ম কি আমার প্রতি একই রকম মহানুভবতা দেখাবে? আমি এটা জিজ্ঞাসা করছি, কারণ আমার সাথে আমার ধর্মভাবাপন্ন বন্ধুদের কিছু গুরুতর পার্থক্য আছে। যারা সত্যিকারের সৎ বন্ধু তারা অবশ্য এতে সায় দেবে। আমি তাদের গথিক রীতির ক্যাথেড্রাল (Cathedral) দেখে বিস্মিত হই। এক নিরক্ষর ব্যবসায়ীর কাছে আসা আরবী কোরান 'নাজিল' হওয়ার গল্পকে "সম্মান" করি। এমন কি হিন্দু ও জৈনদের সান্তনা বা স্বস্তি পাবার জায়গাটি সম্পর্কেও আমি আগ্রহ বোধ করি। কোন রকম বিনয়ের বিনিময় ছাড়াই আমি এমন করতে থাকব। ধর্ম কিন্তু আসলে শেষ পর্যন্ত সে ধরণের কোন মহানুভবতা দেখাতে ইচ্ছুক নয় মোটেই।

এই যে আমি যে কথাগুলো লিখছি এবং যেভাবে আপনি পড়ছেন, ধর্মভাবাপন্ন মানুষেরা এইসব কথাকে আক্রমণ করতে, ধ্বংস করতে চাইবে। তারা আমাকে এবং আপনাকে ধ্বংস করার জন্য নানারকম ফন্দি-ফিকির করবে। বিভিন্ন মানবিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমার এই প্রতীতি হয়েছে যে, আমি আমি একটা কথাই বলতে পারি; আর তা হল -**"ধর্ম সবকিছুকে বিষাক্ত করে তোলে।"**

ক্রিস্টোফার হিচেন্স, আমেরিকান লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং সামালোচক। God is Not Great সহ বহু গ্রন্থের প্রণেতা। উপরের লেখাটি Slate ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল।

অগ্নি অধিরূঢ়, বাংলাদেশে বসবাসরত মুক্তমনার নিয়মিত লেখক। বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ইমেইল - agniadhirurho@gmail.com

ব্রুনো'র সমকালীন আরো যাদের হত্যা করা হয়েছিল

নুরুজ্জামান মানিক

১

মধ্যযুগের ইউরোপে সম্রাট ট্রাজান (খ্রি ৯৮-১১৭) এর সময় নীতি নির্ধারণ করা হয় , খ্রিস্টান হওয়া একটি মৃত্যুদন্ডযৌগ্য অপরাধ । অবশ্য খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকলেও তৃতীয় শতকে এ ধর্মকে বেশ খোলাখোলিভাবেই সহ্য করা হতো। কিছু কিছু সংখিপ্ত দমনমুলক প্রচেস্টা নেয়া হয়েছিল বৈকি আর একবার বড়ো ধরনের নির্যাতন শুরু করেন ২৫০ সালে সম্রাট ডেসিয়াস (২৪৯-৫১খ্রি) এবং সম্রাট ভালেরিয়ান (২৫৩-২৬০ খ্রি) তা' চালিয়ে যান । দূটি সহনশীলতার ফরমান (৩১৩ ও ৩১৩ খ্রি) নির্যাতনের অবকাশ ঘটায় । ধর্মীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে এই দলিল দুটির গুরুত্ব আছে । এর মধ্যে একটি ছিল সম্রাট কনস্তানতিন (খ্রি ৩০৬-৩৩৭) যা ইডিকট অব মিলান নামে পরিচিত ।এই ফরমান জারির প্রায় দশ বছর পরে কনস্তানতিন দ্য গ্রেট স্বয়ং খ্রিস্টধর্ম গ্রহন করেন । যে খ্রিস্টধর্মীরা এতদিন সহনশীলতা দাবি করছিলেন এই যুক্তিতে যে, ধর্মবিশ্বাস ঐচ্ছিক সেই তারাই রাস্টীয় ক্ষমতার সমর্থনে সহনশীলতার মত পরিত্যাগ করল আর প্রচার করল 'খ্রিস্টীয় মতবাদে যারা বিশ্বাস করে না তারা অনন্তকালের জন্য নরকে যাবে' । আর কায়েমী রাজনৈতিক স্বার্থজনিত কারণে শাসকশ্রেনী 'একমাত্র সত্য' হিসেবে খ্রিস্টীয় মতবাদ জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া আর ভুলের বিস্তার রোধ করা কর্তব্য হিসেবে গ্রহন করে (এই নীতি সর্বকালে সর্ব দেশে সব শাসক শ্রেনীর জন্য নিদারুন ভাবে সমকালিন সত্য)। কনস্তানতিন দ্য গ্রেট ও তার উত্তারিধাকারদের আমলে একের পর এক ফরমান জারি হতে থাকে । পেগ্যান মতবাদ চুরান্তভভাবে বিধবস্ত হয় চতুর্থ শতকে সম্রাট থিওডোসিয়াস (৩৭৯-৯৫) এর কঠোর আইন বলে । স্পেনে ধর্মদ্রোহী প্রিসিলিয়ান (৩৪০-৮৫) এর মৃতুদন্ড থেকে ধর্মদ্রোহিতার জন্য মৃতুদন্ড দেয়া শুরু হয় । নেতৃস্থানীয় খ্রিস্টান যাজক সন্ত আগাস্তিন (মৃ ৪১০ খ্রি.) ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পীড়নের নীতি প্রণয়ন করেন এবং একে ধর্মগ্রন্থের শক্তভিত্তির উপর স্থাপন করেন ।শাসক শ্রেনীর উপর গির্জার প্রভাব সবচেয়ে মারাত্মক রূপলাভ করে দ্বাদশ শতকে । আলবেজোয়াতে

তথাকথিত ক্রুসেডের নামে পুরুষ, নারী ও শিশুদের পাইকারিভাবে আগুনে পুড়িয়ে ও ফাসিতে ঝুলিয়ে মারা হয় । তাতেও তারা সন্তষ্ট হলেন না । বিরুদ্ধমতাবলম্বীদের খুজে বের করার জন্য ১২৩৩ খ্রিস্টাব্দে পোপ নবম গ্রোগোরি ইনকুইজিশন বা ধর্মীয় বিচারসভা নামে এক সংঘটিত ব্যবস্থা চালু করেন যা পুর্নতা পায় চতুর্থ ইনোসেন্ট এর এক অধ্যাদেশ বলে ১২৫২সালে।

২

জিঅরদানো ব্রুনো কে ভিন্নমত পোষনের দায়ে রোমে দন্ডাজ্ঞা দেবার পর "কাম্পো দ্য ফিওরি" নামক দহনস্থলীতে পুড়িয়ে মারা হয় ১৬০০ সালে। এটা আমরা কমবেশী সবাই জানি। তিনি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন বিধায় তাকে নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে । বাংলা ভাষায়ও লেখার কমতি নেই । বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শহীদুল ইসলামের একটি লেখা এই বইয়েও সন্নিবেশিত হয়েছে।

কিন্তু ব্রুনোই ধর্মীয় নির্যাতনের প্রথম এবং শেষ উদাহরণ নয়; ব্রুনোর ঐ যুগে ইউরোপে এরকম অনেক হত্যাকান্ড ঘটেছিল ,যাদের সবার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়না। যতদুর জানা যায়, ১৬১৯ সালে **তুলুজে লুচিলিও ভানিনি** নাস্তিক হিসেবে দোষী সাব্যস্ত হন; তার জিঁহবা ছুড়ে ফেলা হয় এবং তাকে পুড়িয়ে মারা হয় । প্রথম এলিজাবেথ ও জেমস (রাজ ১৬০৩-১৬২৫) এর শাসনকালে ইংল্যান্ড রোমান ইনকুইজিশনের চেয়ে পিছিয়ে ছিল না কিন্তু যাদের বলি দেয়া হয়েছিল তারা অখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন বলে ঐ দেশের ধর্মীয় উন্মাদনার কথা ভুলে যাওয়া হয়েছে। অবশ্য **কবি মার্লো (**১৫৬৪-১৫৯৩) যদি শূড়িখানায় নোংরা কলহে নিহত না হতেন তবে ইংল্যান্ড তাকে পুড়িয়ে মেরে ইতালির মত গৌরব (!) লাভ করতে পারত, কারণ মার্লোর খ্যাতি ব্রুনোর চেয়ে কম ছিল না । উল্লেখ্য , তিনি নাস্তিকতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু বিচার চলাকালেই তিনি নিহত হন । নাট্যকার টমাস কিড (১৫৫৮-১৫৯৪) কেও নিদারুন শাস্তি দেয়া হয়েছিল। **স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে** (১৫৫৪-১৬১৮) এর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল কিন্তু তিনি দোষী সাব্যস্ত হননি বলে রেহাই

পান । অন্যরা এত সৌভাগ্যবান ছিলেন না । এলিজাবেথের রাজত্বকালে নরউইচে **ফ্রান্সিস কেট** (যিনি কেমব্রিজে করপাস ক্রিস্টির ফেলো) সহ তিন/চার জনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

প্রথম জেমস এর আদেশে **বার্থোলোমিউ লিগেট** (১৫৭৫-১৬১১) কে কিছুদিন কারারুদ্ধ রেখে তারপর স্মিথফিলদে পুড়িয়ে মারা হয় । মাত্র এক মাস পরে **ওয়াইটম্যানকে** কভেন্ট্রির বিশপ লিচফিলডে পুড়িয়ে মারা হয়। **স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে** কে পুনরায় গ্রেফতার করে শিরোচ্ছেদের মাধ্যমে হত্যা করা হয় ১৬১৮ সালের ২৯ শে অক্টোবর । রায়েলের মৃত্যুর পর, তারা মাথাকে মমি করে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। কিছু কিছু সুত্র থেকে জানা যায়, শিরচ্ছেদ করার পূর্বে তাকে শেষবারের মতো ধূমপান করতে দেয়া হয়েছিলো.....মৃত্যুর আগে বন্দীকে শেষবারের মতো ধূমপান করতে দেয়ার রেওয়াজনুসারে তাকেও ধূমপান করতে দেয়া হয়েছিল।

মুক্তির মন্দির সোপান তলে, কতপ্রাণ হল বলিদান

লেখা আছে অশ্রু জলে ... ।

Ref: - J B Buri, A History of Freedom of Thought, 1914.
- Biography of Sir Walter Raleigh at Britannia.com
-Sir Walter Ralegh at the Fort Raleigh website

কৃতজ্ঞতা : তানবীরা তালুকদার ও মাহবুব লীলেন

মৌলবাদ : উৎস সন্ধান, ইতিবৃত্ত এবং সমকালীন প্রেক্ষিত

-রবিউল ইসলাম

ভূমিকাঃ রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন, যে মতবাদ একদিন মানব সমাজকে মুক্তি দেয় বিপ্লবের মাধ্যমে, সেই মতবাদই কালের বিবর্তনে এক সময় মানুষের পায়ে বেড়ী পরিয়ে দেয় । সভ্যতার পথে তাকে এগোতে দেয় না । এক পা যখন সামনের দিকে যায়, অন্য পা তখন পেছন দিকে টেনে ধরে । ইতিহাসের পরতে পরতে আমরা রবীন্দ্রনাথের এই অমর শিক্ষামূলক বাণীর সাক্ষ্য খুঁজে পাই । ইসলাম আরবের মানুষকে মুক্তি দিয়েছিল দাসত্ব, জাহেলিয়াত তথা অজ্ঞানতা, মাৎসান্যায়, বংশানুক্রমিক হত্যাকান্ড এবং গোষ্ঠীপতিদের শোষন ও অত্যাচার থেকে । আরব বিজয়ে দক্ষিণ ভারতে এবং তুর্কীবিজয়ে উত্তর ভারতে একইভাবে না হলেও, বিভিন্ন ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল । প্রখ্যাত ভারতীয় ইতিহাসবিদ সুরজিত দাশগুপ্ত (জন্ম ১৯৩৪ সাল) তাঁর 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' গ্রন্থে লিখেছেন,

> "একথা স্পষ্ট করে বলা দরকার যে ইসলাম আগমনের পরিণামে (ভারতবর্ষে) ভক্তি আন্দোলনের জন্ম না হলেও ইসলাম অবশ্যই ভক্তি আন্দোলনকে উল্লেখযোগ্য উৎসাহ ও প্রচুর প্রেরণা দিয়েছিল ।.....দক্ষিণ ভারত তথা দাক্ষিণাত্যে ভক্তি আন্দোলন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃত শাসনের দুর্গে আঘাত হেনেছিল; সেই দুর্গে উত্তর ভারতে বা আর্যাবর্তে প্রবলতর আঘাত*[১] করেছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা" ।(**[১]) ইসলাম আগমনের(বিশেষ করে সুফী মতবাদের) অভিঘাতে বিচলিত উত্তর ভারতের বাইরে দ্রাবিড় দেশে ভক্তি আন্দোলনের জন্ম নিল, উত্তর ভারতে নিয়ে এলেন রামানন্দ, আর সপ্তদ্বীপ নবখন্ড পৃথিবীতে ভক্তি প্রচার করলেন তাঁর শিষ্য কবীর । কবীরের আহ্বানে সাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানহীন সাধারণ মানুষের জীবনে এই সাধনা অচিরেই এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি লাভ করে । উত্তর ভারতের মুদি, মুচি, মালি, সুতার, কুমার, নাপিত ও মেথর বৃত্তির লোকেরা, যারা ইসলামের সামাজিক সাম্যের প্রভাবে বিদ্রোহের সূচনা করে নিম্নবর্ণের ভক্তিবাদী সন্ত হয়েছিল, দেখল যে সাধারণ তুর্কীর মধ্যে ত' বটেই, দিল্লীর শাহীমহলেও, বাজারের ক্রীত দাস স্বীয় গুণে হচ্ছে প্রভূর জামাতা, সেনাপতি, অমাত্য এবং সুলতান । ব্যক্তি জীবনে আত্মোন্নয়নের এই সম্ভাবনা তাকালীন নিম্নবর্ণের ও বর্গের মানুষের মনোজগতে এক নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটালো । জন্মসূত্রে সর্বপ্রকার অধিকারবঞ্চিত এই দলিতদের আর্থিক ও সামাজিক জীবনে মনুষ্যত্বের ও আত্মমর্যাদা লাভের আকাঙ্খা তাদেরকে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও সমাজদ্রোহী করেছিল । সুতরাং এটা বলা যায় যে আরব বিজয়ে দক্ষিণ ভারতে এবং তুর্কীবিজয়ের প্রেক্ষাপটে উত্তর ভারতে ইসলামী সামাজিক সাম্যের প্রভাবে নবযুগের উন্মেষ সূচিত হয় । তাপর্যের দিক থেকে একে য়ুরোপীয় ইতিহাসের রেনেসাঁযুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় । চৈতন্যদেবের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন প্রসঙ্গে ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্ লিখেছেন, "চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব আন্দোলন যে হিন্দুর সমাজ সংরক্ষণেরই ইসলাম প্রতিরোধক পরোক্ষ আন্দোলন, এ সিদ্ধান্ত নিয়ে আজ আর তর্ক নেই । কেবল বৌদ্ধ ও অনুরুপ শ্রেণিকেই নয়, ধর্মান্তরিত হিন্দুকেও সমাজে পূর্ণগ্রহণের সার্থক উপায় হিসাবেই যে প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল, তাঁর প্রত্যাশিত ফলও পাওয়া গিয়েছিল,..... .....ষোল শতক থেকেই বাঙলায় ইসলামের অব্যাহত প্রসার রুদ্ধ হয়ে গেছে,....." । **[২]

একই বক্তব্যের প্রতিফলন পাওয়া যায় কিছুটা ভিন্ন ভাষায় সুরজিত দাশগুপ্তের 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' গ্রন্থে। সুতরাং নির্মোহ দৃষ্টিতে একথা বলা যায় যে, ইসলাম ধর্মের প্রভাব একদিন ভারতবর্ষে মানবাত্মার মুক্তি ও সভ্যতার পথে যাত্রায় অবদান রেখেছিল, ধর্ম-সংস্কারক বা মানবতাবাদীদের জন্য মুক্তি-অন্বেষার ক্ষেত্রে যুগোপযোগী চিন্তার রসদ জুগিয়েছিল, মানুষকে পথ দেখিয়েছিল । হোসেন শাহের আমলকে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের রেনেঁসা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় । সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্মে, সংগীতে

বাঙলার নিজস্ব সংস্কৃতি, এযাবতকাল পর্যন্ত আধিপত্যকারী আর্য -সংস্কৃতিকে ম্লান করে দিয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হল । ইতিহাসবিদ দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎ বঙ্গ'-এ লিখেছিলেন-

> ”বাঙ্গালা দেশে পাঠান প্রাবল্যের যুগ এক বিষয়ে বাঙ্গালার ইতিহাসে সর্বপ্রধান যুগ । আশ্চর্যের বিষয় হিন্দু স্বাধীনতার সময়ে বঙ্গদেশের সভ্যতার যে শ্রী ফুটিয়াছিল, এই পরাধীন যুগে সেই শ্রী শতগুনে বাড়িয়া গিয়াছিল ।..... এই পাঠান যুগে সর্ব প্রথম হিন্দু সমাজে নূতন বিক্ষোভ দৃষ্ট হইল । ....ব্রাহ্মণেরা বাধ্য হইয়া শাস্ত্রগ্রন্থ বাঙলায় প্রচার করিলেন(শাসক শ্রেণীর ভাষা হিসেবে সংস্কৃতের আধিপত্য আর মেনে নেওয়া হলোনা)।.... একদিকে মুসলমান ধর্মের প্রভাব, অপর দিকে বাঙলা ভাষায় ধর্মপ্রচার-এই দুই কারণে বঙ্গীয় জনসাধারণের মন নবভাবে জাগ্রত হইল । শাসন ও রুচি হইতে মুক্ত হইয়া চিন্তাজগতে হিন্দুরা গণতান্ত্রিক হইয়া পড়িল ।... এই পাঠান-প্রাধান্য যুগে চিন্তাজগতে সর্বত্র অভূতপূর্ব স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হইল, এই স্বাধীনতার ফলে বাঙলার প্রতিভার যেরুপ অদ্ভূত বিকাশ পাইয়াছিল, এদেশের ইতিহাসে অন্য কোনও সময়ে তদ্রুপ বিকাশ সচরাচর দেখা যায় নাই ।”

যে ইসলামের প্রভাবে বাঙলায় একদিন ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন, ভক্তি আন্দোলন ও সর্বশেষে রেনেসাঁ সূচিত হয়েছিল, সেই ধর্মই আজ পশ্চাদ্‌পদতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে, অগ্রগতির পথে অচলায়তনের মতো প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা শুধু দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত চিরন্তন বাণীকেই প্রতিভাত ও প্রাসঙ্গিক করে তুলছে ।

আজ ধর্মগুলি সারা বিশ্বে মানব সভ্যতার যাত্রাপথে এক বিশাল বোঝা হয়ে পড়েছে বলে মনে হয় । ধর্মতাত্ত্বিকরা যত তাত্ত্বিক ও পুথিগত ব্যাখ্যাই দেন না কেন, বাস্তব অবস্থাটি হচ্ছে, ধর্মকে আশ্রয় করেই আজ এক প্রায় এক শতাব্দী ধরে মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় উগ্রবাদের দৈত্য বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের ও মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশের সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে । দার্শনিক নীৎসে (১৮৪৪-১৯০০)*[২] এই বলে চার্চকে আক্রমণ করতেন,

> 'জীবন প্রবাহ ও জীবনচেতনা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী কিন্তু চার্চ মানুষের জীবনকে ডিমের খোলসে আবদ্ধ করে রাখে । মানুষের ভিতরের অনন্ত সম্ভাবনা ও প্রচন্ড শক্তিকে চার্চ ও ধর্ম রুদ্ধ করে রাখে ।'

ধর্ম সম্বন্ধে নীৎসের এই মূল্যায়ন স্থান ও কালের বিচারে চূড়ান্ত নয়-ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যে নয়, তা আমরা উপরে দেখিয়েছি । যে সময় বা দেশের (বা মহাদেশের) প্রেক্ষাপটে তিনি এ কথা লিখেছিলেন, সেই কালপর্বে বা তাঁর পূর্ববর্তী সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও সংস্কৃতির প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তিনি সম্ভবত মুক্তচিন্তা ও সৃজনশীলতার প্রসার তথা আধুনিকতার পথে মুখ্য প্রতিবন্ধকরুপে ধর্মের প্রতিক্রিয়াশীল ও অশুভ ভূমিকাকে বিবেচনা করেছেন । এখানে উল্লেখ করা খুব প্রাসঙ্গিক যে, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে(অর্থা তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর পূর্বে) অনুষ্ঠিত নায়াগ্রা কনফারেন্স ধর্মীয় শুদ্ধতা বা রক্ষণশীলতার নামে ইতিহাস ও বিজ্ঞান চর্চার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে । তাই এটা বোধগম্য যে সমকালীন ধর্মীয় কূপমন্ডুকতা প্রত্যক্ষ করে তিনি উপরোক্ত উক্তিগুলি করে থাকতে পারেন । সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ তাঁর চিন্তাধারাকে সম্ভবত অনেকটাই প্রভাবিত করেছিল, যা হয়তো অনেকের বিচারে দেশ-কালের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি । রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, কাব্য ও দর্শনের চিরকালীন ও সার্বজনীন আবেদনের জন্যই তাঁকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে ফ্রেড্রীখ নীৎসের উপরে উদ্ধৃত উক্তিটি সমসাময়িক বিশ্ব ও বাংলাদেশের চলমান সময়ের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও বাস্তব । সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে মৌলবাদের একটি অনুসঙ্গ মাত্র। তবে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ এক নয়। আমরা যথাসময়ে এ দুয়ের মধ্যে চরিত্রগত ও ধারণাগত (conceptual) পার্থক্যগুলি বিশ্লেষণ করব । কিন্তু, কেন মৌলবাদ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিদের কাছে, প্রগতিশীল চিন্তার সচেতন মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগ-ইস্যুতে পরিণত হলো ? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে নিহিত রয়েছে আজকের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনার গুরুত্ব । তবে তার কিছুটা আভাস পাঠক ইতিমধ্যেই পেয়েছেন নিশ্চয়ই । স্বাধীনতার পর জিয়ার ক্ষমতারোহনের পর ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার হীনস্বার্থ মাথায় নিয়ে, সৌদি রাজপরিবারের সমর্থনের আশায় এবং অভ্যন্তরীনভাবে সামরিক এষ্টাব্লিশ্‌মেন্টের রাজনীতিতে স্থায়ীভাবে(কখনো প্রকাশ্যে, কখনো নেপথ্যে) প্রভাব বিস্তারের স্বার্থে, এবং 'I will make politics difficult for the politician'-এই চাণক্য-ডকট্রিনের বাস্তবায়নের উদ্দ্যেশ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে স্বাধীনতাবিরোধী জামাতকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুনর্বাসন করা শুরু করেন । সেই থেকে শুরু করে, এবং বিএনপির '৯১-'৯৬ সাল ও ২০০১-২০০৬ সালের শাসনপর্বে যথাক্রমে নেপথ্যে ও প্রকাশ্যে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে জামাআত ও তার অঙ্গ-সংগঠনগুলো তাদের সক্রিয় ক্যাডারদের দেশের সামরিক বাহিনী, আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন, বিচার বিভাগ, পিএসসি থেকে শুরু করে প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে নজীরবিহীন দলীয়করণের মাধ্যমে দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত করে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে এগোতে থাকে । এর মধ্যে জামায়াত-শিবিরের একটি অংশ, কৌশলগত কারণে 'জাগ্রত মুসলিম জনতা', 'বাংলা ভাই' ইত্যাদি বিভিন্ন নাম নিয়ে , (যেমন করে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভক্তদের কাছে বুদ্ধ বুড়ো শিবরুপে পূজিত হয়েছিলেন) বাংলাদেশের দুর্গম অঞ্চলগুলিতে সামরিক প্রশিক্ষন ও নানা জঙ্গী তৎপরতা শুরু করে ।

১) বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি আফগানিস্তানের মতো একটি ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হবে কিনা, এটিকে একটি মধ্যযুগীয় ধর্মরাষ্ট্রে পরিণত করা হবে কিনা সে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে প্রগতিশীল মহলের মধ্যে ।

২) মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার মানুষদের জন্য, বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল চিন্তার মানুষদের জন্য অদূর ভবিষ্যতের বাংলাদেশ আদৌ নিরাপদ থাকবে কিনা ?

৩) যে প্রত্যাশা, লক্ষ্য, স্বপ্ন, আদর্শ ও চেতনা নিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনা আজ ভুলুণ্ঠিত । ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, মৌলিক অধিকার, নারী-পুরুষ সমতা, বুদ্ধির মুক্তি এবং বিবেকের স্বাধীনতা ইত্যাদি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত চেতনাগুলি জাতীয় জীবনে ও সংবিধানে পুনপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা কি বাংলাদেশে আরেকটি নবজাগরণ ও সংস্কারমুক্তির লক্ষ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন (Enlightenment) সূচিত করতে পারব কিনা, একটি জ্ঞানভিত্তিক বৈষম্যহীন শোষনহীন আধুনিক সমাজ নির্মাণের দিকে এগিয়ে যেতে পারব কিনা, নাকি অদৃষ্ট ও ঐশীনির্ভর, আধা-রাজতান্ত্রিক এবং সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় একটি পুরোপুরি কূপমন্ডূক, বদ্ধ ও বন্ধ্যা সমাজের(এই বন্ধ্যাত্ব ইতিমধ্যেই সমাজ জীবনে পরিলক্ষিত) দিকে ধাবিত হবো, প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকতর তথা ভিক্ষুক-অর্থনীতির দেশে পরিণত হবো ?

৪) বিশ্বমানচিত্রে বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান পরাশক্তিগুলির জন্য সামরিক দিক থেকে কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । চট্টগ্রাম বন্দর, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ এবং বাংলাদেশের তেল-গ্যাসের সম্ভাব্য(Anticipated) নিত্য-নতুন আবিষ্কার ও ক্রম-উ□পাদন বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বৃহৎ শক্তিগুলোর যে

লোলুপ দৃষ্টি বহুদিন যাবৎ এ দেশটির উপর রয়েছে, তা দেশটির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বর জন্য হুমকিস্বরুপ ।

এখন, আজকের ইরাক-যুদ্ধ থেকে বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র জাতিরাষ্ট্রগুলো কি শিক্ষা নিতে পার ? ইরাকে যে এখনো মার্কিনীরা অবস্থান করতে পারছে, ওখানকার সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য তথা এনার্জি সেক্টর(বিদ্যুত, তেল গ্যাস আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) টেলিফোন, ব্যাংকিং ইত্যাদি যেসব সেক্টরগুলি জনগনের মালিকানায় ছিল, সেগুলি এখন বিশ্বায়ন ও প্রাইভেটাইজেশনের নামে মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে, তার কারণ শুধু এই নয় যে ওখানকার শাসক এলিট ও দেশপ্রেমহীন বুর্জোয়াদের একটি অংশ এবং সামরিক-বেসামরিক এষ্টাব্লিশ্‌মেন্ট নিজেদের অবস্থানগত ও শ্রেণিগত স্বার্থে মার্কিনীদেরকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে । কারণটি হলো আরো গভীরে,সেটি তাদের দীর্ঘ ঐতিহাসিক সমস্যা-ঐতিহাসিক ও অংশত অদূরদর্শী সাদ্দামের দীর্ঘ দিনের শিয়াবিরোধী সাম্প্রদায়িক দমন-পীড়ন নীতির কারণে ইরাকে সত্যিকারের কোন জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠতে পারেনি । শিয়াদের প্রতি সাদ্দাম আমলে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় । শিয়া-সুন্নী বিভেদ ছাড়াও গোত্রে-গোত্রে বিভেদ, স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বা হিসেবে কুর্দীদের স্বাধীনতা দাবী ইত্যাদি সমস্যা ইরাকের সমাজে দীর্ঘদিন থেকেই চলে আসছে । দীর্ঘ দিনের এই গোত্র-বিভক্তি (sectarianism), সাম্প্রদায়িক বিভক্তি এবং কুর্দী, এজীদী প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি তথা ভিন্ন জাতিপরিচয়কে যথাযথভাবে মর্যাদা ও মূল্যায়ন না করার কারণে ইরাক কখনই একটি জাতিরাষ্ট্র (Nation state) হিসেবে বিকশিত হতে পারেনি । কুর্দীদের ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিচয়কে মেনে নিয়ে, অসাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয়াতাবাদ বিকাশ লাভ করতে পারেনি কোন দূরদর্শী ক্যারিশমেটিক নেতার অভাবে । তো এমনি একটি পটভূমিতে, যখন ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন সংগঠিত হলো দেশটির তেলসম্পদ গ্রাস করার জন্য(যার মূল লক্ষ্য ছিল বিশ্বব্যাপি এনার্জি তথা জ্বালানী সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে য়ুরোপ , রাশিয়া ও চীনের উপর খবরদারি ও আধিপত্য বিস্তার; তাছাড়া তেলের নিশ্চিত সরবরাহের সাথে একটি শিল্পসমৃদ্ধ অর্থনীতির বহু সূচক নির্ভর করে, যা ভিন্ন আলোচনার বিষয়), তখন ইরাকে সত্যিকারের ঐক্যবদ্ধ কোন প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠেনি । এর আরেকটি কারণ, একদিকে, সাদ্দাম আমলে বৈষম্যের শিকার শিয়াদের একটা বড় অংশ, বিশেষ করে এলিট অংশটি মার্কিনীদেরকে ক্ষমতা ও তথাকথিত গনতন্ত্রের লোভে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে । প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মধ্যে বহু দলাদলি ও বিভক্তি কাজ করছে, যার অন্যতম কারণ হলো 'আয়াতুল্লা প্রথা'*[৩]। আবার যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বহিরাগত হিসেবে 'গোদের উপর বিষফোঁড়ার' মত মৌলবাদী সংগঠন 'আলকায়েদার' মার্কিনীদের শায়েস্তা করার মোক্ষম সুযোগ হিসেবে ইরাকের মাটিকে বেছে নেয়া, যারা শিয়াদের উপর মার্কিন-প্রীতির প্রতিশোধ নিতে গিয়ে যে বর্বর হত্যাকান্ড ঘটাচ্ছে তা জাতির বিভক্তি আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে।

ইরাকের উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে আমরা কি শিক্ষা নিতে পারি ?

১. ব্যক্তির খেয়াল-খুশী, উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থকরণে ও ক্ষমতা নিরঙ্কুষ করার স্বার্থে যে স্বৈরাচারী ও বৈষম্যমূলক শাসন চালানো হয় দীর্ঘদিন ধরে, তা ঐ শাসক সম্প্রদায় বা রেজিম যতদিন ক্ষমতায় থাকে ততদিনই ঐ অগণতান্ত্রিক সিস্টেমটি কাজ করে, এরপর যখন ঐ রেজিমের পতন ঘটে, তখন ঐ সিস্টেমের ক্ষতিকর দিকগুলি বেরিয়ে পড়ে ।

২. সাদ্দান শাসনামলে ইরাক রাষ্ট্রটির(খেয়াল করুন, জাতি নয়) অভ্যন্তরে যে বিভিন্ন অসামঞ্জস্য, বৈষম্য, বিভক্তি, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি রোগগুলি ভেতরে ভেতরে বিরাজমান ছিল, তা কিন্তু সাদ্দামের বাথ পার্টির দোর্দন্ড-প্রতাপ স্বৈরশাসনের মধ্যে মানুষের কোন বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্র ও তথ্যের স্বাধীনতা প্রভৃতির অভাবের কারণে চাপা পড়ে গিয়েছিল । কিন্তু, তার মানে এই নয় যে সমস্যাগুলি ছিলনা, তবে সেগুলি প্রকাশ হওয়ার সুযোগ ও পরিবেশ পায়নি ।

এখন মার্কিনীরা আসার পর,(যেমন সেন রাজবংশের পতন-পর্বে মুসলিম শক্তির আবির্ভাবে-[যাদের উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য-জয় বা অর্থসম্পদলুণ্ঠন] ত□কালীন হিন্দু সমাজের এক উল্লেখযোগ্য অংশই মুক্তির স্বাদ পেয়ে আনন্দিত হয়েছিল) পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, বহুবছর ধরে অবদমিত থেকে হঠা□ করে মুক্তির স্বাদ পেলে যা হয়(বিষ না অমৃত তা' বিচারের ক্ষমতা আর থাকেনা), পেন্ডোরার বাক্স*[৪] খুলে গেল । প্রথম-প্রথম গণতন্ত্র মনে করে যেভাবে আহ্লাদিত হয়েছিল নির্বোধের মত, ধাক্কা খেয়ে এখন ধীরে ধীরে ভুল ভেঙ্গেছে ।

এতক্ষণ ধরে ইরাক নিয়ে যে দীর্ঘ আলোচনা করা হলো, তার উদ্দেশ্যটা আশা করি পাঠক হৃদয়নঙ্গম করেছেন । আমি চার নম্বর পয়েন্টের বক্তব্যের শুরুতে (উপরে দেখুন) ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশের কৌশলগত বিপজ্জনক অবস্থান এবং তেল-গ্যাস-বন্দর-সেন্ট মার্টিন দ্বীপ প্রভৃতির বিপজ্জনক দিকগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম । এমতাবস্থায়, বাংলাদেশে ইসলামীক সন্ত্রাসী, জঙ্গী ও মৌলবাদী উত্থাণের সুবাদে,(যার পৃষ্ঠপোষকতা যুক্তরাষ্ট্র দিয়ে চলেছে) যদি এখানে পশ্চিমা শক্তিগুলির হস্তক্ষেপের অজুহাত সৃষ্টি হয়, শিক্ষিত শ্রেণীর একটি অংশ এবং সেনাবাহীনীর হাতে নির্যাতিত উপজাতিগোষ্ঠীগুলো ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদেরকে সহযোগিতা না করলেও '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মত কোন প্রতিরোধযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে বলে মনে হয়না । গ্রামে-গঞ্জের অগণিত হতাশ মুক্তিযোদ্ধা, যারা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি, দারিদ্রের মধ্যে বাস করছে এবং বহুস্থানেই স্থানীয় রাজাকারদের কাছে ব্যক্তিগত বা সরকারী বাড়ী বা সম্পত্তি হারিয়েছে, অত্যাচারিত হয়েছে বিএনপি-জামাআত সরকারের সময়, তাদের সন্তানরা হিসেব করবে নিশ্চয়ই যে '৭১-এর যুদ্ধে গিয়ে তাদের বাবারা কি পেয়েছিল । তারা দেশটিকে সেনাবাহীনীর দেশ, গ্রাম্য চেয়ারম্যান-টিএনও-ডিসি-এসপি-আমলা-এলিট-মু□সুদ্দি ব্যবসায়ী বা বুর্জোয়া-(সেনাবাহিনীর আশীর্বাদপ্রাপ্ত ও ভাগীদার)সিন্ডিকেট চক্র প্রভৃতি নব্য মৌলিক গণতন্ত্রের(আইয়ুব খানেরটা ছিল পুরনো মডেল) হালুয়াভোগীদের দেশ বলেই ভাববে-নিজেদের দেশ বলে ভাববেনা । মোদ্দা কথা, দেশটির মানুষ কার্যত দুই ভাগ-চতুর্ভাগ হয়ে যাবে । অবশ্য বাংলাদেশে এখনই প্রকৃত প্রস্তাবে দুটো জাতি বাস করছে অন্তর্গত মননের দিক থেকে এবং জাতিসত্ত্বার প্রশ্নে । এক পক্ষ হলো যারা নিজেদের বাঙালী বলেই মনে করে-যারা অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তায় বিশ্বাসী । অন্য পক্ষ মুসলিম জাতীয়তা ও পাকিস্তানী সংস্কৃতি এবং পাকিস্তানী জাতীয়তায় বিশ্বাস করে, যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে 'পাকিস্তান ভাঙা' বলে মনে করে এবং তারা মনে মনে নিজেদেরকে পাকিস্তানী বলে গর্ববোধ করে । বিদেশী শক্তি অনুপ্রবেশের সাথে সাথে এ দুটো জাতির মধ্যে হানাহানি শুরু হতে পারে এবং বাংলাদেশ নামক ভুখন্ডটিকে পুনদ্বিখন্ডিতকরণের প্রস্তাব বা প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে ।

আমাদের জাতিপরিচয় বা আত্নপরিচয়ের যে সংকট, তার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে এই মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা । মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা এমন দুটি বিষাক্ত রোগ যার চিকি□সার পূর্বে

রোগ দুটিকে ভাল করে জানতে হবে । আর মৌলবাদ যদি অন্তর্নিহিত দূরারোগ্য রোগের সিম্প্টম হয়ে থাকে, তবে আমাদের প্রথম কাজ হবে রোগটিকে আগে জানা । রোগটিকে না জানলে রোগের ডায়াগনসিস আমরা করতে পারব না ।

১. সংজ্ঞা নিরুপণ-মৌলবাদের অন্যতম উৎপত্তিস্থান ও চারণভূমি মার্কিন যুক্তিরাষ্ট্রের ধর্ম ও মৌলবাদ বিষয়ক পন্ডিত এবং ইসলাম-বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ব্রুস লরেন্স*[৫] মৌলবাদকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন-

> 'Fundamentalism is a multifocal phenomenon precisely because the modernist hegemony, though originating in some parts of the west, was not limited to Protestant Christianity'(emphasis added)**[৩].

অর্থা, মৌলবাদ হচ্ছে একটি বহুকেন্দ্রিক প্রপঞ্চ যা আধুনিকতাবাদের প্রভাব বা আধিপত্যের প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত হয় । এটি পাশ্চাত্যের কোন কোন অংশে উদ্ভব ঘটলেও প্রটেষ্টান্ট খ্রীষ্টান্টদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না ।

অন্যত্র তিনি বলছেন,

> ”Fundamentalism is an ideology and vision of the world that can not be labeled and identified.”

কারণ পরিচয় বা 'identity'*[৬] (sameness, identical or একরুপতা, অভিন্নতা)-র প্রশ্ন উঠলে “সংজ্ঞার প্রশ্ন আসে বা খোঁজ করতে হয়” । তিনি বিশ্বাস করেন যে “ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্ম-পরিচয় পরস্পর বিরোধী ।”এই ডিউক য়ুনিভার্সিটি প্রফেসরের মতে, মৌলবাদ 'বিমূর্ত ধারণা বা বিশেষায়িত ধারণাভিত্তিক এবং আঞ্চলিক সীমানার পত্তন ঘটায় ।” 'Identity'-র সাপেক্ষে মৌলবাদের এই সংজ্ঞায়ন এই লেখক ত্রুটিমুক্ত বলে মনে করে না-এটা নিছক তাত্ত্বিক বিশ্লেষন । সম্ভবত, তাঁর প্রফেসরসুল্ভ উদারতা(যা পশ্চিমী সভ্যতা ও রেনেসাঁজাত liberalism-এর নামান্তর) ও বৈচিত্রপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে তিনি এভাবে দেখেছেন । তবে এই সিদ্ধান্তের ত্রুটিপূর্ণ দিক সময়মতো দেখানো হবে ।

মৌলবাদ সম্পর্কে প্রফেসর লরেন্সের আরো সংজ্ঞায়ন হচ্ছেঃ”the affirmation of religious authority as holistic and absolute, admitting of neither criticism nor reduction; it is expressed through the collective demand that specific creedal and ethical dictates derived from scripture be publicly recognized and legally enforced ।”(**[৪])

অর্থাৎ, মৌলবাদ হলো “ধর্মীয় কর্তৃত্ব(ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে) বা অধিকার যাতে ধর্মকে মোক্ষ এবং ব্যাখ্যাতীত বলে দাবী করা হয় । যা কোন সমালোচনা বা লঘুকরনকে স্বীকার করেনা । যৌথ বা সামষ্টিক দাবীর মাধ্যমে এটা প্রকাশ করা হয় যে, ধর্মশাস্ত্র থেকে পাওয়া সুনির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস ও নীতিশাস্ত্রীয় বিধিনিষেধগুলিকে গণস্বীকৃতি প্রদান করা হোক এবং আইনগত বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে প্রয়োগ করা হোক।” লরেন্স যুক্তি দিচ্ছেন যে, উক্ত মতবাদ দার্শনিক যুক্তিবাদিতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদকে প্রত্যাখ্যান করে যা আধুনিকতার সহগামী, কিন্তু প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করে, যা আবার আধুনিক যুগেরই বৈশিষ্ট্য । সবচেয়ে সঙ্গতিপূর্ণভাবে মৌলবাদকে আখ্যায়িত করা যায় সংস্কারমুক্ত মূল্যবোধের বিরোধিতা দিয়ে । তিনি বিশ্বাস করেন যে, মৌলবাদ হচ্ছে একটি বিশ্বময় প্রপঞ্চ এবং একে সুনির্দিষ্টভাবে

ব্যাখ্যা বা বোঝার পূর্বে অবশ্যই এর পূর্বসূত্র বা পরিপ্রেক্ষিতগুলির তুলনামূলক বিচার করতে হবে ।

অষ্ট্রেলীয় দার্শনিক ল্যুডভিগ উইট্জেন্ষ্টাইন (Ludwig Josef Johann Wittgenstein;1889-1951) বিশ্বব্যাপী মৌলবাদী প্রবণতার যোগসূত্র বোঝাতে গিয়ে পারিবারিক সাদৃশ্যতার (Family Resemblance)*[৭] -এর তত্ত্বটি প্রথম উদ্ভাবন করেন । তাঁর এই সাদৃশ্যতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উইট্জেন কতগুলি খেলার উদাহরণকে বেছে নেন-যেমন, বোর্ড খেলা, বল খেলা, অলিম্পিক গেম্স্ এবং ইত্যাদি। এতে সবগুলি খেলার যে আবশ্যিকভাবে একটি একক সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকবে এমন কোন কথা নেই(টীকা দেখুন; *৭) । লরেন্স মৌলবাদের পাঁচটি সাধারণ "পারিবারিক সাদৃশ্যতাকে" তালিকাভুক্ত করেছেন-

১) মৌলবাদ সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থক । তারা নিজেদেরকে সমাজের ন্যায়পরায়ণ অবশেষরুপে দেখে । এমনকি তারা যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ তখনও নিজেদের সংখ্যালঘিষ্টরুপে উপলব্ধি করে।

২) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বা সেক্যুলারপন্থী ও পথভ্রষ্ট ধর্মানুসারীদের বিরুদ্ধ-মনোভাবাপন্ন এবং যুদ্ধংদেহী-ভাবাপন্ন ।

৩) তারা সমাজের দ্বিতীয় পর্যায়ের এলিট শ্রেণীর(পেটিবুর্জোয়া) পুরুষ যারা নিয়তই ক্যারিশমেটিক পুরুষদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় । ৪) মৌলবাদীরা তাদের নিজস্ব পরিভাষার জন্য শব্দাবলীর উদ্ভব ঘটায় । ৪) মৌলবাদের ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে তবে কোন আদর্শিক অগ্রদূত নেই ।

উপরোক্ত সংজ্ঞায়নও ত্রুটিমুক্ত নয় এই জন্য যে, এতে (আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ ও অতিপরিচিত) মৌলবাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য বাদ পড়ে গেছে । তা হলো, এটি আধুনিকতা ও প্রগতিবিমুখ এবং অচলায়তনপন্থী তথা গতিশীলতার বিরোধী ও প্রতিবন্ধক ।

প্রফেসর রিচার্ড টি. এন্টন মৌলবাদকে সংজ্ঞায়িত করেছেন -এভাবে- "Fundamentalism is only one response to the 'cultural disqualification of all traditions bearing a unified code of meaning in a world committed to rapid change and pluralization. ... fundamentalism is a transnational religious phenomenon that has entered many domains of culture and social organization with startling consequences for the individual, the intimate social group and the nation-state".(**[৫])অর্থা "মৌলবাদ শুধু প্রথাগত ঐতিহ্যগুলির সাংস্কৃতিক ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি একটি প্রতিক্রিয়া । যেগুলি(যে ঐতিহ্য বা মূল্যবোধগুলি) দ্রুতগতির পরিবর্তন ও বহু সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ধর্মীয় আদর্শের অন্তর্ভুক্তিকরণ, সহাবস্থান ও পারস্পরিক বিনিময় প্রক্রিয়ার (বহুত্বকরণ-Pluralization)*[৮] প্রতি সমর্পিত একটি বিশ্বে তা পর্যবাহী সূত্রবদ্ধ আইন বা বিধিমালাকে ধারণ করে ।মৌলবাদ হলো কোন দেশের একটি গোষ্ঠীর বা বিশেষ জনসমষ্টির ধর্মীয় স্বপ্নবিলাস বা উচ্চাকাঙ্খামূলক প্রবণতা বা প্রপঞ্চ যা সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতির বহু ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করেছে । যার পরিণতি ব্যক্তিমানুষ, ঘনিষ্ট সামাজিক বর্গ এবং জাতিরাষ্ট্রের জন্য হয়েছে অভাবনীয়" ।

অধ্যাপক আহ্মদ শরীফ মৌলবাদের সংজ্ঞা প্রসংগে বলছেন-"মৌলবাদ ইংরেজী Fundamentalism-এর বঙ্গানুবাদ । আর 'Foundation' থেকে এর উপত্তি ধরলে এ প্রতিশব্দ হবে

'ভৈত্তিকতা' । প্রটেষ্টান্ট ধর্মের পরিশীলিত যৌক্তিক সংস্কৃত রুপান্তরকেই ১৮৯৫ সনের নায়েগ্রা সম্মেলনে 'Fundamentalism' নাম দেওয়া হয়েছিল । তখন থেকেই শব্দটা প্রতিচ্য দেশে চালু হয়েছে । এর স্থিতি হচ্ছে খ্রীষ্টীয় কেরামতিতে অবিচল পাঁচটি আস্থা-প্রশ্নহীন বিশ্বাস । মার্কিন স্বার্থে সেই মৌলবাদ এখন তৃতীয় বিশ্বের এক মহা শাস্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যা সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । মৌলবাদী বদ্ধচিত্তের এবং পরমত অসহিষ্ণু না হয়েই পারে না । কেননা সে নিজের শাস্ত্র ব্যতীত আর সব শাস্ত্রকেই ভুল-ত্রুটিবহুল মিথ্যে বলে জানে, মিথ্যের সঙ্গে আপোসে সহিষ্ণুতায় সহাবস্থান অবশ্যই পাপ"**[৬] । অন্য একটি প্রবন্ধে**[৭] তিনি বলছেন-

> "Orthodoxy ও Fundamentalism প্রায় অভিন্ন । ..... ফান্ডামেন্টালিস্ট বা মৌলবাদীদের সঙ্গে গোঁড়া রক্ষণশীল শাস্ত্রনিষ্ঠ অর্থোডক্সদের পার্থক্য হচ্ছে মৌলবাদীরা ঐহিক জীবনে সুবিধেবাদী রাজনীতি সচেতন এবং কোনো নীতিতে-নিয়মে-আদর্শে আন্তরিকভাবে নিষ্ঠ নয়, কেবল শাস্ত্রধ্বজী হয়ে এরা পার্থিক সুখ সুবিধে-বাঞ্ছা চালিত হয় । এদের ধার্মিক এবং পারত্রিক জীবনে গুরুত্ব এবং আস্থাশীল লোকের একান্ত অভাব । এদের শাস্ত্রে সত্যে আদর্শে ও চরিত্রে নিষ্ঠা বড় কম বা প্রায় নেই-ই । এ কাপট্য হিন্দু মৌলবাদীদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকট । কেননা এদের মধ্যে অভিন্ন উপাস্য নেই । উপাসনা-পদ্ধতি এবং শাস্ত্র-তত্ত্বও অভিন্ন নয় । সৌর-শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-লিঙ্গায়েত মিলে কি একদলীয় মৌলবাদী হতে পারে" ?

পাঠক যদি একটু ভাল করে পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে দেখবেন, প্রফেসর লরেন্স প্রদত্ত সংজ্ঞা এবং আহ্‌মদ শরীফের সংজ্ঞার মধ্যে ভাষাগত বা প্রকাশভঙ্গীর কিছু বৈসাদৃশ্য থাকলেও অন্তর্গত মিলই বেশী । দুজনই অসহিষ্ণুতা, বদ্ধচিত্ততা বা রক্ষণশীলতা ও প্রশ্নহীন বিশ্বাস-এই দিকগুলো দেখিয়েছেন । লরেন্সের ভাষায় ধর্মের "সমালোচনা বা লঘুকরণ" স্বীকার না করা এবং ধর্মকে "absolute" বা মোক্ষ ও ব্যাখ্যাতীত(Holistic) দাবী করার মধ্য দিয়ে এই অসহিষ্ণুতার ব্যাপারটি ধরা পড়ে । রিচার্ড এন্টন বর্ণিত "দ্রুতগতির পরিবর্তন ও বহুত্বকরণ বা বহুত্ববাদিতার" (rapid change and pluralization) এবং প্রফেসর লরেন্স বর্ণিত "আধুনিকতাবাদের আধিপত্য বা প্রভাব"(modernist hegemony)-এর প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আহ্‌মদ শরীফের ব্যবহৃত "বদ্ধচিত্ততা" বিশেষ্যটির মর্মার্থ বা ভাবটি প্রতিফলিত হয় তবে স্বীকার করতেই হবে যে আহ্‌মদ শরীফের সংজ্ঞার মধ্যে বেশ সীমাবদ্ধতা আছে । তিনি অর্থোডক্সি ও ফান্ডামেন্টালিজ্‌মের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে যা বলেছেন(উপরে) সেটা য়ুরোপ-আমেরিকার মৌলবাদের জন্য সত্য নয়-অর্থোডক্স চার্চের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করেই মার্টিন লুথার ও পরে জন ক্যাল্ভিন প্রমুখের নেতৃত্বে প্রটেষ্টান্ট মৌলবাদীরা সংস্কার আন্দোলন করেছিল । পক্ষান্তরে প্রফেসর লরেন্সের সংজ্ঞায় কিছু ত্রুটি থাকলেও তুলনামূলকভাবে অনেক ব্যাপক ও এবং গভীর অর্থ ধারণ করে । তাই, ব্রুস লরেন্সের সংজ্ঞাকে আমরা মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ বলে গ্রহণ করতে পারি । প্রফেসর রিচার্ড এন্টনের সংজ্ঞাও কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অনেকটাই ব্যাপক । তবে সংজ্ঞগগুলির মধ্যে কোনটির সীমাবদ্ধতা থাকলেও অন্যটির মাধ্যমে সে অপূর্ণাঙ্গতা দূর হয়েছে বলা যায় । এটাই লেখকের তিনটি সংজ্ঞা দেওয়ার কারণ ।

২. গোড়ার কথা- ক)এখানে প্রথমেই পরিষ্কার করে নেওয়ার দরকার, ভারত-বাংলাদেশের কোন কোন সমাজতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক যে দাবী করেছেন, যে মৌলবাদের জন্ম মূলত ফ্রান্সে, তা পুরোপুরি সঠিক নয় । ভৌগলিক অর্থ সঠিক হলেও চুলচেরা বিচারে সঠিক নয় । এ অনুমানের সপক্ষে তাঁরা যথেষ্ঠ আলোচনা করেননি । যেমন, সুরজিত দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' গ্রন্থে বলেছেন, যে আধুনিক মৌলবাদের জন্ম হয় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইউরোপের জেনেভা শহরে জাঁ(John Calvin, 1509-1564) ক্যাল্ভিন-এর নেতৃত্বে । কিন্তু, ফ্রান্সের জেনেভাকে মৌলবাদের জন্মভূমি বলে পাশ্চাত্যের খুব

কম ঐতিহাসিক বা গবেষক স্বীকার করেন । জাঁ ক্যাল্ভিন সম্পর্কে বহু বিতর্ক রয়েছে মার্কিন গবেষক ও গ্রন্থকারদের মধ্যে । প্রকৃত ঘটনা হলো, প্রথম জীবনে যাজক ক্যাল্ভিন ইটালীর রেনেসাঁ ও সমকালীন ফ্রান্সের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন বা Enlightenment- এর ভাবাদর্শ দ্বার প্রভাবিত Humanism (তকালে হিউম্যানিষ্ট আন্দোলন ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের আরেকটি ধারা) মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হলেও(১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দ) পরে শুধুমাত্র চার্চের ঐক্য ও রাষ্ট্রের উপর চার্চের প্রভাব-ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখে সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন । তিনি যখন প্যারিসে বিশ্ববিদ্যালয়ের Liberal art-এর ছাত্র ছিলেন, তখন ক্রীশ্চান সন্যাসী ও ঈশ্বরতত্ত্ববিদ মার্টিন লুথারের নেতৃত্ব (ধর্মীয়) সংস্কার আন্দোলনের জোয়ার চলছিল ফ্রান্সে, যার অন্যতম লক্ষ্য ছিল রোমান ক্যাথলিক চার্চের একচেটিয়া কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানানো । এটা ছিল চার্চেরই বিভিন্ন পদবীর যাজকদের (Clergyman, Pastor etc) একটি আন্দোলন । তিনি মনে মনে এর সমর্থক ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তীকালে তাঁর লেখা বইয়ে**[৮] । তবে য়্যানাবাপ্টিস্টদের (Anabaptist)*[9]- দের 'মুক্ত চার্চ' আন্দোলনকে তিনি চার্চের ঐক্য ও চার্চীয় এষ্টাব্লিশ্‌মেন্টের জন্য বিপজ্জনক বলে মনে করেছিলেন । এদিক থেকে ক্যাল্ভিনকে ক্ষমতাপন্থী বলা যেতে পারে । তবে এটাও ঠিক যে লুথারপন্থীদের উপর যখন অর্থোডক্স চার্চ কর্তৃপক্ষের দমনপীড়ন চলছিল, তিনি সে সময় একজন খ্রীষ্টানের জন্য বিবেকের স্বাধীনতা এবং শাসকদের জন্য সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে মত দিয়েছিলেন । অবশ্য পরে বিবেকের স্বাধীনতার ব্যাপারে তাঁর এ অবস্থান থেকে তিনি বিচ্যুত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন ভিন্নমতাবলম্বী আচরণের জন্য বা ভিন্ন ধর্ম-ব্যাখ্যা বা ধর্মবিশ্বাসের জন্য সার্ভেটাসকে মৃত্যুদন্ড দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল চার্চীয় পবিত্রতা রক্ষার নামে এবং এই ট্রায়ালে তিনি নিজের প্রভাবকে কাজে লাগিয়েছেন পুরো সিটি প্রশাসন ও চার্চের কাঠামোকে ব্যবহার করে জুরিদের প্রভাবিত করার মাধ্যমে ।

আহ্‌মদ শরীফও একটি প্রবন্ধে**[৯] লিখেছেন যে মৌলবাদের জন্ম ফ্রান্সে, যা আসলে পুরোপুরি সঠিক নয় । প্রফেসর ব্রুস লরেন্সের মতো ধর্ম ও মৌলবাদ বিষয়ক মার্কিন পন্ডিতের লেখাতেও এর সপক্ষে কোন কথা নেই । জাঁ ক্যাল্ভিনের জীবনীকার এলিস্টার ই. ম্যাকগ্র্যাথ**[১০] এবং ডোনাল্ড কে. ম্যাককিম**[১১] কারও লেখাতেই কোন লেশমাত্র ইঙ্গিত বা আলোচনা নেই যে, ক্যাল্ভিনীয় মতবাদ (Calvinism)-কে পরে আমেরিকায় প্রটেষ্টান্ট মৌলবাদের উসরুপে বা চেতনা বা আদর্শগত ভিত্তি ও প্রেরণারুপে ব্যবহার করা হয়েছে । অন্তত আনুষ্ঠানিকভাবে এর স্বীকৃতি নেই কারণ সম্ভবত ফ্রান্সে 'মৌলবাদ' শব্দটি তখনও ব্যবহার শুরু হয়নি বা এর সাথে ভাবগত পরিচিতি ছিল না । পাঠকের কাছে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে, যখন এ ব্যাপারে যথাসময়ে বিস্তারিত আলোচিত হবে ।

খ) যদিও মৌলবাদী চিন্তাধারার ইতিহাসের বেশীরভাগই যুক্তরাষ্ট্রেই উদ্ভব ঘটেছিল, এসব প্রপঞ্চ ছিল ষোড়ষ শতাব্দীর য়ুরোপে সংঘটিত অনেকগুলি ধারাবাহিক বুদ্ধিবৃত্তিক(আন্দোলনের) ধারার প্রতিক্রিয়া । প্রথম খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর আদিকালীন চার্চের সময় থেকে য়ুরোপীয় এনলাইটেন্‌মেন্টের সময় পর্যন্ত কালপর্বে এই ধারণাটি প্রাধান্য বিস্তার করেছিল যে, বাইবেলের বাণী খোদার কাছ থেকে কতিপয় গ্রন্থকারের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে । (বাইবেলীয় গ্রন্থমালা) প্যান্‌টেট্যুখের (Pentateuch)*[১০] মূসায়ী ঐশীত্বের*[১১] ঐতিহ্যগত বিশ্বাসের সমালোচনাগুলোর একটি ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দের জার্মানীতে করা হয়েছিল । যখন সংস্কারবাদী পন্ডিত কার্লস্‌টেড একটি রচনায় সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিলেন যে, মূসা(সঃ)-র মৃত্যুবর্ণনা(বাইবেলীয় অন্যতম ধর্মগ্রন্থ 'ড্যুটারোনমী'; ৩২:৫-১২) এবং উক্ত ধর্মগ্রন্থের অবশিষ্ট অংশগুলির মধ্যে বেশকিছু আক্ষরিক বা সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় । যেহেতু কার্লস্‌ডেট দেখিয়েছেন যে, মূসা(সঃ)-র পক্ষে নিজের মৃত্যু নিয়ে

লিখে যাওয়া সম্ভব ছিল না, তাই তিনি উপসংহার টানলেন, যে একই লোকের দ্বারা গ্রন্থটির উভয় খন্ড লিখিত হয়েছে । তাই সেই ব্যক্তি মূসা হতে পারেনা .....এভাবে পরবর্তীকালে আরো অনেক খ্রীষ্ট ধর্মশাস্ত্রীয় পন্ডিত এব্যাপারে প্রকল্প (Hypothesis) দেন এবং পরীক্ষানিরীক্ষা চালান । যাতে দাবী করা হয় যে, ওল্ড টেস্টামেন্ট (Old Testament)*[১২] একজন ব্যক্তির দ্বারা লিখিত নয় । দীর্ঘ দিন ধরে এ নিয়ে আলোচনা-বিতর্ক ও গবেষণা চলতে থাকে এবং ঐ ধারণাটিকে আরো সম্প্রসারিত করা হয় । যেমন- জেনেসিস-এ বর্ণিত অনেক সূরারই বহুবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ইত্যাদি । জেনেসিস-এ আক্ষরিক পূনরাবৃত্তির উপস্থিতি ব্যাখ্যা এবং পরীক্ষানিরীক্ষা চালানোর জন্য প্রথম বড় ধরণের প্রচেষ্টা চালান ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে একজন ফরাসী চিকিৎসক ডক্টর জিন এস্ট্রাক (Jean Astruc) । তিনি একটি বিতর্কিত পুস্তিকা লেখেন '*Conjectures on the Original Documents That Moses Appears to Have Used in Composing the Book of Genesis*' মূল দলিলগুলি সম্পর্কে এই অনুসিদ্ধান্ত যে জেনেসিস-গ্রন্থের রচনায় মূসা*(সঃ)*-এর নাম আরোপিত বলে মনে হচ্ছে*]* । পরে এটি দালিলিক প্রকল্প*(Documentary Hypothesis)'* হিসেবে পরিচিতি লাভ করে । কিছুদিনের মধ্যেই একদল জার্মান পন্ডিত এস্ট্রাকের তাত্ত্বিক ধারণাগুলোকে আরো সম্প্রসারিত করে উচ্চতর সমালোচনা *'(Higher Criticism)'* নামে একটি বাইবেলীয় গবেষণা-প্রসূত তাত্ত্বিক মত প্রণয়ন করেন । বহু শাস্ত্রকার-পন্ডিত এসব কাজে জড়িত ছিলেন- আমাদের জন্য অবশ্য এসব বিস্তারিত শাস্ত্রীয় আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক । ইতিহাসের নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টটি হচ্ছে এখানে, বাইবেলের গ্রন্থগুলির অনুবাদ, ব্যাখ্যা এবং লিপিগত বা কর্তৃত্বগত সত্যতা নিয়ে যৌক্তিক প্রশ্ন দেখা গিয়েছিল শাস্ত্রকারদের মধ্যে । তার মধ্যে একটি ছিল এই যে, যীশুর কুমারীগর্ভে জন্মলাভের(অর্থা কোন পিতার ঔরস ব্যাতীত) ধারণাটি মূল গ্রীক রচনার ত্রুটিপূর্ণ অনুবাদের ভিত্তির উপর নির্ভরশীল । এই সুযোগেএখানে একথা উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবেনা যে, নবী-রাসুলদের যুগে বংশানুক্রমিকভাবে বিভিন্ন উপকথাগুলি(Myths) যে ঐশীবাণীর মর্যাদা পেয়েছে, সেগুলো আদতেই এক প্রজন্মের নবীর কাছ থেকে কতিপয় জ্ঞানী ব্যক্তির স্মৃতিবাহিত হয়ে পরবর্তী কোন প্রজন্মের নবীর কাছে পৌছেছে তা এখানে প্রমাণিত হচ্ছে ।

৩) **ইতিবৃত্ত**-এমনই পটভূমিতে, Documentary Hypothesis যখন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করল, এবং Modernism(আধুনিকতাবাদ) নামে ব্যাপকভাবে আদৃত হলো, প্রটেস্টান্ট রক্ষণশীল গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এটি যেন বোমার বিস্ফোরনের মতই অনুভূত হলো । প্রটেস্টান্ট রক্ষণশীলরা উক্ত মতবাদের বিপক্ষে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালো । আধুনিকতাবাদীদের(Modernist) Higher Criticism-এর প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষশীল প্রটেস্টান্টগণ ১৮৯৭ সালে নায়াগ্রায় ঐতিহাসিক নায়াগ্রা বাইবেল সম্মেলনে(Niagra Bible Conference)-এ মিলিত হলো । যার উদ্দেশ্য ছিল Modernist-দের প্রত্যুত্তরে একটি পাল্টা ধর্মশাস্ত্র দ্বারা শক্তিশালী অবস্থান নেয়া । এই প্রক্রিয়া(অর্থাৎ Higher Criticism-কে ঠেকানোর জন্য নিজেদের রক্ষণশীল শাস্ত্রীয় নীতিমালা ও তাত্ত্বিক অবস্থানের পক্ষে শক্তিশালী যুক্তি খুজে বের করা এবং তত্ত্ব দাঁড় করানো) ১৯১০ সালে অনুষ্ঠিত প্রেসবিটারিয়ান চার্চের(Presbyterianism)*[১৪] সাধারণ সভা(General Assembly) পর্যন্ত চলল ।

রক্ষণশিল ঐতিহ্যবাদীরা পাঁচটি মূলনীতি ধার্য করলেন, যেগুলো তাদের যুক্তিতে খ্রীষ্টধর্মকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করে । মূলনীতিগুলির আলোচনা এই প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক বলে লেখক মনে করছে । ১৯১০ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে বারটি পুস্তিকা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলো, 'The Fundamentals; A Testimony to the Truth'-এই শিরোনামে । এর মধ্যে ৬৪ জন লেখকের সর্বমোট ৯৪টি আর্টিকেল

সংযোজিত হয়, যেগুলোতে উপরোক্ত পাঁচ মূলনীতির ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ ও সত্যতা প্রতিপাদন করা হয় । এই পুস্তিকাসিরিজের মাধ্যমে ত□কালীন রক্ষণশীল খ্রীষ্টানগণ **'The Fundamentalists'** বলে পরিচিত হলো ।

এখানে আমি পাঠককে স্মরণ করাতে চাই, যে ডক্টর আহ্‌মদ শরীফ ও সুরজিত দাশগুপ্তের মতে মৌলবাদের জন্ম ফ্রান্সে এধারণা যে ভুল, তা এতক্ষণে পাঠকের কাছে স্পষ্ট হওয়ার কথা । তবু, আমি খোলাসা করছি । যদি এমন হতো যে, সংস্কারের নামে ক্যালভিনের ছদ্মবেশী মৌলবাদী মতবাদ বা ক্যাল্ভিনিজ্‌ম সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রে আমদানি হয়ে সেখানকার মৌলবাদীদের আদর্শিক ও তাত্ত্বিক প্রেরণার উ□স হতো, তাহলে ফ্রান্সকেই মৌলবাদের পিতৃভূমি বলা যেত । কিন্তু টেকনিক্যাল কারণে সেটা বলা যাচ্ছে না কারণ, ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদ ও উ□সের প্রতিক্রিয়ায় 'The Fundamentals' পুস্তিকাসিরিজের জন্ম সেটা হচ্ছে Documentary Hypothesis, যা জার্মান পন্ডিতরা রচনা করেন ফরাসী চিকি□সক ডক্টর জিন এস্ট্রাকের গবেষণামূলক পুস্তিকার ভিত্তিতে(উপরে বর্ণিত)। কিন্তু এই পুস্তিকার মাধ্যমে এষ্ট্রাক বাইবেলের আক্ষরিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে গিয়ে সেসময়ের সাপেক্ষে উদারপন্থী অবস্থান নিয়েছিলেন, যার পরিণতিতে পরে ডকুমেন্টারী হাইপোথিসিসের প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণশীলরা ফান্ড্যামেন্টাল্‌স গ্রন্থমালা রচনার জন্য উদ্বুদ্ধ হয় । তাই মোটা অর্থে বা ভৌগোলিক অর্থে ফ্রান্স থেকে মৌলবাদ যুক্তরাষ্ট্রে এসেছে একথা হয়তো বলা যাবে, কিন্তু চুলচেরা ঐতিহাসিক বিচারে তা সঠিক হবে না ।

ধনকুবের তেলব্যবসায়ী মিল্টন ও লিম্যান স্ট্যুয়ার্ট(Lyman Stewart)-এর অর্থায়নে 'দ্য ফান্ড্যামেন্টাল্‌স্'-এর তিন মিলিয়ন কপি মুদ্রিত হলো । ১৯১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া অঙ্গরাজ্যে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্ব ফান্ড্যামেন্টালিস্ট সম্মেলন । ঠিক একই সময়ে Moody Bible Institute*[১৫] প্রতিষ্ঠিত হলো যার উদ্দেশ্য ছিল 'বাইবেলের পান্ডুলিপিগুলো সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ও স্ববিরোধিতামুক্ত'-এই মৌলবাদী মতবাদটিকে জোরালোভাবে সমর্থন ও প্রতিপাদন করে প্রচার-প্রকাশনার কাজ চালানো । উক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মৌলবাদী ঈশ্বরতত্ত্ববিদগণ ফান্ড্যামেন্টাল্‌সে(The Fundamentals) বাইবেলের বাণীগুলোর আক্ষরিক অর্থে গ্রহন বা বিশ্বাস করার ব্যাপারে মত দিয়েছেন । এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্টীয় মৌলবাদকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেওয়া । 'একমাত্র তারাই প্রকৃত খ্রীশ্চিয়ান' - (খ্রীশ্চিয়ান) মৌলবাদীদের এই গোঁড়া বিশ্বাস তাদেরকে অন্যান্য খ্রীশ্চিয়ান সম্প্রদায়ের সঙ্গে এক দীর্ঘস্থায়ী তিক্ত সংগ্রামের(খ্রীশ্চান সাম্প্রদায়িকতার সূত্রপাত) দিকে নিয়ে গেল,- যখন তারা যতগুলি সম্ভব শাস্ত্রীয় প্রতিষ্ঠান(Theological Institutes)এর নিয়ন্ত্রণ নেয়ার জন্য উঠে-পড়ে লাগল । যা ছিল তাদের ভাষায় 'Modernist ও Liberal-দেরকে বের করে দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলিকে পাপমুক্ত বা শুদ্ধ করা অর্থা□ শুদ্ধি অভিযান চালানো' ।

পরবর্তী পর্বের ঘটনাপ্রবাহ উদারপন্থী(Liberal) এবং মুক্তচিন্তার মানুষদের জন্য আরো খারাপের দিকে গেল । ফান্ড্যামেন্টাল্‌স্ গ্রন্থমালার মৌলবাদী ব্যাখ্যা-বক্তব্যের সাথে এবার রক্ষণশীল প্রটেস্টান্টগণ আরো অনেকগুলি নতুন ধারণা বা মতবাদকে বরণ-গ্রহণ করতে বিপুল সংখ্যায় এগিয়ে এল । সেগুলির মধ্যে অন্যতম দুটি হচ্ছে-১) একচেটিয়াবাদ-যে মতবাদে দাবী করা হলো যে, একমাত্র ফান্ড্যামেন্টালিস্টদেরই বাইবেলের প্রকৃত ও সত্য অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদানে কর্তৃত্ব করার নির্ভরযোগ্য ও বৈধ অধিকার বা যোগ্যতা রয়েছে । অর্থা□ তারাই হচ্ছে খাঁটি ও অকৃত্রিম ক্রীশ্চিয়ান । ২) স্বাতন্ত্র্য-এই ধারণার মাধ্যমে দাবী করা হয় যে বাইবেলের অন্যান্য ক্রীশ্চিয়ান (গোষ্ঠীর) ব্যাখ্যা(যেমন, ক্যাথলিক, উদারপন্থী ইত্যাদি) কেবল চরমভাবে ভুলই নয়, বরং তাদের কলুষময় প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে তাদের এসব কাজে (অর্থা□ ব্যাখ্যার নামে অবিশ্বাস ছড়ানো) বাধা দেওয়া এবং তাদেরকে পরাস্ত করা মৌলবাদীদের কর্তব্য ।

বাস্তবিকই, উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই আজকের যুগে 'মৌলবাদী চার্চের' নির্ধারক চরিত্র হয়ে দাড়িয়েছে ।

The Fundamentals-এ অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলোর ইতিপূর্বে উল্লেখিত বক্তব্য ছাড়াও অন্যান্য রচনাগুলোতে উদারপন্থী ক্রীশ্চানদের Social Gospel(নীচে টীকার স্থলে Gospel[১৬] সম্পর্কে দেখুন)-এর ধারণাকে আক্রমণ করা হয় । যাতে উদারপন্থী ক্রীশ্চানরা এই মর্মে জোরালো মতামত তুলে ধরেন যে, সব মানুষের জীবনমানের উন্নতির জন্য ক্রিশ্চিয়ানদের উচিত অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখা । ক্রীশ্চান মৌলবাদীরা বরং ধারণাটি এই যুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করে যে, যেহেতু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আবির্ভাব আসন্ন, চার্চের একমাত্র কাজ হবে, পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্বে যে সময়টুকু এখনো আছে তার মধ্যে যত বেশী সংখ্যায় সম্ভব মনুষ্য-আত্মাকে (আধ্যাত্মিকভাবে বা পাপের হাত থেকে) উদ্ধার করা । ক্রীশ্চান মৌলবাদীরা তাদের দৃষ্টিতে 'কাফের (ভিন্নমতাবলম্বী) ও সধর্মত্যাগীদের' সঙ্গে কোন সহযোগিতা বা সংশ্রব রাখতে চাইল না । এটা ছিল মৌলবাদীদের তৃতীয় প্রধান নিশানা, তবে এসব ত□পরতা যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আগুন জ্বালালো, তা আজ পর্যন্ত চলছে । যা থেকে আজকের 'সৃষ্টি-তত্ত্ব ও বুদ্ধিদীপ্ত ডিজাইন' আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে-যা ছিল 'বিজ্ঞান এবং বিশেষ করে জীবের ক্রমবিকাশের(Evolution) প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকে টার্গেট করে রাজনৈতিক প্রচারাভিযান চালিয়ে যাওয়া ।

চার্লস ডারউইন তাঁর গবেষণালব্ধ গ্রন্থ 'প্রজাতিবর্গের উ□পত্তি প্রসঙ্গে'(On the Origin of Species)- এর প্রথম প্রকাশের পরের বছরগুলোতেই সমালোচনার ঝড়ের সম্মুখীন হলো(এটা য়ুরোপের ঘটনা বলা হচ্ছে-যুক্তরাষ্ট্রের নয়) ধর্মীয় নেতাদের পক্ষ থেকে । যারা 'প্রাণী থেকে মানুষ এসেছে' এই ধারণাকে বাইবেলের উপর সরাসরি আঘাত হিসেবে নিয়েছিল । লক্ষ্যণীয় স্বল্প কালের মধ্যেই, মোটামুটি ১৯০০ সালের মধ্যে, য়ুরোপের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলোকে মেনে নিলেন, ঠিক যেভাবে (পূর্বে বর্ণিত) 'ডকুমেন্টারী হাইপেথিসিস'-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু নিয়ে বাইবেলের বিশেষজ্ঞ-পন্ডিতদের সমাধান মেনে নিয়েছিলেন ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন ধরণের । মৌলবাদীরা বিবর্তনবাদ (ক্রমবিকাশ তত্ত্ব) ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে তাদের সমস্ত বিদ্বেষপূর্ণ উদ্যম নিয়ে প্রত্যাখ্যান করল, যার লক্ষ্যবস্তু ছিলেন জার্মান বাইবেল বিশেষজ্ঞরা । প্রিন্সটন চার্চের ঈশ্বরতত্ত্ববিদ গ্রেশাম ম্যাচেম ঘোষণা করলেন যে, 'উদারপন্থী আন্দোলনের গোড়া একটাই; নানা কিসিমের আধুনিক উদার ধর্মমতগুলির উ□স হচ্ছে ঐ (নষ্টের গোড়া) প্রকৃতিবাদ (Naturalism)*[১৮]-অন্যকথায়, খ্রীষ্টধর্মের উ□পত্তির ক্ষেত্রে খোদার সৃষ্টিশীল ক্ষমতা বা কুদরতি মহিমার কোন স্থান নেই, সহজ বাস্তবতা হলো, (সত্য-মিথ্যা যাই হোক) উদারপন্থা কেবল (ধর্মব্যাখ্যা নিয়ে) ভিন্নমতই নয়-খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষা থেকে স্বতন্ত্র কিছু বিষয়ে বিচ্যুতিই নয় । বরং এর সম্পূর্ণ বিপরীত, সম্পূর্ণ ভিন্ন উ□স থেকে উদারপন্থার উদ্ভব ঘটেছে.... সৃষ্টিকর্তা, মানুষ, স্রষ্টার(এবং সেই সাথে চার্চীয়) কর্তৃত্বের আসন এবং মোক্ষলাভের পথ সম্পর্কিত উদারপন্থী দৃষ্টভঙ্গি বা মতবাদ খ্রীষ্টধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ।.....খ্রীষ্টধর্ম ভেতর থেকেই আক্রান্ত হচ্ছে এমন একটি আন্দোলন দ্বারা যেটি মর্মবস্তুর দিক থেকেই ক্রীশ্চিয়ানবিরোধী '। মৌলবাদী ধর্মীয় সংগঠনগুলি রক্ষণশীল আইনপ্রণেতাদের নিয়ে মৈত্রী ফ্রন্ট স্থাপন করল কংগ্রেসে 'বানর আইন' পাশ করার লক্ষ্যে-এই আইনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক রাজ্যে বিবর্তনবাদ শিক্ষা দেওয়া বেআইনী করা হলো । বিভিন্ন রাজ্যে এনিয়ে যতগুলি আইন প্রণিত হয়েছে তার মধ্যে একটি ছিল ১৯২৫ সালে টিনেসী রাজ্য বিধান সভায় প্রণিত বাটলার এক্ট । মার্কিন সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন(Civil Liberties Union) টেনেসি রাজ্যের

নতুন আইনের(যার মাধ্যমে বিবর্তনবাদ শিক্ষা দেওয়ার মৌলিক নাগরিক, মানবিক ও বিবেকের অধিকার লঙ্ঘন করে সংবিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে) সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার সিদ্ধান্ত নিল । তারা ঘোষণা করল যে, যে কোন শিক্ষকই ইচ্ছাপূর্বক এই আইন লঙ্ঘন করবেন, সংগঠনের পক্ষ থেকে তারা তাকে প্রয়োজনীয় সমর্থন দেবেন । টিনেসীর ডেটনে জীববিদ্যার শিক্ষক জন টি স্কোপ্স্ এব্যাপারে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এলেন কালো আইন লঙ্ঘন করে মামলার মাধ্যমে একে চ্যালেঞ্জ করতে । যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে বিখ্যাত টিনেসি আদালতের এই বিচারে(যা 'Scopes Trial' হিসেবে খ্যাত)কোর্টে শত শত সাংবাদিক, বাল্টিমোর রেডিওর খ্যাতিমান রিপোর্টার এইচ এল মেনকেন প্রমুখ আদালতে উপস্থিত ছিলেন । ফটোগ্রাফারদেরকে ছবি তোলার অনুমতি দেওয়া হলো । বানর আইন লঙ্ঘনের জন্য মিস্টার স্কোপ্স্ এবং সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন পরাজিত হয়, যার মূল কারণ ছিল জুরিদের মধ্যে রক্ষণশীলদের সংখ্যাধিক্যতা । আইনগত জটিলতার কারণে সুপ্রিম কোর্টে আপীল করার সুযোগ হলোনা ।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রভাবশালী আইনজ্ঞদের সহায়তায় মৌলবাদীরা মামলায় জিতে গেলেও, সেটা তাদের জন্য হিতে বিপরীত হয়েছিল । কারণ, জুরিদের জেরার সময়, বাইবেলে বর্ণিত যে সৃষ্টি-তত্ত্বের ভিত্তিতে মৌলবাদী আইনবিদরা বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদ পরিহার করে নিছক ধর্মবিশ্বাসের নামে বিজ্ঞানচর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছেন, সেটি রেডিও-টেলিভিশনে দেশব্যাপি মানুষ সচক্ষে দেখতে পেল । সাংস্কৃতিকভাবে মিডিয়াযুদ্ধটি ছিল মৌলবাদের জন্য একটা বিধ্বস্তকর পরাজয় । অনতিকাল পরেই এই রাজনৈতিক ও আইনগত বিজয় তাদের জন্য দুর্দশা বয়ে আনল । প্রখ্যাত রিপোর্টার-কলামিষ্ট মেনকেন ও অন্যান্য কলামিষ্টদের লেখা শ্লেষাত্নক আর্টিকেল এবং সিনক্লেয়ার ল্যুইস ও এলমার গ্যান্ট্রির মতো ঔপন্যাসিকগণ মৌলবাদীদেরকে অশিক্ষিত ও জঙ্গল থেকে আগত (সূক্ষ্মচিন্তা বিবর্জিত) অমার্জিত গেঁয়োরুপে চিত্রিত করলেন । বানর আইনের মাধ্যমে মৌলবাদীদের রাজনৈতিক বিজয়ের মৃত্যু ঘটল কয়েক বছরের মধ্যেই । ধর্মশাস্ত্রীয় কলেজ ও ইন্স্টিট্যুটগুলোর(যেমন-আমাদের মাদ্রাসা) মধ্যে মৌলবাদী ও উদারপন্থী বা Modernist-এর মধ্যে অন্তর্কলহের কারণে চার্চসদস্যপদ ও যাজক-তৈরীর প্রশিক্ষণে ছাত্রের সংখ্যা অপ্রত্যাশিতভাবে হ্রাস পেল । ১৯২৯ সালের মহামন্দার সময় যুক্তরাষ্ট্রে কার্যকর সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মৌলবাদ প্রায় মৃত বা অকেজো হয়ে গেল ।

গ) প্রিয় পাঠক, মৌলবাদের সঙ্গে ভাইরাসের তুলনা করা যেতে পারে । 'ইসলাম ও শরীয়া' গ্রন্থের লেখক হাসাম মাহ্মুদ তাঁর ওয়েবসাইট banglarislam.com-এ একটি আর্টিকেলে সাম্প্রদায়িকতাকে ভাইরাসের সাথে তুলনা করেছেন । তিনি লিখেছেন, 'যে ভাইরাস হচ্ছে এমন একটি জটিল রাসায়নিক যৌগ(এব্যাপারে আমার সামান্য দ্বিমত আছে-ঠিক জড় বা রাসায়নিক যৌগ না বলে, একে জড় ও জীবের মাঝামাঝি একধরণের অণুজীব বা Microorganism বলাই যুক্তিযুক্ত) যা যুগ যুগ ধরে এর সমস্ত ক্ষতিকারক গুণগুলি নিয়ে মৃতবৎ পড়ে থাকতে পারে । যে মূহুর্তে এটি কোন প্রাণীদেহ বা এর অভ্যন্তরস্থ জীবকোষের সংস্পর্শে আসে, তখনই এটি তার সবগুলো নিষ্ঠুর বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেঁচে উঠে' । অর্থা, ভাইরাস কোন জীবদেহে পরজীবি হওয়ার সুযোগ না পেয়ে, যতক্ষণ খাদ্য ও পানীয় অর্থা পুষ্টি সংগ্রহ করতে অক্ষম হয়, ততক্ষণ এটা মৃতব পড়ে থাকে, কিন্তু, যখনই উপযুক্ত কোন পরিবেশ(যেমন-নির্দিষ্ট তাপমাত্রায়, পরজীবি হয়ে অন্য প্রাণী বা মানুষের দেহে প্রবেশ করার পর) এবং পুষ্টিগ্রহণের সুযোগ পায়, তখনই বেঁচে উঠে এবং বংশবৃদ্ধি করতে শুরু করে । তবে, এটা তো গেল বেঁচে ওঠার ক্ষেত্রে । কিন্তু, এদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য যে সামাজিক পদার্থবিদ্যার কিভাবে কাজ করে সেব্যাপারে এই লেখকের একটি

সূত্র রয়েছে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, সোভিয়েত-মার্কিন ঠান্ডাযুদ্ধের পটভূমিতে, (ভাইরাসের মত বহুকাল মৃত থাকার পর) যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীশ্চান মৌলবাদীরা তাদের ভাগ্য ফেরানোর সুযোগ পেল । তাকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে আসীন নাস্তিক্যবাদী লেনিনপন্থী নেতৃত্ব ছিল তাদের সুবিধাজনক শত্রু । সেসময় মৌলবাদীরা দ্রুততার সাথে নেতৃস্থানীয় ডানপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে মৈত্রী স্থাপন করল, ভাইরাস যেমন করে পরজীবি হিসেবে অন্য জীবদেহে আশ্রয় নেয় । যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাককার্থিজ্‌মের*[১৯] প্রাদুর্ভাবের যুগে, সময়টা ছিল মৌলবাদী ধর্মতত্ত্ব বিকশিত হওয়ার উর্বর উর্বর ক্ষেত্র । এমন সুবর্ণ সুযোগ ও অনুকুল পরিস্থিতি তাদের (মৌলবাদী ভাইরাসের) জন্য রাজনৈতিক প্রভাবপত্তি প্রসারের উপায় নিয়ে এল, যা তারা বহু যুগ উপভোগ করেনি ।

১৯২০ সালের মৌলবাদী আন্দোলনের মতোই, এটা ছিল সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া । ষাটের দশকের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক বিবর্তনের গতিধারা অত্যন্ত তীব্র হলো । দশ বছরের মধ্যেই একটি নব্য প্রজন্ম মার্কিন গতানুগতিক সামাজিক কাঠামোকে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করল । নাগরিক অধিকার আন্দোলন ঐতিহ্যবাহী সামাজিক ভূমিকা ও প্রভাব নষ্ট করে ফেলল । যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন ও নাগরিক অধিকার আন্দোলন দেশপ্রেমের প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে এল এবং বিশ্বব্যাপী মার্কিন ভূমিকাকে প্রশ্নের মুখে ফেলল । অংশীদারত্বভিত্তিক গনতন্ত্রের(Participatory democracy) দাবীতে পরিচালিত আন্দোলন গতানুগতিক রাজনৈতিক এষ্টাব্লিশমেন্টকে চ্যালেঞ্জ করল । নারীমুক্তি আন্দোলন ও সমকামী অধিকার আন্দোলন প্রচলিত পরিবার-কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করল ।

এমনই একটি পটভূমিতে, মৌলবাদীদের শত্রুতার লক্ষ্যবস্তু হলো নাগরিক অধিকারসংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের কিছু সিদ্ধান্ত বা রায় । তার মধ্যে একটি ছিল ১৯৫৪ সালের 'ব্রাউন ভি ইডুকেশন বোর্ড ' সংক্রান্ত রায় যাতে 'Segregated'*[২০] স্কুলগুলিকে আইন-বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল । যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশের রাজ্যগুলির মৌলবাদীরা সেগ্রিগেশনকে বাইবেল-অনুমোদিত বলে গণ্য করত । তারা **Desegregation**-এর প্রক্রিয়া ও নাগরিক অধিকার আন্দোলনের বিরুদ্ধে তিক্ত সংঘাতে লিপ্ত হলো ।

১৯৫৪ সালের কোর্ট ডিসিশনের প্রতিক্রিয়ায় বহু মৌলবাদী চার্চ তাদের নিজস্ব প্রাইভেট স্কুল প্রতিষ্ঠা করল, যেগুলি কোর্টের রায়ের আওতার বাইরে ছিল । এতে তারা তাদের বর্ণবৈষম্যমূলক সেগ্রিগেশন নীতির প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে পেরেছিল, যাতে করে ঐসব স্কুলগুলিতে কালোদের ছেলেমেয়েরা ভর্তি হতে পারতো না । এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্যসমাজে অনুসৃত ব্রাহ্মণদের বেদচর্চা, ব্রহ্মসাধনা ও বিদ্যাচর্চা প্রভৃতির একচেটিয়া অধিকারের কথা বেশ প্রাসঙ্গিক । ১৯৬১ সালের সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় ছিল মৌলবাদীদের জন্য আরেকটি বড় ধরণের আঘাত । রায়ে স্কুলগুলোতে ধর্মীয় প্রার্থনার জন্য সরকারী প্রশাসনের অনুমোদন দেয়া বেআইনী বলে ঘোষিত হলো । রায়ে বলা হয়েছে,"We think that, in this country, it is no part of the business of government to compose official prayers for any group of the American people to recite as a part of a religious program carried on by government." (US Supreme Court, Engel v Vitale, 1961) এই রায় ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদীদের জন্য একটি বড় ধরণের বিজয় । এই আইনী সুরক্ষার ফলে ধর্মকে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখা হলো 'Wall of separation'-এর নীতি অনুসরণ করে । ফলশ্রুতিতে বহুত্ববাদী ধর্মীয় সংস্কৃতির আবহ মৌলবাদীদের বাধ্য করল এই বাস্তবতার সাথে মানিয়ে চলতে ।

১৯৬১ সালে *Epperson v Arkansas* মামলায় কোর্ট রায় দিল যে বিভিন্ন রাজ্যে

প্রচলিত বিবর্তনবাদবিরোধী 'বানর আইন' সংবিধান পরিপন্থী । উপরোক্ত পরাজয়গুলির প্রতিক্রিয়ায় ক্রীশ্চান মৌলবাদীরা সেই ১৯২০ সালের অভিজ্ঞতায় ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির সাথে মৈত্রী স্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য আদাজল খেয়ে লাগল । .....পরবর্তী এক দশকের মধ্যে মৌলবাদীরা অনেকগুলি সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করল যেগুলির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ, নির্বাচনে ধর্মীয় সেন্টিমেন্টের ব্যবহার, সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রভৃতির মাধ্যমে তারা নজিরবিহীন রাজনৈতিক প্রতিপত্তি অর্জন করল । তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯৭৯ গঠিত জাতীয় মৌলবাদী রাজনৈতিক সংগঠন মোরাল মেজরিটি ইন্‌ক্ । এই প্রভাব-প্রতিপত্তি তাঁরা বুশের শাসনকাল পর্যন্ত প্রয়োগ অব্যাহত রেখেছে ।

৪. ক) আধুনিইক ইসলামী মৌলবাদের আদিগুরু ছিলেন ইবনে তায়মিঞা (১২৬৩-১৩২৮)*[২১] ।

তিনি যে সময়ের মানুষ ছিলেন তখন মুসলিম দেশগুলো বহিঃশক্তির আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল । তাঁর সময় ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে একদিকে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য মোঙ্গল বাহিনীর কাছে পরাজিত ও অধিকৃত হয়, অন্যদিকে পবিত্র ভূমি হিসেবে মুসলিমদের কাছে সমাদৃত জেরুজালেম য়ুরোপের সাম্প্রদায়িক চরিত্রের ক্রুসেডারদের দ্বারা অধিকৃত হয় । আবার এদিকে মোঙ্গলরা মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রায় সম্পূর্ণটাই ধ্বংস করেছিল যখন সিরিয়ায় মোঙ্গলদের কাছে মুসলিম শক্তির পতন ঘটে । এমনই একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে, (যখন মুসলিম রাজ্যগুলিতে অস্থিরতা-অবক্ষয় ও নৈরাজ্য চলছিল) তখন এর কারণ হিসেবে তায়মিঞা দেখলেন যে মুসলমানরা ধর্মীয় রীতিনীতি, কঠোর শৃঙ্খলা-নিয়মানুবর্তীতা হারিয়ে নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে । তাঁর মতে, তখনকার মুসলিম নেতারা এর জন্য অনেকাংশে দায়ী , যারা জনগণকে সঠিক বিশ্বাস ও ধর্মাচার পালনের দিকে উ্সাহিত করেনি । সেসময় মোঙ্গলরা ইসলামে ধর্মান্তরিত হলেও তাঁর প্রধান অভিযোগ ছিল মূলত মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে । তায়মিঞার মতে, কেবল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে কেউ মুসলমান হলেই সত্যিকার মুসলিম হয় না । সত্যিকার মুসলিম হতে হলে শরিয়াকে কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে । এর পেছনে পটভূমিটা ছিল, ধর্মান্তরিত হলেও গেংগিস খান প্রবর্তিত পুরনো(ধর্মান্তরিত হওয়ার আগের) যাসা বিধান(Yasa Code)-এর দিকে মোঙ্গলদের তখনও ঝোঁক রয়ে গিয়েছিল । এর ফলশ্রুতিতে তায়মিয়া তাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিলেন এবং এভাবে একটি নূতন নজীর সূচনা ঘটালেন 'তথাকথিত 'খোদার প্রতিনিধিত্বকারীদেরকে'(খেলাফত, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং তাদের সমর্থনকারী আলেমদেরকে) হিংসাত্মক বিদ্রোহের মাধ্যমে অপসারণ করার যোগ্য' বলে প্রচার করার মাধ্যমে ।

খ) উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আব্দুল ওয়াহাবের(১৭০৩-১৭৯২) নেতৃত্বে সালাফি*[২২] আন্দোলনের মাধ্যমে তায়মিয়ার দর্শন পুনরুজ্জীবন লাভ করে । সালাফি মতে, প্রথম তিন প্রজন্মের মুসলিমরা অর্থা, মুহম্মদ(সঃ)এর সাহাবীগণ এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের মুসলমানেরাই ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝেছে এবং অনুসরণ করেছে । য়ুরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের প্রতি সালাফি আন্দোলনের সমীহ ছিল । এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা মুসলমানদের কল্পিত স্বর্ণযুগকে পুনরুজ্জীবিত করার স্বপ্ন দেখেছিল । কিন্তু,আব্দুল ওয়াহাব মূল সালাফি দর্শন থেকে সরে আসেন । তিনি দাবী করেন যে মুসলিম বিশ্বের অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে পাশ্চাত্যের নব নব বিপ্লব ও পরিবতনের জোয়ার, যেমন-য়ুরোপীয় আধুনিকতাবাদ । মোটকথা হাদীস বা কোরাণের যেকোন যুগোপযুগী পরিবর্তন বা সংশোধনকে তারা বিদাহ্(বাংলায় 'বেদায়াত') বলে রায় দিয়েছিল এবং প্রথাগত ইসলামের অনেক

উপাদানকেও । তিনি মুসলিমদের অনেক আচার-প্রথাকে শেরেক হিসেবে চিহ্নিত ও অভিযুক্ত করেন । ওয়াহাবীরা নিজেদেরকে মুজাহিদীন(একত্ববাদী) বলে ঘোষণা করল । কিন্ত এর ফলে প্রথাগত ইসলামের আচার-প্রথা, স্থানীয় লোকজ সংস্কৃতির সাথে ওয়াহাবী উগ্র ইসলামের দ্বন্দ্ব দেখা দেয় দেশে দেশে-যেমন ইরানের শিয়াদের নিজস্ব কিছু প্রথা ও সংস্কৃতি বহু যুগ পূর্ব থকেই ছিল । বিভিন্ন দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য-দর্শন ও সংস্কৃতির সাথে আদান-প্রদানের যে ইচ্ছানিরপেক্ষ বাস্তবতা, এবং খাপ খাওয়ানোর বিচক্ষণ নীতি এভাবে উপেক্ষিত হয়, যার নজীর আমরা ভারতবর্ষে ইসলামের বিস্তারলাভের সময় দেখতে পাই । কোন কোন গবেষকের মতে সঊদি আরবকে ওয়াহাবী মতবাদ রপ্তানীর জন্য সাধারণভাবে চিহ্নিত করা হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা প্যান ইসলামী সালাফি মতবাদের রপ্তানি ঘটিয়েছে । সৌদি আরব বেশকিছু সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে বিভিন্ন দেশে(অন্তর্জাতীয় বা আন্তঃদেশীয়) কাজ করার জন্য যেগুলোর হেডকোয়ার্টার সৌদি আরবে অবস্থিত । এসব সংগঠনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সুপরিচিত হলো বিশ্ব মুসলিম লীগ যা ১৯৬২ সালে মক্কায় প্রতিষ্ঠিত হয় । এই প্রতিষ্ঠানটি সাঈদ কুতুব ও হাসান আল বান্নার নেতৃত্বে বিভিন্ন দেশে পুস্তক ও ক্যাসেট সরবরাহ ও বিতরনের ব্যবস্থা করতে থাকে । সৌদি আরবের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তাদের এই আন্দোলনের মূল কেন্দ্র ।

গ) **পারিবারিক সাদৃশ্যতা** --ক) 'ইসলামী মৌলবাদ' পরিভাষাটির উদ্ভাবক হচ্ছেন সুপরিচিত প্রাচ্যবিদ এইচ এ আর গিব । যিনি তাঁর Mohammedanism (পরে 'ইসলাম' নামকরন করা হয়) গ্রন্থে প্যান ইসলামিক(ইসলামী উম্মা) সংস্কারক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা হিসেবে পরিচিত জামাল আল দীন আল আফগানীর(১৮৩৮-১৮৯৭)*[২৩] প্রসঙ্গ তুলে ধরেন । তিনি ছিলেন উনিশ শতাব্দীতে পারস্য, মিশর এবং অটোমান সাম্রাজ্যের মুসলিম আধুনিকতাবাদের প্রতিষ্ঠাতা, দার্শনিক ও রাজনৈতিক কর্মী, যিনি বিশ্বব্যাপী পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শোষন এবং বিশেষ করে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিশ্ব-মুসলিমের ঐক্যের(প্যান ইসলামিজ্‌ম) প্রয়োজনীয়তার প্রবক্তা । পশ্চিমা আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের সংগঠিত করার রণকৌশলের ক্ষেত্রে তিনি শাস্ত্রীয় পন্থায়(ফিকাহ্-সুন্নাহ-শরীয়া ইত্যাদি) জোর দেওয়ার ব্যাপেরে কমই আগ্রহী ছিলেন । মুসলিম সংহতির জন্য তাঁর আহ্বান মিশরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, 'তাঞ্জিমাত' নামে খ্যাত তুরস্কের সংস্কার আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছিল । পশ্চিমা ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ(যেমন-ম্যালিস রুথভেন) আফগানীকে মৌলবাদী বলেছেন এই জন্য যে, তিনি (রুথভেনের ভাষায়) ষড়যন্ত্রের পরিকল্পক এবং প্রথম যুগের ইসলামে ফিরতে চেয়েছিলেন । রুথভেনের এই দাবীর পক্ষে অন্য ঐতিহাসিকদের সমর্থন পাওয়া যায়না । এখানে দুটো পয়েন্ট আসছে-এক,শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহটি যে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে আঘাত করেছিল পাঠক তা দেখেছেন । রুথভেন সাহেবের আফগানীকে মৌলবাদী বলার এটা একটা কারণ হতে পারে । দুই, যেখানে আফগানীর সময় 'মৌলবাদ' পরিভাষাটিরই জন্ম হয়নি, তিনি কিভাবে আফগানীকে মৌলবাদী আখ্যা দিতে পারেন ? আমরা সবাই জানি যে ১৮৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে নায়াগ্রা সম্মেলনের মাধ্যমে মৌলবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে । কিন্তু, হোয়াইট হাউসের আশীর্বাদপ্রাপ্ত বিশ্লেষকরা সেটি গোপন করতে চান । এভাবে ধরলে তো মার্টিন লুথার এবং জন ক্যাল্ভিনকে যে অনেকে বিশ্ব মৌলবাদের আদিপিতা বলতে হয়-যা অনেকেই বলে থাকেন । এগুলো নিরপেক্ষতা ও সত্যনিষ্ঠতা থেকে করা হয়না-অনেকটা ভাবাবেগ থেকে করা হয়ে থাকে । আসলে তায়মিঞার পর পর ইবনে ওয়াহাব প্রমুখরাই ইসলামী মৌলবাদকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার আন্দোলনের সূচনা ঘটান ।

আল-আফগানী ১৮৭৯ সালে অটোমান সুলতান আব্দুল আজিজের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং

তাঁর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন । (কোন কোন ঐতিহাসিকের ভাষ্য) বলা হয়ে থাকে যে, অটোমান সুলতান আফগানীর তাত্ত্বিক আদর্শ ও স্বপ্নকে কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন । তুরস্কের রাজকর্মচারীরা,- যারা তখন 'তাঞ্জিমাত সংস্কার'-এ নিমগ্ন হয়েছিল, আল-আফগানী্কে তেমন গুরুত্ব দিলনা । তিনি সেখানে শিক্ষা পরিষদের একজন কর্মচারী নিযুক্ত হন । শিক্ষা কাউন্সিলকে তিনি তাঁর মতবাদ প্রচারের ফোরাম হিসেবে ব্যবহার করেন, যেখানে তিনি অনেকগুলো উদ্দীপনাময় সংস্কারবিষয়ক লেকচার দেন । লেকচারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল মূলত সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা, সেই লক্ষ্যে ইসলামী সমাজকে আধুনিকীকরণের আবশ্যকতা এবং শিয়া যুক্তিবাদী দর্শন । ইসলামী সমাজকে আধুনিক করার পক্ষে তাঁর ভাবাদর্শ এবং শিয়া যুক্তিবাদ ইস্তাম্বুলের রক্ষণশীল সুন্নী মোল্লা সম্প্রদায়কে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল ।

১৮৮৪ সালে আফগানি প্যারিসে একটি শক্তিশালী লিঁয়াজো-মাধ্যম প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর শিষ্য মুহম্মদ আবদুহ্‌কে নিয়ে-পাশ্চাত্য পন্ডিতদের ভাষায় সেটি ছিল তাঁর সময়ের নেতৃস্থানীয় 'সংস্কারবাদী জার্নাল'(হিউম্যানিষ্টদের ভাষায়, মৌলবাদী জার্নাল) । উক্ত সংবাদপত্রের মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক আদর্শের পুনরুজ্জীবন ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা এবং মুসলিম দেশগুলির কর্ণধার ও মুসলিমদের বৃহত্তর ঐক্যের আহ্বান জানানো হতো । আফগানী যুক্তি দেন যে, এভাবেই মুসলমান সমাজ য়ুরোপীয় শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে তাদের পুরনো ক্ষমতা ফিরে পেতে পারে । তিনি আরো মত দিয়েছিলেন যে, ইরান অবশ্যই সংবিধান ও পার্লামেন্টের মাধ্যমে শাসিত হওয়া উচিত যেখানে জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে । তবে এব্যাপারে মতভেদ বা বিতর্ক রয়েছে । কারণ, তাঁর একজন জীবনীকারের*[২৪] মতে, যদিও তাঁর প্রশংসাকারী একজন সমসাময়িক ব্রিটিশ ঐতিহাসিক তাঁকে লিবারেল হিসেবে চিহ্নিত করেন, প্যারিস থেকে প্রকাশিত তাঁর পরিচালিত সংবাদপত্রের তাত্ত্বিক প্রবন্ধগুলোতে এমন কোন ভাষ্য পাওয়া যায়নি যা রাজনৈতিক গণতন্ত্র এবং সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষে যায় । বলাই বাহুল্য, যে এটা তখনকার সময়ের জন্য ছিল একটা ইয়োটোপীয় চিন্তাধারা । প্যান ইসলামিজ্‌মের ধারণার সাথে স্থানীয় শাসক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের দ্বন্দ্বের স্বরুপটি সেযুগে তাঁর জন্য বোঝা সম্ভব ছিলনা । তিনি মুসলমানদের ঐক্যের কথা বললেও একজন খলীফার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ধারণা সমর্থন করেননি । বরং য়ুরোপীয় উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার উপর জোর দিয়েছিলেন । তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইসলাম ধর্মকে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে খাপ খাওয়ানো সম্ভব, এবং নিজেদের বিশ্বাসের ভিন্নতা বজায় রেখেও রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে । ঐক্যের রুপটি কেমন হবে, রাষ্ট্রের কাঠামো বা রুপটি কেমন হবে সেসম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা তাঁর ছিল বলে মনে হয় না । শুধু তাই নয়, ঐক্যের পন্থা হিসেবে ভোটের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচনের অথবা আবর্তন পদ্ধতির মাধ্যমে(Alternating) খলীফা নির্বাচনের ব্যবস্থা করে সব পক্ষকে খুশী করার পরামর্শ তিনি দিয়েছিলেন কিনা সেব্যাপারে জানা যায়না । ধর্মীয় পদবীর ভিত্তিতে তিনি যে আলেম-শাসিত (খেলাফতী ব্যবস্থার অনুরুপ) 'ধার্মিক ও পূণ্যশীল শহর'-এর কল্পনা করেছিলেন, তার সাথে মুসলিম ঐক্যের ব্যাপারটি একটি গোঁজামিল বা ইয়োটোপিয়া বলেই মনে হয় । কারণ, রাষ্ট্রের শাসনকাঠামো বা আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর উপর যে বিভিন্ন মুসলিম দেশ বা রাজ্যগুলির শাসক শ্রেণীর কায়েমীস্বার্থের, ক্ষমতাভাগাভাগির এবং অবস্থান ও প্রভাবপ্রতিপত্তির প্রশ্নটি জড়িত ছিল এবং বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে বিরাজমান তখনকার স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের যুগে তাঁর ঐ ভাবধারা যে সম্পূর্ণ অবাস্তব ছিল সেটা তিনি বুঝতেন বলে মনে হয়না ।

প্রিয় পাঠক, বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, রক্ষণশীল মোল্লাদের এই ধরনের পশ্চাদ্‌পদ ভূমিকার কারণে মুসলিম দেশগুলি জ্ঞানবিজ্ঞানে পিছিয়ে পড়েছিল, যার কারণে তারা সাম্রাজ্যবাদীদের

লুণ্ঠনের স্বীকার হয় । যাই হোক, তুরস্কের সুন্নী কট্টরপন্থী মোল্লারা তাঁকে কাফের ফতোয়া দেয় । পক্ষান্তরে তিনি সুন্নী মৌলবীদের খোদা সম্পর্কিত ধারণাকে একজন অশিক্ষিত কারিগরের জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করেন । ওলামাদের সাথে আফগানীর দ্বন্দ্ব চরমে উঠলে (ক্ষমতার স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্যের জন্য) সুলতান আব্দুল আজিজের জন্য তার ভারবহন করা কঠিন হয়ে পড়ল । এ থেকে বোঝা যায় সেযুগের মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলিতে বিদ্যমান পারিপার্শ্বকতার সাপেক্ষে তিনি যথেষ্ঠ অগ্রসর চিন্তার মানুষ ছিলেন ।

যেহেতু এসবের পরেও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের দ্বারা তাঁকে 'ইসলামী মৌলবাদের জনক' আখ্যা দেওয়া যে রাজনৈতিক বিবেচনা করা হয় তা অনুমান করা যায় ।

১৮৯২ সালে আফগানী ইরানের শাহ্ নাসির আল-দীন কর্তৃক আমন্ত্রিত হন সরকারী কাজে বিজ্ঞ পরামর্শ দেয়ার জন্য । যখন ইরানে অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, (রাষ্ট্রের শাসনকাঠামোর অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্বের কারণে) ইরান শিঘ্রই ব্রিটিশদের কাছে শর্তসাপেক্ষে আত্মসমর্পন করতে যাচ্ছে । তিনি তখন দাবী তোলেন যে ইরানের রাজস্ব শাহের য়ুরোপে প্রমোদ-ভ্রমনে ব্যায়ের পরিবর্তে রেলরোড নির্মাণ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতিতে ব্যয় করা হোক । তিনি মত দেন যে, সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিরোধ করতে হলে ইরানের একটি টেকসই ও যুগোপযোগী সেনাবাহিনীর প্রয়োজন । শাহের সাথে তাঁর সম্পর্কের অবনতি ঘটে শাহের কায়েমী স্বার্থ ও তার ব্রিটিশ-নীতির

কারণে । এই দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে তিনি কারারুদ্ধ হন ও পরে ইরান থেকে বিতাড়িত হয়ে অটোমান মেসোপটেমিয়ায় নীত হন । পরে তিনি শাহ্‌কে অভিযুক্ত করেছিলেন য়ুরোপীয়ানদের বিশেষ সুবিধা দিয়ে মুসলমানদেরকে দুর্বল করার জন্য এবং এইরুপে রাজস্বের অপব্যয় করার জন্য । শাহের ব্রিটিশ-আনুকূল্যের প্রতি তাঁর এই বিক্ষোভ ও তীব্র সমালোচনাকে, ১৮৯১ সালে শাহের বিরুদ্ধে যে সফল বিদ্রোহ সংগঠিত হয় তার আদি-উ□স হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে । এই বিদ্রোহের কারণ ছিল ব্রিটিশ কোম্পানীর একচেটিয়া পূজির কাছে আত্মসমর্পন করে একচেটিয়াভাবে টোবাকো মঞ্জুর*[২৫] করা । এই বিদ্রোহের পরিণতিতে ১৯০৫ সালে ইরানে সাংবিধানিক বিপ্লব সংঘটিত হয় ।

বিশ্লেষণ- ইবনে হানবাল, ইবনে তাঈমিঞাএবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মসংস্কারক ও ভারত উপমহাদেশে বিস্তৃত বর্তমান মৌদুদীবাদ(মৌলবাদ)এর পথিকৃ□ মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব এবং তাদের ঐতিহ্য অনুসারী ইবনে সউদের যোদ্ধাদেরকে আমরা মৌলবাদীরুপে চিহ্নিত করতে পারি, সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রচলিত ইসলামের 'মূল শাস্ত্রীয় বিশ্বাসে'(অর্থা□, কোরাণ-হাদীসের বিধানগুলির আক্ষরিক ও সাহাবীদের সময়কার আরব্যসমাজে প্রচলিত ব্যাখ্যাকে চালু বা প্রয়োগ করা; পন্ডিত লরেন্স প্রদত্ত সংজ্ঞা দেখুন) তাদের ফেরার প্রচেষ্টা জন্য । কারণ, তাদের ধারণায় বিগত কয়েক শতাব্দীর সঞ্চিত রীতি-প্রথা, শিক্ষা ও ঐতিহ্য (তাদের ধারণায়)যার অভাব পূরণ করতে পারেনি । আরেকটি প্রপঞ্চ এখানে লক্ষ্যণীয়-সেটা হচ্ছে, 'পারিবারিক সাদৃশ্যতা'; আমি আমার অন্য একটি প্রবন্ধে('চিরকালীন মোল্লা-পুরোহিততন্ত্র বনাম নারীর ক্ষমতায়ন, পতিতাবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি') দেখিয়েছিলাম যে, মৌলবাদীরা সমাজবিবর্তনের ইচ্ছানিরপেক্ষ ধারাবাহিকতা ও এর অভন্তরস্থ সাংস্কৃতিক বহমানতাকে হয় বুঝতে পারেনা অথবা মেনে নিতে পারেনা । এখানে প্রসঙ্গটা এসেছে এই জন্য যে তাদের এই বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন দেশের বা মহাদেশের মৌলবাদীদের 'পারিবারিক সাদৃশ্যতা'-র লক্ষণকে তুলে ধরছে যা উইটজেন্‌ষ্টাইন ইতিপূর্বে দেখিয়েছেন । ব্যক্তি ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে-এটা একটা ভাববাদী ধারণা, যা মনীষী কার্ল মার্ক্সের ঐতিহাসিক বস্তুবাদে এবং পরে মহামতি লেনিন অসার ও ভিত্তিহীন বলে প্রতিপাদন করেন । এই ধারণায় সমাজের বিভিন্ন উপাদান,

বস্তুগত শর্ত, বিদ্যমান সামাজিক বর্গ ও শ্রেণীসমূহকে কাদামাটির মতো 'Flexible' বলে ধরে নেয়া হয় ।

রুথভেনের মতে, আফগানীদের সূচিত সালাফিয়া' আন্দোলন, যার ভাবাদর্শটি ছিল একই সাথে এনলাইটেনমেন্ট এবং মহানবীর পূণ্যবান সাহাবীদের স্বর্ণযুগে ফেরার স্বপ্নবিলাস, তা শেষ পর্যন্ত একটি পর্যায়ে গিয়ে তার আধুনিকতাবাদের চেতনাকে আত্মসা করল । যখন মোহাম্মদ আবদুহ্ আফগানীর সঙ্গ ত্যাগ করে মিশরের ব্রিটিশ শক্তির সাথে হাত মেলালো তথাকথিত সংস্কারবাদী এজেন্ডাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আশায় ।

৫. ইবনে তায়মিয়া এবং আব্দুল ওয়াহাবের পরে ইসলামী মৌলবাদের পথিকৃৎ ছিলেন মূলত দুজন-মিশরের হাসান আল বান্না এবং পাকিস্তানের মৌদুদীর গুরু সৈয়দ(বা সাঈদ) কুতুব ।

সাঈদ কুতুবের উত্থাণের পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে স্কটিশ ঐতিহাসিক, গ্রন্থকার এবং ক্যালিফোর্নিয়া য়ুনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ এন্ড কম্পারেটিভ রিলিজিয়ন-এর প্রাক্তন প্রফেসর ম্যালিস রুথভেন লিখেছেন, যে ইসরাইলের প্রতি পশ্চিমা পৃষ্ঠপোষকতা এবং তার ভাষায় 'মিশরের একনায়ক'(এবং অবশ্যই আমাদের কাছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং ধর্মনিরপেক্ষ জাতিয়তাবাদী নেতা) গামাল আব্দুল নাসের কর্তৃক মৌলবাদী সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুডের উপর দমন-পীড়নের ফলশ্রুতিতে যে বিক্ষোভের জন্ম নেয়, সেটাই তার ভাষায় 'ইসলামী তাত্ত্বিক'(?) সাঈদ কুতুবের লেখনীর জন্য জ্বালানীর কাজ করে । অবশ্য, বলতেই হবে যে, এটা তাঁর ব্যাক্তগত ধারণা । তিনি যখন গামাল আব্দুল নাসেরকে একনায়ক আখ্যায়িত করেন, তখন তাঁর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে । কি পটভূমিতে নাসের ক্ষমতা নিয়েছিলেন, মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কোন গণতান্ত্রিক শাসককেই যে টিকতে দেয়নি সেসব ইতিহাস এখানে টানতে চাইনা । তবে নাসেরকে পশ্চিমারা একনায়ক বলার মূল কারণ যে তাঁর তেলসম্পদ জাতীয়করণের ফলে ইঙ্গ-মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানীগুলির স্বার্থহানি ও খবরদারির অবসান, সুয়েজ খাল বন্ধ করে দেওয়া(যা রুথভেন সাহেব উল্লেখ করেননি) ইত্যাদি, সেটা বোধগম্য । শুধু তাই নয়, তার প্রতি এই সহানুভূতি এবং তাকে মহিমান্বিত করার এই প্রচেষ্টা থেকে সাঈদ কুতুবের মত মৌলবাদী ক্যারিশ্‌মেটিক নেতাদের প্রতি এবং সর্বোপরি মধ্যপ্রাচ্যে মৌলবাদী উত্থাণের পেছনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের লেলিয়ে দেওয়া বুদ্ধিজীবিদের সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক ও নৈতিক প্রচার ও অনুপ্রেরণা যে কাজ করেছে এট বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে । যাই হোক, রুথভেন সাহেবের মারফত আমরা জানতে পাচ্ছি যে, ১৯৬৬ সালে সাঈদ কুতুবকে নাসেরের পুলিশ কারাগারের নিক্ষেপ করে এবং দন্ডিত করে সরকারবিরোধী সন্ত্রাসী কাজের জন্য, যেমন করে আমাদের দেশের জঙ্গীরা সাধারণ মানুষ হত্যা করেছিল ইসলামের নামে । তবে পার্থক্য হচ্ছে এই, যে পাশ্চাত্যের প্রচারের কল্যাণে সাঈদ কুতুবকে বিখ্যাত করে তোলা হয় । ওই দন্ডের পরেই নাকি কুতুব সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, আরব বিশ্বের মুসলিম সমাজ আর ইসলামিক নেই । তারা আবার আরবের সেই আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগের পাপ-অজ্ঞতা-অধর্ম ও পৌত্তলিকতা প্রভৃতিতে পতিত হয়েছে । কুতুব তার লেখায় যুক্তি দিয়েছেন যে, খোদা যেভাবে মুহম্মদকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন (দিয়েছিলেন কি ? দেখুন টীকা-ভাষ্য *[২৬]), যে মক্কার প্যাগানরা(পোত্তলিকরা) ইসলামের কাছে চূড়ান্তভাবে বশ্যতা স্বীকার না করা পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, ঠিক তেমনিভাবে, একইভাবে তার ও তার সুযোগ্য অনুসারীদের(অর্থা জঙ্গীদের) উপর দায়িত্ব বর্তে গেছে আরবের নামে মুসলমান সরকারগুলোর উপর এবং পাশ্চাত্যের ব্যাক্তিবর্গ ও পর্যটকদের উপর হামলা চালানো । কত বড় মিথ্যাচার এটা । ইসলামকে কতটা নীচে নামানো হয়েছে, পাঠক একবার

ভেবে দেখুন । আমরা ভাল করেই জানি, রসুল্লাহ্ তরবারীর মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রচার করতে চাননি । তিনি পৌত্তলিক উপাসকদেরকে বুঝিয়েছেন, ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন, সেজন্য নির্যাতনও সহ্য করেছেন । তিনি তখনই যুদ্ধ করেছেন, যখন নব্য মুসলিমরা আক্রান্ত হয়েছিলেন অথবা আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয়েছিল অথবা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে নব্য মুসলিমদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল । আর, ইসলাম কি এতই ঠুনকো যে, বলপুর্বক ও হিংসাত্মক উপায়ে পৌত্তলিকদের উপর চাপিয়ে দিতে হবে ? কিন্তু, কুতুবের ভাষায় সেই শক্তির ভাষা ও নিষ্ঠুরতার সাফাই-ই প্রতিফলিত হচ্ছে-কিন্তু এর মাধ্যমে তিনি সবচেয়ে জঘন্য যে অন্যায় ও মিথ্যাচারটা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা হলো রসুলুল্লাহ্র প্রতি 'ধর্মান্তরিত করার জন্য উগ্রপন্থা ও সন্ত্রাসের পথ গ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলামের সূচনাতেই নজীর সৃষ্টির' জন্য দোষারোপ করে । এভাবে নিজস্ব রাজনৈতিক ইসলামের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি উগ্রপন্থাকে জায়েজ করেছেন রসুলুল্লাহ্কে পাশ্চাত্যের কাছে সন্ত্রাসীরুপে চিত্রিত করার মাধ্যমে ।

ব্রিটিশ রাজনৈতিক তথ্যবিশ্লেষক ক্রিস ব্যাকবার্ণ ২০০৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের ইউ এন প্লাজা হোটেলে অনুষ্ঠিত 'সন্ত্রাসবাদ, গণতন্ত্র ও বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন' সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাঁর 'জামায়াতে ইসলামীঃ বাংলাদেশের জন্য হুমকি' শীর্ষক নিবন্ধটি উপস্থাপন করেন(সূত্রঃ ভোরের কাগজ, ২২ নভেম্বর, ২০০৭) । বেশ সংক্ষেপে এখানে প্রাসঙ্গিক ও আমাদের মৌলবাদ নামক রোগের নিরাময়ের উপায় বা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঔষধ খুঁজে বের করার জন্য যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকু বিবৃত করছি । ব্যাকবার্ণ তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, যে ১৯৪১ সালে মওলানা আবুল আলা মওদুদীর হাতে পাকিস্তানের লাহোরে জামায়াতে ইসলামীর জন্ম । এর সাংগঠনিক শাখা রয়েছে ভারত, বাংলাদেশ, কাশ্মীর, শ্রীলঙ্কা এবং আফগানিস্তানে । মওদুদী মনে করতেন, যে মুসলিম দেশগুলি (তার ভাষায়) জাতীয়তাবাদ, নারী স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভৃতি বিকৃত পাশ্চাত্য মতবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে । মওদুদী বিশ্বাস করতেন যে একটি পুরোপুরি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে হলে ইসলামের বিধানকে আংশিক (ব্যাখ্যার মাধ্যমে) ব্যবহার করতে হবে । তিনি বিশ্বাস করতেন, মুসলিম রাষ্ট্র হবে (যেমন-ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক চরিত্রের পঙ্গু ও অকার্যকর রাষ্ট্র পাকিস্তান , ১৯৪৭ সাল) ফ্যাসিস্ট ও কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের একটি সংকর, যেখানে একটি অনির্বাচিত ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী রাষ্ট্র এবং জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করবে । সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা(মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম আদর্শ বা চেতনা) এবং প্রগতির কোন জায়গা থাকবে না । বলব থাকবে সাহাবীদের দাসতান্ত্রিক যুগের ও মধ্যযুগীয় বর্বর ও নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক শরীয়া আইন ।

মওদুদী প্রভাবিত হয়েছিলেন মিশরে জন্ম নেয়া রাজনৈতিক ইসলামের অন্যতম পথিকৃ মুসলিম ব্রাদারহুড(লক্ষ্য করুন-নামের মধ্যেই সাম্পদায়িকতার বর্ণবাদী গন্ধ লেগে আছে, নামই বলে দিচ্ছে, অন্য ধর্মমতের ও ভিন্নমতাবলম্বীদের কোন স্থান নেই তাদের সম্ভাব্য রাষ্ট্রে) দ্বারা । কুতুবের মতবাদ বা তত্ত্বটি ছিল, একটি বিপ্লবী ইসলামী শক্তি গড়ে তোলা, যারা মৌলবাদী ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের পরিকল্পনার শত্রুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জেহাদ করবে । তবে মওদুদী এটাকেই একমাত্র পন্থা মনে করতেন না । তিনি মনে করতেন, ইসলামী আন্দোলনের জন্য একটি রাজনৈতিক দল দরকার যাদের কিছুটা হলেও আইনি বা সাংবিধানিক বৈধতা থাকবে এবং তারা যেন প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করতে পারে ।.....তিনি বিশ্বাস করতেন,(মওদুদীর রণকৌশল) রাজনৈতিক দল হিসেবে কাজ করতে থাকলে প্রচলিত ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের আন্দোলন সূচিত করার জন্যও সুযোগ পেয়ে যাবেন এবং যখনই সময় উপুযুক্ত বিবেচিত হবে এবং জেহাদের প্রতি পর্যাপ্ত সমর্থনের ব্যাপারে নিশ্চিত

হওয়া যাবে, তখনই সশস্ত্র জেহাদে নামা হবে । প্রিয় পাঠক, এদের ভন্ডামীটা এবার বুঝুন, একদিকে তারা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি আধুনিক সভ্য রাষ্ট্রের সংবিধানের মূলনীতিগুলোকে প্রত্যাখ্যান করছে, আবার তেমন একটি সংবিধানের আওতায় সংবিধান-প্রদত্ত গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকার আইনের সুযোগসুবিধা গ্রহণ করে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির ছাতা মাথায় দিয়ে ভেতরে ভেতরে সুদূরপ্রসারী অনিয়মতান্ত্রিক এজেন্ডা ও লক্ষ্য নিয়ে ট্রোজান হর্সের ভূমিকা নিয়েছেন । এটাকে একটা বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রতি, ধর্মের নামে প্রতারণা ও জালিয়াতি ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে ?

৬. মৌলবাদের অশুভ ও ক্ষতিকারক দিক- ক)এ ব্যাপারে ভূমিকাতেই মোটামুটি আলোচিত হয়েছ । তবে এখানে আরেকটু সম্প্রসারিত করা হবে । মার্ক জুয়ের্গেন্সমেয়ার(Mark Juergensmeyer)*[২৭] যুক্তি দিয়েছেন যে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের ধারণা বিকশিত হয়েছে যখন ফরাসী বিপ্লবের (ফলাফলস্বরুপ এর যে মর্মবাণী বা আকাঙ্খাটি ছিল তার) শিক্ষা ও চেতনা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা চার্চের প্রতি বা ঐতিহ্যের প্রতি ব্যাক্তির আনুগত্যকে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ জাতিরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দ্বারা প্রতিস্থাপন করার লক্ষ্য হিসেবে স্থির করল । জিন জ্যাক রুশো জাতিরাষ্ট্রের বৈধতাকে স্থান দিয়েছেন জনগণকে অগ্রাধিকার দিয়ে, চার্চকে নয় । উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে উক্ত মতবাদ যখন বিকাশ লাভ করছিল, জাতিরাষ্ট্রীয় আনুগত্যটি জাতীয়তাবাদের আদর্শের উপর ভিত্তি করেই রুপ পাচ্ছিল । রিচার্ড টি এন্টন জানাচ্ছেন যে এই আদর্শ চারটি মৌল উপাদানে গঠিত হয়েছিল-ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক আদর্শ, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় পরিচয়(যুক্তরাষ্ট্রে যা চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের নীতির মাধ্যমে প্রতিফলিত বা বাস্তবায়িত হয়); একটি বিশেষ চরিত্রের বা বৈশিষ্ট্যের রাজনৈতিক দল(প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র); এবং ভৌগোলিক এলাকার উপর ভিত্তি করে একটি ভাবাবেগসম্বলিত(জাতীয় আবেগ) আত্মপরিচয় এবং একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রতি আস্থা বা আনুগত্য ।

জুয়েরগেন্সমেয়ার যুক্তি দিয়েছেন যে, অতীতের ধর্মীয় আন্দোলনগুলো থেকে আধুনিক ধর্মীয় বিক্ষোভ-আন্দোলনগুলোর পার্থক্য হচ্ছে, বর্তমানেরগুলো জাতিরাষ্ট্র বা এর আদর্শকে এবং ধর্মীয় বৈধতার পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে প্রাধান্য দেয়াকে লক্ষ্যবস্তু করেছে । এইসব আধুনিক ধর্মীয় আন্দোলন(মৌলবাদী আন্দোলন) ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদকে প্রত্যাখ্যান করে । জুয়েরগেন্সমেয়ার আরো বলছেন যে, এসব আন্দোলনকারীরা(মৌলবাদীরা) ধর্মনিরপেক্ষতাকে পশ্চিম থেকে আমাদানী করা নয়া ঔপনিবেশিক আদর্শ বলে গণ্য করে । তারা ধর্মীয় বাগাড়ম্বর, আদর্শ এবং নেতৃত্ব প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যায় এবং ধর্মনিরপেক্ষ জাতিরাষ্ট্রের বিকল্প হিসেবে ধর্মভিত্তিক জাতিরাষ্ট্রের তত্ত্ব হাজির করে । প্রশ্ন হচ্ছে, একই যুক্তিতে ইসলামী আদর্শ বা কৃষ্টিকে কেন আরববহির্ভূত দেশগুলো গ্রহণ করবে নিজেদের বহুযুগের লোকায়ত সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে সেব্যাপারে মৌলবাদী তাত্ত্বিকরা নীরব-বাংলাদেশে জাতিরাষ্ট্রের ধারণার বিরুদ্ধে যারা লেখেন তাদের কলামে এপ্রশ্নের উত্তর থাকেনা । আর ধর্মনিরপেক্ষতা সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক আদর্শ, নাকি ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদ -সেটার প্রমাণ চোখের সামনেই রয়েছে-পাকিস্তান, মিশর, সৌদি আরব প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলোকে আমেরিকার নয়াউপনিবেশ ছাড়া আর কি বলা যাবে ? আফগানিস্তান ও পাকিস্তানকে ব্যর্থ রাষ্ট্র বানিয়েছে সেখানকার মৌলবাদী ও জঙ্গী দলগুলি । ওহাবদের আদর্শ যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে-সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না, কারণ আধুনিকতার বিরুদ্ধে ওহাবের অবস্থান কেবল সৌদি আরব-পাকিস্তানের মত দেশগুলিকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দিক থেকে পশ্চাপদ ও সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনেরই সুবিধা করেছে । আর মিশর যে মার্কিন নয়া-উপনিবেশ হওয়ার ভাগ্য বরণ করেছে তার কারণ হচ্ছে, সাঈদ কুতুব চক্র কর্তৃক মৌলবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে

নাসেরের প্রতিষ্ঠিত ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে জাতিরাষ্ট্রের ভিত্তিকে দুর্বল ও অস্থিতিশীল করা । প্রজ্ঞার দৃষ্টি দিয়ে ইবনে তায়মিয়ার অর্থোডক্স ইসলাম এবং ইবনে ওয়াহাবের সালাফি ব্রান্ডের প্যান ইসলামিজম(যা আফগানীর উদার ও আধুনিক প্যান ইসলামিজমের সংকীর্ণ রুপ) নাসেরের জাতীয়তাবাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর ও অন্তর্ঘাতমূলক হয়েছিল । কারণ ওয়াহাবী মতবাদ চরিত্রের দিক থেকে জাতীয়তাবাদবিরোধী এবং সেজন্য সাম্রাজ্যবাদের জন্য সুবিধাজনক । নাসেরের ক্ষমতাচ্যুতির ফলে ইসরাঈল, যুক্তরাষ্ট্র-ব্রিটেন এবং তাদের তেলকোম্পানীগুলোই লাভবান হয়েছে বেশী । তাই সাঈদ কুতুব চক্র কাদের স্বার্থরক্ষার জন্য তথাকথিত ইসলামী আন্দোলন করেছিল সেটা সত্যিই ভাববার বিষয় ।

খ) দার্শনিক নীৎসে তাঁর অস্তিত্ববাদের দর্শন(Existentialism)-এ দেখিয়েছেন যে ব্যক্তিমানুষের কর্মের জন্য দৈবশক্তির প্রভাব বা ভূমিকাকে বাতিলকরণ বা তার অনুপস্থিতির ধারণা বা নীতির মধ্যেই তার আপন কর্মের ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ ফলাফলের দায়দায়িত্বটি নিহিত রয়েছে । এই ধারণাকে আরো বিস্তৃত করলে কী দেখব ? প্রথমত ব্যক্তির স্বাধীন স্বত্ত্বার ধারণার নিশ্চয়তা অর্থাৎ সামাজিক-রাষ্ট্রিক পরিমন্ডলে এই স্বাধীন স্বত্তার স্বীকৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে ব্যক্তিমানুষের নৈতিকতার প্রশ্নটি-নিজের এবং সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি ।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির বিবেকের ও ভিন্নমত প্রকাশের স্বাধীনতা, অভাব-অভিযোগ-অপছন্দ-অন্যায়-বৈষম্য প্রভৃতির সুরাহার জন্য বিক্ষোভ প্রকাশের অধিকার, প্রতিকার-সমাধান-পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ বা প্রতিকার দাবী করার অধিকার এবং স্বাধীনতা ইত্যাদির মধ্যেই নিহিত রয়েছে পারস্পরিক দায়বদ্ধতার, মানবমুক্তি, মানবপ্রগতি এবং সমাজ-রাষ্ট্র ও ব্যক্তির কল্যাণের সম্ভাবনা ।

নী□সে যে চার্চকে অভিযুক্ত করেছিলেন যে, চার্চ মানুষের জীবনকে ডিমের খোলসের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে, তা সম্ভবত এই কারণে যে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে চার্চ ব্যক্তির স্বাধীন সত্ত্বাকে পদদলিত করছে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও শ্রেয়োবোধের উপর চার্চের ইচ্ছাকে ও ধর্মবিশ্বাসকে জোর করে চাপিয়ে দিয়ে । মধ্যযুগীয় য়ুরোপে চার্চের সীমাহীন ক্ষমতার বর্বর রুপ আমরা দেখেছি । প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী (বা অর্থোডক্সবিরোধী) লক্ষ লক্ষ খ্রীষ্টান, ইহুদী, বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানচর্চাকারী ছাত্রদেরকে 'ইনক্যুইজিশন'*[২৮] নামক ধর্মীয় পুলিশ সংস্থার মাধ্যমে ধরে এনে হত্যা করা হয়েছিল । 'সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে'-কোপার্নিকাসের এই তত্ত্বকে সমৃদ্ধ ও প্রচারের জন্য রোমান ইনক্যুইজিশন ব্রুনোকে পুড়িয়ে মেরেছিল ।

১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত গ্রন্থ 'ডায়ালগে' গ্যালিলিও কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে সমর্থন ও সমৃদ্ধ করার 'অপরাধে' তাঁকে রোমান ইনক্যুইজিশনের সামনে হাজির করা হয় ও কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় । তাঁর লিখিত ডায়ালগকে নিষিদ্ধ করা হয় । পরে বাকী জীবন তিনি ফ্লোরেন্সে গৃহবন্দী অবস্থায় কাটান । ব্রুনোর সমসাময়িককালে লুচিলিও ভানিনি, টমাস কিড, ফ্রান্সিস কেড প্রমুখকে ধর্মান্ধদের হাতে নিগৃহীত ও নির্যাতিত হয়ে নিহত হতে হয় । এ এক সুদীর্ঘ ইতিহাস..... ।

গ) আজকের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে উপরোক্ত আলোচনা কিভাবে প্রাসঙ্গিক ? আজ কি বাংলাদেশে একই ব্যাপার ঘটছে না ? ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর কি মৌলবাদী ও উলামাদের ইচ্ছাকে ধর্মের নামে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছেনা ? আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, বাংলাদেশে মাদ্রাসাগুলো এবং তাদের হেডকোয়ার্টার বায়তুল মোকাররম মসজিদ মধ্যযুগীয় য়ুরোপের চার্চের মতই রাষ্ট্রযন্ত্রের সমান্তরাল একটি ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চাইছে । বায়তুল মোকাররম মসজিদকে কেন্দ্র করে রক্ষণশীল ওলামাদের সংগঠন, হাজার হাজার মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল ও মোল্লা-মৌলবীদের সংগঠনগুলি,

এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলির সাম্প্রতিক ত[]পরতা থেকে তার চিত্র পাওয়া যায় । নারিনীতি ইস্যুতে বর্তমান মৌলবাদঘেঁষা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাদের একাংশের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের এবং নারী স্বাধীনতা ও নারীর ক্ষমতায়নের ধারাগুলোকে নিজেদের ইচ্ছেমত সংশোধন ও বাতিল করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে এই লক্ষণটিই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বায়তুল মোকাররম কীভাবে একটি 'চার্চতুল্য' প্রশাসনিক ক্ষমতাসম্পন্ন অশুভ প্রতিষ্ঠানরুপে বেড়ে উঠছে ।

এই ধরণের আলামত জাতির জন্য অশুভ পরিণতি বয়ে আনতে পারে । মোল্লাচক্র ও মৌলবাদী গোষ্ঠী(ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলো) বায়তুল মোকাররমকে 'রাষ্ট্রের সমান্তরাল একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে' পরিণত করতে সক্ষম হলে, দেশটি একটি নব্য ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত হবে । কারণ, তখন ধর্মের নামে গণমানুষের ইচ্ছা ও আকাঙ্খার উপর মোল্লা-মৌলবাদী চক্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে চাপিয়ে দেয়া হবে । এর কুফল আফগানিস্তানে আমরা দেখেছি, ইরানে এখন তা চলছে । সৌদি আরব তো প্রায় প্রতিদিনই শরীয়া কোর্টের মাধ্যমে নারী নির্যাতনের ঘটনার জন্ম দিয়ে চলেছে, যার সর্বশেষ হলো একজন গণধর্ষিতা নারীকে চাবুক দিয়ে শাস্তি দেওয়ার পর আবার কয়েক মাস জেল দেয়া হয়েছে (তথ্যসূত্রঃমুক্ত-মনা ফোরাম) । ধর্মের নামে তালেবানদের যে মধ্যযুগীয় বর্বর শাসন আমরা দেখেছি-নারীদের স্কুল বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে শিক্ষার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, চাকরী-ব্যবসা করতে না দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তিতে বাধ্য করা, বেপর্দা হওয়ার অপরাধে বা অবৈধ মেলামেশার অপরাধে প্রকাশ্যে পাথর ছুঁড়ে বা গুলি করে হত্যা করা ইত্যাদি । উপরের প্রত্যেকটি উদাহরণই ব্যক্তির নিজস্ব রুচি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও স্বপ্ন ও প্রতিভাকে তথা সৃজনশীলতা ও স্বাধীন সত্ত্বাকে পদদলিত করা হয়েছে ।

এখন, এই বিংশ শতাব্দীর শেষে আমরা কি বাংলাদেশে তেমনই একটি ধর্মরাষ্ট্রের নামে ফ্যাসিবাদী ও বৈষম্যমূলক-নির্যাতনমূলক রাষ্ট্র চাই কীনা সেটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যস্থা নিতে হবে । গ্রামে-গঞ্জে ফতোয়াবাজীর শিকার হয়ে শত শত নারী আত্মাহুতি দিচ্ছে, নয়তো গ্রামছাড়া হতে বাধ্য হচ্ছে । ধর্ম কোথায় আছে ? মানবতা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে ধর্মের কারণে । ফতোয়াবাজি এখন নিরীহ মানুষের সম্পত্তি গ্রাসের মাধ্যমে ধনী হওয়ার অনৈতিক রমরমা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে(দেখুন, শরীয়ার নামে ফতোয়াবাজির বর্বরতা; তথ্যসূত্রঃ সমকাল, ২২ মে ২০০৮ সংখ্যা; শিরোনাম-সুনামগঞ্জের গ্রামে নতুন এক 'বাংলাভাই') । গ্রাম্য সালিশীর মাধ্যমে বিচার-প্রবণতার অব্যাহত বৃদ্ধির মধ্যে আমরা তিনটি অশুভ লক্ষণ দেখতে পাই-১) এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলবাদী কর্তৃক রাষ্ট্রের আইন ও সংবিধানকে অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধা করার ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন জেনেশুনে । জেনেশুনে এইজন্যই বলছি যে, যারা এসব করছে, তারা সহজ-সরল কৃষক নয়, এরা অত্যন্ত স্মার্ট, আইন ও সংবিধান সম্পর্কে এরা ভালই খবর রাখে এবং আধুনিক আয়েসপূর্ণ জীবনযাপন করে ।

২) সালিশী বিচার অনুষ্ঠানে মাধ্যমে রাষ্ট্রের আইন ও রাষ্ট্রযন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করা;

৩) ভবিষ্যতে নিজেদের সাধের যে শরীয়া রাষ্ট্র কায়েম হবে বলে এই বর্বর মোল্লাগুলো স্বপ্ন দেখছে, তার প্রস্তুতি স্বরুপ নারীদেরকে গিনিপিগ বানিয়ে টেস্টকেস হিসেবে শরীয়ার বিধান প্র্যাকটিস করছে ।

তো আমরা পছন্দ করি না করি, আমাদের গ্রামভিত্তিক সমাজের আধাসামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের কারণে উপরোক্ত ক্ষতিকর উপাদানগুলি এতে রয়ে গেছে, যেগুলি একটি উদার, মানবিক ও আধুনিক

সমাজ-রাষ্ট্র গঠনের পথে অন্তরায় । কারণ, এমনকি বিচার বিভাগ বা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আমরা একটা সামন্ততান্ত্রিক মাইন্ডসেট দেখতে পাই, যা দেশে অনেক অঘটন, নৈরাজ্য, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার অভাব এবং সামরিক-বেসামরিক আমলাদের স্বৈরাচারমনস্কতা ও অগণতান্ত্রিক আচরণের জন্য দায়ী ।

ঘ) প্রিয় পাঠক, যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগ, স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাসবিদ্রোহের সময় থেকে মিশরে মূসা নবী হয়ে রসূলুল্লাহ্ পর্যন্ত, এই যে এত বিদ্রোহ, ঐশী বাণী প্রচারের আড়ালে সমাজবিপ্লব, এত রক্তক্ষয়, যন্ত্রণা-নিপীড়ন-মৃত্যু এসব কিসের জন্য ? য়ুরোপে ও পৃথিবীর অন্যান্যস্থানে এত বিপ্লব-বিদ্রোহে লক্ষ মানুষের রক্তদান, এসব কিসের জন্য ? এসবের অন্তর্গত লক্ষ্যটা তো ছিল সভ্যতার বিভিন্ন ধাপ পার হয়ে, অজ্ঞানতাকে অতিক্রম করে মানবাত্মার মুক্তি ঘটানো ।

কিন্তু আজ যদি মৌলবাদী চক্র বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, নারী স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতা, এবং ধর্মীয় সেন্টিমেন্টের একচেটিয়া অধিকারের নামে মতপ্রকাশ ও বিবেকের স্বাধীনতার ধারণাগুলোকে নস্যাত করে দেয়, মৌলিক মানবিক অধিকারের মতো সাংবিধানিক নীতিমালাগুলিকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করে(অর্থাৎ under mine করে), যেগুলো মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জাতি অনেক ত্যাগ স্বীকারের ভিতর দিয়ে অর্জন করেছে, তাহলে আমাদেরকে আবার একটি মধ্যযুগীয় ফ্যাসিবাদী-বর্বর রাষ্ট্রে ফিরে যেতে হবে । ওলামা চক্র আজ ধর্মের নামে নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতাকে নারীসমাজ তথা সমগ্র জনগোষ্ঠীর মতামত-শ্রেয়োবোধের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে একটি বৈধ ও পবিত্র সংবিধানকে অগ্রাহ্য করে । নারীদের সৃজনশীলতার অপমৃত্যু ঘটাচ্ছে ।

এভাবে ধর্মীয় মৌলবাদ একটি দেশের সমাজকে স্থবির ও বন্ধ্যা করে দেয় । বদ্ধ জলাশয় যেমন মশক, রোগজীবাণু প্রভৃতি উৎপাদনের উৎকৃষ্ট কারখানা, তেমনি একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ সমাজের পরতে পরতে যখন সর্বগ্রাসী স্থবিরতা ও হতাশা দানা বেঁধে উঠে, তখন সে সমাজের পক্ষে আর বড় মাপের জ্ঞানীগুনি, বিজ্ঞানী, বিচক্ষণ কর্ণধার জন্ম দেয়া সম্ভব হয়ে উঠেনা, ২০০০-এর দশকে আমরা যে প্রেক্ষিত দেখতে পাচ্ছি, যে অস্থিরতা-অবক্ষয় দেখতে পাচ্ছি এর মূলে রয়েছে শুধুমাত্র তরুণ প্রজন্মের সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব নয়, পুরনো প্রজন্মেরও বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াপনা । এ ধরণের ভাবই প্রকাশ পেয়েছে মৃত্যুর পূর্বে লেখা মনস্বী লেখক ওয়াহিদুল হকের একটি কলামে । তিনি লিখেছিলেন,

> '.....বাঙালীর বাছাই করা শ্রেষ্ঠ সন্তানগুলিকে তুলে নিয়ে যায় বধ্যভূমিতে । বাঙালীর বুদ্ধিতে পাঞ্জাবীর পাশবিকতায় বাঙলার ভবিষ্যটি মারাত্মক জখম হয়ে গেল । কতটা জখম হয়েছে বাঙালীর বাস্তবতা এবং বাঙালীর শ্বাস নেবার এবং বিকশিত হবার মানসাকাশ এতগুলি বুদ্ধিজীবি দিবস পালন করেও তার কোন ধারণা পাবার চেষ্টা করেনি বাঙালী, বাঙালী পড়েনা, লেখেনা- সার্থক করে বুদ্ধিজীবি হত্যাকে' ।

ধর্মবিশ্বাসী মুসলিম ভাইয়েরা যদি এলেখা পড়ে থাকেন, তাহলে তাদের বিবেক-বুদ্ধির প্রতি আমার প্রশ্ন থাকবে, মূসা নবীর নেতৃত্ব ফেরাউনের বিরুদ্ধে বনী ইসরাঈলের(ইসরাঈল জাতিকে) যে অসহযোগ ও বিদ্রোহ ঘটেছিল এবং মূসা তাওরাত (Old Testament) ধর্মগ্রন্থের যে ধর্মীয় বিধানগুলি নবী দিয়েছিলেন, সেকি শুধু সেসব আদেশ-বিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার জন্য। নাকি একটি শ্রেয়তর সমাজের স্বপ্নকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ? ঈসা বা যীশুর শিক্ষা কি শুধু তাঁর সেই যুগের রীতিনীতিতে থেমে

থাকার জন্য নাকি ভবিষ্যতের কল্যাণময় কোন উন্নত সমাজের জন্য ? যীশু জন্মেছিলেন বর্তমান প্যালেষ্টাইনের বেথলাহাম(Bethlehem) শহরে । তাঁর শৈশব কেটেছিল গালীল প্রদেশের নাজারেথ শহরে । লক্ষ্যণীয় যে তিনি যখন ধর্মপ্রচার করছিলেন, তখন প্যালেষ্টাইনসহ মধ্যপ্রাচ্য রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল । তাঁর আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকে ঈহুদীদের উপর শোষণ-নির্যাতন চলছিল এবং তার ফলশ্রুতিতে যে ঈহুদীদের যে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল তার ধারাবাহিকতা যীশুর নবী হিসাবে উত্থাণের সময় পর্যন্ত চলেছিল । রোমান সাম্রাজ্যের শক্তিমত্তা, বর্বরতা, লুণ্ঠন-অত্যাচার এবং তার বিপরীতে ঈহুদীদের অসহায়ত্ব, রোমানদের স্থানীয় এজেন্ট-শাসকদের স্বার্থপরতা, পুরোহিতদের নৈতিক অবক্ষয় এবং সাধারণ মানুষের নৈতিক আত্নশক্তির অবনতি তাঁর মনে রেখাপাত করে থাকবে । বিপ্লবীদের সমর্থন করার জন্য তাঁর নিজস্ব জনপ্রিয়তা কাজে লাগিয়ে ভক্ত সাধারণ মানুষকে আহ্বানের জন্য বিপ্লবীদের অনুরোধে তিনি সাড়া দেননি । সম্ভবত তিনি সেটাকে সময়োপযোগী ও দূরদর্শিতার কাজ হবে বলে মনে করেননি-হঠকারী মনে করেছিলেন বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে । যার ফলে ধর্মের আশ্রয়ে সমাজবিপ্লবের লক্ষ্যে মানুষের মধ্যে আত্মশক্তি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন-একথা বোধ করি বলা যায় । এটা কি আমার অনুমান ? প্রশ্ন হলো যে, একটি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম থাকার পরও, নিজে ইহুদী হয়েও যে যীশু ঈহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মপ্রচার শুরু করেছিলেন তার কারণ কি ? পন্ডিত ও ঐতিহাসিকদের মতে, তিনি রোমানদের কাছ থেকে ইহুদী সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, যখন বিদ্রোহীরা গোপনে সংগঠিত হচ্ছিল । এই পটভূমি বিচার করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আসলে তিনি ধর্মের আড়ালে আরেকটি ফ্রন্ট বেছে নিয়েছিলেন, যার লক্ষ্য ছিল মানুষের লাঞ্চনা-অপমানের অবসান ঘটানো ।

তো যা বলছিলাম, একইভাবে, মুহম্মদ(সঃ) কি তাঁর যুগের দাসতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপযোগী ধর্মীয় বিধিবিধান ও রীতিনীতির মধ্যে পৃথিবীর সব দেশের সমাজ পড়ে থাকবে, কেবলমাত্র সেজন্যই ইসলামের প্রচলন ঘটিয়েছিলেন, যখন নারীর মর্যাদা দেয়া হয়েছিল সেযুগের উপযোগী করে, (ধনীদের জন্য কেনা দাসীদের সঙ্গে সঙ্গম জায়েজ ছিল, এক স্ত্রী থাকা অবস্থায়ও দাসী অথবা একাধিক স্ত্রী রাখা শরীয়ত মোতাবেক বৈধ ছিল যদি খাওয়ানো-পরানোর সংস্থান থাকতো, এটা মানসিকভাবে স্ত্রীদের জন্য বহনযোগ্য ছিল কিনা সেটা সেযুগে বিবেচ্য ছিলনা । আরবে ইসলামপূর্ব যুগে প্রচলিত নারীর প্রতি বর্বরতার অবসান করতে, শরীয়ত প্রচলনের মাধ্যমে তাদেরকে পুরুষের করুণার পাত্রী করা হয়েছিল । হিলা বিবাহ হচ্ছে তখনকার দাসতান্ত্রিক সমাজের উপযোগী শরীয়া বিধানের ভালো উদাহরণ ।) সেই আকাঙ্খা বা ভবিষ্যত-চিত্রকল্প(Vi si on) তাঁর আরাধ্য ছিল ? নাকি আরো উন্নততর সভ্য সমাজের দিকে মানবসমাজ ধাবিত হবে সে vi si on নিয়ে তিনি ধর্ম প্রচার করেছিলেন ? কিন্তু নারীনীতি নিয়ে ওলামাদের কার্যকলাপ আমাদেরকে ধারণা দিচ্ছে যে, তাঁরা রসুলুল্লাহ্‌র বর্বর যুগে ফিরতে চাচ্ছেন, যা রসূলুল্লাহ্ চাননি ।

৭. নিরাময়ের পথ-পদ্ধতি--প্রোটেস্টান্ট মৌলবাদীদের উত্থাণের ইতিহাস থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, ভাইরাসের পুষ্টি যেমন পরজীবদেহের মধ্যকার কোষের প্রোটিনে, মৌলবাদীদের পুষ্টি হলো ধর্মবিশ্বাসী দুর্বল মনের মানুষকে দিয়ে । তাদের পুষ্টি রেডিক্যাল উদারীকরণের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট দারিদ্র্য, হতাশা, মানুষের অসহায়ত্ব এবং এর ফলে অদৃষ্টবাদিতা ও পারলোকিকতার প্রতি তাদের যে নির্ভরতা তার মধ্যে ।

তাদের বৃদ্ধি বা পুষ্টিকে ভ্যাকুয়াম থিওরীর উপমা দিয়ে চমকারভাবে ব্যাখ্যা করা যায় । সাধারণ অর্ধশিক্ষিত(এমনকি অনেক শিক্ষিত) মানুষের মস্তিষ্কে যদি আদর্শ-রুচি-অসাম্প্রদায়িক উদার

মানবতা ও মূল্যবোধের চেতনার গ্যাপ তৈরী হয়, তবে সেটা ধর্ম দিয়ে পূরণ করতে চায় । সাধারণ কূপমন্ডুক মানুষের চিরন্তণ স্বভাবই হলো, সে কোন না কোনভাবে জগ সম্পর্কে সাময়িক একটা মীমাংসা খুঁজে পেতে চায় সীমিত জ্ঞান দিয়ে । তাই, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের যে প্রশ্নগুলির বা ইস্যুগুলির কারণে তাকে বারবার মৌলবাদীর দ্বারস্থ হতে হয়, যথা-বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা, পরকালে বেহেস্তের ফল লাভের বাসনা এবং নরকভীতি, পারিবারিক বা ধর্মীয় নৈতিকতা-এসবের বিকল্প যে স্বাধীন সত্ত্বার চেতনা ও আদর্শ, সেটা মানুষকে দিতে হবে । সেটা দেয়ার জন্য আমি দুই ধরণের সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক মেকানিজ্‌মের প্রস্তাব করছি ।

১. গরীব মেধাবী ছাত্রের জন্য ভার্সিটিতে পড়ার জন্য স্কলারশিপ- ক) বিভিন্ন হিউম্যানিষ্ট ও প্রগিতিমনা ইন্টারনেট সাইট ও ফোরামগুলি এবং প্রবাসে অবস্থানরত বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগঠনগুলির মাধ্যমে একটি কল্যাণ ফান্ড গঠন করতে হবে ।

১) থানা বা উপজেলা পর্যায়ে কয়েকজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কমিটি করে দিতে হবে হিসাব, রক্ষণাবেক্ষণ, জনসংযোগ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য ।

২) ছাত্রদের ক্যাটাগরী অনুযায়ী প্রাথমিক থেকে সিনিয়র লেভেল পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের ছাত্রদের জন্য বিজ্ঞান, ধর্ম, পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস ইত্যাদির বিভিন্ন বিষয়ের বইয়ের সংগ্রহ রাখতে হবে অর্থা একটি আদর্শ পাঠাগারের ব্যবস্থা করা ।

৩) বিজ্ঞান, ধর্ম, পৃথিবীর ইতিহাস, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মাল্টিপল চয়েস প্রশ্নপত্র তৈরী করা ।

৪) থানা-উপজেলা পর্যয়ে পরীক্ষামূলকভাবে এক বা দুটি স্কুল বা কলেজের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রকে বাছাই করতে হবে প্রিটেস্টের মাধ্যমে ।

৫) একটি ঘরভাড়া নিয়ে সেখানে পাঠচক্রের ব্যবস্থা করতে হবে ।

৬) বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের রেজাল্টের রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তাদেরকে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে ফেলতে হবে । যথা-লেভেল-এ, লেভেল-বি ইত্যাদি । ক্যাটাগরির উপর ভিত্তি করে তাদেরকে বোঝার উপযোগী বিষয়ের বই পড়তে দিতে হবে । বই বাসায় নিয়ে যাওয়া যাবেনা, পাঠচক্রের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বই পড়তে হবে । পাঠচক্রের পরিবেশের গাম্ভীর্য রক্ষা করতে হবে য়ুরোপীয় ষ্টাইলে ।

৭) প্রিটেস্টে যারা ভালভাবে পাশ করবে, তারা পরের রাউন্ডে আরেকটু উচ্চস্তরের কঠিন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হবে ।

৮) দ্বিতীয় স্তরের পরীক্ষার জন্য তাদেরকে বই সরবরাহ করতে হবে এবং নিয়মিত পাঠচক্রের ব্যবস্থা রাখতে হবে ।

৯) পাঠাগারের পরীক্ষা ও স্কুল-কলেজের পরীক্ষার জন্য বিনা মূল্যে বিভিন্ন বিষয়ে কোচিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা । এব্যাপারে শহরে অবস্থানরত আমাদের (হিউম্যানিষ্ট বা বামপন্থী) প্রগতিশীল সাহিত্য ক্লাবগুলির সদস্যদের কাছ থেকে ভলান্টিয়ার হিসেবে চক্রাকার পদ্ধতিতে একটি একদিন বা দুদিনের জন্য ক্লাশ নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে ।

১০) প্রথম দিকে প্রতি দুই বা তিন বছরে শুধু একজনের জন্য একজনকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা যেতে পারে । তাই, পরীক্ষার অনেকগুলি ধাপ পার হয়ে যেতে হবে-এতে করে তারা যথেষ্ট পরিমাণ বই পাঠ করতে বাধ্য হবে ।

১১) পাঠাগারে পর্যায়ক্রমে একটি-দুটি কম্পিউটার ব্যস্থা করে ইন্টারনেট সংযোগ দিতে হবে।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাদেরকে মুক্ত-মনার মত সাইটগুলোতে ছড়া-কবিতা, রচনা প্রভৃতি প্রকাশের জন্য উ্সাহিত করে প্রতিভা বিকাশের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে ।

১২) পাঠাগারকে কেন্দ্র করে কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, ইত্যাদির ব্যস্থা করতে হবে । বিজয়ীদের জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখতে

১৩) পাঠাগারের কম্পিউটারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ে, ইউ-টিউব সাইটের থেকে সংগ্রহ করে আফগানিস্তান-ইরান প্রভৃতি দেশে শরীয়ার নামে নারী নির্যাতনের বিভিন্ন প্রামাণ্য ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে । ফতোয়াবাজির নামে নারী নির্যাতনের ঘটনার উপর যেসব নাটক বা ছবির ডিভিডি বা সিডি রয়েছে, সেগুলো দেখানোর ব্যবস্থা করা । যেমন-হাসান মাহ্মুদের 'হিল্লাহ্' নাটকটির চলচ্চিত্র রুপ দেয়া হয়েছে ।

১৪) সংখ্যালঘু নির্যাতনের যেসব প্রামাণ্যচিত্র ইউ টিউব ওয়েবসাইটে আছে, সেগুলি দেখানোর ব্যবস্থা করা । শ্রদ্ধেয় শাহ্রিয়ার কবীরের কাছে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অনেক প্রামাণ্যচিত্রের ক্যাসেট ও ডিভিডি রয়েছে । তাঁর কাছ থেকে কপি করে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করতে হবে ।

১৫) পাঠাগারের ইন্টারনেটের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখতে হবে ।

১৬) পাঠাগার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একটি সংবাদপত্রের কয়েকটি কপি রাখতে হবে, যাতে কিছু ছাত্র । এভাবে তাদের পত্রিকা পড়ার অভ্যাস ও সচেতনতা তৈরী হবে । ছাত্রদেরকে পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রগতিমনা লেখকের কলাম পড়ার জন্য উ্সাহিত করতে হবে ।

২. **১)** যুক্তরাষ্ট্রের সিভিল লির্বাটিজ ইউনিয়নের অনুকরণে বাংলাদেশে সবগুলি মানবাধিকার সংগঠন, আইনজীবি সংগঠন, নারী সংগঠন মিলে একটি 'সিভিল রাইটস ইউনিয়ন' ইউনিয়ন গঠন করা যেতে পারে । এই সংগঠন মৌলবাদবিরোধী এবং বিভিন্ন মানবাধিকার বা নারী অধিকার ইস্যুতে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করবে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে । এই সংগঠন মানবাধিকার ইস্যুতে আইনি লড়াই চালাবে ঐক্যবদ্ধভাবে ।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রটেস্টান্টদের উত্থাণের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বলা যায় যে, আইনি লড়াই বা আন্দোলনের পদক্ষেপ নেয়ার পূর্বে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী বা গোষ্ঠীর সম্ভাব্য সব ধরণের প্রতিক্রিয়া (বস্তুগত শর্ত), তাদের সাংগঠনিক শক্তির উ্সরুপ উপাদানগুলির অবস্থা ইত্যাদি সবকিছু বিবেচনায় রাখতে হবে । সেখানে মৌলবাদীরা যখন মামলায় জিতেছিল, ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির জন্য সেটা নৈতিক বিজয় ঘটেছিল । তাই প্রোপাগান্ডা একটা ভাল অস্ত্র হতে পারে ।

২) ঔষধ দিতে হবে সইয়ে সইয়ে, এই শিক্ষা প্রটেস্টান্ট মৌলবাদীদের উত্থাণ থেকে নিতে পারি । মৌলবাদীরা যখন বেশ কয়েকটি মামলায় হেরে যায়, তার পর থেকেই কিন্তু তারা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন সৃষ্টি ও ফান্ড রেইজিংয়ের মাধ্যমে শক্তিবৃদ্ধি করতে শুরু করেছিল । তাই আঘাত কতটা দিতে হবে সেটা ভেবেচিন্তে মামলা বা আন্দোলনে নামতে হবে । আসলে মামলা বা আন্দোলনের ক্ষেত্রে নৈতিক ন্যায্যতা থাকলেই হলোনা, জনসংযোগের মাধ্যমে, সামাজিক সংগঠন ও ফোরাম সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন মৌলবাদবিরোধী ও মানবাধিকারসংক্রান্ত ইস্যুগুলির ন্যায্যতা সম্বন্ধে ব্যাপক প্রচার-প্রপাগান্ডার ব্যবস্থা করতে হবে ।

টীকা ও পাদটীকা-

*১. এখানে 'আঘাত' বলতে আদর্শিক বা সংস্কারমূলক প্রভাব বোঝানো হচ্ছে, কোন 'ধর-মার-কাট'-এর মতো ব্যাপার নয় । লেখকের উক্ত বইটি পড়লেই তা বোঝা যাবে ।

২. ফ্রেড্রীখ উইলহেল্ম নীৎসে(১৮৪৪-১৯০০)-উনিশ শতাব্দীর জার্মান দার্শনিক ও ভাষাবিজ্ঞানী । ধর্ম, নৈতিকতা, সমকালীন সংস্কৃতি, দর্শন এবং বিজ্ঞান বিষয়ে সমালোচনামূলক(critique) গ্রন্থ লেখেন । নী□সের প্রভাব দর্শনকে অতিক্রম করে অস্তিত্ববাদ(Existentialism) ও উত্তরাধুনিকতা পর্যন্ত ব্যাপ্তিলাভ করে। অস্তিত্ববাদ(Existentialism)- হচ্ছে একটি জার্মানীতে সংগঠিত একটি দার্শনিক আন্দোলন যাতে প্রস্তাব করা হয় যে ব্যক্তিমানুষই জীবনের অর্থ ও সারবত্তাকে(জীবনবোধ) সৃষ্টি করে, সহজ কথায় জীবনকে অর্থময় করে তোলে-কোনরকম ঈশ্বর-দেবতা বা ঐশী শক্তি সেটা তার জন্য করে দেয় না । অস্তিত্ববাদ স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে স্বীকার করে নেয়,যে অতিপ্রাকৃত বা ঐশী শক্তির অনুপস্থিতির মানে দাঁড়ায়, ব্যক্তি মানুষ সম্পূর্ণরুপে স্বাধীন,
তাই চূড়ান্তভাবে আপন কর্মের দায়দায়িত্ব বহনকারী ।

৩. আয়াতুল্লা প্রথা-'আয়াতুল্লাহ্'(আরবীতে হলো : آية الله)-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'খোদার চিহ্ন বা 'খোদার ছায়া' । 'Twelver shi'sm'(আরবীতে 'ইথনাশারীয়াহ্; বা 'দ্বাদশ' শিয়া মতবাদ বা দ্বাদশ ইমাম এ আয়াতুল্লা হচ্ছে ইমামদের সামাজিক প্রভাব দ্বারা সমর্থিত উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ ধর্মীয় কর্তৃত্ব বা পদবী । আয়াতুল্লাহ্‌র অনুসারীরা তাদের ধর্মীয় নেতার কথাকেই নবী বা খোদার কথা বলে মনে করে । কোণ একটি সেক্টের আয়াতুল্লাহ্ ও তাঁর অনুসারী বা ভক্তদের মধ্যে 'পৃষ্ঠপোষক ও পোষ্য'-জাতীয় সম্পর্ক থাকে । কোন বিশেষ এলাকার ধর্মীয় নেতা(বা আয়াতুল্লাহ্)-র অনুসারীরা আয়াতুল্লাহ্‌র কাছে তাদের ধর্মীয়, সামাজিক, আর্থিক(যেমন-স্কুল, মসজিদ, হাসপাতাল প্রভৃতি নির্মাণের জন্য) ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ ও মুখোমুখি মন্ত্রণা গ্রহণের জন্য আয়াতুল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে থাকে । পরিবর্তে অনুসারীরা আয়াতুল্লাহ্‌কে 'পবিত্র আনুগত্য' দিয়ে থাকে যেকোন ব্যাপারে-যেমন, রাজনৈতিক-রাস্ট্রীয় বা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইস্যুতে ।

Twelver shi'sm'*(ইথনাশারীয়াহ্)-এটি হচ্ছে শিয়া সম্প্রদায়ের একটি শাখা বা সেক্ট । এটা দিয়ে পদবীও বুঝানো হয় । এটা এই বিশ্বাস থেকে এসেছে যে 'দ্বাদশ ইমাম' হচ্ছে বারোজন খোদা-নিযুক্ত(Divinely) ইমাম । যিনি ইসলামী জ্ঞান তথা ইসলামী আইনশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং দর্শনে বহু বছরের শিক্ষালাভের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ প্রাজ্ঞরুপে পরীক্ষিত ও স্বীকৃত তাঁকেই আয়াতুল্লাহ্ খেতাবে ভূষিত করা হয় ।

*৪--গ্রীক পূরাণে কথিত 'পেন্ডোরা'(যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'সমস্ত কিছুর দাতা', 'সমস্ত গুণাবলীর দাতা') ছিল প্রথম নারী । প্রত্যেক গ্রীক দেবতা অনুপম উপহারের মাধ্যমে তাঁকে সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিলেন । দেবতাদের প্রধান জিউস কারিগরি শিল্পের দেবতা হেফিস্টাসকে আদেশ করলেন পেন্ডোরাকে মাটির ছাঁচে তৈরী করতে । এটা ছিল প্রমিথিউসের আগুনের গুপ্ত রহস্য চুরি করার অপরাধে মানবজাতির শাস্তি । সমস্ত দেবতারা তাকে অনিষ্টকর ক্ষমতাসম্পন্ন উপহার দিলেন । আধুনিক ব্যাখ্যানুযায়ী, পুরা কাহিনীর মূল ঘটনা হলো, ওটা ছিল আসলে একটি জার(Jar), যার ঢাকনা পেন্ডোরা খুলে দিয়েছিল এবং যার ভিতর থেকে মানবজাতির জন্য অমঙ্গলজনক সমস্ত কিছুকে মুক্ত করে দিল-লোভ-লালসা, অহঙ্কার, কু□সা রটনা, ঈর্ষা, শত্রুতা, রোগ, হতাশা-নৈরাশ্য, বার্ধক্য, মৃত্যু, সন্ত্রাস, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি । শুধু একটি জিনিসই ঐ জারের মধ্যে ছিল- সেটি হলো আশা । তারপর পেন্ডোরা জারটি বন্ধ করে
দিল ।(তথ্যসূত্র-উইকিপিডিয়া, গোগল, ইন্টারনেট থেকে)

*৫-যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা রাজ্যের ডুরহাম সিটিতে অবস্থিত ডিউক য়ুনিভার্সিটির মানবিক বিভাগের প্রফেসর এবং 'Duke Islamic Studies Center'(ডিউক ইসলামিক গবেষণা কেন্দ্র)-এর পরিচালক এবং ছয়টি গ্রন্থের রচয়িতা যার মধ্যে রয়েছে 'Shattering the myth: Islam Beyond Violence and Defenders of God : The fundamentalist Revolt Against the Modern age'.

*৬-'Identity'-Identity is a term used throughout the social sciences to describe an individual's comprehension of him or herself as a discrete, separate entity. This term, though generic, can be further specified by the disciplines of psychology and sociology ।

*৭-Family resemblance(পারিবারিক সাদৃশ্যতা)-জার্মান দার্শনিক ল্যুডভিগ উইটজেনষ্টাইন(১৮৮৯-১৯৫১) প্রস্তাবিত একটি দার্শনিক ধারণামৌল । এই পরিভাষাটি তাঁর ব্যবহৃত একটি রুপকালঙ্কার যার মাধ্যমে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ককে বুঝানো হয়ে থাকে । এর মূল ভাবটি হচ্ছে, যেসব বস্তু বা ব্যক্তিসমূহকে একটি সাধারণ কাঠামোগত বা গাঠনিক বৈশিষ্ট্যে বা চেহারা দিয়ে সম্পর্কযুক্ত করা যায় বলে অনুমান করা হয়, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি ধারাবাহিকভাবে যুক্ত, পারস্পরিকভাবে আংশিক আবরণকারী বস্তুসমূহের সাদৃশ্য দিয়ে সম্পর্কযুক্ত করা যায়, যেখানে কোন বৈশিষ্ট্যই সবগুলোর সাথে কমন বা সাধারণ হয়না ।

*৮-Pluralization-Act of Pluralizing, Pluralism. Pluralism- বহুত্ববাদ; বিভিন্ন জাতিগত বা নৃতাত্ত্বিক উ□স, গোষ্ঠী, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সহাবস্থানের নীতি ।

*৯-য়্যানাবাপ্টিস্ট(Anabaptist)-ষোড়ষ শতাব্দীর য়ুরোপের মৌলিক সংস্কারপন্থী খ্রীশ্চিয়ানগণ যাদের উদ্ভব রোমান ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতিমুলক ত□পরতা এবং মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে পরিচালিত কর্তৃত্ববাদী(সামাজিক-রাষ্ট্রীয়) প্রটেস্টান্ট আন্দোলন(Magisterial Protestant Movement) এই উভয় প্রবনতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যেমে হয়েছিল । উক্ত সংস্কারবাদী ধারার জন্ম হয় সুইজারল্যান্ডে।

*১০-বাইবেলের পাঁচটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ- জেনেসিস(Genesis); এক্সোডাস(Exodus); লেভিটিকাস(Leviticus); সাংখ্য(Numbers); ড্যুটারোনমী(Deuteronomy) ।

*১১-মূসায়ী ঐশীত্ব বা পয়গম্বরী(Mosaic authorship)-উপরে বর্ণিত বাইবেলের পাঁচটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ মূসা(সঃ)এর মাধ্যমে উদ্ভূত বা সৃজিত বলে ঐতিহ্যগতভাবে যে বিশ্বাস আরোপ করা হয় ।

*১২-Old Testament:পুরানো নিয়ম, ইহুদীরা যাকে তানাক(বাংলায় তাওরাত) বলে থাকে ।

*১৩-New Testament(পুরনো নিয়ম) খ্রীষ্টীয় বাইবেলের দ্বিতীয়ার্ধ বা দ্বিতীয় খন্ডের নাম । প্রথমার্ধ হচ্ছে হিব্রু ভাষায় রচিত ইহুদীদের বাইবেল Old Testament বা পুরানো নিয়ম, ইহুদীরা যাকে তানাক(বাংলায় তাওরাত) বলে থাকে ।

*১৪-প্রেসবিটারিয়ান চার্চ(Presbyterian Church; Presbyterianism)-পশ্চিম য়ুরোপের প্রটেস্টান্ট খ্রীশ্চিয়ানদের সংস্কারকৃত(Reformed) একটি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সেক্টগুলির একটি পরিবার । এটি ক্যাল্ভিনপন্থী বা ক্যাল্ভিন মতবাদেরই(Calvinism)-এরই একটি উপধারা ।

*১৫-Moody Bible Institute-খ্রিষ্টীয় ভগবদ্বাক্য-প্রচারকগণ(Evangelist) এবং ব্যসায়ী ড্যুইট লীম্যান মুডি(Dwight Lyman Moody) কর্তৃক ১৮৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত খ্রীষ্ট-ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । যাতে তিনটি প্রধান মন্ত্রক বা বিভাগ অন্তর্ভুক্ত হয়-শিক্ষা, প্রচার(Broadcast) এবং প্রকাশনা(Publishing) ।

*১৬-Gospel*১৫-খ্রীষ্টের উপদেশাবলী বা জীবনকাহিনী; New Testament-এর* অন্তর্ভুক্ত চারটি বাইবেলীয় ধর্মগ্রন্থের একটি ।

*১৭-Evangel-খ্রীষ্টীয় গস্পেল(The Christian Gospel)

*১৮-প্রকৃতিবাদ(Naturalism)-যে মতবাদে বলা হয় যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই(প্রকল্প বা Hypothesis, সাময়িক ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া, পরীক্ষণ এবং পুনরাবৃত্তি-এই প্রক্রিয়া) হলো প্রকৃতিতে ঘটিত বাস্তব ঘটনাকে অনুসন্ধান-তদন্ত করার একমাত্র কার্যকর উপায় ।

*১৯-ম্যাককার্থিজ্‌ম(McCarthism)- যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যবহৃত একটি পরিভাষা; চল্লিশের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে প্রচন্ড কমিউনিষ্ট ভীতি ও সন্দেহবাদ গ্রাস করেছিল বা জনমনে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল তাকে বোঝানো হচ্ছে । সেই সময় বিশেষ করে মার্কিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর কমিউনিষ্ট প্রভাব বাড়ছে বলে ভয় ও সন্দেহ বাড়তে থাকে । তকালীন মার্কিন সিনেটর যোসেফ ম্যাক্‌কার্থীর সন্দেহবাদীতা ও উগ্রনীতি(McCarthy Doctrine)-কে লক্ষ্য করেই পরিভাষাটির জন্ম, যা পরবর্তীকালে আরো ব্যাপক ও সাধারণ অর্থে(অর্থা কেবল ম্যাক্‌কার্থীর অনুসৃত নীতি নয়-এটা এখন রুপকে পরিণত হয়েছে) রুপক হিসেবে প্রচলিত হয়েছে । সেই সময় কমিউনিষ্ট হওয়ার অপরাধে বা কমিউনিষ্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার অভিযোগে হাজার হাজার মার্কিনীকে বিভিন্ন সরকারী সংস্থা বা গোয়েন্দা সংস্থা, প্রাইভেট এজেন্সী, ও প্রাইভেট শিল্প-সংস্থার প্যানেল বা তদন্তকমটির তদন্তের নামে হয়রানি ও নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয় । হাজার হাজার মানুষ অন্যায়ভাবে চাকরীচ্যুত হয় ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয় এবং সারা জীবনের জন্য তাদের ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়ে যায় ।

*২০-Segregated, Segregation-একটি বর্ণবাদী নীতি; এর দ্বারা বিভিন্ন বর্ণের ও ধর্মের মানুষ পৃথক রেষ্টুরেন্ট, স্কুল, সিনেমাহল, রিয়েল এস্টেট, পাড়া-মহল্লা ব্যবহার করার প্রথা প্রবর্তনের অধিকার চাওয়া হয় । প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীল বর্ণবাদীরা এই দাবী জানায় ।

*২১-ইবনে তাঈমিঞা(১২৬৩-১৩২৮)-সুন্নী ইসলামী স্কলার; জন্ম- সিরিয়া সীমান্তের সন্নিকটবর্তী বর্তমান তুর্কীতে অবস্থিত হারানে । তিনি ছিলেন কঠোর শাস্ত্র-আচারনিষ্ঠ এবং কোরাণ ও সুন্নাহ্-এর ভিত্তিতে ঘোর শরীয়াপন্থী । তাঁর সময়ের সূফী ও দার্শনিকদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা(যেমন প্রেম ও ভক্তিমার্গীয় সাধনপথ), ধর্মীয় জ্ঞান ও ব্যাখ্যা এবং তার ভিত্তিতে যে আচার-অনুষ্ঠান সেসবকিছুর ঘোর বিরোধী ছিলেন । তিনি মনে করতেন যে একমাত্র কোরান ও সুন্নাহ-ই মুসলমানের জন্য মোক্ষলাভ ও বেহেস্তলাভের একমাত্র পথ । তাঁর মতে ধর্মীয় সত্যে পৌঁছানোর জন্য যুক্তিবাদ কোন বিশ্বস্ত মাধ্যম নয় । তিনি মনে করতেন, যে ইসলামী আইনশাস্ত্র যেভাবে গ্রীক যুক্তিবিদ্যা, দর্শন এবং সূফীমতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিল তা ইসলামের জন্য বেমানান । তাঁর সমসাময়িক কালের বিখ্যাত ঈমাম লিখেছেন যে, তায়মিঞা মনে করতেন, আল্লাহ্ আক্ষরিক অর্থেই বেহেস্তে বাস করেন, আক্ষরিক অর্থেই বেহেস্তের(মহাশূন্য বা আকাশের উপর) উপরে রয়েছেন এবং আক্ষরিক অর্থেই বেহেস্তের সিংহাসনে বসে আছেন ।

*২২-সালাফি(আরবীতে,**سلفي**; যার অর্থ পূর্বপুরুষগণ)-সালাফি আন্দোলনের সূচনা ঘটে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে জামাল আল আফগানী, আব্দুহ, এবং রশীদ রিদার নেতৃত্বে । সালাফি শব্দটির উপত্তি হয়েছে আস-সালাফ আস-সালিহীন শব্দটি থেকে, যার শাব্দিক অর্থ পূণ্যশীল ধার্মিক
পূর্বপুরুষগণ ।

*২৩-জামাল আল দীন আল আফগানী(১৮৩৮-১৮৯৭)-তাঁর জন্মস্থান নিয়ে বহুকাল যাব বিতর্ক চলেছে এবং সঠিক তথ্য জানা যায়না । তবে, তাঁর শৈশব ও কৈশরকালীন শিক্ষা আফগানিস্তানের কাবুল ও ইরানের তেহ্‌রানে নিয়েছিলেন । একটি মতে তিনি ইরানের আসাদাবাদে ১৮৩৮ সালেজন্মগ্রহণ করেছিলেন । কিন্তু প্রচুর পরিমান দলিল(১৮৯১ সালে ইরান থেকে নির্বাসনের পর প্রাপ্ত কাগজপত্রের সংগ্রহ) সাক্ষ্য দেয় যে তিনি ইরানে জন্মগ্রহণ করেছেন, যেখানে তাঁর শৈশব কেটেছে এবং একটি শিয়া মুসলিম পরবারে তিনি বেড়ে উঠেন ।

*২৪-Nikki R. Keddie, *Sayyid Jamal ad-Din "al-Afghani": A Political Biography*

(Berkeley: University of California Press, 1972), pp. 225-26.

*২৫-টোবাকো মঞ্জুরী(Tobacco Granting)-১৮৯০ সালের মার্চে শাহ্ ব্রিটিশ কোম্পানীকে 'বিশেষ টোবাকো সুবিধা' মঞ্জুর করেন । এর মাধ্যমে ব্রিটিশ লুঠেরা ঔপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানী ইরানের প্রায় সম্পূর্ণ টোবাকো সম্পদের উ□পাদন, বিক্রয় ও রপ্তানী করার একচেটিয়া অধিকার লাভ করে । বিনিময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বা□সরিক মাত্র ১৫০০০ পাউন্ড রাজস্ব দেয়ার এবং বিক্রয়লব্ধ লাভের মাত্র পচিশ শতাংশ দেয়ার ব্যবস্থা রাখে । বিলাসব্যসন ও য়ুরোপ ভ্রমণের কারণে ভেতরে ভেতরে শাহ্ দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল ।

*২৬-"আমি পয়গম্বর প্রেরণ করিনা, সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শকরুপে ব্যতীত"....."তাহাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নহে"....."আমি আপনাকে তাহাদের সংরক্ষক করি নাই এবং আপনি তাহাদের কার্য্যনির্বাহী নহেন"....."আপনি তাহাদের বলিয়া দিন, আমি তোমাদের উপর খবরদারকারী নহি "..... ।-সূরা আল্ আনাম, আয়াত ৪৮,৫২,৬৬, ৬৯ ও ১০৭ ।

"(হে রসূল) বলুন, সত্য তোমাদের পালনকর্তা হইতে আগত । অতএব, যাহার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক, এবং যাহার ইচ্ছা অমান্য করুক" ।....."আমি রসূলদিগকে সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারীরুপেই প্রেরণ করি ।"-সূরা কাহ্ফ, আয়াত ২৯ ও ৫৬ ।

*২৭-Mark Juegensmeyer-যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয় ও সান্তা বারবারা য়ুনিভার্সিটির সমাজতত্ত্ব, বৈশ্বিক গবেষণা ও ধর্মীয় গবেষণার প্রফেসর । তাঁর রচিত অনেকগুলি গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে-গান্ধীর পথ, স্রষ্টার মনে সন্ত্রাস, ধর্মীয় সন্ত্রাসের বিশ্বব্যাপী উত্থাণ ইত্যাদি ।

*২৮-Inquisition-(১২ শতাব্দী থেকে মোটামুটি ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত)- সাম্রাজ্যের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরোধিতার জন্য রোমান ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃক যে বিচারের প্রথা প্রচলিত ছিল । এই স্পেন, রোমান সাম্রাজ্য এবং পর্তুগালে প্রচলিত ছিল । ইনক্যুইজিশনের বিচারে বিধর্মীদেরকে নির্যাতন বা মৃত্যুদন্ড দিয়ে হত্যা করা হতো । এটা ছিল এক ধরণের গোপন পুলিশ ও বিচার সংস্থা । ১২৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রোমের নবম পোপ গ্রেগরী ইনক্যুইজিশন প্রতিষ্ঠা করেন । ১২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই বিচার প্রথা মধ্য ও পশ্চিম য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়ে । ইনক্যুইজিশনের মাধ্যমে ইয়োরোপে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয় ।

রবিউল ইসলাম, লেখক ও গবেষক। ইমেইল - rblislam@yahoo.com

মৌলবাদের জন্ম ও বিকাশ - রুখতে হবে কীভাবে

মোঃ জানে আলম

মৌলবাদের মূল উৎসভূমি

মৌলবাদের জন্ম ও বিকাশের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে সর্বাগ্রে তার মূল উ□সভূমি সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকা উচিত। একথা বলাই বাহুল্য-মূলতঃ ধর্মই হলো ধর্মীয় মৌলবাদের উ□সভূমি। পৃথিবীতে ধর্মের সংখ্যা ১০০৯টি এবং কোন ধর্মই তার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী পরিহার করেনি। প্রত্যেক ধর্মের দাবী হলো-সে ধর্মই একমাত্র সঠিক ধর্ম-শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তার বাস্তব কারণ হলো-কোন ধর্ম অন্য ধর্মের সঠিকত্ব স্বীকার করলে সে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা আর থাকেনা। মজার ব্যাপার হলো, যে সকল ধর্ম ঈশ্বরে বিশ্বাস করে আর যে সকল ধর্ম ঈশ্বরে বিশ্বাস করেনা (বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম) - তারা সকলেই পরস্পর বিরোধী। ইসলাম ধর্মে ইহুদী নাসেরাদের সাথে বন্ধুত্ব পর্যন্ত করতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সে কারণে একজন সত্যিকার ধার্মিকের পক্ষে অন্য ধর্মকে সহ্য করা- তাকে মেনে নেওয়া -- শ্রদ্ধা করা অত্যন্ত কঠিন--গোঁড়া ধার্মিকদের বেলায় তা প্রায় অসম্ভব। ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার বীজও নিহিত এখানে । তাই সাম্প্রদায়িকতা ও ধার্মিকতার মধ্যকার পার্থক্য রেখাটি অত্যন্ত ক্ষীণ। নিজ ধর্মে বিশ্বাস রাখা এবং একই সাথে অসাম্প্রদায়িক উদার ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী হওয়া সুকঠিন বৈকি। কারণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী ধর্মানুসারীরা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থকে ঐশী বাণী রূপেই ঘোষণা করেন এবং তাদের ধর্মগ্রন্থকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বলে দাবী করেন। যেহেতু এসব ধর্মানুসারীরা তাদের ধর্মগ্রন্থকে ঈশ্বরের বাণী মনে করেন, সেহেতু এ বাণী তাদের কাছে চূড়ান্ত এবং নির্ভূল। নিরীশ্বরবাদী ধর্মানুসারীরাও তাদের ধর্মবেত্তাদের বাণীকে সমভাবে নির্ভূল ও অলঙ্ঘনীয় মনে করেন। তাই ধার্মিক লোকেরা বিশ্বাস করেন--ধর্মীয় গুরু-যাযক-পুরোহিত-মোল্লারা যা সদম্ভে প্রচার করে থাকেন - একমাত্র ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার মধ্যেই তাদের ইহকাল ও পরকালের সার্বিক মুশকিল-আসান নিহিত এবং তা যথার্থভাবে অনুসরণ না করার কারণেই আজ আমাদের যত ইহজাগতিক বালা-মুসিবত। যেহেতু ধর্মবিশ্বাসী মাত্রেই বিশ্বাস করেন--তাদের ধর্মগ্রন্থ ঐশী বাণী, সেহেতু তা কখনো ভুল হতে পারেনা এবং তাকে সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিমার্জন করার এখতিয়ার কোন মানুষের নেই। অতএব ধর্মগ্রন্থ ও তার বাহক তথা নবী পয়গম্বরদের আদেশ নির্দেশ --আধুনিকতার মানদণ্ডে তা যতই অসঙ্গতিপূর্ণ হউক না কেন--সে অনুসারে আমাদের রাজনৈতিক-সামাজিক-রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনা করতে হবে। এ বিশ্বাস বা ধারণাই হলো ধর্মীয় মৌলবাদ। সুতরাং ধর্মীয় বিশ্বাসই হলো ধর্মীয় মৌলবাদের আদি উ□স-ভূমি এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতারও সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

মৌলবাদ কেন বিপজ্জনক?

প্রত্যেক ধর্মের মৌলবাদীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো--তারা তাদের ধর্মের মৌলিক বিধি-বিধানকে সমাজ ও রাষ্ট্রে অবিকলভাবে প্রয়োগ করতে চায়। তারা রাষ্ট্রের ও সমাজের সকল দিগনির্দেশনার জন্য ধর্মের আদিম ধারণা বা বিধি-বিধানকে অনুসরণ করে। মুসলিম মৌলবাদীরা সমাজ ও রাষ্ট্রের তাব□ সমস্যা সমাধানের জন্য

তাদের পবিত্র ধর্ম-গ্রন্থ কুরআন ও সুন্নাহের উপর নির্ভর করতে চায়। কুরআন যেহেতু ঐশী গ্রন্থ এবং হযরত মুহাম্মদ(দঃ) আল্লাহের প্রেরিত পুরুষ, সেহেতু কুরআন ও সুন্নাহের (নবীর জীবনাচরণ) বাহিরে কোন দিগনির্দেশনা মুসলমানেরা মানতে নারাজ। ইহুদী মৌলবাদীরা তোরাহ্ এর আক্ষরিক ব্যাখ্যার বাইরে বিন্দু-বিসর্গ যেতে প্রস্তুত নয়। খৃষ্টান মৌলবাদীরা প্রায় সকল প্রশ্নে বাইবেলের শিক্ষা অভ্রান্ত বলে দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে। সাধারণভাবে সকল ধর্মের মৌলবাদীরা, প্রাণীজগত ও পৃথিবী সৃষ্টি-রহস্য (Cosmology & Anthropology) নিয়ে তাদের স্ব স্ব ধর্মের ব্যাখ্যাকে অভ্রান্ত মনে করে-যদিও এসব ব্যাপারে ধর্মগ্রন্থগুলোর ব্যাখ্যা পরস্পর বিরোধী। মৌলবাদীদের এ ধারণা যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করা হয়, তখন রাষ্ট্র পরিচালনায় সাধারণ জনগণের মতামত গ্রহণ-এমনকি বৈজ্ঞানিক-যুক্তিনির্ভর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণেরও কোন সুযোগ থাকেনা। সবকিছু যেহেতু ধর্মের আদি নির্দেশ অনুসারে করতে হবে, সেহেতু এখানে কেবলমাত্র ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রাহ্য করা যেতে পারে। তাই ধর্মভিত্তিক বৃহ[] রাজনৈতিক দল " জামায়াতে ইসলামী বাঙলাদেশ" এর জন্মদাতা মওলানা মওদুদী পশ্চিমা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন। ইরানী বিপ্লবের নেতা আয়তুল্লাহ খোমেনি ইসলামী ব্যবস্থাকে পশ্চিমা গণতন্ত্রের বিপরীত প্রত্যয় (Anti-thesis) বলে উল্লেখ করেছেন। গণতন্ত্রের বদলে স্বেচ্ছাচার, মত প্রকাশের স্বাধীনতার বদলে বাক স্বাধীনতার কঠোর নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে নাগরিক অংশ গ্রহণের বদলে সে সুযোগের সংকোচন- এ সবই মৌলবাদী প্রশাসনের অন্তর্গত। প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেহেতু শুধুমাত্র ধর্ম-নির্দেশিত অনুশাসন প্রবর্তন করতে হবে, সেহেতু এসব নিয়ে বিতর্ক বা ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগও সেখানে থাকেনা। আইন বা নৈতিক প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার/যোগ্যতা শুধুমাত্র ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিরাই রাখেন, ফলে অন্য কারো মত গ্রহণের প্রশ্নই ওঠেনা। খোমেনি তার " কাসাফ আসরার" গ্রন্থে ধর্মশাস্ত্রের গুঢ়ার্থ উদ্ধারের চেষ্টার বিরুদ্ধে সাবধান করে বলেছেন- একমাত্র তারাই এর অর্থ বুঝতে পারবে, যারা আরবী ভাষায় বিজ্ঞ, বার ঈমামের শিক্ষার সাথে সুপরিচিত ও ধর্ম শাস্ত্র অধ্যয়নে সুদীর্ঘ সময় ব্যয় করেছেন। তাহলে ধর্মের যতই উদারনৈতিক ব্যাখ্যা দেওয়া হউক না কেন, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র কখনো (আধুনিক) গণতান্ত্রিক হতে পারেনা। তাই যারা ধর্ম-ভিত্তিক রাষ্ট্রের কথা বলেন, আবার জোটবদ্ধ নির্বাচন করে পশ্চিমা গণতন্ত্রের সিঁড়ি বেয়ে ক্ষমতার অংশীদার হয়েছেন এবং হতে চান, তাদের চরিত্রের স্ববিরোধীতা অত্যন্ত প্রকট। পৃথিবীতে অনেক রাষ্ট্র আছে, যাদের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো মুসলমান। সে অর্থে তারা মুসলিম রাষ্ট্র। তাদের মধ্য থেকে কোন রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্রের মডেল হিসাবে ধরতে গেলে সৌদি আরবকেই সর্বাগ্রে বিবেচনায় নিতে হয়। মাটির নীচে অগাধ (তবে অফুরন্ত নয়) তেল সম্পদের কারণে সে দেশ আজ একটি ধনী দেশ হলেও তার আর্থ-সামাজিক কাঠামোটি কেমন? যুগ যুগ ধরে সে দেশে শরিয়া আইনের নামে চলছে বাদশা শেখ আব্দুল আজিজ এর একটি গোষ্ঠীতান্ত্রিক পারিবারিক শাসন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাঠামোর সর্বত্রই একটি পরিবারের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ। রাষ্ট্র পরিচালনায় দেশের জনগণের বিন্দুমাত্র অংশগ্রহণ নেই। সে দেশের অগাধ তেল সম্পদ লুঠেপুটে খাচ্ছে তারা। আর তাদের তখত-তাউসকে নিরাপদ রাখার জন্য তারা পদলেহন করছে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের-বিনিময়ে যারা লুঠে নিচ্ছে তাদের তেল সম্পদ। চুরি করলে প্রকাশ্যে হাত কেটে ফেলা, বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্কের জন্য কোমর-সমান মাটিতে পুঁতে প্রকাশ্যে পাথর ছুঁড়ে মারাসহ একটি মধ্যযুগীয় বিচার ব্যবস্থা সে দেশে প্রচলিত- যেখানে আধুনিক বিচার পদ্ধতি অনুপস্থিত। মানুষের বাক-স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, ইত্যাকার মৌলিক মানবাধিকারের বালাই নেই। পরিহাসের বিষয় হলো, আরবী শেখরা পেট্রোডলারের বদৌলতে আধুনিক প্রযুক্তির সকল সুফল নিংড়ে নিয়ে অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবন যাপন করলেও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে আকঁড়ে

রেখেছে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারনা ও মূল্যবোধকে-কেবল আপামর জনগণকে শোষণ ও অবদমনের জন্য। আজ সর্বাপেক্ষা নিগৃহীত সে দেশের নারী সমাজ-যারা বস্তুতঃ এখনো অবরোধবাসিনী-মোঠা অঙ্কের যৌতুক না ফেলে যাদের পাত্রস্থ পর্যন্ত করা হয়না। তবুও প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত অঢেল তেল সম্পদ তাদের জনগণকে দারিদ্র্য থেকে রক্ষা করেছে। অপরাপর আরব দেশগুলোর অবস্থা ও তদ্রুপ। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে আফগানিস্তানের তালেবান রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা আরো লোমহর্ষক-ভয়াবহ-ভীবৎস। এখন প্রশ্ন হলো-আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আমরা এরকম একটি মধ্যযুগীয় ব্যবস্থায় নিয়ে যেতে চাই কিনা? নিলে আমাদের মুশকিল-আসান হবে কিনা?

আমাদের রাষ্ট্রের মৌলিক সমস্যাটা কি?

আমাদের দেশ এখন কোন ঔপনিবেশিক শাসকের করতলগত নহে। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন দশক পূর্বে আমরা আমাদের দেশকে স্বাধীন করেছি। কিন্তু ভৌগোলিক এ স্বাধীনতাকে সার্বিক অর্থে অর্থবহ করার জন্য যে আর্থ-সামাজিক মুক্তি, তা আমরা এখনো অর্জন করতে পারিনি। সে আর্থ-সামাজিক মুক্তি অর্জনে আমাদের যা করতে হব--প্রথমতঃ সমাজের প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকতে হলে যে ন্যূনতম অর্থনৈতিক সঙ্গতির প্রয়োজন, তার নিশ্চয়তার জন্য প্রত্যেক পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে; এটাই মানুষের পাঁচটি মৌলিক মানবাধিকার-অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকি□সা-বাসস্থান অর্জনের পথ সুগম করবে। অতঃপর সমাজে মানুষের মত প্রকাশের অধিকার--একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যা নিশ্চিত হবে। আইনের শাসন কায়েম করতে হবে--প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি আধুনিক বিচার ব্যবস্থা যার অপরিহার্য পূর্বশর্ত। কিন্তু উপরোক্ত কোন শর্তই ধর্মীয় অনুশাসনের সাথে সম্পর্কিত নয়। অধিকন্তু ধর্মীয় শাসনের নামে মৌলবাদীরা যে ব্যবস্থা চালু করতে চাচ্ছে সে ব্যবস্থায় আর যাই থাকুক, মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকতে পারেনা, থাকতে পারেনা আধুনিক বিচার ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নটি ইহজাগতিক- অর্থনৈতিক নীতিমালার সাথেই সংশ্লিষ্ট- কোন ধর্মীয় বিধিব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত নয়। তাই সমস্যাটি ধর্মের নয়, সমস্যাটি রাজনৈতিক-অর্থনীতির। স্মর্তব্য যে, ইসলামী শরিয়া আইন কায়েম করলে উপরোক্ত সমস্যাগুলো যদি সমাধান হোয়ে যেত, তাহলে বিগত ৬০ এর দশক তথা বাঙলাদেশের জন্মের পূর্ব থেকেই সাংবিধানিকভাবে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা এবং বিগত ৮০ এর দশক থেকে শরিয়া আইন ও হুদুদ আইন চালু থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের মানুষ কি আর্থ-সামাজিক মুক্তির সন্ধান পেয়েছে? তাছাড়া ইসলামী বিপ্লবের পর ইরানের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ইতিহাস কী বলে? কী বলে তালেবান-শাসিত আফগানিস্তানের ইতিহাস? বরং বেদনাদায়ক সত্য হলো পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি আজ একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদঃ মৌলবাদের হিংস্ররূপ

মৌলবাদ বাংলাদেশে জঙ্গিরূপ ধারণ করেছে-বিগত ১৭ই আগস্ট, ০৫ সালে একই সাথে ৬৩টি জেলায় বোমাবাজি- ধারণাটিকে তর্কাতীত করে তুলেছে। পরবর্তী সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে আত্মঘাতী বোমা হামলার মাধ্যমে দু'জন বিচারকসহ বেশ কয়েকজন আইনজীবি ও নিরীহ মানুষ মারা গেছেন। ইতিপূর্বে মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের সাথে গাঁটছড়া-বাঁধা বর্তমান জোট সরকার দৃঢ়তার সাথে দেশে মৌলবাদী শক্তির

অস্থিত্বই অস্বীকার করেছেন । জঙ্গি ত□পরতার সংবাদ পরিবেশনের জন্য উল্টা বিরোধী দল ও সংবাদ মাধ্যমকে দায়ী করেছেন--দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অপপ্রয়াসের অভিযোগ তুলে। কয়েকজন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার ও বিদেশী সাংবাদিককে বহিস্কার করেছেন। 'বাঙলা ভাই'- 'ইংরেজী ভাই' নামে কেউ নেই বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বারংবার তার 'বাংলিশ' ভাষায় গলাবাজি করেছেন। কিন্তু আজ মৌলবাদ যখন জঙ্গীরূপে আবির্ভূত হয়ে জাতীয় নিরাপত্তাকেই হুমকীর মুখোমুখী করেছে, তখন কর্তাব্যক্তিরা বোল পাল্টিয়ে বলতে শুরু করেছে- এটা একটা গ্লোবাল সমস্যা। মৌলবাদের উত্থানকে অস্বীকার করে-প্রকারান্তরে তাকে প্রশয় দিয়ে-যে অন্যায় বর্তমান জোট সরকার করেছেন, তার ছেয়ে গুরুতর অন্যায় তারা করে চলেছেন অপরাধীদের না ধরে -- বিরোধী দলের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে- শূণ্যে তরবারি ঘুরিয়ে-জনগণের জীবনকে নিরাপত্তাহীন করে দিয়ে। আজকের ভীবৎস বাস্তবতা হলো আমাদের রক্তমূল্যে কেনা প্রিয় স্বদেশভূমি আজ উগ্র-পশ্চাদপদ-মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারনায় বিশ্বাসী কতিপয় গোঁড়া ইসলাম-ধর্মীয় মৌলবাদীদের হাতে আক্রান্ত। তাদের প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে পৃষ্ঠপোষকতা করছে একাত্তুরের সে পরাজিত জামাত-শিবির চক্র।

ইতিহাসের নজিরবিহীন আত্মত্যাগের মাধ্যমে-একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের জঠর ছিঁড়ে-নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জন্ম-নেওয়া একটি রাষ্ট্রে মৌলবাদের এ বিপজ্জনক উত্থান কিভাবে সম্ভব হলো? বাঙালি জাতির সমকালীন ইতিহাসের এটাই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা নির্মম পরিহাস--দুর্বোধ্য স্ববিরোধীতা (চধ□ধফড়ী) । এ স্ববিরোধীতার ব্যাখ্যার মধ্যেই নিহিত আছে একে রোখার সঠিক পথ ও পন্থার সন্ধান।

মৌলবাদের জন্ম ও বিকাশ

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটঃ প্রেক্ষিত পাকিস্তান

বাঙলাদেশে মৌলবাদের জন্ম ও বিকাশকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে পাকিস্তানে মৌলবাদের জন্ম ও বিকাশের কার্যকারণ বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কারণ-

প্রথমতঃ পাকিস্তানের জন্ম ধর্মীয় দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এ দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা। সে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত উপমহাদেশের দু'প্রান্তে অবস্থিত দু'টি মুসলিম প্রধান অঞ্চলকে নিয়ে গঠিত হোয়েছিল পাকিস্তান (যদিও তা ছিল ঐতিহাসিক লাহের প্রস্তাবের পরিপন্থী) । আজকের বাঙলাদেশ ছিল সেদিনের পূর্বপাকিস্তান। তাই ১৯৪৭ সালে জন্ম থেকে ১৯৭১ সালে বাঙলাদেশের অভ্যূদয় পর্যন্ত দু'দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস হলো এক ও অভিন্ন।

দ্বিতীয়তঃ জন্মের অব্যবহিত পর হতে পাকিস্তানের রাজনীতিতে ধর্মের অনুপ্রবেশ, এতদবিষয়ে ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা এবং সস্তা জনপ্রিয়তা ও ধর্মভীরু আমজনগণের ভোটের আশায় মৌলবাদী শক্তির সাথে মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর অপরিণামদর্শী আপোষকামীতা প্রভৃতি পাকিস্তানে মৌলবাদের জন্ম ও বিকাশে যে ভূমিকা রেখেছে সে ইতহাসের বিস্ময়কর রেপ্লিকা হলো বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস।

দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে বৃহত্তর ভারতের সংখ্যালঘূ মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র দাবী করলেও মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বস্তুতঃ কোন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রবক্তা ছিলেন না। তার স্বপ্ন ছিল মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় পাকিস্তান গণপরিষদে(১১ই আগস্ট, ১৯৪৭ ইং) তার প্রদত্ত প্রথম ভাষণে--যেখানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন--

"আমরা একটি রাষ্ট্রের নাগরিক-এই প্রতিপাদ্য থেকেই আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। এটিকেই আমাদের আদর্শ হিসাবে সামনে রাখা প্রয়োজন এবং আপনারা দেখবেন সময়ের ব্যবধানে হিন্দু আর হিন্দু থাকবেনা, মুসলমানেরাও মুসলমান থাকবেনা। ধর্মীয় অর্থে নয়। কারণ ধর্ম হলো মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ক্ষেত্র। একটি জাতির নাগরিক হিসাবে তথা রাজনৈতিক অর্থে-- পাকিস্তানের নাগরিক হিসাবে" । তার এ বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি পাকিস্তানকে মূলতঃ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। (যদিও তা অর্জনে তিনি ধর্মকেই হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছেন এবং ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষতা সোনার পাথরবাটির মত অবাস্তব)। একইভাবে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লেয়াকত আলী খানও ছিলেন পশ্চিমা গণতন্ত্রের সমর্থক। ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করলেও তারা কখনো ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেননি। ধর্মভিত্তিক দলগুলো-বিশেষভাবে 'জামায়াতে ইসলাম' ও 'মজলিশে আহরার এ ইসলাম'- পাকিস্তান আন্দোলনেরই বিরোধীতা করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান জন্মের অব্যবহিত পর তারা কীভাবে ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক অঙ্গণে নিজেদের স্থান করে নেয়, সে ইতিহাস অত্যন্ত তা□পর্যপূর্ণ ও চমকপ্রদ। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রকাশ্য বিরোধীতার কারণে 'জামায়াতে ইসলামী' ও 'মজলিশে আহরার এ ইসলাম' প্রভৃতি ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলো পাকিস্তান জন্মের পর অত্যন্ত কোণঠাসা হোয়ে পড়ে। রাজনৈতিক অঙ্গনে ফিরে আসার জন্য তাদের কোন ধর্মীয় নোতুন ইস্যুর প্রয়োজন ছিল। এমতাবস্থায় তারা 'কাদিয়ানীরা মুসলমান নহে' এবং 'রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে' -- এরকম একটি অবান্তর--সদ্যস্বাধীন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অগ্রগতির প্রশ্নে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন-হাস্যস্পদ ইস্যুকে সামনে নিয়ে আসে। ১৯৪৯ সালে কাদিয়ানীদের অমুসলমান ঘোষণার দাবী করে মজলিশে আহরার এ ইসলাম কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গার আহবান করে। তাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল জামায়াতে ইসলামী ও তাদের তাত্ত্বিক গুরু মৌলানা মওদুদী। তাদের প্রত্যক্ষ উস্কানীতে পাঞ্জাবে কাদিয়ানী বিরোধী দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়-- দ্রুত লাহোরেও ছড়িয়ে পড়ে এ দাঙ্গা এবং তা ক্রমে ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে থাকে। দীর্ঘ চার বছর ব্যাপী চলার পর ১৯৫৩ সালে দাঙ্গা এমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে যে, পাকিস্তান সরকার লাহোরে সামরিক শাসন জারী করতে বাধ্য হয়। এ দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। দাঙ্গার বিষয়ে তদন্তের জন্য সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে কমিটি গঠিত হয়। আদালত বিচারে দাঙ্গায় প্রত্যক্ষ উস্কানী প্রদানের জন্য মৌলানা মওদুদীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন- যা তার প্রাণভিক্ষা আবেদনের কারনে মওকুফ করা হোয়েছিল। সৌদী বাদশাহর হস্তক্ষেপে পরবর্তী সময়ে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ভয়াবহ দাঙ্গা পরিস্থিতি সামরিক শাসনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেও ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের খুশী করার জন্য এবং ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠীর সমর্থনের আশায় পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লেয়াকত আলী খান পাকিস্তানের সংবিধানে "অবজেকটিভ রেজুলেশন" যুক্ত করলেন, যাতে বলা হল-পাকিস্তানের সংবিধানে কুরআন ও সুন্নাহের পরিপন্থী কোন ধারা থাকতে পারবেনা। পাকিস্তানের সংবিধানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র শব্দ কয়টি যোগ করা হল এবং সংবিধানের কুরআন ও সুন্নাহের পরিপন্থী কোন ধারা আছে কিনা তা পরীক্ষা করার

জন্য আলেমদের নিয়ে একটি ওলেমা পরিষদ গঠন করা হল। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লেয়াকত আলী খান মৌলবাদীদের সাথে এভাবে আপোষ করলেন। পাকিস্তানের রাজনীতিতে ধর্ম এভাবে নিজের স্থান করে নিল এবং মৌলবাদী ধর্মভিত্তিক দলগুলো এটাকে তাদের প্রাথমিক বিজয় ভেবে উল্লসিত হলো। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হলো--ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ধর্মীয় মৌলবাদীদের সাথে আপোষ করেও লিয়াকত আলী খান ক্ষমতায় থাকতে পারলেননা। আততায়ীর নির্মম গুলির আঘাতে তাকে জীবন দিতে হয়েছে। সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে অতঃপর যা চলতে লাগল তাহলো-- প্রাসাদ রাজনীতি--- ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র-- পর্দার অন্তরালে সামরিক-বেসামরিক আমলা ও কিছু ক্ষমতান্ধ রাজনীতিকের ক্ষমতার হিস্যা নিয়ে কামড়া-কামড়ি। ইস্কান্দর মীর্জা প্রেসিডেন্ট, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইউব খান প্রধানমন্ত্রী, অতঃপর মাত্র ৩০ মাসের মাথায় ইস্কান্দর মীর্জাকে তাড়িয়ে আইউব খানের ক্ষমতা অধিগ্রহণ--এসব পরিবর্তনের সাথে পাকিস্তানের আমজনগণের কোন সম্পর্ক ছিলনা, ছিলনা কোন আদর্শিক দ্বন্দ্ব-এসব নিছক ক্ষমতার লড়াই। এমনকি জনগণ বুঝতেও পারতনা কোত্থেকে কি হচ্ছে। সব কিছু ঘটছিল পর্দার অন্তরালে। অন্দর মহলের মল্লযুদ্ধে সর্বশেষ বিজয়ী নটেরগুরু জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানে ভাগ্যবিধাতা হিসাবে আবির্ভূত হলেন ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে। ক্ষমতা গ্রহণের পর বৃটিশ ভাবধারায় প্রশিক্ষিত জেনারেল আইয়ুব ১৯৬২ সালে তার ঘোষিত সংবিধানে পাকিস্তানের নাম থেকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র শব্দ কয়টি বাদ দিলেন, মুসলিম পারিবারিক আইন সংশোধন করলেন-- গোঁড়া মোল্লাদের কট্টর বিরোধীতা সত্ত্বেও-- মুসলিম পারিবারিক আইনে কিছু পরিবর্তন আনলেন। কিন্তু তার এ ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থানও বেশী দিন টিকলনা। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তারও সস্তা জনপ্রিয়তার প্রয়োজন অনুভত হলো এবং সে লক্ষ্যে কিছু দিনের মধ্যেই ১৯৬২ সালের সংবিধানে আবারো সংশোধনী এনে ইসলামী প্রজাতন্ত্র শব্দ কয়টি যোগ করল। সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ বিষয় হলো-১৯৬৫ ইং সালে ফাতেমা জিন্নাহের বিরুদ্ধে নির্বাচন করতে গিয়ে এক শত আলেম থেকে ফতোয়া আদায় করল-- ইসলামী রাষ্ট্রে কোন মহিলা রাষ্ট্র-প্রধান হতে পারেনা। সকল বিরোধী দলের সমর্থন ও প্রচুর জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও মৌলিক গনতন্ত্রীদের ভূঁয়া চেক প্রদান সহ নানা কারচুপির মাধ্যমে নির্বাচনে বিজয়ী হলো আইয়ুব খান। তার এ বিজয়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে মোল্লাদের অবস্থান আরো সুসংহত হলো। অবিভক্ত পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল সেদিনের পূর্বপাকিস্তানের বাঙালিদের স্বাধিকার আন্দোলন দমিয়ে রাখার জন্য পাকিস্তানী শাসকেরা বরাবরই ধর্মকেই ব্যবহার করেছে। সর্বশেষ বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ঠেকাতে গিয়ে যে গণহত্যা--নারী ধর্ষণ-এ সকল অপকর্ম তারা করেছে ধর্ম রক্ষার নামে। মাত্র ২৪ ব□সরের মধ্যে পাকিস্তান ভেঙ্গে বাঙলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার বিপদ সম্পর্কে-কী পাকিস্তানী রাজনীতিবিদ, কী সামরিক

জান্তা-কেউ আদৌ কোন শিক্ষা নেয়নি। বরং সে বিপজ্জনক পথেই পাকিস্তানের অভিযাত্রা অব্যাহত থাকল। সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে নির্বাচনে জিতলেও জুলফিকার আলী ভূট্টোর স্বৈরাচারী অপশাসন ও নির্বাচনে প্রচণ্ড কারচুপির বিরুদ্ধে বিরোধী জোটবদ্ধ আন্দোলন যখন তুঙ্গে ওঠে, তখন ধর্মীয় দলগুলোকে হাতে নেওয়ার জন্য এবং আমজনগণকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে ভূট্টো কিছু শরীয়া আইন প্রণয়ন করলেন। ভুট্টোই প্রথমবারের মত জামায়তের দাবী মোতাবেক কাদিয়ানীদের ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসাবে ঘোষণা করলেন। ভূট্টোকে ক্ষমতাচ্যুত করে জেনারেল জিয়া--এতদিন ধরে

পাকিস্তানী রাজনীতিবিদরা তিলে তিলে যে কাজটি করছিলেন--ধর্মীয় মৌলবাদীদের সাথে আপোষ করে পাকিস্তানকে একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত করা--তার ষোলকলা পূর্ণ করল। ভূট্টো কাদিয়ানীদের ধর্মীয় সংখ্যালঘু ঘোষণা করেছিলেন, জিয়াউল হক তাদের অমুসলিম ঘোষণা করলেন। তাদের সরকারী চাকুরী থেকে অপসারণ করলেন। কাদিয়ানীদের মসজিদগুলো বন্ধ করে দিলেন। কাদিয়ানীদের আলাদা পরিচয় পত্র, তাদের জন্য আলাদা নির্বাচন ব্যবস্থা করা এবং দেশে হুদুদ আইন চালু করে শরীয়া আদালত গঠন করলেন। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহের স্বপ্নের বিপরীতে তার উত্তরসুরীরা পাকিস্তানকে একটি মধ্যযুগীয় ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করল। চুরি করলে হাত কেটে ফেলা, যৌন ব্যভিচারের জন্য মাটিতে পুঁতে পাথর ছুঁড়ে মারা, একজন পুরুষ সাক্ষীর বিপরীতে দু'জন নারী সাক্ষী হাজির করা-হুদুদ আইনের নামে সকল মধ্যযুগীয় আইন আজ পাকিস্তানে বিদ্যমান। মজার ব্যাপার হচ্ছে জিয়াউল হকের পরবর্তী সময়ে পশ্চিমাভাবধারায় প্রশিক্ষিত বেনজির ভূট্টো ক্ষমতাসীন হলেও জিয়াউল হকের ইসলামীকরণের বিরুদ্ধে কোন সংস্কার পদক্ষেপই নেননি। ত[illegible]পরবর্তী সময়ে ক্ষমতাসীন নেওয়াজ শরীফ এর আমলেই-পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ পৃষ্টপোষকতায়-তালেবানদের উত্থান। আজকের সামরিক শাসক মোশারফ মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে যতই হম্বিতম্বি করুক না কেন, ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানে-যেখানে রাষ্ট্রই মৌলবাদী- সেখানে ইসলামী মৌলবাদীদের কিভাবে রুখবেন তা আদৌ বোধগম্য নয়। অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে মৌলবাদ আজ পাকিস্তানে অনেক শক্তিশালী। গত ২২শে জানুয়ারীর 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' এর এক প্রতিবেদনে লেখা হয়--আফগানিস্তানের সীমান্ত সংলগ্ন একটি জেলায় বস্তুতঃ তালেবানদের শাসন চলছে। পাকিস্তানের প্রশাসন সেখানে মূলতঃ নিষ্ক্রিয়। ইতিহাসের নির্মম পরিহাস হলো-স্বাধীনতার দীর্ঘ ৫৯ বছর পরও পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হতেতো পারলইনা বরং একটি ধর্মীয় গোঁড়ামী আক্রান্ত সামরিক স্বৈরতন্ত্রই হলো আজকের পাকিস্তান--যার নিগড় থেকে বের হওয়ার জন্য একাত্তুরের বাঙালিদের মত বর্তমানে লড়াই করছে

বেলুচিস্তানের মুক্তিকামী জনগণ-বালুচ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ধর্মীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্রের জাতিগত শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এর ফলশ্র"তি আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ। সঙ্গত কারণেই ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র আমাদের ৪ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে সংবিধানে গৃহীত হয়। একটি স্বল্প-শিক্ষিত, দারিদ্রক্লিষ্ট জনগোষ্ঠির এ অর্জন -রাষ্ট্র পরিচালনায় উপরোক্ত আদর্শগুলোকে নীতিমালা হিসাবে গ্রহণ ছিল বাস্তবিকই অভাবনীয়- যা পশ্চিমা বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক অগ্রগতির পর অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে একটি স্বল্প-শিক্ষিত ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর এ অর্জনের তা[illegible]পর্য আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়না। তাই আমরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করি, স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বঙ্গবন্ধু সরকার মাদ্রাসা শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া শুরু করেন। অথচ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলাদেশের অভ্যূদয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে- রাজাকার-আলবদর বাহিনী সৃষ্টির মাধ্যমে-তাদের নব্বই শতাংশের উপরে ছিল মাদ্রসার ছাত্র ও শিক্ষক। স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকদের একাধিক সভা-সমাবেশে দুঃখের সাথে কথাটি উল্লেখ করলেও তার সরকার ইসলামী

ফাউণ্ডেশন সৃষ্টি করলেন। আজকে সে ইসলামী ফাউন্ডেশন মৌলবাদীদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। তারপরও ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতা অন্যতম রাষ্ট্রীয় নীতিমালা হিসাবে বহাল ছিলÑধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধ ছিল এবং ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার সুযোগ অবারিত ছিলনা। কিন্তু ১৯৭৫ সালের আগষ্ট মাসে এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে ক্ষমতাচ্যূত করে যারা ক্ষমতাসীন হলো তারা সর্বাগ্রে তাদের এ অপকর্মের বৈধতা দিতে জনগণের সামনে আবির্ভূত হলো ধর্মের আলখাল্লা পড়ে। এতবড় একটা জঘন্য হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে মাথায় কালোটুপি ও মুখে আল্লাহ-রসুলের নাম নিয়ে মঞ্চে আবির্ভূত হলো খুনী মোস্তাক- প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিভূ হিসাবে-ক্ষমতাসীন হয়েই যে তার পরিহিত কালো টুপিকে জাতীয় টুপি ঘোষণা করেছিল। এ প্রতিবিপ্লবের সুবিধাভোগী হিসাবে ক্ষমতাসীন সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান দেশের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র মুছে দিলেন। নৃতাত্ত্বিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্থলে নিয়ে আসলেন বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদ। অর্থনৈতিক নীতিমালার ক্ষেত্রে অধনবাদী বিকাশের পথ- যা সমকালীন উন্নয়নশীল দেশগুলেতে সঠিক উন্নয়ন কৌশল হিসাবে খুবই জনপ্রিয় ছিল- পরিহার করে ধনবাদী বিকাশের পথ গ্রহণ করলেন। বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমার পরও সুনির্দিষ্ট অভিযোগে একাত্তুরের যে সকল যুদ্ধাপরাধী বিচারের অপেক্ষায় ছিল তাদেরও ক্ষমা করে দেওয়া হলো। জামাতে ইসলামী সহ ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোকে ধর্মের নামে রাজনীতি করার লাইসেন্স ফিরিয়ে দিলেন। জামাতের আমীর যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজমকে দেশে এনে রাজনীতিতে পূনর্বাসিত করলেন। কতিপয় মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশ-বিশেষভাবে সৌদী আরবের আর্থিক সাহায্য নিয়ে জামায়াতে ইসলামী তাদের রাজনৈতিক প্রচারণা তীব্রতর করল- যার মূল লক্ষ্য ছিলো বাঙলাদেশের স্বাধীনতাকে ভুল প্রমাণ করা এবং বাঙলাদেশকে তথাকথিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রে রূপান্তর করা। পচাঁত্তরের পট পরিবর্তনের পর ধারাবাহিকভাবে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজেদের রাজনৈতিক বৈধতা আদায় ও আমজনগণের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবার জন্য ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করা শুরু করল পূর্ণোদ্যমে। মেজর জিয়া তার সকল বক্তব্য শুরু করার আগে প্রকাশ্যে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" বলা শুরু করলেন। জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ডের পর ক্ষমতাসীন খলনায়ক, তুলনাহীন দুশ্চরিত্র হোসেন মোঃ এরশাদ রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের মাত্রাটা আরো বাড়িয়ে দিলেন একই লক্ষ্যে-- তার সব অপকর্মকে বৈধতা দেওয়া। তিনি সংবিধান সংশোধন করে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে দেশটাকে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে রূপান্তরের দিকে এক ধাপ এগিয়ে দিলেন । ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহারের সাথে এরশাদ রাজনীতিতে পীরতন্ত্রের প্রবর্তন করে নোতুন মাত্রা যোগ করলেন । তিনি প্রকাশ্যে রাষ্ট্রীয় হেলিকপ্টার ব্যবহার করে বিভিন্ন পীরের কাছে যেতে শুরু করলেন এবং এসব গণ্ডমুর্খ ও ভণ্ড পীরের উপদেশ প্রকাশ্যে সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রচার করতেন। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারকে এরশাদ এমন এক হাস্যকর পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যে, যখন তার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন তীব্র হয়ে উঠল, তখন তিনি প্রতি শুক্রবারে কোন না কোন মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করতে যেতেন। মসজিদে গিয়ে তিনি পূর্বরাত্রে স্বপ্নাদিষ্ট হোয়ে সেই মসজিদে জুমার নামাজ পড়তে এসেছেন বলে ডাহা মিথ্যা অবলিলায় বলে যেতেন; অথচ মানুষ জানত, এরশাদ আসবেন বলে দু'তিন দিন পূর্ব থেকেই সরকারী লোকেরা ঐ মসজিদ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা ও নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত ছিল। এরশাদের পতনের পর প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দল নির্বাচনী কৌশল হিসাবে নগ্নভাবে ধর্ম ও ভারত বিরোধীতাকে কাজে লাগাল। ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহারে তারা এতটুকু গেল যে, আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে ধর্ম চলে যাবে, মসজিদে মসজিদে আজানের পরিবর্তে উলু ধ্বনি হবে--

দেশ ভারতের অঙ্গ রাজ্যে পরিণত হবে- ইত্যাকার কথা জোরেশোরে বলে বেড়াতে লাগল । বলাবাহুল্য তারা এ অপকৌশলে সফল হয়ে নির্বাচনে জিতেছিল এবং ক্ষমতাসীন হোয়ে তারাও রাজনীতিতে-রাষ্ট্রীয় আচারানুষ্ঠানে- ধর্মের ব্যবহার বাড়িয়ে দিল। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বৃহ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ--সম্ভবতঃ ভোটের রাজনীতির বিবেচনায় এবং বিরোধী প্রচারণার জবাবে- তাদের রাজনৈতিক আচার আচরণেও ধার্মিকতা প্রদর্শণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলো। জয় বাঙলা শ্লোগানের সাথে তারা ও "লা-ইলাহা ইল্লালাহু-নৌকার মালিক তুই আল্লাহ"--প্রভৃতি শ্লোগান উচ্চারণ করতে লাগল। বিএনপি ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় বিভিন্ন উপনির্বাচনে বিএনপির সীমাহীন কারচুপি একটি দলীয় সরকারের অধীনে যে কোন নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলল। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ আন্দোলন শুরু করল। সে আন্দোলন করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ যুগপ কর্মসূচী গ্রহণ করল জামায়াতে ইসলামীর সাথে। আন্দোলনের মুখে প্রথমে বিএনপি একতরফা একটি নির্বাচন-অতঃপর সে নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন পাশ এবং সে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি সরকারের সর্বাত্মক ব্যর্থতার পটভূমিতে আবারো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পটপরিবর্তন হলো। সুদীর্ঘদিন পর এবার ক্ষমতায় এলো মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ। কিন্তু বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে তত্ত্ববধায়ক সরকারের আন্দোলন করতে গিয়ে জামায়াতের সাথে অঘোষিত ঐক্য করে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির কী ক্ষতিটা আওয়ামী লীগ করেছে সে উপলব্ধি আওয়ামী নেতৃত্বের এখনো হয়েছে কিনা জানিনা। শুধু তা নয়, আওয়ামী লীগ ও তার রাজনৈতিক আচরণে এমন কিছু পরিবর্তন আনল যা প্রকারান্তরে ধর্মীয় রাজনীতিকেই উসাহিত করল। দীর্ঘদিন পর ক্ষমতাসীন হয়ে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পূনর্বাসনের তেমন কোন কার্যকর উদ্যোগত গ্রহণ করলই না, বরং তাদের দলীয় কর্মসূচী এবং রাষ্ট্রীয় কর্মসুচীতে তারা ধর্মীয় আচার-আচরণ অনুসরণ করতে শুরু করল পূর্ণোদ্যমে। সংসদে প্রত্যেক সাংসদদের মাথায় টুপি পরে বসা এবং যে কোন বক্তব্যের শুরুতেই জোর গলায় "বিসমিল্লাহীর রাহমানির রাহিম" বলা, কোন কিছুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থপান করতে গিয়ে মোনাজাত করা, যে কোন অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলোয়াত করা, নেতা-নেত্রীর ফি বছর হজ্জ করা ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মীয় আচরণের সাথে রাজনৈতিক আচরণকে গুলিয়ে ফেলে অপরাপর ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণের সাথে আওয়ামী লীগের আচরণের পার্থক্য নির্ণয় করা দুরূহ হয়ে পড়েছিল-যা বস্তুতঃ ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকেই বৈধতা প্রদান করছিল। মজার ব্যাপার হলো, ক্ষমতাসীন হয়ে বিএনপিতো নয়ই, আওয়ামী লীগও এরশাদ প্রণীত রাষ্ট্রধর্ম বাতিল করার কথা চিন্তাও করলনা। কিন্তু এত কিছু করেও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যেমন থাকতে পারলনা, তেমনি যে সকল ধর্মীয় গোষ্ঠীর মনজয় করার জন্য আওয়ামী লীগ এতকিছু করল -তাদের মন থেকেও আওয়ামী লীগ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা মুছে ফেলতে সক্ষম হলনা। বরং জাতীয়তাবাদী দল আরো এক ধাপ এগিয়ে জামাতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট নামক দলের সাথে জোট বেঁধে নির্বাচন করে আজ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়। ইতিহাসের নির্মম পরিহাস হলো-রাজনৈতিক স্বার্থে-ক্ষমতার লোভে- যে বৃহ রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মকে নিজেদের সুবিধামত রাজনীতিতে ব্যবহার করছে শেষ পর্যন্ত তারা কেউ ক্ষমতায় থাকতে পারবেনা বরং তাদের এ রাজনৈতিক আচরণ মৌলবাদীদের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করে দিবে। ক্ষমতাসীন হয়ে জোট সরকার ধর্মপালনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের কাঁধে তুলে দিল। ক্ষমতান্ধ হয়ে এ সামান্য বোধটুকু আমাদের জাতীয়তাবাদী নেতারা হারিয়ে ফেলল যে, রাষ্ট্র একটি সামাজিক সংগঠন-কোন সংগঠনের কোন ধর্ম থাকেনা। ধর্ম, তথা উপসনা-ধর্ম (ডড়ংযরঢ় জবষরমরড়হ) থাকে মানুষের--কোন বস্তু বা সংগঠনের নয়।

বস্তু বা সংগঠনের ইহকাল পরকাল নেই। তারা স্বর্গ-নরকে যাবেনা। তাই তাদের ধর্মের প্রয়োজনও নেই। কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্ম পালনের ফলে প্রকারান্তরে বৈধতা পেল ধর্ম নিয়ে রাজনীতি ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি। এভাবে সেক্যুলার রাজনীতির শিকড় কাটা হতে লাগল একে একে। বলাবাহুল্য, কেবল ক্ষুদ্র বাম গণতান্ত্রিক দলগুলো -জনমনে যাদের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ-ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির শ্লোগান অব্যাহত রাখল। কিন্তু তাদের কণ্ঠের আওয়াজ এতই ক্ষীণ যে তা আমজনগণ পর্যন্ত পৌছেনা। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, পাকিস্তানী রাজনীতিবিদরা যেভাবে ক্ষমতার স্বার্থে তিলে তিলে ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করে পাকিস্তানকে একটি ধর্মভিত্তিক সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন, ঠিক সে পথেই আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা দেশকে নিয়ে যাচ্ছেন। তফাৎ শুধু এই যে, আমাদের জনগণের প্রতিরোধের মুখে সামরিক আমলা এদেশে পাকিস্তানের মত শেকড় বিস্তারে সক্ষম হয়নি।

ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকাঃ

ধর্মীয় রাজনীতির জন্য উপরোক্ত উর্বর ভূমিতে মধ্যপ্রাচ্যের বিপুল পেট্রো-ডলার পেয়ে জামাতে ইসলামী ইতোমধ্যেই নিজেদের খুব সংগঠিত দল হিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এতদ্ব্যতীতও ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, জামায়াতে মুজাহেদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)-যাকে অনেকে জামায়াতে ইসলামীর সশস্ত্র শাখা বলে মনে করে-হরকাতুল জিহাদ, খতমে নওবুয়াত আন্দোলন-জামাতে ইসলামী যাদের পৃষ্টপোষকÑ জিহাদ আন্দোলন প্রভৃতি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর জন্ম হয়- যদিও তথাকথিত ইসলামী শাসনব্যবস্থার স্বরূপ নিয়ে তাদের মধ্যেও তীব্র মতবিরোধ বিদ্যমান। মধ্যপ্রাচ্যের টাকায় পরিচালিত বিভিন্ন ইসলামী এনজিওদের প্রধান কাজ হলো এসমস্ত ধর্মীয় দলগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা করা। এভাবে বিদেশী, বিশেষভাবে মধ্যপ্রাচ্যের টাকায় উপরোক্ত রাজনৈতিক দলগুলো এদেশের সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে আল্লাহের দুনিয়ায় আল্লাহের শাসন কায়েমের জিগির তুলে দেশের বিশেষভাবে গ্রামের দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি সমর্থকগোষ্ঠী সৃষ্টি করতে পেরেছে। এজন্য তারা বিশেষভাবে টার্গেট করেছে গ্রামের মাদ্রাশাগুলোকে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যের সুযোগে তারা তাদের তরুণ ছেলেদের সহজে প্রলুব্ধ করতে পারছে। নগর সভ্যতার বিকাশ ও পাশাপাশি গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার সীমাহীন দারিদ্র্য ও পশ্চাদপদতা, শহরের সাথে গ্রামের বৈষম্য মৌলবাদী ধারণা প্রসারের জন্য উর্বর ক্ষেত্র তৈরী করে রেখেছে।

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটঃ বাঙলাদেশ প্রেক্ষিত

মৌলবাদ প্রসারের আরো একটি মূল কারণ হচ্ছে বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলোর সীমাহীন ব্যর্থতা। স্বাধীনতার দীর্ঘ তিন দশক পরেও আমাদের দেশে যেমন একটি সত্যিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিকশিত হয়নি, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানেও তারা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। মুক্তবাজার অর্থনীতিকে উন্নয়নের অব্যর্থ মডেল হিসাবে গ্রহণ করা হলেও বস্তুতঃ দেশে কাঙ্খিত শিল্পায়ন ঘটেনি। ফলতঃ সমাজে যেমন শ্রেণী বৈষম্য তীব্র হোয়েছে, তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য। উ্পাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কহীন এক শ্রেণীর শহুরে লুঠেরা ধনিকদের সীমাহীন জৌলুস-আধুনিক জীবন যাপন-আর অন্যদিকে গ্রামের বিশাল দারিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার প্রাণান্তকর আদি সংগ্রাম-এ স্ববিরোধী বৈশিষ্ঠমণ্ডিত কোন সমাজ কখনো স্থিতিশীল হতে পারেনা। বেকারের সংখ্যা তিন কোটির উপরে।

ফি বছর ২১/২২ লক্ষ শিক্ষিত বেকার শ্রমের বাজারে প্রবেশ করছে। দুর্নীতি সর্বগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ করে পুরো সমাজকে গিলে ফেলেছে। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা দুর্নীতিগ্রস্থ দেশের কলঙ্ক তিলক আমাদের মাতৃভূমির ভালে শোভা পাচ্ছে বিগত চার বছর ধরে। স্বাধীনতার পর হতে আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠীর ধারাবাহিক ব্যর্থতার ফলশ্রুতিতে আজ গ্রামীণ ও শহুরে নিম্ন-মধ্যবিত্ত দরিদ্র যুবশ্রেণীর মনে যে হতাশা দানা বেঁধেছে তাকেই সুপরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাবার প্রয়াস পাচ্ছে ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলো। আলজেরিয়া, মিশর ও তুরস্কের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করলেও আমরা একই রকম চিত্র দেখতে পাব যে, সে সব দেশেও সামাজিক বৈষম্য ও দারিদ্র দূরীকরণে মূল রাজনৈতিক শক্তিগুলোর ব্যর্থতা মৌলবাদের উদ্ভব ও বিকাশের উর্বর ক্ষেত্র তৈরী করে দিয়েছে। এহেন একটি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ক্ষমতাসীন চক্র মৌলবাদকে মোকাবেলার পরিবর্তে তাদের কর্মসূচীকেই আত্মীকরণ করে ফেলেছে। এক্ষেত্রে বৃহ রাজনৈতিক দলগুলো কে কতটুকু ধার্মিক, তা প্রমাণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা কারিকুলাম চালু করার পরিবর্তে তারা ধর্মীয় অনুশাসন নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছে।

রুখতে হবে মৌলবাদ

মৌলবাদী শক্তিকে কেবল রাজনৈতিকভাবে পরাজিত করে -উনিশ শ' একাত্তুরে যেমনটি আমরা করেছিলাম- রোখা যাবেনা। চুড়ান্তভাবে ঠেকাতে হলে তাকে রুখতে হবে আদর্শিকভাবে। সারাদেশে ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে ওঠা মাদ্রাশাগুলোতে শিক্ষার নামে যা ছড়ানো হচ্ছে তা মূলত ধর্মাশ্রয়ী কুপমণ্ডুকতা ও অজ্ঞতা। অথচ মৌলবাদের প্রধান আশ্রয় হলো অজ্ঞতা। বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ও নারী শিক্ষার বিস্তার সে অজ্ঞানতা রোধে প্রধান ভূমিকা নিতে পারে। বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনার প্রসার ঘটাবে ও তার লালন মৌলবাদী অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে বর্ম হিসাবে কাজ করবে। এ লক্ষ্য অর্জনের প্রধান শর্ত হচ্ছে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিযুক্ত করা। মৌলবাদীদের সন্তুষ্ট করার জন্য সরকার যদি একের পর এক ধর্ম পালনের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়, তাতে মৌলবাদের ভিত্তি কেবল শক্তই হবে। তাই বৈজ্ঞানিক যুক্তি বিস্তারের মাধ্যমে সর্বাগ্রে আমাদের মৌলবাদী মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার অসারতা, অপ্রাঙ্গিকতা-পশ্চাদপদতা ও গণবিমুখতা তুলে ধরতে হবে আম জনগণের কাছে- বিশেষভাবে বর্তমান প্রজন্মের কাছে। সেজন্য একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

মৌলবাদের মূল উস যেহেতু ধর্মীয় গোঁড়ামী এবং এ গোঁড়ামীর উর্বরক্ষেত্র যেহেতু অশিক্ষা-কুশিক্ষা, সেহেতু তাকে রুখতে হলে আমাদের সর্বাগ্রে শিক্ষা, বিশেষভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে একই শিক্ষা পদ্ধতির আওতায় আনতে হবে। ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করতে হবে এবং ধর্ম নিয়ে রাজনীতি এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক কাঠামো, বেকারত্ব দূরীকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচন, আইনের শাসন কায়েম, গ্রাম ও শহরের বৈষম্য দূরীকরণ-বিশেষভাবে গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন- ইত্যাদি আশু পদক্ষেপ মৌলবাদ উত্থানের বিরুদ্ধে বর্ম হিসাবে কাজ করবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, স্রোতস্বিনী নদীতে যেমন কোন শেওলা-শৈবাল জন্মাতে পারেনা, তেমনি একটি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক, গণতান্ত্রিক ও উন্নত আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে মৌলবাদসহ কোন প্রকার

কুসংস্কারের আগাছা শিকড় গাড়তে পারবেনা।

তথ্যসূত্রঃ

* ইসলাম, রাজনীতি এবং রাষ্ট্র-পাকিস্তান অভিজ্ঞতা-সম্পাদনা-আসগর খান

- General in Politics- By-Asgar Khan
- Religion in Global Politics- Jeff Haynes
- Pakistan: Nationalism without a Nation—Edited by- Christophe Jaffrelot
- Will Baluchistan Break Out of Pakistan ?
  Frédéric Grare-- January 31, 2006—Source --internet

মোঃ জানে আলম, গবেষণা, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিষয়ক সম্পাদক, গণফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটি।

নবম অধ্যায় : ধর্ম ও নারী ৮ ৯ ৬ *[ক্লিক করুন]*

- পুরুষ রচিত 'ধর্মে' বিকলাংগ নারী : *নন্দিনী হোসেন ৮ ৯ ৭ [ক্লিক করুন]*
- ' সনাতন ধর্মে' র দৃষ্টিতে নারী : *অনন্ত বিজয় ৯ ১ ০ [ক্লিক করুন]*
- চিরকালীন মোল্লাতন্ত্র বনাম নারীর সমানাধিকার : *রবিউল ইসলাম ৯ ১ ৯ [ক্লিক করুন]*
- নারীকে ক্ষমতাহীন করেছে একক ঈশ্বরের প্রবক্তারা : *দীক্ষক দ্রাবিড় ৯ ৪ ৪ [ক্লিক করুন]*

পুরুষ রচিত ধর্মে বিকলাঙ্গ নারী

নন্দিনী হোসেন

ধর্মের স্রষ্টা পুরুষ। তাই দেখি 'ঈশ্বর' ভাবনাতেও পুরুষালী ছায়া। পুরুষের জন্য সব আরাম-আয়েশ স্ত্রী, দাসী, বাদী কতো কী। নারীর জন্য কিছুই নেই। জীবনে-মরণে একই পুরুষ । মরেও তার শান্তি নেই- বেহেস্তে গেলেও যেতে হবে, হাড়মাংস জ্বালানো সেই মিনষেটার সাথে! কিন্তু বেহেস্তে যাবেন কিভাবে? পবিত্র আল কোরানে ইসলামের জন্য জিহাদ (সংগ্রাম) করলে, মহান আল্লাহতায়ালা জান্নাতে (স্বর্গ) প্রবেশের নিশ্চয়তা দিয়েছেন (সুরা ইমরান, ৩:১৪২; সুরা মোহাম্মদ, ৪৭:৪-৬; সুরা ফাতাহ, ৪৮:৫); তা জান্নাতে গিয়ে জীবনবাজি রেখে ইসলামের জন্য যুদ্ধ করা জিহাদিরা কী পাবেন? পাবেন-যতখুশি ফলমূল, সুরা ভর্তি পেয়ালা আর মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র পরিধানরত আনতনয়না-পরমাসুন্দরী চিরকুমারীদের (সুরা সোয়াদ, ৩৮:৫১-৫২; সুরা আদ দোখান, ৪৪:৫১-৫৭); যারা চিরকুমারী, প্রেমময়, যেন এক একটি ঢেকে রাখা মুক্তা (সুরা আল ওয়াক্বেয়া, ৫৬:১০-৪০); যাদের এর আগে কোন মানুষ বা জিন কখনো স্পর্শ করে নি (সুরা আর রহমান, ৫৫:৫৬); এ হুরেরদল (জার্মান ভাষায় 'হুর' শব্দের অর্থ গণিকা!) জান্নাতের তাঁবুতে রয়েছে অপেক্ষমাণ অবস্থায় (সুরা আর রহমান, ৫৫:৭২)। কিন্তু এগুলো তো পুরুষদের জন্য, আর নারীর জন্য? কিছুই নয়। কেউ কেউ বলেন নারীর জন্য রয়েছে তার "পূন্যবান স্বামী"! ভালো করে বিভিন্ন ধর্মের কেতাব লক্ষ্য করলে দেখা যায়, জান্নাত বা স্বর্গ হচ্ছে এক একটি গণিকালয়, যেখানে মদ-নারীর ছড়াছড়ি। আর এই গণিকালয়ের তত্ত্বাবধায়ক হচ্ছেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা! দুঃখের কথা, এরপরও আমাদের এ সমাজের বেশিরভাগ নারীই এই ধরণের ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন এবং বিপদের দিনে তাঁর কাছেই আশ্রয় খোঁজেন!

সোজা কথায় নারীর স্বার্থ কখনও পুরুষের ধর্ম দেখেনি; দেখার কথাও নয়। তাই প্রচলিত সবগুলো ধর্মগ্রন্থ আতিপাতি করে খুঁজেও পুরুষতান্ত্রিকতার বাইরে দাঁড়িয়ে লেখা হয়েছে এমন একটা শব্দও পাওয়া যাবে না। আসলে পুরুষের চোখ নারীকে যেভাবে দেখে, দেখতে ভালোবাসে, যেমন করে নারীকে পেতে চায় ধর্মগ্রন্থগুলোকে ঠিক সেভাবেই সাজানো হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হওয়া স্বাভাবিক আল্লাহ/ঈশ্বর/গড ভয়ানক এক চোখা! ভয়ানক রকম পুরুষতান্ত্রিক নারীলোভী; আবার আর সেই পরিমাণ-ই নারী বিদ্বেষী! নিচের হাদিস দেখলে নারীর অবস্থান ধর্মের মগজে কোথায় কিছুটা ধারণা করা যায়:

> হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত : নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন : 'আমি যদি কোন ব্যক্তিকে অন্য কোন ব্যক্তির সামনে সিজদা করার নির্দেশ দান করতাম তবে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য।'' (তিরমিযী)

সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামিক স্কলার ইমাম গাজ্জালি (রঃ) বিখ্যাত 'ইয়াহ্ইয়া উলুমেদ্দিন' (পৃ-২৩৫)গ্রন্থে লিখেছেন -

> "স্ত্রীর উচিৎ স্বামীকে তার নিজ সত্ত্বার চেয়েও উপরে স্থান দেয়া, এমনকি তার সকল আত্মীয়স্বজনের উপরে স্থান দেয়া। সে স্বামীর জন্যে নিজকে সদা-সর্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখবে যেন স্বামী যখন ইচ্ছা তাকে ভোগ করতে পারে..।"

যেহেতু ধর্ম এনেছিল পুরুষ তাদের স্বার্থে - পুরুষের ধর্মে নারীর স্থান, তাই তাদেরই পদতলে হবে তাতে আর আশ্চর্য কী। নারী তার প্রয়োজন মেটাবে, খুব বেশি হলে সহচরী সেজে সময়ে সময়ে মিষ্টি দুটো কথা শুনে বর্তে যাবে - এই তো নারী। খ্রিস্টান ধর্মে আছে : এ্যাডাম-এর প্রয়োজন হয়েছিল বলেই ইভের সৃষ্টি। ক্রিস্টিয়ান লেখক-শিল্পীরাও তাদের কর্মে প্রচার করতে ভালোবাসেন, 'Women are subordinate to men because they are created after men and from men and for men. (Drury, 1994, 34)'

তাছাড়া সেন্ট পলের দু-একটি বক্তব্য এখানে উল্লেখ করলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে; বাইবেল থেকে উদ্ধৃত করা যায়: "...I permit no women to teach or to have authority over a man; she is to keep silent. For Adam was formed first, then Eve; and Adam was not deceived, but the women was deceived and became a transgressor. Yet she will be saved through childbearing, provided they continue in faith and love and holiness with modesty." (1 Timothy 2:8-15)

সেন্ট পলের আরেকটি উদ্ধৃতি, "Indeed, man was not made from women, but women from man. Neither was man created for the sake of woman, but women for the sake of man." (1 Corinthians 11:3-10)

কি চমৎকার! তাহলে তো আর কোন কথাই থাকে না। ধর্মীয় মগজ থেকে উৎসারিত এই রকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাবে। এখানে ইসলাম ধর্মের আরও কিছু নারী সম্পর্কীত হাদিস নিচে উল্লেখ করা হল :

> হযরত মোহাম্মদ বলেন 'আমার অনুপস্থিতিতে আমি পুরুষের জন্য মেয়েদের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর ফিতনা ও বিপর্যয় রেখে যাইনি।'' (বোখারি ও মুসলিম)

> 'নারী (জাতির মূল অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথম নারী, আদি মাতা হাওয়া) পাঁজরের (উর্দ্ধতম হাড় হইতে সৃষ্ট। পাঁজরের হাড় সমূহের মধ্যে উর্দ্ধতম হাড় খানাই সর্ব্বয়াধিক বাঁকা। তুমি যদি উহাকে পূর্ণ সোজা করিতে তৎপর হও যে, তুমি তোমার মন মত পূর্ণ সোজা না করিয়া ছাড়িবে না) তবে উহা ভাঙ্গিয়া যাইবে। আর যদি উহাকে তোমার মন মত পূর্ণ সোজা করায় তৎপর হও, তবে অবশ্য উহার মধ্যে একটু বক্রতা থাকিবে,কিন্তু ভাঙ্গিবে না, আস্ত থাকিবে, তুমি উহার দ্বারা সাহায্য, সহায়তা লাভ করিয়া নিজের অনেক কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে।'' (বোখারি শরিফ, ২০৫)

> ‘স্বামী তাহার স্ত্রীকে স্বীয় বিছানায় আসিবার জন্য ডাকিলে যদি স্ত্রী স্বামীর ডাকে সাড়া না দেয় (এবং স্বামী তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়) তবে ভোর পর্য্যন্ত সারা রাত্র ফেরেশতাগণ ঐ স্ত্রীর প্রতি লানৎ ও অভিশাপ করিতে থাকেন।’’ (বোখারি ও মুসলিম)

আরেকটি হাদিস এরকম,

> ‘....নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন দোযখ পরিদর্শন-কালে আমি দোযখের দ্বারে দাঁড়াইলাম এবং জানিতে পারিলাম যে, দোযখীদের মধ্যে নারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইবে।’ (বোখারি শরিফ, ২১১)

আমরা জানি, নারীদের নির্দিষ্ট বয়সে ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বকোষ বেরিয়ে ফ্যালোপিয়ন টিউবে এসে শুক্রকীটের জন্য অপেক্ষা করে, শুক্রকীট না পেলে ওই ডিম্বকোষের মৃত্যু ঘটে এবং ঋতুস্রাব হিসেব বেরিয়ে আসে। এই ঋতুস্রাবের মেয়াদ প্রত্যেক নারীরই নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক মাসে চার-পাঁচ দিন স্থায়ী হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে - এটি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ব্যাপার, শুচি-অশূচির কোনো ব্যাপার নয়। তবে এই সময় নারীদের প্রয়োজন একটু বিশ্রামের । অথচ আল কোরানের দৃষ্টিতে রজঃস্বলা নারী অশূচি-দূষিত, তাই এ সময় স্ত্রীসঙ্গ বর্জনীয় (সূরা বাকারা, ২:২২২)। কিন্তু হাদিস থেকে জানা যায়, ‘রজস্বঃলা স্ত্রীর সাথে কোনো পুরুষ সংগত হলে তাকে এই কাজের জন্যে এক দিরহাম সদকা দিতে হবে। রক্তের রং কিছুটা হলদেটে হলে সদকার পরিমাণ হবে অর্ধ দিনার আর সম্পূর্ণ লাল হলে এক দিনার (মিশকাত : ৫৫৩, ৫৫৪)।’’- তাহলে দেখা যায়, কোরান যা বাতিল করেছে, হাদিস তা সামান্য সদকার বিনিময়ে হালাল করে দিয়েছে!

উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক নারী আসলে ধর্মের দৃষ্টিতে মনুষ্য পদবাচ্যই নয়! তাকে কিভাবে কোন কৌশল অবলম্বন করে দমিয়ে রাখা যাবে এবং তার থেকে নিজ স্বার্থ উদ্ধার করা যাবে তার-ই যেন সব ফন্দি-ফিকির বের করা হয়েছে। ‘পবিত্র ধর্মে’র নামে নারীকে পুরুষতান্ত্রিকতার যাঁতাকলে পেষণ করা সহজ। যুগ যুগ ধরে এই ধুরন্ধর কৌশলেই নারীর ‘বাঁকা চলন’কে বশে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। নারীও খুশী। ধর্ম বলে কথা। ‘পবিত্র’ জ্ঞানে পিপড়ের সারির মত পিলপিল করে ধর্মের পিছনে ছুটছে তো ছুটছেই। এছাড়া নারীর শিক্ষা-দীক্ষাও নারীর নিজস্ব নয়; পুরুষের-ই মনোনীত তথাকথিত শিক্ষা নিয়ে তার বড়জোর চাকুরি জুটে। তাতে হৃদয়ের অর্গল খুললেও মগজের ভিতরে পাকানো জট আর খুলে না। নারীর ভিতর শতাব্দীর অন্ধকার দূর হওয়ার গতি, তাই বড় ধীর। যার জন্য আজও দেখি ধর্মের নামে নারীর বিরুদ্ধে ফতোয়ার রমরমা ব্যবসা চলে। নারী কি চাইবে, না-চাইবে, কিভাবে চাইবে, হাসবে, কাঁদবে, কিভাবে মরবে সব-ই বলে দেয় পুরুষ। হয়ত তাই দাবি দাওয়ার ছিটে ফোঁটা পেলেও বর্তে যায় নারী!

এবার একটা কেস স্টাডি দেখা যাক। তাতে আধুনিক নারীর প্রাত্যহিক জীবন যাপনের একটা খন্ডচিত্র পাওয়া যাবে। ফলে আমাদের ধারণা পেতে সুবিধা হবেণদুই হাজার আট সালের একজন মুসলিম বঙ্গনারীর

জীবনে মধ্যযুগের আরবে রচিত 'ধর্ম গ্রন্থের' আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কিনা। নীলা (ছদ্মনাম) একজন প্রবাসী কর্মজীবী নারী। নিজ কথনেই শুনা যাক তার জীবন যাপনের প্রাত্যহিক চালচিত্র :

> 'আমাকে সকাল সাতটায় কাজে দৌঁড়াতে হয়; তাই নাস্তাটুকুও সারার উপায় থাকে না বাসায়। ছেলেমেয়ে তখনও ঘুমিয়ে। ওদের স্কুল কিছুটা দেরিতে। নয়টার দিকে। বিকেল পাঁচটায় যখন কাজ শেষ হয়, তখন শরীর মন অনেকটা বিধস্ত। ফেরার পথে প্রায় দিনই টুকটাক বাজার সারতে হয়। তবে আজকাল বাজার-সদাই প্রায় সবই অনলাইনে করি, সময় বাঁচানোর জন্য। বাসায় ফিরতে ফিরতে প্রায়দিনই বিকেল ছয়টা। সন্তানদের সামন্য খোঁজ খবর নিয়েই দৌঁড়াতে হয় কিচেনে। নিজের ক্লান্ত শরীরটাকে পাত্তা দেওয়ার অবসরটুকুও মেলে না। বিকেলের চা, রাতের খাবার, রান্নার ফাঁকে ফাঁকে ছেলেমেয়েদের হোমওয়ার্কের খোজখবর করা এর মধ্যেই আবার টুকটাক জরুরি ফোনগুলোও সেরে নিতে হয়। তারপর ঘরদোর গুছানোর পালা শেষ করে রাতের খাবার সেরে, শুরু করতে হয় পর দিনের প্রয়োজনীয় কাজ গুছিয়ে রাখার পালা। এতসব করতে করতে রাত এগারটা সারে এগারটা বেজে যায়। এরপর কিছুটা সময় নিজেকে দেই। যেমন কিছু পড়াশুনা করার চেষ্টা করি। বই আমার প্রাণ, চেষ্টা করি প্রতি রাতে অন্তত দুই পাতা হলেও পড়ার; তারপর বিভিন্ন নিউজ সাইটগুলো ঘেটে খবরাখবর গুলো জেনে নেই। ই-মেইল পড়ি, দরকার হলে দু'একটার উত্তর দেই। এ সব শেষ করে ঘুমাতে ঘুমাতে রাত দুইটা-আড়াইটা বেজে যায়। জন্মসূত্রে আমি যেহেতু একজন মুসলিম নারী, আজ দুই হাজার আট সালে দাঁড়িয়ে আমার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব নয় পরিপূর্ণ ইসলামিক রীতিনীতিগুলো মেনে জীবন যাপন করা। আমাকে যেভাবে উর্ধ্বশ্বাসে দৌঁড়াতে হয় সাত সকালে, সারাদিন প্রায় দৌঁড়ের উপর থাকতে হয়ণসেখানে আমার পায়ের আঘাতে 'মাটি কাঁপল' কি-না তা দেখার সময় কোথায় আমার? ঘরের ভিতর নীরবে চলাফেরা করার-ই বা সুযোগ কোথায়? আর বেহেস্তে যাওয়ার জন্য স্বামীর সন্তুষ্টি আদায়ের নানা তরিকা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার মত এত অলস সময়ও আমার হাতে নেই। দুজন মানুষ একসাথে থাকতে গেলে ঠুকাঠুকি কিছুটা লেগেই থাকবে। আমার জীবনযাপনের সাথে তাই মধ্যযুগীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোহীন, অন্ধকার গৃহকোণে পরে থাকা নারীর জীবনযাপনকে মিলাতে চাইলে কি সেটা বাস্তব-সম্মত হবে? তাছাড়া আমি মনে করি ভালো-মন্দের পার্থক্যটা ঠিক কোথায় তার শতভাগ পরিস্কার কোন সীমারেখা টানা না গেলেও আমার বিবেক, বুদ্ধি এবং শিক্ষা অনুযায়ী আমি নিজেকে চালিত করি। নীতিবোধ শেখার জন্য মধ্যযোগীয় ধর্মের কোন প্রয়োজন দেখি না। কারণ সেসময়কার নৈতিকতাবোধ আর আজকের নৈতিকতাবোধ এক নয়। মধ্যযুগে সামান্য চুরি করার জন্য হাত কেটে ফেলা হত। আজকের সভ্য দুনিয়ায় তা (অসভ্যদের কথা বাদ) কল্পনাই করা যায় না।'

উপরে উল্লেখিত চিত্র শুধু এই একজন নীলার নয়, বরং প্রায় প্রতিটি ঘরে একই চিত্র। কী দেশে, কী প্রবাসে। তবে পার্থক্য এই, নীলা জানেন তিনি কি করছেন, তার অবস্থান পরিস্কার। অন্যেরা দুই নৌকায় চড়তে গিয়ে খাবি খাচ্ছেন। এবার চোখ ফেরানো যাক 'ঐশী' গ্রন্থ কোরানের দিকে। একটু খোঁজ নিয়ে দেখি সেখানে নারী-পুরুষ সম্পর্ক নিয়ে কি বলা আছে। বিষয়টা সবচেয়ে স্পষ্ট করা হয়েছে যে সূরাটির মাধ্যমে, তা হচ্ছে সুরা নিসা, ৩৪ নম্বর আয়াত।

> (সুরা নিসা : ৩৪) পুরুষেরা নারীদের উপর কতৃত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে ও তারা হেফাযত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং **প্রহার কর।** যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ।

এখানে আল কোরান নারী-পুরুষের প্রতি নিরপেক্ষতা দেখিয়ে স্ত্রীকে অধিকার বা অনুমতি দেয়নি অবাধ্য স্বামীকে প্রহার করার, স্বামীরত্নটি যত অকালকুষ্মান্ডই হোক না কেন। নারীদের প্রহার করার বৈধতা দেওয়া আছে বহু সহি হাদিসেও[*]। এই সমস্ত হাদিসের অনেকগুলোতেই বিধৃত হয়েছে কিভাবে আমাদের মহানবী আয়শাকে বুকে আঘাত করতেন, কিভাবে আবু জাহাম তার বউকে পেটাতেন, কিভাবে আবু বকর আয়শার গর্দানে আঘাত করতেন ইত্যাদি। সাধারণভাবে কিভাবে স্ত্রীকে প্রহার করতে হবে তা বর্ণিত হয়েছে তিরমিযীতে (পৃঃ ৪৩৯)-

> 'যদি স্ত্রীর আচরণ অসৎ এবং ভক্তিহীন হয়, তবে স্বামীর অধিকার আছে স্ত্রীকে প্রহার করার; কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যেন শরীরের কোন হাড় ভেঙ্গে না যায়। স্বামীর অপছন্দনীয় ব্যক্তিকে কখনোই স্ত্রী বাসায় ঢুকতে দেবে না। স্বামীর পছন্দ-অপছন্দ সবকিছুকে স্ত্রী গুরুত্ব দেবে।'

নারীদের প্রহার করার ব্যাপারে এসব ইসলামী কিতাবের সাথে মিল পাওয়া যায় সনাতন হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বৃহদারণ্যকোপনিষদ (৬/৪/৭, ১/৯/২/১৪) এবং শতপথ ব্রাহ্মণের (৪/৪/২/১৩)[†]।

---

[*] দেখুন, হাদিস নং vol. 7, # 715; vol. 8, #828; vol. 7, #132 Bukhari, Muhammad, "Sahih Bukhari", Kitab Bhavan, New Delhi, India, 1987, translated by M. Khan, Muslim, Abu'l-Husain,
Sahih Muslim, Book 009, # 3512, #2127, #3506:; "Sahih Muslim", International Islamic Publishing House, Riyadh, Saudi Arabia, 1971, translated by A. Siddiqi
Dawud, Chapter 709, #2141, #2142; Abu Dawud, Suliman, "Sunan", al-Madina, New Delhi, 1985, translated by A. Hasan

[†] "বজ্র বা লাঠি দিয়ে মেরে নারীকে দুর্বল করা উচিৎ, যাতে নিজের দেহ বা সম্পত্তির উপর কোনো অধিকার না থাকতে পারে" (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৪/৪/২/১৩ নং শ্লোক)

কোরানের একই সুরার অন্যান্য আয়াতে যা পাই তা হচ্ছে :- (সুরা নিসা, ৪:৩) 'আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতিম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পুরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে, একটিই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হয়ার অধিকার সম্ভাবনা ।'মানে পুরুষেরা (যদি সকলের সাথে সমান ইনসাফ করতে পারে) সর্বোচ্চ চারজন নারীকে একসাথে বিবাহ করতে পারবে। কিন্তু নারী-পুরুষের প্রতি নিরপেক্ষতা দেখিয়ে কোরানে কোথাও নারীদের একসাথে বহুবিবাহের অনুমতি দেয়া হয় নাই (বর্তমানে প্রচারিত কোনো ধর্মেই এরকম নির্দেশ বা অনুমতি পাওয়া যায় না, কেন? মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নেই বলে?); এছাড়া আল্লাহর বান্দারা যে তাদের স্ত্রীদের প্রতি এই 'সমান ইনসাফ' করতে পারবে না, সেটি মহান আল্লাহতায়ালা মনে হয় আগেই জানতেন; তাই পরবর্তীতে এ বাধা তুলে দিয়েছেন (সূরা নিসা, ৪:১২৯)। তাহলে আর থাকলো কী? পুরুষেরা বিয়ে একসাথে চারটি স্ত্রী রাখতে পারবে, তবে উপপত্নী, দাসী সম্ভোগের সংখ্যা অনুল্লেখিত (সূরা আহযাব, ৩৩:৫০, ৫২)[‡]।

মহান আল্লাহতায়ালার কাছে, পুরুষের অবস্থান নারীদের কিছুটা উপরে (সুরা বাকারা, ২:২২৮), সাক্ষী হিসেবে একজন পুরুষ সমান দুজন নারী (সুরা বাকারা, ২:২৮২)। আমি সুরা বাকারা থেকে উদ্ধৃত করছি-

> 'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋনের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না| আল্লাহ্ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেয়া এবং ঋন গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহেক ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশ কম না করে| অত:পর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দূর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখাবে। **দুজন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে যদি দুজন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা** ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়... ।'

[‡] পবিত্র কুরানে চারটি বিয়ের উল্লেখ থাকলেও মহানবী (দঃ) নিজেই তাঁর জীবনে বিষয়টি লঙ্ঘন করেছেন বলে মনে করা যেতে পারে। খাদিজা মারা যাওয়ার সময় মহানবীর বয়স ছিল ৪৯। সেই ৪৯ থেকে ৬৩ বছর বয়সে মারা যাবার আগ পর্যন্ত তিনি কমপক্ষে হলেও ১১ টি বিয়ে করেন। এর মধ্যে আয়েশাকে বিয়ে করেন আয়েশার মাত্র ৬ বছর বয়সের সময়। এ ছাড়া তার দত্তক পুত্র যায়েদের স্ত্রী জয়নবের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করেন; এ ছাড়া ক্রীত দাসী মারিয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন যা হাফসা এবং আয়েশাকে রাগান্বিত করে তুলেছিলো; যুদ্ধবন্দি হিসেবে জুয়ারিয়া এবং সাফিয়ার সাথে সম্পর্ক পরবর্তীতে নানা রকম বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। Ali Dashti তার 'Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad' বইয়ে মুহম্মদের জীবনে ২২ জন রমনীর উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে তার ১৬ জন স্ত্রী, ২ জন দাসী, এবং অন্য ৪ জন বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্কের উল্লেখ আছে।

এখানে লক্ষ্যনীয় যে, সাক্ষী সাবুদের ক্ষেত্রে দুজন পুরুষ সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে। যদি দুজন পুরুষ না পাওয়া যায় – তা হলে মহিলাদের দিয়ে কাজ চলতে পারে, তবে একজন পুরুষের বদলে দুজন নারীর সাক্ষ্য নেওয়া যেতে পারে। শুধুমাত্র মহিলাদের সাক্ষী গ্রহনযোগ্য নয়। সাথে অন্ততঃ একজন পুরুষ থাকতেই হবে। যারা কোরানের মধ্যে সব সময় নারী-পুরুষের সাম্য খুঁজে পান, যারা বৈষম্যের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেন, তারা এর কি জবাব দেবেন? নারীরা চিন্তায় চেতনায় পুরুষদের থেকে হীন, তাদের স্মৃতিশক্তি দুর্বল, তাদের বিচার বুদ্ধি কম, তারা ঠিকমত সাক্ষ্য দিতে পারবে না এই ভাবনা থেকেই মূলত – দুজন নারীর সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সমতুল্য করা হয়েছে।

নারীকে বঞ্চিত করা হয়েছে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও। সুরা নিসা অনুযায়ী উত্তরাধিকার সুত্রে বাবা-মার কাছ থেকে একজন পুরুষ সন্তান যা পাবে, মেয়ে সন্তান পাবে তার অর্ধেক। আল্লাহ বলেন, (৪:১১),

> 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন: **একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান**। অত:পর যদি শুধু নারীই হয় দু-এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে| যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অত:পর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ওছিয়্যেতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ।'

মুসলিম 'স্কলার'রা বলতে চান, মেয়ে বড় হয়ে যেহেতু স্বামীর সম্পত্তি পায়, তাই পিতার সম্পত্তি তাকে কম দেওয়া হয়েছে। এগুলো আসলে ছেলে ভুলানো ছড়া। আধুনিক বিশ্বে বহু নারী উপার্যনক্ষম। অনেকেই স্বামীদের থেকেও বেশী রোজগার করেন, তাদের অনেককেই স্বামীর উপার্যনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে হয় না। মেয়েদের অনেকেই আজ বহুজাতিক কোম্পানির সিইও, এমনকি রাষ্ট্রক্ষমতার-ও শীর্ষে ছিলেন, কিংবাএখনো আছেন। এদের কাছে ওই আয়াতগুলো বোকা বোকাই লাগবে। আর তা ছাড়া এমন অনেক নারীই আছেন যারা পরে বিয়েই করেননি, কিংবা করবেন না। মেয়েদের বড় হয়ে 'স্বামী' থাকতেই হবে – এটা কি ধ্রুব সত্য নাকি?

পবিত্র আল কোরানের দৃষ্টিতে বহুগামী পুরুষের কাছে নারী শুধুই সম্ভোগের বস্তু, সে জন্য দেখা যায় ইসলামী সৈনিকদের জন্য যুদ্ধবন্দি সধবা, বিধবা, বিবাহিত, অবিবাহিত সব নারীকে হালাল করা হয়েছে (৪: ২৪)। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আমাদের মহানবী থেকে শুরু করে হজরত আলী, হজরত ওসমান, হজরত ওমর সবাই যুদ্ধবন্দী নারী উপভোগ করেছেন, কখনোবা উপপত্নি বানিয়েছেন। কোরানে বলা আছে – 'তোমাদের দক্ষিন হস্ত যাদের অধিকারী (দাস, দাসী এবং যুদ্ধবন্দিনী)- আলাহ তোমাদের জন্যে

তাদেরকে বৈধ করেছেন" (৪:২৪)[§]! কোরানে মেয়েদের সংজ্ঞায়িতই করা হয়েছে শস্যক্ষেত্র হিসেবে - 'তোমাদের স্ত্রীরা হচ্ছে তোমাদের জন্যে (সন্তান উৎপাদনের) ফসলক্ষেত্র, তোমরা তোমাদের এই ফসলক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই গমন করো ...' (সূরা আল বাকারা, ২:২২৩)। এরপর কি আর কিছু বলার থাকতে পারে? যৌন কর্ষণের ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণের সকল ক্ষমতা পুরুষের হাতে দিয়ে দিলেন মহান আল্লাহতালা!

উপরের একটি সুরায়ও নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দেওয়া তো দূরে থাক, মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হয়নি। এখন কথা হল, উপরে উল্লেখিত কোরানের নির্দেশ অনুসারে নারীরা পুরুষদের সমান ক্ষমতা দাবী করলে বিশাসীদের 'ধর্মীয় অনুভুতি' আঘাত পাবেই! কারণ তারা দাবি করতেই পারে, তাদের আচরণ কোরান অনুযায়ী সঠিক-ই আছে! আমরা দেখেছি এ সরকারের আমলে ঘোষিত 'জাতীয় নারী উন্নয়ননীতি'র বিরুদ্ধে মোল্লাদের বিক্ষোভ। দেখেছি কিভাবে উত্তরাধিকার আইনে নারীদের পুরুষদের সাথে সমতা দিতে গিয়ে সরকার কিভাবে মোল্লাদের কাছে মাথা নত করে পিছু হটে গেলো।

ইসলামি আইনে 'জেনা' হলো, ব্যভিচার, বিবাহ-বহির্ভূত যৌনমিলন, ধর্ষণ ও পতিতাবৃত্তি। অর্থাৎ পরস্পরের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নেই এমন দুজন নর-নারীর মধ্যে যৌনমিলন হলো জেনা। ইসলামি শরিয়তী আইনে জেনার জন্য চরম শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে, তবে নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে শাস্তি দু'রকম। জেনার জন্য অবিবাহিত পুরুষের শাস্তি ১০০ ঘা বেত্র¨, বিবাহিত পুরুষের ক্ষেত্রে ৮০ ঘা বেত্র¨। কিন্তু নারীদের বেলায় প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড। আর এই 'জেনা' সংক্রান্ত অপরাধ প্রমাণ করতে চারজন পুরুষ সাক্ষীর প্রয়োজন, কোনোভাবেই নারীর সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামি আইনের এই ধরনের কঠোর-ভয়ঙ্কর বিধান থেকে বিশ্ববাসীর মুখ ফিরিয়ে নেয়ার জন্য কতিপয় ইসলাম-দরদীরা আল কোরানের (সুরা নিসা, ৪:১৬) এই আয়াতটি উল্লেখ করেন- 'আর তোমাদের মধ্যে যে দুজন (নর-নারী) এ (ব্যভিচারের) কাজ করবে, তাদের দুজনকেই তোমরা শাস্তি দিবে, (হাঁ) তারা যদি তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদের (শাস্তি দেয়া) থেকে তোমরা সরে দাঁড়াও...'। হঠাৎ করে এই আয়াত নজরে আসলে অনেকে ভাবতে পারেন, ব্যাভিচারে অভিযুক্ত দুজন নারী-পুরুষেরই শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে, তাহলে অপরাধীদের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সমান দৃষ্টিপাত করা হয়েছে, এরকম দাবিও করেন অনেকে। কিন্তু আসলেই কী তাই, সত্যি কী এখানে দুজন অপরাধীর অপরাধ প্রমাণিত হলে সমান শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে? এই আয়াতে কিন্তু কখনোই 'সমান শাস্তি' কথাটি বলা হয়নি, ভালো করে লক্ষ্য করুন। পূর্বের আয়াতটি (সুরা নিসা, ৪:১৫) আগে দেখি, তাহলেই বুঝা যাবে-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অপরাধীদের জন্য কী আল্লাহতায়ালার সমান দৃষ্টিভঙ্গি- 'তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা (ব্যভিচারের) দুষ্কর্ম নিয়ে আসবে, তাদের (বিচারের) ওপর তোমরা নিজেদের মধ্যে থেকে চারজন সাক্ষী যোগাড় করবে, অতপর সে চারজন লোক যদি ইতিবাচক সাক্ষ্য প্রদান করে

[§] Dictonary of Islam থেকে জানা যায়, দাসী যদি বিবাহিতাও হয়, তাকেও অধিকারে নেয়ার ক্ষমতা আছে মনিবের। সুরা ৪:২৪; "তোমাদের দক্ষিন হস্ত যাদের অধিকারী- আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাদেরকে বৈধ করেছেন"- এই আয়াতের ব্যখ্যায় জালালান বলেন- "অর্থাৎ, যাদেরকে তারা যুদ্ধের ময়দানে আটক করেছে, তাদের সাথে সহবাস করা তাদের জন্যে বৈধ, যদি তাদের স্বামীগণ জীবিতও থাকে"

তাহলে সে নারীদের তোমরা ঘরের ভেতর অবরুদ্ধ করে রাখবে, যতোদিন না, মৃত্যু এসে তাদের সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয়, অথবা আল্লাহতায়ালা তাদের জন্যে অন্য কোনো ব্যবস্থা না করেন।'

পুরুষ ব্যভিচার করলে তাকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘরে আটক রাখার বিধান কোরানের কোথাও দেয়া নেই, কোরান থেকে কেউ দেখাতেও পারবে না। কিন্তু নারীকে নিয়ে এমন কঠোর বৈষম্যপূর্ণ বিধান থাকার পরেও আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা যখন দাবি করেন, আল কোরান বা আল্লাহতায়ালার কাছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান, তখন আর বলার কিছু থাকে না!

বাস্তব ক্ষেত্রে জেনা এবং হুদুদ আইন যে ধর্ষনকারীদের 'রক্ষা কবচ' হিসবে ব্যবহৃত হয় তা আমরা পাকিস্তান, ইরান, আফগানিস্তান, সৌদি আরব সহ অন্যান্য ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোতে দেখেছি। ধর্ষন প্রমান করার জন্য 'চারজন সাক্ষী' প্রায় কোন ক্ষেত্রেই মেয়েটির পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব হয় না, ফলে শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, ধর্ষণকারীর ঘটে মুক্তি, আর মেয়েটা 'জেনা' করার দায়ে কপালে জুটে 'শারিয়ার রজম'। অনেক সময় দেখা যায়, মেয়েটির পরিবারই হতভাগ্য মেয়েটিকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দেয় পরিবারের 'সম্মান' রক্ষার জন্য। এর যে কত 'ডকুমেন্টেড কেস' আছে তার ইয়ত্তা নেই।

কোরানের দৃষ্টিতে পুরুষ চাইলেই তার স্ত্রীকে 'তালাক' দিতে পারে, শুধুমাত্র পরপর তিনবার অথবা আলাদা আলাদাভাবে শব্দটি উচ্চারণ করলেই হয়ে যায় (সূরা বাকারা, ২:২২৭-২২৯), কিন্তু এক্ষেত্রেও কোরান শরিফ নারীকে তালাক দেবার অধিকার দেয়নি** (যদিও ১৯৬১ সালের তৎকালীন আইয়ুব খান সরকার 'মুসলিম পারিবারিক আইন'-এ পবিত্র কোরানকে ডিঙিয়ে গিয়ে স্ত্রীদের তালাক দেয়ার অধিকার দিয়েছে, এ জন্য সেসময় মোল্লা-মৌলভীরা অনেক চিল্লা-ফাল্লা করেছিল; যা হোক, বর্তমানে বাংলাদেশে এ আইনই কার্যকর রয়েছে)। আরেকটি আয়াত দেখুন- 'যদি সে (পুরুষ) তাকে তালাক দিয়েই দেয়, তাহলে তারপর (এ) স্ত্রী তার জন্যে (আর) বৈধ হবে না, (হ্যাঁ) যদি তাকে অপর কোনো স্বামী বিয়ে করে এবং (নিয়মমাফিক তাকে) তালাক দেয় এবং (পরবর্তী পর্যায়ে) তারা যদিই (সত্যিই) মনে করে, তারা (এখন স্বামী স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে) আল্লাহর সীমারেখা মেনে চলতে পারবে, তাহলে পুনরায় (বিয়ে বন্ধনে) ফিরে আসতে তাদের ওপর কোন দোষ নেই; এটা হচ্ছে আল্লাহর (বেঁধে দেয়া) সীমারেখা...।' (সুরা বাকারা, ২:২৩০)। এই আয়াত থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কোনো পুরুষ যদি তালাক দেয় (ইসলামিতাত্ত্বিকদের মতে, ভুলক্রমে হলেও) এবং পরে তার স্ত্রীকে ফেরত চায়, তবে সহজভাবে ফেরত নেয়া যাবে না। নারীটিকে আবার বিয়ে দিতে হবে অন্য পুরুষের সাথে, যৌনসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এই দ্বিতীয় স্বামীর সাথে, এরপর এই দ্বিতীয় স্বামী নামক পরিত্রাতার ইচ্ছা হলে তাকে তালাক দিবে, তারপরই নারীটি যথাবিহিত ইদ্দত পালনের পর প্রথম স্বামীর কাছে

** আমার লেখাটি ইন্টারনেটে প্রকাশিত হবার পর এক ধর্মবাদী ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন, কোরানে নাকি নারীর তালাক দেবার অধিকার আছে, কিন্তু সেটি 'উহ্য' রাখা হয়েছে। । উহ্য থাকলে কিভাবে সেটা কোরাণে থাকলো, তিনিই তা ভাল জানেন। তার কথা যদি সত্যি বলেও ধরে নেই, তা হলেও বলতে হয়, কোরানে পুরুষদের তালাক দেবার অধিকার উহ্য রাখা হয়নি, 'উহ্য' রাখা রাখি শুরু হয় কেবল মেয়েদের ক্ষেত্রে! এ নিয়ে অনন্ত বিজয় খুব সুন্দর একটি প্রবন্ধ লিখেছেন 'আন্তর্জালিক আলাপন' নামে যা সাতরং ওয়েব সাইটে রাখা আছে। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়েও বলা যায়, বিয়ে থাকলে তালাক আবশ্যক। আবশ্যক উভয় ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকার বিবেচনায়। এক্ষেত্রে উহ্য রাখা কিংবা কোন রকম ছাড় থাকার যৌক্তিকতা নেই।

যেতে পারবে, নচেৎ নয়। এই আয়াতে তালাক দিবে পুরুষ, অথচ এর ফল ভোগ (ধর্ষিত হতে হবে) করবে নারী। ভুল করবে একজন, শাস্তি পাবে অন্যজন; একেই কী বলে সমানাধিকার! (কোন কোন তফসিরকাররা বা ইসলামি চিন্তাবিদরা দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বলে থাকেন, 'তালাককে নিরুৎসাহিত করার জন্যই এতো কঠিন বিধি করা হয়েছে।'- ওনাদের এ যুক্তি শুনলে বড়ই খেলো মনে হয়! যে পুরুষ ভুল করে তাকে কিছু দিতে হয় না, হারাতে হয় না, শাস্তি পেতে হয় না; অথচ নিরাপরাধ নারীটিকে সব মূল্য দিতে হয়; উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে ইক্যুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন!) ইসলামের পরিভাষায় এই দ্বিতীয় স্বামীকে বলা হয় 'মুহাল্লিল'। হযরত মোহাম্মদ (সঃ) বলে গেছেন- 'মুহাল্লিলের সাথে বিয়ে তখনই বৈধ হবে, যখন তাদের দুজনের মধ্যে যৌন-মিলন হবে।'[††] (বোখারি হাদিস, ২০৭৮, ২০৭৯)

যাক, এসব সুরা এবং হাদিস নিয়ে মুসলিম ফেমিনিষ্ট এবং স্কলারদের বক্তব্য কী, এবার চোখ ফেরাই সেদিকে। আমেরিকান ফেমিনিষ্ট এবং মুসলিম স্কলার Amina Wadud Muhsin যিনি বিভিন্ন ঐতিহাসিক এবং বর্তমান ইসলামিক স্কলারদের ইন্টারপ্রিটেশনগুলো অনুসন্ধান করে যে মতামত প্রকাশ করেছেন, সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াত এর ব্যাপারে তিনি বলেছেন, 'পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্বশীল'-বাক্যটি আসলে সেই সময়কার প্রেক্ষিতে রচিত। 'প্রেক্ষাপট এবং সময়' এই বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হবে। তখনকার আর্থ-সামাজিক বিষয়টিই এই সুরার মাধ্যমে প্রাধান্য পেয়েছে। যেহেতু তখন পুরুষরাই ছিল পরিবারের প্রধান বা একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। আমিনা মনে করেন বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই সূরাটির ব্যাপারে আরও উদার (লবিরোল) রিইন্টারপ্রিটেশনের সুযোগ আছে।

আরেক মুসলিম ফেমিনিস্ট মরোক্কান Fatema Mernissi এবং ইজিপশিয়ান আমেরিকান Leila Ahmed দুজনেই মোটামুটি তাদের বিভিন্ন লেখায় যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন তা হল, ইসলামে যে সামাজিক ন্যায়বিচারের কথা বলা হয়েছে তা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্যই প্রযোজ্য হওয়ার কথা। কিন্তু ব্যাপারটা দেখা যাচ্ছে পরস্পরবিরোধী। নারীর উপর ধর্মের নামে নানা বিধি নিষেধ চাপিয়ে দেওয়ার ফলে নারীর অবস্থা দিনে দিনে শোচনীয় হয়েছে। পুরূষের অধীনতা, বশ্যতা স্বীকার-ই তাদের নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। Leila Ahmed আরও উল্লেখ করেছেন মোহাম্মদের সময়ে, অর্থাৎ প্রথম যুগের মুসলমান সমাজ নারীর প্রতি অনেক বেশি সংবেদনশীল ছিল। মূলতঃ আব্বাসীয় সময় থেকেই নারীর প্রতি চরম বৈষম্যমুলক ব্যবস্থা চালু হয় ধর্মের নামে। ইসলামের নামে না হলেও আব্বাসীয় যুগে-ই উপপত্নী গ্রহণকে আইনানুগ করা হয়। যা ছড়িয়ে পরে সর্বত্র। যার ফল হয় নারীর জন্য ভয়াবহ। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের ফলে এদের মান-মর্যাদা বলতেও কিছু ছিল না; ছিল না কোন অধিকার। Leila Ahmed যে আইনকে উল্লেখ করেছেন, 'extreme androcentric bias' বলে। মুসলিম নৈতিকতার কণ্ঠটি কিন্তু এক্ষেত্রে ছিল একেবারেই অনুপস্থিত। উপপত্নী এবং দাসীদের ইচ্ছামত ব্যবহারের অধিকার পাওয়ার ফলে নারীদের অবস্থা দাঁড়াল ঘরের কোনে পরে থাকা ব্যবহার্য্য কোন বস্তুর চেয়েও করুন। অধিকার বিহীন। অন্ধকারে দিন-রাত্রি পার করা শুধু। সমাজের উপর তলার নারী

[††] স্ত্রী তালাকের অবাধ সুযোগ বাস্তবায়নের জন্যই ইসলামের কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে খন্ডকালীন বিয়ের প্রচলন আছে। যেমন মুসলিম শিয়া সম্প্রদায়ে চালু আছে 'মূত-আ' নামের অস্থায়ী বিয়ে। এতে বিয়ের এমনকি এক ঘন্টার মধ্যেই স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে, কিংবা চুক্তি মোতাবেক এমনিতেই তালাক হয়ে যায়। শিয়া সম্প্রদায় ছাড়াও, কুইন্সল্যান্ড, গ্রীনল্যান্ড, তাসমানিয়া, সামোয়া, উত্তর আমেরিকার নেটিভ ইন্ডিয়ানদের মধ্যে স্বল্পকালীন মেয়াদভিত্তিক যৌন চাহিদা পূরণের 'ধর্মীয়' চুক্তির রেওয়াজ চালু আছে।

সমাজের অবস্থাও সুখকর ছিল না। কারণ এরা ছিল একেবারেই প্রান্তিক- যে কারণে আসলে তাদের কোনো 'ভয়েস'-ই ছিল না।

Mrnissiও প্রায় একই কথা উল্লেখ করেছেন, তিনিও দাবি করেছেন তুলনামুলকভাবে মোহাম্মদের সময় নারী কিছুটা হলেও স্বাধীনতা ভোগ করত। যেমন ঘরের বাইরে তাদের উপস্থিতির প্রমান পাওয়া যায়। সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে না হলেও তিনি লিখেছেন - "They were active in the early Islamic movement." মোহাম্মদের প্রথম স্ত্রী খাদিজা ছিলেন প্রথম মুসলিম নারী। তাছাড়া মোহাম্মদের প্রিয় পত্নী আয়শা ছিলেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ হাদিসের অন্যতম প্রধান উৎস।

Mernissi ভাষায় -"... She was a major political actor in the civil war or strife (fitna) following the assassination of the third caliph 'Uthman in 656. Her role as a source of hadiths is so important that in one tradition the Prophet is supposed to have told the Muslims that they ' received half their religion from a woman." এছাড়াও ইসলামে অনেক নারী বিদ্বেষী হাদিসের উৎস আবু হুরায়রার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেন। যেমন, Fatema Mernissi সহ অনেকেই মনে করেন আয়েশার সাথে সাহাবী আবু হুরায়রার দ্বন্ধের কারণেই বহু নারী বিদ্বেষী হাদিস সৃষ্টির মূল কারণ।

যাই হোক। তবে আসল ব্যাপার হচ্ছে 'পবিত্র ধর্মে'র নামে পিতৃতান্ত্রিকতার ভয়াবহ মিশেল দিয়ে উদ্ভট এক খিচুড়ি পাকানো হয়েছে। ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে জেনেসিসের মিথ সামান্য অদল-বদল করে নিজেদের বলে চালিয়ে দিয়েছে ইসলাম। তাই আদম হাওয়া আর গন্দম ফলের কথা পাওয়া যায় লোকমুখে। আদম এর প্রয়োজনে এখানেও দেখা যায় হাওয়ার জন্ম। অর্থাৎ ধর্মে নারী চরিত্রের সৃষ্টি পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য। বেহেস্তে যেতে হলেও নারীর জন্য প্রয়োজন হয় পুরুষের সার্টিফিকেট। প্রভু-স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট হলেই কেবল তিনি বেহেস্তে যাওয়ার সার্টিফিকেট পান, নাহলে নয়। যেমন হাদিস আছে, যে পর্যন্ত স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট নয় সে বেহেস্তে যেতে পারিবে না...।

এখানে আরেকটি বিষয় আলোচনা করা দরকার। মুসলিম নারীবাদী এবং স্কলারদের দৃষ্টিতে সমস্যার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে - কোরান অপরিবর্তনীয়-এই বদ্ধমূল বিশ্বাস। মুসলিমদের মধ্যে এই বিশ্বাসের ফলেই কোরানকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য সামান্য পরিবর্তন সাধন করাও এক কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে পুরুষতন্ত্র কোরানের আক্ষরিক অর্থ ধরে রাখায় অতি উৎসাহী। কিন্তু আমার মনে হয় এই সনাতনী মৌলবাদী চিন্তাধারার পরিবর্তন প্রয়োজন। বিশেষ করে কোরানের যে সব আয়াতে জেন্ডার ইস্যু পরিস্কারভাবে উল্লেখিত আছে, সেগুলো নিয়ে আসলে নতুন করে আমাদের ভাবতে হবে। বর্তমান সভ্যতায় ইসমিক রাষ্ট্র আধুনিক রাষ্ট্র ধারণার সাথে খাপ খায় না মোটেই। বরং ন্যায় এবং সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মানে মধ্যযুগের আইনকে ধর্মের নামে আঁকড়ে পরে থাকা মানে সমাজ-সভ্যতাকে উটের যুগে ফিরিয়ে নেওয়া। আজকের সমাজ-বাস্তবতার সাথে যার দ্বন্দ্ব অনিবার্য। যেমন ইসলামিক ষ্টাডিজ এবং কম্পেরাটিভ রিলিজিয়ন-এর

অধ্যাপক, ইতিহাসবিদ, এবং ইসলামসহ বহু গ্রন্থের লেখক Malise Ruthven লেখায় কিছুটা ফুটে উঠছে। আমি Ruthven -এর 'Islam' থেকে সম্পূর্ণ লাইনগুলো এখানে হুবহু তুলে দিচ্ছি :

> "The argument that a woman giving evidence on a business matter might need assistance from her friend might make sense under pre-modern conditions when most women were illiterate, but as the Quranic rules stand, the testimony of a woman with a higher degree in business administration is only worth half that of an illiterate male. Beyond such textual sticking points, however, there are areas where masculine or andocentric interpretations are being contested, particularly in the field of hadith, where the questioning of sources belongs to a time honoured methodology and is less controversial than taking issue with the text of the Quran. The biggest obstacles facing Muslim feminists are cultural and historical: feminism is perceived as coming from a hostile source." (Malise Ruthven: Islam, 113)

অবশেষে বলার কথা একটাই- যদিও মুসলিম নারীবাদীরা মনে করেন, 'ইসলাম' নয়, প্রতিক্রিয়াশীল পুরুষতন্ত্রই ধর্মের নামে নারী পুরুষের বৈষম্য টিকিয়ে রেখেছে। ঠিক একইভাবে খ্রিস্টান ধর্মেও দেখি খ্রিস্টান নারীবাদীরা যে উৎস থেকে গরলের উৎপত্তি, তাকে মাফ করে দেন আবলীলায়; খালি পুরুষতন্ত্রের উপর ঝাল ঝাড়েন। বিষয়টা কিছুটা হাস্যকরও। গোড়ায় গলদ রেখে মাথায় জল ঢেলে কি হবে? পুরুষ রচিত ধর্মে নারীর জন্য যৎসামান্য দয়া দাক্ষিণ্য আছে হয়ত, তাও তাদেরই স্বার্থে। নারীর স্বভাব বৈশিষ্ট্যকে পূরুষের তুলনায় নিম্নশ্রেণীর আখ্যা দিয়ে তাকে `ধর্মের` প্রলেপ মিশিয়ে মহিমান্বিত করা হয়েছে, এই বলে যে, নারী বাঁকা কারণ তার সৃষ্টিই বাঁকা হাঁড় থেকে। বিস্তারিত পরিসরে না গিয়েও হিন্দু ধর্মে নারীর অবস্থান নিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, হিন্দুধর্মে ক্ষেত্রবিশেষে নারীর অবস্থা মুসলিম নারীর চেয়েও অনেক বেশি শোচনীয় ছিল। বিধবা বিবাহ ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। সতীদাহের মত জঘণ্য এক প্রথা চালু ছিল ধর্মের নামে। এই ধর্মে কয়েকজন যোগপুরুষের আবির্ভাবে আগের অবস্থার কিছুটা অবসান হলেও- এখনও নারী সর্বক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার। নারী-শিশুদের তো এখনও সেখানে জন্মাতেই দেওয়া হচ্ছে না। সে আরেক ভয়াবহ চিত্র; অন্য প্রসঙ্গ।

মোদ্দা কথা হচ্ছে কোন ধর্মই যেহেতু নারীর প্রয়োজনে বা নারীর কল্যাণে সৃষ্টি হয়নি; নারীর ধর্ম-কাতরতা তাই দূর করা প্রয়োজন, তাদের নিজেদের-ই কল্যাণের জন্য। ধর্ম রচিত হয়েছে পুরুষদের দ্বারা, পুরুষদের জন্য, নারীর কল্যানের জন্য নয়। বেগম রোকেয়া এ প্রসঙ্গে 'আমাদের অবনতি' প্রবন্ধে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেন –

> 'যখনই কোন ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনি ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। আমরা প্রথমতঃ যাহা মানি নাই, তাহা পরে

ধর্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য করিয়াছি। আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগন ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষরচিত বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।'

ধর্মে থাকবেন, আবার পুরুষের সমান অধিকারও দাবি করবেন, এটা আসলে অনেকটা 'সোনার পাথরবাটি' যেমন, তেমনি। ধর্ম আকঁড়ে থাকতে গেলে এর চেয়ে বিপরীত চিত্র আশা করা যায় না। কারণ ধর্ম নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেয়নি। মোল্লা, পুরোহিতরা কোত্থেকে দেবে? খোদ 'ধর্ম' বিষয়টাই উপড়ে ফেলতে পারলে, মানব সভ্যতা রক্ষা পেলেও পেতে পারে।

তথ্যসূত্র :

- রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯, ঢাকা
- মাহমুদ শামসুল হক, নারী কোষ, হাতে খড়ি, ২০০৫
- Drury, C. (1994) 'Christianity' in J. Holm with J. Boker (eds) Women in Religion, London, Printer Publishers, 30.
- Ruthven, M. (2000) Islam, 2nd edn, Oxford, Oxford University Press.
- Wadud-Muhsin, A. (1999) Qur'an and Woman: Re-reading the Sacred Text from a Women's Perspective, Oxford, Oxford University Press (first published 1992).
- Linda Woodhead, Christianity, Oxford University Press (2004)
- Ali Dashti, Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad, Mazda Pub; June 1994
- Leila Ahmed, Women and Gender in Islam (1992)
- http://www.islamdharma.net
- http://www.banglakitab.com
- http://www.quraanshareef.org/

নন্দিনী হোসেন, সাতরং আন্তর্জালের প্রতিষ্ঠাতা, এবং লেখক। বাংলাদেশের বিভিন্ন দৈনিক এবং সাপ্তাহিকে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ইমেইল - nondinihussain@gmail.com

'সনাতন ধর্মে'র দৃষ্টিতে নারী

অনন্ত বিজয় দাশ

যে কোনো দেশ-কাল-প্রেক্ষাপটের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় অনিবার্যভাবেই নারীর অবস্থান নিয়ে আলোচনা চলে আসে; অর্থাৎ আমরা চাই বা না-চাই, নারীর অবস্থান দিয়ে বিবেচনা করা হয়, ঐ দেশ-কাল-প্রেক্ষাপট কতটা আধুনিক, কতটা প্রগতিশীল-মানব-কল্যাণকামী, কিংবা কতটা অনাধুনিক, প্রগতিবিরোধী, জড়-বন্ধ্যাগ্রস্থ; কারণ অবশ্য আছে—নারী সর্বত্রই, সর্বদা সমাজের অর্ধেক, তা সত্ত্বেও নারী যুগ-যুগ ধরে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার যাতাকলে পড়ে নিষ্পেষিত-নিগৃহীত-নির্যাতিত হচ্ছে। এ সমাজে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র আর সম্পত্তির উপর পূর্ণ অধিকার স্বীকার তো অনেক দূরের বিষয়, পরিবারের অবৈতনিক দাসী, সন্তান উ্পাদনের যৌনযন্ত্র, আর পুরুষের চিত্ত-বিনোদনের খোরাক কিংবা ভোগ্যপণ্য হওয়া ছাড়া নারীর আর কোনো স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে, তা মানতে এখনো সমাজের অনেকেই ইতঃস্তত বোধ করেন, দ্বিধান্বিত হন। জানি, কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম হয়তো আছে; যেমন যাযাবর জাতি, পর্বতবাসী, বনবাসী, দ্বীপবাসী প্রভৃতি কিছু প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান ঊর্ধ্বমুখী, নারীর মর্যাদা পুরুষের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ। কিন্তু এ কথাও সত্য, পুরুষের বাহুবল, তথাকথিত লিঙ্গ-বৈষম্য, ধর্মীয় বিধি-বিধান-শাস্ত্র-পুরোহিতের প্রতাপ-প্রপাগান্ডা, উৎপাদনব্যবস্থা-প্রযুক্তির দ্রুত বিশ্বায়নের চাপের ফলে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ক্রমশ ভেঙে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মোড় নিচ্ছে। ফলে সারা বিশ্বেই নারীকে শোষণ-নিপীড়ন-শৃঙ্খলিত করার ব্যাপ্তি দীর্ঘতর হচ্ছে। আবার ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যেই পিতৃতান্ত্রিকতার বিপক্ষে নারীর অধিকার রক্ষা, নারী-মুক্তি-স্বাধীনতার আন্দোলন গড়ে উঠছে (এজন্যই তসলিমা নাসরিনদের মতো মহিয়সী নারীর আবির্ভাব ঘটছে...)। সমাজে নারীর বর্তমান অবস্থান নিয়ে পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে; নারীর পরাধীনতার শিকলকে ভেঙে চুড়ে দেবার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষিত হচ্ছে দিকে দিকে; হাজার-হাজার বছরের জীর্ণ ধ্যান-ধারণা, প্রথা আর নিয়মের বেড়াজাল নির্মোহে ভেঙে নারীর ক্ষমতায়নের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চলছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই কায়েমী স্বার্থবাদীরা নিজের অবস্থান নিয়ে শঙ্কিত, তটস্থ। দেখা যায় সুদূর অতীতকাল থেকে কায়েমী গোষ্ঠী সমাজের কোনো না কোনো অংশকে, শ্রেণী-বর্ণ-সম্প্রদায়কে (সামগ্রিক অর্থে নারীকে) দাবিয়ে রেখে, শোষিত করে নিজের আখের ঠিক রাখার জন্য ঐশ্বরিক বিধান-শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে আসছে; বরাবরের মতো শাষকগোষ্ঠীর মন্ত্রণাদাতা (পঞ্চম বাহিনী) এ সমাজের কথিত 'বুদ্ধিজীবী' (অধ্যাপক, কবি, লেখক, নাট্যকার, ইতিহাস-রচয়িতা, সহজ ভাষায় আমাদের এখানে যাদের 'সুশীল সমাজে'র প্রতিনিধি বলা হয়) এ ক্ষেত্রে নিরলস সহযোগিতা করেছে। কেউবা নারীকে পূর্ণ মানবরূপে বিবেচনা না করে, জৈবিক সত্তাকে অস্বীকার করে, তথাকথিত কাব্যিক ব্যঞ্জনায় 'অর্ধ-মানবী' বিশেষণে ভূষিত করে নারীকে রহস্যময় বানিয়েছে! এতে পিতৃতন্ত্রেরই দারুন লাভ; ভুলিয়ে-ভালিয়ে আরো কিছুদিন নারীকে অন্তপুরে অথবা অধঃস্তন করে রাখা সম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে পিতৃতন্ত্রের গর্বিত প্রতিনিধি আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুল প্রচলিত গানের কলি : 'শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী!/পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি।' কিংবা 'অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা'। কবিদের চোখে নারী অর্ধেক কল্পনা তো বটেই, সাথে ওই 'মানবী'টুকুও কল্পনা; অর্থা নারী এক সম্পূর্ণ অবাস্তব সত্তা

বা ভাব। নারীর জৈব সত্তার কোনো স্বীকৃতি তাঁদের কাছে নেই। ড. হুমায়ুন আজাদ তাঁর নারী গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৯) বলেন—"পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতা নারী সৃষ্টি না করলেও নারী ধারণাটি পুরোপুরি পুরুষের সৃষ্টি : পুরুষ নারীকে নানা শব্দে শনাক্ত করেছে, নারীর সংজ্ঞা রচনা করেছে, সংজ্ঞার ভাব ব্যাখ্যা করেছে, নারীর অবস্থান নির্দেশ করেছে, নারীর জন্য বিধি প্রণয়ন করেছে, এবং নিযুক্ত করেছে নিজের কামসঙ্গী ও পরিচারিকার পদে।"

আমাদের সমাজ-সংস্কৃতিতে জৈবিক নারীকে এমনভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দেয়া হয়, জন্মের পর থেকেই, যাতে তাদের মধ্যে নারীত্ব বা নারীধর্ম প্রবলরূপে বিকাশ লাভ করে। নারীত্ব বা নারীধর্ম বলতে কী বোঝায়? সোজা ভাষায় বলা যায় : 'পুরুষের (পিতা, ভাই, স্বামী) আজ্ঞাবাহী সদাসেবায় নিয়োজিত এক জীব।' আর আমাদের সমাজে নারীদের ক্ষেত্রে 'সতী' বা 'চরিত্র' বলতে শুধুমাত্র যৌনশুচিতাকেই বোঝায়, কিন্তু পুরুষের যৌন মাধুকরীবৃত্তিকে বহুভাবে প্রশয় দেয়া হয় (এ সমাজে 'সতী' শব্দের অনুরূপ অর্থে পুংলিঙ্গ প্রতিশব্দ আগেও ছিল না, এখনো নেই); সেখানে নারীর সামান্যতম পদস্খলন বরাবরই চূড়ান্তভাবে দণ্ডিত হয়ে এসেছে। আমাদের সমাজে যে 'অর্ধমানবী' নারী দেখা যায়, কোনো জৈব, মনস্তাত্ত্বিক বা অর্থনৈতিক ভাগ্য তার রূপ স্থির করে না; সমগ্র সভ্যতাই উ□পাদন করে, তৈরি করে পুরুষ ও খোজার মাঝামাঝি এ প্রাণিটিকে, যাকে বলা হয় 'নারী'। তাই তো বিখ্যাত নারীবাদী সিমোন দ্য বোভোয়ার তাঁর দ্বিতীয় লিঙ্গ গ্রন্থে বলেছিলেন, 'কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না, ক্রমশ নারী হয়ে ওঠে।'

ধর্মবাদীরাসহ অনেক সাধারণ মানুষ প্রায়ই জোর গলায় বলে থাকেন সকল ধর্মেই নারীকে জননীর (সর্বোচ্চ) সম্মান দেয়া হয়েছে (উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সেই 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী' বহুল উদ্ধৃত-পঠিত বাক্যটি) এবং তার প্রতি সম্মান-কর্তব্য-দায়িত্বের ওপর কম-বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে! তারা একে নারীর অধিকারের স্বীকৃতি বা নারীর মর্যাদার সাথে সমার্থকরূপে দেখেন বা দেখিয়ে থাকেন। এই দেখা বা দেখানোর পেছনে হয়তোবা তাদের মধ্যে নারী সম্পর্কে সদর্থক প্রেরণা কাজ করে। কিন্তু এটাও সত্য, নারী সম্পর্কিত এ ধরনের ভালো-ভালো (!) বক্তব্যের পাশাপাশি সুদীর্ঘকাল থেকে আজকের দিনেও আমাদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, সব ধর্মীয় বিধিবিধানে-উপাখ্যানে নারী সম্পর্কিত নানা কুসংস্কার-অপসংস্কারের ফলগুধারা বহমান; নারী অশুভ, মানুষের (পুরুষদের) স্বর্গ থেকে পতনের কারণ এই নারী, নারী শয়তানের ফাঁদ, নারী নরকাগ্নির ইন্ধন, রূপবান বা কুরূপ বিচার না করেই পুরুষ দেখলেই কামক্রিয়ায় রত হওয়ার জন্য নারীর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে, সৃষ্টিগতভাবে নারী বক্রস্বভাবের, নারী পুরুষের পাজরের হাড় থেকে সৃষ্টি—ইত্যাদি কু□সি□ ধ্যান-ধারণা-কুসংস্কার আজকের একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের চূড়ান্ত উ□কর্ষতার যুগে এসেও বেশিরভাগ মানুষ (ধর্মবাদীরাসহ) মেনে নেয় বিনা প্রশ্নে, বিনা যুক্তিতে! তাঁদের দৃষ্টিতে নারী কখনোই স্বাধীনতার যোগ্য নহে (... ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি)! মজার বিষয় হচ্ছে, প্রায়শই ছদ্ম-প্রগতিশীলরা নারী সম্পর্কিত ভালো ভালো কথাগুলো বুক ফুলিয়ে প্রচার চালালেও সমাজ-জীবনে, ব্যক্তিজীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে নারী সম্পর্কিত নঞর্থক ধারণাকেই প্রাধান্য দেন বেশি! (তবে রক্ষণশীল বা মৌলবাদীরা যেমনটা বিশ্বাস করেন, দৃষ্টিভঙ্গি যেমন, তেমনটি প্রচার চালান, প্রয়োগও করেন ব্যক্তিগত জীবনে তেমনটিই) কেন ছদ্ম-প্রগতিশীলদের এরকম স্ববিরোধী আচরণ? কারণ—যাবতীয় ধ্যান-ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি তো এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামো থেকে সামাজিকীকরণের সময় ব্যক্তির ভিতর বিকশিত হয়; পরিবার-আত্মীয়স্বজন-প্রতিবেশীর কাছ থেকে সে যা

দেখে, শুনে, বুঝে তাই সে শেখে, তার বিশ্লেষণের ক্ষমতা-দৃষ্টিভঙ্গিও সেরকমই হয়। মাঝে কিছুকাল তথাকথিত 'আধুনিক শিক্ষা' লাভের ফলে ব্যক্তির এতদিনকার ধ্যান-ধারণা-দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈপরীত্ব বা দ্বন্দ্ব শুরু হয়। যার কারণেই ব্যক্তির মধ্যে এরকম স্ববিরোধী আচরণ লক্ষ্য করা যায়। আজকের দিনে আমাদের দেশে বা অন্যত্র নারী-মুক্তিবিরোধী বা প্রগতিবিরোধীরা তাঁদের বক্তব্যের পক্ষে সবচেয়ে বেশি যে যুক্তি দেন, তা-হল নারী সম্পর্কিত ধর্মীয় বিধি-বিধানের। এ প্রবন্ধে নারী সম্পর্কিত হিন্দু ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আলোচনাটি সীমাবদ্ধ রাখব (আর হিন্দু ধর্মের ধর্মগ্রন্থ যেহেতু অনেক, তাই সবগুলো ধর্মগ্রন্থ থেকে নয়, বরং হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী কয়েকটি ধর্মগ্রন্থকেই প্রাধান্য দেয়া হবে) কারণ : এক, প্রবন্ধের কলেবর যেন বিশাল হয়ে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি না ঘটায়; দুই, বিষয়ের ভিত্তি যেন ঠিক থাকে; সর্বশেষ তিন, আমার মতো নগন্য লেখকের সামর্থ্যরে বিষয়টিও জড়িত আছে। সনাতন হিন্দু ধর্মের তথাকথিত প্রগতিশীল লোকেরা সময়-সুযোগ পেলেই বড়াই করে বলে বেড়ান, হিন্দু ধর্মে না-কী নারীদের যথেষ্ট স্বাধীনতা-সম্মান দেয়া হয়েছে; নারীদের মাতৃজ্ঞানে এ ধর্মে পূঁজা করা হয়; হিন্দু নারীরা অন্যান্য ধর্মের তুলনায় অনেক বেশি প্রগতিশীল! এ ধরনের বক্তব্য প্রচারের কারণ আছে; পশ্চিমা সামাজ্যবাদের বর্তমান চক্ষুশুল ইসলামি মৌলবাদ নিয়ে সারা বিশ্বের গণমাধ্যমগুলো ব্যস্ত থাকায় ফাঁক দিয়ে সুযোগ বুঝে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের ধর্মকে প্রগতিশীল, যুগোপযুগী, নারী স্বাধীনতার পক্ষে—ইত্যাদি তকমা ব্যবহার (ব্রেনওয়াশ!) করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন। এ প্রবন্ধে আমি শুধুমাত্র প্রগতিশীল দাবিদার হিন্দুধর্মাবলম্বীদের দাবিগুলোর যথার্থতা নিরুপণের জন্য হিন্দু ধর্মীয় অনুশাসনগুলোর 'কিছু' দৃষ্টান্ত হাজির করার চেষ্টা করবো। আমি মনে করি, এই 'কিছু', অনেক কিছু বোঝার জন্য যথেষ্ট। স্বীকার করে নিচ্ছি, এটি কোনো মৌলিক প্রবন্ধ নয়; বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন লেখা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সংকলিত করা হয়েছে মাত্র। আর একটি কথা, প্রবন্ধের শিরোনামটি আমার নিজেরও পছন্দ নয়; হিন্দু ধর্ম কী করে 'সনাতন' ধর্ম হতে পারে সেটা আমি নিজেও বুঝি না। শুধু হিন্দু ধর্ম কেন, পৃথিবীর কোনো ধর্মই কি 'সনাতন' হতে পারে? অন্তত ধর্মের সমাজবৈজ্ঞানিক-নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস যারা জানেন, তাদের কাছে এই 'সনাতন' শব্দটি অত্যন্ত খেলো মনে হবে। কিন্তু হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা যেহেতু নিজেদের ধর্মকে 'সনাতন হিন্দু ধর্ম' নাম দিয়ে চিহ্নিত করেন, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রবন্ধের নামকরণটি এরকম হল।

এবার মূল আলোচনায় আসি। বলা হয়ে থাকে হিন্দুধর্মের মূল গ্রন্থ বেদ। এজন্য অনেকে হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্ম হিসেবেও অভিহিত করে থাকেন। হিন্দুধর্মের বেদ চারটি; যথা ঋগবেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ ও যজুর্বেদ। এই যজুর্বেদ দুই ভাগে বিভক্ত—একটি হচ্ছে কৃষ্ণযজুর্বেদ বা তৈত্তরীয় সংহিতা অন্যটি শুক্লযজুর্বেদ; এই শুক্লযজুর্বেদ আবার দুই ভাগে বিভক্ত, একটি শতপথ ব্রাহ্মণ এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদ। শুক্লযজুর্বেদের অন্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণে নারীকে তুলনা করা হয়েছে এভাবে, "সে ব্যক্তিই ভাগ্যবান, যার পশুসংখ্যা স্ত্রীর সংখ্যার চেয়ে বেশি" (২/৩/২/৮)। শতপথ ব্রাহ্মণের এ বক্তব্যকে হয়তো দরদী ধর্মবাদীরা ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে যৌক্তিকতা দিতে চেষ্টা করবেন, কিন্তু পরের আরেকটি শ্লোকে পাওয়া যায় হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিতে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান; "বজ্র বা লাঠি দিয়ে নারীকে দুর্বল করা উচিৎ, যাতে নিজের দেহ বা সম্পত্তির উপর কোনো অধিকার না থাকতে পারে" (৪/৪/২/১৩)। এর থেকে স্পষ্ট কোনো বক্তব্যের আর প্রয়োজন আছে? বৃহদারণ্যকোপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবাল্ক্য বলেন, "স্ত্রী স্বামীর সম্ভোগকামনা চরিতার্থ করতে অসম্মত হলে প্রথমে

উপহার দিয়ে স্বামী তাকে 'কিনবার' চেষ্টা করবে, তাতেও অসম্মত হলে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে মেরে তাকে নিজের বশে আনবে" (৬/৪/৭, ১/৯/২/১৪)। দেবীভাগবত-এ নারীর চরিত্র সম্পর্কে বলা আছে (৯:১): "নারীরা জোঁকের মত, সতত পুরুষের রক্তপান করে থাকে। মুর্খ পুরুষ তা বুঝতে পারে না, কেননা তারা নারীর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। পুরুষ যাকে পতঙ্গী মনে করে, সেই পতঙ্গী সুখসম্ভোগ দিয়ে বীর্য এবং কুটিল প্রেমালাপে ধন ও মন সবই হরণ করে।" বাহ্! হিন্দুরা না-কি মাতৃজ্ঞানে দেবীর (দূর্গা, কালি, মনসা, স্বরসতী, লক্ষী) পূজা করে? 'নারী' সম্পর্কে যাদের ধর্মীয় বিধানে এমন হীন বক্তব্য রয়েছে, তারা দেবীর পূজা করলেই কী আর না-করলেই কী? ঋগে¦দ বা অন্যান্য বেদ, উপনিষদে কয়েকজন বিদুষী ও শাস্ত্রজ্ঞ নারীর নাম জানা যায়, যারা বিভিন্ন শ্লোক রচনা করেছিলেন; তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, গার্গী, বা□সী, বাক্, অপালা, সূর্যা, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি। আধুনিককালে কেহ কেহ এই বিদুষী নারীদের নাম দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে চান, সেকালে নারীরা কতটুকু স্বাধীন ছিল যে, তাঁরা বেদের শ্লোক পর্যন্ত রচনা করেছিলেন! অস্বীকার করা যাবে না, সেকালে কয়েকজন নারী শ্লোক-মন্ত্র রচনা করে শিক্ষাক্ষেত্রে নিজেদের স্বতন্ত্র্য অবস্থান প্রমাণ করে গেছেন। কারণ ধর্মগ্রন্থকে ঘিরেই ছিল সেকালের শিক্ষা। তবে একটা উদাহরণ দিলেই বুঝা যাবে, ত□কালীন সমাজে এ বিদুষী নারীদের অবস্থান কি রকম ছিল? (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যে রচিত) বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যায়, খ্যাতনামা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য এবং অন্যান্য ঋষিদের সাথে এক সভায় ঋষি বাচাক্লুর কন্যা গার্গী ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে তর্কে লিপ্ত হয়ে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন। একসময় যাজ্ঞবল্ক্য ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠেন, "হে গার্গী, আর বেশি প্রশ্ন করো না, তাহলে তোমার মাথা খসে পড়ে যাবে!" (৩/৬/১); যাজ্ঞবল্ক্যের বক্তব্যে গার্গী থেমে গেলেন পরবর্তীতে স্বীকার করলেন, ব্রহ্মবিদ্যায় যাজ্ঞবল্ক্যকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না (৩/৮/১-১১)। আবার যে নারীরা বেদের-উপনিষদের শ্লোক-মন্ত্র রচনা করেছেন, সেই নারীদের উত্তরসূরীদের জন্য মনু বেদসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পাঠের অধিকার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, "নারীরা ধর্মজ্ঞ নয়, এরা মন্ত্রহীন এবং মিথ্যার ন্যায় এই শাস্ত্রীয় নিয়ম—(অশুভ)" (মনুসংহিতা, ৯/১৮)।

হিন্দুধর্মের ইতিহাসে সেই কুখ্যাত সতীদাহ বা সহমরণের কথা প্রথম জানা যায় অথর্ববেদে, "... জীবিত নারীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মৃতের বধু হতে" (১৮/৩/৩); "এই নারী পতিলোকে যাচ্ছে, এ প্রাচীন রীতি অনুসরণ করছে..." (১৮/৩/৩/১)। এ প্রাচীন রীতি কত পুরানো? এটি আর্য না প্রাগার্য সংস্কৃতি? কারণ আমরা ইন্দো-ইয়রোপীয় অন্য সভ্যতাগুলিতে আমরা সহমরণের কথা তো পাই না। উত্তরগুলো আমার জানা নেই। তবে পাঠক, আপনারা হয়তো ইতিহাস পাঠের কারণে জানেন, এই বাংলায় ১৮১৫ সাল থেকে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত মাত্র তের বছরে ব্রাহ্মণ্যবাদীর দল পুণ্যলাভের আশায় আর নারীর সতীত্ব (?) রক্ষার ধুয়া তুলে ৮১৩৫ জন নারীকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে সতী বানিয়েছিল! একটু ভাবুন তো, একটি নিরাপরাধ মেয়েকে টেনে-হিচড়ে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলছে, পাশে মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন সক্কলে দাঁড়িয়ে 'বল হরি বল' কীর্তন গেয়ে নিজেদের স্বর্গে যাবার আয়োজন করছে, ভাবতেই তো গা গুলিয়ে উঠে! মানুষ কী পরিমাণ পাষণ্ড-হারামি-ধর্মান্ধ হলে এরকম কাজ করতে পারে? 'ধর্ম' নামক আফিমীয় মাদক মানুষকে কতটুকু নিবোর্ধ-মানবিকতাশূণ্য বানিয়ে দেয়, তারই উদাহরণ হতে পারে উপমহাদেশের এই সতীদাহ প্রথা।

মনুসংহিতা এবং নারী : হিন্দু আইনের মূল উ□স হচ্ছে এই 'মনুসংহিতা' এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছেও এটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বিবেচ্য। এই ধর্মগ্রন্থে নারীর কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে"—,বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ/পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোহগ্নিপরিক্রিয়া॥" (২:৬৭), অর্থা□স্ত্রীলোকদের বিবাহবিধি বৈদিক— সংস্কার বলে কথিত, পতিসেবা গুরুগৃহেবাস এবং গৃহকর্ম তাদের (হোমরূপ) অগ্নিপরিচর্যা; আবারও বলে দেয়া হয়েছে নারীর গৃহকর্ম এবং সন্তান উ—কর্তব্য□পাদন (৯:২৬)। সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্যই নারী এবং সন্তান উ□পাদনার্থে পুরুষ সৃষ্টি হয়েছে (৯:৯৬)। যে সকল নারী একদা বৈদিক মন্ত্র-শ্লোক পর্যন্ত রচনা করেছিলেন, তাদের উত্তরসূরীদের জন্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত-অমন্ত্রক (২:৬৬); নারী মন্ত্রহীন, অশুভ (৯:১৮)। কন্যা, যুবতী, রোগাদি পীড়িত ব্যক্তির হোম নিষিদ্ধ এবং করলে নরকে পতিত হয় (১১:৩৭)! স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে —(৫:১৫৪)"বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্বা পরিবর্জিতঃ/উপচর্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥" বাংলা করলে দাঁড়ায়, স্বামী দুশ্চরিত্র, কামুক বা নির্গুণ হলেও তিনি সাধ্বী স্ত্রী কর্তৃক সর্বদা দেবতার ন্যায় সেব্য। পরবর্তী শ্লোকে রয়েছে, কোনো নারী (স্ত্রী) যদি স্বামীকে অবহেলা করে, ব্যভিচারিণী হলে সংসারে তো নিন্দিত হবেই সাথে-সাথে যক্ষা, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়, শুধু তাই নয় পরজন্মে শৃগালের গর্ভে জন্ম নিবে সেই নারী (৫:১৬৩-১৬৪)। স্ত্রীদের জন্য স্বামী ছাড়া পৃথক যজ্ঞ নেই, স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোনো ব্রত বা উপবাস নেই, শুধু স্বামীর সেবার মাধ্যমেই নারী স্বর্গে যাবে (৫:১৫৫)। সাধ্বী নারী কখনো জীবিত অথবা মৃত স্বামীর অপ্রিয় কিছু করবেন না (৫:১৫৬)। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীদের কি করতে —হবে"কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুস্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ/ন তু নামাপি গৃহ্নীয়া□ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥" (৫:১৫৭), সহজ ভাষায় বাংলা করলে হয়, স্ত্রী সারা জীবন ফলমূল খেয়ে দেহ ক্ষয় করবেন, কিন্তু অন্য পুরুষের নামোচ্চারণ করবেন না। কিন্তু স্ত্রী মারা গেলে স্বামী কি করবেন, "ভার্যায়ৈ পূর্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্মণি/পুনর্দারক্রিয়াং কুর্যা□ পুনরাধানমেব চ॥" (৫:১৬৮), এই শ্লোকেরও বাংলা শুনুন, দাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে স্বামী আবার বিয়ে এবং অগ্ন্যাধ্যান করবেন। সত্যি! নারী-পুরুষের মধ্যে কী চম□কার সমতা!! কেহ কেহ বলেন, 'মনুবাদ' থেকেই না-কি 'মানবতাবাদ' এসেছে! দারুন! ধন্য মোরা মনুর প্রতি! আবার এই 'মনুবাদ' না-কী হিন্দু আইনের উৎস! নারীর গুণাবলী নিয়ে মনু বলেন, নারীর কোনো গুণ নেই, নদী যেমন সমুদ্রের সাথে মিশে লবনাক্ত (সমুদ্রের গুণপ্রাপ্ত) হয়, তেমনই নারী বিয়ের পর স্বামীর গুণযুক্ত হন (৯:২২)। নারীর স্বাধীনতা সম্পর্কে মনুর সংহিতাতে বলা আছে : "অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দ্দিবানিশম্/ বিষয়েষু চ সজ্জন্ত্যঃ সংস্থাপ্যা আত্মনো বশে॥" (৯:২), অর্থা□ স্ত্রীলোকদের স্বামীসহ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ দিনরাত পরাধীন রাখবেন, নিজের বশে রাখবেন...; আবার এর পরেই আছে বিখ্যাত সেই শ্লোক : "পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে/রক্ষতি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥" (৯:৩) অর্থা□ স্ত্রীলোককে পিতা কুমারী জীবনে, স্বামী যৌবনে ও পুত্র বার্ধক্যে রক্ষা করে; (কখনও) স্ত্রীলোক স্বাধীনতার যোগ্য নয়। এখন যারা (সনাতনবাদীরা) নারীমুক্তির বিষয়ে নিজ ধর্মের পক্ষে সাফাই গান, তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, এই শ্লোক দেখে তারা কী ব্যাখ্যা দেবেন? নিশ্চয়ই আমতা আমতা করে ছলনা-শঠতার মাধ্যমে যৌক্তিকতা (বাস্তব উপযোগিতা) দানের চেষ্টা করবেন, কিংবা অস্বীকার করে বসবেন, আদৌ এ ধরনের কোনো শ্লোক কোথাও নেই! নারী সম্পর্কে ঘৃণ্য দৃষ্টিভঙ্গি ছড়িয়ে আছে সমগ্র মনুসংহিতা জুড়েই; নারীনিন্দায় মনুসংহিতা শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করে গেছে। মনুর দৃষ্টিতে নারী স্বভাবব্যভিচারিণী, কামপরায়ণা; কাম, ক্রোধ, পরহিংসা, কুটিলতা ইত্যাদি যত খারাপ দোষ আছে, সবই

নারীর বৈশিষ্ট্য, এসবই দিয়ে নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে! তবু সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এসব কিছুই নজরে আসে না, তাঁরা উদয়-অস্ত খুঁজে বেড়ান ইসলামধর্ম, খ্রিস্টানধর্ম, বৌদ্ধধর্ম নারীদের কোন্ অধিকার দিয়েছে, আর কোন্ অধিকার দেয়নি! আলোচনায় মশগুল কোথায় কোন মুসলিম দেশে নারীদেরকে পাথর ছুড়ে হত্যার ফতোয়া দেয়া হল, বোরকা চাপিয়ে দেয়া হল, কিংবা কোথায় হিল্লা বিয়েতে নারীকে বাধ্য করা হল! এ নিয়েই তাদের মাথা-ব্যাথা! হিন্দুধর্মের এমন স্ববিরোধী, মানবতাবিরোধী, নারী-বিদ্বেষী চরিত্র জানার পরও কোন্ যুক্তিতে হিন্দুধর্মকে আধুনিক-প্রগতিশীল দাবি করা হয়? নারীর প্রতি এতো বিদ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা আর কোনো ধর্মে আছে কি-না আমার জানা নেই? ধর্মগুরু, ঈশ্বরতুল্য মনু ঠিক কী পরিমাণ নারী-বিদ্বেষী হলে বলতে পারেন : "নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ/সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে॥" (৯:১৪), অর্থা "যৌবনকালে নারী রূপ বিচার করে না, রূপবান বা কুরূপ পুরুষ মাত্রেই তার সঙ্গে সম্ভোগ করে।" (বাহ্! মনে হয় তাদের নিজেদের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র!); আসুন, একই রকম আরেকটি মনুর শ্লোক —দেখি"স্বভাব এস নারীনাং নরাণামিহ দূষণম্/অতোহর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ॥" (২:২১৩) অর্থা "নারীর স্বভাবই হলো পুরুষদের দূষিত করা..."!

মহাভারত এবং নারী : সনাতন হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কাছে আরেকটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে মহাভারত; যদিও ইদানীং অনেকে একে মহাকাব্য হিসেবে বিবেচনা করেন, তবে বেশিরভাগ ধর্মাবলম্বীদের কাছে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে 'মহাভারতের কথা অমৃতসমান' বিবেচিত হয়। পণ্ডিতেরা বলেন মহাভারতের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টাব্দ চতুর্থ শতকের মধ্যে এবং কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের কাল (যদি বাস্তবে কখনো সে যুদ্ধ ঘটে থাকে) মোটের উপর খ্রিস্টপূর্ব নবম শতক। মহাভারতেও নারী সম্পর্কে মনুসংহিতার প্রভাব পড়েছে তীব্রভাবে, এসেছে নারী সম্পর্কে অনেক হীন বক্তব্য; যার সামান্য কয়েকটি আগ্রহীদের জন্য তুলে ধরা হচ্ছে : মহাভারতের অসংখ্য চরিত্রের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হচ্ছে ভীষ্ম, তাঁর মধ্যেও স্পষ্টরূপে মনুর ছায়া পরিলক্ষিত হয়, তিনি বলেন (১৩/৩৮), "উহাদের (স্ত্রীলোকদের) মত কামোন্মত্ত আর কেহই নাই। ... কাষ্ঠরশি যেমন অগ্নির, অসংখ্য নদীর দ্বারা যেমন সমুদ্রের ও সর্বভূত সংহার দ্বারা অন্তকের তৃপ্তি হয় না, তদ্রুপ অসংখ্য পুরুষ সংসর্গ করিলেও স্ত্রীলোকের তৃপ্তি হয় না।"। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও গুরু ভীষ্মের মতোই, তাঁর মুখেও শোনা যায় তীব্র নারীনিন্দা, "উহারা (নারীরা) ক্রিয়া-কৌতুক দ্বারা পুরুষদিগকে বিমোহিত করে। উহাদিগের হস্তগত হইলে প্রায় কোনো পুরুষই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। গাভী যেমন নূতন নূতন তৃণভক্ষণ করিতে অভিলাষ করে, তদ্রুপ উহারা নূতন নূতন পুরুষের সহিত সংসর্গ করিতে বাসনা করিয়া থাকে" (১৩/৩৯)। আবারো পঞ্চপাণ্ডবের মহাজ্ঞানী পিতামহ ভীষ্মের উপলব্ধি, "মানুষের চরিত্রে যত দোষ থাকতে পারে, সব দোষই নারী ও শূদ্রের চরিত্রে আছে। জন্মান্তরীয় পাপের ফলে জীব স্ত্রীরূপে (শূদ্ররূপেও) জন্মগ্রহণ করে" (ভীষ্মপর্ব ৩৩/৩২); "স্ত্রীগণের প্রতি কোন কার্য বা ধর্ম নেই। (কারণ) তারা বীর্যশূণ্য, শাস্ত্রজ্ঞানহীন।" (অনু, ১৩/৩৯) এরপরেও নাকি মহাভারতের কথা অমৃতসমান! (সূত্র : মনুসংহিতা ও নারী, পৃষ্ঠা ৭২-৭৬) "তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, দাবানল, ক্ষুরধার বিষ, সর্প ও বহ্নিকে রেখে অপরদিকে নারীকে স্থাপন করিলে ভয়ানকত্বে উভয়ে সমান-সমান হবে" (অনুশাসনপর্ব ৩৮)। ব্রাহ্মণ্যধর্মের 'সম্পূর্ণ ধর্মগ্রন্থ' রূপেই এখন গীতার স্থান; এবং কারো কারো কাছে আধুনিক ধর্মগ্রন্থ! গীতাকে বলা হয়, শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী, ভগবদগীতা। কিন্তু এই গীতাতেও দেখি ভগবানের কণ্ঠে মনুর বক্তব্য!

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় পঞ্চপাণ্ডবের শ্রেষ্ঠ বীর শ্রীমান অর্জুনের মুখে শুনি—"অধর্মাভিভাবা কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ/স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥" (গীতা, ১:৪০) অর্থা "হে কৃষ্ণ, অধর্মের আবির্ভাব হলে কুলস্ত্রীরা ব্যভিচারিণী হয়। হে বার্ষ্ণেয়, কুলনারীগণ ব্যভিচারিণী হলে বর্ণসংকরের সৃষ্টি হয়"। এর পরেই বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি হলে কি হয়, তারও উত্তর রয়েছে : "সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘœানাং কুলস্য চ/পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥" (গীতা, ১:৪১) অর্থা বর্ণসঙ্কর, কুলনাশকারীদের এবং কুলের নরকের কারণ হয়। শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি ক্রিয়ার লোপ হওয়াতে ইহাদের পিতৃপুরুষ নরকে পতিত হয়।" এই উক্তিগুলো পঞ্চপাণ্ডবের এক ভাই অর্জুনের; মেনে নিচ্ছি ভগবদগীতায় শ্রী ভগবানের উক্তিই প্রামাণ্য, অর্জুনের নয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের বক্তব্য খণ্ডন তো করেনই নি, বরঞ্চ সে বক্তব্যকে পুরোপুরি সমর্থন করে এবং অর্জুনকেও ছাড়িয়ে গিয়ে নারীদের 'পাপযোনি' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন : "মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ/স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেপি যান্তি পরাং গতিম্॥" (গীতা, ৯:৩২) অর্থা "আমাকে আশ্রয় করে স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র এসব পাপযোনিরাও পরম গতি লাভ করে থাকে"। এরপরই দয়ময় ভগবান ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিদের ভক্তিতে গদগদ হয়ে বলেন : "কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা/অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥" (৯:৩৩) অর্থ হচ্ছে "পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিগণ যে পরম গতি লাভ করিবেন তাহাতে আর কথা কি আছে? অতএব আমার আরাধনা কর। কারণ এই মর্তলোক অনিত্য এবং সুখশূণ্য।" পাঠক, বত্রিশ নম্বর শ্লোকে লক্ষণীয় যে, নারীর সাথে বৈশ্য ও শূদ্ররা পাপযোনিভুক্ত, শুধু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বাদে! কিন্তু নারী যদি কোনো ব্রাহ্মণের মেয়ে হয় তবুও সে ভগবানের দৃষ্টিতে পাপযোনিভুক্ত। বুঝা যাচ্ছে, ভগবানের কাছে নারীর আলাদা কোনো জাত বা বর্ণ নেই; সব নারীই পাপযোনিভুক্ত। কিন্তু খটকা লাগে, কোনো ব্যক্তির নিজের জন্মের উপর নিজের কি কোনো হাত থাকতে পারে? যদি হাত নাই থাকে, তবে নারী, বৈশ্য, শূদ্ররা পাপযোনিভুক্ত হয় কী করে? তাছাড়া এ ধরনের নোংরা বক্তব্য কী কোনো ধর্মগ্রন্থে থাকতে পারে? এ ধরনের নোংরা বাণী এখানেই শেষ নয়, আরো আছে; প্রচুর পরিমাণে আছে। নারীদের নিয়ে হিন্দু ভগবান থেকে শুরু করে মুনি-ঋষি, ঠাকুর-পুরোহিত, রাজন্যবর্গ কারোর-ই চিন্তার শেষ নেই। নারী অমুক, নারী তমুক! অনেকেই ভাবতে পারেন, হিন্দুধর্মের দৃষ্টিতে নারী বোধহয় কখনোই ভালো নয়? না, না। এরকমটি নয়। হিন্দু মুনি-ঋষিরা ভালো নারী-ধর্মচারী নারীর বৈশিষ্ট্য ঠিক করে দিয়েছেন! তাদের দৃষ্টিতে সতী-সাধ্বী-ধর্মচারিণী হচ্ছে—"ন চন্দ্রসূর্যৌ ন তরুং পুন্নাুো যা নিরীক্ষতে/ভর্তৃবর্জং বরারোহা সা ভবেদ্ধর্মচারিণী॥ (মহাভারত, ১২/১৪৬/৮৮) অর্থাৎ "যে নারী স্বামী ব্যতীত কোনো পুংলিঙ্গান্ত (নামের বস্তু), চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষও দর্শন করে না, সে-ই ধর্মচারিণী।" ওরেবাব্বা! দেখলেন তো! ধর্মচারিণী হতে হলে কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন? এতো দেখি পর্দাপ্রথা থেকেও চূড়ান্ত ও উন্মত্ত সংস্করণ! সনাতন ধর্মাবলম্বীরা এরপরেও কোন মুখে দাবি করেন, তাদের ধর্ম প্রগতিশীল, তাদের ধর্মে নারী সম্পর্কে কোনো বাজে ধারণা নেই? না জেনে দাবি করে বসলে আমার কিছু বলার নেই? কিন্তু জেনে-শুনে যারা এগুলো গোপন করে নিজেদের ধর্ম যুগোপযুগী, নারী-মুক্তির পক্ষে কিংবা নারী-মুক্তি হিন্দু ধর্মেই রয়েছে বলে সাফাই গান, তাদের জন্য বাংলা ভাষায় একটা ভদ্র শব্দ প্রচলিত আছে, তা হল 'চশমখোর'! হিন্দুধর্ম নারীকে বিন্দুমাত্র মানুষের মূল্য দেয় না; নারী শুধুমাত্র পণ্য, নারীর নিজস্ব কোনো অধিকার নেই, নেই স্বাধীনতা; এখনো হিন্দুধর্মাবলম্বীদের বিয়ের সময় কন্যাদান করা হয় পুরুষের (স্বামী/প্রভু) কাছে যজ্ঞ-মন্ত্র ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতা মেনেই। বৈদিকযুগ থেকেই বিয়ের সময়ই কন্যাদান নয়, অহরহই যে কোনো অনুষ্ঠান

সম্পন্ন করতে ক্ষত্রিয় রাজা বা ঠাকুর-পুরোহিত-ব্রাহ্মণদের মনোরঞ্জনের জন্য নারীদের দান করা হতো, দেখুন পবিত্র মহাভারতের কিছু নমুনা : মহাভারতের কথিত শ্রেষ্ঠ সত্যবাদী যুধিষ্ঠির নিজেও যজ্ঞে-দানে-দক্ষিণায় বহুশত নারীকে দান করে দিতেন অবলীলায় অতিথিরাজাদের আপ্যায়নে (আশ্বমেধিকপর্ব ৮০/৩২, ৮৫/১৮)! রাজাদের লালসার তো শেষ নেই! শুধু ক্ষত্রিয় রাজারা ভোগের জন্য নারী পেলে তো হবে না, অমৃতের সন্তান ব্রাহ্মণেরা কী দোষ করলো তবে! চিন্তার কিছু নেই, ওদের জন্যও ব্যবস্থা আছে। শ্রাদ্ধের-দক্ষিণার তালিকাতে পুরোহিত ব্রাহ্মণদের নারী দান করার বিধান রয়েছে, দেখুন : আশ্রমবাসিকপর্ব ১৪/৪, ৩৯/২০, মহাপ্রস্থানপর্ব ১/৪, স্বর্গরোহণপর্ব ৬/১২,১৩।

যাহোক, এই ইহজগতে না হয় দুদর্মনীয় কামভোগের একটা ব্যবস্থা করা গেল, কিন্তু মৃত্যুর পর কী হবে? মরণের পরেও তো সুখ-শান্তির ব্যবস্থা থাকা চাই। চিন্তা নেই, তারও রেডিমেড ব্যবস্থা আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো যুদ্ধ করে মারা গেলে স্বর্গে পাওয়া যাবে অসংখ্য সুন্দরী নারী। প্রমাণ চাই তো নিশ্চয়ই! দেখুন : বনপর্ব ১৮৬-১৮৭, কর্ণপর্ব ৪৯/৭৬-৭৮, শান্তিপর্ব ৬৪/১৭, ৩০; ৯৬/১৮, ১৯, ৮৩, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ১০৬; রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড ৭১/২২, ২৫, ২৬, সুন্দরকাণ্ড ২০/১৩। (সূত্র : প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য, পৃষ্ঠা ৬৩)

নারীর জন্য নয় কোনো ধর্মগ্রন্থ : পাঠক, এবার আলোচনায় ইতি টানতে হচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরেই তো দেখলেন-পড়লেন হিন্দুধর্মীয় অনুশাসনগুলো। কি মনে হয়? এই ধর্মীয় অনুশাসনগুলো কী নারীদের পক্ষে, কিংবা ওগুলোতে কি নারীদের প্রতি ইতিবাচক কোনো বক্তব্য আছে? (অস্বীকার করছি না, কোথাও কোথাও হয়তো ভাসা-ভাসা আছে, কিন্তু সার্বিকভাবে দেখলে, কখনোই বলা যাবে না, হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো নারীদের প্রতি —ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে) কেউ কেউ হয়তো পুরানো সেই ভাঙা রেকর্ড'ভগবানের কাছে নারী-পুরুষ সবই সমান' বাজিয়ে বলবেন ওগুলো এক-আধটু সব ধর্মেই আছে, এতে দোষের কিছু নেই! এসব কথা শুনলে বড্ড হাসি পায়; করুণা হয় সনাতনপন্থীদের প্রতি! সনাতনপন্থীদের কথা এবার বাদ দেই, অনেকে হয়তো ভাবছেন, নারীর প্রতি এতো অবমাননা, অশ্লীল বক্তব্য থাকার পরও নারীরা এ হীন অবস্থানকে মেনে নিলেন কেন? প্রশ্নটা আমাকেও ভাবিয়েছে অনেকদিন। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হয়, তাকালীন পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা শুধু এগুলোকে ধর্মীয়-বিধান বলেই মানতে বাধ্য হয়েছিলেন; না হলে নির্ঘাত বিদ্রোহ হত। সেকালে নারীরা কোনো ধরনের শিক্ষা পাননি; খুব পরিকল্পিতভাবেই তাদেরকে ধর্মগ্রন্থ এবং অন্যান্য জ্ঞানার্জন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। নারীর সবরকম মানবিক ও সামাজিক অধিকারকে অস্বীকার করে পুরুষদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল ভোগের জন্য আর সন্তান উৎপাদনের জন্য; তবে সে সন্তান হতে হবে ছেলে। মেয়ে জন্মের পরই মাথায় ঢুকানো হত 'জন্মান্তরবাদ' ও 'কর্মবাদ'-এর তত্ত্ব। মনুর মতো শাস্ত্রকাররা নারীদের বুঝাতেন, নারীর জন্ম হল আজন্ম পাপের ফল...! মনুসংহিতাসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে বোঝা যায়, ব্রাহ্মণপুরুষ কর্তৃক রচিত ওগুলো একেকটা 'পুরুষসংহিতা'; নারীদের (যে বর্ণের হোক) জন্য নয় ওগুলো। নারী যদি মুক্তি চায়, প্রগতির দিকে হাঁটতে চায়, নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে চায় পূর্ণরূপে, তবে অবশ্যই-অবশ্যই তাদের 'ধর্মকারায়' বজ্র হেনে বেড়িয়ে আসতে হবে। ধর্মগ্রন্থের যতই সাহিত্যিকমূল্য কিংবা দার্শনিক তত্ত্ব লুকানো থাকুক না কেন, নারীকে এর ভার বহন করার প্রয়োজন নেই।

নারীর এতে কোনো ক্ষতি হবে না, কোনো অংশ ক্ষসে পড়বে না। বরং আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা, যুক্তিবাদ আর অসাম্প্রদায়িক মনোভাবই পারে নারীর সার্থক মুক্তি ঘটাতে; এতেই নারীর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ মর্যাদা বিকাশিত হবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

(১) সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভূমিকা, অনুবাদ, টীকা), ২০০২, মনুসংহিতা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
(২) শ্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাদিত), ১৯৯৭, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা।
(৩) কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৮, ধর্ম ও নারী, এলাইড পাবলিশার্স, কলকাতা।
(৪) কঙ্কর সিংহ, ২০০৫, মনুসংহিতা ও নারী, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা।
(৫) সুকুমারী ভট্টাচার্য, ২০০২, প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
(৬) সা'দ উল্লাহ্, ২০০২, নারী অধিকার ও আইন, সময় প্রকাশন, ঢাকা।
(৭) মাহমুদ শামসুল হক, ১৯৯৬, নারীকোষ, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা।
(৮) প্রবীর ঘোষ, ১৯৯৪, যুক্তিবাদের চোখে নারী-মুক্তি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

অনন্ত বিজয়, শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, এবং যুক্তি পত্রিকার সম্পাদক। মুক্তমনার একজন নিবেদিতপ্রাণ সদস্য। সংরক্ষনশীল সনাতন ধর্মের মিথ, কুসংস্কার এবং অনুদার সমাজ কাঠামোর একজন প্রবল সমালোচক। মানবতা এবং যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০০৬ সালে মুক্তমনা এওয়ার্ড পেয়েছেন। ইমেইল - ananta@inbox.com

চিরকালীন মোল্লাতন্ত্র বনাম নারীর সমানাধিকার

রবিউল ইসলাম

> "মানুষেরে ঘৃণা করি,-
> ও কারা, কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি" !..... বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম

ধর্ম যখন মানুষের চেয়ে বড় হয়ে উঠে, তখন কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী ঘটে একটি জাতির জীবনে । তাই হয়ে এসেছে চিরকাল, ইতিহাস তাই বলে । অথচ কে না জানে, মানুষের জন্যই ধর্ম এসেছিল, ধর্মের জন্য মানুষ নয়-ধর্মের নামে মোল্লা-পুরোহিতদের তথাকথিত (বিকৃত) শরিয়ত-মনুংহিতার যাঁতাকলে নারীসমাজকে আজও বলী হতে হচ্ছে । আজ যেন মানুষ হয়ে গেল গৌণ (এবং তার মধ্যে নারী আরো বেশী গৌণ), আর ধর্ম হয়ে গেল মুখ্য একশ্রেণীর মোল্লা-পুরোহিতদের কাছে । অথচ এই ভারতবর্ষের আদিবাংলায়,-সমতটে শ্রীচৈতন্য তাঁর চিরন্তণ প্রেমের বাণী গেয়ে উঠেছিলেন-'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাঁহার উপরে নাই ।' মরমী সাধকরা জেনেছেন, মানবাত্মাই হলো পরমাত্মার অংশ, মানবাধারের মধ্যেই স্রষ্টা বিরাজ করছেন , আর ধর্ম-দর্শন-শিল্প-সংস্কৃতি হলো সেই মানবাত্মা থেকে উ্সারিত ঠিকরনো আলো যা মানুষকে পথ নির্দেশ করে এবং সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করতে শেখায় । বিদায় হজ্বের ভাষনে রসুলুল্লাহ্(সঃ) অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছিলেন,-

> "ধর্ম নিয়া তোমরা বাড়াবাড়ি করিও না, ধর্ম নিয়া বাড়াবাড়ির কারণে অতীতে বহু জাতি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে" ।

> "...তোমরা নিজেদের ধর্মে অন্যায়ভাবে সীমা লঙ্ঘন করিও না, ঐ সমস্ত লোকের কল্পনার উপর চলিও না যাহারা অতীতে নিজেরাও ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছে এবং আরও বহু লোককে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করিয়াছে ।"-সূরা মায়িদাহ্, আয়াত ৭৬ ।

প্রিয় পাঠক, এই আলোকে বিচার করুন রাজনৈতিক ইসলামের পথিকৃত মওলানা মওদুদীর ধর্মবিরোধী তৎপরতাকে,- যে লোক একটি গোষ্ঠী তথা মুসলমানদের একটি সেক্টের কায়েমী স্বার্থে শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে শান্তির ইসলামের বিকৃত ও সুবিধাবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে নিজস্ব ব্রান্ডের ইসলাম প্রবর্তন করেছিল । যা হলো উগ্র ওহাবী ইসলামেরই নামান্তর এবং আজকের জামায়াত ও অন্যান্য সমগোত্রীয় দল অনুসরণ করছে কায়েমি স্বার্থে। উপরোক্ত আয়াতের শেষের অংশটুকু,-'নিজেরাও ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছে.....'-এই আলোকে বিচার করুন ১৯৫৩ সালে মৌদুদী কর্তৃক দাঙ্গা বাধিয়ে পাকিস্তানের লাহোরে ১৫ হাজার কাদিয়ানীকে হত্যার ঘটনা* ।

এটাই কি আমাদের ইসলাম ? তাতো নয় । হৃদয়মন্দিরের যে অতলসিন্ধুকে মন্থন করে যুগ যুগ ধরে

---

* মুনীর কমিশন রিপোর্ট, লাহোর হাইকোর্ট, ১৯৫৬ দ্রঃ

এত মরমী আধ্যাত্মিকতা, ভাবদরিয়ায় ভাবরস ও ভক্তিরসের লীলা, ধর্ম ও দর্শনের কল্যাণ শিক্ষা, সেই সাত রাজার ধন মানিক-রতন হেলায় উপেক্ষিত হয়ে গুমরে কাঁদে আর বিধাতা নীরবে চোখের জল ফেলে ।

সে বিনে আর জানেনা, জানেনা যে মন,
.....
সেই একজনারে মন সপেছি.....
.....
সে আমার আছে পরাণে.....
এই ভবদরিয়ায়,..... এই ভবদরিয়ায় ঢেউ উঠেছে
ফুল ফুটেছে ভবের মাজারে । (মরমী গান, লেখক-অজ্ঞাত)

নজরুল 'পাপ' কবিতায় লিখেছেন-

"মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির-কাবা নাই ।"

কে জানে নজরুল, লালন ফকীর-নানক-কবীর প্রমুখ মরমী মানবতবাদীরা সমাধিতে শুয়ে নীরবে চোখের জল ফেলছেন কিনা সব দেখে শুনে !

প্রিয় পাঠক, গ্রাম্য সমাজপতিদের যোগসাজসে ফতোয়াবাজ বর্বর মোল্লারা কত নূরজাহানকে, কত নিরীহ দরিদ্র পিতার কিশোরী কন্যাকে হয় পাথর মেরে হত্যা করেছে নয়তো দোর্‌রা দিয়ে শাস্তি দিয়েছে (যার চূড়ান্ত পরিণতি হলো আত্মগ্লানিতে ভুগে মেয়েটির আত্নহত্যা), মৌলবাদী নরপশুদের দ্বারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কত হাজার মানুষ খুন হলো, কয়টি মসজিদ-মন্দির ধ্বংস হলো, কত কোরাণ-গীতা দাহ হলো, আহমদীয়া ও হিন্দু সম্প্রদায়ের কি পরিমাণ সম্পত্তি মৌলবাদী জঙ্গী-দুর্বৃত্তদের দ্বারা আত্নসাৎকৃত হলো ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক সহিংসতার একটা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত-প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়া উচিত ।

যে বয়সে একটি শিশুর সুকুমার-বৃত্তি চর্চার কথা ; বিদ্যার্জন, ছবি আঁকা, ছড়া-কবিতা আবৃত্তি চর্চার কথা, সঙ্গীতের কোমলতা ও ধর্মের ভক্তিরস-কল্যাণকে হৃদয়তন্ত্রীতে সমন্বিত করার কথা, সে বয়সে কেন সেই ফুল পিশাচ-নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত-ক্ষতবিক্ষত হয় ? অকালে ঝরে যায় ধর্মপিশাচদের হিংস্র থাবায় ? জাতির বিবেকের কাছে আমার প্রশ্ন । অথচ কোন কোন সভ্য দেশে বার-চৌদ্দ বছরের কোন সন্তানকে মা-বাবাও যদি প্রহার করে, আইন অনুযায়ী মা-বাবাকে জেলে যেতে হয় । অথচ, ঐ হতভাগ্য মেয়েদেরই কেউ হয়তো সুযোগ পেলে একদিন 'মাদার তেরেসা ' বা 'বেগম রোকেয়া' কিংবা 'সরোজিনী নাইডু' হয়ে জ্ঞান আর ভালবাসার আলো ছড়াতে পারতো (যা ঐ মোল্লাদের কাছে দুর্লভ), হতে পারত রুনা-লায়লার মতো শিল্পী অথবা কোন দরদী চিকিৎসক । ক্লোজ-আপের কল্যাণে নোলককে আজ কে না জানে । অথচ, বেশীদিন আগের কথা নয়, যখন তাঁর গর্বিত 'মা' মানুষের বাড়ীতে কাজ করে তাকে মানুষ করেছেন । কোথায় হারিয়ে যেত নোলকের ভিতরের সেই প্রতিভা যদি ক্লোজ-আপ তাকে খুঁজে বের না করতো, হারিয়ে যেতো হৃদয়ের সেই মণি-মুক্তো যা আজ ধাপে ধাপে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠার অপেক্ষায় ।

অথচ, হতভাগ্য ঐ নূরজাহানদের চারপাশের যে ঘন-নিকষ অন্ধকার পারিপার্শ্বিকতা তৈরী করে রেখেছে মোল্লাতন্ত্র ও গ্রাম্য সামন্ততন্ত্রের মিলিত অশুভ শক্তি, সেটি ভেদ করে ঐ হতভাগীনীরা আলোর কাছে যে পৌছতে পারে না । আর তাই বুঝি ঐ মহাকালের করুণ সঙ্গীত শোনা যায়, যার মাঝে নারীর চিরন্তন কান্না ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে,-

'আমি যে আঁধারে বন্দীনী, আমাকে আলোতে নিয়ে যাও,
স্বপন ছায়াতে চঞ্চলা, আমাকে পৃথিবীর কাছে নাও ।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ '-এ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং সম্পদ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারীপুরুষের সমানাধিকারের নীতি গ্রহণ করেছে, তখন কিছু স্বঘোষিত 'ইসলামের ধ্বজাধারী' মৌলবাদী দল রব তুলল যে এতে নাকি কোরাণ লঙ্ঘিত হয়েছে । ইসলামবিরোধী কোন আইন তাঁরা হতে দেবেন না বা প্রতিরোধ করবেন ইত্যাদি । আমি বুঝতে পারছি না, তাঁদের পক্ষের (অর্থাৎ রাজনৈতিক ইসলামের) এত আলেম-ওলামা থাকতে তাদের একদল প্রতিনিধি প্রধান উপদেষ্টা বা ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টার কাছে গিয়ে যুক্তি দিয়ে বিশদ ব্যাখ্যাসহকারে বুঝিয়ে বলছেন না কেন যে, কোন্ কোন্ কারণে গৃহীত নীতিটি ইসলামবিরোধী বা কোরাণবিরোধী । 'নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮'-এ সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের অধিকার সম্পর্কে আসলে কী লেখা রয়েছে, তা' কি তারা একবারও পড়ে দেখেছেন ? নাকি 'চিলে কান নিয়ে গেল' বলে মতলবি শোরগোল তুলে ঘোলাপানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করছেন । তারা কেন এ বিষয়ে উম্মুক্ত বিতর্কের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছেন না দেশ-বিদেশের ইসলামী স্কলারদের, যারা নারীবিরোধী ও মানবতাবিরোধী শরীয়াকে ইসলামের মৌল চেতনার পরিপন্থী তথা ইসলামবিরোধী বলে প্রমাণিত করেছেন এবং সংস্কারের তাগিদ দিয়েছেন । সেটা না করে বা উম্মুক্ত আলোচনাসভায় সাধারণ মানুষকে মুক্তভাবে প্রশ্নের সুযোগ না দিয়ে তাঁরা 'প্রতিরোধ-প্রতিহত' করার হুমকি দিচ্ছেন । জরুরী অবস্থায় আর সবার জন্য যখন মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ, তখন আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে মিছিল-সমাবেশ করেছেন -এতেই এদের জঙলী চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়ে শুধু নয়, এদের ভিতরের দৈন্যতাটিও ফাঁস হয়ে যায়। আসলে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার স□সাহস এদের নেই, তাই সেটি ঢাকবার জন্য তাদের এত আক্রমনাত্নক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় ।

সম্প্রতি নিউইয়র্কের মদীনা মসজিদে ওলামা পরিষদের এক সমাবেশে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গৃহীত 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮' বাতিলের দাবী জানিয়েছেন । মোল্লারা তাঁদের বক্তৃতায় দাবী করেছেন যে পবিত্র কোরআনেই নারীর স্থান নির্ধারিত হয়েছে । তারা বলেছেন, কোরআন-হাদীসের আলোকে নারীরা যাবতীয় সুযোগসুবিধা ভোগ করছেন । তারা বলেছেন, বিভিন্ন পর্যায়ে কোটা প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে নারীকে করুণার পাত্রে পরিণত করা হয়েছে । বিদেশীদের মদদে বর্তমান সরকার নারী উন্নয়ন নীতিমালার নামে নারীদের অধিকার খর্ব করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে । বিভিন্ন পর্যায়ে কোটা প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে নারীদের প্রতিভা ও যোগ্যতাকে করুণার পাত্রে পরিণত করা হয়েছে । আমি তাঁদের সভায় উপস্থিত ছিলাম না । পত্রিকায় যতটুকু পড়েছি, তাই লিখলাম । মজার ব্যাপার হচ্ছে, একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী

ও নারীধর্ষনের সহায়ক আশরাফুজ্জামান খান সভা পরিচালনা করেন । যাহোক, মোল্লারা তাঁদের কৌশল পাল্টেছে দেখছি । তারা এখন জানে যে, সরাসরি নারী উন্নয়নের বিরোধিতা আজকের যুগে আর করা যাবে না । এখন তারা নারী দরদী সেজেছে । একাত্তরে যারা আমাদের মাবোনদের পাক হানাদারদের কাছে তুলে দিয়েছিল ক্ষমাতার স্বাদ পাওয়ার জন্য, যাদের ফতোয়াবাজির শিকার হয়ে নারীরা অহরহ আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে তারাই এখন নারীদরদী সেজে আবার নারী উন্নয়ন নীতির বিরুদ্ধে লেগেছেন । প্রশ্ন করি, কোটা প্রথা প্রবর্তনের প্রশ্ন আসে কেন, সব কিছুই যদি ঠিক ঠাক থাকে, সব ধরণের সুযোগসুবিধাই নারীরা ভোগ করে থাকেন । কেন বিশেষভাবে 'নারী উন্নয়ন নীতিমালা'র প্রয়োজন হয়, কিন্তু 'পুরুষ উন্নয়ন নীতিমালা'র প্রয়োজন হয়না ? আমাদের দেশে নারী শিক্ষার হার কত[†] ? শতকরা কয়জন নারী চাকরী করতে পারছে, স্বাধীন ব্যবসা করতে পারছে ? কয়জন নারী ডাক্তার, প্রকৌশলী, আইনব্যবসা প্রভৃতি পেশায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে ? যে কয়জন আছে তাদের সংখ্যা নগ্ণ্য নয় কি ? এখান থেকেই বেরিয়ে আসে 'কোরআন-হাদীসের আলোকে নারীরা যাবতীয় সুযোগসুবিধা ভোগ করছেন' এই দাবী কতটা ভিত্তিহীন মিথ্যা ও অসার । উক্ত দাবী সত্য হলে এনজিওগুলিকে কেন নারীশিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নিতে হয় ? কারণ আর কিছুই নয়, সরকারী প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে মৌলবাদীদের প্রভাব বিস্তার । কথায় আছে, বিরোধ থাকলেই মীমাংসার প্রয়োজন হয়, সমস্যা থাকলেই সমাধানের প্রশ্ন আসে । ন্যায্য হিস্যা পাওয়ার অধিকারের মধ্যে করুণার প্রশ্ন আসবে কেন ? করুণার পাত্রী করার ব্যবস্থা তো মোল্লাশ্রেণী নারীদের করে এসেছে যুগ যুগ ধরে । কিভাবে তা এই প্রবন্ধে আমি দেখাব । তবে তার আগে এখানে সামান্য কিছু নমুনা দেখাব । মোল্লারা ঠিকই বলেছেন, ইসলামে অবশ্যই নারীকে ন্যায্য অধিকার দেওয়া হয়েছে । বরং মোল্লারাই বিকৃত-গোজামিলের ব্যাখ্যা দিয়ে সে প্রদত্ত অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ-প্রতিফলন ঘটতে দেননি । যেমন, সম্প্রতি মোল্লাদের চাপে 'নারী উন্নয়ন নীতি-২০০৮' এর জন্য প্রণীত রিভিউ কমিটিতে কতিপয় ওলামাকে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং তারা নাবালিকা বিবাহকে আইন করে নিষিদ্ধ করার পরিবর্তে নিরুৎসাহিত করার জন্য সংশোধনী দিয়েছেন কোরআন-হাদীসের অজুহাত দিয়ে । মোল্লারা নারী সমাজের কল্যাণ চাইলে (জাতশত্রু না হলে) নারীমুক্তির জন্য ক্ষতিকর এমন একটি আবদার করতেন না-এর উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, নারীকে মননে, বুদ্ধিতে, মর্যাদায়, আর্থিক স্বাবলম্বনে পিছিয়ে রেখে ভোগের বস্তু করে রাখা । তারা এভাবে নিজেরাই প্রমাণ করছেন যে ইসলাম সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, বর্তমান সভ্যতার পথে যাত্রায় তার উপযোগিতা হারিয়েছে । প্রমাণ করেছেন যে, 'ইসলামী মূল্যবোধ', 'ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান' বলে যেসব গাল্ভরা শব্দ ঐ গোষ্ঠিটি বলে এসেছে সেগুলো আজকের যুগে ন্যায়-নীতির বিচারে কত দুর্বল; ইসলাম নারীমুক্তির শত্রু-নারীর জন্য আত্মার 'বন্দীশালা' । নারীর শত্রু কি সত্যিই ইসলাম নাকি অপব্যাখ্যাকারী প্রতিক্রিয়াশিল মোল্লারা ? তাহলে ১৯৯৭ সালে বিভিন্ন নারীসংগঠন, মানবাধিকার সংঠন এবং এনজিওগুলো মিলে ঐকমত্যের ভিত্তিতে যে 'নারী নীতি' প্রণীত হয়েছিল, সেটকে কেন ২০০৪ সালে, রাতের অন্ধকারে অত্যন্ত অনৈতিক উপায়ে লুকোচুরির আশ্রয় নিয়ে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল জোট সরকার মোলবাদীদের কারসাজিতে ? যেখানে কর্মসংস্থান, বাজারব্যবস্থা, ঋণ, সম্পদ, উত্তরাধিকার, ভূমির উপর নারীর অধিকার, যাতায়াত ব্যবস্থা, ডে কেয়ারের ব্যবস্থা(কর্মজীবি মায়েরদের শিশুদের দেখাশোনার জন্য বিশেষ আবাসিক ব্যবস্থা), দক্ষ-অদক্ষ নারীশ্রম-শক্তির কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহন, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে এবং বিচারবিভাগীয় উচ্চপদে নারী নিয়োগের নীতি, সংসদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন এবং সমান সুযোগ ও অংশিদারিত্বের

[†] নারী-৪৩%, পুরুষ-৫৯%

ধারাগুলি বাদ দেয়া হয়েছিল ? ডে কেয়ারের বিরুদ্ধাচরণের কারণ কি নারীকে চাকরী-ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি থেকে বিরত-বঞ্চিত রাখার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে নিরু[]সাহিতকরণ ? সভ্য দেশগুলিতে কর্মজীবি মায়েরা ডে কেয়ারগুলিতে নিশ্চিন্তে তাঁদের বাচ্চাদের রেখে যান কর্মস্থলে যাওয়ার পূর্বে । এই মানবিক ব্যবস্থা দিয়েই একটি সভ্য দেশের সমাজের সাথে মধ্যযুগীয় বর্বর সংস্কৃতির ধারক মোল্লা-মৌলবাদী আক্রান্ত-দূষিত আমাদের এই অসভ্য দেশের পার্থক্য করা যায় । নারীসমাজকে তাঁদের শত্রু চিনতে হবে, নইলে আখেরে আরো অনেক বেশী পস্তাতে হবে যা তাঁরা কল্পনাও করতে পারছেন না এই মূহুর্তে । নিউইয়র্কের মদীনা মসজিদে অনুষ্ঠিত ওলামাদের উপরোক্ত সমাবেশে কথিত বক্তব্যে আসা যাক । মৌলবাদীরা যে কথায় কথায় 'ইসলাম' শব্দটি ব্যবহার করেন মুখস্থ আপ্তবাক্যের মতো-তারা বোধ করি নিজেরাও জানেন না এধরণের টার্ম ব্যবহারের মস্তবড় ভুল ও ফাঁকটা কোথায় । এধরণের মুখস্থ শব্দ প্রয়োগের কারণে মনে হয় তারা ইসলামকে একটি অপরিবর্তনীয় জড়গ্রন্থ হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চান মানুষের কাছে । ইসলাম তো একটা ব্যাপক ধারণা । যেখানে হাজারো তরীকা রয়েছে, বিজ্ঞ আলেমদের নিজেদের মধ্যেই হাজারো মতভেদ রয়েছে-সেটাকে কি করে একটি নির্দিষ্ট স্থির-ধ্রুব স্ট্যান্ডার্ড ধরে বলা যায়,'ইসলাম অনুমতি দেয়না, ইত্যাদি ইত্যাদি.... ।

হ্যাঁ, নারীকে বর্তমান আধুনিক যুগের উপযোগী অধিকার-মর্যাদা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় যে স্পেস, যে প্রভিশন সেটা অবশ্যই ইসলামে আছে । সেটাই মোল্লারা মানতে বা বুঝতে চান না অথবা বুঝতে অক্ষম । তা' হলো, কোরাণের আদেশ-নির্দেশগুলির যুগোপযোগী ব্যাখ্যা । এই প্রবন্ধে সেটাই আলোচিত হবে ।

প্রিয় পাঠক, চলুন, আমরা সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে দেখি, কোরাণ আসলে কি বলে সম্পদের উত্তরাধিকার প্রশ্নে । কারণ, আজকাল কতিপয় সংবিধান বিশেষজ্ঞ যেমন জাতিকে অজ্ঞ মনে করে ইচ্ছেমতো আইনের ধারা সম্পর্কে জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছেন, তেমনি একশ্রেণীর আলেম-মৌলানাও স্বার্থবুদ্ধি এবং ক্ষমতা বা প্রতিপত্তির লোভ দ্বারা চালিত হয়ে ইসলাম ও শরীয়ত সম্পর্কে জাতিকে নিজেদের খেয়ালখুশীমতো বিভ্রান্ত করে যাচ্ছে । প্রিয় পাঠক, কোন্ ব্যক্তির বাণীকে (এক্ষেত্রে খোৎবা ও ওয়াজমাহ্ফীল) আপনি বিশ্বাস করবেন, সেটা নির্ভর করবে ঐ ব্যক্তির চারিত্রিক গুনাবলী, ব্যক্তিত্ব, সততা প্রভৃতি অতীত-বর্তমান কার্যকলাপের রেকর্ডের উপর । সোজা কথায়, সমাজে যার গ্রহণযোগ্যতা গড়ে উঠেছে । শুধুমাত্র ওয়াজ-নসীহত আর নামাজ-রোযা করলেই কেউ মহৎ ও অনুসরণীয় মুমীন ব্যক্তিত্ব হয় না । মৌলানা-মৌলবীদেরকে যে আমাদের সমাজে এত সমাদর করা হয়, তা' কতটা সমীহের কারণে আর কতটা ধর্মীয় দুর্বলতা ও পরকাল ভীতির কারণে সেটা বলা মুশকিল । নবীজীকে যে মক্কার কুরাইশরা আল-আমীন উপাধি দিয়েছিল, তা তিনি অর্জন করেছিলেন দীর্ঘদিনের সত্যবাদিতা ও সততা দিয়ে তাঁদের মনজয় করেছিলেন বলে । মানুষের বিশ্বাসের মর্যাদা নবী (সঃ) রাখতে পেরেছিলেন বলেই বর্বর কুরাইশদের মাঝেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । ইসলামের প্রথম যুগের চারজন খলিফাও অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন । তার প্রায় ৫০০ বছর পর শেখ আলি উসমান, খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি, কুতুব বখতিয়ার-শেখ ফরীদ প্রমুখ ধর্ম প্রচারক সাধকগণ ভারতবর্ষে এসে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তি-ভালবাসা অর্জন করেছিলেন তাঁদের বাহুল্যহীন অতি সাধারণ কৃচ্ছতাপূর্ণজীবন, বিশাল উদারতা, মহত্ত্ব ও মানবপ্রেম দিয়ে । পক্ষান্তরে 'নারী নীতি' নিয়ে মোল্লাদের উপরোক্ত অনৈতিক 'লুকোচুরি' কি সাক্ষ্য দেয় ? আজকের যুগে আমাদের শর্ষিনার পীর সাহেব

কিভাবে আপন ভাই-বোনের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন তার খবর আমরা জেনে যাই অন্যায়ের শিকার তারই বোনেরই করা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে পত্রিকার পাতা থেকে(সমকাল; ৫ জুন,২০০৬)।

পরকীয়া প্রেমের মতো অনৈতিক কারণে খুন হন ইসলামী ঐক্যজোট নেতা ইকবাল (সমকাল; ২০ অক্টোবর, ২০০৫ অনলাইন সংখ্যা)। তো সেই আলোকে বিচার করুন আজকের যুগের মোল্লা-মৌলানাদের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু । সুতরাং সত্যের খাতিরে আমাদের নিজেদেরই সত্য-মিথ্যা যাচাই করে নিতে হবে গ্রহণযোগ্য ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইসলামী পন্ডিতদের গবেষণালব্ধ দলিলাদি থেকে।

> "আমিই কোরাণ নাযিল করিয়াছি এবং আমিই উহার রক্ষক"-সূরা হিয্‌র, আয়াত ৯ । কোরাণের জিম্মা যেখানে আল্লা নিজেই নিচ্ছেন, তখন তথাকথিত 'কোরাণ-দ্রোহিতা' বা 'কোরাণবিরোধী তৎপরতা' ঘটে থাকলে তাঁর ভার আল্লাই নিচ্ছেন এবং এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন‡ আয়াতের মাধ্যমে মানুষকে(এক্ষেত্রে আলেম-ওলামেদেরকে) সেই বিতর্কিত দায়(নাকি কর্তৃত্ব ?) থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে ।
>
> "অতএব, আপনি (রসুল সঃ) উপদেশ দিন, আপনি ত কেবল উপদেশদাতা, আপনি তাহাদের শাসক নহেন" । -সূরা আল্ গাসিয়াহ্, আয়াত ২১ ও ২২।
>
> "আমি পয়গম্বর প্রেরণ করিনা, সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শকরুপে ব্যতীত"....."তাহাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নহে"....."আমি আপনাকে তাহাদের সংরক্ষক করি নাই এবং আপনি তাহাদের কার্য্যনির্বাহী নহেন"....."আপনি তাহাদের বলিয়া দিন, আমি তোমাদের উপর খবরদারকারী নহি "..... ।-সূরা আল্ আনাম, আয়াত ৪৮,৫২,৬৬, ৬৯ ও ১০৭ ।
>
> "(হে রসূল) বলুন, সত্য তোমাদের পালনকর্তা হইতে আগত । অতএব, যাহার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক, এবং যাহার ইচ্ছা অমান্য করুক" ।....."আমি রসূলদিগকে সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারীরুপেই প্রেরণ করি ।"-সূরা কাহ্‌ফ, আয়াত ২৯ ও ৫৬ ।
>
> "বলুন, ...আমি স্পষ্ট সতর্ককারী ব্যতীত আর কিছুই নহি" । -সূরা আল্ আহ্‌কাফ, আয়াত ৯।

প্রিয় পাঠক, এবার আপনারা মিলিয়ে নিন ইসলামী লেবাসধারী সংগঠনগুলি ও একশ্রেণীর মওলানার সাম্প্রতিক জেহাদী বক্তব্যের সাথে উপরের আয়াতগুলি-"কোরাণবিরোধী কোন আইন হলে আমরা প্রতিরোধ করব" । এরা কারা ?- 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন', জামাত এবং এর সমগোত্রীয় দলগুলি । উপরের আয়াতগুলি কি শাসনতন্ত্র বা শাসনব্যবস্থা হিসেবে কোরাণকে ব্যবহারের কোন অধিকার দিচ্ছে এমনকি রসুলুল্লাহ্(সঃ)-কে ? শাসনতন্ত্র মানে হচ্ছে কতগুলি আইন ও অধ্যাদেশের বিভিন্ন ধারা-উপধারার সমাহার । 'আইন' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করুন । যেখানে রসূলুল্লাহ্‌কেই কোন কর্তৃত্ব দেওয়া হয়নি, কোরাণের

‡ টীকা-কারণ আল্লাহ্ জানেন যে এটা না করলে কোরাণের উপদেশগুলির প্রায়োগ-প্রশ্নে 'Authorization ' নিয়ে ভবিষ্যতে অহেতুক বিবাদ-বিতর্ক ও হানাহানি সৃষ্টি হবে ।

আয়াতগুলিকে আইন হিসেবে প্রয়োগ বা কায়েম করার জন্য, সেখানে আলেম-ওলামাদেরকে সেসব আয়াতকে আইন হিসেবে প্রয়োগের কর্তৃত্ব দেয়ার তো প্রশ্নই উঠে না, যাদের নিজেদের মধ্যেই রয়েছে হাজারো দলাদলি এবং গোষ্ঠী , রয়েছে নৈতিকতা-গ্রহণযোগ্যতার একান্ত অভাব । তাহলে কীভাবে সেগুলিকে 'আইন' বলা হচ্ছে ? ইসলামী নামধারী এসব দলগুলির এইসব ত পরতা জনগনকে ধোঁকার নিরন্তর প্রচেষ্টা ছাড়া আর কী বলা যাবে ? তথাকথিত 'আল্লার আইন' বা 'ইসলামী শাসন' নয়-আসলে নিজেদের মঞ্জিলে-মকসুদ অর্থা 'ক্ষমতা' নামক দেবীলক্ষ্মীর বরলাভই তাদের আসল মোক্ষ ।

উপরোক্ত আয়াতগুলি হচ্ছে শক্তিশালী দলিল যা দিয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণিত, যে কোরাণের বাণীগুলিকে উপদেশবার্তা ব্যতীত রাষ্ট্রনীতি হিসেবে প্রয়োগের কোন নির্দেশনা নেই, সুযোগও নেই । অথচ মোল্লারা রাষ্ট্রনীতির উপর একটি গোষ্ঠীর ইচ্ছাকে চাপিয়ে দিতে চাচ্ছেন, নিজস্ব ব্যাখ্যা অনুযায়ী নারীর উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত কোরাণের আয়াতকে রাজনীতির হাতিয়ার বানিয়েছেন। প্রিয় পাঠক, এদের চারিত্রিক ও কায়েমী স্বার্থের স্বরুপ আমাদের চিনতে হবে । এই লেখক প্রবন্ধের স্থানে স্থানেই প্রসঙ্গ অনুযায়ী উপরোক্ত গোষ্ঠীর ধর্মীয় মুখোশ টেনে খুলে ফেলার চেষ্টা করবে । আমদেরকে এখন ঠিক করতে হবে, আমরা কি মোল্লা সম্প্রদায়কে প্রভু মানব("....আমি(মুহম্মদ) স্পষ্ট সতর্ককারী ব্যতীত আর কিছুই নহি") নাকি সৃষ্টিকর্তাকে প্রভু মানব । তবে একটা কথা তাদেরকে সুস্পষ্ট জানিয়ে রাখতে চাই, এই গোষ্ঠীর খোদার প্রতিনিধিত্বের ধৃষ্টতা এদেশের মানুষ সহ্য করবে না- "জনগণের কোন সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতা মানিনা-সকল ক্ষমতা শুধু আল্লার"- এই ধরণের চাণক্য কৌশল দিয়ে, নির্বিকার-নিরপেক্ষ আল্লার উপর তথাকথিত 'আল্লার আইন' ও 'সার্বভোমত্ব' আরোপ করে নিজেদেরকে আল্লার স্থলাভিষিক্ত করার ধুর্ত মতলবি ধান্দায় বাংলার মানুষ বেশীদিন ভুলবে না । ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মীয় ও এথ্নিক গোষ্ঠীগুলিকে কিভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে, শত্রু-সম্পত্তির মতো একটি বর্বর বৈষম্যমূলক আইন করা হয়েছে হিন্দুদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করার জন্য । মৌলবাদী গোষ্ঠীটি এই আইন থেকে নিজেদের হীনস্বার্থ হাসিল করেছে । সেসব প্রশ্ন এবং জাতিসত্ত্বা ও জাতিয়তাবাদের প্রশ্নের সাথে উপরোক্ত ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের দ্বন্দ্বের মীমাংসা প্রসঙ্গে স্বনামধন্য কলামিষ্ট গাফ্ফার চৌধুরী, প্রয়াত মনস্বী লেখক মানবতাবাদী ওয়াহিদুল হক, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, মুনতাসীর মামুন প্রমুখ বুদ্ধিজীবিরা যথেষ্ট লিখেছেন-আর সেসব প্রশ্ন এ প্রবন্ধের আওতার বাইরে । তাই, সংক্ষেপে শুধু এটুকুই বলব যে, দেশের সংবিধানের উপর মুসলিম- অমুসলিম, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, নারী-পুরুষ সবারই হক রয়েছে । 'কোরাণের আইন'-এর নামে সংবিধানের ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সার্বভোমত্ব ও নিরপেক্ষতার উপর বৈষম্যমূলক হস্তক্ষেপ যেমন জনগণ মেনে নেবে না, তেমনি 'সার্বভোমত্ব ও ক্ষমতা শুধু আল্লার'(ফ্যাসিস্ট সাঈদীর কুখ্যাত উক্তি)-এ কথা বলে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে পদদলিত করার পায়তারা জনগণের বাঁচামরার সংগ্রামের মুখেই জবাবদিহিতার প্রয়োজনে ধুলিঃসাৎ হয়ে যাবে । পরবর্তীতে আমরা সময়মতো প্রসঙ্গ অনুযায়ী সম্পত্তির উপর নারীর উত্তরাধিকার প্রশ্নে শরীয়ার অনুশাসনগুলি ইসলামসম্মত(অর্থা কোরাণসম্মত) কিনা এবং নির্ভরযোগ্য কিনা তা' আলোচনা করব ।

১) **আলেম-মোল্লাদের কাছে কিছু প্রশ্নঃ** ক) আলেম-ওলামা সাহেবরা যে যুক্তিটি সবসময় দিয়ে থাকেন তা' হলো, কোরান নির্দেশ দিচ্ছে -'সম্পত্তির ক্ষেত্রে দুইজন নারীর অংশ একজন পুরুষের সমান '। তারা যুক্তি দেন-'নারীকে ভরনপোষণ ও রক্ষার দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে' । আজকের আধুনিক

সভ্য যুগে, কোন শিক্ষিত, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীর জন্য এটা গ্রহণযোগ্য হবেনা এটা বলাই বাহুল্য । এধরণের চিন্তাধারা ও প্রবণতা থেকে আশংকা করার যথার্থ কারণ রয়েছে যে এই গোষ্ঠী শাসন ক্ষমতা পেলে নারীকে পার্শ্ববর্তী আফগানিস্তানের অনুকরণে সত্যই অন্দর মহলে ঢোকাবে কিনা ? উপরে বর্ণিত কোরাণের নির্দেশ(নির্দেশ নাকি উপদেশ সেটা উপরে আলোচিত হয়েছে) সম্পর্কে আসা যাক । ধরে নিলাম এই ক্ষেত্রে 'নির্দেশ' বলা হচ্ছে । আমরা আমাদের প্রথম কেস স্টাডিটি করব । কেসটি হলো, মিঃ এক্স মারা গেছেন । মরহুমের পুত্র সন্তান নেই । মা, বাবা, দুই মেয়ে ও স্ত্রী আছে । কে কত অংশ পাবে তা বের করতে হবে । এবার, পাঠককে অনুরোধ করব, কষ্ট করে সূরা নিসার ১০ ও ১১ নম্বর আয়াতে বর্ণিত উত্তরাধিকার সম্পর্কিত নির্দেশগুলি যত্নসহকারে পড়ুন । পিতা ও মাতা উভয়ে এক ষষ্ঠাংশ করে পাবেন; স্ত্রী এক অষ্টাংশ পাবেন; দুই কন্যা মিলে পাবেন দুই তৃতীয়াংশ । এবার কষ্ট করে অংশগুলি যোগ করুন । উত্তর যদি সঠিক হয় তবে আমাদের '১' পাওয়ার কথা অর্থাৎ ১০০% মিলে যাওয়ার কথা । কিন্তু, মজার ব্যাপার হচ্ছে, ফলাফল ১-এর বেশী হয়ে যাচ্ছে । এ থেকে কি প্রমাণ হয় ? কোরাণ ভুল ? জানিনা, তবে হযরত আলী রসুলুল্লাহ্‌র(সঃ) মহাপ্রয়াণের পরে এই নির্দেশটিতে তখনকার উপযোগী সংশোধন করেছিলেন । এখন, আলেম-মোল্লা সাহেবদের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁরা যে সবসময় দাবী করে থাকেন যে কোরআনের একটি অক্ষরও পরিবর্তন করার ক্ষমতা কেয়ামত পর্যন্ত কারো নেই , সেই দাবীর ভিত্তি কি এখানে আর থাকছে ? উপরে বর্ণিত কোরান-হাদীসের দলিলগুলি এবং নিম্নে বর্ণিত সূরা বাকারার ১০৬ নম্বর আয়াত থেকে এটি প্রমাণিত যে বাস্তব অবস্থার প্রয়োজনে, স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে কোরআন সংশোধনযোগ্য। এছাড়া এ সম্পর্কে অন্যান্য আয়াত বা দলিল কি বলে আমি একটু পরে আলোচনা করব ।

২(খ) দ্বিতীয় প্রশ্নঃ মোল্লারা যুক্তি দিচ্ছেন, পুরুষ যেহেতু নারীর ভরনপোষন ও রক্ষণাবেক্ষন করবে, সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশের কর্তৃত্বের দাবীদার হচ্ছে পুরুষ । তা' ছাড়া, মেয়েরা ত' পিতা ও স্বামী উভয় পক্ষ থেকেই পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ পাবেন । কিন্তু, সেটা ত' একটি গোত্রীয় সমাজের জন্য প্রযোজ্য । এখন সূরা নিসায়(আয়াত ১০,১১) আমরা দেখতে পাচ্ছি, মৃত ব্যক্তির স্ত্রী পুত্র-কন্যা থাকলে তাদের তুলনায় অনেক কম পাবেন(এক অষ্টমাংশ মাত্র)।

দেখা যাক, সূরা নিসা, আয়াত ১০ কি নির্দেশ দিচ্ছে-".....আর যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই-বোন থাকে, তবে তাহার মাতা এক ষষ্ঠাংশ পাইবে ।"

"....আর এমন মৃত ব্যক্তি-.....এবং তাহার এক ভ্রাতা অথবা এক ভগ্নী থাকে, তবে এতদুভয়ের প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ পাইবে । আর যদি ইহারা তদপেক্ষা বেশী হয়, তবে ইহারা সকলে এক তৃতীয়াংশের অংশীদার হইবে, অছিয়ত পূর্ণ করার পর..." ।-(আয়াত ১২)

প্রিয় পাঠক, উপরের আয়াতগুলি ভাল করে প্রণিধান করা যাক, আমাদের সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে । সাধারণভাবে, মা-বাবার আগে সন্তানের মৃত্যু অস্বাভাবিক এবং ব্যতিক্রম হিসেবেই ধরা হয় । কিন্তু এই 'যদি শর্ত'-কে মেনে নিলে, সন্তান, স্বামী এবং পিতার অংশ মিলে মাতা সর্বমোট পাবেন ৬২.৫ শতাংশ (১/৮+১/৬+১/৩)। এখানেও সমস্যা রয়েছে, পিতার সম্পত্তি ও স্বামীর সম্পত্তির পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে

। নিশ্চয়তার ব্যাপারে আমরা পরে কথা বলব । কিন্তু 'যদি' শর্তের উপর আমরা নির্ভর করতে পারি কি ? বিশেষ করে আজকের যুগের বাজারে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীদের জন্য এটা অত্যন্ত বাস্তব একটি সমস্যা । ভ্রাতা বা ভগ্নী একজন হলে পাবে এক ষষ্ঠাংশ, একাধিক হলে পাবে এক তৃতীয়াংশ, সেখানে স্ত্রী পাচ্ছেন মাত্র এক অষ্টমাংশ । মনে রাখতে হবে, আমাদের সমাজে খুব কম ভাই পাওয়া যাবে যারা বোনদের দেখাশোনা করেন । কিন্তু আরবের গোত্রীয় সমাজে তা' ছিল না, তখন সম্পুর্ণ গোত্র মিলে একটি পরিবার হিসেবে গণ্য হতো । নারীদের আর্থিক নিরাপত্তা গোত্রের অবশ্য কর্তব্যরুপে গণ্য করা হতো । গোত্রের নিয়ম-কানুন প্রত্যেককে মান্য করতে হতো । অত্যন্ত ন্যায্য একটি প্রশ্ন হচ্ছে, যে স্ত্রী সারাজীবন সন্তান লালনপালন, তাদের মানুষ করা থেকে শুরু করে ঘর-গৃহস্থালি(এটাও শ্রমের মধ্যে পড়ে যার মূল্যায়ণ আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ করেনা) এমনকি বাহিরে চাকরী করলেন; যে স্ত্রী(বা সন্তানদের চিরাচরিত দুঃখিনী মা) সারাজীবন সংসারের জন্য অবদান রাখলেন স্বামীর সম্পত্তির উপর তাঁর দাবী ও হক কি পুত্র-সন্তানদের চেয়ে বেশী নয় ? আর মা তো সন্তানদের অমঙ্গল চাইবেন না । সেই স্ত্রী(বা সন্তানদের মা) পাবে মাত্র এক অষ্টমাংশ অথবা এক চতুর্থাংশ যদি সন্তান না থাকে(আয়াত ১১) ভ্রাতা-ভগ্নীদের এক ষষ্ঠাংশ বা এক তৃতীয়াংশের বিপরিতে(উপরের দলিল দেখুন) । প্রশ্ন হলো, আমাদের সমাজের বাস্তবতায় স্বামীর অনুপস্থিতিতে পুত্রের সংসারে পুত্রবধূর সাথে যদি কোন মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপন সংসারের স্থিতিশিলতার জন্য হোক বা স্বার্থপরতার জন্য হোক, মাতাকে যদি পুত্র সন্তান পৃথক হওয়ার জন্য চাপ দেয়, সেক্ষেত্রে মায়েদের অবস্থা কি হয় সেতো আমরা বাস্তবে প্রায়ই দেখতে পাই । বেচারী মা পালা করে একেক সন্তানের বাসায় থাকেন গলগ্রহের মতো । আবার কোন কোন মায়ের স্থান হয় নার্সিং হোমে । তাই বলছি, কোরআনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নির্দেশ গোত্রীয় সমাজের জন্য প্রযোজ্য ছিল, যেখানে প্রতিটি গোত্র তাদের নারীকে প্রোটেকশন দিত, কিন্তু আজকের যান্ত্রিক বাস্তবতার যুগে এটা প্রয়োগযোগ্য নয় । এই সাথে মিলিয়ে দেখুন নিম্নের দলিলগুলি-

"নসখ্(অর্থঃ কোন নির্দেশকে অন্য নির্দেশ দ্বারা প্রতিস্থাপন-কোরাণে এটা আছে)-এর উপলব্ধি আসিয়াছে মানুষের উপকারের জন্য সমাজের বিদ্যমান পটভূমি ও আইনের সমন্বয় করার প্রয়োজন হইতেই "-প্রিন্সিপল্স্ অফ ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স-ড. হাশিম কামাল[§] ।

“..প্রত্যেক কালের জন্য বিশেষ আহ্কাম হয় ।.....এবং মূল কিতাব তাঁহারই নিকট রহিয়াছে ।”-সূরা রা'দ, আয়াত ৩৯ ।

২(গ) আলেম-ওলামা সাহেবরা একটি মিথ্যে কথা জাতিকে শুনিয়ে যাচ্ছে যে বাংলাদেশে নারীরা পিতা ও স্বামী উভয়ের পক্ষ থেকেই নাকি সম্পত্তির ভাগ পেয়ে থাকে । হাঁ, নারীকে এর মধ্যে যে কতবড় ফাঁক রয়েছে, তা ভুক্তভোগীরাই জানেন । বাংলাদেশের কয়জন নারী তাদের পিতার সম্পত্তি(কোরান বর্ণিত এক তৃতীয়াংশ) থেকে লাভবান হচ্ছেন ? সিংহভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, ভাইরাই বোনদের অংশটুকু ভোগ করে থাকেন, যে মোল্লারা এই ইস্যু নিয়ে হৈচৈ করছে তারাও এর বাইরে নয় । অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, আমার আত্নীয়স্বজনের মধ্যেই এর উদাহরণ রয়েছে । সম্পত্তি নিয়ে যারা কিছুমাত্র খোঁজখবর রাখেন,

[§] প্রত্যক্ষ সূত্রঃ বাংলা শরীয়া-১, হাসান মাহমুদ

তারা জানেন যে প্রায় ক্ষেত্রেই, বোনেরা তাঁদের অংশটুকু ভাইদের ছেড়ে দেন । যেমন, আমার গরীব আত্মীয়ারা তাঁদের পিতৃসম্পত্তির অংশটুকু শহরে বাসরত অবস্থাপন্ন ভাইদের সনির্বন্ধ অনুরোধে ভাইদের কাছে ছেড়ে দিয়েছেন অথবা কিছু Compensation -এর বিনিময়ে দিয়ে দিয়েছেন । অথচ, আগেই বলেছি, কথিত ঐ ভাইয়েরা বেশ অবস্থাশালী । মোল্লারা কি এই বাস্তব ব্যাপারটা জানেন না ? নিশ্চয়ই জানেন । কিন্তু তবুও তাঁরা ভন্ডামী করে চলেছন ।

২(ঘ) আলেম সাহেবদের কাছে আমাদের প্রশ্ন হলো,-

২(ঘ)১. স্বামীর সম্পত্তির উপর স্ত্রীর হক ও অধিকার কি ভগ্নীর চেয়ে অনেক অনেক বেশী নয় ? সংসারকে দাঁড় করানো ও সন্তানদের মানূষ করার জন্য স্ত্রীর সারা জীবনের যে পরিশ্রম, নিষ্ঠা, এবাদত, সাধ-আহ্লাদ বিসর্জন এসবের কি কোনই মূল্য নেই ? ব্রাহ্মণ্য ধর্মে যেমন নারীকে দেবীর আসনে বসানোর নামে ইচ্ছেমত বঞ্চনা করা হয়েছে সারা জীবন আমিষ খেতে না দিয়ে এবং জীবন-যৌবন ও সাধ-আহ্লাদ থেকে, তেমনি আমাদের নারীরা কি 'মায়ের পায়ের নীচে বেহেস্ত' এই আপ্তবাক্যে সন্তুষ্ট থাকবেন ? এখন তো পুরুষতন্ত্র সেই সান্তণাটুকুও কেড়ে নিচ্ছে । সাম্প্রতিক কালে পুরুষতন্ত্রের চালু করা নতুন সুবিধাবাদী কুসংস্কার হলো, স্বামীর পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত'। স্ত্রীর তুলনায় মৃতের ভ্রাতা বা ভগ্নীর অংশ বেশী হওয়ার অজুহাতটি কি শুধু এই যে ভগ্নী, সম্পর্কে মৃত ব্যক্তির বেশী ঘনিষ্ঠ ? তাহলে কি স্ত্রীকে 'বাইরের একজন করুণাপ্রাপ্ত মানুষ' হিসেবে বিবেচনা বা ট্রিট করা হলো না ? এমন একটি পটভূমিতে স্বামী-স্ত্রীর অটুট পারিবারিক বন্ধন, পারিবারিক স্থিতিশীলতা এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে একনিষ্ঠতা কতখানি আশা করা যায় ?

২(ঘ)২. পাঠক বোধ করি একমত হবেন যে, ভগ্নীর সবচেয়ে বেশী অধিকার হচ্ছে পিতা ও স্বামীর উপর । পিতার উপর জন্ম ও স্নেহগত(কন্যাসুলভ সেবার বৈষয়িক মূল্যায়ন প্রশ্নাতীত ও অরুচিকর, অনেক বঙ্গ নারীকে এটা শুধুই মর্মাহতই করবে) এবং স্বামীর উপর হলো দীর্ঘ কষ্টসাধ্য অর্জনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অধিকার । তাই মৃত ব্যক্তির বোন পিতার কাছ থেকে সম অংশীদারত্বের ভিত্তিতে ও স্বামীর কাছ থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত । মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যদি এভাবে পরিবারের বাহিরে চলে যায় ভ্রাতা-ভগ্নী(দের)কে এক ষষ্ঠাংশ বা এক তৃতীয়াংশ(তারা একের বেশী হলে) প্রদানের মাধ্যমে, তাহলে আজকের বাজার পরিস্থিতিতে সন্তানদের মানুষ করা তথা পড়াশুনার ব্যয় নির্বাহ, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-যাতায়াত প্রভৃতি নানাবিধ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যে আর্থিক নিরাপত্তার প্রশ্নটি আসছে, তার গ্যারান্টি কে দেবে ? আলেমগণ কি দেবেন ? নাকি পরিবর্তে আমাদেরকে রিজিকের কথা বলে দায় সারবেন ? সবার জন্য রিজিকের নিশ্চয়তা থাকলে কেন গড়ে বছরে ৬ মিলিয়ন শিশু অথবা দিনে ২৬,৫০০ শিশু ক্ষুদা ও পুষ্টিহীনতায় মৃত্যুবরন করে(জাতিসংঘ রিপোর্ট)? জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পূর্বেই এই লক্ষ লক্ষ অবোধ শিশুদেরকে আল্লাহ্ পরীক্ষা করছেন-এধরণের চিন্তা-বিশ্বাস হাস্যকর নয় কি ? রিজিকের ব্যাপারটি আপনারা নিজেদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন কি ? গরীব-গুবরো জনসাধারণকে মোল্লারা সবর করতে বলবেন, পরীক্ষার কথা বলবেন, নিজেরা পরীক্ষা দিচ্ছেন কি ? তাহলে, ইসলামের স্বঘোষিত ঠিকাদার মুফতি(গডফাদারের অপর নাম কি মুফতি?) মওলানা ফজলুল হক আমিনী কেন নিজের ছেলেকে পাঠিয়ে দেন সন্ত্রাস-পেশীশক্তির সাহায্যে বেআইনিভাবে ওয়াক্ফ এস্টেটের(বড় কাটারা মাদ্রাসা) দখল নেয়ার জন্য(ভোরের কাগজ; ০১ মার্চ, ২০০৮

অনলাইন সংখ্যা)। খালেদার সময় প্রকাশ্য দিবালোকে জনৈক পুলিশ কনষ্টেবল হত্যার নায়ক এই আমিনী ও তার সমমনা ধর্ম-ব্যবসায়ীরা সম্প্রতি ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর উদ্দ্যেশ্যে বলেছিল, কোরআনবিরোধী নারী নীতি প্রণয়ন করে তিনি নাকি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছেন । খুনি-সন্ত্রাসীরা যদি ইসলামের ঠিকাদারী নিয়ে নেয় এবং যেনতেন প্রকারে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করে তবে, জনগণের যে কি দশা হয় আর ইসলামেরই বা কি দশা হয় তা' মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে । আর আমাকে মনে করিয়ে দেয় , নজরুলের কবিতার দুটি লাইন, 'কোথা চেঙ্গিস, গজনী-মামুদ, কোথায় কালাপাহাড় ? ভেঙ্গে ফেলো ঐ ভজনালয়ের যত তালা দেওয়া দ্বার'! এই লেখক দিন গুনতে থাকে কোন এক বর্বর, রুদ্রমূর্তি খানে-দাজ্জালের-যে হবে যুগ যুগ সঞ্চিত পাপ হতে জাত মূর্তিমান দানব । বিশ্বের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের কূপমন্ডুকতা-সুবিধাবাদিতা-সংকীর্ণতা-অজ্ঞতা-পশ্চাদপদতা-অসহিষ্ণুতা-অধর্ম-অমানবিকতা-জাতিবিদ্বেষ-যুক্তি ও বিজ্ঞানবিমুখতা ইত্যাদি জনিত পাপই হবে ঐ দানবের শক্তির উ□স ।

২(গ)৩. এতো গেল যাদের সহায়-সম্পদ আছে সেই শ্রেণীর কথা । কিন্তু, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও গরীব শ্রেণীর অনেক নারী আছে যারা বিবিধ বাস্তব কারণে একান্নবর্তী পরিবারে থাকতে চায় না । তাঁরা স্বাধীনভাবে স্বামী-সন্তানাদি নিয়ে থাকতে চায় । তাদের ক্ষেত্রে কি সমাধান ? গোত্রীয় সমাজের বিধান কি তাঁদের ক্ষেত্রে কাজ করবে ? তাঁদের মধ্যে অনেকেই তো হরেক পেশায় কাজ করেন-স্বামীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল তাঁরা হতে চান না বাস্তব কারণেই । লক্ষ লক্ষ নারী গার্মেন্টস্-এ কাজ করে বিপুল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন, আবার কারখানা থেকে বাড়ী ফিরে গিয়ে সংসারের সমস্ত কাজ করছেন । মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপুলসংখ্যক পেশাজীবি নারী অফিসের কাজ সেরে বাসায় এসে সংসারের অনেক কাজ সারেন । সভ্য দেশগুলির অফিস-আদালতে, মলে বা ডিপার্টমেন্ট স্টোরগুলিতে দেখা যায় মেয়েদেরকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় সুপারভাইজার, ম্যানেজার ইত্যাদি করা হয়-তাঁদের শ্রম ও দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরুপ । তাহলে আমাদের দেশে কেন তাঁদের ন্যায্য ক্ষমতায়ন মেনে নেয়া হবেনা ? সম্পত্তির ন্যায্য হিস্যাভিত্তিক আইনী কর্তৃত্ব দেয়া হবেনা যার যোগ্যতা তারা বহু আগেই প্রমাণ করেছে । মোল্লারা ১৪০০ বছর আগের সামাজিক কাঠামোকে এখনো মনোজগতে গেঁথে রেখে সে সময়কার পরিস্থিতিতে যেসব আয়াত নাজেল হয়েছে বা শরীয়ার(যা অনির্ভরযোগ্য) বিধান প্রয়োগ করা হয়েছে, সেগুলিকে আজকের যুগে চালাতে চাইছেন কোনরকম সংস্কার না করে । তখনকার আরবের গোত্রবদ্ধ সমাজে রসূলুল্লাহ্‌র উত্থাণ ও সমাজসংস্কারের পূর্বপর্যন্ত মেয়েদের অবস্থা ছিল প্রায় দাসদের মতই । স্ত্রীরা এক গোত্র থেকে বা এক স্বামী দ্বারা(তালাকের মাধ্যমে) বিতাড়িত হলে অন্য গোত্র বা স্বামীর আশ্রয়লাভ করতো দাসীর মর্যাদা নিয়েই । তাছাড়া তখনকার যোগাযোগব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতার কারণে ব্যবসাবাণিজ্যও ছিল মৌসুমভিত্তিক ও এবং খুব অপ্রতুল । এই অবস্থায় পুরুষদের পক্ষেই কেবল দূর্গম পথ পাড়ি দিয়ে সংসার ও গোত্রের অর্থনৈতিক চাকা ঠিক রাখতে হত । তাই স্বাভাবিকভাবেই সেযুগে যে পুরুষকে আর্থিক কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছিল সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারের মাধ্যমে তা সেযুগের প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট প্রগতিশীল পদক্ষেপ ছিল । আর, বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত এবং কাঠামোগত অনগ্রসরতার কারণে নারীর পূর্ণাঙ্গ সমানাধিকারের জন্য রসূলুল্লাহ্‌র সমসাময়িক সমাজ প্রস্তুত ছিল না ।

"আমি কোন আয়াত রহিত করিলে বা ভুলাইয়া দিলে তাহা অপেক্ষা উত্তম অথবা

সমপর্যায়ের আয়াত আনি"-বাকারা ১০৬ । দেখা যাচ্ছে যে, খোদ কোরানেই সামাজিক পরিবর্তনের সাথে বিধান পরিবর্তনের স্বীকৃতি আছে ।

উপরে ইতিমধ্যেই আমি নসখ্ (অর্থঃ কোন নির্দেশকে অন্য নির্দেশ দ্বারা প্রতিস্থাপন-কোরাণেও এটা আছে)-এর উল্লেখ করেছি ।

"(শারীয়া)-তে সেই সমাজের বৈশিষ্ট আছে যে সমাজে শারিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল ।"-ইমাম শাফি, "রিসালা"-পৃষ্ঠা ৩** ।

এবারে পাঠক বিচার করে দেখুন, ১৪০০ পূর্বের একটি সমাজব্যবস্থার জন্য যে 'সদুপদেশ'(বারবার বলছি-'আইন' নয়) প্রযোজ্য ছিল, আজকের যুগে তা' প্রযোজ্য কিনা । এই নিরন্তর সমাজবিবর্তন ও পরিস্থিতি বদলের ব্যাপারটি আল্লা জানেন বলেই কোরাণকে আইন হিসেবে নবী(সঃ)-র কাছে পাঠাননি । চিন্তা করে দেখুন, কত অসংখ্য ধরণের সমাজকাঠামো আজ পর্যন্ত মানবেতিহাস পার হয়ে এসেছে-সমাজ কোন স্থির জড়বস্তু নয় । আমরা শুধু মোটা দাগের কয়েকটি উদাহরণ দেব-প্রস্তরযুগের যূথবদ্ধ সমাজব্যবস্থা, দাসব্যবস্থা, সামন্ততন্ত্র অভিজাততন্ত্র, পূজিতান্ত্রিক সমাজ, সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং কল্যাণরাষ্ট্র । এখন, ধরা যাক, যদি কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত ধরণের সম্ভাব্য পরিস্থিতির জন্য আল্লাহ্ নবী করীম(সঃ)-কে বাণী পাঠাতেন তাহলে কত লক্ষ পৃষ্ঠার কোরাণ লিপিবদ্ধ করতে হত ? সে কোরাণের আয়তনই বা কী হত ? যে যুগে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি, কম্পিউটার আবিষ্কৃত হয়নি সে যুগের জন্য সেটা কি অবাস্তব ছিল না ? তাছাড়া, তখনকার অন্ধকার বর্বর যুগে, যখন মানুষের মধ্যে জ্ঞান-শিক্ষা-মেধা ইত্যাদি বিকশিত হয়নি, সেযুগের মানুষের জন্য সেটা কঠিন হয়ে যেত নাকি ?

৩। কিছু বাস্তবভিত্তিক প্রশ্ন রাখতে চাই তথাকথিত আলেম-ওলামাদের উদ্দ্যেশ্য করে,-

ক) মৌলানারা বলছেন যে স্বামীর কাছ থেকে নারীরা সম্পত্তির অংশ(এক অষ্টমাংশ মাত্র) বা হিস্যা পেয়ে থাকেন তাই পিতার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ তাদের জন্য যথেষ্ঠ । কিন্তু যেসব স্বামীরা কথায় কথায় শরীয়তের নামে 'তিন তালাক' বলে স্ত্রী তালাক দিচ্ছে গ্রামেগঞ্জে, সেক্ষেত্রে পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার বিপরীতে নারীর সম্পত্তির হিস্যার গ্যারান্টি কে দেবে ? আর যদি, স্বামীর মৃত্যুর আগেই স্ত্রীর মৃত্যু হয় (সংসারের জ্বালায় নিষ্পষিত হয়ে), তবে তো তাদের স্বামীর উত্তরাধিকার ভোগ করার সুযোগই থাকে না । যে নারীটি অবহেলিত ও বঞ্চিত হয়ে মারা গেলো(যা অহরহ ঘটছে) তাঁর দায়ভার কে নেবে ? মোল্লারা, মুসলিম পারিবারিক আইন চর্চাকারী কোর্ট, নাকি তথাকথিত সংবিধান প্রয়োগকারী রাষ্ট্র ? এক্ষেত্রে একমাত্র গ্যারান্টি হতে পারতো পিতার কাছ থেকে সমতার ভিত্তিতে(কোরাণের যুগোপযোগী প্রয়োগের মাধ্যমে) প্রাপ্ত উত্তরাধিকার এবং শিক্ষা-চাকরী প্রভৃতি মৌলিক সাংবিধানিক ও নাগরিক অধিকার যা শুধু একটি সঠিক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও অধুনিক যুগোপযোগী 'নারী নীতি' ও 'উত্তরাধিকার আইনের' মাধ্যমেই বাস্তবায়ন সম্ভব । তাহলে, উপরোক্ত পরিস্থিতিতে 'নারীরা স্বামীর সংসারে গিয়ে স্বামীর মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির আধিকার পাবে'-

** সূত্রঃ বাংলা শরীয়া-১, হাসান মাহমুদ

মওলানা সাহেবদের এই দুর্বল অজুহাত বিশাল একটি 'যদি'-এর মধ্যে পড়ে ধোপে টেকে কি ? আর স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত যদি অপেক্ষা করতে হয়, এবং নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন-কর্তৃত্ব না পেলে, পরিবারে স্ত্রীর দুর্বল অবস্থানের কারণে স্বামী স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারে এবং অনৈতিক-উচ্ছৃংখল জীবনের দিকে প্রলুব্ধ হতে পারে । তাই নয় কি ? বস্তি এলাকায় এবং শহরের এলিট সোসাইটিতে এটা খুব সাধারণ ঘটনা । তবে এও কি সত্য নয় যে, মোল্লাতন্ত্র চিরকালই পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতাকে সমর্থন দিয়ে এসেছে ? নাকি কয়েকটি করে বিবি রাখার সুবিধা ও স্বেচ্ছাচারিতার গোপন লোভটি তারা দমন করতে পারেন না ?

এবার রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে আসি । সাম্প্রতি সংবিধানে নারীর সমানাধিকার সংরক্ষিত করে যে সমস্ত ধারা ৭২-এর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাওয়া সংবিধানে সংযোজিত হয়েছিল এবং এখনো রয়েছে সেসব সম্পর্কে পরম শ্রদ্ধেয় শাহরিয়ার কবীর তাঁর প্রবন্ধে('বাংলাদেশে মৌলবাদ এবং নারীর অধিকার'-সূত্র দৈনিক জনকণ্ঠ) ব্যাপারে আলোচনা করেছেন । সার্বজনীন মানবাধিকারের জাতিসঙ্ঘ ঘোষণা বা সনদ 'সিডো'-তে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের প্রতিট ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকারের বিষয়টি স্বীকৃত হয়েছে এবং বাংলাদেশ এতে স্বাক্ষরকারী দেশ । এখন, কিছু গণবিরোধী-নারীবিরোধী মৌলবাদীর কথায় এই অঙ্গীকার থেকে সরে এলে বাংলাদেশ একটি অনুদার মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশেষ করে সভ্য দেশগুলির কাছে পরিচিত হবে । এতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আন্তর্জাতিকভাবে কতটা বৃদ্ধি পাবে তা' পাঠকদেরকে ভেবে দেখতে বলি । তাই, আপনাদের কাছে অনুরোধ, দেশে আপনারা যারা মসজিদে নিয়মিত যাচ্ছেন, মসজিদের উপর আপনাদের সবারই সমানভাবে হক রয়েছে-আপনারা মসজিদগুলিতে খো□বার নামে বিতর্কিত ও স্বার্থবুদ্ধিপ্রসূত(ক্ষমতার লোভে) রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদানে প্রতিরোধ করুন, মসজিদগুলোকে রক্ষণশীল স্বাধীনতাবিরোধী হিংস্র মৌলবাদীদের একচ্ছত্র আধিপত্যের কাছে ছেড়ে দেবেন না ।

৪) ক) এবার আমাদের ফোকাস গ্রামের দিকে নিলে কি দেখব ? গরীব ঘরের নারীরা যদি পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা-অত্যাচার না মেনে, ফতোয়াবাজ মোল্লাদের প্ররোচনায় হিলা বিবাহের মত অবমাননাকর (গ্রাম্য সালিশিভিত্তিক বিচার-প্রহসন) না মেনে প্রভাবশালী পুরুষ ও মোল্লাদের ভোগের পণ্যমাত্র হতে অস্বীকার করে এবং আত্মসম্মান রক্ষার্থে যদি আত্মহননের পথ বেছে নেয়(অন্তত এই স্বাধীনতাটুকু তাদের রয়েছে, যা দিয়ে তাঁরা বারবার প্রমাণ করতে চেয়েছে যে তাঁরা স্বাধীন সত্ত্বা ও স্বাধীন ইচ্ছাসম্পন্ন মানুষ), শহরে গ্লানিকর পতিতাবৃত্তির জন্য যেতে বাধ্য হয় গরীব পিতার ভিটায় স্থান না পেয়ে, অথবা নিদেনপক্ষে ভাসমান মজুর হয়ে শহরের জনসংখ্যা ও অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করে, তাঁর জন্য দায়ী কারা ? উত্তর হলো এক কথায় গ্রাম্য মহাজন-মাতবর শ্রেণীর শোষণ-নির্যাতনের সহযোগী ও স্বার্থরক্ষাকারী ফতোয়াবাজ মোল্লাশ্রেণী । কারণ এটাই চলে আসছে এবং চলছে । আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, মোল্লাতন্ত্র ও সমাজের ভয়ে, গ্রামবাংলার অগণিত সম্পন্ন ঘরের বাবা-মারাও তাদের কন্যাদেরকে প্রাইমারী স্কুলের চৌকাঠ পেরোতে দেন না, বিয়ে দিতে বাধ্য হন । পরিণতিতে, শিক্ষাবঞ্চিত হয়ে এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের অভাবে, হয় স্বামীর যৌতুকের দাবীতে নির্যাতন সইতে না পেরে একসময় আত্নহননের পথ বেছে নেয়, অথবা স্বামীপরিত্যক্ত হয়ে দুঃসময়ের পরিস্থিতিতে পতিতাবৃত্তির পথ বেছে নিতে হয় । ঐসব ভাগ্যাহতা নারী যদি পর্যাপ্ত শিক্ষার সুযোগ পেতো অথবা বাপের কাছ থেকে আর্থিক ক্ষমতায়নের সুযোগ পেয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পেতো, তবে তাঁরা সাধ করে পতিতাবৃত্তিতে নাম লেখাতোনা, আত্মহননের পথ বেছে নিতো না ।

মোল্লাতন্ত্রই এর জন্য দায়ী ।

মোল্লারা যদি এর দায় অস্বীকার করেন, তা হলে আমি একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে ধরব । মার্চ ত্রিশ, ২০০৭ সংখ্যার দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন 'নারচরের মহিলা সমিতির দারিদ্র জয়' থেকে সংক্ষেপে তুলে ধরছি । কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার শ্রীপুর ইউনিয়নের নারচর গ্রামের ঘটনা । পাশের গ্রামের ভূমিহীন কৃষক সিদ্দিকুর রহমান অভাবের তাড়নায় এলাকার এক দাদনদারের কাছ থেকে ঋণ নেন ৩ হাজার টাকা । গরুর ব্যবসা শুরু করে মাসে ১০ শতাংশ হারে সুদ গুনতে গিয়ে ঋণ আর শোধ হয় না । পরের বছর দাদনদার এসে তার ঘরদোর খুলে নিয়ে যায় । দাদনদার আর কেউ নয়, পার্শ্ববর্তী কৈয়নি গ্রামের মওলানা(?) আইউব আলী । কল্পনা করুন একবার, একজন ফতোয়াবাজ মওলানার প্রকৃত পরিচয় হলো সে দাদনদার, খাস বাংলায় সুদখোর কাবুলিওয়ালা । ভেবে দেখুন, এসব মৌলানা নামধারী ফতোয়াবাজদের স্বেচ্ছাচারী-মনগড়া ফতোয়ার পরিণামে গ্রামের অসহায় দরিদ্র নারীদের ভাগ্যে কী গজব নেমে আসতে পারে । যাই হোক, সিদ্দিক কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে হাজির হন পাশের নারচর গ্রামের অবস্থাপন্ন রওশন আরার বাড়ীতে যার স্বামী একজন প্রকৌশলী । ঘটনাটি রওশন আরার নারীমনকে ব্যথিত করে । তবে, এ ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়ে রওশন আরা দাদন ব্যবসার শিকার ও অভাবজর্জরিত অসহায় নারীদের সংগঠিত করে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন-'নারচরের মহিলা সমিতি' ।..সেটা ছিল বিনা সুদে ঋণ নিয়ে অবলম্বনহীন মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলার সংগ্রামী পদক্ষেপ ।..... ৬০টি গ্রামের মোট ২ হাজার ৩৫ জন নারী তখন নারচর সমিতির সদস্য । ১০ টাকা দিয়ে সদস্য হয়ে সুবিধাজনক সময়ে সুদমুক্ত ঋণ নিয়ে কিছু একটা শুরু করা যায় । তখন পরিবারের পুরুষ সদস্যসহ অন্যরাও সেকাজে অংশ নেন । প্রথম আলো প্রতিবেদক যখন সরেজমিনে পরিদর্শন করছিলেন, তখন বিলকিসের স্বামী ও গ্রামের লোকের কাছে জানতে পারলেন যে নলকূপ বসানো নিয়ে মহিলা সমিতির উন্নয়নকাজে নারীদের অংশগ্রহন তথা সর্বোপরি সমিতিকে প্রতিরোধ করতে কোমর বেঁধে লেগেছিল তিনটি মহল- দাদনদার, মোল্লাতন্ত্র আর স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক দল । সুদখোর আর মোল্লারা মিলে গ্রামে সমিতির ভদ্রলোকদের অবাঞ্চিত ঘোষণা করে । তাহলে দাদনদার-মহাজনদের শোষণ-নিপীড়নের সহযোগী শক্তি কারা ? উত্তর হলো এক কথায় ফতোয়াবাজ ধর্মব্যবসায়ী মোল্লাতন্ত্র । তাদের অজুহাত কি ছিল ? নারীরা বেপর্দা হয়ে যাচ্ছে । কিন্তু, আসল কারণগুলি কি ? তাদের আর দাসী বানিয়ে ইচ্ছমতো ব্যবহার করা যাবে না, কয়েকটি করে বিবি রাখা যাবেনা । সালিশির নামে মাতবরদের কাছে ঘন ঘন দাওয়াত কিংবা জমিজিরাত(আল্লার নামে দান) উসুল করা যাবে না- দুর্দশাগ্রস্থ একেকজন নারীকে মহাজনদের হাতে হিল্লার নামে তুলে দিয়ে কিছু রাত ভোগের ব্যবস্থা করে দিয়ে মাতবরদের প্রিয়ভাজন হওয়া যাবেনা । প্রিয় পাঠক, এই হচ্ছে আমাদের মোল্লাদের চরিত্র । যারা সুদখোর-মহাজনদের সুদখোরির সহায়তা করে, তাদের কাছে আমরা ইসলামের বাণী শুনতে চাই না । নারীরা যে মোল্লাদের কাছে ভোগের সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়, সেটা যে শুধু মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রমানিত হয়েছে সেটাও ঠিক নয়, এই প্রবন্ধের লেখক ঢাকা শহরে আমার এক আত্নীয়ের বাসায় এক মিলাদ-মাহ্ফীলে মৌলবী সাহেবকে বলতে শুনেছে যে, 'মেয়েরা হলো শোকেসের জিনিস, তাই শোকেসে সাজিয়ে রাখলেই তাদেরকে মানায়' । সব মোল্লারা এই ধারণা পোষণ করেন না,- সাঈদীদের কথাবার্তা আর নারী-উন্নয়নবিরোধী জেহাদী(?) তৎপরতায় তেমন কোন প্রমাণ আমরা পাইনি । ইসলামী ফ্যাসিস্ট, গডফাদার, বকধার্মিক সাঈদী তার নাপাক ওয়াজে বাংলাদেশের শিক্ষিত নারীদের পরিহিত পোশাক-পরিচ্ছেদ সম্পর্কে যে আদিরসাত্মক বর্ণনা

প্রদান করেন, তাতে বোঝা যায় যে তিনি দূরবীন দিয়ে মহিলাদের পোশাক পর্যবেক্ষণ করেন । আর উপস্থিত ধার্মিকরুপী পুরুষ ভন্ডের দল সেই রুচিহীন, অসংস্কৃত বর্ণনা উপভোগ করে ।

এই অসংস্কৃত বীর পুঙ্গবের দলই যে বায়তুল মোকাররমে তান্ডব চালাবে,- ইচ্ছেমত একাধিক বিবাহ, তালাক প্রভৃতি স্বেচ্ছাচারী কর্মকান্ডের মাধ্যমে নারীদেরকে ভোগের পণ্য করে রাখার সুবিধাগুলি হাতছাড়া হওয়ার আশংকায়, এতে আর আশ্চর্য কি । কিন্তু, প্রবন্ধের শুরুতে আমি বলেছিলাম, যে ইসলামের স্বঘোষিত ঠিকাদারদের ধর্মীয় মুখোশ আমি টেনে খুলে ফেলব প্রবন্ধের স্থানে স্থানে প্রসঙ্গ অনুযায়ী । এদের স্বরুপ কি ? খেলাফত মজলিসের আমীর আল্লামা আজিজুল হক তার চার ছেলেসহ ৩০-৩৫ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী নিয়ে মোহাম্মদপুর সাতমসজিদ রোডের জামিয়া রহ্‌মানিয়া মাদ্রাসায় হামলা চালিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে(প্রথম আলো, মে ২৮, ২০০৭ অনলাইন সংখ্যা)। মাদ্রাসার লাইব্রেরী থেকে পাঁচ-ছয় লাখ টাকা মূল্যের বই লুট করে এবং মাদ্রাসার ক্যাসিয়ার আব্দুল্লাহ আল মাসুদকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ দুই লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয় । ..... অভিযোগকারী হচ্ছেন(মামলার বাদী) উক্ত মাদ্রাসার সহসভাপতি হাজি মোহাম্মদ আলী ।

প্রিয় পাঠক, এই খেলাফত মজলিসের লোকরাই বিএনপি শাসনের শেষ দিকে ঢাকার কাদিয়ানীদের মসজিদে হামলা চালিয়ে বহু মুসল্লীদের আহত করেছিল 'তাঁরা মুহম্মদকে নবী মানেনা' এই মিথ্যা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ধুয়া তুলে এবং তাদেরকে অমুসলমান আখ্যা দিয়ে । বর্বর দেশ হিসেবে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিতে সেদিন তাঁরা কালিমা লেপন করেছিল । এই সন্ত্রাসীরাই কিনা আমাদের ইসলামের জিম্মাদার !

খ) মোল্লাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই, সমিতি বা এন্‌জিওর নামে বেপর্দা মহিলারা বেগানা পুরুষের সাথে বেশরীয়তি মেলামেশা করে এবং স্বামীর অবাধ্য(মধ্যযুগীয় মূল্যবোধ-ইসলামে সমর্থন নেই) হয় এই অজুহাতে সবসময় উন্নয়নের বিরোধিতা করছেন, দেশের অর্ধেক শক্তিকে আপনারা অকেজো করে দেশকে পিছিয়ে রাখছেন, কিন্তু কথিত চোদ্দগ্রামের ঐ সিদ্দিকদের মতো অভাবগ্রস্থ ভূমিহীন ক্ষেতমজুর পিতাদের অসহায় কন্যারা বা স্ত্রীরা যদি পিতা বা স্বামীর অভাবের কারণে শহরে কাজ করতে গিয়ে প্রতারণার ফাঁদে পড়ে পতিতাবৃত্তিতে নাম লেখায়, তবে সেটা কী শরীয়তসম্মত হবে নাকি ইসলামসম্মত হবে ? কোন্ ইসলাম ? বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে সিদ্দিকের মতো হাজারো অসহায় পিতা, কখনো বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া মেয়েকে অর্থকষ্টের কারণে যৌতুকের দাবী মিটিয়ে সময়মতো বিয়ে না দিতে পারার ফলে, আবার কখনো কন্যাটিকে লেখাপড়া শেখানোর অপরাধে, অথবা তালাকপ্রাপ্তা কন্যাকে বাড়ীতে স্থান দেওয়ার অপরাধে সমাজের কাছে নানাধরণের কটূকথা ও মানসিক গঞ্জনার শিকার হন, যার যার উ□স হলো মৌলানা-মৌলবীদের অশুভ সাংস্কৃতিক প্রভাব ও প্রচার । সামান্যতম মানবতাবোধ এদের মধ্যে নেই ।

এখানে হয়তো আপত্তি উঠতে পারে এই বলে যে, কুমিল্লার একটি গ্রামের(নারচর) ঘটনা দিয়ে বাংলাদেশের সমস্ত গ্রামের(ও শহরের) মোল্লাদের বিচার করা যায় না-নারচরের ঘটনা একটি বিচ্ছন্ন ঘটনা । তাদের চরিত্র সম্পর্কিত অনেকগুলি দৃষ্টান্ত আমি ইতিমধ্যেই দেখিয়েছি । লক্ষ্য করতে হবে যে, কথিত মহিলা সমিতির বিরুদ্ধে গ্রামের কোন একক মোল্লা পেছনে লাগেননি । লেগেছিল গ্রামের পুরো মোল্লাসমাজ । একজন ব্যক্তিমোল্লা আর মোল্লাতন্ত্র এক ব্যাপার নয় । অর্থা□, মোল্লাতন্ত্র গড়ে উঠে সম্মিলিতভাবে তাদের

গ্রাম শাসনের স্থানীয়ভাবে প্রভাব বা ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর মধ্য দিয়ে । একজন মৌলবির ব্যক্তিগত বিরোধিতা একজিনিস আর জোতদার-মহাজনদের সাথে মিলে প্রভাব বিস্তার করা ভিন্ন জিনিস । আর এভাবে দেখলে, বাংলাদেশের অগণিত গ্রামেই মোল্লাতন্ত্রের উপস্থিতি দেখা যাবে । আবার অন্যদিকে, মোল্লাতন্ত্রকে কাজে লাগাচ্ছে পুরুষতন্ত্র । মোদ্দা কথা, পুরুষতন্ত্র ও মোল্লাতন্ত্র একে অপরের পরিপূরক । বহু গ্রামেই, যেখানেই গ্রাম্য যৌথ খামার বা সমিতি অথবা এনজিওর কার্যক্রম(শিক্ষামূলক, বিনিয়োগভিত্তিক, স্বাস্থ্যভিত্তিক ইত্যাদি) দেখা গেছে, প্রায় সব জায়গাতেই স্থানীয় মোল্লারা বাধা দিয়েছে এবং তাদের শহুরে কমরেডরা বা সহযোগিরা তাতে উ□সাহ ও মদদ জুগিয়েছেন সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে । অর্থা□ সবসময়ই তাঁরা জাতির উন্নয়নের বিরুদ্ধে, প্রগতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে । অথচ ভারতের বিরুদ্ধে তাঁদের এত বিদ্বেষ, ভারতই নাকি পাকা ধানে মই দিচ্ছে, আপনারাই বলুন, দেশের অর্ধেক শক্তি নারীকে ঘরে আবদ্ধ রেখে আমরা কিভাবে ভারতের সংগে পাল্লা দেব ? যে পাকিস্তান একসময় সবকিছুতে ভারতের সাথে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টা করতো, আজ কেন এত পিছিয়ে পড়ল, ভারত কিভাবে এত সামনে এগিয়ে গেল-একটি অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্নপ্রকাশের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলো, তা আমাদের ভাবতে হবে বৈকি । তাঁরা মানব-সম্পদ উন্নয়ন ঘটাচ্ছে গুরুত্বের সাথে, মানবদক্ষতা কাজে লাগাচ্ছে । তাদের নারী প্রোগ্রামার, নারী প্রকৌশলী, নারী চিকি□সক প্রভৃতি পেশাজীবীরা ইউরোপ-আমেরিকাসহ পৃথিবীর দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, এমনকি ভারতের নারী মহাকাশবিজ্ঞানী আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ-গবেষণা ও অভিযান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে স্বদেশবাসীকে গৌরবান্বিত করছে । প্রিয় পাঠক, শুধু অন্যকে গালি দিয়ে, নিজেদের দোষগুলির ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে রেখে আমরা কোনদিন এগোতে পারবনা ।

গ) ইসলামের ধ্বজাধারীরা কি জানেন যে, শহরে কর্মরত গৃহপরিচারিকা(যাদের অনেককেই গৃহস্বামীদের লালসা পূরণ করতে হয় বাধ্য হয়-(পেটের জ্বালা বড় দায়, গার্মেন্টস শ্রমিক, ইটভাঙ্গা নারী শ্রমিক ইত্যাদির এক বড় অংশেরই গ্রামে স্বামী রয়েছে) ? তাঁদের অনেককেই জীবিকার বাস্তব প্রয়োজনে, টিকে থাকতে গিয়ে, অথবা শহরের বস্তিতে সস্তা ভাড়ার নিমিত্তে বা একাধিক পুরুষের থাবা থেকে বাঁচার জন্য সাইনবোর্ড হিসেবে(দ্বিতীয়) একজন পাতানো স্বামী নিয়ে লিভ টুগেদার করতে বাধ্য হয় ? এটা নতুন কোন ব্যাপার নয়, বহু দিন থেকেই চলে আসছে । মোল্লারা ত' গ্রামে আধা সামন্ত শ্রেণীর এবং শহরে লুটেরা ব্যবসায়ীদের উচ্ছিষ্ট ভোগ করে আরাম-আয়েশে থাকেন, হারাম-হালালের বাছবিচার না করে, তাঁদের এসব অভিজ্ঞতা থাকার কথা নয় । 'উচ্ছিষ্ঠভোগের' ব্যপারটি ঈষ□ ব্যাখ্যা না দিলে পাঠক হয়তো আমার উপর বিক্ষুব্ধ হবেন এই ভেবে যে আমি মনগড়া বক্তব্য চালিয়ে দিচ্ছি । অভিজ্ঞরা জানতে পারেন, ঢাকা-চট্টগ্রাম শহরে এত অসংখ্য মসজিদ স্থাপনের পেছনের রহস্যটা কি ? না, পরলৌকিক কোন লাভের জন্য নয়, স্রেফ জাগতিক-ইহলৌকিক কারণেই ঢাকা শহরের অলিতে-গলিতে এত মসজিদ স্থাপন করা হয়েছে । মসজিদকে কেন্দ্র করে যে শপিং সেন্টারগুলি গড়ে উঠে, তার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে রীতিমতো কামড়াকামড়ি-টেন্ডারবাজি শুরু হয় বৈধ-অবৈধ সমস্ত উপায়ে । এইসব লুন্ঠন ও চাঁদাবাজির একটা অংশ আল্লার নামে দান করা হয় মোল্লাদের বিভিন্ন ফান্ডে, তাতে নাকি সব হালাল হয়ে যায়। প্রসঙ্গত, মাদ্রাসা শিক্ষকদের চাঁদা নিয়ে গঠিত ফান্ড আত্মসা□ করে কীভাবে ইনকিলাবের মওলানা মান্নান নিজের ব্যবসায় কাজে লাগিয়েছেন, সেসব ঘটনা আমরা পত্রিকায় দেখেছিলাম । আজ, যেসব ধর্মব্যবসায়ী রাজনৈতিক গোষ্ঠী নারীর সমানাধিকারের বিরুদ্ধে মিছিল-সমাবেশ করছে, সে মোল্লারাই কিন্তু একসময়ের খুনি ও প্রতারক মৌলানা মান্নানের স্মৃতিচারণ-সভায়

বা মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় হরহামেশা বলে থাকেন, যে মৌলানা মান্নানের জীবন, ইসলামের সেবায় তাঁর 'আপোষহীন' সংগ্রাম(বিশেষ করে আ.লীগ সরকারের সঙ্গে) নাকি তাদের জন্য পাথেয় ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত ! বক্তব্যগুলি হুবহু এরকম না হলেও মূলকথাটা তাই ছিল । এখন, প্রশ্ন হলো, মৌলানা মান্নানের কোন্ আদর্শটিকে এই মোল্লারা অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত মনে করছেন ? চাঁদাবাজি ও প্রতারণা(যার উদাহরণ উপরে দেয়া হয়েছে) ? নাকি একাত্তরের সময় বুদ্ধিজীবি হত্যা ? প্রিয় পাঠক, আজ এই একই গোষ্ঠী নারীর সমানাধিকারের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে তথাকথিত ইসলাম রক্ষার নামে । এই গোষ্ঠীই ৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৭১এর স্বাধীনতাযুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিটি সাংস্কৃতিক, স্বাধিকার ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিরোধিতা করে এসেছে । ইতিহাস সাক্ষী, চিরকালই এরা গণমানুষের গণতান্ত্রিক স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং কায়েমীস্বার্থের পক্ষে অর্থাৎ এষ্টাব্লিশমেন্টের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে ।

তো, কথা হচ্ছিল, গ্রাম থেকে আসা বস্তিবাসী ছিন্নমূল নারী-পুরুষ শ্রমিকদের লিভ-টুগেদার নিয়ে । ফতোয়াবাজদের কাছে প্রশ্ন, স্বামীর অজান্তে অথবা অবিবাহিত নারীশ্রমিকদের এই যে লিভ টুগেদার-এটাওতো বেশরিয়তি কাজ, পারবেন কি এটা বন্ধ করতে ? তা হলে তো গ্রাম থেকে মহাজনী শোষণ এবং কৃষিতে পূজিবাদ তথা গ্রাম্য বাজারব্যবস্থায় বিবিধ উদারীকরণের ফলে সৃষ্ট মেরুকরনের কারণে নিস্বীকরনের শিকার নারীপুরুষের শহরমুখি স্রোতকে বন্ধ করতে হবে(যার অনেকটা দায়দায়িত্ব আপনাদের উপর বর্তায়) ? । না আপনারা সেটা পারবেন না, কারণ এরই নাম হচ্ছ সমাজবিবর্তন, সমাজ বাস্তবতা-যা সমাজ বিকাশের ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম, যা আপনাদের জন্য দুর্বোধ্য । ১৪০০ বছর আগের আরবের সমাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো আর শিল্পবিপ্লবোত্তর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর এখনকার তৃতীয় বিশ্বের গরীব মুসলিম দেশগুলোর শতধা শ্রেণীবিভক্ত সমাজ কাঠামোর মধ্যে আকাশপাতাল ফারাক । আরবে তখন এত শত শত বস্তি ছিল না । সারভাইভাল-প্রটেকশন ও জৈবিক চাহিদা প্রভৃতি কারণে ঐ ভাসমান নারী শ্রমিকরা লিভ-টুগেদার করতে বাধ্য হয়, বিবাহ তাদের কাছে খরচের বিলাসিতা আর স্বাধিনতা ত্যাগ । তো কথা সেটা নয়, প্রশ্ন হলো নারীদের উপরোক্ত অবস্থার জন্য দায়ী কি শুধু মহাজনী ও গ্রামীন পুজিবাদী শোষন ? তা অবশ্যই নয়, মোল্লাতন্ত্রও অনেকাংশে দায়ী । কিভাবে ? গ্রামীন সামন্ততন্ত্রের জন্য উপযোগী সাংস্কৃতিক আবহটি মোল্লারাই তৈরী করে রাখেন-কিভাবে কতভাবে সেটা করেন তা লিখতে আলাদা একটি নিবন্ধ লিখতে হবে ।

ঘ) এখন, শহরের মোল্লারা মাঝেমধ্যেই পূণ্যলোভে হুংকার ছাড়েন পতিতালয়গুলো বন্ধ করে দেবেন । আমার বিনীত প্রশ্ন, এটা করার নৈতিক অধিকার তাদের রয়েছে কি ? বাংলাদেশে উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কার্যক্রমকে (অবশ্য জামাতি এনজিওগুলো মাফ) প্রথম থেকেই প্রতিরোধ ও বিরোধিতার মাধ্যমে দরিদ্র নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার পথে গ্রাম ও শহরের মোল্লারা কি একযোগেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আসছে না ? তবে কোন অধিকারে ভাগ্যাহত এইসব পতিতার জীবিকার বিকল্প ব্যবস্থা না করে তাদেরকে উচ্ছেদ(পতিতালয় থেকে) করার জন্য অমানবিক বর্বর হামলা চালানো হয় ? কথায় আছে,'শঠ রাজনীতি আর মৌলবী-পুরোহিতদের ভণ্ডামী নাকি বেশ্যাবৃত্তির চেয়েও খারাপ'। কথাটা উল্টো করে বললে, বেশ্যাবৃত্তিও এর চেয়ে উত্তম, তারা আর যাই করুক লোক ঠকায় না । তাঁদের বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করার মুরোদ কি তথাকথিত ধার্মিকদের আছে ? এটা কি শুধু সরকারের কাজ ? ভদ্রলোকদের মত না হোক, কোনরকমে পেটেভাতে খেয়েপরে বেঁচে থাকা তো তাদের অধিকার । আপনারা তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বীও হতে

দেবেন না, আবার এদিকে পতিতাবৃত্তিও করতে দেবেন না, তবে তারা যাবে কোথায়-আত্মহত্যা করবে ? সে পথও তো আপনারা আপ্তবাক্য দিয়ে বন্ধ করে রেখেছেন ।

এখন মূল প্রসঙ্গে ফেরা যাক । উপরে বর্ণিত এইসব গ্লানিকর জীবনের পরিণতি ও ঘটনা হয়তো অনেক কম হতো যদি নারীরা পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে পুরুষের সাথে সমানাধিকারের আইনগত প্রটেক্শন পেতো এবং ক্ষুদ্র বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারতো ।

৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের(১৯৩৯-১৯৪৫) পূর্বে ও তারপরও বহুকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের মুসলিম ও হিন্দু পরিবারগুলোর কাঠামো ছিল প্রধানত একান্নবর্তী ধরণের এবং মূল্যবোধ ছিল রক্ষণশীল তথা মধ্যযুগীয় ধাঁচের, এটা আমরা মোটামুটি অনেকেই জানি । তখন হিন্দু-মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোতে নারীদের কঠোর পর্দার মধ্যে রাখা হতো । মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরা ইংরেজি শিক্ষা দূরে থাকুক, বাংলা শিক্ষাও নিষিদ্ধ ছিল ধর্মীয় বিধানের নামে । শুধুমাত্র ফারসী ভাষায় সীমিত কিছু ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ পেতো । বেগম রোকেয়ার পারিবারিক জীবন এবং ভাইয়ের সাহায্য-অনুপ্রেরণায় লুকিয়ে লুকিয়ে রাতের বেলা বিদ্যাচর্চা করার কাহিনী আমরা সবাই জানি । হিন্দু রক্ষণশীল পরিবারগুলোতেও নারীদের একই অবস্থা ছিল । তো একান্নবর্তী পরিবারগুলোতে নারীদের যখন এই অবস্থা চলছিল, তখন প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে কালোবাজারী, মজুতদারী ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হলো এবং বহু দিন স্থায়ী হলো, তাতে ঘটলো ইতিহাসের জঘন্যতম মন্বন্তর যা পঞ্চাশের মন্বন্তর বলে কুখ্যাত । সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনাহারে মেরে ফেলা হয়, যে ষড়যন্ত্রের হোতা ছিল শাসক ইংরেজ বেনিয়াগোষ্ঠী এবং তাদেরই উচ্ছিষ্ঠভোগী এদেশেরই এলিট ও লুটেরাবুর্জোয়াচক্র ।

তো এই মন্বন্তরের পটভূমিতে হিন্দু-মুসলিম একান্নবর্তী পারিবারিক কাঠামো ভেঙ্গে যেতে লাগলো, একসময়ের সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল পরিবারগুলোর উপর নেমে এলো চরম বিপর্যয় । পরিবারের পুরুষ সদস্যরা আকালের সময় স্ত্রী-কন্যাদের বেশীদিন ভরনপোষণ করতে অক্ষম হওয়ায়, একসময় ঐ হতভাগ্য নারীদের পথে বের হতে হয় কাজের সন্ধানে । তাদের কেউ শহরে এসে নব্য ব্যবসায়ী শ্রেণী বা উচ্চবিত্তের মানুষের বাড়ীতে দাসীবৃত্তির কাজ নিল(এবং হয়তো খুব অনিবার্য কারণেই অনেককে গৃহকর্তার যৌনক্ষুধা মেটাতে হয়েছিল), কেউবা প্রথমে ভিক্ষাবৃত্তি এবং তাতে টিকতে না পেরে শেষ পর্যন্ত পতিতাবৃত্তিতে নাম লেখাল । অবশ্য হিন্দু রক্ষণশীল পরিবারের যেসব রমনীগণ নৃত্য ও গীতবিদ্যা তথা ধ্রুপদী সংগীত শেখার সুযোগ বা সোভাগ্য লাভ করেছিল তারা বড়জোর বাঈজী হিসেবে জীবন নির্বাহ করতে পেরেছে । তবে এদের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে নগন্য । সত্যজিত রায়ের সাড়া জাগানো এবং জাতিয়-আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত ছায়াছবি 'অশনি সংকেত'-এ মন্বন্তর বা আকালের সময়ে মেয়েদের দুর্দশার জীবন্ত ও করুন চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায় । দেখা যায় কিভাবে এক মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের সুন্দরী ললনা পাড়ার অন্য মেয়েদের সংগে কিছুদিন পাশ্ববর্তী ডোবাগুলিতে বুকসমান পানিতে কচু, লতাপাতা এসব দিয়ে একবেলা অন্ন জোটানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে । তারপর সেসবও যখন ফুরিয়ে গেল, এক পয়সাওয়ালা ভীষণদর্শণ এক ব্যবসায়ীর(নাকি মজুতদার-দানব ?) হাত ধরে শহরে পাড়ি জমাল অনিচ্ছাসত্ত্বেও , যে লোকটি এতদিন তাঁকে প্রস্তাব দিয়ে আসছিল তার হাত ধরে পালানোর জন্য । না, কোন প্রেম-ভালবাসার বশবর্তী হয়ে নয়, ভদ্রঘরের ঐ

মহিলাটিকে কিছুদিন নিজের কাছে রেখে বিয়ের নাম করে ভোগের জন্য । তারপর ঐ মহিলাটির কি পরিণতি হয়েছিল, বুদ্ধিমান পাঠক বা দর্শকদেরকে নিশ্চয় বুঝিয়ে বলতে হবে না । তখন ভদ্রঘরের অসংখ্য নারীর ভাগ্যে এটাই ঘটেছিল ।

এবারে একটি জ্বলন্ত প্রশ্ন রাখতে চাই । উপরোক্ত এসব নারীদের সম্ভ্রম, মানমর্যাদা, পর্দা ও আব্রু তথা পারিবারিক খানদানীত্ব এবং শরীয়তি আদব যে রক্ষা হলোনা, বন্যার জলের মতো ভেসে গেল, তাঁর জন্য মূলত কি কারণ দায়ী ছিল ? উত্তর হতে পারে- ক) পরিবারের পুরুষদের অক্ষমতা ? খ) বিশ্বযুদ্ধোত্তর মরণদশাগ্রস্থ পূজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংকট তথা কালোবাজারী, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ? গ) স্বাধিনতা সংগ্রাম দমনের লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে গণহত্যার উদ্দ্যেশ্যে সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ ? ঘ) ত□কালীন রক্ষণশীল পরিবারগুলোর মুসলিম নারীদের ইংরেজী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়া, পেশাগত দক্ষতা(যেমন- শিক্ষকতা, ডাক্তারী প্রভৃতি) বা যেকোন হাতের কাজ শিক্ষা ইত্যাদি থেকে বিরত রাখা-যা করা হতো খানদানী কৃষ্টি(সম্ভ্রান্ত শরীফ ঘরের আদব-কায়দা) এবং শরীয়তনির্দেশিত পর্দা প্রথার কঠোর প্রয়োগের দোহাই দিয়ে । ঙ) মুসলিম নারীর পিতার সম্পত্তির যুগোপযোগী উত্তরাধিকার থেকে (শরীয়তসম্মত এক তৃতীয়াংশের হিস্যা নয়) বঞ্চিত হওয়া ? কোনটি প্রধান কারণ ?

বিবেচকমাত্রই বুঝতে পারবেন যে, খ) ও গ)-এ বর্ণিত উত্তরটি পটভূমিগত কারণ, প্রত্যক্ষ কারণ নয় ? আমাদের দেখতে হবে যে প্রতিকূল ও সংকটময় পরিস্থিতিতে, শরীয়ার নামে যে অনুশাসন ও কৃষ্টি বিরাজমান ছিল তা কালের পরীক্ষায় টেকসই কিনা, উত্তীর্ণ কিনা । কারণ শরীয়তি অনুশাসনকে অপরিবর্তনীয় বিধান হিসেবে মোল্লারা দাবী করে থাকেন, বিশেষ পরিস্থিতি এবং সমাজকাঠামোর ক্রমাগত বিবর্তনের বাস্তবতাটুকু বিবেচনায় না নিয়ে । উপুযুক্ত উত্তরটি সম্ভবত ঘ) ও ঙ)-এ বর্ণিত সম্মিলিত উত্তর । কথিত ঐসব ভাগ্যাহতা নারীর যদি শিক্ষা থাকত, হরেক রকমের হাতের কাজের কোন না কোনটি জানা থাকত, আর পিতার সম্পত্তির সমভাবে প্রাপ্ত অংশ দিয়ে এবং হস্ত-দক্ষতা ব্যবহার করে ছোটখাট বিনিয়োগ করতে পারতো, তবে তাদেরকে মন্মন্তরের সময় ভিক্ষাবৃত্তি বা পতিতাবৃত্তিতে নামতে হতো না । কিন্তু মধ্যযুগীয় শরীয়তি সংস্কৃতি ছিল এর অন্তরায় । অনেকে আপত্তি তুলতে পারেন যে, শরীয়তনির্দেশিত পিতৃসম্পত্তিতে নারীর এক তৃতিয়াংশের হিস্যা থেকে কেউ নারীকে বঞ্চিত করলে তার জন্য শরীয়ত দায়ী হবে কেন ? । কারণ, শরীয়তের মাধ্যমেই নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন এবং বিবিধ পারিবারিক বিষয়ে পরিবারের কর্তাদের উ□সাহিত করা হয়েছে নারীর সিদ্ধান্তগ্রহণের অধিকারকে অবদমিত রাখতে । আমি খুব সংক্ষেপে কোরানের কিছু আয়াত এবং বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদদের কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব ।

"যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করেন তাহা তিনি ভালই জানেন" । আয়াতটি ইঙ্গিত করছে, অবস্থার পরিবর্তনের সাথে বিধান পরিবর্তনের স্বীকৃতিকে ।

এবারে আসা যাক পরিবারে নারীর সিদ্ধান্তগ্রহণের অধিকারের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান প্রসঙ্গে । হানাফী আইন পৃঃ ১৩৮-১৩৯ থেকে[††]-

[††] প্রত্যক্ষ সূত্রঃ banglarislam.com; হাসান মাহ্মুদ

"বিয়েতে মেয়েরা অভিভাবক হতে পারবে না" ।

"ব্যবসার দলিলে নারী-সাক্ষী পুরুষের অর্ধেক"-হানাফী আইন,৩৫২ পৃষ্ঠা ; শাফি'ই আইন-পৃঃ ৬৩৭ ।

"প্রথম হইতেই নারীসাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য না হইবার কারণ হইল,- তাহাদের বুঝিবার কম ক্ষমতা, তাহাদের কম স্মরণশক্তি, ও তাহাদের কম নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা "। -দি পেনাল ল' অফ ইসলাম-মোঃ ইকবাল সিদ্দীকি, কাজী পাবলিকেশন্স, লাহোর-পৃঃ ৪৪,৪৫,৪৬,৪৭, ১২৭ ও ১৪৯[#] ।

তাহলে, উপরোক্ত দলিল দুটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, যেখানে নারীকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবেই স্বীকার করা হচ্ছে না, যাদের বোধশক্তি ও স্মরণশক্তির উপরই কোন ভরসা করা হয়নি, হেলায় অগ্রাহ্য করা হয়েছে, সেখানে পারিবারিক, সাংসারিক বা জাগতিক যে কোন বিষয়ে পরিবারের মধ্যে নারীর যে সিদ্ধান্তগ্রহণের ও মতামত প্রকাশের ক্ষমতা থাকবে না সেটা বলাই বাহুল্য । পঞ্চাশের মন্বন্তরের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের মুসলিম পরিবারগুলোতে নারীদের এ অবস্থাই ছিল যার বিরুদ্ধে মহীয়সী বেগম রোকেয়া আজীবন আদর্শিক সংগ্রাম করেছন । এখন পরিবারে যখন নারীদের সিদ্ধান্তগ্রহণের ও মতপ্রকাশের অধিকারই থাকে না, যার লাইসেন্স শরীয়াই দিয়ে দিয়েছে, সেখানে তাকে উত্তরাধিকার প্রশ্নে অবদমিত ও প্রভাবিত করে নিস্ক্রীয় করে রাখার পথটি সহজ নয় কি ? "যাদের বোধশক্তির অভাব রয়েছে, স্মরনশক্তি ও বিচারবুদ্ধির অভাব রয়েছে, তারা সম্পত্তি নিয়ে কি করবে" ? "বিচারবুদ্ধি-স্মরণশক্তির অভাব থাকলে(শরীয়াপ্রদত্ত লাইসেন্স) তারা ত' সম্পত্তিকে কাজে লাগাতে পারবে না, বিনিয়োগও করতে পারবে না-অপচয়ই শুধু করবে"। এসব যুক্তি দিয়েই শরীয়ার অস্ত্র ব্যবহার করে তকালীন মুসলিম পরিবারগুলোর পুরুষ সদস্যরা নারীদেরকে অবদমিত করে রাখতো(যা আজও চলছে)। আর তার ফলাফল ছিল, মন্বন্তরের সময় একসময়ের পর্দানশীন নারীকে পতিতাবৃত্তি অথবা দাসীবৃত্তিতে নামতে বাধ্য হওয়া । এই হলো গিয়ে শরীয়তি খানদানী(অর্থা বনেদি) কৃষ্টির পরিণতি ।

ফতোয়াবাজির কারণে নারীদের আত্মহত্যা অথবা পতিতাবৃত্তির পথ বেছে নেয়ার ব্যাপারে সঠিক পরিসংখ্যানের জন্যএকটা ব্যাপক সরেজমিন অনুসন্ধান হলে ভাল হয় । তবে 'আইন ও সালিশ কেন্দ্রের' মতো সংগঠনগুলোর কাছে অথবা জাতিসংঘের নারীসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদনে এসব পরিসংখ্যানগত তথ্য পাওয়া যেতে পারে । অনেক পাঠক হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারেন, আমি একচেটিয়া মোল্লাতন্ত্রের বিপক্ষে লিখছি, নারীর উপর ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় প্রথার নামে যে নিপীড়ন করা হয়েছে বা এখনো হচ্ছে, সেসব নিয়ে আমি নীরব কেন ? কারণ দুটো-এক, এই লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ের বিতর্কিত 'নারীনীতি' এবং ব্রিটিশ কালপর্ব থেকে সমকালীন সমাজ পর্যন্ত মুসলিম নারীর সামাজিক অবস্থান বা মর্যাদার ক্ষেত্রে মোল্লাতন্ত্রের ভূমিকার ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করা । দুই, যুগ যুগ ধরে মনুসংহিতার নামে হিন্দু নারীদের কিভাবে নিষ্পেষিত করা হয়েছে, সতীদাহ-সতীচ্ছেদ প্রভৃতি হাজারো বর্বর প্রথার মাধ্যমে, এবং এখনো কি ধরণের নিষ্পেষণ চলছে, সেসব আলোচনা করবেন হিন্দু সমাজের কোন আলোকিত প্রাজ্ঞ লেখক-যা এই প্রবন্ধের আওতার বাইরে ।

[#] পূর্বোক্ত

৫। গ্রাম্য সমাজে এখনো এধরণের ভুরি ভুরি ঘটনা দেখা যায় যে, পিতা হয়তো অন্য কোন যুবতী নারীকে বিয়ে করছে বিবাহযোগ্যা কন্যার উপস্থিতিতে, তখন মা-মেয়ের ভাগ্যে নেমে আসে দুর্গতি । আর যদি সেই সাথে একাধিক ছেলে সন্তান থাকে, তবে তথাকথিত শরীয়ত-নির্দেশিত, নারীদের জন্য পিতৃসম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের যে ফর্মূলা, তাঁর পরিণতিটা কি দাঁড়াচ্ছে ? কোরআনে শর্তসাপেক্ষে বহুবিবাহ অনুমোদিত । কারণটি ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, রসুলুল্লাহ্‌র সময়ের আরব্য সমাজে গোত্রের নিয়ম অনুযায়ী নারীদের ভরনপোষণের দায়িত্ব পিতা, স্বামী বা (তালাক-হিলা প্রভৃতির ফলে) অন্য কোন পুরুষের হাতে ন্যাস্ত হতো । তখনকার যুগের জন্য সেটি স্বাভাবিক হলেও আজকের যুগের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীরা এ ধরণের সমাধান মেনে নেবেন না । তো, স মা ও সৎ-ভাইবোনদের উপস্থিতিতে প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর হিস্যা(এক অষ্টমাংশ); কন্যাসন্তানদের(অর্থা পরস্পর সৎবোন) হিস্যা(এক তৃতীয়াংশ) কি উপরোক্ত অবস্থায় একই থাকছে নাকি যথাক্রমে এক ষষ্টদশতম(১/১৬) ও এক ষষ্ঠাংশে(১/৬) পরিণত হচ্ছে ? কিন্তু আজকের বাজারে, পিতৃ সম্পত্তিতে স্ত্রী-কন্যার অবমূল্যায়িত (একাধিক স্ত্রীর কারণে) অংশের বিপরীতে 'সমান ব্যবহারের শর্ত' স্ববিরোধী নয় কি ? বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে কোন নারী কি তার সাজানো স্বপ্নের সংসারে আরেকজন সতীনকে মেনে নেয় ? আরবের গোত্র সমাজে সেটা ছিল স্বাভাবিক-স্ত্রীরুপে রক্ষিতা হওয়াও নারীর কাছে অগৌরবজনক কিছু ছিলনা । তাই, তখনকার সময়ের জন্য কোরাণে সেটার শর্তসাপেক্ষ অনুমোদন দেয়া হয়েছিল । কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান বাজারে ও আর্থসামাজিক বাস্তবতায় সম্পত্তির এভাবে ভাগ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে কোন মা'ই সন্তানের ভবিষ্যত নিরাপত্তাহীনতা মেনে নেবেন না ।

৬) ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে মুসলিম সমাজের মনস্তত্ত্বে একটা আক্ষেপ ছিল যে 'হিন্দুরা সমস্ত উঁচু পদের সরকারী চাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, কোর্ট-কাছারী সব দখল করে ফেলেছে-হিন্দুদের ষড়যন্ত্রে ইংরেজ মুসলমানদের প্রতি বৈষম্য করছে' এবং করেছে('করেছে' বলছি-কারণ আজও বহু মুসলমান এই ধারণা পোষন করেন) । এই আক্ষেপ, বিদ্বেষ ও হীনমন্যতাকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজ মৌদুদি, কায়েদে আজম, এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লাদের দিয়ে এবং অন্য পক্ষে উগ্র হিন্দু নেতাদের উস্কে দিয়ে অসংখ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়েছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম এ কারণে বারবার হোচট খেয়েছিল অনৈক্য, বিভক্তি, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প এবং হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃঘাতি হানাহানিতে ।

প্রশ্ন হলো, ক) এই যে দাঙ্গাকবলিত হয়ে অগণিত পিতা সন্তানহারা হলো, অসংখ্য মা পুত্রহারা হলো, অসংখ্য বধূ স্বামীহারা হলো ; এত হাহাকার-ভোগান্তির জন্য দায়ী কি শুধু ইংরেজ ?
খ) এত ত্যাগের পরেও স্বাধীনতা সংগ্রামে বারবার পিছিয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী কি শুধু ইংরেজ নাকি যে মূল কারণটি বা পটভূমিটি ইংরেজদেরকে এই সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল সেটি ? কারা দায়ী ছিল ? ইতিহাস সাক্ষী, এই মোল্লারাই তকালীন মুসলিম সমাজকে বুঝিয়েছিল, ফতোয়া দিয়েছিল যে বিধর্মীদের ভাষা শিক্ষা করা যাবে না । বিধর্মী ইংরেজের ভাষা শিখে মুসলমানরা ঈমাণ হারিয়ে ফেলবে, নাসারাদের ভাষা-কৃষ্টির প্রভাবে মুসলিমরা তাদের শত শত বছরের পূর্বগৌরব হারিয়ে ফেলবে । আর এভাবেই তখন মুসলমানদেরকে

পঞ্চাশ বছরের জন্য পিছিয়ে দেয়া হয় শিক্ষাদীক্ষাসহ সর্বক্ষেত্রে । বন্ধুগণ, এবার বিচার করুন, উপরের ক) ও খ)-এ বর্ণিত ট্রাজেডীর জন্য কারা দায়ী ? মোল্লারা নয় কি ? তাঁরাই ত' এত অগণিত দাঙ্গা ও রক্তপাতের কারণগুলো সৃষ্টি করেছিল । আজকের মোল্লারা কি তাদের হয়ে এই অসংশোধনযোগ্য ভুলের জন্য ক্ষমা চাইবেন ?

আজ যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালায়' অর্থনীতি ও সম্পত্তিসহ সর্বক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকারের প্রস্তাব (যেহেতু এটি এখনো আইন নয়, কিন্তু এর ভিত্তিতে আইন প্রনয়ণের সম্ভাবনা রয়েছে) করা হয়েছে, তখন ধর্মব্যবসায়ী মোল্লারা এর বিরুদ্ধে হৈচৈ শুরু করে দিয়েছে, তারা আমাদেরকে ভূতের মতো পেছন দিকে টেনে ধরতে চাইছে । চিরকালই দেশেবিদেশে তাদের একই প্রতিক্রিয়াশীল প্রগতিবিরোধী ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছে । প্রিয় পাঠক, আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, দেড়শ-দুইশ বছর আগে যেভাবে মোল্লাতন্ত্রের কারণে মুসলিম সমাজ পিছিয়ে গিয়েছিল, বহু অকল্যাণের ভুক্তভোগী হতে হয়েছিল শুধু মুসলমানদেরই নয়, পুরো ভারতবর্ষকে, আজও তাদের প্রগতিবিরোধী, কল্যাণবিরোধী এবং শ্রেয়োঃবিরোধী ভূমিকার কোন পরিবর্তন হয়নি এতটুকুও, তাদের মনগড়া, বিকৃত নিজস্ব ইসলামের নামে, শরীয়তের নামে । চিরকালই এই গোষ্ঠীটি সভ্যতার বিরুদ্ধে, বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে, আধুনিকতার বিরুদ্ধে এবং কল্যাণ-প্রগতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, অচলায়তন সৃষ্টি করেছে ।

এই মোল্লাতন্ত্র, ফতোয়াবাজি এবং শরীয়াতন্ত্রের কারণেই বিশ্বের মুসলিম দেশগুলি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে প্রযুক্তিতে পাশ্চাত্যের তুলনায় শতবছর পিছিয়ে আছে আর ধুঁকে ধুঁকে মার খাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে ।

আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় এই প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লাদের ভূমিকা কি ছিল এদেশের মানুষের সেটা ভুলে যাওয়ার কথা নয় । এরা হচ্ছে অন্ধকারের শক্তি, তাই অন্ধকার ও অজ্ঞতা ছড়ানোই এদের কাজ । এদের কারণেই আজ সমাজে নারীর প্রতি এত সহিংসতা, এত এসিড-সন্ত্রাস, হত্যা প্রভৃতির মতো বর্বর অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে । কারণ, অনৈসলামিক শরীয়ার নামে(পৃথিবীর বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদরা শরীয়াকে ইসলামবিরোধী বলে রায় দিয়েছেন) এই মোল্লারা ধর্ষক ও ধর্ষিতাকে, নির্যাতক ও নির্যাতিতাকে একই শাস্তি দিয়ে অপরাধীদেরকে উ□সাহিত করেছে । এদের সালিশীর বিচার-প্রহসনের কারণে শত শত নারী অপমানে-লজ্জায় হয় আত্মহত্যা করেছে, নয়তো ঘরবাড়ী-স্বামী সবকিছু হারিয়ে পথের ভিখিরি হয়ে গেছে, নতুবা মৃত্যুবরন করেছে ঐ নূরানি চেহারার পিশাচগুলোর নিষ্ঠুর প্রস্তরাঘাতে । প্রিয় পাঠক, খুব বেশীদিন আগের ঘটনা নয়, এই একই চক্র(যে মৌলবাদী সংগঠনগুলো নারীর সম অধিকারসংক্রান্ত জাতীয় নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে), একই (খেলাফত মজলিসের ক্যাডার) নরপিশাচরা জোট সরকারের সময় প্রকাশ্য দিবালোকে, আপন কন্যার সামনে এক কাদিয়ানি মসজিদের ঈমামকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল । আহ্‌মদীয়াদের বাড়ীঘরে আগুন লাগিয়ে লুণ্ঠনযজ্ঞ চালিয়েছিল, তাদের পবিত্র মসজিদ ভেঙ্গে দিয়েছিল, পবিত্র কোরআন শরীফে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, প্রার্থণারত অবস্থায় বর্বর হামলা চালিয়ে আহত করেছিল মুসল্লীদের । কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, বাঙ্গালী বড় বিস্মৃতিপ্রবণ জাতি !

জামাত ও তার সমগোত্রীয় কিছু মৌলবাদী, ধর্মব্যবসায়ী ও স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক দল আজ

ইসলাম ও তথাকথিত আল্লাহ্‌র আইন(?) রক্ষার নামে শান্তিপ্রিয় মুসল্লীদেরকে ব্যবহার করতে চাইছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রস্তাবিত সাম্প্রতিক নারী নীতির বিরুদ্ধে, যা হবে নারী অধিকারের রক্ষাকবচ । কিন্তু কোন্ ইসলাম ? যারা আজকাল ইসলাম রক্ষার নামে বায়তুল মোকাররমে তান্ডব চালাচ্ছে, তাঁদের প্রকৃত স্বরুপ কি ? এদের মধ্যে রয়েছে খেলাফত মসজিদের আমির শায়খুল হাদীস আজিজুল হক, মুফতি আমিনী প্রমুখ যাদের সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিগ্রস্ত চরিত্র আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি । এরা যে হানাহানি ও ফিত্‌না সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক ইসলামের পূজারী হবে তাতে কি আশ্চর্য হওয়ার কিছু আছে ? প্রিয় পাঠক, আমাদের ইসলাম হলো সুফীসাধকদের উদার ও সমাহিত শান্তির ইসলাম । তলোয়ারের মাধ্যমে এদেশে ইসলাম কায়েম হয়নি, হয়েছিল সূফী-দরবেশদের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে, তাঁদের সহনশীলতা, উদারতা, ক্ষমা, ভালবাসা, আধ্যাত্মিকতা, মরমী ভাবরস ও ন্যায়পরায়ণতার প্রভাবে(আজকের মৌলবাদীদের মধ্যে যার লেশমাত্রও খুঁজে পাওয়া যায় না),-হিংসা ও ঘৃণা ছড়িয়ে নয় । ইতিহাস সাক্ষী, সূফী মনসূর হাল্লাজের মতো সিদ্ধ সাধককে তাঁর সময়ের রক্ষণশীল অসহিষ্ণু শরীয়াপন্থী মোল্লারাই প্রাণদন্ডে দন্ডিত করেছিল খোদাদ্রোহী আখ্যা দিয়ে । সব যুগেই এদের ভূমিকা একই রকম । মতের মিল না হলেই একদল আলেম বা মৌলানা অন্যদল মৌলানাকে মুরতাদ আখ্যা দিয়ে আসছেন যা সম্পূর্ণভাবে কোরাণের ও রসূলুল্লাহ্‌র নির্দশের বরখেলাপ ।

তো যা বলছিলাম, বাংলাদেশের এইসব ধর্মব্যবসায়ীদের অপত্‌পরতার আসল উদ্দেশ্য হলো, একটা কিছু ইস্যু করে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করা এবং প্রান্তিক সাংগঠনিক অবস্থা থেকে নিজেদের উত্তরণ ঘটিয়ে ক্ষমতার আস্বাদগ্রহণ এবং কায়েমীস্বার্থের ভাগীদার হওয়া । অন্য কথায়, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো 'theocracy' (যাজকসম্প্রদায় বা ধর্মনেতাদের দ্বারা পরিচালিত স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকাঠামো) প্রতিষ্ঠা করা অর্থা মোল্লাতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেওয়া । এসব অশুভ আলামত । এসবের যে কী ভয়ংকর পরিণতি হতে পারে, দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে(১২৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) ইনকুইজিশন(Inquisition)[§§] আইনের(অনেকটা ব্লাসফেমী আইনের মত) মাধ্যমে ইউরোপের যাজকতন্ত্রের বর্বর, উপীড়নমূলক ও রক্তক্ষয়ী ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি । চোখের সামনে আফগানিস্তানই ত' শরীয়ার নামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বড় উদাহরণ-পর্দা না মেনে জীবিকার তাগিদে কর্মস্থলে যাওয়ার অপরাধে কিভাবে মহিলাদেরকে শাস্তির নামে নির্যাতন করা হতো, প্রেম বা ব্যাভিচারের অপরাধে দোররা বা পাথর মেরে হত্যা করা হতো, মেয়েদের চাকরি করতে না দিয়ে, তাদের স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে জোরপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তিতে নামতে বাধ্য করা হয়েছিল, তার প্রামাণ্যচিত্র ও সচিত্র তথ্য ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও ইন্টারনেটের কল্যাণে দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে ।

আমাদের ভারতবর্ষে, সেন রাজাদের সময়[***], পুরোহিততন্ত্রের ধর্মীয় বর্বরতা, শোষণ-দূর্নীতি ও অত্যাচার-

[§§] Inquisition-refers to the judgment of heresy by the Roman Catholic Church (In west Europe)। The Inquisition (aka The Holy Orders of the Emperor's Inquisition) is a secret organisation in the Warhammer 40,000 universe. They act as the secret police of the Imperium, hunting down any and all threats to the stability of the God-Emperor's realm.

[***] সেন রাজাদের রাজত্বকাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বা পন্ডিতদের ভিন্নমত রয়েছে বলে মনে হয় । ডক্টর আহ্‌মদ শরীফ তাঁর 'বাঙলার সমাজে, সাহিত্যে, ও সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান' শীর্ষক একাডেমীক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেনঃ"নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে বল্লাল সেন চৌদ্দ শতকের শেষার্ধের লোক"। নির্বাচিত প্রবন্ধ; আহ্‌মদ শরীফ; পৃষ্ঠা ১০৪ । কিন্তু, আমরা জানি, যে ভারতবর্ষে ইসলামের আবির্ভাবের(খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী) প্রায় সমসাময়িক কালেই শঙ্করের

নিপীড়নের কাহিনী ইতিহাস পাঠকমাত্রেই জানেন । আমার মতো অনেকেরই আশংকা যেন মিথ্যে হয়, যে আফগানিস্তানের মতো মধ্যযুগীয় মোল্লা-শাসনের দিকে বাংলাদেশ ধাবিত হচ্ছে কিনা । তখন, নারীসমাজ এখন যেটুকু শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন, তাও হারাবেন । ভোটের অধিকার ত' দূরে থাকুক । সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলিতে ইসলামের নামে মেয়েদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে । বাংলাদেশের সচেতন নারীসমাজের কাছে আমার একান্ত আহ্বান, সময় থাকতে মোল্লাদের সাম্প্রতিক নারী-উন্নয়নবিরোধী ত্পরতার বিরুদ্ধে আপনারা সোচ্চার হোন, তা না হলে, এদেরকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য বর্তমান সরকারের যেসব গোপন চক্রান্ত চলছে, সেটাই সফল হবে । প্রয়োজনে ঝাড়ুমিছিল বের করুন । নির্বাচনের সময় যেসব মহিলা বোরখা পরে ঘরে ঘরে গিয়ে ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠনের পক্ষে ভোট চাইতে যায়, দয়া করে তাদের ভালো ভালো ধর্মীয় কথায় ভুলে যাবেননা । ওদের ভদ্রমুখোশের আড়ালের হিংস্র চেহারাটা লুকিয়ে রাখে, আবার সময় সুযোগমত প্রকাশ করে । আজ যদি আপনারা মেয়েরা ঘুমিয়ে থাকেন, পূণ্যার্জনের আশায় অহেতুক মৌলবীদের (ইসলামের সঙ্গে সমপর্কবিহীন) মিলাদে-দাওয়াতে আমন্ত্রণ জানিয়ে, দান করে মোল্লাদের 'বিশেষ সামাজিক মর্যাদা' বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেন, মৌলবাদীদের অথবা তাদের প্রতিনিধিত্বকারী বোরখাওয়ালী ক্যাম্পেইনারদের মিষ্টি কথায় ভুলে যান, তাহলে এখন যেটুকু স্বাধীনতা রয়েছে সেটুকুও হারাতে হবে । এমনকি আফগানিস্তানের পরিণতি বরন করতে হবে-প্রশাসনে ও সংসদে প্রতিনিধিত্ব তো দূরে থাকুক, চাকুরী ও শিক্ষার অধিকার হরণ করে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করা হবে ।

একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, সাধারণ মানুষের মৌলিক ইস্যুগুলি যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দ্রব্যমূল্য, দারিদ্র্য, বিদেশী ও তাদের এদেশীয় এলিট-দোসরদের কাছ থেকে খনিজসম্পদের ন্যায্য হিস্যা আদায় ও তার পরিকল্পিত ব্যবহার, পরিবেশরক্ষা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলিতে কখনোই এই মৌলবাদীদের কখনো আন্দোলন করতে দেখা যায়নি । শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী ও কৃষকদের ন্যায্যমূল্যে সারের দাবীর মতো ইস্যুগুলিতে কোনদিনই এই গোষ্ঠীর নেতাদের কারো একটি বিবৃতি বা নিবন্ধ আমরা পত্রিকায় দেখিনি , আন্দোলন তো দূরে থাক । আজ যখন উত্তরবঙ্গে নীরব দুর্ভিক্ষ চলছে, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে দেশের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের মানুষেরা দিশেহারা, নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিয়ে সরকারের নানান লুকোচুরিতে দেশের মানুষ সন্দিগ্ধ ও উদ্বিগ্ন এবং বিশেষ করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে জনগণ সোচ্চার হয়ে উঠেছে, তখন রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে, সেসব থেকে জনগণের দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরানোর জন্যই, ঠিক সেই সময়টিকেই কথিত ঐসব গণবিচ্ছন্ন মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলি, এমন একটি মতলবী ও স্পর্শকাতর ইস্যুতে মাঠ গরম করতে চাইছে । সাধারণ মানুষের জীবন-মরণ ইস্যুগুলির ব্যাপারে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই । এইসব মৌলবাদী দলগুলো গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেনা বলেই সাধারণ মানুষের জীবন-মরণ ইস্যুগুলির ব্যাপারে তাদের মাথাব্যথা নেই, এদের গঠনতন্ত্রের মধ্যেও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি তথাকথিত 'আল্লার একচ্ছত্র অধিকারের' নামে । অথচ খেলাফতের সময়ও(এজীদের পূর্ব পর্যন্ত) তখনকার সময়ের উপযোগী

আবির্ভাব(সূত্রঃ উপরোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ১০০) । ইতিহাসবিদ সুরজিত দাশগুপ্তের মতে শঙ্করাচার্যের উত্থান নবম শতাব্দীতে এবং রামানুজের আবির্ভাব একাদশ শতাব্দীতে(ভারতবর্ষ ও ইসলাম; পৃঃ ৫৪)। কিন্তু, আহ্‌মদ শরীফের উপরোক্ত গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছঃ রামানুজের আবির্ভাব বার শতকে । যেহেতু এটা সাধারণ বোধবুদ্ধির কথা, যে সেন রাজাদের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত সম্প্রদায়ের অত্যাচারের ফলেই নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানসজগতে পুঞ্জিভূত বিক্ষোভ বহুকাল ধরে সঞ্চিত ছিল, তাই ইসলামের আগমনের পর নয়, তার বহু পূর্বেই বল্লাল সেনের রাজত্ব বিদ্যমান ছিল । তাই তিনি 'চৌদ্দ শতকের শেষার্ধের লোক'-এ দাবীর সত্যতা মেলে না । আসলে বল্লাল সেন শঙ্করাচার্যের(অষ্টম বা নবম শতাব্দী) অনেক আগে রাজত্ব করে থাকতে পারেন । কারণ, বল্লাল সেন পিতা বিজয় সেন ও পুত্র লক্ষণ সেন-এই দুই জনের মধ্যবর্তী সময়ে রাজত্ব করেছেন ।

প্রাথমিক ধাঁচের নির্বাচনমূলক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ।

প্রিয় পাঠক, উপরে চিত্রিত পৈশাচিকতা, হিংস্রতা, বর্বরতা, কপটতা, সুবিধাবাদিতা , সংকীর্ণ কায়েমী স্বার্থ-ইত্যাদিই হলো গিয়ে, মৌলবাদীদের ও মোল্লাতন্ত্রের আসল চেহারা । এদের পাপের কোন সীমা-পরিসীমা নেই । এদের কারণেই নারীসমাজের এত হাহাকার, এত দুঃখ, এত দীর্ঘশ্বাস । এত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সংখ্যালঘুদের ব্যবসা ও সম্পত্তি লুণ্ঠন, গ্রেনেড বিস্ফোরণ করে অগণিত নিরীহ মানুষ হত্যা । এই ভন্ডরাই নাকি মোনাজাতের মধ্যে দোয়া করে, 'সমস্ত মুসলমানকে আল্লা যেন সুখে-শান্তিতে রাখে, হেফাজত করে' । কিন্তু এরাই মানুষের জীবনকে অশান্তিতে ভরিয়ে তুলছে । হিলার নামে স্ত্রীকে যদি অন্যের ঘরে দেয়া হয়, তাতে শুধু ঐ নারীই মানসিক নিপীড়নের শিকার হয় না, স্বামীকেও মানসিক যন্ত্রণা পোহাতে হয় । একজন অশিক্ষিত স্বামী সাময়িক রাগ বা খেয়ালের বশে 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ করতেই পারে-এটা সংসারের স্বাভাবিক ঘটনা । কিন্তু, আল্লা ত' মানুষের মধ্য দিয়েই তাঁর কাজ করে যান, তাহলে মোল্লাদের এসব ভূমিকা কি খোদার কাজের সহায়ক ? তাহলে কিভাবে আল্লা মুসলমানদের (বিধর্মীদের কথা বাদই দিলাম-তাদের কথা আল্লা ভাববেন) শান্তিতে রাখবেন ?

অতএব, এসব ধর্মব্যবসায়ী চক্র 'ইসলাম গেল গেল' রব তুলে নারী-অধিকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবে, সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি এবং দুর্বলতাকে পূজি করে কিছুদিনের হুজুগে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করবে এবং সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করবে-এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই । বরং এটাই প্রত্যাশিত । আপনারা এবার বিচার করুন কারা নারীকে চিরকাল করুণার পাত্র করে রেখেছিল ?এসব মতলববাজদের ব্যাপারে জনগনকে সতর্ক থাকতে হবে, তাতেই তাঁদের ঈমাণ ও দেশপ্রেম উভয়ই রক্ষা পাবে।

কারণ আল্লাহ্ সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না (-আল্ কোরান) ।

পরিশেষে, নজরুলের 'পাপ' কবিতার দুটি লাইন দিয়ে লেখা শেষ করছি-

“ধর্মান্ধরা শোন,
অন্যের পাপ গনিবার আগে নিজের পাপ গোনো ।” ।

রবিউল ইসলাম, লেখক ও গবেষক। ইমেইল - rblislam@yahoo.com

নারীকে ক্ষমতাহীন করেছে একক ঈশ্বরের প্রবক্তারা

দীক্ষক দ্রাবিড়

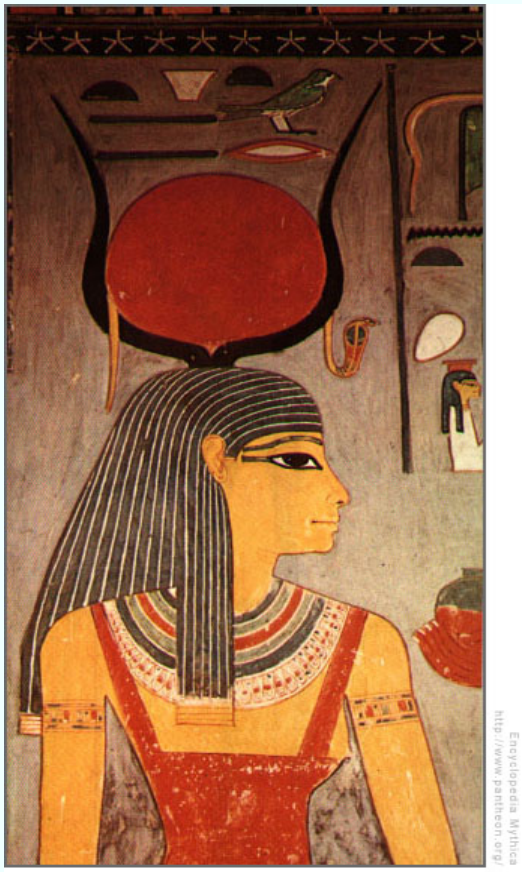

আমিই প্রথম এবং আমিই শেষ
আমিই সম্মানিতা এবং আমিই ধিক্কৃতা
আমিই পতিতা এবং আমিই পবিত্রা
আমিই স্ত্রী অথচ আমিই কুমারী
আমিই মাতা এবং আমিই কন্যা
আমিই আমার মায়ের সন্তান-সন্ততি
আমিই বন্ধ্যা এবং শত সন্তানের জননী
আমারই বিবাহ-উৎসব ছিল ভুবনখ্যাত
এবং আমিই কোনো স্বামী গ্রহণ করিনি

আমিই ধাত্রী এবং যে কিছুই ধারণ করে না
আমিই আমার প্রসব বেদনার সান্ত্বনা
আমিই বর এবং আমিই কনে

আমার স্বামীই আমাকে জন্ম দিয়েছে
আমার বাবার আমিই মা এবং
আমার স্বামীর বোন এবং সে আমার অপত্য....

আমার কথায় মনোযোগ দাও
আমি সেই যে অসম্মানিতা এবং
একই সাথে শ্রেষ্ঠ।

উপরের কথাগুলো ধর্মগ্রন্থের কথাই মনে হয়। কিন্তু প্রচলিত পুরুষ-ঈশ্বরের বাণী নয় তা বক্তব্যে স্পষ্ট। এমন নারী-কণ্ঠে কোন নারী-ঈশ্বর কথা বলেছেন তা এখনও অজানা। তবে এই পবিত্র বাক্যসমূহ আবিষ্কার হয়েছে ১৯৪৫ সালে মিশরে, নাগ হাম্মাদি নামে খ্যাত দলিলগুলোর মধ্যে। এগুলো যীশু খ্রিস্ট মারা যাওয়ার দুশো বা তিনশ' বছর পরে লেখা। ধারণা করা হয় এখানো সোফিয়ার কথা বলা হয়েছে তবে ইসিসের কথাও হতে পারে এগুলো।

পুরুষ ঈশ্বরের সাথে নারী-ঈশ্বরের ধারণার মূল পার্থক্য ধরা পড়ে এখানে। নারী ঈশ্বর বহুমাত্রিক। তার চরিত্রের মধ্যে সবকিছু অন্তর্ভুক্ত। সকল বৈপরীত্য একসাথে স্থান করে নিয়েছে। নারী-ঈশ্বর তাই একই সাথে প্রাচীন ও উত্তর-আধুনিক। তার মধ্যে একসাথে আছে পুরুষ ও নারী সত্ত্বা, আছে সৃষ্টি ও ধ্বংস।

নারীকে ক্ষমতাহীন করেছে কারা?

সৃষ্টির অসীম রহস্যময়তা দেখে এক সময় ভক্তিতে গদগদ হয়ে মাথা নোয়াতো অসহায় আদিম মানুষ। সৃষ্টির যত কর্মকান্ড তার মধ্যে সবচে জরুরি, তখনও মানুষের ব্যাখ্যা-অজানা আর গুরুত্বপূর্ণ ছিল মানব-জন্ম (নারী আর পুরুষের মিলনের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে বন্দনা করতো একসময় মানুষ। এই মিলন তখন ছিল উপাসনা, পবিত্র কর্ম। যখন নারীদেহ নাপাক ঘোষিত হলো তখন এই মিলন হলো নিষিদ্ধ আর পাপকর্ম)। আর এই অসম্ভব জটিল কর্মকান্ডটা ঘটতো নারীর উদরে; বিমুগ্ধ পুরুষের কাছে নারী ছিল তাই জীবনের আরেক নাম, স্রষ্টার রূপ, ক্ষমতা ও শক্তির আঁধার। সৃষ্টির উৎপাদনশীলতাকে তাই আদিম মানুষ কল্পনা করেছে নারী হিসেবে। পূজা করেছে দেবী হিসেবে। ফসল ফলায় যে মাটি, থাকার আশ্রয় দেয় যে ভূমি, তাকে পৃথিবী জুড়ে প্রাকৃতিক ধর্মবাদী সব মানুষ তখন সম্মান জানাতো 'মাদার আর্থ' হিসেবে। পুরুষের উৎপাদনের হাতিয়ার, কলাকৌশল আবিষ্কার আর ধর্মচিন্তার নানা প্রচলনে এখন পৃথিবী শুধুই পুরুষদের 'প্ল্যানেট আর্থ'।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কোনও সমাজবিজ্ঞানীর কল্পনা নয়। খোদ বাংলাদেশের অনেক আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে এখনও চালু আছে নারী-প্রধান সমাজ ব্যবস্থা, মাতৃ-প্রধান পরিবার প্রথা। শুধু যেসব আদিবাসীর আঙ্গিনায় হানা দিয়েছে গির্জার পুরোহিতরা সেখানেই শুধু নারীর প্রভাব ক্ষয়ে গেছে বা যাচ্ছে। নারীর দেবীত্ব কেড়ে নিয়েছে ঈশ্বরের ক্রুশ।

খ্রিস্টান ধর্ম ক্রুশকে নিজেদের প্রতীক বানানোর আগে যে ক্রস চালু ছিল পাশ্চাত্যে তা ছিল সুইজারল্যান্ডের পতাকার ক্রসের মত। দুটি সমান রেখার ক্রস। নারী ও পুরুষের সমান গুরুত্বে ভারসাম্য প্রদানকারী একটি প্রতীক। রোমানরা খ্রিস্টান ধর্মকে হাতিয়ে নিয়ে নিজেদের বানানোর পর তারা তাবৎ চেষ্টা করেছে সমাজে নারীর ক্ষমতা ও ভূমিকাকে সংকুচিত করে ফেলতে।

ক্যাথলিকদের বই 'দি উইচেস হ্যামার' হচ্ছে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে নারীকে ক্ষমতাশূন্য করে দেয়ার খুন-রাঙা দলিল। এর রচয়িতারাই মুক্ত চিন্তার নারী থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার প্রথম পরিকল্পনা নেয়। সব বিদুষী নারী, পূজারী নারী-পুরোহিত, জিপসি-নারী, মিস্টিক নারী-পীর-দরবেশদেরকে আখ্যা দেয়া হয় 'ডাইনি' হিসেবে। পাওয়ামাত্র তাদেরকে খুন করার উন্মাদনায় মাতে ক্যাথলিকরা। চিকিৎসা জ্ঞানসম্পন্ন মিডওয়াইফ/ধাত্রীরা যারা সন্তানজন্মকে ব্যথামুক্ত করে প্রসূতিকে আরাম দিতে চাইতো তাদেরকে হত্যা করতো তারা। কারণ জেনেসিস-এর ঈশ্বরব্যাখ্যায় প্রসববেদনা নারীর পাপের শাস্তি- ইভের কর্মফল। ইউরোপজুড়ে তিনশ বছর ধরে এই ধর্মীয় উন্মাদনায় কম পক্ষে পাঁচ মিলিয়ন মুক্ত চিন্তার নারীকে হত্যা করা হয়েছে।

নারীমূর্তি ভাঙায় ব্যস্ত পুরুষ ঈশ্বর

এই একটি বিষয়ে ধর্মে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী পুরুষেরা একমত। মানুষের কখনও নারী-ঈশ্বর ছিল না। তাদের জোর দাবী ঈশ্বর সর্বদাই পুরুষ ছিলেন। অর্থাৎ, সমাজে নারীর মর্যাদা এত উঁচুতে কখনও ছিল না যে মানুষ সৃষ্টিকর্তার কল্পনা করতে গিয়ে তাকে নারী ভাবতে পারে। অনেক প্রত্নতাত্ত্বিকরা দুনিয়ার গুহাচিত্র আর মূর্তির ধ্বংসাবশেষ ঘেঁটে শেষ কথা বলে দিয়েছেন যে এমন কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ তারা পাননি। পাওয়া নাই যেতে পারে। শুধু মাটির নীচে পাওয়া জিনিসেই সত্য থাকে না, সত্য অন্যত্রও আছে, অন্যভাবেও সত্যকে পাওয়া যায়। আর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নিজে থেকে কথা বলে না, মানুষই এর ব্যাখ্যা দেয়। একেক ব্যাখ্যা একেক রকম হয়। তবু যুৎসই নারী-ঈশ্বর মূর্তি না পেয়ে এটাই চালু তত্ত্ব যে নারী কখনও ঈশ্বর হওয়ার যোগ্য ছিল না। এমনকি উর্বরতার দেবী নারী ছিলেন তার প্রমাণও তারা পান না।

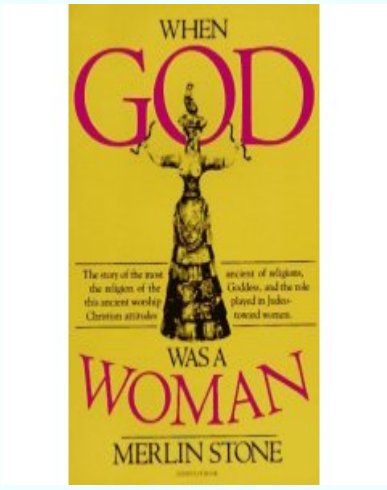

তাই যখন মার্লিন স্টোন ১৯৭৬ সালে লিখলেন 'হোয়েন গড ওয়াজ ওম্যান' তখন বিরোধীমতের লোকেরা হা রে রে রে করে তেড়ে আসলেন। তবে মার্লিন স্টোনের ব্যাখ্যার সূত্রে ৭০ ও ৮০-র দশকে চালু হলো রিলিজিয়াস ফেমিনিজম। এই মতের এক প্রবক্তা এলিজাবেথ ডেভিস লিখলেন `দ্য ফার্স্ট সেক্স' বইটি। যাতে তিনি দেখালেন মিথিওলজি, এ্যানথ্রোপলজি এবং ডিসিপ্লিন হিসেবে হাঁটি হাঁটি পা পা করলেও আর্কিওলজির সব তথ্য-উপাত্ত প্রমাণ করে যে সমাজ আগে মাতৃতান্ত্রিক ছিল। এবং মহাদেবীকে (গ্রেট গডেস) প্রতিস্থাপিত করে ইহুদি, খ্রিস্টান মুসলিম ধর্মের অনুসারীরা প্রতিহিংসাপরায়ণ পুরুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি করেছে।

আমার উষ্মাটা শুধু খ্রিস্টান ধর্মের উপর ভাবলে ভুল হবে। ইসলামের ইতিহাস অনেক বেশি প্রামাণ্য, অনেক সাম্প্রতিক। সেখানেও নারী-মূর্তি, নারী-দেবীর প্রতি আক্রোশ দেখতে পাই। একক ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নারী-দেবীদের ধ্বংস দেখতে পাই। পুরুষ প্রধান সমাজের ভ্যালুজ চালু করতে গিয়ে নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে তোলা দেখতে পাই।

মক্কা বিজয়ের পর নবী মুহাম্মদ কাবার মধ্যে ঢুকে পাগানদের দেবী-মূর্তিগুলোকে বাইরে এনে ভাঙ্গেন। এর মধ্যে ছিল লাত, উজ্জা ও মানাত। এরা পূজনীয় দেবী ছিল শুধু কুরাইশদের নয় সেই উত্তর আফ্রিকা থেকে যারা ফি বছর হজ্জ্ব করতে আসতো সেইসব পাগানদের। নবী মুহাম্মদ ও তার সঙ্গী-সাথীরা দেবীদের মূর্তি ভাঙেন কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মানুষের মূর্তি ভাঙেননি। মেরি ও শিশু যীশুর মূর্তি নবী ভাঙেননি। ভেঙেছেন সেসব নারীমূর্তি যারা থাকলে একক ঈশ্বরের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়। আর আল্লাহও চরম হুমকিতে থাকেন এসব মূর্তিগুলোর কাছে। তার একটা ব্যাখ্যাও তিনি দেন কোরানের সুরা আন নাজমের ২৩ নং আয়াতে :

الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى وَآبَاؤُكُم مَّا أنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا نْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ
الْهُدَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ
(এগুলো কিছু নাম ছাড়া কিছু নয়, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছো। এর সমর্থনে আল্লাহ কোনও দলিল নাজিল করেননি। .....)

মাটির নীচে প্রত্নতাত্ত্বিকদের হাতে আবিষ্কার হওয়ার মত নারী-ইশ্বর, নারী দেবীর মূর্তি থাকবে কি করে? যদি পুরুষের তলোয়ারের আঘাতে সেসব টুকরো টুকরো হয়ে যায়। লোককাহিনী থেকে আমরা সেসব কথা পেতে পারি। সেসব নারী দেব-দেবীর গল্পগাঁথা মনে করিয়ে দেয় একদা এমন সমাজ ছিল যখন নারীকে ঈশ্বর ভাবতেও মানুষের আপত্তি ছিল না।

একক ঈশ্বরের প্রবক্তারা গল্পে, মিথে থেকে যাওয়া দেবীদের, নারী-ঈশ্বরদের নামগুলো মুছতে পারেনি। মূর্তির মত এগুলো তো আর ভাঙা যায় না। তবে তার একটা বিকৃত ব্যাখ্যা চালু করেছে তারা। খ্রিস্টানরা পাগান নারী দেবীদের নাম চুরি করে এ্যাঞ্জেলদের নাম দিয়েছে আর তা দিয়ে গল্প চালু করেছে। যাতে পরবর্তীতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে নারী-ইশ্বরদেরকে ভুল করে খ্রিস্ট ধর্মের এ্যাঞ্জেল ভাবে। কোরানেও একই তথ্য দেখা যায়। একই সুরার ২৭ আয়াতে সেই ব্যাখ্যা পাই আমরাঃ

الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى نَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ

(যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তারাই ফেরেশতাদের নারীর নাম দিয়ে থাকে।)

পাঠ্যপুস্তকে তাই আমরা ইসলামের আগের সময়কে জাহেলিয়াত বলেই পড়ি। পড়ি, 'আরবের মানুষেরা তখন জীবন্ত কন্যাসন্তান কবর দিত'। অথচ মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রার নাম আমরা ইতিহাসে পাই। সেই যুগে নারীরা রাণী হতে পারতো। খাদিজা বিধবা হয়েও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী হতে পারতো। তবু খাদিজার কর্মচারী থেকে স্বামী হওয়া মুহাম্মদ যখন নবী হলেন তখন তার প্রচারিত ধর্মের অনুসারীরা দাবী জানান ইসলামেই নারীকে সত্যিকার অধিকার দেয়া হয়েছে তখন বিস্ময় লাগে। এই সেই ধর্ম যে ধর্মে নারী নেতা হতে পারে না, ইমাম হতে পারে না, রাষ্ট্রের অধিপতি হতে পারে না। অথচ ইতিহাস বলে, ইসলাম আসার আগে আরবের বেদুইন সমাজে নারীদের প্রভাব পুরুষদের চেয়ে কম ছিল না (এখনও আরবের বেদুইন মহিলাদের স্বাধীনচেতা মনোবৃত্তি নিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রকেই বিপাকে পড়তে হয়।)। উমর খলিফা হওয়ার আগে মক্কা ও মদিনার নারীদের জন্য হিজাব বাধ্যতামূলক ছিল না। নারীদের ভাগ্যের চাকা এই পেছনে ঘুরানোর প্রক্রিয়ায় এক ঈশ্বরের প্রবক্তাদের সক্রিয় ভূমিকার কথা ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। এ জানার জন্য মাটি খুঁড়তে হয় না, প্রত্নতাত্ত্বিক হওয়ার দরকার করে না।

নারী-ঈশ্বরকে মাটিচাপা দেয়ার জন্য শুধু পুরোহিতরা নয় প্রত্নতাত্ত্বিকরাও দায়ী

মূল কথা ছিল নারীপ্রধান বা মাতৃতান্ত্রিক একটা সমাজ যদি আদিকালে থেকে থাকে তবে সে সমাজে মাতৃমূর্তি বা নারী-ঈশ্বর বা দেবীদের উপাসনা হওয়ারই কথা। এখন আমরা একক ঈশ্বরের ধারণা পৃথিবীতে চালু হওয়া ও তার সাথে মহাদেবী বা নারী-ঈশ্বর পূজার বিরোধের সন্ধান করতে পারি।

বাইবেল ও কোরানে আদম-ইভের যে ঈশ্বরের গল্প আমরা পাই তার বয়স মানুষের চেয়ে অনেক কম। নবী মুহাম্মদকে আদমের ২৫ তম প্রজন্ম ধরে আদম ও তার সন্তানদের বয়সে উদার হাতে গ্রেস দিলেও আদমের স্বর্গপতনের ইতিহাস ৪৫০০ বছরের বেশি পুরনো বানানো যায় না। তবে ইসরাইল-আরবের এই ঈশ্বরের আগেও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানবগোষ্ঠীর মধ্যে একক-পুরুষ-ঈশ্বরের যে গল্পকথা শোনা যায় তা প্রায় ১৪ হাজার বছরের পুরনো। অর্থাত্ আদমের ঈশ্বরের চেয়েও সে ঈশ্বর দশ হাজার বছর পুরনো।

কোনো সন্দেহ নেই, ঈশ্বরের ধারণা পৃথিবীর এক বিন্দুতে জন্ম হয়ে পরে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে নি। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ আলাদা আলাদা করে তাদের ঈশ্বর কল্পনা করেছে। এতো বিজ্ঞানের সূত্র নয় যে সর্বত্র একই যোগফল হবে। ধর্ম বরং কলা বা মানবিক শাখার মত; বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বিভিন্ন ভাবে ছবি আঁকবে বা কবিতা লিখবে, গল্প ফেনাবে। গোল বাঁধিয়েছেন কার্ল মার্কসের দেশি ফাদার উইলহেম স্মিদ। ১৯১২ সালে তিনি বই লিখলেন 'দি অরিজিন অভ দি আইডিয়া অব গড'। এতে তিনি তত্ত্ব দিলেন প্রিমিটিভ মনোথিইজমের। যার মোদ্দা কথা হচ্ছে পৃথিবীর সব অঞ্চলের সব আদিবাসীদের ধর্ম শুরু হয়েছে একজন আকাশ-ঈশ্বরের কল্পনা থেকেই। অন্যান্য দেব-দেবী যুক্ত হয়েছে পরে। যদিও স্মিদ, ক্যাথলিক ফাদার ছিলেন, যদিও তিনি বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করতেন না, যদিও তিনি ফ্রয়েডকে গাল-মন্দ করতেন, তবুও তার এই তত্ত্ব চার্চ পার হয়ে সমাজবিজ্ঞানের অনেক শাখায় স্থায়ীত্ব পেয়েছে।

নৃতাত্ত্বিকরা অনেক আদিবাসী সমাজে গিয়ে দেখতে পেয়েছেন যে তারা দূরবর্তী এক আকাশ-ঈশ্বরের কথা বলে তবে সে ঈশ্বর মানুষের কোনো কাজে সাড়া দেয় না বলে তারা বিভিন্ন শক্তির দেব-দেবী মূর্তি পূজা করতে বাধ্য হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষ বিবৃতদাতার তাদের এসব আকাশ-ঈশ্বরের যে বর্ণনা দেয় তাতে পুরুষালী বৈশিষ্ট প্রধান, সুতরাং আদিম ঈশ্বরের একটা পুরুষমত ধারণা আমরা পাই।

এর বিপরীতে আমরা নারী-ঈশ্বর, মহাদেবীর কিছু কাহিনীও পাই। কিন্তু পুরুষ-প্রধান সমাজ ব্যবস্থায় নারী-ঈশ্বরের কথা কেউ জোরালো কণ্ঠে বলে না। তবুও ১০০ খ্রিস্টাব্দে গ্রিক ঐতিহাসিক প্লুটার্ক মহাদেবী ইসিস-কে চিহ্নিত করেন প্রকৃতির নারী উপাদান হিসেবে। প্লুটার্কের মৃত্যুর সময়কালে আরেক গ্রিক দার্শনিক এপুলিউস 'দি গোল্ডেন এ্যাস' নামে এক বই লেখেন সেখানে দেখা যায় মহাদেবী ইসিস বলছেন:

> 'আদিম ফ্রাইজিয়ানরা আমাকে ডাকতো পেসিনানটিকা, দেবতাদের মাতা; এথেন্সবাসী আমাকে ডাকে সেক্রোপিয়ান আর্টেমিস, সাইপ্রাস দ্বীপের বাসিন্দাদের কাছে আমি পাফিয়ান আফ্রোদিতি, ক্রিটের শিকারীদের কাছে আমি ডিকটায়ানা, ত্রিভাষী সিসিলিয়ানদের কাছে প্রোসারপাইন। কেউ আমাকে চেনে জুনো নামে, কেউ চেনে বেলোনা নামে, কিন্তু ইথিওপিয়ানদের দুই গোত্র আর মিশরবাসী, যারা আদি বিদ্যায় বুৎপত্তি অর্জন করেছিল, ...তারা আমাকে ডাকে আমার আসল নামে, রাণী ইসিস।'

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের নারী-ঈশ্বর,মহাদেবী বা দেবীর পূর্ণাঙ্গ নামের তালিকার জন্য এই ওয়েবসাইটটিতে ঢুঁ মারতে পারেন: http://www.mothergoddess.com/

অনেকেই অভিযোগ তোলেন, কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক খননেই নারী-ঈশ্বর বা মহাদেবীর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কথাটা অসত্য এবং ভুল তত্ত্বের কারণে বিভ্রান্তিতে সৃষ্ট মতবাদ। প্যালিওলিথিক যুগের খনন কাজে শুধু ইউরোপের ৩ হাজার বর্গমাইলের মধ্যে প্রায় ১ হাজার নারী মূর্তি বা ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে। যেগুলোর কিছু কিছু ২৭,০০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দের।

সমস্যা হচ্ছে এসব নারী-মূর্তি বা ছবির ব্যাখ্যায়। কেউ ব্যাখ্যা দিয়েছেন এগুলো কোনো বিশেষ নারীর প্রতিকৃতি, কোনো প্রাচীন সুন্দরী রমণীর ভাস্কর্য, অথবা প্রাগৈতিহাসিক পর্ণোগ্রাফি বা ইরোটিকা। আজ থেকে ৩০ হাজার বছর আগের মানুষ ইরোটিকার জন্য নারী-মূর্তি বানাতো এ শুধু পুরুষ প্রত্নতাত্ত্বিকদের পক্ষেই কল্পনা করা সম্ভব। এখানেই প্রমাণ, শুধু ধর্ম নয়, বিজ্ঞানও নারীর ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে কাজ করেছে, যেহেতু কিছু পুরুষরা এর নেতৃত্বে ছিল বলে। মাত্র বিংশ শতাব্দীতে এসে প্রত্নতাত্ত্বিক মারিয়া গিমবুতাস (১৯২১-১৯৯৪) ব্যাখ্যা দিলেন যে এসব মূর্তি হচ্ছে মিথোলজিক্যাল চরিত্র এবং বিভিন্ন ঋতুতে বা বিভিন্ন মিথকে পুনরানুষ্ঠান করার আশায় এসব মূর্তি ব্যবহৃত হতো। মারিয়া প্রথম ব্যাখ্যা দেন যে, প্রাচীন ইউরোপ ছিল নারী-ঈশ্বর/মহাদেবী কেন্দ্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক। অন্যদিকে ব্রোঞ্জ যুগের ইন্দো-ইউরোপিয়ান সমাজের সংস্কৃতি

ছিল পিতৃতান্ত্রিক।বলাবাহুল্য, তার ব্যাখ্যা অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। কিন্তু মারিয়া মানুষের ইতিহাসে নারী ও নারী-ঈশ্বরের নতুন অবস্থান তৈরি করে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

এখন অনেকেই মনে করেন যে, এসব নারী-মূর্তির সাথে জমির উর্বরতা প্রার্থনা, নারী দেবীদের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা, ঋতু-উপাসনা এবং মহাদেবী পূজার মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে।

নারীর ইসলাম বা ইসলামের নারী

কুরআনের এবং আরব অঞ্চলের প্রধান ধর্মগুলোর পুরুষ থেকে নারীর সৃষ্টি এবং পুরুষের জন্যই তাদের সৃষ্টির যে গল্প, এটাই এসব ধর্মের মূল নারী বিষয়ক দর্শন হয়ে উঠেছে। সুতরাং কাঠমোল্লা থেকে মুসলিম মনীষি সবাই ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন যে, নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পরে এবং পুরুষের আনন্দের জন্য। এই মিথ বা গল্পকথাকে আরো বাড়ানো হয়েছে এবং এটাকে একটি পবিত্রতার কাপড় পড়ানো হয়েছে যাতে এই গল্পের কেউ কোনো সমালোচনা করলে তা হয়ে দাঁড়ায় ধর্মগ্রন্থের অবমাননা। 'নারী পুরুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে'- এ কথায় যদি কেউ অবমাননার বিষয় খুঁজে না পান তবে তাকে কী বলা যায়। সেক্ষেত্রে একটি হাদিস দেখুন: হাদিসে আছে:

> ‘নারীদের প্রতি বন্ধুত্বমূলক আচরণ করো কারণ তাদেরকে বুকের হাড় থেকে তৈরি করা হয়েছে, বুকের বাঁকা হাড়, যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও তবে তা ভেঙে যাবে; আর যদি তুমি কিছুই না করো, তবে সে বাঁকাই থেকে যাবে।‘

এ বাক্যটি নিশ্চয়ই অবমাননাকর। কিঞ্চিত আত্মসম্মানবোধ থাকলে কোনো নারীই তা অস্বীকার করতে পারবেন না। তাদের অনেকেই হয়তো কোরানের এই আয়াতগুলোতেও নারীর প্রতি অবজ্ঞার বিষয়টি খুঁজে পান না:

> ‘হে ঈমানদারগন! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়।‘ (২ : ১৭৮)

> ‘আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত, আর যদি সে আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাত দিবসের উপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েজ নয়। আর যদি সদ্ভাব রেখে চলতে চায়, তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে| আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী, আর নারীরদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।‘ (২ : ২২৮)

> 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন: একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। অত:পর যদি শুধু নারীই হয় দু-এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক| মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অত:পর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ওছিয়্যেতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর| তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না।' (৪ : ১১)

তো সুরা বাক্বারা ও নিসার আয়াতগুলো পড়ুন। নিসার তিন নম্বর আয়াতে আছে পুরুষের বহুবিবাহের অধিকার আর ৩৪ নম্বর আয়াতে আছে প্রহারের অধিকার। সেগুলো এখানে পুনরুল্লেখ করলাম না। নিসার ১১ নং আয়াতে পুরুষ সন্তান ও মেয়ে সন্তানের মধ্যে যে পার্থক্য করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীতে অনেক মুসলিম নারী সংগঠন আন্দোলন করছে। তাদের বক্তব্য একটাই পিতার কাছে সন্তানের লিঙ্গ পরিচয় বড় হতে পারে না। কিন্তু কোরানে নারীর প্রতি অবমাননাকর বক্তব্য আছে আরো অনেক আয়াতেই। হতে পারে এর একটি কারণ কুরাইশরা যে তিনটি দেবীর পূজা করতো সে তিনটি দেবী নারী ছিলেন। পুরুষের তুলনায় নারী যে নীচু তা বুঝা যায় কোরাণের অনেক আয়াতে (যেমন: ৪:১১৭, ৪৩:১৫-১৯, ৫২:৩৯, ৩৭: ১৪৯-৫০, ৫৩:২১-২২, ৫৩: ২৭)।

কোরআনে নবীর স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে কিছু আয়াত আছে যা পরবর্তীতে সব মুসলিম নারীদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়া অসংখ্য হাদিস আছে যেগুলোতে নারীর অবস্থানকে খাটো করা হয়েছে। হাদিসের সূত্র নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে এবং অনেক হাদিসকে পরবর্তীতে অশুদ্ধ বলে দাবী করা হয়েছে। এসব কারণে সেসব সূত্র উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম। তবে হাদিসের সূত্র ধরে আমাদের সমাজে চলে আসা কিছু রীতি বা বক্তব্য আছে যা আমরা শুনি। যেমন: "স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেশত", "নারীর চলন বাঁকা", "নারীর একমাত্র সদগুণ হল পতিব্রতা স্ত্রী হওয়া" ইত্যাদি। এধরনের আরো অজস্র নিয়ম-কানুন-রীতি ও আইন দিয়ে মুসলিম রমণীদের ভূমিকা ইসলামে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যে ভূমিকা হলো বাড়িতে থাকা, পুরুষের ইশারায় ছুটে আসা, স্বামীকে মান্য করা তার ধর্মীয় দায়িত্ব। হাদিসে আরো বলা আছে একজন স্ত্রী কখনও তার স্বামীকে না করতে পারবে না যদি সে উটের উপরেও থাকে। বলা আছে, যেসব বিষয়ের মধ্যে খারাপ ও

শয়তানি জিনিস লুকিয়ে থাকে তা হলো: বাড়ি, নারী ও ঘোড়া। নবী নাকি বলেছেন সেই ব্যক্তি কোনোদিন উন্নতির মুখ দেখবে না যে নারীর কাছে তার গোপন কথাগুলো বলে, কিংবা সেই জাতি কখনো উন্নতি করবে না যে জাতি নারীকে নেত্রী হিসেবে গ্রহণ করে ইত্যাদি।

কোরান ও হাদিস দিয়েই শুধু ইসলাম ধর্ম চলে না। ইসলামে খলিফা ও মুসলিম মনীষিদের বক্তব্যকেও গুরুত্ব দেয়া হয়। ইসলামী শিক্ষার ও নিয়ম-কানুনেরই এসব অংশ। তাছাড়া সামাজিকভাবে এসব শিক্ষা চলে আসছে মুসলিম সমাজের মধ্যে। তাই বিভিন্ন খলিফা, দার্শনিক ও ধর্মীয় চিন্তাবিদের নারীবিরোধী কথা-বার্তা ইসলামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অত্যন্ত জোরদার ভাবে (যদিও ইসলাম দাবী করে তারা নারীকে দিয়েছে অধিক স্বাধীনতা। কিন্তু তারা একবারও ভাবে না যে নবী মুহাম্মদ ইসলাম ধর্ম প্রচারের আগেই একজন বিধবার ব্যবসায় কর্মচারি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সুতরাং ইসলামহীন সে পরিবেশেও নারী অনেক অগ্রসর ছিল।)

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর আদেশ দিয়েছিলেন, লেখা শিখতে নারীদের বাধা দাও। আরেকবার তিনি বলেছিলেন, নারীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে, এতে অনেক সুবিধা। তার সবচেয়ে নিন্দার্হ বক্তব্য ছিলো যে, তিনি বলেছিলেন, দরকার হলে মেয়েদেরকে কাপড় ছাড়া রাখো। যাতে তারা ঘরের বাইরে যেতে না পারে, বিয়ের অনুষ্ঠানে না যায় এবং প্রকাশ্যে না আসতে পারে। বাইরে গেলেই তারা অপরিচিত পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং যা তাদের নাই তার প্রতি নারীরা আকর্ষিত হয়।

নারী বিরোধী বক্তব্য আরো বেশি পাওয়া যায় চতুর্থ খলিফা আলীর বক্তব্যে। তিনি বলেছিলেন, সমস্ত নারী জাতি হচ্ছে দুষ্ট প্রকৃতির এবং সবচে খারাপ দিক হচ্ছে এরা প্রয়োজনীয় দুষ্ট। আরেক জায়গায় তিনি বলেছেন, কখনও নারীর কাছে পরামর্শ চেয়োনা কারণ তাদের পরামর্শ অর্থহীন। তাদেরকে লুকায়ে রেখো যাতে তারা কোনো পুরুষকে দেখতে না পারে। তাদের সংস্পর্শে বেশি সময় কাটায়ো না তাহলে তারা তোমাকে ধ্বংসের প্রান্তে নিয়ে যাবে।

ইসলামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এসব বক্তব্য আর মুসলিম দেশগুলোতে নারীর প্রতি ব্যবহার দেখেও যারা বুঝতে পারে না ইসলামে নারীর অবস্থান কোথায় তাদেরকে কি বলা যায়। নারী যদি নিজের অস্তিত্বকে সম্মানিত না করতে পারে তবে সে ধর্মের কাছ থেকে কিভাবে উন্নত ব্যবহার আশা করতে পারে।

নবী মুহাম্মদ বলেছেন নারী ও দাস এই দুই দুর্বল জিনিসকে দয়ার সাথে দেখতে। ইসলামে নারীকে বুদ্ধির দিক দিয়ে, নৈতিকভাবে এবং শারীরিকভাবে নিম্নস্তরের হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হাদিসেই আছে নারীদের যুক্তিবোধ ও বিশ্বাস কম। নারীকে স্পর্শের বিষয়ে ইসলামে আছে নানা কটুক্তিমূলক নিষেধাজ্ঞা:

> 'একজন পুরুষের কাছে বেগানা নারীর কনুইয়ের গুতা খাওয়ার থেকে শুকরের ঝাপটা (splash) খাওয়াও উত্তম'।
>
> অথবা
>
> 'তিনটি জিনিস কারো ইবাদতকে বাধাগ্রস্ত করে, যদি তার সামনে দিয়ে কালো কুকুর, মহিলা কিংবা গাধা গমন করে।'

কুকুর ও গাধার সাথে নারীকেও যুক্ত করা হয়েছে অপবিত্রতার চিহ্ন হিসেবে। লিবারেল মুসলমানরা এসব হাদিস ও প্রমাণকে অপ্রমাণিত বলে চালিয়ে দিতে চান। কিন্তু কোরানের বাণীর ক্ষেত্রে তাদের কি বক্তব্য? কোরানের উপর নির্ভর করেই মাওলানারা ওয়াজ-নসিহত করে যাচ্ছেন যে, পুরুষের চেয়ে নারী নিম্নস্তরের এবং সমানাধিকার ইসলাম বর্হিভূত চিন্তা। তার প্রমাণ আমরা বাংলাদেশে অহরহই পাচ্ছি।

দীক্ষক দ্রাবিড়, ইন্টারনেটের বাংলা ব্লগে লিখে থাকেন। তার কিছু প্রবন্ধ মুক্তান্বেষা সহ বাংলাদেশের অন্যান্য লিটল ম্যাগাজিনেও প্রকাশিত হয়েছে।

দশম অধ্যায় : অন্যান্য ৯৫৪ *[ক্লিক করুন]*

- সৃষ্টিতত্ত্বের গালগপ্প বনাম বিবর্তনের শিক্ষা : *মেহুল কামদার (তানবীরা তালুকদার)* ৯৫৫ *[ক্লিক করুন]*
- স্বজ্ঞা- সংঘাত ও সমন্বয়ের উর্ধ্বে : *দীপেন ভট্টাচার্য* ৯৬১ *[ক্লিক করুন]*
- মানব প্রকৃতি কি জন্মগত নাকি পরিবেশগত? : *অপার্থিব* ৯৭৪ *[ক্লিক করুন]*
- সমকামিতা (সমপ্রেম) কি প্রকৃতিবিরুদ্ধ? : *অভিজিৎ রায়* ৯৮০ *[ক্লিক করুন]*
- সমকামিতা সম্পর্কিত কিছু ব্যক্তিগত মতামত : *স্নিগ্ধা আলী* ৯৯৬ *[ক্লিক করুন]*
- জুলিয়েটের জন্য : *রিচার্ড ডকিন্স (অগ্নি অধিরূঢ়)* ৯৯৮ *[ক্লিক করুন]*
- আত্মঘাতী কুসংস্কার : *প্রদীপ দেব* ১০০৫ *[ক্লিক করুন]*
- মহাশূন্যে শিবলিংগ : *নৃপেন্দ্র নাথ সরকার* ১০০৯ *[ক্লিক করুন]*
- সর্বগ্রাসী অপবাদ বনাম একজন আরজ আলী মাতুব্বর : *রণদীপম বসু* ১০১৬ *[ক্লিক করুন]*
- আমার স্বর্গ এখানে : *মীজান রহমান* ১০২৭ *[ক্লিক করুন]*

সৃষ্টিতত্ত্বের গালগপ্প বনাম বিবর্তনের শিক্ষা

মেহুল কামদার
অনুবাদ: তানবীরা তালুকদার

অনেক অনেক বছর আগে ভারতে আমার ছোট্টবেলার এক ঘটনা। আমি তখন আমার দাদাবাড়িতে। খুব কষ্ট করে আমার দাদা বাড়ি তথা তার চশমার শোরুম-এর ছাদে উঠেছিলাম। এমনি এমনি ছাদে উঠিনি, মনে ধান্দা ছিলো একটা। ভাবছিলাম, সেদিনের ইতিহাস ক্লাশে পড়ানো আর্কিমিডিসের একটা পরীক্ষা হাতে নাতে করা যায় কিনা। আসলে স্কুলের স্যার সেদিন আমাদেরকে আর্কিমিডিস কিভাবে সূর্যরশ্মির সাহায্যে "পার্শিয়ান নৌযান পুড়িয়ে" দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে পড়িয়েছিলেন। আর বলেছিলেন আমরা নিজেরাই চশমার কাচ ব্যবহার করে একই পদ্ধতিতে ছোট কাগজ পোড়াতে পারব। আমি দোকানে রাখা বিশাল বাক্স থেকে খুজে পেতে দশ ডাইঅপ্টারের একটি কাঁচ বের করে নিলাম এবং সেটা নিয়ে মাদ্রাজের তীব্র রোদ উপেক্ষা করে বাইরে চলে এলাম হাতে একটা শক্ত কাগজ নিয়ে। তখনও আমি স্কুলের পোষাক পাল্টাইনি, আমি প্রচন্ড মনোযোগ দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম কাঁচের ভেতর দিয়ে সূর্যরশ্মিকে কাঁচের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীভূত করে কাগজটাকে পুড়িয়ে দিতে। কিছুটা সময় অপেক্ষার পর আমি দেখতে পেলাম, কাগজের মাথায় যেখানে আলো পড়েছিল সেখানটায় একটা কালো দাগ পড়েছে, এবং একটা মৃদু ধোঁয়ার কুন্ডলী উঠছে। আলোক রশ্মির দ্বারা কাগজটা পুড়েছে। এটা আমার জন্য একটি দম বন্ধ করা মুহূর্ত - আমি কাচের ভেতরের রশ্মির সাহায্যে আস্তে আস্তে বোর্ডের উপড় আমার নাম লেখার চেষ্টা করছিলাম, প্রথম তিনটা অক্ষর লেখা হতেই আমি আনন্দে আমার হাতের কাপুনি এবং আমার উত্তেজনা টের পেতে লাগলাম। ঠিক সেসময় আমার মা আমাকে ছাদের লাগোয়া রান্নাঘর থেকে ডাক পাড়লেন, "মেহুল, তুমি এই রোদের মধ্যে ছাদে বসে কি করছ"? আমি মায়ের দিকে না তাকিয়েই সানন্দে চিৎকার উত্তর দিলাম, "আমি কাঁচ দিয়ে সূর্যের আলো দিয়ে কাগজে আমার নাম লিখছি"। আমি কিছু বুঝে উঠার আগেই মা দৌড়ে এসে খপ করে আমার হাত থেকে সব কেড়ে নিলেন। আমি হতভম্ব চোখে তাকিয়ে মাত্র জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম আমি কি কিছু ভুল করেছি, ঠিক তখনই আমার গালে কষে একটা চড় পড়ল। চড়ের সাথে বলা মায়ের কথাগুলোও এখনও আমার মনে আছে, যদিও গুজরাটি থেকে অনুবাদ করলে ভাষাটা অনেকটাই তার মাধুর্য্য হারাবে। তিনি আমাকে বললেন, "সূর্য দেবতা রেগে যাবেন", আম সজল নেত্রে মাকে বল্লাম, সূর্য রশ্মি ব্যবহার করলে সূর্যদেব যদি রেগেই যেতেন তাহলে তিনি পার্শিদের বিরুদ্ধে গ্রীকদের যুদ্ধে তাদেরকে জেতার জন্য রশ্মি দিয়ে সাহায্য করতেন না। প্রায় সাথে সাথেই আর একটি চড় অবধারিত ভাবে গালে নেমে এলো। আমি বুঝতে পারলাম ধর্মীয় অতিকথা নিয়ে প্রশ্ন করা বিপদজনক - যা আমি সেই কিশোর বয়সে বুঝেছি অনেকেই তা হয়ত তাদের জীবন দিয়ে শিখেছেন।

তারপরও ধর্মকথা আমাকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করে। মায়ের কাছে প্রত্যকে বার চড় খাওয়া মানেই ভারতের সংস্কৃতিতে দাদীর কাছে প্রত্যেকবার আদর পাওয়া। আমাদের দাদী যখন আমরা ছোট ছিলাম তখন আমাদেরকে

গান গেয়ে ভোলাতেন আর যখন বড় হলাম তখন গল্প বলে ভোলাতেন। দাদীর বিশাল গল্পের ভান্ডারে আমাদের প্রত্যেকেরই পছন্দের আলাদা গল্প ছিল, এবং দাদী খুব খুশি মনেই সে সব গল্প আমাদেরকে বারবার শুনিয়ে যেতেন। দাদীর গল্প আমাকে এতোটাই মুগ্ধ করেছিল যে অনেক অনেক বছর পড়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য পড়তে আগ্রহী হই। যাক সেটা অন্য আর একটি গল্প। কিন্তু যখন মুক্তমনাতে ডারউইন ডে'র উপর লেখা দেয়ার জন্য সবাইকে আমন্ত্রন জানানো হলো, আমি অতি সহজেই সেটিকে এড়িয়ে যেতে পারতাম এই ভেবে যে এই বিষয়ের উপরতো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমি পড়িনি। যে এ্যামেরিকায় বাস করে অতীতে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের মধ্যে ধর্মের রূপকথাকে কেন্দ্র করে (যাদের অধুনা অবতার হলো "Intelligent Design" বা 'সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প') স্মরন রাখার মতো যুদ্ধের কথা জেনেছি, এবং তাদের সে যুদ্ধ এখনো নানাভাবে দেখছি, বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির আলোকে এই সৃষ্টিতত্ত্বের উপকথাগুলো নিয়ে আলোচনা করাটা আমার জন্য বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বিভিন্ন দেশের শত শত উপকথার নানা রকম তথ্য দিয়ে শত শত ওয়েব সাইট তৈরী হয়েছে। যেমন আশা করা যায় কেউ কেউ আছেন ধর্মের গল্প গুলো শুধু শুনেছেন এবং সেই শোনা গল্পগুলোই মানব জাতীর জন্য লিখে ফেলেছেন, আবার কারো কারো কাছে হয়তো এই গল্পগুলো শুধুই উপভোগ্য কল্পিত গল্প মাত্র, বিভিন্ন যুগের গল্প গুলোকে এক সাথে জোড়া দিলে মানুষের চিন্তা ভাবনার বিকাশের স্তরগুলো পাওয়া যায়। তাদের কথানুযায়ী ধর্মের উপকথা থেকে মূল বক্তব্য নেয়া প্রয়োজনীয় বলে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এমন কোন আজগুবী ওয়েব সাইট থেকে গল্প নেবো যারা এই গল্পগুলোকে সত্যি বলে প্রমান করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। কোন নিরশ্বরবাদী কিংবা স্বাধীন চিন্তা ভাবনার ওয়েব সাইট থেকে যদি তথ্য সংগ্রহ করি তাহলে হয়তো তাদের তথ্যে লেখায় আমার নিজস্ব চিন্তা ভাবনার ছাপ পড়ে যেতে পারে। আর যে ওয়েব সাইট গুলো বিশ্বাস করে যে এই গল্প গুলো ভবিষ্যতের কোন একটি বিরাট ইঙ্গিত বহন করছে তারা অনেক রঙ চঙ দিয়ে সেই গুলোকে বিস্তারিত ভাবে পরিবেশন করেছে।

ইহুদী-খ্রীষ্টানদের মিথ দিয়েই শুরু করি। বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের মতবাদের সাথে প্রথমেই যাদের মতবাদের সরাসরি দ্বন্দ্ব - তারা হলেন মূসা- খ্রীষ্টের অনুসারীরা। বাইবেলের সৃষ্টি তত্ত্বের জেনেসিস অধ্যায়টি মনোযোগ দিয়ে পড়লে এটি খুব সহজেই বোঝা যায় -

শুরুতেই স্রষ্টা প্রথমে স্বর্গ তৈরী করেছেন আর পৃথিবী। পৃথিবী তখন ছিল আকারহীন এবং অকার্যকর একটা জায়গা। এর মুখায়ব ছিল অন্ধকারে ঢাকা। স্রষ্টার চিন্তা তখন পানির দিকে ঘুরল। স্রষ্টা তখন বললেন, আলো হোক, জগত আলোয় ভরে উঠল। স্রষ্টা আলো দেখে মুগ্ধ হলেন, তিনি অতঃপর আলোকে অন্ধকার থেকে আলাদা করলেন। আলোকে স্রষ্টা নাম দিলেন দিবা আর অন্ধকারকে নাম দিলেন রাত্রি। আর সন্ধ্যা এবং সকাল হলো দিনের প্রথম সূচনা। তারপর তিনি বললেন সমুদ্রের ঠিক মাঝখানে একটি মহাকাশ তৈরী হোক, এবং এরপর পানি পানি থেকে পৃথক হোক। এরপর তিনি মহাকাশ তৈরী করেন, তারপর তিনি মহাকাশের উপরের পানি থেকে নীচের পানি আলাদা করেন। এবং এভাবেই এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে।

অ্যাপাচি রূপকথার সাথে এই রূপকথার গল্পের পার্থক্য কতো :

শুরুতে কিছুই ছিল না, না পৃথিবী, না আকাশ, না চাদ, না সূর্য, শুধুই অন্ধকার ছিল চারিধারে। হঠাৎ করে অন্ধকার থেকে একটি হালকা গোলাকার সমতল একটা চাকতি বেরিয়ে আসল, যার এক পাশ হলুদ আর অন্যপাশ সাদা, মধ্যকাশে ঝুলন্ত অবস্থায় এটিকে দেখা গেলো। সেই পাতলা গোলাকার চাকতির মধ্যে একজন শুভ্র সফেত পোষাক পড়া দাড়িওয়ালা স্রষ্টা বসে আছেন । যেনো এইমাত্র তিনি লম্বা ঘুম থেকে দুইহাতে চোখ মুখ কচলে উঠে বসলেন।

যখন তিনি অসীম অন্ধকারের দিকে তাকালেন, উপড়ে আলো জ্বলে উঠল। তিনি নীচের দিকে তাকালেন সেখানেও আলোর সমুদ্র তৈরী হলো। পূর্ব দিকে তিনি অত্যন্ত দ্রুত উজ্জল হলুদাভ প্রত্যুষ তৈরী করলেন। পশ্চিম দিকের চারপাশ জুড়ে ছড়িয়ে দিলেন অনেক রঙের আনাগোনা। নানা রঙের মেঘও ছিল অবশ্য।

আর কারা এসব রুপকথায় বিশ্বাস করে বলে আপনি ভাবছেন :

লক্ষ্য লক্ষ্য অগনিত বছর ধরে যে অন্ধকার ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, যখন স্বর্গ - মত্য কিছুই ছিল না, শুধু ছিল সীমাহীন স্বর্গীয় বিধি বিধান। তখন দিন আর রাত ছিল না, সূর্য বা চাদ ছিল না। যেনো স্রষ্টা সীমাহীন এক অতল নিদ্রায় তলিয়ে ছিলেন। সৃষ্টির কোন সংজ্ঞা ছিল না, কোন বানী ছিল না, আলো - বাতাস কিছুই ছিল না। জন্ম, মৃত্যু বা পরকালের জীবনের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কোন মহাদেশ, কোন অঞ্চল, কোন বহতা নদী বা সাত সমুদ্রের সীমারেখা ছিল না। ইহকাল - পরকাল, স্বর্গ - মর্ত্য, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সময়ের কোন কিছুরই কোন অস্তিত্ব ছিল না। জন্ম - মৃত্যু তখন আসেওনি, ফিরেও যায় নি।

(এটা শিখ সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে নেওয়া হয়েছে)

সারা বিশ্ব জুড়ে আমাদের পূর্ব পুরুষদের করা আপ্রান চেষ্টা থেকে এটা স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে, জীবনের সৃষ্টি কিংবা এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি কি করে হলো সেটা বুঝতে এবং জানতে তারাও খুবই আগ্রহী ছিলেন এবং এ নিয়ে তারা বিস্তর চিন্তা ভাবনাও করেছেন। আদিম যুগের মানুষেরা বিজ্ঞান কিংবা শিক্ষার জ্ঞান ছাড়া বাধাহীন কল্পনা শক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আশে পাশের পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে যা তাদের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হতো তারা সেভাবেই তার একটা ব্যাখা দাড় করাতো। যখন তারা মাটির ঘরে বসবাস করতো, পশু দিয়ে টানা বাহন ব্যবহার করতো, সেই সময়ের মানুষদের পক্ষে আজকে আমাদের কাছে যা খুবই নৈমিত্তিক বা সহজ কাজ তা তাদের কল্পনায়ও অসাধ্য ঘটনা ছিল। পাখির মত উড়ে বেড়ানো নিয়ে মানুষেরা কল্পণাপ্রবন ছিল প্রথম থেকেই- আদিম মানুষদের কল্পনায় প্রথমে উড়ন্ত দেবতা তৈরী হতো তারপর তাদের উপকথায় প্রবশ করত তাকে উড়ানোর কৌশলগত রঙ বেরঙ-এর গল্প । বর্বর যুগে নানা জরা ব্যাধি এবং যুদ্ধ বিগ্রহের কারনে মানুষের জীবন স্বল্পস্থায়ী

হতো, প্রতি দিনের জীবন যুদ্ধের যন্ত্রনাগুলো ভুলে থাকার উপায় ছিল পরকালের সুখ শান্তির গল্প শোনা। এবং যখন এই প্রশ্নটি আসতো কিভাবে মানুষের এবং অন্যান্য প্রানীর সৃষ্টি হলো তখন মানুষের একজন স্বর্গীয় সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি করতে হতো যিনি এই বিদ্যমান সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিকর্তার স্বরূপ কিরকম হবে এতো দূর মানুষ কল্পনা করতে পারেনি তাই সে তার নিজের পছন্দের সৃষ্টিকর্তার অবয়ব তৈরী করে নিয়েছে। আরবীয় ধর্মগুলোতে পরিস্কারভাবে সৃষ্টিকর্তার অবয়বের ইঙ্গিত আছে, যেখানে হিন্দু ধর্ম, প্রাচীন মিশরীয় ধর্ম, গ্রীস এবং রোমের ধর্মগুলো এতো প্রাঞ্জলভাবে এনিয়ে কিছু বলেনি, কিন্তু আছে তাদের পরিপূর্ন নিজস্ব আদলে যুদ্ধরত রাজার মতো দেবতা, আদালতের গল্পসহ পৌরনিক কাহিনী, উপপত্নী, ক্রীতদাস, বিদূষক এবং তাদের সময়ে মানুষকে শোষন করার অন্যান্য সকল ফাকিবাজী গল্প।

এইসব পৌরনিক গল্পগুলোতে পরিবর্তন আসতে অনেক সময় লেগেছে, ঐশীগ্রন্থ গুলো পরিবর্তন হতে পারেনি কারন তাদের ধর্মে পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই। তাদেরকে পরিপূর্ন বলে ধরে নেয়া হয় সেখানে কোন প্রশ্ন করার এমনকি কিছু কিছু জায়গায় ভাষার ব্যাখা নিয়েও কথা বলার সুযোগ নেই, আগের শতাব্দীগুলো থেকে এ ধরনের বেশ কয়েকটি উৎপথগামী ঘটনার কথা জানা যায়। আর এখন, মানুষের জ্ঞানের উৎকর্ষতা সীমাহীন। বিজ্ঞানী জেমস হাটনের ভূতাত্ত্বিক গবেষনা এবং চার্লস ডারউইনের বিবর্তনের উপর গবেষনা শীঘ্রই সবাইকে যথাযথ বিবরনের সাথে জানাবে, কিভাবে প্রথমে জীবনের উদ্ভব হলো এবং তাদের নিখূত গবেষনার সেই পদ্ধতি যার দ্বারা বিজ্ঞানীরা সমস্ত ঘটনাগুলোকে এক সাথে যৌক্তিকভাবে সারিবদ্ধ করে সবার সামনে আনেন, যদিও তারা ধর্মের লোকজনের কারনে আতংকিত থাকেন, বিশেষ করে গীর্জার অনুসারীদের দ্বারা। ইশ্বর তার কল্পনা থেকে মানুষের সৃষ্টি করেননি, বরং মানুষ পৃথিবীতে এসেছে বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় - এ ধরনের সত্য কথায় চার্চের গুরুত্ব কমে যায়। যারা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্রীতদাস বানিয়ে রেখে শোসন করে চলেছে যুগ যুগ ধরে আর জোর করে পয়সা কড়ি হাটিয়ে নিচ্ছে - মানুষের কাছে তাদের আসল রুপও প্রকাশ পেয়ে যায়। মোটামুটি পরিস্কার করেই, এরা জনগনকে বোঝায় যে ধর্ম বইতে যা লেখা আছে, তাই সত্য। পৃথিবীর বেশীরভাগ লোকই আগে ক্রিশ্চিয়ান বাইবেলের অনুসারী ছিলেন, তারা একটি বাস্তব দৃষ্টিকোন থেকে সকলেই ভুল ছিলেন। অনেক আগে ক্রিশ্চিয়ান সমাজ বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে তার সৌরজগত সম্পর্কে দেয়া মতামত প্রত্যাহার করার জন্য জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু পরে ইংল্যান্ড রোম, স্পেনকে এ নিয়ে প্রকাশ্যে বিতর্কের আহ্ববান জানিয়েছে এবং পরে ফ্রান্সকে বাধ্য করেছে নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে সমাধান হিসেবে নিতে, তখন কোন চার্চের সাহস হয়নি এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করতে। তবে এক্কেবারে প্রথম দিকে, ইংল্যান্ডের সরকারী প্রটেষ্টান্ট চার্চ এর তরফ থেকে বাধা দেয়ার জন্য প্রচন্ড চেষ্টা করা হয়েছিল, বিশপ্ স্যাম উইলবিফোর্স চেষ্টা করেছিল ডারউইনের এবং তার অনুসারী বিজ্ঞানীদেরকে টমাস হাক্সলি'র মুখোমুখী করতে , যেখানে হাক্সলিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সে কি উত্তরাধিকার সুত্রে তার মায়ের বংশের নাকি বাবার বংশের বানরকুল থেকে জন্মগ্রহন করেছে। হাক্সলের জবাব ছিল খুবই নেতিবাচক, তিনি বললেন, আমি এমন একজন শিক্ষিত ব্যক্তি যিনি তার প্রাকৃতিক শক্তি, বাগপটুতাকে, পক্ষপাতদুষ্ট, মিথ্যাকথন এর কাজে ব্যবহার করে তার ঔরসথেকে জন্ম নেয়ার পরিবর্তে বরং একটি শিম্পাঞ্জী থেকে জন্মগ্রহন করতে পছন্দ করব। সেই সময়ের সংবাদপত্রগুলো এ নিয়ে বিশাল বিশাল কার্টুন ছাপে সে সময় এই বলে যে, হাক্সলি বলেছেন, তিনি বিশপ হয়ে জন্ম নেয়ার পরিবর্তে একটি শিম্পাঞ্জী হয়ে জন্মগ্রহন করতে চেয়েছিলেন। এরপর আর কোন চার্চ বিবর্তনবাদীদের বিরক্ত করার কোন স্পর্ধা

দেখায়নি। তারা বরং বিবর্তনবাদকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য অনেক ধরনের প্যাচানো ঘোরালো পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। প্রথমে তারা, মৃত্যুশয্যায় ডারউইনের ক্রিশ্চিয়ান হয়ে যাওয়ার মিথ্যে গুজব রটিয়েছেন, তারপর তারা বিবর্তনবাদ পড়ানোর উপরে বিভিন্নভাবে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের চেষ্টা চালিয়েছেন, এবং অবশেষে তারা পরিপূর্ন প্রতারনামূলক ধর্ম তত্ব "ইন্টিলেজেন্স ডিজাইন" নিয়ে এসেছেন, এবং আবারো চেষ্টা চালাচ্ছেন এ্যামেরিকার উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে বিবর্তনবাদের পরিবর্তে এটিকে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে পড়ানোর জন্য। এবং কিছু কিছু আরব দেশ সহ বিভিন্ন জায়গায় বিবর্তনবাদ পড়ানো বন্ধ করার ব্যাপারে চার্চগুলো সফলও হয়েছে বিশেষ করে আরবের উপসাগরের পরামর্শ দাতা দেশগুলো তাদের দেশের স্কুলগুলোতে বিবর্তনবাদ পড়ানো নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

যদিও শেষ পোপ দ্বিতীয় জন পল স্বীকার করেছেন যে, বিবর্তনবাদ ছিল বিজ্ঞানের সঠিক তত্ব, এবং তার উত্তরসূরী বেনডিক্ট তার সাথে একমত, তারপরো দুজনে মিলে সৃষ্টি তত্বের গল্পের "নৈতিকতা" প্রচার করে বিরাট হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন চারধারে। যেনো লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর হওয়া অত্যাচারের ইতিহাস, অতীতে চলা গীর্জার স্বৈরতন্ত্র বাইবেলের ব্যখ্যা যার পর নাই 'নৈতিক', আর অন্যদিকে জীববিজ্ঞানীদের সতর্ক এবং শ্রমসাধ্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, যারা ডারউইনের বিবর্তনের তত্বকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরো গবেষনা করে চলছেন এবং মুল উৎসের দিকে ক্রমস ধাবিত হয়ে অন্তিম রহস্যের সমাধানের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন - তাদের সবকিছুই কোন না কোনভাবে অনৈতিক। যেনো বিজ্ঞানের বাস্তব শিক্ষা, কিংবা বিবর্তনবাদ সত্য হলেও বাইবেল ছাড়া কোন না কোনভাবে "অনৈতিক"। এই হলো পরোক্ষ ভাবে বিবর্তনবাদকে গ্রহন করার সেই নমুনা যেখানে তারা সারাক্ষন বোঝাতে চাইছেন বিবর্তনবাদকে ধর্মের সাথে মিশিয়ে পড়াতে হবে, রাজনৈতিকভাবে এদেরকে দুমুখো সাপ বলা ই বোধ হয় সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত হবে।

ধর্মের যুক্তিনুসারে এদের কথাগুলো প্রশ্নের অতীত, এর বিরুদ্ধে যেকোন ধরনের সমালোচনা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বেশীরভাগ ঐশী গ্রন্থগুলোতেই যারা এর বিরুদ্ধাচারণ করবে তাদেরকে ভয়ানক হুশিয়ারী দেয়া আছে, প্রায়শই দেখা যায় ধার্মিকগন এসব কল্পকাহিনীতে এতোটাই জড়িয়ে যান যে যারা তাদের এই মৌলবাদী মতের সাথে একমত পোষন করে না, তাদেরকে খুন, অত্যাচার এমনকি পঙ্গু করে দিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। যেসব পরিস্থিতিতে তারা এধরনের কিছু করতে অপারগ হয়, যেমন এ্যামেরিকার কিছু উচ্চ শিক্ষিত ভদ্র এলাকায় সেখানে তারা আইনের আশ্রয় নিয়ে আইনের মুগুর দিয়ে বিজ্ঞানকে থামানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সত্যি হলো বিজ্ঞানের গবেষনা কোন স্থির হয়ে থাকা জড় বিষয় নয়, আর বিজ্ঞানীদেরকে তাদের গবেষনার পক্ষে যুক্তি প্রমান দাড় করাতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়, যেখান থেকে নতুন সম্ভাবনার উদয় হবে। বিজ্ঞানীদের শিক্ষা, গবেষনা ও তথ্যের প্রতি যে উদ্দীপনা দেখা যায় ঠিক সেই রকম উদ্দীপনা মৌলবাদীদের মধ্যেও দেখা যায় লোককে বিশৃংখল, বিভ্রান্ত ও মিথ্যের দিকে নিয়ে যেতে। আমরা একটা চলমান এলোপাতাড়ি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছি এই তথ্যটি জানার পর পৃথিবীর প্রতি আমাদের দ্বায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। দীর্ঘ জৈব-রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়ার ফলে এক সময় প্রানের সৃষ্টি হয়েছে। যে কোন ধরনের অবিমৃশ্যকারীতা আবার এটাকে শেষও করে দিতে পারে। বিবর্তনের এই জ্ঞানই আমাদেরকে পৃথিবী, পরিবেশ কিংবা জীবনকে সম্মান করতে শিখায়। বিজ্ঞানীদের কিংবা

মানবতাবাদীদের পরকালের নরকের ভয়ে কিংবা স্বর্গলাভের আশায় "নৈতিক" জীবন যাপনের দরকার নেই। যেহেতু কোন সৃষ্টিকর্তাই নেই, তাই সাধারন মানুষের নৈতিক জীবন যাপনের ভার তার নিজের উপর। স্বর্গ বলতে যেহেতু কিছু নেই, তাই জীবনের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য আনন্দ উচ্ছাসে জীবন ভরিয়ে তোলার খুবই দরকার আছে, এবং যখন আমরা জানব কিভাবে আমরা এই সুন্দর জীবন পেয়েছি সেটাকে আরো বেশী করে উপভোগ করব। ডারউইন দিবস সেই জন্যই সমস্ত পৃথিবী জুড়ে উৎসব করার মতো একটি সেক্যুলার দিবস কারন এই দিনের মাধ্যমেই সমস্ত কুসংস্কার, বর্বরতা এবং মাথার উপর জোর করে চেপে থাকা অজ্ঞতার অবসান জানানো হয়েছে।

মেহুল কামদার : ভারতের তামিলনাড়ুর অধিবাসী। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিকাগো শহরবাসী। মুক্তমনা ফোরামের সহ মডারেটর এবং প্রয়াত এম. ডি. গোপাল কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত 'মডার্ন র্যাশনালিস্ট' পত্রিকার সম্পাদক। ভারতে থাকাকালীন অনেক যুক্তিবাদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ইমেইল- mehulkamder@yahoo.com

তানবীরা তালুকদার, লেখক এবং নৃত্যশিল্পী। নেদারল্যান্ডস-এ বসবাসরত মুক্তমনার কো মডারেটর। অনেকদিন ধরেই ইন্টারনেট-এ লিখছেন। বেশ কিছু প্রবন্ধ দেশের দৈনিক পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছে। ইমেইল - tanbira.talukder@gmail.com

স্বজ্ঞা: সংঘাত ও সমন্বয়ের উর্ধ্বে

দীপেন ভট্টাচার্য

১. আত্মহত্যার সমস্যা

খ্যাতনামা ফরাসি লেখক ও দার্শনিক অ্যালবার কাম্যু তাঁর "সিসিফাসের কিংবদন্তি" (The Myth of Sisyphus) বইতে লিখেছেন মানুষের সবচেয়ে বড় দার্শনিক সমস্যা হচ্ছে আত্মহত্যা। কাম্যু লিখেছেন, মানুষ সব সময় তার জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্যের সন্ধান করে, কিন্তু অচেতন পৃথিবী ও মহাবিশ্ব মানুষকে সেই উদ্দেশ্যে পৌঁছতে দেয় না, জীবনের অভিযানের অন্তর্নিহিত কোন স্বচ্ছতা ধরতে দেয় না। এর ফলে সৃষ্টি হয় এক ধরণের অর্থহীনতা, কাম্যু যাকে বলেছেন absurd ।

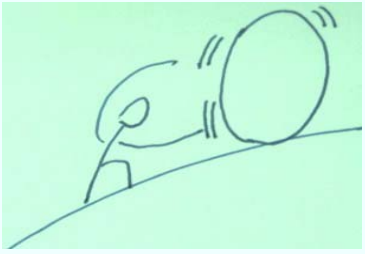

চিত্র ১: সিসিফাসের চিরায়ত ও অর্থহীন শ্রম

মৃত্যুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাতে গ্রীসের দেবতারা সিসিফাসকে পাহাড়ের ওপর একটা বিশাল পাথর উত্তোলন করার আদেশ দেয়, কিন্তু পাহাড়ের চুড়ায় পাথরটি ওঠানো মাত্র সেটি গড়িয়ে নিচে নেমে যায়। সিসিফাসকে নিচে নেমে আসতে হয়, পাথরকে আবার পাহাড়ের ওপর ওঠাতে হয়, পাথর আবার নিচে নেমে আসে। এই ভাবে চলে অসীম সময় পর্যন্ত, এই হল সিসিফাসের ওপর দেবতার অভিশাপ। মানব জীবনকে সিসিফাসের absurd কাজের সাথে তুলনা করা চলে, ঈশ্বরহীন পৃথিবীতে জীবনের আপাত: অর্থহীনতা সম্বন্ধে যারা চিন্তা করে তাদেরকে এই absurd আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিতে পারে। মৃত্যু দিয়ে যদি জীবনের সীমানা নির্ধারিত হয়, তবে চিন্তা, চেতনা ও যুক্তির সঙ্গে তার সংঘাত অনিবার্য, সেই ক্ষেত্রে নিজের জীবনের অবসান পৃথিবীর দৈন্যতা থেকে মুক্তির পথ বলে ভাবা যেতে পারে। কিন্তু কাম্যু বলছেন মানুষকে এই দ্বন্দ্বকে মেনে নিতে হবে, স্বীকার করে নিতে হবে জীবনের সীমাবদ্ধতা ও অর্থহীনতা। ত্যাগ করতে হবে সমস্ত আশা। আশা-আকাঙ্ক্ষার বোঝা যখন মানুষ ঘাড় থেকে নামাতে পারবে, তখনি নিজেকে সে স্বাধীন বা মুক্ত বলে ভাবতে পারবে। কাম্যুর জগতে এই প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে "বিদ্রোহ"– জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

অনেকে বলতে পারেন আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে কাম্যুর বিদ্রোহ এক ধরণের রোমান্টিক ভাবনা। যে মহাবিশ্ব মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ধার ধারে না, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কি লাভ?

মানব জাতি এই সমস্যার সমাধান হয়তো করতে পারেনি, কিন্তু আমরা জানি সাধারণতঃ মানুষ আত্মহত্যা করে না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য[১] অনুযায়ী আত্মহত্যার সংখ্যা বছরে এক হাজার থেকে দশ হাজার জনে এক জন বা তারও কম। দেশ অনুযায়ী এই সংখ্যার তারতম্য আছে, পুরুষরা মহিলাদের থেকে বেশি আত্মহত্যা করে থাকে এবং বয়সের সাথে আত্মহত্যার সম্পর্ক আছে । বেশির ভাগ মানুষই অস্তিত্বের সীমাবদ্ধতা মেনে নেয়, তারা নিজের জীবনের সব সম্পর্ক (পরিবার, সমাজ ও প্রকৃতি) নিয়ে এক ধরনের অর্থ গড়ে তোলে, আর সেই "নিজেকে বিশ্বাস করানো" অর্থের মাঝে তারা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিমজ্জিত করে সুখের সন্ধান করে।

কয়েকশো কোটি বছরের প্রাকৃতিক বিবর্তন আজকের এই ভারসাম্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যা আমাদের বেঁচে থাকার সমস্ত উপকরণ যোগাচ্ছে ও পৃথিবীতে মানব প্রজাতির নিরবিচ্ছিন্ন অস্তিত্বকে নিশ্চিত করছে। প্রকৃতিই নির্ধারণ করে দেয় সমাজের মধ্যে আমরা যে ন্যায়-নীতির বিচার প্রতিষ্ঠা করি, আর মানুষের প্রকৃতি ক্রমাগত সেই ন্যায়-নীতিকে বির্বতন করছে । পৃথিবীর বুকে মানুষ প্রজাতি এক লক্ষ বছরের ওপর বাস করছে, এক ধরনের মজ্জাগত সহযোগিতা বোধ না থাকলে মানুষ এতো দিন পৃথিবীর বুকে থাকতো না ।

আমার মনে হয় এমন কি যে সব মানুষ যারা মনে করে ন্যায়-নীতি ঈশ্বর প্রদত্ত লিপির মধ্যে লুকানো, তারা নিজেদের চারপাশের পরিস্থিতি অনুযায়ী এক ধরনের অস্থায়ী "কাজ চলে যায়" গোছের বিচার বোধ সৃষ্টি করে। খুব হালকা ভাবে দেখলে - আমরা সাধারণতঃ মিথ্যে কথা বলি না কারণ আমরা জানি যদি সবাই মিথ্যে বলে তার পরিণাম কি হতে পারে, আমরা সাধারণতঃ অন্য একটি মানুষকে হত্যা করি না কারণ আমরা জানি সবাই হত্যাকারী হলে সমাজ অস্থিত হয়ে পড়বে, তাতে একক হত্যাকারীরও বাঁচার সম্ভবনা থাকবে না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আনুমানিক ১৮৫০ সাল নাগাদ অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষায়, "আমারদিগের ন্যায়পরতা ও উপচিকীর্ষা বৃত্তির বৈলক্ষণ না হইলে প্রতারণা ও মনুষ্য-বধে অর্ন্তকরণ প্রফুল্ল হয় না"[২]। তাই সমস্ত সমাজতত্ত্বের শুরু জীববিদ্যায়।

২. জীববিজ্ঞান

জীববিজ্ঞান আমাদের মস্তিষ্কের গঠন নির্ধারণ করে দেয় । এটা মনে করা একেবারে অযৌক্তিক হবে না যে অলৌকিক চিন্তার অভ্যুদয় হয়েছে আমাদের বিবর্তিত মস্তিষ্কের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে। নৃতত্ত্ববিদ বারবারা কিং এর মনে করেন ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক চেতনার উদ্ভব হয়েছে মানুষ আবির্ভাবের সঙ্গে - কয়েক লক্ষ বছর আগে[৩]। মস্তিষ্ক বিজ্ঞানী ভিলানোর রামাচান্দ্রান Phantoms in the Brain বইতে[৪] এই প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু কৌতূহলোদ্দীপক গবেষণার উল্লেখ করেছেন। রামাচন্দ্রানের মতে ঈশ্বর সংক্রান্ত যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি, বস্তু জগতকে অতিপ্রাকৃত অর্থ আরোপ করা, বা যে কোনো সিন্ধান্ত সম্পর্কে আমাদের নিশ্চয়তা তা সবই আসছে মস্তিষ্কের টেমপোরাল লোব (temporal lobe) - মস্তিষ্কের ডান ও বাঁ দিক - থেকে । তিনি আরও লিখেছেন, "এমনটা কি হতে পারে যে বিবর্তনের ফলে মানব প্রজাতি তাঁর মস্তিষ্কে এক বিশেষ ধরনের নিউরাল সার্কিট সৃষ্টি করেছে যা কিনা ধর্মীয় অনুভূতির উদ্ভব করে? অতি-প্রাকৃতের ওপর মানুষের বিশ্বাস সারা পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে এমনভাবেই প্রোথিত যে মনে হতে পারে সাধারণ জীববিদ্যাই হচ্ছে এই ধরনের আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের ভিত্তি ভূমি।"

মানুষ তাঁর জীবনের অর্থ খুঁজতে গিয়ে হয়তো নিজের মাথায় সৃষ্টি করেছে এমন একটা বলয় যা কিনা তাকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী করেছে, ডারউইনীয় অভিব্যক্তিবাদী তত্ত্বের আলোকে বলা যায় এই বলয় বা নিউরাল

সার্কিট মানুষকে প্রাকৃতিক ও মানসিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বাঁচতে সাহায্য করেছে। এই বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কিছু মতান্তর থাকলেও এটা মোটামুটি স্বীকৃত যে টেমপোরাল লোবের ক্ষত থেকে যে এপিলেপসি বা মৃগী রোগ হয় তা রোগীদের মহাবিশ্বকে ভিন্ন রূপে দেখায়। কানাডীয় মনস্ততঃবিদ মাইকেল পারসিংগার[৫] যে গবেষণা করেছেন তা প্রমাণ করেছে যে এই ধরনের রোগীরা তাদের মাঝে হঠাৎ হঠাৎ ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করে, তাদের কাছে এই উপস্থিতি একেবারে বাস্তব, শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক নয় । যেহেতু তারা এই আবির্ভাবের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত সেহেতু তাদের জীবনে এই অভিজ্ঞতা এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে । অনেকে মনে করে তাদের জীবনের দায়িত্ব হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করা। পারসিংগারের গবেষণা আরো দেখায় যে মৃগী রোগী নয় এমন লোকেরও টেমপোরাল লোবে জোরাল তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্র বিকিরিত করে এক ধরনের আধ্যাত্মিক অসীমতার ভাব সৃষ্টি করা সম্ভব[৬]।

অসীমতার বোধকে আমাদের স্বত্তাই সৃষ্টি করে, আবার সেই বোধকে আমাদের স্বত্তাই অনুধাবন করে। কিন্তু আমাদের স্বত্তা সৃষ্টি হয় কি ভাবে? কি ধরনের নিউরনের সংকেত আমাদের আমিত্ব, অহম বা "আত্মা" সৃষ্টি করে? যেই ইলেকট্রন স্রোত ধারা চেতনার সৃষ্টি করে, সেই চেতনা কি তার উৎস ধারাকে চিহ্নিত করতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর মস্তিষ্ক বিজ্ঞানীরা খুঁজছে।

৩. বাস্তবতা

মস্তিষ্কের এক অংশে (বা বিভিন্ন অংশে) সৃষ্ট চেতনা মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সাহায্যে মহাবিশ্বের বাস্ত বতা খুঁজতে চায়? এখানে আমাদের পরিবেশকে জানবার জন্যে গাঢ় দাগের কিছু প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করি। প্রথমে বলি শব্দের কথা। বাইরের থেকে আগত শব্দ তরঙ্গকে আমরা মস্তিষ্কের মাঝে শব্দ নামে অনুভূতিতে রূপান্তরিত করি (নৈর্ব্যক্তিক ভাব দেখলে "শব্দ" বলে কিছু নেই, এই প্রসঙ্গে পরে আসছি) , শুধু তাই নয় সেই শব্দ-অনুভূতিকে আমরা আবার বাইরের উৎসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি। যদি শেষোক্ত ক্রিয়াটি না ঘটতো তবে সমস্ত শব্দ ধ্বনি আমাদের মাথার মধ্যে থেকে যেতো, তাতে কোনো লাভ হতো না... আমাদের মস্তিষ্ক এক অর্থহীন শব্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে থাকত। এবার ধরা যাক আলোর কথা। বাইরের তথ্য বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ফোটন মাধ্যমে আপতিত হয় আমাদের চোখের রেটিনার ওপর। দৃশ্য সৃষ্টির স্নায়ুতন্ত্র ফোটনের সংকেত সঞ্চার করে মস্তিষ্কে, সেখানে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকে দেয়া হয় বিভিন্ন রঙ – লাল, সবুজ, হলুদ ইত্যাদি। প্রকৃতিতে কি এই রঙগুলো আছে ? নেই। বস্তুসমূহকে রঙ্গিন করে চিত্রিত করলে তাকে সহজে চিহ্নিত করা যায়, প্রকৃতির প্রতিযোগিতায় এই বৈশিষ্ট্যটির আবির্ভাব মানব প্রজাতির ক্রমান্বয়তা নিশ্চিত করেছে । কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক শুধুমাত্র বাইরের রঙ্গিন দৃশ্য-ই নির্মাণ করে না, সে দৃশ্যকে বহুমাত্রিক জ্যামিতিতে আরোপ করে এক আপাতঃদৃষ্টিতে ত্রিমাত্রিক জগৎ সৃষ্টি করে। তাই এক অন্ধ ও অন্ধকার মহাবিশ্বের বাস্তবতা নির্ধারণে মস্তিষ্কের "অনুবাদক" ভূমিকা অপরিহার্য। (অন্ধকার মানে কালো নয়, শুধুমাত্রা নিউরনের আচরণ দিয়ে রঙের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যাবে না, রঙের অনুভূতির প্রসঙ্গে পরে আসছি ।)

তবুও যে কোনো বস্তুর গঠন আমাদের দৃষ্টিতে তার সঠিক রূপে ধরা পড়ে না। আমাদের শরীর বা যে কোনো বস্তুর অন্তর্নিহিত গঠন মূলত ফাঁকা জায়গা। যে পরমাণু দিয়ে বস্তু সৃষ্টি সেই পরমাণুর অভ্যন্তর বা গঠন বলতে গেলে শূন্যস্থান দিয়েই পূর্ণ। আমরা যদি একটা পরমাণুর মডেল গড়তে চাই তাহলে পরমাণুর নিউক্লিয়াস হিসেবে একটা চা-এর কাপ ভাবা যেতে পারে, চায়ের কাপটা একটা বড় ফুটবল

স্টেডিয়াম-এর মাঝে রেখে দিলে স্টেডিয়ামের পরিধিটা হবে পরমাণুর পরিধি। এখন স্টেডিয়ামের মধ্যে কিছু মাছি ছেড়ে দিলে সেগুলোকে আমরা বলবো ইলেকট্রন। দেখা যাচ্ছে স্টেডিয়ামটা মূলতঃ শূন্যস্থান দিয়েই ভর্তি! আমাদের শরীর এই রকম ফাঁকা পরমাণু দিয়ে গঠিত। ফাঁকা পরমাণু দিয়ে গঠিত মানব দেহ, পিরামিড, তাজমহল, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য ও নক্ষত্ররা।

এই সমস্ত বস্তু যদি ফাঁকা জায়গা দিয়েই গঠিত হয়, তবে তাদেরকে কেন আমরা কঠিন ও অস্বচ্ছ হিসেবে দেখি? সূর্যের দৃশ্যমান আলো যখন আমাদের শরীরের ওপর পড়ে, তখন তা ত্বকের ওপরের পরমাণু (বা অণু) দ্বারা শোষিত হয়। এর কিছুক্ষণ পরে সেই শোষিত শক্তির কিছু অংশ ত্বক বিকিরণ করে। এই বিকিরণ চোখের মাধ্যমে মস্তিষ্ক অনুধাবন করে, আর বাকি শোষিত শক্তিটুকু ত্বকের মাঝে তাপ সৃষ্টি করে। যেহেতু দৃশ্যমান আলো ত্বকের প্রথম স্তরেই শোষিত হয়ে যায় সেহেতু আমাদের দেহের একটা অস্বচ্ছ রূপ আমরা দেখি।

আলো তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের থেকে ছোট জিনিসকে চিত্রায়িত করতে পারে না। যেহেতু অতিবেগুনী রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোকের থেকে কম তাই আমরা যদি অতিবেগুনী রশ্মিতে দেখতে পারতাম তাহলে আমাদের শরীরের অনেক সূক্ষ্ম গঠন প্রতিভাত হত। যদি আমরা এক্স-রেতে দেখতে পারতাম তাহলে আমাদের ত্বক বা মাংস অদৃশ্য হতো, হাড় বাদে আমাদের শরীর কাঁচের মতো স্বচ্ছ হয়ে যেতো। তখন তাই হতো বাস্তবতা।

সূর্যের বিকিরণ দৃশ্যমান আলোয় হয় সবচেয়ে বেশি যদিও সূর্য অতিবেগুনি ও অবলোহিত তরঙ্গেও বেশ পরিমাণ শক্তি বিকিরণ করে। স্তন্যপায়ী জন্তুরা কোটি কোটি বছর ধরে সূর্যের বিকিরণ অনুযায়ী বির্বতিত হয়েছে, তাদের চোখের স্নায়ুতন্ত্রী সূর্য থেকে আগত ফোটন সংখ্যা অনুযায়ী তার সংগ্রহ ক্ষমতাকে বাড়িয়েছে। এই কারণে আজ আমরা শুধুমাত্র দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গে মহাবিশ্বকে দেখি, বিশাল বাস্ত বতার খুব ছোট একটা অংশকে আমাদের সরাসরি বোধ দিয়ে অনুধাবন করি।

মহাবিশ্বকে সমগ্রভাবে বোঝার জন্য আমরা বিজ্ঞান চর্চা করছি, অন্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দেখতে পারে এমন যন্ত্র তৈরি করছি, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা দিয়ে পরমাণু ও অণুর গঠন বোঝার চেষ্টা করছি, দূরবীণ দিয়ে দৃশ্যমান মহাবিশ্বের শেষ প্রান্তের গ্যালাক্সি দেখছি, পুরাতন সময়ের ফসিল দিয়ে বিবর্তনের ধারা বোঝার চেষ্টা করছি। এই সবই আমাদের মহাবিশ্ব এবং আমাদের অস্তিত্বের বাস্তবতাকে একটা পূর্ণাঙ্গ রূপে ধরার চেষ্টা।

বাস্তবতার আরো রূপ থাকতে পারে। স্ট্রিং বা সুপারগ্র্যাভেটি প্রকল্প আমাদের বলছে যে আমাদের মহাবিশ্বের দশটা বা এগারটা মাত্রা থাকতে পারে। আমরা এর মধ্যে শুধুমাত্র তিনটি মাত্রা বুঝতে পারি, বাকি মাত্রাগুলো নাকি খুবই ছোট ও গোলাকৃতি হয়ে স্থানের প্রতিটি বিন্দুতে অবস্থান করছে। এই ছোট মাত্রাগুলো বর্তমান বা নিকট ভবিষ্যতের প্রকৌশল দিয়ে উন্মোচিত করা সম্ভব নয়। এই ধরনের আপাতঃদৃষ্টিতে অসম্ভব মাত্রাসমূহের অস্তিত্ব কী আসলেই আছে? এর উত্তর ভবিষ্যতের বিজ্ঞান দিতে পারবে, তবে যেহেতু মহাবিশ্বের অস্তিত্ব আছে ("অস্তিত্বহীনতার" বদলে) এবং বাস্তবতাকে আমরা sample করি আমাদের স্থান ও কালের সীমাবদ্ধতায়, এটা মনে করা অসংগত হবে না যে স্থান ও কাল হয়তো বৃহৎ কোনো বাস্তবতার অংশ – সেই বৃহৎ মহামহাবিশ্বের রূপরেখায় স্থান ও কাল অসংখ্য সম্ভাবনার একটা বাস্তবায়ন মাত্র।

৪. উদ্দেশ্যহীনতা

কিন্তু বাস্তবতার গঠন ও প্রকার নিয়ে আমরা যত ভেবেছি ততই এর আপাতঃ উদ্দেশ্যহীনতা আমাদের বিষাদগ্রস্ত করেছে। স্টিভেন ভাইনভার্গ তার প্রথম তিন মিনিট বইতে লিখেছেন, "The more the universe seems comprehensible, the more it also seems pointless." বক্তব্যটা ইংরেজীতেই রাখলাম মূলতঃ pointless কথাটার জন্যে। (এই উক্তির জন্যে ভাইনভার্গকে অনেক গঞ্জনা শুনতে হয়েছে।) আমাদের মানসিক ক্যাটাগরির বাইরে মহাজগৎ এক "অন্ধকার" রাজত্বে বাস করে, অতি উজ্জ্বল তারাদের আলোর বর্ণালী কোনো মানসিক অনুবাদ ছাড়া অদৃশ্য তরঙ্গই থেকে যায়। কয়েকশো কোটি বছর ধরে যে নক্ষত্ররা জন্মেছে, আলো বিকিরণ করছে, বিস্ফোরিত হয়েছে বা নিষ্ফল মরে গেছে, তার অর্থ কি?

আমাদের দেহ যে সমস্ত জটিল উপাদান দিয়ে তৈরি (অক্সিজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, লোহা, ইত্যাদি) তারা সৃষ্টি হয়েছে সূর্যের পূর্ববর্তী নক্ষত্র সমূহের অভ্যন্তরে, সেই সৃষ্ট উপাদান সুপারনোভা বিস্ফোরণ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল মহাশূন্যে, তারপর সৌর-মন্ডল সৃষ্টির সময় সেই উপাদানগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল পৃথিবীর গঠনে, পরবর্তীতে জীব-বিবর্তনের ফসল হিসেবে আজ সেগুলি আমাদের শরীরের অংশ। কাজেই সচেতন মানুষের আবির্ভাবের জন্যে কয়েকশো কোটি বছরের প্রক্রিয়ার প্রয়োজন ছিল, তাই মহাবিশ্বের আজকের বয়স চেতনা সৃষ্টির জন্যে যে সময়ের প্রয়োজন ছিল তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই পুরাতন নক্ষত্রদের জীবন যেন নিষ্ফল নয়, এই ধারার চিন্তাধারা এনথ্রোপিক সূত্রের আলোচনার অন্তর্ভূক্ত (বাংলা ভাষায় অভিজিৎ রায় এই নিয়ে একটা সুন্দর
আলোচনা করেছেন[৭]) ।

এনথ্রোপিক সূত্রের একটা উপপাদ্য হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে কোটি কোটি (বা অসীম সংখ্যক) মহাবিশ্ব থাকতে পারে যে মহাবিশ্বগুলো একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন। তার মধ্যে কিছু মহাবিশ্বে পদার্থবিজ্ঞানের নীতি ও ধ্রুবকগুলো এমন হতে পারে যা জীবন ও চেতনা বিকাশের জন্যে উপযুক্ত। এটা একটা লটারী খেলা, পাশার গুটির চালে আমাদের মহাবিশ্বের বিজ্ঞানসূত্র জীবন বিকাশে সাহায্য করেছে।এই প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার ধারণাটা মোটামুটি যৌক্তিক, কিন্তু আপাততঃ এটাকে প্রমাণ করার কোন পদ্ধতি আমাদের জানা নেই, অসীম সংখ্যক মহাবিশ্বের ধারণা এখন কল্পনা-অনুমান (speculation) হিসেবে থাকছে, তাকে hypothesis বলা যাচ্ছে না। অসংখ্য মহাবিশ্বের কোন সম্মিলিত তত্ত্বও আমাদের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের মন অসংখ্য মহাবিশ্বের ধারণাকে ভেবে নিতে পারে, যদিও আমাদের জীবনে সেই সমস্ত মহাবিশ্বের কোন ভূমিকা নেই। আমাদের জীবনে তাদের অস্তিত্ব pointless!

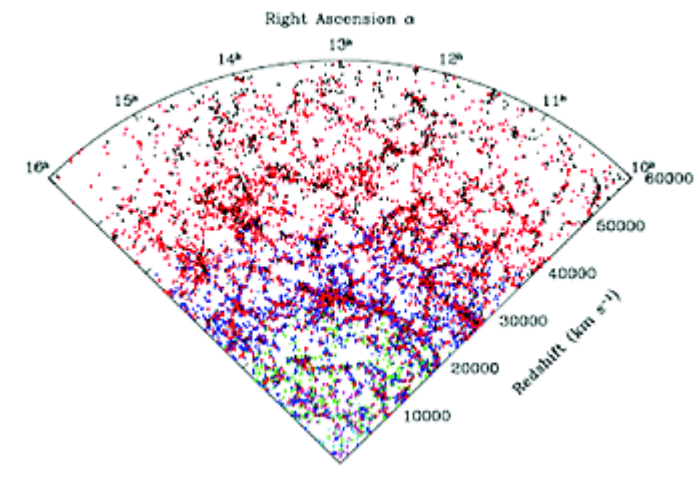

চিত্র ২: SLOAN দূরবীনের ডিজিটাল স্কাই সার্ভে কৃত নিকটবর্তী মহাশূন্যে গ্যালাক্সির মানচিত্র[৮] ।
এখানে প্রতিটি বিন্দু একটি গ্যালাক্সি ।

বর্তমানে SLOAN দূরবীনের ডিজিটাল স্কাই সার্ভে[৮] আমাদের নিকটবর্তী মহাবিশ্বের (কয়েক বিলিয়ন আলোকবর্ষের মধ্যে) মানচিত্র তৈরি করছে। দুই নম্বর চিত্র-টিতে SLOAN পর্যবেক্ষিত প্রায় এক লক্ষ গ্যালাক্সির একটা মানচিত্র দেখানো হয়েছে, এটা আকাশের একটা ছোট্ট অংশ মাত্র, এর প্রতিটি বিন্দু একটি গ্যালাক্সি এবং ত্রিমাত্রিক দৃশ্যকে দুটি মাত্রায় দেখানো হয়েছে। এই চিত্রে আমরা দৃশ্যমান মহাবিশ্বের খুবই ক্ষুদ্র একটা অংশ দেখেছি (সমগ্র মহাবিশ্ব অসীম হতে পারে)। প্রতিটি গ্যালাক্সিতে প্রায় দশ হাজার কোটি (১০০ বিলিয়ন) নক্ষত্র থাকতে পারে। কোটি কোটি গ্যালাক্সির মধ্যে কি প্রাণ থাকতে পারে না, বা সেই প্রাণের মধ্যে আমাদের মত সচেতনতার উদ্ভব হতে পারে না? অবশ্যই পারে, কিন্তু এই গ্যালাক্সিগুলো এত দূরে যে তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের কোন প্রশ্ন ওঠে না। অনেক দূর ভবিষ্যতে কোন গ্যালাক্সি থেকে কোন সংকেত হয়ত আমরা পেতে পারি, তার উপর ভিত্তি করে আমরা আর একটা কল্পনার জগত গড়তে পারি, আমাদের দর্শন পালটাতে পারি, কিন্তু আমাদের ব্যবহারিক জগতে সেই সংকেত কোন ভূমিকা রাখবে না। আবার অন্যভাবে দেখলে যেহেতু দর্শনের সংগে জীবনের যোগসূত্র অচ্ছেদ্য, সুদূর গ্যালাক্সির সামান্য একটি সচেতন সংকেত আমাদের জীবন বদলে দিতে পারে ! যেটাই হোক না কেন, এই সমস্ত গ্যালাক্সির বাসিন্দাদের সাথে আমাদের হয়তো কোন দিনই দেখা হবে না। এই ভাবে ভাবলে মহাবিশ্বের এই বিশাল গঠনকে pointless বলা অসঙ্গতঃ হবে না।

৫. অনুভূতির অভ্যন্তরে: কুয়ালিয়া

বাস্তবতা সম্পূর্ণভাবে আমাদের মস্তিষ্কের বিশ্লেষণ ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। এই বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে বাস্তবতার কোন নৈর্ব্যক্তিক অস্তিত্ব নেই । মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, কোয়ার্ক, ইলেকট্রন, তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ, স্থানের বহুমাত্রিকতা, কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তা ইত্যাদি নিয়ে আমাদের চেতনার বাইরে নিশ্চয়ই কোন একটা বাস্তবতা রয়েছে, কিন্তু বাস্তবতাকে আমরা বুঝতে চাই তার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে। এই প্রতিনিধিরা আমাদের স্বত্তার কাছে বর্হিবিশ্বকে উদ্ভাসিত করে রঙ, শব্দ, গন্ধ, গঠন, গতি, আনন্দ বা মনোবিকারের মত খুবই ব্যক্তিগত অনুভূতির উৎপত্তি করে যা কিনা দ্বিতীয় কোন স্বত্তা দেখতে বা বুঝতে পারবে না। অনেক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক এই ধরনের অভিজ্ঞতাকে বলছেন quale (কুয়ালি) বা বহুবচনে qualia (কুয়ালিয়া)[৪,৯]। চোখ থেকে এক ধরনের স্নায়ু মাধ্যমে সংকেত মস্তিষ্কতে পৌঁছায়, আমাদের মস্তিষ্ক সেই

সংকেতকে একটা ত্রিমাত্রিক বিশ্বে পরিণত করে। কিন্তু ত্রিমাত্রিক বিশ্বের তথ্য সৃষ্টি এক জিনিস আর তথ্যকে স্বজ্ঞার মানসপটে প্রক্ষেপণ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এর উপমায় বলা যায় ক্যামেরা, সেট, প্রেক্ষাপট, অভিনেতা, পরিচালক, ইত্যাদি দিয়ে একটা চলচ্চিত্র তৈরি করে ফিল্মে বা ডিস্কে আবদ্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু তাকে প্রজেক্টর মাধ্যমে পর্দায় না ফেললে পুরো ঘটনাটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তবে স্বজ্ঞার অনুধাবন প্রক্রিয়ায় প্রজেক্টর মাধ্যমে চিত্রায়িত দৃশ্যটিকে বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করার কোন সুযোগ নেই।

কিছু নিউরনের সমষ্টি কেমন করে সেই দৃশ্য সৃষ্টি করে, সেই রঙ কোন জায়গা থেকে আসে যা কিনা শুধুমাত্র আমার মনে উদ্ভাসিত হয়? প্রক্রিয়াটির ব্যাখ্যা এখনো মস্তিষ্ক বিজ্ঞানীদের হাতের বাইরে। জড় প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করে এই কুয়ালিয়া বোধের কোনো উদাহরণ বা উপমা আমরা পাব না, কুয়ালিয়া নিতান্তই ব্যক্তিগত, তাকে বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ বর্তমান জ্ঞান দিয়ে করা সম্ভব নয়। তবে আমরা জানি যে বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ সঞ্চার করে এই কুয়ালিয়া বোধের (উচ্ছাস, বিষন্নতা, গন্ধ) সৃষ্টি করতে পারেন। কুয়ালিয়া সৃষ্টি হয় আমরা জানি, কিন্তু সেই সৃষ্টিকে আমাদের স্বত্তা কি করে অনুধাবন করে তা বোঝা কঠিন।

নিচের ছবিটি ভালো করে লক্ষ্য করুন: লাল, সবুজ, বেগুনী, সাদা ও কালো এই পাঁচটি রঙের আয়তক্ষেত্র দেয়া হয়েছে। এই জ্যামিতিক ক্ষেত্রগুলো থেকে আমাদের চোখের রেটিনায় পড়ছে ৬৫০ (লাল), ৫৫০ (সবুজ) ও ৪৫০ (বেগুনী) ন্যানোমিটারের তরঙ্গ, সাদা আয়তক্ষেত্র থেকে আসছে ৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটারের তরঙ্গসমূহ, আর কালো ক্ষেত্র থেকে কার্যতঃ কোন তরঙ্গই বিকিরিত হচ্ছে না। আমাদের মস্তিষ্ক ওই তরঙ্গগুলোকে অনুবাদ করছে রঙে, সেই রঙ আমাদের মানসপটে উদ্ভাসিত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের কাছে লাল, সবুজ বা বেগুনী কোনো বোধ থাকার কথা নয়, আলোর কোনো রঙ নেই। এই লালের বোধতা হচ্ছে একটা নিজস্ব ব্যক্তি-স্বত্তার অনুভূতি, একে বাইরে থেকে কোনো যন্ত্র দিয়ে দেখা যাবে না। লাল রঙের অনুভূতিকে আমরা নীল করে দিতে পারি না, আবার আপনি যে গাঢ়ত্বের লাল দেখবেন আমি তা নাও দেখতে পারি, কিন্তু সেই পার্থক্যকে ধরার জন্য কোনো পর্যবেক্ষণ করাও সম্ভব নয়।

সাদা ও কালো রঙের ব্যাপারটা আরো অদ্ভূত । সাদা রঙ সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মিশ্রণে এবং কালো রঙ হচ্ছে তরঙ্গের অনুপস্থিতে । আবার কোন কোন সময় খুব উজ্জ্বল উৎসের পাশে অনুজ্জ্বল উৎসকে আমরা কালো হিসেবে দেখি । আলোক ফোটনের অনুপস্থিতি সৃষ্টি করে কালো কুয়ালিয়া । মহাশূন্যকে আমরা বলছি কালো, সে কি আসলেই কালো? শুধুমাত্র স্নায়ুর অনুরণন দিয়ে কুয়ালিয়া ব্যাখ্যা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। কুয়ালিয়া-র অস্তিত্ব বা ব্যাখ্যা নিয়ে মতান্তর আছে, তবে এটা ontologyর (বস্তু ও জীবনের সম্পর্ক নিয়ে দর্শন) একটা বিরাট গবেষণার বিষয়।

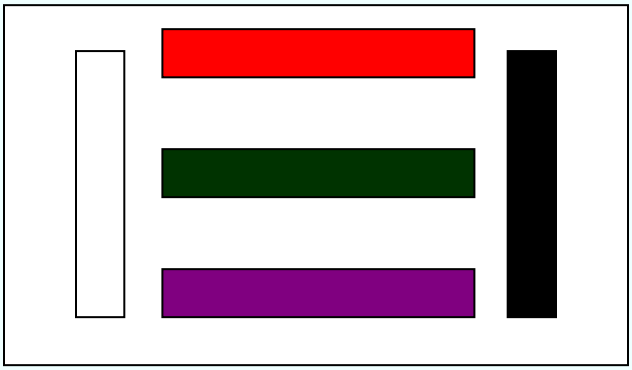

চিত্র ৩: প্রকৃতি-তে লাল, সবুজ বা বেগুনী রঙের অস্তিত্ব নেই, কিন্তু মস্তিষ্কে নিউরনের কার্যকলাপ আমাদের স্বত্তায় ওই রঙগুলোর অনুভূতি সৃষ্টি করে ।

শুধু আলোক বা শব্দ তরঙ্গই নয়, মস্তিষ্কের মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অনেক হরমোন আমাদের মধ্যে বিভিন্ন বোধ ও ব্যক্তিত্ব সঞ্চার করে । অক্সিটোসিন আমাদের উদার করে, মস্তিষ্কের সামনের দিকে ফ্রন্টাল লোবে ডোপামিন কমে গেলে তা আমাদের মনোযোগ ও স্মৃতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সেরাটনিনের অভাব আমাদের বিষণ্ন করে । যেহেতু এই ধরনের অনুভূতির ক্যাটাগরি জীব দেহের বাইরে নেই (এবং এই ধরনের ক্যাটাগরি অসংখ্য হতে পারে), তারা সবই কুয়ালিয়ার অর্ন্তভূক্ত হবে ।

জীবনানন্দ দাশ তার বোধ কবিতায় লিখেছেন,

আলো অন্ধকারে যাই, মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে !
স্বপ্ন নয়, শান্তি নয়, ভালবাসা নয়.
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়!
আমি তারে পারি না এড়াতে.
সে আমার হাত রাখে হাতে;
সব কাজ তুচ্ছ হয়, পন্ড মনে হয়.
সব চিন্তা প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়, শূন্য মনে হয় ।

কবির মস্তিষ্ক অসংখ্য কুয়ালিয়ায় পূর্ণ, তাদের সম্মিলিত ভাবে বোধ বলছেন কবি । বোধ সৃষ্টি করছে স্বত্তা, স্বত্তা সৃষ্টি করছে বোধ ।

৬. মৃত্যুর পরে

চার নম্বর পরিচ্ছেদে (উদ্দেশ্যহীনতা) আমি যখন বলেছি "আমাদের" সঙ্গে অন্য গ্যালাক্সির সভ্যতার দেখা হবে না, আমি "আমার" স্বত্তাকে দূর ভবিষ্যতে বিস্তার করতে চেয়েছি মানব সভ্যতার অংশ হিসেবে । কিন্তু সেই দূর ভবিষ্যতে আমার কোন ধরনের অস্তিত্ব থাকবে না, আমার স্বত্তা বা মন আমার

মস্তিষ্ক-নির্ভর, যে নিউরন সমষ্টি আমার সমস্ত কুয়ালিয়া সৃষ্টি করে, তাদের ধ্বংসের পরে এটা মনে করা স্বাভাবিক যে ব্যক্তি-স্বজ্ঞারও সমাপ্তি হবে।

মৃত্যুর রূপ কিরকম হতে পারে তা আমরা প্রতিদিন "অনুভব" করি। স্বপ্নবিহীন ঘুম হচ্ছে একধরনের মৃত্যু। চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী জেরাল্ড এডেলমান তার Universe of Consciousness, How Matter becomes Imagination বইতে[৯] লিখছেন, "আমরা জানি আমাদের এই দুর্লভ সচেতনতা পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে সামান্য আঘাত বা মস্তিষ্কে ক্ষুদ্র রাসায়নিক অসামঞ্জস্যতার জন্যে। ধরতে গেলে আমাদের সচেতন জীবন সবসময়ই ধ্বংস হচ্ছে যখন আমাদের ঘুমে স্বপ্ন থাকে না..."। মস্তিষ্ক বিজ্ঞানীরা দেখেছেন স্বপ্ন ছাড়া ঘুমের সময় মাথার নিউরনরা একসাথে ছোট কম্পাঙ্কে (১ থেকে ৩ হার্টজ) আচরণ করে, নিউরনের সেই আচরণে চেতনা হারিয়ে যায় (৪ নমবর চিত্র)। তাছাড়া অপেরেশানের সময় অচেতনকারী রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাবে রোগীর চৈতন্য সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়। ঘুম বা ক্লোরোফর্ম দুটোই আমাদের মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যায়।

নিউরনের তরঙ্গের মত সংকেত প্রদানে চেতনা হারিয়ে যায়, ঘুম থেকে জেগে উঠে আমরা ঘুমিয়ে পড়ার পূর্ব মুহূর্তটিকে স্মরণ করতে পারি, মাঝখানে স্বপ্ন না থাকলে সেই অন্তর্বর্তী অংশটিতে সময়ের কোন অস্তিত্ব নেই। জন্ম হবার আগে যেমন আমাদের স্বজ্ঞা ও স্বত্তা ছিল না, ঘুমের মধ্যেও তারা না থাকতে পারে। তবে স্বজ্ঞা না থাকার ব্যাপারটা এতই বিমূর্ত ও ব্যক্তিগত যে এর কোন নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই।

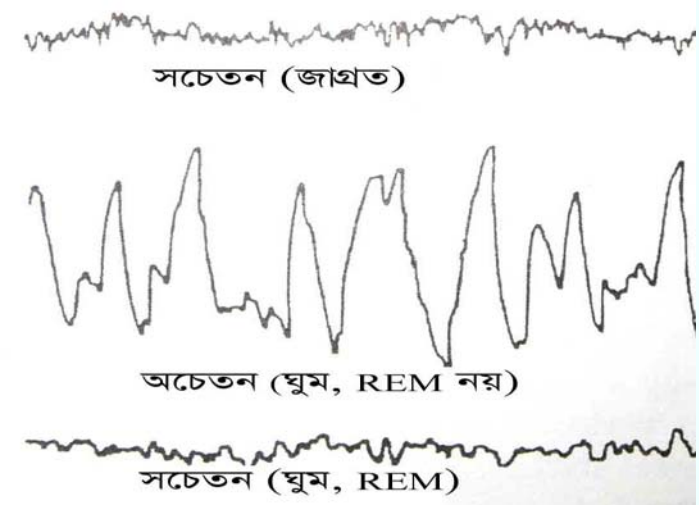

চিত্র ৪: জেগে থাকা অবস্হায় ও REM ঘুমের সময় নিউরনের আচরণ একই রকম। স্বপ্ন-ছাড়া ঘুমের সময় নিউরনের আচরণ ভিন্ন, এই সময় নিউরন সমষ্টি স্বজ্ঞা সৃষ্টি করতে পারে না। G.E. Edelman &G. Tononi (২০০০) থেকে গৃহীত[৯]।

তবুও আমার মন আমার দেহের ধ্বংস কল্পনা করতে পারে, দশ কোটি বছর পূর্বের ডাইনোসরের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে পারে, আবার কয়েকশো কোটি বছর পরের মহাবিশ্বের অবস্থাকে অনুধাবন করতে পারে। সেই মন জানে মৃত্যুর পরে তার অস্তিত্ব ছাড়াই মহাবিশ্ব চলবে যেমন চলছে কোটি কোটি বছর। কিন্তু অন্ততঃ সেই স্বজ্ঞার জন্যে মহাবিশ্বের শেষ সেখানেই। প্রতিটি মৃত্যুই একক, এক জনের সচেতনতার

অবস্থান অন্য একটি স্বত্তার অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত নয়। সেই জন্য প্রতিটি জীবনই মূল্যবান, মৃত্যু পরবর্তী জীবনে বা আত্মার অমরত্বে যারা বিশ্বাস করে তারা জীবনের এই ক্ষণিকতা সঠিক ভাবে উপলব্ধি করে কিনা আমি জানি না ।

জীবনের সময়ের স্বলপতায় মন বিষণ্ন হলেও সে একটা "সুখের" জীবনের সন্ধান থেকে বিরত হয় না, কারণ জীববিবর্তনের অংশ হিসেবে সে তার এই ভূমিকা পালন করতে "বাধ্য"। সেই ভূমিকাকে অর্থবহুল করতে, বাধ্যতাকে মানিয়ে নিতে সে সৃষ্টি করেছে শব্দ ও সংগীত, কথা ও কবিতা, রঙ ও চিত্র, স্পর্শ ও প্রেম। নিজে বাঁচার জন্যে ও তার বংশকে বাঁচানোর জন্যে সে সৃষ্টি করেছে সমাজ ও আইন। পারসিংগার[৫] ও রামাচন্দ্রানের[২] গবেষণা হয়তো প্রমাণ করে মানুষ নিজের অস্তিত্বের অর্থ খুঁজতে গিয়ে সৃষ্টি করেছে ঈশ্বর ।

৬. আমার স্বজ্ঞা: সংঘাত ও সমন্বয়ের উর্ধ্বে

অ্যালবার কাম্যু তার বইতে জীববিজ্ঞানের উল্লেখ করেন নি। আমাদের চিন্তায় আত্মহত্যার স্থান আছে, কিন্তু মন আত্মরক্ষার খাতিরে এই ক্রিয়াটিকে বাস্তবায়িত করতে দেয় না। অনেক অসচেতন প্রক্রিয়ার মধ্যে এটিও একটি । মস্তিষ্ক বিজ্ঞান বলতে বিংশ শতাব্দীর আগে কিছু ছিল না, আর চেতনা নিয়ে একমাত্র দার্শনিকরাই ভাবতেন। কিন্তু এখন নানাবিধ কারিগরী উন্নতির সাথে সাথে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরের ক্রিয়াকলাপ আমাদের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন মস্তিষ্ক কম্পিউটারের মত কোন রৈখিক যন্ত্র নয়, এর কোন প্রোগ্রামও নেই, সেই অর্থে সাধারণ রোবট বলতে আমরা যা বুঝি মস্তিষ্ক তা নয়, মস্তিষ্ক টুরিং মেশিন নয়। কিন্তু মস্তিষ্কের কোন একটা বিশেষ অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমরা হারাই কোন বিশেষ স্মৃতি, হারাই কোন নির্দিষ্ট বোধ, বোঝার বা বিশ্লেষণের ক্ষমতা, ইত্যাদি ।

স্থান ও কালের ধারণার মধ্যে যে রকম রহস্য আছে স্বজ্ঞার সৃষ্টিও সে রকম এক রহস্যে ঢাকা আছে । বিবর্তন প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যে মস্তিষ্ক সৃষ্টি করেছে তা সবসময় যৌক্তিক সংকেতে কাজ করে না। চেতনার প্রতিটি মুহূর্তে আমরা অগণন বোধের মধ্যে নিমজ্জিত থাকি - চোখের বাইরে নিরবিচ্ছিন্ন দৃশ্য, দৃশ্যের প্রতিটি বস্তুর বৈশিষ্ট্য, সেই বৈশিষ্ট্যর সাথে ব্যক্তিগত স্মৃতি, সেই স্মৃতি গড়ে ওঠার ইতিহাস, বিভিন্ন ইন্দ্রিয় অনুভূতির সঙ্গে স্বত্তার সংযোগ, এই তালিকার শেষ নেই। মস্তিষ্ককে এই সমস্ত কিছু বুঝে স্বজ্ঞার কাছে তা উপস্থাপনা করতে হবে। কিন্তু স্বজ্ঞা তো পূর্ব থেকে সৃষ্ট হয়ে নেই, স্বজ্ঞাকে আমাদের প্রতিটি মুহূর্তে সৃষ্টি করতে হয়। কোটি কোটি নিউরন পারস্পরিক সংকেত আদান প্রদানের মাধ্যমে স্বজ্ঞা সৃষ্টি করে, সেই আদান-প্রদানকে হতে হবে বিরতিহীন, প্রতিটি বর্তমান মুহূর্তকে মনে রেখে অতীতের কাছে গচ্ছিত করতে হবে। নিউরনের সংকেত ভ্রমণ করে শ্লথ গতিতে, তাই বিজ্ঞানীরা মনে করেন উপরোক্ত প্রক্রিয়া ব্যবহার করে এক ধরণের নির্বাচন প্রক্রিয়া যা কিনা কম্পিউটারের মত নয়[৯] ।

আমরা উল্লেখ করেছি যে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া মস্তিষ্ক সৃষ্টি করেছে তাই সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করতে মস্তিষ্কে ঈশ্বর-চিন্তার সুযোগ করে দিয়েছে, বর্তমানে এই গবেষণার ধারাটি বিবর্তনবাদী মনস্তত্ত্বের একটা বিশেষ বিষয়। তবে এই ধারার মধ্যেও প্রতিষ্ঠানগত মতভেদ আছে, কিছু দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা মনে করে ঈশ্বর-চিন্তার উদ্ভব হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে, একে বলা হচ্ছে adaptation, অথাৎ বিবর্তনের ফলে মস্তিষ্কে আধ্যাত্মিক চেতনার আবির্ভাব মানুষকে বাঁচার বারতি সুযোগ করে দিয়েছে[১০] । কিন্তু অনেক গবেষক বলছেন, যদিও ঈশ্বরে বিশ্বাস জীবনে সান্ত্বনা আনতে পারে, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা

দিয়ে জানি কাজের সময় ঈশ্বর সাহায্য করে না, বরং অতিমাত্রায় ঈশ্বরে বিশ্বাস করলে সেই গোষ্ঠীর ধবংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে (খাদ্য উৎপাদনে, চিকিৎসায়, যুদ্ধে বা ভর্তি পরীক্ষায় ঈশ্বরের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা যায় না!)। কাজেই, এই গবেষকরা বলছেন নিজেকে ভুল বোঝানো বা ফাঁকি দেওয়ানো প্রাকৃতিক বিবর্তনে কোন সাহায্যের কারণ হতে পারে না। তাদের মতে এই পরিবর্তন কোন adaptation এর ফলে হয় নি, এটা বরং একটা প্রাকৃতিক অ্যাক্সিডেন্টের জন্যে হয়েছে[১১]। অর্থাৎ মানব আবির্ভাবের ঊষালগ্নে বা পরে কোন mutation এর ফলে ঈশ্বর বোধের সৃষ্টি হয়েছিল। তৃতীয় একটি ধারা বলছে adaptation বা হঠাৎ mutation যেটাই হোক না কেন একসময় অলৌকিকতা বা ঈশ্বর-বিশ্বাস গোষ্ঠীকে ধরে রাখতে সাহায্য করেছিল, কিন্তু বর্তমানে এই ধরনের নির্বাচন মানুষকে কোন বারতি সুযোগ দেবে না। স্ক্যানডানাভীয় দেশগুলো দেখলে আমার এই তৃতীয় ধারার কথা মনে হয় - নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্কের ইতিহাসে প্রথমে ভাইকিং পৌত্তলিকতা ও পরে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস হয়তো এক কঠিন প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাদের গোষ্ঠীদের একত্র করে রেখেছিল, কিন্তু আজ এই দেশ তিনটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিতে একদম শীর্ষে, গীর্জার প্রভাবও এই দেশগুলিতে ন্যূনতম ।

আমরা যাকে বলি বিশ্বাস বা বিশ্বাস প্রণালী সেটা হচ্ছে একটা গোষ্ঠীর অংশ হিসেবে নিজেকে দেখা যা কিনা জীবনে পূর্ণতা আনতে পারে[২]। এর সাথে আসে বিশ্বস্ততা, সম্মান, ইত্যাদি আরো ধারণা যা কিনা ডারউইনীয় বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মানুষকে সমাজের মধ্যে থাকতে সাহায্য করেছে। এটা কোনো মহাজাগতিক ধর্ম বা বিশ্বাস নয়, এটা নিতান্তই সাধারণ গোষ্ঠীবাদ যার বাস আমাদের মস্তিষ্কের মাঝেই।

উপরের আলোচনা ও ২ নং পরিচ্ছেদ (জীববিজ্ঞান) থেকে ধরে নেয়া যাক যে আমাদের সবার মস্তিষ্কে আধ্যাত্মিক চিন্তার একটা সুযোগ থেকে গেছে। করোটির আবদ্ধতায় উদ্ভূত স্বজ্ঞা জীবনের ও বিশাল মহাবিশ্বের অস্তিত্বের অর্থ খুঁজবে এটাই তো স্বাভাবিক, আমাদের সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও বিমূর্ততার উৎস এই অন্বেষার মাঝেই। কিন্তু শুধুমাত্র ঈশ্বর কল্পনায় এর উত্তর নিহিত থাকতে পারে না, ঈশ্বর কোন জাগতিক (বা মহাজাগতিক) ব্যাপার হলে তারও উৎস থাকতে হবে, মহাঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, আবার মহামহাঈশ্বর থেকে মহাঈশ্বর এরকম ভাবে অসীম একটা ধারার কথা ভাবা যেতে পারে। এক সীমাহীন মহামহাবিশ্বের অসীম তথ্য তাকে (বা তাদের ধরে) রাখতে হবে! আবার এরকমও হতে পারে আমাদের মহাবিশ্ব অন্য এক মাত্রার অসাবধানী ভুলোমনা ছাত্রের অমনোযোগীতার ফলাফল, সে তার অধ্যাপকের নির্দেশ না শুনে তার একসপেরিমেন্টে বেশী শক্তি বা পদার্থ ঢেলে দিয়েছিল যা কিনা কৃষ্ণবিবর হয়ে তার মহাবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছে। আর তার আগে, এই ভুলোমনা ছাত্রের মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে আর এক ভুলোমনা ছাত্রের অসাবধানতার কারণে, এই রকম ভাবে একটা অসীম সংখ্যক অমনোযোগী ছাত্রের অবিমৃষ্যকারী কার্যকারণে ঘটিত মহাবিশ্বের ধারা কল্পনা করা যেতে পারে। শেষ ফলে ভুলোমনা ছাত্র সৃষ্ট মহাবিশ্বের ধারা আর ঈশ্বর সৃষ্ট মহাবিশ্বের ধারার মধ্যে কোন পাথর্ক্য নেই ।

এটা স্পষ্ট যে উপরোক্ত চিন্তাধারা খুব একটা তৃপ্তিদায়ক হতে পারে না । যেমন তৃপ্তিদায়ক হতে পারে না কিংবদন্তি এবং মনগড়া, অনেক সময় অযৌক্তিক, স্ববিরোধী ও অর্ধপক্ক তথাকথিত নীতিতে ভরা ধর্মগ্রন্থ। তবুও প্রথম ধারাটি আমাদের কল্পনাকে বাধা দেবে না, আমরা সেই অসীম ধারা নিয়ে গবেষণা করতে পারি, অংক কষতে পারি, এমন কি কবিতা লিখতে পারি, সব মহাবিশ্বের ভুলোমনা ছাত্ররা কেন তাদের অধ্যাপকদের আদেশ শুনছে না অথবা না শোনার সম্ভাবনা কতটুকু তা নিয়ে উচ্ছ্বসিত আলোচনা করতে পারি । অনুরূপ ভাবে অসীম সংখ্যক ঈশ্বরের অনুক্রমে আমরা প্রশ্ন করতে পারি এইসব ঈশ্বরদের

কুয়ালিয়া বোধ কি ভাবে সৃষ্টি হল (বা তাদের কুয়ালিয়া আদৌ আছে কিনা) অথবা অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের অসীম তথ্য ও সীমাহীন সম্ভাবনার আধার হিসেবে তাদেরকেও কি স্হানগত ভাবে অসীম হতে হবে? এই প্রশ্নগুলো অন্ততঃ ইন্টারেস্টিং।

পুঁথিগত ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এমন অনেকে বলে সেই ঈশ্বর মহাজাগতিক, কিন্তু একটু প্রশ্ন করলেই দেখা যাবে সেই ব্যক্তি অনুসরণ করে এমন এক গোষ্ঠীগত (tribal) তন্ত্র যা কিনা সে বংশাণুক্রমে গ্রহন করেছে। সেই ব্যক্তি মুখে এক সর্বব্যাপী ঈশ্বরের কথা বললেও কার্যক্রমে নিজের গোষ্ঠীর নিয়মানুবর্তিতার সাথে একাত্বতাবোধ করে, প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় কোনো পুঁথির অবিশ্বাস্য ঘটনা "বিশ্বাস" করে। এর মাঝে ঊনিশ-বিশ হতে পারে, কিন্তু আমরা জানি শিশুরা তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে বড় হলে ভবিষ্যতে তাদের বিশ্বাসই অনুসরণ করে। পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতি বারন্ত শিশুর মস্তিষ্কের কিছু নিউরন ও সিনাপস (synapse) সমষ্টিকে শক্তিশালী করে, বলতে গেলে tribal বা লৌকিক (folk) ঈশ্বরের কুয়ালিয়া এই সময়েই শিশু বা কিশোর মনে সৃষ্টি হয় । (চা অথবা ওয়াইন স্বাদ বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন ধরনের চা বা ওয়াইন চেখে নতুন স্বাদের কুয়ালিয়া তৈরি করে যেগুলো আগে তার মাথায় ছিল না[৯])। এর সাথে যুক্ত হয় গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ। ঈদের জামাত, পূজার বাজনা, গীর্জার শান্ত পরিবেশ আমাদের মনে এমনই দাগ কাটে যে তাদেরকে আমরা পরবর্তীতে বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে আলাদা করে দেখতে পারি না। এই সবই মাথার মধ্যে এমন ভাবে গেঁথে আছে যে আমাদের পক্ষে সাংস্কৃতিক ঈশ্বরকে অস্বীকার করা খুব কঠিন। বেশির ভাগ বিশ্বাসীরাই এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে খুব একটা ভাবে না, ভাবলেও তারা নিতান্ত ট্রাইবালিজম এর কারণে সেই প্রক্রিয়ার উর্ধ্বে উঠতে পারে না, এদের মধ্যে যারা চিন্তাবিদ তারা সেই ট্রাইবাল প্রথাকে মহাজাগতিক বলে প্রমাণ করারও চেষ্টা করে।

শেষাবধি বাস্তবতার জটিলতা (কুয়ালিয়া, অসীমতা, স্থানের মাত্রা, মৃত্যু, সময়ের বোধ ও উদ্দেশ্যহীনতা) সংগঠিত ঈশ্বর বিশ্বাসকে অকিঞ্চিৎকর করে দেয়, সেই অর্থে আনুষ্ঠানিক ধর্মের সাথে সংঘাত বা সমন্বয় কোন আচরণই প্রযোজ্য নয়। টেমপোরাল লোবে অবস্থিত অ্যামিগডালা (amygdala) মহাবিশ্বের এক গভীর অর্থ সৃষ্টি করতে পারে, তার মানে কি মহাবিশ্বের এক গভীর অর্থ ও উদ্দেশ্য আছে ? মাতার মস্তিষ্কে অক্সিটোসিন ও ভাসোপ্রেসিন হরমোনের মাত্রা শিশুর প্রতি মাতার ভালোবাসা নির্ধারণ করে[১২], তার মানে কি মায়ের ভালোবাসা বলে আলাদা কিছু নেই? স্বজ্ঞাই ভালোবাসার কুয়ালিয়া তৈরি করে, স্বজ্ঞাই সেই কুয়ালিয়াকে অনুধাবন করে - এই ধাঁধা সাধারণ ঈশ্বর বিশ্বাস বা আনুষ্ঠানিক ধর্ম থেকে অনেক গভীর। এই ধাঁধার উত্তর হয়তো নেই, এক ঈশ্বরোত্তর পটভূমিতে এই উত্তরের সন্ধান হয়তো এক দিন করা যাবে।

গ্রন্থপন্জী

[১] http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suiciderates/en/

[২] B. J. King, Evolving God, A Provocative View on the Origins of Reigion, Doubleday Publishing, 2007

[৩] বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা (১৮১৮-১৮৬০), সম্পাদনা শরদিন্দু শেখর রায়, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ২০০৭

[৪] V.S. Ramachandran, Sandra Blackeslee, Phantoms in the Brain, Quill, NY, 1998

[৫] Michael A. Persinger, Ph.D., Neuropsychological Bases of God Beliefs, Praeger Publishers, NY, 1987

[৬] Michael A. Persinger, Katherine Makarec, Temporal Lobe Epileptic Signs and Correlative Behaviors Displayed by Normal Populations, Journal of General Psychology, Vol. 114, 1987

[৭] অভিজিৎ রায়, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, মুক্তমনা

[৮] http://www.sdss.org

[৯] Gerald M. Edelman, Giulio Tononi, A Universe of Consciousness, How Matter Becomes Imagination, Basic Books, NY, 2000

[১০] Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought, by Pascal Boyer, Basic Books, NY, 2002

[১১] L. A. Kirkpatrick, Toward an Evolutionary Psychology of Religion and Personality, Journal of Personality, Vol. 67, Issue 6, 1999

[১২] A Bartels & S. Zeki, The Neural Correlates of Maternal and Romantic Love, Neuroimage, 21, 1155, 2004

ড. দীপেন ভট্টাচার্য আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার গবেষক। ইমেইল- tishan2@yahoo.com

মানব প্রকৃতি কি জন্মগত, না পরিবেশগত?

অপার্থিব

এই প্রশ্নটি যুগযুগ ধরে সনাতনী দার্শনিকদের ভাবিয়ে এসেছে । প্রশ্নের উত্তর অনুযায়ী তাঁরা দু দলে বিভক্ত ছিলেন। একদল মনে করতেন মানুষ জন্ম নেয় একটা স্বচ্ছ স্লেটের মত, জন্মের পর সময়ের সাথে পরিবেশ ও পারিপার্শিকতা ঐ স্বচ্ছ স্লেটে মানুষের স্বভাব লিখতে থাকে। ব্রিটিশ দার্শনিক লক এই মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন। এখনও অনেকে বিশেষ করে যাঁদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার অভাব তাঁরা এই মতবাদে বিশ্বাস করেন। বলাই বাহুল্য যে এর বিপরীত মতবাদীরা মনে করেন যে কেবল বংশাণু ই মানুষের স্বভাব নির্ধারণ করে, পরিবেশের কোন প্রভাব নেই। এই দুই চরম অবস্থানের মতবাদীদের যথাক্রমে পরিবেশ নির্ণয়বাদী ও বংশাণু নির্ণয়বাদী বলা হয়। বর্তমান বিজ্ঞানের আলোকে এই দুই চরম অবস্থানই ভ্রান্তিপূর্ণ । যদিও চরম বংশাণু নির্ণয়বাদীর সংখ্যা এখন হাতেগোণা, চরম পরিবেশ নির্ণয়বাদীর সংখ্যা নগণ্য নয়। অদর্শগত ও রাজনৈতিক শুদ্ধতার কারণে অনেকে এই মতবাদে বিশ্বাস করেন বা এর প্রচারে লিপ্ত হন, বিজ্ঞানের প্রমাণ বা সাক্ষ্যের তোয়াক্কা না করে। সাম্যবাদীরা পরিবেশ নির্ণয়বাদকে পছন্দ করেন কারণ তা তাদের সাম্যবাদের বাণী প্রচারে সহায়তা করে। আর এ কারণেই মার্ক্স তাঁর অনেক বাণীতেই এটাই জোরের সাথে বলেছিলেন যে মানুষের সকল বৈশিষ্ট্যই পরিবেশের ফল। পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ায় স্ট্যালিন মার্ক্সসীয় মতবাদের সংগে সংগতিপূর্ণ করার লক্ষ্যে বংশাণুবিদ্যাকে বিকৃত করতেও পেছপা হননি । এই উদ্দেশ্যে তিনি লাইসেঙ্কো নামক এক ঠগ বিজ্ঞানীকে নিয়োগ করেন। যখন ভাভিলভ প্রমুখ সৎ বিজ্ঞানীরা লাইসেঙ্কোর তত্ত্বের ভুল ধরিয়ে দেন তখন স্ট্যালিন তাদেরকে গুলগে পাঠিয়ে দেন। যাহোক, বংশাণুবিদ্যা ও স্নায়ুমনোবিজ্ঞানের সৌজন্যে আমরা এখন জানি যে উভয়ই অবদান রাখে মানুষের স্বভাব গঠনে। উভয়ের অবদান থাকলেও তা প্রতিসাম্যমুলক নয়, বংশাণবিক অবদানই মুখ্য। অনেকে উভয়ের অবদানের বাস্তবতা জানলেও এ সম্পর্কে এক অতিসরলীকৃত ধারণা পোষণ করেন। তারা পরিবেশের অবদানকেই মুখ্য বলে বিবেচনা করেন। আচরণের উপর বংশাণুর প্রভাবকে স্বীকার করতে তারা অস্বস্তি বোধ করেন। অথচ বহু বছরের গবেষণায় এটা পরিষ্কার যে gene manipulation বা বংশাণুর নড়চড়ের (যেমন selective breeding বা বৃত প্রজনন) দ্বারা নিম্ন স্তরের প্রাণীদের মধ্যে আগ্রাসন, নমনীয়তা, ক্ষিপ্রতা বা শ্লথতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে তারতম্য ঘটান সম্ভব। অথচ মানুষ এক বিশেষ প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও তার বেলায় এই সত্যটি (অর্থাৎ, মানব স্বভাবের তারতম্য যে বংশাণুজনিত তফাতের কারণে হতে পারে) মানতে রাজি নয় চরম পরিবেশ নির্ণয়বাদীরা।

এই রচণায় পরিবেশ আর বংশাণু এই দুই অবদানের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। আমার লেখার ভিত্তি হবে মস্তিষ্কবিজ্ঞান ও বিবর্তনী মনোবিজ্ঞানয়ের উপর বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান। এই জ্ঞানের বদৌলতে আমরা জানি যে মানুষের স্বভাবের নিয়ামক হচ্ছে মস্তিষ্ক। সঠিকভাবে বলতে হলে মস্তিস্কের কোটি কোটি স্নায়ুকোষের পারস্পরিক সংযোগকারী বর্তনীসমূহ (Synaptic connections)। এই বর্তনী গঠিত হয় বংশাণুর নিয়ন্ত্রণে। বর্তনীর সিংহভাগই ভ্রূণে থাকা অবস্থায় তৈরী হয়ে যায়। এই পর্যায়ে বংশাণুতে নিহিত

তথ্যই মূল ভূমিকা নিয়ে থাকে। ভ্রূণের অভ্যন্তরের পরিবেশও অবশ্য বংশাণুর পরিস্ফুটনে সহায়তা করে। মস্তিস্কের বাকি স্নায়ুগুলির যোগসূত্র সাধিত হয় জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিবেশের প্রভাবে । কিন্তু যে কথাটা মনে রাখা দরকার এবং যা অনেকেই উপলব্ধি করেননা সেটা হল যদিও বলা হচ্ছে যে জন্ম পরবর্তী মস্তিস্কের অভিব্যক্তি হয় পরিবেশের প্রভাবে কিন্তু এর আসল নিয়ামক হল বংশাণু। ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। একই পরিবেশীয় উদ্দীপক দুই ভিন্ন মস্তিস্কে একই ভাবে বা একই মাত্রায় বংশাণুর পরিস্ফুটন ঘটায় না। ঘুরিয়ে বললে, কোন বিশেষ পরিবেশীয় উদ্দীপকের চাপে মস্তিষ্ক কিভাবে প্রভাবিত হবে বা প্রতিক্রিয়া করবে তা সেই মস্তিষ্কের অধিকারীর বংশাণুর দ্বারাই নির্ধারিত হয়। তাই একই পরিবেশে বেড়ে উঠেও দুই ব্যক্তি ভিন্ন চরিত্রের অধিকারী হয়। এই সত্যটি খুব পরিস্কার ভাষায় লিখেছেন প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী উইলিয়াম ক্লার্ক তাঁর বই "Are We Hardwired?" (আমরা কি জন্মসূত্রে নিয়ন্ত্রিত?) এর ২০ পৃষ্ঠায় যেখানে তিনি মানুষের আচরণের তিনটি প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন :

> 'Naturally ocurring differences between individuals in the genes regulating any of these processes may well explain differences in the way different people react to the same external situation.'

(বিভিন্ন ব্যক্তির এই তিনটি প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী বংশাণুগুলির মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্যই ব্যাখ্যা দেয় কেন তারা একই পরিবেশের প্রভাবে ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে)।

যে তিনটি প্রক্রিয়ার কথা বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি হল : (১)পরিবেশের উদ্দীপক সম্পর্কে মস্তিস্কের ধারণা (২)সঞ্চিত স্মরণশক্তির সাহায্যে ঐ উদ্দীপকের প্রক্রিয়াকরণ এবং (৩) পরিবেশের উদ্দীপকরে প্রতিক্রিয়া ব্যক্তকরণ।

আর এক বিজ্ঞানী, এম.আই.টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক স্টিভেন পিঙ্কার তাঁর বই : "The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature' এর ১০২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

> 'স্নায়ুবিজ্ঞান এটাই বলছে যে, মস্তিস্কের মৌলিক বিকাশ ঘটে বংশাণুর নিয়ন্ত্রণে। মস্তিস্ক সমূহ তাদের নিজ নিজ জন্মগত পার্থক্যের সাক্ষর বহন করে, এক মস্তিস্ক অপর কোন মস্তিস্কের প্রতিনিধিত্ব কখনই করতে পারেনা'

আগেই উল্লেখ করেছিলাম যে মানুষের স্বভাব বিকাশে বংশাণুর প্রভাবই মুখ্য। এবং কোন কোন বৈশিষ্ট্য শুধু বংশাণুর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, পরিবেশের কোন প্রভাব এই বৈশিষ্ট্যতে পড়ে না। এর সমর্থন মেলে অভিন্ন যমজ পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে। উইলিয়াম ক্লার্ক তাঁর "Are We Hardwired?" এর ১৮-১৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে অভিন্ন যমজেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে লালিত হয়েও এক আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য প্রদর্শন করে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে ভিন্ন পরিবেশে অভিন্ন যমজদের মধ্যে সাদৃশ্য আনয়নে বংশাণুর ভূমিকা যমজ নয় এমন দুই ব্যক্তির মধ্যে সাদৃশ্য আনয়নে অভিন্ন পরিবেশের ভূমিকার চাইতে অনেক বেশী শক্তিশালী। স্টিভেন পিঙ্কারও তাঁর "How the Mind Works" (কেমন করে মস্তিস্ক কাজ করে) এর ২০ পৃষ্ঠায়

যমজদের মধ্যে মিলের বংশাণুগত কারণের উপর জোর দিয়েছেন। স্টিভেন পিঙ্কার তাঁর পূর্বোল্লিখিত "The Blank Slate' বইয়ের ৪৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন যে অভিন্ন যমজদের মধ্যে প্রাণদন্ড, ধর্ম ও অন্যান্য বিতর্কিত সামজিক বিষয়ে চিন্তাধারায় এক অদভূত মিল দেখা যায়। অন্যদিকে অসদ্ যমজ, যাদের বংশাণু ভিন্ন বা দুই ভাই/বোন যারা অভিন্ন পরিবেশে বেড়ে উঠে তাদের মধ্যে প্রায়ই দিন রাতের মত তফাত পরিলক্ষিত হয়।

সারকথা হল কোন কোন মানব বৈশিষ্ট্য বংশাণু দ্বারা নির্ধারিত, আর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি বংশাণু ও পরিবেশের যৌথ ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট। মানুষের স্বভাবের প্রবণতাগুলি বংশাণুর পরিস্ফুটনের ফল। হার্ভার্ড এর প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী এড্ওয়ার্ড উইলসন তাঁর "প্রকৃতির সন্ধানে" (In Search of Nature) বইয়ের ৮৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

> 'বংশাণু যে কোন বিশেষ আচরণ নির্ধারণ করবে এমনটি সব সময় নয়, বংশাণু যা করে তা হল কোন কোন আচরণের প্রবণতাকে সৃষ্টি করা, বিশেষ করে নির্দিষ্ট পরিবেশে ঐ প্রবণতাগুলিকে তৈরী করা।'

অনেক পরিবেশ নির্ণয়বাদীরা বলে থাকেন মানুষ জন্ম সূত্রে খারাপ নয়, খারাপ (সামাজিক) পরিবেশই তাকে খারাপ করে। এই উক্তিতে একটা অসঙ্গতি আছে। যদি কোন মানুষ খারাপ না হয় তাহলে সামাজিক পরিবেশ খারাপ হয় কি ভাবে? পরিবেশ ত মানুষেরই সৃষ্ট। আর সামাজিক পরিবেশ বলতে চারিপাশের মানুষকেই ত বোঝান হয়, নিশ্চয় গাছপালা নদনদী নয়। সামাজিক পরিবেশ ও মানুষের ক্ষেত্রে মুরগী আগে না ডিম আগে এই প্রশ্ন প্রযোজ্য নয়। সামাজিক পরিবেশ মানুষের সৃষ্টি। মানুষের সমন্বয়ে গঠিত। কাজেই পরিবেশের বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম তার গঠনকারী মানুষের বৈশিষ্ট্য বা ধর্মকেই প্রতিফলিত করে। এক অর্থে সামাজিক পরিবেশ হল কোন জনগোষ্ঠির সকল মানুষের মস্তিস্কের সমষ্টিগত ফল যা প্রত্যেক মস্তিস্কের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেহেতু মস্তিস্ক নিজে বংশাণুর দ্বারা নির্ধারিত হয়, তাই চূড়ান্ত বিচারে পরিবেশও ওই জনগোষ্ঠির বংশাণুসমষ্টির (Gene Pool) দ্বারা সৃষ্ট।

এড্ওয়ার্ড উইলসন তাঁর পূর্বোল্লিখিত "প্রকৃতির সন্ধানে" বইতে আরও লিখেছেনঃ

> পৃঃ ১০৭:
> "সংস্কৃতি একটি জীববৈজ্ঞানিক উৎপাদন।"
>
> পৃঃ ১১০:
> "মোদ্দা কথা, সংস্কৃতি জীববৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট আর বিবর্তিত হয় আবার জীববৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ফলে প্রভাবিত হয়।"

উইলসন একথাও উল্লেখ করেছেন যে বংশাণুই এপিজেনেটিক সূত্র নির্ধারণ করে। এপিজেনেটিক সূত্র হল কোন পরিবেশীয় উদ্দীপনে কোন স্নায়ু বর্তনী তৈরী হবে তার ফর্মূলা বা নিয়ম। অর্থাৎ মানুষের আচরণ বা

স্বভাবে পরিবেশের প্রভাব সত্য হলেও বংশাণুর হেরফের এর দরুন একই পরিবেশ বিভিন্ন মানুষকে ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে, যে কথাটি পূর্বেও উল্লেখ করেছি।

যদিও পরিবেশ জনগোষ্ঠির বংশাণুসমষ্টির দ্বারা সৃষ্ট, কিন্তু একথাটি জানা দরকার যে, সময়ও এখানে এক গুরুত্বপূর্ণ গুণক। বর্তমান পরিবেশ কেবল বর্তমান জনগোষ্ঠির বংশাণুসমষ্টিরই ফলশ্রুতি নয়, বিবর্তনেরও একটা ভূমিকা আছে এখানে। তাই সঠিক ভাবে বলতে হলে বর্তমান পরিবেশ হল সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত পরিবেশ ও জনগোষ্ঠির বংশাণুসমষ্টির সহ বিবর্তনের (Gene-Culture Coevolution) ফল।

এ প্রসংগে স্টিভেন পিঙ্কারের "The Blank Slate' এর ৬৯ পৃষ্ঠা থেক কিছু উদ্ধৃতি দেয়া যাকঃ

> "ইতিহাস ও সন্স্কৃতির ভিত্তি হতে পারে মনোবিজ্ঞান, যার ভিত্তি হতে পারে কলনবিজ্ঞান (Computation), স্নায়ুবিজ্ঞান, বংশাণুবিদ্যা ও বিবর্তনবিজ্ঞান। মানুষ তথা তাবৎ প্রাণীর সকল অংগই বিবর্তনের দ্বারা সৃষ্ট। মস্তিস্ক, যা কিনা সবচাইতে জটিল অংগ, তাও অবশ্যই বিবর্তনজাত। যেহেতু আচরণ বা স্বভাব মস্তিস্কের সাথে সংযুক্ত, মানব স্বভাব তাই চূড়ান্ত বিচারে বিবর্তন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আবার বিবর্তন নিয়ন্ত্রিত হয় বংশাণুর সঞ্চালন ও সংরক্ষণের জৈবিক তাড়নায়, পরিব্যক্তি আর প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে উপর থেকে নীচু স্তর পর্যন্ত কার্যকারণের একটা পূর্বাপর সম্পর্ক বিদ্যমান।"

পিঙ্কারের উপরের উক্তির সাথে আমি একটা মন্তব্য জুড়ে দিতে চাই সেটা হল, যে বংশাণুর সঞ্চালন ও সংরক্ষণের জৈবিক তাড়না আবার পদার্থবিজ্ঞানের বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

মানুষের স্বভাব সহজাত নয় এটা শেখান, পরিবেশ নির্ণয়বাদীদের এই উক্তিতে যে অসংগতি আছে সেটার ইঙ্গিত আগেই দিয়েছি। স্টিভেন পিঙ্কার 'The Blank Slate' এর ৪৪ পাতায় এ প্রসঙ্গে বলেনঃ

> "বুদ্ধিমত্তা, বৈজ্ঞানিক মেধা,যৌন প্রবণতা ও সহিংসতার প্রতি আসক্তি ইত্যাদি কখনই পুরোপুরি শেখান নয়।"

৫১ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন,

> 'স্নায়ুবিজ্ঞান ও বংশাণুবিদ্যা এই সত্যটিই তুলে ধরে যে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ের দায় বাবা মা বা সমাজের উপর সবসময় বর্তান যায় না। যদি শেখানর দ্বারা মানুষের স্বভাবকে প্রভাবিত করা যেত তাহলে মনোবিকারগ্রস্তদের নিরাময় করা যেত'।

কিন্তু পিঙ্কার যেমনটি বলেন ২৬৩ পৃষ্ঠায় "মনোবিকারগ্রস্তদের নিরাময় করা যায় না" শেখানর মাধ্যমে যে মানুষের কুস্বভাব পরিবর্তন করা যায়না সেই সত্যটির সমর্থন মেলে একটি বাস্তব ঘটনায় । ঘটনাটির উল্লেখ আছে পিঙ্কারের বইতেই, ২৬২ পৃষ্ঠায়। ঘটনাটি হল নর্মান মেইলার নামক পুলিতজার পুরস্কারপ্রাপ্ত একজন

লেখক জ্যাক এবট্ নামক এক বন্দীকে মুক্ত করতে সাহায্য করেন কারণ তাঁকে লেখা এবটের চিঠিগুলো পড়ে তিনি খুবই চমৎকৃত হয়েছিলেন, আর ঐ চিঠিগুলি তিনি তাঁর ১৯৮০ সালে লিখিত বই 'In the belly of the beast'তেও ছাপিয়েছিলেন। ছাড়া পাওয়ার পর এবট্ বেশ নামীদামী মহলে আপ্যায়িত হত, অনেক নৈশভোজেও আমন্ত্রিত হত। অথচ মাত্র দু সপ্তাহ পরে সে এক রেস্তোরার বেয়ারাকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে রেস্তোরার টয়লেট ব্যবহার নিয়ে কথাকাটাকাটির সময়!

পরিবেশ বা সংস্কৃতি নির্ণয়বাদীরা এই একটা যুক্তি প্রায়ই দেন যে যৌন অপরাধীরা নিজেরাও অতীতে যৌন অপরাধের শিকার হয়েছিল বলে যৌন অপরাধে লিপ্ত হয়। এটাও সবসময় সত্য নয়। জোন রজার্স তাঁর 'Sex: A Natural History' বইটিতে লিখেছেন যে বেশীর ভাগ শিশু যৌন নিপীড়নকারীদের নিজেদের জীবনে শিশু নিপীড়নের কোন ইতিহাস নেই বলেই প্রমাণ মেলে। বইটির ৪২৯ পৃষ্ঠায় তিনি বংশাণুবিজ্ঞানী ফ্রেড বার্লিনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলে যে বিকৃত যৌন আচরণ শেখান নয়, এটা জৈবিকভাবেই অঙ্কুরিত। অবশ্য তিনি এটাও বলতে ভুলেননি যে সমাজ যেন ঐ ধরণের অপরাধীদের অবশ্যই শাস্তি দেয় সমাজকে রক্ষা করার জন্যেই, কিন্তু একই সাথে ঐ আচরণকে বোঝার চেষ্টাও চালিয়ে যাওয়া থেকে বিরত না হয়ার আহ্বান জানান। পিঙ্কার তাঁর বইয়ের ৩১১ পৃষ্ঠায় বলেন যে কানাডীয়রা আমেরিকানদের মত একই টিভি শো দেখে কিন্তু কানাডায় অপরাধজনিত হত্যার হার আমেরিকার ১/৪ ভাগ মাত্র। এটা এই মতকেই নাকচ করে যে সহিংস আচরণ টিভি শো থেকে শেখা। পিঙ্কার আর একটা সাধারণ ধারণাকে প্রশ্ন করেন যেটা হল শিশুরা বেড়ে উঠার সময় বাহিরের প্ররোচণায় সহিংস আচরণ শেখে। তিনি ৩১৬ পৃষ্ঠায় এই যুক্তি দেন যে শিশুরা যূদ্ধ বা সহিংস খেলনার সাথে পরিচিত হবার অনেক আগেই সহিংস প্রবণতার লক্ষণ দেখায়। অন্যান্য অনেক ঘটনাও এই সাক্ষ্যই দেয় যে, মানুষের স্বভাব শেখার দ্বারা সৃষ্ট নয়। আমরা দেখি কিভাবে কোন কোন মানুষ ধার্মিক হয়ে যায় ধর্মশিক্ষা বা প্রচারণার অবর্তমানেই। আবার উলটোটাও দেখা যায়। হঠাৎ করেই ধর্মভীরু বা ধর্মান্ধ ব্যক্তি নাস্তিক বনে যায়।

একটা নিষ্ঠুর সত্য অনেক বাবা মাকেই মেনে নিতে হয় যে তাঁদের ছেলেমেয়েকে যতই শেখান হোক না কেন তারা সবসময় তাঁদের মনমত হয়ে তৈরী হয়না । যে শেখাটা তাদের বংশাণবিক প্রবণতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সেগুলিই তারা সহজে গ্রহণ বা আত্মীকরণ করে। যার বংসশাণবিক প্রবণতা শিল্পকলার প্রতি তাকে জোর করে চিকিৎসাবিদ্যা বা প্রকৌশলবিজ্ঞান শেখানর চেষ্টা ফলপ্রসূ না হবার সম্ভাবনাই বেশী।

এখন আসি কেন এখনও অনেকের মধ্যে এই স্বচ্ছ স্লেটের ধারণা বা চরম পরিবেশ নির্ণয়বাদের প্রতি আসক্তি দেখা যায় যদিও স্পষ্টত তা বিজ্ঞানের প্রমাণ ও সাক্ষ্যের পরিপন্থী সেই আলোচনায়। একটা কারণ হল তারা ভয় করেন যদি আচরণ বংশাণুনিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ, জন্মগতই হয় এটা স্বীকার করে নেয়া হয় তাহলে মানুষের কুকর্মের কোন জবাবদিহিত্ব থাকলনা। জন্মগত স্বভাবের দরুন কোন আচরণের জন্য মানুষকে দায়ী করা যাবে না, কারণ জন্মগত বৈশিষ্ট্যের উপর মানুষের কোন হাত নেই। কিন্তু এই চিন্তার একটা ত্রুটি হল যে একই কথা বলা যায় পরিবেশ নির্ণয়বাদের ক্ষেত্রেও। পরিবেশ ও ত ব্যক্তিবিশেষের আওতার বাইরে। পরিবেশ তৈরী হয় অনেক মানুষের সমন্বয়ে অনেক সময় ধরে। পরিবেশ নির্ণয়বাদীরা স্বাধীন ইচ্ছাকে পরিবেশের সাথে যুক্ত

করেন। কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে পরিবেশকে ত বদলান যায়না। আসলে যেটা তাঁরা ভুলে যান সেটা হল, পরিবেশ বা জন্ম যে কারণেই হোক অপরাধের শাস্তি বিধান ও জবাবদিহিত্ব থাকবেই সমাজকে রক্ষার জন্য, বিবর্তনের তাগিদেই। কাজেই তাদের এই ভয় অমূলক।

দ্বিতীয়ত, তাদের ভয় যে বংশাণবিক নিয়ন্ত্রণের সত্য স্বীকার করলে মানুষের মধ্যে অসাম্যকে মেনে নিতে হবে কারণ মানুষের বৈশিষ্ট্যের (মেধা, বল ইত্যাদি) উপর বংশাণূর প্রভাব সবার ক্ষেত্রে সমান নয়। এর ফলে সাম্যবাদ প্রচারে সমস্যা হতে পারে। কারণ সাম্যবাদের মূল স্বীকার্য্য হল সব মানুষই জন্মগতভাবে সমান। এই কারণেই মার্ক্স বংশাণুবিজ্ঞান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু মানুষে মানুষে সাম্য তাদের জন্মগত অভিন্নতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত করা ঝুঁকিপূর্ণ। বস্তুতঃ সাম্যতা বাহ্যিক কোন শর্তভিত্তিক হয়া উচিত নয়। এটাকে একটা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবেই গ্রহণ করা বাঞ্ছণীয়। কারণ বাহ্যিক শর্তগুলি পরিবর্তনশীল ও বিতর্কিত হতে পারে। যে কোন মতবাদ, সেটা সাম্যবাদই হোক বা অন্য কোন মতবাদই হোক তার মেধা নিজের গুনেই প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করা উচিত, অন্য কোন শর্তের উপর ভিত্তি করে নয়। বস্তুতঃ সব মানুষই জন্মগত ভাবে অভিন্ন না বলে বলা উচিত সব মানুষই জন্মগতভাবে সমান মানবাধিকারের অধিকারী। কিন্তু জন্মগতভাবে তাদের সব বৈশিষ্ট্যই সমান বা অভিন্ন এটা বলা বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল।

অপার্থিব : মুক্তমনার ফোরামের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অপার্থিব এর সাথে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা হিসেবে ও লেখক হিসেবে। পুরো নাম অপার্থিব জামান, তবে অপার্থিব নামেই লিখে থাকেন। বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য, যুক্তিবাদ অধিবিদ্যা তাঁর প্রিয় বিষয়। পদার্থবিদ্যার এই স্নাতক বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত। ইমেইল : aparthib@yahoo.com

সমকামিতা (সমপ্রেম) কি প্রকৃতিবিরুদ্ধ?

অভিজিৎ রায়

অনেকেই সমকামিতা নিয়ে বেজায় বিব্রত থাকেন। নাম শুনলেই আঁতকে উঠেন। কাঠমোল্লারা তো গালি দিয়ে খালাস- সমকামিরা হচ্ছে খচ্চর স্বভাবের, কুৎসিৎ রুচিপূর্ন, মানসিক বিকারগ্রস্ত। এমনকি প্রগতিশীলদের মধ্যেও রয়েছে নানা রকম ওজর আপত্তি। যারা শিক্ষিত, 'আধুনিক' শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন, গে লেজবিয়ন ইত্যকার তথাকথিত 'পশ্চিমা' শব্দের সাথে কমবেশি পরিচিত হয়েছেন, তারাও খুব কমই ব্যাপারটিকে মন থেকে 'স্বাভাবিক' বলে মেনে নিতে পারেন। তাদের অনেকেই এখনো ব্যাপারটিকে 'প্রকৃতি বিরুদ্ধ' মনে করেন, আর নয়ত ভাবেন - পুরো ব্যাপারটি উৎকট ধরনের ব্যাতিক্রমধর্মী কিছু, এ নিয়ে 'ভদ্র সমাজে' যত কম আলোচনা করা যায় ততই মঙ্গল। উপরে উপরে না বললেও ভিতরে ভিতরে ঠিকই মনে করেন সমকামীরা তো হচ্ছে গা ঘিন ঘিনে বিষ্ঠাকৃমি জাতীয় এঁদো জীব। মরে যাওয়াই মনে হয় এদের জন্য ভাল। সমাজ সভ্যতা রক্ষা পায় তাহলে।

আমি এই প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক দিক (মুলত জীববিজ্ঞান ও জেনেটিক্সের দৃষ্টিভঙ্গি) থেকে নির্মোহভাবে বিষয়টি আলোচনা করব। সামাজিক ও মনস্তাত্বিক ধ্যান-ধারণাগুলো আলোচনায় আসবে পরে, প্রবন্ধের শেষ দিকে। আমি নিজে সমকামী নই, কিন্তু সমকামী বন্ধু-বান্ধবদের জীবন প্রত্যক্ষ করার এবং এ নিয়ে কিছু পড়াশুনা করার ও লেখালেখি করার সুবাদে কিছু ধারনা অর্জন করেছি। আমার এ প্রবন্ধটি সে চিন্তাভাবনারই ফসল বলা যেতে পারে। পাঠক-পাঠিকাদের হয়ত এ প্রবন্ধ ভিন্নমাত্রার আবেদন তৈরি করবে বলে মনে করি। তবে, এ নিয়ে পাঠকদের ভিন্নমত থাকলে আমি তা সদরে পর্যালোচনা করতে, এবং যুক্তিনিষ্ঠ হলে তা গ্রহণ করতে রাজী। আমি প্রবন্ধটি শুরু করছি ভুল ভাবে ব্যবহৃত কিছু মন্তব্য দিয়ে, যা সমকামিতার বিরুদ্ধে প্রায়শই ব্যবহার করা হয় :

"সমকমীতা প্রাকৃতিক কোনোভাবেই হতে পারে না মূলত (নারী-পুরুষে) কামটাই প্রাকৃতিক"

কিংবা অনেকে এভাবেও বলেন -

"নারী আর পুরুষের কামই একমাত্র প্রাকৃতিক যা পৃথিবীর সকল পশু করে। যার মূল লক্ষ্য হলো বংশ বৃদ্ধি"

উক্তিগুলো স্রেফ উদাহরণ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। অনেকেই সমকামিতাকে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ' বা 'অস্বাভাবিক' হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্য উপরোক্ত ধরণের যুক্তির আশ্রয় নেন। আমি এই উক্তির পেছনের যুক্তিগুলো নিয়েই মূলতঃ আলোচনা করব।

আসলে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ' , 'অস্বাভাবিক', 'প্রাকৃতিক নয়' -এই ধরণের শব্দচয়ন করার আগে এবং তা ঢালাওভাবে তা প্রয়োগ করার আগে কিন্তু খোলা মনে পুরো বিষয়টি আলোচনার দাবী রাখে। এই বাংলাতেই এমন একটা সময় ছিল যখন বাল্যবিবাহ করা ছিল 'স্বাভাবিক' (রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম সহ অনেকেই বাল্যবিবাহ করেছিলেন) আর মেয়েদের বাইরে কাজ করা ছিল 'প্রকৃতি বিরুদ্ধ'। সয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মেয়েদের বাইরে কাজ করার বিপক্ষে একটা সময় যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন এই বলে -

> *'যেমন করেই দেখ প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। যদি প্রকৃতির সেরকম অভিপ্রায় না হত, তা হলে মেয়েরা বলিষ্ঠ হয়ে জন্মাতো। যদি বল, পুরুষদের অত্যাচারে মেয়েদের এই দুর্বল অবস্থা হয়েছে, সে কোন কাজেরই কথা নয়।'*

অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের যুক্তি এখন মানতে গেলে কপালে টিপ দিয়ে, হাতে দু-গাছি সোনার বালা পরে গৃহকোণ উজ্জ্বল করে রাখা রাবীন্দ্রিক নারীরাই সত্যিকারের 'প্রাকৃতিক', আর শত সহস্র আমিনা, রহিমারা যারা প্রখর রোদ্দুরে কিংবা বৃষ্টিতে ভিজে ইট ভেঙ্গে, ধান ভেনে সংসার চালাচ্ছে, কিংবা পোষাক শিল্পে নিয়োজিত করে পুরুষদের পাশাপাশি ঘামে শ্রমে নিজেদের উজার করে চলেছে - তারা সবাই আসলে 'প্রকৃতি বিরুদ্ধ' কুকর্মে নিয়োজিত - কারণ, 'প্রকৃতিই বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না'। বাংলাদেশের অখ্যাত আমিনা, রহিমাদের কথা বাদ দেই, আমেরিকার নাসা থেকে শুরু করে মাইনিং ফিল্ড পর্যন্ত এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে মেয়েরা পুরুষদের পাশাপাশি আজ কাজ করছেন না। তাহলে? তাহলে আর কিছুই নয়। নিজের যুক্তিকে তালগাছে তোলার ক্ষেত্রে 'প্রকৃতি' খুব সহজ একটি মাধ্যম, অনেকের কাছেই। তাই প্রকৃতির দোহাই পাড়তে আমরা 'শিক্ষিত জনেরা' বড্ড ভালবাসি। প্রকৃতির দোহাই পেড়ে আমরা মেয়েদের গৃহবন্দি রাখি, জাতিভেদ বা বর্ণবাদের পক্ষে সাফাই গাই, অর্থনৈতিক সাম্যের বিরোধিতা করি, তেমনি সময় সময় সমকামি, উভকামিদের বানাই অচ্ছুৎ। কিন্তু যারা যুক্তি নিয়ে একটু আধটু পড়াশোনা করেছেন তারা জানেন যে, প্রকৃতির দোহাই পাড়লেই তা যুক্তিসিদ্ধ হয় না। বরং প্রকৃতির কাঁধে বন্ধুক রেখে মাছি মারার অপচেষ্টা জন্ম দেয় এক ধরণের কুযুক্তি বা হেত্বাভাসের (logical fallacy)। ইংরেজীতে এই ফ্যালাসির পুথিগত নাম হল - 'ফ্যালাসি অব ন্যাচারাল ল বা অ্যাপিল টু নেচার '। এমনি কিছু 'অ্যাপিল টু নেচার' হেত্বাভাসের উদাহরণ দেখা যাক -

> *১। মিস্টার কলিন্সের কথাকে এত পাত্তা দেওয়ার কিছু নেই। কলিন্স ব্যাটা তো কালো। কালোদের বুদ্ধি সুদ্ধি একটু কমই হয়। কয়টা কালোকে দেখেছ বুদ্ধি সুদ্ধি নিয়ে কথা*

বলতে? প্রকৃতি তাদের পাঁঠার মত গায়ে গতরে যেটুকু বাড়িয়েছে, বুদ্ধি দিয়েছে সেই অনুপাতে কম। কাজেই তাদের জন্মই হয়েছে শুধু কায়িক শ্রমের জন্য, বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার জন্য নয়।

২। মারামারি, কাটাকাটি হানাহানি, অসাম্য প্রকৃতিতেই আছে ঢের। এগুলো জীবজগতের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। কাজেই আমাদের সমাজে যে অসাম্য আছে, মানুষের উপর মানুষের যে শোষণ চলে তা খারাপ কিছু নয়, বরং 'কম্পলিটলি ন্যাচারাল'।

৩। প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। যদি প্রকৃতির সেরকম অভিপ্রায় না হত, তা হলে মেয়েরা বলিষ্ঠ হয়ে জন্মাতো।

৪। সমকামিতা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। প্রকৃতিতে তুমি কয়টা হোমোসেক্সুয়ালিটির উদাহরণ দেখেছ?

এমনি উদাহরণ দেওয়া যায় বহু।

উপরের উদাহরণগুলো দেখলে বোঝা যায়, ওতে যত না যুক্তির ছোঁয়া আছে, তার চেয়ে ঢের বেশি লক্ষনীয় 'প্রকৃতি' নামক মহাস্ত্রকে পুঁজি করে গায়ের জোরে পাহাড় ঠেলার প্রবণতা। কাজেই বোঝা যাচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ট ষাঁড়দের স্বভাবজাত অ্যাপিল টু নেচার-এর শিকার হচ্ছে সমকামীরা। অনেক সময় সমকামিদের প্রতি সুপরিকল্পিত উপায়ে এবং সাংগঠিকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ঘৃণা। সমকামিতাকে একটা সময় দেখা হয়েছে মনোবিকার, মনোবৈকল্য বা বিকৃতি হিসেবে। সমকামিদের অচ্ছুৎ বানিয়ে এদের সংস্রব থেকে দূরে থাকার প্রবণতা অনেক দেশেই আছে। শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার তো আছেই, কখনো এদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে আত্মহননের পথে। আর এগুলোতে পুরোমাত্রায় ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে ধর্মীয় সংগঠন এবং রক্ষণশীল সমাজ। সমকামিদের প্রতি হিংসাত্মক মনোবৃত্তির কারণে ইংরেজীতে সৃষ্টি হয়েছে নতুন একটি শব্দ - হোমোফোবিয়া (Homophobia) । মানবাধিকারের দৃষ্টিকোন থেকে এটি নিতান্ত অন্যায়। মানবাধিকার এবং সমানাধিকারের প্রেক্ষাপট থেকে এগুলো নিয়ে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার আগে সমকামিতা বলতে আসলে কি বোঝায় তা আমাদের জানা দরকার।

সমকামিতার ইংরেজী প্রতিশব্দ হোমোসেক্সুয়ালিটি তৈরি হয়েছে গ্রীক 'হোমো' এবং ল্যাটিন 'সেক্সাস' শব্দের সমন্বয়ে। ল্যাটিন ভাষায়ও 'হোমো' শব্দটির অস্তিত্ব রয়েছে। তবে 'ল্যাটিন হোমো' আর 'গ্রীক হোমো' কিন্তু সমার্থক নয়। ল্যাটিনে হোমো অর্থ মানুষ। ওই যে আমরা নিজেদের হোমোস্যাপিয়েন্স ডাকি - তা এসেছে

ল্যাটিন ভাষা থেকে। কিন্তু গ্রিক ভাষায় 'হোমো' বলতে বোঝায় 'সমধর্মী' বা 'একই ধরণের'। আর সেক্সাস শব্দটির অর্থ হচ্ছে যৌনতা। কাজেই একই ধরনের অর্থাৎ, সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করার (যৌন)প্রবৃত্তিকে বলে হোমোসেক্সুয়ালিটি। আর যারা সমলিঙ্গের প্রতি এ ধরনের আকর্ষণ বোধ করেন, তাদের বলা হয় হোমোসেক্সুয়াল। সমকামিতার ইতিহাস প্রাচীন হলেও ইংরেজীতে শব্দটির ব্যাবহার কিন্তু খুব প্রাচীন নয়। একশ বছরের কিছু বেশি হল শব্দটি চালু হয়েছে। শুধু ইংরেজী কেন, ইউরোপের বিভিন্ন ভাষাতেও সমকামিতা এবং সমকামিতার বিভিন্নরূপকে বোঝাতে কোন উপযুক্ত শব্দ প্রচলিত ছিল না। বাংলায় 'সমকামিতা' শব্দটি এসেছে বিশেষণ পদ -'সমকামী' থেকে। আবার সমকামী শব্দের উৎস নিহিত রয়েছে সংস্কৃত 'সমকামিন' শব্দটির মধ্যে। যে ব্যক্তি সমলৈঙ্গিক ব্যক্তির প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করে তাকে 'সমকামিন' বলা হত। সম এবং কাম শব্দের সাথে ইন প্রত্যয় যোগ করে 'সমকামিন' (সম + কাম + ইন্) শব্দটি সৃষ্টি করা হয়েছে। আমার ধারণা সমকামিতা নামের বাংলা শব্দটির ব্যাবহারও খুব একটা প্রাচীন নয়। প্রাচীনকালে সমকামীদের বোঝাতে 'ঔপরিস্টক' শব্দটি ব্যবহৃত হত। যেমন, বাৎসায়নের কামসূত্রের ষষ্ঠ অধিকরণের নবম অধ্যায়ে সমকামীকে চিহ্নিত করতে 'ঔপরিস্টক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও পরবর্তীকালে এ শব্দের বহুল ব্যবহার আর লক্ষ্য করা যায় নি, বরং 'সমকাম' এবং 'সমকামী' শব্দগুলোই কালের পরিক্রমায় বাংলাভাষায় স্থান করে নিয়েছে। কেউ কেউ সমকামিতাকে আরেকটু 'শালীন' রূপ দিতে 'সমপ্রেম' শব্দটির প্রচলন ঘটাতে চান , অনেকটা ইংরেজীতে আজকের দিনে ব্যবহৃত 'গে' বা 'লেসবিয়ন' শব্দের মত।

এখন কথা হচ্ছে সমকামিতা কি জন্মগত নাকি আচরণগত? এটি বুজতে হলে আমাদের যৌনপ্রবৃত্তিকে বুঝতে হবে। আজকের দিনের মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যৌন-প্রবৃত্তির ক্যানভাস আসলে সুবিশাল। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ (বিষমকামিতা) যেমন দৃষ্ট হয়, তেমনিভাবেই দেখা যায় সম লিঙ্গের মানুষের মধ্যে প্রেম এবং যৌনাকর্ষণ। বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি এরা কোন যৌন-আকর্ষণ বোধ করে না, বরং নিজ লিঙ্গের মানুষের প্রতি এরা আকর্ষন বোধ করে। এদের যৌনরুচি এবং যৌন আচরণ এগুতে থাকে ভিন্ন ধারায় । ব্যাপারটি অস্বাভাবিক নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের বাইরে অথচ স্বাভাবিক এবং সমান্তরাল ধারায় অবস্থানের কারণে এধরনের যৌনতাকে অনেক সময় সমান্তরাল যৌনতা (parallel sex) নামেও অভিহিত করা হয়। সমান্তরাল যৌনতার ক্ষেত্র কিন্তু খুবই বিস্তৃত। এতে সমকামিতা যেমন আছে তেমনি আছে উভকামিতা, কিংবা দুটোই, এমনকি কখনো রূপান্তরকামিতাও। আমি আমার প্রবন্ধ মূলতঃ 'সমকামিতা' বিষয়েই সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করব, যদিও অন্যান্য যৌন-প্রবৃত্তিগুলো (যেমন রূপান্তরকামিতা)ও বিভিন্ন সময় আলোচনায় উঠে আসবে। আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা বলেন, সমকামিতা নিঃসন্দেহে যেমন আচরণগত হত পারে, তেমনি হতে পারে জন্মগত বা প্রবৃত্তিগত। যাদের সমকামী যৌনপ্রবৃত্তি জন্মগত, তাদের যৌন-প্রবৃত্তিকে পরিবর্তন করা যায় না, তা সে থেরাপি দিয়েই হোক, আর ঔষধ দিয়েই হোক। মানুষের মস্তিস্কে হাইপোথ্যালমাস নামে একটি অংগ রয়েছে, যা মানুষের যৌন প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে। সিমন লিভের শরীরবৃত্তীয় গবেষণা থেকে জানা গেছে এই হাইপোথ্যালমাসের interstitial nucleus of the anterior hypothalamus, বা সংক্ষেপে INAH3 অংশটি সমাকামিদের ক্ষেত্রে আকারে অনেক ভিন্ন হয়।

আরেকটি ইঙ্গিত পাওয়া গেছে ডিন হ্যামারের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে। ডিন হ্যামার তার গবেষণায় আমাদের ক্রোমোজমের যে অংশটি (Xq28) সমকামিতা ত্বরান্বিত করে তা শনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। এছারাও আরো বিভিন্ন গবেষণায় মনস্তাত্বিক নানা অবস্থার সাথে পিটুইটরি, থাইরয়েড, প্যারা-থাইরয়েড, থাইমাস, এড্রিনাল সহ বিভিন্ন গ্রন্থির সম্পর্ক আবিস্কৃত হয়। যদিও 'গে জিন' বলে কিছু এখনো আবিস্কৃত হয়নি, কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফলের অভিমুখ কিন্তু সেই দিকেই (আমি এদের গবেষণা নিয়ে পরে আরো আলোচনা করব)। এই ধরণের গবেষণা সঠিক হয়ে থাকলে বলতেই হয় সমকামী মনোবৃত্তি হয়ত অনেকের মাঝেই জন্মগত বা জেনেটিক, আরো পরিস্কার করে বললে, 'বায়োলজিকালি হার্ড-ওয়্যার্ড'। জন্মগত সমকামিরা 'বায়োলজিকালি হার্ড-ওয়্যার্ড' হলেও আচরণগত সমকামীরা তা নয়। এরা আসলে বিষমকামী। এরা কোন ব্যক্তিকে বিষমলিঙ্গের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে তাদের সাথে যৌন-সংসর্গে লিপ্ত হয়। যেমন, জেলখানায় দীর্ঘদিন আটকে থাকা বন্দীরা যৌনসঙ্গীর অভাবে সমলিঙ্গের কয়েদীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেত পারে। কিন্তু, জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলেই দেখা যায়, এদের আচরণের পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশের ক্যাডেট কলেজের ছেলেপিলেদের সম্পর্কেও এ ধরনের ধারণা প্রচলিত আছে। এই ধরণের যৌন প্রবৃত্তির বাইরেও আছে উভকামিতা, কিংবা আছে উভকামিতার সমকামিতা। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী আলফ্রেড কিন্সে এই ধরনের বিভিন্ন যৌনতাকে পরিমাপ করার জন্য ১৯৪৮ সালে 'যৌনতা বিষয়ক স্কেল' উদ্ভাবন করেন। এই স্কেলের এক প্রান্তে আছে পরিপূর্ণ বিষমকাম, অন্যপ্রান্তে পরিপূর্ণ সমকাম। দুই মেরুর মাঝামাঝি রিয়েছে বিভিন্ন পর্যায়- প্রধাণতঃ বিষমকাম, তবে প্রায়ই সমকাম; সমান সমান বিষমকাম এবং সমকাম; প্রধানত সমকাম তবে প্রায়ই বিষম কাম; প্রধাণত সমকাম, তবে মাঝে মধ্যে বিষমকাম ইত্যাদি। কিন্সের এ স্কেল নিয়ে কিছু বিতর্ক থাকলেও এটি অন্ততঃ বোঝা যায় যে, আমাদের যৌন-প্রবৃত্তির ক্যানভাস আসলে খুবই বিস্তৃত, এবং যৌন প্রবৃত্তি একইভাবে সকলের মাঝে ক্রিয়াশীল হয় না।

যৌন প্রবৃত্তি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রাসঙ্গিকভাবেই সেক্স বা যৌনতার উদ্ভব নিয়ে কিছু না কিছু বলতে হয়। রিচার্ড ডকিন্সের ' বিবর্তনীয় স্বার্থপর জিন' (selfish gene) তত্ত্ব সঠিক হয়ে থাকলে বলতেই হবে যৌনতার উদ্ভব নিঃসন্দেহে প্রকৃতির একটি মন্দ অভিলাস (bad idea)। কারণ দেখা গেছে অযৌন জনন (asexual) প্রক্রিয়ায় জিন সঞ্চালনের মাধ্যমে যদি বংশ বিস্তার করা হয় (প্রকৃতিতে এখনো অনেক এককোষী জীব, কিছু পতংগ, কিছু সরিসৃপ এবং কিছু উদ্ভিদ- যেমন ব্ল্যাক বেরি অযৌন জনন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে থাকে) তবে বাহকের পুরো জিনটুকু অবিকৃত অবস্থায় ভবিষ্যত প্রজন্মে সঞ্চালিত করা যায়। কিন্তু সে বাহক যদি যৌন জননের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে থাকে, তবে তার জিনের অর্ধেকটুকুমাত্র ভবিষ্যত প্রজন্মে সঞ্চালিত হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে বংশবিস্তার করলে এটি বাহকের জিনকে ভবিষ্যত প্রজন্মে স্থানান্তরিত করবার সম্ভাবনাকে সরাসরি অর্ধেকে নামিয়ে আনে। এই অপচয়ী প্রক্রিয়ার আসলে কোন অর্থই হয় না। কারণ, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মুল নির্যাসটিই হল - প্রকৃতি টিকে থাকার ক্ষেত্রে তাদেরকেই বাড়তি সুবিধা দেয় যারা অত্যন্ত ফলপ্রসু ভাবে নিজ জিনের বেশি সংখ্যক অনুলিপি ভবিষ্যত প্রজন্মে সঞ্চালিত করতে পারে। সে হিসাবে কিন্তু অযৌন জননধারীরা (আমরা

এখন থেকে এদের 'অযৌনপ্রজ' নামে ডাকব) বহু ধাপ এগিয়ে আছে যৌনধারীদের (এদের ডাকব 'যৌনপ্রজ' নামে) থেকে।

কারণ অযৌনপ্রজদের যৌনপ্রজদের মত সময় নষ্ট করে সঙ্গী খুজে জোড় বাঁধতে হয় না। সংগম করে করে শক্তি বিনষ্ট করতে হয় না। নিজের বা সঙ্গির বন্ধ্যাত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। বুড়ো বয়সে ভায়াগ্রা সেবন করতে হয় না। কিংবা সন্তানের আশায় হুজুর সাঈদাবাদীর কাছে ধর্ণা দিতে হয় না। যথাসময়ে এমনিতেই তাদের বাচ্চা পয়দা হয়ে যায়। কিভাবে? আমরা এখন যে ক্লোনিং -এর কথা জেনেছি, এদের প্রক্রিয়াটা অনেকটা সেরকম। এক ধরনের 'প্রাকৃতিক ক্লোনিং' এর মাধ্যমে এদের দেহের অভ্যন্তরে নিষেক ঘটে চলে অবিরত। ফলে কোন রকম শুক্রানুর সংযোগ ছাড়াই দেহের ডিপ্লয়েড ডিম্বানুর নিষেক ঘটে চলে। জীববিজ্ঞানে এর একটি গালভরা নাম আছে - পার্থেনোজেনেসিস (Parthenogenesis)।

কাজেই পার্থেনোজেনেসিস নামধারী অযৌনপ্রজরা সত্যিকার অর্থেই অপারাজেয়, অন্ততঃ যৌনপ্রজদের তুলনায়। এদের কোন পুরুষ সঙ্গীর দরকার নেই। সবাই এক এক জন মাতা মরিয়ম - সয়ম্ভু যীশু উৎপাদনে পারঙ্গম। যৌনপ্রজরা যে সময়টা ব্যয় করে সংগি খুঁজে তোষামোদ, আদর সোহাগের পশরা খুলে ধুঁকতে ধুঁকতে জিন সঞ্চালন করে, সে সময়ের মধ্যে অযৌনপ্রজরা গন্ডায় গন্ডায় বাচ্চা পয়দা করে ফেলতে পারে - এবং বাইরের কারো সাহায্য ছাড়াই। ফলে 'স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে' এরা বাড়তে থাকে গুনোত্তর হারে। নীচে এরকম একটি অযৌনপ্রজ প্রজাতি "হুইপটেল গিরগিটি"র ছবি দেওয়া হল।

চিত্রঃ হুইপ্টেল গিরগিটি - অযৌনপ্রজ প্রজাতির হার্টথ্রব। এদের বংশবিস্তারের জন্য কোন পুরুষ সঙ্গির প্রয়োজন নেই।

মজার ব্যাপার হল এই হুইপটেল গিরগিটিকূলের সবাই মহিলা, আর তা হবে নাই বা কেন! তাদের ত কোন পুরুষ শয্যাসংগীর দরকার নেই। পুরুষেরা তাদের জন্য 'বাহুল্যমাত্র'। কিন্তু তারপরও তাদের মধ্যে সেক্স-

সদৃশ একধরনের ব্যাপার ঘটে। দেখা গেছে এক গিরগিটি আরেক গিরগিটিকে যদি জড়িয়ে ধরে রাখে তাহলে তাদের ডিম পাড়ার হার বেড়ে যায় । প্রকৃতির সমকামী প্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! তাই জীববিজ্ঞানী জোয়ান রাফগার্ডেন আমেরিকার দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলে দেখতে পাওয়া এই গিরগিটিগুলোকে 'লেজবিয়ন লিজার্ড' হিসেবে তার 'ইভল্যুশনস রেইনবো' বইয়ে উল্লেখ করেছেন। আমাদের কাছে যত অস্বাভাবিক বা প্রকৃতিবিরুদ্ধই মনে হোক না কেন, হুইপটেল গিরগিটি বা এ ধরনের সরিসৃপদের কাছে কিন্তু এটি অতি স্বাভাবিক ঘটনা, এবং এরা এভাবেই প্রকৃতিতে টিকে আছে, এবং টিকে আছে খুব ভালভাবেই। ২০০৬ সালে সরিসৃপকুলের আরেক প্রজাতি কমোডো ড্রাগন (Komodo Dragon) কোন পুরুষসঙ্গী ছাড়াই লন্ডনের চিড়িয়াখানায় বাচ্চা পয়দা করে রীতিমত আলোড়ন ফেলে দেয় ।

বিজ্ঞানীরা ২০০১ সালে নেব্রাস্কার ডুরলি চিরিয়াখানার হাতুরীমুখো হাঙ্গরেরও (Hammerhead shark) প্রজনন লক্ষ্য করেছেন কোন পুরুষসঙ্গির সাহায্য ছারাই। এগুলো সবই পার্থেনোজেনেসিস-এর খুবই স্বাভাবিক উদাহরণ। পার্থেনোজেনেসিসের আরো ভাল উদাহরণ খুঁজতে চাইলে বাংলাদেশের খোদ ঢাকা শহরের ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় চলে যেতে পারেন। শুনেছি, আঁশ পোকা নামে এক বদখদ পোকায় নাকি ছেয়ে গেছে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার গাছপালা। ক্যান্টনমেন্টের বাসিন্দারা রীতিমত আস্থির। প্রথম আলোতে এ নিয়ে রিপোর্ট পর্যন্ত হয়েছিল। বংশবৃদ্ধির জন্য এ পোকার কোন পুরুষ লাগে না, মাদী পোকাটি একাই হাজারে হাজার ডিম পেড়ে পঙ্গপালের মত বংশবৃদ্ধি করে আর আশেপাশের গাছপালাগুলোকে ছিবড়া বানিয়ে ফেলে।

আরো কিছু মজার উদাহরণ দেওয়া যাক। উত্তর আমেরিকার সমুদ্রোপুকূলে এক ধরনের ক্ষুদ্র প্রাণি খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এরা আটলাণ্টিক স্লিপার শেল (Atlantic Slipper Shell) নামে পরিচিত। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এরা হল ক্রিপিডুলা ফরমিক্যাটা (crepidula formicata)। এই প্রজাতির পুরুষেরা একা একা ঘুরে বেড়ায়। তারপর তারা কোন স্ত্রী সদস্যদের সংস্পর্শে আসে এবং সংগমে লিপ্ত হয়। যৌন সংসর্গের ঠিক পর পরই পুরুষদের পুরুষাংগ খসে পড়ে এবং এরা রাতারাতিও স্ত্রীতে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরের পর এরা আর একাকী ঘুরে বেড়ায় না, বরং স্থায়ী হয়ে বসবাস করতে শুরু করে। প্রকৃতিতে পুরুষ থেকে নারীতে পরিনত হবার এ এক বিচিত্র দৃষ্টান্ত। ক্রিপিডুলা নিয়ে গবেষণায় বেড়িয়ে এসেছে আরো নানা ধরনের বিচিত্র তথ্য। বিজ্ঞানীরা এই এই প্রজাতির একটি সদস্যকে খুব ছোট অবস্থায় অন্য সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। এবার পরীক্ষা চালিয়ে দেখা যায়, এর মধ্যে স্ত্রী জননাঙ্গের বিকাশ ঘটতে শুরু করেছে। কিন্তু যদি একে কোন পরিণত ক্রিপিডুলার সাথে রাখা হয়, তবে সে ধীরে ধীরে পুরুষে রূপান্তরিত হরে থাকে।

উত্তর আমেরিকার ওই একই অঞ্চলের 'ক্লিনার ফিশ' নামে পরিচিত এক ধরনের মাছের মধ্যে গবেষণা চালিয়ে রূপান্তরকামীতার পরিস্কার প্রমাণ পেয়েছেন। এ মাছগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম ল্যাবারিডেস ডিমিডিয়াটাস (Laborides dimidiatus)। এ প্রজাতির পুরুষেরা সাধারণতঃ পাঁচ থেকে দশজন স্ত্রী নিয়ে ঘর বাঁধে (নাকি 'হারেম বাঁধে' বলা উচিৎ?)। কোন কারণে পুরুষ মাছটি মারা পড়লে স্ত্রীদের মধ্যে যে কোন একজন (সম্ভবতঃ সবচেয়ে বলশালী জন) সংসার পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এই দায়িত্ব গ্রহনের পর থেকেই ওই স্ত্রীমাছটির মধ্যে দৈহিক পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। দু সপ্তাহের মধ্যে সে

পরিপূর্ণ পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে যায় (তার গর্ভাশয় ডিম্বানু উৎপাদন বন্ধ করে দেয়, এবং নতুন করে পুরুষাংগ গজাতে শুরু করে) এবং এবং অন্যান্য স্ত্রী মাছদের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে স্ত্রী থেকে পুরুষে রূপান্তরের এও একটি মজার দৃষ্টান্ত। রূপান্তরকামীতার উদাহরণ আছে এনিমোন (anemone) বা 'ক্লাউন মাছ'দের (Clown Fish) মধ্যেও। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন সামুদ্রিক প্রবাল প্রাচীরের কাছাকাছি বেড়ে ওঠা মাছদের মধ্যে পরিবেশ এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী যৌনতার পরিবর্তন অতি স্বাভাবিক ঘটনা। মানুষের মধ্যেও রূপান্তরকামীতার অস্তিত্ব আছে। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার পুরুষ রূপান্তরকামী জরগেন্সেনের লেখা "Christine Jorgensen: A Personal Autobiography" বইটির কথা বলা যায়। ক্রিস্টিন জরগেন্সেনের আগের নাম ছিল জর্জ জরগেন্সেন। তিনি সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন। তিনি নিজেকে নারী ভাবতেন। তার রূপান্তরকামী মানসিকতার জন্য চাকরী চলে যায়। পরে ১৯৫২ সালে অস্ত্রপ্রচারের মাধ্যমে তিনি নারীতে রূপান্তরিত হন। এ ধরনের অজস্র ঘটনার উদাহরণ হাজির করা যায়। উদাহরন দেওয়া যায় প্রখ্যাট জীববিজ্ঞানী জোয়ান রাফগার্ডেনের। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান বিভাগের এ অধ্যাপক ৫২ বছর বয়সে পুরুষ থেকে নারীতে (জনাথন রাফগার্ডেন থেকে জোয়ান রাফগার্ডেনে) রূপান্তরিত হন। ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায়, জোয়ান অব আর্ক থেকে শুরু করে আজকের বাস্কেটবল লিজেন্ড ডেনিস রডম্যান সহ অনেকের মধ্যেই যুগে যুগে রূপান্তর প্রবণতা বিদ্যমান ছিল এবং এখনো আছে। এগুলোর পেছনে সামাজিক ও মনস্তাত্বিক কারণকে অস্বীকার না করেও বলা যায় - এ ধরনের চাহিদা বা অভিপ্রায় প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়। আর সে জন্যই, প্রখ্যাত রূপান্তরকামী বিশেষজ্ঞ হেনরী বেঞ্জামিন বলেন, আপাত পুরুষের মধ্যে নারীর সুপ্ত সত্তা বিরাজমান থাকতে পারে। আবার আপাত নারীর মধ্যে পুরুষের অনেক বৈশিষ্ট্য সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। তিনি বলেন - "Every Adam contains the element of Eve and every Eve harbors traces of Adam, physically as well as psychologically."

উপরের আলোচনা থেকে নিশ্চয় বোঝা যাচ্ছে, যৌনতার ক্যানভাস আসলে সুবিশাল। এখানে এখানে বিষমকামতা যেমন আছে, তেমনি আছে সমকামিতা, উভকামিতা, উভকামের সমকামিতা কিংবা রূপান্তরকামিতা। এ যৌনপ্রবৃত্তিগুলোকে ঢালাওভাবে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ' অভিধায় অভিহিত করার আগে আমাদের আরেকটিবার চোখ মেলে প্রকৃতির দিকে তাকানো উচিৎ। এরপর সামগ্রিকভাবে বোঝা উচিৎ যৌনতার উদ্ভবকে। প্রানীজগতের একেবারে গোড়ার দিকে কিছু পর্ব হল - প্রটোজোয়া, পরিফেরা, সিলেনটেরেটা, প্লাটিহেলমিনথিস, অ্যানিলিডা, মোলাস্কা ও কর্ডাটা। এই সমস্ত প্রাণিদের বেশিরভাগই উভলিংগ বা হার্মাফ্রোডাইট (Hermaphrodite), কারণ এদের শরীরে স্ত্রী ও পুরুষজননাঙ্গের সহবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এদের জন্য উভলিঙ্গত্ব কোন শারীরিক ত্রুটি নয়, বরং এটি পুরোপুরি 'প্রাকৃতিক'। এরা এদের উভলিঙ্গত্ব নিয়েই স্বাভাবিক বংশবিস্তারে সক্ষম। অর্থাৎ, যে যৌনতার বিভাজনের জন্য আমরা যৌনপ্রজরা আজ গর্ববোধ করি, অবলীলায় অন্যদের 'অ্যাবনরমাল', 'আননেচারাল'-এর তকমা এঁটে দেই- গোড়ার দিকে কিন্তু প্রকৃতিতে যৌনতার সেরকম কোন সুস্পষ্ট বিভেদ ছিল না। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, মানব সমাজেও উভলিঙ্গত্ব বিরল নয়। প্রাচীন গ্রীসে সমকামিতা, প্রাচীন রোমে খোজা প্রহরী (eunuch), নেটিভ ইন্ডিয়ানদের মধ্যে 'দ্বৈত সত্তা' (two-spirits), আরব ও পার্সিয়ায় 'বার্দাজ' এবং ভারতবর্ষে 'হিজরা'দের

অস্তিত্ব সেই সাক্ষ্যই দেয়। পশ্চিমা বিশ্বে শেরিল চেজ, এরিক শেনিগার, জিম সিনক্লায়ারের মত ইন্টারসেক্স -সেলিব্রিটিরা বহাল তবিয়তে বাস করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ ষাঁড়েরা এদের অনেককেই 'অস্বাভাবিক' হিসবে চিহ্নিত করবেন। আমরা বরং এখন 'স্বাভাবিক' মানুষদের কথা বলি ।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, বিবর্তনের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় আমরা গর্বিত 'স্বাভাবিক' মানুষেরাও নিজেদের দেহেই উভলিঙ্গত্বের বহু আলামত বহন করে চলেছি - নিজেদের অজান্তেই। যেমন, নারী জননাংগ পুরুষের মত না হলেও, পুরুষের শিশ্নের অনুরূপ একটি ক্ষুদ্র ও অত্যন্ত সংবেদনশীল অঙ্গের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়, যাকে ভগাংগুর বা ক্লাইটোরিস বলে। আবার অন্যদিকে পুরুষ শরীরে স্ফীত স্তন না থাকলেও স্তন ও স্তনবৃন্তের সুপ্ত উপস্থিতি সব সময়ই লক্ষ্যনীয়। বলাবাহুল্য, বংশবিস্তারে এসমস্ত অংগের কোন ভূমিকা নেই, তবুও আমরা এসমস্ত 'এবনরমালিটি' বহন বহন করে চলেছি 'প্রাকৃতিক ভাবেই' - বিবর্তনের পথ ধরে। আরো কিছু উদাহরণ দেই। পুরুষ শরীরের থেকে ব্যাপক পরিমানে অ্যান্ড্রোজেন (androgen) যেমন নিঃসৃত হয়, তেমনি অল্প পরিমানে হলেও এস্ট্রোজেন (estrogen) নিঃসৃত হয়ে থাকে। এই এস্ট্রোজেন 'স্ত্রী হরমোন' হিসেবে পরিচিত। ঠিক তেমনি, মেয়েরা স্ত্রী হরমোন নিঃসরণের পাশাপাশি সামান্য পরিমানে হলেও পুরুষ হরমোনও নিঃসরণ করে থাকে। এইভাবে বিপরীত লিঙ্গের অনেককিছুই আমরা প্রাণের উৎপত্তির ঊষালগ্ন হতে ধারণ করে চলেছি - এবং তা প্রাকৃতিকভাবেই। শুধু মানুষ কেন অনেক প্রানীর মধ্যেই এমনটি লক্ষ্যনীয়। আফ্রিকার নিশাচর মাংশাসী স্পটেড হায়নাদের কথা বলা যায়, যাদের নারী সম্প্রদায়কে দেখলে পুরুষ বলেই বিভ্রম হবার কথা। সায়েন্টেফিক আমেরিকানের জানুয়ারী ২০০৪ সংখ্যায় লেখা হয়েছে - "The large erectile clitoris of a female spotted Hyena closely resembles a male's penis. Much like many male animals, female spotted hyenas use their clitorises in greeting displays and dominance interactions". এ ধরনের 'পুরুষাংগ সদৃশ' দীর্ঘ ভগাংগুর শুধু স্পটেড হায়নাদের মধ্যে নয়, আছে কাঠবিড়ালী সদৃশ নিশাচর প্রাইমেট 'বুশ বেবী' এবং 'স্পাইডার মাঙ্কি' এবং 'উলি মাঙ্কি'র মধ্যেও। আবার বিপরীতটাও (মেয়েদের মত যৌনাংগ) দুর্লভ নয়। পুরুষ ডলফিন এবং তিমিদের ক্ষেত্রে চোখে পড়ার মত কোন 'বহিস্থ পুরুষাংগ' দেখা যায় না। এই জলজ স্তন্যপায়ীদের (Cetaceans) কোন অণ্ডাশয়ও নেই।

আবারো যৌনপ্রজ এবং অযৌনপ্রজদের গল্পে ফিরে যাই। বিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে যৌনপ্রজদের যাবতীয় কাজ-কর্ম যে বিধ্বংসী রকমের অপচয়ী তা আগেই উল্লেখ করেছি। মানুষের কথাই ধরা যাক। একটি সুস্থ 'যৌনপ্রজ' দম্পতি তাদের দীর্ঘ জীবনে গড়ে প্রতি সপ্তাহে একবার করে পঞ্চাশ বছর ধরে সঙ্গম করে থাকে। কিন্তু সে হিসেবে তাদের বাচ্চা কাচ্চার সংখ্যা থাকে নিতান্তই নগন্য - দুইটি কি তিনটি। উন্নত বিশ্বে এখন এমন দম্পতিও আছে যারা বাচ্চা কাচ্চা একেবারেই নেয় না। সে সব দেশে জন্মহার এখন পড়তির দিকে। কাজেই যৌনতার 'একমাত্র' উদ্দেশ্য যদি কেবল পরবর্তী প্রজন্মে 'জিন সঞ্চালন' হয়ে থাকে, তবে বলতেই হয় এই আনাড়ি পদ্ধতিটি নিসন্দেহে একটি 'অকর্মার ধাড়ি'। শুধু মানুষ নয়, হাতী, গরিলা, শুয়োর, ঘোড়াদের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তারা যৌন সংসর্গে যে পরিমানে সময় ও শক্তি

ব্যয় করে সে তুলনায় ভবিষ্যত প্রজন্ম তৈরি করতে পারে একদমই কম। সারা জীবনের নব্বইভাগ যৌনসংসর্গেই কোন ধরনের অযাচিত প্রেগনেন্সির ভয় থাকে না। আর সমকামিতার উদাহরণ হাজির করলে তো সেক্সের মূল উদ্দেশ্যকেই প্রশ্নবিদ্ধ করতে হয়। সেক্সের একমাত্র উদ্দেশ্য যদি কেবল ভবিষ্যত প্রজন্ম টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে 'জিন সঞ্চালন' হয়ে থাকে, তবে সমকামীরা নিঃসন্দেহে "বায়োলজিকাল ডেড এন্ড"-এ। আর অনেক বিবর্তনবাদীরাই সেজন্য খুব যান্ত্রিকভাবে ডারউইনবাদকে সমকামিতার বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। আর এমন সমস্ত 'যুক্তি' উপস্থাপন করা শুরু করেন যখন মনে হয় তাদের জায়গা ওই ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের সাথে একই বিছানায়! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওই 'যান্ত্রিক' ডারউইনবাদীরা সেক্সুয়াল সিলেকশন বা যৌন-নির্বাচনের ধুঁয়া তুলে সমকামিতাকে অস্বীকার করেন, কিংবা বলার চেষ্টা করেন এরা প্রকৃতির এক ধরনের বিচ্যুতি (aberration)। ভাবখানা যেন, ওই দু'চারটা সমকামিদের নিয়ে অতটা চিন্তা আমাদের না করলেও চলবে!

কিন্তু সত্যই কি তাই? তারা সমকামিদের সংখ্যা 'দু-চারটি' বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেও বাস্তবতা কিন্তু ভিন্ন। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী আলফ্রেড কিন্সের রপোর্ট অনুযায়ী প্রতি দশ জন ব্যক্তির একজন সমকামী । অর্থাৎ, জনসংখ্যার শতকরা প্রায় দশভাগই ওই যান্ত্রিক ডারউইনবাদীদের আভিলাসে ছাই দিয়ে অর্থাৎ জীন সঞ্চালনের 'মহৎ' প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করে টিকে আছে। কিন্সের গবেষণা ছিল সেই চল্লিশের দশকে। সাম্প্রতিক কালে (১৯৯০) ম্যাকহুটার এবং স্টেফানি স্যান্ডার্স এবং জুন ম্যাকহোভারের গবেষনা থেকে জানা যায়, পৃথিবীতে শতকরা প্রায় চোদ্দ ভাগের মত সমকামি রয়েছে । ১৯৯৩ সালে 'জেনাস রিপোর্ট অন সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার' থেকে জানা যায়, পুরুষদের মধ্যে প্রায় শতকরা নয় ভাগ এবং মহিলাদের মধ্যে শতকরা ৪ ভাগ সমকামি রয়েছে । কাজেই সংখ্যা হিসেবে সমকামিদের সংখ্যাটা কিন্তু এ পৃথিবীতে কম নয়। সায়েন্টিফিক আমেরিকান মাইণ্ড-এর ২০০৬ এর একটি ইস্যুতে সমকামীদের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার ৩ থেকে ৭ ভাগ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ কথা বলতেই হবে, পরিসংখ্যানগুলোর পরিসীমা একে অন্যের খুব কাছাকাছি (মোটামুটি ৫-১৫ ভাগ) হলেও কোনটাই হয়ত প্রকৃত অবস্থা নির্দেশ করছে না। কারণ সামাজিক একটা চাপ সবসময়ই থেকে যায় সমকামিতাকে নিরুৎসাহিত করে বিষমকামিতাকে উৎসাহিত করার। অনগ্রসর সমাজে এই চাপ আরো প্রবল। ফলে অনেক সময়ই দেখা যায় সমাজের চাপে একজন প্রকৃত সমকামি বিষমকামী হয়ে জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। স্বামী কিংবা বউ বাচ্চা নিয়ে সংসার করছেন। এদের বলা হয় নিভৃত সমকামী (closet gay)। বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত মানবাধিকার কর্মীর কথা জানি যিনি নিভৃত সমকামী হয়ে তার স্ত্রীর সাথে বিবাহিত জীবনযাপন করছেন।

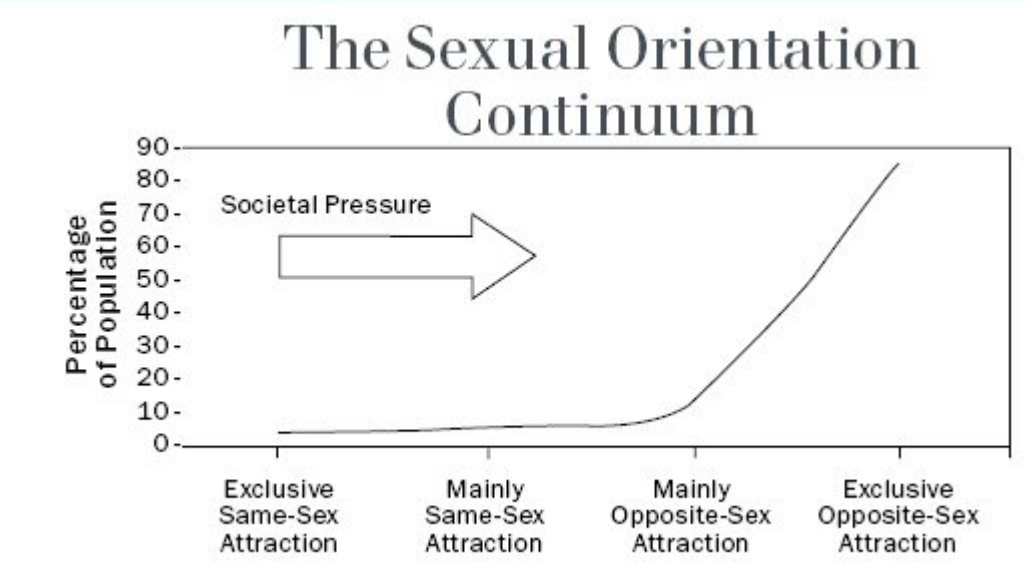

চিত্র : আমাদের সমাজে সবসময়ই একটা চাপ থাকে সমকামীদের নিরুৎসাহিত করে বিষমকামের দিকে ঠেলে দেওয়ার।

আরেকজন 'বিবাহিত সমকামীর' কথা পড়েছিলাম একটি কেস স্টাডিতে। উনি দিল্লিতে বসবাসরত দন্ত চিকিৎসক। নাম রমেশ মন্ডল। নিজে সমকামী। কিন্তু পারিবারিক চাপে পড়ে তাঁকে একসময় বিয়ে করতে হয়। কিন্তু স্ত্রীর সাথে তার সম্পর্ক স্রেফ যান্ত্রিক। তিনি তার যৌনচাহিদা নিরসন করেন গোপনে তার এ সমকামী বন্ধুর সাথে। কখনো-সখনো জব্বলপুর, কোলাপুরে চলে যান। তার স্ত্রী আজো এ ব্যাপারটি জানেন না। সম্পূর্ন মিথ্যার উপরে দাঁড়িয়ে আছে রমেশের দাম্পত্য জীবন। আরেক সমকামি ভদ্রলোক নীতিন দেশাই স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে প্রায়ই চলে যান মুম্বই-এর চৌপাট্টির সমুদ্র সৈকতে। কারণ সহজেই অনুমেয়।

অনেক পাঠক হয়ত পাকিস্তানী সমকামী কবি ইফতি নাসিমের ব্যক্তিগত জীবনের সমপ্রেমের মর্মন্তুদ কাহিনী জানেন। কবি নাসিম ছোটবেলা থেকেই তার সমবয়সী একটি ছেলের সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। তারপর দুই কিশোর কৈশোরকাল অতিক্রম করে বড় হলো। পড়াশুনার পাঠ চুকিয়ে তারা তখন প্রতিষ্ঠিত হবার পথে। তখন স্বাভাবিকভাবেই বাসা থেকে এল বিয়ের চাপ। এমন কি ইফতির বন্ধুটির বাসার লোকজন মেয়ে টেয়ে দেখে তার বিয়ে পর্যন্ত ঠিক করে ফেলল। ইফতির বন্ধু সেদিন তার সমকামী মানসিকতার কথা বাসায় খুলে বলতে পারেন নি। আর তাছারা পাকিস্তানী গোড়া মুসলিম সমাজে বড় হবার কারনে সমাকামিদের প্রতি ঘৃণাউদ্রেককারী কোরাণের আয়াতগুলোর কথাও তার ভালই জানা ছিলো। ফলে যা হবার তাই হল। বেশ ধূম ধাম করে বিয়ে হল ওই বন্ধুর। সে বিয়েতে ইফতিও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং হাজিরও ছিলেন। ফুলশয্যার রাতে বন্ধুর বাড়িতে ইফতি ছিলেন। যে মানুষটির সাথে তার এতদিনের প্রেমের সম্পর্ক, সে মানুষটি সমাজের চাপে পড়ে এক অচেনা নারীর বাহুলগ্ন হবেন, এ চিন্তা তাকে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলল - 'আজকে রাতে তুমি অন্যের হবে, ভাবতেই চোখ জলে ভিজে যায়'! সারা রাত তিনি ঘুমাতে পারলেন না। এ পাশ ও পাশ করে কাটালেন। শেষ রাতে হঠাৎ দরজায় ধাক্কা। হুড়মুড় করে বিছানায় উঠে বসলেন ইফতি। দরজা খুলে ইফতি দেখলেন- অসহায়ভাবে বাইরে তার বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনেই নির্বাক।

শুধু বাংলাদেশ, ভারত বা পাকিস্তানে কেন, খোদ আমেরিকাতেও একই অবস্থা। জেমস ম্যাকগ্রিভি তাঁর নিভৃত সমকামের কথা স্বীকার করে নিউজার্সির গভর্নর পদ থেকে পদত্যাগ করেন ২০০৪ সাল । সমাজে ইফিতি নাসিম বা ম্যাকগ্রিভির মত লোকদের 'কামিং আউট অব ক্লোসেট' হিসবে বিবেচনা করা হয়।

মানুষের কথা বাদ দেই, প্রানীজগতেও কিন্তু সমকামিদের সংখ্যা নেহাৎ মন্দ নয়। গবেষকরা অনেকদিন ধরেই এ নিয়ে গবেষণা করছেন। প্রসঙ্গতঃ লু হুজি, কর্ণেল লক, জিউনার, জুরের, হাবাক, উইলিয়ামস, শের জং, জেন গুডোয়ল প্রমুখ বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমলব্ধ গবেষনার কথা উল্লেখ করা যায়। এদের গবেষণার মধ্য দিয়ে উঠে আসতে থাকে প্রানীজগতের নানা অজানা তথ্য। আবার অন্যদিকে অ্যালেন, প্রেনটিস, অ্যালেন লিস, জেমসন, মারফি প্রমুখ বিজ্ঞানীরা প্রানীজগতের যৌনতা বিষয়ে ব্যাপক গবেষনা চালিয়েছেন। তাদের গবেষনায় প্রানীজগতে সমকামিতার সুস্পষ্ট নিদর্শন ধরা পরে। সে নিদর্শনগুলোর নমুনা জানতে চাইলে পাঠকেরা জীববিজ্ঞানী ব্রুস ব্যাগমিলের লেখা '*বায়োলজিকাল এক্সুবারেন্স : এনিমেল হোমোসেক্সুয়ালিটি এন্ড ন্যাচারাল ডাইভার্সিটি*' বইটি পড়ে দেখতে পারেন। বইটিতে ব্রুস ব্যাগমিল প্রকৃতিতে ৪৫০টির ও বেশি প্রজাতিতে সমকামিতা এবং রূপান্তরকামিতার অস্তিত্ব সনাক্ত করেছেন। প্রাইমেট বর্গের মধ্যে সাধারণ শিম্পাঞ্জিদের প্রজননহীন যৌনতা খুবই প্রকট। মানুষের মতই তারা কেবল 'জিন সঞ্চালনের' জন্য সঙ্গম করে না, সম্ভবতঃ করে আনন্দের জন্যও। কাজেই তাদের মধ্যে মুখ-মৈথুন, পায়ু মৈথুন থেকে শুরু করে চুম্বন, দংশন সব কিছুই প্রবলভাবে লক্ষ্যনীয়। তারা খুব সচেতনভাবেই সমকাম, উভকাম এবং বিষমকামে লিপ্ত হয়। শিম্পাঞ্জীদের আরেকটি প্রজাতি বনোবো শিম্পাঞ্জী (প্রচলিত নাম পিগমী শিম্পাঞ্জী)দের মধ্যে সমকামি প্রবণতা এতই বেশি যে, ব্যাগমিল বলেন, এই প্রজাতিটির ক্ষেত্রে 'Homosexual activity is nearly as heterosexual activity …. '। একেকটি গোত্রে এমনকি শতকরা ৩০ ভাগ সদস্য উভকামিতার সাথে যুক্ত থাকে। এরকম সমকামি এবং উভকামি প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে গরিলা, ওরাং-ওটান, গিবন, সিয়ামাং, লঙ্গুর হনুমান, নীলগিরি লঙ্গুর, স্বর্ণ হনুমান, প্রবোসিক্স মাঙ্কি ইত্যাদি প্রাইমেটদের মধ্যেও। প্রাইমেট ছাড়াও সমকামি আচরণ লক্ষ্য করা গেছে বিভিন্ন স্তন্যপায়ী জীবের ক্ষেত্রেও। এদের মধ্যে হাতি, সিংহ, চিতাবাঘ, হায়না, ক্যাঙ্গারু, হরিণ, জিরাফ, পাহাড়ি ভেড়া, আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকার মোষ, জেব্রা উল্লেখযোগ্য। পাখিদের মধ্যে পেঙ্গুইন, ধুসর পাতিহাঁস, কানাডা পাতিহাঁস, কালো রজহাঁস, বরফী পাতিহাঁস, মিউট রাজহাঁস, শকুন সহ অনেক প্রাণীর মধ্যে সমকামিতার সুস্পষ্ট উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। সরীসৃপের মধ্যে সমকামিতার আলামত আছে কমন অ্যামিভা, অ্যানোল, গিরগিটি, স্কিনক, গেকো মাউরিং, কচ্ছপ, রাটেল স্নেক প্রভৃতিতে। সমকামিতার অস্তিত্ব আছে বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাঙ, স্যালাম্যান্ডারের মত উভচর এবং বিভিন্ন মাছেও।

এখন তাইলে কথা হচ্ছে, যদি প্রচলিত মত অনুযায়ী সমকামিরা 'বায়োলজিকাল ডেড এন্ড' কিংবা প্রকৃতিজগতের বিচ্যুতিই হয়ে থাকে, তবে এই হারে সমকামীরা এ পৃথিবীতে টিকে থাকল কি করে? আমাদের বুঝতে হবে যে, যত স্বল্প সংখ্যকই হোক না কেন, প্রানীজগতে সমকামিতার প্রবৃত্তি একটি বাস্তবতা, শুধু

মানুষের ক্ষেত্রে নয়, প্রাণিজগতের প্রায় সকল প্রজাতির ক্ষেত্রেই। প্রকৃতিতে সবসময়ই খুব ছোট হলেও একটা অংশ ছিল এবং থাকবে যারা যৌনপ্রবৃত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের চেয়ে ভিন্ন। কিন্তু কেন এই ভিন্নতা? এর একটি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনীয় ইকোলজিস্ট জোয়ান রাফগার্ডেন রোথসব্রগ তার "Evolution's Rainbow: Diversity, Gender and Sexuality in Nature and People." বইয়ে। তিনি বলেন, যৌনতার উদ্দেশ্য সনাতনভাবে যে কেবল 'জিন সঞ্চালন করে বংশ টিকিয়ে রাখা' বলে ভাবা হয়, তা ঠিক নয়। যৌনতার উদ্দেশ্য হতে পারে যোগাযোগ এবং সামাজিকিকরণ। তিনি বলেন :

> 'যদি আপনি সেক্স বা যৌনতাকে যোগাযোগের একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে দেখেন, তাহলে আপানার কাছে অনেক কিছুই পরিস্কার হয়ে যাবে, যেমন সমকামিতার মত ব্যাপার স্যাপারগুলো - যা জীব বিজ্ঞানীদের বছরের পর বছর ধরে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল। বনোবো শিম্পাঞ্জীদের মধ্যে সমকামী সংশ্রব বিষমকামীদের মতই দেদারসে ঘটতে দেখা যায়। আর বনোবোরা কিন্তু প্রকটভাবেই যৌনাভিলাসী। তাদের কাছে যৌনসংযোগের (Genital contact) ব্যাপারটা আমাদের 'হ্যালো' বলার মতই সাধারণ। এভাবেই তারা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করে থাকে। এটি শুধু দলগতভাবে তাদের নিরাপত্তাই দেয় না, সেই সাথে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য আহরণ এবং সন্তানদের লালন পালনও সহজ করে তুলে'।

শুধু বনোবো শিম্পাঞ্জীদের কথাই বা বলি কেন, বাংলাদেশেই আমরা যেভাবে বড় হয়েছি সেখানে ছেলেদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব হলে একজন আরেকজনকে স্পর্শ করে, হাতে হাত ধরে কিংবা ঘারে হাত দিয়ে ঘোরাঘুরি করে। ঝগড়া-ঝাটি হলে বুকে জড়িয়ে ধরে আস্থা পুনর্প্রতিষ্ঠিত করে। মেয়েরাও তাই। এই আচরণ একটু প্যাসিভ তবে এ ধরনের প্রেরণা কিন্তু মনের ভেতর থেকেই আসে। বলা বাহুল্য, এই প্রেরণার মধ্যে কোন জিন সঞ্চালনজনিত কোন উদ্দেশ্য নেই, পুরোটাই যোগাযোগ এবং সামাজিকীকরনের প্রকাশ।

যোগাযোগ আর সামাজিকরণের কথা মাথায় রেখেই জোয়ান রাফগার্ডেন রোথসব্রগ তার বিবর্তনবিদ্যা সংক্রান্ত 'ইভ্যলুশনস রেইনবো' (পূর্বে উল্লিখিত) বইয়ে 'যৌনতার নির্বাচন' (sexual selection)-এর বদলে 'সামাজিক নির্বাচন' (social selection) - এর প্রচলন ঘটানোর প্রস্তাব করেছেন। তিনি বলেন, প্রানীজগতের সাংগঠনিক ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে তাদের খাবার, সঙ্গী প্রভৃতির সঠিক নির্বাচনের উপর। প্রাণিজগতের এই নির্বাচনই কখনো রূপ নেয় সহযোগিতায়, কখনো বা প্রতিযোগিতায়। এবং এটাই শেষ পর্যন্ত সমস্ত পারিবারিক বিবিধ সম্পর্কের ভিত্তি তৈরি করে। কোন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে সেই সম্পর্ক

একগামিতা বা মনোগামিতে রূপ নিতে পারে (মানুষ ছাড়াও কিছু রাজহাঁস, খেঁকশিয়াল, কিছু পাখির মধ্যে একগামী সম্পর্ক আছে), কখনো বা রূপ নেয় বহু(স্ত্রী)গামিতা বা পলিগামিতা (সিংহ, বহু প্রজাতির বানরের মধ্যে এরকম হারেম তৈরি করে ঘোরার প্রবণতা আছে), কখনোবা বহু(পুরুষ)গামিতা বা পলিঅ্যান্ড্রি (কিছু সিংহ, হরিণ এবং প্রাইমেটদের মধ্যে)তে। এমনকি অনেকসময় দলে একাধিক 'জেন্ডারের' মধ্যেও সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যেমন, ব্লু গ্রীন সানফিশ নামের একপ্রজাতির মাছ আছে যেখানে এক একটি ঝাঁকে দুই পুরুষ মাছের মধ্যে সমধর্মীযৌনতার বন্ধন (same-sex courtship) গড়ে উঠে। এখানে মুখ্য পুরুষ মাছটি (এদের 'আলফা মেল' বলা হয়) একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে তুলে আর তারপর অপর পুরুষ মাছটিকে সাথে নিয়ে তাদের যৌথ সাম্রাজ্যে স্ত্রীমাছগুলোকে ডিম পাড়তে আমন্ত্রণ জানায়। অনেকসময় দ্বিতীয় পুরুষ মাছটি স্ত্রী মাছের অনুকরণ করে স্ত্রী মাছের ঝাকের সাথে মিশে যায় - যা অনেকটা আমাদের সমাজে বিদ্যমান ক্রস-জেন্ডার প্রতিনিধিদের মতই। ড. রোথসব্ররগের মতে, যৌন-প্রকারণ এবং সমধর্মী যৌনতা এভাবে প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করে, যা অনেক সময়ই মোটা দাগে কেবল শুক্রানুর স্থানান্তর নয়। সামাজিক নির্বাচন হচ্ছে সেই বিবর্তন যা সামাজিক সম্পর্কগুলোকে টিকিয়ে রাখে। ড. রোথসব্ররগের মত সামাজিক নির্বাচনের ধারণাকে সমর্থন করেন ব্রুস ব্যাগমিল এবং পল ভ্যাসি সহ অনেক বিজ্ঞানীই।

তবে বেশিরভাগ জীববিজ্ঞানীই এখনই 'যৌনতার নির্বাচনকে' সরিয়ে দিয়ে 'সামাজিক নির্বাচন'কে গ্রহণ করার পক্ষপাতি নন, কারণ প্রকৃতিজগতের বেশিরভাগ ঘটনাকেই 'যৌনতার নির্বাচন' দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনবাদী জীববিদ জেরি কয়েন রোথসব্ররগের সমালোচনা করে বলেন : 'She ignores the much larger number of species that do conform to sexual selection theory, focusing entirely on the exceptions. It is as if she denies the generalization that Americans are profligate in their use of petrol by describing my few diehard countrymen who bicycle to work.'। নেচার পত্রিকায় রোথসব্ররগের বইটির ভুয়সী প্রসংশা করার পরও তার 'সামাজিক নির্বাচন' তত্ত্বের সমালোচনা করে নৃতত্ত্ববিদ সারাহ হর্ডি বলেন - '(তার) এ (উদাহরণ) গুলো যৌনতার নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য উপযুক্ত কারণ নয়, বরং এগুলো হতে পারে জীব-বৈচিত্রকে (সামাজিকভাবে) গ্রহণযোগ্য করার অনুপ্রেরণা'। এর কারণ আছে। অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন, যৌনতার নির্বাচনের মাধ্যমেই হোমসেক্সুয়ালিটিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সমকামিতার জিন (যদি থেকে থাকে) যোগাযোগ ও সামাজিকতার উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে উপযোগী তা বনোবো শিম্পাঞ্জীদের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে। আবার এমনো হতে পারে মানুষের মধ্যে 'গে জিন'-এর ভূমিকা পুরুষ এবং স্ত্রীতে ভিন্ন হয়। ইতালীর একটি সমীক্ষায় (২০০৪) দেখা গেছে, যে পরিবারে সমকামী পুরুষ আছে সে সমস্ত পরিবারে মেয়েদের উর্বরতা (fertility) বিষমকামী পরিবারের চেয়ে বেশি থাকে। আন্দ্রিয়া ক্যাম্পেরিও-সিয়ানির ওই গবেষণা থেকে জানা যায়, বিষমকামী পরিবারে যেখানে গড় সন্তান সন্ততির সংখ্যা ২.৩ সেখানে গে সন্তানবিশিষ্ট পরিবারে সন্তানের সংখ্যা ২.৭ । এছাড়া এডয়ার্ড ও উইলসন 'কিন সিলেকশন'-এর মাধ্যমে হোমোসেক্সুয়ালিটিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন সেই ১৯৭৮ সালেই। টক-অরিজিনের এই লিঙ্কটিতেও বিবর্তনের আধুনিক তত্ত্বের মাধ্যমে সমকামিতার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কাজেই যে কারনেই সমাজে হোমোসেক্সুয়ালিটির অস্তিত্ব থাকুক না কেন, এবং সেগুলোকে উপস্থাপনের সঠিক মডেল নিয়ে বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীদের মধ্যে যত

বিতর্কই থাকুক না কেন (বিজ্ঞানে এধরনের বিতর্ক খুবই স্বাভাবিক), এটি এখন মোটামুটি সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন (যান্ত্রিক ডারউইনবাদী আর গুটিকয় ধর্মান্ধ বিজ্ঞানীরা ছাড়া) যে, সমকামিতার মত যৌন-প্রবৃত্তিগুলো 'অস্বাভাবিক' বা 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ' নয়, বরং বৈজ্ঞানিক উপাত্ত ও তত্ত্বের সাহায্যেই এই ধরনের যৌন-প্রবৃত্তিগুলোকে ব্যাখ্যা করা যায়; জীববিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণা কিন্তু সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। আজ আমি যখন এ লেখাটি লিখতে বসেছি তখন সারা পৃথিবী জুড়ে চারশ'রও বেশি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গে জিন নিয়ে গবেষণা হচ্ছে।

আধুনিক চিকিৎসকেরা এবং মনোবিজ্ঞানীরা এখন সমকামিতাকে একটি স্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তিই মনে করেন। উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালের ১৫ ই ডিসেম্বর American Psychiatric Association (বহু চিকিৎসক এবং মনোবিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সংগঠন) বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার মাধ্যমে একমত হন যে সমকামিতা কোন নোংরা ব্যাপার নয়, নয় কোন মানসিক ব্যধি। এ হল যৌনতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ১৯৭৫ সালে American Psychological Association একইরকম অধ্যাদেশ দিয়েছিলেন। সকল আধুনিক চিকিৎসকই আজ এ বিষয়ে একমত। তারপরও বাংলাদেশ সহ অনেক রাষ্ট্রেই সমকামিতা স্বীকৃত নয়, অনেক জায়গাতেই এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এখানে সমকামীদের হয় লুকিয়ে থাকতে হয়, কিংবা অভ্যস্ত হতে হয় 'ক্লোসেট গে' হয়ে 'বিবাহিত' জীবন যাপনে। পশ্চিমা বিশ্ব কিছুটা হলেও এ ব্যাপারে উদার হয়েছে বিগত কয়েক দশকে। সেখানে গে এবং লেসবিয়ানরা বিশ্বের বহু দেশে সামাজিক স্বীকৃতি ও আইনগত বৈধতার জন্য কয়েক যুগব্যাপী আন্দোলন করছেন, অংশ নিচ্ছেন 'গে-প্রাইড' মার্চে। তাদের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে আমেরিকার কয়েকটি স্টেটে সমকামী বিয়ে আজ স্বীকৃত। ব্রিটেনেও টনি ব্লেয়ারের সরকার কয়েক বছর আগে প্রথম সমকামী যুগলদের স্বীকৃতি দিয়েছে। পশ্চিমে সমকামী-অধিকার আন্দোলনের সাফল্য এখন উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার কয়েকটি প্রধান দেশ তাদের আইন সংস্কারে এগিয়ে এসেছে। চীনে আগে মাও সে তুংয়ের আমলে মনে করা হতো, সমকামিতা হচ্ছে 'পুঁজিবাদের বিকৃতি'। কিন্তু আশির দশক থেকে তাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। নেলসন ম্যানডেলার নেতৃত্বে সাউথ আফ্রিকায় বর্ণবাদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর যে নতুন সংবিধান হয় তাতে শুধু ধর্মই নয়, যৌনতা বিষয়ে কোনো বৈষম্য করা হবে না এমন ধারা সংযোজিত হয়। আমরা আশা করব, যুগের দাবীর সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও একটা সময় সমকামিতার প্রতি সহিষ্ণু মনোভাব গড়ে উঠবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ষাঁড়দের যাতাকলে নিয়ত পিষ্ট সংখ্যালঘু যৌনপ্রবৃত্তির মানুষগুলোর আইনী অধিকার স্বীকৃত হবে। আর সেজন্য দরকার আমাদের সবার বিজ্ঞানমনস্ক উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি।

তথ্যসূত্রঃ

১। রমাবাই এর বক্তৃতা উপলক্ষে, জৈষ্ঠ, ১২৯৬, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ।
২। Dylan Evans & Howard Selina, *Introducing Evolution*, Icon Books, UK, 2001
৩। Joann C. Gutin, *Why Bother? Sex seems like an unnecessary complicated means of reproducing. So how did it ever started? And why did it catch on?* Discover, June, 1992.

৪। David Crews, *Animal Sexuality*, Scientific American, January, 1994
৫। অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, সমপ্রেম, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৫।
৬। Wardell B. Pomeroy, Clyde E. Martin, Alfred C. Kinsey Paul H. Gebhard , *Sexual Behavior in the Human Female, AND Sexual Behavior in the Human Male*, W. B. Saunders Company , 1953
৭। David P. McWhirter, Stephanie A. Sanders and June Machover Reinisch, *Homosexuality/Heterosexuality: Concepts of Sexual Orientation*, Oxford University Press, USA, 1990
৮। John Maynard Smith, *The Evolution of Sex*, Cambridge University Press; 1978।
৯। Bruce Bagemihl, *Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity*, Stonewall Inn Editions, 2000
১০। Simon Levay and Dean H. Hamer, *Evidence for a Biological Influence in Male Homosexuality*, Scientific American, May 1994.
১১। Joan Roughgarden, *Evolution's Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People*, University of California Press, May 17, 2004।
১২। Sarah Blaffer Hrdy, Sexual diversity and the gender agenda, Nature 429, pp 19 – 21, 06 May 2004
১৩। Talk Origin, Claim CB403: Evolution does not explain homosexuality; http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB403.html
১৪। Leslie Feinberg, Transgender Warriors : Making History from Joan of Arc to Dennis Rodman, Beacon Press, 1997.
১৫। অভিজি রায়, সমকামিতা (সমপ্রেম) কি প্রকৃতি বিরুদ্ধ? একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনঃস্তাত্বিক আলোচনা, মুক্তমনা।

ড. অভিজিৎ রায়, আমেরিকায় বসবাসরত গবেষক এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' ও 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। সাম্প্রতিক সম্পাদিত গ্রন্থ - 'স্বতন্ত্র ভাবনা'। ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com

সমকামিতা সম্পর্কিত কিছু ব্যক্তিগত মতামত

স্নিগ্ধা আলী

সমকামিতার মতো একটা স্পর্ষকাতর বিষয় নিয়ে লিখতে বসে ভাবছিলাম কোথা থেকে শুরু করবো। আজকের পৃথিবীতে সমকামিতার ব্যাপারটা আর লুকোচুরির পর্যায়ে নেই। Gay Pride Day এখন আর শুধু সমকামীদের অধিকার আর গৌরব বহন করে না অনেকের জন্যই এটার অর্থ আরও ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে। এটাকে সামগ্রিক মানবাধিকারের একটা অংশ হিসেবেও দেখা হয়। কিন্তু এই লেখাটা সেরকম কোন নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, এই লেখাটা লিখছি দুটা কারণে। প্রথমত, আমি এ পর্য্যন্ত কোন লেখা পড়িনি যেখানে কোন গে বা লেসবিয়ান কে খুব কাছ থেকে দেখার (আমি ভালো পরিচয় ইত্যাদি বুঝাচ্ছি না) অভিজ্ঞতা আছে, আর দ্বিতীয়ত আমার কিছু পরিচিতদের মতে কোন মেয়ে লেখকেরা সাধারণত এই ধরনের আলোচনায় অংশ নেয় না।

আমার খুব কাছের একজন সমকামী। বাংলাদেশে বড় হওয়ার কারণেই হোক বা যে কারণেই হোক আমার নিজেরো খুব ভালো মতোই homophobia ছিলো - এটাকে অস্বাভাবিক এবং অন্যায় ভাবতাম। আমি আসলে এখন নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করি। যখন প্রথম জানতে পারি যে আমার খুব প্রিয় একটা মানুষ সমকামী, আমি বাধ্য হই নিজের ভেতরের ছোট থেকে মেনে নেওয়া মূল্যবোধগুলোর মুখোমুখি হতে। এটা যদি দূরের কেউ হতো তাহলে আমিও হয়তো ব্যাপারটা আরো বহুদিন ওরকম ভাবেই দেখতাম। কিন্তু তখন সব social norm বা tabooর চাইতে বড় ছিলো তাকে এবং জিনিষটাকে বোঝার চেষ্টা করা। সমকামীদের সারাজীবনই সমাজের সাথে যুদ্ধ করে যেতে হয় কিন্তু তাদের প্রথম বড় যুদ্ধ নিজেদের সাথে। নিজের কাছে স্বীকার করে নেয়া যে সে অন্যদের মতো 'স্বাভাবিক' না, সে এমন একটা কিছু যেটাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয়, তার এমন একটা 'বিশেষত্ব' আছে যে কথা জানতে পারলে তার সব প্রিয় মানুষগুলো তাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে - এটা কি পরিমাণ অসহণীয় কষ্টের হতে পারে তা হয়তো আমরা যারা কখনো এরকম 'সব হারাবার' ভয় এর মুখোমুখি হই নি তারা ঠিক বুঝতে পারবো না।

তারপর এদেশে (আমেরিকায়) আসার পর আমার বেশ বড়ো একটা গে লেসবিয়ান কমিউনিটির সাথে পরিচয় হয় এবং আমি আরো কি কি আবিষ্কার করি জানেন? সাধারণত সমকামীদের নিয়ে যে প্রচলিত ধারনাগুলো আছে - যে সমকামী ছেলেরা একটু 'মেয়েলী' হবে, হাত পা বেশী বেশী নাড়িয়ে কথা বলবে, অথবা বিষমকামী (heterosexual) ছেলেদের তুলনায় বেশি ফ্যাশন সচেতন হবে, লেসবিয়ান মেয়েরা একটু 'পুরূষালী' হবে - এমন কোন কথাই নেই। 'এরা' ওরকম হয়, আবার হয় ও না। মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে আমার চেনা অন্তত ৮০ শতাংশ ওরকম না- হতে পারে এটা হয়তো একটা খন্ড চিত্র মাত্র কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাই।

তার চেয়েও বড়ো কথা যেহেতু এরা নিজেরা mainstream এর বাইরের মানুষ তাই এদের অন্যান্য প্রান্তিক মানুষগুলোর প্রতি একটা সহজাত সহানুভূতি থাকে। আমার চেনা সমকামীদের একটা বড়ো অংশ প্যালেষ্টাইন ইস্যু, মেয়েদের বিরুদ্ধে ভায়োলেন্স, নারীবাদ, পরিবেশ দূষণ, আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ, মানবাধিকার রক্ষা এবং আরও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক/ রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আন্দোলনে জড়িত। শুধু জড়িত বললে আসলে কম বলা হবে এদের অনেকের জন্য নিজের নিজের বিশ্বাসের বাস্তবায়নের চেষ্টাটাই জীবন। আমার চেনা একটা সাদা আমেরিকান ইহূদী লেসবিয়ান কি করে জানেন? প্যালেষ্টাইনে গিয়ে যখন ইজ্রায়েলিরা বিভিন্ন প্যালেষ্টানিয়ান বসতি উচ্ছেদ করার জন্য ট্যাঙ্ক নিয়ে আসে, মেয়েটা সেই ট্যাঙ্কের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যেতে হলে ওকে পিষে এগোতে হবে। যেহেতু সে আমেরিকান নাগরিক তাই সত্যি সত্যি তাকে পিষে ফেলে না, খালি ইজরায়েলি জেলে নিয়ে দিনের পর দিন ফেলে রাখে। মেয়েটাকে আমেরিকায় ফেরৎ পাঠানো হয়, মেয়েটা আবার যায়।

সমকামিতা সম্পর্কে আমি খুব বেশী কিছু হয়তো জানি না , কিছু সমকামী সম্পর্কে কিছু জানি - সেটাই লিখলাম। ওদের অনেকের কাছে আমার একটা ব্যক্তিগত ঋণ আছে - দৃষ্টিটাকে নিজের বাইরে প্রসারিত করার শিক্ষা আমি প্রথম ওদের কাছেই পাই।

সমকামিতা নিয়ে এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত অভিজিৎ রায়ের গবেষণা ভিত্তিক লেখাটি (সমকামিতা কি প্রকৃতিবিরুদ্ধ?) আমার অতি প্রিয় লেখাগুলোর অন্যতম। আমার লেখাটি যেমন ব্যক্তিগত আবেগ থেকে লেখা, ওটি তেমনি বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে বিশ্লেষণ করে দেখানো - সমকামী কি বিষমকামী আমরা সবাই একই স্পেকট্রামের মধ্যেই একটু এখানে আর একটু ওখানে অবস্থান করি।

স্নিগ্ধা আলী, আমেরিকার কর্ণেল ইউনিভার্সিটিতে সমাজবিজ্ঞানে পিএইচডি করছেন। সমাজ, মানবাধিকার, নারীবাদ প্রভৃতি বিষয়ে লেখালিখি করেন। ইমেইল - snigdha.ali@gmail.com

জুলিয়েটের জন্য

রিচার্ড ডকিন্স
অনুবাদ: অগ্নি অধিরূঢ়

প্রিয় জুলিয়েট,

এখন তোমার বয়স দশ হয়েছে। একটা জরুরী বিষয় জানানোর জন্য এই চিঠি লিখছি। আমরা যা জানি তা কিভাবে জানি- এই সমস্যা কি কখনো তোমাকে অবাক করেনি? আমরা কোন কিছু জানি কিভাবে? যেমন এই তারাগুলোর কথা ধরা যাক। এরা ছোট্ট বিন্দুর মত আকাশে জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু আসলে এগুলো সূর্যের মত এক একটা বিরাট আগুনের গোলা। এর কোন কোনটা অনেক অনেক দূরে অবস্থিত। আর এরকম এক নক্ষত্র সূর্যকে ঘিরে আমাদের পৃথিবী বলের মত বনবন করে ঘুরছে - এটাইবা আমরা কিভাবে জানি।

প্রশ্নগুলোর উত্তর হচ্ছে 'প্রমাণ'। কোন কিছুকে প্রমাণিত বা সত্য বলার স্বপক্ষে কিছু সহজ উদাহরণ আছে। যেমন দেখা, শোনা, গন্ধ বা স্বাদ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গত অনুভূতিকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। নভোচারীরা পৃথিবী থেকে শত শত মাইল দূরের মহাকাশ ভ্রমণ করেছেন। সেখান থেকে একাধিক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে পৃথিবী গোল। খালি চোখেই তা দেখা যায়। নভোচারীরা নিজের চোখে আমাদের সুন্দর এই নীল পৃথিবীকে গোল দেখেছেন। আমাদের চোখ সবসময় যে সব কিছু দেখতে পারে তা নয়। নিখুঁতভাবে দেখতে গেলে চোখের আরও কিছু জিনিসের সাহায্য প্রয়োজন। ঝকঝকে, মিটমিটে, উজ্জ্বল আলোর সন্ধ্যাতারা আকাশে খালি চোখে দেখা যায়। কিন্তু যদি তুমি টেলিস্কোপ দিয়ে দেখো, তাহলে দেখবে সন্ধ্যাতারা আসলে একটি সুন্দর গোলক। একে ভেনাস (শুক্রগ্রহ) বলে। এরকম করে সরাসরি দেখে, শুনে বা অনুভব করে তথ্যগ্রহণ করাকে বলে পর্যবেক্ষণ।

সাধারণত প্রমাণ নিজে পর্যবেক্ষণ নাও হতে পারে। কিন্তু প্রমাণের পিছনে পর্যবেক্ষণ অবশ্যই থাকবে। কেউ 'খুন' হলে সাধারণত তার চাক্ষুষ সাক্ষী থাকেনা। খুনের ঘটনা খুনি নিজে ও আক্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ দেখেনা। কিন্তু গোয়েন্দারা বিভিন্ন দিক ও উপাদান পর্যবেক্ষণ করে এমন সব প্রমাণ সংগ্রহ করেন যেগুলো শুধু একটি দিকেই আঙ্গুল তোলে। যে ছুরিটা ব্যবহার করা হয়েছিল তার গায়ে অপরাধীর আঙুলের ছাপ থেকে যায়। এ থেকে প্রমাণ হয় যে খুনি ছুরিটা নিজহাতে ধরেছিল। শুধুমাত্র এই চিহ্ন দেখে বলা যাবেনা যে যার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে সেই খুনি। বরং আরও অন্য অনেক প্রমাণ পাওয়া গেলে তাহলে তার সাথে একে মেলানো যেতে পারে। একজন গোয়েন্দা বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন। অনেক রকম প্রমাণ সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। এই প্রমাণগুলোকে বিভিন্নভাবে তুলনা করে, বিশ্লেষণ করে একটা সমাধান বের করেন।

যারা মহাকাশবিজ্ঞানী তাদের কাজকর্ম অনেকটা গোয়েন্দাদের মত। তারা এই পৃথিবী ও বিশ্বব্রহ্মান্ড নিয়ে নানারকম পর্যবেক্ষণ শেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঠিক কোনটা সত্যি এ বিষয়ে তারা প্রথমে একটি সন্দেহ বা ধারণা চিন্তা করেন (একে Hypothesis বলে)। এরপর বিষয়টি নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে, অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সাথে আলোচনা করেন। যদি তারা সত্যকে বুঝতে পারেন তাহলে একটি সম্ভাব্য মন্তব্য করেন। একে বলে ভবিষ্যৎবাণী করা। মনে করো, যদি পৃথিবীটা সত্যি সত্যি গোল হয় তাহলে কি ঘটা উচিত? একজন ব্যক্তি যদি একদিকে মুখ করে ক্রমাগত যেতে থাকে তাহলে একসময় সারা পৃথিবী ঘুরে তার আগের জায়গায় চলে আসা উচিত। যদি তোমার হাম হয় তাহলে ডাক্তার কি করেন? তিনি প্রথম দেখাতেই বলে দেন না যে তোমার হাম হয়েছে। তিনি প্রথমে তোমাকে দেখে মনে মনে ধারণা করেন যে তোমার হয়তো হাম হয়েছে। এরপর তিনি চোখ দিয়ে তোমাকে বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। তিনি দেখবেন তোমার মুখে বা হাতে কোন দাগ আছে কি না? তারপর তোমার কপাল গরম কি না তা হাত দিয়ে স্পর্শ করে বুঝবেন। তোমার বুকের ভিতর কফ জমে কোন শব্দ হচ্ছে কি না তা কান দিয়ে শুনবেন (স্টেথেস্কোপের সাহায্যে)। এই ধরণের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ পাওয়ার পর তিনি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন যে তোমার হাম হয়েছে। ডাক্তাররা কখনও কখনও রোগীকে আরও নানারকমের পরীক্ষানিরীক্ষা করতে বলেন। রোগীর রক্ত পরীক্ষা বা এক্সরে করার পর তিনি নিশ্চিত হন। এই পরীক্ষাগুলো ডাক্তারের চোখ, কান এবং হাতকে রোগীর সমস্যা বুঝতে সাহায্য করে।

বিজ্ঞানীরাও এই পদ্ধতিতে কাজ করেন। তারাও ডাক্তারদের মত বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জটিল ও দুর্বোধ্য মহাবিশ্বকে বুঝতে চেষ্টা করেন। আচ্ছা, এখন এইসব সন্দেহ, পর্যবেক্ষণ, ইত্যাদির কথা থাক। কোন কিছু বিশ্বাস করার স্বপক্ষে আরও ভাল কিছু কারণ আছে। আমি সেইসব নিয়ে তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই। এগুলো হল ঐতিহ্য, প্রথা, বয়স্ক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা কর্তৃপক্ষের আদেশ এবং প্রত্যাদেশ বা ঐশী বাণী।

প্রথমে ঐতিহ্য বা প্রথার কথা বলি। কয়েক মাস আগে টেলিভিশনের এক অনুষ্ঠানে আমি ৫০ জন শিশুর সাথে গল্প করেছিলাম। খুব সচেতনভাবে এই শিশুদেরকে বাছাই করা হয়েছিল। বিভিন্ন আলাদা আলাদা ধর্ম থেকে এই শিশুদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে। কেউ খ্রিস্টান, কেউ ইহুদী, কেউ মুসলমান কিংবা কেউ হিন্দু বা শিখ ধর্মের। উপস্থাপক তাদের ধর্মবিশ্বাস জানার জন্য প্রত্যেকের কাছে গিয়েছিলেন। তারা প্রথার কথা বলেছিল। আমিও সেই প্রথার কথা বলছি। শিশুরা তাদের বিশ্বাসের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ দেখাতে পারেনি। কোন প্রমাণ ছাড়াই পিতা বা পিতামহের কাছ থেকে পাওয়া ধর্মকে তারা গ্রহণ করেছে। তারা ঠিক এভাবে বলেছে-"আমরা হিন্দুরা এটা বিশ্বাস করি, মুসলমানরা বলেছে আমরা ওটা বিশ্বাস করি, খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করি অন্যকিছুতে"- এরকম।

যদিও তারা বিভিন্ন জিনিসে বিশ্বাস করে তারপরও তারা কেউ সঠিক না। উপস্থাপক এটাকেই স্বাভাবিক ভেবে নিয়েছেন। তিনি ওদেরকে নিজধর্ম নিয়ে পরস্পরের সাথে আলোচনা করতেও বললেন না। কিন্তু তাদের বিশ্বাস কোত্থেকে এসেছে এই কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলাম। এর মূল উৎস আসলে প্রথা। তার মানে পিতামহ থেকে পিতা, পিতা থেকে সন্তান এভাবে বিশ্বাস প্রবাহিত হয়েছে। অথবা শতাব্দীকালব্যাপী

হাতবদল হওয়া বই থেকে তাদের বিশ্বাস এসেছে। আর পূর্বপুরুষরা একই জিনিস শতাব্দীর পর শতাব্দী বিশ্বাস করে গেছেন। কোনরকম সন্দেহ পোষণ না করেই তারা বিশ্বাসকে মেনে নিয়েছেন। এটাকেই বলে প্রথা (Tradition)।

প্রথাকে নিয়ে একটা সাধারণ সমস্যা আছে। কতদিন আগে মূল গল্পটা তৈরি হয়েছে সেটা কোন বিষয় না। বর্তমান কাল পর্যন্ত সত্যি বা মিথ্যা যাই হোক তা প্রথার মাধ্যমে চলে এসেছে। মানুষ প্রশ্ন না করে চোখ বন্ধ রেখেই তা গ্রহণ করে এবং মেনে চলে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তা সত্যি হয়ে গেল। কোন একটা গল্প শত কেন হাজার বছর বয়স হলেও সত্য হয়ে যায় না।

ইংল্যান্ডের বেশিরভাগ মানুষ চার্চ অব ইংল্যান্ডের দ্বারা ব্যাপ্টাইজ হয়েছে। কিন্তু এটা খ্রিস্টিয় ধর্মের একটা শাখা মাত্র। এছাড়াও আরও অনেক শাখা আছে। যেমন রাশিয়ার অর্থোডক্স, রোমান ক্যাথলিক এবং মেথোডিস্ট চার্চ। তাদের প্রত্যেকের বিশ্বাস ভিন্নরকম। এখনও ইহুদী ধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম পরস্পরের চাইতে আলাদারকম। আবার ইহুদি ও মুসলমানদের মধ্যেও বিভিন্নতা আছে। এসব ধর্মবিশ্বাসীরা সামান্য মতপার্থক্যের কারণে যুদ্ধ করতে পিছুপা হয়না। অতএব তুমি হয়তো ভাবতে পারো যে তাদের নিজ নিজ বিশ্বাসের স্বপক্ষে সামান্য হলেও কিছু ভাল প্রমাণ আছে। কিন্তু আসল ঘটনা হল, তাদের বিশ্বাসের উৎস বিভিন্ন রকম সংস্কৃতি বা প্রথা।

আরেকটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে বলি। রোমান ক্যাথলিকগন মনে করেন মা মেরি এমনই বিশেষ সম্মানীয় ছিলেন যে তিনি মারা যেতে পারেন না। তাকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অন্য খ্রিস্টানরা এটা মানেন না। তারা বলেন যে মেরি অন্যান্য মানুষের মত এই পৃথিবীতেই মারা গেছেন। এই খ্রিস্টানরা এর বেশি আর কিছু বলেন না। রোমান ক্যাথলিকদের মত মা মেরিকে স্বর্গের রাণী বলেননা। মেরির সশরীরে স্বর্গারোহনের গল্পটা খুব একটা পুরনো নয়। কারণ বাইবেলে এ সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। আসলে বাইবেলে মা মেরি সম্পর্কে খুব একটা বেশি কিছু বলা হয়নি। ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে মা মেরির সশরীরে স্বর্গারোহনের গল্পটি ছিল না। প্রথমে এটা অন্যান্য সব গল্প যেমন 'তুষার রাজকন্যা' গল্পটির মত তৈরি করা হয়েছিল। পরবর্তীতে কয়েকশত বছর পর এটা বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। শত শত বছরব্যাপী গল্পটা প্রচলিত থাকার কারণে মানুষ একে মূল্য দিয়েছে। একটি গল্প যত পুরনো হয় মানুষ ততোই তাকে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। সর্বশেষে রোমান ক্যাথলিকদের দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে এই গল্পটা লিখিত হয়। এটা খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। এই তো সেদিন ১৯৫০ সালে। আমার বয়স তখন তোমার মত ছিল। লিখিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে গল্পটা সত্যি। বরং মেরির মৃত্যুর ছয় বছর পরে যখন গল্পটা তৈরি হয় তখন যেমন বানানো ছিল, ১৯৫০ সালেও তেমন ছিল।

আমি এই প্রথা বা ঐতিহ্য সম্পর্কে পরে এই চিঠির শেষে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে বিশ্বাসের অন্য দুই খারাপ অজুহাত 'কর্তৃপক্ষের আদেশ' ও 'প্রত্যাদেশ' সম্পর্কে কিছু বলে নেই।

'কর্তৃপক্ষ' (Authority) এই জিনিসটাকে আমরা খুব মানি। কারণ এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো আমাদের কাছে আসে। আইন বা নীতিগত সমর্থন আমরা এখান থেকে পেয়ে থাকি। রোমান ক্যাথলিক চার্চে

পোপ হচ্ছেন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। যেহেতু তিনি একজন পোপ সেহেতু মানুষ বিশ্বাস করে যে তিনি কোন ভুল করতে পারেন না। ইসলাম ধর্মের মধ্যেও তেমনি দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ আয়াতুল্লাহ হলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা মান্যবর কর্তৃপক্ষ। এই দেশের অনেক মুসলমান খুন করার জন্য তৈরি হয়ে আছে। কারণ এর অনুমতি তারা ঐ আয়াতুল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছে।

এর আগে আমি তোমাকে বলেছিলাম, রোমান ক্যাথলিকরা ১৯৫০ সালে ঘোষণা করে যে মেরির শরীর স্বর্গে তুলে নেয়া হয়েছে এ কথা তারা আগে থেকে বিশ্বাস করে আসছিল। আসলে আমি বলতে চাচ্ছি যে পোপ নিজেই একথা বলেছেন। তিনি নিজে একথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। আর পোপ যেহেতু বলেছেন সেহেতু তা অবশ্যই সত্য এবং মান্য। এর কোন যথার্থ কারণ নেই, তারপরও পোপ বলে কথা। অন্য আর কারও কথার চাইতে পোপের কথাকে তোমার বেশি বিশ্বাস করতেই হবে। বর্তমান পোপ (১৯৯৫) তার অনুসারীদেরকে একাধিক সন্তান নেবার নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষ যদি এই কর্তৃপক্ষীয় নির্দেশকে বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নিত তাহলে তা পরিণামে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বয়ে আনত। অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে রোগ-ব্যধি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি লেগেই থাকত।

হ্যাঁ, বিজ্ঞানের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেবার সময় আমরা অন্যের উপর নির্ভর করে থাকি। যেমন, আমি নিজে আলো যে এক লক্ষ ছিয়াছি হাজার মাইল বেগে ছুটছে তার প্রমাণ কখনো দেখিনি। আমি এ কথা বইতে পড়েছি। এখানে বইকে আমি 'কর্তৃপক্ষ' বলে মনে করেছি। তবে এটা ওই কর্তৃপক্ষের চেয়ে ভাল। কারণ কর্তৃপক্ষকে তুমি কোন প্রশ্ন করতে পারবেনা। কিন্তু যথাযথ প্রমাণসাপেক্ষে বই লেখা হয় আর ইচ্ছে করলে যে কেউ এই প্রমাণগুলো নিজে নিজে পরীক্ষা করতে পারে। এটা খুবই স্বস্থিদায়ক। কিন্তু মেরির শরীর স্বর্গে তুলে নেয়া হয়েছে এ ঘটনার স্বপক্ষে একটা ছোট প্রমাণও কোন প্রিস্ট (ধর্মনেতা) দিতে পারবে না।

বিশ্বাসের পক্ষে তৃতীয় খারাপ কারন হল প্রত্যাদেশ বা ঐশী বাণী। মেরির সশরীরে স্বর্গারোহন বিষয়ে যদি পোপকে ১৯৫০ সালে জিজ্ঞাসা করা হত তাহলে তিনি প্রত্যাদেশের কথা বলতেন। তিনি কিভাবে এই প্রত্যাদেশ পেয়েছেন? একটু কল্পনা করে নিতে হবে। একদিন তিনি নিজের ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে প্রার্থনায় বসেছিলেন। ঈশ্বরের কাছে বারবার সাহায্য চাইলেন। নিজে নিজেই অনেক চিন্তা করলেন। তারপর নিজেই এক অনির্দেশ গভীর বিশ্বাসবোধ থেকে নিজ ধারণাকে বিশ্বাস করা শুরু করেন। বিশ্বাসী মানুষ যখন নিজের অন্তরের অন্ত:স্থলে এক গভীর বিশ্বাস বহন করেন, যখন নিজের মনের গহীনে এক ভিন্নরকম অনুভূতিকে চিহ্নিত করতে পারেন আর তখন তারা কোনরকম প্রমাণ ছাড়াই তাকে সত্য বলে মেনে নেন। এটাকে তারা 'প্রত্যাদেশ' বা 'ঐশী অনুভূতি' বলে থকেন। প্রত্যাদেশের দাবী শুধুমাত্র পোপ করেছেন তা নয়, অন্য ধর্মের মানুষরাও প্রত্যাদেশের দাবী করেন। বিশ্বাসের স্বপক্ষে প্রত্যাদেশকে তারা খুব জোরালো প্রমাণ বলে মনে করেন। কিন্তু সত্যিই কি এটা ভালো কারণ?

ধরো, তোমাকে বললাম যে তোমার প্রিয় কুকুরটা মারা গেছে। তাহলে প্রথমে তোমার মন খুব খারাপ হয়ে যাবে। হয়তো তুমি জিজ্ঞাসা করবে 'তুমি কি নিশ্চিত? কিভাবে তুমি জানলে? কিভাবে এটা ঘটল?' এখন ধরি, আমি বললাম -'আমি আসলে ঠিক জানিনা যে কুকুরটা মরেছে। এর কোন প্রমাণ আমার কাছে নেই। আমার মনের ভিতরে একটা অনুভূতির সৃষ্টি হল যে হয়তো সে মারা গেছে।' তাহলে ভয় দেখানোর জন্য

তুমি আমার উপর কিঞ্চিৎ রেগে যাবে। কারণ তুমি জানো কারো মনের অনুভূতি কেউ মারা যাবার ঘটনা বিশ্বাস করার মত যথেষ্ঠ জোলালো ও গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য তোমার সঠিক তথ্য প্রমাণ দরকার। আমাদের প্রত্যেকেই সময়ে সময়ে মনের গভীরে বিভিন্নরকম অনুভূতি বোধ করি। কখনও সেগুলো সঠিক হয় কখনওবা হয় না। বিভিন্নরকম মানুষ প্রত্যেকের চাইতে ভিন্নরকম অনুভূতি বোধ করে। তাহলে কেমন করে তুমি কার অনুভূতিকে সত্য বলে গ্রহণ করবে? তাহলে কুকুরের মারা যাবার ঘটনা আমরা কিভাবে বিশ্বাস করতে পারি? যে নিজচোখে মৃত দেখেছে তার কাছ থেকে শুনে অথবা নিজে কুকুরের হৃদপিণ্ডের বন্ধ হওয়া পরীক্ষা করে কিংবা যিনি কুকুরটা মারা যাবার সময় উপস্থিত ছিলেন এমন কারো কাছ থেকে জেনে নিয়ে।

মানুষ কখনও কখনও বলে যে নিজের মনের গভীর অনুভবকে বিশ্বাস করতে হবে। না হলে স্ত্রীর ভালোবাসার উপর আস্থা রাখা সম্ভব হবে না। কিন্তু এটা ভুল যুক্তি। কারণ কেউ কাউকে ভালোবাসে কি না তা বোঝার অনেক উপায় আছে। চোখে দেখে ও কানে শুনেও ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্মীয় নেতারা যেমন বলেন তেমন এটা শুধুমাত্র মনে গভীরে অনুভবের বিষয় নয়। বাহ্যিক বেশ কিছু চিহ্ন দেখে মনের অনুভূতি বোঝা যায়। চোখের চাহনী, কথার কোমলতা, সহানুভূতি, সহৃদয়তা, এগুলো সবই সত্যিকারের প্রমাণ।

কখনও কখনও মানুষ কোন প্রমাণ ছাড়াই মনে করে তাকে অন্য কেউ ভালোবাসে। শেষ পর্যন্ত যদিও তা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়, তবুও তারা নিজেদের বিশ্বাসে অটল থাকে। কেউ কেউ মনে করে যে সিনেমার নায়ক (বা নায়িকা = Actor) তাকে ভালোবাসে। যদিও তাদের কখনও দেখা হয়নি। তবুও এমন বিশ্বাস থেকে তাকে টলানো যায় না। এই ধরণের মানুষেরা আসলে মানসিকভাবে অসুস্থ। অন্তর্গত অনুভূতিকে বাইরের কিছু উপাদানের প্রেক্ষিতে প্রমাণ সাপেক্ষ হতে হবে, না হলে তাকে কোনক্রমেই বিশ্বাস করা যাবে না।

মনের গভীরের অনুভূতি বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রেও খুব প্রয়োজন। কিন্তু এটা শুধুমাত্র পরবর্তীতে প্রমাণের জন্য পরীক্ষণযোগ্য তবে এমন সব আইডিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোন একটা ধারণা যখন খুব সত্যি বলে মনে হয়, তখন বিজ্ঞানীরাও সে সম্পর্কে দৃঢ় ধারণা পোষন করেন। কিন্তু এটা তারা দীর্ঘসময়ব্যাপী পরীক্ষা চালানোর সুবিধার জন্য করে থাকেন। তারা ঐ দৃঢ় ধারণাকে ভিত্তি করে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে একটি যথার্থ প্রমাণ খোঁজার চেষ্টা করেন। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন আইডিয়া খুঁজে পাবার জন্য নিজের মনের অনুভূতিকে ব্যবহার করেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রমাণ খুঁজে পান না ততক্ষণ নিজের মনের ভাবনার জন্য কোন দায়বদ্ধতা স্বীকার করেন না।

আবার প্রথার কথায় আসি। এবার আমরা একে ভিন্নপদ্ধতিতে দেখবো। প্রথা বা ঐতিহ্য কেন আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি। নিজেদের জন্য উপযোগী পরিবেশে যেন সুস্থভাবে বেচেবর্তে থাকতে পারি সেজন্য প্রাণীরা বিবর্তিত হয়েছে। আফ্রিকার সমভূমিতে সিংহরা খুব ভালবাবে বাঁচতে পারে। ক্রেমাস স্বাদু জলের মাছ, আবার কাঁকড়ারা লবনাক্ত জল ছাড়া থাকতে পারে না। মানুষও একরকম প্রাণী। আমরা এই পৃথিবীতে অন্য মানুষদের সাথে মিলেমিশে বাঁচার উপযোগী করে তৈরি হয়েছি। আমরা সিংহ বা কাঁকড়া মত সাধারণত কোন খাবার শিকার করি না। বাজার থেকে বিক্রেতার কাছ থেকে কিনে নেই। তারা

আবার উৎপাদকের কাছ থেকে কিনে আনে। মাছ যেমন পাখনা দিয়ে জলের মধ্যে ভেসে বেড়ায় আমরা তেমন মানুষের সমুদ্রে সাঁতার কাটছি। অন্য মানুষের সাথে আমরা বিভিন্নরকম সম্পর্ক তৈরি করি। আর এই সম্পর্ক তৈরিতে সাহায্য করে আমাদের বুদ্ধি। সমুদ্র যেমন লবনাক্ত জল দিয়ে ভর্তি, মানুষের পৃথিবীতেও তেমন জানার মত বিভিন্ন জটিল বিষয় আছে। যেমন ভাষা।

তুমি ইংরেজিতে কথা বল, কিন্তু তোমার বন্ধু অ্যান ক্যাথরিন কথা বলে জার্মান ভাষায়। তুমি তোমার নিজস্ব 'মানব সমুদ্রে' সাঁতার কাটার উপযোগী ভাষায় কথা বল। আর কোন উপায় নয় শুধুমাত্র প্রথা বা ঐতিহ্যের মাধ্যমেই ভাষাকে আমরা পেয়েছি। ইংল্যান্ডে পিপ/পেপ (Pepe) বলতে কুকুরকে বোঝায়। কিন্তু জার্মানীতে বলে 'এইন হান্ড'(ein Hund)। এর মধ্যে কোনটাই সঠিক নয় আবার কোনটাই অন্যটার চেয়ে বেশি সত্যি নয়। দুটো শব্দই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। নিজের মত মানব সমুদ্রে সাঁতার কাটার সুবিধার জন্য শিশুদেরকে নিজেদের দেশেই ভাষা শিখতে হবে। নিজের মত মানুষদের সাথে আরও নানাকিছু করতে হলে তাকে অন্য আরও অনেক প্রথা ও ঐতিহ্যকে ব্লটিং পেপারের মত আত্মস্থ করতে হবে। মনে রাখবে প্রথাগত তথ্য বলতে যা দাদুর কাছ থেকে পিতা, পিতার কাছ থেকে নতুন প্রজন্ম পর্যন্ত চলে এসেছে তাকে বোঝায়। শিশুর মগজকে সব ধরণের প্রথাগত তথ্যগুলোকে পিপাসার্তের মত গলাধকরণ করতে হবে। কোনটা ভাল বা মন্দ তা বাছাই করার সামর্থ শিশুদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। তাই তারা ভূত-পেত্নী, জ্বিন-পরী, ডাকিনী, দৈত্য ইত্যাদি বিশ্বাস করা সহ বিভিন্ন আজেবাজে শব্দ শিখে ফেলে।

এটা আসলেই দু:খজনক। কিন্তু করার কিছু নেই। কারণ শিশুরা তাদের চারপাশের সবরকমের তথ্যকে খুব দ্রুত শিখে ফেলে। বিশেষ করে বড়রা যা বলে তা সত্য-মিথ্যা, ঠিক-বেঠিক যাই হোক তাকে গভীরভাবে বিশ্বাস করে। বড়দের অনেক কথা বেশ তথ্যবহুল এবং বিভিন্ন প্রমাণসাপেক্ষে সত্যি একথা ঠিক। কিন্তু তারা যখন বিভিন্ন অর্থহীন বা বাজে কথা বলে তখন তা শেখা থেকে শিশুদের বিরত রাখার কোন উপায় নেই। এখন ওই শিশু যখন বড় হবে তখন সে কি করবে? সেও ছোটদেরকে একই কথা বলবে। তাই বলছিলাম, যখন কোন কিছু গভীরভাবে বিশ্বাস করা হয় তা সে যতই মিথ্যা হোক কিংবা বিশ্বাস করার মত কোন কারণ থাক বা না থাক, তা ছড়িয়ে পড়ে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাহিত হয়ে যায়।

ধর্মের ক্ষেত্রেও কি এমনটাই ঘটেছে? সৃষ্টিকর্তা, স্বর্গ, মেরির মারা না যাওয়া , যিশুর পিতা কোন মানুষ নয়, প্রার্থনার উত্তর পাওয়া যায়, ওয়াইন রক্তে পরিণত হয় - এসবের কোনটার পিছনে কোন ভাল প্রমাণ নেই। তারপরও লক্ষ লক্ষ মানুষ এতে বিশ্বাস করে। এর কারণ হয়তো শৈশব কৈশোরে যখন সবকিছু বিশ্বাস করার মত তাদের বয়স ছিল, তখন বড়রা এসব বিশ্বাস করতে বলেছিল।

লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ধারণায় বিশ্বাস করে কারণ শৈশবেই তারা ভিন্ন ভিন্ন ধারণার কথা শুনেছে। একটি খ্রিস্টান শিশুর চাইতে মুসলিম শিশুর অভিজ্ঞতা ভিন্নরকম। দুজনই এমনভাবে প্রভাবিত হয়ে বড় হয়েছে যে তারা নিজেকে সঠিক ও অন্যদেরকে বেঠিক বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। এমনকি খ্রিস্টান, রোমান ক্যাথলিক, চার্চ অব ইংল্যান্ড, বিশপশাশিত গির্জা, মরমন প্রমুখেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ধারণায় আস্থা রাখে। আবার তারা নিজেকে সম্পূর্ণ সঠিক ও অন্যদের প্রত্যেককে ভুল বলে মনে করে। তুমি যে কারণে ইংরেজি আর অ্যান যে কারণে জার্মান বলে ঠিক একই রকম কারণে তারা ভিন্ন ভিন্ন ধারণায় বিশ্বাস করে। নিজ নিজ

দেশে ইংরেজি বা জার্মানভাষা সঠিক। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম নিজের দেশে সঠিক নাও হতে পারে। কারণ প্রত্যেক ধর্ম অন্য ধর্মকে মিথ্যা বলে প্রচার করে। কোন দেশে মেরি মরতে পারেনা আবার কোন দেশে মেরি সম্পূর্ণভাবে মৃত। মেরি আয়ারল্যান্ডের দক্ষিণের ক্যাথলিক শাসিত দ্বীপে অমর নন, কিন্তু উত্তরের প্রটেস্টান্ট মতাবলম্বীদের কাছে মৃত।

আমরা এই সব বিষয় নিয়ে কি করব? আসলে আমাদের করার তেমন কিছুই নেই। তুমিও কিছু করতে পারবে না। কিন্তু তুমি একটা জিনিস করতে পার। এরপর থেকে কেউ যদি তোমার সামনে কোন কিছুকে গুরুত্বপূর্ণ বলে, তাহলে তুমি নিজেকেই প্রশ্ন করবে-"এটা কি প্রমাণ সাপেক্ষ বক্তব্য? নাকি, প্রথা বা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অথবা প্রত্যাদেশের কারণে বিশ্বাসযোগ্য।" এর পরে কেউ যদি তোমার সামনে কোনকিছুকে সত্য বলে, তাহলে তুমি জিজ্ঞাসা করবে -'কি ধরণের প্রমাণ আপনার কাছে আছে?' তারা যদি এর কোন সদুত্তর দিতে না পারে, তাহলে আমি আশা করবো তাদের কথা বিশ্বাস করার আগে খুব সতর্কভাবে বিচার করবে।

তোমার বাবা

উপরের লেখাটি তাঁর মেয়ে জুলিয়েটের দশম জন্মদিন উপলক্ষে রিচার্ড ডকিন্সের লেখা চিঠির অনুবাদ। Good and bad reasons for Believing শিরোনামের মূল ইংরেজী লেখাটি পরে ডকিন্সের বই A Devil's Chaplain- এ অন্তর্ভুক্ত হয়।

ড. রিচার্ড ডকিন্স, আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী বিজ্ঞানী, গবেষক এবং দার্শনিকদের অন্যতম। পেশায় বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। যুক্তিবাদী এবং সমাজসচেতন লেখালিখির কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে ড. রিচার্ড ডকিন্সের খ্যাতি আজ আক্ষরিক অর্থেই তুঙ্গস্পর্শী। 'ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার', 'সেলফিশ জিন', 'আনোয়েভিং দ্য রেইনবো', 'ক্লাইম্বিং মাউন্ট ইম্প্রোবেবল', 'ডেভিলস চ্যাপ্লেইন' এবং 'অ্যান্সেসটর টেল' সহ অসংখ্য পাঠকনন্দিত জনপ্রিয় ধারার বিজ্ঞানভিত্তিক বইয়ের রচয়িতা। সম্প্রতি নিজ উদ্যোগে তৈরী করেছেন 'রিচার্ড ডকিন্স ফাউন্ডেশন'। তাঁর সর্বশেষ বই - 'দ্য গড ডিলুশন' এখন পর্যন্ত বিগত বাইশ সপ্তাহ ধরে নিউয়র্ক টাইমসের 'বেস্ট সেলার' তালিকায় রয়েছে।

অগ্নি অধিরূঢ়, বাংলাদেশে বসবাসরত মুক্তমনার নিয়মিত লেখক। বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ইমেইল - agniadhirurho@gmail.com

আত্মঘাতী কুসংস্কার

প্রদীপ দেব

১

সম্প্রতি আমার এক কাকা মারা গেছেন। তাঁর যক্ষা হয়েছিল। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ধরা পড়লো তাঁর মাথায় একটা টিউমারও হয়েছিল এবং ব্রেন টিউমারের নিয়ম অনুসারেই তা দ্রুত বাড়ছিলো। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, বিজ্ঞানে বিশ্বাসী। বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসার পরামর্শই দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার আত্মীয় মানে কাকার ছেলে মেয়েরা এবং আরো অনেক আপাত শুভাকাঙ্খীর বিশ্বাস বিক্ষিপ্ত। তাঁরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাশাপাশি কিছু তান্ত্রিকের শরণাপন্নও হয়েছিলেন। বাড়িতে থাকিনা বলে ঘটনাগুলো আমার অজানাই ছিল। কিংবা ইচ্ছে করেই আমাকে জানানো হয়নি। কাকার মৃত্যুর পর যা জেনেছি - তাতে দেখা যাচ্ছে কাকাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আওতায় আনা হয়েছিল একেবারে শেষ অবস্থায়।

যক্ষা রোগের প্রাথমিক লক্ষণ ধরা পড়ার পর স্থানীয় হাসপাতালে যোগাযোগ করে চিকিৎসা নেয়ার পর কাকার আত্মীয় স্বজনরা বলতে শুরু করলেন - কাকাকে "বাণ" মারা হয়েছে। যে সে "বাণ" নয়, একেবারে "রক্তবাণ"। রক্তের সম্পর্কের কেউ নাকি কাকার ক্ষতি করার জন্য জাদু টোনা করে এই "বাণ" মেরেছে। কাকা নিতান্তই দরিদ্র একজন মানুষ। তাঁর ক্ষতি করে আত্মীয়স্বজনদের কী উপকার হবে কে জানে। তবে এ ধরণের ব্যাপারে পাড়া প্রতিবেশীর বিশ্বাস অর্জন করতে সময় লাগে না। "বাণ" কাটার ব্যবস্থাও আছে। বিখ্যাত তান্ত্রিককে হাজির করা গেলো একজোড়া হালের বলদ বিক্রি করে। নানারকম জাঁকযজ্ঞের প্রহসনে গেলো আরো কয়েক হাজার টাকা। "রক্তবাণ" কাটা গেছে বলে মহাবাক্য উচচারণ করতে করতে কাকার গোয়াল থেকে একটি গাই গরু নিয়ে চলে গেলেন তান্ত্রিক সাধক। কাকা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেলেন আরো কয়েক ধাপ। প্রাণের সাথে সাথে ধনেও টান পড়লো মারাত্মকভাবে।

২

এ ধরণের ঘটনা বাংলাদেশের আনাচে কানাচে এতটাই স্বাভাবিক যে শুনে আমাদের খুব একটা প্রতিক্রিয়া হয় না। আমরা যেন ধরেই নিয়েছি যে এসব তো ঘটবেই। শুধু আমার দরিদ্র কাকার বেলায় কেন - খুব বড় বড় মানুষের ক্ষেত্রেও তো দেখা যায় নানা রকম অবৈজ্ঞানিক কাজ কর্ম। এই তো সেদিন স্কয়ার হাসপাতালের সামনে গণদোয়া অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার রোগ মুক্তির জন্য। সারাদেশে এ ধরণের দোয়া, প্রার্থনা অবিরাম চলছে যে কোন ব্যাপারেই। সম্প্রতি দেশের খারাপ অবস্থার জন্যও দেশের সেনাবাহিনীর প্রধান ব্যক্তি দায়ী করলেন স্বয়ং আল্লাহ্‌কে। আল্লাহ্ নাকি পরীক্ষা করছেন দেশের মানুষের। কয়েক বছর আগে জোট সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন যখন একজনের মৃত্যু প্রসঙ্গে বলেছিলেন - "আল্লাহ্‌র মাল আল্লাহ্ নিয়ে গেছেন" কেউ কেউ প্রতিবাদ করে বলেছিলেন - তিনি দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা করছেন। এখন "আল্লাহ্

আমাদের পরীক্ষা করছেন" কথাটা কি দায়িত্ব এড়ানোর পর্যায়ে পড়ে না? আসলে যুক্তিনির্ভর মানুষ মাত্রেই জানেন যে - অলৌকিকতার আশ্রয় মানুষ তখনই নেয় যখন লৌকিক ব্যাপারটা নিজের বিপক্ষে যায়।

৩

নানা রকম মানুষের নানা রকম সংস্কার আছে। অনেক দিন থেকেই চালু হয়ে আছে এসব সংস্কার। কোন কোন সংস্কারকে আমরা কুসংস্কার বলি, কোন কোনটাকে ভালো মন্দ কিছুই না বলে প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখি। যেমন অনেকে ১৩ সংখ্যাটিকে এড়িয়ে চলেন। আনলাকি থার্টিন বেশ প্রচলিত একটি সংস্কার। কেউ এ সংস্কার মেনে চললে আমরা কেউ কিছু মনে করি না। কোরিয়ায় ৪ সংখ্যাটি হলো মৃত্যুর প্রতীক। সেখানে পারত পক্ষে কেউ চার সংখ্যাটি ব্যবহার করে না। লিফ্‌টে দেখা যায় 1, 2, 3, F, 5, 6 । এ ধরণের সংস্কার নিয়ে আমরা বড়জোর হাসি। কিন্তু খুব একটা আত্মঘাতী মনে করি না এদের। ভারতীয় ক্রিকেটারদের আঙুলে হাতে বাহুতে গলায় নানারকম সুতা, আংটি, তাবিজ, লকেট দেখতে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। একটা উইকেট পেলে বোলারদের যেভাবে মাদুলিতে চুমু খেতে দেখি তাতে বড়জোর মনে করি যে ক্রিকেটারটি বড়ই সংস্কারাচ্ছন্ন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে আমরা কিন্তু এই ক্রিকেটারকে বিশ্বাসের এই অন্ধত্বের জন্য বর্জন করি না। কিন্তু সকল কুসংস্কারই যে মাঝে মাঝে আত্মঘাতী হয়ে উঠে।

৪

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন। চট্টগ্রাম শহর থেকে যারা শাটল ট্রেনে ইউনিভার্সিটিতে আসা যাওয়া করেছেন তারা জানেন ট্রেনের অবস্থা। একদিন ট্রেনে ফিরছি ক্যাম্পাস থেকে। প্রচন্ড ভীড়। আমাদের কম্পার্টমেন্টের সিঁড়িতে পা ঝুলিয়ে বসেছে বেশ কয়েকটি মেয়ে। আমি গাদাগাদি ভিড়ে তাদের পেছনে বন্ধুদের সাথে দাঁড়িয়ে। ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে ট্রেন থামতে না থামতেই ধুপধাপ নামতে গিয়ে মেয়েদের একজনের আর্তচিৎকার। তার দুই পা চলে গেছে ট্রেনের নিচে, চাকার কাছে। প্লাটফরমের ধার আর ট্রেনের কম্পার্টমেন্টের মাঝে আটকে আছে সে। স্বাভাবিক রিফ্লেক্স অনুসারে দ্রুত তার হাত ধরে টেনে তুলতে গিয়েই ধাক্কাটা খেলাম। আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা মেয়েটি চিৎকার করছে - "আপনি না, আপনি না, কোন মেয়েকে ডাকুন"। আশে পাশের মেয়েরা কেউ সাড়া দিচ্ছে না তার আহবানে। এ অবস্থায় কোন সাহসী মেয়েকে ডেকে এনে তাকে টেনে বের করার অর্থ হলো আরো অনেকক্ষণ সময়। ট্রেন এখানে থামে বড়জোর দু'মিনিট। এর মধ্যে ট্রেন যদি চলতে শুরু করে - আস্ত পা নিয়ে আর উঠতে হবে না তাকে। দু'বন্ধু মিলে তাকে টেনে প্লাটফরমের উপর তোলার পর মেয়েটির আবারো ধমক, "কেন আমার হাত ধরলেন আপনারা"? একটি দুর্ঘটনা থেকে একজন মেয়েকে হাত ধরে টেনে উদ্ধার করার মধ্যে কী অপরাধ থাকতে পারে আজও বুঝতে পারিনি। বোরকা পরা মেয়েটি কি কোরাণের বাণী অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছেন যে বেগানা পুরুষের স্পর্শে পাপ হয়। এ কী ধরণের সংস্কার একজন ইউনিভার্সিটি পড়া স্টুডেন্টের!

৫

সাপের কামড়ে ডাক্তারের বদলে ওঝার শরণাপন্ন হয় এখনো বেশির ভাগ মানুষ। সাপ সম্পর্কে কত রকম কুসংস্কারই না চালু আছে আমাদের মাঝে। সাপুড়েরা নানারকম আষাঢ়ে গল্প করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছে নিয়মিত। বীণ বাজালে সাপ ছুটে আসে একথা বিশ্বাস করার লোকের অভাব নেই। আর সাপ সম্পর্কে অদ্ভুত সব অসত্য গল্পে ভরা আমাদের লোককাহিনীগুলো, রূপকথাগুলো। আর সিনেমা গুলোর তো কথাই নেই। এসব পড়ে দেখে শুনে সাপ সম্পর্কে আমাদের কুসংস্কার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে - সাপে কামড় দিলে সোজা যে হাসপাতালে নেয়ার দরকার তা না করে ওঝার হাতে সময় সঁপে দিই। নির্বিষ সাপে কামড়ালে বেঁচে যাই - প্রাথমিক চিকি□সায় - যা ওঝা তাদের নানারকম ভড়ং সহ দিয়ে থাকে। আর বিষধর সাপে কামড়ালে ওঝাও যখন কিছু করতে পারে না - তখন ডাক্তার ডাকি। কখনো বাঁচি - বেশির ভাগই মরি। কারণ বিষের ক্রিয়া ততক্ষণে মারাত্মক হয়ে ওঠে। আমাদের আধুনিক প্রযুক্তির যুগেও ওঝার ডাক পড়ে - এর চেয়ে আত্মঘাতী সংস্কার আর কী হতে পারে।

৬

সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় সিডরে ভোলার অনেক গুলো ইউনিয়নে নিজেদের ঘর ছেড়ে বের হয়নি বাড়ির বউরা। সবাই আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিলেও বাড়ির বউরা ঘরে রয়ে গিয়েছিল এই বিশ্বাসে যে "ঘরের মইধ্যে বউরা না থাইকলে হেই ঘর থাহেনা"। যুগান্তর পত্রিকায় এ খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল ৪/১২/০৭ তারিখে। সিডর কাউকে রেহাই দেয়নি সেখানে। কারণ ঘরে বউ থাকলো কি থাকলো না তাতে কিছু যায় আসে না প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কাছে। কিন্তু এই আত্মঘাতী কুসংস্কার দূর করা কি যায় এত সহজে? বৈজ্ঞানিক পূর্বাভাসকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে বসে থাকার শক্তি যোগাচ্ছে আত্মঘাতী সব কুসংস্কার।

৭

অনেক গ্রামে আমি দেখেছি - সন্তান জন্মাবার পর মা ও শিশুকে প্রায় এক মাস থাকতে দেয়া হয় আঁতুড় ঘরে। এই আতুঁড় ঘর হলো বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে নোংরা একটি ঘর। এই একমাস প্রসূতি মাতাকে এই আঁতুড় ঘরে প্রায় বন্দী করে রাখা হয়, অস্পৃশ্য করে রাখা হয়। এক মাস নাকি মা ও শিশু অপবিত্র থাকে। অথচ এই সময়টাতে মা ও শিশুর থাকা দরকার সবচেয়ে আরামে, সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন অবস্থায়। কারণ যে কোন সুযোগেই নানারকম সংক্রমণ ঘটতে পারে মায়ের এবং নবজাতকের। কিন্তু কুসংস্কারের কারণে প্রসূতি মাতা ও নবজাতককে কাটাতে হয় অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে যা পরবর্তীতে তাদের স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে।

৮

আমাদের সংস্কার চিন্তা প্রবল। দিনে দিনে তা আরো বাড়ছে। কিন্তু যতসব কুসংস্কারের ডিব্বা গলায় বেঁধে সযতনে আগলে রেখে কতটুকু এগিয়ে যাওয়া সম্ভব আমাদের? আমাদের দেশে লোডশেডিং-এ যত মোমবাতি

জ্বলে তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে মোমবাতি জ্বলে মন্দির মসজিদ গির্জা প্যাগোড়া ফকির দরবেশ আউলিয়াদের মাজারে। এই মানত করা মোমবাতির আলোতে মনের কুসংস্কারের অন্ধকার আরো গাঢ় হয়, আমরা এগিয়ে চলি অন্ধকারের দিকে। এখন আমাদের দরকার একটি ঝকঝকে নতুন বিজ্ঞান-প্রজন্ম। সংস্কারে মসৃণ হওয়ার দরকার নেই, যুক্তিতে রুঢ় হলেই হলো।

ড. প্রদীপ দেব অস্ট্রেলিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত। ইমেইল - Pradip.Deb@utas.edu.au. প্রকাশিত বইঃ অস্ট্রেলিয়ার পথে পথে (২০০৫), আলবুকারকি থেকে হলিউড (২০০৬), আইনস্টাইনের কাল (২০০৬)।

মহাশূন্যে শিবলিংগ

নৃপেন্দ্র নাথ সরকার

১ক খুঁদে দেবতা

আম গাছে মুকুল এলেই অপেক্ষার শেষ হত না। আম পাকবে, খাব। কিন্তু একটু সমস্যা ছিল। ঠাকুরমা গাছের প্রথম দুটো আম দেবতার ভোগের জন্য রেখে দিত। বলত, "যা, ঠাকুর বাড়ী যা। খোকা বা পরান ঠাকুর-রে ড্যাইক্যা নিয়া আয়।" ওরা তখন হয়তো রাস্তায় মার্বেলের গুটি দিয়ে খেলছে। খেলা বাদ দিয়ে সাথেসাথেই চলে আসত। এর মধ্যে একটা আকর্ষণ ছিল। ঠাকুরমা একটা বাটিতে দুধ-মুড়ি দিত আর আম দুটো সযত্নে চুকলা ছাড়িয়ে বাটিতে ছেড়ে দিত। দেবতা আম-গোলা-দুধ-মুড়ি তৃপ্তি নিয়ে খেত। আম-দুধের গন্ধে ঘর ভরে যেত। আমার জিভের জল চুইয়ে পড়ত। ঠাকুরমা মাটিতে পড়ে থাকা আমের চুকলা দুটো আমার হাতে ধরে দিত। তাই চেঁটেপুটে খেতাম। খাওয়া শেষে ঠাকুরমা একটি চকচকে আধ-আনি দক্ষিনা দিত খোকার হাতে। খোকা নাচতে নাচতে চলে যেত। ঠাকুরমা তখন আর একটি বাটিতে আম দুধের সাথে মুড়ি মেখে দিত। আমের চুকলা আর আঁটিতে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকত ঠাকুরমা তাই খেত আর আমার আম খাওয়ার দৃশ্য দেখে পরম তৃপ্তিলাভ করত।

১খ নিয়ম মেনে চলতে হয়

আমার আমের জন্য অপেক্ষা করা নিশ্চয় ঠাকুরমাকে পীড়া দিত। কিন্তু তাতে কি? ঠাকুরমার তো কিছু করার ছিল না। গাছের প্রথম ফলটার ভাগীদার একজন দেবতা। সেই দেবতা ফলটি ভক্ষন করবেন, আম খাওয়া উদ্বোধন হবে, তারপর গাছের মালিকের অনুমতি হবে। এটাই নিয়ম। ঠাকুরমা তো নিয়ম বহির্ভূত কাজ করতে পারেনা। আমিও জেনে গেছি নিয়ম নিয়মই। নিয়ম নিয়মিত চলতে থাকে। ধর্ম থেকে সৃষ্ট এই সব নিয়ম মগজে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। আমার আমের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা ঠাকুরমার হয়তো তেমন কষ্ট হতনা।

১গ ঠাকুরমার ভূতে বিশ্বাস

ভূত আছে কি নেই, তার ঠিক নেই, কিন্তু ভয় আছে তা সত্য। ধর্মের সাথে ভুতের মিল আছে। ধর্মের নিয়ন্তা ঈশ্বর (ঈশ্বর শব্দটি ব্যবহারই নিরাপদ।)

ঈশ্বর আছে কি নেই
তার নেই কোন ঠিক
তার সবই বেঠিক
তাকে শুধুই ভয়, এটাই ঠিক।

ধর্ম বড়ই শক্তিশালী। এদের অবস্থান মগজে। জন্মের পর থেকেই এরা মগজটাকে ধোলাই করে শক্ত ঘাটি বানিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। মানুষের নিজস্ব চেতনাবোধে ক্ষত সৃস্টি করে। এই ভুতের বদৌলতে আমার ঠাকুরমা তার নিজের নাতিকে বঞ্চিত করতে পেরেছেন। ঠাকুরমা তাঁর নিজের নাতি বাদ দিয়ে অন্যের নাতিকে আগে যত্ন-আত্তি করে কোন কষ্ট পাননি, বরং পরম শান্তিই পেতেন।

১ঘ চলছে-চলুক

খোকা আমার সমবয়সী। এক সাথে খেলতাম, ঝগড়া-ফগড়াও করতাম। সে তো যখন খেলি তখন। ধর্মের প্রসংগ এলে একই খোকাকে দেবতা বানানো হয়। খোকার কোন দোষ নেই। আমরাই বানাই। আমার ঠাকুরমা বানায়, আমি বানাই। নেপালে সব মেয়েই মেয়ে। আবার কোন এক বিশেষ মেয়ে দেবী, কুমারী। কোন প্রশ্ন করার প্রশ্নই হয় না। সংস্কার, নিয়ম। নিয়ম নিয়মের মত চলে। খোকার মধ্যে কোন দেবত্ব আছে কি নেই, এ নিয়ে সংশয়ের কোন স্থান নেই। কারন, এটিই নিয়ম। নিয়মের বাইরে গেলেই অনিয়ম। অনিয়ম থেকে বিশৃংখলা, মারমারি, হানাহানি। তসলিমা নারী নির্যাতনের কথা বলেছে বলেই যত বিপত্তি। নির্যাতিতা নারীও তসলিমার বিপক্ষে সাফাই দিচ্ছে। বোরখার ভেতরে আবদ্ধা রমনীর বিশ্বাস ওই বোরখার ভিতরেই স্বাধীনতার স্বর্গসুখ। নিবিড় বিশ্বাসের মোহে, নির্যাতন নির্যাতনই মনে হয়না; বরং ওর মধ্যেই আছে মাদকতা, তৃপ্তি, আনন্দ, নারীর সমান অধিকার আর গগনচুম্বী সন্মানবোধ।

বনের পাখীরে ডাকি বলিছে খাঁচার পাখী
আমি থাকি মহাসুখে ঝড়ঝঞ্জার নেই ঝুকি
তোমার চোখে ঘুম নাই, খাবার মিলবে কোথা
খাটে বসে খাই আর ছড়াই হেথা আর হোথা
নিজের মনে গাও তুমি কিচির মিচির গান
বুম্বাই ট্রেনিং দিছে মোরে জানের জান।

দুই নারী সমান এক নর,
ইহাই জানিবে নারীর সম-অধিকার!

২ মহাশূন্যে শিবলিংগ

পৃথিবীর উচ্চতম ডিগ্রীধারী একজন শিক্ষিত ব্যক্তি, বিবর্তনবাদ, পদার্থবিদ্যা বা মহাশূন্য গবেষনায় নোবেল পুরস্কার পেয়ে যাবেন হয়তো। মগজ ভর্তি পদার্থ বিদ্যা বা মহাশূন্যের নতুন নতুন তত্ত্ব, পাঁচ-দশখানা আইনস্টাইন-ডারউইন ঢুকে আছে মগজে। কিন্তু ধর্মের প্রসংগে এই জগত বিখ্যাত লোকটিও হয়তো যবুথবু হরিদাস পাল, একজন পূণ্যার্থী। দেখা যাবে কোন এক মন্দিরে মহাশূন্য গবেষক হরিদাস পাল বৌয়ের হাত ধরে শিবলিংগে দুধ ঢেলে পূণ্য সঞ্চয়

করছেন। মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য নিরুপণে মগ্ন মহাশূন্য বিজ্ঞানী শিবলিংগে বুঝিবা নতুন তথ্য খোঁজে পান। দুধ ঢালতে ঢালতে একসময় স্ত্রীর কথা ভূলে শিবলিংগ নিয়ে মহাশূন্যে পাড়ি জমান।

পৃথিবী বিখ্যাত পদার্থবিদটি যদি একজন মুসলমান হন, ধর্মের কথা হলেই 'তুমি আর... নও সে তুমি। তুমি এখন আয়েত আলী মিয়া। যুক্তিবাদী আরজ আলী মাতুব্বরের নখের যুগ্যিও না।' পদার্থবিদ আয়েত আলী বা মহাশূন্য গবেষক হোসেন মিয়াকে হয়তো দেখা যাবে মক্কার বাতাসে শয়তান আছে ভেবে পাথর ছুড়তে। এদের মনে সামান্য প্রশ্নও জাগবে না, বাতসে কোথায় শয়তান?

৩ নব নব দেবতার আবির্ভাব

১১ই মার্চ ২০০৮ তারিখে ভারতে দিল্লীর ৩১ মাইল পুবে দুই মুখ নিয়ে জন্মগ্রহন করল লালি। এটি একটি অস্বাভাবিক জন্ম। হাজারো বিড়ম্বনা আছে ভবিষ্যতে। কিন্তু হিন্দু পূণ্যার্থীরা বুঝে ফেলেছে, লালি আর কেউ নয়, স্বয়ং কোন দেবী। কোন দেবী? তেত্রিশ কোটির মধ্যে হবে একজন! শুরু হয়ে গেল পূজো-অর্চনা। হায়রে লালি! তুই বুঝলি না তুই কি জিনিষ! অস্ত্র-প্রচারে আলাদা করা? স্বয়ং দেবীর গায়ে আঘাত। অসম্ভব। ধর্মে সইবে না। যত বেশী অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে, হিন্দু ভাববে তত বড় দেবতা।

বাংলাদেশে নতুন আরও একখানা দেবতার সংযোগ ঘটেছে। নাম বাবা লোকনাথ। ছোটবেলায় লোকনাথের পঞ্জিকা দেখেছি। হয়তো সেই লোকনাথই এখন নতুন দেবতা। মুহাম্মদ একটা ভাল কাজ করে গেছেন। একটা শক্ত দাঁড়ি টেনে দিয়ে গেছেন। আমার পরে আর কোন পয়গম্বের আগমন হবে না। বাস্! নতুন পয়গম্বরে্র আর কোন উ্পাত নেই। কিন্তু ভারত একটি উন্মুক্ত এবং উর্বর দেশ। যখন তখন দেবতাদের আবির্ভাব হয়। সারা হিন্দুস্থানে যে সময় তিন লাখ লোকও ছিলনা, তখনই দেব-দেবীর সংখ্যা ছিল তেত্রিশ কোটি। তারপর একে একে নতুন আরও কত দেব-দেবী যোগ হয়েছে কে তার হিসেব রাখে?

৪ক পেশা ছেড়ে অপেশা

তসলিমা নাসরিন নিজেই নির্যাতিতা। ছয়-সাত বছর বয়সে আপনজন দ্বারা লাঞ্ছিতা হয়েছেন। দেখেছেন নিজের পরিবারে ব্যভিচার, পীর এবং ধর্মীয় মৌলবাদের প্রভাব। মা পীরের বাড়িতে জিকির করতেন। মায়ের সাথে পীরের কথা, কোরানের বাণী শুনতেন। জীবনের শুরুতে এত কিছু দেখে শুনে যুক্তি দিয়ে বুঝার চেষ্টা করতেন। পীরের যুক্তি বুঝার জন্য কোরান ভালভাবে পড়লেন। আবার পড়লেন। কোরান পড়ে তাঁর মনের যন্ত্রনা উপশম হলনা। বরং আবিষ্কার করলেন নারী নির্যাতনের প্রচুর মশলা আছে ওতে। পুরুষ সবসময়ই নারীর এক ডিগ্রী উপরে (২:২২৮), দুই নারী এক পুরুষের সমান (২:২৮২), মনে করলে পুরুষ মহিলাকে পিটাবে (৪:৩৪), ইত্যাদি।

মানুষের রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত করার মহান ব্রত নিয়ে চিকি□সা পেশাকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, সারা দুনিয়ার অর্দ্ধেক মানুষ ভয়ানক এক কোষ্ঠ রোগে আক্রান্ত! সাধারন চিকি□সার জন্য ভূড়ি ভূড়ি ডাক্তার তৈরী হচ্ছে ফি-বছর। কিন্তু সামাজিক কোষ্ঠ রোগটি দেখার কেউ নেই। ভাবেও না কেউ। ঘোরের মধ্যে বাস করে রোগী নিজেই জানেনা সে কতবড় অসুখ নিয়ে খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলছে।

ব্যামো সারাতে গেলে প্রথমে রোগ নির্নয় করতে হয়। রোগ নির্নয় করতে রোগের গভীরে প্রবেশ করতে হয়। সমাজে নারী রাতে ভোগের সামগ্রী আর দিনে তার সঞ্চালন মাত্রা রান্না ঘর থেকে খাবার টেবিল। মানুষের মৌলিক অধিকার একজন নারীর নেই। ধর্মগ্রন্থ কোরানেও নারীর অধিকার সীমিত, নির্যাতন সহায়ক। মানুষকে রোগমুক্ত করে জনসেবার চেয়ে নারীর মুক্তিই তাঁর কাছে জরুরী হয়ে দাঁড়াল। মালেকা বেগমদের মত পায়ের উপর পা তুলে জীবনটাকে উপভোগ করতে পারতেন। কখনো সখ হলে নারী নেতা সেজে সভা-সমিতিতে বাণী প্রচার করতে পারতেন। তিনি তা করতে পারলেন না। স্টেথোস্কোপ ছেড়ে ধরলেন কলম।

৫ক জ্ঞানতীর্থ, জ্ঞানচূড়ামনিদের বেহাল অবস্থা

মানুষের মগজ ধর্মের দেহ, আর বিশ্বাসবোধই তার আত্মা। ধর্মের প্রথম ও প্রধান শর্ত বিশ্বাস স্থাপন। এই বিশ্বাসের মৃত্যু হলেই ধর্ম থেকে মানুষের নির্বান লাভ। আর মানুষে মানুষে ধর্মভিত্তিক ভেদাভেদের অবসান ঘটে। অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এর জন্য দরকার নতুন মতবাদ দ্বারা নিজেকে মহাপুরুষে উন্নীত করে বাকী সবাইকে মোহাবিস্ট করে রাখা। নতুন মতবাদকে শক্তিশালী করতে মাত্র একটি মিথ্যা দরকার। বলতে হবে, আমি কেউ নই, আমি ঈশ্বরের প্রতিনিধি মাত্র। আমি যা বলি এগুলো সবই তাঁর কথা। মহাপুরুষটি একদিন মারা যাবেন কিন্তু তাঁর বানী-চিরন্তনী ধর্ম নামে সময়ের সাথে অনড় হয়ে বসে থাকবে। অতীতে তাই ঘটেছে। মোহাবিস্ট অনুগামীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধর্মকে মগজে ধারন করে কৃতার্থ হচ্ছে। মহাপুরুষের ধজ্জ্বাধারীরা প্রতিষ্ঠিত বানীকে অক্ষত রাখার দৃঢ় প্রত্যয়ে যুগে যুগে পাতি মহাপুরুষের সৃস্টি হচ্ছে। ধর্মের ধারা অব্যাহত রাখার অপচেষ্টা চলেছে। সময় এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞানীরা সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে গবেষনা করে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীদের নব নব আবিষ্কার ও প্রযুক্তির কল্যানে প্রতি নিয়তই শতাব্দীর পুরনো অনড় ধর্মীয় বাণীগুলো অসারে পর্যবসিত হচ্ছে, ন্যুব্জ হচ্ছে। তখন জ্ঞানতীর্থ, জ্ঞানচূড়ামনিদের নীচ থেকে চিমটি কাটা ছাড়া আর কোন উপায় থাকছে না।

৫খ তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে

হাজার, দেড়-হাজার, দু-হাজার বছর আগে, বিজ্ঞান চর্চা তেমন ছিলনা। পৃথিবী ছিল আধ্যাতিকতার চারণক্ষেত্র। বড় বড় বুলি আর প্যাচালের যুগ। ফলে প্রতিটি ধর্মের নেতা ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের অপ্রতিরুদ্ধ অগ্রগতির ধারা অনুধাবন করতে পারেননি। তাঁরা নিজেদেরকে গগনচূম্বী তাল গাছ আর ধর্মকে প্রকান্ড তাল ভেবেছিলেন। ভাবতে পারেননি তাল একদিন মাটিতে থুবড়ে পড়বেই।

তালগাছ একঠাঁয়ে দাঁড়িয়ে
আশ-পাশ ছাড়িয়ে
উকি মারে আকাশে-দুরে
মনে ভাবে
আমি কি হনুরে ...

ঘুড়ি ভাবে,
তালগাছ তুই তালগাছ
মাটির সাথে তোর সহবাস
দেখ, মেঘের কাছে আমি
ভাসি শূন্যে, আমি অন্তর্যামী।

তালগাছ জানেনা মৃত্যু তার শিরোধার্য। পাতা বিবর্ণ হবে। গাছ শুকিয়ে মারা যাবে। উনুনে চাপিয়ে গৃহবধূ একদিন পিঁয়াজো ভাজবে। ঘুড়ি আকাশে মাথা আর লেজ নেড়ে তুবড়ি বাজায়। জানেওনা ঝাপ্টা বাতাসে কখন সুতো ছিড়ে মাটিতে হূমড়ি খেয়ে পড়বে অথবা গাছের ডালে ঝুলতে থাকবে, কখন বাশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠবে, আর তার কাজলা দিদি শোলক শোনাবে।

তালগাছেরা ভেবেছিলেন এই পৃথিবী তখন যেমন ছিল, হাজার বছর পরেও তেমনি থাকবে। তাঁদের বক্তব্য কোনদিন ভূল প্রমানিত হবে এমনটি ঘুনাক্ষরেও ভাবেননি। হাজার বছর আগের পারিপা্র্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে নিজের চৌকষ বুদ্ধিতে মাথায় যা এসেছে তাঁরা তাই বলেছেন। ফলে বাণী তাল গাছের মত ইতিহাসের পাতায় একপায়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে।

বিজ্ঞানের অপ্রতিরোদ্ধ অগ্রগতিতে অনেক বাণীই ভূল প্রমানিত হচ্ছে। নেতা চলে গেছেন। কিন্তু ধজাধারীরা বিপাকে পড়ে গেছে। পথ একটাই বিজ্ঞানীর মুখ বন্ধ কর নতুবা জেলে ঢুকিয়ে রাখো। ধর্ম নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও আর ব্রুনোর মত বিজ্ঞানীদের মাথায় খড়্গ ধরেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে সাময়িক ভাবে শ্লথ করেছে। থামাতে পারেনি। হিংস্রতা এখনও বন্ধ হয়নি। সময়ে সময়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

৬ জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কেবা কবে

নেতার মুখ থেকে ধর্মের জন্ম হয়েছে। কাজেই একদিন মৃত্যু হবে। প্রাচীন অনেক ধর্মেরই মৃত্যু ঘটেছে। যেগুলো এখনও দাপাদাপি করছে, এদেরও নিশ্চিত মৃত্যু হবে।

আম-জনতার মাথায় হাত বুলায়ে রাজা সেজে মগজ ধোলাই করা বিজ্ঞানী বা ইঞ্জিনীয়ারের কাজ নয়। এটি ধর্মনেতার কাজ। ধর্মনেতা যা বুঝেন এবং বলেন তার নাম বাণী। সব্বাইকে তা মেনে চলতে হবে। এর নাম শান্তি। না মানলে অশান্তি, বিবাদ। আর বিবাদ মানেই গর্দান। ধর্ম নিজে প্রানহীন। কিন্তু ধর্মধারীরা প্রানহীন নয়। এরা আপোষহীন। মারমূখী। ধর্মের কাছ থেকে বিজ্ঞানের নেওয়ার কিছু নেই। বরং, ধর্ম বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনীয়ারের সৃষ্ট কৌশল অপব্যাবহার করে মানব সভ্যতার বিনাশের অপকৌশলে নিয়োজিত। বাঘ বা সিংহ একটি প্রাণী হত্যা করে। কিন্তু ধর্ম নাখোঁস হলে প্রাণ যায় লক্ষ লক্ষ মানুষের।

বিজ্ঞান কারও ধার ধারে না। বস্তু ও প্রকৃতির রস ও তথ্য অনুসন্ধানই বিজ্ঞানীর কাজ। ইঞ্জিনীয়ার বিজ্ঞানীর একীভূত জ্ঞান সমন্বয়ে নতুন যন্ত্র ও কৌশল তৈরী করে মানুষের জীবন ধারন সুন্দর ও আরামদায়ক করে। বিজ্ঞানের জন্ম নেই, কাজেই এর মৃত্যু নেই। নিউটন মহাকর্ষ বলের জন্ম দেননি। উনি শুধু তথ্যটি গুছিয়ে সবাইকে বলেছেন। কোন নেতা হননি। মাটির নীচে খনিজ পদার্থ যীশু খ্রীষ্টের জন্মের আগেও ছিল। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন মাত্র। মেঘে মেঘে ঘর্ষনের ফলে বিদ্যুত তৈরী হয়। আগেও হত, এখনও হয়। আগে জ্ঞানের অভাব ছিল। সুযোগ বুঝে কোন ধূর্ত ব্যক্তি পন্ডিত হয়েছেন, “আরে, তোমরা কিছুই জান না। ঈশ্বর শুধু আমাকে বলেছেন। তোমরা তাঁকে ভয় কর না, তাই দন্ত-কপাটি দেখিয়ে ভয় দেখাচ্ছেন।” বিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞান না থাকা পর্যন্ত মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে বিদ্যুত চমকানো সৃষ্টিকর্তারই কাজ। মানুষ কিছুই পারেনা। তিনি সবই পারেন। এটিও তাঁরই কাজ। মানুষ যখনই এর আসল তত্ত্বটি বুঝতে পেরেছে তখনই ধর্ম বিজ্ঞানকে শত্রু রুপে চিহ্নিত করেছে। সংঘাত হয়েছে। ধর্ম পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে। ইদানীং সুর পাল্টাচ্ছে। সুর পাল্টাচ্ছে ব্যাখ্যায়, অনুবাদে।

৭ বিজ্ঞান ও ধর্মে সংঘাত নাকি সমন্বয়?

এ দুটোতে সংঘাত বা সমন্বয়ের কোন কারন নেই। দুটোর পথ ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। ধর্মের উদ্দেশ্য হল অন্যের উপর প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তার করা। তাই রাজনীতিকে ধর্মের মাসতুত ভাই বলা চলে। অপর পক্ষে মানুষের উপর প্রাধান্য বিস্তার বা রাজনীতিবিদ হওয়ার খায়েস একজন বিজ্ঞানীর থাকে না। প্রাকৃতিক নিয়ম এবং বস্তু বা পদার্থের গুনাবলী নির্নয়কল্পে একজন বিজ্ঞানী আবিষ্ট মনে নিরলস কাজ করে চলে। বিজ্ঞানীদের নব নব আবিষ্কার হাজার বছরের পুরনো ধর্ম-ভিত্তিক ধারনা ভুলে পর্যবসিত হয়। ধর্ম তখন আঘাত প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিষয়। একে ধরা যায় না। ধার্মিকটি প্রাকৃতিক নিয়মকে না ধরতে পেরে হাতের কাছের বিজ্ঞানীর গালে চড় মারে। বিজ্ঞানী একা। তাই তাকে আর একটা গাল বাড়িয়ে দিতে হয়।

তসলিমা জড় পদার্থ কিম্বা জীব বিজ্ঞানী নন। তিনি আদতে ছিলেন চিকি□সক; কিন্ত সমাজকে তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে করতে পরিণত হন সমাজবিজ্ঞানীতে । ধর্ম নারী নির্যাতন সমস্যাটিকে জটিল ও স্পর্শকাতর করেছে।

তিনি সমস্যাটির কেন্দ্রে প্রবেশ করে এর বিশ্লেষণ করেছেন, সেখানে তিনি সম্পূর্ন একা। যা ঘটেছিল গ্যলিলিও, কোপার্নোকাস, ব্রুনোর ক্ষেত্রে, সেই একই ব্যভিচার চলছে এখন তাঁর ক্ষেত্রে। তিনিও একা মার খেয়ে যাচ্ছেন। একবিংশ শতকে ধর্মের প্রদীপ শিখা নিভু নিভু জ্বলছে। এযুগে গ্যলিলিও, কোপার্নোকাস, আর ব্রুনোরা নির্বিঘ্নে তাঁদের গবেষনা করতে পারছে। ধর্মের প্রদীপ সর্বত্রই নিভে আসবে। তসলিমাদের জন্য পৃথিবী হবে উন্মুক্ত। এখন যার জীবন কাটছে অন্তরীনে, সেই তসলিমা নাসরিনের সন্মানে বাংলার মানুষই একদিন গড়ে তুলবে আর এক স্ট্যাচু অব লিবার্টি।

ড. নৃপেন্দ্র নাথ সরকার পেশায় শিক্ষক ও গবেষক। বাংলাদেশ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫ বছরের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে ১৯৮৯ সালের জানুয়ারীতে আমেরিকা চলে আসেন। বর্তমানে তিনি টেক্সাসের প্রেইরী ভিউ এএন্ডএম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, গবেষক এবং প্রোগ্রাম উন্নয়ন নিরীক্ষা সমন্বয়ক। কৃষি যন্ত্রপাতি বাদ দিয়ে কম্পিউটার প্রকৌশলে অধ্যাপনা ও গবেষনায় নিয়োজিত। ইমেইল - nsarker@hotmail.com

সর্বগ্রাসী অপ-‘বাদ’ বনাম একজন আরজ আলী মাতুব্বর

রণদীপম বসু

দার্শনিক, না শিশু?

শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে ছোট্ট শিশুটি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো চাঁদটা গোল কেন? আমরা যারা ইতোমধ্যে বড় হয়ে গেছি, প্রশ্ন শুনেই নড়েচড়ে ওঠি। তখন আর ঠিক মনে করতে পারি না আমরাও কি এমন প্রশ্ন করেছিলাম শৈশবে? সৃষ্টির শুরুতে একান্ত তরল প্রকৃতির মহাজাগতিক একটা বস্তুপিণ্ডের তীব্রগতির ঘুর্ণায়মান অবস্থায় মহাকর্ষের কেন্দ্রাভিগ আর কেন্দ্রাতিগ বলের সম্মিলিত প্রভাবের সাথে অন্যান্য অনুঘটক মিশে বস্তুর আকৃতি প্রকৃতই গোল হয়ে যাবার ধারণাটা যারা প্রশ্ন খুঁজে খুঁজে পেয়ে গেছেন তাদের কথা আলাদা। একটা শিশুর পক্ষে তা বুঝার বা তাকে বুঝানোর প্রেক্ষিতও এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বটা অন্যত্র। আমরা যারা এই চাঁদটাকে গোল দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তাদের কাছে এটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে, পূর্ণিমার চাঁদ তো গোলই। এখানে বিস্ময়ের কী আছে! বিস্ময়ের কিছুই খুঁজে পাই না আমরা। তাই চাঁদ কেন গোল, এটাও যে একটা কৌতূহলী প্রশ্ন হতে পারে সেই বোধটাই মরে গেছে আমাদের। এমন হাজারো লক্ষ অভ্যস্ততার মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে গিয়ে বিস্ময়হীন কৌতূহলহীন এই আমরা আসলে এক প্রশ্নহীন অন্ধধারণার বশংবদ প্রাণীই এখন; জিজ্ঞাসু মানুষ নই; দার্শনিক তো দূরের কথা। ব্যাখ্যাহীন পূর্ব-সংস্কারের গড্ডালিকায় নিমজ্জিত আমাদের সুসভ্য চেহারার ভেতরে অন্তর্গত উপলব্ধিটা যে কতো অন্ধকার কালোয় ডুবে আছে, সেই বোধটুকুও হারিয়ে বসে আছি অধিকাংশেই। এর ফল যা হবার তাই হয়েছেÑ কোন অনাচারেই আর আশ্চর্য হই না আমরা। অলৌকিক নামে লৌকিক কৌশলজাত কিছু মিথ্যাচার, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং চিরাচরিত প্রথার কাছে প্রশ্নহীন আনুগত্য দিয়ে খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুমাচ্ছি আর ফলন বাড়াচ্ছি এক অথর্ব প্রজাতির। অথচ একটু কাণ্ডজ্ঞান খরচ করলেই প্রত্যেকটা মানুষই হতে পারতো একেক জন সম্ভাব্য লোক-দার্শনিক। কীভাবে?

‘ভালো দার্শনিক হওয়ার জন্যে একমাত্র যে-জিনিসটি আমাদের প্রয়োজন তা হলো বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতা।

শিশুদের এই ক্ষমতাটি আছে। তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। মাতৃগর্ভে অল্প কটা মাস কাটিয়ে তারা একেবারে নতুন এক বাস্তবতার মধ্যে এসে পড়ে। কিন্তু তারা যখন বড় হয় তখন এই বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতাটি যেন নষ্ট হয়ে যায়। কেন এমনটা হয়?...

একটি সদ্যোজাত শিশু যদি কথা বলতে পারত তাহলে হয়ত যে অসাধারণ বিশ্বে সে এসে পড়েছে সেই বিশ্ব সম্পর্কে কিছু কথা জানাতে পারত। কীভাবে সে চারদিকে তাকায় আর যা কিছু দেখে সেদিকেই কীভাবে কৌতূহলের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দেয় সে, তা তো আমরা প্রায়ই দেখে থাকি।...

কিন্তু শিশুটি ভালো করে কথা শেখার অনেক আগেই এবং দার্শনিকভাবে চিন্তা করতে শেখার অনেক আগেই পৃথিবীটা একটা অভ্যাসে পরিণত হবে তার।...

ব্যাপারটা রীতিমত দুঃখজনক... পৃথিবীর ব্যাপারে অতি অভ্যস্ততার কারণে এর সঠিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে যারা অক্ষম হয়ে পড়ে...

মনে হয় যেন বড় হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি চলার সময় আমরা বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতাটি হারিয়ে ফেলি। আর তাতে করে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু হারিয়ে ফেলি আর সেই হারিয়ে ফেলা জিনিসটিই ফের খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন দার্শনিকেরা। কারণ, আমাদের ভেতরে কোথাও থেকে কিছু একটা বলে ওঠে যে, জীবন এক বিশাল রহস্য। আর ঠিক এই ব্যাপারটিই আমরা উপলব্ধি করেছিলাম অনেক আগে, যখন এই কথাটি আমরা ভাবতে শিখিনি।

আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে: দার্শনিক প্রশ্নগুলো আমাদের সবাইকেই ভাবিত করলেও আমরা সবাই কিন্তু দার্শনিক হই না। নানান কারণে বেশিরভাগ লোকই প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে এমনই বাঁধা পড়ে যায় যে বিশ্ব সম্পর্কে তাদের বিস্ময় এসবের আড়ালে চলে যায়।

বাচ্চাদের কাছে এই বিশ্ব আর তার সমস্ত কিছুই নতুন; এমন একটা কিছু যা দেখে বিস্ময় জাগে। বড়োদের কাছে ব্যাপারটা সে-রকম নয়। বিশ্বটাকে বড়োরা একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলেই ধরে নেয়।

ঠিক এই জায়গাটাতেই দার্শনিকেরা এক বিরাট ব্যতিক্রম। একজন দার্শনিক কখনোই এই বিশ্বের ব্যাপারে ঠিক পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে পড়েন না। তিনি পুরুষ বা নারী যা-ই হোন না কেন, তাঁর কাছে বিশ্বটা খানিকটা অযৌক্তিক বলে ঠেকতে থাকেÑ মনে হতে থাকে হতবুদ্ধিকর, এমনকী হেঁয়ালিভরা। দার্শনিক আর ছোট্ট শিশুদের মধ্যে তাই একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় খুব মিল। সারা জীবন একজন দার্শনিক একটা শিশুর মতোই স্পর্শকাতর রয়ে যান।'

(সোফির জগৎ / ইয়স্তেন গার্ডার / অনুবাদ: জী এইচ হাবীব)

তাই দর্শন সম্ভবত শেখার কোন বিষয় নয়; বরং দার্শনিকভাবে চিন্তা করাটাই শেখার বিষয় হতে পারে।

কে হবে প্রশ্নকর্তা?

দার্শনিক চিন্তাসূত্র অনুযায়ী জ্ঞান বা জিজ্ঞাসা বিবেচনায় জগতে চিন্তাশীল সত্ত্বা চার ধরনের হতে পারে

(এক) যে জানে যে, সে সব জানে

(দুই) যে জানে যে, সে কিছুই জানে না

(তিন) যে জানে না যে, সে সব জানে

(চার) যে জানে না যে, সে কিছুই জানে না।

'যে জানে যে, সে সব জানে' এমন কাল্পনিক সত্ত্বার অস্তিত্ব আদৌ সম্ভব কি না, নিশ্চিতভাবেই তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। এই অসীম মহাবিশ্ব চরাচরে সংখ্যারহিত পরিমাণে বিশাল থেকে অতিক্ষুদ্র এই অনন্ত সংখ্যক বিষয়-বস্তু-ঘটনাপুঞ্জের সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংশ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াজনিত কার্য-কারণের দৃশ্যমান-অদৃশ্য সম্ভব-অসম্ভব অনন্ত-অনাদি মহাসমীকরণের কল্পনারহিত প্রতিটি একক যুগ্ম গোষ্ঠী বা সামগ্রিক প্রেক্ষিতের প্রেক্ষাপট ধারণ করার মতো কাল্পনিক সত্ত্বার অস্তিত্ব কল্পনাতেও কি সম্ভব? জানার যেমন কোন সীমা নেই, তেমনি সীমাহীন জানার বিষয়টিও যৌক্তিক কারণেই যুক্তিহীন। তাই বলা যেতে পারে- যে জানে যে সে সব জানে, এমন সত্ত্বার অস্তিত্ব কেবল যুক্তিপরম্পরাহীন দার্শনিক কল্প-ধারণা মাত্র।

'যে জানে যে, সে কিছুই জানে না' দর্শনের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ এটি। এ ক্ষেত্রে যাঁর কথা সর্বাগ্রে চলে আসে তিনি গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস (৪৭০-৩৯৯ খ্রি. পূ.)। সমগ্র দর্শনের ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে রহস্যময় ব্যক্তিই তিনি। জীবদ্দশায় একটি বাক্যও লেখেন নি । তারপরেও ইউরোপিয় চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে বড় প্রভাব আর কেউ ফেলতে পারেন নি।

'আমি কেবল একটা কথাই জানি আর সেটা হলো আমি কিছুই জানি না' নিজের স্বপক্ষে এ কথাটা বলেই তিনি শুধু প্রশ্ন করে যেতেন, বিশেষ কোনো একটা আলোচনার সূত্রপাত ঘটাতে, যেন তিনি বিষয়টা সম্পর্কে কিছুই জানেন না। যাদের সঙ্গে তিনি কথা বলতেন তাদের তিনি এমন একটা ধারণা দিতেন যে আসলে তিনি তাদের কাছ থেকে শিখতে চাইছেন। প্রশ্নটাই ছিলো তাঁর যুক্তির ধারালো হাতিয়ার। এই হাতিয়ার দিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি তাঁর প্রতিপক্ষকে তার যুক্তির দুর্বলতা বা অসারতা বুঝিয়ে দিতেন আর তখন কোণঠাসা হয়ে পড়ে তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হতো কোনটি ন্যায় আর কোনটি অন্যায়।

প্রকৃতপক্ষে জানার স্বপক্ষে বাড়িয়ে দেয়া প্রতিটা কার্যকর ধাপে কৌতূহলী ব্যক্তি মূলত নিজের অজ্ঞানতাকেও আরেক ধাপ চিহ্নিত করার প্রয়াস পান। অর্থা নিত্য নতুন জানার মাধ্যমে নিজের অজ্ঞানতাই খুঁজে বেড়ান তাঁরা। এভাবে নতুন নতুন জ্ঞানে তাঁদের কৌতূহল আরো বেশি করে উসাহী হতে থাকে আরো নতুন নতুন জ্ঞানের দিকে। কেননা তিনিই জ্ঞানী যিনি তাঁর অজ্ঞানতাকে আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারই জ্ঞান। জানা-কে আবিষ্কার করেন যত, ততই না-জানা'র বিপুলতা সম্বন্ধে সচকিত ও বিহ্বল হয়ে ওঠেন তাঁরা। তাই, যে জানে যে সে কিছুই জানে না, সে-ই সবচেয়ে জ্ঞানী; জ্ঞান অন্বেষণে জানার অদম্য ইচ্ছাই তাঁকে নিরন্তর প্রশ্নমুখি করে তোলে।

প্রশ্নময় কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সক্রেটিস যে শুধু জ্ঞানী'র সংজ্ঞাটাই নির্ধারণ করে দেন তা-ই নয়, উল্টো, মূর্খামীর মুখোশটাও ছিঁড়ে ফেলেন একই যুক্তিতে যে জানে না যে সে কিছুই জানে না। আমরা অধিকাংশই তো সেই মূর্খের দলে, যারা ভান করে যে তারা অনেক কিছুই জানে; অথচ নিজের কাণ্ডজ্ঞানটাও ব্যবহার করতে জানে না। তারা যে কিছুই জানে না, সেই বোধটাও তাদের নেই। অথচ দর্শনগত সত্যগুলো প্রত্যেকেই বুঝতে পারে স্রেফ যদি তারা তাদের সহজাত কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে যুক্তিবোধটাকে ব্যবহার করে। সহজাত যুক্তি ব্যবহার করার অর্থ হচ্ছে নিজের মনের গভীরে পৌঁছে সেখানে যা আছে তা ব্যবহার করা। নিজে অজ্ঞ সেজে সক্রেটিস লোকজনকে তাদের কাণ্ডজ্ঞান ব্যবহার করতে বাধ্য করতেন। কিন্তু কুসংস্কারে ডুবে থাকা সমাজের ক্ষমতাসীন প্রাতিষ্ঠানিক মূর্খতা লোকজনের কাণ্ডজ্ঞান ব্যবহার করার সুযোগ দেবে কেন?

তাই আড়াই হাজার বছর আগের ক্ষমতাসীন প্রতিষ্ঠান যেমন সক্রেটিসকে বাধ্য করেছিলো হেমলকের তীব্র বিষ পান করতে, তেমনি বহুকাল পরে এসেও আমাদের বরিশালের গণ্ডগ্রামে প্রশ্ন করতে জানা স্বশিক্ষিত এক কৃষক দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরকেও প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে এই তখ্ত প্রতিষ্ঠানই 'পবিত্র হাজতবাসে' নিক্ষিপ্ত করে। এতে করে কি প্রশ্ন থেমে গেছে? প্রশ্নের প্রাকৃতিক শক্তিই প্রশ্নকে চিরকাল শক্তিশালী করে রাখে।

তৃতীয় পর্যায়ের যে দার্শনিক সত্ত্বা যে জানে না যে সে সব জানে, এটাও হেঁয়ালিপূর্ণ একটা দার্শনিক বিভেদ মাত্র। যে জানে, অথচ এ বিষয়টাই সে জানে না এরকম কাঁঠালের আমসত্বের স্বাদ কল্পনাতেই সম্ভব, বাস্তবে নয়।

অতএব, প্রাথমিকভাবে উপস্থাপিত দার্শনিক সত্ত্বার যে চারটি ধারণা উপস্থাপিত হয়েছে, যুক্তি পরম্পরায় এসে চূড়ান্ত ফলাফলে দাঁড়ায়

এক) যে জানে যে, সে সব জানে > একটা অসম্ভব কল্পনা বা কাল্পনিক অস্তিত্ব

দুই) যে জানে যে, সে কিছুই জানে না > জ্ঞানীর বিজ্ঞতা

তিন) যে জানে না যে, সে সব জানে > অবাস্তব

চার) যে জানে না যে, সে কিছুই জানে না > মূর্খের অজ্ঞতা।

অর্থা এই সৃষ্টিজগতে দু'টো সত্ত্বাই কেবল ক্রিয়াশীল। জ্ঞানী আর মূর্খ। জ্ঞানী মাত্রেই তাঁর মধ্যে একটা বিস্ময়বোধসম্পন্ন দার্শনিক সত্ত্বা ক্রিয়াশীল থাকবে। কার্যকারণ ভিত্তিক যুক্তির তীব্র রশ্মি দিয়ে সব কিছুকেই প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণে উদ্যোগি থাকেন এঁরা; ন্যায় ও অন্যায়কে পার্থক্য করেন। আর যারা কাণ্ডজ্ঞানহীন অজ্ঞান বা মূর্খ, তাদের দুর্ভাগ্য যে, তারা এটাও জানে না যে তারা মূর্খ! ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করবে কোত্থেকে!

কী সেই প্রশ্ন

বিষয়ের মধ্যে বিষয় খুঁজে না পাওয়াটাই বোধ করি দর্শনের একটি বহুল আলোচিত বিষয় বা চিরায়ত দার্শনিক জটিলতাও। কথাটা হেঁয়ালিপূর্ণ মনে হলেও হাস্যকর নয় কিছুতেই। কেননা চলতে ফিরতে আমরা আমাদের সাদাসিধে যাপন প্রণালীর মধ্যেও এরকম দার্শনিক হাপরে পতিত হই মাঝেমধ্যেই। একটা সংবেদনশীল ও গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে হয়তো আলোচনা করতে হবে, চিন্তাসূত্র গাথার প্রক্রিয়া নিয়ে ভাবতে ভাবতে বিষয়ের এতো অগুনতি ডালপালা গজিয়ে যায় যে শেষপর্যন্ত কোথা থেকে কীভাবে শুরু করতে হবে তা নির্বাচন করাটাই একটা জটিলতর সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। যেখান থেকে শুরু করলে সুরাহার খুব সুন্দর একটা উপায় হয়তো বের হয়ে আসতে পারতো, সেটা না হয়ে ভুল পথে পা দিয়ে আষ্ঠেপৃষ্টে পেঁচিয়ে নিজেকে হতবিহ্বল করে তুলছি। হয়তো মাঝপথে ক্ষান্ত দিয়ে ফের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে হচ্ছে। এবং আবারো ওই

একই সমস্যা; কোত্থেকে শুরু করবো? অর্থাৎ অন্বিষ্ট বিষয়ের অভ্যন্তরে ক্রমবর্ধমান যে অসংখ্য বিষয়ের সমাহার, তা থেকে উপযুক্ত বিষয়টিকে নির্বাচন করা বা তুলে আনাটাই মূলত একটা সম্ভাব্য সহজ প্রক্রিয়ার জটিল প্রারম্ভ-সূচক হয়ে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কেন এমন হয়? এর যথাযথ উত্তর হয়তো এটাই যেÑ যথাযথ প্রশ্নটি করতে পারছি না আমরা। কেন পারছি না? হয়তো প্রশ্ন করার উপায়টাই জানা নেই আমাদের, তাই।

জগতের সমস্ত উত্তরই না কি নিহিত থাকে উ□ক্ষিপ্ত প্রশ্নের মধ্যেই। বলা হয়ে থাকে যিনি প্রশ্ন করতে জানেন, উত্তর তাঁকেই এসে ধরা দেয়। এবং প্রতিটা উত্তর হয়ে ওঠে ফের আরেকটা প্রশ্নের নিয়ামক সূত্র। এমনি করেই প্রশ্ন-উত্তর-প্রশ্ন-উত্তর-প্রশ্নের এই যে পর্যায়ক্রমিক বুনন প্রক্রিয়া, সেই সূচনা লগ্ন হতে কালক্রমে বয়ে বয়ে মানব-সভ্যতার অবারিত চিন্তা-জগতে তা-ই আজ সর্বব্যপ্ত হয়ে এক দার্শনিক ভিত্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকেই কি দর্শন বলে? দর্শনের সংজ্ঞা নিরূপনের চাইতে বরং দর্শনের সাথে পরিচিত হওয়াটাই বোধ করি অধিকতর সহজ উপায়।

দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে দর্শন বিষয়ক কয়েকটি প্রশ্ন করা, অনাদিকাল ধরে যে সব প্রশ্ন করে আসছে মানুষ। এবং সম্ভবত মানুষের আদি দার্শনিক প্রশ্নগুলোর মধ্যে দু'টো প্রশ্নই অত্যন্ত মৌলিক মানুষ কী, পৃথিবীটা কোথা থেকে এসেছে? কেবল এ দু'টো প্রশ্নই মানব সভ্যতার আদি দর্শনের ভিতটাকে গড়ে দিয়েছিলো বিপুলভাবে। পৃথিবীতে খুব সম্ভব এমন কোন সংস্কৃতি নেই যেখানে এ প্রশ্ন দু'টো উত্থাপিত হয় নি। এর উত্তর খুঁজতে গিয়েই আদি মানবগোষ্ঠীর কল্পনাশক্তির সৃজনক্ষমতায় চম□কার সব দৃষ্টান্ত হয়ে আছে হাজারো দেব-দেবী বিষয়ক পৌরাণিক কাহিনীর মায়াবী জগ□গুলো। মানুষের কল্পনা-ক্ষমতা যে কতো অফুরন্ত হতে পারে তার সাক্ষা□ প্রমাণ পেয়ে যাই আমরা এগুলো পাঠ করলে। এখন প্রশ্ন আসে, কল্পনা কী? সমকালীন বাস্তবতায় যে প্রশ্নের উত্তর সাধারণত মেলে না তাকে কিছু উদ্ভাবনীমূলক ধারণাসৃষ্ট কাহিনী পরম্পরায় সাজিয়ে উত্তর খোঁজার আপাত স্বস্তি-প্রয়াসই কল্পনা। তাহলে প্রশ্ন চলে আসবে, ধারণা কী? এমনি করে সূত্র থেকে সূত্র ধরে একটার পর একটা প্রশ্নের তোরণ পেরিয়ে এক অনির্দিষ্ট তথা অভূতপূর্ব গন্তব্যের দিকে এই যে আপাত অনিশ্চি□ ছুটে যাওয়া, এটাকে কী বলবো আমরা? কেউ কেউ বলেন 'যুক্তি'। পৃথিবী কী করে সৃষ্টি হয়েছে? যা ঘটে তার পেছনে কি কোন ইচ্ছা বা অর্থ রয়েছে? মৃত্যুর পরে কি জীবন রয়েছে? কীভাবে জীবন যাপন করা উচি□ আমাদের? এরকম হাজারো প্রশ্নের সংগতিকে অসংখ্য যুক্তি আর যুক্তিহীনতা দিয়ে যে যার মতো ধারণ করেছে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি ভিত্তিক আদি মানবগোষ্ঠীর স্বকল্প গড়া উপাখ্যানগুলো। কালে কালে একদিন সভ্যতার মধ্যযুগে এসে তা থেকেই উ□পত্তি হয়ে গেলো 'ধর্ম' নামক বিচিত্র এক জটিল তত্ত্ব বা অদ্ভুত ধারণার। আর তখনি প্রশ্ন ওঠে, ধর্ম কি যৌক্তিক, না অযৌক্তিক?

প্রশ্নের হুমকী

প্রশ্ন কি হুমকী হয় কখনো? হয়; প্রশ্ন হুমকী হয় মিথ্যার কাছে। কেন? মিথ্যার কোন সত্যনিষ্ট ভিত্তি থাকে না। প্রশ্নের শক্তির কাছে মিথ্যার ফানুস টিকতে পারে না, চুপসে যায়। বাইরের চকমকি চেহারার ভেতরে

ভিত্তিহীন অবলম্বনগুলো মুহুর্মূহু প্রশ্নের ধাক্কায় ভেঙে গেলে মিথ্যার সৌধটা হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়ে। তাই মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত কোন তত্ত্ব বা মতবাদ সমূহ প্রশ্নকেই বেশি ভয় পায়। তার অস্তিত্বের উপর হুমকী বলে প্রশ্নকারীকেই সে সবচেয়ে বড় শত্র" মনে করে। এসব মিথ্যা-বাদের অনুসারীরা তক্কে তক্কে থাকে প্রশ্নকারীর মুখটাকে রুদ্ধ করে দিতে। তার প্রমাণ সেই সক্রেটিস থেকে শুরু করে লিওনার্দো ব্র"নো, গ্যালিলিও হয়ে আমাদের আরজ আলী মাতুব্বর এবং হালের হুমায়ুন আজাদ। তাঁদের অপরাধ তাঁর চলমান ও প্রতিষ্ঠিত মিথ্যা মতবাদকে প্রশ্নের মুখোমুখি করে মিথ্যা অস্তিত্বে নাড়া দিয়েছেন।

এই যে প্রশ্নকে এতো ভয় তাদের, প্রশ্নের শক্তিটা কী? প্রশ্নের শক্তি হচ্ছে উত্থিত যুক্তি। এটা সেই যুক্তি, যে কোন সীমানা মানে না। সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতির এসিড টেষ্টে গলিয়ে গলিয়ে কার্যের পেছনে কারণ এবং তারও পেছনের সূচনা-বিন্দুকে খুঁজে বের করতে সদা উদ্যত সে পিছপা হয় না। কেবল যুক্তিই তো পারে সব ছিঁড়ে ফেড়ে জগতের সবচেয়ে নির্মম ও মৌলিক প্রশ্ন-দুটো নির্দ্বিধায় ছুঁড়ে দিতে কী, এবং কেন?

মানবগোষ্ঠীর সূচনালগ্ন থেকেই প্রাথমিক বিস্ময় নিয়ে সৃষ্টির উ□স খোঁজায় উদ্যোগি হয়েছেন আমাদের বুদ্ধিমান পূর্বসূরিরা, যাঁদেরকে আজ আমরা জ্ঞানী ও দার্শনিক হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকি। জ্ঞানে বিজ্ঞানে অগ্রগামী এসব গুণী দার্শনিক বিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই মানব সভ্যতাকে সেই আদি থেকে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে নিতে ব্রতী হয়েছে। তাই গতকাল পর্যন্ত যে জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন এসে মানুষের সমকালীন অভিজ্ঞতায় যুক্ত হলো, এই সর্বশেষ অর্জনও পরবর্তি অন্বেষায় হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক সূত্র। এভাবে যে কোন যুগে বা কালে সমকালীন জ্ঞানস্তরই সে সময়ের চিন্তারাজ্যে কোন তত্ত্ব বা মতবাদ প্রচার ও বিশ্লেষণের যৌক্তিক মানদণ্ড হিসেবে গৃহিত হয়েছে।

তাই বিভিন্ন সময়ে জন্ম নেয়া ধর্মতত্ত্বগুলো সে সময়কালের বাস্তবতা ও কল্পনাকেই ধারণ করেছে শুধু। যেহেতু বিজ্ঞানের পথ সর্বদাই চলমান, যৌক্তিক ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায় তাই বিজ্ঞান সাধারণত কোন পরম সত্যে বিশ্বাসী নয়। বস্তুর ভেতরের কার্যকারণ সম্পর্কের প্রাথমিক ব্যাখ্যাকে বিজ্ঞান প্রথমে হাইপোথিসিস হিসেবেই প্রচার করে। পরবর্তি পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের প্রেক্ষিতে সেটা যাচাই বাছাই হতে হতে এক পর্যায়ে তা বৈজ্ঞানিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ধর্মতত্ত্বে পরীক্ষা নিরীক্ষার কোন বালাই নেই। এটা কেবলই এক যুক্তিহীন বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্মগ্রন্থগুলোর কাহিনী বর্ণনায় এর জন্ম বা বর্ণনাকালীন সময়ে বিজ্ঞাননির্ভর সত্যের যেটুকু দেখা পাওয়া যায়, সময়ের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞানধর্ম অনুযায়ী পরবর্তিতে তাও হয়তো মিথ্যা হয়ে গেছে নতুবা নতুন সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু অনড় ধর্ম যেহেতু যুক্তিহীন কিছু বিশ্বাস মাত্র, তাই পরবর্তি বাস্তবতায় এসে ধর্মীয় সত্যগুলো কিছু গাজাখোরি কাহিনীর মতো বিকলাঙ্গ হয়ে গেলেও ধর্মধ্বজাধারীরা সেটাকেই ধ্র"ব সত্য জ্ঞানে কতকগুলো অন্ধসংস্কারকে জীবনধারায় মিশিয়ে 'ইহাই পরম সত্য' বলে নিজের সাথে সাথে অন্যকেও প্রতারিত করে যাচ্ছেন। ফলে পরবর্তিকালে এসে ধর্মীয় সত্য আর বৈজ্ঞানিক সত্যের মধ্যে বিপরীতমুখি অবস্থান তৈরি হয়েছে। আরো স্পষ্ট করে বলা যায় ধর্ম এখন সত্যের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে নিশ্চিতভাবে। এ প্রসঙ্গে ধর্মীয় সত্য বনাম বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন ও নমূনা পাশাপাশি রেখে নিজস্ব কাণ্ডজ্ঞানটুকু খরচ করে যাচাই করলেই আমাদের কাছে সব পরিষ্কার হয়ে যায়। আর এ কাজটাই বিস্ময়করভাবে অবিশ্বাস্য

দক্ষতায় করে দেখিয়েছেন একান্তই মাটিলগ্ন সাধাসিধে এক স্বশিক্ষিত ব্যক্তি আরজ আলী মাতুব্বর। আমাদের শহুরে-শিক্ষিত ভাষায় তিনি নিতান্তই একজন ব্রাত্যজন। কিন্ত জানার অদম্য কৌতূহলে শিক্ষা দীক্ষা জীবন যাপনে জাগতিক সমস্ত প্রতিকূলতায় আষ্ঠেপৃষ্টে জড়িয়ে থেকেও অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে শুধুমাত্র স্বীয় পরিচর্যায় কীভাবে জ্ঞানচেতনায় দার্শনিক বিভার উদ্ভাস ঘটাতে হয়, তা-ই দেখিয়েছেন আমাদের আরজ আলী মাতুব্বর। চোখ থাকলেই কি চক্ষুষ্মান হয়? প্রাতিষ্ঠানিকতার বড় বড় সার্টিফিকেটধারী তথাকথিত শিক্ষিত জন্মান্ধদের অবিমৃষ্য মূর্খতাকে দূর করার উপায় দেখানো জন্যে তিনি 'সত্যের সন্ধান' ও 'সৃষ্টি রহস্য' নামের যে দু'টো জাজ্জ্বল্যমান চোখ দান করে গেছেন, তুলনা বিচার হঠকারি হলেও, আমাদের মনে পড়ে যায় সেই সক্রেটিসের কথাই। তাই বুঝি এই আরজ আলী মাতুব্বরকে উদ্দেশ্য করে আরেক পণ্ডিতজন শ্রদ্ধেয় সরদার ফজলুল করিমের আবেগ-সঞ্জাত উক্তি- 'আমাদের সক্রেটিস' একটুও বাহুল্য মনে হয় না।

আমাদের লোক-দার্শনিক

আজ থেকে গুনে গুনে একশ' বছর আগে। রবীন্দ্রনাথ তখনো নোবেল পান নি। সেটা আরো পাঁচ বছর পরের ঘটনা। প্রচারিত জন্মসাল বিবেচনায় বাঙালীর বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও বাংলাকাব্যে পাশ্চাত্য আধুনিকতার অন্যতম অগ্রণী-পাণ্ডব কবি জীবনানন্দ দাশ উভয়েই তখন ন'বছরের কিশোর বালক। ঠিক সেই সময়ের সেই অন্ধকার সামাজিক অবস্থায় বরিশালের কোন এক গণ্ডগ্রামে অসহায় মা'কে নিয়ে আট বছর বয়েসী পিতৃহীন নিরক্ষর যে বালকটিকে 'দশ দুয়ারে সাহায্য' নিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কোনো সুযোগ যার কখনোই আসবে না এবং পরবর্তী পঞ্চাশ বছরেও যার নামটি উল্লেখযোগ্য হিসেবে কারো মুখেও উচ্চারিত হবে না, তাঁর নাম আরজ আলী মাতুব্বর। একান্তই গায়ে-গতরে খেটে খাওয়া অত্যন্ত সাধারণ এক মানুষের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু কালের কালরেখায় অসাধারণ মানুষও যেমন সাধারণ হয়ে যায়, আবার খুব সাধারণ মানুষও অসাধারণ হয়ে ওঠে। তেমনি এক অসাধারণ হয়ে ওঠা মানুষের গল্প তাঁর নিজের মুখেই শুনি

'বরিশাল শহরের অদূরে লামচরি গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম আমার ৩রা পৌষ, ১৩০৭ সালে। চার বছর বয়সে আমার বাবা মারা যান, ১৩১১ সালে। আমার বাবার বিঘা পাঁচেক কৃষিজমি ও ক্ষুদ্র একখানা টিনের বসতঘর ছিলো। খাজনা অনাদায়হেতু ১৩১৭ সালে আমার কৃষিজমিটুকু নিলাম হয়ে যায় এবং কর্জ-দেনার দায়ে মহাজনরা ঘরখানা নিলাম করিয়ে নেন ১৩১৮ সালে। তখন স্বামীহারা, বিত্তহারা ও গৃহহারা হয়ে মা আমাকে নিয়ে ভাসতে থাকেন অকূল দুঃখের সাগরে। সে সময়ে বেঁচে থাকতে হয়েছে আমাকে দশ দুয়ারের সাহায্যে।

তখন আমাদের গ্রামে কোনোরূপ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিলো না। শরীয়তি শিক্ষা দানের জন্য জনৈক মুন্সি একখানা মক্তব খোলেন তাঁর বাড়িতে ১৩২০ সালে। এতিম ছেলে বলে আমি তাঁর মক্তবে ভর্তি হলাম অবৈতনিকভাবে। সেখানে প্রথম বছর শিক্ষা করলাম স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ তালপাতায় এবং বানান-ফলা কলাপাতায়, কেননা আমার বই-স্লেট কেনার সঙ্গতি ছিলো না। অতঃপর এক আত্মীয়ের প্রদত্ত রামসুন্দর বসুর 'বাল্যশিক্ষা' নামক বইখানা পড়ার সময় ছাত্রবেতন অনাদায়হেতু মুন্সি সাহেব মক্তবটি বন্ধ করে দিলেন ১৩২১ সালে। আর এখানেই হলো আমার আনুষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষার সমাপ্তি বা সমাধি।

পড়া-লেখা শেখার প্রবল আগ্রহ আমার ছিলো। কিন্তু কোনো উপায় ছিলো না। পেটের দায়ে কৃষিকাজ শুরু করতে হয় অল্প বয়সেই। আমার বাড়ির পাশে একজন ভালো পুঁথিপাঠক ছিলেন। কৃষিকাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি তাঁর সাথে পুঁথি পড়তে শুরু করি, বাংলা ভাষা পড়বার কিছুটা ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং উদ্দেশ্য আংশিক সফল হয় জয়গুন, সোনাভান, জঙ্গনামা, মোক্তল হোসেন ইত্যাদি পুঁথি পাঠের মাধ্যমে। এ সময়ে আমার পাড়ার দু'টি ছেলে বরিশালের টাউন স্কুল ও জিলা স্কুলে পড়তো। তাদের পুরোনো পাঠ্যবইগুলো এনে পড়তে শুরু করি ১৩৩৫ সাল থেকে এবং তা পড়ি ১৩৪৩ সাল পর্যন্ত। কেন তা জানি না, সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদির চেয়ে বিজ্ঞানের বই ও প্রবন্ধগুলো আমার মনকে আকর্ষণ করতো বেশি। তখন থেকেই আমি বিজ্ঞানের ভক্ত।

আমার মা ছিলেন অতিশয় নামাজী-কালামী একজন ধার্মিকা রমণী। এবং তার ছোঁয়াচ লেগেছিলো আমার গায়েও কিছুটা। কিন্তু আমার জীবনের গতিপথ বেঁকে যায় আমার মায়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে একটি দুঃখজনক ঘটনায়।

১৩৩৯ সালে মা মারা গেলে আমি মৃত মায়ের ফটো তুলেছিলাম। আমার মাকে দাফন করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত মুন্সি, মৌলবি ও মুসল্লিরা এসেছিলেন, 'ফটো তোলা হারাম' বলে মায়ের নামাজে জানাজা ও দাফন করা ত্যাগ করে তাঁরা লাশ ফেলে চলে যান। অগত্যা কতিপয় অমুসল্লি নিয়ে জানাজা ছাড়াই আমার মাকে সৃষ্টিকর্তার হাতে সমর্পণ করতে হয় কবরে। ধর্মীয় দৃষ্টিতে ছবি তোলা দূষণীয় হলেও সে দোষে দোষী স্বয়ং আমিই, আমার মা নন। তথাপি কেন যে আমার মায়ের অবমাননা করা হলো, তা ভেবে না পেয়ে আমি বিমূঢ় হয়ে মা'র শিয়রে দাঁড়িয়ে তাঁর বিদেহী আত্মাকে উদ্দেশ করে এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, "মা! আজীবন ছিলে তুমি ধর্মের একনিষ্ঠ সাধিকা। আর আজ সেই ধর্মের নামেই হলে তুমি শেয়াল-কুকুরের ভক্ষ্য। সমাজে বিরাজ করছে এখন ধর্মের নামে অসংখ্য কুসংস্কার। তুমি আমায় আশীর্বাদ করো, আমার জীবনের ব্রত হয় যেন কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূরীকরণ অভিযান। আর সে অভিযান সার্থক করে আমি যেন তোমার কাছে আসতে পারি। তুমি আশীর্বাদ করো মোরে মা, আমি যেন বাজাতে পারি সে অভিযানের দামামা।"

আমি জানি যে, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূরীকরণ অভিযানে সৈনিকরূপে লড়াই করবার যোগ্যতা আমার নেই। কেননা আমি পঙ্গু। তাই সে অভিযানে অংশ নিতে হবে আমাকে বাজনাদার রূপে। প্রতিজ্ঞা করেছি যে, সে অভিযানে দামামা বাজাবো। কিন্তু তা পাবো কোথায়? দামামা তৈরির উপকরণ তো আমার আয়ত্তে নেই। তাই প্রথমেই আত্মনিয়োগ করতে হলো উপকরণ সংগ্রহের কাজে।

বিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব ও বিবিধ বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরীর সদস্য হয়ে সেখানকার পুস্তকাদি অধ্যয়ন করতে শুরু করি ১৩৪৪ সাল থেকে। স্বয়ং মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত বলে যদিও ইসলাম ধর্মের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু তত্ত্ব জানার সুযোগ ছিলো, কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ, পার্সি, ইহুদি, খ্রীস্টান ইত্যাদি ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই আমার জানার সুযোগ ছিলো না। তাই সেসব ধর্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু জানার আগ্রহ নিয়ে পড়তে থাকি বরিশালের শংকর লাইব্রেরী ও ব্যাপ্টিস্ট মিশন লাইব্রেরীর কিছু কিছু বই। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের দর্শন বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির সাহেব জানতেন আমার

সাধনার উদ্দেশ্য কি। তাই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক হবে বলে তিনি আমাকে দর্শনশাস্ত্র চর্চা করতে উপদেশ দেন এবং তাঁর উপদেশ ও সহযোগিতায় দর্শনসমুদ্রের বেলাভূমিতে বিচরণ করতে থাকি ১৩৫৪ সাল থেকে। তখন দিন যেতো মাঠে আমার রাত যেতো পাঠে।

মায়ের মৃত্যুর পর থেকে দীর্ঘ ১৮ বছর সাধনার পর কতিপয় ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসকে দর্শনের উত্তাপে গলিয়ে বিজ্ঞানের ছাঁচে ঢেলে তার একটি তালিকা তৈরি করছিলাম প্রশ্নের আকারে ১৩৫৭ সালে। এ সময় স্থানীয় গোঁড়া বন্ধুরা আমাকে ধর্মবিরোধী ও নাখোদা (নাস্তিক) বলে প্রচার করতে থাকে এবং আমার দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম ছেড়ে শহর পর্যন্ত। লোক পরম্পরায় আমার নাম শুনতে পেয়ে তৎকালীন বরিশালের লইয়ার ম্যাজিস্ট্রেট ও তাবলিগ জামাতের আমির জনাব এফ. করিম সাহেব সদলে আমার সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন ১৩৫৮ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে আমার বাড়িতে গিয়ে। সে দিনটি ছিলো রবিবার, সাহেবের ছুটির দিন। তাই তিনি নিশ্চিন্তে আমার সাথে তর্কযুদ্ধ চালান বেলা ১০টা থেকে ২টা পর্যন্ত। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বরিশালে গিয়ে তিনি আমাকে এক ফৌজদারি মামলায় সোপর্দ করেন 'কম্যুনিস্ট' আখ্যা দিয়ে। সে মামলায় আমার জবানবন্দি তলব করা হলে উপরোল্লিখিত তালিকার প্রশ্নগুলোর কিছু কিছু ব্যাখ্যা লিখে 'সত্যের সন্ধান' নাম দিয়ে তা জবানবন্দিরূপে কোর্টে দাখিল করি তৎকালীন বরিশালের পুলিশ সুপার জনাব মহিউদ্দীন সাহেবের মাধ্যমে, ২৭শে আষাঢ়, ১৩৫৮ সালে (ইং ১২. ৭. ৫১)।

'সত্যের সন্ধান'-এর পাণ্ডুলিপিখানার বদৌলতে সে মামলায় দৈহিক নি®কৃতি পেলাম বটে, কিন্তু মানসিক শাস্তি ভোগ করতে হলো বহু বছর। কেননা তৎকালীন পাকিস্তান তথা মুসলিম লীগ সরকারের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিলেন যে, 'সত্যের সন্ধান' বইখানা আমি প্রকাশ করতে পারবো না, ধর্মীয় সনাতন মতবাদের সমালোচনামূলক অন্য কোনো বই লিখতে পারবো না এবং পারবো না কোনো সভা-সমিতিতে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বমত প্রচার করতে। যদি এর একটি কাজও করি, তবে যে কোনো অজুহাতে আমাকে পুনঃ ফৌজদারিতে সোপর্দ করা হবে। অগত্যা কলম-কালাম বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতে হলো ১৯৭১ সাল পর্যন্ত। এভাবে নষ্ট হয়ে গেলো আমার কর্মজীবনের অমূল্য ২০টি বছর।

বাংলাদেশে কুখ্যাত পাকিস্তান সরকারের সমাধি হলে পর 'সত্যের সন্ধান' বইখানা প্রকাশ করা হয় ১৩৮০ সালে, রচনার ২২ বছর পর। তারপরে আমার লিখিত বই 'সৃষ্টি রহস্য' প্রকাশিত হয় ১৩৮৪ সালে, 'স্মরণিকা' ১৩৮৯ সালে এবং 'অনুমান' নামের ক্ষুদ্র একখানা পুস্তিকা ১৩৯০ সালে। এ প্রসঙ্গে সভাসীন সুধীবৃন্দকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমার লিখিত যাবতীয় পুস্তক-পুস্তিকাই হচ্ছে আমার মায়ের মৃত্যুদিনে আকাক্সিক্ষত 'দামামা'র অঙ্গবিশেষ।

কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, আমি ধর্মের বিরোধিতা করছি। বস্তুত তা নয়। পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি সমস্ত জীবের এমনকি জল, বায়ু, অগ্নি ইত্যাদি পদার্থেরও এক একটি ধর্ম আছে। ধর্ম একটি থাকবেই। তবে তার সঙ্গে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার থাকা আমার কাম্য নয়।

মানব সমাজে ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিলো মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্যই। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত ধর্মগুলো মানুষের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই করছে বেশি, অবশ্য জাগতিক ব্যাপারে। ধর্মবেত্তারা সকলেই

ছিলেন মানবকল্যাণে আত্মনিবেদিত মহাপুরুষ। কিন্তু তাঁরা তাঁদের দেশ ও কালের বন্ধনমুক্ত ছিলেন না। তাঁদের প্রবর্তিত সেকালের অনেক কল্যাণকর ব্যবস্থাই একালের মানুষের অকল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই ধর্মীয় সমাজবিধানে ফাটল ধরেছে বহুদিন আগে থেকেই। সুদ আদান-প্রদান, খেলাধুলা, নাচ-গান, সুরা পান, ছবি আঁকা, নারী স্বাধীনতা, বিধর্মীর ভাষা শিক্ষা, জন্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ধর্মবিরোধী কাজগুলো এখন শুধু রাষ্ট্রীয় সমর্থনপুষ্টই নয়, লাভ করেছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। বিশেষত গান, বাজনা, নারী, নাচ ও ছবি Ñ এ পাঁচটির একত্র সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায় সিনেমা, রেডিও এবং টেলিভিশনে। কিন্তু সেসবের বিরুদ্ধে সনাতনপন্থীরা কখনো প্রতিবাদের ঝড় তোলেননি। অথচ প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন ফজলুর রহমান, বযলুর রহমান, আ. র. হ. এনামুল হক, আবুল ফজল প্রমুখ মনীষীগণের দু'কলম লেখায়। কতকটা আমারও।

বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে ধর্ম হোঁচট খাচ্ছে পদে পদে। কোনো ধর্মের এমন শক্তি নেই যে, আজ ডারউইনের বিবর্তনবাদ বাতিল করে দেয়, নাকচ করে মর্গানের সমাজতত্ত্ব এবং ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত করে কোপার্নিকাস-গ্যালিলিওর আকাশ তত্ত্ব, নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব এবং আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বকে।

মধ্যযুগে যুগমানবের আসনে সমাসীন ছিলেন ত□কালীন মুনি-ঋষি ও নবী-আম্বিয়ারা। তাঁরা ছিলেন গুণী, জ্ঞানী ও মহ□ চরিত্রের মানুষ, তবে ভাববাদী। তাঁদের আদেশ-উপদেশ পালন ও চরিত্র অনুকরণ করেছেন সেকালের জনগণ এবং তখন তা উচিতও ছিলো। কিন্তু সেই সব মনীষীরা এযুগের মানুষের ইহজীবনের জন্য বিশেষ কিছুই রেখে যাননি, একমাত্র পারলৌকিক সুখ-দুঃখের কল্পনা ছাড়া।

এ যুগের যুগমানবের আসনে সমাসীন আছেন Ñ কবি-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা। এঁরা সবাই এযুগের গুণী, জ্ঞানী ও মহ□ চরিত্রের মানুষ। তবে এঁরা হচ্ছেন মুক্তমন, স্বাধীন চিন্তার অধিকারী ও বাস্তববাদী। এঁদের অবদান ছাড়া এ যুগের কোনো মানুষের ইহজীবনের এক মুহূর্তও চলে না। তাই এঁদের সম্মিলিত মতাদর্শ আমাদের মস্তকে গ্রহণ করা উচিত ভাববাদের আবর্জনার বোঝা ফেলে দিয়ে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানবিরোধী কোনো শিক্ষাই গ্রহণীয় নয়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, এঁদের সম্মিলিত মতাদর্শ কি? এক কথায় তার উত্তর হচ্ছে মানবতা। হয়তো ঐ মানবতাই হবে আগামী দিনের মানুষের আন্তর্জাতিক ধর্ম তথা 'মানবধর্ম'।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায় (যে সভাটি কোনো কারণবশত অনুষ্ঠিত হয়নি) পাঠ করার জন্য আরজ আলী মাতুব্বরের লিখিত ভাষণের নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করা হলো এ জন্যেই যে, আমরা তাঁর ঘটনাবহুল জীবন ও তাঁর গড়ে ওঠা চিন্তাজগতের একটা রূপরেখা এ থেকেই পেয়ে যেতে পারি। তবে তাঁকে বুঝার সাথে সাথে আমাদের নিজেদের জীবন জগ□ ও চলমান অন্ধত্বের স্বনির্মিত দার্শনিক জটিলতা কুটিলতাগুলো বুঝতে হলে তাঁর রচনাবলীর গভীর পাঠ আমাদের জন্য আবশ্যক ও জরুরি বলেই মনে হয়। চোখ থাকলেই যে চক্ষুষ্মান হওয়া যায় না, আরো কিছু থাকতে হয়, সেটাই আরজ আলী মাতুব্বর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। সক্রেটিসের মতোই সেই কঠিন প্রশ্ন-করার উপায় আবারো বা□লে দিলেন 'কেন?'

এবং মৃত্যুর আগে তাঁর চুরাশি বছর বয়সে আরেকটি যে অসাধারণ কাজ করে গেলেন তিনি, তাঁর ভাষ্যেই শুনি

'... মৃত্যুর পরে আমার চক্ষুদ্বয় চক্ষুব্যাংকে এবং মরদেহটি বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজে দান করেছি। উদ্দেশ্য মানবকল্যাণ।' #

রণদীপম বসু, ঢাকা, বাংলাদেশে বসবাসরত লেখক। ইমেইল - ranadipam@yahoo.com

আমার স্বর্গ এখানে

মীজান রহমান

একটা জিনিস আমি কোনদিন বুঝতে পারিনি। যাঁরা স্বর্গে চলে গেছেন, যেমন আমাদের নবীজী হজরত মোহাম্মদ (দঃ), এবং যাঁদের হাতে স্বর্গের গ্যারাণ্টিমারা সার্টিফিকেট আছে, তাঁদের জন্য আমরা এই জড়জগতের সাধারণ মনুষ্যকূল এত দোয়াদরূদ পড়ি কেন। স্বর্গবাসীদের জন্যে মর্ত্যবাসীদের খানিক হিংসা হতে পারে, কিন্তু দুশ্চিন্তা হবে কেন। আর যদি দুশ্চিন্তা না থাকে তাহলে দোয়া পড়ি কেন তাঁদের জন্যে। দোয়া বলতে আমি বুঝি মঙ্গলকামনা, আশীর্বাদ। শব্দটা ফারসি হলেও 'সাহিত্য সংসদ বাঙ্গালা অভিধান'-এ তো এই মানেটাই দেওয়া আছে। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে তো মনে হয় মহানবীর জন্যে আমার মত নগণ্য মানুষের দোয়া পড়াটাই শাস্তিযোগ্য ধৃষ্টতা বলে গণ্য হওয়া উচিত। আমার ধাঁধাটা এবার বুঝতে পারছেন তো ? কে যেন সেদিন বলছিল, জনাব মোহাম্মদ আতা ও তাঁর আঠারোজন সঙ্গীসাথী যাঁরা শাহাদত বরণ করে জান্নাতবাসী হলেন এগারোই সেপ্টেম্বর (২০০১) তাঁদের রূহের মাগফেরাতের জন্যে পাকিস্তানসহ আরো ক'টি দেশের পুণ্যবান মুসলমানগণ নামাজের শেষে আল্লার কাছে হাত তুলে দোয়া পাঠিয়েছেন। দোয়াটার একটু অপচয় হল না কি ? মানে তাঁরা তো উড়োজাহাজে করেই বেহেশ্তে চলে গেলেন। গ্যারাণ্টিড। শুধু তাঁরাই গেলেন না, সাথে করে বেশ কিছু নাসারাকেও নিয়ে গেলেন। এই নাসারাগুলো অবশ্য স্বর্গে যেতে পেরেছে কিনা সন্দেহ, শাস্ত্রমতে ওদের তো নরকের ইমিগ্রেশন পাওয়ারই কথা।

আতাসাহেবের উইলটা পড়ে বেশ মজা লাগল। অবশ্য সেটা যদি আদৌ আতাসাহেবেরই উইল হয়ে থাকে। কে জানে, কোন ইহুদী চাল কিনা ওটা। আসলে সমস্ত ঘটনাটাই তো ইহুদী চক্রান্ত হতে পারে। দিনকে রাত আর রাতকে দিন করার ব্যাপারে ওদের মত ওস্তাদ আর কে আছে। তবে ধরে নেওয়া যাক এটা সত্যি সত্যি আতাসাহেবেরই উইল। তাতে নাকি তিনি ইচ্ছাপ্রকাশ করে গেছেন যাতে তাঁকে কবর দেওয়া হয় খাঁটি মুসলমানদের পাশে। সেটা নিউ ইয়র্ক শহরে সহজ না'ও হতে পারে। তাছাড়া এতগুলো পোড়া লাশের মাঝে কোন্টা খাঁটি মুসলমানের লাশ আর কোন্টা নাসারার সেটা জিলিয়ানী সাহেব বুঝবেন কেমন করে। তার উপর কারো হাড়মাংস তো একত্র নেই। একজনের করোটি হয়ত লেগে আছে আরেকজনের ধড়ে, একজনের চোখ আরেকজনের কোটরে। এ-অবস্থাটা আতাসাহেব হয়ত ভেবে দেখেননি। আর হ্যাঁ, তিনি নাকি পইপই করে বলে গেছেন তাঁর জানাজাতে যেন কোন রমণী উপস্থিত না থাকে। সেটা সহজেই বোধগম্য। খাঁটি মুসলমানের মরালাশ দিয়ে জীবিত নারী করবে কি। তার কাজ হল জীবিত খাঁটি মুসলমানের কাছে। উইলটা করার সময় আতাসাহেবের উকিল হয়ত আরেকটা কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে। বেহেশ্তের হুরপরী। আমেরিকান এয়ারলাইন্সের এগারো নম্বর ফ্লাইটে করে তিনি যেখানে গেলেন সেখানে তো বাহাত্তর জন হাস্যময়ী লাস্যময়ী কুমারী তাঁর আগমনের জন্যে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকবার কথা। বেহেশ্তের কুমারীরা

দেখতে কেমন জানি না, কোনদিন জানার সুযোগও হবে না সেটা ভাল করেই জানি। তবে কার্যত তারা নিশ্চয়ই ক্লিনেক্স কোম্পানীর টিস্যুর মত। কিম্বা ডিসপোজেব্ল ডাইপার। একবার ব্যবহার করলেই ফেলে দিতে হয়। আল্লাতা'লার কুমারী-ফ্যাক্টরীটা হালে নিশ্চয়ই ডাবল্ শিফ্টে চলছে। মধ্যযুগের পর এই তো প্রথম এতবড় ডিম্যাণ্ড। এত শহীদ তো অনেকদিন আসেনি আল্লার আরশে। প্রত্যেকের জন্যেই বাঁধাধরা র‍্যাশন – বাহাত্তর কুমারী। গুণ করে দেখুন সংখ্যাটা কোথায় দাঁড়ায়। কুমারীগুলি রি-ইউজেবল্ কিনা সেটা জানা থাকলে অঙ্কটা ঠিকমত করা যেত। বেহেশ্তের কুমারী-ফ্যাক্টরী আর বাংলাদেশের গার্মেণ্টস্ ফ্যাক্টরী একই রকম এফিশিয়েণ্ট বোধহয়। স্বর্গের মদিরা হল আরেকটা আকর্ষণ। আমার স্থূলমস্তিষ্কে খানিক ধাঁধা লাগে। মর্ত্যে এটাকে পান করে পাপীরা, স্বর্গে করে নেকীরা। যুক্তিটা দুর্বোধ্য মনে হয়। এক মিলাদমহফিলে সেদিন মৌলভীসাহেব বললেন, পাকপরওয়ান্দেগার স্বয়ং নেক মুসলমানের হাতে সুরার গেলাশ তুলে দেবেন। ওখানে নিশ্চয়ই ওয়েটারের অভাব। অভাব তো হবেই। মেয়ে ওয়েটারগুলি তো সব পুণ্যবানদের হারেম নিয়েই ব্যস্ত। আর পুরুষ যারা আছেন সেখানে তারা নিশ্চয়ই ওয়েটারের মত হীন কাজ করবেন না। যাইহোক, আতাসাহেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াটা তো সমাপ্ত হল না এখনো। শয়তানের দেশ আমেরিকায় যখন খাঁটি মুসলমান পাওয়া কঠিন তখন বুশসাহেবের উচিত হবে কিছু পয়সাকড়ি খরচ করে তাঁকে মধ্যপ্রাচ্যের কোন এক নাসারামুক্ত দেশে পাঠিয়ে দেওয়া। ইরানে খোমাইনিসাহেব আছেন। তাঁর পাশে জায়গা পেলে খুবই ভাল হয়। এক খাঁটি মুসলমানের পাশে আরেক খাঁটি মুসলমান। ইরান যদি রাজী না হয় তাহলে ইরাক আরেকটি সম্ভাবনা। বড়পীর আছেন সেখানে। মহান নেতা সাদ্দাম হোসেন এখনও শাহাদাত বরণ করেননি। সুতরাং তাঁর পাশে বসতিস্থাপনের আশা বাতিল করতে হয়, যদিও বুশমশাইয়ের মনে সে-রকম একটা গোপন ইচ্ছা নিশ্চয়ই উসখুস করছে। সবচেয়ে উ□কৃষ্ট জায়গা হল আফগানিস্তান। এর চেয়ে নেক জায়গা আর কোথায় আছে পৃথিবীতে। মুসলিম বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দুই নেতার নিবাস ওখানে। ওসামা বিন লাদেন আর মোল্লা মোহম্মদ ওমর। তাঁদের অঙ্গুলিনির্দেশে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ ইমানদার যুবক জান কোরবান করতে প্রস্তুত হবে, বিশেষ করে সেটা যদি ইয়াংকি-নিধনের মত একটি মহ□ কর্ম হয়। পাঠক নিশ্চয়ই জানেন যে তাঁরা একাধারে পরস্পরের শ্বশুর ও জামাতা, অর্থা□ একে অন্যের কন্যাকে শাদী করেছেন। এমন মধুর মিলনের সম্পর্ক সংসারে বড়ই বিরল।

সেদিন শুনতে পেলাম আন্তর্জাতিক ইসলামের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হল আমেরিকাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এটা কারও অজানা নয় যে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় শয়তান হল আমেরিকা। জ্ঞানবিজ্ঞানে সবচেয়ে উন্নত। সবচেয়ে শক্তিশালী। আমেরিকা কাত হলেই তো দুনিয়া কাত। বিশ্ববিজয়। তারপর আরামসে আজান দেওয়া যাবে হোয়াইট হাউসের চত্বরে। চাঁদতারাযুক্ত সবুজ পতাকা উড়বে প্রেসিডেণ্টের অফিসচূড়ায়। বিরাট স্বপ্ন। কত বছর লাগবে সিদ্ধ হতে কে জানে। হয়ত পুরো শতাব্দীটাই লেগে যাবে। লাগুক। মুসলমানের সবুর আছে। তবে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। একদিকে বিবিসাহেবার সাহায্যে সংখ্যা বাড়িয়ে যেতে হবে, আরেকদিকে দালানকোঠা, শপিং মল, খেলার মাঠ, বড় বড় সেতু, এগুলো উড়িয়ে দেওয়ার কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। ইনশাল্লাহ সাফল্য আসবেই একদিন না একদিন।

সম্ভবত সে-সাফল্য স্বচক্ষে দেখার ভাগ্য আমার হবে না। আমার ছেলেদেরও আয়ুষ্কাল পার হয়ে যেতে পারে তার আগে। নাতি-নাতনিদের কথা বলা যায় না। যে রেটে বিজ্ঞান নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করছে তাতে মনে হয় এই শতাব্দীরই শেষের দিকে লোকে একশ' দেড়শ' বছর অনায়াসে বেঁচে থাকতে পারবে। তবে শেষ বয়সে তাদেরও হয়ত ইয়ারপীস পরতে হতে পারে, সুতরাং হোয়াইট হাউসের আজান তাদের কাণে না'ও প্রবেশ করতে পারে। চিন্তা হল তার পরের প্রজন্মটাকে নিয়ে। বিশেষ করে মেয়েগুলোর জন্য। মেয়েদের ভয় তো অল্পবিস্তর সব সমাজেই, তবে আমাদের সমাজেই সবচেয়ে বেশি। হোয়াইট হাউসের আজান মানেই তো ওদের ভাগ্যাকাশে কেয়ামতের শিঙা। আপাদমস্তক বোরখা। স্কুলকলেজ বন্ধ। খেলাধূলা বন্ধ। প্রেমে পড়া বন্ধ। পরপুরুষের পানে দৃষ্টিপাত মানে মুণ্ডপাত। যাকে বলে শরিয়াতন্ত্র। খালেফাতুন রাশেদীন। ইসলামের স্বর্ণযুগ। আমেরিকার পতন মানে এই স্বর্ণযুগের পুনরুত্থান। এই স্বর্ণযুগের জন্যে বিশ্ববাসীর কতখানি আগ্রহ জানি না, আমার আগ্রহ নেই। আমার বন্ধুবান্ধব কারো আছে বলে মনে হয় না। দুয়েকজন যাদের আছে তারা আমেরিকার ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের ছত্রছায়াতে বাস করেই রাশেদীনের স্বপ্ন দেখছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাস হল নানারকম বন্দীত্বের শেকল ভেঙে মুক্তির আলো খোঁজা। আমাদের বেলায় যেন তার বিপরীতটাই সত্য। আমরা মুক্তির পথ ছেড়ে অবরোধের পথ খুঁজতেই যেন বেশি ভালবাসি।

আমার বংশধরদের জন্যে বিষয়সম্পত্তি কিছুই রেখে যাওয়া হল না। ভেবেছিলাম, এই স্বাধীনতাটুকুই থাকবে তাদের সবচেয়ে বড় উত্তরাধিকার। আমি তংকার মোহে এদেশে আসিনি, যদিও যৌবনের একটা সময় আমারও তংকার মোহ ছিল খানিক। কিন্তু এদেশের প্রধান আকর্ষণ ছিল এই স্বাধীনতাটুকু। আমার জীবনচালনার অধিকার ও দায়িত্ব কেবল আমারই, এই জ্ঞানটুকু। আমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাব, যা ইচ্ছে তাই খাব, পরব, বলব, লিখব, ভাবব, যাকে ইচ্ছে তাকে কাছে টানব বা দূরে ঠেলব, ইচ্ছে হলে মসজিদে যাব, ইচ্ছে না হলে যাব না, ইচ্ছে হলে রোজা করব, ইচ্ছে না হলে করব না। আমার এই মৌলিক স্বাধীনতাটুকু কেড়ে নেবার জন্যে কোন ধর্মপুলিশ নেই এখানে। আফগানিস্তানের বর্বর তালেবানদের মত এখানে কেউ দর্জির ফিতা নিয়ে টহল দেয় না রাস্তায় দাড়ির দৈর্ঘ মাপার জন্যে। এদেশে আমি ইচ্ছে করলে দাড়িগোঁফ সব কামিয়ে ফেলতে পারি, আবার ইচ্ছে করলে এমন লম্বা দাড়ি রাখতে পারি যাতে রাস্তা ঝাড়- দিয়ে গিনিজ-এর রেকর্ড বইতে নাম ছাপানো যায়। এদেশের পুলিশ বোরখাপরা মেয়েদের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে না খুরওয়ালা জুতো পরল কিনা কেউ বা আলতা পরেছে কিনা কেউ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুললে কাউকে শূলে উঠতে হয় না এখানে, শরিয়ার ওপর কটাক্ষ করলে মৃত্যুদণ্ড পেতে হয় না কাউকে। ধর্ম ও রাষ্ট্র স্বতন্ত্র জিনিস এখানে। এই স্বাতন্ত্র্যটুকু আমি বজায় রাখতে চাই। এই স্বাতন্ত্র্য ছাড়া গণতন্ত্র সম্ভব নয়, ব্যক্তিস্বাধীনতা বা মানবাধিকার সম্ভব নয়। জীবনের সব সুখের চেয়ে বড় সুখ এই ব্যক্তিস্বাধীনতা, এই মানবাধিকার। এই সুখটুকু আফগানিস্তানে নেই, ইরান বা আরবে নেই, পাকিস্তানে নেই, বাংলাদেশেও লোপ পেতে বসেছে। আমার মন কাঁদে জন্মভূমিতে ফেরার জন্যে, কিন্তু সমাজের বাধা, সন্ত্রাসের বাধা, হরতালের বাধা আর শরিয়ার বাধা আমাকে বারবার ফিরিয়ে আনে সেখান থেকে। আমি এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে চাই। এই খোলা আকাশের নিচে, এই বিশুদ্ধ বায়ুর মাঝে। হোয়াইট হাউসে আজানের ধ্বনি শোনার বাসনা আমার নেই। কোন আজানের ধ্বনিই আমি শুনতে চাই না। যে আজান

আমার মনে বাজে না সে আজান দালানের গম্বুজে শোনার আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। আমার বিধাতা যাঁকে আমি সেজদা করি তিনি মসজিদে থাকেন না, থাকেন আমার হৃদয়ে।

সেদিন কাগজে পড়লাম কাশ্মীরের খবর। দু'টি মুসলমান মেয়ে বাজারে গিয়েছিল কেনাকাটার জন্যে। হঠাৎ তাদের মুখে অ্যাসিড ছুড়ে মারল দুর্বৃত্তের দল। দুর্বৃত্ত বলাটা বোধহয় ঠিক হল না, আসলে ওরা মুক্তিযোদ্ধা। কাশ্মীরকে যারা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করতে চায় বা নিজেরাই স্বাধীন হতে চায়, তাদেরই কীর্তি ওটা। তালেবানদের পদাঙ্ক অনুসরণই তাদের উদ্দেশ্য। তালেবানরা ধর্মীয় রাষ্ট্র বানিয়েছে স্বাধীন হবার পর। কাশ্মীরের বীর যোদ্ধাগণ স্বাধীন হবার আগেই ধর্মীয় রাষ্ট্র স্থাপন করার কাজে লেগে গেছে। ধর্মের প্রথম কাজই তো মেয়েদের ঘরে ঢোকানো, যাতে ভবিষ্যতে কেউ বোরখা ছাড়া রাস্তায় বেরুবার সাহস না পায়। ভাবলাম, সত্যি সত্যি যদি স্বাধীন হয়ে যায় একদিন তাহলে তারা কি করবে। অসতী নারীকে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে পাথর মেরে হত্যা করা ? মেয়েদের স্কুলকলেজ বন্ধ করে দেওয়া ? ওদের ঘরের ভেতরে আটকে রেখে দিনরাত দীনিয়াত পড়ানো ? পুরুষের ভোগের সামগ্রী ছাড়া আর সব কাজ থেকে তাদের অব্যাহতি দেওয়া ? সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম পড়ে যে মুক্তিবাহিনীর নারীশাখাও নাকি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে এই বর্বরতার। দাসত্বই যাদের কাছে স্বাধীনতার সমান তাদের কি কখনো স্বাধীন করা সম্ভব ?

কাশ্মীর আর আফগানিস্তানের মেয়েদের জন্যে আমার ভীষণ কষ্ট লাগে, তবে আমার সত্যি সত্যি কোন অধিকার নেই তাদের ব্যাপারস্যাপার নিয়ে কোন রাজনৈতিক মন্তব্য করার। কিন্তু বাংলাদেশ আমার জন্মস্থান। আমার বিশ্বাস বাংলাদেশের ব্যাপার নিয়ে মন্তব্য করার অধিকার আমি এখনো হারাইনি সব। দেশটার জন্ম হল ধর্মনিরপেক্ষতাকে ভিত্তি করে। ধর্মের দালালদের সঙ্গে লড়াই করে করেই ত্রিশ লক্ষ লোক প্রাণ দিল একাত্তরে। আড়াই লক্ষ নারী হারালো তাদের সম্ভ্রম। মুসলমান দেশের বর্বর সৈন্যরা এসে হামলা করল সেই দেশেরই বাঙালিপ্রধান অঞ্চলে। তাতে সর্বনাশ হল আড়াই লক্ষ মেয়ের। এই সর্বনাশ করার অধিকারটুকু তারা পেল কোত্থেকে ? ধর্ম থেকে, না, জন্ম থেকে ? অথচ কি আশ্চর্য, ঐসময় যে-পশুরা আমাদের অসহায় মেয়েগুলোকে ধরে ধরে চালান দিয়েছিল সৈন্যশিবিরে, ঠিক তারাই বা তাদের বংশধরেরা আজকে বাংলাদেশেরই পথেঘাটে জোরগলায় চি[illegible]কার করে বলছে, বাংলা হবে আফগান, আমরা হব তালেবান। এর চেয়ে বড় বিড়ম্বনা আর কি হতে পারে। এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে জাতির জীবনে। তবুও এই নির্মম বিড়ম্বনাকে, এই অসহ্য অপমানকে অকাতরে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন আমাদের রাজনৈতিক নেতানেত্রীরা। '৯৬-এর সংসদে তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র দু'জন, এবার (২০০১) সেটা দাঁড়িয়েছে ষোলতে। এই দেশটা কি সত্যি সত্যি স্বাধীনতার যোগ্য ?

না, হোয়াইট হাউসের আজান আমি শুনতে চাই না। প্রার্থনা করি আমার বংশধরকেও যেন শুনতে না হয় কোনদিন। আমার নাতনির মুখে কেউ যেন অ্যাসিড না ছোড়ে কখনো। আমেরিকাতে জন্মগ্রহণ করেও তাকে

যেন হিজাব পরতে বাধ্য না করে কেউ। হিজাব যদি সে নিজের ইচ্ছাতে পরতে চায়, পরুক, কিন্তু অন্যের ইচ্ছাতে পরতে না হয় যেন। সে যদি বিকিনি পরে সমুদ্রের পানিতে সাঁতার কাটতে চায়, কাটুক, তাতে যেন বাধা না দেয় কেউ। সে যদি বন্ধুবান্ধব নিয়ে ডিস্কোতে গিয়ে রকের তালে নাচতে চায়, নাচুক। তাতে যদি বাবা-মা বাধা দিতে চায়, দিক, ধর্মপুলিশ যেন না দেয়। তার শ্বাসনালী যেন রুদ্ধ করে না ফেলে কেউ। সে যেন পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে পূর্ণমানব হয়ে উঠতে পারে। তার ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য, তার মেধা, তার নিজস্বতা যেন পূর্ণ মর্যাদা লাভ করতে পারে সমাজের কাছ থেকে। হোয়াইট হাউসের আজানের চেয়ে হাজারগুণ বেশি কাম্য আমার তার স্বাধীনতা, তার ব্যক্তিসত্তার পূর্ণবিকাশ।

ইরান আর ইরাকের যুদ্ধের সময় শুনতাম বারো-তেরো বছরের নিষ্পাপ নিরীহ ছেলেগুলোর হাতে বন্দুক দিয়ে বলা হত, যুদ্ধে গিয়ে শহীদ হলে তাক্ষণিক পুরস্কার পাওয়া যাবে আল্লার কাছ থেকে। রীতিমত লিখিত সার্টিফিকেট নাকি দেওয়া হত স্বর্গের। সেই স্বর্গে আছে সীমাহীন সুরার সাগর, আছে অগণিত সম্মোহনী কুমারী। আমি এই স্বর্গকে বিশ্বাস করি না। এই স্বর্গের বর্ণনা আমাকে লজ্জা দেয়, বিব্রত করে। সুরাপান আমি কোনদিনই পছন্দ করিনি, স্বর্গেও করব না, যদি সেখানে যেতেই হয় অগত্যা। স্বর্গের কুমারীকে ভোগ করার কল্পনা আমার বিবমিষা জাগায়, মনে করিয়ে দেয় আমার ফুলের মত নিষ্কলুষ বোনগুলোর কথা। আমি যে স্বর্গ চাই সে-স্বর্গ পতিতালয় নয়। আমার স্বর্গ এখানেই, এই মহামানবের সাগরকূলে। যেখানে মনুষ্যত্ব আছে, নারীর প্রতি সম্মান আছে, কুমারী কিশোরীর প্রতি আছে স্নেহের দৃষ্টি, সেখানেই আমার স্বর্গ।

[২০০১ সালের অক্টোবর মাসে লিখিত এই প্রবন্ধটি 'দুর্যোগের পূর্বাভাস' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।]

ড. মীজান রহমান, কানাডার অটোয়ায় বসবাসরত গণিতের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। পঞ্চাশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষকতা করেছেন বেশ ক'বছর। বিশ্লেষনধর্মী প্রবন্ধকার হিসেবেও সুপরিচিত। প্রকাশিত গ্রন্থ সাতটি - তীর্থ আমার গ্রাম (১৯৯৪), লাল নদী (২০০১), অ্যালবাম (২০০২), প্রসঙ্গ নারী (২০০২), অনন্যা আমার দেশ (২০০৪), আনন্দ নিকেতন (২০০৬)। সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ 'দুর্যোগের পূর্বাভাস' (২০০৭)। ইমেইল - mrahman@math.carleton.ca

পরিশিষ্ট: তর্ক বিতর্ক ১০৩২ *[ক্লিক করুন]*

- ধর্ম ও বিজ্ঞানঃ কোথায় সংঘাত এবং কেন সমন্বয়ের প্রশ্ন? *সুরজিত মুখার্জী ১০৩৩ [ক্লিক করুন]*
    - একটি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া : *অভিজিৎ রায় ১০৩৭ [ক্লিক করুন]*
    - সংঘাত- সমন্বয় এর প্রশ্নঃ সাবজেকটিভ না অবজেকটিভ? *মোঃ জানে আলম ১০৪২ [ক্লিক করুন]*

- আস্তিকতা বনাম নাস্তিকতা : *মেজবাহউদ্দিন জওহের ১০৪৬ [ক্লিক করুন]*
    - 'আস্তিকতা বনাম নাস্তিকতা'র প্রত্যুত্তরে : *অভিজিৎ রায় ১০৬২ [ক্লিক করুন]*

উপসংহার ১০৭৭ *[ক্লিক করুন]*

ধর্ম ও বিজ্ঞান : কোথায় সংঘাত ও কেন সমন্বয়ের প্রশ্ন ?

সুরজিত মুখার্জী

''ধর্ম ও বিজ্ঞান : সংঘাত - সমন্বয়ের রণনীতি - রণকৌশল'' শিরোনামে মোঃ জানে আলম সাহেবের লেখাটি পড়ে ভাল লাগল। লেখাটির গুনগত মান অতি সুন্দর এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিচারে বিজ্ঞানকে অত্যাধিক পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে এবং তূলনা করতে গিয়ে ধর্মের তূলোধোনা করা হয়েছে আর বিজ্ঞানকে ধর্মের উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে।

বস্তুতঃ বিজ্ঞান ও ধর্মের এই ধরনের তূলনা এবং এককে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর প্রতিপন্ন করার আলোচনাগুলি পড়ে আমার মনে হয় কেন রজনীগন্ধা ফুলের সঙ্গে হিমসাগর আমের তূলনা করে বলা হয়না যে আমটি সুস্বাদু এবং খেলে পেট ভরে কিন্তু রজনীগন্ধা ফুলে কি হয় ? সুগন্ধ ? মানুষের কাছে নেহাৎই নিষ্প্রয়োজন। ইতিহাস ও ভূগোলে কেন তূলনা করা হয়না যাতে মানুষকে বোঝানো যায় ভূগোল ইতিহাসের চেয়ে অধিক বাস্তবিক তাই অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতর কারণ দেশ, ভূখন্ড, পাহাড়, পর্ব্বত পর্যবেক্ষণযোগ্য কিন্তু ইতিহাসের অনেকটাই প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাচীন লিপিবদ্ধ বিবরণীর সাথে (কিছু যৌক্তিক) কল্পনামিশ্রিত। আসলে আমার ব্যক্তিগত ধারনা হল, প্রাচীন ধর্মের (সৎ) প্রণেতাদের যদি জানা থাকত যে ভবিষ্যতে বিজ্ঞান নামক জ্ঞানের একটি শাখা তৈরী হবে যাতে প্রমান ও পর্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে কোন কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করা যাবেনা এবং ভবিষ্যত বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী মানুষেরা ধর্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় তত্ত্বকে অবৈজ্ঞানিক ও কেবলমাত্র ভূয়ো বিশ্বাসভিত্তিক আখ্যা দিয়ে উড়িয়ে দেবে তাহলে হয়তো তাঁরা অযথা, সৃষ্টি, প্রকৃতি ও বিশ্বব্রহ্মান্ডের ব্যাখ্যা এবং তার সাথে একটি অতিমানবিক সৃষ্টিকর্তার যোগসুত্র ইত্যাদি বিষয়ে মস্তিস্কব্যায়ে বিরত থাকতেন অথবা মতবাদ প্রেরণে অপেক্ষাকৃত সতর্ক থাকতেন। তবু এগুলি ছাড়াও ধর্মে বহু কিছু আছে যেগুলির মূল্য অবশ্যই বিদ্যমান আর ধর্ম সেগুলির মধ্যে সীমিত থাকলেই হয়ত মঙ্গল হত এবং এই যুক্তিবাদীদের হাতে অযথা নিগৃহীত হতে হত না।

যুক্তিবাদ মানেই ধর্মের বিরোধিতা করা নয় আর খুঁজে খুঁজে ধর্মগ্রন্থগুলির নঞর্থক ও বিভ্রান্তিকর অংশগুলি উদ্ধৃত করে ধর্মকে আমূল মিথ্যা প্রমান করা নয়। আমার মতে সৎ যুক্তিবাদ হল ধর্মের অযৌক্তিক দিক গুলি বর্জন করে তার যুক্তিযুক্ত এবং মানুষের পক্ষে কল্যানকর তত্ত্বগুলি সঠিকভাবে প্রণয়ন করা। অবশ্য তথাকথিত যুক্তিবাদীরা যদি ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে কোনওকিছুই যৌক্তিক খুঁজে না পান তা হলে অবশ্য অন্য কথা। তবে আমার মতে এমন যুক্তিবাদ নিরপেক্ষ নয় আর পক্ষপাতদুষ্ট যুক্তিবাদ ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতবাদের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিদের মতো যুক্তিবাদীদের শ্রেনীও অনেক। তাদের কিছুসংখ্যক আছে যাদের কাজ হল ধর্মগ্রন্থগুলি পাঠ করে শুধুমাত্র সেগুলির মধ্যে দ্বন্দমূলক, ত্রুটিপূর্ন এবং বিভ্রান্তিকর কি কি আছে তা নির্ধারন করা আর যদি তাতে কিছু সত্যতা থেকে থাকে তা সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে ধর্মকে নিছক একটি বিশ্বাসভিত্তিক সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তাত্ত্বিক মতবাদ বলে যুক্তি স্থাপন করা। আরও এক শ্রেণী আছে যারা ঈশ্বরতত্ত্ব ও তাঁহাতে অন্ধ বিশ্বাসই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য এইরূপ ধারনা ব্যক্ত করে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব প্রমান করার জন্য আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যায় বা বা অস্তিত্ব প্রমান করার চ্যালেন্জ জানায়। ধর্মগ্রন্থগুলিতে বর্ণিত অথবা বর্তমান কিছু স্বঘোষিত অলৌকিক শক্তিধর ভন্ড ধর্মব্যবসায়ীদের দাবি মিথ্যা প্রমান করার

দায়ীত্বশীল যুক্তিবাদীরাও এই শ্রেণীর অর্ন্তগত। এনারা ভালভাবেই জানেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অলৌকিক শক্তির প্রমান কখনই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় দেওয়া সম্ভব নয়। অতএব ভিত্তিহীন ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে মানবজাতিকে অগ্রগতির পথে নিয়ে চলো এই হল তাদের উপদেশ। অবশ্য এই শ্রেণী বিভাজন সর্ব্বদা পরস্পর বর্জনকারি না হলেও তাদের ধর্মবিরোধের গন্ডির গুরুত্ব আরোপন অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন। তবে আমার উদ্দেশ্য, সব যুক্তিবাদীদেরই এক পাত্রে ফেলা নয় কারন আমার দেখা ও জানা এমন যুক্তিবাদীও আছে যারা প্রচলিত ধর্ম, বিশ্বাস, ঈশ্বর ইত্যাদির চরম বিরোধী হয়েও ধর্মের সদগুন ও জনহিতকর দিকগুলি অস্বীকার করেনা। তবে অবশ্যই তারা এটা মানতে নারাজ যে নৈতিকতার উৎস শুধুমাত্র ধর্ম, সত্য, কারণ বাস্তবে দেখা যায় ধর্মে ঘোর অবিশ্বাসী হয়েও পরম নৈতিক মানুষের সংখ্যা অজস্র। এই অজস্র মানুষেরা আসলে সৎ আর সত্য হল এই যে ভন্ড ধার্মিকের চেয়ে সৎ অধার্মিক সহস্রগুন ভাল। তবু বলব বহু সাধারন মানুষকে একটি পরিশুদ্ধ ধর্ম যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে।

অনেক যুক্তিবাদী ধর্মকে তার অপপ্রয়োগের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে এবং ধর্মীয় মৌলবাদীদের দ্বারা পরিচালিত ধর্মের সমালোচনা ও নিন্দা করে, ঠিক কিছুটা এইরকম, যেন একটি দাগী আসামীকে আদালতে বিচারকের আসনে বসিয়ে আদালতের বিচার পদ্ধতির সমালোচনা করা। আদালতের বিচারধারার যদি সমালোচনা করতে হয়, আইন শাস্ত্র পড়ব, যতটুকু ভালো স্বীকার করব আর যা অন্যায় ও অসমর্থনীয় সেগুলি নিকৃষ্ট চিহ্নিত করে বাদ দেওয়ার সুপারিশ করব এবং নিরপেক্ষ চিন্তাশীল মানুষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্মতিতে সেটি গ্রাহ্য বা প্রণয়ন করব। আমার মতে এই ভাবেই সমাজের নিয়ম কানুন, আইন, ব্যবস্থা ইত্যাদি স্থাপিত হয়ে এসেছে এবং দায়ীত্বশীল বুদ্ধিজীবি নাগরীকদের, ধর্মের ক্ষেত্রেও এই ভূমিকা হওয়া উচিত।

আলম সাহেবের একটি বাক্য বড় অদ্ভূত লাগল, অবশ্য এতে তাঁর বিশেষ কোনও দোষ দেখতে পাইনা কারন ইদানিং অনেক পাশ্চাত্য যুক্তিবাদীরাও এই ধরনের মত পোষণ করে। তিনি বলছেন ‘‘আধুনিক যুগে এমন কোন গোঁড়া ধর্মবেত্তা পাওয়া যাবেনা যিনি বিজ্ঞানের আবিষ্কার নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার থেকে নিজেকে বিরত রেখেছেন’’। অর্থাৎ ধর্মবেত্তারা চশমা পরলেই প্রযুক্তির ব্যবহার, কারণ এটি বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত; সেইরূপ কাগজ, কলম এমনকি তাঁত, বস্ত্র ইত্যাদিও বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত। তবে উক্তিটির উদ্দেশ্য এই প্রযুক্তির ব্যবহারের আপত্তি নয়, বিজ্ঞানের সার্ব্বজনীনতা প্রতীপন্ন করা। কিন্তু পৃথিবীর ধর্মগুলি কেন সার্ব্বজনীন নয় ? কোন এক ধর্মের বিশ্বাস অন্য ধর্মের বিশ্বাসকে কারা নাকচ করে দেয় ? ওই আদালতের বিচারকের আসনে বসা দাগী আসামীরা ? তাছাড়া অন্ধবিশ্বাস সতত অনিশ্চিত ও অনির্দিষ্ট তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু ধর্মের মধ্যেও বহু সত্য বিদ্যমান যেগুলি আদৌ অনিশ্চিত ও অনির্দিষ্ট নয় এবং এইসব সত্য সব ধর্মগুলিতেই ব্যপ্ত আর সেগুলির সার্ব্বজনীন হতে বাধা কোথায় ? আমার জন্ম যে কোন ধর্মেই হোক না কেন, আমি অন্য যে কোন ধর্মের মতবাদের সত্যতা যাচাই করে তা জীবনে প্রয়োগ করে যদি একবার নয় বারবার সুফল পাই, কেন সেই মতবাদপুষ্ট ধর্ম আমার কাছে অস্পৃশ্য থাকবে ?

এছাড়া আমার মতে বিশ্বাস এবং অন্ধবিশ্বাস এই শব্দদুটিকে আলাদা করা উচিৎ কারণ বিশ্বাস মানুষের একটি প্রাথমিক মনন প্রক্রিয়া এবং বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবি, ডাক্তার, আইনজীবি, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবি, শিক্ষক, ছাত্র ইত্যাদি সকল শ্রেনীর মানুষই এটি নিরন্তর ব্যবহার করে থাকে। বহু আবিষ্কার যুক্তিসম্মত বিশ্বাস থেকে প্রসূত আর বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত অনেক। অতএব অন্ধবিশ্বাস নয় যুক্তিসম্মত বিশ্বাস দিয়ে কোন কিছুর অনুসন্ধানের সুত্রপাত হতেই পারে তবে পরবর্তি পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ, হয় এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগাতে পারে নয় বিশ্বাসটি ভ্রান্ত বলে পরিত্যাগ করার ইঙ্গিত দিতে পারে। অর্থাৎ বিজ্ঞান ধর্ম বা যে কোন বিষয়ের সত্যান্বেষণে এই প্রক্রিয়া সমান ভাবে কার্যকরি এবং বিশ্বাসের সঠিক প্রয়োগ মানুষকে সত্যের থেকে বিচ্যুত করেনা তার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

আরও একটি বিষয় আমাকে বিব্রত করে, সেটি হল বিজ্ঞান দিয়ে ধর্মকে প্রমান করার অথবা আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ধর্মে বহু আগেই নিহিত ছিল এইরূপ ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা বা অপচেষ্টা। আমার মনে হয় ধর্মানুরাগী মানুষদের হীনমন্যতাই এর জন্য দায়ী। বস্তুবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদের আক্রমনের হাত থেকে তাদের ধর্মকে বাঁচাতে গিয়েই তাদের এই অপপ্রয়াস। হয়ত এই পন্থা ধর্মের বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপন করতে পারে এই ধারনা থেকেই এরূপ আচরনের সুত্রপাত। অত্যন্ত দুঃখজনক। বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম !!! ব্যাপারটা কিছুটা ঐতিহাসিক ভূগোল বা ভৌগলিক ইতিহাস নামক বিষয়ের মতো দাঁড়াবে। কিন্তু বিজ্ঞান ও ধর্ম বিষয়গতভাবে ভিনরাজ্যের হলেও সত্যানুসন্ধানে তাদের মিলিত ব্যবহার নিষিদ্ধ কেন হবে ? যেমন ভূগোলের বিষয়বস্তু এবং ইতিহাসের বিষয়বস্তু মানবসৃষ্ট ও স্বতন্ত্র হলেও সত্যান্বেষণের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই দুয়েরই প্রয়োজন পড়ে তাই দুটি বিষয়ের সংঘাত আমাদের অনুসন্ধানের পক্ষে নিঃসন্দেহে ঘাতক হতে পারে। অতএব সত্যের অনুসন্ধানে শুধু দুটি নয় বহু বিষয়ের সমন্বয় আবশ্যক এবং এই সমন্বয়ে, বিষয়গুলিকে মানব চরিত্ররূপ কল্পনা করে পারস্পরিক বিদ্বেষভাবাপন্ন মনোভাব আরোপ করে, দেওয়া নেওয়ার প্রশ্ন খাড়া করলে প্রকৃত সত্যান্বেষী মানুষের সমূহ বিপদ।

বিজ্ঞানের অর্থ হল বিশেষ জ্ঞান, অর্থাৎ কোন কিছুর সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান। অর্থাৎ মানুষের নৈতিকতা সম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞানকেও আমাদের সহজ ভাষায় বিজ্ঞান আখ্যা দিতে পারি। কিন্তু পরিভাষায় বিজ্ঞান শব্দের ব্যবহার তার সংজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত এবং সেখানে সব বিশেষ জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলা যাবেনা। যাই হোক এই বিশেষ জ্ঞান যে কোন ভাবে আসতে পারে আর সেজন্য বিজ্ঞানাগারই যে একমাত্র জায়গা তা আমি মনে করিনা।

আমার ব্যক্তিগত অভিমত হল বাস্তবিক মানবধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন অর্ন্তদ্বন্দ্ব নেই এবং আপাত সংঘাত হল কৃত্রিম ও কিছু মানুষের মস্তিস্কপ্রসুত ছায়াযুদ্ধের মত। বিজ্ঞান অবশ্যই অনস্বীকার্য্য কারণ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ এবং ইন্দ্রিয়গুলির সম্পর্ক সহজাত ও পরস্পরের পরিপূরক। নিম্নশ্রেনীর জীব থেকে মানুষ পর্যন্ত সকলেরই জীবনধারনের জন্য এই জগতের বিধি মেনে চলতে বাধ্য এবং মানুষ উন্নততম জীব তাই তার উন্নত জীবনধারন ও অগ্রগতির জন্য এইসব বিধিনিয়মের অগ্রিম জ্ঞান অপরিহার্য। কিন্তু একমাত্র জীব, মননশীল মানুষের ধর্মের প্রয়োজন, কারণ তার কাছে বিজ্ঞানের আওতার বাইরেও এক বিশাল জগৎ বিরাজমান যেখানে মানুষের অনুভূতি, নৈতিকতা, সুখ, দুঃখ, ভালবাসা আবার ক্রোধ, লালসা, হিংসা, কুসংস্কার, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে এবং সঠিক, সত্য, নিরপেক্ষ বা সার্ব্বজনীন ও কুসংস্কারমুক্ত একটি মানবধর্মই মানুষকে সাহয্য করতে পারে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে ধর্মের অনুসরন ছাড়া মানুষ এই বিশাল জগতের উপর যথার্থ নিয়ন্ত্রন রাখতে পারেনা এবং যারা পারে তারা অসাধারন ও পরম সৎ ধার্মিকের চেয়ে কিছু কম নয় আর তাদের কোন ধর্মের প্রয়োজন নেই। কিন্তু সাধারন মানুষের কাছে ধর্মের মূল্য অবশ্যই আছে।

পাঠক যেন এটা না মনে করেন যে আদপে ধর্ম কি সেই প্রসঙ্গ ছেড়ে ধর্ম কি হওয়া উচিৎ তাই নিয়ে আমার আলোচনা, বরং ধর্ম যা হওয়া উচিৎ ছিল আর কেন তা হয়নি সেই দিকেই আমার দৃষ্টিপাত। ধর্মের মধ্যেই বহু সত্য আছে যা জনসাধারনের হিতকর আবার বহু তত্ত্বও আছে যা অসত্য ভ্রান্ত ও বিপথগামী এবং সময়োপযোগী নয়। সৎ যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদ আমি তাকেই মনে করি যা এই সমস্ত অবান্তর মতবাদগুলিকে চিহ্নিত করে ধর্মের অপলাপ না করে সেগুলিকে প্রকৃত ধর্মের অন্তরায় বলে প্রতিপন্ন করবে। অপরদিকে ধর্মের যুক্তিসাপেক্ষ ভাল দিকগুলো অবশ্যই স্বীকার করে সেগুলির উপর সাধারন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তবে যুক্তিবাদ যদি নিরপেক্ষ হয় ও অন্ধ বিজ্ঞানমনস্ক বা ধর্মান্ধ মৌলবাদ কোনটাই না হয় তবেই সেটা সম্ভব।

বস্তুবাদী বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে এই জগতের সত্যসমষ্ঠির বড় একটা অংশ কিন্তু তার বাইরেও বিশাল বাকী অংশটিও বিদ্যমান যা বিজ্ঞান প্রমান করতে পারেনা এমন নয়, সহজভাবে বলতে গেলে বিজ্ঞানের চর্চ্চার

বিষয়বস্তু নয়। এবং এই সত্যগুলি অনুধাবন করা মানুষের জীবনে নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার, অনু পরমানুর পর্য্যবেক্ষণ, গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি ও বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্ঠির ইতিহাস অনুসন্ধানের চেয়ে কিছু কম জরুরি বলে আমি মনে করিনা।

অতীতে শক্তিধর অত্যাচারী ধর্মপ্রবর্তকদের দ্বারা তৎকালীন যুক্তিসম্পন্ন, বস্তুবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক ও বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের নিপীড়ন আর জগৎ সৃষ্টির মতবাদ বলপূর্ব্বক চাপিয়ে দেওয়া এবং অনাদিকাল ধরে ও অধুনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিশ্বব্যাপি মৌলবাদজাত সন্ত্রাস, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের দ্বারা আশ্রিত পালিত কোটি কোটি টাকার ধর্মীয় ব্যাবসা ইত্যাদি বিবেকবান মানুষদের চিরকালই বিব্রত করেছে ও এখনও করছে। একটি কারণ হিসাবে আমার মনে হয় এরই ফলস্বরূপ মানুষের প্রতিহিংসাপরায়ন মন অবচেতনভাবে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সংঘাত বাধিয়েছে। বিজ্ঞানকে তার অপব্যবহার থেকে স্বতন্ত্র রেখেছে অথচ ধর্মকে তার অপব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত করে ধর্মের মুন্ডপাত করেছে। এ কি ধরনের একপেশে যুক্তিবাদ বা মানবতাবাদ ? অপরদিকে একাধারে বিজ্ঞানমনস্ক অথচ ধর্মানুরাগী মানুষেরা বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয় ঘটানোর প্রস্তাব দিয়ে থাকেন।

বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয় মানুষের করার অপেক্ষায় থাকেনা এই সমন্বয় ওতপ্রত, স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক। আর সমন্বয় শুধু বিজ্ঞান ও ধর্মের কেন, সমগ্র সত্য জ্ঞান আহরনের বিষয়বস্তুর মধ্যেই বর্তমান আর তারা সমষ্টিগতভাবেই বিরাজমান, মানুষ তার অনুসন্ধানগত সুবিধার জন্য এই কৃত্রিম বিভাজন সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতি একটি সম্পূর্ণ পুস্তক যা বিপুল এবং অনন্ত সত্যের ভান্ডার। প্রকৃতিদত্ত অমোঘ অস্ত্র, যুক্তিবিচারের সঠিক প্রয়োগে সমস্ত অসত্য খন্ডন করে সত্যকে উন্মোচন করাই মানুষের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য। এর জন্য বদ্ধ মনে কোন বিষয়কে বাদ দেওয়া যে কোন মানুষের নিজস্ব নির্ব্বাচন এবং হয়ত বহু সত্য অজানা ও অনাবিষ্কৃত রাখা তাদের কাছে গ্রহনযোগ্য।

তবে বিজ্ঞানই যদি মানুষের জীবন জগতের শেষ কথা হত তবে আইনষ্টাইনের মত বিশ্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী পরমানু বিস্ফোরন প্রয়োগের সাফল্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রনহানীতে মর্মাহত না হয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নাচনাচি করতেন। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক চেতনার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানবিক চেতনার বিকাশেরও প্রয়োজন এবং তা বিজ্ঞান থেকে নয় বরং কিছু অংশে ধর্মের থেকেই সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য অন্ধবিশ্বাস, অলৌকিক তত্ত্বসমূহ, চমৎকার, পাপ, পুন্য, ব্যক্তিগত ঈশ্বর, বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্টির আজগুবি সব গল্প, প্রকৃতির ঘটনাবলীর অবাস্তব এবং উল্টোপাল্টা ব্যাখ্যা, মৌলবাদ ইত্যাদি থেকে ধর্মকে মুক্ত করতে হবে আর স্বার্থান্বেষী, প্রতারক ধর্মপ্রচারকদের অনির্দিষ্টকালীন অবকাশে পাঠাতে হবে।

অনেকে হয়ত মনে করবেন এ আবার কেমন ধর্ম ? উপরিউক্ত পদার্থগুলি যদি বাদই গেল তবে ধর্মের রইলটা কি ? আবার এই গুনাগুনগুলি ধর্ম থেকে লোপ পেলে বিজ্ঞানের সঙ্গে সংঘাত কি ভাবে সম্ভব আর এইরকম ধর্মকে কি ধর্ম বলা যাবে ? আসলে সমস্যাটা ধর্মের নয়, দৃষ্টিভঙ্গির। আমি আবার বলছি, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে থেকেই সম্যক যুক্তি ও বিচারধারা প্রয়োগ করে বহু সত্য অনুধাবনপূর্ব্বক এইরকম একটি সুস্থ মানবধর্ম নিষ্কাশন করা সম্ভব আর এই সত্যগুলির কোনটাই অপরীক্ষিত ও অসার নয়, যে কেউ চাইলেই তাদের সত্যতা যাচাই করতে পারে। বিজ্ঞান ও ধর্মের সংঘাত বাধালেই সমন্বয়ের প্রশ্ন আসবে।

আশা করব এমন ধর্মের, বিজ্ঞানের সঙ্গে সংঘাত বা সমন্বয়ের কোন প্রশ্নই উঠবেনা।

ধর্ম ও বিজ্ঞানঃ কোথায় সংঘাত এবং কেন সমন্বয়ের প্রশ্ন? - একটি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

অভিজিৎ রায়

আমি সুরজিত মুখার্জীর 'ধর্ম ও বিজ্ঞানঃ কোথায় সংঘাত এবং কেন সমন্বয়ের প্রশ্ন?' খুব আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। তিনি তার প্রবন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশ করেছেন, এ বইটির সম্পাদক হিসেবে আমি যার জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি। আমি আমার উত্তর খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করব।

সুরজিত প্রশ্ন করেছেন, কেন বিজ্ঞানকে ধর্মের চাইতে কেউ কেউ বড় করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন? কেউ কি বলতে পারে ইতিহাস কিংবা ভুগোলের মধ্যে কে বড়? এ কথাগুলো শুনতে মধুর লাগে, ক্ষেত্র বিশেষে 'যৌক্তিক' বলেও মনে হয়, কিন্তু এ গুলোর উত্তর সুরজিত বাবু নিজেও হয়ত জানেন। বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের দ্বন্দ্বের কারণেই গ্যালিলিওর মত বিজ্ঞানীকে একটা সময় সইতে হয়েছিল নির্যাতন। সেই ঘটনাটি আরেকটিবার স্মরণ করা যাক। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে - বাইবেল বিরোধী এই সত্য কথা বলার অপরাধে চার্চ গ্যালিলিওকে অভিযুক্ত করেছিল 'ধর্মদ্রোহিতার' অভিযোগে। ১৬৩৩ সালে। গ্যালিলিও তখন প্রায় অন্ধ, বয়সের ভারে ন্যুব্জ। অসুস্থ ও বৃদ্ধ বিজ্ঞানীকে জোর করে ফ্লোরেন্স থেকে রোমে নিয়ে যাওয়া হয়, হাটু ভেঙ্গে সবার সামনে জোড় হাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়ে বলতে বাধ্য করা হয় এতদিন গ্যালিলিও যা প্রচার করেছিলেন তা ধর্মবিরোধী, ভুল ও মিথ্যা। বাইবেলে যা বলা হয়েছে সেটিই আসল, সঠিক - পৃথিবী স্থির অনড় - সৌর জগতের কেন্দ্রে। গ্যালিলিও প্রাণ বাঁচাতে তাই করলেন। পোপ ও ধর্মসংস্থার সম্মূখে গ্যালিলিও যে স্বীকারোক্তি ও প্রতিজ্ঞা-পত্র স্বাক্ষর করেন, তা বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাসে ধর্মীয় মৌলবাদীদের নির্মমতার এবং জ্ঞান সাধকদের কাছে বেদনার এক ঐতিহাসিক দলিল:

> আমি ফ্লোরেন্সবাসী স্বর্গীয় ভিন্সেঞ্জিও গ্যালিলিওর পুত্র, সত্তর বৎসর বয়স্ক গ্যালিলিও গ্যালিলি সশরীরে বিচারার্থ আনীত হয়ে এবং অতি প্রখ্যাত ও সম্মানার্হ ধর্মযাজকদের (কার্ডিনাল) ও নিখিল খ্রীষ্টীয় সধারণতন্ত্রে ধর্মবিরুদ্ধ আচরণজনিত অপরাধের সাধারণ বিচারপতিগণের সম্মূখে নতজানু হয়ে স্বহস্তে ধর্মগ্রন্থ স্পর্শপূর্বক শপথ করছি যে, রোমের পবিত্র ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম সংস্থার দ্বারা যা কিছু শিক্ষাদান ও প্রচার করা হয়েছে ও যা কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে আমি তা সবসময় বিশ্বাস করে এসেছি, এখনও করি এবং ঈশ্বরের সহয়তা পেলে ভবিষ্যতেও করব। সূর্য কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ও নিশ্চল এরূপ মিথ্যা অভিমত যে কিরূপ শাস্ত্রবিরোধী সে সব বিষয় আমাকে অবহিত করা হয়েছিল; এ মিথ্যা মতবাদ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে এর সমর্থন ও শিক্ষাদান থেকে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত থাকতে আমি এই পবিত্র ধর্মসংস্থা কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছলাম। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে একই নিন্দিত ও পরিত্যক্ত মতবাদ আলোচনা করে ও কোন সমাধানের চেষ্টার পরিবর্তে সেই মতবাদের সমর্থনে জোরালো যুক্তিতর্কের অবতারণা করে আমি একটি গ্রন্থ রচনা করেছি; এজন্য গভীর সন্দেহ এই যে আমি খ্রীষ্টধর্মবিরূদ্ধ মত পোষণ করে থাকি। .... অতএব সঙ্গত কারণে আমার প্রতি আরোপিত এই অতিঘোর সন্দেহ ধর্মাবতারদের ও ক্যাথোলিক সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেকের মন হতে দূর করবার উদ্দেশ্যে সরল অন্তকরণে ও অকপট বিশ্বাসে শপথ করে

> বলছি যে পূর্বোক্ত ভ্রান্ত ও ধর্মবিরূদ্ধ মত আমি ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করি। ...আমি শপথ করে বলছি যে, আমার ওপর এজাতীয় সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে, এরূপ কোন বিষয় সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আর কখনও কিছু বলব না বা লিখব না। এরূপ অবিশ্বাসীর কথা জানতে পারলে অথবা কারও ওপর ধর্মবিরূদ্ধ মতবাদ পোষণের সন্দেহ উপস্থিত হলে পবিত্র ধর্মসংস্থার নিকট অথবা যেখানে অবস্থান করব সেখানকার বিচারকের নিকট আমি তা জ্ঞাপন করব। শপথ নিয়ে আমি আরও প্রতিজ্ঞা করছি যে, এই পবিত্র ধর্মসংস্থা আমার ওপর যে সব প্রায়শ্চিত্তের নির্দ্দেশ প্রদান করবে আমি তা হুবহু পালন করব। এসব প্রতিজ্ঞা ও শপথের যে কোন একটি যদি ভঙ্গ করি তাহলে শপথভঙ্গকারীর জন্য ধর্মাধিকরণের পবিত্র অনুশাসনে এবং সাধারণ অথবা বিশেষ আইনে যেসব নির্যাতন ও শাস্তির ব্যবস্থা আছে তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করব। অতএব ঈশ্বর ও যেসব পবিত্র গ্রন্থ আমি স্পর্শ করে আছি এঁরা আমার সহায় হোন। আমি উপরে কথিত গ্যালিলিও গ্যালিলি শপথ গ্রহণ ও প্রতিজ্ঞা করলাম এবং নিজেকে উপর্যুক্তভাবে বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে প্রতিশ্র"ত হলাম। এর সাক্ষ্য হিসেবে স্বহস্তলিখিত শপথনামা যার প্রতিটি অক্ষর এইমাত্র আপনাদের পাঠ করে শুনিয়েছি তা আপনাদের নিকট সমর্পন করছি। ২২শে জুন, ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দ, রোমের মিনার্ভা কনভেন্ট।"

শোনা যায়, এর মধ্যেও একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ গণিতজ্ঞ-জ্যোতির্বিদ স্বগতোক্তি করেছিলেন- 'তার পরেও কিন্তু পৃথিবী ঠিকই ঘুরছে'। ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ নিয়েই গ্যালিলিওর মৃত্যু হয় ১৬৪২ সালে, নিজ গৃহে, অন্তরীণ অবস্থায়। শুধু গ্যালিলিওকে অন্তরীণ করে নিযযাতন তো নয়, ব্রুনোকে তো পুড়িয়েই মারলো ঈশ্বরের সুপুত্ররা। তারপরো কি সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘোরা ঠেকানো গেল?

শুধু গ্যালিলিও বা ব্রুনো নয়, ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, হাইপেশিয়া, এনাক্সোগোরাস, ফিলিপ্রাস প্যারাসেলসাস, এনাকু সিমন্ড, লুচিলিও ভানিনি, টমাস কিড, ফ্রান্সিস কেট, বার্থোলোমিউ, লিগেট, ইবনে খালিদ, যিরহাম, আল দিমিস্কি, ওমর খৈয়াম, ইবনে সিনা, ইবনে বাজা, আল কিন্দী, আল রাজি কিংবা ইবনে রুশদের সহ অনেককেই ধর্মান্ধদের হাতে নিগৃহীত এবং নির্যাতিত হয়ে নিহত হতে হয়। এই বইয়ের অষ্টম অধ্যায়ে লেখকেরা এধরণের নিপিড়নের অনেক পরিসংখ্যান হাজির করেছেন। ইতিহাস আর ভুগোলের মধ্যে এহেন রক্তাক্ত দ্বন্দ্বের কথা কি সুরজিত বাবু কখনো শুনেছেন? কখনো কি শুনেছেন যে, ইতিহাসের কোন তত্ত্বের জন্য ভুগোল-ওয়ালারা নির্যাতন করেছে কোন বিজ্ঞানীর উপর? এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই। বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের দ্বন্দ্বকে ইতিহাস - ভুগোলের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সাথে তুলনা করা অতি সরলীকরণ বই কিছু নয়।

আজকের দিনের পরিবর্তিত পরিবেশে বিজ্ঞানীদের উপর এত ঢালাওভাবে অত্যাচার করা কিংবা ডাইনী পোড়ানোর মত তাদের পুড়িয়ে মারা না গেলেও ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের দল সুযোগ পেলে এখনো বিজ্ঞানের

অগ্রগতি ঠেকাতে মুখিয়ে থাকে। যখনই বিজ্ঞানের কোন নব আবিস্কার তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত বিশ্বাসের বিপরীতে যায়, খোদ বিজ্ঞানকে ফেলে দিতে চায় আস্তাকুঁড়ে। অধিকাংশ ধার্মিকেরাই এখনো বিবর্তন তত্ত্বকে মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি কারণ ডারউইন প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবস্থান ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত সৃষ্টির কল্পকাহিনী গুলোর একশ আশি ডিগ্রী বিপরীতে। এখনো সুযোগ পেলেই ধর্মান্ধ মোল্লার দল প্রগতিশীল দার্শনিক, বিজ্ঞানী কিংবা সাহিত্যিককে 'মুরতাদ' আখ্যা দেয়, চাপাতি দিয়ে কোপায় কিংবা দেশ থেকে নির্বাসিত করে। এব্যাপার স্যাপার গুলোতো আর ইতিহাস ভুগোলের সাথে তুলনা করে ধামাচাপা দেওয়া যাবে না।

এখন কথা হচ্ছে কেন এই দ্বন্দ্ব যার বলি হয়েছে বিজ্ঞানীরা প্রতিটি যুগে? কারণ, ধর্ম সব সময়ই এক ধরণের 'অ্যাবসুলটনেস' দাবী করে - ধর্গ্রন্থে লেখা বাণিগুলোকেই অভ্রান্ত সত্য হিসবে মেনে চলতে বাধ্য করে এর অনুসারীদের। এর বাইরে এক পা দিলেই হা রে রে করে ঝাপিয়ে পড়ে। ধর্ম মহাবিশ্ব সম্বন্ধে প্রাচীন, বালখিল্য এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিথ্যা ধারনা দেয়, আর অন্য দিকে বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত নতুন জ্ঞানের সাপেক্ষে আমাদের আধুনিক ধারণায় আমাদের আলোকিত করে তুলে। ধর্ম ধর্মগ্রন্থে লেখা বানীর সাপেক্ষে নীতি-নৈতিকতার এক ধরণের 'পরম আকড়' হিসবে প্রতিপন্ন করতে চায়। এর অন্যথা হলেই চলে নির্যাতন কিংবা ঘৃণা। ভারতে দীর্ঘদিন জাতিভেদের যে বিষবাষ্প কুড়ে কুড়ে খেয়েছে, যেভাবে শুদ্র এবং দলিতদের উপরে চলেছে নির্যাতন নিপিড়ন, যে ভাবে সতীদাহের নামে মহিলাদের একসময় পুড়িয়ে মারা হয়েছে - তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ম হতে উৎসারিত। সৌদি আরবে মেয়েদের গৃহবন্দী করে রাখা হয় ধর্মের দোহাই দিয়েই। আফগানিস্তানে আর ইরানে কাঠমোল্লারা ক্ষমতা দখলের পর কিভাবে আল্লাহর আইন বলবৎ করতে গিয়ে মানবাধিকারকে বিসর্জন দেয়া হয়েছে তা আমরা দেখেছি। আমরা দেখেছি বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়ে কিভাবে ১৯ জন ধার্মিক এরোপ্লেনকে বোমা বানিয়ে ৯/১১ এর মত ঘটনা ঘটিয়েছে। কাজেই ব্যাপারটা এত সরল নয়। ক্রিস্টোফার হিচেন্স তার 'God Is Not Great: How Religion Poisons Everything.' গ্রন্থে বলেন[1] -

> 'ধর্মের বিরুদ্ধে চারটি পুরনো অভিযোগ আছে। প্রথমত: মানুষ ও মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে ধর্ম সম্পূর্ণ ভুল তথ্য দেয়। দ্বিতীয়ত: এটা ভুল ভাবে মনে করে যে আত্মার শান্তর জন্য শক্তি যোগায় কেবলমাত্র ধর্ম। তৃতীয়ত: ধর্ম যৌনতাকে অস্বাভাবিক ও বিপদজনকরূপে উপস্থাপন করে আর নারীদের হেয় হিসেবে প্রতিপন্ন করে। চতুর্থত: ধর্ম মনে করে নৈতিকতার ধারক আর বাহক কেবল ধর্ম'।

এ সমস্ত ভুলের নিগড় থেকে ধর্ম যে এখনো বেরুতে পেরেছে তা বলা যায় না।

সুরজিত বাবু অন্ধবিশ্বাসকে বিশ্বাস থেকে পৃথক করার প্রস্তাব করেছেন। সাধু প্রস্তাব, সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে কিভাবে অন্ধবিশ্বাস আর বিশ্বাস পৃথক করা যাবে? আমার মতে, বিজ্ঞান আর ধর্মের প্রতিনিয়ত সংঘাত আর সংঘর্ষেই ধর্মবাদীরা বুঝতে পারছেন, তাদের বিশ্বাসগুলো ভুল আর পরিত্যাজ্য। তারা আজ বুঝতে পেরেছেন, ভূকেন্দ্রিক সৌরমডেলে আর আস্থা রাখা যাবে না, তা যতই ধর্মগ্রন্থ দ্বারা

[1] অষ্টম অধ্যায় ক্রিস্টোফার হিচেনসের (অগ্নি অধিরূঢ় অনুদিত) 'ধর্ম সবকিছুকে বিষাক্ত করে তুলছে' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য

সমর্থিত হোক না কেন; তারা বুঝতে পেরেছেন ছয় হাজার বছরের পৃথিবীর বয়সের ধারণা অবৈজ্ঞানিক; তারা বুঝতে পেরেছেন জীবজগত স্থিতিশীল নয়; তারা বুঝতে পেরেছেন আদম হাওয়ার কেচ্ছাকাহিনী থেকে বিবর্তন তত্ত্ব অনেক বেশী গ্রহনযোগ্য। কাজেই বিজ্ঞানকে হেয় না করে বরং সুরজিতবাবুর কৃথার্থ থাকা উচিত যে, তিনি যা চাইছেন তা বিজ্ঞানই করে দিচ্ছে।

তবে সত্যি বলতে কি, সুরজিত বাবু যতই বিশ্বাস এবং অন্ধবিশ্বাস বা অপবিশ্বাসের পার্থক্য করার চেষ্টা করুন না কেন, 'বিশ্বাস' ব্যাপারটিই কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে একটি 'অপ-বিশ্বাসমূলক' প্রক্রিয়ার উপর। ডঃ হুমায়ুন আজাদ তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন[2],

> 'যে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই, যার কোন অস্তিত্ব নেই যা প্রমাণ করা যায় না, তাতেমানুষকে বিশ্বাস করতে হয়। মানুষ ভুতে বিশ্বাস করে, পরীতে বিশ্বাস করে বা ভগবানে, ঈশ্বরে বা আল্লায় বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস সত্য নয়, এগুলোর কোন বাস্তব রূপ নেই। মানুষ বলে না, আমি গ্লাসে বিশ্বস করি বা পানিতে বিশ্বাস করি, মেঘে বিশ্বাস করি। যেগুলো নেই সেগুলোই মানুষ বিশ্বাস করে। বিশ্বাস একটি অপবিশ্বাসমূলক ক্রিয়া। যা সত্য, তাতে বিশ্বাস করতে হয় না; যা মিথ্যে তাতে বিশ্বাস করতে হয়। তাই মানুষের সব বিশ্বাস ভুল বা ভ্রান্ত, তা অপবিশ্বাস।'

জিম ওয়াকার তার The problems with beliefs প্রবন্ধে[3] বলেন -

> Beliefs and faiths represent a type of mental activity that produces an unnecessary and dangerous false sense of trust and wrongful information (thinking coupled with the feeling of 'truth'). Faith rarely agrees with the world around us. History has shown that beliefs and faith, of the most intransigent kind, have served as the trigger for tragic violence and destruction and sustained the ignorance of people. Replacing beliefs with predictive thoughts based on experience and evidence provide a means to eliminate intransigence and dangerous superstitious thought.

জিম ওয়াকার আরো বলেন -

> Why does religious belief create such monstrous atrocities? Because religion expresses everything into terms of belief, faith, and absolutes, without need for reason or even understanding. Religion puts reality, morality, love, happiness and desire in a supernatural realm inaccessible to the mind of man. How can humans ever achieve peace when their religious scripts has their god condoning war and violence, while man

[2] হুমায়ুন আজাদের মুখোমুখি - বাংলাদেশও এখন চাপাতির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, মুক্তমনা, http://www.mukto-mona.com/Articles/humayun_azad/mukho_mukhi.pdf
[3] Jim Walker, The problems with beliefs, http://www.nobeliefs.com/beliefs.htm

> must accept the superstitious belief that their unknowable god does this for mysterious reasons, forever beyond the comprehension of man? How can you understand the physics of the universe if you believe that an unfathomable supernatural agent created everything just a few thousand years ago? How can you live a full happy life if your religion denies the nature of sex, desire, and mind? How can you have workable government if you believe laws derive from an incomprehensible super-being? How can you have the future of the planet or your grand children if you believe that supernatural predestination will end the world?

আসলে দ্বন্দ্বটা অন্ধবিশ্বাস থেকে বিশ্বাস আলাদা করার বিষয়ে নয়, দ্বন্দ্বটা বিশ্বাস বনাম যুক্তির। দ্বন্দ্বটা বিজ্ঞান বনাম অপবিজ্ঞানের। বিজ্ঞানের তথা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি হচ্ছে মুক্তমন (open mind) মুক্তান্বেষা (free inquiry), সংশয়ী মনোবৃত্তি (critical thinking), পরীক্ষা-নিরীক্ষা (experiment) এবং পদ্ধতিগতভাবে লব্ধ প্রাকৃতিক-জ্ঞান, যেটাকে ইংরেজীতে বলে - 'methodical naturalism'। ধর্ম যেখানে ঐশী বানীর উপর নির্ভর করে পৃথিবীতে একটি 'বিশ্বাস নির্ভর ব্যবস্থা' কায়েম করতে চায়, সেখানে বিজ্ঞান কোন অনুকল্পকেই বিনা প্রশ্নে মেনে নেয় না এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত ফলাফলগুলো, দেশ, কৃষ্টি কিংবা সংস্কৃতিভেদেও পরিবর্তিত হয় না। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ কিংবা প্রাপ্ত অনুসিদ্ধান্তগুলো যে কোন দেশের গবেষণাগারে বসে পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব। বিজ্ঞান সে অর্থে সার্বজনীন। ধর্মও এক ধরণের সার্বজনীনতা দাবী করে, তবে তাদের 'সত্যতা' প্রায় সব ক্ষেত্রেই নির্ভর করে লোককথা, উপকথা, ঐশী বাণী, প্রত্যাদেশ, পবিত্র কিতাব গ্রন্থ, নবী-পয়গম্বর, সাধু সন্ত, ভিক্ষু কিংবা মোল্লাদের বচনের উপর। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু' - সকল ধর্মেরই মূল উপজীব্য। কিন্তু এ সব আপ্তবাক্য কিংবা ঐশী বচনের চেয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীদের কথাই আজ অনেক ক্ষেত্রে বেশী গ্রহণীয়। তাই মহাবিশ্বের জন্ম এবং পরিণতি নিয়ে একজন পোপ কিংবা বায়তুল মোকারমের খতিবের চেয়ে স্টিফেন হকিং কিংবা ওয়াইবার্গের মত বিজ্ঞানীদের মতামতই এ সময়ে সচেতন মানুষদের কাছে কেন বেশী আকর্ষনীয়, তা সহজেই অনুমেয়। প্রবীর ঘোষ তার অলৌকিক নয়, লৌকিক গ্রন্থে বলেছিলেন- সভ্যতার অনিবার্য গতি আসলে বিশ্বাসের বিপরীতে, যুক্তির অভিমুখে। ব্যাপারটা যত দিন যাচ্ছে আমাদের কাছে ততই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

ড. অভিজিৎ রায়, আমেরিকায় বসবাসরত গবেষক এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' ও 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। সাম্প্রতিক সম্পাদিত গ্রন্থ - 'স্বতন্ত্র ভাবনা'। ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com

ধর্ম ও বিজ্ঞান: সংঘাত-সমন্বয় এর প্রশ্নঃ সাবজেকটিভ না অবজেকটিভ?

(শ্রী সুরজিত মুখার্জীর প্রতিক্রিয়ার জবাবে)

মোঃ জানে আলম

‘ধর্ম ও বিজ্ঞানঃ সংঘাত সমন্বয়ের রণনীতি রণকৌশল’ শীর্ষক আমার একটি নিবন্ধ মুক্তমনা ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হয়েছে। তার প্রতিক্রিয়ায় শ্রী সুরজিত মুখার্জী ‘ধর্ম ও বিজ্ঞানঃ কোথায় সংঘাত ও কেন সমন্বয়ের প্রশ্ন’ শীর্ষক একটি নিবন্ধ মুক্তমনায় প্রকাশ করেছেন। তারই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় শ্রী অভিজিৎ রায় তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ একটি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন। অভিজিৎ রায়ের সুলিখিত প্রতিক্রিয়ায় শ্রী সুরজিত মুখার্জী অনেক প্রশ্নের যথার্থ জবাব পেয়েছেন বলে আমার মনে হয়। তথাপি যে সকল বিষয় শ্রী অভিজিৎ রায়ের লেখায় আসেনি, সে সকল বিষয়ে মূল নিবন্ধের লেখক হিসাবে কোন মতামত না দিলে সাধারণ পাঠক বিভ্রান্তির সুযোগ থেকে যায় বিধায় আমার এ প্রয়াস।

প্রথমত, আমি সুরজিত মুখার্জীকে ধন্যবাদ জানাই, আমার নিবন্ধটি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করার জন্য। তার প্রতিক্রিয়ার শুরুতে আমার লেখার গুণগত মান নিয়ে তার মন্তব্যের জন্যও তাকে ধন্যবাদ। সুরজিত বাবুর প্রতিক্রিয়ার শিরোনাম থেকে বুঝা যাচ্ছে, তিনি বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সংঘাতের কোন কারণ দেখতে পাচ্ছেন না। তার মতে, সংঘাত যেখানে নেই, সেখানে আবার সমন্বয়ের প্রশ্ন কেন? তার প্রতিক্রিয়ায় সুরজিত বাবু আমার নিবন্ধের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ এনেছেন, আমি ধর্ম ও বিজ্ঞানের তুলনা করতে গিয়ে বিজ্ঞানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছি এবং ধর্মকে তুলাধোনা করেছি এবং বিজ্ঞানকে ধর্মের উপরে স্থান দিয়েছি। দু’টি পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব বা দর্শনের তুলনামূলক আলোচনায় দুটোকে কি সঠিক বলার সুযোগ থাকে? যুক্তিবাদ সে কথা কি সমর্থন করে?

দ্বিতীয়ত, তিনি বলেছেন, বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের তুলনা পড়ে তার মনে হয়েছে, এ যেন রজনী গন্ধা ফুলের সাথে হিমসাগর আমের তুলনার মত উদ্ভট। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, ইতিহাসের সাথে ভুগোলের কেন তুলনা করা হয়না। তিনি একটি দারুণ কথা বলেছেন, “প্রাচীন ধর্মের (সৎ) প্রণেতাদের যদি জানা থাকত যে ভবিষ্যতে বিজ্ঞান নামে জ্ঞানের একটি শাখা তৈরী হবে, যাতে প্রমাণ ও পর্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে কোন কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করা যাবেনা এবং ভবিষ্যতে বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী মানুষেরা ধর্ম সম্বন্ধীয় যাবতীয় তত্ত্বকে ভূয়া বিশ্বাস ভিত্তিক আখ্যা দিয়ে উড়িয়ে দেবে, তাহলে তারা হয়তো অযথা সৃষ্টি, প্রকৃতি ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যা এবং তার একটি অতিমানবিক সৃষ্টিকর্তার যোগসূত্র ইত্যাদি বিষয়ে মতিস্ক ব্যয়ে বিরত থাকতেন অথবা মতবাদ প্রেরণে অপেক্ষাকৃত সর্তক থাকতেন। ” তার এ উক্তি থেকে তিনটি স্বীকারোক্তি বের হয়ে আসে, এক, সব ধর্মপ্রণেতারা সৎ ছিলেন না ; দুই, তাদের মতবাদ প্রেরণে আরো সর্তক হওয়ার অবকাশ ছিল, তিন, তারা অযথা সৃষ্টি, প্রকৃতি ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখা এবং তার একটি সৃষ্টিকর্তার যোগসুত্র ইত্যাদি

বিষয়ে মস্তিষ্ক ব্যয় করেছেন। সুরজিত বাবুরতো না জানার কথা নয় যে, ধর্মীয় দর্শনের মূল বিষযতো জগৎ ও জীব সৃষ্টি সম্পর্কে তার মতবাদ। তা বাদ দিলে ধর্মীয় দর্শনের আর থাকে কি? তিনি লিখেছেন, 'পক্ষপাতদুষ্ট যুক্তিবাদ ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতবাদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়'। প্রিয় সুরজিত বাবু, যুক্তিবাদ হল সত্যে উপনীত হওয়ার একটি দার্শনিক পদ্ধতি। কার্য-কারণ সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে অবরোহ-আরোহ পদ্ধতিতে কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছার পদ্ধতি হল যুক্তিবাদ। এর কোন পক্ষ থাকেনা। যুক্তির পক্ষ বা বিপক্ষ একমাত্র অধিকতর যুক্তি বা পাল্টাযুক্তি। সর্বাপেক্ষা মারাত্মক কথা তিনি লিখেছেন, "যুক্তিবাদীদের মধ্যে কিছ্ু সংখ্যক আছে যাদের কাজ হল ধর্মগ্রন্থগুলি পাঠ করে শুধুমাত্র সেগুলির মধ্যে দ্বন্দমূলক, ত্রুটিপূর্ণ এবং বিভ্রান্তিকর কী কী আছে তা নির্ধারণ করা, আর যদি তাতে কিছু সত্যতা থেকে থাকে, তা সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে ধর্মকে নিছক একটি বিশ্বাসভিত্তিক সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তাত্ত্বিক মতবাদ বলে যুক্তি স্থাপন করা।" সুরজিত বাবু , ধর্মগ্রন্থে কিছু কিছু দ্বন্দ্বমূলক, ত্র"টিপূর্ণ এবং বিভ্রান্তিকর বিষয় আছে নাকি? কী কথা শুণি আজ মন্থরার মুখে! সুরজিত বাবু হয়ত ভুলে গেছেন, সব ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাসীরা দাবী করেন, তাদের ধর্মগ্রন্থ ঐশী বাণী। ধর্মগ্রন্তগুলোতেও সে কথা বলা আছে। তা যদি সত্য হয়, তাহলে তাতে কিছু কিছু দ্বন্দ্বমূলক, ত্র"টিপূর্ণ এবং বিভ্রান্তিকর বিষয় থাকে কিভাবে ? তাহলে স্রষ্টাও কি ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নন ? সাবধান সুরজিত বাবু! এ কথা মুখে আনলে মৌলবাদীরা রে রে করে তেড়ে আসবেন। ধর্মের পক্ষে বলেও শেষ পর্যন্ত নিজের পৈত্রিক প্রাণটা নিয়ে টানাটানি হতে পারে। এভাবে সুরজিত বাবুর আরো অনেক বক্তব্য উদ্বৃত করে আলোচনার অবকাশ থাকলেও নিবন্ধের আকারের কথা বিবেচনা করে তা করলাম না। তবে তার শেষ আশাবাদটি এমন ধর্মের বিজ্ঞানের সঙ্গে সংঘাত বা সমন্বয়ের কোন প্রশ্নই উঠবেনাÑ নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করতে হয়। কারণ ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সংঘাতটা কী সাবজেকটিভ না অবজেকটিভ, তা বুঝতে পারলে সুরজিত বাবু এমন আশাবাদ ব্যক্ত করতেন না। জন্ম ও বিকাশগত কারনে ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের যে বিরোধ বা সংঘাত তা অবজেকটিভ। এটা কোন ব্যক্তি, বৈজ্ঞানিক, ধর্মবেত্তা বা ধার্মিক লোকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করেনা। হ্যা, বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের সমন্বয় করার প্রয়াসটা সাবজেকটিভ। এটা মানুষের সমসাময়িক কালের প্রয়োজনে, আর্থ-সামাজিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক কিংবা রাজনৈতিক প্রয়োজনে বা উদ্দেশ্যে মানুষ করতে পারে বা করে থাকে। ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের সমন্বয় না করলে তাতে বিজ্ঞানের কিছু যাবে আসবেনা, বরং নিজের অস্থিত্ব ঠিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে ধর্ম এখন বিজ্ঞানের আশ্রয় খুঁজছে, বিজ্ঞান দিয়ে ধর্মের খাটিত্ব প্রমাণের প্রাণান্তকর প্রয়াস চলছে। কিন্তু ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সংঘাতটা মানুষের ইচ্ছানিরপেক্ষ। বিজ্ঞানের যত জয়, ধর্মের তত ক্ষয় এ দুই দর্শনের বিকাশ ও অগ্রগতির মাত্রা ব্যস্তানুপাতিক। সুরজিত বাবুদের মত অনেকের কাছে বেদনাদায়ক হলেও এটাই সত্য। কবিগুরুর ভাষায়, সত্য যে কঠিন, সে কঠিনেরে ভালবাসিলাম।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের সাথে সংঘাত কেন, কেনইবা সমন্বয়ের প্রশ্নটি সামনে আসছে, কিংবা ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের তুলনা কেন, এ সকল প্রশ্নের সঠিক জবাবের মধ্যেই সুরজিত বাবু তার অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন। বস্তুত এ প্রশ্নের জবাব নিহিত আছে ধর্ম ও বিজ্ঞানের জন্মের মধ্যেই। সুরজিত বাবু ঠিকই বলেছেন, রজনীগন্ধার সাথে হিমসাগর আমের তুলনা চলেনা, তুলনা করা হয়না ভুগোলের সাথে ইতিহাসের। পাল্টা প্রশ্ন সুরজিত বাবুকেই, কেন তা করা হবে ? দু'টাতো এক বিষয় নয়। তুলনা চলবে

রজনীগন্ধার সাথে রজনী গন্ধার, বাংলাদেশী রজনীগন্ধার সুগন্ধ নাকি জাপানের রজনীগন্ধার সুগন্ধ বেশি, কিংবা কোনটি বেশী শুভ্র, ডাটা মোটা, পাপড়ি বড় ইত্যাদি ইত্যাদি। ইতিহাসের সাথে তুলনা চলে ইতিহাসের কাদের ইতিহাস সমৃদ্ধ, বাঙালির না পাঞ্জাবীর, প্রাচ্যের না প্রতীচ্যের। ভূগোল এর সাথে ভূগোলেরও এ তুলনা চলে, কোন দেশের ভূ-প্রকৃতি কেমন, কেমন তার প্রাকৃতিক গড়ন ইত্যাদি ইত্যাদি। একই ধরনের বস্তুর সাথে বস্তুর, মানুষের সাথে মানুষের এবং প্রাণীর সাথে প্রাণীর যে তুলনা চলে সেকথা বুঝার জন্য কাউকে কম্পিউটার বিজ্ঞানী হওয়ার প্রয়োজন নেই । ক্রিকেটার আক্রাম না ফুটবলার আলফাজ ভাল খেলে, প্রশ্নটাই যেমন অবান্তর, তেমন অবান্তর আম মজা না কাঁঠাল মজা প্রশ্নটিও। কিন্তু ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের তুলনাকে সুরজিত বাবু এ রকম অবান্তর তুলনা বলে কেন মনে করলেন? এখানে বিজ্ঞান ও ধর্ম সম্পর্কে তার উপলব্ধির বিভ্রান্তি কাজ করেছে নিঃসন্দেহে। ধর্ম ও বিজ্ঞান দুটোই যে দর্শন তবে জন্ম ও বিকাশগত কারণে পরস্পরবিরোধী দর্শন । তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বটি রীতিমত বৈরী দ্বন্দ্ব। বিপত্তিটা এখানেই। যেহেতু দু'টি দর্শন পরস্পর বিরোধী, সেহেতু দু'টিই সত্য হতে পারে না। এখানে একটাকেই সত্য বলে মেনে নিতে হবে। ধর্মীয় দর্শনের মূল ভিত্তি হল জগৎ ও জীব এর জন্ম ও বিকাশ, মৃত্যু ও লয় এবং তার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কালক্রমে মানুষের মনে গড়ে ওঠা গুচ্ছ গুচ্ছ বিশ্বাস বা ধারণা। সে দর্শনের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে কিছু ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক আচার-আচরণ বিশেষভাবে স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করার জন্য অহর্নিশ প্রার্থনা বা উপাসনা। স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস, তার সন্তুষ্টি বিধান করে পরলৌকিক মুক্তি বা মোক্ষলাভ হল ধর্মীয় আচরণ বা উপসানার মূল কথা। এখানে ব্যক্তি বা সমাজের কল্যাণার্থে যা কিছু করতে বলা হয়েছে, তারও প্রণোদনা কিন্তু স্রষ্টার সন্তুষ্টি, বিনিময়ে স্বর্গ লাভ। ধর্মীয় দর্শন চিন্তা করে ব্যক্তি মানুষের মুক্তি তথা পরলৌকিক মুক্তি নিয়ে, যার মূল কথা মৃত্যুর পর সে স্বর্গে যাবে না নরকে যাবে। পক্ষান্তরে বৈজ্ঞানিক দর্শনের ভিত্তি হল কিছু তত্ত্ব-সমষ্টি অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষন ও পরীক্ষণের মাধ্যমে যা সৃষ্টি হয়েছে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে প্রযুক্তি, যা মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন, এমনকি রাষ্ট্রীয় জীবনকে পর্যন্ত পাল্টে দিয়েছে। এখানে মানুষের পরলৌকিক জীবনের কোন স্থান নেই। স্বর্গে যাওয়ার আশায় কোন বিজ্ঞানী তার গবেষণা পরিচালনা করেন না। সত্যকে জানা, জ্ঞানের অনুসন্ধান ও মানবগোষ্ঠীর কল্যাণে নিত্য নতুন আবিস্কার, এ হলো একজন বিজ্ঞানীর মহানব্রত। এর জন্য বিধাতা পুরুষ তাকে স্বর্গে না নরকে পাঠাবে সেটা নিয়ে তারা মোটেও চিন্তিত নন। পক্ষান্তরে একজন ধার্মিক বা ধর্মবেত্তাদের সকল ধর্মীয় ক্রিয়া-কর্মের লক্ষ্য পরলৌকিক মুক্তি । তাই ধর্মীয় দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বিধি-বিধান কেবল মানুষের সে সকল আচার-আচরণ নিয়ে মাথা ঘামায়, যা মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক বিষয়। সমাজ ও সভ্যতাকে সচল রাখার যে ভিত্তি বস্তুগত উৎপাদন তাতে ধর্মের কোন ভূমিকা নেই। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় দর্শনের সৃষ্টি হয় জীব ও জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কিত মতবাদের উপর ভিত্তি করে- যদিও এ মতবাদ ক্রমান্বয়ে বিবর্তিত হয়েছে। মজার ব্যাপার হল, এ বিষয়েও সকল ধর্মের মত কিন্তু এক নয়; বরং পরস্পরবিরোধী। কিন্তু জীব ও জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক মতবাদে কোন পরস্পর বিরোধীতা বা স্ববিরোধীতা নেই যদিও সে মতবাদের বিবর্তন ও বিকাশ আছে। মানব সভ্যতার আদি যুগে বিশাল প্রকৃতি, আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহতারা, নদী-পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ইত্যাকার জিনিষগুলো ছিল মানুষের কাছে অপার বিস্ময়। কারণ মানুষ সেদিন শুধু হাতিয়ারের দিক থেকে নয়, মননের দিক থেকেও ছিল নিতান্ত অপরিপক্ষ ও

অসহায়। কে সৃষ্টি করল বৈচিত্রময় এ জগত ও জীবন জন্ম থেকেই এসব ভাবনা মানুষের মনে উদয় হয়েছে। তার যুক্তিসঙ্গত জবাব তারা খুঁজে পেল একজন সৃষ্টিকর্তাকে আবিস্কার করে। তাই বলা চলে, আদিম মানুষ শুধু ধর্ম সৃষ্টি করেন নি, তার সাথে একজন সৃষ্টিকর্তাও সৃষ্টি করেছেন। তাহলে দাঁড়াল কী ? সৃষ্টিকর্তা মানুষ সৃষ্টি করেন নি বরং মানুষই তার প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টিকর্তাকে। বস্তুত সেদিনের প্রেক্ষাপটে তাই ছিল যুক্তিসঙ্গত। রীতিমত অকাট্য যুক্তি সৃষ্টিকর্তা না থাকলে সৃষ্টি কোত্থেকে আসে। তাহলে সৃষ্টিকর্তা আসল কোত্থেকে তখনো সে প্রশ্ন করার বুদ্ধি মানুষের হয়নি। কালক্রমে পাথরে পাথরে ঘর্ষণ করে আগুন আবিস্কার, পাথর ঘঁষে হাতিয়ার তৈরী ইত্যাদি উপায়ে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ফলে মানুষের চেতনারও বিকাশ ঘটতে থাকে। মানুষের বুদ্ধির বিকাশ, মানুষের মধ্যে যুক্তিবোধ ও কার্য-কারণ সম্পর্ক বিষয়ে ভাবনার উদ্রেক, জীব ও জগৎ সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষের সনাতন বিশ্বাসে চিড় ধরাতে লাগল। বিশ্ব মানবগোষ্ঠীর সমাজ সভ্যতা যখন সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্কের নিগড়ে আবদ্ধ ছিল, তখন পর্যন্ত ধর্মীয় চেতনাই সমাজের মূলচেতনা হিসাবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সামন্তবাদী সমাজের জঠর ছিঁড়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের উদ্ভব ও বিকাশ ক্রমে ধর্মীয় চেতনাকে অপসারিত করে বিজ্ঞানকে সমাজের মূল চেতনায় অভিসিক্ত করল । সৃষ্টিকর্তা না থাকলে কোন কিছু সৃষ্টি হয় কিভাবে, সে যুক্তির পিঠে আসল পাল্টা প্রশ্ন, তাহলে সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টি করল কে। 'ঘড়ি-মেকার' তত্ত্বের জনকেরা এখানে হতভম্ব হলেও ধর্মবেত্তারা তাতে হতোদ্যম না হয়ে তাদের তাৎক্ষণিক জবাব তিনি স্বয়ম্ভু। নাছোড়বান্দা বিজ্ঞান তখন প্রশ্ন ছুড়ে দেয়, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ম্ভূ হলে প্রকৃতি স্বয়ম্ভূ হতে বাঁধা কোথায়? প্রিয় শ্রী সুরজিত মুখার্জী, এতক্ষণে আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘাতটা কোথায়? আর সমন্বয়ের প্রয়োজন বিজ্ঞানের স্বার্থে নয়, মানুষের স্বার্থে আজন্ম লালিত ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের নিকষকালো আঁধারে ঢাকা অচলায়তন থেকে মানুষকে ধীরে ধীরে জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত মুক্ত জগতে নিয়ে আসার রণকৌশল হিসাবে। তাতে ধর্ম হয়ত কিছু দিনের জন্য পার পেয়ে যাবে, অর্থাৎ দীর্ঘজীবি হবে, তবে চিরজীবি হবে না কখনো। অনাগত ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের আরো পিলে চমকানো ও অভাবিত বিকাশে আপনি আচরি মরে যাবে ধর্ম, ঠাঁই করে নিবে মানব সভ্যতার মিউজিয়ামে পরিণত হবে গবেষণার বস্তুতে আগামী প্রজন্মের কাছে।

মোঃ জানে আলম, গবেষণা, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিষয়ক সম্পাদক, গণফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটি। ইমেইল- jalamadv@yahoo.com

আস্কিতা বনাম নাস্কিতা

আমি একজন আস্কি।

যদি প্রশ্ন করা হয় কেন আমি আস্কি - তার সবচেয়ে সহজ যে জবাবটি হাতের কাছে রেডী আছে- তা হলো - আস্কি হওয়া সোজা। পুর্বপুর"ষদের বিশ্বাস ও পারিপার্শিক সমাজব্যবস্থা আমাদের জেনেটিক কোডে ও আমাদের মনে আস্কিতার বীজ আপনা আপনিই বুনে দেয়। আমরা নিজের অজান্তেই আস্কি হয়ে যাই। তাছাড়া আমাদের সামনে এতবড় একটা সৃষ্টি রয়েছে, এর একজন সৃষ্টিকর্তা না থেকে কি পারে, কারণ ছাড়া কি কোন কার্য্য হয় - এই চলতি যুক্তি তো হাতের কাছে মওজুদ আছেই। পক্ষান্তরে নাস্কি হওয়া খুব কঠিন কাজ। জন্মসুত্রে প্রাপ্ত এবং মনের গহনে প্রোথিত আস্কিতার বৃক্ষটিকে বুদ্ধি এবং লজিক দিয়ে উপড়ে ফেলে সেখানে নাস্কিতার বীজ বোনা কোন সহজ কাজ নয়। ধর্ম-পরিবর্তনের মতোই একটি অতি কঠিন কাজ এটি। নাস্কি হওয়ার জন্যে যে পরিমান হলুদ পদার্থ মস্কের ভেতর থাকা দরকার, এজন্মে আর তার অধিকারী হতে পারলাম না। এপ্রসংগে নজর"লের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। কাঠমোল্লারা যখন তাকে নাস্কি ও কাফের আখ্যায় আখ্যায়িত করেছিল তিনি হেসে বলেছিলেন - 'যাক্, এতদিনে কাফের হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছি তা'হলে'। নাস্কি হওয়া যে সোজা কাজ নয়, নজর"ল তা বুঝেছিলেন, তাই হয়তো এমন সরস জবাব দিতে পেরেছিলেন।

তবে নিজে আস্ক্যিধর্মের অনুসারী হলেও নাস্কিদের আমি ঘৃনা করি না। পৃথিবীতে প্রতিটি লোকের নিজ বিশ্বাসমত চলার ও বাঁচার অধিকার রয়েছে, ঘৃনা শুধু ঘৃনারই জন্ম দেয়। কেউ যদি নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে নাস্ক্যিধর্মকেই বরণীয় বলে মনে করে, তাকে বাঁধা দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। সুতরাং নাস্কি বন্ধুদের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা রেখে আমার আস্কিতার স্বরূপের উপর সামান্য আলোকপাত করাই অত্র লেখার মুল উদ্দেশ্য।

আগেই বলেছি আস্ক্যিবাদ আমাকে কষ্ট করে অর্জন করতে হয়নি। আলো বাতাসের মতো সহজভাবেই তা আমি জন্মসুত্রে লাভ করেছি। বয়স বাড়ার সাথে সাথে মাঝে মাঝে সংশয় যে আসেনি তা নয়, জীবন ও জগতের বহু ঘটনায় মনে হয়েছে আসলেও সৃষ্টিকর্তা বলে কিছু আছে কি ? যদি সত্যিই সৃষ্টিকর্তা নামক অল-পাওয়ারফুল কোন সত্তা থেকে থাকেন, জীবজগতে এত অত্যচার অনাচার দেখেও তার আসন টলে উঠে না কেন ? ধর্মগ্রন্থসমুহ হতে সৃষ্টিকর্তার যে ছবি পাই, তাতে দেখা যায় তিনি অসীম ক্ষমতাধর একজন স্বে"ছাচারী রাজা। মানুষের মতোই তার রাগ আছে, রেগে গেলে তিনি মানুষের মতোই অভিশাপ দেন, এমনকি যার উপর রাগ হয় তাকে বা তার গোত্রকে সমুলে ধ্বংস করে ফেলতেও দ্বিধা করেন না। স্বে"ছাচারি রাজাদের মতোই তিনি চাটুকারিতা ভালবাসেন, কেউ দিনরাত তার স্বগান করলে তিনি খুবই খুশী হন। চাটুকারদেরকে তিনি প্রচুর ধনসম্পদ, হীরা মানিক্যে গড়া প্রাসাদ, এমনকি শত শত সুন্দরীশ্রেষ্ঠা প্রমোদসংগীনি উপহার দেন। পৃথিবীর রাজাদের মতোই তিনি তার রাজত্বের খোজখবর রাখার খুব একটা সময় পান না, তাকে হয়তো অন্য কোন রাজকীয় কাজে খুব বেশী ব্যস্ থাকতে হয়। নইলে বুশ-ব্লেয়ারেদের বোমায় যখন শত শত নির্দোষ নরনারী প্রাণ হারায়, তখন সিংহাসনে বসে তিনি কী করেন ? শ্রীকৃষ্ণের মতো প্রেমের বাশী বাজান ? রাম্স্ফিল্ড, ডিক চেনি, কন্ডোলিসা রাইসদের মতো দানবদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কাছে বিশ্বের কোটি কোটি নরনারী জিম্মি, তবুও সৃষ্টিকর্তার বজ্র তাদের উপর নেমে আসে না কেন ? মোল্লা, পুরোহিত আর যাজকদের রমরমা ধর্ম-ব্যবসার কাছে সমস্ মানব সমাজ জিম্মী হয়ে থাকে

অনাদিকাল। কেন ? বিধাতা বলে সত্যিই যদি কেউ থেকে থাকেন তবে তথাকথিত অন্যায়ের বির"দ্ধে সংগ্রামে তার মনোনীতজনকে কেন নিজ হাতে তরবারী ধরে মানুষ হত্যা করতে হয় ? বিধাতার একটা ইশারাই তো সবকিছু ধ্বংস করার জন্যে যথেষ্ট। ধ্বংসই বা করতে হবে কেন ? তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি ই"ছা করলেই তো সমস্ মানুষ ভাল হয়ে যেতে বাধ্য। অথচ দেখা যায় দুনিয়ার লোকদের ভালমন্দের জন্য তাকে মানুষের প্রতি চেয়ে থাকতে হয় । ভাল করলেও মানুষেই করে, মন্দ করলেও মানুষেই করে । কেন ? তার ভুমিকা তাহলে কী ? মানুষকে হেদায়েত করার জন্য একজন মানুষকেই মনোনীত করার দরকার কী ? স্বর্গদুত ঈশ্বরের বাণী নিয়ে চুপি চুপি একজন মানুষের কাছে আসেন। কেন ? তার বদলে স্বর্গদুত যদি আকাশে নিজের জ্যোতির্ময় চেহারাটা প্রকাশ করে সমস্ মানুষকে সম্বোধন করে রাজাধিরাজের বাণীটি শুনিয়ে দিতেন তাহলে তো আর মানুষের মনে কোন সন্দেহ থাকত না। পাপী-তাপী সবাই সেই ঐশী বাণী নিজ কানে শুনতে পেতো, তখন আর কারও পক্ষে সেই বাণীর বির"দ্ধচারণ করার উপায় থাকত না। তা না করে স্বর্গদুত কিনা আমাদের মতোই আরেকজন মানুষের কাছে ইশ্বরের বাণী শুনিয়ে দিয়ে যান, তাও আবার কানে কানে ! সেই বাণী প্রচার করতে যেয়ে বেচারা সেই মানুষগুলিকে কি হেনস্াই না হতে হয়। এই সমস্ ভড়ংয়ের কোন অর্থ আছে ?

শুধু কি তাই ? ঈশ্বরের বানী হলে তা তো শ্বাশ্বত হওয়ার কথা। কিন্তু দেখা গেল বাণীগুলি যে যুগে নাজেল হয়, পরবর্তী যুগের সাথে তা আর ম্যাচ করে না। তাকে পরিবর্তন পরিবর্ধনের দরকার হয়। বিশ্বব্রম্মান্ডের সৃষ্টিকর্তা বলে যাকে আমরা বিশ্বাস করব, তিনি কি এতটাই খেলো ? সৃষ্টির বিশালতা ও বৈচিত্রের কথা ভাবতে গিয়ে সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষকেও হাবুডুবু খেতে হয়, তার মনে এই উপলব্ধি জন্মে যে সমস্ জীবনটা জ্ঞানসমুদ্রের বেলাভূমিতে নুড়ি কুড়াতেই কেটে গেল, সমুদ্রে অবগাহন করার সুযোগ আর হলো না। সেই বিরাট বিশাল সীমাহীন বিশ্বের সৃষ্টিকর্তাটি কিনা এত হাস্যকররকম ক্ষুদ্র ! এতগুলি কেন এবং কিন্তুর পর যদি কেউ মনগড়া সেই ক্ষুদ্র সৃষ্টিকর্তাটির উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে না পারে, তাকে নাস্ি ক বলে গালি হয়তো দেয়া যায় - তবে দোষ দেয়া যায় না।

আমার উপরের কথাগুলি নিশ্চয়ই নাস্িকের মতো শুনা"ছ বলে অনেকে সন্দেহ করতে পারেন। তবে সত্য কথা এই যে এতকিছুর পরও ভেতরের বিশ্বাসের বাতিটি আমি জ্বালিয়ে রাখতে পেরেছি, কীভাবে পেরেছি সেই আলোচনাই অত্র প্রবন্ধের মুল উদ্দেশ্য।

(ক) :- জীবন ও মরণ

হাউজ অব ফেইথ বা বিশ্বাসের ঘরের সবচেয়ে বড় তুর"পের তাস যেটি - সেটি হলো মৃত্যু। আরেক অর্থে বলা যায় জীবন। কারণ জীবন প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুরই আরেক রূপ। প্রকৃতিতে পরস্স্পর বিরোধী অথচ একে অন্যের পরিপুরক কিছু জিনিস বা ঘটনা (ইভেন্ট) আছে। এদের একটিকে ছাড়া আরেকটি অর্থহীন, অস্তিত্বহীনও বলা যায়। একটি থাকলে আরেকটি অবধারিতভাবে থাকবেই। আলো দিয়ে অন্ধকারকে বুঝা যায়, তেমনি অন্ধকার দিয়ে আলোকে। একটি ছাড়া আরেকটির কোন অস্তিত্ব নাই। অন্ধকার না থাকলে আলোর অস্তিত্ব যেমন বোধগম্য হতো না, তেমনি হতো না আলো না থাকলে অন্ধকারের। ম্যাটার- এ্যান্টি ম্যাটার, ইলেকট্রন- পজিট্রন, নর- নারী, দিন- রাত্রি, ইহকাল- পরকাল ইত্যাদি হাজারো রকম পরিপুরক পদার্থ ও ঘটনার সমাহারে এই বিশ্ব ব্রম্মান্ডের সৃষ্টি। ঠিক একই নিয়মে জীবনের পরিপুরক ঘটনাটিই মৃত্যু। কিংবা বলা যায় মৃত্যুর পরিপুরক ঘটনাটির নামই জীবন । দিনের পর যেমন রাত আসে রাতের পর আসে দিন, ঠিক তেমনি জীবনের পরে আসে মৃত্যু কিংবা মৃত্যুর পরে আসে জীবন । জীবন ও মৃত্যু অনন্ত জীবনচক্রের দুইটি ছেদবিন্দু মাত্র। জন্মবিন্দু ও মৃত্যুবিন্দুর মাঝামাঝি যে সময়কাল তা আমাদের খুব পরিচিত, তাই তাকে আমরা ভীষণভাবে

বিশ্বাস করি। কিন্তু মৃত্যুবিন্দু ও জন্মবিন্দুর মাঝামাঝি আরেকটি সময়কাল তো থাকতেও পারে; থাকতেও পারে কেন - থাকাটাই স্বাভাবিক। সেই সময়কাল আমাদের অপরিচিত বলে তা যে একেবারেই নাই তার প্রমান কী ? সুতরাং মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবনের কল্পনা করা কি এতই অযৌক্তিক ?

জন্মপরবর্তী যে সময়কালটা আমাদের খুব পরিচিত তার স্বরূপই কি আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছি ? জীবনের স্বরূপ আমাদের কাছে এখনও অজানা। প্রোটিন কণা ও এ্যামিনো এ্যাসিডের মিশ্রনেই নাকি একটি পার্থিব জীবনকণা তথা জীবকোষের সৃষ্টি। একটি জীবকোষ ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে একটি পুর্ণাংগ জীবের সৃষ্টি করে বলে বলা হয়ে থাকে। তবে প্রোটিন ও এ্যামিনো এ্যাসিড মিশালেই যে একটি জীবকোষ তৈরী হয়ে যাবে তা কিন্তু নয়। এর সাথে আরও কিছু একটা থাকা দরকার বিজ্ঞানীরা 'যে একটা কিছুর' নাম দিয়েছেন 'লাইফ ফোর্স'। প্রোটিন-এ্যামিনো এ্যাসিডে যে পর্য্যন্ত এই লাইফ ফোর্স প্রবাহিত না হয় সে পর্য্যন্ত একটি জীবকোষ চোখ মেলে তাকায় না। এই লাইফ ফোর্সের স্বরূপ কি, তা এখনও আমাদের অজানা। এই ফোর্স বা বল যে প্রকৃতিতে বিরাজমান আর চারটি বলের মতো বল নয়, তা নিশ্চিত। (বিদ্যুৎচুম্বকীয় বল, মহাকর্ষীয় বল, দুর্বল পারমানবিক বল ও সবল পারমানবিক বল - এই চারটিমাত্র প্রাকৃতিক বলকে বিজ্ঞানীরা শনাক্ত করতে পেরেছেন। প্রকৃতিতে আর যেসমস্ত বল পরিলক্ষিত হয়, সেগুলি এই চারপ্রকারের মৌলিক বলের প্রকারভেদ মাত্র)। লাইফ ফোর্স আসলেই কী বস্তু তা চির রহস্যে ঢাকা। প্রকৃতির অন্যান্য বলগুলির সাথে পদার্থের বিভিন্নরূপ মিথষ্ক্রিয়ার ফলে বিশ্বের সমুদয় পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের পরিমিত মিশ্রনে পর্য্যাপ্ত পরিমান বিদ্যুৎচুম্বকীয় বল প্রবাহিত হওয়ার ফলেই পানির সৃষ্টি হয়েছে। হাইড্রোজেন-অক্সিজেনের মিশ্রনের মধ্যে বিদ্যুৎশক্তি চালনা করে ল্যাবরেটরীতেও কৃত্রিম উপায়ে পানি তৈরী করা যায়। প্রাইমরডিয়াল (ঢ়ৎরসড়ৎফরধষ) বিশ্বে কীভাবে এ্যামিনো এ্যাসিড ও প্রোটিন মিশ্রিত হয়ে প্রথম প্রাণকনাটির সৃষ্টি হয়েছিল, চার্লস ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বে তার সাম্ভাব্যতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির যুগেও ল্যাবরেটরীতে এ্যামিনো এ্যাসিড ও প্রোটিন একত্রে মিশ্রিত করে একটি জীবকোষ তৈরী করা সম্ভব হয়নি। মানুষের জ্ঞান এই পর্য্যায়ে পৌছেচে যে সে ক্লোন করে হুবহু আরেকটি আস্ত মানুষ তৈরী করে দিতে পারে। অথচ অতি ক্ষুদ্র একটি জীবকোষ তৈরী করতে পারে না। এর কারণ - জীবনের অন্তর্নিহিত রহস্যময় যে শক্তির বলে এ্যামিনো এ্যাসিড ও প্রোটিন জোটবদ্ধ হয়ে একটি প্রাণকোষের সৃষ্টি করে, মানুষ এখন পর্য্যন্ত তাকে ধরতে পারেনি। এই পার্থিব জীবনে নিত্যদিন অনুভব করা একটি ফোর্সকেই আমরা শনাক্ত করতে পারিনি, সেখানে অপার্থিব জীবনের তথা মৃত্যুপরবর্তী জীবনের না দেখা একটি ফোর্সকে আমরা কীভাবে শনাক্ত করব ? পৃথিবীতে জীবনের অন্তর্লীন সেই শক্তিকে শনাক্ত না করেও আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে সে আছে । তাহলে অপার্থিব জীবনে সেইরূপ বা অন্যপ্রকারের কোন শক্তি যে থাকতে পারে - এই বিশ্বাস অযৌক্তিক হবে কেন ?

'মৃত্যুই পার্থিব জীবনের পরম পরিনতি, এ্যাবসলিউট এন্ড, একেবারে ফুল ষ্টপ' - এটা মেনে নিতে মানবমন কেঁদে উঠে। আমি আছি, ভীষণভাবে আছি। আশা-আকাংখা, কামনা-বাসনা, প্রেম-ভালবাসায় পরিপুর্ণ হয়ে আছি। ক'দিন পরেই আমি আর থাকব না, কোথাও না; ইহকালেও না পরকালেও না। এটা যদি সত্যও হয়, অত্যন্ত রূঢ় সত্য, বিয়ের প্রথম রাতেই প্রেয়সীর মরে যাওয়ার মতো জঘন্য সত্য। স্বাভাবিকভাবেই অকাট্য প্রমান ছাড়া এইরূপ একটা সত্যকে মেনে নেওয়া যায় না। 'মৃত্যুর পরে আর কিছু নাই, আছে কেবল অনন্ত শুন্যতা, এ্যান ইনফিনিটলি ভাষ্ট এম্প্লটিনেছ' - এই অনুসিদ্ধান্ত এখনও প্রমানিত হয়নি। ঠিক তেমনি মৃত্যুর পর আরও একটি জীবন আছে, স্বর্গ-নরক আছে - এই থিওরিও এখনও

প্রমানিত হয়নি। এই দুইটি অপ্রমানিত অনুসিদ্ধান্তের কোনটি আমাদের কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য সেটিই আমাদেরকে বিচার করে দেখতে হবে।

প্রথমতঃ- মৃত্যুর পর আছে কেবল শুন্যতা-- কথাটিতে শুন্যতা বলে একটি টার্ম আছে। শুন্যতা বলতে আমরা কী বুঝি ? শুন্যতার স্বরূপ কী ? শুন্যতা বলতে কি চরম অর্থহীনতা বুঝায় ? দর্শন ও বিজ্ঞান - কোনটাই কিন্তু তা বলে না। নেগেটিভ দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করে শুন্যতাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলে চলবে না, বরং পজেটিভ দৃষ্টিকোনে শুন্যতার স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে। এস্থলে পজিটিভ ও নেগেটিভ দৃষ্টিভংগীর একটু বিশদ বর্ননা দেয়া আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের এক উপন্যাসের নায়ক ছিল ঘোরতর নাস্তিক। তাকে যখন ঈশ্বর সম্স্লর্কে প্রশ্ন করা হলো তিনি বললেন - আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না কথাটা এমন নয়, আমি 'না-ঈশ্বরে' বিশ্বাস করি। তিনি নাস্তিক, তবে অবিশ্বাসী নন। তিনিও একজন বিশ্বাসী, কারণ তিনি 'না-ঈশ্বরে' বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ তার নাস্তিকতা একটি হ্যা-বাচক বা পজিটিভ বিষয়, না-বাচক বা নেগেটিভ বিষয় নয়। তদ্রূপ শুন্যতা একটি পজেটিভ বিষয়, এক অর্থে শুন্যতা মানে পরম পুর্ণতা। শুন্যতার মাঝেই পুর্ণতা রূপ পায়। ঘর আমাদের নিত্যদিনের পরিচিত একটি জিনিস যার মধ্যে অধিষ্ঠান করে আমাদের সারাটি জীবন কাটিয়ে দেই। অথচ এই ঘরটির দিকে যদি আমরা নিরাসক্ত মনে ফিরে তাকাই, তবে সেখানে সীমাহীন শুন্যতা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাব না। মহাশুন্য গোটাকেয়েক ইটকাঠের ফ্রেমে আবদ্ধ হয়ে আমাদের চোখের সামনে একটি ঘর হিসেবে প্রতিভাত হয়ে উঠে। মন থেকে ইট-কাঠের ফ্রেমকে দুর করতে পারলে ঘরের মধ্যে শুন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। দার্শনিকেরা তাই শুন্যতা-পুর্ণতাকে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ হিসেবে বিবেচনা করেন, বলেন - **"That which is form is just that which is emptiness & that which is emptiness is just that which is form"**। অর্থাৎ - যা শুন্যতা, তাই পুর্ণতা। যা নিরাকার, তাই আকার। পদার্থ এবং শক্তি দুইটি আলাদা আলাদা বিষয়, অথচ আলাদা হলেও তারা আলাদা নয়। প্রকৃতপক্ষে পদার্থই শক্তি এবং শক্তিই পদার্থ। ঠিক একইভাবে পুর্ণতাই শুন্যতা এবং শুন্যতাই পুর্ণতা। আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন মহাবিশ্বে মোট যে পরিমান শক্তি ও পদার্থ আছে, তা নাকি সৃষ্টি হয়েছে এক মহা শুন্যতা থেকে। অর্থাৎ মহাবিশ্ব জুড়ে নিরন্তর ঘটে চলছে শুন্যতা ও পুর্ণতার লুকোচুরি খেলা। জীবনমৃত্যুও শুন্যতা -পুর্ণতার এই লুকোচুরি খেলার প্রকারভেদ ছাড়া আর কিছু নয়। মৃত্যুর মাঝ দিয়ে জীবনের মহাশুন্যতা সুচিত হয়, কিন্তু শেষ হয়ে যেতে পারে না। কারণ মৃত্যুরূপ শুন্যতার মাঝে রয়েছে মহাপুর্ণতার হাতছানি। সুতরাং মৃত্যুর পরেই সবকিছু শেষ হয়ে গেল বলে একটা প্রকান্ড যতিচিহ্ন টেনে দিয়ে বসে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। বরং এ এমন একটি কাজ যা মানুষের কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে শোচনীয়ভাবে সীমাবদ্ধ করে ফেলে।

দ্বিতীয়তঃ- মৃত্যুই জীবনের শেষ পরিণতি, এর পর আর কিছু নেই - এই অনুসিদ্ধান্ত মেনে নিলে জীবনটা অর্থহীন বলে মনে হয়, জীবনের বহু ক্রুশিয়াল প্রশ্নের জবাব মেলে না। এই পৃথিবীতে যে যেমন কাজ করে সে তেমন ফল পায়। খুন করলে ফাঁসিতে যেতে হয়, ভালভাবে লেখাপড়া করলে পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাশ করা যায়। আবার এও দেখা যায় যে অনেক কাজের প্রতিফল এই পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। সমাজে ক্ষমতাবান ভুরি ভুরি লোক রয়েছে যারা অসংখ্য মন্দ কাজ করেও দিব্বি মাথা উচু করে বেঁচে আছে, লাখ লাখ লোকের মৃত্যুর কারণ ঘটিয়েও সমাজে গণ্যমান্য হয়ে আছে। অপরদিকে অনাচার, অবিচার আর শোষনের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে একটি নিষ্ফল জীবনের ভার বহন করে কোটি কোটি লোককে ভুপৃষ্ঠ হতে বিদায় নিতে হ"ছে। কতো শিশু জন্মগতভাবে পংগু বিকলাংগতার অভিশাপ মাথায় নিয়ে পৃথিবীতে আসছে, একটি নিষ্ফল ব্যর্থ জীবন কাটিয়ে আবার চলে যা"ছে। শুধু ইহকাল তথা একটিমাত্র জীবনই যদি আমাদের অমোঘ পরিণতি হয়,

তা'হলে এইসব জীবনের কী অর্থ থাকতে পারে ? কী অর্থ আছে সততার, ন্যায়পরায়নতার, ভালোর, মন্দের, পাপের, পুণ্যের ? আমার জীবনের পরিণাম একটি প্রকান্ড শূন্যমাত্র, সুতরাং খামোখা কেন আদর্শ, ত্যাগ, মহত্ব, মহানুভবতা প্রভৃতি অলীক স্বর্ণমৃগের পিছে ছুটে বেড়ানো ? তার চেয়ে যেকোন উপায়ে এই ছোট্ট জীবনটাকে কানায় কানায় ভরিয়ে নিয়ে একে সর্বোতভাবে উপভোগ করাই কি বুদ্ধিমানের কাজ হয় না ?

পক্ষান্তরে এমন যদি হয় যে আমার এই জীবনটাই সব প্রশ্নের শেষ উত্তর নয়। মৃত্যুর দরজা দিয়ে আমরা আরেকটি রিফর্মড জীবনে প্রবেশাধিকার পাব, চার মাত্রার ভুবন ছেড়ে বহুমাত্রিক (কিংবা মাত্রাতীত) কোন জগতে প্রবেশ করব। সেই জীবনের সেই জগতের স্বরূপ আমাদের অজানা, তবে তা অবধারিতভাবে আছে। সেই জগতে আমাদের স্থান কোথায় হবে - বাঙলাদেশে হবে নাকি আমেরিকাতে হবে - দোয়াত আলী ও মোসাম্মৎ পরিষ্কার বেগমের পংগু ছেলেটি হয়ে জন্মাব নাকি বিল গেট্সের ঘরে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মাব - তা নির্ভর করবে আমাদের এ জীবনের কৃতকর্মের উপর। এমনটি যদি হয় তা'হলেই কেবল জীবনের অর্থ কিছুটা পরিস্কার হয়।

আমরা পৃথিবী নামক একটি গ্রহে জীবনস্রোতে আছি এটা প্রমানিত সত্য। মৃত্যুর পরে আমাদের পরিণতি কী হবে তা আমরা জানি না। মৃত্যুর পরে আর কিছু নাই, মৃত্যু জীবনের কমপ্লিট যতিচিহ্ন - এই থিওরী প্রমানিত সত্য নয় । আবার - মৃত্যুই আমাদের অন্তিম পরিণতি নয়, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আরেক ধরণের জীবনচক্রে আমরা প্রবেশ করব - এই থিওরীটিও নিঃসংশয়ে প্রমানিত হয়নি । এই দুইটি অপ্রমানিত থিওরীর মধ্যে কোনটা আমরা গ্রহণ করব ? সাধারণ জ্ঞানে বলে - যে থিওরীতে আমাদের জীবন-জিজ্ঞাসার সঠিক জবাব মেলে সেটিই অধিক গ্রহণযোগ্য - তাই নয় কি ?

(খ):- বিশ্বাস অবিশ্বাসের দন্দ্বযুদ্ধ

আমাদের আলোচনার মুল বিষয়বস্তু ছিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব। ঈশ্বরকল্পনা মুলতঃ মৃত্যুভয় থেকেই উদ্ভুত হয়েছে, তাই প্রথমেই জীবন ও মৃত্যু নিয়ে উপরের আলোচনাটুকু। ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব বিষয়টিতে এসে দার্শনিকরাও দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন - আস্তিক্যবাদী ও নাস্তিক্যবাদী। আস্তিক্যবাদী দার্শনিকরা কার্য্যকারণের সুত্র অবলম্বন করে সৃষ্টির জন্যে একজন স্রষ্টার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। পক্ষান্তরে নাস্তিক্যবাদী দার্শনিকরা স্রষ্টা নাই সরাসরি একথা না বলে স্রষ্টার আদৌ কোন প্রয়োজন নাই বলে সৃষ্টিরহস্যের সমাধান খুজতে চেয়েছেন। আমাদের মতো সাধারণ লোকদের পক্ষে দর্শনশাস্ত্রের সুকঠিন অংগনে প্রবেশ করা সহজ নয়, দার্শনিক আলোচনাও এ প্রবন্ধের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। বরং দর্শন-বিজ্ঞানের বাইরে আমাদের মতো কোটি কোটি আদমসন্তান তাদের সামান্য সাধারণ জ্ঞানকে সম্বল করে কীভাবে এই কঠিন প্রশ্নটির মুখোমুখী হন- বর্তমান প্রবন্ধ তারই একটি আলেখ্যচিত্র মাত্র।

স্রষ্টার অস্তিত্ব কল্পনা করতে যেয়ে সাধারণ জ্ঞান প্রথমেই যে সুত্রটিকে হাতের কাছে পান, তা সেই পুরোনো কার্য্যকারণের সুত্র। প্রকৃতিতে কারণ ছাড়া কোন কার্য্য হয় বলে দেখা যায় না। **'To every effect, there must be a cause'** । একটি আপেল গাছ থেকে নীচের দিকে পড়ে, কারণ আপেলেটির পিছে রয়েছে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণজনিত টান। কালো মেঘের মাঝখান থেকে আলোর ঝলক দেখা যায়, কারণ মেঘের মাঝে রয়েছে বিদ্যুৎ নামক একপ্রকার শক্তি। বেশীদিন রেডিয়াম জাতীয় পদার্থের কাছে থাকলে শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, কারণ রেডিয়ামে রয়েছে পারমানবিক বিকিরণ। অর্থাৎ প্রতিটি কাজের পেছনে একটি কারণ রয়েছে। তাই যদি হয় তা'হলে সৃষ্টিরূপী এই সুবৃহৎ

কাজটির পেছনে নিশ্চয়ই একটি আদি কারণ থাকতে হয়। সেই আদি কারণই ঈশ্বর। এই যুক্তির বিপক্ষে নাস্কিদের কিছু পাল্টা যুক্তি রয়েছে। প্রথমতঃ - সৃষ্টির আদি কারণরূপী কোন ঈশ্বর যদি থেকেই থাকেন, তবে তাকে কে সৃষ্টি করেছে ? অত্যন্ সংগত প্রশ্ন। আস্কিবাদীরা যে যুক্তিতে সৃষ্টির পেছনে একটি আদি কারণ খুঁজতে যান, সেই একই যুক্তিতে বির"দ্ধবাদীরা সেই কারণের পেছনের কারণ খুঁজতে যেতেই পারেন। এর জবাবে আস্কিবাদীরা বলেন - ঈশ্বরের পেছনে কোন কারণ নেই, তিনি কারণাতীত বা স্বয়ম্ভু। নাস্কিবাদীরা একটু মুচকি হেসে বলেন - ওয়েল, ঈশ্বর যদি কারণ ছাড়া হতে পারেন, সয়ম্ভু হতে পারেন - তা'হলে সৃষ্টিরই বা কারণ ছাড়া হতে বাঁধা কোথায় ? সয়ম্ভু হতে বাঁধা কোথায় ?

দ্বিতীয়তঃ নাস্কিবাদীদের ঝুলিতে আরও একটি বড় অস্ সংযোজিত হয়েছে ইদানীং । কোয়ান্টাম মেকানিক্স্ নামক অত্যাধুনিক এক বিজ্ঞানশাস্ অনুসিদ্ধান্ দিয়েছে যে এই বিশ্বে কারণ ছাড়াও কাজ হতে পারে, কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন নামক এক অপার্থিব কারনে সৃষ্টির সুচনা হতে পারে, এর জন্যে ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে থাকার দরকার নেই। (যদিও কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন কী জিনিস এবং তা কেন হয়, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অন্যতম জনক আইনষ্টাইন পর্য্যন্ তা বুঝতে পেরেছিলেন কিনা জানা যায় না। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অনিশ্চয়তা দেখে আইনষ্টাইন ক্ষোভের সাথে মন্ব্য করেছিলেন - **`God does not play dice'** - ঈশ্বর পাশা খেলেন না)।

আস্কিবাদী ও নাস্কিবাদীদের এই টাগ অব ওয়ারের মাঝখানে পড়ে আমাদের মতো সাধারণ লোকদের হয়েছে অনেকটা যাতাকলে পড়া ইদুরের মতো ত্রাহি অবস্থা। না এদিকে যেতে পারি না ওদিকে, না ঘরকা না ঘাটকা। তবে উভয় ঘরের এই অন্হীন লড়াইয়ের মাঝেও একটা সত্য কিন্তু অত্যন্ উজ্জল। আস্কিবাদীরা সুস্পষ্টরূপে প্রমান করতে পারেন নাই যে ঈশ্বর নামের কোন এক বড়বাবুই এই বিশ্বব্রম্মান্ডের পরিচালক। তারা বড়জোর এইটুকু বুঝাতে পেরেছেন যে মানুষের জন্যে একজন ঈশ্বরের বড়োই প্রয়োজন। পক্ষান্রে নাস্কিবাদীরাও একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমান করতে পারেন নাই যে ঈশ্বর নামের কোন পদার্থ (নাকি শক্তি?) আদৌ নাই। তারা বড়জোর এইটুকু বুঝাতে পেরেছেন যে বিশ্বব্রম্মান্ডের সৃষ্টির পেছনে ঈশ্বর নামক কোন কল্পনার আশ্রয় না নিলেও চলে। এই দুই অপ্রমানিত অনুকল্পের কোনটিকে জনসাধারণ গ্রহণীয় বলে মনে করবে তা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও এইস্থানে এসে বিশ্বাস একটা গুর"ত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আমাদের মতো কোটি কোটি সাধারণ নরনারী এই বলে বিশ্বাসকে আকড়ে ধরে যে ঈশ্বর নামক একটি অতিমানবীয় সত্ত্বা আমাদের জীবনজিজ্ঞাসার জন্যে জন্য বড়োই প্রয়োজন। তাকে ছাড়া আমাদের জীবন পরিপুর্ণ হয় না, প্রেমভালোবাসার কোন মানে হয় না, জীবনটাকে একান্ই অর্থহীন বলে মনে হয়। হ্যা, নাস্কিবাদীরা যদি অংক কষে প্রমান করে দিতে পারতেন যে ঈশ্বর নামক কোন সত্ত্বার অস্তিত্ব আদপেই নাই, তাহলে অন্য কথা ছিল। এস্থলে কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন - প্রমান করার দায়িত্ব কি নাস্কিদের একার ? আস্কিরাই প্রমান কর"ক যে ঈশ্বর আছেন। সেক্ষেত্রে আমার যুক্তি হলো - হ্যা, প্রমান করার দায়িত্ব নাস্কিদের একার। যুগে যুগে তাই হয়ে এসেছে। এক কালে মানুষ তার স্থুল বুদ্ধি এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্বাস করতো যে এই পৃথিবীটাই বিশ্বব্রম্মান্ডের কেন্দ্রস্থল। কিছু জ্ঞানী মানুষ যখন চাক্ষুষভাবে প্রমান করে দিলেন যে মানুষের এই যুগসঞ্চিত ধারণা ভুল, মানুষ তখন তা মেনে নিল। মানুষ এখন পর্য্যন্ বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর নামক এক অদৃশ্য সত্তা তাদের জীবন-মরণের নিয়ামক, তিনি সর্বপ্রকার কার্য্যকারণের অতীত, তিনি স্থুল তিনি সুক্ষ্য, তিনি নিরাকার তিনিই সাকার, তিনি প্রথম তিনিই শেষ, তার অস্তিত্বের মধ্যেই মনুষ্যজীবনের সমস্ জিজ্ঞাসার জবাব নিহিত রয়েছে। ঈশ্বরের অনস্তিত্বের অকাট্য প্রমান যদি কারও হাতে থেকে থাকে, তবে প্রমান পেশ করে মানুষের বহুযুগসঞ্চিত

ভুল ধারণা ভেংগে দেওয়ার দায়িত্ব অবশ্যই তার, আস্কিক্যবাদীদের নয়। কারণ আস্কিক্যবাদীদের মতবাদ জনসাধারন তাদের জীবনজিজ্ঞাসার অনুকূলে বলে এমনিতেই মেনে নিয়েছে।

তাহলে দেখা যা"ছ যে কোনপ্রকার বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যপ্রমান তথা বৈজ্ঞানিক সমীকরণের সাপোর্ট ছাড়াই জনসাধারণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী। কারণ এই বিশ্বাসের মধ্যে তারা তাদের ছোট্ট জীবনের অধিকাংশ প্রশ্নের জবাব পায় (অনেক প্রশ্নের জবাব অবশ্য পাওয়াও যায় না যেগুলির উল্লেখ প্রথমেই করা হয়েছে, তবে প্রথাগত ঈশ্বর-ধারণার উর্ধে উঠতে পারলে সব ধরণের প্রশ্নের জবাবই মেলে)। এখন দেখা যাক, আমাদের মতো সাধারণ বিশ্বাসীরা যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তার স্বরূপটি কীরূপ, তার সাথে আমাদের সম্স্লর্কের ভিত্তিটাই বা কী।

(গ):- আপনারে চিনলে যায় রে অচেনারে চেনা

ঈশ্বর বড়ো গোলমেলে একটি শব্দ। যাকে ধরাছোয়া যায় না, একমাত্র বিশ্বাস ছাড়া যার কাছে পৌছানোর কোন রাস্তা নাই, সেইরকম একটা জিনিসকে নিয়ে কাহাতক আলোচনা করা যায় ? এইজন্যেই বোধ হয় সক্রেটিস সাহেব বলে গেছেন - ঈশ্বরকে বুঝার আগে নিজকে চেন - **`know thyself'**। যে জিনিসকে দেখা যায় না, ধরা-ছোয়া যায় না সেইরূপ একটা অলীক জিনিসকে উপলব্ধিতে আনা খুব কঠিন কাজ। এরূপ ক্ষেত্রে সদৃশ কোন জিনিসের সাথে মিলিয়ে বুঝার চেষ্টা করা একটা অত্যন্ত কার্যকরী কৌশল। মানুষের আত্মা (ংড়ঁষ) এইরূপ আরেকটি গোলমেলে শব্দ যাকে আমরা নিত্যদিন বহন করে চলি অথচ কখনও দেখতে পাই না, দেখার বা বুঝার চেষ্টাও করি না। অথচ আত্মা বলে কোন কিছু যদি সত্যিই থেকে থাকে, তা'হলে সেটাই মানুষের সবচেয়ে কাছের জিনিস হওয়ার কথা। এত কাছের একটি জিনিসকে আমরা বুঝতে পারি না, বুঝতে যাই অলীক স্বর্গের বাশিন্দা কোন্ এক অপার্থিব ঈশ্বরকে ! তাই হয়তো ললন ফকির দুঃখ করে বলেছিলেন - 'ঘরের কাছে হয় না খবর, কী দেখতে যাও দিল্লী লাহোর'। সুতরাং মহাজন-পন্থা অনুসরণ করে নিজের দিকেই প্রথমে দৃষ্টি ফেরানো যাক। যদি সেখানে কিছু পাওয়া যায়, তা'হলে সেই পথ ধরে এগুলে বৃহত্তর কিছু একটা পাওয়া গেলে যেতেও পারে।

আত্মা আসলে কী ? জীবন বা লাইফফোর্স আমরা দেখতে না পেলেও তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি। জীববিজ্ঞানের সুত্র অনুসারে কোন পদার্থের ভেতর নিম্নের লক্ষণগুলি প্রকাশিত দেখা গেলে সেটিকে জীবন্ত বা জীবনযুক্ত বলে ধরে নেওয়া হয়:-

১। খাদ্যগ্রহণ - জীব খাদ্যগ্রহণ করে, জড়বস্তু করে না।

২। বৃদ্ধি - জীব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, জড়ের ক্ষয়বৃদ্ধি নাই।

৩। পুনরূৎপাদন - জীবেরা পুনরূৎপাদন করে, জড়েবস্তু তা করে না।

৪। রেসপিরেশন - প্রতিটি জীবন্ত বস্তু শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়, এমনকি গাছপালাও।

৫। মুভমেন্ট - বৃক্ষলতাও নড়াচড়া করে। শাখাপ্রশাখাকে আলোর দিকে মেলে ধরা গাছপালার নড়াচড়া করার উদাহরণ।

৬। মেটাবলিজম, এক্সক্রিশন, সিক্রেশন - প্রতিটি জীবকোষের ভেতর প্রতিনিয়ত নানাবিধ রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটছে জীববিজ্ঞানের ভাষায় যার নাম মেটাবলিজম। জীবদেহ হতে অপ্রয়োজনীয় বস্তুর (যথা মল-মুত্র) নিঃসরণকে এক্সক্রিশন বলে। জীবদেহ হতে অনেক সময় প্রয়োজনীয় বস্তুও নিঃসরিত হয় (যেমন পিত্তরস, মুখগহ্বরের লালা, ফুলের পরাগরেণু ইত্যাদি)। এর নাম সিক্রেশন।

৭। স্পর্শকাতরতা - পারিপার্শ্বিক অবস্থা (যেমন শৈত্য, তাপ, দিন, রাত্রি ইত্যাদি) অনুধাবন ও সেই অনুযায়ী আচরণ করার ক্ষমতা।

৮। অসমোরেগুলেশন - প্রতিটি জীবকোষে পানির পরিমানকে একটি নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় বজায় রাখার ক্ষমতা।

৯। প্রতিটি জীবকোষ প্রোটিন ও নিউক্লিক এ্যাসিড সমন্বয়ে গঠিত।

১০। মৃত্যু - জীবের মৃত্যু অবধারিত। জীবদেহে মেটাবলিজম প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার নামই মৃত্যু।

উপরের বৈশিষ্টগুলি দেখে জীববিজ্ঞানীরা লাইফফোর্সের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন। জড় বা মৃত বস্তুর মধ্যে উপরের বৈশিষ্টগুলির কোনটিই থাকে না। জীবন্ত বস্তু হতে উপরোক্ত বৈশিষ্টগুলি অন্তর্হিত হলে তা তখন জড়ে রূপান্তরিত হয়। আমরা বলি যে বস্তুটির মৃত্যু ঘটেছে বা তার জীবন চলে গেছে। সুতরাং দেখা যা"ছ যে প্রাণকে ধরতে না পারলেও তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই, সে যে আছে তা আমাদের মেনে নিতেই হয়। কিন্তু আত্মা ? আত্মা বলে আদৌ কিছু আছে কি ? যদি থেকেই থাকে তবে তার স্বরূপ কি ?

একটা উদাহরণ দেয়া যাক। আমরা জানি, বিদ্যুৎ শক্তি প্রকৃতির এক অপরিহার্য উপাদান। সবসময় দেখা না গেলেও সে লুক্কায়িত অবস্থায় সবকিছুর মাঝেই আছে। এই বিদ্যুৎশক্তি যখন কোন রেডিও কিংবা টেলিভিশন যন্ত্রের সংস্পর্শে আসে, তখন সে একটি আকার পায় এবং যন্ত্রটির মাধ্যমে কিছু কাজ করিয়ে নেয়। সেই কাজ একটি গান হতে পারে, হতে পারে একটি মনোহর নাঁচ। কাজ করার ক্ষমতা ও উৎকর্ষতা নির্ভর করে রেডিও কিংবা টেলিভিশন যন্ত্রটির নির্মান-কৌশল এবং ওয়াটেজের উপর। বিদ্যুৎ শক্তি তারের ভেতর নিশ্চল অবস্থায় থাকে। যখনই তা একটি বাল্বের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখনই উজ্জ্বল আলোরূপে তা প্রকাশিত হয়। নিষ্প্রাণ বাল্বটি বিদ্যুৎশক্তিকে নিজের মধ্যে ধারণ করে জীবন্ত হয়ে উঠে এবং চারিদিকে আলো বিতরণ শুর" করে। বাল্বটির আলো বিতরণের ক্ষমতা ও স্থায়ীত্বকাল নির্ভর করে বাল্বটির গঠণশৈলী অর্থাৎ এর ফিলামেন্টের উপর। নিরাকার বিদ্যুৎশক্তি একটি আকারে সীমায়িত হয়ে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্যে একটি নির্দ্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করে যায়। বাল্বটির ফিলামেন্ট ছিড়ে গেলে এর মৃত্যু হয়েছে বলা যায়। তবে তাতে বাল্বজন্মের আদি কারণ সেই বিদ্যুৎশক্তির কিছুমাত্র যায় আসে না। বাল্বজন্মের সফলতা বিফলতা নির্ণয় হয় সে তার জীবৎকালে কী পরিমান আলো দিতে পেরেছে তার উপর। অর্থাৎ একটি নিরাকার শক্তি একটি আধারে সীমায়িত হয়ে একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে আবির্ভুত হয়েছে এবং একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্যে কিছু কাজ সম্পাদন করেছে। ঠিক একইভাবে সেই অনন্ত প্রাণশক্তি বা লাইফফোর্স একটি আধারে সংবদ্ধ হয় এবং একটি আত্মা গড়ে তুলে। এ যেন সেই খাঁচার ভিতর অচিন পাখীর বাসা, মৃন্ময়ের মাঝে চিন্ময়। রবীন্দ্রনাথ কি আর সাধে বলেছেন -"তোমারি মিলনশয্যা হে মোর রাজন, ক্ষুদ্র এ দেহের মাঝে অনন্ত আসন। অসীম বিচিত্রকান্ত ওগো বিশ্বভুপ, দেহে মনে প্রাণে আমি একি অপরূপ"।

আত্মা নামক সেই দুর্জ্ঞেয় পদার্থটির উপর আরও একটু অনুসন্ধান চালানো যাক। ধরা যাক আতাউর রহমান নামক একজন লোক, পিতা বাতেন রহমান, মাতা মোসাম্মৎ রাবেয়া রহমান। উন্নিশ শো সত্তর সালের আগে লোকটির কোন অস্তিত্ব ছিল না। পৃথিবীতে প্রাণপ্রবাহ ছিল, প্রাণশক্তির লীলা সেখানে আজিকার মতোই প্রবাহিত হতো। কিন্তু আতাউর রহমান বলে কেউ ছিল না। দু'জন মানব-মানবীর কোন এক মিলনমুহুর্তে তাদের জৈবিক কামনা-বাসনার নির্য্যাসরূপে সে অস্তিত্বে এসেছিল। প্রাণশক্তি বা লাইফফোর্স একটি আধারে সংবদ্ধ হয়ে একটি আত্মার সৃষ্টি করেছিল, একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে একজন আতাউরের জীবনগাথা শুর" হয়েছিল।

মাতৃগর্ভেও তার আত্মা ছিল, শৈশবে বাল্যেও তার আত্মা ছিল। কিন্তু সেই আত্মার কোন ভালোমন্দবোধ ছিল না, ছিল না কোন পাপবোধ-পুণ্যবোধ। ক্ষুধা-তৃষ্ণার মতো কিছু প্রাইমারি জৈবিক বোধ ছাড়া আর কোন বোধ হয়নি সেই শিশু আত্মাটির। তা'হলে দেখা যা"ছ - বোধশক্তি আত্মার বাইরের একটি জিনিস যা মানুষকে শ্রমের বিনিময়ে অর্জন করতে হয়।

আতাউরের দেহ ক্রমেই পরিপক্ক হতে থাকল, দেহের সংগে পাল্লা দিয়ে পরিপক্ক হয়ে উঠছে তার আত্মাটিও। তার মস্ক্ষকোষগুলি বৃদ্ধি পা"ছ, তার দেহ ক্রমেই সুগঠিত হয়ে উঠছে। বিভিন্ন গ্ল্যান্ড হতে বিভিন্নরূপ হরমোন নিঃসৃত হয়ে তাকে একজন সর্বাংগসুন্দর যুবকরূপে গড়ে তুলল। প্রতক্ষ ও অপ্রতক্ষ শিক্ষার বদৌলতে আতাউরের মস্ক্ষের নিউরোন কোষগুলি পরিপুর্ণ হয়ে গেল। প্রকৃতি ও পারিপার্শিকতা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে সে ধর্ম-কর্ম শিখল, আল্লাহ-রসুল চিনল, ভালমন্দ বুঝল, কামবোধ জানল। দেহের রূপান্তরের সাথে সাথে সে পাপ করল, পুণ্য করল। অর্থাৎ - মায়ের পেটের ও শৈশবের নির্গুণ আত্মাটি গুণবিশিষ্ট হলো। দেহযন্ত্রের বিভিন্ন গ্ল্যান্ড হতে নিঃসৃত হরমোন, পুর্বপুর"ষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জেনেটিক তথ্যাবলী এবং নিউরোনদ্বারা আহরিত পারিপার্শিক তথ্যাবলী -- এই তিনপ্রকারের উপাদানের মিথস্ক্রিয়ার ফলে সে পাপাত্মা হলো, পুণ্যাত্মা হলো। তার শৈশবের নির্গুণ আত্মাটির এই যে রূপান্তর - তা কিন্তু সম্পুর্ন দৈহিক কারণেই ঘটলো ।

মানবাত্মার বিবর্তনের পরবর্তী ধাপগুলিও একটু বিবেচনা করে দেখা যাক। আতাউর বৃদ্ধ হয়েছে, দেহের জীবকোষগুলি নিত্য ক্ষয়প্রাপ্ত হ"ছ কিন্তু নুতন করে জন্মা"ছ না। দেহের যে ভাইটাল অর্গানগুলি তাকে এতদিন টগবগে ঘোড়ার মতো ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, সেগুলির কর্মক্ষমতা কমে গেছে। সে ভালমতো খেতে পারে না, চলতে ফিরতে পারে না। তার চিন্তাশক্তি হ্রাস পেয়েছে। এতদিন অরূপরতন, সাকার-নিরাকার ইত্যাদি কতো ভাবনাই না তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। সে লজিকের সাহায্যে ঈশ্বরকে নাই করে দিতে পারত, ধ্যানে বসে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছে বলে পুলক অনুভব করতো। তার মনে প্রেম ছিল, কখনও তা কোন মানবীর প্রতি ধাবিত হয়েছে, কখনও বা ঈশ্বরের প্রতি। এসবকে সে তার পুণ্যাত্মার গুনাগুন ভেবে গর্ব অনুভব করতো। যেই তার দেহযন্টা জড়াগ্রস্থ হয়ে পড়লো, অমনি তার আত্মার সমস্ শক্তি লোপ পেল। তার আত্মা আছে, কিন্তু সেখানে আর প্রেমবোধের সঞ্চার হয় না। তার আত্মা আছে, কিন্তু মনে কোন ঐশী ভাব জাগে না। অর্থাৎ- আতাউরের দেহযন্ত অথর্ব হওয়ার সাথে সাথে তার আত্মাও অথর্ব হয়ে পড়েছে, তার দেহের বিবর্তণের সাথে সাথে আত্মার রূপান্তর ঘটেছে !

আতাউর একদিন কোমায় চলে গেল। তার হৃদপিন্ড, ফুসফুস, কিডনি প্রভৃতি অর্গানগুলি দিব্বি কাজ করছে, শুধুমাত্র ব্রেন কাজ করছে না। চোখ আছে দেখতে পা"ছ না, কান আছে শুনতে পা"ছ না। খেতে পারছে না, ভাবতে পারছে না, অথচ তখনও সে বেঁচে আছে, তার শরীরে প্রাণ আছে। প্রাণের চিহ্ন হ"ছ মেটাবলিজম। আতাউরের দেহে মেটাবলিজম প্রক্রিয়া তখনও চালু আছে, অর্থাৎ সে মৃত নয়। এমনকি লাইফ সাপোর্টিং যন্ত্রের সাহায্যে তার শরীরের মধ্যে প্রাণপ্রবাহ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে ধরে রাখা যেতে পারে। এই অবস্থায় তার আত্মার অবস্থা কী, আত্মা আছে না চলে গেছে ?

একজন পুর্ণবয়স্ক সুস্থ্যসবল লোক হঠাৎ করে ব্রেনে আঘাত পেল। ফলে তার ব্রেনের কিছু অংশ অচল হয়ে গেল। লোকটি হয়ে পড়লো বদ্ধ উন্মাদ। সে পাগলামীর বশে যে কোন সময় আরেকজন লোককে খুন করে বসতে পারে। ন্যায়-অন্যায় প্রভেদকারী যে নিউরোনগু"ছ তাকে এতদিন চালিয়ে নিয়ে এসেছে যাকে আমরা ন্যায়বোধ বলে আখ্যায়িত করে থাকি, সেই

নিউরোনগু"ছর কার্য্যকারীতা শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে তার মধ্যে আর ন্যায়-অন্যায়বোধ অবশিষ্ট নাই। সে উলংগ হয়ে লোকসমাজে হাজির হতে পারে। যে নিউরোনগু"ছ তার মধ্যে লজ্জা বা শালীনতাবোধ গুনটির জন্ম দিয়েছিল, সেই নিউরোনগু"ছর কার্যকারীতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে তার মধ্যে আর বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ অবশিষ্ট নাই। অর্থাৎ একজন সুস্থ্যসবল লোক শুধুমাত্র একটি অংগ খোয়ানোর ফলে কোন কাজই করতে পারছে না, পাপও করতে পারছে না, পুণ্যও করতে পারছে না। সুতরাং দেখা যা"ছ যে আত্মা মানুষের দেহ-বহির্ভুত কোন বিষয় নয়। দেহের সাথে আত্মা অংগাংগীভাবে জড়িত, কিন্তু প্রাণ নয়। এতকিছুর পরও কি সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে যে আমাদের দেহরূপী আকারধারী জটিল সিষ্টেমটির টোটাল ফলাফলের নামই আত্মা ? যতক্ষন দেহ আছে, আত্মা নামক একটি বিষয়ের অস্তিত্ব আছে; দেহ অকার্য্যকর হয়ে পড়লে আত্মাও অকেজো হয়ে পড়ে। দেহবিযুক্ত আত্মার ধারণা একটি নামমাত্র, গুনবাচক কোনকিছু তাতে নেই। এ এক চরম অনস্তিত্ব অবস্থা, 'ধ নরম ঘঙ' - নাস্তি। সাধে কি আর মহাপুর"ষরা বলে থাকেন - আত্মা আর কিছু নয় আমার প্রভুর হুকুমমাত্র - 'command from my Lord'। হুকুমের কি কোন অবয়ব আছে যে তাকে ধরা ছোয়া যাবে, কাটাছেড়া করে তার অস্তিত্বকে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করে তোলা যাবে ? হুকুমটি প্রোটিন ও এ্যাসিডে তৈরী একটি যন্ত্র হিসেবে ঘুরে বেড়িয়েছে কিছুকাল, যন্ত্রটি বিনষ্ট হওয়ার পর হুকুমের আর মুল্য কী থাকে ? 'দেহবিযুক্ত আত্মা একটি অনস্তিত্ব অবস্থা - একটি শুন্য অবস্থা' - এই প্রপজিশনে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। পজিটিভ দিক থেকে বিচার করলে শুন্যতার মাঝেই পরম পুর্ণতা নিহিত আছে, শেষের মাঝে শুর"র ইংগিত আছে।

(ঘ):- আছে অনল অনিলে চির নভোনীলে

আত্মা সম্পর্কে এই প্রসারিত ধারণাটুকু নিয়ে এবার বোধ হয় ঈশ্বর সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা করা যেতে পারে। যদিও মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা নামক যে সত্তা, যাকে আমরা ঈশ্বর নামে অভিহিত করে থাকি, তার স্বরূপ সঠিক ভাবে উপলব্ধি করা মানবীয় জ্ঞানের আয়ত্বাধীন বলে বিশ্বাস করা যায় না। সৃষ্টির বিশালতা ও বৈচিত্রের কথা বিবেচনা করলেই যেখানে মানবীয় জ্ঞান অপর্য্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হয়, সেখানে তার সৃষ্টিকর্তাকে ধরতে যাওয়া একটা অসম্ভব প্রয়াস। অনেকটা অন্ধের হস্তীদর্শনের অনুরূপ। তবুও মানুষ থেমে নেই। যুগ যুগ ধরে সে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে; প্রাণ দিয়ে, মন দিয়ে, কবিতা দিয়ে, সংগীত দিয়ে, ধর্ম দিয়ে, কল্পনা দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে, ভক্তি দিয়ে, প্রেম দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, বিজ্ঞান দিয়ে, অবিজ্ঞান দিয়ে – অর্থাৎ মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির সবগুলো উপকরণ দিয়ে মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে। মানুষের এই অন্তহীন অভিযাত্রার ফল কতটুকু মিলেছে, তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। তবে জগতের শ্রেষ্ঠতম কবিতাটি আর শ্রেষ্ঠতম সংগীতটি যে না পাওয়ার এই মহৎ বেদনা থেকেই উৎসারিত - তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ঈশ্বর কী বা ঈশ্বর কে - এই প্রশ্নের জবাব মানুষের হাতে নেই। মানুষের অন্তহীন জিজ্ঞাসার বিশ্বাসভিত্তিক উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে ধর্মে, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাভিত্তিক উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে দর্শনে। ঈশ্বরোপলব্ধির তাড়নায়ই মানুষ আত্মোপলব্ধিতে উৎসাহিত হয়েছে, আত্মার পথ ধরে পরমাত্মায় পৌছুতে চেয়েছে। ইতিপুর্বে আমরা দেখেছি - নিরাকার নিরাবলম্ব নিরাবয়ব নির্বেদ বিমুর্ত অজ্ঞাতপুর্ব অজানা রহস্যময় এক প্রাণশক্তি কিছুকালের জন্যে একটি দেহের মধ্যে সংবদ্ধ হয়ে একটি স্বতন্ত্র সত্তায় মুর্ত হয়ে একটি আত্মার প্রকাশ ঘটায়; গ্রামবাংলার চারণকবির কাব্যিক অনুভুতিতে যা ক্ষনস্থায়ী একটি বুদবুদ হিসেবে ধরা দিয়েছে - "জলে বায়ু হলে আটকা, ক্ষনেকারে নাম ধরে ফুটকা, জাতের বায়ু দিলে ঝটকা, জাতে জাতে মিশা যায়"। মৃত্যুর পর 'জাতের বায়ু জাতে জাতে মিশা যায়' - অর্থাৎ প্রাণশক্তি সেই মহাপ্রানে বিলীন হয়ে যায়। আত্মা তার গুনবাচক বা কর্মবাচক অস্তিত্ব হারিয়ে শুধুমাত্র একটি নামবাচক অস্তিত্ববস্থায় ফিরে যায়, যা প্রায় অনস্তি

ত্ববস্থা বা শুন্যাবস্থার কাছাকাছি। কেউ যখন বলে যে মৃত্যুর পর আত্মা বলে কিছু থাকে না তার কথা যেমন পুর্ণ সত্য নয়, ঠিক সেইভাবে কেউ যখন বলে যে মৃত্যুর পরও আমার আত্মাটি পার্থিব সত্তার মতোই পুর্ণভাবে বিরাজ করে - তার কথাও পুর্ণ সত্য নয়। এ এমন একটি অবস্থা যেখানে এসে আস্তি ও নাস্তি একবিন্দুতে মিশে গেছে। ঠিক যেন গণিতশাস্ত্রের শুন্য। গনিতের শুন্য একটি সংখ্যা, অথচ কনসেপশনের দিক থেকে বিচার করলে শুন্য মানে কোনকিছু না থাকা। শুন্য একই সংগে আছে এবং নেই। শুন্য একটি অবস্থান যেখান থেকে পজেটিভ ও নেগেটিভ সংখ্যাগুলির লীলাখেলা শুর" হয়ে অসীমের দিকে ধাবিত হয়েছে। ঠিক একইভাবে আত্মার নামবাচক অবস্থা গনিতের শুন্যের মতোই একটি অবস্থা যেখানে এসে ধনাত্মক বিশ্বাস ও ঋণাত্মক বিশ্বাস একসংগে এসে মিলিত হয়। এ প্রসংগে বিজ্ঞানের বিগ-ব্যাংগ তত্ত্বটির উল্লেখ করা যেতে পারে। ইদানীংকালে বিজ্ঞানীরা সৃষ্টিরহস্যের মুলবিন্দুতে পৌছতে যেয়ে অংক কষে এক 'অদ্বৈতবিন্দু'র (ংরহমঁষধৎরঃু) সন্ধান পেয়েছেন যেটাকে তারা 'বিগ-ব্যাংগ' নামে অভিহিত করে থাকেন। এই থিওরীর মতে মহাবিশ্বের যাত্রা শুর" হয়েছিল অসীম ঘনত্ববিশিষ্ট একটি বিন্দু থেকে। এই বিন্দুর পুর্বে কী ছিল বিজ্ঞান তার ব্যাখ্যা দিতে পারে না, কারণ এই বিন্দুতে আসলে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সমস্ত সুত্র অচল হয়ে পড়ে। সংজ্ঞা অনুযায়ী বিন্দু এমন একটি জিনিস যার শুধুমাত্র অস্তিত্ব আছে, কিন্তু কোন মাত্রা নাই, অর্থাৎ দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ কিছুই নাই, ঠিক যেন একটা শুন্য, মহাশুন্য। বিগ-ব্যাংগ মুহুর্ত যেন মহাবিশ্বের প্রসববেদনার মুহুর্ত, মাত্রাতীতের মাত্রার ভেতর আত্মপ্রকাশের মুহুর্ত, অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে উত্তরণের মুহুর্ত, নির্গুণ অবস্থা থেকে সগুণ অবস্থায় আত্মপ্রকাশের মুহুর্ত। বিগব্যাংগ মুহুর্ত থেকে বিশ্বের (বিজ্ঞানের ভাষায় স্থানকালের) যাত্রা শুর"। এই বিন্দু থেকে যাত্রা শুর" করে প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী সে বিবর্তিত হয়েছে, কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে পদার্থ, শক্তি। সৃষ্টি হয়েছে নীহারিকা, ছায়াপথ, তারকাপুঞ্জ, গ্রহমন্ডলী। সৃষ্টি হয়েছে প্রাণ, জীবজগত ও মানুষ। সৃষ্টি হয়েছে আইনষ্টাইন - রিলেটিভিটির সুত্রের পথে যিনি সৃষ্টিকর্তাকে ধরতে চান। সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্রনাথ - ছন্দের মাধ্যমে যার মুখে সবাক আত্মোপলব্ধি - 'আকাশ ভরা সুর্য্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ, তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান'।

ঈশ্বরের নামবাচক অবস্থাও (আরবী ভাষায় যাকে এছমে জাত বলে অভিহিত করা হয়) অনেকটা দেহহীন আত্মার অনুরূপ, যার শুধুই অস্তিত্ব আছে কোন প্রকাশ নাই। 'দেহবিযুক্ত আত্মা একটি অনস্তিত্ব অবস্থা - একটি শুন্য অবস্থা', ঠিক সেইরূপ সৃষ্টিপর্য্যায়ের পুর্ববর্তী ঈশ্বরও যেন দেহহীন একটি আত্মা। শুধুমাত্র নামটি মাত্র সম্বল করে তিনি শুন্যবিন্দুতে অবস্থান করেন। তিনি গুপ্ত ছিলেন নির্গুণ ছিলেন, প্রকাশিত হওয়ার ঐশী আকাংখায় তিনি গুণবিশিষ্ট হলেন। তার গুনবাচক অবস্থার ফলাফলই এই বিশ্বপ্রকৃতি। মহাবিশ্ব সেই মহাসত্তার রচিত অনুপম মহাকাব্য যার প্রতিটি ছত্রে প্রতিটি পত্রে তিনি মিশে আছেন। আছেন "অনল অনিলে চির নভোনীলে ভুদরে সলীলে গহনে, আছে বিটপীলতায় জলদেরই গায় শশী তারকায় তপনে"।

এখানে একটি মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন এসে যায় -- 'তা'হলে এই বিশ্বপ্রকৃতিই কি ঈশ্বর'? অত্যন্ত সংগত প্রশ্ন, যদিও জবাবটা তার চেয়েও বেশী কঠিন। দার্শনিকেরা এই প্রশ্নের জবাব কীভাবে দিয়েছেন জানি না, তবে মরমী সুফি-সাধকরা কীভাবে এই প্রশ্নের মুখোমুখী হয়েছেন তার একটুখানি আভাস দেওয়া যেতে পারে। যদি আমরা ঈশ্বর নামক একটি নামবাচক সত্তার পুজাই করি, তা'হলে তার স্বরূপ জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ নামরূপী ঈশ্বর সমস্ত মানবীয় জ্ঞানের অতীত। নামরূপী ঈশ্বর যেন বিগ-ব্যাংগ মুহুর্ত, সেখানে সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক সুত্র অচল। তবে যে বিন্দুতে এসে তিনি প্রকাশিত বা গুনবিশিষ্ট হয়েছেন, সেই মুহুর্ত থেকে তার স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব, কারণ গুনবিশিষ্ট জিনিস মানবীয়

জ্ঞানের আয়ত্বাধীন। সুফী সাধকরা তাই বিশ্বপ্রকৃতিকে ঈশ্বরের ছায়া বা দর্পণ হিসেবে অনুভব করে থাকেন যার মধ্যে ঈন্দ্রিয়াতীত অবাঙমানসগোচর অনন্ত সত্তাটি প্রতিবিম্বিত হন প্রতিক্ষণ। লালন ফকিরের ভাষায় - "জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়, ধরতে গেলে কে তারে পায়, তেমনি সে থাকে সদাই ফলেতে বসে"।

মানুষের চিন্তাশক্তির একটা লিমিটেশন আছে যার বাইরে যাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বিজ্ঞানশাস্ত্রও যেহেতু মানুষের তৈরী, সুতরাং বিজ্ঞানশাস্ত্রেরও একটি লিমিট থাকা অবধারিত। বিজ্ঞানের যেসমস্ত সমীকরণ বিশ্বপ্রকৃতি নিয়ে কাজ করে সেগুলিতে অবধারিতভাবে দুইটি ফ্যাক্টর লক্ষ্য করা যায় - লিমিট টেন্ডস টু জিরো (খঃ⟶০) এবং লিমিট টেন্ডস টু ইনফিনিটি (খঃ⟶∞)। জিরো এবং অসীম - এই দুই প্রান্তবিন্দুর মধ্যে বিজ্ঞানের বিচরণ, এর বাইরে নয়। জিরো এবং ইনফিনিটি যদিও অংকশাস্ত্রে দুইটি সংখ্যার ন্যায় ব্যবহৃত হয়, তবুও এই সংখ্যা দুইটির প্রকৃত স্বরূপ আজও মানুষের অজানা। সংখ্যা দু'টিকে দুই প্রান্তের দু'টি খুটির মতো ধরে নেয়া হয়েছে এইমাত্র। ঈশ্বর বলে যে সত্তাটি আমাদের কল্পনায় আছেন তিনি স্থানকালের অতীত, অর্থাৎ অংকশাস্ত্রের জিরো ও ইনফিনিটি সংখ্যাদ্বয়ের বাইরে। সুতরাং কোন বিজ্ঞানের থিওরী দিয়ে তাকে মাপতে যাওয়া বাতুলতা। তিনি মানুষের কল্পনায় বাস করেন, বিজ্ঞানের সমীকরণে নয়। মানুষের কল্পনার ব্যপ্তি সীমাহীন, তা কোন নিয়মনিগড়ে আবদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে বিজ্ঞানের সমীকরণ কঠোরভাবে নিয়মনিগড়ে আবদ্ধ। সমীকরণ কিছুতেই মানুষকে আলোর চেয়ে দ্রুতবেগে ছুটাতে পারমিট করে না। কিন্তু মানুষের কল্পনা ইচ্ছে হলেই আলোর চেয়ে সহস্রগুন বেশী বেগে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। ভাষা দিয়ে আমরা তাকে প্রকাশ করতে প্রয়াস পাই, কিন্তু তিনি ভাষারও অতীত। মন দিয়ে তাকে আমরা বুঝতে চাই, কিন্তু তিনি মনেরও অতীত। তিনি অবাঙমানসগোচর। যুক্তি দিয়ে তাকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করা যায় না, যেমন যায় না অপ্রমান করা। কারণ তিনি সমস্ত যুক্তি-তর্কের অতীত। আদিতেও তিনি আছেন, অন্তেও তিনি আছেন। বিশ্বাসীদের হৃদয়ে তিনি আছেন, আকাশপৃথিবী পরিপুর্ণ করে আছেন।

(ঙ):-আমি কোন জন সে কোন জনা

ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ক কী ? স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক মাত্র ! মানুষ বিধাতার হাতে গড়া অত্যন্ত উন্নতমানের কমপিউটার যন্ত্রবিশেষ, এর বেশী কিছু নয় ? তাই যদি হবে তা'হলে কেন স্বর্গ-নরকের অলীক স্বপ্ন দেখানো, কেন ভাল কাজের তাগিদ, মন্দ কাজের নিষেধ ? কেনই বা পাপপুন্যের জন্যে মানুষকেই দায়ী করা ? কমপিউটারের ম্যাল-ফাংশনিংয়ের জন্যে যন্ত্রটি নিজে দায়ী হবে কেন ? সে তো বলতেই পারে - 'তুমি যেমনি নাঁচাও তেমনি নাঁচি পুতুলের কি দোষ' ? পুরোনো অকেজো কমপিউটার - তা সে যতো প্রিয়ই হোক - তাকে গার্বেজ না করে কে কবে তার জন্যে রাজপ্রাসাদ বানায়, সুরম্য রাজপ্রাসাদের দামী শো-কেসে যত্ন করে সাজিয়ে রাখে ? মানুষের সাথে স্রষ্টার কি এমনি স্রষ্টাসৃষ্টির সম্পর্কমাত্র ?

আরও এক ধরণের স্রষ্টাসৃষ্টি সম্পর্ক দেখা যায় যেখানে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির প্রাণের যোগ থাকে। পিতামাতার সাথে সন্তানের সম্পর্কটি এই ধরণের একটি সম্পর্ক। সন্তান পিতামাতার প্রত্যক্ষ সৃষ্টি, অথচ পিতামাতার সাথে সন্তানের প্রাণের যোগ রয়েছে। সে পিতামাতার প্রতিনিধি বা খলীফা, তাদের উত্তরাধিকার। সন্তান পিতামাতার সৃষ্ট একটি স্বতন্ত্র সত্তা হয়েও দেহের প্রতিটি কোষে জন্মদাতার প্রতিচ্ছবি ধরে রাখে, সন্তানের মাঝে পিতামাতা প্রতিবিম্বিত হন। সন্তানের মংগলের জন্যে পিতামাতা অহোরাত্র ব্যতিব্যস্ত থাকেন, তার মংগলে সর্বান্তকরণে সুখী হন, অমংগলে দুঃখে অধীর হয়ে পড়েন। ভাল কাজ করলে পুরষ্কার দেন, মন্দ কাজ করলে তিরষ্কার করেন। বিশ্ববিধাতার সাথে মানুষের সম্পর্কের সুত্রটা যদি সেইরূপ

কোন আত্মিক সুতায় বাঁধা থাকে, তাহলেই কেবল স্বর্গনরক বা ইহকাল পরকালের মর্মার্থ কিছুটা হলেও পরিস্ফুট হয়। ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্কটাকে কুমোর-হাড়িপাতিলের সম্পর্কের মতো সম্পর্ক দিয়ে বাঁধতে গেলে শেষ গন্ব্যস্থল যে গো-ভাগাড় তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বস্তুতঃ ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ক অনুভবের বিষয়, যোগবিয়োগ বা পুরণভাগ দিয়ে সমীকরণে ফেলে কাটছেড়ার বিষয় নয়। এ যেন তরুনতরুনীর প্রেম - কেন হলো কীভাবে হলো - কোন কারণ কোন লজিক খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুধু তরুনতরুনীর মনই জানে, তাদের একজনকে বাদ দিয়ে আরেকজনের জীবন মিথ্যে - অর্থহীন। মানুষের মাঝেও একশ্রেণীর লোক আছেন যারা প্রেমের মাধ্যমে সুষ্টিকর্তার কাছে পৌছতে চান। ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্কটা যাচাই করতে আমরা এবার প্রেমপথযাত্রী সেইসব আধ্যাত্মবাদীদের দুয়ারে হানা দেব, এই সম্পর্ককে আধ্যাত্মবাদীগন কোন চোখে দেখেন তার উপরে কিঞ্চিত আলোকপাত করব।

আধ্যাত্মবাদ ধর্মদর্শনের একেবারে নিগুঢ়তম অধ্যায়, ইংরেজীতে যাকে বলে কন্ডেনসেট। আধ্যাত্মবাদের সাধকগন প্রেমের পথ ধরে ঈশ্বরের কাছে পৌছুতে চান, কারণ প্রেমের চেয়ে শক্তিশালী কোন মাধ্যম এই সৃষ্টিতে দ্বিতীয়টি আছে বলে মনে হয় না। তাদের প্রচেষ্টার নীট রেজাল্ট কী, তার নির্ভরযোগ্য বিবরণ মিলে না। এই পথের সাধক যারা, তারা তাদের অনুভুতিকে একটা গোপনীয়তার আড়ালে রাখতেই বেশী পছন্দ করেছেন। দয়িতের সাথে দয়িতার মিলনমুহুর্তটি একান্ ভাবেই তাদের নিজস্ব ধন, সেখানে দশজনের প্রবেশ মুহুর্তটির গোপন মাধুর্য্য নষ্ট করে ফেলে। তবে কবিতায় বা গানে তাদের যে অন্র্জালা প্রকাশিত, তা পরখ করে দেখলে বিষয়টি সম্পর্কে যে ধারণা জন্মে তাতে মনে হয় যেন আধ্যাত্মবাদের একটা বিশেষ পর্য্যায়ে এসে সাধক নিজের মাঝে ঈশ্বরকে প্রতিবিম্বিত দেখতে পান - সেই অসীম সত্তায় নিজেকে বিলীন দেখতে পান। 'নাফাকতুহু মিন র"হি' - তোমার মাঝে আমার আত্মা ফুকে দিলাম - এই বাণীর বাস্ব প্রত্যক্ষ হয় তার জীবনে। সে অনুভব করে - তার মাঝে প্রবাহিত হ"ছ বিশ্বাত্মা। সেই অসীম বিশ্বাত্মার প্রেম পরশে সাধকের মন আলোকিত হয়ে উঠে, তার কানে বেজে উঠে ঐশ্বরিক ছন্দ। হাজার বছর আগে ভারতের নিভৃত তপোবনে ধ্যানরত ঋষির মনে একটি মহা ভাব জন্ম নিয়েছিল - 'অহম ব্রম্মাস্যি' - আমিই ব্রম্ম। এর হাজার বছর পরে আরবের বিরাণ মর"ভূমিতে সম্পুর্ণ আলাদা গোত্রের একজন মানুষের কন্ঠেও সেই একই সুর শুনি - 'আনাল হক্ক' -আমিই সত্য। সেই একই অনুভুতি দেশকালের গন্ডী অতিক্রম করে গ্রামবাংলার শ্যামল মাটিতে বাউলকবি লালনের মুখেও সমান তালে ঝংকৃত হয়ে উঠে - 'আমি কোনজন সে কোন জনা'। নগর বাউল রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতায় ও গানের মাঝেও সেই অভিন্ন সুরেরই দ্যোতনা - 'কন্ঠে আমার কী গান শুন, অর্থ আমি বুঝি না কোন, বীণাতে মোর বাজিয়া উঠে কাহার ভৈরবী'। বস্তুতঃ আধ্যাত্মপথের পথিক যারা, তাদের জীবনব্যপী সাধনাকে বিশ্লেষণ করলে একটা সত্যই স্পষ্ট হয়ে উঠে। সে সত্য এই যে - এরা সকলেই একটা বিশেষ পর্য্যায়ে এসে নিজেকে ঈশ্বরের সাথে একাত্ম ও অভিন্ন সত্তা হিসেবে অনুভব করেছেন, মৃন্ময়ের মাঝে চিন্ময়ের প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন।

কেউ কেউ হয়তো এইসব অতীন্দ্রিয় অনুভুতিকে মনের বিকার, হ্যালোছিনেশন, মুর্খের ভাববিলাস বলে উড়িয়ে দেবেন। বিজ্ঞানের দুই প্রান্ের (জিরো ও ইনফিনিটি) বাইরের কোন কিছুকে তারা পাত্তা দিতে চান না। তা না দিন, সে অধিকার তাদের পুরোমাত্রায় রয়েছে। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি বিজ্ঞানকে এত ছোট গন্ডীতে ফেলে দেখি না। বিজ্ঞানের পরিসর অতি ব্যপক, এর সম্ভাবনা অসীম। এর শিকড় সেই পরম বিজ্ঞানীর মুলগ্রন্থি পর্য্যন্ বিস্তৃত। কে জানে যে আগামীতে আরও

কোন নূতন বিজ্ঞানের বদৌলতে সৃষ্টিকর্তার আরও নিকটে আমরা পৌছে যাব না ? মাত্র শত বছর আগেও কি মানুষ ভাবতে পেরেছিল যে সৃষ্টিরহস্যের এত কাছাকাছি সে পৌছে যেতে পারবে ? একটি সিঙ্গল সেলকে কালচার করে একটি পুর্ণাংগ মানুষ তৈরী করতে পারবে ? ঈশ্বরের দিকে পৌছানোর দুইটি রাস্তা - এক জ্ঞানমার্গ, দুই ভক্তিমার্গ। ভক্তিমার্গ তথা প্রেমমার্গ সুফী সাধকদের পথ, পক্ষান্তরে জ্ঞানমার্গ বিজ্ঞানীদের পথ। এক পথে মনসুর, লালন ফকির, রবীন্দ্রনাথদের যাত্রা - আরেক পথে গ্যালিলিও, নিউটন, আইনষ্টাইনদের যাত্রা। উভয়ের গন্তব্যস্থল একই - সৃষ্টিরহস্যের মুলবিন্দুতে পৌছানো তথা ঈশ্বরের মনকে জানা। লক্ষ্য এক, শুধু পথই আলাদা। এদের সাধারণ পরিচয় একটাই, এরা সবাই সত্য পথের পথিক।

(চ):-কেমনে হয় তার মনের খবর

আধ্যাত্মবাদী তথা অতিন্দ্রীয়বাদীদের দৃষ্টিকোন থেকে স্রষ্টাসৃষ্টির সম্পর্ক এতক্ষন বিস্তর আলোচনা হলো। একটা প্রশ্ন কিন্তু এখনও রয়েই গেছে - বিশ্ববিচিত্র এই সৃষ্টিকান্ডের পেছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কী ? তিনি কি বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বসৃষ্টি করেছেন, না সবই তার খেয়ালি মনের খেলা মাত্র। এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া আর ঈশ্বরের মন পড়তে পারা একই কথা। দর্শন বিজ্ঞান এ নিয়ে যুগের পর যুগ কলহ করে মরছে, উত্তর কোথায় ? এর জবাব খুঁজতে আমরা আবারও হানা দেব আধ্যাত্মবাদীদের দুয়ারে, তারা বিষয়টিকে কীভাবে বুঝতে চেয়েছেন তা দেখা যাক।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - 'মানুষ যেন হারিয়ে যাওয়া এক রাজকুমার যে নিজের পরিচয় নিজে জানে না। সে জানে না যে সামান্য নয়, সে রাজার ছেলে'। বিশ্ববিধাতা তার সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে অরূপ থেকে রূপময় ভুবনে অবতরণ করেছেন, তার জ্যোতিই সৃষ্টির মুল কারক। কিন্তু মানুষের মাঝে তার প্রকাশ ব্যতিক্রমধর্মী প্রকাশ। মানুষ যেন সমস্ত সৃষ্টিজগতের নির্য্যাস, মানুষের মাঝে তিনি মাধুর্য্যভজন করেন। তিনি প্রেমে উত্তাল হয়ে উঠেন এই মানবহৃদয়ে, আর কোথাও নয়। বিমুর্ত অনস্তিত্বতা থেকে তিনি অবয়বে আসেন এই আদমসুরতেই। ছন্দের গীতাঞ্জলী হয়ে গলে পড়েন মানুষেরই হাতে। ক্রুশবিদ্ধ যিশুর হৃদয় দিয়ে তিনি অন্যায় দন্ডের যন্ণা ভোগ করেন, সক্রেটিসের হাত দিয়ে হেমলক পান করে বেদনায় নীলকণ্ঠ হন, কুষ্ঠরোগীর হৃদয়পদ্মাসনে বসে বেদনার্ত ছন্দে বিগলিত হন তিনিই। লালন ফকিরের ভাষায়-

'অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি এই মানুষের উত্তর কিছুই নাই
দেবদেবতাগন করে আরাধন জন্ম নিতে মানবে।
এই মানুষে হবে মাধুর্য্যভজন
তাইতে মানুষরূপ গড়লেন নিরঞ্জন'।

স্রষ্টা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনুভুতিও লালনের প্রায় কাছাকাছি। তার মতে মানবসত্তা ঈশ্বরের মায়ার প্রকাশ, মানুষ তথা সৃষ্টিপটে তিনি অবিরাম তার মানসছবি অংকন করে যা"ছন। মানুষ যেন ঈশ্বরের সোনা বোঝাই করার ভেলা মাত্র, মানুষ যদি মুকুলটি হয় তা'হলে ঈশ্বর তার সুবাস —

"আমার মাঝে তোমারি মায়া জাগালে তুমি কবি
আপন পটে আঁক মানস ছবি

তাপস তুমি, হেয়ালি তব, কী দেখ মোরে কেমনে কব
আপন মনে মেঘ স্বপনে আপনি রচ রবি।
তোমারই সোনা বোঝাই হলো আমি তো তার ভেলা
নিজেরে তুমি ভুলাবে বলে আমারে নিয়ে খেলা
কন্ঠে আমার কী গান শুন, অর্থ আমি বুঝি না কোন
বীণাতে মোর বাজিয়া উঠে তোমারি ভৈরবী
মুকুল মম সুবাসে তব গোপনে সৌরভি।"

(ছ):- শেষ কথা

ঈশ্বর অনন্ত এবং সান্ত, ঈশ্বর নিরাকার এবং সাকার, ঈশ্বর রূপ এবং অরূপ, ঈশ্বর প্রথম এবং শেষ, ঈশ্বর শুন্য এবং পুর্ণ, ঈশ্বর গোপন এবং প্রকাশ, ঈশ্বর দৃশ্য এবং অদৃশ্য, ঈশ্বর জ্ঞেয় এবং অজ্ঞেয়, ঈশ্বর প্রেম এবং অপ্রেম, ঈশ্বর আনন্দ এবং বেদনা, ঈশ্বর কার্য্য এবং কারণ, ঈশ্বর কবি এবং কবিতা, ঈশ্বর গুন এবং নির্গুন, ঈশ্বর গাছ এবং ফল, ঈশ্বর জন্ম এবং মৃত্যু। তার থেকেই আমি এবং আমা থেকেই তিনি। তার থেকেই আমি আগত এবং তার দিকেই আমি প্রত্যাগত। তিনিই বিশ্ব সৃষ্টির মুল বিন্দু। তার প্রতি প্রেম এবং বিশ্বাসই আমার বেঁচে থাকার প্রেরণা। তার বাণী কানে শুনা যায় না, প্রাণে শুনতে হয়। পত্রে-পল্লবে, ফুলে-ফুলে, গানে-গানে, তারায়-তারায় প্রকাশিত তার বাণীর প্রতি হৃদয় মেলে রেখেছি অনুক্ষন। জীবনে যদি সেই বাণী নাও শোনা যায়, মৃত্যুর মাঝে তা শুনব এই বিশ্বাস নিয়েই বেঁচে থাকা আমাদের। অবিশ্বাস নিয়ে জেতার চেয়ে নিজের বিশ্বাস নিয়ে ঠকাও শ্রেয়। কবিগুর" বর্ণিত সেই কৃপণ ভিক্ষুকের কাহিনী বলে অত্র প্রবন্ধের ইতি টানতে চাই। এক যে ছিল ভিক্ষুক, সে ছিল খুবই কৃপণ। পারতপক্ষে তার হাত দিয়ে কোন কিছু গলতে চাইত না। একদিন সকালবেলা ভিক্ষায় বের"নোর আগে সে সংবাদ পেল, আজ দেশের রাজা রাজপথে বের"বে। শুনে ভিক্ষুক বেজায় খুশী। ভাবল রাজার যাত্রাপথে সে বসে থাকবে। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় রাজা দু'হাত ভরে ধনধান্য ছিটাবে, সে ঝুলি ভরে তা ঘরে নিয়ে আসবে। কিন্তু একি অবাক কান্ড, রাজাধিরাজের স্বর্ণরথটি হঠাৎ করে তার সামনে এসে দাড়িয়ে পড়ল। রাজা রথ থেকে নেমে এসে ভিক্ষুকের কাছে হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'আমায় কিছু দাও গো বলে বাড়িয়ে দিল হাত'। রাজার প্রার্থণা শুনে ভিক্ষুক মাথা নীচু করে রইল। এ কোন ধরণের কৌতুক রাজার ! ভিক্ষুক মনে মনে ভাবল - "তোমার কিবা অভাব আছে, ভিখারি ভিক্ষুকের কাছে, এ কেবল কৌতুকের বশে আমায় প্রবঞ্চনা, ঝুলি হতে বাড়িয়ে দিলেম ছোট্ট একটি কণা"। কৃপণ ভিক্ষুক, প্রাণ ধরে ছোট্ট একটি শস্যের দানা সে রাজার হাতে তুলে দিল। সেই শস্যদানা হাতে নিয়ে রাজা রথে উঠে চলে গেলেন। সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে ভিক্ষুক যখন তার ভিক্ষার ঝুলিটি উজার করে ঢালল - সে অবাক হয়ে দেখতে পেল - তার ভিক্ষালব্ধ জিনিষের মধ্যে ছোট্ট একটি সোনার কণা। সে বুঝতে পারল, রাজভিখারিকে সে যে ছোট্ট শস্যকণাটি দিয়েছিল তাই শতগুনে বর্ধিত হয়ে সোনা হয়ে ফিরে এসেছে। অনুশোচনায় ভরে গেল তার মন। হায়, সে যদি কৃপণতা না করে ঝুলির সবকিছুই রাজার হাতে তুলে দিতে পারত !

"যবে পাত্রখানি ঘরে এনে উজার করি - একি
ভিক্ষামাঝে ছোট্ট একটি ছোট্ট সোনার কণা দেখি !
দিলেম যা রাজ-ভিখারিরে স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে-
তখন কাঁদি চোখের জলে দু'টি নয়ন ভরে

তোমায় কেন দিইনি আমার সকল পুর্ণ করে ?”

রাজারও কখনো কখনো ভিক্ষাবিলাসের লিপ্সা হতে পারে, প্রজার কাছে কাছে রাজারও কিছু চাওয়ার থাকতে পারে ! গল্পের ভিখারির মতো কৃপণ হয়ে অনুশোচনা করার চেয়ে একটু অকৃপণ হলে তাতে কার কতটুকুই বা ক্ষতি ?

মেজবাহউদ্দিন জওহের
e-mail: mezbahmezbah@hotmail.com
জানুয়ারি ০৯, ২০০৪ সাল

‘আস্তিকতা বনাম নাস্তিকতা’র প্রত্যুত্তরে

অভিজিৎ রায়

জনাব মেজবাহউদ্দিন জওহেরের আস্তিকতা এবং নাস্তিকতা নিয়ে অত্যন্ত সুলিখিত লেখাটি পড়বার পর থেকেই এ নিয়ে কিছু লিখবার তাগিত অনুভব করছি। প্রবন্ধটির গঠন শৈলী এবং ভাষাবিন্যাসের জন্য কেবল নয়, প্রতিপক্ষের চিন্তাধারার প্রতি তাঁর সন্মানবোধ, বিপরীত মতগুলোকেও যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে নেওয়া, যাচাই করা, সেগুলো নিয়ে চিন্তা করা এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে খন্ডন করার চেষ্টা করা সব কিছুর ব্যাপারেই তার লেখাটি আমাদের জন্য একটি আদর্শ হতে পারে।

জওহেরর সাহেবের প্রবন্ধটিকে খন্ডন করবার জন্য নয়, মূলতঃ নিরপেক্ষভাবে কিছু তথ্য তুলে ধরতেই আমার আজকের এই লেখা। হয়ত ব্যাপারটিকে ‘অর্থহীন বিতর্কের সূচনা’ বলে মনে হতে পারে, কিংবা মনে হতে পারে অযথা কালক্ষেপণ, কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের এই উন্মুক্ত আলোচনায় আমরা নিজেরা তো বটেই, উপকৃত হবেন অগনিত সাধারণ পাঠকেরাও। এটি প্রয়োজনীয়, কারণ, রাষ্ট্রীয় পক্ষপাতদুষ্ট আইন-কানুনের সীমাবদ্ধতায় এ ধরনের আলোচনা দেশে কখনই সম্ভব হত না; আমরা দেখেছি প্রচার মাধ্যম এবং সংবাদ পত্র গুলোও ‘তাঁবেদারদের তল্পিবাহক’ হিসেবে সবসময়ই থেকে গিয়েছে, যুক্তি-তর্কের গঠনমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করে মুক্ত-মনের বিকাশে কখনই উদ্যোগ নেয় নি; ধর্মের রাজনীতি আর ধর্মানুভূতিটাই যেন তাদের কাছে মূখ্য, ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তি-বুদ্ধির চর্চা পদে পদে হয়েছে বাঁধাগ্রস্ত, কখনও বা নির্মমভাবে পদদলিত। ইন্টারনেট আসার ফলে এ শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি অনেকটাই। এখানে আইনের যাঁতাকলে পড়ে তথ্যের আদান-প্রদান একপেশে ভাবে আর বাঁধাগ্রস্ত হয় না; ফলে দুই পক্ষই নির্ভয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে- হোক না যতই তা ধর্মবিরুদ্ধ, প্রথাবিরুদ্ধ। নিরপেক্ষ পাঠকেরা দুপক্ষের বক্তব্য থেকে সহজেই সত্যের নির্যাসটুকু আস্বাদন করতে পারবেন।

জওহের সাহেব নাস্তিকতার সংজ্ঞা যে ভাবে দিয়েছেন, তার সাথে আমি একদমই একমত নই। তিনি রবীন্দ্রনাথের একটি উপন্যাসের (সম্ভবত গোরা) একটি চরিত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে চেয়েছেন নাস্তিকরাও এক অর্থে বিশ্বাসী। তারা ‘না-ঈশ্বরে’ বিশ্বাসী। জওহের সাহেব শুধু নন, আমি দেখেছি অনেকেই বুঝে হোক, না বুঝে হোক, এই ব্যাপারটি মাঝে মধ্যে এভাবেই আউরে দেন যে, আস্তিক্যবাদের মত নাস্তিক্যবাদও একধরনের বিশ্বাস। আস্তিকরা যেমন ‘ঈশ্বর আছে’ এই মতবাদে বিশ্বাস করে, তেমন নাস্তিকরা বিশ্বাস করে ‘ঈশ্বর নেই’ - এই মতবাদে। দুটোই নাকি বিশ্বাস। এ বইয়ে সন্নিবেশিত ‘সংশয়ীদের ঈশ্বর’ নামক আরেকটি প্রবন্ধে আহমাদ মোস্তফা কামাল প্রায় একই ধরণের মতামত প্রকাশ করে বলেছেন –

> ‘আস্তিকতার বিপরীত শব্দ নাস্তিকতা নয়, এই দুটো শব্দ দুটো বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করে। একটি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, অন্যটি ঈশ্বরের অনস্তিত্বে বিশ্বাস।‘

নাস্তিকদের এভাবে সংজ্ঞায়ন সঠিক কি ভুল, তা বুঝবার আগে 'নাস্তিক' শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থটি আমাদের জানা প্রয়োজন। 'নাস্তিক' শব্দটি ভাংলে দাঁড়ায়, নাস্তিক + কন বা নাস্তি+ক। 'নাস্তি' শব্দের অর্থ হল নাই, অবিদ্যমান। 'নাস্তি' শব্দটি মূল সংস্কৃত হতে বাংলায় এসে 'ক' বা 'কন' প্রত্যয় যোগে নাস্তিক হয়েছে যা তৎসম শব্দ হিসেবে গৃহীত। ন আস্তিক = নাস্তিক - যা ন ঞ তৎপুরুষ সমাসে সিদ্ধ এবং আস্তিকের বিপরীত শব্দ। আরো সহজ করে বাংলায় বললে বলা যায়, *না + আস্তিক = নাস্তিক*। খুবই পরিস্কার যে, সঙ্গত কারণেই আস্তিকের আগে 'না' প্রত্যয় যোগ করে নাস্তিক শব্দটি তৈরী করা হয়েছে। আস্তিকরা যে ঈশ্বর/আল্লাহ/খোদা ইত্যাদি পরম সত্ত্বায় বিশ্বাস করে এ তো সবারই জানা। কাজেই নাস্তিক হচ্ছে তারাই, যারা এই ধরণের বিশ্বাস হতে মুক্ত। তাই সংজ্ঞানুযায়ী নাস্তিকতা কোন বিশ্বাস নয়, বরং 'বিশ্বাস হতে মুক্তি' বা 'বিশ্বাসহীনতা'। ইংরেজীতে নাস্তিকতার প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Atheist'। সেখানেও আমরা দেখছি theist শব্দটির আগে 'a' প্রিফিক্সটি জুড়ে দিয়ে Atheist শব্দটি তৈরী করা হয়েছে। অ্যাথিজমের উপর বহুল প্রচারিত গবেষণাধর্মী একটি ওয়েব সাইটে শব্দটির সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে এভাবে –

> Atheism is characterized by an absence of belief in the existence of gods. This absence of belief generally comes about either through deliberate choice, or from an inherent inability to believe religious teachings which seem literally incredible. It is not a lack of belief born out of simple ignorance of religious teachings.

সহজেই অনুমেয় যে, 'absence of belief' শব্দমালা চয়ন করা হয়েছে 'বিশ্বাস হীনতা'কে তুলে ধরতেই, উলটোটি বোঝাতে নয়। Gordon Stein তাঁর বিখ্যাত 'An Anthology of Atheism and Rationalism' বইয়ে নাস্তিকতার (Atheism) সংজ্ঞায়ন করতে গিয়ে বলেন,

> 'When we examine the components of the word 'atheism,' we can see this distinction more clearly. The word is made up of 'a-' and '-theism.' Theism, we will all agree, is a belief in a God or gods. The prefix 'a-' can mean 'not' (or 'no') or 'without'. If it means 'not,' then we have as an atheist someone who is not a theist (i.e., someone who does not have a belief in a God or gods). If it means 'without,' then an atheist is someone without theism, or without a belief in God'. (Atheism and Rationalism, p. 3. Prometheus, 1980)

আমরা যদি atheist শব্দটির আরো গভীরে যাই তবে দেখব যে, এটি আসলে উদ্ভুত হয়েছে গ্রীক শব্দ 'a' এবং 'theos' হতে। গ্রীক ভাষায় 'theos' বলতে বোঝায় ঈশ্বরকে, আর 'a' বলতে বোঝায় অবিশ্বাস বা বিশ্বাসহীনতাকে। সেজন্যই Michael Martin তাঁর 'Atheism: A Philosophical Justification' বইয়ে বলেন, 'According to its Greek roots, then, atheism is a negative view, characterized by the absence of belief in God.' (*"Atheism: A Philosophical Justification", p. 463.,Temple University Press, 1990*) '।

আসলে নাস্তিকতাকে 'না-ঈশ্বরে বিশ্বাসের' খাঁচায় পুরে বিশ্বসীর দলে ভিরানোর ব্যাপারটি খুবই অবিবেচনাপ্রসুত। ব্যাপারটাকে আরেকটু পরিস্কার করা যাক। ধরা যাক, এক মুক্ত-মনা যুক্তিবাদী ব্যক্তি ভুতে বিশ্বাস করেন না। তবে কি সেজন্য তিনি 'না-ভুতে' বিশ্বাসী হয়ে গেলেন? জওহের সাহেবের যুক্তি অনুযায়ী তাই হবার কথা। এভাবে দেখলে, প্রতিটি অপ-বিশ্বাস বিরোধিতাই তাহলে উলটোভাবে 'বিশ্বাস' বলে চালিয়ে দেওয়া যায়, তা সে ভুতই হোক, পঙ্খিরাজ ঘোড়াই হোক, অথবা ঘোড়ার ডিমই হোক। যিনি পঙ্খিরাজ ঘোড়া বা চাঁদের চড়কা-বুড়ীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, তিনি আসলে তাঁর সংশয় এবং অবিশ্বাস থেকেই তা করেন না, তার 'না-বিশ্বাসে' বিশ্বাসী হবার কারণে নয়। যদি ওই ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন ওগুলোতে তিনি বিশাস করেন না, তিনি হয়ত জবাবে বলবেন, ওগুলোতে বিশ্বাস করার মত যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নি বলে। কিংবা হয়ত বলতে পারেন, এখন পর্যন্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ওগুলো সত্ত্বার বাস্তব অস্তিত্ব কেউ প্রমাণ করতে পারেন নি, তাই ওসবে বিশ্বাস করার প্রশ্ন ওঠে না। এটি পরিস্কার যে, এই বক্তব্য থেকে তার মনের সংশয় আর অবিশ্বাসের ছবিটিই আমাদের সামনে মুর্ত হয়ে ওঠে, বিশ্বাসপ্রবণতাটি নয়। ঈশ্বরে অবিশ্বাসের ব্যাপারটিও কিন্তু তেমনি। নাস্তিকেরা তাদের সংশয় আর অবিশ্বাস থেকেই 'নাস্তিক' হন, 'না-ঈশ্বরে' বিশ্বাস থেকে নয়। সে জন্যই মুক্ত-মনা Dan Barker তাঁর বিখ্যাত 'Losing Faith in Faith: From Preacher to Atheist' গ্রন্থে পরিস্কার করেই বলেছেন - 'Basic atheism is not a belief. It is the lack of belief.' (পৃঃ ৯৯)। আসলে সত্যি বলতে কি, 'বিশ্বাস' ব্যাপারটিই দাড়িয়ে আছে একটি 'অপ-বিশ্বাসমূলক' প্রক্রিয়ার উপর। আমি সুরজিত বাবুর সাথে বিতর্কের সময় ড. হুমায়ুন আজাদের সাক্ষাৎকার থেকে একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি উদ্ধৃত করেছিলাম। উক্তিটি এখানেও খুব প্রাসঙ্গিক। ড. হুমায়ুন আজাদ তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন,

> 'যে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই, যার কোন অস্তিত্ব নেই যা প্রমাণ করা যায় না, তাতেমানুষকে বিশ্বাস করতে হয়। মানুষ ভুতে বিশ্বাস করে, পরীতে বিশ্বাস করে বা ভগবানে, ঈশ্বরে বা আল্লায় বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস সত্য নয়, এগুলোর কোন বাস্তব রূপ নেই। মানুষ বলে না, আমি গ্লাসে বিশ্বস করি বা পানিতে বিশ্বাস করি, মেঘে বিশ্বাস করি। যেগুলো নেই সেগুলোই মানুষ বিশ্বাস করে। বিশ্বাস একটি অপবিশ্বাসমূলক ক্রিয়া। যা সত্য, তাতে বিশ্বাস করতে হয় না; যা মিথ্যে তাতে বিশ্বাস করতে হয়। তাই মানুষের সব বিশ্বাস ভুল বা ভ্রান্ত, তা অপবিশ্বাস।'

নাস্তিকেরা সঙ্গত কারণেই এই সমস্ত প্রথাগত অপবিশ্বাসের বাইরে।

জনাব জওহের আরেকটি বিষয় ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, '...নাস্তিক্যবাদীরা যদি অঙ্ক কষে প্রমাণ করে দিতে পারতেন যে ঈশ্বর নামক কোন সত্ত্বার অস্তিত্ব আদপেই নাই- তা হলে অন্য কথা ছিল। এস্থলে কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন - প্রমাণ করার দায়িত্ব কি নাস্তিকদের একার? আস্তিকরাই প্রমাণ করুক যে ঈশ্বর আছেন। সে ক্ষেত্রে আমার যুক্তি হল, হ্যা **প্রমাণ করার দায়িত্ব নাস্তিকদের একার।** যুগে যুগে তাই হয়ে এসেছে।'

ধারণাটি ভুল, যুগে যুগে মোটেও তা হয়ে আসে নি। দর্শন শাস্ত্রে 'Burden of Proof' বলে একটি টার্ম প্রচলিত আছে যার মর্মার্থটি হল, যে কোন উটকো দাবীর যথার্থতা প্রমাণ করার দায়িত্ব দাবীদারের। আপনি যদি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হন, পরীতে বিশ্বাসী হন, জ্বীনে বিশ্বাসী হন, পূর্ব জন্মে বিশ্বাসী হন, অ্যালিয়নে বিশ্বাসী হন - আপনাকেই এই সমস্ত বিষয়ের অস্তিত্বের যথার্তা প্রমাণ করতে হবে; যারা এগুলোতে বিশ্বাস করে না, তাদের দায়িত্ব নয় 'অঙ্ক কষে' আপনার দাবীকে ভুল প্রমাণ করা কিংবা নস্যাৎ করা। যিনি ভুতে বিশ্বাস করেন অথচ ভুতের অস্তিত্বের প্রমাণ চাইলেই উলটে প্রতিপক্ষের কাঁধে দায়ভার চাপিয়ে দিয়ে বলেন, 'প্রমাণ করুন তো, ভুত বলে কিছু নেই' - তিনি আসলে নিজের অজান্তেই একটি যৌক্তিক ভ্রান্তিতে (logical fallacy) আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, দর্শনে যার একটি সম্ভ্রান্ত নাম আছে - 'Shifting the Burden of Proof'; সহজ বাংলায় যাকে বলে 'উদোর পিন্ডি বুধোর ঘারে' চাপানো। এই ভ্রান্তিটিকে দর্শন শাস্ত্রে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে-

> The burden of proof is always on the person asserting something. Shifting the burden of proof is the fallacy of putting the burden of proof on the person who denies or questions the assertion. The source of the fallacy is the assumption that something is true unless proven otherwise. *(Ref: The Atheism Web, Logic & Fallacies)*

বার্ট্রান্ড রাসেলকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল উনি ঈশ্বরের অনস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারবেন কিনা। তার জবাবে উনি বলেছিলেন:

> 'যদি আমাকে বলা হয় প্রমাণ করতে যে জিউস, পসেইডন, হেরা কিংবা অন্যান্য অলিম্পিয়ানদের অস্তিত্ব নেই, তাহলে হতভম্ব হয়ে বসে থাকা ছাড়া আমি কোন যুক্তি খুঁজে পাব না!'

জওহের সাহেব যে যুক্তিতে নাস্তিকদের উপর 'উদোর পিন্ডি' চাপিয়ে দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন সে একই যুক্তিতে তাহলে জিউস, হেরা, ব্রহ্মা, কালী, থর, পশুপতি, অশ্বত্থামা, ট্যাশ গরু, রামগরুরের ছানা সবকিছুকেই 'বিনা প্রমাণে' মেনে নিতে হয়, কারণ কেউ এখন পর্যন্ত 'অঙ্ক কষে' এগুলো যে আদপেই নেই - তা প্রমাণ করতে পারে নি। অবশ্যই না করতে পারার সঙ্গত একটি কারণও আছে। কারণ, দর্শন শাস্ত্র আমাদের শিখিয়েছে যে, নেতিবাচক আস্তিত্বের প্রস্তাবনা (negative existential proposition) কখনই প্রমাণযোগ্য নয়। ব্যাপারটি ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। স্কোপস মাঙ্কি ট্রায়াল খ্যাত চার্লস ব্যারো সেজন্যই বলতেন, "I don't believe in God, because I do not believe in Mother Goose"।

বিষয়টি আরেকটু খোলসা করা যাক। বার্টরান্ড রাসেল একবার তার 'Is There a God?' প্রবন্ধে বলেছিলেন*, আমাদের মধ্যে যদি কেউ যদি প্রস্তাব করে যে, মঙ্গল গ্রহ এবং পৃথিবীর মাঝে একটি কক্ষপথ

* Bertrand Russell, "Is There a God?" (1952), in The Collected Papers of Bertrand Russell, Volume 11: Last Philosophical Testament, 1943-68, ed. John G. Slater and Peter Köllner (London: Routledge, 1997), pp. 543-48.

বড়াবড় একটি চীনামাটির চায়ের পেয়ালা উপবৃত্তাকার পথে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, আর পেয়ালাটা আকার-আয়তনে এতই ছোট যে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র কিংবা মহাজাগতিক অন্যান্য উপকরণ দিয়েও তাকে সনাক্ত করা সম্ভব না – কেউ কি প্রমাণ করতে পারবে যে এই চীনামাটির পেয়ালা ঘুরবার অনুমানটি ভুল? সম্ভবত নয়। কিন্তু কোন সুস্থ মস্তিস্কের মানুষই অযথা – কথা নেই বার্তা নেই - পেয়ালা ঘুরবার এ ধরনের অনুমানটিকে বিবেচনায় আনবেন না, কিংবা খুব একটা আমল দেবেন না। বরং সবাই ভাববেন, যেই উজবুক দাবী করছে এরকম একটা পেয়ালা ঘুরছে, তাকেই বলুন না কেন বাপু সেটি প্রমাণ করতে! আসলে সেটাই কি স্বাভাবিক নয়? প্রমাণ করার দায়িত্ব কিন্তু দাবীদারের উপরই বর্তায়। কার্ল স্যাগান বলতেন – 'Extraordinary claims require extraordinary evidence'। কাজেই চীনামাটির চায়ের পেয়ালা ঘুরবার কাহিনীটি আমাদের কাছে যতই মজার লাগুক না কেন, এটি প্রমাণ করার দায়িত্ব তাঁর ঘারেই বর্তাবে, যিনি এমনতর 'Extraordinary' প্রস্তাবটি উত্থাপন করছেন।

বিজ্ঞান কখনোই মঙ্গলের চারিদিকে 'পরিভ্রমণরত চীনা মাটির পেয়লা' কিংবা 'টুথ ফেরি' অথবা 'পঙ্খিরাজ ঘোড়া'র অস্তিত্ব প্রমাণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। এবং করেনি সঙ্গত কারনেই। আমাদের মধ্যে কেউই হাজার হাজার, কোটি কোটি দেবতা, অপদেবতা, ভুত, ভগবান, শয়তান , রাক্ষস, খোক্কস, হুর-পরী ইত্যাদির অনস্তিত্ব প্রমাণ করার দায়ভার কখনোই অনুভব করেন না; এবং না করেই ওগুলোর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী থাকেন। সেটাই স্বাভাবিক। জওহের সাহেব যখন জিউস, অ্যাপেলো, আমোন রা, দুর্গা, কালী, মিথ্রা, থর কিংবা 'ফ্লাইং স্পেগেটি মন্সটার'কে মিথ বলে মেনে নিয়েছেন, আমি তার সেই মিথের তালিকায় আরেকটি অতিরিক্ত সত্ত্বার সংযোজন করেছি, আর সেটি হচ্ছে জওহের সাহেবের মনগড়া 'ঈশ্বর'।

জওহের সাহেব কোন ধরনের অংক কষে দেখালে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব মেনে নেবেন তা অবশ্য তিনি পরিস্কার করেন নি। কিন্তু তিনি নিজেই আবার তাঁর প্রবন্ধে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, আধুনিক কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্ব খুব ভালভাবে দেখিয়েছে যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টি হতে পারে নিতান্তই প্রাকৃতিক নিয়মে- কোন পরম পুরুষের হাতের ছোঁয়া ছাড়াই, স্বতস্ফুর্তভাবে। এর পরও নাস্তিকদের কাঁধে দায়িত্ব থাকে কিভাবে? বরং আমার তো মনে হয় বল এখন রয়ে গেছে আস্তিকদের কোর্টে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হলে তাদেরই বরং আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলোকে ভুল প্রমাণ করে বলতে হবে যে, না - এভাবে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে বিশ্বজগৎ কোনমতেই তৈরী হতে পারে না; ঈশ্বরের হাত লাগবেই। শুধুমাত্র আইনস্টাইনের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যাপারটি এড়িয়ে গেলে চলবে না।

প্রসঙ্গতঃ বলে নেওয়া ভাল যে, সব কিছুর পেছনে সৃষ্টিকর্তা থাকতে হবে, কিংবা সব ঘটনার পেছনেই কারণ থাকতে হবে, এটি স্বতঃ সিদ্ধ বলে ভাবে নেওয়ার আসলেই কোন যৌক্তিক কারণ নেই। আকাশে যখন 'সন্ধ্যার মেঘমালা' খেলা করে, কিংবা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসে সুচারু নক্সার হিমশৈল, অথবা একপশলা বৃষ্টির পর পশ্চিম আকাশে উদয় হয় বর্ণিল রংধনুর, আমরা সত্যই মুগ্ধ হই, বিস্মিত হই। কিন্তু আমরা এও জানি এগুলো তৈরী হয়েছে স্রষ্টা ছাড়াই পদার্থবিজ্ঞানের কিছু সূত্রাবলী অনুসরণ করে। এছাড়া পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে যারা গবেষণা করেন তারা সকলেই জানেন, রেডিও অ্যাকটিভ ডিকের মাধ্যমে আলফা

বিটা, গামা কনিকার উদ্ভব হয় প্রকৃতিতে কোন কারণ ছাড়াই, স্বতঃস্ফুর্তভাবে। এছাড়াও 'ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশন'-এর ঘটনাও একটি কারণবিহীন ঘটনা বলে পদার্থবিজ্ঞানের জগতে অনেক আগে থেকেই স্বীকৃত।

অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন যে, ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে শুন্য থেকে স্বতস্ফুর্তভাবে বিশ্বজগৎ তৈরী হওয়া কোন অসম্ভব বা অলৌকিক ব্যাপার নয়। এবং এভাবে বিশ্বজগৎ তৈরী হলে তা পদার্থবিজ্ঞানের কোন সূত্রকেই আসলে অস্বীকার করা হয় না। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসরণ করে শূন্য অবস্থা থেকে যে বিশ্বজগৎ তৈরী হতে পারে- এ ধারণাটি আসলে সর্বপ্রথম ব্যক্ত করেছিলেন নিউইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটির এডয়ার্ড ট্রায়ন, ১৯৭৩ সালে[†]। ১৯৮১ সালে মহাজাগতিক স্ফীতি তত্ত্বের (cosmic inflation) আবির্ভাবের পর থেকেই বহু তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী প্রাথমিক কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে মহাজাগতিক স্ফীতিকে সমন্বিত করে তাদের মডেল বা প্রতিরূপ নির্মাণ করেছেন। বহু বৈজ্ঞানিক জার্নালে সেগুলো প্রকাশিতও হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে এখানে কিছু সাম্প্রতিক পেপারের উল্লেখ করা যেতে পারে[‡] :

David Atkatz and Heinz Pagels, "Origin Of The Universe as a Quantum Tunneling Event" Physical review D25 (1982): 2065-73;

S.W. Hawking and I.G.Moss "Supercooled Phase Transitions in the Very Early Universe ", Physics letters B110 (1982):35-38;

Alexander Vilenkin, "Creation of Universe from Nothing" Physics letters 117B (1982) 25-28,

Alexander Vilenkin, "Quantum Origin of the Universe" Nuclear Physics B252 (1985) 141-152,

Andre Linde, "Quantum creation of the inflationary Universe," Letter Al Nuovo Cimento 39(1984): 401-405

Victor Stenger, The Universe: The Ultimate Free Lunch," European Journal of Physics 11 (1990) 236-243. ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃ স্ফুর্তভাবে শূন্য থেকে মহাবিশ্বের উদ্ভবের ধারণাটি যদি স্রেফ 'ননসেন্স'ই হত, তবে বৈজ্ঞানিক জার্ণালগুলোতে এই ধারণার উপর আলোকপাত করা পেপারগুলো সাম্প্রতিক সময়ে কখনই প্রকাশিত হত না। এ বিষয়ে আলোকপাত করে আমি আমার বই 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী'(অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৫) তে লিখেছি। এ ছাড়া এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়েও একাধিক প্রবন্ধে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে; বিদগ্ধ পাঠকেরা পড়ে দেখতে পারেন।

[†] E.P. Tryon, "Is the Universe a Vacuum Fluctuation?", Nature 246 (1973): 396-97.
[‡] For more popular level work, readers are requested to read Guth's Grand Guess (Discover, 2002) or "The self-reproducing Inflationary Universe" (Scientific American, 1998).

কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে একেবারে শুন্য থেকে মহাবিশ্ব উদ্ভবের ধারণা ছাড়াও আরো একটি ধারণা খুব সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞানীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছে। পল স্টেইনহার্ট এবং নেইল টুরক তাদের প্রস্তাবিত চক্রাকার বা সাইক্লিক মডেলে দেখিয়েছেন এ মহাবিশ্বের কোন শুরু নেই, শেষ নেই। এ এক চলমান 'এন্ডলেস ইউনিভার্স' (এ নিয়ে প্রথম অধ্যায়ের প্রবন্ধ 'ঈশ্বরই কি সৃষ্টির আদি বা প্রথম কারণ?' এবং 'মহাবিশ্ব ও ঈশ্বর : একটি দার্শনিক আলোচনা' দ্রঃ)। ভবিষ্যতের পর্যবেক্ষণলব্ধ গবেষণা থেকে হয়ত জানা যাবে স্বতঃ স্ফুর্তভাবে শূন্য থেকে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে মহাবিশ্বের ধারণাটি সঠিক, নাকি চক্রাকার অফুরন্ত মহাবিশ্বের ধারনাটি ঠিক। কিন্তু যেটিই ঠিক হোক না কেন ঈশ্বর নামক অনুকল্পটি যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় তা হয়ত প্রমাণিত হয়ে যাবে। কারণ আস্তিকতা-নাস্তিকতা বিবাদের সারাংশটি হবে এরকম –

আস্তিকঃ এই মহাবিশ্ব তৈরি করেছে কে? নিশ্চয় ঈশ্বর।
নাস্তিকঃ তা হলে সেই ঈশ্বরকে তৈরি করেছে কে?
আস্তিকঃ কেউ না। ঈশ্বর সয়ম্ভু; কিংবা হয়ত সব সময়ই ছিলেন।
নাস্তিকঃ তা হলে আমরাও বলতে পারি এই মহাবিশ্ব সয়ম্ভু (কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে উদ্ভুত) কিংবা মহাবিশ্বও হয়ত সবসময় ছিলো (চির অনন্ত সাইক্লিক ইউনিভার্স)।

দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে অদূর ভবিষ্যতে ঈশ্বর নামক অনুকল্পকে গ্রহণ না করেই মহাবিশ্বের উদ্ভব কিংবা অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি কিন্তু সে দিকেই ইঙ্গিত করছে।

আরো কিছু অঙ্ক কষা যাক। অঙ্ক কষে 'ঈশ্বর নেই' এটা প্রমাণ করতে চাওয়ার আগে জেনে নেওয়া ভাল যে, ঈশ্বরের কোন যুক্তিগ্রাহ্য সংজ্ঞা বাজারে আছে কিনা। কবি সাহিত্যিক থেকে শুরু করে ভাবুক দার্শনিকটি পর্যন্ত যে যার মত ঈশ্বরকে সংজ্ঞায়িত করেন। কেউ প্রেমিকার চোখে, কেউ বা রাত্রির জ্যোৎস্নায়, কেউ কবিতায়, কেউবা গানে, কেউ সুরা-সাকীতে, কেউ জনসেবায়, কেউ প্রকৃতিতে কিংবা কেউবা আবার সচিন তেন্ডুলেকরের ব্যাটিং-এ ঈশ্বরকে খুঁজে পান। এধরনের অব্যক্ত মানবিক আবেগ, উপমা, মনের ভাবগত প্রতিরেৈপকে সঠিক বা ভুল প্রমাণ করার কিছু নেই, বিজ্ঞান ওসব নিয়ে কাজও করে না। বিজ্ঞানের প্রয়োগ নিঁখুত বাস্তবতায়। যে সমস্ত বিষয় সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত নয়, সে গুলো নিয়ে বিজ্ঞানের কোন মাথাব্যথা নেই। ঈশ্বরের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা খুঁজতে গিয়ে ধর্মগ্রন্থগুলোর দিকে তাকালেও দেখা যায় সেখানে স্ববিরোধিতার ছড়াছড়ি। যেমন বাইবেলের ধারনা অনুযায়ী ঈশ্বর অদৃশ্য (Col. 1:15, ITi 1:17, 6:16), এমন একটি সত্ত্বা যকে কখনও দেখা যয় নি (John 1:18, IJo 4:12)। অথচ বাইবেলেরই বেশ কিছু চরিত্র যেমন মুসা (Ex 33:11, 23), আব্রাহাম, জেকব (Ge. 12:7,26:2, Ex 6:3) ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে। ঈশ্বর পরিস্কার করেই বাইবেলে বলেছেন – 'you cannot see my face, for no one can see me and live' (Ge 32:30)। অথচ, জেকব ঈশ্বরকে জীবন্ত দেখেছেন (Ge 32:30)। এগুলো

তো পরিস্কার স্ব-বিরোধীতা। ঠিক একই কথা বলা যায় হজরত মুহম্মদের 'মিরাজে'র ক্ষেত্রেও। আরজ আলী মাতুব্বর তার 'সত্যের সন্ধান' গ্রন্থে লিখেছেন,

> 'এ কথায় প্রায় সকল ধর্মই একমত যে, 'সৃষ্টিকর্তা সর্বত্র বিরাজিত'। তাহাই যদি হয়, তবে তাঁহার সান্নিধ্যলাভের জন্য দূরে যাইতে হইবে কেন? আল্লাহতা'লা কি ঐ সময় হযরত (দ.) - এর অন্তরে বা তাঁহার গৃহে, মক্কা শহরে অথবা পৃথিবীতেই ছিলেন না? পবিত্র কোরানে আল্লাহ বলিয়াছেন - 'তোমরা যেখানে থাক, তিনি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন' (সুরা হাদিদ - ৪)। মেরাজ সত্য হইলে এই আয়াতের সহিত তাহার কোন সঙ্গতি থাকে কি?'

আরও দেখা যায়, একটি ধর্মের ঈশ্বরের সাথে আরেকটি ধর্মের ঈশ্বরের বিস্তর ফারাক। এক ধর্মের ঈশ্বর কোরবানি করলে খুশি হন তো আরেক ধর্মের ঈশ্বর জীব হত্যাকে মহাপাপ মনে করেন। এক ধর্মের ঈশ্বরের কাছে মুর্তি পুজা বৈধ, আরেক ধর্মের ঈশ্বরের কাছে তা শিরকতুল্য অপরাধ। এক ধর্মের ঈশ্বরের কাছে শুয়োরের মাংস হারাম, আরেক ধর্মের ঈশ্বরের কাছে নয়। এক ধর্মের ঈশ্বরের কাছে গোহত্যা মহাপাপ হলেও, আরেক ধর্মের ঈশ্বরের কাছে তা উৎসব। এক ধর্মের ঈশ্বরের অনুসারীরা দাঁড়ি রাখায় পুন্য খুঁজলে আরেক ধর্মের অনুসারীরা খোঁজেন টিকি রাখায়! ধর্মগ্রন্থগুলোর বাণীগুলোকে অভ্রান্ত ধরে ঈশ্বরের সার্বজনীন সংজ্ঞা খুঁজতে গেলে তো মাথার সমস্ত চুল পড়ে যাবার দশা হবে! তারপরও ধর্ম-দর্শন নির্বিশেষে যে বেশিষ্ট্যগুলো দিয়ে ঈশ্বরকে সচরাচর মহিমান্বিত করা হয় সেগুলো সবই দেখা গেছে যুক্তির কষ্ঠিপাথরে খুবই ভঙ্গুর। যেমন, ঈশ্বরকে বলা হয় 'পরম দয়াময়' (all-loving) এবং সর্ব শক্তিমান (all-powerful or omnipotent), নিখুঁত (perfect), সর্বজ্ঞ (omniscient) ইত্যাদি। কিন্তু সর্বশক্তিমত্তা (omnipotence) এবং সর্বজ্ঞতা (omniscience) যে একসাথে প্রযোজ্য হতে পারে না তা যুক্তিবাদীদের দৃষ্টি এড়ায়নি। ক্যারেন ওয়েন্স তা সুন্দরভাবে নিম্নোক্ত পংক্তিতে তুলে ধরেন[§] –

Can Omniscient God, who
Knows the future, find
The omnipotence to
Change His future mind?

কথা হচ্ছে, ঈশ্বর যদি সর্বজ্ঞ বা 'অমনিসায়েন্ট' হন, তবে তিনি আগে থেকেই জানেন যে তিনি ভবিষ্যতের ঘটনায় হস্তক্ষেপ করে সেটি পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেন। ভবিষ্যৎ ঘটনা তিনি শেষ মুহূর্তে পরিবর্তন করতেই পারেন – কারণ তিনি সর্বশক্তিমান, আফটার অল! কিন্তু মুশকিল হল, তিনি কি করবেন তা অনেক আগে থেকেই জানার মানে হল শেষ সময়ে আকস্মিকভাবে মত পরিবর্তন করা তার পক্ষে অসম্ভব। আর তার পক্ষে কোন কিছু অসম্ভব মানেই হচ্ছে তিনি সর্বশক্তিমান নন।

ঈশ্বর যে সর্বশক্তিমান নন, তা নিচের প্রশ্নটির সাহায্যে সহজেই দেখানো যেতে পারে –

[§] Richard Dawkins, The God Delusion, Mariner Books; 1 edition (January 16, 2008) থেকে উদ্ধৃত।

যদি প্রশ্ন করা হয় -

'ঈশ্বর কি এমন কোন ভারী পাথরখন্ড তৈরি করতে পারবেন, যা তিনি নিজেই উঠাতে পারবেন না?'

এ প্রশ্নটির উত্তর যদি হ্যা হয় – তার মানে হচ্ছে ঈশ্বরের নিজের তৈরি পাথর নিজেই তুলতে পারবেন না, এর মানে তিনি সর্বশক্তিমান নন। আবার প্রশ্নটির উত্তর যদি না হয়, তার মানে হল, সেরকম কোন পাথর তিনি বানাতে পারবেন না, এটাও প্রকারান্তরে তার অক্ষমতাই প্রকাশ করছে। এ থেকে বোঝা যায়, অসীম ক্ষমতাবান বা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলতে কিছু নেই। দেখা গেছে, মানুষের কাছে যা যৌক্তিকভাবে অসম্ভব, তা ঈশ্বরও তৈরি করতে পারছেন না। ঈশ্বর পারবেন না চারকোনা বৃত্ত আঁকতে, ঈশ্বর পারবেন না কোন 'বিবাহিত ব্যাচেলর' দেখাতে কারণ এগুলো যৌক্তিকভাবে অসম্ভব।

ঈশ্বর যে পরম করুণাময় বা 'অল লাভিং' নন, তা বুঝতে রকেট সায়ন্টিস্ট হতে হয় না। আরজ আলী মাতুব্বর তার 'সত্যের সন্ধানে' গ্রন্থে বলেছেন,

> 'কোন ব্যক্তি যদি একজন ক্ষুধার্তকে অন্নদান ও একজন পথিকের মাল লুণ্ঠণ করে, একজন জলমগ্নকে উদ্ধার করে ও অন্য কাউকে হত্যা করে অথবা একজন গৃহহীনকে গৃহদান করে এবং অপরের গৃহ করে অগ্নিদাহ, তবে তাহাকে 'দয়াময়' বলা যায় কি? হয়ত তাহার উত্তর হইবে - 'না'। কিন্তু উপরোক্ত কার্যকলাপ সত্ত্বেও ঈশ্বর আখ্যায়িত আছেন 'দয়াময়' নামে। ... জীব জগতে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক বিদ্যমান। যখন কোন সবল প্রাণী দুর্বল প্রাণীকে ধরিয়া ভক্ষণ করে, তখন ঈশ্বর খাদকের কাছে দয়াময় বটে, কিন্তু তখন কি তিনি খাদ্য-প্রাণীটির কাছেও দয়াময়? যখন একটি স্বর্প একটি ব্যাঙকে ধরিয়া আস্তে আস্তে গিলিতে থাকে, তখন তিনি স্বর্পটির কাছে দয়াময় বটে। কিন্তু ব্যাঙটির কাছে তিনি নির্দয় নহেন কি? পক্ষান্তরে তিনি যদি ব্যাঙটির প্রতি সদয় হন, তবে সর্পটি অনাহারে মারা যায় না কি? ... কাহারো জীবন রক্ষা করা যদি দয়ার কাজ হয় এবং হত্যা করা হয় নির্দয়তার কাজ, তাহা হইলে খাদ্য-খাদকের ব্যাপারে ঈশ্বর সদয়ের চেয়ে নির্দয়ই বেশী। তবে কতগুন বেশী তাহা তিনি ভিন্ন অন্য কেউ জানে না, কেননা তিনি এক একটি জীবের জীবন রক্ষা করার উদ্দেশে অসংখ্য জীবকে হত্যা করিয়া থাকেন। কে জানে একটি মানুষের জীবন রক্ষর জন তিন কয়টি মাছ, মোরগ, ছাগল ইত্যাদি হত্যা করেন?... কেহ কেহ মনে করেন ঈশ্বর সদয়ও নহেন এবং নির্দয়ও নহেন। তিনি নিরাকার নির্বিকার ও অনির্বচনীয় এক সত্তা। যদি তাহা নাই হয়, তবে পৃথিবীতে শিশুমৃত্যু, অপমৃত্যু, এবং ঝড়, বন্যা, মহামারী, ভুমিকম্প ইত্যাদি প্রাণহানিকর ঘটনাগুলির জন্য তিনিই কি দায়ী নহেন?'

আরজ আলীর প্রশ্নমালা মানব মনের অন্তহীন সংশয়বাদী চিন্তাকেই তুলে ধরেছে সার্থকভাবে। গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাস (৩৪১-২৭০ বিসি) সর্বপ্রথম 'আর্গুমেন্ট অব এভিল' (Argument of Evil)-এর সাহায্যে 'ঈশ্বরের অস্তিত্বের' অসারতা তুলে ধরেন এভাবে :

ঈশ্বর কি অন্যায়-অবিচার-অরাজগতা নিরোধে ইচ্ছুক, কিন্তু অক্ষম?
তাহলে তিনি সর্বশক্তিমান নন।

তিনি কি সক্ষম, কিন্তু অনিচ্ছুক?
তাহলে তিনি পরম দয়াময় নন, বরং অপকারী সত্ত্বা।

তিনি কি সক্ষম এবং ইচ্ছুক -দুটোই?
তাহলে অন্যায়-অবিচার-অরাজগতা পৃথিবীতে বিরাজ করে কিভাবে?

তিনি কি সক্ষমও নন, ইচ্ছুকও নন?
তাহলে কেন তাঁকে অযথা 'ঈশ্বর' নামে ডাকা?

অকাট্য এই যুক্তি। বস্তুত 'The Oxford Companion to Philosophy' স্বীকার করেছে যে, সনাতন আস্তিকতার বিরুদ্ধে আর্গুমেন্ট অব এভিল বা 'মন্দের যুক্তি' সবচেয়ে শক্তিশালী মরণাস্ত্র, যা কেউই এখন পর্যন্ত ঠিকমত খন্ডন করতে পারেনি[**]। এ তো নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, প্লেগ, মহামারী, খড়া, বন্যা, সুনামীর মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে লক্ষ কোটি নিরপরাধ নর-নারী এবং শিশুর মৃত্যুর ব্যাপারে মানুষকে কোনভাবেই দায়ী করা চলে না। এ সমস্ত অরাজগতার অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে ঈশ্বর একটি অপকারী সত্ত্বা। কারণ 'সর্বজ্ঞ' ঈশ্বর আগে থেকেই জানতেন যে, সুনামীর ঢেউ আছড়ে পরে তার নিজের সন্তানদের হত্যা করবে, তাদের স্বজন হারা করবে, গৃহচ্যুত করবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, ঘর বাড়ি ধ্বংস করে এক অশুভ তান্ডব সৃষ্টি করবে। অথচ আগে থেকে জানা থাকা সত্ত্বেও সেসব প্রতিরোধে কোন ব্যবস্থাই তিনি নিতে পারেন নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় ঈশ্বর এক অক্ষম, নপুংশক সত্ত্বা বই কিছু নয়। এ বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে পল কার্জ তার 'ধর্মীয় দাবী সম্বন্ধে যে কারণে আমি সংশয়বাদী' প্রবন্ধের একটি অংশে 'আর্গুমেন্ট অব এভিল' নিয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া, এ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে 'স্বাধীন ইচ্ছা, মন্দ ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব' নামের প্রবন্ধটিতে লেখক অপার্থিব বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা আসলে পরস্পরবিরোধী।

মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা কিংবা সর্বশক্তিমত্তা যে পরস্পরবিরোধী তা অনেক আগেই দেখিয়েছেন আরজ আলী মাতুব্বরও। তিনি তাঁর 'সত্যের সন্ধান' গ্রন্থে বিধাতার 'সর্বশক্তিমত্তা'র দাবী খন্ডন করে লেখেন :

> 'বলা হয় যে, আল্লাহর অনিচ্ছায় কোন ঘটনা ঘটে না। এমনকি গাছের পাতাও নড়ে না। বিশেষত তাঁহার অনিচ্ছায় যদি কোন ঘটনা ঘটিতে পারে তাহা হইলে তাঁহার 'সর্বশক্তিমান' নামের সার্থকতা কোথায়? আর যদি আল্লাহর ইচ্ছাতেই সকল ঘটনা ঘটে, তবে জীবের দোষ বা পাপ কি?'

একই কথা একটু অন্যভাবে বলেছেন প্রবীর ঘোষ তার 'আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না' বইয়ে –

> 'আল্লাহ ঈশ্বর সব কিছুর নিয়ন্তা। সর্বশক্তিমান। তাঁর ইচ্ছে ছাড়া গাছের পাতাটি নড়ে না, মানুষের নিঃশ্বাস পড়ে না। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরই ভজনার জন্য। তাঁরই গুন-কীর্তনের জন্য। তাহলে সমস্ত মানুষকে দিয়ে তাঁর গুন-কীর্তন করাতে পারছেন না কেন? যুক্তিনিষ্ঠ মানুষগুলো ঈশ্বর, আল্লাহর গুণ-কীর্তন করা তো দূরের কথা, বরং অস্তিত্ব নিয়েই টানা হ্যাচড়া শুরু করেছে। ঈশ্বর এই সব যুক্তিবাদী মানুষদের কেন নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না? কেন ওইসব বে-আক্কেলদের মুখ থেকে ঈশ্বর-আল্লাহর ভজনা

[**] Ted Honderich, The Oxford Companion to Philosophy, Oxford University Press, USA (1995)

বের করতে পারছেন না? তব কি যুক্তিবাদীদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ঈশ্বরের নেই? যুক্তিবাদীদের কাছে ঈশ্বরজাতীয়দের সব জারিজুরিই কি তবে ফক্কা?'

তারপরও ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান আর দয়াময় জ্ঞানে পুজো করা চলছেই। চলছে প্রার্থনাগীত, স্তব স্তোত্র, ঈশ্বর-বন্দনা, ঈশ্বর-মাহাত্ম্য। এ চলবেই। তা চলুক আপত্তি নেই। কিন্তু একটি আগাগোরা পরস্পরবিরোধী এবং অসংজ্ঞায়িত বিষয়কে গনিতের সাহায্যে ভুল প্রমাণের আহ্বান জানানোর আগে জওহের সাহেব আরেকটু ভাবলে বোধ হয় ভাল করতেন।

জনাব মেজবাহউদ্দিন জওহের জীবন-মৃত্যু, আত্মা, লাইফফোর্স ইত্যাদি বিষয়ের ভুল ভাবে অবতারনা করে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাফাই গেয়েছেন। বস্তুতঃ আত্মা এবং লাইফ ফোর্স- দুটোই খুবই অবৈজ্ঞানিক শব্দ এবং বিজ্ঞান এগুলোর অস্তিত্বকে স্বীকার করার মত তথ্য প্রমাণ পায়নি। এগুলো আসলে মানুষের আদিম কল্পণা, অজস্র মিথের মতই কিছু মিথ। প্রবন্ধের আকারের কথা স্মরণ রেখে আমি এই মুহূর্তে এ বিষয়গুলো নিয়ে এখানে বিস্তারিত কিছু বলতে চাইছি না। জীবন-মৃত্যুর আধুনিক ধারণা সঙ্কলিত করে এবং আত্মার অস্তিত্ব ছাড়াই কিভাবে প্রাণকে ব্যাখ্যা করা যায় এ নিয়ে আমি এবং ফরিদ আহমেদ মিলে গতবছর একটি বই লিখেছিলাম – 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' (অবসর, ২০০৭)। সে বইয়ে আমরা দেখিয়েছিলাম, 'আত্মা' এবং 'লাইফ ফোর্স' বা 'জ়ীবন শক্তি' তত্ত্বের মূল হোতা আসলে প্লেটোর ভাববাদী দর্শন। এ দর্শন শিখিয়েছিলো যে, প্রাণী বা উদ্ভিদ কেউ জীবিত নয়, কেবলমাত্র ঈশ্বর যখন প্রাণী বা উদ্ভিদ দেহে আত্মা প্রবেশ করান, তখনই তাতে জীবনের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। প্লেটোর এই 'জীবনশক্তি তত্ত্ব' অ্যারিস্টটলের দর্শনের রূপ নিয়ে প্রায় দু'হাজার বছর মানব সভ্যতাকে শাসন করেছিল। পরবর্তীতে পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মমত এই দর্শনকে ধর্মের 'মূল উপজীব্য' হিসেবে আত্মস্থ করে নেয়। তাই অধিকাংশ মানুষ আজও আত্মা দিয়ে জীবন-মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার প্রাচীন প্রয়াস থেকে মুক্তি পায়নি। এ ছাড়া, আমাদের এই বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ে 'আত্মা বলে সত্যই কি কিছু আছে?' প্রবন্ধটিতে আমি আরো বিস্তারিতভাবে আত্মার অসারতা দেখিয়ে বলেছি - বস্তুতঃ স্নায়ুবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান, জেনেটিক্স আর বিবর্তনবিজ্ঞানের নতুন নতুন গবেষণা আত্মাকে আক্ষরিক ভাবেই রঙ্গমঞ্চ থেকে হটিয়ে দিয়েছে। একই অধ্যায়ে সংকলিত ফরিদ আহমেদ অনুদিত মাইকেল শারমারের 'পরকালের পরাবাস্তবতা' প্রবন্ধটিও আত্মা সংক্রান্ত মিথগুলো খন্ডন করেছে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে। আর সেজন্যই যুগল-সর্পিলের (ডিএনএ) রহস্যভেদকারী নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক বলেন, 'একজন আধুনিক স্নায়ু-জীববিজ্ঞানী মানুষের এবং অন্যান্য প্রানীর আচরণ ব্যাখ্যা করার জন্য আত্মা নামক ধর্মীয় ধারণার দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না'। ১৯২১ সালে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন একই ধারণা পোষণ করে বলেছিলেন, 'দেহবিহীন আত্মার ধারনা আমার কাছে একেবারেই অর্থহীন এবং অন্তঃসারশূন্য'। আগ্রহী পাঠকেরা এ বইয়ের ষষ্ঠ এবং সপ্তম অধ্যায়ের প্রবন্ধগুলো আরেকবার পড়ে দেখতে পারেন।

জওহের সাহেবের একটি উক্তি নিয়ে আমি এখানে কিছু কথা বলতে চাই। তিনি প্রাণের উদ্ভবের পেছনে ঈশ্বরের হাত থাকার প্রতি ইংগিত করে বলেছেন, 'কিন্তু বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির যুগেও ল্যাবরেটরীতে এ্যামিনো এসিড ও প্রোটিন একত্রে মিশিয়ে একটি জীব কোষ তৈরী করা যায় নি। মানুষের জ্ঞান এমন

পর্যায়ে পৌঁছেচে যে সে ক্লোন করে হুবহু আরেকটি মানুষ তৈরী করে দিতে পারে। অথচ অতি ক্ষুদ্র একটি জীবকোষ তৈরী করতে পারে না'। এই উক্তির মাধ্যমে জনাব জওহের সাহেব যেটি তুলে ধরেছেন তা হল বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা কোন ঈশ্বরের প্রমাণ নয়। তার আর্গুমেন্টটি এরকম :

** বিজ্ঞান এই মুহূর্তে ল্যাবরেটরীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটাতে পরছে না*
** অতএব প্রাণের উদ্ভবের পেছনে ঈশ্বরের একটা ভুমিকা আছে।*

এটি খুবই ভুল যুক্তি। বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সব যুগেই ছিল, থাকবে। আবার অনেক সীমাবদ্ধতাই বিজ্ঞান অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়েছে। বিজ্ঞান স্থির নয়, সতত গতিশীল। এটা ঠিক প্রাণের উদ্ভবের পেছনে বিরাজমান সৃষ্টির আদি নিয়ামকগুলোর অনেক কিছুই এখনও অজানা, অনেক কিছুই এই মুহূর্তে ব্যাখ্যাতীত, কিন্তু তা বলে এ নয় যে তার পেছনে ঈশ্বর নামক কোন কাল্পনিক সত্ত্বাকে আমাদের মেনে নিতে হবে। আজকের বিজ্ঞানীদের কাছে যা অজানা ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীরা তার সমাধান নিয়ে আসবেন, এবং তা তারা সমাধান করবেন বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেই। এভাবেই প্রতিনিয়ত আমাদের জ্ঞান এগুচ্ছে। অনেকেই এ ব্যাপারটি বুজতে চান না। যখনই কোন রহস্য সমাধান করতে তারা ব্যর্থ হন, এর পেছনে ঈশ্বরের ভুমিকাকে কল্পনা করে নেন। যখনই আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে কোন ফাঁক ফোকর দেখতে পান, এর ভিতরে ঈশ্বরকে গুজে দিয়ে এর একটা সহজ সমাধান দিতে সচেষ্ট হন। এধরনের আর্গুমেন্টকে দর্শনের পরিভাষায় বলে 'গড ইন গ্যাপস'। একটা সময় যখন বিজ্ঞান এতটা উন্নতির শিখরে ছিল না- আস্তিকেরা তাই যেখানে সেখানে ঈশ্বরকে আবিস্কার করতেন, যেখানেই রহস্য দেখতেন, বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা খুঁজে পেতেন, সেখানেই তারা ঈশ্বরকে পেয়ে যেতেন। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে যতই ফাঁক ফোঁকর ভরাট হয়ে যাচ্ছে, ততই তাদের ঈশ্বর লজ্জিত হয়ে নিজের পরিসীমা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রত্তর করে ফেলছে। একটা সময় মানুষ আকাশে খোদার আরশ আর স্বর্গের জন্য আলাদা স্থান চিহ্নিত করেছিল। কথিত আছে রাবন নাকি এই পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত সিঁড়ি বানানোরও পায়তারা করেছিলেন। তার মানে মানুষেরা মহাকাশে পৃথিবীর খুব কাছাকাছি জায়গাতেই স্বর্গ, নরক, খোদার আসনের কল্পণা করেছিল। কিন্তু টেলিস্কোপ যন্ত্রের আবিস্কারের পর আর গ্যালিলিও নিউটনের অবদানের পরে আর আকাশে খোদার আরশ আর খুঁজে পাওয়া যায় না, খোদা এখন লুকিয়ে পড়েছে 'বিজ্ঞানীরা কি ল্যাবরেটরীতে জীবকোষ তৈরী করতে পেরেছে' অথবা 'মানুষ কি মৃত্যুকে জয় করতে পেরেছে?' অথবা 'বিগ ব্যাং-এর আগে কি ছিল বিজ্ঞান কি তা ব্যাখ্যা করতে পারে?' - এধরনের কিছু আপ্তবাক্যের ভিতরে। বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরীর ফ্লাস্কে জীব কোষ তৈরী করতে না পারলেও ফ্লাস্কে কৃত্রিমভাবে আদিম পরিবেশের প্রতিরূপ সৃষ্টি করে অনেক আগেই দেখিয়েছেন যে, এ পৃথিবীতেই আদিম অবস্থায় অজৈব পদার্থ হতে জীবনের উৎপত্তি হয়েছে এবং তা কোন রহস্যজনক কারনে নয়, বরং জানা কিছু রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। নোবেল বিজয়ী রসায়নবিদ হ্যারলড সি ইউরে আর তার ছাত্র স্টেনলি এল মিলারের পরীক্ষাটি এক্ষেত্রে স্মর্তব্য। এভাবে তারা উচ্চ তাপে আর চাপে অজৈব পদার্থ থেকে এ্যামিনো এসিডের সন্ধান লাভ করেন যাকে জীবনের ভিত্তিমূল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এরপরেও বিজ্ঞানীরা এখনো এমন কোন জীবকোষ ল্যাবরেটরীতে তৈরী করতে পারেন নি যা ফ্লাস্কের গা বেয়ে নেমে এসে আমাদের চমকে দেবে। এর একটি প্রধান কারণ - 'সময়'। জীবকোষ তৈরীর পেছনে পৃথিবীতে বিবর্তন প্রক্রিয়া চলেছে কোটি কোটি বছর ধরে। আর এই কোটি বছরে পৃথিবীর আবহাওয়াও বদলেছে বিস্তর। যেমন,

আদিম পরিবেশে মুক্ত-অক্সিজেন ছিল না, আক্সিজেনহীন বিজারকীয় আবহাওয়া আক্সিজেনময় জারকীয় আবহমন্ডলে রূপান্তরিত হয় আজ থেকে দুই বিলিয়ন বছর আগে। আবার বর্তমান বিশ্বের বায়ুমন্ডলে আদিম পরিবেশের মত মিথেন ও এ্যামোনিয়া নেই, তার জায়গায় আছে জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, আনবিক নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও প্রচুর আনবিক অক্সিজেন। এই কোটি বছরের সময়-প্রসার আবহমন্ডলের পরিবর্তনকে ল্যাবরেটরীর ফ্লাস্কে বেঁধে রাখা যায় না। ক্লোন করতে কোটি কোটি বছর অপেক্ষার ঝক্কি নেই বলে ক্লোন করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু প্রোটিনয়েড, কো-এসারভেট, নিউক্লিয়িক এসিড, নিউক্লিয়প্রোটিন গঠনের সময়সাপেক্ষ ধাপ পেরিয়ে আদিম জীবকোষ বা ইউবায়োন্ট একারণেই এখনো তৈরী করা সম্ভব হয়নি। কৃত্রিম প্রাণ তৈরি করা না গেলেও বিজ্ঞানীরা প্রাণ তৈরির খুব কাছাকাছি অবস্থায় রয়েছেন, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। রসায়নাগারে কৃত্রিমভাবে ভাইরাস তৈরী করার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে অনেক দিন হল; পোলিও ভাইরাস সহ দশ হাজার প্রজাতির ভাইরাস তৈরী করা গেছে ভাইরাসের জিনোম পর্যবেক্ষন করে এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে। এক ব্যাক্টেরিয়া থেকে অন্য ব্যাক্টেরিয়াতে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়াও সফল হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই তৈরির পথে পাওয়া গেছে এমন কিছু তথ্য যা আমাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রে রীতিমত বিপ্লব এনেছে। ক্রেগ ভেন্টর সহ অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন আর আগামী দুই বছরের মধ্যেই আদি কোষ বা প্রোক্যারিওট আর দশ বছরের মধ্যে প্রকৃত কোষ বা ইউক্যারিওট বানানো সম্ভব হবে। একটা সময় আসবে যখন বিজ্ঞান এ ধরণের অন্তিম রহস্যের অনেকগুলোই সমাধান করে ফেলবে, তখন এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক ফোকর গুলো আপনা আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে, তারপরও হয়তো কিছু বিশ্বাসী মানুষ থাকবেন যারা ফাঁক ফোকর খুজে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেবেন :' হু, প্রাণ তো তৈরি করলে বাপু, সে প্রাণের বুদ্ধিসুদ্ধি তো আমার মত দেখছি না। আমার বুদ্ধি কেন তোমার বানানো প্রানীটার চেয়ে এত বেশি হল -নিশ্চয়ই বিজ্ঞান কখনো এগুলোর জবাব দিতে পারবে না। কাজেই ক্ষমা চাও ঈশ্বরের কাছে, নতজানু হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করো হে অবোধ শিশু ... "

আমি আমার লেখাটি শেষ করব নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের বিষয়টি আরেকটু পরিস্কার করে। অনেকেই সজ্ঞাতভাবে ধরে নেন যে, ধর্ম না থাকলে সমাজ উচ্ছন্নে যাবে। নাস্তিক হয়ে গেলে মানুষ খুন খারাপি রাহাজানি যা ইচ্ছে করতে পারে। কিন্তু এগুলো সবই সজ্ঞাত ধারণা, প্রমাণিত সত্য নয়। আমি এ বইয়ের পঞ্চম অধ্যেয়ে আমার 'নৈতিকতা কি শুধুই বেহেস্তে যাওয়ার পাসপোর্ট?' প্রবন্ধে অনেক পরিসংখ্যান হাজির করে দেখিয়েছি, ধার্মিক হলেই মানুষ সৎ হয় না, কিংবা নাস্তিক হলেই মানুষ পশু হয়ে যায় না। নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের ব্যাপারগুলো মুলতঃ নির্ভর করে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট এবং সমাজ সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর। আমার প্রবন্ধটি ছাড়াও অপার্থিব, ভিক্টর স্টেংগর এবং স্যাম হারিস তাদের নিজ নিজ প্রবন্ধে পরিস্কার করেছেন যে, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের ব্যাপারগুলো মোটেই ঈশ্বরপ্রদত্ত নয়, কিংবা ধর্ম থেকে উদ্ভুত নয়, বরং সমাজ বিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবেই এটি মানব সমাজের ভিত্তি হিসেবে গড়ে উঠেছে। কাজেই আমাদের সমাজে নীতি-নৈতিকতার অস্তিত্ব ঈশ্বর থাকার বা না থাকার কোন প্রমাণ নয়। জওহের সাহেব আরো মনে করেন, পরকালের অস্তিত্ব না থাকলে জীবন অর্থহীন। কারণ এ সমাজে অনেকেই চুরি দারী রাহাজানি করে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাজেই তার মতে একমাত্র ইনসাফ হতে পারে মরার পর ঈশ্বর যদি তার বিচার করে! কিন্তু এ তো দুর্বলের আর্তনাদ। মানুষের নির্মিত মানব-সমাজের উদ্ভুত সমস্যাবলীর কারনে সৃষ্ট ভুক্তভোগীদের সকল ঝুট ঝামেলার সমাধান করার জন্য বসে রয়েছেন পরম পিতা জাতীয় কেউ – আমার

আপনার সকল সমস্যা সমাধান করে দেবেনই তিনি, এজীবনে না হলেও পরজীবনে। ঈশ্বর যে মানুষের দুর্বলতাকে পুঁজি করে বেঁচে আছে তা এ থেকেই অনেকটা বোঝা যায়। এ ধরনের চিন্তা অনেকটা মদ খেয়ে জাগতিক দুঃখ ভুলে থাকার প্রচেষ্টা আর কি! বিখ্যাত লেখাক এবং নাট্যকার জর্জ বার্নাড শ তাই বলতেন, এ যেন বাস্তব সমস্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার তাগিদে মদ-খাওয়া মাতালের সাময়িক পরিতৃপ্তি -

> 'The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one.'।

সমাজে লালু ফালুরা দুর্নীতি করে বুক চিতিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তা থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হলে মানুষকেই রুখে দাঁড়াতে হবে। মানুষের মনেই জাগাতে হবে সচেতনতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা। তা না করে ইহকালের বিচারের দাবী পরজগতে ঠেলে দেওয়ার অর্থই হচ্ছে নিজের সাথে আর সমাজের সাথে বঞ্চনা। বঞ্চনা আর ঈশ্বর এখানে যেন একই সুতোয় গাঁথা। দরিদ্রের দারিদ্র্যের বাস্তবতাকে ভুলিয়ে রাখতে, শ্রমিকের ভাতের দাবীকে ধামাচাপা দিয়ে রাখতে, দুর্নীতির নহর অব্যাহত রাখতে ঈশ্বর নামক ধারণাটির আসলে জুড়ি নেই। তুমি বঞ্চিত, লাঞ্ছিত – গরাদ ভাঙ্গার গান কখনো গেও না, তার চেয়ে যাও ঈশ্বরের কাছে দু হাত তুলে প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই মরার পর তিনি বিচার করবেন। তুমি খেতে পাচ্ছ না? ঈশ্বরের কাছে নতজানু হও। নিশ্চয় তিনি তোমাকে বেহেস্তে নসিব করবেন; আর সেখানে তুমি পাবে অফুরন্ত খাবার। ঈশ্বরের ধুয়া তুলে সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে রাখা হয়, তাদের জানতে দেওয়া হয়না সমাজে অসাম্যের মূল উৎসটা আসলে কোথায়। শাসকেরা চায়না সাধারণ মানুষেরা কুসংস্কারের পর্দা সরিয়ে বুঝতে শিখুক – তাদের অসাম্যের কারণ কোন ভাগ্য নয়, পুর্বজন্মের কর্মফল নয়, নয় কোন অপদেবতার কারসাজি। শাসকেরা বরং চায় অসাম্য দূর করার জন্য সাধারণ মানুষেরা রাস্তায় না নেমে মন্দিরে মসজিদে যাক, প্রার্থনা আর দোয়ার নহর বইয়ে দিক, নতজানু হোক ঈশ্বর নামক অলীক চিন্তার কাছে; ভেবে নিক কোন এক ভাগ্য দোষে তার এই দুরবস্থা, এগুলো সব ঈশ্বরের পরীক্ষা – আর ঈশ্বরই তা সমাধান করে দেবেন পরকালে। এভাবে ভাবলে, ভাবাতে পারলে ত শাসক শ্রেনীরই অন্তহীন লাভ। আমরা নাস্তিকেরা, ইহজাগতিক মানুষেরা ইহকালের সমস্যাগুলোকে ইহকালেই সমাধান করার পক্ষপাতি, কোন অলীক সত্ত্বার কাছে প্রতাশা জলাঞ্জলি দিয়ে নয়। আর এটাই এখন সময়ের দাবী। আমার উত্তরটি শেষ করছি কবি নির্মলেন্দু গুনের 'নাস্তিক' কবিতাটির উদ্ধৃতি দিয়ে –

> নেই স্বর্গলোভ কিংবা কল্প-নরকের ভয়,
> অলীক সাফল্যমুক্ত কর্মময় পৃথিবী আমার৷
>
> চর্মচোখে যা যা দেখি, শারীরিক ইন্দ্রিয় যা ধরে,
> তাকেই গ্রহন করি৷ জানি, নিরাকার অপ্রত্যক্ষ
> শুধুই ছলনা, বিশ্বাস করি না ভাগ্যে, দেবতার বরে৷
>
> আমার জগৎ মুগ্ধ বাস্তবের বস্তুপুঞ্জে ঠাসা,
> তাই সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অতীন্দ্রিয় নয়৷

সেই শ্রেষ্ঠ মানব-সন্তান, যার মন মুক্ত ভগবান৷
আমার মস্তক নিত্য নত সেই নাস্তিকের তরে৷

ড. অভিজিৎ রায়, আমেরিকায় বসবাসরত গবেষক এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' ও 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। সাম্প্রতিক সম্পাদিত গ্রন্থ - 'স্বতন্ত্র ভাবনা'। ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com

উপসংহার

২০০১ সালের জুন মাসে ইন্টারনেটে আবির্ভাবের পর থেকেই বহু চিন্তা জাগানো লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের মুক্তমনা সাইটটি। তার থেকে বাছাই করা কিছু প্রবন্ধ নিয়ে '*বিজ্ঞান ও ধর্ম – সংঘাত নাকি সমন্বয়?*' বইটি সংকলিত করা হয়েছে। এর বাইরেও আলাদা করে বইটির জন্য লেখকদের কাছ থেকে লেখা আহবান করা হয়েছিল ২০০৮ সালের এপ্রিল মাসে। লেখা আহবানের পর অনেক লেখকদের কাছ থেকে খুব উৎসাহব্যাঞ্জক সারা পাওয়া গেছে। তাদের কাছ থেকে পাওয়া বহু সুচিন্তিত লেখায় ধন্য হয়েছে আমাদের এই সংকলনটি। আমি এই সংকলনের সকল লেখকদের ধন্যবাদ জানাই।

এই সংকলনের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যকার সম্পর্ক খোঁজা, জানা এবং বোঝার একটি চেষ্টা করা হয়েছে। সন্দেহ নেই, বিজ্ঞান এবং ধর্ম – দুটোর প্রভাব এবং গুরুত্ব আমাদের জীবন এবং সংস্কৃতিতে অপরিসীম। কিন্তু এদের মধ্যে সম্পর্কটি ঠিক কেমন? এ গ্রন্থের লেখকেরা তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং আধুনিক গবেষণালব্ধ সাক্ষ্য-প্রমানের সাপেক্ষে এটি অনুসন্ধান করেছেন। তিনভাবে এদের মধ্যকার সম্পর্ককে দেখা যেতে পারে। এক – বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে কোনই দ্বন্দ্ব নেই। এক সর্বজ্ঞ স্রষ্টার ইচ্ছেতে তৈরী হয়েছে আমাদের এই বিশ্বজগৎ, আর তারই নির্দেশে সব কিছু চলছে। এই মতের অনুসারীরা মনে করেন, বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিস্কারগুলোর ইঙ্গিত স্রষ্টা আগে থেকেই ধর্মগ্রন্থগুলোতে দিয়ে রেখেছেন। বিজ্ঞানীদের কাজ কেবল সেগুলো খুঁজে বের করা। এই মতাদর্শের দাবীদারেরা বিশ্বব্রহ্মান্ডকে দেখেন অনেকটা ঘড়ির মত করে। বিজ্ঞানীরা কেবল চোখের সামনে এই ঘড়িটিকে দেখতে পান, এর অন্তর্নিহিত কলকব্জার চাল-চলনকে প্রত্যক্ষ করেন আর চালচলনের সূত্রগুলো উদ্ঘাটন করেন, কিন্তু কখনোই কারিগরের সন্ধান পান না। এদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা আব্দুর রহমান বয়াতীর গানের মত ... 'মন আমার দেহ-ঘড়ি, সন্ধান করি ... কোন্ মিস্তরী বানায়েছে ...'।

দ্বিতীয় মতাদর্শের অনুসারীরা মনে করেন, বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, এবং তা খুব স্পষ্ট। এদের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টাকে এই দলের সমর্থকেরা অর্থহীন এবং বিভ্রান্তিকর বলে মনে করেন। এই মতের দাবীরারেরা মনে করেন, ধর্মের অনেক প্রাচীন ব্যাখ্যা এবং অভিমতকে বিজ্ঞান যুগে যুগে ভুল প্রমাণ করেছে বহুবার। এর মধ্যে পৃথিবীর বয়সের ভ্রান্ত অনুমান, ভু-কেন্দ্রিক তত্ত্ব, আত্মার অনুমান, সৃষ্টিতত্ত্বের নানা কেচ্ছা-কাহিনীসহ অনেক কিছুই আছে। এ বিপুল মহাবিশ্বকে ঘড়ির সাথে তুলনা করাকে তাঁরা অতি সরলীকরণ এবং ভ্রান্ত মনে করেন। তাঁরা মনে করেন, আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্বই কোন কারিগর ছাড়া মহাবিশ্বের অস্তিত্বকে আজ ব্যাখ্যা করতে পারে। মহাবিশ্বের কারিগরের ধারণাকে তারা দার্শনিকভাবেও ভ্রান্ত বলে তারা মনে করেন, কারণ সব কিছুর পেছনে একজন কারিগর থাকলে, সেই কারিগর কোত্থেকে উদ্ভুত হল সেটাও তো বলতে হবে। তারা আরো মনে করেন, ধর্মগ্রন্থগুলোতে কোন আধুনিক বিজ্ঞান নেই, বরং আছে আধুনিক বিজ্ঞানের নামে চতুর ব্যাখ্যা এবং গোঁজামিল। সেজন্যই, ধর্মের কাছে বিজ্ঞানের কখনো দারস্থ হতে হয় না, বরং ধর্মবাদীরাই আজ প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের পর নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থের সাথে জুড়ে

দিতে মুখিয়ে থাকে। কারণ ধর্মবাদীরা জেনে গেছে, ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান ঠিকই টিকে থাকতে পারবে, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ছাড়া ধর্মগুলো বেঁচে থাকার আর কোন অক্সিজেন খুঁজে পাচ্ছে না।

তৃতীয় আরেকটি মত আছে। এই মতাদর্শের অনুসারীরা মনে করেন বিজ্ঞান এবং ধর্মের অবস্থান আলাদা দুটি বলয়ে। এদের মতে, বিজ্ঞান এবং ধর্ম দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করে। বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক সূত্রের সাহায্যে প্রাকৃতিক জগতকে ব্যাখ্যা করে, আর ধর্ম নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের চর্চা করে। সহজ কথায় বিজ্ঞানের কাজ-কর্ম যন্ত্রপাতির মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য যা আমাদের যৌক্তিক এবং বৌদ্ধিক জ্ঞানকে প্রতিনিয়ত ত্বরান্বিত করে; আর ধর্মের কাজ মানুষের আত্মিক উন্নতিসাধন। যতক্ষণ বিজ্ঞান এবং ধর্ম পরস্পর আলাদা থেকে ভিন্ন ভিন্ন বলয়ে অবস্থান করে, ততক্ষণ বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। ঝামেলা লাগে তখনই যখন এই দুই ভিন্ন বলয়ের অধিবাসীরা একে অপরকে অতিক্রম করতে চায়। যেমন, বিজ্ঞানীরা যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে 'আত্মার ওজন' পরিমাপ করতে যান, কিংবা ধর্মবাদীরা যখন 'সৃষ্টিতত্ত্ব'কে কিংবা 'বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প'কে বিজ্ঞানের পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে চান ইত্যাদি। এই দলের সদস্যরা মনে করেন, বিজ্ঞান এবং ধর্মকে আলাদা বলয়ে আটকে রাখতে পারলেই তাদের মধ্যে সংঘাত এড়ানো সম্ভব।

এই তিনটি দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষে-বিপক্ষে বহু প্রবন্ধ এই বর্তমান সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ ছাড়াও এসেছে নানা ধরনের বৈচিত্রময় বিষয়ানুগ রচনা। বিজ্ঞান কি ঈশ্বরকে পেয়ে গেছে? কিংবা মহাবিস্ফোরণ, সূক্ষ-সমন্বয় কিংবা নৃতাত্ত্বিক যুক্তগুলো কি স্রষ্টা থাকার আদৌ কোন যৌক্তিক প্রমাণ? এ সংকলনের সংশয়বাদী লেখকদের অধিকাংশই এই ধরনের সিদ্ধান্তের বিপরীতে রায় দিয়েছেন। প্রায়শঃই বলা হয়, এক মহারহস্যময় 'অদ্বৈত বিন্দু' থেকে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু এই বিস্ফোরণ কেন হয়েছে বা এই বিস্ফোরণের আগে কি ছিল – বিজ্ঞান নাকি এগুলো প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে অক্ষম - এ কথা বলেই বিস্ফোরণের পেছনে এক স্রষ্টা থাকার প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করা হয়। বলা হয়, সব কিছুর পেছনে স্রষ্টা আছে, কাজেই মহাবিশ্বের পেছনেও একজন স্রষ্টা আছেন। সবকিছুর পেছনে স্রষ্টা থাকলে ঈশ্বরের পেছনে কেন কোন স্রষ্টা থাকবে না ব্যাপারটি অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য। অবশ্য বিশ্বাসীদের মতে, এই ধরণের প্রশ্ন ভ্রান্ত। এই প্রশ্ন যদি ভ্রান্তই হয়, তবে মহাবিশ্বের পেছনে একটি মাত্র কারণের সন্ধান করা এবং কারণটিকে 'অপার্থিব লেবেল' এঁটে দিয়ে একে ঈশ্বর বানানো কতটা অভ্রান্ত? কিভাবে বোঝা গেল, মহাবিশ্বের অস্তিত্বের পেছনে কোন কারণ থেকে থাকলে সেটা কখনোই প্রাকৃতিক কারণ হতে পারবে না, ঈশ্বর নামক এক পরাক্রমশালী 'সত্ত্বাই' হতে হবে? আর এধরনের সত্ত্বা থেকে থাকলে তিনি কি আমাদের প্রার্থনায় সাড়া দেন? প্রার্থনায় সাড়া দেওয়ার কোন পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ কি কোথাও আছে? আর মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা ছাড়া যদি কিছুই ঘটবার উপায় না থাকে তাহলে পাপপুণ্যের সকল দায়ভার কেন মানুষকেই বহন করতে হবে কেন, এটিও সমান যৌক্তিক প্রশ্ন – যা প্রতিটি যুগের চিন্তাশীল দার্শনিকেরা করে এসেছেন। সর্বজ্ঞ স্রষ্টার ইচ্ছেতেই যদি জগৎ তৈরি হয়ে থাকে, তা হলে দুর্ভিক্ষ, খরা, মহামারী, সুনামী, বন্যা কিংবা দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ প্রাণহানির দায়-দায়িত্ব ঈশ্বর নেবেন না কেন? নিজের সৃষ্টি নিয়ে এধরনের 'ছেলে খেলা' - এই যে লক্ষ কোটি মানুষের মৃত্যু কিংবা ইতিহাসের পরিক্রমায় কোটি কোটি (কারো কারো মতে প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগ) প্রজাতির বিলুপ্তি কতটা তাঁর সৃষ্টির 'সূক্ষ সমন্বয়' (Fine Tuning) কিংবা 'বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনার'

(Intelligent Design) দিকে নির্দেশ করে? এ বিষয়গুলো নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা করা ছাড়াও এ গ্রন্থে এসেছে মহাবিশ্ব, পরিকল্পনা বা ডিজাইন নিয়ে আলোচনা, ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং মৌলবাদ প্রসঙ্গ, ধর্মের উৎস এবং অলৌকিকতার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, ধর্ম নারী এবং সমকামিতা প্রসঙ্গ, অজ্ঞেয়বাদ, সংশয়বাদ, যুক্তিবাদ, আস্তিকতা ও নাস্তিকতা নিয়ে নানা ধরনের তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদি। পদার্থবিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানের আধুনিকতম তত্ত্ব এবং তথ্যের আলোকে মহাবিশ্ব এবং জীবনের অস্তিত্বের অনুসন্ধান করা হয়েছে, নির্দেশ করা হয়েছে আধুনিকতম দার্শনিক চিন্তাভাবনা এবং সমস্যাগুলোর প্রতিও। নৈতিকতা জিনিসটা পরম নাকি আপেক্ষিক, কিংবা ধর্মই কি নৈতিকতার একমাত্র উৎস, কিংবা সমাজে গড়ে ওঠা মূল্যবোধগুলো সব ঈশ্বর প্রদত্ত কিনা – এ ব্যাপারগুলোও আলোচিত হয়েছে সুবিস্তৃত পরিমন্ডলে। আমাদের জানা মতে বাংলা ভাষায় এ ধরণের চিন্তার উদ্রেগকারী গ্রন্থ এই প্রথম। বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের মুক্তমনে গ্রন্থটি পাঠ করার অনুরোধ রইলো।